চিত্র-সূচী

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

বুদ্ধদেব, যশোধরা ও বালল।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩২৯

১ম সংখ্যা

মুক্তধারা

[উত্তরকূট পার্ব্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর-দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আম-বাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝরণাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্ত্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদল সমস্তদিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারো হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারো হাতে শঙ্খ, কাহারো ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।]

গান

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর।

জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শঙ্কর শঙ্কর।

[সন্ন্যাসীদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল। পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ। উত্তর-কূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল,—

আকাশে ওটা কি গড়ে' তুলেচে? দেখ্‌তে ভয় লাগে।

নাগরিক

জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

পথিক

কিসের যন্ত্র?

নাগরিক

আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে' যেটা তৈরি করছিল, সেটা ঐ ত শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক

যন্ত্রের কাজটা কি?

নাগরিক

মুক্তধারা ঝরণাকে বেঁধেচে।

পথিক

বাবারে! ওটাকে অসুরের মাথার মত দেখাচ্চে, মাংস নেই, চোয়াল খোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে' দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক

আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুৎ আছে, ভাবনা কোরো না।

পথিক

তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতর সূর্য্যতারার সাম্‌নে মেলে রাখ্‌বার জিনিষ নয়, ঢাকা দিতে পার্‌লেই ভাল হ'ত। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, যেন দিন-রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্চে।

নাগরিক

আজ ভৈরবের আরতি দেখ্‌তে যাবে না?

পথিক

দেখ্‌ব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই ত এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতর বাধা দেখি নি। হঠাৎ ঐটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠ্‌ল—ও যে অমন করে' মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্দ্ধার মত দেখাচ্চে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্চে না।

[প্রস্থান।

[একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ। একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে।]

স্ত্রীলোক

সুমন! আমার সুমন! (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার সুমন এখনো ফির্‌লো না! তোমরা ত সবাই ফিরেচ।

নাগরিক

কে তুমি?

স্ত্রীলোক

আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার সুমন!

নাগরিক

তার কি হয়েচে বাছা?

অম্বা

তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেচে।

পথিক

তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধ্‌তে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা

আমি শুনেচি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ঐ গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখ্‌তে পাই নে।

পথিক

কেঁদে কি হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে। আজ আমাদের বড় দিন, তুমিও চল।

অম্বা

না বাবা, সেদিনও ত ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পূজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখ আমি বলি তোমাকে, আমাদের পূজো বাবার কাছে পৌঁচচ্চে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্চে।

নাগরিক

কে নিচ্চে?

অম্বা

যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল যে। সে যে কে এখনো ত বুঝ্‌লুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন!

[উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।]

দূত

যন্ত্ররাজ-বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি

কি তাঁর আদেশ?

দূত

এতকাল ধরে' তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরণাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেচ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়্ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি

তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েচে।

দূত

শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনো এ-খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না, যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েচেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি

দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েচেন, আমাকে দিয়েচেন জলকে বাঁধ্বার শক্তি।

দূত

তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের ক্ষেত—

বিভূতি

চাষের ক্ষেতের কথা কি বলচ?

দূত

সেই ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি

বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে' মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষীর কোন্ ভুট্টার ক্ষেত মারা যাবে সে কথা ভাব্বার সময় ছিল না।

দূত

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করচেন এখনো কি ভাব্বার সময় হয় নি?

বিভূতি

না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাব্চি।

দূত

ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি

না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত

অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি

অভিশাপ! দেখ, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েচি। তারা ত অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েচে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত

যুবরাজ বল্চেন কীর্ত্তি গড়ে' তোল্বার গৌরব ত লাভ হয়েচেই, এখন কীর্ত্তি নিজে ভাঙ্বার যে আরো বড় গৌরব তাই লাভ কর।

বিভূতি

কীর্ত্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙ্বার অধিকার আর আমার নেই।

দূত

যুবরাজ বল্চেন ভাঙ্বার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি

স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূত

তিনি বলেন—উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি

যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে বোলো আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আল্গা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূত

ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যেসব ছিদ্রপথ থাকে সে কারো চোখে পড়ে না।

বিভূতি (চমকিয়া)

ছিদ্র ? সে আবার কি ? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান ?

দূত

আমি কি জানি ! যাঁর জান্‌বার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

[দূতের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া —

১

বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি ত বেশ লোক ! কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে' এসেচ টেরও পাইনি।

২

সে ত ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন্ ভিতরে ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে' যায় বোঝাই যায় না। সেই ত আমাদের চবুয়াগাঁয়ের ন্যাড়া বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেসগুরুর কানমলা খেলে, আর কখন্ সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এত বড় কাণ্ডটা করে' বস্‌ল।

৩

ওরে গবৃক্ষ, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি ? মালাগুলো বের কর, পরিয়ে দিই।

বিভূতি

থাক্ থাক্ আর নয়।

৩

আর নয় ত কি ? যেমন তুমি হটাৎ মস্ত হয়ে উঠেচ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মত হটাৎ লম্বা হয়ে উঠ্‌ত আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক মানাত।

২

ভাই, হরিশ ঢাকী ত এখনো এসে পৌছল না !

১

বেটা কুঁড়ের সর্দ্দার, ওর পিঠের চাম্‌ড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—

৩

সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজবুৎ।

৪

মনে করেছিলুম বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন !

৫

ভালই হয়েচে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ ! পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৩

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ ! আমাদের লম্বু এক-একটা কথা বলে ভাল ! দশরথ !

৫

সাধে বলি ! ছেলের বিয়েতে ঐ রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম। যত চড়েচি তার চেয়ে টেনেচি অনেক বেশি !

৪

এক কাজ কর ! বিভূতিকে কাঁধে করে' নিয়ে যাই !

বিভূতি

আরে কর কি ! কর কি !

৫

না, না, এই ত চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেচ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েচে।

[কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল।]

সকলে

জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয় !

গান

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র !

তুমি চক্রমুখরমন্ত্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ
 ধ্বংস-বিকট দন্ত !
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
 বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
 অচল-চলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ়
 ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
 লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
 ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
 ইন্দ্রজাল তন্ত্র।

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল।

[উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

রণজিৎ

শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই ত বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে' বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে' দিলে। কিন্তু মন্ত্রী তোমার ত তেমন উৎসাহ দেখ্‌চিনে। ঈর্ষা ?

মন্ত্রী

ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ

তাতে ফল হল কি ? দুবছর খাজনা বাকি। এমনতর দুর্ভিক্ষ ত সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে' রাজার প্রাপ্য ত বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী

খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিষ আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্য্যে ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখ্‌বেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে।

রণজিৎ

তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেচ উপরে চড়ে' বসে' নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।—এ কথা বল নি ?

মন্ত্রী

বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিৎ

যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।

মন্ত্রী

কেন মহারাজ ?

রণজিৎ

যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী

মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলচেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি হয়ত কোন সূত্রে জান্‌তে পেরেচেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝরণাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেচে। তাই তাঁকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে—

রণজিৎ

তা ত জানি—ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরণাতলায় গিয়ে শুয়ে থাক্‌ত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হয়েচে

অভিজিৎ, এখানে কেন ?" ও বল্লে, "এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুন্‌তে পাই।"

মন্ত্রী

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "তোমার কি হয়েচে যুবরাজ ? রাজবাড়ীতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখ্‌তে পাইনে কেন ?" তিনি বল্লেন, "আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌচেচে।"

রণজিৎ

ঐ ছেলের যে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্চে।

মন্ত্রী

যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিৎ

ভুল করেচেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলি আমার ক্ষতি হচ্চে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসঙ্কটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠ্‌বে যে।

মন্ত্রী

অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ

কিন্তু এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ঐ যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠীসুদ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধর্‌তে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী

মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ কর্‌তে সাহস করিনে। কিন্তু জানেন ত এমন সব দুর্য্যোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ

আচ্ছা সেজন্যে চিন্তা কোরো না।

মন্ত্রী

আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা কর্‌তে বলি।

[প্রতিহারীর প্রবেশ।]

প্রতিহারী

মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে।

[প্রস্থান।

রণজিৎ

ঐ আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্চে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ।—ও কিসের শব্দ ?

মন্ত্রী

ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েচে।

[ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান—

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর শঙ্কর।

[প্রস্থান।

[রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন। তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ।]

রণজিৎ

প্রণাম ! খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আস্‌বে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিনি।

বিশ্বজিৎ

উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেচি।

রণজিৎ

তোমার এই দুর্ব্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ

কি নিয়ে মহোৎসব ? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে

দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্চেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন ?

রণজিৎ

শত্রু দমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ

মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই ?

রণজিৎ

যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েচেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে' তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ

তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ

খুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজের বলে' গ্রহণ করতে পারচে না।

বিশ্বজিৎ

আমার শিক্ষায় ? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না ? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্ব্বনাশ করে' সে বিদ্রোহ আমি দমন করিনি ? শেষে কখন ঐ বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল—আলোর মত এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে' দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ঐ উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও ?

রণজিৎ

মুক্তধারার ঝরণাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল একথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বুঝি ?

বিশ্বজিৎ

হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর সোনালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি দেখ্‌চ, ভাই ?" সে বল্লে, "যেসব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্চি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে তখনি মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেচে, ওকে ধরে' রাখবে কে ? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বল্লুম, "ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।"

রণজিৎ

এতক্ষণে বুঝলুম।

বিশ্বজিৎ

কি বুঝলে ?

রণজিৎ

এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে। সেইটেই স্পর্দ্ধা করে' দেখাবার জন্যে নন্দিসঙ্কটের পথ সে খুলে দিয়েচে।

বিশ্বজিৎ

ক্ষতি কি হয়েচে ? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই—যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ

খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য্য রেখেচি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে' যাও।

বিশ্বজিৎ

আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব। [প্রস্থান।

অম্বার প্রবেশ (রাজার প্রতি)

ওগো তোমরা কে ? সূর্য্য ত অস্ত যায়—আমার সুমন ত এখনো ফিরল না।

রণজিৎ

তুমি কে ?

অম্বা

আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই ? সুমন কি তবে এখনো চলেচে, কেবলি চলেচে, পশ্চিমে গৌরীশিখর

পেরিয়ে যেখানে সূর্য্য ডুব্‌চে, আলো ডুব্‌চে, সব ডুব্‌চে?

রণজিৎ

মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী

হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিৎ (অম্বাকে)

তুমি খেদ কোরো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েচে।

অম্বা

তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধে-বেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ

নেবে এল। সেই সন্ধে এখনো আসে নি।

অম্বা

তোমার কথা সত্যি হোক্, বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ব। সুমন!

[প্রস্থান।

[একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল।]

গুরু

খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখ্‌চি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর!

ছাত্রগণ

জয় রাজরা—

গুরু

(হাতের কাছে দুই একটা ছেলেকে থাব্‌ড়া মারিয়া)

—জেশ্বর!

ছাত্রগণ

জেশ্বর!

গুরু

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ

শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু (ঠেলা মারিয়া)

পাঁচবার।

ছাত্রগণ

পাঁচবার।

গুরু

লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু

উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ

উত্তরকূটা—

গুরু

—ধিপতির

ছাত্রগণ

ধিপতির—

গুরু

জয়।

ছাত্রগণ

জয়।

রণজিৎ

তোমরা কোথায় যাচ্চ?

গুরু

আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্চি আনন্দ কর্‌তে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব কর্‌তে শেখে তার কোন উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাইনে।

রণজিৎ

বিভূতি কি করেচে এরা সবাই জানে ত?

ছেলেরা (লাফাইয়া হাততালি দিয়া)

জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে' দিয়েচেন।

রণজিৎ

কেন দিয়েচেন?

ছেলেরা (উৎসাহে)

ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ

কেন জব্দ করা?

ছেলেরা

ওরা যে খারাপ লোক!

রণজিৎ

কেন খারাপ?

ছেলেরা

ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ

কেন খারাপ তা জান না?

গুরু

জানে বই কি, মহারাজ। কি রে, তোরা পড়িস্ নি—বইয়ে পড়িস্ নি—ওদের ধর্ম্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা

হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম্ম খুব খারাপ।

গুরু

আর ওরা আমাদের মত—কি বল্ না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা

নাক উঁচু নয়।

গুরু

আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য্য কি প্রমাণ করে' দিয়েচেন—নাক উঁচু থাক্‌লে কি হয়?

ছেলেরা

খুব বড় জাত হয়।

গুরু

তারা কি করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা

হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু

উত্তরকূটের মানুষ কোনো দিন যুদ্ধে হেরেচে জানিস্?

ছেলেরা

কোনো দিনই না।

গুরু

আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্‌জিৎ দু'শো তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো দক্ষিণী বর্ব্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা

হাঁ দিয়েছিলেন।

গুরু

নিশ্চয়ই জান্‌বেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠ্‌বে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড় দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলিনে। আমরাই ত মানুষ তৈরী করে' দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কি পান আর আমরাই বা কি পাই তুলনা করে' দেখ্‌বেন।

মন্ত্রী

কিন্তু ঐ ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার

গুরু

বড় সুন্দর বলেচেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার! আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড় দুর্ম্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী

আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা কর্‌ব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান করিল।

রণজিৎ

তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী

পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এইসব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে' দেওয়া গেচে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে' চলেচে। বুদ্ধি বেশি থাক্‌লে কাজ কলের মত চলে না।

রণজিৎ

মন্ত্রী, ওটা কি, আকাশে?

মন্ত্রী

মহারাজ, ভুলে যাচ্চেন, ওটাই ত বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ

এমন স্পষ্ট ত কোনো দিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী

আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেচে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্চে।

রণজিৎ

দেখেচ, ওর পিছন থেকে সূর্য্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেচেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মত দেখাচ্চে। অতটা বেশি উঁচু করে' তোলা ভাল হয় নি।

মন্ত্রী

আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েচে মনে হচ্চে।

রণজিৎ

এখন মন্দিরে যাবার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ]

১

দেখ্‌লি ত, আজকাল বিভূতি আমাদের কি রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘসে' ফেল্‌তে চায়। একদিন বুঝ্‌তে পার্‌বেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড় হয়ে উঠ্‌লে ভাল হয় না।*

২

তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেচে বটে।

১

আরে রেখে দে; তোরা ওকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচিস। ঐ যে বাঁধটি বাঁধ্‌তে ওর জিব বেরিয়ে পড়েচে ওটা কিছু না হবে ত দশবার ভেঙেচে।

৩

আবার যে ভাঙ্‌বে না তাই বা কে জানে?

১

দেখেচিস্ ত বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?

২

কেন, কেন, কি হয়েচে?

১

কি হয়েচে? এটা জানিসনে? যে দেখ্‌চে সেই ত বল্‌চে—

২

কি বল্‌চে ভাই?

১

কি বল্‌চে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্‌গেস্ কর্‌তে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কি বল্‌ব।

২

তবু ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বল্ না—

১

রঞ্জন, তুই অবাক কর্‌লি। একটু সবুর কর্ না, পষ্ট বুঝ্‌বি হঠাৎ যখন একেবারে—

১

সর্ব্বনাশ! বলিস কি দাদা? হঠাৎ একেবারে?

১

হাঁ ভাই, ঝগ্‌ড়ুর কাছে শুনে নিস্। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেচে।

২

ঝগ্‌ড়ুর ঐ গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে' বসে!

৩

আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা কিছু বিদ্যে সব—

১

আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্ম্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মত গুণী—কত বড় মাথা—ওরে বাসরে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরীব না খেতে পেয়েই মারা গেল!

৩

শুধুই কি না খেতে পেয়ে?

আরে না খেতে পেয়ে কি কারো দাঁতের দেওয়া কি খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কি ? আবার কে কোন্ দিক থেকে—নিন্দুকের ত অভাব নেই ? এ দেশের মানুষ যে কেউ কারো ভালো সইতে পারে না।

২

তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্তু—

১

আহা, তা হবে না কেন ? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্! ঐ চবুয়া গাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার নাম শুনেচিস্ ত ?

২

আরে বাস্‌রে! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে ? তিনি তৎসেই—ঐ যে কি বলে—

৩

হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নস্যি তৈরি করার এত বড় ওস্তাদ এ মুল্লুকে হয় নি। তাঁর হাতের নস্যি না হলে রাজা শক্রজিতের একদিনও চল্‌ত না।

৩

সেসব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই ত বস্‌ব তার ডাইনে।

নেপথ্যে

যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও!

২

ঐ শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েচে।

[বটুকের প্রবেশ, গায়ে ছেঁড়া কম্বল,
হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো।]

১

কি বটু, যাচ্চ কোথায় ?

বটু

সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও!

১

কেন বল ত ?

বটু

বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে' নিয়ে গেল, আর তারা ফির্‌ল না।

৩

বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো ?

বটু

তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে।

১

সে আবার কে ?

বটু

সে যত খায় তত চায়—তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মত কেবলি বেড়ে চলে।

পাগ্‌লা! আমরা ত যাচ্চি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণা দানবী কোথায় ?

বটু

খবর পাওনি ? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় কর্‌তে চলেচে। তৃষ্ণা বস্‌বে বেদীতে।

২

চুপ্ চুপ্ পাগ্‌লা! এসব কথা শুন্‌লে উত্তরকূটের মানুষ তোকে কুটে ফেল্‌বে।

বটু

তারা ত আমার গায়ে ধূলো দিচ্চে, ছেলেরা মার্‌চে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতী দুটো প্রাণ দিয়েচে সে তাদের সৌভাগ্য।

১

তারা ত মিথ্যে বলে না।

বটু

বলে না মিথ্যে ? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড় ক্ষতি সইবেন কেন ? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়োনা ও পথে।

[প্রস্থান]

২

দেখ, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

১

রঙ্গু, তুই বেজায় ভীতু। চল্ চল্।

[সকলের প্রস্থান।

[যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়

বুঝ্‌তে পার্‌চিনে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?

অভিজিৎ

সব কথা তুমি বুঝ্‌বে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে' যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেচি।

সঞ্জয়

কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখ্‌চি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আল্‌গা হয়ে আস্‌ছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়্‌ল?

অভিজিৎ

ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্ত্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেচে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়

দেখ্‌চ না, যুবরাজ, ঐ যন্ত্রের চূড়াটা সূর্য্যাস্ত মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়ন্ত পাখীর বুকে বাণ বিঁধেচে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে' যাচ্চে। আমার এ ভালো লাগ্‌চে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চল, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ

যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়

রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কি করে' বুঝ্‌লে?

অভিজিৎ

বুঝ্‌লুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেচে।

সঞ্জয়

তোমার এ কথার অর্থ আমি পাইনে।

অভিজিৎ

মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝ্‌তে পার্‌লুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

সঞ্জয়

যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে' নাও!

অভিজিৎ

না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের কর্‌তে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়

তুমি অত কঠোর হোয়ো না, আমাকে বাজ্‌চে।

অভিজিৎ

তুমি আমার হৃদয় জানো, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝ্‌বে।

সঞ্জয়

কোথায় তোমার ডাক পড়েচে তুমি চলেচ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন কর্‌তে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধে হয়ে এসেচে, রাজবাড়িতে ঐ যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধর্‌লে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ

ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়

সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সেদিন তার সাম্‌নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগ্‌বার আগেই কোন্ ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্‌তে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে কর্‌বার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেচে,

কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়চে না?

অভিজিৎ

পড়চে বই কি। সেইজন্যেই সইতে পাচ্চিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে' দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করচে। স্বর্গকে ভালো লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করিনে।

সঞ্জয়

গোধূলির আলোটি ঐ নীল পাহাড়ের উপরে মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে—এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্ত্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁচচ্চে না?

অভিজিৎ

হাঁ, পৌঁচচ্চে। আমারও বুক কান্নায় ভরে' রয়েচে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখী দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে' আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানিনে; কিন্তু ও যে এই সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজচে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেচে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

[বটুর প্রবেশ]

বটু

যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ

কি হয়েচে, বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়চে যে।

বটু

আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম, বলছিলুম, "যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।"

অভিজিৎ

কেন, কি হয়েচে?

বটু

জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ-বলি চায়।

সঞ্জয়

সে কি কথা?

বটু

সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দুই নাতীর রক্ত ঢেলে দিয়েচে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে' যাবে। কিন্তু এখনো ত ভাঙল না, ভৈরব ত জাগলেন না।

অভিজিৎ

ভাঙবে। সময় এসেচে।

বটু (কাছে আসিয়া চুপে চুপে)

তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ?

অভিজিৎ

শুনেচি।

বটু

সর্ব্বনাশ! তবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই?

অভিজিৎ

না, নেই।

বটু

এই দেখচ না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়চে, সর্ব্বাঙ্গে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?

অভিজিৎ

ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু

চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোক যখন ধিক্কার দেবে?

অভিজিৎ

সইতেই হবে।

বটু

তাহলে ভয় নেই।

অভিজিৎ

না ভয় নেই।

বটু

বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ঐ পথে। ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক

ঐকে দিয়েচেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিন্‌তে পার্‌বে।

[বটুর প্রস্থান।

[রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ]

উদ্ধব

নন্দিসঙ্কটের পথ কেন খুলে দিলে, যুবরাজ?

অভিজিৎ

শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব

মহারাজ ত তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর ত দয়ামায়া আছে।

অভিজিৎ

ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে' বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েচি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখ্‌তে পারিনে।

উদ্ধব

মহারাজ বলেন, নন্দিসঙ্কটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজনপাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েচ।

অভিজিৎ

চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাক্‌বার দুর্গতি থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েচি।

উদ্ধব

দুঃসাহসের কাজ করেচ। মহারাজ খবর পেয়েচেন এর বেশি আর কিছু বল্‌তে পার্‌ব না। যদি পার ত এখনি চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।

[উদ্ধবের প্রস্থান।

[অম্বার প্রবেশ]

অম্বা

সুমন! বাবা সুমন! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি?

অভিজিৎ

তোমার ছেলেকে নিয়ে গেচে?

অম্বা

হাঁ, ঐ পশ্চিমে, যেখানে সূর্য্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ

ঐ পথেই আমি যাব।

অম্বা

তাহলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ

বল্‌ব।

অম্বা

বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন!

[প্রস্থান।

[ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন জয় বন্ধন-ছেদন
জয় সংকট-সংহর,
শঙ্কর, শঙ্কর!

[প্রস্থান।

[সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ]

বিজয়পাল

যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসচি।

অভিজিৎ

কি তাঁর আদেশ?

বিজয়পাল

গোপনে বল্‌ব।

সঞ্জয় (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া)

গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন?

বিজয়পাল

সেই ত আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়

আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল

মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়

আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল।

[বাউলের প্রবেশ—

গান

ও ত আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে!
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী
কূলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে।

[প্রস্থান।

[ফুলওয়ালীর প্রবেশ]

ফুলওয়ালী

বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়

কেন, তাকে তোমার কি প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী

আমি বিদেশী, দেওতলী থেকে আসচি। শুনেচি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি করচে। সাধুপুরুষ বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে' নিজের মালঞ্চের ফুল এনেচি।

সঞ্জয়

সাধুপুরুষ না হোক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী

কি কাজ করেচেন তিনি?

সঞ্জয়

আমাদের ঝরণাটাকে বেঁধেচেন।

ফুলওয়ালী

তাই পূজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?

সঞ্জয়

না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী

তাই পুষ্পবৃষ্টি? বুঝলুম না।

সঞ্জয়

না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট কোরো না, ফিরে যাও!—শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ঐ শ্বেতপদ্মটি বেচবে?

ফুলওয়ালী

সাধুকে দেব মনন করে' যে ফল এনেছিলুম সে ত বেচতে পারব না।

সঞ্জয়

আমি যে-সাধুকে সব-চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

ফুলওয়ালী

তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। বোলো আমি দেওতলীর দুখ্‌নী ফুলওয়ালী।

[প্রস্থান।

[বিজয়পালের প্রবেশ]

সঞ্জয়

দাদা কোথায়?

বিজয়পাল

শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়

যুবরাজ বন্দী! এ কি স্পর্দ্ধা!

বিজয়পাল

এই দেখ মহারাজের আদেশপত্র।

সঞ্জয়

এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।

বিজয়পাল

ক্ষমা করবেন।

সঞ্জয়

আমাকেও বন্দী কর, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল

আদেশ নেই

সঞ্জয়

আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনি চলুম। (কিছু দূরে

গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে' দাদাকে দিয়ো।

[উভয়ের প্রস্থান।

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ *

গান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ঐ পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়্‌ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

[শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ]

ধনঞ্জয়

একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কি হয়েচে?

১

প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার ত সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরো অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়

ওরে আজো মারকে জিৎতে পার্‌লি নে? আজো লাগে?

২

রাজার দেউড়িতে ধরে' নিয়ে মার! বড় অপমান!

ধনঞ্জয়

তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস্‌নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।

[গণেশসর্দারের প্রবেশ]

গণেশ

আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশপিশ করচে।

ধনঞ্জয়

তাহলে হাত দুটো বেহাত হয়েচে বল্‌।

গণেশ

ঠাকুর, একবার হুকুম কর ঐ ষণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়

মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস্‌নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মার্‌লে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে' রাখ্‌লে ঢেউ জয় করা যায়।

৪

তাহলে কি কর্‌তে বল?

ধনঞ্জয়

মার জিনিষটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও!

৩

সেটা কি করে' হবে, প্রভু?

ধনঞ্জয়

মাথা তুলে যেমনি বল্‌তে পার্‌বি লাগচে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২

লাগচে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়

আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে' মরে। হাঁ করে' রইলি যে? কথাটা বুঝ্‌লি নে?

২

তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

---

* এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রায়শ্চিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্ব্বে লিখিত।

ধনঞ্জয়

তাহলেই সর্ব্বনাশ হয়েচে।

গণেশ

কথা বুঝ্‌তে সময় লাগে, সে তর্ সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েচি, তাতেই সকাল-সকাল তরে' যাব।

ধনঞ্জয়

তার পরে বিকেল যখন হবে! তখন দেখ্‌বি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেচে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে' না যদি বুঝিস্ ত মজ্‌বি।

গণেশ

ও কথা বোলো না, ঠাকুর! তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েচি তখন যে করে' হোক্ বুঝেচি।

ধনঞ্জয়

বুঝিস্ নি যে তা আর বুঝ্‌তে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েচে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে সুর বেরল না। একটু সুর ধরিয়ে দেব?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো!
এম্‌নি করেই মারো, মারো!

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মার্‌তে নয় পালাতে থাকিস্, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই;
যা-কিছু-আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্‌তে চলেছি। বল্‌তে চাই, "মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ডরে কিম্বা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগতে পার্‌ব না।

এবার যা কর্‌বার তা সারো, সারো,
আমিই হারি, কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো!

সকলে

সাবাস্, ঠাকুর, তাই সই!—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো!

২

কিন্তু তুমি কোথায় চলেচ, বল ত?

ধনঞ্জয়

রাজার উৎসবে।

৩

ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কি দাঁড়ায় বলা যায় কি। সেখানে কি কর্‌তে যাবে?

ধনঞ্জয়

রাজসভায় নাম রেখে আস্‌ব।

৪

রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, সে হবে না!

ধনঞ্জয়

হবে না কি রে? খুব হবে, পেট ভরে' হবে।

১

রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়

তোরা যে মনে মনে মার্‌তে চাস্ তাই ভয় করিস্, আমি মার্‌তে চাইনে তাই ভয় করিনে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কাম্‌ড়ে লেগে থাকে।

২

আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩

রাজার কাছে দর্‌বার কর্‌ব।

ধনঞ্জয়

কি চাইবি রে?

৩

চাইবার ত আছে ঢের, দেয় তবে ত?

ধনঞ্জয়

রাজত্ব চাইবি নে?

৩

ঠাট্টা কর্‌চ, ঠাকুর?

ধনঞ্জয়

ঠাট্টা কেন কর্‌ব? এক পায়ে চলার মত কি দুঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজারি না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চম্‌কে উঠ্‌তে পারিস্ কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবী কর্‌তে হবে।

২

যখন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়

রাজদর্‌বারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বল্‌ব, বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে' না চিন্‌বি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবী খাট্‌বে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও ত বুক-ফুলিয়ে বস্‌বার জায়গা নয়, হাত জোড় করে' বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধূলোয় ধূলোয় কপালের রাজটীকা যে মিলিয়ে এসেচে। ভিতরে বশ মান্‌ল না, বাইরে রাজত্ব কর্‌তে ছুট্‌বি? রাজা হলেই রাজাসনে বসে; রাজাসনে বস্‌লেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েচ আপন হাতে
মান দিয়েচ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধূলোতে ঢেকে ঢেকে।

১

যাই বল, রাজদুয়োরে কেন যে চলেচ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

ধনঞ্জয়

কেন, বল্‌ব? মনে বড় ধোঁকা লেগেচে।

১

সে কি কথা?

ধনঞ্জয়

তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধর্‌চিস্ তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্চে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেচি সেইখানে, যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

২

কিন্তু রাজা তোমাকে ত সহজে ছাড়্‌বে না।

ধনঞ্জয়

ছাড়্‌বে কেন রে! যদি আমাকে বাঁধ্‌তে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কি?

গান

আমাকে যে বাঁধ্‌বে ধরে' এই হবে যা'র সাধন,
সে কি অম্‌নি হবে?
আমার কাছে পড়্‌লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অম্‌নি হবে?
কে আমারে ভরসা করে আন্‌তে আপন বশে?
সে কি অম্‌নি হবে?
আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক্ প্রেমের রসে,
সে কি অম্‌নি হবে?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অম্‌নি হবে?

২

কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পার্‌ব না।

ধনঞ্জয়

আমার এই গা বিকিয়েচি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সইবে।

১

আচ্ছা, চল ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে।

ধনঞ্জয়

তবে তোরা এইখানে বোস্, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

১

দেখ্‌চিস্, ভাই, কি চেহারা ঐ উত্তরকূটের মানুষগুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়্‌তে সুরু করেছিলেন শেষ করে' উঠ্‌তে ফুরসৎ পান নি।

২

আর দেখেচিস্ ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরার ধরণটা?

৩

যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেচে, একটুখানি পাছে লোক্‌সান হয়।

১

ওরা মজুরী কর্‌বার জন্যেই জন্ম নিয়েচে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২

ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কি?

১

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দেখিস্ নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার মত।

২

উইপোকাই ত বটে! ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে।

৩

আর গড়ে' তোলে মাটির ঢিবি।

২

ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

২

পাপ, পাপ! আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস্?

৩

কেন বল ত?

২

তা জানিস্ নে? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্ব্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দ্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ—অপবিত্র।

৩

এ তুই কোথায় পেলি?

২

স্বয়ং গুরু বলে' দিয়েচেন।

৩

(উদ্দেশে প্রণাম করিয়া)

গুরু, তুমিই সত্য!

[উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ]

উ ১

আর সব হল ভাল, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে' নিলে, সেটা ত—

উ ২

ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে' নেব। এখন বল্, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ৩

ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েচে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১

ও ভাই, ঐ যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২

কি করে' বুঝ্‌লি?

উ ১

কান-ঢাকা টুপি দেখ্‌ছিস্ নে? কিরকম অদ্ভুত দেখ্‌তে? যেন উপর থেকে থাব্‌ড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে' দিয়েচে।

উ ২

আচ্ছা, এত দেশ থাকৃতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? এরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

উ ১

কানের উপর বাঁধ বেঁধেচে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়!

(সকলের হাস্য)

উ ৩

তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

(হাস্য)

উ ১

পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েচে কি রে?

উ ৩

জানিস্ নে আজ আমাদের বড় দিন। বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

উ ১

চুপ করে' রইলি যে? গলা বুজে গেছে? টুঁটি চেপে না ধর্‌লে আওয়াজ বেরবে না বুঝি? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

গণেশ

কেন বিভূতির জয়? কি করেচে সে?

উ ১

বলে কি? কি করেচে? এত বড় খবরটা এখনো পৌঁছয় নি? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখ্‌লি ত?

উ ৩

তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে; সে দয়া না কর্‌লে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মত শুকিয়ে মরে' যাবি।

শি ২

পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠ্‌ল নাকি?

উ ২

দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১

দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি ত?

উ ১

ঐ যে মুক্তধারার বাঁধ।

(শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য)

উ ১

এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেচিস্?

গণেশ

ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা বাঁধ্‌বে? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েচেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়্‌বে?

উ ১

স্বচক্ষে দেখ্‌না, ঐ আকাশে!

শি ১

বাপ্‌রে! ওটা কি রে?

শি ২

যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মার্‌তে যাচ্চে।

উ ১

ঐ ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আট্‌কেচে।

গণেশ

রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্ দিন বল্‌বে ঐ ফড়িঙের ডানায় বসে' তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধর্‌তে বেরিয়েচে।

উ ১

ঐ দেখ, কান ঢাকার গুণ! ওরা শুনেও শুন্‌বে না, তাই ত মরে!

শি ১

আমরা মরেও মর্‌ব না পণ করেচি।

উ ৩

বেশ করেচ, বাঁচাবে কে?

গণেশ

আমাদের দেবতাকে দেখনি? প্রত্যক্ষ দেবতা? আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩

কানঢাকারা বলে কি? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পার্‌বে না। [উত্তরকূটের দলের প্রস্থান।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

ধনঞ্জয়

কি বলছিলি রে বোকা? আমারই উপর তোদের

বাঁচাবার ভার ? তাহলে ত সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েচিস্।

গণেশ

উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেচে।

ধনঞ্জয়

বাঁধ বেঁধেচে, বল্‌লে ?

গণেশ

হাঁ, ঠাকুর।

ধনঞ্জয়

সব কথাটা শুন্‌লিনে বুঝি ?

গণেশ

ও কি শোন্‌বার কথা ? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়

তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেচিস ? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুন্‌তে হবে ?

শি ৩

ওর মধ্যে শোন্‌বার আছে কি, ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়

বলিস্ কি রে ? যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হোক্ আর বাইরেই হোক্।

গণেশ

ঠাকুর, তাই বলে' আমাদের পিপাসার জল আট্‌কাবে ?

ধনঞ্জয়

সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা বোস্, আমি সন্ধান নিয়ে আসিগে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আস্‌বে।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান।

[শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ]

শি ৩

এ কি বিষণ যে ! খবর কি ?

বিষণ

যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেচে, তাকে সেখানে আর বাখ্‌বে না।

সকলে

সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ

কি করবি ?

সকলে

ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ

কি করে' ?

সকলে

জোর করে'।

বিষণ

রাজার সঙ্গে পার্‌বি ?

সকলে

রাজাকে মানিনে।

[রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ]

রণজিৎ

কাকে মানিসনে ?

সকলে

প্রণাম।

গণেশ

তোমার কাছে দর্‌বার কর্‌তে এসেচি

রণজিৎ

কিসের দর্‌বার ?

সকলে

আমরা যুবরাজকে চাই।

রণজিৎ

বলিস্ কি ?

১

হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ

আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি ?

সকলে

অন্নবিনে মর্‌চি যে।

রণজিৎ

তোদের সর্দার কোথায় ?

২ (গণেশকে দেখাইয়া)

এই যে আমাদের গণেশ সর্দ্দার।

রণজিৎ

ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ

ঐ আস্‌চেন।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

রণজিৎ

তুমি এই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েচ ?

ধনঞ্জয়

ক্ষ্যাপাই বই কি, নিজেও ক্ষেপি !

(গান)

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষ্যাপা সে ?
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কি যে বাজায় কোন্ বাতাসে ?
গেল রে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা ?
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা,
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে !

রণজিৎ

পাগ্‌লামি করে' কথা চাপা দিতে পার্‌বে না। খাজনা দেবে কি না, বল।

ধনঞ্জয়

না, মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ

দেবে না ? এত বড় আস্পর্দ্ধা ?

ধনঞ্জয়

যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পার্‌ব না।

রণজিৎ

আমার নয় ?

ধনঞ্জয়

আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ

তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে ?

ধনঞ্জয়

ওরা ত ভয়ে দিয়ে ফেল্‌তে চায়, আমি বারণ করে' বলি, প্রাণ দিবি তাঁকেই প্রাণ দিয়েচেন যিনি।

রণজিৎ

তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখ্‌চ বই ত নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়্‌বে। তখন ওরা মর্‌বে যে। দেখ, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ

ধনঞ্জয়

যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েচি। দুঃখের উপরওয়ালা সেইখানে বাস করেন।

রণজিৎ (প্রজাদের প্রতি)

আমি তোদের বল্‌চি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে

আমাদের প্রাণ থাক্‌তে সে হবে না।

ধনঞ্জয়

(গান)

রইল বলে' রাখ্‌লে কা'রে ?
হুকুম তোমার ফল্‌বে কবে ?
টানাটানি টিঁক্‌বেনা, ভাই,
র'বার যেটা সেটাই র'বে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখ্‌তে পার্‌বে না। সহজে রাখ্‌বার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চল্‌বে।

রণজিৎ

মানে কি হল ?

ধনঞ্জয়

যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে' যা রাখ্‌তে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিঁক্‌বে না।

গান

যা-খুসি তাই করতে পার,
গায়ের জোরে রাখ-মার,

যার গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা' স'ন সেটাই সবে।

রাজা, ভুল করুচ এই, যে, ভাবচ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হ'ল। ছেড়ে রাখ্‌লেই যা'কে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপ্‌তে গেলেই দেখ্‌বে সে ফস্‌কে গেচে।

(গান)

ভাবচ, হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখ্‌বে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয়না যেটা সেটাও হ'বে।

রণজিৎ

মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে' রেখে দাও!

মন্ত্রী

মহারাজ—

রণজিৎ

আদেশটা তোমার মনের মত হচ্চে না ?

মন্ত্রী

শাসনের ভীষণ যন্ত্র ত তৈরি হয়েচে, তার উপরে ভয় আরো চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা

এ আমাদের সহ্য হবে না।

ধনঞ্জয়

যা বল্‌চি, ফিরে যা!

১

ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েচি, শোননি বুঝি ?

২

তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব ?

ধনঞ্জয়

আমার জোরেই কি তোদের জোর ? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্ব্বল করবি।

গণেশ

ও কথা বলে' আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়

তবে আমার হার হয়েচে। আমাকে সরে' দাঁড়াতে হল।

সকলে

কেন ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়

আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি ? এত বড় লোক-সান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে ? বড় লজ্জা পেলুম।

১

সে কি কথা ঠাকুর ? আচ্ছা, যা করতে বল তাই করব!

ধনঞ্জয়

আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে' যা।

২

চলে' গিয়ে কি করব ? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে ? আমাদের ভালোবাসো না ?

ধনঞ্জয়

ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে' যা!

সকলে

আচ্ছা, ঠাকুর চল্লুম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়

কিন্তু কি রে! একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।

সকলে

আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়

ওকে চলা বলে ? জোরে!

গণেশ

চল্লুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে'।

[প্রস্থান।

রণজিৎ

কি বৈরাগী, চুপ করে' রইলে যে।

ধনঞ্জয়

ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে, রাজা।

রণজিৎ

কিসের ভাবনা ?

ধনঞ্জয়

তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা কর্‌তে পার নি আমি দেখ্‌চি তাই করে' বসে আছি। এতদিন ঠাউরে-ছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্চি; আজ মুখের উপর বলে' গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেচি।

রণজিৎ

এমনটা হয় কি করে'?

ধনঞ্জয়

ওদের যতই মাতিয়ে তুলেচি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না ত। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে' দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁক্‌ড়ে থাকে।

রণজিৎ

ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে' জেনেচে।

ধনঞ্জয়

তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্য্যন্ত পৌঁছল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পার্‌তেন বাইরে থেকে আমি তাঁকে রেখেচি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ

রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পূজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়

ওরে বাপ্‌রে! বাজে না ত কি! দৌড় মেরে পালাতে পার্‌লে বাঁচি। আমাকে পূজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চল্‌ল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়্‌বে, দেবতা ছাড়্‌বেন না।

রণজিৎ

এখন তোমার কর্ত্তব্য?

ধনঞ্জয়

তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে' ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ

তবে আর দেরি কেন? সর না!

ধনঞ্জয়

আমি সরে' দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়্‌বে ওদেরি মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সর্‌তে পারি নে।

রণজিৎ

নিজে সর্‌তে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্চি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে' রাখ।

ধনঞ্জয়

(গান)

তোর শিকল আমায় বিকল কর্‌বে না।
তোর মারে মরম মর্‌বে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমায় ধর্‌বে না।
যে পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কি বল্?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ডরে পরাণ ডর্‌বে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান।

রণজিৎ

মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এসগে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্ম্মের জন্যে অনুতপ্ত, তাহলে—

মন্ত্রী

মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ

না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্চি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর!
শঙ্কর শঙ্কর!
বজ্রঘোষ-বাণী, রুদ্র শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শঙ্কর, শঙ্কর!

[প্রস্থান।

[উদ্ধবের প্রবেশ]

উদ্ধব

এ কি? যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহারাজ চলে' গেলেন?

মন্ত্রী

পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে' বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠ্‌ছিল না। যাই যুবরাজকে দেখে আসিগে।

[প্রস্থান।

[দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ]

১

মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেচে? কেন বল্‌চে যুবরাজ অন্যায় করেচেন—আমি এ বুঝ্‌তেও পারিনে, সইতেও পারিনে।

২

বুঝ্‌তে পারিসনে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে? উনি নন্দি-সঙ্কটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

১

আমি জানিনে তাতে অপরাধ কি হয়েচে? কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনে যে যুবরাজ অন্যায় করেচেন।

২

তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন বুঝ্‌বি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে' বোধ হয় তাদেরি বেশি সন্দেহ কর্‌তে হয়।

১

কিন্তু যুবরাজকে কি সন্দেহ কর্‌চ তোমরা?

২

সবাই বল্‌চে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে' নিয়ে, উনি এখনি উত্তরকূটের সিংহাসন জয় কর্‌তে চান,—ওঁর আর তর সইচে না।

১

সিংহাসনের কি দরকার ছিল ওঁর! উনি ত সবারই হৃদয় জয় করে' নিয়েচেন। যারা ওঁর নিন্দে কর্‌চে তাদেরই বিশ্বাস কর্‌ব আর যুবরাজকে বিশ্বাস কর্‌ব না?

২

তুই চুপ কর্। একরত্তি মেয়ে, তোর মুখে এসব কথা সাজে না। দেশসুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত কর্‌চে তুই হঠাৎ তার—

১

আমি দেশসুদ্ধ লোকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একথা বল্‌তে পারি যে—

২

চুপ্ চুপ্।

১

কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে বেরতে চায়। যুবরাজকে আমি সব-চেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ কর্‌বার জন্যে আমার যা-হয় একটা কিছু করতে ইচ্ছা কর্‌চে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানৎ কর্‌ব—বল্‌ব, "বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিথ্যে!"

২

চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুন্‌তে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখ্‌চি!

[উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ]

১

কিছুতেই ছাড়্‌চিনে, চল রাজার কাছে যাই।

২

ফল কি হবে? যুবরাজ যে রাজার বক্ষের মাণিক,

তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের পরে।

১

করুন রাগ, পষ্ট কথা বল্‌ব কপালে যাই থাক।

৩

এ দিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্ত্তি? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকূটের চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল?

এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম রইল কোথা? বল ত দাদা!

৩

কাউকে চেন্‌বার জো নেই।

১

রাজা ওকে শাস্তি না দেন ত আমরা দেব।

২

কি করবি?

১

এ দেশে ওঁর ঠাঁই হচ্চে না। যে পথ কেটেচেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

৩

কিন্তু ঐ ত চবুয়া গাঁয়ের লোক বল্‌লে, তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্চে না।

১

রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েচে।

৩

লুকিয়েচে? ইস্, দেয়াল ভেঙে বের করব।

১

ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করব।

৩

আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মরব তবু—

[উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী

কি হয়েচে?

১

লুকোচুরী চল্‌বে না। বের কর যুবরাজকে।

মন্ত্রী

আরে বাপু, আমি বের করবার কে?

২

তোমরাই ত মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পারবে না কিন্তু আমরা টেনে বের করব!

মন্ত্রী

আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।

৩

গারদ থেকে?

মন্ত্রী

মহারাজ তাকে বন্দী করেচেন।

সকলে

জয় মহারাজের, জয় উত্তরকূটের!

২

চল্ রে, আমরা গারদে ঢুক্‌ব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী

গিয়ে কি করবি?

২

বিভূতির গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আস্‌ব।

৩

গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী

যুবরাজ পথ ভেঙেচেন বলে' অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙ্‌বে, তাতে অপরাধ নেই?

২

আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি ত কি হবে?

মন্ত্রী

পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে' শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে' রাখ্‌চি। একটা ব্যবস্থা আগে করে' তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙ্‌তে হয়।

৩

আচ্ছা, তবে গারদ থাক্, রাজবাড়ির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে' আসিগে।

৩

ও ভাই, ঐ দেখ্! সূর্য্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ঐ চূড়াটা এখনো জল্‌চে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েচে।

২

আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্য্যের আলো আঁক্‌ড়ে রয়েচে যেন ডোব্‌বার ভয়ে। কি রকম দেখাচ্চে।

[নাগরিকদের প্রস্থান।

মন্ত্রী

মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী কর্‌তে বলেছিলেন এখন বুঝেচি।

উদ্ধব

কেন?

মন্ত্রী

প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভাল ঠেক্‌চে না। লোকের উত্তেজনা কেবলি বেড়ে উঠ্‌চে।

[সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়

মহারাজকে বেশী আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না, তাতে তাঁর সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী

রাজকুমার, শান্ত থাক্‌বেন, উৎপাতকে আরো জটিল করে' তুল্‌বেন না।

সঞ্জয়

বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী

তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধন মোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়

সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জান্‌তুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসঙ্কটের খবর পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী

তবেই বুঝ্‌চেন, বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়

আমি চিরদিন তাঁরই অনুবর্ত্তী, বন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী

কি হবে?

সঞ্জয়

পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্দ্ধেক। আরেক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী

রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাক্‌বার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়

মন্ত্রী, এ ত তোমার নিজের কথা বলে' শোনাচ্চে না, এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী

তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়

কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেচ, দূর থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী

কি করতে?

সঞ্জয়

শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী

সময় যে বড় সঙ্কটের, এখন কি—

সঞ্জয়

সেইজন্যেই এই ত উপযুক্ত সময়।

[উভয়ের প্রস্থান।

[বিশ্বজিতের প্রবেশ]

বিশ্বজিৎ

ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব

হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ

অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েচ ত?

উদ্ধব

পেয়েচি।

বিশ্বজিৎ

সেই-মত কাজ হয়েচে?

উদ্ধব

অল্প-পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ

মনে সংশয় কোরো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি একাজ সাধন করে তা হলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব

কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ

আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে' নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে

আগুন, আগুন।

উদ্ধব

ঐ হয়েচে। বন্দীশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েচে। এই সুযোগে বন্দী দুটিকে বের করে' দিই।

[কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ]

অভিজিৎ

এ কি দাদামশায় যে!

বিশ্বজিৎ

তোমাকে বন্দী করতে এসেচি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ

আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবচ তোমরাই আগুন লাগিয়েচ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ

কেন, ভাই, কি তোমার কাজ?

অভিজিৎ

জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিৎ

তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ

সময় এখনি এসেচে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ

আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ

না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েচে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ

তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে' আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিৎ

যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ

ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেচে যে।

অভিজিৎ

যেখান থেকে ডাক এসেচে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ

তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেচ তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে' যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ

তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।

[দুই জনের দুইপথে প্রস্থান।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

(গান)

আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্ত্তি দেখি নাই।
দুহাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে?
একি আনন্দময় নৃত্য অভয়
বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই,
আগল যাবে সরে'
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবি রে ছাই করে'।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই।

[বটুর প্রবেশ]

বটু

ঠাকুর, দিন ত গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়

বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

বটু

ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিলে?

ধনঞ্জয়

ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু

ভরসা দাও, প্রভু, বড় ভয় ধরিয়েচে।—জাগো, ভৈরব, জাগো! আলো নিবেচে, পথ ডুবেচে, সাড়া পাইনে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে! জাগো, ভৈরব, জাগো!

[প্রস্থান।

[উত্তরকূটের নাগরিক দলের প্রবেশ]

১

মিথ্যে কথা! রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেচে।

২

দেখব, কোথায় লুকিয়ে রাখে!

ধনঞ্জয়

না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১

এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চম্‌কিয়ে দিলে।

৩

তা বেশ হয়েচে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়

যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে' আছে তাকে ধরবে কি করে'?

১

সাধুগিরি রাখ, আমরা ও সব মানিনে।

ধনঞ্জয়

না মানাই ত ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে' তোমাদের

মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোয়ালে। আমাকে সুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশ ছাড়া করেচে।

১

তাদের গুরু কে?

ধনঞ্জয়

যার হাতে তারা মার খায়।

১

তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই সুরু করি-না কেন?

ধনঞ্জয়

রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমত পাঠ দিতে পারি কি'না। পরীক্ষা হোক্।

২

সন্দেহ হচ্চে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকী করেচ।

ধনঞ্জয়

তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকী আমাকে নিয়ে।

২

দেখ্‌লি ত, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা কি ফন্দি চল্‌ছে।

১

নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে সরাবার চেষ্টা। এইখানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধ না। দড়িগাছটা ত তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন

এই নাও না দড়ি, তুমিই বাঁধ না

২

ওরে, তোরা কি উত্তরকূটের মানুষ? দে, আমাকে দে! (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কি বল্‌চেন?

ধনঞ্জয়

কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়্‌চেন না।

[ভৈরব পন্থীর প্রবেশ]

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর।
বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর শঙ্কর। [প্রস্থান।

কুন্দন

ঐ দেখ চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আস্‌চে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠ্‌চে।

১

দিনের বেলায় ও সূর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেচে। ওকে ভূতের মত দেখাচ্চে।

কুন্দন

বিভূতি তার কীর্ত্তিটাকে এমন করে' গড়্‌ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাক্‌বার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মত।

[৪র্থ নাগরিকের প্রবেশ]

৪

খবর পাওয়া গেল, ঐ আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েচে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েচে।

২

এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরচে। ও থাক্ এইখানে বাঁধা পড়ে'। ততক্ষণ দেখে আসি। [প্রস্থান।

ধনঞ্জয়

(গান)

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর ও গুণী?
বাঁধাবীণা রইবে পড়ে' এম্‌নি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী?

তাহ'লে　　হার-হ'ল যে হার হ'ল
শুধু　　বাঁধাবাঁধিই সার হ'ল
　　　　গুণী মোর, ও গুণী!
বাঁধনে　　যদি তোমারি হাত লাগে,
　　　　তাহ'লেই সুর জাগে,
　　　　গুণী মোর, ও গুণী!
না হলে　　ধূলায় পড়ে' লাজ কুড়াবে।

[নাগরিকদের পুনঃ প্রবেশ]

১

এ কি কাণ্ড?

২

খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীসুদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন! এর মানে কি বল?

কুন্দন

উত্তরকূটের রক্ত ত ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে' বন্দী করে' নিয়ে গেচেন।

১

ভারি অন্যায়। এ'কে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না?

২

এর উচিত বিধান হচ্চে—বুঝ্‌লে, দাদা—

১

হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন

আর জানিস্ ত, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে ত পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

১

তার সব কটি গুণে নিয়ে তবে—কি অন্যায়! অসহ্য অন্যায়!

৩

আর ওঁদের সেই জাফ্‌রানের ক্ষেত, তার থেকে অন্তত পক্ষে বৎসরে—

২

হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কি করা যায়?

১

ও ঐখানেই থাক্‌না পড়ে'।

[প্রস্থান।

ধনঞ্জয়ের গান

ফেলে　　রাখ্‌লেই কি পড়ে র'বে? (ও অবোধ)
যে তার　　দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ওযে　　কোন্ রতন তা দেখ্‌না ভাবি,
　　　　ওর পরে কি ধূলোর দাবী?
ও　　হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
　　　　হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।
ওর　　খোঁজ পড়েচে জানিস্ নে তা?
তাই　　দূত বেরল হেথা সেথা।
যারে　　কর্‌লি হেলা সবাই মিলি,
　　　　আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,
যারে　　দরদ দিলি, তার ব্যথা কি
　　　　সেই দরদীর প্রাণে স'বে?

[কুন্দনের পুনঃ প্রবেশ]

কুন্দন

ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি,—অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনি বাড়ি পালাও। কি জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়

কি জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্যেই ত বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন

এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়

উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন

তুমি শিবতরাইয়ের মানুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়

ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে

জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন

আমার ভালো বোধ হচ্চে না, চল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

[উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ]

১

এখন কোন্ দিকে যাই? নওসাহুতে যারা ছাগল চরায় তারা ত বল্‌লে, তারা দেখেচে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২

আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হুকুম!

১

মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে' কথা উঠেচে। কিন্তু অম্বা পাগ্‌লীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্চে সে যাকে দেখেচে সে আমাদের যুবরাজ—আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেচেন।

২

কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্চে না।

১

আলো না হলে আমরা ত এক পা এগতে পার্‌ব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে' আনিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[একজন পথিকের প্রবেশ]

পথিক (চীৎকার করিয়া)

ওরে বুধ—ন, শম্ভু—উ! বিপদে ফেল্‌লে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বল্‌লে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধর্‌বে। কারো দেখা নেই। অন্ধকারে ঐ কালো যন্ত্রটা ইসারা কর্‌চে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?

২ পথিক

আমি নিম্‌কু, বাতিওয়ালা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জ্বল্‌বে, বাতির দর্‌কার। তুমি কে?

১ পথিক

আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখ্‌তে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল?

নিম্‌কু

অনেক মানুষ আস্‌চে, কাকে চিন্‌ব?

হুব্বা

অনেক মানুষের মধ্যে তাকে খোঁজো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ—ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের কর্‌তে হয় না—সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ঐ ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দর্‌কার বেশি।

নিম্‌কু

দাম কত দেবে?

হুব্বা

দামই যদি দিতে পার্‌তুম তবে ত তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের কর্‌ব কেন?

নিম্‌কু

রসিক বট হে! [প্রস্থান।

হুব্বা

বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে' চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়।—উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিমঝিম কর্‌চে। নাঃ, বাতিওয়ালার সঙ্গে রসিকতা না করে' ডাকাতি কর্‌লে কাজে লাগ্‌ত।

[আরেকজন পথিকের প্রবেশ]

পথিক

হেইয়ো!

হুব্বা

বাবারে, চম্‌কিয়ে দাও কেন?

পথিক

এখন চল!

হুব্বা

চল্‌ব বলেই ত বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চল্‌তে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়্‌তে হয় সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চি।

পথিক

দলের লোক তৈরী আছে' এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে।

হুব্বা

কথাটা কি বল্লে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ্ অভ্যেস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝ্তেই পারিনে। দলের লোক বলচ কাকে?

পথিক

আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ্ অভ্যেসে হাত পাকিয়েচি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝ্লে ত?

উঃ, বুঝেচি। ওর সোজা মানে হচ্চে, আমাকে চল্‌তেই হবে মর্জ্জি থাক্ আর না থাক্। কোথায় চল্‌ব? এবার একটু মোলায়েম করে' জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেচে।

পথিক

শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুব্বা

শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক

নন্দিসঙ্কটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথ্‌বার পালা।

হুব্বা

ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখ্‌তে পাচ্চ না বলেই এত বড় শক্ত কথাটা বল্লে। আমি হচ্চি—

পথিক

তুমি যেই হও না কেন, দুখানা হাত আছে ত?

হুব্বা

নেহাৎ না থাক্‌লে নয় বলেই আছে নইলে একে কি—

পথিক

হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠ্।

[দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ]

২ পথিক

আরেকজন লোককে পেয়েচি, কঙ্কর।

কঙ্কর

লোকটা কে?

ও

আমি কেউ না, বাবা, আমি লছ্‌মন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর

সে ত ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চল শিবতরাই।

লছ্‌মন

যাব ত, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কঙ্কর

বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছ্‌মন

দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগ্‌চে।

কঙ্কর

তুমি চলে' গেলে তার রোগ হয় সার্‌বে, নয় সে মর্‌বে; তুমি থাক্‌লেও ঠিক তাই হত।

হুব্বা

ভাই লছ্‌মন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেয়েচি।

কঙ্কর

ঐ যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্চে। কি নরসিং খবর ভালো ত?

[কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ।]

নরসিং

এই দেখ, দল জুটিয়ে এনেচি। আরো কয়দল আগেই রওনা হয়েচে।

কঙ্কর

তা হলে চল, পথের মধ্যে আরো কিছু কিছু জুটবে

দলের একজন

আমি যাব না।

কঙ্কর

কেন যাবে না? কি হয়েচে?

উক্তব্যক্তি

কিছু হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর

লোকটার নাম কি, নরসিং ?

নরসিং

ওর নাম বনোয়ারি,পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর

আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই—কেন যাবে না বল ত ?

বনোয়ারি

প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর

আচ্ছা, না হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে ?

বনোয়ারি

আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর

ন্যায় অন্যায় ভাব্‌বার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইখানেই অন্যায় হচ্চে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি

উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কঙ্কর

ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে ! দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিং

শত্রু কাজে লাগিযে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেচি।

বনোয়ারি

তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাক্‌ব, কোনো কাজে লাগ্‌ব না।

কঙ্কর

উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জ্জন করবার উপায় জুটি।

হুব্বা

বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে' সব কথা বুঝ্‌তে চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে' নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে' থাক।

বনোয়ারি

তোমার প্রণালীটা কি ?

হুব্বা

আমি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না বলেই সুর বের করচি নে—নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কঙ্কর

(বনোয়ারির প্রতি)

এখন তোমার অভিপ্রায় কি ?

বনোয়ারি

আমি এক পা নড়্‌ব না।

কঙ্কর

তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে !

হুব্বা

একটা কথা বলি, কঙ্কর দাদা, রাগ কোরো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে পারলে কাজে লাগ্‌ত।

কঙ্কর

উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাক্‌তে এই কথাটা বুঝে দেখো।

হুব্বা

এরি মধ্যে বুঝে নিয়েচি।

[নরসিং ও কঙ্কর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান।]

নরসিং

ঐ যে বিভূতি আস্‌চে ! যন্ত্ররাজ বিভূতির জয় !

[বিভূতির প্রবেশ]

কঙ্কর

কাজ অনেকটা এগিয়েচে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন ? তোমাকে নিয়েই জুটলেই উৎসব করবে।

বিভূতি

উৎসবে আমার সখ নেই।

নরসিং

কেন বল ত ?

বিভূতি

আমার কীর্ত্তি পণ্ড করবার জন্যেই নন্দি-সঙ্কটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌছল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলচে।

কঙ্কর

কার প্রতিযোগিতা, যন্ত্ররাজ ?

বিভূতি

নাম করতে চাইনে, সবাই জানো। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই; এর মধ্যে আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসন-বাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিং

এত বড় কথা ?

কঙ্কর

তুমি সহ্য করলে, বিভূতি ?

বিভূতি

প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর

কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো ? তুমিই ত বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি

সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং

পাহারা রাখলে ভালো করতে না ?

বিভূতি

সেই ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্চেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ঐ নন্দিসঙ্কটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর

তোমার পক্ষে এ ত কঠিন নয়।

বিভূতি

না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুস্কিল এই যে, ঐ গিরিপথটা সঙ্কীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং

বাধা কত দেবে ? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভূতি

মরবার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর

মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে

জাগো, ভৈরব, জাগো।

[ধনঞ্জয়ের প্রবেশ]

কঙ্কর

ঐ দেখ, যাবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি

বৈরাগী, তোমাদের মত সাধুরা ভৈরবকে এ পর্য্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমিই ভৈরবকে জাগাতে চলেচি।

ধনঞ্জয়

সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি

এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়

না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন

বিভূতি

সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়

সব চেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনি তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন;
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শঙ্কর, শঙ্কর!

[প্রস্থান।

[রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী

মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েচে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা ত—

রণজিৎ

তারা যেখানেই থাক না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কঙ্কর

মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবী করি।

রণজিৎ

শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে' থাকি?

কঙ্কর

তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েচে।

রণজিৎ

কি! সংশয়! কার সম্বন্ধে?

কঙ্কর

ক্ষমা করবেন, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্চে ততই তাদের অধৈর্য্য এত বেড়ে উঠ্‌ছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসঙ্কটের ভাঙা দুর্গ গড়ে' তোল্‌বার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ

আমার হাতে কেন রাখ্‌তে পার্‌লে না?

বিভূতি

যেটা আপনারই বংশের অপকীর্ত্তি, তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে এ রকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী

মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আত্ম-শ্লাঘায় অন্যদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্য্যের দ্বারা অধৈর্য্যকে উদ্দাম করে' তুল্‌বেন না।

রণজিৎ

ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়

বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখ্‌ছি।

রণজিৎ

যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়

না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখ্‌তে পারিনে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিৎ

তবে এখানে কি করচ?

ধনঞ্জয়

যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে

সুমন, বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা

ও কে ও?

মন্ত্রী

সেই অম্বা পাগলী।

[অম্বার প্রবেশ]

অম্বা

কই, সে ত ফিরল না।

রণজিৎ

কেন খুঁজ্চ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বা

ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে?—সুমন, সুমন।

[প্রস্থান।

[চরের প্রবেশ]

চর

শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে' আস্‌চে।

বিভূতি

সে কি কথা? আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই ত ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েচে। কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ ত জানে না। তা হলে কি করে'—

কঙ্কর

কি বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভূতি

সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

কঙ্কর

তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি

সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হোক সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণজিৎ (চরের প্রতি)

তারা কি অভিপ্রায়ে আসচে তুমি জান?

চর

তারা শুনেচে—যুবরাজ বন্দী হয়েচেন, তাই পণ করেচে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে' তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভূতি

আমরাও খুঁজ্‌চি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁজ্‌চে, দেখি কার হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়

তোমাদের দুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।

চর

ঐ যে আস্‌চে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দ্দার।

[গণেশের প্রবেশ]

গণেশ (ধনঞ্জয়ের প্রতি)

ঠাকুর, পাব ত তাঁকে?

ধনঞ্জয়

হাঁ রে, পাবি।

গণেশ

নিশ্চয় করে' বল।

ধনঞ্জয়

পাবি রে!

রণজিৎ

কাকে খুঁজ্‌ছিস্?

গণেশ

এই যে, রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিৎ

কা'কে রে?

গণেশ

আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে' রাখ্‌বে? ওকেও?

ধনঞ্জয়

মানুষ চিন্‌লিনে, বোকা? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার?

গণেশ

ওকে আমাদের রাজা করে' রাখ্‌ব।

ধনঞ্জয়

রাখ্‌বি বই কি। ও রাজবেশ পরে' আসবে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

(গান)

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ,
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর, শঙ্কর !
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর, শঙ্কর।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে

মা ডাকে, মা ডাকে ! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয় !

বিভূতি

ও কি শুনি ? ও কিসের শব্দ ?

ধনঞ্জয়

অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠ্‌ল যে।

বিভূতি

আঃ থাম না, শব্দটা কোন্ দিকে বল ত ?

নেপথ্যে

জয় হোক্, ভৈরব !

বিভূতি

এ ত স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।

ধনঞ্জয়

নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।

বিভূতি

শব্দ বেড়ে উঠ্‌চে যে, বেড়ে উঠ্‌চে।

কঙ্কর

এ যেন—

নরসিং

বোধ হচ্চে যেন—

বিভূতি

হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙ্‌লে ?—কে ভাঙ্‌লে ?—তার নিস্তার নেই।

[কঙ্কর, নরসিং ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান।

রণজিৎ

মন্ত্রী, এ কি কাণ্ড ?

ধনঞ্জয়

বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েচে।

(গান)

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।

মন্ত্রী

মহারাজ, এ যেন—

রণজিৎ

হাঁ, এ যেন তারি—

মন্ত্রী

তিনি ছাড়া আর ত কারো—

রণজিৎ

এমন সাহস আর কার ?

ধনঞ্জয়

(গান)

নাচে রে নাচে চরণ নাচে,
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিৎ

শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এইসব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।

গণেশ

প্রভু, ব্যাপার কি হল কিছু ত বুঝ্‌তে পার্‌চি নে।

ধনঞ্জয়

(গান)

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিৎ

ঐ পায়ের শব্দ শুন্‌চি যেন ! অভিজিৎ, অভিজিৎ !

মন্ত্রী

ঐ যেন আস্‌চেন !

ধনঞ্জয়

(গান)

মরমে মরমে বেদনা ফুটে,
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

[সঞ্জয়ের প্রবেশ]

রণজিৎ

এ যে সঞ্জয়। অভিজিৎ কোথায় ?

সঞ্জয়

মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিৎ

কি বল্‌চ, কুমার !

সঞ্জয়

যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেচেন।

রণজিৎ

বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েচেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন ?

সঞ্জয়

না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ঐখানেই যাবেন, আগে গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত -বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত যেতে দিলেন না।

রণজিৎ

কি হল আরেকটু বল।

সঞ্জয়

ঐ বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কি করে' তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে' গেল।

গণেশ

যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না !

ধনঞ্জয়

চিরকালের মত পেয়ে গেলি।

[ভৈরবপন্থীর প্রবেশ—

গান

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শঙ্কর শঙ্কর।
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর !
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শঙ্কর শঙ্কর !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌষ সংক্রান্তি ১৩২৮, শান্তিনিকেতন

রমলা

রক্তের মতন রাঙা লালমাটির পথ। আলোছায়াময় দিগন্তের কোল হইতে নামিয়া কত গিরিমালার তট দিয়া কত শালবনের তলে তলে কত গ্রামের পাশে পাশে আঁকিয়া বাঁকিয়া কত নদী ডিঙাইয়া কত প্রান্তর পার হইয়া পথটি চলিয়াছে; চলিতে চলিতে কখনও যেন শ্রান্ত হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া পড়িয়াছে, আবার লাফাইয়া উঠিয়া সুদূর দিগন্তের নীল মায়ার দিকে ছুটিয়াছে।

পথ দিয়া একটি পুস্‌পুস্‌-গাড়ী অতি ধীরে চলিয়াছে। সাধারণতঃ পুস্‌পুস্‌-গাড়ী এত আস্তে যায় না, কিন্তু গাড়ীর মধ্যে যে যুবকটি একা বসিয়া সান্ধ্যশ্রী দেখিতেছিল সে পুস্‌পুস্‌ওয়ালাদের অতি ধীরে চালাইতে বলিয়াছে। তাহারা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, এত আস্তে চলিলে কাল সকালে হাজারিবাগ পৌছানো যাইবে না। যুবকটি জানাইল, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পথের ধারে গ্রামে গ্রামে খাবার পাইলে সে এই পার্ব্বত্যশোভাময় পথে কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতে রাজী আছে।

যুবকটি একজন চিত্রশিল্পী। তাহার ছয়ফুট দীর্ঘ সুঠাম দেহ মাংসমেদবহুল নয়, পাৎলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা যেন প্রাণের ফোয়ারা; চুলগুলি একটু লম্বা কোঁক্‌ড়ানো, ডান দিকে টেরী কাটা, রেখাবিহীন প্রশস্ত ললাটে যৌবনের টীকা জ্বলিতেছে, মুখের দিকে চাহিলেই মনে হয় ইহার অন্তরে কিসের আগুন অহর্নিশি জ্বলিতেছে, স্বপ্নময় দীর্ঘ চোখদুইটির উপর চশ্‌মার কাচদুইটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, সরু লম্বা নাকে প্যাস্‌নের নাকীটি সুন্দর ভাবে লাগানো; দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখের গঠন একটু লম্বা, চোয়াল দৃঢ় প্রশস্ত হইলেও চিবুক অধর অতি সুকুমার কোমল, তরুণীর আননের মত তারুণ্যমণ্ডিত; চুলগুলি লম্বা বলিয়াই হউক বা মাথার পেছনটা একটু উঁচু বলিয়াই হউক মাথার তুলনায় গলাটা একটু সরু দেখায়; সবচেয়ে সুন্দর তাহার লম্বা আঙুলগুলি, যেন রঙের আগুনের শিখা। হাঁটু উঁচু করিয়া তাহার উপর দুই হাতের আঙুলে আঙুলে জড়াইয়া হাত রাখিয়া দূরপথের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, সোনার আংটির নীলাটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

পিছনে নীল পাহাড়ের সারি সুন্দরীর নীলাম্বরী শাড়ীর মত গোধূলির আলোয় ঝলমল করিতেছে, দুই পাশের শালের বনে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকার রহস্যলোকের মত জমা হইতেছে; পথটি সেখানে অনেকখানি নামিয়া আসিয়া অতি ঋজুভাবে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া যুবকটি গাড়ীর আগে আগে জোরে চলিতে লাগিল। সে যেন বীরপথিক, দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া কাহাকে সে জয় করিবার জন্য চলিয়াছে, মনে এই ভাবটি জাগাইয়া পায়ে পায়ে চলিয়া সে চড়াই পথে উঠিতে লাগিল। পথের উচ্চ সীমায় উঠিতেই সম্মুখে সূর্য্যাস্তের অপরূপ রূপে স্তব্ধ হইয়া সে দাঁড়াইল। তেপান্তরের মাঠের মত শূন্য প্রান্তর দিগন্তের সহিত গিয়া মিলিয়াছে, তাহারই উপর চক্রবাল রাঙাইয়া রক্তমেঘস্তূপে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, যেন কোন নীড়-হারা পথিক বিহঙ্গ দুই রাঙা ডানা মেলিয়া দিনশেষে রাত্রির অনন্ত তারা-লোকের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে, কোন প্রেমবেদনায় তীরবিদ্ধ তাহার চঞ্চল বক্ষ হইতে রক্ত চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, পাহাড়ের মাথায় মাথায় শালগাছের পাতায় পাতায় তাহারই বুকের রক্তবিন্দু উপলমণির মত জ্বলিতেছে, ওই রক্ত মেঘগুলি তাহারই ছিন্নবিচ্ছিন্ন পালকের দল, এই প্রান্তরভরা রাঙা আলো তাহারই বুকের আগুন; বনের মর্ম্মরে, শূন্যপ্রান্তরে হাওয়ার নৃত্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহারই পক্ষসঞ্চালনের শব্দ শোনা যাইতেছে, রাত্রির অন্ধকারপারে কোন্ নব অরুণ-লোকের দিকে হু হু করিয়া সে উড়িয়া চলিয়াছে—

যুবকটি লাফাইয়া উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।"

গাড়ীটি যখন যুবকের নিকট আসিয়া পৌছাইল, সে চালকদিগকে তাহাদের চীৎকার ও গাড়ীচালানো থামাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইতে বলিল। নিকষমণির মত কালো এই পাহাড়ের ছেলেরা তাহাদের যাত্রীটির দিকে অবাক হইয়া তাকাইল,—প্রতিদিনের সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন কি অসামান্য সৌন্দর্য্য আছে যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আবার যুবকটি চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া আবার গাড়ী থামাইয়া গাড়ীর ভিতর হইতে চামড়ার ব্যাগটা বাহির করিল। ব্যাগটা খুলিয়া আঁকিবার সরঞ্জাম তুলিগুলির পাশ হইতে লেপ্‌চা বাঁশীটা তুলিয়া ব্যাগ বন্ধ করিয়া নাগ্‌রা জুতাটা খুলিয়া গাড়ীর সম্মুখে পা ঝুলাইয়া বসিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল। গাড়ীর চাকা লাল ধূলি উড়াইয়া করুণ আর্ত্তনাদে চলিল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি বাঁশীতে এক নেপালী গান বাজাইতে লাগিল। সরল দীপ্ত পাহাড়ী সুরে কুলীদের মনগুলিও সাড়া দিয়া উঠিল, বাঁশরী-তান-মুখর রাঙা-আলো-ভরা পথ দিয়া তাহারা আনন্দের সঙ্গে গাড়ী টানিতে টানিতে চলিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নির্ব্বিবাদে বাঁশী বাজানো চলিল না, পিছন হইতে এক মোটরকারের হুঙ্কারধ্বনি বনপথ ধ্বনিত করিয়া আসিতে লাগিল। মেল্ সার্ভিসের মোটরকার ষ্টেসন হইতে যাত্রী লইয়া আসিতেছে। মোটর-লরী তখন কিছু দূরে ছিল; তবু কুলীরা অতি সন্ত্রস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পথের এক পাশ দিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী টানিতে লাগিল, পাশের বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে যেন তাহারা বাঁচিয়া যায়। যন্ত্রযানের গর্জ্জনের সঙ্গে বাঁশী অনেকক্ষণ পাল্লা দিল বটে, কিন্তু কলদৈত্যের হুঙ্কারের সঙ্গে ব্যাকুলবেণু কতক্ষণ পারিয়া উঠিবে—বিরক্ত হইয়া যুবকটি গাড়ীটা পথের এক পাশে রাখিতে বলিয়া নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুই রক্তবর্ণ চক্ষু জ্বালাইয়া মোটর-লরী নিকটে আসিল এবং তাহাদেরই সম্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। কি একটা যন্ত্র খারাপ হইয়াছে বলিয়া ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নামিয়া কল ঠিক করিতে সুরু করিল।

যুবকটি পথের পাশে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল, মোটরকারের দিকে চাহিয়া দেখা আবশ্যক বোধ করে নাই। কিন্তু মোটর থামিতেই তাহার মনে হইল কে যেন পিছন হইতে তাহার দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া আছে; মুখ ফিরাইয়া দেখিল গাড়ীভরা যাত্রী যেন তাহারই দিকে চাহিয়া—অস্পষ্ট আলোয় তাহাদের স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, কেবল কতগুলি নানা রংএর ছায়ামূর্ত্তি। তবু প্রথম বেঞ্চের একেবারে শেষ প্রান্তে যে মূর্ত্তিটি রাঙা নদীজলের মত টলমল করিতেছিল তাহাকে সে চিনিল; ওই শ্যাম্‌পেন-রংএর শাড়ীপরা মেয়েটির সঙ্গেই ত সে কলিকাতা হইতে এক ট্রেনে এক কম্‌পার্টমেণ্টে আসিয়াছে, তাহার চম্পক-মুখে গোধূলির আলো যেন লোধ্ররেণু মাখাইয়া দিয়াছে, ওই আবেশময় চোখ দুইটি রঙীন স্বপ্নে ভরা, অজন্তার চিত্র-শিল্পীরা আপন অন্তরের রং ও আনন্দ দিয়া নারীর যে আঁখি আঁকিয়া গিয়াছেন সেই দীর্ঘপল্লবঘন সারঙ্গ-নয়ন তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল, গণ্ডের কালো তিলটি দেখা যাইতেছিল না, শুধু তমাল-দিঘির সন্ধ্যাজলের মত দুইটি স্নিগ্ধ চোখ।

কল ঠিক করিয়া ড্রাইভার মোটরে উঠিল। মোটর-লরী আবার গর্জ্জন করিয়া নড়িল। সেই স্থির চোখ দুইটি নদীর ঢেউয়ের মত দুলিয়া ছলছল করিয়া উঠিল, তাহার দীপ্তমুখে কি দুষ্টামিভরা হাসি খেলিয়া গেল, তারপর সেই তরুণী হাতের নীল রুমালটা তাহারই দিকে, হাঁ, তাহারই দিকে নাড়িতে নাড়িতে পথের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

মোটর-লরী যখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, তাহার পিছনের আলোটা আর দেখা যাইতেছে না, শুধু সম্মুখে পথের শেষপ্রান্তে দুইটি তারার আলো জলজল করিতেছে, যুবকটি তখন ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং জোরে গাড়ী চালাইতে বলিল। বাহকেরা চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী লইয়া ছুটিল।

বাঁশী বাজাইতে আর ইচ্ছা রহিল না। গাড়ীর সব জান্‌লা খুলিয়া একটা বালিশে অর্দ্ধহেলান ভাবে বসিয়া যুবকটি পকেট হইতে হাভেনা সিগার বাহির করিল, কিন্তু দেশলাইটা বাহির করিয়া দেখিল ট্রেনে সব কাটি নিঃশেষিত হইয়াছে। কুলীদের নিকট হইতে একটা দেশলাই

চাহিয়া লইয়া সে তাহাদিগকে সিগারেট দিতে গেল, তাহারা একটু আশ্চর্য্য হইয়া আপত্তি জানাইল, পরের গ্রামে গিয়া তাহারা তামাক খাইবে; তবু দলের মধ্যে যে সব-চেয়ে অল্পবয়স্ক ছিল সে একটা সিগার চাহিয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল।

গিরিবনপ্রান্তরে সন্ধ্যার কালো ছায়া নিবিড় হইয়া আসিতেছে, পশ্চিমের রক্তমায়া মিলাইয়া যাইতেছে, যেন রাঙা গোলাপের পাতাগুলি ধীরে ধীরে কালো হইয়া আসিতেছে; একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতেছে।

বালিশে হেলান দিয়া চুরুট টানিতে টানিতে এই আলো-ছায়াময় উদাস প্রান্তরের দিকে চাহিয়া অনেক কথাই যুবকটির মনে পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সম্মুখে নবমীর চাঁদ উঠিল; তাহারই রূপালী আলো শালবনের অন্ধকারে দৈত্যপুরে সুপ্ত কোন্ রাজকন্যার জন্য যেন পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে; ছোটপাহাড়গুলিকে দেখাইতেছে যেন দৈত্যেরা সারি বাঁধিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই তারাভরা আকাশের তলায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে জ্যোৎস্নার মায়ালোকে রূপকথা-রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া যায়, অন্তরের অনন্তকালের রাজপুত্র জাগিয়া উঠে, এই গিরিবন লঙ্ঘন করিয়া তেপান্তরের মাঠের পর মাঠ পার হইয়া কোথায় যাইতে চায়—অসীম তাহার আশা, দুর্জ্জয় তাহার শক্তি, দুর্গম তাহার পথ, সুদূরের বাণী তাহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে।

তিনটি সিগারেট পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, আর-একটি ধরাইল। তরুণীর বসিবার ভঙ্গীর অপূর্ব্ব সুষমাময় ছবিটি তাহার চোখে বার বার জাগিতে লাগিল। ফুলের গন্ধে মৌমাছি যেমন আকুল হইয়া উঠে এই তরুণীর মুখ তাহার মনে তেমনি নেশা জাগাইয়াছিল। বার বার সে ভাবিতেছিল, এ মুখ সে আজকে ট্রেনে নয়, ইহার পূর্ব্বেও কোথায় দেখিয়াছে, ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না।

সিগারেটের বাক্স খুলিয়া আর-একটা সিগারেট তৈরী করিয়া ধরাইল। এতক্ষণে মনে পড়িল, রসেটীর আঁকা এক-খানা ছবি দেখিয়াছিল, তাহারই মত এই মুখখানি; ছবিটার নাম মনে পড়িল না, নাই পড়ুক—রসেটীর সেই ছবিখানি মূর্ত্তিমতী দেখিয়াই সে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে শুধু এ মুখের গণ্ডে একটি তিল। প্রিয়ার তিল সম্বন্ধে হাফেজের কবিতা যখন সে পড়িয়াছিল, তখন সে তাহা কবির পাগ্‌লামী ভাবিয়াই মনে মনে হাসিয়াছিল; আজ মনে হইল, সত্যই একটি তিলের জন্য ত্রিভুবন দেওয়া যায়।

বাহিরের প্রকৃতির মত সেও আপন মনে মায়া-জাল বুনিতে লাগিল। তাহার এই তেইশ বছরের জীবন অনেক তরুণীর স্পর্শেই চঞ্চল রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথাও সে আশ্রয় খুঁজিয়া পায় নাই। সূর্য্যাস্তের যে রক্ত-বিহঙ্গরূপ সে দেখিয়াছিল, তাহারই মত তাহার প্রাণ—এ নীড়-হারা পথিক-পাখী নব নব সৌন্দর্য্যলোক পার হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

তাহার প্রথম প্রেম হইয়াছিল এক পুতুলের সঙ্গে। সে যখন তিন বছরের, তখন তাহার মামা তাহাকে যে জার্ম্মান পুতুলটা কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেই নানা রংএর সাজপরা মেমটাকে বুকে জড়াইয়া সে প্রথম রাত ঘুমাইতেই পারে নাই। তাহার বয়স যখন সাত বৎসর, সে তাহার সমবয়স্ক এক জেঠতুতো বোনকে বড় ভালোবাসিত; আচার চুরি হইতে লাট্টু ঘোরানো, পুকুরে নাওয়া, কুলগাছে চড়া, সব বিষয়ে বোনটিকে সঙ্গী না পাইলে কিছুই করিতে পারিত না। নয় বছর বয়সে সে তাহার এক বন্ধুর বোনকে ভালো-বাসে। তাহাকে সে একদিন গাড়ী চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিল মাত্র, পরদিন মাসিক পরীক্ষায় অর্দ্ধেক আঁক না কসিয়া ও অর্দ্ধেক আঁক ভুল কসিয়া আসিয়া-ছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুকে ডাকিতে যাইয়া বন্ধুর বোনকে গাছে দোল খাইতে দেখিত, তাহার সঙ্গে কোনদিন কথা হয় নাই। চোদ্দ বৎসর বয়সে সে তাহার বোনের এক বন্ধুকে ভালোবাসে। সেবার তাহারা পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিল, সেই সমুদ্রতীরে ঝিনুক কুড়ানোর ভালোবাসা, যত সুন্দর ঝিনুক পাইত সে তাহাকে আনন্দের সঙ্গে উপহার দিত। যাইবার সময় তাহার দেওয়া অর্দ্ধেক ঝিনুক মেয়েটি ফেলিয়া গেল দেখিয়া সে সমস্ত রাত কাঁদিয়াছিল।

তাহার ঘরে বাহিরে পথে বিপথে কত তরুণীর

চাউনিতে কৈশোরের কত দিন নেশার মত কাটিয়াছে, কত বিনিদ্র রাত্রিতে জ্যোৎস্না-সুধা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সেই শিশুকাল হইতে এ যৌবন পর্য্যন্ত সে যাহাদের ভালোবাসিয়াছে, তাহাদের অনুপম আনন্দের হাসি, যাহারা তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছে তাহাদের তারার মত আঁখির আলো এই মাধবীরাত্রে তাহার চারিদিকে স্বপ্নমায়া সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বাক্স খুলিয়া আর-একটি নূতন বাঁশী বাহির করিয়া সে বাজাইতে সুরু করিল।

কয়েক ঘণ্টা চলিয়া কুলী বদল করিতে তাহারা এক গ্রামের কাছে থামিল। এক আমগাছের তলায় বসিয়া কুলীরা তামাক খাইতে সুরু করিল। যুবকটি একটা সিগারেট ধরাইয়া গাড়ীর পাশে পথের মাঝে দাঁড়াইল। মাথার উপর একটা স্নিগ্ধনীলপর্দ্দার ঘেরাটোপ দেওয়া, তাহাতে মাঝে মাঝে তারার চুম্‌কীগুলি জ্বলিতেছে, চারিদিক অস্পষ্ট, আব্‌ছায়া, মাঝে মাঝে কালো রংএর ছোপ। সম্মুখে তরুছায়াসমাচ্ছন্ন গ্রামটি ঘুমন্ত, তাহার পাশ দিয়া পথের কালো রেখা তারালোকের সহিত গিয়া মিশিয়াছে, ঝিল্লী ও বাতাসের সন্‌সন্‌ শব্দ হইতেছে।

সহসা একটা মোটরকারের হুঙ্কার শোনা গেল, যুবকটি সরিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই নিমেষের মধ্যে একখানি মোটর-কার ভাঁটার মত চোখ জ্বালাইয়া তাহারই পাশে আসিয়া থামিয়া গেল। গাড়ী হইতে এক কোটপ্যান্টপরিহিত যুবক রুক্ষস্বরে বলিল,—এই কুলী, হিঁয়া পানি মিলে গা ?

একে মোটরকার ত তাহাকে চাপা দিতে দিতে রহিয়া গিয়াছে, তারপর এরূপ সম্ভাষণে যুবকটি সিল্কের পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইয়া—Who the devil ! বলিয়া অগ্রসর হইল। মোটরের আলোয় তাহার চোখ এত ধাঁদিয়া গিয়াছিল যে গাড়ীতে কে বসিয়া আছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। অগ্রসর হইয়া দেখিল সাহেব নয়, বাঙ্গালী-সাহেব।

দুইজন দুইজনকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখে মুখে চাহিয়া রহিল। তারপর বাঙ্গালী-সাহেবটি মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আনন্দের সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল,—হ্যালো রজত, তুমি এখানে! এমন unearthly placeএ তোমায় দেখ্‌বো আমি dreamও কর্‌তে পারি নি! Excuse me, তোমায় mean করে' আমি কিছু বলিনি বুঝ্‌তে পার্‌ছো।

সাহেবটি রজতের হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনী দিল।

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,—তুমি যেরকম মোটর হাঁকিয়ে আস্‌ছিলে আর যেরকম সাহেবী পোষাক পরে' ইংরেজী বল্‌চো, তোমায় চিন্‌তে আমার ভয় কর্‌ছে, যতীন।

—Oh never mind ! এই দেখোনা কুলীগুলো কি fool, গাড়ীটা ডান দিকে রেখেছে, আর-একটু হলে একটা accident হয়েছিল। তা তুমি—

তাহাকে বাধা দিয়া রজত হাসিয়া বলিল,—না আমাকে তুমি নেহাৎ এবার গাড়ী চাপা দিতে পার্‌লে না। মনে পড়ে ইস্কুলে একদিন বেঞ্চি চাপা দিতে চেয়েছিলে? তাও ত পারো নি।

উচ্চস্বরে প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া রজতকে আর-এক ঝাঁকুনী দিয়া যতীন বলিল,—হ্যালো ওল্ড বয়, কতদিন পরে দেখা বল ত ?

—ও, অনেকদিন পরে, তা তুমি জল. জল কি চেঁচাচ্ছিলে, তোমার তেষ্টা পেয়েছে ?—বলিয়া রজত গাড়ী হইতে চিনেমাটির চিত্রিত ছোট কলসী বাহির করিল।

—না, না, আমার জলতেষ্টা নয়, আমার গাড়ীটার।

—ও, তোমার ও দানবের তৃষ্ণা ত আমার এই এক কুঁজো জলে মিট্‌বে না।

—তা মিট্‌বে না। তোমার কুলীদের আমি বরং জল আন্‌তে বল্‌ছি, তুমি ততক্ষণ একটা সিগারেট দাও দেখি।

কুলীদের ডাকিয়া জল আনিতে বলিয়া দুই বন্ধু পথের পাশে এক বড় কালো পাথরের উপর বসিল।

যতীন তাড়াতাড়ি ঘড়িটা দেখিয়া বলিল,—আমি তোমায় আধঘণ্টা সময় দিতে পারি, তা এ পথে কোথায় যাবে ? আচ্ছা, মোটরসার্ভিস্ হয়েছে ত, এ গাড়ীতে কেন—চিরকাল দেখেছি তুমি দেরী কর্‌তে পার্‌লে শীগ্‌গীর কর্‌বে না।

—এমন রাত্তির আর এমন পথটা, মোটরে সেই দম আট্‌কে হুস্ করে' গেলে কি সুখ বলো ?

—ও তোমার আর্টিষ্টের মতন কথা হোলো বটে।

আচ্ছা আর্টিষ্ট হলেই কি কুঁড়ে হতে হবে? তাতে কি কাজ চলে?—পশ্চিমের লোকেরা এগিয়ে চলেছে—দেখো, এই মোটরকারের মত; আর আমাদের দেশ—গরুরগাড়ীর মত ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে আর্ত্তনাদ করতে করতে কোনোমতে চলেছে।—প্রাণ চাই!—একে ত দেশটা ঝিমিয়ে পড়েছে, তার উপর তোমরাও যদি আলস্যের মৌতাত লাগাও—

—তা হলে দেশের আর কোন আশাই নেই—ও নিরুদ্দেশ ছুটে মরার চেয়ে পথটা উপভোগ করতে করতে যাওয়া ভালো—

—যাক্, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, ছোটবেলা থেকেই আমি যে-পাতায় অঙ্ক কসেছি তার পাশেই তুমি ছবি এঁকেছো—তোমায় আমায় গরমিল হয়ে আস্‌ছে—এখন যাচ্ছ কোথায়?

—হাজারিবাগে।

—বেড়াতে?

—বেড়াতে ঠিক নয়, ছবি আঁক্‌তে।

—সেই বেড়াতেই হোলো।

—তা নয় হে, এক ধনী ভদ্রলোক এক আর্টিষ্ট চান, তাঁর ঘরের দেওয়ালে ছবি এঁকে দেবে, তা ছাড়া বোধ হয় কয়েকখানা portraitও আঁক্‌তে হবে—আমার আঁকা ছবি exhibitionএ দেখেছিলেন, তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তা হলে এদেশে আর্টিষ্টেরা নেহাৎ starve করে না দেখ্‌ছি! আচ্ছা ভদ্রলোকের কি রকম টাকা বল ত, জমিদার?

—তা ত বল্‌তে পারি না, ভাই।

—দেখ, যাচ্ছ ও-সব খোঁজ রাখনি?—দেখ, আমি একটা capitalist খুঁজ্‌ছি, বেশী নয়—এখন বিশ লাখ টাকা হলেই হবে, একটা কয়লার খনি, একটা ম্যাইকার, আরও কয়েকটা আইডিয়া আছে।

—তা তুমি এখন কি করছ?

—আমি? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেই ফিরিঙ্গি প্রফেসারটার সঙ্গে বক্সিং লড়াই জানো, তার সঙ্গে মারামারি করে' ত কলেজ ছেড়ে দিলুম, তারপর কপাল-ঠুকে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম, আমেরিকায় বছর দেড় ছিলুম, জার্ম্মানীতে মাস ছয় কাটিয়ে এই কয়েকমাস হোলো দেশে এসেছি—হাঁ, আশ্চর্য্য দেশ জার্ম্মানী—একটা দেশ বটে, worth living—

—তা এখানে কি করছ?

—এখন ঝাঝায় একটা খনি তৈরী করবার কনট্রাক্ট পেয়েছি—আর এই ছোটনাগপুরে boring করে' বেড়াচ্ছি—কয়লাটয়লা নয়—এখানে অন্য কোন ধাতু নিশ্চয় আছে—

—গুপ্তধনের সন্ধানে আছ বলো!

—ঠিক বলেছ, দেখি ভাগ্যে যদি থাকে, তবে কি জানো আলাদীনের যে প্রদীপ না হলে দৈত্য আসে না রত্নও পাওয়া যায় না, সেই প্রদীপটা বুঝ্‌লে ত, রূপচাঁদ ভাই, রূপচাঁদ—

—তা আর বুঝ্‌ছি না, তবে ভাই আমি যে রত্নের সন্ধানে আছি তা তোমার ও প্রদীপেও মেলে না—সে সাত রাজার ধন এক মাণিক—প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে খুঁজ্‌তে হয়—

কাহার দুইটি স্বপ্নময় চোখ তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

—ওঃ, তুমি এখনও সেই ছেলেবেলার মত আছ—খালি তরুণী—ছোটবেলায় আমরা পয়সা পেলেই চানাচুর কি বেগুনী কি লাট্টু কিন্‌তুম, আর তুমি কিন্‌তে জলছবি কি বাঁশী কি ফুল—ও-সব বাঁশী ফুলে পেট ভরে না—বুঝ্‌লে?

—এখনও ভাই বুঝ্‌তে আরম্ভ করিনি।

—বুঝ্‌বে একদিন—এই যে বাংলার গ্রামে গ্রামে সব ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছে—ও যতই কুইনিন-মিক্‌শ্চার খাও আর বন কেটে মশারি বুনে মশা তাড়াও—কিছুতেই কিছু হবে না, যেদিন সিল্‌ভার টনিক পেটে পড়্‌তে সুরু হবে দেখ্‌বে কোথায় ম্যালেরিয়া—ওই কুলীগুলো জল নিয়ে এসেছে—মোটরটা কি শুধু শুধু তেতেছে, ধরো প্রায় একশো মাইল drive করে' আস্‌ছি, আবার আধঘণ্টার মধ্যে ষ্টেশন পৌঁছতে হবে।

কুলীগুলি জল ঢালিয়া মোটরের চাকাগুলি ঠাণ্ডা করিতে লাগিল। যতীন যদিও রজতের অপেক্ষা

খর্ব্বাকৃতি কিন্তু তাহার দৃঢ়মাংসপেশীবহুল দেহ দেখিলেই মনে হয় এ যেন একটা শক্তির ডাইনামো, গোলগাল ভরা মুখ, জলজলে চোখ দুইটি সর্ব্বদা সজাগ, চারিদিকে ঘুরিতেছে। রজতের দীর্ঘদেহ দেখিলেই মনে হয় এ যেন প্রাণরসের ফোয়ারা, বিদ্যুৎশিখার মত কাঁপিতেছে। তাহার লীলায়িত দেহখানি যতীন লোহার মত দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—স্বপ্ন সব ছেড়ে দাও ভাই, dreamsএ দেশের এই দশা, কাজ চাই, কাজ—

রজত মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—তুমি কি কাজ করছ ভাই?

—আমি? ওই ত বল্লুম টাকা পাচ্ছি না, না হলে দেখ্‌তে এখানে লোহা তৈরী কর্‌বার কারখানা করতুম—লোহা—বুঝ্‌লে, লোহা হচ্ছে এ যুগের দেবতা, এদেশে তার জন্ম দিতে হবে—প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেদিন জার্ম্মানীর মত হবে—

যতীনের উদ্দীপ্ত বাক্যধারায় বাধা দিয়া একটু ব্যঙ্গের স্বরে রজত বলিল,—তবেই ভারতের মুক্তি?

—নিশ্চয়! দেখ্‌বে সেদিন সে পরাধীন নেই! যদি শক্তি পাই, আমি এখানে ইঞ্জিন তৈরী করব, মোটর,—এই ফোর্ডকারের মত Dutt-car, তোমরা চড়বে, এসো লেগে যাও আমার কাজে—বলিয়া নিজের মোটরটা ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল।

—কেন ভাই? এই সাম্‌নে শান্ত গ্রাম ঘুমোচ্ছে দেখ্‌ছ, তোমার কাজের চোটে এদের চোখে দিনরাতে নিদ্রা থাকবে না, বুকে থাকবে অতৃপ্ত জ্বালা,—এ গ্রামের জায়গায় আসবে কুলীদের বস্তির কদর্য্যতা আর বীভৎসতা, মদের দোকান আর বারবনিতা—তোমার কলে একঘণ্টায় একশো মাইল যাবে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কথা শুনবে, এক মিনিটে একখানা কাপড় হবে, এক সপ্তাহে একখানা বাড়ী হবে, আবার এক নিমিষে মানুষ মেরে ফেলবে, নগর পুড়িয়ে দেবে—পাহাড় ডিঙোবে, সাগর পেরোবে, আকাশে উড়বে—সব মান্‌লুম —কিন্তু সত্যিসুখ দিতে পারবে কি?

—সুখ দিতে পারব না? এই কলের জন্য কত material comforts বেড়ে গেছে, এই রেলগাড়ী, মোটর, ইলেকট্রিকের আলো, কত বল্‌ব—Silly—তোমাদের মত ভাবুকদের বোঝাতে পারব না—ওসব থিওরী বুঝি না, আমি বুঝি কাজ, কাজ,—

—আচ্ছা অনেকক্ষণ ত মোটরের গান শুনলে এখন আমার বাঁশীটা একটু শুনবে, স্কুলে বাঁশী শোন্‌বার জন্য আমায় কতই না ক্ষেপাতে—

রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে আবার দেখিয়া যতীন বলিল,—না ভাই; আজ সময় নেই, হাজারিবাগে শীগ্‌গির আস্‌ছি, তখন শোনা যাবে, কোথায় উঠ্‌ছ?

—যোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী।

—যোগেশচন্দ্র—আচ্ছা মনে থাক্‌বে, আর দেরী করলে মেল পাব না।

রজতের কোমল হাত তাহার শক্ত হাতে ধরিয়া মোটরের দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া দীপ্ত স্বরে যতীন বলিল,—কাজ—কাজ—কাজ চাই ভাই, সব স্বপ্ন ছেড়ে দাও—ভাবতে হবে কি করছ তুমি। এই মানবশক্তির জন্য, মানবসভ্যতার উন্নতির জন্য কি করছ- science, civilisation, happiness—

মোটরের দরজাটায় এক থাপ্পড় দিয়া যতীন বলিতে লাগিল,—এই যে মোটরটা—এ কি একটা শুধু জড় কল ভাবো? আমার মোটেই তা মনে হয় না, এ আমার জীবন্ত বন্ধু, আমার চলার শক্তি, আমার পায়ের সবচেয়ে বড় muscle, তেজী ঘোড়া হাঁকিয়ে যা আরাম তার চেয়ে আরাম একে চালিয়ে—আচ্ছা ভাই আজ আসি—বলিয়া সে দরজা না খুলিয়াই মোটরে লাফাইয়া উঠিল। মোটর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহার শব্দে তাহার au revoir ডুবিয়া গেল, কালো পথে হুঙ্কার করিতে করিতে মোটর নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

আবার সব স্তব্ধ, শুধু হাওয়ার সন্‌সন্ শব্দ। ধীরে এক গেলাস জল গড়াইয়া খাইয়া রজত অতি আস্তে গাড়ীতে উঠিল। তরু-ছায়ায় ঘুমন্ত গ্রামের দিকে চাহিল, তারাভরা উদার আকাশের দিকে চাহিল, দিগন্তে কালোপাহাড়ের সারির দিকে চাহিল, শিখরে শিখরে নানাভাবের রেখাগুলি যে তরঙ্গায়িত হইয়া

উঠিয়াছে, এই পাহাড়গুলো যেন অচল বস্তুপুঞ্জ নয়, ওই সচল রেখাগুলি নীলাকাশের পটে তাহাদের প্রাণের গতিকে টানিয়া উচ্ছ্বসিত করিয়া দিয়াছে। তেমনি তাহার প্রাণ কোন্ রংএর রেখাপথ দিয়া যাইবে ?

জান্‌লার ফাঁক দিয়া একটু চাঁদের আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িল। সেই জ্যোৎস্নাময় নীলিমার দিকে চাহিয়া রজত ভাবিতে লাগিল, সত্যই সে মানব-সভ্যতার উন্নতির জন্য কি করিতেছে ? বিজ্ঞান, সভ্যতা, মানবের সুখ,—যতীনের কথাগুলি ব্যঙ্গের সুরে কি বেদনার সুরে তাহার কানে বাজিতে লাগিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

বালিশ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বিপুলরহস্যময় দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্যই কি চাই ? অজন্তার চিত্রশালা, না কয়লার খনি ? রবীন্দ্রনাথের গানগুলি, না লোহার কারখানা ? এইসব সরলনগ্ন গ্রাম্য-জীবন, না নগরের কৃত্রিম মুখোস-পরা সভ্যতা ? দুই-ই চাই ? বাঁশীর সুরের সঙ্গে মোটরকারকে কে বাঁধিতে পারিবে ?

আবার সে ধীরে শুইয়া পড়িল। তারাগুলি যেন মাথার গোড়ায় প্রদীপের শিখার মত দপ্ দপ্ করিতেছে, ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজে সমস্ত আকাশ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। এ-সমস্ত ভাবিতে তাহার ভালো লাগিল না। তারাগুলির দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখন হয়ত সেই তরুণী বাড়ী পৌঁছিয়া গিয়াছে ; সেও হয়ত তাহারি মত এদেশে নূতন আসিয়াছে, এ অজানা দেশ এই জ্যোৎস্না-রাত্রির মায়ায় আরও অপূর্ব্ব লাগিতেছে ; সেও হয়ত এম্নি বিছানায় শুইয়া মাথার গোড়ার জান্‌লা খুলিয়া ছিন্নমালার ফুলদলের মত তারাগুলি দেখিতে দেখিতে সারাদিনের যাত্রার কথা, তাহার কথাও একটু ভাবিতেছে, তাহার ক্লেশে মুখে নীলাকাশে এম্নি জ্যোৎস্না ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, অপূর্ব্ব দ্যুতিময় তাহার চোখ দুটি ওই তারাটির দিকে চাহিয়া আছে।

ভাবিতে ভাবিতে রজতের চোখ নিদ্রায় ভরিয়া আসিল।

২

পরদিন রজত যখন হাজারিবাগে পৌঁছাইল, তখন সুন্দর প্রভাত। পাহাড়ের গা হইতে স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকা উড়িয়া যাইতেছে, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় শিশিরের বিন্দুগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতেছে। সহর হইতে মাইল তিন দূরে এক খোলা প্রান্তরের মধ্যে বড় লালবাড়ীর সাম্‌নে কুলীরা গাড়ী থামাইল। বাড়ীটি পথ হইতে কিছু দূরে, উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। লতামণ্ডিত গেটের সম্মুখে নামিয়া লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়া রজত বাড়ীর দিকে উঠিয়া চলিল। পথের দুই পাশে ইউক্যালিপ্‌টাস ও পাম-গাছের সারি, তাহার মাঝে মাঝে ক্রোটনের সার, লতাকুঞ্জ, পুষ্পবীথি।

প্রায় অর্দ্ধেক পথ উঠিয়া পথের এক বাঁকে রজত দেখিল, এক ঝাউ-গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে বসিয়া একটি মেয়ে নিবিষ্টমনে বই পড়িতেছে, বাসন্তী রংএর শাড়ীর উপর লাল রংএর বইখানি, সাদাপাতাগুলির উপর সোনার বালাগুলি ঝিকিমিকি করিতেছে। পাঠনিরতা তরুণী-মূর্ত্তির পাঠভঙ্গীর অপূর্ব্ব সুষমাময় চিত্রের দিকে চাহিয়া রজত চুপ করিয়া দাঁড়াইল। লুটাইয়া-পড়া শাড়ীর পাড় হইতে ঝুলিয়া-পড়া চুলগুলি পর্য্যন্ত দেহের সব রেখা যেন বইখানির উপর পরম প্রীতিতে প্রণত হইয়া পড়িয়াছে ; মুক্ত কালো কেশে অর্দ্ধেক মুখ ঢাকা। রজতের কেমন ধারণা হইয়াছিল কালকের পথে-দেখা মেয়েটিকে সে এ বাড়ীতে আসিয়া দেখিতে পাইবে, অবশ্য এ বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ সে খুঁজিয়া পায় নাই। তাহাকে না দেখিয়া সে যতখানি ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াছিল তাহা হইল না।

মেয়েটি তাহার দিকে লক্ষ্যই করিতেছে না দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া রজত একটু মেকী কাশিয়া নাগরা জুতাটা কাঁকরে ঘসিল। শব্দে চমকিত হইয়া হাত দিয়া চুলের গুচ্ছগুলি মুখ হইতে সরাইয়া চাহিতেই এক অপরিচিত যুবককে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া মেয়েটি অতি অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। রজত দেখিল যেন মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা। সে একটি ছোট নমস্কার করিল। প্রতিনমস্কার করিতে গিয়া হাত হইতে বইখানি সশব্দে পড়িয়া যাইতে

মেয়েটির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। রজত বইখানি তুলিয়া তাহার হাতে দিতে সে সিঁদুর-মাখানো মুখে তাহার দিকে চাহিল।

রজত ধীরে বলিল,—এটা কি যোগেশ-বাবুর বাড়ী ?

প্রশ্নটি অবশ্য নিষ্প্রয়োজন, কেননা এটা যে যোগেশ-বাবুর বাড়ী সে সম্বন্ধে কুলীরা তাহাকে বার বার আশ্বাস দিয়াছে। কিন্তু কাহারও সহিত, বিশেষতঃ কোন মেয়ের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিতে হইলে, এই নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন কথাগুলিই সবচেয়ে কাজে লাগে।

নতদৃষ্টিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলিল,—হাঁ। আপনি ?

—আমাকে তিনি আসতে লিখেছিলেন, একজন আর্টিষ্টের দরকার ছিল না ?

দীপ্তচক্ষে রজতের দেহ ও বেশভূষার দিকে চাহিয়া পরিচিতজনের মত বলিল,—ও, আপনি, আসুন।

তারপর লজ্জাজড়িত চরণে ভেল্‌ভেটের চটিজুতোটা পরিয়া, কাঁকরে-লুটানো শাড়ীর আঁচলটা গেরুয়া-রংএর ব্লাউজের উপর টানিয়া সে ধীরে অগ্রসর হইল। রজত চলিল, ঠিক তাহার পাশেও নয়, ঠিক তাহার পেছনেও নয়।

স্নিগ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলিল,—পুস্‌পুসে এলেন বুঝি ?

—হাঁ।

রজতের দিকে ক্ষণিকের জন্য মুখ ফিরাইয়া মেয়েটি বলিল,—আমরা আপনাকে কাল expect করেছিলুম।

তাহার দেহের গতিচ্ছন্দের দিকে চাহিয়া রজত হাসিমাখানো স্বরে বলিল,—ও !

আবার রজতের মুখ নিমেষের জন্য দেখিয়া লইয়া তরুণী বলিল,—বাবা ভাব্‌লেন বুঝি এলেন না। তারপর রমলা বল্‌লে—বলিয়াই থামিয়া গেল। একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

রজত তাহার পাশে আসিয়া পড়িল। নীরবে পথের আর-একটা বাঁক উঠিতে রজত পথের ধারের ক্রোটনের পাতাগুলিতে হাত দিয়া বলিল,—ভারি সুন্দর ক্রোটনগুলো ত, কি সুন্দর গোলাপগুলোও !—বলিয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল।

মেয়েটি আর-একবার রজতের দিকে চাহিয়া বলিল, —হাঁ, কাজীর ভারি ফুলের সখ, এই গাছগুলো ওর প্রাণ।

চোখে চোখ রাখিয়া রজত বলিল,—ফুল ... ই ভালোবাসে।

নতদৃষ্টিতে মেয়েটি বলিল,—হাঁ।

বাকী পথটুকু আবার নীরবে কাটিল।

বাড়ীর সিঁড়ির সম্মুখে আসিতেই স্মিতহাস্যে মেয়েটি রজতের দিকে চাহিয়া বলিল,—আসুন ! তারপর দুইজনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া ফুলের টবগুলির পাশ দিয়া বারান্দা পার হইয়া এক বড় হলঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেটি ড্রয়িং-রুম। মেঝেতে সবুজ কার্পেট পাতা, দেওয়ালগুলো নীল আর ছাদটা সোনালী-রং-করা, ছবি সোফা কোচ ইত্যাদি দিয়া ঘরটা সাহেবী ফ্যাসানে সাজানো বটে কিন্তু চেয়ার টেবিল সব ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন। ঘরের মাঝখানে এক সোফায় ছাই-রংএর সুট পরিয়া এক বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার পাশে এক সিংহাসনের মত চেয়ারে গেরুয়া রংএর আলখাল্লা পরিয়া এক প্রৌঢ় মুসলমান এক ফার্সী বই পড়িয়া শুনাইতেছেন। বৈরাগীর মত কোঁক্‌ড়া চুল তাঁহার ঘাড়ে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; কাঁচাপাকা দাড়ি খুব লম্বা নয়, খুব ঘনও নয় ; চোখ দুইটি বাউলদের মত ভাসাভাসা যেন কোন স্বপ্নলোকে স্থিত ; দেহ দীর্ঘ সুঠাম। মাঝে মাঝে দাড়িতে আঙ্গুল চালাইয়া মুসলমানটি ফার্সী পড়িতেছেন আর তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইতেছেন। তাহারই ছিন্নটুকরা কয়েকটি কানে আসিল—

কাজীসাহেব ওমার খায়াম পড়িতেছিলেন—

গোয়েন্দ্ বেহেশ্‌ৎ-ই-ইদন্ বা-হুর্ খুশস্ত্ ;
মন্ মী-গোয়েম্ কে আব-ই-আঙ্গুর খুশস্ত্।
ঈঁ নক্‌দ্ ব-গীর, ও দস্‌ৎ আজ্ আঁ নসিয়াহ্ ব-দার,
ক-আওয়াজ-ই-ঢোল্ বরাদর্ আজ্ দূর্ খুশস্ত্॥

লোকে বলে—ইদন-স্বর্গ পরীর পশরা খুশী-করা ; আমি বলি—আঙুরের রসই খুশী-করা। এই যা নগদ তাই চেপে ধরো, আর হাত গুটিয়ে নাও ধারের কার্‌বার থেকে ; ঢোলের আওয়াজ ভাই দূর থেকেই·········

কাজী-সাহেব পড়িতে পড়িতে সহসা থামিয়া গেলেন

দেখিয়া যোগেশ-বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কোণের পিয়ানোর কাছ হইতে কে যেন চঞ্চল চরণে সরিয়া গেল।

কন্যার দিকে চাহিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—কি মাধু-মা? ইনি?

রজত একটি ছোট নমস্কার করিয়া বলিল,—আমাকে আপনি আস্‌তে লিখেছিলেন—আমার নাম রজতকুমার—

তাহাকে বাধা দিয়া যোগেশ-বাবু প্রফুল্লমুখে বলিয়া উঠিলেন,—ও! আর বল্‌তে হবে না, চিনেছি, আপনিই exhibitionএ সেই বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যার ছবি এঁকে-ছিলেন, আর খুকীর ছবিটা—

—আজ্ঞে হাঁ,

—বেশ, বেশ! বসুন। দেখুন, ছবিটা আমাদের ভারি ভালো লেগেছিল, সেটা আগে কে কিনে নিয়েছিল বলে' আমার মেয়ের কি দুঃখ - বোসো না তুমি—

হাতের বইয়ের পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে মাধবীর গণ্ড রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রজত ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

যোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—হাঁ আমি ভেবেছিলুম কোন বয়স্ক আর্টিষ্টের আঁকা, যখন শুনলুম এক ইয়ং আর্টিষ্ট—তাই আপনায় ডেকে পাঠালুম—কাজী সাহেব সেই কল্‌কাতার ছবিখানার কথা মনে নেই—ঝড়ের—

কাজী-সাহেব ওমার খায়াম উল্টাইতে উল্টাইতে স্নিগ্ধচোখে একবার রজতের দিকে চাহিলেন।

যোগেশ-বাবু বলিতে লাগিলেন,—ছবিটা আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে—কালো কালো মেঘে আকাশ কালীতে ভরা, সাপের ফণার মত বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, তার তলায় ছিপ্‌টি-মারা কালো ঘোড়ার মত নদীর জল ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, দুধারে গাছের সারি দিশাহারা—জলে স্থলে ধূলো-বালিতে মেঘে বাতাসে যেন রুদ্রের আবির্ভাব—আর একটা পাখী দুই সাদা ডানা মেলে তারি মধ্যে উড়ে চলেছে। আশ্চর্য্য আপনার রেখার টানগুলো - পাখীটা আমার চোখে ভাস্‌ছে—ঝোড়োবাতাসে ভরা নৌকার পালের মত তার ডানা দুটো!

কাজী-সাহেব মাথার চুলগুলি নাড়িয়া রজতের দিকে প্রসন্নমুখে চাহিয়া বলিলেন,—আমি ত বলেছিলুম, এ ছবি নয়, এ রংএ তৈরী ঝড়ের গান।

মাধবী রজতের দিকে চাহিতেই তাহার মুখ গর্ব্বসুখে রাঙা হইয়া উঠিল।

যোগেশ-বাবু বলিতে লাগিলেন,—পাখীটা আশ্চর্য্য কৌশলে এঁকেছেন, ঠোঁট হতে ডানার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত রেখাগুলো এমন গতিশীল উত্তাল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে ঝড়ের গর্জ্জন যত বাড়ছে, বায়ুর বেগ যত উন্মত্ত, ততই তার বক্ষ নেচে উঠ্‌ছে, কণ্ঠে দীপক-রাগিণী বাজ্‌ছে, নির্ভয়ে মহানন্দে ঝড়ের মেঘের বুকে ছুটে সে চলেছে—দেখুন নদীর তট থেকে গাছের পাতা থেকে পাখীর ডানা থেকে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা অগ্নিপথ পর্য্যন্ত রেখাগুলো যেন কোন্ রুদ্রতালে নাচ্‌ছে, উত্তাল তরঙ্গের মত এই রংএর ঝড় সৃষ্টি করেছে—

রজত বাধা দিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, যোগেশ-বাবু অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন,—তাই আপনাকে ধরে' আন্‌লুম, আমাদের কয়েকখানা ছবি এঁকে দেবেন—বেশী নয়, আমার শোবার ঘরে খান চারেক, লাইব্রেরীতে খান তিনেক, এই ঘরটায় যে ক'খানা হয়, আর আমার মেয়ে কি তার ঘরটা না সাজিয়ে ছাড়বে—তাছাড়া কাজীর একখানা portrait—

কাজী-সাহেব চুলগুলি দোলাইয়া দাড়ি নাড়িয়া অতি বিনীতভাবে আপত্তি তুলিলেন,—না—না, আমার কেন সাহেব, আপনারই—

যোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—আর আমার মেয়ের একখানা ভালো দেখে—এই—

মাধবী অকারণে পাশের টেবিলের বইগুলি গোছা-ইতেছিল, রাঙামুখ তুলিয়া বলিল,—আর তোমার খানা বুঝি আঁক্‌তে হবে না, বাবা!

—সে কি আর না আঁকিয়ে ছাড়বি—তা কি কি ছবি আঁক্‌বেন সে বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তবে আমার কতকগুলো আইডিয়া আছে, ধরুন—.

স্নিগ্ধকণ্ঠে বাধা দিয়া মাধবী বলিল,—বাবা—

—কি মাধু?

—উনি এইমাত্র আস্‌ছেন।

—ও ! তাহলে এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আচ্ছা বিকেলে কথা হবে এখন। তুমি ওঁকে ঘর দেখিয়ে দাও—কাজী-সাহেব সুরু করো—

হর্‌গিজ্‌ ঘম্ দু রোজ্‌ ম-রা য়াদ্ ন-কিশ্‌ৎ.........

কাজী তাঁহার ফার্সী কবিতায় মনোনিবেশ করিলেন।

মাধবী রজতকে লইয়া বারান্দায় বাহির হইল। বারান্দাটি বাড়ীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়াছে। ড্রয়িংরুমটি পশ্চিমমুখী। তাহারা সে দিকের বারান্দা পার হইয়া উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়া পড়িল। রজত তাহার পিছন পিছন যাইতে যাইতে চুড়িগুলির দিকে চাহিতে তাহার হাতের বইখানির নাম সরবে চিন্তা করিবার মত ধীরে পড়িল, Great Hunger—

রজত বইখানির নাম উচ্চারণ করিতে, মাধবী একটু থামিয়া তাহার সঙ্গ লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—হাঁ, বইখানি পড়েছেন ?

—পড়েছি।

—বড় দুঃখের কথা লেখে, ট্রাজেডি পড়তে আমার মোটেই ভালো লাগে না—

—ওইটাই জীবনের মর্ম্মের কথা।

মাধবী যাইতে যাইতে রজতের মুখের দিকে স্মিত-নয়নে চাহিয়া বলিল,—আপনি এই বয়সেই দেখ্‌ছি জীবনের সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

—আপনার চেয়ে বয়সে বড় হব বোধ হয়।

—তা বলে খালি কান্নার কথা লিখে কি লাভ বলুন ?

—জগতের সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই কান্নার সাহিত্য।

আমার মোটেই ভালো লাগে না, এত মন খারাপ হয়ে যায়।

—কিন্তু জীবনটা কি দেখুন—আমাদের দেশের লোকেরা বলে লীলা ; কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা ঠিক বলে, সংগ্রাম—বাহিরের বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, আর সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে হানাহানি কাড়াকাড়ি—

তাহার দীর্ঘ বিপর্য্যস্ত চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, মাধবী খোলা চুলগুলি একটা খোঁপা করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—এ সব ফিলজফি আমি বুঝি না, যা পড়ে' বেশ আনন্দ হয় তাই লেখো, যাতে মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাই করো—

—কিন্তু জীবনটা যে দুঃখ কান্নায় ভরা—

—তা বলে' কি হাস্‌তে মানা—সত্যি যে লেখকের লেখা পড়ে' খালি কাঁদতে হয় তার ওপর আমার এমন রাগ হয়—আসুন, এইটা আপনার ঘর—

উত্তরদিকের বারান্দা পার হইয়া তাহারা পূর্ব্বদিকের শেষ সীমান্তে এক ছোট ঘরের সম্মুখে হাজির হইল। পাশের ঘরে এক দুষ্টামিভরা হাসির শব্দ শোনা গেল, ঘর-দেখানো কাজটা কোন চাকর দিয়া করাইলে ত অতিথিকে সমাদরের বিশেষ ত্রুটি গৃহকর্ত্রীর হইত না, এই হাসির এই অর্থ। কর্ত্তব্যের মাত্রাটা একটু বেশী হইতেছে।

ঘরটি একটু ছোট, আস্‌বাবপত্র সাধারণ। চাকর সুটকেশ, ব্যাগ, বেডিং ইত্যাদি আগেই আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে কি একটা কাজে পাঠাইয়া মাধবী একটু বিনীত স্বরে বলিল,—দেখুন, আপনার জন্যে ওপরের একটা ভাল ঘর বাবা ঠিক করেছিলেন—

রজত বাধা দিয়া বলিল,—না, না, এ ঘর ত সুন্দর ! আমার কল্‌কাতার ঘর যদি দেখেন।

—আপনি কাল রাতে আস্‌বেন ভেবে, দোতলার ঠিক এর ওপরের ঘরটাই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আমার এক বন্ধু—

হাঁ, কিন্তু আমার এক বন্ধু—বলিয়া শাড়ীর রাঙা রং ও চোখের দীপ্ত হাসির ঢেউ তুলিয়া সমস্ত ঘর চঞ্চল করিয়া মাধবীর বন্ধুটি বাতাসের দোলায় দোদুল পুষ্পলতার মত রজতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে রজত দেখিল, কালকের পথে-দেখা সেই তরুণী। তরুণী হাস্যমধুরকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল,—হাঁ, কিন্তু এই বন্ধুটি এসে ঘরটি দখল করেছে, আর আপনি আসবেন জান্‌লে—

মাধবী লজ্জায় রাঙা হইয়া বিরক্তির সহিত বন্ধুটির দিকে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল,—ইনি রমলা বসু আর ইনি—

হাসির স্বরে রমলা বলিল,—থাক, তোমায় আর

ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়ে দিতে হবে না, রেল-কোম্পানী কালকেই এ কাজটা সেরে রেখেছে!—তার পর চোখে হাসির আগুন ঠিকরাইয়া রজতকে বলিল,—দেখুন, পুস্‌পুসে এসে এই ঠক্‌লেন, ঘরটি বেদখল হয়ে গেল।

—ঠকে যা আনন্দ পেলুম আপনি জিতেও তা পান নি—

তাহাদের দুইজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, মাধবী একটু যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমলা বলিল,—তা বটে, যে রকম বাঁশী বাজাতে বাজাতে আস্‌ছিলেন আমার লোভই হচ্ছিল মোটর থেকে নেমে আপনার গাড়ীতে গিয়ে জুটি—আ, যেমন মোটরের মধুর সঙ্গীত তেম্নি তার মৃদু দোলা!—ঝাঁকুনিতে গা ব্যথা হয়ে গেছে।

—ও ঝাঁকুনি থেকে আমিও ত্রাণ পাইনি, ওটা যানের দোষ নয় এ দেশের পথের।

—কিন্তু ভারী সুন্দর আপনার বাঁশী বাজ্‌ছিল, আমার পাশের এক মেম ত প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছিল, সে নেপালে এক পাহাড়ীর মুখে এম্নি সুর শুনেছিল।

—হাঁ, ওটা এক নেপালী গান। কাল কখন পৌঁছোলেন?

—সে অনেক রাতে, ঘড়ি দেখিনি ক'টা। আচ্ছা আপনার ভয় কর্‌ল না, পথে ত বাঘ বেরোয় শুনেছি।

—কই, ভাগ্যে ত দেখা মিল্‌লো না।

—আচ্ছা সকালে কিছু খেয়েছেন?

—ও, এক গাঁয়ে এমন মিষ্টি দুধ দিলে, তা ছাড়া বাড়ী থেকে খাবার এনেছিলুম বাসি লুচি—

—বাসি লুচি—O lovely! আমার favourite—কিন্তু ওই দুধটা, আঃ!—বলিয়া রমলা একটু নাক সিঁট্‌কাইয়া রজতের হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি মোটেই খেতে পারি না, কেমন করে' যে লোকেরা খায়! আচ্ছা, আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন, আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম গরম কাট্‌লেট ভাজ্‌ছিলুম—আপত্তি নেই ত?

—মোটেই না।

—আর এক-কাপ্ চা কি কফি

—না, এক-কাপ্ চা-ই পাঠান।

—আচ্ছা, গেট্‌স্ কৈ? বা! মাধবী কোথায়? কি আশ্চর্য্যি মেয়ে!

মাধবী যে কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই।

নীল ভেল্‌ভেটিনের চটিজুতার হিলের উপর লাট্টুর মত ঘুরিয়া চারিদিকে হাসির আলো ঠিক্‌রাইয়া রমলা বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপার ত অতি সামান্যই। কিন্তু মাধবী যে কেন তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ঘরে থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, ধীরে পাশের ঘরে গিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। রমলা যখন বাবুর্চ্চিদের দিকে চলিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

(৩)

নূতন জায়গাটির সহিত পরিচয় করিবার জন্য রজত বিকালে ঘর হইতে বাহির হইল, কিন্তু বাড়ীর বারান্দাতেই আটক পড়িয়া গেল। ড্রয়িংরুমের পাশ দিয়া যাইতেছে, দেখিল রমলা ও মাধবী ভিতরে বসিয়া। রমলা পিয়ানোটা খুলিয়া টুংটাং করিতেছে আর মাধবী কি একখানা সচিত্র বিলাতী মাসিকপত্রিকার পাতা উল্টাইতেছে। রজত দরজার গোড়ায় আসিয়া ঢুকিবে কি না ভাবিতেছে, রমলা পিয়ানোর ওপর আঙুলগুলি মৃদু খেলাইতে খেলাইতে বলিল,—আসুন না। আপনি নিশ্চয় পিয়ানো বাজাতে জানেন।

রজত ধীরে তাহাকে একটি নমস্কার করিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া আর-একটি নমস্কার করিল। মাধবী চুপ করিয়া পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া যাইতে যাইতে মাথাটা কোনমতে নীচু করিল। রমলা হাসিয়া পিয়ানোয় এক ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল,—দেখুন আস্‌তে যেতে এত নমস্কার কর্‌লে হাঁপিয়ে উঠ্‌ব, তার চেয়ে এসে একটু বাজান।

বিনীতকণ্ঠে রজত বলিল,—ওটা ত আমি মোটে জানি না, এই চাষী পাহাড়ীদের বাঁশী একটু বাজাতে পারি।

অতি উৎসাহের সহিত রমলা বলিল,—তবে সেইটাই নিয়ে আসুন।

অনুনয়ের স্বরে রজত উত্তর দিল,—না, দেখুন এখন নয়।

হাসির স্বরের সঙ্গে একটু ঝাঁঝ মিশাইয়া রমলা বলিল,—বেশ, আমি তবে পিয়ানো বন্ধ করলুম।

ক্ষমা চাহিবার ভঙ্গিতে রজত বলিল,—না দেখুন—

মাধবী বই হইতে মুখ না তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,—থাক্‌ই না এখন বাপু!

একটু কড়া স্বরে রমলা বলিল,—না, আপনার সঙ্গে ঝগড়া, পিয়ানো বাজানো শুনতে এসেছিলেন আর—

বাধা দিয়া রজত হাসিয়া বলিল,—আর আপনি ত কাল বাঁশী শুনেছেন।

—তা হবে না—স্থিরকণ্ঠে বলিয়া রমলা সশব্দে পিয়ানো বন্ধ করিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিল।

রজত অতি অপ্রতিভ হইয়া কি করিবে ভাবিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাধবী কয়েকখানা ছবি উল্টাইয়া ধীরে বলিল,—পারবেন না ওর সঙ্গে আপনি। ভালোয় ভালোয় বাঁশীটা নিয়ে আসুন।

রজত ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই রমলা পিয়ানো খুলিয়া এক ঝঙ্কার দিয়া হাসি-মাখা স্বরে বলিল,—আচ্ছা থাক্‌, বাঁশীটা রাতের জন্য রইল।

রজত তবু দ্বার প্রায় পার হইল দেখিয়া সে একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল,—আসুন এখন বাঁশী শুনবো না, দরকার নেই।

তারপর সে আপন মনে পিয়ানো বাজাইতে সুরু করিল।

নারীর, বিশেষতঃ তরুণীদের, অন্তরের লীলা চির-রহস্যের, এ কথা রজত জানিত; আজ তাহার সত্যতা চোখের সম্মুখে প্রমাণ হইল দেখিয়া অবাক হইল না। তাহার কবিবন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল,—নারী হচ্ছে পুরুষের কাছে এক জীবন-জোড়া জিজ্ঞাসার চিহ্ন, নীল-সমুদ্রের মত অতল, সন্ধ্যার রক্তমায়ার মত চঞ্চল, ওদের সম্বন্ধে কোন থিওরী গোড়ো না, বুদ্ধি দিয়ে এ চিররহস্যময় যন্ত্রটিকে বুঝতে যেও না, পারবে না, প্রতিক্ষণে এর নব নব রূপ। প্রেমের সহিত স্পর্শ কর, যখন যে সুরে আঘাত করবে, তার যেমনই হোক ঝঙ্কার ঠিক পাবে। নারী-সেতারকে বুঝতে যেও না, প্রেমের হাতে আনন্দে বাজাও।

কোন প্রকার বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া সে দেখিতে বসিল। তাহাদের পিছনে খোলা জানলা দিয়া অবারিত মাঠ আর উন্মুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছিল, সেই নীলাকাশের রক্তিমাভ পটে দুই তরুণী বন্ধু যেন ছবির মত আঁকা।

বিশ্বশিল্পী দুইজনকেই সুন্দর করিয়া গড়িয়াছে বটে, কিন্তু একজনকে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে গড়িয়া গড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; আর একজনকে নিখুঁত ভাবে গড়িলেও, গড়া তার শেষ হইতে চাহিতেছে না। মাধবী যেন কোন গ্রীকভাস্করের গঠিত মূর্ত্তি, তাহার যৌবনপুষ্পিত তনু বসন্তব্রততীর মত পরিপূর্ণ কিন্তু টলমল করিতেছে না; তাহার দেহের বর্ণ স্থিরদামিনীর মত স্বচ্ছ স্নিগ্ধ প্রস্তরের শুভ্রতার মত; প্রতি অঙ্গ সুগঠিত, কোথাও সৌন্দর্য্যের রিক্ততা নাই, তাহার নাক চোখ ঠোঁট মুখ হিসাব করিয়া সাজানো, প্রতি অঙ্গের সহিত প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্জস্য, এ মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা, মনকে মুগ্ধ করে বটে কিন্তু মত্ত করে না। আর রমলাকে দেখিলে মনে হয় এ শিল্পীর তুলিতে আঁকা সুন্দর ছবি; এ অনুকৃতি শিল্প নয়, ভাবাত্মক; প্রতি অঙ্গভঙ্গী ভাবের ব্যঞ্জনায় ভরা, দেহের গঠনে বর্ণে সৌন্দর্য্য ফুরাইয়া যায় নাই, তাহার নাক চোখ মুখ একটু অসম ভাবেই গড়া, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য বাড়িয়াই গিয়াছে, চক্ষে গণ্ডে মাঝে মাঝে কিসের দীপ্তি ঝলসিয়া ওঠে, মুখের রং সব সময়ে এক রকম থাকে না, কখনও পদ্মপরাগের মত রাঙা হয় কখনও শুকনো গোলাপ-পাতার মত কালো হয় কখনও পলাশের মত জ্বলজ্বল করে, তাহার মনের ছন্দের মত তাহার দেহ লীলায়িত,—সবচেয়ে সুন্দর তাহার সারঙ্গ-নয়ন, কখনও হাসির আলো কখনও স্বপ্নের মায়া কখনও দীঘির কালো কখনও মেঘের ছায়া, তাহার চক্ষু-তারকায় যে আলো জ্বলিতেছে, তাহা সূর্য্যের নয় তারার নয় তাহা বিদ্যুতের, তাহার

দিকে চাহিলে সমস্ত জগৎ প্রাণময় প্রেমময় হইয়া ওঠে।

বীঠোফেনের একটি sonata বাজাইয়া রমলা দীপ্তমুখে রজতের দিকে চাহিল। রজত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল,—ভারি সুন্দর, আর-একটা বাজান না।

—বাজাচ্ছি, মাধু তোর গানের বইগুলো কোথায়?

—ওপরে আছে বোধ হয়, তোর ত বেশ হাত পিয়ানোতেও, তোর কাছে রোজ শিখ্‌লে হয়।

—তুমি ত শিখ্‌ছিলে এখানকার কোন্ মেমের কাছে।

—সে আর বোলো না, আন্‌ব নাকি ওপর থেকে?

—থাক্, আমি এম্নিই বাজাচ্ছি, ভুল হলে কেউ ত আর ধর্‌তে পার্‌ছে না!—বলিয়া কৌতুক-ভরা চোখে রজতের দিকে চাহিয়া বীঠোফেনের এক ঝড়ের গান বাজাইতে সুরু করিল।

নির্ণিমেষ নয়নে রজত এই পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, এ যেন একটা সুরের ছবি—চোখ দুইটির আনত কম্পিত রেখায়, রাঙা ঠোঁট দুইটির আনন্দে তরঙ্গিত টানে, পদ্মরাগের মত আঙুলগুলির লীলায়িত ছন্দে, হেলিয়োট্রোপ রংএর শাড়ীর দুলিয়া-ওঠার ভঙ্গিতে, দেহের প্রতি রেখা সুরকে মূর্ত্ত, গানকে গতিশীল সাকার করিয়াছে, পায়ের তলে লুটানো লাল পাড় হইতে উদ্যত বেণীর কেশগুলি পর্য্যন্ত ছবির রেখাগুলি প্রাণের ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—এই রমলা-ছবিখানিতে বিশ্ব-শিল্পী রেখাকে বক্ষে একটু ওঠাইয়া কটিতে একটু গড়াইয়া কণ্ঠে একটু টানিয়া কেশে বাড়াইয়া শাড়ীর পাড়ে দোলাইয়া কি বিচিত্ররূপ আঁকিয়াছে। এই দেহভঙ্গির সুষমার দিকে চাহিতে চাহিতে রজতের চিত্ত কোন্ সঙ্গীতলোকে হারাইয়া গেল।

গানের সুরের কি আশ্চর্য্য শক্তি, আত্মার অন্তরতম গৃহের বন্ধদুয়ার সব খুলিয়া যায়, চিত্তের নীলাকাশে রক্তরাঙা সন্ধ্যার স্বপ্নমায়া বুলাইয়া দেয়। গানের সুর রূপকথার রাজপুত্রের মত সোনার কাঠির স্পর্শে চিত্তের ঘুমন্ত রাজপুরী জাগাইয়া তোলে, প্রাণ-শতদল-শায়িনী চিরবিরহিণী কোন সৌন্দর্য্যময়ী জাগিয়া ওঠে! রজতের মনে হইল তাহার হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে ঘুমন্ত রাজকন্যা আজ জাগিয়া উঠিয়া প্রাণের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারি সম্মুখে মূর্ত্তিমতী বসিয়াছে।

বাজানো শেষ করিয়া রমলা দীপ্তনেত্রে রজত ও মাধবীর দিকে চাহিল। দুইজনকেই স্তব্ধ দেখিয়া বলিল,—কি হলো?

রজত বিমুগ্ধ হাসিয়া বলিল,—যা সুরের ঝড় তুল্‌লেন।

—এখন ত কেটে গেছে? না, না, এখন একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্ চলুন,—বলিয়া চেয়ার হইতে একটু নাচের ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। —কিন্তু বাঁশির কথাটা যেন রাতে মনে থাকে,—বলিয়া পিয়ানোটা বন্ধ করিল।

রজতের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার নিকটের এক সোফায় বসিয়া পড়িল, তাহার সহসা মনে পড়িয়া গেল, এই অপরিচিত যুবকটির সহিত বেড়াইতে যাওয়া ঠিক হইবে না। অবশ্য কোন্ কারণে সে বসিল তাহা বলা শক্ত, যাইতে তাহার কোথায় বেদনা বোধ হইতেছিল।

রমলা তাহার নিকট ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া বলিল,—কি হলো তোমার!

—ভাই এই গল্পটা শেষ করি।

—নাও, এই সন্ধ্যেবেলা তোমায় গল্প শেষ কর্‌তে হবে না,—বলিয়া বায়স্কোপের ম্যাগাজিনটা টান মারিয়া কার্পেটে ফেলিয়া দিল।

রজতও একসঙ্গে বেড়াইতে যাইবার মত শক্তি মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, সে পাশের দরজা দিয়া ধীরে ঘরের দিকে যাইতেছে দেখিয়া রমলা একটু বিস্মিতনয়নে চাহিয়া বলিল,—কোথায়?

দীনভাবে রজত বলিল,—ঘরে একটু কাজ আছে।

একটু তিক্তকণ্ঠে রমলা বলিল,—আচ্ছা।

এ-সব ঢং সে মোটেই সহিতে পারে না।

বারান্দার কোণে কাজী-সাহেব চুপ করিয়া বসিয়া সন্ধ্যার আলোয় পাহাড়গুলির দিকে তাকাইয়া ছিলেন। রমলা ছুটিয়া গিয়া প্রায় তাঁহার দাড়ির ওপর পড়িয়া হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া গেরুয়া রংএর আল্‌খাল্লাটা টানিয়া বলিল,—চলো ত কাজী সাহেব!

উদ্দাসস্বরে কাজী-সাহেব বলিলেন,—কোথায় ?

দীপ্তকণ্ঠে রমলা বলিল,—চলো না, আমরা বেড়িয়ে এসে এমন বেড়ানোর গল্প বলব !—তার পর সোনার চুড়ির ঝঙ্কার তুলিয়া কাজী-সাহেবের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তার দিকে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অলির প্রতি কুসুম

পূবের আকাশ লাল হয়ে ঐ এলো,
　উঠেছে ঐ শুকতারাটি জ্বলি' ;
জাগো প্রিয়, নয়ন দুটি মেলো,
　জাগো আমার বক্ষ-কোষের অলি।

সারাটি রাত জেগেই আছি আমি
　দণ্ড প্রহর পল অনুপল গুনি',
জাগো বঁধু, ফুরিয়ে আসে যামী—
　ভোর-আরতির ঘণ্টা কাঁসর শুনি।

জানো না নাথ কি করে' যে মম
　রাত কেটেছে মরণ প্রতীক্ষায়,
বারেক জাগো নিঠুর প্রিয়তম,
　আমার সময় ফুরিয়ে এলো হায়।

হাজার চোখে পূব্ আকাশে চাই,
　হাজার কানে শুনছি প্রতিধ্বনি,
মোর বিদায়ের আর যে দেরী নাই,
　জাগো আমার হাজার চোখের মণি।

"জয় মা জগদম্বা" বলে' হায়
　নিঠুর বামুন উঠেছে ঐ জেগে,
হস্তে সাজী, নামাবলি গায়
　এদিক পানে আসছে দ্রুত বেগে।

বারেক জেগে আমায় বিদায় দাও,
　হের এ চোখ শিশিরে যায় ভাসি',—
শেষ কথাটি গুঞ্জরিয়া গাও—
　কর্ণে বহি' বিদায় নিক এ দাসী।

দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবার লব'
　"জন্ম দিও, এবার দিয়ে প্রাণ
এমন দেশে, হয় না যেথা তব
　পূজার লাগি' প্রেমের বলিদান।"

বেতালভট্ট

পিচ্‌কারী দিয়ে বাড়ী তৈরী—

আজকাল আমাদের দেশে এবং বিদেশে কন্‌ক্রিট্ দিয়ে বেশীর ভাগ বাড়িই তৈরী হচ্ছে। এই জিনিষটা দিয়ে কাজ হয় খুবই চট্‌পট্ আর বাড়ীখানাও হয় পাথরের মত শক্ত। এতদিন পর্য্যন্ত কাঠের ফ্রেমের মধ্যে কন্‌ক্রিটের কাঁচা মসলা ঢেলে দিয়ে (কন্‌ক্রিটের) বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। এখন এক রকম নূতন কায়দায় এই কন্‌ক্রিটের বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে। একটা লম্বা ক্যাম্বিসের নলের আগায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসওয়ালা একটা লোহা বা অন্য কোন শক্ত ধাতুর মুখ লাগানো থাকে। সেগুলো দেখ্‌তে অনেকটা কলিকাতার রাস্তায় জল-দেওয়া নলের মত। একটা চৌবাচ্চায় শুক্‌নো কন্‌ক্রিট ঢালা থাকে, তারপর তার মধ্যে জোরে জল ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর কন্‌ক্রিট গলে' যাবা মাত্র সেটাকে ঐ নলের মধ্যে দিয়ে বাড়ী তৈরী কর্‌বার ফ্রেমের গায়ে ছুড়্‌তে আরম্ভ করা হয়। এই তরল কন্‌ক্রিট নলের মধ্যে থেকে ঠিক্ পিচ্‌কারীর মত বেরিয়ে আসে। ফ্রেমের একটা দিক আল্‌কাৎরা-মাখানো কাগজ আর খুব সূক্ষ্ম লোহার জালে মোড়া থাকে। কন্‌ক্রিট শুকিয়ে যাবা মাত্র আল্‌কাৎরা-কাগজ আর লোহার জাল খুলে ফেলা হয়। এই রকম বাড়ীর সব দেওয়াল, মেঝে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে বেঞ্চি চেয়ার পর্য্যন্ত কন্‌ক্রিট দিয়ে করা যায়। এই রকম করে' পিচ্‌কারীতে কন্‌ক্রিট ছুড়ে তৈরি একখানা বাড়ীকে, একটা কন্‌ক্রিটের বড় টুকরা বলা যায়।

একটা পাঁচ-ঘর-ওয়ালা বাড়ী মাত্র দুদিনে করা যায়! পিচকারীর মধ্যে দিয়ে তরল কন্‌ক্রিট এত জোরে বেরিয়ে আসে যে ফ্রেমের মধ্যে কোথাও সামান্য ফাঁকও থাকে না। চৌবাচ্চার মধ্যে কন্‌ক্রিট খুব ভাল করেই মিশ খায়, কারণ বাজে মাল দেওয়ালের গায়ে বসে না, ঝরে' পড়ে' যায়। দেওয়াল যত ইচ্ছা পুরু করা যায়। প্রথম যে বাড়ী এই রকমে তৈরী করা হয়, তার দেওয়াল ছিল ৬ ইঞ্চি পুরু। এই রকম করে' বাড়ী তৈরী করার সুবিধা প্রচুর, অথচ অসুবিধা বিশেষ কিছু নেই বল্লেও হয়। লোকে এর সুবিধার বিষয়ে অভিজ্ঞ হলে ক্রমে ক্রমে সকলেই এই রকমে বাড়ী তৈরী করবে আশা করা যায়। কাঠের ফ্রেমের মধ্যে তরল কন্‌ক্রিট ঢাল্‌লে তক্তা অনেক নষ্ট হয়। কিন্তু এই কন্‌ক্রিট-ছোড়া পিচ্‌কারীর সাহায্যে বাড়ী তৈরী করলে কেবল আল্‌কাত্‌রা-মাখানো কতকগুলো কাগজ ছাড়া আর কিছুই নষ্ট হয় না। এতে খাটুনিও অনেক কম, আর বাড়ীখানাও হয় অনেক অংশে ভাল।

পিচকারী দিয়া কন্‌ক্রিট ছোড়া হইতেছে।

পিচকারী দিয়া-তৈরী বাড়ী।

সঙ্কুচিত মামি—

ইজিপ্টে পুরাকালের অনেক রাজার মামি পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসে এক লাল মানুষের মামি আনীত হইয়াছে। মামিটির বয়স ৪০০ বছরের বেশী। জন ক্র্যাটিয়েল নামক পেরু-দেশীয় একজন ইঞ্জিনিয়ার ইহা আনিয়াছেন। মামির দৈর্ঘ্য মাত্র ২৫ ইঞ্চি।

কারুবা সর্দ্দারের সঙ্কুচিত মামি।

সাড়ে তিন হাত লম্বা মানুষের দেহকে কেমন করিয়া যে এত সঙ্কুচিত করা যায় তাহা দক্ষিণ-আমেরিকার লাল-মানুষেরাই কেবল জানে। এই ঔষধের সন্ধান পৃথিবীর আর কোন জাতির জানা নাই। এই মামি কারুবা নামে একজন পেরুদেশীয় সর্দ্দারের। তিনি ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ক্র্যাটিয়েল সাহেবের গলার পুঁতির মালাগুলিও এই মামির সঙ্গেই পাওয়া গেছে।

মানুষের গায়ের জোর—

দেহের অনুপাতে মানুষের যে-পরিমাণ শক্তি আছে সামান্য সামান্য পোকা-মাকড়ের শক্তি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। দেহের অনুপাতে মানুষ পোকার কাছে অতি হীনবল বলিয়া মনে হয়। মাছির অনুপাতে যদি আমাদের পায়ের জোর থাকিত তবে আমরা অনায়াসে একটা ৩০০ ফুট উঁচু স্থান হইতে লাফ দিতে পারিতাম। মাঝে মাঝে দেখা যায় একটা পিঁপড়া একটা মাটির ঢেলাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

গুবরে পোকার ভীষণ দেহবল।

এই কাজটি একজন লোকের একটি রেলগাড়ী টানিয়া লইয়া যাওয়ার সমান। একটা পিঁপড়া তাহার দেহের ১৪০০ গুণ ওজনের জিনিষ টানিতে পারে। পিঁপড়া তাহার দেহের অপেক্ষা [illegible]০০ গুণ ওজন তুলিতে পারে। গুবরে-পোকা তাহার দেহের [illegible]গুণ ওজন বহন করিতে পারে। এই অনুপাতে মানুষের ১০৮০ মণ ওজন বহন করিতে পারা উচিত।

প্রাচীন মুদ্রা—

স্যারেন জারবে নামক এক ভদ্রলোকের নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুরানো একটি মুদ্রা আছে। মুদ্রাটি তামার, তাহার মাপ ১০ বর্গ-ইঞ্চি। ইহার ওজন সাড়ে ছয় পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে তিন সের। মুদ্রার উপর ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ছাপ আছে। সুইডেনে দ্বাদশ চার্লসের যুদ্ধের সময় এবং তাহার পরেও এইরকম মুদ্রার চলন ছিল। এই
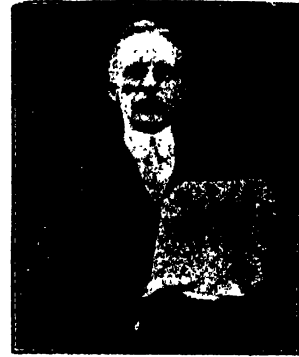
সব-চেয়ে বড় পুরানো মুদ্রা।

ভদ্রলোকের ৩০,০০০ মুদ্রা আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নানা দেশের নানা রকম এবং নানা সময়ের মুদ্রা এই তহবিলে আছে। ভদ্রলোকের সমস্ত সঞ্চয়ের দাম কোটী টাকারও বেশী। ইঁহার কাছে এমন দু-একটি মুদ্রা আছে যাহা আর কোথাও নাই বলিলেও হয়। তাহাদের মূল্যও কিছু স্থির করা সম্ভাপর নয়।

ধাতুনির্ম্মিত গোলাপ-গাছ—

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরের একজন ওস্তাদ মিস্ত্রি এক রকম ধাতু দ্বারা একটি গোলাপ ফুলের গাছ তৈয়ারী করিয়াছেন। এই মিস্ত্রির নাম ষ্টেভেন গাভুনীন। অক্সি-এ্যাসিটিলিন শিখার সাহায্যে ধাতুর টুকরাগুলিকে জোড়া লাগানো হইয়াছে। গোলাপ-ফুলগুলি ধাতুনির্ম্মিত নহে। রঙিন কাঁচের ফানুষ দিয়া ফুলগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গোলাপ-গাছটিকে দেখিলে একেবারে আসল গোলাপ-গাছ বলিয়াই মনে হয়।

আলোর গোলা—

এতদিন পর্য্যন্ত সমুদ্রের মাঝে অন্ধকারে শত্রুজাহাজের সন্ধান করিতে হইলে সার্চলাইটের বা সন্ধানী-আলোর সাহায্যে করিতে হইত।
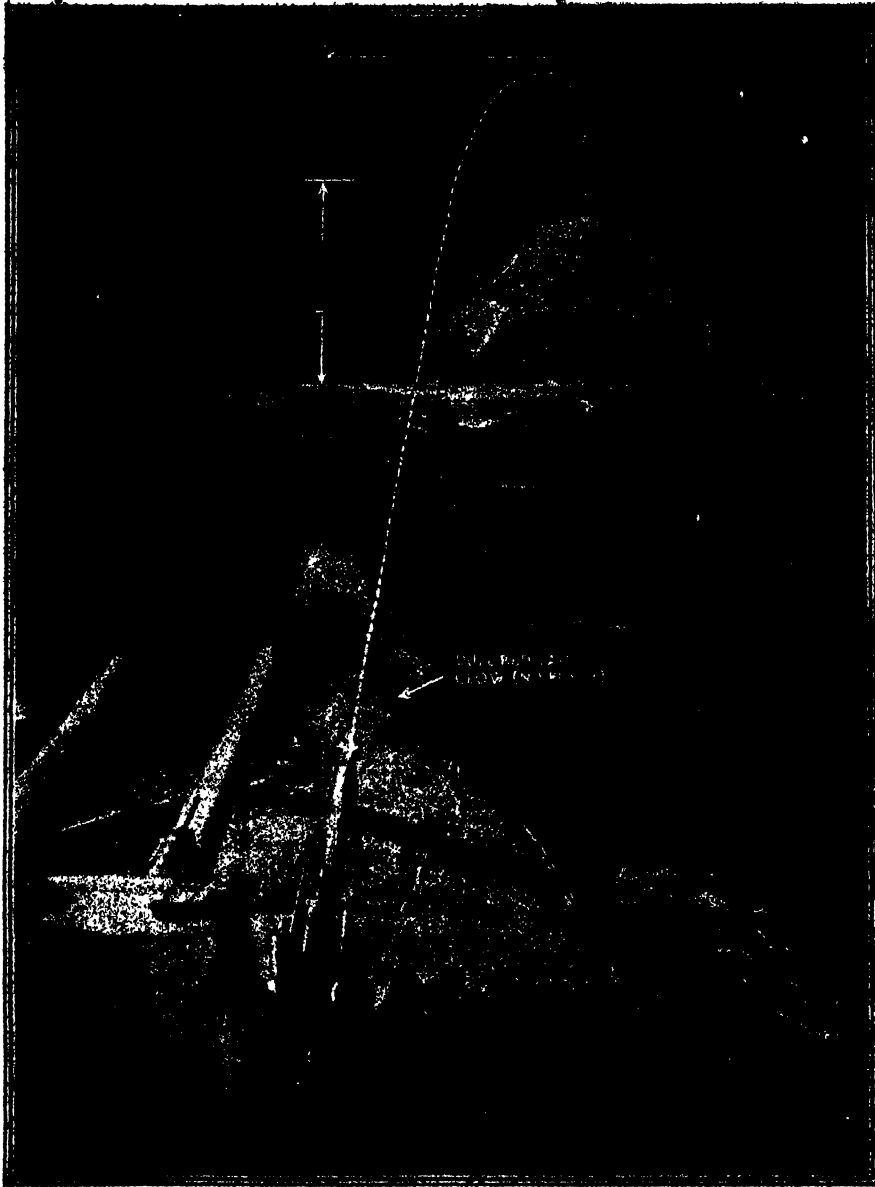
শত্রু-জাহাজের উপর আলোর গোলা।

হাতে অনুসন্ধানকারী জাহাজও শত্রুর কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। এক প্রকার নূতন গোলার আবিষ্কার হইয়াছে, এই গোলা ৫-ইঞ্চি- বা ৩-ইঞ্চি-মুখওয়ালা কামানের মধ্যে ভরিয়া ছুড়িতে হয়। গোলা ৬ মাইল গিয়া ফাটিয়া যায়। তখন এই গোলার মধ্য হইতে একটা ৮ লক্ষ বাতির জোরের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই আলো সমুদ্রের উপর প্রায় এক মাইল স্থান দিনের মত পরিষ্কার করিয়া দেয়। গোলা ছুড়িবার সময় কামানের মুখে কোন রকমের আলো বা আগুন দেখা যায় না। কেবল খানিকটা ধোঁয়া বাহির হয়। এই ধোঁয়া দূর হইতে একেবারেই দেখা যায় না। ৫-ইঞ্চি-মুখ-ওয়ালা কামানের মধ্যে হইতে যখন গোলা বাহির হয়, তখন সামান্য একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। কিন্তু তাহা দেখিয়া শত্রু-জাহাজ, অনুসন্ধান-কারী জাহাজের স্থান নির্ণয় করিতে পারে না।

—

সাবানের ফেনার মধ্যে অভিনয় —

বায়স্কোপ এবং থিয়েটারে নানা রকমের চমৎকার এবং অদ্ভুত চিত্র-পট দেখা যায়। মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত দু-একখানা পট এবং দৃশ্য দেখা যায় যাহাতে দর্শকরা একেবারে হতভম্ব হইয়া যায়। কিছুদিন
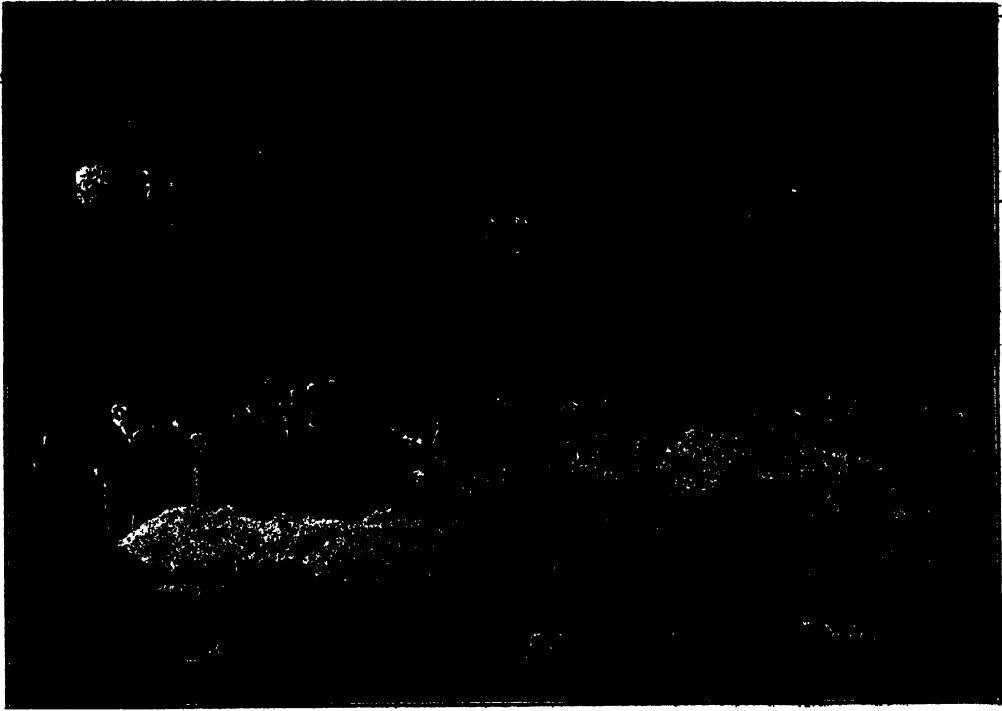
সাবানের ফেনার মধ্যে নৃত্য।

পূর্ব্বে একজন থিয়েটারের কর্ত্তা সাবানের ফেনার বুদ্বুদের মধ্যে নাচ দেখাইয়া দর্শকদের চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার মধ্যে সাবান গোলা হয়। চৌবাচ্চাটা ৪০ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট চওড়া। চৌবাচ্চা হইতে সাবানের ফেনা নলের মধ্য দিয়া বহুছিদ্রযুক্ত নাচঘরের মেঝের তলায় লইয়া যাওয়া হয়। তারপর ঘরের মেঝের তলায় সাবানের ফেনা জমিলে তাহার ভিতর দিয়া বাতাস ছাড়া হয় এবং মেঝের ছিদ্রসমূহের ভিতর দিয়া মেঝের উপর সাবানের বুদ্বুদ জমা হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে যখন নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা নৃত্য করে, তখন তাহা কোন এক স্বপ্নরাজ্যের পরীদের বসন্ত-ক্রীড়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

—

অ-নিষ্ঠুর মোষের লড়াই—

মহিষ-যুদ্ধে রক্তপাত হওয়াটা এত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে বিনা-রক্তপাতে মহিষ-যুদ্ধের কথা অনেকে কল্পনাও করিতে পারেন না। মেক্সিকোর লোকেরা মহিষ-যুদ্ধ-প্রিয়। সেখানে মহিষ-যোদ্ধারা লম্বা লম্বা ধারালো বর্শা লইয়া আসরে নামিয়া পড়িত, এবং বর্শার খোঁচাতে মহিষকে ব্যতিব্যস্ত বিরক্ত করিয়া তাহাকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিত। খানিকক্ষণ যুদ্ধ করার পর মহিষ বেচারা একেবারে মরার মত হইয়া পড়িত, এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শুইয়া পড়িত। যুদ্ধের শেষে মহিষের প্রাণশূন্য দেহটাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। একজন মেক্সিক্যান্ এবার একটি নূতন রকমের মহিষ-যুদ্ধ করিয়াছেন। এই যুদ্ধে যোদ্ধার হাতে ধারালো বর্শার বদলে ভোঁতা বর্শা থাকে। এই রকম বর্শার মুখে খুব চট্‌চটে এক রকম আঠা লাগানো থাকে। দূরে হইতে ইহাকে ঠিক আসল বর্শারই মত মনে হয়, এবং ইহার খোঁচা পাইয়া মহিষও বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে। যুদ্ধ যেমন হইবার তেমনিই হয়। কেবল হয় না অনর্থক রক্তপাত। যুদ্ধের শেষে মহিষকে একটা ফটক দিয়া আসরের বাহিরে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। দর্শকগণ ইহাতে পুরা মাত্রায় আনন্দ পায়। ঘরে ফিরিবার সময় তাহারা তাহাদের ক্লান্ত মনে বীভৎস লাল রক্তের ছোপ্ লইয়া যায় না। অথচ মহিষ-যুদ্ধের আনন্দটুকু তাহারা বেশ ভাল করিয়া ভোগ করিয়া যায়।

—

চলন্ত গির্জ্জা—

হ্যারিস্‌বার্গের জন্ ফুল্টন এক চলন্ত গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে-সব লোক গির্জ্জায় আসিবার সময় পায় না, সারা দিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, অথবা আসিবার ইচ্ছা থাকিলেও কাছাকাছি গির্জ্জা পায় না, তাহাদের দুয়ারে দুয়ারে এই গির্জ্জা ঘুরিয়া বেড়াইবে। একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীর উপর এই গির্জ্জা। গাড়ীর সামনের দিকে পাদরী মহাশয়ের থাকিবার ঘর এবং পিছনের দিকে ছোট একটি বেদী। এই বেদী হইতে পাদরী মহাশয় উপাসনা করেন। সুবিধামত স্থানে এই চলন্ত গির্জ্জা থামানো হয়। আশেপাশের লোকেরা এবং মোটরভ্রমণকারীরা এই গির্জ্জাতে আসিয়া যোগদান করেন।

—

কাঠের তৈরী হুবহু মানুষ-মূর্ত্তি—

আমেরিকার স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কোর লোকেরা জাপানী মিস্ত্রি হামাকুচির মাসাকুচির তৈরী একটি কাঠের মূর্ত্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। এই মূর্ত্তিটি ওস্তাদের নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব বলে' মনে হয়। কোথাও

মাসাকুচির স্বহস্তে তৈরী নিজের মূর্ত্তি।
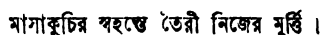
সামান্যও খুঁত নেই। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পী ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সমান মাপে কেটেছিলেন। এই রকম করে' দুই শতেরও বেশী কাঠের টুক্‌রা তাঁকে কাটতে হয়েছে। তারপর সেগুলিকে শিরিষ আঠা এবং কাঠের গোঁজের সাহায্যে খাপে খাপে বসানো হয়েছে। সব টুক্‌রাগুলিকে বসানো হলে পর ওস্তাদ মূর্ত্তিটিতে মানুষের গায়ের রঙের মত রঙ লাগিয়েছেন। রং লাগানোরও বাহাদুরী আছে, কারণ মানুষের শরীরের রঙের সঙ্গে তার কোথাও বিন্দুমাত্র অমিল নেই। কাঠের মূর্ত্তির গায়ে নকল লোমকূপ আছে এবং তাতে শিল্পীর নিজের শরীরের লোম বসানো হয়েছে। ওস্তাদ চোখদুটি কাঁচ দিয়ে তৈরী করেছেন। তাঁর নিজের মাথার চুল কেটে তার মাথায় লাগিয়েছেন। এত বড় ওস্তাদের এই কাজটি করতে লেগেছে তিন বছর। মাসাকুচি হাতির দাঁতের কাজেও খুব পাকা।

—

ফাউণ্টেন পেন্ সাফ করা—

কিছুদিন ব্যবহার করার পর দেখা যায় যে ফাউণ্টেন পেন আর ভাল কাজ দিতেছে না। তাহার মুখ দিয়া কালি পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যায়, আবার মধ্যে মধ্যে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই রকম হইবার একমাত্র কারণ, কলমের ভিতরে কালি জমিয়া প্রায় দানা দানা হইয়া যায়। এইসমস্ত কালির দানা কালি পড়িবার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এই দানাগুলিকে কলম হইতে বাহির করিয়া দিলে কলম আবার বেশ ভাল কাজ দিবে। কলম [illegible]। তারপর [illegible] করিয়া রাখিয়া [illegible] তারপর খুব জোর ঝাঁকানি দিয়া [illegible] হইবে। এইরকম কয়েকবার করিলেই কলম বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। "সেল্‌ফ-ফিলার্" কলমে ঝাঁকানি না দিলেও চলে। কারণ ঐ-সব কলমের মধ্যের জলকে এমনিই তাহার মুখ দিয়া খুব জোরে বাহির করা যাইতে পারে।

হেমন্ত

—

প্রবল বাতাসে প্রজ্বলিত প্রদীপ লইয়া যাবার কৌশল—

সমান পরিমাণ গন্ধক ও সমুদ্রফেনা মিশাইয়া খানিকটা তুলাতে মাখাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিবেন। ঐ সলিতা তিল-তৈলযুক্ত প্রদীপে জ্বালিয়া প্রবল বাতাসের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেও নিভিবে না।

—

পৃথিবীতে কত চর্‌কা আছে—

পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ১৫ কোটী ২০লক্ষ চর্‌কা আছে। তন্মধ্যে গ্রেট্ ব্রিটেনে আছে—৫ কোটী ৬ লক্ষ।

—

এক বৎসর যাবৎ দুগ্ধ টাট্‌কা রাখিবার উপায়—

প্রথমতঃ দুগ্ধের জল মারিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইবেন। তারপর উহা কোন পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিবেন যে, উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপ করিলে ঐ দুধ একবৎসর পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকিবে।

—

কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী—

শুক্তি বা ঝিনুক যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা পুরুষ থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারা স্ত্রীতে পরিণত হয়। শুক্তি-জীবনে এই পরিবর্ত্তন যে মাত্র একবার হয় তাহা নহে। প্লাইমাউথের সামুদ্রিক-জীব-বিষয়ক পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে যে, ২৭ দিনের মধ্যে একটি ঝিনুক দশলক্ষ সন্তানের জননী হইয়া আবার পুরুষে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

—

রাত্রিকালে হৃদযন্ত্রের কার্য্য—

রাত্রিকালে শয়নকালীন আমরা চাদর বা অন্য কোন প্রকার গাত্রাবরণ গায়ে দিই। চাদর প্রভৃতি গায়ে দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা নিশ্চয়ই উত্তর দিব শীত অনুভব করিলে শরীরকে গরম করিতে উহা ব্যবহার করা হয়। এখন জিজ্ঞাস্য আমরা শীত অনুভব করি কি জন্য? তার সহজ উত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে—রাত্রিতে নিদ্রাকালীন হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বা সাড়া (Beat) জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা প্রতিমিনিটে

১০ বার কম পাওয়া যায় অর্থাৎ স্পন্দন বা সাড়া ঘণ্টায় ৬০০ বার কম হয়। সাধারণতঃ মানুষ ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যায় ; ঐ ৮ ঘণ্টায় হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন বা সাড়া ৫ হাজার বার কম হয়। ডাক্তারদের মতে প্রতিবার স্পন্দনে বা সাড়ায় ৬ আউন্স রক্ত উত্তোলিত হইয়া শিরাসমূহে প্রবাহিত হয়। এখন দেখা গেল ৮ ঘণ্টার নিদ্রার ফলে দিনের বেলা অপেক্ষা ৩০ হাজার আউন্স কম রক্ত উত্তোলিত হইয়া শিরাসমূহে চলাচল করে। শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা হৃদ্‌যন্ত্রের এই রক্ত-প্রবাহের উপর নির্ভর করে, ও নিদ্রাকালীন এই কম রক্ত চলাচলের জন্য শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা কমিয়া যায়। এইজন্য আমরা শীত অনুভব করি। রাত্রিকালই আমাদের প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট নিদ্রার সময়। সেইজন্য রাত্রিকালে শীত আমরা বেশী অনুভব করি ও তাহা নিবারণার্থ গাত্রাবরণ ব্যবহার করিয়া থাকি।

সমুদ্রের গভীরতা ও আয়তন—

সমুদ্রের গভীরতা ও আয়তন কত বিশাল তাহা আমরা ধারণায় আনিতে পারি না। নীচে মহাসাগরগুলি আনুমানিক কত-মাইল-ব্যাপী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের গভীরতা প্রভৃতি দেখান হইল।

প্রশান্ত মহাসাগর ৬ কোটী ৮০ লক্ষ ; আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর ৩ কোটী ; ভারত মহাসাগর আর্কটিক ও আণ্টার্কটিক মহাসাগর একত্রে ৪ কোটী ২০ লক্ষ ; মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

একমাইল লম্বা একমাইল চওড়া ও একমাইল গভীর এরূপ একটি চৌবাচ্চা ৪৪০ বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ পূর্ণ করিলে তবে প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশি মাপিয়া নিঃশেষ করিতে পারা যাইবে। প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির আনুমানিক ওজন হচ্ছে ৯৪৮০.................. কোটী টন। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের গভীরতা অধিকাংশ স্থানেই প্রায় ৩ মাইল ও উহার ওজন ৩২৫০.......... কোটী টন। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের জলরাশি পূর্ণ করিতে ৪৩০ মাইল চৌকা একটি চৌবাচ্চার প্রয়োজন। অপর তিনটি মহাসাগরের আয়তন ও গভীরতা, প্রশান্ত ও আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর অপেক্ষা অনেক কম। সমস্ত পৃথিবীর সাগর ও উপসাগরগুলি জলপূর্ণ করিতে ১০০০ মাইল চৌকা একটি চৌবাচ্চার দরকার।

অলক

—

অণুর গঠন —

রেডিয়াম আবিষ্কারের আগে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন বস্তুর সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব হইতেছে একটি অণু। সম্প্রতি বস্তুবিজ্ঞানসমিতিতে একটি অণুর ২৫ কোটি গুণ বর্দ্ধিতায়তন একটি নকল তৈরি করিয়া দেখানো হয় ; সেই নকলটি মাত্র ৯ ইঞ্চি মোটা একটি কেলাশ বা দানা ; সুতরাং একটি অণুর আকার ৯ ইঞ্চি মোটা একটা মিছরি বা ফটকিরির দানার ২৫ কোটি ভাগের এক ভাগ। একটি অণু কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি ; এই নকল অণুতে সেই পরমাণু-সংস্থান বিবিধ বর্ণ ও আকারের গুটিকা-বিন্যাসে দেখানো হইয়াছে। এই-সব গুটিকার সংস্থান সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ সংস্থানের সমান ; অন্তরীক্ষে যেমন গ্রহ-উপগ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে আবর্ত্তিত হয়, একটি অণুর অন্তরেও তেমনি পরমাণুগুলি সর্ব্বদা নিজেদের এক-একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় আবর্ত্তিত হইয়া থাকে।
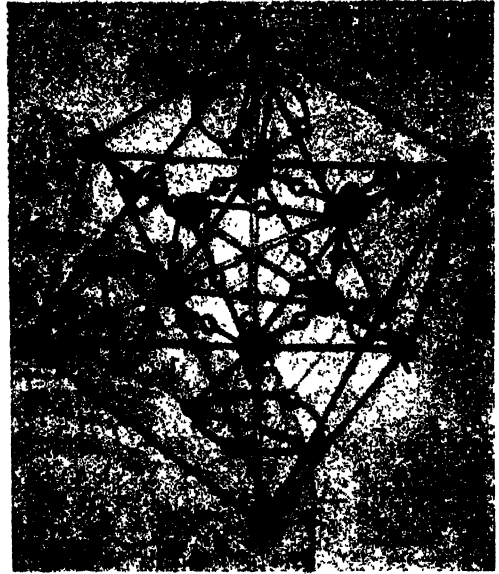
অণুতে পরমাণু সংস্থান।

—

হাসি কান্না, হাঁচি কাশি, নাকডাকার কারণ—

মানুষের হাসি কান্না হাঁচি কাশি ও নাকডাকার শব্দ হয় মানুষের নাক ও কণ্ঠের মধ্যেকার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি মাংসপেশীর বিশেষ বিশেষ রকমের স্পন্দন আকুঞ্চন সম্প্রসারণে ; এইসব মাংসপেশীর স্পন্দন-ব্যাপারের উপর ইচ্ছাশক্তির কোনো হাত নাই ; তাই মানুষ ইচ্ছা করিলেই হাসি-কান্না-হাঁচি-কাশি-নাকডাকার শব্দ অনুকরণ করিতে পারে না—ওস্তাদ হরবোলার নকলও মেকি বলিয়া সহজেই চেনা যায়।

হাসির ভাব অন্তরে উপস্থিত হইলেই কণ্ঠনালীর মধ্যে কণ্ঠার কাছে বাক্‌তন্ত্রী খুব টান হইয়া কষিয়া যায়, এবং ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প প্রশ্বাসের ধাক্কায় সেই তন্ত্রী থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া বাজিয়া হাসির ধ্বনি সৃষ্টি করে ; প্রাণখোলা দরাজ হাসির সময় বাক্‌তন্ত্রী-বাদ্য ছাড়া কণ্ঠনালীর পেশীর (larynx ও pharynx) স্পন্দন হইয়া থাকে।

কান্নার সময় কণ্ঠনালীর মুখের ঢাক্‌নি (glottis) আধবোজা হয়, এবং হ্রস্ব অথচ জোরালো নিশ্বাস ভিতরে টানিয়া দীর্ঘপ্রশ্বাস ত্যাগ করা হয়, এবং তাতেই কান্নার ধ্বনি উঠে ; কান্না যদি অধিকক্ষণ চলে তবে পেটের মধ্যেকার আবরক পর্দ্দা (diaphragm) অকস্মাৎ আক্ষেপে স্পন্দিত হয় এবং ফুসফুসে ক্রমান্বয়ে একবার চাপ পড়ে ও চাপ আল্গা হয়, এবং তার ফলে নিশ্বাস-প্রশ্বাস দমকে দমকে যাওয়া-আসা করিতে থাকে, আর এই ব্যাপারকে আমরা বলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কান্না। কান্নার সময় কণ্ঠপেশীর স্পন্দনে অশ্রু-গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে থাকে।

কাশির সময় গভীর নিশ্বাসের টানে কণ্ঠনালীর ঢাক্‌নি আধবোজা হয় আর তারপর জোরে প্রশ্বাসের ধাক্কা সেই ঢাক্‌নিতে গিয়া লাগে, সেই ধাক্কায় কণ্ঠঢাক্‌নি হঠাৎ খুলিয়া যায়, কাশির শব্দ হয় এবং কণ্ঠনালীর মধ্যে আগন্তুক উত্তেজক বস্তু শ্লেষ্মার সঙ্গে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া যায়।
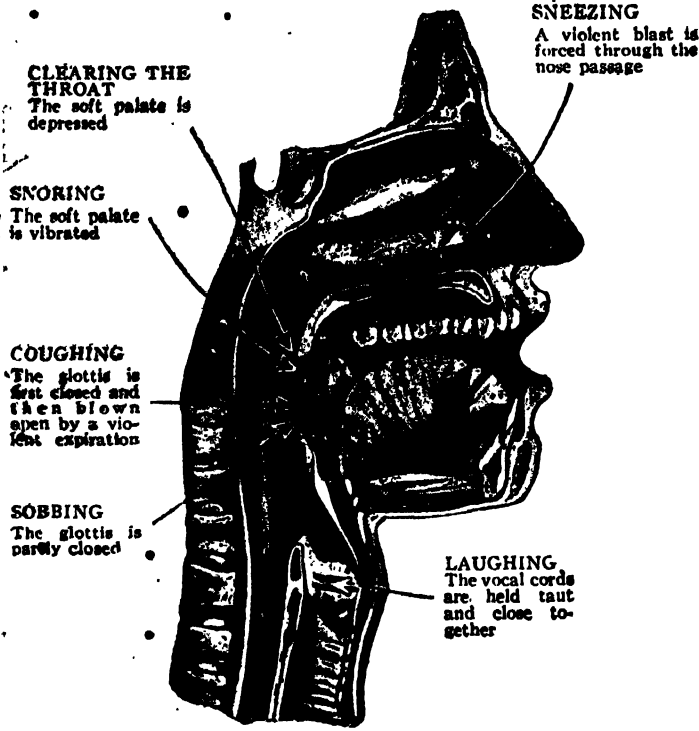
The locations of the organs involved in producing various complicated muscular acts, such as laughing, crying, and sneezing, are shown in the above cross-sectional diagram

হাসি কান্না, হাঁচি কাশি, নাকডকার উৎপত্তি।

গলা-খাঁখারি দিবার সময় ফুস্‌-ফুস্‌ হইতে খানিকটা বাতাস জোরে বাহির হইয়া আসে, জিহ্বার মূলের উপর তালু-মূল (soft palate) অবনত হইয়া কণ্ঠদ্বার প্রায় বন্ধ করে, এবং সেই প্রশ্বাসের কণ্ঠনির্গমে শব্দ হয়।

হাঁচির সময় দীর্ঘনিশ্বাস দ্রুত টানিয়া হঠাৎ তাহা নাসাপথে পিচ্‌-কারি দিয়া বাহির হওয়াতে হ্যাচ্ছো শব্দ উৎপন্ন করে। কণ্ঠনালীর ঢাক্‌নিটা হাঁচির সময় খোলা থাকে।

ঘুমের সময় যদি মুখ দিয়া নিশ্বাস লওয়া ও ফেলা যায়, তবে লম্বিত তালুমূল (soft palate) ও আলুজিব ক্রমাগত কম্পিত হইয়া ঘড়রঘড়র শব্দ উৎপন্ন করে।

হেঁচ্‌কির কারণ পেটের আবরক পর্দ্দা (diaphragm) নিশ্বাসের ঠেলায় কুঞ্চিত হইতে হইতে হঠাৎ কণ্ঠ-ঢাক্‌নি (glottis) বন্ধ হওয়াতে ছাড়া পায়—যেন ফুটবলের ব্লাডারে বাতাস ভরিতে ভরিতে হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া হইল,—আর অমনি কণ্ঠ হইতে হেঁচক হেঁচক শব্দ নির্গত হয়।

এইসব ব্যাপার এতগুলি বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য্যের উপর নির্ভর করে যে ইচ্ছা করিলেই ঐসব ব্যাপারের শব্দ অনুকরণ করা যায় না; সেইজন্য ভদ্রতারক্ষার হাসির নাম কাষ্ঠহাসি, অসত্য কান্নার নাম মায়াকান্না, চেষ্টাকৃত নাসিকাগর্জ্জনের নাম জেগে ঘুমানো।

বিজ্ঞান-ভিক্ষু

বৃদ্ধার বৈধব্য

বারেক শোনো ওগো আমার গোপন হিয়ার কথা,—
এ অভাগীর জীবন-শেষের জমাটবাঁধা ব্যথা।
আজ নিমেষেই দীর্ঘ আমার অতীত জীবনখানি—
মূর্ত্ত হয়ে উঠছে স্মৃতির লাখ ছুরিকা হানি'।

নিমেষ আজি লক্ষ যুগের বার্ত্তা লয়ে' ফেরে;
অতীত-জীবন-তোরণ খোলা, বাঁধ্‌বে কেবা এরে?
জীবন-ব্যাপী কাজ-অকাজের উঠ্‌ছে ছবি ফুটি';—
নাও গো দেখে, এর পরে যে নিতেই হবে ছুটী!

চলা তোমার থাম্‌বে না যে—সে কথা তো জানা,
জনম-যবনিকার তলে দাঁড়াও, শোনো মানা।

পড়্‌ছে মনে কোন্ ফাগুনের কোন্ চাঁদিনী রাতে,
আমার এ হাত মিলিয়েছিলাম তোমার কিশোর হাতে!
বাসর-রাতের আলোয় ঘেরা সেই যে মিলন-মেলা—
এখনো তার দীপ্তিটুকু মনেই করে খেলা।
কিশোর ওগো! শঙ্কাঘেরা সেই নিমেষের দেখা,
নারী-প্রাণের কোমল পাতায় আঁক্‌ল অমর রেখা।
দীর্ঘ আমার অতীত জীবন কাট্‌ল তারি ধ্যানে;
ভুল্‌ব না তো, ভুল্‌তে পারি জীবন-অবসানে?…

পড়্‌ছে মনে তোমায় আমায় ঘর-কন্নার দিনে,
চল্‌ত না তো একটি তিলও কারুর কাউকে বিনে।
আকুল দুটি তরুণ-প্রাণের মিলন-অভিলাষ,
নিবিড় করেই বাঁধ্‌ত দুয়ে অটুট বারো মাস।
আদর সোহাগ ছাপিয়ে উঠে ভাসিয়ে দিত দুয়ে;—
পার্‌ব দিতে মন থেকে তার স্মৃতিটুকুন ধুয়ে?
কথায় কথায় চল্‌ত দুয়ের অকারণের আড়ি;
কথায় কথায় লোক-দেখানো ঘট্‌ত ছাড়াছাড়ি।
একটুখানি অসুখ হলে ভাসিয়ে দিতাম কেঁদে;
আমার বেলায় রাত জেগে যে রাখ্‌তে বুকে বেঁধে।
পড়্‌ছে মনে শচীন্ তখন বছর তিনের ছেলে,
যাচ্ছিলে সেই কোন্ বিদেশে আমায় একা ফেলে;
কেঁদেই আকুল, হলো না আর যাওয়া বিদেশমুখী,
ক্ষেপিয়েছিলে আমায় বলে, 'নেহাৎ কচি খুকী।'

* * *

আজ্‌কে মনে অতীত দিনের অনেক কথাই উঠে,
বল্‌ব কত?—বল্‌তে ভাষা কণ্ঠে কি আর ফুটে?
একটি পলের সোহাগঢালা একটুখানি কথা,
কোন্ ক্ষণিকের প্রণয়মাখা হাসির চপলতা;
একটি দুটি ছোট্টখাটো প্রেমের অভিনয়,
নিবিড় হয়ে বিরাট হয়ে জাগ্‌ছে পরাণময়।
জাগ্‌ছে মনে ঘরকন্নার শতেক রকম ছবি;—
বীণার বিয়ে হতে শচীর বিলেত যাওয়া, সবি।
গৃহ-রাজ্যে বানিয়েছিলে আমায় যেচে রাণী;
করার যা মোর হয়ত করা হয়নি অনেকখানি।
কিন্তু তোমার উৎসাহময় সরব-নীরব ভাষা—
জানিয়ে দিত পেয়েছি রে করিনি যা আশা।
আমার অনুমতির আশায় জম্‌ত কাজের রাশি;
'কিই বা জানি' বল্‌তে তুমি একটু চপল হাসি'।
যাক্ সে কথা ভুল্‌ব না আর মনেই মরুক ঘুরে,
কাজ কি তাহায় বাইরে এনে কালের পাহাড় খুঁড়ে?

* * *

বুড়ো হলাম, ভাব্‌তাম দুয়ে কখন্ বা অজানা,
কার কপালে জুট্‌বে এসে পারের পরোয়ানা।
কার আগে কে যমদুয়ারে কর্‌ব করাঘাত,
সেই ভাবনায় কাট্‌ত অনেক নীরব-নিঝুম রাত।
হঠাৎ দেখি মুদ্‌লে আঁখি, ভাঙ্‌ল চমক মোর;
বুঝ্‌লাম একাই কর্‌তে হবে জীবন আমার ভোর।
পেরিয়ে এলাম দুজনাতে দীর্ঘ পথের রেখা;
জীবনের এই সন্ধ্যাকালে সঙ্গিনী হায় একা!
দীর্ঘ জীবন-সাথী ওগো! জীবনের শেষ তীরে—
সঙ্গীহারা চেয়ে দেখি মরণ আসে ঘিরে।
মৃত্যু-সাগর-উর্ম্মি মাঝে ডুব্‌তে একা ভয়;
শ্রান্ত আমি কেই বা মোরে সঙ্গে করে' লয়?
দীর্ঘ পথের সঙ্গী ওগো! খেয়ার ঘাটে সাঁঝে,
হঠাৎ মোদের ছাড়াছাড়ি বিদায়-বিলাপ মাঝে।
পথ তো আমার সাঙ্গ হল, সন্ধ্যা নেমে আসে;—
মরণ-পারে চল্‌ব যবে, চল্‌বে কি মোর পাশে?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

জাতীয় শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার অর্থ কি? ইহা কি আরণ্যক ঋষির আশ্রম, না ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বিহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা? ইহা কি সিন্দুর-চর্চ্চিত গ্রাম্য বটবৃক্ষের উদ্বোধন না গিরিগহ্বরের অন্ধকারের আবাহন? এ শিক্ষা কি মন্ত্রের মৌখিক উচ্চারণ, পরম্পরাগত বাক্যের শ্রবণ ও স্মরণ এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুর চরণে আত্মনিবেদন?

প্রাচীনের এরূপ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সম্ভব হইলেও সময়োপযোগী হইবে না। চেষ্টা বিফল হইবে। যুগোপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলাই ভারতের বিশেষ প্রকৃতি। তাঁর কপালে অসামঞ্জস্য লেখা নাই। ভারত যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যুগে যুগে নব কলেবর লাভ করিয়াছেন। পারসিক কি গ্রীক, সেমেটিক কি সিদিয়ান্, তুর্কী কি খৃষ্টান্, যুগে যুগে যিনি হিমাদ্রিকিরীট মহাসিন্ধুবিধৌত এই মহাদেশে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাকেই এই প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, সমন্বয়ের উপর তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আরম্ভ হইয়াছিল কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্ গোত্রের মানুষ লইয়া তার ত কোন খোঁজই নাই। সে আদিমানবের পদচিহ্ন আজও আমরা বক্ষে ধারণ করিতেছি। তারপর কোলারীয় দ্রাবিড়ীয়,—তাও ত বিস্মৃতির গর্ভে। আর আজ-কালকার খৃষ্টান মুসলমান—এসকল লইয়া সমন্বয় আজও চলিতেছে। এই সমন্বয়ের মধ্যে বাহ্যপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ—এই বিশ্বে যেখানে প্রাণের সাড়া আছে মানবপ্রাণ মস্তক নত করিয়া তাহারই সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ব্যক্তি সমষ্টিগত জ্ঞান হইতেই আপনার পরিপুষ্টির মালমসলা সংগ্রহ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছে। ভারতের এই বিশেষ প্রকৃতি হইতে যে শিক্ষার উৎস উৎসারিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন গ্রীসের বা অব্য য়ুরোপের শিক্ষাপ্রণালী হইতে কোন অংশেই হীন নহে। ভারতীয় শিক্ষার নিজস্ব উপাদানের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা। বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষতলে গুরুশিষ্য-সমাগম শিক্ষা-ব্যয়ের প্রায় সমস্ত টাকাটা হর্ম্ম্যনির্ম্মাণে ব্যয় করিবার সুযোগ না থাকার ফল নয়। ইট্-পাটকেলের পিঞ্জরে আবদ্ধ জীবন অপেক্ষা পশুপক্ষী বৃক্ষলতার সঙ্গে সহানুভূতিসূত্রে আবদ্ধ জীবন কত উচ্চ, কত সুন্দর! (২) অতি বাল্যেই পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া গুরুগৃহের বিস্তৃততর পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়া বহির্জ্জগতের দশজনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার অধিকার। এক কথায় Citizen হইবার যোগ্যতালাভ। (৩) সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সকল আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়া জ্ঞানানুশীলনের সুদীর্ঘ অবসর। এবং (৪) সর্ব্বোপরি ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মানুসরণ। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয় কিন্তু যাহা স্বীকার করিলাম কার্য্যগত জীবনে তাহা পালন।

চরিত্রগঠন না হইলে কোন শিক্ষাই শিক্ষা নয় এবং যাহা শিখিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অভ্যাস না হইলে চরিত্রও গঠিত হইল না। যাহা শুভ তাহার আচরণের নাম অভ্যাস এবং যাহা অশুভ তাহা হইতে নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য—এই দুই চরিত্র গঠনের প্রধান সাধন। চরিত্র গঠনে প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবনের ত্রিব্রত—পবিত্রতাব্রত, দারিদ্র্যব্রত ও শ্রমব্রত—অবশ্য গ্রহণীয় ও অনুষ্ঠেয়। কায়মনোবাক্যের সংযম বা চিত্তচাঞ্চল্য ও ভোগাসক্তি পরিত্যাগই পবিত্রতার একমাত্র সাধন ছিল তাহা নহে, প্রাণপণে সত্যানুসরণ ছিল ইহার প্রধান অঙ্গ। যে সময়ে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যার্থীর চরম লক্ষ্য, দারিদ্র্যব্রতের প্রয়োজনীয়তা সে সময়ে কত তা বলাই বাহুল্য। অর্থগৃধ্নুতা ও অর্থলালসা পরিহার করিতে হইত এমনভাবে যে অর্থবিষয়ে রাজপুত্র ও ফকীরের পুত্রকে সমান পদবীতে দাঁড়াইতে হইত। আজকালকার একই ছাত্রাবাসে বাস করিয়া যেমন ধনীপুত্রের এক ব্যবস্থা আর গরীবের ছেলের অন্তরূপ, সেখানে তাহা হইতে পারিত না। শারীরিক

পরিশ্রমটা 'ছোট-লোকের' কাজ বলিয়া যেসব 'ভদ্র-লোকের' ধারণা তাদের বিদ্যার্থী হইবার অধিকার ছিল না। দৈহিক শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়াই গুরুগৃহে প্রবেশ করিতে হইত। কেবল গুরুর নয়, শিষ্যভ্রাতৃমণ্ডলীর সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সেবার ভার বহনে প্রস্তুত থাকিতে হইত। তাহাতে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিচার ছিল না। ইংলণ্ডের রাজপুত্রকে যদি ইটন-স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হয় তবে সহাধ্যায়ীর জুতা পরিষ্কারটা অসম্মানের কাজ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিলে চলে না। সেকালের বিদ্যার্থীকে কেবল গৃহনির্ম্মাণে নয়, গৃহ সম্মার্জ্জনেও রাজী হইতে হইত এবং গুরুকুলের অন্নসংস্থানের জন্য রাজপুত্রের ভিক্ষায় বহির্গত হওয়া অসম্মানের কাজ ছিল না। আমরা ডিমক্র্যাসী ডিমক্র্যাসী বলিয়া চীৎকারই কেবল করিতেছি, হাতে-কলমে তার শিক্ষার ব্যবস্থা কি করিয়াছি? পরিবারে সামাজিক জীবনে শিক্ষা-ক্ষেত্রে তো তার বিপরীত আচরণই লক্ষিত হইতেছে। যখন দেখি ছাত্রাবাসে বিভিন্নবর্ণের ছাত্রগণ আপনাদের বর্ণ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে নিতান্ত ঘৃণ্য বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন ডিমক্র্যাসীর সকল আশায় জলাঞ্জলিই দিতে হয়। জাতিভেদের প্রকোপকালেও তো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য গুরুকুলে ভ্রাতৃভাবে একত্র বাস করিয়াছে। আমরা যে প্রাচীনকালে ফিরিয়া যাইতে চাই, কোথায় যাইব তাহা ঠিক করিয়াছি কি?

যাহা হউক, প্রাচীন কালের শিক্ষার আদর্শ দুইভাগে বিভক্ত ছিল—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত দিকের শিক্ষা আত্মবিদ্যা—মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দিন দিন মোক্ষপথে অগ্রসর হইবে। মানুষ জন্মমাত্র যে-সকল ঋণে আবদ্ধ হয় ঋষি-ঋণ তার অন্যতম। জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত যে-সকল কলা ও বিদ্যা রহিয়াছে পুরুষপরম্পরায় যে-সকল শিক্ষা ও সাধনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা আয়ত্ত করিয়া ভবিষ্যদ্-বংশীয়দিগের জন্য সংরক্ষণ ঐ ঋষি-ঋণ শোধের পন্থা। ইহাই শিক্ষার সমষ্টিগত দিক। সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তির যে স্থান, শিক্ষাটা তাহার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অবশ্যগ্রহণীয় উচ্চশিক্ষার ও পল্লীসংঘসমূহের একরূপ সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ কেম্ব্রিজ হইতে কলিকাতায় আসে নাই, মান্দ্রাজ হইতেই ম্যাঞ্চেষ্টরে গিয়াছিল। শিক্ষায় সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার ছিল। শিক্ষা পুঁথিগত ছিল না, বিদ্যা ও কলার সাহায্যে কার্য্যকরী করা হইয়াছিল।

আধুনিক টোল ও চতুষ্পাঠীতে ইহার ব্যভিচার ঘটিয়াছিল বলিয়াই রাজা রামমোহন রায় ইহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি যখন দেখিলেন, টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালী হইতে কলা ও বিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে, আছে কেবল পরম্পরাগত অর্থশূন্য কতকগুলি বাঁধি গতের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, তখন তিনি একদিকে নূতন করিয়া Art ও Scienceএর প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে বেদান্তবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আত্মবিদ্যার অনুশীলন—জাতীয় শিক্ষাধারার এই দুই বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্টপ্রায় দিক পুনরুজ্জীবিত করিয়া ইহার সংরক্ষণ ও ইহার সঙ্গে নবীনের যোগ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই দুই দিকের পূর্ণ সম্মিলন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া কেবল vocational training, অর্থকরী বিদ্যা বা কার্য্যকরী শিক্ষার পশ্চাতে ছুটিলে যাহা বাস্তবিক স্বদেশী বস্তু, আমাদের জাতীয় শিক্ষা, তাহা লাভ হইবে না। আমাদের এই যে জাতীয় শিক্ষা-যন্ত্র ইহার কাছে বর্ত্তমানকালের শিক্ষামন্দির-সকলের শিখিবার অনেক রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষাসৌধ এই জাতীয় ভিত্তির উপরই গড়িতে হইবে। বর্ত্তমানযুগের পরিবর্ত্তিত অবস্থার প্রয়োজন বুঝিয়া, বর্ত্তমান জটিল সার্ব্বভৌমিক শিক্ষার ও সাধনার দাবী স্বীকার করিয়া সে ভিত্তিকে গভীরতর ও বিস্তৃততর করা যাইতে পারে। কিন্তু নির্ম্মাণকার্য্য এই ভিত্তির উপরেই করিতে হইবে।

তবে, আজ যে এক জাতীয় শিক্ষার কথা শুনিতেছি তাহা খোল-নল্‌চে বাদ একটি হুঁকো। তাহা না শিক্ষা, না জাতীয়। পাছে বৈদেশিক হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে এই ভয়ে ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা। ইহা ভারতের আত্মধর্ম্মের বিরোধী। ভারত কখনও বাহিরকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই—যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা

সুন্দর তাহা সর্ব্বত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব্বত্র বিলাইয়াছেন। কিন্তু আজ এ কি দেখি! যাহাকে বলি বৈদেশিক শিক্ষা তাহারই শিক্ষাশালা হইতে জনকতক ছাত্র ভাগাইয়া লইয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলাম আর নাম হইল জাতীয় বিদ্যাপীঠ। এ যেন নামাবলী দিয়া পেণ্টুলান গড়িয়া নাম দিলাম জাতীয় পরিচ্ছদ! উলঙ্গ হইয়া উলঙ্গ প্রকৃতির কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই কি ভারতের এতকালকার সাধনার সিদ্ধি! শেষ কালে কি সব ছাড়িয়া হিন্দী ও চরকার চর্চ্চাই এ জাতির পিতৃ-পুরুষ পূজ্যপাদ ঋষিগণের ঋণশোধের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? হায়! ঋষিগণের যুগযুগান্তের তপশ্চর্য্যার কি এই পরিণাম! ইহারই নাম 'আমার বুদ্ধি শোন্, ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে নটে শাক বোন্।' যদি নটে শাক বুনা এতই প্রয়োজনীয় হয় তবে ঘর দোর ভাঙ্গিতেই হইবে এমন কি কথা আছে। যে জাতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান যন্ত্রবিদ্যা ও বৈদেশিক সংস্রব পরিত্যাগ করে, তাহা আর যাহাই হউক ভারতীয় নয় ইহা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইবে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় বৈদেশিক যান্ত্রিক রাসায়নিক ও ধাতুবিদ্যাবিদের জন্য যেমন উন্মুক্ত ছিল, জগতের বাজারে ভারতও অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বিদ্যা-বাণিজ্যের আদান-প্রদানের দাবী কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারই ফলে ভারতে নীল পাকা রং ও ইস্পাতের উদ্ভব—যাহারা একদিন ভারতমাতাকে মধ্যএশিয়ার কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারত-মাতা যে একদিন সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন, জগতের জাতিসকল যে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে তাঁহার প্রাধান্য নির্ব্বিবাদে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার জঙ্গলের চন্দনকাষ্ঠ ও সুগন্ধি মস্‌লা-সম্ভার, আকরের হীরা আর জলের মুক্তার মহিমায় নয়। তাঁর মানুষগুলিরও কিছু কিস্মত উঁহার মধ্যে ছিল। সুতরাং প্রাচীনের দিকে কেবল মুখ ফিরাইলেই আমাদের সকল দুর্গতির অবসান হইবে না। আমাদিগকে যদি বাস্তব জাতীয়তা লাভ করিতে হয় তবে সেই শিক্ষা-পদ্ধতিকেই পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে যাহার জন্য রাজা রামমোহন রায় আপনার সমগ্র সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন যাহার মধ্যে পরা- ও অপরা-বিদ্যা সমঞ্জসীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার বলে এই প্রাচ্য ভূখণ্ড কোনোরূপ সাম্রাজ্যপিপাসাদ্বারা পরিচালিত না হইয়াও সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যাহাতে পূর্ব্ব উপদ্বীপ হইতে পূর্ব্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ য়ুরোপ পর্য্যন্ত এক বিশ্ব-জোড়া বৈদেশিক বাণিজ্য তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল।

যে শিক্ষা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে অহিংসার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ নয়, বিজ্ঞানের একটা বিকৃতির সঙ্গে হিংসার যোগ দেখিয়া বিজ্ঞানকেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত—যে শিক্ষা পার্থিব লাভালাভের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথও দেখাইবে না, তাহা ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলিয়া কখনও সুধীজনকর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না। সত্য বটে ভারতই প্রথমে বিজ্ঞানের সাহায্যে ধ্বংসের মন্ত্র "Damascus blade"এর রহস্য জগৎকে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তিনি বিশ্বমৈত্রী ও পরাশান্তির পথও জগৎকে দেখাইয়াছেন। যে শিক্ষায় এই শান্তি, এই মৈত্রী, এই মুক্তির দ্বার খোলে, যদি সেই শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতে পার, তবে জাতীয় শিক্ষার কথা বল। নতুবা যা করিতেছিলে তাই কর, পাপের বোঝা বাড়াইও না।*

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

* মহীশূর-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পণ্ডিতবর ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কন্‌ভোকেশন স্পিচ্ অবলম্বনে লিখিত।

সুমিত্রা

সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা এখনও বেশ মনে পড়ে। অনেককাল আগেকার কথা। সে সময়কার জীবনটা বেশীর ভাগই ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে; বিস্মৃতির কুয়াসা তার অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে; দু-একটা দিন, ছোটোখাটো গোটাকতক ঘটনা, এই কেবল এখনও মনোলোকে সুস্পষ্ট আকার নিয়ে টিকে আছে।

পুজোর ছুটিতে বাড়ীসুদ্ধ মামার বাড়ী এসেছিলাম। খুব বেশী দূর আস্‌তে হয়নি। কল্‌কাতার একটা পাড়া ছেড়ে আর-একটা পাড়ায় গিয়ে ওঠা, এই মাত্র। কিন্তু পুজোর সময় বাপের বাড়ী যাওয়ার নিয়মটা মা ভাঙতে রাজি ছিলেন না। এতকাল আমাদের বিদেশে কেটেছে, সেখান থেকে আসাটার মধ্যে বেশ একটা গৌরব ছিল। মাঝে কত-শ' মাইলের ব্যবধান, বাড়ী ছেড়ে ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠা, তার থেকে ট্রেন, ট্রেন থেকে নেমে যাবার ঘোড়ার গাড়ী, তারপর মামার বাড়ী। তার তুলনায় এই দুটো বড় রাস্তা আর সঙ্কীর্ণ তিনটে-গলির দূরত্ব অত্যন্তই নগণ্য লাগ্‌ছিল; কিন্তু গিয়ে পৌঁছবার পর আনন্দটা সেজন্যে কিছু কম হল না।

তখন সেকেণ্ডক্লাশ ছেড়ে এণ্ট্রান্স ক্লাশে উঠ্‌বার উপক্রম কর্‌ছি। এণ্ট্রান্স ক্লাশ যে ম্যাট্রীকুলেশন ক্লাশ নয়, এ কথা মনে রেখে আশা করি কেউ আমার মামার বাড়ী যাওয়ার আনন্দটাকে অসহ্য ন্যাকামি মনে কর্‌বেন না;—তখন আমার বয়স মাত্র তেরো বৎসর।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছায় দোতলা ছেড়ে একতলায় নাম্‌ছিলাম। রান্নাঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডায় তখন একটা রীতিমত সভা বসে গিয়েছে। দিদিমা তর্‌কারি কুট্‌তে বসেছেন, চারপাশে তাঁর নাতি-নাত্‌নীর দল। কড়াইশুঁটি ছাড়াবার ছুতোয় কেউ খেতে ব্যস্ত আছে, কেউ তার অনাচারটা কর্তৃপক্ষের গোচরে এনে পুণ্য-অর্জ্জনের বৃথা চেষ্টা কর্‌ছে, কেউ বা ছোট ভাই-বোনকে চিম্‌টি কেটে বা চুল ধরে' টেনে নিজের চিত্ত-বিনোদন কর্‌ছে।

এ দৃশ্যটা কিছু নতুন নয়, এবং মানুষগুলিও কেউই অপরিচিত নয়; কাজেই এখানে দাঁড়াবার কারণ এখানে না খুঁজে, অন্য কোনো দিকে খুঁজ্‌তে হয়।

আমি নাম্‌তেই আমার বড়মামী চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "বীরু, দে-না ওদের দুটোকে ছাড়িয়ে, গেল যে!"

বারাণ্ডারই একেবারে শেষ প্রান্তে যে একটা মল্লযুদ্ধ চল্‌ছে তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। মামীর কথায় যোদ্ধা দুটির মাঝখানে পড়ে' তাদের ছাড়াতে গেলাম। আমার এই শান্তিস্থাপনের সাধু চেষ্টার প্রথম ফল হল এই যে দুজনের কিল চড় আঁচড় কামড় সব-ক'টা আমার গায়ে এসে পড়্‌ল। মিনিট পাঁচ-ছয় যেন আমার উপর দিয়ে একটা ঘূর্ণী বায়ু বয়ে গেল। তিন জোড়া হাত-পা এমন লক্ষ্যহীন নিরপেক্ষ ভাবে চালিত হতে লাগ্‌ল, যে, তার শেষ পরিণাম খুবই শোচনীয় হতে পার্‌ত, যদি না বাইরের থেকে আরো সাহায্যকারী দেখা দিতেন। তিনজনে যখন তিন জায়গায় দাঁড়ালাম তখন আমার মাথা এবং মুখ জ্বালা কর্‌ছে, কোটের দুটো বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে এবং বাকি পোষাক-পরিচ্ছদের সৌষ্ঠবও অম্লান নেই।

আর দুটি মানুষের মধ্যে যেটি আমার ভাই, তিনি আমার সাম্‌নেই দুই-চোখ-ভরা জল আর মুখ-ভরা তীক্ষ্ণ আক্রমণের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পাশের দিকে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে হাঁপাচ্ছে। তার কাপড়খানা ধূলোয় প্রায় গৈরিক হয়ে উঠেছে, মাথার চুলের কাল রঙও অনেকখানি চাপা পড়ে' গিয়েছে। চোখ দুটো ক্রুদ্ধ পশুশাবকের মত জলজল কর্‌ছে। আমাদের দুজনের চেয়ে চড়-চাপড় সে বেশী বই কম খায়নি, কিন্তু চোখে এক-ফোঁটা জল নেই; এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন সুবিধা পেলেই আর-এক পালা সুরু কর্‌তে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

দিদিমার সভাটা এই আকস্মিক উৎপাতে একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তিনি উঠে পড়ে' সেই রণরঙ্গিণী

মেয়েটির দুই হাত ধরে' বল্‌লেন, "আয় সুমি, মটরশুঁটি নিবি ?"

সে এক ঝট্‌কায় নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, "চাই না তোমার ছাইয়ের মটরশুঁটি, তোমার ঐ পোড়ারমুখো নাতিকে দাও," বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

দুই ছেলের মুখ হাত জল ঢেলে পরিষ্কার করতে করতে আমার মা অত্যন্ত চটে' বল্‌লেন, "বাবা! মেয়ে না ত ডাকাত! ছেলেটাকে থাম্‌চেছে দেখ কেমন করে'? কাদের এমন দস্যি মেয়ে?"

দিদিমা বল্‌লেন, "ঐ যে গলির মোড়ে লাল বাড়ীটা, ঐ বাড়ীর মেয়ে। ওর বাবা নতুন এসেছে এখানে, আগে তুই দেখিস্‌নি। ছেলে-মেয়ে দুটো প্রায়ই যায় আসে, বুড়দের সঙ্গে এখনো আলাপ হয়নি।"

মায়ের রাগ তখনও পড়েনি। তিনি গামছা দিয়ে নিজের ছোট ছেলের মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন, "আহা কি মেয়েই তৈরি করেছে! আমার ধীরু ত বেটা ছেলে, কিন্তু অমন মারকুটে নয়। বাছার মুখটা একেবারে চষে' দিয়েছে যেন।"

একটা সামান্য মেয়ের কাছে দুই ভাইয়ে এমন ভাবে অপমানিত হয়ে আমার পৌরুষ অত্যন্তই আহত হয়েছিল। মায়ের কথায় আরো রাগ বেড়ে গেল। "আরো ছেলেদের আহ্লাদে ননীগোপাল বানাও, তারপর হামাগুড়ি-দেওয়া খোকার কাছেও লাথি খেয়ে মর্‌বে," বলে' রেগে আবার আমি উপরে চলে' গেলাম। বেড়াতে যেতে হলে গলি পার হতেই হবে। পথের মধ্যে সুমিত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এ ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। প্রথম পরিচয়ের তীব্র অনুভূতি আমি তখনও একটুও ভুল্‌তে পারিনি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার বোন কুসুমের সঙ্গে সুমিত্রার অত্যন্ত ভাব হয়ে গিয়েছে। দরজার কাছে বসে' হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে মাটির ঢেলার উনুন তৈরি করে' ঘরকন্নার কাজ পুরোদমে চলেছে। আমি যেন তাকে দেখ্‌তেই পাইনি এমন মুখ করে' বেরিয়ে গেলাম। সে যে চোখে একরাশ কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল, তাতে খুসি হওয়া উচিত, না সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত তা একেবারেই ঠিক কর্‌তে পারলাম না।

নীচ থেকে মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে আবার উপরেই উঠ্‌তে হল। বাবার কড়া হুকুম ছিল সকাল বেলা দুঘণ্টা অন্ততঃ পড়্‌তেই হবে। পড়্‌বার বই বেশীর ভাগ নীচের একটা ঘরে থাক্‌ত, কিন্তু জিওমেট্রীখানা উপরে-শোবার ঘরে ছিল। কি কারণে জানি না আমার মনে হল যে সকাল বেলা জিওমেট্রী পড়াই উচিত, কারণ শক্ত জিনিষ সকাল বেলা পড়্‌লে বেশ সহজে বোঝা যায়।

বই আন্‌তে উপরে চল্‌লাম। ঢুক্‌বার পথেই মেয়ে দুটি ঘরকন্না সাজিয়ে বসে'। ইচ্ছা করে'ই হোক্‌ বা অসাবধানতা-বশতঃই হোক্‌, আমার পা লেগে উনুনের একটা দিক গড়িয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উপরের কড়াটাও কাত হয়ে পড়্‌ল। এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে কিন্তু একবারও ফিরে তাকালাম না। চেয়ার টেনে নিয়ে জিওমেট্রী খুলে খুব একমনে পড়্‌তে বসে' গেলাম।

শুন্‌লাম সুমিত্রা তীব্র বিরক্তিপূর্ণ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "দেখ্‌লে তোমার দাদার হাঁট্‌বার ছিরি! দিল আমার উনুনটা ভেঙে। চোখে দেখ্‌তে পায় না নাকি ?"

সামান্য একটা মেয়ের কথাকে আমার গ্রাহ্য না করারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কেমন করে' জানি না কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল—বল্‌লাম, "চোখ নেই তাদের, যারা লোকের দরজা জুড়ে ইট্‌ পাটকেল নিয়ে বসে' থাকে। মানুষের কাজের সময় তারা ঘরে ঢুক্‌বে না নাকি ?"

আমার কথাগুলো বোধ হয় উচিত কথা বলেই সুমিত্রার মনে হল। সে একটু সুর নরম করে' বল্‌লে, "তা বল্‌লেই ত হত, আমি সরিয়ে নিতাম। লাথি মেরে না ভাঙ্‌লেই কি চলত না ?"

অতঃপর আর কি বলা যায় ভেবে পেলাম না। অগত্যা পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু মন যে বিশেষ লাগ্‌ল তা নয়। অনেকক্ষণ দরজার গোড়ায় কোনো রকম শব্দ না শুনে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। দেখ্‌লাম হাঁড়িকুঁড়ি সমেত রন্ধনকারিণী দুজনেই অন্তর্ধান করেছেন।

মূর্ত্তিমতী উপদ্রব দুটি সরে' যাওয়াতে কিন্তু আমার

বিদ্যাচর্চ্চার কিছু সুবিধা হল না। বইয়ের দিকে যতবার তাকালাম, ঘড়ির দিকে তার চেয়ে ঢের বেশীবার তাকালাম, এবং শেষে ঘড়িটা অন্ততঃ আধ ঘণ্টা স্লো চলে স্থির করে' বই ফেলে উঠে পড়লাম।

কুসুম আর তার বন্ধু সরে' গিয়েছিল বটে, কিন্তু বেশী দূরে সরেনি। পাশের ঘরেই তাদের দেখ্‌তে পেলাম। সুমিত্রা আমাকে দেখ্‌তে পাবামাত্র বল্‌লে, "এরি মধ্যে বুঝি সব কাজ হয়ে গেল?"

আমি গম্ভীর মুখ করে' সংক্ষেপে বল্‌লাম, "হুঁ।"

তারা আবার খেলায় মন দিল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম—আমার চলে' যাওয়া উচিত, না আর-একটু থেকে সুমিত্রার সঙ্গে পরিচয়টা পাকাপাকি করে' নেওয়া উচিত। এ পর্য্যন্ত সেই প্রথমে প্রশ্ন করেছে, আমি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত উত্তর দিয়েছি মাত্র। সেই যেন সব দিক দিয়ে বড়। কিন্তু এটা হওয়া ত উচিত ছিল না।

সুমিত্রার নাম ভাল করে'ই জান্‌তাম, তবু আর কিছু বলবার না পেয়ে বল্‌লাম, "তোমার নাম কি?"

সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "সুমিত্রা। আর তোমার নাম কি?"

ভয়ানক রাগ হল। মেয়েটার কি আস্পর্দ্ধা! আমার নাম কি তা জান্‌বার তার কি দর্‌কার? আর দর্‌কার থাক্‌লেও কুসুমের কাছ থেকে আড়ালে ত জানা যায়। আরো বেশী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তুমি কি পড়?"

সুমিত্রা তেমনি চট্ করে বল্‌লে, "শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ। তুমি কি পড়?"

তাকে জব্দ কর্‌বার ইচ্ছাটা আমার গতিরোধ কর্‌ল, তা না হলে প্রায় দু-তিন পা এগিয়ে গিয়েছিলাম। যতগুলো যতবিষয়ের বইয়ের নাম মনে পড়্‌ল, খুব বিকৃত ইংরিজি সুরে সব ক'টা হড়্‌হড় করে' বলে গেলাম।

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সুমিত্রা বল্‌লে, "সব ক'খানা শেষ করেছ?"

আমি অম্লানবদনে বল্‌লাম, "হ্যাঁ।"

সুমিত্রা বল্‌ল, "আমার বইটাও শেষ হয়ে এলো, দু-তিনটে পাতা বাকি আছে, ছিঁড়ে দিলেই হবে।"

এর পর পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হল।

বিকালে আবার তার সঙ্গে দেখা। বড়মামী তখন বাড়ীর স্ত্রীজাতীয়া সব ক'টি মানুষকে আটক করে' তাদের চুল বাঁধ্‌তে বসেছিলেন। যাদের বন্ধনদশা থেকে মুক্তি-লাভ হয়েছিল তারা একটু সরে' বসে' অন্যদের দেখ্‌ছিল, এবং মাঝে মাঝে জলের ঘটী, ভিজে গাম্‌ছা, তেলের শিশি প্রভৃতি এগিয়ে দিয়ে বড়মামীর সাহায্য কর্‌ছিল। সুমিত্রা তার রুক্ষ চুলের রাশ নাক-মুখের উপর বিক্ষিপ্ত করে' একমনে বড়মামীর আঙুলের খেলা দেখ্‌ছিল। আমি ঘরে ঢুকে দেখ্‌লাম তখন কুসুমের কেশবিন্যাসের পালা চল্‌ছে। মুখ এবং মাথার অর্দ্ধেক ময়লা ভিজে গামছার আড়ালে চাপা, চুলগুলো স্বভাব ত্যাগ করে' বড়মামীর ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে মাদুরে রূপান্তরিত হয়ে আস্‌ছে। সোজা ঘাড় এক চুল এদিক ওদিক নড়্‌বামাত্র পিঠের উপর কিল পড়ে' তাকে আবার সোজা করে' দিচ্ছে।

কুসুম ছাড়া পাবামাত্র বড়মামী দয়া করে' বল্‌লেন, "সুমি, আয় তোর চুলগুলোও বেঁধে দিই। কি শ্রী হয়েছে দেখ না।"

সুমিত্রা ঝাঁক্‌ড়া চুল শুদ্ধ মাথাটা সজোরে নেড়ে বল্‌লে, "না, আজ কেন বাঁধ্‌ব? আজ ত বাবা নেই।"

বড়মামী গালে হাত দিয়ে বল্‌লেন, "শোন মেয়ের কথা! বাবা নেই ত আর চুল বেঁধেও কাজ নেই। এর যে বড় হয়ে কি দশা হবে!"

আলাপের আরম্ভটা এই রকম। তারপর কেমন করে' কোন্ পথে সেটা বেড়ে চল্‌ল, তা এখন ভাল করে' মনে পড়ে না। কিন্তু এখন নিজের প্রায়-ভুলে-যাওয়া সেই অতীত জীবনকে যখন মানসচক্ষে দেখ্‌তে চেষ্টা করি, তখন নিজের বালকমূর্ত্তির পাশে সর্ব্বদা যার উজ্জ্বল দীপ্ত মুখ ভেসে ওঠে, সে আমার ভাই বোন কেউ নয়, কোন সমপাঠী বালকবন্ধু নয়, সে এই সুমিত্রা। পরবর্ত্তী জীবনে তার যে চেহারা দেখেছিলাম, কালের প্রভাবে তা অনেকখানি মন থেকে মুছে গেছে, কিন্তু বালিকা সুমিত্রার মুখ এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে।

পূজোর ছুটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষ হয়ে এলো। আবার নিজেদের বাড়ী ফেরা গেল। পায়ে হেঁটে যেখানে রোজ

সুবেগা যাওয়া যায়, সেখান ছেড়ে আস্তে বিশেষ দুঃখ হবার কথা নয়, তবু মনে হল যেন অনেক দূরে চলে' এলাম।

পরের কয়েকটা বছরের কথা মনে কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে কেবল এই মনে হয়—একটার পর একটা পরীক্ষার পড়া কেবলি বুকের উপর পাষাণ ভারের মতন চেপে থাক্‌ছে, আর প্রাণপণে খেটে রাত জেগে কোনোরকমে তাকে ঝেড়ে ফেল্‌ছি। কিন্তু সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্পের দ্বীপবাসী বুড়োর মত কখন সেটা আবার অতর্কিতে এসে ঘাড়ে চেপে বস্‌ছে, আর আবার তাকে নামাতে প্রাণপাত কর্‌তে হচ্ছে।

২

আমার জীবনের অন্য সব বছরগুলোর চেয়ে যে বছরে আমার বয়স পঁচিশ ছিল সেটাকে আমি সর্ব্বদা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। তার কারণ, মানুষের ভাগ্যে দুঃখবিধান যিনি করেন সেই দেবতা আমার উপর সে বছরে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করে' রেখেছিলেন। প্রথম সেই বছর আমার বাবা মারা গেলেন; এবং তাঁর শ্রাদ্ধ সমাপন করে', যখন শেষ অতিথিটিকে বিদায় দিতে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন টেলিগ্রামে খবর পেলাম অমৃতসরে যে ব্যাঙ্কে বাবা তাঁর সমস্ত সঞ্চয় গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই ব্যাঙ্কটি ফেল করেছে। মাকে খবর দিতে গেলাম, তিনি একটা কাথাও বল্‌লেন না।

শৈশবে যে বাড়ীতে দিন কেটেছিল, সেটাকে অনেক দিন হল ছেড়ে এসেছিলাম। আমার বোন কুসুমের বিয়ে হয়ে যাবার কিছু পরেই সেই বাড়ীতে আমার ছোট ভাই ধীরেন মারা যায়। মা আর সে বাড়ীতে থাক্‌তে চাইলেন না। দিন কতক অস্থায়ীভাবে মামার বাড়ী বাস করে' মহানগরীর একপ্রান্তে ছোট একখানি বাড়ীতে এসে আমরা আবার নতুন করে' ঘর বাঁধ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম।

এবারকার প্রতিবেশী যারা তারা আমাদের অপরিচিতই থেকে গেল। কারণ, পরিচয় স্থাপনে সব আগে পা বাড়ায় যারা, সেই বালিকাজাতীয় জীব একটিও আমাদের সংসারে তখন ছিল না। মা রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘর ছেড়ে কোথাও বেরতেন না, কাজেই তাঁর ভিতর দিয়েও অচেনাকে চিন্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার পথে, ছাতে বেড়াতে গিয়ে অনেক সময় এধার-ওধারের অনেক বাড়ীর মানুষগুলির মুখ দেখ্‌তে পেতাম, তাদের কণ্ঠস্বর সারা দিনরাত শুন্‌তাম; কিন্তু অপরিচয়ের যবনিকা যেমন দুর্ভেদ্য গোড়ায় ছিল, শেষ অবধি প্রায় তাই থেকে গেল।

সন্ধ্যার সময় বেরবার উপক্রম কর্‌ছি এমন সময় মা বল্‌লেন, "বীরেন, একটু সকাল-সকাল ফিরিস্‌। রাস্তার উপরের দরজাটা দশটা রাত অবধি হাঁ করে' খোলা থাকে, এ ত ঠিক না।"

আমি বল্‌লাম, "এ বেঠিক কাজটা ত আজন্ম চলে আস্‌ছে।"

মা বল্‌লেন, "না না, পাড়ায় ক'দিন থেকে ভয়ানক চুরি হতে আরম্ভ হয়েছে, ঝিটা বল্‌ছিল। সাবধান হওয়া ভাল।"

মায়ের অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম কি না মনে নেই। কিন্তু মাঝরাত্রে ভীষণ চীৎকার আর বিকট কোলাহলে ঘুম যখন চম্‌কে ছুটে গেল, তখন মায়ের ঝির উপর রাগ হল তার সত্যবাদিতার জন্যে। উঠে বেরিয়ে এসে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝ্‌লাম চোর আসেনি, অন্ততঃ আমাদের বাড়ী আসেনি। অল্প একটু দূরে, সরু একটা গলির ভিতর অনেকগুলো খোলার ঘর তাদের অধিবাসীদের কুশ্রী দারিদ্র্য সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ করে' আমাদের চোখকে পীড়া দিত। আজ সেই মলিন ছবিখানার উপর কোন্ অদৃশ্য চিত্রকর আগুনের দীপ্তিময় প্রলেপ দিয়ে তাকে ভীষণরকম রমণীয় করে' তুলেছেন। পাড়ার যত লোক, এবং পাড়ার বাইরেরও অনেক লোক এই প্রলয়নাট্যে দর্শক এবং অভিনেতারূপে এসে জুটেছে, প্রত্যেক বাড়ীর ছাদ বারাণ্ডা জান্‌লা সব মানুষে পরিপূর্ণ। গলির ভিতর ভীড় তখন এত বেশী যে চট্ করে ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না যে নেমে গিয়ে ওর মধ্যে ঢুকতে পার্‌ব কি না, এবং যদি পারিও তা হলেও কোনো কাজ কর্‌তে পার্‌ব কি না।

এমন সময় কে যেন বলে' উঠ্‌ল, "ওরা ফায়ার-ব্রিগেডে খবর দিচ্ছে না কেন?" গলার স্বরটি স্ত্রীলোকের।

একজন পুরুষ তার উত্তরে বল্লেন, "গিয়ে পরামর্শ-টা দিয়ে এসো না?"

সাম্নে চেয়ে দেখ্লাম। আগুনের আভা তখন রাত্রির অন্ধকারকে অনেকখানি দূরে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। কাজেই যাকে দেখলাম তাকে বেশ ভাল করেই দেখ্লাম। সুমিত্রাকে গত পাঁচ বছরের মধ্যে চোখে দেখিনি, তার খোঁজ-খবরও বিশেষ জান্তাম না; অকস্মাৎ হুগজ দূরে দাঁড়িয়ে সে কথা বল্ছে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম। দিনের আলোয় কোনোদিন যার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, এই মাঝরাত্রে ঘরপোড়ানো আগুন কি করে' তাকে দৃষ্টিলোকে টেনে আন্ল?

মাকে বল্লাম, "মা, সাম্নে চেয়ে দেখ ত, ও সুমিত্রা না?"

মা একবার তাকিয়ে দেখে বল্লেন, "তাই ত, আবার এখানেও এসে জুটেছেন!" তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে গেলেন। সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমাদের কারুই বিশেষ মধুরভাবে হয়নি, কিন্তু আর-সকলে আরম্ভের তীব্রতাকে পরের মাধুর্য্যে ভুল্তে পেরেছিল, মা সেটা পারেননি। যে ছেলেকে উপলক্ষ্য করে' সে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, সে বেঁচে ছিল না, এটা তাঁর বিরাগের একটা কারণ। তা ছাড়া কয়েক বছর আগে যে ঘটনাটা সুমিত্রাকে আমাদের জীবন থেকে নির্ব্বাসিত করে' দিল, তার স্মৃতিও কিছু সুখপ্রদ নয়।

বাবা অনেক চেষ্টার পর কুসুমের জন্য অল্প খরচে একটি ভাল পাত্র স্থির করেছিলেন। কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছিল। আমার বেশ মনে আছে আমি ঘরে বসে' নিজের ক'জন বন্ধুবান্ধবকে বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করব মনে মনে তার তালিকা কর্ছিলাম। এমন সময় পাশের ঘরে বাবা-মায়ের গলার স্বর আমার মনকে সেদিকে টেনে নিয়ে গেল। বেশ জোরেই তাঁরা কথা বল্ছিলেন, কাজেই শুন্বার কোনো ভুল হল না। শুন্লাম সুমিত্রার বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে সেই পাত্রের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে স্থির করে' ফেলেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই বিয়ে, আজ আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণার্থে লোক পাঠানোও হয়েছে।

সুমিত্রার বিবাহ সম্বন্ধে অন্য রকম ব্যবস্থা হয়ত মনে মনে আমার ছিল। খবর পেয়ে আমার মনোভাবটা যে-রকম হল, সেটার সঙ্গে আমার বাবা কিম্বা মা যা অনুভব কর্ছিলেন তার খুব বেশী সাদৃশ্য ছিল না। তাঁরা কুসুমের বিবাহ না-হওয়াটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন; আমার কাছে সুমিত্রার বিবাহ হওয়াটা তার চেয়ে বেশী উত্তেজনার কারণ হয়েছিল, এ কথা স্বীকার কর্ছি। সুমিত্রার বাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্তে আমরা যে কেউ যাইনি এ কথা বোধ হয় বলা বাহুল্য।

লিখ্তে যতক্ষণ লাগ্ল, এ-সব কথাগুলো মনে কর্তে তত সময় লাগেনি। হটাৎ চকিত হয়ে দেখ্লাম, দমকলের গাড়ী ঘণ্টা বাজিয়ে গলির মুখে এসে দাঁড়াল। নাটকের পঞ্চমাঙ্কের সময় হয়ে এসেছিল, এই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শেষ যবনিকা পড়ে' গেল। বাকী যা রইল তা নিয়ে কাব্য-রচনা করা চলে বটে, কিন্তু আমার গল্পের মধ্যে তার বিশেষ কোনো স্থান নেই।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ছাতের উপর বেড়াতে বেড়াতে গত রাত্রির কথাই ভাব্ছিলাম। আশে-পাশের কলের চিম্নীর ধোঁয়ার উচ্ছ্বাসে তখনও আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত। অসংখ্য পাপের স্মৃতিতে ব্যথিত মহা-নগরীর বিরাট বক্ষ ভেদ করে' এই কালিমাময় বিপুল দীর্ঘশ্বাসগুলি আমার মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত আঁধারে ভরে' দিয়েছিল। কেবলি ভাব্ছিলাম ভুলে থাকা আর ভুলে যাওয়ার ভিতর এতবড় প্রভেদ কেন? শুকতারার মত দিনের আলো প্রখর হতেই যে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গিয়েছিল, আজ সন্ধ্যা হবার আগেই সে সাঁঝের তারার মত ফিরে এল কেমন করে'?

নীচে মায়ের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী ঝির আলোচনা চল্ছে, তার এক-একটা টুক্রা হাওয়ার স্রোতে কানে ভেসে আস্ছিল। আলোচনার বিষয় আর কিছু নয়, আমাদের সংসারের সীমাহীন দুর্গতির কাহিনী। বাবা ধার যে পরিমাণে রেখে গিয়েছিলেন, টাকা সে পরিমাণে রেখে যেতে পারেন নি। যাও বা রেখে গিয়েছিলেন, তার ভার অন্য লোকে গ্রহণ করেছিল, কেবল ঋণগুলির উত্তরাধিকার থেকে কেউ আমাকে

রক্ষিত করেনি। কিন্তু আমরা সকলে মিলে যে সমস্যার সমাধান করতে পারিনি, ঝি যে তা পারবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না।

যে বাড়ীতে সুমিত্রাকে কাল রাত্রে দেখেছিলাম, সেটা অত্যন্তই কাছে। কিন্তু সুমিত্রা ত একেবারেই কাছে ছিল না। তাদের বাড়ীর সঙ্কীর্ণ বারাণ্ডাটা ঠিক গলির ওপারেই। অনেকবার তাকালাম, কেউ সেখানে নেই। শেষবার একজন মানুষ দেখতে পেলাম, কিন্তু তাকে না দেখলেও আমার কিছু ক্ষতি হত না। আমারই বয়সী একজন ছেলে খুব চোখ পাকিয়ে এধার ওধার দেখে ঘরের ভিতর চলে' গেল।

মা কোনোদিন ছাতে ওঠেন না, হটাৎ সেদিন এসে উপস্থিত। বললেন, "জানিস্ বীরেন, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। আমি তখনই বলেছিলাম না?"

আমি বললাম, "কলটা হটাৎ কোথায় তুমি নড়তে দেখলে? আর তখন যে কি বলেছিলে তা আমার একেবারেই মনে নেই, বলে' দিতে হবে।"

আমার রসিকতার প্রয়াসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' মা বললেন, "আমাদের ফাঁকি দিয়ে বুড়ো ভেবেছিল যে খুব জিতে নেবে। এখন মেয়ে দুবেলা ঝাঁটা খাচ্ছে।"

বৃথাই না বুঝবার চেষ্টা করলাম, বললাম, "কি যে বলছ! কোন্ বুড়ো এবং কোন্ মেয়ে?"

মা বললেন, "ঐ তোমাদের সুমিত্রা গো! ক্যান্তর মা ওদের ওখানেও কাজ করে, সেই গল্প করছিল। বুড়ো বাপ মরে' গিয়েছে; ওর স্বামীটা আসামে না কোথায় কাজ করে; শাশুড়ী আর দেওরের সঙ্গে ও এখানে রয়েছে।"

শেষ অবধি শুনবার ইচ্ছায় বললাম, "তোমার ঝি দেখছি খুব উপন্যাস বানাতে পারে।"

মা চটে' বললেন, "বানাবে কেন? ও তেমন মানুষ নয়। সেদিন দেওরটা সুমিত্রার কাছে টাকা চেয়েছিল, ও দেয়নি। শাশুড়ী ছেলের হয়ে বউয়ের হাতের গহনা খুলে নিতে গিয়েছিলেন, তাও পারেননি। ও মেয়েকে পারলে ত বুড়ী! তারপর নাকি দরজা বন্ধ করে' সবাই মিলে তাকে মারধোর করেছে। শক্ত মেয়ে, একবার চেঁচিয়ে কাঁদেওনি!"

আমি বললাম, "তার স্বামী কি করতে আছে?"

মা বললেন, "পোড়া কপাল তার স্বামীর! টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, তা বুড়ো তাদেরও ফাঁকি দিয়েছে। তার মত না থাকলে কি আর বাড়ীর লোকে বউকে অত যন্ত্রণা দিতে পারে?"

ছাতে বেড়ান অসমাপ্ত রেখে নীচে চলে' গেলাম। ওদের বাড়ীটার সামনে কয়েকবার ঘুরে এলাম। কিন্তু তাতে লাভ হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

এর পর থেকে মাঝে মাঝে সুমিত্রাকে দেখতে পেতে আরম্ভ করলাম। হয়ত আগেও দেখতে পারতাম, কিন্তু যার সম্ভাবনা মাত্রও মনে ছিল না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ থাকতে পারিনি। চেহারা খুব যে বদলেছে তা নয়, কিন্তু এই যে আমার শৈশবের খেলার সঙ্গিনী তা ঠিক যেন অনুভব করতে পারতাম না। প্রভেদ একটা অনুভব করতাম কিন্তু সেটা এতটা অপরিস্ফুট যে ভাষার রাজ্যে তাকে আমল দেওয়া চলে না।

ক্যান্তর মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের অতঃপর যা-কিছু আলোচনা হত, সব-তাতে আমি ভাগ নেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু শ্রুতিমধুর কিছু লাভ করিনি এটা নিশ্চয়। পাড়ায় চোরের উপদ্রব যে দিন-দিন বাড়ছে এ খবরটা চোরেরা না দিলেও আমি রোজই পাচ্ছিলাম।

কাজেই সেদিন রাত সাড়ে দশটায় যখন বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছি, তখন হটাৎ যে আমার পাশ দিয়ে তীরের মত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ছুটে চলে' গেল, তাতে অবাক যত না হলাম, ভয় তার চেয়ে বেশী পেলাম। আমার কোনো মূল্যবান সম্পত্তি চুরি হয়ে গেল—ভয় এজন্য নয়; কারণ ভগবান আমাকে সে ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। চোর যদি সত্যিই এসে থাকে তাহলে আমার মা সে বিষয়ে যেভাবে নিজের মত ব্যক্ত করবেন, সেইখানেই আমার ভয় ছিল। তাই চোরের চেয়েও চুপিচুপি উপরে উঠে যখন আবিষ্কার করলাম যে মা যথারীতি দরজা বন্ধ করে' ঘুমুচ্ছেন এবং আমার ঘরের যা-কিছু অস্থাবর সম্পত্তি সবই যথাস্থানে বিরাজ করছে, তখন আশ্বস্ত হলেও অবাক হলাম।

শোবার সময় আলো নিভিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা

দিতে গিয়েই চমকে উঠে বসলাম। কিসের একটা হিম শীতল স্পর্শ আমাকে একেবারে ঘুমের দেশের সীমানার পারে টেনে নিয়ে এল। আবার আলো জেলে সেটা হাতে করে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

আমার বালিশের উপরে সোনার হার চুড়ি বালা প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ পড়ে রয়েছে। সেই মুহূর্তেই বুঝলাম সে কে যাকে আমি চোর মনে করেছিলাম। কিন্তু তার ব্যবহারের কোনও মানে আবিষ্কার করবার ক্ষমতা আমার হল না। ঘুমও হল না। সারাটা রাত কেবল কি করে এই অদ্ভুত দানের একটা কিনারা করব, তাই ভেবেই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কেবলমাত্র ভাবলে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। অথচ কাজে কিছু করবার কোনো উপায় নেই। অগত্যা মন যদিও নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত রইল, তবু অন্য দিনের মত স্নানাহার, স্কুলে যাওয়া, কিছুই বাদ গেল না। জিনিষ কটা সঙ্গে করে নিয়ে বেরলাম, ঘরে রেখে যেতে সাহস হল না।

বিকেলবেলা বাড়ী ফিরে আসতেই মায়ের কাছে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম যে শুধু ভাববার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এইবার করবার পালা; উপায় না থাকে, উপায় করে নিতে হবে।

সকাল দশটা আন্দাজ সময়ে সুমিত্রাদের বাড়ী মহা গোলমাল শুনে পাড়ার লোক গিয়ে উপস্থিত হয়। ওদের বৌয়ের গায়ের সব গহনা নাকি রাত্রে চুরি গিয়েছে। তার জন্যে বৌকে উৎপীড়ন করার অর্থ প্রথমে সকলে বুঝতে পারেনি, পরে শোনা গেল যে বউ গহনা নিজে লুকিয়ে রেখেছে, চোরে নিয়ে যায়নি। কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছে তাই আবিষ্কার করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

নির্য্যাতনের বর্ণনা মা যেরকম বিশদভাব করলেন, আমি তা করতে চাই না। অসহ্য যন্ত্রণাও যে মুখ বুজে নীরবে সহ্য করছে, তবু নিজের ব্যথাকে দশের কৌতূহল আর অবজ্ঞামিশ্রিত করুণার জিনিষ করতে চায়নি, তার গোপন বেদনাকে আজ লোকের সামনে টেনে আনলে আমি তার বন্ধুর কাজ করব না।

ঘরের ভিতর ঢুকে দোর বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করলাম কি এখন আমার করা উচিত। আমি সুমিত্রাকে বাঁচাতে চাই, যেমন করেই হোক। কিন্তু কি করব? নির্ব্বিচারে যা খুসি করে গেলেই কি তার উপকার হবে? অপকার কি তার চেয়েও বেশী হবে না? সুমিত্রা নিজে কি চায়? কেন সে আমার কাছে তার জিনিষ রেখে গেল?

এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল তাদের বাড়ীর দিকে। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে সুমিত্রার শাশুড়ী আর দেওর কোথায় চলেছে? সুমিত্রা কোথায়?

ছাতের উপর থেকে লাফ দিয়ে সরু গলিটা ডিঙিয়ে তাদের বাড়ীর ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভেবে চিন্তে এমন কাজ কেউ করে না। কিন্তু এতক্ষণ কেবলি ভেবেছি, কাজে কিছুই করিনি; তাই এবার ভাবনাটাকে বাদ দিলাম।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। সামনের ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

ঘরের মেঝের উপর যে শুয়ে ছিল, সে উঠে বসল। তার খোলা চুলের রাশ মুখের উপর এসে পড়েছে, এক হাত দিয়ে সেগুলো সরিয়ে সে চেয়ে দেখল। কপালের উপরে একটা রক্তের ধারা তখনও শুকোয়নি।

আমার আসাটাতে কোনো বিস্ময় না দেখিয়ে সে বললে, "তুমি শিগ্‌গির যাও, ওরা এখনি ফিরে আসবে।"

আমি বললাম, "তোমার জিনিষ ফিরিয়ে নাও, আমি এখনি যাচ্ছি।"

সুমিত্রার চোখ দুটো জলে উঠল। আমার মনে হল মাঝখান থেকে বারোটা বছরের ব্যবধান যেন খসে গেল, সামনে যাকে দেখলাম সে যেন এই উৎপীড়িতা অপরিচিতা সুমিত্রা নয়, এ আমার শৈশবের সঙ্গিনী, যাকে প্রায় নিজের মতই আমি জানতাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, "ফিরে নেব? আমার কপালের উপরের রক্ত এখনও শুকোয়নি দেখছ? এ শুধু আজ নয়, একবছর ধরে প্রায় প্রতিদিনিই এমনি চলছে। সব বিফল হবে?"

বুঝতে পারলাম না। বললাম, "কি বলছ ঠিক ধরতে পারছি না। আমি তোমার গহনা রাখলে তোমার কিছু সুবিধা হবে?"

সুমিত্রা হাসবার চেষ্টা করল। তার সেই রক্তরঞ্জিত মুখে হাসি যে কেমন দেখিয়েছিল তা না দেখলে বুঝবার উপায় নেই। সে বললে, "সুবিধার আশায় করিনি। কিন্তু ঐ কটা সোনার টুকরো নেবার জন্তে যারা আমাকে খুন করতেও পারে তাদের হাতে আমি কিছুতেই ওগুলো দেবে না।"

আবার সেই আট বছরের সুমিত্রার অজেয় মনটাকে দেখলাম। কিন্তু রাগ হল; বললাম, "সুমিত্রা, কিন্তু আমাকে জড়াচ্ছ কেন এর ভিতর? আমি তোমার প্রতিহিংসার অস্ত্র হতে চাই না। তুমি তোমার গহনা ফিরে নাও, নিয়ে নর্দ্দমায় ফেলে দাও কি যা-খুসি কর। আমি এসব রাখ্‌ব না।"

তার মুখের উপর কেমন একটা ছায়া এসে পড়ল। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললে, "আমার বাবার দেওয়া জিনিষ, এ তোমাকে ছাড়া কাউকে আমি দিতে পারব না। তুমি যা-খুসি কোরো,—বেচে ধার শোধ কোরো। ওর দাম খুব বেশী হবে না জানি, কিন্তু আমার আর-কিছু নেই, এইটুকু মনে রেখো। এখন যাও।"

আমি বললাম, "আমি যাচ্ছি; কিন্তু তুমি কি এই খুনেদের মধ্যেই থাক্‌বে?"

সুমিত্রা বললে, "থাক্‌ব না ত, যাব কোন্ চুলোয়?"

আমি বললাম, "তুমি স্বামীর কাছে চলে' যাও না?"

সে বললে, "আমার স্বামী কোথায় যে যাব? দেখ্‌ছ না আমার কপালে সিঁদুরের বদলে রক্তের দাগ?"

আমি বললাম, "তোমাকে কোনো রকমে কি সাহায্য করতে পারি না?"

সুমিত্রা বললে, "আমি সাহায্য চাই না। যার বিপদের গোড়ায় তার নিজের বাপ আর স্বামী, সে কোন্ লজ্জায় অন্যের সাহায্য নেবে? তুমি আমার আর খোঁজ নিও না। আমার দিব্যি রইল।"

ফিরে এলাম। আমার বাবার ঋণ শোধ কিছু হল না, কিন্তু সুমিত্রার যা ঋণ আমার কাছে ছিল তা শোধ হয়ে গেছে।

এর পরে কি হল তা আর বলে' লাভ নেই। খবরের কাগজে অসংখ্য আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুসংবাদের মধ্যে একদিন তার নাম দেখেছিলাম। কিন্তু তখন আর কলকাতায় ছিলাম না, খবর নেবার উপায় ছিল না, তা ছাড়া খবর নেওয়াতে তার নিষেধ ছিল। তারই মত যাদের মানুষে পিষে মারছে এমন লোকের সাহায্যার্থে তার ধন দান করে' দিয়েছিলাম। স্মরণচিহ্ন আমার কাছে ছিল কেবল তার শেষ কথার স্মৃতি। লোকের চোখে হয়ত আমি পরস্ব-অপহারী, কিন্তু যে পিতাকে সে সংসারে সবচেয়ে ভালবাসত, তাঁর দেওয়া উপহার সে আমাকে ছাড়া কাউকে দিতে পারে নি—এরই আনন্দ আমাকে বর্ম্মের মত ঘিরে আছে। আমার বাড়ীর লোকে আর সুমিত্রার নাম করে না। কিন্তু আমার শৈশব যেমন আমার এই অকাল-বার্দ্ধক্যের মধ্যে লুকানো আছে, একেবারে হারিয়ে যায়নি, তেমনি সে মরে'ও আমার জীবনে বেঁচে আছে।

শ্রীসীতা দেবী

ফাগুন-বাতাস

ফাগুন-বাতাস—ব্যাকুল মলয়,
ছুটি পাখাই সমান চপল—প্রথম-সৃষ্টি, শেষের প্রলয়!
কচি কিশলয়ের পুঞ্জে
সবুজ স্বর্গ গড়্‌চে কুঞ্জে,
ঝরা-পাতার ঘূর্ণীঝড়ে সমান মাতাল সকল সময়।

ফাগুন-বাতাস—ব্যাকুল মলয়,
বোঁটায় পুটে ফাটিয়ে কুঁড়ি ফুটিয়ে কুসুম উজান সে বয়
সেই উজানের ফাঁকে ফাঁকে
আবার ভাঁটায় ভাঙন লাগে,
ফলের ধরা এগিয়ে আসে—ফুলের মরা আসন্ন হয়!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

নিম্নবঙ্গের মঠ

জন্মদুঃখী কবি কাঁদিয়া কহিয়াছিলেন যে,—

> "ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি ম'লে
> তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?"

চিতার উপর মঠ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা প্রাচীন কালের হিন্দুর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। পরলোকগত পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের চিতায় মঠ দিয়া প্রাচীনকালে হিন্দুসন্তান আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। এই প্রথা এখনও পূর্ববঙ্গে লুপ্ত হয় নাই, এখনও যাঁহারই সাধ্যে কুলায় তিনিই পিতা-মাতার শ্মশানে মঠ প্রতিষ্ঠিত করা পুণ্য-জনক মনে করেন। কিন্তু এখন আর মঠগুলি আগের মত অভ্র ভেদ করিয়া উঠে না, পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে আর তাহাদের শির দেখা যায় না। দায়-সারা গোছের হাত দশ বার তৈয়ারী হইলেই খুব হইল। অনর্থক অত ইট সুরকি স্তূপীকৃত করিয়া ফেলিয়া রাখে কে ?

এই নয়নানন্দদায়ক স্থাপত্যনিদর্শনগুলি নানা নৈসর্গিক উৎপাতে ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের বিখ্যাত ভূমিকম্পে আমাদের গ্রামের প্রকাণ্ড একটি মঠ

সোনারঙ্গের মঠ—ঢাকা।
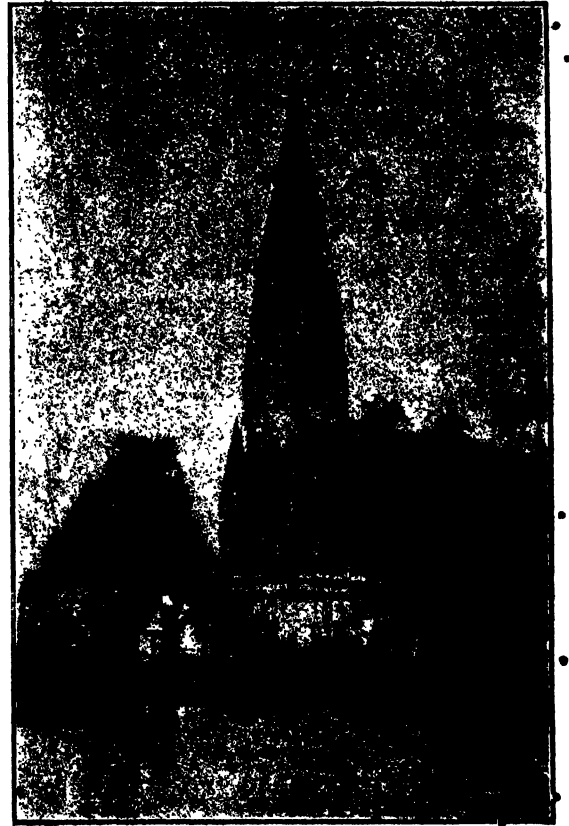
কেওয়ার গ্রামের মঠ—ঢাকা।
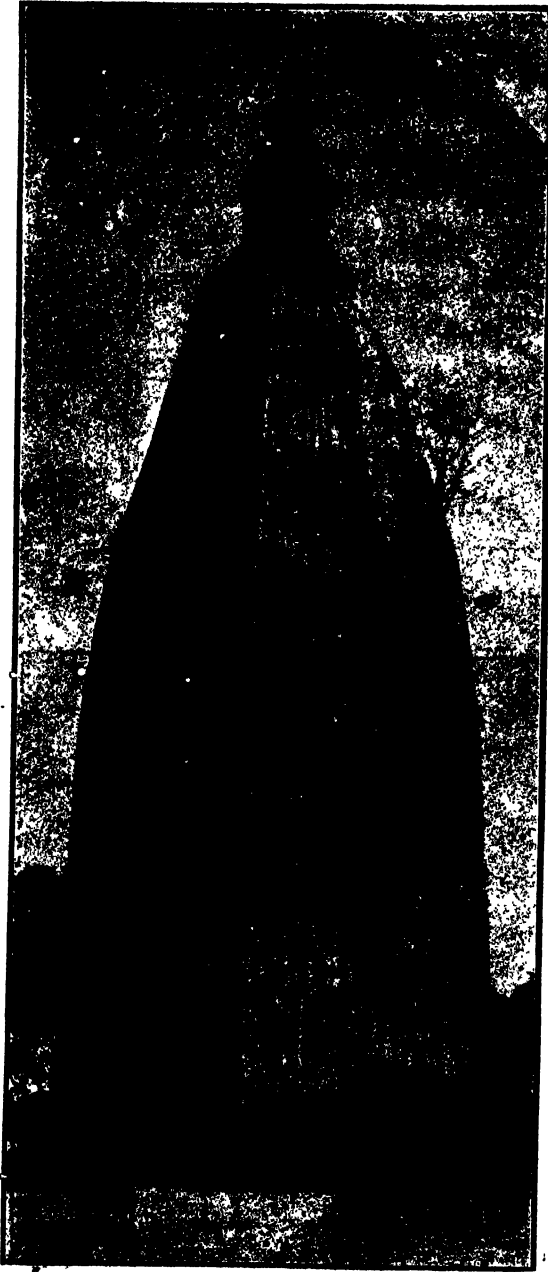
রাজাবাড়ীর মঠ—ঢাকা।

ভূমিসাৎ হয়; ঐ ভূমিকম্পে অনেক মঠেরই হয়ত ঐ দশা হইয়াছিল। দুই চারিটি কঠিনপ্রাণ মঠ এখনও দাঁড়াইয়া থাকিয়া বর্ত্তমান ও অতীতের সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। সুন্দরবন হইয়া যিনি একবার কলিকাতা হইতে ঢাকা আসিয়াছেন অথবা ঢাকা হইতে কলিকাতা গিয়াছেন তিনিই জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ আনন্দস্মৃতি অর্জ্জন করিয়া লইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অফুরন্ত আনন্দ-উৎসের মত দুই ধারে সুপারি-তাল-নারিকেলের সবুজ সৌন্দর্য্য ধরণীবক্ষ হইতে সরল রেখায় অবিশ্রাম ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সারি সারি বীণার তারের মত তাহাদের নিরাভরণ কৃশ কাণ্ড—বাতাসে অনবরতই তাহাতে ঝঙ্কার উঠিতেছে।

এই তালীবনের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ দুই-একটি উচ্চ মঠের চূড়া নয়নগোচর হয়; অমনি আমরা বুঝিতে পারি যে রসভঙ্গ হয় নাই, ঠিক এমনটিরই দরকার ছিল। সুপারি-তালের মেলায় এমন অগ্নিশিখার মত স্থাপত্যই তাল রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, অন্য যে-কোন আকৃতির ইমারৎই অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইত। দূর হইতে এই মঠগুলি কি মনোরম বলিয়াই বোধ হয়। অগ্নিশিখার মত রক্তিমবর্ণ মঠ আকাশ পানে উঠিয়া গিয়াছে। নিম্নেই একটি নাতি-বৃহৎ পুষ্করিণী। পাড়ে তাহার ছায়া করিয়া আছে আমলকী হরিতকী তমাল বট অশ্বত্থ। একটি অর্দ্ধভগ্ন সিঁড়ি জলে নামিয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া ধীরে ধীরে একটি পল্লীবধূ কলস কক্ষে নামিতেছে। পুষ্করিণীতে মঠের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয়, ইহা কি ইট-সুরকির মঠ? এ যেন পিতার আত্মার মঙ্গলার্থে ভগবানের সিংহাসন পানে সন্তানের চিরোৎস্থত আন্তরিক আকুল প্রার্থনা শিল্পীর হাতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

শিল্পী লাভ-ক্ষতির বিচার বাদ দিয়া এই মঠ গড়িতে বসিয়াছিল। যে ইট-সুরকির স্তূপ এই মঠ গড়িতে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে অনেক-কোঠাওয়ালা একটা প্রাসাদ তৈয়ার হইতে পারিত। তাহা না করিয়া শিল্পী নির্ম্মাণ করিল ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইল ক্ষুদ্র একটি শিবলিঙ্গ এবং তাহার চূড়া টানিয়া টানিয়া উঠাইল একেবারে মেঘের সীমায়। এত বড় চূড়াটা মানুষের বিশেষ কোন কাজেই লাগিল না। চূড়ায় যত্ননির্ম্মিত অসংখ্য খোপে যত রাজ্যের পাখী আসিয়া নিশ্চিন্ত বাসা বাঁধিয়া বসিল। বিষয়ী চূড়ার দিকে চাহে আর ভাবে,—"কি অপব্যয়! ভূমিকম্পে তো ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া!" গ্রাম্য শিশু ক্রোশেক দূর হইতে "ঐ রে, মামার বাড়ীর মঠ দেখা যায়!"
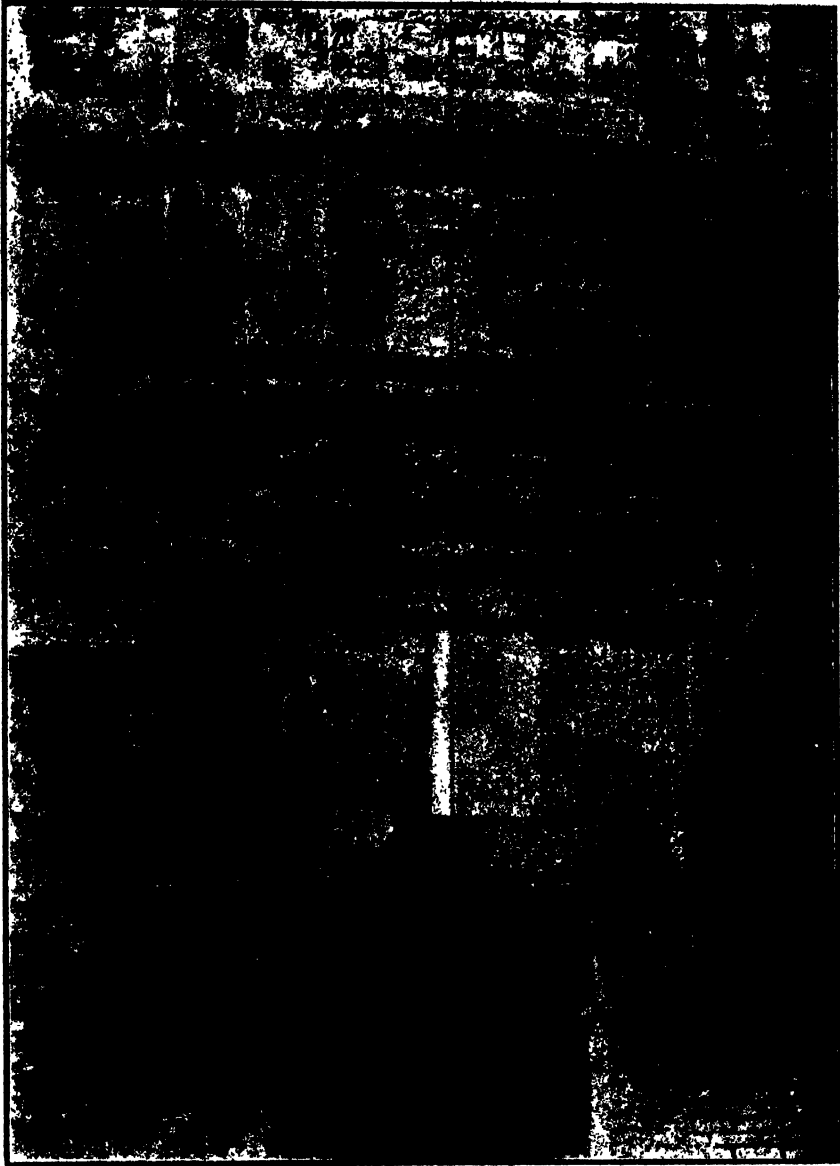
রাজাবাড়ীর মঠের দরজার উপরের কারুকার্য্য।

বলিয়া নাচিতে নাচিতে দৌড়াইতে থাকে। সন্ধ্যায় পান্থ-বিরল পথে পথিক পশ্চিম গগনে স্পষ্টীকৃত মঠের দিকে চাহিয়া খুসী হইতে থাকে, পথ তাহার কাছে ফুরাইয়া আসে। বর্ষায় অন্ধকার রাত্রে গ্রাম্য খালের গলি-ঘুঁজিতে দিক্‌ভ্রান্ত ডিঙ্গি-নৌকার মাঝি মঠের চূড়ার দিকে চাহিয়া দিক ঠিক করিয়া লয়।

পূর্ব্ববঙ্গে এমন একটি প্রাচীন গ্রামও পাওয়া যাইবে না যেখানে দুই-একটি মঠ নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই সেই গ্রামেরই নিজস্ব। দুই-একটির খ্যাতি কিন্তু সারা দেশটাই জুড়িয়া আছে। এই বিখ্যাত মঠগুলির মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠই প্রাচীনতম ও বিখ্যাততম। রাজাবাড়ী ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমে অবস্থিত। মঠটি পদ্মার একেবারে পাড়ে। গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ অথবা নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

ইছাই ঘোষের দেউল—বীরভূম।
(বীরভূম বিবরণ হইতে গৃহীত)

যাইতে জাহাজের যাত্রীগণ এই মঠটির দিকে চাহিয়া থাকেন যতক্ষণ দেখা যায়। কতবার পদ্মা ইহার দিকে ছুটিয়া আসিয়াছে, রাজাবাড়ীর মঠ বুঝি এবার আর টিকিল না ভাবিয়া প্রত্নপ্রিয় ব্যক্তিগণ শঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু মঠটি যেন দৈবরক্ষিত, অমর! প্রত্যেক বারই পদ্মা উহার পাদমূল হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।

রাজাবাড়ী মঠের গাত্রে কোনও লিপি অঙ্কিত নাই। কাজেই ইহা কোন্ সময় তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু উড়িষ্যার মন্দিরাবলীর আকৃতির সদৃশ ইহার বিশিষ্ট বর্তুলাকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা যে সময় তৈয়ার হইয়াছিল তখন পর্যন্ত শিল্পীগণ হিন্দুস্থাপত্যের বিশেষত্ব ভোলে নাই। রাজাবাড়ী মঠের কয়েকটি বিশেষত্ব বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য। প্রথমতঃ, মাথায় যে ঘণ্টাকৃতি চূড়া ও কুম্ভ আছে উহা হিন্দুস্থাপত্যেরই বিশেষত্ব। দ্বিতীয়তঃ, ঘণ্টা হইতে নিম্নে পাদদেশ পর্য্যন্ত যে থাক্ থাক্ খাঁজ নামিয়া আসিয়াছে তাহা প্রাক্‌মুসলমান যুগের মন্দিরাবলীতেই দেখা যায়। যতদূর জানি, বাঙ্গালা দেশে আর-একটি মাত্র মঠে এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—উহা বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্বের নিকটে অবস্থিত এবং ইছাই ঘোষের দেউল নামে খ্যাত। জন-

নবরত্ন মঠ (আধুনিক)—বাসণ্ডা, বরিশাল।
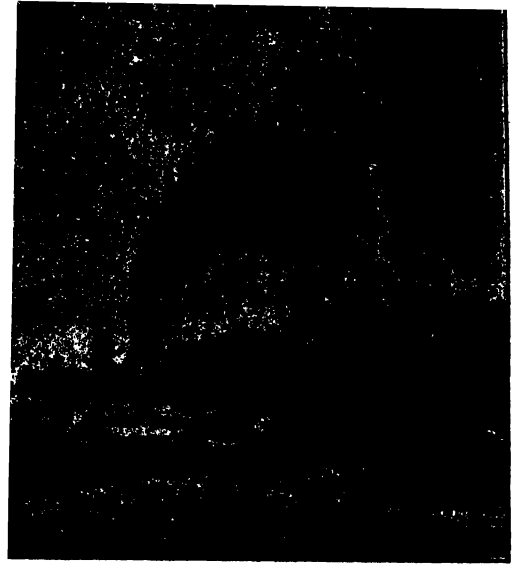
একুশরত্ন মঠ—রাজনগর, ঢাকা।
(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতে)

রমনার কালী মন্দির—ঢাকা।

প্রবাদ এই যে এই দেউল বা মঠ ইছাই ঘোষের নির্ম্মিত, কাজেই ইহা প্রাক্‌মুসলমান যুগের। প্রাক্‌মুসলমান যুগের না হউক, ইহা যে রাজাবাড়ীর মঠের মতই খুব পুরাণা, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রবাদ অনুসারে রাজাবাড়ীর মঠ কেদার রায়ের মায়ের চিতার উপর নির্ম্মিত। রাজাবাড়ীর মঠও পূর্ব্বদ্বারী, ইছাই ঘোষের দেউলও পূর্ব্বদ্বারী। রাজাবাড়ীর মঠের গায়ে নানা-রকম পোড়াই ইষ্টকের কারুকার্য্য আছে।

অন্য যে কয়টি মঠের ছবি দেওয়া গেল সেগুলি দেখিলেই মনে হইবে যে ইতিমধ্যে রচনারীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। রাজাবাড়ীর মঠ সৌন্দর্য্যে কুলাঙ্গী বীরপ্রসবিনীর মত। আর এই মঠগুলি তন্বঙ্গী জ্যোৎস্নাপায়িকা লঘুচ্ছন্দা নায়িকার মত। রাজাবাড়ীর মঠে হিন্দু স্থাপত্যের ছাপ বেশ আছে, কিন্তু এগুলিতে তাহা ধরা কঠিন। আরও অনুসন্ধান না করিয়া এই পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে জোর করিয়া কোন কথা বলা যায় না। কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে যে ইয়োরোপীয়গণের বাঙ্গালায় আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের গীর্জ্জা প্রভৃতিতে সূক্ষ্মচূড় গথিক স্থাপত্য-প্রথার প্রবর্ত্তন দেখিয়া তাহারই অনুকরণে এই অগ্নিশিখার

আকৃতি মঠের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অনুকরণে আমাদের লজ্জিত হইবার কিছুই নাই। এই তাল-নারিকেলের দেশে এই সূক্ষ্মচূড় স্থাপত্য-প্রথা এমন চমৎকার মানাইয়াছে যে এই নূতনত্ব-প্রয়াসে শিল্পের বিকাশই হইয়াছে, শিল্পের প্রাণ ক্ষুন্ন হয় নাই।

যতদূর দেখা যায়, এই প্রথা বোধ হয় রাজা রাজবল্লভই তাঁহার একুশরত্ন নির্ম্মাণে প্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে একুশরত্নের অনুকরণে এই প্রথা দেশময় আদর লাভ করিয়াছিল। ৫২ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৬ সনে একুশরত্ন পদ্মাগ্রাসে পতিত হয়। একুশরত্নের অনুকরণে নির্ম্মিত মঠে আজ দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ঢাকা সহরে রমনার কালীর মন্দিরও এই প্রথাতেই প্রায় এক শতাব্দী হইল নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

সন্ধ্যা

দিনের কমল মুদ্‌লে আঁখি
সন্ধ্যা-সাগর-জলে,
নিদ্‌-পাড়ানি বুলায় আকাশ
গভীর ছায়া-ছলে;

রাত্রি আসে কালো ভ্রমর
আঁধার-পাখা বোয়ে,—
পদ্ম-পাতের পরাগ-ফোঁটা
জল্‌চে তারা হোয়ে।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মোরগ—"তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইক অবহেলা।"
চিত্রকর শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সৌজন্যে।

প্রণাম

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে।

যাত্রা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে।
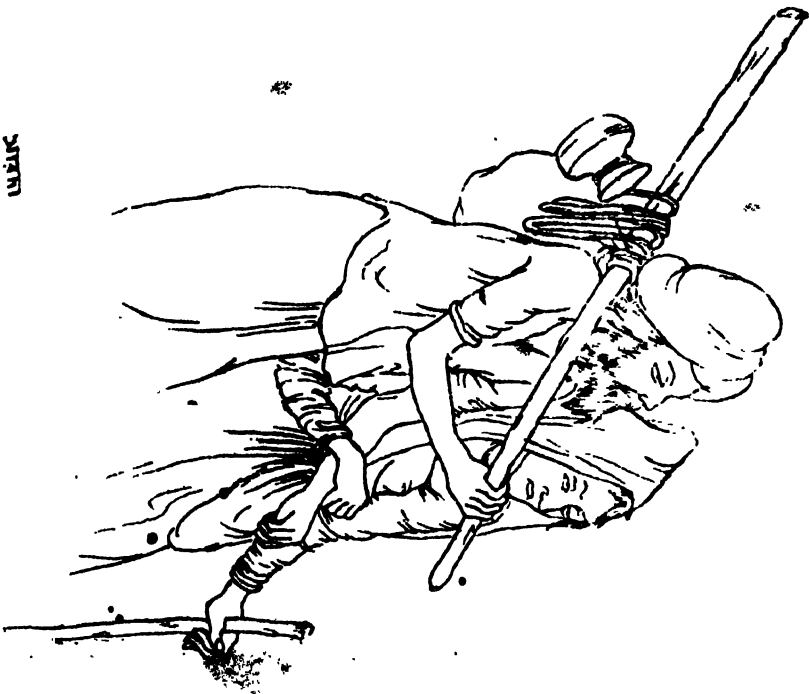
হারামণি

গত পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুবিল্বের মেলায় বাউলদের কাছ থেকে কতকগুলি গান সংগ্রহ করেছিলাম; সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করব। এবার যে তিনটি গান দেওয়া হচ্ছে, এগুলির গায়ক—রঘুনাথ দাস, বয়স ৪৫ বৎসর, বাসগ্রাম মাটিয়াড়া, থানা ভরতপুর, পোষ্ট অফিস মজান, সাব-ডিভিজান কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ। রঘুনাথ দাসের গুরুর নাম শারদ মোহান্ত বা সুচাঁদ।

১

ওরে অনুমানে ভাব্‌লে মানুষ ধরা যাবে না।
যদি বর্ত্তমানে ধর্‌তে পার, নইলে পার্‌বে না॥
সেই মানুষ কর্‌ছে খেলা,
আর সেই মানুষ কর্‌ছে লীলা,
যদি মানুষ দেখে কর্‌ছ হেলা তবে কিছুই হবে না।
আমি শুনি সাধুজনার কাছে—
এই মানুষে সেই মানুষ আছে;
তুমি যুক্তি নাওগে গুরুর কাছে, নইলে পাবে না।
সেই মানুষ-রূপে নন্দের ঘরে,
আর মানুষ-রূপে বলির দ্বারে,
সেই মানুষ আছে সব আধারে,
(পাগল মন) চিন্‌তে পার না।
দাস রঘুনাথের এই বাসনা—
সেই মানুষ করি উপাসনা;—
আমার গোঁসাই সুচাঁদের এই চরণ বিনা
আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না॥

২

ঘরে গুড় থাকিতে মন রে ময়রা ভিয়েন কর্‌লি না;—
তোর সাধের খোলা রইল পড়ে'
হাতা তাহায় দিলি না।
গুড় রাখ্‌লি পেলে ভরে',
পেলের মুখ না লেপিলে,
ডেঁয়ো পিঁপ্‌ড়ে জুটে গুড় সব খেলে লুটে;
তাতে ভিয়েন কর্‌লে মাল জমিত রে,
তুই ভিয়েন কর্‌তে গেলি না।
আগুন আছে তোর ঘরে,
সে জল্‌ছে জোর করে',
এই বেলাতে তাড়াতাড়ি নে ভিয়েন করে'।
মোর রসের খোলা জুড়িয়ে গেলে
শেষে ভিয়েন করা হবে না।
দাস রঘুনাথ ভণে—
মনের নিষ্ঠা-আগুনে
গুরুর প্রতি দৃষ্টি করি বস্‌গে ভিয়েনে।
কোরো না আখার পাড়ে আঁকাবাঁকি,
তা হলে ভিয়েন করা হবে না॥

৩

তারে দেখ্‌বি যদি নয়ন ভরে'
এ দুটো চোখ কর্ রে কাণা।
আর শুন্‌বি যদি সে মধুর বুলি,
তো বাইরের কানে আঙুল দে না।
বিজলের মধু চিনি সে যে,
গাঢ়-প্রেমের মিছ্‌রি-পানা;
আবার খাবি যদি কসে' এঁটে,
তো বেঁধে রাখ্ তোর কু-রসনা।
রাজার রাজা,—তার হুজুরে
যাবি যদি নাই রে মানা,—
পরশমণি পরশ করে'
হতে যদি চাও রে সোনা।
ওরে কান্ত বলে সে-সব
আছে আমার প্রাণে জানা,
আমি জেনে শুনে ভেবে গুণে
ভুলে রইলাম কি কারখানা॥

সংগ্রাহক—

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীঅনাথনাথ বসু

সাধনা ও সিদ্ধি*

কথারম্ভে মহাত্মা রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম গ্রহণ করি,—যাঁর সাধনায় বর্ত্তমান ভারতের সকল প্রচেষ্টার সিদ্ধির বীজ উপ্ত হয়েছিল; যিনি নব্য ভারতের স্রষ্টিকর্ত্তা; অজ্ঞানকুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানিশায় যিনি জ্ঞানের বর্ত্তিকা হাতে জীবনের সকল পথে অগ্রসর হয়েছিলেন; ১০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যিনি জীবনবাঁশীতে জাগরণের সুর তুলে সুপ্ত দেশবাসীকে নূতন পথের পথিক হ'তে আহ্বান করেছিলেন; ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে যিনি সর্ব্বপ্রথম সংস্কার-চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন; আধুনিক বঙ্গভাষার একজন জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় সেই রাজা রামমোহন রায়! রামমোহনের সিদ্ধির মূলে ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই, এই কথাই আজ আমি বাঙালী যুবককে বড় আশা করে বল্‌তে এসেছি। আজ এই জীবনসন্ধ্যায় জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আমি শিখেছি এই একটা পরম সত্য—সাধনা বিনা সিদ্ধি নাই।

আজ বাঙালীকে এই পরম সত্যটি গ্রহণ করতে হবে—শুধু মুখস্থ করা নয়, শুধু স্বীকার করা নয়, একবারে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহামতি গোখলে বলেছেন—What Bengal thinks to-day, the whole of India thinks to-morrow—বাঙালীর মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা সারা ভারত গ্রহণ করে। রামমোহনের সময় থেকে মস্তিষ্কচালনার ক্ষেত্রে বাঙালী অগ্রণী ব'লে গণ্য হ'য়ে এসেছে—বাঙ্‌লার কোলে অনেক ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, সুলেখক, বৈজ্ঞানিক, দেশবিশ্রুত বাগ্মী, জন্মগ্রহণ করেছেন—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রে এক এক জন দিক্‌পাল বাঙ্‌লার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছেন। বাঙালী আগুয়ান্ হ'য়ে চলেছে স্বীকার করি—তবু আজ একবার বাঙালী যুবককে কঠোর আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, তার চরিত্রের গলদ কোথায়; অন্তরের কোন্ বাধাটা তার চলার পথে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে।

সক্রেটিস্ বলেছেন, যারা আঠার বৎসর পার হয়েছে, তাদের উপদেশ দিয়ে কোন ফল নেই। তাই আমার বক্তব্য আজ দেশের যুবকবৃন্দের কাছে—যারা আমাদের ভবিষ্যতের আশা—আমাদের হৃদয়ের ধন। এই সম্পর্কে আর এক কথা এই যে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্", এটা আমার কাছে নিতান্তই বাজে কথা;—আমি বলি "ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" অপ্রিয় সত্য বল্‌তে হবে—দেশবাসীকে প্রীতি নিবেদন ক'রে খুব স্পষ্টভাবেই তাদের ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে হবে। পত্রাবরণে ভগ্ন স্থান লুকিয়ে রাখ্‌লে দুর্গ-প্রাচীরও সহজেই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ঢাক্‌লে অভাব ঘোচে না; অভাবকে সকল সময়েই মোচন করতে হয়;—আর তার জন্যে চাই কঠোর আত্মপরীক্ষা, আর তীব্র বেগবতী ইচ্ছাশক্তি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর বক্তৃতায় একস্থলে কতকগুলি মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন। কথাগুলি এই, যে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে এবং যথেষ্ট ধৈর্য্যসহকারে তিনি মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠার হাজার গ্রাজুয়েটের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। এদের মধ্যে ৩৭০০ জন সরকারের চাকরী করেছেন, তারও অধিক ইস্কুল মাষ্টার হয়েছেন, আর ৭৬৫ জন ডাক্তার হ'য়ে বাহির হয়েছেন। এই তালিকা দৃষ্টে এঁরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অতি সহজেই অনুমেয়। মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ জীবনের একটানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে জ্ঞানজগতে নব নব পথের সন্ধানে বের হন নি। আর মান্দ্রাজী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে যা সত্য, বাঙালী গ্রাজুয়েট সম্বন্ধে সেই কথাই সর্ব্বোতোভাবে প্রযুজ্য। বাঙ্‌লা দেশেও ঐ—একই দশা।—কেরাণী, মাষ্টার, ডাক্তার আর উকীল। আর সেই গলাধঃকরণ, উদ্গিরণ, পরীক্ষাপাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, তারপর

---

* ১২ই মাঘ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ।

মা সরস্বতীর সঙ্গে সেলাম্ আলেকম্। মুন্সেফ, ডেপুটী, জজ,—তা মাদ্রাজী গ্রাজুয়েট বাঙালীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হ'য়ে গিয়েছেন, কিন্তু সবাই বাঁধা ওই চাকরীর ঘানীতে আর সবার অন্তরের কথা হচ্ছে—"মা আমায় ঘুরাবি কত—কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।"

আবার এই গ্রাজুয়েট উৎপন্ন কর্‌বার শক্তি মাদ্রাজের চেয়ে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বেশী। এই ব্যাপারে কল্‌কাতা সবার অগ্রণী—কিন্তু হেসো না, এ-সব ঘরের কথা বাইরে না যায়। অসহযোগ, সহযোগ স্বীকার করি না; এবার ২০,০০০ ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে আর শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন পাশ হবে। কিন্তু একজন উপাধিকারী কি প্রকার কূপমণ্ডুক তা চিন্তা করলে মন বিষাদিত হয়। বর্ত্তমান প্রথানুসারে একজন এম-এসসি কিম্বা এম-এ'র ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাক্‌লেও চল্‌তে পারে। ইতিহাস পাঠও ইচ্ছাধীন। আব্রাহাম লিঙ্কলন্, ফ্রাঙ্ক্লিন প্রভৃতির নাম শোনেন নি এমন গ্রাজুয়েটও অনেক আছেন। ভূগোল চাই না, ইতিহাস চাই না, দেশের কথা চাই না, পৃথিবীর কথা চাই না,—শুধু পাশ করে' যাও—মাট্রিক, আই-এ, বি-এ, ফার্ষ্টক্লাস, সরেস এম্-এ। উচ্চশিক্ষিত যুবক হয়ত ম্যাট্‌সিনীর নাম শুনেছেন—গ্যারীবাল্‌ডিকেও হয়ত মস্ত একটি বীর ব'লে জানেন কিন্তু কাবুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেই মাথা চুল্‌কাতে আরম্ভ করবেন। যদি প্রশ্ন করি আমেরিকায় অন্তর্বিবাদ (Civil War) কেন হ'ল—এ বিপ্লবে কে কে রথী ছিলেন—লিঙ্কলন্ জ্যাক্‌সন্ কে, কোন্ পক্ষ জয়ী হ'ল, বিরোধের ফলাফলে দেশের লাভ লোক্‌সান কি হ'ল? তাহলেই ফিলসফির ফার্ষ্টক্লাস এম্-এ একবারে অবাক্ হ'য়ে হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন;—এ-সব আবার কি? প্রফেসারের কোনো নোটে ত এ-সব লাল নীল সবুজ পেন্সিলে দাগ দিয়ে কস্মিন্ কালে পাঠ করি নি।

চতুর্থবার বিলাত গিয়ে গতবৎসর এই সময় আমি দেশে ফিরে আসি। সেখানে লণ্ডন্, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্‌মিংহাম্, লীড্‌স্, এডিনবরা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি। অনেকস্থলে এক একটা কলেজ একএকটা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা বিদ্যানুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে আর প্রত্যেক বিভাগেই পাঁচ ছয় জন ছাত্র সেই বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন। আর পর পর এমন বড় লোক ঐসকল বিদ্যামন্দির থেকে বাহির হ'য়ে আস্‌ছেন, যা ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। এঁদের অনেকে একটা বিশেষ বিষয়ের গবেষণার নেশায় ভরপুর হয়ে সারা জীবন উৎসর্গ করে' দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ এদের শূন্যস্থান অপরে পূরণ করছেন। আর এই-সকল বিষয়ের বৈচিত্র্যই বা কি! একখানা "নেচার্" তুলে নিয়ে চোখ বুজে তার যে-কোন স্থান খুলে য়ুরোপে অনুশীলিত কত রকম বিদ্যার কত রকম রোজনাম্‌চা যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়; সেখানে কতশত অনুসন্ধান-সমিতি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতিতে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ত পরিপুষ্ট করছে। এই ইউরোপের সব দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত নিয়ত মানবের জীবনকে কত উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, যে তার আর শেষ নেই। কত শত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে কত শত প্রচেষ্টা, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, কত একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধকের ঐকান্তিক চেষ্টা ঐ-সব দেশে বিদ্যার্থীগণের তথা জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিকে সদা জাগ্রত করে' রেখে দিয়েছে। ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর, আসীরিয়া, বাবিলন প্রভৃতি দেশে লোকে কিরূপ জীবনযাপন করেছিল সেই-সকল প্রত্নতত্ত্বের বিচারের ফলে য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ জ্ঞান-রাজ্যের এক একটা নূতন দিক উন্মুক্ত করে' দিয়েছেন যার নাম হয়েছে—ইজিপ্টলজি, আসিরিওলজি ইত্যাদি। লেয়ার্ড, রলিন্‌সন, পেট্রি (Layard, Rawlinson, Petrie) প্রভৃতি এই-সকল বিদ্যার হোতা।

তার পর প্রাচ্যের প্রান্তে এসে দেখা যাক্। জাপানে তোকিও, কোবে, কিয়োতো, প্রভৃতি বিখ্যাত নগরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানানুশীলনে সর্ব্বাংশে য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সেবার বিলাতগামী জাহাজে আমার সঙ্গে প্রায় দুই শত ভারতবাসী ছাত্র ইউরোপে চলেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া সবাই কেমন করে' ফাঁকি দিয়ে একটি বিলাতি সস্তা ডিগ্রি এনে দেশী ডিগ্রির উপর টেক্কা দিবেন সমস্ত সময় সেই চিন্তা ও পরামর্শ করছিলেন। আমাদের

দেশের যে-সব ছাত্র মাট্রিক বা আই-এ, আই-এসসি প্রভৃতি পাশ করে' বিলাত চলে' যান, দেখ্‌তে পাওয়া যায় জ্ঞানান্বেষণ তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁদের চিন্তা, কি করে' শীঘ্র একটা বিলাতী ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশবাসীর চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেবেন। জাপানী ছাত্র আপন দেশে কোন একটি বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ কর্‌বার পর য়ুরোপ যান এবং সেখানে সেই বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থান করে' সেই বিষয়টিই শিক্ষা করেন। আর আমাদের ছাত্রগণ অনেকস্থলে ভিটে মাটী বেচে, কেউ বা বড়লোকের জামাতা হবার লোভে ডিগ্রী লাভের আশায় মুগ্ধ হ'য়ে বিলাত যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটে তা বল্‌ছি না। এর ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। আমাদের ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও মেঘনাদ সাহা বিদেশে একবার জাপানী ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনারা কি লণ্ডনের ডিগ্রী নিতে এসেছেন ?" তাঁরা জাতীয় গর্ব্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, তাঁরা নিজেদের দেশের ডিগ্রীকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করেন না। আমাদের দেশেরও উক্ত শ্রীমানদ্বয় বিলাতি ডিগ্রির মোহে স্বাদেশিকতাকে খর্ব্ব করেন নি, এ পরম গৌরবের কথা। বাস্তবিক ঐ-সব জাপানী ছাত্র এসেছেন, স্যর জোসেফ টম্‌সন, রাদারফোর্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানবিশারদদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌বার জন্য, ডিগ্রীলাভের জন্য নয়।

কিন্তু আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সেই ১৮৫৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট উৎপন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে ক'জন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে নিজের কিছু দিতে পেরেছে যা একেবারে মৌলিক ও নূতন, যাতে মানবের জ্ঞান পুষ্টিলাভ ক'রে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেহই যে কিছু দেন নি এমন কথা বল্‌ছি না। ব্যতিক্রম ত আছেই। কিন্তু তাঁদের আজীবন সাধনার ভিতরের কথা কে বুঝ্‌বার চেষ্টা করে—কে তাঁদের অহেতুকী জ্ঞানতৃষ্ণার যথার্থ সম্মান কর্‌তে পারে ? এখানে যে সব ছাত্রই ডিগ্রী চাচ্ছেন আর চাকরী করছেন! কোন বিষয়ে কৃতিত্ব ত কেউ দেখাতে পার্‌লেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার দেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। আপন রোজগারের প্রধান অংশ পুরাতন পারসী পুঁথি ক্রয় কর্‌তে ব্যয় করেছেন, পাটনা খোদাবক্স্ লাইব্রেরীতে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তাই মোগলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি আজ Authority বা প্রামাণ্য পণ্ডিত। তাঁর উপর আর কেউ কথা বল্‌তে পারেন না, এদেশেও নয়, য়ুরোপেও নয়; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীই এঁর পাণ্ডিত্যের কারণ নয়—এই কৃতিত্বের পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জীবনের সাধনা।

কি কুক্ষণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীর দিকে ঝোঁক পড়েছিল। সেই পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলেই আজ চাকরীর উমেদার। হিন্দু কলেজের ছেলেরা যারা মাইকেল-রাজনারায়ণের সমপাঠী—তাঁরা গ্রাজুয়েট হ'লেই প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ডেকে বড় বড় চাক্‌রী দিতেন। এই সময় থেকে মতিগতি যে চাকরীর দিকে গেল সে আর ফির্‌লো না। বাঙ্‌লার ধনে ইংরেজ-মাড়োয়ারীর সিন্ধুক বোঝাই হ'ল, আর বাঙ্‌লার গোপালেরা শান্ত শিষ্টভাবে ডিগ্রীলাভের সাধনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। সাধনা—ডিগ্রী, তাই সিদ্ধি—চাকরী!

এইরূপে আদর্শ খাটো হ'য়ে গেল। তাই গভীর জ্ঞানসাধনা দেশে প্রতিষ্ঠিত হ'ল না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানেই বাঙালী যুবক সন্তুষ্ট থাক্‌তে শিখ্‌লেন। মল্লিনাথ, বল্লভ, তারাকুমার, সারদারঞ্জন—এই-সব টীকার সাহায্যে এক সর্গ ভট্টি, বা রঘুবংশ প'ড়েই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হলেন, কেউ বা আধ সর্গ প্যারাডাইস-লষ্টের নোট মুখস্থ করে' ইংরেজি সাহিত্য দখল করে' বস্‌লেন। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে একখানা বাহিরের বই নিয়ে কেউ পড়ে' দেখ্‌লেন না—যেহেতু সে পাশ করার কাজে লাগে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল এক প্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে; ইতিহাসও না পড়্‌লে চলে। বাস্তবিক কি লজ্জা, কি পরিতাপের কথা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ এম্‌-এ, এম-এস্‌সিগণ অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা কুশিক্ষিত। ক্যালেণ্ডারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, হার্ভার্ডকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সারা দুবছর ফুটবল ক্রীকেট খেলেছে ও দেখেছে বলে' আমার এক বন্ধু যখন আপন পুত্রের এম-এ পাশ করা সম্বন্ধে হতাশ

হয়ে পড়্লেন, তখন চতুর পুত্র কয়েক দিনের মধ্যে মেস থেকে মেস্যান্তর ঘুরে নোট জোগাড় কর্লে এবং পরীক্ষকের মন জুগিয়ে চলে' অবহেলে পাশ ক'রে ফেলে বাপকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিলে!

তাই বলি সর্ব্বনাশ হয়েছে এই ভাসা-ভাসা জ্ঞানে, আর অতি সস্তা পাশে। ফিস্ক্যাল-কমিশনে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, ঘনশ্যামদাস বিরলা প্রভৃতি বস্‌বেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে এঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে যাঁদের নাম জলজল কর্ছে সেই (Cobden Medallist) স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাঙালী যুবক ত ঐ অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের আলোচনায় আহূত হলেন না। স্যার বিঠলদাস ঠাকরসে বড় বড় কলের মালিক—পরন্তু "গোল্ড মেডেলিষ্ট" নন। টাকা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করেন বলে' মহামতি গোখ্‌লে বজেট-বক্তৃতা প্রস্তুতের কালে তাঁর পরামর্শ বহুমূল্য জ্ঞানে গ্রহণ করতেন। ভারতবর্ষে রেলওয়ে-কার্‌বার-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে যাঁর মতামত বহুমূল্য বলে' বিবেচিত হয় তিনি হচ্ছেন ডিগ্রীহীন সাতকড়ি ঘোষ। চিন্তামণি, কালীনাথ রায় প্রমুখ সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ অনেকেই ডিগ্রীশূন্য; কিন্তু এঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব মূল্যবান কথা লেখেন, বড় বড় ডিগ্রীধারীগণ তা থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ কর্‌তে পারেন।

আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক জাতি বলে' গর্ব্ব করে' থাকি আর য়ুরোপীয়দের জড়বাদী বলে গালি দিই। কিন্তু জড়বাদী ওরাই আমাদের দেশের স্থানে স্থানে নানা কুষ্ঠালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করে। ভারতবর্ষে ৭২টি কুষ্ঠালয় আছে তন্মধ্যে দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক স্থাপিত একটি ছাড়া আর সবই তো ওদের। ফাদার ডামিয়েন তাঁর জীবনই তো কুষ্ঠীর সেবায় তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন! আর্ত্তকে কেউ কোলে তুলে নিচ্ছে আবার কেউবা বল্‌ছে—ওকে ছুঁয়ো না। বাস্তবিক কি বৈচিত্র্য ওদের জীবনে! জান্‌বার, বুঝ্‌বার, পাবার কি দুর্নিবার চেষ্টা! কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ কর্‌বার জন্যে বৎসরের পর বৎসর চেষ্টা কর্ছেন, তার আয়োজনই বা কত; কেউ বা আফ্রিকা মহাদেশের কিলিমেন্‌জেরো পর্ব্বতের চিরতুহিনাচ্ছন্ন চূড়ায় কোন চিরনূতনকে দেখ্‌বার প্রয়াস কর্ছেন। সু-উচ্চ গিরিদেশে শ্বাসরোধ হয়ে কেউ বা প্রাণ হারিয়েছে—তবু দৃক্‌পাত নেই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। মেরুসন্নিহিত প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জান্‌বার জন্য ফ্রাঙ্ক্‌লিন, ন্যান্‌সেন, শ্যাক্‌লটন প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু কত অসাধ্য না সাধন করেছেন। মানুষের যা সাধ্য তা এরা কর্‌বে, আবার মানুষের যা অসাধ্য তাও এরা কর্‌বে। কি বিপুল দুর্দ্দান্ত জীবন! উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ইংরেজ হুকার বিচিত্র লতাগুল্মের সন্ধানে সিকিম প্রদেশে গিয়ে সেখানে বন্দী হলেন। তাই নিয়ে যুদ্ধই বেধে গেল। যুদ্ধজয়ের পর তিনি মুক্ত হলেন। তাঁর Flora Indica বর্ণিত সংগ্রহ বিলাতে কিউ গার্ডেনে (Kew Garden) কত যত্নে রক্ষিত হয়েছে। আবার পশুতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয়ান্ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদসঙ্কুল আফ্রিকার জঙ্গলে খাঁচার মধ্যে বাস করে' মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছেন—উদ্দেশ্য গরিলা শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বনমানুষের অভ্যাস ও আচরণ জান্‌বেন; তাদের ত ভাষা নেই, তাই সঙ্কেতে তাদের ভাববিনিময় লক্ষ্য কর্‌বেন। এমনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারেই তাঁরা সত্যের আবিষ্কার করেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যায় টাইকো ব্রেহী, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেলের সম্পর্ক কত নিবিড়, কত গভীর! এত গভীরতা শোণিতসম্পর্কে কোথায় পাবে! গ্যালিলিও কেপ্‌লার সমসাময়িক ছিলেন। কেপ্‌লারের অভাবে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলীর আবিষ্কারের পথ সুগম হত না। কত বিনিদ্র রজনীতে উদার উন্মুক্ত অসীম আকাশের দিকে কি আনন্দে কি আশায় এঁরা চেয়ে থাক্‌তেন! কি অমূল্য রত্ন এঁরা পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে দিয়ে গেছেন। এঁদের জ্ঞান-সাধনার মূলে গভীর অভিনিবেশ! একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে এঁরা সাধ্য বস্তুর সন্ধান করেছিলেন, তাই সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষণে নিউটন এমনই তন্ময় হ'য়ে যেতেন যে আপন আহারের কথাই বিস্মৃত হতেন। একদিন নিউটন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভৃত্য আহার্য্যদ্রব্য সম্মুখে রেখে গেল। তাঁর বন্ধু কৌতুক ক'রে সেইগুলি খেয়ে নিয়ে

হাড়গুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেন। ধ্যানভঙ্গের পর আহার করতে গিয়ে নিউটন দেখলেন হাড়গুলি প'ড়ে আছে। অতএব পণ্ডিতবর সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর আহার হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু অত মনে নেই। তাই পাছে কেউ ঠাট্টা করে এই আশঙ্কায় চারিদিক চেয়ে সেখান থেকে চ'লে গেলেন। কি আপন-ভোলা ভাব! এরূপ তন্ময়ত্বের আরও কয়েকটি নিদর্শন দেখাই। রেনেসাঁস যুগে প্যারিস নগরে গোমারভক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট স্কালিগার আপন ঘরে পাঠে নিমগ্ন; এদিকে বাহিরে হত্যাকাণ্ড হ'য়ে গেল (Massacre of St. Bertholomew); কত প্রোটেষ্টাণ্টকে খুন করা হ'ল, কিন্তু তিনি এমনই তন্ময় যে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার তার পরদিন জানলেন। এথেন্সের সৈন্যদলভুক্ত হ'য়ে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস একটানা ২৪ ঘণ্টা নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেন, তবেই ত দুরূহ তত্ত্বসমূহের মীমাংসা পেতেন। গ্রীকদর্শনের তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু। প্লেতো তাঁর শিষ্য। ভাষা-তত্ত্ববিদ্ বুদিয়স্‌এর বিবাহদিনে গির্জায় কনে এসেছেন, অন্যান্য বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু বর কোথায়? বরকে ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বরের পাঠগৃহে গিয়ে দেখা গেল তিনি ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন আছেন। যার বিয়ে তাঁর মনে নেই। রোমান সৈন্য যখন আর্কিমিডিসকে খুন করতে এসেছে তখন আর্কিমিডিস বললেন—দাঁড়াও একটু, এ বৃত্তটা নষ্ট ক'রে দিও না, এ প্রমাণটা শেষ করি। বর্ব্বর সৈনিক তাঁকে খুন ক'রে জগতের মহৎ সত্য উদ্ঘাটনের পথ হয়ত রুদ্ধ ক'রে দিয়ে গেল। এমনই ক'রে আপনহারা হ'য়ে সাধনা না করলে কি কেউ কখনও কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে?

এই নিঃস্বার্থ সাধনায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছে। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ—স্বার্থপর ক্রোড়পতির কেউ সংবাদ লয় না। কিন্তু তাঁর অর্থ যখন 'জনহিতায়' ব্যয় হয়, তখন তিনি হন শ্রেষ্ঠ ও মান্য। জ্ঞানসাধকের সাধনলব্ধ যা-কিছু তা পৃথিবীর সকলেরই সম্পত্তি। তাই তাঁরা সকলেরই বড় আপনার জন। কিন্তু আমরা নষ্ট হয়েছি সাধনার অভাবে, সঙ্কুচিত হয়েছি স্বার্থপরতার প্রভাবে। তাই বিদ্যাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই আমরা হ'টে গিয়ে পিছনে প'ড়ে গেছি। সর্ব্বনাশকারী পল্লবগ্রাহিতা আমাদের নষ্ট করেছে। ৺প্রতাপ মজুমদার বলতেন "জাপানীরা অপেক্ষাকৃত হাঁদা, বাঙালী অতি বুদ্ধিমান।" সেইজন্যই বাঙালী আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আত্মঘাতী উদ্যমহীনতা আমাদিগকে স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে চেষ্টিত করে। তাই আজ সব ক্ষেত্রেই চাই সাধনা। অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, অর্থসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা প্রভৃতি নানাসমস্যায় প'ড়ে আমরা সব রকমে মাটি হ'য়ে যেতে বসেছি। এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে লেগে প'ড়ে থেকে এক একটি সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলে আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে চেষ্টামাত্রেই অথবা কিছুদিনের চেষ্টাতেই যে এই-সকল কঠিন সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে যাবে তা কখনই নয়। সুতরাং কাজ আরম্ভ ক'রেই ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, প্রয়াসসাধ্য সকল কার্য্যেই করার আনন্দটাই মুখ্য, পাওয়ার আনন্দ নয়; মৃগয়ায় যেমন অন্বেষণেই আমোদ, তেমনি প্রকৃতির গূঢ়রহস্য যাঁরা উদ্ঘাটন করেন তাঁদের সেই চেষ্টাতেই অপার আনন্দ। আজ আমাদের তাই এই প্রচেষ্টার আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। জর্ম্মান দার্শনিক লেসিং সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে যদি ঈশ্বর এসে তাঁকে বলতেন—তুমি সত্য চাও না সত্যের সন্ধান চাও, তবে তিনি জবাব দিতেন—আমি সত্যের সন্ধান চাই, কিসে পাব, কেমন করে পাব, এই যে দেখা দেবে, পরক্ষণে আড়ালে লুকোবে; এই খোঁজের খেলার বিপুল আনন্দে আমি ভরপুর হ'য়ে থাকতে চাই। এই ত প্রাণবন্তের লক্ষণ। বাস্তবিক আনন্দ প্রাপ্তিতে নয়, অন্বেষণে। আর এই অন্বেষণ বা সাধনা একই কথা।

ধর্ম্মজগতে বুদ্ধ, যীশু, মোহম্মদ, চৈতন্য—এঁদের সিদ্ধিলাভের ইতিবৃত্ত একই। জনকোলাহলের বাহিরে পর্ব্বতে জঙ্গলে, গুহার মধ্যে জীবনের কিয়দংশ সাধনা ক'রে এঁরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরণ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ গ্রথিত হয়েছে। আবার বুদ্ধদেবেরও অপর নাম এইজন্য "সিদ্ধার্থ"; আমরা অতীতের গর্ব্ব করে থাকি, কিন্তু

অতীতের প্রাণের লক্ষণগুলিকে আপন জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে চাই না;—অতীতের সিদ্ধির উপর আমাদের লোভটুকু ষোল আনা আছে, কিন্তু তার জীবনব্যাপী কঠোর সা...র কথা শুনেই আমরা আতঙ্কে মরে' যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা আজ শতদলপদ্মের মত বিকশিত হয়েছে। কিন্তু একটির পর একটি করে' এই শতদল ফুটেছে,—এর পিছনে আছে একনিষ্ঠ সাধনা। গোখলে ইস্কুলমাষ্টার ছিলেন, শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও ছিলেন। পরাঞ্জপেও তাই। ৭৫ টাকা মাহিনায় গোখলে ফার্‌গুসন কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু গোখলে আজ দেশপূজ্য, তার কারণ তিনি দেশসেবার সাধনা করেছিলেন। এই দারিদ্র্যব্রতধারীর বজেট-বক্তৃতায় ব্যবস্থাপক সভায় লাট কর্জ্জন কাঁপ্‌তেন। আর এক প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর কথা বলে' আমার কথা শেষ করি;—তিনিও দারিদ্র্যব্রতধারী, মহাসাধক মহাত্মা গন্ধী। গন্ধী আজ বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু একদিনেই কি তাঁর নাম সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে? ২১ বৎসর পূর্ব্বে আলবার্ট হলে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্দ্দশা দেশবাসীর নিকট বিবৃত কর্‌তে আমিই প্রথম তাঁকে আহ্বান করি। স্বর্গগত নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। গন্ধীর বক্তৃতার বিষয় ছিল—কেপ কলোনিতে (Cape Colony) ভারতবাসীর অশেষ দুর্দ্দশার কথা। মহাত্মা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের নেতা। তিনি দেশবাসীর হিতের জন্য আপনাকে একবারে নিঃশেষ করে' উৎসর্গ করে' দিয়েছিলেন। নেটাল প্রদেশে তিনি তাদের সঙ্গে তুল্য ভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচরিত হয়েছিলেন। মাসে ৫।৬ হাজার টাকা আয়ের ব্যারিষ্টারী তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে' সবারি ব্যথাকে বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। কতবার জেলে গেছেন, কত কষ্ট সহ্য করেছেন, মেথরের কাজ পর্য্যন্ত করেছেন। তাই ত তিনি আজ জনসাধারণের হৃদয় মন অধিকার কর্‌তে পেরেছেন। আজ অন্ততঃ ২৭।২৮ বৎসর যাবৎ তিনি নিগৃহীত ভারতবাসীর নেতা—যেখানে অত্যাচার উৎপীড়ন, সেইখানেই মহাত্মা গন্ধী; তাই আজ তাঁর নামে দলিত জনসঙ্ঘের প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—আশায় উৎফুল্ল হয়। এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী-প্রভাবের পশ্চাতে রয়েছে মহাত্মাজীর আজীবন সাধনা।

রামমোহন রায়কে বাঙালীর ঘরে পাঠানো বিধাতার একটি বিশেষ বিধান বলে' আমার মনে হয়। আমার স্থির বিশ্বাস, বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার কর্‌তে হলে বাঙালীর জীবনে আজ চাই সাধনা —তিল তিল করে' আত্মদান। বাঙালী আজ স্থিরপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে, ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে' থাক্‌লে ভারতের নিদারুণ দুর্দ্দশা ঘুচ্‌বেই। আজ বিধাতার ইঙ্গিত—বাঙালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন কর্‌বে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভ্রমর ও প্রজাপতি

জীবনটা এই—পথের ধারের ফুল,
তুচ্ছ ভেবেই প্রজাপতি তার কাছ থেকে রয় দূর;
ভ্রমর কিন্তু করে না মোটেই ভুল—
সন্ধানী সে যে, ব্যথার বদলে মধু খায় ভরপুর॥

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

ভক্ত ও ভগবান

মর্দ্‌-এ-খুদা ন-বাশদ্—
বলেক্‌ অজ খুদা জুদা ন-বাশদ।

ভগবৎ-ভক্ত জন ভগবান নয়—
ভগবান হ'তে তবু ভিন্ন কেবা কয়?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন

প্রকৃতির পাঠশালা

বস্তুর রঙের বিভিন্নতার কারণ কি?—আলোকরশ্মির মধ্যে সাতটা রং আছে—বেগুনী নীল আস্‌মানী সবুজ হল্‌দে কম্‌লা লাল; রঙের নাম কটা মনে রাখ্‌বার জন্যে প্রত্যেক নামের আদ্য অক্ষর একসঙ্গে জুড়ে একটা কথা আমরা তৈরি কর্‌তে পারি—বেনী-আসহ-কলা। একটা তেশিরা কাঁচের ভিতর দিয়ে যদি সূর্য্যরশ্মি চালনা করা যায়, তবে সূর্য্যের সাদা আলো ভেঙে সাত টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে যায় বেনীআসহকলা সাত রঙে। আমরা বস্তু দেখ্‌তে পাই যখন সেই বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে আমাদের চোখে সেই বস্তুর আকারের একটি ছায়াপাত করে, আর সেই প্রতিকৃতির অনুভূতি থেকে আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে। বস্তুর গায়ে যখন আলো গিয়ে পড়ে, তখন আলোর সবটুকুই আলোর গা থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে না, কতকটা আলো সেই বস্তু নিজে শোষণ করে' নেয়। যে-বস্তু প্রায় সবটুকু আলোই প্রতিফলিত করে, সেই বস্তুকে আমরা সাদা অর্থাৎ সাতরঙের সমষ্টি দেখি—যেমন কাগজ, দুধ, চূন ইত্যাদি; যে বস্তু কেবল মাত্র লাল রংটুকু ছেড়ে দিয়ে বাকী ছয় রং আত্মসাৎ করে সে বস্তু আমাদের চোখে ঠেকে লাল—যেমন পদ্ম গোলাপ, পাকা মাকাল, তেলাকুচো; এইরূপে কোনো বস্তু বা কেবল হল্‌দে, কেবল সবুজ, অথবা কেবল নীল রং ত্যাগ করে, আর বাকী অন্য কটাকে গ্রাস করে,—সে-সব বস্তু তাদের ত্যক্ত রঙের ছোপেই আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়; কোনো বস্তু আবার নিজের অঙ্গের এক অংশ থেকে এক রং ছাড়ে ও অন্য অংশ থেকে অন্য রং ছাড়ে, তাই সিঁদুরে-আমে আপেলে আর দোপাটী প্রভৃতি ফুলে একসঙ্গেই অনেক রকম রং দেখ্‌তে পাওয়া যায়; যে বস্তু সমস্ত আলোটুকুই শোষণ করে, কিছুই ত্যাগ করে না, তার রং দেখায় কালো—অর্থাৎ সকল বর্ণের অভাব। বস্তুর এই যে আলোর কিছু শুষে নেওয়া ও কিছু ছেড়ে দেওয়া ধর্ম্ম, এর কারণ এখনো নির্ণয় হয়নি; বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন,—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর, অণু-সংস্থানের তারতম্যই এর কারণ।

আলো জিনিসটা কি?—বহু প্রাচীনকালেই আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে আলো জিনিসটা একটা গতি; যে আলোর তেজ আর উজ্জ্বলতা যত বেশী সে আলো তত বেশী দূর পর্য্যন্ত যায়। যায় ত; কিন্তু কি যায়? এ প্রশ্নের উত্তর নিউটন এই দিলেন যে—আলো থেকে সেই বস্তুর অতি সূক্ষ্ম কণা ছুটে গিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে ও অবাধ স্থানকে ভরিয়ে তুল্‌লেই সেখানে আলোর অনুভূতিও প্রকাশ হয়। সবাই এই কথা বহু কাল মেনে চলেছিলেন—প্রামাণিক সত্য বলে' নয়, নিউটনের মতন একজন অতবড় বৈজ্ঞানিক আন্দাজ কর্‌ছেন এইজন্যে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শাস্ত্র আর গুরুর দোহাই চলে না; লোকে নিউটনের সিদ্ধান্তে সন্দেহ করে' সন্ধানে লেগে গেল—সত্য যা কেবল তাই মান্য, সত্যকেই পেতে হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে। শেষে আবিষ্কার হল যে আলো একরকমের অদৃশ্য অনমুভূত পদার্থের তরঙ্গ—এই পদার্থ সর্ব্বব্যাপী এবং এর নাম ঈথার বা ব্যোম।

সর্দ্দার পোড়ো

—

গাঁট্টা তেওয়ারী

(হিন্দুস্থানী গল্প)

রাজামশাই সভায় বসে' ঝিমুচ্ছেন,—চারিধারে পাত্র মিত্র, জ্ঞানী গুণী সকলে তাঁকে ঘিরে রয়েছে; কারুর মুখে একটিও কথা নেই, সকলেই চুপচাপ। এমন সময় একটি

বিট্‌কেল বামুন রাজসভায় এসে রাজাকে প্রকাণ্ড এক সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। মাথায় তার প্রকাণ্ড এক পাগ্‌ড়ি আর কাঁধের উপর সাড়ে তেরো হাত লম্বা এক বাঁশের লাঠি।

রাজামশায়ের তন্দ্রা কোথায় ছুটে গেল, তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দুই-একবার ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কে তুমি, কি চাও বাপু?"

সে চট্‌পট্‌ বলে ফেল্লে—"হুজুর, আমার নাম গাঁট্টা তেওয়ারি, আমার বাবার নাম লাট্টু তেওয়ারি, আমার পিসের নাম——"

রাজা তাকে বাধা দিয়ে বল্লেন "তা বেশ, তা বেশ,—তোমার নিজের পরিচয় পেলেই যথেষ্ট, তোমার বাপ-পিসের নাম জেনে আমার কোনও দর্‌কার নেই। বলি তুমি ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর, রান্নাবান্না কর্‌তে পার কি?"

গোঁপে চাড়া দিয়ে গাঁট্টা বল্লে—

"মুই রসুই ভি করি
ফিন্‌ কুস্তি ভি লড়ি।"

রাজা বল্লেন—"বেশ বেশ, তুমি রসুইও কর্‌বে, আবার মাঝে মাঝে আমার বড় বড় পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তিও লড়্‌বে। কেমন পার্‌বে ত?"

একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে গাঁট্টা বল্লে—"হুজুরের হুকুম হয়ত এক্ষুণি লড়্‌তে পারি। ভিখন সিংএর মেসো পালোয়ান দিলবাহাদুর আমার সঙ্গে এসেছিল কুস্তি লড়্‌তে, আমি তাকে এমনি চৌপাট্টা প্যাচ্‌ লাগালাম যে বেচারা সাড়ে পাঁচবার ডিগবাজী খেয়ে বিশ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়্‌ল। পালোয়ানের কথা ছেড়েই দিন্‌ না মহারাজ, কত বড় বড় জঙ্গলে গিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঘ হাতীকে আমি লাথি মেরে একেবারে ছাতু বানিয়ে দিয়েছি।" বলে' সে ঘন ঘন তাল ঠুক্‌তে লাগ্‌ল।

রাজার সভার বড় বড় পালোয়ানেরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে' নীরবে মাথা চুল্‌কাতে লাগ্‌ল।

গাঁট্টা তেওয়ারি রাজার বাড়ীতে বেশ সুখেই আছে। রাজবাড়ীতে বামুন-চাকরের অভাব নেই, তাই তাকে বিশেষ কিছু কাজ-কর্ম্ম কর্‌তে হয় না। খায় দায়, আর পড়ে' পড়ে' ঘুমোয়। রাজার পালোয়ানেরা আর কেউ সাহস করে' তার সঙ্গে লড়্‌তে আস্‌তে চায় না—কি জানি বাবা, কাকে কখন লাথি মেরে ছাতু বানিয়ে দেবে।

এর মধ্যে একদিন কোথা থেকে একটা বুনো মোষ এসে রাজ্যে একেবারে হুলুস্থুল লাগিয়ে দিল। রাজা-মশায় ভারি ভাবনায় পড়্‌লেন। তিনি সভায় বসে' গালে হাত দিয়ে ভাব্‌ছেন—কি করা যায়, এমন সময় মন্ত্রী উঠে বল্লেন "মহারাজ! আমাদের গাঁট্টা তেওয়ারি থাক্‌তে আর ভয় কিসের?"

এই কথা শুনে রাজা-মশায় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লেন—"আরে তাই ত, তাই ত, এ কথা ত আমার মোটেই মনে হয়নি—আরে গাঁট্টা থাক্‌তে আমাদের ভয় কিসের?"

সভাসদেরা ঘাড় নেড়ে বল্লে—"তাই ত গাঁট্টা থাক্‌তে আমাদের কিসের ভয়?"

রাজা গাঁট্টাকে ডেকে আন্‌তে হুকুম কর্‌লেন।

দু মিনিটের মধ্যে তেওয়ারিজি সাম্‌নে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

রাজা বল্লেন—"গাঁট্টা, এবার তোমার বীরত্ব একটু দেখাতে হচ্ছে, এই বুনো মোষটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।"

খুব এক চোট হেসে নিয়ে গাঁট্টা বল্লে—"এই ইঁদুরের বাচ্চাটাকে আর তাড়াব কি হুজুর, বাঁ হাত দিয়ে এক চড় মেরে তার ভূত ভাগিয়ে দেব। আমি গাঁট্টা তেওয়ারি—আমার বাপ লাট্টু তেওয়ারি,—পিসে টাট্টু দুবে, মেসো ছোট্টু মিশির, মামা খোট্টা চৌবে—ব্যাটা পালাবে কোথায়?"

রাজা ত খুব খুসী হয়ে তাকে বিদায় দিলেন, আর এদিকে গাঁট্টা কাঁপতে কাঁপ্‌তে বাড়ী এল। কারণ সে তার জন্মেও এমন কাজ আর করে নি।

বাড়ী এসে গাঁট্টা ঠিক কর্‌ল যে সেই রাত্রেই সে রাজ-বাড়ী থেকে সরে' পড়্‌বে! তা না হ'লে তার মানও যাবে প্রাণও যাবে।

শেষরাত্রে যখন সকলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে—সেই সময় গাঁট্টা তেওয়ারি তল্পীতল্পা বেঁধে খিড়্‌কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় গাঁট্টার পথ দেখ্‌তে

বেশী কষ্ট হচ্ছিল না। সে ছুটছে আর মাঝে মাঝে পিছনে তাকিয়ে দেখছে—রাজবাড়ীর কেউ দেখ্তে পেল কি না।

কিছুদূর গিয়েই সে দেখ্তে পেল—ও রে বাবা, তার 'ইঁদুরের বাচ্ছাটা' একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ আওয়াজ করছে। আর যায় কোথা, পালোয়ান সিং তল্পীতল্পা মাটিতে ফেলে একটা গাছের উপর উঠে ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপতে লাগল। মোষটা এদিক ওদিক চেয়ে একদৌড়ে একেবারে গাছের নীচে এসে হাজির। এসেই আর কথাবার্ত্তা নেই—গাছের গুঁড়িতে মেরেছে এক ঢুঁ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গাঁট্টা পড়্‌বি ত পড় একেবারে ঢিপ্ করে' তারই ঘাড়ে। পড়ার সময় গাঁট্টা ভেবেছিল, পড়েই বুঝি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু যখন দেখ্‌ল যে সে মোটেই অজ্ঞান হয়নি আর মোষের শিংএর উপর না পড়ে' তার পিঠেরই উপরে পড়েছে, তখন তার সাহস আর বুদ্ধি আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গেল। মাথার পাগ্‌ড়িটা খুলে সে আচ্ছা করে' তার চোখে আর শিংয়ে বাঁধল; তার পর সোজা রাজবাড়ীর দিকে হাঁকিয়ে দিল।

এত যে কাণ্ড হবে মোষ তা মোটেই ভাবেনি। আর তার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে বেচারা কেবল গাছের গুঁড়িতেই এক ঢুঁ মেরেছিল- সেই সঙ্গে সঙ্গে যে গাছের উপরের মূর্ত্তিমানটি তার পিঠে চড়ে' বস্‌বেন—এ তার মোটেই মনে হয়নি। যা হোক, সে ভীষণ ঘাব্‌ড়ে গেল আর বুঝ্‌ল সে যে-লোকের হাতে পড়েছে তার সঙ্গে আর বেশী গোলমাল করা চল্‌বে না। কাজেই গাঁট্টা তাকে যে দিকে নিয়ে চল্‌ল সে শান্ত শিশুটির মত সেই দিকেই চল্‌ল।

ভোরে উঠে রাজামশায় বাইরে পায়চারী করছেন এমন সময় দেখ্‌লেন, দূরে গাঁট্টা তেওয়ারি একটা প্রকাণ্ড মোষের পিঠে চড়ে' সেই দিকে আস্‌ছে। রাজমশায় ত "বাবা গো, মা গো!" বলে' সেই যে অন্দরমহলে ছুটে পালালেন সমস্ত দিন আর বেরুলেন না। পরদিন যখন শুন্‌তে পেলেন মোষটাকে শিকল দিয়ে গোয়ালে বেঁধে রাখা হয়েছে, তখন তিনি সাহস করে' বাইরে বেরুলেন আর সাম্‌নে গাঁট্টাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধেই ধেই করে' নাচ আরম্ভ করে' দিলেন। রাজ্যসুদ্ধ লোক একমুখে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ধন্য গাঁট্টা, ধন্য গাঁট্টা।"

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

—

পাখীর গল্প

বাজপাখী

এক সময়ে "দীর্ঘজট" নামে এক ব্রহ্মচারী বহুকাল ধরে' তপস্যা করে' কিছু ফল পেয়েছেন কি না পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যাবার সময়ে মালবদেশের মধ্যে এক ভীষণ বনে ধ্যানে বস্‌লেন। তিনি ধ্যানেতে জান্‌তে পার্‌লেন, "এখানে 'রক্তাক্ষ' নামে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ বাস করে। সে এই বনের পশুপাখীদের হত্যা করে' মনে খুব আনন্দ পায়। সে রক্তের সঙ্গে মেশান কাঁচা মাংস খেতে ভাল-বাসে।" পরের কষ্ট দেখ্‌লে দীর্ঘজটের হৃদয় গলে' যেত। তিনি প্রাণী-বধে কাতর হয়ে ব্যাধের সাম্‌নে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "রে রক্তাক্ষ, কেন তুই পশুপাখী মেরে ভয়ানক পাপ কর্‌ছিস?"

ব্যাধ এই কথা শুনে রেগে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "আমার খুসী! রে ভণ্ড সন্ন্যাসী! তোকেও মেরে ফেল্‌ব।"

ব্রহ্মচারী চোখ লাল করে' বল্‌লেন, "ওরে পাজি, আমার তপস্যার ফল দেখ্। তোর যে গুণ আছে, সেই গুণে তুই বাজপাখী হয়ে যা।"

কি আশ্চর্য্য! দীর্ঘজটের শাপে রক্তাক্ষ তখনই বাজপাখী হয়ে আহার খুঁজ্‌বার জন্যে এক গাছ থেকে আর-এক গাছে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। সেই সময় থেকে সে পাখীদের প্রাণ নষ্ট করে' ও তাদের রক্তপান করে' "বাজপাখী" হয়ে আছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগদ্বন্ধু পাল

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা, পরহস্তগতং ধনম্

গোকুল একটা ব্যাঙ্কে কাজ কর্‌ত, তার কাজ ছিল টাকা আদায় করা। দশ বছর সে এই ব্যাঙ্কে কাজ করছে, কোনোদিন হিসাবে তার এক পয়সাও গোলমাল হয়নি। কর্ত্তারা বল্‌তেন যে তার মত বিশ্বাসী লোক দেশে ত নেইই, বিদেশেও আছে কি না সন্দেহ! কোনোদিন তার কামাই হতো না। কাজে সামান্য ত্রুটিও তার কেউ কোনোদিন ধর্‌তে পারেনি। এমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য সে!

সামান্য যা বেতন পেত, তাতেই তার দিন বেশ চলে' যেত। তার সামান্য অবস্থার জন্য বিধাতার কাছে অভিযোগ কর্‌তে তাকে কেউ কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে তার দু-একজন বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস কর্‌ত—"ওহে, তুমি গাদা গাদা টাকা নাড়াচাড়া কর, তোমার হাত কি একটুও সুড়্‌সুড় করে না?" সে তার উত্তরে বল্‌তো—"আরে তোমরাও যেমন—যে টাকা আমার নয়, তা ত টাকাই নয়, তাকে পথের বালি বল্‌লেও হয়।" প্রতিবেশীরা তাকে বড় শ্রদ্ধা ভক্তি কর্‌ত। বিপদে আপদে তার পরামর্শ নেওয়াটা তারা বড় প্রয়োজন মনে কর্‌ত।

* * * *

একদিন সে সকাল বেলায় এক পেয়ালা চা খেয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল টাকা আদায় কর্‌তে। মাসের শেষ দিন, কাজেই অনেক টাকা সেদিন তাকে আদায় কর্‌তে হবে। রোজ যে সময় সে বাড়ী ফিরে আস্‌ত, সেদিন তার অনেক পরেও সে বাড়ী এলো না। আপন বল্‌তে কেউ তার ছিল না, তবুও পাড়ার লোকে তার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল। সবাইকার মনে সন্দেহ হল, পথে হয়ত সে ডাকাতের হাতে পড়ে' মারা গেছে। অনেক টাকা তার কাছে আছে। পুলিসে খবর দেওয়া হলো। খোঁজ কর্‌তে কর্‌তে জানা গেল, সন্ধ্যা সাতটার সময় সে একটা দূরের বস্তি থেকে টাকা আদায় করে' বাড়ির দিকে ফেরে। তার কাছে তখন মোট আড়াই লাখ টাকার নোট ছিল। তারপর যে তার কি হলো, সে কোথায় গেল, তার কোন খবর জানা গেল না। চারিদিকের মাঠ ঘাট বন বাদাড় সব তন্নতন্ন করে' খোঁজ করা হলো চারিদিকে তার করে' দেওয়া হলো, সব বে-কাজের হলো। সে নেই, তার কোনো খবরও পাওয়া গেল না। তখন যত-সব পাকা পাকা পুলিসের লোক আর ব্যাঙ্কের মোড়লরা এই মনে কর্‌লেন, যে সে বিশ্বাসী লোক, টাকা নিয়ে সে কোথাও পালাতে পারে না; পথে নিশ্চয়ই ডাকাতের হাতে পড়ে' সে মারা গেছে। তাঁরা এটাও বুঝ্‌তে পার্‌লেন, যে ডাকাতের দলের লোকেরা ডাকাতি কর্‌বার পূর্ব্বেই এই মত্‌লবটা স্থির করেছিল।

তার অদৃশ্য হবার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। খবরের কাগজেও খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে গেল। পাড়ার লোকে বল্‌ল, "হায় হায়! এমন একজন লোক যাওয়াতে আমাদের পাড়ার জোর অনেকখানি কমে' গেল।" ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা বল্‌লেন, "আমরা এমন লোক আর পাব না। দশ বছরে সে আমাদের যা কাজ দিয়েছে, অন্য কেউ চল্লিশ বছরেও তা দিতে পার্‌বে না।" এই রকম নানা লোকে নানা কথা বল্‌তে লাগল।

এদিকে যখন এত-সব কাণ্ড হচ্ছে, তখন কিছু দূরের একটা সহরে বসে একজন সাধু লোক সব দেখে-শুনে মনে মনে হাস্‌চে। পুলিস যখন তার জন্যে আকাশ-পাতাল হাত্‌ড়ে মর্‌ছিল তখন সে একটা নদীর ধারে তার কাপড়-চোপড় বদল করে' পুরান কাপড়গুলো একটা পোট্‌লা করে' একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেয়। তার পর নোটের থলিটাকে বেশ করে' বুকের কাছে রেখে সে এখানে পালিয়ে আসে। তার মনে কোনো ভয় বা ভাবনা ছিল না। একটা হোটেলে সে বেশ করে' খেয়ে রাত কাটায়। পরদিন সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠ্‌ল, তখন সে কি কর্‌বে না-কর্‌বে সব স্থির করে ফেলেছে।

ধরা তাকে পড়্‌তেই হবে, এটা তার জানা ছিল।

পুলিসের চোখে বড় বেশীদিন ধুলো দিয়ে থাকা অসম্ভব। সে তখন ঐ আড়াই লাখ টাকার নোটগুলোকে একটা মোটা খামে ভরে' বেশ করে বন্ধ করে' তার ওপর গোটা দশেক শীল মোহর করল। তারপর সে এক উকিলের বাড়ী গেল।

উকিলকে গিয়ে বল্ল, "দেখুন মশায়, আমার এই খামটাতে কয়েকটা দরকারী দলিল-পত্র আছে। আমি কয়েক বছরের জন্যে বিদেশ যাচ্ছি। তা যাবার আগে এগুলো আমি আপনার কাছে রেখে যেতে চাই। এতে আশা করি আপনার কোনো আপত্তি হবে না?"

উকিল-মশায় বল্লেন, "আরে না না, আপত্তি আর কি হবে, তবে আপনি একটা রসিদ নিয়ে যান।"

সে রসিদের কথা ভাবেনি। রসিদ নিয়ে আর-এক ফ্যাসাদ হবে, পুলিসের হাতে পড়ে' যদি রসিদখানা তাদের হাতে যায়, তবে সব নষ্ট হবে। তাই সে বল্ল, "দেখুন, রসিদ নিয়ে আমার কোনো লাভ নেই। আমার আপন লোক কেউ নেই যে তার কাছে রসিদ রেখে যাব, তার চেয়ে ওটা অমনি থাক। কিই বা ওতে আছে। আমি এসে আমার নাম বল্লে আপনি ওটা আমায় দেবেন। ফিরতে আমার অনেক দেরী হতে পারে।"

উকিল-মশায় আর কি করেন—বল্লেন, "তা বেশ, তবে আপনার নামটা বলে' যান, খামের ওপর লিখে রাখি, আপনি এসে ঐ নাম বল্লে আপনি খাম ফেরৎ পাবেন।"

একটু ভেবে সে বল্লে, "আমার নাম জলধর—জলধর চক্রবর্ত্তী।"

* * *

উকিলের বাড়ী ছেড়ে যখন সে রাস্তায় এলো, তখন তার মনে আর কোনো চিন্তা নেই। সে তখন একেবারে বে-পরোয়া। মনে মনে বল্তে লাগল, 'ধরুক এখন পুলিসে! কি করবে আমার? কি প্রমাণ তারা পাবে? আমায় ধরবে বটে, কিন্তু যার জন্যে আমায় ধরা, তার দেখাও বাছারা পাবেন না। বড়জোর বছর-পাচেক জেল হবে! কুছ-পরোয়া নেহি! নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া, ব্যায়াম, নিদ্রা! কোন চিন্তা নেই! শরীরটা ভাল করে' আস্তে পারবো। তারপর বেরিয়ে এসে? আঃ! কি আরাম! আড়াই লাখ! দূরের একটা গ্রামে চলে' যাব, নদীর ধারে একটা বাড়ী করব। সেখানে কে বা আমায় চিন্বে? আমি যে তখন শ্রীযুক্ত জলধর চক্রবর্ত্তী! বাড়ীটা বেশী বড় করব না। দান-ধ্যানও করব কিছু কিছু। লোকের চোখে গোলাপজলে ধোওয়া বালি বেশ দিতে পারব—বেশ হবে! আর তাকে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই!'

আরো একটা দিন সে লুকিয়ে কাটালো—নোটগুলোর নম্বর বেরিয়েছে কি না জান্বার জন্যে। সেগুলো বেরোয়নি দেখে তার মনটা আরো হাল্কা হয়ে উঠ্ল।

শেষে সে পুলিসের হাতে ধরা দিল। পুলিসের জেরাতে বল্ল, "পথের ধারে বাদাম-গাছের তলায় একটা বেঞ্চে আমি টাকা ইত্যাদি সব নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। হটাৎ যখন ঘুম ভাঙ্ল দেখ্লাম নোটের থলি, খাতাপত্র সব কোথায় চলে' গেছে। তারা যে কোথায় গেছে আমি অনেক খোঁজ করে'ও জান্তে পার্লাম না।"

পথে হটাৎ ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তার পাঁচ বছর জেলে ঘুমোবার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হলো।

* * *

জেলখানাতে তার দিন আনন্দেই কাটতে লাগ্ল। জেলখানার কষ্টটাকে সে তার সামান্য পাপের একটু প্রায়শ্চিত্ত বলে'ই গ্রহণ করল। এখানে তার কাজকর্ম্মে সবাই সন্তুষ্ট। কর্ত্তারা বল্লেন, "এমন লোকের যে জেল কেন হলো বুঝতে পারি না—এ লোক কখনো চুরি করতে পারে না।" তার শরীর জেলখানায় বেশ ভাল হতে লাগ্লো।

* * *

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে এলো। পথে সে চলেছে আর মনে ভাব্ছে, "এতদিন পরে আমার সব সার্থক হলো। এখন কিছু খেয়ে আর পোষাকটা বদ্লে নিয়ে উকিলের বাড়ী যাব। সে আমায় প্রথমে চিন্তেই পারবে না! সে হয়ত আমার মুখের দিকে হাঁ করে' চেয়ে থাকবে—আমি তখন আমার খামখানা ফেরৎ চাইব। তার হয়ত কিছুই

মনে নেই! হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজাই না হবে! তারপর উকিল-মশায় বল্‌বেন—'তা আপনার নাম বলুন ত, খামখানা বার করে দি।' আমি তখনো নাম বল্‌ব না—একটু মজা কর্‌ব তাঁকে নিয়ে! বেচারা একেবারে বোকা বনে' যাবে—! শেষে আমি নাম বল্‌ব—আমি শ্রী—! এ্যা!—এ কি! শ্রী—কি? নামটা ভুলে গেলাম নাকি?"

তার পথ চলা বন্ধ হয়ে গেল। সে হঠাৎ থম্‌কে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল! কোনো রকমেই আর নামটা তার মনে আসে না! সে একটা বেঞ্চে বসে' নামটার জন্যে আকাশ পাতাল খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমাগত মনে আসে শ্রী—তারপর আর কিছুই মনে আসে না। নামটা যেন তার গলার কাছে এসে আট্‌কে আছে, মুখে আর কোনো রকমেই আসে না। কেবল শ্রী—শ্রী—তারপর আর কিছুই মনে আসে না। ঘণ্টা দুয়েক এম্‌নি করে' ভাব্‌বার পর তার মাথা গরম হয়ে উঠ্‌ল। চোখ মুখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগ্‌ল। তার গা দিয়ে তখন দরদর করে' ঘাম পড়্‌ছে। হাত যেন হাজার চারেক পিঁপ্‌ড়েতে কাম্‌ড়াচ্চে বলে' মনে হ'তে' লাগ্‌ল। তার বসে' থাকা অসম্ভব হলো। সে মাটিতে খুব জোরে একটা লাথি মেরে উঠে পড়্‌ল।—"এমন করে' এক জায়গায় বসে' ভাব্‌লে নামটা মনে আস্‌বে না, আরো দূরে পালাবে, তার চেয়ে কিছু খেয়ে নি, একটু শান্ত হলেই আবার মনে আস্‌বে ঠিক।" এই মনে করে সে রাস্তা দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল ক্ষেপার মতন। পথের লোকজনের ব্যস্তভাবে চলাফেরা, গাড়ীর শব্দ—এই-সবের মধ্যে সে তার আড়াই-লাখ-পাবার নামের খোঁজ করতে লাগ্‌ল। "শ্রী—শ্রী—" আর কিছুই মনে আসে না।

সন্ধ্যা হলো। সে ক্রমাগত পথে পথে ঘুর্‌ছে। তার খাওয়ার কথা মনে নেই—চুল উস্কো খুস্কো। চোখ-দুটো আগুনের মত জ্বলছে। লোকের বাড়ীতে আর রাস্তার দোকানে আলো জ্বলে' উঠ্‌ল। সে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে উকিলের বাড়ীর দুয়ারে এসে দরজার হাতলটা ধরে' বলে' উঠ্‌ল, "উঃ আর পাচ্ছি না, আমি পাগল হলাম নাকি? আড়াই লাখ টাকা—চুরি করেছি বটে কিন্তু তার জন্যে শাস্তিও ত বড় কম ভোগ করিনি! টাকা রয়েছে, উকিল রয়েছে, আমিও রয়েছি! সব যাবে কি? একটা কথা, একটা নামের জন্যে আমার সব যাবে কি? শ্রী—শ্রী—না, আর মনে আস্‌বে না—তাকে কি?—শ্রী—শ্রী—"

সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়্‌ল। রাস্তা দিয়ে চলেছে সে—হুঁস্ নেই। লোকের গায়ে ধাক্কা লাগ্‌ছে, পথের লোকে তার দিকে চেয়ে তাকে পাগল মনে করে' দূরে সরে' যাচ্ছে, তার খেয়াল নেই। কতবার সে গাড়ীর তলায় পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গেল! গাড়োয়ান গাল দিয়ে গেল—কোনো দিকে তার মন নেই। "শ্রী—শ্রী—" তার পর আর মনে আসে না!

একটু রাত হলে পর সে ক্লান্ত হয়ে নদীর ঘাটে এসে দাঁড়াল। পলকহীন চোখে নদীর শুব্ধ জলে চেয়ে রইল। "নদীর জলে কি নামটা পাওয়া যাবে? হয়ত বা যাবে"—এই কথা তার দুবার মনে হলো। তারপর সে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে জলের কাছে গিয়ে আঁজলা করে' জল খেল। এ কি! নদীর জল তাকে টান্‌চে কেন? হারানো নামটার সন্ধান দেবে বলে'? সে থাক্‌তে পার্‌ল না—পড়্‌ল নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে! ডুবে গেল। আবার ভেসে উঠ্‌ল। হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌লো—"পেয়েছি! পেয়েছি! শ্রীজলধর—শ্রীজল—।"

ঘাটে লোক ছিল না। নদীতে নৌকা ছিল না। শুব্ধ জলে পথের ধারের আলোর আর আকাশের তারার ছায়া পড়ে নাচ্‌ছিল। একবার একটা শব্দ হলো, খানিকটা জল ছলাৎ করে ঘাটে এসে লাগ্‌ল,—তারপর সব নিস্তব্ধ।*

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

---

* মরিস্ লেভেল লিখিত ফরাসী গল্পের অনুকরণে।

হাটের পথে।

শিশুশিক্ষায় মহিলা

ডাক্তার ফ্রোয়েবেলের উদ্ভাবিত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার কথা অনেকেই জানেন। ছেলেদের খেলার ছলে শিক্ষা দেওয়া এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। ডাক্তার মেরিয়া মন্তসরী অধুনাতন খেলার ছলে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এখন এঁর পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রায় সকল দেশেই হইয়াছে। ইনি ইটালীবাসিনী ও প্রথমে চিকিৎসক ছিলেন। ছেলে-মেয়েরা খেলিতে খেলিতে নিজেরাই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিয়া আপনা-আপনি জ্ঞান আহরণ করিবে এই মূলসূত্র ধরিয়া তিনি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে বলেন। এই-রূপে শিশু নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করে—কেন? আর নিজেই তার উত্তর খুঁজিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করে। এই মহিলার ছবি ও শিক্ষাপদ্ধতির বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই প্রবাসীতে আমরা প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

সঙ্গীত-শিক্ষায় মহিলা

আগে ইংলণ্ডে সঙ্গীত শিক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিদ্যা ছিল। কুমারী সারা এন্ গ্লোভার ছিলেন এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তিনি টনিক-সল্-ফা স্বরলিপি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া অতি সাধারণ লোকের পক্ষেও সঙ্গীত সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এর চেয়ে সহজ-পদ্ধতির স্বরলিপি এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। এই পদ্ধতিতে এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও যে-সে গান শিখিয়া গাহিতে ও বাজাইতে পারে। কুমারী গ্লোভার দেশের ঘরে ঘরে সঙ্গীতের বিমল আনন্দ ছড়াইয়া দিয়া ৮২ বৎসর বয়সে ১৮৬৭ সালে আনন্দধামে প্রস্থান করেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মহিলা-প্রগতি

পুরুষের লেখা সমস্ত শাস্ত্রবিধান অগ্রাহ্য করিয়া নারী আপনার অধিকার পূর্ণমাত্রায় দখল করিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজে নারী ধর্ম্মপ্রচারক এবং শিক্ষক ছিল না বলিলেই হয়। বর্ত্তমানে নারী ধর্ম্মপ্রচারকের ও শিক্ষকের সংখ্যা বেশ বাড়িয়া উঠিতেছে।

মিস্ হেনড্রিক্ (তাঁহার পুরা নাম এখনও জানা যায় নাই) জগতে এই প্রথম ট্র্যাফিক্ ম্যানেজারের পদ পাইয়াছেন। এই ভদ্রমহিলা জাহাজ-চলাচল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ।

ক্যানাডার পার্লামেণ্টের প্রথম নারী সভ্য এগ্‌নিস্ ম্যাক্‌ফেল। তাঁহার বয়স মাত্র একত্রিশ বছর।

আমেরিকার ওরগন্ প্রদেশে একটি নূতন আইন পাশ হইয়াছে। বিবাহার্থী প্রত্যেক লোককে এবং স্ত্রীলোককে বিবাহের পূর্ব্বে ডাক্তারকে শরীর দেখাইতে হইবে। মিশিগানেও এই রকম একটি আইন পাশ হইয়াছে। ডাক্তার যদি শরীর ভাল এবং ব্যাধিমুক্ত বলিয়া সার্টি-ফিকেট দেন তবেই সে বিবাহের অনুমতি পাইবে। সংক্রামক কোন রোগ থাকিলে সে বিবাহ করিতে পায় না।

নরওয়ে, জার্মেনী, এবং ভায়েনাতেও এমনি কতক-গুলি আইন পাশ হইয়াছে। এই-সমস্ত দেশে বোর্ড নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, ব্যক্তিমাত্রেই এই বোর্ডের মত লইয়া তবে বিবাহের যোগ্য হইতে পারিবে।

আমাদের সোনার বাংলা দেশে এই রকম কোন আইন পাশ হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। তাহা হইলে আর মেয়ের বয়স হইলেই, কানা খোঁড়া, শ্মশানের পথে যাত্রী পাত্র ধরিয়া, দেশের ধর্ম্ম, সমাজের মুখ, এবং নিজের জাতি বাঁচানো চলিবে না। আমাদের আইন-মজলিসেও বোধ হয় এইরূপ কোন আইন-প্রস্তাবকারীকে মজলিসে একঘরে হইতে হইবে।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েট রুশিয়ায় নারী

বহু শতাব্দী ধরিয়া রুশিয়ায় নারী-পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতা অপকৃষ্টতা লইয়া যে তকরার চলিতেছিল, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের কলমের এক আঁচড়েই তাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। নারীপুরুষের তুলনার বিচার-ভার এখন আর একমাত্র পুরুষের উপর ন্যস্ত নাই, রুশিয়ার বিপ্লবে স্বাধীনতাকামী নারীরা পুরুষের সমানে সমানে প্রাণপাত করিয়া লড়িয়াছেন, বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশিয়ার গঠনে নারীর বুদ্ধি বিচক্ষণতা ঐকান্তিকতা স্বার্থত্যাগ পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রয়োজন হয় নাই, তাই সোভিয়েট রুশিয়াতে নারী সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ। সমান শ্রমে পুরুষ ও নারীর সমান পারিশ্রমিক ব্যবস্থা; নিম্নতম হইতে উচ্চতম রাজপদগুলিতে নারীপুরুষের সমান অধিকার। পারিবারিক জীবনযাত্রার নানা তুচ্ছ প্রয়োজনে, সন্তানপালনের নানা অনাবশ্যক খুঁটিনাটিতে নারীজীবনের কত অমূল্য সময় বৃথা ব্যয়িত হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র গর্ভিণী মাতার তত্ত্বাবধান ও শিশু সন্তানের লালন-পালনের বহুলাংশ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন; নারী অতঃপর তাঁর অখণ্ড অবসর সমাজ ও পৃথিবীর হিতচিন্তায় ও হিতানুষ্ঠানে নিয়োগ করিতে পারিবেন। সোভিয়েট রুশিয়াতে এতদিন নারীর নিশাশ্রম বা খনির রুদ্ধতায় শ্রম আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে। নারীর মাতৃত্বের উপর সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ যে কত বেশী নির্ভর করে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই শ্রম-আইন তৈরি হইয়াছে। এই আইন অনুসারে প্রসবের দুইমাস পূর্ব্ব হইতে প্রসবের দুই মাস পর পর্য্যন্ত প্রসূতি নারীরা সকল প্রকার পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পান। শুধু তাহাই নহে ঐ বিশ্রামের চার মাস তাঁহারা পূর্ণহারে বেতন এবং শতকরা পঁচিশ টাকা ভাতা পাইয়া থাকেন। প্রসবের পর প্রায় বৎসরকাল পর্য্যন্ত প্রসূতির দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা শ্রম এবং প্রত্যেক দুই ঘণ্টা পর পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম ব্যবস্থা। প্রসবের সময় প্রসূতি, বিনামূল্যে ধাত্রী ও চিকিৎসকের সাহায্য এবং ঔষধাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নবজাত শিশুর পরিচর্য্যা সম্বন্ধে উপদেশাদি দেওয়ার জন্য সর্ব্বত্র চিকিৎসকদের হাঁটি আছে।

শিশু সম্বন্ধে মায়েদের দুশ্চিন্তা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রায় সবখানিই লাঘব করিয়া দিয়াছেন। শিশু জন্মিবামাত্রই তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্রের। সে শিশু বিবাহজাত কি না এ প্রশ্ন কুত্রাপি কাহারো মনে উঠে না। মাতা ইচ্ছা করিলেই শিশুকে রাষ্ট্রপরিচালিত শিশু-আশ্রমগুলির কোন একটির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহা না করিতেও পারেন। রুগ্ন শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর পল্লীতে বা অন্যত্র মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে স্বাস্থ্য-আশ্রম বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। বিদ্যালয়গুলিতে বিনামূল্যে আহার ব্যবস্থা।

নারীদিগকে ঘরকন্নার অনাবশ্যক হাঙ্গামা হইতে মুক্তি দিবার জন্য রাষ্ট্রের পরিচালনায় জনসাধারণের সমবেত পাকশালা ও আহারস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। রুশিয়ার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এই আহারস্থানগুলিতে আহার করিয়া থাকে।

কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে নারীদের এই-সমস্ত অধিকার ও সুখসুবিধার মূলে নারীদের নিজেদেরই জীবনব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রাণপাত, ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কথার উল্লেখ করিলেই কেবল যথেষ্ট হইবে। সোভিয়েট রুশিয়াকে আভ্যন্তরীণ- ও বহিঃ-শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও গ্রহণ করিয়াছেন। দলে দলে নারীরা সৈন্যদলগুলিতে যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহারা কেবল যে শুশ্রূষাকারিণীর কাজেই ব্রতী হইতেছেন তাহা নহে, অস্ত্রধারিণীর সংখ্যাও বড় কম নহে। অস্ত্রধারণ যদি অন্যায় হয় তবে পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই অন্যায়। বিধাতার নিয়মে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক অধিকার-ব্যবস্থা যেমন নাই পৃথক বিধি-ব্যবস্থাও তেমনি নাই; সোভিয়েট রুশিয়াতে কর্ত্তব্য ও অধিকারে নারী ও পুরুষে তাই সম্পূর্ণ অভেদ।

স. চ.

চিকিৎসা-বিদ্যায় ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা

রেঙ্গুনে ব্যাপ্‌টিষ্ট কলেজ হইতে যে ব্রহ্ম-মহিলা সর্ব্বপ্রথম গ্রাজুয়েট হন তাঁহার নাম মা স সা। ইনি কলেজের পাঠ শেষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ডাক্তারীর দিকে ইঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতেও বি-এ পরীক্ষা দেন। তারপরে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন ও অস্ত্র-চিকিৎসায় বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইনি ব্রহ্মদেশের সর্‌কার হইতে এক বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত যান এবং ডাব্‌লিনের রয়্যাল কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্‌স্ ও সার্জ্জন্‌স্ হইতে উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইনি রেঙ্গুনের ডাফ্‌রিন্ হাঁস্‌পাতালের পরিচালিকা নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে মা স সা তাঁহার দেশের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নানা হিতকর অনুষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন।

নারী-কারাগারের সংখ্যা হ্রাস

কয়েক বৎসর আগে ইংলণ্ডে অপরাধিনী নারীদের জন্য এক শত কারাগার ছিল। বর্ত্তমানে এক শতের জায়গায় মাত্র পঁচিশটি কারাগার টিকিয়া আছে। তাহার কারণ ইংলণ্ডের নারীদের মধ্যে এখন অপরাধের মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২০ সালে এই পঁচিশটি কারাগারের মধ্যে ছয়টিতেও প্রতিদিন পঞ্চাশের অধিক অপরাধিনী আসিত না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সুশিক্ষার বিস্তার করিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে অপরাধের মাত্রা হ্রাস হইতে বাধ্য। আমাদের দেশে অপরাধিনী নারীর সংখ্যা কম নয়, কেননা এখানে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার নাই বলিলেই চলে। কবে আমরা আমাদের নারীদিগকে শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে উন্নত করিয়া সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গ বলবান্ করিয়া তুলিব?

সঙ্গীতে নারী

ইংলণ্ডের রয়্যাল ফিল্‌হার্ম্মনিক সোসাইটিতে আগে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নারীদের প্রবেশ-অধিকার ছিল না। বর্ত্তমানে নারীরা সেখানে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই সোসাইটি যখন স্থাপিত হয় তখন মেয়েরা কেবলমাত্র গায়িকারূপে হাজির হইতে পারিতেন। এখন তাঁহারা এখানে সভ্য হইবার অধিকার পাইলেন, এমন কি অনেক বিভাগে পরিচালিকা হইবার ক্ষমতাও তাঁহারা পাইয়াছেন।

গুপ্ত

—

চিত্র-শিল্পে বালিকার কৃতিত্ব

১৯২১ সালের—লণ্ডনের রাজকীয় চিত্রশালায়, (Royal Academy of Arts) বাসন্তী চিত্র-প্রদর্শনী উপলক্ষে, কুমারী ইলিন শোপার নামে ১৫ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা, নিজে আঁকিয়া দুখানা ছবি পাঠান। প্রতিযোগী ১২০০০ হাজার বিখ্যাত চিত্রকরদের মধ্যে যে এ বালিকাটি স্থান পাইবে, ইহা কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু বিচারকদের চক্ষে ইলিনের দুখানা ছবি পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত এবং প্রদর্শন-যোগ্য বিবেচিত হয়। এত অল্পবয়সে কোন চিত্রকরই এরূপভাবে সম্মানিত হন নাই। ইলিন আর্ট স্কুলে পড়িয়া চিত্র-বিদ্যা শিখেন নাই। এই বালিকা ছেলেবেলা হইতেই পিতার নিকট চিত্রাঙ্কণ-বিদ্যা অভ্যাস করেন। ইঁহার পিতা একজন বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী, নাম জর্জ্জ শোপার, আর্-ই। ১৩ বৎসর বয়স হইতেই ইলিন ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন। যশস্বী চিত্রশিল্পী বলিয়া ইলিনের নাম এখন জগদ্বিখ্যাত।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

—

বাংলা মেয়ে

ঘরের কোণে দুয়ার এঁটে বন্দী কেন রহিস্ নারী,
পড়িস্ কেন যুগল-পায়ে অধীনতার শিকল ভারী?
স্যাঁৎসেতে তোর ঘরের মাঝে
হাঁপিয়ে-তোলা ধোঁয়ার কালো।
দাসত্বেরই পঙ্কিলতা—সেই কি তোমার লাগ্‌চে ভালো?
কারাগৃহের ঘুল্‌ঘুলিটি খোলনি কি একটি বারো,
চিরকালই বন্দী-শালায় রুদ্ধ জ্বালায় নিশ্বাস ছাড়ো?
আকাশ সে কি নীল নয়নে ইঙ্গিতে হায় দ্যায়নি ডাক,
জান্‌লা খুলে উড়ন্ত ঐ দ্যাখনি কি পাখীর ঝাঁক?

মুক্তি-আশায় আকুল হয়ে অধীর বুক কি উঠ্‌ল দুলে,
না ঐ সোনার পিঞ্জরেতেই রইলে নীরব সকল ভুলে?
মলয় তোমায় শুনায়নি কি দুরন্ত তার পাগল বাণী,
হৃদয় তোমার উঠ্‌ল না কি অগাধ স্রোতেই উথ্‌লে ভাসি'?
পূর্ণিমার-ই চাঁদনী কভু—অন্ধকারের লক্ষ তারা,
স্বাধীন-পথে বেরিয়ে যেতে হাতটি তাদের ছায়নি নাড়া?
পর্দ্দানশীন পতিব্রতা লক্ষ্মী-সতী বাঙ্‌লা-মেয়ে,
চিরকালই অন্ধতা এই রইবে তোমার জীবন ছেয়ে?
বিশ্ব-ভোরে মুহুর্ম্মুহু এই যে বিবর্ত্তনের দোল,
তুল্‌বে না কি ঝনঝনানি জাগরণের একটু রোল?
জীবন তোমার পীড়ন সয়ে' চুপটি করে' শুধুই কাঁদা,
ঝাঁট-দেওয়া আর ঘর-নিকানো চচ্চড়ি-শাক-ছেঁচড়া রাঁধা?
সূর্য্য দেখেই সরম পেয়ে ঘোম্‌টা তোমার দিচ্ছ টেনে,
সূর্য্য-ও তাই বজ্র প্রখর বারে-বারে দিচ্ছে হেনে!
অধীনতার রোদন যদি মুছ্‌তে চাও হে একেবারে,
হিঁচ্‌ড়ে জাগাও অসাড় মনের তুহিন-শীতল সুপ্তিটারে!
মুক্তিপথের যাত্রী হয়ে যোগ্য হওয়া চাই-ই যে আজ,
বিদ্রোহিণী, কণ্ঠে তোমার গর্জ্জে' উঠুক রুদ্র বাজ!
অত্যাচারে বিক্ষত যে ক্ষুধায়-উছল তোমার বুক,
ঘোম্‌টা খুলে দেখাও তোমার অশ্রু-সজল মলিন মুখ!
যুদ্ধ ন্যায়ের শুদ্ধ কর, সত্য তোমার ন্যায়ের দাবী,
পশ্চাতে আজ থাক্‌বে কেন—এই কথাটা দাঁড়াও ভাবি'!

শ্রীনীহারিকা দেবী

—

চীনদেশের নারী

কোন একটা জাতির বিষয় কেবল বাহির হইতে দেখিয়া কিছু বলা শক্ত। তাহাদের বিষয় সম্পূর্ণ কিছু বলিতে হইলে তাহাদের সমস্ত আচার ব্যবহার রীতি নীতির সহিত ভাল করিয়া পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন আছে। চীন দেশের নারীদের বিষয় চট্ করিয়া কিছু বলা বড় শক্ত। তাহারা কি পরে, কি খায়, ইত্যাদি অনেক কিছু একদিনের পরিচয়ে বলা যায় বটে; কিন্তু তাহাদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়, তাহারা কেমন করিয়া তাহাদের দিন কাটায়, সমাজে তাহাদের কি স্থান, ইত্যাদি বিষয় কেবল বাহির হইতে একদিনের দেখায় বলা যায় না। অনেক লেখকের মতে চীনা নারীর, সমাজে স্বামীকে বাদ দিয়া নিজের কোন বিশেষ স্থান নাই। তাহার যাহা-কিছু সবই স্বামীকে জড়াইয়া। চীনা নারী যদি তাহার সম্বন্ধে বিদেশীর এই উঁচু ধারণা শোনে, তবে সে বিশেষ খুসী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চীন দেশে প্রথম পা-ফেলিয়াই চোখে পড়ে বন্দরের মধ্যে লাল বা কাল ঢোলা পায়জামা আর কুর্ত্তী পরা চীনা নারী-কুলী। স্ত্রী-পুরুষের পোষাক প্রায় এক রকমের, নারীর মাথার বিশেষ আচ্ছাদন দেখিয়া তাহাকে চেনা যায়। বন্দর ছাড়িয়া চীনদেশের ভিতরে যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই এই-সব নারী-কুলীদের দেখা যায়। তাহারা পিঠে পাহাড়ী মেয়েদের মত ছেলে বাঁধিয়া আপন মনে কাজ করিয়া যায়। হাটে বাজারে পথে-ঘাটে সব জায়গায় ইহাদের দেখা যায়। চীনা সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা কিন্তু অনেকটা আমাদের দেশের মেয়েদের মত পর্দ্দানসীনা। এ বিষয়ে সমাজ-পতিদের কোন কড়া হুকুম নাই, কিন্তু লোক-মত বলে, যে, বড়-ঘরের মেয়েদের স্থান দশজনের মাঝে নয়। তাহাদের নিজের অন্দরে যথেষ্ট কাজ করিবার আছে। তবে গরীব ঘরের মেয়েদের বাহিরে আসিতে হয় অভাবে পড়িয়া—পেটের দায়ে।

একই পরিবারে এমন দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী সমানে একসঙ্গে ঘরে এবং ঘরের বাহিরে কাজ করে, অথচ ননদ এবং ঐ বাড়ীর অন্য মেয়েরা ঘরে বসিয়া কম্‌ফর্‌টার বুনিতেছে।

অন্যান্য দেশের মতই চীন দেশে গরীব এবং বড়-লোকের ঘরের মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য আছে খুবই বেশী। চীন দেশের সমাজ দৃঢ় লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে পরিবারকে লইয়া সমাজ। সমাজ এক পরিবারের বিশেষ কোন একজনের কোন দাবী গ্রাহ্য করে না। এই পরিবারে নারীর স্থান খুবই উঁচুতে কেবলমাত্র একটি দিক দিয়া—তাহা সন্তানের জননীরূপে। বিবাহের পর নারী তাহার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া স্বামীর সহিত এক হইয়া যায়।

চীন দেশের পুরুষদের পুত্র-সন্তান না থাকিলে অকল্যাণ হয়। অকল্যাণের শেষ কেবল ইহ-জগতেই নয়, পর-

জগতেও তাহার জের চলে। কন্যা-সন্তান পুত্রের কাজ করিতে পারে না, কারণ বিবাহের পর কন্যা অন্য পরিবারের লোক হইয়া যায়। অন্য দেশের মেয়েদের বিবাহের পরেও বাপের বাড়ীর সহিত অনেক যোগ থাকে; কিন্তু চীন দেশে মেয়েরা বিবাহের পর একেবারে তাহাদের স্বামীর এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পত্তি হইয়া যায়। বাপের বাড়ীর সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধই থাকে না।

চীনদেশে দায়ভাগে নারীর কোন অধিকার নাই। এইজন্যই বোধ হয় বাবা-মা তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দিয়া থাকেন। তাহা না হইলে অনেক সময় পিতার মৃত্যুর পর কন্যা একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। বিবাহিত নারীর পুত্রসন্তান হইলে পর তাহার আদর অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। শ্বশুর-বাড়ীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কন্যার বাপের বাড়ীর লোকে আপত্তি করিতে পারে, কিন্তু লোকমত প্রায়ই স্বামীর বাবা এবং মায়ের পক্ষেই যায়।

চীনদেশে নারীর স্থান পুরুষের নীচে হওয়ার কারণ আছে। তাহাদের শাস্ত্রে বলে নারী নাকি জগতের যত অনিষ্ট এবং মৃত্যুর কারণ এবং পুরুষ যত মঙ্গলের হেতু। পুরুষ জগতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, নারী তাহার পাপের দ্বারা তাহার লয় করে। নারীরাও এই শাস্ত্রমত মানিয়া লইয়াছে। এই মতের বিরুদ্ধে তাহারা কোন কথা বলে না। সমস্ত চীনদেশেই পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন পায়। এ বিষয়ে বড়-ঘর এবং ছোট-ঘরে কোন তফাৎ নাই।

মেয়ের জন্ম হইলে পরিবারে বিশেষ আনন্দ দেখা যায় না। তাহার কারণ যে কন্যা একটু বড় হইলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে। গরীবের ঘরে মেয়ের নব আগমন দুঃখের পূর্ব্বসূচনা, কারণ মেয়ের বিবাহ-ব্যাপার বড় ব্যয়সাধ্য। এইজন্য গরীব-ঘরে অনেক সময় শিশু বালিকা হত্যা করা হয়। অবশ্য তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালেই হয়। সমস্ত চীনদেশে এমনি ভাবে যে কত বালিকা-শিশু-হত্যা হয় তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত, কারণ তাহা কোন খাতায় বা সরকারী পুস্তকে লেখা হয় না।

চীনা-সুন্দরীর চরণ-কমল

এই শিশুহত্যার কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে চীনারা তাহাদের ঘর-আলোকরা ছোট ছোট হাসি-খুসী ছেলেমেয়েদের ভালবাসে না। তাহারা তাহাদের ছেলেমেয়েদের আপনার এবং আমার মত সমান ভালবাসে। নব বৎসরের প্রথম দিনে ছোট ছোট মেয়েরা যখন লাল এবং হলদে কাপড় পরে, মুখে রং মাখে, হাতে এবং পায়ে পুঁতির বালা এবং মল পরে, তখন তাহাদের দেখিতে পরীর দেশের মানুষ বলিয়া মনে হয়। সাত আট বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়ে সমান ভাবে পালিত হয়। তার পর ছেলের বিদ্যারম্ভ হয় এবং মেয়ে অন্দরে প্রবেশ করে। অন্দরে প্রবেশ করিয়া সে লিখিতে পড়িতে এবং সেলাইয়ের কাজ শেখে। গরীবের ঘরের মেয়েরা অন্দরে যায় না, তাহারা ঘরের বাহিরে মায়ের কাজে সাহায্য করে।

মেয়ের বিবাহের অনেকদিন পূর্ব্বেই সে বাগ্‌দত্তা হয়। বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে পর তাহাকে সব সময়

ভাবী শ্বশুর-বাড়ীর লোকদের চোখ এড়াইয়া চলিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে শ্বশুর-বাড়ীর কাহারো দৃষ্টিপথে পড়া চীন দেশের মেয়েদের কাছে বড়ই লজ্জার কথা। মেয়ের ভাবী স্বামী প্রায়ই দূরের গ্রাম বা সহরের লোককেই স্থির করা হয়—মেয়ের এক গ্রামের পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বড় একটা দেখা যায় না। ঘটকেরাই সব স্থির করে। তাহারা এই সূত্রে বেশ দুপয়সা রোজ্‌গার করিয়া লয়। অনেক সময় খুব শিশুকালেই ছেলে এবং মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়া থাকে, এবং খুব ভয়ানক কিছু হইলেও বিবাহের কথার নড়চড় কদাচিৎ দেখা যায়। বিবাহের পাকা কথা হইয়া গেলে পর ভাবী বধূকে বর বিবাহের পূর্ব্বে আর দেখিতে পায় না। তবে মানুষের মনের ভিতরকার লোকটি সব দেশেই এক রকম। বর এবং কন্যার মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ এবং গোপনে প্রণয়লিপির আদানপ্রদানও চলে। চীন দেশের গোঁড়া লোকমত হিসাবে মেয়েদের লেখা পড়া শিখানো ভাল নয় বটে, কিন্তু ঐ দেশের নাটকের এবং উপন্যাসের নায়িকা প্রায়ই লেখা-পড়া-জানা এবং শিক্ষিতা হন। এমন কি মাঝে মাঝে বেশ সুরসিকা এবং কবি নায়িকারও দেখা পাওয়া যায়।

চীনদেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিবাহের নানা রকম পদ্ধতি আছে। তবে কতকগুলি বিষয়ে সব প্রদেশেই একরকম নিয়ম আছে। বিবাহের পূর্ব্বে উভয় পক্ষের কর্ত্তারা এক জায়গায় বসিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করেন। কোষ্ঠী দেখার নিয়মও আছে। বরের এবং কন্যার শাশুড়ীদের বিষয় আলোচনা হয়। উভয় পক্ষকেই প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে উভয়ে উভয়ের মান-সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবেন।

কথা স্থির হইয়া গেলে পর খুব বড় লাল কার্ড আদান-

প্রদান হয়। এই কার্ড প্রদান এবং গ্রহণ হইয়া গেলে পর বুঝিতে হইবে যে বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেল। যৌতুকাদির আদান-প্রদানও হয়।

দক্ষিণ চীনে বরের পিতা বরের জন্য কন্যাকে বলিতে গেলে এক প্রকার ক্রয় করেন। এই স্থানে ঘটক মহাশয়েরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। কনের বাড়ীর খরচ বড় ভয়ানক হয়। যৌতুক এবং পণে তাহাদের মাঝে মাঝে ঘর বাড়ীও বিক্রয় করিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজের বিবাহে কন্যাপক্ষকে অনেক রকমের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। বিছানা, খাট, পালঙ্ক, তৈজস-পত্র ইত্যাদি অনেক কিছুই দিতে হয়। তাহার উপর বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ করিয়া ভোজের বন্দোবস্ত করিতে হয়। বর এবং কনের বন্ধু-বান্ধবেরা নানা রকমের উপহার দেয়।

বিবাহ-উৎসবে অন্যান্য সভ্যদেশের মত খাওয়া-দাওয়া একটা প্রধান ব্যাপার। কন্যাপক্ষ যদি গরীব হয়, তবে তাহাদের বন্ধু-বান্ধবেরা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা অর্থ এবং জিনিষপত্র দিয়া সাহায্য করে।

কন্যা বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইয়া বরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বাপের বাড়ী হইতে সে একটা লাল কাপড়ে মোড়া দোলায় চড়িয়া আসে। চীন-নারীর ভাগ্যে জীবনে একবার মাত্র এই দোলায় চড়া ঘটে। কনে খুব দামী পোষাক পরে, তারপর লাল রেশম বা ভাল শালুতে ঘোমটা দিয়া এই দোলায় বসে। দোলায় বসিয়া বড় আরাম হয় না, অনেকের গরমে দম বন্ধ হইয়া যায়। আবার শীতকালে জমিয়া যাইবার মত অবস্থাও অনেকের ভাগ্যে হয়। এইসব কারণে কোন মেয়ে দুবার এই দোলায় চড়িতে চায় না।

স্বামীর বাড়ী যাত্রা করিবার সাতদিন পূর্ব্ব হইতে মেয়েকে তাহার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের মাঝে বসিয়া শোক করিতে হয়। মনে দুঃখ হোক বা না হোক শোক প্রকাশ করিতে হইবেই। বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে পর স্বামীর পাশে বসিয়া তাহাকে সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলিতে হইবে। কোন প্রকার ক্লান্তির চিহ্ন প্রকাশ করা অসভ্যতা বলিয়া ধরা হয়। বিবাহ-উৎসব শেষ হইলে পর বধূকে স্বামীর মাতার এলাকাধীন হইতে হয়।

শাশুড়ীর কড়া শাসন দেখিয়া হয়ত আমাদের মনে হইতে পারে চীনা-নারী বিবাহ করিয়া সুখী হয় কি না। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত, কারণ সব দেশের সুখের মাপকাঠি এক রকম নয়। আমরা যেমন চীনা বিবাহ-পদ্ধতি অদ্ভুত বলিয়া মনে করি, তাহারাও হয়ত আমাদের যা-কিছু সবই অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতে পারে।

চীনা সমাজে বিবাহ বাতিল করা বা অন্য রকম কুৎসার কথা প্রায়ই শোনা যায় না। তবে একটা বয়সে মেয়েদের আত্মহত্যা করিবার বড় ঘটা দেখা যায়। স্বামীর মায়ের অত্যাচারের ফলেই এই ব্যাপার বেশী হয়। ঘরের বধূর আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন প্রতিকারের পথ নাই। তবে সমাজে নারীশিক্ষার বিস্তার হইলে ইহা কমিয়া যাইবার আশা আছে।

স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ফলে পরিবারে অনেক রকমের গোলমাল হয়। চীনা শাস্ত্র এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য দার গ্রহণ করার পক্ষে নয়। কিন্তু এক স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আবার বিবাহ করা চলিতে পারে। বড় লোকের ঘরেই এটা বেশী হয়।

বাবা মা বর্ত্তমানে পরিবারের সব ছেলে এক বাড়ীতেই বাস করে। তাহাদের সকলকেই কর্ত্তার হুকুমে চলিতে হয়। তাহাদের মতের বিশেষ কোন দাম নাই। মেয়েরা রান্নাবান্না ইত্যাদি ঘরের কাজ করে। পুরুষদের সঙ্গে বসিয়া নারীদের খাইবার অধিকার নাই। পুরুষরা বাড়ীর বাহির মহলে উঠানে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া খায়। মেয়েরা অন্দরে বসিয়া খায়। ঘরের বাহিরে নারীর সম্মান বেশী—স্বামী গাড়ী জুড়িয়া স্ত্রীকে তাহাতে বসাইয়া নিজে পাশে পাশে হাঁটিয়া যায়।

চীন দেশের বাড়ী-ঘরের কথা কিছু বলা দরকার। অবশ্য বড়-লোকের বাড়ী গরীবের বাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল হয় একথা বলা বাহুল্য। বাড়ীর চারিদিকে দেওয়াল থাকে। দেওয়ালের মধ্যে অন্দর মহল এবং বাহির মহল ভাগ করা আছে। ঘরগুলি সবই একতলা এবং সারি সারি থাকে। তাতে দুয়ার ছাড়া জানালা নাই বলিলেও

হয়। বড় লোকের বাড়ীতে অনেক মহল থাকে। স্ত্রী-মহল এবং পুরুষ-মহলের মাঝে দেওয়াল দেওয়া এবং দুয়ার বন্ধ থাকে। বড়-লোকের বাড়ী বেশ সাজানো থাকে। দেওয়ালে লাল এবং সোনালি কাপড় মোড়া থাকে। ঘরের মধ্যে বেশ দামী নানা রকম তৈজস-পত্র সাজান থাকে।

চীনা দোকানে নানা রকমের চমৎকার সেলাইয়ের কাজ দেখা যায়। তাহা এইসব দোকানীর ঘরের মেয়েদের তৈরী। চীনদেশে চায়ের ব্যবসা এবং চাষ খুবই চলে। এই কাজে মেয়েরাই বেশীর ভাগ নিযুক্ত থাকে। পিঠে সন্তান বাঁধিয়া তারা অক্লান্ত ভাবে সারাদিন মাঠে কাজ করে।

দক্ষিণ চীনে মাটির উপর স্থানাভাব, তাই অনেক পরিবারকে চিরকাল জলের উপর নৌকায় বাস করিতে হয়। নৌকার উপর মেয়েদের স্বাধীনতা একটু বেশী। তাহারা খোলা হাওয়ায় বসিয়া ঘরের সব কাজ কর্ম্ম করে, বড় ঘরের মেয়েদের মত তাহারা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া চিরকাল কাটাইয়া দেয় না। একটি গল্প চীনদেশে চলিত আছে। কো কি নামে এক বড়-ঘরের মেয়ের বাড়ীতে আগুন লাগে, বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ীতে না থাকায় তিনি লোক-লজ্জার ভয়ে আগুনে পুড়িয়া মরেন, তবু ঘরের বাহির হন নাই।

নব বৎসরের প্রথম দিন নারীদের একটি বিশেষ আনন্দের দিন। এই দিনে তারা নূতন পোষাক পরিয়া কাছাকাছি কোন বাগানে গিয়া আনন্দ-উৎসব করিয়া নূতন বৎসরকে বরণ করে এবং দিনশেষে বনভোজন করিয়া বাড়ী ফেরে।

মাঝে মাঝে মেয়েরা বাপের বাড়ী যায়। বাপের বাড়ীতে তারা সব সময় আদর পায় না। তবুও তাদের মাঝে মাঝে শ্বশুরঘর ত্যাগ করিয়া বাপের বাড়ীর অনাদরের মধ্যেই যাইতে হয়। তাহাতে স্বামীর ঘরের লোকেরা বুঝিতে পারে, যে তাহার মাথা রাখিবার অন্য একটা আস্তানা আছে।

বড় ঘরের মেয়েরা থিয়েটার ইত্যাদি দেখিতে পায় না, তবে বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের আয়োজন করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়। গরীবের ঘরে এসব সম্বন্ধে কোন বিশেষ বাধা নাই।

বড়-ঘরের মেয়েদের শিশুকাল হইতে পা ছোট করিবার বন্দোবস্ত হয়। লোহার জুতা পরাইয়া পাকে বাড়িতে দেওয়া হয় না। কিছুকাল পরে পা-দুখানি ছুটো গজালের মত দেখিতে হয়। এই রকম পাকে চীনারা বলে "চরণ-কমল"। বড় ঘরের মেয়েদের এটা রূপের একটা বিশেষ চিহ্ন। পা-ছোট মেয়েদের অকেজো করিয়া রাখা হয়, তাহারা চলিতে পারে না, দাঁড়াইতেও পারে না। এখন এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। কয়েকস্থানে প্রথাটি মন্দা পড়িয়াছে, কিন্তু একেবারে দূর হয় নাই। চীনের অনেক প্রদেশে এই ভীষণ প্রথা বেশ বাঁচিয়া আছে।

চীনদেশে মেয়েদের পোষাক অনেককাল ধরিয়া এক রকমই চলিয়া আসিতেছে। বড়-ঘরের মেয়েরা মাথায় টুপী পরে, তাহা দেখিতে তাহার স্বামীর টুপীর মত হওয়া চাই। টুপীতে সাটিন জড়ানো থাকে। সকল মেয়ের টুপীতে সোনার কোন কিছু লাগাইবার অধিকার নাই। গরীবের ঘরের মেয়েদের টুপীর কোন বাহার নাই। সকল শ্রেণীর মেয়েরাই ঢোলা পাঞ্জাবী জামার মতন কুর্ত্তী পরে। বড় ঘরের মেয়েরা পেটিকোট ব্যবহার করে—অবশ্য সকলেই করে না।

বড়-ঘরের মেয়েরা সাটিনের তৈরী জুতা পরে। তাহারা অবস্থা-মত রেশম সাটিন বা সুতার পোষাক ব্যবহার করে। পোষাক তাহারা নিজের হাতে তৈরী করে। ছেলে-মেয়েদের পোষাক বড়দের মতই, তবে ছোট আকারের হয়। শীতকালে ছেলে-মেয়েরা এবং লোকে জামার উপর জামা পরিয়া দেখিতে অনেকটা কাপড়ের বস্তার মত হয়। গরীব ছেলে-মেয়েরা তুলা-ভরা জামা পরে।

ছোট ছোট মেয়েদের মাথা কামাইয়া দেওয়া হয়। কেবল মাথার দু-পাশে দুই গুচ্ছ চুল রাখিয়া দেওয়া হয়। মেয়ে বড় হইলে তবে চুল রাখিয়া খোঁপা বাঁধে। মাথার খোঁপা বাঁধা বড় কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া চীনা মেয়েরা ৭ দিনে একবার খোঁপা খোলে। কাঠের বালিসে মাথা রাখিয়া ঘুমায়, তাহাতে খোঁপা নষ্ট হয় না; জাপানী

মেয়েরাও ঠিক এইরূপ করিয়া থাকে। খোঁপাতে নানা প্রকার গয়না ব্যবহার করার প্রথা আছে—রং-বেরঙের নকল ফুল, চুলের কাঁটা ইত্যাদি অনেক কিছুই খোঁপায় গোঁজা হয়। চীনা মেয়েদের খোঁপার বাহার আছে নানা রকমের।

অনেক বড় ঘরের মেয়েরা হাতের নখ কাটে না, তাহা ঢাক্‌না দিয়া রক্ষা করে।

চীনা-নারীর স্থান পরিবারে যতই খারাপ বা পরাধীন হউক না কেন—এমন নারীও ঐ দেশে দেখা যায় যাহারা গলার জোরে শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীকে বেশ জব্দ করিয়া রাখে। এইসমস্ত বধূরাই অনেক সময় ঘরের কর্ত্রী হয়। স্বামী বেচারাকে সব ব্যাপারে তাহার কথা মানিয়া চলিতে হয়। চীনদেশে স্ত্রৈণ স্বামীর সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে। নারীরা অনেক সময় বেশী বুদ্ধিমান হয় এবং তাহাদের মনের জোরও পুরুষ অপেক্ষা বেশী হয়। এই কারণেও তাহারা অনেক সময় পুরুষদের শাসন করে।

চীন দেশে একখানি বিশ্বকোষ আছে—তাহাতে মোট ৬২৮ খানি পুস্তক আছে। তাহার মধ্যে ৩১৬ খানি নারী সম্বন্ধে।

পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সন্তানদের প্রধান কর্ত্তব্য। পিতামাতার জীবিত অবস্থায় সব বিষয়ে তাঁহাদের মত লইয়া সন্তানদের চলিতে হয়। মাতার মৃত্যুতে তিন বছর শোক করিতে হয়। সেই সময় বাহিরের প্রায় সব কার্য্যই ত্যাগ করিতে হয়।

বিধবাদের স্থান চীনা সমাজে খুব খারাপ নয়। তাহারা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে। বিধবার বিবাহে খরচ খুবই কম, এইজন্য অনেকে বিধবা বিবাহ খুব আনন্দের সঙ্গেই করে। চীনারা বিধবাদের "হাল-হীন নৌকা" বলে। সকলেই বিধবাদের একটু কৃপার চোখে দেখিয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমানে চীনা সমাজে নারীদের মধ্যে হঠাৎ কেমন একটা জাগরণের সাড়া আসিয়াছে। এতদিনকার আলস্য আর পুরুষ-প্রাধান্য এতদিন পরে হঠাৎ তাহারা ছিঁড়িবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।
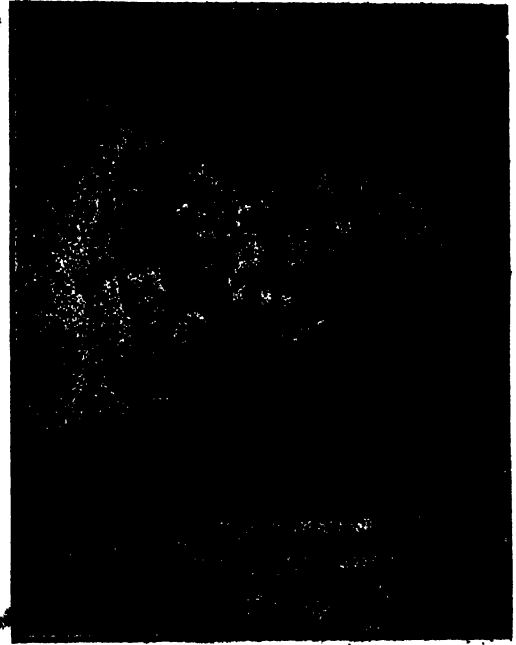
চীনাসুন্দরীর খোঁপার গহনা।

এখন নারীরা আমেরিকার নারীদেরও পাল্লা দিতে চলিয়াছে। পিকিংএর কলেজে নারী এবং পুরুষ এক-সঙ্গে বিদ্যালাভ করিতেছে। চীন ইতিহাসে এ ব্যাপার এই প্রথম। কেহ ইহার কল্পনাও করিতে পারে নাই। বালিকারা নানা রকমের খেলা দশজনের সাম্‌নেই সুরু করিয়া দিয়াছে। চীনদেশের সব-চেয়ে শিক্ষিত প্রদেশে হুনানে নারীরা ভোটের অধিকার পাইয়াছে। অনেক চীনা সরকারী কর্ম্মচারী মেয়েদের কাছে গালে চড় পাইয়াছেন। মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া ভোট দিবার এবং অন্যান্য ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দাবী করিতেছেন। চারি-দিকে নারী-শিক্ষার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পুরুষরাও এই নারী-জাগরণ কোন প্রকার মন্দ চোখে দেখিতেছে না। তাহারাও অনেক কার্য্যে মেয়েদের সাহায্য করিতেছে। এইসমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে—চীনা নারী-সমাজ আর খুব বেশীদিন অন্যান্য সভ্যদেশের নারী-সমাজের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। গোঁড়া চীনা-পুরুষসমাজ নারী-জাগরণকে খুব স্নেহের চোখে দেখে না, কিন্তু তাহাদের গলার স্বর বড় ক্ষীণ, কারণ সে দলে লোক বড় কম।

তাহাদের আপত্তি ক্রমে যুবকদলের উৎসাহে চাপা পড়িয়া একে একে সবই বদ্‌লাইয়া যাইবে বলিয়া আশা যাইতেছে। চীনা সমাজ পূর্ব্বে যা ছিল, তাহা হইতেছে।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের পথ

গ্রামের মাঝে পথখানি সে বট-অশথে ঢাকা—
খানিক তারি লুকিয়ে আছে, খানিকটা তার ফাঁকা ;
সে যেন ঠিক গ্রামের বধূ—খানিক চেয়ে আড়ে
লুকিয়ে পড়ে ঘোম্‌টা টেনে আম্‌-বনেরি ধারে।
আঁকাবাঁকা নদীর সাথে যায় সে এঁকে বেঁকে
কর্ত্তাকুড়ের ছাচ্‌তলা দে' ঘাট পিছনে রেখে।
হাটে বাটে সব দেখে' সে আবার কোথা চলে—
লক্ষ গাঁয়ে পরশ দিয়ে কম্‌নে কিসের ছলে !
এ যেন রে খুঁজতে বাছুর গয়লাদের এক মেয়ে
বনের আশে পাশে ঘোরে ব্যাকুল চোখে ধেয়ে।
বামুনদের এক উঁচু নিয়ে নাপ্তে মাসী ক্ষীরি
কুটুম-বাড়ী চল্‌ছে যেন অলস ধীরি ধীরি।
এম্‌নি গ্রামের পথখানি সে স্বপ্নে যেন ভরা,
ছায়ার স্নেহে নদীর গানে মোহন শ্রমহরা।
টুন্‌টুনি ও বুল্‌বুলিরা লক্ষ কথা পাড়ে,
মৌমাছি গায় বৈঁচি-বনে কামিনী-ফুল-ঝাড়ে।
সে পথ দিয়ে চল্‌ব আমি কাজ রবে না কিছু,
কোথায় যাব নেই ঠিকানা, ডাক্‌বে না কেউ পিছু।
গ্রামে গ্রামে পরশ দিয়ে চল্‌ব নব গাঁয়ে
বাব্‌লাবনের গন্ধ শুঁকে হাটকে রেখে বাঁয়ে।
সেইখানেতে নদীর সাথে পথের চেনাশোনা—
সেথায় অশথ্‌তলায় শুয়ে স্বপ্ন কত বোনা।
পাশে রেখে কলুবাড়ী, কেয়াবনের রাশি
পেরিয়ে অলস চল্‌ব মৃদু শীতল বায়ে ভাসি'।
কা'কে দেবো কিসের খবর তা রবে না মনে,
মনে হবে চেনা ছিল কুটীরগুলোর সনে।
এ পথ দিয়ে চল্‌ব অশেষ অচিন্‌ গাঁয়ে কোথা—
চম্‌কে চা'ব অচিন্‌ ঘাটে—বধূরা স্নানরতা,—
দেখিয়ে হাসি ঢাক্‌বে মুখে গাম্‌ছা আড়াল দিয়ে,
নিশাস ফেলে চল্‌ব পুন নূতন প্রীতি পিয়ে।
দেখ্‌ব কোথা দুষ্টু ছেলে কোমর বেধে ছুটে'
পাত্‌তাড়ি ও মাদুর নিয়ে পাঠশালাতে জুটে।
কলসী ভাঙা জীর্ণ মাদুর নিয়ে শ্মশান যেথা
চোখ মেলিয়ে অবাক যেন পথটা রহে সেথা।
শতেক গ্রামের প্রয়োজনের এইটি গতিবিধি,
"হরিবোল্‌" ও পথিক-গীতি শুন্‌ছে এ যে নিতি ;
বনের ছায়ে ঘুমোয় কোথা, রোদের মাঝে জাগে,
ঝিল্লি ভেক ও শতেক সাপে বক্ষ ইহার মাগে।
পথটি যেন পল্লী-মায়ের সুদীর্ঘ এক স্নেহ—
বাড়িয়ে বাহু বাঁধ্‌ছে সবায়, চিনায় সবে গেহ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে'
যেদিন হাওয়া উঠ্‌ত ক্ষেপে'
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগ্‌ত পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হ'ত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে ;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে'-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-ক্ষেতে
সূর্য্য-ওঠার রাঙা-রঙীন বেলায়,
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠ্‌ত দুলে'
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়,
সেদিন আমার হ'ত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবী ;—
তাইত হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবী !

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে জননীর কোলের পরে
জন্মেছিলি মর্ত্ত্যঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহারি বক্ষ হ'তে তোরে
কে এনেচে হরণ করে',
ঘিরে তোরে রাখে নানান্ পাকে !
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই ত ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
"গেছিস্ দূরে, অনেক দূরে,"
কি যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকলখানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে—
ভালো করে' পাইনি তাহা বুঝে ;
ফিরেছি তাই নানামতে,
নানান্ হাটে, নানান্ পথে,
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার আঙন মাঝে
প্রভাত-রবির শঙ্খ বাজে,
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্তমনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হ'তে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁট-কাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্ব্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই ত মেশা,
আবর্জ্জনা জমে উপার্জ্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে,
পথ বেড়ে' যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে' যাই মুক্তি-সুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে' দিই টুটে',
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েচেন সাজিয়ে পত্রপুটে।

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে—
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ ;
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইল ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগন পারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েচে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কি ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা' নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন ;
কাছেকে আজ পেলেম কাছে
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

(শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৮)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাস-ব্যবসায়

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল।… তৎকালের খৃষ্টীয়ান বণিকগণ এদেশে অতি বিস্তৃতরূপে দাসব্যবসায় চালাইতেন বলিলে একটু বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশের গরিব হিন্দু পিতামাতা গরুবাছুর বেচার মত শিশু- ও কিশোর-বয়স্ক পুত্রকন্যা বিক্রয় করিত।…

বাংলার সকল জেলায় পুরাতন কাগজপত্রে ও তৎকালের সংবাদপত্র-সমূহে দাসব্যবসায়ের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার জীবনে দাসব্যবসায়, দাসদাসী ক্রয় একটা অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। প্রত্যেক সমৃদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানের সংসারে পাল পাল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল।…

মরিশাস্ ও বুরবঁ এই দুইটি দ্বীপ মনুষ্য বাসোপযোগী করিয়া কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার মানসে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী…ক্রীতদাসের পাল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া… উক্ত দ্বীপদ্বয়ে প্রেরণ করেন (French East India Company's letter to the Pondichery Council, dated Paris—25 h September, 1727)। প্রথমে চন্দননগরের উপর ক্রীতদাস সংগ্রহের ভার পড়ে ; কত যে বাঙ্গালী ও বিহারী দরিদ্র ব্যক্তি জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্র পারে বুরবঁর বনে ও মরিশাসের উৎকট উত্তাপে ইহলীলা সাঙ্গ করে তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

১৭২৯ সালের মধ্যভাগে পণ্ডিচারী হইতে হুকুম আসে যে চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস কিনিয়া আর পাঠাইতে হইবে না, মান্দ্রাজ উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে বাংলা অপেক্ষা সস্তা দরে ক্রীতদাস পাওয়া যাইতেছে (Letter of Pondichery Council to the Council at Chandernagore, dated Fort Louis, Pondichery, the 14th June, 1729)। দুই বৎসর পরে সে প্রদেশে সুজন্মা হয়। তখন হুকুম আসে সেখানে দর, চড়া, অতএব আবার চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস পাঠান হউক (The same, dated 12th March, 1731)। ১৭৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারীতে সংবাদ যায় যে পাটনার নবাব (আলিবর্দ্দী খাঁ) কোন এক হিন্দু রাজাকে (সম্ভবতঃ বিহারের কোন জমিদার বা বঞ্জারা নামক দস্যুগণকে) যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ১২ হইতে ১৫ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। চন্দননগর হইতে ডুপ্লে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটনার ফরাসী কুঠিয়াল Groiselleকে হুকুম দিলেন—"৩০০ ক্রীতদাস ক্রয় কর।" পণ্ডিচারী হইতে সংবাদ আসিল—"যদিও বুরবঁ দ্বীপে প্রতি বৎসর ২০ জন মাত্র পাঠাইবার হুকুম আছে—মরিশাস দ্বীপে ৩০০ ক্রীতদাস পাঠাইলে কাজে আসিবে, এবং যেহেতু মনে হয় মাল সস্তায় পাওয়া যাইবে, প্রত্যেক জাহাজে কিছু কিছু করিয়া ৩০০ শতই পাঠাইয়া দেওয়া হউক।" (Letter of Pondichery Council to that of Chandernagore, dated Fort Louis, Pondichery, 24th September 1735.)

La Bourdonnais তখন মরিশাস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার উপর কোম্পানির হুকুম ছিল—তিনি আবশ্যক মত ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস আমদানি করিতে পারিবেন (The same 13th March, 1736)। ১৭৫১ সালে বুরবঁর শাসন-সভা হইতে আবেদন আসে—৬০ জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী, বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ৩০, পাঠান হউক।—পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরের উপর সে আবেদন রক্ষা করিবার ভার পড়ে (The same, dated 8th September, 1751)।

…আমরা শিশুগণকে যে ছেলেধরার ভয় দেখাই, দাসসংগ্রাহকগণ সেই ছেলেধরা (Anandaranga Pillai's Diary—Madras Govt. publication—Vol., I, p. 227)। ইয়োরোপীয় বণিকগণের প্রত্যেক আড্ডায়—চন্দননগরে, হুগলিতে, চুঁচুড়ায়, শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় দাসের আড়ত ছিল, দাসের হাট বসিত। গহনার নৌকায় বোঝাই দিয়া যেমন আজকাল ব্যবসায়ী হাটে বেসাত লইয়া আসে, তৎকালে দাসব্যবসায়ী দাসদাসী বোঝাই দিয়া ভাগীরথী-বক্ষ বহিয়া দাসের হাটে জীবন্ত বেসাত লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য একেবারেই অভিনব ছিল না।…এদেশে রোমান ক্যাথলিক পরিবারের মধ্যেই অধিক-সংখ্যক দাসদাসী পোষিত হইত। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ক্রীত-দাসদাসীর নিদর্শন কোথাও পাই নাই। কৃষাণ বা মজুর হিসাবে হিন্দুর ঘরেও হয়ত ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু গৃহসংসারের পরিচারিকা বা পরিচারক হিসাবে থাকা সম্ভব নহে। হিন্দুগণ অর্থের লোভে আগন্তুক খৃষ্টীয়ানগণের ও মুসলমানগণের দাসব্যবসায়ে সহায়তা করিতেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহারা নিজে যে দাসদাসী পুষিতেন তাহার পরিচয় পাই নাই। মুসলমানগণ ক্রীতদাসদাসীর প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। …দাসদাসীকে স্বাধীনতা দান করা মুসলমানের পক্ষে পুণ্য কর্ম্ম। মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক মুসলমান দাসদাসীকে মুক্তি প্রদান করিতেন।

…খৃষ্টীয়ান সংসারে দাসগণ অনেক সময়ে অতি নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হইত, অতি সামান্য অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত অতি সাধারণ শাস্তি ছিল, মাঘের শীতে উলঙ্গ করিয়া দাস বা দাসীর মস্তকে উপর্য্যুপরি বহু কলসী ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া একটা আমোদজনক প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত ছিল।

দাস ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইলে সরকারকে একটা মাশুল দিতে হইত। ইংরেজ সরকার দাসপ্রতি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা শুল্ক লইতেন। ফরাসী সরকার দাসখৎখানি লিখিবার কাগজের জন্য পাঁচ সিকা লইতেন এবং দাসদাসীর মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা

শুষ্ক আহার করিতেন। এই পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে।...

(প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন, ১৩২৮) শ্রীচারুচন্দ্র রায়

—

বাংলার বৈশিষ্ট্য

...কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে—যখন ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও সাধনা, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্বদাই সমষ্টির ঐক্যের ভিতরে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোনও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া সেই সম্বন্ধের অন্তর্গত ব্যক্তি বা বিষয়ের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করে নাই। ভারতের দেবতা এক নহেন বহুও নহেন, কিন্তু তিনি সেই একবস্তু যাঁহার মধ্যে একের সঙ্গে বহু ও বহুর সঙ্গে একের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।...ভারতের মনীষা স্মরণাতীত কাল হইতে মানব-প্রকৃতির মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের শাসনে ও সমাজের বন্ধনে বাঁধিয়াও, বৈষম্যের মধ্যেই সাম্য, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।......

ভারতের সমষ্টিগত সমাজ ও চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় সাধনার যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাধনা ও সভ্যতার তুলনায় বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ...বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্ম্মে, বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলাতে, বাংলার সমাজ-জীবনে—সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেষত্বটা ফুটিয়াছে।...

সে মূল বস্তুটি—স্বাধীনতা। বাংলা চিরদিন কি সমাজের, কি ধর্ম্মের, সকল প্রকারের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে; প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্রবন্ধনকে সর্ব্বদা শিথিল করিয়া আসিয়াছে।...

বাংলার সনাতন সাধনার আর-একটা বিশেষত্ব—ইহার মানবতা... বাঙ্গালীর চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এক দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতাস্পৃহা এবং সাধনের দ্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাই বাঙ্গালীর পুরাগত সাধনার মূল লক্ষণ বলিয়া দেখিতে পাই।...

(বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৮) শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

—

শিল্পের অধিকার

...খেলতে-খেলতে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়—এই তো ঠিক!...শিল্পজ্ঞান তো শুধু এই বহিরঙ্গীন চর্চ্চা ও প্রয়োগ-বিদ্যার দখল নয়; রস, রসের স্ফূর্ত্তি—এসবের আয়োজন যে স্বতন্ত্র। ...রসপরতন্ত্রতাই হলো তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাত্র আয়োজন।...স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানুষ, মনও তাদের রকম-রকম, রসও বিচিত্র ধরণের, আয়োজনও হলো প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র প্রকারের।... প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিল্প-রসকে ধরবার যে আয়োজন করে' নিলে সেইটেই হল ঠিক আয়োজন, তাতেই ঠিক জিনিষটি পাওয়া যায়; এছাড়া অনেকের জন্য একই প্রকারের বিরাট আয়োজন করে' পাওয়া যায় সুকৌশলে প্রস্তুত করা সামগ্রী বা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালাই-করা কোনো-একটা আসল জিনিষের নকল মাত্র। Artistএর অন্তর্নিহিত অপরিমিত বা infinity, artistএর স্বতন্ত্রতা individuality—এই-সমস্তর নির্ম্মিতি নিয়ে যেটি এলো সেইটেই art, অন্যের নির্ম্মিতির ছাপ, এমন কি বিধাতারও নির্ম্মিতির ছাঁচে ঢালাই হয়ে যা বার হলো তা আসলের নকল বই আর তো কিছুই হলো না। ভাল, মন্দ, অদ্ভুত বা অত্যাশ্চর্য্য এক রসের সৃষ্টি তো সেটি হলো না। এইটুকুই যথার্থ পার্থক্য art-এ ও না-art-এ, কিন্তু এ যে বড় ভয়ানক পার্থক্য—স্বর্গের সঙ্গে রসাতলের, আলোর সঙ্গে না-আলোর চেয়ে বেশী পার্থক্য। স্বর্গের ঐশ্বর্য্য আছে, রসাতলের গাম্ভীর্য্য আছে, রহস্য আছে, আলোর তেজ, অন্ধকারের স্নিগ্ধতা আছে; কিন্তু art-এ না-art-এ তফাৎ হচ্ছে—একটায় সব রস সব প্রাণ রয়েছে, আর একটায় কিছুই নেই!

Artএর একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা—simplicity। অনাবশ্যক রং-তুলি, কল-কারখানা, দোয়াত-কলম, বাজনা-বাদ্যি সে মোটেই সয় না।...আশ্চর্য্য ব্যাপার শিল্পের—এই যেমন-তেমনের উপরে সওয়ার হয়ে যেমনটি জগতে নেই, তাই গিয়ে আবিষ্কার করা! মাটির ঢেলা, পাথরের টুকরো, সিঁদুর, কাজল—এরাই হয়ে উঠ্‌লো অসীম রস আর রহস্যের আধার।

রসের তৃষ্ণা, শিল্পের ইচ্ছা যার জাগ্‌বে, সে তো কোনো আয়োজনের অপেক্ষা করবে না;—যেমন করে হোক্ সে নিজের উপায় নিজেই করে নেবে; এ ছাড়া অন্য কথা নেই!...

মূল কথা হচ্ছে রসের তৃষ্ণা, শিল্পের ইচ্ছা হলো কি না—উপযুক্ত আয়োজন হলো কি না—শিল্পের জন্যে বা রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে—এটা একেবারেই ভাব্‌বার বিষয় নয়। বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা মেটাবার শিল্পকার্য্য তার প্রয়োগ-বিদ্যা। তার খুঁটিনাটি উপদেশ আইনকানুন সমস্তই এমন অপর্য্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে, কোনো মানুষের সাধ্য নেই তেমন আয়োজন করে' তোলে। শিল্পকে, রসকে পাওয়ার জন্যে আয়োজনের এতটুকু অভাব যে আছে তা খুব একেবারে আদিম অবস্থাতে আর সব দিক দিয়ে অসহায় অবস্থাতেও মানুষ বলেনি; উল্টে বরং প্রয়োজন হলে আয়োজনের অভাব ঘটে না কোনোদিন—এইটেই তারা, হরিণের শিং, মাছের কাঁটার বাটালি, একটুখানি পাথরের ছুরি, একটুকরো গেরিমাটি, এই-সব দিয়ে নানা কারুকার্য্য নানা শিল্প রচনা করে' দিয়ে সপ্রমাণ করে' গেছে। এ না হলে হবে না, ও না হলে চলে না—শিল্পের দিক দিয়ে একথা বলে শুধু সে, যার শিল্প না হলেও জীবনটা চল্‌ছে কোনো রকমে। আদিম শিল্পীর সাম্‌নে শুধু তো বিশ্বজোড়া এই রসভাণ্ডার খোলা ছিল, চেয়ারও ছিল না, টেবিলও ছিল না, ডিগ্রীও নয়, ডিপ্লোমাও নয়, এমন কি তার নিজের জাতীয় শিল্পের Gallery পর্য্যন্ত নয়—কি উপায়ে তবে সে শিল্পকে অধিকার কর্‌লে?...

...অলসস্য কুতো শিল্পং? নিশ্চয় আমাদের এখানকার জীবনযাত্রায় কোথাও একটা কল বিগ্‌ড়েছে যাতে করে' জীবনটা বিশ্রী রকম খুঁড়িয়ে চল্‌ছে, শরীর খেটে মরছে কিন্তু মনটা পড়ে' আছে অবশ অলস।...শিল্পী যা ছুঁয়ে দেয় তাই সোনা হয়ে যায়, অথচ সোনা দিয়ে বেচারা ছেলে-মেয়ের গা কোনোদিন ভরে' দিতে পার্‌লে না। তাজের পাথর যারা পালিস করলে—আয়নার মতো ঝকঝকে, দুধের মতো সাদা করে', মুক্তোর চেয়েও লাবণ্য দিয়ে তার গম্বুজটা গড়ে' গেল যারা, দেওয়ালের গায়ে অমরদেশের পারিজাত-লতা চড়িয়ে দিয়ে গেল যে নিপুণ সব মালি, তারা রোজ-মজুরী কত পেয়েছিল?...শিল্পী নীচ জাত হলেও যে শিল্পের পাণিগ্রহণ করেছে, সেই কারণে সকল সময়ে শিল্পী বিশুদ্ধ—এই কথা ভারতবর্ষের ঋষিরা বলে গেছেন, কিন্তু যেখানে এই শিল্প আজকালের-কলের-মানুষ আমাদের পরশ পাচ্ছে, সেইখানেই সে মলিন হচ্ছে—ফুল যেমন চট্‌কে যায় সেরিসিকের হাতে পড়ে'। এর উপায় কি?

কাজের বন্দীর রসের সঙ্গে পরিচয় পরিণয় ঘটবার কি আশা নেই? কেন থাকবে না? কাজ-কর্ম্ম আমাদেরই বেঁধে পীড়া দিচ্ছে এবং কবি, শিল্পী, রসিক—এঁরা সব এই কাজের জগতের বাইরে একটা কোনো নতুন জগতে এসে বিচরণ করছেন তা তো নয়।...ঐ যে কবীরের ইচ্ছাসুখে তাঁত বোনার রাস্তা, তারি ধারে তাঁর কল্পবৃক্ষ ফুল ফুটিয়েছিল। এই ইচ্ছাসুখটুকুর মুক্তি কবি, শিল্পী, গাইয়ে, গুণী সবাইকে বাঁচিয়ে রাখে—পয়সার স্তূপ নয়, কিম্বা কাজ ছেড়ে ভরপুর আরামও নয়।

...মন, সে তো বাধা মানবার পাত্রই নয়। জেলখানার দরজা মন্ত্র-বলে খুলে সে তো বেরিয়ে যেতে পারে একেবারে নীল আকাশেরও ওপারে! সে তো মৃত্যুর কবলে পড়ে'ও রচনা করতে পারে অমৃত-লোক! তবে কোথায় নিরাশা, কোথায় বাধা?...কবি শিল্পী কেউ কাজের জগৎ ছেড়ে রসকলির তিলক টেনে অথবা জটাজুটে ছাই-ভস্মে একেবারে রসগঙ্গাধর সেজে কেবলি বৃন্দাবন আর গঙ্গাসাগরের দিকে পালিয়ে চলেছেন তা তো কোনো ইতিহাস বলে না। মৃত্যু দিয়ে গড়া এই অমিয়রসের পেয়ালা, শুকনো চামড়ার কার্পা, যার মধ্যে ধরা হয়েছে গোলাপজল, কাজের সুতোয় গাঁথা পারিজাত ফুল—এইগুলোকে তাঁরা জীবনে অস্বীকার করে' চলতে চেষ্টা করেন নি, উল্টে বরং যারা কাজে নারাজ হয়ে একেবারেই বয়ে যাবার জন্যে বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে তাদের ধমক দিয়ে বলেছেন 'জৈ্যা কা ত্যোঁ ঠহরো'—আরে অবুঝ, ঠিক যেমন আছ তেমনই স্থির থাক। কথাই রয়েছে কারুকার্য্য। কাজের জটিলতার শ্রম, শ্রান্তি, সমস্তই মেনে নিলে তবে তো সে শিল্পী। এই সহরের মধ্যে দাঁড়িয়েই কি আমরা বলতে পারি, রস কোথায়—তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে, শিল্প কোথায়—তাকে দেখতে পাচ্ছিনে? ইন্দ্রনীলমণির ঢাকন দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা, কালো-সাদা বাঁকা-সোজা রং-বেরং কারুকার্য্য দিয়ে নিবিড় করে' সাজানো, এটি ধরা রয়েছে—তোমারও সামনে, তারও সামনে, আমারও সামনে, ওরও সামনে—বিশেষ করে' কারু জন্যে তো এটা নয়—জায়গা বুঝেও তো এটা রাখা হয়নি—তবে দুঃখ কোন্‌খানে?—ঢাকা খোলার বাধা কি? কত শক্ত-শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এই কাজটাই কি খুব কঠিন আর দুঃসাধ্য হলো? ঢাকা খোলার অবসর পেলেম না—এইটেই হলো কি আসল কথা? ধর' অবসর পেলেম—পূর্ব্বপুরুষ খেটে-খুটে টাকা জমিয়ে গেল, পেটের ভাবনাও ভাবতে হল না,—মেয়ের বিয়েও নয়, চাকরিও নয়; কিম্বা আফিস-আদালত ইস্কুলগুলোর সঙ্গে একদম আড়ি ঘোষণা করে' অথবা ছুটি পাওয়া গেল—রসের পেয়ালাটার তলানি পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছবার। কিন্তু এত করে' হলো কি?—লাড্ডুর খদ্দের এত বেড়ে চল্লো যে দিল্লির বাদশার মেঠাইওয়ালাও ফতুর হবার জোগাড় হলো। অতএব বলতেই হয় অবসর ও অর্থের মাত্রার তারতম্যে রস পাওয়া না-পাওয়ার কম-বেশ ঘটছে না, আমাদের ইচ্ছে না-ইচ্ছে, কি ইচ্ছে কেমন ইচ্ছে—এরি উপরে সব নির্ভর করছে, এই ইচ্ছেটাই যা পেতে চাই তাই পাওয়ায়; পথ দেখায় এই ইচ্ছে। নজর বিগড়ে গেছে আমাদের, না-হলে শিল্পের আগাগোড়া—তার পাবার গুলুকসন্ধান সমস্তই চোখে পড়তো আমাদের। কি চোখে চাইলেম, কিসের পানে চাইলেম, চোখ কি দেখলে এবং মন কি চাইলে, চোখ কেমন করে' দেখলে, মন কেমন ভাবে চাইলে, চোখ দেখলেই কি না, মন চাইলেই কি না—এরি উপরে পাওয়া না-পাওয়া, কি পাওয়া, কেমন পাওয়া, সবই নির্ভর করছে।

কাজের উপরে জাতক্রোধ রক্ত-চক্ষু নিয়ে নয়, সহজ চোখ সহজ দৃষ্টি এবং সেটি নিজের সহজ ইচ্ছা এবং আন্তরিক ইচ্ছা—এই নিয়ে নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা, নবরসরুচিরা যিনি তাঁর সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে হয় সহজে। রসের পেয়ালায় যদি নাগাল পাওয়া গেল তখন আর কিসের অপেক্ষা?...যতটুকু অবসরই হোক না কেন তাই ভরিয়ে নিলেম রসে, যেমনই কাজ হোক না কেন তাই করে' গেলেম—সুন্দর করে' আনন্দের সঙ্গে; যা বল্লেম, কইলেম, লিখলেম, পড়লেম, শুনলেম, শোনালেম—সবার মধ্যে রস এলো সৌরভ এলো সুষমা দেখা দিলে;—শিল্প ও রস শুকশারীর মতো বক্ষপিঞ্জরে চিরকালের মতো এসে বাসা বাঁধলো। কি কবি, কি শিল্পী, কিবা তুমি, কিবা আমি এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিথি-হলেম, রসের পূর্ণপাত্র ত কারুর সঙ্গে ছিল না, একেবারে খালি পাত্রই নিয়ে এলেম, এলো কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে একটুখানি পিপাসা। আমরা না জানতে মাতৃস্নেহে ভরে' গেল আসবামাত্র সেই এতটুকু পেয়ালা আমাদের, তার পর থেকে সেই আমাদের ছোট পেয়ালা—তাকে ভরে' দিতে কালে-কালে পলে-পলে দিনে-রাতে এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতুতে রসের ধারা ঝরেই চল্লো, তার তো বিরাম দেখা গেল না;—শুধু কেউ ভরিয়ে নিয়ে বসে' রইলেম নিজের পেয়ালা বেশ কাজের সামগ্রী দিয়ে নিরেট করে', কেউ বা ভরলেম পরে সেটা নব-নব রসে প্রত্যেক বারেই সেটা খালি করে'-করে'। এই কারণে আমরা মনে করি সৃষ্টিকর্ত্তা কোনো মানুষকে করে' পাঠালেন রসের সম্পূর্ণ অধিকারী, কাউকে পাঠালেন একেবারে নিঃস্ব করে'। এ কি কখনো হতে পারে? রসো বৈ সঃ বলে যাঁকে ঋষিরা ডাকলেন, তিনি কি বঞ্চক? রাজার মতো কাউকে দিলেন ক্ষমতা, কাউকে রাখলেন অক্ষম করে,' শিল্পীর সেরা যিনি তাঁর কি এমন অনাসৃষ্টি কারখানা হবে?—কেউ পাবে সৃষ্টির রস, সৃষ্টির শিল্পের অধিকার, আর-একজন কিছুই পাবে না? এত বড় ভুল কেবল সেই মানুষই করে যে নিজের দোষে নিজে বঞ্চিত হয়ে বিধাতাকে দেয় গঞ্জনা।...

এক-একবার ঘরের মধ্যে থেকেও হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হয় দরজাটা কোথায় হারিয়ে গেছে—উত্তরে কি দক্ষিণে কিছুই ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না; রসের মধ্যে ডুবে থেকে আমাদের রসের সন্ধান, আর শিল্পের হাটে বসে' শিল্পলাভের উপায় নির্দ্ধারণ, এও কতকটা ঐরূপ।

পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের এ-সবই তো যে-রস ঝরছে দিনরাত তারই নির্ম্মিতি ধরে' প্রকাশ পাচ্ছে; অখণ্ড রসের খণ্ডখণ্ড টুকরো তো এরা—একটি আলোর থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ! এর অধিকার পাওয়ার জন্যে কোনো আয়োজন কোন শাস্ত্রচর্চ্চাই দরকার করে না। কাজের জগতের মাঝেই রস ঝরছে—আনন্দের ঝরণা আলোর ঝোরা; তার গতি ছন্দ সুর রূপ রং ভাব অনন্ত; আর কোথায় যাবো—শিল্প শিখতে শিল্পকে জানতে? নীল আর সবুজ এমনি সাত রঙের সাতখানি পাতা, তারি মধ্যেই ধরা রয়েছে রসশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সঙ্গীত, কবিতা—সমস্তেরই মূলসূত্র ব্যাখ্যা সমস্তই! এমন চিত্রশালা যার ছবির শেষ নেই, এমন বাণী-মন্দির যেখানে কবিতার অবিশ্রান্ত পাগ্‌লা-ঝোরা ঝরছেই, এমন সঙ্গীতশালা যেখানে সুরের নদী সমুদ্র বেয়ে চলেছে অবিরাম, এর উপরে রসকে পাবার, শিল্পকে লাভ করবার, আর কি আয়োজন মাটির দেওয়ালের ঘরে করতে পারি? এর উপরে কিবা অভাব আমাদের জানাতে পারি? Artistএর সেরা, কারিগরের সেরা—বিশ্বকর্ম্মার এই অযাচিত দান, এই নিয়েই তো বসে' থাকা চলে;—দেখ আর লেখ, শোন আর বসে' থাক!

আর তো কিছুর জন্যে চেষ্টা হয় না ইচ্ছেও হয় না। এই অপ্রার্থিত অপর্য্যাপ্ত সৃষ্টি আর রস—একেই বুক পেতে নিয়ে সৃষ্টির যা কিছু—মানুষ থেকে সবাই—চুপচাপ বসে' রইলো ঘাড় হেঁট করে রসের মধ্যে

ডুবে, সেরা শিল্পীর এই কি রচনা, রচনার পরিপূর্ণতা—মুখবন্ধেই হলো কল্পনার শেষ? শিল্পীর রাজা যিনি শুধু একটা জগৎজোড়া চলমান বায়স্কোপের রচনা করে'ই খুসি হলেন, জীবজগৎটাকে সোনালী রূপালী মাছের মতো একটা আশ্চর্য্য গোলকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়াতেই তাঁর শিল্প-ইচ্ছার শেষ হয়ে গেল? চিত্রকর মানুষ তার টানা রূপগুলির টানে-টানে যেমন চিত্রকরের ঋণস্বীকার করে' চলায় সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্রকরকেই আনন্দ দিতে-দিতে আপনাদের সমস্ত ঋণ শোধ করে' চলে, তেমনি ভাবেই তো এই বিরাট শিল্পরচনার সৃষ্টি হলো, তাই তো এর নাম হল অনাসৃষ্টি নয়,—সৃষ্টি। সৃষ্ট যা, সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে ঋণী হয়ে বসে রইলো না,—এইখানেই সেরা শিল্পীর গুণপনা মহাশিল্পে মহিমা প্রকাশ পেলে। শিল্পী দিলেন সৃষ্টিকে রূপ, সৃষ্টি দিয়ে চল্লো শিল্পীকে আপনার রূপ রস সমস্তই। ওদিক থেকে এলো ওদিকের সুর এদিক পানে, এদিক থেকে চল্লো এদিকের সুর ওদিকে, অপূর্ব্ব এক ছন্দ উঠ্‌লো জগৎ জুড়ে! আমাদের এই শুক্‌নো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম-বর্ষার প্লাবন বুক পেতে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বল্লে—রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না? সবুজ শোভার ঢেউ একেবারে আকাশের বুকে গিয়ে ঠেক্‌লো; ফুলের পরিমল, ভিজে মাটির সৌরভ বাতাসকে মাতাল করে' ছেড়ে দিলে; পাতার ঘরের এতটুকু পাখী সকালসন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বল্লে—আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার।—নতুন-নতুন আলোর ফুলকি দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে' চল্লো, তারপর একদিন মানুষ এলো, সে বল্লে—কেবলি নেবো, কিছু দেবো না? দেবো—এমন জিনিষ যা নিয়তির নিয়মেরও বাইরের সামগ্রী; তোমার রস আমার শিল্প—এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্ম্মিত নির্ম্মাল্য ধর, এই বলে মানুষ, নিয়মের বাইরে যে, তার পাশে দাঁড়িয়ে শিল্পের জয়ঘোষণা করলে—

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতি ভারতীকবের্জয়তি॥"

নিয়মের মধ্যে ধরা মানুষের চেষ্টা, নতুন বর্ণে, নতুন-নতুন ছন্দে বহে' চল্লো নিয়মের সীমা ছাড়িয়ে ঠিক-ঠিকানার বাইরে। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার এই নির্ম্মিতি:—যেটা পরিমিতের মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিত দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে।

(বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৮) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবতত্ত্ব

...'দিব্' হইতে 'দেব' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিব্ এই ধাতুর অর্থ 'প্রকাশ' এবং 'ক্রীড়া'। যিনি প্রকাশ পান বা যিনি ক্রীড়া করেন; তিনিই দেব শব্দের যোগলভ্য অর্থ,—আবার যাঁহা দ্বারা প্রকাশ হয়, তিনিও দেব শব্দের অর্থ হইতে পারেন। সুতরাং, ভক্তের বুদ্ধি-বৃত্তিতে যিনি প্রকাশ পান, অথবা যাঁহার প্রভাবে সাধনাপর মানব, সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়, তিনিই দেব বা দেবতা। এই স্বয়ং-প্রকাশশীল ও সর্ব্বপ্রকাশ-হেতু দেবতা হিন্দুর একমাত্র উপাস্য। সকামের ত কথাই নাই, নিষ্কাম উপাসকও এই সর্ব্বপ্রকাশহেতু প্রকাশশীল দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন।...

শাস্ত্র সেই দেবকে বিশ্বরূপ ও বিশ্বাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এ সংসারের সকল বস্তুই তাঁহার উপর অধিষ্ঠিত, সকল পদার্থই তাঁহার সত্তায় সৎ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, সেই দেব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি এক ও অদ্বিতীয়; হিন্দুমাত্রেই তাঁহারই পূজা বা উপাসনা করিয়া থাকে।...ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে পৃথক দেবতা বলিয়া উপাসিত হইলেও সমগ্র উপাসক-সঙ্ঘের একমাত্র উপাস্য দেবতা সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তরাত্মা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমপুরুষ। তিনিই প্রকাশ ও প্রকাশয়িতা, এই প্রপঞ্চ কেবল তাঁহার ক্রীড়ামাত্র।

(বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৮) শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

শিল্প ও কৃষি সংবাদ

সূতা ও কাপড়।

১৯২১ অব্দের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এই তিন মাসে ভারতবর্ষে ১৬৮০ লক্ষ পৌণ্ড (১ পৌণ্ড=॥০ সের) সূতা এবং ১০১০ লক্ষ পৌণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২০ অব্দের ঐ তিন মাসে ১৬৩০ লক্ষ পৌণ্ড সূতা ও ১০০০ লক্ষ পৌণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২১ অব্দের এপ্রিল হইতে নভেম্বর এই আট মাসে ৪৫৬০ লক্ষ পৌণ্ড সূতা এবং ২৭১০ লক্ষ পৌণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২০ অব্দের ঐ আট মাসে যে পরিমাণ সূতা ও কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল, তদপেক্ষা ১৯২১ সালে অধিকতর পরিমাণে সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯১৯ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে ১০২০ লক্ষ পৌণ্ড সূতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ অব্দে ৬১০ লক্ষ পৌণ্ডের অধিক সূতা বিদেশে রপ্তানী হয় নাই।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, গতবর্ষে ভারতবর্ষে দেশী মিলের কাপড় ও সূতা অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আকের গুড় ও খেজুর গুড়।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান বর্ষে ৬৬২৭০০ বিঘা ভূমিতে আকের চাষ হইয়াছিল। গতবর্ষে ৬৫৬০০০ বিঘা ভূমিতে আক উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বৎসর দার্জ্জিলিং জেলাতে ধান্যের ন্যায় আকও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। রঙ্গপুর ও নোয়াখালি জেলায় ১৬ আনা আকের ফসল হইয়াছে; কুড়িটি জেলায় বার আনা হইতে পনর আনা, তিনটি জেলায় এগার আনা, এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় নয় আনা মাত্র আকের ফসল হইয়াছে। মোটের উপর বর্ত্তমান বর্ষে বাঙ্গালা দেশে আকের ফসল তের আনার কিছু অধিক হইয়াছে। গত বৎসরের অপেক্ষা এ বৎসর ফসল কম হইয়াছে। প্রতি বিঘায় ১০/০ মণ করিয়া গুড় ধরিলে, সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান বর্ষে ২৩৯০০০ টন্ গুড় উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর ২৫৪৬০০ টন্ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। খেজুর-গুড়ও এ বৎসর কম উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর খেজুর-গুড় ১২৪১০০ টন্ উৎপন্ন হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ১১৯৮০০ টন্ খেজুর-গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

গমের ফসল।

গত বৎসর ভারতবর্ষে ২,৩১৮৫০০০ একর ভূমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ২৭,৭৩৯,০০০ একর ভূমিতে গম উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশে গমের চাষ সামান্য পরিমাণে হয়।

(গন্ধবণিক, ফাল্গুন)

বাঙ্গালার লোকসংখ্যা

১৯২১ অব্দের মার্চ্চ মাসে বাঙ্গালাদেশে যে লোকগণনা হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট পাঠে জানা যাইতেছে যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে শতকরা ২$\frac{1}{2}$ লোক বাড়িয়াছে। অর্থাৎ দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার মোটজনসংখ্যা ৪৬,৩০৫,১৭০ ছিল ; তাহা বাড়িয়া ৪৭,৫৯২,৪৬২ হইয়াছে। এই জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ২৪,৬২৮,৩৬৫ জন এবং স্ত্রীলোক ২২,৯৬৪,০৯৭ জন। বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক।

কোন্ বিভাগের কোন্ জেলায় কত লোকসংখ্যা, এবং শতকরা কত বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :--

বর্দ্ধমান বিভাগ।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
বর্দ্ধমান	১৪৩৮৯২৬	০	৬.৫
বীরভূম	৮৪৭৫৭০	০	৯.৪
বাঁকুড়া	১০১৯৯৪১	০	১০.৪
মেদিনীপুর	২৬৬৬৬৬০	০	৫.৫
হুগলী	১০৮০১৪২	০	০.৯
হাওড়া	৯৯৭৪০৩	৫.৭	০
মোট	৮০৫০৬৪২		

প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
২৪ পরগণা	২৬২৮২০৫	৮	০
কলিকাতা	৯০৭৮৫১	১.১	০
নদীয়া	১৪৮৭৫৭২	০	৮
মুর্শিদাবাদ	১২৬২৫১৪	০	৮
যশোহর	১৭২২২১৯	০	১.২
খুলনা	১৪৫৩০৩৪	৬.৭	০
মোট	৯৪৬১৩৯৫		

রাজশাহী বিভাগ।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
রাজশাহী	১৬৮৯৬৭৫	০.৬	০
দিনাজপুর	১৭০৫৩৫৩	১	০
জলপাইগুড়ি	৯৩৬২৬৯	৩.৭	০
দার্জ্জিলিং	২৮২৭৪৮	৬.৫	০
রঙ্গপুর	২৫০৭৮৫৪	৫.১	০
বগুড়া	১০৪৮৬০৬	৬.৬	০
পাবনা	১৩৮৯৪৯৪	১	২.৭
মালদহ	৯৮৫৬৬৫	০	১.৮
মোট	১০৩৪৫৬৪		

ঢাকা বিভাগ।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
ঢাকা	৩১২৫৯৬৭	৮.৩	০
ময়মনসিংহ	৪৮৩৭৭৩০	৬.৯	০
ফরিদপুর	২২৪৯৮৫৮	৪.৮	০
বাখরগঞ্জ	২৬২৩৭৫৬	৮.২	০
মোট	১৩৮৩৭৩১১		

চট্টগ্রাম বিভাগ।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
ত্রিপুরা	২৭৪৩০৭৩	৯.৭	০
নোয়াখালি	১৪৭২৭৮৬	১.০	০
চট্টগ্রাম	১৬১১৪২২	৬.৮	০
পার্ব্বত্য প্রদেশ	১৭৩২৪৩	১২.৬	০
মোট	৬০০০৫২৪		

মিত্ররাজ্য।

জেলা	মোট লোকসংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধি	শতকরা হ্রাস
কুচবিহার	৫৯২৪৮৯	০	০.১
ত্রিপুরা রাজ্য	৩০৪৪৩৭	৩২.৬	০
মোট	৮৯৬৯২৬		

(গন্ধবণিক, ফাল্গুন)

—

কদলী ও তাহার ব্যবহার

ফলের মধ্যে কদলী বা কলা একটি-শ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য। ইহা পুষ্টিকারক উপাদানে পূর্ণ। ইহাতে শর্করা, শ্বেতসার পদার্থ (starch), অ্যাল্‌বুমেন্ (albumen) ও লবণ (mineral salts) আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাকে নীরসীকৃত অর্থাৎ ইহার জলীয়ভাগকে অপসারিত (dehydration) করিতে পারিলে, কলার শুষ্ক টুক্‌রা, কলার আটা, ও পাকা কলা হইতে উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ও তৎসমুদায় দেশ-বিদেশে রপ্তানী করিয়া লাভজনক ব্যবসায় করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলসমূহকে নীরসীকৃত করিবার উপায় বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নীরসীকৃত ফল খাইয়া যুদ্ধের সময় জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়ার বহুলোক প্রাণধারণ করিয়াছিল।

কলা হইতে আটা বা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে, সুপক্ক ও পরিপুষ্ট কলা বাছাই করিয়া লইতে হয়। সুপক্ক কলা হইতে figs প্রস্তুত করিতে হইলে, সুমিষ্ট ছোট আকারের কলাই উপযুক্ত। কলা পাকিয়া হরিদ্র বর্ণ হইলে, তাহার ছাল ও আঁশ তুলিয়া ফেলিতে হয়। পূর্ব্বে হস্তদ্বারাই ছাল ও আঁশ তোলা হইত। কিন্তু এখন ছাল ও আঁশ তুলিবার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ছাল ও আঁশ তুলিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। তার পর ছাড়ানো কলাগুলি খুন্‌চা বা পাত্রের উপর সাজাইয়া রেলের উপর চালিত ছোট ছোট গাড়ীতে বোঝাই করা হয়। সেই গাড়ীগুলি কৃত্রিম উপায়ে উত্তপ্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে চালিত হইতে থাকে। এইরূপে কলার রস বা জলীয়ভাগ প্রায় $\frac{3}{4}$ অংশ কমিয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কলার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও ঘটে। এই পরিবর্ত্তন-ফলে কলার শ্বেতসার (starch) অংশগুলি শর্করাতে পরিণত হয়। কলা এইরূপে প্রস্তুত হইলে, তাহার রং সোনার মত হয়, এবং তাহা ফিগ্ (fig) ফলের মত চট্‌চটে হয়। এইগুলি বাক্সে প্যাক্ করিয়া রাখিলে, এবং বাক্সগুলি শীতল, শুষ্ক, ও বায়ু-সঞ্চালিত স্থানে রাখিলে, অনেক মাস ধরিয়া কলাগুলি সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং তাহার রং ও আস্বাদনও চমৎকার থাকে। যদি অধিক পক্ক বা অপক্ক কলা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহাতে টক্ গন্ধ হয়, এবং তাহার আস্বাদনও বিকৃত হইয়া যায়।

শুষ্ক কদলীখণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে, বড় বড় কাঁচকলা সংগ্রহ করিতে হয়। কাঁচকলার মধ্যে শ্বেতসার পদার্থ অধিক পরিমাণে ও শর্করা অল্প পরিমাণে থাকায়, তাহা হইতে ভাল ফিগ্ প্রস্তুত হয় না। শুষ্ক কদলী-খণ্ডগুলি অল্পেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহা কলে চূর্ণ করিলে তাহা হইতে চমৎকার আটা প্রস্তুত হয়। এই আটা গমের আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে বিস্কুট প্রস্তুত করিলে, সেই বিস্কুট সৌগন্ধযুক্ত, উপাদেয় ও সহজপাচ্য হয়। কলার আঁটা হইতে পিষ্টক, পাই (Pie) ও মিষ্টান্নও প্রস্তুত হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলাগুলি শুষ্ক করিবার সময়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদের শ্বেতসার অংশগুলি সহজ-পাচ্য শর্করাতে পরিণত হয়। সুপক্ব কদলীর ন্যায় ইহাদের অ্যাল্‌বুমেন্ ও লবণের ভাগ সুরক্ষিত থাকে।

সদ্যসংগৃহীত তাজা কলা অপেক্ষা এই নীরসীকৃত কলার খাদ্য কোনও কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ। নয় পোয়া ওজনের কলা হইতে অর্দ্ধ সের পরিমিত নীরসীকৃত কলার খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই খাদ্যের পুষ্টিকারক গুণ তাজা কলা অপেক্ষা সাড়ে চারিগুণ বেশী, এবং ইহা প্রায় ছয় আনা সুলভ। এই খাদ্য অতিশয় সহজপাচ্য এবং ইহার তুল্য পুষ্টিকারক খাদ্য খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশে প্রচুর পরিমাণে কলা জন্মে। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেহ সুপক্ব কলা হইতে উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য এবং কাঁচকলা হইতে আটা প্রস্তুত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি যে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জার্ম্মানীর বার্লিন্ (Berlin) নগরে ডাক্তার হারমান্ লুথজের (Dr. Herman Luthje) বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলার খাদ্য ও আটা প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে। কেহ সেখানে গিয়া এই খাদ্য ও আটা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া শিখিয়া আসিতে পারিলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

(গন্ধবণিক, ফাল্গুন)

—

কলিকাতার কথা

১৭৮৪ খৃঃ পাথুরিয়া গির্জ্জা বা 'সেণ্ট জন চ্যাপেল্' তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৭৮৪ খৃঃ ১৮ই জানুয়ারি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও ১৭৮৭ খৃঃ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ লেফ্‌টেনাণ্ট্ কর্ণেল্ রবার্ট্ কিড্ শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র জেমস্ কিড্ খিদিরপুরের ডক তৈয়ারি করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতে খিদিরপুর হইয়াছিল।

তখন কলিকাতায় খুনজখম, নরবলি, দাসবিক্রী হইত। বাগবাজারে, চিৎপুরে কালীর মন্দিরে ১৭৮৮ খৃঃ ৬ই এপ্রেল শনিবার অমাবস্যায় নরবলি হইয়াছিল। কুমারটুলির মিত্রদের ছেলের বিবাহে কোম্পানীর কেল্লায় কামানদাগা হইয়াছিল।

চোর-ডাকাতের উৎপাত থামাইবার জন্য তখন তাহাদের ফাঁসী দেওয়া হইত।

১৭৮৮ খৃঃ খিদিরপুর বৈঠকখানা ও বিরজিতলায় গরীবদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করিবার অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। পীড়িতগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্য বৈঠকখানার বাজারে একটি অস্থায়ী হাঁসপাতাল হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস্ নিজে তিন হাজার টাকা চাঁদা দিয়া সর্ব্বপ্রথমে এ দেশের লোকের জন্য হাঁসপাতাল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন এ দেশের লোকেরা ইংরেজি ডাক্তার দেখাইত না বা তাহাদের ঔষধ খাইত না। কলিকাতার লটারির টিকিটে এস্‌প্লেনেড, টাউনহল, ট্রিজ্ঞি, চ্যারিটেবল্ ফাণ্ডের সূচনা হইয়াছিল। তখন দরিদ্র খৃষ্টানদিগকে বড়দিন ছোটদিন ও গুড্ ফ্রাইডেতে উক্ত ফণ্ড হইতে টাকাকড়ি দেওয়া হইত। তখন লোকেরা গঙ্গাস্নানের জন্য ঘাট করিয়া দেওয়া বড় পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করিত। সেকালের কলিকাতার ঘাটের পরিচয়ে তখনকার নামজাদা লোক ও জায়গার বিবরণ জানা যায়। ইহাদের মধ্যে ইংরেজ ও আর্ম্মানির নাম পাওয়া যায়। তাহারা তাহাদের মাল তুলিবার সুবিধার জন্য ঐসকল ঘাট করিয়াছিল।

কর্ণওয়ালিসের আমলে কোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইয়াছিল। স্যার উইলিয়ম জোন্স্ শকুন্তলা আদি নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বেচিয়া যাহা পাইতেন তাহাতে অক্ষম দেনাদারের উদ্ধার করিতেন। যেখানে নন্দকুমারের বিচার হইয়াছিল সেই ওল্ড-কোর্ট-হাউস ভাঙ্গিয়া কর্ণওয়ালিস্ সেইখানে সেই কুবিচারের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বোধ হয় স্কচ্ গির্জ্জা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের গরীব নুনপ্রস্তুতকারী মলঙ্গীরা তাহাদের প্রধান কর্ম্মচারী হিলম্যান হেঙ্কেলের মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিত।

বাঙ্গালায় ১৭৮৯ খৃঃ গোয়াটিমালা হইতে নীলের নমুনা আনাইয়া বিলাইয়া উহার চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতায় ১৭৯৪ খৃঃ প্রথম বাঁধাকপির চাষ হইয়াছিল। তখন কলিকাতা হইতে চিঠি (২॥০ তোলা) কাশীতে ।৶০, পাটনায় ।/০, ভাগলপুর নাটোর বীরভূম রাজমহল ৶০, বর্দ্ধমান নদিয়া শান্তিপুর মুর্শিদাবাদ ৵০ মাশুলে পৌঁছিত। উইণ্টল সাহেব এস্‌প্লানেড হইতে কলিকাতায় রাত্রি ৮টা-৯টার সময় প্রথম বেলুনে উঠিয়াছিলেন। এখন যেখানে নূতন চীনাবাজার আছে সেইখানে লেবেডেফ্ সাহেব বাঙ্গালীর ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর ইংরেজী যন্ত্রের সহিত গতাদিতে মিলাইয়া এক নূতন ধরণের থিয়েটার খুলিয়াছিলেন। গোপীমোহন ঠাকুর উহা ভাঙ্গিয়া নূতন চীনাবাজার করিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ ২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় বাঙ্গালীর প্রথম রাজভক্তির এক সভায় বিশহাজার আটশত টাকা চাঁদা তুলিয়া ব্রিটিশজাতিকে নেপোলিয়নের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিসের আমলেই হাঁসুড়ে ফাঁসুড়ে ঠগ চোর ডাকাতের ভয় কমিয়াছিল, রাস্তা পাকা হইয়াছিল; ব্যাঙ্কের নোট বাহির হইয়াছিল।

(সুবর্ণবণিক-সমাচার, ফাল্গুন) শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

—

আইস্‌লণ্ডের সাগা সাহিত্য

ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ যে-কোন প্রকার বীরত্বে পূর্ণ পুরাতন কাব্যকাহিনী সাগা (Saga) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই-সকল কাহিনী যে একেবারে ঐতিহাসিক তাহাও বলা চলে না, অথচ একেবারে কাল্পনিক বলিয়াও ইহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু আইস্‌লণ্ডের সাগা বলিতে আইস্‌লণ্ডীয় ভাষায় তদ্দেশবাসী-রচিত তত্রত্য কোন বীরপুরুষের জীবন-কাহিনী-সম্বলিত গদ্যকাব্য বুঝায়। আইস্‌লণ্ডের এই সাগা সাহিত্য জগতের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং ইহাই এই দ্বীপটির গৌরবের বস্তু।...

এই সাগা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা প্রথমতঃ আইস্‌লণ্ডের একটা ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস ও তদ্দেশবাসীগণের পুরাতন রীতিনীতি ও সংসার-যাত্রার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী সত্তরের কোঠায় পড়িলে রাজ্য-বিপ্লবের ফলে নরোয়ের কতকগুলি অধিবাসী দেশত্যাগপূর্ব্বক আইস্‌লণ্ডে বসতি উঠাইয়া লইয়া যায়।...বস্তুতঃ বলিতে গেলে একরূপ সাগা সাহিত্য হইতেই স্কেণ্ডিনেভীয় দেশত্রয়ের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে।...এই-সকল

দেশের লোকের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদয়েরও বিশেষ বিবরণ সাগা নামক এই গদ্য-সাহিত্যের ও এড্ডা (Edda) নামধেয় পদ্য-সাহিত্যের বাহিরে বড় দেখা যায় না।......

...ঐতিহাসিক কালের ইউরোপীয় সভ্যতাকে সাহিত্য ও সমাজেতিহাসের ধারা সম্পর্কে অত্যন্ত মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—(১) বীরত্ববৈভবের যুগ বা হিরোয়িক (Heroic) যুগ, (২) অলৌকিকত্ব-প্রধান ভাবুকত্বের যুগ বা রোমান্টিক (Romantic) যুগ, এবং (৩) আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক (Scientific) যুগ। ইহাদের প্রত্যেক যুগের সাধনা ও আদর্শ ভাষায় প্রকাশিত হইবার সময়ে স্বভাবতঃই সাহিত্যের অসংখ্য রূপের মধ্যে একটা বিশেষরূপ ধারণ করিয়া নিজ নিজ বিশেষত্ব জ্ঞাপন করিয়াছে। হিরোয়িক যুগের পক্ষে এই বিশিষ্ট সাহিত্য-রূপ হিরোয়িক এপিক (Heroic Epic) বা শৌর্য্যকাহিনীপূর্ণ মহাকাব্য। রোমান্টিক যুগের পক্ষে রোমান্স অব শিভাল্‌রী (Romance of chivalry) বা আর্ত্তত্রাণ, ধর্ম্মরক্ষিতা, শীলসম্পন্ন যোদ্ধার অলৌকিক বীরকীর্ত্তির কাব্য-কাহিনী; আর বৈজ্ঞানিক যুগের পক্ষে রিয়ালিষ্টিক নভেল (Realistic novel) বা বস্তুতন্ত্র কথাসাহিত্য। কেবল ইতিহাসের হিসাবে যাহাকে মধ্যযুগ (Middle Ages) বলে, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ হিরোয়িক ভাবাক্রান্ত ছিল, এবং পরার্দ্ধে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে শিভাল্‌রী (chivalry) ভাবের অভ্যুদয় হয়। এই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই আদিম সাগা রচনার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।

...খৃষ্টান ধর্ম্মানুপ্রাণিত রোমীয় সাহিত্যসাধনার প্রভাববশে ইউরোপে রোমান্টিক যুগের আবির্ভাব হইল, এবং প্রাচীন হিরোয়িক যুগের বীরধর্ম্ম খ্রীষ্টান আদর্শের অনুপ্রেরণায় শিভাল্‌রীতে পরিণত হইল। এইরূপে ইউরোপীয় জাতিসকল স্ব স্ব বিশেষত্ব হারাইয়া ভাব কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে সমতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু জার্ম্মেণীয় জাতির যে শাখা স্কেণ্ডিনেভিয়ার নরোয়ে প্রদেশে বাস করিত, তন্মধ্যে যাহারা আইসলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা দৈবগতিকে এই বিশিষ্টতার সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম ও রোমক নীতির প্রভাবের বহির্ভূত বলিয়া আইসলণ্ডের সাগা সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী হিরোয়িক যুগের শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ নিদর্শন-সমূহ রক্ষিত হইয়াছে।......

...ব্যুৎপত্তি অনুসারে সাগা অর্থে 'কাহিনী'—যে গল্প কথিত হয়।... আদিম সাগাগুলিকে কেবল মুখে মুখে আবৃত্তি করা হইত। ইহাদের কতকগুলি পরে লিখিত হইয়াছিল।...এই-সমস্ত সাগাতে যে ঘটনা-রাজি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ স্থলে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বকার এবং কোন স্থলেই ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কালের নহে।...... ১০০০ খৃষ্টাব্দের দু' এক বৎসর পরে আইসলণ্ডীয়গণ খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহণ করে।

কতকগুলি লিখিত সাগার বর্ণিত ঘটনাবলী সাগা-যুগের বা তৎপরবর্ত্তী কোনও কালেরই নহে, পরন্তু অধিকাংশ কল্পনা প্রসূত। ...ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীর সাগা-সমূহেই প্রথমতঃ ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব আসিয়া পড়ে।

কতকটা খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিধান সম্পর্কে আর কতকটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আইসলণ্ড নরোয়ে রাজ্যের অধীন হওয়াতে, আইসলণ্ডীয় সাগা সাহিত্যে ইউরোপীয় বাতাস লাগিতে থাকে।...ত্রয়োদশ শতাব্দী সাগা সাহিত্যের পরাকাষ্ঠার যুগ।

রাজতন্ত্র প্রথার বিস্তারের ফলে নরোয়েবাসীগণ আইসলণ্ডে উপনিবেশ সংস্থাপন করে।...... ইহার পূর্ব্বে সমাজবিধানে রাজশক্তি প্রবল ছিল না। সমগ্র দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল, এবং উপরে রাজা থাকিলেও জার্ম্মেণীয় জাতির আদিম প্রকৃতি অনুসারে মণ্ডলের প্রধানগণ প্রকৃত পক্ষে অনন্যপরতন্ত্র ভাবেই জীবন যাপন করিতেন। অধিকন্তু অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ঐসকল স্থানের সাহসিক অধিবাসীবৃন্দ সমুদ্রোপকূলভূমিতে লুণ্ঠনবৃত্তি দ্বারা জীবিকা ও ধন সঞ্চয় করিত। এই কারণে ইহাদের প্রকৃতি পরচ্ছন্দানুবর্ত্তনে আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে।... এই-সকল দৃঢ়মতি বীরগণ যে নূতন দেশে নিরাপদেই বসতি সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। সামান্য কারণে ইহাদের মধ্যে ঘোরতর কলহ বাধিত এবং জাতীয় প্রকৃতি-সুলভ প্রতিশোধপরায়ণতার তাড়নায় ইহা হইতেই দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যক্তিগত ও বংশগত ভীষণ বিরোধ সৃষ্ট হইয়া রক্তক্ষয়ের কারণ হইত। এইরূপ নানা ঘটনায় নায়কগণের বীরকর্ম্মের ও অপকর্ম্মের স্মৃতি প্রতি জনপদেই সযত্নে রক্ষিত হইত।

...বিদেশের ইতিবৃত্তাদি বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়পূর্ব্বক কেহ দেশে প্রত্যাগত হইলে, দেশবাসীরা উহা আগ্রহের সহিত শুনিত ও মনে রাখিত। উপনিবেশ সংস্থাপনের পরে অল্পকাল মধ্যেই প্রত্যেক মণ্ডলের অধিবাসীগণের সম্মিলনে টিং (Thing) নামে এক-একটি সাধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।......এইরূপে ইউরোপের উত্তরাংশের বহুদেশের ইতিহাস-বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান আইসলণ্ডীয় সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল।

...এইরূপ কথকতাশক্তি ভদ্রজীবনের একটি শ্লাঘ্য ভূষণ বলিয়া পরিগণিত ছিল। সামাজিক উৎসবাদিতে কথকেরা উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন এবং বহু ভদ্র ব্যক্তি জীবিকা স্বরূপ চারণবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। বিদেশে রাজারাজড়াদের কাহিনী-কথনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে যশোলাভ ও ধনাগম উভয়ই সহজসাধ্য হইত। সাগা-কথক (Saga man) ও স্কাল্ড (Scald) বা কবিরূপে আইসলণ্ডীয়গণ বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিল এবং তজ্জন্য বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।...

হিরোয়িক আদর্শের বীরত্বকাহিনী ভাষায় প্রকাশের উপযোগী এইরূপ সাহিত্য-রীতির উদ্ভাবন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আইসলণ্ডীয়গণের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।...কিন্তু ক্রমশঃ সমসাময়িক ব্যাপার বর্ণনোপলক্ষে এই সাগারূপের প্রয়োগের ফলে অবশেষে অতীতের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান ঘটনা-সম্বলিত মহাকাব্য রচনা সাগা সাহিত্যের আবার এক অতুলিত আবিষ্কার। এই স্থলে আত্মজীবনী ও মহাকাব্য এক হইয়া পড়িয়াছে, বর্ণিত ব্যাপারসমূহের অনুষ্ঠাতা ও বর্ণনাকারীর পার্থক্য দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, ঘটনা সংগ্রহ ও সাহিত্যাস্বাদজনিত রসোল্লাসের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। এই অপরূপ সাহিত্যের লক্ষণগুলির নির্দ্দেশ ও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভাব, ভাষা ও ভাষারীতির সমন্বয়-ফলে সাগা সাহিত্য যেমন একদিকে কাব্যকলার এক অপূর্ব্ব রূপ, তেমন অন্যদিকে আবিকৃত হিরোয়িক আদর্শের ও জার্ম্মেণীয় জাতির আদিম অবস্থার এক অক্ষত-দুর্ল্লভ চিত্র।...

সাগার গদ্যরীতিতে কৃত্রিমতা ঢুকিতে পারে নাই।...উহা যেন কথা ভাষারই প্রকৃতি-অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিণতি।...ঘটনাকালে প্রত্যক্ষদর্শী বা পাত্রপাত্রীগণ মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আক্রান্ত হইত, ঠিক সেই ভাবই বজায় রাখা হইয়াছে। পাত্রপাত্রীগণের চরিত্রাঙ্কনেও অপরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।...বস্তুতঃ একটি সামান্য ব্যাপার, বা একটি ক্ষুদ্র কথাতে এত অধিক অভিব্যঞ্জনা অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না।...হয়ত এক জনের কথার মধ্যে বহু-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবশে আরও একাধিক গোটা

সাগা আসিয়া পড়ায় পূর্ব্বেকার সাগাটির সঙ্গতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।... বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব আর-একটি দোষ।...

আবার আবৃত্ত ও শ্রুত হইবার জন্ত রচিত হইয়াছিল বলিয়া সাগার আখ্যানবস্তু ও ভাষারীতিতে কোন কোন বিষয়ে বৈচিত্র্যের অভাব এবং গতানুগতিকত্ব ঘটাই স্বাভাবিক। কারণ যাহা আবৃত্তি করিতে হইবে তাহা ভালরূপ মুখস্থ থাকা আবশ্যক। বিষয়ের সাদৃশ্য ও ভাষার বাঁধিবোল থাকাতে কথক ও শ্রোতা উভয়েরই স্মৃতিশক্তির সহায়তা হইত। অন্যান্য দোষগুণগুলিও এইরূপে প্রাচীন আইস্‌লণ্ডীয়গণের স্বভাব, প্রবৃত্তি ও সামাজিক অবস্থার স্রোতোজাত ফল।

সাগা সাহিত্যে উহাদের যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে গৃহস্থের জীবনযাত্রা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ভাগ করা ছিল। গ্রীষ্মকালে মাছধরা, পক্ষী-শিকার, মেষচারণ, ঘাস কাটা ও কাঠ-কুড়ান প্রভৃতি বাহিরের কাজ হইত, এবং ঘরের ভিতর বসিয়া কাপড় বুনা, যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে দীর্ঘ শীতকাল কাটিত। কতকগুলি নিয়মিত উৎসবোপলক্ষে সম্মিলন দ্বারা বৎসরের কাল কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইত। বসন্তকালে কোন কোন উৎসব হইত, এবং স্থানীয় টিং বা সাধারণ সভা বসিত; গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে বৃহত্তর আল্‌টিং (Althing) সভার অধিবেশন হইত; গ্রীষ্মাবসানে বিবাহাদি শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইত এবং শীতের মাঝামাঝিও একটা বহুদিনব্যাপী উৎসব প্রচলিত ছিল।

অধিবাসীবৃন্দ স্বাধীন ও পরাধীন (Slave) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। স্বাধীন অধিবাসীরাই শাসন-ক্ষমতার পরিচালনা করিতেন বটে, কিন্তু সামাজিক আচার-ব্যবহারে দলপতি, সামান্য গৃহস্বামী ও নফর ইঁহাদের কাহারও মধ্যে কোনরূপ বাধা নিষেধ না থাকাই তখন স্বাভাবিক ছিল। প্রভুভৃত্য সকলে একই প্রকার জীবন যাপন করিত, একই খাদ্য আহার করিত, একই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। বসন ভূষণ আচার ব্যবহারেও তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাইত না। পরাধীন শ্রেণীভুক্ত নফরেরাও একেবারে ক্রীতদাসের মত ছিল না। তাহাদেরও কতকগুলি বিধি-সঙ্গত অধিকার ছিল এবং বিক্রয়কালে তাহাদের মূল্য আইনের বিধানে নির্দ্দিষ্ট হইত।...

উচ্চনীচের মধ্যে চিন্তার বিষয় লইয়া কোন প্রভেদ ছিল না। হিরোয়িক ভাবাপন্ন সমাজে ইতর ও ভদ্রের জ্ঞানে কর্ম্মে বিশেষত্ব থাকিলেও এরূপ বিভিন্নতা ছিল না যে, তাহারা তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। সংসারের নিত্যকর্ম্মে তাহারা একই পথেই চলিত। সামান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে উচ্চের গরিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত না। উচ্চবংশজাত বীরপুরুষগণ গো-মহিষাদির দোষ গুণ নিজেই দেখিয়া লইতেন।...গোমহিষাদি পালিত পশু, জল-পথে লুণ্ঠন, জোর করিয়া কাহাকেও অপহরণ, নানাপ্রকারের বাণিজ্যজাত চোরাই মালের পুনরুদ্ধার, বৈরনির্য্যাতন, আত্মীয়-স্বজনের সম্মান রক্ষা প্রভৃতি বিষয় লইয়া তাহারা ব্যাপৃত থাকিত, এবং এ সকল ব্যাপার বুঝিতে কাহারও পক্ষে সূক্ষ্ম চিন্তা-শক্তির প্রয়োজন হইত না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইসমুদয় প্রাকৃত বিষয়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া সাগা সাহিত্যের অবলম্বন হইয়াছে।...সাগা সাহিত্যের চরিত্রগুলিও এক-একটি জীবন্ত মনুষ্যের মত।...

স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন ইউরোপের উত্তরপথের ভদ্রবংশীয় বীরপুরুষের আদর্শ। ইঁহারা প্রতিবাসী অপর অনন্য-পরতন্ত্র গৃহস্থগণের নিকট চিরকাল সম্মান প্রাপ্ত হইতেন; সম্পত্তিবত্তা গুণে ও উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রামস্থগণের সকল অনুষ্ঠানে অধিনেতা হইতেন; কিন্তু প্রজা, সামন্ত বা কর্ম্মচারীরূপে নিজেরা কখনও কোন রাজার অধীন হইতেন না; কেহ তাঁহাদের নিজের বা কোন আত্মীয়ের অনিষ্ট বা অমর্য্যাদা করিলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উহার জন্য আইন-নির্দ্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে, বা অন্যভাবে স্বীয় শক্তিতে উহার প্রতিশোধ দিতে না পারিলে, অসম্মানকর ও কর্ত্তব্যের ত্রুটিজনক বলিয়া মনে করিতেন, পরন্তু প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিশোধ-অন্তে বৈরভাব ত্যাগ করিতেন। এই ছিল জার্ম্মেনীয় জাতির প্রচলিত ব্যবস্থা। উহার যে শাখা আইস্‌লণ্ডে চলিয়া যায়, তাহারা এই ব্যবস্থা আরও দৃঢ়তার সহিত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

এক-একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এই দ্বীপে আসিয়া এক-একটি জনপদ স্বাধিকারভুক্ত বলিয়া দখল করিয়া লইতেন। তিনিই এই জনপদের জমি খণ্ডে খণ্ডে সঙ্গীগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। এইরূপে এক-একটি বাড়ী হইত। প্রত্যেক বাড়ীর মালিক এক-একটি স্বতন্ত্র পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। এইরূপ বাড়ীই তথাকার সমাজ-গঠনের মূলীভূত। কতকগুলি বাড়ীর সমষ্টিকে এক-একটি টিং (Thing) বলিয়া ধরা হইত। এইরূপ টিং-সকলের সমবায়ে আইস্‌লণ্ডীয় সাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল।

যিনি জনপদটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, তিনি, স্বভাবতঃই তাহাদের নেতা হইতেন। টিংএর অন্তর্গত জনপদ মধ্যে পুরাতনধর্ম্মানুযায়ী পূজা ও বলির উৎসবে তিনিই পৌরোহিত্য করিতেন; বিভিন্ন পরিবারের কর্ত্তারা টিং সভায় সম্মিলিত হইলে তিনিই সভাপতি হইতেন এবং প্রয়োজন হইলে টিংএর অধিবাসীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ সমীপবর্ত্তী অন্যান্য জনপদের প্রধানগণের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেন। এইরূপ দলপতিগণকে ভূম্যধিকারী বা স্থানীয় শাসনকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। কারণ, বাড়ীর মালিকগণ ইচ্ছা করিলে এক দলপতির পরিবর্ত্তে অপর দলপতির অধীনস্থ হইতে পারিতেন; আবার দলপতিও স্বয়ং অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার 'দলপতি' পদটি উত্তরাধিকার-সূত্রে কাহাকেও দিয়া যাইতে পারিতেন, বিক্রয় করিতে পারিতেন, কয়েক জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারিতেন, এমন কি বন্ধকও দিতে পারিতেন। দেশে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত থাকা পর্য্যন্ত এই দলপতিগণ প্রভূত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন।

নিকটবর্ত্তী দলপতিগণের ও তাঁহাদের অধীনস্থগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদের ফলে, কোন বিধান অনুসারে উহার মীমাংসা হইবে তাহার অনিশ্চয়তাবশতঃ, পরিশেষে ৯৩১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সমগ্র দ্বীপটির জন্য আল্‌টিং (Althing) নামে একটি 'মহাসভার' প্রতিষ্ঠা হইল এবং ইহার একজন সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইলেন। ইনি সমগ্র দেশের জন্য এক সাধারণ বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এইসকল পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, বংশপরিচয় যুদ্ধকলহ ও আইনের বিধান লইয়া ব্যবস্থার খুঁটিনাটি তর্ক ইত্যাদি বিষয় আইস্‌লণ্ডের সাগা-সমূহে কেন পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়।...

(সহচর, ফাল্গুন)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার

সরস্বতী পূজা

...সরস্বতী পূজা ঠিক কবে কোন্ সময় কাহার দ্বারা আরম্ভ হইল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা যে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের...প্রকৃতি-খণ্ডে সরস্বত্যুপাখ্যানের

চতুর্থ অধ্যায়ে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপে গুরুশাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া সূর্য্যের উপদেশে সরস্বতীর স্তবস্তুতির দ্বারা সেই নষ্টজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে।… সরস্বতীর ইতিহাস অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমরা মূর্ত্তি-পূজার ক্রমাভিব্যক্তিও দেখিতে পাই।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণ দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে-সকল দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী দেবীর নামই বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে স্ত্রী-দেবতাদিগের স্থান নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ-সকল দেবতাগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উষা এবং তৎপরেই সরস্বতী। ঋগ্বেদের তিনটি সম্পূর্ণ সূক্তে এবং অন্যান্য সূক্তের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে।… 'সরস্বৎ' শব্দের অর্থ 'প্রভূত-জলবিশিষ্ট'। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী হইয়াছে।… ঋগ্বেদে সরস্বান্ ও সরস্বতী দুইজনের স্তব আছে,…অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগকে প্রভূত জলবিশিষ্ট (নদ বা নদী) রূপেই মনে করা যায়।… ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে আছে।—…

বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্॥ ৬॥

অর্থাৎ "শুভ্রবর্ণে দেবি! বর্দ্ধিত হও. স্তবকারীকে অন্নদান কর।"…

উভে যত্তে মহিমা শুভ্রে অন্ধসী অধিক্ষিয়ংতি পূরবঃ। সা নো বোধ্যবিত্রী॥

অর্থাৎ হে শুভ্রবর্ণে (সরস্বতী), যে তোমার মহিমার দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ (দিব্য ও পার্থিব অগ্নি অথবা গ্রাম্য ও আরণ্য) অন্ন প্রাপ্ত হয়, সেই তুমি আমাদিগের রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও (বা জ্ঞান দান কর)।…

ঋষিদিগের স্তবস্তুতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সরস্বতী একটি অজেয় জলপ্রবাহ। কিন্তু…তাঁহারা ইহাকে চেতনাবিহীন জলপ্রবাহ বলিয়া মনে করিতেন না। ইহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয়, অদৃশ্য দেবতার সাক্ষাৎকার যেন তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল অন্নদাত্রী ও জলবাহিকা তাহা নহেন, তিনি অন্নযুক্ত-যজ্ঞবিশিষ্টা, যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী (সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী ধিয়াবসুঃ—১।৪।১০), সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী (চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতংতী সুমতীনাং), এবং সকল জ্ঞানের উদ্দীপয়িত্রী (ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি—১।৪।১২)। সরস্বতীর এই যে সকল গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার বাগ্‌দেবীত্বও অঙ্কুর থাকিতে পারে।…

বেদের মন্ত্রের দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা হয়, তিনিই দেবতা (যা তেন উচ্যতে সা দেবতা); সুতরাং নদীপ্রবাহ 'দেবতা'।… এই সরস্বতীকে আমরা কখন কখন ইলা ও ভারতীনাম্নী দুইটি স্ত্রীদেবতার সহিতও যুক্ত দেখিয়া থাকি। ইলা পৃথিবী, বাক্, অন্ন ও গোপার্যের অন্তর্গত। ভারতীও বাক্-পর্য্যায়ান্তর্গত। কিন্তু ১০ম মণ্ডলে ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্রে এই তিন জনকেই আহ্বান করা হইয়াছে। সেস্থানে ভারতীর ব্যাখ্যা হইয়াছে…সর্ব্বভূত জলধারা পূর্ণ করেন বলিয়া ভরত অর্থে আদিত্য, ভারতী তাঁহার সম্ভূতা ভাঃ অর্থাৎ দীপ্তিঃ॥

ঋগ্বেদে সরস্বতীর এই বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেও ব্রাহ্মণের যুগে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পুরাণের যুগে ইনি সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, বেদশাস্ত্র-যোগমাত্র বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা, শাস্ত্রজ্ঞান-বাগ্‌বিভবপ্রদা ব্রহ্মপত্নী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন।…

সরস্বতী নদী আর্য্য ঋষিগণের জীবন চিন্তা যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন।…

সিন্ধু-সরস্বতীর তীরে বৈদিক আর্য্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এই সরস্বতীর সাহায্যে আর্য্য অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার আদান-প্রদান করিতেন। কি ধর্ম্ম, কি সামাজিক জীবন, কি বাণিজ্য, কি জ্ঞানানুশীলন সমস্ত ব্যাপারই নদীর কৃপায় সুসম্পন্ন হইতে থাকায়, নদী তাঁহাদের জীবনে অতি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং ইহা তাঁহাদের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। এইসকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে সরস্বতী নদী হইলেও কিরূপে বিদ্যা, জ্ঞান ও কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। জ্ঞানের সহিত সরস্বতীর এই অভেদ-কল্পনা তাঁহাকে বাগ্দেবী করিয়া তুলিল।…

জ্ঞান উপলব্ধি করিবার বিষয় প্রকাশ করিবার নহে। ইহা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ও সৌন্দর্য্যময়। সাধারণ মানব যাহাতে ক্রমে ইহার নিকট উপনীত হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে আধুনিক সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির শুভ্র বর্ণ জ্ঞানের বিশুদ্ধত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রকাশ করিতেছে। হস্ত-বিধৃত বীণা, পুস্তক, লেখনী ও পদ্মযুগল এবং আসনস্বরূপা শ্বেতাম্ভোজ সাহিত্য ও শিল্পবিজ্ঞানকে ব্যক্ত করিতেছে।* শব্দ দুই প্রকার ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বীণার দ্বারা ও বর্ণাত্মক শব্দ পুস্তকের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। হস্তস্থিত বীণার দ্বারা ইহাও বুঝান হইয়াছে যে, জ্ঞান চিত্ত-তন্ত্রীতে অহর্নিশি স্পন্দন উৎপন্ন করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য বস্তুও তাঁহার এক-একটি গুণের প্রকাশক।

সরস্বতীর স্তোত্রে আছে—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা॥

—দেবীর আসন শ্বেতপদ্ম, তিনি শ্বেতপুষ্প-শোভিতা, তাঁহার বস্ত্র শুভ্র, তাঁহার অঙ্গে শ্বেত গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত, তাঁহার বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, নেত্র শুভ্র, তিনি শ্বেত-চন্দনে চর্চ্চিতা এবং শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা। তাঁহার পূজোপচার দ্রব্য নবনীত, দধি, ক্ষীর, খৈ (লাজ), শুক্ল ধান্য, শুক্লবর্ণ-পক্ক-গুড়, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত শুভ্র হবিষ্যান্ন, যবগোধূম-চূর্ণ-নির্ম্মিত ঘৃতসংস্কৃত শুভ্র পিষ্টক, শুভ্র পুষ্প—সমস্তই শুভ্র। তিনি স্বয়ং কুন্দেন্দু তুষার-হার-ধবলা। সর্ব্বা-শুক্লা সরস্বতী।…নদীতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই ইঁহার রহিয়াছে। পদ্ম, হংস, কচ্ছপী (বীণা) এ সমস্তই জলের সহিত সম্বদ্ধ।…এই তথ্য আমরা গ্রীক-পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাই। তথায় বলা হইয়াছে, দেবদূত হার্‌মিস্ কচ্ছপের নাতিগভীর দৃঢ় দেহবর্ম্মের উপরে তন্ত্রী সংযোগ করিয়া বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।†

পদ্ম শিল্পের পরিচায়ক আবার তাহা হৃৎপদ্মেরই প্রতিরূপক শ্বেতাব্জ।

---

* ভরহুত্‌স্তূপ হইতে আনীত প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত বৃত্তাকার কারুকার্য্যময় চিত্রগুলি পদ্ম-ফুলেরই প্রতিচ্ছবি। সাঁচিস্তূপের পূর্ব্ব-তোরণের স্তম্ভগুলির উপরও পদ্মের সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পদ্ম শিল্পীগণের একটি প্রিয় বস্তু এবং সৌন্দর্য্যবোধের উদ্দীপয়িত্রী। কবিগণ পদ্মের সৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ যে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়াই তাঁহারা কাব্যে বর্ণনীয় নদীতড়াগাদির সলিলমাত্রেই পদ্মাদি-বর্ণনের নিয়ম করিয়াছেন।

† হার্‌মিস্ দেবদূত বলিয়া বাগ্মিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সরস্বতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বীণাপুস্তক-হস্তা শুক্লবর্ণা এক দেবী আবির্ভূতা হন। সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতি। রাধা, লক্ষ্মী, দুর্গা, সাবিত্রী ও সরস্বতী,—সৃষ্টি-কার্য্যে এই পাঁচটি প্রকৃতি। যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনিই প্রকৃতি সরস্বতী। তিনি পুস্তক-রচয়িত্রী ও সঙ্গীত তানমান প্রভৃতির কারণ-স্বরূপা দেবী। তাঁহারি করে ব্যাখ্যা-মুদ্রা ও তিনি বীণা-পুস্তক-ধারিণী ; তাঁহার বর্ণ শ্বেতপদ্ম-সন্নিভ।

ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে সরস্বতীর পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ ষোড়শ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিবে, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলেন। তাহার পর অন্যান্য দেবগণ এবং মানবগণ সরস্বতীর পূজা করিলেন। গুরুশাপে ভ্রষ্টজ্ঞান যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যোপদেশে সরস্বতীর উপাসনা করিয়া নষ্টজ্ঞান পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার গুরুর কলহের কথার উল্লেখ করিয়া কেবলমাত্র সূর্য্যের স্তব দ্বারা শুক্লযজুর্বেদ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সূর্য্যের সহিত সরস্বতীর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সরস্বতীর মাহাত্ম্য বাড়িল।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সরস্বতী বিষ্ণুর ভার্য্যা হ'ন। বিষ্ণুর অন্য দুই পত্নীর নাম লক্ষ্মী ও গঙ্গা। একদিন কলহ করার ফলে গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন, তিনি নদী হইবেন। স্বামী নারায়ণের আদেশে সরস্বতীর এক অংশ ব্রহ্মার স্ত্রী হইলেন। বাকী অংশ লইয়া তিনি নারায়ণের নিকট অবস্থান করিলেন। সরস্বান্ শব্দের অর্থ প্রভূত-জলবিশিষ্ট। সর্ব্বব্যাপী হরি দীর্ঘকাল সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে জলশায়ী বলা হয় এবং তাঁহার পত্নী বাণীকে সরস্বতী বলা হইয়াছে। বেদে সরস্বতীর যে দ্বিভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, পুরাণে এইভাবে তাহাদিগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল। বৈদিক যুগে প্রতিমার সৃষ্টি হয় নাই। পাণিনির আবির্ভাবের কাল খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী (কাহারও কাহারও মতে পাণিনির আবির্ভাব-কাল আরও পূর্ব্বে) ধরিলে পাধিনির আবির্ভাব-কাল বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে হয়। পাণিনিতে প্রতিকৃতি-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, পাতঞ্জলে কোন কোন দেবতার মূর্ত্তি-সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দুগণও প্রতিমা গড়িত ; কিন্তু ভাস্কর-শিল্প বৌদ্ধগণের হস্তেই চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্তূপ, চৈত্য, বুদ্ধের নানারূপ মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত ছাইয়া ফেলিল। যখন খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত-রাজগণের অভ্যুদয় হয়, তৎকালীন খোদিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি এখন পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বের প্রায় ৪ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ যুগেই সুকল্পিত মূর্ত্তির প্রথম সৃষ্টি। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর শেষ হইতে বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী ছিল না। অবশ্য বুদ্ধের জীবনী-সম্বন্ধে যে-সকল প্রস্তরমূর্ত্তি আছে তাহাতে দেখা যায়, ব্রহ্মাদি প্রধান হিন্দু দেবগণ বুদ্ধের স্তব করিতেছেন ; ইহা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইতেছে। ইহা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে, তখন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি হিন্দুগণ পূজা করিতেন ও সেইগুলি কিরূপ হইবে সে-সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের বেশ ধারণা ছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দেবতাগণের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। বৌদ্ধগণের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হিন্দু দেবতা আপন নামে আশ্রয় পাইলেন। আর-এক সম্প্রদায়ে তাঁহাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। ইন্দ্র বজ্রপাণি-রূপে, বিষ্ণু অবলোকিতেশ্বর-রূপে এবং ব্রহ্মা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ-রূপে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। মঞ্জুশ্রীর পত্নী রহিলেন সরস্বতী বা বাগীশ্বরী। মঞ্জুশ্রীর অনেক প্রতিমূর্ত্তিতে বীণাবাদিনী একটি দেবী লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ ইনিই মঞ্জুশ্রীর শক্তি-স্বরূপা সরস্বতী। একটি তিব্বতীয় প্রস্তরমূর্ত্তিতে দেখা যায়, সরস্বতী সুন্দর-ভঙ্গীতে উপবিষ্টা রহিয়াছেন ও বীণাবাদন করিতেছেন। যবদ্বীপস্থ যোগীয়োকোটায় সিংহাসনাসীনা এক সরস্বতী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ; নকুল ইঁহার বিশিষ্ট পরিচায়ক।

গান্ধার হইতে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় তাঁহা বাগীশ্বরী দেবীর প্রতিমা। ইনি সিংহবাহিনী ও বীণাবাদ্যরতা। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি বাগীশ্বরী-মূর্ত্তি আছে। দেবী উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন, দক্ষিণ চরণ একটি কমলের উপর ন্যস্ত। ইনি চতুর্ভুজা-মূর্ত্তি, নিম্নে একটি সিংহ।

মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তিতলে দুইটি সিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। জাপানে অঙ্কিত মঞ্জুদেবতার কোন কোন মূর্ত্তিতে সিংহবাহন আছে। এইজন্য সম্ভবতঃ বাগীশ্বরীরও বাহন সিংহ। বৈদিক যুগে ঋত্বিগ্ ব্রহ্মা বেদবিদ্যা-পারদর্শী। পুরাণে আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদিশাস্ত্র নিঃসৃত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সহিত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন হয় নাই। ব্রহ্মার বাহন হংস, সেই জন্য সরস্বতীর বাহনও হংস।

মৎস্যপুরাণ-মতে সাবিত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-অনুসারে সরস্বতী প্রথমে বিষ্ণুপত্নী, পরে তাঁহার এক অংশ ব্রহ্মা-পত্নী হন। কিন্তু গরুড়- ও মৎস্যপুরাণ-মতে পুষ্টি ও লক্ষ্মী বিষ্ণুর যুগল পত্নী। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে ইন্দিরা (লক্ষ্মী) ও বসুমতী। বরাহ-অবতারে বিষ্ণু বসুমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বসুমতীর পতি। সুতরাং মনে হয়, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীযুগে বাণী বিষ্ণুপত্নীরূপে কল্পিত হন। ব্রহ্মার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পৌরাণিক-যুগে বিষ্ণুর প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও রামায়ণে ব্রহ্মার মৎস্য কূর্ম্ম ও বরাহরূপ ধারণের কথা আছে। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে ঐ-সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের পৃথক্ উপাসনা করিতেন ও সেই সঙ্গে তাঁহাদের অভেদরূপও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার পরে ব্রহ্মপত্নী সরস্বতীর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সরস্বতী-মূর্ত্তিযুক্ত বিষ্ণুর প্রস্তর-মূর্ত্তিও অনেকটা আধুনিক।

তন্ত্রে বৌদ্ধ মঞ্জুঘোষকে বিকৃত করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাঁহার আকার-কল্পনায় বৈচিত্র্য হয় নাই ; তবে পূজার প্রণালী [illegible] বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাগীশ্বরী দেবীকে তন্ত্রে উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে।

বুদ্ধি-দেবতা, বীণা বংশী সঙ্গীত কবিতা জ্যোতিষ ও অক্ষরের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তাঁহার প্রিয় জীবগণের মধ্যে কচ্ছপ একটি। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে খাদ্যোপহার দেওয়া হইত তাহার মধ্যে ধূপ ধূনা মধু ও [illegible] থাকিত। সরস্বতীর সহিত গ্রীক-দেবতা হারমিসের গুণের কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইনি পুরুষ, উনি স্ত্রী। গ্রীকদিগের জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা (বা মিনার্ভা), দেবরাজ জিউসের কন্যা—তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূতা। সরস্বতীও এইরূপ পরমাত্মার মুখোদ্ভূতা। মিনার্ভাকে কেহ কেহ বংশীর আবিষ্কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গ্রীকদিগের দেবী আর্টিমিসের সহিত সরস্বতীর একটি সাদৃশ্য আছে। দুইজনেই ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রকলাধারিণী। আর্টিমিস্ সঙ্গীত-দেবতা য়্যাপোলোর যমজ-ভগিনী।

দেবীর ললাটে তরুণ শশিকলা, তিনি শ্বেতবর্ণা ও শ্বেত-পদ্মোপরি উপবিষ্টা, তাঁহার হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি মাল্য- ও শুভ্রবস্ত্র-বিভূষিতা, চন্দনানুলিপ্তদেহা, ললাটে চন্দ্রকলাধারিণী, হাস্য-বদনা ও ত্রিনয়না; তাঁহার চারি হস্তে ব্যাখ্যামুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় প্রতিমা-লক্ষণে চতুর্হস্তা দেবী-মূর্ত্তির বিষয় বলা আছে;—বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম, এবং দক্ষিণ হস্ত-দুইটিতে অক্ষসূত্র ও বরাভয়। কোথাও বা তিনি হংসোপরি উপবিষ্টা; হস্তে বীণা, অক্ষসূত্র, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি ভালোন্মীলিত-লোচনা, পদ্মোপরি উপবিষ্টা, তাঁহার হস্তে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক। সর্ব্বস্থানেই তিনি মুক্তেন্দু-কুন্দপ্রভা ও তরুণেন্দুবদ্ধমুকুটা। তিনি প্রবোধপ্রদায়িনী এবং বাগ্বিভব-বৃদ্ধি-কারিণী। ধ্যানভেদে তাঁহার হোমে দুগ্ধ, তিল, মধুমিশ্রিত শ্বেত-পদ্ম, নাগকেশর, চম্পক ও আকন্দ-পুষ্পের প্রয়োজন হয়। এ মূর্ত্তি কল্পনায় আনিলে আধুনিক সরস্বতীর মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তন্ত্রে পারিজাত-সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ইনি হংসারূঢ়া, শুভ্রবর্ণা, স্মিততরমুখী এবং মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা। ইঁহার হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতময় ঘট এবং অক্ষমালা। ইঁহার হোমে আকন্দ, নাগকেশর বা চম্পক পুষ্প ব্যবহৃত হয়।

তন্ত্রে মাতৃকা-দেবীকেও বাগ্দেবতা বলা হইয়াছে। মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি-পঞ্চাশদ্বর্ণময়। ইঁহার ললাটে ভাস্বর চন্দ্র বিরাজিত, চারি হস্তে মুদ্রা, অক্ষমালা সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা (পুস্তক)। ইনি বিশদ-প্রভা-যুক্তা ও ত্রিনয়না।

দেবীগণের আকার তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে বাগীশ্বরী, পারিজাত-সরস্বতী ও মাতৃকাদেবী, সরস্বতীরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। ইঁহারা বর্ণময়কায়া; এইভাবে কল্পিত হইয়াছেন। ললাটের চন্দ্রকলা বর্ণমালার চন্দ্রবিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কাত্যায়নীতন্ত্রানুসারে চণ্ডীপূজার সময় চণ্ডিকাদেবীর ত্রিভাবে ধ্যান করিতে হয়। এই ত্রিভাব তাঁহার তামসী, রাজসী ও সত্ত্বগুণাশ্রয়া মূর্ত্তি। প্রথম চরিতে তিনি মহাকালী, তাহার পরে মহালক্ষ্মী ও সর্ব্বশেষে সরস্বতী।

এই মহা-সরস্বতী গৌরীদেহ-সমুৎপন্না, সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া, শুম্ভাসুর-নিসূদনী। তাঁহার অষ্টহস্তে বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল ও ধনু। যেন দেবী এই-সকল অস্ত্রদ্বারা মোহরূপ শুম্ভাসুরকে বিনাশ করিতেছেন।

(বামাবোধিনী পত্রিকা, মাঘ ও ফাল্গুন) শ্রী—

ষষ্ঠী-মঙ্গল

"ষষ্ঠী-মঙ্গল" কাব্য একখানি অপ্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা গীতিকাব্য। ভাষা ও রচনা দেখিয়া মনে হয়, ইহা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "চণ্ডী" কাব্যের পরবর্ত্তী। "ষষ্ঠীমঙ্গল" গীতিকাব্যের রচয়িতার নাম ভণিতায় গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র দ্বিজ-ভূষণ রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী বলিয়া লিখিত আছে। কবির কোথায় নিবাস ছিল, এবং কখন তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কোথাও ভণিতা দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। এই কাব্যে গন্ধ-বণিকবংশীয়া রাজকন্যা প্রভাবতীর সতীত্ব-কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং উক্ত বংশীয় কেত্রসেন, মধুমতী ও দেবীবরেরও চমৎকারিণী কথা লিপিবদ্ধ আছে। ভগবতী ষষ্ঠীদেবী ইঁহাদেরই দ্বারা পৃথিবীতে তাঁহার পূজা প্রচারিত করিয়াছিলেন, গীতিকাব্যে এইরূপ উক্তি আছে।

তবে এই গীতিকাব্যে বৌদ্ধধর্ম্মের যে কিছু কিছু গন্ধ আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। "নিরঞ্জন" "ধর্ম্ম" "আদ্যা" "সিদ্ধা" প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা এই অনুমান সমর্থিত হয়। আর "যোগী" সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কাব্যখানি আবদ্ধ থাকায় এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। কবির মতে যিনি "নিরঞ্জন," তিনিই "ধর্ম্ম" এবং তাঁহা হইতেই সৃষ্টির প্রকাশ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে "আদ্যা" সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"ষষ্ঠীমঙ্গল" একখানি বড় গীতিকাব্য। ইহাতে ত্রয়োদশটি পালা আছে। ষষ্ঠীদেবীর আদেশে কবি এই কাব্যখানি রচনা করেন:—

নিশিশেষ চৈত্রমাস বুধবার দিনে।
গীত রচিবারে দেবী কহিলা স্বপনে॥
সেই কথা অনুসারে করিনু বর্ণন।
ব্যাধি সঙ্কটেতে মোর তনয়া পীড়িত।
তার রক্ষাহেতু মোরে করাইল গীত॥
ত্রয়োদশ-পালা গীত কহিলা রচিতে।
আজ্ঞা প্রমাণে গীত রচিনু সেই মতে॥
তনয়া রাখিলা মোর দিয়া পদছায়া।
এমতি রাখিবা আমা শুন মহামায়া॥

(গন্ধবণিক, মাঘ)

"সুয়ো দুয়ো"

কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মল্লিক এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন:—

"পৌষ মাহার সংক্রান্তি দিবসে বহু গৃহস্থ কলাগাছের ডিঙ্গি প্রস্তুত করিয়া বা সোলার নৌকা (যাহা ঐ দিবস বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়) করিয়া তাহাতে জোড়া সিম্, জোড়া কুল, পঞ্চরত্ন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া "সোয়া দোয়া" পূজা করিয়া থাকেন। এই পূজার তাৎপর্য্য কি? ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ পূজা হইয়া থাকে কি না? বাংলায় কতদিন হইতে এই পূজার প্রচলন হইয়াছে?"

পৌষ সংক্রান্তি দিবসে কলাগাছের যে ডিঙ্গী প্রস্তুত করিয়া ভাসান হয়, কলিকাতা অঞ্চলে তাহাকে "সোয়া দোয়া ভাসান" বলে, আর মফঃস্বলে "সুয়ো দুয়ো ভাসান" বলে। উচ্চারণের তারতম্যের জন্যই ঐরূপ নাম হইয়াছে। "সুয়ো ও দুয়ো" দুইখানি জাহাজের নাম। মফঃস্বলে একমাত্র গন্ধবণিক্ জাতির মধ্যে তাহা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক গন্ধবণিক্ গৃহস্থ পৌষ সংক্রান্তি দিনে কলাগাছের বাকলে দুইখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জোড়া জোড়া ফল, শস্য ও পঞ্চরত্ন প্রভৃতি দিয়া তাহাদের পূজা করে। তৎপরে সন্ধ্যার সময়ে তাহাতে এক-একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসর বাজাইয়া পুষ্করিণী বা নদীর জলে "সুয়ো দুয়ো" ভাসাইয়া দেয়। গন্ধবণিক্ জাতীয় বালক-বালিকারা মহোৎসাহে এই উৎসব করিয়া থাকে। জলের উপর যখন সমস্ত প্রদীপযুক্ত অসংখ্য "সুয়ো দুয়ো" ভাসিতে থাকে, তখন দৃশ্য অতিশয় চমৎকার হয়। গন্ধবণিক্-বালিকারা "সুয়ো দুয়ো" ভাসাইয়া নিম্নলিখিত ছড়াটি গাহিতে থাকে—

সুয়ো দুয়ো ভাস্লো,
আমার ভাই হাস্লো।

সুয়ো দুয়ো যায় ভেসে ভেসে,
আমার ভাই যায় হেসে।
ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধবণিক্‌গণ সাংযাত্রিক বা সমুদ্রযাত্রী বণিক্ ছিলেন। পৌষমাসে বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘর "ধানে কাপাসে" পূর্ণ হইত। তুবলার একটি প্রাচীন ছড়ার কিয়দংশ এইরূপ :—

পৌষমাসে পৌষুরি
ধানে কাপাসে ঘর করি।

দেশে প্রচুর ধান্ত ও কার্পাস উৎপন্ন হইলে, পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিবসে সাংযাত্রিক বণিক্‌গণ জাহাজে তৎসমুদায় এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতেন। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিনমাস এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসও সমুদ্রযাত্রার জন্ম প্রশস্ত সময় ছিল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সমুদ্রে কখনও কখনও ভয়ানক ঝড় উঠিয়া পোতসমূহকে বিপর্য্যস্ত করিত। কিন্তু মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ঝড়ের আশঙ্কা কম্ থাকায়, এই তিন মাসই সমুদ্রযাত্রার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময় ছিল। পৌষ সংক্রান্তি দিবসেই বণিকগণের পোতসমূহ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিত। সেই সময়ে বণিক্‌দের মঙ্গলের জন্ম পূজা ও উৎসব হইত। কালক্রমে যে কারণেই হউক, শাস্ত্রকারগণ সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিলে, সাংযাত্রিক বণিক্‌গণ সমুদ্রযাত্রা হইতে বিরত হন। কিন্তু পৌষসংক্রান্তি দিবসে সমুদ্রযাত্রার জন্ম যে উৎসব হইত, তাহা থাকিয়া যায়। তখন "মধু অভাবে গুড়" দেওয়ার প্রথার ন্যায়, প্রকৃত অর্ণবপোতের অভাবে গন্ধবণিক্‌গণ কলাগাছের ছোট ছোট নৌকা করিয়া ও তাহাতে ফল, শস্ত ও পঞ্চরত্ন দিয়া সেগুলি ভাসাইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। সেই প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতা-অঞ্চলে গন্ধবণিক্‌বালিকাদিগকে "সুয়ো দুয়ো" ভাসাইতে দেখিয়া অন্যান্য জাতির বালিকারাও সেই প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু মফঃস্বলে গন্ধবণিক্ বালিকা ব্যতীত অন্ত কোনও জাতির বালিকারা "সুয়ো দুয়ো" ভাসায় না। "সুয়ো দুয়ো" ভাসানের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভারতবর্ষের অন্যত্র এই প্রথা বিদ্যমান আছে কি না, তাহা জানি না।

(গন্ধবণিক, মাঘ)

—

শিল্পের অন্ধকার যুগ

আমাদের দেশে শিল্পের আব্‌হাওয়া হাজার হাজার বছর ধরে' বইছিল, হঠাৎ সে সুবাতাস সেই আনন্দের স্রোত কেন বন্ধ হ'ল, তার কারণ কোন্‌খানে সন্ধান কর্‌তে হবে? কালে কালে বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কে এসে বাইরের বন্যা আমাদের ঘরের শান্তি ও শ্রী অনেকটা ওলট-পালট করেছে সত্যি, কিন্তু এই বাইরের পরশ সব সময়ে শিল্পের নাশ করেই গেছে তা তো একেবারেই বলা চলে না, বরং এর উল্টোটাই ঘটেছে দেখি। বাইরে থেকে মোগল পাঠান যখন এল তখন আমাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে শিল্পও ধরণ বদ্‌লালো বটে, কিন্তু একটা নতুন রূপ পেলে এ দেশের স্থাপত্য চিত্র সঙ্গীত ও নানা কলাবিদ্যা—সোনার সঙ্গে এসে মিল্লো সোহাগা! কিন্তু তারপরে আজকের আমাদের যুগে শিল্পের দিক দিয়ে একটা যে অন্ধকার হঠাৎ নাম্‌লো, এই যে বাইরে থেকে যা এলো তার থেকে রস পেলেম না, সেটা যে বাইরের দোষেই ঘট্‌লো একথা জোর করে' বলি কেমন করে? আকাশ বর্ষার জল ঢেলে দিয়ে গেল, পাথর সে রস নিতে পার্‌লে না, এটার জন্যে আকাশকে অভিসম্পাৎ দেওয়া মূর্খতা। মরুভূমি ফুল ফোটাতে পার্‌ছে না, ঘাসও গজাতে পার্‌ছে না, কেননা তার অন্তরের শক্তি চলে' গিয়েছে! আমরাও তেমনি হয়তো নিজেরাই নিজের দোষে শিল্পকে হারিয়েছি, একথা যদি বলি তো সেটা একেবারেই মিছে হবে কেন? অন্য দিকের কথা ছেড়ে দিই, শুধু শিল্পলক্ষ্মীর কাছে আমরা কি চাচ্ছি আর আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরাই বা কি চেয়ে নিয়েছিলেন দেখ্‌লেই হয়! আমাদের চাওয়া মোটা এবং মোটামুটি, আর আমাদের আগেকার তাঁদের চাওয়া একেবারে বাদ্‌সার মতো—ঢাকাই মস্‌লীন তাজমহল এমনি সব দুর্ল্লভ সামগ্রীর ফর্‌মাস ও আব্দার! মোট কথা আমরা বলি—অল্পে খুসি থাক, আর তাঁরা বলেছিলেন সব দিক দিয়ে—'অল্পেতে সুখ নেই'।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাক্‌তেন গুহায় কিন্তু সেকালের শিল্পী গিয়ে গুহাটা সাজিয়ে দিলে আশ্চর্য্য কারিগরী দিয়ে; আর আমরা স্বয়ং বুদ্ধের দাঁত রাখ্‌বার জন্তে একটা বিহার এই সেদিন গোলদিঘির ওপারে রচনা করেছি, তার ভিতরে বাইরে ছাপ মারা রয়েছে আমরা আজকাল কতটুকু সামান্তে খুসি! এখানে টাকা ও চাঁদার কথা অনেকেরই মনে উঠ্‌বে, কিন্তু একথা জোর করে' বলা যায়—তাজমহলের রচনায় যে খরচ পড়েছিল তার চতুর্গুণ খরচ কর্‌লেও ওই ভিক্টোরিয়া হলটাকে একটা তেমন কিছু করে' তুল্‌তে পারা শক্ত, ওটা যেমন-তেমন যুগের মানুষদের চাওয়া যেমন-তেমনই হবে। তাজমহল গড়্‌তে পারে এমন কারিগরের অভাব যে এখনো ঘটেছে তা আমি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু তেমন কারিগরি চাইবার মতো মনোভাব যে আমাদের চলে' গিয়েছে সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরেশনাথের বাগান, সাতপুকুর, এমনি সব বড় বড় বাগান ও মন্দির আমাদের দুয়ারের কাছেই দেখা যাবে, সেগুলো প্রস্তুত কর্‌তে যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং ভাল কারিগরদের সময় নষ্ট করানো হয়েছিল, কিন্তু কোনোটা সাহাদারা কিম্বা আসল পরেশনাথের একখণ্ড পাথরেরও সমতুল্য হল না, বরং যা হল তা মোটেই চোখ জুড়ানোর মত নয়! গঙ্গার এপারে দেখ ঐ মাড়োয়ারীদের শ্রাদ্ধ-ঘাট আর ওপারে গঙ্গার পশ্চিম কূল জুড়ে গ্রামের ধারে ধারে ভাঙ্গা সমস্ত শিবতলা বটতলা এমনি নানা স্নান-ঘাট শ্মশান-ঘাট দেখ্‌তে পাচ্ছি। খরচের হিসেবে সেকালের ঘাটগুলো এখনকার ঘাটের চেয়ে ঢের সস্তা কিন্তু ঢের সুন্দর বল্‌তেই হবে। তখন মাল ও মজুরী সস্তা ছিল স্বীকার করি; কিন্তু গড়ন ও কারুকার্য্য সুন্দর হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে মাল ও মজুরীর খুব সম্পর্ক আছে তা তো বোধ হয় না! এলুমিনিয়ামের গেলাসটার ধরণে জলপাত্র কাঁসাতে গড়্‌তেও যা মাল ও মজুরী, সেকালের চমৎকার গড়ন চমৎকার পালিশ-দেওয়া চুম্‌কি ঘটিতেও সেই মাল সেই মজুরী, কাজেই বলি কারিগরের অভাবে কিম্বা মাল-মসলার জন্তে নয়, তফাৎটা হচ্ছে নজরের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বশতঃ। আমরা চাচ্চি গেলাস—কাঁচের গেলাসেরই রূপান্তর, আর আমাদের তাঁরা চেয়েছিলেন ঘটী কিন্তু সুন্দর ঘটী সুডৌল সামগ্রী! যত গোল এইখানে।

অর্থ-সমস্তাকে শিল্পের ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এক হিসেবের কোঠায় রাখা ভুল, কিন্তু অভিধানে বল্‌ছে শিল্প মানে অর্থকরী বিদ্যা। কারিগর সেকালেও যেমনি আজও তেমনি পেটের দায়ে এই অর্থকরী বিদ্যার উপাসনা করে' আস্‌ছে, কিন্তু যারা কেবল অর্থের ও স্বার্থের জন্তই অর্থ করে তাদের সঙ্গে আধপেটা খেয়ে যে-সব কারিগর থাকে তাদের এই তফাৎ—কারিগর যে, সে কারিগরিকেই প্রধান ও অর্থকে অপ্রধান করে' দেখে, আর অর্থকার দেখে ঠিক এর উল্টোটা।

আমরা যখন সবাই অর্থ করতে ব্যস্ত তখন—এক আফিসের কাজ এবং সেয়ারের কাজ ও ধনের আনুষঙ্গিক কতকগুলো অকাজ ছাড়া আর কোন কাজের- যেমন শিল্প-কাজের—মূল্য আমরা দিচ্ছিনে। আগে তো এমন ছিল না, ধনী তখন সৌখীন ছিল, কারিগরের কাছে কি চাইতে হয় কেমন চাইতে হয় জানতো, তার বদলে কারিগর তাদের এমন জিনিস দিয়ে যেত যা যাচাই-করা বাজারে জিনিষের চেয়ে ঢের বেশী দামী। এখন বাদশা-সাজাদা নবাব খাঞ্জাখাঁ নেই, নবাব বাবুরাও দেশের চেয়ে বিদেশের কারিগরদের সম্মান দিতে ছুটেছেন এ কোম্পানী সে কোম্পানীর দ্বারে দ্বারে, কাজেই দেশের কারিগর সব যখন বলছে—খাটাও শুধু পেট ভরাবার মতো দাও—তখন তারা কোনো সাড়া পাচ্ছে না কোনোখানে, কেবল খুব অনেক দূরে যে টাকা চালান যাচ্ছে তারি শব্দ বেচারারা শুনতে পাচ্ছে আর নিজের নিজের কপালে ঘা মেরে পেশা ছেড়ে কুলি-গিরিতে ভর্ত্তি হচ্ছে।

কারিগরে চাই কদরদাঁ, সমজদার, এ না হলে তার উপবাস আর উৎসাহভঙ্গ অনিবার্য্য, আর তার ফলে শিল্পের দিক দিয়ে অন্ধকার যুগ দেশে আসবেই নিশ্চয়! চাইলেও এখন যে মনের মতো জিনিসটি পাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে তার একমাত্র কারণ কারিগরদের মন কদরের অভাবে নির্জীব হয়ে পড়েছে, তারা কাজের মধ্যে আনন্দ পাচ্ছে না- যেন তেন প্রকারেণ কাজটা শেষ করে' দিয়ে টাকাটা নিয়ে সরে' পড়তে পারলেই খুসী বোধ করছে। কারিগরের দিক দিয়ে এখনকার বেরসিক তথাকথিত 'সমজদার আমাদের উপরে যে নালিশ তার কথা বল্লেম, এইবার আমাদের দিক দিয়ে কি বলবার আছে জানতে চাই।

(প্রবর্ত্তক, মাঘ) শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়,
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়।
এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি'
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়!
এস নব-জাগ্রত প্রাণ,
চির যৌবনজয় গান।
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্ব-নাশা,
ক্রন্দন দূর হোক্, বন্ধন হোক্ ক্ষয়।

(শান্তিনিকেতন, ফাল্গুন) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্র

তুমি যে চৈত্র শেষ-বসন্ত—
পূর্ণ-মুক্ত-দল,
ঋতু-মৃণালের পরাগ-বিভল
উজ্জ্বল শতদল!
কী মধু-মদিরা মর্ম্ম ভরিয়া
ধরণী-অধরে দিয়েছ ধরিয়া,
ভুলেচে সে—সারা 'শিশির' নয়নে
ঝরিয়াছে কত জল!

দিক্-বালা তার সেতারের তারে
হানি মৃদু কুহু-মীড়
শেষ উৎসব সুরে দিল ভরি
আকাশের দূর তীর।
দুলিয়ে বিনোদ বাঁকা বক-বেণী,
শ্রোণীতে মেখলা চম্পক-শ্রেণী
কাঁপিয়ে,—বকুল-অঞ্জলি ঢালে
বন-রাণী নতশির!

তুমি যে চৈত্র শেষ-বসন্ত—
তুমি যে বর্ষ-শেষ—
মধু-উৎসব বাকী আছে যাহা
করো করো নিঃশেষ!
উৎসব-শেষে নব বৈশাখ
বাজাবে রুদ্র আহ্বান-শাঁখ,
উৎসব-স্মৃতি যেন নাহি আনে
মনে কোন ক্ষোভ-লেশ।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাহার মীমাংসায় বহুলোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

১

পুষ্করিণীর জল বিশোধনের জন্য তুঁতে ব্যবহারের উপদেশ আছে। তুঁতে ব্যবহারে মাছের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা আছে কি না?

শ্রীহরিচরণ দাস

২

"ব্রহ্ম-ক্ষত্র" শব্দের অর্থ কি?

মিবারের রাজপুত রাজবংশকে ভিন্সেন্ট স্মিথ ব্রহ্ম-ক্ষত্র বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রমাণ দেন নাই। এই উক্তির সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

কতদিন পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের লোকে জামা পরে? কোন্ সময় হইতে এই প্রথা প্রচলিত হয়?

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

৪

বঙ্গ ভাষার সর্ব্বপ্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকার নাম কি? উহা কোন্ সালে এবং কাহা দ্বারা সম্পাদিত হয়?

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

৫

উপবিষ্ট অবস্থা অপেক্ষা শয়ান অবস্থায় শীত বেশী লাগে কেন?

শ্রীকর্ণধার বিশ্বাস

৬

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম কোন্ ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্রের কাজ শিখিয়াছিলেন? সেই মুদ্রাযন্ত্রেরই বা নাম কি?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়

৭

রাণা উপাধির অর্থ কি? এই উপাধি সর্ব্বপ্রথমে মেবারের কোন্ রাজা কি উপলক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন? শুনা যায়, তৎপূর্ব্বে উহা অন্য রাজবংশের সম্পত্তি ছিল। সত্য হইলে, সে কোন্ রাজবংশ? সে বংশের কে, কোন্ সময়ে, কি কারণে এ উপাধি ধারণের অধিকারে বঞ্চিত হয়েন?

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

৮

চোখ ঘুরাইয়া চাহিলে একটা জিনিষ অনেক দেখায়, ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রীশক্তিপদ কর

৯

টক দেখিলে জিহ্বায় জল আসে কেন? মিষ্টি দেখিলে ত জিহ্বায় জল আসে না, ইহার কারণ কি?

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী
শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টশালী
শ্রীবিরজাশঙ্কর মৈত্র

১০

ভারতবর্ষে পুরাকালে কিরূপ সূচের প্রচলন ছিল? তাহার কোনও নিদর্শন আছে কি না। বিদেশী সূচ আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কিরূপে সেলাই-কার্য্য সম্পন্ন হইত? সেরূপ এখনও করা চলে কি না।

শ্রীঅন্নপূর্ণা হালদার

১১

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মৌলবী মীর মশার্‌রফ হোসেন প্রণীত "বিষাদ-সিন্ধু" নামক পুস্তকে "আম্বাজ" ও "এরাক" নামক দুইটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। স্থান দুইটি কাল্পনিক নহে; অনেক আরবী ফার্সি কেতাবে ইহাদের নাম শুনা যায়। রাজ্য দুইটি কোথায় অবস্থিত? এবং বর্ত্তমানে কি কি নামে পরিচিত?

শ্রীমহীদীন আহামদ, শ্রীআব্‌দুল বারি

১২

হিন্দুদের মস্তকে শিখাধারণের উদ্দেশ্য কি? কতকাল হইতে এই নিয়ম প্রচলিত আছে?

শ্রীধ্রুবজ্যোতিঃ গুপ্ত

১৩

সজারু শশক অযাত্রা, প্রতিকূল বায়ু অযাত্রা, সুবেশ নারী কবরে

ক্রন্দন অবাত্রা, কোন্ শাস্ত্র অনুসারে? কর্ণবেধ পঞ্চম বর্ষে—কোন্ শাস্ত্রের নির্দেশ? কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে, ইন্দ্র শিবের পূজা করিবার সময় "রুদ্রের অধ্যায় আছিমা" পাঠ করিতেছেন। উহা কোন্ বই বা কোন্ বইয়ের অধ্যায়?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কিশনগঞ্জ সবডিভিশনের অধীন ঠাকুরগঞ্জ থানার এলেকায় "বাগমনুলা" নামে একটি মৌজা আছে। সেখানে গত কয়েক বৎসর হইতে মৃত্তিকা-নিম্নে একটি বৃহৎ মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মন্দিরের অনতিদূরে দুইটি পুষ্করিণী আছে। উক্ত মন্দিরটি একটি উচ্চ মাটীর ঢিপির মধ্যে ছিল। এবং ইহার পার্শ্বে আরও একটি মাটীর স্তূপ আছে। স্থানীয় লোকে মন্দিরটি খুঁড়িবার সময় কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটি "বামন" মূর্ত্তি আমার কাছারীতে আছে ও একটি মূর্ত্তি উক্ত মন্দিরের উপরে আছে। উক্ত মূর্ত্তিগুলি বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাতে উচ্চ শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

একজন সাধু ভিক্ষালব্ধ অর্থের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে ঐ মন্দিরটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১০।১২ ফুট খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অল্প, এখন পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার আবিষ্কার হয় নাই। স্থানীয় লোকে ইহাকে কানাইজীর মন্দির বলিয়া থাকে।

যদি কেহ ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ বলিতে পারেন তবে বিশেষ বাধিত হইব। আর যদি কোন সহৃদয় প্রত্নতাত্ত্বিক উহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চান, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এসম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ আনন্দের সহিত জানাইতে পারি।

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মিত্র, এ্যাসিষ্টাণ্ট মেনেজার।
পোয়াখালী সার্কেল। পোয়াখালী, পূর্ণিয়া।

—

মীমাংসা

(গতবৎসরের জিজ্ঞাসার উত্তর)

(৬৭)

কালীর দাগ উঠাইবার উপায়

কাপড়ে কালী পড়িয়া গেলে অক্জ্যালিক এসিড (Oxalic Acid) জলের সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা সেই স্থান উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিলে কালীর দাগ উঠিয়া যায়। কাম্‌রাঙ্গা আম্‌রুল (টক্ আম্‌রুল) শাকের রস বা নেবুর রসেও কালীর দাগ উঠিয়া যায়।

শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য

(৮০)

পুকুর খননের নিয়ম

বায়ু-পুরাণে পুকুরাদি কি ভাবে খনন করিতে হয় সেই সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে তাহা এই :—"কূপবাপীপুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ। তড়াগঃ সরসীচৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ। সত্ত্বিৰ্জ্জলাশয়ঃ কার্য্যো যত্নাদ্ যাম্যোত্তরায়তঃ॥ বায়ুপুরাণে জলাশয় আট প্রকার :—কূপ, বাপী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ, সরোবর, সাগর এবং পুষ্করিণী (পুকুর); সজ্জনেরা অতি যত্নের সহিত উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্যে জলাশয় খনন করিবেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(৮২)

অরন্ধন প্রথার তাৎপর্য্য

অরন্ধন সম্বন্ধে "বাচস্পত্য" অভিধানে এবং শব্দকল্পদ্রুমে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

"কর্কটমধ্যাৎ সিংহার্কে সিংহান্নং সিংহকন্যয়োঃ।
মনসাসেবনাগেভ্যো দত্ত্বা সর্ব্বং নিবেদিতম্।"

অর্থাৎ শ্রাবণের অন্ন ভাদ্রে খাইবে এবং ভাদ্রের অন্ন ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসের সংযোগ দিনে অর্থাৎ ভাদ্র-সংক্রান্তিতে খাইবে। ভাদ্র মাসের যে কোন দিন অরন্ধন করা যায়; উহাকে সাধারণতঃ ইচ্ছা-অরন্ধন বলে। ভাদ্র-সংক্রান্তির অরন্ধনের নাম বৃদ্ধারন্ধন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(৮৩)

প্রাচীন ভারতে অবরোধ প্রথা

প্রাচীন ভারতে অবরোধ প্রথা কোনও না কোনও আকারে বর্ত্তমান ছিল সন্দেহ নাই। 'অসূর্য্যম্পশ্যা নারী' ইত্যাদি উদাহরণ তাহারই সাক্ষ্য দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তখনও এমন স্ত্রীলোক ছিলেন যাঁহার মুখ পরপুরুষে দেখা ত দূরের কথা, সূর্য্য পর্য্যন্তও দেখিতে পাইতেন না। তারপর, সেকালের অন্তঃপুরেও সকলে চাকুরী পাইতেন না। মুসলমানের হারেমে যেমন খোজা থাকিত, প্রাচীন ভারতবাসীর অন্তঃপুরে সেইরূপ কঞ্চুকী থাকিত—ইহা সংস্কৃতনাট্যপাঠক সকলেই জানেন। ইনি বৃদ্ধ এবং সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ হইতেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(৯৫)

ভারতে কাগজ

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মনীষীপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ভারতীয় পুস্তকাগারে হস্তলিখিত পুস্তকের যে বিবরণ Asiatic Societyর তদানীন্তন Secretaryর নিকট প্রেরণ করেন, সেই বিবরণের ৫ম প্যারাগ্রাফে তিনি কাগজের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে অন্ততঃ দুইসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতীয়েরা কাগজের ব্যবহার ও প্রস্তুত-করণ-প্রণালী অবগত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্যাসসংহিতায় একটি বচন আছে যে 'কোনও দলিলের মুসাবিদা প্রথমে কাষ্ঠফলক অথবা মাটির উপর করিবে। ভ্রমাদি সংশোধন করিয়া পত্রে নকল করিবে।' এই পত্র শব্দের অর্থ এখানে বৃক্ষপত্র নহে।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"এই বচন লিখিত হইবার কত পূর্ব্ব হইতে কাগজের ব্যাবহার ছিল জানি না। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীনকালে তালপত্র অপেক্ষা কোনও ভাল জিনিষ ছিল।......আমার মনে হয় অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা কাগজের নির্ম্মাণ-প্রণালী অবগত ছিল। তাহারা নিজেরাই ইহার উদ্ভাবন করিয়াছিল কি Chineseদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল তাহা বলা কঠিন।"

(Records of Ancient Sanskrit Literature, I. 16-17—দ্রষ্টব্য।)

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(৯৯)

মঘীসন

ইহা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে মুসলমান ও পর্ত্তুগীজগণের চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকারের পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মগজাতি

ব্রহ্মদেশের আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া জলদস্যুর ন্যায় চট্টগ্রাম, সুন্দরবন এবং পূর্ববঙ্গের আরও অপরাপর অঞ্চল আক্রমণ করতঃ যাহা পাইত তাহা লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইত। তখন এই ব্রহ্মদেশের মগজাতির ভিতর এমন কোন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন না যিনি এক প্রকাণ্ড দেশ শাসন করিতে পারেন। সেই সময় আরাকান, আকিয়াব, মাইরোহাং, ভুতিতং, রাতিতং, মন্দু প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক তথাকথিত মগ-নরপতি ছিলেন। সুবিধা পাইলে এই মগ-নরপতিগণ একে অন্যের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেন এবং সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে ছাড়িতেন না। অবশেষে প্রায় ১৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে মাইরোহাং রাজ্যে এক পরাক্রান্ত পুরুষ উঠিয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশে এক অখণ্ড মগ-শাসন বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই শক্তিশালী পুরুষ কালক্রমে এক দেশের পর আর-এক দেশ জয় করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধেক ব্রহ্মদেশ স্বীয় করতলগত করিলেন এবং শেষে চট্টগ্রাম জয় করিয়া ইহাকেও ব্রহ্মদেশের সহিত যুক্ত করিলেন। অতঃপর এই নরপতি মাইরোহাং রাজ্যে সিংহাসনারূঢ় হইয়া স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার মানসে এক সাল প্রচলিত করিলেন। ইহাই মগী বা মঘী সন। ১৩২৯ সালে ১২৮৫ মগী হইবে। শুধু চট্টগ্রামে কেন, সমগ্র ব্রহ্মদেশে এবং ত্রিপুরা ও আসামের কোন কোন অংশেও এই সন প্রচলিত আছে দেখা যায়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার পাল

(১০০)

হাজিয়া যাওয়ার ঔষধ

চা-খড়ি ও খয়ের (খদির, যাহা পানের সহিত ব্যবহার করা হয়) সমভাবে লইয়া গুঁড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ঐ চূর্ণ অল্প জল দিয়া ঘুঁটিয়া ব্যবহার করিলে সকল প্রকার পাঁকুই বা হাজা আরোগ্য হইবে। (পরীক্ষিত)

শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য

(১০৭)

আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন তাঁহাদের নাম সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কুলাচার্য্য হরিমিত্র লিখিয়াছেন—ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরী।

বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—শাণ্ডিল্য-গোত্রজ কবি ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ-গোত্রজ দক্ষ, বাৎস্য-গোত্রজ ছান্দড়, ভরদ্বাজ-গোত্রজ হর্ষ এবং সাবর্ণিক-গোত্রজ বেদগর্ভ।

বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন—শাণ্ডিল্য-গোত্রজ নারায়ণ, বাৎস্য-গোত্রজ ধরাধর, কাশ্যপ-গোত্রজ সুষেণ, ভরদ্বাজ-গোত্রজ গৌতম এবং সাবর্ণ-গোত্রজ পরাশর।

এই তিন মতই ঠিক। সম্ভবতঃ প্রথমে আদিশূর ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরীকে আনিয়া থাকিবেন। কার্য্যান্তে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গিয়া সমাজে গৃহীত না হওয়ায় আবার ফিরিয়া আইসেন। আদিশূর বা আদিত্যশূর তখন রাঢ় দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে রাঢ় দেশে বাস করান। তাঁহাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণ, মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ, বীতরাগের পুত্র দক্ষ, সুধানিধির পুত্র ছান্দড় এবং সৌভরীর পুত্র বেদগর্ভ আসিয়াছিলেন এবং পিতার সহিত রাঢ়দেশেই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ঘোষাল প্রভৃতি উপাধি বাসগ্রাম অনুসারে পাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কোন উপাধি ছিল না।

উক্ত ক্ষিতীশ প্রভৃতির অপর পুত্রগণ দেশেই ছিলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেলে তাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে দেশের কোন ব্রাহ্মণই পতিতের শ্রাদ্ধ বলিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। তাহাতেই তাঁহারাও দেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। আদিশূর বা আদিত্যশূর তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (বরেন্দ্রে পাণ্ডুয়া) রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্র দেশে বাস করান। তাঁহারাই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ। তাঁহাদের কোন উপাধি ছিল না। বাসগ্রাম অনুসারে পরে মৈত্র, ভাদুড়ি, সান্যাল প্রভৃতি উপাধি লইয়াছিলেন।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়, পুরাতত্ত্ববিশারদ

(১০৯)

নিব তৈরির কারখানা

চৈত্রমাসের প্রবাসীতে বেতালের বৈঠকে শ্রীযুক্ত কে এম ব্যানার্জ্জীর ঠিকানা ছিল ২৩ নং শ্যামবাজার রোড, কলিকাতা ; উহা ২২ নং শ্যামবাজার রোড হইবে।

শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১৫)

বাল্মীকির মাতার নাম

বাল্মীকি চ্যবনমুনির পুত্র, এ কথাটার প্রচারক পণ্ডিত কৃত্তিবাস এবং তাঁহার ভাষা-রামায়ণ।

মানব সংহিতায় দেখা যায় মনুপুত্র দশজন প্রজাপতির মধ্যে সপ্তম প্রজাপতি "প্রচেতা" এবং নবম "ভৃগু" (১ম অঃ, ৩৫ শ্লোক), অতএব প্রচেতা এবং ভৃগু ইঁহারা দুইজন পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ; প্রচেতা জ্যেষ্ঠ, ভৃগু কনিষ্ঠ। এই ভৃগুর পুত্র চ্যবনমুনি প্রচেতার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র।

বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে দেখা যায় রামের অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় এই চ্যবনমুনি (৯০ সর্গ ও ৪ শ্লোক) এবং বাল্মীকিমুনি সশিষ্য উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি রামকে সীতার পবিত্রতা এবং লব ও কুশ যে সীতার গর্ভজাত রামেরই পুত্র ইহা বলিতে বলিয়াছিলেন ;—

প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
নস্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥" ১৮

(উঃ কাঃ, ১০৯ সর্গ)

রঘুনন্দন রাম! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই দুইটি (লব এবং কুশ) তোমারই তনয়।

এখানে দেখা যাইতেছে বাল্মীকি নিজেই বলিয়াছেন তিনি প্রচেতার "দশম" পুত্র। ভৃগু এই প্রচেতার কনিষ্ঠ সহোদর। অতএব এই ভৃগুমুনি বাল্মীকির খুল্লতাত। সুতরাং ভৃগুর পুত্র চ্যবনমুনি বাল্মীকির খুল্লতাত ভ্রাতা। কৃত্তিবাস পণ্ডিত তাঁহার ভাষা-রামায়ণে বাল্মীকি-মুনির এই খুল্লতাত ভ্রাতা চ্যবনমুনিকেই বাল্মীকির পিতা বলিয়া প্রচার করিয়া অতীব গুরুতর ভুল করিয়াছেন ; আমরাও তাহাই অনুসরণ করিতেছি।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন

(১১৮)

আকের ডগার উই নিবারণ

টাটকা-গোবর-ছিটান করিতে যদি আকের ডগা বসান হয় তাহা হইলে উই ধরিতে পারে। পুরাতন গোবরের সার ছিটান দরকার।

উই নিবারণ করিবার উপায় :—

(১) প্রাপ্তা হইতে কেরোসিন ইমালসান উই-পোকা-নিবারক।

(২) স্নেও পরের উকজল, গুঁড়া চুন /৶০, সাদা সেঁকো বিষ ১।০ ভরি জিয়া ৪॥০ ভরি মিশাইয়া উহাতে ডগাগুলি ডুবাইয়া রেড়ীর খৈল চূর্ণ ১৮০ পাহাড় হাই /।৶০ ও চুণা /৶০—এই মিশ্রণের পালার উপর গড়াইয়া লইয়া সত্বর ডগা বসাইবে। এই আরকজল ও মিশ্রণ এক বিঘা জমির ডগার জন্য যথেষ্ট প্রত্যহ টাটকা জল ও মিশ্রণ ব্যবহার করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়া ডগা ও চাষার পক্ষে রক্ষাকবচস্বরূপ হইবে।

(৩) আকের ডগা কিংবা চারা জমিতে বসাইবার পূর্ব্বে উভয় মুখে একটু করিয়া আলকাতরা লাগাইলে উই পোকা ধরিতে পারে না।

(৪) ডগা রোপণের পরে উই দমন করিবার উদ্দেশ্যে জমিতে জল দিয়া ভরিয়া দিতে হয়।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(১২১)

গুড-মাখানো দড়িতে পুদিনার উৎপত্তি

মাছির ডিম হইতে পুদিনা উৎপাদনের নিম্নলিখিত প্রণালী বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কৃত কৃষিসংগ্রহে আছে :—'দুই কি তিন হাত পরিমিত একগাছি মোটা রজ্জু গুড় মাখাইয়া নির্জ্জনে দুই এক দিন টানাইয়া রাখুন—গুড়ের লোভে মাছি আসিয়া পড়িবে নির্জ্জনে রাখার অর্থ মক্ষিকাগুলির উপবেশনে ব্যাঘাত না হয়, রজ্জুতে রৌদ্র না লাগে।

একটি জায়গা কোদলাইয়া গো মল-মূত্রের সার দিয়া প্রস্তুত করত —প্রথমতঃ রক্তশাল্মলির ঝুল ও মাকড়সার জাল বিছাইয়া তদুপরি সাবধানে গোলাকারভাবে ঐ রজ্জু বসাইতে হইবে—রজ্জুর যে খানে হাত লাগিবে তথাকার ডিমগুলি নষ্ট হইবে—তজ্জন্য হাত না লাগাইয়া সাবধানে কৌশলে বসাইতে হইবে ইহার উপর পূর্ব্বোক্ত সার মিশ্রিত মাটি দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া দিতে হইবে—যে পর্য্যন্ত অঙ্কুর নির্গত না হয়—ততদিন পচা গোবরের জল ছিটাইতে হয়—দুই সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্কুর হইবে।"—(কৃষিসংগ্রহ—১২৯০ সাল, ৯৫ পৃঃ। "পাইকপাড়া নর্শরী হইতে প্রকাশিত।")

আমরা কতক চেড়ার লোম, ঝুল ও মাকড়সার সহ মিলাইয়া দিয়া পুদিনা উৎপাদন করিয়াছিলাম। মোটকথা ডিমগুলি মাটির চাপে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য কোন পালকবৎ নরম পদার্থ (soft down) দেওয়া দরকার।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী রায়-চৌধুরী

(১২৬)

এক চক্ষু না-দেখানো

পুরুষকে এক চক্ষু না দেখানোর কারণ কি জানি না। তবে এ সম্বন্ধে একটি বচন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে উদ্ধৃত দেখা যায়। তাহা এই—

"প্রাণপ্রিয়াং ন স্বামেকচক্ষুষা দর্শয়েৎ পতিম্।
চক্ষুঃ পরিহিতাকাঙ্ক্ষী ন স্পৃশেদেকপাণিনা॥"

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(১২৭)

পিপারমেণ্ট গাছ হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী

সুপরিণত টাটকা পিপারমেণ্ট গাছে শতকরা ০·২৫ হইতে ০·৪ ভাগ পিপারমেণ্ট তৈল থাকে, ও শুষ্ক অবস্থায় এই তৈলের পরিমাণ ১ হইতে ১·২৫ ভাগ থাকে। গ্রীষ্মকালে তৈলের পরিমাণ ১·২৫ হয়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং পুষ্পোদগম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষগুলি কাটিয়া আতপ-তাপে শুখাইতে হইবে (আতপ-তাপে শুকাইলে শতকরা প্রায় ৭ ভাগ অধিক তৈল পাওয়া যায়।) অতঃপর পুষ্প-সমেত শুষ্ক বৃক্ষগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া একটি তাম্রের ভাণ্ডে রাখিয়া উহার মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হইবে। এই তাম্র ভাণ্ডের মুখস্থ ঢাকনার সহিত একটি কুণ্ডলাকার বক্রনালী সংযুক্ত করিয়া ঐ নলটি শীতল জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। নলের অপর প্রান্তটি জলের বাহিরে একটি তামার হাঁড়ির সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপে একটি বকযন্ত্রের সৃষ্টি হইবে। এক্ষণে অল্প অগ্নির উত্তাপে এই তাম্রের বকযন্ত্রটি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে জলীয় বাষ্পের সহিত পিপারমেণ্ট তৈল তাম্রের নলের মধ্যে দিয়া চুয়াইয়া হাঁড়িতে জমিবে। অগ্নির তাপের পরিবর্ত্তে যদি জলীয় বাষ্পের তাপ (steam heat) চুয়াইতে পারা যায় তবে বেশ ভাল তৈল পাওয়া যাইবে, কিন্তু তৈলের পরিমাণ কিছু কম হইবে। এক্ষণে হাঁড়িস্থ জলের উপর ভাসমান তৈল পৃথককারী পিক (separating funnel) অথবা পালক দিয়া পৃথক করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীআশুতোষ দত্ত

(১৩২)

(১) "রাম লক্ষ্মী গদাধর গৌরী বাসু পুরন্দর"

এই উক্তিতে আমরা যে লক্ষ্মীর নাম দেখিতে পাই তিনি বোধ হয় চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত "পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ" হইবেন। গদাধর প্রভুর উপশাখা বর্ণনা কালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

'শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটি চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ॥" (আদি, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।)

ইহার অতিরিক্ত লক্ষ্মীনাথের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের ভক্তগণের বিশ্বাস যে গদাধর লক্ষ্মীর অবতার স্বরূপ, সেইজন্যও হয়ত "লক্ষ্মী গদাধর" উল্লেখ হইয়া থাকিবে।

(২) শিবের ভাং খাওয়া

মহাদেব অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির ঈশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার এক নাম সিদ্ধিদেব। বটুক-ভৈরবস্তবে আমরা মহাদেবকে "সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসেবিত" রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। কালক্রমে লৌকিক মতে বোধ হয় এই সিদ্ধি হইতেই 'ভাং' খাওয়ার কথা মহাদেবে আরোপ করা হয়।

(৩) কুশহস্ত হইয়া শাপ দেওয়া

কলাণতন্ত্রে (১ম পটল) লিখিত আছে যে পূজাকালে বা কোন মন্ত্র উচ্চারণের সময় সর্ব্বদা কুশহস্ত হইয়া থাকিবে; কুশহস্ত না হইলে পূজা বিফল হয় এবং মন্ত্রেরও ফল পাওয়া যায় না। অভিশাপ দেওয়া একপ্রকার মন্ত্রবিশেষের উচ্চারণ মাত্র; সুতরাং অভিশাপ দেওয়ার সময়ে কুশহস্ত হওয়া শাস্ত্রানুমোদিত।

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত

(১) কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীতে চৈতন্য-পারিষদ লক্ষ্মীকান্ত আতৈরকেই "লক্ষ্মী" বলিয়া লিখিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর ১৩শে তাম্র কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে ইঁহার তিরোভাবোপলক্ষে ৺ভূমণ্ডলী সত্রে দধি-মন্থে এবং সুন্দরকুটিগ্রামে ইঁহার তিথি-মহোৎসব হয়। পি, এম বাকুচির পত্রিকাতে কামরূপ আসামদেশীয় বৈষ্ণবদিগের পার্ব্বদিন মধ্যে ইঁহার 'নাম' এবং 'উৎসবস্থানগুলির' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এই স্থানগুলি এবং তাঁহার তিরোভাব আসাম প্রদেশের কামরূপে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নির্ম্মিত মূর্ত্তির ছবি, তাঁহারই সৌজন্যে মুদ্রিত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
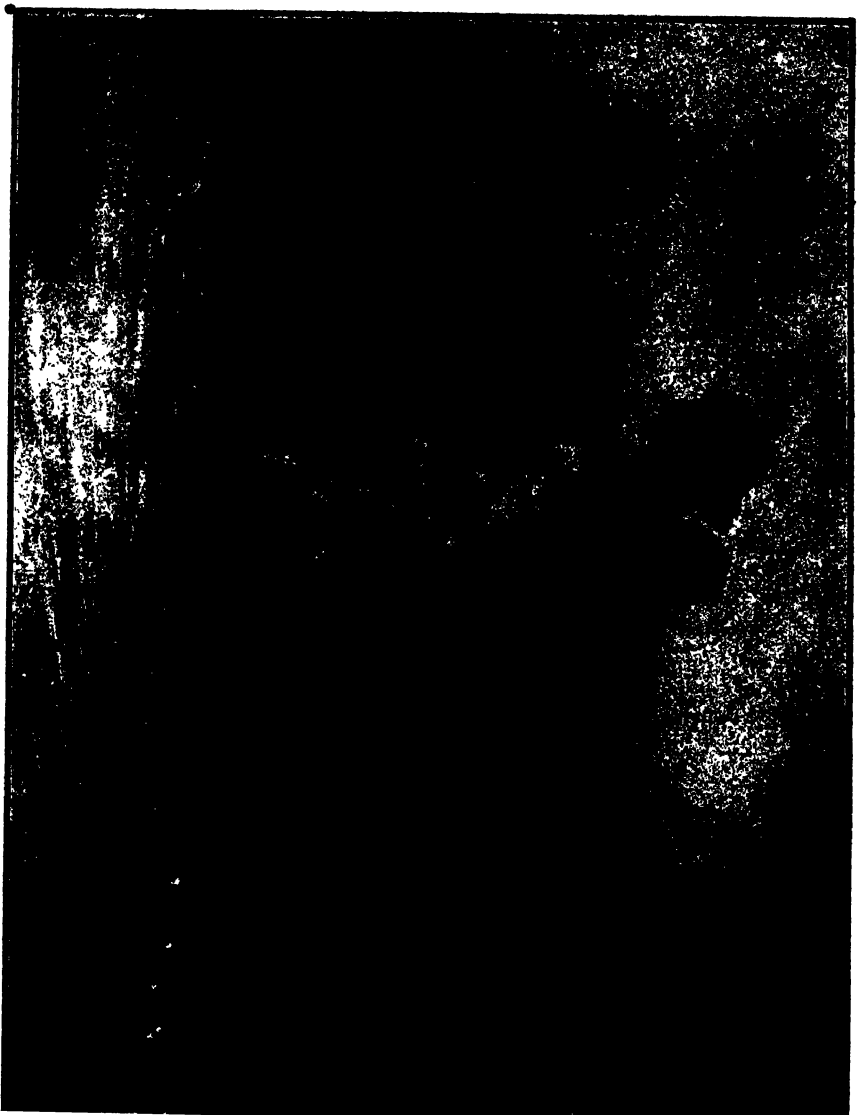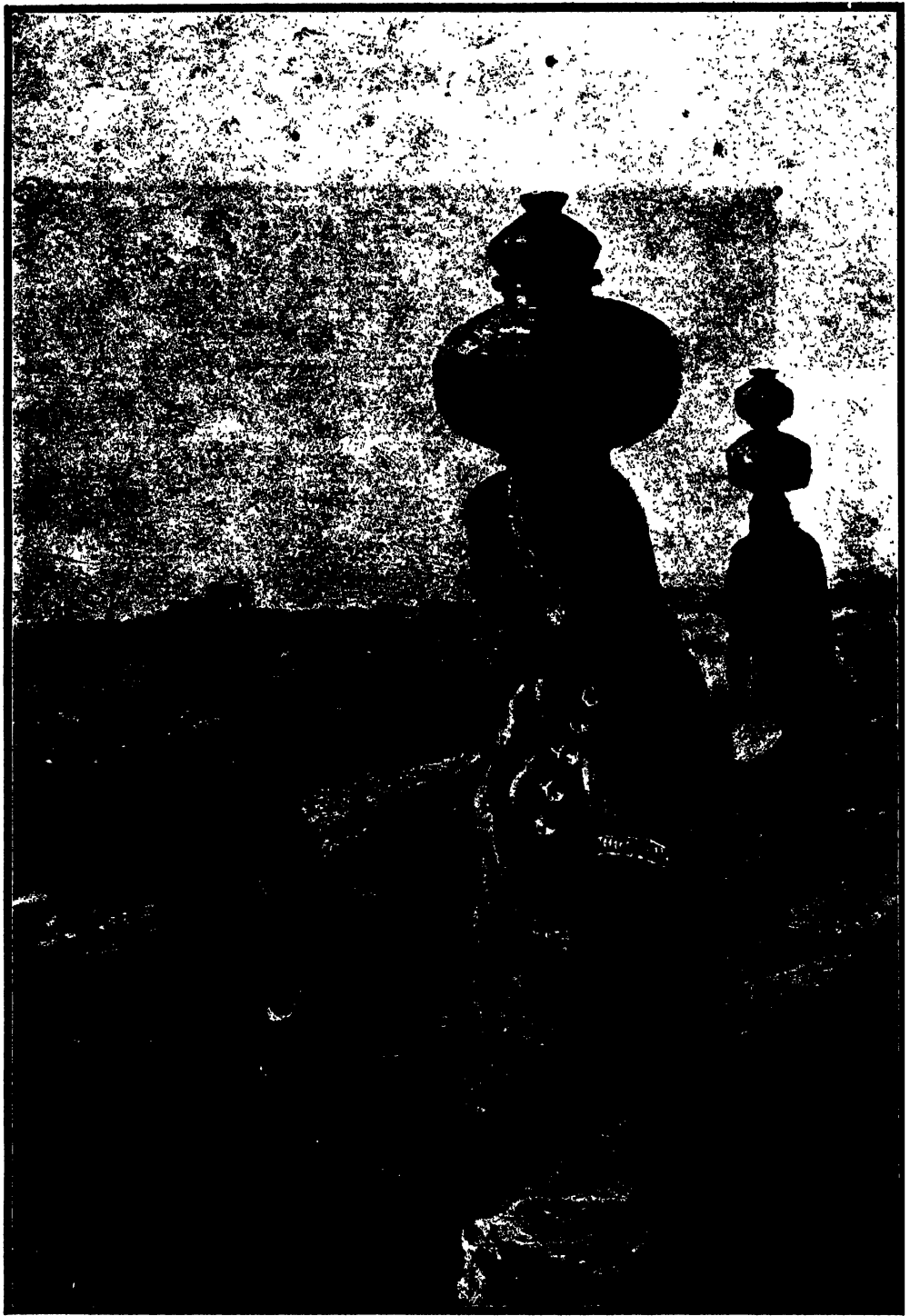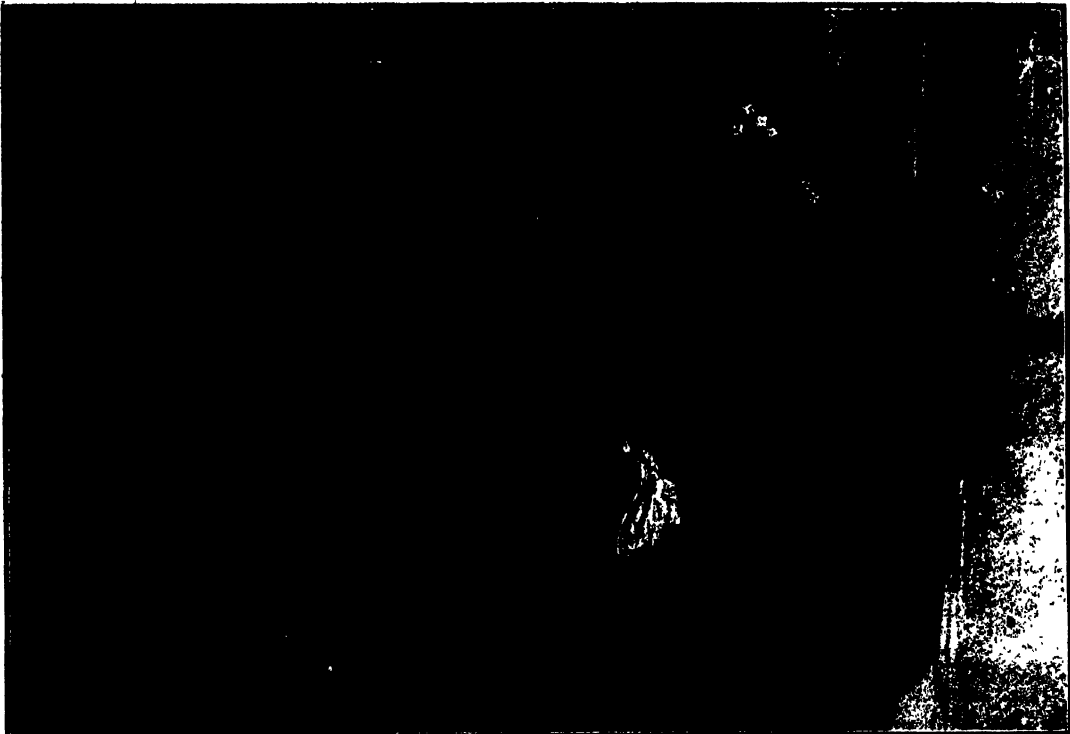
ঘরমুখো।

চিত্রকর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে।

গোয়ালিনী।

চিত্রশিল্পী শ্রীমতী সুনীতি সেন রায়ের সৌজন্যে

ওমার খৈয়াম।

চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

মালিনী

চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

ত্রয়ী।

চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

শীত-প্রভাত।

চিত্রকর শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে।

বীণা-বাদিনী।

চিত্রকর শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু মহাশয়ের সৌজন্যে।

ওঁ মণিপদ্মে হুঁং।

চিত্রকর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিত্রাধিকারী শ্রীচারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।

নিমাই পণ্ডিতের টোল।

চিত্রকর শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

(৩) জলহস্ত হইয়াই শাপ দিবার কথা পুরাণ এবং মহাভারতাদিতে দেখা যায় এবং প্রচলিতও আছে। "কুশ"-হস্ত হইয়া শাপ দিবার কথা কোন শাস্ত্রে নাই। অভিধানে (প্রকৃতিবাদ) দেখা যায় "কুশ" সংজ্ঞা-বাচক শব্দ। এবং পুং ও ক্লীব লিঙ্গে "কুশের" অনেক অর্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ক্লীব লিঙ্গে কুশের একটি অর্থ "জল"। অতএব ইহা নিশ্চিত যে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "শাপ দিতে বাণী কুশ লৈল হাতে" এখানকার এই "কুশ" শব্দটি কবি "জল" অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব

(২) শিব যে ধুস্তুরাপ্রিয় সে বিষয়ে প্রমাণ আছে।—

"ধুস্তুরকৈস্তু যো লিঙ্গং সকৃৎ পূজয়তে নরঃ।
স গোলক্ষফলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে॥"—ভবিষ্যপুরাণ।

(৩) শাপ দেওয়ার সময় যাহাতে শাপবাক্য নিষ্ফল না হয় সেজন্য শাপদাতা আচমনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া লয়েন, এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে ভুরি ভুরি আছে। শুদ্ধ এবং পবিত্রভাবে যে কথা বলা যায় তাহার গুরুত্ব যে সাধারণ কথা হইতে অনেক বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাপদাতা শুদ্ধ হইয়া ইহাও দেখান যে তিনি ঠাট্টা করিতেছেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষেই শাপ দিতে উদ্যত। কুশ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র জিনিষ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা কুশ হাতে রাখিবার নিয়মও রহিয়াছে। কোনও শাস্ত্রীয় কার্য্যাদির সময় কুশ না লইলে অপবিত্রই থাকিতে হয়, ইহা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। এ অবস্থায়, শাপ-দানকালে কুশ হাতে লওয়া অতি স্বাভাবিক।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(১৩৪)

বদরপুর ঘাটের দুর্গ

গৌড়েশ্বর বাদশাহ সুলেমান কররাণীর সময় রাজা দেবীদাস ছাতকের রাজা (বা জমিদার) ছিলেন। বরাক নদীর তীরের দুর্গ তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার পূর্ব্বতন রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীস্নেহাংশুভূষণ বক্সী

(১৩৯)

মুদ্রিত চক্ষু কেমন করিয়া আলোক অনুভব করে

আমাদের শরীরের সকল স্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপ আছে এবং উহা দ্বারা আমাদের দেহের মধ্যে সকল স্থানেই অল্পবিস্তর আলো প্রবেশ করিতে পারে। কোনও কোনও স্থানের লোমকূপগুলি এত অধিক ক্ষুদ্র যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের চক্ষুর পাতার উপরও ঐ প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতি লোমকূপ আছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকার গৃহে বসিয়া থাকিবার সময় যদি কেহ আলো লইয়া গৃহে প্রবেশ করে তবে ঐ আলো কিয়ৎপরিমাণে লোমকূপগুলির ভিতর দিয়া আমাদের চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও আমরা চক্ষু দ্বারা আলোর অনুভূতি বুঝিতে পারি। যে পরিমাণ আলো লোমকূপের ভিতর দিয়া আমাদের চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করে তাহা দেখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে; সুতরাং আমরা উহাদ্বারা কিছুই দেখিতে পারি না। কেবল অন্ধকারের গাঢ়তা কিছু কমিয়া যায় এই মাত্র। যদি দেখিবার উপযুক্ত আলো লোমকূপের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারিত তবে আমরা চক্ষু না মেলিয়াও সকল বস্তু বেশ দেখিতে পাইতাম।

শ্রীবিনয়েন্দ্রকিশোর গুপ্ত

চোখের উপরকার চামড়ার আবরণটি খুব পাতলা। একটা আঙ্গুল প্রদীপের আলোর কাছে ধরলে, সেটার ভিতর-আলোর যে কেমন অবাধ গতি তা সবাই হয়ত দেখেছেন। পাতলা চামড়ার এই আবরণটি ভেদ ক'রে আলো চোখের সামনে যে উজ্জ্বল কি যায়, সেটা বিচিত্র নয়। চোখে পুরু কাপড় চাপা দিলে কিন্তু আর আলো দেখা যায় না।

শ্রীহেমগোপাল সমাদার

আমরা যে-সকল বস্তু দর্শন করি, চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত স্থূল (convex) লেন্স দ্বারা তাহাদের উল্টা প্রতিরূপ রেটিনা বা অক্ষি-পর্দার উপর পতিত হয়, কিন্তু আলোকের অনুভূতি আমরা অন্যরূপে পাইয়া থাকি। আলোক ইথর-কণার কম্পনের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইথর-কণার এই কম্পনের স্পর্শ রেটিনায় হইলে ইহার পশ্চাতে অবস্থিত (Optical Nerve) চক্ষু-স্নায়ুতে একরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়; চক্ষুস্নায়ু দ্বারা এই উত্তেজনা মস্তিষ্কের (Visual Sensorium) দৃষ্টিকেন্দ্রে নীত হইলে আমরা আলোকের অনুভূতি পাইয়া থাকি। চক্ষুর সম্মুখে যে চর্ম্মময় আবরণ রহিয়াছে আলোকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বচ্ছ নহে; ফলে ইথর-কম্পনের কিয়দংশ এই চর্ম্মময় আবরণ ভেদ করিয়া রেটিনার উপর আঘাত করে। এইজন্য চক্ষু বন্ধ থাকিলেও আমরা আলোকের অনুভূতি পাইয়া থাকি।

ম. ক. খ.

আমাদের চোখের ভিতর পীত-অংশ (yellow spot) ও অন্ধ-অংশ (blind spot) বলে' দুটো জায়গা আছে। পীত-অংশের অনুভবশক্তি খুব বেশী। অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে' বসে' থাকলেও আলোর অনুভূতি পাবার কারণ, যে আলোর রশ্মি চোখে লাগা মাত্র আমাদের ভুরুর নীচেকার একটা শির (nerve) একটু কুঞ্চিত হয়, ও তাহার দ্বারা আমাদের পীত-অংশ আঘাত পায় ও সেই মুহূর্ত্তে আমরা আলোর সঞ্চার অনুভব করি।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

(১৪০)

বেলপাতা তুলসী ও দূর্ব্বার পবিত্রতা

বিল্ববৃক্ষ হিন্দুদের নিকট অতীব পবিত্র বৃক্ষ। নানা শাস্ত্রে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই হেতু বিল্বপত্র পূজার্থে ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বিধি :—

তৎফলৈস্তৎপ্রসূনৈর্ব্বা তৎপত্রৈর্ব্বঃ প্রপূজয়েৎ।
তৎকাষ্ঠচন্দনৈর্ব্বাপি স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
(যোগিনী তন্ত্র।)

তুলসীও হিন্দুশাস্ত্র মতে পবিত্র। তুলসীপত্রে পূজাবিধি সম্বন্ধে প্রমাণ—

বাজিদন্তকপত্রৈশ্চ পুষ্পৈর্ব্বৈরপি চণ্ডিকাম্।
তুলসীকুসুমৈঃ পত্রৈরর্চ্চয়েজ্জ বৃষধ্বজে॥
(কালিকাপুরাণ।)

গয়াশ্রাদ্ধফলং দাতুঃ পিতৄণাং পরিতোষদম্।
তৎফলং স্যাচ্ছতগুণং তুলসীপত্রদানতঃ॥
(বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।)

দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতকথায় দূর্ব্বার উৎপত্তি ও পবিত্র বলিয়া ব্যবহৃত হইবার কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেই আছে—

তৈরিয়ং স্পর্শমাসাদ্য দূর্ব্বা দৈবাজরামরা।
কন্যা পবিত্রা দেবৈস্তু সর্ব্বদাভ্যর্চ্চিতা তথা॥

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায়

(১৪১)

Human Magnetism

Human Magnetismকে এক কথায় ব্যক্তিগত আকর্ষণী-শক্তি বলা যাইতে পারে; এই শক্তি প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে গুপ্ত বা সুপ্তভাবে অবস্থান করে। ইহার প্রকৃত অনুশীলন দ্বারা মানুষ জনসমাজের দৃষ্টি ও প্রীতি সহজেই আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। ইহার উৎকর্ষ সাধন হেতু নৈতিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি বিশেষভাবে পালনীয়, যেমন মিথ্যা বা কু-কথা বলিবে না, কাণা বা খোঁড়াকে দেখিয়া হাসিবে না, বড় বড় নখ রাখিবে না, মুখ-গহ্বর অপরিষ্কার রাখিব না, ময়লা কাপড় পরিধান করিবে না ইত্যাদি। Latent Light Culture, Tinnevellyর নিকট এসকল বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীমাখমলাল চৌধুরী

(১৪২)

ভারতে নোট

পূর্ব্বকালে এদেশে নোটের বা তদ্বৎ অন্য কোন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তোগলক একবার নোট চালাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে তাম্রমুদ্রা চালাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উহাতেও অকৃতকার্য্য হন। নোটের বা তদ্বৎ অন্য কোন মুদ্রার প্রচলন থাকিলে প্রজারা উহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিত। মহম্মদের পরে ইংরেজদের পূর্ব্বে নোট বা তদ্বৎ কোন মুদ্রার প্রচলন সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীস্নেহাংশুভূষণ বক্সী

(১৪৪)

ফস্ফরিক এসিড্

Phosphoric Acid জীবদেহের অন্যতম উপাদান। জীবজন্তু ফস্ফেট সাধারণতঃ উদ্ভিদ্ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। উর্ব্বর ভূমিতে ফস্ফেট অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। কোনও কোনও খনিজ পদার্থেও ফস্ফেট পাওয়া যায়। আমাদের দেশীয় সহজলভ্য বস্তুর মধ্যে ধান, গম প্রভৃতি শস্যের বিচালী হইতেও ফস্ফেট পাওয়া যায়। প্রায় ১৫।১৬ মণ বিচালী হইতে আধসের পরিমাণ ফস্ফরাস ফস্ফেটরূপে বর্ত্তমান আছে। জীবজন্তু ও মনুষ্যের মলমূত্র হইতেও ফস্ফেট (সাধারণতঃ Sodium Ammonium Phosphate রূপে) পাওয়া যায়। Guano নামক উৎকৃষ্ট সার প্রধানতঃ একপ্রকার সামুদ্রিক পক্ষীর পরিত্যক্ত মল। গবাদি পশুর রক্তেও ফস্ফেট বর্ত্তমান আছে, এইজন্য কশাইখানায় যে রক্ত পাওয়া যায় তাহাকে জমাইয়া শুকাইয়া উৎকৃষ্ট সার-রূপে ব্যবহার করা হয়।

ম ক থ

Basic Slag বা ধাতুমল একটি (Phosphoric Acid) প্রস্ফুরক-দ্রাবক বহুল পদার্থ। ইহার অপর নাম লৌহ প্রস্ফুরকাম্ল (Iron Phosphate), Thomas Phosphate, প্রস্ফুরক ধাতুমল (Phosphate Slag) বা নির্গন্ধ দীপক (Odourless Phosphate)। লৌহ-কারখানায় ইস্পাত প্রস্তুতকালে যে ধাতু-মল বা Slag পাওয়া যায় তাহাই Basic Slag নামে অভিহিত। সুতরাং ইহা ইস্পাতের By-product। এজন্য এই প্রস্ফুরক-বহুল সারের মূল্যও অতি অল্প ধাতু মলে (Basic Slag) শতকরা ১৪ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত প্রস্ফুরক চূর্ণয়কের (Calcium) সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কয়েকটি Basic Slag রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে একটি নমুনার বিশ্লেষণের ফলাফল লিখিত হইল:—

	%
চূর্ণকাম্ল (CaO) Lime	৪০.৮৬
সুবর্ণকাম্ল (MgO) Magnesia	৬.৩০
লৌহাম্ল (Ferrous & Ferric Oxide)	২৪.১৮
মাঙ্গানীজাম্ল (Manganous Oxide)	৪.৬২
এ্যালুমিনা (Al_2O_3) Alumina	১.৮৭
প্রস্ফুরকাম্ল (P_2O_5) Phosphoric Acid Anhydride	১৬.৬৮
গন্ধকাম্ল (SO_3) Sulphuric Anhydride	০.৩৪
বালুকীন প্রভৃতি Silica etc.	৮.১২
মোট	৯৯.৬৭

Basic Slagকে যত সূক্ষ্মতম অংশে বিভক্ত করা হইবে উহাতে দ্রবণীয় প্রস্ফুরক দ্রাবকের (Soluble Phosphoric Acid) ভাগ ততই অধিক হইবে। এইজন্য ইহা এত মিহি করিয়া গুঁড়া করিতে হয় যে উহার শতকরা ৭৫ ভাগ প্রতি ইঞ্চিতে ১৬০টি ছিদ্রযুক্ত সূক্ষ্ম চালুনীর (160 holes sieve) মধ্য দিয়া বাহির হইবে ও অবশিষ্ট শতকরা ২৫ ভাগ প্রতি ইঞ্চিতে ১০০ ছিদ্রযুক্ত চালুনীর (100 holes sieve) মধ্য দিয়া বাহির হইবে। এরূপ মিহি অবস্থায় ইহাতে শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ দ্রবণীয় প্রস্ফুরকাম্ল (P_2O_5) পাওয়া যায়। হাড় হইতে যে প্রস্ফুরক সার পাওয়া যায় ইহা তাহার প্রায় তিনগুণ অধিক কার্য্যকারী। অধুনা আমাদের দেশে এই সার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কারণ Tata Iron & Steel Co. Ltd, Bengal Iron & Steel Co. Ltd, প্রভৃতি লৌহ কারখানাগুলিতে এই সারজ ধাতুমল By product হিসাবে পাওয়া যাইতেছে। Messrs. D. Waldie & Co Ltd., Messrs. Shaw Wallace & Co. নামক সার-ব্যবসায়ীগণ ঐ সকল ধাতুমল ক্রয় করিয়া সাররূপে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

প্রকৃতির ক্রোড়েও প্রস্ফুরকবহুল খনিজের অভাব নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিচিনাপল্লীর অন্তর্গত পেরাম্বুলা তালুকের মধ্যে মৃত্তিকা-গর্ভে এই খনিজের পিণ্ড প্রচুর পরিমাণে আছে। ১৮৯৩ খৃঃ ডাক্তার রাথ (Dr. H. Wrath) অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুইশত ফুট নীচে একটি কর্দ্দম-স্তরে এই খনিজের পিণ্ড (Nodules) চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত আছে। সেখানে এই খনিজ পিণ্ড এত অধিক আছে যে তথা হইতে প্রায় ২১ কোটি মণ প্রস্ফুরকাম্ল পাওয়া যাইতে পারে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান খনন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে প্রতি একশত বর্গফুটে প্রায় ১৪ হইতে ২৪ সের এবং কোনো কোনো অগভীর স্তরে ৩৫ সের পর্য্যন্ত প্রস্ফুরকাম্ল অন্যান্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় আছে। এই সকল খনিজ-পিণ্ডে শতকরা ৩৮ হইতে ৪৭ ভাগ প্রস্ফুরকাম্ল ও ৯৬ ভাগ চূর্ণকাম্ল আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সহিত শতকরা ৪ হইতে ৮ ভাগ লৌহ ও এ্যালুমিনা আছে। তৎকালে এই খনিজ-পিণ্ডগুলি উঠাইবার জন্য দুইবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু উহার তেমন চাহিদা (Demand) না থাকায় সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

পশু-পক্ষীর বিষ্ঠায়ও কিয়ৎপরিমাণে প্রস্ফুরক দ্রাবক আছে। পায়রা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির বিষ্ঠায় শতকরা ০.৫ হইতে ০.৭৫ ভাগ ও শুষ্ক অবস্থায় ০.৯৮ হইতে ১.৭ ভাগ; গোময়ে ০.২৩ হইতে ০.২৭ ভাগ; মানবের বিষ্ঠায় ০.১৮ ও প্রস্রাবে ০.২৭ ভাগ প্রস্ফুরকাম্ল আছে।

কোনও কোনও গুল্ম-লতাদির ভস্মেও শতকরা ২ হইতে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। রেড়ির খইলে—১·৯৬ ভাগ, তুলা-বীজের খইলে—৩·১২ ও তিসির খইলে—২·৩ ভাগ প্রচুরকায় আছে।

শ্রীআশুতোষ দত্ত

(১৪৫)

কাঁচ তৈয়ারির স্থান

ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত কারখানাগুলিতে কাঁচ তৈয়ারী হইয়া থাকে :—

১। নাইনী গ্লাস ওয়ার্কস—নাইনী—এলাহাবাদ।
২। পাঞ্জাব গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং—আম্বালা।
৩। হিমালয়ান্ গ্লাসওয়ার্কস লিমিটেড—রাজপুর, দেরাদুন।
৪। পরসাফণ্ড গ্লাস-ওয়ার্কস—তেলেগাঁও—পুণা।
৫। পীরমহম্মদ গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং—বোম্বাই।
৬। জব্বলপুর গ্লাস ফ্যাক্টরী জব্বলপুর।
৭। ইম্পিরীয়াল গ্লাস-ওয়ার্কস—ভাওয়াল—পাঞ্জাব।
৮। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস গ্লাস-ওয়ার্কস—মোরাদাবাদ।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি ছোট ছোট কাঁচের কারখানা আছে। প্রায় ৫।৬ মাস পূর্ব্বে পাঞ্জাব গ্লাস ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং ভারতীয় ছাত্রগণকে এ বিষয় শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। উপযুক্ত লোকদিগকে এ বিষয় শিক্ষা দিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। সুতরাং ঐ কোম্পানীর সম্পাদক বা অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে শিক্ষার্থীর অভিলাষ পূর্ণ হইবে। আর যদি জাপান বা ইউরোপে যাইয়া শিখিবার ইচ্ছা থাকে আমাকে স্বতন্ত্রভাবে পত্র লিখিলে আমি এ বিষয় সবিস্তারে তবে জানাইব।

শ্রীআশুতোষ দত্ত, বি-এস সি
উত্তরপাড়া।

আমাদের গ্রামের কতিপয় অর্থশালী ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এখানে একটি সুবৃহৎ কাঁচের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের গ্রামটি কলিকাতার উপকণ্ঠে; জিজ্ঞাসু স্বয়ং আসিয়া বালি, সোরা, সিমেণ্ট ও অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান সংযোগে কাঁচের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া এবং তাহা হইতে চিম্নী, জার, বাসন, ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ দেখিয়া যাইতে পারেন। শিক্ষা করিবার কথা কারখানার পরিচালকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবেন।

৮ প্রসন্নকুমার লাহিড়ীর বাটী,
সাঁতরাগাছি, হাওড়া। শ্রীস্নেহময় সান্ন্যাল

(১) বেলজিয়ম, জার্ম্মানী, জাপান বা আমেরিকায় গিয়া কাঁচ তৈয়ারী শিখিতে পারা যায়। ভারতবর্ষেও কাঁচের কারখানা প্রচুর; তন্মধ্যে জব্বলপুর, এলাহাবাদ ও হাওড়া-রামরাজাতলা এই তিনটি স্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোম্পানীর নাম (i) Jubbulpore Glass Works, Jubbulpore, C. P., (ii) The Allahabad Glass Factory, Allahabad ও (iii) The Rajah Glass Works Factory at Ramrajahtola, Howrah.

শ্রীমন্মথনাথ চৌধুরী, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার পাল

(১৪৬)

রেশমী পশমী বা সূতী কাপড়ে লোহার দাগ উঠাইবার উপায়

রেশমের কাপড়ে বা পশমের কাপড়ে লোহার দাগ ধরিলে তাহা "গোঁড়া লেবুর" রসে ভিজাইয়া পরে জলে কাচিয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়। (পরীক্ষিত।)

শ্রীশশীতোষ মুখোপাধ্যায়

দাগওয়ালা কাপড়খানাতে উত্তমরূপে সাবান মাখাইয়া ঘাসের উপর পাতিয়া রাখুন (রৌদ্র থাকে যেন)। কাপড়ের জল কিয়ৎপরিমাণে শুষ্ক হইলে কিঞ্চিৎজল ছিটাইয়া দিন এবং ঐ দাগের উপর লেবুর রস মাখাইয়া দিন। লেবুর রস দিয়া ঐ জায়গাটা একটু দলিয়া দিন। কয়েকবার এরূপ করিয়া কাপড়খানা কাচিতে লইয়া যান। কাচিবার কালে দাগটা একটু দলিয়া দিলেই দাগ উঠিয়া যাইবে।

শ্রীস্নেহাংশুভূষণ রক্ষিত

রেশমী, পশমী বা সূতী কাপড়ের লোহার দাগ উঠাইবার প্রক্রিয়া—

১। লোহার-দাগ-লাগা স্থানটি আমরুল-দ্রাবকের (Oxalic Acid) গাঢ় দ্রবে কয়েক মিনিট কাল ভিজাইয়া পরে পরিষ্কার ইস্পাতের ছুরি দ্বারা অল্প অল্প ঘসিলে দাগ উঠিয়া যাইবে। অতঃপর পরিষ্কার জলে ঐ স্থান উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। (একভাগ আমরুল-দ্রাবক ১০ ভাগ জলে মিশাইলে আমরুল-দ্রাবকের গাঢ় দ্রব হইবে।)

২। এক আউন্স পরিস্রুত জলে এক গ্রেণ পটাশ-ফেরোসাইনাইড (Yellow Prussiate of Potash) ও এক ফোঁটা গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Acid) মিশাইয়া দাগ-লাগা স্থানটি এই দ্রবে কিছুক্ষণ ভিজাইবার পর ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। পরে এক আউন্স জলে ১০ গ্রেণ পটাশক্ষার (Pearl Ash or Carbonate of Potash) মিশাইয়া পুনরায় ঐ স্থানটি এই পটাশের জলে ভিজাইয়া পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিলে লোহার দাগ উঠিয়া যাইবে।

৩। পটাশ বিন-অক্জালেট (Potash Bin-Oxalate) ১ ভাগ, মধু—৫ ভাগ ও পরিস্রুত জল—৪০ ভাগ মিশাইয়া কাপড়ের যে স্থানে লোহার দাগ লাগিয়াছে তথায় লাগাইয়া ৪।৫ ঘণ্টা কাল রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানটি ভিজাইয়া দিয়া অল্প অল্প রগড়াইতে হইবে। পরে পরিষ্কার জলে ধুইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

৪। দাগ-লাগা স্থান লেবুর রস ও লবণ দ্বারা ভিজাইয়া রৌদ্রে রাখিলে দাগ উঠিয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় যদি একবার লাগাইলে না উঠে তবে দ্বিতীয়বার লাগাইলে উঠিয়া যাইবে।

৫। দাগলাগা স্থানটি জলে ভিজাইয়া উহার উপর সমভাগ জম্বীর-দ্রাবক (Citric Acid) ও ক্রীম অব টার্টার (Cream of Tarter) মিশাইয়া আস্তে আস্তে ঘসিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

পশমী কাপড় পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া—

পশমী কাপড় পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমে কাপড়গুলি রৌদ্রে দিয়া ব্রুশ সাহায্যে উহার ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। পরে নিম্নলিখিত যে কোন উপায়ে উহা পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

১। অর্দ্ধসের ভাল সাবান টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া দুইসের আন্দাজ ফুটন্ত জলে গলাইতে হইবে। সাবানের দ্রব ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত ৬ ড্রাম আন্দাজ স্পিরিট অব টার্পিন (Spirit of Turpentine) ও দুই ড্রাম আন্দাজ এ্যামোনিয়া (Liquor Ammonia) মিশাইয়া দুই গ্যালন ঈষদুষ্ণ জলের সহিত মিশাইতে হইবে। এখন এই জলে কাপড়গুলি উত্তমরূপে নাড়িয়া-চাড়িয়া কাচিয়া পরিষ্কার জলে ৩।৪ বার ধুইয়া ফেলিলে কাপড় বেশ পরিষ্কার হইবে। হাতের চাপ দিয়া কাপড়ের জল বাহির করিয়া দিতে হইবে। নিংড়াইলে কাপড় খারাপ হইবে।

২। কেরোসিন বা স্পিরিট অব টার্পিন	এক ছটাক
নরম সাবান (Soft Soap)	দুই ছটাক
গ্লিসিরিন্	আধ ছটাক

মিশাইয়া কাপড়ের সর্ব্বত্র লাগাইয়া ১০ মিনিট কাল রাখিতে হইবে। পরে ঈষদুষ্ণ জলে কাচিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিলে পশমী কাপড় পরিষ্কার হইবে।

৩। নদীর পরিষ্কার জল অথবা বৃষ্টির জলে সাবান গুলিয়া উহার সহিত হাত-সওয়া গরম জল মিশাইয়া সেই জলে কাপড়গুলি বার বার ডুবাইয়া তুলিতে হইবে। কয়েক মিনিট কাল এইরূপ করিলে কাপড়ের সমস্ত ময়লা দূর হইবে। সাবানের জল যদি অত্যধিক ময়লা হইয়া যায় তবে আর খানিকটা পরিষ্কার সাবানের জলে কাপড়গুলি বার বার ডুবাইয়া তুলিতে হইবে। যদি প্রথম বারে কাপড় বেশ পরিষ্কার হয় তবে দ্বিতীয় বার আর সাবানের জলে না চুবাইয়া ঈষদুষ্ণ পরিষ্কার জলে ধুইলেই চলিবে।

৪। গরম কাপড়ের উপর পাতলা করিয়া (Starch) শ্বেতসার অথবা Kaoline বিছাইয়া দিয়া কাপড়খানি ভাঁজ করিয়া ৫।৬ দিন রাখিয়া পরে ঝাড়িয়া ফেলিলে ঐ Starch বা Kaolineএর সহিত তৈলাদি চলিয়া যায়। এরূপভাবেও গরম কাপড় পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। কোনও রঙ্গিন কাপড় পরিষ্কার করিতে হইলে ঐ Starch বা Kaoline প্রথমে সেই রংএ রঞ্জিত করিতে হয়।

রেশমী কাপড় পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া—

১। অর্দ্ধ পোয়া মধু, অর্দ্ধ পোয়া নরম সাবান (soft soap) ও অর্দ্ধ পোয়া জিন্ নামক মদ্য, আধ সের ফুটন্ত জলে মিশাইয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। একটি কাঠের মঞ্চের উপর একখানি সুতি কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর রেশমী কাপড়টি বিছাইতে হইবে—যেন কোনও স্থান জড় হইয়া না থাকে। এখন একখানি নরম বুরুশ ঐ মিশ্রিত দ্রবে ডুবাইয়া রেশমের কাপড়ের উপর আস্তে আস্তে ঘসিতে হইবে। সাবানের জল যেন কাপড়ের সর্ব্বত্র ঘসা হয়। ১০ মিনিট কাল কাপড়খানি ঐ সাবান মাখাইয়া রাখিয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ধুইলে বেশ পরিষ্কার হইবে।

২। নরম সাবান ৪ আউন্স, ব্রাণ্ডি (Brandy) ১ আউন্স ও জিন্ (Gin) এক পাঁইট উত্তমরূপে মিশাইয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। একটি স্পঞ্জ (Sponge) বা ফ্লানেলের কাপড় দিয়া রেশমের কাপড়ের উভয় পৃষ্ঠে এই আরকটি মাখাইয়া ২।৩ বার পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিলে নূতনের মত পরিষ্কার হইবে। কোন রঙ্গিন রেশম হইলেও রংয়ের পার্থক্য ঘটিবে না।

৩। রঙ্গিন রেশম পরিষ্কার করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা বিধেয়।

এক সের ফুটন্ত জলে আধপোয়া আন্দাজ পরিষ্কার ভাল সাবান গুলিয়া ঠাণ্ডা করিতে হইবে। হাত-সওয়া গরম থাকিতে থাকিতে কাপড়গুলি বার বার উহাতে চুবাইয়া তুলিতে হইবে। পরে ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে। যদি রেশমের বর্ণ উজ্জ্বল পীত, আপিঙ্গল লোহিত, লোহিত বা নীলাভ গাঢ় লাল হয় তবে এক গ্যালন জলে সামান্য গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Acid) দিয়া (জলের আস্বাদন সামান্য টক হইলেই হইবে) তাহাতে কাপড় চুবাইয়া পরে পরিষ্কার জলে ধুইতে হইবে।

পিঙ্গল অথবা কমলা-লেবুর বর্ণের রেশম হইলে দ্রাবকের জলে ডুবাইবার প্রয়োজন নাই। উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের রেশম রাং-লবণকের (Tin-Chloride) দ্রবে ডুবাইয়া পরিষ্কার জলে ধুইতে হইবে। ঈষৎ লাল বা ফিরোজা প্রভৃতি রংয়ের কাপড় সামান্য লেবুর রস অথবা সির্কা (Vinegar) মিশ্রিত জলে ধুইতে হইবে। আর আসমানি রংয়ের কাপড় সামান্য Potash-এর জলে ধুইতে হইবে। ফট্‌কিরির জলে ধুইলেও রেশমের বর্ণ নষ্ট হয় না।

পরিষ্কার জলে কাচিবার পর হাতের চাপে জল বাহির করিয়া কোনও সুতি কাপড়ের সহিত কাঠের রোলারে গুটাইয়া পরে ঘরের মধ্যে শুখাইয়া লইতে হইবে।

সুতি কাপড় ধুইবার ও পরিষ্কার করিবার প্রক্রিয়া আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষে' একবার লিখিত হইয়াছে। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

শ্রীআশুতোষ দত্ত, বি-এস্ সি

নারী

নারী সে যে,—হোক না সে সুরূপ কুরূপ,
আমি তারে গড়ি নিত্য দিয়া নব রূপ ;
যা-কিছু সুন্দর, আর যাহা রমণীয়,
চিত্ত মোর যাহা চায়, যাহা-কিছু প্রিয়,
এ-বিশ্বের রূপে রসে গন্ধে আর গানে,
এ-হিয়ারে টানে যাহা অমৃতের পানে,—
সে-সবার মাঝে, মোর সৃজন-লীলায়
সমগ্রের সাথে, মোর চিত্ত-নিরালায়,
নারী সে যে যুগে যুগে নিত্য গড়ি' উঠে,
আনন্দের মহিমায় তারি রূপ ফুটে !
জ্যোতির্ম্ময়ী, সে যে দীপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে,
বাঁধা সে ত' পড়ে নাই দেহের বাঁধনে ;
ক্ষুদ্র করে' দেখি তা'রে রূপ-রেখা মাঝে,
মানবের চিত্তে সে যে মুক্তি লভিয়াছে !
কে তারে বাঁধিবে আজ ক্ষুদ্রতার ছাঁদে ?
মুক্ত-হিয়া মানবের তারি লাগি কাঁদে ;
যুগে যুগে, দেশে দেশে প্রেমিকের হিয়া
রূপ তারে দেছে প্রেম-অমৃত সিঞ্চিয়া ;
সে ত নহে একা মোর, আমারি কেবল,
মোর প্রেমে বাঁধি তারে কোথা হেন বল ?
মিছে তারে পিছে বাঁধা, মিছে টানাটানি,
ডাকে তারে অসীমের ঐ হাত-ছানি।

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী

ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ

মুসলমানের ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে বারবার প্রতিশ্রুত হইয়াও ইংরেজ কেন তাঁহার মুসলমান প্রজাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াও সেভ্রাস সন্ধিতে তুরস্ক-শক্তিকে প্রায় সমূলে উৎখাত করিয়া গ্রীক্-শক্তিকে প্রবল করিবার প্রয়াসী হইয়া উঠিলেন তাহা বুঝিতে হইলে পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যের সমস্যাটিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। রুশ-শক্তি যখন প্রবল ছিল তখন তাহার ভারত-অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্ক-শক্তিকে প্রবল রাখা সুবিধাজনক বোধ হওয়াতে ইংরেজ তুরস্কের সহিত মুখে মিত্রতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টান-প্রীতি ও প্রাচ্যের প্রতি অবজ্ঞা ইংরেজের মনে বরাবরই প্রচ্ছন্ন থাকাতে ভিতরে ভিতরে তুরস্কের খৃষ্টান-প্রজা-বিদ্রোহগুলির অনুকূলতা করিতেও দ্বিধান্বিত হন নাই।

ইংরেজের মনোভাব তুরস্কের জানা ছিল। ১৮৭৭ সালের জুনমাসে 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি' নামক মাসিকপত্রে তুরস্কের প্রধান উজির মিধাৎ পাশা এক বিস্তৃত প্রবন্ধে এই ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে—

"Turkey was not unaware of the attitude of the English Government towards her : the British Cabinet had declared in clear terms that it would not int-rfere in our dispute. This decision of the English Cabinet was perfectly well-known to us, but we knew still better that the general interests of Europe and the particular interests of England were so bound up in our dispute with Russia that, in spite of all the declarations of the English Cabinet, it appeared to us to be absolutely impossible for her to avoid interfering sooner or later in the Eastern dispute."

অর্থাৎ ইংরেজ-সরকারের তুরস্কের প্রতি মনোভাব তুরস্কের অজানা নাই। বৃটিশ মন্ত্রীসভা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে আমাদের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরেজ মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্ত আমাদের বেশ জানাই ছিল কিন্তু আমরা আরও ভাল করিয়া জানিতাম যে রাশিয়ার সহিত আমাদের বিবাদের ফলাফলের সহিত সমগ্র ইউরোপের এবং বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের স্বার্থ এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে ইংরেজ-সরকার প্রাচ্য বিবাদে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারিবেন না।

ইংরেজের রুশ-ভীতি যে-শুধু তুরস্ককেই প্রবল রাখিয়াছিল তাহাই নহে। অষ্ট্রীয়াকেও প্রবল করিয়া সার্ব্ব-স্লাভীয় আন্দোলনকে প্রতিহত করাও ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হওয়াতে ইংরেজ অষ্ট্রীয়াকে নানারূপে সাহায্য করিতে থাকে।

কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধের পর রুশ-শক্তি হীনবীর্য্য হইয়া পড়াতে ভারতে রুশভীতি কমিয়া যায়। এদিকে জার্ম্মানী ফরাসী-যুদ্ধের পর হইতেই এত শীঘ্র শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে যে তাহার পূর্ব্ব-অভিযানে ব্যাঘাত দেওয়া ইংরেজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। রাশিয়ার বলক্ষয়ে তুরস্ককে প্রতাপশালী করিয়া রাখা আর ইংরেজের স্বার্থ রহিল না। তাই এসিয়াবাসী এই জাতির প্রতি শ্বেতকায়দিগের সহজাত-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। Sickman of Europeকে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেই যেন ইংরেজ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কারণ ঠিক এই সময়েই কাইরো ও স্তাম্বুলে (Pan-Islamic) সার্ব্ব-মোস্লেম আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমান জাতি-সমূহকে সংঘবদ্ধ করিয়া পরাক্রান্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইসলামের এই সংহতিতে ইংরেজের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। তাই ইস্লামের এই জাগরণের প্রচেষ্টা তাহাদের ভাল না লাগিবারই কথা এবং জার্ম্মানী ইস্লামের জাগরণে সাহায্য করিয়া ইস্লাম-বন্ধুরূপে প্রাচ্যে প্রভুত্ববিস্তারের সুযোগটি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করায় ইংরেজ আরও বিব্রত হইয়া উঠে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হলাণ্ড রোজ (Holland Rose) তাঁহার ইউরোপীয় জাতিসমূহের বিকাশ (The Development of European Nations) নামক পুস্তকের "বৃহৎ শক্তিসমূহের নব সমন্বয়" (New Groupings of Great Powers) নামক অধ্যায়ে বলেন,—"Constantinople and Cairo were the centres of this Pan-Islamic movement, which aiming at the closer union of all Moslems in Asia, Europe and Africa around the Sultan threatened to embarrass Great Britain, France and Russia. The Kaiser, seeing in this revival of Islam an effective force, took steps to encourage the 'true believers' and strengthen the Sultan . Germany and Austria were likely to undermine British interests in the Near East, while on the other hand, the diversion of Russia's activities from Central Asia and the Balkan to the Far East, lessened the Muscovite Menace which had so long determined the trend of British policy. Moreover, Russia's ally France, showed conciliatory spirit. Forgetting the rebuff at Fashoda she aimed at expansion in Morocco. Now Korea and Morocco did not vitally concern us. The Bagdad railway and the Kaiser's court to Pan-Islamism were definite threat to our existence as an Empire ..The aggressive character of the German schemes explains why France, Great Britain and Russia began to draw together for mutual support."

"কাইরো ও স্তাম্বুল হইয়াছিল সার্ব্ব-মোস্লেম আন্দোলনের কেন্দ্র স্বরূপ। এই আন্দোলন, সুলতানের সিংহাসনতলে ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকার মুসলমানদিগকে সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়া গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে বিব্রত করিতেছিল। কাইজার মুসলমানদিগের জাগরণে জার্ম্মানীর শক্তিসঞ্চয়ের সুবিধা বুঝিয়া সুলতানের শক্তিকে দৃঢ় করিতে চেষ্টিত হইলেন। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া পশ্চিম-

প্রাচ্যে ইংরেজ-স্বার্থের বিপরীতে নিজশক্তি সঞ্চার করাতে, ইংরেজদিগের ক্ষতি হইতে লাগিল, অপরদিকে বল্‌কান ও মধ্য এসিয়া হইতে, রুশ-শক্তি একান্ত-পূর্ব্বে রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করাতে ইংরেজের রুশ-ভীতি কমিয়া গেল। রাশিয়ার মিত্ররূপে ফ্রান্স পূর্ব্ব-বিরোধ ভুলিয়া ইংরেজদিগের সহিত মেলামেশার আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ফ্যাসোদার অপমান ভুলিয়া ফ্রান্স মরকোতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কোরিয়া ও মরক্কোর সহিত ইংরেজ-স্বার্থ যুক্ত ছিল না, অপর পক্ষে বাগ্‌দাদ রেল লাইন এবং কাইজারের তুরস্ক-প্রীতি আমাদের স্বার্থের অন্তরায় এবং উহাতে আমাদের সাম্রাজ্যের ক্ষতির কারণ হইবার সম্ভাবনা। জার্ম্মানীর বলবৃদ্ধির উপায়গুলি ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংরেজের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়াতে উক্ত তিন শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।"

কাজে কাজেই জার্ম্মান-শক্তিকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা পাওয়া ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ মন্ত্রীবর্গের প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। আল্‌বেনিয়া লইয়া ইতালী ও অষ্ট্রীয়ার মনোবিবাদ বাড়াইয়া তুলিতে এই রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা যথেষ্টই প্রয়াস পাইলেন। এবং তুরস্কের নিকট হইতে ত্রিপলী অন্যায় ভাবে কাড়িয়া লইতে ইতালীকে কেহ বাধা দিলেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে উঁহারা ইতালীকে ত্রিমিত্র মিলন (Triple Alliance) হইতে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে লাগিলেন। ত্রয়ী (Triple Entente) রাষ্ট্রনীতির গতি এইরূপে ত্রিমিত্রমিলনের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। তাই সুযোগ বুঝিয়া বল্‌কান-শক্তি-পুঞ্জ হতবীর্য্য তুরস্ককে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কিন্তু নবীন তুরস্ক-সম্প্রদায়ের (Young Turks) শৌর্য্যে তুরস্ক কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোটামুটি ইউরোপের রাষ্ট্র-নৈতিক অবস্থা এই। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সত্ত্বেও ইংরেজ সার্ভিয়া ও বুল্‌গেরিয়া প্রভৃতি বল্‌কান রাজ্য-সমূহের সহিত ভিতরে ভিতরে সহানুভূতি দেখাইয়া আসিলেও এযাবৎ প্রকাশ্য ভাবে তুরস্কের শত্রুতা করেন নাই। তাই যুদ্ধাবসানে ইংরেজের তুরস্কের প্রতি প্রকাশ্য বিরুদ্ধভাব দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রকাশ্য শত্রুতা ইংরেজের মুসলমান প্রজাবৃন্দের মহা অসন্তোষের কারণ হইবে জানিয়াও কেন যে ইংরেজের হঠাৎ গ্রীক-প্রীতি এতটা জাগিয়া উঠিল তাহা প্রথমে পরিষ্কার বুঝিয়া উঠা যায় নাই।

ইংরেজের গ্রীক-প্রীতি যে অহেতুকী নয়, ইহার অন্তরালে যে গোপন অভিসন্ধি ছিল তাহা সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে আড্রিয়াটিক উপকূলে ইতালী তাঁহার প্রাচীন অধিকার পূর্ণ দখলে আনিয়া যখন হঠাৎ বলশালী হইয়া ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন তখন ইতালীর বিপক্ষীয় শক্তিকে প্রবল করিয়া তুলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়া ইতালীর শক্তিকে খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাওয়া ইংরেজের প্রয়োজন হইল। গ্রীস অনেক-দিন হইতেই ইতালীর প্রতিকূলতা করিয়া আসিতেছিল, তাই ভূমধ্য সাগরে গ্রীসশক্তিকে প্রবল করিয়া ইতালীর set off সৃষ্টি করা ইংরেজের স্বার্থ হইল। ইতালী যখন আড্রিয়াটিকের পূর্ব্ব উপকূলে প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য নিজের দাবী শান্তি-বৈঠকে উত্থাপন করিলেন তখন হইতেই ইংরেজপক্ষ হইতে তাহার প্রতিকূলতা আরম্ভ করা হইল। ইষ্ট্রীয়া ও ডাল্‌মেসিয়া প্রদেশ পুরাতন ভিনিস রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া ইতালী সেইগুলিকে নিজের দখলে আনিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইতালীর এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে যুগোস্লাভিয়া রাজ্যকে তলে তলে উস্কাইয়া দিবার প্রয়াস মিত্র-শক্তি-বর্গের তরফ হইতে চলিতে লাগিল। যুগোস্লাভিয়া ডাল্‌মেসিয়ার অনেকটাই দখল করিয়া বসিলেন। দ্যান্নুন্‌সিয়োর প্ররোচনায় ইতালিয়া ইরেন্‌ডেন্টা নামে নব্য ইতালীয় তরুণ সম্প্রদায় এক দল গঠন করিয়া যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া মিত্রশক্তিবর্গের রাজনীতি-ধুরন্ধরেরা একটা রফা-নিষ্পত্তির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইতালীর ব্যবহারে কিন্তু স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে ইতালী আড্রিয়াটিকে প্রাধান্য লাভ না করিতে পারিলে সহজে এই বিরোধের কোনই সমাধান হইবে না। কিন্তু আড্রিয়াটিকে ইতালীকে প্রাধান্য দিবার পূর্ব্বে গ্রীসকে শক্তিশালী করিয়া তুলা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের সঙ্গে একটা রফা-নিষ্পত্তি করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট ফ্রান্সের সেভার্স সহরে তাড়াতাড়ি একটা সন্ধির খসড়া খাড়া করা হইল। লয়েড জর্জ্জ যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন এবং অধিবাসীদিগের ইচ্ছা সম্বন্ধে উইল্‌সন যে-সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আন্তর্জ্জাতিক এই সন্ধিপত্র ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। ইহাতে তুরস্কের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে, কেননা গ্রীসকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বল্‌কান রাজ্য হইতে ভূমধ্যসাগরস্থ প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলাই এই সন্ধিপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কাজেকাজেই ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবার বড় একটা অবকাশ ছিল না।

"The Treaty of Sevres will have changed the position of Greece from that of a Balkan State of secondary importance into that of a Mediterranean power whose influence must be far-reaching."—H. Charles Wood in the *Quarterly*.

ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের প্রভাব বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই মেসিডোনিয়া ইজিয়ান দ্বীপ থ্রেস ও স্মার্ণা তুরস্কের নিকট হইতে কাড়িয়া গ্রীসকে দেওয়া হইল। ইতালী সেভার্স-সন্ধির বলে ডোডিকানিস দ্বীপ-সমূহ অধিকার করিয়াছিল কিন্তু তার কিছুদিন পরে ইতালী একপ্রকার বাধ্য হইয়া উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই গ্রীসকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হয়েন। ১৫ বৎসর পরে যদি সাইপ্রাস্ দ্বীপ ইংরেজ গ্রীসকে প্রদান করেন তাহা হইলে ইতালী রোড্‌স্ দ্বীপও গ্রীসকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন বলিয়া স্বীকার করেন।

১০ই আগষ্ট আর-একটি সন্ধিপত্রে ইংরেজ ও ফরাসী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ অবধি নানা সন্ধিসর্ত্তে গ্রীসের উপর খবরদারী করিবার যেসকল অধিকার অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বিনা সর্ত্তে সেই-সকল অধিকার বর্জ্জন করিতে স্বীকার করিলেন। বুল্‌গেরিয়ার ইজিয়ান সাগরে সহজে যাতায়াত করিবার পথ উন্মুক্ত রাখিতে মিত্রশক্তি-বর্গ যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন থ্রেস্‌কে গ্রীসের অধিকারভুক্ত হইতে দিয়া তাহার সম্ভাবনাকে নষ্ট করিলেন। এইরূপ নানা অন্যায়ের দ্বারা গ্রীসপ্রভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা হইল। তাহার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর র‍্যাপালো সহরে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই র‍্যাপালো সন্ধিদ্বারা আড্রিয়াটিক সমস্যার একটি সুমীমাংসা সম্ভবপর হইয়াছে। জারা দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত সমস্ত ডাল্‌মেসিয়া প্রদেশের উপর ইতালী নিজের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে যুগোস্লাভিয়া ইষ্ট্রীয়ার উপর তাহার দাবী ছাড়িয়া দিলেন। ইতালী আড্রিয়াটিকে প্রভাব বিস্তার করিলেন বটে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রীসশক্তি ভূমধ্যসাগরে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ইতালী-শক্তির প্রসারের অন্তরায় হইয়া

উঠিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির এই কূট ব্যবস্থাই আবার ইউরোপের ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুল্‌গেরিয়া ইজিয়ান সাগরে কোনও বন্দর না পাওয়াতে বুল্‌গার শস্য অবাধে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাতায়াত করিতে পারিতেছে না। বুল্‌গার শস্য ইউরোপের খাদ্যের অভাব ঘুচাইয়া আসিয়াছে। তাহার অভাবে বর্ত্তমানে ইউরোপে খাদ্য অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীস-শক্তির আকস্মিক বিকাশে রুমেনিয়া জেকোস্লোভাকিয়া ও বুল্‌গেরিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া গ্রীসের বিপক্ষে এক হইয়াছেন। এদিকে মুস্তাফা কামাল পাশা তুরস্কপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গ্রীসের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাকে বারবার পরাস্ত করিয়া দিয়াছেন। মিত্রশক্তি গোপনে গ্রীসকে সাহায্য করিয়াও কামালের শক্তির বিরুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। কামাল নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য বোল্‌শেভিকদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্যোগী হওয়াতে ইংরেজ বিপদ গনিতেছেন। অর্থাৎ তুরস্ক-সন্ধি-সর্ত্ত পুনর্ব্বিচারের কথা উঠিয়াছে। যদি নিজ স্বার্থের হানি না করিয়া কোনও রকমে তুরস্ক-শক্তিকে সুখী করা চলে। কিন্তু গ্রীস-সমস্যা ভিন্ন আরব-সমস্যা পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যে ইংরেজকে বড়ই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। সে সমস্যার কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অচেনা

নিশিদিন প্রতি পলে পলে
কে যে মোর সাথে সাথে চলে
　কি কহিতে চায় কানে কানে,
ধরার রহস্যকথা সে কি জানে, সে কি সব জানে ?…
　কি আড়াল দুনয়নে দোলে,
　এ ধরা উতল কলরোলে
　কোথায় ডোবায় তার বাণী,
তবু সে সোহাগ-ভরে কাছে এসে ধরে হাতখানি !
　　　কে গো সে ?

ওঠে ঝড় কাল-বৈশাখীর,
কোলাহল অযুত পাখীর
　দিক্ হতে দিকে যায় ভাসি',
চোখে তার কি অভয়, মুখে কোন্ প্রশান্তির হাসি !…
কোন্ সে দুরূহ তপস্যায়
ধ্যান-নেত্রে দিনু তার যায়,
　কোথায় সে উত্তরিবে শেষে,
কোন্ অঘটন কথা শোনায়ে ফিরিবে দেশে দেশে ?…
　　　কে গো সে ?

দূর হতে দূরে অবিরত
চলি আমি মুগ্ধ স্বপ্নাহত,
　নিশিদিন চলি তার পাণে,
ধরার রহস্যকথা যেইজন জানে সব জানে।…
　চলি সব দুঃখক্লেশ সহি'
　শকতি-অতীত ভার বহি',
　মানবের সব দুঃখভার
যেথা গিয়ে অবসান ওগো সে সন্ধান জানে তার।
　　　কে গো সে ?

　'পাশরি' সকল সুখ আশা
　তারেই দিয়েছি ভালোবাসা
　সে আমার সাথে সাথে চলে,
নয়নে হেরিতে তারে ভাসি সদা নয়নের জলে।
　সে কি আমি, সে কি মোর আমি ?
　আমারই মাঝারে দিবাযামী
　আপনারে লুকাইয়া রাখে,
ব্যর্থ এ জীবন মোর লাজ পেয়ে সে কি মুখ ঢাকে ?
　　　কে গো সে ?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

বিদেশ

জেনোয়া বৈঠক—

ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপের হতশ্রীর পুনরুদ্ধার সাধনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য কান্ সহরে যে অর্থনৈতিক বৈঠক বসিয়াছিল তাহার সিদ্ধান্তগুলি ফরাসী রাষ্ট্রীয় মহাসভা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করাতে কান্ বৈঠক বৃথা হইয়া গেল।

ইংরেজ ও ফরাসীর মনান্তর ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে জেনোয়া-বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। ব্রিয়াঁর পদত্যাগে ফরাসী-ইংরেজের মিত্রতাবন্ধন আরও শিথিল হইয়া উঠে। কিন্তু মধ্য-ইউরোপের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং মধ্য-ইউরোপের ভাগ্যের সহিত সমস্ত ইউরোপের ভাগ্য এমনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে যে মধ্য-ইউরোপের বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস না পাইলে ইউরোপকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। তাই জেকো-স্লোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী বেণীসের প্রচেষ্টায় ফ্রান্স জেনোয়া-বৈঠকে উপস্থিত হইতে সম্মত হইয়াছেন। ১১ই এপ্রিল জেনোয়া-সহরে বৈঠক আরম্ভ হইবে। ইউরোপের অর্থনৈতিক সাম্য এবং মুদ্রার নিরূপণ ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহা ব্যতীত মধ্য-ইউরোপের রাজ্যসমূহকে ঋণদান, রাশিয়ার সহিত রফা-নিষ্পত্তি প্রভৃতি আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা আছে।

বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য ইংলণ্ডের তরফ হইতে লয়েড জর্জ্জ, লর্ড কার্জ্জন ও স্যার রবার্ট হর্ণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে বৈঠকের আরম্ভে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। ফরাসী তরফ হইতে চারিটি প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবার কথা, কিন্তু বিচার-মন্ত্রী বার্থু (M. Barthou) ভিন্ন আর কেহ এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হন নাই। ফরাসীজাতি বৈঠকের ফল সম্বন্ধে এতই সন্দিগ্ধ যে কোনও ফরাসী কূটনীতি-বিশারদ বৈঠকে যোগ দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছেন না। মিলেরাঁ আফ্রিকা পরিদর্শনের অছিলায় বৈঠক হইতে দূরে থাকিতেছেন; পোয়াঁকারে ফ্রান্স ছাড়িয়া যাইতে অপারগ বলিয়া জানাইয়াছেন। বার্থু ভার্সাই সন্ধি-সর্ত্ত ও লয়েড জর্জ্জের সন্ধি-স্থাপন-প্রণালীকে আক্রমণ করিয়া প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইনি ফরাসী ক্ষাত্রশক্তিকে প্রবল করিয়া তুলিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ফরাসী ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতাবন্ধন স্থাপনের জন্যও ইনি উদ্গ্রীব। তাই ইঁহার নির্ব্বাচনে ইংরেজদের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে।

ফরাসী মন্ত্রীসভা অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির করিয়াছেন যে ইউরোপের পুনরুদ্ধারের সকল প্রচেষ্টাতেই ফ্রান্স যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা পাইবে, এবং অর্থনৈতিক সকল সমস্যা পূরণের জন্য নানা আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিবে। কিন্তু জেনোয়া-বৈঠকে যদি চাতুরী করিয়া প্রাচ্য-সমস্যা, বোল্‌শেভিক-সমস্যা প্রভৃতি রাষ্ট্র-নৈতিক সমস্যার পূরণের প্রয়াস দেখা যায় তবে ফরাসী স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফরাসী প্রতিনিধিগণ সেই-সকল আলোচনায় বাধা দিবেন।

সোভিয়েট রাশিয়াকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। ইংরেজ-সরকার প্রস্তাব করিবেন যে রাশিয়ার পুরাতন ঋণ যদি সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লয়েন তাহা হইলে সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রকে রাশিয়ার নিয়মসঙ্গত রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইবে। তবে রাশিয়ার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কোনও সুদ লওয়া হইবে না।

রাশিয়ার প্রতিনিধি চিচেরিন বলেন যে সোভিয়েট অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আঘাত না করিয়াও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ও পুরাতন ঋণ স্বীকারের পদ্ধতি আবিষ্কার করা যাইতে পারে। পুঞ্জীকৃত ধনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্র চেষ্টা পাইতেছেন বটে; তথাপি পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে একটু-আধটু রফা-নিষ্পত্তি করিয়া চলিতেই হইবে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ স্বীকার করিবার পূর্ব্বে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রকে রাশিয়ার নিয়মসঙ্গত ও প্রকৃত রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রাশিয়ার প্রতিনিধি জেনোয়া-বৈঠকে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি দাবী করিবেন।

(১) রাশিয়ান জাহাজের সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধির অধিকার দিতে হইবে।

(২) সোভিয়েট নিশানকে রাশিয়ার নিশান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার প্রাপ্য সম্মান দিতে হইবে।

(৩) রাশিয়ান বাণিজ্য-জাহাজ বন্দরের ভিতর প্রবেশাধিকার পাইবে।

(৪) যুদ্ধের পূর্ব্বে রাশিয়ার যে-সমস্ত বাণিজ্য-জাহাজ ছিল তাহা এখন মিত্রশক্তিবর্গের করতলগত হইয়া আছে। তাহার শতকরা বাটখানি আবার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(৫) যে-সমস্ত জাহাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা ফেরৎ দেওয়া হইবে না তাহার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(৬) দার্দ্দেনেলিশ প্রণালীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে কমিশন বসিবে তাহাতে সোভিয়েট প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

মিত্রশক্তিবর্গ যদি এই-সকল সর্ত্তে স্বীকৃত হন তবে রাশিয়া মিত্রশক্তি-বর্গের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত আছেন, নতুবা নহে।

দেখা যাউক জেনোয়া-বৈঠকের ফল কিরূপ হয়।

পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য—

গ্রীস ও তুরস্কের বিবাদ মিত্রশক্তির পক্ষে নানা অসুবিধার কারণ হওয়াতে উহার একটা রফানিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য প্যারিস সহরে এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে অ্যাঙ্গোরার পক্ষে ইউসুফ কামাল, তুরস্কের সুলতানের পক্ষে ইজ্জত পাশা, ইংরেজ পক্ষে লর্ড কার্জন, ফরাসীদিগের পক্ষে পয়াঁকারে এবং ইতালীয় পক্ষে কাঞ্জার উপস্থিত ছিলেন। গ্রীস কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৈঠকে ইতালীর প্রতিনিধি বলেন যে ভূমধ্যসাগরে শক্তিসমন্বয় রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে তুরস্কের স্বাধীনতা ও পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। অ্যাঙ্গোরা ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ থ্রেস ও অ্যানাটোলিয়া ফিরিয়া পাইবার দাবী করেন। লর্ড কার্জ্জন রফানিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে তুরস্ক-গ্রীস যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ফরাসী প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে যুদ্ধ স্থগিত রাখিলে গ্রীসকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করা হয়। এখন গ্রীসশক্তি ধ্বংসের মুখে রহিয়াছে; যুদ্ধ স্থগিত রহিলে গ্রীক সৈন্য আত্মরক্ষা করিবার অবসর পাইয়া কোনও সুদৃঢ় স্থানে আবার সমবেত হইয়া নূতন অভিযানের জোগাড় করিতে পারে। গ্রীসের এই সুবিধাটুকু করিয়া দেওয়া উচিত নহে। যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবটি কিন্তু খুব আগ্রহের সহিত গ্রীস গ্রহণ করিয়াছে। অনেক আলোচনার পর মিত্রশক্তিবর্গ যেরূপ মীমাংসা দ্বারা তুরস্ক-গ্রীক সমস্যার নিষ্পত্তি করিতে চাহিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম বিগত ৩০শে মার্চ্চ লর্ড মহাসভায় লর্ড কার্জ্জন বিবৃত করিয়াছেন। সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি এই :—

যুযুৎসু শক্তিবর্গ যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলে মিত্রশক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে গ্রীকসৈন্য এসিয়া-মাইনর হইতে অপসারিত হইবে। এক একটি প্রদেশ হইতে গ্রীকসৈন্য সরিয়া যাইলেই সেই সেই প্রদেশ তুরস্ক-শাসনের অধীনে আসিবে। মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাদিগের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। পরে তুরস্ক যদি জাতিসমূহের সংঘের সভ্য নির্ব্বাচিত হয় তবে এই খ্রীষ্টান প্রজাদিগের স্বার্থরক্ষার ভার সংঘের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হস্তে থাকিবে। আর্ম্মেনীয়ানদিগের একটি স্বাধীন বাসভূমির ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পাওয়া যাইবে। পূর্ব্ব থ্রেসের কতকটা অংশ তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পশ্চিম থ্রেস গ্রীসের থাকিবে। লর্ড কার্জ্জন বলেন যে গ্রীস সৈন্য যখন থ্রেসকে অধিকার করিয়া বেশ সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে তখন থ্রেসের সম্পূর্ণ অংশ ফিরাইয়া দিতে গ্রীসকে অনুরোধ করা যায় না। কার্কেকাজেই আড্রিয়ানোপল্ ও গ্যালিপোলি গ্রীসের থাকিবে। মিত্রশক্তিবর্গ আরও বলেন যে, দার্দ্দেনেলিসের উভয় তীরের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং তীরের ধারে সৈন্যাবাস থাকিতে দেওয়া হইবে না। গ্যালিপোলি উপত্যকার দুর্ঘটনার পুনরভিনয় হইতে দিতে মিত্রশক্তিবর্গ সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, অতএব তাহা যাহাতে সম্ভবপর না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

লর্ড কার্জ্জন বলেন যে এই সিদ্ধান্ত চরমসিদ্ধান্ত না হইলেও বেশ সুমীমাংসাই বটে এবং তুরস্ক ও গ্রীস এই উভয় পক্ষেরই ইহাকে গ্রহণ করা উচিত। তুরস্ক ও অ্যাঙ্গোরা মীমাংসাগুলির সম্বন্ধে এখনও কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা সমস্ত সর্ত্তগুলিকে তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। তবে যতদূর বোঝা যায়, তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত সহজে গ্রহণ করিবেন না। ভারতীয় খেলাফৎ কমিটিও এই মীমাংসার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, গ্যালিপোলি, আড্রিয়ানোপল্ ও পশ্চিম-থ্রেস গ্রীসের অধীন রাখা অত্যন্ত অন্যায়। অধিবাসীদিগের দাবী মানিয়া চলিলে এইগুলি তুরস্কের প্রাপ্য। উচ্চ-সমুদ্রের প্রবেশ-সংকেত এই স্থানে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য অবাধ্য হইবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। আড্রিয়ানোপল-আয়ন সম্বন্ধে ব্যবস্থা এবং দার্দ্দেনেলিস হইতে দুর্গ-সমাবেশ তুলিয়া দেওয়াও ইহাদের মতে অত্যন্ত অন্যায়। খেলাফতী-মতামত হইতেই মুসলমানদিগের মনের ভাব বেশ বুঝা যায়। তাই মনে হয় তুরস্কের সহিত রফানিষ্পত্তি এত সহজে হইবার নয়।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ

মহাত্মার বিচার—

বোম্বাই গবর্মেণ্টের আদেশ অনুসারে গত ১০ই মার্চ্চ আহমেদাবাদের পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা গান্ধী এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারকে গ্রেপ্তার করেন। পরের দিনই তাঁহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করানো হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা। গত জুন মাস হইতে গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত যে-সমস্ত প্রবন্ধ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের ভিতর চারিটি প্রবন্ধে নাকি এই বিদ্বেষ প্রচার করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বলিয়াছিলেন, তিনি যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন, এ কথা যথাকালে যথাস্থানে স্বীকার করিবেন। ইহার পর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়কে দায়রাতে সোপর্দ্দ করেন।

গত ১৮ই মার্চ্চ দায়রা-জজ মিঃ ব্রুমফিল্ডের এজলাসে ইঁহাদের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বিচারক মহাত্মার প্রতি ছয় বৎসর এবং শঙ্করলালের প্রতি এক বৎসর শ্রমহীন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এই এক বৎসর কারাদণ্ড ছাড়া শঙ্করলালকে এক হাজার টাকা জরিমানাও দিতে হইবে। জরিমানার অর্থ না দিলে তাঁহাকে আরো ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আদালতে মহাত্মা গান্ধী নিজের অপরাধ নিরাপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং সাক্ষীর হাঙ্গামা কিছুমাত্র সহ্য করিতে হয় নাই। যেরূপ আত্মবাহিত ভাবে এবং অনাড়ম্বরের সহিত তিনি দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এই বিচারটি ভারতের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আদালতে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন"—এড্‌ভোকেট জেনারেল আমার প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করেন নাই। বর্ত্তমান-গবর্মেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করাই আমার একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এড্‌ভোকেট জেনারেল সত্যই বলিয়াছেন, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সংশ্রবে আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আমি গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করিতেছি।

"আমার ঘাড়ে যে দায়িত্ব-ভার চাপানো আছে তাহার গুরুত্ব যে আমি জানি না এমন নহে। সব জানিয়া-শুনিয়াই আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। মাদ্রাজ-বোম্বাই-চৌরীচৌরার অপরাধের জন্য আমাকে দায়ী করা হইয়াছে—সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি না। আজ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় আমি আবার সেই আগুন লইয়া খেলা করিব। জন-সাধারণ সর্ব্বত্র সংযত হইয়া চলে নাই। তথাপি অহিংসাই যে আমার মূলমন্ত্র তাহাতে কিছুমাত্র

ভুল নাই। আমাকে লঘু শাস্তি দেওয়া হোক এ প্রার্থনা আমি কখনো করি না। আমাকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়াই সঙ্গত। বিচারক যদি খাঁটি হন তবে হয় তাঁহাকে আমার প্রতি যথারীতি আইনসঙ্গত সাজার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে পদ পরিত্যাগ করিয়া আমার মত অসন্তোষ প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে। অসহযোগই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতিকারের একমাত্র উপায়।

"আমাকে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ধারাটি দণ্ডবিধির রাজনৈতিক বিভাগের সকলের সেরা ধারা বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার এমন সুন্দর উপায় আর নাই। আইনের সাহায্যে দেশের সন্তোষ বৃদ্ধি করা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যদি কাহারো ভালোবাসা না থাকে তবে তাহা প্রকাশের স্বাধীনতা তাহার আছে। আমি ও শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল যে-আইন অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছি, বহু জনপ্রিয় নেতা এই আইন অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছেন। রাজার প্রতি বিদ্বেষ দূরের কথা, ব্যক্তিগত ভাবে কোনো রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধেও আমার কোনো বিদ্বেষ নাই। যাহা দেশবাসী-মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য, আইনের চক্ষে তাহাই ঘৃণিত অপরাধ। এ আইনের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুদণ্ড আমি তাহাই প্রার্থনা করিতেছি।"

এমন নির্ভীক, এমন সুস্পষ্ট উত্তর কেবলমাত্র মহাত্মার নিকট হইতেই আশা করা যায়। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতাকামী, তাহার মুক্তিপ্রয়াসী, দেহের আগে তাহাদের মন স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁহাদের মন দুঃখ-ভয়ের ভাবনা হইতে স্বাধীন; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রভাব নাগপাশ হইতে স্বাধীন। স্বাধীনতা এই শীর্ণদেহ কঙ্কালসার লোকটির মনের ভিতর যে কিরূপ ভাবে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহা এই পাষাণ-প্রাচীরে ঘেরা বিচার-গৃহে, পরিপূর্ণ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি—

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্ম গত ১৭ই মার্চ্চ কংগ্রেসের কার্য্য-পরিচালক-সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারেও দেশবাসী যেরূপ ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রশংসার্হ। কংগ্রেস কমিটি আশা করেন, ভবিষ্যতে নিদারুণ সঙ্কটের সময়েও দেশবাসীর ভিতর এই ধৈর্য্য এবং স্থির বুদ্ধির অভাব ঘটিবে না।

(২) কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ধারণা, এরূপ সময়েও এই শান্তি অহিংস-অসহযোগ নীতির উন্নতিরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং এই ধৈর্য্যের দ্বারা খেলাফত-অবিচারের ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকারের সুবিধা হইবে স্বরাজ লাভের পথ সুগম হইবে।

(৩) মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর কোনো পরিবর্ত্তন হইবে না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে বরদলই এবং দিল্লীর প্রস্তাবানুযায়ী গঠন-ব্যবস্থার দিকেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি ব্যক্তিগত আইন-অমান্য ব্যাপারে যাহাতে হঠাৎ লিপ্ত না হন, সেজন্য এই কমিটি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

(৪) কংগ্রেস ও খেলাফৎ প্রতিষ্ঠানসমূহকে খদ্দর প্রচলনের আন্দোলন আরো তীব্রতর ভাবে চালাইতে হইবে। সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের নর-নারীকেই খদ্দর প্রচলনের আন্দোলন পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিবার জন্ম এই সমিতি বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। কারণ ইহার রাজনৈতিক উপযোগিতা যেমন, অর্থনৈতিক উপযোগিতাও তেমনি বেশী। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবার ইহাতে কুটীর-শিল্পের সুবিধা পাইবে। এই কুটীর-শিল্পে কেবলমাত্র অবসরকালটুকু নিয়োগ করিলে, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ভারতের বহু নর-নারীর অর্থাগমেরও একটা উপায় হইবে। মিঞা মহম্মদ হাজি, জান মহম্মদ ছোটানী ও শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ, মহাজন ও অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাতীয় কুটীর-শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন। সমিতি তাঁহাদের উপরেই সে ভার অর্পণ করিতেছেন।

উপরের এই প্রস্তাবগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি প্রস্তাব ১৭ই-১৮ই মার্চ্চের সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) অধিক পরিমাণ খদ্দর প্রস্তুত করিবার জন্ম নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি হইতে তিন লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইবে।

(২) এই সমিতি ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ কাল 'জাতীয় সপ্তাহ' বলিয়া গণ্য করিবার জন্ম দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছেন। ৬ই এপ্রিল উপবাস করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে এবং ১৩ই এপ্রিল সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবভাবে হরতালের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 'জাতীয় সপ্তাহে' তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্ম চাঁদা সংগ্রহ এবং খদ্দরের প্রসার ও প্রচারকল্পে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবগুলির ভিতর হইতেই বোঝা যায় ভাঙার অপেক্ষা তাঁহাদের নজর বিশেষভাবে পড়িয়াছে গড়ার দিকে। এই গড়ার কাজ ছাড়া জাতি যে জাগিতে পারে না—বড় হইতে পারে না—তাহা বলাই বাহুল্য।

সংবাদপত্রের বিপদ—

গবর্ণমেণ্টের মনোমত কথা দিয়া কাগজ ভর্ত্তি না করিয়া অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলার অপরাধে ভারতবর্ষের অনেকগুলি কাগজ বর্ত্তমানে বেজায় রকমে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কাহারো বা জামিনের টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, কাহারো বা সম্পাদক জেলে পচিতেছেন। কতকগুলি বিপন্ন সংবাদপত্রের নাম এবং তাহাদের বিপদের নমুনা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

'বন্দেমাতরম্' লাহোরের কাগজ। ইহার সহকারী সম্পাদক লালা রামপ্রসাদের প্রতি ১৮ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জরিমানার অর্থ দিতে না পারিলে ইঁহাকে আরো ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইহার সম্পাদক লালা শান্তিনারায়ণ এবং প্রিণ্টার কেদারনাথকে ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও মৌলবী মহম্মদ কাজিম আলি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে তিন মাস ও ১৪৩ ধারা অনুসারে একমাস অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া পুলিশ-আইনের ৩২ ধারা অনুসারে ইঁহাদের প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে। জরিমানা অনাদায়ে আরো তিন মাস কারাবাস।

সিন্ধু প্রদেশের 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জেমচাঁদ বাজ্জনীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মান্দ্রাজের 'কোয়ামি রিপোর্ট' নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক

এল, এম, গোলাম মহম্মদ দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

জব্বলপুরের 'তিলক' নামক হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ ৬০০ টাকার জামিন তলব করিয়াছেন।

সিন্ধু হায়দ্রাবাদের 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানন্দের প্রতি দুই বৎসর শ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'হিন্দু'র সম্পাদকের পক্ষে এরূপ লাঞ্ছনা নূতন নহে। এ পর্য্যন্ত ইহার তিনজন সম্পাদক গবর্ণমেন্টের এই নূতন ধরণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের 'রেঙ্গুন মডার্ণ টাইম্‌স' ও 'নলেজ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক কারাগারে পচিতেছেন।

কলিকাতার 'হিন্দুস্থান'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্তের উপর ১২৪ ধারা অনুসারে নোটীশ জারি করা হইয়াছে। তাঁহার মামলার শুনানি এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীহট্টের 'জনশক্তি' পত্রিকার জামিনের দুই হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। অর্থাভাবে ইহার প্রচার এখন বন্ধ আছে। পরিচালকেরা ভিক্ষার ঝুলি বহিয়া সাধারণের দ্বারস্থ হইয়াছেন।

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা গান্ধী এবং উঁহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের প্রতি যথাক্রমে ছয় বৎসর এবং এক বৎসর অশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কলিকাতার বাংলা দৈনিক 'বন্দেমাতরমের' মুদ্রাকর এবং প্রকাশক শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য দুইটি প্রবন্ধের জন্য ১২৪ (ক) এবং ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার বিচার চলিতেছে।

এতগুলি কাগজ রাজদ্রোহ করিয়াছে, একথা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অদ্ভুত। আর যদি করিয়াই থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, গবর্ণমেন্টের আইনকানুনের ভিতর এমন কোন গলদ আছে যাহাতে রাজদ্রোহ খুব সহজে হয়।

ঐক্য আন্দোলন—

যুক্ত প্রদেশের ঐক্য আন্দোলন লইয়া কলিকাতার ইংলিস্‌ম্যান পত্রিকা যেরূপ ভাবে হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই মনে করিতেছিলেন, ইংরেজ রাজত্ব উল্টাইয়া দিবার জন্য আবার একটা প্রবল ষড়যন্ত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার ফলে একটা রক্তগঙ্গার সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই ভয় যে অমূলক তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্যাপারটার তদন্তের ভার পড়িয়াছিল কমিশনার লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল কনডোপসের উপর। তিনি এসম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় ঐক্য সমিতিসমূহে প্রধানতঃ আলোচিত হয়—

(১) যে খাজনা স্থির করা আছে তাহার বেশী খাজনা দেওয়া হইবে না।

(২) খাজনা দিয়া রসিদের দাবী করিতে হইবে।

(৩) বাজে কোনো রকমের কর দেওয়া হইবে না; বিনা পয়সায় খাটা হইবে না।

ঐক্য-আন্দোলনকারীদের দাবী যে অন্যায় বা অসঙ্গত নহে তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। জমীদারদের নানারকমের অন্যায় এতদিন প্রজারা যে সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহার এক কারণ, দেশের আর্থিক সমস্যা বর্ত্তমানে যে-অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো সে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় নাই; দ্বিতীয় কারণ, যুগের যে শিক্ষা লোকের মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্পৃহাটাকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছে ইতিপূর্ব্বে তাহা তাহাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তাহারা এখন আর প্রবলের পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিতে চায় না। এমন অবস্থায় শত শত বৎসরের গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিতে গিয়া জনসাধারণ যদি একটু আধটু মাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

মোপ্‌লা হাঙ্গামা—

মোপ্‌লা হাঙ্গামার সময় মিঃ এ আর ন্যাপ মালাবারের স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি সম্প্রতি মোপ্‌লাদের সম্পর্কে একটি ঘোষণা-বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মালাবারের শান্তিরক্ষার জন্য যে-সব মোপ্‌লাকে কয়েদ বা নির্ব্বাসিত করা প্রয়োজন তাহাদের ভিন্ন অতিরিক্ত একজন লোককেও গবর্মেণ্ট বন্দী বা নির্ব্বাসিত করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহা ছাড়া যাহারা নিজেদের অপরাধের জন্য অনুশোচনা করিতে রাজি আছে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এরূপ কাজ করিবে না বলিয়া যাহারা প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত, গবর্মেণ্ট তাহাদিগকেও মার্জ্জনা করিতে রাজি আছেন।

শ্রীমতী কস্তুরী বাই গান্ধী—

মহাত্মার কারাদণ্ডের পর তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাই গান্ধী দেশবাসীর কাছে নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন:—

দেশের প্রিয় নরনারীগণ, মহাত্মা আজ ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহার এই গুরু শাস্তিতে আমি যে ব্যথিত হই নাই একথা কিছুতেই বলিতে পারি না। তবে আমার আশা এই—এই কারাদণ্ড তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হইবে না। তাঁহার দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার বহুপূর্ব্বেই আমরা আমাদের স্বীয় কার্য্যের দ্বারা তাঁহার মুক্তির পথ সহজ করিয়া দিতে পারিব। আমার সান্ত্বনা—তাঁহার দণ্ডকাল হ্রাস করিবার উপায় আমাদের নিজেদের ভিতরেই আছে। ভারত যদি জাগিয়া উঠে, সে যদি কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যতালিকা অনুসারে কাজ সুরু করিয়া দেয়, তবে কেবলমাত্র তাঁহাকে মুক্ত করা নহে, গত দেড়বৎসর ধরিয়া আমরা যে তিনটি সমস্যার মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিতেছি তাহারও সমাধান সহজেই আমাদের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িবে। প্রতিকার আমাদের নিজেদের হাতেই আছে। যদি কৃতকার্য্য না হই তবে সে দোষ আমাদের।

সুতরাং আমার দুঃখের প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, মহাত্মার প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান, তাঁহাদের সকলকেই আমি কংগ্রেসের কার্য্য-তালিকা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। মহাত্মা চরকা এবং খদ্দরের উপরেই বিশেষভাবে জোর দিয়া গিয়াছেন। এই খদ্দর এবং চরকার সাফল্য লাভ করিতে পারিলে আমাদের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যারই সমাধান হইবে না—ইহাতে আমাদের পায়ের রাজনৈতিক শৃঙ্খলও খসিয়া পড়িবে। সুতরাং মহাত্মার গ্রেপ্তারে তিনটি বিষয় আমাদের মূলমন্ত্রস্বরূপ হওয়া উচিত:—

(১) নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলকেই বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে এবং খদ্দর ব্যবহারের জন্য সকলকেই প্ররোচিত করিতে হইবে।

(২) সূতাকাটা নারী-সমাজের দৈনন্দিন ধর্ম্মকার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) ব্যবসায়ীদের বিদেশীবস্ত্রের কারবার বন্ধ করিতে হইবে।

চাউলের রপ্তানি—

চাউলের দর অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট গত দুই

বৎসর ভারত হইতে চাউলের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই রপ্তানি, বন্ধের আদেশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। কৈফিয়ৎ, ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে গত বৎসর বেশ ভাল ফসল হইয়াছে, সুতরাং আর রপ্তানি বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই।

প্রয়োজন আছে কি না, দরিদ্র চাষার মুখের দিকে চাহিলে বোঝা যায়; নিরন্ন জনসঙ্ঘের দৈনিক জীবনযাত্রার পদ্ধতিটা খতাইয়া দেখিলে বোঝা যায়।

ভারতবর্ষের জনসাধারণের দিন যে কিরূপ ভাবে কাটিতেছে, পরের মুখে ঝাল খাইয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। অথচ তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট আর এমন কোনো উপায়ও জানেন না যাহা দ্বারা এই স্বরূপটা নির্ণীত হইতে পারে।

চাউলের রপ্তানি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধাহারী কোটি কোটি লোকের অর্দ্ধাহারকে আরো কমাইয়া, ধনী মহাজন এবং দালালদের প্রচুরকে আরো প্রচুরতর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মহিলার কারাদণ্ড—

মান্দ্রাজের মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী গঙ্গা ভাগীরথী সুব্রহ্মা দেবীকে গত ২২শে মার্চ্চ গ্রেপ্তার করিয়া কোকনদ জেলে আটক রাখা হইয়াছিল। গত ৪ঠা এপ্রিল তাঁহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করা। বিচারক তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য একটি একশত টাকার এবং দুইটি দুইশত টাকার জামিন দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। জামিন দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সুব্রহ্মা দেবীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে সুব্রহ্মা দেবী বলিয়াছিলেন, "গ্রেপ্তার হওয়াটা আমার পক্ষে সত্য সত্যই সুখের বস্তু। কারণ তাহা হইলে জেলে গিয়া আমি আমার স্বদেশের বন্দী ভাইদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে পারিব।"

রাজনৈতিক অপরাধে কারাবরণ করিয়া লওয়া ভারতীয় মহিলার পক্ষে এই প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বে দার্জ্জিলিংএর সাবিত্রী দেবী স্বদেশী প্রচারের অপরাধে বোম্বাই জেলে বন্দী হইয়াছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

দরিদ্র দেশের অর্থের অপব্যয়—

সর্ব্বনাশা শৈলবিহার

বাঙ্গলার গবর্ণর বাহাদুরের শাসন-মজলিসের সদস্যগণ ও জনপ্রিয় মন্ত্রীগণের দার্জ্জিলিং শৈলবিহার বাবদে কত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব সরকার দিয়াছেন।—

সার হেনরী হুইলারের বাবদে পড়িয়াছে—১ হাজার ২১ টাকা ৭ আনা ৫ পাই।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দের বাবদে—২ হাজার ৩ শত ৯১ টাকা ২ আনা—সার হেনরী হুইলারের খরচের দ্বিগুণ।

মিষ্টার কারের বাবদে—প্রায় দেড় হাজার টাকা।

সার আবদর রহিমের বাবদে—প্রায় দুই হাজার টাকা।

সার সুরেন্দ্রনাথের বাবদে—প্রায় আড়াই হাজার টাকা।

মিঃ পি, সি, মিত্রের বাবদে—প্রায় ২৩০০ টাকা।

নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর বাবদে—প্রায় ১৬০০ টাকা।

—মোহাম্মদী

দেশের আয় ব্যয়—

বাংলা বজেট
১৯২১—২২

বাঙ্গালার মোট রাজস্ব	৯,৭১,৮২,০০০৲
বাঙ্গালার মোট খরচ	১১,৮০,১৩,০০০৲
আয় অপেক্ষা বেশী খরচ	২,০৮,৩১,০০০৲
পুলিশের খরচ	২,৯০,৮৫,০০০৲
শিক্ষার খরচ, দেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষক ও সকল বিভাগের কর্ম্মচারীর বেতন সমেত	১২,৬০,০০০
স্বাস্থ্য বিভাগের খরচ	২৯,৪৬,০০০৲
চিকিৎসা বিভাগের খরচ	৫২,২৯,০০০৲
কৃষি বিভাগের খরচ	২১,৪১,০০০৲

বঙ্গবাণী —মোহাম্মদী

স্বাস্থ্য-কথা—

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এ পর্য্যন্ত ৩৫০০ ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে বাঙ্গালার যুবজনের স্বাস্থ্যের নমুনা দিতেছি :

শতকরা ৩৬ জনের চক্ষু খারাপ; এবং তৃতীয়াংশ ছেলের দাঁত খারাপ এবং শতকরা ৪১ জন কুব্জাকৃতি!

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বস্ত্র-কথা—

সূতা নাটাইবার অদ্ভুত যন্ত্র

আমাদের বয়ন-বিভাগের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাসের চেষ্টায় আমরা একটি নূতন সূতা-নাটান কল প্রস্তুত করাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই নূতন কল দ্বারা ঘণ্টায় ২ মোড়া অর্থাৎ ২০ ফেটী সূতা সহজে নাটান যায়। মূল্য ৯৲ নয় টাকা। অগ্রিম ৫৲ টাকা সহ অর্ডার পাইলেই ষ্টীমার অথবা রেল যোগে পাঠাইতে পারি।

শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার, হেড মাষ্টার,
বিনোদপুর পোষ্ট, বসন্ত কুমার উচ্চ বিদ্যালয়। —কল্যাণী

চট্টগ্রামে বয়ন-কারখানা—চট্টগ্রামে চাকারিয়া মহিলা সমবায় স্পিনিং ও ট্রেডিং কোম্পানী নামে একটি বয়ন-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজার মহিলা সেখানে সূতা উৎপন্ন করেন। ইহা ছাড়া কারখানা হইতে উৎকৃষ্ট চরকা, তাঁত প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

সম্মিলনী

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

বোম্বাইয়ের বস্ত্র-ব্যবসায়ী-সমিতি ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ড হওয়ার জন্য কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর পক্ষে বিলাতী কাপড়ের অর্ডার দেওয়া উচিত নহে। যদি কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ী বিলাতী কাপড় আমদানী করেন, তাহা হইলে প্রতি খণ্ড কাপড়ের জন্য তাঁহাকে একশত টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।

—হিন্দুস্থান

আবগারী সংবাদ—

বাংলা দেশের আবগারী বিভাগের ১৯২০-২১ অব্দের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ঐ বৎসরে সমস্ত বাংলা দেশে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এগারো হাজার দুইশত সাতাশী গ্যালন মদ বেশী বিক্রয় হইয়াছিল। অবশ্য ইহা শুধু দেশী মদের হিসাব।

মদ বিক্রয় বেশী হওয়ার যে কারণ এই রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে নূতন ইটখোলা, ট্যানারী, গালা প্রভৃতির কারখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য এবং অন্য অন্য কয়েকটি জেলায় কলের কুলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ মদের বিক্রিও বেশী হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, হুগলী এবং আরও দুই এক স্থানে মদ বিক্রয় বৃদ্ধির কারণ কুলীদের মাহিনা বৃদ্ধি। সর্বসমেত ১৬টি জেলায় মদ বিক্রয় বাড়িয়াছে এবং ১১টি জেলায় মদের কাটতি কমিয়াছে। আবগারী কালেক্টর তাড়ি সম্বন্ধে বড়ই নিরাশ হইয়াছেন; লাভের দিক দিয়া এই কাজে তেমন সুবিধা হইবে না। তবুও আলোচ্য বৎসরে তাড়ি হইতে লোকসান ত হয় নাই, বরং লাভই হইয়াছে।

গাঁজার নেশা বাঙ্গালীরা ছাড়িয়া দিতেছে বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য বর্ষের পূর্ব্ব বৎসরে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীরা দুই হাজার বাহান্ন মন ছয় সের গঞ্জিকা সেবন করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এক হাজার আটশত চল্লিশ মণ ছাব্বিশ সের গাঁজা খরচ হইয়াছিল। অর্থাৎ দুইশত এগারো মন বিশ সের গাঁজা কম খরচ হইয়াছে।

আফিমের মাত্রা একটু বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এক হাজার আটত্রিশ মণ পাঁচ সের আফিম খরচ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এক হাজার পঁয়ষট্টি মণ চৌত্রিশ সের আফিম বিক্রয় হইয়াছে। অর্থাৎ এ বৎসর সাতাশ মণ উনত্রিশ সের আফিম বেশী বিক্রয় হইয়াছে। সতেরোটি জেলায় আফিমের খরচ বাড়িয়াছে এবং নয়টি জেলায় খরচ কমিয়াছে। আফিমের খরচ বাড়িলেও মদের মতন বাড়ে নাই, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

লুকাইয়া কোকেন আমদানী চলিতেছে। কলিকাতা এবং এই সহরের আশপাশের স্থানসমূহে চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান, হুগলি, প্রভৃতি স্থানে লুকাইয়া কোকেন বিক্রয় ও খাওয়া চলিতেছে। মেদিনীপুর ও ফরিদপুরে একটি করিয়া কোকেনের আড্ডা পাওয়া গিয়াছে। —হিন্দুস্থান

দান—

ভবানীপুর, ৩১ নং কালীঘাট রোডস্থিত নিখিল ভারত অনাথ আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুরোদিয়া ১৬০০৲ টাকার ২৭০৲ মণ চাউল, চুনিলাল কিষণলাল ৪০০৲ টাকার একটি মেশীন ও দি গ্রেট বেঙ্গল ফার্ম্মেসী ৮০৲ টাকার ঔষধ দান করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

ভবানীপুর, ৩১ নং কালীঘাট রোডস্থিত নিখিল ভারত অনাথ আশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্দ্র লাহা ও শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত মহাশয়গণ ২৫০৲ ও ১০০৲ টাকা যথাক্রমে দান করিয়াছেন।

—মোহাম্মদী

হিতকর অনুষ্ঠান—

কুষ্ঠাশ্রম।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মিঃ জে, ক্যাম্পবেল ফরেষ্টার বাঙ্গলায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা সরকারের নিকট ৫০,০০০ টাকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এই আশ্রমের জন্য মেদিনীপুর জেলায় ৭০৭ একর জমি পাওয়া গিয়াছে। এই জমি একজন সদাশয় ব্যক্তি দান করিয়াছেন। এই আশ্রমে প্রথমত এক হাজার কুষ্ঠরোগী থাকিতে পারিবে। গত লোক-গণনায় দেখা যায়, বাংলাপ্রদেশে সর্বশুদ্ধ ১৭,৪৮৩ জন কুষ্ঠরোগী আছে।—সম্মিলনী

সাহিত্য-সংবাদ—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পদক ও পুরস্কার:—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ পদক—জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ পদক—(ক) বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(ক) অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৮। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক—(খ)—বাঙ্গলার গীতি কাব্যে অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৯। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—নবীনচন্দ্রের কাব্যে "জরৎকারু" চরিত্র।

১০। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—বাঙ্গলা সাহিত্যে সুরেশচন্দ্র।

১১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ গোপথ ঐতরেয় তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২০৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

—মোহাম্মদী

রচনা প্রতিযোগিতা

বিষয়: (১) আদর্শের সংঘর্ষ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।

(২) লাইব্রেরী ও তাহার প্রতিষ্ঠা:—প্রথম রচনাটি যে-কোন ব্যক্তি লিখিতে পারিবেন, কিন্তু দ্বিতীয়টি বিশেষভাবে ছাত্রগণের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। উপযুক্ত পরীক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষা করাইয়া নির্ব্বাচিত বিষয় দুইটির প্রত্যেকটিতে যে দুই ব্যক্তির রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাঁহাদিগকে একখানি করিয়া রৌপ্য-পদক প্রদান করা হইবে। যাঁহারা রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ৩০শে মের মধ্যে আপন আপন রচনা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য:—প্রতিযোগিতার জন্য প্রেরিত সকল রচনাই লাইব্রেরীর সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সারস্বত লাইব্রেরী।
২।১, দেওয়ান লেন,
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দে,
অবৈতনিক সম্পাদক

নারীর প্রতি অত্যাচার—

আহিরীটোলার ষোল বছরের মেয়ে আনন্দময়ীর উপর তার শ্বশুর-বাড়ীর সকলের অত্যাচারের সংবাদ আমরা আগেই দিয়াছি। সম্প্রতি আনন্দময়ী কোর্টে এই অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা অত্যন্ত অমানুষিক, বীভৎস। হিন্দু সমাজের এই অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

যাঁরা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করিবেন আশা করি।

বালিকা বধূ তাহার পিতাকে অত্যাচারের কথা যাহা বলিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

"আমাকে উহারা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে বলে। আমি স্বীকার পাই নাই। ইহাতে আমার ননদী আমাকে শাসাইয়া বলে, "তোর জিদ্ কি করিয়া ভাঙ্গিতে হয় তাহা দেখাইব।" ইহার পর হইতে আমার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। আমার হাত পা কোমর ইত্যাদি সর্ব্বস্থানে বাঁধন দিয়া প্রহার করা হইত। আমার গলায় ফাঁস দিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত এবং সর্ব্বাঙ্গে তপ্ত লৌহশলাকার ছেঁকা দেওয়া হইত। পূজার সময় হইতে একখানা কাপড় পরাইয়া রাখা হইয়াছিল। বন্ধনাবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ এক স্থানেই হইত, কাজেই ঐ বস্ত্র পূতিপঙ্কপূর্ণ হইয়াছিল। কুকুরের মত দিনান্তে একমুঠা ভাত খাইতে দিত। হাতের পায়ের বাঁধনের কসনে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়াছিল, উহাতে পুয় পূর্ণ হইয়াছিল। বস্ত্রের দুর্গন্ধ ও ক্ষতের পুয়ের দুর্গন্ধে ঘর নরকের আকার ধারণ করিয়াছিল।"

—বসুমতী

নারী প্রসঙ্গ—

স্বরাজ সাধনায় আসামের মহিলা। ডিব্রুগড় মহিলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা রাজবালা বড়ুয়া বি-এ, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্তা দেবীপ্রভা ভূঞা, শ্রীযুক্তা সুরবালা বড়ুয়া ও শ্রীযুক্তা নিভাবতী বড়ুয়া কংগ্রেসের কার্য্যে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। মেয়ে-মহলে চরকা প্রচলনের জন্য তাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই মহিলাগণ বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া মেয়েদিগকে চরকায় সুতা কাটা শিখাইতেছেন। যাহাতে স্কুলের বালিকারা অন্তত পক্ষে অবসর-কালটা চরকায় সুতা কাটিয়া কাটায় তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে।—নবসংঘ

মহাত্মার পত্র ও বঙ্গ রমণীর কর্ত্তব্য —

বর্ত্তমান জাতীয় পুনরুত্থানে বঙ্গ নারীরা যে কাজ করিতেছেন, তাহা বস্তুতই বিস্ময়কর। কিন্তু বাঙ্গালার মহিলারা পূর্ব্বকালে যেমন মনোরম সুতা কাটিতেন যত দিন বাঙ্গালার ছয় বৎসরের অধিক বয়স্কা প্রত্যেক বালিকা ও মহিলা তেমনি ভাবে চরকায় সুতা না কাটেন ততদিন আমি সন্তুষ্ট হইব না। একনিষ্ঠ হইয়া চরকায় সুতা না কাটিলে যে আমরা আমাদের এই দুর্ভাগা দেশ হইতে দারিদ্র্য ও অভাব দূর করিতে পারিব না— সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।—চারুমিহির

নারীশিক্ষা—

দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকেই বাঙালীর পতন আরম্ভ হয়েছে। জ্ঞান-বীর্য্যের অভাবে, পুরুষের সঙ্গে নারী-জাতীরও অধঃপতন চরম সীমায় গিয়ে ঠেকেছে। পুরুষ আজ জাগরণের ঝকমকে আলোয় লাফিয়ে উঠলেও, নারী তার পিছনে পড়ে' আছে ; তাদের পথে আড়াল ক'রে দাঁড়ালে জাতীয় উত্থান স্বপ্নের মতই নিরর্থক হবে।

নারীকে আমরা আজও আঁধারে বদ্ধ ক'রে রেখে দিতে চাই। আমাদের মতে, নারী পুরুষের মত শিক্ষা পেলে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হবে ; কথাটা মরা জাতির পক্ষেই শোভা পায়।

লীলাবতী পুরুষের মত জ্ঞানলাভ করেছিল, জাত কি তার জন্য কলঙ্কিত হয়েছে? ভানুমতী, কর্ণাটরাজমহিষী, কবি কালিদাসের পত্নী, এঁরা সর্ব্বার্থবিদুষী ছিলেন, সমাজ কি সে জন্য অধঃপাতে গিয়েছিল? তার পর উপনিষদের সে দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সেই পরম জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। সে গৌরবে আজও আমরা কৃতার্থ হয়ে আছি।

শত বৎসর পূর্ব্বেও, যে নারী স্বামীর চিতা-শয্যায় হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিত, সেই নারী জাতির প্রতি পুরুষের দান আজও যদি উদারভাবে প্রদত্ত না হয়, তা হলে বিধাতার অভিশাপে আমাদের জাতিটা যে উৎসন্ন যাবে, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

—নবসঙ্ঘ

পুলিসের ভীষণ অত্যাচার—

নিরীহ কৃষক আহত। (কংগ্রেস নিউজ সার্ভিস)

গত ২৯শে ফাল্গুন সোমবার নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে একখণ্ড জমিতে ৬ জন কৃষক চাষের কাজ করিতেছিল। তখন প্রাতঃকাল ; পথ, ঘাট, মাঠ কুয়াসাচ্ছন্ন। তাহারা "আল্লাহু আকবর" "বন্দেমাতরম" প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিল, এ জিলার কৃষকেরা এরূপ আজকাল সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। ঠিক সেই সময় ৩৮ জন অস্ত্রধারী পুলিশ ও ৩৪ জন উপরিতন পুলিশ কর্ম্মচারী পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া আসিতেছিল। কয়েক দিন যাবৎ ঐসকল পুলিশ ড্রিল্ প্যারেড্ করিতেছে।

৩৪ জন অস্ত্রধারী পুলিশ "আল্লাহু আকবর" 'বন্দেমাতরম' শব্দ শুনিয়াই মাঠে নামিয়া ঐ কৃষকদিগকে ছুরিকা ও বন্দুকের বাঁট দ্বারা আঘাত করে। ফলে একজন কৃষকের কপালের ডান দিকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ একটি জখম হইয়াছে। তাহার শরীরের আরো নানা স্থানে প্রহার পড়িয়াছে। কৃষকটির নাম এছাহাক। সে এখন সাহাপুর কংগ্রেস আফিসে চিকিৎসিত হইতেছে। ইহারা অস্ত্রধারী পুলিশদিগকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্য আনন্দধ্বনি করে নাই। পুলিশদের সঙ্গে ধীর স্থির ভাবে বীরের মত কথাবার্ত্তা বলিয়াছে। প্রাণনাশ হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে বিরত হয় নাই। তাহারা বলিয়াছে আল্লার জন্য কেল্লা দিব ইহা আর বেশী কি? তাহারা পুলিশের বিরুদ্ধে সরকারের আদালতে মামলা করিতে রাজী নয়।

এই অশিক্ষিত মুসলমান কৃষকের আচরণে সমস্ত নোয়াখালী জিলা ধন্য হইয়াছে।—শ্রীহরিকুমার রায়।— নোয়াখালী সম্মিলনী

চট্টগ্রাম জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগের অবস্থা

অমৃতবাজার পত্রিকার একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, চট্টগ্রাম জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জেলের অবস্থার বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে এই দারুণ গ্রীষ্মে যে ঘরটিতে ৩৫, ৩৬ জন লোককে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহাতে সাধারণতঃ ১৫, ১৬ জনের বেশী ধরে না। যে সামান্য পানীয় জল দেওয়া হয়, তাহাতে অনেকেরই তৃষ্ণা নিবারণ হয় না এবং মুসলমানরা 'উজু' করিবার জন্য এক ফোঁটা জলও পান না। চালের সঙ্গে ধান ও বালি প্রচুরভাবে মিশ্রিত থাকে ; ডাল ও তরকারীর অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয়। হাসপাতালে দু'চারটি মামুলি ঔষধের বোতল সাজান ভিন্ন রোগ সারাইবার আর কোন ব্যবস্থা নাই। সহরের মধ্যেই নাকি ৭, ৮ জন জেল-পরিদর্শক আছেন! তাঁহারা কি নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইতেছেন?—আত্মশক্তি

বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত যতজন হিন্দু ও মুসলমান অসহযোগী কারাগারে গিয়াছেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটি তাহার একটা তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাতে দেখা যায়

ঢাকায় হিন্দু ১৬৭ মুসলমান ৩৪, ময়মনসিংহে হিন্দু ১৬৭ মুসলমান ৭৪, ফরিদপুরে হিন্দু ২৯৯ মুসলমান ৮৮, নোয়াখালীতে হিন্দু ২৫ মুসলমান ৪৯, ত্রিপুরায় হিন্দু ৩৩ মুসলমান ১৪, যশোহরে হিন্দু ২৩ মুসলমান ১৮, নদীয়ায় হিন্দু ১৬ মুসলমান ৩১, পাবনায় হিন্দু ৮ মুসলমান ৯, দার্জ্জিলিংএ হিন্দু ৮৫ মুসলমান নাই, খুলনায় হিন্দু ২৫ মুসলমান নাই, মেদিনীপুরে হিন্দু ২৪ মুসলমান ৭, রঙ্গপুরে হিন্দু ৭৮ মুসলমান ১৭৩, কলিকাতায় হিন্দু ১৮৬৮ মুসলমান ১৯৮১, চট্টগ্রামে হিন্দু ২৯০ মুসলমান ৩৬৭, বরিশালে হিন্দু ২১৭ মুসলমান ৭৮ জন দণ্ডিত হইয়াছেন।—যশোহর

শোক-সংবাদ—

কবির লোকান্তর:—চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত গত ১০ই মার্চ্চ রবিবার রাত্রিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালার কাব্য-জগতের বিশেষ ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই। জীবেন্দ্রকুমার স্বভাব-কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত "তপোবন" প্রভৃতি গ্রন্থই তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবে।　　—ঢাকা প্রকাশ

স্বরাজ-প্রসঙ্গ—

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত—খদ্দরই স্বরাজ দিবে। যখন বিদেশী বস্ত্র বয়কট সম্পূর্ণ হইবে এবং সকল লোক খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিবে, তখন স্বরাজ স্থাপিত হইবে, এবং সেজন্য যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন দেশের লোকে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভারতের লোকে যদি তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করে, তাহা হইলে শুধু ইংলণ্ডের নহে সমস্ত জগতের রাজনৈতিক আবহাওয়া বদলাইয়া যাইবে।　　—হিন্দুস্থান

সেবক

বদন-চন্দ্রমা

অধর নিস্‌পিস্
নধর কিস্‌মিস্,
রাতুল তুলতুল্ কপোল;
ঝরলো ফুলকুল,
করলো গুল্ ভুল
বাতুল বুল্‌বুল্ চপল।
নাসায় তিল ফুল
হাসায় বিল্‌কুল,
নয়ান ছল্‌ছল্ উদাস,
দৃষ্টি চোর চোর
মিষ্টি ঘোর ঘোর,
বয়ান ঢল্‌ঢল্ হুতাশ!
অলক দুল্‌দুল্,
পলক ঢুল্‌ঢুল্,
নোলক চুম্ খায় মুখেই;
সিঁদুর মুখটুক
হিঙুর টুকটুক,
দোলক ঘুম যায় বুকেই!

ললাট ঝল্‌মল্
মলাট মল্‌মল্,
টিপটি টল্‌টল্ সিঁথির,
ভুরুর কায় ক্ষীণ,
গুরুর নাই চিন্,
দীপটি জল্‌জল্ দিঠির।
চিবুক টোল্ খায়,
কি সুপ-দোল্ তায়
হাসির ফাঁস দেয়, সাবাস!
মুখটি গোলগাল,
চুপটি বোলচাল্,
বাঁশীর শ্বাস দেয় আভাস।
আনার-লাল-লাল-
দানার তার গাল,
তিলের দাগ তায় ভোমর,
কপোল-কোল ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভায় চুমোর!

কাজী নজরুল ইস্‌লাম
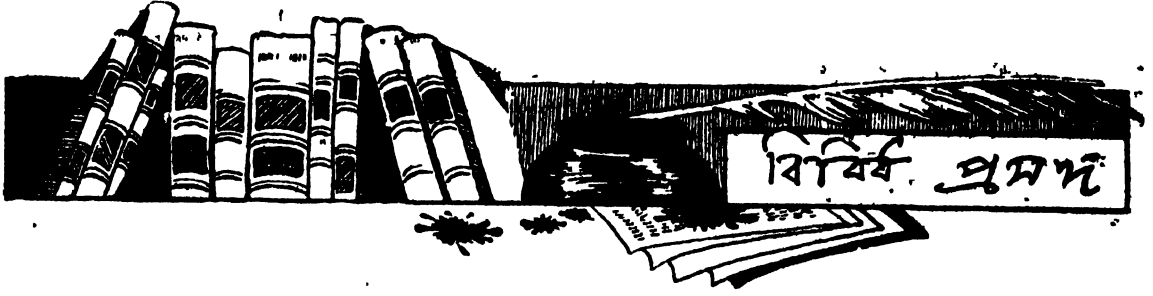
স্বরাজ প্রার্থনা

বর্ষারম্ভে বিশ্বপতির নিকট পূর্ণ স্বরাজ প্রার্থনা করিতেছি। ব্যক্তিগত স্বরাজ চাহিতেছি, সমষ্টিগত স্বরাজ চাহিতেছি।

যে আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি, তাহা মনুষ্যহৃদয়ে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকুলের কর্তৃত্ব নহে। যে আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি, পরমাত্মার কর্তৃত্বই তাহার ভিত্তি।

বিশ্বনিয়ন্তার রাজত্ব আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ও সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। তাহা হইলেই আমরা প্রত্যেকে ও সকলে স্ব-রাজ্য লাভ করিতে পারিব।

—

মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীর প্রতিবাদ

গত কংগ্রেস সপ্তাহে আহমদাবাদে মৌলানা হস্‌রৎ মোহানী মহাত্মা গান্ধীর সহিত যে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলেন বলিয়া কতকগুলি খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল, মৌলানা সাহেব তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন, যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইবার জন্য অমূলক কথা রটান হইয়াছে।

—

মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ড

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ-উৎপাদক ও রাজদ্রোহ-উত্তেজক প্রবন্ধ লিখন অপরাধে মহাত্মা গান্ধীর বিনাশ্রম ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে। তাঁহার অপরাধ প্রমাণার্থ তাঁহার লেখা এইরূপ তিনটি প্রবন্ধ বিচারকের সমীপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য দুই বৎসর, হিসাবটা এইরূপ। কিন্তু গান্ধী মহাশয় আরো অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। বক্তৃতা ছাড়িয়া দিয়া, কম করিয়া ধরিলেও এই প্রকার প্রবন্ধেরই সংখ্যা ত্রিশ চল্লিশ হইবে। তাহা হইলে তাঁহার ষাট কিম্বা আশী বৎসরের জেল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশের উপর। সুতরাং তাঁহাকে পূরামাত্রায় জেল খাটাইতে হইলে, ইহলোকে তিনি যতদিন থাকিবেন, তাহার উপর পরলোকেও তাঁহাকে অনেক বৎসর কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরলোক এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আছে। পৃথিবীতে স্বাধীনতা বিস্তার এবং পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ফলে ইউরোপের ব্রিটিশ ও অন্য কয়েকটি জাতি বহুদেশ শাসন করিবার হুকুমনামা (mandate) পাইয়াছেন। অনেক বৎসর অপেক্ষা না করিলে বোঝা যাইবে না, যে, সে-কেলে পরদেশ জয় এবং হালফ্যাশানের এই হুকুম-নামায় কোন প্রভেদ আছে কি না, এবং থাকিলে সে প্রভেদটুকুর মাত্রা, পরিমাণ ও স্বরূপ কি। পরলোক এখনও ব্রিটিশ কিম্বা অন্য কোন জাতির দখলে আসে নাই, তাহা শাসন করিবার হুকুমনামাও কেহ পায় নাই; হয়ত ভবিষ্যতে বৃহত্তর কোন যুদ্ধের দ্বারা পরলোকেও স্বাধীনতা বিস্তার এবং গণতন্ত্রের জন্য পরলোককে নিরাপদ করিবার চেষ্টা হইবে। আপাততঃ কিন্তু কাহাকেও কারাদণ্ড দিতে হইলে ইহলোকে তাহার যতদিন বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক হওয়ায়, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধীর কেবল তিনটি প্রবন্ধের উপর তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করা হইয়াছিল; কেন

না, তিনি দৈহিক হিসাবে দুর্ব্বল ও কৃশ, দীর্ঘজীবী না হইতেও পারেন। নতুবা হয়ত তাঁহার আরো প্রবন্ধ আদালতে পেশ করা হইত, এবং আরো দীর্ঘতর সময়ের জন্য তাঁহার কারাবাসের ব্যবস্থা হইতে পারিত।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে, মৌলানা শৌকৎ আলী ত কৃশ বা দুর্ব্বল নহেন, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে রাজদ্রোহ প্রচার ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদনও ছিল, কিন্তু তাঁহাকে ত গান্ধী মহাশয় অপেক্ষা কম বৎসরের জন্য জেলে পাঠান হইয়াছে? কি কারণে বিচারকেরা কাহারো দণ্ড কম, কাহারো বেশী দেন, তাহা বলা কঠিন; কারণ, পরচিত্ত অন্ধকার, অন্যের মনে কি আছে, কেমন করিয়া বলিব? তবে অনুমান এই হয়, যে, গান্ধীর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এইজন্য যাহাতে তিনি সেই প্রভাব লোকদের উপর আর বিস্তার বা প্রয়োগ করিতে না পারেন তন্নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কালের জন্য আটক করিয়া রাখা আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু মানুষকে জেলে কয়েদ করিয়া রাখিলে তাঁহার প্রভাব নষ্ট বা খর্ব্ব করা যায় না, যদি উহা সত্যমূলক হয়। এই জন্য দেখা গিয়াছে, যে, পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কারাদণ্ডে বা স্বাভাবিক কারণে মৃত হইবার পর মানবজাতির উপর তাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হইলেও তাঁহার কার্য্যকারিতা ও প্রভাব কমিবে না। যাঁহারা তাঁহাকে বাস্তবিক ভক্তি করেন এবং তাঁহাকে সত্য সত্যই মহাত্মা মনে করেন, তাঁহারা তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়া দেখান্, যে, তাঁহাদের ভক্তি অকপট ও প্রগাঢ়, এবং তাঁহার প্রভাব সত্যমূলক।

—

গান্ধীর প্রভাবের কারণ

রাজনীতি-ক্ষেত্রে গান্ধীর বিপরীতমতাবলম্বী লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহার পবিত্র চরিত্র, সাধুজীবন, তপশ্চর্য্যা, এবং মানবপ্রেমের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। আমেরিকার "সার্ভে" নামক কাগজে মডারেট্‌দলের অন্যতম প্রধান নেতা, ভারতভৃত্য সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গান্ধী কেমন মানুষ (Gandhi the man) তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার শেষ প্যারাগ্রাফ্‌টি এই—

"The writer of these lines is not one of Mr. Gandhi's political followers or a disciple of his in religion. But he claims to have known him for some years and to have been a sympathetic student of his teachings. He has felt when near him the chastening effects of a great personality. He has derived much strength from observing the workings of an iron will. He has learned from a living example something of the nature of duty and the worship due to her. He has occasionally caught some dim perception of the great things that lie hidden below the surface and of the struggles and tribulations which invest life with its awe and grandeur. An ancient Sanskrit verse says: "Do not tell me of holy waters or stone images; they may cleanse us, if they do, after a long period. A saintly man purifies at sight."—*The Survey,* Jan. 28, 1922, p. 676.

ইহার শেষ বাক্যটির তাৎপর্য্য এই—একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে কথিত হইয়াছে, "পবিত্র তীর্থোদক বা শিলাবিগ্রহের কথা আমায় বলিও না, তাহারা আমাদিগকে পবিত্র করিলেও তাহা দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ, কিন্তু আমরা সাধুব্যক্তির দর্শনমাত্রেই নির্ম্মল হই।"

ইহা হইতে গান্ধীর প্রতি লেখক মহাশয়ের মনের ভাব অনুমিত হইবে।

অন্য দিকে, মডারেট দলের আর-একজন নেতা স্যার শঙ্করন্ নায়ার বলিয়াছেন, যে, গান্ধী অসৎ ও কপটাচারী। অর্থাৎ স্যার শঙ্করন্ নায়ারের মতে গান্ধী কপট-সাধুতা ও চালাকী দ্বারা লোককে বোকা বানাইয়া শক্তিমান্ ও প্রভাবশালী হইয়া পড়িয়াছেন। এই মতকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি। আমেরিকার অন্যতম প্রধান দেশনায়ক আব্রাহাম লিঙ্কন্ বলিয়া গিয়াছেন, তুমি লোকসমষ্টির কতক অংশকে কতক সময় বোকা বানাইতে পার, কিন্তু সকলকে চিরকাল বোকা বানাইতে পার না।

মহাত্মা গান্ধীর জ্ঞান বুদ্ধি পূর্ণ ও নিখুঁত, তাঁহার কখন কোন ভুল দোষ ত্রুটি হয় নাই, হইতে পারে না, ইহা তিনি নিজে কখন দাবী করেন নাই, বরং ভুল

ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বেচ্ছায় কঠোর শাস্তি লইয়াছেন। আমরাও কখন কখন তাঁহার সমালোচনা করিয়াছি; দু তিনটি বিষয় ছাড়া আমাদের সেইসব সমালোচনা সত্য হইয়াছিল বলিয়া আমরা এখনও মনে করি। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, যে, তাঁহার প্রভাব সত্যমূলক; এবং মানবপ্রেমে অনুপ্রাণিত নিঃস্বার্থ সাধুজীবন উহার অন্যতম কারণ।

গান্ধীর বিরোধীরা অনেকে মনে করেন ও বলিয়াছেন, যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করিয়া শক্তিমান্ ও প্রভাবশালী নেতা হইয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে গান্ধী গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিবার পক্ষে ছিলেন, এবং তদ্রূপ সহযোগিতা করিতে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা স্বয়ং বর্জ্জন করিয়া তিনি তখন হইতে অন্য সকলকেও উহা বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তখন হইতে তাঁহার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাসকল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাগ উৎপাদন করিতেছে, মনে করিতে হইবে। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বকালে এমন কোন কোন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন, যাঁহারা গান্ধীর মত গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা কখন করেন নাই কিন্তু যাঁহাদের লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগই উৎপন্ন হইয়াছে। অথচ ইঁহারা কেহই গান্ধীর মত লোকপ্রিয় ও প্রভাবশালী হইতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা গান্ধীর প্রভাবের একমাত্র বা প্রধান কারণ হইলে এই সকল লোক গান্ধী অপেক্ষা অধিক, অন্ততঃ তাঁহার সমান, প্রভাবশালী হইতেন। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। মহাত্মা গান্ধীর এবং এইসকল লোকের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ আচরণ কেবল বক্তৃতা ও লেখায় আবদ্ধ। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, উহার প্রতি বিরাগবশতঃ রক্তপাত করিয়াছে, তাহাদের বিরোধিতা আরো বেশী; কিন্তু এই প্রকার বিদ্রোহীদের মধ্যেও কাহারও প্রভাব মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা অধিক হয় নাই। অতএব গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা ছাড়া তাঁহার লোকপ্রিয়তার ও প্রভাবের অন্য কিছু কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে।

বিদেশী কাপড়ের এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান ও লেখনী ধারণকেও তাঁহার প্রভাবের প্রধান কারণ মনে করা যায় না। কারণ, বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শুধু বিদেশী কাপড় নহে, বিদেশী জিনিষ মাত্রকেই বর্জ্জন করাইবার নিমিত্ত অনেক বক্তা ও লেখক প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল বিদেশী পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বিদেশী সভ্যতা বিদেশী ভাষা বিদেশী শিক্ষাপ্রণালী, সমুদয়েরই বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই গান্ধীর মত প্রভাবশালী হন নাই। গান্ধী সমুদয় বিদেশী সামগ্রী বর্জ্জন করিতে বলেন নাই বটে, কিন্তু বিদেশী সভ্যতা ও ভারতবর্ষে বিদেশীদের প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তিনিও বিরূপ। কিন্তু ইহা তাঁহার লোকপ্রিয়তার প্রধান কারণ নহে; কেন না, তাহা হইলে স্বদেশী যুগের পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মীরাও তাঁহার মত বা তাঁহা অপেক্ষা শক্তিশালী হইতে পারিতেন।

তাঁহার সামাজিকমত ও ধর্ম্মমত সকলের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুত্ব কতক আছে, কতক নাই। যেমন, তিনি জন্মান্তর, বৈদিক অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, এবং অবতারবাদ মানেন বলিয়াছেন, কিন্তু অন্য দিকে কোন জাতি উচ্চ ও কোন জাতি নীচ ও অবজ্ঞেয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না। কোন জাতি যে অস্পৃশ্য, তাহা তিনি কথায় ও কাজে অস্বীকার করেন। মৃৎপ্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত দেবদেবী মূর্ত্তির পূজা তিনি করেন না; উহাতে তিনি অবিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন, যে, এই-সকল মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে কোন ভক্তিভাবের উদয় হয় না। তাঁহার সামাজিক মত ও ধর্ম্মমত তাঁহার সম্পাদিত ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজের ১৯২১ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখের সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। সব কথা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার সমর্থক কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"I believe in ... *avataras* and rebirth." "I believe in the *varnashramadharma* in a sense in my opinion strictly Vedic but not in its present popular and crude sense."

"The divisions [into castes] define duties, they confer no privileges. It is, I hold, against the genius of Hinduism to arrogate to oneself a higher status or to assign to another a lower."

"I do not disbelieve in idol-worship."

"An idol does not excite any feeling of veneration in me."

"I should be content to be torn to pieces rather than disown the suppressed classes. Hindus will certainly never deserve freedom nor get it if they allow their noble religion to be disgraced by the retention of the taint of untouchability. And as I have Hinduism dearer than life itself, the taint has become for me an intolerable burden. Let us not deny God by denying to a fifth of our race the right of association on an equal footing."

ইহা হইতে দেখা যাইবে, যে, মহাত্মা গান্ধী প্রচলিত হিন্দুত্বের সমুদয়টিতে বিশ্বাস করেন না, কোন কোন অংশে বিশ্বাস করেন। হিন্দুয়ানী তাঁহার লোকপ্রিয়তা ও শক্তির একমাত্র বা প্রধান কারণ হইলে, যে-সকল দেশ-সেবক প্রচলিত হিন্দুয়ানীর সমুদয়টি মানেন ও তদনুসারে চলেন, তাঁহাদের প্রভাব তাঁহা অপেক্ষা অধিক, অন্ততঃ তাঁহার সমান, হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আমেরিকার সার্ভে কাগজে গান্ধীর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার এক জায়গায় বলিয়াছেন,

In fact, it is his complete mastery of the passions, his realisation of the ideal of a *sannyasin* in all the rigor of its eastern conception, which accounts for the great hold he has over the masses of India and has crowned him with the title of Mahatma or the Great Soul."

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, যে, গান্ধী মহাশয় রিপু-কুলকে সম্পূর্ণ বশে আনিয়াছেন এবং সন্ন্যাসিত্বের কঠোর প্রাচ্য আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করেন; এইজন্যই ভারতীয় জনসাধারণের উপর তাঁহার এত প্রভাব ও এইজন্যই তিনি মহাত্মা উপাধি পাইয়াছেন। তিনি বশী, এবং সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করেন; ইহা তাঁহার প্রভাবের অন্যতম কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও প্রধান বা একমাত্র কারণ নহে। কেননা, তাঁহা অপেক্ষাও ত্যাগী, একেবারে নগ্ন, গৃহপরিবারহীন, রিপু-জয়ী মানুষ এদেশে ছিলেন, এবং এখনও আছেন, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের উপর তাঁহার মত প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

কোন জাতিই বিদেশী শাসন ভালবাসে না। সুতরাং কেহ সেরূপ শাসনের দোষ দেখাইলে, তিনি কতকটা লোকপ্রিয় হইয়া থাকেন। অতএব গবর্ণমেণ্টকে বিরাগ-ভাজন করিবার চেষ্টা গান্ধী মহাশয়ের প্রভাবের আংশিক কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। নিজের দেশের সভ্যতা, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, প্রভৃতিতে গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক। অতএব গান্ধীর আংশিক হিন্দুত্ব, ভারতীয় সভ্যতার প্রতি অনুরাগ, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিরাগও তাঁহার প্রভাবের আংশিক কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার ত্যাগ ও সাদাসিধা জীবনও তাঁহার প্রভাবের অন্যতম কারণ। কিন্তু তাঁহার অসামান্য প্রভাবের কারণ কেবলমাত্র এইগুলির মধ্যেই পাওয়া যায় না। অন্য সব কারণ, প্রধান প্রধান কারণ, অন্বেষণ করিতে হইবে।

বঙ্গবিভাগের পর রাষ্ট্রীয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ বাংলাদেশে উপলব্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার জন্য অনেকে প্রাণও দিয়াছেন। স্বাধীনতার আকর্ষণ অতিশয় প্রবল। এইজন্য স্বাধীনতার প্রচারকেরা বঙ্গে বহুলোকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন এই আদর্শের সহিত অহিংসার আদর্শ সম্মিলিত হয় নাই। অহিংসা-মন্ত্রে, যে-কারণেই হউক, আমাদের জাতীয় হৃদয় সায় দেয়। সেই হেতু, গান্ধী মহাশয় স্বরাজলাভের উপায়কে হিংসা-বর্জ্জিত করায় তাঁহার প্রভাব বঙ্গের স্বাধীনতা-প্রচারক-দিগের অপেক্ষা ব্যাপক হইয়াছে।

গান্ধীর নির্ভীকতা তাঁহার প্রভাবের অন্যতম কারণ। বিশেষ লাভজনক ব্যারিষ্টারী পেশা তিনি ত বহুকাল ত্যাগ করিয়াছেন। বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছেন। পরিচ্ছদ একখানি গামছার মত বস্ত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আহার অতি সামান্য। সুতরাং কোন্ বাহ্য সম্পত্তি বা আয় নষ্ট হইবার ভয় তাঁহার নাই। বাকী থাকে, ব্যক্তিগত

দৈহিক স্বাধীনতা লোপের ভয়, পরিবার ও আত্মীয়দের বিরহ, এবং প্রাণনাশের ভয়। সে ভয়কেও তিনি জয় করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে তিনি বার বার জেলে গিয়াছিলেন, সাংঘাতিক প্রহারও সহ্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও চম্পারনে এবং কায়রায় জেলে যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও নিজের সঙ্কল্পিত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অসহযোগ প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছে। তিনি বরাবর প্রফুল্লচিত্তে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে মনের কোন চিন্তা ও ভাবকে গোপন না করিয়া এমন বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও এমন বিস্তর বক্তৃতা করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহাকে চির-নির্ব্বাসন দণ্ডে বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ইচ্ছা ভারত-সম্পৃক্ত ইংরেজ আমলাতন্ত্রের থাকিলে তাহার সমর্থক আইনের ধারার অভাব হইত না। এই প্রকার গুরুতম দণ্ডের জন্যও মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বদা প্রস্তুত। জালিয়ানওয়ালা বাগে ও অন্য অনেক জায়গায় কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী মানুষকে বেআইনীভাবে যেমন গুলি করিয়া মারিয়াছে, সে প্রকারে নিহত হইবার জন্যও মহাত্মা গান্ধী বরাবর প্রস্তুত ছিলেন ও এখনও আছেন।

এই নির্ভীকতা তাঁহার প্রভাবের একটি প্রধান কারণ। কিন্তু শুধু প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিলেই মানুষ কোটি কোটি লোকের হৃদয়ের উপর এরূপ রাজত্ব করিতে পারে না। গুণ্ডারা অপরকে মারিতে গিয়া বা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে গিয়া মরিতেও প্রস্তুত থাকে; বেতনভোগী সৈনিকেরাও এইরূপ নির্ভীকতা দেখায়। অথচ তাহারা কেহ অগণ্য মানবের হৃদয়ের রাজা হয় না।

কিসের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাহার উপর তাহার প্রভাবের পরিমাণ, ব্যাপকতা, ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। গান্ধী স্বার্থের জন্য, সাংসারিক সুখ ও খ্যাতির জন্য, সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের জন্য, নির্ভয়ে প্রাণপণ করেন নাই। দেশের ও জাতির দুঃখ দুর্গতি পরাধীনতা অপমান দূর করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। তাই তিনি অসংখ্য মানুষের বাধ্যতা ও পূজা পাইয়াছেন।

যাঁহারা কোন আদর্শের জন্য সর্ব্বস্বপণ, সর্ব্বসুখপণ, প্রাণপণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে যে একটি গভীর বিশ্বাস থাকে, তাহা তাঁহাদিগকে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করে। পৃথিবীর ইতিহাসে নানা দেশে নানা যুগে দেখা গিয়াছে, যে, মহাপ্রাণ লোকেরা ধর্ম্মের জন্য, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, কিম্বা কোন মহৎ আদর্শের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, কিম্বা নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, যে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৈহিক স্বাধীনতা লুপ্ত হইতে পারে, তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইতে পারেন, তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে; তথাপি তাঁহারা নিজেদের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা এরূপ চিন্তা করেন নাই, যে, "আমরা কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন বা প্রাণদণ্ড দ্বারা আমাদের কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলে আমাদের কাজ কে করিবে? অতএব যাহাতে কারাদণ্ড, নির্ব্বাসন, বা প্রাণনাশ না হয়, এইরূপ ভাবে কাজ করা যাক্।" তাহার কারণ, তাঁহারা জানিতেন, মনুষ্যবিশেষ উপলক্ষ্য মাত্র; বিশ্ববিধাতা কেবল মাত্র একজন বা কতকগুলি মানুষের দ্বারা নিজের কাজ করাইতে পারেন, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহার কাজ অচল বা পণ্ড হয়, বা স্থগিত থাকে, এমন নয়; তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতকুলশীল কত মানুষের দ্বারা ও কত প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন, মানুষ তাহা জানে না।" এই হেতু জগতের মহৎ কর্ম্মীরা বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বনিয়ম ও বিশ্বশক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগে কাজ করিতে থাকেন। পরব্রহ্মে বিশ্বাসী নহেন এমন কোন কোন মহৎ কর্ম্মীও, জগতের গতি মঙ্গলের দিকে বলিয়া উপলব্ধি করিয়া, সত্যের, ন্যায়ের, ও মঙ্গলের জয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহাদের নির্ভীকতা, সর্ব্বস্বপণ, সর্ব্বসুখপণ, ও প্রাণপণ বিশ্বের অচল মঙ্গল নিয়মে বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত, বিশ্ব-শক্তিই তাঁহাদের শক্তির উৎস।

মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবের আর একটি কারণ, তিনি দুঃখী তাপী দরিদ্রের আন্তরিক দরদী। ইহা মুখের কথার বক্তৃতার দরদ নয়, খবরের কাগজের বা বহির লেখার দরদ নয়। ইহা হৃদ্গত, জীবনগত দরদ। তিনি ছিলেন ধনী, কিন্তু খান, পরেন, গরীবের মত। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,

গরীব-দুঃখীর প্রতি তাঁহার করুণা ও স্নেহ অগাধ—সাগরের মত, আমি তাঁহাকে তাঁহার নিজের পরিহিত কাপড় দিয়া একজন কুষ্ঠরোগীর ক্ষত মুছাইয়া দিতে দেখিয়াছি।" অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হওয়ায় এবং দেহরক্ষার জন্য রাত্রে নিদ্রার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি কখন কখন প্রথম শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু গরীবের তৃতীয় শ্রেণীই তাঁহার সাধারণ যান।

কাহারও শুধু ত্যাগে জীবনের সার্থকতা হইতে পারে না। ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করিয়া বৃহৎকে গ্রহণ করিতে পারিলে, ক্ষণিককে ছাড়িয়া শাশ্বতকে ধরিলে, প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়কে বরণ করিলে, জীবন সার্থক হয়। শাক্যসিংহ যৌবনে পিতৃগৃহ, পত্নী ও পুত্র, এবং ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সমুদয় জগৎকে আত্মীয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন (তাহার মধ্যে নিজের পরিবারবর্গও অন্তর্গত ছিলেন) এবং এইরূপ বোধ ও গ্রহণের পর সকলের দুঃখ চিরকালের জন্য মোচন করিতে আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুষ্ক-হৃদয় সর্ব্বত্যাগী অনেক সন্ন্যাসী আগে জন্মিয়াছিলেন, এখনও অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহারা কেবল ত্যাগই করিয়াছেন, বিশ্বকে ও বিশ্বজনকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া,

> "দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।
> সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
> সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে।"

বলিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা বিশ্ববন্ধু হইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধী ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই করিয়াছেন বলিয়া অগণিত জনসংঘের হৃদয়ে তাঁহার জন্য স্থান হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী অপরকে যাহা করিতে বলেন, আগেই নিজে তাহা করেন বা করিতে প্রস্তুত থাকেন। কোন জাতের কোন কৌলিক কাজকে তিনি হেয় বা অপবিত্র মনে করেন না। "অস্পৃশ্যতা" দূর করিতে তিনি বদ্ধ-পরিকর। এইজন্য তিনি স্বয়ং বহুবার পায়খানা পরিষ্কার করিয়াছেন। একটি "অস্পৃশ্য"জাতীয়া বালিকাকে তিনি নিজের কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া নিজের পরিবারে পালন করিয়াছেন।

তিনি কূটরাজনীতি বুঝেন না, কিম্বা ন্যায় ও সত্য-সঙ্গত কৌশলও কখন অবলম্বন করেন নাই, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে ইহা বলিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। দল বাঁধিবার ও তাহা পুষ্ট রাখিবার প্রয়োজন তিনি বুঝেন; নেতৃত্ব করিতে হইলে কখন কখন নিজের মতের বিরুদ্ধেও দলের লোকদের অধিকাংশের মত গ্রহণ করিতে হয়, ইহাও তিনি বুঝেন। তিনি এই নীতির অনুসরণ কখন কখন করিয়াছেন, কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত আচরণে ও বিশ্বাসে নিজের বিবেকবিরুদ্ধ কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি বা অভ্রান্ততার ভাণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল নহেন। পুনঃ পুনঃ নিজের ভুলচুক স্বীকার সম্বন্ধে তিনি নিজেকে "নির্লজ্জ" (shameless) বলিয়াছেন। তিনি নিজের ভুলভ্রান্তি যেমন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন, তেমনি কোন জায়গার, সম্প্রদায়ের, শ্রেণীর, বা দলের লোকদের দোষও স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করেন। কেবল গবর্ণমেণ্টের নিন্দা তিনি করেন না, আবশ্যক হইলে স্বদেশবাসীদের নিন্দাও করিয়া থাকেন; তাহাদের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হন না। বিবেচক ও সৎ লোকেরা এইজন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন।

গান্ধীর জীবনের অনেক বৎসর ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টায় যাপিত হইতেছে বটে; কিন্তু তাঁহার প্রধান ব্রত রাজনৈতিকসমস্যাসম্বন্ধীয় নহে। তিনি সমগ্র মানবজাতির জীবনের ও চরিত্রের আমূল সংস্কার চান। পবিত্রতা দ্বারা, সত্যের একান্ত অনুসরণ দ্বারা, অহিংসা দ্বারা, অপরকে কষ্ট না দিয়া নিজে দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়া, অপরের উপর কোন জোর-জবরদস্তী না করিয়া কেবল আত্মিক শক্তির প্রয়োগ-দ্বারা, এই সংস্কার সাধিত হইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। আত্মিক শক্তি প্রয়োগের পথ ও অহিংসার পথের পথিক হইয়া নিজেদের তপস্যা ও দুঃখসহিষ্ণুতাদ্বারা জাতীয় স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, এই বিশ্বাস স্বয়ং হৃদয়ে পোষণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী সকলের মনে উহা সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা

করিতেছেন। এই বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নহে, ইহা যে সত্য, তাহা ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা লাভ দ্বারা প্রমাণিত হইলে, তাহা তাঁহার ও ভারতীয় জনসমষ্টির অক্ষয় কীর্ত্তি হইবে। জগতের ইতিহাসে কোন ব্যক্তি ও জাতির এরূপ কীর্ত্তি নাই।

—

চরখার কথা

একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন ও লেখেন, যে, হাতে চরখায় সুতা কাটিয়া তাহা হইতে হাতের তাঁতে কাপড় বুনিয়া দেশের বস্ত্রাভাব দূর করা যাইবে না; এরূপ কাপড়ের দাম এত হইবে, যে, সস্তা মিলের কাপড় থাকিতে বেশী লোকে বরাবর তাহা কিনিবে না; ঘরবুনা কাপড় (খাদ্দার) কখন মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না; সস্তা মিলের কাপড় থাকিতে বেশী দাম দিয়া খাদ্দার কেনা অপব্যয় এবং অর্থনীতির নিয়ম-বিরুদ্ধ; সকলের চেয়ে সস্তা যাহা তাহা গরীব লোকদিগকে কিনিতে না-বলিয়া খাদ্দার চালাইবার চেষ্টা করিলে দেশের প্রতি ও গরীব লোকদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়; ইত্যাদি।

চরখা ও হাতের তাঁতের সমালোচক প্রত্যেক লোকেই উল্লিখিত প্রত্যেকটি কথা বলেন না; কিন্তু কেহ না কেহ ইহার কোন না কোন কথা বলেন। কয়েকটি তথ্যের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিলাতী কলের কাপড় এবং বোম্বাই অঞ্চলের কলের কাপড়ের ব্যবহার দেশব্যাপী প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে চরখা ও হাতের তাঁতই আমাদের লজ্জা রক্ষা করিত। কলের কাপড় হওয়া সত্ত্বেও, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেও প্রতি জেলায় অনেক ঘর তাঁতি হাতের তাঁতে কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কাপড়ের কলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তাঁহারা কি প্রকারে টিকিয়া ছিলেন ও আছেন, তাহা অনুসন্ধেয়। বাংলাদেশে শ্রীরামপুরে এবং ভারতবর্ষের অন্য কোন কোন স্থানে সরকারী বয়ন-বিদ্যালয় আছে। ইহাতে হাতের তাঁতে কাপড় বুনিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। হাতের তাঁতকে বাঁচাইবার চেষ্টা যদি ব্যর্থ বলিয়া আগে হইতেই স্থির থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বিদ্যালয় কেন রাখিয়াছেন? যদি কাপড়ের কল স্থাপনই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী উপায় হয়, তাহা হইলে হাতের তাঁতে কাপড় বুনিতে শিখাইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কি আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া সুপথ হইতে দূরে রাখিয়া ইংরেজজাতির স্বার্থ-সাধন করিতেছেন? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হাতের তাঁতের কার্য্যকারিতায় বিশ্বাস করেন। অনেকে বলেন, চরখার সুতায় কাপড় না বুনিয়া মিলের সুতায় কাপড় বুনিলে বরং হাতের তাঁত টিকিতে পারে, নতুবা টিকিবে না। তাহা হইলে, বিহার গবর্ণমেণ্ট একটি প্রদর্শনী করিয়া উৎকৃষ্ট চরখার জন্য কেন পুরস্কার দিয়াছেন? ইহা কি ভণ্ডামি? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, যে, বিহার গবর্ণমেণ্ট চরখা চালাইবার চেষ্টাকে পণ্ডশ্রম ও শক্তির অপচয় মনে করেন না। কলিকাতার এ বৎসরের স্বদেশী মেলা গবর্ণমেণ্টের ও মডারেট দলের সমবেত চেষ্টায় খোলা হয়। তাহাতেও চরখার ও হাতের তাঁতের উৎপন্ন বস্ত্রকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। যদি স্বদেশী মেলা সংস্পৃষ্ট সরকারী ও বেসরকারী লোকেরা চরখার কার্য্যকারিতা বুঝিয়া এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, গান্ধীর খাদ্দারবিষয়ক মতের সহিত বাংলা গবর্ণমেণ্টের দেশী মন্ত্রীদের ও মডারেট দলের মতের মিল আছে। কিন্তু যদি তাঁহারা চরখায় বিশ্বাসী না হইয়াও অন্য কোন কারণে উহার আদর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চরখার সমালোচনা করেন। অমৃত বাজার পত্রিকায় এক-খানা চিঠিও লিখিয়াছেন দেখিতেছি। তাঁহার মতের বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন নাই। তবে তিনি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ইহার উল্লেখ করায় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, ১৯২১ সালের ৯ই, ১১ই ও ১২ই জুন তারিখের হেডমাষ্টারদের মন্ত্রণাসভার রিপোর্টে দেখিতেছি, যে, ৭ই মে তারিখের মন্ত্রণাসভায় গৃহীত ষষ্ঠ প্রস্তাবে চরখায় সুতাকাটা ও হাতের তাঁতে

কাপড় বোনা ইংরেজী স্কুলসকলের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য্য হয়। রিপোর্টে দেখিতেছি, যে, দুইশত সাতচল্লিশটি স্কুল সুতা কাটা ও কাপড় বোনা শিখাইবার প্রস্তাব করেন। তা ছাড়া বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় সরকারী ইস্কুল সকলেও চরখার প্রবর্ত্তন করিতে দিতে রাজী হইয়াছেন—অবশ্য এই সর্ত্তে যে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে না। অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি যোগেন্দ্রবাবুর মতে চরখা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা এক প্রকার রাজনৈতিক চা'ল। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, যে, কলিকাতার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার জানিত ২৪৭টি ইংরেজী স্কুল এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী উহার প্রশ্রয় দিলেন কেন?

আমরা চরখা ও হাতের তাঁতের দ্বারা দেশের বস্ত্রের অভাব দূর করা অসম্ভব মনে করি না। যদি এই উপায়ে আমাদের আবশ্যক সব কাপড় প্রস্তুত নাও হয়, তাহা হইলেও যত হয়, ততই ভাল। কারণ ইহাদ্বারা দেশের বিস্তর লোকের অন্নসংস্থান হইবে, এবং সূত্র ও বস্ত্র নির্ম্মাতাদিগকে অন্নের জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে, খাদ্দারের ও কলের কাপড়ের মূল্যেও বেশী তফাৎ হইবে না। তা ছাড়া, মানুষ যে-সব স্থলে মূল্যের দ্বারাই চালিত হয়, তাহা নহে। কোথাও গোমাংস সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইলেও হিন্দু তাহা ব্যবহার করে না, কোথাও শূকর মাংস সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইলেও মুসলমান তাহা স্পর্শ করে না, আমিষ খাদ্য কোথাও নিরামিষ আহার্য্য বস্তুর চেয়ে সুলভ হইলেও নিরামিষভোজীরা তাহা খায় না। এরূপ খাদ্যাখাদ্যের বিচার ভাল কি মন্দ, এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। কেবল ইহাই বক্তব্য, যে, মূল্যের ন্যূনতা বা আধিক্যই সব স্থলে মানুষকে দ্রব্যবিশেষ ক্রয়ে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত করে না। সেইজন্য আমরা যদি মনে করি, যে, খাদ্দার পরিধান আমাদের জাতির পক্ষে আবশ্যক ও হিতকর, তাহা হইলে কিছু অধিক মূল্য দিয়াও উহা পরিতে পারি।

ইহা সত্য, যে, সব দেশে তাহাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে না; কতক জিনিষ অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে কাপাস জন্মে, এবং আরও জন্মিতে পারে। এখানে তন্তুবায় আছে, এবং অন্য জাতিতেও বস্ত্র বয়ন করে ও করিতে পারে। যখন কলের কাপড়ের সৃষ্টি হয় নাই, তখন আমরা নিজেই নিজেদের কাপড় উৎপন্ন করিতাম। হইতে পারে, যে, তখন আমরা এখনকার মত এত বেশী কাপড় ব্যবহার করিতাম না। কিন্তু এখন যেমন বেশী কাপড় দরকার, সেইরূপ চরখার এবং তাঁতের উন্নতিও হইয়াছে, এবং আগেকার চেয়ে বেশী লোক সুতা কাটা ও কাপড় বোনায় নিযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। আমরা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত অনবসর লোকদিগকে তাহাদের অধিকতর আয়ের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ন্যূনতর আয়ের সুতা কাটা বা কাপড় বোনার কাজে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছি না। দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার লোক আছে; তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ এরূপ লোক আছে, যাহারা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস কাজ করে, বা দিনের মধ্যে অল্প সময় কাজ করে। এইসকল লোক যত সহজে ও যত কম মূলধন খাটাইয়া সুতা কাটিয়া দুপয়সা রোজগার করিতে পারে, আর কোন উপায়ে তাহা পারে না। আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমে অভ্যস্ত হওয়াটাও কম লাভ নহে। যদি মানুষ কাপড়ের কলে মজুরী করিতে গিয়া যন্ত্রের অংশবৎ এবং কতকটা দাসবৎ হইয়া কাজ করে, নিজ গ্রাম ও আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে থাকিয়া সামাজিক শাসনের ও পারিবারিক প্রভাবের অভাব বশতঃ নৈতিক শিথিলতায় অভ্যস্ত হয়, তাহা বাঞ্ছনীয়, না গ্রামের পরিবারের ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়া অনলস স্বাধীন জীবন যাপন ভাল?

অর্থনীতি শাস্ত্রে আমরা পণ্ডিত নহি। কিন্তু ইহা বুঝি, যে, অপেক্ষাকৃত বেশী দাম দিয়া দেশী জিনিষ কিনিলেও দেশ দরিদ্র না হইয়া ধনশালী থাকিতে পারে। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই বিদেশীর নিকট হইতে সস্তায় কোন জিনিষ কিনিলেও সেই অল্প মূল্যটুকু বিদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু সে যদি বেশী দাম দিয়া নিজের ভাইয়ের নিকট হইতে সেই জিনিষ কেনে, তাহা হইলে টাকাটা পরিবারের মধ্যেই থাকে। দেশ ও জাতি একটি বৃহৎ

পরিবার। দেশে যাহার কাঁচা মাল জন্মে এরূপ দেশী পণ্যদ্রব্য বেশী দাম দিয়া কিনিলেও টাকাটা দেশে ও জাতির হাতেই থাকায় তাহাতে লাভ আছে।

—

চরখা ও স্বরাজ

চরখার প্রবর্ত্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে কিনা, এই প্রশ্ন অনেকে করেন। চরখার প্রবর্ত্তন দ্বারা সাক্ষাৎভাবে স্বরাজ লাভ হইতে পারে, ইহা আমরা মনে করি না; কারণ, কিরূপে তাহা হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেহ বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে ইচ্ছুক আছি। দেশে যখন কেবল চরখার সুতা ও হাতের তাঁতের কাপড় ছিল, তখনও ত দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। যে অবস্থা স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদিগকে সমর্থ করে নাই, তাহা স্বাধীনতা পুনর্লাভে সাক্ষাৎ ভাবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই সমর্থ করিবে, ইহা বলা যায় না। তবে পরোক্ষ ভাবে চরখার প্রচলন দ্বারা স্বরাজ লাভের পথ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝি ও বিশ্বাস করি। সংক্ষেপে খুলিয়া বলিতেছি।

স্বরাজ জিনিষটি শুধু রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার নহে। উহা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব ত বটেই, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্বও বটে। যেমন দেহের কোন একটি অঙ্গকে বলশালী করিতে হইলে অন্য অঙ্গগুলিকেও সবল করিতে হয়, এবং দেহের বলবিধানে মনঃসংযোগ আবশ্যক হয়; তেমনি এক-একটি বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্বের উপর নির্ভর করে, এবং সকল বিষয়ে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ সজাগ সতর্ক অনলস মন ও দেহের উপর নির্ভর করে। কোন-একটি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতির চেষ্টাকে একমুখী, সুশৃঙ্খল, ও সমবেত করিতে হয়, এবং সকলকে নিজের স্বার্থ অন্ততঃ কতকটা ত্যাগ করিয়া সমস্ত জাতির মঙ্গল-চিন্তায় ও অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইতে হয়। চরখা ও হাতের তাঁতকে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার প্রধান উপায় করিতে হইলে, সুশৃঙ্খল, সমবেত, একমুখী চেষ্টার এবং পরার্থ-পরতার একান্ত প্রয়োজন হইবে। এই সাধনায় আমরা যদি সিদ্ধি লাভ করি, তাহা হইলে পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের একটি প্রধান অংশে আমাদের জাতীয় আত্ম-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ত হইবেই, অধিকন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্র ভালর দিকে এমনভাবে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইবে, যে, তাহা রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ স্বরাজ লাভে আমাদের খুব কাজে লাগিবে। যে জাতির লোকেরা একজোট হইয়া বস্ত্রসম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিতে পারে, তাহার অন্যান্য দিকেও সেই দলবদ্ধ চেষ্টার প্রয়োগ করিয়া সাফল্য লাভে সমর্থ হইতে পারে, এরূপ আশা দুরাশা নহে।

খাদ্দারের উৎপাদনে বিস্তর লোক কাজ পাইবে; শুধু যাহারা সুতা কাটিবে ও কাপড় বুনিবে তাহারা নহে, যাহারা চরখা ও তাঁত তৈয়ার করিবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করিবে, তাহারাও। লক্ষ লক্ষ উৎপাদক ও লক্ষ লক্ষ ক্রেতার মধ্যে এইরূপে একটি যোগ স্থাপিত হইবে। জাতীয় একতা এই প্রকার নানা উপায়ে জন্মে।

স্বরাজ লাভ করিতে হইলে নানা প্রকারের প্রচারক ও কর্ম্মীর প্রয়োজন। তাঁহাদের ভরণপোষণ ও যাতায়াতের ব্যয়, পুস্তিকা ও পুস্তক মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যয়, প্রভৃতির জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। ভারতের আবশ্যক কাপড় ভারতের তুলায় ভারতীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইলে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য স্বরূপ যে অনেক কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা দেশেই থাকিবে, এবং তাহা হইতে স্বরাজ-প্রচেষ্টায় সাহায্য পাওয়া যাইবে।

এইরূপ আরও অনেক সুবিধার বিষয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা হৃদয়-মনের আত্মার উন্নতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ মনে করি। নিজেদের দরকারী কাপড় নিজেরা উৎপন্ন করিতে পারিলে আমাদের মনে যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও আত্মনির্ভর জন্মিবে, আমরা যেরূপ উৎসাহিত হইব, তাহা আমাদিগকে নানা কার্য্যক্ষেত্রে "অসাধ্য" সাধনে সমর্থ করিবে।

আরও একটি লাভ আছে। যাঁহারা গরীবদের জন্য নিজের সুখসুবিধা কখন ত্যাগ না করায় আমাদের মত আত্মগ্লানি অনুভব করেন, তাঁহারা খাদ্দার পরিধান করিয়া এই তৃপ্তি বোধ করিতে পারিবেন, যে, হয়ত ইহার কিছু সুতা কাটিয়া কোন গরীব লোক এক বেলার মুড়ি জলপানের সংস্থান করিয়াছে।

"অস্পৃশ্যতা" দূরীকরণ ও স্বরাজ।

মহাত্মা গান্ধীর অনেক সহকর্মীও বুঝিতে পারেন না, যে, তিনি "অস্পৃশ্যতা" দূরীকরণকে স্বরাজ লাভের জন্য একান্ত আবশ্যক কেন মনে করেন। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা কেন উহা একান্ত আবশ্যক মনে করি, তাহা অনেকবার বলিয়াছি। আবার সংক্ষেপে বলি।

যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিত, এবং সে অবস্থাতেও যদি আমাদের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোককে অস্পৃশ্য মনে করা হইত, তাহা হইলেও আমরা তাহাদের "অস্পৃশ্যতা" দূর করা একান্ত আবশ্যক মনে করিতাম। কোন জা'তের বা শ্রেণীর সকল মানুষকে কেবল তাহাদের বংশের নিমিত্ত পুরুষানুক্রমে অস্পৃশ্য মনে করা মহাভ্রম, এবং তাহাতে তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ও অমানুষিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়। কোন মানুষ কেবল দুটি কারণে কিছুকালের জন্য অস্পৃশ্য হইতে পারে—(১) যদি তাহার ছোঁয়াচে কোন রোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে নীরোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে তাহার সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত ব্যতীত ছোঁওয়া উচিত নয়; তন্নিমিত্ত ছুঁইলে তৎপরে হস্তআদি উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য; (২) যদি কাহারো শরীরের কোন অংশে কোন ময়লা, অশুচি, বা অনিষ্টকর পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দেহের সেই স্থানটি অস্পৃশ্য; তাহা স্পর্শ করিলে হস্ত আদি প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোটি কোটি লোকের সমষ্টি কতকগুলি জাতি পুরুষানুক্রমে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে না, এবং তাহাদের প্রত্যেকের দেহে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ময়লা লাগিয়া থাকে না। সুতরাং তাহারা সর্ব্বদা অস্পৃশ্য হইতে পারে না। অন্যদিকে ব্রাহ্মণাদি যে সব জাতি "অস্পৃশ্য" বিবেচিত হয় না, তাহাদের অনেকে কখন কখন ছোঁয়াচে ও কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, এবং তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও কখন কখন অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় থাকে। সেই সেই সময়ে, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা বা তাহাদের দেহ প্রক্ষালনার্থ ভিন্ন তাহাদিগকে স্পর্শ করা উচিত নয়।

কিন্তু যে যে কারণে কোন কোন মানুষ কখন কখন অস্পৃশ্য হইতে পারে, আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিলেও, "অস্পৃশ্যতা" বা "অনাচরণীয়তার" সম্পর্কে মানুষের মনে যে ঘৃণা অবজ্ঞা দ্বেষ থাকে, ক্ষণকালের নিমিত্তও আমরা তাহার সমর্থন করি না। কাহাকেও অবজ্ঞা করা মহা ভ্রম ও মহা অধর্ম্ম। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, এবং নিজেরও অপমান ও অনিষ্ট করা হয়। যিনি যত অধিক পরিমাণে যত বেশীসংখ্যক জীবকে প্রীতি করিতে পারেন, তিনি তত অধিক মহৎ ও ঈশ্বরের সদৃশ হন। কঠিন বসন্ত রোগে বা গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে, তাহাদের সেবা করিবার নিমিত্ত ভিন্ন, ছুঁইবার আবশ্যক নাই; কিন্তু তাহার মানে এ নয় যে তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও ঘৃণা করিতে হইবে। তাহাদের প্রতি করুণা ও প্রীতিই একমাত্র ধর্ম্মসঙ্গত মনোভাব।

অবজ্ঞা অবজ্ঞাত ও অবজ্ঞাতা উভয়েরই অনিষ্ট করে। মানুষ অবজ্ঞাত হইতে হইতে নিজেই নিজেকে হীন মনে করিতে অভ্যস্ত হয়। পুরুষানুক্রমে কোন জা'তের মনের ভাব এইরূপ হইলে তাহারা মনুষ্যত্বহীন, নিস্তেজ, মহদাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া বাস্তবিক হেয় হইয়া পড়ে। "অস্পৃশ্যতা"-বোধ এই প্রকারে এদেশে বহুকোটি মানুষকে বহুশতাব্দী ধরিয়া অমানুষ করিয়া রাখিয়াছে। স্বরাজের অর্থ এই, যে, আমরা নিজে নিজের দেশের ও জাতির সকল কর্ম্মের কর্ম্মী ও কর্ত্তা হইব। এই "আমরা" কাহারা? শুধু "স্পৃশ্য" জাতিগুলি "আমরা" নহি; বহুকোটি "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" লোকেরাও এই "আমরা"র অন্তর্গত। কিন্তু যদি তাহারা হেয়, হীন, অমানুষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমুদয় জাতিটি ত দেশের সব কাজের কাজী, সব কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে পারে না। কর্ত্তা যে হইবে, তাহার শিরদাঁড়াটা সোজা এবং মাথাটা উঁচু হওয়া চাই। কিন্তু যে-সব জা'ত পুরুষানুক্রমে অবজ্ঞাত হইয়া আপনাদিগকে হীন ভাবিয়া আসিতেছে, তাহাদের শিরদাঁড়া সোজা, মাথা উঁচু, সমস্ত শরীরটা সাহসে ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসে খাড়া হইবে কেমন করিয়া?

যে অবজ্ঞাত কেবল তাহারই অমানুষ হইবার সম্ভাবনা

পারে ; আর নিজে যে অবজ্ঞা করে সেও অমানুষ হয়। তাহার প্রমাণ আমাদের দেশের "স্পৃশ্য" জাতিরা। তাহারা "অস্পৃশ্য"দিগকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু নিজেরাও এমন অমানুষ যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদেশী জাতির দাসত্ব করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মর্ম্মান্তিক ধিক্কার বোধ হয় না। অপরের অবমাননা যে করে, তাহার নিজেরও মনুষ্যত্বের আদর্শ খাট হইয়া যায়, সে নিজেও ক্ষুদ্রাশয়, হীনচেতা, কাপুরুষ হইয়া পড়ে।

স্বরাজের মানে সোজা কথায় এই, যে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অঙ্গ আবশ্যক সব কাজ আমরা নিজে করিতে পারিব। তাহার মানে এই, যে, আমরা সক্ষম সমর্থ কর্ম্মিষ্ঠ জ্ঞানবান্ নীতিমান্ সাত্ত্বিক জাতি হইব। কিন্তু জাতির পক্ষমাংশ বা ষষ্ঠাংশ হীন দশায় পড়িয়া থাকিলে ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? কাহারো শরীরকে কার্য্যক্ষম বলিষ্ঠ করিতে হইলে, তাহার একটা হাত বা একটা পা বা বুকের একটা দিক্ বা একটা পাঁজরায় কম জোর থাকিলে চলে কি?

জাতীয় একতা ভিন্ন আমরা কখন উন্নত ও অগ্রসর হইতে পারি না, ইহা স্কুলের বালকদের রচনার খাতাতেও দৃষ্ট হইবে। জাতীয় উন্নতি খুব বড় ও কঠিন কাজ। ইহা সকলের চেষ্টা-সাপেক্ষ। জাতির কোটি কোটি লোককে বাদ দিয়া ইহা করা যাইতে পারে না। তা ছাড়া, আমাদিগকে এমন কতকগুলি অধিকার ও ক্ষমতা ইংরেজদের হাত হইতে জিনিয়া লইতে হইবে, যাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়া আছি। ইহা ত আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, যে, ইংরেজরা কখন বহুসংখ্যক মুসলমানকে, কখন বহুসংখ্যক "অবনত" জাতির লোককে, কখন অব্রাহ্মণদিগকে (non-Brahmans), কখন জমীদারদিগকে, কখন বা খোজাজাতের লোকদিগকে জাতীয় আত্মকর্তৃত্বলাভ-প্রয়াসী দল হইতে চ্যুত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া আসিতেছে। তাহারা যত সহজে এই ভেদ জন্মাইতে পারিয়াছে, তাহা সম্ভব হইত না, যদি আমাদের মধ্যে রন্ধ্র না থাকিত। কোথাও অশুচিতা থাকিলে, ছিদ্র থাকিলে, তবে শনি প্রবেশ করিতে পারে। পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা ও পরস্পরকে অবিশ্বাস এই অশুচিতা, এই রন্ধ্র।

কালসাগরে জাতীয়-জীবনের তরী ভাসাইয়া তাহাতে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার কতকগুলি মাল্লামাঝি স্পৃশ্য, অন্যেরা অস্পৃশ্য। যে কাছিটি, যে পালটি, একদল লোক ছুঁইবেন, অন্যেরা তাহা ছুঁইবেন না; যে নঙ্গরটি তুলিবার বা ফেলিবার জন্য একদল লোক হাত লাগাইবেন, অন্যেরা তাহাতে হাত লাগাইবেন না। এ অবস্থায় জাতীয়-জীবন-তরী চলিবে কেমন করিয়া? এ অবস্থাও তবু ভাল; কিন্তু যদি একদল জাহাজ ঘাটে বাঁধিতে অন্যদল ভাসাইতে, একদল পাল তুলিতে অন্যদল গুটাইতে, একদল নঙ্গর তুলিতে অন্যদল ফেলিতে, ইচ্ছা করে, তাহা হইলে জাহাজ চলে কেমন করিয়া?

শত্রুতা বরং সহ্য হয়, অবজ্ঞা সহ্য হয় না। তুমি আমার সঙ্গে মারামারি লাঠালাঠি কর, আমাকে মারিয়া ফেল, বুঝিব তুমি আমাকে শত্রু মনে করিলেও প্রতিদ্বন্দ্বী ও মানুষ ভাবিয়াছিলে; ভবিষ্যতে তোমার সন্তান ও আমার সন্তানে মিত্রতা হইতে পারিবে। কিন্তু যদি তুমি আমাকে এত হীন মনে কর, যে, গরু ঘোড়া গাধা ছাগল ভেড়া উকুন ছারপোকা মশা মাছি ছুঁইতে পার অথচ আমার স্পর্শে আমার ছায়ায় আমার দৃষ্টিতেও তুমি কলুষিত হও, এ অপমান অসহ্য, অমার্জ্জনীয়, ইহার স্মৃতি ততদিন মুছিবে না যতদিন অবজ্ঞার পরিবর্ত্তে প্রীতিশ্রদ্ধা এবং দূরত্বের পরিবর্ত্তে মমতার উদ্রেক না হইবে।

"আমরা সব ভাই ভাই।" বেশ কথা। তোমার ভাইকে তুমি এক আসনে বসাও, তাহাকে ছোঁও, তাহার সঙ্গে আহার কর, তাহার দেওয়া অন্নজল গ্রহণ কর। আমাকে ছোঁও না কেন, একাসনে বসিতে দাও না কেন, আমার সঙ্গে আহার কর না কেন, আমার দেওয়া অন্নজল গ্রহণ কর না কেন? অন্যদিকে আমার উৎপন্ন ও আমার ছোঁওয়া ফল মূল শস্যে শরীর পুষ্ট করিতে, তোমার কোন আপত্তি দেখি না।

মহাত্মা গান্ধী "অস্পৃশ্যতা" দূর করিতে চান, কিন্তু তিনি "অস্পৃশ্য"দের সহিত পংক্তিভোজন ও বৈবাহিক আদান-প্রদান চান না। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বলিতে তিনি অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় জাতিদের সহিত কি কি প্রকারে সমানে সমানে ব্যবহার চান, তাহার

কোন বর্ণনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু তিনি যাহা চান, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি। আমরা স্বয়ং তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভ্রাতৃত্ব চাই। আমরা সকলের সঙ্গে পংক্তিভোজনে এবং সকলের অন্ন গ্রহণে কোন দোষ দেখি না। বরং ইহাতে জাতীয় ঐক্য ও পরস্পরের সহিত প্রীতির বন্ধন বাড়িতে পারে মনে করি। যাহাদের সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম্ম, শিক্ষা, আচার ব্যবহার একরকমের, তাহাদের মধ্যে, জা'ত-নির্বিশেষে, বৈবাহিক আদানপ্রদানে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করি না; বরং মনে করি যে ইহা ভিন্ন সম্পূর্ণ একজাতিত্ব সম্ভব নহে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যতটুকু চান বলিয়া অনুমান করি, কার্য্যতঃ ততটা হইলেও জাতীয় একতা কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে গেলে এই বলা যায়, যে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে পংক্তিভোজন না করিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে ঔদ্বাহিক আদানপ্রদানও নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এক আসনে বসেন, এক পুকুরে এক ঘাটে স্নান করেন, এক কূপ হইতে জল তোলেন, কায়স্থের দেওয়া জল ব্রাহ্মণ পান করেন, কায়স্থকে ছুঁইলে ব্রাহ্মণ স্নান করেন না, ইত্যাদি। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পর যে আচরণ চলিত আছে, হাড়ি ডোম মুচি বাউরী প্রভৃতি জা'ত, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জা'তের কাছে সেই ব্যবহার পাইলে তাহাতেও অনেক মঙ্গল হয়। অনেকে বলিবেন, হাড়ি ডোম প্রভৃতি জা'ত বড় অপরিষ্কার থাকে। আমরা বলি, তাহাদের প্রত্যেকেই এরূপ নহে। নোংরা নিরক্ষর দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণকে যদি অস্পৃশ্য মনে না করা হয়, তাহা হইলে সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নমঃশূদ্রকে কেন অনাচরণীয় মনে করা হইবে? মানুষটিকে দেখিয়া শুনিয়া তদনুসারে তাহার সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, জা'ত ও বংশ অনুসারে নহে।

একজন মুচি খৃষ্টিয়ান্ হইয়া গেলে আমাদের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইবেন, স্বধর্ম্মে থাকিলে তাহা পাইবেন না, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত?

মান্দ্রাজ অঞ্চলে যাহারা শূদ্র হইতেও হীন বিবেচিত হয়, তাহাদিগকে "পঞ্চম" বলে। পঞ্চমরা আপনাদিগকে আদি দ্রাবিড় বলে। মান্দ্রাজ প্রদেশে কেবল যে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে হিংসা দ্বেষ প্রবল হইয়াছে, তাহা নহে, আদি দ্রাবিড় এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিদের মধ্যে রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব সহজে লব্ধ হইতে পারে কি? হইলেও তাহা কি জাতির কিয়দংশেরই কর্ত্তৃত্ব হইবে না? জাতীয় বলিতে ত জাতির সকল শ্রেণীর বুঝিতে হইবে?

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন মান্দ্রাজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে নিরস্ত্র অবাধ্যতা (civil disobedience) আরম্ভ করিবার নিমিত্ত জমীর খাজনা দেওয়া বন্ধ করিবার কথা হয়, তখন তথাকার গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, যে, যাহারা খাজনা দিবে না, তাহাদের জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া উহা "অবনত" শ্রেণীর (depressed classes) লোকদিগকে দেওয়া হইবে। সকল প্রদেশেই "অবনত" শ্রেণীর মধ্যে খুব গরীব লোক আছে, অন্য শ্রেণীর মধ্যেও আছে। "অবনত" শ্রেণীর লোকেরা জমী পান, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য দরিদ্রতা অনুসারে মানুষের সাহায্য করা, জা'ত অনুসারে নহে। জা'ত বা ধর্ম্ম অনুসারে সাহায্য করিলেই বুঝা যায় যে, ভেদনীতি ("divide and rule") অবলম্বিত হইতেছে। তাহার একটি দৃষ্টান্ত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। হাড়ি ডোম বাউরী মুচি বাগ্‌দী কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জা'তের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার মুসলমানদের চেয়েও কম। অথচ গবর্ণমেণ্ট অনেক বৎসর হইতে মুসলমানদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু হাড়ি ডোম প্রভৃতির জন্য সেরূপ কিছু করেন নাই। ইহার কারণ, ভেদনীতি প্রয়োগ দ্বারা শক্তিশালী মুসলমান-সম্প্রদায়কে হাত করিবার ইচ্ছা। মুসলমানেরা সকলে খুব সুশিক্ষিত হউন, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে চাই। কিন্তু ইহাও চাই, যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই সুশিক্ষা পান। শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইলে যে-যে শ্রেণী যে পরিমাণে অধিক নিরক্ষর তাহাদের জন্য তত বেশী চেষ্টা ও ব্যয় হওয়া কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম বা

জাতি অনুসারে বিশেষ ব্যবস্থা রাজনৈতিক-ভেদবুদ্ধি-প্রসূত।

যাহা হউক গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ভেদনীতি প্রয়োগের পথ যে আমরা খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি, এবং সেই পথ যে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, আমরা ইহাই বলিতে চাই।

অবজ্ঞা দ্বারা আমরা নমঃশূদ্রদিগকে অনাত্মীয় করিয়া ফেলিয়াছি। প্রীতিশ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহাদিগকে আত্মীয় করিতে হইবে। এই অবজ্ঞাজাত অনাত্মীয়তা বশতঃ স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মুসলমানেরা উহাতে যোগ দেন নাই, নমঃশূদ্রেরাও যোগ দেন নাই। বর্ত্তমান সময়ের স্বাজাতিক (Nationalist) প্রচেষ্টার সহিত বিস্তর মুসলমানের যোগ আছে; তাহার একটি কারণ, মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনকে স্বাজাতিক আন্দোলনের সহিত জড়িত করিয়াছেন। বিস্তর নমঃশূদ্র কিন্তু এখনও স্বাজাতিক প্রচেষ্টা হইতে দূরে রহিয়াছেন। তাঁহারা অল্পদিন পূর্ব্বে বাগেরহাটে এক সভা করিয়াছিলেন।

সেদিন একখানি ইংরেজী দৈনিকে এই মত পড়িতে-ছিলাম, যে, বাংলা দেশে অস্পৃশ্যতা নাই। পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। সম্পাদক এ কোন্ বাংলাদেশের কথা বলিতেছেন? আমরা গ্রীন্‌ল্যাণ্ড হইতে আসি নাই, বাংলাদেশেই আমাদের জন্ম ও নিবাস। আমরা ত এখনও অস্পৃশ্যতা দেখিতেছি। তবে ইহা ঠিক্ বটে, যে, দক্ষিণ ভারতে যে প্রকারের "অস্পৃশ্যতা"র যত প্রাদুর্ভাব, বাংলাদেশে তাহা তত নাই।

হিন্দুসমাজের অন্যতম দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ছুৎমার্গের নিন্দা পড়িয়া প্রীত হইলাম।

আমাদের সহিত সকলে একমত হইবেন, এ আশা আমরা করি না। কিন্তু আমরা একটা প্রস্তাব করি; তাহাতে আপত্তি না হওয়া উচিত। দেশনায়কেরা সমুদয় অনাচরণীয় জাতির লোকদের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে বলুন, "আপনারা কি কি সামাজিক প্রথা রীতিনীতি ও ব্যবস্থায় ব্যথিত তাহা মন খুলিয়া বলুন।" তাঁহাদের কথা শুনিয়া নেতারা প্রতিকারের চেষ্টা করুন। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের সময় ইহা হইতে পারিবে কি?

অনেকে মনে করেন ও বলেন, যে, স্বরাজলাভের পর অনাচরণীয়দের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইবে। আমরা বলি, দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের লাঞ্ছনা ও তাহাদের প্রতি মমতাবিহীন ব্যবহার ও অত্যাচার ভারতবর্ষের অধঃপতনের ও অধঃপতিত অবস্থায় থাকিবার একটি প্রধান কারণ। ইহার প্রতীকার না হইলে ভারতের সুদশা হইবে না। তা ছাড়া, আগেই আমরা দেখাইয়াছি, যে, স্বরাজের প্রকৃত অর্থ অনুসারে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও স্ব-রাজ হইবে না, যদি অবনতশ্রেণীর লোকেরাও আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্ব-রাজ্যের অর্থাৎ আত্ম-রাজত্বের অংশী না হয়, এবং সেরূপ অংশী তাহারা হইতে পারে না, যতদিন তাহারা সামাজিক মর্য্যাদায়, শিক্ষায়, জ্ঞানে, আর্থিক অবস্থায় উন্নত না হইতেছে।

তোমরা কবে তোমাদের স্বরাজ লাভ করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা লাঞ্ছিত হইতে থাকিব, ইহা কোন্ দেশী ধর্ম্ম, ন্যায়, ভ্রাতৃভাব, বা দেশভক্তি?

অবনত শ্রেণীর লোকেরা, স্বরাজলাভের পর অনাচরণীয়দিগকে সামাজিক অধিকার প্রদানেচ্ছু ব্যক্তি-গণকে এই একটি প্রশ্ন করিতে পারেন, "যখন কোন ভিন্নধর্ম্মী বিদেশী ভারত আক্রমণ ও অংশতঃ জয় করে নাই, সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার যুগেও ত আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে অনাচরণীয়ত্ব হইতে আচরণীয়ত্বে উন্নীত করেন নাই? তখন কি বাধা ছিল যাহা ভবিষ্যতে আপনারা স্বরাজ পাইলে থাকিবে না?"

ন্যায়বিরুদ্ধ, মনুষ্যত্ববিরুদ্ধ, নির্ম্মম ব্যবস্থার প্রতিকার এখনই করিতে হইবে। প্রত্যেক রকমের উন্নতি অন্য সব রকমের উন্নতির সহিত জড়িত। কোনটিকে বাদ দিয়া কোনটি হয় না। যদি বা আপাততঃ মনে হয়, যে, হইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে এমন কিছু খুঁৎ থাকিয়া যায়, যাহাতে সেই উন্নতি সত্য ও স্থায়ী হয় না।

হিন্দুমুসলমানের মিলন

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহার ভিত্তিভূত মূলনীতি-সমূহ অনুসারে স্বরাজের জন্য হিন্দুমুসলমানের আন্তরিক মিলনও একান্ত আবশ্যক। তাহা যাহাতে হয়, সেই চেষ্টা করা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই কর্ত্তব্য।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে অটোনমি

একটা কথা উঠিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্ব থাকা উচিত কি না। আমাদের মতে নিশ্চয়ই থাকা উচিত। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে অটোক্র্যাসি বা স্বৈরতন্ত্র অটোনমি নহে। আরও বক্তব্য, যে, যে বংশী-বাদককে বাঁশী বাজাইবার জন্য টাকা দেয়, তাহার, কি সুর বাজাইতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার অধিকার থাকা উচিত। টাকাটা বাঁশী বাজাইবার জন্যই খরচ হইল কি না, তাহা দেখিবার অধিকারও দাতার থাকা উচিত। আইন অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোনমি আছে, কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক আইন আমরা অধ্যয়ন করি নাই; এইজন্য বলিতে পারিলাম না, যে, আইন অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অটোনমি আছে কি না। কিন্তু উহার যে আশুনমি, অর্থাৎ, "হে আশু (-তোষ), নমি (তব পায়)", এইরূপ মতি আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—

প্রার্থীর চোখ-রাঙানী

কোন কোন ইংরেজী দৈনিক কাগজের একাধিক পত্রলেখক এইরূপ তর্ক করিয়াছেন, যে, যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট, অর্থাৎ এম্-এ, এম্-এসসী, পীএইচ্-ডী, ডী-এসসী পড়াইবার ব্যবস্থা গবর্ণ-মেণ্টের অনুমোদন অনুসারে হইয়াছিল, এবং যেহেতু শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য হিসাবে যোগ্যতা অযোগ্যতা ব্যতীত অন্য কারণে তাহাদের নিয়োগ নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষমতা প্রায় প্রয়োগ করেন নাই, অতএব গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ঋণ শোধ করিতে এবং ব্যয়বাহুল্যের ভার অনেকটা বহিতে বাধ্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতা কিরূপ আমরা তাহা অধ্যয়ন করি নাই, সুতরাং সেদিক দিয়া কিছু বলিব না। গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে বাধ্য কি না, কেবল সেই বিষয়ে একটি কথা বলিতে চাই। পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রস্তাব করিবার ক্ষমতার সীমা-নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্ট বলেন,

"The Committee should frame its recommendations merely with a view to the best expenditure of existing funds and it should understand that further grants for post-graduate education cannot be expected in the near future."—*Calcutta University Commission* (1917-19) *Report*, volume II, p. 51.

এই কমিটির সভ্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিঃ হর্নেল, ডাঃ হেডেন্, ডাঃ শীল, ডাঃ হাউয়েল্‌সু, ডাঃ রায়, মিঃ হ্যামিল্টন্, মিঃ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, এবং মিঃ এণ্ডাস‌ন্।

পত্রলেখকদের যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের আরও বক্তব্য আছে। কিন্তু আপাততঃ আর কিছু বলিব না।

—

নাগার্জ্জুন পুরস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের যে ছাত্র বৎসরের মধ্যে রাসায়নিক গবেষণায় সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইবে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দশ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার আয় হইতে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞ-তার সহিত এই দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিক নাগার্জ্জুনের নামে আচার্য্য রায় তাঁহার এই পুরস্কারের নামকরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণার পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা রায় মহাশয়ের এই দান উপযুক্ত প্রকারের হইয়াছে, এবং নাম-করণও উত্তম হইয়াছে।

—

আয়র্ল্যাণ্ডের অবস্থা

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আয়র্ল্যাণ্ডকে বহু পরিমাণে আত্ম-

করিতে দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে-সব আইরিশ নেতা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নূতন শাসনবিধিতে দেশের কাজ কিরূপ চলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু আইরিশ সাধারণ-তন্ত্রের দলের লোকেরা ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে, তাঁহাদের দেশকে গ্রেটব্রিটেন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশ দেখিতে চান। এই হেতু, নূতন গবর্ণমেণ্টের দল ও আইরিশ সাধারণতন্ত্রের দলে আবার প্রকাশ্য ও গোপন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রক্তারক্তি খুব হইতেছে। ইহা সাতিশয় পরিতাপের বিষয়।

কোন জাতি যদি তাহাদের দেশকে বিন্দুমাত্রও অন্যের অধীন দেখিতে না চায়, যদি তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে চায়, তাহা হইলে এই মহৎ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। জগতের লোকে যদি মনে করে, যে, পূর্ণ স্বাধীনতাকামী এই জাতির বিপক্ষে যে শক্তি দণ্ডায়মান, তাহা অপরাজেয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে জাতি যদি আশায় বুক বাঁধিয়া মনে করে যে তাহারা "অসাধ্য" সাধন করিতে "অসম্ভব"কে সম্ভব করিতে পারিবে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এই রকম লোকদের দ্বারাই পৃথিবীর কঠিনতম কাজ সম্পাদিত হইয়াছে ও মানবজাতির বহু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আমাদের হৃদয় রক্তারক্তিতে সায় দেয় না। আমাদের মনে কেবলি এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে থাকে যে, মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি যুদ্ধ ছাড়া পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার অন্য ধ্রুব উপায় আছে, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেলে জগতের সুমহান্ উপকার হইবে। জগতের যোদ্ধা শক্তিশালী জাতিরা আমাদের এই রক্তারক্তিবিমুখতা আমাদের পরাধীনতা ও দুর্ব্বলতা হইতে উৎপন্ন মনে করিতে পারেন। তা করুন; আমরা যাহাকে শ্রেয়ঃ মনে করি তাহাকে শ্রেয়ঃ বলিবই। আমরা আইরিশদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-কর্তৃত্বের পক্ষপাতী, কিন্তু হিংসাদ্বেষ রক্তারক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

আইরিশরাই কেবল হিংসাদ্বেষ রক্তারক্তি করিয়াছে, বা তাহারাই প্রথমে উহার সূত্রপাত করিয়াছে, ইহা আমরা বলি না; কারণ, ঐতিহাসিক সত্য তাহা নহে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত আয়র্লাণ্ডে ব্রিটিশ-জাতির অত্যাচারের কাহিনী অতি লোমহর্ষণ। এই জন্য আমরা ব্রিটিশজাতিরও নিন্দা করি। কিন্তু প্রতিহিংসা ও তজ্জনিত পুনঃপ্রতিহিংসার সমর্থন ও প্রশংসা করিতে আমরা অক্ষম।

রেলে মালের ভাড়া

রেলে যাত্রীদের ভাড়া পূর্ব্বেই বাড়িয়াছে, এবং তাহা গরীব তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত বেশী হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। রেলে মালের ভাড়াও বাড়িয়াছে। মালের ভাড়ার হার যে-নীতি অনুসারে যে-প্রকারে বাড়ান হইয়াছে, তাহা দেশী পণ্যদ্রব্য ও পণ্যশিল্পের পক্ষে অসুবিধাজনক এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য ও পণ্যশিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। তাহাতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ দুর্ম্মূল্য হইবে। সার্ভেণ্ট কাগজে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। রেল কোম্পানীর দায়িত্বে মালগাড়ীতে প্রেরিত ঘীর ভাড়া দ্বিগুণ হইয়াছে। আমাদের এই দৈনিক আহার্য্য জিনিষটি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া অনেকদিন হইতেই কঠিন হইয়াছে; দামও অত্যন্ত বাড়িয়াছে। এখন উহা আরও দুর্ম্মূল্য হইবে, এবং ভেজালও বাড়িবে। ইহাতে দেশের লোকদের স্বাস্থ্যের অনিষ্ট ও কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস হইবে।

দেশী কার্পাস সূত্র এক মণের মাইলপ্রতি যত ভাড়া, বিদেশী কাপড় এক মণেরও সেই ভাড়া স্থির হইয়াছে, যদিও দেশী সুতার দাম বিদেশী কাপড়ের দাম অপেক্ষা কম। ইহাতে দেশী সুতা একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিয়া দেশেই কাপড় প্রস্তুত করিবার অসুবিধা হইবে; কিন্তু বিদেশী কাপড় দেশের নানাস্থানে চালান করিবার সুবিধা হইবে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আবশ্যকমত চরখার সুতা কাটিয়া তাহা হইতে সেই সেই স্থানেই কাপড় বুনাইলে এই অন্যায় নিয়মের প্রতিকার হইতে পারে।

পরিষ্কৃত চিনি (যাহা বিদেশ হইতে আমদানী হয়), এবং দেশী গুড়ের ভাড়া সমান রাখা হইয়াছে, অর্থাৎ

উভয়ের মূল্যে অনেক তফাৎ। আমাদের দেশের অনেক ছোটবড় কারখানায় গুড় পরিষ্কার করিয়া চিনি প্রস্তুত করা হয়, আকের রস হইতে সাক্ষাৎভাবে চিনি প্রস্তুত করা হয় না। নূতন রেলভাড়ায় এইসব কারখানার অসুবিধা হইবে, এবং তথায় উৎপন্ন চিনি দুর্মূল্য হইবে।

"সুতা ও কাপড় এবং গুড় ও চিনির ভাড়া নির্দ্দেশে বিদেশীর সুবিধা ও দেশীর অসুবিধা যে নীতি অনুসারে করা হইয়াছে, গম ও আটা ময়দা এবং তৈলবীজ ও তৈলের ভাড়া নির্দ্দেশে সেই নীতি অন্য প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যায়, যে, কাঁচা মাল ও তদুৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের ভাড়া সমান রাখা হইয়াছে, কারণ তাহাতেই বিদেশীর সুবিধা। কিন্তু সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ ও গম বিদেশীর সুবিধার জন্য বিদেশে রপ্তানী করা দরকার, এবং তদুৎপন্ন তৈল ও আটা ময়দা সুজি দেশেই দেশী লোকের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন। এইজন্য গম ও তৈলবীজের (অর্থাৎ কাঁচা মালের) ভাড়া আটা ময়দা সুজি ও তৈলের (অর্থাৎ কাঁচা মাল হইতে উৎপন্ন পণ্য-দ্রব্যের) ভাড়া অপেক্ষা কম রাখা হইয়াছে। এই নজীর অনুসারে সুতা ও গুড়ের ভাড়া বিদেশী কাপড় ও বিদেশী চিনি অপেক্ষা কম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহাতে যে বিদেশীর অসুবিধা ও দেশীর সুবিধা।"

রেল বিস্তারের জন্য ঋণ

রেলওয়েতে দেশী ও বিদেশী লোকদের এক প্রকার ক্ষতি-লাভ ও সুবিধা-অসুবিধার দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়ে দ্বারা আমাদের কোনই কার্য্য সৌকর্য্য ও উপকার হয় নাই, এরূপ নহে। ইহাতে যাতা-য়াতের সুবিধা, জিনিষপত্র পাঠাইবার সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা, দেশ দেখিয়া সুখ পাইবার ও জ্ঞান বাড়াইবার সুবিধা, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের পরস্পর জানিবার চিনিবার এবং সেই উপায়ে এক মহাজাতি হইবার সুবিধা, হৃদয়-মনের সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতা বৃদ্ধি করিবার সুবিধা, প্রভৃতি হইয়াছে। কিন্তু অসুবিধা এবং অনিষ্টও হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও প্রসার বাড়িয়াছে, কোন সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব দেশে হইলে তাহা অতি দ্রুত ছড়াইয়া যাইতেছে, বিদেশী পণ্য-দ্রব্য গ্রামের অলি গলিতে পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিল্প ও শিল্পীর ক্রমশঃ তিরোভাব হইয়া আসিতেছে তাহাতে বহুসংখ্যক লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের কৌলিক পথ বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত অধিক লোককে কৃষীর ও সাধারণ মজুরীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, এই কারণে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইয়া আসিতেছে; ইত্যাদি।

বিদেশীদের কিন্তু রেল বিস্তারে সুবিধাই বেশী। তাহাদের শিল্প বাণিজ্যের ইহাতে খুব সুবিধা হইয়াছে, রেলওয়ের লোহা ইস্পাতের লাইন, এঞ্জিন, গাড়ী ও অন্য নানাবিধ জিনিষ জোগাইয়া তাহারা ধনী হইয়া আসিতেছে, রেলওয়েতে মূলধন খাটাইয়া বা মূলধন ধার দিয়া তাহার লভ্যাংশ বা সুদ তাহারা পাইতেছে, রেলওয়ের খুব-মোটা ও অল্প-মোটা বেতনের কাজগুলিতে নিযুক্ত থাকিয়া বিদেশীরা ধনবান হইতেছে, রেলওয়ে দ্বারা খুব সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুত ও অধিক সংখ্যায় সৈন্য পাঠাইবার উপায় থাকায় ভারতবর্ষকে জয় করিবার ও অধীন রাখিবার সুবিধা হইয়াছে।

সুতরাং রেলওয়ের বিস্তারের জন্য বিদেশী গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসাদারেরা যে খুব ব্যগ্র থাকিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই ব্যগ্রতা-প্রযুক্ত ভারত-গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে, বিলাতে দেড়শত কোটি টাকা ঋণ করিয়া এখন হইতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া এদেশে রেলওয়ে বিস্তার ও তাহার উন্নতি করিবেন। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে।

রেলওয়ে বাড়ান অপেক্ষা অনেক বেশী দরকারী কাজ এদেশে আছে। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অতি সামান্য চেষ্টা ও ব্যয় করা হয়। তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া তবে রেলওয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। এখনও শতকরা ৯৪জন লোক এদেশে নিরক্ষর রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-রিপোর্ট অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে ছাত্রপ্রতি বার্ষিক প্রায় ৭৲ টাকা খরচ হয়। ব্রিটিশ ভারতের মোট অধিবাসীর শতকরা ১৫জন প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর উচ্চতম সংখ্যা ধরিলে অবৈতনিক সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যয়

প্রায় ছাব্বিশ কোটি টাকা হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট, রেলবিস্তার, সৈনিকদের রণদক্ষতা ও সরঞ্জামের উৎকর্ষ সাধন, প্রভৃতি কত কাজে সরকারী রাজস্ব হইতে বা ঋণ করিয়া কত কোটি টাকা ঢালিতেছেন, অথচ অবৈতনিক শিক্ষা দিবার কথা তুলিলেই বলেন, টাকা কোথায়, তোমরা নূতন ট্যাক্স দ্বারা টাকা তুলিয়া ঐ কাজে হাত দাও। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় করিতে বলিলেও ঐ একই জবাব পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত, জলসেচনের ব্যবস্থা ও অন্যান্য উপায়ে কৃষির উন্নতি, অরণ্যসকলের সংরক্ষণ ও উন্নতি, জলপথসকলের রক্ষা উন্নতি ও বিস্তৃতি, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে পণ্যদ্রব্যসকল উৎপাদনের নিমিত্ত শিক্ষাদান, মূলধন-প্রাপ্তির সুযোগবিধান, কারখানা স্থাপন, প্রভৃতি কত কাজ আছে, যাহা রেলওয়ের আগে বা অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগ ও অর্থব্যয়ের দাবী করিতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে দিকে দৃষ্টি নাই। কারণ ইহা বিদেশী গবর্ণমেণ্ট।

রেলওয়ের আবশ্যক সর্ব্বাগ্রে বলিয়া মানিয়া লইলেও তাহার জন্য মূলধন ঋণ ভারতবর্ষে না করিয়া বিলাতে কেন করা হইতেছে? উহার সুদ যখন ভারতীয় রাজকোষ হইতেই দিতে হইবে, তখন ভারতীয় ধনীরা ঐ ঋণ দিয়া সুদটা পান, ইহাই তো স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। ভারতবর্ষ হইতে ঋণ পাওয়া না গেলে বিদেশে যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যায়, সেখানেই ধার চাওয়া উচিত। ইউরোপের সকল দেশই এখন ঋণী দেশ; গ্রেটব্রিটেনও ঋণী দেশ। কেহই আমেরিকার প্রভূত ঋণ শোধ করিতে পারিতেছে না। অধমর্ণ দেশের লোকদের চেয়ে উত্তমর্ণ দেশের লোকদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে টাকা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উচ্চ সুদটা ইংরেজ ধনীদিগকে দেওয়া দরকার বলিয়া বিলাতেই ঋণ করা হইতেছে।

তাহার পর, ঋণ করিয়া সেই টাকায় রেলওয়ের জিনিষ বেশীর ভাগ বিলাতেই কেনা হইবে। কিন্তু লোহার রেল-আদি ভারতেই অপেক্ষাকৃত কম দরে টাটা কোম্পানী দিতে পারে। যুবরাজের ভ্রমণের চমৎকার গাড়ী যখন ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইয়াছে, তখন মালগাড়ী ও সাধারণ যাত্রীগাড়ীও এখানে নিশ্চয়ই হইতে পারে। যদি এদেশে নাও হয়, তাহা হইলেও, ইহা জানা কথা, যে, রেলওয়ের উৎকৃষ্ট সব জিনিষ বিলাত অপেক্ষা অন্য কোন কোন দেশে সস্তায় পাওয়া যায়। সেই-সব দেশে কেন কেনা হইবে না? ইহা সুস্পষ্ট যে বিলাতের লোকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি নানা প্রকারে করা হইতেছে।

—

রেলভাড়া ও রেলের ব্যয়

রেলভাড়ার বর্ত্তমান উচ্চতার একটা এই কারণ দেখান হইতেছে, যে রেলওয়ে চালাইবার খরচ যুদ্ধের আগে অপেক্ষা বাড়িয়াছে। কিন্তু ভারত স্বাধীন হইলে খরচ খুব কমান যাইত। উচ্চতম ও উচ্চতর চাকরীগুলির বেতন অত্যন্ত বেশী; তাহাতে উপযুক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারী রাখিলে খরচ অনেক কমিত। বিলাতে উচ্চ সুদে টাকা ধার না করিয়া অন্যত্র কম সুদে টাকা ধার করা চলিত। চড়া দামে বিলাতী রেলওয়ে-সামগ্রী না কিনিয়া অন্যত্র সুলভতম উৎকৃষ্ট জিনিষ কিনিলে ব্যয় অনেক কমিত। এদেশে পূর্ব্বেকার বা এখনকার রেল-ভাড়া আমেরিকার বা বিলাতের রেল-ভাড়া অপেক্ষা কম, ইহা বস্তুতঃ মিথ্যা কথা। আয়ের কত অংশ ব্যয় করিয়া কোন্ দেশের লোক কি জিনিষ বা সুবিধা পাইতে পারে, তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে তবে বলা যায়, কোন্ দেশে কোন্ জিনিষ বা সুবিধা কম ব্যয়ে বা বেশী ব্যয়ে পাওয়া যায়। সার্ভেণ্ট কাগজে রেলওয়ে বোর্ডের প্রকাশিত একটি বহি হইতে একটি মত উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে, যে, ১৯০৩ সালে আমেরিকার একজন মজুর তাহার একদিনের মজুরী ব্যয় করিয়া রেলে ষাট মাইল যাইতে পারিত, কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ শ্রেণীর একজন মজুর একদিনের মজুরী খরচ করিয়া চৌদ্দ মাইলের বেশী রেলে যাইতে পারে না।

—

খাদ্দার প্রচলনের চেষ্টা ও বিদেশী সুতা ও কাপড়ের আমদানী

১৯২০-২১ সালের যে এগার মাস ফেব্রুয়ারীতে শেষ হয়, তাহাতে ১১২ কোটি টাকার সুতা ও কাপড় ভারতে

আম্‌দানী হইয়াছিল। ১৯২১-২২-এর ঐ এগার মাসে আম্‌দানী সুতা ও কাপড়ের মূল্য ৫৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। খাদ্দার প্রচলনের চেষ্টা এই হ্রাসের একমাত্র কারণ না হইলেও একটি কারণ নিশ্চয়ই বটে।

বঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত যাহারা অন্যত্র চরখা, হাতের তাঁত ও খাদ্দার চালাইবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা বৃথা চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

—

বঙ্গের নূতন লাটের প্রথম কাজ

বঙ্গের নূতন লাট তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নামঞ্জুরী ছুটি বরাদ্দ তাঁহার নিজের আইনসঙ্গত ক্ষমতা অনুসারে মঞ্জুর করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। আমাদের বিবেচনায় সভাকে এই প্রকারে বার বার অপদস্থ না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হইত। লর্ড রোনাল্ড্‌শের আমলেও কিছুদিন আগে ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত একাধিক প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কাজ করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভাগুলির ক্ষমতা ও মর্য্যাদার পরিমাণ ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে।

—

গবর্ণমেণ্টের ঋণ করিবার ক্ষমতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ের মত না লইয়া বা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের অনুমতিক্রমে টাকা ধার করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণমেণ্টের যতদিন থাকিবে, ততদিন বজেটের আলোচনা এবং মঞ্জুরী না-মঞ্জুরীর ব্যাপারটা প্রহসনের মত বোধ হইতেছে। খাঁটি স্বরাজের মধ্যে এরূপ ভেজাল একটুকুও থাকিতে পারে না। একটুও মেকি কিছু থাকিলে তাহা স্বরাজনামের যোগ্য নহে।

—

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে এবং অন্য নানাবিধ বিষয়ে প্রায়ই কবিতা লিখিতেন, এবং তৎসমুদয় মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইত। তাঁহার দেহ সুস্থ সবল ছিল না, তাহাই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

—

পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী

পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন প্রধান বিদুষী এবং কর্ম্মিষ্ঠা জনহিতসাধিকা মহিলার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। মহারাষ্ট্রের কেদগাঁওয়ের নিকট স্বপ্রতিষ্ঠিত "মুক্তি" নামক পল্লীতে তিনি প্রায় দেড়হাজার বিধবা নারী ও অনাথ বালিকাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ধর্ম্ম ও সাধারণ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত গত ১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীর ৫৯৮-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

—

উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন-সংস্থাপক সমিতি

লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির নেতৃত্বে "উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন-সংস্থাপক সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গের বাহিরে উত্তর-ভারতে যে-যে-স্থানে বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন বৃদ্ধি, ইহাদের মধ্যে যাহারা সাহিত্যানুরাগী তাঁহাদের পরস্পরের ভাববিনিময়, প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা ইহার সমর্থন করিতেছি।

—

নারীশিক্ষাসমিতির কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার

নারীশিক্ষাসমিতি বিধবা ও অন্য সহায়হীনা নারী-দিগকে শিক্ষা দিয়া নিজ নিজ জীবিকানির্ব্বাহে সমর্থ করিবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহার খুব প্রয়োজন আছে। সর্ব্বসাধারণ এই উদ্দেশ্য-সাধনে সমিতিকে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য দিলে সাতিশয় আহ্লাদের বিষয় হইবে।

নারীশিক্ষাসমিতি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় গৃহে বালিকা ও মহিলাদিগকে বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি নানাবিধ অর্থকর

কার্য্য শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

—

সঙ্গীত সংঘের শাখা

অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গীত শিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদের দেশে অল্পই আছে। সঙ্গীত সংঘ বহু বৎসর ধরিয়া এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি সংঘ কলিকাতার উত্তর অঞ্চল নিবাসী গৃহস্থদিগের সুবিধার জন্য ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে একটি শাখা খুলিয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষার্থিনীদের ইহাতে খুব সুবিধা হইবে।

চিত্র-পরিচয়

আমাদের মুখপাতের ছবিখানি অজন্টা-গুহার একটি প্রাচীর-চিত্রের নকল। ছবির বিষয় হইতেছে—বুদ্ধদেব তপস্যায় বোধি লাভ করিয়া পিতৃরাজ্য কপিলবাস্তুতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; তিনি রাজান্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নী যশোধরাও পতির সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ শ্রবণ করা অবধি কাষায়-বস্ত্রধারিণী সন্ন্যাসিনী হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিতেছেন। যশোধরা স্বামীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, বুদ্ধদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন যশোধরা পুত্র রাহুলকে বলিলেন—'বৎস, যাও, তোমার পিতার নিকট হইতে তোমার পিতৃধনের উত্তরাধিকার চাহিয়া লও।' শিশু রাহুল, বহু সন্ন্যাসীর মধ্যে পিতাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা, কোন্ জন আমার পিতা?' যশোধরা পুত্রের প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'বহু পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম যিনি, তিনিই তোমার পিতা—তাঁহাকে তুমি চিনিয়া লও।' রাহুল দেখিয়া দেখিয়া বুদ্ধদেবকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্থির করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া প্রার্থনা করিলেন—'পিতা, আমার পিতৃধনের উত্তরাধিকার আমাকে দান করুন।' তখন বুদ্ধদেবের ইঙ্গিতে আনন্দ একখানি কাষায় উত্তরীয় রাহুলের অঙ্গে বেষ্টন করিয়া দিয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজার পৌত্রের হাতে সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র দান করিলেন। তার পর আনন্দ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু, শিশুর মাতাকেও কি প্রসাদ বিতরণ করিবেন?' তখন বুদ্ধদেব বলিলেন—'আমার ধর্ম্ম নরনারী সকলের জন্যই।' যশোধরা দীর্ঘ বৈধব্যের অবসানে আনন্দিত হৃদয়ে পতির সহিত প্রব্রজ্যা স্বীকার করিলেন।

চারু

পুস্তক-পরিচয়

মতিচুর—মিসিস আর, এস, হোসেন। ৮৬ লোয়ার সার্কিউলার রোড, কলিকাতা। দুই টাকা।

বইখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'ডেলিসিয়া-হত্যা' খুবই ভাল করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

লেখিকার ভাষা বেশ সহজ এবং সরল, তাহাতে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য বা ভাবের ফেনা নাই। এইজন্যই পুস্তকখানি পড়িতে আরো ভাল লাগিয়াছে।

ঐশ্বর্য্য—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

সামাজিক উপন্যাস। বইখানি উপন্যাস হিসাবে খুব ভাল না হইলেও একেবারে বাজে নয়। গ্রামের চিত্রগুলি দু-এক জায়গায় বেশ ভালই ফুটিয়াছে। বইখানি আমাদের মন্দ লাগে নাই। বাঁধাই ও ছাপা ভাল।

গ্রন্থকীট

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রণয় পত্র

প্রাচীন চিত্র হইতে

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত বসন্ত সিংহ মহাশয়ের সৌজন্যে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

২য় সংখ্যা

পুনরাবৃত্তি

১

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে' খেলা কর্‌চে একটি ছোট ছেলে, আর একটি ছোট মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমরা কি খেল্‌চ?"

তারা বল্‌লে, "আমাদের আজকের খেলা রাম-সীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে' গেলেন।

ছেলেটি বল্‌লে, "এই আমাদের দণ্ডক বন, এখানে কুটীর বাঁধ্‌চি।"

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেচে, ভারি ব্যস্ত। আর মেয়েটি শাকপাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধ্‌চে; রাম খাবেন, তারি আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বল্‌লেন, "আর ত সব দেখ্‌চি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়?" ছেলেটিকে মান্‌তে হল তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। রাজা বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।"

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে' দেখ্‌লে। তার পরে বল্‌লে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বল্‌লেন, "আমি খুব ভালো হার্‌তে পারি। পরীক্ষা করে' দেখ।"

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগ্‌ল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশ-বারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মর্‌তে হল। মর্‌তে মর্‌তে তিনি হাঁপিয়ে উঠ্‌লেন।

ত্রেতা যুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক্ তেমনি করেই ডাক্‌তে লাগ্‌ল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দ্দায় পর্দ্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক্ সেই সুরই বাঁধ্‌লে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ছেলে মেয়ে দুটি কার?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরীব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে' দিন চলে।"

রাজা বল্‌লেন, "যখন সময় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছা।"

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস কর্‌লে না, মাথা হেঁট করে' রইল।

২

দেশে সব-চেয়ে যিনি বড় পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তার পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু রাজার ইচ্ছা। সকলের চেয়ে সঙ্কট রুচিরার। কেন না, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে, সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘট্‌বে, কারণ, কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাট্‌তে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভৎসনা করে' বলেন, "বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন?"

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিষে।"

অধ্যাপক বলেন, "সে-সব অনুরাগ ছাড়।"

সে বলে, "তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাক্‌বে না।"

৩

এমনি করে' কিছুকাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "রুচিরা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কৌশিক?"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "সে যে কিছুই শিখেচে এমন বোধ হয় না।"

রাজা বল্‌লেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক একটু হাস্‌লেন, বল্‌লেন, "এ যেন গোধূলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন, "তোমার কন্যার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত হয় না।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"

রাজা বল্‌লেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্চে।"

রাজা বল্‌লেন, "সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "হাঁ, সেই কথাই বটে।"

রাজা বল্‌লেন, "আমার সাম্‌নে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক্‌। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্‌লে, "এই পণে আমার কন্যার মত আছে।"

৪

বিচার-সভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে', কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে' উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃক্‌পাতও করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করেনি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে' তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি। তাই আজ যখন তার যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মত ঝিক-মিক করে' উঠ্‌ল, তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পার্‌লে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

রাজা মন্ত্রীকে বল্‌লেন, "এখন বিবাহের দিন স্থির কর।"

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বল্‌লে, "ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।"

রাজা বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "জয়লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?"

কৌশিক বল্‌লে, "জয় আমারই থাক্‌, পুরস্কার অন্যের হোক্‌।"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন: তার পরে শেষ পরীক্ষা।"

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে' গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু রুচির সমস্ত মন কোথায়?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "এখনো যদি সতর্ক না হও, তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।"

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগ্‌ল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে' বল্‌লেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে' বল্‌চি আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝ্‌তে পার্‌লেম্‌ না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বল্‌লে, "ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কন্যা কি বলে?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?"

রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তার চোখের জল আজ কি রকম সাক্ষ্য দিচ্চে?"

মন্ত্রী চুপ্‌ করে' রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বস্‌লেন। মন্ত্রীকে বল্‌লেন, "তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে' দাঁড়াল।

রাজা বল্‌লেন, "বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?"

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বল্‌লেন, "আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর-একবার দেখ্‌তে আমার বড় সাধ।"

রুচিরা মুখের একপাশে আঁচল টেনে চুপ করে' রইল।

রাজা বল্‌লেন, "বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুন্‌চি বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেচে। তুমি মনে কর্‌লেই সে অভাব পূরণ হয়।"

রুচিরা কোনো কথা না বলে' রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম কর্‌লে।

রাজা বল্‌লেন, "কিন্তু বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজ্‌তে পার্‌ব না।"

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বল্‌লেন, "এবার রাক্ষস সাজ্‌বে তোমাদের অধ্যাপক।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধর্ম্ম-পূজা

(ভূমিকা)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে (৪০৫—৪১১) চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ভারতবর্ষে আসেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা পশ্চিমদিকের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। সে যুগে তাম্রলিপ্তি বাংলাদেশের একটা মস্ত বন্দর বলে' সুপরিচিত ছিল। সেখানে তখন বাইশটা বৌদ্ধ মঠ ছিল। ফাহিয়ানের কিঞ্চিদধিক দুই শ বছর পরে আসেন হুয়েন্ সাং। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে সর্ব্বত্রই নিষ্প্রভ দেখে যান; তাম্রলিপ্তিতে দশ-বারটার বেশী মঠ তিনি দেখেন নি; ভিক্ষুর সংখ্যা সেখানে হাজারের বেশী ছিল না। প্রায় ৫০টা দেবমন্দির দুই শ বৎসরের মধ্যে গড়া হয়েছিল, আর ঐ নগরে বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ একত্র বাস করতো। মোটের উপর সমস্ত বাংলা দেশে খুব কম করে' দশহাজার সঙ্ঘারাম ছিল ও প্রায় এক লক্ষ ভিক্ষু সেইসব আরামে বাস করতেন। এই দুই চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা পাঠ করলে জানা যায় যে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অধোগতি সুরু হয়েছে। কিন্তু অধোগতি সুরু হলেও লোপ পাবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বাংলাদেশেই বৌদ্ধধর্ম্ম টিঁকে ছিল। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "Modern Buddhism" গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে বাংলাদেশের এই এক লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণের জন্য খুব কম করে এক কোটি পরিবারের প্রয়োজন। তাঁর মত্ সত্য বলে' মান্‌তে হলে বাংলাদেশে দেড় হাজার বছর আগে চার কোটি বৌদ্ধ বাস করত। এবং আর দুই কোটি হিন্দুও ছিল। সুতরাং ৭ম শতাব্দীতেই ৬ কোটি লোক বাংলা দেশে ছিল এরূপ অনুমান করতে হয়। কিন্তু সংখ্যানির্ণায়ক রীতি (Statistical method) অনুসরণ করে' আমরা এ অনুমান শ্রদ্ধেয় বলে' মান্‌তে পারি না। আমরা জানি যে ভারতের সর্ব্বত্র ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় সুরু হয়। বাংলাদেশেও সেই প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছিল। আদিশূরের ঐতিহাসিকত্ব সত্য কি না জানি না; তবে আদিশূরের পঞ্চব্রাহ্মণ আমদানী করার প্রবাদের মধ্যে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের সূত্রপাত হয়েছিল সেটা নিশ্চিত কথা।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম মরে নি। সে নানা আকারে দেশের নানা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। মাঝখানে পাল-রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ জেগে উঠেছিল। সে কথা আমরা যথাস্থানে আন্‌বো। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে শাখাকে আমরা মহাযান আখ্যা দিয়ে থাকি তার সম্বন্ধে লোকের একটা গোড়ার ভুল আছে। মহাযান বল্‌তে কোনো ধর্ম্ম-মত বুঝায় না, বুঝায় কতকগুলি শাখার দর্শনশাস্ত্র। সেই মহাযান নানা বিকৃত আকার ধারণ করে' চীন জাপান কোরিয়া তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থানে যেমন বিচিত্র ধর্ম্মমত সৃষ্টি করেছে, তেমনি ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধমত বিলুপ্ত হবার আগে অনেক-রকম ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়ে' তুলেছিল। সেইসব ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি বর্ত্তমানে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় মধ্যযুগে তাদের পৃথক অস্তিত্ব ছিল, হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাদের বিরোধ ছিল, এবং সেই বিরোধ মিটাবার জন্য ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের চেষ্টাও ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি শাখা ধর্ম্ম-ঠাকুরের বিষয় আলোচনা করব। নাথপন্থ ও সহজযান সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা কর্‌বার আশা রাখি।

ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলাদেশে আলোচনা করেন। তবে তিনি এ বিষয় আলোচনা কর্‌বার পরে শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজাবিধান ও অন্যান্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়েছে।* এইসব গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত ভাল করে' আলোচিত হয় নি। 'ধর্ম্ম-পূজা' বুদ্ধেরই পূজা। কেহ কেহ বলেন—এই ধর্ম্ম বৌদ্ধ-ত্রি-রত্নের দ্বিতীয়-রত্ন। কিন্তু সে ধর্ম্ম নারীমূর্ত্তিতে পরিকল্পিত। ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ উভয়ের চারি চারি হস্ত, কিন্তু

* সম্প্রতি শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন—Buddhism in Bengal, Dacca Review for October, 1921.

বুদ্ধের দুইখানি হস্তের অধিক কখনো দেখা যায় না। 'ধর্ম্ম' মহাযানে সর্ব্বদাই নারী-রূপে অঙ্কিত; তাঁহার দুইখানি হাত বুকের কাছে ধর্ম্মচক্র-মুদ্রা আকারে নিবদ্ধ। তৃতীয় হস্তে পদ্ম অথবা পুঁথি। চতুর্থ হস্তে মালা। * নেপালে ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহা নারী-মূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার Archæological Survey of Mayurbhanja গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

"In the fifth century of the Christian era, Dharma, one of the Buddhistic trinity, came to be represented in the form of a goddess. A female form of Dharma similar to the above, has been discovered near the Mahabodhi. Such forms are also found in all Buddhistic Chaityas in Nepal. An image of Dharma has also been found at Badasai (Mayurbhanj). The Buddhist Newars worship Dharma as a goddess, under the names of Adi Dharma, Prajnaparamita, Dharma Debi, Arya Tara and Gayeswari." (P. XCVI.)

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্ম্মের মূর্ত্তি ময়ূরভঞ্জের স্থানে স্থানে পাওয়া গেছে। সেই-সব মূর্ত্তি ও নেপালের চৈত্যগুলিতে উৎকীর্ণ ধর্ম্ম দেবী-মূর্ত্তিতেই পরিকল্পিত। বৌদ্ধ নেওয়ার জাতি ধর্ম্মকে দেবীরূপে, ও আদিধর্ম্ম প্রজ্ঞাপারমিতা ধর্ম্মদেবী আর্য্যতারা ও গয়েশ্বরী নামে পূজা করিয়া থাকে।

বাংলাদেশের ধর্ম্মঠাকুর এই ধর্ম্ম নন। তিনি কোথায়ও নারীরূপে পরিকল্পিত হন নি। তা ছাড়া তাঁর নাম 'ধর্ম্মরাজ'। বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ধর্ম্মরাজের পূজা বলেই লোকে জানে। এই ধর্ম্মরাজ হচ্ছেন স্বয়ং বুদ্ধ, কারণ বৌদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ লিখেছেন—"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধ ধর্ম্মরাজস্ তথাগতঃ"। এই ধর্ম্মরাজের পূজাই হচ্ছে শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। বুদ্ধের ধর্ম্ম বৌদ্ধদের নিকট কখনো 'বৌদ্ধধর্ম্ম' বলে' অভিহিত হতো না; তারা বল্‌তো সদ্ধর্ম্ম। পালি সাহিত্যে এই শব্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মকে বুঝানো হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তিব্বতীলামা তারানাথ বৌদ্ধধর্ম্মের যে ইতিহাস লিখেছিলেন তাতে তিনি বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধমতকে কেবলমাত্র 'ধর্ম্ম' নামে আখ্যাত করে' গেছেন। †

* Oldfield—Sketches of Nepal, Vol. II, p. 150.
† Journal A. S. B. 1891.

তিব্বতী ভাষায় 'ছো(স্)' বল্‌তে বৌদ্ধধর্ম্মই বেশী করে' বুঝায়। সুতরাং ধর্ম্ম বল্‌তে যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ বল্‌তে যে বুদ্ধদেব বুঝায় এ কথা আর বেশী করে' প্রমাণ করতে হবে না। আমরা ধর্ম্মসাহিত্য থেকে ধর্ম্মপূজকদের ধর্ম্মমত যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবো এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাদের মিল ও গরমিল দেখাবার ত্রুটি করবো না।

আমরা ধর্ম্মপূজকদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করবো।

শূন্যপুরাণ তার নাম সার্থক করে' প্রথমেই শূন্যতার যে বর্ণনা দিয়েছে তা এত সুন্দর যে তার খানিকটা নিয়ে উদ্ধৃত করে' দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল॥
দেবতা দেহারা ন ছিল পুজিবাক দেহ।
মহাসুন্ন মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥
বার বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীর্থ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী॥
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার॥
দস দিকপাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্ত নহি ছিল জমের তাড়ন॥
চারি বেদ নহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার॥
বৌধ জপ্ত নহি ছিল ন ছিল বিস্নুপাত।
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ॥
সন্ন্যত ভরমন পরভুর সুন্যে করি ভর।
কাহারে জম্মাব পরভু ভাবে মাআধর॥

শূন্যপুরাণ-কার পূর্বের কোনো সৃষ্টি স্বীকার করেন নি। প্রলয়ের কোনো কথা উপর্য্যুক্ত পংক্তিগুলির ভিতর থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ধর্ম্মপূজাবিধানে সৃষ্টি-লয়ের কথা পাই—

সব হল্য নাশ তেজ বায়ু আকাশ
হত হল্য রবি সসি।
গত দিবা রাতি হত হল্য খেতি
চতুর্দ্দশ ভুবন আদি॥ (পৃঃ ১৯৯)

মাণিক গাঙ্গুলী তাঁর 'ধর্ম্মমঙ্গলে' লিখেছেন :—

অতল বিতল সপ্ত রসাতল
সংনিধি সমুদ্র সাত।
অসুর কিন্নর আদি চরাচর
সকলি হইল পাত॥
সৃষ্টি করি লয় দেব দয়াময়
আপনি রহিল শূন্যে।
চিন্তামনি ভবে চিন্তিত বৈভবে
সৃষ্টি সৃজিবার জন্যে॥ (পৃঃ ৯)

শূন্যপুরাণ-কারের মতে 'পরভু', 'মাআধর', 'করতা' হচ্ছেন পরম দেবতা। প্রথমে প্রভু 'অনিল'দের সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি 'পুরুষ'রূপে নিজেকে সৃষ্টি করলেন। এই পুরুষের চক্ষু অবয়বাদি কিছু ছিল না—"রক্তবীজে জনম তার নহিক বাপ মাও।" এই মত হচ্ছে মাধ্যমিক দর্শনের মত—অনুপপাদক। নাগার্জ্জুনের এই মত যে কেবল তাঁর মাধ্যমিক বৃত্তির মধ্যে ছিল তা নয়, বেদান্ত পর্য্যন্ত সেই মত গ্রহণ করেছিলেন। পুসাঁ (La Vellie Poussin) লিখেছেন যে—

"The main idea that there is no birth, production, *juti*, *utpada*, that causation is impossible since the cause cannot be identical with, nor different from the effect, since neither being, nor non-being, nor being+non-being, can originate, is thoroughly madhyamika." (J. R. A. S, 1910 ; p. 136)

এই পুরুষের নাম নিরঞ্জন। নিরঞ্জন শব্দের অর্থ আমরা জানি নিরাকার, অঞ্জন-রহিত। পূর্ব্বের কায়াহীন চক্ষুহীন পুরুষের নাম যে নিরঞ্জন হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু লোকে তার একটা সহজ ব্যাখ্যা বার করেছিল। প্রভু জলে (নীরেতে) ছিলেন—"নীরেত নিরমল কায়া নাম নিরঞ্জন"—তাই তাঁর নাম নিরঞ্জন হয়েছে বলে, সাব্যস্ত হয়েছিল।* মাণিক গাঙ্গুলী কিন্তু এপ্রকার শব্দতত্ত্ব সৃষ্টি করেন নি; তিনি লিখেছেন—"নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরঞ্জন তুমি," ইত্যাদি (১২।১৮)।

যাই হোক, ধর্ম্ম নিরঞ্জন যোগে বস্‌লেন ও চৌদ্দযুগ ব্রহ্মজ্ঞানে কেটে গেল। তার পর হাই তুল্‌তে গিয়ে উলুক (প্যাঁচা) হঠাৎ বের হয়ে পড়্‌লো। এই উলুক-মুনি প্রভুকে চৌদ্দযুগ টেনে টেনে শেষকালে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লেন ও প্রভুকে কিছু খাদ্য দেবার জন্য বল্‌লেন। প্রভুর সম্বল ছিল মুখের নিষ্ঠীবন মাত্র; তাই দিয়ে উলুকের প্রাণ বাঁচালেন; নিষ্ঠীবনের দুই এক ফোঁটা উলুকের মুখের বাইরে পড়াতে সাগর সৃষ্টি হলো। সেই সাগর-জলে উভয়ে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন।

এই উলুক-সৃষ্টি ধর্ম্মসাহিত্যের একটা বিশেষত্ব। উলুক হিন্দুদের কাছে খুব ঘৃণ্য। বেদে বার চারেক উলুকের উল্লেখ পাই; মৃত্যুর সঙ্গে উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।* লৌকিক ধর্ম্মেও উলুকের স্থান নাই। এখন প্রশ্ন—ধর্ম্মসাহিত্যে ও ধর্ম্মপূজায় এই উলুক কোথা থেকে এল। আমার মনে হয়—মধ্যযুগে যখন হিন্দুধর্ম্ম ও পুরাণকথা লোকের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা অনেক ভাব গল্প প্রবাদ অজ্ঞভাবেই গ্রহণ করেছিল। লৌকিক ধর্ম্মে যমকে ধর্ম্মরাজ বলে—তা আমরা জানি; যমের সহিত উলুকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বোধ হয় যম ও ধর্ম্মরাজের অর্থ ও ভাবের গোলমালে—উলুক ধর্ম্ম-পূজকদের নিকট অত বড় আসন পেয়েছে। ধর্ম্মরাজ ও যমরাজের আসন-পরিচ্ছদাদির মধ্যেও গণ্ডগোল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

সাহিত্যপরিষৎ থেকে "ধর্ম্মপূজাবিধান" নামে যে গ্রন্থখানি ছাপা হয়েছে—তাতে দুই জায়গায় সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। শূন্যপুরাণের বিশদবর্ণনা ধর্ম্মপূজা-বিধানে পাওয়া যায় না। প্রভু শূন্যের মধ্যে জন্ম নিলেন; সেই শূন্যই অনিল। অনিল নিরঞ্জনকে বল্‌ছেন যে তিনিই পিতা, তিনিই মাতা—তিনিই আদিতে 'বিম্বুকে'র মধ্যে ছিলেন, ইত্যাদি। এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা

* এই রকম Sound Philology যে কেবল গ্রাম্য কবিরা কর্‌তেন তা নয়, বিষ্ণুপুরাণ-কার নারায়ণের অর্থ দিয়েছেন—
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ১. ৪. ৬।

* "A bird, either the owl or the pigeon (kapota), is said to be the messenger of *yama* apparently identified with death. In another place a demoness is compared with an owl. In the Sutras the owl is the messenger of Evil Spirits."—[Macdonell—Vedic Mythology.]

হিন্দুদের ব্রহ্মতত্ত্ব ভাল করে' পাই—"য়েক ব্রহ্ম দিতিয় নাহিক আর" (পৃঃ ২০০)।

শূন্যপুরাণের গল্পাংশ যতই উদ্ভট হোক, বেশ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। উলুক-মুনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লে প্রভু তার দেহ থেকে একটা পাখা ছিঁড়ে জলে ফেলে দিলেন এবং তখনি হংস সৃষ্টি হলো। সেই হংস বল্‌ছে যে তারও "নাহিক বাপ মাও"। যাই হোক, চৌদ্দ যুগ প্রভুকে বহন করে' হংসরাজ দেবতাকে ঠেলে ফেলে আকাশে উড়ে গেল। এখানেও লৌকিক বিশ্বাস ও শাস্ত্রের উল্টাটি ঠিক দেখা যাচ্ছে। হংস পবিত্র; পুরাণে হংসের স্থান খুব উচ্চ।* সেখানে সে বিষ্ণুকে অক্লান্ত-ভাবে বহন করেই ধন্য; কিন্তু এখানে হংস ঠাকুরকে ফেলে পালিয়ে গেল। ধর্ম্মপূজাবিধানের এক জায়গায় আছে "হংসরথে বিজয় ঠাকুর নিরঞ্জন" (পৃঃ ২১৬); তবে সেখানে নিরঞ্জন পরব্রহ্মের নামান্তর মাত্র। তা ছাড়া ধর্ম্মপূজাবিধানে যে হিন্দুপ্রভাব অনেক বেশী তা আমরা দেখ্‌তে পাব।

প্রভু হংসের পর কচ্ছপ সৃষ্টি কর্‌লেন; কিন্তু যে কচ্ছপ পৃথিবীর ভার সহ্য কর্‌ছেন—তিনিও চৌদ্দযুগ পরে চম্পট দিলেন। প্রভু খুবই মুস্কিলে পড়্‌লেন। তখন তিনি সোনার পৈতা ছিঁড়ে জলে দিলেন ফেলে, ভাব্‌লেন বাহনটি অন্যদের মত অকৃতজ্ঞ হবে না। কিন্তু পৈতা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল বাসুকি নাগ। বাসুকি তখনি প্রভুকেই খাবার জন্য তেড়ে ছুট্‌লো; ধর্ম্ম বেগতিক দেখে উলুকের পরামর্শে কানের কুণ্ডল খুলে ফেলে দিলেন। সেই কুণ্ডল জলে পড়েই ব্যাঙ্‌ হয়ে গেল—বাসুকি সেই ব্যাঙ্‌ খেতে মন দিলেন। ধর্ম্মপূজাবিধানে আছে যে ধর্ম্মের পৈতা হচ্ছে হাজার-মাথা অষ্টনাগ। এটা পৌরাণিক অনন্ত নাগের বর্ণনার সঙ্গে মেলে। কিন্তু কোথায়ও ত দেখা যায় না যে বাসুকি প্রভুকে খেতে ছুটেছে! সুতরাং এই আখ্যায়িকাটাও লৌকিক বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাচ্ছে।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য কর্‌বার আছে। হিন্দুদের ঘৃণ্য মৃত্যুর দূত উলুক হচ্ছেন মুনি, ধর্ম্মের নিত্যসহচর। ধর্ম্মের সঙ্গে উলুকের যোগের কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা কর্‌বো। হংস, কূর্ম্ম, বাসুকি সকলেই বেশ শান্ত কৃতজ্ঞ বলেই শাস্ত্রে উক্ত; কিন্তু ধর্ম্মসাহিত্যে তাদের যে রূপ দেখা গেল সেটা আদৌ আদর্শস্থানীয় নয়। এই-সবের মানে কি তা স্পষ্ট করে' বলা বড় কঠিন; হিন্দুদের যেটা পূজ্য তাকেই ছোট করা ও যেটা অপূজ্য সেটাকে বড় করাই যদি এর ভিতরকার কথা হয়, তবে এ কয়টি প্রাণীই বেছে নেওয়ার মানে কি?

এখন আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের অন্যান্য কোটায় প্রবেশ করি। ধর্ম্মপূজকদের মতে পৃথিবী ধর্ম্মের গায়ের ময়লা; তিনি বাসুকির মাথায় সেই ময়লা চাপিয়ে দেন বলেই পৃথিবীর অপর নাম বসুমতী। মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীতেও আমরা যে সৃষ্টিতত্ত্ব পাই সেটি ধর্ম্মপূজকদের বিশ্বাসের অনুরূপ। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় আলোচনা করেছেন। মাণিক দত্তের মতে ধর্ম্ম পাতালে যান মাটি আন্‌বার জন্য। সেখান থেকে শূন্যমূর্ত্তিতে তিনি উপরে উঠে আসেন। মাণিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের লেখক হলেও তাঁর বই আরম্ভ হয়েছে ধর্ম্মকে নিয়ে, আর তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে শূন্যপুরাণ বা আর কোনো ধর্ম্মপূজার বইএর প্রভাবে লিখিত হয়েছিল। শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে আদ্যাশক্তি ধর্ম্মের ঘর্ম্ম থেকে সৃষ্টি হন। এই আদ্যাশক্তি গৌরী বলেও উক্ত হয়েছেন (পৃ ১৫২)। এই দেবী ধর্ম্মের কন্যার ন্যায়; এঁর গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব জন্মগ্রহণ করেন। ঘনরাম লিখেছেন "পরম ব্রহ্ম বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি" "প্রকৃতি হইতে জন্মে ত্রিগুণ আধান" "বিধি বিষ্ণু মহাদেব জন্মিল মহান্‌।" শূন্যপুরাণ ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীর মধ্যে একটা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা দেখা যায়। তিনি অকস্মাৎ সৃষ্টিকার্য্য সুরু করিয়েছেন। শূন্যপুরাণ, ঘনরাম, ধর্ম্মপূজা-বিধান, মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর বর্ণনার মধ্যে একটা পারম্পর্য্য আছে। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলী উলুক ও সাগর সৃষ্টি করে' লিখ্‌ছেন—

"শক্তি সনে তথি　　　একে স্থিতি গতি,
তিন মূর্ত্তি সেই কালে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব　　　এই তিন দেব
ইহার উপমা কিবা।

* Hopkins—Epic Mythology, p 19.

শক্তি হল্যা তিন ইথে নাহি ভিন
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা ॥"

মাণিক গাঙ্গুলী বোধ হয় কতকগুলি ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ত্যাগ করেছিলেন। পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রভাব ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের মধ্যে যতটা দেখা যায়, প্রাচীনতর গ্রন্থে ততটা পাওয়া যায় না। শূন্যপুরাণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের স্থান যে খুব উচ্চে নয় তা আমরা দেখেছি ; তাঁদের জন্ম হলো আদ্যার কাম থেকে। তাঁরা সব ধর্ম্মের নির্দেশ-মত যে যার কাজ ভাগ করে' নেন। ধর্ম্ম চারি জনের উপর সৃষ্টি পরিচালনের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মাণিক গাঙ্গুলীও তাই করেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেবতার একটি করে' শক্তি জুটিয়েছেন, যেমন ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, শিবানী।

তার পর দেখা যায় যে ব্রহ্মাদি তিনজন দেবতা ধর্ম্মের ধ্যানে বসেছেন এবং ধর্ম্ম তাঁদের পরীক্ষা কর্‌বার জন্য বের হয়েছেন। মাণিক এখানে দেবতাদের জবানী ধর্ম্মের যে স্তব জুড়েছেন সেটা একেবারে পৌরাণিক ছাঁদে গড়া। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টি-অধ্যায়টা পড়্‌তে পড়্‌তে বেশ দেখা যায় যে তিনি ধর্ম্ম দেবতার সম্মান ও ব্রহ্মাদির সম্মান দুই রাখ্‌বার জন্য ব্যস্ত। তাই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি যে বৌদ্ধ-সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্মত এটা জানাতে তিনি কুণ্ঠিত বলেই উলুক সৃষ্টির পরেই প্রকৃতি হতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি দেখালেন। পুরাণো মত থেকে ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এতক্ষণ আমরা শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্গলগুলির সৃষ্টি-তত্ত্বের কথাই বল্লাম। এখন বৌদ্ধসৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে এর মিল-অমিলগুলি দেখানো যাক্।

বুদ্ধদেব যদিও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে নিষেধ করেছিলেন, তথাচ লোকে তাঁর নিষেধ বেশীদিন মানেনি। ব্রাহ্মণ্য সৃষ্টিতত্ত্বের উপর তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব গড়ে' তুল্‌লেন। নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বেশ একটা ছবি আমরা পাই। তাঁদের মতে আদিবুদ্ধ হচ্ছেন পরমদেবতা। ওল্‌ড্‌ফিল্‌ড্‌ (Oldfield) লিখেছেন—

"The system of theology taught in the Buddhist scriptures in Nepal is based upon a belief in the divine supremacy of Adi-Buddha as sole and self-existent spirit pervading the universe."—Sketches of Nepal, Vol. II, p. 111.

হজ্‌সন (Hodgson) নেপালের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ খেটেছিলেন, এ পর্য্যন্ত অত পরিশ্রম আর কেউ করেছেন কি না সন্দেহ। তাঁর মতটা নিয়ে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি। স্বয়ম্ভূ-পুরাণ-মতে আদিতে শূন্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; গুণকুরণ্ডব্যূহে লেখা আছে যে যখন কিছুই ছিল না—তখন স্বয়ম্ভূ ছিলেন একা ; কেবল তিনিই আদিতে ছিলেন বলে' তাঁকে বল্‌তো আদিবুদ্ধ। তাঁর বহু হবার কামনা হলো—সেই কামনা হচ্ছেন প্রজ্ঞা। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার যোগে প্রজ্ঞা-উপায় বা শিব-শক্তি বা ব্রহ্মা-মায়ার সৃষ্টি। এই কামনার উদ্রেকের সঙ্গে পঞ্চদেব বা পঞ্চবুদ্ধের জন্ম হলো। সেই পঞ্চ বুদ্ধ হচ্ছেন বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ বা পদ্মপাণি, অমোঘসিদ্ধি। প্রত্যেক বুদ্ধের উপর এক এক বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি কর্‌বার আদেশ হলো আদিবুদ্ধের। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধ পিতাপুত্রের ন্যায়। চার বুদ্ধ ও বুদ্ধকল্প গত হয়েছে। বর্ত্তমান কল্প হচ্ছে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির রাজত্ব। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে সৃষ্টি কর্‌লেন—এবং জগতের সৃজন পালন ও সংহারের কাজে জুড়ে দিলেন। বৌদ্ধসৃষ্টিতত্ত্ব পড়্‌লে বেশ দেখা যায় যে হিন্দুদের প্রধান দেবতাদের স্থান আদিবুদ্ধ, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বেরও নীচে। শূন্যপুরাণ ও মঙ্গল-সাহিত্যে আমরা দেখ্‌তে পেয়েছি যে ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতার উৎপত্তি মোটেই হিন্দুশাস্ত্র-সঙ্গত নয়। এঁরা সকলে ধর্ম্মের কন্যা আদ্যার পুত্র-স্থানীয়। এখানে আমরা যেমন দেখ্‌লাম ব্রহ্মাদির অবস্থা, পরে প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু অন্যান্য দেবদেবীর স্থান ও মানের কথা আস্‌বে। সেখানে দেখা যাবে যে ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্ম্মের দেহারায় উপস্থিত হচ্ছেন! শুধু তাই নয়, তাঁরা ধর্ম্মের জন্য রীতিমত তপস্যা কর্‌ছেন। বৌদ্ধ (মহাযান্) মতানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে শূন্যপুরাণোক্ত সৃষ্টিরহস্যের খানিকটা মিল আছে। মূলতত্ত্বটা বৌদ্ধমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই দেখা যাচ্ছে। আগামীবারে আমরা পণ্ডিতদের বিষয় ব্যাখ্যা কর্‌তে গিয়ে দেখাবো যে শূন্যপুরাণের সহিত নেপালী বৌদ্ধধর্ম্মের যোগ আরও কত ঘনিষ্ঠ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অব্যক্ত ও ব্যক্ত

চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া যে মৌন জীবন প্রসারিত, তাহার অব্যক্ত ক্রন্দন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জগৎ-সম্মুখে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন [অব্যক্ত—আচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু, এফ-আর-এস প্রণীত—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত—মূল্য ২৷৷০]।

বিজ্ঞান তো সার্ব্বভৌমিক। তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধকের সাধনা ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে ? পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে পূরা হইতেছে, বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর তোলা হইতেছে। দৃশ্য জগৎ বিচিত্র এবং বহুরূপী। এই সতত-চঞ্চল প্রাণী আর এই চির-মৌনী অবিচলিত উদ্ভিদ্, ইহাদের মধ্যে তো কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ভারতবর্ষে উঠিলেন এক সাধক, যিনি তাঁহার চিন্তাকে কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়া আবার পর মুহূর্ত্তে তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়া প্রকৃতির এই বৈষম্যের মধ্যে একতার সন্ধানে ছুটিলেন, এবং জড়, উদ্ভিদ্ ও জীবের মধ্যে এক সেতু বাঁধিয়া দিলেন। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বে যে মহান্ সুমধুর ছন্দের সন্ধান আছে, ভারতের কবি জগদীশচন্দ্র সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; তবে কবি হইয়াও তিনি বৈজ্ঞানিক। তাই কবি যেখানে শুধু 'যেন' বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, সেখানে কবি ও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'এস, দেখ, এই সেই'। ভারতীয় সাধক নানা পথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণী-বিদ্যা ও মনস্তত্ত্ব-বিদ্যাকে এক কেন্দ্রে মিলিত করিয়া বিজ্ঞানের এই চতুর্বেণীসঙ্গমরূপ মহাতীর্থ স্থাপিত করিলেন।

জার্ম্মান অধ্যাপক হার্টস্ সর্ব্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে ঢেউ উৎপাদন করেন। আকাশের স্পন্দনেই যখন আলোর উৎপত্তি, তখন হার্টস্-উৎপাদিত এই অদৃশ্য আলোক ও দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একই হওয়া উচিত। কিন্তু হার্টসের ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সেই ঢেউ ও দৃশ্য আলোকের প্রকৃতির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এক কল নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা হইতে অদৃশ্য আকাশোর্ম্মির দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোকের দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি গিয়া পৌছিল। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তাড়িতোর্ম্মি উৎপন্ন হয় ; একদিকে একটি খোলা নল ; তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলোক বাহির হয় এবং অপর দিকে সেই অদৃশ্য আলোক দেখিবার জন্য একটি কৃত্রিম চক্ষু। এই যন্ত্র দ্বারা তিনি বিশদ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একই, যদিও আমাদের দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা হেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করি। অদৃশ্য আলোক ইটপাট্‌কেল ঘরবাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়, সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৪ সালের শেষভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজে এইরূপে বিনা তারে সংবাদ প্রেরিত হইল। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউনহলে এ সম্বন্ধে তিনি বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিলেন। বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার উইলিয়াম মেকেঞ্জি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-উর্ম্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে মার্কনী তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেণ্ট্ গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে দূরদেশে কেবল টেলিগ্রাফের তার দিয়া সংবাদ প্রেরিত হইত, আজ মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনাতারে আকাশতরঙ্গের সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে।

"দৃশ্যের পরিমাণ কতই ক্ষুদ্র, কিন্তু অদৃশ্য যে সীমাহীন। তবে ত আমরা সেই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই ? একান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্‌শলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্তপথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার ? সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস, যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্য এরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ,

আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই-একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়-বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং বিশ্বজগৎ একদিন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে।"

তারহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য্য দেখিলেন, যে, কলের সাড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হয় কিন্তু উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যায়। দেখিলেন, দিবা-রন্তেই পরীক্ষণ শ্রেয়—কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়া যায়। তখন এ প্রশ্ন তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না, যে, কলের এ ক্লান্তি কেন হয়। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল; সে-সব ছাড়িয়া দিয়া ঐ নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দেখিতে পাইলেন, জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য, জড়েও তাহার ক্রিয়া পরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন।

জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের হস্তে এই-সব নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া আসিবেন মনে করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সর্ব্বপ্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ বার্ডন সেণ্ডারসন বলিলেন, জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্ব্বে নিষ্ফল হইয়াছে, সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য; এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার-চর্চ্চা হইয়াছে; আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন; আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন। আচার্য্য উত্তর করিলেন, "নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার; আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম; আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল, তাহাই সত্য; ইচ্ছাতেই হউক্ অনিচ্ছাতেই হউক, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।" তৎপরে বহুবৎসরব্যাপী সাধনা দ্বারা নব নব উদ্ভাবিত যন্ত্রে বহুবিধ পরীক্ষায় বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্ব্বাক্ জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিলেন। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিলেন, এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধির মাত্রার মুহূর্ত্তেক পরিবর্ত্তন নিরূপণ করিলেন। মনুষ্যস্পর্শেও বৃক্ষ যে সঙ্কুচিত হয়, তাহা দেখাইলেন। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও সেই-সমুদয়ের একই-বিধ ক্রিয়া প্রমাণ করিলেন। উদ্ভিদ্-পেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে মানবহৃদয়ের স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইলেন। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিলেন। প্রমাণ করিলেন, যে, যে-সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদ্‌স্নায়ুর আবেগ, উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। বৃক্ষের স্বহস্তে লিখিত এই-সকল সাক্ষ্যে বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, আজ তাহা সর্ব্বত্র আদরে গৃহীত হইয়াছে; বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, এখন তাঁহারাই পরম মিত্র হইয়া দাঁড়াইলেন; এবং বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধক পৃথিবীর নিকট হইতে জয়মাল্য আহরণ করিলেন।

আমরা অনেকেই কেবল মাত্র পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব ঘোষণা করিয়া সন্তুষ্ট থাকি;

"সত্য বটে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অমর তত্ত্বসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন এবং দুই-চারিজন বিদেশীও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হে বেদ-উপনিষদ-রচয়িতার বংশধর, আজ তোমার স্থান কোথায়? হায় আলনস্কর! তোমার দিবাস্বপ্ন কি কোনও দিন ভাঙ্গিবে না? তোমার পণ্যদ্রব্য শুধু পিপিট ও কাচ। স্বর্ণ ও হীরক বলিয়া তাহা বিক্রয় করিবে মনে করিয়াছিলে এবং অলীক ধনে আপনাকে ধনী মনে করিয়া ভাগ্য-লক্ষ্মীকে পদাঘাত করিলে! দর্শকগণের উপহাস এত অল্পদিনেই ভুলিয়াছ? কি বলিতেছ? তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ ধনী ছিলেন, তাঁহারা পুষ্পকরথে বিমানে বিহার করিতেন! মূঢ়! তবে কি করিয়া সেই সম্পদ্ হারাইলে? চাহিয়া দেখ! দূরে যে ধবল পর্ব্বত দেখিতেছ, তাহা নর-কঙ্কালে নির্ম্মিত। তুমি যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে কর, উহা তাহাদেরই অস্থিস্তূপ। দেখ, কাহারা সেই অস্থিনির্ম্মিত সোপান বাহিয়া গিরিশৃঙ্গে উঠিয়াছে এবং শৃঙ্গে ঝাঁপ দিয়া নীলাকাশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উড্ডীয়মান শ্যেন-পক্ষী-শ্রেণী বলিয়া যাহা মনে করিয়াছ, দেখিতে দেখিতে সেগুলি মেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। অবাক্ হইয়া তুমি ঊর্দ্ধে চাহিয়া আছ। অকস্মাৎ মেঘরাজ্য হইতে নিক্ষিপ্ত বহ্নিশেল তোমার চতুর্দ্দিকে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। কোথায় তুমি পলায়ন করিবে? গহ্বরে প্রবেশ করিয়াও নিস্তার নাই। বিষবাহক বাষ্পে তোমাকে সে স্থান হইতেও বাহির হইতে হইবে।"

আজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষ নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছে, বহুবৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য তাঁহার পরীক্ষাগার হইতে সেই সত্যের ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষায় দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, যে, ছিন্ন-শাখ বৃক্ষ

আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কয়েক দিন পরে বাঁচিয়া ওঠে, আর বিচ্যুত পত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেন তবে এই বিভিন্নতা ?

"ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

"বৃক্ষের ভিতরেও আর-একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্ত্তনের সহিত যুঝিয়াছে।

"আরও একটি শক্তি তাহার চিরসম্বল রহিয়াছে। সে যে বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে। এইজন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির উর্দ্ধে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা ছায়া-দানে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তি-বলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে ? যে ধৈর্য্য, যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, যে স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে প্রতিপালিত হয়, সে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে ? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

স্নায়ুমূলে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিতে করিতে আচার্য্য দেখিলেন, যে, বাহিরের নির্দ্দিষ্ট শক্তির প্রয়োগে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়।

"কিন্তু বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে, ভিতরের শক্তি দ্বারাও তাহা সংঘটিত হয়। তবে মানুষ ত কেবল অদৃষ্টের দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে, যাহার দ্বারা সে বহির্জ্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশ-দ্বার কখনও উদ্ঘাটিত কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এই রূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার উপর সে জয়ী হইবে।

ভিতরের শক্তি ত স্বেচ্ছা! তবে জীবনের কোন্ স্তরে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে ? জন্মিবার সময় ক্ষুদ্র ও অসহায় হইয়া এই শক্তিসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর লালিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছে। মাতৃস্তন্যের সহিত স্নেহ, মায়া, মমতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং বন্ধুজনের প্রেম দ্বারা জীবন উৎফুল্ল হইয়াছে। দুর্দ্দিনেও বাহিরের আঘাত-ফলে ভিতরের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায় ? এইসবের মূলে আমি না তুমি ?

একের জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি অন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছ। অনেকে তোমার নির্দেশে জ্ঞানসন্ধানার্থ জীবন পাত করিয়াছে। মানবের কল্যাণহেতু রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়া দুঃখদারিদ্র্য বরণ করিয়াছে এবং দেশ-সেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। সেইসব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্ম্মে, শৌর্য্য ও বীর্য্যে পরিপূরিত করিয়াছে।"

বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশে বঙ্গভাষা কতই না দীন। কিন্তু মনীষীর কাছে ভাষার এ দৈন্য কোনরূপ অন্তরায় হইল না, এবং 'অব্যক্তে' যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক মহান্ মিলন সঙ্ঘটিত হইল।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [এম-এ]

ভাঙা বেহালা

তার তা'র ছিঁড়ে গেছে, কোণে আছে টাঙানো;
থাক্ থাক্ ভাল নয় তার ঘুম ভাঙানো।
নাই সুর সুমধুর, মীড় তার খেলে না,
আড়ানার সাড়া নাই মেলে না ক তেলেনা।

উঠে না'ক ঝঙ্কার বাঁরোয়া কি ইমনে,
চুপ করে' ঝিমাইছে, ভাবিতেছে কি মনে ?
মনে বুঝি পড়ে তার অতীতের গরিমা,
জাগিতে যে পারে না ক—কি নিবিড় জড়িমা।

প্রাণ তার ভরপুর সাহানার সোহাগে,
ভোগবতী টেনে আনে সুরশরে বেহাগে,
মল্লার আনে তার পথহারা পুলকে,
অলকার সন্দেশ এ নীরস ভূলোকে।

সুরনদী সত্য কি সিকতায় হারালো ?
দেবতা কি দারুময়ী ছবি হয়ে দাঁড়ালো ?
না গো না না—গুমরিয়া যে ভ্রমর কেঁদেছে,
মধুভরা মধুচাকে আজি বাসা বেঁধেছে।

সমরের শেষ তার আজ তার ছুটি রে,
স্মরে জয়-গৌরব বসি' একা কুটীরে।
আজ রথ থামাইয়া ঢুলিতেছে সারথি,
পূজা শেষ—করে সাধু মনে মনে আরতি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক [বি-এ]

ক্ষু দ্রে র খেলা

আমাদের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ক্ষ এই সংযুক্তাক্ষরের যে-সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে[১], তাহাদিগকে প্রধানত তিন ভাগ করা যাইতে পারে। এই এক-একটি ভাগকে আমরা বর্গ নামে উল্লেখ করিব। (১) প্রথম, খ বর্গ; (২) দ্বিতীয়, ছ বর্গ; এবং (৩) তৃতীয়, উষ্ম বর্গ। (১) খ-বর্গের মধ্যে খ ও ক; (২) ছ-বর্গের মধ্যে ছ ও চ; এবং (৩) উষ্ম-বর্গের মধ্যে শ ও স। দ্রষ্টব্য—
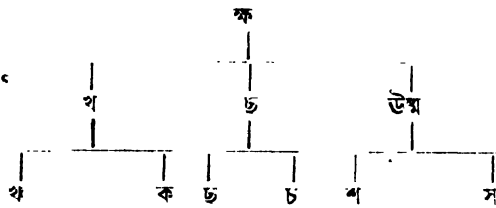
২। ক্ষুদ্র শব্দের উষ্ম-বর্গের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা আমি শূ দ্র নামে একটি পৃথক প্রবন্ধে (প্রবাসী, পৌষ, ১৩২৮) সবিশেষ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তাহার সার কথাটা এই যে, আবৈদিক কাল হইতে প্রচলিত শূ দ্র শব্দটি মূল ক্ষু দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু শূদ্রেরা সেই প্রাচীন কালে অপর তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য অপেক্ষা গুণে ও কর্ম্মে নিকৃষ্ট বা ছোট ছিলেন, সেই-জন্য তাঁহাদিগকে ক্ষু দ্র বলা হইত, এবং এই ক্ষু দ্র শব্দই নিজের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে ক্রমে-ক্রমে শূ দ্র আকারে পরিণত হইয়াছে।

৩। খ-বর্গের মধ্যে প্রথমে খ-কে গ্রহণ করা যাউক। ক্ষু দ্র প্রাকৃতে খু দ্দ, তাহা হইতে ক্রমশ আমাদের খু দ। যদিও উহা মূলত বিশেষণ ছিল, তথাপি আমাদের নিকট বিশেষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বলি 'চাউলের খু দ' অর্থাৎ 'কণা'। ওড়িয়া ও অসমীয়াতেও এই। বলা বাহুল্য খুব ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহার নাম খু দ হইয়াছে। তুলঃ—সিংহলী কু ডু 'ছোট', 'ক্ষুদ্র'। খুদ যখন বিশেষ্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন একটা বিশেষণের অভাব বোধ হইল, তাই আমরা বিশেষণ পাইলাম খু দি, খু দে (< খু দি য়া, ও খু দ্রি য়া—যোগেশ বাবু, অস° খু দী য়া)। এই খু দ শব্দটা যে কত প্রাচীন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক করিয়া বলিতে না পারিলেও মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ইহা অশোকের সময়ে ছিল। তাঁহার শিলালিপিতে আমরা 'ক্ষুদ্র' অর্থে খু দ ক শব্দের দেখা পাই (Rock Edict X., Kalasi)।

৪। ক্ষু দ্র ক হইতে স্পষ্টত প্রাকৃত-প্রভাবে উৎপন্ন ক্ষু ল্ল ক শব্দ অথর্ব্ববেদ (দুইবার) তৈত্তিরিয় সংহিতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বহু বৈদিক গ্রন্থে আছে। পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৬.২. ৩৯)। কিন্তু কাশিকাকার ইহার ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন চমৎকার! তিনি বলেন ইহা হইয়াছে ক্ষুধ্ + ল (লা ধাতু) হইতে, অর্থাৎ যে ক্ষুধাকে ছেদন করে! যাহাই হউক, এই ক্ষু ল্ল কে র ককার-হীন অংশ ক্ষু ল্ল হইতে পূরাদস্তুর-মত প্রাকৃত শব্দ হইল খু ল্ল। পূর্ব্বে ক্ষু দ্রে র শেষ দ্র অংশটাই প্রাকৃত ভাবে ল্ল হইয়াছিল, ক্ষু অবিকৃত ছিল, এখন তাহাও খাঁটি প্রাকৃত হইয়া খু হইল, সম্পূর্ণ শব্দটি হইল খু ল্ল। ইহার সহিত তা ত শব্দ লাগাইয়া আমরা 'কাকা'-কে বলিতে লাগিলাম খু ল্ল তা ত। ছ বর্গের একটি শব্দের সহিত এখানে আমরা তুলনা করিতে পারি। পরে আমরা দেখিতে পাইব ক্ষ স্থানে চ হয়, এই নিয়মে ক্ষু দ্র হইতে চু ল্ল হয়। এই চু ল্লে র পর তা ত শব্দ যোগ করিয়া চু ল্ল তা ত হয়। ইহা হইতে প্রাকৃতেরই নিয়মে ক্রমশ মারাঠীতে দেখা গেল চু ল· তা[১]। মারাঠীরা কাকাকে বলে চু ল· তা, আর কাকীকে বলে চু ল· তী। আমাদের খু ল্ল তা ত গুরু-গম্ভীর আকারে স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, উচ্চ ভাষা ভিন্ন ইঁহাকে দেখা যায় নাই, তাই আমরা ইঁহার সাহায্যে আমাদের কাকীমাকে ডাকিতে পারি নাই; খু ল্ল তা ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাই। তাই বলিতে হয় এ ক্ষেত্রে মারাঠীরা জিতিয়াছেন, তাঁহারা একটা বেশী শব্দ পাইয়াছেন।

১। কিরূপে এই-সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে, এবং বলিতে গেলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠার সম্ভাবনা, তাই এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না।

১। চু ল তা শব্দের অন্তর্গত লকার-স্থিত অকারটা প্রস্তু অর্থাৎ উচ্চারিত হয় না। ইহাই সূচনা করিবার জন্য ল-কারের পর একটু ফুটকি (ল·) দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৫। সংস্কৃত ক্ষু দ্র ক হইতে প্রাকৃত-প্রভাবে গাথা বা বৌদ্ধ-সংস্কৃতে খু ড্ড ক (সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ৪৬০ পৃঃ দুইবার)। ইহা হইতে ক্রমশ খু ড় অ হইয়া আমাদের নিকট খু ড়া ও খু ড়ো (স্ত্রীলিঙ্গে খু ড়ী)। যদিও ইহা মূলত বিশেষণ, তথাপি আমরা ইহাকে বিশেষ্য করিয়া লইলাম। কাকাকে বুঝাইতে পারে এরূপ কিছু ইহাতে না থাকিলেও (অর্থাৎ খু ল্ল তা ত শব্দে যেমন তা ত জুড়িয়া দেওয়া ছিল সেরূপ কিছু না থাকিলেও) আমরা ইহাকে 'কাকা' অর্থে চালাইয়া লইলাম। কিন্তু যদিও আমরা কাকাকে খুল্লতাত শব্দের মত খু ড় তা ত শব্দে ডাকি না, তথাপি একদিন যে এই শব্দটি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাই শেষে একটা অ (< ক) জুড়িয়া দিয়া তাহা হইতে (অর্থাৎ খু ড় তা ত অ হইতে) বিশেষণ করিয়া লইলাম খু ড়্ তা তঁ[৩]। খুড়-তাঁত ভাইবোন' আমরা সাধারণতই বলিয়া থাকি। কোনো কোনো অঞ্চলে কোমলভাবে উচ্চারিত হইয়া ইহাই হয় খু ড় তু তঁ। এইরূপ জে ঠ্ তা ত, জে ঠ্ তু তঁ ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে খু ল্ল তা তের ন্যায় খু ড়্ তা তঁ প্রভৃতিরও স্ত্রীলিঙ্গ নাই, এবং ছিলও না। আমাদের খু ড়্ শা শ, বা খু ড়্ শু শ্‌ 'খুড়ী শাশুড়ী', ও খু ড়্ শ শু র 'খু ড়া শ্ব শু র' শব্দেও এই ক্ষুদ্রের খেলা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে খু ড়া বা খু ড় বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে।

৬। ড আবার ট হওয়ায় (§৭) এই খু ড় শব্দই[৪] খু ট আকার ধারণ করিয়া হিন্দীতে দেখা দিয়াছে,—সেখানে ইহা 'ক্ষুদ্র' বা 'নিকৃষ্ট' অর্থেই প্রযুক্ত হয়। যেমন, খু ট্ চাল্, 'খারাপ ব্যবহার', খু ট্ চালী 'দুষ্ট', 'দুর্বৃত্ত'।

৭। ভাষাসমূহে এইরূপ একটা নিয়ম দেখা যায় যে, মূলত যাহা কোমল (ঘোষ), তাহা কঠোর (অঘোষ) হয়; এবং যাহা কঠোর তাহাও কোমল হইয়া যায়। যেমন সংস্কৃতের ব ক বাঙ্লায় ব গ; এইরূপ কা ক, কা গ; 'কা গা ব গা' প্রসিদ্ধ। আবার ধো বা হইতে ধো পা, বী জ হইতে বি চি। এই নিয়মানুসারে খু ড় অ শব্দের ড-কারটা ট-কার হইয়া গেল। তারপর পূর্ববর্ত্তী উকারটা ওকার আর শেষের অকার দুইটা মিলিয়া আ হওয়ায় হইল খো টা। ইহা হিন্দীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অর্থ 'নিকৃষ্ট' 'খারাপ'। যেমন, খো টা সোনা, 'খারাপ সোনা'; খো টা আদমী 'খারাপ মানুষ'। গর্ব্বিত বাঙালী হিন্দীকে খো টা 'খারাপ' ভাবিয়াছে। তাই এই খো টা-ভাষীদিগকে (অর্থাৎ হিন্দীভাষীদিগকে) তাহারা অবজ্ঞার সহিত বলিয়া আসিয়াছে (যদিও কোনরূপে বলা উচিত ছিল না) খো ট্টা। যেমন জোর দিতে গিয়া আমাদের নিকট স ক ল হয় স ক্ক ল, ক খ ন হয় ক ক্‌খ ন, সেইরূপ জোর দেওয়াতেই হিন্দী খো টা বাঙ্লায় হইয়াছে খো ট্টা[৫]।

৮। মনে হইতেছে আমাদের 'ছোট' অর্থে খা ট' শব্দকেও এইখানে গাঁথিয়া দিতে পারা যায় কি? খু ড় অ > খু ট অ > খা ট অ > খা ট। কিন্তু উকার স্থানে অকার হওয়ার উদাহরণ যদিও পাওয়া যায় (যেমন সং পু ন র্ পালি-প্রাকৃত প ন; সং স্ফু র তি, পালি ফ র তি; সং মু কু ট, প্রা ম উ ড়; সং মু কু র, প্রা ম উ র), তথাপি উকার স্থানে আকার হওয়ার উদাহরণ নিতান্ত অল্প, কচিৎ পাওয়া যায় (যেমন সং ভা নু ম তী 'ইন্দ্রজাল', মারাঠী ভা না ম তী)। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা যদি মনে করি যে, অকারটাই পরে আকার হইয়া পড়িয়াছে তবে তাহাতে দোষ হইতে পারে না। তাই খু ট অ

৩। তা ল প্রভৃতি শব্দের লকারস্থ স্বর বস্তুত হ্রস্বতর ওকার। ইহা সূচনা করিবার জন্য অকারের উপর একটু দাঁড়ি দেওয়া হইয়াছে (অ̍)। সর্ব্বত্র এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৪। অথবা পূর্ব্বোক্ত খু ড্ড > খু ট্ট > খু ট এইরূপও হইতে পারে। খু ট্ট শব্দ যে, বস্তুত প্রয়োগে ছিল তাহা যশোর অঞ্চলে 'ছোট্ট' তেলের ভাঁড় বুঝাইতে প্রস্তুত খুঁ টি শব্দ হইতেই ধরা যায়। পরবর্ত্তী ৫ম টীকা দ্রষ্টব্য। তুলনীয় ছুট, (১২)।

৫। তুলনীয়—বাঙ্লার খুঁ ত 'দোষ' 'ত্রুটি', খোঁ টা বা খো টা ও হিন্দী প্রভৃতির খো ট 'দোষ' 'গঞ্জনা'। মনে হয়, এ শব্দগুলিরও ক্ষু দ্র শব্দের সহিত যোগ রহিয়াছে। খুঁ ত ও খোঁ টা য় অনুনাসিক স্বর থাকায় তাহা সূচনা করিতেছে যে, তাহার পরে যথাক্রমে ত ও ট বর্গের কোনো সংযুক্ত বর্ণের প্রথম অংশটি লোপ হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে ঐ অনুনাসিক স্বরটি হইয়াছে। যেমন ক ক্ষ > ক ক্ খ > কাঁ খ; মা র্জ্জ ন > ম জ্জ ন > ম ঞ্জ ন, মা জ ন (কবিরাজ মহাশয়দের দ ন্ত ম ঞ্জ নে র শেষ শব্দ ম ঞ্জ ন মোটেই সংস্কৃত নহে, ইহাতে সংস্কৃতের আ কা র মা ত্র রহিয়াছে); এইরূপ মু দ্‌গ > মু গ্ গ > মুঁ গ (মুঙ্গ); ক র্ক র > ক ক্ ক র > কাঁ ক র; ইত্যাদি অনেক।

> * খ ট্ অ > * খা ট অ > খা ট বলা যাইতে পারে। ·

কোনো কোনো সংস্কৃত কোশে 'খর্ব'-অর্থে খ ট্ট ন শব্দ ধরা হইয়াছে (Apte, Monier Williams)। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, এই খ ট্ট ন হইতেই খা ট হইয়াছে। খ ট্ট ন শব্দ যে মূলত সংস্কৃত তাহার প্রমাণ নাই, আর তাহা হইতে খা ট হইতেও পারে না। শেষের ন-কারের স্থানে একটা অ (<ক) থাকিলে অবশ্য হইতে পারিত।

৯। হিন্দীতে এবং কোনো কোনো প্রাদেশিক বাঙ্‌লায় 'ক্ষুদ্র' অর্থে খু দ্‌ রা শব্দ প্রচলিত আছে। ইহা স্পষ্টতই সংস্কৃত ক্ষুদ্রক শব্দ হইতে (> খু দ র অ > খুদরা) আবার ঠিক ঐ অর্থেই খু চ্‌ রা শব্দ প্রচলিত আছে। ইহা খু দ্‌ রা শব্দেরই অপর রূপ। দ-টা কিরূপে চ হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে দুইটি ইরানীয় শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সং· ক্ষু দ্র হইতে পহ্লবীতে (ক-যোগে) খু র্ দ ক্, ফারসীতে খু র্ দ্। কেহ বলিতে পারেন, ইহা হইতেই বর্ণ বিপর্যয়ে হয় তো আলোচ্য ঐ দুই শব্দ হইয়া থাকিবে।

১০। এইরূপে খ বর্গের খ-য়ের৬ পালা শেষ করিয়া এইবার আমরা ক-য়ের পালা আরম্ভ করিব। ক ও খ এই উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ যে, ক অল্পপ্রাণ, আর খ মহাপ্রাণ; ক-য়ে শ্বাস দিলে তাহাই খ হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাই খ-য়ের শ্বাস না থাকিলে তাহা ক-য়ের আকার ধারণ করে। এই নিয়মে খ-য়ের শ্বাসটা পরিত্যক্ত হওয়ায় পূর্ব্ব-প্রদর্শিত (§৫) খু দ নিজের শেষে উকার লইয়া সিংহলীতে কু ডু 'ক্ষুদ্র' হইয়া দেখা দিয়াছে।

১১। সংস্কৃতের ক্ষুদ্র অবেস্তায় খ্ষু দ্র (xudra); তাছাড়া তাহাতে 'ক্ষু দ্র' বা ছোট অর্থেই আর একটি শব্দ হইতেছে কু ত ক (kutaka)। ফারসীতেও ঠিক এই অর্থে কু চ ক। ইহাতে আর-একটি শব্দ হইতেছে কু দ ক, অর্থ 'ক্ষুদ্র' 'শিশু'। লিথুয়ানিয়ায় পাওয়া যায় kudikis 'শিশু'। এই শব্দগুলি তুলনা করিলে মনে হয় ইহাদের একটি সাধারণ মূল আছে, এবং হইতে পারে ইহা ক্ষু দ্র ক, অথবা ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ আর কোনো একটি শব্দ। পূর্ব্বের কু দ ক, কু ত ক, ও কু চ ক, এই তিনটি শব্দ, ক্রমপরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে (কু দ ক > কু ত ক > কু চ ক)। আমাদের কু চ বা কু চা, ও কু চি শব্দ (যেমন 'কু চা অথবা কু চ নৈবেদ্য', 'কু চি বাসন') এই ফারসী কু চ ক (<কু চ অ) শব্দেরই ভিতর দিয়া আসিয়াছে। 'ক চি পাতা' 'ক চি হাত' ইত্যাদির কচি ('ক্ষুদ্র') শব্দও এই কু চ ক হইতে। ফারসীর ক্ষুদ্রার্থে প্রযুক্ত কু দ ক ও লিথুয়ানিয়ার kudikis 'ছোট শিশুকে' বুঝায়। ফারসীর কু দ ক হইতে পূর্ব্ববঙ্গে কু ডু, কো দা 'খোকা' (কো দী 'খুকী'); এবং ইহা হইতেই মালদহের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 'খোকা' অর্থে প্রযুক্ত গু ধা শব্দ হইয়াছে।

১২। এইবার আমরা ছ-বর্গের কথা বলি। আমরা দেখিয়া আসিলাম ক্ষ খ হয়, এইরূপ ইহা আবার ছ-ও হয়। সংস্কৃত ক্ষা র হইতে আমাদের ছা র-খা র কথায় একসঙ্গেই আমরা ইহার পরিচয় পাই। ক্ষু দ্র ক যেমন খু ড্ড ক হয় দেখা গেল, সেইরূপ তাহা হইতে আবার * ছু ড্ড ক শব্দও হয়। ইহা হইতে * ছু ড্ড অ, পরে উকার স্থানে ওকার, প্রথম ড-কারের লোপে পূর্ব্বস্বর সানুনাসিক ও শেষের দুই অকার মিলিয়া আকার হওয়ায় ছোঁ ড়া। আবার ড কোমল (ঘোষ), ইহা কঠোর (অঘোষ) হইলে ট হইয়া যায় (ঈদৃশ স্থলে পৈশাচী প্রাকৃতের প্রভাব বলিতে পারা যায়), তাহা হইলেই * ছু ড্ড ক হইয়া গেল ছু ট্ট ক (= ছু ট্ট অ, ছু ট্ট, পাইঅলচ্ছী, ৪৭২)। ইহা হইতে উকার ওকার হওয়ায় হইয়া গেল ছো ট্ট, একটা টকারের লোপে ছো ট, হিন্দীতে ছো টা। ছ-য়ের শ্বাসটা গেলে তাহাই চ হইয়া পড়ে। এইরূপে মনে হইতেছে ঐ ছো ট্ট বা ছো ট্টা হইতে হিন্দীর চো ট্টা ('দুর্ব্বৃত্ত' 'চোর') হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি ক্ষু দ্র ক হইয়াছে খু ল্ল ক, কিন্তু ক্ষ যখন ছ হয় তখন সেইরূপেই তাহা হইতে হয় * ছু ল্ল ক

৬। প্রাকৃতের য-শ্রুতির নিয়ম (আমার লিখিত য-শ্রু তি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, শা ন্তি নি কে ত ন, ১৩২৭, বৈশাখ) ও উচ্চারণ অনুসরণ করিলে এতাদৃশ স্থানে খ-এব, ক-এর না লিখিয়া খ-য়ের, ক-য়ের ইত্যাদিই লেখা উচিত।

(=ছু ল্ল অ) এবং ইহা হইতে হইয়াছে ছু ল্লা, ছু ল্লু 'নিকৃষ্ট' 'লম্পট')। উত্তর- ও পূর্ব্ববঙ্গে এই শব্দের প্রচলন আছে।

এই বর্গের অন্তর্গত, 'কাকা' অর্থে মারাঠী চু ল· তা শব্দের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

১৩। পঞ্জাবীতে (জপজী, পাণিনি-কার্য্যালয়, ১৩২৫, পৃ: ৬৩) 'ছেলে' অর্থে চে লা ("চেলে") শব্দ পাওয়া যায়। প্রাকৃতে (দশবৈকালিকসূত্র-বিবরণ, দেবচন্দ্রলাল ভাই-জৈনপুস্তকোদ্ধার, বোম্বাই, ১৯১৮, ৯৯ ক) 'পুত্র' অর্থে চে ল্ল অ শব্দ আছে। চে লা, চে ট (স্ত্রী· চে টী), চে ড় (স্ত্রী· চে ড়ী) চে ল্ল অ শব্দের সহিত সম্বদ্ধ দেখা যায়! কিন্তু চে ল্ল অ শব্দের মূল কি? উল্লিখিত স্থানে প্রাকৃতের যে ছায়া-সংস্কৃত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহার প্রতিশব্দ লিখিত হইয়াছে ক্ষু ল্ল ক। ইহাতে মনে হয় ছায়া-সংস্কৃত-লেখকের মতে ক্ষু দ্র ক > (* ছু ল্ল অ > চু ল্ল অ >) চে লা। কিন্তু উকার স্থানে একার হওয়ার উদাহরণ নিতান্তই অল্প। তবে উ স্থানে অ, এবং অ-স্থানে এ হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে পারা যায়, ক্ষু দ্র ক > * ছু ল্ল অ > ছে লা[৭]; আর * ছু ল্ল অ > চে ল্ল অ > চে ল অ > চে লা; আবার ক্ষু দ্র > * ছু ড্ড (তুল :—খু ড্ড ক) > * চে ড্ড > চে ড় (চে ড়ী), > চে ট (চে টী)।

ছা ও য়া ল 'ছেলে' শব্দ প্রসিদ্ধ। ইহার মূল কি? প্রথম অংশ (ছা ও-) শা ব হইতে সন্দেহ নাই; দ্বিতীয় অংশ (-য়াল) কোথা হইতে আসিল চিন্তার বিষয়। কেহ-কেহ বলিতে চান সমগ্র শব্দটি শা ব বা ল হইতে। ছা বলিতে ছেলেমেয়ে দুইই হইতে পারে, তাই কেবল ছেলেকে বুঝাইবার জন্য তাহার সহিত বাল জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ছা ও য়া ল বলিতে অবিশেষে ছেলে-মেয়ে দুই বুঝায়। এই ব্যুৎপত্তিতে সংশয় থাকিয়াই যায়। এই ছা ও য়া লে র সঙ্গে ছে লে র যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষাতত্ত্ব-রসিকেরা আলোচনা করুন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

৭। ছ ল্লী হইতে (মেদিনী, জীবানন্দ, ল-দ্বিক ১৮, পৃ: ১৫২) ছে লে, যোগেশ বাবুর (অভিধান) এ মত ভাল মনে হয় না, এ সম্বন্ধে স ঙ্ক্ষ ক র ত ত্ত্বে (প্রকাশ্য) কিছু আলোচনা করিয়াছি। আমি যাহা উপরে লিখিলাম তাহাতেই আমার নিজের সন্দেহ আছে।

জাতক

মূল পালি হইতে শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত, দ্বিতীয় খণ্ড; শ্রীঅনুকূল ঘোষ কর্ত্তৃক ১।৩ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৸৵+২৯০। মূল্য ৫৲।

আলোচ্য পুস্তকখানি বহুদিন হইল হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করিতে না পারিয়া শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের নিকট লজ্জিত ও অপরাধী হইয়াছি। তাই প্রথমেই তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কিছুকাল হইল ঈশান-বাবু বঙ্গীয় পাঠকগণকে জাতকের প্রথম খণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। এই প্র বা সী তে ই আমি ইহার আলোচনা করিয়াছিলাম। আনন্দের বিষয় তিনি আমাদিগকে তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রদান করিয়াছেন, এবং আশা আছে, যদিও তিনি ক্রমশ অধিকতর প্রাচীন ও জীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন তথাপি অবশিষ্ট চারিখণ্ডও আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব। ৪৪০টি জাতকের অনুবাদ হইয়াছে, যাহা বাকী আছে তাহাও অচিরে হইয়া যাইবে। বঙ্গের যুবকেরা যাহা করিতে পারেন নাই, যাহা করিবার চেষ্টাও করেন নাই, এই বৃদ্ধ বয়সে ঈশান বাবু তাহাই করিয়াছেন। বঙ্গে পালির অধ্যয়ন অধ্যাপন ক্রমশ বাড়িতেছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য একখানিও পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল না। গভীর ভাবে আলোচনার খুবই অভাব বোধ হয়। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় পালি বা বৌদ্ধ শাস্ত্রেরও সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কার্য্য দেখিলে নিজের প্রতি ধিক্কার আসে,—আমরা কি করিতেছি, আর তাঁহারাই বা কি করিয়াছেন ও করিতেছেন! আমরা যৎসামান্যেই তৃপ্ত হইয়া পড়ি, আর কিছু করিতে ইচ্ছা হয় না। তাই বঙ্গে অথবা সমগ্র ভারতেই পালি ভাষার শিক্ষা এতদিন হইতে প্রচলিত হইলেও আমরা এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিবার মত কিছুই করিতে পারি নাই। ঈশান বাবুর এই বৃদ্ধ বয়সের কাজ দেখিয়া যদি আমাদের যুবকগণের এই দিকে কার্য্য করিবার উৎসাহ হয়, তবে তাহা বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে।

জাতকের প্রথম খণ্ডের আলোচনায় আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, এই দ্বিতীয় খণ্ডেরও সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাই বলা যায়। অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য,—যদিও স্থানে-স্থানে গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগে ভাষার অপকর্ষ সাধন হইয়াছে, যেমন—'গোচর ভূমিতে কাঁদ পাতিল', 'মঞ্জুষার ভিতরে আট্‌কাইয়া রাখিলেন', 'হিমবন্তে প্রাণত্যাগ করিল', ইত্যাদি (পৃ, ২৩)। যাঁহারা কথাবস্তুর রস বা বিবিধ ইতিবৃত্তের উপকরণ পাইতে চান তাঁহাদের ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইবে। কিন্তু ঐতিহাসিক

পাঠককে স্থানে স্থানে কিছু সাবধান হইতে হইবে। মূল জাতকে অধিকাংশই গদ্য, ও কিছু কিছু পদ্য আছে। গদ্য অংশের অনুবাদে মূলকে যতটা অনুসরণ করা হইয়াছে, পদ্য অংশে সেরূপ না করিয়া অনেক স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গদ্য অংশেরও অনুবাদে স্থানে স্থানে ত্রুটি লক্ষিত হইল।

"অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্ম্মাসনে বসিয়া থাকিতেন" (পৃ, ১)। মূলের বি নি চ্ছ য় ট্‌ ঠা ন শব্দের অর্থ 'বিচারস্থান' বা 'বিচারালয়,' 'ধর্ম্মাসন' নহে। ইংরেজী-অনুবাদক bench লিখিয়াছেন, ইহাতে 'law-court' বুঝাইতে পারে। বি নি চ্ছ য় ট্‌ ঠা ন শব্দে যে 'ধর্ম্মাধিকরণ', অনুবাদক নিজেই তাহা ঐখানেই একটু পরে লিখিয়াছেন ("সুব্যবস্থার গুণে অচিরে ধ র্ম্মা ধি ক র ণ")। "এই নির্লজ্জ বৃদ্ধকে ধর ত !" (পৃ, ৬) মূলে আছে 'দু ট্‌ ঠ'। তদনুসারে 'দুষ্ট' লিখিলেই বেশ হইত, 'নির্লজ্জ' লিখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। মূলে আছে (vol. II p. 11, l. 13) "সু চি জা তি কো সী হো ("শুচিজাতিকঃ সিংহ"), ইহার অনুবাদ করা হইয়াছে "সিংহ অতি শুচিপ্রিয়" (পৃ, ৭)। ইহা ঠিক নহে। শুচি-জাতিক আর শুচি-প্রিয় এক নহে। ঐ কথাটার ইহাই তাৎপর্য্য যে, সিংহ-জাতি শুচি, পবিত্র। উরগজাতকে মূলের (p. 13, l. 10) ম হা স ম জ্জা (মহাসমজ্যা) শব্দের অর্থ "মহাসমারোহ" (পৃ, ৯) করা হইয়াছে। কিন্তু 'সমারোহ' আর 'সমজ্যা' এক নহে ; সমজ্যা বলিতে সভা, সমিতি, পরিষদ্‌ ; সম্মেলন শব্দে ইহার ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। "সে (নাগ)…নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটিয়া যাইতে লাগিল" (পৃ, ৯)। এখানে পৃষ্ঠোপরি শব্দের অর্থটা পরিস্ফুট নহে। মূলে আছে 'নদী-পিট্‌ঠেন' (নদীপৃষ্ঠেন), নদীর পৃষ্ঠ দিয়া,—এখানে পৃষ্ঠ শব্দের অর্থ 'তল', নদীর তল-দেশ দিয়া অর্থাৎ নীচে দিয়া ; ইহাই ঐ শব্দটার তাৎপর্য্য। "বোধিসত্ত্ব…সুপর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন" (পৃ, ৯) ; এখানে মূলের 'অ নু মো দ ন (অথবা অ নু মো দ না) শব্দের অর্থ আশীর্ব্বাদ ঠিক নহে। গর্গজাতকে (পৃ, ১০) "বলাবলি আরম্ভ করিল"—ইহা মূলের 'উ জ্ঝা য় ন্তি' শব্দের অর্থ মনে হয়, কিন্তু 'উ জ্ঝা য় ন্তি' (অবধ্যায়ন্তি) শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে 'অবজ্ঞা করিতে লাগিল' লিখিলে ঠিক হইত। 'অবজ্ঞা' অর্থে 'অবধ্যান' শব্দ সংস্কৃতেও প্রসিদ্ধ। "প্রত্যভিবাদন করিবে", "প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিতে হইবে" (পৃ, ১০) ; উভয়স্থানেই লিখিতে হইলে 'প্রত্যাশীর্ব্বাদ' লিখিলে ঠিক হইত, 'প্রত্যভিবাদন' ঠিক নহে, এবং 'আশীর্ব্বাদ' ও 'অভিবাদন'ও এক নহে। অলীনচিত্ত-জাতকে (p. 18, l 10) আছে, "ছুতারেরা সমস্ত কাঠে চিহ্ন করিয়া (স ঞ্‌ ঞং ক ত্বা)…।" ঈশান-বাবু অনুবাদ করিয়াছেন "সমস্ত কাঠে এক দুই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়া…।" সংজ্ঞা শব্দে গণিতের অঙ্ক বুঝাইতে পারে না। আলোচ্য অনুবাদ পড়িলে লোকের এ বিষয়ে নানা ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। (জাতকে পুরাতত্ত্ব অংশেও (পৃ, ২১/, ২১৵) 'এক দুই ইত্যাদি অঙ্ক তক্ষণের' কথা দেখিয়া সহজেই বুঝা যাইতে পারে কেমন ভ্রম হইবার আশঙ্কা আছে।) 'সংজ্ঞা করার' ইহাই তাৎপর্য্য যে, কোন্‌ কাঠের সহিত কোন্‌ কাঠখানা জোড়া দিতে হইবে তাহা ঠিক রাখিবার জন্য একটা দাগ বা চিহ্ন দিয়া রাখিত। "কাঠ কাটিতেছে ও ছিলিতেছে" (পৃ, ১২)—এখানে 'ছিলিতেছে' শব্দটি অধিক, মূলে নাই। "হাতী…কাঠের একখানা চেলার উপর পা দিয়াছিল" (পৃ, ১২)। মূলে আছে খা ণু ক (অথবা খা ণু ক),—ইহার অর্থ শঙ্কু, ছোট গোঁজ, খোঁচ, চেলা নহে। পরে (পৃ, ১৩) আবার ইহার অর্থ 'কাঠের কুচি' করা হইয়াছে, ইহাও ঠিক হয় নাই। "তীক্ষ্ণধার শস্ত্র লইয়া"—এখানে মূলের অনুসরণে বাইশ বা বাস্‌লা নামের বিশেষ শস্ত্রকে ("তি খি ন বা সি য়া", তীক্ষ্ণ বাশ্যা) উল্লেখ করাই উচিত ছিল। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইত যে. উহার প্রচলন তখনো ছিল। "যন্ত্রপাতি বহিয়া আনিত" (পৃ, ১৩),—এখানেও মূলে আছে "বাশী প্রভৃতি"। হস্তী ছুতারদের কেমন কাজ করিত তাহার বর্ণনার এক স্থানে আছে—ত চ্ছ স্তা নং প রি ব ত্তে ত্বা দে তি.. সো ত্তা য় বে ঠে ত্বা কা ল সু ত্ত কো টি য়ং গ ণ্‌ হা তি"। ঈশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন "যখন তাহারা কাঠ ছিলিত, তখন গুঁড়িগুলি (গাছগুলি বলিলে মূলানুযায়ী হইত) উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিত…। সে-সমস্ত দ্রব্যই শুণ্ড দ্বারা এমন বেষ্টন করিয়া ধরিত যে কিছুই পড়িয়া যাইত না।" শেষাংশের মূল "কালসুত্ত কোটিয়ং গণ্‌হাতি,"—ইহার টীকায় উক্ত হইয়াছে—"কালসুত্ত কোটিয়ং গণ্‌হাতি অর্থাৎ যমের সূত্রের ন্যায় ধরিত—এমন ভাবে ধরিত যে, কিছুতেই ফস্কাইয়া যাইত না।" এ ব্যাখ্যা বড় কষ্টকল্পিত। ছুতার-মিস্ত্রীরা কাঠের কাজ করিবার সময় কাল-রং-মাখান একরকম সুতা দিয়া প্রথমে কাঠে আবশ্যক-মত দাগ দিয়া পরে সেই দাগ অনুসারে তাহা কাটে। যাহাতে এই সুতা জড়ান থাকে ছুতার-মিস্ত্রী নিজেই তাহা ধরে, আর অপর দিকটা অন্যকে ধরিতে দিয়া তাহার সাহায্যে কাঠে দাগ দেয়। এখানেও এই কথাই বলা হইতেছে,—হাতীটি কাল সুতার আগাটা শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিত। পালি কথাটার আক্ষরিক অর্থ হইতেছে—শুণ্ডের দ্বারা বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণ সূত্রের অগ্রভাগে (অর্থাৎ অগ্রভাগকে) ধারণ করিত। দ্রষ্টব্য Journal of the Pali Text Society, 1884, pp. 76-78। এখানে আলোচ্য শব্দটির সবিশেষ আলোচনা আছে।

পালির চা টি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে (পৃ, ৩৮৵, ১৪) 'কলস' বা 'কলসী', কিন্তু বস্তুত কলস ও চাটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। চাটিকে বাঙলার কোনো কোনো স্থানে 'চাড়ি' বা 'চাড়া' বলে, ইহা মাটির গোলাকার অতিবৃহৎ পাত্র, গরুকে ইহাতে খাবার দেয়। দেখিয়াছি (রাজশাহীতে) ছোট ছোট নদীও ইহাতে পার হওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার ইহাকে 'নাদা' বলে।

ঈশান বাবু ক র্ণি কা র পুষ্পকে (১৭ পৃ.) 'কনক-চাঁপা' বলিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত তাহাই কি? কনক-চাঁপার বেশ গন্ধ আছে, কিন্তু কর্ণিকারের গন্ধ নাই ("বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ। প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ।"—কুমার, ৩।২৮)। ইহা সোঁদাল, সোনালু, হিন্দীতে কনিয়র ; ইহার লম্বা-লম্বা ফল হয় ; কবিরাজেরা ইহাতে জোলাপ দিয়া থাকেন।

আমার মনে হইতেছে, জাতকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনায় লিখিয়া-ছিলাম গৌতমীকে বাঙলায় ম হা প্র জা প তী না লিখিয়া ম হা প্র জা ব তী লেখা উচিত ছিল, এবং আরো লিখিয়াছিলাম যে, প্র জা ব তী শব্দ হইতেই আমাদের পো য়া তী শব্দটা আসিয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডেও (পৃ, ২৵, ২৩৮) দেখিতেছি ঈশান বাবু প্র জা প তী ই লিখিয়াছেন। কেন আমি প্র জা ব তী লিখিতে চাই খুলিয়া বলি। Childers সাহেব অভিধানপ্রদীপিকা (২৩৭,১০০০) ও ধম্মপদের (১৮৫,২৪৫) উল্লেখ করিয়া প্র জা প তী লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু বস্তুত ঐ দুই পুস্তকে ও অন্যান্য পালি পুস্তকে আছে প জা প তী, প্র জা প তী নহে, পালিতে ইহা থাকিবার কথাও নহে। দিব্যাবদান (পৃ, ২,প,২ ; পৃ, ৯৮, প, ২১) প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত পুস্তকে প্র জা প তী শব্দ আছে ; কিন্তু এই দিব্যাবদান ও বিশেষত ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত বা গাথা ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহে এরূপ অনেক শব্দ আছে যাহা খাঁটি সংস্কৃত নহে। পালি-প্রাকৃতের মিশ্রণে ঐ এক-রকম অদ্ভুত সংস্কৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোনো কোনো শব্দের একাংশ খাঁটি সংস্কৃত হইলেও অপরাংশ খাঁটি পালি বা প্রাকৃত, ইহা যে-কেহ বলিবেন। প্র জা প তী শব্দটিও এই প্রকার। Childers বা M. M. Williams কেহই

শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেন নি। অন্য কোনো লেখকেরও এ বিষয় কোনো মন্তব্য আমি এপর্য্যন্ত জানি না। আমি যে উহার অনুবাদ প্র জা ব তী করিতে বলিতেছি আমিই তাহার একমাত্র উত্তরদাতা। প্র জা ব তী (=সন্তানবতী স্ত্রী, পরে সাধারণত স্ত্রী) বলিলে একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু খাঁ টি সংস্কৃত প্র জা প তী করিলে তাহার অর্থ matron, wife কিরূপে হইতে পারে, আমি তো বুঝিতে পারি না। তকারে দীর্ঘ ঈটা কোথা হইতে আসিল ইহাও ভাবিতে হইবে। বৈদিক সংস্কৃতে এত প্রসিদ্ধ প্র জা প তি শব্দটি পালি সাহিত্যে প্র জা প তী হইয়া স্ত্রী-বাচক হইয়া পড়িল, ইহাও একটা ভাবিবার বিষয়। পু ত্র ব তী শব্দে যেমন সাধারণত যাহার পুত্র আছে সেই স্ত্রীলোককেই বুঝাইয়া থাকে, প্র জা ব তী শব্দেও সেইরূপ প্রথমত সন্তানবতী স্ত্রীকেই বুঝাইত ; ক্রমে তাহা কেবল স্ত্রী-অর্থেও প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে (অভিধানপ্প, ২৩৭)। শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়। আমি বলিয়াছি আমাদের পো য়া তী শব্দ প্র জা ব তী হইতে। এই উভয় শব্দের অর্থগত যদি কিছু পার্থক্যও থাকে, তবে যতক্ষণ অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা না পাইতেছি ততক্ষণ ভাষাতত্ত্বের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাকে বলিতেই হইবে পো য়া তী শব্দ প্র জা ব তী শব্দের অপভ্রংশ। পোয়াতী গর্ভবতী স্ত্রীকে বুঝায়, আবার প্রসবের পরেও যতদিন সন্তান একটু বড় হইয়া না উঠে ততদিন এরূপ স্ত্রীলোককেও বুঝায়। কিন্তু কেবল প্রাদেশিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া কোনো প্রাচীন সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দের অর্থ নির্ণয় করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। প্রজা=সন্তান, প্রজাবতী—সন্তানবতী, ইহাই ঠিক অর্থ। দুই-একটা প্রয়োগ দিই :—

"সাম্প্রতং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম।
সোঽহং পত্নীমভীপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্র জা ব তী ম্॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯৭,১৮।

প্রজাবতী=সন্তানবতী। যিনি প্র জা ব তী অর্থাৎ সন্তানবতী হইতে পারেন, সেই পত্নীরই কথা এখানে বলা হইয়াছে। রাজশেখরও (বালভারত, নির্ণয়সাগর, ৩২ পৃঃ) দ্রৌপদীর বিশেষণরূপে প্র জা ব তী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ("প্রজাবতি, তবায়মভিপ্রায়ঃ")।

'ভ্রাতৃজায়া' অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ আছে (অমর, ৩,৬,৩০)। সীতাকে বর্জ্জন করিবার সময় তাঁহার সম্বন্ধে রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন (রঘু, ১৪,১৫)—"প্র জা ব তী দোহদশংসিনী তে।" কিন্তু বস্তুত এখানেও রাম গ র্ভ ব তী সীতাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলায় ঐ শব্দটি সন্তানবতীকেই বুঝাইতেছে।

এখানে একটা আপত্তি হইতে পারে, সংস্কৃতের অন্তস্থ 'র' পালিতে 'প' হয় কি? অনেক হয় ; যথা, সংস্কৃত শা র, পালি ছা প ; এইরূপ লা র, লা প (পক্ষিবিশেষ) ; সংস্কৃতের প্র+আ+√ বৃ ধাতু হইতে পালিতে পা রু প তি। এইরূপ আরো আছে।

এ বিষয়ে আর-একটি শেষ প্রমাণ দিই। পালির ম হা প জা প তী গোতমীকে ললিতবিস্তরে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) একই পৃষ্ঠায় (১১৫ পৃ) তিনবার মা হা প্র জা ব তী গৌতমী বলা হইয়াছে। Lefmannএর সংস্করণে (মূলে ১ম খণ্ড, পৃ, ১০০) যদিও ম হা প্র জা প তী আছে, তথাপি পাঠান্তরে (২য় খণ্ড, পৃ ৪৫) ম হা প্র জা ব তী পাঠ দেখা যাইবে।

সীলানিসংস জাতকে (১৯০) একস্থানে (পৃ, ১১২) আছে :—
"তয়ো কূপকা ইন্দনীলমণিময়া, সুবণ্ণময়ো লকারো, রজতময়ানি যোত্তানি...।" ঈশান বাবু অনুবাদ করিয়াছেন (পৃ, ৭১) :—"উহার মাস্তুল তিনটা ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা, বাতপটদণ্ড সুবর্ণ দ্বারা, রজ্জুগুলি রৌপ্য দ্বারা গঠিত হইল।" ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, ঈশান বাবু মূলের ল কা র কে 'বাতপটদণ্ড' বলিতেছেন, বা ত প ট শব্দের অর্থ নৌকার 'পাল', তাহা হইলে বা ত প ট দ ণ্ড আর মাস্তুল (কূপক) একই হইয়া পড়ে, তাই তিনি টীকায় বলিয়াছেন ল কা র শব্দ মাস্তুলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ; কিন্তু আবার অন্যত্র (পৃ, ২॥৶০) বলিয়াছেন, 'পাল খাটাইবার জন্য' মাস্তুলগুলির 'গায়ে...এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ yard)...।' ল কা র শব্দের পাঠান্তর ল ঙ্কা র। Cowell সাহেব ইহাই দেখিয়া উহার অর্থ ন ঙ্গ র (ফারসী ল ঙ্গ র) করেন। ইহা যে সঙ্গত নহে ঈশান বাবু তাহা বলিয়াছেন। স্বর্গীয় হরিনাথ দে (Journal of the Pali Text Society, 1906-1907, p. 173) Cowell সাহেবের এই মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহার অর্থ নৌকার 'পাল'। তিনি বিসুদ্ধিমগ্‌গ (ব্রহ্মদেশীয় সংস্করণ, পৃ,১১০) হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"যথা চ অচ্ছেকো নিয়ামকো বলববাতে ল ঙ্কা র ং পূরেত্বা নাবং বিদেশং পক্খন্দাপেতি ; অপরো অচ্ছেকো মন্দবাতে ল ঙ্কা রং ওরোপেত্বা নাবং তত্থেব ঠপেতি ; ছেকো পন মন্দবাতে ল ঙ্কা রং পূরেত্বা বলববাতে অড্‌ঢ ল ঙ্কা রং পূরেত্বা সোত্থিনা ইচ্ছিতট্‌ঠানং পাপুণাতি।"

ইহার ভাবার্থ হইতেছে—যেমন কোনো অনিপুণ মাঝি প্রবল বায়ুতে পাল উড়াইয়া নৌকাকে বি-দেশে (অর্থাৎ যেখানে যাইবার কথা সেখানে না গিয়া অন্যত্র) লইয়া ফেলে ; আর অন্য কোনো অনিপুণ মাঝি মন্দ বায়ুতে পাল খুলিয়া ফেলিয়া নৌকাকে সেইখানেই রাখে ; কিন্তু নিপুণ মাঝি প্রবল বায়ুতে অর্দ্ধেকটা পাল উড়াইয়া ভালয়-ভালয় অভীষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়...।

এ স্থলে ল কা র শব্দেরও একটা প্রয়োগ দিতে পারা যায়, ইহাতেও বুঝা যাইবে তাহার অর্থ 'পাল' :—

"অচলপদরবন্ধং সুট্‌ঠিতোদারকূপম্
উদিতপুথু ল কা রং দক্খ-নিয্যামকং চ।
সয়মভিমতলঙ্কাগামিনং নাবমেতে
সপদি সমুপরূল্‌হং অদ্দসুং রাণিজেহি॥"
দাঠাবংস, ৪. ৪২ (Journal, P T S, 1884, p 140).

উদিতপুথুলকার =উদিত পৃ থু ল কা র, 'যাহার চওড়া পাল উত্থিত হইয়াছে।' লক্ষণীয়—আলোচ্য জাতক, পূর্ব্বে উদ্ধৃত বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ও দাঠাবংসের নৌকার বর্ণনা একই রূপ, এবং তাহার শব্দাবলীও একই।

নৌকার 'পাল' বুঝাইতে পালিতে ল ঙ্কা র কোথা হইতে আসিল, ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি? আমার মনে হইতেছে, মূল অ ল ঙ্কা র হইতে হইয়া থাকিবে। পাল তুলিলে নৌকার বিশেষ রকমের শোভা হইয়া থাকে, তাই সেই অর্থে প্রথমে অ ল ঙ্কা র শব্দটা চলিয়া যায়, পরে শব্দবিশেষের সংসর্গে অকারটা লোপ হওয়ায় ল ঙ্কা র হইয়া পড়িয়াছে। যেমন উ ডু ম্ব র হইতে আমাদের ডু ম্ব র 'ডুমুর' হইয়াছে ; অ ভ্য ন্ত র হইতে ভি ত র। প্রাকৃতে ই র স্থানে র, অ পি স্থানে রি, এবং অন্যান্য এইরূপ শব্দ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কেবল মাত্র আদিস্থিত স্বরের লোপেই হইয়াছে। একটু পরিষ্কার করিয়া বলি :—

প্রাকৃত

"অপত্থিতো রি সুয়ণো কঈণ কর রে গুণে পয়াসেই।
ধবলেই জয়ং সয়লং সভারও চের নিসি-নাহো"
সুরসুন্দরীচরিত্র (০ কহা), কাশী, ১৯১৬, ১.২৭।

সংস্কৃত

অপ্রার্থিতোঽপি সুজনঃ কবীনাং কাব্যে গুণান্ প্রকাশয়তি।
ধবলয়তি জগৎ সকলং স্বভারত এব নিশি-নাথঃ॥

প্রার্থনা না করিলেও সুজন ব্যক্তি কবিগণের কাব্যে গুণসমূহ

প্রকাশ করেন, যেমন নিশানাথ স্বভাবতই সমস্ত জগৎ (জ্যোৎস্নায়) ধবলিত করেন।

এখানে মূলত অ প খি তো+অ পি (অপ্রার্থিতো+অপি), পরে সন্ধির নিয়মে অকার লোপে, অ প খি তো পি। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বহুপ্রয়োগ হইতে হইতে শেষে অ পি (অপি) স্থানে পি হইয়া গিয়াছে, এবং সেইজন্যই প্রাকৃতে দেখা যায় ন পি (নাপি)। আলোচ্য প্রাকৃত কবিতাটিতে চে র শব্দ এ র অর্থে প্রযুক্ত। প্রাকৃতের নিয়মে চ+এর=চে র। কিন্তু ভাষায় বহুবার ইহার প্রয়োগ হওয়ায় পরবর্ত্তী কালে চকারের অর্থের দিকে কোনো লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল এ র-অর্থেই ইহা প্রাকৃতে প্রযুক্ত হইতে থাকে। সংস্কৃতেও অ র আর অ পি উপসর্গের অকার লোপ প্রসিদ্ধ, যথা র গা হ্য=অ র গা হ্য, পি ধা ন=অ পি ধা ন। "বষ্টি ভাগুরিরলোপম্ অবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।" বৈয়াকরণিকেরা না ধরিলেও অ ধি উপসর্গেরও অকারের লোপ দেখা যায়, এবং দেখা যাইবারই কথা, "হৃদি সর্বস্য ধি ষ্ঠি ত ম্ (গীতা, ১৩,১৭)।

এইরূপেই ল ঙ্কা র শব্দের অ ল ঙ্কা র হইতে উৎপত্তি সম্ভব, পরে অনুনাসিক ঙকার পরিত্যক্ত হওয়ায় তাহাই ল কা র হইয়াছে। আমার তো ইহাই মনে হইতেছে, পাঠকগণের মত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

প ট্ট (<প ত্র) হইতে পা ট, এবং তাহা হইতে ক্রমে (পা ড় > পা ল >) পা ল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে 'পা ল' অর্থে কোন শব্দ প্রযুক্ত হইত কোনো পাঠক জানাইলে অনুগৃহীত হইব। বা ত প ট, বা ত প ট্ট খুব প্রাচীন নহে, স্পষ্টই দেখা যায়। বা ত প ট কথাসরিৎসাগরে আছে (M. M. Williams)।

সী লা নি সং স শব্দের শেষ পদের সংস্কৃত আ নি শং স, ছাপিতে ভুল হওয়ায়, অ নি শং স হইয়া গিয়াছে (পৃ, ১০, টীকা)।

চুল্লপদুম-জাতকে আছে (পৃ, ১১৭)—"উ প রি গ ঙ্গা য় চোরং... হলপাদে...ছিন্দিত্বা...।" এখানে উ প রি গঙ্গা শব্দের অনুবাদ "উপরি গঙ্গাতটে" করায় (পৃ, ৭৪) অর্থটা পরিষ্কার হয় নাই। উহার অর্থ হইতেছে গঙ্গার উজানের দিকে। ইংরেজী অনুবাদ বেশ পরিষ্কার —' Upper Ganges " এইরূপ গ ঙ্গা নি ব র্ত্ত ন (পৃ, ১১৭) শব্দের অর্থও পরিষ্কার হয় নাই, ন দী - নি ব র্ত্ত ন (পৃ, ৭৪) বলিলে কিছু বুঝা যায় না। এস্থলেও ইংরেজী অনুবাদটা ভাল ("a bend of the river")।

"চারিটা বৃহৎ পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক" (পৃ, ৭৫),—এখানে মূলে পাত্রের ('ভাজন') কথা থাকিলেও "চা রি টা বৃহৎ পাত্রের" কথা মূলে নাই।

পালিতে লিখিত নাম, বা ব্যক্তিবাচক শব্দগুলি বাঙলায় লিখিতে হইলে একটা কোনো প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। ঐ-সকল শব্দকে সংস্কৃতে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে, না পালিতে যেমন আছে তেমনি রাখিতে হইবে? সংস্কৃতে করিলে মন্দ হয় না, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সুকর নহে। বোধ হয় এইজন্যই ঈশান বাবু কতক সংস্কৃত করিয়া লিখিয়াছেন, কতকের বা অর্দ্ধ অংশ সংস্কৃতে করিয়াছেন, আবার কতককে ঠিক পালিতেই রাখিয়াছেন। প ব্ব তূ প থ র জাতক (১৯৫), ইহা পালিতেই রহিয়াছে (পর্ব্বত+উপস্তর) ; চু ল্ল প্র লো ভ ন জাতক (২৬৩) এখানে প্রথম অংশ (চুল্ল) পালি রহিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ ('প্রলোভন') সংস্কৃতে করা হইয়াছে। অন্যত্রও এরূপ আছে। বাঙলার সহিত মিলাইতে হইলে সংস্কৃত করিলে ভাল হয়, কিন্তু যতদূর সম্ভব সর্ব্বত্রই তাহা করা উচিত। চু ল্ল শব্দকে অনায়াসেই সংস্কৃত করিয়া ক্ষু দ্র লেখা যাইত। আর যদি ইহা ভাল না হয়, তবে সর্ব্বত্র মূল পালিটাই লিখিয়া লওয়া ভাল, সংস্কৃত শব্দটা বুঝাইবার জন্য বন্ধনীর মধ্যে একবার তাহা দেওয়া যাইতে পারে।

জাতকের আলোচ্য খণ্ডের প্রধান বিশেষত্ব ইহার জা ত কে পু রা ত ত্ত্ব-নামক অংশ। জাতকসমূহে যে-সমস্ত সামাজিক, বা রাজনীতিক প্রভৃতি প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়, ইহাতে তৎসমুদয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ইহা পড়িলে সেই কালের একটা চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে জাতকের বাঙলায় প্রকাশিত কেবল দুই খণ্ডেরই নহে, অবশিষ্ট খণ্ডগুলিরও বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। বাঙলায় এরূপ সঙ্কলন নূতন। ফিক্ সাহেব জর্ম্মান ভাষায় Social Organisation in North-East India in Buddha's Time * পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে এইসব আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখন উহা রচনা করেন তখন জাতকের শেষ খণ্ড (৬ষ্ঠ) প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তাহা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ঈশান বাবু তাহাও করিয়াছেন। এই-সমস্ত বিবরণকে বু দ্ধে র সময়ের বলা ঠিক নহে, কারণ জাতকসমূহ তাঁহার পরিনির্ব্বাণের অনেক পরে রচিত ; তবে হইতে পারে কোনো-কোনো গল্প বা তাহার অংশ-বিশেষ পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার কোনো বিশেষ প্রমাণ নাই।

পূর্ব্বে আমরা কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কেবল তাহাই দেখিয়া আলোচ্য পুস্তকখানির গুণসমূহ অস্বীকার করিলে তাহা নিতান্ত অন্যায় হইবে। উহার গুণ ও দোষ উভয়কেই সম্মুখে রাখিয়া অসঙ্কোচে বলিতে পারি বঙ্গের পাঠকগণ, সাধারণই হউন আর বিশেষজ্ঞই হউন, ইহার দ্বারা প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইবেন। তাই ইহার বহুল প্রচার হইতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

* পাঠকেরা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় ইহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

সাইবেরিয়ার বুরীজাতি

সাইবেরিয়ায় বুরীজাতি নামে এক জাতি আছে। বৈকাল হ্রদের পূর্ব্বদিকে বৈকাল প্রদেশে এদের বাস। ইহারা যাযাবর প্রকৃতির লোক। এই জাতির লোকদের ঘোড়া দৌড়ানর সখ খুব বেশী। পার্ব্বত্য দেশেও ইহারা ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের এক দিক হইতে আরেক দিকে খুব দ্রুতবেগে যাইয়া থাকে। এই দেশ শীতপ্রধান আর জমি উর্বরা নয় বলিয়া এরা পশু পালন করে এবং দেশের যেখানে পশুপালনের সুবিধা আছে সেইখানে যাইয়া কিছুদিনের জন্য আড্ডা করে, আবার আরেক জায়গায় চলিয়া যায়।

এদেব খাদ্য বাজরা আর ভেড়ার চর্ব্বি। মাখন আর দুধ দিয়া এরা চা খায়। মাঞ্চুদের মত এরা পোষাক পরে আর টুপী মাথায় দেয়। এদের খাওয়া পরা বেশ সাদাসিধে।

এরা সাধারণতঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে কেউ কেউ অনেক পশু পালন করে, আর এক জায়গাতেই বসবাস করে। এদেরই নাম 'বৈস্'।

১৮শ শতাব্দীর আগে এরা যাদুমন্ত্র ও ভূতসিদ্ধিতে খুব বিশ্বাস করিত। তার পর হইতে এরা বৌদ্ধ হইয়াছে এবং লামাদের ধর্ম্ম মানিয়া চলে। বৈকাল হ্রদের নিকটে ডটসন নামক স্থানে এদের ধর্ম্ম-পীঠ আছে। তাহার নাম 'জিলঁগ-নার' বা মহান্তদের হ্রদ। এখানে প্রায় ১০০।১৫০ লামা-সাধু বাস করেন।

লামা-পদ পাওয়া ধনী বুরীদের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এইজন্য ছোট-বেলা হইতেই ছেলেদের লামার

সাইবেরিয়ার গুরু লামা

জীবন্ত-দেবতা তারানাথ

বুরীদের নাচঘর

বুরী লামা সাধুর মন্দির

মাত্র, আর শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে চেষ্টাও করে না। তবে অনেকে আবার খুব বিদ্বান হয়। এইরূপ একজন লামার নাম স্তম্ভ লামা। ইনি সাইবেরিয়ার লামাদের মধ্যে সব-চেয়ে বড় ছিলেন। এক সময় ইনি সিংহলে গিয়াছিলেন।

এদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা আছে। এরা জীবিত মানুষকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে। এই দেবতা-দের সংখ্যা এখন একশ'র উপরে হইবে। এঁরা তিব্বত, চীন ও মঙ্গোলিয়ায় যাওয়া-আসা করেন। লামাদের মত এঁরা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য

জিম্মা করিয়া দেওয়া হয়। লামারা এদের ক্রিয়াকাণ্ড, তিব্বতীয় ব্রহ্মবিদ্যা, সাহিত্য, আয়ুর্ব্বেদ, বৌদ্ধ দর্শন, গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। অনেকেই আসলে কিছু শেখে না, কেবল লিখিতে পড়িতে জানে

পালন করেন। তিব্বতের দালাই লামার মত এই দেবতাদেরও অবতার হয়। বুরীদের বিশ্বাস যে দেবতাদের দেহরক্ষার পরে এঁদের আত্মা নবজাত শিশুর মধ্যে প্রবেশ করে। এই দেবতারা কোন মঠে পদার্পণ

করিলে লোকেরা এঁদের পূজা করে, স্তুতি করে, আশীর্ব্বাদ লয়, আর নিজের নিজের ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করে। এঁদের আসন দালাই লামার নীচে।

বুরী-লামারা কোন বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে এক-প্রকার আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করেন। ইহার নাম 'টজম্' বা নাচ। নাচের সময় বড় বড় ঢোল, তুরী, নাকাড়া, শঙ্খ বাজান হয়, আর বিচিত্র-বেশী মূর্ত্তিগুলি নানা রঙ্গে নানা ঢঙে নাচিতে থাকে। কেউ মৃত্যু-দেবতা, কেউ দৈত্য ইত্যাদি সাজে। সোনালি জরির কাপড় ও মণিময় অলঙ্কার পরিয়া এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিগুলি স্বদেশীদের আনন্দ ও বিদেশীদের ত্রাস উৎপাদন করে। লামারা নিজেদের ধর্ম্মের মধ্যে স্থানিক দেবতা আর ভূতের পূজা সামিল করিয়া লইয়াছেন, আর এই উৎসবের আয়োজন করিয়া বুরীদের মধ্যে লামা-ধর্ম্মের প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন।

এই জাতির ডাক্তারদের রোগীর অবস্থা ও চালচলন বুঝিয়া চলিতে হয়। বুরীরা ত আর এক জায়গায় স্থির থাকে না, আজ যে রোগী এখানে, কাল হয় ত সে চল্লিশ মাইল দূরে পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। তাই ডাক্তার বেচারাকে আপনার ঔষধের পোঁটলাপুঁটলি উট বা টাট্টুর উপর চাপাইয়া দিয়া সারা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এদের চিকিৎসা একরকম যাদুগিরি। হয়ত কারু বাতের ব্যারাম ;—তাহাকে ধরিয়া লাঠি দিয়া কয়েক ঘা দিয়া, কোন গাছের রস খাওয়াইয়া, হয়ত কোন পশুর কোন অবয়ব, এমন কি, লোমশ পশুর চাম্ড়া পর্য্যন্তও ঔষধের অনুপান ধার্য্য করিয়া চিকিৎসা চলিতে থাকে।

এই জাতি মানবের আদিপিতা আদমের সময়কার শান্তি উপভোগ করিতেছে বলা যাইতে পারে; তবে এখনকার সভ্যতার কিরণ এই গভীর অন্ধকারের মধ্যেও ছুটিয়া আসিতেছে।*

শ্রীরমেশ বসু [এম-এ]

* ("সরস্বতী",—জানুয়ারী. ১৯২১।)

বাউল

গাও

গাও গো বাউল তোমার তরল একতারাতে তান তুলে
নাম-ভোলা ঐ নীল আকাশের বুকের মাঝে ঢেউ আনি';
দখিন হাওয়া থম্‌কে দাঁড়াক্, চম্‌কে শুনুক্ কান খুলে
স্বপ্নপুরের সেই বাণী।

মউল কেন ধর্‌ল আজি পউষ-রাতের আম-বনে?
কোন্ ফাগুনের স্বপ্ন দেখে জাগ্‌ল কোকিল চোখ চেয়ে?
শীতের সাঁঝে শিরিষ শাখে কি যে বাজায় আন্‌মনে
সেই বারতা যাও গেয়ে!

শিশির-শ্যামল-মাঠের পথে চল্‌ব তোমার গান শুনে,
রাতের ছোঁয়া লাগ্‌বে আমার কঠিন পায়ের চার-পাশে,
বনের ছায়া কাঁপ্‌বে তোমার একতারাটির তান শুনে,
চল্‌ব আমি তার আশে।

বনের ঘন স্বপনখানি বাজ্‌বে না কি সেই সুরে—
হাওয়ায় যে গান ঘুমিয়ে আছে প্রাণের মৃদু আহ্বানে?
বল্‌বে কি সে, 'এই যে আমি তোমার কাছে, নেই দূরে,-
ডাকো আমায় কোন্‌খানে?'

শোনাও আমায় দূর আকাশের ভাষা-বিহীন গান আনি'
মানস-সরের কলধ্বনি একতারাতে তান তুলে;
চোখ-চলে-না এমন দেশের ছায়ার মতন রূপখানি
দেখ্‌ব আমি সব ভুলে।

গাও

গাও গো বাউল তোমার অবুঝ একতারাতে তান দিয়ে
ব্যথার বনে শন্‌শনিয়ে লাগুক্ কাঁপন মন-হরা।
গাঁয়ের পথে চল্‌বে তুমি—সাথে আমার প্রাণ নিয়ে,
হব তোমার পথ-ধরা।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আমীর ফয়জল

আমীর ফয়জল ইংরেজ-রক্ষিত বর্ত্তমান মেসোপটেমিয়ার রাজা। ইনি মক্কা শরীফের রাজপুত্র, গোঁড়া মুসলমান-সন্তান। ফয়জলের বয়স অল্প, ৩৩।৩৪ হইবে। ইনি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, উদারস্বভাব এবং ধর্ম্মভীরু। বীরোচিত গুণ ইহাঁর চরিত্রে যথেষ্ট আছে। শুনা যায় পূর্ব্বে ইনি ইংরেজের ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। আজ তিনি ইংরেজের বন্ধু এবং তাহাদের অভিভাবকত্বে সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্য চালাইতেছেন। তাঁহার বুদ্ধি ও শক্তি ইংরেজের হাতে রক্ষিত। প্রতি মাসে ইংরেজের কাছ হইতে তিনি মাসহারা পাইতেছেন তিরিশ হাজার টাকা, আর একত্রিশটি করিয়া তোপধ্বনি তাঁহার বরাদ্দ। ইহা কি কম গৌরবের কথা ?

যাহা হউক—আমীর ফয়জল নিজের শক্তিগুণে দুর্দ্দান্ত আরব ও বেদুইন দস্যুদের শাসন করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিতেছেন।

ফয়জল খুব দৃঢ়চিত্ত লোক। তাঁহার দেশে শেখ ও বদ্দুদের মধ্যে নিয়ম আছে বড়লোক হইলে যত ইচ্ছা বিবাহ করা যায়। এমন দেশেও ফয়জল আজ অবধি কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এমনও শুনা যায় যে ইনি নিরামিষভোজী।

রাজতক্তে বসিয়াই ফয়জল বাগ্‌দাদের অনেক নিয়ম-কানুন বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছেন। এ-সমস্ত পরিবর্ত্তন ফয়জলের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তিনি প্রচার করিয়াছেন বাগ্‌দাদ কোরান শরীফের মতে শাসিত হইবে ;—কোনো মস্‌জিদের কাছে মদের দোকান থাকিতে পাইবে না, থিয়েটারে নর্ত্তকী থাকিতে পাইবে না, এবং শহরের মধ্যে

রাজা ফয়জলের দরবার-গৃহটি ক্লক্-টাওয়ার বা সরাই বিল্ডিং বলিয়া খ্যাত। এই বাড়ীটি ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ পুরাণ তুর্কী প্রাসাদের এক অংশ। সমস্ত বাড়ীতে পাঁচ ছয় হাজার লোক ধরিতে পারে। বর্ত্তমানে ইহা "রাজপ্রাসাদ" বলিয়া খ্যাত। রাজা ফয়জল সিংহাসনে বসিয়া। রাজার বাঁ দিকে দাঁড়াইয়া (১) জেনারেল স্যার এইল্‌মার্ হ্যাল্‌ডেন, (২) সৈয়দ ইমান আলি—ইনি বাগ্‌দাদের একজন প্রসিদ্ধ শেখ। ইহাঁর আসন মক্কার রাজার পরেই এবং ইনি বিখ্যাত সুন্নি মস্‌জিদ আব্‌দুল জিলানীর কর্ত্তা। ইনি এখন রাজার-পরামর্শদাতা রূপে কাজ করিতেছেন। রাজার ডান দিকে দাঁড়াইয়া, (১) রাজার মন্ত্রী, (২) হাই কমিশনারের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী (৩) স্যার পার্‌সি কক্স—হাই কমিশনার

রাজা ফয়জলের খাস দরবার। ছবির বাঁ দিক হইতে—হাইকমিশনার, হামিদ পাশা, হাই কমিশনারের সেক্রেটারী, রাজা ফয়জল, রাজার দেওয়ান, ইরাক্ জাতীয় সৈন্যদলের সেনাপতি এবং প্রধান সেনাপতি

বাগদাদে ভারতবাসী—বাঁ দিকের দ্বিতীয় মিঃ এইচ্ তেওয়ারীর সৌজন্যে আমরা বাগদাদের চিত্রগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য পাইয়াছি

আব্‌দুল কাদির জিলানি মস্‌জিদ—বাগ্‌দাদ

মোটেই মদের দোকান থাকিবে না। নৈতিক উন্নতি বিষয়ে তাঁহার এই সৎ-চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার এই চেষ্টার ফলও খুব ভাল হইয়াছে। আগে বাগ্‌দাদে ১২০টি দেশী ও বিলাতী মদের দোকান ছিল; এখন তাহার জায়গায় ২০।২১খানি মাত্র দাঁড়াইয়াছে। থিয়েটার ছিল ৮।৯টা, এখন প্রায় সমস্তই বন্ধ।

এই প্রসঙ্গে বাগ্‌দাদের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বাড়ী, ও দর্‌বারের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানকার দর্‌বারগৃহ Clock Tower বা Serai Building নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে ইহা তুর্কীর রাজপ্রাসাদ ছিল। টাইগ্রীস নদীর উপরে ইহা অবস্থিত। এই প্রাসাদটি এত প্রকাণ্ড যে ইহার ভিতরে একসঙ্গে পাঁচ ছয় হাজার লোক জমায়েত হইতে পারে। তুর্কী জাতি যে বনিয়াদী ও বিলাসী তাহা এই বাড়ী দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

সৈয়দ ইমানী আলি বাগ্‌দাদের একজন প্রসিদ্ধ শেখ। ইঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। মক্কা শরীফের রাজার পরই ইঁহার আসন। ইনি আবার সুন্নিদের মস্‌জিদ আব্‌দুল কাদির জিলানীর মালিক। ইনি আমীর ফয়জলের রাজ-পুরোহিত।

আব্‌দুল কাদির জিলানী মস্‌জিদটি এত বড় যে
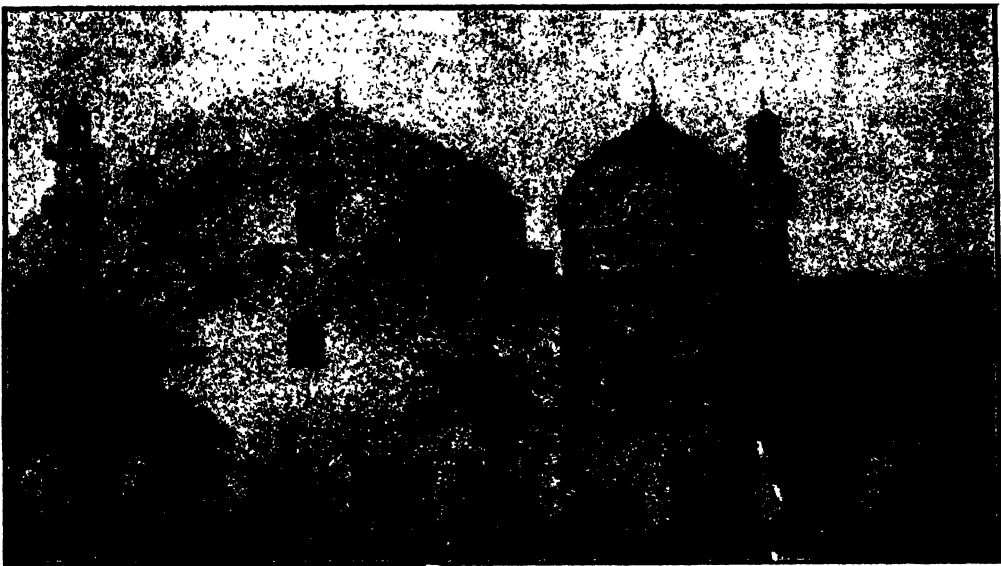
আব্‌দুল কাদিরের গোর—বাগ্‌দাদ

এরূপ আকারের মস্‌জিদ সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। বাগ্‌দাদ রেল-ষ্টেশন হইতে এখানে যাইতে মাত্র সাত-আট মিনিট লাগে। যে জায়গায় মস্‌জিদটি অবস্থিত সেখানকার নাম বাব্‌-এল-শেখ। মস্‌জিদের ভিতরে হিন্দুদের যাইবার অধিকার নাই। তবে বাহির হইতে মস্‌জিদের যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতি চমৎকার। ইহার উপরকার শিল্প ও কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ১৯২০ সালের অশান্তির সময় প্রায় দশ-বারো হাজার বেদুইন একসঙ্গে গোপনে ইহার ভিতর সভা করে, এবং তাহার পরেই লড়াই বাধে।

হামিদ পাশা বাগ্‌দাদের আর-একজন প্রধান লোক। ইনি রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের কর্ত্তা। ১৯২০ সালে অশান্তির সময় ইনি ইংরেজের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। লেখক ইঁহার বাড়ীতে অনেকদিন অতিথি ছিলেন। ইনি সচ্চরিত্র ও খুব মিশুক।

বাগ্‌দাদ শ্রীহরিপদ তেওয়ারী

এক অপরিজ্ঞাত বৈষ্ণব কবি

অনেকদিনের কথা, আগরতলা বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর কীটদষ্ট বিস্তর গ্রন্থ ও কাগজ রক্ষার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় জ্বালাইবার নিমিত্ত স্তূপাকারে রাখা হইয়াছিল। একদিন সেই আবর্জ্জনা-স্তূপ উপর উপর ঘাটিয়া একখানা হস্তলিখিত খাতা পাইলাম, তাহাতে কতকগুলি বৈষ্ণব-পদাবলী লিখিত ছিল।

অল্পদিন হইল, আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা গেল, তাহাতে কতিপয় অপরিজ্ঞাত পদ এবং কয়েকটি পদে অপরিচিত পদকর্ত্তার ভণিতা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কৌতূহলাবিষ্ট হৃদয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পদকল্পতরু প্রভৃতি যে-সকল মুদ্রিত পদাবলীগ্রন্থ আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাতে ঐ-সকল পদ অথবা পদকর্ত্তার নাম পাই নাই; এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থেও তদ্বিষয়ক কোন কথার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। 'বঙ্গীয় কবি' গ্রন্থ প্রণয়ন উপলক্ষে আমরা যে-সকল বিবরণ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়াও কিছু পাওয়া গেল না। পরিশেষে, আগরতলা রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত হস্তলিখিত বহু প্রাচীন গীতকল্পতরু, গীতচন্দ্রোদয় ও পদামৃতসিন্ধু প্রভৃতি অপ্রকাশিত গ্রন্থনিচয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত খাতায় সন্নিবিষ্ট কোন কোন পদ ও ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। প্রাপ্ত খাতায় যে-সকল অপরিজ্ঞাত কবির নাম পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ণানন্দ দাস একজন। ভণিতায় উল্লিখিত নাম ব্যতীত আমরা পূর্ণানন্দের কোনরূপ পরিচয় বা বিবরণ পাই নাই। এই-সকল বিষয় জানিবার আশায় কোন কোন বৈষ্ণব-সাহিত্যানুরাগী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হইয়াছিলাম; তাঁহারা জানাইয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাপি পূর্ণানন্দের অথবা তাঁহার রচিত পদাবলীর সন্ধান পান নাই।

আমরা 'পূর্ণানন্দ' ভণিতাযুক্ত দুইটি ও 'পুণ্যানন্দ' ভণিতার একটি পদ পাইয়াছি। পূর্ণানন্দ ও পুণ্যানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি, লিপিকরপ্রমাদে নামের এবম্বিধ পার্থক্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস; কিন্তু এই বিশ্বাস অভ্রান্ত কি না, বলিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। যে তিনটি পদ পাইয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক ও বিশেষজ্ঞগণের হস্তে স্থিরসিদ্ধান্তের ভার অর্পণ করা ব্যতীত গত্যন্তর দেখিতেছি না। পদগুলি এই :—

(১)

শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নটবর শ্যাম।
চিত চমকিয়ে হরে শ্রবণে বয়ান॥[১]
এ কি অপরূপধ্বনি শুনিলাম শ্রবণে।
এমন বেণুর ধ্বনি হানিল পরাণে॥

---

(১) হরে শ্রবণে বয়ান—বাঁশীর রব শ্রবণে কর্ণ এত তন্মাত হইয়াছে যে তদ্দরুণ বদনের ক্রিয়া রহিত হইয়াছে, অর্থাৎ নির্ব্বাক্ হইয়া বংশী-ধ্বনি শুনিতেছে।

পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি।
যে জন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি॥
সুবল লইয়া কানু দ্রুতগতি চলে।
চন্দ্র বেড়িয়া তারা আছে তরুতলে॥[২]
তটস্থ[৩] হইয়া শ্যাম দাঁড়াইয়া রহে।
জগতমোহিনী রূপ পূর্ণানন্দ কহে॥[৪]

(২)

কাতর হইয়া পুছে রসময় শ্যাম,
তোমার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ—
কোন জাতি, কোথা নিজ ধাম॥
আমি থাকি এই বনে, চরাই সব ধেনুগণে,
কভু তোমায় না পাই দেখিতে।
বলাই দাদার সঙ্গে থাকি, তোমায় কখন নাহি দেখি,
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে॥
এত শুনি কহে গৌরী, শুন হে নন্দের হরি,
তোমাকে দিব পরিচয়।
প্রেম নাম আমি ধরি, বাসপুর মধুপুরী,
মাতা মোর তব পূজ্য হয়॥
তোমার প্রিয় মাতা যে, আমারও পূজ্য সে,
সে জন আমার হয় তাতে।[১]
আমার বন্ধু যেই জনে, তাহারে সকলে জানে,
দাস পূর্ণানন্দ ভাবে চিতে॥

(৩)

ফিরাইতে কর নারে গিরিধর,
আকুল হইল শ্যাম।
চেয়ে নত পানে দেখে রাই-চরণে
লেখা আছে শ্যাম নাম॥
অঙ্গের পরশে নাগর হরিষে
বুঝিল রাইয়ের কাজ।
যত সখিগণ গেল অন্য বন,
মিলয়ে নিকুঞ্জ মাঝ॥
কাতর ভাবে হরি দুই কর জুড়ি
কহে শুন প্রাণেশ্বরী।
তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা
নাহি জানে হর গৌরী॥
রাই বলে শ্যাম, মোর নিবেদন,
তোমা না দেখিলে মরি।
ঘর তেয়াগিয়া দেখিলাম আসিয়া
নটবর-বেশ-ধারী॥
সঙ্গের সঙ্গিয়া মিলিল আসিয়া
রাধিকা কাণুর কাছে।
প্রেম সমাধিয়া আনন্দে চলিলা,
কহে পুণ্যানন্দ দাসে॥

উদ্ধৃত পদগুলি যে খাতায় পাওয়া গিয়াছে, সেই খাতাখানা কোন্ সময়ের লিখিত, জানা যায় নাই। রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি ও সাহিত্যানুরাগী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে বিস্তর প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে আগরতলায় প্রাচীন পদাবলী চর্চ্চাও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। মনোহরসাই কীর্ত্তনের নিমিত্ত কতিপয় সুগায়ক দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। খাতায় সংগৃহীত পদগুলি নানা ব্যক্তির রচিত হইলেও, ঘটনার শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে; দেখিলে মনে

(২) চন্দ্র—শ্রীরাধিকা, তারা—সখিগণ।

(৩) তটস্থ—নিকটবর্ত্তী।

(৪) শেখরদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদের প্রথমাংশ অন্যরূপ হইলেও শেষাংশ ঠিক এই পদটির অনুরূপ। পদাবলী-সাহিত্যে একাধিক ব্যক্তির ভণিতাযুক্ত একটি পদ, অথবা সামান্যরূপ পরিবর্ত্তিত একটি পদে একাধিক ব্যক্তির ভণিতা প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে; ইহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শেখরদাসের পদটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। পূর্ণানন্দের পদ অপেক্ষা এই পদটি বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ-ভাবব্যঞ্জক।

রাধার বাঁশীর স্বরে গগন ভেদিল।
শুনি শ্যাম নাগর অমনি অধৈর্য্য হইল॥
দূর হতে সুস্বর শুনিতে পাইল কানু।
রাখালেরে কহিছেন ফিরায়ে আন ধেনু।
শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নটবর শ্যাম।
চিত চমকয়ে হরে শ্রবণে বয়ান॥
একি অপরূপধ্বনি শুনিলাম শ্রবণে।
এমন বেণুর ধ্বনি হানিল পরাণে॥
পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি।
যেজন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি॥
সুবল লইয়ে কাণু দ্রুতগতি চলে।
চন্দ্র বেড়িয়া তারা আছে তরুতলে॥
তটস্থ হইয়া শ্যাম দাঁড়াইয়া রহে।
জগতমোহিনী রূপ দাস শেখর কহে॥

(১) ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝা গেল না।

হয়, কীর্ত্তনের সুবিধার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালা আকারে পদগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পূর্ব্বে ঐরূপ সংগ্রহের চেষ্টা হইবার কথা শুনা যায় নাই,—এবং তৎপরেও এরূপ চেষ্টা হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং উক্ত মহারাজের সময়েই গায়কগণের ব্যবহারার্থ প্রাচীন পুঁথিসমূহ আলোড়ন করিয়া এই খাতা লিখিত হইয়াছিল, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্য যে-সকল অপরিজ্ঞাত পদকর্ত্তার নাম ও অপ্রকাশিত পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ক্রমে প্রকাশ করা হইবে। সেই-সকল পদকর্ত্তার বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা বিশেষ চেষ্টিত রহিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ

শেখ সাদীর কাসিদা ও গজল

পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে পারস্যের কাব্য-কুঞ্জে তিনজন কবি-পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়। কবি শেখ সাদী ইঁহাদের অন্যতম। পারস্যের কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত শেখ সাদীর মত স্বদেশে কি বিদেশে সম্পূজিত হইয়া কবির নিজ উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই।* হাজি লতিফ আলি খাঁ তাঁহার "আতস কাদা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,"পারস্যের কবি-প্রতিভার জাগরণ-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এমন কোন কবির আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ফিদৌসী, নিজামী, আন্‌ওয়ারী এবং শেখ সাদী, এই কবি-চতুষ্টয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারেন। কি প্রাচীন কি আধুনিক যুগের লেখকগণের মধ্যে কবি শেখ সাদী অসাধারণ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লেখক; বাগ্মিতা ও রচনা-বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত চারিজন প্রতিভা-সম্রাটের অন্যতম।"† কবির জ্ঞান, কবিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হইয়া পারস্যের বিখ্যাত বিদ্বান ও লেখক মীর সৈয়দ আলি মশটক কবিকে পরম শ্রদ্ধাভরে "হাজার গানের বুল্‌বুলি" নামে সম্মানিত করিয়াছেন।* বাস্তবিকই কবির সুললিত বাক্যবিন্যাস, শব্দনির্ব্বাচন, সমৃদ্ধ অলঙ্কার-সুষমা, ইন্দ্রজালময়ী কাব্যমায়ার বিচিত্র বিকাশ, নানা-বিষয়িণী রচনার মধ্য দিয়া পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াই ক্ষান্ত নহে; ভাবের অনুভূতিতে, উন্মেষণে, মানব-চরিত্র অধ্যয়নে, অভিজ্ঞতায়, চিন্তাশীলতার বিকাশেও তাহা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সাধারণ পাঠক কবির মধুর কোমলকান্তপদাবলীর ভাবে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক কবির কাব্যে ভাবের প্রবাহ ও অসাধারণ মনীষার পরিচয় পাইয়া আত্মহারা হন। সাদীর রচনাবলী পারস্য-সাহিত্যের 'নিমক্‌-দান' অর্থাৎ লবণ-ভাণ্ডার নামে সম্মানিত। লবণ অমৃত-বিশেষ অর্থাৎ লবণ ভিন্ন রন্ধনের অন্যান্য প্রচুর উপাদান সত্ত্বেও যেমন কোনপ্রকার ভোজ্য ব্যঞ্জন সুস্বাদু, মুখরোচক ও তৃপ্তিকর হয় না, তেমনি শেখ সাদীর রচনাবলী ভিন্ন পারস্য-সাহিত্য অন্যান্য লেখকের সুরচিত রচনা সত্ত্বেও অপূর্ণ ও অঙ্গহীন; সাদীর রচনাবলী পারস্য-সাহিত্য-রত্নহারের উজ্জ্বলতম মধ্যমণি। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন কালিদাস, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন সেক্সপীয়র, জর্ম্মান সাহিত্যে যেমন গেটে, ইতালীয় সাহিত্যে যেমন দান্তে, ফরাসী সাহিত্যে যেমন ভিক্তর

* কবি, বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজিত। খাওয়াতিম দ্রষ্টব্য। এই উক্তি ও কুশাগ্রবুদ্ধি চাণক্যের উক্তি একার্থসূচক।

† Prof. Eastwick অনূদিত হাজি লতিফ আলি খাঁ রচিত সাদীর জীবনী গ্রন্থ আতস কাদার ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

* খোরাসান-নিবাসী বিখ্যাত লেখক আমির দৌলত সাহ প্রণীত ও Prof. Brown সম্পাদিত তজ্‌কিরাতুস্‌ শোয়ারা দ্রষ্টব্য।
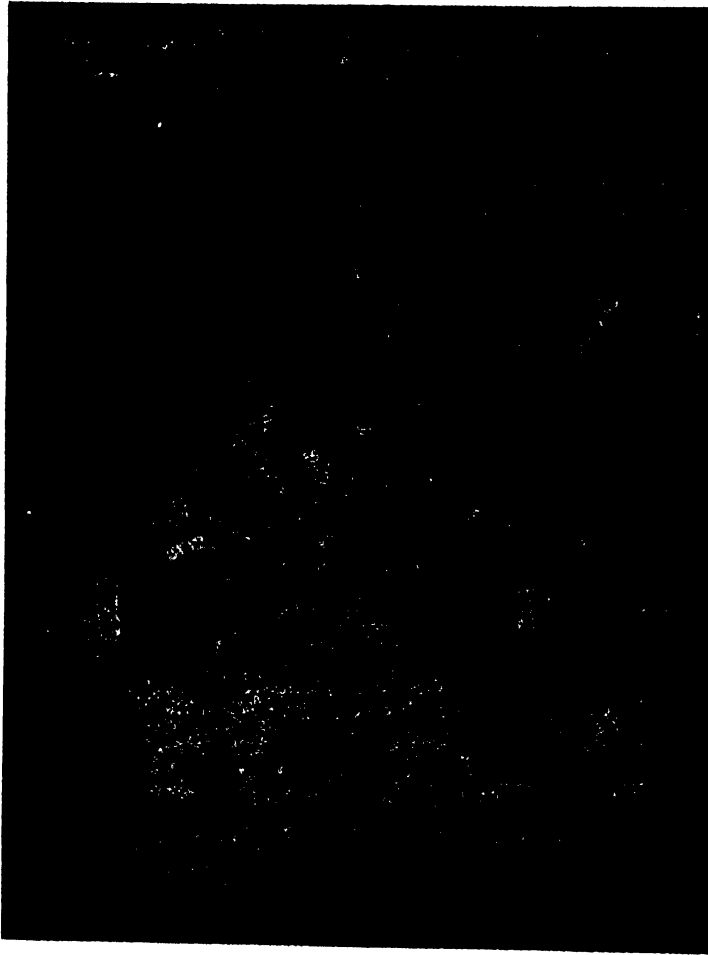
পারস্যের কবি শেখ সাদী

হুগো, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, পারস্যসাহিত্যে তেমনি কবি শেখ সাদী।

কবি শেখ সাদী দেবতার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত।* কবি মৌলানা হাতিফী তাঁহার দিওয়ানে লিখিয়াছেন,—যদিও পয়গম্বর মহম্মদ বলিয়াছেন, আমার পর আর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিবে না, তথাপি কবিদের মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ-প্রেরণায় কাব্য-শাস্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়া পয়গম্বর রূপে ভক্তি ও পূজা পাইবেন। ফির্দৌসী বীররস কাব্যে, আন্‌ওয়ারী বিষাদসঙ্গীতে, ও শেখ সাদী গজল বা গীতি-কবিতা রচনায় চির অমরত্ব লাভ করিবেন।

কবির সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার উজ্জ্বল-আলোকরশ্মি-পাতে পারস্য-সাহিত্যের সকল বিভাগই অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব বিস্তার করে। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পারস্য-সাহিত্য নানা ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত। তন্মধ্যে প্রধানতঃ—(১) হুজ্‌জা (২) গজল (৩) কাসিদা (৪) তস্‌বীব (৫) মস্‌নবী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সম্পদে সমুজ্জ্বল। শেখ সাদীর কুল্লিয়াৎ অর্থাৎ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বুস্তাঁ, গুলিস্তাঁ ও কয়েক খণ্ড রাশেল্লা (ধর্ম্মপুস্তিকা) ব্যতীত অবশিষ্টগুলি প্রধানতঃ কাসিদা ও গজল। এগুলি আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত। শেখ সাদীর সময় হইতেই দিওয়ান অর্থাৎ গজলকে একত্র করিয়া আদ্য অক্ষর অনুসারে প্রকাশ প্রথার প্রচলন হয়।* কবির বন্ধু, বিস্‌তুন নিবাসী আলি বিন আহম্মদ ৭২৬ হিজরাব্দে সাদীর গজলগুলিকে দিওয়ানে পরিণত ও ৭৩৪ হিজরাব্দে সম্পাদন করেন।†

গজল একপ্রকার গীতি-কবিতা অর্থাৎ ইহা শুধু কবিতা নয়, গান ও কবিতা উভয়ই। সুন্দরীর সাহচর্য্যে গায়কের

* মরমী কবিদ্বয় ফরিদ্‌উদ্দিন আত্তার ও জামী প্রণীত তজ্‌কিরাতুস্ আউলিয়া ও নাফাৎ-উল-আনাস দ্রষ্টব্য।

দর্ শায়েরস্তান পায়াম্‌বারান্ আন্দ্।
কত্তলিস্ত্ কে জুম্‌লাগী বর আঁ আন্দ্।
ফির্দৌসী উ আন্‌ওয়ারী উ সাদী
হরচনদ্ কী না না বি আদি।

* Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, prepared by Khan Sahib Maulvi Abdul Muqtadir, Vol. I, 1908, দ্রষ্টব্য।

† Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the British Museum, prepared by Charles Rieu, Vol. II, দ্রষ্টব্য।

হৃদয়ে যে উল্লাস উত্থিত হয়, তাহার উচ্ছ্বাস বর্ণনাই গজলের উদ্দেশ্য।*

কবি গজলকে গানের উপযোগী করিয়াই রচনা করেন। ইহাদের ছন্দভঙ্গীও গীতের উপযোগী। সাধারণ গানের মত গজল কতকগুলি বয়েৎ বা কলিতে বিভক্ত; উহার প্রথম বয়েৎ বা কলিকে মৎলা বলে। প্রথম বয়েৎ বা মৎলা এগার হইতে সতের মাত্রায় রচিত হয়। গজলের প্রথম কলি বা মৎলার দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে। কিন্তু মৎলার পরবর্ত্তী অন্যান্য বয়েৎএর দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে না। অপিচ পরবর্ত্তী বয়েৎএর শেষ চরণের সঙ্গে প্রথম বয়েৎ বা মৎলার মিল থাকে। এই প্রকার মিলই ডাক্তার জেম্‌স্‌ রসের মতে ফারশী এবং আরবী কবিতার ছন্দবৈশিষ্ট্য। কাসিদার ছন্দভঙ্গীও গজলের অনুরূপ। ইহারও মৎলা বা প্রথম কলির দুই চরণের পরস্পর মিল থাকে এবং পরবর্ত্তী বয়েৎএর দুই চরণের পরস্পর মিল না থাকিলেও গজলের মত শেষ চরণের সহিত মৎলার বা প্রথম কলির মিল থাকিবে। ছন্দভঙ্গীতে কাসিদা এবং গজল একরূপ হইলেও বিষয় এবং দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন। সাদীর গজলগুলি সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য, প্রেম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক। ইহা ঊর্দ্ধ-সংখ্যা দশ বা বারটি পদ বা বয়েৎএ রচিত হয়। কাসিদা সাধারণতঃ স্তুতি, ব্যঙ্গ, ধর্ম্ম, দার্শনিক-তত্ত্ব অথবা নীতিকথা বিষয়ক। গজলের শেষ ছত্রে কবি নিজ তাখাল্লুস অর্থাৎ ভণিতা সংযোগ করেন।† কিন্তু কাসিদাতে কোনপ্রকার ভণিতা দিবার নিয়ম নাই।

অধ্যাপক ব্রাউন বলেন, পারস্য এবং ভারতবর্ষীয় কাব্যরসিকগণ আরবী ভাষায় রচিত সাদীর কাসিদা-গুলিকে অতি উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আরবীয় বিদ্বানগণ উহাকে মাঝারি রকমের রচনা (mediocre performance) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।‡ কবির পারস্য কাসিদাও অতি চমৎকার। হাজি লতিফ্‌ আলি খাঁ বলেন, শেখ সাদীর কাসিদা, গজল, নীতি-উপদেশপূর্ণ কবিতা ও হাস্য-রসাত্মক রচনা কবিত্বে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও চরমোৎকর্ষে অমূল্য।*

সাদীর বাইশখানি গ্রন্থের মধ্যে চারখানি গজল-গ্রন্থ।† তন্মধ্যে একখানি খুসবিসায়েৎ খেউড় গজল ইব্রাহিম খাঁ‡ বলেন, সাদীই সর্ব্বপ্রথম পারস্যের গীতি-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধন করেন। আমীর দৌলত সাহ § বলেন, দিল্লির কবি আমীর খসরু গজল-রচনায় সাদী অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধ্যাপক ব্রাউন প্রণীত পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস ও ডাক্তার জেম্‌স্‌ রসের অনূদিত গুলিস্তাঁর ভূমিকা পাঠে জানা

---

* সাহিত্য ১৩১৩ ও Miss Costelo প্রণীত Rose Garden of Persia দ্রষ্টব্য।

† অধ্যাপক ব্রাউন অনুমান করেন, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে গজলে ভণিতা দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

‡ In Persia and India it is commonly stated that Sadi's Arabic Qasidas are very fine. But scholars of Arabic speech regard them as very mediocre performances. —Literary History of Persia.

* Sadi's lyrical poems possess neither easy grace and melodious charms of Hafiz's songs nor the over-powering grandeur of Jalaluddin Rumi's divine hymns, but they are nevertheless full of deep pathos and show such a fearless love of truth as is seldom met with in Eastern poetry.—Encyclopaedia Britannica, eleventh edition.

† কবির গ্রন্থসংখ্যা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত আছে। ফরাশী দেশীয় প্রাচ্যভাষাবিৎ পণ্ডিতদ্বয় De Sacy De Herbelo ও Sir William Jones বলেন বুস্তাঁ, গুলিস্তাঁ ও মুলুম্মাত এই পুস্তকত্রয় ভিন্ন শেখ সাদী অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। Major Stewart তৎপ্রণীত ইতিহাস-বিখ্যাত সুলতান টিপুর রাজকীয় পাঠাগারের তালিকার মধ্যে সাদীর রচিত সতেরখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কবির বন্ধু বিসতুন নিবাসী আলি বিন আহম্মদ ও J. Harrington সাদীর রচিত বাইশখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত Bodlin (Oxford), British Museum (London), India Office (London), Oriental Public Library (Bankipore) প্রভৃতি পাঠাগারে রক্ষিত আরব্য ও পারস্য ভাষার পাণ্ডুলিপির তালিকায় কবির রচিত বাইশ খানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে। আমরা আধুনিক প্রচলিত মত অনুকরণ করিলাম।

‡ ইব্রাহিম খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখক ও বারাণসীর অধিবাসী।

§ দৌলত সাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক ও খোরাসানের অধিবাসী। আমির আলা উদ্দৌলা ইস্‌ফারানির পুত্র। তিনি মহত্ত্বে পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি নিরহঙ্কার ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার তজ্‌কিরাতুস্‌ শোয়ারা অর্থাৎ পারস্য কবিগণের জীবনচরিত পুস্তক অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

যায় যে, খাকানি জাবালি প্রভৃতি সাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ গজল রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সাদী প্রথম গজল-কবি না হইলেও, তিনি তাঁহার সমসাময়িক এমন কি পূর্ব্ববর্ত্তী গজলরচনাকারীগণ অপেক্ষা গজল রচনায় অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; ঐতিহাসিক হাম্‌দুল্লা মুস্তৌফি বলেন, গজল রচনায় শেখ সাদী চরমোৎকর্ষ লাভ করেন।* এমন কি সাদীর রচিত গজল ভিন্ন অন্যান্য কবিগণের গজল, গজল নামেরই উপযুক্ত নহে।† অধ্যাপক ব্রাউনও বলিয়াছেন, গজল রচনায় শেখ সাদী অন্যান্য পারস্য কবিগণ এমন কি হাফিজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।‡ বাঁকিপুর ওরিয়েণ্ট্যাল পাব্‌লিক লাইব্রেরীর মৌলভী আব্‌দুল মক্তাদির সাহেব বলেন,§ পারস্যে যে-সমুদয় গীতি-কবি আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে হাফিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। গজলের উৎকর্ষ-জনিত গৌরব খ্যাতনামা শেখ সাদীর প্রাপ্য সন্দেহ নাই; হাফিজের প্রবর্ত্তিত রীতি যথেষ্টই মার্জ্জিত ও পরিচ্ছন্ন (refined and polished) এবং তাঁহার বিশেষ প্রকাশ-সৌন্দর্য্য আজ পর্য্যন্ত কেবল অনতিক্রম্য হইয়া আছে তাহা নহে, তাঁহার সমকক্ষও নাই। পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীর যশ অবশ্যই প্রচুর এবং তাঁহার গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ এই দু'টি শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। কিন্তু হাফিজের সহিত তাঁহার গজলের তুলনা করিলে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাদীর গজল অধিকতর প্রশংসার্হ।§ সাদীর গজল, হাফিজের সরস অনাহতগতি ছন্দপ্রবাহে পূর্ণ অথবা জেলালুদ্দিন রুমির ভক্তিরস ও ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছ্বসিত গরিমামণ্ড ভাবধারায় পূর্ণ না হইলেও, উহা গভীর করুণরস এবং নির্ভীক সত্যানুরাগের পরিচয়ে পূর্ণ; যাহা প্রাচ্য দেশের কবিতায় কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।* যাহা হউক শেখ সাদী প্রথম গজলরচনাকারী না হইলেও, তাঁহার দ্বারাই যে পারস্যের গজল-কুঞ্জের শোভা-সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং গজল বা গীতিকাব্য রচনায় কবি শেখ সাদীই প্রথম অমরত্ব লাভ করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া কবি মৌলানা হাফিজের গজলের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। সমরখন্দ নিবাসী কবি নিজামী-অরুদি বলিয়াছেন, সাদীর দিওয়ান ভাবের উদ্দীপক ও চরমোৎকর্ষে পূর্ণ।† পারস্যের কবিগণের মধ্যে সাদীই প্রথম শ্রেণীর গজল-রচয়িতা এবং তাঁহারই গজল ঐতিহাসিক হিসাবে বিখ্যাত (classic)।‡ অধ্যাপক ব্রাউন, সাদীর গজলের প্রচার ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বলেন, পারস্যের কোন কবিই আজ পর্য্যন্ত সাদীর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিত-যশা হইতে পারেন নাই; কবির যশ কেবলমাত্র তাঁহার জন্মভূমির মধ্যেই বিস্তৃত ছিল না, পরন্তু যে দেশে পারস্য-ভাষার আলোচনা হয়, সেই দেশেই তাঁর যশ বিস্তৃতি লাভ করে। বহুল প্রচার ও জনপ্রিয়তার হিসাবে হাফিজের পরই সাদীর গজলের স্থান।§

সাদীর পূর্ব্ববর্ত্তী গজল-কবি খাকানি ও জাবালি সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইল। খাকানি, পারস্যের শের্‌ওয়ান প্রদেশ নিবাসী বিখ্যাত কবি। পারস্যের কবিগণের মধ্যে ইনিই "সুল্‌তান্ উস্-শোওয়ারা" অর্থাৎ কবি-সুলতান রূপে সম্মানিত ছিলেন। 'খাকানি' কবির কল্পিত নাম। গঞ্জা প্রদেশে (আধুনিক এলিজা-ভেতপল) কবি খাকানি ৫০০ হিজরাব্দে (১১০৬-৭ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম আফ্‌জল উদ্দিন ইব্রাহিম বিন আলি শের্‌ওয়ান। কবির পিতা সূত্র-ধরের কর্ম্ম করিতেন এবং মাতা প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী

* তারিখ্‌ই গুজিদা।

† It is in the Persian Ghazal or ode, that he is especially held by orientals to have surpassed all other poets. They even go so far as to say that previous to Sadi there was no ode worthy of the name in existence.—Platts.

‡ In his Ghazals or odes Sadi is considered as inferior to no Persian poet, not even Hafiz.

—Literary History of Persia.

§ Khan Saheb Abdul Muqadir's Catalogue of Persian and Arabic Manuscripts, Vol. I, 1908.

* আতসকাদা।

† চাহার মকলা।

‡ পাওয়াতিম-ই-সাদী দ্রষ্টব্য।

§ Literary History of Persia

ছিলেন, পরে মুসলমান হন। কবি খাকানি পারস্যের প্রাচীন কবি কালাকির শিষ্য। সুল্‌তান খাকান মাসুচরের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত বলিয়া শেরুওয়ান প্রদেশের রাজকুমার কবিকে 'খাকানি' উপাধিতে ভূষিত করেন। গজল রচনার জন্যই কবি খাকানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "হাফ্‌ত্‌-আক্‌লিম্‌" বিখ্যাত গজল-গ্রন্থ। কবি পদ্যে একখানি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। এই ভ্রমণ গ্রন্থখানির নাম "তুফৎ-উল-ইরাকিন্‌"। এই গ্রন্থে খাকানি, ইরাক্‌-আজাম, ইরাক্‌-আরব দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৮২ হিজরাব্দে (১১৮৬ খ্রীঃ) তাব্রিজে কবির মৃত্যু হয় এবং তাব্রিজ প্রদেশের অন্তর্গত শারখার নামক প্রসিদ্ধ স্থানে কবিকে সমাধিস্থ করা হয়।

কবি জাবালি, ঘার্জ্জিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নিশবা অর্থাৎ উপাধি আল্‌ জাবালি অর্থাৎ পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী। কবির সম্পূর্ণ নাম আব্দুল ওয়াজিদ আল জাবালি। কবি জাবালি গজল রচনার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কবি ঘার্জ্জিস্তান হইতে হিরাত ও গান্ধারায় আগমন করেন। কিছুকালের জন্য গজ্‌নি-পতি সুল্‌তান বাহরাম সাহ বিন্‌ মাসুদের দরবারে তিনি রাজকবি রূপে অবস্থান করেন। কিছুকাল অবস্থান করিবার পর সুল্‌তান বাহরাম সাহের সহিত সুল্‌তান সঞ্জর খালজুকির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সুল্‌তান বাহরাম সাহ পরাজিত হন। কবি এই যুদ্ধ-ব্যাপারকে গরিমাময় ভাব এবং ছন্দের মধ্যে প্রকাশ করেন। এই কবিতায় কবি বিজয়ী সুল্‌তানের বীর্য্য-বত্তার মহিমা কীর্ত্তন করেন। সুল্‌তান কবির কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যের রাজকবি রূপে সম্মানের সহিত লইয়া যান। ৫৫৫ হিজরাব্দে কবির মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গজল-গ্রন্থ আছে।

সাদির গজলগুলি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; যথা :—
(১) তায়াবাৎ (২) বদেয়া (৩) খাওয়াতিম (৪) খুস্‌বিসায়েৎ।

তায়াবাৎ—কবির সাদাসিদা ধরণের সাধারণ গজল-গ্রন্থ হইলেও বিশেষত্বে পূর্ণ। ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে সুবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিৎ সুপণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স ও ডাক্তার জেম্‌স্‌ রস বলেন, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি গজলের প্রথম দুই চরণ আলিফে ও অপর চরণগুলি ক্রমান্বয়ে আলিফ ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণের সহিত শেষ হয়।*

বদেয়া—শব্দালঙ্কারপূর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাব ও ভক্তিরসপূর্ণ গজল-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট অতি শ্রদ্ধার ও আদরের বস্তু। ইহাতে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণন ও শ্রীভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

খাওয়াতিম—কবির পরিণত বয়সের রচনাবলীর মধ্যে এই গজল-গ্রন্থখানি গভীর ও গরিমাময় ভাবে পূর্ণ। যে সময় কবি পার্থিব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীর মত ধ্যানজীবন যাপন করিতেন, যে সময়ে কবির মিলনাকাঙ্ক্ষী আত্মা সত্য-শিব-সুন্দরের শ্রীচরণে মিলিত হইবার আশায় সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই ঈশ্বর-সমাধির পূর্ব্বরাগরঞ্জিত মুহূর্ত্তে কবি এই অপূর্ব্ব-শ্রীসমন্বিত গজলগুলি রচনা করেন। ইহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে কবির হৃদয় মন সেই বিরাট বিশালতায় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত গরিমা, সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রাণে সংহত হইয়া উঠিয়াছে।

খুস্‌বিসায়েৎ অর্থাৎ গদ্যে ও পদ্যে রচিত অশ্লীল গজল-গ্রন্থ। অশ্লীল গজলের প্রচলন গজনী রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া দেশময় বিস্তৃতি লাভ করে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ কবিগণ অপেক্ষা খেউড় গজলের কবিগণ সবিশেষ আদর প্রাপ্ত হইতেন, এমন কি তাঁহারা হকিম (doctor) উপাধিতে পর্য্যন্ত ভূষিত হইতেন। তৎকালীন রুচিতে এই শ্রেণীর রচনা অশ্লীল বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইত না।†

---

* ...the two first lines of the first four Ghazals terminate in an Alif, and the others in succession in each letter of the alphabet.

† Swift, stern, and other wits of our last and the preceding age could relish indecency and nastiness; and it is creditable perhaps to the present generation that it has no taste for such grossness. This was not, however, the case in the age and country in which Sadi flourished any more than it was in the early and best parts of our own literary history.—Introduction to Gulistan, translated by Dr. Ross, 1823.

কবি শেখ সাদী তৎকালীন এক দুশ্চরিত্র রাজকুমারের আদেশে গদ্যপদ্যময় অশ্লীল গজল রচনা করেন। এই-সমস্ত গজল নীতি-বিৎ কবি (Ethical Poet) শেখ সাদীর দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কবি শেখ সাদী এই অশ্লীল রচনার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়াছেন ও অনুতপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।* তিনি বলিয়াছেন—"এক বাদশাহপুত্র হকিম সোজনীর অশ্লীল গজলকে আদর্শ করিয়া আমাকে কতকগুলি গজল রচনা করিতে আদেশ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি আমাকে হত্যা করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। প্রাণবধের আশঙ্কায় ভীত হইয়া এরূপ রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই রুচিবিগর্হিত কর্ম্মের জন্য আমি অনুতপ্ত ও শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। পারস্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে শুধু শেখ সাদীই নহেন, পারস্যের অনেক কবি, নীতিবেত্তা, অমার্জ্জিত রুচি, চিন্তা ও ভাব দ্বারা নীতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।

পারস্যের প্রাচীন যুগে যে কবি অশ্লীলতার অবতার রূপে "হকিম" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং যাঁহার অশ্লীল রচনাকে আদর্শ করিয়া কবি শেখ সাদী খেউড় গজল রচনা করিবার জন্য তৎকালীন বাদশাহ-পুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন, সেই খেউড় গজলের কবি হকিম সোজানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম। সমরখন্দনিবাসী হকিম মহম্মদ বি আলি সোজনী† প্রধানতঃ অশ্লীল এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতার জন্যই বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। শৈশব হইতে সোজনী প্রধানতঃ অশ্লীল ও বিদ্রূপাত্মক রচনার অনুশীলন করেন এবং পরিণত বয়সে তাঁহার প্রতিভা কুরুচি ছাড়া সুরুচিপূর্ণ কবিতা রচনার দিকে অতি অল্প সময়ই নিয়োজিত হইয়াছিল। হকিম সোজনীর রচিত অশ্লীল গজলগুলির মত অশ্লীলতার এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন বোধ হয় কোন সভ্য দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক হামদুল্লাও বলিয়াছেন, সোজনী তাঁহার কাব্যে চরম-অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়াছেন।* দৌলত সাহ তৎপ্রণীত পারস্য কবিগণের জীবনী পুস্তকে লিখিয়াছেন—সোজনীর কবিতা এতই অশ্লীল যে পড়িলেই বমনের উদ্রেক করে।† এই কারণেই তিনি অশ্লীলতা প্রকাশ বৃদ্ধির ভয়ে সোজনীর কবিতা উদ্ধার হইতে বিরত হইয়াছেন। কিন্তু পারস্যের সুপণ্ডিত লেখক ও জীবনীকার আউফি‡ সোজনীর অশ্লীল গজলগুলিকে প্রতিভাশালী কবির প্রতিভা-সঞ্জাত রচনা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।§ কবির অশ্লীল রচনা ব্যতীত অল্প সংখ্যক সুরুচি ও গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা আছে। ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তৌফি বলেন, সোজনীর এইসকল রচনা সুন্দর ও অতুলনীয়। কথিত আছে নিম্নলিখিত কবিতা রচনার জন্য কবি শ্রীভগবানের ক্ষমার পাত্র। আমরা নিম্নে সেই কবিতাটির অনুবাদ প্রকাশ করিলাম :—

তোমার এ বিশ্ব-গৃহে নাহি দুখ নাহি দৈন্য নাহি ত্রুটিপাপ,
পাত্র ভরি' আমি তাহা করিয়া সৃজন বাড়াই সন্তাপ।¶

৫৬৯ হিজরাব্দে (১১৭৩—৭৪) হকিম সোজনীর মৃত্যু হয়।||

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

* The author, however, seems to have repented of having written these indecent verses, yet endeavours to excuse himself on account of thus giving a relish to other poems, as "salt is used in the seasoning of meat."—T. W. Peal.

† তারিখ-ই-গুজিদা—ইঁহার নাম আবুবকর ইদ্রিস-সোলমানি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

* তারিখ-ই-গুজিদা।

† অধ্যাপক ব্রাউন সম্পাদিত, আমির দৌলত সাহ প্রণীত তজ্‌কিরাতুস্‌শোয়ার দ্রষ্টব্য।

‡ ইনি মহম্মদ আউফি নামে সুপরিচিত। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ আব্দর রহমন বি আউফি। আউফি তৎকালীন অনেকগুলি সাধুর জীবনচরিত রচনা করেন। "লুবাবউল্‌আলবাব" নামক গ্রন্থের জন্য আউফি বিখ্যাত। আউফি সুলতান নসীরুদ্দিন কুবাচারের রাজত্ব-সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

§ While Awfi, though regarding his facetiæ as full of talent, considers it jest * * .—Oriental Biographical Dictionary.

¶ তারিখ-ই-গুজিদা।

|| লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ শেখ সাদীর জীবনীর এক পরিচ্ছেদ। বেঙ্গল পাবলিশিং হোম কর্ত্তৃক শীঘ্রই পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

দাস বিক্রয়ের প্রাচীন দলীল

পূর্ব্বে এই দেশে যে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ আমাদের বর্ত্তমান সমাজেও বিরল নহে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাচীন দলীল পত্রাদিতেও কখন কখন পাওয়া যাইতেছে। ১৩২০ সনের ভাদ্রমাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত হইয়াছিল। গত বর্ষের "ভারতবর্ষে" ও বর্ত্তমান বর্ষের "প্রবর্ত্তকে" এক-একখানা দলীল প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত উভয় দলীল হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে দুরবস্থায় পড়িয়া দাসরূপে বিক্রীত হইত, এবং ঋণ গ্রহণ করিয়াও দাসত্ব স্বীকার করিত। ইহাতে আমাদের দেশের কোন দুরবস্থাপন্ন পরিবারের শোচনীয় পরিণামের কথাই জানিতে পারা যায়; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় যেভাবে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল, আমাদের দেশেও যে সেইভাবে দাসগণ ক্রীত ও বিক্রীত হইত, ইহার প্রমাণসূচক কোন দলীল-পত্রাদি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। এইরূপ একখানা দলীল প্রকাশিত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই দলীলের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রথম ভাগ পার্শী-ভাষায় লিখিত এবং সেই সময়ের প্রচলিত প্রথানুযায়ী রাজদ্বারে রেজেষ্টারী-কৃত। দলীলের শিরোদেশে একটি বৃত্তাকার মোহরের চিহ্ন আছে, তাহাতে "খাদেমেসরে কাজি, কেয়ামুদ্দিন" ও তাহার পার্শ্বে—"মোহর নং ৯" পার্শী ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। দলীলের তারিখ বাঙ্গলা ১১৯৫ সন অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৮৮ সাল। সেই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালীস বঙ্গদেশ শাসন করিতেন।

দলীল

[দলীলের প্রথমাংশ পার্শী ভাষায় লিখিত, তাহা আমাদের ভাষার গণ্ডীর বহির্ভূত। ইহা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত শেষের অংশের পাঠ প্রকাশিত হইল।]

"ইয়াদিকির্দ্দ—

শ্রীরামনরসিংহ দত্ত সাকিন বিক্রমপুর সিমুলিয়া

দাস বিক্রয়ের দলিল—শীল-মোহর

দাস বিক্রয়ের দলিল – ফারসী অংশ
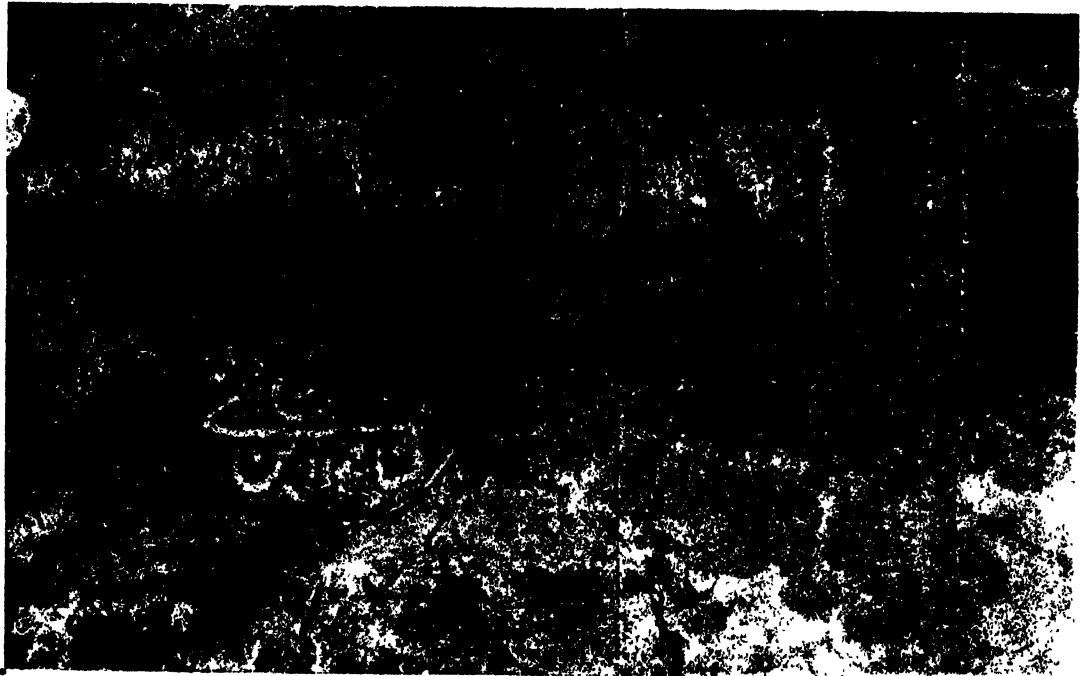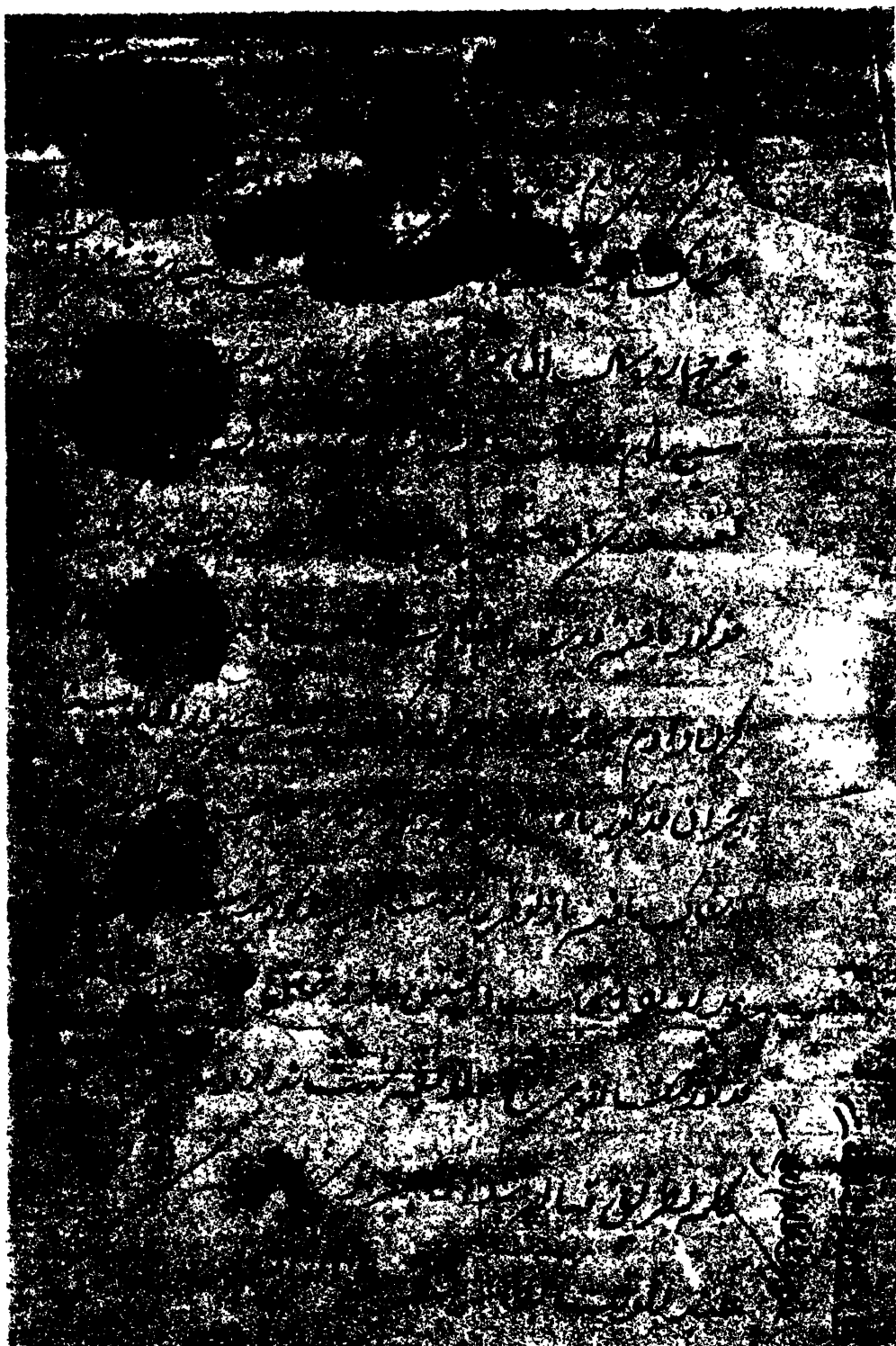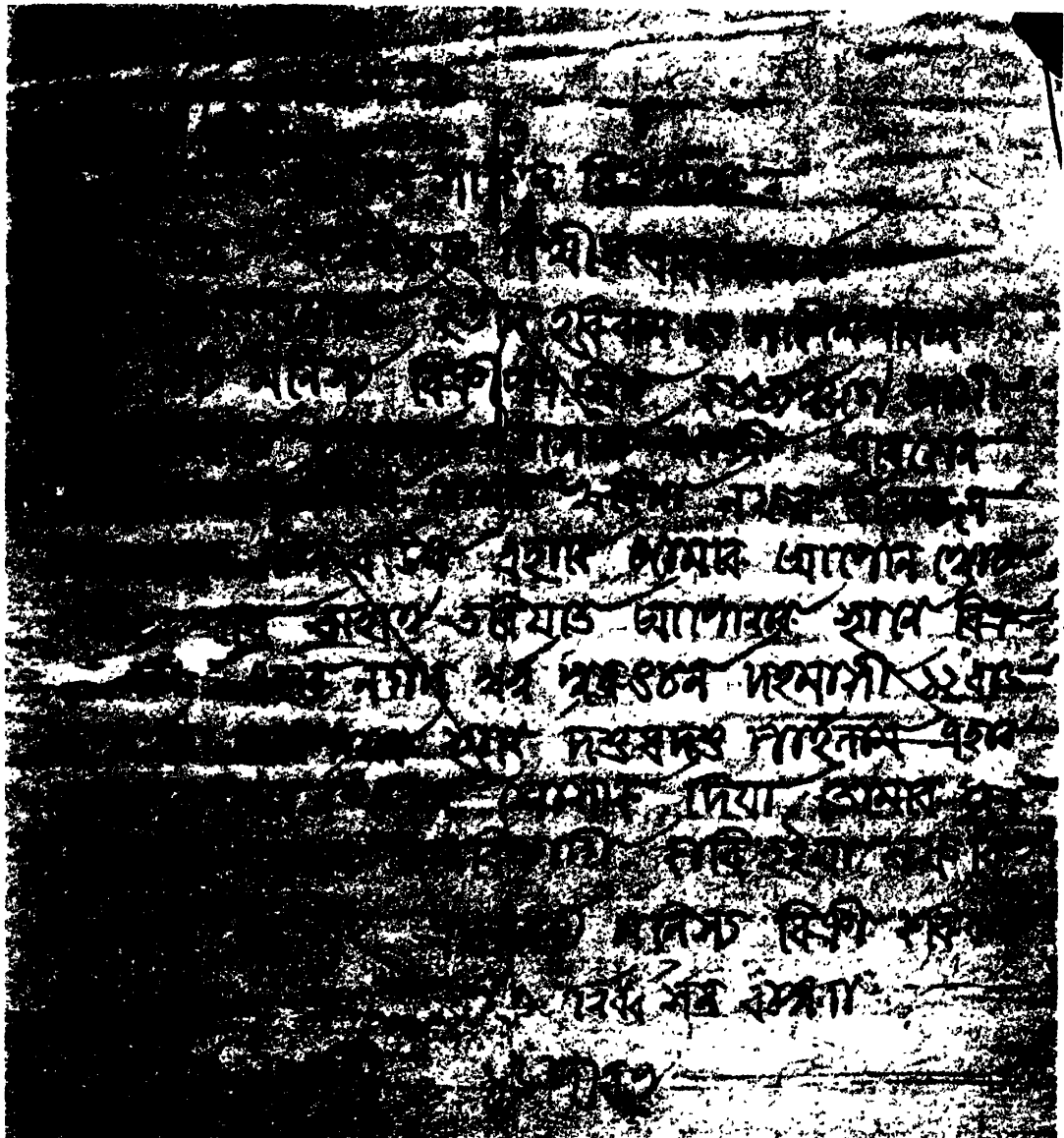
দাস বিক্রয়ের দলিল—বাংলা অংশ

শুচরিতেষু লিখীতং শ্রীরামধন দত্ত ওলদে কৃষ্ণরাম দত্ত ইভান হরিরাম দত্ত সাকীন শ্রীরামপুর কস্য মনিস্য বিক্রী-পত্রমিদ কার্জঞ্চগে আমী মহোত্তুর্বিক্যে হালাক পেড়াসান আছী আর কোন লক্ষ নায়াছে এসবব আমার খরিদা নফর শ্রীরঞ্জনদাস ওমর চৌদ বড়িষ এহাকে আমার আপোন খোষরাজী রুকবতে বাহাল তবিয়তে আপোনার স্থানে বিক্র করিলাম এহার নগদ মুল্য পুরওজন দহমাসী ১২ বাড় রূপাইয়া আপোনার স্থানে দস্তবদস্ত পাইলাম এহার নোওয়া জীমা খোরাক পোসাক দিয়া তোমার পুত্র পউত্রাদী ক্রেমে দানবিক্রাদী কারি হইয়া নফরি কর্ম্ম করাইতে রহ এদদর্থে মনিস্য বিক্রী করিলাম। ইতি······৫ এগা······নব্ব সন বাঙ্গলা তারিখ ১৬ শ্রাবণ—।”

দলীলের শিরোদেশে মোহরের অপর দিকে—
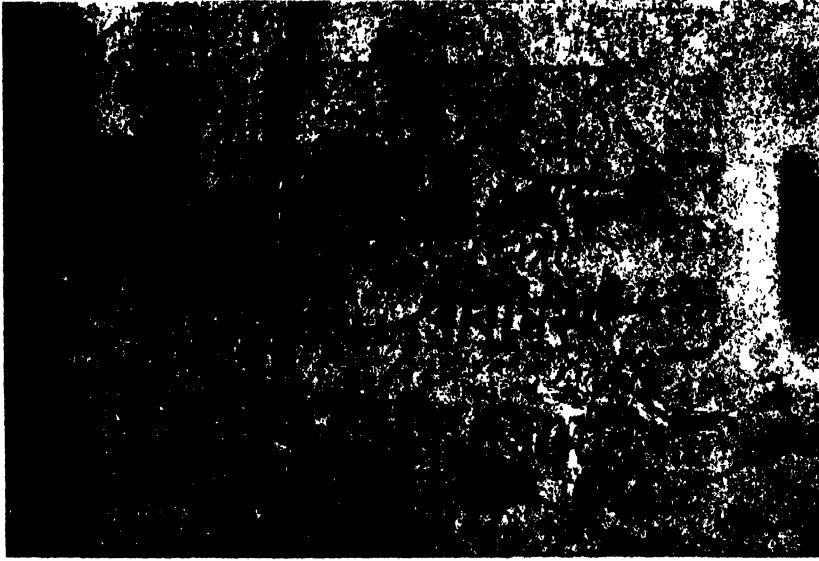
দাস বিক্রয়ের দলিল—দলিলের পিঠে সাক্ষীদের নাম

"ইসাদী—

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রায়

শ্রীগোপীকৃষ্ণ সর্ম্মা"

এবং পার্শী লেখার শেষভাগে এক পার্শ্বে

"নিসাণ সৌ

শ্রীরামধন দত্ত"

লিখিত রহিয়াছে; এবং অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের দস্তখত আছে।

এই দলীলের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও চলে, কারণ ইতিপূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু "খরিদা নফর" ও "বিক্র করিলাম" কথাতে দাস-ব্যবসায় যে বিশেষভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল তাহাই বুঝা যায়। ইহা ব্যতীত বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব এই দলীলে লক্ষ্য করিবার আছে। পূর্ব্ববঙ্গে "রাঢ়ী" ও "বরেন্দ্র" ব্রাহ্মণগণ এখনও তাঁহাদের শ্রেণীগত বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন; কিন্তু অনেক কায়স্থ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বঙ্গজ কায়স্থগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। যে রামনরসিংহ দত্ত এই রঞ্জনদাসকে খরিদ করেন, তাঁহার বংশধরগণ এখনও উক্ত সিমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহারা আমার প্রতিবেশী। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের ঘরে একখানা কুলজীগ্রন্থ আমি পাইয়াছিলাম। তাহা আমি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে দিয়াছি। ঐ কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে রামনরসিংহ দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে রাঢ়দেশে শ্রীরামপুর, বারিষা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন, পরে বঙ্গদেশে গমন করেন। এই দলীলে দাসবিক্রেতা রামধনদত্তের নিবাস শ্রীরামপুর বলিয়া লিখিত আছে। বিক্রমপুরে শ্রীরামপুর নামে কোন গ্রাম আছে বলিয়া আমি জানি না। এই দলীলে বুঝা যায় যে রামনরসিংহ দত্তের পূর্ব্বপুরুষগণ তখন সবেমাত্র শ্রীরামপুর হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন এবং তখনও তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরের সম্বন্ধ লোপ পায় নাই। দলীলের অপর পৃষ্ঠে সাক্ষীগণের যে নাম ধাম আছে তাহাতে "শ্রীতারাচান্দ পাল, সাং শ্রীরামপুর" বলিয়া লিখিত আছে। কুলজী-গ্রন্থের "আগে রাঢ়, শেষে বঙ্গে" এই উক্তি এই দলীলের দ্বারা কতকটা প্রমাণিত হয়।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু [এম-এ]

প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্র ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঝামর তাহার কেশের দোলার ঝাপ্‌টা মেরে গগন দুলায়,
সর্ব্বনাশী জালামুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল দোলে !
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে !
বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর !"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে,
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে !
এবার মহানিশার শেষে
আস্‌বে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় হাসে শিশু চাঁদের কর—
আলো তার ভর্‌বে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ-চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে—
গগন-তলের নীল খিলানে !
অন্ধকারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে !
এই ত রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? প্রলয় নূতন-সৃজন-বেদন !
আস্‌ছে নবীন, জীবন-হারা অসুন্দরে কর্‌তে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আস্‌ছে হেসে—
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়্‌তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
ঐ ভাঙা গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !—
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্ !
ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

সব পেয়েছির দেশে

সেদিন সমস্ত দুপুর ও বিকেল আমার সেই শীর্ণদেহ অ্যানার্কিষ্ট্ বন্ধুর সঙ্গে অশ্রান্ত তর্ক করে' শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। টুর্গেনিভ্ তাঁর এক নভেলে রুসযুবক সম্বন্ধে লিখেছেন—রাসিয়ানরা অফুরন্ত তর্ক চালাতে ওস্তাদ। কিন্তু তিনি যদি বঙ্গযুবকদের সঙ্গে পরিচিত থাক্তেন তবে তাঁকে স্বীকার করতে হত অপরিসীম তর্ক কর্বার অপরিমেয় শক্তিতে বঙ্গযুবকদিগের নিকট রুসযুবকগণও হার মানে; রুডিনের অপেক্ষা বাক্‌বীর এদেশে অনেক খুঁজে পেতেন। সোসিয়ালিজ্‌ম্, অ্যানার্কিজ্‌ম্, নিহিলিজ্‌ম্ কমিউনিজ্‌ম্—অনেক ইজম্-এর ঘাতপ্রতিঘাতে ম্যার্ক্‌স্, টল্‌ষ্টয়, ক্রোপট্‌কিন, লেলিন, গান্ধী, অনেক বিদ্যুন্ময় নামের স্বপ্নঘন শব্দ-উৎসবে তর্কের ঝড় উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ছিল। তর্ক হয়ত সারারাত থাম্‌তো না, ভাগ্যক্রমে আমার বন্ধুর মনে পড়ে' গেল কোন্ আড্ডায় কি বিষয় নিয়ে তাঁর অদ্ভুত বাক্‌চাতুরী দেখাবার নিমন্ত্রণ আছে। আমাকে রেহাই দিয়ে তিনি যখন গেলেন তখন সন্ধ্যার স্নিগ্ধতাহীন অন্ধকার। চেয়ারটা টেনে বারান্দায় এসে বস্‌লুম, বিষ-নিশ্বাসের মত ধূমে আতঙ্কিত নগর দুঃস্বপ্নের মত পড়ে' রয়েছে, ধোঁওয়ার কুজ্ঝটিকা পার হতে না পেরে চাঁদের আলো করুণনয়নে চাইল। রজনীগন্ধার ঝাড়টা ড্রেনের দুর্গন্ধের কাছে হার মেনে নতমুখে পড়ে' রয়েছে; দূরে গ্যাসের আলোটা যেন কোন্ চিরজালাময় তৃষ্ণা-লোকের প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ বসে' দম আট্‌কে আস্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লুম।

পথে কোথাও একটু ধোঁওয়ার কালিমা নেই; অকলঙ্ক নীলাকাশে তারালোক জুঁইফুলের ঝাড়ের মত মাথার ওপর ছেয়ে রয়েছে; সুধাসৌরভময় বসন্তের বাতাস বইছে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মনে হলো কোন্ রূপ-কথার স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যলোকে এসে পৌঁছেচি। মোড়ের কাছে যে ডাষ্ট্‌বিন্‌টা ছিল, সেটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার জায়গায় একটা সোনালী ডালিয়া ফুলের গাছ; তার পাশে যে পত্রহীন শীর্ণ কৃষ্ণচূড়াগাছ দিন দিন জীর্ণ হচ্ছিল, সেটা ফুলে ফলে ভরে' নটবর অগ্নিশিখার মত বাতাসে নৃত্য কর্‌ছে; সহসা একটা কুহু ডেকে উঠ্‌ল। অবাক্ হয়ে চম্‌কে দেখি, রাস্তার মোড়ে যে বৃদ্ধা ভিখারিণী করুণ আর্ত্তনাদে ভিক্ষা চাইত, আর যে ছোট মেয়েটা ভয়ঙ্কর ময়লা ছেঁড়া নেক্‌ড়া পরে' আঁস্তাকুড়ে আঁস্তাকুড়ে ছেঁড়া কাগজ আর নেক্‌ড়া কুড়িয়ে বেড়াত, তারা জ্যোৎস্নার মত শুভ্র নির্ম্মল বসন পরে' হাস্‌ছে আর খেলা কর্‌ছে। রোজ যখন এই পথ দিয়ে গেছি—ওই ভিখারিণীর কঙ্কালসার দেহ ভীতিপ্রদ করুণ মুখ দেখে চোখ বুজ্‌তেই ইচ্ছে করেছে; দেখেছি—মানব-শক্তি ও সভ্যতার মহাদম্ভের মত মোটরকার তার পাশ দিয়ে জয়ধ্বনি করে' চলে' গেছে, কিন্তু সে অহর্নিশি করুণ ক্রন্দনে সবাইকে এই কথাই স্মরণ করিয়েছে—মানব-সভ্যতা একদিকে মোটরকার আর একদিকে এই রোগ-দারিদ্র্যের মূর্ত্তি সৃষ্টি করে' চলেছে। আজ তার মুখের হাসি দেহের দিব্য শ্রী দেখে বহুক্ষণ চেয়ে রইলুম। মন-ভোলানো বাঁশীর তান কানে এলো। ওই কোণে যে বিড়ির দোকানটা ছিলো, সিগারেটের ও দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে তৈরী ঘরে বসে যত পক্ক ও অকালপক্ক লোকগুলো ছোট ছেলেদের নিয়ে সারাদিন বিড়ি পাকাতো আর অশ্লীল গল্প কর্‌ত, তাদের হীনবাস কালিভরা-মুখ ও বিড়ির গন্ধে স্থানটায় যেতে ঘৃণা হত—দেখি, সে বিড়ির দোকান নেই, সেখানে এক কদমফুলের গাছ উঠেছে, আর তার তলায় মুসলমান ছেলেরা লাল নীল নানা রংএর সাজ পরে' বাঁশী বাজাচ্ছে। আর ওইখানে যে মহাপঙ্কিলতাময় ভয়ঙ্কর বস্তি ছিল, যেখানে নর্দ্দমায় নর্দ্দমায় বাঁধা জল পচে, রুদ্ধ মাটির কূপে কূপে দাসত্বপীড়িত প্রাণ পচে, সভ্যতার বদ্ধস্রোত পচে' বিষিয়ে ওঠে, সূর্য্যের আলো কি জ্ঞানের আলো যেখানে পৌঁছাতে পারে না, দখিন বাতাস কি প্রেমের হাওয়া প্রবেশ কর্‌তে পথ খুঁজে খুঁজে ফেরে, পাপবিভীষিকাময় রোগাতঙ্কিত দুঃখদারিদ্র্যের চির-অন্ধকারময় রাত্রিলোকে ভূতের মত মানুষেরা ঘোরে—অবাক হয়ে দেখ্‌লুম, আদিমযুগের অসভ্যমানুষের গুহাগহ্বরের চেয়েও ভয়ঙ্কর সেই শ্রমিক জন্তুদের খোলা-

ছাওয়া মাটির গর্ত্তগুলো আর নেই—সে স্থানে নারিকেল তাল তমাল গাছের সারি, তাদের তলে তলে কাঁচ ও কাঠের ছোট ছোট কুটীর; মসৃণ শ্যামল পাতায় পাতায় লাল নীল নানা রংএর কাচের ছাদে দেওয়ালে জ্যোৎস্নার আলো রংএর হোলিখেলা করছে;—কয়েকখানি ছোট বাড়ীর মাঝে দধির মত স্নিগ্ধশুভ্র শ্বেতপাথরের বাড়ী, সেখান থেকে হাসি-গানের শব্দ আস্‌ছে, মনে হলো খুব ভোজ চল্‌ছে; লাল পাথরের জাল্‌তি দেওয়া দরজায় যে মুসলমান নারী দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে আর গল্প করছে, তার স্নিগ্ধমুখ মিষ্ট কণ্ঠ শুনে অবাক্ হলুম। বস্তির সাম্‌নের জলের কলে তার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সবাই জানে, সবার শেষে এসে নিছক গলার জোরে ও মুখভঙ্গিতে সে আপনার কলসীগুলি সবাইয়ের আগে ভরে' নিয়ে যায়। সে যাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে' গল্প করছিল তাদের মধ্যে একজন গুজরাটী আর-একজন বাঙ্গালী বাবুর বেশে থাক্‌লেও বেশ চিন্‌তে পার্‌লুম—প্রথম জন হচ্ছে আমার এক গান্ধীভক্ত নন্‌কো বন্ধু গোলদিঘিতে বক্তৃতা দিয়ে জেলতীর্থে গেছে; আর যে পুলিস সার্জ্জেনটা বন্ধুকে মেরে হাত ভেঙ্গে দিয়ে লালবাজারে ধরে' নিয়ে গিছ্‌লো, সে-ই আদ্ধির পাঞ্জাবী পরে' আতর মেখে গল্প জমিয়েছে। এ সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে এত আবিষ্ট হয়ে গিছ্‌লুম যে আশ্চর্য্য হবার মত মনের ভাব ছিল না—কিন্তু গাছের তলা ছেড়ে পথে একটু যেতেই পরমাশ্চর্য্যকর এক ব্যাপারে মনটা নড়ে' উঠ্‌ল। তারার মালার মত বেলফুলের ঝাড়ের তলায় আমাদের পাড়ার সেই সুদখোর বেনে মহাজনটা—হাঁ, সেই সুদখোর পাষণ্ডটা, ভোর হতে গভীর রাত পর্য্যন্ত তাকে কেবল বাঘের মত হিংস্র চোখ দুটো জ্বালিয়ে সিন্দুকে টাকা তুল্‌তে আর থাঁড়ার মত নাকটা হিসেবের খাতায় গুঁজে সুদের অঙ্ক কস্‌তেই দেখেছি —সে আনন্দে বেহালা বাজাচ্ছে আর শরৎসেফালির মত সুন্দর এক খুকীর সঙ্গে নাচ্‌ছে, মাঝে মাঝে চাঁপা রংএর চুলগুলোর ওপর চুমো খাচ্ছে—সোনারংটার প্রতি লোভ এখনও তার যায়নি। ব্যাপারটা দেখে' পথের মাঝখানে এক গোলাপ-গাছের তলায় বসে' পড়্‌লুম। একটু বসে'ই গাড়ীচাপা পড়্‌বার ভয় হলো; কিন্তু কোথাও কোন মোটর বা গাড়ীর শব্দ নেই, এ রাস্তা দিয়ে যেন কখনও কোন গাড়ী চলে না।

বসে' ভাব্‌ছি, এ কোন্ অদ্ভুত দেশে পৌছুলুম, না জানি এবার কি বিচিত্র কাণ্ড ঘট্‌বে। বেশীক্ষণ ভাব্‌তে হলো না, দেখি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রেঞ্চম্যানের মত সেজে এক যুবক এক বাঙ্গালী মেয়ের হাত ধরে' গান গাইতে গাইতে আস্‌ছে—

'চলি গো চলি গো, যাই গো চলে',
পথের প্রদীপ জ্বলে গো—গগনতলে।'...

তারা এসে আমার গাছের কাছে দাঁড়ালো, ভেবেছিল হয়ত জায়গাটায় কেউ নেই। গাছের তলাটা আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত ভেবেই দাঁড়িয়ে উঠ্‌লুম। আমার মুখে পথের আলো পড়্‌তেই রবেস্‌পেয়ারের মত সাজপরা যুবকটি আনন্দের সঙ্গে ডাক্‌লে, 'বন্ধু, তুমি!'

ভালো করে' চেয়ে দেখি এ যে আমার সেই রেভলিউ-স্যানিষ্ট্ বন্ধু। কি আশ্চর্য্য, তার শীর্ণদেহ লাবণ্যে ভরে' উঠেছে, চোখের চশ্‌মাটা খসে' গেছে, আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য তার হাতে কোন বই নেই, আছে একটা বাঁশী। সে কোন তর্ক সুরু কর্‌লে না।

আমি বল্লুম,—'তোমাকে দেখে বাঁচ্‌লুম। এ যে কোন্ অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছি ভাই, আমি ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।'

সে হো হো করে' হেসে উঠ্‌ল, এমন প্রাণখোলা হাসি যে সে হাস্‌তে পারে তা আমার ধারণাই ছিলো না। বল্লুম,—'তুমি যে ভাই এমন গান গাইতে পারো এটা এতদিন লুকিয়ে রাখা তোমার ভয়ঙ্কর অন্যায় হয়েছে।'

হাসিটা কোনমতে থামিয়ে সে বল্লে,—'এ হচ্ছে সব পেয়েছির দেশ, জানো না কবি বলে' গেছেন,—"যে যায় সে গান গেয়ে যায়, সবপেয়েছির দেশে।"'

আমাদের পাশ দিয়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বাউলের বেশ পরে' এক হরিণ-শিশু কোলে নিয়ে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে' গেলো, তার পেছন পেছন নৃত্য-দোদুল ছোট ছেলের দল।

বন্ধুর দিকে চেয়ে বল্লুম—'এ দেশটা দেখ্‌বার জন্যে আমার অনেকদিন থেকেই খুব ইচ্ছে। আমি ত ভাই

এদেশের পথ চিনি না, মানুষদেরও জানি না, তুমি যদি আমার সঙ্গী হও। তোমার কোন কাজ নেই ত?' তার পাশের সঙ্গিনীর কথা আমার সত্যি মনে ছিল না।

বন্ধুটি আবার অট্টহাস্য করে' উঠ্‌ল, বল্লে—'এ দেশের ত পথ চিন্‌তে হয় না, সব পথই ত পথ, অপথ কোথাও নেই; আর লোকদের চেনা—পথের ধারে কি অচেনা ঘরে যাকে ভালো লাগ্‌বে, ভালো বাস্‌তে ইচ্ছে কর্‌বে, তাকে বন্ধু বলে' ডাক্‌লেই হলো, সে তোমার চিরপ্রিয় হয়ে গেলো।—আর কাজের বালাই এখানে মোটেই নেই, সব সময়ের ছুটি—যে যা কর্‌বে তাই তার কাজ।'

হাওয়ায় গোলাপকুঞ্জটা দুলে উঠ্‌ল, কানের কাছে এস্রাজের ঝঙ্কার উঠ্‌ল, ফিরে দেখি বন্ধুর তরুণী সঙ্গিনীর চন্দনকাঠের এস্রাজটা আমায় ডাক্‌ল 'বন্ধু!'

জ্যোৎস্নাধৌত আকাশের নীলিমার মত নীলসাড়ি অরুণ-কুসুমমঞ্জরী জড়িয়ে ঝলমল কর্‌ছে, যমুনাজলের মত কালো কেশে কেতকীকদম্বের মালা জড়ানো, চম্পক-অঙ্গুলির স্পর্শে সোনার তারগুলিতে ঝঙ্কার দিয়ে তারার আলোর মত পথ-ভোলানো নয়নে চেয়ে ডাক্‌লো,—'বন্ধু!'

ধীরে এগিয়ে পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত তার আঙুলগুলি জড়িয়ে আমিও ডাক্‌লুম,—'বন্ধু!'

তরুণী মুখে কিছু বল্লে না, এস্রাজের তারে কথা বেজে উঠ্‌লো,—এসো, আমি তোমার সঙ্গিনী হয়ে এ দেশ দেখাচ্ছি।

অবাক্ হয়ে আমার পুরানো বন্ধুর দিকে চাইলুম। তরুণী এস্রাজটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ঝর্ণার সুরে বল্লে,—'এসো বন্ধু!' আমার হাত ধরে' টেনে নিয়ে চল্ল।

অ্যানার্কিষ্ট্ বন্ধুটি মুচ্‌কে হেসে বল্লে, 'না, না, আমি একটুও রাগ কর্‌ছি না। জানো, এ দেশে ঈর্ষ্যাবিদ্বেষ নেই। কোন ভয় নেই তোমার। ওই দেখ্‌ছ লালডোরা-কাটা বাসন্তী রংএর সাড়ি-পরা ছোট খুকীটি, একটা খর্‌গোস কোলে করে' আস্‌ছে, ওর সঙ্গে ভাব করে' আমি এখুনি এখানে বাঁশী বাজাতে বসে' যাব।'

অন্য সময় হলে আমার বোধহয় ভয় হোত। সে দেশের হাওয়ার কি গুণ ছিল,—আমার একটুও দ্বিধা সঙ্কোচ হলো না, দু'জনে হাত ধরাধরি করে' চল্লুম; সবচেয়ে আশ্চর্য্য—তরুণীর সঙ্গে আমি গান জুড়ে দিলুম, গলা ঠিক মিলে গেল, একটু বেসুর হল না।

সে থেমে বল্লে—তুমি গান্ধীযুগের লোক, নয়?

—হাঁ। কেমন্ করে' বুঝ্‌লে?

—তোমার ওই মোটা খদ্দরের সাজ দেখে'। আমি ইতিহাসটা ভালো করে' পড়েছি কিনা, তাই তোমায় সব দেখাবার ভার নিতে সাহস হলো।

—সাজটা এদেশের মত করে' নিতে পার্‌লে ভালো হয় বোধ হয়।

—কি দর্‌কার, এখানে যে যার নিজের খুসিমত সাজে। ওই ছেলেটা দেখো ইউরিপিডিস্-যুগের গ্রীকের মত সেজে চলেছে আর তার পাশের বন্ধুটি ক্লিয়োপেট্রার সময়ের ঈজিপ্সিয়ান নারীর মত সেজে যাচ্ছে। তোমার কি কাপড়-জামা বদ্‌লাতে ইচ্ছে কর্‌ছে?

—হাঁ, এ দেশের মত।

—বল্লুম ত এ দেশের কোন বিশেষ সাজ নেই, আপন সৌন্দর্য্যবোধ অনুসারে যে যা-খুসি সাজে, যে কোন গত-শতাব্দীর যে কোন দেশের সাজ পর্‌তে পারে।

পথের দুইধারে গাছের সারির মধ্য দিয়ে চল্লুম। গাছের পাতার মাঝে মাঝে লাল নীল সাদা নানা রংএর আলো মাণিকের মত জ্বল্‌ছে।

বল্লুম—ওগুলো কি ইলেক্‌ট্রিকের আলো?

হেসে বল্লে,—না, ইলেক্‌ট্রিক কি, আমরা রেডিয়ামের যুগও পার হয়ে এসেছি। ওগুলো হচ্ছে মণি, ওই ইন্দ্র-নীলমণি, ওই চন্দ্রকান্তমণি…

—কি সুন্দর দেখ্‌তে, কিন্তু তোমার এস্রাজটা যে ফেলে এলে!

—ফেলে এসেছি কি?

—হাঁ সেই গোলাপ-গাছের তলায়।

—ও, তুমি আজ নতুন কিনা, তুমি জানো না এ দেশের কথা; এখানে প্রত্যেক জিনিষ হচ্ছে সবাইয়ের জিনিষ, যার যখন যে-জিনিষ দর্‌কার সে সে-জিনিষ ব্যবহার করে।—আমি ত এখন এস্রাজ বাজাচ্ছি না, অবশ্য কোনো দোকানে রেখে এলে ভালো হত—তা

ওটা যার দরকার হবে গাছতলা থেকে তুলে নেবে।—তোমার কি বাজনা শুনতে ইচ্ছে করছে?

—হাঁ, একটা গাও না কিছু!

—দেখি এ কুসুমগুলোর কাছে নিশ্চয়ই কেউ কোন বাদ্যযন্ত্র রেখে গেছে। এই দেখো, একটা বীণ পাওয়া গেলো!

—তুলে নিলে যে, কা'র ওটা?

—কা'র কি! এখানে সব জিনিষ যে প্রত্যেকের জিনিষ। বীণ্‌টা আমার দরকার হয়েছে আমি নিয়ে চল্লুম, বাজানো শেষ হলে কাউকে দিয়ে দেবো অথবা কোথাও রেখে যাব।

বীণ্ বাজাতে বাজাতে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম—তার মেজেটা লাল মার্ব্বেলের, দেয়ালগুলো নীল কাঠের আর ছাদটা হীরের মত সাদা কাঁচের। ঘরের মধ্যে জাপানী-পোষাক-পরা এক যুবক এক ষ্টোভে গরম গরম বেগুনী ফুলুরী ভাজ্‌ছে, আর লাল ভেল্‌ভেটের ফ্রক পরা এক খুকীকে মহানন্দে খাওয়াচ্ছে।

আমি বল্লুম—কি সুন্দর বেগুনীগুলো ভাজ্‌ছে!

—তোমার ভারি লোভ হচ্ছে? এসো না কিছু খাওয়া যাক্।

—না, নিশ্চয় পচা তেল।

—কি, পচা! অবাক কর্‌লে তুমি, সবপেয়েছির দেশের এতবড় অপমান কেউ কখনও করেনি। এখানকার সব জিনিষ তাজা, সব মানুষ চিরনবীন, সতেজ স্বাধীন—এসো তুমি।

আমরা কাছে পৌছতেই জাপানীটি বল্লে—এসো বন্ধু, আমার ভাজা শেষ হয়েছে, তোমাদের কি আমি ভেজে দেবো?

তরুণী বল্লে—না, আজকে আমার নতুন বন্ধুকে আমি নিজ হাতেই ভেজে খাওয়াব।

যুবক ও খুকীটি কয়েকখানি বেগুনী মহানন্দে খেতে খেতে চলে' গেল।

আমি বল্লুম—ও দোকান ছেড়ে গেল কোথায়?

অয়স্কান্তমণিময় বঁটিতে নীলবেগুনগুলো ফালা কর্‌তে কর্‌তে বন্ধু হেসে বল্লে—আহা তুমি ভুলে যাও কেন, এ দোকান যে সবাইয়ের দোকান, এখানে private property বলে' কোন হাস্যকর জিনিষ নেই। আমাদের বেগুনী খাবার ইচ্ছে হলো, আমরা ভেজে খেয়ে গেলুম। তুমি কড়ায় তেলটা চড়াও অথবা বীণ্‌টা বাজাও, বেগুনী ভাজার সঙ্গে সঙ্গে তারের সুর ভারি সুন্দর শোনাবে।

নিঃসঙ্কোচে বীণ্‌টা তুলে নিলুম এবং আশ্চর্য্যের বিষয় মন্দ বাজালুম না।

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—এটা কি ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভ?

—হাঁ, এটা অনেক শতাব্দীর আগেকার জিনিষ; এখন সবচেয়ে নতুন রান্নার উনুন হচ্ছে সূর্য্যমণি—সে আর-কিছু নয় একটা পাত্রে সূর্য্যের তেজ জমা করা হয়, তার আগুনের শিখায় বেশ রান্না করা যায়;—আর এই ষ্টোভের ইলেক্‌ট্রিসিটিও সূর্য্যের আলো থেকে নেওয়া—না, না, দেখ্‌ছি বর্ষার জলধারা থেকে জমা করা।

খুব আনন্দের সঙ্গে রান্না আর খাওয়া শেষ হলো, তারপর বন্ধু দক্ষিণ-হাওয়ার মুখে রাঁধ্‌বার যন্ত্রটা কি রকম কায়দা করে' রাখ্‌লে।

বল্লুম—ওটা কি হলো?

—অনেকখানি ত আগুন খরচ কর্‌লুম, হাওয়া থেকে কিছু আগুন ওতে জমা হোক।—রোসো জায়গাটা পরিষ্কার করে' যাই।

ঘরের কোণ থেকে সোনার সরু কাটির গুচ্ছের মত একটা ঝাঁটা টেনে নিয়ে বন্ধু ভারি খুশি হয়ে সমস্ত ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ কর্‌লে। দেখ্‌লুম ঝাঁটার কাটিগুলি থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে' মেজেটাকে ধুইয়ে দিচ্ছে, কোন ধূলো উঠ্‌ল না।

বল্লুম—ঝাঁটাটা ত ভারি মজার।

—আর ঝাঁট দিতেই কি মজা কম?

—বাস্তবিক ঝাঁট দিতে ভারি আনন্দ পাচ্ছ দেখ্‌ছি। তোমরা পৃথিবীর শ্রী কিনা, অসৌন্দর্য্য তোমাদের সয় না, সব মলিনতা আপন হাতে নির্ম্মল সুন্দর করে' তুল্‌তে চাও। কিন্তু ঝাঁটার মুখটা যতক্ষণ মাটির বুকের দিকে থাকে ততক্ষণই ভাল, আকাশের দিকে উঠ্‌তে চাইলেই মুস্কিল হয়।

—হাসালে তুমি, অমন কাণ্ড এদেশের নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে ছাড়া আর কোথাও হয় না।

ঘর পরিষ্কার করে' পথে বেরিয়ে পড়্‌তেই আমি বল্লুম—কিন্তু একটু ত জল খাওয়া হলো না।

—জলতেষ্টা পেয়েছে? চলো সাম্‌নের বাড়ী যাওয়া যাক।

—ওই বাড়ীটায়? ঠিক যেন মধ্যযুগের ব্যারনদের ক্যাস্‌ল্?—জানাগুলো আছে?

—নাই বা রইলো!

—নাই বা রইলো!—trespass হয় যদি?

—কি? কি বল্লে?

—trespass—অনধিকার-প্রবেশ।

—ও, মনেই থাকে না তুমি বিদেশী।—এদেশে কার অধিকার বা কর্ত্তব্য তা কেউ জানে না, তাই নিয়ে তর্কসভা ডাক্‌তে, কমিটি কমিসান বসাতে বা বড় বড় পুঁথি রির্পোট লিখ্‌তেও হয় না;—সবাই আনন্দে কাজ করে' যায়—যার যখন যা ইচ্ছে হয়।—আমাদের জীবনের একটা principle, সেটা হচ্ছে—খুসি!

—আমার বন্ধু, খুসি হচ্ছে ওই যে মেয়েটা সবুজ ঘাঘ্‌রা ঘোরাতে ঘোরাতে ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল দুলিয়ে লোহার চাকাটা বোঁ বোঁ করে' চালিয়ে চলেছে, ওর সঙ্গে একটু চাকা ঘোরাই।

—তা চলো না! বা এই যে দুখানা চাকা পড়ে' রয়েছে, কাটি সুদ্ধু—চলো—

সত্যিসত্যিই দুজনে দুখানা চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে চল্লুম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই, রাস্তার কোণে বেণুবনের তলায় যে ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতেরা প্রবীণাদের সঙ্গে বসে' গল্প কর্‌ছিলেন, তাঁরা একটুও আপত্তি জানালেন না, একটু ভ্রূকুটিও কর্‌লেন না।

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে আমরা এক বড় রাস্তায় এসে পৌঁছুলুম। বন্ধুর চাকাটা বলে' উঠ্‌ল—এবার আমরা দোকানের রাস্তায় এসে পড়েছি!

আশ্চার্য্য, এদেশের মেয়েরা, এরা লোহার চাকা থেকে মিষ্টি কথা বের কর্‌তে পারে।

চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে বন্ধু এক লাল কাচের বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌ল। এ বাড়ীগুলোর কোন দরজা লাগানো নেই, দরওয়ানও নেই। আমিও বন্ধুর পেছন পেছন গিয়ে সবুজ মখ্‌মলে মোড়া ঘরে চাকাসুদ্ধু ঢুকে ভারি অপ্রস্তুতে পড়্‌লুম, ভাব্‌লুম এবার বুঝি দোকানের লোক-গুলো তেড়েই আসে। কিন্তু একটি যুবক ও নারী হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের দিকে অগ্রসর হলো দেখে' ভরসা হলো। একজনের সাজ লাল সিল্কের, রাজপুতের মতো; আর একজনের সাজ ইরাণী সুন্দরীর মত। আমার তরুণী বন্ধু চাকাটা গলায় মালার মত ঝুলিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হেসে বল্লে—আজকের রাতে কি সাজ করা যায় বল তো রাজপুত?

—তুমি যেরকম চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে এলে, আজ জিপ্সির সাজ পরো।

—আচ্ছা বেশ। আমার এই নতুন বন্ধুকে একটি বেশ ভালো সাজ দাও। এঁর গান্ধীর খদ্দর পছন্দ হচ্ছে না।

ইরাণী বল্লে—আচ্ছা এঁকে বেদুয়িন্ সর্দ্দার সাজিয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা তাই, তা হলে শীগ্‌গীর আমাদের দাও।

আমি দেখ্‌লুম, বড় ঘরের চারদিকে কত রংয়ের কত রকমের সাজসজ্জা টাঙ্গানো, যেন একটা বড় সিনেমা কোম্পানির গ্রীন্‌রুম। আফ্রিকার অসভ্যদের সাজ, গ্রিন্‌ল্যাণ্ড-বাসীদের সাজ থেকে চীনে জাপানী কতরকমের সাজসজ্জা। বন্ধুটি বল্লে—এই দুইজনের পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সাজসজ্জা সম্বন্ধে জ্ঞান অদ্ভুত।

বন্ধু জিপ্সি-তরুণী সাজ্‌লে, রক্তের মত লাল মখ্‌মলের ঘাঘ্‌রা, উষার মত অরুণ-বরণ সিল্কের জামা, তার ওপর সমুদ্রের মত নীল ওড়্‌নায় তারার মত হীরের কুচি জ্বল্‌ছে, মুক্ত বেণীর সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মালা জড়ানো। বেদুয়িন-সর্দ্দারের জমকালো সাজটা পরে' আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম যে পুরানো জামাকাপড়ের কথা মনে ছিল না। জিপ্সি সুন্দরী বল্লে—বেশ সাজ হয়েছে তোমার, চলো। তখন মনে পড়্‌ল পকেটে যে অনেক টাকা ছিল। তাড়াতাড়ি খদ্দরের পাঁ'বাটা ইরাণীর হাত থেকে ছিনিয়ে পকেট থেকে নোট টাকা বের কর্‌তে কর্‌তে বল্লুম—কত দাম দিতে হবে এর, সাজের কত দাম?

আমার কোন কথা যেন না বুঝ্‌তে পেরে তিনজনে আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

আমি আবার বল্লুম—কত দাম, খুব বেশী নাকি?

তরুণী তখন মধুর হেসে বল্লে—এ আজ নতুন এসেছে। বন্ধু, এ দেশে ত কোন জিনিষের দাম দিতে হয় না; সে ব্যবসার বর্ব্বরতার যুগ অনেকদিন কেটে গেছে—আমাদের ত কোন টাকাই নেই!

আমি কাপড়-জামাগুলো তুলে গুটিয়ে নিচ্ছি দেখে' সে আরও হেসে বল্লে—ও কাপড়-জামার বোঝা কেন মিছে বয়ে মরবে? যদি পরে পর্‌তে ইচ্ছে হয়, এ দোকানে কিম্বা যে-কোন দোকানে গিয়ে পাবে।

আমার হাতের টাকা সিকি দুয়ানি দেখে ইরাণী আনন্দে লাফিয়ে আমার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে' নিজের হাতে ছিনিয়ে নিয়ে বল্লে—কি মজার জিনিষ, এগুলো কি?

—আমাদের দেশের টাকা।

—আগেকার লোকগুলোর একটুও সৌন্দর্য্য-বোধ ছিল না, আমাদের দেশের ছেলেরা যে টাকাগুলো নিয়ে খেলা করে সেগুলো এর চেয়ে ভাল দেখ্‌তে। তাতে এর চেয়ে ভালো ছবি আছে।—কি একটা ছবি—কার?

—আমাদের রাজার।

—রাজা! এই রকম রাজা?

রাজপুত বল্লে—চলো আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধুর কাছে, সে সব বলে' দিতে পারবে—এ রাজা কোন্ যুগের কোন্ দেশের ছিল, এর মন্ত্রীরা কিরকম যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করত।

আমি ধীরে বল্লুম—তোমাদের রাজা নেই?

তরুণী ধীরে আমার হাত ধরে' বল্লে,—আছে বৈকি বন্ধু! আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাজা; আবার তুমি আমার রাজা, আমি তোমার রাজা! এসো তোমায় বাজারটা দেখাই।

বাইরে বেরিয়ে এলুম। দুধারে ছোট ছোট বাড়ীর সারি, কোনটা কাঠ ও কাচের, কোনটা নানারংএর পাথরের, কোনটা পর্ণকুটীর, কোনটা মন্দিরের মত! মাঝে মাঝে বেণুপথ, লতাকুঞ্জ, পুষ্পবীথিকা। বাড়ীর দেওয়ালে মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা; থিয়েটারের, চুরুটের, ঔষধের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কোন বিজ্ঞাপনের বিশ্রী কাগজ মারা নেই, ব্যবসাদারদের সুপ্রচুর মিথ্যাকথায় ভরা লাল নীল নানা রংএর কাগজে কালীতে দেওয়ালগুলো কদর্য্য হয়ে ওঠেনি, এমনকি দোকানের সাম্‌নে কোন সাইন্‌বোর্ডও নেই। জুতোর দোকানের সাম্‌নে মস্ত জুতো ঝুল্‌ছে, জামার দোকানের সাম্‌নে জামা।—কি শান্ত স্নিগ্ধ সব! শুধু মানুষের পায়ের চলার ধ্বনি, গানের সুর আর হাসির শব্দ।

এ পথ ছাড়িয়ে এক প্রশস্ত পথে এসে পড়্‌লুম। এক-কোণে কয়েকটি মণির অক্ষরে জ্বল্‌ছে, 'মালবিকা'।

বল্লুম—ওটা কি!

—ও হচ্ছে এ পথের নাম। মালবিকা এক প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিল, তাঁর নামেই পথ। এ দেশে ত গভর্ণর বা বড়-লোক নেই যে তাদের নামে প্রতিদিনের চল্‌বার পথ হবে?—যারা সত্যিকার হৃদয়জয় করে' যায়, যেমন শিল্পী কবি বৈজ্ঞানিক, তাদের নামেই পথ হয়।

—আচ্ছা তোমাদের দেশে কি কোন গাড়ী নেই?

—আমরা পায়ে চল্‌তে এত আনন্দ পাই যে গাড়ীতে চড়ি না। অবশ্য মোটর ট্রাম, সেই-সব বীভৎস শব্দকারী যন্ত্রযান-জন্তুগুলি নেই।—আচ্ছা চলো মঞ্জুলিকা পথ দিয়ে।

—মঞ্জুলিকা কে?

—সে ছিল এক গায়িকা। সুরসায়রের শতদলের মত ফুটে উঠেছিল। সে অফুরন্ত গান গেয়েছে আর তার বন্ধু ভক্তেরা তার গলার সুরের সঙ্গে ঝুড়ির পর ঝুড়ি মাটি কেটেছে, রাস্তা তৈরী করেছে।

কিছুদূর গিয়ে এক শ্বেতপাথরের গম্বুজের সাম্‌নে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লুম—কি সুন্দর! যেন এক-ফোঁটা চোখের জল জমাট হয়ে গেছে, জ্যোৎস্নায় টলমল কর্‌ছে।

তরুণী বল্লে—হাঁ, মঞ্জুলিকার গানে যে-সব শিল্পীদের প্রাণ জেগে উঠেছিল তারাই দিনরাত ধরে' আপন প্রাণের ব্যথা ও আনন্দ দিয়ে গানের সুরের সঙ্গে অশ্রুজল মিশিয়ে এই নির্ম্মল শুভ্র মর্ম্মরতাজ গড়েছে।—এ ত প্ল্যান করে' রাজমিস্ত্রীদের মাহিনা দিয়ে পাথরের পর পাথর বসিয়ে গড়া নয়?

সেই শিল্প-সৌন্দর্য্যের সাম্‌নে মাথা নত হয়ে এলো। একটু জনবহুল পথে গিয়ে পড়্‌লুম।

বন্ধু বল্লে—এই দেখ আমাদের দেশের গাড়ী। জন্তুদের মত দেখ্‌তে বটে ওরা, সত্যি জন্তু নয়।

একটি লাল ঘোড়ায় চড়িয়ে মা তাঁর ছেলেকে টেনে নিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, এক বুড়োকে এক ভেড়ার ওপর বসিয়ে তার নাৎনী টান্‌ছে আর হাস্‌ছে, এক ময়ূরের গাড়ীতে বসিয়ে প্রেমিক তার প্রিয়াকে ফ্লুট বাজাতে বাজাতে টেনে নিয়ে চলেছে। সব শব্দ একটা গানের সুরের মত বাজ্‌ছে।

বল্লুম—এ যে সব মানুষ-টানা গাড়ী!

—না, গাড়ীগুলো নিজেরাই যেতে পারে, ওরা ইচ্ছে করে' টান্‌ছে। কি আনন্দে হাস্‌ছে দেখ্‌ছ!

রাজহংসের মত একটি মখ্‌মলে-মোড়া গাড়ী পথের পাশে পড়ে' ছিল, বল্লুম—তুমি একটু বসো না, আমি একটু টানি।

গর্ব্বোৎফুল্ল মুখে হেসে বন্ধু বল্লে—না, পায়ে চল্‌তেই আমার বেশ লাগ্‌ছে।

এ পথ পেরিয়ে এক পদ্মবনের ধারে এক বড় বাড়ীর সাম্‌নে এসে পৌছলুম।

—এত বড় বাড়ী ত আগে কোথাও দেখিনি?

—এটা সবাইয়ের খাবার বাড়ী কি না, তাই একটু বড়। বড় বাড়ী আমরা তৈরী করিনি. বিংশ-শতাব্দীর কয়েকখানা বড় বাড়ী ভাঙা হয়নি। ওই যে দূরে বাড়ী-খানা দেখ্‌ছ ওটা নাকি ছেলে-মেয়েদের কলেজ ছিল, এখন আমরা ময়দার গুদাম ছাড়া কোন কাজে লাগাতে পারিনি।

—বাড়ীর কিন্তু গুণ আছে, এর সাম্‌নে এসেই আমার স্থিদে পাচ্ছে।

—এসো না কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্—কি রকম ভাবে খাবে বল তো!

—কি রকম মানে?

—কারুর বাড়ীতে উঠে তার অতিথি হয়ে খেতে পারো, অথবা দোকান বা ভাণ্ডার থেকে জিনিষ এনে গাছের তলায় আলাদা রান্না করে' খেতে পারো, অথবা সাধারণ ভোজনাগারে গিয়ে।

—তোমাকে তো একবার রাঁধালুম, আর কষ্ট দেবো না—চলো এই খাবারের বাড়ীতেই ঢোকা যাক্।

মার্ব্বেলের প্রাসাদে ঢুকে পড়্‌লুম। সাম্‌নেই শ্বেত-পাথরে-গড়া শঙ্খধবল লক্ষ্মীর মূর্ত্তি, তারপর সাদা মার্ব্বেলের প্রকাণ্ড ঘর। লাল নীল কত রংএর আলো জ্বল্‌ছে, চারিদিকে ছোট ছোট নানা রংএর পাথরের কারুকার্য্যময় টেবিল, তাদের ঘিরে চন্দনকাঠের চেয়ার মখ্‌মল-মোড়া।

হংসমিথুন-আঁকা এক রাজহংসের মত সাদা পাথরের টেবিলে এক কোণে আমরা দুজন বস্‌লুম।

—কে আমাদের খাবার এনে দেবে?

—তুমি ভাব্‌ছ খান্‌সামাকে ডাক্‌বে?—এখানে হয় কোন বন্ধু আনন্দের সঙ্গে খাওয়ায়, না হলে নিজেরা রেঁধে খাবার জিনিষ বয়ে নিয়ে আস্‌তে হয়।

আমাদের টেবিলের একপাশে কয়েকজন পাকা আমের মত বৃদ্ধ গল্প কর্‌ছে দেখে' আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌লুম, তারপর দেখ্‌লুম, দিদিমা-ঠাকুমাদের মত অনেক প্রৌঢ়া নারী তসর-গরদের কাপড় পরে' প্রতি টেবিলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বন্ধু আমার দিকে একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লে-কোন ভয় নেই, এদেশের বৃদ্ধেরা বিভীষিকার বস্তু নন, বুঝ্‌লে?—এখানে যারা রেঁধে আনন্দ পায় তারা রাঁধ্‌তে আসে, আর যারা খাইয়ে আনন্দ পায় তারা খাওয়ায়। ওই বর্ষীয়সীরা প্রতি টেবিলে খাওয়ানো তদারক করে' বেড়াচ্ছেন।

আমরা বস্‌বার একটু পরেই মোগল-বেগমের মত সাজ পরে', কেশে কেতকীর মালা জড়িয়ে এক বালা আমাদের কাছে হেসে দাঁড়িয়ে বল্লে—বন্ধু, তোমরা কি খাবে বলো, আমি আজ এক বাদ্‌শাহী পোলাও আর কাবাব রেঁধেছি, তোমাদের খাওয়াতে পার্‌লে ভারি আনন্দ পাব।

আমি হেসে বল্লুম—তোমার যা-খুসি নিয়ে এসো।

তার পেছনে তার বন্ধু মোগল-বাদ্‌শার বেশ পরে' দাঁড়িয়ে ছিল, সে বল্লে—কিসের থালায় আন্‌ব? রূপোর, না কাঁচের, না মাটির?

—কাঁচের থালাতেই নিয়ে এসো।

অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলুম,—কত রকমের সাজ!

কেউ রূপকথার রাজকন্যা, কেউ কোন উপন্যাসের নায়ক, কেউ কোন নাটকের নায়িকা, কেউ ইরাণী, কেউ নরওয়েজিয়ান, কেউ জাপানী, কেউ মেক্‌সিক্যান। কোনো টেবিলে কোনো কবি তার কবিতা পড়্‌ছে, কোনো টেবিলে মুখে মুখে গল্প হচ্ছে অথবা গল্পপাঠ চল্‌ছে, ঘরের কোনো কোণে একটা ছোট অভিনয় চল্‌ছে। হঠাৎ এক কোণে পুলিসের লাল পাগ্‌ড়ী আর বিচারপতির লাল গাউন দেখে' আমি চম্‌কে বল্লুম—ওটা কি হচ্ছে বন্ধু ?

সে হেসে বল্লে—ও একটা প্রহসন হচ্ছে। তোমাদের যুগে কি রকম আইনের বিচার হোত, আমাদের ফার্সের দর্‌কার হলে তারই অভিনয় করি।

কাশের মত সাদা লীলাপদ্ম-আঁকা কাচের থালায় বেগম রাঙা পোলাও দিয়ে গেলো। কাবাবটা মুখে দিতে বন্ধু বল্লে—ভেবো না এটা মাংস।

—মাংসের চেয়ে সুস্বাদু খেতে।

—এ দেশে ত জন্তু বধ হয় না।

পোলাও শেষ হতে না হতেই এক চীন-রমণী টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কোনো চীনে ডিশ্‌ খাবে ?

—খুব খাব।

ড্রাগন-আঁকা একটা চীনেমাটির ডিশ্‌ নিয়ে সে কি আন্‌তে গেল।

আমাদের পাশের টেবিলে কাবুলী-সাজ-পরা কয়েকটি যুবক মুখে মুখে এক গল্প রচনা কর্‌ছিল। গল্পের সুতোটা সবাই মিলে টেনে টেনে যখন প্রায় ছেঁড়ে, আমার দিকে সবাই মিলে তাকিয়ে বল্লে,—ভাই, এটা শেষ করে' দাও না !

আমি কোনমতে গল্পটা শেষ করে' বল্লুম,—তা গল্পটা ত মন্দ হলো না। এখানে বুঝি কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক নেই ? থাকুলে নিশ্চয় তোমাদের তাগাদা দিয়ে এটা লিখিয়ে ছাড়্‌তেন।

আমার কথা শুনে সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে চাইল, যেন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। তরুণীবন্ধু একটু হেসে বল্লে—এ হচ্ছে নতুন বিদেশী, আমাদের দেশের কিছুই জানে না। জানো বন্ধু, আমাদের দেশে মাসিক-পত্রিকা আর খবরের-কাগজ নেই, এমন কি কোন ঘরে বইয়ের আল্‌মারি নেই। লেখক লিখেই খালাস—আর গল্প কবিতা শুনিয়েই তাঁর আনন্দ। তারপর লেখা খুব ভালো লাগ্‌লে সমজ্‌দার বন্ধুরা সেটা নিজেদের হাতে কপি করে' রাখে, আর যদি অনেক লোকেরই সে লেখাটা দর্‌কার হয় তবে সবাই মিলে প্রেসে গিয়ে নিজেরাই খেটে ছাপায় আর বন্ধুদের উপহার দেয়।

—তোমাদের তাহলে কোন মাসিক-পত্রিকা নেই ?

—পত্রিকা আছে, তবে সেগুলো ঠিক মাসে মাসে বেরয় না। লেখকরা ত আর যন্ত্র নয় ?—এই যে এখানে একখানা পড়ে' রয়েছে দেখো না।

পত্রিকাখানা তুলে নিলুম, ভেল্‌ভেট কাফে বাঁধানো, মসৃণ তুলট কাগজগুলোর উপর কি সুন্দর হাতের লেখা ! হাতে আঁকা কয়েকখানি ছবি,—মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বোঝা আর কলের ফিতের মত ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস নেই।

তুষারের মত সাদা এক কাকাতুয়া আর এক কালো ময়না কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের পাশে বস্‌ল। তাদের ভাগ দিয়ে খাওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল।

খাওয়া শেষ হলে বন্ধু উঠে বল্লে—তোমার তখন জলতেষ্টা পেয়েছিল, আমি সর্‌বৎ করে' নিয়ে আস্‌ছি, তুমি ততক্ষণ থালা-বাটিগুলো ওই জলের ধারায় ধুয়ে নিয়ে এসো।

টেবিল পরিষ্কার করে' থালা-বাটি ধুয়ে সাজিয়ে রেখে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখ্‌ছিলুম, বন্ধু সর্‌বৎ নিয়ে এলো।

মধুর মত মিষ্টি, মদের মত আবেশময় সে সর্‌বৎ, বন্ধুর অন্তরের প্রেমসুধার মত স্নিগ্ধ। তাই পান করে' সব বন্ধুদের আমাদের আনন্দ জানিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

রজনী গভীরা, নিরালা পথ, পুষ্পবীথিকার বাতাস আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌ছে, কুহুধ্বনি থেমে গেছে।

বন্ধুর হাত ধীরে টেনে নিয়ে বল্লুম—তোমার নামটা কি জানা হলো না ত বন্ধু !—

—আমার নাম ? আমার তো কোন নাম নেই, যে যা বলে' ডাক্‌বে তাই আমার নাম। আমার যত বন্ধু তত নাম।

—আমি তোমায় কি বল্‌ব ?

—যা খুসী।

—সাকী!

—সর্দ্দার!

বেণুবনপথে জ্যোৎস্না থম্‌থম্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

ধীরে বল্লুম—অনেক ত ঘোরা হলো, এবার আমায় বাড়ীর পথ চিনিয়ে দাও।

হেসে বল্লে—বাড়ী? বাড়ী কি হবে?

—এ দেশে কি সবাই পথে পথেই চলে, কেউ ঘর বাঁধে না? কারুর কি নিজের বাড়ী নেই? তোমার কি ঘর নেই বন্ধু?

তার চোখে জল ভরে' এলো, ব্যথিত স্বরে সে বল্লে—এদেশে সব সুখ, শুধু ওই দুঃখ। প্রেম এখানে স্বরাট্ বলে' প্রেমের মিথ্যা অভিনয় তো এদেশে চলে না। দুই তরুণ-তরুণী প্রাণে মিলিত হলে যেমন প্রেমের সঙ্গে আনন্দে ঘর বাঁধে, তেমি তাদের প্রেমে কোথাও একটু ফাঁকি হলেই আবার ঘর ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়্‌তে হয়।

দুজনে স্তব্ধ হয়ে চল্লুম।

বন্ধু ধীরে বল্লে—এতক্ষণ হাসি শুনে এসেছ, কান্নার সুরের মত একটা বাঁশী শুন্‌তে পাচ্ছ—নদীর ওপারে বসে' কোন্ বিরহী একা বাজাচ্ছে।—

আমার চোখ অশ্রুতে ভরে' এলো।

—ওই যে পথের বাঁকে বাঁশগাছের তলায় কুঁড়েটা দেখ্‌ছ, আল্‌পনাকাটা আঙিনায় একটি মাটির ঘৃতপ্রদীপ জল্‌ছে, দরজার গোড়ায় মাটির মঙ্গল-কলস বসানো, দেওয়ালে শঙ্খ ও চর্‌কা আঁকা, ওই যে বাঁশের বেড়ার গা ধরে' ঝুমকো-লতা উঠেছে, তার পাশে একটা হরিণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওই খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ীটায় আমি রোজ রাতে গিয়ে ওই বাঁশীর চেয়েও করুণ সুরে সেতার বাজাতে বসি,—ওই আমার একা থাক্‌বার বাড়ী।

ভাঙা গলায় আমি বল্লুম—এখন তুমি কি ওখানে যাবে? আমি তবে বিদায় নি।

ম্লান হেসে সে বল্লে—না চলো, আগে তোমায় নদীর কোনো ময়ুরপঙ্খীতে ঘুম পাড়িয়ে আসি—তারপর যাব।

পথের শেষে নদীতে এসে পৌঁছলুম। কি স্নিগ্ধ অমল জলধারা! তীরে মিলের কদর্য্যতা, জেটির গুদামের সারি নেই, মখ্‌মলের মত সবুজ ঘাসের পাড় আর গাছের সারি। শৃঙ্খল-মুক্তা নদী আনন্দে চলেছে। প্রকাণ্ড কল-দৈত্যের মত ষ্টিমার-সঙ্ঘগুলো বুকে চেপে নেই, ছোট ছোট নৌকো বলাকার মত অমল জলে যেন ঘুমিয়ে আছে।

দুজনে গিয়ে একটা তরীতে উঠ্‌লুম, পেছন থেকে কে ডাক্‌লে—'বন্ধু!' দেখি আমার সেই সোসিয়ালিষ্ট বন্ধু! আনন্দে তার হাত জড়িয়ে বল্লুম—এসো ভাই।

তিনজনে নৌকোয় গিয়ে বস্‌লুম। মণি-প্রদীপের মত একটা রেডিয়াম হালের কাছে জল্‌তে লাগ্‌ল।

সোসিয়ালিষ্ট্ বন্ধুটি বল্লে—আজ তো রাতে উৎসবের আনন্দ দেখ্‌লে, কাল দিনে কাজের আনন্দ দেখাব। সবপেয়েছির দেশের আনন্দ যেমন অফুরন্ত, তার দেখাও অফুরন্ত; সময় চাই। আজ ঘুমোও।—

"এক রজনীর তরে হেথায়
দূরের পান্থ এসে
দেখ্‌তে না পায় কি আছে এই
সব পেয়েছির দেশে।"

আমি ধীরে বল্লুম—আজ ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে বৃদ্ধ সবাইয়ের মুখে যে হাসি দেখ্‌লুম, গান শুন্‌লুম, তাতেই আমি ধন্য হয়েছি।

নৌকোর এক কোণ থেকে সেতার বের করে' সাকী ঝঙ্কার দিলে। একবার সাকীর অরুণ-বরণ সাজের দিকে আর-একবার উন্মুক্ত নীলাকাশের অনন্ত তারালোকের দিকে চাইলুম। মনে হলো, সৃষ্টির আরম্ভ হতে মানুষের বুকে একটি ক্ষুধা—তা প্রেমের ক্ষুধা, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত বুঝি এ অগ্নিশিখা অনির্ব্বাণ থাকবে।—মানুষের সব সুখ হতে পারে, কিন্তু লাখ লাখ যুগ গেলেও প্রেম-তৃষিত অন্তর জুড়াবে না।

সেতারের সুরলোক চারিদিকে সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌ল। জ্যোৎস্নাধারার দিকে চেয়ে অন্তর কানায় কানায় অশ্রুতে কি সুধারসে ভরে' উঠ্‌ল জানি না। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এলো।

* * * * *

গির্জ্জার ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজ্‌ল। বারান্দা

ছেড়ে খোলাছাদে গিয়ে দাঁড়ালুম। ধোঁওয়া কেটে গেছে, অকলঙ্ক নীল আকাশে তারাগুলো ঝলমল করছে, হাস্না-হানার গন্ধ বাতাসে ভেসে এল্লো। ইটের পর ইট, তাতে মানুষ-কীট।—ওই বস্তি ওই গলি; ওই যেখানে আলো ম্লান হয়ে এসেছে কি বীভৎসতা কি কদর্য্যতা, যন্ত্রদৈত্য-পিষ্ট স্বর্ণলোলুপ শক্তিমদমত্ত বণিক্-সভ্যতার প্রতিরূপ এই নগর যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো অতি ভীষণ জন্তুর মত অতি শ্রান্ত হয়ে পড়ে' আছে। শুধু রজনী-গন্ধার ঝাড়টা দক্ষিণ হাওয়ায় মর্ম্মর করে' বল্লে,

"নাইক পথে ঠেলাঠেলি
নাইক হাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্ রে পথের ধূলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা,
রেখে দে তোর খোঁজা!
পা ছড়িয়ে বস্ রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায় ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে!"

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু [এম-এ]

নিরুপায়

গেছে চলে' হাসি চিরতরে,
কেন গেছে কে তা জানে?
দুখের দেবতা এসো ওগো,
চুপি চুপি এসো প্রাণে।
চোখে ছলছল ভরে' লয়ে' জল বলো কথা কানে কানে।

দুঃখে কাহারো নাহি লোভ,
কেউ নাই তাই কাছে;
কারো কোনো কাজে লাগি নাই,
সবে তাই ছাড়িয়াছে;
অশ্রুর ঘোর আঁখিপুটে মোর শুধু ব্যবধান আছে!

স্তব্ধ এ অমা-নিশিথিনী,
আঁধারে ধরণী ছায়,
জানিবে না কেহ আজি যদি
এসো গো নীরব পায়।
একখানি যামী, শুধু তুমি আমি, প্রাণ আর নাহি চায়!

বলো, মুখপানে চেয়েছিলে,
জেনেছিলে সব কথা,
বেদনে বেদনা পেয়েছিলে,
বুঝেছিলে সব ব্যথা,
ছিলে নিশিদিন উপায়বিহীন বুকে চেপে নীরবতা।

বলো, হাতে তব কিছু নাই,
সকল দিয়েছ মোরে,
যা চাহিতে পারি, যাহা চাই—
দিয়েছ শূন্য করে';
সহিতেছ ভার মহারিক্ততার সকল জীবন ভরে'!

* * *

দুখের দেবতা এসো ওগো,
শোনো কথা কানে কানে;
দরদী আমার কত আছে,
ভালোবাসে প্রাণে প্রাণে—
তোমার নয়ন মুছাবার জন কেউ নাই কোনোখানে!

নিরুপায় ওগো, দ্বারে দ্বারে
ঘুরে ঘুরে লও তুলি'
কোটি বুক হতে এক বুকে
বেদনা-আঘাত-গুলি!…
তোমার বেদনা স্মরিয়া বন্ধু আমার বেদনা ভুলি!

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী [বি-এ]

রমলা

(৪)

রজত ঘরে যাইবে বলিয়া বাহির হইল বটে কিন্তু তাহার ঘরে যাওয়া হইল না। পথেই চাকর মনিয়া আসিয়া জানাইল, সাহেব ডাকিতেছেন। দোতলায় যোগেশ-বাবুর লাইব্রেরীতে মনিয়া লইয়া গেল।

কালো ওভার্‌কোট মুড়ি দিয়া ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া যোগেশ-বাবু একখানা বই পড়িতেছিলেন, রজত প্রবেশ করিতেই বইখানি টেবিলে বইয়ের গাদায় রাখিয়া চশ্‌মাটা খুলিয়া বলিলেন,—আসুন, আমি ভাব্‌ছিলুম আপনি বেড়াতে গেছেন।

নমস্কার করিয়া রজত জান্‌লার কাছে এক চেয়ারে বসিল, ধীরে বলিল,—না, এই বেরুচ্ছিলুম্।

—বেশ বেড়াবার জায়গা, কেমন লাগ্‌ছে আপনার?

—খুব সুন্দরই লাগছে, কল্‌কাতার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে ত—

—হাঁ, আমারও জায়গাটা ভারি পছন্দ, এই ধরুন retire করে' পাঁচ বছর হয়ে গেল বরাবরই এখানে আছি, তবে গ্রীষ্মকালটা কোন hillএ চলে যেতে হয়।

—পাঁচ বছর আছেন?

—হাঁ, একবার বেড়াতে এসে আমার স্ত্রীর এ জায়গা ভারি পছন্দ হয়েছিলো, তাই পেন্‌সন নিয়ে এইখানেই বাড়ী করলুম। তা, তাঁকে আর এ বাড়ী ভোগ কর্‌তে হল না, এসে প্রথম বছরেই মারা গেলেন—ওই যে পাশের ঘরটা, ওই ঘরটায়, ওটা বন্দই থাকে—

বৃদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠ উদাস হইয়া উঠিল, তাঁর শুভ্র ভ্রূর তলায় গ্রন্থপাঠক্লিষ্ট বড় বড় কালো চোখ জলছলছল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া রজত কথার ধারাটা অন্যদিকে চালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আপনাকে দমন করিয়া ধীরে বলিলেন,—ওই মা-হারা মেয়ে আমার মা হয়ে আছে। কোথায় মাধবী-মা?

—তিনি নীচে আছেন।

—আচ্ছা থাক্।

—আপনার কোনো ছেলে নেই?

—ছেলে? কি জানো বাবা, তাদের নিজের সংসার হয়েছে, বুড়ো বাপের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলো? হাঁ, আছে বৈ কি, এক ছেলে রাওলপিণ্ডিতে ডাক্তার, আর এক ছেলে সিমলা সেক্রেটেরিয়েটে আছে,—আর মেয়েই বা কি আপন বলুন, মেয়েকেও ত পরের ঘরে পাঠাবার জন্যে মানুষ করা, তা হলেও সে মেয়ে। এই ঘরভরা বই দেখ্‌ছেন, এই বই আর মা-টিকে নিয়ে বেঁচে আছি। যাক্, আপনাকে ডেকে পাঠালুম, আপনার ছবি ভারী ভালো লেগেছে; তুলির টানগুলো দিয়েছেন, যেমন bold তেম্নি আইডিয়ায় ভরা। ভাব্‌লুম কত রাজ্যের বই কিনে ত টাকার শ্রাদ্ধ কর্‌ছি, একজন দেশের' আর্টিষ্টের একটু সাহায্য করা যাক্—তাই—

—আমি আপনার ছবি যথাসাধ্য ভালো করেই আঁক্‌বো—ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকার সখ, সারাজীবন যদি রাখ্‌তে পারি—

—হাঁ, ছবি এঁকে এ দেশে পেট চলা মুস্কিল, তবে আপনার ছবি,—না, ছবি আঁকা কিছুতেই ছাড়্‌বেন না। আর দেখুন, মাধুর ছবি আঁকার ভারি সখ, ওকে একটু শিখিয়ে দিতে হবে, ও নিজে চেষ্টা করে' যা এঁকেছে, ওর একটা talent আছে বোধ হয়; না, আপনি জীবনে যে professionএই যান, ছবি আঁকা ছাড়্‌বেন না।

যোগেশ-বাবু নীরব হইলেন। কথা শেষ হইয়া গেল ভাবিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইতেই যোগেশ-বাবু বলিলেন,—ও কি উঠ্‌ছেন যে, বসুন।

রজত তাঁহার দুঃখরেখাঙ্কিত বার্দ্ধক্যজীর্ণ মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বসিল। সন্ধ্যার ছায়ায় সেই কালো ওভার্‌কোট-জড়ানো মূর্ত্তিকে বড় করুণ দেখাইতেছিল। বাঁধানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া মৃদু হাসিয়া যোগেশ-বাবু উদাস স্বরে বলিলেন,—কি জানেন রজত-বাবু, সুখ জিনিষটা, ওটা বড় রহস্যের, বড় আশ্চর্য্যের। ও কখন আসে কখন যে যায়,—আজ আপনাকে দেখে কেমন একটা আনন্দ হচ্ছে,—আর ওই রমলাকে দেখে কাল যে কি

আনন্দ হয়েছিলো, কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি, ও যে আসবে ভাবিনি। কোথায় সে ?

—তিনি কাজী-সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন দেখলুম।

—আর, ওই কাজী, আশ্চর্য্যি ও লোকটা, একটা রত্ন, সমস্ত পশ্চিম ঘুরে আমি ওকে ধরে' এনেছি; দিল্লীর কোনো বাইজীর গলায় ওর মত মিষ্টি গান শুনিনি—এখন ওর বুড়ো বয়স, ভাঙা গলা, বিশ বছর আগে ওর গলায় যা গান শুনেছি, আহা,—এই বুড়ো বয়সে ওর কবিতা আর গজল শুনে প্রাণটা তাজা রয়েছে। না হলে, এই যে বইয়ের স্তূপ দেখছেন, এই যে কাব্যগ্রন্থ, আর্টের বই, ছবির বই, শুকনো পাতা—সব শুকনো পাতা, গোলাপের রাঙা পাতা শুকিয়ে গেলে যেমন লাগে—words, words, words—ডাক দি ওই কাজীকে, ভরপুর ওর প্রাণ, জীবনের রসে ভরপুর—এই আট বছর আমার সঙ্গে আছে, কোনোদিন দেখিনি কাজী বসেছে ভালো লাগছে না,—বলিতে বলিতে আবার বৃদ্ধ থামিয়া গেলেন।

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, সামনের পাম-গাছগুলি একটু মৃদু দুলিতেছে, ঘরটা যেন কি রহস্যমায়ায় ভরা।

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—কি বলছিলুম ?

রজত আপনার অজ্ঞাতে বলিয়া উঠিল,—রমলার কথা কি বলছিলেন।

—হাঁ, রমলা, ওর মা আমার ভারি বন্ধু ছিলো, তাই ও মেয়েটাকে বড় ভালোবাসি। ওর বাবা আর আমি এক সঙ্গে বিলেত যাই, আমি I. C. S. পাশ করে' এলুম, সে ব্যারিষ্টার হয়ে এলো,—ও, বেশ মনে পড়ছে, সেনেদের বাড়ীর সে রাতটা, তখন বিভার বয়স রমলার মতনই সতেরো আঠারো হবে, আর দেখতে,—ও, কাল রাতে হঠাৎ যখন রমলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো,—দেখো, তুমি রমলার একটা portrait এঁকে দেবে।

বৃদ্ধের প্রদীপ্ত কণ্ঠ থামিয়া গেল, ঘরের অন্ধকারে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, শুধু চোখ দুইটি জলজল করিতেছে। রজত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ক্লান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—সে বিভা কতদিন চলে' গেছে, তারপর তার স্বামীও গেছে, স্বপ্নের মত মনে হয় জীবনটা, সেদিন যেন সুরু হল, আর এই ফুরিয়ে গেল,—রহস্য, মহা রহস্য, কোথায় নিয়ে চলেছো,—

শেষ কথাগুলি কোনো অজানা শক্তির উদ্দেশ্যে বলিয়া যোগেশ-বাবু ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। বাহিরের আকাশে কয়েকটি তারা দপ্-দপ্ করিতে লাগিল, ঘরের স্তব্ধ অন্ধকার যেন কিসের ভারে কাঁপিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সচকিত হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—হাঁ, কি বলছিলুম ?

রজত ধীরে বলিল,—আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আর কথা বলবেন না।

করুণ হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—শ্রান্ত নয় বাবা, পঙ্গু হয়ে পড়েছি এই বাতে। হাঁ, আচ্ছা, ওই যে অয়েল্-পেন্টিংটা দেখছেন,—অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছেন না ? কিন্তু আমি জলজল দেখছি, ও হচ্ছে আমার স্ত্রী, সেনেদের বাড়ীতেই ওর সঙ্গে আলাপ হয় সেই নেমন্তন্নর রাতে, হাঁ, বেশ মনে পড়ছে, ও গাইলে রবিবাবুর একটা গান আর বিভা একটা ফ্রেঞ্চ গান, চোখ দু'টো ভারি করুণ লাগছে, না ? কিন্তু মুখের হাসিটা কি মিষ্টি, মাঝে মাঝে যেন ঠোঁট দুটো নড়ে' ওঠে, কি কথা বলতে যায়, পারে না, বোবা, ভাষা ভুলে গেছে,—ও মরবার আগে—

যেন কোন ঘুমঘোর হইতে সজাগ হইয়া উঠিয়া যোগেশ-বাবু থামিয়া গেলেন। রজত শ্রোতা-রূপে বসিয়া থাকিলেও যোগেশ-বাবুর কণ্ঠস্বরে ও দেহের ভঙ্গিতে কাতর হইয়া পড়িতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল,—আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, চলুন একটু বাইরের হাওয়ায়।

যোগেশ-বাবু এবার সহজ কণ্ঠে বলিলেন,—হাঁ, ভারি সুন্দর রাত, আপনি বরং বাইরে একটু বেড়িয়ে আসুন, আর দেখুন, আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত ? মাধবী যথাসাধ্য দেখবে জানি, যদি কোনো অসুবিধে হয় জানাবেন।

—না, কোনো অসুবিধে নেই।

ধীরে মাধবী ঘরে ঢুকিয়া পিতার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—বাবা।

—কি মাধু, কি মা?

—চলো, একটু বারান্দায় বেড়াই।

যোগেশ-বাবুর চোখ আবার যেন ঘোলাটে হইয়া আসিল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—আচ্ছা মাধু, বিভা মরার আগে কি বলেছিলো, জানিস্?

কাতরকণ্ঠে মাধবী বলিল,—জানি বাবা, তুমি ওঠো।

রজত ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কানে যোগেশ-বাবুর করুণকণ্ঠ আসিল, বলেছিলো সে আমাকে ভাল বাসে। মাধবীর প্রদীপ্ত কথাগুলি কানে আসিল,—বাবা, চলো, তুমি আজ বড্ড বেশী পড়েছো। আবার যোগেশ-বাবুর ক্লান্তকরুণ স্বর,—আর তোর মা বলেছিলো—

আবার মাধবীর কান্নার সুরে ডাক,—বাবা!

আবার যোগেশ-বাবুর উদাস স্বর,—আমি কি তোকে ভালোবাসি না মা?

রজত সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল কিন্তু মাধবীর দীপ্ত তীক্ষ্ণকণ্ঠ কানে আসাতে থামিয়া গেল,—কে, কে দিয়েছে, কে দিয়েছে আবার বোতোল বের করে'? মনিয়া, হতভাগা ছোঁড়া।

—না, মা, মনিয়া নয়, আমি নিজে, নিজে।

ঝন্‌ঝন্ করিয়া কাঁচের গেলাস ভাঙ্গার শব্দ হইল। যোগেশ-বাবুর কণ্ঠ,—ও, তুমি কেঁদো না, তুমি কেঁদো না, ও poor dear, dear, ওই তোর মা কি বল্‌ছে জানিস, আমায় ত সারাজীবন জ্বালিয়েছো, আমার মেয়েকে জ্বালিও না—তোকে আমি কি কষ্ট দিই মা?

—বাবা, চলো বাইরে।

পাগলের মত যোগেশ-বাবু বলিতেছেন,—ও, ওঘরের দরজাটা কে খুলেছে? বন্ধ করে দিয়ে এসো, না, না, আস্‌তে দিও না, তালা ভেঙে আস্‌বে!

এক বোতোল ভাঙ্গার শব্দ হইল।

এবার মাধবীর ধীর কণ্ঠ,—বাবা, একটু স্থির হয়ে শোও।

রজত বাহিরে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইতে মাধবী তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—আপনি নীচে যান, কাজী-সাহেব যদি থাকে পাঠিয়ে দেবেন,—কাজীকে,—রমলা যেন না আসে,—শীগ্‌গীর যান।

ধীরে রজত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

কান্নাভরা সুরে মাধবীর ডাক কানে আসিল,—বাবা।

(৫)

কাজী-সাহেবকে ধরিয়া লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে রমলা এক ছোট নদীর ধারে গিয়া পড়িল। শীর্ণ স্রোত-ধারা অতি ঝিরিঝিরি বহিতেছে। বালির উপর কতক-গুলি বড় বড় কালো পাথরের স্তূপ; তাহারই উপর দুইজনে গিয়া বসিল। দূরে পাহাড়ের আড়াল দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সূর্য্যের রক্তাভা নদীর জলে ঝিলিমিলি, বালির উপর চিকিমিকি করিতেছে, অতি মৃদু বাতাস বহিতেছে।

নদীর স্থির জলে বালি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে রমলা বলিল, —কাজী-সাহেব।

পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন,—কি রমলা মা?

—আচ্ছা, কাজী, তোমার দেশ কোথায়?

দাড়িতে হাত বুলাইয়া উদাস প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন,—আমার দেশ? যেখানে থাকি সেই আমার দেশ।

—যাও, আমি বল্‌ছি, তুমি কোথায় জন্মেছিলে? আমার মত তো তোমারও বাবা মা নেই, কিন্তু তাঁরা কোথাকার লোক ছিলেন?

—কেন মা?

—তোমায় দেখ্‌লে মনে হয় তুমি যেন একটা রহস্য, তাই জান্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

—আমি জন্মেছিলুম—এই মাটির বুকেই জন্মেছিলুম।

—যাও বল্‌বে না, তাহলে তোমায় কক্ষনো পিয়ানো শোনাবো না, পাকা চুলও তুলে দেবো না।

—সত্যি মা, আমি পথের ধূলায় জন্মেছিলুম, কোন্ ঘরহারা মা যে আমায় পথে জন্ম দিয়ে গিছ্‌লো তাঁকে ত আমি জীবনে দেখিনি।

কাজীর একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া রমলা বলিল,—সত্যি, তোমার গল্পটা বলো না—

—আগ্রায়, যমুনার ধারে এক গাছের তলা থেকে আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যিনি মানুষ করেন, তিনি দিল্লীর এক প্রসিদ্ধা বাইজী—

—তারপর? বা, তোমার জীবন নিয়ে দিব্য এক উপন্যাস আরম্ভ করা যেতে পারে।

উদাস সুরে কাজী বলিলেন,—তারপর আর কি, সেইখানে মানুষ হয়ে উঠেছিলুম।

রাঙা নদীর জলের দিকে চাহিয়া কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা ধীরে বলিল,—আচ্ছা, কাজী, ওরা কি খুব খারাপ। আমার মনে হয় সমাজ ওদের যত খারাপ বলে তত নয়। আমার এত জানতে ইচ্ছে করে!

—খারাপ বলা যায় না মা, তবে কি জানো—

কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা বলিল,—না, বলো কাজী।

কাজী ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—এই দেখ আমার ত অর্দ্ধেকের ওপর জীবন ওই নরককুণ্ডেই কেটেছে, সুখ নেই মা ওখেনে, শুধু জ্বালা—জ্বালা—আমার মার কথা যখন ভাবি কান্না পায়—নাচে, গানে, মদে, টাকায় সুখ পাননি। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত, দেখি আমাকে জড়িয়ে তিনি সজলচোখে অশ্রান্ত চুমো খাচ্ছেন। এখনও হঠাৎ চম্‌কে উঠি, কে যেন ডাক্‌লো মাণিক সোনা! সংসারের বিষটাই ওদের ভাগ্যে পড়েছে, অমৃতের স্বাদ যে ওরা মোটেই পায় না—আমার এত খারাপ লাগ্‌তো।

নদীর জলে ভেজা বালির দিকে চোখ রাখিয়া কাজী চুপ করিল। কাজীর আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া রমলা বলিল,—আচ্ছা তুমি কোথাও চোলে গেলে ত পার্‌তে।

—পালাইনি কি? দু'তিন বার পালালুম, আবার ছুটে এলুম বাইজী মার কাছে। বাইরের লোক এত ঘৃণা কর্‌তো, কেউ যদি একটু ভালোবাস্‌তো! কয়েক বার মা নিজে আমায় দু'তিন জায়গায় পাঠালেন, আবার নিজে টেনে নিয়ে গেলেন।

—আচ্ছা, তোমার মত সুন্দর বাঁশী বাজাতে আর গাইতে নাকি দিল্লী সহরে কেউ, পার্‌তো না?

একটু ব্যঙ্গের সুরে কাজী বলিলেন,—হ্যাঁ, আর এমন মদ খেতে গুণ্ডামি কর্‌তে তালুকদারদের ছেলেদের উচ্ছন্নে দিতেও কেউ পার্‌তো না।

—না, না, কাজী তুমি খুব ভদ্র ছিলে।

—না মা, এ কাজীকে যৌবনে দেখ্‌লে তুমিও ভয়ে পালাতে।

—আচ্ছা, কাজী, তোমার তাহলে সাদি হয় নি?

মৃদু হাসিয়া কাজী বলিলেন,—সাদি হয় নি! স্বয়ং সুরের হুরীর সঙ্গে আমার সাদি হয়ে গেছে।

কাজী কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু দ্রাক্ষারসের মত রাঙা নদীর স্থির জলে কাহার মুখ ভাসিয়া উঠিল। কাজী স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সে তরুণী কিশোরীর মুখ নয়, পূর্ণবয়স্কা নারীর মুখ। তাজমহলের বাগানে এক জ্যোৎস্নার আলোয় তাহাকে দেখিয়া মদের পেয়ালা, পাপপুরীর জ্বালা সব ছাড়িয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজী মুখ তুলিয়া দীপ্ত নয়নে রমলার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহারও গণ্ডে এম্নি একটি তিল ছিলো; হাস্যমধুর কণ্ঠে কাজী বলিলেন,

> আগর্ আঁ তুর্‌ক্-শীরাজী
> কদস্ত্ আরদ্ দিল্-মারা।
> বখাল-ই-হিন্দ্-রস্ বখ্‌শম্
> সমর্‌কন্দ্ ও বুখারা-রা॥

রমলা কৌতুকভরা মুখে উচ্চ হাসিয়া বলিল,—ওটা কি হল কাজী-সাহেব?

—ওটা কিছু নয়, একটা ভোলা কথা মনে হল।

—ও, আচ্ছা, জীবনটা কি মজার নয়? তোমার জীবনটা মনে করো না—

—হাঁ,—মজারই বই কি, হাসি পায়, কান্নাও আসে—দোষ কাকে দি? রক্তের দোষ আছে, অবস্থার দোষ, ভাগ্যের দোষ, আর নিজের দোষ ত আছেই—এই সাত বছর ধরে মদ ছুঁইনি, তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে—

মদ কথাটা কাজী উচ্চারণ করিতে রমলা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিল,—আচ্ছা কাজী, আমার দাদাকে তুমি বিলেত থেকে এসে দেখোনি, মদ খেলে কেমন দেখায় বল তো? আমার বোধ হয়—

—তাঁর কি বিয়ে হয়েছে ?

—না, এই ত গেলো বছর এসেছে।

দীপ্তকণ্ঠে কাজী বলিলেন,—মদ ছেড়ে যেন বিয়ে করে সে, আর যদি ছাড়তে না পারে, বিয়ে যেন সে না করে। বোলো, কাজী বলেছে, আমার মত জীবনটা জালিয়ে ছাই করে' দেওয়াও ভালো, তবু—

আপন আবেগ দমন করিয়া কাজী থামিয়া গেলেন।

রমলা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল,—চলো, কাজী, বড় অন্ধকার হয়ে আসছে।

দুইজনে উঠিয়া লাল পথ দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

রমলা মৃদু হাসিয়া বলিল,—এখন তোমায় ঠিক দেখাচ্ছে একজন মুসলমান ফকির, তোমার একতারাটা যদি আনতে।

—বাঁশির কাছে কি একতারা বাজানো ভালো লাগবে ?

রমলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ধীরে বলিল,—রজত-বাবু কিন্তু ভারি সুন্দর বাঁশি বাজান।

নামটি উচ্চারণ করিতে রমলার পানে-রাঙা ঠোঁট দুইটি যে কিরূপ কাঁপিল তাহা কাজী লক্ষ্য করিলেন না। রজতের সম্বন্ধে কথা বলা দুইজনেরই মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা কেমন সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। রমলার বর্ত্তমান জীবনের কথা লইয়াই গল্প চলিল। তাহার বোর্ডিং-জীবন, দু'একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সম্বন্ধে নানা কৌতুক পরিহাস করিতে করিতে তাহারা বাড়ীর গেটে আসিয়া পৌছাইল।

গেট পার হইতেই রজত তাহাদের দিকে অতি ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিল। রমলা কিন্তু তাহার উদ্বিগ্নতা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া বলিল,—আমরা কতদূর বেড়িয়ে এলুম, নদী দেখে এলুম।

রজত কাজীর দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—কাজী-সাহেব, আপনি শীগ্‌গীর ওপরে যান, আপনাকে ডাকছেন।

কাজী একটু ভীত হইয়া বলিলেন,—আমায়, কে ডাকছেন ? মাধু ?

রজত ব্যস্তভাবে বলিল,—হাঁ, যান, আপনাকে দরকার।

কোনো অজানা ভয়ে শিহরিয়া কাজী দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। পিছনে রমলা ও রজত নীরবে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ নীরবে চলা রমলার সহ্য হয় না, সে বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিয়া বলিল,—কৈ বাঁশিটা এবার—

—ভোলেন নি দেখছি।

—না, ফাঁকি হচ্ছে না।

রজত করুণ-ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—দেখুন, আমায় ক্ষমা করবেন, এখন আমি বাঁশি বাজাতে পারবো না।

রমলা কি বলিতে যাইতেছিল, রজতের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। ধীরে সে সিঁড়ির দিকে যাইতেছে দেখিয়া রজত বলিল,—ওপরে যাবেন না।

বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রমলা বলিল,—কেন ?

—বারণ করে' দিয়েছেন।

—বারণ ? কে ?

কি বলিবে রজত ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, ধীরে বলিল,—বারণ করে' দিলেন।

একটু রুক্ষস্বরে, আচ্ছা, বলিয়া রমলা পিছনে বাগানের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৬)

রাত্রি গভীরা না হইলেও, চারিদিক স্তব্ধ, বাড়ীখানি নীরব। ঘরেই রজতের খাবার দিয়া গিয়াছিল। কোণের মার্ব্বেল-টেবিলে খাবার চাপা দিয়া সে সে-ঘরের জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ঠিক পাশের ঘরে যে কাজী-সাহেব দুধের বাটি ঢাকা দিয়া দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন তাহা সে জানিত না। ধীরে একটিন সিগারেট ও তাহার বাঁশি লইয়া রজত ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরে শুক্লাদ্বাদশীর চন্দ্র হইতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, লালপথে অভ্রের কুচিগুলি ঝকমক করিতেছে, একটু বাতাস বহিতেছে, গাছগুলি যেন নীরবে ভিজিতেছে।

রজত ভাবিল, বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে জানিত না খানসামা আর চাকর মনিয়া ছাড়া সবাই নিজ নিজ ঘরে বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছে। ধীরে

সে সামনের টেনিসকোর্ট পার হইয়া কয়েকটি রুস্‌মসের সার ছাড়াইয়া বড় রাস্তার নিকট এক কালো পাথরে বসিয়া চুরুট ধরাইল। ধীরে একটু বাতাস বহিয়া পিছনের ফুলগাছ দোলাইল। কি ফুলের গাছ তাহা সে দেখিতে পাইতেছিল না, শুধু বাতাসে অজানাফুলের মাদক গন্ধ আসিল। ওই পুষ্পলতার মত তাহার মনও এই জ্যোৎস্নারাতে দুলিতেছে, কাহার সৌরভ তাহার অন্তর এমন উন্মনা করিয়াছে? চুপ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল, সব চিন্তা যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে, গুছাইয়া সাজাইবার মত যেন ইচ্ছাশক্তিও নাই। চুরুটটা অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলিয়া দিল, আর একটা চুরুট ধরাইল। গিরিঝর্ণার মত চঞ্চলা কলহাসিনী এইরূপ তরুণীর সহিত তাহার এই প্রথম পরিচয়। ইহাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। নারীহৃদয়ের রহস্যালোক, যে প্রদীপের আলোয় উজ্জল হইয়া উঠে, সে প্রেমের প্রদীপ। সেই অগ্নিশিখাই কি তাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে? প্রেমেই নারীকে বোঝা যায়; তবু, সারাজীবন পাশাপাশি থাকিয়া সঙ্গী তাহার সঙ্গিনীকে চিনিতে পারে না কেন? বন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল, 'যদি কোন নারীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য অনুভব করতে চাও, তার অন্তরের অপরূপ মায়ালোকে প্রবেশ করতে চাও, তবে প্রথমে তাকে ভালোবাসো।' রজতের মনে হইতেছিল, তাহার জীবনধারা এই বাড়ীর তটভূমিতে আঘাত খাইয়া যেন কোন নূতন দিকে প্রবাহিত হইবে।

সে ভাবিতেছিল, জীবনের মূল সমস্যাটা কি? বাস্তবিক কি চাই? নিছক আত্মসুখ অথবা পরের মঙ্গল অথবা আর্টের উন্নতি অথবা যতীন যাহা বলিয়া গেল, Science civilisation, মানবের কল্যাণ? তাহার জীবনের সত্য কাজ কি?

এই যে বৃদ্ধ I. C. S., এই যে প্রৌঢ় গায়ক, ইঁহাদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? এই দুই তরুণী আর তাহার মত কত যুবক তাহাদের শৈশব-কৈশোরের রূপকথার নদীগুলি পার হইয়া রঙীন পাল তুলিয়া সম্মুখে উজ্জল জীবন-সমুদ্রে যৌবনতরী ভাসাইয়া পড়িয়াছে—কোনদিকে বাহিতে হইবে, কোনদিকে? কোনো পরমাশ্চর্য্য জীবনীশক্তি কি তাহাদিগকে অন্ধের মত আপন খুসিতে প্রখর ঘটনার স্রোতে টানিয়া লইয়া যাইবে? আপন তরুণ স্বপ্ন কি যৌবনশক্তি দিয়া জীবন সফল করিয়া তুলিতে পারিবে?

এই পাহাড়ের মালা ও তরঙ্গায়িত লাল মাটির দিকে চাহিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক মামার কথা, পৃথিবীর বিবর্তনের ধারার কথা মনে পড়িল। কোন জীবনশক্তি এক অগ্নিময় পিণ্ড হইতে এই শ্যামলা সুন্দরী পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, যুগে যুগে কতরূপে তাহার কত প্রকাশ, কত কুৎসিত বীভৎস বীজাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরী নারীর দেহ সে গড়িয়া চলিয়াছে; কেন্নো কেঁচো হইতে গোলাপ ফুল, Diplodocus; Archœopteryx, Titanothere, Tetrabelodon হইতে আরম্ভ করিয়া কত রকম মাছ, পাখী, পশু, মানুষ—পৃথিবীর পর্ব্বে পর্ব্বে কত জীব-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া সে চলিয়াছে। একদিকে সে যোদ্ধা, রক্তচক্ষু, ক্ষুধার্ত্ত, লালসাপীড়িত, তাই গাছের কাঁটা, বাঘের নখ, হাতীর দাঁত, গণ্ডারের চামড়া, সাপের জিহ্বা, আবার পাথরের বর্শা, লোহার বল্লম, তীর, বন্দুক, কামান, বারুদ। আর একদিকে সে প্রেমিক—ভোগ করিতে চায়, তাই গোলাপ-ফুল, রাঙা পালক, কুহুর কণ্ঠ, নারীর আঁখি, শিল্পীর তুলি।

এই পৃথিবীর সৃজনধারায়, তাহার কোথায় স্থান, তাহার কি কাজ? বন্ধুর কথা তাহার মনে পড়িল, সে বলে, প্রতিজীবনের কাজ হচ্ছে আপনাকে বিকশিত করা। ধর্ম্ম কি? সবার ধর্ম্ম সমান নয়, সবার মুক্তিপথ এক নয়। কারো ধর্ম্ম ছবি আঁকা, কারো ধর্ম্ম লোহা পেটা, কারো ধর্ম্ম বাঁশি বাজানো, কারো ধর্ম্ম ইঞ্জিন চালানো, কারো কাজ ধ্যানে বসা, কারো কাজ লাঙ্গল চষা, কারো কাজ সেবা করা, কারো কাজ যুদ্ধে মারা। জগতে সত্য বীর কে? জীবন যে সত্যই কি, তা সে জানে; তার দুঃখ বেদনা জেনেও তাকে ভালোবাসে।

আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রে রজতের চিন্তাগুলি এমি এলোমেলোই আসিতেছিল। সাধারণতঃ সে এত ভাবে না, চোখে চাহিয়া উপভোগ করাটাই তাহার প্রকৃতি। কিন্তু আজ এ তরুণী দুইটি তাহার অন্তরের কোন গোপন দুয়ারে আঘাত করিয়াছে, সে জীবনটা বুঝিতে চাহিতেছে।

যৌবনে একটা সময় আসে যখন নাস্তিকতা মোহের মত তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। এই ঈশ্বরে অবিশ্বাস মনের কোনো অসুস্থতা বা বিকৃতির লক্ষণ নয়। এ উচ্ছল যৌবন-শক্তির নবসৃষ্টিশক্তিরই লক্ষণ। এই সন্দেহের বিদ্রোহ-পথ দিয়া সত্যের মন্দিরে পৌঁছা যায়।

রজতের মনে কিছুদিন ধরিয়া এরূপ এক নাস্তিকতা পাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু এ মাধবী রাত্রে তারাভরা আকাশের স্নিগ্ধ প্রশান্তির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এই যে রূপের ঝর্ণা, এই যে রসের ফোয়ারা, এই যে অপরূপ রংএর ঝোরা নিরন্তর ঝরিয়া পড়িতেছে, দুই চক্ষু ভরিয়া আনন্দে অহর্নিশি পান কর। এই চাঁদের আলো যেন কাহার হাসির অমৃতধারা। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছে, সবার পিছনে সে আনন্দ-হাসি উছলিয়া উঠিতেছে।

এ জ্যোৎস্নারাত্রি তাহার শিল্পী প্রাণকে স্পর্শ করিল। মোনা লিসা'র মুখের চিররহস্যময় আনন্দ-হাস্যের মত আজ এ নীলাকাশ ভরিয়া কাহার হাসি, সেই হাসির সুরে শুষ্ক রুক্ষ রক্ত মাটি হইতে সবুজ তৃণ মুখ তুলিতেছে, গাছে গাছে ফুল রঙীন হইয়া উঠিতেছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঝর্ণার মৃদঙ্গ বাজিতেছে। মানুষ কি? সে কি সত্যই অমর আত্মা, অমৃতলোকের যাত্রী? না, সে একটা বীজাণু, এক জীব-কোষ, মৃত্যুতে মাটিতে হাওয়ায় মিশিয়া যাইবে? এ সব ভাবিবার দরকার নাই, আজ রজত যাহা দেখিতেছে, যাহা স্পর্শ করিতেছে,—চারিদিকে কি অনাহত বীণা বাজিতেছে, সবার পিছনে কাহার হাসির রঙের ধারা। বিশ্বশতদললীনা অনন্তঊর্ব্বশীর ও জ্যোৎস্নাহাসির দিকে চাহিয়া রজত বাঁশিটি মুখে তুলিল।

রজত যখন জ্যোৎস্নার আলোয় বসিয়া ভাবিতেছিল, তখন যোগেশ-বাবু তাঁর শোবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় চুপ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। সে ঘরে মাধবী ছিল না বটে, কিন্তু সে পাশের ঘরে পিতার জন্য সজাগ হইয়া ছিল। জান্‌লার কাছে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের পাতায় চাঁদের আলো করুণ চোখের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া সে নিজ জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। যতদিন তার মা ছিলেন, ততদিন সে মনের সহজ আনন্দে বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর স্কুল ছাড়িয়া পিতার গুরুভার বহিতে বহিতে সে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুক্তি পাইলে যেন সে বাঁচে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে পিতার জন্য এমন সুনিবিড় প্রীতি আছে যে পিতাকে ছাড়িয়াও সে যেন কোথাও থাকিতে পারিবে না। এ বাড়ীতে সে তাহার সমবয়স্ক কোনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী পায় নাই, শুধু মাঝে মাঝে রমলা ছুটির সময় আসে। বাড়ীতে থাকিলেও তাহার শিক্ষার কোনো ত্রুটি হয় নাই। এক মেম শিক্ষয়িত্রী বরাবর ছিলেন, কয়েক মাস হইল তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কাজীসাহেবের কাছে সঙ্গীতচর্চ্চা হয়, পিতাও মেয়ের পড়াশুনা মাঝে মাঝে দেখেন।

তাহার এই উনিশ বছরের জীবনে খুব কম যুবকদের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে। দার্জ্জিলিং কি সিমলা কি পুরীতে গ্রীষ্মযাপনের সময় যে কয়েকজনের সহিত নমস্কারের আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের কেহই তাহার মন স্পর্শ করে নাই। কিন্তু যে তরুণ শিল্পী তুলি দিয়া তাহার চিত্তের প্রশংসা লাভ করিয়াছে, সে আজ তরুণ আঁখি দিয়া তাহার চিত্তের প্রেমও লাভ করিতে চায়।

একা থাকিয়া থাকিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবা মাধবীর স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। স্থিরতাই তাহার প্রকৃতি; কিন্তু চোখের জলের মত করুণ চাঁদের আলোয় ভরা ঘরে সে আজ কেমন বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। একবার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিল, জান্‌লার কাছে গিয়া সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিল, আবার চেয়ারে আসিয়া বসিল। মনকে বুঝাইল এ চঞ্চলতার কারণ তাহার পিতা। কাল রাতে এমি সময় রমলাকে দেখিয়া তাহার পিতা কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার ভয়ই হইয়াছিল। সে অবশ্য জানিত তাহার পিতা রমলার মাকে ভালোবাসিতেন। কিন্তু রমলা পূর্ব্বেও তো বহুবার আসিয়াছে, কখনও তিনি এমন চঞ্চল হন নাই, আর জালাময়ী প্রেমস্মৃতিকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য মদের দরকার হয় নাই। এবার রমলা যেন একটা ঘূর্ণীহাওয়ার মত আসিয়াছে। সে চারিদিকে

গোলমাল, আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছে। নানা কথার মাঝে বার বার রজতের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

পাশের ঘরে বৃদ্ধ যোগেশ-বাবু ঠিক কিছু ভাবিতেছিলেন না, তাঁহার চিন্তার সুতা খালি জোট খাইতেছিল, চক্ষু দিয়া দু'এক বিন্দু জলও ঝরিয়া পড়িতেছিল। স্ত্রীর মৃত্যু-শয্যার পাশে বসিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মদ আর ছুঁইবেন না, সে প্রতিজ্ঞা অবশ্য রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এমন করিয়া কোনোদিন আত্মহারা হন নাই। কাল-রাত্রে যখন রমলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বিভা বলিয়া ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়াছিলেন; বিবাহের রাত্রে রক্তপট্টবস্ত্রপরিহিতা বিভা ঠিক এম্নিই দেখাইয়াছিল। সে বিবাহে অবশ্য নবদম্পতী সুখী হয় নাই, আর তারপর তিনি যে বিবাহ করেন, তাহাতেও কেহ সুখী হয় নাই। শুধু একটু সময়ের গোলমালে কতকগুলি জীবন ভাঙিয়া চুরিয়া গেল, তিনি যেদিন সন্ধ্যা বেলা বিবাহের প্রস্তাব করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, সেইদিন প্রভাতে বিভার বিবাহের লালচিঠি আসিল। সেই রাতে তিনি আবার মদের পেয়ালা সুরু করিলেন।

তারপর পূর্ণযৌবনে বিভা সহসা একদিন অ্যাপোপ্লেক্সিতে তিনঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। তাঁর স্বামীও কয়েকবছর বাদে হঠাৎ নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন; ডাক্তারেরা বলিয়া-ছিলেন নিউমোনিয়া, মদ, ক্রিমিন্যাল ব্যারিষ্টারের রাত্রি জেগে খাটুনি, এ ত্র্যহস্পর্শ হইলে কেউ বাঁচাতে পারে না। আর তাঁর স্ত্রীও তো তাঁহার অত্যধিক মদ্যপান ও মানসিক অশান্তির জন্য অকালে মরিয়াছেন। সেই মদ আবার ছুঁইলেন কেন? জ্বালা, অসহনীয় জ্বালা, মাঝে মাঝে সমস্ত বিশ্বের বিরুদ্ধে মন হইতে আগুন জ্বলিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে চায়। ভুলিতে চান, ভুলিতে চান। অস্পষ্টস্বরে শুধু বলিলেন,—না মাধু, আর জ্বালাবো না। আবার বিভার কথা মনে জাগিতে লাগিল।

যোগেশ-বাবুর ঠিক নীচের ঘরটিতে আর-একজন প্রৌঢ় তাঁহার যৌবনস্বপ্ন ভাবিতেছিলেন। মরচে-পড়া তার-ছেঁড়া পুরাতন বীণা ধূলায় ভরিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া-ছিল, সহসা কিসের স্পর্শে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে; পুরাতন মধুর গানগুলি বাজিতেছে। আজ সন্ধ্যায় রমলা কাজীর বুকের শুক্‌নো পাঁজরগুলিতে যেন মৃদঙ্গ বাজাইয়া তুলিয়াছে। এম্নি জ্যোৎস্নারাত্রে আগ্রায় এক মর্ম্মরের প্রাসাদে বসিয়া যে সাকীকে বীণ শুনাইয়াছিলেন, সে আজ কোথায় তাহা কেহ জানে না। তখন কাজীর বয়স সতেরো হইবে, বারবনিতাদের বীভৎসতা অসহ্য হওয়াতে কাজী পালাইয়া এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন, তাঁর মেয়েকে গান শিখাইতেন। তাঁহার মনে পড়িল, অর্দ্ধরাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন, সেই কিশোরীর ঘরের দিকে যাইবার জন্য উঠিলেন, ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া ভূতের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন, সেই রাতে আবার তাঁহার বাইজী মার কাছে ফিরিলেন। তারপর জীবনে তাহার সহিত একবার দেখা হইয়াছিল। তখন যৌবনের শেষঘাটে, মমতাজের অনুপম মর্ম্মর-সমাধির ছায়ায় শুধু ক্ষণিকের চাউনি। সে চাউনি প্রেমের সহিত বলিয়াছিল,—আর কেন? এবার ও পেয়ালা ভেঙে ফেলো, আর ত সুধা কানায় কানায় উচ্ছল হয়ে উঠ্‌বে না, শুধু গরল তলায় জ্বল্‌বে। সেই রাতে কাজী ফকির হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ রমলাকে দেখিয়া সেই নবজীবনদায়িনী নারীর কথা বার বার মনে পড়িতেছিল।

রমলা কিন্তু তাহার ঘরে ছিল না। সে বাহিরের জ্যোৎস্নায় বসন্ত-বাতাসেরই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উচ্ছল যৌবনের অকারণ সুখে তাহার দেহ মন কানায় কানায় ভরা। যে-সব খুঁটিনাটি তুচ্ছ ঘটনায় অন্য মেয়েদের মনে মেঘ জমিয়া বজ্রগর্জ্জন এমন কি বারিবর্ষণ পর্য্যন্ত হইয়া যায়, সে-সব ঘটনা সে হাসির হাওয়ায় নিমেষে উড়াইয়া দিত। বের্ডিংএর বন্দীশালায় থাকিয়াও তাহার মনের সজীবতা, আনন্দ উপভোগের শক্তি পঙ্গু হইয়া যায় নাই। চানাচুর কি জ্যোৎস্না রাত, গোলাপফুল কি ভালো ফিল্‌ম্, ভালো গান কি কাপড়ের রং, দেখিলেই সে নাচিয়া বলিয়া উঠিত, how lovely! তাহার দর্শনশাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—এক I adore it, আর এক I hate it, মধ্যপথ কিছু নাই। সুখ জিনিষটা কি, কি করিয়া পাওয়া যায়, এ-সব ভাবিবার শক্তি বা সময় তাহার ছিলো না। রমলার দর্শন অনুসারে

অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়াই বা কি হইবে, ভবিষ্যতের অজ্ঞ গণ্ডি গড়িয়াই বা কি হইবে,—যাহা পাও উপভোগ করো, আনন্দ নিংড়াইয়া লও। তাই মাধবীর গাম্ভীর্য্যকে সে পছন্দ করিত না, আর আনন্দ উপভোগের কোনো উপায় সম্মুখে থাকিলে তাহা বৃথা যাইতে দিত না,—মোটর চড়াই হোক আর ঘর ঝাঁট দেওয়াই হোক, রান্না করাই হোক আর নভেল পড়াই হোক, গল্প বলাই হোক আর খুনসুটি করাই হোক,—জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের পেয়ালায় যে আনন্দ ভরা, ইহাই সে জানিত। পিতার মৃত্যুর পর ক্রায়োসেসন্-বোর্ডিং তাহার বাড়ী হইয়া উঠিয়াছে। বরাবর যোগেশ-বাবুই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, এখন তাহার দাদাই তাহার ভার লইয়াছেন। বোর্ডিং-এর পচা খাবার, শক্ত চেয়ার টেবিল আর বদ্ধ প্রাচীর হইতে এ প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি পাইয়া সে স্বাধীনতা পুরাদমে উপভোগ করিয়া লইতেছিল। এখানকার ভেল্‌ভেটে মোড়া চেয়ারে বসিবার আরাম, সোফায় শুইয়া পড়িবার আয়েস, আপন খুসিমত রাঁধিয়া খাইবার সুবিধা, মুক্তপথে যথেচ্ছা ঘুরিবার সুখ, খুসিমত পিয়ানো বাজাইবার আনন্দ, ইত্যাদি দেহ-মনের সব ছোটবড় সুখে সে পরম তৃপ্তি বোধ করিতেছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

রজত অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট মুখ হইতে ফেলিয়া বাঁশিটি মুখে তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-ধীর বাতাসে বাঁশির সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মাধবী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সাথী-হারা এক কুহর করুণ কণ্ঠে ফুলের কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, এ রূপসায়ী জ্যোৎস্না-সৌন্দর্য্যতীরে কোন্ চিরব্যর্থ প্রেমতৃষ্ণা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। যোগেশ-বাবুর চিন্তার জাল ছিঁড়িয়া গেল, তিনি বচকিত হইয়া উঠিয়া জানালাটা ভালো করিয়া খুলিয়া জ্যোৎস্নার আলোয় সোফায় বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, বিভার সেই গানের সুর জ্যোৎস্নায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কাজী-সাহেব ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় এক কোণে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার যৌবনরূপ সুরের রংএ ভরিয়া গেল। বীণ বাজাইয়া যে গজল তিনি কৈশোরে এক রাত্রে গাহিয়াছিলেন, তাহারি সুর-হুরী যেন তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

আর রমলার মনে যে কি হইল তাহা বলা শক্ত, সে শুধু বেড়ানো বন্ধ করিয়া রাঙা কাঁকরের উপর বসিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ বাঁশি বাজাইয়া রজত থামিল। শুভ্র বাড়ীর দিকে চাহিল। তারাভরা আকাশের নীল পটে আঁকা লালবাড়ীটি মহাশঙ্কভরা, যেন রূপকথার সুপ্ত রাজকন্যার নিঝুম পুরী,—রাজপুত্রের সোনার কাটির ছোঁওয়া লাগিলেই জাগিয়া উঠে। ধীরে সে বাড়ীর দিকে চলিল। দুধারে গাছগুলি নিদ্রিত দৈত্যের মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া।

বাঁশি থামিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না ভরিয়া সে বাঁশির তান যেন নীরবে বাজিতেছে। চারিদিক কি স্তব্ধ, শুধু তাহার ঘরের নিকট আসিতে পাশের কুঞ্জ হইতে কে চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল। তারাভরা নীলিমার মত তার নীলশাড়ীর ঝলমলানি।

(৭)

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে রজতের ডাক পড়িল। সাদামার্ব্বেলের লম্বা টেবিলের একদিকে যোগেশ-বাবু বসিয়াছেন। তাঁহার এক পাশে কাজীসাহেব আর এক পাশে মাধবী। রমলা তাঁহাদের উল্টাদিকে দাঁড়াইয়া চা তৈরী করিয়া দিতেছিল।

রজত ধীরে নমস্কার করিয়া ঢুকিতেই, রমলা স্মিতহাস্যে তাহাকে অভিবাদন করিয়া তাহার পাশের চেয়ার দেখাইয়া দিল। মাধবী একবার নির্নিমেষ নয়নে রজতের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু দুইটি চায়ের কাপে স্থাপিত করিল। কাজী-সাহেব প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। আসুন বলিয়া যোগেশ-বাবু অভ্যর্থনা করিলেন। রজত চেয়ারটা রমলার পাশ হইতে একটু টানিয়া ধীরে বসিল।

চা তৈরী করিয়া রমলা দুষ্টামিভরা চোখে বলিল,—চা খেতে কোনো আপত্তি নেই ত, না দুধ এনে দেবো?

রজত যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এইরূপ ভান

করিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিল,—আগে ওঁকে দিন।

রমলা যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—ঠিক বটে ladies first।

সে কাপ্‌টা মাধবীকে দিয়া পরের কাপ্‌টা রজতের দিকে অগ্রসর করিতেই রজত আবার বলিল,—আপনি আগে নিন।

রমলা হাসিমাখাস্বরে বলিল,—না, guest first এবার।

চা দিয়া সবাইকে রুটিতে মাখন মাখাইয়া দিতে দিতে রমলা জিজ্ঞাসা করিল,—কাকাবাবু, আর-এক কাপ? কাজী-সাহেব?

দাড়ি নাড়িয়া কাজী বলিলেন,—না মা, আচ্ছা দাও, তোমার হাতে চা-টা আর-এক কাপ খেতে ইচ্ছে করছে।

কাজী-সাহেবকে আর-এক কাপ দিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া রমলা বলিল—মাধু, চা? আপনি?

রজত ধীরে কাজীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল,—আচ্ছা, দিন আর-এক কাপ! রুপালী কাপে সোনালী চা!

রমলা হাসিয়া বলিল,—বা, ও তার চেয়ে কফি আরও সুন্দর দেখায়, lovely কফি। আচ্ছা কাকাবাবু, আজ খেয়ে ওই ফার্সী নিয়ে পড়্‌তে পাবেন না, তার চেয়ে কোথাও বেড়াতে চলুন।

কাপ্‌টা মুখ হইতে নামাইয়া যোগেশ-বাবু স্নিগ্ধনয়নে রমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আমার যে বাত মা, বেশী চল্‌তে তো পার্‌বো না, এ ক'দিন আবার বেড়েছে।

কৌতুকভরা চোখে সবাইয়ের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—বাত! ও, আমি একটা বাতের ওষুধ জানি—এক হিমাচলের সন্ন্যাসীর স্বপ্নলব্ধ ঔষধ।

কাজী-সাহেব পেয়ালাটার চা নিঃশেষ করিয়া প্লেটে রাখিয়া বলিলেন,—তাই নাকি মা, বল তো।

রমলা মাধবীর প্লেটে রুটি দিয়া বলিল,—ও সে যা ভয়ঙ্কর, নিশ্চয় মাধবী ভয় পাবে।

মাধবী ধীরে বলিল,—বলই না বাপু।

মাখন-মাখা ছুরিটা নাড়িতে নাড়িতে রহস্যভরা স্বরে রমলা বলিতে আরম্ভ করিল,—শুনুন কাকাবাবু, কুড়িটা কালো কাঁকড়া-বিছে, এ সাধারণ বিছে নয়, সে নাকি কোন্ পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া যায়, সাপের মত বিষাক্ত, কেঁচোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, কুচ্‌কুচে কালো,—চারটে ধুত্‌রো-বিচি, এক তোলা গাঁজা, এক তোলা আফিম, আধ পো গরগরে লাল লঙ্কা, এই না দেড়সের সরষের তেলে ফেলে আগুনে চড়িয়ে সেদ্ধ করতে হবে, তারপর তেল যখন ফুট্‌বে ওই জীবন্ত বিছেগুলো ফেলে দিতে হবে—সেই তেল মরে' মরে' আধসের থাক্‌তে নামাতে হবে, তারপর তাই ছেঁকে যে কালো কুচ্‌কুচে তেল বেরোবে এ কয়েকদিন মাখলেই—এখন সে বিছে পাওয়াই মুস্কিল।

রজত হাসিয়া বলিল,—সে বিছেও কোনো পাহাড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর সে তেলও কেউ তৈরী করতে পার্‌বে না।

রমলা নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরী করিতে করিতে বলিল,—কেন, হনুমান যদি এ যুগে থাক্‌তো, তবে হুকুম দিলেই পাহাড় সুদ্ধ এসে হাজির হোত।

রজতের গণ্ড একটু লাল হইয়া উঠিল, সে নীরবে রুটি চিবাইতে লাগিল; সে দিকে কোনো দৃক্‌পাত না করিয়া রমলা চীৎকার করিয়া উঠিল,—এ মা, কি পিঁপ্‌ড়ে জেলিটায়—কাকা-বাবু, আর রুটি? না?

জেলির শিশি হইতে পিঁপ্‌ড়ে ঝাড়িতে ঝাড়িতে রজতের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—জানেন, একবার একদল লাল পিঁপ্‌ড়ে আমাদের বোর্ডিং আক্রমণ করলে, সে এমন কাণ্ড যে চিনি রেখে চা তৈরী করতে করতে চিনি উড়ে যেতে লাগ্‌লো।

রজত রুটিখানি শেষ করিয়া বলিল,—ও, যেমন হ্যাম্‌লিন সহরে ইঁদুরেরা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু ছেলেদের বোর্ডিংএ তো অমন পিঁপড়ে হয় না—

রমলা উত্তর দিল,—তাঁরা বিনা চিনিতে চা খান বলে',

শুনুন না—সে এমন পিঁপ্‌ড়ে, কাজী ত শুনেছো—

কাজী দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—হাঁ, আর তার সঙ্গে ছারপোকা আর আরসোলার আক্রমণটা বাদ দিচ্ছো যে?

রমলা চামচে করিয়া চায়ে চিনি মিশাইতে মিশাইতে বলিল,—আমাদের গান হল জানেন কি, কাকাবাবু—

জ্যামেতে জেলিতে শাড়ীতে ফুলেতে
পিঁপড়ে সকল ঠাঁই,
পাউডার আর পমেটমটিতে
পিঁপড়ের ভরা ভাই।
সাবান মাখাও দায়,
চানাচুর আর চকোলেট যত
নিমেষে উড়িয়া যায়।

যোগেশ-বাবু স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন,—কে লিখেছিলো গানটা?

মাধবী ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল,—নিজেরই লেখা গান, শোনানো হচ্ছে।

রজত তাহার মুখের দিকে চাহিতেই রমলা সলজ্জ-ভাবে নিজের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নিজের রুটিতে জ্যাম মাখাইতে মনোনিবেশ করিল।

কাজী রজতের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—আর-একবার গাও তো, মা।

রমলা বলিল,—না, আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আপন রুটি-চা-তে সে এতক্ষণে গভীরভাবে মনোযোগ দিল।

সবাই চুপচাপ দেখিয়া রজত ধীরে যোগেশ-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—আজ থেকেই কাজ আরম্ভ কর্‌বো ভাব্‌ছি।

রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে যোগেশ-বাবু বলিলেন,—আজ থেকেই! দু' একদিন বিশ্রাম নিতে পারেন।

রজত উত্তর দিল,—না, দর্‌কার নেই। ছবিগুলো একটু ভেবে আঁক্‌তে হবে, কতকগুলো বড় ছবি আঁকার কাগজ পাঠাতে আমার বন্ধুকে লিখে দিয়েছি, তবে পোর্ট্রেট্‌গুলো শীগ্‌গীর আরম্ভ করা যেতে পারে।

যোগেশ-বাবু বলিলেন,—তা বেশ, কবে আরম্ভ কর্‌বেন? কাজীসাহেব?

কাজী মাথা ও দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন,—না, না, আমার কেন, কি দর্‌কার, আপনারই—

যোগেশ-বাবু স্নেহভরা চোখে মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তবে, মাধুমা'র?

মাধবী বাপের দিকে শূন্য দৃষ্টি রাখিয়া একটু তিক্তস্বরে বলিল,—না, বাবা।

মৃদু হাসিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—তা হলে ত আমারই আরম্ভ কর্‌তে হয়।

চায়ের কাপ শেষ করিয়া রমলা বলিল,—আমি বুঝি বাদ গেলুম?

অতি অপ্রতিভ হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন,—না, মা, তোমার কথাও ওঁকে বলেছি, তা হলে তোমারই—

তাঁহাকে বাধা দিয়া রমলা পরিহাসের সুরে বলিল,—আমি চুপ করে' বসে' থাক্‌লে তো উনি আঁক্‌বেন, আমি sittingই দেবো না, চুপ্‌চাপ বসে' থাক্‌তে পার্‌বো না—

রজত ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল,—sitting দেবার দর্‌কার হবে না।

তারপর ধীরে বলিল,—কাজীসাহেবের ছবি আগে আরম্ভ করা যাক।

যোগেশ-বাবু বলিলেন,—আচ্ছা, তাই বেশ আর মাধু-মাকে একটু আঁক্‌তে শিখিয়ে দেবেন।

রজত বলিল,—একটা সময় ঠিক কর্‌লে ভালো হয়।

মাধবীর দিকে ফিরিয়া যোগেশ-বাবু স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন,—কখন তোমার সময় হবে, মা।

চোখ না তুলিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে মাধবী বলিল,—আমার সময় হবে না, বাবা।

যোগেশ-বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—কেন মা! শরীরটা ভালো নেই!

ধীরে বাবার দিকে নিমেষের জন্য চাহিয়া মাধবী বলিল,—আচ্ছা, দুপুরে এক ঘণ্টা।

রজত যোগেশ-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—দু'ঘণ্টা হলে ভালো হয়।

যোগেশ-বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, ও এক ঘণ্টাই শিখুক্, আর এক ঘণ্টা নয় রমুকে—

রমলা রুটির অর্দ্ধেক মুখ হইতে ভাঙিয়া লইয়া বলিল—না, কাকাবাবু, আমার ও-সব ভালো লাগে না, ও-সব হবে না, ততক্ষণ পুডিং রাঁধলে—

কাজী হাসিয়া বলিলেন,—বেশ মা, আমাদের তুমি রোজ নতুন নতুন পুডিং খাইও।

রমলা উৎসাহের সহিত বলিল,—আচ্ছা, কি খাবেন? —Almond Pudding, Custard Pudding, French Pudding, Quaking Pudding?

রজত বলিল,—ও শেষেরটা নয়।

কাজী বলিলেন,—সেই কি রমলা পুডিং খাইয়েছিলে?

—ও, বলিয়া রমলা তাহার রুটিতে মন দিল।

যোগেশ-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইতে কাজী ও মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একহাতে তাঁহার লাঠিতে আর-এক হাতে মাধবীর হাতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন। কাজী তাঁহার পিছন পিছন চলিলেন। রজত একবার রমলার মুখের দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া পাশের দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইল। সবাই চলিয়া গেল, রমলা তাহার জ্যাম-মাখা রুটির শেষটুকরা চিবাইতে চিবাইতে একটা চামচ লইয়া প্লেটে কাপে টুং টুং শব্দ করিয়া এক পিয়ানোর স্থর বাজাইতে লাগিল।

হাসিভরা স্থরে বলিয়া উঠিল,—কেমন বাজ্‌ছে বল্ তো মনিয়া?

কিশোর চাকরটি কালো টিকের মুখে আগুনের মত তাহার পানে-রাঙা ঠোঁটগুলি আনন্দে কাঁপাইয়া বলিল,—ভারি স্থন্দর, দিদিমণি, কিন্তু যখন ঝন্‌ঝন্ করে' প্লেট ভেঙে পড়ে!

—তুই ভাঙ্‌তে পারিস্ এ প্লেটখানা?

—খুব পারি!

—ভাঙ্!

—বক্‌বেন, মাধু-দিদিমণি বক্‌বেন।

—আমি বল্‌ছি, তুই ভাঙ্।

—না, দিদিমণি।

—আচ্ছা, আমি ওর দাম দেবো, তুই বাজার থেকে কিনে আনিস্।

—না, দিদিমণি!

—যাঃ, ভীতু, দেখ্—

রমলা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া একখানি মাখন-লাগানো পাখীফুল-আঁকা বড় প্লেট মেজেতে জোরে ফেলিয়া দিল। ঝনঝন শব্দে প্লেটখানি ভাঙিয়া সাদাটুক্‌রাগুলি চারিদিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। সহাস্য চোখে সেই ভগ্ন-খণ্ডগুলির দিকে চাহিয়া রমলা দাঁড়াইয়া রহিল।

প্লেটভাঙার শব্দে দুই দিক হইতে মাধবী ও রজত ছুটিয়া আসিল। মনিয়া ভীতমুখে মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—দিদিমণির হাত থেকে প্লেটটা পড়ে' ভেঙে গেলো।

রমলা হাসির বাতাস তুলিয়া বলিল,—যা মিথ্যুক্, এক-খানা প্লেট ভেঙে দেখ্‌লুম ভাই, কেমন শব্দ শুন্‌তে।

মাধবীর গম্ভীর মুখ হাসির আলোয় একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল দেখিয়া রজতের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—গ্যেটের গল্প জানেন না? একবার তিনি রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কেউ নেই, সাদা ধপ্‌ধপে প্লেটগুলো টেবিলে সাজানো; একে একে সেগুলো তিনি জান্‌লা দিয়ে রাস্তায় ফেল্‌তে স্থরু কর্‌লেন; প্রত্যেক খানা ঝঙ্কার দিয়ে ভাঙে আর তিনি হাততালি দিয়ে ওঠেন;—তাঁর মা তো শব্দ শুনে ছুটে এসেছেন, গ্যেটে মনের আনন্দে প্লেটের পর প্লেট ভেঙে চলেছেন, মা এসেছেন খেয়ালই নেই, মা তাঁর ছেলের স্থখের আনন্দের দিকে চেয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন, বকুনি দেওয়া হল না।

কথা শেষ করিয়া রমলা চাহিয়া দেখিল, মাধবী নাই, চলিয়া গিয়াছে।

সেইজন্যেই তিনি এত বড় কবি হতে পেরেছিলেন,—বলিয়া রজতও মুচকিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

রমলা একটা পিয়ানোর স্থর মৃদু গাইতে গাইতে মনিয়ার সঙ্গে প্লেটের ভাঙা অংশগুলি তুলিতে লাগিল।

(৮)

সেইদিনেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে বলিল বটে কিন্তু সমস্ত সকাল রজত আপন ঘরে হেলাফেলা করিয়া কাটাইল। প্লেটভাঙার ঝন্‌ঝনানির স্থর তাহাকে ঘিরিয়া প্রভাতের আলোয় বাজিতে লাগিল।

সমস্ত দুপুর অলসভাবে কাটিল। একবার মাধবীকে চিত্রবিদ্যা শিখাইতে ড্রয়িংরুমে গিয়াছিল। মাধবী এরূপ আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল [illegible] কলেজের প্রফেসারের মত মুখবন্ধ বক্তৃতা দিয়া [illegible] মাঝে মাঝে কাগজে দু'

চারিটি রেখা টানিয়া কোনোমতে আধ ঘণ্টা কাটাইল। তারপর মাধবী, ভালো লাগ্‌ছে না, বলিয়া তাহাকে বিদায় দিল। একা ঘরে সে দিবাস্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল।

রজত বিকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইল, মাধবী ও রমলা পিয়ানোর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল। ড্রয়িং-রুমের পাশ দিয়া গেলেও কেহ তাহাকে ডাকিল না। সে ধীরে একা সাম্‌নের পথ ধরিয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল। নূতন অজানা জায়গার পথে ঘোরার মহারহস্য আছে, হঠাৎ কোন্ পথ যে কোথায় লইয়া যাইবে, কোন্ কোণে যে কি পরমাশ্চর্য্যকর বস্তুর সন্ধান মিলিবে, তাহা কে জানে। চঞ্চল উৎসুক চিত্ত লইয়া রজত পথ ধরিয়া বরাবর চলিল।

রমলা মাধবীর নিকট তাহার কলেজের গল্প করিতে-ছিল। রজত বারান্দা দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া রমলা বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা ভাই মাধু, রজত-বাবু বেশ আঁক্‌তে পারেন, না?

একখানি সচিত্র বিলাতী পত্রিকার পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে মাধবী বলিল,—হুঁ।

চেয়ারটা একটু দোলাইয়া রমলা বলিল,—কাল রাতে কি সুন্দর বাঁশি বাজাচ্ছিলেন! আমাদের বোর্ডিংয়ের সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটা, মনে নেই যার মুখ ঠিক পানের মত, সে এক খৃষ্টান ছেলের বাঁশি বাজানো শুনে তাকে বিয়েই ক'রে ফেল্লে! এঁর বাঁশি শুন্‌লে কি কর্‌তো না জানি! আর আঁকেন ত চমৎকার, অবশ্য আমি ছবির কিছুই বুঝি না।

মৃদু হাসিয়া মাধবী পত্রিকাখানা মুড়িয়া বলিল,—গুণের ত ব্যাখ্যা হল, এবার তোমার 'কিন্তু' দিয়ে আরম্ভ কর।

রমলা যখন কাহাকেও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার বন্ধুরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, কতকগুলি প্রিয় সত্য ও মিথ্যার পর না জানি কি অপ্রিয় তীক্ষ্ণ সত্যকথা বাহির হইবে। সে কাহারও দোষ বলিতে গেলে আগে তাহার গুণের তালিকা দিয়া সুরু করে।

চেয়ারে স্থির হইয়া বসিয়া রমলা বলিল,—না, কিন্তুটা থাক্, তুমি তা হলে যা চটবে!

—বেশ মেয়ে! যা, আমি চট্‌ব কেন?

রমলা মাধবীর কাছে চেয়ারটা টানিয়া আনিয়া তাহার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—আচ্ছা, ভাই, ওঁর বাড়ী কোথায়, বাবা মা আছেন নিশ্চয়?

একখানি নূতন মাসিকপত্রিকা নাড়িতে নাড়িতে মাধবী বলিল,—তা আমি কি জানি, ছবি আঁক্‌তে এসেছেন, তাঁর বাড়ির খবর কে জিজ্ঞেস কর্‌তে গেছে?

মাধবীর বাম গালটা টিপিয়া রমলা বলিল,—আঁক্‌তেই তো এসেছেন, তোমার মনে কিছু না আঁকেন তাই বল্‌ছি।

রমলার হাতটা জোরে টিপিয়া মাধবী বলিল,—যা, বাজে বকিস্ না, কে কার মনে কি আঁকে তা দেখা যাবে।

রমলা ধীরে উঠিয়া মাধবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার হাতে খোলা পত্রিকার উপর যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল,—এবার এসে তোকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি মেমগুলোর ছবি দেখ্‌ছিস্, ওদের চেয়ে তোকে দেখ্‌তে ভালো, দেখ্ তো, রং যেন ফেটে পড়্‌ছে।—বলিয়া, তাহার রক্তিম অধরে এক চুম্বন করিল।

—আ, কি করিস্, আর জ্বালাতন করিস্ না, রমু।

—বেশ কর্‌বো,—বলিয়া তাহার ডান গালটা সজোরে টিপিয়া রমলা তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

মাধবীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—তুমি কিন্তু এবার এমন গম্ভীর হয়ে গেছো, আমার এসে প্রথম ভয়ই করেছিলো।

তারপর পিয়ানোর সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া রমলা বলিল,—এবার প্রাইজের সময় যে গানটা বাজিয়েছিলুম শুনবি?

পত্রিকা উন্টাইতে উন্টাইতে মাধবী বলিল,—আচ্ছা, বাজা।

রমলা পিয়ানোয় ঝঙ্কার দিল।

একা একা বেশীদূর যাইতে রজতের ইচ্ছা হইল না। সে যখন বেড়াইয়া ফিরিল, সন্ধ্যা হয়-হয়। রমলা পিয়ানোর পাশে চুপচাপ বসিয়া আছে, মাধবী উপরে পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

রজত ড্রয়িংরুমে ঢুকিতে রমলা তাহাকে লক্ষ্য করিল

না দেখিয়া সে যেন অন্ধকার ঘরটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—আজ অনেক দূর বেড়িয়ে এলুম।

রমলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—মোটেই না, এই মাত্র ত গেলেন।

অপ্রস্তুত হইয়া রজত বলিল,—অনেক দূরই ত বোধ হল, বেশ জায়গাটা।

রমলা কোনো উত্তর না দিয়া চেয়ারটাকে মৃদু দোলাইতে লাগিল। রজত ধীরে বাহির হইয়া গেল। বারান্দা পার হইয়া লাল পথ দিয়া গেটের দিকে চলিল। এবার সে সত্যই বহুদূর ঘুরিয়া অনেক রাতে বাড়ী ফিরিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

রবীন্দ্র-পরিচয়

[রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লেখা এগারো হাজার লাইন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায় না। কিছুকাল হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য-সূচী (Bibliography) সংকলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সূচী-সংকলন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। নিদর্শন-স্বরূপ বাল্য-রচনা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব। এই সময়ের অধিকাংশ লেখায় কোনো স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া না রাখিলে পরে আর কোনো চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। সংকলন যেমন অগ্রসর হইবে রবীন্দ্র-পরিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্য্য অগ্রসর হওয়ায় ইহাতে সমালোচনার ধারাবাহিক ঐক্যসূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। তাই মনে রাখা আবশ্যক যে "রবীন্দ্র-পরিচয়" সাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্ব্বাভাষ মাত্র।]

কবিকাহিনী

এই খণ্ডকাব্যখানি প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ভারতী ১ম বর্ষ ১২৮৪ সন (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ) পৌষ ২৬৪-২৬৮ পৃষ্ঠা, ১ম সর্গ—২৬৮ লাইন, মাঘ ৩১৮—৩২৫ পৃষ্ঠা, ২য় সর্গ—৪২৫ লাইন, ফাল্গুন ৩৬০—৩৬০ পৃষ্ঠা, ৩য় সর্গ—১৫৫ লাইন, চৈত্র ৩৯৩—৩৯৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ সর্গ—৩৬৭ লাইন, মোট ১১৮৫ লাইন। রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে ষোল বৎসর।

"বনফুল" ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২৮২-১২৮৩ সনের (১৮৭৫-১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ) জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১২৮৬ সনে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) পুস্তকাকারে কবিকাহিনীই প্রথম প্রকাশিত হয়। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে—

> "এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না কিন্তু তখন আমার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনো মতেই বলা যায় না।" (১)

গ্রন্থ-পরিচয়

গ্রন্থখানির আকার ৬৪/৮"+৪১/৮" (১৭ মিমি × ১০.৫ মিমি) ডবল্ ফুলস্ক্যাপ্ ১৬ পেজি ৩ ফর্মা ৬ পৃষ্ঠায় মোট, মুখপত্র+৫৩ পৃষ্ঠা; স্মল পাইকা অক্ষরে প্রতি পৃষ্ঠায় ২৪ লাইন ছাপা। উৎসর্গ-পত্র নাই। কবিকাহিনীর এক লাইনও পরে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; বইখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য। নাম-পত্র (title page) এইরূপ—

(১) জীবন-স্মৃতি—১০৮ পৃঃ।

কবিকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ও

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

মেছুয়াবাজার—রোডের ৪৯ সংখ্যক ভবনে

সরস্বতী যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত

সংবৎ ১৯৩৫।

আখ্যান-ভাগ। (২)

রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবিকাহিনীর আখ্যান ভাগ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে, লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিষটি।" (২)

প্রথম সর্গ

প্রথম সর্গে কাব্যের নায়ক কবির শৈশব কালের কথায় বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের মনে আদর্শ শিশুজীবনের ছবি কিরূপ ফুটিয়াছিল তাহার পরিচয় পাই। শিশু কবি আপন মনে প্রকৃতির কোলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, মনের আনন্দে গান গাহিতেছে—

জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া। (২)

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, যে, মানুষের যে-সকল আকাঙ্ক্ষা বাস্তব জগতে পূর্ণ হয় না, কল্পনার জগতে মানুষ তাহা সম্ভোগ করিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে বালক রবীন্দ্রনাথ কবিকাহিনীর মধ্যে কল্পনার সাহায্যে নিজের অনেক অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া লইয়াছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে আছে—

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্ব্বত্র যেমন-খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না,—সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।" (১)

কবিকাহিনীর শিশু কবি কিন্তু সখ্ মিটাইয়া বাহিরের জগতে খেলা করিয়া বেড়াইত।—

প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণ-কিরণে
বিমল সরসী যবে হোত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রুজলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া। (২)

প্রকৃতির কোলে শুধু খেলা করা নহে, শিশু কবি গাছপালা পশুপক্ষীর সমস্ত খুটিনাটি বিষয়েরও খোঁজ রাখিত,—কোথায় পাখীরা গান করে, কোথায় ফুলগুলি ঢলিয়া পড়ে, কোথায় বাতাসে গাছের পাতা নাচিয়া উঠে!

বিজন কুলায় বসি গাহিত বিহঙ্গ
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক
কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি
কামিনীর গাছ হোতে পড়িলে ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা।" (৩)

প্রকৃতির কোলে খেলা করিবার জন্য এই প্রবল আগ্রহ এই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই পরবর্ত্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বিস্তারিত প্রান্তরের মধ্যে শালের বীথি আমলকী-

(১) জীবনস্মৃতি, পৃ. ১০৭।
(২) ভা, ১২৮৪, পৃ. ২৬৪। কবি-কাহিনী, ১ পৃষ্ঠা।

(১) জীবন-স্মৃতি, পৃ. ১৬।
(২) ভা. ১২৮৪, পৃঃ ২৬৪-২৬৫। কবি-কাহিনী, ১-২ পৃষ্ঠা।
(৩) ক-কা, পৃ ১-২। ভা, ১২৮৪, পৃ ২৬৪।

কাননের ছায়ায় বালকদিগের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। কবিকাহিনীর শিশুকবিও রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে লোপ পায় নাই, "শারদোৎসবের" বালকদলও দিশাহারা হইয়া গাহিয়াছে—

কি করি আজ ভেবে না পাই
　পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই—
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই—
　সকল ছেলে জুটি। (১)

শিশুকবি যেমন মায়ের কোল হইতে ছুটিয়া পালাইয়াছে, বালকদলও তেমনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়াছে—

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই
　যাব না আজ ঘরে!
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
　নেব রে লুট করে! (২)

যাহা হউক শিশুকবির শৈশব ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। কবি যৌবনে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতির সহিত যোগ এখন আরও ঘনিষ্ঠ হইল।

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপিচুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা। (৩)

কবি প্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তন্ময় হইয়া যাইত, আপনার মনে কত ভাবনাই ভাবিত।

ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি-পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের 'পরে হবে প্রকাশিত;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্তে পূরিত;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন। (৪)

কল্পনাদেবী তখন কবির প্রতি অনুকূল—

কল্পনা! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া,
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
*　*　*　*
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীরতলে বাজাইত বাঁশি,
তুমিও তাহারি সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর। (১)

রাত্রির অন্ধকারে যখন সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কবি তখন একাকী পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া প্রকৃতির স্তবগান গাহিত।

সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না
কেবল আকাশ-ব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
কেবল পর্ব্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান;
কেবল সুদূর-বনে দিগন্ত-বালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরূপে
মৃদুতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর-গীতি সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সম্মুখে বাহয়া,
নীরবে নিশীথ-বায়ু কাঁপাত পল্লব। (২)

পনেরো ষোল বৎসর বয়সে লেখা প্রকৃতি-স্তবের মধ্যেও কল্পনা-শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়; প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া কবি গাহিতেছেন—

শত শত গ্রহতারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব-চরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন! (৩)

ইহার পর নীহারিকা-পুঞ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে জগতের সৃষ্টি ও পরিণতি বর্ণনা করিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা বলিয়াছেন—এই নিয়ম-বন্ধন যদি একবার কোথাও ছিন্ন হয় তবে কি ভয়ঙ্কর প্রলয়কাণ্ডই উপস্থিত হইবে!

এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে
কক্ষছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্যচন্দ্রতারা

(১) শারদোৎসব পৃ ২।
(২) শারদোৎসব, পৃ ১৯।
(৩) ক-কা, পৃ ৩। ভা, পৃ ২৬৫।
(৪) ক-কা, পৃ ৪-৫। ভা, পৃ ২৬৫।

(১) ক-কা, পৃ ৫-৬। ভা, পৃ ২৬৬।
(২) ক-কা, পৃ ৬-৭। ভা, পৃ ২৬৬।
(৩) ক-কা, পৃ ৮। ভা, পৃ ২৬৬।

অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায় ;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে। (১)

আরও কিছুদিন পরে "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়" নামে একটি কবিতায় কতকটা এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রকৃতির রুদ্র-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের মনকে চিরদিনই আকর্ষণ করিয়াছে, পরবর্ত্তীকালের লেখায় সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই বাল্যকালের লেখাটির মধ্যেও আমরা প্রকৃতির প্রলয়রূপের বন্দনা দেখিতে পাই।

যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বতচূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মত
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব,
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা দেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়িছে খসিয়া
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি। (১)

এই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুতরঙ্গে "দোলে রে প্রলয় দোলে" অথবা বর্ষশেষের "ঈশানের পুঞ্জমেঘ ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধহারা" পর্য্যন্ত ঝড়ের বর্ণনায় কবির হাত কখনো কাঁপে নাই।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "মোরে কর সভা-কবি ধ্যান-মৌন তোমার সভায় হে শর্ব্বরী"; রাত্রি ও সন্ধ্যার স্তবও তিনি পরে অনেক লিখিয়াছেন; কিন্তু এই অল্প বয়সের লেখাতেও নিশীথ-রাত্রির সভাকবি হইবার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীনে.
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকশিত। (১)

শুধু রাত্রি নয়, সঙ্গে সঙ্গেই আছে—

কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষায়
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মত
আধঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি!
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ বালারে—
যেদিকে দক্ষিণবধূ ফেলেন নিশ্বাস
সেদিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সেদিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সেদিকে বসন্তলক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া! (২)

দ্বিতীয় সর্গ

প্রকৃতির কোলে এই ভাবে কবির জীবন কাটিতে লাগিল, কিন্তু কবির হৃদয় শূন্য থাকিয়া গেল—কিসের যেন অভাব থাকিয়া গিয়াছে—

এখনো বুকের মাঝে, রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর?
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া। (৩)

এই পনেরো ষোল বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল
* * *
পারে না পূরিতে তারা, বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন। (৪)

প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষকেও ভালবাসিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। (৫)

সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বাদ দিয়া কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই।

কবিকাহিনীর নায়ক শূন্য হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া

(১) ক-কা, পৃ ৭-৮। ভা, পৃ ২৮৭।
(২) ক-কা, পৃ ৯। ভা, পৃ ২৬৭।

(১) ক-কা, পৃ ৯-১০। ভা, পৃ ২৬৭।
(২) ক-কা,—পৃ ১০। ভা, পৃ ২৬৭-২৬৮।
(৩) ক-কা, পৃ ১২। ভা, মাঘ, ১২৮৪, পৃ ৩১৮।
(৪) ক-কা, পৃ ১৩। ভা, পৃ ৩১৯।
(৫) কড়ি ও কোমল।

বেড়াইত, একদিন অপরাহ্ণে শ্রান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িল।

> হেনকালে ধীরি ধীরি, শিয়রের কাছে আসি
> দাঁড়াইল একজন বনের বালিকা,
> চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে
> কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক ?
> অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার,
> নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
> তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময় ?
> কি দুখে উদাস হোয়ে করিছ ভ্রমণ ? (১)

বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলিল, কবির মনে হইল এতদিন পরে তাহার হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকা কবিকে তাহার পর্ণ-কুটীরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

> হোথায় বিজন বনে দেখেছ কুটীর ওই,
> চল যাই ওইখানে যাই দুজনায়।
> বন হোতে ফলমূল আপনি তুলিয়া দিব,
> নির্ঝর হইতে তুলি আনিব সলিল,
> যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
> সুখনিদ্রা-কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
> আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত,
> কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া। (২)

"বনফুলে"র নায়িকা কমলার ন্যায় নলিনীর সহিতও বনের হরিণ বনের পাখী বনের গাছপালার একটি সুমধুর হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বনফুল-পরিচয়-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতির সহিত মানুষের মিলনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল হইতেই মুগ্ধ করিয়াছে।

> হরিণ-শাবক এক আছে ও গাছের তলে
> সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক !
> দূরে সরসীর ধারে আছে এক চারুকুঞ্জ,
> তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন,
> কত পাখী ডালে ডালে সারাদিন গাইতেছে
> কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
> আবার দেখাব সেই অরণ্যের নির্ঝরিণী,
> আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
> পাখী এক আছে মোর, সে যে কত গায় গান,
> নাম ধোরে ডাকে মোর 'নলিনী' 'নলিনী'।
> যা আছে আমার কিছু, সব আমি দেখাইব,
> সব আমি শুনাইব যত জানি গান। (৩)

(১) ক-কা, পৃ ১৫। ভা, পৃ ৩১৯।
(২) ক-কা, পৃ ১৬। ভা, পৃ ৩২০।
(৩) ক-কা, পৃ ১৭। ভা, পৃ ৩২০।

নলিনীর সহিত কবি কুটীরে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কবির মন নলিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। নিজের ভালবাসার কথা প্রকাশ করিতে না পারায় কবির মন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

> সুখ বা দুখের কথা বুকের ভিতরে যাহা
> দিনরাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
> প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
> জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
> কবি তার মরমের প্রণয়-উচ্ছ্বাস-কথা
> কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া,
> পৃথিবীতে হেন ভাষা নাহিক মনের কথা
> পারে যাহা পূর্ণভাব করিতে প্রকাশ। (১)

কিন্তু এইভাবে বেশীদিন চলে না, একদিন কবি বালিকার কাছে গিয়া অশান্ত বালকের মত কত কি বলিয়া ফেলিল; অসংলগ্ন কথা মনের ভাবকে প্রকাশ না করিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া দিল।

> কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
> পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা।

বালিকাও কবির কাছে নিজের ভালবাসার কথা প্রকাশ করিল।

তাহার পর নলিনী ও কবির একত্র জীবনযাপনের কথা।

> অরণ্যে দুজনে মিলি আছিল এমন সুখে,
> জগতে তারাই যেন আছিল দুজন ;
> যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু,
> যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
> আলুলিত চুলগুলি সাজাইয়া বনফুলে
> ছুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে,
> একথা ও-কথা লয়ে, কি যে কি কহিত বালা
> কবি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে নারিত। (২)

বালিকার মন প্রণয়ে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না।

> শুধু সে বালিকা ভালবাসিত কবিরে।
> শুধু সে কবির গান কত যে লাগিত ভাল,
> শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর।
> *　　*　　*
> শুধু সে কবিরে বালা শুনাতে বাসিত ভাল
> কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যার,
> কিন্তু সে কথায় কবি, কত যে পাইত অর্থ,
> গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়। (৩)

(১) ক-কা, ১৯ পৃ। ভা, ৩২১ পৃ।
(২) ক-কা, ২০ পৃ। ভা, ৩২১ পৃ।
(৩) ক-কা, ২৬ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ।

বনবালিকার চরিত্রে কৃত্রিমতার আভাস মাত্র ছিল না, তাহার জীবন বনদেবতার মতনই সরল সহজ সুন্দর।

আঁধার অমার রাত্রে, একাকী পর্ব্বত-শিরে
সেও গো কবির সাথে রহিত দাঁড়ায়ে,
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ অশনি আর
পর্ব্বতের বুকে যবে বেড়াত মাতিয়া,
তাহারো হৃদয় যেন নদীর তরঙ্গ সাথে
করিত গো মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব।
* * *
বন-দেবতার মত এখন সে এলোখেলো,
কখনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কখনো এমন শান্ত, প্রভাতের বায়ু যথা,
নীরবে শুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত। (১)

কিন্তু এত সুখেও কবির মন তৃপ্ত হইল না,

এখনো কহিছে কবি, "আরো দাও ভালবাসা,
আরো ঢাল ভালবাসা হৃদয়ে আমার।"

পনেরো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিচরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন জগতের অনেক কবি সম্বন্ধে এ-সকল কথা খাটে।

স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবী নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিয়ে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পুরায় তারা আকুল বিলাপে। (২)

কবি বা শিল্পীর মন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, কিছুতে তার সন্তোষ নাই, সে এক অভিজ্ঞতার পর আরেক অভিজ্ঞতা ভাঙিয়া নূতন নূতন শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহ করে। কথাটা নূতন নহে, অনেকেই এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এত অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ এই জিনিষটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

যাহা হউক কবির অতৃপ্তি ঘুচিল না।

কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পুরিল না প্রাণের শূন্যতা"!
বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি
"আরো দাও ভালবাসা হৃদয় ঢালিয়া।
আমি যত ভালবাসি, তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পুরিবে না প্রাণের শূন্যতা।" (৩)

(১) ক-কা, ২১ পৃ। ভা, ৩২১-৩২২ পৃ।
(২) ক-কা, ২২ পৃ। ভা ৩২২ পৃ।
(৩) ক-কা, ২২ পৃ। ভা, ৩২২ পৃ।

বালিকা এ কথার কি উত্তর দিবে? সে ত কিছু বাকি রাখে নাই—

যা ছিল আমার কবি দিয়াছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি
সকলি তোমার প্রেমে দেছি বিসর্জ্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ। (১)

কবির মন কিন্তু তৃপ্ত হয় না—যা পাওয়া যায় না কবির মন চায় তাই।

"ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?
সারাদিন সাধ যায় শুনাই মনের কথা,
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া?
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখের পানে,
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা?
* * *
এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।" (২)

মনের ভিতরে এই অতৃপ্তি, বাহিরের কোন জিনিষে মিটিবে না। কবি ঠিক করিল সে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইবে, অন্য দেশে অন্য লোকালয়ে কোথাও তৃপ্তি পায় কি না দেখিয়া আসিবে। কবি বালিকার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

বালিকা নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি,
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চখে।
সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে, তবুও রহিল চাহি,
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেষ।
* * *
কবি ত চলিয়া যায়—সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে,
আঁধারে কাননভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু,
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে।
* * *
তখন বনান্ত হোতে সুধীরে শুনিল কবি,
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষণ্ণ সঙ্গীত,
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি,
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে। (৩)

বালিকা গান করিতে লাগিল।

(১) ক-কা, ২২ পৃ। ভা, ৩২২ পৃ।
(২) কা-কা, ২৩ পৃ। ভা, ৩২২ পৃ।
(৩) ক-কা, ২৭-২৮ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ।

কেন ভাল বাসিলে আমার ?
কিছুই নাহিক গুণ, কিছুই জানি না আমি,
কি আছে ? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয় ?
যা আমার ছিল সাধ্য, সকলি করেছি আমি,
কিছুই করিনি দোষ চরণে তোমার,
শুধু ভাল বাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তাতেও তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি,
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার ? (১)

তৃতীয় সর্গ

কবি কত দুর্গম নদী গিরি লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেল, কত দূর দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিল, নূতন লোকালয় দেখিল, কিন্তু তাহার হৃদয় শান্ত হইল না। কবির হৃদয় বিকল হইয়া গিয়াছে—কিছুই তাহার ভাল লাগে না, পাখীর গান নির্ঝরের ধ্বনিতেও কবির হৃদয় আর পূর্ব্বের ন্যায় জুড়ায় না। নলিনীর বিরহে সমস্তই তাহার নিকট শূন্য ঠেকে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীর দিকে চাহিয়া কবি বসিয়া থাকে।

জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ধরা নীরব রজনী।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সরসী-বক্ষে প্রশান্ত জোছনা।
নভ-প্রতিবিম্ব-শোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র-তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন!
স্নিগ্ধরাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
অধীর বসন্ত-বায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব। (২)

এইরূপ নীরব রজনীতে কবির মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানি না কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া, উথলিয়া উঠে গো কেমন! (৩)

যখন রাত্রি হইয়া আসে পুরানো সুখের কথা কবির মনে পড়ে, কবির মন উদাস হইয়া যায়।

কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি!
কে আছে এমন যার এ হেন নিশীথে
পুরাণো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি! (১)

কবির ত এরূপ অবস্থা। ওদিকে বনবালিকা নলিনীও নিতান্ত বিষন্ন হৃদয়ে অরণ্য-কুটীরে দিন কাটাইতেছে। তাহার সেই সরল হাসি সেই সদানন্দ প্রফুল্লভাব আর নাই—

আর সে গায় না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হোয়েছে নীরব।
আর সে লইয়া বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমে না বালা কাননে কাননে।
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির,
এমন বিশুষ্ক শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ। (২)

বালিকা এখন মরণের দিন গুনিতেছে, মনে শুধু এক সাধ যে কবিকে দেখিয়া যেন মরিতে পারে।

কবির প্রত্যাবর্ত্তন

ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া কবি কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

বহুদিন পরে কবি পদার্পিল বনভূমে,
বৃক্ষলতা সবি তার পরিচিত সখা,
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাহিছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর করি। (৩)

বাহিরের প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, যা-কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা মানুষের হৃদয়ে; কবি অধীর হইয়া কুটীরের দিকে চলিল।

দুয়ারের কাছে গিয়া, দুয়ারে আঘাত দিয়া
ডাকিল অধীর স্বরে নলিনী নলিনী!
কিছু নাই সাড়াশব্দ, দিল না উত্তর কেহ,
প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিদ্রূপ।
কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা' রোয়েছে পড়ি,
বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে। (৪)

কবি আকুল হইয়া কাননে কাননে নলিনীকে খুঁজিল, কেহ সাড়া দিল না, শুধু ঘুমন্ত হরিণেরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল, কাতর কবি গিরিশৃঙ্গে গিয়া উঠিল।

(১) ক-কা, ২৮ পৃ। ভা, ৩২৪ পৃ।
(২) ক-কা, ৩২ পৃ। ভা, ফাল্গুন, ৩৬১ পৃ।
(৩) ক-কা, ৩২-৩৩ পৃ। ভা, ৩৬১ পৃ।

(১) ক-কা, ৩৩ পৃ। ভা, ৩৬১ পৃ।
(২) ক-কা, ৩৪ পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ।
(৩) ক-কা, ৩৫ পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ।
(৪) ক-কা, ৩৫ পৃ। ভা, ৩৬২ পৃ।

দেখিল সে গিরিশৃঙ্গে, শীতল তুষার পরে
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান-মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল,।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধ-নিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে। (১)

নলিনীর ঘুম আর ভাঙ্গিল না, কবির সহিত তাহার আর দেখা হইল না। কবিকেও তাহার পর দিন হইতে সেই বনে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

নিকটের জিনিষ অবহেলা করিয়া মানুষ দূরে চলিয়া যায়, নিকটকে হারায় এবং দূরকেও পায় না, এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া বলিয়াছেন। ২০ বৎসর বয়সে লেখা "ভগ্ন-হৃদয়" নামক নাটিকখানিতে আরেক কবি নলিনীরই মত সরলা বালিকা মুরলাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কাছে থাকিতে বুঝিতে পারিল না যে সে মুরলাকেই ভালবাসে। দেশে দেশে ঘুরিয়া সে কবিও একদিন মুরলাকে খুঁজিল—

দেশে দেশে ভ্রমিতেছি কোথায়—কোথায় ?
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধূ ধূ করিতেছে,
সে মাঠেতে অন্ধকার—বিস্তারিয়া বাহু তার—
ভূমিতে রাখিয়া মুখ কেঁদে মরিতেছে!
কোথা তুই—কোথা মুরলা রে—
কোথা তুই গেলি বল্—শুধাইব কারে ?" (২)

মুরলার সঙ্গে যখন দেখা হইল, মুরলা তখন মৃত্যুশয্যায়। দেখা হইবার কিছু পরেই সব শেষ হইয়া গেল।

আরো কিছুদিন পরে, ২৮ বৎসর বয়সে লেখা "মায়ার খেলা"য় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই সুর বাজিয়াছে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনের-মত কারে খুঁজে মর'!
সে কি আছে ভুবনে!
সে যে রয়েছে মনে!

(১) ক-কা, ৩৬-৩৬ পৃ। জী, ৩৬২ পৃ।
(২) ভগ্নহৃদয়, ২৭ শ সর্গ, পৃ ১৭৪।

মায়াকুমারীরা বারবার গাহিয়াছে—

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!
মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে!

আবার ষাট বৎসর বয়সে "তপস্বী"র কথা লিখিয়াছেন।

সাধনার একটা পর্ব্ব শেষ করে' সে চোখ মেলে দেখ্‌লে কাঠকুড়ানি মেয়েটি খোঁপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম ফুলে রঙ করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না, যেন সে এমন একটি জানা সুর যার পদগুলো মনে পড়্‌চে না। * * তপস্বী দেখেও দেখ্‌লে না, আবার তপস্যায় মন দিলে। * * মেয়েটি একদিন বল্‌লে "প্রভু, আমি বহু দূরদেশে যাব, আমাকে আশীর্ব্বাদ করো।" তপস্বী বল্‌লেন "যাও"। মেয়েটি চলে গেল। * * তারপর যখন তপস্যা পূর্ণ হল, যখন বর নেওয়ার সময় এল, ইন্দ্র জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কি চাও ?" তপস্বী তখন বল্‌লেন "এই বনের কাঠকুড়ানিকে"।

এই বয়সেই আবার লিখিয়াছেন পরীস্থানের রাজপুত্রের কথা।

উদাস ঝোরার ধারে বনের মেয়ে কাজরীকে পেয়ে যার মন তৃপ্ত হল না, যে ভাব্‌লে কাজরীর কালো চেহারার মাঝে পরী ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে। রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়েও যে রোজই কাজরীকে বলে "তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও, আমি যে তোমার পরীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই।" তারপর একদিন যখন কাজরী বল্‌লে "না, আমি আর ফাঁকি দেব না," যখন কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাতে তিন প্রহরের বাঁশি বাজ্‌ল, চাঁদ যখন পশ্চিমে হেলেছে, শোবার ঘরে বিছানার শাদা আস্তরণের উপর রাশ করা কুন্দফুল ফেলে রেখে দিয়ে কাজরী যখন চলে গেল, তখন রাজপুত্র বুঝ্‌লে, চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায় তখন আর তাকে পাওয়া যায় না। ‡

অতএব দেখা যাইতেছে যে কবিকাহিনীর মধ্যেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি মূল সুরের আভাস পাওয়া গেল। এইরূপ মূল সুরের আভাস পাওয়া যায় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ [বি-এ (কাণ্ট্যাব)]

‡ বঙ্গবাণী, বৈশাখ, ১৩২৯, সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ

ভারতের মুসলমান প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য খিলাফৎ সম্বন্ধে নানারূপ প্রতিশ্রুতি ইংরেজসরকার বার বার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তুরস্ক-প্রাধান্য ইংরেজ-স্বার্থের পরিপন্থী হওয়াতে তুরস্কের পরিবর্তে অন্ত কোনও মুসলমান রাজ্যের হস্তে জিজারৎউল্ আরব অর্থাৎ আরবের পবিত্র তীর্থগুলির ভার দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহাই ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার বিবেচ্য হইয়া উঠিল। ধন ও জনবলে মধ্যআরবের সামন্তরাজ ইব্‌ন্ সাউদ্ প্রধান। আরব জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবের পর হইতেই আরবের প্রজা-সাধারণ ইব্‌ন্ সাউদ্‌কেই আরব জাতীয়দলের নেতৃত্বপদে বরণ করিয়াছিল। উড্রো উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা অনুসারে আরব দেশে স্বাধীনরাজ্য স্থাপিত হইলে ইব্‌ন্ সাউদ্‌কেই রাজ-পদে অভিষিক্ত করা উচিত ছিল। প্রজাসাধারণের অভিরুচি অনুসারে আরবের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে মিত্রশক্তি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইংরেজ-মন্ত্রী ব্যাল্‌ফুর ঘোষণা করেন যে মিত্রশক্তিবর্গ আরবে অধিবাসীবৃন্দের স্বেচ্ছাবরিত দেশজ-রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিবেন।

যুদ্ধারম্ভে চার্চ্চিল সাহেব উপনিবেশ-সচিব এবং আরববন্ধু কর্ণেল লরেন্স তাঁহার সহযোগী ছিলেন। কাজে কাজেই আরব জাতীয়তাকে প্রবল করিয়া তুলিতে ইংরেজ সরকার তখন খুব সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তুরস্ক সম্রাট ইস্‌লামজগতের ধর্ম্মগুরু খলিফা। তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিতে হইলে ইব্‌ন সাউদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তেমন ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং সাউদের প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার সরিফ হুসেনকে আরবের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলে মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস খুব বেশী ক্ষুণ্ণ না হইতেও পারে মনে করিয়া ইংরেজ-সরকার হুসেনের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মক্কার সরিফ আরবের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইলে মুসলমানদিগের পুণ্যতীর্থগুলির সংরক্ষণ-ভার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত আছে মনে করিয়া ভারতীয় মুসলমান প্রজাবৃন্দ নিশ্চিন্ত থাকিবেন এরূপ ভরসা ইংরেজের ছিল।

তাই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতেই হুসেনের সহিত ইংরেজ সরকারের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। ১৯১৭ সনের মাঝামাঝি সময়ে হুসেন তুরস্কের অধীনতা অস্বীকার করিয়া হেজ্জাজে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজের সাহায্যে আসিবার সময় হুসেন আশা করিয়াছিলেন যে সিরিয়া হেজ্জাজ ইরাক কুর্দ্দিস্থান প্রভৃতি আরবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইয়া একটি আরবসাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে এবং হুসেন তাহার শাসন-ভার পাইবেন। কিন্তু যুদ্ধ-ঘোষণার কিছুদিন পর হইতেই তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। ইরাকি আরবগণ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার দাবী করিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংরেজদিগের একটি রফা-নিষ্পত্তি হয়। এই রফা-নিষ্পত্তি সাইক্‌স্ পিকো (Sykes Picot) নিষ্পত্তি নামে বিখ্যাত। ইহাতে ফ্রান্সের উপর সিরিয়ার খবরদারী করিবার অধিকার ইংরেজ স্বীকার করেন। কাজেকাজেই হেজ্জাজ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশ হুসেনের অধিকারে আসিবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ইংরেজ-সরকার হুসেনকে সমস্ত আরবের অধীশ্বর করিবার প্রতিশ্রুতি করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা হয় তো ভাবিয়াছিলেন যে কার্য্যকালে ফ্রান্সকে কোনও রকমে বুঝাইয়া সিরিয়া হুসেনকে দিতে পারিবেন। ইংরেজের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া হুসেনের পুত্র ফইজুল তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেরিফিয়ান সৈন্য ইংরেজ সৈন্য পৌছিবার একদিন পূর্ব্বেই ডামাস্কাস্ জয় করিয়াছিলেন এবং মিত্রশক্তিবর্গ বিরুৎ জয় করিতে অগ্রসর হইবার সাতদিন পূর্ব্বেই বিরুৎ দখল করিয়াছিলেন। ফরাসী সেনাপতি গুরো বিরুতে পৌছিয়াই ফইজুলকে সেরিফিয়ান পতাকা নামাইয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। ফইজুল ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। মুখে ইংরেজ অনেক আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু কাজে কোনই ফল হইল না। ("Feisal had our support in debate but not in action."—D. G. Hogarth.)

পারী বৈঠকে আরবদিগের দাবী উপস্থিত করিবার জন্য ফইজুল ফ্রান্সে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হয়। মিত্রশক্তিবর্গের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সিরিয়াবাসীগণ ডামাস্কাস সহরে এক মহাসভা আহ্বান করিয়া ফইজুলকে সিরিয়ার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ডামাস্কাস, হোম্‌স্, হামা ও আলেপ্পো সহরে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে থাকে। ইহাতে ফরাসীজাতি ফইজুলের দলের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠাতে ইংরেজ সরকার ফাঁপরে পড়েন। অনেক বাকবিতণ্ডার পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্যান্‌রেমো বৈঠকে আরবের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের খবরদারীর ভার স্থির করা হয়। সার্ব্ব-সিরিয়ান (Pan-Syrian) মহাসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিরিয়ার খবরদারীর ভার ফ্রান্সকে দেওয়া হয় এবং ইংরেজ সরকার প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়ার খবরদারীর ভার প্রাপ্ত হন। জুলাই মাসে ফইজুল ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন। হুসেন ইংরেজের সাহায্য চাহিলে মন্ত্রী বোনার ল' বলেন "ফরাসীজাতি যে-সকল স্থানের খবরদারী করিবার ভার পাইয়াছেন সেই-সকল স্থানের কোনও মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার ইংরেজের নাই।" ("Britain has no right to nterfere in a country where France has received the mandate.")

তাহার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সেভার্স সন্ধির খসড়া স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিপত্র অনুসারে আর্ম্মেনিয়া ও হেজ্জাজ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয় এবং সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়া স্যান্‌রেমো বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে খবরদারীর অধীনে থাকিবে বলিয়া স্থির হয়।

হুসেনের আবেদনের উত্তরে ইংরেজ সরকার জানাইয়াছিলেন যে

সিরিয়ার কোনও মীমাংসা করিবার অধিকার ইংরেজের নাই। কারণ ফ্রান্সের উপর জাতিসমূহের সংঘ সিরিয়ার খবরদারী ভার অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর অ্যাঙ্গোরার ইউসুফ কামালের সহিত ফ্রান্সের Franklin Bouillionএর যে রফা-নিস্পত্তি হয় তাহাতে সিরিয়ার কতকাংশ অ্যাঙ্গোরাকে ফিরাইয়া দেওয়াতে ইংরেজ সরকার ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। লর্ড কার্জ্জন বলিলেন যে "এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়াতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের লণ্ডন চুক্তি এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সের্ভাস সন্ধির মূল নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিসিবিন ও জিজারৎ ইবন-ওমার অ্যাঙ্গোরাকে ফিরাইয়া দিবার অধিকার ফ্রান্সের নাই। ফ্রান্স সিরিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা নহেন, জাতিসমূহের সংঘের পক্ষ হইতে কেবল মাত্র খবরদারীর ভার পাইয়াছেন।" হুসেনের দাবীর সময় ইংরেজ বলিলেন সিরিয়ার ব্যাপারে ইংরেজ কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না. কিন্তু আবার অ্যাঙ্গোরার সহিত ফ্রান্সের রফানিস্পত্তিতে ইংরেজই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গণ্ডগোল করিলেন। অবশ্য অ্যাঙ্গোরা সন্ধিতে ইংরেজের ক্ষতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। লর্ড কার্জ্জন বলেন নিসিবিন ও জিজারৎ-ইব্‌ন্‌-ওমার হইতে মেসোপটেমিয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করিবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। উহা ফিরাইয়া পাওয়াতে অ্যাঙ্গোরা রাজ্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সুযোগ পাইবেন। চোবানবে পর্য্যন্ত বাগ্‌দাদ রেল-লাইন কামাল পাশা ফিরিয়া পাওয়াতে ভারতের প্রান্ত সীমা বিপন্ন অবস্থায় রহিল। যদি দাঘিস্থান, ককেসাস, পারস্য ও আফ্‌গান রাজ্যের মধ্যে সখ্য-স্থাপনে কামালের দল সুবিধা পায় তবে ভারত আক্রমণ করা কামালের পক্ষে অতি সহজ হইয়া পড়িবে। ফরাসীজাতি কামালকে সেই সুবিধা করিয়া দেওয়াতে সেভার্স সন্ধির মূল নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মক্কার আরব দল এই-সকল ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এক চাল চালিলেন। তাঁহারা হুসেনের পুত্র ফইজুলকে মেসোপটেমিয়ার সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া তাঁহাকে ইরাকের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু হুসেন ও ফইজুল ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। হুসেন বলেন, "You speak to me continually of the British Government and British policy. But I see five Governments where you see one and the same number of policies. There is a policy, first of your foreign office; second, of your army; third of your navy; fourth of your protectorate in Egypt; fifth, of your Government of India. Each of these British Government's seem to me to act on a Arab policy of its own." "আপনারা ক্রমাগত আমার নিকট ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি ও ব্রিটিশ শাসন-তন্ত্রের কথা বলিয়া আসিতেছেন। আপনারা যেখানে একটি মাত্র শাসনতন্ত্রের কথা বলেন আমি সেই স্থলে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ও পাঁচটি ভিন্ন রাষ্ট্রনীতি দেখিতে পাই। আপনাদের পররাষ্ট্র বিভাগের এক প্রকার নীতি। সৈন্যবিভাগের নীতি অন্যরূপ। তাহার পর আপনাদের নৌবহরের, ইজিপ্টসরকারের ও ভারত-সরকারের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন প্রকারের। এই পাঁচটি বিভাগের আরবনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।" বাস্তবিক প্রত্যেক বিভাগ নিজ স্বার্থের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টি রাখাতে আরবনীতি সম্বন্ধে এত গণ্ডগোলের সৃজন হইয়াছে যে আর ব্রিটিশ নীতির প্রতি হুসেন ও ফইজুল বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছেন না। ফলে আরবে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। অ্যাঙ্গোরা সরকার যদি ভবিষ্যতে মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তাহা হইলে আরব জাতীয় দল তাঁহার সহিত হয় তো যোগ দিবে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির সামঞ্জস্যের অভাবে যে-সকল গলদ ঘটিয়াছে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে আরবে এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় [বি-এল]

—

নূতন মানুষ

একটা জাতির প্রাণের পরিচয় স্বভাবতই সব-চেয়ে বেশী আত্ম-প্রকাশ করে সেই জাতির যুবন-সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া। রণক্লান্ত পরাজিত জার্ম্মেনীর যখন ধূলার শয্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবার কথা, তখন তার যুবনদলের মধ্যে যৌবনের উদ্দাম অদম্য প্রাণধারা কি ভীষণ খরগতিতে বহিয়া চলিয়া সমাজে রাষ্ট্রে সভ্যতায় ভাঙন ধরাইয়া দিবার উদযোগ করিয়াছে তাহার বর্ণনা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়—জার্ম্মেনীর এই যুবন-আন্দোলন "লণ্ডন, বায়েস্‌বাডেন্‌ প্রভৃতি স্থানে জার্ম্মেন রাষ্ট্রনেতাদের স্বাক্ষরিত সন্ধিসর্ত্তাদির অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে" জার্ম্মেনীর ভবিষ্যৎকে নিয়মিত করিবে।

কুড়ি বৎসর আগে জার্ম্মেনীর এই নবজাগ্রত যুবন প্রাণের প্রথম স্পন্দন "বাণ্ডেরফোএগেল্‌" বা "নীড়হারা পাখীর দল" প্রভৃতি আন্দোলনে প্রথম অনুভূত হইয়াছিল। উহার মধ্য দিয়া বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে জার্ম্মেনীর তরুণতরুণীদের লাজুক অন্তঃপ্রকৃতির প্রথম পরিণয়ের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুবন-আন্দোলন মুক্তপ্রকৃতির মধ্যে পাখীর মতো পাখা মেলিয়াই খুসী নহে। উহার মধ্যে লড়াইয়ের সুর লাগিয়াছে। জরার বিরুদ্ধে এই লড়াই, প্রাণহর অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তায় নহে; কেবলমাত্র দুর্দ্দমনীয় প্রাণশক্তির দ্বারা জীবনের যেখানে যেখানে—সমাজে রাষ্ট্রে, চিন্তায় কর্ম্মে ব্যবহারে—এই জরার আধিপত্য, সেখান হইতে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া যৌবনের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য। লোভ-পরায়ণ সৈনিকতা, নিয়মবদ্ধ ধর্ম্ম, কারখানার নিস্পেষণ, বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতা, ব্যবস্থা-পরিষদের যথেচ্ছাচার—এসমস্তের বিরুদ্ধেই সম্প্রতি যুদ্ধ-ঘোষণা করা হইয়াছে। কেননা জার্ম্মেনীর বর্ত্তমান জাতীয় জীবনসঙ্কটের জন্য প্রত্যক্ষ-ভাবে এগুলিই দায়ী।

জীবনের সমুদয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যুবনদিগকে বাদ দিয়া দূরে সরাইয়া রাখা স্বার্থপর বয়স্ক লোকদের ধর্ম্ম। জার্ম্মেনীর যৌবনধর্ম্ম ইহারও বিরোধী হইয়াছে। যৌবন তার স্বাধিকারের বলে দেশের জীবনকে সভ্যতাকে নিজের হাতে নিজের মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিবে, দেশের শুভা-শুভের কথা ভাবিবে, নিজের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী অন্তত নিজেদের জীবনকে গঠন করিবার পরিপূর্ণ অধিকার তাহার থাকিবে; তাহাতে সে বরঞ্চ বারম্বার ভুল করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে, কিন্তু অথর্ব্ব প্রাচীনদের হাত-ধরা হইয়া, জীবনের সর্ব্বত্র দলে দলে "যো-হুকুম" জড়পিণ্ড হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে না।

এই যুবন-আন্দোলন নবপ্রচারিত বিরাট ধর্ম্ম-আন্দোলনের মতো আজ যদিও জার্ম্মেনীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত প্লাবিত আলোড়িত করিতেছে, তথাপি ইহার মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তী সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব কিছুমাত্র নাই। সঙ্ঘ গড়িবার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া ব্যাপকভাবে ব্যক্তির জীবনকেই সার্ব্বজনীন আদর্শ-অনুযায়ী গড়িয়া তোলা ইহার লক্ষ্য। সেইজন্য কতকগুলি বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান এবং আইন-

কানুনের সঙ্কীর্ণতা লইয়া নূতন একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবার ভয় এই যুবন-ধর্ম্মে নাই।

এই যুবনধর্ম্ম তাই বলিয়া সমাজকে অস্বীকার করিতেছে না। সমাজ-সেবা ক্রমেই এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি খুব বড় অঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যুবনধর্ম্মে সকলের উপরে ব্যক্তিত্বেরই জয়জয়কার। ইহার আদর্শ ব্যক্তি-জীবনের আদর্শ, তাই ইহার নীতি-পর্য্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে স্বাস্থ্যরক্ষা—শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্। যাহাদের ভিত্তি করিয়া জাতীয় সভ্যতার বনিয়াদ গড়িবে, এই বিচিত্র বিশ্বে বিধাতার মানুষ-সৃষ্টির মহা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহারাই যদি ভগ্ন-স্বাস্থ্য জীবন্মৃত হয় তবে শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম্ম নীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, যুদ্ধ শান্তি প্রভৃতির এত কোলাহল এত আয়োজন যে একান্তই নিরর্থক ও পণ্ডশ্রম তাহা হৃদয়ঙ্গম করা ইঁহাদের কঠিন হয় নাই। মনের দিক হইতে সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতা ইঁহাদের সবচেয়ে বড় সাধনার জিনিষ। অবিচলিতভাবে এই আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবনকে যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছে Der Neue Mensch বা নূতন মানুষ। ইঁহারা কোনও রকমের মাদক তাম্রকূটাদি স্পর্শ করেন না, জীবন-ধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য সমস্ত বিলাস-বাসনা বর্জ্জন করেন। কমিউনিজমের আদর্শ অনুযায়ী সমাজ-জীবন গঠন করিবার চেষ্টাও কোথাও কোথাও হইয়াছে।

এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কথাটি স্বার্থ নয়, উহা যুবন্ মনের বেগবান্ আদর্শাভিমুখীনতা। ইহা কেবলমাত্র শুষ্ক বিচার-বিতর্কের বিষয় নয়, লক্ষ লক্ষ তরুণ মনের প্রীতিরসের অভিষেকে ইহার জন্ম। এই হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় ধর্ম্ম-আন্দোলনগুলির সঙ্গে ইহার তুলনা চলিতে পারে। চলিত অর্থে ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যুবন-ধর্ম্মে তাহাও বাদ পড়ে নাই। আমরা শুনিতে পাই জার্ম্মেনীর উপাসনাগারের বেদীগুলিতেও বার্দ্ধক্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লোপ পাইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহে অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতা ঘুচিয়া নিবিড় রসগভীর প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত হইতেছে। ভয়োদ্রেককারী স্তব্ধতা ভাঙিয়া দেবায়তনগুলিতে প্রাণখোলা হাসির বন্যা কলরোল তুলিয়া বহিতেছে। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির দেবতার সঙ্গে এই নূতন মানুষগুলির পরিচয় ও আদানপ্রদানের বড় ক্ষেত্র হইতেছে মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতির কোলে, জনবহুল পথে বা উদ্যানে, পাহাড়ে প্রান্তরে বনে।

পৃথিবীতে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধদের আধিপত্য চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে; হঠাৎ যুবকদের এই অভ্যুত্থানে সমস্ত ইউরোপ আমেরিকায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে যাঁহারা আতঙ্কিত হইতেছেন তাঁহাদের একটা কথা নিশ্চয়ই আমরা ভাবিয়া দেখিতে বলিতে পারি। পৃথিবীর কারবার এতদিন ধরিয়া চালাইয়া যাঁহারা দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের হাত হইতে সে কারবারের কর্ত্তৃত্ব খসিয়া যাওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয়? পৃথিবীকে নূতন করিয়া গঠন করিবার প্রয়োজন আছে; জার্ম্মেনীর নূতন মানুষদের আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী [বি-এ]

বারমাসের খাদ্যের তালিকা

মাঘেতে মকর মিঠে
কুর্ত্তি আলু সিম।
ফাল্গুনে দুগুণ মিঠে
বার্ত্তাকুতে নিম॥
চৈত্রেতে শ্রীফল মিঠে
খেয়েছিলেন রাম।
বৈশাখেতে হয় মিঠে
শোল মাছে আম॥
জ্যৈষ্ঠেতে আম জাম
আষাঢ়ে কাঁঠাল।

শ্রাবণেতে খই দই
ভাদ্রে পাকে তাল॥
আশ্বিনেতে ঝুনো নারকেল্
কার্ত্তিকেতে ওল।
অগ্রহায়ণে নবান্ন
চিংড়ি মাছের ঝোল॥
পৌষেতে মূলো মুড়ি
খেতে বড় মিঠে।
গরম দুধে চাঁপা কলা—
চন্দ্রপুলি পিঠে॥

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মজুমদার
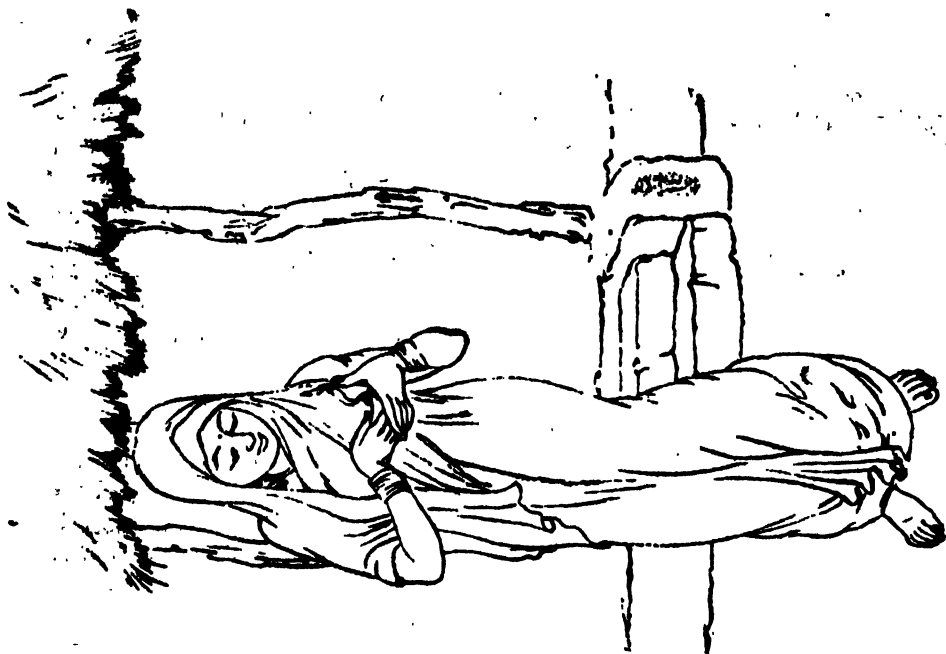
প্রত্যাশী

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে

সাঁঝের বাতি
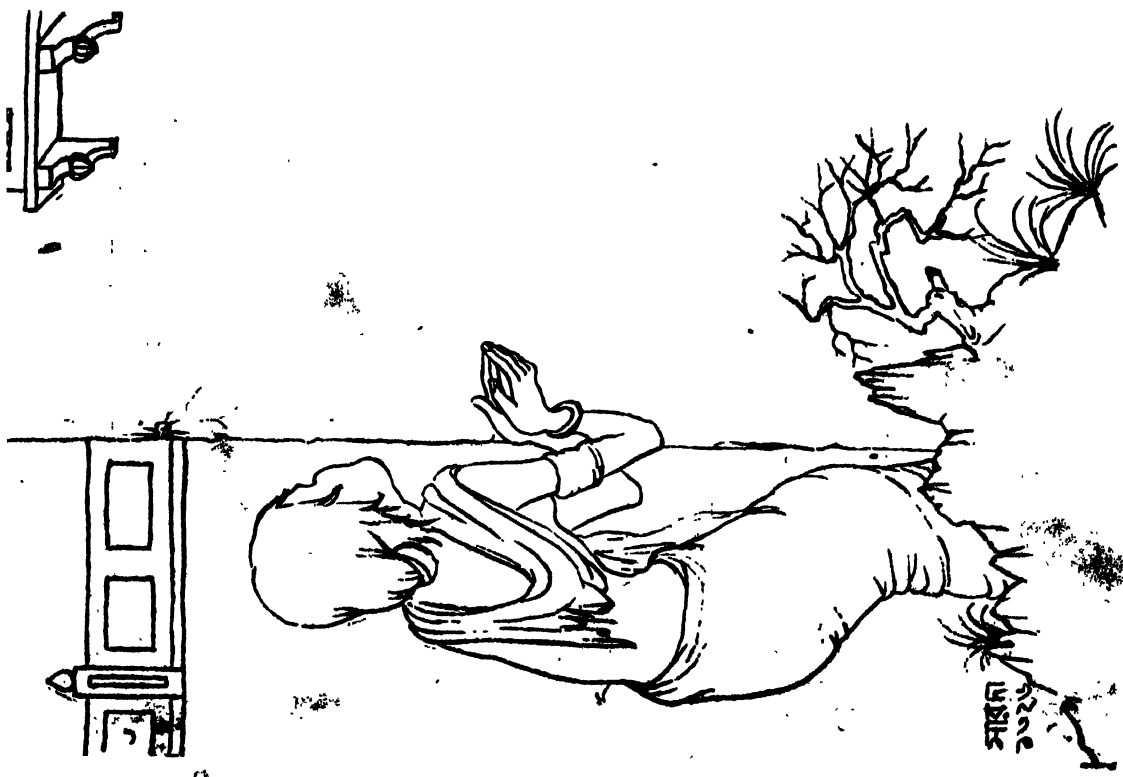
চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে

আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ডি-এস্‌সি, এফ-আর-এস

বৃক্ষের অঙ্গ-ভঙ্গী

মানুষের অঙ্গ-ভঙ্গী হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সকাল বেলা তাহার যে আকৃতি থাকে, দিনের শেষে পরিশ্রমাদিনের ক্লান্তিহেতু তাহা পরিবর্ত্তিত হয়। সুখে সে উৎফুল্ল, দুঃখে সে বিবশ। সব জীবজন্তুর মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; তাহা কেবল ভিতরের পরিবর্ত্তন জনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও তাহার অঙ্গ-ভঙ্গী বিভিন্ন হইয়া যায়। তাড়নায় কুপিতা ফণিনী মুহূর্ত্তেই সংহাররূপিণী হইয়া থাকে।

এইরূপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া জীব বহুরূপী হইয়াছে। ভিতরের শক্তির সহিত বাহিরের শক্তির নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বাহিরের আঘাতের ফলেই ভিতরের শক্তি দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে শক্তি প্রবেশ করিয়া ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে। যাহা বাহিরে অসীম ছিল, তাহাই ভিতরে সসীম হইল; এবং সেই ক্ষুদ্র তখন বৃহতের সহিত যুঝিতে সমর্থ হয়। সেই ক্ষুদ্র কখনও বাহিরকে বরণ করে, কখনও বা প্রত্যাখ্যান করে। জীবনের এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী।

জীবের ন্যায় বৃক্ষের ভঙ্গীও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পাতা কখনও আলোর সন্ধানে উন্মুখ হয়, কখনও প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে বিমুখ হয়। এই সকাল বেলায় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, যে, সূর্য্যমুখীর গাছটি পূর্ব্বগগনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাতাগুলি ঘুরিয়া এরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে, প্রত্যেক পাতার উপরে যেন সূর্য্যরশ্মি পূর্ণরূপে পতিত হয়। ইহার জন্য কোন পাতা উপরের দিকে উঠিয়া থাকে, আর পাশের পাতাগুলি ডান কিম্বা বামদিকে পাক খাইয়া সূর্য্যকিরণ পূর্ণমাত্রায় আহরণ করে। বৈকাল বেলায় দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাতা পশ্চিমগগনোন্মুখ হইয়াছে, ডাল এবং সব পাতাগুলি ঘুরিয়া গিয়াছে। কি শক্তির বলে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল? বাহিরের সহিত ভিতরের এ কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! সূর্য্য ত প্রায় পাঁচ কোটি ক্রোশ দূরে, তবে কি রাখীবন্ধনে গাছ দিবাকরের সহিত এইরূপ সম্মিলিত হইল?

উদ্ভিদ্-বিদ্যাসম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায়, যে, সূর্য্যমুখীর এই ব্যবহার 'হীলিওট্রোপিজম্' জনিত। হীলিওট্রোপিজমের বাঙ্গালা অনুবাদ, সূর্য্যের দিকে মুখ হওয়া। সূর্য্যমুখী কেন সূর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয়? কারণ "সূর্য্যের দিকে মুখ" হওয়াই তাহার প্রবৃত্তি! যখন কোন বিষয়ের প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়, তখন কোন দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রতন্ত্র তাহাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে সেই মন্ত্রটি সংস্কৃত, লাটিন, কিম্বা গ্রীক ভাষায় হওয়া আবশ্যক। সোজা বাঙ্গালায় কিম্বা অন্য আধুনিক ভাষায় হইলে মন্ত্রের শক্তি থাকে না। এই জন্যই গ্রীক হীলিওট্রোপিজম্ মন্ত্রে সূর্য্যমুখীর ব্যবহার বিশদ হইল!

১) লজ্জাবতী এবং সূর্য্যমুখীর পাতাগুলি সূর্য্যের আলোকের দিকে প্রসারিত। ডানদিকে স্থিত তৃতীয় ছবিটিতে সূর্য্যমুখীর আলোর গতি অনুসরণ।

সে যাহাই হউক, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। এই-সব অঙ্গ-ভঙ্গী অদৃশ্য জীববিন্দুর প্রকৃতি-গত কোন পরিবর্ত্তন দ্বারাই সাধিত

হয়। জীব-বিন্দুর পরিবর্ত্তন অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদৃশ্য। তবে কিরূপে সেই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করা যাইতে পারে? বহুচেষ্টার পর বিদ্যুৎ-বলে সেই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টি-গোচর করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ বিষয়ে দুই-একটি কথা পরে বলিব।

কেবল সূর্য্যমুখীই যে আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এরূপ নহে। টবে বসান একটি লতা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। রুদ্ধ জানালার একটি রন্ধ্র দিয়া অতি ক্ষুদ্র আলোক-রেখা আসিতেছিল। পরের দিন দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

(২) আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত 'ইলেক্‌ট্রীক্ প্রোব্' দ্বারা ভিতরের স্নায়ু নির্ণীত হইতেছে।

লজ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। টবে বসান লতাটি যদি জানালার নিকটে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, যে, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। টব ঘুরাইয়া দিলে পাতাগুলি পুনরায় নূতন করিয়া ঘুরিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, পাতাগুলি কেবল উঠে এবং নামে তাহা নয়, কোনগুলি ডানদিকে এবং কোনগুলি বামদিকে পাক খায়। পাতার ডাঁটার গোড়ায় যে স্থূল পেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই পাতাগুলি ঘুরিয়া থাকে, কখনও উঠানামা করে, কখন ডানদিকে কিম্বা বাম দিকে পাক খায়। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল, যে, পাতার গোড়ায় একটিমাত্র পেশী আছে যাহার দ্বারা কেবলমাত্র উঠানামা হয়। কিন্তু আমাদের হাত ঘুরাইতে হইলে অনেকগুলি পেশীর আকুঞ্চন এবং প্রসারণের আবশ্যক। অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম, যে, লজ্জাবতীর পাতার মূলে চারিটি বিভিন্ন পেশী আছে, যাহার অস্তিত্ব ইতিপূর্ব্বে কেহই মনে করিতে পারেন নাই। একটি পেশীর দ্বারা পাতা উপরের দিকে উঠে, আর-একটির দ্বারা নীচের দিকে নামে, অন্য একটির দ্বারা ডান দিকে পাক খায় এবং চতুর্থ পেশীর দ্বারা বাম দিকে ঘুরিয়া যায়।

ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই, যে, পালক দ্বারা উপরের পেশীটুকুতে সুড়সুড়ি দিলে পাতাটি উপরের দিকে উঠে এবং সেই ঊর্দ্ধ গতি যন্ত্রের দ্বারা লিখিত হয়। এক নম্বরের বা চারি নম্বরের পেশীকে এইরূপে উত্তেজিত করিলে পাতাটি বামদিকে বা ডানদিকে পাক খায়, দুই নম্বর বা তিন নম্বরটিকে ঐরূপ উত্তেজিত করিলে পাতা নীচে নামে বা উপরে উঠিয়া যায়। সূর্য্যের আলো এই-রূপে পেশীর নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উক্তবিধ সাড়া পাওয়া যায় (৩নং ছবি দেখ)। তবে সূর্য্যের আলোক ত সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় পত্রমূলটি ঢাকা থাকে। লজ্জাবতীর বড় ডাঁটাটির সহিত চারিটি ছোট ডাঁটা সংযুক্ত, এবং সেই ছোট-ডাঁটার গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা থাকে। আলো সেই ক্ষুদ্র পাতার উপরই পড়ে। পড়িবামাত্রই দেখা যায় যে পাতা নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পাতার নড়াচড়া ত সেই দূরের স্থূল পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ভিন্ন হইতে পারে না। তবে ছোট পাতাগুলি আলোর অনুভব-জনিত উত্তেজনায় কি সঙ্কেত কোন্ পথ দিয়া দূরে

(৩) এই লতার পাতাগুলি বন্ধ জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্রের আলোর দিকে ফিরিয়া আছে।

প তাটি নীচের দিকে পড়ে। তিন নম্বরের ছোট পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, পাতার বাহির দিক হইতে ভিতরের দিকে হুকুম পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে সেই বল্‌গা টানিয়া সঙ্কেত পাঠায়?

কেবল তাহাই নহে। কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে চালিত করিবার জন্য একটা বল্‌গা টানিলে তাহা সাধিত হয় না। নৌকার একটি দাঁড় টানিলে নৌকা কেবল ঘুরিতে থাকে। দিশা-হীন তবে এক দিকের টান! অন্ততঃ দুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বারা গন্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট হয়। এক সময়ে দুইটি দাঁড় টানা আবশ্যক।

পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার এক-একটি পাখার সংযোগ। একটি চক্ষু অন্ধ হইলে সে আর আলোর দিকে যাইতে পারে না। এক দাঁড়ের নৌকার ন্যায় কেবল ঘুরিতে থাকে। যখন দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে, কেবল তখনই দুইটি ডানা একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়, এবং সে সোজা পথে আলোর দিকে ধাবিত হয়। আলো যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা কেবল একটি চক্ষুর উপর পড়ে, সেইজন্য একটি পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গটি ঘুরিয়া যায়। ঘুরিয়া যখন সোজাসুজী আলোমুখীন হয় এবং আলো দুইটি চক্ষুর উপর সমানভাবে পড়ে, তখন দুইটি পাখাই সমানভাবে একই শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং পতঙ্গ তাহার অভীষ্ট লাভ করে,—জীবনে কিম্বা মরণে!

পাঠাইয়া থাকে? এই বিষয়ে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, যে, চারিটি ছোট ডাঁটা হইতে পাতার মূল পর্য্যন্ত চারিটি বিভিন্ন স্নায়ুসূত্র প্রসারিত। তাহা দ্বারাই খবরাখবর পৌঁছিয়া থাকে। এক নম্বরের ক্ষুদ্র পাতা-গুলিকে কোনরূপে উত্তেজিত করিলে একটি মাত্র সূত্র দিয়া পত্রমূলের এক নম্বরের পেশীতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, অমনি পাতাটি বামদিকে পাক খাইয়া যায়। চারি নম্বরের পাতাগুলিকে ঐরূপে উত্তেজিত করিলে ডানদিকে পাক খায়। দুই নম্বরের পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে বড়

দুইটি দাঁড়ের দ্বারা তরণী কেবল নদীবক্ষের উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদিগ্-বিহারী জীব কখনও দক্ষিণে কখনও বামে কখনও উর্দ্ধে কখনও বা অধোদিকে ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্ব্বমুখী গতি নিরূপণ করিবার জন্য অন্ততঃ চারিটি রশ্মির আবশ্যক।

লজ্জাবতীর পাতার প্রতি কোষই আলোক ধরিবার ফাঁদ। সেই আলোর উত্তেজনা এক-একটি স্নায়ুসূত্র ধরিয়া পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়।
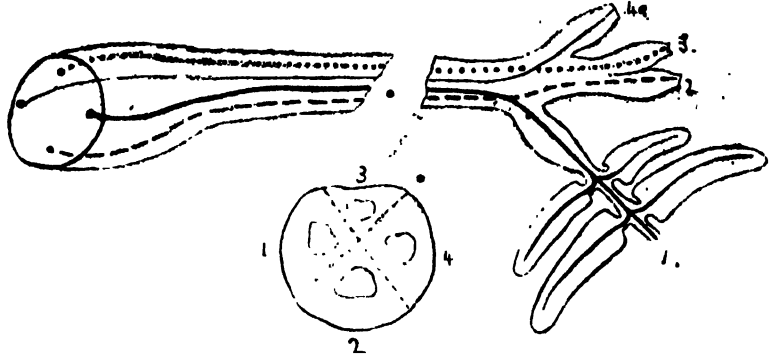
(৪) লজ্জাবতী পত্রের বিবিধ অংশ। নিম্নের ছবিতে ডাঁটার মূলে চারিটী পেশী দেখা যাইতেছে। ডানদিকের ছবিতে চারিটি ক্ষুদ্র ডাঁটা এবং তৎসংলগ্ন ছোট পাতা। স্নায়ুসূত্র পাতা হইতে ডাঁটার মূলে গিয়া পৌঁছিয়াছে।
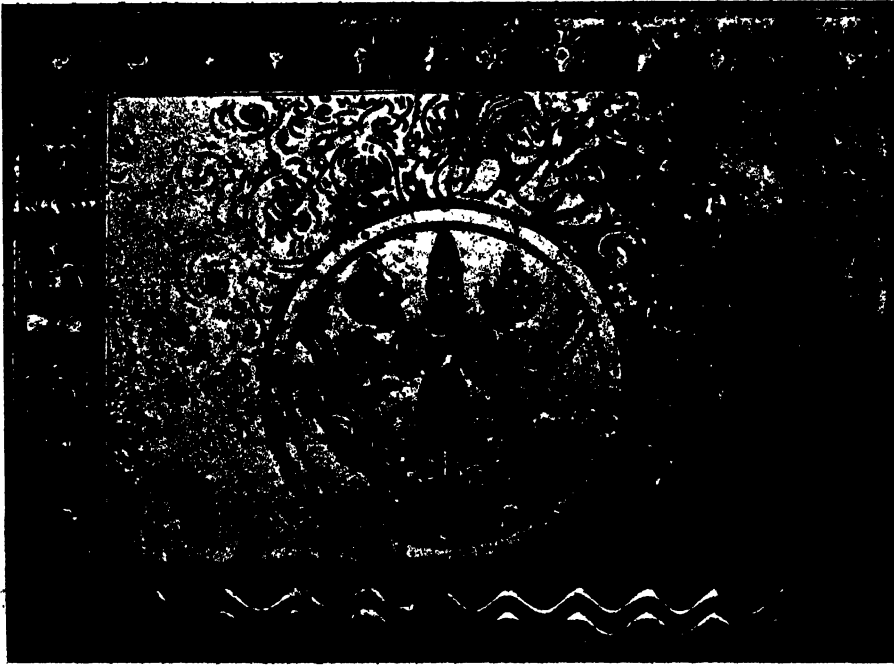
(৫) আলোক ও আঁধারের দ্বন্দ্ব। রথে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে আঁধারের পরাভব।
(বসু বিজ্ঞানমন্দিরে স্থাপিত ধাতু-ফলক হইতে গৃহীত)

যতক্ষণ না চারিটি ডাঁটার পত্র-সমষ্টি সমানভাবে আলোক-মুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বল্গার টানের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পত্ররথ তখন দক্ষিণে, কিম্বা বামে, উর্দ্ধে কিম্বা নিম্নে চালিত হয়।

সবিতার রথ

সারথি তবে কে? দিবাকর নিজকে কোটী কোটী অংশে বিভক্ত করিয়া ধরা-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া সূর্য্যদেবের শত শত মূর্ত্তি মেঝের উপর দেখিতে পাই।

সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাঁহার রথরূপে গ্রহণ করেন। পত্রের চারিটি বল্গা তাঁহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া সীমাহীন তাঁহার গতি। কিন্তু এই অসীম পথ

প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ধূলিকণার ন্যায় এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র লতার অতি ক্ষুদ্র পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির দ্বারা প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র পাতাটির গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। জীবন এবং জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সর্ব্বভূতের চালক তুমি, তোমার তেজোরাশিকে কে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন !

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

খাদ্যকথা

খাদ্য-কথা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ৭০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।।০ আনা।

এই বহির মুখপত্রে দেখিতেছি, লেখক পূর্বে ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসুর "ল্যাবরেটরীর" "রসায়ন বিশ্লেষক" ছিলেন। এক্ষণে তিনি "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রের সহকারী সম্পাদক। দেখিতেছি বহিখানিতেও এই দুই কর্ম স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ, কিমিতি-বিদ্যার সাহায্যে খাদ্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই দুই উক্তির একটু ব্যাখ্যা কর্তব্য।

আমরা কি খাই, তা জানি। কিন্তু জানি না, কি খাদ্যে কি ভাগে কি কি কৈমিতিক উপাদান আছে। না জানাতে যে আমাদের দেহ-যাত্রা নির্বাহের বিঘ্ন হইতেছে, এমন নহে। কিমিতি-বিদ্যা সেদিনকার, আর খাদ্যের কৈমিতিক বিচার কালিকার বলিলেও চলে। তথাপি যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ চলিয়া আসিতেছে। ইতর প্রাণীর বিদ্যা নাই, বহু বহু মানুষও বিদ্যাহীন। বিদ্যাহীন বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীন নহে। সে বুদ্ধি স-হ-জ (natural)। ইতর প্রাণীর সহজবুদ্ধি (instinct) আছে, মানুষেরও আছে। আরও কিছু আছে, সেটা ভূয়োদর্শন, বারবার দেখিয়া শুনিয়া ভুগিয়া ঠকিয়া ফলাফল বিবেচনার বুদ্ধি।

এই একটা গাছের ফল, কখনও দেখি নাই, খাই নাই। সুঘ্রাণ ঠেকিল, সুন্দরও ত বটে। মুখে দিলাম, স্বাদু বোধ হইল। রসনার অনুমতি হইল, ফলটি গলার সেপারে চলিয়া গেল। ক্ষুধিত ছিলাম, ক্ষুধা শান্ত হইল। এক বেলা গেল, দুই বেলা গেল, ক্লেশ হইল না, ফলটি উদরে জীর্ণ হইয়া গেল। সে ফল যখন আবার জুটিল, তখন একটা নয়, দুইটা নয়, গণ্ডা-গণ্ডা গলাধঃ করিয়া ফেলিলাম। এক বুদ্ধিমান্, সেও ফলটি প্রথম দেখিল, কিন্তু খাইল না; কি জানি খাইলে যদি অসুস্থ হয়। কিন্তু দেখিল মর্কটে খায়, গোরু বাছুরে খায়, পাখীতে খায়। শঙ্কা গেল, নিজে খাইল। আর এক বুদ্ধিমান্ দেখিল ফলটি খাইলে দেহের তৃপ্তি হয়। ফলটি খা-দ্য ছিল, এখন ভো-জ্য হইল। কাঁচা আম খাদ্য বটে, কিন্তু ভোজ্য নয়। পাকা মিষ্ট আম খাদ্য ত বটেই, ভোজ্যও বটে। কাঁচা আম যার খাদ্য সে খাদক। পাকা আম যার ভোজ্য, সে ভোক্তা। এই দুই-এর প্রভেদ যিনি জানেন, তিনিই খাদ্যাখাদ্য-বিচারের অধিকারী। আমরা দেবতার প্রসাদার্থে তাঁহার সম্মুখে খাদ্য কিংবা খাদ্যোপকরণ ধরি না; ধরি ভোজ্য কিংবা আমায় রাঁধিয়া তাঁহার ভোগ দিই, কারণ ভোক্তা ত দেহ নয় যে খাদ্য পাইলেই তুষ্ট হইবে। খাদ্য সম্বন্ধে দুই-তিনখানি বই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে। ভোজ্য সম্বন্ধে একখানিও হয় নাই।

কথাটা আর একটু বিস্তার করি। সেই অ-জানা, অভুক্তপূর্ব ফলটা কৈমিতিকের কর্মশালায় লইয়া গিয়া বলিলাম, "হে কৈমিতিক মহাশয়, আপনার যন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ জারণ মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা বলুন এটা আমাদের খাদ্য কি? ভোজ্য কি? অপথ্য, কুপথ্য, না সুপথ্য?" তখন কৈমিতিক বুঝিতে পারিলেন তাঁহার বিদ্যা একটা সাক্ষীমাত্র, বিচারক নহে। ভোক্তা স্বয়ং বিচারক, আমাশয়, পক্বাশয় প্রভৃতি আশয়গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠান। প্রত্যেক আশয়ে বিচার চলিতে থাকে, স্থূল বিচার নয়, সূক্ষ্ম বিচার। এমন সূক্ষ্ম যে, বাজারের খাদ্য-নীক্ষক 'পাস' করিয়া খাঁটি বলিয়া 'সার্টিফিকট' দিলেও মিষ্টান্নের ঘি মিশাল প্রতিপন্ন হয়। কৈমিতিক বলিতে পারেন, "সিদ্ধ ও আতপ চাউলে গুণগত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।" (খাদ্য-কথা, ১৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু অন্ততঃ সাড়ে চারিকোটি বাঙ্গালী জানে আতপ চাউলের ভাত গুরু-পাক, অনেকে জানে খাইলে অম্বল হয়। ভাবিবার আছে, ধান সিঝাইলে চালের কোন-না-কোন পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়। সেই পরিবর্তনে সিদ্ধ চালের ভাত লঘু। আরও সোজা কথা আছে। দুই চালের গুণগত পার্থক্য উপলব্ধ না হইলে ধান সিঝাইবার পরিশ্রম ও জ্বালন খরচ কেন করা হইতেছে?

খাদ্যবিচারে কিমিতিবিদ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রয়োজন কি এবং কতটুকু, তাহা মনে না রাখিলে কিমিতির সাক্ষ্যের বাহিরে গেলে অ-সত্য আসিয়া পড়ে। সাক্ষী মাত্রেরই এই দশা ঘটে, জানার বাহিরে গেলেই মিথ্যা বলিয়া ফেলে। প্রত্যেক বিদ্যার (বিজ্ঞানের) এক একটা সীমা আছে। সীমার মধ্যে বিচরণ করিলে আমাদের সুফল হয়, বাহিরে গেলে গলায় বিষম লাগার মতন আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে বিষম লাগে। সবাই জানি, একের যাহা পথ্য, অন্যের তাহা কুপথ্য হইতে পারে। যে খাদ্য পাইয়া খাইয়া, কেবল বাল্যাবধি নয়, পিতৃপিতামহাবধি, যাহার সাত্ম্য হইয়া গিয়াছে, অন্যের কুপথ্য হইলেও তাহার পথ্য। চলিত কথায় বলি, অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। অতএব যখন বলি, এই আহার লঘু কি গুরু, সু-পচ কি দুষ্পচ, তখন স্থূল বাক্যই বলি। অতএব আহার-বিদ্যা (dietetics) চাই, খাদ্য-বিদ্যা না জানিলেও চলে। পশ্চিমদেশে আহার-বিদ্যা সেদিন আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই মতি এখনও অস্থির। আহারের পরে জল পান করিবে না, পশ্চিমদেশীয় ডাক্তারী বিদ্যার এই উপদেশে আমাদের কত শিক্ষিত জন বিভ্রান্ত হইয়া অজীর্ণ রোগে পড়িয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহারা সাত্ম্যাসাত্ম্য বিবেচনা করেন নাই, প্রকৃতিগত তৃষ্ণাও মানেন নাই। এইরূপ, কে বলিয়াছিল, কে জানে, ভাতের ফেনে ভাতের সারাংশ চলিয়া যায়, আমরা যে ফেন-গালা ভাত খাই, সেটা

তের ছিদ্রো ! অমনই শিক্ষিত জন চিন্তিত হইলেন, ভাবিলেন না। ন গালা চলিত হইল কেন। "খাদ্য-কথার" লেখক ইহার উল্লেখ রিয়া ভ্রান্তি নিরাস করিয়াছেন। কিন্তু কেন-গালার মধ্যে যে আহার-ন্য আছে, তাহার কথা বলেন নাই।

এই বিষয়ে এত কথা বলিবার একটু প্রয়োজন আছে। খাদ্য ম্বন্ধে দুই তিন খানি বই বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে। দুই একটা খ্যানও (lectures) পড়িয়াছি। সবই ডাক্তারের কিংবা আধা-ক্তারের লেখা। তাঁহারা সবাই তাঁহাদের পশ্চিমদেশীয় গুরুর পথে চরণ করিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক, এবং সে শিক্ষা সম্যক্, যে ক্ষায় অন্যপথ অদৃশ্য হয়। কিন্তু শিক্ষা (training) ও জ্ঞান এক হ। যে শিক্ষায় একদেশীয় জ্ঞান জন্মে, বিবিধ পথের সম্ভাবনা করিতে য় না, সে শিক্ষায় মানসিক দাসত্ব ঘটে। মানসিক দাসত্বের ন্য ভয়ানক আর কিছুই নাই, কারণ দাসত্বের ক্লেশ নুভূত হয় না। জেলের কয়েদী শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু হার মন কয়েদখানার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায় না। কি জানি কেন মাদের ডাক্তার মহাশয়েরা দেশী পথ দেখিতে পান না। জল বায়ুতে, ত গ্রীষ্মে, আহার বিহারে, ধর্ম কর্মে এদেশ ও ইয়ুরোপ কত ভিন্ন। দেশের পথ্য এদেশের পথ্য না হইবার কথা। যদি এদেশের পথ্য নিবার বাসনা হয়, আয়ুর্বেদ আছে। ইহাতে কিমিতি নাই, কিন্তু হার-বিধি আছে। দেহের কান্তি বল বর্ণ পুষ্টি চেষ্টা প্রভৃতির মূলে হার। যে বিদ্যায় আহার-বিধি জানিতে পারি, সে বিদ্যা আয়ুষ্কর।

কিমিতি-বিদ্যা দ্বারা খাদ্যের শরীরোপযোগী উপাদান নির্ণীত হইতে রে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সে উপাদান স্থূল। মনে খিতে হইবে, সে উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদান থাকিতে পারে, ম্ভবতঃ হেতু যাহা কৈমিতিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। একটা উদাহরণ -ই। "ভাইটামীন" নামক একটা উপাদানের কথা অনেকে নিয়া থাকিবেন। ইহা নূতন আবিষ্কৃত। ইহার বিভিন্ন প প্রকৃতি প্রভাব প্রভৃতি এখনও অজ্ঞাত বলিলে চলে। হার মাত্রা অল্প, কিন্তু বীর্য অতিশয়। খাদ্যে ইহার অভাব টলে দেহের পোষণ হয় না। দুগ্ধে ইহার সদ্ভাব আছে। মহর্ষি ক দুগ্ধকে "জীবন" বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কিমিতি দ্বারা ই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তা নয়। যোগবলও নয়। ভূয়োদর্শন বং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান দ্বারা কত অভাবনীয় তথ্য অবগত ইতে পারা যায়, তাহার এই একটা দৃষ্টান্ত।

খাদ্যের স্থূল উপাদান জানিয়া ফল আছে। খাদ্য হইতেই হের উপাদান। যে খাদ্যে যেটা নাই, সে খাদ্য হইতে সেটা াইতে পারি না। যে খাদ্যে সে উপাদান মাত্রায় অধিক াছে, সে খাদ্য হইতে সে উপাদান দেহেরও পাইবার ম্ভাবনা করিতে পারি। ঘি খাইলে দেহে মাংস বৃদ্ধি ইতে পারে না, যেহেতু ঘি-তে মাংসের উপাদান নাই। ক কথায়, ঘি ও মাংস স-মা-ন (similar) দ্রব্য নয়। চরকে এই ব সুন্দরভাবে ব্যক্ত আছে। তাহাতে আছে শারীর ধাতু (anatomical elements—tissues) গুণসামান্য যোগে বৃদ্ধি, বিপর্যয়ে হ্রাস হয় শারীর হ্রাস)। যথা, মাংসের সমান-গুণ মাংস; মাংসভোজনে মাংস দ্ধি হয়। যদি মাংস না জোটে, তাহা হইলে মাংসের সমান গুণ-ষ্ঠ অন্য আহার গ্রহণ করিবে। যেমন ছেনা, দাল। কিমিতি-বিদ্যায় দি দালে মাংসের তুল্য উপাদান আছে, এবং ভাগে মাংসের অপেক্ষাও ধিক। মাংসে যদি কুড়ি, দালে পঁচিশ। তথাপি মাংস ও দাল মানগুণসম্পন্ন নহে। ডাক্তারী বিদ্যা উক্ত তত্ত্ব পূর্বে স্বীকার করিত , এখনও স্পষ্ট ভাবে করে না। কিন্তু দেখিতেছি, স্বীকার করিলে খাদ্যের-উপাদান নির্ণয়ের প্রয়োগ সোজা হইয়া পড়ে। যথা, দেহের স্নেহন (স্নিগ্ধতা) ইচ্ছা করিলে স্নেহ দ্রব্য (যেমন ঘি) ভোজন করিবে. বৃংহণ (বৃদ্ধি) ইচ্ছা করিলে বৃংহণ দ্রব্য (যেমন মাংস) ভোজন করিবে। এখন দেখিব, কোন্ খাদ্যে স্নেহনের দ্রব্য কত, বৃংহণের দ্রব্য কত।

ইহার পরে আরও কথা আছে। সরিষা তেল একটা স্নেহ। ঘি-এর পরিবর্তে সরিষা তেল খাইলে চলে না কি? যদি ঘি-ই চাই, গাওয়া ঘিয়ের পরিবর্তে মহিষা ঘি খাইলে চলে না কি? কিমিতি-বিদ্যায় ইহার উত্তর নাই।

অতএব কিমিতি-বিদ্যার সীমা এবং খাদ্যের কৈমিতিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ মনে রাখিয়া "খাদ্য-কথা" পড়িতে হইবে। তখন দেখা যাইবে, পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে।

এখন দ্বিতীয় মন্তব্য একটু ব্যাখ্যা করি। "খাদ্য-কথা"র ভাষা ডাক্তারী ভাষা। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ডাক্তারী গ্রন্থে ডাক্তারী ভাষা থাকিবে, তাহাতে নূতন কথা কি। কিন্তু সে কথা নয়। ডাক্তারী পরিভাষা থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা বহিতে বাঙ্গালা ভাষা থাকিবার কথা। ডাক্তারী ভাষা না-বাঙ্গালা, না-ইংরেজী। বরং ব'লতে পারি, ভাষাটা ইংরেজীর আভাঙ্গা তর্জমা। ইংরেজী বহির তর্জমা নয়, ডাক্তারের নিজের ইংরেজীর তর্জমা। যিনি ইংরেজী জানেন না, যিনি ডাক্তারী ভাষার ইংরেজী ভাবিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাকে পদে পদে থামিয়া থামিয়া পড়িতে, এবং ঘুরানো বাঁকা সোজা করিয়া লইয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা ইংরেজী পড়িয়া, ইংরেজীতে শি-ক্ষি-ত (educated) হইয়া সে ভাষায় ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। কাজেই লিখিবার কিংবা কথা কহিবার সময় সে অভ্যাস চলিয়া আসে। ফলে অক্ষর কিংবা ধ্বনি বাঙ্গালা হইলেও ভাষা বাঙ্গালা রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। সবই সত্য। তথাপি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালা লেখক ও বাঙ্গালা বক্তা আছেন। ইহাঁদের ভাষায় ইংরেজী ছাঁদ কদাচিৎ পাই। ইহাঁরা উত্তম লেখক। মধ্যম লেখক অনেক আছেন। কিন্তু ডাক্তার লেখক মধ্যম শ্রেণীতেও পড়েন না কেন? ইহাই আশ্চর্যের কথা। কারণ কি, কে জানে। হয়ত তিনি মনে করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভাষাজ্ঞান তত আবশ্যক নয়। হয়ত বা তাঁহার শিক্ষার গুণে মানসিক দাসত্ব প্রকট হইয়া উঠে। অল্প বয়সে কেবল বার্তা শিক্ষার দোষেই এই। লেখায় সাবধান না হইলে, ভাষা ও সাহিত্য চর্চা না করিলে, চিত্তকে সর্ব-মুখে ছাড়িয়া না দিলে এই দোষ শোধরাইতে পারা যায় না। ডাক্তারী বৃত্তি ইংরেজ ডাক্তারের অনুকরণ; কাজেই চাল-চলন, এমন কি বসন-ভূষণও ইংরেজের মতন। ইংরেজী অনেকে শিখিতেছে কিন্তু ইংরেজের পোষাক পরিতেছে কি? ডাক্তারখানায় দেখি, তাঁহার বাড়ীতে দেখি, নিজের বাড়ীতে ডাকি, ডাক্তার ও সাহেবী পোষাকের নিত্যসম্বন্ধ দেখিতে পাই। ইহাতে মনে হয়, বৃত্তির অনুকরণ হইতে চরিত্রেও হয়। চরিত্রের কিয়দংশ ভাষায় ব্যক্ত হয়। দেশীয় কৃষ্টির (culture) অভাবে শত শত বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্ বিদেশী হইয়া পড়িতেছেন।

"খাদ্যকথার" লেখক ডাক্তারের দলে পড়িয়া নিজের মাতৃভাষা ডাক্তারী করিয়া ফেলিয়াছেন। দুঃখ হইতেছে এত তথ্যপূর্ণ বইখানি রচনার দোষে সাধারণের সুবোধ্য হইল না।

ডাক্তারী ভাষার আর-এক লক্ষণ পরিভাষায় স্পষ্ট দেখিতে পাই। জানি, পরিভাষা-প্রণয়ন অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়াই সর্বদা সাবধান হইতে হয়। ভাষাকে অবহেলা করাই যাহাদিগের ধর্ম, তাহারা পরিভাষায় পরিশ্রম করিবেন কেন? তাঁহারা আয়ুর্বেদ হইতে প্রচুর পরিভাষা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু আয়ুর্বেদ তাঁহাদিগের অগ্রাহ্য, অস্পৃশ্য। বস্তুতঃ ডাক্তারী বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ যেন দুই ঈর্ষ্যাপরায়ণা

সপত্নী, একে অন্যের সৌভাগ্য দেখিতে পারে না। কালের গুণে ডাক্তারী বিদ্যা সুয়োরাণী, দুর্ভগা আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার ছায়াও মাড়াইতে চান না। আমরা কিন্তু দুইএর মিলন বাঞ্ছা করি, পরদেশী ডাক্তারী বিদ্যাকে স্বদেশী করিয়া লইতে চাই। কিন্তু সম্প্রতি সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার নহে। ইহার প্রধান অন্তরায় বর্ত্তমানে ডাক্তারী শিক্ষা, যে শিক্ষায় বৈজ্ঞানিকের যোগ্য চিন্তাস্বাধীনতা লুপ্ত হইতেছে।

"খাদ্যকথার" পরিভাষা "ডাক্তারী" পরিভাষা। এখানে কয়েকটা উদাহরণ তুলি। আমাদের দেহের মূল উপাদান পাঁচ প্রকার। খাদ্যে সেই পাঁচ প্রকার উপাদান অন্বেষণ করা হইয়া থাকে। ইংরেজীতে এই পাঁচের নাম proteids, carbo-hydrates, fats, salts and water। ডাক্তারী ভাষায় proteid হইয়াছে 'আমিষ জাতীয়,' কেহ বা বলেন 'ছানা জাতীয়'। 'আমিষ' অর্থে মাংস, আমিষ-জাতীয়—মাংস জাতির অন্তর্গত (ইংরেজীতে of the same species as flesh)। কিন্তু ঠিক হইল কি? proteid মাংসের একটা উপাদান; মাত্রায় অধিক হইলেও, একটা উপাদান। proteid ও মাংস এক নহে। কিন্তু মাংস-জাতীয়—মাংস যে দ্রব্য সেই দ্রব্য, এই অর্থ হয়। মাংসবৎ বলিলে বরং ঠিক হইত। 'ছানা-জাতীয়' এই পরিভাষায় অপর দুইটা দোষ ঘটিয়াছে। শব্দটা ছা-না নয়, ছেনা। ছা-না বলিলে শাবক বুঝি। ছে-না খাঁটি বাঙ্গালা; জা-তী-য় খাঁটি সংস্কৃত। উভয়ের যোগ বিরুদ্ধ যোগ। carbohydrates ডাক্তারী পরিভাষায় 'শালি জাতীয়'। 'স্বাস্থ্য সমাচার' পত্রে এবং 'খাদ্যকথার' শেষে একা শা-লি আছে, জা-তী-য় নাই। এই শা-লি শব্দ কে দিয়াছিল, কে জানে। কিন্তু শালি সংস্কৃত শব্দ, অর্থ হৈমন্তিক ধান্য। সেই শব্দ অদ্যাপি রাম-শালি, সীতা-শালি প্রভৃতি ধানের নামে, শালি ধানের চালে ও শালি জমিতে চলিত আছে। carbohydrates দুই জাতীয়—starch আর sugar। প্রথমটির বাঙ্গালা শ্বেত-সার কিছু-দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। এটি নূতন রচিত, পূর্ব্বে কেহ জানিত না। লোকে পা-লো জানে, sugar শর্করা সবাই জানে। starch নাই শালি হইল, শর্করাও শা-লি? 'স্নেহ-জাতীয়' শব্দটা আরও হাস্যজনক হইয়াছে। কারণ স্নেহ ইংরেজীতে fats and oils; অতএব জাতীয় যোগে অনর্থ ঘটিয়াছে। salts 'লবণ জাতীয়' বরং বলা চলে, যদিও ল-ব-ণ নিজেই জাতিবাচক। দৃষ্টান্ত, আয়ুর্ব্বেদের পঞ্চ-লবণ।

পরিভাষার দোষ দেখাইয়া নিরস্ত হইলে লেখকের প্রতি অন্যায় করা হয়। এই কারণে আমার রচিত পরিভাষা উপস্থিত করিতেছি। ডাক্তার মহাশয়গণ ভালমন্দ বিচার করিবেন।

Proteid—প-লী-য়। (প-ল—মাংস; পল সম্বন্ধীয় প-লী-য়)

Carbohydrates—প ল-লী-য়। [প-ল-ল—মাংস ও পঙ্ক। পঙ্ক অর্থ হইতে বাঙ্গালা প-লি sediment, silt। বোধ হয়, প-ল-ল হইতে পা-লো। starch এবং sugar (কেলাসিত crystallized) দু-ই-ই sediment।]

Fats and oils—স্নেহ।

Salts—ল-ব-ণী-য়। (ল-ব-ণ বলিলেও চলে, তবে সামান্য লবণ বা নুন হইতে পৃথক করিতে ল-ব ণী-য়)

"খাদ্যের পরিপাক প্রণালী" নামক পরিচ্ছেদে অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মহা-স্রোতের (alimentary canal) বিভিন্ন অংশের নাম আয়ুর্ব্বেদে আছে, কয়েকটা নাই। সে সব নাম লইলে ক্ষতি কি ছিল জানি না। তৎপরিবর্ত্তে নূতন নাম রচনা করিয়া ডাক্তারী বিদ্যাকে বিদেশীয় রাখিয়া দেশের জ্ঞানবৃদ্ধির পথে কাঁটা দেওয়া হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ দেশী আঁঠির গাছ, সতেজ বহুব্যাপী। ইহার ফল ছোট ও টকুয়া হইলেও গাছটা দেশের মাটি ও জল-বায়ুর যোগ্য হইয়াছে। এই আঁঠির গাছে বিদেশী ডাক্তারী বিদ্যার কলম ধরাইলে, যদ্যপি গাছটি দীর্ঘজীবী হইত, আমরা ফলও অধিক ও উত্তম পাইতাম। এই কথাই বারবার শোনা যাইতেছে, বিদেশী বিদ্যা স্বদেশী করিতে হইবে। কত বিদেশী গাছ দেশী হইয়া গিয়াছে, আঁঠি পড়িয়া হইয়াছে। কত বীজ বিনষ্ট হইয়াছে, কত গাছ গুণান্তর পাইয়াছে। বিদেশী বিদ্যাকে কালচক্রে নিক্ষেপ না করিয়া বুঝিয়া শুঝিয়া দেশী বিদ্যার সহিত তাহার জোড়-কলম ঘটাইতে হইবে। দেশী বিদ্যার পরিভাষা গ্রহণ এই ঘটনার প্রথম পদ।

"খাদ্যের পরিপাক প্রণালী" পরিচ্ছেদে বহু কৈমিতিক দ্রব্যের নাম আছে। এ নামগুলি ইংরেজী না রাখিয়া উপায় নাই। কিন্তু যে পুস্তকের নাম খ-খা, তাহাতে অন্ন পরিপাকের কৈমিতিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল কি? আমার বিবেচনায় পরিপাক-জন্য দ্রব্যগুলির নাম একবারে বর্জ্জনীয়। কারণ কে জানে, 'পেপটোনা' কি, 'এমিনো এসিড' কি? যে জানে সে 'খাদ্য-কথা' পড়িবে না, যে না জানে সে বুঝিবে না। নাম শুনিলেই বস্তু-গ্রহ হয় না।

"খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ" নামক পরিচ্ছেদ হইতেও অনেক বাদ দিতে পারা যায়। বাদ দিলে সমগ্র পুস্তক সাধারণ পাঠকের সুবোধ্য হইত। প্রশ্নটা গুরুতর। আহারের মাত্রা নয়, খাদ্যের মাত্রা নয়, কোন্ প্রকার খাদ্যের কত খাইলে আহারের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ প্রত্যহ কত পলীয়, কত পললীয়, কত স্নেহ, কত লবণীয়, কত জল খাইবে? যে কৈমিতিক উপায়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে লেখক সে উপায় বলিয়াছেন। এখানেও বলি, যে জানে সে এই বই হইতে নূতন শিখিতে চাহিবে না, যে না জানে সে কিছুই বুঝিবে না। বস্তুত মনে হয়, লেখক কিমিতি-বিদ্যা এত না জানিলে তাঁহার বইখানি সকলের পাঠ্য হইতে পারিত। কিমিতি-বিদ্যার সাধ্য কি ঐ প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমাদের শরীর যদি বা কৈমিতিক কর্ম্মশালা হয়, তাহা হইলেও দেখিতেছি যেমন গ্রাম্য কর্ম্মকারের কর্ম্মশালা ও তবস্তা কোম্পানীর কর্ম্মশালা এক নয়, শরীর রূপ কর্ম্মশালাও তেমন এক নয়। তা ছাড়া, কর্ম্মশালা কর্ম্মকারের প্রয়োজন বুঝিতে পারে কি?

লেখকও নিরুপায় হইয়া আপ্ত, অবশ্য পশ্চিম দেশীয় আপ্ত, প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মানি দেশে লিবিগ নামে এক প্রসিদ্ধ কৈমিতিক ছিলেন। তাঁহার বিবেচনায় আমিষ আহার হইতে "শরীরের সমস্ত শক্তি উৎপন্ন হয়।" ইহা লিখিয়া লেখক বলিতেছেন, "আজকাল কোন পণ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী নহেন।" যদি তাই, তবে আর তাঁহার নাম স্মরণ কেন?

এইরূপ, ভইট নামক আর এক পণ্ডিত অপদস্থ হইয়াছেন। তিনি কিন্তু ডাক্তারী বিদ্যায় আহারের মাত্রা অদ্যাপি কষিয়া দিতেছেন। তাঁহার মতে "পরিমিত পরিশ্রমী বয়স্ক ব্যক্তির (ইয়োরোপীয়ানের) খাদ্যে—১২০ গ্রাম আমিষ উপাদান, ৫০০ গ্রাম শালি উপাদান এবং ১০০ গ্রাম স্নেহ উপাদান থাকা আবশ্যক।"

বোধ হয় পাঠক ভাবিতেছেন, ইয়ুরোপীয়ের খাদ্যের মাত্রা জানিয়া তাঁহার কি হিত হইবে, আর "গ্রাম" কথাটাই বা কি। লেখকের হইয়া আমি উত্তর দিব কি? ইয়ুরোপীয় বিদ্যায় ইয়ুরোপীয় আদর্শ না হইয়া কি ভারতীয় হইবে? "গ্রাম" তাঁহাদের পরিভাষা, বিশেষতঃ কিমিতি-বিদ্যায়, যেমন আউন্স্ ইংরেজের। ডাক্তারী বিদ্যা বাঙ্গালায় লিখিলেও তোলা লেখা চলিবে না। ঐ কথা বাঙ্গালীকে বুঝাইতে হইলে লেখা হইত, ১০ তোলা পলীয়, ৩৪ তোলা পললীয়, ৮।০ তোলা স্নেহ। মোট ৫২।০ তোলা।

ইহার পর আরও দুই তিন জন বিদেশীর মত আছে। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার মাকে সাহেবের মতও আছে। এই মত তত উপেক্ষণীয়

নহে।" আমাদের খাদ্যে পলীয়ভাগ অল্প হইতেছে। কিন্তু লেখক সে মত অগ্রাহ্য করিয়া "সহজ পরিশ্রমী [?] বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনিক খাদ্যে" প্রায় ৪ তোলা পলীয়, ১৭ তোলা পললীয়, ৫ তোলা স্নেহ আবশ্যক বলিয়াছেন। এই মতের হেতু যাহাই হউক, খাদ্য মোট ২৬ তোলা হয়, ভইটসাহেবের প্রমাণের অর্দ্ধেক। তা ছাড়া, সে ভদ্রলোক কোন্ সৌখিন বাবু যাঁহার এত অল্প আহারে দিন চলে! এত বিচারের পরে লেখক কিন্তু ডাক্তার ঘাড়ে সব মাত্রা চাপাইয়া দিয়া মহর্ষি চরকের শরণ লইয়াছেন। লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছেন। কারণ চরকসংহিতার যে সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে লেখকের বিচার্য বিষয় নাই। চরক বলিতেছেন, মাত্রাভোজী হইবে। লেখক জানিতে চান, আমিষ ও নিরামিষের ভাগ কত হইবে।

"খাদ্য সম্বন্ধে বিচার" নামক পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে দুইএক কথা লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গুরুভোজন হইয়া গিয়াছে। গুরুভোজন দুই কারণে হয়। মাত্রা-জন্য গুরু, আর সংস্কার-জন্য গুরু। অর্থাৎ লঘু খাদ্য, যেমন ভাত, অধিকমাত্রায় খাইলে গুরুভোজন হয়, আর চালের পিঠা অল্পমাত্রায় খাইলেও গুরুভোজন হইতে পারে। "খাদ্য-কথা" সংস্কার-জন্য গুরু হইয়াছে, আমার সমালোচনা মাত্রা-জন্য গুরু হইয়া পড়িল। তথাপি আর একটু লেখা কর্তব্য মনে করিতেছি। "খাদ্যকথার" লেখক গ্রন্থখানি আমায় তাঁহার শ্রদ্ধার উপহার সরূপ দিয়াছিলেন। চাল কাঁড়া হউক, আকাঁড়া হউক, শ্রদ্ধায় প্রদত্ত হইলে উত্তম বলাই শিষ্টাচার, আমিও উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে কাহারওর হিত হইত কি? দেশের কত লোক দেখিতেছি, বসনে ও বাসনে পয়সা খরচ করিতেছে, কিন্তু অশনে অতিশয় মিতব্যয়ী। রাঢ়ের বিশেষতঃ এই বাঁকুড়া জেলার লোকগুলির শীর্ণ ও রুক্ষ দেহ দেখিলেই মনে হয়, ইহাদের আহারে পলীয় ও স্নেহের অত্যল্প ভাগ। অনুসন্ধানেও জানিতেছি, তাহাই বটে। কে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে?

'ডাক্তারী ভাষা' ও 'ডাক্তারী পরিভাষা' পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও পরিভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে। নতুবা জ্ঞান প্রচার হইবে না। ডাক্তারী ভাষা ও পরিভাষার নিদান অন্বেষণ করিতে গিয়া অশিষ্ট হইয়াছি। বড় দুঃখে হইয়াছি। বিদ্যার এ-দেশ সে-দেশ নাই। তিনি সর্বত্র পূজনীয়া। কিন্তু পূজার বিধি সবদেশে সমান নয়। একথা আমাদের ডাক্তারদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। কারণ তাঁহারা দেশ ভুলিলেও দেশ তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারিবে না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা

প্রবাসে মাতৃভাষার সাধনা ও প্রচারের উদ্দেশ্য যে শুধু মহৎ তাহা নহে; ইহা আমাদের আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ সঙ্কল্পের দুটি দিক আছে। একটি ভিতরের, অন্যটি বাহিরের। ভিতরের দিক, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের দিক।

আমরা প্রবাসী বাঙ্গালী, সাহিত্যের কেন্দ্র হইতে দূরে। বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে আমাদের সংস্রব ততটা ঘনিষ্ঠ নহে। এমন কি, হয়ত যুক্ত প্রদেশে এখনও অনেক বাঙ্গালী আছেন যাঁহাদের পক্ষে নির্দ্দোষ বাঙ্গলা বলিতে কিম্বা লিখিতে পারা সাধ্যাতীত না হইলেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুনিয়াছি এমন এক সময় ছিল যখন কোন কোন বাঙ্গালী মাতৃভাষায় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। এ সম্বন্ধে হাস্যকর অনেক গল্প আছে, তাহার অবতারণা এখন করিব না।

প্রবাসে যদি মাতৃভাষা চর্চ্চা ও প্রচারের সুবিহিত ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে নিজভাষা সম্বন্ধে আমাদের এ অপবাদ সম্পূর্ণ দূর হইবে। মনুষ্য মাত্রই মাতৃভাষার গৌরব করে। বাঙ্গলাভাষাও বাঙ্গালীর বড় আদরের বস্তু। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাতৃভাষার সঙ্গে সংযোগ রাখিবার জন্য আমাদের সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। প্রবাসে সাহিত্য-সভার প্রথম সার্থকতা এই যে, ইহার সাহায্যে বাঙ্গলাভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঘটিবে। এটি আমাদের নিজেদের দিক।

বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা দ্বারা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ঐক্য ও সামঞ্জস্য সুসম্বদ্ধ হয়। সাহিত্য জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় গ্রন্থি। আমরা বাঙ্গালীরা যে যেখানেই থাকিনা কেন, যত দূরেই বাস করিনা কেন, সকলেই যে এক পরিবার-ভুক্ত, আমাদের সাহিত্য তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র, ভাব ও চিন্তা বাঙ্গলা সাহিত্যে পরিস্ফুট। স্বদেশ-প্রীতি, ভক্তি-প্রবণতা, ভাবুকতা, কাব্যানুরাগ বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের মধ্যে গণ্য। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্', রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা,' দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ', গোবিন্দ রায়ের 'নির্ম্মল সলিলে,' আমাদের কানের [illegible] দিয়া মরমে প্রবেশ করে তখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে স্বদেশ-প্রেমের তড়িত-স্রোত বহে, এমন আর কিসে হয়?

বাঙ্গালী জাতির আর-একটি বিশেষত্ব ভক্তি-প্রবণতা। বাঙ্গলার সাহিত্য ও কবিতা সে ভক্তিরসে সরস। যে বাঙ্গালী বহুদিন সুদূর প্রবাসে রহিয়াছে, হয়ত অনেক দিন বাঙ্গলার ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাকেও রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত শোনাও, বৈষ্ণব কবিদের গীতিকবিতা শোনাও, অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইবে।

বাঙ্গালীর অন্যান্য বিশেষত্বও তাহার সাহিত্যের মধ্যে উন্মেষিত দেখিতে পাই। প্রবাসে বাঙ্গালীচরিত্রের বিশেষত্ব যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহার জাতীয়ত্ব যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলাসাহিত্যের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। আমরা যে প্রদেশে বাস করি সে প্রদেশবাসীর জাতীয় মহত্ত্ব আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে, ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের নিজস্ব যাহা তাহা ভুলিলে চলিবে না।

প্রবাসে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চ্চার অনেক সার্থকতা। তন্মধ্যে একটি এই—যে, আমরা যুক্ত প্রদেশে থাকিয়া বাঙ্গলাসাহিত্যের উন্নতিকল্পে নূতন উপকরণ যোগাইতে পারি। আদান-প্রদানে সাহিত্যের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয়। উর্দ্দু সাহিত্য ও হিন্দি সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক রত্ন আছে; সেগুলি সঞ্চয় করা আমাদের পক্ষে সুসাধ্য, এবং তাহা সঞ্চয় করিয়া আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বাড়াইতে পারি। যাঁহারা উর্দ্দু, ফার্সি কিম্বা হিন্দি ভালরূপ জানেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে একটি দায়িত্ব আছে। মধুকর যেমন নানা কুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আপনার মধুচক্রের মধুভাণ্ডার পূর্ণ করে, সেইরূপ তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে ঐ দেশের বিবিধ সাহিত্যকুসুম হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া আমাদের মধুচক্রের আয়তন বর্দ্ধিত করেন।

এদেশের ইতিহাস, এদেশের পুরাতত্ত্ব, এদেশের রীতি-নীতি হইতে নানা প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করিয়া আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে পুষ্টতর ও আরও সারগর্ভ করিতে পারি।

এবিষয়ে আমাদের আর-একটি কর্ত্তব্য আছে। আমরা যেমন এ দেশের সাহিত্যাদির সাহায্যে আমাদের নিজের ভাষাকে আরও অলঙ্কৃত করিতে পারি, সেরূপ বাঙ্গলা সাহিত্যভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন খাদ্য সংগ্রহ করিয়া এদেশের ভাষাকে আরও সুশ্রী ও সবল করিতে পারি। আধুনিক হিন্দি সাহিত্য অনেকটা বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুকরণে গঠিত হইতেছে। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের উপর আর-একটি ভার আছে—সেটি বাঙ্গালী জাতির বাহিরে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিস্তার। বাঙ্গলা সাহিত্য নানা সম্পদে আজ এত সমৃদ্ধ যে ইহা শুধু বাঙ্গালীর গৌরবের ধন নহে, সমগ্র ভারত আজ এ সাহিত্যের শ্লাঘা করে। বাঙ্গলা সাহিত্য আজ জগতের সকল সুসভ্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সাহিত্যকে জগতের শ্রেষ্ঠ মুকুট পরাইয়াছেন। যেমন ইউরোপের সকল প্রদেশেই সুশিক্ষিতেরা ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা সুশিক্ষার অঙ্গ মনে করে, আমরা আশা করি শীঘ্রই সে দিন আসিবে যে দিন ভারতের সর্ব্বত্রই সুশিক্ষিতেরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে তেমনই আদরে গ্রহণ করিবে। বাঙ্গলা সাহিত্য শুধু বাঙ্গলার সাহিত্য হইবে না—ভারতের সাহিত্য হইবে। এ উচ্চ উদ্দেশ্য সংসাধনের প্রতি আমাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গলা সাহিত্য প্রসারের গুরুভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত।

বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙ্গালীর যে কয়েকটি কর্ত্তব্যের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় প্রশস্ত।

প্রথমতঃ—যেখানে পঞ্চাশাধিক বাঙ্গালীর বাস সেখানে বাঙ্গলা-পুস্তকভাণ্ডার স্থাপনা। সে ভাণ্ডারে শুধু গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের পুস্তকভাণ্ডারে অন্য নানা প্রকার সদ্‌গ্রন্থ, ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের পুস্তকও রাখা উচিত। সে পুস্তক পাঠের অধিকারী শুধু বাঙ্গালী হইবে না, এদেশীয়েরাও ইহার অধিকারী হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্য বিস্তারের সহায়তা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—সাহিত্য-সমিতি, যেখানে সম্ভব, স্থাপন করা। যেখানে সাহিত্যোৎসাহী কয়েকটি বাঙ্গালী থাকিবে

সেখানে বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চ্চার ও আলোচনার জন্য সমিতি স্থাপিত হইবে। এবং যাঁহারা বাঙ্গালী নন, তাঁহাদেরও সে সমিতির সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে।

তৃতীয়তঃ—প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনী। সম্বৎসরে একবার সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালীরা সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যালোচনা করিবে ও সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে সদুপায় উদ্ভাবন করিবে। যাহাতে বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইবে।

চতুর্থতঃ—যুক্তপ্রদেশে একটি সুলিখিত ও সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা স্থাপন। ইহার উপকারিতা নিঃসন্দেহ।

এদেশে যাঁহারা সুলেখক, এ পত্রিকায় তাঁহাদের প্রবন্ধাদি বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ হইবে। এ দেশের উদীয়মান লেখকদের উৎসাহ ও উন্নতির নিমিত্ত এরূপ একটি মাসিক পত্রিকা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গলা সাহিত্যভাণ্ডারে এ দেশেরও দেয় অনেক জিনিষ আছে। আমাদের যাহা দিবার তাহা একটি মাসিক পত্রিকার সাহায্যে অনায়াসে দিতে পারিব। পত্রিকায় এমন অনেক রচনাদি থাকিবে যাহা এ দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, আচার ব্যবহার, শিল্পকলা ইত্যাদি উপকরণে পরিপুষ্ট। আমার মনে হয় এ পত্রিকার এক সংস্করণ, অন্ততঃ একাংশ, দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে এদেশীয়দের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্য প্রসারের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ—এ দেশে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের শাখা বিস্তার করা। তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের সঙ্গে আমাদের অক্ষুণ্ণ যোগ সংরক্ষিত হইবে। এখানকার পরিষদের একটি বিশেষত্ব এই হওয়া উচিত যে বাঙ্গলা সাহিত্যের উত্তম গ্রন্থাদি, এবং উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ ও কবিতার সংকলন দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইবে। ভারতে যাহাদের ভাষা সংস্কৃতপ্রসূত, এ উপায়ে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রসার ও আদর বাড়িবে। যে দেশ দেশান্তেই থাকিনা কেন, মাতৃভাষা আমাদের নিত্য পূজার দেবতা। মধুসূদন সুদূর প্রবাসে মাতৃভাষাকে সম্বোধন করিয়া যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমরাও যেন সেরূপ বলিতে পারি :—

"নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
* * *
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্না তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

লাক্ষ্ণৌ শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

[এই অভিভাষণ কানপুরে উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।]

রূপের তারতম্য

(তামিল কবিতা)

সুরূপ, অথচ মূর্খ—চির অপকারী ;
কুৎসিত, বিদ্বান কিন্তু—নয় অসুন্দর।

সরল শরের বেগ—প্রাণ-অপহারী,
বিকৃতগঠন বীণা—অমৃত-নির্ঝর।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

চণ্ডীদাস কাব্য —শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা, এম-এ। দাম পাঁচ সিকা; কাপড়ে বাঁধাই, দেড় টাকা।

মোটের উপর বইখানি ভালই হইয়াছে। তবে দু-একস্থানে জোর করিয়া কবিত্ব করিতে গিয়া একটু একটু খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা কবিতারসগ্রাহী, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইবেন। ছাপা ও কাগজ একরকম চলনসই হইয়াছে।

সচিত্র বয়ন-বিজ্ঞান—শ্রীরসময় সিংহ। আট আনা, প্রাপ্তিস্থান লেখকের নিকট, লালবাজার, বাঁকুড়া।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের চারিদিকে তাঁত এবং চর্‌কার ব্যবহার তাঁতি ছাড়া অন্য লোকেও করিতেছেন। যাঁহারা নূতন করিয়া বয়ন-কার্য্য শিখিতে চান, তাঁহাদের কাছে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আদৃত হইবে আশা করি। লেখক বেশ সহজ ভাষায় এবং চিত্র-সাহায্যে বক্তব্য বিষয় সহজবোধ্য করিয়াছেন।

হায়দার আলি - শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চুঁচুড়া, তেলিনীপাড়া, দাক্ষায়ণী প্রেস হইতে প্রকাশিত।

একখানি নাটক। অভিনয় করিবার মত হয় নাই। তবে এমনি বই হিসাবে পড়িলে ভাল লাগিতে পারে। নাটকের প্রধান চরিত্র-গুলি ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই। ছাপার দোষ-প্রমাদ অনেক আছে, লেখক তাহা স্বীকার করিলেও তাঁহাকে একেবারে মার্জ্জনা করা যায় না। তাড়াতাড়ি করিয়া যা-তা ছাপানো অপেক্ষা কিছু দেরী করিয়া ভাল করিয়া ছাপানোই উচিত। বইখানি ছোট করিয়া ভুলচুক বাদ দিয়া ছাপাইলে অভিনয়ের মত হইতে পারে।

কার্পাস—বি, কে, মুখার্জ্জি, পোষ্ট বেহালা, কলিকাতা।

এই পুস্তিকায় জগতের প্রায় সব দেশের তুলার বিষয় কিছু না কিছু বলা হইয়াছে। যাঁহারা এখন চর্‌কা কাটিতেছেন এবং তাঁত চালাইতেছেন, এই বইখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের উপকার হইবে। ভারতের কার্পাস সম্বন্ধে আরো কিছু বেশী বলা উচিত ছিল, যাহা বলা হইয়াছে তাহা নেহাত সামান্য। মোটের উপর বইখানি পড়িলে অনেকেই কিছু শিখিবেন আশা করা যায়। ছাপা ভাল। বাঁধাই খারাপ।

গ্রন্থকীট

বাঙ্গালীর বল বা বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস —শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ প্রণীত। মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫২২+৭১+২৲+।০+৶০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। চার টাকা।

এই পুস্তকখানিতে মহাভারতের যুগ হইতে ইংরেজ অধিকারের আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙালী জাতির বাহুবলের, যোদ্ধৃত্বের ও বীরত্বের ইতিহাস সুশৃঙ্খলায় বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ একখানি প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাব ছিল। এখন ইহা বাঙালী জাতির ও বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হইল। চমৎকার সুন্দর উৎকৃষ্ট বই; প্রত্যেক বাঙালী নরনারীর পাঠ করা উচিত। বাংলা বইএ নিতান্ত দুর্লভ শব্দসূচী এই বইখানির সৌষ্ঠব ও উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছে; যাঁরা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য এই পুস্তক আলোচনা করিবেন তাঁদের বিশেষ কাজে লাগিবে। এই বইখানি পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; যিনি এই বই পড়িবেন তিনিও আমাদের মতন আনন্দিত হইবেন জোর করিয়া বলিতে পারি।

নীলদর্পণ ৺দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। কর মজুমদার এণ্ড কোম্পানী, ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৮৯ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটককারের শ্রেষ্ঠ নামজাদা বই, বাংলার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ এই নীলদর্পণ। তারই শোভন সুন্দর সংস্করণ। ভূমিকায় নীলবিদ্রোহের ইতিহাস ও পরিশিষ্টে শব্দার্থ আছে, দীনবন্ধুজীবনী আছে, নীলদর্পণ নাটকের ইতিহাস আছে। বাংলায় যে এমন সুন্দর উপকারী সংস্করণের বই হইতেছে ইহার জন্য প্রকাশকেরা পাঠকদের ধন্যবাদভাজন। এই সংস্করণের সমাদর যে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

মহাত্মা গান্ধী—শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, হাওড়া পানিত্রাস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৭০ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা। চতুর্থ সংস্করণ।

মহাত্মার জীবনী ও আধুনিকতম উপদেশবাণী এই সংস্করণে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংস্করণে ১২ খানি ছবি আছে—মহাত্মার নিজের ও তাঁর হস্তাক্ষরের এবং তাঁর কর্ম্মজীবনের সম্পর্কিত আর কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির। এ বইএর প্রশংসা আমরা করিয়াছিলাম; যে বইএর চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে তার প্রশংসা করা নিষ্প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সমগ্র দেশ ভক্তিমান হইয়াছে; তাঁর জীবন ও উপদেশ আলোচনা করিয়া নিজেদের জীবনকে গঠিত করার পক্ষে এই পুস্তক সকল নরনারীর সহায় হইতে পারিবে।

কেদার-বদরীর পথে শ্রীবীরেশচন্দ্র দাস, বি-এল প্রণীত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ১৪৭ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

গৌরীশুঙ্গ হিমালয় ভারতের পবিত্র তীর্থ। সেই তীর্থের একটি পথের বৃত্তান্ত ও যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে আছে; পথের কত মাইল অন্তর চটী সরাই, কোথায় কি সুবিধা, কোথায় কি দ্রষ্টব্য ও কর্ত্তব্য আছে, ইত্যাদি কেজো কথার সঙ্গে দেশের দৃশ্যের বাক্যচিত্র সংযোজিত হওয়াতে ইহার উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে। একখানি ম্যাপ সংযোজন করাতে তীর্থযাত্রীদের বিশেষ সাহায্য করা হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—অন্নদা ঠাকুর। ৫২।২।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৮ পৃষ্ঠা। ভালো কাগজে ছাপা। এক টাকা।

এই বইএ কতকগুলি কবিতা আছে, বিষয় তত্ত্বকথা—ধর্ম্মতত্ত্ব প্রীতি ইত্যাদি। এই বই নাকি "ভগবান রামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ হইতে ভক্ত অন্নদা ঠাকুরের স্বপ্নদশায় প্রাপ্ত।" যাই হোক, এর মধ্যে অনেক শাশ্বত সত্যের কথা আছে।

তসর প্রসঙ্গ—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ। উপাসনা প্রেস, ৪৪ডি খুলিন হাসপাতাল রোড, ইণ্টালি, কলিকাতা, ৪২ পৃষ্ঠা। দু আনা।

তসর-কীট পালন করিবার ও তসর-গুটি হইতে রেশমী সুতা বাহির করিবার প্রণালী এই পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের কাজে লাগিবে।

চরকা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত ভূমিকা সহিত। দুই পয়সা।

ভারতের বস্ত্র-শিল্পের অবনতির ইতিহাস ও তার উন্নতির উপায়, চরকায় সুতা কাটার প্রণালী, চরকায় কিরূপ রোজগার হইতে পারে, সুতার পক্ষে কিরূপ তুলা উৎকৃষ্ট, ভারতের তুলার চাষ ও রপ্তানির হিসাব ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তিকায় আছে। চরকা-কাটুনে নর-নারী পড়িলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

খাদ্যকথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। স্বাস্থ্যসমাচার কার্য্যালয়, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭০ পৃষ্ঠা। আট আনা।

এই পুস্তকে এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—(১) খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। (২) খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। (৩) খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান। (৪) খাদ্যের পরিপাক প্রণালী। (৫) খাদ্যসমূহের গুণাগুণ। (৬) খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ। (৭) খাদ্যসম্বন্ধে বিচার। (৮) খাদ্যের দোষে রোগ ভোগ। (৯) খাদ্যসমূহের বিশ্লেষণ। বিশেষ উপকারী ও উৎকৃষ্ট পুস্তক। দেহী মাত্রেরই দেহপোষণের জন্য খাদ্য আহার প্রয়োজন: সেই খাদ্যের বিষয় জানা প্রত্যেক নর-নারীর—বিশেষ করিয়া মাতাদের—আবশ্যক। এই বই খাদ্য নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহায্য করিবে। বইখানি সুলিখিত।

কারবার শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ। নোয়াখালি বড়বাজার। ৯৫ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

পশু, পক্ষী, পালো, পাট, সুগন্ধি, কম্বল, সতরঞ্চ, বাসন, কলা, কাপড়, কৃষি, দালালী, কাঁচ, শস্য, শিরিষ, হাড়, সাবান, দেশলাই, নস্য, নকল-সোনা, ভেলী-রূপা, মিল্ক্-ফুড ইত্যাদি কারবারের উপায় ও সফলতার কৌশল এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের কাজে লাগিবে।

ভারতে যুবরাজ—শ্রীআবদুল বারি প্রণীত। হরিনারায়ণপুর, নোয়াখালী।

রাজভক্তির উচ্ছ্বাস পদ্যে। ইংরেজের প্রশংসায় গদ্গদ রচনা।

যুবরাজ-সম্বর্দ্ধনী কাব্য—শ্রীমন্মথকুমার রায়।

তথৈবচ। কাব্যের বিশেষণ যে সম্বর্দ্ধনী কেন হইল তা মা সরস্বতীই জানেন যিনি কবিকে কৃপা করিবার ছলে বিড়ম্বনা করিয়াছেন। ভারতে রণেতে প্রাণপণেতে মিল। তাতে কি; কাঠের বিড়াল হোক না, ইঁদুর ধরিলেই হইল। এক কবিওয়ালা জাড়াগ্রামে গিয়া জাড়ার বাবুদের স্তুতি গাহিয়া জাড়াতে ও তবুতে মিল করিয়াছিল: কিন্তু তাতে বঙ্গবাণী ক্ষুণ্ণ হইলেও লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছিলেন; কবিওয়ালার ছন্দ ও পদ্য মিলে নাই, কিন্তু তার ভাগ্যে পুরস্কার মিলিয়াছিল বিস্তর। লেখকেরও কিছু সুবিধা হইয়া থাকিলে হয়ত।

পঞ্চামৃত—শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ বি-এ। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য উল্লেখ নাই। ছাপা, কাগজ, বাঁধা উত্তম।

পাঁচটি ও পাঁচটি ব্যঙ্গরচনা—(১) অক্ষর বিভীষিকা। (২) ডবল আওয়াজ। (৩) ৩এর রাজত্ব। (৪) আদালতীয় বাংলার নালিশ। (৫) ৫এর প্রভুত্ব। (৬) শুল্ক ব্রহ্ম। (৭) উকার বনাম ওকার। (৮) না-য়ের নক্সা। (৭) বৈদ্যেরা কবিরাজ কি ডাক্তার? (৮) ননদ ভাজ সংবাদ (প্রহসন)। যাঁরা ঘণ্টা খানেক হাসিতে চাহেন তাঁরা কিনিয়া পড়িবেন—রচনায় রঙ্গ ও রস দুই আছে।

রোবাইয়াৎ—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। বেঙ্গল পাব্লিশিং হোম, ৫ মুরমহম্মদ লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠাঙ্ক বা দাম দেওয়া নাই। বইএর বাঁধাই বেশ সুন্দর।

ইংরেজ কবি ফিট্জেরাল্ড ওমার খায়ামের শ্লোকাবলী আশ্রয় করিয়া একরকম স্বাধীনভাবেই কবিতা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; ইংরেজী কবিতার মধ্যে ওমারের কবিতার প্রায় কিছুই নাই। এই পুস্তিকায় এক পাতে ইংরেজী কবিতা ও তার সামনের পাতে বাংলা অনুবাদ ছাপা হইয়াছে। অনুবাদ সুন্দর সরস প্রাঞ্জল হইয়াছে। তবে সাত নকলে আসল খাস্তা—ওমার খায়াম এ অনুবাদের তল্লাট দিয়াও যান নাই। এ রকম অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়া কেউ যেন মনে না করেন যে ওমার খায়ামের কবিত্বরস উপভোগ করিতেছেন।

কৃষ্ণকথা—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ৪৪ পৃষ্ঠা, তিন আনা।

পদ্যে কৃষ্ণলীলার কথার বিবৃতি।

বিশ্বসংহিতা—প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীরামবুদ্ধ দেব, ৫৮ আপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা। চটি পুস্তিকা দুখণ্ড, এক আনা, তিন আনা।

লেখক এই পুস্তকের পরিচয় স্বরূপ লিখিয়াছেন—"খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মানব-সমাজ-বিধি অর্থাৎ পৃথিবীতে শান্তি, স্নেহ, ভক্তি, ক্ষমা, দয়া, কর্ত্তব্যপালন প্রভৃতি দ্বারা সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রণালীবিষয়ক সমাজ-সংস্কার ব্যবস্থা।" লেখকের আদর্শ সমাজে অনেক উৎকৃষ্ট, সকল দেশের ধার্ম্মিক চিন্তাশীলের অভিলষিত ব্যবস্থা থাকিবে; কিন্তু তার মধ্যে মানবের আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিভেদও থাকিবে। এক কলসী দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা—ব্যস্!

পঞ্চরত্ন—শ্রীহীরালাল রাহা। প্রকাশক শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ৪ সৃষ্টিধর দত্তের লেন, কলিকাতা। ডিমাই আট পেজি ১০১ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

কঠ, কেন, প্রশ্ন, ঈশ, মণ্ডূক এই পঞ্চ উপনিষদের মূল টীকা অনুবাদ। এর মধ্যে অনেক উদ্ভট ও অদ্ভুত তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে—ধ্বনিসাদৃশ্য দেখিয়াই বাইবেল ও উপনিষদের অনেক নামকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আছে।

বসন্ত-উৎসব কাব্য—শ্রীবাঁট প্রণীত (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), হরিপুর, ভায়া শান্তিপুর, জেলা নদীয়া। ডিমাই ৮ পেজি ২৫৭ পৃষ্ঠা। আড়াই টাকা।

কোদালের বাঁট চাষের কাজে উপযোগী হইলেও কবিতার ক্ষেতের ক্ষতিই করিয়া থাকে। হইয়াছেও তাই। কোদালের বাঁটের উপযুক্তই বসন্ত-উৎসব কাব্য এখানি।

শান্তি-গীতা—শ্রীশশিজীবন সেন। প্রকাশক শ্রীনলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ২।২ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।

পদ্যে তত্ত্বকথা। পদ্যের মিল—ক্রূর, দৃঢ়; আবশ্যক, রোক; অপারগ, লোক; মহৌষধ, রোধ; ইত্যাদি। বাহুল্যেনালম্।

শ্রীসয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দসংগ্রহ—প্রয়োজক শ্রীজয়সুখরায় পুরুষোত্তম রায় জোষীপুরা অনে ভানুসুখরাম, নির্গুণরাম মহেতা। প্রকাশক বিদ্যাধিকারী কচেরী, ভাষান্তর শাখা, বড়োদা রাজ্য।

এই পুস্তকে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংস্কৃত বা দেশী অনুবাদ বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রবন্ধ লেখকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী পুস্তক। নাগরী-প্রচারিণী সভা ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতির পরিভাষা আলোচনা করিয়া এই পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার পরিভাষার সুধীসমাজে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে মনে হয়।

গার্গী—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাশ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক বগুড়া কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট লিমিটেড, বগুড়া। দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত। ৪৯ পৃষ্ঠা। চার আনা।

উপনিষদের গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক আখ্যায়িকা সরল সহজ ভাবে কথোপকথনের মধ্য দিয়া বিবৃত হইয়াছে। মহিলা ও বালিকাদের পাঠযোগ্য।

মিতা—মাসিক শিশু-সাহিত্য। শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার সম্পাদক। কদমতলা চুঁচুড়া। প্রতি মাসে স্বসম্পূর্ণ এক-একখানি বই বাহির হইবে। বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় পয়সা।

প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে—খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিত—আমাদের দেশ। কবিতায় ভারতবর্ষের বর্ণনা। শিশুদের মনে দেশাত্মবোধ, দেশের গৌরব-বোধ, দেশের পরিচয় সঞ্চারিত করিবার পক্ষে ইহা সাহায্য করিবে।

ঋগ্বেদ—প্রথম ভাগ—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত প্রণীত। ২৬৪ পৃষ্ঠা। আড়াই টাকা। ৩ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

বেদের মন্ত্র আলোচনা করিয়া বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বিশদ করিয়া বুঝানো হইয়াছে। বৈদিক ঋষিরা যে একেশ্বরবাদী ছিলেন, ও বৈদিক দেবতাগণ যে একই দেবতার নামান্তর ইহাই এ পুস্তকের প্রতিপাদ্য। বেদের দেবতা ও যজ্ঞ প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর বৈদিক culture সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। এই পুস্তক সেই জ্ঞান লাভে সহায়তা করিবে।

কড়া মিঠা—শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত। দু আনা।

দেশ- ও সমাজ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দেশের যুবকযুবতীদের প্রতি কতকগুলি স্পষ্ট উপদেশ বাক্য। অনেক সত্য ও কাজের কথা বলা হইয়াছে।

পল্লী ইউনিয়নের ট্যাক্স্ ও ভোটার—শ্রীনিরঞ্জন চন্দ্র, বি-এল সংকলিত। চার আনা।

গ্রামের চৌকিদারী ইউনিয়ন বোর্ডের উদ্দেশ্য ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও পরস্পরের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিবৃত করা হইয়াছে। গ্রামবাসীদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী—বিক্রমপুরের প্রাচীন কবি স্বর্গীয় দ্বিজ রামকৃষ্ণ বিরচিত। বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। দু আনা।

প্রাচীন রচনা প্রচারের উপকারিতা আছে। বিশেষত যাঁরা সত্যনারায়ণে ভক্তিমান তাঁরা এই পাঁচালী মুদ্রিত পাইয়া সুখী হইবেন।

পুরাণতত্ত্ব—শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। ব্রাহ্মণ রক্ষণ-সভা, কাশীধাম। পাঁচ আনা।

কথোপকথনের দ্বারা পুরাণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী "স্বকপোল-কল্পিত ভেজাল সামগ্রী" কত যে আছে তাহা পাঁচ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়া দেখানো হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী—শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক—পাল ভট্টাচার্য্য কোম্পানী, ২১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৮২ পৃষ্ঠা। চার আনা।

মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অমিয়-গীতা—শ্রীমোহিনীমোহন বসু প্রণীত। ঢাকার লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। আট আনা।

পদ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার বাংলা অনুবাদ।

দেশের ডাক—শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯, রামনাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৯ পৃষ্ঠা। দশ পয়সা।

দেশের ও দেশের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেশবাসীর বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—সহযোগিতাবর্জ্জন।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব চরিত—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু দাস। প্রকাশক—ষ্টুডেণ্ট ষ্টোর, খাগড়া মুর্শিদাবাদ, ২৯ পৃষ্ঠা। চার আনা।

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ও লক্ষণ কি তাহাই এই পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য—শ্রীমতী সুখলতা রাও। প্রকাশক—ইউ রায় এণ্ড সন্স, ১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা। ৫০ পৃষ্ঠা। সচিত্র। ছয় আনা।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার উপদেশমূলক বই। বইএর কাগজ ভালো, ছাপা ভালো, ছবি উত্তম, লেখা উৎকৃষ্ট ও সহজ। শিশুশিক্ষার উপযুক্ত বই সর্ব্বাংশে।

অম্রসত্ত স্কেলে ষ্টীমে ১ ঘণ্টায় প্রস্তুত ও তৈয়ারী অম্রসত্ত দুগ্ধ দিয়া ও অম্রের রস ও বরফ দিয়া প্রস্তুত ও ব্যবহার-প্রণালী-সার—শ্রীমনোহর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। উত্তরপাড়া। বিবিধ প্রকার আমের ছবি আছে।

আমসত্ত তৈরী করিবার প্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তিকা।

আর্য্যানুষ্ঠান-চন্দ্রিকা—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীগণেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বারইভাগ, পাঙ্গাসী পোষ্ট, পাবনা। পাঁচ আনা।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দৈনিক প্রাতঃ অবধি সান্ধ্যকৃত্য আচার সন্ধ্যা বন্দনা তর্পণ ইত্যাদির বই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গল্পলহরী—কমলা রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির সেবকগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক দাশ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী, ৬ কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা। ৪৪ পৃষ্ঠা। পাঁচ আনা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর উপদেশের মধ্যে মধ্যে যে-সব গল্প

বলিতেন তাঁরই কতকগুলি বোধ হয় ছেলেদের উপযোগী বাছিয়া একত্র করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। গল্পগুলি সরস ও শিক্ষামূলক।

ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, জপসা বাবুর বাড়ী, নগর, পোঃ উপসী, জেলা ফরিদপুর। ১৭৩ পৃষ্ঠা ডিমাই আট পেজি। সচিত্র। কাপড়ে বাঁধা। আড়াই টাকা।

ফরিদপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রত্যেক জেলার ইতিহাস সংগৃহীত না হইলে বাংলা তথা ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে না। যাঁরা জেলার ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন তাঁরা জাতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার যজ্ঞের ঋত্বিক। সুতরাং এই-সব ইতিহাস স্থানীয় লোকের নিকট ত সমাদৃত হইবেই, ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবে। এই ইতিহাসে ফরিদপুরের বহু গ্রাম ও ব্যক্তির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে; সেই-সব বিবরণ বেশ চিত্তাকর্ষক।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৩ পৃষ্ঠা। তিন আনা।

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা লিখিয়া লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া কঠোর নির্ব্বাসন সহ্য করিয়া তিনি পূর্ব্বেই খ্যাতি ও দেশের লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লেখক এই পুস্তিকায় বলিতেছেন—"মনের অতীত সত্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া মন ও শরীরকে পূর্ণ জ্ঞান আনন্দ ও শক্তি প্রকাশের যন্ত্ররূপে রূপান্তরিত করা" "মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য"। "এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীব ব্রহ্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ হইয়া দাঁড়ায়। তখনই সে প্রকৃত স্বরাট।" "জীবনের মধ্যে জীবের পূর্ণরূপের প্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য।" নিজের শক্তি ও বুদ্ধি ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে—মর্ত্তে অমরধাম প্রতিষ্ঠাই এ যুগের সাধনা। "ব্রহ্ম শুধু গুণাতীত তুরীয় সত্তা নহেন, তিনি গুণময় ও গুণভোক্তা, সব জীবই তাঁহার লীলাকেন্দ্র—এ সত্য উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী আমাদের সামাজিক পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এই সত্য প্রতিফলিত হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিবে।"

বিচিত্র ভ্রমণ—শ্রীকুঞ্জলাল বসাক প্রণীত। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র। এক টাকা।

গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ সার্কাস খেলোয়াড়। তিনি বার বার নানা সার্কাস-দলের সঙ্গে যোগ দিয়া ভারতের প্রায় সমস্ত শহর, বহির্ভারতের দ্বীপপুঞ্জ, বর্ম্মা, শ্যাম, চীন, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি বহুদেশের বহু প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া সেই সেই দেশের দৃশ্য রীতি নীতি ইতিহাস প্রভৃতি যাহা অবগত হইয়াছেন তাহার বিবরণ ও চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নানা দেশের বিচিত্র কাহিনী ছত্রে ছত্রে কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। সমস্ত এশিয়াখণ্ডের সমুদ্রকূলের প্রধান প্রধান দেশের বিবরণ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভ্রমণ-কাহিনী বাস্তবিকই বিচিত্র। যিনি পাঠ করিবেন তিনিই অনেক কিছু নূতন খবর জানিয়া প্রীত হইবেন, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। ইহা কোনো পুস্তকের সম্বন্ধে পরম প্রশংসা।

অঘোরপ্রকাশ—স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবনকাহিনী—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বিবৃত। বাঁকিপুর, অঘোর-পরিবার। ১২২ পৃষ্ঠা ডিমাই আট পেজি। দুই টাকা।

গৃহস্থ সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মনিষ্ঠা মহিলার জীবনকাহিনী। মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত; ব্রহ্মনিষ্ঠ পরিবারের গৃহিণীর আদর্শ জীবনের কথা।

নিম্ন ও পতিত জাতি – শ্রীমধুসূদন আচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ। বালিয়াটি, ঢাকা। প্রকাশক—দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস, ১৬৮ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫৭ পৃষ্ঠা। এক টাকা দু আনা।

সমালোচনার জন্য এই পুস্তক বহুকাল হইল পাইয়াছিলাম; ভালো করিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা থাকাতেই বিলম্ব হইয়া গেল; এর জন্য আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। এই পুস্তকে গ্রন্থকার শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়া কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে নিম্নশ্রেণীর ও পতিত বলিয়া নির্দেশ করার অবৈধতা অনিষ্টকারিতা ও অধার্ম্মিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বাংলা দেশেই বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া পাতিত্য ও নিম্নত্বের বিরুদ্ধে মহৎ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন; আমরা তাঁহাদের সেই আদেশ ও যুক্তি অমান্য করিয়া নিজেদের অপমান করিতেছি, প্রতিবেশী বন্ধুদের অপমান করিতেছি, গুরুস্থানীয় মহাপুরুষদিগকে অপমান করিতেছি। আজ অবধি দেখা যাইতেছে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণজাতীয় লোকেরাই এই কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টায় অগ্রণী। আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিষ্ঠ সাহস সমদর্শিতা মহাপ্রাণতা সত্যানুরাগ ও ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিয়াছেন। যে মহৎ বাণী কালে কালে বারংবার বিঘোষিত হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবং যে মহৎবাণী মহাত্মা গান্ধীর প্রধান উক্তি ও বিশেষত্ব সেই পাতিত্য-পরিহারের বার্ত্তাবাহক হইয়া আচার্য্য মহাশয় দেশের ও সমাজের কল্যাণের চেষ্টার জন্য সকলের ধন্যবাদভাজন। মহাত্মা গান্ধীর এই যুগপ্রবর্ত্তক সাম্যবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই আচার্য্য মহাশয়ের এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা গ্রন্থকারের অধিকতর প্রশংসার বিষয়। তিনি স্বয়ং এই কুপ্রথার অনিষ্টকারিতা ও অন্যায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যুক্তি ও শাস্ত্রের নজিরে তাহা দূর করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছেন। বর্ত্তমান সাম্যবাদের দিনে এই পুস্তকের বহুল প্রচার ও পাঠ বাঞ্ছনীয়।

পুঁতির মালা—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। সচিত্র। ডিমাই ৮ পেজি ৭৬ পৃষ্ঠা। বোর্ডে বাঁধা। বারো আনা।

বালক ভ্রাতৃদ্বয়ের শিশুপাঠ্য গল্পের বই। মোহনলালের চারটি ও শোভনলালের তিনটি মোট সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলি সুলিখিত; ভাষায়, ভঙ্গিমায়, রচনায় নিখুঁত; গল্পগুলি প্রায়ই মজাদার হাসিভরা—কাজেই শিশুদের মনোহারী। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে এর ফেরার বিরাম নাই—ইহা হইতেই বইখানির কদর বোঝা যায়। শিশুদের পড়িতে দিলে তারা যে প্রীত হইবে তাহা সমালোচকের নিজের বাড়ীর অভিজ্ঞতা হইতে জোর করিয়া বলা যায়। সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত বইখানি অনেক কষ্টে শিশুব্যূহ হইতে উদ্ধার করিয়া এই পরিচয়টুকু লিখিতে হইল। বইএর ছবিগুলিও উত্তম—ওস্তাদ চিত্রকরের আঁকা।

মুদ্রারাক্ষস

পঞ্চরত্ন—(কঠ-কেন-প্রশ্ন-ঈশ-মুণ্ডকেতি উপনিষদঃ পঞ্চকাঃ)—সাঙ্খ্যবেদ-প্রণেতৃ শ্রীহীরালাল রাহা কর্ত্তৃক অনুবাদিত। পৃঃ ১০১ মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার এই খণ্ডে কঠোপনিষদের প্রথম বল্লীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যেক মন্ত্রেরই বহু অর্থ; কোন কোন মন্ত্রের ৯টা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেক ব্যাখ্যাই অদ্ভুত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

নবহুল্লোড়। Reform Screams. A Pictorial

অঙ্গারং শত-ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি

Review at the close of the year 1921. By Gaganendranath Tagore. Published for the Artist by Thacker Spink and Co., Calcutta and Simla 1921. Price Rs. 3.

বঙ্গের প্রধান ব্যঙ্গচিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত ১৫ খানি ব্যঙ্গচিত্র এই পুস্তকে আছে। ইহার উৎকৃষ্ট ছবিগুলির মধ্যে কোন কোনটি মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ছবিগুলির নাম—নব জন্মাষ্টমী ; প্রথম বাঙ্গালী শাসনকর্ত্তার উদয়—কোথায় তিনি ? ; বুড়ো বাংলার গঙ্গাযাত্রা ; প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—কনের মা কাঁদে আর টাকার পুটুলি বাঁধে ; বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নিযোগ ; বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ ; লে আও চৌষট্ট হাজার ; জাতি-গঠনের বাধা ; জগদীশের ধ্যানভঙ্গ ; কবির ওড়া ; পণ্ডিত শেখে দেখে, মূর্খ শেখে ঠেকে ; বিচিত্র পরিণয় ; ভূতগত ব্যাপার ; রং-কো-অপারেশন ; জীয়ন্তে মরা। কতকগুলি ছবির মধ্যে কেবল যে মজা আছে, তা নয়, দুঃখের কারণও আছে, এবং শিখিবার আছে। আমরা একটি ছবির প্রতিলিপি চিত্রকর মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত করিতেছি। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, স্পর্শদোষ, অর্থাৎ কোন কোন শ্রেণীর মানুষকে ছুঁইলে অশুচি হইতে হয় এই ধারণা, আমাদের জাতির এমন অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধি এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক দেশহিতৈষী এই ধারণা উন্মূলিত করিতে পারেন নাই। ইহা জাতি-গঠনের একটি প্রধান বাধা। ইহাকে চিত্রকর কালীর দাগ রূপে কল্পনা করিয়া দেখাইতেছেন, যে, ভারতের প্রধান রাসায়নিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও ধুইয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক ভারতীয় লোকেরা হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও এই স্পর্শ-দোষ সম্বন্ধীয় ধারণাকে অনেকেই অতিক্রম করিতে পারেন না।

র

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্রকর
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দর্শন সঙ্গীত—শ্রীউমেশচন্দ্র বিশ্বাস তত্ত্বনিধি প্রণীত। পোঃ আঃ ভাবতা, মুর্শিদাবাদ। মূল্য আট আনা। ১৩২৮ সাল।

ধর্ম্মমন্দিরে এবং পারিবারিক উপাসনায় পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল সঙ্গীতের প্রচলন আছে, তাহার উদ্দেশ্য মানুষের পাপবৃত্তিগুলি দূর করিয়া, প্রাণের ভক্তি ও ভালবাসা ভগবৎ-চরণে অর্পণ করিয়া, নৈতিক মার্গে আত্মোন্নতি সাধন করা। ইহা ব্যতীত আর-একপ্রকার সঙ্গীত আমাদের দেশে দেখা যায়, দার্শনিক আধ্যাত্মিকতাই তাহার বিশেষত্ব। সংসার অসার, জগৎ মিথ্যা, তুমি কার, কে তোমার, এইরূপ বৈরাগ্যমূলক উপদেশ এই শ্রেণীর গানে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। আমাদের দেশে মাঠে কৃষকগণ ও নদীতে নৌকার মাঝিরা অনেক সময় এ-সকল গান গাহিয়া থাকে। যে-সকল দার্শনিক শব্দের সমষ্টি দ্বারা গানগুলি বিরচিত হয়, সেগুলি পুনরাবৃত্তিবশতঃ প্রায়ই অর্থশূন্য বাগ্‌জালে পরিণত হইয়া পড়ে, তাহা দ্বারা মনে বৈরাগ্য কি অন্য কোন দার্শনিক ভাবের উদয় হয় না। বক্ষ্যমাণ পুস্তকখানির প্রণেতা তাঁহার গানগুলিকে ভাবগর্ভ করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যে-সকল দার্শনিকতত্ত্ব তিনি সঙ্গীতাকারে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেগুলি স্পষ্ট করিবার জন্য টীকাস্বরূপ ষড়্‌দর্শন এবং বৌদ্ধ- ও চার্ব্বাকদর্শন হইতে সূত্র ও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের বঙ্গানুবাদ স্বীয় মন্তব্য সহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে-সকল পাঠক সঙ্গীতরসজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের নিকট এই টীকাগুলি বেশ শিক্ষাপ্রদ হইবে। তাঁহারাও এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

জ

ভূমিকম্পের পূর্ব্বলক্ষণ—

ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কিছুদিন আগে টের পাওয়া সম্ভব হইলে, বহু দুর্ঘটনা ও তার আনুষঙ্গিক প্রাণহানি ও অর্থক্ষতি নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভূমিকম্পের সম্বন্ধে এতদিনকার নানা আনুমানিক ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়া ডাক্তার এ্যাণ্ড্রু সি লসন নামক ক্যালিফর্ণিয়ার এক পণ্ডিত সম্প্রতি এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ঝড়-বাত্যার সম্ভাবনা বহু আগে হইতেই যেমন নির্ভুলভাবে বলিয়া দেওয়া যায়, এই নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে তেমনি করিয়া ভূমিকম্পেরও সম্ভাবনা আঁচিয়া বলা সম্ভব হইবে। লোকে সাবধান হইয়া বিপদের স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিবে; অথবা এমন সব উপায় অবলম্বন করিয়া ভূমিকম্পের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিবে, যাহাতে বিপদের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়া যায়।

ডাক্তার লসনের মতে পৃথিবীর উপরকার মৃত্তিকা, প্রস্তর ও ধাতুর স্তরগুলি উত্তর মেরুর টানে ক্রমাগত একটু একটু করিয়া উত্তরাভিমুখী গতিতে সরিয়া চলিতেছে। এই সচল স্তরের গভীরতা কোথাও নীচের দিকে মাত্র কয়েক ফুট, কোথাও বা শতাধিক মাইল পর্য্যন্ত। এই গতি এত মন্থর যে আপাত-দৃষ্টিতে অনুভব করা যায় না। কিন্তু অহোরাত্র একদণ্ডের জন্য এই গতির বিরাম নাই। পাহাড়, পর্ব্বত, প্রান্তর, উপত্যকা এক অদৃশ্য শক্তির টানে অদৃশ্য গতিতে ক্রমাগত স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

এখন, যে-কারণে ধনুকের ছিলাকে টানিয়া হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে তাহা ছিট্‌কাইয়া আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে, গতি-বিজ্ঞানের সেই একই নিয়মে চলমান্ মৃত্তিকা- ও পাষাণ-স্তরগুলি উত্তরমেরুর টান হইতে কোনো কারণে মুক্তি পাইলেই পিছনের টানে ছিট্‌কাইয়া পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চায়। তখন সেই স্তর-পর্য্যায়ের মধ্যে যে দারুণ আলোড়ন ঘটে তাহারই সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা ভূমিকম্পে পাইয়া থাকি। ধনুকের ছিলা দুই কারণে পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিতে পারে;—এক যদি ধনুকধারী ছিলা হইতে তার হাত উঠাইয়া লয়, আর যদি ধনুকের বাঁক ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উত্তর মেরুর টানের কখনো বিরাম নাই। কাজে কাজেই, ধনুকের বাঁক ভাঙার মতো টানের মুখে এক সময় স্তরপর্য্যায়ের সংহতি হঠাৎ কোথাও ভাঙিয়া যায়;—তখনই ভূমিকম্প ঘটে।

স্তরপর্য্যায়ের এই উত্তরাভিমুখী গতির সঠিক বেগ ডাক্তার লসন হিসাব করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। গতির টান্‌তি (tension) কতখানি হইলে স্তরপর্য্যায়ের সংহতি ছুটিয়া যায় তাহারও নিরীখ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অতঃপর এই দুই বিষয়ের পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ভূমিকম্পের সম্ভাবনা অসম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। যতদিন আবার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা না হইতেছে ততদিন এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি না তাহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইতে পারিবে না।

—

হাতহীন গোলন্দাজ—

ওহায়োতে উইনেমিলার নামক একটি লোক আছে। তার ডান হাতটি কাঁধের কাছ পর্য্যন্ত একেবারেই নাই, বাঁহাতটিও কব্জির

বাড়ীটি আগে কালো খুঁটিটির কাছে ছিল, ভূমিকম্পের পাক টানে প্রায় আড়াই হাত সরিয়া গিয়াছে।
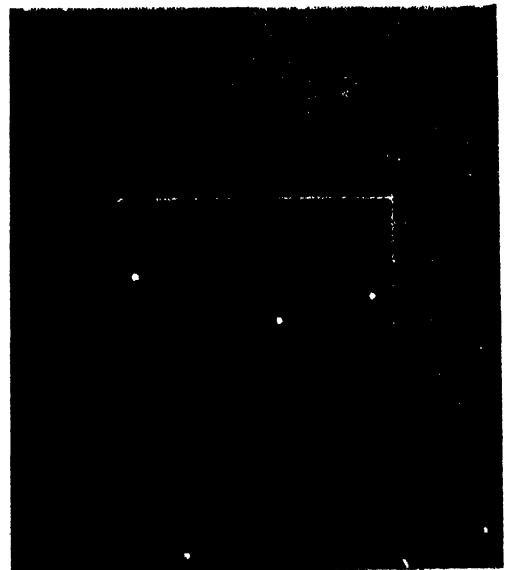
হাতহীন গোলন্দাজের গুলি ছোড়া।

কাছে কাটা। কাটা কব্জির কাছে একটি হুকে বন্দুকের নল আটকাইয়া ঘোড়ার সঙ্গে লাগানো ছোট একটি তার দাঁতে টানিয়া সে অবলীলায় বন্দুক ছুড়িতে পারে। বন্দুক খোলা, ভরা, সাফ্ করা প্রভৃতি কাজও সে নিজেই করিয়া থাকে।
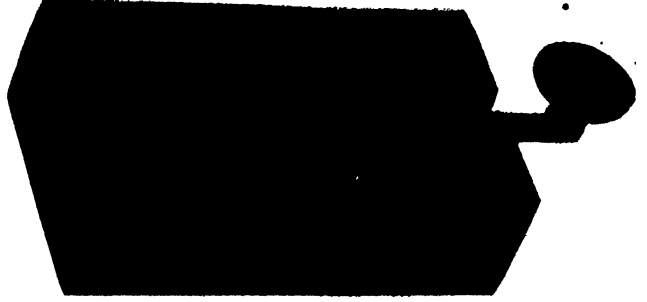
কলের করাত—

নিউ ইয়র্কের এক ব্যক্তি একটি কলের করাত নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাতে পনেরো ইঞ্চি পরিধির গাছ দুই মিনিটে কাটিতে পারা যায়।

কলের করাতে গাছ কাটা।

মাছের চামড়ার জুতা—

মাছের ও সাপের চামড়ার জুতা ইউরোপ আমেরিকায় পরম সমাদরের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। এই জুতার খরচ কম, টেকসই বেশী, দেখিতেও চমৎকার পরিপাটি। বাংলা মাছের দেশ, সাপও এ দেশে অপ্রচুর নহে, জুতা তৈরির এই নূতন উপকরণ কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িতে পারে।

কর্ণহীনের কর্ণ—

বধিরতা মোটামুটি দুই রকমের হইয়া থাকে। (১) মস্তিষ্ক হইতে কর্ণপটহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত শব্দবাহী স্নায়ু, বা মস্তিষ্কের শব্দ-গ্রাহী কোষগুলি বিকৃত হইয়া যে বধিরতা উৎপন্ন হয়। (২) স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক অবিকৃত থাকিয়া কর্ণপটহ বা কর্ণেন্দ্রিয়ের বাহিরের আর-কোন পীড়া হেতু যে বধিরতা। প্রথমোক্ত বধিরতার কোনও প্রতিবিধানের উপায় বিজ্ঞান আজও পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই; কৃত্রিম কর্ণপটহ বা ear-trumpet আর অনুশ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে শেষোক্ত প্রকারের বধিরদের শুনিবার উপায় কতক কতক হইয়াছে। মিষ্টার এস্ জি ব্রাউন নামক এক ইংরেজ Ossiphone (ওসি-ফোন) নামক একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনকর্ত্তা। শব্দবাহী স্নায়ুগুলি যাহাদের অবিকৃত অবস্থায় আছে এমনতর বধির লোকেরা এই যন্ত্রটির সাহায্যে অতি মৃদু শব্দও পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পাইবেন। ধ্বনি-তরঙ্গ এই যন্ত্রটির অন্তর্গত চৌম্বক vibrator-এ স্পন্দিত হইয়া

ওসিফোন্ যন্ত্র।

কর্ণপটহের পরিবর্ত্তে শরীরের যে-কোনও হাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় ও শব্দবাহী স্নায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হয়। যন্ত্রটিতে টেলিগ্রাফের প্রেরক যন্ত্রের মতো একটি হাতল লাগানো থাকে, তাহাতে-সংলগ্ন বোতামটিকে দাঁতে চাপিয়া আঙুলে টিপিয়া বা শরীরের যে-কোনও কঙ্কালবহুল জায়গায় লাগাইয়া রাখিলেই ধ্বনিস্পন্দনের সঙ্গে শব্দ অনুভূত হইতে থাকে। কাহারও সঙ্গে বসিয়া গল্পগুজব করিতে হইলে এই ওসিফোন ছাড়া টেলিফোন গ্রামোফোন প্রভৃতির মতো একটি sound box ব্যবহার করিতে হয়। অপর ব্যক্তি এই sound boxএর মধ্যে কথা বলে। প্রয়োজন হইলে অন্য একটি যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনির জোর বহুগুণ বাড়াইতেও পারা যায়।

স. চ.

ডানপিটে কাণ্ড—

ছবিগুলিতে যে-সব অতিসাহসিক কাজের নমুনা দেখানো হচ্ছে তা সত্যিই ভয়ানক, কারণ এই রকম বাহাদুরি নেবার জন্যে অনেকেই চেষ্টা করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বাহাদুরি জীবিত অবস্থায় তাঁরা পান না। বাহাদুরি দেখাবার সময়েই তাঁরা মারা যান। আমেরিকার আরভিংটন্ সহরের এ স্যাণ্ডার্স সাহেব এইসমস্ত ডানপিটে কাজে অগ্রণী। তাঁর কতকগুলি কাজের নমুনা দেব।

(১) একবার পাল্লা দেবার জন্যে তিনি নিউইয়র্কে একটা খুব উঁচু পতাকা-স্তম্ভের ডগাতে উঠে, তার ডগাতে পেট রেখে শুয়ে-ছিলেন। হাওয়া ভয়ানক জোর ছিল, তাতে তার একদিকে একটু বেশী হলেই পড়ে' মরে' যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী ছিল।

(২) নায়াগ্রা জলপ্রপাতে তিনি একবার একটা ৬০ ফুট খাড়া জায়গার উপর উঠেছিলেন। চারদিক বরফে ঢাকা, ধরবার মত বিশেষ কোন অবলম্বন ছিল না; কেবল স্থানে স্থানে খোঁচা খোঁচা হয়ে যে বরফ দু'-এক জায়গায় বেরিয়েছিল তারই সাহায্যে তিনি

নিশান-দাণ্ডার ডগায় ডানপিটের সর্দ্দার স্যাণ্ডার্স।

নায়াগ্রা প্রপাতের খাড়াইয়ের গায় স্তাওাস্‌।

এই অসম্ভব কাজটি করেন। একবার একটু পা এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু। এই কাজ করার জন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

(৩) একবার বায়স্কোপের চলন্ত ছবি তোল্‌বার জন্যে তাঁকে

ডিনামাইটের মুখে স্তাওাস্‌।

একটা জাহাজের মাস্তলে চড়িয়ে মাস্তলটাকে ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ৫০ ফিট দূরে গিয়ে পড়েন। পুলিশের ডাকাত-ধরা দেখাবার জন্যে এই ছবি তোলা হয়।

(৪) একবার একটা পুল রঙ করতে করতে তিনি নীচে, নদীর ওপর পড়ে যান। ওপরের জল জমে বরফ হয়ে ছিল। তিনি বরফ ভেঙে একেবারে জলে গিয়ে পড়েন। বরফ ভেঙে, সাঁতার দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, তিনি অনেক কষ্টে ডাঙ্গায় ওঠেন।

হেমন্ত

—

জ্যান্ত কুমীর লইবার কৌশল—

আমাদের দেশে কুমীর ধরা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। পাড়াগাঁয়ে সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিরা মাঝে মাঝে পুকুরের ধার হইতে বা এঁদো গর্ত্ত হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর প্রায়ই ধরে। কিন্তু লোকালয়ে যখন আনে তখন প্রায়ই তাহাদের মারিয়া আনে, জ্যান্ত আনিতে কদাচিৎ দেখা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার একজন কুমীর-শিকারী একটি জ্যান্ত কুমীর বেশ কৌশল করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কুমীরটার গলার কাছে একটা খুব জোর ফাঁস লাগায় ও নাকের কিছু ওপরে একটা ফাঁস লাগায়। কিন্তু শিকার করিতে বা আক্রমণ করিতে কেবল মুখই কুমীরকে সাহায্য করে না, তাহার ল্যাজ তাহার

জ্যান্ত কুমীর লইবার কৌশল।

সহায়। ল্যাজের এক এক ঝাপ্‌টায় এক একটা জোয়ান মানুষকে তাহারা বেশ কাল করিতে পারে। সেইজন্য ল্যাজ ঘুরাইয়া তাহার মুখের সহিত বৃত্তাকার করিয়া বাঁধিলে আর কুমীর বাবাজীর কোন ক্ষমতা থাকে না। আমেরিকার শিকারীটি ঠিক এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে কুমীর জ্যান্তও থাকে জব্দও হয়। ল্যাজ এইরকম ঘুরাইয়া লইলে ল্যাজের শিরা অবশ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর আছে, যে এ উপায় সব সময় সফল হয় কি না সন্দেহ।

আকাশ-পথের আলো—

কিছুদিন পূর্ব্বে নিউইয়র্কের কাছে সমুদ্রের উপর জাহাজ হইতে আকাশে খুব জোরালো সার্চ্ লাইট হইতে আলো ফেলা হইয়াছিল। অনেকে মেঘের গায়ে এই তীব্র আলোককে মেরুদ্যুতি (Aurora Borealis) মনে করেন। অনেকে আবার ইহাকে তড়িতালোক স্থির করেন। যে সার্চ্ লাইট হইতে এই আলো ফেলা হয় তাহার জোর ১,৪০০,০০০০০০ মোমবাতির সমান (candle-power)। ইহা এলমার স্পেরির আবিষ্কার। এই আলো সোজা আকাশে উঠিয়া যায়। উপরে ১০ মাইল পর্য্যন্ত ইহার গতির পরিমাণ। বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখন
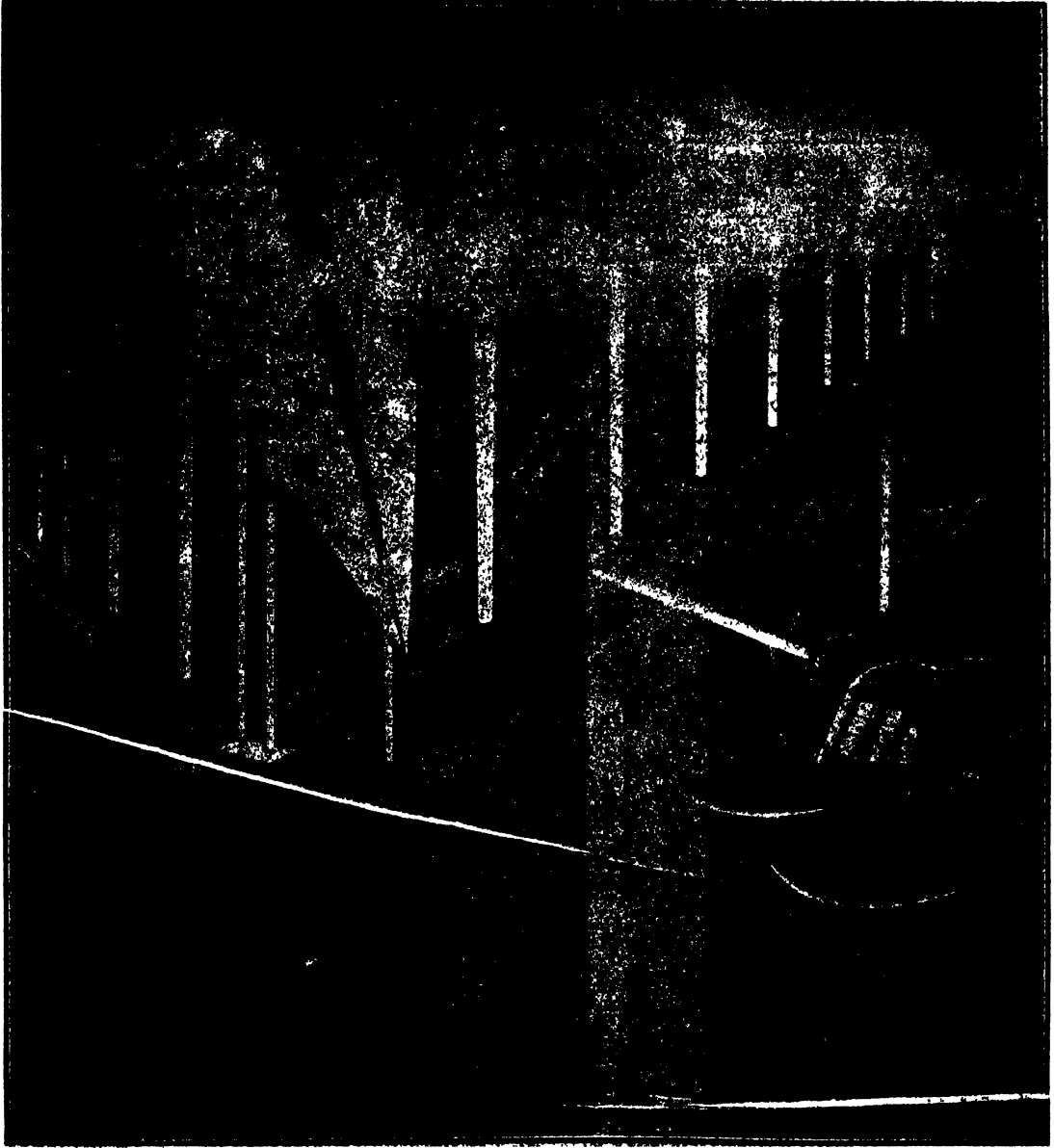
দশ-মাইল-চলা আকাশ-আলোর মেঘের গায়ে চায়ের বিজ্ঞাপন।

এই আলোর সাহায্যে আকাশে বিজ্ঞাপন দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আলোর চাকনি-কাচের উপর বিজ্ঞাপন লিখিলেই তাহা মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হইতে পারে। উড়ো জাহাজের এয়ারোড্রোমের উপর নামিবার সময় এই আলো যথেষ্ট সাহায্য করিবে। চার-চাকাওয়ালা গাড়ীর উপর এই আলো স্থাপিত থাকে। ছবিতে আলোর পরিচয় আরো ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে।

হেমন্ত

পঞ্চমুখী পেঁপে—

হায়দ্রাবাদের (দক্ষিণাপথ) এক শেঠের বাগানে একটি পেঁপে

পঞ্চমুখী পেঁপে, উপর হইতে।

পঞ্চমুখী পেঁপে, নীচে হইতে।

গাছে যত পেঁপে ধরিয়াছে তার প্রত্যেকটি পাঁচ আঙুলের থাবার মতো দেখিতে। দেখিলে মনে হয় এক বোঁটায় পাঁচটি ফল এক সঙ্গে জুড়িয়া গিয়া ফলিয়াছে। আমরা ইহাকে পঞ্চমুখী পেঁপে নাম দিয়াছি।

শ্রীঅমৃতলাল শীল (হায়দ্রাবাদ)

জীবন্ত বায়ুমান যন্ত্র—

একটি ৮ আউন্স শিশি পৌণে ১ পাইট জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে একটি জীবন্ত জোঁক ছাড়িয়া দিয়া শিশিটির মুখ মসলিন বা সিল্কের কাপড় দ্বারা আবৃত করিলে একটি সুন্দর জীবন্ত বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) তৈয়ারী হইবে।

আবহাওয়া নির্ম্মল হইলে শিশির মধ্যস্থ জোঁকটি শিশির নীচে গোলাকার ধারণ করিয়া পড়িয়া থাকিবে। বৃষ্টি আসিবার পূর্ব্বে জোঁকটা সোজাসুজি উপর দিকে উঠিয়া গিয়া স্থির হইয়া সমভাবে ভাসিতে থাকিবে ও ঝাত্যা আসিবার পূর্ব্বে উহা দ্রুত নড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিবে।

অলক

এক মাইল লম্বা দরখাস্ত—

লর্ড গ্রিফোর্ড, লর্ড সভায় একখানা দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। দরখাস্তখানির দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল! উহাতে নাম স্বাক্ষর আছে—৭৫,১০৫ জনের!

বিমান-বীর—

ল্যারি বর্জ্জেস্ সম্প্রতি দুইজন যাত্রীকে লইয়া ২১,৯০৯ ফিট উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডল হইতে হাওয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। এত উর্দ্ধে এ যাবৎ কেহই উঠিতে পারেন নাই।

নগেন্দ্র ভট্টশালী

বোঝার ভারে

শ্রীচারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত

'অমৃতবাজার-পত্রিকা' হইতে গৃহীত

[নিরন্ন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বস্ত্রহীন ভারতবাসীর ঘাড়ে সামরিক বিলাসিতার বিপুল ব্যয়ের বোঝা চাপিয়াছে।]

বিহারের এক প্রাচীন ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী পরিবার

বরিশাল জেলায় খালিশকোটা গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে মুখোপাধ্যায়োপাধিক রমানাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জন্ম হয়। দিল্লীর সিংহাসনে তখন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

রমানাথ বিদ্যাবাগীশের গৃহে দোলদুর্গোৎসব হইতে বার মাসে তের পার্ব্বণ চলিতেছে, ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অভাব নাই, গ্রামে অপ্রতিহত প্রভাব; কিন্তু তাঁহার অন্তরে সুখ নাই, পুত্র না হওয়ায় বিপত্নীক রমানাথ মনস্তাপে তাঁহার দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। ভাবিয়াছিলেন একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া সুখী হইবেন, কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কন্যাটি অল্পদিনেই বিধবা হইয়া পিতার মর্ম্ম-বেদনা বৃদ্ধি করিলেন। রমানাথ সমস্ত বিষয় ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়া বিধবা কন্যাকে লইয়া কাশীবাসী হইলেন। রেল তখন কোথায়? তাঁহারা নৌকা-যোগে রওনা হইলেন। কথিত আছে, কাশীর নিকটে গঙ্গা-বক্ষে এক রাত্রিতে রমানাথের উপর স্বপ্নাদেশ হইল—"অপর নৌকায় এক 'মাতাজীর' ঝুলিতে 'শ্রীধর শালগ্রাম' আছে, তাহা লইয়া গিয়া যেন কাশীধামে প্রতিষ্ঠা করা হয়।" বলা বাহুল্য স্বপ্নাদেশ তিনি পালন করিয়া ছিলেন। বিধবা কন্যা বলিলেন—পিতা যখন শালগ্রাম পাইয়াছেন, তখন বংশ নিশ্চয়ই থাকিবে। কন্যার ইচ্ছাক্রমে তখন বৃদ্ধ রমানাথ ষাট বৎসরের অধিক বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এবং তাহার ফলে কাশীধামেই কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌমের জন্ম হইল।

কৃষ্ণানন্দ অতি অল্প বয়সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়া পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন। কাশীনরেশ তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় সভাপণ্ডিতপদে বরণ করেন এবং তদবধি এই বংশের বিষয় সম্পত্তি পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত হইতে থাকে। অচিরেই তিনি কাশীর বিদ্বন্মণ্ডলী হইতে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক "সার্ব্বভৌম" উপাধি প্রাপ্ত হন। কাশীর মহারাজা চেৎসিংহ কাশী অঞ্চলে তাঁহাকে প্রভূত ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন। নিঃসন্তান কাশী-নরেশ পুত্র-কামনা করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই সেই যজ্ঞকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। মহারাজের এক পুত্র হয়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কাশীনরেশ পূর্ব্বোক্ত ভূসম্পত্তি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) আরম্ভ হয় সেই সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় বেহার অঞ্চলে ইতিহাস-বিশ্রুত রাজগৃহের সন্নিকটে ২৩০০ বিঘা—বাঙ্গালা দেশের ৪০০০ বিঘা—মঙ্গলময় জমি ২২৯ রাজকরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জমিদারী তিনি উক্ত স্থায়ী ব্যবস্থাতেই পাইয়াছিলেন। পরে ইহা দুই লক্ষের অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে দাঁড়ায়। এই জমিদারীর নাম "রৈতর"। ইহা আজিও বর্ত্তমান। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী শিবরাম পিতার বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ তিনি জ্ঞান-চর্চ্চা ও যোগ সাধনায় এতদূর মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকিত না। তিনি তন্ত্রের বিধানে শবসাধনাদি করিতেন এবং কথিত আছে যে বাক্‌সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বিষয়ে বীতরাগ শিবরামের ঔদাসীন্যের সুযোগ পাইয়া পার্শ্বস্থ জমিদার-মণ্ডলী তাঁহার কাশীর সমস্ত সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে করায়ত্ত করিয়া লয়েন। শেষে বিহার অঞ্চলের রৈতর নামক সম্পত্তিও এইরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িলে, তাঁহার পুত্র তারাশঙ্কর তাহা উদ্ধার করেন। তারাশঙ্কর হইতেই এই বংশের সমৃদ্ধি হয়। তাঁহার বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতা শিবরাম গঙ্গালাভ করেন। কিশোর তারাশঙ্কর এই বয়সেই বিষয়-বুদ্ধিতে পরিপক্ব হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তখন হইতে পৈতৃক বিষয় রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একাকীই বিহার অঞ্চলে যাত্রা করেন। তথায় গিয়া রৈতর জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা উদ্ধারের উপায় দেখিতে থাকেন। যে-সকল জমিদার তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিয়া-

ছিলেন তাঁহাদের সহিত তাঁহাকে বিস্তর ফৌজদারী মামলা এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে হয়। কত বিপদ কত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং কত বার যে শত্রুদিগের চক্রান্তে জীবন সঙ্কটময় করিয়া অবশেষে জগদীশ্বরের কৃপায় এবং স্বীয় উদ্যম ও পরাক্রম প্রভাবে রৈতর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তৎকালীন অরাজক অবস্থার কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়ী ছিলেন তদ্রূপ কষ্ট-সহিষ্ণু এবং সাহসী ছিলেন। একাদিক্রমে দুই তিন দিন অশ্বারোহণে থাকিলেও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। তিনি কাশীধাম হইতে অশ্বারোহণে ৫।৬ দিনে রৈতরে আসিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের দিনে নানা স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তিনিও মহা বিপন্ন হইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় শক্তি ও কার্য্যতৎপরতার প্রভাবে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁহার গৃহে দোলদুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। তাঁহার ভদ্রাসন আত্মীয়-কুটুম্বগণে পরিবৃত থাকিত। আতিথেয়তা এই বংশের সাধারণ গুণ হইলেও তারাশঙ্করে তাহা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল। এই ধীর নির্ভীক কর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয় অদ্ভুতকর্ম্মা তারাশঙ্কর মৃত্যুকালে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। কুহিলার এবং নাদনের বাঙ্গালী জমিদারদ্বয় তাঁহাকে জায়গীরাদি দিয়া সম্মানিত করেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গ গয়া বাঁকিপুর এবং কাশীতে পর্য্যায়ক্রমে বাস করিতেন।

তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাশঙ্কর স্বীয় বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি ও চরিত্র প্রভাবে বংশের নাম ও মর্য্যাদার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ-সরকারেও বেশ প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন। এই বংশে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন এবং গয়া মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং গয়ার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। এই-সকল কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পাইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত করেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহাকে সম্মানকর প্রশংসাপত্র (Certificates of Honour) দিয়া সম্মানিত করেন। তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন বটে, কিন্তু জনহিতকর কার্য্যে সাধারণের সহিত যোগ দান করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বহু দরিদ্র ভদ্রসন্তানের অন্নদাতা ছিলেন। কত অভাবগ্রস্ত বিপন্ন যে তাঁহার অর্থসাহায্য পাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। গয়া যাত্রী-হাঁসপাতালে (Gaya Pilgrim Hospital) তিনি স্বীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ দশ সহস্র টাকা দান করেন; হাঁসপাতালের সম্মুখে সংস্কৃতে লেখা তাঁহার স্মারক-লিপি আজিও বিদ্যমান আছে। তিনি সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ততোধিক ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। এই উদার-হৃদয় পরহিতব্রত কর্ম্মবীর জীবনে যশঃ সঞ্চার করিয়া এবং বহুসংখ্যক নরনারীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গয়াধামে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় আপনাদিগের মধ্যে এক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থানুসারে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অন্য ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

দুর্গাশঙ্করের কনিষ্ঠ সহোদর ভিখারীশঙ্কর শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি এণ্ট্রেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শিল্প ও কলাবিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। সুকুমার শিল্প আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করেন। বহু অর্থব্যয়, বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর একনিষ্ঠার ফলস্বরূপ তিনি চিত্রাঙ্কণ-সীবন, লৌহকার ও সূত্রধরের সূক্ষ্ম ও শ্রমশিল্প এবং ইন্দ্রজাল প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। গোজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, গয়াতে তিনি গো-রক্ষণী সভা স্থাপন করেন, এই সভা অদ্যাবধি বহু গো সেবা করিয়া থাকে। লোক-সেবার জন্য তিনি স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া তাম্রা ঔষধালয় নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই ঔষধালয় হইতে আজিও দরিদ্র রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

ভিখারীশঙ্কর সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান ভক্তিমান ছিলেন, কারণ তিনি সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্মই অবগত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ অনুশীলন করিতেন, অন্যান্য ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য সেইরূপ পরিশ্রম করিতেন। তিনি পাদ্রির নিকট বাইবেল, মৌলভির নিকট কোরান এবং ব্রাহ্ম আচার্য্যের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের সারতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভিখারীশঙ্কর সাধুসন্ন্যাসীকে যেমন, মুসলমান ফকিরকেও তেমনি ভক্তি করিতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বহু অর্থ নষ্ট করিবার পর তিনি তাহাতে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তিনি ৬৮ বৎসর বয়সে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কাশীর বিখ্যাত "তারা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্" নামক যন্ত্রালয় এই ভিখারীশঙ্কর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ইঁহার অন্য সহোদর এবং তারাশঙ্করের সকল পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধীশক্তিসম্পন্ন গদাধরশঙ্করের জীবনও বৈচিত্র্যময়। তাঁহার মধুর স্বভাব ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনিও অগ্রজের ন্যায় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ময়দা ও তেলের কারখানা করিয়া তিনি প্রথমে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রাপ্য টাকা বাজার হইতে উঠাইয়া লইতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। এবং তাহার ফলে কারবার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। টিকারীর মহারাজা তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহাকে তাঁহার বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকাংশের সার্কল্ অফিসার্ পদে নিযুক্ত করেন। পরে টিকারীরাজের অনেকগুলি গ্রাম পত্তনি লইয়া তিনি লাভবান হন। ইঁহার অল্পদিন পরেই তাঁহার দেহান্ত হয়। গদাধরশঙ্কর গয়া বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি সরকারী বেসরকারী সকলের নিকটই সমান ছিল। তাঁহার সরস আলাপে ও মধুর আপ্যায়নে সকলেই আকৃষ্ট হইতেন। ভ্রমণের প্রবৃত্তি তাঁহার প্রবল ছিল। তিনি ভারতের প্রধান প্রধান দর্শনীয় স্থান দর্শন জন্য ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।

খৃঃ ১৮০০ অব্দে গয়াতে "শঙ্করভিলা" নামে সুন্দর আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় গদাধরশঙ্কর স্থায়ী ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন। সাহিত্য, তৌর্য্যত্রিক্ এবং নাট্যকলায় ও অভিনয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। "শঙ্কর ভিলা" এই-সকল বিষয় আলোচনার কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। কাশীধামে, বাঁকিপুরে এবং গয়াতে তাঁহার যত্নে অনেকগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্য বিলক্ষণ ছিল। সুতরাং তিনি যখন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেন, তখন সকলেরই অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতা হইতে অভিনয়দক্ষ শিক্ষিত বালকদিগকে আনাইয়া তাহাদিগকে গয়াতে স্থায়ী ভাবে বাস করাইবার জন্য চাকরি, কণ্ট্রাক্‌টরি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া এই নাট্যামোদীর "শঙ্কর-ভিলা"য় বাস করিতেন এবং তাঁহার আত্মার তৃপ্তির জন্যই যেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কোন কোন শ্রেষ্ঠ নাটক এই ভবনেই রচনা করিয়াছেন।

তারাশঙ্করের চতুর্থ পুত্র বিষ্ণুশঙ্কর এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শরৎশঙ্কর এক্ষণে বর্ত্তমান। বিষ্ণুশঙ্কর ইতিপূর্ব্বে জমিদারীর সমস্ত কাজ কর্ম্ম স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি প্রাচীন মুসলমান রাজধানী এক্ষণে পাটনা জেলার সবডিবিজন বিহারের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। অধুনা তিনি গয়াতেই অবস্থিতি করিতেছেন। এখানে তিনি কয়েক বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনার হইয়া গয়া সহরের উন্নতিকল্পে বহু আয়াস স্বীকার করেন। বিষ্ণুশঙ্কর সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও ধর্ম্মচর্চ্চায় বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। গয়া গোরক্ষিণীর মহাত্মা পরমহংস স্বামী শিবসাগর পুরীর নিকট তিনি উপদেশ গ্রহণ করেন। ধনিওয়া পাহাড়ির ৺ঠাকুরদাস বাবাও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কনিষ্ঠ শরৎশঙ্কর গীতবাদ্যানুরাগী। প্রায় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। বাল্যাবধি পশু পক্ষী পালনে তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকায় তিনি লেখাপড়ায় উন্নতি করিতে পারেন নাই। তিনি বিহার-সন্নিহিত বৈতর জমিদারীতেই বাস করেন।

ভিখারীশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র উমাশঙ্কর পিতার আদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন পতৃপ্রতিষ্ঠিত

দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহারই পরিচালনাধীন। উমাশঙ্কর সদানন্দ নির্ব্বিরোধী উদারমতি এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। তিনি স্বকীয় কোন চেষ্টা ব্যতিরেকে প্রতিবেশী ও স্থানীয় ভদ্র-মণ্ডলীর শুভ ইচ্ছায় মিউনিসিপাল কমিশনর এবং লজিং-হাউস্ বোর্ড ও হাসপাতাল কমিটির সদস্য হন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি কলিকাতা নিবাসী অধুনা ইংলণ্ড প্রবাসী ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস, মহাশয়ের উৎসাহে প্রাচীন শিল্প-কলার আলোচনায় বিশেষ যত্নবান্। তাঁহারই আগ্রহে মাগধী ভাষার চর্চ্চায় তিনি মনোনিবেশ করিয়াছেন। উমাশঙ্কর মগহি কৃহাবত্ সংগ্রহ নামক যে গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাহা য়ুরোপের বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছে। ডাক-টিকিট সংগ্রহ করা তাঁহার একটি বাতিক; Philatelist (ডাকটিকিট সংগ্রাহক) বলিয়া তাঁহার নাম আছে। তিনি যে-সকল টিকিট সংগ্রহ করিয়াছেন, জনৈক বৈদেশিক "ফাইলাটেলিষ্ট" তাহার জন্ম চারি সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু উমাশঙ্কর তাঁহার বহুযত্ন-সঞ্চিত টিকিটগুলি হস্তচ্যুত করেন নাই। তিনি কিছুদিন "Philatelic Advertiser" নামক পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন।

তাঁহার মধ্যম সহোদর রমাশঙ্কর বিষয়-কর্ম্মের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা হেতু বিদ্যাভ্যাসে অগ্রজ বা কনিষ্ঠের ন্যায় মনোনিবেশ করেন নাই। গীতবাদ্যাদিতে তাঁহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। কিশোর বয়স হইতেই তিনি পিতা ও পিতৃব্যের জমিদারীর যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন এবং একজন সুদক্ষ জমিদার বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু রাধাকান্ত লালের জমিদারী যত-দিন তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল, শুনা যায় তিনি তাহাতে চুরি তছরূপ প্রভৃতি নিবারণ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালিত করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অর্থাৎ ভিখারীশঙ্করের তৃতীয় পুত্র শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তানুরাগী এবং উদার-প্রকৃতি। তিনি বি-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন হঠাৎ কোন গুরুতর শোক পাইয়া কলেজ ত্যাগ করেন। পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিসেমহাশয়ের স্কুলে কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু তাঁহার গুরুদেব পরমহংস শিবলাগর পুরীর উপদেশে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি অতি অল্প মূলধনে "B. S. B. Sons" নামে বাণিজ্যালয় গয়া কাছারী-রোডে স্থাপন করেন এবং অল্প কালের চেষ্টায় কারবারের উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তিন-চারি বৎসর তাহা সযত্নে পরিচালন করিবার পর ব্যবসায় কার্য্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। দেশভ্রমণে তিনি তাঁহার পিতৃব্য গদাধরশঙ্করের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি পদব্রজে এবং রেল যোগে উত্তর ও মধ্যভারতের প্রায় সকল দর্শনীয় স্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কাশীর প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের বরণীয় ৺কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার দাদাশ্বশুর ছিলেন এবং তৎপুত্র কাশীনরেশের তহশীলদার ও সহকারী মন্ত্রী ৺জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মামাশ্বশুর ছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ জ্ঞানানন্দ-বাবু তাঁহাকে পুত্র-স্থানীয় করিয়া আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার সাধু-সঙ্গের অভাব ছিল না। শুনা যায় জ্ঞানানন্দ-বাবুর আদর্শ এবং নিত্য সাধুসঙ্গই শ্যামাশঙ্করের ধর্ম্মপ্রবণতা এবং গার্হস্থ্য সন্ন্যাসের মূল। শ্যামাশঙ্কর গয়াধামে শঙ্কর-লাইব্রেরী নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং কলিকাতা কৃষ্ণনগর পুরাতন-গয়া জব্বলপুর ও কাশীতে শাখা কারবার স্থাপন করিয়াছেন। "B. S. B. Sons" এর কারবার এক্ষণে তাঁহার পিতৃব্য গদাধরশঙ্করের এক মাত্র পুত্র নির্ব্বিরোধী সৎস্বভাব এবং পিতৃগুণের অধিকারী আদ্যাশঙ্করের সুপরিচালনায় অটুট রহিয়াছে। এই "শঙ্কর"-পরিবারের এবং তারাশঙ্করের দৌহিত্র-গোষ্ঠীর অনেকেই এক্ষণে গয়াতেই স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

মহিলা-মজলিস

চর্‌কা ও বস্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্ত্তব্য *

মাতৃপূজার বিপুল যজ্ঞের হোতা কর্ম্মবীর মহাত্মা গান্ধী কারাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে পত্রখানি আমাকে লিখিয়াছিলেন হয়ত অনেকে তাহা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় জীবনের এই মহাসন্ধিস্থলে দিগ্‌দিগন্ত হইতে জাগরণের সাড়া ভারতের নব ইতিহাস নিয়তই রচনা করিতেছে। বাংলা দেশের গৃহ-লক্ষ্মীগণের জাগরণ এই তরঙ্গকে নবধারা প্রদান করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তাই তিনি আজ আমাদের মাতৃজাতির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছেন। যে বিখ্যাত মস্‌লীন একদিন সূক্ষ্মশিল্পের নিদর্শন হিসাবে জগতে এক আশ্চর্য্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা এই বাংলা দেশেরই মায়েদের হাতে-কাটা সুতোয় তৈরি। তাই আজ আমাদের নারীজাতির দিকে সমস্ত ভারতের বিশেষ দৃষ্টি।

চর্‌কা প্রচলনের প্রথম চেষ্টায় অন্যান্য দশজনের মত আমিও সন্দিহান হইয়া বিদ্রূপ করিয়াছি। এই রেল পুল কলকব্জার ও কারখানার দিনে হাতে-ঘোরা কাঠের চর্‌কার প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বাঁশের চর্‌কার পশ্চাতে যে প্রাণশক্তির আবেগময় স্পন্দন রহিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নয়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাতীয় চরিত্রে যে দৃঢ়তা আনয়ন করিতেছে তাহাই পরম সম্পদ। আজ আমি আপনাদের নিকট আমার স্বগ্রামবাসীদের উপহার দেওয়া খদ্দর পরিধান করিয়া আসিয়াছি। তাই আজ আমার হৃদয় দেশ-মাতৃকার স্বহস্তের স্নেহের দান লাভ করিয়া কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে। আজ উচ্ছ্বসিত হৃদয় কাজ কবির ভাষায় আপনিই বলিয়া উঠিতেছে—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"। আজ আমার পরিধানের কাপড়, গায়ের জামা ও চাদর, যে শুচিতা আনিয়া দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। এই সভাস্থানে আসিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ডাকে আসামবাসী জনৈক ব্যক্তি এই যে সুতো আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা ৮০ নম্বরের সুতা অপেক্ষা সূক্ষ্মতায় হীন নহে।

আজ সুজলা সুফলা বাংলা দেশের চারিদিকে যে অন্ন-বস্ত্রের মহা হাহাকার উঠিয়াছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে দরিদ্রতার যে রুদ্র সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া আজ দেশবাসী আর্ত্ত, সেই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে দেশবাসীর ধনাগমের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। যে দেশে জন-প্রতি গড়ে দৈনিক এক আনা আয়, সে দেশে যে-কোন প্রকারেরই ধনবর্দ্ধনের পথ মুক্তির পথেরই মতো অসঙ্কোচে অবলম্বনীয়। সমগ্র ভারতের জনপ্রতি গড়ে দৈনিক আয় এক আনা। ইহাতে বর্দ্ধমানাধিপ ও দ্বারবঙ্গের মহারাজার ন্যায় বিত্তশালী ব্যক্তিগণের আয়ও যোগ করা হইয়াছে। অতএব এই হতভাগ্য দেশ যে কি প্রকার নির্ধন তাহা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং চর্‌কা কাটিয়া যদি কেহ দৈনিক আয় এক আনাও করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের বিত্ত দ্বিগুণিত হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চর্‌কার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি ভিত্তিহীন।

চাই প্রাণ। অসাড় নিস্পন্দ হৃদয় সরস করিতে মহাপ্রাণতা চাই; বাংলা দেশে বরিশালের মাটি মহাপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণায় আজ উর্ব্বর। তাই বরিশাল আজ খদ্দর-প্রচলনে অগ্রণী। উষর পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম খদ্দর বয়ন করিয়া আজ সরস হইয়াছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাহাড়িয়া ও ভদ্রলোকদের মধ্যে কাপাস চাষ ও খদ্দর বুনন এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে। তাই সেখানে সহজেই কৃতকার্য্যতা আসিয়াছে। কিন্তু বরিশালের নূতন অধ্যবসায় আরো প্রশংসনীয়। ইতিমধ্যে আটলক্ষ

---

* ভবানীপুর পদ্মপুকুর চড়ক মেলার শিল্পপ্রদর্শনীতে মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস্‌সি কর্ত্তৃক লিখিত।

চর্‌কা ও একশত তাঁত চলিতেছে। সপ্তাহে পাঁচ মণ এবং মাসে কুড়ি মণ সুতা কাটা হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা এই-সমস্ত করিতেছেন। মা-বোন্‌দের সাহায্য লইয়া একজন যুবক অনায়াসে চর্‌কা ও তাঁতে দৈনিক পাঁচসিকা রোজ্‌কার করিতে পারেন। আজকাল বি-এ, এম্‌-এ, পাস করিয়া চাকরী লাভের জন্য যে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তাহাতে স্বাধীনভাবে ঘরে থাইয়া, দৈনিক পাঁচসিকা রোজ্‌কার নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি দিবানিদ্রা, পরচর্চ্চা ইত্যাদি একটু ছাড়িয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে এই আয় ঘরে ঘরে হইতে পারে এবং দেশের শোচনীয় বস্ত্রসমস্যার সমাধানও যুগপৎ হয়।

বাংলাদেশে প্রতিবৎসর অন্যূন ২০।২৫ কোটী টাকার বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হয়। যিনি একজোড়া বস্ত্র ক্রয় করিলেন তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি তাহাতে বিদেশে ৩।৪।৫ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন। এই প্রকারে বিত্তহীন দরিদ্র দেশ হইতে বস্ত্রের জন্য আমরা সম্বৎসর ২২৷৹ কোটী টাকা যেন বিদেশে হেলায় নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছি। সহরে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মানুষের সরল জীবনগতি ক্রমশই জটিল হইয়া পড়িতেছে। অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত সুবিধা বশতঃ বিলাসিতাও সহরে অধিক। সহরে স্বামী ও পুত্রগণ বেশী অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং সহরের রমণীগণের আলস্য ও বিলাসিতা বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আমি গ্রামে গ্রামে মা-লক্ষ্মীগণের নিকট চর্‌কার বার্ত্তা প্রচারে বাহির হইয়াছিলাম। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি মোটা কাপড় পরিয়া অগ্রসর হইয়া স্বামী ও পুত্রগণকে লজ্জা দেন, তবে এ স্রোত ফিরাইতে বেগ পাইতে হইবে না। কলিকাতা বাংলা দেশে রুচি ও শিক্ষার আদর্শস্থান। কলিকাতাবাসিনীগণের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কেননা তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত ফ্যাশ্যন্ সুদূর পল্লীপ্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে।

মানুষের স্বভাবই গতানুগতিকতা। তাই ফ্যাশনের প্রতাপ এত বেশী। সেদিন মফঃস্বলে এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে চায়ের সঙ্গে হাণ্টলী পামারের বিস্কুট দেখিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিলাম চৌদ্দ-ছটাকী এক কৌটার তিন টাকার উপর মূল্য লাগিয়াছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি, এই বিস্কুট আমাদের মুড়ি অপেক্ষা খাদ্যগুণে কোন রকমে শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু কি আমাদের সংস্কার এবং বিকৃত রুচি। মুড়ি এবং নোলেন গুড় দিয়া কে আজ অতিথি সৎকার করিতে সাহসী হইবেন? বাহিরের চাকচিক্যের মোহে, আমরা ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন হইলেও বাহিরে কোঁচার পত্তন করিতেছি। সকলেরই স্বামী এমন অনেক কিছু রোজ্‌গার করেন না। সীমন্তিনীগণ "মিহির উপর থাপী" না হইলে বস্ত্র পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে বিলাতী সুতায় প্রস্তুত সূক্ষ্ম দেশী ধুতি স্বদেশীবস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

বঙ্গললনাগণ কি ওজনে ভারী বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কাররাশি ফেলিয়া দেন? সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের ভার বহন করা যদি ক্লেশকর না হয়, তবে মোটা খদ্দর বসন পরিধানে কেন কষ্ট হইবে? এই-সমস্তেরই মূলে দেখি ফ্যাশান্। তাই বলিতেছি, আপনারা পুরবাসিনীগণ, আপনারা পথপ্রদর্শন করুন। এ দায়িত্বভার আপনাদের। উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্নগণই সমাজের সর্ব্ববিধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধারম্ভে ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বাগ্রে কেম্ব্রিজ অক্স্‌ফোর্ডের বনিয়াদী আভিজাত্যাভিমানী ঘরের পুত্রগণই রণক্ষেত্রে জীবন দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রমজীবী কিম্বা অন্য সম্প্রদায় হইতে এ আন্দোলন উত্থিত হয় নাই। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর আন্দোলন সমাজের উচ্চস্তর হইতেই নিম্নস্তরে আসিয়াছে। তাই কলিকাতাবাসী সমবেত মহিলাবৃন্দের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া এ দিকে একটু মনোযোগ প্রদান করেন। কেননা তাঁদের স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্দ্ধশিক্ষিতা পল্লীগ্রামের ভগিনীগণ তাঁহাদিগকেই অনুকরণ করিবেন।

আজ আমি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি যখন প্রতি পল্লীতে তাঁত চলিবে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের সন্তানগণ বৃথা আত্মমর্য্যাদার মোহে জীবনে শ্রেয়কে বরণ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। গৃহের আনন্দ বালক-বালিকা-

গণই বৰ্দ্ধন করে। ছোট ছোট বালিকাগণের নিপুণ নিষ্ঠায় যখন চরকার সূতা প্রতি গৃহে তৈরি হইতে থাকিবে তখন সে সৌন্দর্য্য কি অনুপমই না হইবে! গৃহিণীকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়ত থাকিতে হয়; কিন্তু কন্যাগণ প্রত্যেকে ঘণ্টায় ১।।০ তোলা সূতা কাটিতে পারেন। প্রতি দিনে মাত্র এক ঘণ্টার উৎপন্ন ১।।০ তোলা করিয়া ধরিলে বৎসরে ৪৫০ তোলা অর্থাৎ ৫।।০ সের সূতা হওয়া বিচিত্র নয়। ১০।২ নং সূতার ১২ ছটাকে একখানি বস্ত্র হইতে পারে। তাহা হইলে, বৎসরে ১০।১২ খানি বস্ত্র তৈয়ার করা কষ্টসাধ্য নহে। বস্ত্র বুননের মজুরি অতি নামমাত্রই দিতে হয়। জোড়া-প্রতি পাঁচসিকা। কাজেই প্রতি সংসারে দৈনিক ১।।০ তোলা সূতা প্রস্তুত হইলে বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিতে গৃহের উপার্জ্জকদিগকে এত বেগ পাইতে হইবে না। আপাততঃ তূলা খরিদ করিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এমন কে আছেন তিনি বলিতে পারেন তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে ১০।১৫টি রাম-কাপাসের বা গাছ-কাপাসের গাছ করিবার জমির অকুলান? এই ভবানীপুর অঞ্চলেও অনেকেরই বাড়ীতে ১০।১২টি কাপাসের গাছের উপযুক্ত জমির অভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে মনোযোগের অভাব যথেষ্টই। আর কতদিন উদাসীন হইয়া থাকিব? দেশে যে ভাত-কাপড়ে শনি পড়িয়াছে তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না? আজ দেশের জোলা তাঁতি লুপ্তব্যবসায় হইয়া ধ্বংসোন্মুখ।

এই মৃত বাংলায় প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। আজ দেশের এই সঙ্কটে আমি মাতৃজাতিকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা হস্তে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। ইংলণ্ডের মহা সঙ্কট ও পরীক্ষার দিনে রমণী জাতিই আগুয়ান হইয়া আসিয়াছেন। নারী জাতির প্রেরণায় আবার আমাদের সাধনা সফল হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কবি বলিয়াছেন—

"তোরা না করিলে এ মহা সাধনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলাকবি লিখিয়াছেন—

"রমণী-শকতি অসুর-দলনী,
তোরা নিরমিত কোন্ ধাতু দিয়া?"

আজ হীনবীর্য্য দুর্ব্বল অসহায় বাঙালী জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মন বিষাদিত হয়। এই মরুভূমির আবার উর্ব্বরতা সাধন করিতে হইবে। মাতৃশক্তি জাগ্রত হইয়া দেশের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিবেন, ইহাই বিশ্বাস করি। তাই আজ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাংলা দেশের শক্তিস্বরূপিণী মাতৃজাতির প্রতি আমার নিবেদন যে তাঁহারা একবার জাগ্রত হউন। নিজের গৃহে পরিবারে তাঁহারা প্রেরণার অমৃত উৎস সৃজন করুন। বেশীদিন নয়, ছয় মাসের সাধনাই এই ক্লান্তি দূর করিয়া নবজীবন আনয়ন করিবে। প্রতিগৃহে চর্‌কা গৃহদেবতার আসন গ্রহণ করিলে আবার আমরা বাঁচিব।

যিনি অদৃশ্যে কত জাতির অভ্যুদয় ও পতন সাধন করাইলেন, তাঁহার মঙ্গল-হস্ত ইতিহাসের বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যেন আমরা দেখিতে পাই। তিনি কঠিন বিচারকের নির্ম্মম ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে আমাদের সাধনানুরূপ সফলতাই প্রদান করিবেন। অল্পায়াসে অধিক লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা আমরা করিব না, অকুতোভয় হইয়া কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি আমাদের আসিবেই। অন্তঃকরণে বিশ্বাস ও আশা লইয়া আমরা এই সাধনায় প্রবৃত্ত হই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

—

ইজিপ্টের নারী

ইজিপ্টের বর্ত্তমান জাতি, বাঙালীদের মত একটি মিশ্র জাতি। পুরাকালে, ইতিহাস লিখিবার বহুপূর্ব্বে হয়ত কোন একটা বিশেষ জাতি ইজিপ্টে বাস করিত। কিন্তু তাহার পর জগতে সভ্যতার আলোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতি আসিয়া ইজিপ্টে বাস করিতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান ইজিপ্ট-বাসী এই-সমস্ত জাতির সংমিশ্রণের ফল। তবে এখনো ফেলাহিন এবং কপ্ট নামক দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। তাহারা অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ ইজিপ্টীয়। তাহাদের নাক মুখ চোখের গড়নের সঙ্গে ইজিপ্টের পুরানো দেবমন্দিরের গায়ে খোদিত মূর্ত্তিদের নাক মুখ চোখের অনেক সাদৃশ্য আছে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের ভিতর ফেলাহিন জাতির বিশুদ্ধতা কিঞ্চিৎ বেশী-পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।
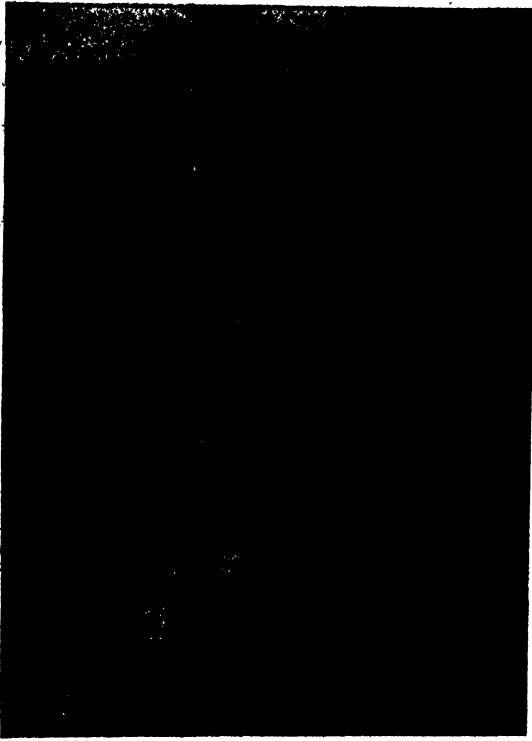
ইজিপ্টের নারী।

ইজিপ্টের নিম্ন অংশের এবং নাইল ব-দ্বীপের বেশীর ভাগ অধিবাসীই ফেলাহিন। ফেলাহিন জাতির লোকদের কপাল বেশ চওড়া, বড় বড় কাল চোখ, সোজা উঁচু নাক। গড়ে তাহারা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা। আরব জাতির সঙ্গে তাহাদের বিবাহাদির দ্বারা মিশ্রণ বেশী হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের দেখিলেই বেশ বোঝা যায় তাহারা পুরানো ইজিপ্টবাসীদের বংশধর।

গরীবদের পোষাকের বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই। বড়লোকদের ভিতর নানা রকম পোষাক চলিত আছে। কেহ তুর্কী পোষাক পরেন, কেহ আরবী পোষাক পরেন, আবার কেহ বা সাহেবী কেতার বেশে থাকেন। গরীব মেয়েদের সমস্ত অঙ্গ একটা লম্বা নীল রঙের আল্‌খাল্লায় ঢাকা থাকে। বড়লোকের ঘরের মেয়েদের নানা রকম পোষাকের বাহার আছে, তাহার উপর তাঁহাদের গহনার ফর্দ্দও বেশ প্রকাণ্ড। গহনা বেশীর ভাগই সোনার। বড়লোকের ঘরের মেয়েদের পরনে থাকে তুর্কী রমণীর মত পায়জামা, তাহার উপর ঢোলা কুর্ত্তা, তাহার উপর একটা সাদা রঙের আল্‌খাল্লা। তাহা কোমরে রঙীন সুতার দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। অনেকে এই আল্‌খাল্লার উপরে কাঁধ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত আর-একটা জামা পরেন। শীতকালে এই রকমের আরো দু-একটা বেশী জামা পরিতে হয়। গরম কাপড়ের জামাও অনেকে ব্যবহার করেন।

উঁচু ঘরের ফেলাহিন নারীরা রূপ বাড়াইবার জন্য চোখে সুর্‌মা লাগান। অনেকে আবার অঙ্গে নানা রকমের উল্কি পরেন। মেয়েদের চুল খুব প্রচুর হয়। চুলের বিনুনী করা হয় কিন্তু খোঁপা বাঁধা হয় না। বিনুনীগুলি পিঠে ঝুলিতে থাকে। দু-একটা বিনুনী কালো সাপের মত বুকের উপরেও পড়িয়া থাকে। সোনার বালা, চুড়ি, চুলের কাঁটা, চিরুণী ইত্যাদি অনেক কিছু গহনা ইঁহারা ব্যবহার করেন। অনেকে আবার সারি করিয়া মোহর গাঁথিয়া চুলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন। বিনুনীর শেষে রেশমের ফিতা বাঁধা হয়। তাহাতেও সোনার মোহর ঝুলিতে দেখা যায়।

সহরের বা গ্রামের সাধারণ কাজে মেয়েদের দেখা যায় না। তাহাদের যত কিছু কাজ সবই ঘরের ভিতর। ঘরসংসার দেখা এবং সন্তান পালন করা তাহাদের প্রধান কাজ। অবিবাহিতা নারীদের পিতার সংসারের রান্না-বান্না এবং কুর্ত্তা সেলাই ইত্যাদি কাজেই ব্যস্ত থাকিতে হয়। সকাল বেলায় বাড়ীর সকলে এক-পেয়ালা কফি এবং খানদুয়েক করিয়া আগুনে পোড়ানো রুটি খায়। তুর্কী রমণীর মত ইজিপ্টের নারীদের হারেমে বদ্ধ থাকিতে হয় না বটে, তবে তাই বলিয়া বাহিরের-জগতে তাহাদের পুরুষের মত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। সকাল বেলা তাহারা নিজেদের বন্ধুদের বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে পায়, তখন তাহাদের প্রধান কাজ—বাজে গল্প করা, তামাক খাওয়া, কফি পান করা এবং নর্ত্তকীদের নাচ দেখা।

গরীবের ঘরের মেয়েদের বাহিরের জগতে স্বাধীনতা বেশী আছে। কারণ তাহাদের পরিশ্রম করিয়া খাইতে হয়। বসিয়া খাইবার মত অবস্থা তাহাদের নয়।

নারীদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। লেখা-

পড়া-জানা নারী খুবই কম। নিজেদের সংসার এবং বন্ধু-বান্ধবদের বিষয় তাহারা কিছু কিছু খবর রাখে। অন্য কোন বিষয়ের খবর রাখা তাহাদের প্রয়োজনের বাহিরে।

বড়লোকের ঘরের মেয়েদের কখনো রাস্তায় ঘাটে দেখা যায় না। তবে খুব কদাচিৎ তাহারা এমনভাবে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পথ দিয়া চলিয়া যায় যে নিজের বাড়ীর লোকেও তাহাদের চিনিতে পারে না। গৃহস্থ ঘরের বয়স্কা মেয়েদের পথে দেখা যায়। সুন্দরী-দেখিতে-নয় মেয়েদের বিনা ঘোম্‌টায় পথে দেখা যায়। গরীবের ঘরের মেয়েদের প্রায়ই দেখা যায়। ঘোম্‌টার সম্বন্ধে তাহাদের অত বেশী কড়াকড়ি নাই।

এই দেশে মেয়েদের বিবাহ একটু কম বয়সেই হয়। তবে অবশ্য আমাদের সোনার বাঙলা দেশের মত সাড়ে সাত বছর বয়সে নয়। মেয়েদের সাধারণত ১৪ এবং ছেলেদের ১৬।১৭ বছর বয়সে বিবাহ হয়। কোনো অধিক-বয়স্ক মাঝারী অবস্থার লোক যদি অবিবাহিত থাকে, তবে সে লোকের চক্ষে বড় খেলো হইয়া থাকে। সে লক্ষীছাড়া এবং চরিত্রহীন।

গয়না, তেল এবং সুর্‌মাওয়ালীরা এখানে ঘটকীর কাজ করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ হয় না। কাজেই কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এই ঘটকীদের আশ্রয় লইতে হয়। ঘটকীদের এখানে কাট্‌বেহ্‌ বলে। তাহারা সব বাড়ীর অন্দরে প্রবেশ পায় এবং বরের মনোমত কন্যার সন্ধান করে। কনের বাড়ীর লোকেরা ইহাদের আগমন বেশ বুঝিতে পারে, এবং কনের মা বিশেষ করিয়া এই ঘটকীর মন প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করেন; কারণ ঘট্‌কীর মত হইলেই বিবাহ এক রকম হইয়া যায়। বিবাহ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে বর কন্যার মুখ দেখিতে পায় না। ঘটকী কন্যা পছন্দ করিয়া আসিলে বরের মা, বোন বা অন্য কোন নিকট-আত্মীয়া কনের বাড়ী যান। ঘটকীর কথা কতখানি সত্য তাই দেখিয়া আসেন। তারপর বরের বাড়ীর মত হইলে ঘটকী কনের বাড়ী গিয়া পাকা কথা পাড়ে। কনের বাড়ীর মত এক রকম হইয়া থাকে, কারণ তাহা না থাকিলে ঘটকী সেখানে দুবার প্রবেশ করিতে পায় না।

বিবাহে আপত্তি এবং অমত করিবার অধিকার মেয়ের আছে। তবে কাজে তাহা কখনো দেখা যায় না। কারণ ভাবী বরকে সে কখনো বিবাহের পূর্ব্বে দেখিতে পায় না! সম্পর্কে ভাই হইলে খুব কম বয়সে তাহাকে হয়ত দু-এক বার দেখে। ঘটকী বর সম্বন্ধে খুবই প্রশংসা করে। এমন অবস্থায় মেয়ের আপত্তি করিয়া কোন লাভ নাই। না দেখিয়াই যখন বিবাহ করিতে হইবে, তখন সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তবে গরীবের ঘরের ছেলেমেয়েরা, তাহারা সারা দিন মাঠে কাজ করে। তাহারা ঘটকীর সাহায্য না লইয়াই নিজের ইচ্ছামত স্ত্রী বাছিয়া লয়। মেয়ের মত হইলে তাহাকে বিবাহ করে।

বিবাহের সমস্ত পাকা কথা হইয়া গেলে পর, দুই পক্ষের কর্ত্তাদের মধ্যে দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথা উঠে। বিবাহের পূর্ব্বে বরকে কনের জন্য কিছু দিবার প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। বিবাহ স্থির হইয়া গেলেই ⅔ অংশ টাকা দিতে হয়। বাকি অংশ বিবাহ বাতিল না হইলে আর কোনদিন দিতে হয় না। কন্যাপক্ষের লোকেরা বরের-দেওয়া-টাকা হইতেই কন্যাপণ দিয়া থাকে। সেইজন্য কোনো পক্ষেরই বিশেষ কষ্ট হয় না। এই-সমস্ত স্থির হইয়া গেলে পর কোন একজন ম্যাজিষ্ট্রেট বা কাজির সাম্‌নে সব লেখাপড়া হইয়া যায়। তাহার পর বর দুইজন বন্ধু সঙ্গে করিয়া কনের বাড়ী যায়। সেখানে কনের পিতা তাহাদের ঘরে বসান। ঘরে কয়েকজন সাক্ষী এবং একজন কোরাণ-পাঠক বর্ত্তমান থাকে। কোরাণের প্রথম অধ্যায় পড়া হইলে পর বর এবং কনের পিতা মুখোমুখি বসেন, দুই-জনে দুই-জনার ডান হাত চাপিয়া ধরেন এবং হাত উপরে উঠাইয়া বুড়ো আঙুলের উপর বুড়ো আঙুল চাপিয়া রাখেন। কোরাণ-পাঠক তার পর উভয়ের হাত একটা কাপড়ে ঢাকিয়া দিয়া কিছু উপদেশ দেন এবং তাহার পর বরকে বাগ্‌দত্ত করেন। উপহার ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়। কোরাণ-পাঠক কিছু পায়। তাহার পর

ইজিপ্টের বিবাহ-মিছিলে কন্যার চতুর্দ্দোল।

সকলে মিলিয়া এক জায়গায় বসিয়া ভোজনাদি হয়। এই-সমস্ত কাজ হইয়া গেলে পর বিবাহ হয়। বিবাহে উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী নিমন্ত্রিত হয়। ভোজন-উৎসব বিবাহের একটি বিশেষ অঙ্গ। বিবাহ হইয়া গেলে পর বর-কন্যা সংসার করিতে আরম্ভ করে।

নিম্ন ইজিপ্টে কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে দলবল লইয়া কোন বিশেষ স্নানাগারে স্নান করিতে যায়। কন্যা যদি অবস্থাপন্ন ঘরের হয় তবে এই স্নানোৎসব বেশ জাঁকজমক করিয়াই হয়। একটি বেশ ছোটখাট শোভাযাত্রা হয়। দলের আগে গায়ক ও বাদ্যকার থাকে। তাহারা সারাপথ বাদ্য বাজাইতে ও গান করিতে করিতে যায়। স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া প্রবেশ-পথে একটা রুমাল লট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। ইহার অর্থ "পুরুষদের আসা নিষেধ।" স্নান শেষ হইয়া গেলে পর কন্যা সহচরী-বেষ্টিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে, নাচ দেখে এবং গান শোনে। স্নানাগার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কন্যা একতাল হেনা-বাটা হাতে করিয়া লয়, তাহাতে কন্যার সহচরীবৃন্দ এক-একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা লাগাইয়া দেয়। অবশ্য যাহার যেমন সাধ্য তেমনি মূল্যের মুদ্রা দেয়। সকলকেই যে সমান দিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। তাহার পর কন্যা তাহার হাতের এবং পায়ের নখ হেনাতে লাল করিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করে। কন্যা চলিয়া যাইবার পর অন্যান্য অতিথিগণও তাহাদের নখ রাঙাইয়া লয়।

পরের দিন সকালে কন্যার সাজ-গোজ আরম্ভ হয়। সারা সকাল ইহাতেই কাটিয়া যায়। বিকালের দিকে কন্যা তাহার সঙ্গে তাহার বিশেষ দু-একজন আত্মীয়া লইয়া স্বামীর গৃহের দিকে যাত্রা করে। কন্যার সঙ্গে উট বা ঘোড়া বোঝাই করিয়া তাহার যৌতুকাদিও প্রেরণ করা হয়। কন্যার দলের সঙ্গে আরব কুস্তিগীর, খেলোয়াড়, গায়ক, বাদক প্রভৃতি অনেক কিছু থাকে। তাহারা পথের মাঝে মাঝে থামিয়া নানা রকমের খেলা সঙ্গীত প্রভৃতি করে। সঙ্গে ভিস্তিওয়ালা থাকে, সে পিপাসুকে জলদানে তৃপ্ত করে।

স্বামীর গৃহে কন্যা পৌঁছিলে পর অভ্যাগতদের জন্য নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ হয়। তাহার পর ভোজন শেষ হইলে পর সবাই বিদায় গ্রহণ করে। সব-শেষে কন্যার ধাত্রীও বিদায় লয়। এতসব কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে পর স্বামী তাহার বধূর ঘোম্‌টা তুলিয়া মুখ দেখিতে পায়। ঘটকীর কথা কতখানি সত্য তা এতদিন পরে সে নিজের চোখে দেখিবার অবসর পায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর সাতদিন তাহাকে ঘরের বাহিরে আনা হয় না। এমন কি সন্তানের পিতাও তাহাকে দেখিতে পায় না। সাতদিন পরে বাড়ীর চারিদিকে প্রদীপ জ্বালা হয় এবং ভূত তাড়াইবার জন্য নুন এবং যব গম প্রভৃতি শস্য ছড়ান হয়। কন্যা-সন্তান হইলে প্রথম স্ত্রী-অতিথি এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা তাহাকে দেখিতে পায়। পুরুষ-সন্তান হইলেও একই বিধি, তবে এই স্থলে পিতা তাহার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে।

ছেলের নাম-করণ যেমন ভাবে হয়, তাহার বৃত্তান্ত হয়ত অনেকেরই ভাল লাগিবে না। কাজি এক-টুক্‌রা আক লইয়া চিবায়। তাহার মুখ হইতে রস গড়াইয়া শিশুর মুখে গিয়া পড়ে। তাহার পর শিশুর নাম রাখা হয়।

কপ্ট্‌ জাতি ইজিপ্টের আর-এক শ্রেণীর পুরানো অধিবাসী। তাহারা বেশীর ভাগ উপর-ইজিপ্টেই বাস করে। অ্যাসিউৎ প্রদেশে এবং লেক বিবৃকেৎ-এল-কেরুনে কপ্ট্‌দের ঘন বসতি আছে। নিম্ন ইজিপ্টে যে-সব কপ্ট্‌ বাস করে তাহাদের বেশীর ভাগই দোকানী বা কারবারী। কপ্ট্‌ জাতি মুসলমান নয়—তাহারা খ্রীষ্টান, এই কারণেই বোধ হয় আরবদের সহিত তাহাদের মিশ্রণ বেশী হয় নাই এবং তাহারা ফেলাহিনদের অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ইজিপ্টীয়। ধর্ম্ম তাহাদের বরাবর একই থাকা সত্ত্বেও তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদের বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহাদের পোষাক দেখিয়া, তাহাদের জাতি নির্ণয় করা কঠিন। মুসলমানদের সঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদে তাহাদের কোন অ-মিল নাই। পোষাকের রঙ সম্বন্ধে—তাহারা গাঢ় রঙই বেশী পছন্দ করে।

কপ্ট্‌ রমণীর পোষাকও অনেকটা বড়-ঘরের ফেলাহিন নারীর মত। চুল বাঁধা, গয়না পরা ইত্যাদি সবই এক ধাঁচের। তবে কপ্ট্‌ নারীর গয়না সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়—গয়না তাহাদের নূতন করিয়া বড় একটা কিনিতে হয় না। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত গহনাদি তাহারা ভোগ করে। তবে অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে তাহারা গয়না বাঁধা রাখিতে ইতস্তত করে না, এমন কি মাঝে মাঝে কিছু বিক্রয়ও করে। কপ্ট্‌ নারী তাহার সেমিজের ওপর একটা আঁটা বডিস্‌ পরে, তাহা সাম্‌নে রঙিন সুতায় বাঁধা থাকে। বোতামের পরিবর্ত্তে রঙিন সুতার আদর। নীচে পায়জামা বা ঢোলা পাৎলুন পরে। পায়ে চটি থাকে। গরমকালে তাহারা কেবলমাত্র একখানা ঢোলা আল্‌খাল্লার মত জামা ব্যবহার করে—অন্যান্য সব পোষাকই এক রকম ত্যাগ করে।

ঘরের বাহিরে নারী এমন ভাবে আসে যে তাহার কোন অঙ্গই পথিকের চোখে পড়ে না।

বালিকাদের পোষাক বয়স্কাদের মতই। তবে অনেক ছোট মেয়ে কেবল একটা সেমিজ আর-একটা পায়জামা পরে। মেয়ের একটু বেশী বয়স হইলেই সে তাহার বড়দের অনুকরণ করিতে শিখে। কোন অচেনা পুরুষ সাম্‌নে আসিয়া পড়িলে, সে, বয়স্কা নারীর মত, তাহার সুন্দর কচি মুখখানি ঘোম্‌টার আড়ালে লুকাইয়া রাখে।

সহরের নারীরা বেশীর ভাগ ঘরের কাজেই ব্যস্ত থাকে। বাহিরে তাহাদের কদাচিৎ দেখা যায়। গ্রামের মেয়েরা চাষবাসের কাজে অনেক পরিমাণে পুরুষদের সাহায্য করে। গরীব ঘরের মেয়েরা আটা পেষার কাজই বেশী করে।

ইজিপ্টে নর্ত্তকীদের একটা জাতি বলিলে কিছু অন্যায় হয় না। তাহারা পুরাকালের ফ্যারাওদের সময় হইতেই বাস করিতেছে। বর্ত্তমানে ইজিপ্টে এমন কোন সহর নাই যেখানে ইহাদের দেখা যায় না। নর্ত্তকীরা বলে যে তাহারা হারুণ-অল-রসিদের প্রিয় নফর বারমেকের বংশের লোক। অনেকে বলেন যে নর্ত্তকীরা জিপ্‌সী জাতির একটা শাখা। কিন্তু তাহাদের বিবাহাদি ইজিপ্টের

আলজিরিয়ার নারী।

আলজিরীয় রমণীর সন্তান-বহন।

প্রায় সব জাতির সঙ্গেই হইয়াছে, কাজেই তাহারা একটা মিশ্র জাতি বলিয়া মনে হয়। নর্ত্তকীরা সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই মিশে, কিন্তু তাহাদের বাস করিবার জন্য সহরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। নর্ত্তকীদের চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসা করিবার কিছু নাই। নর্ত্তকীরা ধনী তুর্কী রমণীর মত জমকালো পোষাক পরে। তাহাদের অবস্থা খুবই ভাল, এক-একজনকে ক্রোরপতি বলিলেও হয়। বর্ত্তমান সময়ে ক্রীতদাসীরা নর্ত্তকীদের দল-বৃদ্ধি খুব বেশী পরিমাণেই করিতেছে।

অ্যাল্‌জিরিয়া এবং মরক্কো দুইটি ভিন্ন দেশ বটে, কিন্তু ঐ স্থানের লোকেরা ইজিপ্টের বাসিন্দাদের শাখা। ঐ দুইটি দেশের বেশীর ভাগ লোক বর্ব্বর (Berber) জাতি। তাহা ছাড়া আরব, ইহুদি এবং নিগ্রো যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

বর্ব্বর জাতি দেখিতে, অন্তত বর্ণে, ইউরোপীয়দের মতই। তবে পুরাকালে বর্ব্বর এবং আরবজাতির কিছু মিশ্রণ হইয়াছিল। উভয় জাতির একটা বিষয় একেবারে এক—তাহারা ককেশীয়দের বংশধর। তাহাদের চেহারাতেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে তাহাদের চেহারার মধ্যে আবার কয়েকটা বিষয়ে বেশ পার্থক্যও দেখা যায়। আরবদের মুখ একটু লম্বা ধরণের, বর্ণ খুব বেশী শাদা নয়, নাক খুবই উঁচু এবং চোয়াল মাঝারি। তাহাদের চোখ এবং চুল গাঢ় কালো। আরবরা বর্ব্বরদের অপেক্ষা কম পরিশ্রমী এবং উৎসাহী। তাহারা বর্ব্বরদের অপেক্ষা বেশী চিন্তাশীল। আরবের মন অধিকতর উচ্চস্থানে বিচরণ করে। আরবরা বর্ব্বরদের অপেক্ষা অধিক সংযমী এবং শিক্ষিত।

এল্‌জিরিয়ার বর্ব্বরদের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। কেউ কেউ বলেন ইহাদের নাকি ১২০০ শাখা জাতি আছে; এইজন্য ইহাদের উত্তর আফ্রিকার স্কচ্ জাতি বলে। তবে বার্ব্বার জাতি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত। (১) সাগর তীরের বর্ব্বর, ইহারা 'কেবিল' বলিয়া পরিচিত, (২) এট্‌লা প্রদেশের স্থহ্‌লা এবং মোগদর

প্রদেশের শুস্‌জাতি এবং (৩) কৃষ্ণ বর্ব্বর বা হারাতিন্‌, ইহারা এট্‌লা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বাস করে।

বর্ব্বর রমণীর পোষাক আরব রমণীর মত। ইহারা কাঁধে একটা শাল ফেলিয়া রাখে। আল্‌খাল্লার মত যে লম্বা জামা পরে, তাহা কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। আরব নারী অপেক্ষা ইহাদের স্বাধীনতা কিছু বেশী এবং ইহারা সর্ব্বাঙ্গ-ঢাকা কোন চাদর বা ঘোম্‌টা (হেইক্‌) ব্যবহার করে না। অলঙ্কার স্বরূপ ইহারা হার, বালা, পুতির বা সোনার মালা, মাকৃড়ি বা ইয়ারিং এবং কেউ কেউ নাকছাবি বা নথ ব্যবহার করে।

গ্রামে এবং সহরে বর্ব্বরদের বাড়ী বেশীর ভাগ দোতলা এবং পাথরের তৈয়ারী। তবে অনেক স্থানে (তুয়ারেগ) ইহারা তাঁবু বা ঘাসের ছাওয়া ঘরে বাস করে। ইহারা চাষবাস, সামান্য কারবার ইত্যাদি করে।

কেবিল রমণীর স্থান, আরব বা মূর নারীর অপেক্ষা বেশী সম্মানের। তাহাদের ঘরের বাহিরে আসিতে বাধা নাই, এবং বাহিরে আসিবার সময় ঘোম্‌টাও পরিতে হয় না। স্বামীর সঙ্গে তাহার আসন সমান—অনেক স্থলে বরং উঁচু তবু নীচু নয়। কেবিল পুরুষ সাধারণতঃ এক বিবাহ করে। কেবলি নারীর পোষাক খুবই সাধারণ। বিশেষ কোনো জাঁক-জমক নাই।

আরবরা খৃষ্টীয় ৭ম এবং ১১শ শতাব্দীতে অ্যাল-জিরিয়া এবং মরক্কো জয় করেন। বর্ত্তমান সময়েও ঐ দুইটি দেশে আরবরাই প্রধান অধিবাসী। অ্যাল-জিরিয়ার পশ্চিম অংশেই আরবদের ঘন-বসতি আছে।

আরব নারী একটা শালে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া পথে চলে। এই শালকে ইহারা হেইক বলে। যাহার যেমন অবস্থা সে তেমনি দামের শাল ব্যবহার করে। হেইক্‌-এ মুখের প্রায় সব অংশই ঢাকা পড়ে, কেবল চোখ, নাক এবং কপালের এক অংশ অনাবৃত থাকে। অনেকে এত পাত্‌লা ওড়না বা হেইক ব্যবহার করে যে তাহা ব্যবহার করা না-করা সমান। ইহাতে আরব নারীদের অতি চমৎকার দেখায়। ওড়নার ফাঁকে ঘোম্‌টার আড়ালে সুন্দরী আরবনারীর কালো চোখ একবার দেখিলে আর তাহা ভুলিবার নয়।

কেবিল রমণী।

অনেকস্থানে আরব নারী কেবল একটি চোখ খোলা রাখিতে পায়, আর একটি চোখ আড়ভ্রারে বা মুখের উপর পাত্‌লা ঘোম্‌টায় ঢাকা থাকে।

সাধারণতঃ আরব রমণী দেখিতে সুন্দরী। তবে অনেকে কপালে উল্কি পরিয়া এই সৌন্দর্য্য মাটি করে।

আরব রমণীরা ঢোলা পায়জামা এবং তুর্কী ধরণের কুর্ত্তী পরে। ইহা দেখিতে মোটেই সুদৃশ্য নয়, একটা কাপড়ের বস্তার মত মনে হয়। গরীব ঘরের মেয়েদের পোষাকের জাঁক-জমক কিছু কম। ধনী নারীদের অনেকে ওয়েষ্ট কোটের মত এক রকমের জামা ব্যবহার করে। ইহা পরিলে তাহাদের এক রকম মন্দ দেখায় না।

প্রায় আরব রমণী হেনার দ্বারা নোখ্‌ এবং হাতের তালু রঙ করে। অনেকে আবার চুলের গোড়াতেও হেনা লাগাইয়া রঙিন করে।

আরবনারীর গয়নার বহর বড় ভয়ানক। বড় ঘরের মেয়েরা সব সোনার গয়না পরে। নাক হইতে সুরু

করিয়া পায়ের নোখ পর্য্যন্ত নানা রকমের গয়না থাকে। গরীব মেয়েরা রূপা এবং প্রবালের গয়না ব্যবহার করে। পুতির মালাও তাহারা খুব বেশী ব্যবহার করে। ভিখারী মেয়েরাও অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় একগাদা তামার বালা চুড়ি ইত্যাদি পরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সমাজে আরব রমণীর স্থান অন্যান্য প্রাচ্য দেশ অপেক্ষা অনেক উঁচুতে। বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের মতের যথেষ্ট দাম আছে। যাহাকে বিবাহ করিতে বলা হইবে, তাহাকেই যে বিবাহ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মেয়ের অমতে জোর করিয়া বিবাহ হইতে পারে না। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাই তাহার স্বামীর গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করে। সঙ্গে লোকজন উট ঘোড়া প্রভৃতি অনেক কিছুই যায়। অনেক সহরবাসী আরবরা তাহাদের পুত্রদের মরুভূমির বেদুইনদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা শক্ত এবং কষ্টসহিষ্ণু হইয়া ফিরিয়া আসে।

আসল বিবাহ-কার্য্য খুব সহজেই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। সহরে একজন কাজির সমক্ষেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ পাকা করা হয়। মরুভূমিতে যেখানে কাজি মেলা দুষ্কর, সেখানে কন্যার পিতার তাঁবুর সাম্‌নে একটি ভ্যাড়া হত্যা করিলেই বিবাহ হইয়া যায়। বরকে এই বলি দিতে হয়।

আরবদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু আজকাল বহুবিবাহ খুব কমই হয়। আরবদের মধ্যে স্ত্রী বদলের প্রথাও আছে। স্ত্রী বদল করা সম্বন্ধে ইহাদের কোন বাধা দেখা যায় না, বেশ হাসিমুখে স্বচ্ছন্দচিত্তেই তাহা করে। কিন্তু এই প্রথা সমাজের এবং দেশের পক্ষে খুব কল্যাণের নয়, তাহা বেশ সহজেই বুঝা যায়। সকল নারীই যে ইহাতে সুখী হয় তাহা বলা যায় না।

স্ত্রীর সহিত বনিবনা না হইলে স্বামী তাহাকে বাপের বাড়ী ফেরৎ পাঠাইতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রীর বাড়ী হইতে সে যাহা-কিছু পাইয়াছে সবই ফেরৎ পাঠাইতে হয়। ভাই তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করিতে পারে; তবে ইহাতে ভ্রাতৃবধূর মত থাকা চাই। আরবরা তাহাদের খুড়া জেঠার কন্যাদের বিবাহ করিতে পারে। বড় ভাইএর দাবী সর্ব্ব প্রথম। স্বামী তাহার স্ত্রীর সকল রকমের খরচ জোগাইতে বাধ্য। খরচ জোগাইতে না পারিলে স্ত্রী বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারে। স্ত্রী যদি ঘরের বিশেষ কোন কাজ করিয়া দেয়, তাহার জন্য স্বামীকে পয়সা দিতে হয়।

আরব পুরুষ নারীকে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। নারীর গভীরতম অপরাধকেও তাহারা অতি সহজেই ক্ষমা করে, তাহারা বলে—"নারী দুর্ব্বল, পুরুষই তাহাকে পাপের পথে টানে, তাহাদের অপরাধের জন্য পুরুষই দায়ী, কাজেই তাহাদের অপরাধের বোঝা আমাদের ঘাড়েই বহন করিতে হইবে।" আমাদের দেশের নারীর স্থান কোথায় তাহার তুলনা করুন। আরব জাতি অসভ্য—আমরা অনেকে তাই মনে করি।

কন্যাকে জোর করিয়া পিতার ঘর হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করার কথা এখনও শোনা যায়। এইরূপ বিবাহে স্ত্রী অসুখী হয় না। কারণ বিবাহ হইয়া গেলে পর স্বামী স্ত্রীকে খুবই আদর এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ির সম্বন্ধই চিরকালের সম্বন্ধ হয় না।

আরব রমণীদের মধ্যে শিক্ষা বিশেষ নাই। খুব কম নারীই পড়িতে জানে, লিখিতে-জানা স্ত্রীলোক আরো কম। লেখাপড়াজানা যে দু'এক জন নারী আছেন তাঁহারা সবাই প্রায় বড় ঘরের মেয়ে। গরীব ঘরের মেয়েরা সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া লেখাপড়ার সময় আর পায় না।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

—

মাতৃত্বের শতকরা

আমেরিকার Child Welfare Magazineএ মাতৃত্বের নিম্ন-লিখিত শতকরা নম্বরওয়ারি হিসাবটি বাহির হইয়াছে। আমাদের দেশের মায়েরা শতকরা কে কত নম্বর পাইবার যোগ্য, নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষা করিয়া তাহা দেখিতে পারেন।

"১। শিশুর শরীরের অবাধ বৃদ্ধির জন্য পঁচিশ নম্বর।

শিশুর শরীরের ওজন যাহা হওয়া উচিত তাহার বাস্তবিক ওজন তাহা হইতে কম কি না, ইহা যদি আপনার না জানা থাকে তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

তার শরীরের ওজন উচিত ওজনের চেয়ে কম, অথচ যদি তার দেহ-বৃদ্ধি ভালো করিয়া পরীক্ষা করানো না হইয়া থাকে তবে দশ নম্বর কাটা যাইবে।

দেহপরীক্ষায় দৈহিক ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে, অথচ সেই ত্রুটি নিরাকরণের উপায় অবলম্বন করা হয় নাই—এ যদি হয়, তবেও দশ নম্বর কাটা যাইবে।

২। শিশুর পারিবারিক নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য পঁচিশ নম্বর।

শিশুকে যদি বাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া না হইয়া থাকে, তবে দশ নম্বর কাটা যাইবে।

অন্য লোকের নিকট শিশুর নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখিবার পথে আপনি যদি বাধা হইয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

শিশুর মনে দায়িত্ব-বোধ জন্মাইতে আপনি যদি সাহায্য না করিয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

বিচার বুদ্ধির উপর যদি নিজের স্নেহপ্রবণতা প্রভৃতির স্থান দিয়া থাকেন তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

৩। শিশুর দৈনিক কাজের একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্য পঁচিশ নম্বর।

স্কুলে বা গৃহের বাহিরে অন্যত্র ছেলের অতিশ্রমে হায়রাণ হইয়া যাইবার হেতু কি কি তাহা যদি আপনার জানা না থাকে তবে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

আহার বিষয়ে ছেলের অভ্যাস স্বাস্থ্যকর সুনিয়মিত কি না ইহা জানা না থাকিলে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

ছেলের অন্যান্য সমস্ত অভ্যাস তার স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না ইহা আপনার জানা না থাকিলে পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।

তার নিত্যকর্ম্মের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি সমস্ত যদি না করা হইয়া থাকে, আর তার ওজন যদি তার উচ্চতার অনুপাতে কম হয়, তবে দশ নম্বর কাটা যাইবে।

৪। আদর্শ-শিক্ষার জন্য পঁচিশ নম্বর।

বুকে হাত দিয়া নিজের বিবেককে সাক্ষী রাখিয়া, যত বেশী নম্বর নিজেকে দিতে পারেন, দিতে চেষ্টা করুন। মোট পাইবার যোগ্য, এমন মায়ের অভাব নাই। যাহা আপনার সত্য দাবী, তাহা লইতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।"

—

নারী-প্রগতি

আদালতে নারীদের উকিল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টার হইতে এতদিন আইনের যে বাধা ছিল, বেহারের ব্যবস্থা-পরিষদ সে বাধা দূর করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সেই প্রদেশে নারীরা ইচ্ছা করিলেই ওকালতি ও ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি করিতে পরিবেন।

* * * *

বোম্বাইয়ের ভাটিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিদের অস্বাস্থ্যের প্রতিকারের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন হইতেছে। পুনার বিখ্যাত সেবাসদন এই কাজের ভার লইয়াছেন। ব্যয়ভার-নির্ব্বাহ করিবেন ভাটিয়া সম্প্রদায়েরই দুইটি লোকহিত-অনুষ্ঠানের দুইজন ট্রাষ্টী। সেবাসদনের শুশ্রূষাবিভাগ হইতে দুইজন পাকা শুশ্রূষাকারিণী ও একজন লেডী ডাক্তার আসিয়াছেন, বোম্বাইয়ের কয়েকজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইঁহাদের কাজের সহায়তা করিবেন। শুশ্রূষাকারিণীরা ও মেয়ে-চিকিৎসকেরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া প্রসূতি ও আসন্ন-প্রসবা, নবজাত শিশু প্রভৃতির সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইবেন।

* * * *

১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে নারীদের যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। নারীরা বহুদিন ধরিয়া বহুবার সে নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াছেন। এতদিনে নিষেধ দূর হইয়াছে।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালগুলির মধ্যে একমাত্র টোহোকুতে নারীদের ছাত্রীহিসাবে প্রবেশাধিকার আছে। জাপানের নারীরা সর্ব্বত্র এই অধিকারের দাবী করিতেছেন।

জাপানের কারখানাগুলিতে অন্যূন ৬ লক্ষ নারী-শ্রমজীবী কাজ করেন। সরকারী চাকরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কাজে নারীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মমন্দিরগুলিতে মেয়েদের প্রধান উপাসিকা হইবার পক্ষে যে বাধা ছিল তাহাও অনেক জায়গায় অপসারিত হইয়া চলিয়াছে।

* * * *

ভিয়েনার আদালতে এই প্রথম একজন নারী ব্যারিষ্টার আইন-ব্যবসায় করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইঁহার নাম 'ফ্রাউলিন্' মূলজি মেইয়ার। ডবলিঙ্গের ফৌজদারী আদালতে ইনি কাজ সুরু করিয়াছেন।

* * * *

প্রাচীন বিধিব্যবস্থায় অষ্ট্রীয়াতে নারীদের আইন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল, দেশে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিষেধ উঠিয়া গিয়াছে।

* * * *

'সেনোরিতা' কারমেন লিঅন স্পানিশ পার্লামেণ্টের প্রথম নারী সভ্যপদপ্রার্থী। মাদ্রিদের একটি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তিনি স্পেনের ব্যবস্থা-প্রণয়ন-পরিষদের সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

* * * *

হল্যাণ্ডের নারীদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার অধিকার প্রথম দেওয়া হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ নারী ইঞ্জিনিয়ার-গ্রাজুয়েট হইয়া বাহির হইয়াছেন।

* * * *

যে-সমস্ত নারী ভোট দিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন আমেরিকায় এমন নারীদের একটি জাতীয় সম্মিলন গঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু দেশের গণতন্ত্র এই সম্মিলনে নারী-প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পূর্ব্বে এরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখান হইতে যে নারী প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহার নাম মিস্ মার্গারিটা কনরয়। ইনি জাতিতে ইংরেজ, কিন্তু বর্ত্তমানে পেরুর অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। নারীর অবস্থা উন্নত করিতে ইনি বিশেষ সচেষ্ট।

* * * *

অন্য দেশও যে এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট তাহা নহে। ক্যানাডা পার্লামেণ্টে যিনি প্রথম নারী সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহার নাম মিস্ এ্যাগনেস্ ম্যাক্‌ফেল। ইনি সর্ব্ববিষয়েই খুব উন্নতিকামী। কৃষকদিগের উন্নতির জন্য এক সমিতির তিনি সভ্য। ইঁহার জীবন-কথা উল্লেখযোগ্য। যোল বৎসর বয়সে গ্রাম্য জীবনের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা ঘটে। এবং তখন হইতেই পল্লীর উন্নতি ও কৃষক

জীবনের উন্নতি তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। খুব অল্প কথায় বলিতে গেলে আয়ার্লণ্ডে যেমন রাজনৈতিক সিন্‌ফিন্ তিনি সেইরূপ কৃষিবিষয়ে একজন সিন্‌ফিন্।

* * * *

আমেরিকার কংগ্রেসওয়ালাদের সেখানকার নারী-সঙ্ঘকে বিশেষ ভয় করিয়া চলিতে হয়। এই-সমস্ত নারী সঙ্ঘের একমাত্র কাজ মানবের হিতসাধন। নির্ব্বাচনের সময় নারী-সঙ্ঘ অনেক উপায়ে কাহারো ভোট বেশী করিয়া দিতে পারে আবার কাহারো ভোট পাইবার আশা একেবারে লোপ করিয়া দিতে পারে। ওয়াশিংটন সহরে এই সঙ্ঘের কেন্দ্র আছে। কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্যের সমস্ত খোঁজ নারী-সঙ্ঘ রাখে। কোন খবর ইহার কাছে গোপন রাখা চলে না। কোন্ কংগ্রেস-সভ্য কোথায় কি বলিলেন, কি করিলেন, কোন্ কথা রাখিতে পারিলেন না ইত্যাদি সব খবরই থাকে। একজন কংগ্রেসওয়ালা সম্বন্ধে নারী-সঙ্ঘের খাতায় লেখা আছে—'ইনি বিদ্যালয়ে ফুটবল এবং বেস্‌বল খেলিতেন, এবং একটা সভায় ইনি একটা পাশ-হওয়া আইনকে পাশ হয় নাই বলিয়া ভুল করেন।' কংগ্রেসওয়ালাদের সব সময়েই ভয় থাকে কখন তাঁহারা এই নারী-সঙ্ঘের বিষ-নয়নে পড়েন।

—

কৃষ্ণভাবিনী-স্মৃতিসভায়

আজ যাঁহার স্মৃতিসভায় আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম-গ্রহণ করেন, ও পরে শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ হন। ভবিষ্যতে তিনি যে একজন জগদ্বিখ্যাতা মহিলা হইবেন তাহার আভাস শৈশবকাল হইতেই পাওয়া গিয়াছিল। বিবাহের পর তিনি যখন দাস-মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার স্বামী দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধনের জন্য ও উচ্চশিক্ষা-লাভেচ্ছু হইয়া বিলাত-গমনের বাসনা করেন। তখন বিলাত-গমনের নাম শ্রবণ করিলেই সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। যাঁহারা বিলাতে গমন করিতেন তাঁহারা জাতিচ্যুত হইয়া পিতার অবাধ্য ত্যাজ্যপুত্র রূপে পরিগণিত ও এমন কি বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেন। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়েরও সেই অবস্থা ঘটে। কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়াও সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও, ঐ যে হিন্দুশাস্ত্র-মতে হাতে হাতে সঁপিয়া দিবার সময় মা-বাবা বলিয়া দিয়াছিলেন—"পতিই দেবতা, সুখে দুঃখে বিপদে তাঁর চিরসঙ্গিনী থেকো,"—সেই "পতিই দেবতা" এই কথা প্রাণে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে বিলাত গমন করিবার বাসনা করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি তাঁহাকে মধুর সান্ত্বনাবাক্য ও উপদেশাদি দ্বারা ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করেন। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করেন; কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী দাস উত্তরে বলেন, "আমার সব যাক্ তাতে দুঃখ কি? সীতা রাজসম্পদ ত্যাগ করে' রামের সঙ্গে বনে যেতে পেরেছিলেন আর আমি তো কোন্ ছার।"

এই সময় তাঁহার দুই বৎসরের একটি কন্যা ছিল। তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। নিজে হিন্দু-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পাবেন নাই, কন্যা তিলোত্তমাকে দিয়া সে সাধ পূর্ণ করিবেন ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু বিলাত-গমনে তাঁহার শ্বশুর-মহাশয় তিলোত্তমার ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। এই পাত্রে পড়িয়া তিলোত্তমা অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইতেন, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চাহিতেন না। মাতার উপযুক্ত কন্যা হইয়া নীরবে অশ্রুজল ফেলিতেন। তবুও এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করিতেন না।

দশ বৎসর যাবৎ বিলাতে থাকিবার পর দেবেন্দ্রনাথ দাস যখন সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান না দিয়া ত্যাজ্যপুত্র করেন। তিনি সস্ত্রীক কখনও পৃথক বাটীতে কখনও হোটেলে থাকিতেন। তখনই তিনি কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়াকে লইয়া ট্রামে ও পদব্রজে গমনাগমন করাইয়া স্ত্রীস্বাধীনতা শিক্ষাদান করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া সঙ্কোচের ভাব দূর করেন। এই সময়ে কৃষ্ণভাবিনী দাস নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বিলাতীভাবে পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেন।
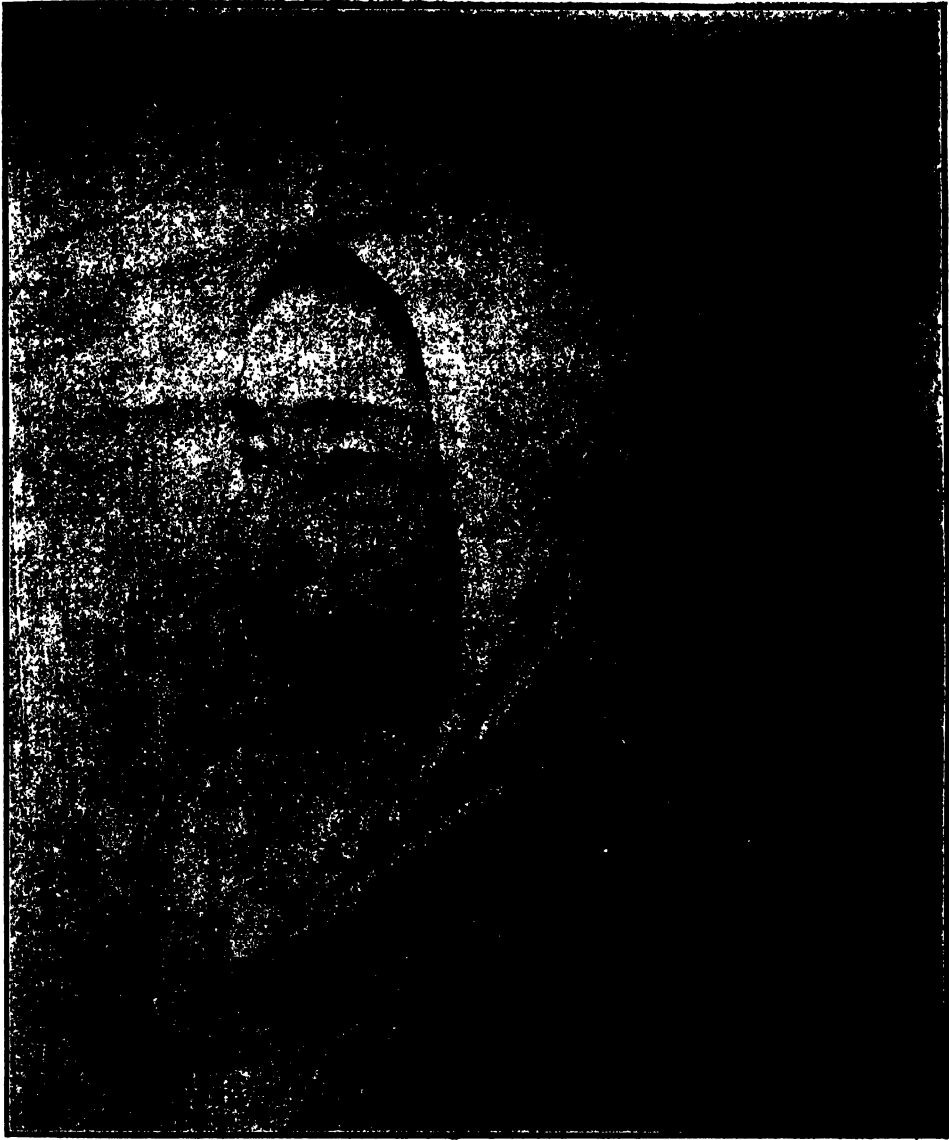
স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস।

এই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাইতেন মাত্র। তাঁহাকে নিকটে রাখার সাধ্য তাঁহার ছিল না, কারণ তাঁহারা বিলাত-ফেরত।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় বরিশালে অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা শীঘ্রই ছাত্র ও দেশবাসিগণকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

এইরূপে কিছু কাল সংসার-ধর্ম্ম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় পরলোক গমন করেন। তখন কৃষ্ণভাবিনী দাস অত্যন্ত নিরাশ্রয়া ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। শ্রীনাথ দাসের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁহার গৃহে তাঁহাকে স্থান দেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে পাশ্চাত্য চালচলন যাঁহার অস্থি-

মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, পতিবিয়োগে তিনি একেবারে সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। আহারাদি এদেশীয় হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদ মানিতেন না।

পতিবিয়োগে তাঁহার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা তিলোত্তমা পরলোক গমন করেন।

আঘাতের পর আঘাতই কৃষ্ণভাবিনীর জীবন-তরীর মুখ ফিরাইয়া দিয়াছিল। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনবরত অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেন। কিন্তু ব্যথা-হারী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল—এক সন্তানের জন্য যাহা পারি নাই জগতের সকল সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া তাহা করিতে হইবে। তাহাতেই আনন্দ, তাহাতেই শান্তি। বৃথা শোক করিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দিই কেন? নারী যদি জীবনে দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে না পারে তবে নারীর সার্থকতা কিসে?

তিনি হৃদয়ে বল পাইলেন, এক সন্তানকে শিক্ষা দিতে পারেন নাই, জগতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার দ্বারা সেই ক্ষোভ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

তাঁহার স্বামী আই-এ ও বি-এর পাঠ্য বইএর নোট লিখিতেন। সেই বইএর বার্ষিক আয় প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একখানি বাড়ী জীবনস্বত্ব লিখিয়া দেন, ইহার ভাড়াও মাসে প্রায় ৬০।৭০ টাকা হইত।

স্বামীর নোট লেখার সম্পত্তি ও বাড়ী ভাড়ার ৬০।৭০ টাকা—এই সকল টাকাই তিনি অনাথ ছাত্রছাত্রীদিগের বেতন ও নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। নিজের জন্য ১০৲ টাকা মাত্র রাখিয়া দিতেন, ইহাতেই তাঁহার সব ব্যয় সঙ্কুলান হইত।

১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম দিন যখন কৃষ্ণভাবিনী দাসের সহিত পরিচিত হইতে গেলাম, সে যে কি মূর্ত্তি দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না। ত্যাগে সন্ন্যাসিনী, ব্যবহারে মাতৃরূপিণী, রূপে লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেজে জলন্ত অগ্নি। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত পরিচয় হইয়াছে, অমন আপনা হইতে মাথা তো কাহারও নিকট কখনও নীচু হয় নাই, এ যে আপনা হইতে মাথা নীচু হইয়া পড়িল। এমন প্রাণ হইতে প্রণাম আমি আর কাহাকেও কখনো করি নাই।

ছয় বৎসর যাবৎ তাঁহার সঙ্গে বসবাস করিয়াছিলাম। দিনের পর দিন যত যাইতে লাগিল ততই তাঁহাকে ভালো করিয়া চিনিতে লাগিলাম। দেবীই বটে—দেবী না হইলে যে পতিতাদের দেখিয়া আমরা ঘৃণায় মুখ ফিরাই, তিনি তাহাদের বুকে তুলিয়া লইয়া প্রাণ শীতল করিতেন। অনাথা বিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি শক্তি সামর্থ্য অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"আমার এক সন্তান গিয়েছে, তার জায়গায় সহস্র সন্তান পেয়েছি—আনন্দময় আঘাতের ভিতর যে এত আনন্দ রেখেছেন তা জান্‌তাম না।" তিনি জীবনে সত্যকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধানও পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ভিত্তি যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজও তাহার জলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে।

যাঁহার বাৎসরিক আয় ৩।৪ হাজার টাকা, কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ নগরীতে তিনি কি প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে, কি শীতকালে, কি বর্ষাকালে পদব্রজে কনে-বৌটির মত আপাদমস্তক দেশী মোটা চাদরে ঢাকিয়া নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেন। নিতান্ত দূরে যাইতে হইলে ট্রামে যাইতেন, কিন্তু কচিৎ কখনও তাঁহাকে গাড়ী চড়িতে দেখিয়াছি। বিদেশে যাইতে হইলে তিনি তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া কখনও মধ্যম শ্রেণীতে যাইতেন না, বলিতেন—"নিজের আরামের চেয়ে ঐ টাকা যাদের প্রয়োজন তাদের দিলে প্রাণে আরাম পাই।"

তাঁহার হাত দুখানি সর্ব্বদাই কার্য্যে লাগিয়া থাকিত। এমন কি দাসদাসীদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে দেখিলে তাহাদের কার্য্য নিজে ভাগ করিয়া করিতেন। ব্যথিতের ব্যথা দেখিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিত ও চক্ষু

দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। কি অনাথাশ্রম, কি বিধবাশ্রম, কি বন্ধুবান্ধবের বাটী, যখনই যেখানে যাইতেন তাঁহার স্বামীর প্রিয় খাদ্যদ্রব্যাদি চাদরের নীচে লইয়া যাইতেন ও নিজের হাতে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। তিনি আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতেন ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন তাই নীরবে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিময় তাঁহার স্নেহক্রোড়ে তাঁহাকে স্থানদান করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মা আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হউক। তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসানেও তাঁহার অতিপ্রিয় মহামণ্ডলের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ভগবান মহামণ্ডল ও তাঁহার সম্পাদিকাকে দীর্ঘজীবী করুন—ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

আজ আর তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিব না; দেশের এ দুর্দ্দিন নয়, সুদিন। এই নবজাগরণের মন্ত্রে কৃষ্ণভাবিনীর আদর্শে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম যে যেখানে আছ জাগ। দেবী কৃষ্ণভাবিনী জন্মগ্রহণ করিয়া শুধু বঙ্গদেশের নয়, সমগ্র ভারতের ও নারীজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন।

দেশের এই সুসময়—এস সকলে তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন করি। পরহিতব্রত পালন করি—এই অভাগা দেশের চারিদিকে হাহাকার, দুঃখে তাপে আর্ত্তনাদে আমরা কি বধির হইয়া থাকিব? আমরা যে নারী জাতি। নারীর কর্ত্তব্য, নারীর ধর্ম্ম, নারীর মাতৃত্ব, নারীকে দেবী করিবে তবেই নারীজন্মের সার্থকতা। তাই কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আজ কেবল এই গাহিতে ইচ্ছা হয়—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

শ্রীক্ষেমঙ্করী দেবী

ইউরোপ-আমেরিকায় নানাদেশের নারী ছাত্রী

জগতের আজ বিশেষ সুদিন। জগতের সর্ব্বত্রই নারীরা সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদের উন্নত করিবার জন্য উঠিয়া-

লণ্ডনে একদল ভারতীয়া মহিলা-ছাত্রী। ছবির একেবারে বাঁ দিকে—মৈসুরের প্রধান মন্ত্রীর কন্যা। তাঁহার পরে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, ইঁহার বাড়ী ত্রিবাঙ্কুড়ে, বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন। অন্যান্য সকলে ডাক্তারী পড়িতেছেন। আমেরিকার অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসু এই ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।
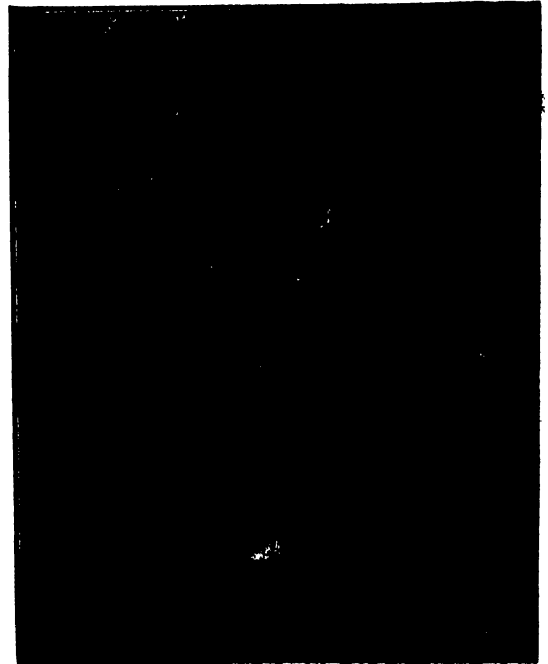
লণ্ডনের ভারতীয়া মহিলা-ছাত্রীরা টেনিস্ খেলিতে যাইতেছেন। আমেরিকার অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসু এই ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।

আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার ছাত্রী।
বাঁ হইতে ডান দিকে—কুমারী প্রভা দাসগুপ্তা (ভারতবর্ষ), ক্লারা কট্‌লেক্ (জাপান), য়ুকি-ও-সাওয়া এবং মিৎসুং দং (চীন)।
এই ছবি একটি আমেরিকান্ কাগজ হইতে গৃহীত।
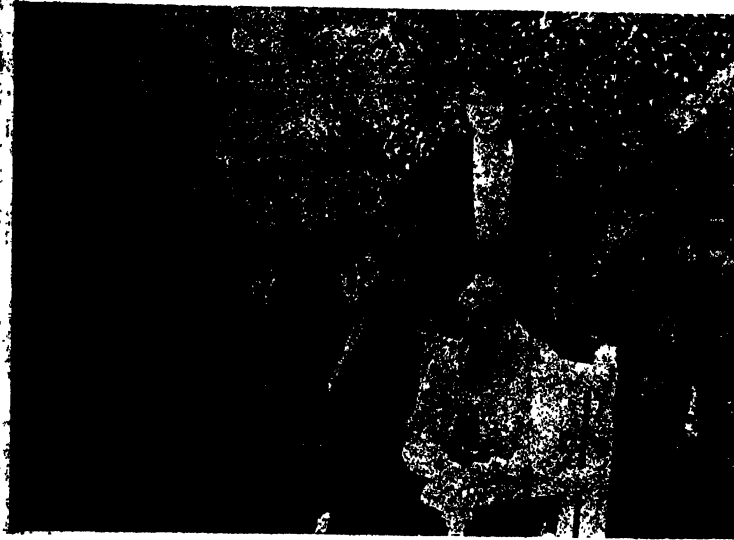
অক্সফর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্ট্ হাইল্ডাজ্ হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ছাত্রীবৃন্দ।
বাঁ দিক হইতে ডানদিকে—মিস্ রেমণ্ড (নিউজিল্যাণ্ড), মিস্ এ্যাসার (অষ্ট্রেলিয়া), মিস্ লব্ এবং মিস্ মারল্যাণ্ড (ক্যানাডা), মিস্ এ্যাস্‌প্লেন (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং কুমারী কমলা সরকার (ভারতবর্ষ)। এই ছবি Lectures Pour Tous নামক ফরাসী কাগজের ১৯২২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা হইতে গৃহীত।

পড়িয়া লাগিয়াছেন। স্বাধীন দেশসমূহে এ চেষ্টা খুবই অগ্রসর, এমন কি পরাধীন দেশেও নারীরা আপনাদের আত্ম-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিতেছেন। বুদ্ধিতে এবং শক্তিতে তাঁরা যে পুরুষের সমকক্ষ তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। একদিন ছিল যখন এশিয়া জ্ঞান-গরিমায় জগতের শিক্ষাদাত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিল। আজ পশ্চিম জ্ঞানদাতা। পশ্চিমের জ্ঞান-মন্দিরে এশিয়ার যে-সব নারী জ্ঞান আহরণ করিতে গিয়াছেন তাঁদের কয়েকজনের ছবি আমরা ছাপিলাম।

—

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকার নিবেদন

আজকার দিনে স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক, এ কথা বলিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। আমরা প্রতিদিনের জীবনে এই শিক্ষার অভাব এত অধিক অনুভব করিতেছি যে এই কর্ত্তব্য কত সত্বর সুচারুরূপে ক্রমে অগ্রসর করিতে পারি তাহাই ভাবিবার বিষয়। দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আবশ্যক প্রাণধারণ সম্ভবপর হয়; কিন্তু দারুণ অভাবের দিন যখন অতীত তখন যেমন আহার্য্য সম্বন্ধে আমরা সাবধান হই এখন শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল এদেশে পুরুষ-পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা চলিয়া আসিতেছে—ইহাতে আমাদের অনেক অভাব দূর হইলেও অনেক অভাবের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্র পতিত হয় নাই। তাঁহারা এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন আপন সুবিধার জন্য—আমরা এখন ইহা চাহিতেছি নিজস্ব শক্তির বিকাশের জন্য—স্ত্রী এবং পুরুষে যে বৈশিষ্ট্য বিধিদত্ত, তাহা রক্ষা না করিলে তাহা অশিক্ষা না হইলেও কুশিক্ষায় পরিণত হয়। কাজেই শিক্ষা যে-ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আর সে ভাবে চালানো চলিবে না; পরীক্ষা পাস করিয়া যে বিদ্যালাভ হয় তাহাতে আমাদের অভাব পুরে না, অনেক শিখিবার বিষয় পরে শিখিতে হয়, তাহাতে জীবনের সামঞ্জস্য হয় না। স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার ভার মাতৃজাতিকেই লইতে হইবে। এই অভাব পূরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও অন্তঃপুর-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে আমাদিগকেই।

আজ দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এই ভার গ্রহণ করিয়া দেশের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছে। অনেক ত্রুটিপূর্ণ ও বহু অভাবগ্রস্ত হইলেও এই কাজটির একমাত্র গৌরব—ইহা সম্পূর্ণ নারীশক্তিপরিচালিত। ইহার বিস্তার এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া আশা হইতেছে শ্যামলা বঙ্গভূমির বুকে এই যে ক্ষুদ্র বীজটি রোপিত হইয়াছিল, আজও যাহা অঙ্কুরের ন্যায় ক্ষীণ দুর্ব্বল ও সুকুমার তাহা একদিন মহীরুহে পরিণত হইয়া ছায়া আশ্রয়, ফুল-ফলদানে দেশকে নন্দিত করিতে পারিবে। আজ আমি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সেবিকারূপে আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি। মনে নিশ্চিন্ত আশা পোষণ করি যে কখনই বঞ্চিত হইব না। বর্ত্তমানে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের অধীনে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বে দুইটি ছিল, গত বৎসর চৈত্রের প্রথমে মির্জ্জাপুর স্ট্রীটে একটি নূতন শাখা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দিনে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫টি, এখন অন্যূন ৫০টি। শিয়ালদহ কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ডিসেম্বর মাসে ৭০টি এবং বহুবাজার কৃষ্ণভাবিনী বিদ্যালয়ে গত বৎসরের শেষে ছিল ৬৫টি। মির্জ্জাপুর স্কুলে দুইজন এবং শিয়ালদহ ও বহুবাজার বিদ্যালয়ে তিনজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। ভবানীপুরে অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে ৭জন ও কলিকাতা অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগে ৫জন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা কার্য্য পরিচালনা করেন। ভবানীপুরের অন্তঃপুর-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ আর কলিকাতা অন্তঃপুর-বিভাগের ছাত্রী-সংখ্যা ৪৫টি। বৎসরে দুইবার করিয়া স্কুলে ও অন্তঃপুরে পরীক্ষা করা হয় এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক ও পদক প্রভৃতি দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের উৎসাহ বাড়াইবার চেষ্টা করা হয় এবং এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া পুস্তক পরিবর্ত্তন করা হয়।

তিনটি স্কুল ও দুইটি অন্তঃপুর-শিক্ষা-বিভাগ ব্যতীত ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের নিজস্ব একটি শিক্ষয়িত্রী-ভবন আছে। তাহার ব্যয় কতক ব্যাঙ্কস্থিত টাকার সুদ হইতে ও কতক ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের আয় হইতে পূরণ করা হয়। সকলপ্রকার ব্যয়, বিশেষতঃ গাড়ীভাড়ার ব্যয় এত অধিক হইয়া পড়িতেছে যে কোনরূপ ব্যয়-সঙ্কোচ না করিলে সমিতির বিশেষ কার্য্যহানির সম্ভাবনা। তাই সাধারণের নিকট এই আশ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করি—যিনি যাহা দান করিবেন শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী
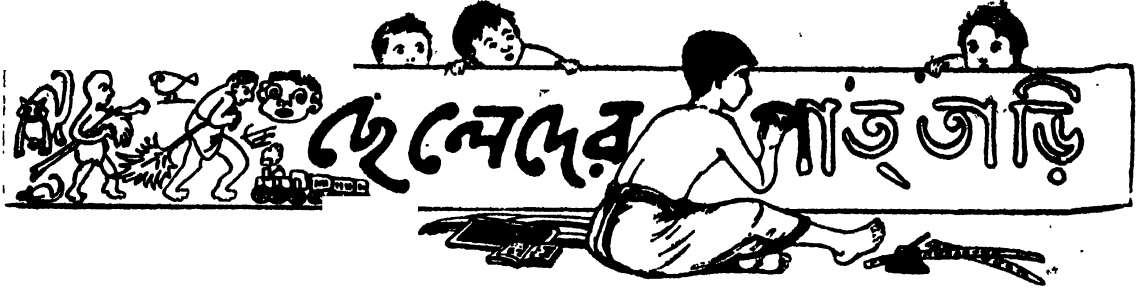
প্রকৃতির পাঠশালা

ব্লটিং কাগজে কালী চোষে কেন ?

ব্লটিং কাগজের আঁশ ছাড়া ছাড়া, আঁশের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে, তাতে কাগজে অসংখ্য ছিদ্র হয় ; সরু ছিদ্রের মুখের সঙ্গে তরল কালী ঠেকাঠেকি হইবামাত্র কৈশিক-আকর্ষণে কাগজের ছিদ্রের মধ্যে কালী শুষিয়া যায়। কেশ বা চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে আপনা হইতে জল আকৃষ্ট হয়, তাকে কৈশিক-আকর্ষণ বলে।

*

বুদ্বুদ গোল হয় কেন ?

জলের অতি পাতলা আবরণে যখন বাতাস বাঁধা পড়ে তখন হয় বুদ্বুদ ; পাতলা তরল আবরণের স্বাভাবিক একটা সঙ্কোচন-প্রবণতা (tension) থাকে ; তার জন্য বুদ্বুদটি সব চেয়ে সম্ভব ছোট আকার ধারণ করিবার চেষ্টা করে ; বৃত্তাকার হইতেছে বস্তুর সব-চেয়ে ছোট আকার ; কাজেই বুদ্বুদ বৃত্তাকার বা গোল হয়।

*

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় আঁকাশে নানা বর্ণবিন্যাস হয় কেন ?

সূর্য্যের আলোক শাদা ; শাদা রং বহু বর্ণের সমাবেশে হয়,—শাদা রঙের মধ্যে মোটামুটি সাতটি রং মিশ্রিত থাকে—বেগুনী, নীল, আস্‌মানী, সবুজ, হল্‌দে, কম্‌লা, লাল। শাদা আলো যদি খুব ছোট কোনো ফুটোর মধ্য দিয়া যায়, অথবা একটা তেশিরা কাঁচের মধ্য দিয়া যায়, তবে সেই শাদা আলো সাত রঙে ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়ে। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্যের শাদা আলো তেরছা হইয়া বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে ; এবং দুপ্রহরে আকাশের মাথায় সূর্য্য থাকলে সূর্য্যালোক খাড়া নামিয়া আসে ; খাড়া সূর্য্যালোককে যতখানি গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয়, তেরছা সূর্য্যালোককে তার চেয়ে গভীরতর বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় ; গভীরতর বায়ুস্তর ভেদ করিবার সময় শাদা সূর্য্যালোক বাতাসের মধ্যেকার ধূলা ও জলবাষ্পে ধাক্কা লাগিয়া সাত রঙে ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং আকাশে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস হয়।

*

পরিশ্রম করিলে লোকে হাঁপায় কেন ?

মানুষ নিশ্বাসে যে বাতাস গ্রহণ করে, তাহার মধ্যেকার অক্‌সিজেন গ্যাস তার রক্তকে ক্রমাগত তাজা করিতে থাকে ; রক্ত যত তাজা থাকে মানুষের শক্তি তত বেশী থাকে। পরিশ্রমের সময় শক্তি ব্যয় হয় ; কাজেই রক্তের মধ্যে বেশী অক্‌সিজেন গ্যাসের অভাব ঘটে, চাহিদা বেশী হয়, এবং ফুস্‌ফুস ঘনঘন বিস্ফারিত প্রস্ফারিত হইয়া নাক মুখ দিয়া ক্রমাগত বাতাস শোষণ করিতে থাকে ; আর লোকে হাঁপাইতে থাকে।

*

সমুদ্রের তলার জলের তাপ।

প্রায় সকল জিনিসই ঠাণ্ডা লাগিলে সঙ্কুচিত হয় এবং সঙ্কুচিত হইলেই বস্তুপিণ্ড ঘন হয়। জল শীতল হইলে ঘন হইতে থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তার তাপ শতভাগিক (সেন্টিগ্রেড) ৪ ডিগ্রিতে গিয়া পৌঁছে ; তার পর জল যত বেশী ঠাণ্ডা হয় তত বিস্ফারিত হইতে থাকে যে পর্য্যন্ত না শূন্য ডিগ্রিতে পৌঁছিয়া জমাট বরফ হইয়া যায়। যে বস্তু যত ঘন তাহা তত ভারি এবং তাহা তত তলায় পড়ে। সমুদ্রের জলরাশির বিরাট চাপে তার তলার জল সব-চেয়ে ঘন হয়, এবং জলের সবচেয়ে ঘন অবস্থার তাপ যখন শতভাগিক ৪ ডিগ্রি, তখন সমুদ্রতলের জলের তাপ ৪ ডিগ্রিই হইয়া থাকে।

খুকীর বাগান

শ্রীশান্তা দেবী কর্তৃক অঙ্কিত
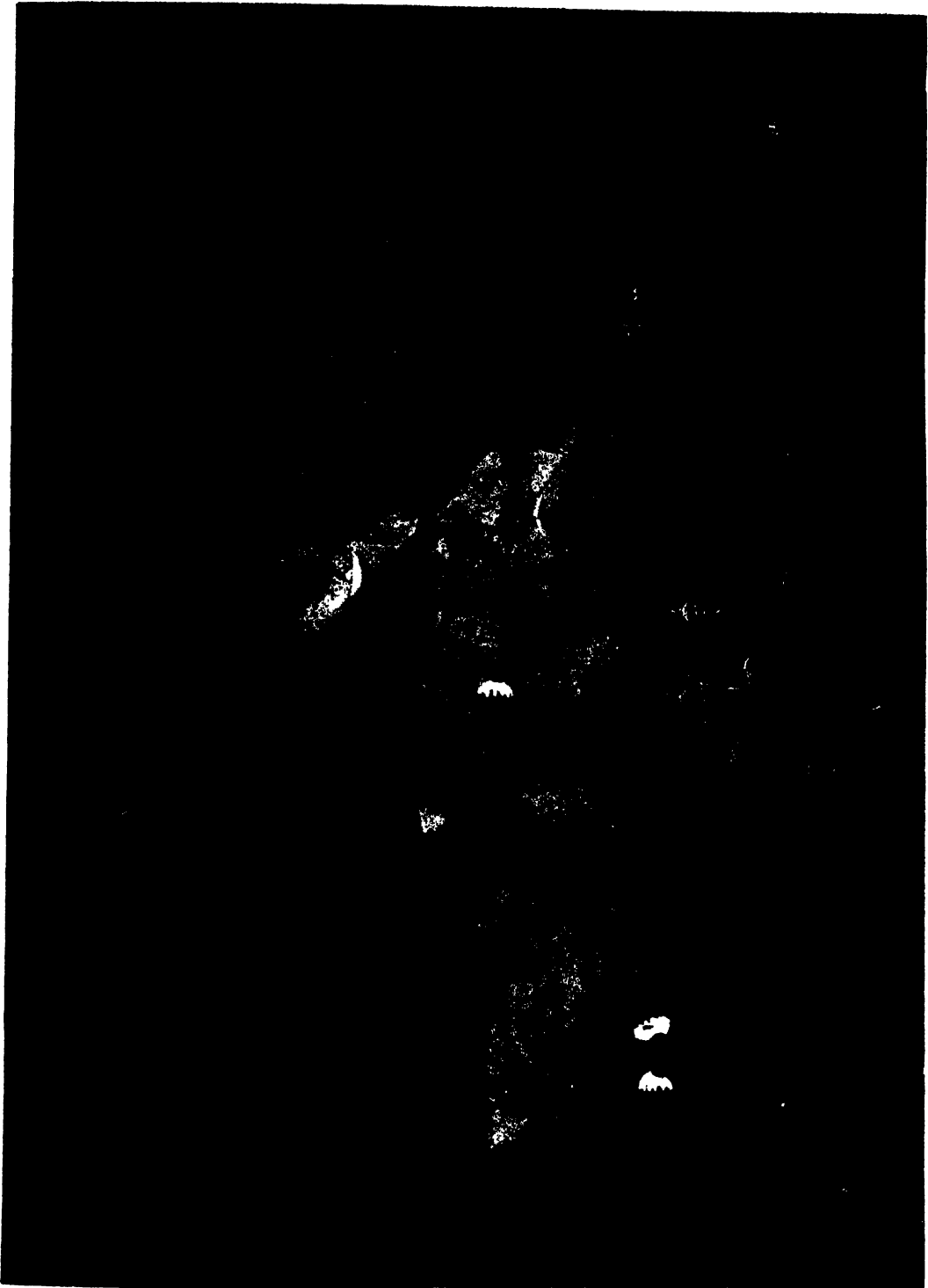
বৃষ্টি হয় কেন ?

বাতাস গরম হইলে হাল্কা হয়; হাল্কা জিনিস উপরে ভাসিয়া উঠে। কোথাওকার বাতাস গরম হইয়া উঠিলে উপরে উঠিয়া যায়; সেই বাতাস যদি জলবাষ্পে ভরা থাকে, আর উপরে উঠিতে গিয়া কোনো ঠাণ্ডা বাতাসের স্তরের সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে বাতাসের মধ্যেকার ধূলিকণার গায়ে জলবাষ্প জমিয়া জল হয়; যদি বেশী ঠাণ্ডার ফলে অণুপরিমাণ জলবিন্দুগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয় এবং বাতাসের ধারণের পক্ষে অধিকতর ভারী হইয়া পড়ে, তবে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে থাকে; ফোঁটার পর ফোঁটা ক্রমাগত ও দ্রুত নামিতে থাকিলে ধারা-বর্ষণ হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা এইসব কারণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি করানো সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন।

*

বিদ্যুৎ ও বজ্র

বৈদ্যুতিক প্রবাহের চক্রপথের মধ্যে যদি একটু ছেদ করিয়া ফাঁক করা যায়, তবে তারের এক মুখ হইতে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইয়া তারের অপর মুখে গিয়া লাগে। বাতাস সর্ব্বদাই বিদ্যুতে ভরা থাকে; অনুকূল অবস্থার সুযোগ পাইলেই বাতাসের বিদ্যুৎ এক স্থান হইতে অপর স্থানে লাফাইয়া গিয়া পড়ে; তখন আমরা বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখি। যখন বাতাস ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ ছুটে, তখন অনেকখানি বাতাস ধাক্কা খাইয়া দুপাশে সরিয়া যায়; বিদ্যুতের ঝাঁপ খাওয়া শেষ হইবামাত্র সেই ঠেলা বাতাস হঠাৎ ছাড়া পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ফাঁক ভরাট করে এবং সেই চেষ্টায় বাতাসের ধাক্কায় যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা বলি বজ্রধ্বনি।

গরম লাগিলে লোকে বাতাস করে কেন ?

গরম লাগিলে গায়ে ঘাম হয়। ঘাম যদি তাড়াতাড়ি শুকাইয়া দেওয়া যায় তবে ঘাম শুকাইবার সময় শরীরের তাপ অনেকখানি শোষণ করিয়া লইয়া যায়। ঘামের উপর শুষ্ক বাতাস ক্রমাগত লাগিতে থাকিলে ঘাম চটপট শুকায় ও শরীরের তাপ অনেকখানি শোষিত হওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়। কিন্তু বাদ্‌লা বা মেঘ্‌লা দিনে বাতাসের মধ্যে জলো বাষ্প প্রচুরভাবে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া বাতাস করিলেও ঘাম শুকায় না, এবং তখন আমরা বলি দিনটা গুমোট করিয়া আছে।

*

লুচি-রুটির ময়দা ঠাসার কি দরকার ?

যদি লুচি-রুটির ময়দা না ঠাসিয়া লুচি রুটি ভাজা যায়, তাহা হইলে লুচি-রুটি চিম্‌ড়ে শক্ত হয়। জল-মাখা ময়দা ঠাসিলে ক্রমাগত উপরের ময়দা নীচে ও নীচের ময়দা উপরে উঠা নামা করিতে থাকে ও ময়দার পরতে পরতে বাতাস বন্ধ হইয়া যাইতে থাকে; বাতাস-ভরা ময়দার লেচি বেলিয়া লুচি রুটি ভাজিলে গরম লাগিয়া বন্দী বাতাস বিস্ফারিত হয় এবং তার ফলে লুচি রুটি ফোলে, পরতগুলি পাতলা হয় এবং পাতলা বাতাস-ভরা লুচি-রুটি মুড়মুড়ে হয়। পাঁউরুটি তৈরি করিতে ময়দার মধ্যে baking powder বা yeast যোগ করে; বেকিং পাউডারে জল পড়িলে সেই পাউডারের টার্টারিক এসিড ও সোডিয়াম এসিড কার্বনেট মিলিয়া ময়দার মধ্যে কার্বন-ডায়োক্‌সাইড ছাড়িতে থাকে, এবং ময়দা সেই গ্যাসে পূর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া পাঁউরুটি ফোঁপ্‌রা বহুছিদ্রল হয়; ইয়েষ্ট বা খমীর যোগ করিলেও এইরূপ কার্‌বন-ডায়োক্‌সাইড নির্গত হয়। জিলিপি অমৃতীর গোলার মধ্যেও এইরূপ বাসী দইএর খমীর যোগ করিয়া জিলিপির নল ফাঁপানো হয়।

সর্দ্দার পোড়ো

—

ভালুকের বাচ্চা

প্যারিসে এক ভদ্রলোকের দুটি ছোট ছোট ভালুক-বাচ্চা আছে। স্ত্রী ভালুকটি সাইবেরিয়ার এবং পুরুষ ভালুকটি আমেরিকার। বাচ্চাদুটি দেখিতে কুকুর-বাচ্চার মত। এই বাচ্চা-দুটির প্রত্যেকটির জন্য ১০,০০০৲ করিয়া দাম উঠিয়াছে।

অদ্ভুত বিড়াল

আমেরিকার উত্তর উইস্‌কন্‌সিন প্রদেশে এক ভদ্র-লোকের একটি বিড়াল আছে। এই বিড়ালটির খাইবার

বিড়াল থাবায় করিয়া দুধ খাইতেছে।

ধরণ-ধারণ মোটেই পশুর মত নয়। সে বাটিতে মুখ ঢোকাইয়া জিব দিয়া দুধ খায় না। থাবা দিয়া দুধ তুলিয়া মুখে দেয়। ইহাতে সময় কিছু বেশী লাগে, কিন্তু দুধ এক ফোঁটাও পড়িয়া থাকে না। জন্মের পর হইতেই সে এম্‌নি ভাবে খায়।

কাঠের বই

সিংহলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঠের বই
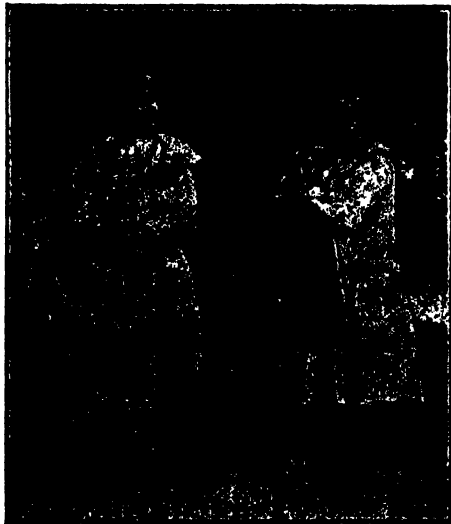
কাঠের বই লইয়া ছোট ছেলেমেয়ে পাঠশালার পথে।

পড়ে। কাঠের শ্লেটের উপর রঙে পাঠ লেখা থাকে—সেই পাঠটি পড়ুয়ার মুখস্থ হইলে এবং সে তাহা বার-দুয়েক ঠিক মত বলিতে পারিলে, গুরুমশায় রঙের লেখা তুলিয়া আবার নূতন পাঠ লিখিয়া দেন। ইয়োরোপে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পূর্ব্বে এই পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়া হইত। তবে কাঠের পরিবর্ত্তে টিন ব্যবহার হইত। অক্ষর লিখিয়া তাহা মুছিয়া যাইবার ভয়ে শিঙের পাতে ঢাকিয়া দেওয়া হইত। ইহাকে "শিঙা-পুস্তক" বলা হইত।

হেমন্ত

বর্ষায়

ঘুটঘুটে কালো মেঘ, দেখে' লাগে ভয় ;
এমন সময়ে বাছা ছেড়ো না 'ক ঘর।'
খোপে-খাপে কোলা ব্যাঙ, ঝোপে-ঝোপে সাপ,
দেখে' চম্‌কাবে পিলে, মরে' যাবে বাপ।
বিট্‌কেল আঁধারে ভূতগুলো পিল্‌পিল্‌
স্যাঁৎস্যাঁতে ডোবা ছেড়ে তালগাছে কিল্‌বিল্‌।
সারাদিন বিছানায় ছেলেদের হুড়্‌দাড়,
হুঁকো রেখে হাঁক দেয় ঘনশ্যাম পোদ্দার।
হেনকালে ও-পাড়ার ঢ্যাঙ্গা তেলি প্যালারাম
গুটিগুটি চলে পথে, ভয়ে ডাকে রামনাম।
বাঁধ-পাড়ে মাম্‌দো—ভূত বড় বেয়াড়া,
কাঁচা ফল কেড়ে খায়—আম জাব পেয়ারা,
ছোট ছেলে দেখে যদি নাকে দেয় খাম্‌চে,
থুথ্‌থুড়ো বুড়ো পেলে দেয় মুখ ভাঙ্‌চে।
বাব্‌লার গাছগুলো—ডাল তার পট্‌কা,
হাড়গিলে ভূত বলে' মনে লাগে খট্‌কা।
নদীপারে শরবনে বিদ্যুৎ দম্‌কায়,—
জান্‌লার ফাঁকে দেখি—তাও পিলে চম্‌কায়।
বাবুদের পোড়ো বাড়ী রাস্তার বাঁ-ধারে,
হুতুম-পেঁচারা ডাকে থম্‌থমে আঁধারে।
বাঁশবনে ফুস্‌ফাস্‌—বাতাসের ধাক্কায়,
কঞ্চিতে কঞ্চিতে শাঁকচুনি পাক খায়।
ওধারে যেয়ো না বাবা জুলপিতে ধর্‌বে,
ভরা সাঁঝে কেন বাপু বাঁশঝোপে মর্‌বে ?

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

শেয়াল কেন 'হুকা হুকা' করে

(সাঁওতালি গল্প)

তিল-সংক্রান্তির দিন সাঁওতালরা ভাল খাওয়া-দাওয়া করে' দল বেঁধে জঙ্গলে শীকার করতে বেরোয়। ঐ হ'ল ওদের উৎসব। একবার এই তিলসংক্রান্তির দিন একদল সাঁওতাল শীকার করবার জন্যে একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলে ঢুকেছে। এখন সেই বনে ছিল মস্ত এক বাঘ; সে দেখলে—গতিক ভাল নয়, এখানে বেশীক্ষণ থাকলেই সাঁওতালদের তীর তার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে' ফেলবে। এই ভেবে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল।

সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা ছিল। এক কাঠুরিয়া কাঠ কেটে তার গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে' সেই রাস্তা দিয়ে রোজ বাড়ী ফিরে যেত। সে-দিনও বেচারা তার গাড়ী হাঁকিয়ে বাড়ীর পথে চলেছে, এমন সময় বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে এসে বলল—"কাঠুরে ভাই, কাঠুরে ভাই, আজ আমাকে তুমি বাঁচাও। সাঁওতালরা দেখতে পেলে এখনি আমায় সাবাড় করে' ফেলবে। আজ যদি তোমার কৃপায় প্রাণে বাঁচতে পারি তবে কোনো দিন তোমার অনিষ্ট ত করবই না, বরং চিরদিন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।"

কাঠুরিয়া গরীব হলেও তার প্রাণটা ছিল বড় ভাল। অন্যের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদত। সে তাড়াতাড়ি একটা থলির ভিতর বাঘকে ভরে' ফেলল আর আশ্বাস দিয়ে বলল—"বাঘ ভাই, তোমার আর কোনও ভয় নেই।"

শীকার শেষ করে' সাঁওতালরা সেই পথ দিয়ে নিজের নিজের গ্রামে চলে' গেল; থলির ভিতর যে বাঘ আছে তা তারা জানতেই পারল না।

তারা চলে' গেলে কাঠুরিয়া থলির মুখ খুলে দিল, আর অমনি বাঘ বেরিয়ে এসে চোখ-দুটো লাল করে' বলল, "আগে তোকেই খাই কি আগে গরু-দুটোকেই খাই?"

কাঠুরিয়া বেচারা ত হতভম্ব। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল—"সে কি ভাই, উপকারের প্রতিদান কি এই?"

বাঘ দাঁত কড়মড় করে' বলল—"নিশ্চয়, জিজ্ঞেস কর-না এই বটগাছকে।"

সেখানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, সে সমস্তই দেখেছিল। সে বলল—"ভাই, উপকারীর উপকার কেউ করে না, এই দেখনা মানুষে আমার ছায়ায় বসে আবার আমারই ডাল কেটে নিয়ে যায়।"

বাঘ বলল—"কেমন কাঠুরিয়া, এইবার তোকে খাই?"

কাঠুরিয়া আর কি বলবে? সে বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপতে লাগল।

এমন সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। বাঘ বলল—"আচ্ছা এই শেয়াল-মামা যা বলবে তাই হবে।"

শেয়াল এসে সমস্ত কথা শুনল, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল—"উঁহু, ব্যাপারটা আমি নিজের চক্ষে না দেখলে কিছুই বলতে পারব না। বাঘকে আবার সেই থলির মধ্যে ঢুকতে হবে।"

বোকা বাঘ অমনি থলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আর শেয়াল আচ্ছা করে' তার মুখ বন্ধ করে' দিয়ে কাঠুরিয়াকে বলল—"ন্যায় বিচার যদি চাও তবে শীগগির বড় দেখে' একটা মুগুর নিয়ে এস।"

এতক্ষণে কাঠুরিয়ার আবার সাহস ফিরে এসেছে। সে একটা প্রকাণ্ড মুগুর এনে ধাঁই ধাঁই করে' সেই থলির উপর এমন মার দিল যে বাঘ একেবারে ছাতু হয়ে গেল।

তারপর কাঠুরিয়া শেয়ালকে বলল—"ভাই, তোমার উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু—আর এই বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তোমাকে তামাক খাবার জন্যে একটি হুকা উপহার দেব।" এই বলে' কাঠুরিয়া বাড়ী চলে' গেল।

শেয়াল সেই দিন থেকে হুকার অপেক্ষায় বসে' রইল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। তাই যখনই তার হুকার কথা মনে পড়ে তখনই ডাকে—"কই হুকা, হুকা, হুকা।"

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

সপ্তে ব্রত

দিনাজপুর জেলার বিশেষতঃ রাইগঞ্জ থানার অন্তর্গত হাড়ী জাতীয় মেয়েরা প্রতিবৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার দিন একটা ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এই ব্রতকে ইহারা সপ্তে ব্রত বলে। আমার বিশ্বাস, শক্তি বা সতী ব্রত হইতেই সপ্তে ব্রত নাম হইয়াছে। ব্রতের পূর্ব্বদিন মেয়েরা সংযম করিয়া ব্রতের দিন উপবাস করে এবং দ্বিপ্রহরের পর হইতেই যথাসম্ভব সাজসজ্জা করিয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে আসিয়া সকলে মিলিত হয়। ব্রতের কথা শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি একটি বর্ষীয়সী নারী দ্বারা কথিত হয়। এবং ইহার সম্মুখে একটি ঘট স্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে কথার বিরাম-কালে ঘটোপরি পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রতচারিণী মেয়ে কলা কেশুর প্রভৃতি ফলমূল আনিয়া ঘটের চতুর্দ্দিকে রাখিয়া দেয়। কথা শেষ হইলে কথয়িত্রী মেয়েটি প্রত্যেকের হাতে এক গুচ্ছ করিয়া ডোরা রাখী বাঁধিয়া দিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস এই ব্রত-স্থানে মানত করিলে বা বর প্রার্থনা করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ডোরা বাঁধার পর সমবেত নারীমণ্ডলী মিলিত-কণ্ঠে সঙ্গীতালাপ করিয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য ইহাদের কয়েকটি সঙ্গীত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সপ্তে ব্রতের গান

(১)

হাতে সবে বাজুবন, গলায়ে সবে ঢোলনা,
আজু দিনে চন্দনে ঢালবি এগেনা *।
হামে নাই জানি রে সপ্তে মায়ের এগেনা,
আজু দিনে চন্দনে ঢালিব এগেনা। ইত্যাদি

(২)

খেলা খেলাইতে হ্যারাইয়া গেল কোটরা,
ছাইবে দেহ * জালুয়া হে ভাইয়া ।
ও মোর সোনার কোটরা।

(৩)

ইজুবস্ত শশুরাল গে বিজুবস্ত তোর নেইর গে,
কিসের লবে * মা এলেন মান্বী-কুল গে।
চন্দনের লবে মা এলেন মানবী কুল গে।
ধূপের লবে সিন্দুরের লবে ফুলের লবে মা এলেন।
ইত্যাদি।

এখন এই হাড়ী জাতি সম্বন্ধে দুইটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহারা মৎস্য বিক্রয় করে, কিন্তু মৎস্য ধরে না। বিবাহ পূজা পরবে বাজনা বাজায়। কেহ কেহ বাঁশের চাটাই পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহারা মুরদাফরাস জাতীয় হাড়ী বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের জাতীয় উপাধি কেহ কেহ হাজরা, সর্দ্দার বলিয়া থাকে। অনেকের আকরিক বিদ্যাও আছে। অনেকেরই বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার। ইহারা হরিনাম ভালবাসে। তুলসী-বেদী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। মাংস-ভক্ষণ ইহাদের পক্ষে নিষেধ। মেয়েদের মধ্যেও অনেকে বেশ গান গাইতে পারে।

* এগেনা —আঙিনা।
ছাইবে দেহ —খুঁজিয়া দাও।
লবে —লোভে।
হ্যারাইয়া —হারাইয়া।

শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি

রাজা

কহিলেন বাদশাহ উজিরে তাঁহার,
'খোদা না পারেন যাহা হেন কিছু কাজ,
করিতে পারার শক্তি আছে কি আমার?
ঠিক না কহিলে তব মাথা যাবে আজ!'

ক্ষণেক ভাবিয়া নিয়া কহিল উজির,
'আছে হেন কাজ প্রভু আছে হেন কাজ,
নিজ রাজ্য হতে কোন প্রজারে বাহির
করিতে পারে না খোদা, পার মহারাজ।'

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শূদ্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে গত পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে। তাঁহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ—ক্ষুদ্র > খুদ্র > শুদ্র > শূদ্র।

প্রথম কথা ক্ষ বিকৃত হইয়া বৈদিক যুগে (শূদ্র বৈদিক যুগের শব্দ) ষ হইতে পারে কি না। শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন আবেস্তায় ক্ষ স্থানে ষ হয়। কিন্তু আবেস্তার শব্দতত্ত্ব (phonology) যে বৈদিক ভাষায়ও খাটিবে তাহার প্রমাণ কি? প্রকৃত প্রস্তাবে মূল হিন্দু-ঈরাণীয় শ্‌-স্‌ ও ক্‌-স্‌ হইতে বৈদিকে ও সংস্কৃতে ক্‌-ষ্‌ (=ক্ষ) হইয়াছে। কিন্তু আবেস্তায় মূল শ্‌-স্‌ স্থানে ষ্‌ এবং মূল ক্‌-স্‌ স্থানে খ্‌-স্‌ হয়।* এই নিয়মানুসারে মূল হিন্দু-ঈরাণীয় *কসুদ্র হইতে আবেস্তায় খযুদ্র (ক্ষুদ্র নহে) এবং বেদে ক্ষু (=ক্ষু) দ্র হইয়াছে† এবং মূল √*শ্‌সি, *মশ্‌সু, *দশ্‌সিন স্থানে বৈদিক ক্ষি, মক্ষু, দক্ষিণ এবং আবেস্তায় ষি, মোষু, দষিণ হইয়াছে।‡ যদিও পহ্লবী ও আধুনিক পারসীতে মূল শ্‌-স্‌ ও ক্‌-স্‌ উভয়স্থানে ষ্‌ (শীন) হয়; কিন্তু তাহা দ্বিতীয় স্তরের নব্য শব্দ-বিকার। প্রাচীন আবেস্তার ভাষায় কিংবা প্রাচীন পারসীতে এইরূপ দেখা যায় না। প্রাচীন ঈরাণীয় ভাষায় শ্‌-স্‌ ও ক্‌স্‌ স্থানে য্‌ (বা শ্‌) হইলেও (যদিও ক্‌-স্‌ > ষ্‌ হইবার কোন প্রমাণ নাই), প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় ঐরূপ বিকার না হইতেও পারে। ভারতীয় ভাষার প্রমাণ স্থলে শাস্ত্রী মহাশয় ক্ষিপ্রা স্থানে শিপ্রার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় ক্ষ স্থানে স হয় এবং বেদে স স্থানে শ হয়। এই প্রমাণ সন্তোষজনক মনে হইতেছে না। প্রথমতঃ, ক্ষিপ্রা > শিপ্রা সন্দেহজনক। ইহা সাধারণ ব্যুৎপত্তি (popular etymology) মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মারাঠী প্রভৃতির শব্দবিকার তৃতীয় স্তরের আধুনিক রূপ—বৈদিক ক্ষ > প্রাকৃত ছ > মারাঠী স। মারাঠী ভাষায় তালব্য বর্ণের উচ্চারণ (তালব্য স্বর যুক্ত না হইলে) দন্ত-তালব্য।§ এই জন্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছ স্থানে দন্ত তালব্য tsh দিয়া স (এবং তালব্য স্বরের সহিত শ) হওয়া মারাঠীর একটি লক্ষণ; যথা, সং. ছল > মা. সল্‌, সং. মৎস্য > প্রা. মচ্ছ > মা. মাসা।* মারাঠীর পূর্ববস্তর মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃতে এইরূপ শব্দবিকার পাওয়া যায় না। সিংহলী প্রভৃতি ভাষায় ঐরূপ কোন কারণে মূল ক্ষ স্থানে পরবর্ত্তী ছএর মধ্য দিয়া স হইয়া থাকিবে। কাজেই মারাঠী প্রভৃতির শব্দ-বিকারের একটি নিয়ম প্রাচীন বৈদিকযুগের প্রাকৃতে (যদি আমরা শূদ্রকে ক্ষুদ্র শব্দের প্রাকৃতরূপ সাব্যস্ত করিতে চাই) খাটান সঙ্গত মনে হয় না। তৃতীয়তঃ মারাঠী প্রভৃতির স স্থানে বৈদিকে শ করা একেবারেই যুক্তিবিরুদ্ধ।

তবে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে? বত্‌লিমিয়ুস (গ্রীক Ptolemaiss শব্দ হইতে আরবীরূপ) উত্তর আরাখোসিয়ায় (Arachosia, আধুনিক আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ) Sudroi নামে একটি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক যুগেও এই জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহারাই প্রথমে শূদ্ররূপে অভিহিত হইয়াছিল, পরে অন্যান্য অনার্য্যগণ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিবেচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।+

মহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

* Macdonellএর Vedic Grammar § ৩৮.১।

† ঐ § ৩৪.১ *b* এবং Pischelএর Grammatik der Prakrit Sprachen § ৩১৯।

‡ Macdonellএর Vedic Grammar § ৩৪ ১*a*, শাসনার্থে মূল √* কৃসি, বৈদিক √ক্ষি, আবেস্তা √খ্‌ষি, মূল √ * কৃসিপ্‌, বৈদিক √ক্ষিপ্‌, আবেস্তা √খ্‌ষিব। আবেস্তা √ সিপ্‌ মূল √* কৃসিপ্‌ হইতে আসিতে পারে না; সুতরাং তাহা বৈদিক ক্ষিপ্‌এর সমান নহে।

§ G. R. Navalkarএর The Students' Marathi Grammar (3rd ed.) § ১৪ (২).

* Jules Blochএর La Formation de la Langue Marathe, §. ১০৩।

† Hastingsএর Encyclopaedia of Religion and Ethicsএ Sudra প্রবন্ধ।

বিনয়-বাবুর "উইণ্ড্‌ মিল" সম্বন্ধে প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় তাঁহার "বার্লিনের পথে" প্রবন্ধে (প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩২৮, ৬১১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—"... মাঠের কোথাও কোথাও দু-একটা কুঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুযন্ত্র বা বাতাসে নিয়ন্ত্রিত কল দেখা যাইতেছে। এইগুলি বাষ্পযুগের পূর্ব্বেকার অর্থাৎ মধ্যযুগের নিদর্শন। এশিয়ায় বোধ হয় কোনো যুগেই এই ধরণের উইণ্ড্‌ মিল (Wind Mill) উদ্ভাবিত হয় নাই।"

বায়ুযন্ত্র বা "উইণ্ড্‌ মিল" খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনীসীয় ভ্রমণকারী মার্কো পোলো (Marco Polo) চীন দেশ হইতে স্বদেশে লইয়া যান; তাঁহার "Spoils of the East"এর মধ্যে এই উইণ্ড মিল একটি সামগ্রী। ঐতিহাসিক মায়ার্স (Myers) বলেন,—"Various arts, manufactures, and inventions (among these the Wind Mill) before unknown in Europe, were introduced from Asia." তারপর foot-note 16, উইণ্ড্‌ মিল প্রসঙ্গে মায়ার্স লিখিয়াছেন,—"Wind mills were chiefly utilised in the Netherlands, where they were used to pump the water from the oversoaked lands, and thus became the means of creating the

most important part of what is now the Kingdom of Holland."

—Myers' 'Middle Ages", page 252.

বিনয়-বাবুকে এ সম্বন্ধে বার্লিনে পত্র দিয়াছিলাম। তাঁর ইচ্ছামত এই পত্র প্রবাসীতে পাঠাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"উইণ্ড মিল (Wind Mill) সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আমার জানা ছিল না। মার্কো পোলোর বিবরণটি মনে থাকিলে একটা ভুল লিখিয়া বসিতাম না, নিশ্চয়। যাহা হউক লেখাটা যখন গ্রন্থাকারে বাহির হইবে, তখন শুধ্‌রাইয়া দেওয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আপনি "প্রবাসীতে" একটা মন্তব্য পাঠাইয়া পাঠকগণের ও সঙ্গে সঙ্গে আমারও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন। আশা করি আপনি পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য উপরিলিখিত মন্তব্যের সহিত এই পত্রাংশটুকুও উদ্ধৃত করিবেন। ইতি......"

শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার [বি-এ]

—

মিঃ হুজ্‌ওয়ার্কের তাঁত

গত ২৩শে চৈত্রের সঞ্জীবনীতে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়:—

"শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল খদ্দর বা দোসুতি তৈয়ারের এক নূতন তাঁত পাঠাইয়াছেন। পুরাতন প্রণালীর তাঁতে প্রতিদিন ১০ হইতে ১৫ গজ দোসুতি তৈয়ারী করা যাইত। কিন্তু উইভিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ হুজ্‌ওয়ার্ক্ এক নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা গ্রাম্য সূত্রধরেরাই নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। উহাতে প্রতিদিন দ্বিগুণ কাপড় তয়ারী হইবে। একজন তাঁতি রোজ ৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে।"

কলিকাতার আপার সার্কুলার রোড্‌স্থ ৯৭-এ সংখ্যক ভবন নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে, তিনি এই তাঁত সম্বন্ধে মিঃ হুজ্‌ওয়ার্কের সহিত মৌখিক আলোচনা করেন, এবং তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। এই প্রশ্নগুলি ইংরেজী দৈনিকে ছাপা হয়। উত্তরগুলি বেশ বিশদ ও সন্তোষজনক না হওয়ায় ললিতবাবু হুজ্‌ওয়ার্ক্ সাহেবকে পুনর্ব্বার চিঠি লিখিয়াছেন। ললিতবাবু উত্তরগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমাদিগকে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ এবং উহার সব কথা সাধারণ পাঠকবর্গের বোধগম্য হইবে না বলিয়া আমরা চিঠিখানি আদ্যোপান্ত ছাপিতে পারিলাম না। ললিত-বাবুর শেষ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এবিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ। "সঞ্জীবনী" যে তাঁতের কথা লিখিয়াছেন তাহা "বেরী তাঁত" নামে পরিচিত।

"প্রথমতঃ—হস্তচালিত বিলাতী বা বেরীর ভারী তাঁতে এদেশীয় সাধারণতঃ অন্নক্লিষ্ট ও ভগ্নস্বাস্থ্য একটি কারিকরকে প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা পরিশ্রমের পর কিছু বিশ্রাম করিয়া হিসাবমত ৯ ঘণ্টার বেশী সময় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। আর তাহার এই শ্রমোৎপন্ন দৈনিক বস্ত্রের পরিমাণ আধুনিক উন্নত প্রণালীর fly-shuttle loomএ কর্ম্মপটু একজন অভিজ্ঞ তাঁতীর দৈনিক-পরিশ্রমজাত বস্ত্রের অপেক্ষা অধিক নহে। তাহা হইলে ফলে উভয়প্রকার লুমে তৈয়ারী বস্ত্রের পরিমাণ সমান হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যহীনতা বশতঃ অত্যন্ত ভারী লুমে অধিক পরিশ্রমের জন্য প্রতি অর্দ্ধঘণ্টার পর কিছু বিশ্রাম—কর্ম্মীর ক্রমশঃ সামর্থ্যক্ষয়ের সূচনা করিতেছে।

"দ্বিতীয়তঃ—বেরী লুমের দাম ৫৫০৲ টাকা, ইহার অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের দাম কমপক্ষে আরও ৩০৲ টাকা, মোট ৫৮০৲ টাকা। দৈনিক ২০।৩০ গজ খদ্দর কাপড় পাওয়া যায়, একখানা উন্নত প্রণালীর fly-shuttle loom সাজ-সরঞ্জাম সমেত মূল্য মাত্র ১০০৲। তাহাতে খদ্দর অর্থাৎ ১০নং সূতায় ৫০ হইতে ৬০ বার প্রতি মিনিটে মাকু ছুড়িয়া (অর্থাৎ পোড়েন দিয়া) একজন তাঁতি দৈনিক প্রায় ২০ গজ কাপড় বুনিতে পারিবে। অতএব এই ৫৮০৲ টাকা বেরীর লৌহ-নির্ম্মিত তাঁতের পরিবর্ত্তে ৫খানি fly-shuttle loomএ (প্রত্যেকখানি ১০০৲ টাকা হিসাবে) প্রত্যহ কমপক্ষে ১০০ গজ কাপড় তৈয়ার করা যাইবে।

"তৃতীয়তঃ—অধিকন্তু দেশী সূত্রধরেরাই ঐ সকল fly-shuttle তাঁত মেরামত বা তৈয়ার করিতে পারে। কিন্তু বেরী তাঁতের অসুবিধা এই যে গ্রাম্য কারিকরদ্বারা লৌহনির্ম্মিত তাঁত মেরামত হওয়া একান্ত অসম্ভব। প্রকৃত খদ্দর কাপড় হাতে কাটা সূতার টানা ও পোড়েনে তৈরী। কিন্তু হাতে কাটা টানার সূতা বুনিবার পক্ষে কম মজ্‌বুত হওয়ায় ও বয়নকালীন অসুবিধা বিধায় আজকাল দেশী মিলে কাটা সূতা টানা করা হয় ও চরকার সূতা পোড়েন করা হয়।"

*

"মাছির ডিম হইতে পুদিনার উৎপত্তি"

আমরা একজন জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে অবগত হইলাম, যে, মাছির ডিম হইতে পুদিনার চাষের যে বৃত্তান্ত বৈশাখের প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে বাহির হইয়াছে, তাহা অসম্ভব ও মিথ্যা। সহজ জ্ঞানেও বলে, যে, ইহা অসম্ভব ও মিথ্যা।

—প্রবাসীর সম্পাদক

ঝিনুক

"অন্যে যতই দামী জিনিস বিনুক",
সাগরতীরে বল্‌চে পড়ি' ঝিনুক,—
"লক্ষ্মী মায়ের সোনার ঝাঁপি
হীরা চুনীর নামেই কাঁপি,
ধনী যারা এসব তারা কিনুক।"

"আমি র'ব পড়ি' সাগর-কিনার,
বালুর 'পরে গাঁথ্‌ব আশার মিনার।
রামধনু-রঙ্ হৃদয় খুলি'
যে-দিন দিব মুক্তাগুলি,
বিশ্ব সে-দিন জানুক আমায় চিনুক।"

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র
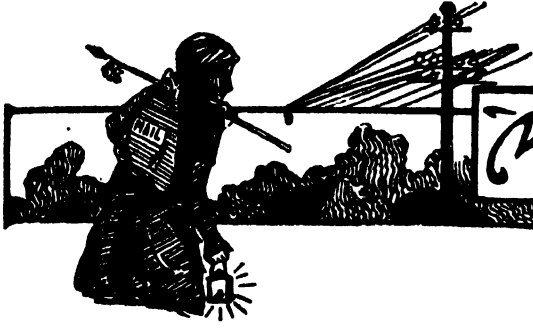
বিদেশ

জেনোয়া বৈঠক—

হৃতশ্রী ইউরোপের পুনরুদ্ধার-সাধনই জেনোয়া বৈঠকের উদ্দেশ্য, প্রকাশ্যভাবে সকলে ইহা স্বীকার করিলেও পরোপকার-প্রবৃত্তি হইতে এই বৈঠকের ব্যবস্থা হয় নাই। সম্মিলনোন্মুখ জাতিবৃন্দ গোপনে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজিতেছিলেন। ইউরোপের রাষ্ট্র-কুশল দেশপ্রধানদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা তাই জেনোয়াতে বেশ ভাল রকমেই চলিতেছে। যতদূর দেখা যাইতেছে, প্রথম হইতেই রাশিয়ার বোল্‌শেভিকরাই জিতিয়া চলিয়াছেন। কূটনীতির যে পরিচয় রাশিয়ার প্রতিনিধিগণের নিকট পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিক মিত্রশক্তিবর্গকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছে। রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ জেনোয়ায় আসিবার পথে বাল্টিক-উপকূলস্থ রিগা সহরেই প্রথম কিস্তি জিতিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বাল্টিক রাজ্য-সমূহের সহিত একটি সন্ধি করিয়াছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের রাষ্ট্রন্দ এ-যাবৎ-কাল কোনও রাজ্য স্বীকার করেন নাই। এই রিগা সন্ধির একটি সর্ত্ত অনুসারে পোলাণ্ড, এস্‌থোনিয়া ও লাট্‌ভিয়া রাজ্য সোভিয়েট-শাসনতন্ত্রকে রাশিয়ার নিয়মসঙ্গত এবং সুপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৈধ রাষ্ট্রতন্ত্ররূপে সোভিয়েট শাসনপ্রণালী এই প্রথম স্বীকৃত হইল। জেনোয়ার জন্য রওনা হইবার পূর্ব্বে সোভিয়েট প্রতিনিধি চিচেরিন বলিয়াছিলেন যে, রাশিয়াতে বিদেশী ব্যবসায়ীকে ব্যবসা করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রাশিয়ার সোভিয়েট শাসনতন্ত্রকে আইনসঙ্গত ও সুপ্রতিষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া মিত্রশক্তি-বর্গকে স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ জেনোয়ায় আসিবার পথে পারিতে ফরাসী প্রতিনিধি পয়াঁকারের সহিত দেখা করিয়া স্থির করেন যে মুদ্রার মূল্য, বিনিময়ের হার, শুল্ক প্রভৃতি সঠিক ভাবে নিরূপণ করিয়া যাহাতে অর্থসাম্য সাধিত হইয়া ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা হিত সাধিত হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা জেনোয়া বৈঠকে করিতে হইবে।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে জেনোয়া সহরে বৈঠক আরম্ভ হয়। এবং এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য এক-একটি কমিটি গঠিত হয়। ইউরোপের সুপ্রিম কাউন্সিলের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য-নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইটালীর পক্ষে সিনর ফ্যাক্‌টসার (সভাপতি), জার্ম্মানীর হার বির্থ, ইংলণ্ডের লয়েড জর্জ্জ, রাশিয়ার চিচেরিন, ফ্রান্সের বার্থু, সুইজারল্যাণ্ডের মোট্টা, বেল্‌জিয়ামের থিউনিস্‌, সুইডেনের ব্রান্টিং, জাপানের ইসি, রুমানিয়ার ব্রাটিয়ানো ও পোলাণ্ডের স্কিরমণ্ট। ইঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদগুলির বিচার-পঞ্চায়েৎ হইলেন। এই একাদশসভ্যের বিচার শেষ-বিচার বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

বৈঠকের আলোচনা একপ্রকার চলিতেছিল। কিন্তু সুচতুর রাশিয়ান প্রতিনিধিরা এক চাল চালিয়া সকলকে হারাইয়াছেন। সভা বসিবার সময় জেনোয়া সহরে চিচেরিন জার্ম্মান মন্ত্রী র‍্যাঠেনোর সহিত একটি রফা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার সর্ত্তানুসারে রাশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে পুনরায় রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এবং উভয়ে পরস্পরের যুদ্ধসংক্রান্ত সকল দেনা-পাওনার দাবী পরিত্যাগ করিলেন। জার্ম্মানী সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইলেন এবং উভয় রাজ্য পরস্পরের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাশিয়া ও জার্ম্মানী সহসা এইরূপ সন্ধি করিয়া বসিবেন এ কথা কেহই কল্পনাও করেন নাই। তাই এই সন্ধির এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কাজেকাজেই রাশিয়া ও জার্ম্মানীকে ভয় দেখাইয়া এইরূপ স্বতন্ত্র সন্ধি হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। ফ্রান্স চোখ রাঙাইয়া বলিলেন যে, রুশ-জার্ম্মান সন্ধি ভার্সাই সন্ধি-সূত্র ও কান্ প্রস্তাবের বিপরীত হওয়াতে উহার মূলনীতিকে আঘাত করিয়াছে; ফ্রান্স তাহা কখনই সহ্য করিতে পারে না। কাজেকাজেই ফ্রান্সকে জেনোয়া বৈঠক পরিত্যাগ করিতে হইবে। জার্ম্মান প্রতিনিধিরা ইহার উত্তরে বলিলেন যে, তাঁহারা মিত্রশক্তিবর্গের অন্যায় ব্যবহার সহিতে না পারাতে ও অসম্ভব আব্দার রক্ষা করা সম্ভব না হওয়াতে রাশিয়ার সহিত সন্ধি করিতে একপ্রকার বাধ্য হইয়াছেন। মিত্রশক্তিবর্গের অর্থশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ জার্ম্মানীর নিকট যে-সকল আর্থিক দাবী-দাওয়া করিয়াছেন তাহা এতই কঠোর ও হৃদয়হীন যে জার্ম্মানী তাহা নীরবে পালন করিতে পারে না। তাই বিত্তহীন জার্ম্মানী অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়ার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাশিয়ার সোভিয়েট শাসনতন্ত্রকে রাশিয়ার প্রকৃত শাসনতন্ত্ররূপে স্বীকার জার্ম্মানী বহুদিন পূর্ব্বেই করিয়াছেন। এই সন্ধি অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক নূতন কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই; কেবল কতকগুলি অর্থনৈতিক নূতন রফা-নিষ্পত্তি করাই এই সন্ধির উদ্দেশ্য।

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে ফ্রান্স একটু নরম হইলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক মীমাংসা করিবার কমিটিতে জার্ম্মানী প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন।

রাশিয়ান প্রতিনিধিগণ জানাইলেন যে মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য পাইয়া রুশ বিদ্রোহীরা সোভিয়েট রাশিয়ার যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূরণ করিবার দায়িত্ব মিত্রশক্তিবর্গ স্বীকার করিয়া রাশিয়ার যুদ্ধ-ঋণ হইতে তাহা বাদ না দিলে পুরাতন রুশ সরকারের ঋণ সোভিয়েট সরকার স্বীকার করিবেন না। কিন্তু বিদ্রোহীদিগের দ্বারা যে ক্ষতি

হইয়াছে তাহার দায়িত্ব মিত্রশক্তিবর্গ গ্রহণ করিলে সোভিয়েট পূর্ব্ব ঋণ স্বীকার করিবেন বটে, কিন্তু শীঘ্র সে ঋণ পরিশোধ করিবার অবস্থা সোভিয়েট সরকারের না থাকাতে মিত্রশক্তিবর্গ রুশ সরকারকে দেউলিয়া বিবেচনা করিয়া কয়েক বৎসর মূল ঋণ আদায় করিতে চেষ্টা করিবেন না এবং ঐ কয়েক বৎসরের জন্ত কোনও সুদ চাহিতে পারিবেন না। রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সাধনের জন্তও মিত্রশক্তিবর্গ নূতন ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিবেন। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি স্বীকার করেন না। সকল সম্পত্তির মালিক সরকার। কাজেকাজেই বিদেশী সম্পত্তির মালিকদিগকেও সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে তাঁহারা পারিবেন না, তবে সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে সোভিয়েট সরকার অঙ্গীকার করিবেন।

মিত্রশক্তিবর্গের অনেকেই জার্ম্মানী ও রাশিয়ার ব্যবহারে বিরক্ত হইলেও বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কারণ জেনোয়া বৈঠক কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে আবার ইউরোপে নূতন কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইবে। একেই ইউরোপ যুদ্ধে অবসন্ন তাহার উপর অর্থের অনাটন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়; এরূপ অবস্থায় নূতন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে ইউরোপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে। মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে বিগত যুদ্ধে প্রধান সহায় ছিল আমেরিকা। কিন্তু ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক গণ্ডগোলে আমেরিকা আর লিপ্ত হইতে প্রস্তুত নয়। বরং জার্ম্মানীর সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বার্লিনের মার্কিন দূত মিঃ হাক্‌টন যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

যুদ্ধে হারিয়াও জার্ম্মান-শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর যদি রাশিয়ার জনবল জার্ম্মানীর সাহায্য করিতে থাকে তাহা হইলে জার্ম্মানীর সহিত আঁটিয়া উঠা সহজ হইবে না। তাই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, ক্ষুধার্ত্ত রাশিয়া ও ক্রোধান্বিত জার্ম্মানীকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা হইলে ইউরোপে যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে তাহাতে ইউরোপের সর্ব্বনাশ হইবে। যে-প্রকারেই হোক এই সর্ব্বনাশ হইতে ইউরোপকে বাঁচাইতে হইবে। ফ্রান্স স্বার্থপরের মত জার্ম্মানীকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে ইংলণ্ড তাহাতে সম্মত হইতে পারে না।

ফ্রান্সে জেনোয়া বৈঠক লইয়া অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। ফরাসী প্রতিনিধিরা বিরক্ত হইলেও নিরুপায় হইয়া বৈঠকে পুনর্ব্বার যোগ দিলেন।

রাশিয়ার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য না আরম্ভ করিলে ইউরোপের নষ্ট-শিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সেইজন্ত রাশিয়ার ব্যবহারে মিত্র-শক্তিবর্গ বিরক্ত হইলেও বৈঠক ভাঙিয়া দিবার সাহস কাহারও নাই। বোল্‌শেভিক শাসনতন্ত্রকে রাক্ষসী শাসনতন্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়া আসা হইলেও স্বার্থের খাতিরে ফরাসী, জার্ম্মানী, ইংরেজ ও আমেরিকানরা বহুদিন হইতেই রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এবং নিজেদের জন্ত সুবিধা করিয়া অপর জাতির উপর টেক্কা দিবার চেষ্টা সকলেই করিতেছিলেন, এমন কি রাষ্ট্রীয় ভাবে আদান-প্রদান আরম্ভ না করিলেও রাষ্ট্রতন্ত্রের জ্ঞাতসারে ব্যবসায়ীরা একটু গোপনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাই রাশিয়া ও জার্ম্মানীর সন্ধিতে মিত্র-শক্তিবর্গ এত ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু মিত্র-শক্তিবর্গের এই একান্ত নিরুপায় অবস্থার কথা সুচতুর রাশিয়ানগণ অবগত থাকাতে তাঁহারা প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত আপনাদের সুবিধাই ষোল-আনা আদায় করিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন। বৈঠকের পূর্ব্বে লেনিন্‌ এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রফা-নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশ্যে জেনোয়া বৈঠকে রাশিয়া উপস্থিত হইতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ভুল; কেননা, সোভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক মত ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে রাশিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত জেনোয়া বৈঠকে উপস্থিত হইবে। সুবিধার আদান-প্রদান করিয়া সোভিয়েট শাসনতন্ত্র যাহাতে শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পায় তাহার উপায় আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই রাশিয়ান প্রতিনিধিগণ জেনোয়াতে উপস্থিত হইবেন।

বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে মিত্র-শক্তিবর্গ অনেকদিন হইতেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। তাই সুযোগ বুঝিয়া জার্ম্মানী ও রাশিয়া মাথা তুলিয়াছেন। মিত্র-শক্তিবর্গ পরস্পরের প্রতি এতই সন্দিগ্ধ যে এতকাল কোনও রকমে একযোগে কাজ করিয়া আসিলেও আর বেশীদিন তাঁহারা যে একযোগে চলিবেন তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। কাজেকাজেই দেখা যাইতেছে, যুদ্ধে হারিয়াও কূটনীতির বলে জার্ম্মানীই শেষে সুবিধা করিয়া লইতেছেন। বুদ্ধির যুদ্ধে জার্ম্মানীই জয়লাভ করিলেন।

কান্‌ ও পারি বৈঠক যেরূপ নিষ্ফল হইয়াছে, উপায় থাকিলে জেনোয়া বৈঠকের ফলও সেইরূপ হইত। কিন্তু ইউরোপের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়া লয়েড জর্জ্জ ফ্রান্সকে কোনপ্রকারে নরম করিয়াছেন। বৈঠক আবার বেশ ভালরকমেই চলিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। এমন সময় বেল্‌জিয়াম আর-একটি গণ্ডগোলের সূত্রপাত আরম্ভ করিয়াছেন। বেল্‌জিয়ামের পররাষ্ট্র-সচিব জাস্‌পার বলেন,—সোভিয়েট সরকার ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি অস্বীকার করিয়া মালিকদিগের আর্থিক ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাকে মানিয়া লইতে বেল্‌জিয়াম রাজী নহে। তাই বেল্‌জিয়ান প্রতিনিধি রাশিয়ান অর্থনৈতিক রফা-নিষ্পত্তি কমিটি ত্যাগ করিয়াছেন। ফরাসী প্রতিনিধি বারের বেল্‌জিয়ান প্রতিনিধি জাস্পারকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন, এবং বলিতেছেন যে, মিত্রশক্তির প্রস্তাবে সহি কিছুদিন স্থগিত রাখিতে ফ্রান্স-সরকার তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। ফ্রান্স-সরকার সমস্ত সর্ত্তগুলি বিচার করিয়া তাঁহাকে সহি করিবার আদেশ না দিলে তিনি প্রস্তাবে সহি করিতে পারেন না। জাস্পার বলেন যে, সোভিয়েট সরকার যখন দেউলিয়া তখন সম্পত্তির বিনিময়ে তাঁহারা ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে চেক দিবেন তাহা সম্পূর্ণ মূল্যহীন একখানি কাগজের টুক্‌রা মাত্র। তাহা লওয়া না-লওয়া একই কথা। কাজেকাজেই এই প্রস্তাব তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

এইরূপ গণ্ডগোলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আবার মতান্তর হইয়াছে। লয়েড জর্জ্জ ও বার্থুর মধ্যে অনেক তর্কাতর্কি চলিয়াছিল। তাহার ফল এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তর্কবিতর্ক শেষে যে বচসায় দাঁড়াইয়াছিল এবং মতান্তর মনান্তরে পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। টাইম্‌স্‌ পত্রিকার সম্পাদক মিঃ উইক্‌হ্যাম ষ্টিড সংবাদপত্রের প্রতিনিধি স্বরূপে জেনোয়া বৈঠকে উপস্থিত আছেন। তিনি বলেন যে, লয়েড জর্জ্জ ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাবন্ধন ছিন্ন করিয়া জার্ম্মানীর সহিত সখ্যতা করিবার সংকল্প জানাইয়াছিলেন। লয়েড জর্জ্জ সেই কথা অস্বীকার করার পরও ষ্টিড সাহেব পুনরায় সেই কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ফরাসী পত্রিকাগুলির সুরেও উহার প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। ব্যাপার অতদূর না গড়াইলেও যে বিশেষ রকম একটা বচসা হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য—

পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্যের সমস্যা নিরাকরণের জন্য পারি বৈঠকের সৃষ্টি হইয়াছিল ; কিন্তু যতদূর বুঝা যাইতেছে সেভার্স সন্ধির যে-সকল পরিবর্ত্তন পারি বৈঠকে স্থির হয় তাহা তুরস্কের জাতীয়দলের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্ত্তনের অনুরূপ না হওয়াতে বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সকল নিষ্ফল হইবে। কামাল পাশার দল বলেন, যে, তাঁহারা যে-সকল দাবী বৈঠকে উপস্থিত করিয়াছিলেন সেইগুলি তাঁহাদের সবচেয়ে কম দাবী ; এইগুলি না পাইলে তাঁহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহারা তুরস্কের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়াই এত অল্পে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মিত্র-শক্তিবর্গ যদি ইহাও দিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে জাতীয়দল রফানিষ্পত্তির কথা বন্ধ করিয়া নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন। সুলতানের অধীন তুরস্ক-সরকার মিত্র-শক্তিবর্গকে জানাইলেন, গ্রীস সৈন্য এসিয়ামাইনর পরিত্যাগ করিলে সন্ধিসর্ত্ত আলোচনা করিবার জন্য তুরস্ক-প্রতিনিধি মিত্র-শক্তিবর্গের প্রতিনিধির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে স্তাম্বুলে বৈঠক বসিবার প্রস্তাব তুরস্ক-সরকার গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ স্তাম্বুলে বৈঠক বসিলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা আছে। মিত্রশক্তিবর্গ, জানাইলেন, যে, সন্ধি-সর্ত্ত স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে গ্রীসকে এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়াতে তাঁহারা তুরস্কের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কামালের দলও তুরস্কের অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করেন ; তদুত্তরে মিত্র-শক্তিবর্গ বলেন যে কামালের দল যদি পারি বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটিরকমে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে গ্রীক সৈন্য এসিয়া মাইনর হইতে সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সৈন্য সরাইয়া লইতে গ্রীস কিছুতেই স্বীকৃত হইবেন না। এবং এসিয়া মাইনর হইতে সৈন্য সরাইয়া লইলেও গ্রীস থ্রেসে সৈন্য-সমাবেশ করিবেন। কেননা থ্রেস সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে গ্রীস রাজী নহেন এবং মিত্র-শক্তিবর্গ থ্রেসের অধিকাংশের উপর গ্রীসের দাবী ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কামালের দল এই-সকল কথা জানিয়াও যদি প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রতিনিধিদিগের নামের তালিকা মিত্র-শক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করিলে কোন্ স্থানে নূতন বৈঠক বসিবে তাহা জ্ঞাপন করা হইবে। কামালের দল জানাইলেন, যে, যুদ্ধ স্থগিত রাখার সঙ্গেসঙ্গেই গ্রীসকে এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কামালের দলের পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রাখা অসম্ভব। কেননা সময় পাইলে গ্রীস নিজ অধিকার সুরক্ষিত করিবার সুযোগ পাইবেন। জাতীয়দল এতদিন যুদ্ধ করিয়া যে সুবিধা করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিবার সময় আর-একটি গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। এসিয়া মাইনরে ইতালী যে ভূমিখণ্ডটুকুর উপর খবরদারী করিবার ভার পাইয়াছিলেন তাঁহার খবরদারীতে ইতালীর ব্যয় যথেষ্টই হইতেছিল কিন্তু সুবিধা কিছুই বড় ছিল না। কোনও বিশেষ স্বার্থ না থাকাতে বৃথা ব্যয়ভার বহন করিতে ইতালী নারাজ হইয়া উঠিলেন। কাজে কাজেই ইতালী সৈন্য-সামন্ত এবং শাসকদলকে এসিয়া মাইনর হইতে সরাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। ইতালী স্থান পরিত্যাগ করিবা-মাত্র সেই-সকল স্থানে গ্রীক সৈন্য প্রবেশ করিয়া সেই-সকল স্থানকে গ্রীসের অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। এই-সব নানা কারণে বিরক্ত হইয়া কামালের দল মিত্রশক্তিবর্গের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অবস্থা গুরুতর হইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ ফরাসী প্রতিনিধি পয়ঁকারে ও ইতালীর প্রতিনিধি স্কাঞ্জারের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া নূতন সূত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন। ফরাসী পূর্ব্বেই অ্যাঙ্গোরার সহিত একটা রফা-নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছিল, ইতালীও সেইরূপ একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার চেষ্টা দেখিতেছিল। কাজেকাজেই লর্ড হার্ডিঞ্জ বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি-ধুরন্ধরেরা জেকো-স্লোভাকিয়া, রুমেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার সহিত একযোগে পশ্চিম-প্রান্তিক প্রাচ্য সমস্যার মীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় তুরস্কের সুলতানের দরবার পারির সিদ্ধান্ত-সকলকে মোটামুটি রকমে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু জাতীয়দল পারি-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় তুরস্ক-দরবারের সম্মতি অসম্মতির বিশেষ কোনও মূল্য নাই। ইতালী যদি ফ্রান্সের অনুসরণ করিয়া অ্যাঙ্গোরা-সরকারের সহিত একটা রফানিষ্পত্তি করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে মিত্র-শক্তিবর্গের একযোগে কাজ করিবার সংকল্প একেবারে ব্যর্থ হইবে এবং তুরস্ক-সমস্যার সমাধানের ভার একা ইংলণ্ডের উপরেই আসিয়া পড়িবে।

চীনের রাষ্ট্র-বিপ্লব—

উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ বহু পুরাতন। উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের ভাষাও ভিন্ন। উত্তর চীনের সভ্যতার কেন্দ্র হইল পিকিং ও দক্ষিণ চীনের সভ্যতার কেন্দ্র ক্যান্টন।

চীনের মাঞ্চু রাজ্যকে ধ্বংস করিয়া যখন সান্-ইয়াট্ সেন্ চীন সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন দক্ষিণ চীনের এই মহামনা স্বদেশ-সেবক চৈনিক ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য উত্তর চীনের দেশনায়ক ইয়ান্ সি কাইকে সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতিরূপে বরণ করিয়া নিজে রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যদিও দক্ষিণ চীনের অধিবাসীদিগের চেষ্টাতেই চীনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তথাপি উত্তর চীনের শক্তি-সামর্থ্যকে চীনের এই নবীন গণতন্ত্রের সেবাতে যাহাতে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয় তাহারই জন্য সান্-ইয়াট্ সেন্ দক্ষিণ চীনের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর চীনের প্রাধান্যকেই বজায় রাখেন।

সান্-ইয়াট্ সেনের ত্যাগ চৈনিক ঐক্য বজায় রাখিতে অতি অল্পদিন মাত্র সমর্থ হইয়াছিল। উত্তরের উদ্ধত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষিণ চীনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। উত্তরেও মাঞ্চুরিয়া বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। উত্তর-চীন জাপানের সাহায্যে চীন সাম্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। জাপানের সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য উত্তর চীনে আনফু সম্প্রদায় আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। দক্ষিণ চীন বরাবরই জাপান-বিদ্বেষী। উত্তর-চীন জাপানের ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে লাগিলেন, কাজে কাজেই জাপান-বিদ্বেষী দক্ষিণ চীন উত্তরের প্রাধান্যকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া ক্যান্টনে আপনাদের ভিন্ন একটি রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। উত্তর চীনের রাষ্ট্রতন্ত্রের কেন্দ্র হইল পিকিং আর দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন।

ক্যান্টন ও পিকিং সরকারের বিবাদ বাড়িয়া উঠিয়া ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে খণ্ড-যুদ্ধও চলিতে লাগিল। এই সময়ে পিকিং সরকারের পরিচালক হইয়া উঠিলেন সুবিখ্যাত চীন-সেনাপতি উ-পাই ফু। ইঁহার গণতন্ত্রে আস্থা নাই ; সেইজন্য ইনি চীনে রাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবার

অভিলাষী। ইনি ইয়ান্-সি কাইকে চীনের সিংহাসনে বসাইয়া নূতন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন উত্তর চীনের অধিনায়ক হইয়া ইনি দক্ষিণ চীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের টচুন অর্থাৎ সামরিক শাসনকর্তাদিগকে হস্তগত করিয়া ইনি দেশময় অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ চীনকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

ক্যান্টন সরকারের এই মহা বিপদ দেখিয়া সান্-ইয়াট সেন্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবসর হইতে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্রোহী টচুনগণ পরাস্ত হইয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার সামরিক শাসনকর্তা মার্শাল চাঙ্গ্ সো লিন্ আবার উত্তর চীনের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া মুক্ডেন সহরে এক নূতন মাঞ্চু-রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সান্-ইয়াট্ সেন্ গণতন্ত্রের সেবক হইয়াও উ-পাই ফুর ধ্বংস-সাধনের নিমিত্ত চাঙ্গ্ সো লিনের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন করেন। চাঙ্গ্ সো লিন পিকিং আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু সমর-কুশলী উ-পাই ফুর কৌশলে চাঙ্গ্ সো লিন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছেন। চাঙ্গ্ কোন রকমে পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে। চাঙ্গের পতনেও সান্-ইয়াট্ সেন্ নিরাশ হন নাই। তিনি উ-পাই ফুর বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। রণকুশলী উর সহিত দ্বন্দ্বে চতুর রাজনীতিক সান্-ইয়াট্ সেন্ কিরূপ সফলতা লাভ করিবেন তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহার মত ত্যাগী মহাপুরুষের প্রেরণায় দক্ষিণ চীন যে অমিতবিক্রমে চীনের মঙ্গলের জন্য লড়িতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে চীন যে কোন্ পথে চলিবে তাহা দেখিবার জন্য সমগ্র ইউরোপের লোলুপদৃষ্টি সজাগ রহিয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় [বি-এল]

—

ভারতবর্ষ

সংবাদপত্রের প্রতি জুলুম—

প্রেস-আইন উঠিয়া গেল বলিয়া অনেক সংবাদপত্রের মহলে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আইন উঠিয়া গেলেও আইন করিবার যাঁহারা মালিক, তাঁহারা যে ইচ্ছা করিলেই জবরদস্তি অনায়াসেই চালাইতে পারেন তাহার নজিরের অভাব নাই। প্রেস-আইন উঠাইয়া দেওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে সংবাদপত্রকে সত্য কথা নির্ভীকভাবে বলিতে দেওয়া হইবে, তবে এই উঠাইয়া দেওয়ার প্রাক্কালে কতকগুলি কাগজের উপর আর জুলুম চালানোর কোনোই আবশ্যক ছিল না। গত বৈশাখের প্রবাসীতে আমরা সংবাদপত্রের প্রতি জুলুমের কতকগুলি উদাহরণ দিয়াছি। এখানেও আরো দুইটির উল্লেখ করিতেছি।

'ফ্রি বার্ম্মা' রেঙ্গুনের সংবাদপত্র। ইহার সম্পাদক ও প্রিণ্টার রাজদ্রোহের দায়ে দণ্ডবিধির ১২৪ (এ) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পত্রিকাতে 'দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাই অভিযোগের কারণ। প্রবন্ধটি 'ফ্রি বার্ম্মার' নিজস্ব সম্পদ নহে, অন্য একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত বস্তু। সম্পাদক এবং প্রিণ্টারের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহারা এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

লাহোরের সংবাদপত্র 'বন্দেমাতরমের' মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। সম্পাদক লালা শান্তিরামের এক বৎসর, প্রকাশক লালা কেদারনাথের ছয় মাস এবং প্রবন্ধ-লেখক ফজল দীনের প্রতি দুই বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি—

গত ২২শে এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। সভায় যে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার ভিতর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) যে-সকল আইনব্যবসায়ী অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করিয়া আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিবেন তাঁহাদের সাহায্যের জন্য শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ যে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহা এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গ্রহণ করিতেছেন। এই টাকা শ্রীযুক্ত বাজাজের নেতৃত্বেই ব্যয় করা হইবে। এই তহবিল হইতে যে-সকল ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করিবেন তাঁহাদিগকে স্ব স্ব প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফৎ শ্রীযুক্ত বাজাজের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) কংগ্রেসকে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় করিবার উদ্দেশ্যে অবনত ও শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর হইতে অধিকতর সংখ্যায় সদস্য গ্রহণ করা উচিৎ।

(৩) কংগ্রেস-পরিচালিত কোনও দোকানে এদেশীয় তাঁত-নির্ম্মিত খদ্দর ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের বস্ত্র থাকিতে পারিবে না এবং টানা ও পোড়েন দুই দিকেই চরকা-কাটা সূতা ব্যবহৃত না হইলে কংগ্রেস হইতে কোনো অর্থও তাহাতে ব্যয় করা হইবে না।

(৪) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি জানাইতেছেন, খুব জরুরী এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার ভিন্ন কংগ্রেস-কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলিকে কোন অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে নিজেদের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য নিজেদের তহবিল সংগ্রহ করিতে হইবে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থের এক-পঞ্চমাংশের বেশী দাবী করিবেন না।

(৫) যে পর্য্যন্ত না মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হন সে পর্য্যন্ত প্রতি-মাসের ১৮ই তারিখে গান্ধীপুণ্যাহ প্রতিপালন করিতে হইবে। এই দিনটা প্রার্থনা, ত্যাগ প্রভৃতি সৎকাজে ব্যয় করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এই দিনের আয়ও সকলকে তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে অর্পণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আপ্ পাঞ্জাব মেল—

গত ৩রা এপ্রিল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ১নং আপ্ পাঞ্জাব মেল ট্রেন মধুপুর ষ্টেশনের কাছে লাইন চ্যুত হইয়াছিল। সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ সি ডেভিস্ এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কয়েকজন অজ্ঞাত লোক ট্রেন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ তিনখানি রেল আপ্ লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"যখন এই প্রকারের কোনো বিপদ ঘটে তখন স্বতঃই এই তিনটি সম্ভাবিত কারণ মনোমধ্যে উদিত হয় :—

(১) লাইন খারাপ ; মেরামতের জন্য রেল স্থানান্তরিত করিয়া পরে হয় তো ঠিক স্থানে তাহা স্থাপন করিতে মেরামতকারীরা ভুলিয়া গিয়াছিল।

(২) ট্রেন বাঁকের মুখে অত্যধিক বেগে যাইতেছিল।

(৩) হয় তো কেহ বিদ্বেষপরবশ হইয়া লাইন খারাপ করিয়া দিয়াছিল।

আমি এই তিনটি বিষয় একে একে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি :—

সাক্ষীগণের সমগ্র এজাহার লইয়া আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কয়েকজন লোক রেল স্থানান্তরিত করিয়া আপ্ লাইনের উপর তাহা আড়াআড়ি ভাবে ফেলিয়া রাখিয়াই এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছিল। কতজন লোক এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিল সাক্ষীদের এজাহার হইতে তাহা নির্ণয় করা যায় না। দুইখানা রেল ফিস্‌প্লেট দিয়া সংযুক্ত থাকিলে শারীরিক বলের সাহায্যে সারাইতে অন্ততঃ পনেরো-কুড়িজন লোকের আবশ্যক। তবে যন্ত্রের সাহায্যে অবশ্য মাত্র চারিজন লোকও সে কার্য্য সমাধা করিতে পারে। কোন্ সময়ে রেল তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহাও সঠিক বলা সম্ভবপর নহে। রাত্রি সাড়ে-দশটার সময় ঐ লাইন দিয়া একখানি মালগাড়ী চলিয়া গিয়াছে। সে সময় লাইনটি সম্পূর্ণ ভাল অবস্থাতেই ছিল। ডাউন পাঞ্জাব মেল ঐ স্থান অতিক্রম করিবার আধ ঘণ্টা পরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই আধ ঘণ্টার ভিতরে অবশ্য এতটা ক্ষতি করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং মনে হয় দুর্ব্বৃত্তেরা ডাউন মেল আসিবার আগেই কাজ আরম্ভ ও শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। অথবা পূর্ব্বে কাজ আরম্ভ করিয়া ডাউন মেল আসিবার সময় পুলের নীচে লুকাইয়াছিল এবং মেল চলিয়া গেলে আবার কাজে লাগিয়াছিল। সে যাহাই হোক, আদালতের তদন্ত-ফল এই, কয়েকজন অজ্ঞাত লোক ট্রেন ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ তিনখানি রেল আড়াআড়ি ভাবে আপ্ লাইনের উপর ফেলিয়া রাখিয়া দুর্ঘটনাটি ঘটাইয়াছে।"

আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ও সন্দেহশূন্য হইতে পারিলাম না।

লক্ষ্ণৌ উদার-নীতিক সঙ্ঘ—

গত ২৭শে এপ্রিল লক্ষ্ণৌ সহরে উদারনৈতিক সঙ্ঘের একটি অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন অধিকার করিয়াছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ অতুলপ্রসাদ সেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"বর্ত্তমানে অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কার্য্যগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এগুলির সহিত অসহযোগের কোনো সম্বন্ধ নাই এবং ইহার ভিতর কতকগুলির সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে দেশের লোকের মনোবৃত্তি অনেক পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বহু লোক মহাত্মার ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। সকলেই আড়ম্বরশূন্য জীবন-যাপনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। মহাত্মার সহজ সাধারণ জীবনযাত্রা ও তাঁহার পবিত্র আদর্শ এই আন্দোলনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে সন্দেহ না করিয়া থাকা যায় না। কারণ উহা নিরাপদ নহে।

"অসহযোগ আন্দোলন হ্রাস হইবার সঙ্গেসঙ্গেই মিঃ মণ্টেগুর পদত্যাগের ফলে বিলাতে সংস্কার-বিরোধী দল আবার মাথা উঁচু করিয়াছে। পাঞ্জাবের কাণ্ডে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদের কার্য্য সমর্থনের চেষ্টাও পার্লামেণ্টে চলিতেছে। কিন্তু সময় থাকিতেই তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। তাঁহারা শাসন-সংস্কার পরিবর্ত্তন করিয়া পুরাতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা যেন না করেন। স্বায়ত্ত-শাসন কেবলমাত্র কথার কথা করিয়া রাখিলে চলিবে না। একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের ভিতর স্বরাজ-লাভের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেই হইবে। মধ্যপন্থীগণ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আইনসঙ্গত বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করিলেও, স্বরাজ সম্বন্ধে ভারতসম্রাট যে অঙ্গীকার উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার লঙ্ঘন সহ্য করিবেন না। এই ব্যাপার লইয়া কথার মারপ্যাঁচ যে তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন তাহাও মনে হয় না। স্বরাজ সম্বন্ধে কোনো অনিশ্চয়তা নাই। আমলাতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে।"

মধ্যপন্থীরা এখন যে-সব কথা বলিতেছেন এবং যে ভাবে তাঁহাদের কর্ম্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছেন, তাহার সহিত কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতির যে বিশেষ তফাৎ আছে তাহা মনে হয় না। সুতরাং এই দুইদল এখন সহজেই একত্রে মিলিত হইয়া কাজে অবতীর্ণ হইতে পারেন। এ সুবিধা সত্ত্বেও ইঁহারা মিলিত হইয়া দেশের কাজে কেন যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন না তাহাও একটি রহস্য বলিয়া মনে হয়।

সভাপতির বক্তৃতার পর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) এলাহাবাদ কংগ্রেস-কমিটির যে ৫৫জন সভ্যকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য এই সভা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

(২) রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ অনেক সময় অকারণে লোককে অভিযুক্ত করেন। সভা ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন। দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ দূর না করিয়া কেবল পুলিশের সংখ্যা বাড়াইলে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, ইহাও সভার অভিমত।

(৩) ব্যয়সঙ্কোচের জন্য প্রথমতঃ, সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক বিভাগ ভারতবাসীদের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইতে হইবে। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য কমিটি নিযুক্ত করায় সভা আনন্দ-প্রকাশ করিতেছেন।

(৪) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা অবসর গ্রহণ করিলে পর সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীগণকে সেই পদে নিযুক্ত না করিয়া বিখ্যাত রাজনীতিকগণকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। সভা বর্ত্তমান গবর্ণরের কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা সমর্থন করেন না।

নিখিল-ভারত শ্রমজীবী সভা—

বোম্বাই সহরে সম্প্রতি নিখিল-ভারতীয় শ্রমজীবী উন্নতি-বিধায়িনী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রমজীবীগণের স্বাস্থ্য ও শরীর সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। নিখিল ভারতীয় শ্রমজীবী উন্নতি-বিধায়িনী সভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মিঃ জোশী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভার নিয়মাদি প্রণয়নের জন্যও একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব তোলা হয়। প্রস্তাব-দুইটি সভায় গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমজীবীদের শিক্ষা, বাসস্থান, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, সমবায়-ভাণ্ডার স্থাপন প্রভৃতি বিষয়েও আরো কতকগুলি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে।

ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি—

ভারত-সরকারের ব্যয়ভার অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে এই ব্যয়ভার লঘু করিয়া তোলা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ভারতসচিবের সহিত পরামর্শ

করিয়া এজন্য বিলাত হইতে একজন বিশেষজ্ঞকে আনাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। বিলাতের গেডিস কমিটির মত এ কমিটিও এমন হওয়া দরকার যে সামরিক ও অসামরিক উভয়] বিভাগের ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ খতাইয়া তাহার সঙ্কোচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিতে পারেন।

এই প্রস্তাবিত কমিটি নাকি গবর্ণমেণ্টকে কেবলমাত্র ব্যয়সঙ্কোচ সম্বন্ধেই উপদেশ দিবেন না, বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক সে সম্বন্ধেও মত প্রকাশ করিবেন।

পুলিশ কন্‌ফারেন্স—

ইষ্টারের অবকাশে ভাগলপুরে বিহার-উড়িষ্যা পুলিশ কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন বসিয়াছিল। সভায় পুলিস-দলের নৈতিক উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। সভায় কয়েকজন কনষ্টেবল্ জোর-জুলুম, জবরদস্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতি আর জুলুম করা হইবে না—এখন হইতে ভালো ব্যবহার করা হইবে—সভায় অনেকেই এই মর্ম্মে শপথও গ্রহণ করিয়াছেন। পুলিশের জুলুম এদেশে ছোট-বড় সকলের পক্ষেই অতিশয় বিভীষিকার বস্তু। সেইজন্য বিপদে পড়িয়াও অনেক সময় এদেশবাসী পুলিশের সাহায্য লইতে চায় না। সেই পুলিশ যদি জুলুম ছাড়ে তবে সেটা যে খুব বড় রকমের সুখবর তাহাতে সন্দেহ নাই। সভায় চৌরীচৌরা তহবিলের জন্য ২০০৲ দুইশত টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

রমণাচার্য্যের বিচার—

এলাহাবাদের 'লিডার' পত্রিকায় কর্ত্তৃপক্ষের একটা নূতন ধরণের বিচার-ব্যবস্থার খবর প্রকাশিত হইয়াছে। খবরটি হইতেছে এই—

শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রমণাচার্য্য কাশীধামের একজন সংস্কৃত-বিদ্যার্থী। তিনি গত ১২ই এপ্রিল নিজের দেহে একখানা বিজ্ঞাপন আঁটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—'১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালা বাগের স্মৃতি-রক্ষার জন্য সকলকেই কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিতে হইবে।' কথা কহিয়া তিনি কাহাকেও হরতালের জন্য উত্তেজিত করেন নাই—তাঁহার সমস্ত অপরাধ এই বিজ্ঞাপন দেহে আঁটিয়া রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া আর কিছু নহে। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। রমণাচার্য্য তাঁহার এজেহারে বলিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে থানাদার আসিয়া তাঁহার গালে কয়েকটা চড় মারেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারা অনুসারে অবৈধ জনতা করার জন্য চালান দেন। ১৫ই তারিখে রমণাচার্য্যের বিচার শেষ হয়। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার একশত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। টাকা না দিলে অ-রাজনৈতিক কয়েদীর মত তাঁহাকে ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ঘটনার সময় আরো একজন লোক এই আসামীর সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাকেও ঐ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

আসামে অত্যাচার—

আসাম হইতে সংবাদপত্রের মারফৎ যেসব খবর প্রচারিত হইতেছে, তাহা সত্য হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণই কেবল অরাজকতার সৃষ্টি করে না, অনেক সরকারী কর্ম্মচারীও অরাজকতার সৃষ্টি করেন এবং অত্যাচারের মাপকাঠি দিয়া যাচাই করিয়া লইলে এই-সব অরাজকতার ভিতরকার গুরুত্ব জনসাধারণের অরাজকতার গুরুত্ব অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প নহে।

'সিলেট ক্রনিকেল', সংবাদ দিয়াছেন, গত ২৮শে মার্চ পুলিশ প্রায় ৩০জন গুর্খা লইয়া ফুলবাড়ী নামক গ্রামে গমন করে। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন, ই-এ-সি মৌলবী মহম্মদ চৌধুরী। ইঁহারা নয়-দশখানি বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়াছিলেন। এক বাড়ীতে তাঁতে একখানি কাপড় বোনা হইতেছিল। সব্ ইন্‌স্পেক্টরের হুকুমে কাপড়খানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। ইহা ব্যতীত গরীব লোকদের মাটির হাঁড়ী কলসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ভিটা-মাটি খুঁড়িয়া ইহারা তচ্ নচ্ করিয়া দিয়াছে।

২৫শে এপ্রিলের 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' প্রকাশ, গোপালগঞ্জ থানায় একদল গুর্খা রাখা হইয়াছে। গত ১৭ই এপ্রিল তাহারা ভদ্রেশ্বর গ্রামে গিয়া কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস ও অস্বাভাবিক রকম জুলুম করিয়াছে। ইহাদের কাজে গ্রামের ভিতর ভীষণ ভয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রামবাসীদের কেহ কেহ উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের বিপদের কথা তারযোগে জ্ঞাপন করিয়াছেন। আসাম-গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীকে আব্দুল নুর খাঁ বাহাদুর নামে এক ব্যক্তি টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন, গোপালগঞ্জের পুলিশ গুর্খা লইয়া তাঁহার পুত্রদের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়াছে। তাঁহাকেও প্রহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা আরো নানা রকমের অত্যাচার করিতেছে। প্রতিকার প্রার্থনীয়। জিয়াউদ্দিন নামক এক ব্যক্তি ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—গোপালগঞ্জের পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাস ও লুট-তরাজ করিয়াছে, আস্‌বাব-পত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, প্রহার করিতেও কসুর করে নাই। মোদসির আলি নামক আর-এক ব্যক্তিও ডেপুটি কমিশনারকে তার করিয়া জানাইয়াছেন, গোপালগঞ্জের পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে কেবলমাত্র খানাতল্লাস করে নাই স্ত্রীলোকদিগকেও অপমান করিয়াছে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে প্রহার করিয়াছে।

শ্রীহট্ট হইতে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, শান্তিরক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীহট্টে প্রায় ছয়শত গুর্খা সেনার আমদানি করিয়াছেন। এই-সকল গুর্খা উদ্দামভাবে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিতেছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দে, সূর্য্যকুমার দাস, কাশীচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন উকিল ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছিলেন, গুর্খারা বলপূর্ব্বক তাঁহাদের ছাতা বন্ধ করিয়া দেয়। চারুবাবু ছাতা বন্ধ করিতে আপত্তি করায় গুর্খারা বলপূর্ব্বক তাঁহার ছাতা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করে। কেবল ইহাই নহে, গাড়ী করিয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইতেছিল, গুর্খারা গাড়ী আট্‌কাইয়া বালিকাদিগকে ভয় দেখায় এবং বন্দুকের বাঁট দিয়া গাড়ীর উপর আঘাত করিতে থাকে। এবিষয়ে ডেপুটি কমিশনার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছেন, স্থানীয় লোকেরা অসহযোগিতা করিয়া গুর্খার আমদানি অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের লাঞ্ছনা অবমাননার জন্য ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন? সত্য কথা। ডেপুটি কমিশনার ভুলিয়া গিয়াছেন, এইরূপ অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচারের ভিতর দিয়াই জাতি মানুষ হইয়া উঠে।

মহাত্মা সম্বন্ধে গুজব—

মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমানে জেলে আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ গুজব বাহির হইতেছে। একটি গুজব উঠিয়াছিল, জেলের ভিতর মহাত্মাকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টার অব ইন্‌ফরমেশন জানাইয়াছেন, এ গুজব নিছক মিথ্যা। ইহার ভিতর কিছুমাত্র সত্য নাই।

মহাত্মা সম্বন্ধে আর-একটি জনরব হইতেছে এই, তাঁহাকে

জারবেদা জেল হইতে অন্য আর-একটি জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায়—কোন্ জেলে, সে খবর গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও জানিতে দেন নাই।

গবর্ণমেণ্টের প্রচার-বিভাগ এ গুজবেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মহাত্মাকে বিনা প্রহরীতে খোলা মাঠের ভিতর রাখিয়া দিলেও তিনি পলায়ন করিবেন এরূপ কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবারও প্রয়োজন নাই। তবু যে লোক এই-সব সন্দেহ করে তাহার কারণ, গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ এমন আছে যাহা লোককে চমকাইয়া দেয় অতি মাত্রায়, অথচ কারণ খুঁজিলে তাহার কোনো কারণও পাওয়া যায় না।

আইন-ব্যবসায়ীর প্রতিবাদ ও অত্যাচারের নমুনা—

রাজনৈতিক কারণে পাঞ্জাবে বেজায় রকম ধরপাকড় চলিতেছে এবং অনেককে অযথা কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করা হইতেছে। এই স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ সম্প্রতি পাঞ্জাব হাইকোর্টের একান্ন-জন আইন-ব্যবসায়ী এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে তাঁহারা লিখিয়াছেন,—

"সভ্যদেশ মাত্রেই জনসাধারণের জন্মগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। সে অধিকারকে ইচ্ছা করিয়া খর্ব্ব করিলে তাহার ফল ভালো হয় না—তাহাতে রাজ্যের বিপদ আরো আসন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু পাঞ্জাবে এই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে না। এখানে লোককে বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। তাহা ছাড়া যাঁহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে, নিঃসন্দেহ রূপে অপরাধী প্রমাণিত হইয়া তাঁহারা সকলে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন তাহাও নহে। এই-সমস্ত ব্যবস্থার দ্বারা শান্তি এবং শৃঙ্খলার ব্যাঘাতই ঘটে, তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় জন-সাধারণ যে কেবলমাত্র ভীত হইয়া পড়িতেছে তাহা নহে, বিচার-বিভাগের গৌরবও প্রচুর পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতেছে। অথচ এই বিচার-বিভাগের বিশুদ্ধতা ও শক্তি সকল সময়েই সন্দেহের অতীত অবস্থায় থাকা উচিত। দণ্ড-প্রয়োগের আবশ্যকতা প্রমাণিত করিবার জন্য এমনভাবে দণ্ড প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য যে, যে-সমস্ত ব্যাপারের সহিত এই-সব ব্যাপারের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ তাঁহারা যেন দণ্ড প্রয়োগ সমর্থন করিতে পারেন। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতিতে তাহা যে সম্ভবপর নহে তাহা বলাই বাহুল্য।"

কেবলমাত্র পাঞ্জাবে নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কর্ত্তৃপক্ষের এই জুলুম একান্ত ভাবেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং এ জুলুম কেবলমাত্র কারাদণ্ডেই নিঃশেষ হইতেছে না, আরো নানা রকম অদ্ভুত ব্যাপারের সৃষ্টি করিতেছে। দুই-একটির নমুনা দিতেছি।

সম্প্রতি রেঙ্গুনের কমিসনার আদেশ দিয়াছেন, রেঙ্গুনে কেহ বিদেশী কাপড় পোড়াইতে পারিবে না। বিদেশী কাপড় দগ্ধ করা অবশ্য সকলে সমর্থন না করিতে পারেন। কিন্তু এসম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কোনো-রূপ হুকুমজারি করিবার অধিকার আছে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব। কাপড় আমার, আমি পোড়াই বা পরি সে-সম্বন্ধে পুলিশ যদি খবরদারী করিতে আসে তবে তাহা কেবল মাত্র অশোভন হয় না, তাহা অন্যায় হয়, অনধিকারচর্চ্চা হয়, দেশবাসীর চিরন্তন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। কোনো নাগরিক (citizen) তাহা সহ্য করিতে পারে না, করা উচিত নহে।

চট্টগ্রামের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সময় শোভাযাত্রা বা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করিতে দেওয়া হয় নাই। যেখানে জনসাধারণের সভা করিবার অধিকার আছে, সেখানে তাহাদের শোভাযাত্রা করিবার অধিকার যে কেন নাই, তাহা বোঝা কঠিন। ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের সময়ে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহার পরে ভারতবর্ষ অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। এই যদি আগাইয়া যাইবার নমুনা হয় তবে সে আগাইয়া যাওয়া যে বিশেষ আকাঙ্ক্ষার জিনিষ নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

আসাম ডোরাণ্ডের ডেপুটি কমিশনার নোটিশ দিয়াছিলেন, সেখানকার কোনো বাড়ীওয়ালাই কোনো অসহযোগীকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। ইহা যে কেবলমাত্র তাঁহার শাসন-বাক্য নহে, ইহার পিছনে যে উদ্যত শাসন-ইচ্ছাও রহিয়াছে তাহাও প্রকাশ পাইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। তাম্বুলবাড়ী চা-বাগানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত পরমানন্দ আগরওয়ালা এই আদেশ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট রকমের খামখেয়ালী। কিন্তু এই খামখেয়ালীর শেষ এইখানেই হয় নাই। আসামী-পক্ষ মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিবেন বলিয়া সময় চাহিয়াছিলেন। ডেপুটি কমিশনার সময়ও দিয়াছিলেন এক মাস। কিন্তু খেয়ালীদের খেয়া-লের সীমা পাওয়া যায় না। আসামীর লোকেরা আদালত হইতে বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি মোকদ্দমা সিনিয়র একষ্ট্রা এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনারের আদালতে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়াছেন।

এমনি আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

রায়কটের অত্যাচার—

পাঞ্জাব কংগ্রেস-কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে ব্যারিষ্টার সৈয়দ আতাউল্লা সাহ রায়কটের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত সুরু করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার তদন্ত শেষ করিয়া রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটির প্রেসিডেণ্ট মৌলবী ফজলল হককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মৌলবী সাহেবকে তাঁহার বাড়ী হইতে থানায় লইয়া যাওয়ার সময় পথের লোকেরা তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটা ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ম্মচারীর কাছে ভালো লাগে নাই। তিনি সকলকে বলেন তাঁহাকেই সেলাম করিতে। কেহ তাহাতে রাজী না হওয়ায় সকলের প্রতি নির্য্যাতন চলিতে থাকে। জন-সাধারণ তাহাতে কোনোরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করে নাই। ইহার পর ২রা এপ্রিল সারা সহরে হরতাল হয়। ৫ই তারিখ সকল দোকানদারকে আহ্বান করিয়া পুলিশ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা ২রা হরতাল করিয়াছিল কেন। উত্তরে তাহারা বলে, ১লা তারিখের কাণ্ড দেখিয়া আপনা হইতেই তাহারা হরতাল করিয়াছিল, কাহারো প্ররোচনায় করে নাই। এই অপরাধে প্রত্যেক দোকানদারের প্রতি পাঁচ ঘা করিয়া বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা হয়। কুন্দন লাল নামক একজন দোকানদারকে দশ ঘা বেত মারা হইয়াছিল। মৌলবী ফজলল হককে সেলাম করার জন্য ৯০ বৎসরের এক বৃদ্ধাও প্রহৃত হইয়াছিল। আমি তাহার ডান হাতের ফোলা দেখিয়াছি। পাঁচ বৎসরের একটি বালককেও এই নিমিত্ত মার সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহার কপালে আমি ক্ষতচিহ্ন দেখিয়াছি। বিস্তর লোক প্রহৃত হইয়াছিল। তাহার ভিতর একজন কালা ও বোবা ব্যক্তিও ছিল। একজন দোকানদারকে পা ধরিয়া টানিয়া বাহির করা হইয়াছিল, আর-একজনকে লাথি মারিয়া ও অন্যান্য নানা ভাবে অপমান করিয়া সেলাম করিতে বাধ্য করা হয়।

পণ্ডিত মালবীয়ের প্রতি ব্যবহার—

সম্প্রতি লাহোরের ব্রাড্‌ল হলে একটি সভা করার আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থির ছিল, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় উহাতে বক্তৃতা করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইয়া সভা বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করেন। পণ্ডিত মালবীয় তখনকার মত সমাগত সকলকে সভাস্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, সভা সাধারণ-সভা ছিল না এবং সেখানে কোনরূপ অশান্তি ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই। পত্রে তিনি একথারও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে পরের দিন তিনি আবার সভা করিতে চান, পুলিশ যেন তাঁহার সে চেষ্টায় কোনোরূপ বাধাপ্রদান না করে। কিন্তু পণ্ডিত মালবীয়ের সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। পুলিশ তাঁহাকে পরের দিনও সভা করিতে দেয় নাই। ইহার পরে তিনি শিয়াল-কোটে গমন করেন। সেখানেও কর্ত্তৃপক্ষের জবরদস্তি তাঁহাকে পুরামাত্রাতেই ভোগ করিতে হইয়াছে। সেখানে একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। পণ্ডিত-জীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সর্দ্দার গুরুবর্ম্মা সিংহের বাড়ীর নিকট একটা খোলা মাঠে অসংখ্য লোক জমা হয়। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয় নাই। পুলিশ সাহেব আসিয়া সভা ভাঙিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে ম্যাজি-ষ্ট্রেট যে ইস্তাহার জারী করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম হইতেছে, "শোভা-যাত্রা এবং সভা-সমিতির কালে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ফৌজদারীর কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে শিয়ালকোট মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার ভিতর ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল কোনো মিছিল বা সভাসমিতি হইতে পারিবে না। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রয়োজন হইলে যে কোনো ব্যক্তির উপর এই আদেশ জারি করিতে পারিবেন।" জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং পণ্ডিত মালবীয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেই লিখিয়া জানান, তিনি নিজেই শোভাযাত্রার পক্ষপাতী নহেন, সুতরাং শোভা-যাত্রা নহে, সেইদিন বিকালবেলা ৫টার সময় তিনি মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে এক সভা করিবেন। তাহাতে পুলিশ যেন তাঁহাকে বাধা-প্রদান না করে। এবার অবশ্য পুলিশ তাঁহাকে দয়া করিয়া আর বাধা-প্রদান করে নাই। সভায় অসংখ্য লোক জমিয়াছিল। পণ্ডিত মালবীয় প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতে আসিয়া কিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের মালিক হইয়া বসিয়াছে, তাহার ইতিহাস, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা, স্বরাজ-লাভের পন্থা, এ-সমস্ত কথারই তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।

হস্‌রৎ মোহানী—

কিছুদিন পূর্ব্বে মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীকে গ্রেপ্তার করিয়া আহমদাবাদে চালান দেওয়া হইয়াছিল। গ্রেপ্তারের সময় তিনি বলিয়া-ছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতির অনুকরণ করাতেই তাঁহাদিগকে সহজে গ্রেপ্তার করার সুবিধা গবর্মেণ্টের হইয়াছে। গবর্মেণ্টও দলে দলে লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে পুরিতেছেন।

সম্প্রতি আহমদাবাদের দায়রা জজের এজ্‌লাসে তাঁহার মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। মামলার জুরী ছিলেন পাঁচজন ভারতবাসী। মৌলানা সাহেব তাঁহার বর্ণনা-পত্রে বলিয়াছেন, "আমার রাজনৈতিক মতামত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করাই আমার এই বর্ণনা-পত্রের উদ্দেশ্য। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমি যেমন কাজ করিয়াছি এবং যেসব কথা বলিয়াছি, তাহা কিছুতেই ১২১ এবং ১২৪ (ক) ধারার অপরাধের গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলা যায় না। সুতরাং এই-সমস্ত ধারার একটি অক্ষরও আমার উপর প্রযোজ্য নহে। আমি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও কংগ্রেসের একজন সভ্য। কংগ্রেসের মতের উপর আমার বিশ্বাস আছে। বৈধ উপায়ে এবং শান্তি বজায় রাখিয়াই স্বরাজ লাভ করিব—ইহাই আমার ইচ্ছা। যদি কখনো নিরুপদ্রব নীতি লঙ্ঘন করিতেই হয় তবে তাহা সরকারের উপদ্রব-বহুল ধর্ষণ-নীতির বিনিময়ে আত্মরক্ষার জন্যই করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা বা তদুদ্দেশ্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার দায়ে ন্যায়তঃ আমি একে-বারেই দায়ী হইব না। আমার বিরুদ্ধে কিছুতেই ১২১ ধারার অপরাধ আসিতে পারে না।

"তাহা ছাড়া গবর্মেণ্ট অপরাধীকে আইন-মত শাস্তি না দিয়া যখন ফাঁসিকাঠ বা মেশিন-গানের সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিবেন, তখনই আমরা জোর-জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহার পূর্ব্বে নহে—এই কথাই আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। সুতরাং ১২৪ (ক) ধারার অভিযোগও আমার বিরুদ্ধে চাপানো যায় না। স্বাধীনতার কামনা করা মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ ধর্ম্ম। স্বাধীনতার প্রয়াসী হইলেই যে কাহাকেও ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করিতে হইবে, তাহার কোনো কারণ নাই। সুতরাং আমি গবর্মেণ্টকে ঘৃণা করি বলিয়াই স্বাধীনতা চাহিতেছি এরূপ মনে করা ভুল। স্বাধীনতার কামনা করিলেই সাজা দিতে হইবে, ইহাই যদি গবর্মেণ্টের সঙ্কল্প হয় তবে আর-একটি নূতন আইনের সৃষ্টি করিতে হইবে, ১২৪ (ক) ধারায় কুলাইবে না।"

জুরীগণ একবাক্যে মৌলানা সাহেবকে দুই ধারাতেই নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, "হস্‌রৎ মোহানী স্বাধীনতাই চাহিয়াছিলেন, জনসাধারণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করা বা রাজদ্রোহিতা প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না।"

জুরীদের এই অভিমত সত্ত্বেও বিচারপতি প্রথম অপরাধ, অর্থাৎ বক্তৃতার বিদ্বেষ প্রচার করার জন্য মৌলানা সাহেবের প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় অপরাধে অর্থাৎ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অপরাধেও তিনি নিজে মৌলানা সাহেবকে অপরাধী বলিয়াই মনে করেন। তবে তিনি এসম্বন্ধে হাইকোর্টের অভিমত না লইয়া কোনো দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন না।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

—

বাংলা

দেশের অবস্থা—

সমগ্র বঙ্গদেশের আয়তন ৮৪,০০০ বর্গমাইল। ইহাতে ৫ বিভাগ, ২৮ জেলা, ১২৫ সহর এবং ১,২৫,০০০ গ্রাম আছে। ১৯১১ খৃঃ লোক-সংখ্যা—৪৬৩০৫১৭০। ১৯২১ খৃঃ জনসংখ্যা—৪,৭৫,৯২,৪৬২ জন; তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা—২,৪৬,২৮,৩৬৪ আর নারীর সংখ্যা—২,২৯,৬৪,০৯৭ জন। ইহার মধ্যে এক আনা লোক সহরে এবং বাকি পনের আনা লোক পল্লীগ্রামে বাস করিতেছে।

বঙ্গদেশের মধ্যে ৫৪৮৩ বর্গ মাইল রক্ষিত বনভূমি, ২৩৩৭ বর্গমাইল গবর্ণমেণ্টের খাস পতিত জমি। বন্দোবস্তী ভূমির পরিমাণ ৬৫,২১১ বর্গমাইল। এতন্মধ্যে ৬৩,৬৯৯ বর্গমাইল ভূমিতে বঙ্গীয় প্রজা-ভূম্যা-ধিকারী আইন প্রচলিত।

বঙ্গীয় প্রজাপুঞ্জ বৎসরে প্রায় ১২।০ কোটী টাকা খাজনা দিয়া থাকে; গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হন।

বঙ্গদেশের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পরিমাণ ৬২৪৯ বর্গমাইল। গ্রামের সংখ্যা ১২ হাজার এবং লোক-সংখ্যা ৪৮,৩৭,৭৩০ জন।

মেদিনীপুর জেলার আয়তন ৫১৪৫ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা ২৬,৬৬,৬৬০ জন। এই জেলা আয়তন হিসাবে বঙ্গদেশে দ্বিতীয় এবং লোক-সংখ্যা হিসাবে তৃতীয় বলিয়া গণ্য।

বর্দ্ধমান বিভাগে শতকরা ৮০, প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৫৯, রাজসাহী বিভাগে ৩৭, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৩১ জন হিন্দু। জেলা হিসাবে মেদিনীপুরে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় অঞ্চলে কম। মেদিনীপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮৮ জন আর চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় অঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা ৯ জন হিন্দু। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় মুসলমান সংখ্যা মোটের উপর হিন্দুর দ্বিগুণেরও বেশী, আর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমান তিন গুণ অধিক।

বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২,০৯,৪৫,৫৭৯ এবং মুসলমানের সংখ্যা ২,৪২,-৩৭,২২৩ জন। লেখাপড়া-জানা হিন্দুর সংখ্যা ২৪,৭৫,২২৬ আর লেখাপড়া-জানা মুসলমানের সংখ্যা ১০,০৩,৭২৫ জন।

বঙ্গদেশে প্রত্যেক এক লক্ষ পুরুষের মধ্যে ৭১ হাজার লোক ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ৮৫ হাজার লোক ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে এবং ৯৩ হাজার লোক ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাঙ্গলার পল্লীতে যে-সকল লোক বাস করিতেছে, তাহাদের জন্য মাত্র এক সহস্র চিকিৎসক আছেন।

বঙ্গদেশে গড়ে ৪০ কোটি টাকার পাট জন্মে। যে-সকল পাটের কল আছে, তাহার মূলধন ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে অধুনা পাটের বাজারে শনির শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে।

---মোস্‌লেম-হিতৈষী।

সরকারের সুবিচার—

ধলা ও কালার পেটের বহর

ব্যবস্থাপক সভায় স্যার গড্‌ক্রে সেদিন সওয়ালের জবাবে দেখিয়েছেন যে, কালা ও ধলা পল্টনের খরচ পড়ে নীচের হারে:--

ধলা	টাকা
সার্জেন্ট বিবাহিত	২৬০৲
" অবিবাহিত	২০৪৲
কার্পোর্যাল বিবাহিত	২২৬৲
" অবিবাহিত	১১৭৲
সিপাহী বিবাহিত	২০৬৲
" অবিবাহিত	১৫০৲

কালার বেলায় কিন্তু মুড়ি-মিছ্‌রির একদর, বিবাহিত কি অবিবাহিত খায় বোধ হয় সমান, যথা:—

কালা	টাকা
হাবিলদার, পদাতিক	৫২৲
" তোপখানা	৫২৲
" ঘোড়সওয়ার	৫৮৲
নায়েক পদাতিক	৪৮৲
" তোপখানা	৪৯৲
" ঘোড়সওয়ার	৫৩৲
সিপাহী পদাতিক	৪২৲
" তোপখানা	৪৪৲
ঘোড়সওয়ার	৪৫৲

এই ব্যাপার দেখে বিবি বাসন্তী অবধি বলেছেন, গোরা বিদেয় করে কালা ঠ্যাঙাড়ে রাখলে পল্টনী ব্যয় আধাআধি এখনি হয়। হয় তো, কিন্তু করে কে?

—বিজলী।

স্বাধিকার ও স্বাধীনতা লাভের আয়োজন—

অসহযোগের প্রসার।

মালদহ

সালিশী সমিতির সংখ্যা—	৯২
স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—	১০০২
চরকার সংখ্যা—	২০০০
কাটা সুতার পরিমাণ—	২৫/০ মণ
তাঁতের সংখ্যা—	৩০২৭

ঢাকা

সালিশী সমিতির সংখ্যা—	২৭৫
সালিশে দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা—	৫০৭
সালিশে ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা—	৮২৫
সালিশে দায়ের মোকদ্দমার সংখ্যা—	২২৫
কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—	৫৩০
চরকার সংখ্যা—	৩০,০০০
ব্যবহৃত চরকার সংখ্যা—	২০,০০০
মাসিক কাটা সুতার পরিমাণ---	৬০/০ মণ
তাঁতের সংখ্যা—	১৫,০০০

বীরভূম

চরকার সংখ্যা---	২০৭০
মাসিক কাটা সুতার পরিমাণ—	৭/০ মণ
তাঁতের সংখ্যা—	২২,০০০
যত তাঁতে বিদেশী সুতা ব্যবহৃত হয়—	১০,০০০
যত তাঁতে ভারতীয় কলের সুতা ব্যবহৃত হয়—	১১০০
যত তাঁত মস্‌লীন তৈয়ারী করে---	৫০০
যত তাঁতে মিশ্রিত সুতা ব্যবহৃত হয়---	৫০০
যত তাঁতে চরকায় কাটা সুতা ব্যবহৃত হয়—	২০০
যত তাঁত বসিয়া আছে---	৩০০০
তাঁতির সংখ্যা---	২৪০২০
আর যত চরকা প্রবর্ত্তিত হইলে জেলাটি আত্মনির্ভর হইতে পারে	২০০০০
সালিশী সমিতি--	৭৩
সালিশে নিষ্পত্তি মাম্‌লার সংখ্যা—	৩৪৯
সালিশে দায়ের মাম্‌লার সংখ্যা—	১৪০

বাখরগঞ্জ

সালিশী সমিতি—	৪৫
সালিশে নিষ্পত্তি মাম্‌লার সংখ্যা—	৪৮৫
সালিশে দায়ের মাম্‌লার সংখ্যা—	১৪৩
চরকার সংখ্যা—	৬০৪৯
যত তাঁতে হাতে কাটা সুতা ব্যবহৃত হয়—	৮০
মাসে যত খদ্দর তৈয়ার হয়—	৬৯৫ গজ
মাসে যত মিশ্রিত খদ্দর তৈয়ারী হয়—	৩৮০ গজ
মাসে কলের সুতায় যে পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী হয়—	৪০,০০০ গজ
স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—	১৯

বাঁকুড়া

গ্রাম্য-সমিতির সংখ্যা—	২৭০
সালিশী সমিতির সংখ্যা—	১৪
চরকার সংখ্যা—	২০,০০০

হাওড়া

চরকার সংখ্যা—	১৯১৪
তাঁত (বিদেশী সূতা ব্যবহার করে)—	৪০০০
তাঁত (মিশ্রিত সূতা ব্যবহার করে)—	৭৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়—	১০
মাসিক কাটা সূতার পরিমাণ—	দেড়মণ

ফরিদপুর

কংগ্রেস-কমিটির সংখ্যা—	১২৪
সালিশী সমিতি—	৫৬
সালিশে নিষ্পত্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা—	৮০১
ঐ ফৌজদারী মোকদ্দমা—	৫০৮
ঐ বিচারাধীন মোকদ্দমা—	১৮৩
চালিত চরকার সংখ্যা—	২১২৪
তাঁতী জাতির সংখ্যা—	২৪০০০
তাঁত (চরকার সূতা ব্যবহার করে)—	১৭
তাঁত (মিশ্রিত সূতা ব্যবহার করে)—	৪৭৬
জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় —	১৫
মাসিক কাটা সূতার পরিমাণ—	১২ মণ

—নীহার।

হুগলী

সালিশী বিচারালয়	৩৫
মোকদ্দমা মীমাংসিত হইয়াছে	২২৫
চরকা চলিতেছে	৩০০০০
খাঁটী খদ্দরের তাঁত চলিতেছে	১০
মিশ্রিত খদ্দরের তাঁত চলিতেছে	৯০
খাঁটী খদ্দর মাসিক তৈরী হইতেছে	১২০০ গজ
মিশ্রিত খদ্দর মাসিক তৈরী হইতেছে	১০০০০ গজ
মাসিক চরকায় সূতা তৈরী হইতেছে	১০ মণ
খদ্দরের দোকান আছে	১২
সমগ্র জেলার তাঁতী	১২০০০
বিদেশী সূতা ব্যবহারকারী তাঁতী	১১০০

বগুড়া

সালিশী বিচারালয়	৪৪৭
মোকদ্দমা মীমাংসিত হইয়াছে	১০০০
চরকা চলিতেছে	৮০০০
মাসিক সূতা তৈরী হইতেছে	১৫ মণ
জেলায় তাঁতীর সংখ্যা	৩০০০
ভারতীয় মিলের ও চরকার সূতা ব্যবহারকারী তাঁতীর সংখ্যা	৩০০০
জেলায় তাঁতের সংখ্যা	১০০০

মিশ্রিত খদ্দরের কাপড়ের দাম প্রতি জোড়া ৫।০ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত।

জলপাইগুড়ি

সালিশী বিচারালয়ের সংখ্যা	১০০
সহরের সালিশী বিচারালয়ে মীমাংসিত মোকদ্দমার সংখ্যা	২০০
এলাকাভুক্ত অমীমাংসিত মোকদ্দমার সংখ্যা	২০
চরকা চলিতেছে	১০০০
চরকায় প্রস্তুত সূতা প্রতিমাসে	২ মণ
জেলায় তাঁতীর সংখ্যা	৮০০
ভারতীয় মিলের সূতা ব্যবহারকারী তাঁতীর সংখ্যা	২৫০

দিনাজপুর

চরকা চলিতেছে	১২০০
তাঁত চলিতেছে	২০০০

কংগ্রেস প্রচার বিভাগ
৭ই এপ্রিল, ১৯২২।

—মোহাম্মদী।

শিক্ষার সুব্যবস্থা—

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রস্তাবিত নিয়মাবলী (বহুল পরিবর্ত্তন)—কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নানা পরিবর্ত্তন করিবার জন্ত সিনেট হাউসে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারদিগের একটি ও এই-সমস্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের আর-একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমান শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে দেশে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে প্রতীকার করাও উহার অন্ততম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই-সমস্ত সভায় যে মতামত প্রকাশ পাইয়াছে তদনুসারে কতকগুলি নিয়মাবলী স্থির করা হইয়াছে। শীঘ্রই ঐগুলি সমর্থিত হওয়ার জন্ত সিনেট সভায় উপস্থিত করা হইবে। আমরা যে-সমস্ত নিয়মাবলীর মধ্যে নূতনত্ব আছে তাহা প্রকাশ করিলাম :—

(১) চোদ্দ বৎসর বয়স হইলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

(২) ইংরেজী ছাড়া অন্ত সমস্ত বিষয়েরই অধ্যাপনা এবং পরীক্ষা মাতৃভাষায় নির্ব্বাহ হইবে। সিণ্ডিকেট ইচ্ছা করিলে ব্যক্তিগত ভাবে এই নিয়মের পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হইবে —(ক) মাতৃভাষায় তিনটি পেপার (খ) ইংরেজীতে দুইটি (গ) অঙ্কশাস্ত্রে একটি ও (ঘ) ভূগোলে একটি।

(৪) নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোন একটিতে পরীক্ষা দিতে হইবে।

(ক) তৃতীয় ভাষারূপে—সংস্কৃত, পালী, তিব্বতীয়, আরবীয়, পারসীক, হিব্রু, আর্ম্মিনীয়ান, ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, জার্ম্মান, অথবা মাতৃভাষা ছাড়া অন্ত যে কোন ভারতীয় ভাষার একটি।

(খ) চিত্রবিদ্যা এবং ব্যবহারিক-জ্যামিতি।

(গ) পরিমিতি এবং জরীপ-শাস্ত্র।

(ঘ) পরীক্ষামূলক যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanics)।

(ঙ) প্রাথমিক বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র)।

(চ) শারীর-বিদ্যা, প্রাথমিক সাহায্য সমেত (first aid)।

(ছ) উদ্ভিদ-বিদ্যা।

(জ) অথবা অন্ত যে কোন বিষয় সিনেট উপযুক্ত বিবেচনা করেন।

ইহার যে-কোন বিষয়ে একটি পেপার হইবে। মাতৃভাষার পরীক্ষার

নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থাকিবে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি পুস্তক পাঠ্য করা হইবে। এই ইতিহাসে বাঙ্গলার কথা বিশেষ ভাবে থাকিবে এবং ভারতের শাসনপ্রণালী ও ইংরেজ আমলে ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। ব্যাকরণ ও রচনা সম্বন্ধেও পরীক্ষা হইবে।

(৫) পরীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত যে কোন এক বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময় শিক্ষা লাভ করিয়া তৎসম্বন্ধে সার্টিফিকেট উপস্থিত করিতে হইবে।

(ক) কৃষিবিদ্যা ও উদ্যান-তত্ত্ব।
(খ) সুতারের কাজ।
(গ) কামারের কাজ।
(ঘ) টাইপ-রাইটিং।
(ঙ) হিসাব-রক্ষা (Bo k-keeping)
(চ) শর্টহ্যাণ্ড।
(ছ) সুতা-কাটা ও বয়ন-বিদ্যা।
(জ) দরজীর কাজ ও সেলাই।
(ঝ) সঙ্গীত।
(ঞ) পারিবারিক অর্থ-নীতি।
(ট) টেলিগ্রাফ্।
(ঠ) সিনেট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠান—

ময়ূরভঞ্জের মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুর রাজ্যের জলাভাব দূরীকরণার্থ দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত টাকার সুদ হইতে বৎসর বৎসর পুষ্করিণী ও কূপ খনন করা হইবে। —যশোহর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দান।—আসামের মিঃ বি, বড়ুয়া এবং সার পি, সি, রায় রাসায়নিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকে দশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। —বীরভূমবার্ত্তা।

ফোর্ড কোম্পানীর উদারতা।—মিঃ হেনরী ফোর্ডের পুত্র মিঃ ইড্‌মেল ফোর্ড সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর ফোর্ড কোম্পানীর কারখানা-গুলিতে ৫ দিনে সপ্তাহ ধরা হইবে।

তিনি বলিয়াছেন, শনিবার ও রবিবার কারখানা একেবারে বন্ধ থাকিবে। "আমার পিতার ও আমার মতে মানুষের পক্ষে সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের কোম্পানীর উদ্দেশ্য হইল, কর্ম্মচারীগণের পারিবারিক জীবনের আদর্শ উন্নত করা।" অথচ এই পরিবর্ত্তনে কাহারও বেতন কমিবে না। ফোর্ড কোম্পানীর মালিকগণের দরিদ্র শ্রমজীবীদের প্রতি এই করুণার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশা করিতেছি, কেবল পকেট বোঝাইএর দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অন্যান্য কারখানার মালিকেরাও এইরূপ সৎ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—

মেদিনীপুরের সম্মিলনে সাধারণ সভার সভাপতি হয়েছিলেন টাকীর জমিদার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়। দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি যথাক্রমে শ্রীযুত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়দ্বয়, উভয়েই রায় বাহাদুর। এ ছাড়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুত সূর্য্যনারায়ণ অগস্তী সাহেব—ইনি অবসর-প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট। ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্য শাখার শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। —বিজলী।

শক্তির উপদ্রব—

শ্রীহট্টে গুর্খা-লীলা (নিজস্ব সংবাদ)—সেদিন কয়েকটি সশস্ত্র গুর্খা কাষ্টঘর হইতে ফিরিবার সময় মেছোবাজারের নিকট আসিয়াই পাদ্রী সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ের চাপরাশীকে চড়াও করিয়া ভুজালী দা দিয়া তাহাকে সাঙ্ঘাতিক আঘাত করে, তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাহার পর আর-একটি লোককে আঘাত করে। একজন মুসলমান, অন্যজন হিন্দু। চাপরাশী মারা গিয়াছে।

গাইবাঁধার হরিপুর গ্রামে টেক্স নিয়ে কিছু গোলমাল হয়। তাই সেখানে ৪০জন গুর্খা ও পুলিস হৈ হৈ করে এসে পড়ে। যারা টেক্স দেয় নি তাদের নামে ওয়ারেণ্ট নিয়ে এঁরা গ্রামে ঢোকেন। গ্রামের লোক কি বলে জানা নেই, তবে এঁরা উত্তম মধ্যম প্রহার আরম্ভ করে দেন। বন্দুকও চলে, নইলে ত চরম হয় না। এর ফলে একজন মারা পড়ে আর ৩ জন মারা পড়্‌বার জোগাড়ে আছে। পুলিসের তরফ থেকেও ২জন ঘাল হয়েছেন। মজা এই—যে-বাড়ীর লোক মরেছে ও ঘা খেয়ে এখনও বেঁচে আছে—তাদের কাছে টেক্স পাওনা ছিল না। —নবসঙ্ঘ।

প্রেসিডেন্সি জেলে হাঙ্গামা।—গত বুধবার দিন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে এক মহা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। কয়েদীগণের বোধ হয় বহুদিন হইতেই অনেক বিষয়ে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ঘটনার দিন একটি জমাদার নাকি কোন কয়েদীকে চপেটাঘাত করে। তাহাতে বহুসংখ্যক কয়েদী ক্ষেপিয়া উঠে। ক্রমে তাহারা ঐ জেলের সংসৃষ্ট পাটের গুদাম ও কেরোসিনের গুদামে আগুন লাগাইয়া দেয় বলিয়া শুনা যায়। অস্ত্রধারী পুলিশগণ আসিয়া কয়েদীগণের উপর গুলি চালাইতে থাকে। এই গুলির চোটে অনেকে মারা যায়। এপর্য্যন্ত সাতজন কয়েদীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। পাটের গুদামের ও কেরোসিনের গুদামের আগুন নিবাইতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে। দমকলের চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকদিন পর্য্যন্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নিবিয়া-ছিল না। প্রচলিত রীতি অনুসারে মাজিষ্ট্রেট যাইয়া এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন। কয়েদীগণ নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও কিজন্য এই প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইল তাহার কারণ এই অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইবে তাহা আশা করা যাইতে পারে না। যে অভিযোগের জন্য তাহারা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছে সে অভিযোগ সামান্য নহে। —চারুমিহির।

বঙ্গীয় রাষ্ট্র-সম্মিলন—

প্রাদেশিক সম্মিলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী বাঙ্গালীকে জাতির জীবনে যে অখণ্ড সত্য রয়েছে, তারই সন্ধানে নিযুক্ত হতে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেছেন—"সেই সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে আজ আমাদের সকল দিক দিয়া জাগিতে হইবে। শুধু রাজনীতি নয়, সমাজ-নীতি নয়, ধর্ম্মনীতি নয়, জীবনের সমস্ত বিকাশের মূলধারার অনুসন্ধান করিতে হইবে।" কথাটা নূতন নয়, কিন্তু রাজনীতির হট্টগোলের মাঝে সমস্ত 'বিকাশের মূলধারার অনুসন্ধানে' প্রবৃত্ত হবার আহ্বান এমন স্পষ্ট করে' কোন রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে করা হয়েছে বলে' আমরা জানিনে। 'বিকাশের' সেই 'মূল ধারাটি' কি এবং কি করে' তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সভানেত্রী যদিও তা বলেন নি, তবুও আজকার এই উত্তেজনার দিনে বাহির-মুখো এই জাতিকে অন্তরের দিকে চাইতে বলে' তিনি মায়ের কাজই করেছেন।

সভানেত্রীর অভিভাষণের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি দেশ-প্রেমকে আর নন্-কো গণ্ডির ভিতরই আটক রেখে চেপে মারতে চান না। দেড় বছর আগে যে গণ্ডি টানা হয়েছিল তার বাহিরে এলেই যে

দেশের কাজ অ-কাজ অথবা কু-কাজ হয়ে দাঁড়াবে এ ধারণা তাঁর মোটেই নেই। দেশের চাইতে নন্-কোঅপারেশনকে সভানেত্রী যে বড় করে' দেখেন না, তাঁর অভিভাষণ পড়ে' এইটেই বোঝা যায়।

শুধু সভানেত্রীর নয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতার মাঝেও এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েচে। প্রতিনিধিদের মাঝেও অনেকে এই মতেরই পক্ষপাতী; কিন্তু এমন অনেকেও ছিলেন, এখনও যাঁরা—"ভাজেন ঝিঙ্গে ত বলেন পটল!" —বিজলী।

শোক-সংবাদ—

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সোমবার সন্ধ্যায় দেহ-রক্ষা করেছেন।

তাঁর তিরোভাবে শুধু বেলুড় মঠ নয় সমস্ত দেশই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল। —বিজলী।

অনুন্নতের উন্নতি-চেষ্টা—

বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ (Bengal Peoples' Association)।

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি রবিবার দিবস কলিকাতাস্থ সিটিস্কুল-গৃহে বঙ্গদেশের কয়েকটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ সমবেত হইয়া 'বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ' গঠন করিয়াছেন। অনুন্নত সম্প্রদায়-সমূহের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করাই এই 'সঙ্ঘের' উদ্দেশ্য। অনুন্নত সম্প্রদায়-সমূহের সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য নানা বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে এই সঙ্ঘ অগ্রসর হইয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় এতদুদ্দেশ্যে পৃথকভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না ও অদূর ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় সুফল লাভের আশা করা যাইতে পারে। 'বঙ্গীয় জনসঙ্ঘ' আশা করেন যে, বঙ্গের বিভিন্ন অনুন্নত শ্রেণীর জনগণ সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার পরিপুষ্টি-সাধনে সহায়তা করিবেন।

আপাততঃ রাজবংশী (ক্ষত্রিয়), নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, শাহা, পাটনী, মাহিষ্য, মালী, ঝল্ল-মল্ল (ক্ষত্রিয়) ও রজক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ 'সঙ্ঘের' সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় ২০টি সম্প্রদায়ের নেতাগণ 'সঙ্ঘে" যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রীদামোদর দাস, বি-এ,
৩৯ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

সেবক
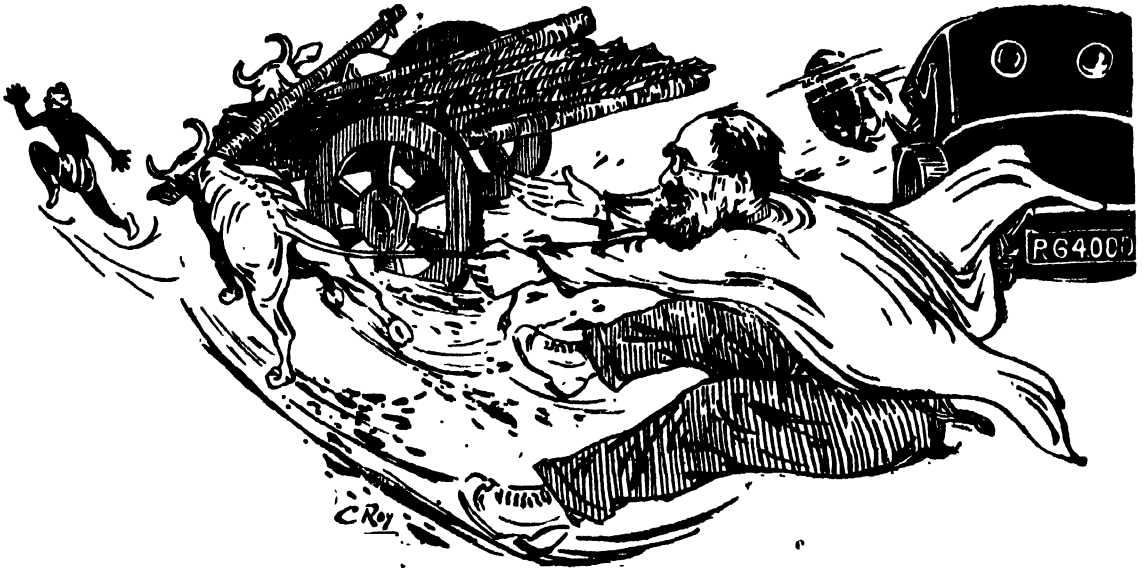
উপকারের উপদ্রব

শ্রীচারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত
আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে গৃহীত

[চৌষট-হাজারী মন্ত্রী মোটরগাড়ী হইতে নামিয়া বেচারা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইয়া নূতন ট্যাক্স্ আদায় করিতে ছুটিয়াছেন—তিনি স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের মন্ত্রী, দেশের হিত করিবেনই করিবেন পণ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।]

বিদূষক

১

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনা-মাণিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পুজো দিলেন।

পুজো দিয়ে চলে আসছেন—গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক—সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

এক জায়গায় দেখ্‌লেন পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করচে।

রাজা তার দুই সঙ্গীকে বল্‌লেন, "দেখে আসি, ওরা কি খেল্‌চে।"

২

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেল্‌চে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?"

তারা বল্‌লে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জিৎ, কার হার?"

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বল্‌লে, "কর্ণাটের জিৎ, কাঞ্চীর হার।"

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা করে হেসে উঠল।

৩

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেল্‌চে।

রাজা হুকুম করলেন, "একেকটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো, আর লাগাও বেত।"

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বল্‌লে, "ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ কর।"

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বল্‌লেন, "এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনোদিন যেন ভুল্‌তে না পারে।"

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধ্যে বেলায় সেনাপতি রাজার সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বল্‌লে, "মহারাজ শৃগাল কুকুর ছাড়া এগ্রামে কারো মুখে শব্দ শুন্‌তে পাবে না।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মহারাজের মানরক্ষা হল।"

পুরোহিত বল্‌লে, "বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।"

বিদূষক বল্‌লে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।"

রাজা বল্‌লেন, "কেন?"

বিদূষক বল্‌লে, "আমি মার্‌তেও পারিনে, কাট্‌তেও পারিনে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাস্‌তে পারি। মহারাজের সভায় থাক্‌লে আমি হাস্‌তে ভুলে যাব।"

(ভারতী, বৈশাখ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ-বেলা

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই
তার লাগি' আজ বাজাই বাঁশি।
যখন এ কূল যাব ছাড়ি,'
পারের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা
বাঁশির সাথে যাবে ভাসি'॥
সেই যে আমার বনের গলি
রঙীন ফুলে ছিল আঁকা,
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে
চিহ্ন তাহার পড়্‌ল ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে
চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায়
আধ্-ভোলা সেই কান্না-হাসি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, ১০ই চৈত্র, ১৩২৮।

বিতরণ

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
গান গেয়ে মোর কেটেচে দিন।
যাবার বেলায় দেব কারে
বুকের কাছে বাজ্‌ল যে বীণ?
সুরগুলি তার নানাভাগে
রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায়
স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।
কিছু বা সে মিলন-মালায়
যুগল গলায় রইবে গাঁথা।
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে
দুই চাহনির চোখের পাতা।
একদা কোন্ চৈত্র মাসে
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
হঠাৎ আমার মনের কথা
কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিলাইদা, ১১ই চৈত্র, ১৩২৮।

অবশেষ

কার যেন এই মনের বেদন
চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায় ;
ঝুমকো লতার চিকন পাতা
কাঁপে রে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।
হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী,
কার সোহাগের স্মরণখানি,
আমের বোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়।
কাঁকন দুটির রিনিঝিনি
কার বা এখন মনে আছে ?
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি
পিয়াল বনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ঐ আভাস দোলে
নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে,
তার সাথে মোর দেখা ছিল
সেই সেকালের তরী-বাওয়ায়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিলাইদা, ১২ই চৈত্র, ১৩২৮।

নিদ্রাহারা

নিদ্রাহারা রাতের এ গান
বাঁধ্‌ব আমি কেমন সুরে ?
কোন্ রজনীগন্ধা হতে
আন্‌ব সে তান কণ্ঠে পুরে ?
সুরের কাঙাল আমার কথা—
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা,—
সাঁজ-সকালে বনের পথে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে।
ওগো সে কোন্ বিহান বেলায়
এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম
শিউরেছিল শিশির-জলে !
অলকে তার একটি গুছি
করবীফুল রক্তরুচি ;
নয়ন করে কি ফুল চয়ন
নীল গগনে দূরে দূরে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিলাইদা, ১৩ই চৈত্র, ১৩২৮।

চেনা

এক ফাগুনের গান সে আমার
আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারাল
নতুন কালের ফুলে ফুলে ?
শুধায় তারে বকুল হেনা,
"কেউ আছে কি তোমার চেনা ?"
সে বলে, "হায়, আছে কি নাই—
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে,
নতুন কালের ফুলে ফুলে"॥
এক ফাগুনের মনের কথা
আর ফাগুনের কানে কানে
গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়,
"মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে ?"
আকাশ বলে, "কে জানে সে
কোন্ ভাষা যে বেড়ায় ভেসে !"
"হয়ত জানি, হয়ত জানি,"
বাতাস বলে দুলে দুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে॥

(ভারতী, বৈশাখ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিলাইদা, ১৪ই চৈত্র, ১৩২৮।

উপসংহার

১

ভোজরাজের দেশে মেয়েটি ভোর বেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায়। সে ছিল কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য্য বলেন, "একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি সুর লাগ্‌ল। তার পরে যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুল্‌তে গেছি তখন মেয়েটিকে ফুলগাছ-তলায় কুড়িয়ে পেলুম।"

সেই অবধি আচার্য্য তাকে আপন তম্বুরাটির মত কোলে নিয়ে মানুষ করেছেন ; মুখে যখন কথা ফোটেনি, এর গলায় তখন গান জাগ্‌ল।

আজ আচার্য্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভাল দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মত মানুষ করে।

কত যুবা দেশ-বিদেশ থেকে এর গান শুনতে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্য্যের বুক কেঁপে ওঠে, বলেন,—"যে বোঁটা আল্‌গা হয়ে আসে, ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

মেয়েটি বলে,—"তোমাকে ছেড়ে আমি একপলক বাঁচিনে।"

আচার্য্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন,—"যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল, সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েছে। তুই যদি ছেড়ে যাস তাহলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

২

ফাল্গুন-পূর্ণিমায় আচার্য্যের প্রধান শিষ্য কুমার সেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম কর্‌লে। বল্‌লে,—"মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তাহলে দুজনে মিলে আপনার চরণ-সেবা করি।"

আচার্য্যের চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌লেন,—"আন দেখি আমার তম্বুরা। আর তোমরা দুইজনে রাজার মত, রাণীর মত আমার সাম্‌নে এসে বস।"

তম্বুরা নিয়ে আচার্য্য গান গাইতে বস্‌লেন। দুলহা-দুলহীর গান সাহানার সুরে। বল্‌লেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না, বৃন্তের কোঁটায় ভেঙে-ওঠা জুঁই ফুলটির মত হাওয়ায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে খসে পড়ে।

শেষে তম্বুরাটি কুমার সেনের হাতে দিয়ে বল্লেন,—"বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তারপরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন,—"এই লও আমার প্রাণ।"

তার পরে বল্লেন,—"আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।"

মাধবী আর কুমার গান ধরলে—সে যেন আকাশ আর পূর্ণ-চাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময় দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য্য কাঁপ্তে কাঁপ্তে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—"মহারাজের কি আদেশ?"

দূত বল্লে,—"তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাঁকে ডেকেচেন।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি ইচ্ছা তাঁর?"

দূত বল্লে,—"আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতি-গৃহে যাত্রা করবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোয়াল, রাজকন্যা যাত্রা করলে।

মহিষী মাধবীকে ডেকে বল্লে,—"আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়্ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিক্‌রে পড়্ল।

রাজকন্যার ময়ূরপংখী আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পাল্কী। সে পাল্কী কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধুলোর উপর ঝড়ে ভাঙা অশ্বত্থ ডালের মত পড়ে রইলেন আচার্য্য, আর স্থির দাঁড়িয়ে রইল কুমার সেন।

পাখীরা গান গাইছিল পলাশের ডালে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনো-দিন ফাল্গুন-সন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয় এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিঃশ্বাস ফেল্লে।

(ভারতী, বৈশাখ)　　শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরীর পরিচয়

১

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ-বিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে। ঘটক বল্লে, "বাহ্লীক রাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন শাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বল্লে, "গান্ধার-রাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়্চে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ আর ধরে না।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বল্লে, "কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোর বেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মত তার বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।"

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়্তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বল্লে, "এর কারণ? ডাক দেখি মন্ত্রীপুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বল্লে, "তুমি ত আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বল, বিবাহে তার মন নেই কেন?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্লে, "মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেচে সেই অবধি তার কামনা সে পরী বিয়ে করবে।"

২

রাজার হুকুম হল পরীস্থান কোথায় খবর চাই। বড় বড় পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখ্লে। মাথা নেড়ে বল্লে, "পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোন ইসারা মেলে না।"

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়্ল। তারা বল্লে, "সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপই ঘুরলেম,—এলা দ্বীপে, মরীচ দ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন আন্তে; মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েচি কৈলাসে দেবদারুবনে, কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।"

রাজা বল্লে, "ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেচে?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্লে, "সেই যে আছে নবীন পাগ্‌লা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারি কাছে "পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বল্লে, "আচ্ছা ডাক তাকে।"

নবীন পাগ্‌লা এক-মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে?"

সে বল্লে, "সেখানে আমি ত সদাই যাওয়া-আসা করি।

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা?"

পাগ্‌লা বল্লে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায়?"

পাগলা বল্লে, "দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কি উপায়ে?"

পাগ্‌লা বল্লে, "কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বল্লে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগ্‌লামি, এ'কে তাড়িয়ে দাও।"

৩

পাগ্‌লার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজ্‌ল।

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেচে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্চ?"

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক সরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে, "উদাস ঝোরা।" সেই ঝরনার তলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়।

এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বল্‌লে, "আজ পাব দেখা।"

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে কাম্যক্ সরোবরের তীর বেয়ে চল্‌ল, পৌঁছল কাম্যক সরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ের কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষ ফুল পরেছে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বল্‌লে, "তোমার ঐ কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী? ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরো ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বল্‌লে, "এই নাও।"

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি কোন্ পরী, আমাকে সত্য করে' বল।"

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিন মেঘের আচম্‌কা বৃষ্টির মত তার হাসির উপর হাসি, সে হাসি আর থাম্‌তে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাব্‌ল, "স্বপ্ন বুঝি ফল্‌ল—এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বল্‌লে, "এস।"

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়্‌ল, একটুও ভাব্‌ল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠ্‌ল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তোমার নাম কি?"

সে বল্‌লে, "আমার নাম কাজরী।"

উদাস ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বল্‌লে, "এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বল্‌লে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা ত ছদ্মবেশ জানি নে।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "আমি যে তোমার পরীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই।"

পরীর মূর্ত্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাব্‌লে, "এর হাসির সুর এই ঝরণার সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরণার পরী।"

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েচে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দ্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এ-সব কেন?"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

তখন তার চোখ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়্‌ল তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফের্‌বার সময় হয়েচে; আর মনে পড়্‌ল তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনচে, আর গুন গুন করে গান গাইচে।

সে বল্‌লে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌ল, বাজ্‌ল বাঁশি, কাঁসি, দামামা,—ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দ্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়ীতে নাম্‌ল, রাজমহিষী কপাল চাপ্‌ড়ে বল্‌লে, "এ কেমনতর পরী?"

রাজার মেয়ে বল্‌লে, "ছি, ছি, কি লজ্জা!"

মহিষীর দাসী বল্‌লে, "পরীর বেশটাই বা কি রকম?"

রাজপুত্র বল্‌লে, "চুপ কর, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেচে।"

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কি না। দেখে যে কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেচে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁৎ করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষ রাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মত।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠ্‌তে যায় রাজপুত্র শক্ত করে' তার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "আজ তোমাকে ছাড়্‌ব না,—নিজরূপ প্রকাশ কর, আমি দেখি।"

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুই চোখ জলে ভরে এলো।

রাজপুত্র বল্‌লে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে?"

সে বল্‌লে "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তবে এইবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।"

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝ গগনে। রাজবাড়ীর নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমিঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পরে' হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুক্‌ল, পরী-বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় শাদা আস্তরণ, তার উপর শাদা কুন্দ ফুল রাশ-করা; আর উপরে জান্‌লা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েচে।

আর কাজরী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজ্‌ল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেচে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই?

রাজপুত্র বল্‌লে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"

(বঙ্গবাণী, বৈশাখ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাহার মীমাংসায় বহুলোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৫)

ছত্রিশ জাতি কি কি ও কোথায় উল্লেখ আছে?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৬)

হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা কতদিনের? শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

(১৭)

ইংরেজী 'Tea' শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ 'চা'। ইহার ব্যুৎপত্তি কোন ভাষা হইতে? শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(১৮)

দুধ সময় সময় টক হইয়া যায় কেন? এমন কোন উপায় অবলম্বন করা যায় কি না যদ্দারা দুধ টক হয় না? শ্রীনলিনী ভদ্র।

—

মীমাংসা

গত বৎসরের মীমাংসা

(১১৬)

প্রাচীন ভারতে ঘড়ী ও সূচিকাভরণ

জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য একটি শ্লোকে বলিয়াছেন যে,১৩৩৬ শকাব্দে (১১১৪ খৃঃ) তাঁহার জন্ম ও ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১১৫০ খৃঃ) তিনি সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২শ শতাব্দীতে ঘড়ির প্রচলন হওয়ার কোনও প্রকার সম্ভাবনা দেখি না।

সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসা ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা—

(১) ছেদ্যক্রিয়া—Incision

(২) ভেদ্যক্রিয়া—Puncturing.

(৩) লেখ্যক্রিয়া—Scratching.

(৪) বেধ্যক্রিয়া—Poring.

(৫) বন্ধনকার্য্য—Bandage.

(৬) সীব্যক্রিয়া—Sewing.

(৭) এষ্যক্রিয়া—Probing.

(৮) আহার্য্য—Extraction.

৪ নং বেধ্যক্রিয়ার (Boring) অর্থ, শিরা কাটা, শিরার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি পঞ্চানন নিয়োগী। সুশ্রুত খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। সুতরাং ভাস্করাচার্য্যের যুগে সূচিকাভরণ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল—ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(১৩৭)

বর্ত্তমান মাস-গণনার আরম্ভ-কাল।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতূ,
শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রীষ্মাবৃতূ,
নভশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতূ,
ইষশ্চোর্জ্জশ্চ শারদাবৃতূ,
সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতূ,
তপশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতূ॥"

তৈ—স—৪,৪,১১০।

মধু ও মাধব (চৈত্র ও বৈশাখ) বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু, শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু এবং মাঘ ও ফাল্গুন শিশির ঋতু।

"প্রবাসী" ১৩১৫, ৪০৪ পৃঃ।

এখানে দেখা গেল—সেই বৈদিক সময়ের মাসগুলিরও ও আজ-কালের মাস-গণনার মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী।

(১৪০)

দূর্ব্বা তুলসী বিল্ব প্রভৃতির পবিত্রতা

দূর্ব্বা, তুলসী ও বিল্ব ইহাদের প্রত্যেকেরই উৎপত্তির এক-একটি আখ্যায়িকা পুরাণে দৃষ্ট হয়। দূর্ব্বা বিষ্ণুর লোম হইতে সমুদ্র-মন্থনের সময় উৎপন্ন হইয়াছে। তুলসী নাম্নী রমণীর কেশসমূহ নারায়ণের বরে তুলসীনামক পুণ্যবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ্মী একদিন শিব-পূজাকালে এক স্তন ছিঁড়িয়া তাহার উপর দেন। শিবের বরে সেই স্তনই বিল্ববৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই ইহার নাম শ্রীফল বৃক্ষ। শিবের ইচ্ছা, ইহার পত্রেই লোকে তাঁহার পূজা করুক। তাহাতেই তিনি প্রসন্ন হইবেন। এই বৃক্ষগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে যে জন্ম হইতেই ইহারা পবিত্র। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।
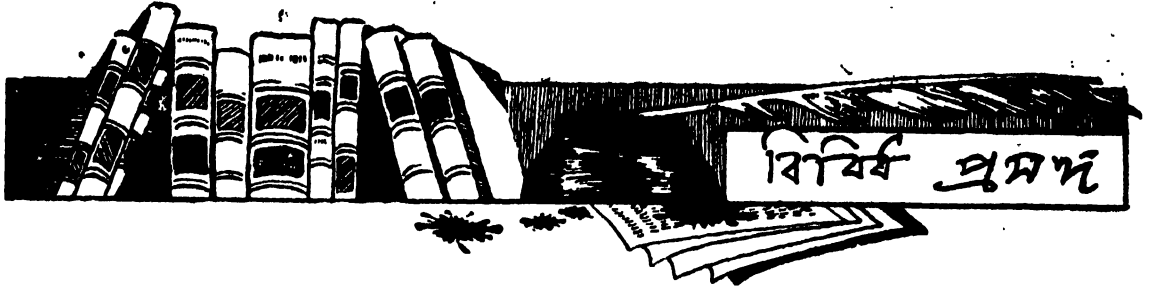
স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ব্রিটিশ লাঠির যুক্তি

কথায় বলে মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি। বঙ্গের লাট লর্ড লিটন বোধ হয় ভারতের লোকদিগকে মূর্খ মনে করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনতালাভেচ্ছা রোগে আক্রান্ত তাহাদিগকে বৃটিশ লাঠি দেখাইয়াছেন।

বিগত ১১ই এপ্রিল, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন লর্ড লিটনকে অভিনন্দিত করিয়া একটি অভিভাষণ পড়েন। তাহার উত্তরে বক্তৃতা করিয়া লর্ড লিটন অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

I see in the task ahead of us—the task I mean of progressing towards self-government or *Swaraj*—two possible interpretations of *Swaraj*, two alternative lines of advance, one of which is clear and open, bright with hope and free from obstacles, the other is encumbered with the thickest of barbed wire entanglements, offers no field for co-operation, and is dark with the menace of racial storms.

The first interpretation of *Swaraj* is the constitutional independence of India. Self-government in the sense of government by the Indian Parliaments as distinct from Government by the British Parliament but in association with the other self-governing Dominions, and allegiance to our common King-Emperor. This can be attained by building up a constitution suited to Indian conditions, by the establishment of an efficient administration in India in which Indians and Europeans are equally interested, in which they are both represented and work side by side freed from the necessity of reference to or control by a Secretary of State of the Imperial Parliament. The hallmark of such *Swaraj* would be the threefold requirements of efficiency in administration, racial co-operation and constitutional freedom. That is a goal towards which Indians and Europeans can advance together, the rate of advance towards which is practically in their own hands and the ultimate attainment of which will be good for India and good for Britain.

The second interpretation of *Swaraj* is racial independence, the Government of India by Indians as distinct from Government by the British, and it is sought to attain it by substituting Indians for Europeans in every branch of the administration and subordinating considerations of efficiency to considerations of race, with the ultimate goal of complete separation.

That is a goal which the British, whether in India or in Britain, can never accept—they cannot advance towards it with Indians, but must contest every inch of the way with them. To prevent its ever being reached the whole strength of our people would, if necessary, be used.

These two policies are in my opinion too often confused, because the policy of racial independence includes also constitutional independence and the policy of constitutional independence necessarily involves the consideration of many racial questions—the readjustment in many respects of the relationship between the two races and the provision of equal opportunities for both. But there is a fundamental difference between the two. They are in fact irreconcilable. They have a different starting point and a different objective. One is constructive and based upon love. It consequently strives to avoid racial controversies and, when they arise, to adjust them by consultation and agreement. The other is destructive and based upon hate. It seeks to make racial issues the main test of the sincerity of Government professions, and presses for their settlement by immediate legislation, whether agreement concerning them can be obtained or not. It is essential that these two should be kept distinct, and the difference between them understood. If the latter has to be stoutly resisted, the former should be sincerely encouraged.

এখানে লাটসাহেব দুরকম স্বরাজের কথা বলিয়াছেন। প্রথম, ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নিয়মতন্ত্র-প্রণালী-সম্মত স্বাধীনতা; দ্বিতীয়, ইংলণ্ড হইতে পৃথক্ হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।

ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে তিনি যে কেন জাতিগত (racial) স্বাধীনতা আখ্যা দিলেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার ভিতর জাতিগত ভাবকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল? ভারতবর্ষ যদি কখনও স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা হইলে সে স্বাধীনতাকে জাতিগত বলা চলিবে না, এমন নয়, তাহা জাতিগতই হইবে, কিন্তু কেবলমাত্র উহা জাতিগত বলিয়াই বা একমাত্র সেই কারণেই ভারতবাসী স্বাধীনতা চায় না। স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করা মানুষের স্বভাব—শাসকসম্প্রদায় ও প্রজা যদি একজাতীয় হন তাহা হইলেও, এবং যদি ভিন্নজাতীয় হন তাহা হইলেও; সুতরাং যে-ক্ষেত্রে শাসকগণ ভিন্নজাতীয়, সেখানে তাঁহাদের ভিন্নজাতীয়তার উপর অতটা জোর দেওয়া উচিত নয়; কেন-না তাহাতে ইহা মনে হইতে পারে, যে, কেবলমাত্র ঐ বিভিন্নতার জন্যই যেন শাসিত মানুষরা স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতেছে। যে-সকল আমেরিকান্ ঔপনিবেশিক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের স্বজাতীয় শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসনকর্ত্তাদের দল যদি ভিন্নজাতীয় হইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহারা আরো পূর্ব্বেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অধীন দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ও আংশিক স্বাধীনতা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কি না, ইহাই আসলে বিবেচনা করিবার বিষয়। ইতিহাসে আমরা ইহাই দেখিতে পাই, যে, বিজেতা ও বিজিত যেখানে ভিন্নজাতীয়, সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার ইচ্ছা অধিক প্রবল। কিন্তু ইতিহাস ইহাও বলে, যে, যেখানে বিজেতা ও শাসিত একই জাতীয়, সেখানেও স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং ভারতবাসীরা অথবা একদল ভারতবাসী যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে চান, তাহা হইলে সে ইচ্ছাকে কিছু-মাত্র অস্বাভাবিক বলা চলে না। তাঁহাদের শাসন-কর্ত্তারা যে ভিন্নজাতীয়, ইহাতে তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবারই কথা, হ্রাস পাইবার কথা নয়; ইতিহাস ও জীববিজ্ঞান ইহাই বলে। সুতরাং তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিলে সেটা জাতিগত (racial) স্বাধীনতাও হয় বলিয়া তাঁহাদের স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষাটাই মারাত্মক দোষ, এমন কথা বলা চলে না। বরং একটি ভিন্নজাতীয় শাসক দ্বারা শাসিত ও অন্যটি সমজাতীয় বিজেতা প্রভুর অধীন, এইরূপ দুইটি অধীন জাতির বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐতিহাসিক ও জীববিজ্ঞানবিৎ নিসংশয়িত রূপে এই মতই প্রকাশ করিবেন, যে, প্রথমোক্ত জাতিটির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা শেষোক্তটির তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত।

গ্রীক বনাম তুর্ক, বুল্‌গেরিয়ান্ বনাম তুর্ক, সার্ভিয়ান্ বনাম তুর্ক, আর্ম্মেনিয়ান বনাম তুর্ক, এই চারিস্থলেই দেখা যাইতেছে যে বিজেতা ও বিজিত ভিন্নজাতীয়। কিন্তু গ্রীক্, বুল্‌গার, সার্ভিয়ান বা আর্ম্মেনিয়ানকে তাহাদের জাতিগত স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে ইংরেজের ত কোথাও বাধে নাই? আমরা জানি, যে, তুর্কদিগকে অত্যাচারী ঘোষণা করিয়াই ইংরেজ ঐ-সকল অধীন জাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইংরেজদের মতে, ইংরেজ ত মিশরের উপর অত্যাচার করেন নাই, তবে তাঁহারা মিশরকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন কেন? উহা শুধু স্বাধীনতা নয়, আবার জাতিগত স্বাধীনতাও বটে। আবার এ দিকে দেখা যায়, ইংরেজ রুশীয়ের বিরুদ্ধে পোলদের সাহায্য করিতেছেন, যদিও উভয়েই এক স্লাভজাতীয়। আমেরিকানরা ত ভিন্নজাতীয় ফিলিপিনোদের উপর অত্যাচার করে নাই, বরং সুশাসনের জন্য ফিলিপিনোরা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ; তবে ফিলিপিনোরা স্বাধীন হইতে চায় কেন? ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, বিজেতা এবং বিজিত সমজাতীয় হউক বা না হউক, শাসকগণ শাসিতদের প্রতি অত্যাচার করুক বা না করুক, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে জাগিয়া উঠিবেই। স্বাধীনতা যদি দেশবিশেষে জাতিগত স্বাধীনতাই হয়, সেইজন্য তাহা নিন্দার্হ হইবে কেন? পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলি,

সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই আমরা দেখিতেছি, য, ইংরেজ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা মিশরকে াধীনতা দান করিয়াছেন। মিশরবাসীগণ যে ইংরেজ ইতে ভিন্নজাতীয়, তাহাতে ত সন্দেহ নাই? মিশরকে দি জাতিগত স্বাধীনতা দেওয়া চলে, তবে ভারতবর্ষকেই া দেওয়া না চলিবে কেন?

সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার ভিতর াতিগত বিভিন্নতার কথাটাকে অত বড় স্থান দিয়া লর্ড লিটন অন্যায় করিয়াছেন।

তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় াই। মডারেটগণ যে 'নিয়মতন্ত্রানুযায়ী স্বাধীনতা'র াক্ষপাতী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসহযোগীদের লেরও সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ইংরেজ-প্রভাব-মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই য কংগ্রেসের লক্ষ্য, আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মা াান্ধীই এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইতে দেন নাই। 'ইয়ং ণ্ডিয়া' পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, যে, স্বরাজ অর্থে তিনি ঝেন, ভারতবর্ষের পক্ষে স্বশাসক ইংরেজ উপনিবেশের মান অধিকারলাভ। ইহার সহিত লর্ড লিটনের 'নিয়ম-ন্ত্রানুযায়ী স্বাধীনতা'র প্রভেদ কি? অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-য়াসী অসহযোগীও আছেন। অতএব আমাদের তিনটি াজনৈতিক দলের কথা ভাবিয়া চলিতে হইবে, দুইটি নয়।

লর্ড লিটনের মতে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা দ্বিতীয় প্রকা-রের স্বরাজের মধ্যে ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়ের সহযোগিতার কান স্থান নাই। কেন যে নাই, তাহা ত আমরা বুঝিতে ারি না। বোধ হয় আমরা সহযোগ অর্থে যাহা বুঝি, ইংরেজরা তাহা বোঝেন না, এই জন্যই এই সমস্যার ৎপত্তি। আমরা সহযোগ বলিতে যে কি বুঝি, াহা মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার তে, তাঁহার প্রার্থিত স্বরাজের ভিতর ইউরোপীয়েরও ান থাকিবে। তবে জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত া প্রভু না হইয়া তাঁহারা তখন হইবেন সমশ্রেণীস্থ া সাহায্যকারী। জাপান ও অন্যান্য স্বাধীন দেশে ইংরেজরা এ ভাবে কাজ করিয়াছেন। কিন্তু সহযোগ বলিতে ইংরেজ সাধারণতঃ এই বুঝেন, যে, কাজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতি এবং প্রণালী সকলই তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন এবং আমরা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া অভিপ্রায়গুলি কার্য্যে পরিণত করিব। কিন্তু ইহা কি সহযোগ, না আজ্ঞাপালন? আমরা ত ইহাকে তাঁবেদারীই মনে করি। যদি স্বাধীন গ্রীকের সঙ্গে ইংরেজের সহযোগ করা চলে, যদি স্বাধীন জাপানী বা ফরাসীর সঙ্গে সহযোগ চলে, তবে স্বাধীন ভারতবাসীর সহিত না চলিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজের আন্তরিক ইচ্ছা যে আমরা চিরকাল তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধির যন্ত্র ও ভৃত্য হইয়া থাকি এবং চিরদিন তাঁহাদের মন-ভুলান কথা দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকি। ইহাকেই তাঁহারা সহযোগ বলেন। কিন্তু এইরূপ "শাক দিয়ে মাছ ঢাকা" চিরকাল চলিতে পারে না। বাস্তবিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া, সমান পদে দাঁড়াইয়া সহযোগ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের আছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্য আমরা দুইটি পরীক্ষার প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি এই; ভারতবর্ষে যতগুলি ইংরেজকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অন্ততঃ ততগুলি ভারতবাসীকে ইংলণ্ডে সেইরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যের ভিতর ইংরেজের যেমন সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার, ভারতবাসীকেও সেইরূপ অধিকার দেওয়া হউক। লর্ড লিটন কি এই প্রস্তাব দুইটির সমর্থন করিতে সম্মত হইবেন?

লর্ড লিটন বলিতেছেন, যে, শাসন বিভাগের প্রত্যেক অংশে ইংরেজের স্থানে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিয়াই এই দ্বিতীয় রকমের স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা হইতেছে। এই কথায় ইহাই বুঝায়, যে, প্রথম শ্রেণীর স্বরাজ, যে স্বরাজ স্বশাসক উপনিবেশগুলি ভোগ করিতেছে, তাহার ভিতর এইরূপ নিয়োগ যেন হয় নাই বা হইতেই পারে না। কিন্তু ইহা সত্য কথা নয়—অন্ততঃ আমরা যতদূর জানি, ইহা সত্য নয়। আমাদের মত সত্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা লাটসাহেবকে দুই একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কানাডা, নিউজীল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া তিনটিই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপনিবেশ। কানাডাতে যে-সকল ব্যক্তি উচ্চতম,

উচ্চতর ও উচ্চ রাজপদগুলি দখল করিয়া আছেন, তাঁহারা কি, ভারতবর্ষে যেমন তদ্রূপ, অধিকাংশই ইংরেজ না কানাডার অধিবাসী? অষ্ট্রেলিয়াতে ঐ-সকল কর্ম্মচারী কি অধিকসংখ্যক অষ্ট্রেলিয়ান্ না ইংলণ্ডনিবাসী? নিউ-জীলণ্ডেই বা তাঁহাদের কোন্ দল সংখ্যায় বেশী? আমরা যতটা জানি, তাঁহারা প্রায় সকলেই কানাডিয়ান্, অষ্ট্রেলিয়ান্ এবং নিউজিল্যাণ্ডার। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয়ের পরিবর্ত্তে ভারতবাসীকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত কবিতে চাই, তাহা হইলে কেন যে তাহা আমাদের পক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উপনিবেশবাসী-গণ ইউরোপীয়বংশোদ্ভূত মানুষ। তবুও তাহারা ইউরোপ হইতে মানুষ আম্দানি করিয়া আপনাদের শাসন কাজ চালায় না। ইহাতে তাহারা অপরাধ করিতেছে বলিয়া কেহ মনে করে না। কিন্তু আমরা ইউরোপীয়বংশোদ্ভূত নই; অথচ আমরা যদি ইউরোপ হইতে শাসক আম্দানি না করিয়া আপনাদের কাজ আপনারাই করিতে চাই, তাহা হইলে সেটা এমন গুরুতর অপরাধ হইয়া দাঁড়ায় কেন? আমাদের ইচ্ছাটাই ত অধিকতর স্বাভাবিক।

স্বাধীনতালাভপ্রয়াসী ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে লর্ড লিটনের দ্বিতীয় অভিযোগ এই, যে, তাঁহারা কে কত কাজের লোক তাহা না দেখিয়া এবং সেই বিচার অনুসারে কর্ম্মী নিয়োগ না করিয়া কে কোন্ জাতির লোক তাহাই বেশী করিয়া দেখেন ও তদনুসারে কর্ম্মী নিযুক্ত করিতে চান। ইহা সত্য কথা নয়। ভারতবর্ষে ইংরেজেরা স্বয়ং এই দোষে দোষী। উপযুক্ত ভারতীয় থাকিতেও ইংরেজ রাজকার্য্যে ইংরেজ নিযুক্ত করে। এই দোষটা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া লর্ড লিটন উল্টা চাপ দিতে চাহিয়াছেন!

কোন ভারতবাসীই, তিনি নরম বা চরম যে পন্থী হোন, ইহা ইচ্ছা করিতে পারেন না, যে, শাসনযন্ত্র কাজের অযোগ্য হোক। আমরা সকলেই চাই, যে, বর্ত্তমানে ইংরেজের হাতে শাসনযন্ত্র যেমন আছে, উহা তাহার চেয়ে কার্য্যকর হয়। আমরা বিশ্বাস করি, যে, ক্রমে ক্রমে উহাকে ইংরেজপ্রবর্ত্তিত শাসনযন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করা যায়, যদিও প্রথম প্রথম কিছু অযোগ্যতা প্রকাশ পাইতে পারে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসনদক্ষতার ইংরেজকৃত প্রশংসা অত্যন্ত অত্যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু উহার যথার্থ মূল্য যতখানি, তাহারও লাঘব করিতে আমরা চাই না। ইংরেজ শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, সমগ্র দেশকে এক শাসনসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন এবং ভারতবাসীদের মধ্যে সমান ন্যায়-বিচার করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু দেশের মূর্খতা শোচনীয়, কৃষি ব্যবসা ও পণ্যদ্রব্য-উৎপাদন বিষয়ে উহা অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষ দরিদ্র, অস্বাস্থ্যের আলয়, মারীপীড়িত এবং পাশববলের ও বিভীষিকার দ্বারা শাসিত। একশত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। এখনও দেশের এই অবস্থা। ইহাকে কি শাসনদক্ষতা বলে?

কিন্তু লর্ড লিটনের অভিযোগ যদি আমরা সত্য বলিয়া মানিয়াই লই, তাহাতেই বা প্রমাণ হয় কি? ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীরা কি সকল স্বাধীন দেশে সমান সুযোগ্য? নিশ্চয়ই নয়। ইংরেজরা দাবী করেন, যে, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসনকর্ত্তা, জার্ম্মানরা বলেন কাজের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত খাড়া করিয়া তুলিতে তাঁহারা সবচেয়ে ওস্তাদ। কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন ইউরোপীয় দেশ যে আপন আপন অপেক্ষাকৃত অযোগ্য রাষ্ট্রীয় কর্ম্মী লইয়াই সন্তুষ্ট আছে, অতি উৎকৃষ্ট ইংরেজ শাসক দ্বারা শাসিত হইতে আকাঙ্ক্ষা মাত্রও করিতেছে না, ইহাতে ত ইংরেজ কোনই অপরাধ গ্রহণ করেন না?

কোন শাসনযন্ত্র ও প্রণালী যে কতখানি যোগ্য, তাহার পরখ করিবার উপায়টা কি? যে শাসনের অধীনে দেশের সকল লোক শিক্ষা পায়, কুসংস্কারমুক্ত হয়, ভাল খাইতে পরিতে ও ভাল থাকিতে পায়, সুস্থ সবল হয়, এবং সাহসী, স্বাধীন ও আত্মশাসনক্ষম হয়, তাহাকেই সুযোগ্য শাসন বলা চলে। উপরোক্ত আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে, ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসনকে সুশাসন বলা চলে কি?

লর্ড লিটনের সমস্ত যুক্তিগুলিই এইরূপ পক্ষপাত-দোষ-

দূষিত। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অনিচ্ছাক্রমে ও অজ্ঞাতসারে তিনি প্রথম শ্রেণীর স্বরাজকে সর্ব্বপ্রকার গুণশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বরাজের অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভাগ্যে জুটিয়াছে সর্ব্বপ্রকার কু-অভিসন্ধি ও দোষ। তাঁহার মতে, প্রথম শ্রেণীর স্বরাজ পাইতে হইলে শাসনযন্ত্রকে কার্য্যদক্ষ করা চাই। যেন পূর্ণস্বাধীনতালিপ্সু ভারতবাসীরা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদিগকে কার্য্যদক্ষ করিতে চান না। প্রত্যেক ভারতবাসীই ইহা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার রাজনৈতিক মত যাহাই হোক না কেন। তাঁহারা সকলেই চান যে ইংরেজের অধীনে ভারতবর্ষের সরকারী কর্ম্মচারীরা যতখানি কর্ম্মকুশলতা দেখাইতেছেন, স্বাধীন ভারতের কর্ম্মীরা তাহা অপেক্ষা অধিক দেখান। হইতে পারে যে প্রায় সকল ইয়ুরোপ-অধিবাসীর মত লর্ড লিটনেরও ইহাই মত যে ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালন ব্যতীত ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য কখনও দক্ষতার সহিত চলিতে পারে না। কিন্তু সে হইল এক কথা এবং ভারতবাসীরা, কর্ম্মীদের কে কত কাজের তাহা না ভাবিয়া, কে কোন্ জাতির সেই কথাই বেশী করিয়া ভাবে, ইহা বলা আরেক কথা। আমাদের মনে হয় না, যে, ভারতবাসীর জাতিগত এমন কোন অক্ষমতা আছে যাহার জন্য তাহারা সুদক্ষ শাসক হইতে পারে না। এমন কি মডারেট্ ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও যে তাহা মনে করেন না, তাহা তাঁহার এক বক্তৃতা হইতে বুঝা যায়। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ যে-কোন সময়ে অন্য দেশের লোকদের সমকক্ষ লোক কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারেন।

লর্ড লিটন মনে করেন, যে, গঠন করিবার ইচ্ছা এবং গঠন-কার্য্যের ক্ষমতা নিয়মতন্ত্রানুযায়ী-স্বাধীনতা-প্রয়াসীগণ অথবা সোজা কথায় মডারেটগণ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। ইহা সত্য নয়। ভারতবাসীদের সকলেই আমরা ভাই বলিয়া মনে করি, অতএব তাঁহার এই ধারণার সমালোচনা করিব না। মডারেট বা চরমপন্থী কাহারও যদি অন্যদল অপেক্ষা কোনও গুণ অধিক থাকে, তাহা সমানভাবেই দেশের কাজে লাগিবে। তাহা লইয়া আমরা গৃহবিবাদ জন্মাইব না।

লর্ড লিটন মনে করেন, যে, এই নিয়মতন্ত্রানু উন্নতির প্রয়াসটির ভিত্তি জাতিতে জাতিতে প্রীতির উপর, এবং অন্যটির ভিত্তি জাতীয় বিদ্বেষ। আমাদের ভিতর কে অন্যের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে পারেন, বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, সেকথার আলোচনা আমরা করিব না। কারণ, বিদেশীদের প্রশংসা বা নিন্দাকে উপলক্ষ্য করিয়া গৃহবিবাদের সৃষ্টি করা মূর্খতা। কিন্তু সাধারণ ভাবে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করা চলে। মানবচরিত্রের উন্নতি অসীম, তাহার সীমা-নির্দ্দেশ করা চলে না; তাহার বিকাশও সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু এখনও উহা সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ না করার জন্য, যে-কোন দেশে বা কালে আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যত প্রকার প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি, কোনটাই অল্পবিস্তর বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। লর্ড লিটন নিশ্চয়ই জানেন, যে, তাঁহার নিজের দেশে, যে-খানে জাতিগত স্বাধীনতা লাভের কথাই ওঠে না, সেখানেও নিয়মতন্ত্রানুযায়ী অধিকার লাভের চেষ্টার সময় অনেকবার যথেষ্ট রক্তপাত হইয়াছে, সকলে সকলের উপর গোলাপজল কেওড়া ছড়ায় নাই, রক্তরাঙা হোলী খেলিয়াছে। এবং তাঁহার দেশে রাজহত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে। কানাডা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার পূর্ব্বে সে দেশে অনেকগুলি বিদ্রোহ-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ যে-মিশরকে জাতিগত স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সেই মিশরেই ত সম্প্রতিও রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। লর্ড লিটনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ইতিহাস বা জগতের অন্যান্য দেশের ইতিহাস হইতে উদাহরণ আর বেশী বোধ হয় দেখানর প্রয়োজন নাই। হিংসা বা জাতীয় বিদ্বেষকে আমরা বিন্দুমাত্রও সমর্থন করি না। আমরা কেবল এইটুকু বলিতে চাই, যে, ইতিহাসে যখন দেখা যাইতেছে, যে, স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রায়ই জাতীয় বিদ্বেষ ও রক্তপাতের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন যাহা যথার্থই অহিংসামূলক এমন একটা আন্দোলনের ভিতর যদি দুই-চার ক্ষেত্রে বিদ্বেষ বা হিংসার প্রকাশের পরিচয়

পাওয়া যায়, তাহা হইলে, সেইগুলি লইয়া অত বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই বলি এই জন্য, যে, ইহার প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বদাই সমস্ত শক্তির সহিত হিংসার নিন্দা করিয়াছেন, এবং হিংসার প্রকাশ যেখানেই তিনি দেখিয়াছেন, নিজে দোষী না হইয়াও তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। কোন স্থানেই ইহা প্রমাণ করা যায় নাই যে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, বা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, বা তাহা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় কোন কংগ্রেস কমিটি পূর্ব্ব হইতে মৎলব আঁটিয়া কোনও স্থানে দাঙ্গা বা রক্তপাত ঘটাইয়াছেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না, যে, যদিও ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন সুবিশাল দেশব্যাপী, তবুও ইহার ভিতর হিংসার ভাব যত কম প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কোন অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও ক্ষুদ্র দেশে এই ধরণের কোনও আন্দোলনে তত কম প্রকাশ পায় নাই। লর্ড লিটনকে আমরা ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, কোন দলের কোন নেতাকেই মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা মানবপ্রেমিক বলিয়া কেহ মনে করে না। ভারতবর্ষে চরমপন্থীদের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিকগণ অনেক সময় তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়া আপনাদের অন্তঃকরণের বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ইল্‌বার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন হয় তখনকার এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার বহু সংবাদপত্রের লেখার এবং অনেকগুলি বক্তৃতার উল্লেখ করা যায়। যখন দমনমূলক প্রেস আইন (যাহা এখন উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে) প্রবর্ত্তিত করা হয়, তখন উহার যে প্রয়োজন আছে তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক দেশীয় সংবাদপত্র হইতে নানাস্থান হইতে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান হয়। লর্ড লিটন যদি মনোযোগ পূর্ব্বক সেই উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে, উদ্ধারকারী সরকারী আম্‌লার দল নরম এবং চরম কোন দলের কাগজকেই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই; দুই দলের কাগজ হইতেই তাঁহারা উত্তেজনা ও বিদ্বেষপূর্ণ লেখা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবাসীরা সবাই মুনি ঋষি নয়, তাহাদের হৃদয় কেবলমাত্র ভালবাসারই আকর নয়। এবিষয়ে লাট-সাহেবের স্বদেশবাসীরা যে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠ তাহা মনে করিবারও কারণ নাই। তিনি যে দুই প্রকারের স্বরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ভিতর প্রথমটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি স্বীয় স্বদেশবাসীর সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন। যথা:—

I rely on the assistance of your Association in working out the first of these two policies which I have described and in advancing in close friendship and co-operation with Indians towards the attainment of constitutional self-government for India.

আমরা কি আশা করিতে পারি, যে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের মধ্যে আর কেহ তাঁহার জাতভাইদিগকে আমাদিগের প্রতি ভালবাসা বশতঃ দাঁত খিঁচাইতে অনুরোধ করিবেন না? একজন এমন অনুরোধ অল্পদিন আগে করিয়াছিলেন।

ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়াও ভারতবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসন যেমন আছে, ভবিষ্যতে যদি তাহার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্টও হয়, তাহা হইলেও আদর্শকামী এমন ভারতবাসী দেখা যাইবে যাঁহারা ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়াও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে চাওয়াটা অন্যায় মনে করিবেন না। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে তাহাতে ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়েরই মঙ্গল। লর্ড লিটন হয়ত ইহা বুঝিবেন না, কিন্তু ইহা সত্য কথা। অন্যদেশ শাসন করিলে, ও উহাকে কেবলমাত্র আত্মসুবিধার জন্য ব্যবহার করিলে, জাতীয় চরিত্রের অধোগতি হয়। আমরা ইংরেজী ইতিহাস পড়িয়া এবং ইংরেজচরিত্র অনুশীলন করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি, যে, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া পরস্পরের সহিত অন্যান্য স্বাধীন দেশের মতন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ইংরেজচরিত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। তখন পরিবর্ত্তনের কিছুকাল কাটাইয়া উঠিলেই ইংরেজ বুঝিতে পারিবেন, যে, ইহাতে তাঁহাদের মারাত্মক আর্থিক ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশালী বন্ধুভাবাপন্ন ভারতের সহিত বাণিজ্যে

তাঁহারা যতটা লাভ করিতে পারিবেন, দরিদ্র বিধ্বস্ত বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া তাহা পাইতে পারেন না।

ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে লর্ড লিটনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তির পরিচয় এই কয়টি কথায় পাওয়া যায় :—

"That is a goal which the British .....can never accept......, but must contest every inch of the way with them. To prevent its ever being reached, the whole strength of our people would, if necessary, be used."

জগতের অতীত ইতিহাসে আমরা অনেক জাতিই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলিয়া পাঠ করি। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং পরে, অনেক জাতিই স্বাধীন হইয়াছে। সত্য হউক বা না হউক, ইচ্ছা করিলে বলা যাইতে পারে, যে, স্বাধীনতা লাভের ফল তাহাদের পক্ষে মন্দ হইয়াছে। বলা যাইতে পারে, যে, অধীনতা বা আংশিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বলা যাইতে পারে, অন্য জাতির পক্ষে যেমনই হোক, স্বাধীনতা ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যাণকর। ইচ্ছা করিলে বলা যাইতে পারে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা করিবার শক্তিই ভারতের নাই। কিন্তু লর্ড লিটন এই সকল বাঁধি গতের একটিও উচ্চারণ করেন নাই। তিনি সোজাসুজি বলিতেছেন, "তোমরা যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে না পার তাহার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব।" ইহাকে 'মোটা লাঠির যুক্তি' বলা চলে, অর্থাৎ আমার যুক্তি যেমনই হোক, তাহা থাক্ বা না থাক্, লাঠির জোরে তোমাকে আমার আদেশ মানিতে বাধ্য করিব। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা-প্রয়াসীর দল অহিংসাবাদী, তাঁহারা মোটা বা সরু কোনপ্রকার লাঠি অন্যের উপর প্রয়োগ করিতে চান না, সুতরাং মোটা লাঠি দেখিয়া ভয় না পাইতে পারেন। আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা চলেন, পার্থিব ক্ষতি, পাশব শক্তি, দুঃখ যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যু-ভয়ও তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। যে-পথে তাঁহারা চলিয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ, ও ধর্ম্মবিরোধী, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে তবেই তাঁহাদিগকে বিরত করা যায়। তাঁহারা, হয় মৃত্যু নয় জয়, এই পণ করিয়াই বাহির হইয়াছেন। মৃত্যুকে তাঁহারা বরণ করিতে প্রস্তুত,—কিন্তু অন্যকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বা লঘুতর আঘাত করিতেও তাঁহারা চান না। জরাগ্রস্ত যাঁহারা, তাঁহারা বিপদের আশঙ্কা বর্জ্জন করিয়া আরামে থাকা শ্রেয় মনে করেন, ঐশ্বর্য্যলাভকে পুরুষত্ব ও আত্ম-সম্মানের উপরে স্থান দেন, কিন্তু এই আদর্শপন্থীর দল চিরনবীন অর্ব্বাচীনের দল। অন্যের কাছে যাহা উন্মাদের কল্পনাপ্রসূত আকাশকুসুম মাত্র, তাহারই অনুসরণে তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করেন।

লর্ড লিটনের যুক্তিগুলিকে যদি স্বার্থপ্রসূত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উহা বোঝা সহজ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বিরুদ্ধাচরণ করিবার নৈতিক কি কারণ থাকিতে পারে? ভবিষ্যতেও ভারত-বর্ষের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার এমন কি কারণ থাকিতে পারে যাহা শাশ্বত ধর্ম্ম নীতি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত?

কাঠবিড়ালকেও যেমন বিড়াল বলা যায়, লর্ড লিটনের কন্‌স্টিটিউশ্যন্যাল্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্‌ও তেমনি ইণ্ডি-পেণ্ডেন্স্ বা স্বাধীনতা। কাঠবিড়াল যেমন বিড়ালের মত ইঁদুর ধরে না, লাটসাহেবের নামিত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্‌ও তেমনি প্রকৃত স্বাধীনতার কাজ করিতে পারে না। কথায় যেমন চিঁড়া ভিজে না, তেমনি শুধু নাম দিলেই আসল জিনিসের কাজ পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক দল যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, তাহা রেশ্যাল্ বা জাতিগত বলিয়া লাটসাহেবের পছন্দসই নহে, কিন্তু আমেরিকার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাহা রেশ্যাল্ বা জাতিগত ছিল না বলিয়া কি তাহা ব্রিটিশ জাতির খুব পছন্দসই হইয়াছিল?

—

বীরের সম্মান

আনন্দ-বাজার পত্রিকায় নিম্নমুদ্রিত "নিবেদন" প্রকাশিত হইয়াছে।

নিবেদন

গত ৬ই এপ্রিল তেজপুর জেলার চিলবান্দা নিবাসী ৺প্রিয়নাথ গোস্বামী মহাশয় মহিলাগণকে ক্ষিপ্ত মহিষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই বীর ব্রাহ্মণ দুইটি পুত্র, একটি কন্যা ও স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থ আমরা দেশবাসীর নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী। সংগৃহীত অর্থ তেজপুর রাষ্ট্র-সমিতির হস্তে অর্পিত হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার :—
শ্রীযুক্ত এম, এন, ধর—১৲
শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র—১৲
শ্রীমান শিশির কুমার মিত্র
হিন্দুস্কুল, ষষ্ঠ শ্রেণী—১৲
মোট—৩৲

নিবেদক—আনন্দ-বাজার সম্পাদক,
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৺প্রিয়নাথ গোস্বামীর অসহায় পরিবার ও পোষ্যবর্গের সাহায্য করা আমাদেব অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করাও আমাদেব কর্ত্তব্য। ইহাতে সমুদয় জাতি লাভবান্ হইবে।

"হিন্দুস্থান" দুঃখ করিয়াছেন, যে, এরূপ কাজের সাহায্যার্থ এত কম টাকা উঠিয়াছে। পরে আরো সামান্য কিছু উঠিয়াছে। পঞ্জাব মেল দুর্ঘটনায় নিহত ড্রাইভার কূপারেব জন্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ ইহা অপেক্ষা খুব বেশী টাকা তুলিয়াছেন, "হিন্দুস্থান" তাহাও বলিয়াছেন। ভাল কাজে আমরা ইংরেজের মত মুক্তহস্ত নহি, ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আমাদের দারিদ্র্য ইহার একমাত্র বা প্রধান কারণ নহে; কেননা, আমাদের ধনীরাও ভাল কাজে ইংরেজ ধনীদের মত টাকা দেন না। তবে, দেশের লোকদের পক্ষ হইতেও কিছু বলিবার আছে। ইংরেজ-মহলে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের প্রচার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, বাঙালী-মহলে কোন বাংলা দৈনিকের প্রচার ও প্রতিপত্তি তদ্রূপ নহে। আমাদের মনে হয়, আনন্দ-বাজার পত্রিকার সম্পাদক যদি নিজের নাম ও তাহার সঙ্গে বাঙালীদের পরিচিত ও বিশ্বাস-ভাজন আরও দুইচারিজন লোকের নাম দিয়া "নিবেদন"টি বাহির করিতেন, তাহা হইলে যাহা উঠিয়াছে তার চেয়ে কিছু বেশী টাকা উঠিতে পারিত।

—

"বাণী-ভবন"

হিন্দু বিধবারা নানা রকম কাজ শিখিয়া যাহাতে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নারী-শিক্ষা-সমিতি "বাণী-ভবন" নাম দিয়া একটি শিক্ষা-লয় প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। গত ১৭ই বৈশাখ রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে উহার প্রারম্ভিক সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এইরূপ বহু শিক্ষালয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে বেনিয়াপুকুরের শ্রীমতী হরিমতি দত্ত মহোদয়া এই কার্য্যের জন্য দশ হাজার টাকা দান করায় নারী-শিক্ষা-সমিতি উৎসাহিত হইয়া বাণী ভবন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাস্থলে বলেন, যে, বাণী-ভবন অসাম্প্রদায়িক ভাবে পরিচালিত হইবে, এবং মহিলা সভ্যদিগের একটি কমি-টির তত্ত্বাবধানে ইহার সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর বলেন, যে, বঙ্গীয় ব্যব-স্থাপক সভা "ভারতীয় শুশ্রূষাকারিণীদের প্রতিষ্ঠানে" (Indian Nurses' Institution) যে এক লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, বাণী-ভবন তাহা হইতে সাহায্য পাইতে পারেন।

শ্রীমতী হরিমতী দত্তের প্রদত্ত দশ হাজার টাকা ছাড়া আরও আট হাজার টাকা দানের অঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে। সৎকর্ম্মানুরাগী পাঠকেরা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, যে, নারী-শিক্ষা-সমিতি ইতিমধ্যেই বাণী-ভবনের জন্য বাড়ী কিম্বা খালি জায়গা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ও দুই-একটির সন্ধানও পাইয়াছেন। সকলেরই এই কাজে সাহায্য করা উচিত—বিশেষত, সধবা ও বিধবা ধনশালিনী মহিলাদের। সাহায্য ৯৩ নম্বর আপার সার্কুলার রোড্ ভবনে শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়ার নিকট প্রেরিতব্য।

—

খদ্দর-পরিধান ও সৎকর্ম্মশীলতা

বাণী-ভবনের প্রারম্ভিক সভা সম্বন্ধে একখানি বাংলা

খবরের কাগজ নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন, যে, সভাস্থলে যে মহিলাটি প্রবন্ধ পড়েন, তিনি বিলাতী কাপড় পরিয়া গিয়াছিলেন, আর-একজন বর্ষীয়সী মহিলা বিলাতী কাপড় পরিয়া গিয়াছিলেন, ইত্যাদি। এই-সব কথা অন্য একটি বাংলা কাগজ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংবাদগুলি কিন্তু সত্য নহে। প্রবন্ধপাঠিকা খদ্দর-পরিহিতা ছিলেন। বর্ষীয়সী মহিলা মহাশয়া দেশী গরদের থান পরিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকটে উপবিষ্টা অন্য একজন মাননীয়া মহিলা দেশী রেশমী কাপড় পরিয়াছিলেন।

সংবাদের সত্যতা ত এইরূপ।

"বাণী-ভবনের" বিরুদ্ধে মানুষের মনে মন্দ ধারণা যাহাতে না জন্মে, তাহার জন্য অসত্য কথার প্রতিবাদ করিলাম। নতুবা তাহা করিবার প্রয়োজন ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে আরও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক।

যে খদ্দর পরে না, তাঁহার দ্বারা কি কোন ভাল কাজ হইতে পারে না? বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম অনেকে খদ্দর পরেন, অনেকে পরেন না। এখন আমাদের মন উত্তেজিত ও অজ্ঞাতসারে পক্ষপাতগ্রস্ত রহিয়াছে। এখন তাঁহারা খদ্দর পরেন, তাঁহারা, যাঁহারা উহা পরেন না, যাঁহাদিগের নিন্দা করিতে পারেন; যাঁহারা খদ্দর পরেন না, তাঁহারা খদ্দরপরিহিতদের নিন্দা করিতে পারেন। সেইজন্য গত দুই-তিন বৎসরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদিগকে বলি, যে, আপনারা নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সাধু ও সৎকর্ম্মশীল লোক বলিয়া যাঁহাদিগকে গণনা করেন, মৃত বা জীবিত সেই-সব লোক ১৯১৮ সাল বা তৎপূর্ব্বে খদ্দর পরিতেন কি না, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করুন। দেখিতে পাইবেন, যে, তাঁহারা খদ্দর না পরিলেও চরিত্রে ও কর্ম্মে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এখনও প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বিস্তর লোক আছেন, যাঁহারা কোন সময়েই বা সব সময়ে খদ্দর পরেন না, অথচ সৎকর্ম্মশীল। আমরা খদ্দর পরা ভাল মনে করি, কিন্তু খদ্দর যাঁহারা পরেন না, তাঁহাদিগকে ঐ কারণে হেয় মনে করিয়া স্বয়ং অহঙ্কারে স্ফীত হই না। খদ্দর পরিয়া দুর্বৃত্ত ও অহঙ্কৃত হওয়া যায়; সৎকর্ম্মশীল ও নম্রও হওয়া যায়। খদ্দর না পরিয়াও দুর্বৃত্ত ও অহঙ্কৃত কিম্বা সচ্চরিত্র ও বিনয়ী হওয়া যায়। সহযোগিতা বর্জ্জন এবং খদ্দর পরিধান করিয়া যাহারা অহঙ্কৃত ও অন্য লোকদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়, মহাত্মা গান্ধী তাহাদের মনের ভাব ও আচরণ নিন্দনীয় বলিয়া গিয়াছেন।

—

মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীর শাস্তি

মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীর বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমা ও তাঁহার শাস্তির বৃত্তান্ত অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগে তাঁহার শাস্তি হইয়াছে, অন্যটিতে শাস্তি হওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে বিচারক বোম্বাই হাইকোর্টের মত জানিতে চাহিয়াছেন। এই কারণে এখন এই মোকদ্দমা ও শাস্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু এইটুকু বলিয়া রাখি যে মৌলানা সাহেবের আত্মপক্ষ-সমর্থন আমরা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

—

চাল রপ্তানীর ফল

যখন ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে বিদেশে চালের রপ্তানী বন্ধ ছিল, তখন উহার দাম কিছু কম ছিল। রপ্তানী আবার আরম্ভ হওয়ায় দাম ক্রমাগত বাড়িতেছে। তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।

গত ১২ই মার্চ্চ হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মগরাহাটে আতপ চালের দর মণকরা ৬৷৵১৫ হইতে ৭।৵০ পর্য্যন্ত ছিল। গত ৫ই মে, অর্থাৎ রপ্তানী আরম্ভ হইবার দুমাসেরও কম সময়ের মধ্যে ৮৶০ হইতে ৯৷০ পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছে। আমরা ১০ই মে এই কথা লিখিতেছি। ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ দর আরও চড়া হইয়াছে। ১১ই ১২ই নাগাদ ১০ টাকা মণ হইবে; ব্যবসাদারেরা এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ চালের বাজার মধ্যে খুব চড়িয়া গিয়াছিল; এখন কিছু নরম আছে।

গবর্ণমেণ্ট যখন রপ্তানী করিবার অনুমতি দেন, তখন বলিয়াছিলেন, যে, চালের দাম বেশী বাড়িলে আবার রপ্তানী বন্ধ করিবেন। এখনও কি যথেষ্ট বাড়ে নাই? গবর্ণমেণ্ট রপ্তানীর অব্যবহিত পূর্ব্বের এক

সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত রালি ব্রাদার্স, শ. ওয়ালেস্ কোম্পানী, পেট্রোকোচিনো ব্রাদার্স এবং গ্রেহাম কোম্পানীর প্রতিদিনের ক্রীত চাউলের ও তাহার দরের তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে, দর খুব চড়িয়াছে কি না।

—

মালাবারে আর্য্যসমাজের কার্য্য

মোপ্‌লা হাঙ্গামায় মালাবার নানাপ্রকারে সাতিশয় বিপন্ন হইয়াছে। ভারত-ভৃত্য সমিতি, স্থানীয় কংগ্রেস্ কমিটি, ইয়ং মেন্স্ ক্রিশ্চিয়ান্ এসোসিয়েশন্, প্রভৃতি, বিপন্ন লোকদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ নানা প্রকারে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যে-সকল হিন্দু পুরুষ ও নারীকে বিদ্রোহী মোপ্‌লারা জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিল, তাহারা ইচ্ছুক হইলে যাহাতে আবার নিজ নিজ পূর্ব্ব ধর্ম্মসমাজে স্থান পাইতে পারে তাহার চেষ্টাও অনেকে করিতেছেন। আর্য্যসমাজ তন্মধ্যে অন্যতম। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পঞ্চাশজন লোক কালিকটে আর্য্যসমাজের কেন্দ্রে আসিয়া আবার হিন্দু হইতে চাওয়ায় তাহাদিগকে হিন্দুর পরিচ্ছদ দেওয়া হইয়াছে। পুরুষদিগকে রাস্তা-নির্ম্মাণ কার্য্যে এবং নারীদিগকে চরকায় সুতা কাটিতে দেওয়া হইয়াছে। একটি অনাথালয় ও একটি বিধবাশ্রম খোলা হইয়াছে।

—

সরকারী ব্যয় সংক্ষেপ

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, এদেশের নানা রাষ্ট্রীয় কার্য্যের বিভাগে ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে কি না, এবং যদি পারে, তাহা হইলে কোন্ কোন্ বিভাগে কি কি দিকে কি কি উপায়ে হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হউক। কয়েকদিন হইল লর্ড ইঞ্চ্‌কেপ্ এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতা বোম্বাই ও করাচীর ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর এবং কলিকাতার ম্যাক্‌নীল কোম্পানীর প্রধান অংশীদার!

কমিটিকে কি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

কমিটির কার্য্যসম্বন্ধে একটা কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে—নানা স্থানে ঘুরিয়া সাক্ষ্য লইতে ও তথ্য অনুসন্ধান করিতে অনেক ব্যয় হইবে। ব্যয়ের ফলস্বরূপ শুধু জনকতক চাপ্‌রাসী পিয়াদার কাজ যাইবে, না বৃহৎ রকমের কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারিলেও নিশ্চিত বলা যায় না।

ব্যয়সংক্ষেপের একটা প্রধান উপায়, ভারতবর্ষের সেনাদলে গোরা সৈনিক ও সৈনিকাধ্যক্ষ (military officers) কমাইয়া তাহাদের স্থানে ভারতীয় সৈনিক ও সৈনিকাধ্যক্ষ নিয়োগ। জাপান ভারতবর্ষ অপেক্ষা সৈনিক-প্রতি কম খরচ করিয়াও পৃথিবীর প্রবলতম জাতিদের সমকক্ষ ও ভয়ের কারণ বলিয়া পরিগণিত; আর ভারতবর্ষ এত বড় দেশ ও এত লোকের বাসভূমি হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র আফ্‌গানিস্তান্‌কে ভয় করিতে ইংরেজরা শিখাইয়া আসিতেছেন। অথচ ভারতবর্ষের এক কোণের শিখেরা এক সময়ে আফ্‌গানদিগকে ভয়বিহ্বল করিতে পারিয়াছিল। ভারতীয়দিগের প্রাণে সাহসের পরিবর্ত্তে ভয়ের সঞ্চার করায় ইংরেজের লাভ আছে। কারণ, আমরা যতদিন বিশ্বাস করিব, যে, আমরা নিজে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিব না, আমাদিগকে সাহস দিবার ও যুদ্ধক্ষেত্রে হুকুম দিয়া চালাইবার জন্য বিদেশী লোক চাই, ততদিন বিদেশীর প্রভুত্ব এবং বেতনাদি হইতে প্রভূত অর্থাগমের উপায় বজায় থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন ভারতের রাজকার্য্যে ব্যয়সংক্ষেপ ভাল করিয়া হইতে পারিবে না।

সামরিক বিভাগ ব্যতীত অন্য-সব বিভাগেও ব্যয় কমাইতে হইবে। ইংরেজের পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব যোগ্য দেশী লোক রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগকে জাপানের রাজকর্ম্মচারীদের মত বেতন দিতে হইবে। স্বাধীন প্রবল-পরাক্রান্ত জাপানের প্রধান মন্ত্রী মাসে ১৫০০৲ টাকা বেতন পান, অন্যান্য মন্ত্রীরা পান ১০০০৲, এবং প্রধান বিচারপতি এক হাজারের চেয়েও কম পান। এদেশে ইংরেজ রাজভৃত্যেরা খুব মোটা মাহিনা আদায় করেন বলিয়া দেশী রাজভৃত্যদিগকেও প্রাদেশিক শ্রেণীর কোন কোন চাকরীতে জাপানী মন্ত্রীদের সমান বা অপেক্ষা

বেশী বেতন দেওয়া হয়। এদেশের সব্‌জজেরা জাপানের প্রধান বিচারপতি অপেক্ষা বেশী বেতন পান।

বাহিরে এইরূপ কোঁচার পত্তন বলিয়াই আমাদের ভিতরে এরূপ ছুঁচোর কীর্ত্তন—দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অজ্ঞতা, রোগ, মহামারী, চিকিৎসার অভাব লাগিয়াই আছে; তাহার সহচর কাপুরুষতা ও কুসংস্কারও লাগিয়া আছে। ব্যয়সংক্ষেপের মোটামুটি যে যে উপায় সূচিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বিত না হইলে, কখন ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে না।

—

বাংলা দেশে ডাকাতী

মধ্যে মধ্যে দৈনিক কাগজে দেখিতে পাই, বঙ্গে কোন সপ্তাহে বা দশাহে ৬০, কোন সপ্তাহে ৫৪, কোন সপ্তাহে বা ৪৬টা ডাকাতী হইতেছে। এখন অসহযোগ আন্দোলনের কৃপায় বেসর্‌কারী লোকেরা আর "রাজনৈতিক ডাকাইতী" করিবার অভিযোগে ধৃত ও দণ্ডিত হয় না। কোথাও কোথাও পুলিসের লোকদের নামে লুটপাট করিবার অভিযোগ শোনা যায় বটে। কিন্তু তাহা অবশ্য রাজনৈতিক ডাকাতী নহে; কোনও প্রকারের ডাকাতী বটে কি না, তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক, উহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, আজকালকার বেসর্‌কারী ডাকাতীগুলির কারণ কি? উহা যখন রাজনৈতিক ডাকাতী নহে, তখন উহার কারণ দুদিকে দুটি। এক দিকে অন্নাভাবগ্রস্ত লোকদের 'মরিয়া' হইয়া ডাকাত হওয়া, কিম্বা দুর্বৃত্ত লোকদের বে-পরোয়া হইয়া ডাকাত হওয়া, অন্যদিকে আক্রান্ত ও হৃতসর্ব্বস্ব লোকদের ভীরুতা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতার অভাব। এই দ্বিবিধ কারণ কি ইংরেজ-শাসনের সমধিক কার্য্য-সাধন-ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে?

—

জনৈক মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব

বেগম সুল্‌তানা মুয়াজিদ-জাদা বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বি-এল পড়িতেছেন। তিনি বি-এলের প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তদুপরি হিন্দু-আইনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি হাব্‌দুল্ মতীন্ নামক খবরের কাগজের সম্পাদকের কন্যা। ইঁহারা পারস্যদেশীয় মুসলমান।

বিদ্যাবত্তার জন্য অনেক নারী প্রাচীন ও আধুনিক কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; অনেকে গবেষণাদ্বারা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে নব নব রত্ন উপহার দিয়াছেন। তাহা হইলেও নারীদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার পুরুষদের সমান এখনও না হওয়ায়, এখনও নারীদের এইরূপ কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বেগম-সাহেবার কৃতিত্বের উল্লেখ করিবার আর-একটি কারণ আছে। সকল দেশেই আইনজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞানের যোগ আছে। আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীন হয়, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকার আইনজ্ঞগণ দীর্ঘকাল রাজনৈতিক নেতৃত্ব করিয়াছেন। আমাদের দেশেও আইনজ্ঞগণ, অসহযোগ আন্দোলন সত্ত্বেও, অনেকস্থলে এখনও রাজনৈতিক নেতা রহিয়াছেন। কিছুদিন হইতে নারীদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক প্রদেশে তাঁহারা এই অধিকার পাইয়াছেন। বঙ্গে এখনও পান নাই। আপত্তিকারীরা বলেন, যে, বঙ্গে পর্দ্দার প্রচলন থাকায় নারীদের রাজনৈতিক জ্ঞানও কম এবং তাঁহাদিগকে অধিকার দিলে তাঁহারা সেই অধিকার ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এসব যুক্তির উত্তর অনেকবার দেওয়া হইয়াছে। পুনরুক্তি না করিয়া, জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, বেগম-সাহেবার মত পর্দ্দানশীন্ মহিলা যদি আইনজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্তঃপুরিকারা উহার সহচর রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করিতে নিশ্চয়ই পারিবেন না, এরূপ মনে করিবার কি কারণ আছে? নিরক্ষর কৃষক দোকানদার প্রভৃতি লোকেরা ভোট পাইতে পারেন, অথচ বিদুষী বিদ্যাবতী মহিলারা উহার অনুপযুক্ত বিবেচিত হন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

—

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও রাজদ্রোহ

অনেক রাজকর্ম্মচারীর এবং ভারতীয় অনেক বে-সর্‌কারী লোকেরও এইরূপ ধারণা আছে, যে, পরাধীন

ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, এই মত প্রকাশ করা, এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা, আইনবিরুদ্ধ ও রাজদ্রোহ-সূচক। আমরা কিন্তু এরূপ কোন আইনের অস্তিত্ব অবগত নহি। কাহারও জানা থাকিলে তিনি জানাইলে উপকৃত হইব।

—

স্থলবিশেষে যুদ্ধের ঔচিত্যানুচিত্য আলোচনা

ভারতবর্ষের আইনসকল সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট আর-একটি জিজ্ঞাস্য আছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বা বিশেষ কোন গবর্ণমেণ্টের নাম না করিয়া কিম্বা বিশেষ কোন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে কিছু না লিখিয়া, কেহ যদি সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন, যে, যে-কোনও দেশের শাসকসম্প্রদায় বা শাসনতন্ত্র অতি অপকৃষ্ট কুশাসন বা ভীষণ অত্যাচার করিলেও প্রজাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার ন্যায্য ও নীতিসঙ্গত অধিকার আছে কি না, এবং থাকিলে কিরূপ কুশাসন ও অত্যাচারের পর কি অবস্থায় তাহা করা অনুচিত নহে, তাহা হইলে এরূপ আলোচনা ব্রিটিশ ভারতের আইনসঙ্গত কি না। অবস্থাবিশেষে যুদ্ধের পক্ষপাতী লোক হয়ত ভারতবর্ষে আছে; কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এখন এরূপ মতাবলম্বী কোন দল আছে কি না জানি না। এক দল, খুব বেশী অত্যাচরিত হইলেও অহিংসা অবলম্বন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করা উচিত, এই মত পোষণ ও প্রচার করেন; অন্য দল কোন অবস্থাতেই নিরস্ত্র প্রতিরোধ (passive resistance) করিতেও রাজী নহেন। সুতরাং পূর্ব্বে উল্লিখিত রকমের আলোচনার কার্য্যতঃ কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু, যাহা প্রায় ঘটে না বা কচিৎ ঘটে, এরূপ অবস্থা ও বিষয়ের আলোচনাও আইনজ্ঞেরা করিয়া থাকেন। এইজন্য প্রশ্নটা নিতান্ত বাজে না হইতেও পারে।

—

বঙ্গে কারখানার সংখ্যা

দৈনিক অনেক কাগজে একটি তালিকা বাহির হইয়াছে, তদনুসারে দেখা যায়, যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশে কারখানার সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। পাটের কল; কাপড়ের কল; লোহা ও ইস্পাত ঢালাইয়ের কারখানা; সাবান, কাচ, চীনাবাসন, লেখার ও ছাপার কালী, এবং নানা রকম রাসায়নিক জিনিষের ও ঔষধের কারখানা; বড় বড় ছাপাখানা; সকলকেই কারখানা বলা যায়।

বাংলাদেশে কারখানার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাতে বাঙালীর আহ্লাদিত হইবার কারণ নাই, বরং দুঃখিত হইবারই কারণ আছে। কেননা অধিকাংশ কারখানাই ইউরোপীয় কিম্বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সম্পত্তি। সকলের চেয়ে বেশী টাকা ও লোক খাটে পাটের কলগুলিতে। কিন্তু সেগুলি ইউরোপীয়দিগের (অধিকাংশস্থলে স্কচ্) সম্পত্তি। দেশী অংশীদার কোন কোনটির আছে বটে; কিন্তু তাহারাও অধিকাংশস্থলে মাড়োয়ারী। কারখানাগুলির অধিকাংশ মজুর ও কারিগর অ-বাঙালী।

বাংলাদেশের মুটে মজুর মুদী ময়রা মিস্ত্রী মুচ্ছুদ্দি মহাজন মাঝি মাল্লা প্রভৃতি যে কিরূপ অধিক পরিমাণে অ-বাঙালী তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। পাহারা-ওয়ালা, দারোয়ান, সইস্, কোচ্‌ম্যান, গাড়োয়ান, মোটর গাড়ীর ড্রাইভারদের মধ্যেও অ-বাঙালী খুব বেশী। অন্য দেশ ও প্রদেশের লোকদের দ্বারা শোষিত প্রদেশ যেমন বাংলা, ভারতের আর কোন প্রদেশ তেমন নয়। অথচ অন্য সব প্রদেশের লোকেরা বলে, বাঙালী উত্তর ও মধ্য-ভারত লুটিয়া খাইতেছে। ইহাতে হাসি কান্না উভয়েরই কারণ আছে।

বঙ্গের ধন পরহস্তে যাওয়াটাই আমাদের একমাত্র দুঃখের কারণ নহে। ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত মুটে মজুর প্রভৃতি অজ্ঞ নিরক্ষর লোকেরা বঙ্গে অনেকটা সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাবের বাহিরে বাস করে বলিয়া তাহাদের চরিত্রের অবনতি হয়, এবং তজ্জন্য বঙ্গের নৈতিক অবনতি ঘটে। একটা দৃষ্টান্ত দি। কলিকাতার রাস্তা-ঘাটে যত অশ্রাব্য অশ্লীল গালাগালি ও ঠাট্টাতামাসা শোনা যায়, তাহার খুব বেশী অংশ অ-বাঙালীর

'মুখনিঃসৃত'। বাঙালীরা সবাই সাধু বলিতেছি না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ হইতে দুর্নীতির ও অশ্লীলতার আমদানীও অবাঞ্ছনীয়। একেই ত কলিকাতায় শতশত অ-বাঙালী অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠী ভিখারী নিকটবর্ত্তী প্রদেশসকল হইতে আসিয়া আমাদের স্কন্ধে চাপিয়াছে। তাহার উপর আবার পাপের আমদানীটা আরো অসহ্য।

বঙ্গের কারখানাগুলির তালিকা পড়িতে পড়িতে একটু আশারও উদয় হয়। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়ের অভিভাষণে দেখিলাম, যে-সব কার্‌খানা চালাইতে হইলে রসায়ন বা অন্য বিজ্ঞান জানা দর্‌কার, দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত এরূপ সব কার্‌খানাই বাঙালীদের দ্বারা চালিত। ইহাতে মনে হয়, বাঙালীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত শ্রমশীলতা, উদ্যম ও ব্যবসা-বুদ্ধি মিলিত হইলে কল-কার্‌খানার ক্ষেত্রে বাঙালী বেশীদিন পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিবে না।

—

নির্লজ্জতা

অনেক খবরের কাগজে একটি মোকদ্দমার কথা পড়িয়া, আমরা যে সাতিশয় আধ্যাত্মিক জাতি, তাহা মনে পড়িয়া গেল। একজন জমিদারের এক রক্ষিতা ছিল। জমিদার ও রক্ষিতা উভয়েই মৃত। জমিদারের পুত্র রক্ষিতার ধনসম্পত্তি অধিকার করিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটির এক ভাই বলিতেছে, সে-ই উহার ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার লইয়া মোকদ্দমা। জমিদারটার পুত্র পিতার অসচ্চরিত্রতা এবং স্ত্রীলোকটির ভাই নিজের ভগিনীর অসচ্চরিত্রতা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে লজ্জা পাইতেছে না। রক্ষিতা জীবিতকালে সমাজ কর্ত্তৃক পতিতা বলিয়া অবমানিত ও পরিত্যাক্ত ছিল; কিন্তু এখন তাহার ধনটাকে কেহ পরিত্যাজ্য বা অস্পৃশ্য মনে করিতেছে না। তাহার ভাই এবং জমিদারপুত্র কেহই সমাজে পতিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হইলে, যতদিন তাহার হৃদয়ের ও জীবনের পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন পতিত থাকিবে, ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যে-পুরুষ অন্ততঃ তাহার সমান পাপী, এবং হয়ত যে তাহার অধঃপতনের কারণ, সেই পুরুষকেও পতিত বলিয়া গণনা করা উচিত; অবশ্য যে পর্য্যন্ত সে অনুতপ্ত হইয়া আত্মসংশোধন না করে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি

আমরা শুনিলাম, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষের পুত্র অসুস্থতা বশতঃ বি-এস্‌সি পরীক্ষায় এক দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া, তৎসত্ত্বেও তাঁহাকে পাস্‌ করা যায় কি না বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহার বিষয়টি মডারেটারদের নিকট পেশ্‌ করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে, অন্য যে-সব পরীক্ষার্থী পীড়াবশতঃ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাহাদেরও বিষয় বিবেচিত হওয়া উচিত। আমাদের বোধ হয়, এই-সব ছাত্রকে মডারেটারদের কৃপার উপর ফেলিয়া না দিয়া আর-একবার পরীক্ষা করিলে, এবং তাহারা যোগ্য বিবেচিত হইলে কেবল পাস্‌ হইবে, বৃত্তি আদি পাইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

—

মিউনিশ্যন বোর্ডের মামলা

যুদ্ধের জন্য আবশ্যক যাবতীয় সামগ্রীকে মিউনিশ্যন্‌ বলে, এবং তাহা প্রস্তুত ও সর্‌বরাহ করাইবার ব্যবস্থা সর্‌কারী যে বিভাগ করে, তাহার নাম মিউনিশ্যন বোর্ড। গত বৃহৎ যুদ্ধের সময় এই বোর্ড যে-সব লোকের সঙ্গে কার্‌বার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সর্‌কারের লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছে বা ঠকাইয়া লইয়াছে, এই অভিযোগে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয়ের নামে গবর্ণমেণ্ট মোকদ্দমা করিতেছিলেন। প্রথমে জে, সী, ব্যানার্জি নামক একজন বাঙালী ও সুখলাল কার্ণানী নামক একজন মাড়োয়ারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হয়। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হয়, "আমরা ইহাদিগকে দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহাদের জেল হইলে অনেক স্বদেশী কার্‌খানা ও কার্‌বার নষ্ট হইবে বলিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম।" তখন অনেক খবরের কাগজে এই কথা লেখা হইয়াছিল, যে,

আসল কারণ ত তা নয়; প্রকৃত কথা এই যে, সরকারী অনেক কর্ম্মচারী লক্ষ লক্ষ (মোট ৮৭ কোটি) টাকা চুরি করিয়াছে, তাহারাও ধরা পড়িবে বলিয়া ঐ দুজন আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ায় ভারতে ও বিলাতে আন্দোলন হয়, এবং মিউনিশ্যান বোর্ডের কর্ত্তা স্যার টমাস্ হল্যাণ্ডের কাজ যায়। দেশী দুজন লোককে ছাড়িয়া দেওয়ায় এ্যাংলোইণ্ডিয়ান কাগজগুলা খুবই উত্তেজিত হইয়াছিল। এখন কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় সব ইউরোপীয় আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; তাহাতে ত কেহ টুঁ শব্দ করিতেছে না। এখন ঐ-সব সম্পাদকের সাধুতাজনিত ক্রোধ (যার ইংরেজী নাম ইণ্ডিগ্নেশ্যান্) কোথায় গেল?

ওয়েট্ নামক একজন ইংরেজ আসামী বিলাতে ছিল। গবর্ণমেণ্ট বহুব্যয়ে এখান হইতে বিলাতে কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাহাকে নামে মাত্র গ্রেফ্তার করান। তাহার পর সে পীড়ার ওজুহাতে জামিনে খালাস ছিল। সে আর বাঁচিবে না, এইরূপ অনুমানে এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। মানুষের মৃত্যুকামনা করিতে নাই; এবং ওয়েট্ বাস্তবিক দোষী ছিল কি না জানি না। অতএব আশা করা যাইতে পারে, যে, মোকদ্দমায় শাস্তির আশঙ্কা হইতে মুক্ত হওয়ায় সে নিরুদ্বেগ হইয়া আরোগ্য লাভ করিবে ও দীর্ঘজীবী হইবে। স্যার্ টমাস্ হল্যাণ্ডও এখন বিলাতে। হল্যাণ্ড্ ও ওয়েট্ উভয়ে হল্যাণ্ড্ ওয়েট্ এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া যদি একটা কার্বার খোলে, এবং "সস্তায়" ভারত-গবর্ণমেণ্টকে সকল রকম যুদ্ধসামগ্রী যোগায়, তাহা হইলে মিউনিশ্যন্ বোর্ডের মাম্‌লায় যতলক্ষ টাকা অপব্যয় হইয়াছে, তাহা কাগজে আদায় দেখান যাইতে পারে! গবর্ণমেণ্টের যে-সব আইন-কর্ম্মচারীর পরামর্শে মোকদ্দমা দায়ের হয়, তাহাদের নিকট হইতে উহার ব্যয় আদায় করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহাদিগকে অন্ততঃ তিরস্কার করা উচিত। কিন্তু যত কোটী টাকা চুরি হইয়াছে, তাহা আদায় কাগজেও দেখাইবার উপায় নাই।

বস্তুতঃ মিউনিশ্যন্ বোর্ডের সব উচ্চ-কর্ম্মচারীর এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীসভার ও বিলাতের ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের যে-সব কর্ম্মচারীর মিউনিশ্যন্ বোর্ডের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, সকলেরই চাকরী যাওয়া ও পেন্‌শন্ বন্ধ হওয়া উচিত। অধিকন্তু, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া অপহৃত কয়েক কোটী টাকার যতটা সম্ভব আদায় করা উচিত। কিন্তু কে তাহা করিবে এবং তাহার আইনই বা কোথায়? আইন বড় চমৎকার চীজ্। উহার জালে চুনো পুঁটি ধরা পড়ে, কিন্তু অনেক সময় রুই কাংলা ধরা যায় না।

গরীব দুঃখী অতি কষ্টে যে ট্যাক্স দেয়, তাহার বিনিময়ে তাহাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, জমীতে জল সেচন, প্রভৃতির যথোচিত বন্দোবস্ত হয় না; কিন্তু বিদেশী ও দেশী চোরে কোটি কোটি টাকা চুরি করিয়াও দণ্ডিত হয় না। যে-গবর্ণমেণ্টের শাসনকালে ইহা ঘটে, তাহাকে কিন্তু খুব বেশী কার্য্যদক্ষ (efficient) বলিয়া মানিতেই হইবে!

—

কংগ্রেসের কর্ম্মী কমিটির দুটি নির্দ্ধারণ

কংগ্রেসের কর্ম্মী কমিটির দুটি আধুনিক নির্দ্ধারণ প্রশংসনীয়। একটিতে তাঁহারা বলিতেছেন, যে, কংগ্রেস্‌কে আরও অধিক গণতান্ত্রিক ও দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় করিবার জন্য "অস্পৃশ্য" ও অবনমিত শ্রেণীর খুব অধিক-সংখ্যক লোককে কংগ্রেসের সভ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইবে। আর-একটিতে বলিতেছেন, যে, কংগ্রেসের কোন সমিতির ভাণ্ডারে সম্পূর্ণরূপে চর্‌কার সূতায় বোনা খদ্দর ভিন্ন অন্য কাপড় রাখা হইবে না, এবং ঐপ্রকার খদ্দর ভিন্ন অন্য কোন রকম কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য কংগ্রেসের টাকা খরচ করা চলিবে না।

—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের মহামনা সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে মিশন ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেনই, দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি সন্ন্যাসী হইলেও গরীব দুঃখী বিপন্নের মা-বাপ সুতরাং অতি বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি মানবপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু ভাববিলাসী ছিলেন না। তিনি হিসাবী ছিলেন এবং

স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি সুশৃঙ্খল ছিল বলিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন ঝড় ভূমিকম্পাদিতে বিপন্ন অগণিত লোকের সাহায্য করিতে পারিতেন।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের কয়েকটি নির্দ্ধারণ

চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে কতকগুলি উত্তম প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বাঙালী হিন্দু-সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। প্রথমেই বলা হইয়াছে, যে, যাহাদের জল আচরণীয় নহে, তাহাদের হাতের জল পান যেন বাঙালী হিন্দুরা করেন। অনুরোধটি খুব ভাল। এই প্রস্তাবে যাঁহারা মত দিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অনুসারে কাজ করিতে না পারিলে যেন কংগ্রেসের সভ্য না থাকেন। কারণ, তাহা ভণ্ডামি হইবে, এবং ভণ্ডামির দ্বারা ব্যক্তিগত বা জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। জল দিবার জন্য সমুদয় কংগ্রেস্-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সভাসমিতিতে কেবল "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়' শ্রেণীর ভৃত্য রাখিলে কংগ্রেস্-নেতাদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য হইবে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের সামাজিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে। অনুরোধ অনুসারে কাজ হউক।

কংগ্রেসের কোন সভাসমিতিতে কাহারও একাধিপত্য থাকিবে না, স্থির হইয়াছে। ইহা ভাল। কেবল সঙ্কট অবস্থায় অল্পসময়ের জন্য একাধিপত্য আবশ্যক ও সুফলপ্রদ হইতে পারে; অন্য অবস্থায় বা দীর্ঘকালের জন্য নহে।

অহিংসার সহিত কর্ত্তব্যপথে দৃঢ় থাকিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। সালিসী আদালত ও পঞ্চায়েৎ সর্ব্বত্র স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে। কাহারো প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া, কেবল চরকায় কাটা সুতার খদ্দর উৎপাদনের ও বিক্রয়ের সুবিধার জন্য, বিদেশী কাপড় ক্রয় হইতে ক্রেতাদিগকে কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার জন্য, কাপড়ের দোকানের সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারা রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। যদি কেবল যুক্তিপ্রয়োগই বাস্তবিক করা হয়, তাহা হইলে ইহা আপত্তিজনক নহে। কার্পাস ও খদ্দর উৎপাদনের জন্য বিস্তারিত প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বঙ্গে গত এক বৎসরের মধ্যে যতপ্রকার জুলুম ও অত্যাচার হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করিয়া কন্‌ফারেন্স্ বাঙালীদিগকে বলিয়াছেন, যে, এই অবস্থার আশু প্রতিকারের জন্য দেশে শীঘ্র স্বরাজ স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হউক।

সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন, এবং যে-সকল কাজে সকলে একমত তাহা একযোগে সম্পাদন, এই উভয় লক্ষ্য কন্‌ফারেন্স্ সমুদয় বাঙালীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। লক্ষ্য মহৎ। দল নির্ব্বিশেষে মানুষের স্বদেশপ্রেমে ও সদিচ্ছায় বিশ্বাস থাকিলে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, নতুবা নহে।

—

এবারকার মলাটের ছবি

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বৃহৎ পুস্তকালয়ে রাগরাগিণীর প্রাচীন চিত্রের একটি পুঁথি আছে। তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ প্রমথলাল সরকারের সৌজন্যে উহা হইতে একটি ছবি প্রস্তুত করাইয়া এবারকার মলাটে ছাপিলাম। ইহা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নির্ব্বাচিত।

—

"রশ্মি"

সূর্য্যরশ্মি বলিতে আমরা সূর্য্যের কিরণ বুঝিয়া থাকি। রশ্মির মানে রাশ বা বল্‌গাও হয়। সূর্য্যের রশ্মিকে যে ঠিক্ বৈজ্ঞানিক অর্থে সূর্য্যের বল্‌গাও বলা যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের লিখিত "বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী" নামক প্রবন্ধ পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নচুরি

অন্য অনেক বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন প্রশ্নপত্র চুরি হইয়া পরীক্ষার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া যাইবার গুজব রটিয়াছিল। আমরাও উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সময়ে নির্ভরযোগ্য তিনজন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম। বাস্তবিক তাঁহারা ঠিক্ সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে অপদস্থ করিবার জন্য যে-যে সচেতন ও অচেতন কল কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়ছিল, তাহার কোন-কোনটা এখনও অসাবধানতা বশতঃ সক্রিয় রহিয়া গিয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু রোগের মূল বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে। 'বিদ্যালাভ হউক বা না হউক, চরিত্র যেমনই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইলাম," জাতীয় চরিত্রের অবনতির সূচক এই ধারণাই যত "নষ্টের গোড়া"। এই জন্য প্রশ্ন চুরি হয় এবং চোরের দুপয়সা লাভও কখন কখন হয়। সভ্য ও স্বাধীন দেশসকলে জীবিকানির্ব্বাহের যতপ্রকার পথ আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই। এইজন্য চাকরীর এত মূল্য, এবং চাকরী পাইবার নিমিত্ত আবশ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটেরও এত মূল্য। রোগের প্রতিকারের জন্য যেমন চারিত্রিক উন্নতি প্রয়োজন, তেমনি জীবিকা-নির্ব্বাহের নানা পথ খুলিয়া দেওয়াও আবশ্যক।

—

খাইবার গিরিসঙ্কট রেলওয়ে

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতের বাহিরে যাইবার একটি পথ খাইবার গিরিসঙ্কট। উহার ভিতর দিয়া গবর্ণমেণ্ট বহু কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮ মাইল লম্বা এক রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন। উদ্দেশ্য ঐ পথ দিয়া ভারত আক্রমণ নিবারণ। কিন্তু আক্রমণ করিবে কে? আফ্‌গানদের সঙ্গে ত মিত্রতাসূচক সন্ধি এই সেদিন স্থাপিত হইয়াছে! রাজনীতির কি সবটাই ভুয়ো? এই গিরি-রেলওয়ে দ্বারা আক্রমণ নিবারিত হউক বা না হউক, উহা যে ভারত-আক্রমণের একটা কারণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, রেল যে ভূভাগ দিয়া যাইবে, তাহার অধিকাংশ আফ্রিদিদের। তাহারা স্বাধীনতায় অভ্যস্ত। তাহারা তাহাদের জায়গার ভিতর দিয়া রেল চালাইলে এই অনধিকার-প্রবেশ নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা ভাবে সহ্য করিবে না।

রণকৌশলের দিক্ দিয়াও রেলটা ঠিক্ মনে হইতেছে না। সম্ভাবিত আততায়ীর ও আমাদের মধ্যে যদি দুর্গম দুরতিক্রম নদী পর্ব্বত আদি বাধা কিছু থাকে, তাহা থাকিতে দিয়া, তাহা অতিক্রম করিবার ভারটা আততায়ীর উপর রাখাই ত ভাল। তা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তাহা অতিক্রম করিয়া আততায়ীর সহিত লড়িতে যাইতেছেন। তা ছাড়া, যদি কোন প্রকারে রেলটা আততায়ীর হস্তগত হয়, তাহা হইলে ভারত-আক্রমণ খুব সোজা হইবে।

—

ভীলদের অসন্তোষ

ভীলরা, বাঁচিয়া থাকার জন্য, হিন্দু মুসলমান ইংরেজ কাহারও নিকট ঋণী নহে। তাহারা স্বয়ং বনজঙ্গল কাটিয়া পার্ব্বত্য জমী চষিয়া হিংস্র জন্তুর সহিত লড়িয়া ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। কোন গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাহারা বরাবর খাজনা সামান্যই দিত, এবং তাহা তাহাদের গায়ের

মণ্ডল বা প্রধান সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিত। কিন্তু যে-যে দেশী রাজ্যে বা ইংরেজ রাজ্যে তাহারা বাস করে, তাহার কোন কোন স্থানে কিছুদিন হইতে তাহাদের খাজনা বাড়িয়াছে এবং তাহা আদায় করিতেছে সরকারী লোক। ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং তজ্জন্য কোথাও কোথাও খাজনা আদায় না হওয়ায় দাঙ্গাহাঙ্গামাও হইয়াছে। ফলে তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরিত হইয়াছে, এবং অনেক গ্রাম দগ্ধ ও অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে। তাহাদের প্রতিনিধিদের সকলকে ডাকিয়া সভা করিয়া যদি বুঝাইয়া বলা হইত, যে, এখন আর সেকালের মত সস্তায় যেমন গৃহস্থালী চলে না তেমনি রাজকার্য্যও চলে না, অতএব কিছু বেশী খাজনা দেওয়া চাই, এবং যদি তাহা আদায়ের ভার তাহাদের গ্রামনীদের হাতেই থাকিত, তাহা হইলে খুব সম্ভব গৃহদাহ ও মানুষবধ প্রভৃতি অপকার্য্য করিতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহাদের হাতে ক্ষমতা থাকে, তাহারা বুঝাইয়া-সুঝাইয়া কাজ করানকে দুর্ব্বলতা মনে করে।

—

অকালী দলন

শিখেরা পরমেশ্বরকে যে-যে নামে অভিহিত করেন, তন্মধ্যে "অকাল" একটি। অকালের অর্থ, যিনি কালাতীত, কালে যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। এই অকালের উপাসকেরা অকালী। অকালী শিখেরা নিষ্ঠাবান্, সাহসী ও উৎসাহী। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, তাহারা এখন বিপ্লবপ্রয়াসী হইয়াছে, এইজন্য তাহারা দলে-দলে ধৃত ও দণ্ডিত হইতেছে। পুলিস্ কর্ত্তৃক তাহাদের অনেকের উপর কোন কোন স্থলে ভীষণ অত্যাচারও হইতেছে। অকালীদিগের পক্ষের লোকেরা বলিতেছেন, যে, তাঁহারা বাস্তবিক শিখ্ মন্দিরসমূহে, শিখ্ জীবনে ও শিখ সমাজে পবিত্রতা ও নিষ্ঠা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী ধর্ম্মসংস্কারক।

—

জাতীয় মহামেলা

জাতীয় মহামেলায় নানাবিধ দেশী জিনিষ প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার মধ্যে কাপড়ই বেশী। তদ্ভিন্ন কলও কয়েকটি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে, হাতের তাঁতে কাপড় বুনিবার জন্য "টানা" প্রস্তুত করিবার কলটি উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ এই কাজের জন্য অনেকখানি জায়গা দরকার হয়, শারীরিক পরিশ্রম খুব হয়, এবং এই কাজ খোলা জায়গায় করিতে হয় বলিয়া বৃষ্টির ও খুব রৌদ্রের সময় ইহা করা যায় না। প্রদর্শিত কলটি ঘরের মধ্যেই অল্প জায়গায় রাখা যায়, এবং অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে সকল ঋতুতে ইহার সাহায্যে টানা প্রস্তুত হইতে পারে। মূল্য ত্রিশ টাকা মাত্র। বগুড়ায় শ্রীরমণীকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট পাওয়া যায়।

—

সহযোগিতাবর্জ্জন ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

সম্প্রতি আলোচনা হইতেছে, যে অসহযোগীরা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, কৌন্সিল্ অব্ ষ্টেট্ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিতে পারেন কি না। কোন অসহযোগীই এ পর্য্যন্ত সরকারের সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন বা সম্ভব মনে করেন নাই। তাঁহারা সরকারকে কর দিতেছেন, সরকারী ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, এবং সময় সময় রেজিষ্ট্রেশ্যন্ আফিস্ও ব্যবহার করিতেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের অনেক প্রসিদ্ধ নেতা আইন-ভঙ্গ অপরাধে জেলে যাইবার সময় পর্য্যন্তও সরকার-প্রতিষ্ঠিত ম্যুনিসিপালিটির সভ্য ছিলেন। বহুসংখ্যক নেতা সরকারী আদালতে বিচারার্থ নীত হইবার পর তথায় প্রকারান্তরে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট না হইয়াও ভবিষ্যতে তাঁহাদের কোন সাধারণ বা বিশেষ অধিবেশনে ইহাও স্থির করিতে পারেন, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলিকেও তাঁহারা অতঃপর আপনাদের কাজে লাগাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কংগ্রেস এমন কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিতেছেন, ততক্ষণ ইহার সভ্যদের, সমবেতভাবে কাজ করার খাতিরে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। মহারাষ্ট্রে এবং ভারতের অন্যান্য কয়েক স্থানে পূর্ব্ব হইতেই এমন মতাবলম্বী লোক আছেন, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায়

প্রবেশ করিয়া লোকমান্য টিলকের মতানুযায়ী কার্য্য করারই পক্ষপাতী। গবর্ণমেণ্ট যখন দেশের উন্নতি-সাধনে যত্নশীল হন, তখন দেশবাসীর উচিত তাঁহাদের সহযোগ করা; কিন্তু যখন দেশের স্বার্থবিরোধী কোন ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন তখন লোকদের উচিত যথাশক্তি আপত্তি করা এবং বাধা দেওয়া, ইহাই ছিল টিলকের মত। দেশভক্ত অকপট মডারেট যাঁহারা, তাঁহাদের মতও প্রায় এইপ্রকার। কিন্তু এই কারণেই যে উপরোক্ত নীতিটি বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা নয়—বর্জ্জন করিবার অন্য কারণ থাক্ বা না থাক্।

কংগ্রেসের কার্য্যের সহিত আমরা যুক্ত না থাকাতে, এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু ঐ একই কারণে আবার এ সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিবার সুবিধাও আমাদের আছে। কারণ আমাদের মতামত কাহাকেও বাধ্য করিবে না, এবং কাহাকেও মুস্কিলে ফেলিবে না।

মহাত্মা গান্ধীর মত যাঁহারা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে শয়তানী মনে করেন, তাঁহারা যদি ফলাফল বিচার না করিয়া উহার সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। আমরা জানি, যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে সম্পূর্ণ অসহযোগই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা। আমরা ইহাও জানি, যে, যদি দেশের সকল অধিবাসী কিম্বা অধিকাংশ বা বহুসংখ্যক অধিবাসী এই পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ইংরেজ জাতির প্রতিনিধিরা ভারতীয় নেতাদের সহিত মিলিত হইয়া অসহযোগীদের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করিবেন। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের মধ্যে সকল সম্পর্ক চুকিয়া না যায়, ততদিন একটা মাঝামাঝি রফা করিবার ও রাখিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে। এখনও এই রফা রহিয়াছে। রফার সীমা আগাইয়া পিছাইয়া দিতে কংগ্রেস্ পারেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিবার অধিকার একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। অবশ্য, বর্ত্তমান আন্দোলনের নেতা যখন মহাত্মা গান্ধী, তখন কোন নূতন পথ ধরিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরামর্শ করা উচিত।

নবপ্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির দোষগুণ বিচার করিবার আর এখন আবশ্যক নাই। যে-সব মডারেট নিজেদের ভাবনা নিজেরা ভাবিতে অভ্যস্ত আছেন, তাঁহারা অভিজ্ঞতার ফলে উহার মূল্য এখন বুঝিতেই পারিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার কদর যতটাই হোক্, কেহ যদি ইহাতে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ভাল মন্দ সকল রকম ব্যবস্থাতেই বাধা দেওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত হইবে না। নীতি হিসাবে উহার সমর্থন করা যায় না। বাস্তবিকই যদি রাজকর্ম্মচারীরা কোনও রকমে দেশের উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে বাধা দেওয়াটাকে সমর্থন করা যায় কি করিয়া? এই ভাবে বাধা দেওয়ার দুইটি মাত্র কারণ থাকিতে পারে। কেহ যদি বিশ্বাস করেন, যে, গবর্ণমেণ্ট যথার্থ দেশের উপকার করিতে চান না, তাঁহারা যখনই উক্ত প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—তাহা কেবল লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্য, তাঁহাদের সত্য উদ্দেশ্য আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি,—তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার বাধা দিবার পথ ধরিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কাহারও ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকে, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য ঐ প্রকার গবর্ণমেণ্টকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিবার জন্য ধর্ম্মসঙ্গত ও অহিংসামূলক সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা, অন্ততঃপক্ষে তাহার সহিত সকল রকম সম্পর্ক বর্জ্জন করা। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন, গবর্ণমেণ্ট কখনও কখনও নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারও করেন, সরকারী হিতচেষ্টাকে বাধা দেওয়া তাঁহাদের উচিত নয়। গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের ধারণা যেমনই হোক, তাঁহাদের হিতচেষ্টাকে, অন্ততঃপক্ষে আপাত-দৃষ্টিতে যাহাকে হিত-চেষ্টা মনে হয়, তাহাকে, বাধা দেওয়া রাষ্ট্রনীতি বা ধর্ম্ম-সঙ্গত হইবে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। কোনও স্থানে হয়ত অত্যন্ত জলাভাব ঘটিয়াছে। কূপ খনন করিয়া, পুকুর কাটাইয়া বা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পাইপ সহযোগে জল আনিয়া এই অভাব দূর করা ভাল, সে বিষয়ে আলোচনা চলিতে পারে বটে। কিন্তু জল জোগানটাতে বাধা দেওয়া চলে না। বাধা দিলে তাহা অমানুষের কাজ

হইবে। অবশ্য, যদি কেহ বেসরকারী ভাবে ঐ অভাব দূর করিতে পারেন, তবে সে ভিন্ন কথা। রাজনীতি হিসাবেও এইরূপ অবিচারিত বাধা দিবার প্রণালী উৎকৃষ্ট নয়। কারণ, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহা নিজে করিবার সাধ্য যদি না থাকে, তবে কেবলমাত্র বাধা দেওয়ার জন্য যিনি বাধা দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দেশের লোক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইবে।

দেশের ছোট বড় অনেক অভাবই গবর্ণমেণ্ট মোচন করিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে করিতেছেন, বলা কঠিন হইতে পারে। কিন্তু দেশে কি এমন বে-সরকারী লোক আছেন, উক্ত সব অভাব মোচন করিবার উপযুক্ত আর্থিক বল, বন্দোবস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্ম্মী যাঁহার বা যাঁহাদের হাতে আছে? এমন লোক আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া নির্ব্বিচারে সব তাতে বাধা দিলেই কাজ হইবে না। কেবল যদি দলের জয়লাভের কথাই ভাবা যায়, তাহা হইলেও এই নীতি খুব সফল হইবার কথা নয়। কারণ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় আইন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে যে-সকল আইরিশ সভ্য ছিলেন বা আছেন, তাঁহারা বাধা দিবার নীতি অবলম্বন করিয়া যে আয়ার্‌ল্যাণ্ডের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, এমন নয়।

কোন কোন অসহযোগীর মনে এই ভয় থাকিতে পারে, যে, তাঁহারা যদি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের যথার্থ বা আপাত-প্রতীয়মান হিতচেষ্টার সহযোগী হন, তাহা হইলে লোকের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করা হইবে, যে, গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ শয়তানী নয়, উহার ভিতর ভাল কিছুও থাকিতে পারে। এবং এইরূপ বিশ্বাস হইলে তাহাদের মনে পর-রাজের পরিবর্ত্তে স্ব-রাজ পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাইতে পারে। আমাদের কিন্তু এ প্রকার ভয় নাই। বিদেশী শাসন যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সর্ব্বাঙ্গীন আত্মকর্তৃত্ব-বিকাশ সম্বন্ধে তাহা কখনই স্বায়ত্ত-শাসনের সমান হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই, যে, উহার অভিপ্রায় যতই সৎ হোক না, কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শাসনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আদর্শানুরূপ হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য বিদেশী শাসকেরা যদি এই পণ করিয়া আসেন, যে, যতশীঘ্র সম্ভব তাঁহারা অধীন জাতিকে স্বায়ত্ত-শাসনে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের হাতে শাসনভার সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করিয়া বিদায় হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা সফল হইতে পারেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এমন কোন উদ্দেশ্য এপর্য্যন্ত প্রকট হয় নাই। কিন্তু আমরা কাহাকে শাসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনে করি, তাহা এখনও বলা হয় নাই। জনসাধারণকে শরীর মন ও আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের সুবিধা দেওয়া ও এই উন্নতির পথের সকল বাধা দূর করাই শাসনব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বলিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশও অবশ্যই বুঝায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, গবর্ণমেণ্ট যদি বিদেশী হন, তবে আপনার সদভিপ্রায় প্রমাণ করিতে হইলে, শাসিত লোকদের হাতে কোনও না কোন সময়ে তাহাদের দেশের কার্য্যভার সমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে, প্রজারা স্বায়ত্ত-শাসনে যথেষ্ট শিক্ষিত হইলেই এইভাবে ভার সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সে-দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। পরাধীন জাতির শিক্ষানবীশীর সময় বড়-জোর এক পুরুষের জীবিতকাল পর্য্যন্ত; কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীতেও যাহারা নিজেদের অধীন দেশকে স্বশাসক করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে না, সেইসব বিদেশী শাসকদের সদভিপ্রায়ে বা সুশাসনদক্ষতায়, কিম্বা উভয়েই সন্দিহান হওয়া অন্যায় নহে।

আমাদের বিশ্বাস এই, যে, গবর্ণমেণ্ট বিদেশী হইলেই তাহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়, কারণ, শাসনতন্ত্র-বিশেষের শ্রেষ্ঠত্বের সার অংশ হইতেছে উহার স্বায়ত্ততা। বিদেশী শাসন আর যত সুখ-সুবিধাই দিক্ না কেন, তাহা যতই মূল্যবান হোক্ না কেন, তাহা স্বশাসন-শক্তির সমতুল্য হইতে পারে না। নিজেরাই নিজেদের নিয়ামক, পরিচালক ও রক্ষক হওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্পত্তি মানুষের নাই। অধীন জাতিকে এই সার ধন হইতে বঞ্চিত না করিয়া কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্ট

টিকিতে পারে না। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের মানেই এই, যে, তদ্দ্বারা শাসিত জাতির এই পরম ধন নাই। এই কারণে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যতে ভারতীয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যতই উন্নত হইয়া উঠুক না, আমরা সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রাখিব এবং এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। আমাদের অন্তরে স্বাধীন হইবার প্রয়াস জাগ্রত রাখিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে শয়তানী হইতে হইবে বা তাহাকে সেইরূপ ভাবিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উহা সাধুই হোক্ বা শয়তানীই হোক্, আমরা স্বভাবতঃ চিরকালই স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা করিব। বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইবামাত্রই যে অধিকতর স্বাধীন বা উন্নত হইবার ইচ্ছা লোপ পায়, এমন নয়। ইংরেজরা ত স্বাধীন, কিন্তু তাঁহারা কি মনে করেন, যে, তাঁহাদের শাসনযন্ত্র একেবারে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, না তাঁহাদের আর অধিকতর স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই? পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণ-তন্ত্রে প্রকাশিত 'নিউ মেজরিটি' নামক কাগজের ১১ই মার্চ্চের সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে, কেণ্টকী প্রদেশের নিউপোর্ট সহরের ইস্পাতের কার্-খানাগুলির ২০০০ ধর্ম্মঘটী শ্রমীকে সায়েস্তা করিবার জন্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে, ও শ্রমীদের ঘরবাড়াগুলিতে শতছিদ্র করা হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তথায় বিভীষিকার রাজত্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের শাসনযন্ত্রেরও এখন অনেক উন্নতি হইতে পারে।

—

ব্যবস্থাপক সভা কাজে লাগাইবার উপায়

আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলি কাজে লাগাইবার একটি উপায় এই;—সভ্যদের উপর যে-সকল ক্ষমতা ও অধি-কার অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা যতই সামান্য হউক, সেই অধিকার ও ক্ষমতাকে একেবারে শেষ সীমা অবধি খাটান। কিন্তু এইভাবে কাজ করার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন অধিকাংশ সভ্যের অতি সাহসী, অতি প্রত্যুৎপন্নমতি, অতি উৎসাহী, অতি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা হওয়া। এইরূপ একদল মানুষকে নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পাঠাইয়া না দেখিলে ব্যবস্থাপক সভাসমূহ কি করিতে পারেন বা না পারেন, তাহা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই।

—

নিজামের রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

কয়েকটি দেশী রাজ্যে অনেক বৎসর ধরিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদ দেশী রাজ্যসকলের মধ্যে বৃহত্তম। সম্প্রতি নিজামের আদেশে ইহাতেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে। ইহার জন্য নিজাম নূতন ট্যাক্স্ স্থাপন করেন নাই।

—

মহিলা ম্যুনিসিপাল কমিশ্যনার

মান্দ্রাজ প্রদেশে মহিলাদের ম্যুনিসিপাল কমিশ্যনার নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাঁহারা নিজে করদাতাদের দ্বারা ম্যুনিসিপাল কমিশ্যনার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। নেল্লোরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে ও ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডে মহিলা সভ্য মনোনীত করিয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সুফল পাইয়াছেন। এবং সম্প্রতি মান্দ্রাজ শহরের মিউনিসিপাল কাউন্সিলে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে, ঐ মিউনিসিপালিটির কার্য্যপরিচালন হিতকর করিবার জন্য—বিশেষতঃ নারী ও শিশুদের কল্যাণার্থ—গবর্ণমেণ্ট উহার কৌন্সিলে একজন মহিলা সভ্য মনোনীত করুন। তদনুসারে মান্দ্রাজ প্রদেশের স্থানিক স্বায়ত্ত-শাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একজন মহিলাকে মনোনীত করিবার উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

সকলের অগ্রণী বলিয়া বাংলার একটা অহঙ্কার আছে। সেইজন্যই বোধহয় ভাল কাজ অন্য কোথাও হইয়া গেলে বাংলা তাহা করিতে চায় না!

—

তৃতীয় শ্রেণীর রেলযাত্রী

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ভাড়াও বাড়িয়াছে, কিন্তু পশু ও মনুষ্যের যে-সব প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধন আবশ্যক, সেইসকলের ব্যবস্থা উহাতে হয় নাই। যাত্রী-

দিগকে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া (কখন কখন মালগাড়ীতেও) যাইতে হয়। ইউরোপের কোন কোন দেশের গাড়ীর মত রাত্রে শুইবার তাক্ (shelf) ঐ-সব গাড়ীতে প্রচলিত করা উচিত। যথেষ্ট পায়খানা ও জলের ব্যবস্থা, এবং সব সময়ে ভদ্রভাবে টিকিট পাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াই রেলকোম্পানীর যাত্রীবহন-বিভাগের প্রধান আয়ের পথ। অথচ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই কষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমান সকলের চেয়ে বেশী। খবরের কাগজ-সকলে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে, এবং জনহিতকর সমিতিসকলের দ্বারা এই বিষয়ে অবিরত আন্দোলন হওয়া আবশ্যক।

—

দমন ও নিগ্রহ নীতি

অসহযোগীরা কিছুদিন হইতে নিরস্ত্র প্রতিরোধ বা সরকারী আইন আদেশ লঙ্ঘন স্থগিত রাখা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের দমন ও নিগ্রহ নীতি সকল প্রদেশে খুব জোরে চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট দেখিতেছি দেশকে ঠাণ্ডা হইতে দিবেন না, এবং লোকদিগকে ভুলিতে দিবেন না, যে, তাহারা পর-রাজ্যে বাস করিতেছে।

—

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার মন্ত্রী

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যখন একজন দেশী মন্ত্রীকে পুলিস্ বিভাগের ভার দিয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার এবং আইনের মর্য্যাদা রক্ষার ভার দেন, তখন একটা রব উঠে, যে, ঐ প্রদেশেই প্রথমে ওরূপ ভার দেশী মন্ত্রীর হাতে গেল। অমনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল, সেখানে আগে হইতেই ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার পর ক্রমশঃ জানা গিয়াছে, যে, মধ্য প্রদেশ ও বেরারে এবং আসামেও ঐরূপ ব্যবস্থা অনেকদিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু ঐ চারিটা প্রদেশে কি জুলুম জবরদস্তি ও পুলিসের অত্যাচার লোপ পাইয়াছে, না আগেকার চেয়ে কমিয়াছে?

গোরার জায়গায় কালা সর্দ্দার আম্‌লা নিয়োগ দ্বারা প্রতিকার হইবে না; পূর্ণ স্বরাজ চাই।

—

মাব্‌লাদের সত্যাগ্রহ

মহারাষ্ট্রে মুল্‌শীপেটায় একটি নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া তদ্দ্বারা সঞ্চিত জল উচ্চ স্থান হইতে ছাড়িয়া তাহার স্রোতের শক্তি দ্বারা তাড়িত শক্তি উৎপাদনের জন্য বোম্বাইয়ের তাতা কোম্পানী বৃহৎ আয়োজন করিয়াছেন। সঞ্চিত জলে নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলের বিস্তর চাষের জমী ও বাসগৃহ ডুবিয়া যাইবে। কোম্পানী তাহা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তথাকার অধিবাসী মাব্‌লারা গ্রাম ও চাষের জমী ছাড়িতে চায় না। ইহারা সেই মাব্‌লা জাতির বংশধর যাহাদের অদ্ভুত শৌর্য্যবলে শিবাজীর সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের কীর্ত্তিস্মৃতিমণ্ডিত প্রাচীন বাসভূমি, এবং পৈত্রিক চাষের জমী ছাড়িবে না। তাহাদিগকে টাকা ও অন্যত্র জমী দিবার অঙ্গীকার করাতেও তাহারা রাজী নহে। তাহারা আগে একবার সত্যাগ্রহ করিয়া যেখানে যেখানে বাঁধ দিবার জন্য ভিৎ খোঁড়া হইতেছিল, সেখানে শুইয়া থাকিত। আবার সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের পুরুষ-নারী-শিশু সকলকে প্রহারাদি নির্দ্দয়ভাবে চলিতেছে।

লাভের আশায় নিষ্ঠুরতা ও মানুষ ক্ষেপান ভাল নয়। হইতে পারে, যে, মাব্‌লারা অবুঝ; কিন্তু অবুঝ লোকদেরও পৈত্রিক সম্পত্তি জোর করিয়া কিনিবার ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার কোন ব্যক্তির বা কোম্পানীর নাই।

—

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত। বৈশাখ-সংখ্যায় ছবির ফর্ম্মা বাদে ১৫৪ এবং ছবির ফর্ম্মা সমেত ১৬২ পৃষ্ঠা ছিল।
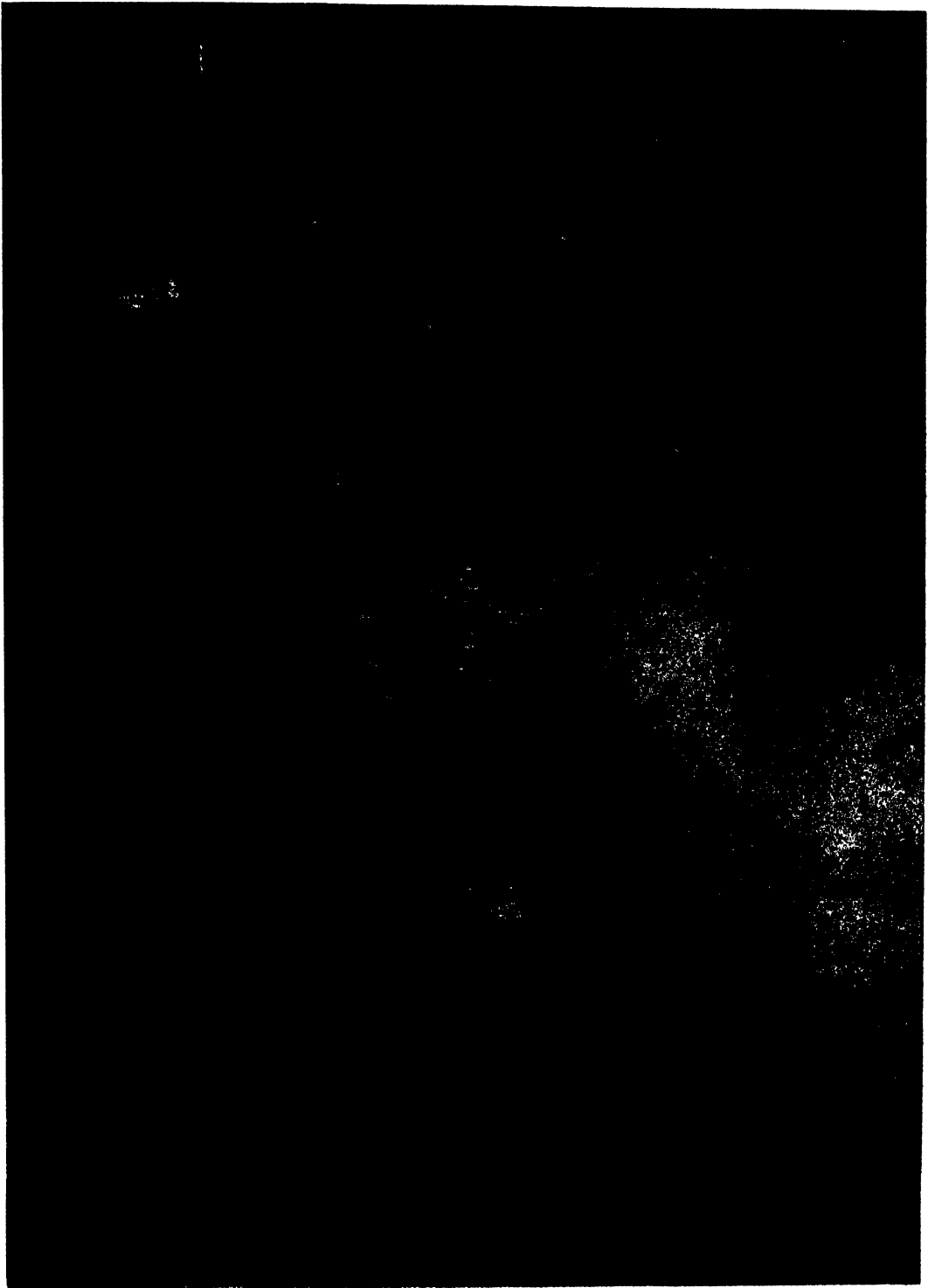
জলসত্র

চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের সৌজন্যে।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩২৯

৩য় সংখ্যা

বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়

অনেক সময় অজ্ঞতাজনিত গরিমাবশতঃ আমাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না; মানুষের ইহা একপ্রকার দুর্ব্বলতা যে সে নিজের দোষ বা ত্রুটি নিজে সহজে দেখিতে পায় না বা দেখিবার চেষ্টা করে না; এমন কি দেখিতে পাইলেও তাহা কৃত্রিম আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা যায় যে এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাই তাহার অবনতির একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যে নিজেকে বড় মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয়, সে কখনও বড় হইতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতের অবস্থার সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে এই বিষয়টি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া, আমরা মনে করি, বাঙ্গালা সাহিত্য পাশ্চাত্য জগতের যে-কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের সমকক্ষ। বিষয়টি তলাইয়া দেখিলে, ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে জগতের মধ্যে একজন প্রতিভাশালী লেখক সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। তাই বলিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডার যে ইংরেজী কিম্বা ফরাসী সাহিত্য-ভাণ্ডারের ন্যায় বিপুল রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ ইহা কি কখনও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে? বাংলাদেশে প্রতিবৎসর যে-সব সুপাঠ্য কাব্য ও পদ্যগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় তাহা ইংলণ্ড কিম্বা ফরাসী দেশের শতাংশেরও একাংশ কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের সংখ্যাও ঐ-সমস্ত দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম।

সেইরূপ পদার্থবিজ্ঞানের বা রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চ্চায় ও গবেষণায় আমাদের দেশে মাত্র দুই-চারিজন একনিষ্ঠ সাধকের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাই বলিয়া এই কথা বলা যায় না যে, বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য প্রদেশ-সমূহের সহিত সমান স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি ইংলণ্ডে যত লোক বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতেছে, এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে তাহার সহস্রাংশের একাংশ লোকও বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত আছে কি না সন্দেহ! এমন কি ক্ষুদ্র জাপানের সমকক্ষ হইতেও আমাদের

অনেক সাধনা করিতে হইবে। এর পর ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের তো কথাই নাই। যদি ইংলণ্ডের জার্ম্মানীর কিম্বা আমেরিকার রাসায়নিক পরিষদের মাসিক-পত্রের মুখপত্র খোলা হয়, এবং তাহার বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র দেখা যায়, তাহা হইলে সকলেই দেখিবেন পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে ও আমেরিকায় মাত্র এক মাসের মধ্যেই কত শত-শত রাসায়নিক আবিষ্কার ঘটিতেছে এবং কত শত-সহস্র বিদ্যার্থী বিভিন্ন রসায়নাগারে অক্লান্ত পরিশ্রমে, চির-নূতন উৎসাহে, অনন্যমনা হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ধ্যানী যোগীর ন্যায় নিবিষ্ট হইয়া আছেন। ইংলণ্ডের গত জানুয়ারী মাসের রাসায়নিক পরিষদের মাসিক-পত্র (Journal) খুলিয়া গণনা করিলে দেখা যাইবে তাহাতে প্রায় ৪৫০টি নূতন তথ্য আবিষ্কারের প্রবন্ধ রহিয়াছে এবং ঐ মাসে ৭৫০জন রাসায়নিক ঐ সংখ্যায় তাঁহাদের অনুসন্ধানের খবর দিয়াছেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা কোথায় পড়িয়া আছি? কবির ন্যায় দুঃখের পীড়নে শুধু বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইবে, "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র হইতেছে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের সুখ ও সম্ভোগে নিযুক্ত করা। ত্যাগের পন্থা অবশ্য আধ্যাত্মিক হিসাবে উচ্চ পন্থা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভোগের ক্ষমতার অভাবে যে ত্যাগ, সে ত্যাগকে তো সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যাইতে পারে না; কিম্বা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এই-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পবি-জ্ঞাত ছিলেন, এই বলিয়া কথার আবরণে আমাদের বর্ত্তমান দৈন্যের লজ্জা নিবারণ করিলেও তো কোন ফললাভের আশা নাই। বর্ত্তমান সভ্যজগতের সমকক্ষ হইতে হইলে আমাদিগকেও তাহাদের মত সাধনা করিয়া শক্তি ও ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা ঐ বিপুল শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমরা যে অতলে ডুবিয়া যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের আত্ম-প্রবঞ্চনা করিবার সময় অতীত হইয়াছে, আমাদিগকে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের ন্যায় আমাদিগকেও একনিষ্ঠ ভাবে বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতে হইবে। কি বিপুল সাধনা ও শক্তি নিয়োগ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ শিল্প ও বিজ্ঞানে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে অনেক সময়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কি বিপুল উদ্যোগ ও আয়োজন পূর্ব্বক তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হইবে।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের জয়-পরাজয় শুধু সামরিক বিক্রম কৌশল ও একনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে নাই; বরঞ্চ উহাতে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহারই বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল। পাঠক-পাঠিকাগণ হয়ত সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন, যে, জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের যাবতীয় রাসায়নিক কারখানা-সমূহে যুদ্ধের আবশ্যকীয় নানা গোলাগুলি, বারুদ ও অন্যান্য ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি এবং ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতে রত ছিলেন; এই কারণে মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে জার্ম্মান সৈন্যের বিজয়িনী শক্তির মুখে যুক্ত-শক্তিকে হটিয়া আসিতে হইয়াছিল। জার্ম্মান সৈন্যেরা যে কত প্রকার বিষাক্ত বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ বিপক্ষ সৈন্যের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা যাঁহারা রীতিমত যুদ্ধের বিবরণাদি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। ইহার প্রতিবিধান-কল্পে যুক্ত-শক্তিরাও আপনাপন রাসায়নিক কারখানা-সমূহে ও রসায়নাগারে শত-সহস্র বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদ্‌কে যুদ্ধের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে যুক্তশক্তিরা এতই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে এমন কি জার্ম্মানীকেও নতজানু হইয়া তাঁহাদের নিকট অচিরে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। ফলে এই নৃশংস ও বীভৎস হত্যা-কাণ্ডের বিপুল আয়োজনের মধ্য হইতে কত নব নব অত্যাশ্চর্য্যকর রাসায়নিক আবিষ্কার ও নূতন শিল্পের

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার বিবরণ দিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, এবং কি পরিমাণ অধ্যবসায়, ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে নানাবিধ যুদ্ধের সরঞ্জাম তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল তাহা কয়েকটি মাত্র উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট হইবে। ইংলণ্ডে প্রতি সপ্তাহে ১৫০০ টন (এক টন=২৮ মণ) Trinitrotoluene (ট্রিনিট্রোটোলুয়েন), ৩০০ টন Picric acid (পিক্‌রিক্ এ্যাসিড), ৩০০০ টন Ammonium nitrate (এ্যমোনিয়াম নাইট্রেট্) এবং ২০০০ টন Cordite (কর্ডাইট্) প্রস্তুত হইত। এই-সমস্ত বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য প্রতি সপ্তাহে নিম্নলিখিত দ্রব্য-সমূহের আবশ্যক হইত; ৬০০০ টন Pyrites (পাইরাইট্‌স্), ২৭০০ টন Sulphur (সাল্‌ফার বা গন্ধক), ৮৩০০ টন Chili Saltpetre (চিলিসল্ট্‌পিটার্),৭২০ টন Toluene (টোলুয়েন, ৬০০,০০০ টন কয়লা হইতে প্রস্তুত), ১৬২ টন Phenol (ফেনোল ;—কার্ব্বলিক এ্যাসিড্ যাহা ১,০০০,০০০ টন কয়লা হইতে উৎপন্ন হয়—বর্ত্তমানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত), ৭০০ টন Ammonia (এ্যামোনিয়া ; ২৫০,০০০ টন কয়লা হইতে), ৩৭৪ টন Glycerine (গ্লীসেরিন্, ২৭০০ টন চর্ব্বি হইতে),৭০০ টন Cotton Cellulose (কটন সেলুলোজ্, ১০৬০ টন আবর্জ্জনা হইতে) এবং ১২০০ টন Alcohol ও Ether (এ্যাল্‌কহল ও ঈথর ; ৪২০০ টন শস্য হইতে)।

আরও কয়েকটি বর্ত্তমান যুগের আশ্চর্য্যকর রাসায়নিক আবিষ্কারের কথা এখানে বলিব, এই-সমস্ত নূতন আবিষ্কার শিল্প-জগতে এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে যে মানুষ এখন আর পূর্ব্বের মতন প্রকৃতির উপর তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্য একান্ত নির্ভরশীল নহে। যেখানে প্রকৃতি বিরূপ, সেখানে মানুষ তাহার শক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার আবশ্যকীয় কাজ জোর করিয়া আদায় করিতেছে।

রক্তমাংস গঠনের ও উদ্ভিদ্-দেহের একটি প্রধান সারবান উপাদান হইতেছে নাইট্রোজেন। মানুষ ও জীবজন্তু এই নাইট্রোজেনটি উদ্ভিজ্জ-খাদ্য হইতে গ্রহণ করে, উদ্ভিদ্ পুনরায় ইহা প্রধানতঃ মাটী হইতে সাররূপে গ্রহণ করে। সত্য বটে নাইট্রোজেন আমাদের বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু মানুষ ও জীবজন্তু তাহাদের শরীর-পোষণের জন্য ইহা বায়ু হইতে সোজাসুজি বা সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্ভিদেরাও বেশীর ভাগ তাহাদের এই খাদ্য মৃত্তিকা-মিশ্রিত সার হইতে গ্রহণ করে। সোরা, সোডিয়াম নাইট্রেট ও এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণ, এই কয়টি সারই সাধারণতঃ মৃত্তিকায় বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদের জীবন ও পরিপুষ্টি ইহাদের উপর নির্ভর করে। একই জমির উপর বারংবার কৃষিকার্য্যের দরুণ এই প্রকৃতিগত মৃত্তিকার সারের ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, এই হ্রাস পরিপূরণের জন্য মাটীতে কৃত্রিম সার দেওয়ার প্রথা সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে। চিলিদেশ-জাত সোডিয়াম নাইট্রেট্ ও কয়লা হইতে প্রস্তুত এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণ—এই দুইই বহুকাল হইতে কৃত্রিম সাররূপে সর্ব্বদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। চিলির সমুদ্রতীরে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই সোডিয়াম নাইট্রেটের স্তর পড়িয়া আছে। ক্রমশঃ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু ও বর্ত্তমান সভ্যযুগে বিলাস-ভোগের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যদ্রব্যের অভাব বাড়িয়া উঠিতেছে, সুতরাং অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য সোডিয়াম নাইট্রেট্ ও এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণ রূপ কৃত্রিম সারের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, জমিতে রীতিমত সার দিয়া তাহার উৎপাদিকা শক্তি দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে চিলি হইতে মাত্র ৯৩৫ টন নাইট্রেট্ রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯১২ সালে ২,৪৭৮,০০০ টন রপ্তানি হইয়াছে। সুতরাং চিলির লবণস্তরে অপর্য্যাপ্ত নাইট্রেট্ থাকিলেও উহা অসীম নহে, এবং যে হারে এই নাইট্রেটের ব্যবহার বৎসর বৎসর বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে বিশেষজ্ঞদের হিসাব-মতে আগামী ২০ কিম্বা ২৫ বৎসরের মধ্যে চিলিস্তর নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

কয়লা হইতে উৎপন্ন এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণের পরিমাণ বড় অধিক নহে। ১৯১০ সালে পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ১,১০,০০০ টন মাত্র এ্যামোনিয়া ও এ্যামোনিয়া-

ঘটিত লবণ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং এই সভ্যতার যুগে কয়লার ক্ষয় যেরূপ ক্রমশঃই বাড়িতেছে তাহাতে ধরিত্রীর কয়লার ভাণ্ডারও নিঃশেষ হইতে বেশী দেরী হইবে না বলিয়া মনে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, যদি বিশ বৎসর পরে চিল্লির লবণস্তর নিঃশেষ হইয়া যায় তবে পৃথিবীর যে সে কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সারের অভাবে খাদ্যের উৎপত্তি কমিয়া যাইবে, দেশে দেশে খাদ্যের অভাব ও ভীষণ সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন এবং উহার প্রতীকার সাধন কল্পে গত ২০।২৫ বৎসর হইতে তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। ইতিমধ্যেই এই অক্লান্ত পরিশ্রমের আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, আমাদের বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেনের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার; বায়ুমণ্ডলে শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ পরিমাণ অক্সিজেন্ আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৪,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক বর্গমাইলের উপরস্থ বায়ুতে ২০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন বর্ত্তমান। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অক্লান্ত ও বহু-বৎসর-ব্যাপী চেষ্টায় বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে সারে ও শিল্পে ব্যবহারোপযোগী নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নাইট্রোজেনকে তাঁহারা নাইট্রিক এসিড্ ও তৎঘটিত লবণে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য ও কৃষিকার্য্যে সারের জন্য ইহাদের প্রচুর ব্যবহার হইতেছে। এই নাইট্রোজেনকে আবার তাঁহারা এ্যামোনিয়া ও তৎঘটিত লবণেও পরিণত করিয়াছেন। এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণ একটি প্রধান সার ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি কখনও প্রকৃতিদেবী আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহার খনির ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া দেন বা তাহা শূন্য হইয়া পড়ে তখন এই বৈজ্ঞানিকগণের কৃপায় নিরাশ্রয়ভাবে আর আমাদের ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মরিতে হইবে না।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন অবরোধের (Blockade) দরুণ চিল্লি হইতে জার্ম্মানীতে সোডিয়াম নাইট্রেটের রপ্তানী বন্ধ হইয়াছিল তখন জার্ম্মানগণ তাঁহাদের কারখানা-সমূহে কৃত্রিম উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে তাঁহাদের যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য বিস্ফোরক পদার্থ-সমূহের উপাদান প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রায় ৪ বৎসরের উপর জার্ম্মানগণ অবরোধ সত্ত্বেও যুদ্ধ পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কৃত্রিম উপায়ে এ্যামোনিয়া বা নাইট্রিক্ এসিড্ ও তৎঘটিত লবণ এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে যে বাজারে ঐ-সব জিনিষের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। জার্ম্মানীতে Badische Anilin und Soda Fabrik কোম্পানীর বিরাট রাসায়নিক কারখানা রহিয়াছে। নূতন আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের জন্য তাহাদের বিভিন্ন কারখানায় বহুসংখ্যক বিখ্যাত রাসায়নিক অবিরাম নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই কোম্পানী এতই ধনশালী ও তাহাদের কারখানা-সমূহ এতই প্রকাণ্ড যে তাহা অনুমান করিতেও আমরা অসমর্থ।

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে জার্ম্মানীর উন্নতির ও যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন অর্থ-বাহুল্যের মূলীভূত কারণ হইতেছে তাহার এই বিশাল রাসায়নিক কারখানা-সমূহ।

রঞ্জন-শিল্পের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী একমাত্র জার্ম্মান কারখানা-সমূহের নিকট পরিজ্ঞাত। ইহা যুদ্ধের সময়ে সকলেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় যখন জার্ম্মানদেশীয় দ্রব্যাদির রপ্তানী এক প্রকার বন্ধ করা হইয়াছিল তখন কাপড় রং করিবার রংএর অভাব, এমন কি লিখিবার কালীর উপাদানের অভাব পর্য্যন্ত সকলকেই অনুভব করিতে হইয়াছিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই বর্ত্তমান সভ্যজগতে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইতে হইলে, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া যাবতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন ভিন্ন অন্য পথ নাই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চাই জাতিগঠনের এক প্রধান উপাদান, যতদিন পর্য্যন্ত এই পথে আমরা বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে না পারিব, ততদিন আমাদের জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার জন্মিবে না।

সত্য বটে, বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হইয়া মানুষ পরস্পরের ধ্বংসের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন শক্তিশালী উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। গত ইউরোপীয় মহাসমরে বিমান-পোত (উড়ো-জাহাজ) ও বিষাক্ত বায়ু প্রভৃতির ব্যবহারেই ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিকগণ এই-সমস্ত বিষাক্ত বায়ু প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীর অনুসন্ধানের ফলে Lewsite (লিউসাইট) নামক এমন একটি বিষাক্ত বায়ুর অবিষ্কার করিয়াছেন যে তাহা যদি উপর হইতে উড়ো-জাহাজের সাহায্যে নিম্নে পৃথিবীর লোকের উপর বর্ষণ করা হয় তাহা হইলে বড় বড় সহরগুলিকে তাহাদের যাবতীয় অধিবাসী সহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিলে সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সংহার-শক্তিকে মানুষের ধ্বংসে নিযুক্ত না করিয়া বিশেষ হিতকর কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন ডিনামাইটের সাহায্যে লোকধ্বংস না করিয়া পাহাড়-পর্ব্বত ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া মানুষের গতি-বিধির জন্য রাস্তা ও রেল-লাইন ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

ক্লোরোফরম্ নামক পদার্থটি বেদনাহীন অস্ত্র-প্রয়োগের জন্য চিকিৎসা-কার্য্যে যে কিপ্রকার ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অনেকদিনের আগেকার কথা মনে পড়ে যখন আমাদেরই এই মেডিকেল কলেজে ইঙ্গিতমাত্রেই যমদূতের মত কয়জন ডোম, রোগীকে জোর-জবরদস্তি করিয়া চাপিয়া ধরিত এবং ডাক্তার তাঁহার শাণিত করাত দিয়া হাত কাটিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিতেন, রোগী তখন অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিত। বর্ত্তমানে ক্লোরোফরমের কৃপায় যে কোন কঠোর ও নিদারুণ অস্ত্রচিকিৎসা বিনা কষ্টে ও সহজে সম্পাদিত হইতেছে। রোগী এমন অচৈতন্য হইয়া থাকে যে সে জানিতেও পারে না, যে, কখন তাহার অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে। চোখের অস্ত্র-চিকিৎসায় ও দাঁত উৎপাটন ব্যাপারে "কোকেন" নামক জিনিষটিও সেইরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রোগের ঔষধ উল্লেখযোগ্য মনে করি। ইহাদের আবিষ্কারে মানবজাতির যে কি পরিমাণ কষ্টের লাঘব হইয়াছে ও মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে তাহা সকলেই অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। "স্যাল্ভার্সন্" নামক অব্যর্থ ঔষধটির বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহা injection বা সূচীবিদ্ধ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করান হয়; ইহা যে কত দুঃখের দুর্ব্বহ জীবনকে শান্তিময় করিয়াছে তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন্, ডিপ্থেরিয়ায় এন্টি-ডিপ্থেরিক্ সীরাম্, আমাশয়ে এমেটীন্ ইত্যাদি আরও অনেক মহৌষধের নাম করা যাইতে পারে, যাহার আবিষ্কারে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ ও হিতসাধন হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে অস্ত্রচিকিৎসার দ্রুত ও অদ্ভুত উন্নতিও বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির একটি প্রধান উদাহরণ। কত অন্ধ ব্যক্তি চোখের (ক্যেটারাক্ট্ অপারেশনের) ছানি কাটাইবার পর পুনরায় কার্য্যকরী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে। তদুপরি বর্ত্তমানে যে কারণেই হউক বালক যুবক ও বৃদ্ধ সবাই ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছেন, চশমার অভাবে তাঁহাদের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, অন্ততঃ শতকরা ৩০জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হইত!

অন্যদিকে এই বিজ্ঞানের চর্চ্চাই আবার মানুষকে তাহার নানাবিধ সুখসম্ভোগের সামগ্রী জোগাইতেছে। কয়লা হইতে সঞ্জাত আল্কাৎরা নামক কাল দুর্গন্ধ পদার্থটি হইতে এমন-সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে, যাহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের রং, নানাবিধ মহৌষধ, ফুল ও ফলের কৃত্রিম গন্ধ ও বহুবিধ বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে। এই-সমস্ত জিনিষ জগতের বাজারে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়নের বিজয়-বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। নানাবিধ বিষাক্ত জিনিষ চিকিৎসা-কার্য্যে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তবে মানুষ যখন সুবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে তখন ভাল জিনিষেরও প্রায় অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে।

আরও-একট বিষয় এখানে বলা আবশ্যক মনে করি। অনেক বিবেচক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে

ওয়াশিংটনে যতই বড় বড় শক্তিপুঞ্জের দরবার বসুক না কেন, প্যারিস্ লণ্ডন কিম্বা ভিনিসে যতই লীগ্ অব্ নেশন্‌সের অধিবেশন হউক না কেন, যুদ্ধ ব্যাপারটি পৃথিবী হইতে কিছুতেই লোপ পাইবার নহে। হইতে পারে, বর্ত্তমান গোলাগুলি দুর্গ ও বড় বড় জাহাজের সংখ্যা, যাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, প্রত্যেক জাতির মধ্যে কমিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যে আরও অধিক শক্তিশালী নূতন নূতন যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে বা সময়মত প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা চিন্তা করিলে মনে হয়, যে, যুদ্ধ-লোপের এই যে আয়োজন আড়ম্বর ইহা শুধু ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুদ্ধের এই নূতন সরঞ্জামের মধ্যে বিষাক্ত বায়ু ও তরল পদার্থ একটি প্রধান জিনিষ। বর্ত্তমানে আমেরিকায় এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা চলিতেছে। তাহাদের প্রস্তুত লিউসাইট বায়ু যে কিরূপ শক্তিশালী তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। গত যুদ্ধের প্রথমভাগে আমেরিকায় কোন বিষাক্ত রাসায়নিক যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুতের কার্‌খানা বা আয়োজন ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার অতি অল্পদিনের মধ্যে যাবতীয় আমেরিকান্ রাসায়নিকগণকে (প্রায় সংখ্যায় ১২০০) দলবদ্ধ করিয়া বিষাক্ত বায়ু প্রস্তুতের জন্য আয়োজন করা হয়। কিরূপ দ্রুতভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় এই অদ্ভুত কার্য্য-কুশলতাই এই জাতির জয়লাভের কারণ, এবং এখনও এই বিষয়ে তাঁহারা যে নূতন নূতন গবেষণা করিতেছেন লিউসাইটের আবিষ্কারই তাহার প্রধান প্রমাণ। ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিচালনের ভার ও জাতির ভাগ্য-নির্ণয় যে একমাত্র রাসায়নিকগণের হাতেই ন্যস্ত হইবে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং রসায়ন শাস্ত্রের বিশেষভাবে চর্চ্চা করা শুধু জাতীয় ধনবৃদ্ধির হিসাবে যে একমাত্র প্রয়োজন তাহা নহে, জাতির অস্তিত্ব-সংরক্ষণেও ইহা প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হইবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে রসায়ন-বিদ্যার চর্চ্চা এখনও পর্য্যন্ত বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, এবং গভর্ণমেণ্টও দেশের রক্ষার জন্য রসায়নশাস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এমন কি যে কয়েকটি যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতের রাসায়নিক কার্‌খানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে তাহাতেও ভারতবাসীর প্রবেশের দ্বার প্রায় একপ্রকার রুদ্ধ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে হইলে ভবিষ্যতে রাসায়নিকগণের সাহায্যই যে প্রধান অবলম্বন হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনেকের মতে আবার, এই বিষাক্ত বায়ুরূপ রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে যে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে হতাহতের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, সুতরাং যুদ্ধের নৃশংসতা ও বিভীষিকাও কমিয়া যাইবে; কারণ বিষাক্ত বায়ুর সাহায্যে বিপক্ষীয় সৈন্যদলকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত ও জ্ঞানহীন করিয়া রাখা যাইবে মাত্র, তাহাতে তাহাদের কোন স্থায়ী অঙ্গহানি বা প্রাণহানির সম্ভাবনা কম। ইহা অমানুষিক হইলেও বর্ত্তমান গোলাগুলিরূপ পাশবিক প্রথা হইতে শ্রেয়তর হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে,—জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা জাতিসংগঠন কার্য্যে কিছুতেই ফললাভ করিতে পারিব না। চারিদিকের শক্তি-মূলক সভ্যতার জাগরণের মধ্যে আমরা কি নিষ্ক্রিয় হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিব—না ঐ শক্তির কঠোর পেষণে লুপ্ত হইয়া যাইব? শক্তিহীন দুর্ব্বল জাতিকে কে কবে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে? আজ যদি ভারতবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আজ এই হীনতা ও দৈন্য তাহাকে বহন করিতে হইত না, পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতি আমাদিগকে তাহাদের জাতীয় সম্মিলনে সসম্মানে আহ্বান করিত।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রী প্রিয়দারঞ্জন রায়

ধর্ম্মপূজা

(ধর্ম্মতত্ত্ব)

গতবারকার প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে, দেখিয়েছি যে বৌদ্ধমতের সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতের কতকটা মিল আছে। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ধর্ম্মপূজার উপর মহাযানের প্রভাব আরও স্পষ্টতর হবে। মোটামুটি বলতে পারা যায় যে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম বা হীনযানের সহিত মহাযানের মতের পার্থক্য হচ্ছে ঈশ্বরবাদ নিয়ে। মহাযানের মধ্যে আস্তিকতাই হচ্ছে পূর্ব্বের মতের থেকে বড় রকমের প্রভেদ। ধর্ম্মপূজায় আমরা পুরাপূরি আস্তিকতাই পাই। দেবতার নাম শূন্যমূর্ত্তি, নিরঞ্জন ও ধর্ম্ম। নিরঞ্জন হচ্ছেন হিন্দুদের পরব্রহ্ম; ধর্ম্ম হচ্ছেন ব্রহ্মা; একটি অব্যক্তি, অন্যটি ব্যক্তি। "ধর্ম্মপূজা-বিধান" গ্রন্থে যে নিরঞ্জন ও ধর্ম্মের পৃথক্ স্তুতি আছে, তার মধ্যে একটাতে শূন্যমূর্ত্তি ও নিরাকার পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাই, নিম্নে তার খানিকটা উদ্ধৃত করে' দিলাম—

ওঁ ন স্থানং ন মানং ন চরণারবিন্দং
রেখং ন রূপং ন চ ধাতুবর্ণং।
দৃষ্টা ন দৃষ্টিঃ শ্রুতা ন শ্রুতি
তস্মৈ নমস্তে নিরঞ্জনায়।৩৫॥
ওঁ ন শ্বেতং ন পীতং ন রক্তং ন রেতং
ন হেমং স্বরূপং ন বর্ণ-কর্ণং।
ন চন্দ্রার্ক-বহ্নি উদয়ং ন অস্তং
তস্মৈ নমস্তেঽস্তু নিরঞ্জনায়।৩৬॥

ইত্যাদি ৪৪ শ্লোক পর্য্যন্ত সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। সমস্ত নেতি নেতি করে' যা থাকে সেইটাই শূন্য নিরঞ্জন। যার অন্ত আদি মধ্য নেই,—যার কর চরণ কায় শব্দ নেই,—যার আকার আদিরূপ নেই,—যার ভয় মরণ জন্ম নেই, ইত্যাদি রূপ হচ্ছে শূন্যমূর্ত্তি। সেই শূন্য-মূর্ত্তি নিরঞ্জনের ধ্যানমন্ত্র শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজাবিধানে আছে (পৃঃ ৮৯)। নিরঞ্জন ও ধর্ম্মের ধ্যান ও মন্ত্র পৃথক ছিল; তার কারণ, নিরঞ্জন ছিলেন ভাব-রূপ, আর ধর্ম্ম হচ্ছেন সাকার-মূর্ত্তি। 'দ্বার-ভেটে'র সময় পণ্ডিতদের কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হতো। প্রশ্ন হচ্ছে—

বাড়ি কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ।
কন্ মূর্ত্তি ধ্যান কর কন্ দেবে পূজ॥
কন্ মুখে পূজা কর কন্ বেদ পড়।
সিগ্রগতি কহিল্যাম চতুরালি ছাড়॥
কোথা পালে তাম্র বালা কেবা দিল করে।
কিরূপে অর্জ্জিল তামা কহনা আমারে॥

প্রত্যুত্তর।—

বাড়ি মোর বল্লুকার।
পুজি শ্রীনৈরাকার॥
শূন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্ত্তি ভজি॥
পূর্ব্ব মুখে পূজা পঞ্চম বেদ পড়ি।
সিগ্রগতি কহিলাও চাতুরালি ছাড়ি॥
বিশ্বকর্ম্মা এই তাম্র করিলা নির্ম্মান।
এ কথা কহিলাও আমি তব বিদ্যমান॥ (১৬৫ পৃষ্ঠা)

এখানে স্পষ্টই রয়েছে, 'শূন্যমূর্ত্তি ধ্যান করি', কিন্তু 'সাকারমূর্ত্তি ভজি'। তবে কি ধর্ম্ম-পূজকদের কোন-প্রকার মূর্ত্তি ছিল? বর্ত্তমানে কোনো মূর্ত্তি আছে বলে' আমাদের জানা নেই। বীরভূম-বাঁকুড়াতে প্রতীক মাত্র ব্যবহৃত হয়। শূন্যপুরাণে কোনো মূর্ত্তির রূপ পরিকল্পিত না থাকলেও, প্রতীক (symbol) যে ব্যবহৃত হতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্ম্মপূজা-বিধানে ধর্ম্মের যে ধ্যান-মন্ত্র আছে নিরঞ্জনের ধ্যান-মন্ত্রের সঙ্গে তার তুলনা হ'তে পারে না। ধর্ম্মের ধ্যান—

ধবলকারিণং দেবং ধবলসিংহাসনে স্থিতং।
উলূকবাহনং ধর্ম্মমিহমাবাহয়াম্যহং। (পৃঃ ৪)

মাণিক গাঙ্গুলি তাঁর ধর্ম্মমঙ্গলে নিরঞ্জন ও ধর্ম্মের পৃথক্ বন্দনা করেছেন। ধর্ম্মের বন্দনায় তিনি লিখেছেন—

উলূকংবাহনং ধর্ম্মং কামিন্যা সহিত শিবং।
ধৌতকুন্দেন্দুধবলকায়ং ধ্যায়েদ্ধর্ম্মং নমাম্যহং॥ (পৃঃ ৪)

ধর্ম্মপূজাবিধানে উপরিউক্ত শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক আছে (পৃঃ ৭)। নিম্নে আর-একটি শ্লোক উক্ত গ্রন্থ থেকে পুনরায় উদ্ধৃত করছি; সেটি থেকে আরও স্পষ্ট বোধ হচ্ছে যে ধর্ম্মের মূর্ত্তি ছিল। শ্লোকটি ধর্ম্মের নমস্কার।

শ্বেতবর্ণং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকং
শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জন নমোস্তু তে। (পৃঃ ৮৭)

মাণিক গাঙ্গুলি যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটিকে রূপক ভাবে নেওয়া হবে, না বর্ণে বর্ণে নেওয়া হবে, সেটা ভাব্বার বিষয়। তিনি লিখেছেন—

ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল বর্ণের মূর্তি
ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ।
ধবল চন্দন গায় ধবল পাদুকা পায়
ধবল বরণ সিংহাসন॥
ধবল বর্ণের ফোঁটা ধবল উজ্জ্বল জটা
ধবল বর্ণের চাঁদমালা।
ধবল চাঁদুয়া খাট ধবল নিশান পাট
ধবল বরণে ঘর আলা॥ ধ, ম; ৫, ১৭-২২

ধর্ম্মপূজাবিধানে আরও একটু স্পষ্ট করে' বলা হয়েছে; সেখানে ধর্ম্মকে শ্বেতযজ্ঞোপবীতধারী চতুর্ভুজ পদ্মনেত্র মহাবাহু মহাবল আজানুলম্বিত-মাল্য-শোভিত কর্পূরশুভ্রাম্বরধর ইত্যাদি বিশেষণ-যুক্ত করা হয়েছে (পৃঃ ৮৭, ৯১)। এ-সব বিশেষণ নিতান্ত অবাস্তব বলে' মনে করে' নেবার হেতু নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম্মের মূর্ত্তি যদি এককালে পূজিত হয়েই থাক্‌বে ত তা বর্ত্তমানে দেখা যায় না কেন? বর্ত্তমানে যা আছে সেটি হচ্ছে পাথর পূজা;—সেই পাথর হচ্ছে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে স্তূপের বিকৃত রূপ। সেটি লৌকিক ব্যবহারে কচ্ছপ নামেই পরিচিত; ধর্ম্মের আর-এক নাম কচ্ছপবাহন। আমাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দিবার চেষ্টা কর্‌বো।

ধর্ম্মপূজাকে এখন আমরা হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই দেখ্‌ছি; কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন দুই ধর্ম্মের মধ্যে বেশ বিরোধ ছিল, এবং 'ভদ্রলোক' বা উচ্চবর্ণের কোনো লোক সাহস করে' ধর্ম্মের গান গাইতে সাহস পেতো না। মাণিক গাঙ্গুলি ত স্পষ্টই বলেছেন—

জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাঁসে॥ পৃঃ ৯

এখানে বেশ দেখা যাচ্ছে স্বপক্ষ বিপক্ষ বলে' দুটা দল, জাতি যাওয়ার ভয় ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু ধর্ম্ম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌ছেন যে তাঁর কোনো ভয় নেই—ধর্ম্মের আদিকবি ময়ূরভট্টকে তিনি বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়েছেন; তা ছাড়া

সপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান।

এই মহা-আদর্শ তিনি কবিদের মনে জাগিয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিয়ে যেমন এই হিন্দুকরণ কার্য্য চল্‌তে লাগ্‌লো—ধর্ম্মপূজা-বিধির মধ্যে হিন্দুত্ব প্রবেশ করাবার চেষ্টা তেমনি চল্‌লো। শূন্য-পুরাণকে আমরা পুরাণো পূজাবিধি বলে' মান্‌তে পারি। আর ধর্ম্মপূজা-বিধান হচ্ছে ধর্ম্মপূজার পুরাপুরি হিন্দু-সংস্করণ। তার রচয়িতা হচ্ছেন জনৈক রঘুনন্দন। রঘুনন্দন হিন্দুদের স্মৃতিকার বলে' এ পুঁথিকেও তাঁর রচনা বলে' চালাবার চেষ্টা হয়েছে। ধর্ম্ম-পূজাকে হিন্দু কর্‌বার আরও চেষ্টা হয়েছে। রমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে গিয়ে আমরা দেখবো যে রমাইএর জন্ম উচ্চকুলে নয়; তিনি 'ছত্রিশজাতিকে' ধর্ম্ম বিলান, সুতরাং শূদ্র বা নীচজাতের প্রতি তাঁর রাগ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্ম্মপূজাবিধানে রমাই ত নীচজাতদের উপর রেগেই খুন! ব্রাহ্মণজাতির গৌরব-বর্দ্ধনই তাঁর উদ্দেশ্য! ধর্ম্মপূজা শূদ্রেরা কর্‌ত। সেই পূজা ব্রাহ্মণেরা হস্তগত কর্‌বার চেষ্টা করেন। সেইজন্য ধর্ম্মপূজাবিধান-রচয়িতা বল্‌ছেন—

মোর নাম করি শূদ্র জত সব খায়।
পিতৃ মাতৃ শ্বশুর তার ঘোর নরক পায়॥
আম্র দেখিয়া যেন খায় অতি সুখে।
চুসিতে চুসিতে যেন আঁঠি লাগে বুকে॥
তেমন আমার দ্রব্য লোভেতে মরণ।
সবংশে তাহারে নাশ করি জে নিধন॥
ঘরে ঘরে দেবতা হলঁ, ভক্তি দেখিয়া।
দুই সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের নাগ পাবেক বসিয়া॥ (৬ পৃষ্ঠা)

আর-এক স্থানে ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মপূজা যে অন্যায় নয়, ব্রাহ্মণ যে বড় জাতি ইত্যাদি প্রমাণ কর্‌তে গিয়ে লেখক লিখেছেন :—

আমার দুয়ারে দ্বিজ-ব্রাহ্মণের মানা নাঞি।
অন্নজল খায়গাইয়া সুধাহ তার ঠাঞি॥
ব্রাহ্মণ কেবল তনু ব্রাহ্মণ ঈশ্বর।
ব্রাহ্মণের দুঃখ হলো কাঁপি থর থর॥ (৫ পৃষ্ঠা)

ধর্ম্মপূজার মধ্যে ব্রাহ্মণগণ প্রবেশলাভের যথেষ্ট চেষ্টা করেন; এবং সেই চেষ্টারই প্রমাণ ধর্ম্মপূজা-বিধান। ধর্ম্মপূজাবিধানখানির মধ্যে শিব ও সূর্য্যের প্রতিপত্তি খুব বেশী। অধিকাংশই সংস্কৃতে লেখা। শূন্যপুরাণ ছিল খাঁটি বাংলায়; ধর্ম্মপূজা-বিধান তাকে

সংস্কার করে' সংস্কৃত ভাষায় চালাবার চেষ্টা। ব্রাহ্মণগণের চেষ্টা এইখানে ক্ষান্ত হয় নি; রমাই যে খাঁটি ব্রাহ্মণ এ কথা প্রমাণ কর্‌বার জন্ম 'যাত্রাসিদ্ধিপদ্ধতি'কার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের হিন্দুভাব ধর্ম্মের পূজার মধ্যে যথেষ্ট প্রবেশ করিয়েছেন; সেই সময়ই বোধ হয় কোনো প্রকার মূর্ত্তি এর মধ্যে চালাবার চেষ্টা হয়। ধর্ম্মপূজাবিধানের একস্থানে প্রতিমা স্থাপনাদির কথাও উল্লেখ আছে। কিন্তু সে প্রতিমা আমরা দেখ্‌তে পাই না কেন? আমার মনে হয় ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণরূপে বাংলার নীচজাতিদের বশ কর্‌তে পারেন নি। এটা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন যে নীচজাতদের মধ্যে যে-সব পূজা হয় তার অধিকাংশই প্রতীকাত্মক (symbolical); মূর্ত্তি-পূজা উচ্চবর্ণের মধ্যে একপ্রকার আবদ্ধ। যখন কোনো জাত 'ওঠে', তখন প্রতিমা-পূজা, বাল্যবিবাহদান, বিধবা বিবাহ বন্ধ, স্পর্শ্যাস্পর্শ বিচার দেখা দেয়। হাড়ী ডোম বাউরী বাইতি প্রভৃতি জাত হিন্দুসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে এসে পড়্‌ল বটে; কিন্তু তারা ব্রাহ্মণদের প্রতিমা গ্রহণ কর্‌লে না। সেইজন্যই আমরা বর্ত্তমানে ধর্ম্মপূজার মধ্যে কোনো প্রকার মূর্ত্তির সন্ধান পাই না।

ধর্ম্মপূজার মধ্যে আনুষঙ্গিক অনেক পূজা প্রবেশ করেছে; কিন্তু তার মধ্যে সবগুলিই যে হিন্দু উৎপত্তি তা নয়। শূন্যপুরাণে প্রায় ৫০টি দেব দেবী, ঋষি মুনির নাম আছে; তার মধ্যে সবগুলি বৈদিক না হলেও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে তাঁদের সকলেরই চল আছে। কিন্তু দুই-একটি নাম অত্যন্ত অদ্ভুত পাই;—যেমন

ডাইনে ডুম্বরশাই বামে হনুমান। (পৃঃ ৯১)

ধর্ম্মপূজা-বিধানে পাই—

ডামরশাক্তি মহাপাত্রায় পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ।
ওঁ নমস্তি পাঠিনং সর্ব্বে দেবতা দানবা নরাঃ।
রুদ্রমূর্ত্তিধরং দেবং ডামরশাক্তি নমাম্যহং॥ পৃঃ ১০৯

এ ছাড়া ঝর্ঝরীক, পড়িহার, লৌহজংঘ, পণ্ডাসুর প্রভৃতি নাম ধর্ম্মপূজাবিধানে পাই। এঁরা সকলেই ক্ষেত্রপাল রূপে নমস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে পণ্ডাসুর হচ্ছেন ইক্ষুক্ষেত্রের দেবতা, 'পাহি মামিক্ষুখণ্ডৈঃ ত্বম্‌', 'গুড়-বৃদ্ধিপ্রদায়িনে' 'ইক্ষুবাটি-নিবাসিনে' ইত্যাদি সম্বোধনে তাঁকে নমস্কার করা হয়েছে (পৃঃ ১১০)। এঁদের নাম ও কর্ম্ম থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এঁরা অনার্য্য গ্রাম্য দেবতা। হিন্দুধর্ম্মের স্বভাব হচ্ছে সমস্তকে সে শোধন করে' নিজের করে' নিতে পারে। তাই এ সমস্ত অনার্য্য গ্রাম্য দেবতাকে শোধন করে' হিন্দু করে' নেওয়া হয়েছে। এই রকম করেই ভৈরোঁ ভৈরব হয়েছে, গ্রাম্যশিব ও মহাদেব এক হয়ে গেছেন।

গ্রাম্যদেবতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলের একস্থানে আমরা ৮০টি স্থানের গ্রাম্য-দেবতার নাম পাই। এ ছাড়া সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলেও আমরা একটি তালিকা পাই। মাণিক গাঙ্গুলির তালিকায় যে-সব নাম পাই তার কয়েকটি ধর্ম্মরাজঠাকুর। সেইসব গ্রাম্য-দেবতা এক-কালে অনার্য্যদেবতাই ছিল; ধর্ম্মপণ্ডিতেরা সেগুলিকে ধর্ম্মরাজ বলে' চালিয়ে দেন। তাদের মধ্যে বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি, জাড়াগ্রামের কালুরায় প্রভৃতি ধর্ম্মরাজের প্রতাপ যথেষ্ট। ত্রিবেদী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় তাঁদের গ্রাম জেমোর গ্রাম্য-দেবতার বর্ণনা প্রকাশ করে-ছিলেন। সেটি পূর্ব্বে বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, এখন শিব বলেই চল্‌ছে। অধিকাংশ গ্রাম্য-দেবতা এখন হিন্দু দেবদেবীর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বল্‌ছি তখন এদের অনেকগুলি আবার ধর্ম্মরাজ ছিল। ধর্ম্মের গাজন পরে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের কত জায়গায় এই গাজনের মেলা হয়—তা (Bentley) বেণ্ট্‌লি সাহেবের Fairs and Festivals of Bengal পুস্তকের তালিকা খুলে দেখ্‌লেই বুঝা যাবে। ধর্ম্ম-পূজার প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল এটা তার একটা প্রমাণ।

গতবার একটা কথা সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হয় নি। সেটা হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্বের থিওরির প্রভাব। মধ্যযুগের এমন কোনো সাহিত্য নেই যারা এর প্রভাবের বাইরে ছিল। যুগী-সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দিই—তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব ত মেলেই; মঙ্গলচণ্ডীকারগণও যে এর হাত এড়াতে পারেন নি—তা হরিদাস পালিত মহাশয় সাহিত্যপরিষদ্ পত্রিকায় খুব ভাল করেই দেখিয়েছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতী

সভায় ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার সময়ে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ লেখককে 'যোগীর কাচ' নামে একখানি খাতা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য দেন। এই গানের মধ্যেও ধর্ম্ম-পূজার সৃষ্টিতত্ত্বের প্রভাব দেখ্‌তে পাই। সেই গানগুলি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা কর্‌ব। ধর্ম্মপূজার প্রভাব কতদূর গিয়েছিল সেই গানগুলি হ'তে স্পষ্ট হবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চরকা ও খদ্দর

চরকা সম্বন্ধে অনেক লেখা পড়া হইয়া গিয়াছে, প্রায় প্রত্যহ কোথাও-না-কোথাও ব্যাখ্যান চলিতেছে। তথাপি এখনও অনেকের সংশয় আছে।

সংশয়ীর হেতু এই—(১) প্রচলিত সমাজ-সংস্কার বিপরীত কিছু ভাবিতে ও করিতে হইলে প্রযত্ন চাই; অনেকের প্রযত্ন করিবার শক্তি নাই। (২) কলের শত শত অশ্বশক্তির দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, মানুষের দুইখান হাত দিয়া সে কর্ম্ম হইতে পারে কি? (৩) যদি বা লক্ষ লক্ষ লোকের হাত লাগানা যায়, তা হইলেও হাতের কাজের দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে। কারণ কলের কয়লা খরচের চেয়ে মানুষের খোরাকের খরচ বেশী। (৪) বিলাতের সহিত যদি টক্কর দিতে হয়, বিলাতী কল বসাইতে হইবে। বিলাত যদি শতঘ্নী বাণ ছুঁড়িয়া লড়াই করে, আমাদিগকেও শতঘ্নী বাণ বাহির করিতে হইবে। কারণ শতঘ্নীর মুখে সে-কেলে ঢাল-তলোয়ার টিকিবে না। (৫) পেছু হটা নয়, আগে চল। নূতন থাকিতে পুরাতন কে চায়? কারণ পুরাতনে কুলায় নাই বলিয়াই নূতনের উৎপত্তি। ইত্যাদি।

"ইত্যাদি" পড়িয়া কেহ চম্‌কাইবেন না। প্রবল বাধা "ইত্যাদির" মধ্যে লুকাইয়া আছে। (৬) চরকার সূতা মোটা। এত কাল সরু পরিয়া এখন এই বয়সে মোটা পরিতে পারা যাইবে না। অঙ্গে সহিবে না, সাজিবে না। গ্রীষ্মদেশে গায়ে সরু কাপড় রাখাই কষ্টকর। (৭) অঙ্গে মানাইবে না। চরকার পুঁজি ১০।১২ নম্বরের সূতা। সে সূতার কাপড় যদি সকলকেই পরিতে হয়, ভদ্রলোকের ভদ্রতা রক্ষা হইবে না, কে ছোট কে বড়, চেনা যাইবে না। (৮) শুনিতেছি, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা রামজীবনপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আড়ঙ্গের তাঁতীরা মোটা সূতায় কাপড় বুনিতে পারে না। সরু সূতায় তাদের হাত। বিলাতী সরু সূতা বন্ধ হইলে তারা মারা যাইবে। তা ছাড়া, দেশের শিল্প সব ত গিয়াছে, এখন যেটুকু আছে, সেটুকুও নষ্ট করিতে হইবে কি? (৯) যদি দেশে সূতা-কাটা ও কাপড়-বোনা কল বসাইতে পার, ভাল। না পার,—"

তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন বর্ত্তমান স্বদেশীর তরঙ্গ বহে নাই, কিন্তু বস্ত্রচিন্তা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন "ভারতবর্ষে" (১৩২৫ কার্ত্তিক) ও "প্রবাসীতে" (১৩২৫ কার্ত্তিক) চরকার ও মোটা কাপড়ের অনেক গুণ গাহিয়াছি। তখন সে গান, অরণ্যে রোদন হইয়াছিল। তার পর দেড় বৎসরের মধ্যে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে, যেন চিররুদ্ধ শ্বাসের কপাট খুলিয়া গিয়াছে। আশঙ্কাও হয়, শোকের উপশম হইলে চরকারও অবসান হইবে।

কারণ উল্লিখিত আপত্তিগুলি অসার নহে। বাদী বলিতেছে, পুরাতনে ফিরিয়া চল। প্রতিবাদী বলিতেছে, তা কি আর পারি। বাদী বলিতেছে, কলকারখানার কলহ লাগিয়াই থাকিবে, সে অশান্তি হইতে মুক্ত হও। প্রতিবাদী বলিতেছে, আমি ইচ্ছা করিলেই কি মুক্ত হইতে পারি? আমি কি ইচ্ছা করিয়া ঘূর্ণিপাকে ঘোর খাইতে যাইতেছি? কল চলিবেই, ভাতে-মারা হইতে প্রাণে-মারা পর্য্যন্ত। বাদী বলিতেছে, সে কি, তুমি যে চিরমুক্ত, আপনাকে ভুলিতেছ কেন?

প্রতিবাদী এ-সব তত্ত্ব বুঝিবে না। তাই তাহাকে দেশের দারিদ্র্য ও অর্থনীতির উপদেশ স্মরণ করাইতে হইতেছে।

আমরা নগরবাসী শুনি, বলিও, আমাদের দেশ গরীব। কিন্তু সবাই যে কথাটার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করি, তা নয়। যাঁরা গ্রামে থাকেন না, গ্রামবাসীর সুখদুঃখের ভোগী নহেন, তাঁরা দারিদ্র্যের মাত্রা পাইবেন না। কথায় বলে, যা কষ্ট অন্ন-বস্ত্রের। এই কষ্টের তুল্য কষ্ট আর নাই। রোগের যন্ত্রণা, চিকিৎসার কষ্ট, ঔষধ অপ্রাপ্তির দুঃখ, প্রত্যহ পাই না। "পাই না" বলিতেও পারি না। দেশ যে উজাড় হইতে চলিয়াছে, লোকে যে অকালে মরিতেছে, সে কি কেবল আগন্তু মালেরিয়া ও কলেরার আক্রমণে? পথ্য বিনা লোকের আয়ু কমিয়া গিয়াছে, শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে, রোগও প্রবল হইয়াছে। দেশের ছয় আনা লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কি না সন্দেহ। আট আনা খাইতে পায়, কিন্তু বলকর ও পুষ্টিকর আহার পায় না। নূন-ভাত ও শাগ-ভাত দুই বেলা দুই থালা পাইলেই বীর্য ও আয়ু রক্ষিত হয় না। যাক্, সে অনেক কথা।

এক রাজপুরুষ অঙ্ক কষিয়া আমাদের বার্ষিক আয় ২৮৲ টাকা স্থির করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, এই আয় হইতে ৭৲ টাকা ইন্‌কম টেক্‌স দিতে হয়। বাকি থাকে ২১৲ টাকা। চারানিতে আমাদের প্রত্যেকের আয় এই দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবিক কাহারও আয় বেশী, কাহারও কম। যদি কাহারও আয় ২১০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে অন্য দশজনের আয় ০। যদি ২১০০৲ টাকা হয়, শতজনের আয় কিছুই থাকিবে না। ব্যবসাই ধরি, বাণিজ্যই করি; হাকিমই হই, ওকালতি বেরেষ্টারি করি; ২১৲ টাকার উপর এক পয়সাও আসে না। যদি মাসে ২।৹ টাকাও ধরি, টাকায় ৬ সের দরে ১৫ সের চালের দাম। যার ভাতই এক সম্বল, আধ সের চালে তার দিন চলে না। তথাপি দেখিতেছি, আমাদের মাত্র চালের পয়সা আছে। অপর কিছুর নিমিত্ত এক পয়সাও নাই। যদি কাপড় কিনিতে হয়, ওষুধ আনিতে হয়, নূন-তেলের জোগাড় করিতে হয়, মাথা গুঁজিবার একখান চালা তুলিতে হয়, বহুজনকে পেটে শুখাইতে হইবেই।

এই দুর্দশা লঘু করিবার উপায় কি? আয়-বৃদ্ধি। আয় বৃদ্ধির উপায় কি? শ্রম-বৃদ্ধি। অর্থাৎ লোকে এখন যত শ্রম করিতেছে, যত জনা করিতেছে, তত থাকিলে দুর্দশা ঘুচিবে না, বরং বলহীন ও আয়ুহীন হওয়াতে দৈন্যদশা দিন দিন বাড়িতে থাকিবে। বস্তুতঃ অবস্থা সঙ্কটের। ধন নইলে বল ও আয়ু থাকে না, বল ও আয়ু নইলে ধন হয় না। সোজা দৃষ্টান্তে, টাকা না হইলে মালেরিয়া দূর হইবে না, মালেরিয়া দূর না হইলে টাকাও আসিবে না।

সে যাহা হউক, যদি ধনবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করি, লোকের শ্রম বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাদিকে কর্ম দিতে হইবে। যদি তাদিকে মানুষ রাখিতে চাই, এমন কর্ম দিতে হইবে যে কর্মে স্বাধীনতা আছে আত্মতুষ্টি আছে; এমন কর্ম যা স্ব স্ব গ্রামে থাকিয়া করিতে পারা যাইবে।

এই অতিরিক্ত কর্মের সময় আছে কি? আছে। দেশের বার আনা কৃষি-জীবী। কিন্তু কৃষিকর্মে বার মাস লাগে না, কিংবা লাগাইবার উপায় নাই। যারা বড় কৃষক, তাদেরও আট মাসের বেশী লাগে না। অধিকাংশের ছয় মাস তা-না-না-না করিয়া কাটে। পুরুষেরাই ৪।৫ মাস কর্ম পায় না, মেয়েদের কথা সুধায় কে? গৃহস্থালীতে যদি যায় এক বেলা, আলস্যে কাটে আর এক বেলা। অর্থাৎ মেয়েরাও বছরে ছয়মাস কর্মহীন। শিশু ও আতুরের কথা নয়; যারা খাটিতে পারে, তারা কাল-বৈগুণ্যে ছয় মাস কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় কোনও দেশ এত রোজ্‌গারী নয় যে আট আনা লোকের পরিশ্রমে সকলে সুখে কাল যাপন করিতে পারে।

কৃষক যদি কাপাস চাষ করে, তাহার ও তাহার পরিবারের কর্ম বাড়িয়া যায়। পাঁচ রকম চাষের মধ্যে একটা, কৃষকের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু সুবিধা এই, ধানচাষের মধ্যে যে অবসর থাকিত, সেই অবসরে কাপাস চাষ হইয়া যায়। ফল পাকিবার সময় ছেলেদের কর্ম জোটে। কারণ সব ফল একদিনেই পাকিয়া ফাটিয়া যায় না। তার পর কাপাস শুখানা, খাওই দিয়া বীজ ছাড়ানা আছে। বীজ হেতু গ্রামের তৈলকার কর্ম পাইল, গোরু বাছুরে খইল খাইল, কৃষকপরিবারে কিছু তেলও আসিল। যে তুলা হইল, তাহাতে মেয়েদের কর্ম জুটি। সূতাকাটা এমন কর্ম, যতক্ষণ ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তখন করিতে পারা যায়।

যন্ত্র স্বল্পমূল্য, ছোট; পিঁড়ার এক কোণে পড়িয়া থাকে। সুতাকাটা অল্প অভ্যাসে আসে। পরে সন্ধ্যার পর অন্ধকারেও চলিতে পারে। এমন আর একটি কর্ম্ম দেখিতে পাই না।

এই সোজা কথা, এমন করিয়া বলিতে হইতেছে, এই দুঃখ। কারণ কলিকাতাবাসী সংবাদপত্র-লেখক ও দেশানভিজ্ঞ দেশ-হিতৈষী দেশের অর্থ বৃদ্ধির উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কাগজে-কলমেই থাকিয়া যায়। ইহাঁরা ইংরেজী Cottage industry কথাটার তর্জ্জমা করিয়া "কুটীর-শিল্প" জানিয়াছেন। কিন্তু তর্জ্জমায় যে বুদ্ধির উদয়, সে বুদ্ধি কাজের সময় অন্তর্হিত হয়। আমার বিশ্বাস, এই অদ্ভুত নামটাতেই দেশের বৃদ্ধদিগকে দিশাহারা করাইয়াছে। "কুটীর-শিল্প সমিতি", না "সভা", নাম ঠিক স্মরণ হইতেছে না; কিন্তু স্মরণ হইতেছে চরকায় সুতা-কাটা সে শিল্পের মধ্যে গণ্য হয় নাই। আশ্চর্য্য এই, এত বড় ব্যবসায় (industry), এত প্রয়োজনীয় কলা (manufacture), যাহাতে দেশের গ্রামে গ্রামে, পরিবারে পরিবারে, ধন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ উপায় বর্ত্তমান, তাহাতে চোখ পড়িল না!

কেতাবী অর্থনীতি জিজ্ঞাসা করিতেছে, উৎপন্ন সুতার দাম কত? কলের সুতার চেয়ে সস্তা, না আক্রা? চরকা কখনও কলের সঙ্গে যুঝিতে পারে?

যত গোল এই খানে। কিন্তু কেতাব রাখিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝি, যে সুতায় পরিবারের বস্ত্রকষ্ট দূর হয়, তাহা অ-মূল্য। স্বর্ণপুরী লঙ্কায় সোনা সস্তা হইতে পারে, কৃষক-পরিবার সোনা চায় না, চায় পিতল। বাজারে কলের সুতা যত সস্তা হউক, কৃষকপত্নী কিনিতে যাইতেছে না, তাহার স্বোপার্জ্জিত ক্ষুদের ন্যায় তাহার সুতাও বহুমূল্য। চরকার প্রত্যেক ঘুরণে তাহার চিত্ত ও শক্তি মিলিয়া গিয়াছে। পতি, পুত্র, কন্যা নূতন কাপড় পরিতে পাইবে; কেতাবী অর্থনীতি তাহার আনন্দের সংবাদ রাখে না। তাহার অবসর নাই। কিন্তু কর্ম্মময় জীবনের একটানা স্রোতের মধ্যে যখন উৎসব আসে, পর্ব পড়ে, তখন সে-ই আনন্দ ভোগ করে; অবসাদ-গ্রস্ত নিষ্কর্মা নারীর উদাসমনে সে আনন্দ প্রবেশ করিতে পারে না।

গ্রামের অন্য নারীর সম্বন্ধেও সেই কথা। তফাৎ এই, তাহাকে তুলা কিনিয়া লইতে হইবে। কাপড় চাই, সুতা কাটিতেছে। ভাত চাই, রাঁধিতেছে। কেহ রাঁধুনীর বেতন কষে না। কত ভাতে কত খরচ পড়ে, কেহ ভাবে না। ভাবিলে বুঝিত যত পরিবার তত হাঁড়ী না করিয়া এক হাঁড়ীতে সকলের রান্না হইলে কত কষ্ট কত পয়সা বাঁচিয়া যাইত। তবু ত লোকে মানে না। কেবল সুতা-কাটার বেলা তর্ক?

তথাপি বিজ্ঞ ঘাড় নাড়িতেছেন, কলের সুতা অনেক সস্তা। কিন্তু সে কথা কে অস্বীকার করিতেছে? যদি কেহ সুতাকাটনীকে বেতন দিয়া সুতা কাটাইয়া বিক্রির নিমিত্তে বাজারে আসে, সে দেখিবে তাহার সুতা বিকাইতেছে না; কারণ তাহার সুতা কলের সুতার মতন সমান-সরু নয়, সমান-পাকও নয়। যদি বা বিক্রি হয়, দেখিবে তাহার লাভের অঙ্ক শূন্য হইয়া মূলে টান পড়িয়াছে। কিন্তু এখানে সে কথাই যে নয়।

বাস্তবিক, উল্লিখিত নারীর কাটা সুতা সস্তা। কারণ কাটিবার বেতন বা বাণি লাগে না। যে সময়ে কাজ ছিল না, সে সময়ে কাটা। যে সময় বাঁচাইতে পারিয়াছে, সে সময়ে কাটা। তাহার একটা পয়সাও খরচ হয় নাই, তুলার দামে সুতা পাইয়াছে। এমন কোন্ কল আছে, যেখানে তুলার দামে সুতা পাওয়া যায়?

তথাপি বিজ্ঞ মানিতেছেন না। অতএব গ্রাম হইতে এক দৃষ্টান্ত দিই।—রামধন দেখিল, বর্ষা আসিতেছে, সে সময়ে আনাজ পাওয়া যায় না, এই কুমড়ার দিনে কিছু কুমড়া কিনিয়া রাখিলে ভাল হয়। গ্রামের নিকটের হাটে এক একটা।৹ আনা। কিন্তু পাঁচক্রোশ দূরে ৶৹আনা। সে সকালবেলা গোরু লইয়া পাঁচক্রোশ গেল, কুমড়া কিনিয়া গোরুর পিঠে ছালা ভরিয়া সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিল। কুমড়া আনিল দশটি, দশক্রোশ আনা-গনা করিয়া লাভ করিল ৷৶৹ আনা। কিন্তু সে যখন খাটনি পায়, তখন নিজে পায় ।৶৹ আনা, গোরু পায় ৷৹ আনা। কেতাবী অর্থনীতি বলিতেছে, রামধন নির্বোধ, ৸৶৹ খরচ করিয়া ৷৶৹ আনা পাইয়াছে।

অথচ এইরূপ ঘটনা গ্রামে অহরহ ঘটিতেছে। এই

বাঁকুড়ায় দেখিতেছি, যে কৃষকের গোরু কি মহিষের গাড়ী আছে, সে দুইদিনের পথ আনা-গনা করিয়া বন হইতে জ্বালানি কাঠ আনিতেছে। সে গাড়ী বাহিয়া রোজগার করে প্রত্যহ দেড়টাকা, কিন্তু দুই দিনে তিনটাকা মারা করিয়া তিনটাকার কাঠ দুইটাকায় কিনিতে যায়। কারণ, সব দিন গাড়ী চলে না।

দেশ-সুদ্ধ সবাই কি মূর্খ? সংশয়ী এই সোজা কথা কেন বুঝেন না, কলের সহিত চরকার প্রতিযোগিতা কেন মনে করেন, ভাবিয়া পাই না। তুলার দামে সূতা, তাঁতীকে বাণি দিয়া কাপড়। ফলে কাপড়ের দাম পড়িল, তুলার দাম+বুনিবার বাণি। কোন্ কলে এত সস্তায় কাপড় বেচিতে পারে? যে কৃষকের কাপাসচাষ আছে, তাহাকে তুলার দামও লাগে না। তাহার কাপড়ের দাম—তাঁতীর বাণি; দশহাত কাপড়ে ।৵০ আনা মাত্র। বাজারে সে কাপড়ের দাম আজকাল ২৷৷০ টাকার কম নয়। দেশের লোক মূর্খ-ছিল না, মূর্খ হইয়াছি আমরা।

যে কাপড় চায়, সে সূতা কাটিয়া এত সস্তায় কাপড় পাইতে পারে। যে কাপড় চায় না, পয়সা চায়? তারও লাভ। কলের সূতা যত সস্তা হউক, তুলার দাম ছাড়া কাটুনার বাণি আছেই আছে। কলের স্বল্প বাণি পাইলেও সূতা-কাটুনীর লাভ। কারণ, এই বাণি যত কমই হউক, সেরে চারি-আনা মাত্র হউক, কাটুনীর এই চারি আনাই লাভ। যদি প্রত্যহ আধ পোয়া কাটে, ১০ নম্বরের আধ পোয়া সূতাকাটা কঠিন নয়, প্রত্যহ দুই পয়সা, মাসে এক টাকা, ঘরে বসিয়া পাইবে। এই এক টাকা অন্য কোনও উপায়ে আনিতে পারিত কি?

তাছাড়া, তাহাকেও ত কাপড় চাই, বছরে অন্ততঃ দুখানা। এক সের তুলার দাম একটাকা, দুখান কাপড় বুনিবার বাণি পাঁচ সিকা। এই নয় সিকায় কাপড় পাইবে। লাভ থাকিবে নয় সিকা। বাস্তবিক সূতা কাটার বাণি আজকাল আরও বেশী। সকল জিনিসের দাম চড়িয়াছে, সকল কর্মের বেতনও চড়িয়াছে।

মনে করুন, বঙ্গদেশে বার লক্ষ চরকা চলিতেছে। চরকা-প্রতি বৎসরে বার টাকা ধরিলে প্রায় দেড়কোটি টাকা বাঙ্গালাদেশের আয় বাড়িবে। এই আয় হেলায় নির্বুদ্ধিতায় হারাইতেছি। আর বলি, দেশ গরীব কেন।

আমরা বিদেশে কাপড় বেচিতে চাই না। নিজেদের প্রয়োজন-মতন কাপড় পাইলেই বাঁচিয়া যাই। আমরা সাড়ে চারি কোটি, বছরে হারাহারি দুইখানা, ১০ নম্বর সূতার এক সের পাইলেই চলে। প্রত্যহ আধপোয়া সূতা কাটা কঠিন নয়। অভ্যাস হইয়া গেলে চারিঘণ্টার কর্ম। অতএব চরকা-প্রতি বছরে একমণ সূতা স্বচ্ছন্দে পাইতে পারি। চাই আমাদের এগার লক্ষ মণ। অতএব বার লক্ষ চরকা চলিলে বঙ্গদেশ বস্ত্র-বিষয়ে স্বাধীন হইতে পারে। এমন দিন ছিল।

বঙ্গে প্রায় এক লক্ষ গ্রাম আছে। প্রতি গ্রামে বারটা চরকা বেশী কি? পুরুষ, ছেলে, মেয়ে, বুড়ী বাদ দিলেও বার লক্ষ সবল নারী অবশ্য আছে। শতকের মধ্যে ছয়জন নাই?

সমস্ত দেশের কথা ভাবুন। আমরা বৎসরে ৬০।৭০ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় কিনিতাম; এখন চড়া দামে বোধ হয় ১০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই কাপড়ের তুলার দাম বোধ হয় ৩০ কোটি টাকা। অতএব আমরা বিলাতী কাটুনী ও তাঁতিকে বাণি স্বরূপে ৬০।৭০ কোটি দিতেছি। অর্থাৎ জনাকি ২৲ টাকা, আয়ের ২১ টি টাকা হইতে ২৲ টাকা! এ যে এক-মাসের চালের খরচ! এক মাস উপোষ থাকা! আমরা নিজেই কর্মের উমেদার, পাঁচ ছমাস বসিয়া থাকি, পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। দুই টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় ব্যয় করিতে পারি কি? চরকা কিন্তু এই অপব্যয় রহিত করিতে পারে। কল্পনার কথা নয়, বেশী দিনের কথাও নয়, ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে চরকা আমাদের কাপড় চালাইত। আরও পূর্বে শুধু আমাদের নয়, পরেরও কাপড় যোগাইত।

চরকা যদি এমনই চক্র, উহার ঘূর্ণন রুদ্ধ হইল কেন? বিদেশী বণিক্ কুহক করিল, আমাদের মোহ জন্মিল, আমরা ইতর ভদ্র স্ত্রী পুরুষ সৌখিন হইয়া উঠিলাম। চরকার মোটা সূতার কাপড় মনে ধরিল না, বিলাতী কলের সরু কাপড় সস্তায় পাইয়া চরকা ও তাঁত ফেলিয়া

দিলাম। বিদেশী বণিক্ পয়সা-মোড়ক ও পয়সা-পেয়ালা চা দিয়া শহরের লোককে মাতাইয়াছে, এখন চা নইলে দিন চলে না। সরু কাপড়ও তেমনই মাতাইয়াছে। কারণ সরু পরিলে বুঝায় ধন আছে; এবং আজিকালি ধন দেখানাই ধরণ হইয়াছে। সেকালে উৎসবে ও নিমিত্তে টাকা খরচ হইত, এ কালে দেহের সুখসাধনে ও বিত্ত প্রদর্শনে হইতেছে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে আমরা আর অসভ্য নই।

কলে যত সরু কাপড় যোগাইতে, যত সস্তায় চোখের সামনে ধরিতে লাগিল, চরকার সাধ্য হইল না তেমন সরু ও তত সস্তা কাপড় পরাইতে পারে। আমরা সবাই সরু ধরিলাম, 'বাবু' হইলাম। সমাজ প্রবৃত্তি পরিবর্তন সাম্লাইতে পারিল না, তাঁতীকুল গেল, চরকা বন্ধ হইল, কাপাস চাষ উঠিয়া গেল। এখন যদি বা ধনী ও ভদ্র মোটা পরেন, দরিদ্র ও ইতর কিছুতেই পরিতে চাহিবে না। যে যে জাতির মধ্যে মোটা পরন সুরুচি বিবেচিত হয়, তাহারা রক্ষা পাইয়াছে, এখনও চরকা ঘুরাইতেছে।

যাঁহারা সেকালের চরকার সূতার কাপড় পরেন নাই, যাঁহারা সরু পরিয়া বড় হইয়াছেন, তাঁহারা কখন-কখনও জিজ্ঞাসা করেন লোকে কেমন করিয়া মোটা পরিত, নারী কেমন করিয়া মোটার বোঝা বহিত। জিজ্ঞাসার কথা বটে। কারণ ১০ নম্বর সূতার দশ হাত লম্বা আড়াই হাত বহরের ধুতি বা শাড়ী অষ্টপ্রহর বহিয়া বেড়ানা সহজ নহে। কিন্তু অভ্যাসে সবই সয়। তার সাক্ষী ইদানীর কোট পেণ্ট কিংবা শাড়ী সেমিজ। উক্ত প্রমাণের ধুতি বা শাড়ী ওজনে আধ সের মাত্র। কিন্তু সাহেবী পোষাক ওজনে তিনগুণ, শাড়ী সেমিজও আধ সেরের কম হইবে না। আসল কথা, তা নয়। তখন আট-পহর‍্যা কাপড় ছিল খা-দি, মোটা ও খাট। তোলা কাপড় সরু সূতার, লম্বে ও প্রস্থে বড়। ধনবানের এই দুই রকম কাপড় থাকিত, দরিদ্রেরও প্রায় তাই থাকিত। এই সরু কাপড়ও ৪০।৫০ নম্বরের সূতার উপর নয়।

একথা ঠিক, খা-দি পরিতে কেহই লজ্জা বোধ করিত না। আঁঠুর একটু নীচে নামিলেই প্রমাণ গণ্য হইত। পুরুষদের খাদি ৮ হাত × আট পোয়া, মেয়েদের খাদি ৯ হাত × নয় পোয়া, কিংবা ১০ হাত × নয় পোয়া। মেয়েদের কাপড় তত ছোট নয়। এই হেতু খাদি বলা হইত না। খা-দি আর খ-দ্দ-র একই সংস্কৃত ক্ষু-দ্র শব্দের অপভ্রংশ। যাহা বৃহৎ নয়, উত্তম নয়, তাহা ক্ষু-দ্র। অল্প ও অধম কাপড়, খা-দি। যে কাপড় পরিলে পা ঢাকা পড়ে, যে কাপড়ের সূতা মোটা হইলেও সমান, সে কাপড় খা-দি নয়।

পুরুষে খাদি পরিয়া গ্রামান্তরে যাইতে লজ্জা বোধ করিতেন না। কিন্তু খাদি পরিয়া সভায় যাইতে পারিতেন না। সমগ্র পা ঢাকিতে হইত, তাও নয়; কিন্তু যেখানে থাকুন, ঘরেই থাকুন, বাহিরেই বসুন, আঁঠু ঢাকিয়া খাদি পরিতে হইত। আমাদের সমাজে এখনও এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। জানু-প্রদর্শন দূরে থাক, জানুসন্ধি- (আঁঠু-) প্রদর্শন অশিষ্টের অসভ্যের লক্ষণ। আশ্চর্য এই আমাদের কোন কোনও দেশী ভায়া জাঙ্গিয়া পরিয়া বাড়ীর বাহির হইতে, রেলে যাইতে, কদাচিৎ সভায় বসিতেও লজ্জা বোধ করেন না। এই বীভৎস বেশের উৎপত্তি প্রভুর মনস্তুষ্টি হইলেও আত্মতুষ্টিও কম নয়। এইটি সর্বনাশের কথা তথাপি সমাজের চক্ষে হেয়। কারণ প্রাচ্য অসভ্য হইলেও বর্বর নয়। কোন কোন সাহেব—সব সাহেব কি না জানি না, বাড়ীতে জাঙ্গিয়া পরেন। সেটা তাঁহাদের খাদি, যদিও সেলাই-করা। কিন্তু বোধ হয় কোনও শিষ্ট সাহেব জাঙ্গিয়া পরিয়া শিষ্ট সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন না। সে যাহা হউক, আমার বক্তব্য আটপহর‍্যা কাপড় সকল সমাজেই ক্ষুদ্র, আর উদ্‌গমনীয় বস্ত্র দীর্ঘ। উদ্‌গমনীয় বস্ত্র, ধৌত বস্ত্র, যাহা হইতে ধু-তি। আমরা এখন ঘরে বাইরে ধুতি পরিতেছি!

বর্তমান কুলাঙ্গনা ভাবিতেছেন, তাঁহাদিগের ঠাকুরমা ঠাকুরদিদী কেমন করিয়া ক্ষুদ্র শাড়ী পরিতেন। তাঁহারা যখন গিন্নী, তখনকার কথা নয়; যে গ্রামের ঝিয়ড়ী সে গ্রামেও নয়; যখন বউড়ী তখন শ্বশুর-বাড়ীতে আগুল্ফলম্ব শাটীতে দেহ আবৃত করিতেন না। আঁঠুর কিছু নীচে, আঁঠুর ও গোড়ালীর মাঝামাঝি পহুছিলেই শাড়ীর প্রমাণ বহর হইত। ইদানীর মেয়েদের পা ঢাকা

মেমদের অনুকরণে। আমাদের সমাজে পরস্ত্রীর মুখ দর্শন পাপ বলিয়া গণ্য। অথচ কোনও অঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে কথোপকথন চলে না, অভিজ্ঞা জন্মে না। সে অঙ্গ, পা। কাজেই পা খোলা থাকিত। এই খোলা পায়ে অষ্ট অলঙ্কার শোভা পাইত। দেবী-প্রতিমা দেখিলেই প্রাচীন সাক্ষী পাওয়া যাইবে। মেমদের ন্যায় উর্দ্ধাঙ্গ উন্মোচন ও নিম্নাঙ্গ আবরণ আমাদের চোখে শালীনতা নয়। বোধ হয় আমাদের চোখই ভাল।

এত কথা পাড়িবার হেতু আছে। দেশের হিতার্থে কেহ কেহ 'খদ্দর' পরিতেছেন। কিন্তু সেটা নামে খদ্দর, কাজে সেই ৫ হাত লম্বা ২॥ হাত বহরের ধুতি বা শাড়ী! এমন আত্ম-প্রতারণা আর দেখি না। এ যে প্রাচীন শাঁখা, সোনায় গড়া। নামে শাঁখা, কিন্তু সোনা পরাই অভিপ্রায়। খদ্দরের পঞ্জাবী ও জামা দেখিয়াছি, আঁঠুর নীচে পর্যন্ত ঝুলিতেছে। যিনি খাদি কি, খাদির প্রয়োজন কি, বুঝিলেন না, তিনি চরকা চালাইতে পারিবেন না। দেড় হাত সাতপোয়া বহরের মোটাকাপড় কি ছিল না? জিন কাপড় ত ছিল। ফলে দেখিতেছি, কলে খদ্দর জন্মিতেছে, যেন খদ্দর থাট-বহরের মোটা সূতার কাপড়! এই কারণেই বলিয়াছি, চরকার প্রতিবাদীর আপত্তি অসার নহে। চিত্তের পরিবর্তন না হইলে, মোহ না কাটিলে ঢাকঢোল বাজানা মিছা। মহাত্মা গন্ধী খাদি পরিয়া চিত্ত-শুদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। চরকার খাদি (home-spun) সে তপস্যার উপকরণ বটে।

যে-সব কল চলিতেছে, সে-সব উঠিয়া যাউক, কাহার-কাহারও এমন অভিলাষ জন্মিলেও, কলগুলা উঠিয়া যাইবে না। কল বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাও মনে করি না। কলের দোষ, কল নির্মম, দেশের প্রতি মমতাহীন। সম্প্রতি কল টাকায় টাকা ফলাইতেছে, কারণ দেশের কতক লোক এমন নির্বোধ যে স্বদেশী কাপড় চায়। দশের নিবুর্দ্ধিতায় একের পোয়া-বার। প্রাচীন কালের দণ্ডনীতি থাকিলে অতিলোভের শাসন হইত। এখন কলির কাল; কলি অর্থে কলহ; এরূপ কলহ একমাত্র শাসন। কলে কলে কলি, দেশী ও বিদেশী কলে কলি, নইলে অতিলোভের শাসন হইবে না। চরকা ও তাঁতের সঙ্গে দেশী কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দেশী কলের সঙ্গে বিদেশী কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বর্তমান কালে যখন ধর্ম এক পাদ, তখন কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রেতার পক্ষে মন্দ নয়।

কলের নির্মমতা যদি একগুণ, কল ও ক্রেতার মাঝে ব্যাপারীর যে পঙ্গপাল আছে, তাহাদের নির্মমতা শতগুণ। পঙ্গপালের স্বভাব এই—ধানগাছে একটু রস থাকিতে গাছ হইতে উঠে না। ক্রেতার পয়সার রস নিঃশেষ না করিয়া ব্যাপারী ছাড়ে না। কোথায় দয়া, কোথায় বা মায়া! মানুষের প্রতি মানুষের দয়া হয়; কিন্তু যেখানে ক্রেতার সহিত সাক্ষাৎ নাই, সেখানে মমতাও নাই। এমন মজার কথা, কাহারও দোষ দিবার জো নাই। তথাপি তুমি আমি যখন ৪৲ টাকার কাপড় ৫৲ টাকা দিয়া কিনি, তখন বুঝি কল ও ব্যাপারীর সংসৃষ্টি (co-partnership) না ঘটিলে ১৲ টাকা দণ্ড দিতে হইত না। চলিত কথায়, দুইই গলা-কাটা, তোমার আমার পয়সা লুঠিয়া ধনী হইতেছে।

গ্রামিক কলায় এই সভ্য জুআ-খেলা নাই। সেখানে কারু ও ক্রেতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; দয়া না থাকিলে সমাজের অলক্ষিত কিন্তু নিদারুণ অপযশের ভয় আছে। তাঁতী কাপড়ের বাণি বাড়াইতে পারে, কিন্তু গলা কাটিতে পারে না। কারণ সে যখন রামধনের কাছে আসিবে,—আর একদিন না একদিন আসিতেই হইবে,—রামধনও ছুরী শাণাইয়া রাখিবে। রামধন একা নয়, ক্রেতামাত্রেই রামধনের সহায়। এই কারণে মনে হয়, চরকা ও তাঁত চলিলে খাদি সস্তা হইবে। কলের খাদির চেয়ে সস্তা হইতেও পারে।

কিন্তু তখন অন্য এক বিপদ ঘটিতে পারে। চরকার সূতা ও তাঁতের কাপড়, প্রত্যেকের অল্প বলিয়া, উল্লিখিত পঙ্গপাল সুযোগ পায় না। কিন্তু যখন অনেক জন্মিতে থাকিবে, তখন সে পালও আসিয়া জুটিবে, অগ্রিম দাদন দিয়া বহুর পরিশ্রম হাত করিবে, তারপর পাটচাষে চাষীর যে অবস্থা, সূতাকাটনীর ও তাঁতীর সেই অবস্থা হইবে। লাভ অন্যে খাইতে থাকিবে, কাটনীর ও তাঁতীর যে কষ্ট সে কষ্ট ঘুচিবে না। তার সাক্ষী, এই স্বদেশীর দিনেও তাঁতীর দিন-চলা ভার হইয়া

রহিয়াছে, সগোষ্ঠী পরিশ্রম করিয়া কোনও রকমে বাঁচিয়া আছে। যে কারু নয়, সে দিনিকা (daily wages) যত পায়, তাঁতী কারু হইয়াও তত পায়, সময়ে সময়ে ততও পায় না। এই অবস্থা দেখিলে বলিতে হয়, কল তাহাকে পিষিয়া রাখিয়াছে, তাহার বাণি বাড়া ন্যায্য।

কিন্তু যে তাঁতী সৌখিন কাপড় বোনে, তাহার অবস্থা মন্দ নহে। কারণ সখের জিনিসে দরের বাঁধাবাঁধি প্রায় থাকে না। তবে এই যে রব উঠিয়াছে,—আশ্চর্য্য কেবল বাঙ্গালা দেশে, যেন অন্য দেশে সব সূতার কাপড় হয় না!—ঢাকা ফরাসডাঙ্গার তাঁতীর হাত মোটা হইয়া যাইবে, সে রবের মূল সেই তাঁতী যে সরু বুনিয়া দু-পয়সা করিতেছে। শিল্পলোপ ভূআ কথা। শিল্প বস্তু এত ক্ষণবিধ্বংসী নয় যে দু-দশ বছর অনুশীলনের অভাবে লুপ্ত হইবে। সরু হাত মোটা করিতে, কিংবা মোটা হাত সরু করিতে প্রযত্ন লাগে বটে, কিন্তু প্রযত্ন শিল্প নয়। যে বাস্তবিক শিল্পী, সে সরুতে যেমন মোটাতেও তেমন নিপুণতা দেখাইতে পারে। আর দেশে শিল্পীই বা কোথায়, কয়জনা? অধিকাংশই কারু, কিছু কলাবিৎ, দুইএক জন বা শিল্পী। এ-কথাও ত ঠিক, চরকার সূতা চিরদিন মোটা থাকিবে না। পূর্ব্বে ছিল না, তখন মোটা ছিল, সরুও ছিল। সরর কাটতি হইলে দেশের কলও সরু কাটিতে শিখিবে।

চরকা ও তাঁতের এত গুণ যে এই প্রাচীন কলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করি। এনিমিত্ত কলের প্রতি বিমুখ না হইলে চলে না। জানি, পরিণামে বিষময় হইলেও নূতনের স্বাদ পাইয়া পুরাতনে প্রত্যাবর্তন বহু তপস্যার ফল। আরও জানি, সংসারে যতি-তপস্বী চিরদিনই অল্প। কিন্তু ইহাও জানি, যুগে যুগে যত বি-নেতা আবির্ভূত হইয়াছেন, সকলেই যম নিয়ম প্রচার করিয়া বহু শিষ্যও রাখিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে, আমাদের দেশ যম-নিয়মের দেশ, যতি-সন্ন্যাসীর দেশ। ইহাতেই, ভোগ্যের ত্যাগেই ভারতের গৌরব। সেটা ভাল কি মন্দ, কে জানে। কিন্তু দেশের প্রকৃতি যখন এই, তখন আশা হয় মোটা চলিবে। মোটায় অনেক গুণও আছে। সে সব পূর্ব্বে "প্রবাসীতে" ব্যাখ্যা করিয়াছি।

এখন চরকা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করি। কলিকাতায় দেখিলাম, চরকা নামে খেলানা বিক্রি হইতেছে। আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি কত ক্ষয় পাইয়াছে, কত বিকৃত হইয়াছে, তাহা এই-সব খেলানা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর মতি, কেন এমন হইল! যে শিল্পী চরকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি ছেলে-খেলা করেন নাই, চক্রের উপরে পাশে চক্র বসান নাই। যে চরকা এতকাল চলিয়া আসিয়াছে, যেটা আধুনিক উত্তম কলের আদর্শ হইয়াছে, সেটা কেবল multiplying wheel নয়। আমার বিশ্বাস, তুলা পাইটের দোষে চরকার সূতা সমান হইতেছে না, চরকার দোষে পাক পাইতেছে না। আমায় একজন বলিয়াছিলেন, চরকার চক্র হাল্‌কা হইলে কোনও দোষ হয় না। তিনি বিজ্ঞ, ব্যবসায়ী, চরকা-নির্ম্মাতা এবং স্বয়ং চালক। তথাপি আমার বিশ্বাস হয় না। পূর্ব্বকালে মাঝে পাথরের পিণ্ড দিয়া চক্র ভারী করা হইত;—ওড়িষ্যায় দেখিয়াছি, বাঁকুড়াতেও দেখিতেছি। চক্রকে flywheel করা কি বৃথা কর্ম্মভোগ? আমি চরকার শিল্পীকে নির্বোধ মনে করিতে পারিব না, সে কালের কোনও শিল্পীকে পারিব না।

সে যাহা হউক, প্রথমে খেলানা ফেলিয়া দিতে হইবে, পুরাতনে হাত পাকাইতে হইবে। তারপর দেখিতে হইবে সূতা কেন সরু মোটা হইতেছে, কেন ঢিলা পাক হইতেছে। এখন চরকার সূতা তাঁতী বুনিতে চায় না। কলের সূতা (বিশেষতঃ নাগপুরী) পাইলে হাত-প্রতি এক আনা বাণি, কিন্তু চরকার সূতায় কাপড় বুনিতে দুই আনাতেও পোষায় না। চরকার সূতা ধরিলে তাহাকে তাঁতও বদ্‌লাইতে হইবে। চলিত শানায় চলিবে না, চলিত মাকুতেও চলিবে না। লোককে খাদি পরিতে বলিতেছি। কিন্তু সে খাদি সুন্দর না হইলে তাহারা পরিবে কেন? কোনও নূতন জিনিস সুন্দর না হইলে চলে না। সরু ধুতি ফেলিয়া মোটা খাদি ধরিবে, তবেই চেষ্টা সার্থক।

চরকা চালাইবার, চরকা কেন, যে-কোনও কল চালাইবার কৌশল আছে। চরকা বহিয়া বাড়ীতে

বাড়ীতে দিয়া আসিলেই চরকা চলিবে না। সূতা-কাটা শিখাইয়া দিতে হইবে। মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতে হইবে, বিগ্‌ড়াইলে ঠিক করিয়া দিতে হইবে। এসব ছাড়া উত্তম রূপে ধোনা, সুন্দর পাঁজ করা তুলা কাগজের পোয়া পোয়া-মোড়কে বিক্রি করিতে হইবে। চরকা দিয়া কাপাস-গাছ দেখাইয়া চলিয়া আসিলে কোনও ফল হইবে না। কোথায় তুলা, কে পিঁজে, কে ধুনে, কে পাঁজ করে, এসব চিন্তার অবকাশ হইলে চরকা চলিবে না।

সূতা কাটা মেয়েদের কর্ম। কিন্তু মেয়ে মহলে পুরুষের অধিকার নাই। শিক্ষিকাও দুর্লভ। যে-সে শিক্ষিকা হইলেও চলিবে না। কুলাঙ্গনারও কর্ম নয়। অগত্যা বালক; বুদ্ধিমান্, সৌম্যমূর্ত্তি, ধীর ও মধুরভাষী বালককে শিখাইয়া গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠাইতে হইবে। এক দিন একবার পাঠাইলেও চলিবে না। মেয়েদের সময় থাকে না, এক দিনে মনও ভিজে না। চরকা ও তুলার পাইজ অবশ্য প্রথম বারেই রাখিয়া আসিতে হইবে, মূল্যের কথাই নাই। তার পর শেখা হইলে কাটা সূতা আনিবার পালা, তাঁতীকে দিয়া গামছা বুনাইয়া বাণি লইয়া দিয়া আসা, কাটা সূতায় না কুলাইলে অন্যের সূতা, বাজারের সূতা দিয়া ভরতি করিয়া একটা কিছু বোনা কাপড় কর্ত্তনীকে দিয়া আসিতে হইবে। ইত্যাদি।

লোককে খদ্দর পরানা মুখের কথা নয়।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

দেরাদূনে বাঙ্গালী

আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী গ্রন্থে দেরাদুন-প্রবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছিলাম; তাঁহারা যে সৎকার্য্যের দ্বারা বিদেশে থাকিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, অদ্য তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইল।

প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ দেরাদূনে গ্রেট্ ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া বিভাগের কর্ত্তা গণনা-কার্য্যের উপযোগী কর্ম্মচারী মনোনয়নের জন্য ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট লিখিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। ডাক্তার বুথ তখন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রায় সাহেব ঈশানচন্দ্রকে মনোনীত করিয়া পাঠান। ঈশান-বাবু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী শ্রীহট্টের অন্তর্গত বথিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺গৌরকিশোর মুন্সী মহাশয় লস্করপুর মুন্সেফি আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন। ঈশান-চন্দ্র অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। কিন্তু শুদ্ধ স্বকীয় চেষ্টা ও প্রতিভার বলে সকল অভাব সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অতি যোগ্যতার সহিত ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা, এফ-এ, এবং বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বুথ সাহেবের মনোনয়নে ঈশান-বাবু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর দেরাদূনে পদার্পণ করেন। কর্ম্মদক্ষতার গুণে তিনি অল্পদিনেই হেড কম্প্যুটারের পদে উন্নীত হন। আজ ৩৬ বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া গবর্ণমেণ্টের যেমন প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন বহু বৎসরের প্রবাসবাসে স্বীয় উন্নত চরিত্র এবং গুণগ্রামের জন্য সে প্রদেশের সাধারণেরও সম্মানিত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছেন।

আঠার শ আটানব্বই খৃষ্টাব্দের পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণের সময় ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটি হইতে প্রেরিত বহু জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত সূর্য্যপরিবীক্ষণের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ঈশান-বাবু দেরাদুন হইতে প্রেরিত হন, এবং অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। তিনি যথাসময়ে তাহার বিবরণ "প্রদীপ" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল, কর্ণেল স্যার সিডনী বারার্ড, কে-সি-এস্-আই, আর-ই, এফ্-আর-

রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব

এস্ হিমালয় প্রদেশের ভূগোল ও ভূতত্ত্ব বিষয়ে Himalayan Geography and Geology নামে যে অতি-প্রয়োজনীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লেখেন, তাহার প্রকাশে ঈশান-বাবু বিশেষ সহায়তা করেন। এই-সকল কার্য্যের জন্য এবং তাঁহার অসাধারণ গণিতজ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র বেদান্ত যোগদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন এবং নানা মাসিক পত্রিকায় তত্ত্ববিদ্যা আবহবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতা অনুসারে গণনা করিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া প্রতিবৎসর প্রথম ছয় মাসের বারিপাত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ গণনা প্রকাশ করিয়া তিনি Weather Prophet নামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি সরকারী কার্য্যে যেরূপ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া তদ্রূপ সাধারণেরও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি মাদকনিবারণ-কল্পে সুগঠিত ভজনমণ্ডলী সহ বহুদিন হইতে বহু চেষ্টা করিয়া এরূপ কৃতকার্য্য হন, যে, নিম্নশ্রেণীর মদ্য-পানাসক্তি ছাড়াইয়া দেন। তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটী, ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্গীয়সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক এবং নৈশ বিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেণ্ট্ রূপে বহু কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ভিক্টোরিয়ান্ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট্ ও নর্থ ইণ্ডিয়া ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট রূপে সাধারণের স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নতির বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছেন।

ঈশান-বাবুর দেরাদুন আসিবার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাবু বিমলাচরণ সোম ট্রিগোনো-মেট্রিকাল সার্ভের গণিত বিভাগে কর্ম্ম লইয়া আসেন। তিনিও ঢাকা কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সোম মহাশয় ১৮৬৮ অব্দের এপ্রেল মাসে বিক্রমপুরস্থ কুমারভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রামচরণ সোম মহাশয় ঢাকা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এক-জন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফরের নিজামতে চাকরি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যান এবং স্বীয় কর্ম্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ নবাব কর্ত্তৃক "রায়রায়ান্" উপাধিতে ভূষিত হন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ এই উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বিমলা-বাবু পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠদ্বয় বাবু চপলাচরণ ও বাবু ভূপেন্দ্রকুমার দেশে ওকালতি করিতেছেন। বিমলা-বাবু নূতন কর্ম্মস্থানে আসিয়াই স্বীয় অধ্যবসায়-গুণে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভের হেড এসিষ্টাণ্ট পদে তাঁহাকে উন্নীত করেন। ঐ পদ ইতিপূর্ব্বে সাহেবদিগেরই একচেটিয়া ছিল। বিমলা-বাবুই ঐ পদে প্রথম ভারতবাসী। জনহিতকর সকল কার্য্যেই তাঁহার অনুরাগ, সহযোগ এবং উৎসাহ আছে। তিনি স্থানীয় বাঙ্গালা সাহিত্য-সমিতির প্রধান পরি-চালক এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে সমিতি বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সমিতির গ্রন্থাগারে এক্ষণে দুই সহস্র পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে দয়ানন্দ এংগ্লো-বেদিক হাইস্কুল স্থাপিত হইবার কালে বিমলা-বাবু বিশেষ

সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে প্রতিষ্ঠাতা ৵ পূরণসিংহ নেগী মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিলেও, বিমলা-বাবু এই স্কুলের সহিত বিশেষ ভাবে সংস্থষ্ট আছেন। তিনি প্রয়োজনমত এখনও ছাত্রদিগকে গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি বীজগণিত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। বিমলা-বাবু দেরাদূনে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আগত নূতন বাঙ্গালীর প্রধান আশ্রয়স্বরূপ। অমায়িক ব্যবহার ও বিমল চরিত্রের জন্য বিমলাচরণ-বাবু স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসী সকলেরই শ্রদ্ধা- ও সম্মানভাজন হইয়াছেন।

বিমলা-বাবু আসিবার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বি-এ, জরীপ বিভাগের প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া দেরাদূন আগমন করেন। এখানে তিনি সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার একৃষ্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে কর্ম্ম করিতেছেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গোলাবাড়ী. হালিসহর গ্রামে রমাপ্রসাদ-বাবুর পৈতৃক বাস। তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পুরুলিয়া হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গণিত শাস্ত্রে সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করেন। দেরাদূনে আসিবার পূর্ব্বে তিনি দুই বৎসর কলিকাতা রেভেনিউ বোর্ডে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। দেরাদূনে তিনি ১৯০০ অব্দে আসেন, এবং সেই বৎসরই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে দেরাদূনে বাঙ্গলা-শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। জরীপ বিভাগের কার্য্য শিক্ষা শেষ হইলে তিনি ঐ বিভাগের ম্যাগ্নেটিক পার্টিতে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তিনি প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তান ব্রহ্মের টেনাসেরিম উপকূল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্য প্রভৃতি বহু বিপদসঙ্কুল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎ স্থানের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। রমাপ্রসাদ-বাবু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ট্রিগোনো-মেট্রিকাল সার্ভে আফিসের ড্রইং বিভাগে হেড

বাবু বিমলাচরণ সোম,
দেরাদূন

ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানের পদে কার্য্য করিতেছেন। তিনি এক্ষণে দালানওয়ালা মহল্লায় "সারদা-লজ" নামে একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেরাদূনের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন।

বিগত জর্ম্মন যুদ্ধাবসানে অবসরপ্রাপ্ত কাপ্তেন যতীন্দ্রমোহন মিত্র, আই-এম-এস্ মহাশয় দেরাদূন-প্রবাসী হইয়াছেন। তিনি এখানে অতিঅল্পদিনেই চিকিৎসাভিজ্ঞতা ও অমায়িকতার ফলে প্রবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। স্থানীয় জরীপ বিভাগের ম্যাগ্নেটিক এনার্জেটি-এর পরিচালক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয় অতিশয় দক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি এখানে চিকিৎসা করিয়া বহু লোকের উপকার করিতেছেন। ব্যারিষ্টার জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র সিংহ, এম-এ, ও শ্রীযুক্ত পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, এখানে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বি-এস্-সি, একৃষ্ট্রা
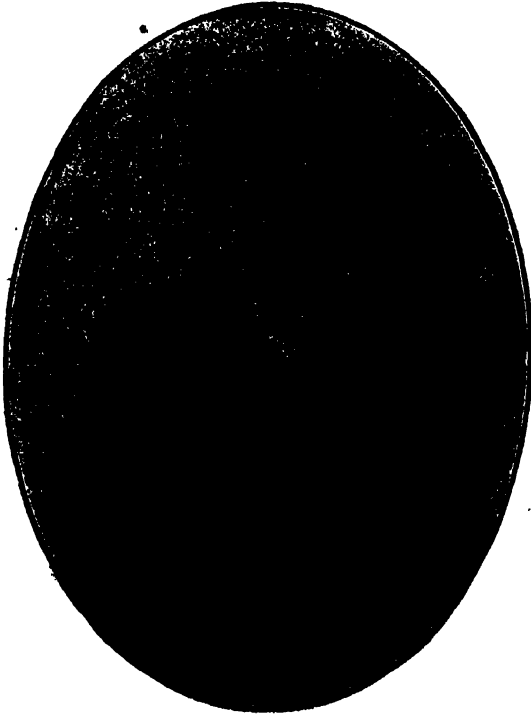
বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বি-এ
দেরাদুন

এ্যাসিষ্টান্ট কন্‌সার্ভেটর অফ্ ফরেষ্টস্; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দে, এক্‌ট্রা এ্যাসিষ্টান্ট কন্‌সার্ভেটার অফ্ ফরেষ্ট্‌স্; শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার এক্‌ট্রা এ্যাসিষ্টান্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া, প্রমুখ বহু পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী দেরাদুন-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

স্থানীয় কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস এবং জরীপ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত হেড্ কম্প্যুটার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সোম মহাশয়গণ প্রমুখ প্রাচীন প্রবাসী বাঙ্গালীগণ এখানে বিশেষ সম্মানিত। এতদ্ব্যতীত জরীপ ও বন বিভাগের বিস্তার হওয়ায় দেরাদুনবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দুইশত হইয়াছে।

ভারতের নানা স্থানে প্রবাসী এবং ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদের বহু সুকীর্ত্তির মধ্যে দেরাদূনের "Homeopathic Charitable Dispensary" হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় অন্যতম। ইহার প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। এই ডিস্পেন্সারীর স্থায়ী সুপরিচালনার জন্য তিনি প্রায় ৮০,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়া মানবসমাজের কৃতজ্ঞতা, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি কোন ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার বা প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইলে এই দান তাঁহার বিশেষত্ব সূচিত করিত না; কিন্তু দেশে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব-বাবুর সংস্কৃতশিক্ষার উন্নতিকল্পে লক্ষাধিক টাকা দানের ন্যায় নিমক-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তারাচাঁদ-বাবু এই কার্য্যে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বিদেশে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সহস্র সহস্র দরিদ্র নরনারী এই চিকিৎসালয়ে ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া প্রতিষ্ঠাতার নাম চিরধন্য করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

রূপান্তর

আমার মনের ব্যথা আছিল গোপনে,
কুঁড়ি যেন পর্ণপুটে আপনারে ঢাকি প্রাণপণে
কেবল একটি রাত; মলয় বুলায়ে হাত,
ফোঁটা দুই অশ্রুপাত করি তার সনে
ফুল করি আজি তারে এনেছে আলোর পারে,
সুরভি মধুতে ঘিরে বরণ-বসনে।

অজানার মত তারে আজি মনে হয়,
ভুলে যাই অকস্মাৎ একদিন সে কি পরিচয়,
স্মৃতি যার বেদনায় ব্যথা দেয় আপনায়,
আজি তারে চেনা দায়, পরম বিস্ময়!
দেখি হত বারে বারে মমতা ততই বাড়ে
যদি খসে যায় ভারে, এই শুধু ভয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

পথ-মোচন

অনেক সময় দেখা যায় যে প্রশ্ন সহজ হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা ফেল্ করিতে থাকে। এক-একটি সহজ বিষয়ও নানা প্রকার কল্পিত রূপক অর্থের আবরণে চাপা পড়িয়া যায়, নিতান্ত সহজ কথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আতিশয্যে ঝাপ্সা বলিয়া মনে হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধেও দেখা যায় যে একটি বিশেষ তত্ত্ব-কথা বা একটি বিশেষ রূপক অর্থ আবিষ্কার করিবার ঝোঁকে অনেক সময়ে লোকে মূল বিষয়টিকে ভুলিয়া যায়, আসল কথাটি সহজ বলিয়াই লোকে ভুল বুঝে। "মুক্তধারা" নাটকখানি সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য গোড়াতেই "মুক্তধারার" সহজ অর্থটিকে সহজ ভাবে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করা দরকার।

(১)

নাটকখানির সম্মুখে সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে নানা মানুষের চলাচলের পথ; দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা অসুরের মত হাঁ করিয়া রহিয়াছে, অপর দিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল; পিছনে বাঁধন-বাঁধা "মুক্তধারা", জলের শব্দ আসিয়া পৌঁছিতেছে কিনা স্পষ্ট বুঝা যায় না; মাঝে মাঝে ভৈরব-মন্ত্র শুনা যাইতেছে—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর।

আর এই সমস্তের মাঝখানে রহিয়াছেন উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ।

অভিজিতের জন্ম রাজ-বাড়িতে হয় নাই, মুক্তধারা ঝরণা-তলা হইতে তাঁহাকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল; তাঁহার কপালে রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে যুবরাজ করা হইয়াছে। অভিজিৎ এ খবর জানিতেন না, তবুও ঝরণার শব্দে পথের সুরে তাঁহার মন উতলা হইয়া উঠিত। গৌরীশিখরের দিকে তাকাইয়া যুবরাজ ভাবিতেন—"যে-সব পথ এখনো কাটা হয়নি ঐ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবী কালের পথ দেখ্‌তে পাচ্চি—দূরকে নিকট কর্‌বার পথ।"

একদিন যুবরাজ শুনিলেন যে মুক্তধারার উৎসের নিকটে কোন্ ঘরছাড়া মা তাঁহাকে জন্ম দিয়াছে। অভিজিৎ বুঝিলেন যে তাঁহার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তাঁহাকে পথে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, ঘরের শঙ্খ তাঁহাকে ঘরে ডাকে নাই। ইহার পর হইতে যুবরাজকে অনেক সময়েই আর রাজবাড়িতে দেখা যাইত না, তিনি রাজবাড়ি ছাড়িয়া ঝরণাতলায় চলিয়া যাইতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"ঐ জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুন্‌তে পাই," বলিতেন—"আমি পৃথিবীতে এসেচি পথ কাট্‌বার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেচে।"

যুবরাজকে তখন শিবতরাইয়ের শাসনভার অর্পণ করিয়া মুক্তধারার নিকট হইতে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অভিজিৎ কিন্তু মুক্তধারার মাতৃভাষা ভুলিতে পারিলেন না। শিবতরাইয়ের অন্নচলাচলের পথ বন্ধ করিবার জন্য অনেকদিন হইল নন্দিসঙ্কটে গড় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, অভিজিৎ এই বহুদিনের পুরাতন গড় ভাঙিয়া নন্দিসঙ্কটের পথ খুলিয়া দিলেন। উত্তরকূটের স্বার্থে আঘাত লাগায় উত্তরকূটের অধিবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যুবরাজ অভিজিৎকে উত্তরকূটে ফিরিয়া আসিতে হইল।

অভিজিৎ উত্তরকূটে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই দেখিলেন মুক্তধারার বাঁধ বাঁধা হইয়া গিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই বাধ্য করা যায় নাই। এতদিন পরে যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে বশ মানাইবার উপায় করিয়া দিয়াছে, শিবতরাইয়ের প্রজাদের পিপাসার জল এইবার বন্ধ করা চলিবে, শিবতরাইয়ে দুর্ভিক্ষ আসন্নপ্রায়। এই অসামান্য কীর্ত্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক উৎসব করিতেছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির প্রশংসায়, যন্ত্র-মহিমা-জয়গানে সমস্ত নগরী মুখরিত।

কিন্তু এই বাঁধ ত সহজে বাঁধা হয় নাই। বাঁধ বারবার

ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত লোক ধূলাবালি চাপা পড়িয়াছে, কতলোক বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যায় নাই তখন রাজার আদেশে প্রত্যেক ঘর হইতে আঠারো বৎসরের উপর বয়সের যুবককে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে নাই। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর যন্ত্র-শক্তি জয়ী হইয়াছে। মায়ের ক্রন্দন কিন্তু থামে নাই। জয়োৎসবের মধ্যেও শুনা যাইতেছে, জনাই গ্রামের অম্বা কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—"সুমন! আমার সুমন! বাবা আমার সুমন এখনো ফির্‌ল না!.........তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরব-মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেচে। বাবা সুমন! সূর্য্য ত অস্ত যায়—আমার সুমনত এখনো ফির্‌ল না!"

উস্কোখুস্কো-চুল হাতে বাঁকা ডালের লাঠি পাগল বটুক সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—"সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাক্‌তে ফিরে যাও। ......বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে' নিয়ে গেল, আর তারা ফির্‌ল না।......... সাবধান, বাবা সাবধান, যেওনা ও পথে।"

একদিকে নাগরিকদিগের উৎসবকোলাহল, অপর দিকে মায়ের ক্রন্দন, পাগলের অভিশাপ, তার মাঝে থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইতেছে—

তিমির-হৃদ্‌-বিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর!

যুবরাজ ফিরিয়া আসিয়া এ সমস্তই দেখিলেন। পাগল বটুক আসিয়া তাঁহাকে খবর দিল—"জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণা-রাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা কর্‌বে। মানুষ বলি চায়।" অম্বা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"সুমন! বাবা সুমন! যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাওনি?"

যুবরাজ বুঝিলেন যে রাজপ্রাসাদের শাসন-নীতির সহিত তাঁহার জীবনের কোন সত্য মিলন ঘটা সম্ভবপর নহে। মুক্তধারার উৎসের নিকট তাঁহার জন্ম, পথ খুলিয়া দিবার আহ্বানটিকে তাঁহার অন্তরতম চৈতন্যের মধ্যে ধারণ করিয়া তিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তাই অভিজিৎ স্পষ্ট বুঝিলেন যে রাজগৃহে তাঁহার স্থান নাই। ভাই-বোনের সম্বন্ধের ন্যায় অভিজিতের সহিত মুক্ত-ধারার যোগ ভিতরে বাহিরে; এই ভিতরকার যোগের পরিচয় তিনি বাহিরের ঘটনার মধ্যেও দেখিতে পাইলেন, সেইজন্যই মুক্ত-ধারার বাঁধ-বাঁধার বেদনা অভিজিৎকে এমন কঠিনভাবে আঘাত করিল। অভিজিতের মনে হইল—"মানুষের ভিতরের রহস্য বিধাতা বাহিরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখেছেন; আমার অন্তরের কথা আছে ঐ মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝ্‌তে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েচি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।" অভিজিৎ রাজকুমার সঞ্জয়কে বলিলেন—"আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে' যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেচি।" অভিজিৎ বুঝিলেন প্রাণ দিয়াও মুক্তধারার বাঁধ তাঁহাকে ভাঙিতেই হইবে।

এমন সময় রাজাজ্ঞায় ধৃত হইয়া যুবরাজ কারাগারে বন্দী হইলেন। তখন সূর্য্য ডুবিতেছে, যন্ত্রের চূড়াটা সূর্য্যাস্তমেঘের বুক ফুঁড়িয়া উদ্যতমুষ্টি দানবের মত দাঁড়াইয়া রহিল, আর রহিল ভৈরব-ত্রিশূল।

উত্তরকূটের উৎসব চলিতে লাগিল। উত্তরকূটের অধিবাসীরা জয়-গর্ব্বে উন্মত্ত, সপ্তাহ পরেই শিবতরাইয়ের চাষের ক্ষেত শুকাইয়া আসিবে। উত্তরকূটের পুরদেবতা এতদিন পরে প্রসন্ন হইয়াছেন, তৃষ্ণার শূলে বিদ্ধ করিয়া শিবতরাইকে এইবার তিনি উত্তরকূটের পদতলে ফেলিয়া দিবেন। উত্তরকূটের বালকদলও জানে যে উত্তরকূটের অধিবাসীরাই সকলের উপর জয়ী, তাহারাও জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। শিবতরাইয়ের প্রজারা রাজার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইতে আসিয়াছিল, উত্তরকূটের অধিবাসীরা তাহাদিগকেও জোর করিয়া টুঁটি টিপিয়া বলাইতে লাগিল—"জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!"

স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় উচ্চারিত জয়ধ্বনির মধ্যে মাঝে মাঝে শুনা গেল—

বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূল-পাণি
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর শঙ্কর!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আকাশ অন্ধকার, কিন্তু রৌদ্রের মদ খাইয়া যন্ত্রের চূড়াটা তখনও লাল হইয়া জ্বলিতেছে, আর অস্তসূর্য্যের আলো স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূল।

এমন সময় বন্দীশালায় আগুন লাগিল। এই সুযোগে খুড়ামহারাজ বিশ্বজিৎ যুবরাজকে বন্দীশালা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন—"তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।" অভিজিৎ জানেন যে এবার সময় হইয়াছে, আর অপেক্ষা করা চলিবে না। তিনি বলিলেন—"আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবচ তোমরাই আগুন লাগিয়েচ? না, এ আগুন যেমন ক'রেই হোক্ লাগ্‌ত। আজ আমার বন্দী থাক্‌বার অবকাশ নেই।" অভিজিৎ বলিলেন,—"জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।" এই বলিয়া অন্ধকারের মধ্যে অভিজিৎ চলিয়া গেলেন—

"কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত!"

বাউল গাহিল—

"ও ত আর ফির্‌বে না রে, ফির্‌বে না আর,
ফির্‌বে না রে!"

অমাবস্যার রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসিল। যন্ত্রের চূড়াটা অন্ধকারে ভূতের মতন কালো দেখাইতেছে, কিন্তু ভৈরব-ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যায় না। যুবরাজ বন্দীশালায় নাই শুনিয়া উত্তরকূটের অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; যুবরাজকে তাহারা রাত্রির অন্ধকার পথে পথে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। নন্দিসঙ্কটের ভাঙা গড় নূতন করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, যন্ত্ররাজ বিভূতির দলবল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে শিবতরাইএ যাত্রা করিয়াছে, পথে যাহাকে পায় জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। শিবতরাইয়ের প্রজারাও পথে বাহির হইয়াছে যুবরাজকে খুঁজিবার জন্য।

মশাল নিবিয়া গিয়াছে, বাতি জ্বলিতেছে না, রাত্রির অন্ধকারে দলে দলে লোক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না, কে কোন্ দিকে চলিয়াছে ঠাহর পায় না, শুধু যন্ত্রের চূড়াটা তখনও যেন ইসারা করিতেছে।

অন্ধকারে বৃদ্ধ বটুক ডাকিতেছে—"জাগো, ভৈরব জাগো!" অম্বা পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে—"সুমন! বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল!" বৈরাগী গান ধরিলেন—

প্রহর জাগে প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল অম্বার ক্রন্দন—"মা ডাকে! মা ডাকে! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়!" এমন সময় ভৈরবের ডমরু বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ শোনা গেল মুক্ত-ধারার বাঁধন-ভাঙা জলোচ্ছাস। বৈরাগী গাহিলেন—

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে।

কুমার সঞ্জয় আসিয়া খবর দিলেন যে যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়াছেন, কিন্তু যন্ত্রাসুরও তাঁহাকে আঘাত ফিরাইয়া দিল, মুক্তধারা অভিজিতের আহত দেহকে কোলে তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে জলস্রোতের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল আর বাজিতে লাগিল ভৈরব-মন্ত্র—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শঙ্কর শঙ্কর!

(২)

যুবরাজ অভিজিৎ ছিলেন সকলেরই প্রিয়, উত্তরকূটের অধিবাসীরা তাঁহাকে সত্যই ভালবাসিত, উত্তরকূটের মেয়েরাও জানে যে "উনি ত সবারই হৃদয় জয় করে' নিয়েছেন।" অথচ অভিজিৎকে নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মহারাজ রণজিৎ দুঃখ করিয়াছেন—"এ-যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।" যুবরাজ অভিজিৎ যখন বাঁধ ভাঙ্গিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন যন্ত্ররাজ বিভূতিও এই আক্ষেপই করিয়াছেন—"স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন্? তিনি কি শিবতরাইয়ের?"

কিন্তু শুধু শিবতরাইয়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য যুবরাজ প্রাণ দিয়াছেন বলিলে তাঁহার আত্মোৎসর্গকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। এক হিসাবে শুধু অভিজিতের নহে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্ম মুক্তধারা ঝরণাতলায় পথের ধারে। মানুষ জন্মলাভ করে মুক্ত অবস্থায়, জন্মকালে তাহার কোন বন্ধন থাকে না, ক্রমে সে নিজের বন্ধন নিজেই সৃষ্টি করে। প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে, নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন করে। কিন্তু উপায় যখন উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যায়, প্রয়োজন যখন আনন্দকে অতিক্রম করে, ব্যবস্থামাত্রই তখন যান্ত্রিক হইয়া উঠে। যান্ত্রিক-ব্যবস্থা জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করে, সমস্ত মানুষের চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। যান্ত্রিক-বন্ধন শুধু যে আলাদা আলাদা করিয়া এক-একটি মানুষকে আঘাত করে তাহা নহে, সমস্ত মনুষ্যজাতিকে পীড়িত করিয়া তুলে। যেখানে বন্ধন সেইখানেই সমস্ত মানুষের বেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠে। অভিজিতের মতন যে মানুষ নিজের জন্ম-কথার অর্থ জানিয়াছে সেই বুঝিতে পারে এই বেদনা কি দুঃসহ, এই বন্ধন কি বীভৎস!

মানুষের হাতে বিধাতা প্রচণ্ড শক্তি দিয়াছেন, বস্তু-পিণ্ডের দ্বারা, উপায় উপকরণ ব্যবস্থা আয়োজনের দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার শক্তি মানুষের ব্রহ্মাস্ত্র। এই ক্ষমতা কল্যাণের পক্ষে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল। কিন্তু স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া উঠে, লোভ যখন দুর্ব্বলকে হিংসা করে, জাতীয় অহমিকা যখন প্রচণ্ড হইয়া উঠে, মানুষ তখন নিজের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র মানুষকে পীড়ন করিবার জন্য ব্যবহার করে, বিশ্বপাপ তখন বিকটমূর্ত্তি ধারণ করে—

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া,
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া!"

কিন্তু যান্ত্রিক-ব্যবস্থার বেদনা কোথায় গিয়া লাগে? যে অত্যাচার করে, যাহার হৃদয় কঠিন সে ত বেদনা অনুভব করে না। যে নিরপরাধ যে দুর্ব্বল তাহাকেই বেদনা সহ্য করিতে হয়। কত মা পুত্রকে হারায়, কত স্ত্রী স্বামীকে হারায়, কত ভাই ভাইকে হারায়, কত নিরপরাধের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। এইজন্যই ত পাপের আঘাত এমন নিষ্ঠুর। যেখানে পাপ, শাস্তি সেখানে আসে না। কিন্তু উপায়নাই, মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগকে অপর সকলকেই ভাগ করিয়া লইতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরদূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ পরস্পরের সহিত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে আসলে কোন বিচ্ছেদ নাই। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করিতে হয়, বন্ধুর পাপে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্ব্বলকে সহ্য করিতে হয়।

একথা বলিলে চলে না যে অন্যের কর্ম্মফল আমি ভোগ করিব কেন। কবি বলিয়াছেন—"হাঁ, আমিই ভোগ করব এই কথা বলে' প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি কর, তপস্যা কর, দুঃখকে গ্রহণ কর! তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণ রূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্ম্মল থাকবে কেমন করে', প্রাণবান্ হয়ে উঠবে কেমন করে'? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে—সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদ্ভদ্রং তৎ—যা ভদ্র তাই আসবে।"

যাহারা দুর্ব্বল যাহারা অক্ষম তাহারা অত্যাচরিত

হয়। এই অত্যাচার, এই অবিচার, অক্ষমের অপমান, ভীত ত্রস্ত দরিদ্রের বেদনার পরিহাস বড় নিদারুণ। কিন্তু এই দুঃখকে জয় করা যায়। শিবতরাইয়ের প্রজারা মার খাইয়াছিল, অবিচলিত সহ্যশক্তির দ্বারা ধনঞ্জয় বৈরাগী দেখাইলেন যে মারের উপরেও জয়ী হওয়া যায়। বৈরাগী ধৈর্য্যের দ্বারা দুঃখকে জয় করিতে শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা সত্য শিক্ষা। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা অত্যাচরিত তাহাদের পক্ষে এ শিক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু আরেক প্রকার দুঃখও আছে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে একত্র করিয়া যে একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম রহিয়াছে তাহাও সত্য। সেইজন্যই এক জায়গার বেদনায় অপর জায়গায় আঘাত লাগে, পাপের বেদনায় সমস্ত বিশ্ব কাঁপিয়া উঠে, সমস্ত মানুষের প্রায়শ্চিত্ত সকল মানুষকেই করিতে হয়। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল, দুঃখের আগুন তাহাকেই প্রথম দগ্ধ করে। সমস্ত মানুষের বেদনাকে যে লোক হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে সহ্যশক্তির দ্বারা শুধু দুঃখনিবৃত্তি করিয়া তাহার নিষ্কৃতি থাকে না—

"ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত!......
... শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিবাগী
পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা!"

উত্তরকূটের অধিবাসীরা স্বার্থের উত্তেজনায় কত মানুষকে পীড়া দিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজারা দুঃখ পাইয়াছে, বটুক দুঃখ পাইয়াছে, সুমনের মা দুঃখ পাইয়াছে, এ সকল দুঃখ সামান্য নহে—কিন্তু এ সমস্ত দুঃখ ফিরিয়া আসিয়া আঘাত করিল সকলের প্রিয় বেদনায় সকরুণ নীরব নম্র মহাপ্রাণ যুবরাজ অভিজিৎকে।

যাহার চিত্ত-তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সব চেয়ে বেশি বাজে তাহাকেই সমস্ত পৃথিবীর বেদনা অধিক করিয়া আঘাত করে। তাহার চক্ষে তন্দ্রা ছুটিয়া যায়, বেদনার আঘাতে বন্ধন খসিয়া পড়ে, দূরদিগন্তে সে শুনিতে পায় রুদ্রের ভৈরব-মন্ত্র তাহাকে আহ্বান করিতেছে।—

"তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেচে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথ-হারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।"

সেইজন্যই, কুমার সঞ্জয় আসিয়া যখন মনে করাইয়া দিলেন "সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সে-দিন তার সাম্‌নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগ্‌বার আগেই কোন ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্‌তে দেয় নি সে কে—কিন্তু ঐ টুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে কর্‌বার নেই? সেই ভীরু যে আপনাকে গোপন করেচে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন কর্‌তে পারেনি, তার মুখ কি তোমার মনে পড়্‌চে না?" যুবরাজ অভিজিৎ বলিলেন—"পড়্‌চে বই কি! সেইজন্যই ত সইতে পাচ্চিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে' দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে হাস্য কর্‌চে। স্বর্গকে ভালো লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যেতে দ্বিধা করিনে।" সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যুবরাজ শুনিয়াছেন, কে তাঁহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে?

"না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।"

কুমার সঞ্জয় আসিয়া আবার বলিলেন—"যা কঠিন তার গৌরব থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।" অভিজিৎ উত্তর করিলেন—"ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখী দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর

একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা কর্‌বে জানিনে; কিন্তু ও যে এই সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে' চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্‌চে। সুন্দর এই পৃথিবী, যা-কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেচে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।… ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্ত্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেচে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য্য আকাশে এঁকে দিলে।"

"ওরে যাত্রী
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোর ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।"

বটুক যখন কাছে আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ?" অভিজিৎ বলিলেন—"শুনেচি।" বটুক—"সর্ব্বনাশ! তবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই?" অভিজিৎ—"না, নেই।" বটুক—"সইতে পার্‌বে কি যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?" অভিজিৎ—"ভৈরবের প্রসাদে সইতে পার্‌ব।" বটুক—"চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোকে ধিক্কার দেবে?" অভিজিৎ—"সইতেই হবে।" বটুক—"তা হলে ভয় নেই।" অভিজিৎ—"না, ভয় নেই।"

যুবরাজ অভিজিৎ জানিতেন যে রুদ্রের প্রসাদ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

"পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্র-নাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা!
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

যুবরাজ অভিজিৎ বেশি কথা বলেন নাই, কারণ তাঁহার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই; কাহাকেও তিনি সঙ্গে লইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—"আমার উপর যে কাজ পড়েচে সে একলা আমারই।"

কুমার সঞ্জয় অনুরোধ করিলেন—"যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে' নাও!" যুবরাজ সঞ্জয়কে কঠোর-ভাবে বাধা দিয়াছেন, বলিয়াছেন—"না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের কর্‌তে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথ আড়াল কর্‌ব।" কুমার সঞ্জয় যুবরাজকে ভালবাসিতেন; নিজের ভাল-বাসাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি যুবরাজকে অনুসরণ করিতে চাহিলেন। যুবরাজ একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন যে সঞ্জয়ের নিকট মুক্তধারার রহস্যের কোন অর্থ নাই, সঞ্জয়ের কানে মুক্তধারার আহ্বান পৌছায় নাই, তাই সঞ্জয়কে তিনি ঠেকাইয়া রাখিলেন। যুবরাজের কর্ম্মের পুনরাবৃত্তিমাত্র করিয়া কোন ফল নাই, যুবরাজ যেমন নিজের পথে চলিয়াছেন সঞ্জয়কেও সেই রকম নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে, যুবরাজের জীবনের ইহাই চরম শিক্ষা।

অভিজিৎ জানিতেন যে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে; এইজন্যই তিনি দল গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। দলের মধ্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। যাহারা দলে ভিড়িয়া পড়ে তাহারা উপলব্ধি করিবার অবসর পায় না যে সত্যকে অন্তরে অনুভব করিয়াছে কি না। দশের ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া বুঝিতে পারে না যে দলের আদর্শ সত্যই নিজের আদর্শ নহে। দলের মোহ ক্রমে অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়, বাঁধা বুলি আবৃত্তি করিয়া সত্যকে বাধাগ্রস্ত করিতে থাকে, সফলতা মাত্রকেই বাহিরের দিক দিয়া পাইবার চেষ্টায় সত্যকে খর্ব্ব করে।

অভিজিৎ বুঝিয়াছিলেন যে সংখ্যাবাহুল্য অথবা আয়তন-বিশালতার দ্বারা সত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, তিনি জানিতেন যে বিন্দুপরিমাণ সত্যের মূল্যও অসীম, তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যবোধ তাহাকেই জাগ্রত কর,

অন্যের মুখের দিকে তাকাইও না, বাহিরের সফলতার দিকে তাকাইও না। বিশ্বজিৎ যখন জানাইলেন—"তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে' আছে, তাদের ডাক্‌বে না?" অভিজিৎ বলিলেন—"যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুন্‌ত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুল্‌বে।"

নিজের সম্বন্ধে যুবরাজের মনে কিন্তু কখনও সন্দেহ মাত্র হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সংকল্প স্থির, তাঁহার বিশ্বাস অচঞ্চল। অম্বাকে বলিলেন, সুমন যে পথে গিয়াছে তিনি নিজেও সেইপথেই যাইবেন। অম্বা বলিল—"যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।" পরিপূর্ণ ভরসায় যুবরাজ শুধু একটি কথা বলিলেন—"বল্‌ব।" যাইবার সময়ে বিশ্বজিৎ যখন বড়ই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘট্‌বে।" অকম্পিত চিত্তে যুবরাজ উত্তর দিলেন—"তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।" হৃদয়ে অপরিমিতা শান্তি লইয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন।

কুমার সঞ্জয় মুক্তধারার নিকটেও অভিজিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অভিজিৎ কুমারকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না, একা চলিয়া গেলেন। সমস্ত দুঃখ সমস্ত পাপের সম্মুখে যেন একাই দাঁড়াইতে চাহিলেন।

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তা'রা সরে' যায়
জীবনেরে করে' যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ!
তা'র পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বল অকম্পিত বুকে,—
'তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক!'"

যুবরাজ অভিজিৎ জীবনের চরম মূল্য দিয়া সমস্ত মানুষের জন্য পথ মোচন করিয়া দিলেন, নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভৈরবকে জাগাইলেন। *

এইরূপ করিয়াই ভৈরবের জাগরণ হয়। স্বার্থের বন্ধনে জর্জ্জর হইয়া, রিপুর আঘাতে আহত হইয়া মানুষ যখন প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করে ও আঘাত পায়—সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে প্রলয়-নৃত্যে গর্জ্জন করিয়া উঠে।

"মরণের গান
উঠেচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে—
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল,—
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।"

মানুষ বলে, "জাগো, ভৈরব জাগো! কঠিন আঘাতে সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জ্জনা কর!"

সঞ্চিত বিশ্বপাপ যখন বিকটমূর্ত্তি ধারণ করে, প্রেমিকের আত্মনিবেদনে ভৈরব তখন জাগিয়া উঠেন।

---

* মে মাসের Modern Review পত্রিকায় "মুক্তধারার" ইংরেজি অনুবাদের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন—"I must ask my readers to treat it as a representation of a concrete fact of psychology" এবং যুবরাজ অভিজিৎই যে নাটকখানির প্রধান পাত্র এরূপ আভাস দিয়াছেন। এইজন্যই এতক্ষণ আমরা যুবরাজ অভিজিতের কথা আলোচনা করিয়াছি। "মুক্তধারা" নাটকখানির মধ্যে অবশ্য অন্যান্য অনেক কথা আছে, সুবিধা হইলে পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাতে
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি' চূর্ণ করে তা'রে
কাল-ঝঞ্ঝাঝঙ্কারিত দুর্য্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্ বিধান।"

যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় জ্ঞানে জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে, প্রলয়-মুহূর্ত্তে তাহার সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া রুদ্রের মার্জ্জনা নামিয়া আসে—

"গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।"

যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জ্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষ ও মারী, প্রবলের অবিচার, আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা তাহাকে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিলে ভৈরবের আবির্ভাব হয়। অন্ধকার রাত্রে রুদ্রের রথচক্রের বজ্রগর্জ্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠে—প্রলয়দাহের রুদ্র-আলোকে স্তূপাকার পাপের দহনদীপ্তিতে ভৈরব আপনাকে প্রকাশ করেন। + সমস্ত বন্ধন ভাসিয়া যায়, চলাচলের পথ জুড়িয়া বাজিতে থাকে—

জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর!

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

+ উদ্ধৃত অংশগুলি বলাকা (পৃঃ ৪৫, ৯৬, ৯৭, ১১৬, ১১৭), চিত্রা ("এবার ফিরাও মোরে", পৃঃ ১৯), গীতালি (পৃঃ ৫০) ও নৈবেদ্য (৬৫, পৃঃ ৭৪) হইতে এবং অন্য কতকগুলি অংশ শান্তিনিকেতন, ১৭শ খণ্ড, ("মা মা হিংসী", পৃঃ ৪৭ ও "পাপের মার্জ্জনা" পৃঃ ৫৭-৫৯), ধর্ম্ম ("দুঃখ", পৃঃ ১০৮) হইতে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে।

রবীন্দ্র-পরিচয়

[রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লেখা বার হাজার লাইন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায় না। কিছুদিন হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য-সূচী (Bibliography) সংকলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সূচী-সংকলন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। নিদর্শন-স্বরূপ বাল্য-রচনা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব। এই সময়ের অধিকাংশ লেখায় স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া না রাখিলে পরে আর কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। সংকলন যেমন অগ্রসর হইবে রবীন্দ্র-পরিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাকিবে।* এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়ায় সমালোচনার ধারাবাহিক ঐক্যসূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। তাই মনে রাখা আবশ্যক যে "রবীন্দ্র-পরিচয়" সাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্ব্বাভাস মাত্র।]§

কবিকাহিনী

চতুর্থ সর্গ

চতুর্থ সর্গে নলিনীর মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছ্বাস, ক্রমে শান্তিলাভ ও পরে বৃদ্ধবয়সে কবির সুখ-দুঃখ ও

* পূর্ব্বে প্রকাশিত ; "দেশ বিদেশের প্রভাব" প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮। "বনফুল" ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩২৮। "কবি-কাহিনী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

§ শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রবাসী-সম্পাদকের নিকট লিখিয়াছেন যে "বনফুলের" পরিচয় পড়িয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যে বনফুলে "বঙ্কিম-বাবুর কপালকুণ্ডলার প্রভাবও বেশ অনুভূত হয়।" তিনি অনেকগুলি উদাহরণ দিয়া নিজের কথা সমর্থন করিয়াছেন। লেখক মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আমার কোন মতভেদ নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপর সমসাময়িক বাংলা লেখকদিগের প্রভাব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৮, পৃ ৭৫১)। পত্রলেখক মহাশয় কপালকুণ্ডলা ও বনফুল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সেই সময় ছাপাইয়া দিবার ইচ্ছা রহিল।

আশার কথা এবং কবির মৃত্যু বর্ণনা করিয়া কাব্য শেষ হইয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতই বৃহৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য্য। (১)

ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথা খুব ঘটা করিয়া বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিণত বয়সের লেখার সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে যতটা হাস্যকর মনে করিতেছেন আমরা সেরূপ মনে করি না।

নলিনীর মৃত্যুর পর কবির মনে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিল যে সত্যই কি সমস্ত ফুরাইয়াছে? যে মানুষ এমন একান্ত সত্য ছিল সে কি একমুহূর্ত্তেই সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া গেল? মৃত্যুর পরে কি আর কিছুই থাকিবে না?

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে?
* * *
এই ভালবাসা, যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সাথে
মুহূর্ত্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন? (২)

শোকাচ্ছন্ন কবি তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া দেখিল কালস্রোতে সমস্তই ভাসিয়া চলিয়াছে কিছুই স্থির নাই।

হিমাদ্রির এই শুষ্ক আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদক্ষেপ গণিতেছি বসি,
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান মিশিতেছে অতীত সমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া। (৩)

কবি বুঝিল কালস্রোতে সমস্তই চলিয়াছে কিন্তু কিছুই বিলীন হইতেছে না, অনন্ত কালের মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কবি দেখিল পাখীরা গান করিতেছে, কাননে বায়ু বহিতেছে, উপত্যকায় ফুল ফুটিতেছে, কেহ চুপ করিয়া বসিয়া নাই। প্রকৃতির প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কবি নিজের শোক ভুলিল।

ধীরে ধীরে দূর হতে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সরল রাগিণী।
* * *
কখনো মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মত আছিল মধুর,
এমনি স্বপনময় এমনি অস্ফুট;
তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতর যেন উথলিয়া উঠে। (১)

কবির বার্দ্ধক্য

ক্রমে কবির বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল। শ্বেতজটা-সমাকীর্ণ গম্ভীরমুখশ্রী বৃদ্ধ কবি হিমালয়ের পাদদেশে বসিয়া গান করিতেছেন।

কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা! সুনীল গগন
ভেদিয়া তুষারশুভ্র মস্তক তোমার।
* * *
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদচূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে!
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হল
ঘুমময় অন্ধকার, গভীর নীরব।
সাড়াশব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্ব্বতের শতদল দিয়া। (২)

কবির মনে পড়িল এই হিমালয় যুগের পর যুগ মানব-সভ্যতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কত পাপ কত রক্তপাত কত অত্যাচার তাহার চোখে পড়িয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া মানুষ কিরূপ হীনতায় নিমজ্জিত হয় তাহা দেখিয়াছে—

(১) জী.স্মৃ পৃ ১০৭।
(২) ক.-কা. পৃ ৩৮-৩৯। ভা. চৈত্র, ১২৮৪, ৩৯৩ পৃ।
(৩) ক.-কা ৪০পৃ। ভা. ৩৯৪ পৃ।

(১) ক.-কা. ৪৩ পৃ। ভা. ৩৯৫ পৃ।
(২) ক, কা ৪৪-৪৫ পৃ। ভা. ৩৯৫ পৃ

দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা ॥
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন !
যে হাত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন. সে অধীনের দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু !
সবল, সে দুর্ব্বলের পীড়িতে কেবল,
দুর্ব্বল, বলের পদে, আত্ম বিসর্জ্জিতে ! (৬)

অন্য দিকে সভ্যতার নামে কি অত্যাচারই চলিয়াছে।

সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা,
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার ! (৭)

এইসব কথা স্মরণ করিয়া কবির মন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি তিনি বিশ্বাস হারাইলেন না, আসন্নমৃত্যু কবি ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া শান্তিলাভ করিলেন—

কবে. দেব, এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি প্রভাতের শিশির-সলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি ;
নাহিক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা ;
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।

* * *

সে দিন আসিবে গিরি এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব-হৃদয়। (৮)

কবি কিন্তু জানেন সে দিনের এখনো দেরি আছে—

প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে.
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়। (৯)

পনেরো ষোল বৎসর বয়সের লেখায় বিশ্বপ্রেমের যে আদর্শ ফুটিয়াছে তাহা খুব গভীর না হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহা বিশ্বপ্রেমেরই আদর্শ বটে। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যখন আদর্শ কবিজীবনের কথা কল্পনা করিয়াছেন তখন জগৎজোড়া শান্তি, সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দিয়াই কবি-চরিত্রের শেষ পরিণতি দেখাইয়াছেন, স্বাদেশিকতার আদর্শ বা স্বাজাত্যবোধের চরম অভ্যুদয়কে উজ্জ্বল করিয়া তুলেন নাই।

কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হইলেও এই চতুর্থ সর্গটিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি না। আমাদের বিশ্বাস বনফুলের ন্যায় কবিকাহিনীর বিষয় নির্ব্বাচনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। বালক রবীন্দ্রনাথ যখন কবিকাহিনী লিখিয়াছিলেন তখন হয়ত নিজেই জানিতেন না যে সেই লেখার মধ্যে তাঁহার নিজের পরবর্ত্তী জীবনের ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেমানুষী হইলেও এই বয়সের লেখায় বিশ্বপ্রেমের কথাকে একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই বলি—

"কেহ যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হইলে ভুল করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যখন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নি-উচ্ছ্বাসের সময়। এখনকার প্রবীণ পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরূপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায় ; কিন্তু প্রথম বয়সে তাহার আবরণ এত কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাষ্প ছিল অনেক বেশি, তখন সর্ব্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাণ্ডব চলিত। তরুণ বয়সের আরম্ভে এও সেই রকম একটা কাণ্ড। (১০)

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(৬) ক.-কা. ৪৭ পৃ। ভা. ৩৯৬ পৃ।
(৭) ক.-কা. ৪৮ পৃ। ভা. ৩৯৬-৩৯৭ পৃ।
(৮) [illegible]৯-৫০ পৃ। ভা. ৩৯৭ পৃ।
(৯) ক.-কা. ৫১ পৃ। ভা ৩৯৮ পৃ।
(১০) জী.-স্মৃ. ১০৬ পৃ।

প্রথম চিঠি

১

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেচে প্রবাসে।

চলে' যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে-কান্নাটি ঘরের আয়নায় মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়্‌ল। মন বল্‌লে, "ফিরি, দুটো কথা ব'লে আসি।" কিন্তু সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আস্‌চে বলে' একজনের দুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর কখনো দেখেনি।

পথে চল্‌বার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মত একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে সেই কথা মনে ক'রে বিস্ময়ে তার বুক ভরে' উঠ্‌ল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেচে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মত পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোট ছোট ঝরণা কা'কে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়ে চুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিটিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেচে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

এই আসা-যাওয়ার সংসারে তারও চলে' যাওয়া তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল একথা কে জান্‌ত? সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সাম্‌নে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখ্‌লে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে' উঠ্‌ল।

ভোর-বেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে, আর কানে যেন সে শুন্‌তে পায়, "তোমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে?"

৩

এমন সময় সূর্য্য উঠ্‌ল। পূর্ব্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে দেবদারুর শিশির-ভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিলমিল করে' উঠ্‌ল।

হঠাৎ চারিটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়্‌ল। কি-জানি কি ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চাল-চলনে।—বড় মেয়ে-দুটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে' গেল। ছোট মেয়ে-দুটি হাসি চাপ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে, চাপ্‌তে পার্‌লে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে' খিলখিল ক'রে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরণাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে' চলে আর ভাবে—"আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি?"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল; একলা ঘরে বসে' চিঠিখানি খুলে পড়্‌লে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী,
আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে
পড়্‌চে কি ঝরি?
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি।
পূর্ণিমা-চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
(ঐ) দখিন বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙ্‌ল আগল
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৮শে ফাল্গুন, ১৩২৮।

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায়
একটি ধারে।
আমি শুন্‌ব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি
সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মত
উঠ্‌বে পূরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের
উঠ্‌[illegible]ারে সারে

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ফাল্গুন-পূর্ণিমা, ১৩২৮।

ভারতবর্ষের প্রভাব

এ্যাসিরিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ানরা যে অক্ষর ব্যবহার কর্‌ত, পাশ্চাত্যরা তার নাম রেখেছেন কিউনিফর্ম্ । পেরেকের মত মোটা আরম্ভ থেকে এর সব অক্ষর ক্রমে সরু হয়ে গেছে বলেই এই নাম। প্রাচীনকালে দুরকম অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—এক-রকম ভাবের চিত্র, অন্যটা শব্দ-বিশেষ প্রকাশ করে। কিন্তু হিতাইত্‌দের যে-সব লেখা পাওয়া যাচ্ছে—এই দুই-রকমের সম্মিলন থেকে তারা হয়েছে।

এ্যাসিরিয়া-রাজাদের কোষাগারের দপ্তরের মধ্যে প্রাপ্ত নানা বিদেশের নাম এবং সেই-সব ভাষার শব্দের মধ্যে একটি কথা হচ্ছে দান্‌তে (বহুবচনের রূপ), তার মানে দান করা। তেমনি সংখ্যাবাচক শব্দও পাওয়া গেছে এক, তিন, পাঁচ, প্রভৃতি।

হিতাইত্‌দের অনেক কথা যে আর্য্য-ভাষা থেকে পাওয়া তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে তাঁরা আর্য্য ছিলেন। এসিয়া-মাইনর তৎকালের সভ্যজাতিদের মিলনের ক্ষেত্র ছিল। এখানে যেমন সংস্কৃত দেবতার নাম পাওয়া গেছে, তেমনি গ্রীক প্রভৃতি আর্য্য-ভাষার সঙ্গেও তাদের অনেক কথার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

তা হলে বলতে হবে, আর্য্য-সভ্যতার দুই প্রবাহ,—এক ধারা পূর্ব্বে, অন্য ধারা পশ্চিমে যাবার সময়, এ্যাসিরিয়া ব্যাবিলন ককেশস্ প্রভৃতি যে-সব দেশ দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাদের যোগ হয়েছে। কিছু তারা নিয়েছে, কিছু দিয়েছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ শতাব্দীতে এসিয়া-মাইনরে প্রাচীন জাতিদের সঙ্গে এই দুই ধারার যে ঘনিষ্ঠ যোগ হয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নেই।

ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি যে খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে প্রবেশ করেছিলেন, তা মনে করার মত প্রমাণ নেই।

খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী মানব-ইতিহাসের একটি আশ্চর্য্য সময়। হঠাৎ সে সময়ে আর্য্য-জাতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ফুলের মত ফুটে উঠে তার সভ্যতা চারিদিকে তখন ছড়িয়ে পড়্‌ছে, তার একটি পরিণতির বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকেরা আইয়োনিয়াতে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। আর্য্য-জাতির এক শাখা,—ইট্রুস্‌কিয়রা, রোমে গিয়ে বাস করছে। গ্রীক অক্ষরে এই সময়ে লেখা ১৫০০ শ্লোক মমির মধ্যে পাওয়া গেছে। ইউ-ফ্রেটিসের ধারে ধারে আর্য্য-জাতির একটি বিপুল প্লাবন তখন পূর্ব্বদিকে গড়িয়ে চলেছে ; সমস্ত পৃথিবীতে অকস্মাৎ সভ্যতা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছড়িয়ে পড়্‌ল। ইতিহাসে এ একটা মস্ত ঘটনা।

মিতানি রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে বৈদিক যুগের একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। মানচিত্রে ইউফ্রেটিস নদীর বাঁকের মধ্যে এই জায়গাটি পার হয়ে সেকালে লোকে ইয়োরোপ থেকে এসিয়া-মাইনরে আস্‌ত। —সমুদ্র-পথে বেশীদূর কোথাও যাওয়া তখন সম্ভবপর হয় নি—ডাঙাপথে ক্রমে ক্রমে আর্ম্মিনিয়া মিতানি .হয়ে পারস্য-উপসাগরে আস্‌বার সহজ পথ মিতানির ভিতর দিয়ে ছিল—ক্রমে সেখান থেকে বোলান পাস্ পার হয়ে ভারতবর্ষে আসা যেত। ২২০ খৃষ্টাব্দে যে বংশ চীনদেশে রাজত্ব করতেন তাঁদের কথা-প্রসঙ্গে রোমক সাম্রাজ্যের পথের বর্ণনা আছে—মরুভূমি পার হয়ে এই পথ মিতানির ভিতর দিয়ে গেছে। এই [illegible] সকলের মিলন-কেন্দ্রের মত ছিল। পশ্চিম-পূর্ব্বের এই চৌ[illegible] বৈদিক ভারতীয়দের আগমনের প্রবাহ-পথ নিঃসন্দেহ এক[illegible]ল। এ্যাসিরিয়রা ভারতীয় আর্য্যদের কাছে কিছু পেয়ে থাক্‌লে এখানেই তা পাবার সম্ভাবনা ছিল। আরও অনেক প্রাচীন যাত্রীদের সঙ্গে এঁদের মিলন হয়ে থাক্‌বে। বৈদিক ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সংস্পর্শেই এই রকম ক'রে এসেছিল এবং নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে তাদের আদান-প্রদান হয়ে থাক্‌বে। এ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ভারতবর্ষ কি করে এসে-ছিল, এই আলোচনা থেকে কতকটা আমরা বুঝ্‌তে পারি।

খৃঃ পূঃ ৭৮০ অব্দে ভারতবর্ষ ও ব্যাবিলনের মধ্যে বাণিজ্যের যোগ ছিল।

ঋগ্বেদে ৮ম মণ্ডলে ৭৮ সূক্তে ২য় মন্ত্রে "মনহিরণ্য" শব্দ পাওয়া যায়। এখন "মন" শব্দটি সংস্কৃত ব'লে মনে করলে, এর কোন মানেই হয় না। এটি মূলে আসিরীয় শব্দ, একে এখানে এ্যাসীরীয়-ভাবে 'পরিমাণ' অর্থে ধরতে হবে। এ রকম দৃষ্টান্ত নানাদিকে আছে। ভারতীয়রা যেমন বিদেশীয়দের দান করেছে, তেমনি গ্রহণ করতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না।

শতপথ-ব্রাহ্মণে যে জলপ্লাবনের কাহিনী আছে সেটি আসিরীয় প্রলয়-প্লাবনের অনুকরণ ব'লে মনে হয়। কারণ যদিও আসিরীয় সাহিত্যে এ কাহিনী নানারূপে দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্যে একবার মাত্র একে দেখ্‌তে পাই। এই-রকমে দুই দেশের সভ্যতার আদান-প্রদানের ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে আসে।

পারস্যের সঙ্গে ভারতের যে যোগ তার আরম্ভ হচ্ছে সাইরাসের সময় থেকে (৫৪৯-৬২৯ খৃঃ পূঃ)। তিনি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কপিশ (Kapissa) বলে এক নগর অধিকার করে' ধ্বংস করেন। এর উল্লেখ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই।

তার পর ভারতীয়রা পারসিকদের সংস্পর্শে আসে দারিয়াসের সময়ে। ব্যাবিলন জয় করে' তিনি Archosia অধিকার করেন। এটিকে অনেকে সরস্বতী ব'লে থাকেন। তাঁর বড় কাজ হচ্ছে—সিন্ধুনদী আবিষ্কার করবার জন্যে একটি অভিযান পাঠান। সে অভিযানের নায়ক ছিলেন—Seylex ব'লে এক গ্রীক।

দারিয়াসের অনেক অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেকে মনে করেন তারই অনুকরণে অশোক তাঁর লিপি বার করেন। তবে দারিয়াস কেবল রাজাদের কথাই বলেছেন, অশোক ন্যায়-ধর্ম্মের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর অনুশাসনে আমরা গান্ধার ও হিন্দুকুশের উল্লেখ পাই।

বভেরু-জাতক থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে ভারত থেকে কতকগুলি বণিক প্রথমে কাক ও পরে ময়ূর বিক্রয় করতে বভেরু-রাষ্ট্রে যায়।

বভেরু অর্থে ব্যাবিলনকেই বোঝায়। জাতকের লেখক এশব্দটি বোধ হয় পারসিকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কারণ পারসিক ভাষার "ল" স্থানে "র" হয়।

অনুমান ৪৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীসে ময়ূরের কথা শোনা যায়। সে সময় Pericles-এর এক বন্ধুই প্রথম ময়ূর গ্রীসে আমদানী করেন —সম্ভবত পারস্য থেকেই। প্রাচীন আসিরীয় সাহিত্যে ময়ূরের কোথাও উল্লেখ নেই। সীসীয়োর সময়ে (খৃঃ পূঃ) কেবল ধনী গ্রীকরা ময়ূরের মাংস আহার করতে পারুত। অশোকের সময়েও ভারতে ময়ূরের মাংস আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হত। মনে হয় পারস্য থেকেই ক্রমশঃ ময়ূর গ্রীসে প্রচলিত হয়েছে।

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি

মাটির গান

ফিরে চল্ মাটির টানে ;
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে।
যার বুক কেটে এই প্রাণ উঠেচে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেচে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে।
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে
কোল রয়েচে পাতা,
জন্মমরণ ওরি হাতের
অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা
সাগর পানে আত্মহারা রে,
প্রাণের বাণী বয়ে আনে॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৮

—

মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র

জগতে পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা মহত্তম বলিয়া বিদিত, তাঁহারা পারিবারিক কোন-না-কোন সম্বন্ধে আদর্শস্থানীয় ছিলেন বলিয়াই মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির ক্ষেত্র পরিবারের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়াছিল।

পুরুষজাতীয় মানুষেরা প্রধানতঃ পিতা, পুত্র, পতি, বা ভ্রাতা রূপে বিচারিত হন না, মানুষ বলিয়াই বিচারিত হন। তাঁহারা পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্য করিয়াই জনসমাজের দাবী হইতে নিষ্কৃতি পান না। মানুষেরা তাঁহাদের নিকট হইতে আরও কিছু চায়। তাঁহারা বিশ্বনিয়ন্তা ও বিশ্ব-নিয়মকে কি পরিমাণে জানিয়া পরব্রহ্মের সহিত কি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, নিজেদের ও অপরের আত্মার কি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, দেশকে জাতিকে জগৎকে তাঁহারা কি দুঃখ-দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কাব্য চিত্র প্রভৃতি রচনা করিয়া তাঁহারা মানুষকে কি আনন্দ অনুপ্রাণনা ও শিক্ষা দিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা কি রহস্য উদ্ভেদ কি তত্ত্ব নিরূপণ কি সন্দেহের মীমাংসা করিয়াছেন, মানুষ তাহা জানিতে চায়।

আমরা আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য সভ্যতার জন্য কেবলমাত্র পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই ঋণী নহি ; সমুদয় সমাজ, সমুদয় জগৎ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের শিক্ষক ও আনন্দদাতা। সুতরাং আমরা সকলেই নরনারী-নির্ব্বিশেষে সমাজের, দেশের, জাতির ও জগতের ঋণ শোধ করিতে বাধ্য। ঈশ্বরদত্ত সমুদয় শক্তির সুব্যবহার করিলে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে এই ঋণ শোধ করিতে পারি।

পারিবারিক জীবনের বাহিরে নারীরও কীর্ত্তি আছে। তথাপি, নারীরা প্রধানতঃ তাঁহাদের পারিবারিক জীবন দ্বারাই বিচারিত হন। কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াও তাঁহারা মানবসমাজের জন্যও কিছু করিতে পারেন। অনেক নারী তাহা করিয়াছেন। পুরুষদের মত তাঁহারাও তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, সভ্যতা ও আনন্দের জন্য পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন জগতের নিকটেও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ঋণী ; এবং এই ঋণ শোধ করা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, ভগবান্ নারীদিগকেও আত্মা দিয়াছেন এবং নানা গুণ ও শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষ-সাধন ও এই-সকল গুণ ও শক্তির সদ্ব্যবহার করা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য। জগৎকে আনন্দ, অনুপ্রাণনা ও শিক্ষা দিবার জন্য, মানবের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের জন্য পুরুষেরা যত-রকম কাজ করেন, মহিলারাও তাহা করিতে পারেন, এবং তাহা করা তাঁহাদের উচিত।

নারীর মাতৃত্ব তাঁহার একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্ম্ম, ও স্বরূপ ; কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম্ম ও স্বরূপ নহে। পুরুষ যেমন আত্মা, নারীও তেমনি আত্মা। পুরুষ যেমন মানুষ, নারীও তেমনি মানুষ। আমরা নারীর নিকট অবশ্যই এই আশা করিব, যে, তিনি সুকন্যা, সুভগিনী, সুপত্নী ও সুমাতা হইবেন ; অবশ্যই এই আশা করিব, যে, তিনি নারীপ্রকৃতির সমুদয় সদ্‌গুণে ভূষিত হইবেন। কিন্তু এ আশাও করিব, যে, তিনি মহৎ মানুষ হইবেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হইবেন, সেই-সব গুণ ও শক্তির বিকাশ তাঁহাতে হইবে যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি, সেই-সব কাজ তিনি করিবেন যাহা লোক-শ্রেয়ঃ সাধনার্থ ও জগতের ঋণ পরিশোধার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে পারেন এবং উভয়েরই কর্ত্তব্য, সেই-সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহার হইবে যাহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হয় ও হইতে পারে, কেন-না উভয়েরই জীবাত্মা এবং উভয়ের সহিতই পরমাত্মার একই প্রকার সম্বন্ধ।

পরিবারের মধ্যে সুমাতৃত্ব চাই, পরিবারের বাহিরে সুমাতৃত্ব চাই। শিশুর কল্যাণের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করার নাম সুমাতৃত্ব। আমরা যদি নিজের ঘর বাড়ী খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি, কিন্তু পাড়া গ্রাম নগর দেশ মহাদেশ অস্বাস্থ্যকর বা মহামারীগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে রোগের বীজ আমাদের বাড়ীতেও আসিতে পারে। সুমাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র গৃহস্থালীর বাহিরেও বিস্তৃত না হইলে গৃহস্থালীর মধ্যে উহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহা যে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে। হৃদয়-মনের পক্ষেও ইহা সত্য।

শিশুর সমুদয় মানসিক পরিবেষ্টন তাহার জ্ঞান ও সুগুণলাভের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। এই দিকে দৃষ্টি রাখা ও তাহার ব্যবস্থা করা সুমাতৃত্বের কাজ।

সবাই সুখী না হইলে কেহ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না, সকলে জ্ঞানী না হইলে কেহই মূর্খতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইতে পারে না, সকলে নীরোগ না থাকিলে কেহই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে পারে না, সকলে যথেষ্ট ভোজনে পুষ্ট না হইলে অতি-ধনীও দারিদ্র্যজনিত সংক্রামক রোগের কবলে পড়িতে পারে, সকলে নীতিমান্ সচ্চরিত্র এবং চিন্তা ভাব কল্পনা কথা কাজ ও ভঙ্গীতে শুচি না হইলে সাধু ব্যক্তিদেরও শুচিতা ম্লান হইয়া যায়। এই-সব কথা প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদের জীবনে অধিকতর সত্য। এইজন্য সন্তানের জননীরা কেবল নিজের শিশুগুলির দেহ মন আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদিগকে নিজের গৃহস্থালীতে মা হইতে ত হইবেই, পাড়ার সমাজের জাতির দেশের জগতের সুমাতৃত্বের কাজ তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া করিতে হইবে।

এই ব্যাপক, ব্যাপকতর ও ব্যাপকতম মাতৃত্ব [illegible]বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা এবং সাধনা সাপেক্ষ।

মাতৃত্বের ব্যাপকক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে মাতৃজাতীয়াদিগকে দলবদ্ধ হইতে হয়। পৃথিবীর নানা দেশের মহিলা সভ্য লইয়া

অনেকগুলি মহিলা-সমিতি আছে। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সুরাপান দূর করা এইরূপ একটি সমিতির উদ্দেশ্য।

জননীরা নিজের নিজের শিশুদের শরীর মন আত্মার পুষ্টি স্বাস্থ্য পবিত্রতা ও আনন্দ বিধানের জন্ত যাহা যাহা চান, হাতের কাছের আরও যতগুলি সম্ভব শিশুর জন্ত তাহার আয়োজন করিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ করিলে মাতৃত্বের আলোক জীবন-পথ আলোকিত করিবে। সেই আলোকে চলিতে চলিতে মাতৃত্ব-শক্তি বাড়িবে। তাহাতে নিজের এবং অন্তের শিশুদের মঙ্গল হইবে।

মাতৃত্ব কেবল যে শিশুদের জন্য তাহা নহে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্তও বটে। যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ তাপ মলিনতা, মায়ের মঙ্গল-হস্ত সেখানেই কাজ করিবে।

আপনা ভুলিয়া প্রীতি-দয়া-সেবা দিয়া অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি উপেক্ষিতকেও রক্ষা করা মাতৃহৃদয়ের কার্য্য। এই মাতৃহৃদয়ের কাজ গৃহে ও গৃহের বাহিরে রহিয়াছে। মাতৃ-জাতীয়ারা যাহাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, কেবল যে তাহাদেরই মাতৃত্ব করিতে পারেন, তাহা নহে; অপরেরও পারেন। আবার যাঁহারা দৈহিক অর্থে মাতা হন নাই, তাঁহারাও বহু শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের কারণ হইয়া প্রকৃত মাতৃপদবাচ্য হইতে পারেন।

(নব্যভারত, বৈশাখ) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নিরঞ্জনের সেবা

আবহমান কাল হইতে আমাদের এতদঞ্চলের যোগিসমাজে নিরঞ্জনের সেবা বা নিরঞ্জনের প্রসাদ দিবার রীতি প্রচলিত আছে, ইহার আর-একটি নাম ঠাকুর-সেবা বা ঠাকুর-প্রসাদ। শিবপূজা কি অন্যান্য যাবতীয় দেবতার পূজার সঙ্গেও নিরঞ্জনের সেবা দেওয়া যায়। এই নিরঞ্জনের সেবাতে অনেকগুলি জাতীয়-ইতিবৃত্ত-মূলক মূল্যবান গ্রন্থ (জাতীয় সাহিত্য) আওড়াইতে হয়, ইহার সাধারণ নাম রয়রাস বা যোগি-ঘরের কথা।

নিরঞ্জনের পূজাতে নিরঞ্জন দেবতার ধ্যান—

"সর্ব্বত্রপাণিপাদান্ত সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরঃ-মুখঃ।
সর্ব্বত্র শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বম্ লেলাবৃতম্ তিষ্ঠতি।"

মূলমন্ত্র প্রণব (ওঁ)।

হরিনারায়ণ নামক (সূক্ষ্ম) চাউলের গুঁড়া /২ সের, এক পোয়া (লাসাযুক্ত) বিরইন চাউলের গুঁড়া, লবঙ্গ ৯ তোলা, গোল মরিচ ৯ তোলা, জায়ফল ২টি, কর্পূর দুই চাকা, পৃথক পৃথক ভাজিয়া কুটিয়া একত্র করিয়া /২।০ সের নরম গুড় কিছু পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া, উপরোক্ত সূক্ষ্ম ছাতু-সমূহ এই জল দ্বারা মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া দিলেই প্রসাদ তৈয়ার হয়। অন্যান্য নানা প্রকার প্রসাদের সঙ্গে এই প্রসাদটি অবশ্যই দেয়।

পূজাতে কর্ম্মকর্ত্তা কোন-কিছুতে এই প্রসাদটি লইয়া মস্তকের উপর রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর রয়রাস বলিতে আরম্ভ করা হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্টবোধ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। পরে এবম্প্রকারে থাকিতে যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া দাঁড়ায় তখন সম্মুখে প্রসাদের ডালাটি রক্ষা করিয়া গলবস্ত্রে করজোড় হইয়া বসিয়া থাকা যায়।

পূর্ব্বকালে রয়রাসের গ্রন্থ-সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রয়রাস বলার প্রথাও কমিয়া যাওয়ায় জাতীয় সাহিত্যগুলিও লোপ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে রয়রাস বলিতে প্রাচীন যোগসার, কুলাঞ্জি পটল, সিদ্ধার আলাবা, ব্রহ্মবুধ, যোগান্ত, আগমসার নামক গ্রন্থ-সমূহের কতক-অংশ বলা হয় মাত্র।

প্রাচীনকালে প্রায় সকল স্বজাতিকেই রয়রাস শিক্ষা করিতে হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে দুই-চারিজন গৃহী ব্যতীত আমাদের সন্ন্যাসীগণ (যোগী সন্ন্যাসী) ও গুরু-পুরোহিতগণের মধ্যেই উহা শিক্ষা করিয়া বলার প্রথা প্রচলিত আছে। উহা গ্রন্থ-আকারে লিখিয়া রাখা বা শিক্ষা করা নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস থাকায়, আমাদের গুরু-পুরোহিত ও সন্ন্যাসীগণ মুখে মুখে শিক্ষা-লাভ করিতেন। তাঁহাদের ইহা শিক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন ছিল। আমাদের কাছাড়ের যোগীদের গুরু-পুরোহিতগণ স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত।

বহুকাল অবধি আমাদের মধ্যে শিক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বশতঃ তত্ত্বমূলক বচন-সমূহ অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক হিন্দি কথারও সমাবেশ আছে। হিন্দি বচনের অর্থও যথাযথ বুঝিতে না পারায় তাহাও অনেকাংশে বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

নীলকণ্ঠ-নির্ব্বাণ-তন্ত্র, আগমসার-তন্ত্র, নির্ব্বাণ-তন্ত্র, যোগান্ত নামক গ্রন্থ বড় মূল্যবান ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কালে কাছাড়ীয় যোগিসমাজের মধ্যে পূর্ব্ব-পুরুষের সংসৃষ্ট অনেকগুলি বৈরাগ্য- ও তত্ত্ব-মূলক গান ও প্রবাদ-বচন ছিল। তাহাও বর্ত্তমানে লোপ হইয়া গিয়াছে।

পুণ্যনাথের রচিত অর্জ্জুনগীতা। দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সমাজে উক্ত গ্রন্থখানির বহুল বিস্তার ছিল।

যোগসিদ্ধ মাটীর তলের বাবা, ফাল্গুনী বুড়ো, বাঁশী বাজাওয়া বাবা, কার্ত্তিক নাথ, আগুন-খাওয়া বাবা, পেদল বুড়ো, শ্রীনাথ, গুরু মহারাজ বাবা প্রভৃতি সিদ্ধগণ উক্ত যোগসাহিত্যরূপ বৃক্ষেরই পক্ক ফল।

কেহ কেহ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করেন। শ্লোকগুলি কোন্ গ্রন্থের জিজ্ঞাসা করিলে খট্বাঙ্গ-পুরাণের শ্লোক বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হস্ত-লিখিত খট্বাঙ্গ-পুরাণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। শ্লোকগুলি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের শ্লেষব্যঞ্জক। একটি শ্লোকের অর্থ এইরূপ—

কলিকালে তিন দেবতা প্রধান, এক তুলসী, দ্বিতীয় গো, তৃতীয় ব্রাহ্মণ। তুলসীর পত্র, জল, মৃত্তিকা, ব্যবহারে লাগে। গরুরও চোনা গোবরাদি পঞ্চগব্য ব্যবহারে লাগে। কিন্তু ব্রাহ্মণ এমনই যে তাহার কোন-কিছু কাজে লাগে না।

পূর্ব্বকালে নাথ-যোগিগণ সকলেই যে যোগাভ্যাসাদি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যে সিদ্ধতত্ত্বের বহুল আলোচনা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যোগাভ্যাসাদি সাধন দ্বারা অন্তরস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে সাধক অনাহত ধ্বনি, ওঙ্কার-ধ্বনি বা একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ শুনিতে পান। 'আচাভুয়া' বাণীকেই শবদ, শব্দ, হুঙ্ক, নাদ প্রভৃতি শাব্দিক অর্থসম্পন্ন বাক্যে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারাই বুঝা যায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শঙ্খিনীর জালে মহারস বন্দী করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতেন।

(যোগিসখা, বৈশাখ) শ্রী পুষ্করচন্দ্র নাথজী

বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদ

এ হরি জনি (১) করহ মোহে রোখ (২)।
আজু মেরি বিলম্বন দৈবকি দোখ (৩)।
তেজি নিজ মন্দির পদ দুই চারি।
ঘন মেহ (৪) বরিখয়ে (৫) মহি ভরি বারি॥
এক গুণ তিমির লাখ গুণ ভেল (৬)।
দিগবিদিগ ভানু বহি গেল (৭)॥
পথ পিছুরই (৮) অভি গরুর (৯) নিতম্ব।
খসেত কবরি না কছু অবলম্ব॥
খনে দরশাই বিজরি করেহ (১০)।
উঠয়ে গাহিয়ে জলধারয় (১১) সেহ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি সুরবর নারী।
ধনীকে দোখবি হৃদয় বিচারি॥

(বিদ্যুৎ, বৈশাখ) শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ রায়

১ জনি (জানিয়া) ২ রোখ (রোষ) ৩ দোখ (দোষ) ৪ মেহ মেঘ) ৫ বরিখয়ে (বরিষয়ে) ৬ ভেল (হইল) ৭ বহি গেল (চলিয়া গেল) ৮ পিছুরই (পিচ্ছল) ৯ গরুর (গড়াগড়ি) ১০ বিজরি করেহ (বিদ্যুৎরেখা) ১১ জলধারয় (মেঘ)।

শ্রীশ্রী৺গন্ধেশ্বরী দেবী

প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রত্যেক গন্ধবণিকের গৃহে শ্রীশ্রী৺গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

এই গন্ধেশ্বরী দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গা। চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে ইনি গন্ধেশ্বরী দেবী রূপে আবির্ভূতা হইয়া গন্ধাসুরকে বধ করেন। সেই কারণে ইঁহার নাম গন্ধেশ্বরী হয়।

সুভূতির ঔরসে ও তপতী-নাম্নী রাক্ষসীর গর্ভে গন্ধাসুর মহাদেবের বরে ত্রিভুবনবিজয়ী ও মহাবলশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুভূতি বৈশ্যকন্যা সুরূপাকে হরণ করিতে গিয়া বৈশ্যগণ কর্ত্তৃক অপমানিত তিরস্কৃত ও হৃতসর্ব্বস্ব হয়। পিতার সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য গন্ধাসুর বৈশ্যবংশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার অনুচরগণ একদিন সুবর্ণবট নামক এক বৈশ্যকে বধ করিলে, তাহার পূর্ণগর্ভা পত্নী চন্দ্রাবতী গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি অরণ্য-মধ্যে একটি কন্যা প্রসব করিয়া গতাসু হন। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কশ্যপ ধ্যানযোগে চন্দ্রাবতীর গর্ভে দেবী বসুন্ধরার অংশাবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অবগত হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। গুণজ্ঞ মহর্ষি সেই দিব্য সৌরভময়ী কন্যার গন্ধবতী নাম রাখিলেন।

"যৌবনোন্মুখী গন্ধবতী পিতার নিধন ও অরণ্য-মধ্যে মাতার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ অসুরগণের বিনাশকামনায় মহামায়ার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।"

গন্ধাসুর গন্ধবতীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা জানিয়া গন্ধবতীকে লাভ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইল। কিন্তু অসুরের চাটুবাদ বা ভীতিপ্রদর্শনে সেই তপোনিমগ্না গন্ধবতীর ধ্যানভঙ্গ হইল না। তখন ক্রুদ্ধ অসুর সবলে গন্ধবতীর কেশাকর্ষণ করিল, কিন্তু অসুরতেজ পরাভূত হইল, গন্ধাসুর সেই তপঃকৃশা পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে যোগাসন হইতে বিচলিত করিতে পারিল না।

"গন্ধবতী বিচলিত হইলেন না বটে, কিন্তু তদীয় হোমকুণ্ডস্থ বহ্নিরাশি বিচলিত হইল। সহসা সেই বিচলিত বহ্নিরাশি হইতে এক দিব্য তেজ সমুত্থিত হইয়া সমস্ত তপোবনকে দুর্নিরীক্ষ্য প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসিত করিল। অসুরপতি বিস্মিত ভীত ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া সভয়ে কেশমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎবেগে সুদূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইল: অত্যুৎকট জ্যোতির প্রভাবে সসৈন্যে অসুররাজ ক্ষণকালের জন্য অন্ধীভূত হইলেন। অনন্তর দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে দেখিলেন বিদ্যুৎ-তুল্য প্রভাময়ী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা এক নারীমূর্ত্তি হোমকুণ্ড-সমীপে গন্ধবতীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আর গন্ধবতী স্বকীয় গলদেশে উত্তরীয়-বল্কল অর্পণ করিয়া আনতনয়নে সেই দেবদুর্লভ শ্রীপাদপদ্মের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিতেছেন।"

অসুর তৎক্ষণাৎ দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর দেবী শূলাঘাতে অসুরের প্রাণ বিনাশ করিলেন ও তাহার প্রকাণ্ড দেহ সমুদ্র-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় সেই দেহ গন্ধদ্রব্যের আকর-ভূমি গন্ধদ্বীপরূপে পরিণত হইল।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবীর যথাবিধি পূজা করিলেন। গন্ধাসুর-নাশিনী গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে ভগবতী গন্ধেশ্বরী-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া গন্ধাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই হেতু গন্ধবণিকগণ অদ্যাপি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে গন্ধেশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন।—"মহানন্দীশ্বর পুরাণ"।

গন্ধেশ্বরী দেবীর আর-একটি উপাখ্যান আছে, তাহা ভবপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে গন্ধবতীর কোনও উল্লেখ নাই এবং গন্ধাসুরের বধের কারণও অন্যরূপ বর্ণিত আছে। সেই উপাখ্যানভাগ এইরূপ:—"গন্ধাসুর নারদের মুখে দেবীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হয় এবং তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভের আশা দুরাশা ভাবিয়া আশুতোষের কৃপাপ্রার্থী হইয়া কঠোর তপস্যা করে। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, গন্ধাসুর শিবস্বারূপ্য-বর প্রার্থনা করে। আশুতোষ অসুর-রাজের অভিলষিত বরই অর্পণ করিলেন। অসুর বরপ্রাপ্তিমাত্র রজতগিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংশ দিব্য শৈব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কিন্তু প্রকৃতিতে সেই অসুর-ভাবই অক্ষুণ্ণ রহিল। তখন অসুর মহাদেবের পরোক্ষে কৈলাসে গমন পূর্ব্বক দাক্ষায়ণীকে প্রার্থনা করিল। দেবী অসুরের দুরাশা দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া যুদ্ধে তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় গন্ধাসুরের দেহ গন্ধমাদন পর্ব্বতরূপে পরিণত হইল। দানবের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধদ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর দেবগণ কর্ত্তৃক দেবী পূজিত হইয়া গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন।"

তারকাসুরের বধের নিমিত্ত হরগৌরীর বিবাহের প্রয়োজন হইলে, তারকাসুর মায়াবলে সমস্ত গন্ধ-দ্রব্য অপহরণ করে। ভগবান্ শিব—দেশদাস, শঙ্খভূতি, ও বিষটগুপ্ত এই গন্ধবণিক্ সহোদর ভ্রাতাদিগকে গন্ধদ্রব্য-সংগ্রহের জন্য আদেশ করেন। সত্রীশ আশ্রমের আদিপুরুষ বিষটগুপ্ত পরম শিবভক্ত ছিলেন। নারদের উপদেশে তিনি ভগবতী গন্ধেশ্বরীর পূজা করিলে, দেবী তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দেন ও অপহৃত গন্ধদ্রব্যগুলি দেখাইয়া দেন। বিষটগুপ্ত দেবী গন্ধেশ্বরীর দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার স্তোত্র করেন।

(গন্ধবণিক, বৈশাখ)

কলিকাতার কথা

সেকালে কলিকাতা সোনার লঙ্কা হইয়াছিল। যে লঙ্কায় আসিত সেই রাবণ হইত। সেকালে বিলাতের রাজা, রাণী, ও সভ্যগণ কলিকাতার গবর্ণর-জেনারেলের উপর চিঠি দিয়া উমেদারগণকে পাঠাইয়া দিতেন। লর্ড ক্লাইবকে ঐরূপ একজন উমেদারকে এক লাখ টাকা দিয়া বিদায় করিতে হইয়াছিল। ইহা লর্ড মেকলে ইণ্ডিয়া বিলের বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্‌কেও তাহা করিতে হইত, না করিলেই সর্ব্বনাশ।

কর্ণওয়ালিস উমেদারের দলের বিলাত হইতে কলিকাতায় আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারীদের নজর লওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। ক্লাইব্‌ ও ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের আমল হইতে যে-সকল কুপ্রথা অবাধে চলিয়াছিল তাহা একে একে বন্ধ হইয়াছিল।

সুন্দরবন পরিষ্কার, ব্যবসার সুবিধার জন্য খাল কাটিয়া ভৈরব ও কপোতাক্ষী নদী এক করিবার হুকুম টীলম্যান্‌ হেঙ্কেলকে দেওয়া হইয়াছিল।

কর্ণওয়ালিসের জন্য কলিকাতায় চাঁদা তুলিয়া প্রথম স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি বিলাত হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিলে উহা খোলা জায়গায় রাখিলে খারাপ হইয়া যাইবে বলিয়া ঐরূপ স্মৃতি-সকল বজায় রাখিবার জন্য টাউন-হল প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল ও লটারী করিয়া কর্ণেল জে টন্‌ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাহা শেষ করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস্‌ দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য নৌকা ও ঘোড়ায় করিয়া যখন যেখানে দরকার হইত যাইতেন। তিনি নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতেন ও সংস্কারের দিকে তাঁহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি স্বদেশী সৈন্যের নিন্দা করিয়া এ-দেশী সীপাইদের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এবং সেই-জন্যই ৬ই মে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গয়াদি-তীর্থযাত্রী হিন্দু সীপাহী-দের নিকট কর আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি কলিকাতার সন্নিকট দক্ষিণেশ্বরে অনাথ বালক-বালিকাদের থাকিবার জায়গা দিবার হুকুম দিয়াছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণের সহিত চূড়ামণি দত্তের বেশ দলাদলি ছিল। ঐ চূড়ামণি দত্তের পুত্র কালিপ্রসাদ দত্তের নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধের সময় শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদি যাহাতে উপস্থিত না হয় তাহার জন্য এই কথা রটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কালীবাবু মুসলমান বাইওয়ালী রাখিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান দত্ত মহাশয় ব্রাহ্মণ বিদায়ের পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন।

সেকালের লোকেরা রসিকতা ও স্পষ্ট কথার খুব আদর করিত।

১৭৮০ খৃঃ হইতে কলিকাতায় ঘোড়দৌড়ের উল্লেখ দেখা যায়। উহা তখন সকালে হইত ও লোকে খড়ের উপর কার্পেট পাতিয়া বসিয়া দেখিত, তিন চারি ঘণ্টায় উহা শেষ হইয়া যাইত। লর্ড ওয়েলেস্‌লি বর্ত্তমান লাট সাহেবের বাড়ীর ভিত্ত-পত্তন মহাসমারোহে ১৭৯৯ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী করিয়াছিলেন। উহার জমি খরিদ করিতে আশী হাজার টাকা ও বাড়ী তৈয়ারি করিতে তের লক্ষ টাকা ও উহা সাজাইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগিয়াছিল। বিলাতের কেড্‌ল্‌-ষ্টোন্‌ হলের নক্সায় উহা তৈয়ারি করা হইয়াছিল। ৪ঠা মে ১৮০২ খৃঃ শ্রীরঙ্গপত্তনের বিজয়োৎসব ও ঐ নূতন বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ একত্রে মহাসমারোহে হইয়াছিল। কলিকাতার গণ্যমান্য সকল অধিবাসিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

রাজা রাজবল্লভের বিধবা পত্নী আপনার দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া কোম্পানির নিকট পেন্সন চাহিয়াছিলেন। রাজা রাজবল্লভ সিরাজের যুদ্ধ-বিভাগের প্রধান দেওয়ান ছিলেন ও ইঁহারই পরামর্শে সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়াছিলেন ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই-সকল দাবীর কথাও নাকি তাঁহার পত্নী দরখাস্তে লিখিয়াছিলেন। ইহাতেই সেকালের বাঙালী জাতির কতদূর অধঃপতন হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।

কলিকাতায় কলুটোলায় রামজয় দত্তের স্কুলে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামকমল সেন ইংরেজি শিখিতেন। তাহাই বোধ হয় বাঙালীর প্রথম বিদ্যালয় ছিল।

(সুবর্ণবণিক-সমাচার, ৬।৫) শ্রী প্রমথনাথ মল্লিক

—

সাঁওতাল পুরাণ

সাঁওতালদিগেরও একটা পুরাণ আছে। তাহাদের এই অলিখিত পুরাণশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা ধারা আছে এবং তাহাদের সভ্যতা ও চিন্তা-প্রণালীর অনুরূপ নানা প্রাচীন কাহিনী আছে।

সৃষ্টিকাণ্ড

অতি প্রাচীনকালে ঠাকুর-বাবা (বাবা যেমন একটা সংসারের স্বামী বা গৃহস্বামী তেমনি ঠাকুর-বাবা এই বিশ্বসংসারের স্বামী বা কর্ত্তা ; বিমানবিহারী সূর্য্যদেবই সাঁওতালদের ঠাকুর বাবা) মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সুবিধা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য নানা প্রকার বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ নিজের দোষে ঠাকুর-বাবাকে চটাইয়া সেই-সমস্ত সুবিধা হারাইয়াছে।

তখন সাঁওতালেরা চম্পারাজ্যে কিস্কু-রাজাদিগের অধীনে পরম সুখে বাস করিত।

সাঁওতালদিগের মধ্যে পৌরাণিক যুগে দ্বাদশ শ্রেণী বা বর্ণ ছিল। স্বশ্রেণীতে ইহাদের বিবাহ হইত না। 'কিস্কু' ইহাদের অন্যতম ; কিস্কুগণই পৌরাণিক যুগে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজত্ব আমাদের 'রাম-রাজত্বের' ন্যায় সর্ব্ব সুখের হেতুভূত ছিল। ধান-গাছে একেবারে তুষবিহীন চাউল ধরিত ; কাপাস গাছে একেবারে সাঁওতালদিগের পরিধানোপযোগী বস্ত্র কার্পাস-বৃক্ষের ফল-স্বরূপে জন্মাইত ; মাথার উকুন তুলিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক হইত না, কারণ মাথার খুলি তখন জোড়া ছিল না, আবশ্যকমত খুলিয়া লইয়া পরিষ্কার করিয়া পুনরায় পাগ্‌ড়ীর ন্যায় মাথায় বসাইয়া দিলেই চলিত।

সাঁওতালদিগের এই পৌরাণিক সুখসম্ভারের অন্তরায় হইয়াছিল একটি হীন-স্বভাবা দাসীর অপবিত্র আচার।

প্রাচীনকালে আকাশ পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিত এবং ঠাকুর-বাবা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া সাঁওতালদিগের ঘর-বাড়ী দেখিয়া যাইতেন। ঠাকুর-বাবা সাধারণতঃ রাত্রিকালেই পৃথিবী পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি যদি কোনও গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন দেখিতে পান, তাহা হইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। ফলে অভিশাপ ও অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। একদিন এক রমণী রাত্রিকালে আহারের পর উচ্ছিষ্ট শাল-পত্র-সমূহ ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল। বাতাসে উড়িয়া সেই পাতা আকাশে চলিয়া যায়। তাহাতে ঠাকুর-বাবা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে আকাশটাকে বহুদূরে সরাইয়া

দিয়াছেন ; কারণ মানুষের এত অপবিত্র ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

সাঁওতালদিগের ঠাকুর-বাবা হইতেছেন 'সিং চন্দো' বা সূর্য্যদেব ; এবং 'নিন্দ্ চন্দো' বা চন্দ্রদেব তাঁহার পত্নী। সাঁওতালদিগের অপবিত্র ব্যবহারে ঠাকুর-বাবা বা 'সিং চন্দো' অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সাঁওতাল বা মনুষ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তারা বা নক্ষত্র 'সিং চন্দো' ও 'নিন্দ চন্দোর' পুত্র-কন্যা।

স্থির হইল 'পিলচু-হারাম' ও 'পিলচু-বুধি' নামে যুবক ও যুবতীকে বাদ দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির ধ্বংস হইবে। সুতরাং ঐ যুবক ও যুবতীর প্রতি সিংচন্দোর আদেশ হইল, "এই গহ্বরে প্রবেশ কর।" তাহারা ভয়-বিহ্বল চিত্তে গর্ত্তে প্রবেশ করিল। তাহার পর ঐ গহ্বর কাঁচা চামড়া দিয়া সিংচন্দো স্বয়ং ঢাকিয়া দিলেন।

তার পর ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ হইল। সূর্য্যের দাহিকা শক্তি অগ্নিরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি এই অগ্নিবর্ষণ চলিল।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রির অবসানে তাহারা গহ্বরের বাহিরে আসিল, সেই যে দুইজন মানুষ বাঁচিল—'পিলচু-হারাম' ও 'পিলচু বুধি'— তাহাদের দ্বাদশ পুত্র ও দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাহাদের দ্বারা ক্রমশঃ মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। তার পর সেই বারো জন হইতে ক্রমে খাদ্যের বিভিন্নতা অনুসারে সাঁওতালদিগের বারো জাতি হইয়াছে।

* * * *

একদিন 'চন্দো' বনে কাঠ কাটিতে গিয়াছেন। ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার পত্নী কতকগুলি মশা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য—মশার কামড়ে অস্থির হইয়া চন্দো গৃহে ফিরিবেন। কিন্তু 'চন্দো' কতকগুলি ডাঁস সৃষ্টি করিলেন, তাহারা মশা ধরিয়া খাইতে লাগিল। তখন নিন্দ চন্দো আরও অনেক জানোয়ার সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিংচন্দো তাহাদের মারিয়া ফেলিলেন। অবশেষে নিন্দ চন্দো একটি ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিংচন্দো কতকগুলি কাঠের কুচো ছুঁড়িয়া মারিলেন। কাঠের কুচোগুলি বৃকে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিল। ব্যাঘ্র পলাইল। সেই অবধি ব্যাঘ্র বৃককে ভয় করে।

চন্দো ঘরে ফিরিলে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার সৃষ্টির এত জীবজন্তুকে খাইতে দেয় কে?"

চন্দো বলিলেন, "আমি সকলকে খাইতে দিয়াছি।"

তাঁহার পত্নী একটি পতঙ্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেখাইলেন লোহার পাত্রের মধ্যে পতঙ্গ ঘাস খাইতেছে। চন্দো লজ্জিত হইলেন।

জন্মান্তরবাদ।

সাঁওতালেরা আত্মার দেহান্তর-পরিগ্রহ বিশ্বাস করে। ইহাদের ঠাকুর জল, স্থল, আকাশ, যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষাদি এক-কালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সংখ্যা কমেও না, বাড়েও না। যতদিনে দেহ-মধ্যে তাহারা বাড়িয়া পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঠাকুর তাহাও ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে মানুষের শরীরেও কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর আত্মা প্রবেশ করে আর কুকুর প্রভৃতির শরীরেও মানুষের আত্মা প্রবেশ করে। যদি কোনও মানুষের শরীরে মানুষের আত্মা থাকে, তবে তাহার আচার-ব্যবহার ভদ্রোচিত হইবে। বিড়াল-কুকুরের আত্মা পাইলে মানুষ কলহপ্রিয় হয়। ভেকের আত্মা পাইলে মানুষ নির্জ্জনতাপ্রিয় ও মুখ-চোরা হয়। বাঘের আত্মা হইলে মানুষ অত্যন্ত ক্রোধী হয়।

পরলোক।

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া মানুষকে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে হয়। 'চন্দো বোংগা' তাহাদিগকে অত্যন্ত খাটাইয়া লয়। সেখানে মেয়েরা এরণ্ড ফল খলে ভাঙ্গিয়া তৈল প্রস্তুত করে। বীজ হইতে চন্দো বোংগা মানুষ গড়ে। যে-সকল স্ত্রীলোকের ছেলে আছে, তাহারা ছেলেকে স্তন্যদান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। আর যে-সকল পুরুষ তামাক-পাতা চিবাইয়া খায়, তাহারা সেই কার্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এই কারণে সাঁওতালেরা তামাক-পাতা চিবাইয়া খাইতে শিখে। হুঁকায় তামাক পোড়াইয়া খাওয়ায় কোনও লাভ নাই। কারণ সেজন্য পরলোকে ছুটী পায় না। এখানে কেহ জল খাইতে পায় না। পুষ্করিণী বা সরোবরে যে-সকল ভেক প্রহরী আছে, তাহারা কাহাকেও জলে নামিতে দেয় না। এইজন্য সাঁওতালদের মৃত্যুকালে তাহাদের সঙ্গে জলপানের পাত্র দেওয়া হয়, কারণ পাত্র থাকিলে তাহাতে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া তাহারা খাইতে পারে। জীবিতকালে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে সাঁওতালেরা পরলোকে জল খাইবার সুবিধা পায়। পুণ্যের ফলে নহে, পাপের শাস্তিস্বরূপে। অশ্বত্থবৃক্ষের পত্র পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া জল কলুষিত করে বলিয়া বৃক্ষরোপণকারীকে জলে নামিয়া পাতা কুড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে তাহার জল খাইবার সুবিধা হয়।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ) শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—

পৌরাণিক ভূগোল

পার্জিটার সাহেব বলেন, মৎস্য বায়ু বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ তৃতীয় হইতে চতুর্থ খৃঃ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভবিষ্য পুরাণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও অধুনা লুপ্ত এক ভবিষ্যপুরাণ ছিল, তাহা হইতে বহু বিবরণ মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে গৃহীত হইয়াছে। এই পুরাণগুলির মধ্যে প্রথমে মৎস্য, তৎপরে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড এবং সর্ব্বশেষে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ রচিত হয়। এই মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রথমে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়, পরে তাহা সংস্কৃতে তরজমা করা হইয়াছিল। প্রায় সমস্ত পুরাণগুলিরই বক্তা সূত। পুরাণগুলিতে প্রথমে কেবল ক্ষত্রিয় রাজগণের প্রাচীন কাহিনী মাত্র ছিল, পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা ইহার মধ্যে নানা দার্শনিক তথ্য সম্বলিত কাহিনী সংযোজিত করেন। পুরাণগুলির রচনার স্থান মগধ।

সমস্ত পুরাণেই পৃথিবীকে ৭টি দ্বীপে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমে জম্বু দ্বীপ, তাহার চতুর্দ্দিকে তাহারই বিস্তৃতির অনুরূপ লবণ সমুদ্রের বিস্তৃতি ; তাহার চতুর্দ্দিকে প্লক্ষ দ্বীপ, প্লক্ষ দ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ। তাহার চতুর্দ্দিকে ইক্ষু সমুদ্র, তাহার চতুর্দ্দিকে শাল্মলী দ্বীপ। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সুরা, ঘৃত, দধি, ও ক্ষীর সমুদ্র ও মাঝে মাঝে কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর দ্বীপ। প্রায় প্রত্যেক দ্বীপে ৭টি করিয়া বর্ষ পর্ব্বত, ৭টি করিয়া নদী ও ৭টি করিয়া বর্ষ আছে। এই সাত সংখ্যাটি মঙ্গলকর সংখ্যা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ এই জম্বু দ্বীপের ৭টি (২৮।৩৪ অধ্যায়) বর্ষের অন্যতম বর্ষ। বেদে এক ভারতবংশের নাম পাওয়া যায়। ম্যাক্‌ডনেল ও কীথ সাহেবরা বলেন, যে-প্রদেশে ভারতবংশ রাজত্ব করিত পরে তাহাই কৌরবদের অধিকৃত হয়। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের পুত্রের নাম ভরত, আবার প্রিয়ব্রত যে সাত পুত্রকে সাত দ্বীপের অধিপতি করেন সেই সাত

পুত্রের মধ্যে অগ্নীধ্রের প্রপৌত্রের নাম ভরত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের এক মতে হিমাহ্ব নামক বর্ষ, ভরতের নামে ভারতবর্ষ নাম পাইয়াছে (৫৪।৩৩), আবার অন্য মতে প্রজাগণের ভরণ করেন বলিয়া মনু ভরতনামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ (১০।৪৮)।

ম্যাক্‌ডনেল ও কীথ সাহেবের মতে যখন কুরু-বংশীয়েরা ভারতরাজ্য অধিকার করেন, তখনও পাঞ্চাল, কোশল, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি রাজ্য পৃথক ছিল। সুতরাং বৈদিক যুগে হিমাহ্ব বর্ষ বা ভারতবর্ষ পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত ও সন্নিহিত কিয়দংশে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। জৈন হরিবংশ মতে জম্বুদ্বীপ ৭টি ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল, যথা, বিদেহ ক্ষেত্র, ভরত ক্ষেত্র, ধাতকী খণ্ড, পুষ্করার্দ্ধ ও ঐরাবত ক্ষেত্র। ভরত ক্ষেত্রে চম্পা, কৌশাম্বী, হস্তিনাপুর ও অযোধ্যা এই কয়টি পুরীর নাম আছে। সুতরাং বর্ত্তমান সমগ্র ভারতবর্ষ যে পূর্ব্বে ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইত না, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আলেক্‌জান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ-সময়ে বা মেগাস্থেনেসের পাটলীপুত্রে অবস্থান-কালে বা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষ নাম প্রচলিত থাকিলে "ইণ্ডিয়া" নাম প্রচলিত হইত না।

প্লক্ষ, শাল্মলী, জম্বু ও শাক বৃক্ষ হইতে দ্বীপগুলির নামকরণ হইয়াছে। তিব্বত দেশে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থলে ইহার নাম "চাম্পু"। "চাম্পু" অর্থে তিব্বতী ভাষায় বৃহৎ নদী। চাম্পু কথাটির চ প্রায় স এর উচ্চারণের কাছাকাছি। জম্বু বা চাম্পু কথাটির অর্থ বৃহৎ নদী। এই চাম্পু নদীতে পূর্ব্বে সামান্য খুঁড়িলেই সোনা পাওয়া যাইত, তাই এই সোনার নাম ছিল জাম্বুনদ।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের উত্তরাংশে দুইটি বৃহৎ নদ আছে, একটি সিন্ধু অপরটি ব্রহ্মপুত্র। দ্বীপ কথাটার মূল অর্থ দুইজলের মধ্যস্থ স্থান। দ্বীপ কথাটার আর এক রূপ দো-আব্। বর্ত্তমান ভারত-বর্ষের উত্তর দিক্ হইতে কোন জাতি বিশেষ দুই বৃহৎ জলের বা নদীর মধ্যস্থ স্থানের নাম জম্বুদ্বীপ রাখিয়াছিল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে একস্থলে জম্বুদ্বীপের ছয়টি বর্ষ পর্ব্বত ও সাতটি বর্ষের নাম করা হইয়াছে, যথা হৈমবত বা ভারতবর্ষ, হেমকূট-সংসৃষ্ট কিম্পুরুষবর্ষ, নিষধ-সংসৃষ্ট হরিবর্ষ, মেরু-সংযুক্ত ইলাবৃত বর্ষ, তৎপরে যথাক্রমে নীল, রম্যক ও হিরণ্ময় বর্ষ। কিন্তু ইহার পরেই শ্বেতবর্ষ ও কুরুবর্ষের নাম আছে (২৪-২৮।৩৪)।

ইলাবৃত বর্ষ পামীর মালভূমি—ইলা বা ইরা কথাটির অর্থ জল, পঞ্জাবের ইরাবতী ও ব্রহ্মদেশের ইরাবদী নামেই তাহা প্রকাশ। পামীর চির-তুষারে আবৃত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম ইলাবৃতবর্ষ।

যে পর্ব্বত-শ্রেণী সাইবিরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজী মানচিত্রের স্তানোভোই, ইয়াব্লোনোই, সায়ান, পামীরের মধ্যভাগ, আলাইতাগ, হিন্দুকুশ, কাপেত দাগ ও এলবুর্জ নামে অবচ্ছিন্ন ভাবে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়া এসিয়া-মাইনর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সমস্ত এসিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই পৌরাণিকের মেরু বা মহামেরু।

আবার পুরাণের বর্ণনায় (৩৪-৩৯।৩৪) (১৭-২২।৪৯) নিষধ, নীল, মাল্যবান ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের যে অবস্থান লিখিত আছে, তাহার সহিত যথাক্রমে পামীরের নিকটস্থ মুস্তাগ বা কারাকোরাম, থিয়ান্‌শান্, আল্‌তিন্‌তাগ ও হিন্দুকুশের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৫০ অধ্যায়েই ভুবন-বিন্যাসের একটি বিবরণ আছে। বামদিকে হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে কৈলাস পর্ব্বত, সেখানে শ্রীমান কুবের রাক্ষসগণের সহিত বাস করেন (১।৫০)। কৈলাসের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে চন্দ্রপ্রভ নামে এক গিরি আছে (৪-৫।৫০)। কৈলাসের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে পিশঙ্গ পর্ব্বতের পাদদেশে লোহিত নামক এক পর্ব্বত আছে। তাহার পাদদেশস্থিত লোহিত সরোবর হইতে লৌহিত্য নামক এক মহানদ উৎপন্ন হইয়াছে (১০-১২।৫০)। কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে অঞ্জন নামক পর্ব্বতের নিকট বৈদ্যুৎ নামক পর্ব্বত আছে। তাহার পাদস্থিত মানস-সরোবর হইতে সরযূ নদী উৎপন্ন হইয়াছে (১৪-১৫।৫০)। কৈলাশ পর্ব্বতের পশ্চিমে মহাদেবের প্রিয় মুঞ্জবান্ পর্ব্বত অবস্থিত। ইহা হিমপ্রধান বলিয়া অতিশয় দুর্গম (১৮-২০।৫০), ইত্যাদি।

সপ্তদ্বীপের অবশিষ্ট দ্বীপগুলি জম্বুদ্বীপের নিকটেই ছিল এবং জম্বুদ্বীপের কোন কোন বর্ষ এই-সকল দ্বীপের অন্তর্গত। কাশ্মীর প্রদেশই কিম্পুরুষবর্ষ। ইহার উত্তরস্থিত কারাকোরাম বা নিষধের চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ষের নাম হরিবর্ষ। নীল বা থিয়ান্‌শান পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বর্ষের নাম নীলবর্ষ। নীল পর্ব্বতের উত্তরে ও শ্বেত পর্ব্বতের দক্ষিণে রমনক নামক বর্ষ আছে। আল্‌তাই পর্ব্বতশ্রেণী পৌরাণিকের শ্বেত পর্ব্বত।

আল্‌তাই পর্ব্বতের উত্তরে সায়ান পর্ব্বতমালা বা শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থ ভূভাগ সম্ভবতঃ হিরণ্ময় বা হিরণ্যকবর্ষ। আবার উত্তর সমুদ্রের নিকটে ও দক্ষিণাংশে উত্তর-কুরুবর্ষ (১২।৪৭)। সাইবিরিয়ার উত্তরভাগই উত্তর কুরু। ভারতবর্ষের কুরুবংশীয়দের সহিত উত্তরকুরুর অধিবাসীদের সম্পর্ক ছিল।

গন্ধমাদন বা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকটেই কেতুমালবর্ষ এবং মাল্য-বানের পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ (৬।৪৫)। তিব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব ও চীনের উত্তর-পশ্চিমস্থ আধুনিক কানসু প্রদেশই একদিন ভদ্রাশ্ববর্ষ বলিয়া অভিহিত হইত। বর্ত্তমান আমুদরিয়া বা ওক্‌সুস্ (Oxus) বা পুরাণের চক্ষুঃ বা অক্ষি নদীর উত্তরস্থ ভূভাগ গ্রীকদের লিখিত বিবরণে সগ্‌দিয়ানা নামে অভিহিত হইয়াছিল। শকদ্বীপ নাম হইতেই যে সগ্‌দিয়া(না) নামের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সম্ভবতঃ চক্ষুঃ বা অক্ষি শব্দে জল বা নদী বুঝাইত। বাঙ্গালা দেশে ময়ূরাক্ষি ও কপোতাক্ষ নামে সেই অর্থই বুঝাইতেছে।—অর্থাৎ যে নদ বা নদীর জলের বর্ণ ময়ূর বা কপোতের বর্ণের মত।

শকদ্বীপ আমুদরিয়া নদীর উত্তরবর্ত্তী। সিন্ধু ও আমুদরিয়ার মধ্যস্থ স্থানের নাম একদিন প্লক্ষদ্বীপ ছিল। জৈন হরিবংশের মতে ঐরাবত-ক্ষেত্রের পূর্ব্বে ধাতকীখণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে পুষ্করদ্বীপের দুইটি বর্ষের মধ্যে একটির নাম ধাতকীখণ্ড। জৈন হরিবংশের ক্ষেত্র পঞ্জাব বলিয়া অনুমিত হয়। আফ্‌গানিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত দ্বীপগুলিই ক্রমে ক্রমে উত্তর পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিল।

পুষ্করদ্বীপ ব্যতীত অন্য সমস্ত দ্বীপেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন কোন পুরাণের মতে শাকদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোথাও চতুর্ব্বর্ণ ছিল না। কেতুমালবর্ষে বঙ্গ, রাঢ়, ক্রৌঞ্চ জনপদ এবং শাকবতী, কুশাবতী, পুষ্কলা, রুণা প্রভৃতি পরিচিত নাম পাইতেছি। বঙ্গ ও রাঢ় নাম এই পশ্চিম হইতেই কি বাঙ্গলায় আসিয়াছে?

৪৮ অধ্যায়ে দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষের ৯টি ভাগ বলা হইয়াছে—ইহার এক ভাগ হইতে অন্য ভাগে যাওয়া অতিশয় দুঃসাধ্য। সাগর-বেষ্টিত দ্বীপ, যাহা কুমারিকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাই নবম দ্বীপ বা ভারতখণ্ড। অপর দ্বীপ-কয়টির নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ। ইন্দ্রদ্বীপ ব্রহ্মদেশ এবং তাম্রবর্ণ সিংহল।

ভারতখণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাত, পশ্চিমপ্রান্তে যবন ও মধ্যভাগে

চতুর্ব্বর্ণ বাস করে। এই ভারতখণ্ডে বা নবম দ্বীপে ৭টি কুলাচল পর্ব্বত আছে, যথা, হিমালয়, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, শুক্তি, সহ্যাদ্রি, মহেন্দ্র, মলয় ও ঋক্ষ। প্রত্যেক কুলাচল হইতে নির্গত কতকগুলি নদীর নাম দেওয়া আছে। যাহা বর্ত্তমানে বিন্ধ্য তাহা পুরাণের পারিপাত্র, এবং পুরাণের বিন্ধ্য মধ্যপ্রদেশের মহাদেও পর্ব্বতশ্রেণী ; ঋক্ষ অমরকণ্টক মালভূমি, সহ্যাদ্রি পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী। মহেন্দ্র উড়িষ্যার নীলগিরি এবং মলয় দাক্ষিণাত্যের আনামলৈ পর্ব্বত।

ভারতের জনপদ ও রাষ্ট্রগুলির নাম এইরূপ,—মধ্যজনপদের নাম কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, কুন্তল, কাশী, কোশল প্রভৃতি ; উত্তরে বাহ্লীক, আভীর, পহ্লব, গান্ধার, যবন, সিন্ধুসৌবীর, মদ্রক, শক, হুণ, পারদ, কেকয় প্রভৃতি জাতি এবং কাশ্মীর, চুলিক প্রভৃতি দেশ অবস্থিত। ইহাতে গুর্জ্জরদের নাম নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে হুণেরা ভারতে প্রবেশ করে, কিন্তু এখানে তাহাদের উত্তরের ক্ষত্রিয় জনপদের মধ্যে নাম পাইতেছি। তাই মনে হয় হুণেরা পঞ্চম শতকে ভারতের মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে যখন ভারতের উত্তরে ছিল তখনই তাহাদের নাম পুরাণে লিখিত হইয়াছে। রাজপুতানার ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে হুণদেরও নাম আছে। এখানে চীন জাতি ভারতের উত্তরে আছে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আবার গঙ্গার সপ্তধারার মধ্যে চক্ষুঃ নদী চীন, তুষার, শক, প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলা হইয়াছে (৪৬।৫০)। চীনেদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাহারা পশ্চিম এসিয়া হইতে আসিয়াছে। চীনজাতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পামীর পর্য্যন্ত দখল করিলে, ইহারা ভারতবর্ষের উত্তরস্থ জাতি বলিয়া পুরাণে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বের জনপদের নাম—অন্ধ্রবাক, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, বিদেহ, মাল, তাম্রলিপ্তক, মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, ইত্যাদি।

অতঃপর দাক্ষিণাত্যের জনপদের নাম আছে,—পাণ্ড্য, চোল, কেরল, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, আভীর, কুন্তল, বিদর্ভ, অশ্মক, মাহিষক, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি। বিন্ধ্য-পর্ব্বতস্থ দেশে মালব, করূষ, উৎকল, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধক, নিষধ, অবন্তি. প্রভৃতি জনপদের নাম পাইতেছি। উৎকলকে বিন্ধ্য-পর্ব্বতস্থ দেশে ধরা হইয়াছে। মনে হয়, বর্ত্তমানে যেখানে উৎকল আছে, পূর্ব্বে সেখানে ছিল না, মধ্য-ভারতে ছিল। বিষ্ণুপুরাণে দাক্ষিণাত্যে অম্বষ্ঠ নামে একটি জনপদের নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের মাহিষক জনপদ হইতে আগত জাতি মাহিষ্য ও অম্বষ্ঠ দেশ হইতে আগত জাতি অম্বষ্ঠ নাম ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গলার বৈদ্যজাতির মধ্যে. বহুকাল হইতে সংস্কৃত-চর্চ্চা দেখিয়া মনে হয়,. তাঁহারা এই অম্বষ্ঠ দেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সমস্ত প্রাচীন কুলাচার্য্যগণই বলিয়াছেন, বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, 'কান্যকুব্জের ত্রিসীমানায় যে-সকল লোক বাস করে, তাহাদের সহিত বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের আকারে সাদৃশ্য নাই। আসামের লোকে ভারতবর্ষের কলিঙ্গ প্রদেশকেই কোলাঞ্চ বলে। তাহা হইলে বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কলিঙ্গ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সেন রাজবংশ যে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। শূর বংশের সহিত সেন বংশের সম্বন্ধ ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ে শূর বংশের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মনে হয়, শূর বংশ ও সেন বংশ উভয়েই দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল—তাই দাক্ষিণাত্যাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের তাঁহারা আদর করিয়া আনাইয়াছিলেন এবং সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলা দেশে বহুকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে দলে দলে লোক আসিয়া বাস করিতেছিল, এবং তাহারা অনেকাংশে সুসভ্য ছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাঙ্গলাদেশের লোকেই নামের পূর্ব্বে শ্রী ব্যবহার করে এবং ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করে। আবার কেবল অন্ধ্র রাজবংশের রাজাদের নামের পূর্ব্বে "সিরি" বা শ্রী-কথার ব্যবহার আছে। ইহা হইতে মনে হয় বাঙ্গলার পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সঙ্গে সঙ্গে অথবা সেন ও শূর রাজবংশের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশে এই লক্ষ্মীপূজা ও শ্রী-প্রয়োগের প্রচলন হইয়াছে।

প্রাচীন বিখ্যাত স্থান প্রতিষ্ঠান-পুরী (বর্ত্তমান পইঠান)। পুরাণকারেরা এই প্রদেশেই বাস করিতেন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ) শ্রী রাখালরাজ রায়

—

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

চোখ, কান, হাত, পা, রসনা সবকটাই হল রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ধরে' বিশ্বের চারিদিককে বুঝে নেবার জন্য। মানুষ নিজের চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক রকমে অসাধারণ শক্তিমান করে' তুল্লে। ছেলেকে অক্ষর চেনাতে শেখালে, বই পড়্‌তে শেখালে তবে সে আস্তে আস্তে চোখে দেখ্‌তে পায়—কি লেখা আছে, বুঝ্‌তে পারে পড়াগুলো, এবং ক্রমে নিজেই রচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়ত বা। যে মানুষ কেবল অক্ষর পরিচয় করে' চল্ল, আর যে অক্ষরগুলোর মধ্যে মানে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, আবার যে রচনার নির্ম্মাণ-কৌশল ও রস পর্য্যন্ত ধর্‌তে লাগ্‌ল এদের তিন জনের দেখা-শোনার মধ্যে অনেকখানি করে' পার্থক্য আছে। কাজেই দেখি—শিল্পই বল আর যাই বল কোন কিছুতে কুশল হয় না চোখ, হাত, কান ইত্যাদি, যতক্ষণ এদের স্বাভাবিক কার্য্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে' সুশিক্ষিত করে' তোলা না যায় বিশেষ বিশেষ দিকে—বিশেষ বিশেষ উপায় আর শিক্ষার রাস্তা ধরে'। এই শিক্ষার তারতম্য নিয়ে আমাদের সচরাচর মোটামুটি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণীর দেখাশোনার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে। ছবি, কবিতা, সুর-সার প্রভৃতি অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে হেঁয়ালীর মতো ঠেকে তা দুই দলের মধ্যে এই পরখ ও পরশের পার্থক্য বশতঃই হয়।

এইজন্যেই কবিতা, সঙ্গীত, ছবি এ-সবকে বুঝ্‌তে হলে আমাদের চোখ-কানের সাধারণ দেখাশোনার চাল-চলনের বিপর্য্যয় কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারায় ঘটাতে হয়, না হলে উপায় নেই। কোন বিষয়ে পটুতা হয় না, হতে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ নানা ইন্দ্রিয়ের নিত্য এবং স্বাভাবিক ক্রিয়ার কতকটা অদল-বদল ঘটিয়ে না তোলা যায়। সারাজীবন বারে বারে একই জিনিষ দেখে শুনে পরশ করে' পরখ কর্‌তে কর্‌তে কাজের দক্ষতা বেড়ে যায়, হাত পা চোখ কানের। শরীর-যন্ত্র, নিত্য ব্যবহারের নিত্য কাজের বস্তু ও ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে এই অভ্রান্ত বস্তু-পরিচয়ের পাঠ সাঙ্গ করে'ই থেমে রইল এই হলো সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ দিয়ে যতটা এগোতে পারি তার চরম পরিণতি। মানুষের দেখা শোনা ছোঁয়া সমস্তই কাজ ও বস্তু এবং বাস্তবিকতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে রইল, নিখুঁত করে চিনে নিতে পারলে, অভ্রান্তভাবে ধর্‌তে পারলে বাইরের এটা ওটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি

বস্তু ও ঘটনা ;—এই যে জ্ঞান একে বলা যেতে পারে বস্তু-বুদ্ধি বা বাস্তব বুদ্ধি—কিন্তু কিছুতেই একে বলা চলে না, বস্তুর রসবোধ শিল্পবোধ সৌন্দর্য্যবোধ অথবা অর্থবোধ! মানুষের এই বস্তুগত দৃষ্টি চিরদিন তার স্বার্থ-বুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো থাকে। নিত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে আশপাশ থেকে যারা এসে মিলছে তাদেরই খবর আমরা দিন-রাত অশ্রান্তভাবে নিয়ে চলেম এই বস্তুগত দৃষ্টি দিয়ে! ময়রা যেমন চমৎকার মিঠাই গড়ে' চল্লো মিঠাইয়ের রসবোধ করার কোন অপেক্ষা না রেখেও! বস্তু-জগতের সঙ্গে পরিচয় বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটিয়ে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মানুষকে খুব দক্ষতা চাতুর্য্য বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা দিয়ে পাকা মানুষ কাজের মানুষ করে' দেয় এটা যেমন সত্যি, আবার শুধু এই গুণগুলি নিয়েই মানুষ গুণী কবি ও শিল্পী হয় না এটাও তেমনি সত্যি। কাজের সংস্পর্শ থেকে কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়ে চেয়ে দেখা, শুনে দেখা, ছুঁয়ে দেখার অভ্যাস চোখ কান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দেওয়ার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার অপেক্ষা রাখে, তবে মানুষের শিল্পজ্ঞান রসবোধ জন্মায়। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে কখন? প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যখন সে মিলিত করে। যে-সব শরীরযন্ত্রের কাজই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাহিরের প্রেরণায় চটপট সাড়া দেওয়া নির্ব্বিচারে; অন্তরের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের যুক্ত করে' দিলে অমনি ভিতরকার প্রেরণায় তারা ধীরে সুস্থে একটুখানি যত্নের সঙ্গে একটু কৌতূহল নিয়ে যেন আত্মীয়তা পাতাতে চল্লো বাহিরের এটা ওটা সেটার সঙ্গে, একটু দরদ পৌঁছল দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে!

ভাবুকের শোনা দেখা বলা কওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ সরলতা ও কল্পনার প্রসার থাকে। ভাবুকদৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণভাবে দেখে শোনে দেখায় শোনায় যে কাজের মানুষের দেখা শোনা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে' দেখ্‌লে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তই হেঁয়ালী বা ছেলেমান্‌ষির মতই লাগে।

শিশুর হৃদয় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে' নেয় বিশ্ব-চরাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেই ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখ্‌তে পারেন শুন্‌তে পারেন, এবং অবোলা শিশু যেটা বলে' যেতে পার্‌লে না সেইটেই বলে' যায় ভাবুক কবিতায় ছবিতে,—রেখার ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিন-রাতগুলোর জন্যে সব মানুষেরই মনে যে একটা বেদনা আছে সেই বেদনা-ভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক, যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন। শিশুকাল যথার্থই ভাবুক এবং আপনার চারিদিককে সে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধর্‌তে চায় বুঝ্‌তে চায় এবং বোঝাতে চায় ও ধরে' দিতে চায়; শুধু সে যা দেখে শোনে সেটা ব্যক্ত করার সম্বল এত অল্প, যে, খানিকটা বোঝায় নানা ভঙ্গী দিয়ে, খানিক বোঝাতে চায় নানা আঁচড় পোঁচড় নয়তো ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখা লেখা ও কথা দিয়ে; এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের সঙ্গে পাকা অভিনেতার সঙ্গে শিশুর তফাৎ। দৃষ্টি দুজনেরই তরুণ, কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখেনি আর-একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে কি কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্য্যন্ত ধরা যায় না।

ন্যাকামো দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আধ-ভাঙ্গা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে', অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ক ভাঙ্গাচোরা টানটোন আঁচড়-পোঁচড় চুরি করে' বসে' বসে' কেবলি শিশু-কবিতা শিশু-ছবি লিখে চল্লেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মন-ভোলানো হয় এ ভুল যারা করে' চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না, শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলে-ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলে-মান্‌ষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা-শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি।

কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে। দিন-রাতের মধ্যে যে-সব ঘটনা হঠাৎ ঘটে কিম্বা আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাঁধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুষ খুব কাজে ব্যস্ত থাক্‌লেও অন্ততঃ এক পলের জন্যেও মন দিয়ে না দেখে থাক্‌তে পারে না—সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে আকৃষ্ট হবার একটা চেষ্টা থেকে থেকে জাগে আমাদের সকলেরই, কিন্তু বাইরে থেকে প্রেরণাসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদির এই কৌতূহল সব সময়ে জাগিয়ে রাখ্‌তে পারেন কেবল ভাবুকেরাই। বিশ্ব-জগৎ একটা নিত্য-উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে, লেখার ছাঁদে, বর্ণে ও বর্ণনে; কাজেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চল্‌তি চশ্‌মার ঠিক উল্টো এবং তার চেয়ে ঢের শক্তিমান চশ্‌মা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশ্‌মা-খানি।

অভিনিবেশ করে' বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষা ও সাধনায় আপনার কার্য্যকরী ইন্দ্রিয়-শক্তি-সকলকে নতুনতরো শক্তিমান করে' তুল্লেন যে মুহূর্ত্তে ভাবুক—সৌন্দর্য্যে অর্থে সম্পদে সৃষ্টির জিনিস ভরে উঠ্‌ল, জগৎ এক অপরূপ বেশে সেজে দাঁড়ালো মানুষের মনের দুয়ারে, বারমহল ছেড়ে অভ্যা-গত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালবাসার রাজত্বে। রসের স্বাদ অনুভব কর্‌লে মানুষ—যেটা সে কিছুতে পেতে পার্‌তো না যদি সে ইন্দ্রিয়-সমস্তকে কেবলি প্রহরী ও মন্ত্রীর কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখ্‌ত বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা নতুন সাধনা যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো লাভ কর্‌লে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু বলা-কওয়া হাঁক-ডাক করেই বসে' রইলো না, সে গেয়ে উঠ্‌ল, হাতের আঙুলগুলো নানা জিনিষ স্পর্শ করে' নরম গরম কঠিন কি মৃদু ইত্যাদির পরখ করে'ই ক্ষান্ত হল না, তারা সংযত হয়ে তুলি বাটালি সূঁচ হাতুড়ি এমনি নানা জিনিষকে চালাতে শিখে নিলে, বীণা-যন্ত্রের উপরে সুর ধর্‌তে লাগ্‌ল হাত, আঙুলের আগা, শুধু লোহার তারকে তার মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, সুরের তার পেয়ে যন্ত্রের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বিচরণ কর্‌তে থাক্‌ল আঙুলের পরশ গুন্ গুন্ স্বরে ফুলের উপরে ভ্রমরের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন প্রেম করে' চল্ল হাত, কান শুন্‌তে লাগ্‌ল প্রেমিকের মতো কোলের বীণার প্রেমালাপ! সরু সূঁচের, সোনার সুতোর, রংএ ভরা তুলির সজীব ছন্দ ধরে' তালে তালে চল্ল আঙুল, হাতুড়ি-বাটালীর ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য কর্‌তে শিক্ষা নিলে শিল্পীর হাত, কাজের ভিড় থেকে মানুষের চোখ-হাত সেই সঙ্গে মনও ছুটী পেয়ে খেলাবার ও ডানা মেলাবার অবসর পেয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধর্‌বার জন্যে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুল্লেন—খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন দূরবীক্ষণ-যন্ত্রকেও হার মানালে মানুষের এই মানস-নেত্র। চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না, দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য যে স্থান, মানুষ এই আর-এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় সেখানে

হয়ে নিজের মনের দেখা নিয়ে বিশ্বরাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল—সেই রাজত্বে—যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে' স্রষ্টা রয়েছেন গোপনে!

এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়াতপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্ব্ব-লোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জলের উপরে যেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে—সমস্তই দিব্য-দৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে' নিলে মানুষ। দর্শকের ও শ্রোতার জায়গায় বসে' মানুষ দেখ্‌বার মতো করে' দেখ্‌লে, শোন্‌বার মত করে' শুনে নিলে নিখিলের এই রূপের লীলা সুরের খেলা, এবং এরও ওপারে যে লীলাময় মানুষকে সমস্ত পদার্থ সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে একই নাট্যশালায় নাচিয়ে গাইয়ে চলেছেন তাঁকে পর্য্যন্ত ছুঁয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে।

দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেল, তার পর এল দেখানোর পালা! মানুষ এবারে আর এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বস্‌ল! এই দৃষ্টি-বলে আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বার করে' আন্‌তে লাগ্‌ল। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হ'ল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বস্‌ল দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে' অবোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রঙহীনকে রং দিয়ে চল্‌ল মানুষ।

(বঙ্গবাণী, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

বাংলার নবযুগের কথা

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

রাজা রামমোহন বাংলার এই নবযুগের প্রবর্ত্তক হইলেও রাজার আদর্শটি বহুদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ধরিতে পারেন নাই। এখনও পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তামসিকতাকে দূর করিবার জন্যই রাজা দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্মকে লোকের অনুভবের উপরে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি এযুগে সত্যভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগকে নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনা লইয়া আধুনিক সভ্য-সমাজের মাঝখানে যাইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে; আর কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিলে চলিবে না। ভারতবর্ষ যখন বড় ছিল, তখনও সে কূপমণ্ডুক ছিল না। এই কারণেই রাজা ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য এতটা আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আদিতে কোনও চেষ্টাই করেন নাই, বরঞ্চ নানাদিকে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন।

কলিকাতা-সমাজে এই নূতন শিক্ষার ফলে একটা প্রবল ধর্ম্ম- ও সমাজ-বিপ্লবের বান ডাকিয়াছিল। রাজা রামমোহন প্রাচীন বেদান্তাদি প্রচার করিয়া প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে যে বিরোধ জাগাইতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সে বিরোধটা সত্বরই আর-এক দিক দিয়া পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

বিরোধটা পাকিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা যে সমন্বয়ের পথটা দেখাইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান লোকে পাইল না। ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ঢেউ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে একেবারেই স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার দিকে প্রবল বেগে ঠেলিয়া দিল। আর উহার মূল কারণ ছিল—এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার অতিশয় বলবতী স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা। ইহাই বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত চিরন্তন কিন্তু সম্প্রতি-বিস্মৃত স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে জাগাইয়া, কস্তুরী-মৃগকে যেমন নিজের নাভিগন্ধে মাতাইয়া চারিদিকে ছুটাইয়া থাকে, বাঙ্গালীকেও সেইরূপ নিজের আদর্শের গন্ধেই য়ুরোপের দিকে ছুটাইয়া দিল।

এ দেশে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ইংরেজের রক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুগটাই য়ুরোপে এক অভিনব স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায় মাতিয়া উঠিয়াছিল।

যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইংরেজীতে যাহাকে Rationalism এবং Individualism কহে, ফরাসী-বিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল; যাঁহারা হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শিখিতে গেলেন, এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁহাদের জীবনেরও মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। এই নূতন আদর্শের প্রেরণায় ইঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মের এবং সমাজের সকল বন্ধনকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বাঙ্গালার ইংরেজীনবীশদিগের প্রথম দলের মধ্যে একটা তীব্র ধর্ম্মদ্রোহিতা এবং সমাজদ্রোহিতা জাগিয়া উঠিল। এই-সকল শিক্ষার ফলে প্রাচীন সমাজে এবং পরিবারে জ্যেষ্ঠগণের সঙ্গে নব্যযুবকদিগের বিরোধ বাধিয়া উঠিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাংলার ইংরেজীনবীশেরা প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া য়ুরোপের ছাঁচে নিজেদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের বা Rationalismএর উপরেই আমাদের প্রথম দলের ইংরেজীনবীশদিগের এই সমাজ-ও-ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহিয়াছিল। এই যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই সত্যের বা বস্তুর একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অপূর্ণতা অনুভব করিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রমাণের দ্বারা মানুষের সকল অভিজ্ঞতার মীমাংসা হয় না দেখিয়া, Intuition বা আত্মপ্রত্যয়ের আশ্রয় লইয়াছিল। আমাদের নূতন ইংরেজীনবীশেরাও কেহ কেহ এই পথেই নাস্তিক্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে আমাদের প্রথম দলের ইংরেজীনবীশদিগের মধ্যে মোটের উপরে দুইটা দল গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এক দল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থা হারাইয়া নাস্তিক্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কেবল লোকশ্রেয়ঃ অর্থাৎ জনসাধারণের যাহাতে কল্যাণ হয় এবং যাহা তাহাদের সুখসমৃদ্ধি সাধন করে, ইহাকেই সমাজ-নীতির মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকের সুখসমৃদ্ধি নষ্ট করে, তাহাই অধর্ম্ম, যাহা দ্বারা ইহ-লৌকিক সুখসমৃদ্ধি তাহাই ধর্ম্ম, ইহাই ইঁহাদের চরিত্রের বুনীয়াদ হইয়া উঠে। আর-এক দল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াও সকল ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইলেন না। ইঁহাদের প্রকৃতির মধ্যেই একটা বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মদ্রোহী হইতে পারিলেন না। ভারতের প্রাচীন সাধনাতেও যুক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা স্থান আছে। গতানুগতিক ধর্ম্মের সাধনে কেহ ইহার সন্ধান লইত না। এইজন্যই আমাদের যে-সকল ইংরেজী-নবীশেরা এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে অযৌক্তিক এবং মানবের স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে কুণ্ঠিত হন নাই।

কি করিয়া ছেলেরা ইংরেজীও শিখিবে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার শাস্ত্র-সাহিত্যও অধ্যয়ন করিবে, অথচ ইহার সে অপরিহার্য্য পরিণাম,

যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব, তাহার হাতও এড়াইয়া থাকিবে, এই অসাধ্য-সাধনায় হিন্দুসমাজের নেতৃগণ প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা শাস্ত্র ও কিম্বদন্তীর দোহাই দিয়া কিম্বা সমাজ-শাসনের ভয় দেখাইয়া নূতন ভাবের ও আদর্শের মদে মাতোয়ারা যুবকের দলের—সমাজ- এবং ধর্ম্মদ্রোহিতাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

এরূপ অবস্থায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক দায়াধিকারের দাবী করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুমূর্ষু ব্রহ্মসভাতে নবচেতনা সঞ্চার করিয়া নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের উপরে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন।

(বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

প্রাণশক্তির রসস্রোত

অনেকের ধারণা আছে যে বুঝি লড়াই করে' দ্বন্দ্বসংঘর্ষের মধ্য দিয়েই শক্তি প্রকাশিত হয়। তারা একথা স্বীকার করে না যে সৌন্দর্য্য মানুষের বীর্য্যের প্রধান সহায়। বসন্তকালে গাছপালার যে নবকিশলয়ের উদ্যম হয়, তা যেমন তার অনাবশ্যক বিলাসিতা নয়, বাস্তবিক পক্ষে সে যেমন তার বড় সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া, তেমনি বড় বড় জাতির জীবনে যে রসসৌন্দর্য্যের বিস্তার হয়েচে তা তাদের পরিপুষ্টিরই উপকরণ জুগিয়েছে। এই-সকল রসই জাতির জীবনকে নিত্য নবীন করে' রাখে, তাকে জরার আক্রমণ থেকে বাঁচায়, অমরাবতীর সঙ্গে মর্ত্ত্যলোকের যোগ স্থাপন করে, এই রসসৌন্দর্য্যই মানবচিত্তে আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় বিকশিত হয়। কেবল দেহেরই নয়, মনেরও জীবন আছে; সঙ্গীত হচ্চে তারই তৃষ্ণার একটি পানীয়, এই পানীয়ের দ্বারা মনের প্রাণশক্তি সতেজ হয়ে ওঠে।

জীবন নীরস হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শুষ্কতার কঠোরতাই যে বীর্য্য এমন কথা আমাদের দেশে প্রায়ই শুন্‌তে পাওয়া যায়। অবশ্য বাহিরে বীর্য্যের যে প্রকাশ সেই প্রকাশের মধ্যে একটা কঠিন দিক আছে, কিন্তু অন্তরের যে পূর্ণতা সেই কাঠিন্যকে রক্ষা করে সেই পূর্ণতার পরিপুষ্টি কোথা থেকে? এ হচ্চে আনন্দরস থেকে। সেইটে চোখে ধরা পড়ে না বলে' তাকে আমরা অগ্রাহ্য করি, তাকে বিলাসের অঙ্গ বলে' কল্পনা করি।

গাছের গুঁড়ির কাষ্ঠ-অংশটাকে দিয়েই ত গাছের শক্তি ও সম্পদের হিসাব করলে চল্‌বে না। সেটাকে খুব স্থূলরূপে স্পষ্ট করে' দেখা যায় সন্দেহ নেই; আর গূঢ়ভাবে তার অণুতে অণুতে যে রস সঞ্চারিত হয়, যে রসের সঞ্চারণই হচ্চে গাছের যথার্থ প্রাণশক্তি, সেটা স্থূল নয়, কঠিন নয়, বাহিরে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে খর্ব্ব করা সত্য-দৃষ্টির অভাব বশতঃই ঘটে। গুঁড়ির সত্যটা রসের সত্যের চেয়ে বড় নয়, গুঁড়ির সত্য রসের সত্যের উপরেই নির্ভর করে, এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

যখন দেখ্‌তে পাব যে আমাদের দেশে সঙ্গীত ও সাহিত্যের ধারা বন্ধ হয়েছে, তখন বুঝ্‌ব দেশে প্রাণশক্তির স্রোতও অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই প্রাণশক্তিকে নানা শাখা-প্রশাখায় পূর্ণভাবে বহমান করে' রাখ্‌বার জন্যেই, বিশ্বের গভীর কেন্দ্র থেকে যে অমৃতরস-ধারা উৎসারিত হচ্ছে তাকে আমাদের আবাহন করে' আনতে হবে। ভগীরথ যেমন ভস্মীভূত সগর-সন্তানদের বাঁচাবার জন্যে পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আমন্ত্রণ করে' এনেছিলেন তেমনি মানসলোকের ভগীরথেরা প্রাণহীনতার মধ্যে অমৃতত্ব সঞ্চারিত করবার জন্য আনন্দরসের বিচিত্র-ধারাকে বহন করে' আনবেন।

সমস্ত বড় বড় জাতির মধ্যেই এই কাজ চল্‌চে। চল্‌চে বলে'ই তারা বড়। পার্লামেন্টে, বাণিজ্যের হাটে, যুদ্ধের মাঠে তাঁরা বুক ফুলিয়ে তাল ঠুকে বেড়ান বলেই তাঁরা বড় তা নয়। তাঁরা সাহিত্যে সঙ্গীতে কলা-বিদ্যায় সকল দেশের মানুষের জন্যে সকল কালের রসস্রোত নিত্য প্রবহমান করে' রাখ্‌চেন বলেই বড়।

(নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাদেশিক দেবতত্ত্ব

একাচুরা পূজা।

ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে এবং ত্রিপুরার উত্তরাংশে এই দেবতার অত্যন্ত সমাদর। ছেলেমেয়ের উৎকট ব্যাধি হইলে, অথবা মৃতবৎসার সন্তান রক্ষার জন্য এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। ইঁহার পূজা মানসিক করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর পায়ে লোহার বালা অভাবে সূতা পরাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ইহাকে একাচুরার বেড়ী বলা হয়। কাহারও অন্নপ্রাশনের সময়, কাহারও পৈতার সময়, কাহারও কাহারও বা বিবাহের সময়েও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা সম্পন্ন হইলে পায়ের বেড়ী কাটিয়া ফেলা হয়। যাহার ধৃত বেড়ী কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পক্ষে পূজার সময় নূতন বেড়ী পায়ে পরাইতে হয়। এই দেবতার নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়।

কোন কোন পদ্ধতিতে ইনি "একচৌর ভৈরব" নামে, কোন পুস্তকে একচূড় ভৈরব নামে, আবার কোথাও—"একচূড় শিব" নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহার ধ্যানের এবং মন্ত্রেরও পার্থক্য দেখা যায়।

(১) নীলজীমূতসঙ্কাশং একচৌরং ত্রিলোচনম্।
দ্বিভুজং শক্রহস্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্॥

(২) নীলজীমূতসঙ্কাশং একচৌরং ত্রিলোচনম্।
গদাখড়্গধরং দেবং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥
বিদ্যাঙ্গং বিদ্যানিলয়ং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্॥

ওঁ একচৌর ভৈরব ইহাগচ্ছেত্যাবাহ্য হুং ক্রৌঁ একচৌরভৈরবায় নমঃ ইত্যনেন পূজয়েৎ।

এই পূজার অঙ্গ ছাগবলিদান। কোন কোন স্থলে মহিষবলিও হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকে একাচুরার ব্রতও করিয়া থাকে।

বরকুমার।

ইনি একাচুরার নিয়ত সহচর দেবতা। যেখানে একাচুরার পূজা হইয়া থাকে, সেখানে ইনিও অবশ্যই পূজা পান। মঙ্গল-ব্যাপারের পূর্ব্বে একাচুরা বরকুমারের পূজা প্রায়শই হইয়া থাকে। কোন কোন পুরোহিত ঠাকুর মনে করিয়াছেন, ইনি বড় কুমার। বড় হইলেই বৃহৎ; অতএব কেহ ইঁহাকে বৃহৎ কুমারায় নমঃ, কেহ বা বৃদ্ধ কুমারায় নমঃ, আবার কেহ কেহ বড়কুমারায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন ইনি বরদাতা কুমার। বৌ[illegible] ষোড়শোপচারে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে।

ধ্যান এইরূপ:—

"ওঁ বড়কুমারং দ্বিভুজং শক্রহস্তারং মদ্যঘটকপালকম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং নানালঙ্কারভূষিতম্।"

ইঁহার অঙ্গদেবতারূপে অষ্ট-ভৈরবের পূজা করিতে হয়। ইঁহার পূজাতেও ছাগাদি পশু বলি হইয়া থাকে।

বনদুর্গা পূজা।

এই দেবতা পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে অতীব প্রভাবশালিনী। প্রত্যেক

হিন্দুগ্রামের পল্লীতে পল্লীতেই ইঁহার অধিষ্ঠান শাকোট বৃক্ষ (শেওড়া গাছ) দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের গোড়াতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং এই পূজার নাম গাছের শুঁড়ির পূজা। মেয়েরা দেবীকেও 'গাছের শুঁড়ি ঠাকুরাইন' বলিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে শেওড়া ভিন্ন উড়ুম্ব প্রভৃতি গাছেও পূজা হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে পূজ্য বৃক্ষের গোড়া বাঁধান হইয়া থাকে। বিবাহ উপনয়ন চূড়াকরণ প্রভৃতি প্রত্যেক মঙ্গল ব্যাপারের পূর্ব্বেই বনদুর্গার পূজা এবং তদঙ্গ বলিদান হইয়া থাকে। এই পূজায় খৈ, চিড়াভাজা, চাউলের গুঁড়া, বীচে কলা প্রভৃতি নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। হংসডিম্বে সিন্দুর মাখাইয়া এই পূজায় দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছেলে হওয়ার পর অশৌচান্ত-দিনে বনদুর্গার পূর্ব্বোক্ত ভোগরাগ দেওয়া হয়। ইহাতে আর ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা নাই। ইহাকে গাছের শুঁড়ির বাড়ান বলিয়া থাকে। কুমিল্লাপ্রদেশে এই পূজা কামিনীগাছের গোড়ায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে কামিনীপূজা বলা হয়। পুরোহিত ঠাকুরগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে কেহ শাকোটবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ, কেহ বা শাকোটবাসিন্যৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন। ধ্যানানুসারে বনদুর্গা ত্রিবলীযুক্তা বনমাল্যবিভূষিতা, শাকোট বৃক্ষে (শেওড়া-গাছে) ইঁহার অধিষ্ঠান।

ওঁ বনদুর্গাং (দুর্গা) বলীপেতাং (তা) বনমালাবিভূষিতাং (তা) শাকোট-বাসিনীং (নী) দেবীং (দেবী) সুতরক্ষাং করুষ মে॥

আমার পুত্রে রক্ষা কর, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা হয়। ধ্যানের পদ্ধতি অশুদ্ধ আছে। "ওঁ হ্রীং বনদুর্গায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

বনদুর্গাং (র্গা) মহাভাগাং (গা)
শাকোটবৃক্ষবাসিনীম্ (নী)।
পটবস্ত্রপরীধানাং (না) সুতরক্ষাং সদা কুরু॥
অস্যাঃ স্তুতিঃ—
উগ্রদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
দিগ্‌বস্ত্রামভয়াং শ্যামাং লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম্॥
শাকোটবাসিনীং দুর্গাং সর্ব্বত্রশুভকারিণীম্।
সৌবর্ণাম্বুজ-মধ্যগাং ত্রিনয়নাং সৌদামিনীসন্নিভাং
চক্রং শঙ্খবরাভয়ানি দধতীমিন্দোঃ কলাং বিভ্রতীম্।
গ্রৈবেয়াঙ্গদ-হার-কুণ্ডলধরামাখণ্ডলাদ্যৈর্নুতাং *
ধ্যায়েদ্বিন্ধ্যনিবাসিনীং শশিমুখীং পার্শ্বস্থ-পঞ্চাননাম্॥

এই ধ্যানটি নেপালাধীশ্বর প্রতাপসাহ সিংহের "পুরশ্চর্য্যার্ণব" নামক বিস্তৃত তন্ত্রনিবন্ধেও অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বনদুর্গার প্রসার নেপাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বনদুর্গার পূজায় শূকর বলি হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের জবাই করার রীতি অনুসারে নাপিত ক্ষুরের দ্বারা শূকরের গলা কাটিয়া দেয়। অধিকন্তু এই পূজার অঙ্গরূপে ২১ একুশটি মোরগ উৎসর্গ করা হয়। ইহাদের হত্যা হয় না। একটি খাঁচার ভিতরে মোরগগুলিকে রাখিয়া পূজা-স্থানের দূরে ঐ খাঁচা রাখা হয়, পুরোহিত দূর হইতে মোরগের গায় জল ছড়াইয়া দেন।

লালসা-বিশ্বেশ্বর পূজা।

এই পূজা ময়মনসিংহের এবং ত্রিপুরার অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে টাকরা-টাকরীর পূজা বলে। মৃত-বৎসায় সন্তানরক্ষার্থই এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস এইরূপ যে, টাকরা-টাকরী দেবতা কচি ছেলেকে অপহরণ করিয়া লইয়া, সেই ছেলের রূপ ধারণ করিয়া দেবতাই ছেলের স্থান অধিকার করে। ভান করিয়া দেবতাই মরিয়া যায়, পরে মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত হইলে, সেখান হইতে দেবতা উঠিয়া যায়। আমরা বাল্যজীবনে এই বিষয়ের অনেক চিকিৎসক দেখিয়াছি, এবং তাহাদের মুখে অনেক অদ্ভুত গল্প শ্রবণ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসক বিরল হইয়াছে।

লালসাবিশ্বেশ্বর অর্দ্ধনারীশ্বরের সজাতীয় দেবতা বলিয়া উল্লেখযোগ্য। কারণ ধ্যানানুসারে এই দেবতা স্ত্রীপুরুষ-শরীরাত্মক, এবং একত্রই পূজনীয়।

মেধাঙ্গীং জীর্ণবসনাং পদ্মহস্তাং ভুজদ্বয়াম্।
বৃক্ষস্থিতাং বালক্রোড়াং মুক্তকেশীং ভয়ানকাম্।
দণ্ডহস্তাং ধৃতকটীং বনমালাবিভূষিতাম্।
জটাভারসমাযুক্তাং (ক্তং) ভস্মবর্ণাং (র্ণং) ভুজদ্বয়াং (য়ং)
দণ্ডপাশসমাযুক্তাং (ক্তং) কেশপিঙ্গললোচনাং (নং)
কটাক্ষস্থানং সততং দন্তোষ্ঠাং (দন্তোষ্ঠং) কল্পিতং সদা।
বালকদং তরুণশান্তং দেবী-দেবমহং ভজে॥

এই পূজা কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত বলিয়া পদ্ধতি লিখিত আছে। "ওঁ লালসা-বিশ্বেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে। সাটের সোহং এই মন্ত্রে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়।

খলকুমারী পূজা

এই পূজা ময়মনসিংহ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশে "ডরাই" পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মনসাপূজার সহিত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া সাধারণতঃ মেয়েরা ইহাকে "ডরাই বিষরী পূজা" বলে। দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার অভিলাষে এই পূজা মানসিক করা হয়। উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে এই পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহার প্রধান পাণ্ডা "গুরমা" নামে প্রসিদ্ধ। স্ত্রী-নপুংসক বা হিজড়া গুরমা নামে প্রসিদ্ধ। নপুংসকের পরিবর্ত্তে পুরুষেই মেয়েলি কাপড় পরিয়া কপালে সিন্দুর ও হাতে শঙ্খ ধারণ করিয়া সারাজীবন অবিবাহিত অবস্থায় যাপন করে। গুরমার গানই খলকুমারী পূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত ; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গুরমার বিরল-প্রচার ও সমাজের রুচিপরিবর্ত্তন, এই উভয় কারণে অনেকস্থলে গুরমা ব্যতীতই পূজা হইতে দেখা যায়। গুরমার গান যেরূপ অশ্লীলতাপূর্ণ, সেরূপ অশ্লীলতা অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না। সাধারণতঃ এই ব্যাপার গুরমার "চৈতাল" নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাপারের "চৈতাল" সংজ্ঞার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, চৈত্রমাসে অনুষ্ঠেয় কামদেবের পূজাঙ্গ অশ্লীল গানের সহিত সাম্য নিবন্ধন ইহার এই চৈতাল সংজ্ঞা হইয়াছে।

গুরমা মাথার চুল এলোথেলো করিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া ভ্রূকুটি-পূর্ণ মুখে অবিশ্রান্ত মাথা নাড়িতে থাকে, এবং তাহার নিকট উপস্থাপিত সাধারণের শুভাশুভসূচক প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, ইহার নাম গুরমার "বান করা"। লোকের বিশ্বাস, গুরমার শরীরে দেবীর অধিষ্ঠান হয়। সুতরাং ভান করার অপভ্রংশ "বান করা" হইতে পারে।

এই দেবীর পূজার অঙ্গরূপে প্রথম দিবস যথারীতি অধিবাস করিতে হয়। পরদিবস পূজা করিতে হয়।

বিশ্বপ্রকাশিনীং দেবীং গৌরবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
বিশ্বেশ্বরীং ভয়ত্রাতাং বিশ্বমাতাং কৃপালয়াম্॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং ঘোররূপাং ভয়ঙ্করীম্।
গভীরনদসংস্থানাং কুম্ভীরোপরিসংস্থিতাম্॥
নানামণিবিভূষাঢ্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
নবযৌবন-সম্পন্নাং কুমারীং কামরূপিণীম্॥
চিত্রবস্ত্রপরিধানাং কুঙ্কুমাক্তাং মনোহরাম্।
খলরূপেণ সম্ভূতাং ত্রিনেত্রাং বরদাং ভজে॥

এই দেবীর অঙ্গদেবতারূপে উগ্রকুমারী, ক্ষেমঙ্করী, জলবাসিনী, হরপুত্রিকা, উগ্ররূপা, গঙ্গাপুত্রিকা ও নন্দিপুত্রিকা, এই অষ্টকুমারীর পূজা

করিতে হয়। অনন্তর যমুনা, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুমায়া, পদ্মা, ছায়া, মায়া, সুরবাক্যা, বাসুদেব, মৎস্যাদি দশাবতার, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, শেষ, অর্কমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল, সোমমণ্ডল, আত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, রজঃ, তমঃ ও অন্তরাত্মা, ইঁহাদেরও পূজা করিতে হয়।

খলকুমারী পূজার অন্তে অঙ্গরূপে সন্ধ্যাকালে জলসমীপে ছায়া ও মায়ার পূজা করিতে হয়।

ছায়াং তেজোময়ীং দেবীং দ্বিভুজাং গৌরদেহিকাম্।
বরাভয়করাং (দেবীং) ঘোরদংষ্ট্রাং ত্রিলোচনাম্॥
বামক্রোড়স্থিতং সৌরিং দক্ষিণস্থং দিবাকরম্।
যমং চতুর্দ্দিশো ভূত্বা ভয়দাং ক্রূররূপিণীম্॥
... ... মাতরং রুদ্ররূপাঞ্চ বরদাং ভজে।

মায়াদেবী ছায়ারই কনিষ্ঠা ভগিনী।

ছায়া-রূপাং কুমারীঞ্চ কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
রুদ্রস্য তনুজাং দেবীং দিব্যালঙ্কারভূষিতাম্॥
কুমারীমসুজাং দেবীং বরদামভয়প্রদাম্।
দ্বিভুজাং শ্বেতবর্ণাঞ্চ পট্টবস্ত্রাদিভূষিতাম্॥

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ) শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

কুড়ানো গান

(মহেন্দ্র ক্ষেপা)

কত উঠ্‌ছে আজব কারখানা
দিল-দরিয়া মাঝে।
ডুব্‌লে পরে রত্ন পাবি,
ভাস্‌লে পরে পাবি না।
দিলের মাঝে জাহাজ আছে
ন-জনা তার গুণ টানিছে,
ছ-জনা তার দাঁড় টানিছে,
হাল ধরেছে একজনা॥
দিলের ভিতর বাগান আছে,
তাতে নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
সৌরভে জগত মেতেছে,
আমার গোঁসাই মাত্‌ল না॥
দিলের ভিতর কমল আছে,
তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রয়েছে।
সেই তিনকে যে এক করেছে
তার বা কিসের ভাবনা॥

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ)

রমলা

(৯)

এইরূপে রজতের কয়েকদিন কাটিয়া গেল—সকালবেলা কাজী সাহেবের পোর্ট্রেট আঁকিয়া যোগেশ-বাবুর সঙ্গে ছবি আঁকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটিয়া যায়; দুপুরের কিছুক্ষণ মাধবীকে ছবি আঁকা শেখানো হয়, বাকী সময়টুকু রজত নিজের ঘরে বসিয়া আপন খুসিমত ছবি আঁকে বা লাইব্রেরীতে গিয়া ছবির বই দেখে, অলসভাবে কাটায়; সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রি একা বেড়াইয়া বাঁশী বাজাইয়া নভেল পড়িয়া কাটিয়া যায়।

ছবি আঁকা শেখানোর সময় মাধবী অতি আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই বলে না। মাঝে মাঝে দু'একবার পেন্সিল বা তুলির টানের মধ্যে তাহার কাচের মত স্বচ্ছ চোখ রজতের অগ্নির মত দীপ্ত চোখের উপর গিয়া পড়ে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তৃতীয় দিন একবার ও চতুর্থ দিন দুইবার রজতের আঙুলের সঙ্গে মাধবীর আঙুর-আঙুল নিমিষের জন্য ঠেকিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রজত কিছুই চঞ্চল হয় নাই। মাঝে মাঝে রজতের কথা শুনিতে শুনিতে মাধবী যেন তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য হারাইয়া ফেলিত, মাঝে মাঝে মনে হইত যেন তাহার মাথায় কিছুই ঢুকিতেছে না। হঠাৎ সে অতি শ্রান্ত বলিয়া, তাহার ছবি রজত কিরূপভাবে সংশোধন করিতেছে তাহা না দেখিয়া উঠিয়া যাইত, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিত।

মাধবীর জন্য রজতের মনে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য ছিল না; কিন্তু রমলা তাহাকে মাঝে মাঝে সত্যই চঞ্চল করিয়া তুলিত। রমলার সহিত বেশী মেশা যে মাধবী পছন্দ করে না তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল। ভদ্রতা-অনুসারে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কি কথা বলা যায়, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; সে যতই এটিকেটের পাহাড় তুলিয়া রমলার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহিত, ততই সে গিরিঝর্ণার মত কলগানে সব বাধা ভাসাইয়া দিত। রজত কাজীর ছবি আঁকিতেছে, সহসা সে ঘূর্ণীহাওয়ার মত কোথা হইতে আসিয়া কাজী-সাহেবের চেয়ার টানিয়া রজতের দিকে কটাক্ষ করিয়া

চলিয়া গেল; মাধবীকে ছবি আঁকা শিখাইতেছে, জানলা বা দরজার আড়াল দিয়া তাহার দুষ্টুমিভরা চাউনি সহসা জলিয়া উঠিল, কখনও বা ঘরে ঢুকিয়া মাধবীর ঘাড়ে ঝুঁকিয়া ছবি সম্বন্ধে অফুরন্ত মন্তব্য অনর্গল বকিয়া কোন কথা না শুনিয়া চলিয়া গেল। লাইব্রেরীতে রজত ছবি দেখিতেছে, সেও একখানি ছবির বই টানিয়া লইয়া কোন সূত্র ধরিয়া কয়েকমিনিট গল্প করিয়া চলিয়া গেল। তাহার সহিত যে কিরূপে মেশা যায় তাহা রজতের সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবার সুবিধা বা একা থাকিবার সুযোগ সে দিত না, দিতে কেমন ভয় করিত।

এখানে আসিয়া রজত খুব ভোরে উঠিত। তাহার ঘরের সম্মুখেই দিগন্তভরা প্রান্তর, তাহার একদিকে পাহাড়, আর-একদিকে শালবন; এই উন্মুক্ত পার্ব্বত্য-দেশে শিশির-ঝলমল উষায় অরুণোদয়ের শোভা তাহাকে প্রথম দিনেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

সেদিন ভোরে উঠিয়া লালরংএর আলোয়ানটা গায়ে দিয়া সামনের মাঠে সে বেড়াইতেছিল, তখন সূর্য্য ওঠে নাই, কয়েকটি তারা পশ্চিমদিকের পাহাড়ের মাথায় জ্বলিতেছে, রাত্রিশেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার স্নিগ্ধ আবরণের মত চারিদিকে ছড়াইয়া। চারিদিক স্তব্ধ; একটা কিসের শব্দে পিছনে মুখ ফিরাইয়া রজত দেখিল, দোতোলার ঘরে জানলা খুলিয়া মাধবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেই আলোছায়ায় তাহাকে মূর্ত্তিমতী উষার মত দেখাইতেছিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া রজত আবার পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই উষার আলোয় শুব্ধ স্নিগ্ধ উদার প্রান্তরের মধ্যে রজতের দীর্ঘ রঙীন দেহ, তাহার বিপর্য্যস্ত কালো কেশ, দীপ্ত চাউনি মাধবীর সদ্যজাগরণফুল্ল অন্তরে কি নেশার অরুণিমা ধরাইয়া দিল; তাহার বিজন যৌবন-পথ এই প্রথম পুরুষের পায়ের স্পর্শে যেন উষার আকাশের মত কাঁপিতেছে; ওই প্রান্তরের মত তাহার জীবন রিক্ত, উদাস, স্তব্ধ, শুভ্রকুয়াসায় ভরা পড়িয়া-রহিয়াছে;—প্রেমারুণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঙা-আলোময় পুষ্পেভরা গীতমুখর হইয়া উঠিবে। চকিতপদে সে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পূরবীসুরের মত কথাগুলি রজতের কানে বাজিয়া উঠিল,—আপনি এত সকালে উঠেছেন যে?

মাধবীকে তাহার পাশে দেখিয়া একটু চমকিয়া উঠিয়া রজত বলিল,—ভারি ভাল লাগে ভোরবেলাটা।

মাধবীর সমস্ত দেহ বেলফুলের মত সাদা শালে জড়ানো, সদ্যজাগরণফুল্ল মুখখানি বিকচপদ্মের মত অকারণ আনন্দে রাঙা, বিপর্য্যস্ত মুক্ত বেণী সাদা শালের উপর দুলিতেছে, কয়েকটি অলক কপোলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; দূর হইতে যাহাকে মূর্ত্তিমতী উষার মত বোধ হইয়াছিল, নিকটে সে নবরূপে প্রকাশিত হইল।

মাধবী দীপ্তকণ্ঠে বলিল,—ভারি সুন্দর ভোর বেলাটা!

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,—হাঁ, ভারি সুন্দর।

মাধবী কোন অজানা আনন্দের আবেগে বলিল,—চলুন না, ওদিকে একটু বেড়িয়ে আসি।

চলুন, বলিয়া রজত ধীরে তাহার পাশে পাশে চলিল। চারিদিক শান্ত, স্নিগ্ধ। এ পবিত্র স্তব্ধতা ভাঙিয়া কথা বলিতে কেহই পারিল না, দুইজনেই নীরবে চলিল। প্রান্তরের মধ্যে তিনখানি খুব বড় কালো পাথরের নিকট আসিয়া দুইজনে থামিল; পাথরগুলি শিশিরে ভিজিয়া গিয়াছে, মনে হয় তাহাদের বুক হইতে জল ঝরিতেছে; মাধবী একটা ছোট পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, রজত তাহার পাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, দূরে পাহাড়ের সারির পাশ দিয়া সূর্য্য উঠিতেছে। পূজার মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে পূজারী যেমন প্রতিমার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়ায় তেম্নি দুইজনে দাড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে চক্রবাল রাঙা করিয়া সূর্য্য উঠিতে লাগিল, ঘাসে ঘাসে পাথরে পাথরে শিশিরবিন্দু ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল, পাহাড়ে পাহাড়ে শালবনের অন্ধকারে হাওয়া জাগিয়া মাতামাতি সুরু করিল। সূর্য্য যখন সম্পূর্ণ উঠিয়া দিনের যাত্রা সুরু করিল, মাধবী একবার দীপ্তনেত্রে রজতের দিকে চাহিল, রজত দেখিল তাহার স্থির শুভ্র নয়ন আজ কি স্বপ্নের রংএ রাঙিয়া উঠিয়াছে।

পাথর হইতে নামিয়া একটু অস্বাভাবিক স্বরেই সে বলিল,—আচ্ছা, ওই শালবনটা কতদূর ?

—মাইল তিনেক হবে বোধ হয়।

—আচ্ছা, ওখানে গেলে চায়ের আগে ফিরে আসা যায় না ?

—তা যায়, কিন্তু আপনার জুতোটা যে রকম শিশিরে ভিজে গেছে,—

—ও, চলুন না, ওই শালবনটায় যেতে এত ইচ্ছে করে।

—চলুন—কিন্তু আস্‌বার সময় রোদ লাগ্‌বে।

—লাগুক, কিছু হবে না।

দুইজনে আবার নীরবে চলিল। মাঝে মাঝে দু'চারিটি অতি তুচ্ছ সামান্য কথাবার্ত্তা; কিন্তু এ নীরবতা যে কি ভাবাভরা তাহা কে বলিবে।

অবশ্য শালবন পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না, কিছুদূরে এক রক্তপদ্মভরা দিঘি ঘুরিয়া তাহারা বাড়ী ফিরিল। মাধবীর খুব ইচ্ছা হইয়াছিল কয়েকটি পদ্ম লইয়া আসে, কয়েকটি পদ্ম তটের অতিনিকটেই ফুটিয়াছিল; কিন্তু রজতকে তুলিয়া আনিতে বলা দূরে থাকুক, সে পদ্মগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করিতে পারিল না, পাছে রজত তাহাকে তুলিয়া দেয়। দুইজনে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন ঘাসে ঘাসে শিশির শুকাইয়া গিয়াছে, পাথরগুলি তাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চোখে আকাশের আলো তখনও পদ্মরাগে রঙীন।

সেদিন ছবি আঁকার সময় মাধবী বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল, আঁকা সম্বন্ধে তাহার অনেক প্রশ্ন করিবার ছিল, সমস্ত সকাল সেগুলি ভাবিয়া মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু রজতের সম্মুখে বসিয়া সব কথা গুলাইয়া গেল, প্রশ্নগুলি ভুলিয়া গেল, মুখের কথাও আটকাইতে লাগিল। আর রজতের কণ্ঠও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বিশেষতঃ যখন রমলা পাশের ঘরে কাজী সাহেবের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে হাসিয়া উঠিতেছিল। সেই হাসির স্বরে রজতের তুলির অতর্কিত আঘাত খাইয়া মাধবীর হাতের সোনার চুড়ি দুইবার সুমধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। সে দিন দুইজনে বহুক্ষণ খাটিল বটে, কিন্তু ছবি আঁকা বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইল না।

(১০)

পূর্ণিমার রাত্রি। নীলাকাশের তট ছাপাইয়া জ্যোৎস্না জুঁইফুলের অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই চন্দ্রালোক-উদ্বেলিত আকুল রাত্রির দিকে চাহিয়া রজত ঘরে থাকিতে পারিল না, পদ্মদিঘি তাহাকে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে টানিতে লাগিল। ধীরে সে বাঁশী লইয়া চুরুট টানিতে টানিতে সম্মুখের প্রান্তর পার হইয়া দিঘির দিকে চলিল।

দিঘির তীরে গিয়া রজত চুপ করিয়া বসিল। রক্তের মত রাঙা পদ্মগুলি লাল মণির মত জ্বলিতেছে, তাহার চারিদিকে জল গলিত হীরকস্রোতের মত টলমল করিতেছে, বাতাসে ফুলের ঝোপগুলি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, শালবনে বাতাস আনন্দ-বাঁশী বাজাইতেছে, পাহাড়গুলি স্বপ্নমায়ার মত দাঁড়াইয়া। ধীরে সে বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল, জ্যোৎস্না-আকুল রাত্রে বাঁশীর স্বর কোন্ জন্মজন্মান্তরের অনন্ত প্রেম-বেদনার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল; কত লক্ষ যৌবনের কত লক্ষ আশা, কে তাহাকে ভাষা দিবে!

বাঁশী যখন থামিল, প্রকৃতির স্তব্ধতা অতি অপূর্ব্ব বোধ হইল। সহসা সেই স্তব্ধতার বুক হইতে উৎসের মত কাহার হাসি ও করতালির ধ্বনি উৎসারিত হইয়া উঠিল, যেন একটা বড় কালো পাথরকে ভাঙিয়া ছুড়িয়া কে চারিদিকে টুক্‌রো টুক্‌রো হীরা মণি মাণিক্য ছড়াইয়া দিল। অতি আশ্চর্য্য হইয়া রজত চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, এখানে কে হাততালি দিল ? ক্ষণিকের মধ্যে যে তরুণীমূর্ত্তি জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, নিমেষের মধ্যে তাহাকে সে চিনিল,—সে রমলা। আর একটু দূরে চাহিয়া দেখিল, কাজীসাহেবের শান্তমূর্ত্তি; এত নিকটে তাহারা, অথচ সে লক্ষ্যই করে নাই।

পূর্ণিমা-নিশীথে বিনিদ্র কুহুর মত রমলা বলিয়া উঠিল,—ও, কি সুন্দর রাত, আর একটু বাজান না।

রজত নির্ণিমেষ নয়নে জ্যোৎস্নাধারায় ঝলমল নীল সিল্কের শাড়ীতে মণ্ডিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

আপনারা সকালে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, আমরা রাতে এলুম; ভাগ্যিস এসেছিলুম, তাই বাঁশী শুনতে পেলুম। বা, বাঁশী থামালেন যে,—বলিয়া রমলা একটা পাথরে বসিয়া পড়িল।

রজত বলিল,—অনেকক্ষণ বাজিয়েছি, তার চেয়ে আপনি একটা গান গান।

—আমার গান শোনেন নি, আমি মোটেই ভালো গাইতে পারি না, কিন্তু এম্নি রাতে গান গাইতে আপনিই ইচ্ছে করে।

—বিনয় করাটা গায়িকাদের দস্তুর, অনেকক্ষণ অনুরোধ না করলে—

—না, না, সত্যি আমি ভালো গাইতে পারি না।

এ কয়দিন ধরিয়া দুই জনের মনে যে রুদ্ধভাবের স্রোত জমিতেছিল, তাহা চন্দ্রালোকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কাজী সাহেব যে দূরে বসিয়া আছেন তাহা তাহাদের লক্ষ্যই রহিল না।

গান গাহিতে জানে না বলিল বটে কিন্তু অতি মৃদু কণ্ঠে রমলা গান ধরিল। একটি অতি পুরাতন হিন্দি গান, সে গান কে রচনা করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী কত গায়কগায়িকার অন্তর-ব্যথায় কত জ্যোৎস্না রাত্রির স্পর্শে মধুর করুণ।

গান শেষ হইলে রজত বলিল,—আপনাদের কলেজে হিন্দি গান শেখায়? বীঠোফেন বলুন আর বাখই বলুন, এই হিন্দি গান কিন্তু কানে সবচেয়ে ভালো লাগে।

—এ গানটা কাজী সাহেবের কাছে শিখেছি। কাজীকে দিয়ে একটা গজল গাওয়ালে হয়।

দুইজনে ফিরিয়া দেখিল কাজীসাহেব কোথাও নাই, তিনি এতক্ষণ ধ্যানরতের মত পাথরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন; এই আলো, ফুল, বাঁশী, গানে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল, যৌবনের গীতমুখর সুন্দরীখচিত প্রেমলীলাময় রাত্রিগুলি উপন্যাসরাজ্যের নায়িকাদের মত তাঁহার মনে পড়িতেছিল, নিশি-পাওয়া মানুষের মত তিনি সম্মুখের পথ দিয়া কোথায় যাইতেছেন।

রজত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কাজীসাহেব ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

যান না, ওপথ দিয়ে একটু ঘুরে গেলেই বাড়ী যাবার বড় রাস্তা। কি সুন্দর পদ্মগুলো!—বলিয়া রমলা জলের নিকট গিয়া কয়েকটি পদ্ম ছিঁড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। রজতও ধীরে উঠিয়া জলের ধারে তাহার কাছে গিয়া বসিল। এ কয়দিন দুইজনের মনে যে কথাগুলি জমিতেছিল, সেগুলি মুক্তধারার মত অন্তর হইতে বাহির হইতে চাহিল।

রমলা পদ্মগুলি দোলাইতে দোলাইতে বলিল,—দেখুন বইয়ে কত পদ্মের কথা পড়েছি, পদ্ম এঁকেছিও, কিন্তু সত্যি পদ্ম ছেঁড়া জীবনে এই বোধ হয় প্রথম। কল্‌কাতায় থাক্‌লে ফুলের নাম মুখস্থ করেই তৃপ্তি।—আপনার বাড়ীও ত কল্‌কাতায়?

—হাঁ, সেইখেনেই জন্ম।

—আচ্ছা, আপনার বাবা আছেন?

—না।

—মা?

—না।

—ভাই বোন?

—একটি ছোট ভাই ছিলো মারা গেছে, বোনও নেই।

—তবে আপনি একা, আমার মতনই কেউ নেই আপনার।

—কেউ না থাকারই মধ্যে।

ও!—বলিয়া রমলা সহসা থামিয়া পদ্মগুলির উপর জলের ছিটা দিতে লাগিল। জলবিন্দুগুলি মুক্তার মালার মত ঝকমক করিতে লাগিল। তাহার মনে যে-কথাগুলি কুঁড়ির মত জাগিতেছিল, রাঙাঠোটের বৃন্তে তাহা বিকচ হইল না। বস্তুতঃ, বিধাতা নারীকে ভাষা দিয়াছেন, মনের কথা বলিবার জন্য নহে, প্রিয় মিষ্টি কথা বলিয়া পুরুষের মনে আনন্দ সান্ত্বনা দিবার জন্য। অবশ্য প্রতি-নারী যদি তাহার মনের কথা সুস্পষ্টভাবে বলে তবে জীবনের দুঃখের বোঝা বাড়ে কি কমে তাহা বলা শক্ত। সে যাহাই হোক, রমলা তাহার মনের কথা বলিতে পারিল না। নানা খুঁটিনাটি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল।

মধুর হাসিয়া রমলা জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, আপনি কতদিন থেকে ছবি আঁক্‌ছেন ?

—মনে ত পড়্‌ছে না কতদিন থেকে। এ বিষয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করবেন জান্‌লে তারিখটা, মিনিট সেকেণ্ডটা পর্য্যন্ত লিখে রাখ্‌তুম। বোধ হয় ন'বছর বয়সের সময়, আমার এক মামা আমার জন্মদিনে এক আঁক্‌বার বাক্‌স দেন, সেইদিন থেকেই—

—আমার কিন্তু ছবি আঁক্‌তে মোটেই ভালো লাগে না, পারি না কিনা। আচ্ছা ওই পাহাড়টায় বেড়াতে গেছেন কোনদিন ?

—না, চলুন না, একদিন পিক্‌নিক্ করা যাক্ ওখানে।

—আজকের পুডিংটা কি বিচ্ছিরি হয়েছিলো! নয়? যা পুড়ে গেলো!

—না, বেশ হয়েছিল ত, কিন্তু কাল্‌কেরটা চমৎকার হয়েছিল!

- কি চমৎকার রাত! না? কিন্তু বোধ হয় অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।

— সুন্দর রাত, খুব বেশী রাত হয়নি, আচ্ছা চলুন, যেতে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে।

পদ্মগুলি নাচাইয়া কয়েকটি অলক মুখ হইতে সরাইয়া রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—না, মাঠ দিয়ে নয়, এদিকের রাস্তা দিয়ে যাবো, যে রাস্তায় এলুম সে রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে ভালো লাগে না।

দুইজনে নীরবে পাশাপাশি চলিল। পথের দুই পাশের গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো রাঙা-পথে-ছড়ানো অভ্রগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাস মাতিয়া উঠিয়াছে। দুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিল, মাঝে মাঝে দু'চারিটি ছোট ছোট কথা। সকালে মাধবীর সঙ্গে যাত্রার নীরবতার সহিত, সে প্রভাতালোকদীপ্ত স্তব্ধতার সহিত, এ স্তব্ধতার অনেক প্রভেদ। এ স্তব্ধতা যেন কি কল্লোলমুখর, অশ্রুতসঙ্গীতভরা, অসহনীয় সুখময়—সকল কথাগানের অবসান হইয়া শব্দের নীরব অতল পারাবারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জ্যোৎস্নাধারাধৌত তরুছায়াস্নিগ্ধ মর্ম্মরমুখর রক্তিম মায়াপথ দিয়া তাহারা দুইজনে যেন কত কাল চলিয়া আসিয়াছে, যেন কতযুগ চলিয়া যাইতে পারে। কেহ কাহারও মুখে চাহিতে সাহস করিল না, হাতে হাত ধরিতেও ইচ্ছা হইল না, অন্তরে অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। রঞ্জতের কাছে এরূপ স্তব্ধতা নূতন নয়, কিন্তু রমলা এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে যেন পুষ্পভরা লতার মত নত হইয়া পড়িতেছিল।

বাড়ীর সিঁড়িতে উঠিয়া জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া রমলা বলিল, অনেক রাত হয়েছে, যান শুয়ে পড়ুনগে।

ফুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে সে সিঁড়ি দিয়া রঙ্গীন মেঘের মত তাহার ঘরে চলিয়া গেল। মাধবী তখন তাহার ঘরে আলো জ্বালাইয়া 'ভ্রষ্টলগ্ন' পড়িতেছিল—

"ফাগুন যামিনী প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।"

হিন্দি গানটির সুর গুঞ্জরণ করিতে করিতে রমলা নিজের ঘরে ঢুকিল। এক কোণে আলো জ্বলিতেছে, এই ঘরটিকে এত অপূর্ব্ব কিন্তু এত ক্ষুদ্র তাহার কোনদিন বোধ হয় নাই। তাহার দেহের তট ভাঙ্গিয়া প্রাণ আনন্দের বন্যার মত এই জ্যোৎস্নালোকের সহিত মিশিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, এ ছোট ঘরে সে যেন থাকিতে পারিবে না। রমলা ড্রেসিংটেবিলের আয়নার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, নিজের মুখ চোখ কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিল, কবরী খুলিয়া চুলগুলি টানিতে লাগিল, ব্লাউসটা খুলিয়া আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া বসিল। জ্যোৎস্না দ্বারে প্রতীক্ষমানা ছিল, আলো নিভাইতেই ঘরে বর্ষার ধারার মত আসিয়া প্রবেশ করিল। রমলা উঠিয়া ঘরের সব জান্‌লা একে একে খুলিতে লাগিল, বহুক্ষণ দিগন্তে তাকাইয়া রহিল। আপনাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, দেহমনের এ অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ অজানা, বিশ্বের কোন্ রহস্যময় অজ্ঞাত স্রোত তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ভেল্‌ভেটিনের চটি-জুতো খুলিয়া আবার বিছানায় আসিয়া বসিল, এ রাতে যে ঘুম হইবে তাহার কোন আশা নাই; কি অজানা আনন্দময় বেদনা, দেহের রক্ত কোন্ রুদ্রতালে নৃত্য করিতেছে। সে রঙ্গীন আলোয়ানটা আন্‌লা হইতে মাথার বালিসের কাছে রাখিয়া একটি পদ্মফুল শুঁকিতে লাগিল। এই বিকচ পদ্মটি আপন গন্ধবর্ণের আনন্দময় অনুভূতিতে

জ্যোৎস্নালোকে যেরূপ শিহরিতেছিল তেমনি তাহার দেহ-মন শিহরিতেছে।

রজত নিজের ঘরে ঢোকেই নাই। তাহার ঘরের জান্‌লার ঠিক সাম্‌নে হাস্নাহানার খুব বড় ঝাড়। এই ঝাড়ের পাশ দিয়া দেয়াল বাহিয়া লতার কুঞ্জ রমলার ঘরের জান্‌লা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; সেই হাস্নাহানার ঝাড়ের সম্মুখে আসিয়া সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন্ অনন্তযৌবনা উর্ব্বশীর সন্ধানে তাহার শিল্পীপ্রাণ সাতরংএর আলোছায়ার রেখার পথ দিয়া তুলির টানে চলিয়াছে; বিশ্বকমলের সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাকে একবার দেখা দিবে না? সেই মানসসুন্দরী যদি এখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় --এই রংএর ছায়া এই আলোর মায়া নয়, রক্তমাংসে অনিন্দ্যসুন্দরী নারী হইয়া সে কি আসিবে না? জ্যোৎস্নাসমুদ্র মথিত করিয়া জলস্থলআকাশের সব সৌন্দর্য্য ছানিয়া পৃথিবীর সব মাধুরী চুরি করিয়া মধুর মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে না? নদীর গতি দিয়া ফুলের গন্ধ দিয়া বসন্তের আনন্দ দিয়া তাহার তনুর সৃষ্টি, তারাভরা নীলাকাশ তাহারই নীলবাস, তাহারই স্বপ্ন-অঞ্চল বনে পর্ব্বতে জ্যোৎস্নায় লুটাইতেছে, তাহারই অঙ্গের হিল্লোল নানা ভঙ্গে লতায় বাঁকিয়া পাতায় হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহারই দেহের সৌরভ পুষ্পে পুষ্পে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই চরণের চাঞ্চল্যে পথে পথে বাতাসের নৃত্য, তাহার টলমল ললিত যৌবন নদী-সরোবরে চলছল করিতেছে, পদ্মে পদ্মে তাহার আঁখির দৃষ্টি, এই স্তব্ধ রাত্রে নির্জ্জনগগনে কুন্দশুভ্র অনন্তযৌবনা একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে—সে কি রক্তধারার ছন্দে পুষ্পকোমলতনুতে মূর্ত্তিমতী হইবে না?

হাস্নাহানার ঝাড় সিন্ধুতরঙ্গের মত বাতাসে উদ্দাম হইয়া পড়িল, একটি কোকিল ডাকিয়া উড়িয়া গেল, রজত ফিরিয়া দেখিল, ঝাড়ের পাশে তাহার সম্মুখে রমলা দাঁড়াইয়া।

দ্রাক্ষারসভরা পেয়ালার মত তাহার চোখদুইটির দিকে চাহিল, নবসৃষ্টির স্বপ্নরহস্যময় মুখের দিকে চাহিল, রূপকথার রাজকন্যার মত তনুবল্লরীর দিকে চাহিল। এমনি উন্মুক্ত আকাশের তলে জ্যোৎস্নাশুভ্র শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে পৃথিবীর আদিম মানুষ নারীকে যেরূপে চাহিয়াছিল তেমনি চাহিয়া রজত একটু অগ্রসর হইল।

কিন্তু সে অসভ্যযুগের পর কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, কত সমাজ-গঠন, কত বিবাহপদ্ধতি, কত ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান মানুষ আপনগড়া নিয়ম-শৃঙ্খলে আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে কোন্ স্বপ্নদেশের দিকে চলিয়াছে। যে সিংহ-সর্পের দোসর ছিল, সে আজ শিল্পী। স্থির হইয়া রজত দাঁড়াইল, চিররহস্য-ময় তরুণীর কালো চোখ তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

হাস্নাহানার গন্ধে বাতাস সুধার মত সৌরভময় হইয়া উঠিল, ইউক্যালিপ্‌টসের মসৃণ পাতায় আলো ঝকমক্ করিতে লাগিল, লাল পথ গলিত স্বর্ণধারার মত জ্বলিয়া উঠিল, রং-বেরংএর ক্রোটনের সারিতে বর্ণের হোলিখেলা সুরু হইল, শালের বনে দুরন্ত বাতাসের মাতামাতি পড়িয়া গেল, উদার প্রান্তর ভরিয়া জ্যোৎস্না থমথম করিতে লাগিল, গন্ধে বর্ণে গীতে আলোক-সম্পাতে দুই তরুণ-তরুণীর চারিদিকে মায়ালোক সৃষ্টি হইল, দুইজনেই স্বপ্নমুগ্ধ দাঁড়াইয়া।

সহসা গোলাপকুঞ্জ হইতে একটি পাখী ডাকিয়া উড়িয়া গেল, একটি তারের ঝঙ্কার শোনা গেল। বহুদিন পরে কাজীসাহেব তাঁহার ধূলাভরা এস্রাজ লইয়া বাজাইতে বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্ত্ত-নাদের ধ্বনি উপরের ঘরে উঠিল,—"ভ্রষ্টলগ্ন" পাঠ শেষ করিয়া মাধবী জান্‌লার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একবার সে নিমেষের জন্য হাস্নাহানার ঝাড়ের দিকে চাহিল, তারপর বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ব্যথায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

স্বপ্ন টুটিয়া গেল, সঞ্চারিণী লতার মত রমলা চলিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত, কিন্তু সে নিমেষ অনন্ত ক্ষণ।

মাধবীর অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে কাজীসাহেবের এস্রাজ বাজিতে লাগিল, রজতের রক্তধারার ছন্দে গন্ধে-উদাস বাতাস বহিতে লাগিল, রমলার এই অজানা হর্ষশঙ্কা-ঝঙ্কৃত অন্তরবীণার মত তরঙ্গায়িত রক্তবর্ণ প্রান্তরে জ্যোৎস্নার ধারা অশ্রুত সঙ্গীত বাজাইতে

লাগিল। আর ঘরের অন্ধকারে বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে রজত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সাদা মার্ব্বেলের টেবিলের উপর একটি রক্তপদ্ম। চন্দ্রের চাহনিতে, পদ্মের পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, পদ্ম গন্ধে বর্ণে বিকসিত হইয়া উঠে, সেই সৃষ্টির বিকাশের আনন্দ সে তাহার দেহে মনে অনুভব করিতে লাগিল।

(১১)

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে নিশিজাগরণক্লান্ত-নয়ন তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু রমলা একবার রজতের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এ মুখ তাহার যেন নূতন দেখা! সকলেরই চায়ের কাপের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। সবাই চুপচাপ দেখিয়া যোগেশ-বাবু কথা সুরু করিলেন।

রজতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কাজীর পোর্ট্রেট শেষ হয়ে গেছে?—

আজ আধ ঘণ্টা বস্‌লেই হয়ে যাবে।

—তারপর, মাধু-মায়ের?

না, বাবা, আমার নয়, বলিয়া মাধবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। করুণকণ্ঠের সহিত এরূপ বিদ্রূপের দীপ্তসুর জড়ানো ছিল যে যোগেশ-বাবু তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ধীরে বলিলেন—তা হলে রমলা-মার?

রমলা কিছু উত্তর দিবার শক্তি পাইল না, শুধু ধীরে অসম্মতির ঘাড় নাড়িল। কাজীসাহেব একটু মুচ্‌কিয়া হাসিলেন। রজতের গণ্ড তরুণীর মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে ধীরে বলিল—আমি এক দিন বিশ্রাম নিয়ে আপনার ছবিই আঁক্‌তে আরম্ভ কর্‌ব।

যোগেশ-বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আচ্ছা। আবার সব চুপচাপ।

তৃতীয় কাপ চা শেষ করিয়া মাধবী বলিল—বাবা, আমি আর ছবি আঁক্‌ব না।

—কেন মা?

—ভাল লাগে না।

—বেশ, ভাল না লাগে শিখো না।

কাজীসাহেব দাড়িতে আঙুল সঞ্চালন করিতে করিতে আবার মৃদু হাসিলেন, সে হাসি তাঁহার দাড়ির তলায় চাপাই পড়িল। সেদিন চা খাওয়া খুব শীঘ্র শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গেল।

গেটের কাছে যে আমগাছ-তলায় রজত প্রথম মাধবীকে দেখিয়াছিল, সেই স্থানটি মাধবীর বসিবার অতি প্রিয় স্থান ছিল। কত উদাস দ্বিপ্রহরে, কত রঙ্গীন সন্ধ্যায় সে ওই জায়গাটায় একখানি বই হাতে করিয়া বসিয়া সুদূরে-হারা লালপথের দিকে চাহিয়া থাকিত। সেদিন সকালে সে একখানি টুর্গেনিভের নভেল লইয়া গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে গিয়া বসিল। সম্মুখে ঢেউ-খেলানো মাঠে আলো প্রখর, লাল রাস্তার দুইধারে সবুজ গাছের সারি বাতাসে করুণ সুরে দুলিতেছে; দূরে ধূসর পাহাড়, একটি গরুর গলার ঘণ্টার ক্লান্ত করুণ ধ্বনি কানে আসিতেছে, চারিদিকে পতঙ্গ-দলের গুঞ্জরণ, রুক্ষকঙ্করময় ভূমিতে মাঝে মাঝে ঘাসের সবুজ প্রলেপ—চারিদিকে শব্দে বর্ণে প্রভাত উদাস হইয়া উঠিয়াছে। গত প্রভাতে কি চাঞ্চল্য তাহাকে পীড়িত করিয়াছিল, আজ মাধবী তাহার স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা স্থির গম্ভীর। ধীরে সে বইয়ের পাতা উন্টাইতেছিল।

ভ্যক্—ভ্যক্—ফট্—ফট্—ফটাস্।

এক প্রচণ্ডশব্দে মাধবীর দিবাস্বপ্ন টুটিয়া গেল। দেখিল ঠিক তাহাদের গেট হইতে একটু দূরে একটি মোটর-কারের পিছনের টায়ার ফাটিয়া গেল। পায়ে শিকারীর গুলি খাইয়া বাঘ যেমন গর্জ্জিয়া ওঠে, তেমনি কয়েক বার গর্জ্জন করিয়া মোটরটা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত একটি যুবক একা গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল. সে গাড়ী হইতে নামিল, এবার গেটের দিকে অগ্রসর হইল। গেট পার হইয়া তাহারই দিকে আসিতে লাগিল।

মাধবী ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। যতীন মাধবীর সম্মুখে আসিয়া একটু হতভম্ব হইয়া গেল, সে গুডমর্ণিং করিবে, না নমস্কার করিবে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খাকী-রংএর হ্যাটটা একটু তুলিয়া মাথা একটু নত

করিয়া বলিল—Excuse me, এটা কি যোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী?

তাহার টুইড্ স্যুটের দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল—হাঁ।

—রজট রায় কি আছেন?

—আছেন, আসুন।

—ও থ্যাঙ্ক্‌স্।

ধীরে যতীন মাধবীর পিছন পিছন চলিল। সে এই সৌন্দর্য্যময়ীর সঙ্গে একটু মুস্কিলে পড়িল। নারীর জগৎ তাহার প্রায় অজানা; নারী সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করা সে নিষ্প্রয়োজন মনে করে, নারীদের কর্ত্তব্য বা অধিকার সম্বন্ধে তাহার কোন থিওরী বা মত নাই, আর নারীদের বুঝিবার দুরূহ চেষ্টা সে কোনদিন করে নাই। এ তরুণীর সহিত অকারণ আলাপ করিবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরূপ চুপচাপ যাইতেও অসোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। তীক্ষ্ণ চক্ষু দিয়া বাড়ীখানির গঠনপ্রণালী দেখিতে দেখিতে সে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা দোতালার জান্‌লায় আর-একটি তরুণীর হাসি-ভরা মুখ দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন দুলিয়া উঠিল।

রমলা আজ সকালে রান্নাঘরে যায় নাই, সে আপন ঘরে বসিয়া এক বন্ধুকে চিঠি লিখিবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিযুক্ত ছিল। চিঠিখানি সচিত্র,—কাজীসাহেব, মাধবী, এমন কি মনিয়ারও ছবি ও কথা বাদ যায় নাই; সে ইংরেজীভাষায় লিখিতেছিল বটে কিন্তু বাংলা অক্ষরে। তাহার কতকগুলি কথা পড়িলেই চিঠির ভাবটা বোঝা যাইবে—গ্লোরিয়াস্ নাইট, সিম্‌প্লি রিপিং, ড্রিমিং, নাইস্ কাজী, ইণ্টারেষ্টিং ইত্যাদি। চিঠিখানি লিখিয়া তাহার উপর হিজিবিজি কাটিতে সুরু করিল, হিজিবিজির রেখাগুলো মিলিয়া অনেকটা রজতের মুখের মত হইয়া উঠিল দেখিয়া সে কাগজখানিকে ছিন্ন করিয়া জান্‌লা দিয়া লতাকুঞ্জের উপর ফেলিয়া দিতেছিল, আর সচিত্র ছিন্নপত্রের লেখাগুলির ভাষা ভাবিয়া আপন খুসিতে হাসিতেছিল। যতীন তাহার ঐ হাসি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেল।

যতীনের মধ্যের ইঞ্জিনিয়ার মানুষটি এতক্ষণ বাড়ীখানি দেখিতেছিল, কিন্তু তরুণীর হস্ত ও বক্ষের ললিত গতি-ভঙ্গিতে মধুর হাস্যে তাহার অন্তরের প্রেম-তৃষিত মানুষটি জাগিয়া উঠিল। বাতায়নবর্ত্তিনী যখন অদৃশ্য হইল, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্বন্ধে সে সজাগ হইয়া সচকিত হইয়া উঠিল।

রজত ঘরে বহুক্ষণ বহু বিষয়ে মন দিবার চেষ্টা করিয়া অকারণেই বারাণ্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মাধবীকে ধীরে অচল গাম্ভীর্য্যে আসিতে দেখিয়া সরিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল যতীন পিছনে আসিতেছে। যতীন এত আনমনা হইয়া আসিতেছিল যে রজতকে দেখিতেই পায় নাই। মাধবী যখন রজতের দুয়ার দিয়া চলিয়া গেল, তখন রজতের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।

—হ্যালো রজট্!

—আরে, এসো, এসো। তারপর?

—তারপর আর কি? আস্‌ব বলে আস্‌ছি না দেখে নিশ্চয় গালাগাল দিচ্ছিলে, না হলে টায়ারটা ঠিক তোমার বাড়ীর সাম্‌নে এসেই ফাট্‌বে কেন?

রজত যতীনকে নিজের ঘরের দিকে লইয়া গেল। যতীনের দিকে এক গদিওয়ালা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া নিজে ক্রোটনের সারির সম্মুখে এক চেয়ারে বসিল। যতীন পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া নিজে এক সিগারেট ধরাইয়া রজতের দিকে চেয়ার টানিয়া রজতকে আর-একটা দিয়া টুপিটা খুলিয়া মেঝেতে রাখিয়া বলিল—তারপর রজট্, তোমায় বেশ improved দেখাচ্ছে হে! গাল দুটো গোলাপফুল হয়ে উঠেছে, বাড়ীখানা বেশ suit করেছে বলো?

—হাঁ, ভারি সুন্দর জায়গাটা। তারপর তুমি?

—ও, আমি ডাকবাংলায় আছি। কাল রাত একটার সময় এসেছি, আজ সকালে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে বেরুলুম, ঘোষের বাড়ীটা এই দিকেই শুন্‌লুম, মোটরটা কি ঠিক জায়গায় থাম্‌লো!

—গুপ্তধনের সন্ধানে বড্ড বেশী ছুটোছুটি কর্‌ছ, রাতারাতি লাখপতি হবে?

—ভাই, তুমিই আমার চেয়ে সাঁচ্চা জহুরী, রত্নের সন্ধান আগে থেকেই পেয়েছিলে! একেবারে দুই হীরে, সাত রাজার ধন কোনটি?

—ও, আস্‌তে না আস্‌তেই খোঁজ পেয়েছো! তুমি বোরিং না করেই খনির সন্ধান পাও বলো?

—না ভাই! এখানে একটু বোরিং কর্‌তে হচ্ছে, তা বুড়োর টাকাকড়ির সন্ধান কিছু পেলে?

—কি করে' জানি বল, retired I. C. S. কিছু বিশেষ নাও থাক্‌তে পারে, আর ছবি আঁক্‌তে এসেছি—

—বন্ধুর কাজটা একটু কর না। দেখ, তুমি একবার বলেছিলে, আমি যদি লাখপতি হই, আর তুমি যদি তোমার মানসীকে খুঁজে পাও, তবে আমি তোমার হিংসা কর্‌ব—কথাটায় কিছু সত্য আছে মনে হচ্ছে।

একটু অবাক্ হইয়া রজত বলিল—তাই নাকি, ওটা ত আমি তর্কের মুখে নিছক্ কবিত্ব করেছিলুম।

যতীনের মনে আজ কি স্বপ্নের রং ধরিয়া গিয়াছে। সে বলিতে লাগিল—না হে, এই যে ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা ঠিক টাকার জন্য নয়, ভাব্‌তে বস্‌লে এমন কি সুখ! কি জান, কি প্রাণের আগুন দেহে জল্‌ছে, ষ্টিম পাওয়ার তৈরী হচ্ছে, তার টানে কোথায় যে চলেছি—হাঁ, কি কথাটা বলেছিলে—?

—The girl of my heart's desire.

—হাঁ, সেই right girlকে না পেলে, বুঝ্‌লে—

—তুমি কি বুঝ্‌তে আরম্ভ কর্‌ছ নাকি?

এই দুই তরুণীর ক্ষণিক দর্শনে বাস্তবিক যতীনের মনে কি নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। এ যেন ইঞ্জিন-বয়লারের ভিতর কয়লা পুরিয়া আগুন জ্বালাইয়া ষ্টিম তৈরী করিতে সুরু না করিয়া কে সোনার তার জুড়িয়া সেতার বাজাইতে বসিল। একটা অস্ফুট 'হুঁ' করিয়া যতীন সিগারেট টানিতে লাগিল।

অৰ্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা ক্রোটন-গাছগুলির তলায় ফেলিয়া রজত বলিল—তুমি এই ছোটনাগপুরে সোনার খনি পেতে পার, কয়লার খনি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে হীরের খনি পেতে পার। কিন্তু right girl, বুঝ্‌লে, ওটা কপাল, জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। বিয়ে করাটা জানই ত জুয়াখেলার মত—

—না ভাই, এখনও জানিনি,—বলিয়া যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কি উঠ্‌লে যে?

—ভাই, সময় ত বেশী নেই, স্মিথের সঙ্গে engagement আছে, আধ ঘণ্টা বাদে। আবার মোটরটা ঠিক কর্‌তে হবে।

—তা হলেও যোগেশ-বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে' যাও।

—চলো।

ড্রয়িংরুমে ফার্সীপাঠ চলিতেছিল।

যতীন সশব্দে প্রবেশ করিতেই যোগেশ-বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রজত বলিল—ইনি আমার বন্ধু, যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

যোগেশ-বাবু বলিলেন—বসুন আপনারা, আপনার মোটরটাই কি—?

—হাঁ, আমার মোটরকার—আপনাদের এসে disturb কর্‌লুম, না?—বলিয়া যতীন বক্রদৃষ্টিতে কাজী সাহেবের দিকে চাহিল। কাজীও এই বাঙ্গালী সাহেবটির দিকে প্রসন্ন নেত্রে চাহিলেন না।

না, না, একটু কবিতা পাঠ হচ্ছিলো, শুন্‌বেন? বলিয়া যোগেশ-বাবু বাঁধানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিলেন।

কাজীসাহেব যোগেশ-বাবুর কথায় একটু বিরক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এই লোকটিকে কবিতা শোনাইতে তিনি মোটেই রাজী নন।

যতীন বলিল—না, না, কবিতা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না, ও রজতই ঠিক বুঝ্‌বে, আমরা কাজের লোক—

সহসা তাহার মুখের কথা থামিয়া গেল, সম্মুখের দরজা দিয়া মাধবী প্রবেশ করিল, নিমেষের জন্য মাধবীর চোখের কালো তারার উপর তাহার চোখ গিয়া পড়িল। মূৰ্ত্তিমতী কবিতা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মাধবী কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পিতার চেয়ারের নিকট আসিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল,—বাবা, রজত-বাবুর বন্ধু কি চা খাবেন?

কথাগুলি কিন্তু যতীনের কানে পৌঁছিল। অতি সাধারণ কয়েকটি কথা, কিন্তু প্রতি কথা গানের সুরের মত তাহার কানে বাজিয়া উঠিল।

যোগেশ-বাবু যতীনের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু যতীনের মুখে কোন কথাই যোগাইল না। সে বোধ হয় হতবাকই থাকিত। গুমোট আকাশে হঠাৎ ফুরফুরে বাতাসের মত রমলা ঘরে প্রবেশ করিল, কাহারও দিকে যেন না চাহিয়া সে বলিল,—একখানা মোটরকার আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে খালি পড়ে' রয়েছে, সেখানায় চড়ে' বেড়িয়ে এলে হয় না কাজী সাহেব?

যতীন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নবাগতার মুখের দিকে চাহিল, এ মুখ যেন তাহার পরিচিত। রমলাও তাহার চপলদৃষ্টি দিয়া যতীনকে বুঝাইয়া দিল তাহাকে সে চিনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিচয় এখন সবাইয়ের সম্মুখে জানাইতে সে মোটেই রাজি নয়। রমলার মনে পড়িল এই ছেলেটিই ত তাহার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, কতদিন তাহার দাদা ইহাকে তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াছে, সে পরিবেষণ করিয়াছে। তাহার দাদার বিলাত-যাত্রার পর যতীন রমলার কোন সন্ধান লয় নাই। কাজেই তাহাদের আর দেখা হয় নাই।

মৃদু হাসিয়া রমলা আবার বলিল,—আচ্ছা, রাস্তায় কুড়ানো unclaimed property ল' অনুসারে কার হয় কাকাবাবু? যে প্রথম পায় তার ত?

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,—ওটা unclaimed নয়, ওর স্বত্বাধিকারী এই সশরীরে, আমার বন্ধু—

—তাই নাকি, আমি ভেবেছিলুম দিব্যি লাভ হল, বিকেলে বেড়াতে যাওয়া যাবে—

যতীন বিনীতস্বরে বলিল,—তা ওটা আপনারই disposalএ রইলো। আপনি কোথায় বেড়াতে যেতে চান?

আপাততঃ এ দুপুর রোদে কোথাও যেতে চাই না, বলিয়া রমলা পিয়ানোর পাশে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিন টানিয়া লইয়া বসিল, এই সওয়া পাঁচ ফুট দীর্ঘ গাঁট্টাগোঁট্টা গোলগাল-মুখ বাঙ্গালীসাহেবটির প্রতি আর কোনরূপ মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ করিল না।

যোগেশ-বাবু ধীরে যতীনকে বলিলেন,—আপনি কোথায় আছেন?

—ডাক-বাংলোয়।

—দুপুরে এইখানেই খেয়ে যাবেন, মোটরটা ত অচল হয়ে পড়ে' রয়েছে।

মাধবী রজতের দিকে ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া বলিল,—আপনার বন্ধু এখানে খেয়ে যাবেন না?

রজত যতীনের দিকে ফিরিয়া বলিল,—যতীন, বেলা ত অনেক হয়েছে, আবার মোটর সারাবে—দুপুরে আমাদের এখানেই খেয়ে যাও।

রমলা দূর হইতে কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল,—আপনি এখানে খেয়ে গেলে মিস ঘোষ ভারি খুসি হবেন।

এইরূপ বলার ভঙ্গীটা মাধবীর মোটেই পছন্দ হইল না, তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

কাজী সাহেব ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—আপনার কি কোন কাজ আছে?

এরূপ অবস্থায় এরূপ ভাবে অনুরুদ্ধ হইলে কেহ খাইয়া যাইতে অসম্মত হইতে পারে কি না জানি না, যতীন অসম্মতি জানাইতে পারিল না। সে মাধবীর রাঙা মুখের দিকে নিমেষের জন্য তাকাইয়া বলিল,—না, কাজ আর কি, kindly যদি একটা চাকর দেন মোটরটা ঠিক করে' পথ থেকে সরিয়ে রাখি।

মাধবী ধীরে বাহির হইয়া গেল, যতীন সম্মুখের দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দুইজন কুলী লইয়া মনিয়া হাজির হইতেই যতীন উঠিয়া চলিয়া গেল। যোগেশবাবু স্নান করিতে বিদায় লইলেন, কাজীসাহেবও উঠিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে, জান্‌লার পাশে রমলাকে একা দেখিয়া রজতের হৃদয় দুলিয়া উঠিল, তাহার কেমন ভয় হইল, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারিল না। রমলার মরালগ্রীবার উপর ক্রীমরংএর ব্লাউজের প্রান্তরেখা কি সুন্দর, ঠিক তাহার উপর কালোচুলের খোঁপা সন্ধ্যাকাশে বিদ্যুৎভরা মেঘস্তূপের মত জমিয়াছে, সেই কবরীর রহস্যময় দিব্যশ্রীর প্রতি তাহার চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল।

রমলার মনে গতরাত্রের স্বপ্নের রেশ কয়েকখানি চিঠির পাতা ছিঁড়িয়া প্রায় কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার রজতের নিঃসঙ্গ আবির্ভাবে কি মায়া যেন তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। ধীরে দুইজনে দুই বিভিন্ন দুয়ার দিয়া দুইদিকে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন বিকাল বেলায় লাইব্রেরীতে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা-সভা বসিয়াছিল। আর্টের ধারার সহিত ধর্ম্মের ধারা মানব-ইতিহাসে কিরূপ মিশিয়া গিয়াছে; ভারতে বৌদ্ধযুগে, ইয়োরোপে মধ্যযুগে, এইরূপ এক এক যুগে এক এক দেশে ধর্ম্মের শিখায় আর্টের আরতি-প্রদীপ কিরূপ জলজল হইয়া উঠিয়াছে; তারপর অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তিতে ভারতের আর্ট গ্রীক রোমক আর্ট অপেক্ষা কোন্ উচ্চস্তরে গিয়া পৌছিয়াছে—এইসব নানা কথা রজত তাহার স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল। অজন্টা, সূর্য্য মূর্ত্তি, তাজমহল, এক একটি কথা উচ্চারণ করিতেই তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। মাধবী পিতার ডানপাশে এক কুশন-চেয়ারে বসিয়া চুপ করিয়া রজতের কথা শুনিতে-ছিল, শিল্পীর আনন্দোদ্ভাসিত কমনীয় মুখের উপর তাহার চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল। যোগেশ-বাবু মাঝে মাঝে একটু মন্তব্য দিয়া আলোচনাকে অগ্রসর করিয়া দিতেছিলেন। রমলা কিছুক্ষণ সে ঘরে ছিল। ছবি দেখিতে সে ভালোবাসে, কিন্তু ছবি সম্বন্ধে আলোচনা, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার সে বোঝে না, ভালোবাসে না। কিছুক্ষণ শুনিয়া শ্রান্ত হইয়া একতলায় ড্রয়িংরুমে সে পিয়ানো বাজাইতে গেল।

পিয়ানো বাজান কিন্তু বেশীক্ষণ হইল না। কিছুক্ষণ পরে যতীন আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই রমলা গান শেষ না করিয়াই পিয়ানো বন্ধ করিল। টুইড সুট বদলাইয়া মুর্শিদাবাদ-তসরের সুট গায়ে উঠিয়াছে। স্মিত-হাস্যে রমলা যতীনকে অভ্যর্থনা করিল বটে, কিন্তু এই হৃষ্টপুষ্ট ইঞ্জিনিয়ারটিকে পিয়ানো শোনাইবার ইচ্ছা তাহার মোটেই হইল না। বলিল,—আপনার বন্ধু ওপরে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।

—না, না, আপনি কেন উঠ্ছেন—আপনার দাদা ভাল আছেন? অনেকদিন দেখা হয়নি।

ভালই,—বলিয়া রমলা চুপ করিল। পুরাতন পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া আলাপ করা তাহার মোটেই ইচ্ছা নয়।

মৃদু হাসিয়া রমলা বলিল,—এর মধ্যে কাজ হয়ে গেল? আপনার ত অনেক কাজ, এত শীগ্গীর ছুটি?

—হাঁ, মোটরটা নিয়ে এলুম, কোথায় বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন?

—মোটর থাক্‌লে এখানে খুব বেড়াতে সুবিধা, আপনার বন্ধুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

মনিয়া ঘরের কোণে ফুলদানিতে নূতন ফুল সাজাইয়া রাখিতেছিল, রমলা তাহাকে বলিল,—এই, ওপরে গিয়ে খবর দিয়ে আয় ত।

মনিয়া বলিল,—কাকে?

রমলা অতর্কিতে বলিয়া ফেলিল,—দিদিমণিকে।

লাইব্রেরীতে আলোচনা-সভার সম্মুখে গিয়া মনিয়া তাহার নিজের বুদ্ধির অনেকখানি খরচ করিয়া বলিল,—দিদিমণি, আজকের সকালের সাহেব এসেছেন, ছোটদিদি-মণি আপনাকে বেড়াতে যাবার জন্য ডেকে পাঠালেন।

মাধবীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্নস্বরে বলিল,—বল্ গে, এখন সময় নেই।

মনিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। বহুক্ষণ পরে ড্রয়িংরুমে গিয়া খবর দিল, সবাই এখন গল্পে ব্যস্ত, কেউ আস্‌তে পারবে না।

বহুক্ষণ বসিয়াও রজত যখন নীচে আসিল না, তারপর উত্তর শুনিয়া রমলার কেমন রাগ হইল, সে ঝোঁকের মাথায় বলিল,—চলুন, আমরাই বেড়িয়ে আসি।

অতি অনিচ্ছুক হইলেও কাজী-সাহেবকে টানিয়া লইয়া রমলা যতীনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। কাজী-সাহেব পিছনে বসিলেন, রমলা যতীনের পাশে সাম্‌নে বসিল। এ যন্ত্র টানিলে কি হয়, ও যন্ত্র টিপিলে কি হয়, steering wheel কিরূপে ঘোরাইয়া মোটর কোনদিকে ঘোরাইতে হয়, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে হাস্যে পরিহাসে সে যতীনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। মোটরের বেগ যতই বাড়িতে লাগিল কাজী-সাহেবের মুখ ততই গম্ভীর হইতে লাগিল আর রমলার দেহ-মন ততই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

মোটরের গতি বৃদ্ধি হইতে ত্রিশ মাইল হইতে ষাট মাইল উঠিতে লাগিল, কাজী-সাহেব ঘন ঘন দাড়িতে হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, রমলার দেহ গতির আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

টার্নারের রংএর হোলিখেলা, হুইস্লারের বর্ণের কুজ্ঝটিকা, ডুলাকের রংয়ের রূপ-কথালোকের মধ্যে যখন এক তরুণ ও এক বৃদ্ধ বর্ণরসিক ডুবিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের পাশে তরুণীটির মন বার বার উদাস হইয়া উঠিতেছিল, এক মোটরের ভক্ ভক্ শব্দ বার বার বিদ্রূপের মত বাজিতেছিল।

ঝিল পার হইয়া বহুদূর ঘুরিয়া যখন রমলা বাড়ী ফিরিল, তখন রাত হইয়া গিয়াছে; গেটের নিকট রমলা ও কাজীকে নামাইয়া যতীন ডাকবাংলায় ফিরিল। কত জ্যোৎস্না রাত্রে কত বিজন দীর্ঘ-পথ-প্রান্তর পার হইয়া তরুর ছায়ায় ছায়ায় হাওয়ার সহিত পাল্লা দিয়া সে মোটরকার হাঁকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু মোটর চালানোয় এমন মাধুরীর স্বাদ সে কখনও পায় নাই। এই জ্যোৎস্না-বিজড়িত সুখ-স্বপ্নকে সে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহিল না।

ডাকবাংলায় গিয়া যতীন ইজিচেয়ারটা বারান্দায় বাহির করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কাটাইল। প্ল্যান আঁকিতে, এষ্টিমেট কষিতে, যন্ত্র ফিট্ করিতে, মোটরে ঘুরিতে তাহার অনেক রাত জাগিয়া কাটিয়াছে, কিন্তু অকারণে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রাত কাটানো তাহার জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম। হাস্নাহানার সৌরভ-ভরা বাতাস বড় মিঠা লাগিল। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি সে উদাসীন, আজ হৃদয়ের কোন্ নিভৃত পথ মুক্ত হওয়াতে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী তাহার সমস্ত হৃদয় জয় করিয়া জুড়িয়া বসিল। তাহার বিরুদ্ধে বাধা দিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাহার রহিল না। দুইখানি মুখ বার বার জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কে তাহার প্রেমিক-হৃদয় জাগাইয়াছে, তাহা তর্ক করিয়া বিচার করিবার ইচ্ছা নাই। অপরিসীম সুখ, অজানা বেদনা—বিশ্বের যে সৃষ্টি-শক্তি প্রজাপতির পাখা রঙীন করিয়া, ফুলের বুকে মধু ঢালিয়া, পাখীর কণ্ঠে গান ভরিয়া, নারীর নয়নে মায়ার ফাঁদ পাতিয়া নব নব জন্মের ধারা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই রূপ-মায়ার জালে আজ সে ধরা পড়িয়াছে। ইহা হইতে ত্রাণ কোথায়? ললিত গতি, চকিত চাহনি, দীপ্ত সৌন্দর্য্য, কথার সঙ্গীত, শাড়ীর খস্‌খস্, আঙ্গুর-আঙ্গুলের স্পর্শ, কেশের সৌরভ—এ মায়াজাল হইতে সে মুক্তি চায় না। ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্, লোহার ঝন্‌ঝন্, কল-দেবীর সঙ্গীতই এত দিন তাহার কাছে মধুর লাগিয়াছে, তরুণীর সামান্য কথায় এত মাধুর্য্য কোথায় লুকানো ছিল!

যতীন যখন মাধবী ও রমলার কথাগুলি ভাবিতেছিল, রজতও তাহারই মত জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া বারান্দায় বসিয়া ছিল। তাহার কবিবন্ধুর কথা মনে পড়িল, সে একবার বলিয়াছিল, যে বলে আমি তোমাকে আজীবন ভালবাস্‌ব, সে ভাবের ঘোরে মিথ্যে কথা বলে। চিরকাল ভালবাস্‌ব, এমন প্রতিজ্ঞা কেউ কর্‌তে পারে না। মানসীর যে রূপ দেখে প্রেমের পদ্ম পাপ্‌ড়ির পর পাপ্‌ড়ি মেলে বিকশিত হয়, সে রূপ ম্লান হলে, অমৃতের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে পদ্ম শুকিয়ে ঝরে' পড়ে। ফুলকে চির অম্লান রাখ্‌বার দুঃসহ চেষ্টা করে বলে' চারিদিকে দেখ ভালোবাসার ভণ্ডামি। আমি অবশ্য সত্যি প্রেমিকের কথা বল্‌ছি, সে বল্‌তে পারে না আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালো-বাসি, কেননা সে প্রেমের হিসাব রেখে তুলনা দিয়ে কথা বল্‌তে জানে না। প্রেমের পদ্মই আমাদের ভাগ্যে জোটে, চির অম্লান পারিজাতের সন্ধান কে পেয়েছে?

রজত ভাবিতেছিল, সত্যই প্রেম এমন ফাঁকি এ চির-চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর প্রেম লইয়া সে কি করিবে?

কাজীসাহেব তখন তাঁহার ঘরে পড়িতেছিলেন—

সাকী বেয়ার্ বাদহ্ কে আমদ্ জমান্-ই-গুল্।
তা বশ্-কুনীম্ তৌবাহ্ দিগর্ দর্-মিয়ান-ই-গুল্॥

(ক্রমশ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা-সংস্কার

স্ত্রীশিক্ষা ও গার্হস্থ্য জীবন

স্ত্রীশিক্ষা, আমাদের দেশে, একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব জীবনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় বালিকাদিগের বাস্তব জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। আমাদের দেশে বালক ও যুবকদিগের দৈনন্দিন জীবনের সহিত বালিকা ও যুবতীদিগের দৈনন্দিন জীবনের একটা বিশিষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। স্ত্রীশিক্ষায় সেটি অস্বীকার করিয়া, পুংশিক্ষার অনুকরণে স্ত্রীশিক্ষা ও শিক্ষায়তনগুলি পরিচলিত হয়। এরূপ চেষ্টার ফলে স্ত্রীশিক্ষা অনুন্নত ও কুপথে পরিচালিত। বালিকাদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন যথার্থ ভাবে যাপন করিবার যোগ্যতা দিবার নিমিত্ত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি উক্ত উদ্দেশ্যের অনুকূলে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

এই দৈনন্দিন বাস্তব জীবনটি কি, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য মাত্র। বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মাতৃত্বই যে কামিনীকুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশিষ্টতা, গৃহই যে তাঁহাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র, এবং গার্হস্থ্যজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই যে তাঁহাদের যথার্থ জীবনাদর্শ,—বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা পরিচালনে, এই কয়টি কথা, বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে।

শিক্ষাসংস্কার।

আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার আমূল সংস্কার আবশ্যক। শিক্ষার উদ্দেশ্য, যে উপায়গুলি অবলম্বন করিলে এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পাবে, এবং কি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে স্থিরীকৃত উপায়গুলির ভিতর দিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে,—এই-সমস্ত সমস্যাই নূতন করিয়া ভাবিয়া লইতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার খুব কম। যাহাতে অল্প আয়াসে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, সেই নিমিত্ত, স্ত্রীশিক্ষা-বিধানে আমাদের দেশীয় জীবনের সনাতন বিশিষ্টতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, উন্নততম দেশের উৎকৃষ্টতম প্রণালীগুলি ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে।

দেশীয় জীবনের বিশেষত্ব।

ধর্ম্ম, শান্তি ও সংযম আমাদের জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা। ত্যাগ, প্রীতি ও ভক্তিই ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ, কর্ম্মময় শান্তি-পূর্ণ নিরুদ্বেগ জীবনই গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ, এবং সংযমের দ্বারা অভাব নিরাকরণই হিন্দু সভ্যতার মূল ভিত্তি। যেখানে পাশ্চাত্য জগৎ নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া, এই অভাব মোচনের অনায়াস-সাধ্য উপায়-উদ্ভাবনই সভ্যতার মূল লক্ষণ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে, সেইখানেই দেশীয় শিক্ষায় তাহার বাহ্য অনুকরণের ফলে বিলাসিতা বৰ্দ্ধিত হইয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল হইতেছে, এবং জাতীয় জীবন অশান্তি ও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বালক ও যুবকদিগের শিক্ষায়, আমরা এই দিকে এতটা অগ্রসর হইয়াছি, যে পশ্চাৎ-অবলোকনের সময় আসিয়াছে। এই বিষকে বিষ জানিয়া স্ত্রীশিক্ষায় পরিত্যাগ করিতে হইবে; এবং শিক্ষাকে ভক্তি ত্যাগ ও সংযমের পবিত্রতায় মহীয়সী করিয়া তুলিতে হইবে। এই কারণে পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ-ভূষা ইত্যাদি বিলাসিতার বাহ্য বাহনগুলির সম্বন্ধে প্রত্যেক মহিলা-বিদ্যালয়ে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষায় স্বাধীনতা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন বর্গের (class) শিক্ষা, এবং বর্গের শিক্ষা সমষ্টির শিক্ষা। কিন্তু রোগ-নিরাকরণে চিকিৎসা যেমন ব্যক্তিগত, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও সেইরূপ ব্যক্তিগত শিক্ষা। ইহাই শিক্ষা বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আবিষ্কার। প্রত্যেক বালক ও প্রত্যেক বালিকাকে পৃথক্‌ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা না থাকিলে, ব্যক্তিগত শিক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। সকল বালক-বালিকা শিক্ষা-ক্ষেত্রে নিজের শিক্ষা নিজেই পরিচালিত করিবে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা এ বিষয়ে প্রয়োজন-মত সাহায্য প্রদান করিবেন। এক কথায়, স্বশিক্ষাই (auto-education) শিক্ষার একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী, এবং সার্থক শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের দেশে, যেরূপে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্গ সংগঠিত হয়, তাহাতে শিক্ষায় স্বশিক্ষা-তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। বিভিন্ন বর্গের বিষয়-নির্ঘণ্ট (curriculum) ও পাঠ-সূচী (syllabus) প্রস্তুত করিবার সময় আমরা কতকটা অভিজ্ঞতা, এবং বেশীর ভাগ কল্পনার সাহায্যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্গের জন্য ছাত্র-ছাত্রীর একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অনুমান করিয়া লই। মনে করি যে এই বয়সের সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দ্ধারিত বিষয়-নির্ঘণ্ট ও পাঠসূচী এক বৎসরের ভিতরই সমাপন করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে বর্গগুলি গঠিত হয়। কিন্তু এরূপ বর্গ-বিভাগ (classification) কেবল সমষ্টিগত শিক্ষার উপযোগী। ইহা দ্বারা সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন ছাত্রদিগের ততটা অপকার হয় না, কিন্তু যাহারা অসাধারণ অর্থাৎ যাহারা স্বল্পবুদ্ধি অথবা উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহাদের প্রভূত অপকারের সম্ভাবনা রহিয়া যায়।

এইরূপে গঠিত এক-একটি বর্গ পাঠোন্নতির দিক দিয়া পরবর্ত্তী বর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সকল প্রকার ছাত্র-ছাত্রীর এক বৎসরের ভিতর নিজ নিজ বর্গের পাঠ সমাপ্ত হইবার কথা, কিন্তু যাহারা স্বল্প-শক্তি-সম্পন্ন, তাহারা এক বৎসরে সমস্ত বিষয়ের পাঠ সমাপন করিতে পারে না। সেই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক-এক বর্গে একাধিক বৎসর যাপন করিতে হয়। অপর পক্ষে যাহারা উৎকৃষ্ট-ধী-শক্তি-সম্পন্ন, তাহারা অনায়াসে এক বৎসরের ভিতর বর্গের পাঠ সমাপন করিতে পারে। এরূপ ছাত্র যদি সুযোগ পায় তাহা হইলে এক বৎসরের কম সময়ের মধ্যেও নির্দ্দিষ্ট পাঠ শেষ করে। প্রচলিত সমান্তরাল পরস্পর-বিরোধী বর্গ-বিভাগ (parallel classification) তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, বর্গের নির্দ্দিষ্ট পাঠ-সমাপ্তি বিষয়ে তাহারা কোন সময়ে তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ পায় না।

বর্গগুলি এরূপ সমান্তরাল ভাবে গঠিত থাকিলেও, শিক্ষার সময় যদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাদিগকে পাশাপাশি রাখিয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য লম্বভাবে নূতন রকমে বর্গগুলি গঠিত হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত শিক্ষার পথ সুগম হয়। এরূপ বর্গ-বিভাগকে পার্শ্ব- অথবা লম্ব-অভিমুখীন বর্গ-বিভাগ (lateral or vertical classification) বলা হয়। এইরূপে বিভক্ত বিভিন্ন বর্গে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; এবং একই বর্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের ছাত্র একই সময়ে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্যের অনুযায়ী একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আয়ত্ত করিবার সুযোগ লাভ করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা-কর্ম্ম সম্পাদিত হইবার সুযোগ থাকিলে ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং বিভিন্ন শক্তি-সামর্থ্যের অনুযায়ী স্বশিক্ষা সম্ভব হয়। শ্রীমতী মন্তেসরী তাঁহার শিশু-আশ্রমে (Children's House) অনুরূপ প্রণালীতে শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করেন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শ্রীমতী পার্ক্‌হার্ষ্ট্ নিউইয়র্কের অনেকগুলি বিদ্যালয়ে এরূপ বর্গবিভাগ পরীক্ষা করিয়া আশাতিরিক্ত সুফল লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও অনেকগুলি বিদ্যালয়ে এরূপ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষক সমাজে প্রণালীটি ডাল্‌টন্-প্রণালী অথবা ডাল্‌টন্-বীক্ষণাগার প্রণালী (Dalton Laboratory Plan) নামে পরিচিত।

নব-সংগঠন।

প্রকৃতির লীলাভূমিতে ব্যক্তির বিশিষ্টতা একটি বিশেষ ধর্ম্ম। জীবে জীবে, মানুষে মানুষে, শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়া পার্থক্য খুব স্পষ্ট। এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া লইয়া শিক্ষা পরিচালন করা উচিত। এরূপ পার্থক্য-বশতঃই সকল বালিকা ও সকল যুবতী সকল স্তরের শিক্ষার উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ে নামে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদিগের শক্তি-সামর্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবিষয়ে অনুমান কল্পনা ও "আন্দাজ"ই শিক্ষার নিয়ামক। গত বিশ বৎসরে এবিষয়ে মনো-

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টান্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংস্কৃত, বিনে-সাইমনের বুদ্ধি-পরীক্ষার (Intelligence Tests) প্রণালীর সাহায্যে, এখনই বৈজ্ঞানিক উপায়ে বালক-বালিকাদিগের বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ, বস্তু-তন্ত্র-পরিমাণক্রমের (Objective Measuring Scale) সহায়তায় বুঝিয়া লইবার উপায় হইয়াছে। এই প্রণালীর সাহায্যে তাহাদের বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ করিয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে কে কতদূর অগ্রসর হইবার উপযুক্ত তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। নির্ণীত হইয়াছে যে, যে-সকল বালক-বালিকার বুদ্ধির গুণ্য (Intelligence Quotient) ৭০ হইতে ৮০র ভিতর তাহারা স্বল্পবুদ্ধি—তাহাদের জন্য সাধারণ শিক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া কর্ম্ম বা বৃত্তি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক; যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ৮০ হইতে ৯০এর ভিতর তাহারা নির্ব্বোধ—তাহারা বিশেষভাবে কেবল নিম্ন-শিক্ষার উপযুক্ত; যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ৯০ হইতে ১১০এর ভিতর তাহারা সাধারণ-বুদ্ধি—তাহারা মধ্য-শিক্ষার চরম সীমায় উপনীত হইবার উপযুক্ত; এবং যাহাদের বুদ্ধির গুণ্য ১১০এর অধিক তাহারা উৎকৃষ্ট-বুদ্ধি—কেবল তাহারাই উচ্চস্তরের প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যখন খুব অল্প, তখন মন্তেসরীর প্রণালী, ডাল্‌টন্‌-প্রণালী, বুদ্ধি-পরীক্ষা, ইত্যাদি উপায়ে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে অধিকতর সুফল লাভ হয় তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। আমাদের দেশে শিক্ষার এরূপ উন্নতি-সাধনে সমর্থ শিক্ষক ও শিক্ষাপরিচালকের সংখ্যা খুব নগণ্য বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই নিমিত্ত ইটালীতে শ্রীমতী মন্তেসরীর নিকট এবং যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টার্‌মান ও নিউ ইয়র্কের শ্রীমতী পার্ক্‌হার্ষ্টের নিকট, কএকজন উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষা-পরিচালন, বুদ্ধি-পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য প্রেরণ করিলে, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া, স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

স্ত্রীশিক্ষার স্বরূপ।

আমাদের স্ত্রীশিক্ষা সাধারণতঃ উপার্জ্জনের জন্য নয়। মানসিক উৎকর্ষ এবং গৃহকার্য্যে দক্ষতালাভ—এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু মানসিক উন্নতি ও সাংসারিক কর্ম্মে দক্ষতা-লাভ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, চিত্তবিনোদন, এবং সৌন্দর্য্য উপলব্ধির উপযুক্ত শিক্ষা বাদ দিলে চলিবে না। এরূপ চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যও পণ্ড হইবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ শিক্ষাই দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ স্বরূপ। এই কারণে অন্যান্য শিক্ষার সহিত প্রাত্যহিক ব্যায়াম, ক্রীড়া, নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, ধর্ম্মসঙ্গীত, এবং চিত্রাঙ্কন সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষার সকল স্তরের বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দৈহিক শিক্ষা।

এই তালিকার একটি বিষয় সম্বন্ধে একটু আপত্তি উঠিবার কথা। মুগুর ভাঁজা, ডাম্‌বেলের কস্‌রৎ, ফুটবল, ক্রিকেট্‌, ইত্যাদি স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গ হইতে পারে না, এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এরূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া দেশীয় স্ত্রীলোকের উপযোগী করিয়া তুলিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে; এবং এরূপ চেষ্টার ফলে, নৈষ্ঠিক সমাজে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক ও ভ্রান্ত ধারণা অনুমিত হইতে থাকিলে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমাদের একটা বিদ্রোহের ভাব আসার সম্ভাবনা খুব অধিক। কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক উন্নতির জন্য এবং এমন কি চরিত্র ও আচরণের উৎকর্ষ সাধনে, ব্যায়াম ও ক্রীড়ার খুব প্রয়োজন। আমাদের দেশের বালিকারাও নানাপ্রকার দেশীয় ক্রীড়ায় যোগদান করে; এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায়, যে-সকল বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য ক্রীড়া প্রচলিত আছে, তাহার বিবরণ সংগৃহীত হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, এইসকল দেশীয় ক্রীড়া দেশীয় জীবনের সহিত বেশ খাপ খায়। কপাটি, বুড়ীবসা (বৌছি), নুনধান্যা (লবণ-কোট), কাণামাছি, কাগের ঠেং, গম্‌ গুম্‌, বুড়ী ছুড়ী, ইত্যাদি গ্রাম্য ক্রীড়া কিছু কিছু সংস্কৃত করিয়া, স্ত্রীশিক্ষার

সহিত নিয়মিতভাবে সংযোগ করিয়া দিলে, মেয়েদের অশেষ কল্যাণের কারণ হইতে পারে। বিদেশী ক্রীড়ার মধ্যে, ব্যাড্‌মিন্‌টন, কিছু কিছু লন্‌টেনিস ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের ক্রীড়াগুলি স্থল-বিশেষে স্ত্রীশিক্ষার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, এবং বোধ হয় এরূপ সংযোগ আপত্তিকর হইবে না।

নীতি শিক্ষা ও ধর্ম্মাচরণ।

নীতি শিক্ষা, ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, এবং ধর্ম্মাচরণ সবগুলিই ধর্ম্মশিক্ষার অন্তর্গত। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়-নির্ঘণ্টে এইটিকে প্রধান স্থান প্রদান করিতে হইবে, এবং প্রথম হইতেই ব্যবহারিক শিক্ষার দিক দিয়া ধর্ম্মাচরণের উপুর ঝোঁক দিতে হইবে। শৈশব-শিক্ষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কোরান প্রভৃতি গল্পচ্ছলে বালিকাদিগের নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং সময় সময় সহজ ভাষায় লিখিত এইসকল বিষয়ের গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। ধর্ম্মোৎসব, পার্ব্বণ ইত্যাদিতে যাহাতে তাহাদিগের ভিতর আচরণের সাহায্যে অতর্কিতভাবে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়, তাহার দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং সহজ সহজ নৈতিক উপদেশগুলি যাহাতে রীতিমত প্রতিপালিত হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নিয়মিত পূজা, স্তোত্র পাঠ, ধর্ম্মসঙ্গীত, এবং বিভিন্ন বয়সোপযোগী ব্রত আচরণ—ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ সহায়। সেই নিমিত্ত এদিকেও বিদ্যালয়ের দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখা উচিত, যে, গৃহের সহিত বিদ্যালয়ের সহযোগিতা ব্যতিরেকে ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে না। যাহাতে এই সহযোগিতা লাভ হয়, পরীক্ষা দ্বারা তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা খুব সহজসাধ্য নয়। এবিষয়ে ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়া, ধারাবাহিক পরীক্ষার সাহায্যে সফলতা ও সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

চিত্তবিনোদনের উপযোগী শিক্ষা।

সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চিত্তবিনোদনের ও অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারে এই শক্তির পরিপূর্ণ সার্থকতা। গৃহই আমাদের অবসর-নিবাস;—আমাদের সমাজ-সংস্থানে ইহাঁ যেমন সত্য, বোধ হয় অন্য কোন দেশে সেরূপ নয়। অবশ্য গৃহে আমাদের মজ্‌লিস্‌ আছে, কিন্তু গৃহের বাহিরে আমাদের ক্লাব্‌ নাই। এই গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপা ললনাকুলই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহারা যদি চিত্তবিনোদনের উপায়গুলির কোন-একটি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, সংসারাশ্রম ভূস্বর্গে পরিণত হয়। সমাজ-সংস্থানে এবং জাতীয় জীবন গঠনে, এরূপ শান্তি-বিধানের সার্থকতা কম নয়। এই কারণে সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত একটি অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

শিক্ষার অবলম্বন।

খুব দুঃখের বিষয় যে নানা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে বাংলা দেশের শিক্ষা-বিধানে ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া পাঠ্য-তালিকা গঠিত হয়। উক্ত ভাষা স্ত্রীশিক্ষাতেও একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। স্ত্রীশিক্ষার সকল স্তরে,—আদ্য, মধ্য, ও অন্ত্য শিক্ষায়, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থান অধিকার করা উচিত। এই মাতৃভাষাই সকল বিষয়েই এবং স্ত্রীশিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষার আলম্বন (medium of instruction) হইবে। যদি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে, যথোপযুক্ত মানসিক উৎকর্ষ ও কর্ম্মকুশলতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে বাংলার বালিকা ও কুমারীদিগকে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া, চিন্তা করিতে শিখাইয়া, যথার্থ উন্নতিলাভের অবসর দিতে হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "দি সেণ্টার অব্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ কাল্‌চার" (The Centre of Indian Culture) নামক পুস্তিকায় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই সংশিক্ষার চরম তত্ত্ব। সম্প্রতি ইংলণ্ডে মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটি রাজকীয় কমিশনের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই সারগর্ভ সত্য তত্ত্বটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মাতৃদুগ্ধেই যেমন শিশুর পুষ্টি, মাতৃভাষাতেও তেমনি জাতীয় অন্তরের পরিপূর্ণ বিকাশ। আমাদের স্ত্রীশিক্ষায় এই ভাষাকে খুব

প্রথম হইতেই উচ্চস্থান প্রদান করিতে হইবে। স্কুলপাঠ্য "ফরমাসে" সাহিত্যের হাত হইতে যত শীঘ্র মুক্তিলাভ হয়, ততই মঙ্গল। এই মাতৃভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষার মধ্য ও অন্ত্য স্তরে, সর্ব্বপ্রধান শিক্ষণীয় বিষয় থাকিবে, এবং শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্তরেও ইহার ভিতর দিয়াই উচ্চতর ও উচ্চতম জ্ঞানসঞ্চয়ের পন্থা সুপ্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। প্রথম প্রথম কোন কোন স্তরে পুস্তক ও শিক্ষকের অভাব অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু এই অভাব তীব্র ও সত্য না হইলে অভাব পূরণ কোনকালেই পর্য্যাপ্ত হইবে না।

প্রশস্ত শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার নানা অন্তরায়।

মাতৃভাষা ও সাহিত্য মানসিক উৎকর্ষ লাভের উৎকৃষ্ট উপায় হইলেও, এরূপ উন্নতির জন্য জ্ঞানমূলক শিক্ষার বিষয়গুলি বহুবিস্তৃত। বিষয়গুলির নির্ব্বাচনে স্ত্রীশিক্ষা ও পুংশিক্ষার সাধারণত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। মাতৃভাষা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রাচীন ভাষা, আধুনিক ভাষা, প্রভৃতি বিষয় উভয় প্রকার শিক্ষার অন্তর্গত। কিন্তু বাংলাদেশের বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বিষয়-নির্ঘণ্ট একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে মানসিক উন্নতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান প্রতিপালন, রোগ শুশ্রূষা এবং গৃহস্থালীর নানা কর্ম্মে দক্ষতালাভই স্ত্রীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পর্দ্দা বাঙালি মহিলাদিগের জীবনের সঙ্গী, খুব অল্প বয়সেই তাঁহাদের বিবাহ হয়, এবং বিবাহ হইলেই শিক্ষায় নানা ব্যাঘাত জন্মে। সাধারণতঃ বিবাহের বয়স দশ হইতে বারো বৎসর। কলিকাতার মত স্থানে এবং পল্লী-অঞ্চলের কোন কোন শিক্ষিত পরিবারে এই বয়স নানা কারণে বর্দ্ধিত হইলেও, ইহা সমাজের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বোক্ত রূপ। এই অন্তরায়গুলি স্বীকার করিয়া লইয়া, স্ত্রীশিক্ষা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর।

স্ত্রীশিক্ষার উপরি-উক্ত অন্তরায়গুলি এবং আনুষঙ্গিক অপরাপর সমস্যা আলোচনা করিয়া, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠ্য-তালিকার সংস্কার করিতে হইলে, আলোচনা জটিল হইবার কথা। সেই কারণে স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্ন ও আনুষঙ্গিক অপরাপর সমস্যা মনে রাখিয়া, বিভিন্ন স্তরের বিষয়-নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া, বিষয় নির্ব্বাচন সংক্ষেপে আলোচনা করাই সুবিধাজনক। সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক-মত অন্যান্য সমস্যাও আলোচিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ চেষ্টার পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি সম্বন্ধে একটি নির্দ্দিষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই স্তরগুলি বালিকাদিগের শক্তিসামর্থ্য এবং মহিলাদিগের সামাজিক জীবনের অনুকূল হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন স্তর পাঁচভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) শৈশব-শিক্ষা।

গৃহ অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষা। চার বৎসরের জন্য। বয়স চার হইতে আট বৎসর পর্য্যন্ত।

(খ) আদ্যশিক্ষা।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা। চার বৎসরের জন্য। বয়স আট হইতে বারো বৎসর পর্য্যন্ত।

(গ) মধ্যশিক্ষা।

বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা। চার বৎসরের জন্য। বয়স বারো হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত।

(ঘ) অন্ত্যশিক্ষা।

বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা। দুই বা তিন বৎসরের জন্য। বয়স ষোল হইতে আঠারো অথবা উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত।

(ঙ) উচ্চতম শিক্ষা।

বিদ্যালয় অথবা অন্তঃপুরের শিক্ষা। এক বা দুই বৎসরের জন্য। বয়স আঠারো অথবা উনিশ হইতে কুড়ি অথবা একুশ বৎসর পর্য্যন্ত।

আমাদিগের বালিকাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সমবয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা দ্রুত বলিয়াই বোধ হয়। ইহার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু প্রচলিত ধারণাই এইরূপ। এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। প্রচলিত ধারণা অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা পরিচালিত হইলে বালিকাদিগের শিক্ষা বালকদিগের শিক্ষা অপেক্ষা কিছু দ্রুত হওয়া উচিত। 'নারীদিগের বর্ত্তমান সামাজিক

আবেষ্টন মনে রাখিয়া এই প্রচলিত অনুমান অনুসারেই স্ত্রীশিক্ষার স্তরগুলি বিভক্ত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার ধারাবাহিক আলোচনায় এই বিভিন্ন স্তরগুলির উপর সম্যক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

শ্রী মণীন্দ্রনাথ রায়

"বাণী-ভবন"

অন্নবস্ত্রের চিন্তা সব মানুষেরই সর্ব্বপ্রথম চিন্তা। যেখানে এই চিন্তাই জীবনের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মানুষের আত্মার অন্যান্য ধর্ম্মের বিকাশ পদে পদে বাধা পাচ্ছে। তার সমস্ত মন-প্রাণ যখন কেবল "হা অন্ন হা অন্ন" বলে' কাঁদে, তখন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্পের অর্চ্চনা কর্‌বে কে? বিশেষ করে' আমাদের এই বাঙালীর ঘরে আদিম মানুষের এই প্রধান চিন্তাটি তার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এখনও এমনভাবে আধিপত্য কর্‌ছে যে মনোমন্দিরে আর কোনও দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা কর্‌বার আর আমাদের অবসর হয় না। অর্থচিন্তাকে তুচ্ছ বলে' দূরে সরিয়ে উচ্চ-চিন্তায় মনোনিবেশ কর্‌তে মানুষকে আমরা যতই উপদেশ দিই না কেন, প্রকৃতিকে ভোলাতে পার্‌ব না। প্রকৃতির ক্ষুধা আমরা যতক্ষণ না মেটাচ্ছি ততক্ষণ আর কারও পাওনার কথা শোন্‌বার আমাদের ক্ষমতা নাই। অথচ সভ্য মানুষ আমরা বলি যে দৈহিক অভাব নিবৃত্তির চিন্তাটা মানুষের চিন্তাসৌধের নিম্নতম সোপান মাত্র; এখানেই যদি আমরা আজীবন পড়ে' থাক্‌লাম তবে আমাদের মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা কিসে? পশুতে আর মানুষে তবে প্রভেদ কোথায়? বাস্তবিক সে-কথা খুবই সত্য; আজীবন এখানে পড়ে' থাক্‌লে আমাদের চল্‌বে না, আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু অগ্রসর হব আমরা খানিকটা পথ বাদ দিয়ে ত নয়, সবটা হেঁটে পার হয়ে। অন্নবস্ত্রের চিন্তা যাতে আমাদের সমস্ত মনোরাজ্য জুড়ে বস্‌তে না পারে, সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে তার পাওনা আমাদের মিটিয়ে দিয়ে ভার-মুক্ত হয়ে পথে বেরোবার অধিকার অর্জ্জন কর্‌তে হবে। মুক্তি অর্জ্জন কর্‌বার এই যে উপায়, আজ আমাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই এইটি অবলম্বন কর্‌তে হবে। উপার্জ্জনে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার আছে কি না, উপার্জ্জন স্ত্রীজনোচিত কার্য্য কি পুরুষোচিত কার্য্য সে-সব বিচার না করে' দেখ্‌তে হবে যে উপার্জ্জনের সাহায্যে আমরা আমাদের নিশিদিনের ক্রন্দন ভুলে অশ্রুহীন চোখে জগতের দিকে তাকাবার অধিকার পাব।

স্ত্রীজাতিকে আমরা অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী কত নামেই অভিহিত করি। কিন্তু চোখের সাম্‌নে আমরা কি গৃহহীনা নিরন্ন অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি অহরহ দেখ্‌ছি না? অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী নাম ভারতবাসী বৃথাই দেয় নি। জগৎকে লালন করা অন্নদান করা ত নারীজাতিরই কাজ। যতক্ষণ তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে ততক্ষণ সন্তানকে আশ্রিতকে অন্নদান করায় তাঁর যেমন আনন্দ তেমন আর হয়ত কিছুতে নয়। কিন্তু যাঁর শূন্য ভাণ্ডারে সন্তানের ক্ষুধা মিটাবার জন্য একমুঠা অন্নও নেই, নিজের দিনান্তের আহারের জন্য যিনি পরের দরজায় কাঙালিনী, অন্নপূর্ণা নামে তাঁকে অভিহিত করার চেয়ে বড় পরিহাস আর কি করা যেতে পারে?

নারীশিক্ষা-সমিতি নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করেন। তাঁরা চান বাঙালীর মেয়ের এই অন্নপূর্ণা নাম সার্থক কর্‌তে। বাঙালীর ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণারা আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আনন্দে অন্ন বিতরণ করুন, এই তাঁদের ইচ্ছা। তাই গৃহহীনা জগদ্ধাত্রী ও নিরন্না অন্নপূর্ণাদের কল্যাণ-কামনায় এই বাণীভবন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও বলা দর্‌কার যে নারী-মাত্রেরই কল্যাণ-কামনা আমাদের উদ্দেশ্য। মানুষের ঘরে অন্ন থাক্‌লেই তার সকল কামনার অবসান হয় না; তার অন্য অভাব থাক্‌তে পারে। উপার্জ্জনক্ষম মানুষের যে আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ যিনি পেয়েছেন, তিনিই জানেন অবসরকালে সদুপায়ে ঘরে বসে'ই অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌লে মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাবই যে কেবল দূর হয় তা নয়, তার মনেরও একটা মস্ত অভাব মেটে। ভগবান তাকে যে হাত পা মস্তিষ্ক দিয়েছেন তার ব্যবহারের ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয়, মনও তত মুক্তি পায়। তৃতীয় আর-একটা জিনিষ এতে লাভ হবে, সেটা

হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক সৃজনী শক্তির সার্থকতায়। মানুষ-মাত্রের মধ্যেই সৃষ্টি কর্বার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে। এই ইচ্ছার সার্থকতা আমরা জগতের শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য বিজ্ঞান দর্শন সব-কিছুর নিদর্শনের মধ্যেই দেখ্‌তে পাই। শুধু এইখানেই এর পরিসমাপ্তি মনে কর্‌লে চল্‌বে না। মাটির ঘরের মেঝের পাতা কাঁথা, চালে টাঙানো শিকে, পিঁড়িতে আঁকা আল্‌পনা, মায়ের হাতে গড়া পিঠে পরমান্ন সবই সেই এক শক্তির পরিচয়। এই সব ক্ষেত্রেই নানারূপে মানুষ তার সৃষ্টি কর্‌বার ক্ষমতাকে সার্থক কর্‌তে চায়।

বাঙালীর ঘরের মেয়েরা সচরাচর ঘরের বাইরে বেরোন না। যাঁরা বাইরে আস্‌তে পারেন তাঁদের শক্তির ব্যবহার কর্‌বার নানা ক্ষেত্র ত তাঁরা পাবেনই; যাঁরা আসেন না তাঁরাও যাতে গৃহশিল্পের চর্চ্চা করে' অর্থ ও আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌তে পারেন, এবং আপন-আপন প্রতিভাকে সার্থক করে' তুল্‌তে পারেন, বাণী-ভবন সেই চেষ্টাও যথাসাধ্য কর্‌বেন।

মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীন-কল্যাণ-কামনায় তাঁদের আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য এই যে ভবনটির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার শুভ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হোক, সকলে এই কামনা করুন।

শ্রী শান্তা দেবী

—

নিউজিল্যাণ্ডের নারী

নিউজিল্যাণ্ডে বর্ত্তমানে যে জাতি বাস করে, তাহারা মাওরি। শ্বেতাঙ্গ সহবাসের ফলে ইহারা এখন প্রায় পূরামাত্রায় সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের পিতা-পিতামহদের আচার-ব্যবহার প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিগত কালে পুরুষ এবং নারীর জীবন এমন ভাবে জড়িত ছিল যে কেবল নারীর বিষয় বলিতে হইলে অনেক কিছু বাদ পড়িয়া যায়, এবং বর্ণনা অসম্পূর্ণ হয়। কাজে কাজেই নিউজিল্যাণ্ডের নারী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে পুরুষদেরও অনেক কথা বলিতে হয়।

নিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীন অধিবাসীরা পলিনেসিয়া হইতে প্রথম এই দেশে আগমন করে। নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা মাওরি নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। পলিনেসিয়ার লোকেদের সহিত এই মাওরি জাতির অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য রকম মিল আছে—এক জাতির লোক না হইলে এই মিল থাকা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু মূল পলিনেসিয় জাতির সহিত এই শাখা জাতির এমন কতকগুলি বিশেষ প্রকার অনৈক্য আছে যাহাতে বর্ত্তমানে তাহাদিগকে পলিনেসিয় জাতি বলিলে ঠিক হইবে না।

কোন্ সময় যে পলিনেসিয়ার একদল লোক এই দেশে আগমন করে তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অনেক প্রমাণাদির উপর ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে নিউজিল্যাণ্ডে ৮৫০ খৃঃ অব্দে পলিনেসিয়দের প্রথম আগমন ঘটে। এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা এক-প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ১২৫০ খৃঃ অব্দ হইতে পলিনেসিয়রা এই দেশে বাস করিতে আরম্ভ করে। ১৩৫০ খৃঃ অব্দে ইহারা নিউজিল্যাণ্ডে পাকা রকমে বসবাস সুরু করে। এই সময় ইহারা দলে দলে নৌকায় করিয়া পলিনেসিয়া ত্যাগ করে এবং নিউজিল্যাণ্ডে পদার্পণ করে। এই সময় হইতে ইউরোপীয়দের নিউ-জিল্যাণ্ড আগমন পর্য্যন্ত এই মাওরি জাতি বাহিরের জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া নিউজিল্যাণ্ডে বাস করে। এমন কি তাহাদের জন্মভূমি পলিনেসিয়ার সহিতও তাহাদের কোন প্রকার যোগ ছিল না।

মাওরিদের চুল কোঁকড়া। পলিনেসিয়দের অপেক্ষা মাওরিরা বেশী শক্ত এবং পেশীবহুল। পলিনেসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী এবং বলবান লোকদের বংশধর এই মাওরিরা। পলিনেসিয়া অপেক্ষা নিউজিল্যাণ্ডের মাটী শক্ত এবং এখানকার আব্‌হাওয়া ভিন্ন প্রকারের। মাওরি-দের এইখানে অধিক পরিশ্রম করিয়া চাষবাস করিতে হইত। যুদ্ধবিগ্রহও এখানে কম হইত না। ইহাতে মাওরিদের রক্তলোলুপত্ব লোপ পাইবার অবসর পায় নাই। মাওরিদের ভিতর বংশগৌরব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। বড় ঘরের নরনারীর চরিত্রে এমন সমস্ত গুণ দেখা যাইত যাহা সভ্যসমাজের উন্নততম স্তরের লোকদের মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না।
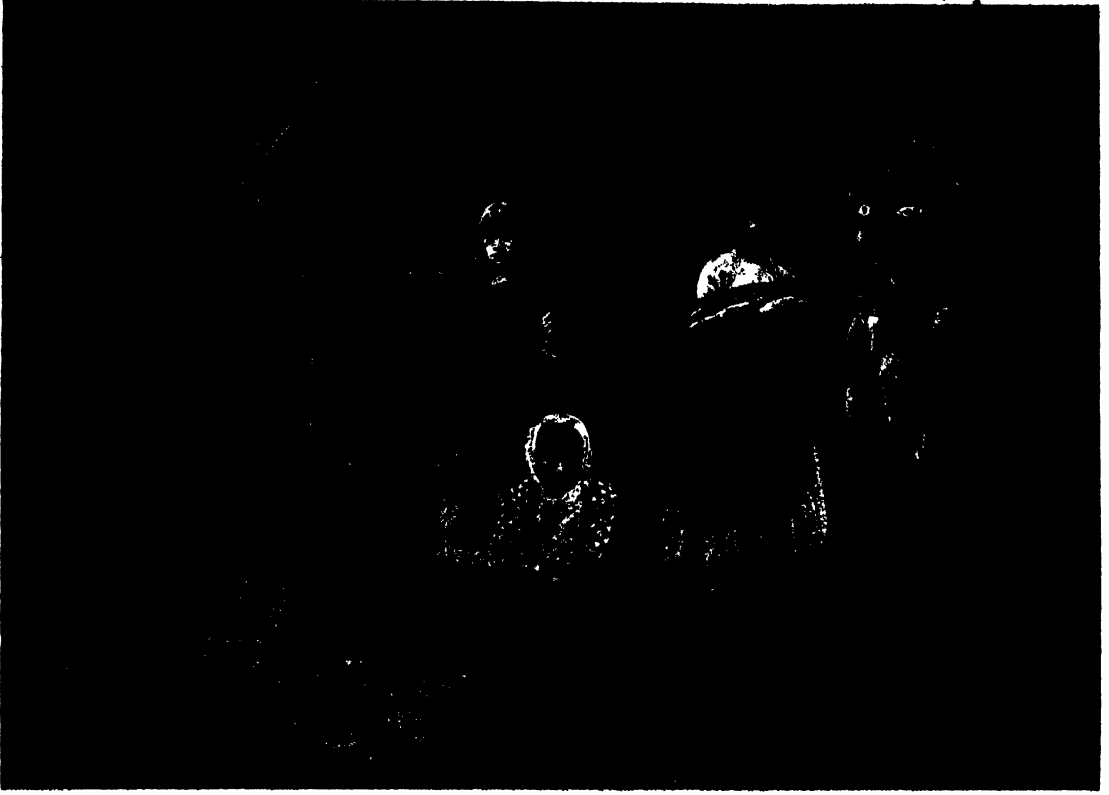
মাওরি মহিলা—দণ্ডায়মানা দুইজনের গায়ের পোষাক গাছের আঁশ দিয়া তৈয়ারী

মাওরি জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইতেছে তাহা সমস্তই অতীতের। কারণ বর্ত্তমানে পরকীয় সভ্যতার প্রভাবে তাহাদের পূর্ব্বকালের রীতিনীতি সমস্তই একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের প্রায় প্রত্যেক মাওরির মধ্যেই শ্বেতাঙ্গরক্ত কিছু না কিছু আছে। তাহাদের প্রাচীন ব্যবসাবাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন কালের নাচিবার ধরণ-ধারণ বদ্‌লাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এখনো যেটুকু মাওরিত্ব বর্ত্তমান আছে, তাহাও খুব তাড়াতাড়ি বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে লুপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মাওরি পুরুষেরা পার্লামেণ্টে সভ্য পাঠাইবার অধিকার লাভ করিয়াছে ; নারীরা এখনো এই অধিকার লাভ করে নাই।

মাওরি সমাজে নারীর স্থান খুব উচ্চ এবং সম্মানের ছিল। নারী পুরুষের সমস্ত কাজেই সহায়তা করিত। নাচে গানে, শাসনে ব্যবস্থায়, এমন কি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যও তাহারা পুরুষদের সাহায্য করিত। বড় ঘরের মেয়েদের সমাজে খুব আদর ছিল। তাহারা স্বামীর ধন এবং গৌরব দুইই বৃদ্ধি করিত। কোন সর্দ্দারের পুরুষসন্তান না থাকিলে কন্যা-সন্তান পুরুষ-সন্তানের সমস্ত অধিকার লাভ করিত। সে-ই দলের সর্দ্দার হইত। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ছেলে বা মেয়ে সর্দ্দার হইত।

মাওরি নারীদের অন্তঃকরণ স্নেহে পরিপূর্ণ। পুরাকালে স্বামী বা ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, মাওরি নারীর আত্মহত্যার কথা শোনা যায়। মাওরি নারীর প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তির কথাও শোনা যায়। শোনা যায় অনেক রমণী স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য নিজের শিশুসন্তানকে হত্যা করিত।

মাওরি জাতির মধ্যে "তাপু" বলিয়া একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। "তাপু"র অর্থ কোন লোক

বা দ্রব্যকে কিছুকালের জন্য বিশেষভাবে পবিত্র এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া রাখা। যতদিন পর্য্যন্ত 'তাপু' থাকিবে ততদিন অন্য কোন লোক তাহাকে ছুঁইতে পারিবে না, ছুঁইলেও সেও 'তাপু' হইয়া যাইবে। যদি কোন নীচু ঘরের লোক এই তাপু-করা লোকটিকে ছোঁয়, তবে হয় সে মরিয়া যায়, নয় সেও "তাপু" হইয়া যায়। প্রাচীনকালে বড় বড় সর্দ্দারেরা সবাই তাহাদের ধনসম্পত্তি সমেত "তাপু" হইয়া থাকিত। তাহাদের শরীর কিম্বা জিনিষ-পত্র কাহারো ছুঁইবার জো ছিল না—তাহা হইলে মরণ কেহ ঠেকাইতে পারিত না। সাধারণ লোকদের মনে 'তাপু' সম্বন্ধে ভয় এত বেশী ছিল যে অনেক সময় ভুল-ক্রমে যদি কেহ কোন তাপু-করা লোকের কিছু স্পর্শ করিয়া ফেলিত এবং কিছু পরে সে যদি তাহার ভুলের কথা জানিতে পারিত, তবে সে মরিয়া যাইবার ভয়েই মরিয়া যাইত! এত বড় ভয়ানক প্রতাপ ছিল "তাপু"র। কাহাকেও "তাপু"-মুক্ত করিতে হইলে একজন বিশেষ পুরোহিত আসিয়া নানা রকম মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ব্যক্তি বা দ্রব্য বিশেষকে 'তাপু'-মুক্ত করিত।

পুরোহিতরা ইচ্ছামত যে-কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যকে তাপু করিয়া রাখিতে পারিত। শস্য যখন কাঁচা থাকিত তখন তাহা তাপু করা থাকিত। কাঁচা শস্য পাছে কেহ নষ্ট করে সেই ভয়েই এইরূপ করা হইত। শস্য পাকিলে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহাকে তাপু-মুক্ত করিলে লোকে সেই শস্য কাটিতে পারিত। যে-সমস্ত লোক বিশেষভাবে চাষবাসের কাজে, শীকারের কাজে বা মাছ ধরিবার কাজে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সবাই "তাপু" হইয়া থাকিত। তাহারা সেই আরব্ধ কার্য্য শেষ না করিয়া এবং পুরোহিত কর্ত্তৃক তাপু-মুক্ত না হইয়া অন্য কোন কাজে যোগ দিতে পারিত না। দেশ-শাসন-কার্য্যে "তাপু" পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কাজে লাগিত। "তাপু" লঙ্ঘন করিবার সাধ্য কাহারো ছিল না। 'তাপু'-করা ব্যক্তিকে কোন একজন তাপু-না-করা লোক খাবার খাওয়াইয়া দিত। কারণ তাপু-করা ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে তাহা তাপু হইয়া যাইবে এবং সেই খাবার মুখে দিলে তাহা প্রাণ-সংহারক হইতেও পারে। অনেক সময় তাপু-করা ব্যক্তি গরুর মত মাটি হইতে মুখে করিয়া খাবার তুলিয়া খাইত। মোটের উপর এই "তাপু" পদ্ধতি মাওরি দেশে সকল কার্য্যেই নিয়োজিত হইত।

মাওরি-সমাজে কন্যা-সন্তানের আগমন খুব বেশী আনন্দের হইত না। পুরুষ-সন্তান হইলে মাওরি সংসারে একটা আনন্দের সাড়া পড়িত। এমন কি অনেক সময় কন্যার বাঁচা অপেক্ষা মরাই ভাল মনে হইত এবং তাহার জন্য শিশু-কন্যাকে হত্যা করা হইত। যদি তাহাকে হত্যা করা না হইত, তবে তাহাকে এবং নব প্রসূতিকে গ্রামের বাহিরে "পবিত্র" নদীতে চোবান হইত। চোবানর পর কয়েক দিনের জন্য শিশু-কন্যা এবং তাহার মাতা তাপু হইয়া থাকিত। এই কয়েকদিন মাতা তাহার শিশুকে লইয়া গ্রামের বাহিরে একটা পাতা-দিয়া-ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে বাস করিত। তাহার পর একটা বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া শিশুকে এবং তাহার মাতাকে পুরোহিত তাপু-মুক্ত করিতেন। তারপর আর-একবার শিশুর নাম-করণের সময় মাওরি-গৃহে একটি বিশেষ উৎসব হইত।

জন্মের পরই কন্যাসন্তান নিহত না হইলে বাল্যকালে এবং যৌবনের ২০।২১ বৎসর পর্য্যন্ত বড় সুখে লালিত হইত। বাবা-মা এবং ঘরের অন্যান্য সবাইকার কাছে সে বড় বেশী আদর পাইত। আদরের মাত্রা সময় সময় এত বেশী হইত যে মেয়েরা তাহাতে নষ্ট হইয়াও যাইত। বাল্যকালে এবং কৈশোরে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত। কতকগুলি খেলা আমাদের দেশের লুকোচুরি, কপাটি, ইত্যাদি খেলার মতই ছিল। দু-একটি খেলা আবার বিশেষ সঙ্গীতের তালে তালে খেলা হইত। এই রকম একটি খেলার নাম ছিল "পোয়"। "পুনি-পুনি" খেলাও গান করিতে করিতে খেলা হইত।

সর্দ্দার বংশের এবং অন্য বড় ঘরের মেয়েদের একটু বয়স হইলেই আর তাহারা খেলা-ধূলা করিয়া দিন কাটাইতে পারিত না। একটু বয়স হইলেই তাহাদের উল্কি পরিতে হইত। পলিনেসিয়ার উল্কি দেওয়ার প্রণালী

এই—কোন সূচাল অস্ত্র দ্বারা গায়ে চিত্র কাটিয়া তাহাতে এক রকম গাছের রস লাগাইয়া দেওয়া হয়। নিউ-জিল্যাণ্ডের লোকেরা তাহা করিত না। তাহারা যে প্রথায় উল্কি পরিত তাহা ভয়ানক কষ্টদায়ক। হাড়ের তৈরি এক রকম অস্ত্র দ্বারা (অনেকটা ছুতোরের বাটালির মত দেখিতে), হাতুড়ির সাহায্যে শরীরের মাংস কাটিয়া নানা রকম দাগ এবং ছবি আঁকা হইত। শরীর হইতে কত রক্ত যে পড়িত তাহার ঠিক নাই। গাছের ছালের আঁশ দিয়া তৈরী একরকম কাপড় দিয়া এই রক্ত মুছান হইত। তাহার পর একরকম কাল গুঁড়া সেই-সমস্ত কাটা স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হইত। মেয়েরা ঠোঁটে এবং চিবুকে উল্কি পরিত। উল্কি পরাতে ছেলেরাই বেশী কষ্ট পাইত! উল্কি কাটিবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিকে তাপু করা হইত এবং উল্কি পরাইবার সময় নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ হইত। কখন কখন কোন সর্দ্দারের কন্যার উল্কি পরিবার সময় একজন ক্রীতদাস বা দাসীকে বলি দেওয়া হইত। এক একটি পরিবার বা বংশের একটা বিশেষ ভাবে উল্কি কাটিবার নিয়ম ছিল। উল্কির দাগ দেখিয়া কে কোন্ বংশের লোক তাহা বলা যাইত।

মেয়ের শিক্ষা মায়ের হাতেই থাকিত। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইত। বয়ন-শিক্ষাকে মাওরিরা একটি পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করিত। নিউজিল্যাণ্ডে এক রকম গাছ জন্মে, তাহার আঁশ সূতার মত সরু। সেই আঁশ বুনিয়া মাওরি মেয়েরা নানা রকমের বস্ত্র তৈরী করিতে পারে। একবার একজন মাওরি সর্দ্দার ইংলণ্ডে গিয়া এই বিশেষ গাছ দেখিতে না পাইয়া বলে, "হায়! হায়! কেমন করিয়া এই হতভাগ্য দেশে লোক বাস করে।" অতি প্রাচীনকাল হইতে মাওরিদের মধ্যে এই গাছের আঁশ হইতে বস্ত্র বোনার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। একটি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে "সর্দ্দারের বাড়ীর লোকেরা এই আঁশের তৈয়ারী এমন বস্ত্র পরিধান করিত, যাহা রেশম অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"

পুরুষরাও এই বস্ত্র-বয়ন-কার্য্য শিক্ষা করিত, কিন্তু তাহারা খুব কম সময়ই বয়ন-কার্য্যে লাগিয়া থাকিত। ইহা একপ্রকার নারীদেরই কাজ ছিল। শীতকালে বিশেষ গাছ হইতে পাতা তোলা হইত, এবং তাহা চাঁছিয়া চাঁছিয়া শিরাগুলিকে বাহির করা হইত। শাঁখ বা বড় ঝিনুকের খোলা দিয়া পাতা চাঁছা হইত। তার পর এইগুলিকে স্রোতের জলে ধোয়া হইত এবং আরো পরিষ্কার করিবার জন্য চাঁছা হইত। তারপর রৌদ্রে টাঙাইয়া ইহাদের শুকান হইত। নানা রকম গাছের ছাল এবং পাতা হইতে নানা রকমের বয়নোপযোগী সূতা বাহির করা হইত। আঁশ রং করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ গাছের ছালের রং বাহির করিয়া লাগান হইত। কাল রং করিতে হইলে গাছের পাতার আঁশকে এক প্রকার কাল রঙের কাদায় চোবান হইত। তারপর এই আঁশগুলিকে পায়ের উপর রাখিয়া হাত দিয়া সূতা পাকান হইত। মোটা সূতা করিতে হইলে এই রকম দুইটি আঁশের সূতাকে এক সঙ্গে পাকান হইত।
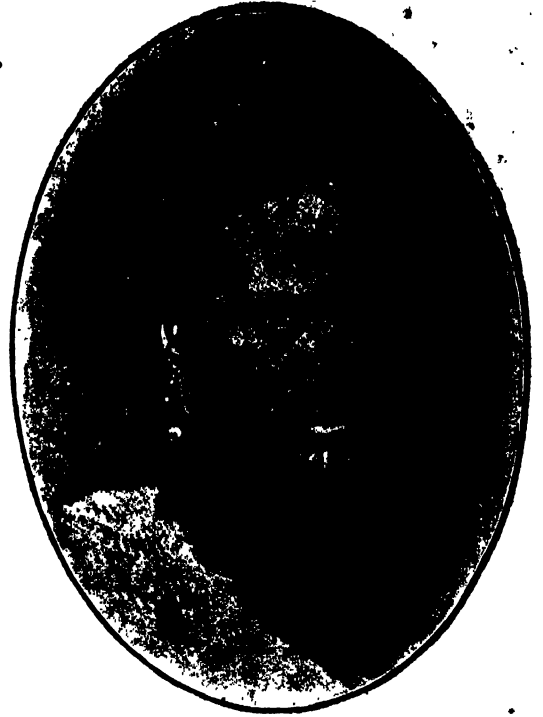
উল্কিপরা মাওরি নারী।

পুরোহিত বয়ন কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রপূত করিয়া দিত, পাছে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, বা কেহ তাহাদের কোন ক্ষতি করে।

মাওরি পোষাকের বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। মাওরিরা এই পাতার আঁশের বোনা দুখানি বস্ত্র (এগুলিকে পাত্লা মাদুর বলাও চলে) ব্যবহার করিত। একখানা কোমরে জড়ান থাকিত, আর একখানা গলায় জড়ান থাকিত, তাহা দেখিতে কতকটা আমাদের দেশের অ-সংসারী বাবাজীর আল্খাল্লার মত। কোন কাজ করিবার সময় এই গলার বস্ত্র খুলিয়া ফেলা হইত। পুরুষ এবং নারীর পোষাকের মধ্যে প্রভেদ কিছুই ছিল না। পুরুষ তাহার গলার বস্ত্র ডান পাশে কাঁধের উপর বাঁধিত, নারী বাঁধিত বাঁ পাশের কাঁধের উপর। আট বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত বালক-বালিকারা কোন প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত না।

মহিলারা চুল খোলা রাখিত। ছোট ছোট বালিকারা কপালের সাম্নের চুল ঠিক ভ্রূর সমান রেখায় কাটিয়া ফেলিত। বড় ঘরের মেয়েরা মাথার দুইপাশে লুইয়া পাখীর লেজ ঝুলাইত।

মাওরি মেয়েরা কানে নানা প্রকারের গহনা পরিধান করিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের মত তাহারা কান ফুঁড়িয়া এইসব গয়না পরিত। কানের গহনার মধ্যে জেড্ পাথরের গহনা সবচেয়ে দামী এবং আদরের ছিল। তাহার একমাত্র কারণ—এই পাথর কাটিয়া গহনা করিতে অনেক সময় লাগিত। জেড্ পাথর সবচেয়ে শক্ত পাথর। এই পাথর তাহারা অন্য পাথরে ঘসিত বা জেড্ পাথরের ধার দিয়া কাটিত। শ্বেতাঙ্গদের শুভাগমনের পূর্ব্বে মাওরিরা কোন প্রকারের ধাতুর সহিত পরিচিত ছিল না। অন্যান্য গহনার মধ্যে নানা প্রকার পাখীর পালক, জন্তুর দাঁত, হাঙরের দাঁত, ফুল, এবং প্রিয়জনের বা স্বামীর দাঁত সারি সারি গাঁথিয়া গলায় ঝোলান হইত।

সবচেয়ে দামী এবং আদরের গহনা ছিল "টিকি"। ইহার অর্থ জেড্ পাথরের তৈরী মানুষের মুণ্ডমালা। এই মুণ্ডগুলি দেখিতে অতি কুৎসিত। ইহা তৈরী করিবার আবার বাঁধা পদ্ধতি ছিল, যেমন-তেমন করিয়া তৈয়ারী করিলেই হইত না।

পুরুষেরাই এই 'টিকি' বেশী পরিত। তবে মেয়েদের গলাতেও ইহা দেখা যাইত। একটি "টিকি" বংশানুক্রমে চলিয়া আসিত। অনেক সময় এই টিকি মানুষের মাথার খুলির একটা দিক ভাঙ্গিয়া তৈরী করা হইত। তবে এই রকম "টিকি" আজকাল নাই বলিলেই হয়।

শ্বেতাঙ্গ-আগমনের পূর্ব্বের মাওরি-জীবন:—সকাল বেলায় পাহাড়ের উপর হইতে সকলে দল বাঁধিয়া নীচে নামিয়া আসিত। নীচে তাহাদের চাষ-আবাদের জমি ছিল। তাহারা 'পা' অর্থাৎ পাহাড়ের উপর কেল্লা হইতে যুদ্ধের বেশে অবতরণ করিত। এক হাতে বর্শা বা মুগুর, আর এক হাতে চাষবাসের দ্রব্যাদি থাকিত। মেয়েরা পিছনে আসিত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইবার পূর্ব্বেই, তাহারা আবার পাহাড়ে উঠিত। নারীরা এবং ক্রীতদাসেরা খাদ্য এবং কাঠের বোঝা লইয়া সাম্নে থাকিত। যখন চাষের কার্য্য একপ্রকার বন্ধ থাকিত, তখন তাহারা কোন দূরের দেশে চলিয়া যাইত; সেখানে মাছ ধরিত, শীকার করিত, নানা রকম অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত; এই সময় নারীরা বস্ত্র-বয়ন-কার্য্যে লাগিয়া থাকিত। সকলেই নিদ্রার সময় ছাড়া কোন না কোন কাজ করিত। কাহাকেও অলস বলিলে, তাহাকে বড় অপমান করা হইত।

রান্না-বান্নার কাজ নারীদেরই করিতে হইত। মাওরিদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ এবং শাক-সব্জী। কিন্তু তখনকার দিনে কুকুর ছাড়া কেবল ইঁদুর নিউ-জিল্যাণ্ডে পাওয়া যাইত। ক্যাপ্টেন কুক্ প্রথমে এই দেশে শূকর এবং ছাগল আম্দানি করেন। ছাগমাংস মাওরিদের খুবই সখের খাদ্য ছিল। তাহারা সকল প্রকার পাখীর মাংসই ভক্ষণ করিত। কয়েক রকমের পাখীর মধ্যে মৃত আত্মীয়দের আত্মা থাকে বলিয়া তাহারা রক্ষা পাইত। কোন রকমের মাছ তাহাদের খাদ্য-তালিকা হইতে বাদ পড়ে না। কত রকমের শাক-সব্জী যে খাইত তাহার বর্ণনা করা যায় না। তাহারা এক রকমের ফার্ণ্ গাছের গোড়া খাইতে খুবই

ভাল বাসিত। প্রথম যখন তাহাদের দেশে গম লাগান হয়, তখন তাহারা অপেক্ষা করিতে করিতে অধীর হইয়া শেষে গম গাছ উপ্‌ড়াইয়া তাহার গোড়ায় ফলের সন্ধান করে !

রান্না বাষ্পের সাহায্যেই হইত। গোল করিয়া গর্ত্ত করিয়া তাহাতে আগুন ধরান হইত। তাহার উপর পাথরের কুচি ফেলিয়া দেওয়া হইত। পাথর গরম লাল হইয়া উঠিত। তখন তাহার উপর গাছের পাতা ছড়াইয়া দেওয়া হইত এবং পাতার উপর জল ছিটাইয়া দেওয়া হইত। পাতার উপর খাদ্য রাখিয়া পাতা চাপা দেওয়া হইত। খুব ভাল করিয়া পাতা চাপা দেওয়া হইলে পর বাষ্পের পলায়ন-পথ বন্ধ করিবার জন্য তাহার উপর মাটি চাপা দেওয়া হইত। লোকে দুবার খাইত, সকালে এবং সন্ধ্যায়। মধ্যে মধ্যে তিনবার খাওয়াও চলিত। রান্না করিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগিত না। রান্না হইতে হইতে মেয়েরা খাইবার জায়গায় পাতার ঝুড়ি রাখিত। এই ঝুড়িতে খাবার রাখিয়া খাওয়া হইত। সর্দ্দার একলা একটা ঝুড়িতে খাইত। অন্যান্য সকলে ৪।৫ জন করিয়া একটা ঝুড়িতে খাইত। সকলে চুপচাপ থাকিয়া কোন কথা না বলিয়া খাইত। মেয়েরা আলাদা খাইত। দাসেরা তাহাদের প্রভুর সাম্‌নে বসিয়া খাইত না। অভ্যাগতদের জন্য আলাদা স্থানে খাবার দেওয়া হইত। একসঙ্গে বসিয়া খাইলে অতিথিদের অপমান করা হইত। খাইয়া হাত মুছিবার দর্‌কার হইলে পাশের কুকুরটার লোম বেশ কাজে লাগিত।

মাছ এবং পাখীর মাংস অনেক সময় সমুদ্রের জলে বেশ করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে বা আগুনের ধোঁয়ায় শুকাইয়া রাখা হইত। অকালে তাহা খাওয়া হইত। যে-সব স্থানে গরম জলের ঝরণা ছিল, সেখানের লোকে মাংস বা মাছ সিদ্ধ করিয়াও খাইত। তবে ঝল্‌সাইয়া খাওয়ার পদ্ধতিই বেশী চলিত ছিল।

গরম ঝরণা জলে মাওরিদের স্নানের খুব সুবিধা হইত। গরম জল পাইলে তাহারা আর অন্য কোথাও স্নান করিতে ভাল বাসিত না।
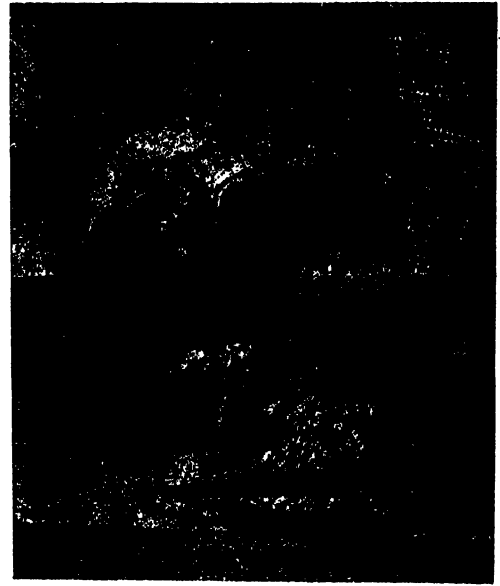
এক দলের লোক অন্য দলকে দূত পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিত। নিমন্ত্রিতের দল স্ত্রী পুরুষ ক্রীতদাস সব লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিত। অবশ্য শত্রুদলকে কেহ নিমন্ত্রণ করিত না। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে একটা এই রকম ভোজের কথা জানা যায়। সেই ভোজে ৮০০০ ঝুড়ি আলু, ৫ লক্ষ মাছ, ৮০০ শূকর এবং ১৫ পিপা তামাক খরচ হয় !

মাওরি মহিলাদের নাকে নাক ঘসিয়া অভ্য না—ইঁহাদের পোষাক গাছের আঁশ হইতে তৈয়ারী।

অতিথির দল কেল্লায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নারীরা একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া গাছের ডাল নাড়িত এবং চীৎকার করিয়া তাহাদের অভিনন্দিত করিত। তাহার পর সকলে খোলা ময়দানে গিয়া একসঙ্গে বসিত। এই খানে "টাঙ্গি" করা হইত। "টাঙ্গি" অর্থাৎ বিলাপ করা। যুদ্ধ হইতে যখন পুরুষরা ফিরিয়া আসিত তখন এই "টাঙ্গি" একটি অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। "টাঙ্গি" করিতে করিতে অনেক সময় মেয়েরা পাথরের টুকরা দিয়া নিজেদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিত। "টাঙ্গি" নাকি তাহাদের খুব একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল।

টাঙ্গি শেষ হইলে পর অতিথিরা নাকে নাক ঘসিয়া কোলাকুলি করিত। অতিথিদের খুব আদর করিয়া খাওয়ান হইত। নারীরাই অনেক সময় খাদ্য বিতরণ

করিত। নানা রকমের দামী উপহার অভ্যাগতদের দেওয়া হইত। তবে তাহা একেবারে নিঃস্বার্থ দান হইত না। ভবিষ্যতে প্রতিদানের আশাতেই এত দান করা হইত।

এই রকম ভোজে অনেক সময় মাওরি রাজনৈতিক বৈঠক বসিত। তখন সর্দ্দারেরা দাঁড়াইয়া দাড়ি দুলাইয়া, নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিত। ভোজে নানাপ্রকার নাচ হইত। স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গেও নাচিত, তফাতে তফাতেও নাচিত। নাচের পা ফেলার কায়দা আশ্চর্য্য ছিল। কোন রকমে একটু তাল ভুল হইত না। নাচ দেখিতেও খুব ভাল ছিল। নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান চলিত। নানা প্রকার অভিনয় নাচের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

সন্ধ্যা বেলায় গ্রামের যুবক-যুবতীরা "হাকা" বা নাচের গান করিতে করিতে নাচিত। নানা রকমের ফুল এবং পালক পরিয়া সকলে দল বাঁধিয়া বসিত, তাহার পর সুকণ্ঠ এবং সু-কণ্ঠীরা গান ধরিলে বাকি সকলে নাচ সুরু করিত।

এক সময় মাওরিরা নরখাদক ছিল। তাহারা যুদ্ধে বন্দী হত্যা করিয়া খাইত। ইহাতে শত্রুপক্ষকে নাকি ভয়ানক অপমান করা হইত। মেয়েরা প্রায়ই এই হত্যা ব্যাপারে যোগ দিত না বা নরমাংস ভক্ষণ করিত না। তবে প্রধান-মহিলাকে যোগ দিতেই হইত।

শত্রুপক্ষ যুদ্ধে বিপক্ষদলের কেল্লায় গরম পাথর ছুড়িয়া আগুন ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। মেয়েরা এই সময় জলপাত্র লইয়া তৈরী থাকিত, কোথাও আগুন ধরিলে জল ঢালিয়া নিবাইয়া দিত। তবে সময় এবং সুবিধা হইলে নারীদিগকে যুদ্ধস্থান হইতে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

যুদ্ধে কোন নারীর যদি কোন আত্মীয় নিহত হইত, তবে সে বন্দীদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হত্যা করিতে পাইত। ইহাতে নিহত ব্যক্তির আত্মার পরম আনন্দ লাভ হইত! একবার একজন সর্দ্দার যুদ্ধে নিহত হয়। তাহার স্ত্রী নিজহাতে ১৬ জন বন্দীর মাথা কাটিয়া ফেলে!

বিবাহ ব্যাপারে পুরোহিতদের কোন হাত ছিল না। বালিকাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বিবাহিত স্ত্রীলোক স্বামীর কাছে কোনদিন অবিশ্বাসিনী হইবে না, লোকের এই রকম ধারণা ছিল। সর্দ্দারেরা বহুবিবাহ করিত। লোকে অনেক সময়ে দাসীদের বিবাহ করিত। তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কোন নারী যদি কোন দাসকে বিবাহ করিত তবে তাহা বড়ই লজ্জার কথা হইত। বিবাহে নারীর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইত না। অনেক সময় পুরুষ বড়-ঘরে বিবাহ করিয়া বড় হইত। নারীরা যেমন ঘরের মেয়ে সেই ঘরেই বিবাহিত হইত। মেয়েরা নিজের দলের বা জাতির কাহাকেও বিবাহ করিত। অন্য দলে বা জাতির কাহাকে বিবাহ করিতে হইলে উভয় জাতির মত দরকার হইত। ভাবী স্ত্রীর ভ্রাতাদের খুব তোয়াজ করিতে হইত। বিবাহের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল, কন্যার ঘর হইতে কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া। অনেক সময় ছিনাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও লোক-দেখানি ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। অনেক সময় এই গোলমালে বেচারী কন্যা মারা যাইত। অনেক সময় কন্যার পিতা বিবাহে ইচ্ছুক পাত্রকে কন্যার সঙ্গে আসিয়া বাস করিতে বলিত। বর তখন কন্যার ঘরে আসিয়া কন্যার জাতির লোক হইয়া যাইত। যে কোন উপায়েই হোক কন্যাকে পুরুষ আপন ঘরে একবার লইতে পারিলেই বিবাহ হইয়া যাইত। আর কোন গোলমাল হইত না।

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

—

হাউস অফ্ লর্ড্সের প্রথম নারী সভ্য

ভাইকাউন্টেস্ রোণ্ডা ইংলণ্ডের হাউস অব্ লর্ড্সের প্রথম নারী সভ্য। ইনিই সর্ব্বপ্রথম হাউস্ অব লর্ড্সে পুরুষ ও নারীর সম-অধিকার নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডের অনেক সম্পাদকের অভিমতে নারী যদি হাউস্ অব কমন্সের সভ্য হইতে পারেন, তবে হাউস্ অব লর্ড্সে বসিতে তাঁহাদিগকে কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। এখন সর্ব্বসমেত ২৪ জন পিয়ারেস্ হাউস্ অব্ লর্ড্সে আসন দাবী করিতে পারেন।

হেমন্ত

—
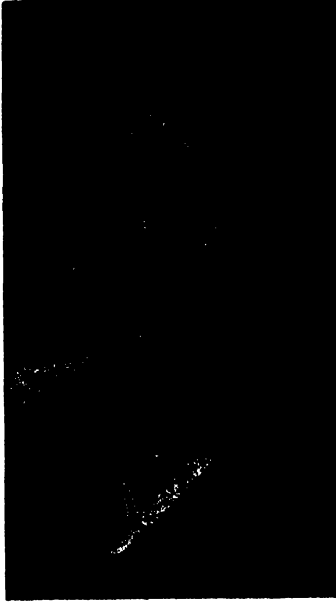
ভাইকাউন্টেস্ রোণ্ডা, ইংলণ্ডের লর্ড সভার প্রথম মহিলা-সভ্য।

মিউনিসিপ্যালিটির মহিলা কমিশনার

মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী কমিশনার নির্ব্বাচনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ফলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত এম ডি দেবদাসের পত্নী মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটির সর্ব্বপ্রথম নারী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ব্যবস্থা মাদ্রাজের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিতেও অনুসৃত হইতেছে। সালেম মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, যে, সদস্যের পদ খালি হইয়াছে, অতঃপর তাহাতে মহিলাদিগকে মনোনীত করিতে হইবে। তালুক বোর্ডেও মহিলা সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন। মাদ্রাজ হাই-কোর্টের উকিল শ্রীযুত রঘুনাথ রাওয়ের পত্নী চেলারী তালুক বোর্ডের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রদেশই সর্ব্বাগ্রে রমণীদের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকারও প্রদান করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নারীদের অধিকার সম্বন্ধে মাদ্রাজ ভারতের আর-সকল প্রদেশকে পাছে রাখিয়া ক্রমাগতই আগাইয়া চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে সকলের পিছনে পড়িয়া আছে আমাদের এই বাংলা। অথচ এই বাংলা গর্ব্ব করে—শিক্ষায় এবং সহবতে সেই নাকি ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয়

গিরিডির উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়টির এবং তাহার বোর্ডিংয়ের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে। সম্প্রতি কুমারী সুনীতি গুপ্ত বি-এ, (এবার বি-টি পরীক্ষা দিয়াছেন) স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও বোর্ডিংয়ের কর্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই কার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত পাত্রী। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম, ও জীবনের সুদৃষ্টান্তের জন্য স্কুল ও বোর্ডিংয়ের ছাত্রীদিগের উন্নতি হইবে বলিয়াই আশা করিতেছি।

সকলেই জানেন, গিরিডি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং উহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত সুন্দর। বর্ত্তমান সময় বাংলা দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা, সেজন্য গিরিডির ন্যায় উৎকৃষ্ট স্থানে বালিকাদিগের একটি স্কুল ও বোর্ডিং থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখানে শিক্ষয়িত্রী-দিগের সঙ্গে ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বালিকাদের বেড়াইবার যথেষ্ট সুবিধা। তদ্ভিন্ন বাংলা দেশে বালিকা-দিগের যে-সকল উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি স্কুল আছে, তাহার অধিকাংশ স্কুল ও বোর্ডিংয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অনেক সময় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও উহাতে বালিকাদিগকে ভর্ত্তি করানো অসম্ভব হইয়া উঠে। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই গিরিডির স্কুলটির উন্নতির সহায়তা করা কর্ত্তব্য। এ বৎসর হইতে এ প্রদেশের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে। আমাদের সহৃদয় বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের শিক্ষার উপযুক্ত কন্যা ও আত্মীয়া-দিগকে গিরিডি বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে স্কুলটির যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। বোর্ডিং ফিঃ মাসিক ১১৲ এগার টাকা। স্কুলের বেতন ক্লাস অনুসারে ৷৹ আনা হইতে ৩৲ টাকা।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলায় মনসা-পূজা

সর্প-পূজা নানা আকারে সারা জগৎ জুড়িয়াই আছে। বাংলায় অনেক লোক মনে করেন আমরাই বুঝি শ্রাবণ মাসে মনসার ভাসান শুনি এবং নাগ-পঞ্চমীতে নাগ-পূজা করি। কিন্তু আসলে প্রায় সব দেশেই এই প্রথা ছিল বা আছে। সেদিন Encyclopædia of Religion and Ethics পুস্তকখানির ১১শ খণ্ডে সর্প-পূজা প্রকরণটি দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইলিয়াট স্মিথের মতে এই সর্পপূজা সব প্রথমে ছিল মিশর দেশে খৃষ্ট-জন্মের ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে। তারপর তাহা নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সাপের পূজা বিশেষ কোনো এক দেশ হইতে অন্য সব দেশে ছড়াইয়াছে ইহা নাও হইতে পারে। সর্প সব দেশেই আশ্চর্য্য জীব। তার অদ্ভুত আকৃতি, তীব্র বিষ, ক্ষিপ্র গতি, ছয় মাস না খাইয়া অন্ধকারে পড়িয়া থাকা, খোলস ছাড়িয়া নবজীবন লাভ করা, দুইভাগ-করা জিহ্বার লকলকানি, এই সবই সব দেশে বিস্ময় ও পূজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছে। কাজেই দেখিতে পাই আফ্রিকার আদিম জাতিদের মধ্যে, আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে, মেলা-নেসিয়ায় (Melanesia), মেক্সিকোতে, চীনে, জাপানে, ক্রীটে, মিসরে, বাবিলোনিয়ায়, হিব্রুভাষী জাতিদের মধ্যে, ফিনিসিয়ায়, গ্রীসে, রোম দেশে, কেল্‌টিক (Celtic), বাল্টো-স্লাভিক (Balto-Slavic) ও টিউটন জাতিদের মধ্যে সর্ব্বত্রই কোনো না কোনো যুগে, কোনো না কোনো আকারে সর্পজাতি পূজা পাইয়াছে এবং বহুস্থানে নানা আকারে এখনও পাইতেছে। মিশর ও দ্রবিড় জাতির ঐক্য যাঁরা মানেন তাঁরা ভারতের দক্ষিণে দ্রবিড় দেশে সর্প-পূজার বাহুল্যে বিচারের একটি নূতন ক্ষেত্র পাইবেন।

সর্পের প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজার ভাব এক এক দেশে এক এক রকম। কোনো দেশে সাপ মৃত্যুলোকবাসী পিতৃগণের প্রতিনিধি, কারণ সর্প খোলস ছাড়িয়া মৃত্যু জয় করিয়া নবজীবন লাভ করে; কোনো দেশে সর্প ভবিষ্যৎ বংশ ও সন্তান বৃদ্ধির চিহ্ন। এই বাংলা দেশেও লোকের বিশ্বাস আছে যে সর্প স্বপ্নে দেখিলে বংশবৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর বহু স্থানে সন্তান-কামনায় সর্পপূজার পদ্ধতি আছে। গুজরাত, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমে এই উদ্দেশ্যে কুমারীরা সর্পপূজা করে। কাজেই সন্তান-কামনায় শিবপূজায় যাঁহারা লিঙ্গ-পূজা অনুষ্ঠানের পরিচয় পাইয়াছেন, সর্প ও শিবের একত্র পূজায় তাঁহাদের বিস্মিত হইবার হেতু নাই। শিবের সঙ্গে নাগের নিত্য যোগ অথচ মনসার সঙ্গে মহাবিরোধ, কাজেই মনসারূপিণী সর্প ও প্রাচীন নাগ এক নহে।

অভিচারাদি কর্ম্মে, যাদুবিদ্যায়, পুরাণ ও ইতিকথায় সর্পের উল্লেখ ও সর্পের নানা ভাবে ব্যবহার ও পূজা এদেশে ও নানা দেশে আছে। নারীধর্ম্ম, সন্ততি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের সঙ্গে সর্পের ধারণা নানা দেশেই জড়াইয়া আছে। আমাদের দেশেও আছে (তুঃ— অষ্টাদশঃ ভাষা-বারবিলাসিনী-প্রৌঢ়-ভুজঙ্গ ইত্যাদি)।

এই ভারতবর্ষেও বিভিন্নপ্রদেশে সর্পপূজার বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন পদ্ধতি। কাশ্মীরে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, পঞ্জাবে, মধ্য ভারতে, কাশী কোশল মগধে, দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড় জাতিদের মধ্যে, আসামে খাসিয়া পর্ব্বতে, মণিপুর ও উত্তর-পূর্ব্ব-সীমান্তবাসী জাতিদের মধ্যে সর্ব্বত্রই সর্প-পূজা আছে। নেপাল, ভোটান প্রভৃতি পর্ব্বতবাসীদের মধ্যেও আছে। নাগের নামে, তক্ষকের নামে, সর্পের নামে কত মন্দির, পুর ও শিলা এখনও ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। নাগপত্তন, নাগপুর, তক্ষশিলা, অহিচ্ছত্র, অনন্তপুর ইত্যাদি নামে সে পরিচয় পাই।

কিন্তু বাংলা দেশের যে মনসা পূজা তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। আমরা তার মূলের একটু সন্ধান লইতে চাই।

কাশীতে ভারতের সব প্রদেশের লোকই আসা-যাওয়া করেন—তাঁরা সবই প্রাচীন ভাবের লোক। তাঁদের আচার ও পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন কালের ভাল পরিচয়ই পাওয়া যায়। আমার জন্মভূমি কাশীতে, তাই ছেলেবেলায় লক্ষ্য করিতাম—সব জাতিই নানা ভাবে

সর্প-পূজা করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্ প্রকারের পূজার সঙ্গে মনসা-পূজার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব ?

সব প্রদেশেই দেখিলাম সর্পকে কোনো না কোনো বিশেষ জাতির মানুষেরা আপনাদের আদি-পুরুষ ও প্রধান দেবতা ও উপাস্য দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে। নাগা জাতির কোনো কোনো শাখা ও অগ্রবাল জাতি নাগের বংশ বলিয়া খ্যাত। সর্প মারিলে নরহত্যা হয়, এমন কি ব্রহ্মহত্যাও হয়। তাহার হেতু বোধ হয় মহাভারতের আস্তিক পর্ব্বটি দেখিলে বুঝিতে পারি। বৈদিক যুগের সর্পপূজার উল্লেখ আজ করিব না। বেদেও বিস্তর সর্প-পূজন ধর্ম্মের পরিচয় আছে। নাগরা তখন এক পরাক্রমশালী জাতি। তাহাদের সঙ্গে আর্য্য ও ব্রাহ্মণাদির বিবাহ হইত! জনমেজয় যখন সরমা-দত্ত শাপ নিবারণের জন্য যোগ্য পুরোহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তখন তাঁহার যজ্ঞের পৌরোহিত্যে উপযুক্ত দেখিয়া তিনি শ্রুতশ্রবা ঋষির পুত্র সোমশ্রবাকে বরণ করিলেন। তাহাতে শ্রুতশ্রবা বলিলেন—আমার এই পুত্র "সর্পকন্যার গর্ভেজাত মহাতপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্ন মৎতপোবীর্য্যসম্ভূত" (মহাভারত, আদিপর্ব্বে পৌষ্যপর্ব্ব ১৭ শ্লোক); যদিও এই ক্ষেত্রে ঠিক বিবাহ হয় নাই। কিন্তু জরৎকারু ছিলেন মহাতপা উর্দ্ধরেতা তপস্বী (মহাভারত, আদি, ৪৫ অধ্যায়)। তিনি একদিন এক বিজন বনে তাঁহার পিতামহ শংসিত-ব্রত ঋষিদের দেখিতে পাইলেন যে তাঁহারা জরৎকারুর সন্ততির অভাবে অধোলোকে যাইতে বসিয়াছেন। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে অধোগামী পিতামহগণ বলিলেন—"জরৎকারু নামে আমাদের এক বংশধর আছে। সে তপস্যাই করিবে, বিবাহ করিবে না। তবে আমরা অধোগতি হইতে রক্ষা পাই কেমন করিয়া ?" তখন জরৎকারু আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি অতি দরিদ্র, আমাকে কে কন্যা দিবে ?" পিতৃগণের মুখে তিনি শুনিলেন তাঁহাদের রক্ষার জন্য জরৎকারুর বিবাহ ও সন্ততি লাভ করাই চাই। তিনি সর্ব্বদেশ ঘুরিয়াও পাত্রী না পাইয়া, একদিন অরণ্যে মনের দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমি দরিদ্র। এতকাল আমি উগ্র তপস্যায় রত ছিলাম। আজ পিতৃগণের নির্দ্দেশে বিবাহ করিতে চাই। কেহ আমাকে কি কন্যা দিবে ?" তখন নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে তাঁহার হস্তে দেন (মহা, আদি, ৪৬ অধ্যায়)। এই বিবাহ বৈধভাবে সম্পন্ন হয়, এবং এই বিবাহই সফল হইয়া জরৎকারুর পিতৃগণকে অধোগতি হইতে রক্ষা করে। এই বিবাহে মহাতপস্বী আস্তিকের জন্ম হয়। তিনি জনমেজয়ের যজ্ঞে গিয়া প্রার্থনা করেন যে সর্পসত্রের বিরাম হউক। ইহা বলিয়া তিনি আপনার পরিচয় দেন। আস্তীক বলিলেন যে "মাতুল-বংশ আমার নাগকুল, তাই তাঁহাদের রক্ষার জন্য এই বর প্রার্থনা করি।" জনমেজয় কহিলেন, "হে দ্বিজবরোত্তম, অন্য বর প্রার্থনা করুন" (মহা, আদি, ৫৬ অধ্যায়)। তখন যজ্ঞের বেদবিৎ সদস্যগণ সকলে একবাক্যে কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণকে নিজ প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না। এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক" (৫৬ অধ্যায়)। তখন আস্তীককে নানাবিধ দান দিয়া রাজা বিদায় করিয়া কহিলেন, "এই যজ্ঞ তো নিবৃত্তই হইল, তবে আমার পুরীতে পুনরায় আপনার আসিতে হইবে। আমার মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা আছে। তাহাতে আপনিই সদস্য হইবেন" (মহাভারত, ৫৮ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক)। নাগকন্যার গর্ভে জন্ম হইলেও ইঁহার বিপ্রত্ব ও ঋষিত্ব কিছুমাত্র দোষগ্রস্ত হয় নাই।

মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বগুলি আগাগোড়া নাগদের বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ। পৌষ্যপর্ব্বে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে (মহাভারত, আদি, পৌষ্য পর্ব্ব, ১৭১ শ্লোক); সেখানে দেখিতে পাই ঋষি শৃঙ্গী রাজা পরীক্ষিতের উপর রুষ্ট হইয়া নাগরাজ তক্ষককে শত্রু-দমনে নিযুক্ত করিতেছেন (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪০,৪২ অধ্যায়)। ব্রাহ্মণ কাশ্যপ পরীক্ষিত রাজার বিপদের প্রতীকার করিতে আসিতেছিলেন। তাহাতে তক্ষক তাঁহাকে বলিলেন, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ হইয়া আপনি দাঁড়াইবেন ? কাশ্যপ অর্থাভিলাষী ছিলেন। কাজেই তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া তক্ষক নিবৃত্ত করিলেন (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৩ অধ্যায়)। ইহাতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষায় নাগরাজ কেমন সচেষ্ট !

সর্পসত্রে ক্ষত্রিয় রাজারা নাগকুল নির্ম্মূল করিতে

চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই। নাগকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ তপস্বী তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও নাগদের মধ্যে বেশ ঐক্য ও প্রীতির ভাব আছে।

খাণ্ডবদাহনে কৃষ্ণার্জ্জুন তক্ষকাদি নাগগণকে ও দানব প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীকে নিঃশেষ করিতে চাহেন। তখন দেখিতে পাই তক্ষক ইন্দ্রের সখা (আদিপর্ব্ব, ২২৪ অধ্যায়, ৮ শ্লোক)। নাগেরা (হস্তীরা) শুণ্ডে জল আনিয়া বনকে দাহ হইতে বাঁচাইতে চাহে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই (আদি, ২২৫, ১৭)। তখনও খাণ্ডবদাহে দেখা যায় ইন্দ্র নাগদের সহায় (আদিপর্ব্ব, ২২৭, ২৯)। অগ্নি জীবকুলকে ধ্বংস করিতেছেন আর কৃষ্ণার্জ্জুনের অস্ত্রে পলায়মানেরাও রক্ষা পাইতেছে না (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২৮ অধ্যায়)। কেবল অরণ্য দগ্ধ করিয়া জন-বসতি বৃদ্ধি করিতে হইলে এরূপ নিষ্ঠুর হইবার প্রয়োজন ছিল না। কৃষ্ণার্জ্জুন যে নাগলোক ধ্বংস করিয়া অগ্নির তৃপ্তি করিতে চাহেন। কিন্তু তক্ষককে তো মারা গেল না। পূর্ব্ব হইতেই কুরুক্ষেত্রে পালাইয়া তিনি রক্ষা পান। তাঁহার পত্নী আপন পুত্র অশ্বসেনকে রক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ং মারা যান। অশ্বসেন অতি কষ্টে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধূমের মধ্য দিয়া অলক্ষিত ভাবে পালায়। বহু অন্বেষণ করিয়াও যখন কৃষ্ণার্জ্জুন তাহাকে পাইলেন না তখন তাহাকে শাপ দিলেন—"তুমি আশ্রয়-হীন হইবে" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২৯ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)। সত্যই তো, তাহাদের আশ্রয় ছিল যে বন, তাহা দগ্ধ হইলে তাহার আশ্রয় আর রহিল কোথায়? মনসা-পুরাণাদির মতে এই জন্যই অর্জ্জুন-বংশের সঙ্গে নাগদের চিরশত্রুতা এবং পরীক্ষিতকে নাগেরা বিনষ্ট করে (বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ১২৮পৃঃ)।

সেই বনেই দেখিতে পাই মন্দপাল নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বিবাহ ও অপত্য উৎপাদন না করিয়া কৃচ্ছ তপ সাধন করিতে গেলেন। ফল হইল না। পিতৃলোকের গতি হইল না। দেবতারা বলিলেন, বিবাহ করিয়া অপত্যলাভ কর (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২৩১ অধ্যায়, ৫—১৪ শ্লোক)। মহর্ষি মন্দপাল সহজে বহু সন্ততি চান। তিনি খাণ্ডবে তির্য্যক্‌যোনিজাত কন্যা জরিতাকে বিবাহ করিয়া চারিজন ব্রহ্মবাদী পুত্র প্রাপ্ত হন। তখন আবার তিনি লপিতাকে বিবাহ করেন। মন্দপাল অগ্নিকে স্তব করিয়া তাঁর বংশধরেরা খাণ্ডবে অগ্নিদাহে রক্ষা পাইবে এইরূপ অভয় পান (মহাভারত, আদি, ২৩১ অধ্যায়, ২৩—৩৩ শ্লোক)। বনদাহ-কালে ঋষি-পত্নী, পক্ষিকন্যা জরিতা যখন তাঁর চারি পুত্র লইয়া বিব্রত তখন তাঁর মনে হইল—"গমন-কালে তো মহর্ষি কহিয়া গিয়াছেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্র জরিতারি কুল-প্রতিষ্ঠা হইবে। সারিসৃক্ক পিতৃগণের জন্য কুলবর্দ্ধন করিবে। তৃতীয় পুত্র স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে। চতুর্থ দ্রোণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ হইবে" (আদি, ২৩২ অধ্যায়, ৯,১০ শ্লোক)। কিন্তু এখন ইহাদের রক্ষা হয় কিসে? শেষে পুত্রেরা মাতাকে বলিল, "আমরা মারা যাইবই। তবে তুমি আমাদের ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা কর। এখনও সন্তানলাভের বয়স তোমার যায় নাই। তোমার আরও সুন্দর সন্ততি হউক" (আদিপর্ব্ব ২৩৩ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক)। যাহা হউক পরস্পরবিযুক্ত হইয়াও ইঁহারা রক্ষা পান। যখন মহর্ষি মন্দপাল স্বীয় পুত্রদের খুঁজিতে জরিতার কাছে যাইতে চাহেন, তখন লপিতা কহিলেন, "তুমি তো পুত্রের জন্য যাইতেছ না। তাহারা সব নাকি ঋষি, তুমি নিজেই এসব কথা বলিয়াছ। তাদের তো তবে দগ্ধ হইবার ভয় কিছুই নাই। (আদি, ২৩৫ অ, ৮ শ্লোক)। আসল কথা তুমি আমার সপত্নী জরিতাকে ভুলিতে পার নাই। এখন আর আমার প্রতি তোমার স্নেহ নাই। তবে তুমি তারই কাছে যাও যার জন্য তোমার মন কাঁদে, আমি না হয় অনাথের মত ঘুরিয়া বেড়াই" (ঐ, ১১-১৩ শ্লোক)।

মন্দপাল কহিলেন, "আমাকে সেরূপ মনে করিও না। আমি দেহ-সুখ চাই না, অপত্যই আমার একমাত্র লক্ষ্য কারণ তাহারাই বংশের আশ্রয় ও পিতৃগণের গতি" (ঐ, ১৪-১৫ শ্লোক)।

মন্দপাল জরিতার কাছে গেলে তাঁহারা কেহ কথা কহিলেন না। পুত্রদের বিষয় প্রশ্ন করিলে জরিতা কহিলেন—"সে-সব খবরে কাজ কি? তরুণী চারুহাসিনী লপিতার কাছেই যাও" (ঐ, ২৫ শ্লোক)। তখন মন্দপাল ঋষি পুত্রগণকে কহিলেন, "আমি অগ্নির সঙ্গে পূর্ব্বেই

তোমাদের কথা বলিয়া রাখিয়াছি। তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি জানিয়া তিনিও দগ্ধ করিবেন না বলিয়াছেন। তাই এতক্ষণ আমি আসি নাই" (আদিপর্ব্ব, ২৬ অধ্যায়, ১-৩ শ্লোক)।

কাজেই খাণ্ডবদাহেও মাঝে মাঝে কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছে। তক্ষক ও তার পুত্র স্থান ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

সুপর্ণ-কন্যার গর্ভে মন্দপালের চারি ঋষিপুত্র ও নাগরাজ তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন রক্ষা পান। ময়দানব শরণাগত হইয়া রক্ষা পায়। কাজেই খাণ্ডবে ছয় জন মাত্র রক্ষা পায় (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২৩০ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)। বাসুকি পূর্ব্বেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন।

এখন এই সুপর্ণ বা পক্ষীজাতির লোক কাহারা? তাঁহাদের কন্যার গর্ভে উৎপাদিত ঋষির পুত্ররা বেদবিৎ ঋষি এবং বংশ-প্রতিষ্ঠাতা। অগ্নিও তাহাদের ভয় করেন। ঋষির পিতৃকুল এই সন্তানের দ্বারা রক্ষা পায়। দ্রৌপদীর বিবাহ-সভায় দেখি মনুষ্যের সঙ্গে নাগ ও সুপর্ণরাও উপস্থিত আছেন (মহা, আদি, ১৮৯, ৭ম শ্লোক)।

এই সুপর্ণদের বিষয় আজ বেশী বলিবার কিছু নাই। কারণ আজকার বিষয় ইহা নহে। পুরাণাদিতে ইহাদের সম্বন্ধে বহু বহু উল্লেখ আছে। তবে খাণ্ডব বনে উভয় দলই বাস করিতেছিল এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের হাতে সমান ভাবে মারা পড়িয়াছিল। এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতে এই-সব পশু—যথা নাগ, পক্ষী প্রভৃতি—পৃথিবীর নানা দেশেই নানা জাতির পবিত্র চিহ্ন (totem) ছিল। সুপর্ণজাতিরা তাহাদের মাথাতে পক্ষীর সুন্দর পালক ব্যবহার করিত।

আমার মনে হয় সুপর্ণ ও নাগগণ অনার্য্য পরাক্রান্ত দুইটি জাতি। এইজন্যই ইহাদিগকে দুই সতীনের সন্তান বলা হইয়াছে। মানবের আদিপুরুষ কশ্যপই ইহাদের জনক, তবে তাঁর স্ত্রী কদ্রু নাগমাতা, বিনতা সুপর্ণমাতা। সূর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় কদ্রু বিনতার দলকে দাস্যে পরিণত করেন। ইহার সহিত প্রাচীন আর্য্যদের নিকট হইতে সৌর পূজা গ্রহণের কিছু ইঙ্গিতও থাকিতে পারে। বিনতার সন্তান জন্মিয়াই এক গজ আহার করিল। এখানে বলা উচিত নাগ অর্থে গজ ও সর্প দুইই। হস্তীর শুঁড়টি সাপেরই মত। আর নাগদের মধ্যেও হস্তীর বংশধর ছিল। উলূপী আপনাকে ঐরাবতের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বিনতার পুত্র গরুড় (সূর্য্যেরই পরিণত রূপ) বিষ্ণুকে স্বীকার করিয়া আপনি তাঁহার বাহন হন। তাহাতে কদ্রুবংশীয় নাগের কাছে দাস্য মোচন হয় (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২য় অধ্যায়)। ইহাতে বেশ মনে হয় আর্য্যদের পূর্ব্বতন সূর্য্য-দেবতাকে গ্রহণ করিয়া নাগরা পরাক্রম-শালী হন (মহাভারত, পৌষ্য পর্ব্ব, ৩ অধ্যায়) ও বিষ্ণুকে গ্রহণ করিয়া সুপর্ণ অর্থাৎ গরুড়ের দল নাগদের দাস্য হইতে মুক্ত হন। এ বিষয়ে অনেক ভাবিবার কথা আছে। এখন ভাবিবার কথা এই যে, অর্জ্জুন কেন নাগবংশের উচ্ছেদ করিতে চান। তিনি নিজেই তো উলূপীকে বিবাহ করেন। এখানে মনে হয় নাগেরাও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত (মহাভারত পৌষ্যপর্ব্ব ৩য়, ৩৬ অধ্যায়, ৬৭ অধ্যায়, ১২৩ অধ্যায়, ইত্যাদি)। যাহারা ইন্দ্রকে মানিয়াছে তাহাদের সঙ্গেই কৃষ্ণার্জ্জুনের বিরোধ। অথচ যে-সব নাগেরা অগ্নিদেবতার সেবা করে তাহাদের সঙ্গে অর্জ্জুনের বিরোধ নাই। ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ আরও নানা স্থলে দেখিতে পাই। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোকুলবাসীর ইন্দ্র-পূজা নিষেধ করিয়া কৃষ্ণ মহা অনর্থের সৃষ্টি করেন। ভীষণ বারিপাতে সব যখন নষ্ট হয় তখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ইন্দ্রের হাত হইতে কৃষ্ণ গোকুল রক্ষা করেন (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়)। নাগরা অনেকেই ইন্দ্রের শরণাপন্ন। জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের নীচে আশ্রয় লইয়াছেন দেখিতে পাই। নাগদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের মাঝে মাঝে বিরোধ লাগে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই নাগদের সহায় ও তাহাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সংযুক্ত। যদিও দেখিতে পাই পুরুবংশীয় ঋক্ষ প্রভৃতি রাজা, অর্জ্জুন স্বয়ং, কুন্তীর পিতা কুন্তিভোজ রাজা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজারা নাগদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই নাগদের সম্বন্ধ বেশী। যেমন পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণেরা শক্তির প্রয়োজন অনুভব করিয়া শক, কুষাণ, রাজপুত, জাঠ

প্রভৃতি বাহিরের দলকে সমাজের মধ্যে ক্ষত্রিয় নামে চালাইয়া লইয়াছেন, তেমনি মহাভারতের পূর্ব্বযুগে ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষত্রিয়দের দমনার্থ নাগদের নিযুক্ত করিয়াছেন। ধনলোভে যদি কোনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহায়তা করিতে চাহিয়াছেন, তবে নাগরাই অর্থ দিয়া তাহাকে ক্ষত্রিয়ের দল হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৩ অধ্যায়)। ব্রাহ্মণদের দেবতা স্বীকার করিয়া নাগরা শক্তিশালী হইয়াছেন। তাই বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি ইন্দ্রের সেবা করেন। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতও এক নাগেরই নাম মহা, আদিপর্ব্ব, ২১৮ অধ্যায়, ১৮-২০ শ্লোক ও মহাভারত, পৌষ্য পর্ব্ব, ৩ অধ্যায়)। কৃষ্ণ যখন ইন্দ্রপূজার বিরোধী, তখন তিনি ইন্দ্রের শরণাগত নাগদের রক্ষা করেন নাই। যে কারণে জরাসন্ধ শিশু-পালাদির সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ হয়, সেই কারণেই নাগদের সঙ্গে খাণ্ডববাসিগণের সঙ্গে কৃষ্ণার্জ্জুনের বিরোধ হয়। কৃষ্ণ ইন্দ্র-বিরোধী হইলেও অগ্নির বিরোধী নন। অগ্নি-দেবতার তৃপ্তির জন্যই খাণ্ডবের দাহ হয়। এবং যে নাগ-কন্যা উলুপীকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন তাঁহার গৃহে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত ছিল। সেই অগ্নিতে অর্জ্জুন দৈনিক অগ্নি-হোত্রাদি করেন (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১৬, ১৫)। নানা কারণে বৈদিক দেবতার সহিত কৃষ্ণের বিরোধ হইয়াছিল। যাগযজ্ঞপর বৈদিক বাণীকে তিনি গীতায় "পুষ্পিতা বাক্" বলিয়াছেন, যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন এবং খুব সম্ভব এইজন্যই ভৃগুমুনির পদাঘাত লাভ করিয়াছেন।

মনসা-পূজার প্রসঙ্গে নাগদের কথা বলিতে হয়। কারণ যখন মনসা দেবী বাংলাতে আসিলেন তখন প্রাচীন জরৎকারুপত্নীর সঙ্গে ও বাসুকির ভগ্নীর সঙ্গে তাঁকে এক করা হয়। আবার মনসার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গরুড়ের স্মরণ করা হইত। তাই সুপর্ণদের কথাও বলিলাম। এই নাগ ও সুপর্ণ দুইই অনার্য্য জাতি। দুইই পরস্পর বিবাদে রত। নাগের দল ইন্দ্রের শরণাপন্ন। নাগের দল সূর্য্যের স্বরূপ লইয়া তর্ক করিয়া সুপর্ণের দলকে (অর্থাৎ পক্ষী যাহাদের totem) বশীভূত করিয়া আধি-পত্য করেন। আর্য্যদের দেবতা গ্রহণ করিয়া নাগরাও প্রবল হইয়া উঠেন (পৌষ্যপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায় ও আস্তীক পর্ব্ব, ২৫ এবং ৩৬ অধ্যায়)।

এই নাগদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে গিয়াই সুপর্ণেরা আর্য্যদের নূতন দেবতা বিষ্ণুকে স্বীকার করেন। বিষ্ণু সূর্য্যেরই পরবর্ত্তীরূপ। তবে ইন্দ্রের পর ইনিই প্রধান হইয়া উঠিলেন। কাজেই বিষ্ণুর নাম হইল "ইন্দ্রা-বরজ"। গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইয়া শক্তিশালী—তাই নাগদের সর্প-শাখা ও হস্তী-শাখা দুই দলকেই বশীভূত করিলেন। পুরাণে আছে গরুড় হস্তীকে খাইলেন ও নাগদের খাইলেন। এই হস্তী ও নাগ দুই দলের totem অর্থাৎ পবিত্র চিহ্ন। গরুড়ের দলের কাছে হারিয়া নাগেরা বিষ্ণুকে স্বীকার করে এবং গরুড়ের ভয় হইতে রক্ষা পায় (ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৩০৯ পৃষ্ঠা)।

গরুড়ের তাড়ায় নাগরা সমুদ্রের দ্বীপে আশ্রয় নেয় (আস্তীক পর্ব্ব, ২৫ অধ্যায়, ২৬ অধ্যায়, ২৭ অধ্যায়)। সেখানে অনন্ত ও কালীয় নাগ স্বীয় বক্ষে ও মস্তকে নারায়ণকে গ্রহণ করেন (ভাগবত, ১৬, ১৭, দ্বিজ বংশী-দাসের পদ্মাপুরাণ, ৩০৭-৩০০পৃষ্ঠা)।

বিনতানন্দন গরুড় অর্থাৎ পুরাণ-মতে যিনি পক্ষী তিনি বিষ্ণুর বাহন হইয়া শক্তিশালী হইয়া ইন্দ্রের রক্ষিত অমৃত হরণ করিতে গেলেন। ইন্দ্র বজ্র মারিলেন। বজ্র ব্যর্থ হইল। গরুড় একটি পক্ষের পালক উপহার দিয়া বজ্রের মান রাখিলেন (মহাভারত, আস্তীক পর্ব্ব, ৩৩ অধ্যায়)। এসব কথা বেশ চিন্তা করিয়া দেখিবার মত।

মোটকথা খাণ্ডবে নাগকুল ধ্বংস হয় নাই। কাজেই নাগ-পূজাও লোপ হয় নাই। অবশ্য আশ্রয়হীন হইতে হইতে ইহারা দুর্ব্বল হইতে লাগিল। খাণ্ডববন-দাহে ইহাই কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও অগ্নির শাপ ছিল (আদি, ২২৯ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)। অহিচ্ছত্রও নিশ্চয় সর্পদেরই দেশ ছিল। পরে দ্রোণ তাহা পান। মহাভারতের প্রথমেই আস্তীক পর্ব। তাহাতে আর্য্য ও নাগদের বিরোধই চলিয়াছে দেখিতে পাই। সুপর্ণ ও নাগদের সঙ্গে আর্য্যদের এমন কি ব্রাহ্মণদেরও বিবাহ হয়। সেই-সব বিবাহের সন্ততিরাও ঋষি, ব্রহ্মবিদ্ ও বেদবিত্তম পুরোহিত হইয়া থাকেন।

নাগরা দেবতাদের শরণ লন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজাকে নাগদের দিয়া দণ্ড দেওয়াইয়াছেন। রাজা পৌষ্য ইহাদিগকে ভয় করেন, কারণ ইহারা বন হইতে লুকাইয়া আসিয়া কখন কি লইয়া পালায় তার ঠিক নাই (মহাভারত আদি, পৌষ্য পর্ব, ১১২ শ্লোক, ইত্যাদি ইত্যাদি)।

তারপর নাগেরা খুব ধনী ও তাহাদের স্থানের নাম ভোগবতী। ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে গিয়া ব্যাস বলিয়াছেন—নাগদের দ্বারা ভোগবতী যেমন শোভাপ্রাপ্ত, পঞ্চ পাণ্ডবের দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থ সেইরূপ (আদিপর্ব্ব, ২০৯, ৫০ শ্লোক)। নাগরা পুর- ও মন্দির-নির্ম্মাণপটু। আর্য্যরা তেমন নির্ম্মাণপটু ছিলেন না। ময়দানব যে সভানির্ম্মাণ করেন তাতে দুর্য্যোধনও বোকা বনিয়া যান। তিনিও খাণ্ডববনবাসীদের ও আর্য্যদের সহায়তা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া রক্ষা পান।

গঙ্গা বাহিয়া আরও পূর্ব্ব মুখে দেশের অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরে গেলে নাগ-লোক। এইজন্য ভীমকে গঙ্গায় ভাসাইলে তিনি নাগলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ সেইখানে গঙ্গাজলের স্রোত গিয়া শেষ হইয়াছে (মহা, আদিপর্ব্ব, ১২৮, ৫৫)। সেখানে গিয়া বাসুকির সঙ্গে ভীমের পরিচয় হইল। কুন্তীর পিতা কুন্তিভোজ রাজা বাসুকির দৌহিত্র—কাজেই দৌহিত্রের দৌহিত্রকে বাসুকি খুব আদর করিলেন (মহা, আদি, ১২৮, ৬৫), তার পর নাগলোকে সুলভ নানা রত্নাদি ভীমকে দিলেন (ঐ, ১২৮, ৬৬)। সুপর্ণদের তাড়াতেই নাগরা সমুদ্রের দিকে পলায়ন করে (আস্তীক পর্ব্ব, ২৫, ২৬, ২৭ অধ্যায়)। সেখানকার নিষাদেরাও গরুড়ের দলের কাছে পরাজিত হয় (আস্তীক পর্ব্ব, ২৮ অধ্যায়)।

নাগদেরই পূর্ব্বে সব রত্নের অধিকার ছিল। এই দেশের সব গূঢ় ধনের সন্ধান তাঁরাই জানিতেন। তাই আর্য্যরা ভারতে আসিয়া যখন সবই অধিকার করিতে লাগিলেন, তখন নাগেরা সুযোগ পাইলেই তাহা চুরি করিয়া লইত, তবে অশ্বসেনের ন্যায় আশ্রয়হীন হওয়ায় ভোগ করিতে পাইত না। তাই আমাদের দেশে যে ধন হারায় তাহাই নাগের কবলে আসিয়াছে বলিয়া লোক মনে করে। প্রোথিত ধনের কলসীতে নাগেরা বাস করে ও নাগেরা যক্ষের মত সব ধনই আগলাইয়া রাখে। এই বিশ্বাস এখনও প্রাকৃত জনের মধ্যে অতি সাধারণ।

অর্জ্জুন যখন যুধিষ্ঠির সহ বিরাজমানা দ্রৌপদীর ঘরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন তখন তিনি পূর্ব অঙ্গীকার মত দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া বনে গেলেন। তখন গঙ্গার ধারে গিয়া অর্জ্জুন স্নানে নামিলে নাগকন্যা উলুপী তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। (আদি, ২১৬, ১৩)। নাগকন্যা অর্জ্জুনের রূপে মুগ্ধা। সেই নাগরাজ-ভবনে যে অগ্নি ছিল সেই পবিত্র অগ্নিতেই অর্জ্জুন যজ্ঞ করিলেন (ঐ, ২১৬, ১৫)। অর্জ্জুনও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন (ঐ, ২১৬, ১৭)।

উলুপী কহিলেন—আমি ঐরাবতের বংশের কৌরব নাগরাজের কন্যা তোমার রূপে মুগ্ধা, আমাকে বিবাহ কর (ঐ, ২১৬, ১৮-২০)। অর্জ্জুন কহিলেন—হে জলচারিণী, আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি (ঐ, ২১৬, ২২)। উলুপী তখন চমৎকার যুক্তিতে বুঝাইয়া দিলেন যে অর্জ্জুন বিবাহ করিতে অধিকারী (ঐ, ২১৬, ২০, ৩২)। উলুপীকে তিনি বিবাহ করিলেন। উলুপী আবার তাঁহাকে গঙ্গাদ্বারে ফিরাইয়া দিয়া গেলেন, বর দিলেন সমস্ত জলচর তোমার বশ হইবে (ঐ, ২১৬,৩৬), অর্থাৎ সব জলচারী নাগেরা তোমার বশীভূত হইবে। এই জলচারিণী কথাটি উপেক্ষণীয় নহে। নাগেরা বাস্তবিকই জলাশয়ের তীরে, নদীর তীরে বাস করিত, তাহারাই জলের মালিক। বেদেও পাই—নাগেরা জলধারা অবরুদ্ধ করিয়া আর্য্যদের মুস্কিলে ফেলিতেছেন। বৌদ্ধসাহিত্যেও দেখি ইহারা সব নদীর উপর প্রভুত্ব করেন। ইহারা নৌকাযোগে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পটু ছিলেন। এই কথা পুরাণেও পাই। এবং তাঁহারা সমুদ্রের দ্বীপে গিয়াও বাস করিতেছিলেন। ইহার কারণ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ভারতসমুদ্রের দ্বীপে ইহারাই ভারতের পরিচয় বহন করেন। মহাযান লঙ্কাবতার গ্রন্থে দেখি সমুদ্রদ্বীপে নাগলোকে বুদ্ধ গেলেন।

উলূপীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অর্জ্জুন হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া অগস্ত্যবট বশিষ্ঠপর্ব্বত প্রভৃতি তীর্থ দেখিয়া অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেশ দেখিলেন (আদি, ২১৭ অধ্যায়, ১-৯)।

এ তো কেবল মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে দেখান গেল। এইরূপ সমস্ত পুরাতন ইতিহাস খুঁজিলে নাগদের পরিচয় নানা ভাবেই পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসাহিত্যেও নাগদের বহু উল্লেখ আছে। তার মধ্যে মহাযান শাখা হইতে দুইএকটি স্থান দেখান যাক। বৌদ্ধ রাজা অশোকের বংশপ্রবর্ত্তক শিশু-নাগ (বিষ্ণুপুরাণ)। মহাবংশ-মতে শিশুনাগ ছাড়া নাগ-দশক নামেও রাজা আছেন (রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য ১৮ পৃষ্ঠা)। স্বয়ম্ভু-পুরাণ-মতে গৌড়রাজ প্রচণ্ডদেব দেবী বীরবতীর ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ম্ভু ক্ষেত্রের মহিমা শুনিয়া ভিক্ষু হইয়া শান্তিকর নাম লন। তিনি ৫টি দেবস্থান প্রতিষ্ঠিত করান। তার পঞ্চমটির নাম নাগপুরী। নাগ-পুরী বরুণ নাগের অধিষ্ঠিত। সেখানে পঞ্চগব্য দিয়া পূজা করিলে বৃষ্টি লাভ হয় (স্বয়ম্ভূ-পুরাণ, ৭ম)।

একবার নেপালে ৭ বৎসর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মহামারী হয়। দুঃখ শান্তির জন্য শান্তিকর অষ্টদল পদ্ম আঁকিয়া অষ্ট নাগকে আহ্বান করেন। নাগেরা আসিলেন। বরুণ নাগ পদ্মের মধ্যস্থলে বসিলেন। তিনি শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ সপ্তফণ। পূর্ব্বদলে নীলবর্ণ অচণ্ড নাগ বসিলেন। দক্ষিণ দলে মৃণালবর্ণ পঞ্চফণান্বিত পদ্মক নাগ। পশ্চিম দলে নবফণান্বিত কুঙ্কুমবর্ণ তক্ষক নাগ। উত্তর দলে সপ্তফণাযুক্ত হরিদ্‌বর্ণ বাসুকি। দক্ষিণ-পশ্চিম দলে হরিদ্‌বর্ণ শঙ্খ নাগ। উত্তর-পূর্ব্ব দলে ত্রিফণান্বিত শ্বেতবর্ণ কুম্ভনাগ। উত্তর-পূর্ব্বে স্বর্ণবর্ণ মহাপদ্ম নাগ—সব আসিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দলের অধিকারিণী নীলবর্ণ কর্কট নাগ আসিলেন না। গঙ্গাবতীর দক্ষিণে আধার হ্রদ হইতে শান্তিকর তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আসিতে বাধ্য করিলেন। নাগদের পূজায় প্রচুর বৃষ্টি হইল। এই নাগদের রক্ত লইয়া শান্তিকর পদ্মদলাসীন নাগদের চিত্র করাইয়া নাগপুর রক্ষা করিলেন। তাহাতে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির প্রতিকার হইল (স্বয়ম্ভূ পুরাণ, ৮৮) পূর্ব্ববঙ্গেও প্রবচন আছে—"নয় নাগের ঘরে জয়কার হইল"; ইহা বৌদ্ধ-আখ্যান-জাত। (তুঃ—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, ৩০ পৃষ্ঠা, ১০৫ পৃষ্ঠা।)

ভগবান ক্রকুচ্ছন্দ নেপালের বাগমতী নদীর তীর্থ বর্ণনায় বলেন—বাগমতীতে রক্তাস্ত্র নামে নাগ আছে। কেশবতী নদীর সঙ্গে বাগমতীর সঙ্গমে চিন্তামণি তীর্থ। সেখানে বরুণ নাগ সর্ব্বকামফলপ্রদ। বাগমতী-রত্নবতী সঙ্গমে রামোদক তীর্থ। সেখানে পদ্ম নাগ কাম ও ভোগ পূর্ণ করেন। বাগমতী-চারুমতীর সঙ্গমে সুলক্ষণ তীর্থ। সেখানে পদ্মনাগ সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রদ। তার পর দ্বাদশ পুণ্যস্থানের বিবরণে ক্রকুচ্ছন্দ বলেন যে সেখানে নৈমিত্তিক যোগ-স্নান হয়। যোগ বিশেষে অনন্ত হ্রদে অনন্ত নাগের পূজায় ধনলাভ হয় (স্বয়ম্ভূ পুরাণ ৫৮)। মহাভারতের বনপর্ব্বে ৮৩ হইতে ৮৫ অধ্যায়ে কয়টি নাগ-তীর্থের বর্ণনা আছে।

লঙ্কাবতারের মতে বুদ্ধ মহাসমুদ্রে নাগদের রাজ-ধানীতে যান, তার পর লঙ্কায় মলয় পর্ব্বতে যান। রাবণ তাঁর অর্চ্চনা করেন।

কাশ্মীর, চাম্বা প্রভৃতি হিমালয় প্রদেশে অতি প্রাচীন নাগপূজা দেখিয়াছি, তাহাতে শিবের সঙ্গে কোনো বিরোধই নাই। সে-সব স্থলে নাগেরা জলধারা বা জলাশয়ের রক্ষক। বেদেও জলপ্রবাহের উপর নাগের হাত আছে দেখিতে পাই। জলের গতিই সর্পের-মত। বৃত্রও সর্পেরই স্বরূপ।

কিন্তু মনসা নামে যে নাগদেবতার নূতন রূপ বাংলা-দেশে আসিল তাহার মূল কোথায়? ইহা নূতন, কারণ মনসার পূর্ব্ববর্ত্তী শিব প্রভৃতি দেবতার পূজার সঙ্গে ইহার ভয়ঙ্কর বিরোধ।

বাংলাদেশের মনসা-পূজায় এই আস্তীক স্তরটি সব নীচের স্তর। কারণ আমাদের মনসার প্রণাম-মন্ত্রটি এই—"তুমি আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকি নাগের ভগিনী, জগৎকারু মুনির পত্নী, তোমাকে নমস্কার।" কিন্তু এই প্রাচীন নাগপর্ব্বের কথা লইয়া মনসা ও চাঁদসদাগরের বিবাদ ও শিবপূজার সঙ্গে নাগপূজার

এত বিরোধ হইতে পারে না। এই পরের অংশটুকু নিশ্চয়ই অন্যত্র হইতে আসিয়াছে।

Ethnological Survey Central Provincesএ দেখিতে পাই যে মধ্য ভারতেও সর্পের ওঝাকে বাইগা বলে—ইহারা বাংলার বেদে ও পূর্ব্ববঙ্গের বাইদার মত। সেখানেও পান-লতার কৃষি যারা করে তারা "বারই"। তারা সর্প-পূজা করে। সিন্ধুদেশের ও কচ্ছের লোকেরা বিষরী পূজা করে—ইহা বাংলাদেশের বিষহরী। বাংলা প্রাচীন কোনো কোনো কাব্যে বিষরী রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মনসা-পূজার সঙ্গে ইহাদের পূজার মিল তত নাই যত আছে দ্রবিড়দের সর্প-পূজার সঙ্গে।

কাশীতে বাল্যকালে দেখিতাম মালাবারের লোকেরা সর্প-পূজাতে আলপনা আঁকিয়া পূজা করিত। বাংলা দেশেরই মত পঞ্চবর্ণ গুড়িকায়, তুষপোড়া, হরিদ্রা-চূর্ণ, বিল্বপত্র গুঁড়া, কুসুম-ফুলের গুঁড়া ও চালের গুঁড়া দিয়া বাংলাদেশের মতই আলপনা করিত। (দ্রষ্টব্য Thurston, Epigraphic Notes on Southern India, 290 page.)

বাংলার মত সে দেশেও বিশ্বাস আছে ওঝা মন্ত্র পড়িয়া সাপকে টানিয়া আনিয়া বিষ চুষাইয়া বাহির করাইতে পারে (ঐ, ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

মহীশূরে দেবীরা "মরী" নামে খ্যাত। তাঁদের মধ্যে একজন আছেন বিশাল দেবী। নামটা আমাদের বাশুলির কাছাকাছি। আমাদের দেশের মারীভয় কি দেবীদের প্রকোপকে বুঝায় না? সেখানে মরী অর্থই দেবী।

কানাড়া ও তেলেগু প্রদেশের পূজা-পদ্ধতি অনেকটা মেলে। কানাড়াতে যেমন বিশালদেবী আছেন, তেমনি "মনে মাঞ্চী" দেবী আছেন। ইনি নাগদেবী। বল্মীক-স্তূপেই প্রায় জাতি-সাপ থাকে। তাই বল্মীক-স্তূপেই কানাড়াতে ও তেলেগুদেশে সাপের পূজা হয়। বৎসরে একবার মাত্র "মনে মাঞ্চীর" পূজা। বিশালদেবীর পূজার সঙ্গে এই মাঞ্চীর পূজা জড়িত। এই "মাঞ্চী" দেবীকে সেখানে "মঞ্চাম্মা" বা "মনচা অম্মা" অর্থাৎ মনচা মাতা বলে। ইহারা "চ"কে প্রায় "স"এর মতন উচ্চারণ করে। কাজেই "মনসা অম্মা" মনসা মাতায় গিয়া দাঁড়ায়। বাল্যকাল হইতেই এই কথাটি জানি। তবু কোনো পুস্তকে পাই নাই বলিয়া এই বিষয়টি লিখি নাই। কেবল নানা পুস্তকে খোঁজ করিতেছিলাম। সেদিন শ্রীযুত Henry Whitehead রচিত "The Religious Life of India" গ্রন্থের ৮৫—৮৭ পৃষ্ঠায় "মনে মনচি" বা "মনচা অম্মার" বিষয় লিখিত হইয়াছে দেখিলাম। বিশাল দেবীর সঙ্গেই ইঁহার সম্বন্ধ, আর ইনি সর্পেরই দেবতা।

এখন কথা—ঐ দেশ হইতে মনসা পূজা আসে কেন? একথাও বহুকাল হইতেই হয়তো অনেকের মনে মনে আছে, প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। সেন রাজারা যে দক্ষিণ হইতে আসিয়াছেন, বহু কাল হইতেই তাহার প্রমাণ দিন দিন বাহির হইতেছিল। অনেকের সঙ্গে এ বিষয়ে মুখে কথাবার্ত্তা বলিয়াছি, তবে কখনও লিখি নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহা সন্দেহ করিয়াছিলেন; তাঁর প্রশ্ন হইল—মুগ্ধবোধ পাণিনির ন্যায় বৈজ্ঞানিক বা কাতন্ত্রের ন্যায় সরল নয়। তবে সুদূর দক্ষিণের এই পুঁথি বাংলাতে আসিল কেন? সেন বংশীয় রাজাদের জাতিটা ঠিক বাংলা দেশে কেন ঠাওর হইতেছে না। এমন সময় বাহির হইল যে সামন্ত সেন কর্ণাট রাজবংশ হইতে আসিয়াছেন। Epigraphic প্রমাণে বাহির হইল দক্ষিণ হইতে আগমন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে অনেক প্রমাণাদি দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তার পর অধ্যাপক শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দেখাইলেন বল্লাল নামে একটি পুরোহিত শ্রেণী দক্ষিণে ছিল। তার পর ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মীথ্‌ তাঁর ভারতের ইতিহাসের নূতন গ্রন্থে সেন রাজাদের পরিচয় আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়া কহিলেন যে ইঁহারা দক্ষিণ হইতে আগত ব্রাহ্মণ। সেদিন দেখিলাম অধ্যাপক শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার সেন রাজাদের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়টির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তিনি বলেন সেন বংশীয়রা কর্ণাটের জৈন আচার্য্য সম্প্রদায়।

ক্রমশঃ আরও বেশী প্রমাণ সংগ্রহ হইতে থাকিবে, কারণ আরও অনেক প্রমাণ আছে। সেখান হইতে দেব দেবী ও পূজা-পদ্ধতি আসা খুবই স্বাভাবিক।

আরও অনেক প্রমাণ মিলিবার সূত্র আছে। বাংলা দেশের শিব-পূজাতে হিমালয়ের শিবও আছেন, দক্ষিণ দেশের শিবও আছেন। দেবীর মধ্যে উত্তরের দেবী ও শক্তি আছেন, দক্ষিণ দেশের গ্রাম-দেবীও আছেন। বাংলা দেশে প্রচলিত বহু তন্ত্র রাবণ-প্রোক্ত। রসায়ন ও চিকিৎসা গ্রন্থের তন্ত্রাংশগুলি রাবণ-প্রোক্ত ও দক্ষিণ-বিদ্যা বলিয়া খ্যাত। আমাদের মঙ্গলকাব্যের গল্পগুলির সব যোগ দক্ষিণ দেশের সঙ্গে। শ্রীমন্ত গেলেন দক্ষিণে সিংহলে। ধনপতি গেলেন সিংহলে। কমলে কামিনী দর্শন দক্ষিণে। বিদ্যা-সুন্দরের সুন্দর কাঞ্চীপুর হইতে আসিলেন; তাঁর চোর-পঞ্চাশৎ চোল কবির পঞ্চাশটি স্তব শ্লোক। রায়মঙ্গল শীতলামঙ্গল ও মনসামঙ্গলেও দক্ষিণের সম্পর্ক প্রবল। আমাদের গল্পগুলি বরাবর কলিঙ্গ, দ্রবিড় বাহিয়া সিংহল তক গিয়াছে। গঙ্গা বাহিয়া বড় যায় নাই। এসব দেখিবার মত, ভাবিবার মত বিষয়।

সমস্ত উত্তর ভারতের মেয়েদের আঁচল ডান কাঁধের উপর ফেলা হয়। তামিল তেলেগু প্রভৃতি দেশের মেয়েদের আঁচল বাম কাঁধের উপর ফেলা হয়। বাংলা দেশের নারীরা উত্তর ভারতে থাকিয়াও উত্তর ভারতের স্ত্রীদের মত আঁচল ডানদিকে ফেলেন না, বাঁ কাঁধে ফেলেন। ইহা সামান্য কথা নয়। বেশভূষাতেও অন্ধ্র দেশের নারীর সঙ্গে বাংলার নারীর বেশী যোগ। উভয়েই জামা পরিতে অভ্যস্ত নহেন এবং দেহ প্রায় অনাবৃতই থাকে। উত্তর ভারতের নারীর এই রীতি নয়। প্রাচীন সংস্কৃত কবিরাও অন্ধ্র নারীর আবরণহীনতার কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলায় নারীদের খোঁপা দক্ষিণের প্রণালীতেই বাঁধা (দ্বিজ বংশীদাস—পদ্মাপুরাণ, ২৮৯ পৃষ্ঠা)।

পুরুষের বেশেও দেখি উভয় দেশেই না আছে পাগড়ী, না আছে জুতা। অবশ্য সভ্যতার সংস্পর্শে উভয় দেশেই কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তবে প্রাকৃত অবস্থাটা একরূপই।

ঢোল ও কাঁশীর সঙ্গে সানাই উত্তর ভারতে কোথাও নাই, অথচ তৈলঙ্গ তামিল দেশে ইহাই জাতীয় বাজনা। কাশীতে বাংলা দেশের "ঢোল ও সানাই" বাদ্য নাই। মান্দ্রাজ দেশের নাটকোটের শ্রেষ্ঠীদের নিত্য পূজা যখন রাত্রিতে বিশ্বনাথ-মন্দিরে যায় তখন সে বাজনা শুনিয়া বাঙ্গালীর কান জুড়ায়। উত্তর ভারতের সানাইর খুব চমৎকার একটি কেমন মৃদু সুর। কিন্তু বাংলায় সানাইর ধরণ তৈলঙ্গের সানাইর মত। তাই বাংলার সানাইর আওয়াজকেও সে দেশে তেলেঙ্গা আওয়াজ বলে (দ্রষ্টব্য দ্বিজ বংশীদাস—পদ্মাপুরাণ, ২৭৪ পৃষ্ঠা)। এইরূপ যে দিক দিয়া দেখা যায় দেখিতে পাই বাংলার সঙ্গে দক্ষিণের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ।

তারপর মনসার সঙ্গে শিবের ঝগড়া ও লখিন্দরের লোহার বাসরের মত গল্প দ্রবিড় দেশীয় মনসাপূজকদের কাছে কাশীতে শুনিয়াছি, খোঁজ করিলে মিলিবে। বিশপ হোয়াইট্‌হেডের গ্রন্থেও একটি গল্প আছে।

বিশপ মহাশয় বলেন যে তৈলঙ্গ উপকূলে এক পূজারীর কাছে এক প্রাচীন তালপাতার পুঁথী পান। তাতে দেবী অম্মাবরু বা অঙ্কাম্মার গল্প আছে। তাহাতে আছে—শিব-সৃষ্টির, ব্রাহ্মণ-সৃষ্টির, জল ও জ্যোতি ও যুগ সৃষ্টির পূর্ব্বে দেবী অম্মাবরু ছিলেন। তিনি তিনটি অণ্ড প্রসব করিলেন। প্রথমটি নষ্ট হইল; দ্বিতীয়টি বায়ুতে পূর্ণ (বাংলাতে বাওয়া ডিম—ব্যর্থ ডিম্ব); তৃতীয়টিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইলেন, পৃথিবী অন্তরীক্ষ হইল। দেবী দেবতা তিনটিকে পালন করিয়া তিনটি পুর তাঁদের দিলেন। দেবী নিজের পুর তামা পিতল সোনা দিয়া বেষ্টিত করিলেন। তাতে ধোপা নাপিত কুম্ভকার বাস করিল।

দেবী শুনিলেন যে তিন রাজা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর পূজায় অবহেলা করিতেছেন। বিশেষ, শিব তাঁকে অবজ্ঞা করায় তাঁর ক্রোধের সীমা রহিল না। তার উপর শিবের আদেশে তাঁর ভৃত্য অম্মাবরুর নগরে গিয়া আবার তাঁকে গালি দেন। দেবী শুনিয়া আগুন হইলেন। তিনি এক হাতে মৃগ, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে ডিণ্ডিম ও নাগের উপবীত গলায় দিয়া এক সভা ডাকাইয়া বলিলেন

যে তাঁর অপমান হইয়াছে। তখন তিনি শৃগাল (শিবা) বাহনে চড়িয়া শিবপুরে চলিলেন। অম্বাবরু নিজের এক দুর্গ সৃষ্টি করিয়া তাহা পরিখাবেষ্টিত ও শঙ্খকণ্টকিত ও এক শত শক্তিদেবী দ্বারা রক্ষিত করিয়া দ্বাদশফণাযুক্ত নাগকে পুরীবেষ্টন করাইয়া রাখিলেন। নাগ নগর-তোরণের উপর বিষ-ফুৎকার করিতে লাগিল। অম্বাবরু সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া জগৎ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ও সাতরাজার মাথা কাটা গেল ও আবার জোড়া দেওয়া হইল। রাজারা নিজেরা কাটাকাটি করিয়া মরিতে বসিল।

কিছুদিন যায়। আবার নয়রাজা অম্বাবরুর পূজা ছাড়িয়া তিলক ধারণ করিল। দেবী দেবগিরিপুরে চলিলেন। প্রহরী বাধা দেয়। অম্বাবরু ফলের পসরা-ধারিণী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সকলকে নিদ্রায় অচেতন করিলেন। তখন তিনি পসরা লইয়া হাঁকিলেন—"হে পূর্ব্বপাড়ার শূদ্রা ভগ্নীগণ, ও পশ্চিম পাড়ার ব্রাহ্মণ ভগ্নীগণ, দক্ষিণ পাড়ার কাম্মা ভগ্নীগণ, ফল চাই ? অপূর্ব্ব ইহার শক্তি।" প্রহরী আসিয়া তাঁকে বেত মারিল। তিনি পসরা মাটীতে ফেলিতেই ভূমিকম্প হইল। তখন তিনি শৈব লিঙ্গায়েৎ (লিঙ্গপূজক) মূর্ত্তি ধরিয়া ভস্ম মাখিয়া শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া "নমঃ শিবায়" বলিতে বলিতে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তারপর অনেক কথা। অবশেষে শুকপক্ষী হইয়া তিনি নগরের তোরণের উপর বসিলেন। নয়জন শিবপূজক শিবপূজা করিতেছিলেন। হাতের শিব তপ্ত আগুনপ্রায় হইয়া উঠিল। শৈবেরা বলিলেন—"তোমার পুরী দগ্ধ হইতে চলিল, হে শিব, আমাদের ছাড়িয়া দাও, আমরা ঘরে ফিরিব। ঢের হইয়াছে, তোমার পূজা করিয়া আর ফল নাই। এখন মহা বিপদ উপস্থিত।" শিব প্রহরীদের বলিলেন—"বাহিরের কেহ কি আসিয়াছে ?" প্রহরীরা বলিল—"এক শিবভক্ত নারী আসিয়াছে মাত্র।" শিব এক প্রমথকে বলিলেন—"তাঁকে বাহির কর।" দেবী অনেক কষ্টে ধরা পড়িলেন। শিব তাঁকে তপ্ত দণ্ডে বাঁধিয়া মারিতে গেলে দণ্ড শীতল হইল। নয়জন শৈব আঘাত করিতে গেলে তাহাদের হাত স্তম্ভিত হইল। দেবীকে দলিতে গিয়া হস্তী স্তম্ভিত হইল। তপ্ত খোলায় দেবীকে ভাজিতে গেলে খোলা জুড়াইয়া গেল। দেবী প্রচণ্ডা হইয়া শুকমূর্ত্তি ধরিয়া কহিলেন—"হে শিব, আমার শক্তি বুঝাইয়া ছাড়িব। হে রাজা ও রাজপুত্রেরা, আমাকে পূজা করিবে কি ?" রাজা ও রাজপুত্রেরা কহিলেন—"হে অম্মাবরু, আমরা স্ত্রীলোক দেবতা পূজা করিব না। নারীদেবতাকে হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে পারিব না। 'নমঃ শিবায়' ছাড়া অন্য নমস্কার উচ্চারণ করিব না। তারপর তুমি আবার দেবী নাকি ?" দেবী তাঁদের শাসাইলেন, রাজারা ভয় পাইলেন না। দেবী ক্রোধে কহিলেন পুর ধ্বংস করিবেন। শিব কহিলেন—"অম্মাবরু যা খুসী করুন, তাঁকে দেবী বলিয়া পূজা করা হইবে না।" তখন অম্মাবরু ঘোর নির্য্যাতন সুরু করিলেন। নানা দুর্নিমিত্ত রোগ বিপৎ সব উপস্থিত হইল, সব ধ্বংস হইতে লাগিল, জল ও উদ্যান শুকাইল, ঝড় চলিল, গাড়ী গাড়ী মৃতদেহ বহিয়া নেওয়া কঠিন হইল। তখন নয় রাজা দুঃখে কষ্টে শিবকে অভিসম্পাত করিলেন—"তোমার জটার গঙ্গা রক্তধারা হউক, পাত্র ফাটুক. মালা ছিঁড়ুক", ইত্যাদি। শিব ভয় পাইলেন না, তিনি সকলকে আবার প্রাণ দিলেন। তখন অম্মাবরু দেবগিরিতে ফুল বেচিতে গেলেন। বাজারে মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "সোনার ওজনে ফুল বেচিব।" রাজারা শিবপূজার জন্য অম্মাবরুর পুরীতে সেই মহার্ঘ ফুল চুরি করিতে গেলেন। অম্মাবরু তখনি রাজাদিগকে ধরিয়া শূলে পুঁতিয়া মারিলেন। শত্রুরা পরাজিত হইল। (Village Gods of South India, pp. 124-137.)

এই তো সেই পুঁথির গল্প। ইহাতে মনসা ও শিবের ঝগড়ার মত কথা আগাগোড়া পাই। শৈব রাজারা চান্দসদাগরেরই মত। উত্তর-ভারতে বাংলার বাহিরে এরূপ গল্প শুনি নাই।

মালাবার-উপকূলের দিকে প্রতি বাড়ীর একটি অংশ নাগের বাসস্থল বলিয়া পবিত্র রাখা হয়। সেই স্থানটি খুবই সুন্দররূপে গাছপালায় ঢাকিয়া সুশ্রী করিয়া রাখিতে হয়। এক শ্রেণীর নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ নাগ-পূজার বিশেষ পুরোহিত। তাঁরা ছাড়া সে নাগ-বাস-স্থানে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। (Ethno-

graphical Notes on Southern India—Thurston, p. 287.')

পূর্ব্ববঙ্গেও প্রায় প্রতি প্রাচীন ধরণের বাড়ীতে এইরূপ কয়েকটি গাছ লইয়া মনসা-খোলা রাখার রীতি আছে। খোলা অর্থ যেখানে জঙ্গলা গাছ কাটিয়া একটু মুক্তজায়গা করা হইয়াছে, অথচ বনস্পতির ছায়া বেশ আছে। বরিশাল, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তর এরূপ মনসা-খোলা আছে। তারপর বাংলায় চাঁদসদাগরের মুখে মনসার নাম (অবশ্য অবজ্ঞার অর্থে) দেখিতে পাই "চেংমুড়ী"। চাঁদসদাগর "চেংমুড়ী কাণী" ছাড়া মনসাকে বড় অন্য নামে অভিহিতই করেন নাই। সেদিন প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় বনৌষধির নামের নানা দেশীয় প্রতিশব্দ খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ দেখিলাম মনসা-গাছেরই তেলঙ্গা নাম "চেংমুড়ু" (ভাবপ্রকাশ, ভাবমিশ্র বিরচিত, কলুটোলা সংস্করণ, পূর্ব্ব খণ্ড, প্রথম ভাগ,—গুড়ুচ্যাদি বর্গ, ৭৫,৭৬ শ্লোক, অনুবাদ টীকা) (দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনের দ্রব্যগুণ ১৬৪ পৃষ্ঠা) । তে‌লেগু বর্ত্তমান অভিধানে আছে "চেমুড়ু" বা "জেমুড়ু" শব্দ। এই শব্দটি পাইয়া আমার ধোঁকা আরও অনেকটা কাটিয়া গেল। মনসা নাম পূর্ব্বেই পাই য়াছিলাম—"মন্চা অম্মা" বা "মনসা অম্মা" অর্থাৎ মনসা মাতা। শিব ও মনসার ঝগড়ার গল্প পাইলাম। পূজার পদ্ধতির ঐক্য পাইলাম। মন্সা-খোলা রাখার নিয়মের সাম্য পাইলাম। মনসা-গাছ যাহাতে মনসা দেবীর পূজা হয় তাহার নামটিও পাইলাম "চেংমুড়ু" বা "চেংমুড়ী"।

বাংলাতে "চেংমুড়ী" কথাটির মানে হয় না। তখন সকলে মনে করিলেন "চ্যাং" অর্থাৎ "লেঠো" মাছের মত মাথা যার সেই মনসা দেবী। বাংলার মনসা-ভাসান-লেখকরাও তখন দক্ষিণ হইতে এই পূজার আসিবার ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন মনসারই নাম "চেংমুড়ু" পাইয়া আগাগোড়া সবটা সুসঙ্গত হইয়া গেল।

আবার তা ছাড়া চাঁদসদাগর যে বাংলার লোক নহেন তাহার প্রমাণ যে বহু জেলাই তাঁহাকে দাবী করিতে চায়। তাঁর নির্দ্দিষ্ট কোনো স্থান নাই। ত্রিপুরা জেলায়. বর্দ্ধমানের চম্পকনগরে, ধুবড়ীতে, বগুড়া জেলায় মহাস্থানে, দিনাজপুরের সনকাগ্রামে, ত্রিবেণীতে, ইহা ছাড়া বিহারের বহু তীর্থে ও আরও অনেক জায়গায় চাঁদসদাগরের বাড়ী আছে। এর গোলমাল দেখিয়া শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে চাঁদসদাগর নামে কেহ ছিলেন না, গল্পটি কল্পনামূলক। বেহুলা পরমা সতী হইলেও বাঙালী নববধূর সঙ্গে তাঁর কিছু প্রভেদ দেখিতেছি। বিবাহ হইতেই তাঁর একটু স্বাধীন নির্ভীকতা ও আত্মশক্তির পরিচয় পাইতেছি। তিনি নৃত্যগীত-নিপুণা। সমুদ্র বাহিয়া দক্ষিণ দিকে দেবপুরীতে যখন তিনি লখীন্দরকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত তখন ভাই বলিতেছেন—"কেমনে ছাড়িয়া দিমু সাগর ভিতরে।

বিষম সাগরের ঢেউ তোলপাড় করে।"—

নারায়ণ দেব কৃত পদ্মাপুরাণ।

কিন্তু বেহুলা নির্ভীক। "অমাবরু" যেমন দেব-পুরীতে গিয়াছেন বেহুলা, মনসা, এমন কি মনসার মাতা চণ্ডীও ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ দাবী সাব্যস্ত করিতে দেবপুরীতে যান। "অম্মাবরু"র সঙ্গে মনসার মাতা চণ্ডীর বেশী মিল। আসলে চণ্ডী অম্মাবরুর ন্যায় গ্রামদেবী। তাঁরই পরবর্ত্তী আমদানী যেসব দক্ষিণের দেবী, মনসা তার অন্য-তম। কাজেই মনসা চণ্ডীর কন্যা। একথাটা একেবারে যুক্তি-হীন নয়। বিজয় গুপ্তের ও অন্যান্য মনসার কথা লেখকের পুস্তকেও দেখিতে পাই যে চণ্ডী শিবের পত্নী হইলেও মনসাকে লইয়া বড় গোল লাগিয়া গিয়াছে। শিব চণ্ডীকে স্বীকার করিলেও মনসার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নারাজ। তাই মন্সার বিবাহ চণ্ডী নিজেই দিতেছেন। শিব সেখানে নাই। ইহা লইয়া বহু ঝগড়া চলিতেছে। কাজেই তখন চণ্ডী যদিও গোলেমালে পার্ব্বতীর স্থান লইয়াছেন তবু মনসার স্থান হইতেছে না। তবে চণ্ডী-কাব্যে দেখি চণ্ডীও ভাল করিয়া গৃহীত হইতে পারিতেছেন না। আর বেহুলাও কলিঙ্গ দেবীর কাছে কলিঙ্গ বালিকার মত স্বাধীনতা ও তেজ লাভ করিয়াছেন। তাঁর মধ্যে রস-বোধটুকুও বেশ আছে। লখীন্দরকে জিয়াইয়া ডোম ও ডোমকন্যার বেশে শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ায় তাহার প্রমাণ। আর অম্মাবরুকেও দেখি নীচ জাতীয়া কন্যা সাজিয়া অপূর্ব্ব চুপড়ী লইয়া বেচাকেনায় বাহির হইয়াছেন।

ভারতের কোন সতীই এই পদ্ধতিতে ঘর ছাড়েন নাই। তাই চাঁদ বেহুলাকে যাইতে মানা করেন (দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৩২৫ পৃষ্ঠা)। আমাদের দেশের সতীলক্ষ্মীদের মধ্যে এত বড় তেজ প্রায় দেখিতে পাই না। বেহুলার তেজ ও নির্ভীকতা বিবাহকাল হইতে। তাঁহার স্বামীসহ সমুদ্রে ভাসিয়া পড়াও কম সাহসের কথা নয়। তারপর শ্বশুরবাড়ী স্বামী-সহ ডোম সাজিয়া যাওয়ার মধ্যে যে একটি পরিহাসপ্রিয়তা আছে তাহা খুব স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করার অভ্যাস না থাকিলে আশা করা যায় না। দেবপুরীতে নৃত্য করিয়া দেবতা প্রসন্ন করা দেবদাসীর কাজ। তাহা বাংলা দেশের প্রথা নয়। তাহা তৈলঙ্গেরই বস্তু।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও দেখি শিবপুর দক্ষিণে, (২১১, ২১২, ২১৮, ২০০ পৃষ্ঠা) দেবপুরীও দক্ষিণে (২০৩, ২৪ পৃষ্ঠা)। তাঁর গ্রন্থেও কর্ণাটরাজ নরসিংহের কথা আছে (পদ্মাপুরাণ, ৭২ পৃষ্ঠা)। মনসা-পূজা সমুদ্রের হারমাদ দ্বীপে [পর্ত্তুগীজ ডাকাতদের দ্বীপ (তুঃ Armada)] হইত (পদ্মাপুরাণ, ১২২ পৃষ্ঠা)। বছাই হালুয়া অর্থাৎ চাষা প্রথম পূজক (তথা বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ৭২ পৃঃ)। সমুদ্রের দ্বীপে চাঁদ মনসা-মন্দির দেখিতে পান (বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ১৮৪ পৃষ্ঠা)।

আজ যে-সব প্রমাণ বলিলাম ইহার জন্য তো বিশেষ কিছু পরিশ্রম করা হয় নাই। আমাদের দেশের একদল তরুণ বিদ্যার্থীর ও একদল জ্ঞানতপস্বীর উচিত এইসব দেশে থাকিয়া তাদের রীতিনীতি, গ্রামদেবতা, গ্রামদেবী, পূজা-পদ্ধতি, আল্পনা, ব্রতের কথা, দেবদেবীর কথা, প্রবচন, শিশুভুলান ছড়া, গল্প, রূপকথা প্রভৃতি, দেবদেবীর মূর্ত্তি, মন্দিরের গঠন, নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর গঠন, পাক করিবার প্রণালী, শিশুদের খেলনা, নানাবিধ Decoration (মণ্ডন), বিবাহ প্রভৃতিতে স্ত্রী-আচার, নারীশিল্প প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখা ও আলোচনা করা। এ বিষয়ে আমি আরও কিছু কিছু ভবিষ্যতে বলিব। বক্তব্য সব কথা আজ বলা হয় নাই।

বাংলাতে মনসা-পূজাতে মহাভারত ও পুরাণাদিতে উল্লিখিত বাসুকি ও তক্ষকের নাম আছে বটে এবং মনসাকে বাসুকির ভগ্নী ও জরৎকারুর পত্নীও বলা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এই মনসা সেই যুগের নহেন। তখনকার নাগলোকের কথা বাংলায় নাগপূজার মনসার প্রভাবে তলাইয়া গেছে। বৌদ্ধ বাসুকি, অনন্ত, পদ্ম প্রভৃতিও নামেই আছেন। আসল চিত্রটি দেখি চেংমুড়ী মনসায় এবং তাহাকে ঠেকাইতে গিয়া শৈব চাঁদসদাগর হেঁতাল হাতে দাঁড়াইয়াছেন। এতবড় বাঙ্গালী বীরও নারীর চক্ষুর জলে হার মানিয়া মনসাকে অগত্যা বামহাতে পূজা করিতে বাধ্য হইলেন।

বাংলা দেশ যেমন দক্ষিণের রাজাদের ঠেকাইতে পারে নাই, তেমনি দক্ষিণের দেবতাদের ঠেকাইতে পারিল না। চাঁদসদাগর খুব কঠিন রকমের শৈব, কিন্তু গ্রাম-দেবীর কাছে তাঁকে মাথা নোওয়াইতে হইল। কারণ গ্রাম-দেবীরা ভয় ও লোভ দেখাইয়া প্রথমে নারীদের বশ করে; কাজেই তখন পুরুষরা দীর্ঘকাল তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। *

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

* প্রবন্ধটি ১০ই বৈশাখ ১৩২৯ শান্তিনিকেতনে সান্ধ্য আলোচনা-সভায় পঠিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। তিনিও দুই-এক স্থলে কিছু কিছু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কাপড়ে তসরের ন্যায় পাকা রং করিবার উপায়

আধপোয়া হিরাকস, একসের জলে মিশাইয়া এক-পোয়ার কিছু কম বাব্‌লার আঠা তাহাতে গুলিয়া দিবেন। তারপর খানিকটা গেরিমাটি-চূর্ণ উহাতে দিয়া কাপড় ভিজাইবেন। কাপড়খানা খুব ভিজিলে—তুলিয়া শুষ্ক করিয়া চূণের জলে ভিজাইয়া, জলে ধৌত করিয়া লইবেন। ইহাতে কাপড়ে তসরের ন্যায় সুন্দর পাকা ছোপ লাগিয়া যাইবে।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

মানের দায়

নন্দীহাটির বড়বাবুর তিনটি মেয়ে আর একটিমাত্র ছেলে। মেয়েদের বিবাহের সময় বড়বাবু যত হাজার টাকার দান-সামগ্রী দিবার অঙ্গীকার করেছিলেন তার চেয়ে পাঁচ-দশ হাজার বেশীই প্রত্যেককে দিয়েছিলেন। শুধু দিয়েছিলেন বল্‌লে যথেষ্ট হবে না, দেওয়াটা যে তাঁর কাছে কতখানি সামান্য ব্যাপার তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন একথাও বলা দরকার। বড়বাবু গহনা কাপড় বাসন আসবাব সব কিছুর দামের রসীদগুলি বরকর্ত্তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভাল জিনিষ দিতে হলে টাকার মায়া করা যে কতখানি দীনতার পরিচায়ক সে কথা অতিথি অভ্যাগত বরযাত্রী কন্যাযাত্রী সকলকেই কোন না কোন অছিলায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নন্দীহাটির বাবুদের মেয়েদের খাট কতখানি উঁচু, কত হাত লম্বা, কতখানি চওড়া না হলে তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হয় একথা জান্‌তে এই-সব বিবাহ সভায় কম লোকে-রই বাকি ছিল। কত ওজনের কয় প্রস্থ গহনা না হলে সে বাড়ীর মেয়েরা ভদ্র-সমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করেন, এবং কত শ' টাকা দামের কয়খানা সাঁচ্চা জরির বুটিদার বেনারসী শাড়ী বাক্সে না থাক্‌লে তাঁরা শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে যমের বাড়ীর পথই শ্রেয় মনে করেন এ-সকল তথ্যও প্রতি কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিতা অন্তঃপুরিকারা সযত্নে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

নন্দীহাটির বাবুদের অনেক-কালের বনিয়াদী ঘর। তাঁদের পাঁচমহল বাড়ীর পাকা ভিত আর গাঁথুনি যেমন এতকাল ধরে অচল অটল হয়ে আছে, তেমনি অচল অটল হয়ে আছে তাঁদের সংসারের আইন-কানুন রীতিনীতি। ছেলে-মেয়ের বিবাহে বর্ত্তমান বড়বাবুর প্রপিতামহ যে-সব নিয়ম প্রবর্ত্তন করেছিলেন আজ পর্য্যন্ত সে সব নিয়মের একচুল পরিবর্ত্তন করাতে বড় কেউ সাহস করেনি। বড়বাবুও কোনোদিন করতেন কি না সন্দেহ যদি না দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর জীবনকালে স্নেহলতা মৃত্যু-স্বয়ম্বরা হয়ে শান্ত বাংলার বুকে এমন একটা ঝড় তুলে দিতেন।

স্নেহলতা যখন প্রাণের চেয়ে মানকেই মানুষের কাছে বড় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সেই সময় নন্দীহাটির বড়বাবু ছিলেন তাঁদের সমাজের সমাজপতি। স্নেহলতার চিতার আগুনের আলোয় বড়বাবুরও চোখ ক্ষণিকের মত ঝলসে গিয়েছিল; তাই তিনিও বংশ নিয়মের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশের আর দশজনের মত কতকগুলো প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলেন। বড়বাবুর কপাল খুব মন্দ ছিল না; কারণ তাঁর তিন মেয়েরই তখন বিবাহ হয়ে গিয়েছে; বাকি ছিল কেবল ছেলেটির।

সাধারণ গৃহস্থ হয়ত মনে করতে পারেন এরকম সময় ছেলের বিয়ে বাকি থাকাটাই ত মন্দ ভাগ্যের কথা! কিন্তু নন্দীহাটির বাবুরা তা মনে করতেন না। তাঁদের টাকার অভাব ছিল না—ছিল ঐশ্বর্য্য দেখবার লোকের অভাব। সুতরাং এরকম দিনে ছেলের বিবাহ দেওয়াতে তাঁদের নাম-যশও বাড়বার বেশী সম্ভাবনা থাক্‌বে, এবং ঐশ্বর্য্য দেখাবার পথেও কোন বাধা পড়্‌বে না। বড়বাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মেয়েদের বিবাহে পণ দেবেন না এবং ছেলের বিবাহে পণ নেবেন না। পণ না দিলে তাঁর মেয়েদের যে কি রকম স্বামীভাগ্য হত, তা বড়বাবুর খুব ভাল করেই জানা ছিল, কিন্তু একথাও সেই সঙ্গেই তাঁর জানা ছিল যে তাঁর তিনটি কন্যাই বিবাহিতা। পুত্রের বিবাহে পণ না নেবার প্রতিজ্ঞাটা করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, কারণ যে-সব ঘরের সঙ্গে নন্দীহাটির বাবুদের কাজ-কর্ম্ম চল্‌ত সে-সব ঘরে পণের দাবী না করলেও পাওনা কিছুমাত্র কম হয় না। আর যদি তা কম হয়ও তাতে নন্দীহাটির ঐশ্বর্য্য-সমুদ্রের জলে জোয়ার-ভাঁটার খেলা দেখা যায় না।

বড়বাবু রায় মোহিনীমোহন চৌধুরী বাহাদুরের পুত্র কিশোরীমোহন কলেজে-পড়া ছেলে। পিতার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সে মাকে বল্‌লে, "বাবা, যদি সত্যি এ-রকম কথা বলে থাকেন, তবে কিন্তু মা

তোমরা কুসুমটি কি লোহাগড়ে আমার সম্বন্ধ করতে পাবে না।"

মা দুই চোখ কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে বল্লেন, "শোন একবার কলির ছেলের কথা! কথায় বলে বল্লটি না চোরটি। আমরা কি করব না-করব তার ভাবনা তোকে এখন থেকে কে ভাবতে বলেছে রে? তুই যা নিজের চরকায় তেল দিগে যা।"

ছেলে বল্লে, "নিজের চরকায় তেল দিতে চাই বলেই ত চোরটি থাকতে পারছি না। সভা ডেকে প্রতিজ্ঞা করে তারপর লাখ টাকার জিনিষ ঘরে তুলে যে বল্বে বিনাপণে ছেলের বিয়ে দিয়েছি, ও-সব ন্যাকামো আমাকে নিয়ে আমি করতে দেব না।"

মা বল্লেন, "ওরে আমার শাক্যমুনি রে! কি করতে হবে শুনি! হাড়ীর মেয়েকে ছেলের বউ করে আন্তে হবে? ভদ্রলোকের মেয়ে যে কোথায় দশ বিশ হাজার সঙ্গে না নিয়ে শুধু হাত নাড়তে নাড়তে শ্বশুর ঘর করতে যায় এও ত কখন শুনি নি।"

ছেলে বল্লে, "এইবার তাহলে শোন। তোমরা যখন নেব না বলেছ তখন যে ভদ্রলোক না চাইলেও দিতে পারে তার মেয়েকে বউ করতে পাবে না। এ আমি বলে দিচ্ছি; একথার আর নড়চড় নেই।"

মা ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন, "কথার মারপ্যাচ না করে সোজা-হুজি বল্না কোন্ ছোটলোকের জামাই হবার সখ হয়েছে?"

বিশেষ কোনো ছোটলোকের জামাই হবার সখ যে কিশোরীমোহনের হয়েছিল তা নয়। কুসুমটি আর লোহাগড়ের জামাই না-হবার সখটাই আপাতত তার খুব বড় হয়ে উঠেছিল।

মোহিনীমোহন ছেলের কথা শুনে প্রথমটা একটু ক্ষুব্ধ আর বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জন্য। লোহাগড়ের মেয়ে না এনেও যে ছেলের বিয়েতে সংসারকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায় এই তথ্যটা প্রমাণ করবার দিকে অকস্মাৎ তাঁর সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়ল, তিনি বল্লেন, "আচ্ছা তাই হবে। কাঙালের ঘরের মেয়েই আমি আন্ব। নন্দীহাটির পরশ-পাথর যে মাটিকেও সোনা করে তুল্তে পারে এবার আমি তাই দেখাব।"

মেয়ে খোঁজার ধুম লেগে গেল। নন্দীহাটির বাবুদের এ এক নূতন খেয়াল! এ বাড়ীর বধূদের নাক মুখ চোখ রং সব চিরকালই এদের মাপকাঠিতে মেপে নেওয়া হয় ঘটকদের তা জানা ছিল, কিন্তু বধূর পিতার দারিদ্র্য মেপে নেবার কোনো মাপকাঠির খবর তাদের জানা ছিল না। এবার একথা বেচারীরা প্রথম শুনলে। বড়বাবুর ভাবী বৈবাহিকের দীন মূর্ত্তি কল্পনা করতে তাদের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে আস্ছিল কিন্তু বড়বাবুর মাথাটা গর্ব্বভরে যেন আকাশে গিয়ে ঠেক্‌তে চাইছিল।

অনেক খুঁজে-পেতে বাবুর মনের মত দরিদ্র একটি বৈবাহিক পাওয়া গেল। মেয়েটিও রূপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। মেয়ের বাপের ভিটেমাটি কিছুই ছিল না। স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বলে যে দুটো কথা আছে তাও তাঁর ভাল করে জানা ছিল না, সুতরাং কোনো রকম সম্পত্তি যে ছিল না সে ত বলাই বাহুল্য। একখানা মাত্র ভাড়াটে ঘর এবং রান্না করবার মত একটুখানি ঘেরা বারাণ্ডা নিয়ে কলিকাতার কোন সহরতলীর একটি একতালা বাড়ীতে ভদ্রলোকের দিন কাট্‌ত। এমন বড় ঘর থেকে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে শুনে বেচারীর দুই চোখে হু হু করে জল এসে পড়েছিল। অনেকে বলে আনন্দেই তাঁর চোখে জল এসেছিল, অনেকে বলে ভয়ে। মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি একটু ইতস্ততঃ করবার উপক্রমও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপক্রমণিকার আগেই মোহিনীমোহন তাঁকে এমন চেপে ধরলেন যে দরিদ্র হরিনাথ আর কোনো কথা বল্‌তে সাহস পেলেন না। অগত্যা বিবাহের সম্বন্ধ পাকা-পাকিই হয়ে গেল।

বিবাহ হয়ে গেল। পাকা-দেখা, গায়ে-হলুদ, অধিবাস প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের নামে মোহিনীমোহন চাল, ডাল, ঘি, তেল, ময়দা থেকে সুরু করে টাকা, মোহর, অলঙ্কার বেণারসী শাড়ীর এমন প্লাবন সুরু করলেন যে কারুর আর বুঝ্‌তে বাকি রইল না হরিনাথের কন্যার বিবাহের খরচটা কোথা থেকে হবে। বিবাহটা যে ঘটা করেই হল তা বলাই বাহুল্য। তবে বিবাহ-সভায় হরিনাথ ছাড়া

আর সকলকেই সেদিন কন্যাকর্ত্তা বলে মনে হচ্ছিল এই যা একটু ত্রুটি।'

নন্দীহাটির বাবুদের বাড়ীতে নিয়ম ছিল বউ আন্‌বার সময় বাড়ীর পুরানো দাসীর হাতে তাঁরা বধূর জন্য এক-প্রস্থ গহনা ও পোষাক পাঠিয়ে দেন। দাসী বধূর পিতৃ-গৃহের বস্ত্র অলঙ্কার সবের বদলে শ্বশুর-গৃহের আভরণে নববধূর আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন করে তার পর পাল্কীতে বউ তোলে। বধূর পিতা ধনীই হোন কি দরিদ্রই হোন তাঁর ঘরের কোনো অলঙ্কার কি বেশভূষা অঙ্গে নিয়ে নন্দীহাটির কোনো বধূ কখনও শ্বশুরের পাল্কীতে পা দিতে পায় নি।

কিশোরীমোহনের বউ আন্‌তে যেতে হবে। কিশোরীমোহনের মানুষ-করা বুড়ো ঝি দেখ্‌লে শুভক্ষণ বয়ে যায় কিন্তু মায়ের ত বউ আন্‌বার আয়োজনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কিশোরীমোহনের জননী উঁচু পালঙ্কের উপর রূপোর পানের বাটা কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে আছেন, দাসীরা তাঁর অঙ্গসেবা করছে আর মাঝে মাঝে গৃহিণীর বামহস্তের দক্ষিণা একটি করে পান গালে পুরছে। খাটের নীচে মেঝেতে গালিচার উপর কুটুম্বিনীরা কেউ শুয়ে কেউ বসে গৃহিণীর মন খুসী করবার জন্য তাঁর রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, সব কিছুর সাত-মুখে প্রশংসা করছেন। কি জানি কোন্ পথে গৃহিণীর হৃদয় জয় করে ফেলা যায়। এইবেলা সব কটা পথেই ঘুরে ফিরে দেখা ভাল। এ সময়ে সুনজরে পড়তে পারলে ছেলের বিয়ের দক্ষিণাটা ভাল রকমই পাওয়া যাবে। খাটের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসে গৃহিণীর ভাগ্নে-বউ তাঁর কঙ্কণ-শোভিত হাতখানা নাড়তে নাড়তে সবে বল্‌তে সুরু করেছেন, "ঢের ঢের রূপসী দেখ্‌লাম কিন্তু আমাদের মামীমার—" এমন সময় বুড়ী ঝি এসে বল্লে, "বলি, হ্যাঁগা মা, নোতন বোয়ের গয়না কাপড় কি আর আজকে বার করে দেবে না? বেলা কি মানুষের মুখ চেয়ে বসে থাক্‌বে?"

গৃহিণী কিছু বল্‌বার আগেই কিশোরীমোহনের দিদি বল্‌লেন, "সে-বাড়ী গিয়ে বলিস্ কনের মাকে, তোমাদের বাড়ীর গয়না-গাঁটি খুলে দাও, তারপর যদি খুলে নেয় কিছু ত লোক পাঠিয়ে দিস্ আমরা গহনা পাঠিয়ে দেব।"

ঘরে হাসির বন্যা বয়ে গেল। গৃহিণী হাই তুলে বল্‌লেন, "নে থাম্ সরি, বাক্স থেকে ময়ূরকণ্ঠী বেণারসীটা বের করে দে, একটা ত কিছু নূতন পরিয়ে আন্‌তে হবে।"

ভাগ্নে-বউ বল্‌লেন, "যা বল্‌লে মামীমা, হলই বা এ বাড়ীর কাপড়, তা বলে নূতন কনে বউ আস্‌ছে, পরা কাপড় পরিয়ে কি আর পাল্কীতে তোলা যায়?"

শুভক্ষণে বউ এসে নাম্‌ল। গড়ের বাজনা, রসুন চৌকী, শাঁখের ফুৎকার, মানুষের চীৎকার, উলুধ্বনি, ছেলের কান্না, সব যেন পরস্পরকে হার মানাবার জন্যে সপ্তমে চড়ে উঠ্‌ল। বধূবরণের আর অভ্যর্থনার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান করে নন্দীহাটির বড়বাবুর একমাত্র পুত্রের বধূকে ঘরে তোলা হল।

* * * *

হরিনাথের কন্যা ইন্দিরার ভাগ্যে ভাগ্যবিধাতা ধন জন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সবই লিখেছিলেন কিন্তু সুখ কথাটা লিখতে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন। আজন্ম তার অভ্যাস একতালার একখানা ঘর আর বারাণ্ডায় দু-চারজন মানুষের মধ্যে থাকা, অকস্মাৎ এই বিপুল পাঁচমহলা বাড়ীখানার অন্দরে এসে পড়ে সে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ-রূপে হারিয়ে ফেলেছিল। শ্বশুরের বাড়ীর অভ্রভেদী মহিমা যত সে অনুভব করত ততই তার নিজের অস্তিত্বটা তুচ্ছ হতে তুচ্ছতর হয়ে আসত। পিতার দীন আবাসের ছোট চারটি দেয়ালের মধ্যে সে নিজের অস্তিত্বের মহিমায় মহিমান্বিত ছিল কিন্তু এখানে তার মনে হত যেন একটা দৈত্যের যোজন-জোড়া হাঁয়ের মধ্যে সে সামান্য এক-গ্রাস আহার্য্যের মত এসে পড়েছে। এখানকার মানুষ-গুলোর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাদের খাওয়া-দাওয়া বসবাসের ভাবনার সঙ্গে তার ভাবনার কোনো যোগ ছিল না, তাদের কোনো কাজের ছায়া তার জীবনযাত্রার পথে পড়ত না, তার কাজের কর্ম্মের ভাবনা-চিন্তার ছায়াও তাদের স্পর্শ করত না। একটা বাড়ীর মধ্যে এই যে এতগুলো প্রাণী, এরা যে শুধু বাহিরের দিক থেকে নিজের নিজের আলাদা

মহলে থাকৃত তা নয়, এদের বনিয়াদী বাড়ীর পাঁচিলের মত এদের মনের মধ্যেও মস্ত মস্ত পাঁচিল তোলা ছিল। এদের স্বামীস্ত্রীর ঘরকন্নাও ছিল আলাদা। বাবুর খাস খানসামা আর গৃহিনীর খাস ঝির এলাকায় যে কাপড়-চোপড় বাসন আসবাব থাকৃত তা কখনও পরস্পরের গণ্ডী অতিক্রম করত না। বাবুর বাহির-মহলের মনের মধ্যে অন্দর-মহলের স্ত্রীর অনধিকার প্রবেশ সেবাড়ীতে অতিবড় হাস্যকর ব্যাপার ছিল। হরিনাথের স্ত্রী পুত্র কন্যার মত আত্মীয়-কটুম্বের সঙ্গে সুখ-দুঃখের ছোটখাট তুচ্ছ কথা বলা সে বাড়ীর লোকের অভ্যাস ছিল না। তাদের পদ-গৌরবের মর্য্যাদার কাছে সুখদুঃখ লজ্জায় মুখ দেখাতে পারত না।

ইন্দিরার কাছে তার শ্বশুরের প্রাসাদের এত-গুলি মানুষ ছিল কেবল এত জোড়া চোখ। তাদের তীক্ষ্ণ চোখের সমালোচনা সে পদে পদে অনুভব করত কিন্তু তাদের মুখের কথায় ভুল সংশোধনের কোনো উপায় সে খুঁজে পেত না। এখানে পরীক্ষক ও সমালোচক ছিল অসংখ্য কিন্তু পরীক্ষার্থী মাত্র একজন, তার না ছিল কোনো নোটের খাতা না ছিল কোনো প্রাইভেট টিউটার।

প্রথম দিন যখন ইন্দিরা শ্বশুর বাড়ীতে খেতে বসল, তখন তার থালার চারিপাশের বাটিগুলো তার চোখে ঠিক মৌচাকের অসংখ্য খোপের মতই লেগেছিল। মধুর সঙ্গে সেখানে হুলের দেখা পাবারও আশঙ্কা তার যথেষ্ট ছিল। একলাই সে খেতে বসেছিল, চারিদিকে দরজা, জানালা, চৌকাঠ ঘিরে কুতুহলী আত্মীয়া আর কুটুম্বিনীর দল নীরবে নতদৃষ্টিতে তার আহারের পর্য্যবেক্ষণ করতে বসেছিলেন। তার একলার হাত আর মুখের উপর অতগুলো মানুষের একাগ্র দৃষ্টি অনুভব করে সে কেঁপে উঠ্‌ছিল, হাত বাড়াতে পারছিল না। তাকে চুপ করে বসে থাকৃতে দেখে কে একজন বলে উঠ্‌ল, "বৌমা, লজ্জা কোরো না। হাতখানা বের কর।" অতি কষ্টে সে আড়ষ্ট হাতখানা থালার দিকে অগ্রসর করল। ইন্দিরার পাতের চারপাশে যে অসংখ্য ব্যঞ্জন সাজানো হয়েছিল তার অধিকাংশের সঙ্গেই তার চিরকালের অপরিচয়। সুতরাং কোনটা যে আগে সুরু করতে হবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। বাড়ীর যদি কেউ তার সঙ্গে বস্‌ত তবে তার দেখাদেখি অনায়াসে এ পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারত, কিন্তু তেমন কেউই ছিল না। দুচারজন কেউ যদি বা ছিল, তারা আজ যেন সবাই ন্যায়নিষ্ঠ পরীক্ষকের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। ইন্দিরা ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে যে বাটিটা সর্ব্বাগ্রে ধরল সেটা প্রায় শেষ পর্য্যায়ের অন্ন। তিনচারজন এক সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠ্‌ল, "ওকি বৌ মা, এ-সব কি মুখেও একবার দেবে না?" লজ্জায় ইন্দিরার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল। সে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে আর-একটা ভুল পাত্রেই হাত দিল। মনে হল খুক্ খুক্ করে একটা চাপা হাসির শব্দ ঝরণার জলের মত লীলাভরে একদিক থেকে আর-এক দিকে গড়িয়ে চলে গেল। চকিতের জন্যে মুখ তুলে ইন্দিরা দেখ্‌লে অধিকাংশের মুখেই কোনোরকম বিকারের চিহ্ন নেই, কয়েকজন ঘাড়টা ফিরিয়ে মুখটা গুঁজে আড় হয়ে বসেছে কিন্তু হাসির একটা স্পন্দন তাদের অঙ্গে তখনও খেলে যাচ্ছে। ইন্দিরা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। দর্শক-দের কাছে যেটা হাস্যকর ঠেকেছিল অধিকাংশের অটল গম্ভীর মুখ দেখে ইন্দিরা সেটাকে তার পক্ষে একটা মারাত্মক অপরাধ মনে করে নিয়েছিল। অপরিচয়ের রহস্য তার বিভীষিকা আরো শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। হয়ত নন্দীহাটির এটাও কোনো একটা অনুষ্ঠান, যার অঙ্গ-হানির জন্যে একমাত্র ইন্দিরাই দায়ী। এই সবে সে একটা অপরাধ করে এসেছে আবার এ তার কি হল? ঘরে ঢুক্‌বার পর যখন প্রণাম আর আশীর্ব্বাদের পালা চল্‌ছিল, তখন গৃহিণী একজন বর্ষীয়সীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে-ছিলেন, "এই আমাদের বামুন ঠাকরুণ।" ইন্দিরা চিরকাল জান্‌ত ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রণম্য, তাই সে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়েছিল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ব্রাহ্মণঠাকুরাণী ইন্দিরার স্পর্শে শিউরে সরে গেলেন, সমস্ত ঘরখানায় সাড়া পড়ে গেল, দুরন্ত লজ্জা আর অপমানের একটা বহিঃপ্রকাশ অসংখ্য ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জ্জনের মত ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শোনা গেল। কিন্তু তার পর এক মুহূর্ত্তেই সব আবার নীরব। খুব যে একটা বড় অপরাধ হয়েছে, পাচিকাকে প্রণাম করে সে যে নন্দীহাটির মুখ হাসিয়েছে একথা তাকে কেউ

না বলে দিলেও সকলের আরক্ত মুখ আর অপমানের শিহরণেই সে বুঝেছিল। কিন্তু কেউ যে তাকে কোনো কথা বলে দিচ্ছে না, ভুল হলে কঠিন শাস্তি না দিয়ে কেবল মর্ম্মাহত মুখ করে তার দিকে চেয়ে দেখছে এইটেই তার সব চেয়ে বড় দণ্ড হয়েছিল। বেচারীর বুকের ভিতরটা যেন পাথর হয়ে জমে আসছিল। যে ব্রাহ্মণীকে ইন্দিরা প্রণাম করেছিল, সে এতক্ষণ পরে বল্লে, "বৌদিদির বাপের বাড়ীতে কি টক ঝাল মিষ্টি সব সমান?" গৃহিণী বধূর উপর অত্যন্ত চটেছিলেন, ব্রাহ্মণী সূত্র ধরিয়ে দেওয়াতে তিনি বলে ফেল্‌লেন, "তা যেমন বাপের বাড়ীর ছিরি-ছাঁদ তেমন ত আচার-বিচার হবে!"

ঝি-চাকরের সাম্‌নে হঠাৎ ঘরের কথা তুলে ফেলায় গৃহিণীর মর্য্যাদার যেটুকু হানি হল, তার জন্যে পর মুহূর্ত্তেই আবার ব্রাহ্মণঠাকুরাণীর উপরে চটে উঠে তিনি বল্লেন, "দেখ বামুন ঠাকরুণ, দাসী-বাঁদী হলে দাসী-বাঁদীর মত হাল-চাল শিখ্‌তে হয়, বড়ঘরের কথায় মুখ সাম্‌লে কথা বলবে।" গৃহিণীর কথায় ব্রাহ্মণী নীরব হলেন, সভাও অসময় বুঝে ভেঙে গেল, কিন্তু ইন্দিরার বুকের ভিতর আরো দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগ্‌ল। তার গৃহপ্রবেশের উপক্রমণিকা তার সমস্ত ভবিষ্যতের রস-ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে নিঙড়ে ফেলে দিল। তারপর দিনে দিনে ইন্দিরার আরো অনেক খুঁৎ বাহির হতে লাগ্‌ল। বউ দুধের বাটির তলশেষানিটুকুও জল দিয়ে খায়, বউ সকালের কাপড় বিকালে পরে, বউ ভাত খেয়ে উঠে থালার উপর বাটিগুলো তুলে রাখ্‌তে যায়, বউ যাকেতাকে বলে বসে তার মা কেমন রাঁধে কেমন মশলা বাঁটে। এই রকম ছোট বড় অসংখ্য দীনজনোচিত ত্রুটি ইন্দিরার প্রত্যহ ধরা পড়্‌ত, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তখনকার মত তাকে সাক্ষাৎভাবে কেউ এসম্বন্ধে সাবধান করে দিত না। তারা শ্যেনদৃষ্টিতে তার দোষ ত্রুটি সব দেখে রেখে মনে গেঁথে তুলে রাখ্‌ত, কখন বা বক্রহাসিতে চকিতের জন্য ওষ্ঠে অবজ্ঞা ফুটিয়ে তুল্‌ত, আর দুমাস ছমাস পরে অকস্মাৎ সেই-সব খোঁটার খোঁচা দিত।

কিশোরীমোহনের মামার বাড়ীতে ছেলে-বউকে মাস দুই পরে নিমন্ত্রণ করেছিল। যাবার সময় বউকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে কিশোরীর মেজ বোন বল্লে, "দেখ ভাই বৌদি, সেখানে গিয়ে যেন জমাদার কি ঝাড়ুদারকে প্রণাম করে বোসো না। দাসী চাকর তারা সবাই সাফ কাপড় পরে, তোমার যদি চিনতে কষ্ট হয় দাদাকে জিজ্ঞেস করে নিও।" বড় বোন সরযূ বল্লে, "আর ভাই, কিছু মনে করো না, কিন্তু তোমার মা যে খুব ভাল ঘুঁটে দিতে পারেন সে খবরটুকু মামীমাকে না দিলেও চল্‌বে।" গৃহিণী বল্লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা ওর বাপের বাড়ীর শিক্ষা-দীক্ষায় যদি ওটুকু ঘটে না আসে ত যা খুসী কর্‌বে। তোরা থাম্ ত।" সরযূ বল্লে, "হাঁ থামলেই হলো কি না? বাবার ত একটা মান মর্য্যাদা আছে, সেখানে গিয়ে বৌদ্দিদি যদি এঁটো পাত চাটে আর তেলীর ন্যাকড়া পরে পেত্নী সেজে সাত দিন কাটায় তাহলেই নন্দীহাটির জয়-জয়কার পড়ে যাবে।" শাশুড়ী মুখের হাসি টিপে মুখখানা ফিরিয়ে নিলেন।

নিষ্ঠুর কথার বাণে ইন্দিরার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হয়ে আসছিল, তার ব্যথা বোঝবার মত একটি মানুষও এখানে ছিল না, কারণ স্বামী বড়ঘরের ছেলে, তাকে এ-সব কথা বলতে সাহস হত না। বাস্তবিকই ত তার শত ত্রুটির ছিদ্র দিয়ে তার অতীতের দারিদ্র্য নগ্ন মূর্ত্তিতে অহরহ দেখা দেয়। হয়ত তার অভাব-পীড়িত দীন মনের পরিচয় পেয়ে স্বামীও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌বে। কিন্তু যেচে সে অবজ্ঞার পথ করে দিতে ইন্দিরা কিছুতেই পারবে না। ওই বাঁকা হাসির বিষ এ বাড়ীর সকলের কাছেই সে পেয়েছে, বাকি আছে একটি মানুষের কাছে, তাকে নিজের হাতে গড়া সিংহাসন থেকে নিজের হাতে নামিয়ে ফেলবার ভয় ইন্দিরাকে মূক করে রেখেছিল। অথচ কাঙালের মেয়ে বলে তাকে সকলে অবজ্ঞা করে বলেই যে সে শ্বশুরের রাজঐশ্বর্য্যটা রাজোচিতভাবে ভোগ করতে সঙ্কুচিত হয় একথাটাও তার জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করত।

এমনি করে দৈন্য আর ঐশ্বর্য্যের যুগল লাঞ্ছনা সয়ে যখন ইন্দিরার দিন কাটছিল তখন হরিনাথ এক দিন ভয়ে ভয়ে মেয়ের খোঁজ নিতে এলেন। ইন্দিরা

বাপের কোলে মুখ রেখে অনেকদিনের জমানো দুঃখের কান্না কেঁদে বললে, "বাবা আমাকে এখান থেকে তুমি নিয়ে চল, এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে।" হরিনাথ সাহসে বুক বেঁধে অন্দরে বেয়ানের কাছে আর্জ্জি পেশ কর্‌লেন। ইন্দিরার ননদ সরযূর শ্বশুর-বাড়ী গেলেই ম্যালেরিয়া ধরত, তাই আজ বছর দুই-তিন তিনি বাপের বাড়ীতে আছেন, হরিনাথের আর্জ্জি শুনে সবার আগে সরযূ বল্‌লেন, "অবাক্ কর্‌লে মা! ছোটঘরে বিয়ে দিয়ে বাবার মান-সম্ভ্রম আর কিছু রইল না। নন্দীহাটির বাবুদের কোন্ বউ আজ চার পুরুষের মধ্যে কবে বাপের বাড়ী রাত কাটিয়েছে তা ত শুনিনি। আমার জেঠিমা, ঠাকুমা সেই বিয়ের কনে ঘরে ঢুকেছিলেন, তার পর এ দেউড়ির সীমানার বাহিরে প্রথম শুয়েছেন চিতায়।" মোহিনীমোহনের দেউড়ির বাহিরে কন্যার জন্য এমন সুখশয্যার ব্যবস্থা কর্‌তে হরিনাথ মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি উড়ুনির আঁচলে চোখ মুছে বাড়ী ফিরে গেলেন।

* * * *

তার পর অনেক দিন কেটে গিয়েছিল; বাইরে সংসারের লোকের চোখে ইন্দিরা নন্দীহাটির বড়বাবুর একমাত্র পুত্রবধূর উপযুক্ত চাল-চলনই রক্ষা কর্‌ত; তার দারিদ্র্যের অহঙ্কারটা সংসারের হাটে উঁচু করে ধরে বেড়াবার বয়স তার কেটে গিয়েছিল; এখন অন্তরেই হয়েছিল সে-সবের স্থান। তার পিতা প্রথম দিন ফিরে যাবার পর আর কোনোদিন এ দেউড়ীতে ঢুক্‌তে সে তাঁকে নিষেধ করে দিয়েছিল; এ দেউড়ীর বাইরে প্রথম রাত্রি চিতায় কাটাবার জন্যে সে সম্পূর্ণই প্রস্তুত হয়েছিল। নন্দীহাটির আত্মীয়-কুটুম্বের কাছে তার পিতা-মাতার কোনো পরিচয়ও আজকাল আর সে দিত না, শ্বশুরকুল পিতৃকুল আর স্বামীর মাতুল-কুলের তিন পুরুষের বাইরে কাউকে যে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে নাই একথাও সে আর ভুল্‌ত না, সকাল বিকাল সন্ধ্যায় এবং অন্ন-প্রাশন আর বিবাহ-সভায় কখন যে কোন-রকম বেশ-ভূষা কর্‌তে হয় তাও ইন্দিরার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল; কোন্ বাড়ীর মানুষের সামনে কি ওজনে হাসি ও মিষ্ট কথা বিতরণ করতে হয় তার মাপেও আজকাল আর ইন্দিরার ভুলচুক ছিল না; মোটের উপর বলা যেতে পারে নন্দীহাটির আদর্শ বধূ বলেই আজকাল বাইরের সংসার ইন্দিরাকে জান্‌ত।

কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ঝোঁকে যে-সমস্ত পাঠ ইন্দিরা এতদিন ধরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছিল, তা তার পরীক্ষার পাঠই রয়ে গেল, অন্তরে সে তা গ্রহণ কর্‌তে পারেনি। দাস দাসীকে আজ পর্য্যন্ত হাতে তুলে সে একটা কিছু দেয়নি বলে গৃহিণীর কাছে তারা অহরহ অনুযোগ করত; গৃহিণী দুই হাতে তাদের দান করে হাস্যমুখে নীরবে বুঝিয়ে দিতেন "কাঙালের মেয়ে দিতে জান্‌লে ত দেবে?" বিবাহের যৌতুক আর মাসিক হাতখরচের টাকা যোগ করলে ইন্দিরার তহবিলে টাকার কিছু কম্‌তি ছিল না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কড়া-ক্রান্তি সবই খাজাঞ্চির খাতায় জমা ছিল। হাত-খরচের টাকা প্রতি মাসে যখন এসে আবার সেই খাতায় যোগ হত তখন মোহিনীমোহনের জান্‌তে বাকী থাকত না যে এ জমা দেবার অর্থ কি! গৃহিণীর কানেও অবশ্য কথাটা উঠ্‌ত। তিনি আশা করেছিলেন বোনেদের বিবাহের সময় ইন্দিরা এই অর্থে বড়রকম কিছু যৌতুক করবে, কিন্তু ফলে দেখা গেল পিঠোপিঠি দুই বোনের এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও ইন্দিরা মোটে যৌতুকই কর্‌ল না। বড়ঘরে বিয়ে হয়ে মেয়ে যে কেমন পর হয়ে যেতে পারে হরিনাথ আত্মীয়-বন্ধুকে সর্ব্বদা তাই বলে বেড়াতে লাগ্‌লেন এবং মোহিনীমোহন আর তস্য গৃহিণী বিস্মিত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। বধূর সুমতির আশায় তাঁদের জলাঞ্জলি দিতে হল।

* * *

কিশোরীমোহনেরও পিতার মত যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল; কিন্তু পিতা-পুত্রের পথ ছিল ভিন্ন। রায় বাহাদুর পিতা যখন রাজা বাহাদুর হবার চেষ্টায় ব্যাকুল, পুত্র তখন দেশভক্তের সপ্তম স্বর্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। পিতাপুত্রের এই ভিন্নমুখী পথ পরস্পরের জানা ছিল, কিন্তু পিতার স্বর্গটাকে পুত্র যে অবজ্ঞার চোখে দেখেন এবং পুত্রের স্বর্গের প্রতি পিতার যে কতখানি বিদ্বেষ তাও

উভয়েরই জানা ছিল। তাই কিশোরীমোহনের কাছে আপনার উচ্চাকাঙ্খার কথা জানাতে মোহিনীমোহনের একটা প্রচণ্ড লজ্জা ছিল, আর মোহিনীমোহনের কাছে আপনার দুরাশার কথা জানাতে কিশোরীমোহনের ছিল বিষম ভয়। কারণ পিতার বিষয়ে তার এখনও কোনো অধিকার জন্মায়নি। পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে আপন আপন প্রাণের কথা লুকাবার আগ্রহে বাড়ীর আর কাউকেও বল্‌তে সাহস পেতেন না।

স্বামী যে একটা বিরাট ব্যাপার নিয়ে মহা ব্যস্ত একথা ইন্দিরার জান্‌তে বাকি ছিল না। খবরের কাগজ, বাড়ীর প্ল্যান, পথ-ঘাটের নক্‌সা, আর হাজার রকম খস্‌ড়া নিয়ে কিশোরীমোহন সর্ব্বদাই মগ্ন, কিন্তু ইন্দিরার চোখের সাম্‌নে সব থাক্‌লেও ইন্দিরাকে সে কোন কথা বল্‌ত না। ইন্দিরাও জিজ্ঞাসা কর্‌ত না। কারণ সে-সব ত বাবুদের কথা। কিন্তু তবু দরিদ্রের মেয়ে ইন্দিরার নন্দীহাটির এত সম্পদের চেয়ে বেশী লোভ ছিল ওই ছেঁড়া খাতা আর কাগজের কথাগুলোর উপরেই। তার স্বামীর সম্পদ ত সকলেই দেখ্‌ছে কিন্তু স্বামীর মন জুড়ে যে জল্পনা-কল্পনা দিবারাত্রি চলেছে, যার কথা দশজনে জানে না, সেইটা স্বামীর মুখের কথায় উপহার পেতেই তার ছিল সবচেয়ে আগ্রহ।

এমন সময় এক নূতন পরিবর্ত্তন দেখা গেল। অতীতের মধ্যে পিতৃগৃহের স্মৃতি চাপা দিয়ে ফেলবার চেষ্টায় ইন্দিরা যখন সমগ্র মনটা নিয়োগ করছিল সেই সময় তার বড় ভাই শীর্ণ দেহ আর জীর্ণ বেশের উপর একমুখ হাসি নিয়ে এসে হাজির। বিবাহের সময় ইন্দিরা তাকে যেমন দেখে এসেছিল, আজ তাকে তেমন মোটেই মনে হল না। তার সে উজ্জ্বল সুন্দর চোখের আলো আজ নিভে গেছে, দুই চোখে আছে শুধু ভিক্ষুকের নির্লজ্জ দীনতা। তার দীর্ঘ কৃশ তরুণ দেহযষ্টি আজ অভাবের নিষ্পেষণে শুক্‌নো আখের মত নীরস কঙ্কাল মাত্র, তার মুখের সলজ্জ হাসি চাটুকারের বাক্যচ্ছটার মত প্রগল্‌ভ। ইন্দিরা ভাইকে এতকাল পরে দেখে খুসী হবে কি, লজ্জায় তার কান্না আস্‌ছিল। ভস্ম-ঢাকা আগুনের মত যার বালমুখের দীপ্তি এতদিন তাদের কুঁড়ে ঘর আলো করে রেখেছিল, দারিদ্র্যের তাড়না আর ঐশ্বর্য্যের লোভ যে তার এমন বিকার করেছে তা ইন্দিরা একদৃষ্টিতে বুঝে নিল। বালকের কল্পলোক তার অনন্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে যৌবনের আগমনে বিদায় নিয়েছে।

অনুপম ভগিনীর এতদিনের অবহেলার জন্য তাকে অনুযোগ কর্‌লে, বড়ঘরে মেয়ের বিবাহ দিয়ে পিতামাতার সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই যে বেশী হয়েছে তাও বল্‌লে। সে বল্‌লে, "গরীবের ঘরে যদি তোর বিয়ে হত তবে আর কিছু লাভ হোক আর না হোক যে রক্তে জন্মেছিস সে রক্তের টান এমন করে কাটাতে পারতিস্ না। শেষকালে চিঠি লেখাও বন্ধ করলি! তুই সুখে আছিস্ সুখে থাক্, না-হয় বাপ-মার দুঃখ না ঘুচাতে চাস নাই ঘুচালি, কিন্তু একবার কি মনেও কর্‌তে নেই?"

ইন্দিরা বল্‌লে, "দাদা মনের কথাও কি তোমরা টের পাও?"

অনুপম বল্‌লে, "মনে কি মানুষে শুধু মনে মনেই করে?"

ইন্দিরা বল্‌লে, "মানুষে না করতে পারে, কিন্তু মেয়েমানুষকে তাই কর্‌তে হয়।"

অনুপম বোনের সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল, বল্‌লে, "আচ্ছা, মেয়েমানুষকে যা কর্‌তে হয়, তাই না-হয় কর। এতখানি পথ এলুম, মানুষটার তেষ্টা পেয়েছে কি না তাও কি একবার খোঁজ নিতে নেই।"

ইন্দিরা রূপার গেলাসে জল এনে ধর্‌ল। অনুপম বল্‌লে "ইন্দিরা, বড়মানুষের বাড়ীতে কি রূপার গেলাস দেখেই পেট ভরে?"

ইন্দিরা হাসলে আর বল্‌লে, "আমায় বল্‌ছ কেন? আমি ত তোমারি বোন।"

অনুপমের আসা-যাওয়া চল্‌তে লাগ্‌ল। বোনকে নূতন করে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টাটা সফল হল তার অন্য দিক দিয়ে। সে কিশোরীমোহনের সুনজরে পড়ে গেল। সুতরাং ভগ্নী শুধু মনে মনে তাকে চাইলেও ভগ্নীপতির দৌলতে তার আদর চাওয়ার বিশেষ অভাব হত না। অনুপমের আত্মীয়তার তলে তলে যে অভিলাষ

স রাক্ষণ বইত, তাকে ঠিক অন্তঃসলিলা তটিনীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে না। অল্পদিনেই সে অভিলাষ এমন স্পষ্ট হয়ে বাইরে দেখা দিল যে ইন্দিরা সরমে মরে যেতে চাইত। কিন্তু অনুপমের এই বুভুক্ষু ভাবই কিশোরীর কাছে তাকে প্রিয় করে তুলল। কিশোরীর জন্মগত আভিজাত্যের অহঙ্কার অনুপমের মধ্যে একটা মস্ত আশ্রয় পেল, যেটা ইন্দিরার মধ্যে সে মোটেই পেত না। এবং সেইজন্যই অনুপম আর কিশোরীর আত্মীয়তার যে মূলসূত্র সেই ইন্দিরাই এদের মাঝখান থেকে সরে গেল। কিশোরীর সঙ্গে অনুপমের বন্ধুতার ক্ষেত্রে ইন্দিরার কোনো স্থান ছিল না। তবু অনুপম ইন্দিরার আশা ছাড়েনি। মাঝে মাঝে নানা ছুতায় কিশোরীর আড়ালে সে ইন্দিরার কাছে হাত পাততে আরম্ভ করল। কারণ কিশোরীর সাম্‌নে তার ভিক্ষাকে যে ইন্দিরা অতি বড় অপমান রূপে নেবে তা তারা দুজনেই বুঝত। কিন্তু অনুপমের সকল ছুতাই বিফল হত। ইন্দিরার হাত থেকে এক পয়সাও সে বার কর্‌তে পার্‌ত না।

দেশের কাজে কিশোরীমোহন আজকাল এত মেতে উঠেছিল যে তার সারাদিনের মধ্যে বাড়ী ফেরবার অবস হত না। একলা ঘরে ইন্দিরার দিন কাটত স্বামীর পরিত্যক্ত এলোমেলো বই কাগজ চিঠিপত্র সহস্রবার গুছিয়ে, আর তার ফেরার আশায় পথ চেয়ে।

সেদিন রাত্রি দশটা বেজে গেছে, দেউড়িতে দরোয়ানদের রামায়ণ-গান থেমে গেছে, পাশের মহলে সরযূর ছেলের কান্নাও আর শোনা যায় না, ভিতর মহলের বারান্দায় দাসীদের আলাপ আর কলহের গুঞ্জন মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে আস্‌ছে, পথে পথিকদের পায়ের ধ্বনির একটানা স্রোতে মাঝে মাঝে বিরাম পড়ে যাচ্ছে, তবু কিশোরীমোহনের দেখা নাই। শোবার ঘরের জানালার গরাদেতে মুখ চেপে পথের দিকে চেয়ে ইন্দিরা দাঁড়িয়ে ছিল। জগতে পথে মানুষের ভাগ্যে যত রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে সেইগুলো সব পালা করে করে তার মনের ভিতর আসা-যাওয়া কর্‌ছিল। পায়ের কাছে একটা দৈনিক কাগজ অসংখ্য জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত দাতার ছোট-বড় দানের তালিকা বুকে করে খস্ খস্ করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় বাহির-বাড়ীর রাঙা পথে কার মৃদু পায়ের ধ্বনি শোনা গেল! ইন্দিরা দেখ্‌লে অনুপম পা টিপে টিপে তারি দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিরক্ত-মুখে সে জান্‌লা ছেড়ে ফিরে দাঁড়াল। বার বার কতবার এই একই পালার অভিনয়? এর কি আর শেষ নেই? ঘরের সমস্ত উজ্জল আলো তার মুখের উপর পড়ে তার মুখের বিরক্তিটাকে যেন আগুনের মত দীপ্ত করে তুল্‌ল। সে বল্‌লে, "এতরাত্রে এখন তুমি কি চাও? দাদা, ভদ্রলোকের ছেলে তুমি—অসময়ে পরের বাড়ী চোরের মত ঢুক্‌তে কি তোমার একটু লজ্জাও করে না?"

অনুপমের ভীত লুব্ধ মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা লজ্জার লালিমা ছড়িয়ে পড়ল। তার পরেই সাম্‌লে নিয়ে একটু রুক্ষ স্বরে সে বল্‌লে, "ইন্দিরা, জানি তুই বড়মানুষের বউ, কিন্তু আমি যে তোর বড় ভাই, একথাটাও কি ঐশ্চর্য্যের অহঙ্কারে ভুলে যেতে হয়? আমাকে তুই শুধু আজ একবার নয়, সহস্র দিন সহস্রবার যা মুখে আসে তাই বলেছিস্।"

ইন্দিরার আগুনভরা চোখের উপব এক-ঝলক জল এসে তার দীপ্ত মুখশ্রী মুহূর্ত্তে করুণ করে তুল্‌লে। সে বল্‌লে, "ছোট বোনকে দিয়ে সহস্র বার এ পাপ করিয়েও যে তোমার আশ মেটে না এই ত আমার সকলের চেয়ে লজ্জা। যে মানুষ একবারের বেশী দুবার এ বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেননি, তাঁর ছেলে হয়ে তুমি আমার এ অপমান কেন বার বার কর আমি ভেবে পাই না।"

অনুপম হঠাৎ নরম হয়ে গেল। যে পথে কথার গতি ফিরেছিল, সে পথে আর বেশীক্ষণ চল্‌লে তার কার্য্য সিদ্ধির কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তাই সে বল্‌লে, "আজ পর্য্যন্ত এক পয়সা তোর কাছে পাইনি, সে কথা ভুলে যাস্‌নে ইন্দিরা। আজ আমার শেষ অনুরোধ, আর আমি কোনোদিন ও কথা মুখে আন্‌ব না, আজকে আমায় শেষ ভিক্ষা তোকে দিতেই হবে। রোগ, শোক, অনাহার কোনো কথাতেই তোকে টলাতে

পারিনি, আজ তোর পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি না দিলে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!"

ইন্দিরা সর্পাহতের মত চম্‌কে সরে গিয়ে বল্‌লে, "দাদা, এ তুমি কি কর্‌লে?"

অনুপম বল্‌লে, "তুই যে পাষাণী, মানুষের কথায় ত তোর মন কোনোদিন গল্‌বে না, তাই অমন কাজটা আমায় কর্‌তে হল। আমার কথা রাখ্, তোর পাপ কেটে যাবে।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "কার টাকা তুমি চাইছ জান? একি সত্যি আমার যে তোমায় দেব! তুমি কি জান না যে আমি শুধু বড়মানুষের ঘর-সাজানো একটা আসবাব?"

অনুপম বল্‌লে, "স্বামীর ধনে স্ত্রীলোকের চিরকালের অধিকার; তার উপর এ ত তোর নিজের নামেরই টাকা।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "কিন্তু স্ত্রীর ভায়েরও কি তাতে অধিকার আছে? তোমায় পরের টাকার পাপে আমি কেন ডোবাতে যাব? আমার বাপের নামে কালি দিতে আমি তোমায় সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

কিছুক্ষণের জন্য অনুপমের বাক্যস্রোতে বাধা পড়ে গেল। তার যুক্তির এমন উত্তর সে মোটেই আশা করেনি। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কি একটা কথা বার বার তার ঠোঁটের আগায় এসে যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে অনুপম বল্‌লে, "কিন্তু ইন্দিরা, জগতে কি ওই একটি মানুষের নামই কেবল তুমি নিষ্কলঙ্ক দেখ্‌তে চাও? ওর বাড়া কি তোমার আর কেউ নেই?"

কি একটা ভয়ে ইন্দিরার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল; সে বল্‌লে, "দাদা তুমি কি বল্‌ছ, আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি না।"

অনুপম ইন্দিরার কানে কানে কয়েকটা কথা বল্‌লে। তারপর নীরবে তারা কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিস্তব্ধতায় দুজনের নিশ্বাসের শব্দ দুজনে শুন্‌তে পাচ্ছিল। ইন্দিরার সুন্দর মুখখানা শ্বেতপাথরের মত শাদা হয়ে গিয়েছিল, তাতে রক্তের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বল্‌লে, "এখন যাও, কাল যা করবার তা আমি কর্‌ব।"

অনুপম বল্‌লে, "কিন্তু ইন্দিরা, আমাকে—"

ইন্দিরা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে, "বল্‌ছি আমি ব্যবস্থা কর্‌ব, তুমি এখনি যাও, নইলে চেঁচামেচি লাগিয়ে দেব।"

উঠে দাঁড়িয়ে ভীতমুখে অনুপম বল্‌লে, "ইন্দিরা, আমি যে তোর জন্যে এত করলাম আমার একটা কথা—"

ইন্দিরা দরজার দিকে এগিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আমি ডাক্‌ছি দরোয়ানকে।"

ভিক্ষাভরা চোখদুটি ইন্দিরার মুখের উপর রেখে অনুপম দরজার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। ইন্দিরার চোখ জলে ভরে আস্‌ছিল, সে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যি, যে তার জন্যে অত কর্‌ল, তার একটা ভিক্ষা শোনবারও তার ক্ষমতা নেই। ভগবান্, কেন তাকে ভিক্ষার উর্দ্ধে কর্‌লে না। ভাইকে উপহার সে দিতে পার্‌ত, কিন্তু ভিক্ষা কেমন করে দেবে?

সে রাত্রে কিশোরীমোহনের সঙ্গে ইন্দিরার কোন কথা হয়নি। পরদিন সকালবেলা কিশোরীমোহন যখন বিছানা ছেড়ে মোটে ওঠেন-নি তখনই ঝিকে ডেকে ইন্দিরা বল্‌লে, "খাজাঞ্চি মশায়কে একবার ভিতরে ডাক।"

ঝি অবাক্ হয়ে বধূঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাইলে। ইন্দিরা তাকে কোনো প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়ে বল্‌লে, "যাও, এখুনি সোজা গিয়ে তাঁকে ডেকে আন, পথে দাঁড়াবে না, তাঁকে ও দাঁড়াতে দেবে না।"

বৃদ্ধ খাজাঞ্চি-মহাশয়ের সঙ্গে বাড়ীর সব মেয়েই কথা বল্‌ত। ইন্দিরার ডাকে বিস্মিত হয়ে এসে তিনি চিকের বাইরে দাঁড়ালেন। ঝি বল্‌লে, "কি বল্‌তে হবে বল বউমা।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "আমার মুখ আছে আমিও কথা কইতে জানি, তুই যা নীচ থেকে আমার পানের বাটা দুটো মেজে আন্।"

ঝি চলে গেল। ইন্দিরা বল্‌লে, "খাজাঞ্চি-মশায়, আমার নামে কত টাকা জমা আছে, বল্‌তে পারেন কি?"

খাজাঞ্চি বল্‌লে, "হ্যাঁ মা পারি, পঞ্চাশ হাজার আছে।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "সে সব টাকাই কি আমার? আমি ইচ্ছা কর্‌লেই কি খরচ কর্‌তে পারি?"

খাজাঞ্চি বল্‌লে, "মা আপনি মালিক, ভৃত্যকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কড়া-ক্রান্তি সব আপনার পায়ে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছি!"

ইন্দিরা বল্‌লে, "আমার এখুনি পঁচিশ হাজার টাকা চাই।"

খাজাঞ্চি স্বপ্নেও মনে করেনি যে ইন্দিরা এক কথায় অকস্মাৎ অতগুলো টাকা চেয়ে বস্‌বে।

সে বল্‌লে, "একবার বাবুকে বলে দেখ্‌লে—"

ইন্দিরা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে, "না, না, বাবুকে বল্‌বার এখন সময় নেই। টাকা আমার এখনি চাই, তার পর যাকে বল্‌বার পরে বল্‌লেই হবে।"

খাজাঞ্চিকে অগত্যা যথাসম্ভব শীঘ্র টাকার ব্যবস্থা কর্‌তে হল। আঁচলে টাকা, নোট, মোহরের পুঁটুলি বেঁধে ইন্দিরা ঘরে ঢুক্‌ল।

কিশোরীমোহন তখনও বিছানায় শুয়ে। ইন্দিরা তাকে ডেকে তুলে বল্‌লে, "কতকগুলো টাকা এক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।" কিশোরীর সঙ্গে কথা বল্‌তে তার কণ্ঠে যে মাধুর্য্য ঝরে পড়্‌ত, তার উৎস যেন আজ শুকিয়ে গিয়েছিল।

বালিশের মধ্যে মুখটা গুঁজেই কিশোরী বল্‌লে, "কোথায়?"

ইন্দিরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর শুষ্ককণ্ঠে বল্‌লে, "কাল রাত্রে দাদা আমার কাছে পঁচিশ হাজার টাকা চাইতে এসেছিল, সেই টাকা তোমায় দিচ্ছি।" কিশোরী কোনো উত্তর দেবার আগেই ইন্দিরা আবার বল্‌লে, "কাকে দিতে হবে দাদার কাছে জেনে নিও।"

কিশোরী তখনও চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। সে কেবল বল্‌লে, "আচ্ছা"। টাকার পুটুলিটা তার মাথার কাছে রেখে দিয়ে ইন্দিরা বাইরে বেরিয়ে গেল। কিশোরী কথা বল্‌বার জন্য কোনো ব্যস্ততা না দেখালেও ইন্দিরা যেন তার প্রশ্নের ভয়েই দ্রুত পলায়ন কর্‌ল।

রোজকার মত স্ত্রীকে কিছু না বলেই আজও কিশোরীমোহন যথা সময় দেশের কাজে বেরিয়ে গেল। এ দিকে ঘুম থেকে উঠেই বড়বাবু যথাকালে পঁচিশ হাজার টাকার কথা শুন্‌লেন; তারপর শুন্‌লেন গৃহিণী, তারপর শুন্‌লেন সরযূ, তারপর যমুনা সরস্বতী মানদা ক্ষেমদা, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবুদের বাড়ীর কাক-পক্ষীও সে-কথা নিয়ে আলোচনা সুরু কর্‌ল। মনটা ইন্দিরার আজ ভাল ছিল না। কিন্তু মন ভাল নেই বলে ত আর চন্দ্র-সূর্য্যের কাজে অবহেলা করা চলে না। নন্দীহাটির বাবুরাও এ বিষয়ে চন্দ্র-সূর্য্যের গোত্রভুক্ত। মৃত্যুর পরোয়ানা দরজায় এসে দাঁড়ালেও সে বাড়ীর লোকের চুলের সিঁথি কাটতে কি সর ময়দা বেশমের প্রসাধন কর্‌তে কোনো ভুলচুক হয় না। ইন্দিরা যখন সকালবেলার সাজসজ্জার পর যথারীতি দ্বিপ্রহরের সজ্জার আয়োজনে ব্যস্ত তখন তার ঘরে আত্মীয়া কুটুম্বিনীরা মিছিল করে এসে উপস্থিত হলেন। গৃহিণী বধূর ঘরে বড় যেতেন না, তিনি শাশুড়ী, বধূর কিছু দরকার থাক্‌লে ত সেই তাঁর কাছে আস্‌বে, এই ছিল তাঁর নিয়ম। সুতরাং আজ তাঁকে দূত পাঠিয়ে ঘরেই থাক্‌তে হল।

ঘরে ঢুকেই সর্ব্বাগ্রে সরযূ বল্‌লে, "বৌ আমাদের একেবারে নির্ব্বিকার পরমহংস, অতগুলো টাকা যে গেল ত গ্রাহ্যই নেই, কেমন আপন মনে সাজসজ্জা হচ্ছে।" অবশ্য সরযূর নিজের সাজসজ্জার যে কোন ত্রুটি হয়েছিল তা নয়।

ইন্দিরা চুপ করে আল্‌না থেকে গিলে দিয়ে কোঁচান শান্তিপুরে শাড়ীটা তুলে খাটের বাজুর উপর রাখ্‌লে। তারপর রূপার খড়কে দিয়ে গন্ধ তৈলের সঙ্গে সিঁদুর গুল্‌তে সুরু কর্‌ল।

কথার উত্তর না পাওয়াতে সরযূ অত্যন্ত চটেছিল। সে বল্‌লে, "হাঁ বউ, তুমি না-হয় বড়মানুষ আছ, তা আমরা গরীব হলেও ত ঘরের লোক; অতগুলো টাকা দিয়ে কোন্ কাঙ্গালের পেট ভরালে তা জান্‌তেও কি আমাদের অপরাধ হবে?"

অপমানে ইন্দিরার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। সে তবু বল্‌লে, "আমার টাকা আমার যাকে খুসী তাকে দিয়েছি, সভা ডেকে তার কৈফিয়ৎ দেবার ত আমার কথা নয়।"

যমুনা বল্‌লে, "ইস্, বৌদির যে আজ বড় তেজ!"

সরস্বতী কায়দা-মাফিক কথা বল্‌তে জানত না বলে' এ বাড়ীতে তার চিরকাল বদনাম ছিল। সে বলে বসল, "তবু যদি না চিংড়ি-মাছ চচ্চড়ি খেয়ে দিন কাট্‌ত! বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলো পারা চক্র।"

তার গ্রাম্য রসিকতার আজ আর কেউ খুঁৎ ধরল না, বরং তার এই একটা বিদ্রূপের খোঁচায় বনিয়াদী বাড়ীর সমস্ত সভ্যতার আভরণ এক নিমেষে খসে পড়্‌ল। মনের অমার্জ্জিত কোণে যার যত আবর্জ্জনা ছিল, একটা উত্তেজনার নেশায় পড়ে সব কখন যে বাইরে বেরিয়ে এল, তা তারা নিজেরাই বুঝতে পার্‌লে না। মা'দা বল্‌লে, "একেই বলে—তোর শিল তোর নোড়া, ভাঙি তোরই দাঁতের গোড়া।"

ক্ষেমদা বল্‌লে, "রোসো আমাদের কিশোরীর ঘুঁটে-কুড়ুনীর জামাই হবার সখ হয়েছিল তার জের কি অমনি মিট্‌বে? এখন কপালে আরো কত হা-ঘরের বাঁ-পায়ের লাথি আছে তাই দেখ, এই ত সবে কলির আরম্ভ।" ক্রমে সুর আরো চড়তে লাগ্‌ল, ইন্দিরার পিতৃ-পিতামহকে নানা অভদ্র সম্ভাষণের পর যখন নন্দীহাটির অন্তঃপুরিকাদের পোষাকী সভ্যতাটা অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠ্‌ল, তখন তারা মুখ সাম্‌লে নিতেই লজ্জা বোধ করছিল। এতক্ষণ তারা যে অসভ্য ও অভদ্র ব্যবহার করেছে সেটা নিজেদের কাছে স্বীকার করতেই তাদের গর্ব্বে আঘাত লাগ্‌ছিল। তাই নিজেদের লজ্জা ঢাক্‌বার জন্যে তারা অভদ্রতাটাকে অন্যায়ের প্রতিবাদরূপে নিজেদের মনের কাছে খাড়া করে নিয়ে সেই পথেই আরো উৎসাহে এগিয়ে চল্‌ল। কিন্তু আসল সমস্যাটা যেখানকার সেখানে রইল।

মানুষের কথার বিষে মানুষকে যতখানি জর্জ্জরিত করা যায়, ততখানি করে তারা গৃহিণীর দরবারে হাজির হল। সেখানে যে ইন্দিরার ডাক পড়্‌ল তা বলাই বাহুল্য। গৃহিণী বল্‌লেন, "কাকে টাকাগুলো দিয়েছ বল। অমন করে লুকিয়ে রাখা কি ভদ্রঘরের বোয়ের উপযুক্ত কাজ? এখুনি দাসীচাকর-মহলে জানাজানি হয়ে যাবে। ছোটলোকে আমাদের কথায় কথা-বল্‌বে সেই কি ভাল হবে?"

ইন্দিরা অম্লানবদনে বল্‌লে, "আমার আপনার লোককেই দিয়েছি।"

সরস্বতী বল্‌লেন, "ওই যে সেই ছুঁচমুখো ভাইটা কাল রাত্তির বেলা সুট্‌ সুট্‌ করে ঘরে ঢুকছিল তাকেই সব ধরে দেওয়া হয়েছে, বুঝ্‌লে না?"

বেদনা-ক্লিষ্ট মুখ যথাসম্ভব শান্ত করে ইন্দিরা বল্‌লে, "না আমার ভাইকে আমি একটা কানা-কড়িও দিইনি।"

ক্ষেমদা বল্‌লেন, "বউ যাহোক সাফাই জানে! ভাইকে দাওনি, ভেয়ের হাতে বাপকে পাঠিয়েছ বুঝি?"

ইন্দিরা বল্‌লে, "আমার বাবা মেয়ের টাকা পা দিয়েও ছোঁন্ না।"

কে যেন বল্‌লে, "কি নবাব বাদশারে!"

সরযূ বল্‌লে, "তবে তোমার কোন্ আপনার লোককে দিলে তাই বল না।"

শ্লেষ বিদ্রূপে আবার চারিদিক ভরে উঠ্‌ল।

ইন্দিরা বল্‌লে, "বল্‌ব না।"

গৃহিণীর মুখে আর কথা আস্‌ছিল না। দাসদাসীর দল সারাক্ষণ দালানে বারাণ্ডায় ঘুরছিল। তাদের মুখের ভাব কি চলার গতিতে কৌতূহল ধরা না পড়লেও তারা যে-সব কথা সাগ্রহে সংগ্রহ করছিল গৃহিণীর তা বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি রুদ্ধ রোষ অনেক কষ্টে চেপে বল্‌লেন, "বৌমা, আজ তুমি একবার বাপের বাড়ী আসতে যাও। অনেকদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "তাই যাচ্ছি।" ইন্দিরা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। পিছনে তার "আপনার লোক" সম্বন্ধে তখনও সরবে বহু মন্তব্য চল্‌ছিল।

গাড়ী চড়ে ইন্দিরা যখন বাপের বাড়ীর পথে বেরুল, তখন একবারও সে চোখ তুলে চাইতে সাহস করেনি। যে বাড়ীর বউ চিতায় শোবার আগে কখনও শ্বশুরবাড়ীর বাহিরে ঘুমোয় না, তার এমন অসময়ে পিতৃদর্শনে যাত্রার অর্থ যে দাস-দাসী আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই কি বুঝেছে তা ভাব্‌তেও ইন্দিরার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

যতক্ষণ সে গাড়ীতে ছিল ততক্ষণ চোখ বুজেই সে কাটিয়েছে। নিজের মুখ দেখানোর লজ্জাটা পরের মুখ না দেখে সে ভুলতে চাইছিল।

সহরতলীর সেই একতলা বাড়ীর দরজায় গাড়ী গিয়ে থাম্‌ল। বাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল আরও জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কেরসিনের টিনে ঘেরা রান্নার বারান্দা কত বর্ষার জল লেগে শতছিদ্র হয়ে এসেছে, তার গায়ের মর্চ্চে খসে খসে চারধারে পড়েছে, তারি পাশে তেল হলুদের দাগে ভরা তার মায়ের ময়লা শাড়ীখানা একটা দড়ির উপর শুকোচ্ছিল। পুরোনো দিনের ছবিগুলি ইন্দিরার চোখে ভেসে উঠ্‌ল; কিন্তু ভাল করে সেগুলো তখন আর সে দেখ্‌তে পারছিল না।

ঘরের মধ্যে ইন্দিরার মা শুধু মেঝেতে শুয়ে পড়েছিলেন, তার পায়ের শব্দে চোখ চেয়ে ইন্দিরাকে দেখে তিনি কেঁদে উঠ্‌লেন, "ওরে আমার অনু কোথা গেল রে!" ইন্দিরার বুকের ভিতর ছম্‌ ছম্‌ করে উঠ্‌ল। দরজা ধরে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেও তার সাহস হচ্ছিল না। সমস্ত বাড়ীটার শোকার্ত্ত মূর্ত্তি তার মনটা আরো অন্ধকার করে তুলেছিল। কান্নার শব্দে তার বাবা এসে দাঁড়ালেন। ইন্দিরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ তুলে একবার তাঁর মুখের দিকে তাকাল। হরিনাথ বল্‌লেন, "আপিসে দু হাজার টাকার গোলমালের জন্যে আজ সকালে অনুপমকে পুলিসে নিয়ে গেল। কাল রাত্রে নাকি তোমার কাছে তার দুহাজার টাকা পাবার কথা ছিল, তুমি তা দাওনি বলে আজ তাকে জেলে যেতে হচ্ছে—এই কথা সে যাবার সময় বলে গেল। সন্তানের মঙ্গলের জন্যে তাকে চোখে দেখ্‌বার অধিকারটুকুও বিসর্জ্জন দিয়ে বড়ঘরে তাকে বিয়ে দিয়েছিলাম, ভগবান এই তার পুরস্কার দিলেন।"

ইন্দিরার মাথার ভিতরে সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। একথা ত কাল অনুপম তাকে বলেনি। তবে বুঝি যাবার সময় বার বার এই কথাই সে ইন্দিরাকে বল্‌তে চেয়েছিল। সে নিষ্ঠুর, অপমানের ভয় দেখিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়েছিল। হায় ভগবান্‌! আজ কে বিশ্বাস করবে যে তার মান রক্ষার জন্যেই এত বড় বিপদকে সে বরণ করে নিয়েছে! যে পিতা তাকেই আজ সবচেয়ে বড় দোষী ঠিক করেছেন, তাঁরই মান রক্ষার জন্যে যে সে আজ কতদিন ধরে কত রুদ্ধ বেদনা বয়ে বেড়িয়েছে তা কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু আর একজনের মানের কথা যে অনুপম কাল তাকে বলেছিল এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

সারারাত ইন্দিরা ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে রইল। বেড়া আগুনের মত দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য্য যেন তাকে দুই দিক দিয়ে ঘিরে ধরেছিল। কোনদিকে তার নিস্তার নেই। সেখানে ছিল দারিদ্র্য তার অপরাধ, এখানে ঐশ্বর্য্যই তার অভিশাপ। তার বাপ মা অপরাধিনী কন্যাকে একটা প্রশ্নও করলেন না, কুশলও জিজ্ঞাসা করলেন না। পুত্রের বিচ্ছেদ ও অপমানের ব্যথায় ইন্দিরার স্মৃতি যখন ইন্ধন, তখন তার দিকে কে ফিরে চাইতে পারে?

খোলা দরজার গোড়ায় বসন্ত দিনের ভোরের বাতাসে ইন্দিরা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেঝের উপর অশ্রুসিক্ত মুখে এলোচুলে তার মাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বাহিরের বারান্দায় হরিনাথও নিদ্রাতুর। সারারাত্রির জাগরণের পর সকালের রোদও তাদের ভোরের নিদ্রা ভাঙাতে পারেনি! এমন সময় দরজায় গাড়ীর শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। কিশোরীমোহন গাড়ীর থেকে লাফিয়ে নেমেই ঘরে এসে ঢুক্‌ল। ইন্দিরা তাকে দেখে মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কিশোরীমোহন ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "বাড়ী চল। এত অভিমান ভাল নয়।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "চল, যেখানে নিয়ে যাবে যাই, এবাড়ীর কাছে আমি যা অপরাধ করেছি তাতে আমার সকল অপরাধ তুচ্ছ। এখানের চেয়ে বেশী অপমানের ভয় সেখানে আর আমার নেই।"

কিশোরী বল্‌লে, "কি করেছ তুমি?"

ইন্দিরা বল্‌লে, "আমার দাদার মান বাঁচবে ভেবে আমি তাকে জেলের আসামী করে ছেড়েছি।"

কিশোরী বল্‌লে, "তার জন্যে আমিই দায়ী। তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আমিই তাকে পাঠিয়েছিলাম। আমি ভীরু, দেশ উদ্ধারের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু তুল্‌তে ত

পারিইনি, ভিক্ষার লজ্জাও সইতে পারিনি বলে অন্যের শরণ নিয়েছিলাম। ভয় ছিল পাছে আমার এ অপরাধ বাবার গোচরে পড়ে আর লজ্জা ছিল স্ত্রীর কাছে চেয়ে নেবার দীনতার। নিজের কথা বেশী ভাব্‌তে গিয়ে পরের কথা ভাব্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "সে-সবই আমি জান্‌তাম।"

কিশোরী বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, "তবে সে-কথা কাউকে বলনি কেন?"

ইন্দিরা নতমুখে বল্‌লে, "তুমি যে কাউকে বল্‌তে চাও নি। আজ পর্য্যন্ত তোমার ওই একটিমাত্র গুপ্তধন ত আমি পেয়েছি, তাও তোমার অজ্ঞাতে, কি করে তা সবাইকে দি?" তার পর অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে ইন্দিরা বল্‌লে, "কিন্তু যেটুকু আমি জান্‌তাম না, সেইটুকু ত বল্‌লে না।"

কিশোরী বল্‌লে, "ওই টাকা আদায় করে দিলে তাকে দু হাজার কমিশন দেব বলেছিলাম। অনেকদিন ধরেই সে আপিসের তহবিলে হাত দিতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু ভরসা ছিল তোমার কৃপায় তরে যাবে। তাই তার সেই ছিদ্রটুকুর পথে আমি নিজের কার্য্যউদ্ধার করবার ব্যবস্থা করেছিলাম।"

ইন্দিরা বল্‌লে, "কিন্তু তুমি ভুল বুঝেছিলে। নিজের এ অপমানের কথা ত সে আমায় বলেনি।"

কিশোরী বল্‌লে, "পারেনি বোধহয়। মানুষকে যে সব গ্লানি সব ক্ষুদ্রতা নীচতার উপরে দেখ্‌তে চায়, তার কাছে নিজের গ্লানি ক্ষুদ্রতা নীচতার লজ্জা স্বীকার করা যে কত শক্ত তা আমি বুঝেছি।"

শ্রী শান্তা দেবী

নিশীথে

গভীর শান্তি এনেছে নিশীথ রাতি,
শয়ন-আগারে নিবিয়া আসিছে বাতি।
আমার সুপ্তি আমার নয়ন হতে
কে করিল চুরি, করিল কেমন মতে?
খোলা বাতায়নে স্থাপিয়া দুইটি আঁখি,
আনমনা পারা বাহিরে চাহিয়া থাকি।
দু'একটি তারা একটু আলোক দানে,
যেন ভয়ে ভয়ে নিরখে ধরার পানে।
সুদূর নীড়ের একটি একক পাখী,
ঘুমহীন চোখে কখনো উঠিছে ডাকি।
পাণ্ডুর চাঁদ জ্যোতিহীন খোলা চোখে,
চাহিছে কখনো কৃষ্ণ মেঘের ফাঁকে।

ক্লান্ত বাতাস সারাদিন ঘুরে ফিরে,
ঘুমায়ে পড়েছে স্তব্ধ তরুর শিরে।
দু'একটি পাতা উঠিছে কোথাও দুলে,
কুসুম কলিকা ঝরিছে বিটপী-মূলে।
বিপুল আঁধার ছেয়েছে ধরার কায়া.
ঘনায়ে আসিছে অদেহী কিসের মায়া।
কি যেন শান্তি, কি যে গো অতল সুখ,
ভরিয়া তুলিছে একটি আকুল বুক।
আজি এ নিশীথে ঘুমেরে রাখিয়া দূরে,
এ আঁধার রূপ রাখিব নয়নে পূরে।
মৌন যামিনী—একাকী সাথীর সম,
চাহিয়া রহিবে, নিকটে রহিবে মম!

শ্রীঅমিয়া চৌধুরী

গ্রীস দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি-আবিষ্কার—

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া গ্রীস দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি খননের চেষ্টা চলিতেছে। লণ্ডনের বার্কবেক্ কলেজের অধ্যাপক মিঃ এফ্ এইচ্ মার্শাল সম্প্রতি একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সেই চেষ্টার ফলে কি কি প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে চিত্রের সহিত তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

উত্তর গ্রীসে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে, এথেন্সের কাছাকাছি জায়গায় খনন-কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রায় কুড়ি বছর ধরিয়া এই কাজ চলে। ধ্বংসাবশেষে যে-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অনৈতিহাসিক যুগের খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১০০০-৭০০ শতাব্দীর। ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে টানাগ্রা নামক স্থানে যে-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হয় তাহাতে বিশেষজ্ঞ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া যান। এখানে একটি আধটি নয়, একেবারে অনেকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া যায়; সেগুলি মাটি ও বালি দিয়া তৈয়ারী আর আধুনিক পুতুলের মত চক্‌চকে ও ঝক্‌ঝকে। মূর্ত্তি-গুলি ছোট ছোট মানুষের। যে-গুলি মেয়েদের মূর্ত্তি তাহাতে আবার পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার অতি চমৎকার। চারিদিকে কবরের সন্ধান করিতে করিতে যে-সব কবর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহারা আবার সব এক আকারের নয়, নানা আকারের। কোথাও পাহাড়ের গা কাটিয়া কবর করা হইয়াছে, কোথাও বা ইট-পাথর দিয়া তৈয়ারী। যে-সমস্ত মূর্ত্তির উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত প্রাচীন, কবেকার ঠিক ধরা যায় না। তবে অধিকাংশই খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ডোডোনা নামক স্থানে খনন আরম্ভ হয় এবং ১৮৯২ সালে উত্তর গ্রীসের ডেল্‌ফি নামক স্থানে। অর্কোমেনস্ নামক স্থানে একটি অদ্ভুত মৌচাকের মত কবর দেখিতে পাওয়া যায়।

পারগামসের প্রাচীন থিয়েটার গৃহ।

ইতিমধ্যে ইউলিসিসের মন্দিরের অবস্থান নির্ণীত হয়। এই জায়গায় কতকগুলি মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটির চারিদিকে প্রচুর জায়গা, সামনে একটি প্রকাণ্ড দালান, তাহাতে বোধ হয় রোগীরা রোগ সারাইবার জন্য স্বপ্নলব্ধ ঔষধের আশায় হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিত। এথেন্সের কাছে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর পাওয়া গিয়াছে। একটি এক-শত ফুট লম্বা মন্দিরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরের অধিকৃত অনেক সুন্দর ভাস্কর্য্য-যুক্ত জিনিষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এগুলি আগে রঙিন ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিওটিয়া নামক পাহাড়ের উপর আর-একটি মন্দিরের অবস্থান জানিতে পারা গিয়াছে। শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মন্দিরটি এপোলোর (সূর্য্য) পূজার জন্য নির্ম্মিত। মন্দিরে একটি আশ্রম সংলগ্ন ছিল। আর দৈববাণী শুনিবার জন্যও একটি গৃহ ছিল। এখানকার কাবিরি মন্দিরও নূতন আবিষ্কৃত। এ মন্দিরটি প্রাচীন, মাঝে মাঝে সারানো হইয়াছিল মাত্র। এটির গঠন স্বতন্ত্র। গ্রীসের অন্যান্য মন্দিরে দেখা যায় ভিতরে তিনটি ভাগ; কিন্তু এই মন্দিরটির ভিতরে চারিটি ভাগ। এ মন্দিরের উপাস্য দেবতা ভূগর্ভস্থ জীবাদির মত। সামোথ্রেস নামক দ্বীপে ও বিওটিয়াতে এই রকম দেবতার পূজা আরম্ভ হয়। থিবস্-এ আবার এই দেবতার পিতাপুত্র
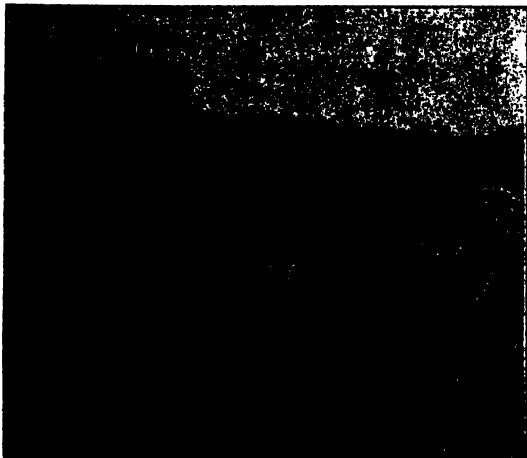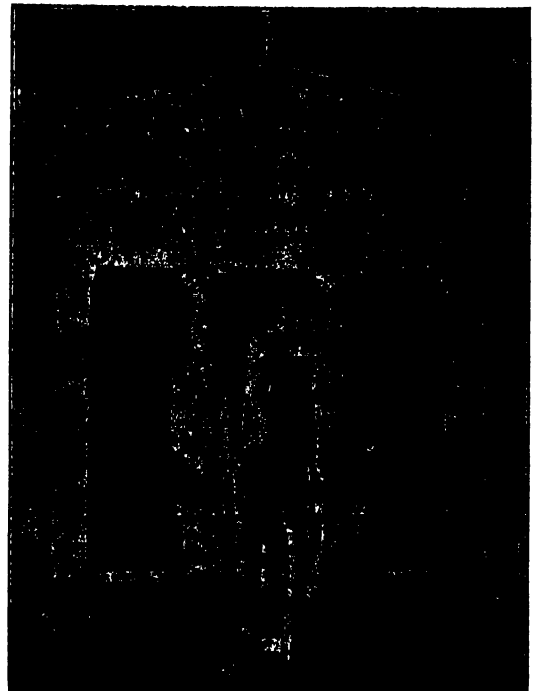
ডেল্‌ফির এক ধনভাণ্ডারের বহির্ভাগ—সামনে স্ফিঙ্ক্‌স্-এর মূর্ত্তি।

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির জিনিষপত্রে সুন্দরতার পরিচয় নাই, সেগুলি ব্যঙ্গপূর্ণ। ঘণ্টা, চক্র, গরুর মূর্ত্তি প্রভৃতি দেবতার স্তুতিগানের সহিত খোদাই করা আছে।

ডেল্‌ফি-তে গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান দৈববাণীর মন্দির ছিল। এখানে পর পর অনেক জায়গা খুঁড়িয়া অনেক জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মন্দিরে যাইবার পথের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে নানা স্থানের রাজা-রাজ্‌ড়াদের উৎসর্গ-করা অনেক জিনিষের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্‌সিরীয়ানরা এক ধাতুনির্ম্মিত বলদ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং স্পার্টার অধিবাসীরা এক জয়লাভের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আট-ত্রিশটি ধাতু-মূর্ত্তি মন্দিরে প্রদান করে,—এ-সমস্তই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরো পাওয়া গিয়াছে অনেক ছোট ছোট ধনভাণ্ডার। এগুলি গ্রীসের নানা সহরের অধিবাসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বা নির্ম্মিত। এই সমস্ত ধনভাণ্ডারের উপর তাস্কর্য্যের কৌশল অনেক আছে। এই-সব তাস্কর্য্য আবার গ্রীসের কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিতেছে—দেবতাদের আধিপত্য-লাভের যুদ্ধ, হোমরের কাব্যে বর্ণিত যুদ্ধ, প্রেম-কাহিনী, ইত্যাদি। নাক্‌সস্ দ্বীপের লোকেরা যে ধনভাণ্ডার নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড স্ফিঙ্‌স্-এর মূর্ত্তি। এ ধনভাণ্ডারটির কারুকার্য্য অতি চমৎকার। পূর্ব্বে এ মূর্ত্তিটি ছিল এ্যাপোলোর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে। এই বিখ্যাত এ্যাপোলো-মন্দিরের অল্প অবশেষই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। থার্‌মস্, মেগারা, ইজিনা, গ্রিট্রসোনা প্রভৃতি স্থানেও অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এতদূর গেল উত্তর গ্রীসের কথা।

এইবার পেলোপনেসস্-এর আবিষ্কারের কথা। ইহাদের মধ্যে মাইসিনি ও অলিম্পিয়া নামক স্থানের আবিষ্কারসমূহই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইসিনির এক নগরের মধ্যে কতকগুলি কবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের উপরটা ঠিক মৌচাকের মত দেখিতে। আরো যে-সমস্ত জায়গা খোঁড়া হইয়াছে ও অনেক উল্লেখযোগ্য জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কয়েকটির নাম আমরা দিলাম, সবগুলির দেওয়া অসম্ভব:—টিজিয়া. এপিডরাস্, ভ্যাফিও, মেগালো-পলিস, আরগস, লাইকোসুরা, টিরিন্‌স্, ম্যানটিনিয়া, করিন্থ ও স্পার্টা। ইহা ছাড়াও ট্রয় এবং অন্যান্য অনেক দ্বীপে এবং এসিয়া মাইনরের অনেক জায়গায় অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনু-সন্ধিৎসু ব্যক্তি মার্শাল সাহেবের পুস্তক পড়িলে উপকৃত হইবেন।

—

অদ্ভুত সামুদ্রিক জানোয়ার—

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা আধুনিক কালে লুপ্ত ইক্‌থিওসরাস্ নামে এক প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জানোয়ারের সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। জন্তুটির ছবি আমরা দিলাম। ছবি দেখিয়া মনে হয় জীবটি সামুদ্রিক সরীসৃপ বিশেষ। জার্ম্মানি প্রভৃতি জায়গায় যে-সব জীবকঙ্কাল সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা এই সরীসৃপের ধারণা করিয়াছেন। আর এখনও ইক্‌থিওসরাস্-এর মত যে-সব সামুদ্রিক জীব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের গতিবিধি ও খাদ্য-রুচি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ইক্‌থিয়সরাসের গতিবিধি ও খাদ্য প্রভৃতি নির্ণয় করিতেছেন। বৈজ্ঞা-নিকেরা আরো বলিতেছেন যে, এই জীব খুব সম্ভব ডাঙার কোন জানোয়ারের বংশধর। কিন্তু ইহাদের শরীরের গঠন দেখিয়া বোধ হয় ইহারা ডাঙায় চলিতে একেবারে অক্ষম। জলে সাঁতার দিবার মতই এদের দেহের গঠন। ইক্‌থিওসরাসের মুখ ছিল গাংদাড়া মাছের মত লম্বা ঠোঁট-ওয়ালা। গলা ছিল না বলিলেই চলে, এইজন্য জলে সাঁতার দিবার ইহার খুব সুবিধা। এমন কি বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান

ইক্‌থিওসরাস্—অধুনা লুপ্ত প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জীব।

করেন, যে, জলে যত জীব সাঁতার দিয়া বেড়ায় সকলের মধ্যে ইক্‌থিওসরাস্‌ই বেশী দ্রুতগামী। এদের লম্বা দাড়ার উপর ছোট ছোট সরু সরু দাঁত। তিমি মাছের সঙ্গে ইহার এক জায়গায় মিল আছে, সেটি হইতেছে ভাসিয়া উঠিয়া আবার সমুদ্রের অতলে ডুবিয়া চলিয়া যাওয়া। তিমির খাদ্য মাছ, ইহারও খাদ্য মাছ। ইহার গা কোন আঁশ বা শক্ত চামড়ায় ঢাকা নয়। কিন্তু ইহার সামনের ও পিছনের পাখা বেশ শক্ত চামড়ায় ঢাকা। ইহার মাথার আকার এরূপ যে ইহাকে দেখিলেই এক ভীষণ কদাকার জীব বলিয়া মনে হয়। ইহাদের দুই পাশের পাঁজ্‌রার আকার এরূপ যে জলে ডুবিবার সময় অনেকটা বায়ু ইহারা টানিয়া লইয়া যায়। গভীর সমুদ্র ছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম গভীর উপসাগর প্রভৃতিতেও ইক্‌থিওসরাসের সন্ধান মিলে। এখনও ইহাদের নাতিপুতিদের কেহ বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে! বৈজ্ঞানিকরা ছাড়িবার পাত্র নন। তাঁদের অক্লান্ত অনুসন্ধান চলিয়াছে।

প

—

তারহীন টেলিগ্রাফ—

গুগ্‌লিএল্মো মার্কনি ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ইঁহার জন্ম ইটালীর বোলোনা সহরের নিকট এক স্থানে, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ২৫শে এপ্রিল। জগতের অন্যান্য বিখ্যাত আবিষ্কর্ত্তাদের অবস্থা প্রায়ই খারাপ দেখা যায়, সেই দিক হইতে মার্কনির ভাগ্য ভাল ছিল। তাঁহার পিতা এবং মাতা উভয়েই বড়লোক ছিলেন। বাল্যকালে মার্কনির শিক্ষার জন্য কোনদিন কোন রকমের কষ্ট হয় নাই। তিনি সুখের কোলে মানুষ হন।

তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি বনের ফলের রস হইতে একপ্রকার কালি আবিষ্কার করেন। এই কালি দিয়া কাপড়ে নাম লিখিলে কোন রকমেই তা উঠিত না। মায়ের কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়া ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর অন্য কোন আবিষ্কারের দিকে মন যায় নাই।

১৬ বছর বয়সের সময় তিনি বিনা তারে বৈদ্যুতিক স্রোত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠাইতে চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পূর্ব্বেই অধ্যাপক হার্জ্ এই বিনা-তার বিদ্যুৎ-স্রোত-প্রবাহ আবিষ্কার করেন। বালক মার্কনি তাহার সাহায্যে খবর আদান-প্রদানের চেষ্টা সুরু করিলেন।

১৮৯৫ সালে মার্কনি প্রথম তাঁহার বিনা-তারে খবর-পাঠান-কলের পেটেণ্ট বা স্বত্ব রেজেষ্টারি করেন। তখন এই বেতারে মাত্র দু' মাইল খবরের আদান-প্রদান হইত। কিছুকাল পরে যখন তিনি বলিলেন যে ইহাতে নয় মাইল পর্য্যন্ত খবর পাঠান চলিবে, তখন লোকে তাঁহাকে উপহাস করে, কেহ কেহ আবার তাঁহাকে পাগল বলে।

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না—তাই দেশের লোকের কাছে আদর এবং উৎসাহ না পাইয়া তিনি তাঁহার কলকজা লইয়া ১৮৯৬ সালের মে মাসে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সেই সময় ইংলণ্ডের পোষ্টাপিস্ বিভাগের বড় কর্ত্তা স্যার ডাব্‌লিউ এইচ পিয়াসের্র নিকট মার্কনি খুব উৎসাহ এবং অভ্যর্থনা পান।

ইংলণ্ডে প্রথমে টেম্‌স্ নদীর উপর বেতার খবর পাঠান হয়। টেমস্ নদী মাত্র ৭৫০ ফুট চওড়া। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে ১২ মাইল পর্য্যন্ত বেতারের খবর পাঠান হইতে লাগিল। পরের বছর ১২ মাইলের স্থানে ৩২ মাইল হইল। সেই বছর রাণী ভিক্টোরিয়া

গ্যাব্রিয়েল্‌মো মার্কনি, তারহীন টেলিগ্রাফের অন্যতম উদ্ভাবক।

এবং যুবরাজের মধ্যে বেতারের সাহায্যে ১৫০টি খবর দেনা-পাওনা হয়। যুবরাজ তখন সমুদ্রে এক জাহাজে ছিলেন। প্রায় ৭০০ খবর আয়র্লণ্ডে ডাব্‌লিন সহরে বেতারের সাহায্যে পাঠান হয়।

২৪ বৎসর বয়সে মার্কনি জগৎবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কাছে সভ্যজগৎবাসীর প্রশংসা ক্রমাগত আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এই প্রশংসা-বাণী তাঁহাকে গর্ব্বে পূর্ণ করিতে পারে নাই। তিনি কম কথা বলিতেন, সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বেশ ভাল পোষাক পরিয়া থাকিতেন। তাঁহার টাকার ভাবনা ছিল না। বেতারের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল।

বেতারের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের ক্ষণ ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে বারোটা। সেই সময় মার্কনি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সেন্ট জন্স নামক স্থানে নিজের পরীক্ষাগারে বসিয়াছিলেন। এ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরের পরপার হইতে কর্ণওয়ালের পোল্‌ধু নামক স্থান হইতে আর-এক জন তাঁহার কাছে বেতারে ইসারা করিতে লাগিল। মার্কনির রিসিভারে (সংবাদ-গ্রাহক যন্ত্রে) ক্রমাগত S অক্ষরটি বাজিতে লাগিল। মার্কনির আনন্দ এবং উৎসাহ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। ১৯০৮ সালে ব্যবসার সুবিধার জন্য এ্যাট্‌ল্যান্টিকের এপার হইতে ওপারে সংবাদের আসা-যাওয়া হইতে লাগিল।

১৯১৪ সালে পৃথিবীর বড় বড় জাতিরা প্রত্যেক সমুদ্র-যাত্রী জাহাজে বেতার রাখিবার নিয়ম করিলেন। ১৯১৬ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন সহর হইতে পারি সহরে বেতার টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হইল—৩৭০০ মাইল তফাতে বসিয়া দু'টি লোক কথাবার্ত্তা বলিতেছে! কিছুকাল পরেই ওয়াশিংটন হইতে হনোলুলুতে বেতার টেলিফোন চলে—ইহার দূরত্ব ৫০০০ মাইল!

বর্ত্তমান সময়ে জগতের শতকরা ১৫ ভাগ খবর বেতারে পাঠান হইতেছে। বেতার টেলিফোনের অদ্ভুত উন্নতি হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৫০,০০০ লোকে বেতারে খবর প্রেরণ ও গ্রহণের কাজে লাগিয়া আছে।

—

মাথার খুলির শক্তি—

সিগ্‌মণ্ট ব্রেইটবার্ট নামক একটি লোকের নাম "লৌহরাজ" হইয়াছে, তাহার মাথার খুলির অসামান্য জোরের জন্য। একটা ৩

মাথার খুলির তাগদ্।

ইঞ্চি মোটা লোহার ডাণ্ডা তাহার মাথায় রাখিয়া সেই ডাণ্ডা ধরিয়া কুড়িজন লোক ঝুলিতে থাকে। "লৌহরাজ" না নড়ন্ না চড়ন্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এই লোহার ডাণ্ডার উপর প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫০ পাউণ্ড ওজনের চাপ পড়ে।

—

দাড়িতে মৌমাছির চাপ—

মৌমাছিরা যখন উড়িয়া আসিয়া কোন জিনিষের উপর বসে,

মৌমাছির দাড়ি

তখন সে কামড়ায় না। এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্ত একজন 'মক্ষিওয়ালা' তাহার চিবুকে ছোট একটা তারের খাঁচায় রাণী-মাছিকে বসাইয়া রাখে। তাহার পর মৌমাছির দল তাহার চিবুকের উপর দাড়ির আকারে আসিয়া বসে। ছবিতে দেখিলে আরো ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

ফুল তাজা রাখিবার উপায়—

ফুলদানিতে অনেকে ফুল রাখেন। খালি ফুলদানিতে ফুল খুবই তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়। ফুলদানিতে জল ভরিয়া দিলে ফুল আরো কিছু বেশী সময় তাজা থাকে। আর-একটি নূতন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে ফুল আরো বেশী সময় তাজা থাকে। একটি বড় আলুর গায়ে কাঁটা দিয়া গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ফুলের বোঁটাগুলি ঢোকাইয়া দিতে হয়। আলুটিকে ফুলদানির মধ্যে রাখিতেও পারা যায়।

মোটরকারের কথা—

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মোটরকারের ব্যবসা এবং তাহার উন্নতি যত বাড়িয়াছে, এমন আর কোন নূতন আবিষ্কারের ভাগ্যে হয় নাই। ৩৩ বছর পূর্ব্বে, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গটফ্রায়েড্ শোলেমের (Gottfried Schloemer) মিলওয়াকী সহরে প্রথম মোটর গাড়ী রাস্তায় চালান। গাড়ীখানির কলকব্জা এবং অন্যান্য সমস্ত অংশ তাঁহার স্বহস্তে তৈরী। সেই অদ্ভুত-দেখিতে মোটরকার হইতে বর্ত্তমানের সুদৃশ্য এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটরকার জন্মলাভ করিয়াছে।
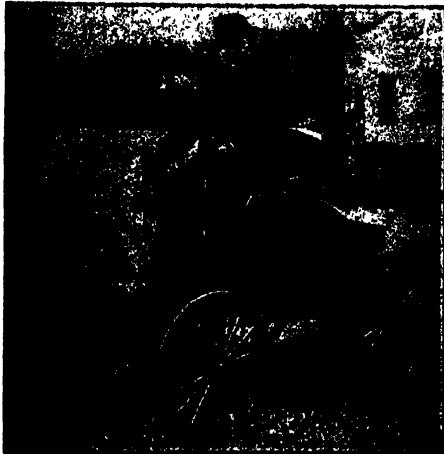
মোটর-গাড়ীর অতিবৃদ্ধ প্র-পিতামহ।

বর্ত্তমানে এক আমেরিকাতেই মোট ১২০৪৩৭৮৬৪২ ডলার অর্থাৎ ইহার প্রায় সাড়ে তিন গুণ টাকা মোটর ব্যবসায়ে খাটিতেছে।

হেমন্ত

কৃত্রিম স্বর্ণ—

যে পরশ-পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া যায়, যাহার সন্ধানে মানব-সভ্যতার মধ্যযুগে রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম জন্ম, এতদিনে তাহার ঠিকানা মিলিয়াছে। এই পরশ-পাথর প্রতীচ্য মানবের বুদ্ধি।

এই বুদ্ধি বলিতেছে, যদিও এখনই লোহাকে সোনাতে রূপান্তরিত করিবার মতো এতখানি শক্তির অহঙ্কার তার নাই, তবুও এ ব্যাপার যে অসম্ভব তাহা সে মোটেই স্বীকার করে না; এমন কি, কোন্ প্রণালী ধরিয়া কি উপায়ে এতদিনকার এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যাইবে তাহাও সে আঁক কসিয়া হিসাব পতাইয়া নিঃসংশয়িত যুক্তির বলে দেখাইয়া দিতে পারে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার এই নিশ্চয়তার মূল্য সামান্ত নহে। যুক্তিতে যাহাকে পাওয়া গিয়াছে, কর্ম্মে তাহার প্রতিষ্ঠা হইতে বেশী দেরী না হইতেও পারে।—

প্রধানতঃ দুইটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া কৃত্রিম স্বর্ণ নির্ম্মাণকে সম্ভব বলিয়া মনে করা হইতেছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে এই, যে, বিশ্বে বাস্তবিক একটির বেশী মূল পদার্থের অস্তিত্ব নাই; এতদিন যে বহু মূল পদার্থ কল্পনা করা হইত তাহা সেই এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থটিরই বহু-রূপান্তর মাত্র। সেইজন্ত মূলতঃ সোনা এবং লোহা একই পদার্থ, সম্ভাবনার দিক দিয়া একের অন্তে রূপান্তরিত হইতে কিছুমাত্র বাধা নাই দ্বিতীয়তঃ Radio activity বা বস্তুপর্য্যায়ের উপর অধুনা-আবিষ্কৃত (১৮৯৯-১৯০৩) অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ার সম্পর্কে দেখা গিয়াছে, অনেক গুরুভার পদার্থ আপনা হইতেই লঘুভার অপর পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। বহুকালব্যাপী নিবিষ্ট পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া মানুষের অধিগত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চলন্ত ফুটপাথ—

আমেরিকার শহরের পথে লোকজন ও গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় কমাইবার জন্ত পথগুলিকে দ্বিতল ত্রিতল করিয়া নির্ম্মাণ করিবার

দ্বিতল রাস্তা। উপরের রাস্তার ফাঁকে নীচের তলার রাস্তা দেখা যাইতেছে।

কল্পনা চলিতেছে। শহরের বড় বড় বাড়ীগুলির ছাতে ছাতে জুড়িয়া এরোপ্লেন প্রভৃতি বিমান-পোতের অবতরণের স্থান করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। নিউ ইয়র্কে ঘণ্টায় দুই, চার ও ছয় মাইল বেগের সচল ফুটপাথ সম্ভবত শীঘ্রই নির্ম্মাণ করা হইবে। পথের দুইদিকের ফুটপাথ বিপরীত মুখে চলিবে। উল্টাদিকের ফুটপাথে কোনও বন্ধুর দেখা পাওয়া গেলে উভয়ে মাঝখানকার অচল পথে নামিয়া পড়িয়া

কথাবার্ত্তা কহা চলিবে। পথের দুধারে বসিবার জন্য সারি সারি বেঞ্চিও থাকিবে।

—

দূর-দর্শন—

টেলিফোনে এখন কেবল দূর হইতে কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। নিকোলা তেস্‌লা নামক বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত "টেলি-ভিস্যন" বা দূর-দর্শন নামক যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রায় শেষ করিয়াছেন, উহার সাহায্যে বহু দূরে বসিয়া দুইজন লোক কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পরস্পরের মুখও দেখিতে সমর্থ হইবে। মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের নির্ম্মাণপ্রণালীর অনুসরণে
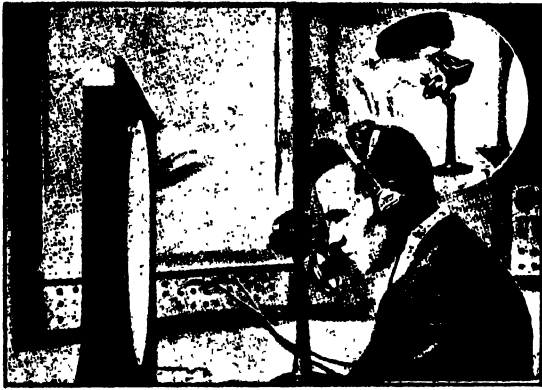
দূর-দর্শন যন্ত্রের পর্দ্দায় দূরস্থ বন্ধুর ছায়ার সঙ্গে কথা কওয়া চলিতেছে।

এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। টেলিফোনের কলের সম্মুখে একটি কাচের পর্দ্দার উপর দূরস্থ ব্যক্তির তড়িদ্বাহিত ছায়া আসিয়া প্রতিফলিত হইবে। কেবল যে তারের টেলিফোঁর কলেই ইহা হইবে তাহা নহে; অ-তার টেলিফোঁতেও হইবে। সুতরাং "টেলিভিস্যনের" চলন হইলে কলিকাতায় বসিয়া কেম্ব্রিজ বা শিকাগো-প্রবাসী বন্ধুর মুখের প্রতিদিনকার প্রত্যেকটি ভাবান্তর এবং তাহার প্রতিদিনকার কুশল তাহার মুখ হইতেই জানা সম্ভব হইবে।

ধ্বনিস্পন্দন—

এক ছিলেন রাজা। একদিন সারেঙা হাতে এক বৃদ্ধ বাউল তাঁহাকে গান শুনাইতে আসিলে তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে প্রাসাদ হইতে ছুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। প্রাসাদের বাহিরে পরিখার উপর যাতায়াতের যে পুল ছিল, বাউল তাহার নিকটে বসিয়া সারেঙা বাজাইতে আরম্ভ করিল। সারেঙার শব্দ পুলটা সহিতে পারিল না, চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল।

এপলোর সঙ্গীতে আপনা হইতে পাথর গাঁথিয়া উঠিয়া ট্রয় সহর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইস্রায়েলবাসীদের সমবেত চীৎকার ও শিঙ্গা-নিনাদে জেরিকোর দুর্গ-প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দে যমুনা নদীর জল উজান বহিত।—এ-সমস্তই পুরাণ-কথা।

কিন্তু জড়বস্তুর উপর সঙ্গীতের প্রভাব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সত্য। বিশ্বের প্রতিটি বস্তু কোনো-না-কোনো বিশেষ স্বরগ্রামের পর্দ্দায় বাঁধা আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সেই স্বরে সে বাজে, এবং তাহার কাছে সেই স্বর বাজাইলে সে সহানুভূতিতে কম্পিত হয়।

এই কম্পন বড় সামান্য ব্যাপার নহে মনে করুন একটি ত্রিতল অট্টালিকা স্বরগ্রামের মুদারার পঞ্চম পর্দ্দায় বাঁধা আছে। সেই অট্টালিকায় কেহ যদি ক্রমাগত মুদারার পা—এই পর্দ্দাটিই বাজাইতে থাকে তবে এতবড় সেই বাড়ীটি এমন ভাবে কম্পিত হইবে যে তাহা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। যদি অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই সুরটিই বাজাইতে থাকে তবে কম্পন এমন প্রচণ্ড হইতে পারে যে তাহার ফলে সমস্ত বাড়ীটি ধ্বসিয়া পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

কোনো বস্তুর এই ধ্বনিতরঙ্গ একটি ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেটে ধরিয়া জমা করিয়া লইয়া ক্যানাডার এক ব্যক্তি তাহার সাহায্যে মোটরগাড়ী, সেলাইয়ের কল প্রভৃতি চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার শক্তি খুব বেশী নহে, তবু অল্পব্যয়সাধ্য ও অল্প-স্থান-সাপেক্ষ বলিয়া হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইবে। ধ্বনিস্পন্দনকে আরও নানা ভাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টা নানাস্থানে হইতেছে।

বাতাসে-বাজা বাঁশী—

ধর্ম্মের ঢোল সত্যই বাতাসে বাজে কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে। কিন্তু এমন একটি ফ্লুট-বাঁশী তৈরি হইয়াছে, বাতাসে ধরিলে যাহা আপনা-আপনি বাজিতে থাকে। একদিক-বোজানো বাঁশের চোঙ বা ফুটোওয়ালা অন্য জিনিসের মধ্যে জোরে বাতাস ঢুকিলে যে

বাতাসে-বাজা বাঁশী।

কারণে শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ হয়, এই ফ্লুটও ঠিক সেই কারণেই বাজে, কেবল ইহার কুল্পির মতো মুখ থাকে তিনটি, আর সেই তিন-মুখওয়ালা বাঁশীটিকে জোরোলো বাতাসের মুখে ধরিয়া খুব সহজেই যে-কোনো গানের গৎ আদায় করিয়া লওয়া যায়।

চামড়া ভরাট করা—

আমাদের দেশেও অনেকেই বাঘের চামড়ার মাথার দিকটা ও হরিণের শিংওয়ালা মাথার চামড়া প্রভৃতিকে কোনো শক্ত জিনিষ দিয়া ভরাট করিয়া লন। জানোয়ারের চামড়াকে এই প্রকারে ভরাট করিয়া মূর্ত্তি-নির্ম্মাণকে ইংরেজীতে stuff করা বলে। কলিকাতার যাদুঘরেও কুমীর, পাখী প্রভৃতি কোনো কোনো প্রাণীর এই প্রকারের পুর-দেওয়া প্রতিমূর্ত্তি আছে।

এতকাল এই ভরাট করার কাজটি যে-পদ্ধতিতে হইত তাহাতে মূর্ত্তিগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইত না। হাতীর পা হইয়া যাইত পাশ-বালিশের মতো, হরিণের শিংয়ের তলায় ছাগলের মুখ বিরাজ করিত। তাই নিউ-ইয়র্কের যাদুঘরে এই কাজের জন্য বাছা বাছা ওস্তাদ ভাস্করদের নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা প্লাষ্টার, মাটি ও কাগজের মণ্ড প্রভৃতির সহায়ে জন্তুদের কাঠামো জীবন্ত মডেল বা ফোটোগ্রাফের অনুকরণে সুন্দর নিখুঁত করিয়া গড়িতেছেন। তারপর তাহার উপর চামড়ার আস্তরণ লাগানো হইলে সেগুলিকে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। জন্তুগুলির আস্থান-ভঙ্গী যাহাতে খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে। একলা একটি জন্তুকে আলাদা করিয়া স্থাপন করিলে এই ভঙ্গী দেখাইবার সুযোগ কম পাওয়া যায় বলিয়া একেবারে এক-একটি হস্তী-যূথ বা শুওরের পাল বা পাখীর ঝাঁক নির্ম্মাণ করিয়া তাহা দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ এক-একটি যূথ বা দল নির্ম্মাণ শেষ

নিউ-ইয়র্কের যাদুঘরে জন্তুর চামড়া ভরাট করিবার ভাস্কর্য্য।

হইতে পাঁচ বৎসরেরও বেশী সময় লাগিতে পারে। আমেরিকার যাদুঘরগুলি এবারে একাধারে যাদুঘর ও শিল্প-প্রদর্শনী হইয়া উঠিবে।

—

হোটেল-ফিরিওয়ালা—

বাতাবী লেবুর আদি জন্মস্থান, বাতাবিয়াতে হোটেলওয়ালা হোটেল ফিরি করিয়া বেড়ায়। কাঁটা চামচে টেবিল চেয়ার থালা বাটি গেলাস তোয়ালে, আর উনুন ও কাঁচা মাছ-মাংসের চাঙাড়ি পর্য্যন্ত সে কাঁধে করিয়া শহরের রাস্তায় বহিয়া ফেরে। পয়সা পাইলেই আহারার্থীকে যে-কোনো জায়গায় টেবিলে বসাইয়া গরম গরম খাবার চটপট তৈরী করিয়া সে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করায়। খাবারে
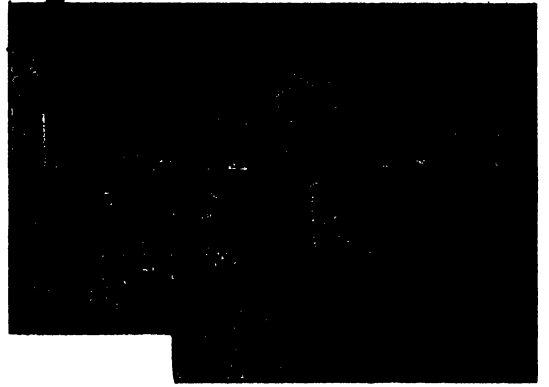
বাতাবিয়ার হোটেল-ফিরিওয়ালা।

বাসি বা ভেজাল বা নোংরা থাকিবার জো নাই। ইহারা রন্ধন-বিদ্যাতেও নাকি ওস্তাদ।

—

তিন হাজার টাকা দামের ফুলগাছ—

আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোয় এক ব্যক্তি একটি অর্কিড বা পরগাছা ফুলের গাছ ৩০০০ টাকাতে বিক্রয় করিয়াছেন। এই ধরণের অর্কিড

তিন হাজার টাকা দামের ফুলগাছ।

পৃথিবীতে আর একটিও নাই। অনেক প্রকার অর্কিডের সাঙ্কর্য্যের ফলে এই নূতন ধরণের অর্কিডটির জন্ম হইয়াছে, এজন্য যে অধ্যবসায় ও পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছে দামটা নাকি তাহার তুলনায় এমন কিছু বেশী হয় নাই।

স চ
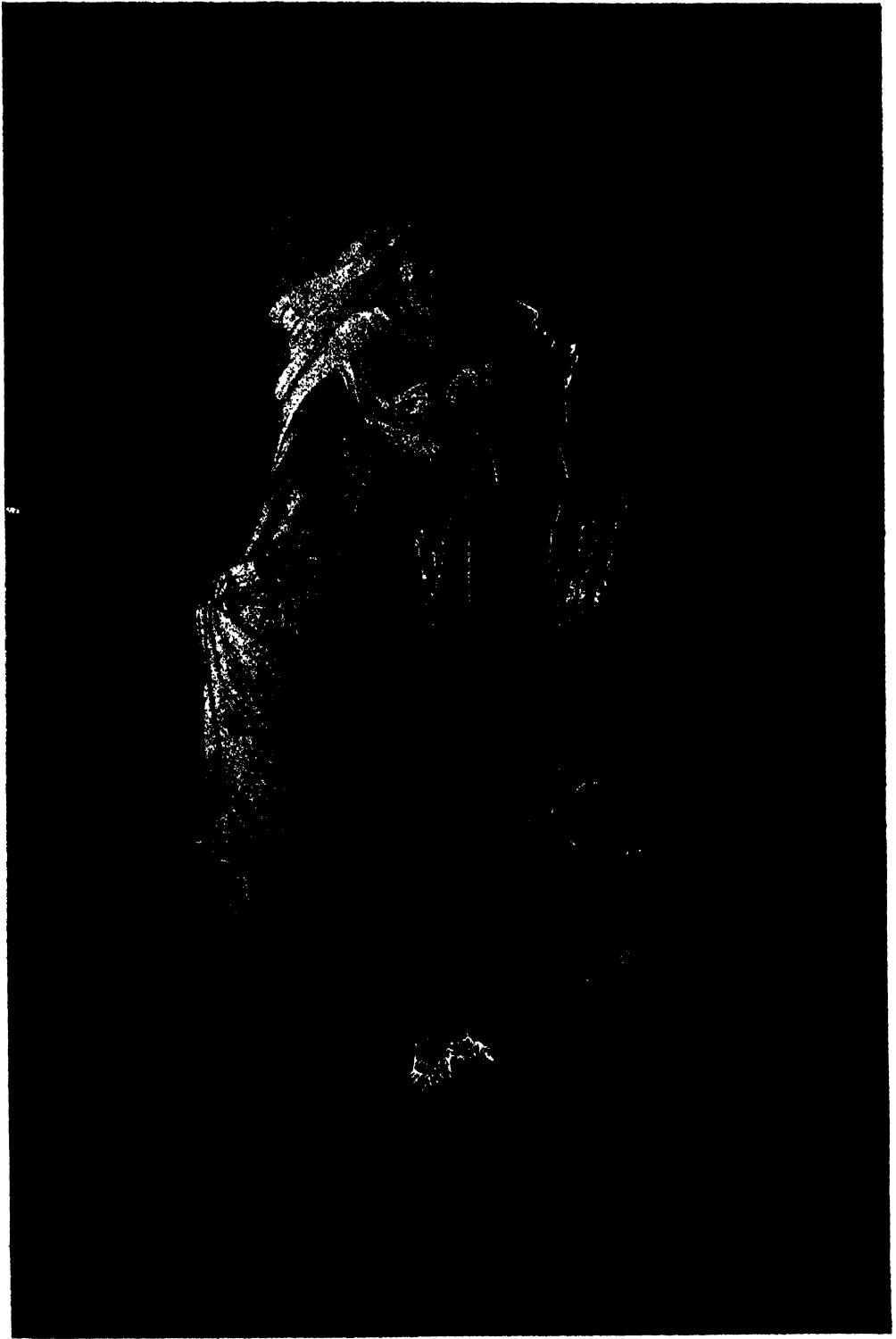
দর্‌গা হইতে

চিত্রকর শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ আবদার-রহমান চাগতাই মহাশয়ের সৌজন্যে।
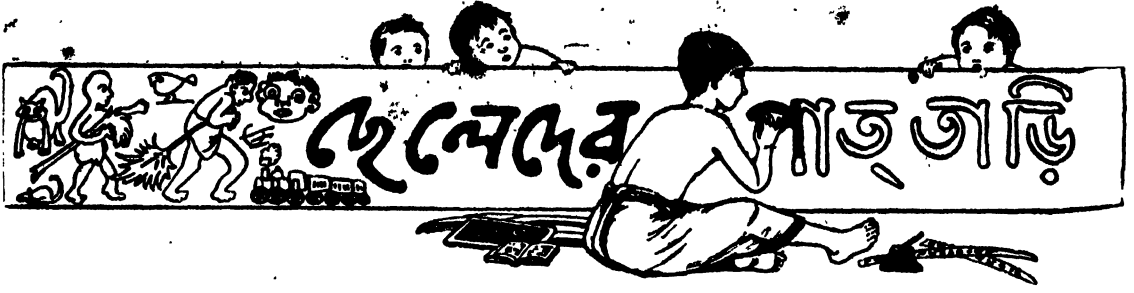
প্রকৃতির পাঠশালা

সূর্য্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন?

সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবী প্রভৃতি এক-একটি গ্রহ, অনবরত শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ সূর্য্যে এত আলো আছে আর পৃথিবীতে মোটে আলো নাই কেন? যে জিনিস হইতে গ্রহগণ তৈয়ারী হইয়াছে তাহা উত্তপ্ত মেঘরাশি মাত্র। এই যে উত্তপ্ত মেঘ হইতে তৈয়ারী পৃথিবী তাহা এখন এমন ঠাণ্ডা হইয়া গেল কিরূপে? সূর্য্য ত এখনো ভীষণ গরম। ইহার একটি কারণ এই যে যে-জিনিস যত ছোট তার উত্তাপ তত কম এবং তার উত্তাপ বড় জিনিসের উত্তাপের চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়। যে কারখানায় কাচ তৈয়ারী হয় সেখানে গিয়া আমরা যদি তিনটি কাচের বল্ তৈয়ারী করিতে বলি—একটি বড়, একটি আর-একটু ছোট ও অপরটি খুব ছোট,—তাহা হইলে আমরা দেখিব যে তিনটি বল্ এক সঙ্গে তৈয়ার হইয়া বাহির হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা ছোটটিই আগে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তার পরে ঠাণ্ডা হইবে তার চেয়ে বড়টি ও সব-শেষে ঠাণ্ডা হইবে সকলের চেয়ে বড়টি। এখন সূর্য্যের আকৃতি হইতেছে সব-চেয়ে বড় বল্‌টির মত, তাই তার উত্তাপ এখনো এত তীব্র রহিয়াছে আর তার আলোও এত জ্বলজ্বল্ করিতেছে। পৃথিবী ঠিক ছোট বল্‌টির মত, তাই এখন তার গা ঠাণ্ডা, অতএব সে আলোও দেয় না। শীতকালে হৃষ্টপুষ্ট বড় জোয়ান লোকের চেয়ে ছোট ছেলেদের গায়ে বেশী গরম কাপড় দিতে হয়। তার কারণ ছোট ছেলের গা বড় লোকদের চেয়ে শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। শরীর যার যত বড় তার উত্তাপ তত বেশী ও তত বেশীক্ষণ থাকে। মোটা শরীর হইতে উত্তাপ চলিয়া যাইতে সময় লাগে। সৌর-জগৎ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ঠাণ্ডা, তার কারণ পৃথিবীর চেয়ে সে ছোট।

—

বালক সম্পাদক

আমেরিকার এক প্রদেশে রিজ্‌ফিল্‌ড্ পার্ক নামক স্থানে স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং অনেক বয়স্ক লোকদের লইয়া একটি জাতীয় সমিতি আছে। এই সমিতিতে সভ্য আছেন প্রায় চার বা পাঁচ শত। ইহাদের একটি কাগজ আছে, তাহা মাসে দুইবার বাহির হয়। এই কাগজের আগে যে-সব সম্পাদক ছিলেন তাঁহাদের সকলেরই বয়স পঁচিশের বেশী। এখন এই কাগজের সম্পাদক একটি বালক, তাহার বয়স চোদ্দ বছর, নাম জন্ মিল্‌টন্ হিন্‌স্। কাগজটির জন্য লেখা বাছিয়া লওয়া, লেখা দেখিয়া দেওয়া, সমস্ত লেখার নাম ঠিক করিয়া দেওয়া ও সমস্ত ছাপা দেখা প্রভৃতি কাজ জন্‌কে করিতে হয়। সে আবার ছাপাখানার কাজও অনেক শিখিয়াছে এবং নিজের একটি ছাপাখানা করিয়াছে। কাগজটির সম্পাদকীয় বিভাগের সবই জন্‌কে লিখিতে হয়। এত অল্প বয়সে সে জাতীয় সমিতির সহকারী সভাপতি হইয়াছে। বারো বছর বয়স হইতেই কাগজ কি করিয়া চালাইতে হয় তাহা সে শিখিয়াছে। আমাদের দেশে এত অল্পবয়সের এমন বুদ্ধিমান ছেলে আছে কি?

—

লোকের মাথা ডিঙিয়ে হাঁটা

ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই লম্বা লম্বা গাঁটওয়ালা বাঁশ লইয়া তাহার গাঁটে পা দিয়া খটাখট হাঁটিয়া বেড়াইয়াছি। কোন কোন ছেলে বাঁশের খুব উঁচু গাঁটে পা দিয়া অসীম সাহসে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার নিউইয়র্ক

ফ্রেড্ উইল্‌সন্ মোটর-সাইকেলের উপর দিয়া চলিতেছেন।

াহরে ফ্রেড এইচ উইল্‌সন্ নামে এক ভদ্রলোক নিজের দুই পায়ে দুই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পা জুড়িয়া দিয়া জনতার মাথার উপর দিয়া মাঝে মাঝে হাঁটিয়া বেড়াইতে-ছেন। আর তাঁহার নীচে দিয়া মোটর-সাইকেলগুলা অনায়াসে গলিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। উইল্‌সন্ লোকটির চেহারা খুব লম্বা চওড়া; তাহার উপর এই বৃহৎ পা,—সর্বসমেত তিনি পনেরো ফুট উঁচু হইয়াছেন। এই রকম ভাবে চলিবার সময় উইল্‌সনের হাতে একটি লাঠি থাকে। অবশ্য এ লাঠি তিনি লোকের মাথায় ব্যবহার করেন না, দেহের সমতা রাখিবার জন্য ইহা নাড়াচাড়া করেন মাত্র। এই রকম হটরঠ্যাংকে আমাদের দেশে আগে রণ-পা বলিত; ডাকাতেরা এই রকম রণপায় চড়িয়া ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত চলিয়া দূর গ্রামে ডাকাতি করিয়া রাতারাতি বাড়ী ফিরিত। এই রকম রণপা পরিয়া ডাকাতির বিবরণ স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিশ্বনাথ নামক উপন্যাসে আছে।

চোখ বেঁধে ছবি আঁকা

একটি কাঠের পুতুল বা ঘোড়া সাম্‌নে রাখিয়া সেটা বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া তারপর কাপড় দিয়া চোখ বাঁধিয়া কাগজের উপর সেই পুতুল বা ঘোড়ার ছবি আঁকিয়া যাওয়া খুব শক্ত কাজ। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষায় আজকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই রকম ভাবে ছবি আঁকানো শেখানো হইতেছে। আগে আঁকিবার জিনিষ-টিকে প্রায় দশ মিনিটের জন্য তাহাদিগকে ভালো করিয়া দেখিতে দেওয়া হয় ও পরে তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই চোখ-বাঁধা অবস্থায় তাহারা ছবিটিকে যেমন দেখিয়াছে মন হইতে সেইরকম আঁকিয়া যায়। কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষকেরা বলেন এইরূপে ছবি আঁকিতে শিখিলে ছেলেদের আঙুলের কৌশল আয়ত্ত হয়, স্মৃতিশক্তি খেলিতে পায় ও বাড়ে এবং মনে মনে তাহারা জিনিষের ধারণা করিতে শিখে।

প

—

আষাঢ়ের গান

বর্ষা এলো রে ঐ,
চেয়ে ভাখ আকাশে—
ছোট বড় কত মেঘ,
শাদা, কালো, ফ্যাকাসে।
স্যাঁৎসেঁতে চারিদিক;
ঘন-ঘোর আষাঢ়ে
কি যে গাই ভেবে ভেবে
নাহি পাই ভাষা রে।
টুপ্‌টাপ্ ঝুপ্‌ঝাপ্
দিন রাত বৃষ্টি;
হায় হায়, গেল বুঝি
ধুয়ে মুছে সৃষ্টি।
দম্‌কায় বায়ু চলে,
চম্‌কায় বিদ্যুৎ।
জল বাড়ে সারা বেলা
একি খেলা অদ্ভুত!

মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি,
　　কড়্ কড় শব্দ।
ভয় পেয়ে খোকা খুকী
　　নির্ব্বাক্, স্তব্ধ।
গাছগুলো এলোমেলো,
　　বাঁতাসের হুটপাট্ ॥
ঝুর্ ঝুর্ পাতা ঝরে
　　ডাল ভাঙ্গে ফুট্ ফাট্।
ঝোপে ঝাড়ে, ডোবা-ধারে
　　গলাফুলো কোলা ব্যাং
বিট্‌কেল উৎসাহে
　　গান গায় গ্যাং গ্যাং।
মরা গাঙ্গে এল বান
　　দুটি তীর ছাপিয়ে—
তর্‌তর্ ছোটে নদী
　　আশপাশ কাঁপিয়ে।
হাটে মাঠে নাহি লোক,
　　নাহি লোক রাস্তার,
এত জল-ঝড়ে তবু
　　কেন আসে মাষ্টার?
হায় হায় কি আপদ—
　　জল ঝড় সন্ধ্যায়
খোকা-বাবু চুপ্‌চাপ্
　　নিজ পাঠে মন দ্যায়।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

—

চাকার খেলা

আমাদের দেশে মোটর-টায়ারের অবস্থা খারাপ হলে, তা ফেলে দেওয়া হয়। অনেকে কেটে তা দিয়ে জুতার তলাও করেন। কিন্তু মোটরের বড় বড় ফাঁপা টায়ার দিয়ে মজার খেলাও খেলা যায়। টায়ারকে একটু জোর দিয়ে ফাঁক করে' তার মধ্যে ছোট ছেলে-মেয়েরা বেশ গোল হয়ে বস্‌তে পারে। তার পর একজন সেটাকে গড়িয়ে দিলে শরীরের চাপ দিয়ে দিয়ে তাকে অনেক দূরে গড়িয়ে নেওয়া যায়। যারা একটু তাল ঠিক করে' চালাতে পার্‌বে, তারা ২০০।৩০০ গজ ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে গিয়েও টায়ারকে দাঁড় করিয়ে
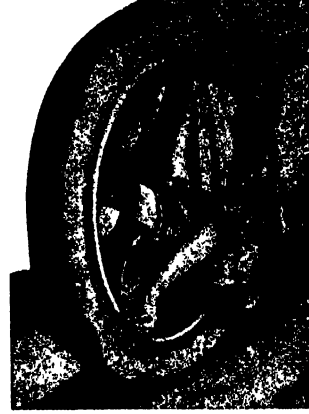
টায়ারের ভিতর বসিয়া গড়াইতেছে।

রাখ্‌তে পারে। ছেলেরা এই নূতন খেলাটাকে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারে।

—

সর্ব্বকনিষ্ঠ র‍্যাডিও অপারেটার

রবার্ট গার্সিয়ার বয়স সাত বৎসর। এই বালক, বিখ্যাত ভাঁড় চার্লি চ্যাপ্‌লিনের দলের অধিকারী এ্যালেন গার্সিয়ার পুত্র। সে এই বয়সেই তারহীন খবর-দারের কাজ করে। বেতারের কাজে ঢুকিতে হইলে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিয়া তারপর পরীক্ষায় পাস করিতে হয়। রবার্ট এই পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া বেতারের কাজে ঢুকিয়াছে। সে শতকরা ৯২ নম্বর পাইয়াছে।

বালক রবার্ট প্রথমে পিতার নিকট হইতে বেতারের কাজ শিখিতে আরম্ভ করে। সে পিতাকে মাঝে মাঝে এমন সকল প্রশ্ন করিয়া বসিত, তাহার পিতার পক্ষে যাহার উত্তর দেওয়া সহজ হইত না। ছেলের নিকট সম্মান নষ্ট হইবার ভয়ে পিতা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বেতারের বিষয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্যগুলি আলোচনা করিতেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রবার্ট বেতারের কলকব্জা এক-রকম বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। বেতারের কলকব্জা বুঝা বেশ শক্ত ব্যাপার—কিন্তু বালক রবার্ট একবার যাহা দেখে তাহা আর দ্বিতীয় বার দেখিতে হয় না।
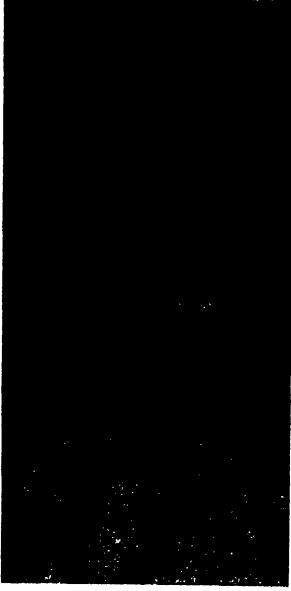
রবার্ট গার্সিয়া।

রবার্টের সঙ্গে অনেক বয়স্ক পরীক্ষার্থী ছিল। তাহারা সাত বছরের বালককে দেখিয়া হাসিয়াছিল, এবং পরে পরীক্ষায় ফেল করিয়া নিজেরা কাঁদিয়াছিল। দুইজন বেতারের কলকব্জাওয়ালা রবার্টকে বেতারের অনেক কলকব্জা উপহার দিয়াছেন। বালক কোন পাকা মিস্ত্রির সাহায্য না লইয়া নিজ হাতে সেই-সব কল বসাইবে।

হেমন্ত

—

কাঁদুনে পুতুল

বাজারে সচরাচর যে-সমস্ত পুতুল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মুখে সব সময় একটুখানি সিঁদুরে হাসি লাগিয়াই থাকে। খুকী-মায়েদের ইহাতে একটু অসুবিধা হয়। দুষ্টামি করিয়া মার খাইয়াও পুতুল যখন দিব্যি মুখ ভরিয়া হাসিতে থাকে, তখন সেটা কেমন যেন খাপ্‌ছাড়া লাগে। তাই এবার এক রকমের পুতুল তৈরি হইয়াছে, তার পিঠে একটু চাপ দিলেই তার দুচোখ বাহিয়া টস্‌টস করিয়া জল পড়িতে থাকে। পুতুলটির পিঠের কাছে একটি ছোট রবারের থলেতে জল ভরা থাকে, সেইখানে চাপ পড়িলেই সেই জল দুটি নল বাহিয়া

কাঁদুনে পুতুল।

চোখের কোণে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই থলে, নল, প্রভৃতি পোষাকের নীচে থাকে বলিয়া বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয়, মার খাইয়া পুতুল নিজে হইতেই কাঁদিতেছে। আমাদের দেশের হাটে বাজারে এই পুতুল এখনও পাওয়া যায় বলিয়া আমরা শুনি নাই। তাই প্রবাসীর অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারা এই কাঁদুনে পুতুলের নামে নিজেরা কান্না সুরু না করিলেই আমরা সুখী হইব।

স চ

—

কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুত্র

এক রাজরাণী। আগে ত তাঁর ছেলেপিলেই হয় না, এখন হলো—একে একে জন্মালো সাত-সাতটি ছেলে। রাণীর কিন্তু মনের সাধ—'একটি মেয়ে হয় তো বেশ হয়!—গৌরীদান ক'রে টুক্‌টুকে ছোট্ট জামাইটি নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি।' সাত ছেলে পাওয়ার পর রাণী তাই নিত্য ব্রত-পূজা করেন, আর দেব্‌তার দুয়ারে কামনা জানান—'ঠাকুর, আমায় ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে দাও।'

কিছুদিন পরে ঠাকুর-দেব্‌তার দয়া হলো।—কোথা থেকে ইয়া-লম্বা-জটা হাঁটু-সমান-দাড়ি নিয়ে এক ফকির এসে রাজবাড়ীর দুয়ারে হাজির। রাণী চুপি-চুপি দাসীকে পাঠিয়ে ফকিরকে অন্দর-মহলে ডেকে আনালেন। রাজ-রাণীর মনের সাধ জেনে ফকির একটা লাল টুক্‌টুকে ফুল বের ক'রে বল্লেন—'মা, সারাদিন উপোষী থেকে

পূর্ণিমার রাতে ভেজা চুলে গোপনে এ ফুলটি বেঁটে খেয়ো—কোলে মেয়ে পাবে; কিন্তু সাবধান, এক ফোঁটাও যেন মাটীতে না পড়ে!—পড়্‌লে, মেয়ে কোলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগের ফল আকাশে উড়ে যাবে।'......আগের ফল তো সাতটি ছেলে,—মানুষ আবার আকাশে উড়ে যাবে কি?—রাণী ফকিরের কথা ঠিক বুঝতে পার্‌লেন না; তবু দু'হাত পেতে ফুলটি নিয়ে মহাযত্নে রেখে দিলেন।

সারাদিন উপোষী থেকে পূর্ণিমার রাতে রাজরাণী নেয়ে এলেন; তারপর ভেজা চুলে আপনার হাতে ফুলটি বেঁটে মুখে দিতে যাচ্ছেন,—হটাৎ ঝনাৎ করে' একশো বাতির ঝাড়টা মেজেয় পড়ে' ভেঙ্গে গেল। হটাৎ চম্‌কে উঠ্‌তে বাঁটা ফুলের রসভরা সোনার ঝিনুকখানি রাণীর হাত থেকে ছিট্‌কে পড়্‌ল। এ কি হ'ল?—ভেবে রাণী তাড়াতাড়ি চেঁছে পুঁছে ঝিনুকের রসটুকু তুলে মুখে দিলেন; কিন্তু মার্ব্বেলপাথরের মেঝের জোড়ের এক ফাঁকে সাত ফোঁটা রস যে নীচে গড়িয়ে গেছে তা তাঁর নজরে পড়্‌ল না।

*　　*　　*　　*

দশমাস দশদিন পরে রাণীর সত্যি-সত্যিঃ একটি মেয়ে হলো—মেয়ে না ত যেন ক্ষীরের পুতুলটি! মা মেয়েকে কোলে তুলেই চাঁপাফুলের মত তুল্‌তুলে গাল দুখানিতে দুটো চুমো দিলেন। এ দিকে—সে-ই যে সাত ফোঁটা রস মাটীতে পড়েছিল তারই ফলে—বোনের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সাত ভাই সাত রাজপুত্র সাতটি কাকাতুয়া পাখী হয়ে উড়ে গেল।

সাত-সাত রাজপুত্র—কোলে-কাঁখের ছেলে তো নয়—কোথায় গেল সব?—কেউই খুঁজে পায় না। রাণী শুনে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লেন। ফকিরের কথা তাঁর মনে হ'লো—হায় হায়, আগে বুঝ্‌লে কি ছেলে হারাতে মেয়ে চান!...কিন্তু এ যে তাঁর গোপন কথা,—মুখ ফুটে বল্‌তেও পারেন না, বুকে চেপে থাক্‌তেও পারেন না।

*　　*　　*　　*

রাজকন্যা সাত আট বছরের হয়েছে। মেয়েকে আদর কর্‌তে গেলেই রাণীর ছেলেদের কথা মনে পড়ে, আবার যাকে পেতে সাত-সাতটি সোনার ছেলে খুইয়েছেন তাকে আদর না ক'রেও কি থাকা যায়?—এ সোনার চাঁদের দিকে চেয়েই তবু রাজরাণী বুকের আগুন চেপে রাখেন।

বড় হয়ে রাজকন্যা দাস-দাসীর মুখে শোনে—তার যে সাতটি ভাই ছিল; তারা তার জন্মের দিন যে কোথায় গেছে কেউ খুঁজে পায়নি। শুনে রাজকন্যার ভাইদের খবর জান্‌তে ভারী সাধ; তাই প্রত্যহই সে রাণীকে বলে—'মা, আমার নাকি সাত দাদা ছিল, তারা কোথায় গেছে বলনা?' মেয়ের মুখে এ কথা শুনে রাণী কেঁদে-কেটে আরো অস্থির হন।

*　　*　　*　　*

রাজপুত্রেরা কাকাতুয়া-পাখী হয়ে ফুরুত ফুরুত ক'রে ঘরে বাইরে উড়্‌তে লাগ্‌ল—কেউ যদি চেনে! কিন্তু রাজবাড়ীতে রঙ্‌-বেরঙের কত পাখীরই মেলা—কাকাতুয়ার দিকে তাকায় কে! তিন দিন তিন রাত উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরেও যখন তারা বাড়ীতে ঠাঁই পেলে না, তখন ছি—হু ছি—হু ক'রে চ্যাচাতে চ্যাচাতে সাত ভাই আকাশে উধাও হ'লো।

*　　*　　*　　*

মনের দুঃখে কাকাতুয়া-পাখী সাত-রাজপুত্র গহন বনে বাসা নিয়েছে। এগার মাস উনত্রিশ দিন বনে-বনেই তারা ঘুরে বেড়ায়; শ্রাবণ-মাসে পূর্ণিমার রাতে মেঘের ফাঁকে গোল চাঁদটি দেখে কদম-ফুলের কথা মনে পড়ে; আর তখনই মনে হয় তাদের মায়ের ঘরের জান্‌লার গোড়ায় যে কদম-গাছটা আছে তাতে তো এমন হাজার হাজার চাঁদ-কদম ফুটে রয়েছে! তাই বছরের এই একটা দিন কিসের টানে তারা রাজ্যে ফিরে যায়। গহন বন থেকে রাজপুরীতে পৌছতে রাত দুপুর হয়; রাজপুত্রেরা নিশুতরাতে কদমগাছের ফোটা-ফুলের পাশে মুখ লুকিয়ে ব'সে থাকে; আর জান্‌লার ফাঁকে সারারাত ধ'রে মায়ের মুখখানি আর ঘুমন্ত বোনটিকে দেখে দেখে—ভোরের চাঁদ না ডুব্‌তে আবার বাসায় ছোটে। শ্রাবণ মাসের চাঁদের আলো—একবার মেঘে ঢাকা পড়ে, ফের মেঘের ফাঁকে উকি মেরে লতা-পাতার জ্যোছ্‌না ছড়িয়ে দেয়; আঁধার-আলোর এ ফিকে রঙে ফোটা কদম-ফুল দেখে বোধ হয় যেন আকাশের ছোকরা চাঁদরা নীচে

নেমে এসেছে; আর, সে ফোটা-ফুলের আড়ালে কাকাতুয়ার সাদা ডানা নড়তে দেখে মনে হয় যেন চাঁদ-পরীর হাট মিলেছে।

* * * *

যায়—এভাবে কয়েক বছর যায়। রাজরাণী ছেলেদের জন্যে প্রায় রাতই কেঁদে কাটান; মায়ের দুঃখে রাজকন্যাও মন-মরা।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা-রাতে মায়ে-মেয়েতে ঘুমিয়ে। রাজকন্যা স্বপ্ন দেখে—কদম-ফুলের মুখোস প'রে কাকাতুয়ার ডানা পিঠে বেঁধে তার দাদারা যেন চাঁদ-পরী সেজেছে; তারা যেন তাকে ডেকে বল্‌ছে—

'বোনটি মোদের বোনটি,
মায়ের গলার কণ্ঠী,
সাত ভায়েরে আছে ভুলে' কেমনে তোর মনটি?'

রাজকন্যা যেন বল্‌লে—ভুলে' থাক্‌ব কেন, দাদা?—আমি তো তোমাদের কথা রোজই ভাবি, কিন্তু তোমরা যে কোথায় আছ কেউ বল্‌তে পারে না। এই তো দেখ,—এলেই যদি তা কিনা আবার চাঁদ-পরী সেজে! কেন? ও ছাই কদম ফুলের মুখোসগুলো ফেলে দাও না কেন?—আবার কাকাতুয়ার ডানাই বা পিঠে বেঁধেছ কেন?'—

বল্‌তেই যেন চাঁদ-পরীদের মুখ থেকে ঝুর্‌-ঝুর্‌ ক'রে কদমফুলের হল্‌দে রোঁয়াগুলো ঝ'রে পড়ল, আর তার বদলে মুখে বেরুলো এক-একটা এ্যা—ত্তো বড় কাকাতুয়ার লাল ঠোঁট। রাজকন্যা যেন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'এ কি হলো, দাদা?—তোমরা যে কাকাতুয়া পাখী হয়ে গেলে!'

সাতভাই যেন ডেকে বল্‌ল—

'কাকাতুয়া! কাকাতুয়া!—কোথায় কি রে গেছে খোয়া?
কেন বনের পাখী?
—মানুষ কে রে ক'রে দেবে?
মনের দুঃখে গহন বনে থাকি।'

রাজকন্যা বল্‌লে—'না না, আর গহন বনে যেতে হবে না,—বল, কি কর্‌লে তোমরা মানুষ হও, আমিই কর্‌ব।' ...'পার্‌বে?' ..'পার্‌বো।'...'ঠিক?'... 'ঠিক।'...

সাতভাই যেন তখন ঠোঁটে ক'রে এক-একটা বন-কাপাসের ফল এনে রাজকন্যার হাতে দিল; আর বল্‌ল—সাত মাস কিন্তু কথা না কয়ে থাক্‌তে হবে—এ সাত মাসের মধ্যে এ বন-কাপাসের তুলোয় সূতা কেটে গাল্‌চে বোনাতে হবে; গাল্‌চের উপর কদম-ফুলের বুটি তুলে' আঙুলের রক্ত মাখিয়ে যদি সাত ভাইয়ের গায় ছুঁড়ে দিতে পার তবেই আমরা মানুষ হই। সাত মাসের মধ্যেই কিন্তু কাজ শেষ হওয়া চাই, আর এ কয় মাস মুখে হাঁ-টিও কর্‌তে পার্‌বে না; কর্‌লে আর কিছুতে আমাদের মুক্তি নেই।' এই না বলেই যেন সাত ভাই কাকাতুয়া পাখী চিঁ-হ্‌ চিঁ-হ্‌ ক'রে ডাক্‌তে ডাক্‌তে উড়ে গেল।

স্বপ্ন দেখেই রাজকন্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় ক'রে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। জানালার নীচে কদমগাছটার দিকে তাকাতেই দেখে সত্যিই তো! কদম-ফুলের আড়ালে যে সাদা পাখীর ডানা! রাজকন্যা ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল। এদিকে তখন ভোরও হয় হয়। কাকাতুয়া পাখী সাত রাজপুত্র ডানা নাড়া দিয়ে আকাশে উড়্‌বে, রাজকন্যা দেখে—তাই তো! এ যে সত্যিই সাতটি কাকাতুয়া! আনন্দে রাজকন্যার আর তর সয় না—পাখী সাতটি কোথায় যায়, দেখ্‌তে সেও ছুট্‌ল।

পাখীরা ওড়ে আকাশে, রাজকন্যা পাখীর দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে হেঁটে ছুটে চলেছে,—কোথায় যায় হিসেব নেই। যেতে যেতে, এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর-এক রাজার রাজ্যে এসে গহন বনে ঢুকবে,—কাকাতুয়া পাখী সাত-ভাই রাজপুত্রেরা চেয়ে দেখে—বোনটিও যে এসেছে। দেখে তাদের আনন্দের আর সীমা নেই—তারা শোঁ ক'রে নীচে নেমে এসে রাজকন্যাকে ঘিরে দাঁড়াল; তারপর কেউ তার হাতে ঘসে ঠোঁট, কেউ বা কাঁধে উঠে' নাচে, কারু বা চিঁ-হ্‌ চিঁ-হ্‌ ডাক আর থামে না। এসব দেখে শুনে রাজকন্যার মনে হ'লো—সত্যি সত্যি এরাই তার সাত-ভাই। সে ভাব্‌লে—ভোরের স্বপ্ন মিছে হয় না; ভাইরা পাখী হয়েছে এ স্বপ্ন যখন মিলে গেল, তখন যা কর্‌লে তারা মানুষ হবে সে স্বপ্ন কি মিথ্যা

হয়? আমি ভাইদের মানুষ না ক'রে ঘরে ফিরব না—তাতে খালি সাতমাস কথা না ক'য়ে কেন যা করতে হয় সবই করব।—এই না ভেবে রাজকন্যা ভাইদের সাথে গহন বনেই র'য়ে গেল।

কাকাতুয়া-পাখী রাজপুত্ররা ঠোঁটে ঠোঁটে খড়কুটা ব'য়ে বোনের জন্য এক কুঁড়ে তৈরী করলে। এক ভাই ফল আনে, এক ভাই মূল আনে, এক ভাই নরম নরম পাখীর পালকে শেজ পেতে দেয়—রাজকন্যার খাওয়া-শোওয়ার কষ্ট নেই। দুবেলা চরার পর ঘরে ফিরবার সময় সবাই এক-একটা বন-কাপাসের ফল ঠোঁটে কামড়ে নিয়ে আসে—রাজকন্যা কাপাসের তুলোয় স্থতো কেটে গাল্‌চে বোনে।

সাত মাসের ছয়মাস যায় রাজকন্যা হাঁও করে না হুঁও করে না, মুখ বুজে একমনে গাল্‌চেই বুনছে। এক দিন কাকাতুয়া-পাখী রাজপুত্ররা বিকেল বেলা চরতে গেছে, রাজকন্যা একলা ঘরের দরজায় বসে স্থতা কাটচে, হঠাৎ সে রাজ্যের রাজার ছেলে মৃগয়ায় এসে গহন বনে উপস্থিত। গহন বনে এ কুঁড়ে কিসের?—রাজার ছেলে এগিয়ে দেখেন দুয়ারে এক পরম স্থন্দরী মেয়ে।...রাজপুত্র এ কথা সে কথা নানান্ কথা স্থধান্, রাজকন্যার মুখে কথা নেই—সে আপন মনে স্থতাই কাটে আর গাল্‌চে বোনে। রাজার ছেলে আর বেশী কিছু না ব'লে কয়ে রাজকন্যাকে নিজের পাশে ঘোড়ায় উঠিয়ে রাজ্যে ফিরলেন।

মায়ের কোল ছেড়ে রাজকন্যা ভাইদের জন্যে বনবাস নিয়েছে—সে ভাইরাই বা কোথায় আর কেইবা কোথায়, তাকে নিয়ে চল্‌ল—স্থধাবারও উপায় নেই—রাজকন্যা কেঁদেই অস্থির। সাতমাসের মধ্যে গাল্‌চে বুনে বুটি তোলা চাই, তাই সে কাঁদতে কাঁদতেও গাল্‌চে তৈরীই করচে, কিন্তু চোখের জলে হাত ভিজে আঙুল যে আর চলে না!

রাজার ছেলে আদর ক'রে রাজকন্যাকে রাজপুরীতে তুল্‌লেন। এমন স্থন্দরী মেয়ে!—রাজার ছেলের মনের সাধ একেই রাজরাণী করেন। কিন্তু রাণী মা চটেই আগুন—কোন্ বন-জঙ্গলের মেয়ে, তার উপর হাবা না বোবা, এমন বৌ হ'লে রাজপাট মানাবে কেন! রাজপুত্রের মন কিন্তু মায়ের এ কথায় প্রবোধ মানে না।

* * * *

গাল্‌চে বোনা হয়ে গেছে, এখন বুটি তোলা চাই; কিন্তু স্থতো যে সব ফুরিয়ে গেল! সাত মাসও তো যায় যায়;—রাজধানীতে বনকাপাস কোথায় পাই?—রাজকন্যা দুদিন ধ'রে ভাবচে। উপায় না পেয়ে তিনদিনের দিন নিশুত রাতে কাপাসের খোঁজে চুপিচুপি রাজপুরী হতে বেরুল। রাজকন্যা এদিকে যায় দেখে দালান কোঠা, ও-দিকে যায় দেখে দীঘি পুকুর—বনকাপাস তো কোথাও মেলে না। হাঁটতে হাঁটতে শেষে সে নদীর পাড়ে শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত। শ্মশানের নীচে বনকাপাসের মস্ত বন; রাজকন্যা আঁচল ভ'রে কাপাসের ফল কুড়োতে লাগ্‌ল।

এই মেয়েই ছেলেকে পাগল করেছে—এই না ভেবে, একেই রাণীমা রাজকন্যার উপর চটা, তার উপর যখন টের পেলেন দুপুররাতে একলা সে কোথায় বেরিয়ে যায়, তখুনি তার পেছন পেছন দুজন দাসীকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন 'কি করে মেয়েটা, দেখা চাই।' রাজকন্যা শ্মশানে ঢুকে কাপাস তুলতে নীচে নাম্‌বে, দাসীরা দূর হতে দেখেই—'ওমা!' ব'লে চেঁচিয়ে দে ছুট; হাঁপাতে হাঁপাতে রাজপুরীতে ফিরে খবর দিল—'রাজপুত্র একটা ডাইনী রাজ্যে এনেচেন, সে শ্মশানে গিয়ে মড়া খায়।' রাণীমা হুকুম দিলেন—'ডাইনীটাকে বেঁধে গারদে রাখ্, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবি।' হৈ চৈ ক'রে লোকজন গিয়ে রাজকন্যাকে বেঁধে আন্‌ল।

তিনদিন পরে রাজকন্যার আয়ু ফুরোবে। সাত মাসের তো এই তিনটি দিনই বাকি। ভাইদের সাথে দেখা নেই দেখা হবে কি না কে জানে? তবু খাওয়া নেই শোওয়া নেই—রাজকন্যা গাল্‌চের উপর বুটিই তুলচে; আর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করচে—'দয়াল ঠাকুর, আমার মরার আগে ভাইদের একবার যেন কাছে পাই।'

চারদিনের দিনে রাজকন্যাকে মশানে নিয়ে মশালচীরা আগুন ধরাচ্ছে, বুটিতোলা গাল্‌চে হাতে রাজকন্যা

চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কোথা হতে শোঁ শোঁ ক'রে উড়ে এসে সাতটা কাকাতুয়া পাখী মাথার উপর থমকে দাঁড়াল; তারপরে তারা হুস ক'রে নীচে নেমে প'ড়ে রাজকন্যাকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। রাজকন্যা চোখ মেলে চেয়েই নিজের আঙুল কামড়ে বুটির উপর রক্ত মাখিয়ে লাল গালচেখানি ভাইদের গায় ছুঁড়ে দিল। সকলে অবাক্ হয়ে দেখে—কোথায় গেল কাকাতুয়া!—এ যে সাত রাজপুত্র!

রাজকন্যা সকলকে সব কথা খুলে বল্লে। সাত ভাই রাজপুত্রেরা বল্ল—বোন, একমাস ধ'রে তোমার খোঁজে কত দেশই যে ঘুরেছি!—ভাগ্যিস এ পথে যেতে আজ তোমায় দেখ্তে পেয়েছিলাম!'

রাজ্যের রাজপুত্র সব শুনে' মহাখুসী। রাণীমারও ভুল ভাঙ্ল। রাজার ছেলের সাথে রাজকন্যার বিয়েতে আর বাধা কিসের?

রাজকন্যা বল্লে—'আমি না ব'লে মায়ের কোল হতে এসেছি, আগে মায়ের কোলে ফিরে যেতে চাই। ভাইদের মত আমাকেও হঠাৎ হারিয়ে মা আমার বেঁচে আছেন কি না জানি না।'

সাত ভায়ের সঙ্গে রাজকন্যা বাপের রাজ্যে ফির্ল। মেয়ের সাথে ছেলেদের ফিরে পেয়ে আনন্দে রাজারাণীর চোখের জল আর থামে না।

কিছুদিন পরে সেই যে রাজকন্যাকে-বিয়ে-কর্তে-চান-রাজপুত্র তিনিও এসে হাজির। দু'রাজ্যের লোক মহা ধুমধামে তখন রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে দিল।

শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের নাটক

কিছুদিন আগে আমেরিকার লস এঞ্জেলেস নামক সহরে গ্যামুট ক্লাব থিয়েটারে মহা সমারোহে রবীন্দ্রনাথের চিত্রা নাটক অভিনীত হয়ে গিয়েছে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ। প্রোগ্রাম অথবা নির্ঘণ্ট-পত্র থেকে আরম্ভ করে দৃশ্যপট অভিনয় ইত্যাদি সমস্তই ভারতীয় আদর্শের অনুকরণে করা হয়েছিল। অর্জ্জুনের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষাল। প্রফুল্লকুমারের বাড়ী কলিকাতায়। অভিনয়ের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে প্রকাশ যে প্রফুল্ল-বাবু অর্জ্জুনের ভূমিকা বেশ চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। চিত্রার ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন কুমারী ব্রন্‌সন্। "চিত্রা" নাটক অভিনয়-কালে নট-নটীরা যে বেশভূষা করেছিলেন তাতে ঠিক ভারতীয় আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা হয়েছে বলে মনে হয় না।

সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ আমেরিকায় বায়স্কোপ মহলে সুপরিচিত। তিনি নিজে একজন বায়স্কোপ-অভিনেতা। "চিত্রা" নাটক অভিনয় হবার পূর্ব্বে তাঁর চেষ্টায় সেখানে আরও কয়েকটি হিন্দু নাটক অভিনীত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে যে গুহ-মহাশয় সম্প্রতি আমেরিকা থেকে দেশে
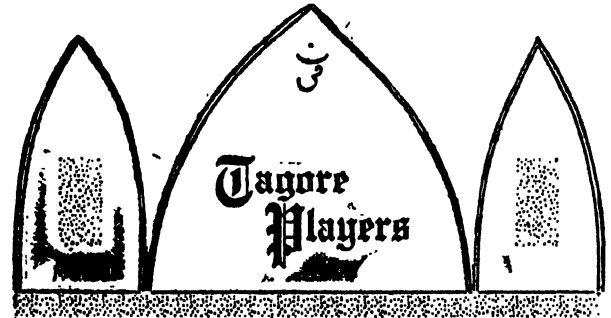
আমেরিকায় চিত্রা নাটকের অভিনয়ের নির্ঘণ্ট।

চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় কুমারী ব্রন্‌সন্।
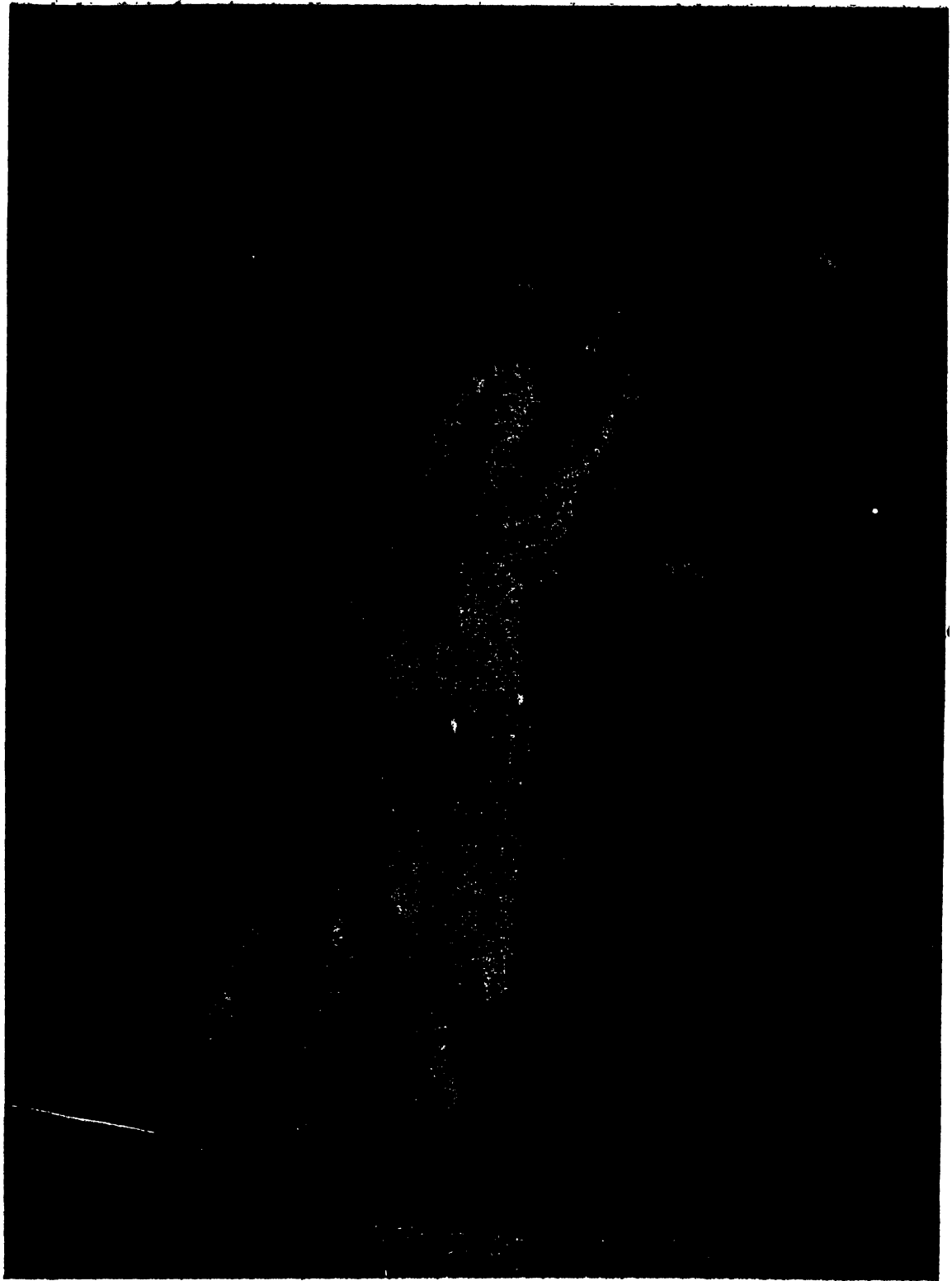
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ম্‌ঁ্যসিয় পোলঁ্যা নামক ফরাসী ভাস্করের গঠিত প্রতিমূর্ত্তি
পারী-নগরীর সালোঁ দ্য লা সোসিয়েতে নাশিয়োনাল্‌ দে বোজ্‌-আর্‌--
ললিতশিল্পের জাতীয় সমিতির প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষাল।

ফিরে এসেছেন এবং কলিকাতায় একটি বায়স্কোপ কোম্পানী খোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন।

সম্প্রতি পারী শহরেও রবীন্দ্রনাথের "চিত্রা" নাটক অভিনীত হয়েছে

শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বর্ষা

বর্ষা এল দুষ্টু মেয়ে
উড়িয়ে এলো-চুল,
চঞ্চল অঞ্চলের থেকে
ছড়িয়ে জুঁইয়ের ফুল।

বর্ষা এল দুষ্টু মেয়ে,
ঢাক্‌চে সে মুখ—দেখ্‌চে চেয়ে,
মিশিয়ে হাসি-ভ্রূকুটী সে
হান্‌চে এক অদ্ভুত—
অপূর্ব্ব বিদ্যুৎ।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ধ্বংসাবশিষ্ট ইউরোপ

বিপরীত স্বার্থের সংঘাতে যে বিরোধ জাগিয়াছে তাহা সভ্য-জগতকে এমনই আলোড়িত করিতেছে যে, কোনও দেশে রাষ্ট্রনীতির গতি একই পথে বেশীদিন চলিতে পারিতেছে না। রাষ্ট্রনীতির ধারা এত শীঘ্র শীঘ্র ভিন্নপথমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে যে তাহার ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি সঠিক নির্দ্ধারণ করা এক রকম অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে ইউরোপের ধ্বংসোন্মুখ ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা যে প্রতিযোগিতা জাগাইয়াছে এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্যলাভের জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রনীতির গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কাজেকাজেই রাষ্ট্রনীতির ধারাকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে ইউরোপের অর্থনৈতিক সমস্যাকে বুঝিতে হইবে।

বিগত যুদ্ধের পর ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন কেবলমাত্র স্বদেশজাত দ্রব্যের সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই চলিতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের হাটে তাহা প্রচলনের জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইতেছে। ইংলণ্ড বাণিজ্যক্ষেত্রে পূর্ব্ব আধিপত্য বজায় রাখিবার চেষ্টায় অবাধ-বাণিজ্যের (free trade) পরিবর্ত্তে উপনিবেশগুলির সহিত সম্মিলিত হইয়া এক শুল্ক-সমবায় (Tariff Union) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশও ক্যানেডা উপনিবেশের সহিত শুল্ক-সন্ধি করিয়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। মধ্য-ইউরোপের নবীন রাজ্যগুলিও জেকো-স্লোভাকিয়ার মন্ত্রী বেনিসের প্রচেষ্টায় এক শুল্ক-সমবায় গড়িয়া বাণিজ্যের হাটে প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন।

সাম্রাজ্য-লোভ ও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে এই-সকল বিপরীত ধারার সৃজন হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানী বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সমগ্র মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে যে অর্থনৈতিক খাদ (Economic Trench) কাটিয়া অন্য-দেশজাত পণ্যের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে বিনষ্ট করিয়া একটি সার্ব্বজাতিক ধনিক-মণ্ডল (International Capitalist Trust) গঠন করিয়া অবাধ-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া বিশ্বযুদ্ধের একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মিত্রশক্তিগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে জাতিসমূহের সংঘ গঠিত হইল শুধু নামে—প্রবল শক্তিগুলিই সংঘের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং দুর্ব্বল জাতিগুলি প্রবলের স্বার্থের নিকট পরাভব মানিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন রহিল না। প্রবলে প্রবলেও স্বার্থের সংঘাত বাধিয়া উঠিল, জার্ম্মানীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাধান্য লাভের জন্য আবার জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে বিশ্বের হাটে জার্ম্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইংরেজ; জার্ম্মানীর তিরোভাবের পর মার্কিনের আবির্ভাব হইল, তাই প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল ইংরেজে আর মার্কিনে। যুদ্ধের অবকাশে আমেরিকা বিশ্বের হাটে আপনাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল; যুদ্ধাবসানে তাহা বজায় রাখিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল। কাজেই ইংরেজের সহিত মার্কিনের স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হইল।

যুদ্ধের সময় ঋণদান ও মাল-সরবরাহ করিয়া প্রভূত ধনবৃদ্ধির সুযোগ আমেরিকার হইয়াছিল। ইউরোপের মুদ্রার মূল্যনিরূপণ অনেকটা আমেরিকার ইচ্ছার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দিকে ইংরেজের ধনসাম্য বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজের একটা মস্ত বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে এই, যে, তাহার কাঁচা মাল বিক্রয় করিবে কাহাকে? যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মানী এক বড় ক্রেতা ছিল। কিন্তু পোঁট্‌লা-পুঁটুলি সমেত যাহাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই পথের ভিখারীকে ক্রেতা করা তো সম্ভব-পর নয়। জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, তুর্কী ও রুশিয়ার অবস্থা রাস্তার ভিখারীর মত; ইহাদের অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা সমস্ত ইউরোপকে দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য-সংহতি নষ্ট হইয়াছে, ফলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হওয়াতে প্রসারের শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। অপরদিকে এসিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অবাধে বাণিজ্য-বিস্তারের সুবিধা পাইয়া আমেরিকা ও জাপানের বাণিজ্যভিত্তি আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা এতই ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে যে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের রাজ্যসমূহকে ধারে মাল সরবরাহ করিয়া তাহাদের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিবার সামর্থ্য আমেরিকার আছে। ইংরেজ কিম্বা অন্য কাহারও ঋণ দিবার শক্তি নাই। যুদ্ধের ফলে আমেরিকা বিশ্বের হাটে প্রবল হইয়াছে, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে ইংরেজ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং জাপান প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া একচ্ছত্র অধিপতিরূপে পূর্ব্বে বিরাজ করিতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রাচ্যে জাপানের এই প্রাধান্যকে খর্ব্ব করিতে উৎসুক; ইংরেজ আমেরিকার ধনপ্রাবল্য সহ্য করিতে নারাজ; ইউরোপে ইংরেজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্য আবার ফ্রান্সের চক্ষুশূল। এই পরস্পর-বিরোধী শক্তিসমূহের ঈর্ষা পরস্পরকে এমনই ক্ষতবিক্ষত করিতেছে যে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। তবে যতদূর দেখা যাইতেছে ইংরেজ আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানকে প্রবল রাখিতে চেষ্টা পাইবেন এবং ইংরেজ ও জাপানের সখ্যতার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও আমেরিকার মিত্রতা জমিয়া উঠিবে বেশ ভালরকমই। ইংরেজের পক্ষে আবার ফ্রান্সের শক্তিকে ব্যাহত করিবার জন্য জার্ম্মান-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাওয়া বিচিত্র নহে। ইতিহাসের গতিকে বিগত যুদ্ধ যে পথে চালাইয়াছে তাহাকে ফিরাইয়া অন্যপথে চালান সহজ নহে। তাই মনে হয় যে বিগত যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ নহে; আবার এক নূতন কুরুক্ষেত্র বুঝিবা বাধিয়া উঠে।

মার্কিন রাজ্য খনিজ ধন-সম্পদে ইংলণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর খনিজ তৈলের শতকরা ৭০ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায়। এই খনিজ তৈলের প্রাধান্য হইতে আমেরিকা কলকারখানার জন্য সস্তায় শক্তি ব্যবহার করিবার উপায় লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিনের পণ্যবাহী জাহাজ ছিল না। পৃথিবীর পণ্য-বহন কারবার

ইংরেজের একচেটিয়া ছিল। যুদ্ধের পর এক বিরাট পণ্যবাহী নৌবহরের সাহায্যে মার্কিন পণ্য সরবরাহে ইংরেজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। ইংরেজ তাই মার্কিন রাষ্ট্রের গতিকে অন্য ক্ষেত্রে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিনের ঘরের পাশে জাপানকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবল রাখিতে উৎসুক। ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রতিযোগিতা বাড়িয়া উঠিলে সেই-সকল স্থানেই মার্কিনের শক্তির অধিকাংশই ব্যয়িত হইয়া যাইবে, ইউরোপের হাটে মার্কিনের সুবিধা করিয়া উঠা বড় সম্ভবপর হইবে না।

জাপান, যুদ্ধের অবকাশে, প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের শক্তিকে যথেষ্ট বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। অবাধ-বাণিজ্য করিবার সুযোগ পাইয়া প্রাচ্যের হাটে বেশ দৃঢ়ভাবে আস্তানা গাড়িয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু প্রথম-শ্রেণীর ব্যবসায়ী জাতি হইয়া উঠিবার এক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া জাপানের বাণিজ্যের প্রসার তেমন হইতে দেয় নাই। জাপানে কয়লা ও লৌহের উৎপাদন সস্তায় সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কয়লা ও লৌহ ভিন্ন সস্তায় পণ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ সম্ভবপর নহে। যুদ্ধের অবকাশে জাপান তাহার এই অভাবটিকেও মিটাইয়া ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। নবীন চীন-সাধারণতন্ত্র ও সাইবেরিয়ার গণতন্ত্রকে ঋণ দান করিয়া তথাকার কয়লা ও লৌহের খনিগুলিকে সস্তায় ইজারা লইয়া জাপান নিজের অভাব অনেকটা পূরণ করিয়া লইয়াছেন। মার্কিন ওয়াসিংটন-বৈঠকে চীনের সহিত জাপানের এই পণ্যসন্ধি নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ নিজের স্বার্থের খাতিরে জাপানের অনুকূলতা করেন।

ইংরেজ উপনিবেশগুলি কিন্তু জাপানকে বিশেষ ভাল নজরে দেখেন না। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমজীবি-সম্প্রদায় জাপানী শ্রমিকের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়া জাপানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন; তাই পীতাতঙ্কে আতঙ্কিত এই উপনিবেশগুলিই ইংরেজে জাপানে মিত্রতার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছেন, তথাপি ইংরেজ সরকার দায়গ্রস্ত হইয়া জাপানের সঙ্গে সখ্যতা করিতেছেন। ইংরেজ যেমন জাপানকে খেলাইয়া মার্কিনকে দুর্ব্বল করিতে চাহিতেছেন তাহার পাল্টা চালে মার্কিনও ফ্রান্সকে ইংরেজের বিরুদ্ধে এক চাল খেলাইয়া লইতেছেন। ইংলণ্ডের এত সন্নিকটে একটি বিরুদ্ধ-স্বার্থ-বিশিষ্ট শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিতে পারিলে মার্কিনের সুবিধা। সার ও রুরের কয়লার খনি ও লংউইর লৌহের কারবার ফ্রান্সের হাতে আসাতে ফ্রান্স, হলাণ্ড, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি রাজ্য ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরেজ কয়লার খনির মালিক ও ইস্পাতের কারবারীর ইহাতে সমূহ ক্ষতি। তাই ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ জার্ম্মানীর রাটেনো ও ষ্টাইনিসের ব্যবসায় যাহাতে ফ্রান্সের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দিতে উৎসুক। জার্ম্মান কয়লা ও লৌহের কারবার যাহাতে প্রবল না হইয়া উঠে ফ্রান্স আবার তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। পূর্ব্ব প্রুসিয়ার কয়লার খনিগুলি যাহাতে পোলাণ্ডের হাতে আসে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা ফ্রান্স করিয়াছিলেন। পোলাণ্ড, জেকোস্লোভাকিয়া ও রুমেনিয়ার সহিত নানা প্রকার ব্যবসায়-সম্পর্কিত বন্দোবস্তও ফ্রান্স করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার লাভ দু'রকমে হইয়াছে। প্রথম লাভ প্রাচ্য ইউরোপে জার্ম্মান পণ্য-প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় লাভ জার্ম্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে একটি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা প্রয়োজন হইলে জার্ম্মানীর প্রতিকূলে ফ্রান্সের অনুকূলতা করিবে। এসিয়া মাইনরের লৌহ-খনিগুলির ইজারা পাইয়া ফ্রান্স তুরস্কের জাতীয়দলের সহিত এমন অনেকগুলি রফানিষ্পত্তি করিয়াছেন যাহা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল। এই-সব নানা কারণে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ও জার্ম্মানীর অনুকূলে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতির ধারা বর্ত্তমানে প্রবাহিত হইতেছে। কালে এই স্বার্থের সংঘর্ষে আর-একটি কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবে কি না কে বলিবে? Communist Reviewএ Karl Radekএ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "English American competition is a capitalist fact of post-war world politics. Naturally competition does not mean immediate war. Fifteen years elapsed between the day when the Saturday Review wrote 'Germaniam dellam esse' and Scapa Flow. But the danger of a resort to war exists. * * * The question is how and when the clash between Anglo-American interests will arise. Eastern Asia and East Europe will play a leading role in the coming conflict. * * * The Pritish Foreign Office wants to use its relation with Japan as a card in the diplomatic game against U. S. A. If Japan can be played off as an English card against the U. S. A., then France may be used as an American card against England. The last three years have witnessed an uninterrupted Anglo-French struggle for European Hegemony." যতদূর দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির অন্তরালে রহিয়াছে অর্থনৈতিক কতকগুলি সমস্যা। এবং বিশ্বের হাটে যে রেষারেষি চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে কয়লা ও লৌহের প্রতিযোগিতা। এই কয়লা ও লৌহের মালিকানা লইয়া শেষে একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিয়া উঠা কিছুই বিচিত্র নহে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কমলা মিঠে করা

প্রথমে কিছু চুণ পচিয়ে কয়েকদিন স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ছড়িয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর যে গাছের ফল মিঠে করতে হবে তার গোড়ার চারদিকে একটি নাতি-গভীর খাল এমন ভাবে কাটতে হবে যে কোন শিকড় যেন কাটা না যায়। পরে সেই পচানো চুণ দিয়ে সেই খাল ভর্ত্তি করে মাটি দিয়ে চেপে দিলেই সেই গাছে খুব মিঠে কমলা হবে। সিলেট জেলার ছাতকের আর খাসিয়া জেলার চেরাপুঞ্জীর কমলা মিষ্টি বলে' প্রসিদ্ধ, কারণ এই দুই জায়গায় চুণাপাথর খুব বেশী। এই উপায়ে আম-কাঁটালও বেশী মিঠে করা যেতে পারে।

শ্রী মহিউদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী

রোএরিক

এক শতাব্দীরও আগেকার কথা, টুর্গেনিভের গল্প উপন্যাস হঠাৎ রুশিয়াকে পৃথিবীর গুণী- ও রসজ্ঞ-সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। সাহিত্য ও ললিতকলায় তারপর হইতে বিশেষ একটি গৌরবের স্থান রুশিয়া বরাবরই অধিকার করিয়া আসিয়াছে। টুর্গেনিভের উপন্যাসরাজির পর শায়কোভেস্কির সঙ্গীত, তারপর এক-সঙ্গে ডষ্টয়েফ্স্কির উপন্যাস ও রুশীয় নৃত্যকলা সমস্ত ইউরোপ জুড়িয়া যে রসের প্লাবন বহাইয়াছিল আজও পর্য্যন্ত তাহাতে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নাই।

কিন্তু এ-সমস্ত ছাড়া রুশিয়া যে চিত্রসম্পদেও সমৃদ্ধ এ কথাটা হয়ত অনেকেরই জানা নাই।

রুশীয় চিত্রকলার একটি বড় বিশেষত্ব এই, যে, উহাতে শিল্পপদ্ধতির দিক দিয়া একদিকে স্কেণ্ডিনেভিয়ার ও অন্যদিকে বাইজেণ্টীয় তাতার ও ভারতীয় প্রভাব এক-সমানভাবে ছায়াপাত করিয়াছে, কিন্তু তার মধ্যেই রুশিয়ার চির-রহস্যভরা চিরন্তন সত্তাটি, তাহার তরুগুল্ম-হীন কালোকষ্টির পাহাড়, তার ম্লান পাণ্ডুর বসন্ত, তার তড়িদুজ্জ্বল সুদীর্ঘ কোজাগর রাত্রি, তার ইতিহাস, তার কিম্বদন্তী সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রুশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত এই তরুণ রুশীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিকোলাস্ কন্‌ষ্টাণ্টিনোভিক্ রোএরিকের চিত্র। নিকোলাস্ রোএরিক্ ছাড়া রুশীয় শিল্পকলার পূজারীদের মধ্যে ভোরুবেল্ সোমোফ, সেরোফ্, বেনোয়া প্রভৃতি আরও অনেক শক্তিশালী শিল্পীদের নাম করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই শিল্পে রুশিয়ার যে প্রকাশ তাহা অনেকখানিই বাহিরের বস্তু। রুশিয়ার জীবনের যেটা ভিতরের দিক্, সত্য সুন্দর শিবের যে আত্মপ্রকাশ তার নিতান্তই অন্তরের বস্তু, তাহাকে পাই আমরা একমাত্র রোএরিকের চিত্রে। এই হিসাবে রোএরিকই প্রথম রুশীয় শিল্পকলায় সেই জিনিসটির পরিচয় দিয়াছেন যাহাকে বলিতে পারা যায় রুশীয় শিল্পের আত্মা। কিন্তু এই আত্মা বস্তু শাশ্বত, দেশে দেশে কালে কালে নানা প্রকাশের মধ্য দিয়াও ইহার চিরন্তন ভাবসত্তা সর্ব্বত্র সর্ব্বমানবেরই বোধগম্য, আদর ও সম্ভোগের সামগ্রী। তাই রোএরিকের শিল্প রুশীয় হইয়াও রুশীয়ত্বের অতীত। উহা শাশ্বত ও সর্ব্বমানবিক।

নিকোলাস্ কন্‌ষ্টানোন্টিভিক্ রোএরিক্।

বর্ত্তমান রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক চিত্রকর,
বিখ্যাত চিত্রসমালোচক ও কবি।

ভাবাত্মক হইলেও রোএরিকের চিত্র দুর্ব্বোধ্য নহে। বরঞ্চ সহজবোধ্যতাই তাঁহার শিল্পের বিশেষত্ব। তাঁহার যে-কোনো চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তার অন্তর্নিহিত সত্যটি অতি অলক্ষিতে আসিয়া মনকে স্পর্শ করে। আপাত-দৃষ্টিতে যেগুলিকে অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া মনে হয়, এমন একটি সহজ অনুভূতি ও প্রকাশের জ্যোতিতে সেগুলি দেদীপ্যমান যে তাহাদিগকে সত্য ও জীবন্ত বলিয়া ভাবা ছাড়া উপায় থাকে না। বাহিরে
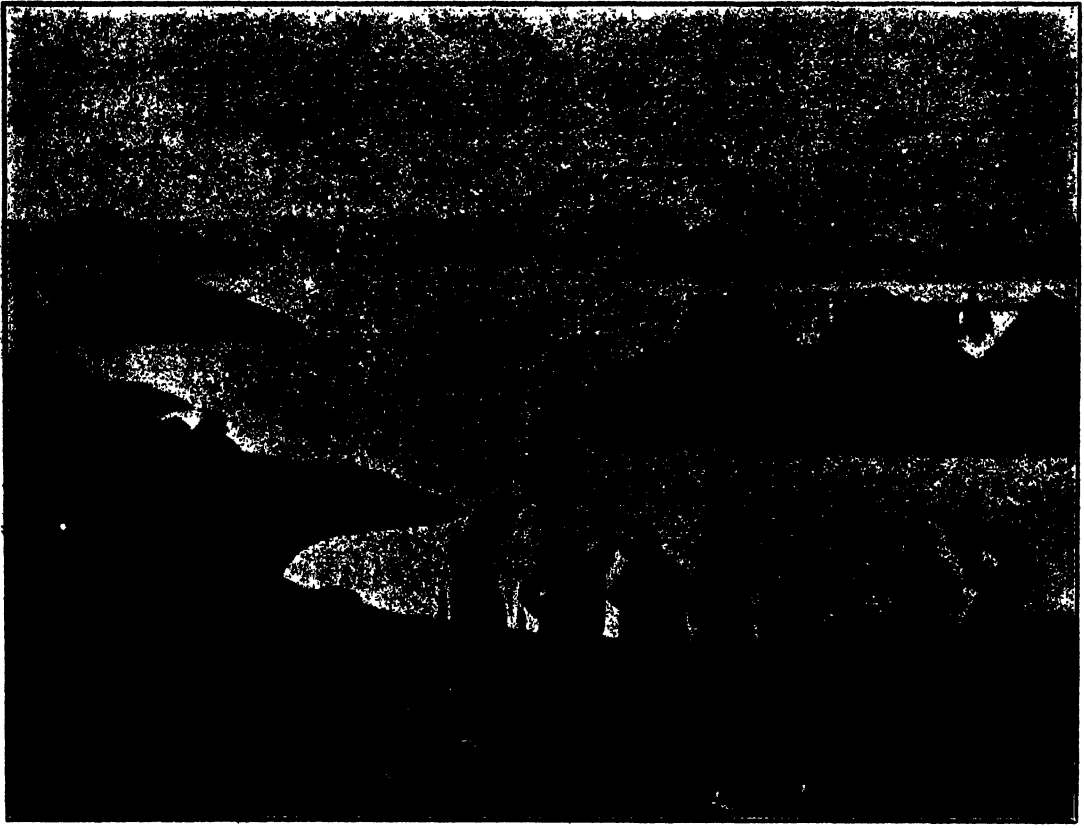
সূর্য্যবন্দনা।

চির-তুষারের দেশে প্রথম সূর্য্যোদয়ে সে-দেশবাসীর উল্লাস, ঘরের চালে-চালে জোড়া দড়ির উপর শুকাইতে দেওয়া মোটা কাপড়ের সারি, দূরের পাহাড়গুলি পর্য্যন্ত যেন কুয়াসার আবরণ ঠেলিয়া বাল-সূর্য্যের স্নেহতপ্ত স্পর্শ বুকে লইতে ব্যস্ত।—সব-কিছুতে মিসিয়া আলোক-ও-তাপ-বঞ্চিত মেরুদেশের সূর্য্যোদয়ের মধ্যেকার মর্ম্মস্পর্শী করুণতাটুকু সুন্দর উপভোগ্য হইয়া ফুটিয়াছে।

তাহাদের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রতি মানুষেরই অন্তরের কোন্ গভীরতার স্থানটিতে চিরকাল যেন স্বপ্নের রূপে তাহারা বিরাজ করে, পলকের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চিরপরিচিত বলিয়া মনে হয়।

মিষ্টিক্ ভাবের স্বভাবই এই যে উহা সহজ। তর্ককে বিচারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-অনুশীলনকে অস্বীকার করিয়া মানুষের অন্তরের সহজ অনুভূতির অনির্দ্দেশ্য পথে যে বিজয়যাত্রা—mysticism বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি। রোএরিকের mysticism এই ধরণেরই। উহা চেষ্টাকৃত সূক্ষ্ম ভাবরাশির সমাবেশ বা অনাবশ্যক জটিলতা নহে। ইহা ব্যতীত ভিতরের দিক্ হইতে সমগ্রভাবে রোএরিকের শিল্প সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার থাকে না। শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোনও থিওরী নাই, তিনি নিজেও সকল থিওরীর বাইরে; তিনি বিশেষ কোনও শিল্পপদ্ধতির ধার ধারেন না; তাঁর শিল্পের ভিতর তাঁর নিজস্ব কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গী বা ষ্টাইলেরও পরিচয় মেলে না—যাহা দেখিয়া তাঁহার আঁকা ছবিকে তাঁহারই ছবি বলিয়া ধরিয়া দেওয়া যায়; এবং যদিও কেহ কেহ মনে করেন, গোগ্যাঁ, ব্লেক ও ভোরুবেলের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত, তবু ইহা নিঃসংশয়িতরূপেই বলা যাইতে পারে যে তিনি কোনও শিল্পীকে নিজের শিল্পগুরু রূপেও গ্রহণ করেন নাই। এক কথায় রোএরিকের শিল্প যেন বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মার সহজ এবং স্বকীয় প্রকাশ, উহা যেন অপৌরুষেয়!
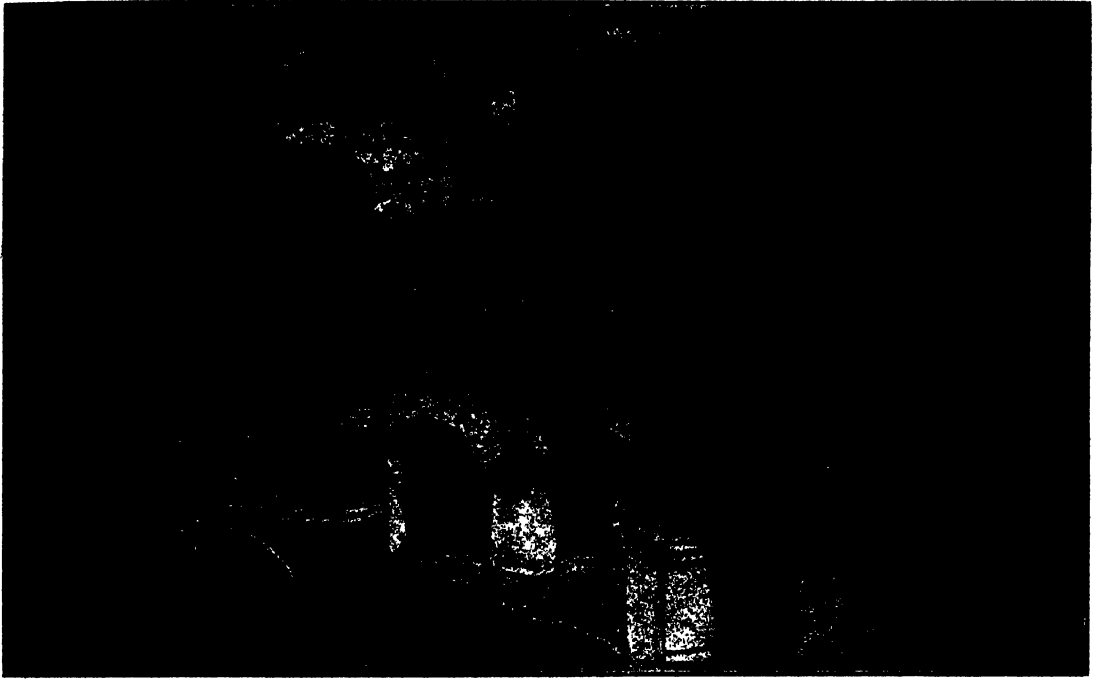
আরতির বেলা।

রোএরিকের আঁকা "প্রাচীন রুশীয় স্থাপত্যকলা" পর্য্যায়ের একখানি ছবি। আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে ; গির্জ্জার দেওয়ালে আঁকা দেবদূতের মূর্ত্তিটির মধ্যে সেই আহ্বান যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়াছে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রোএরিকের জন্ম হয়। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পেট্রোগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, ঐ সময়েই তিনি সেখানকার এ্যাকাডেমীতে চিত্রবিদ্যাও অধ্যয়ন করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে রোএরিকের শিল্পজীবনের পঞ্চবিংশ বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ধরিয়া হিসাব করিলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিল্পজীবনের আরম্ভ। কিন্তু বস্তুত চিত্রশিল্পে রোএরিক প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন করেন তাহারও পাঁচবৎসর পরে, পেট্রোগ্রাড এ্যাকাডেমীতে একটি চিত্র প্রদর্শন করিবার ফলে। তখন হইতেই রুশিয়ার শিল্পী- ও শিল্পরসজ্ঞ-সমাজের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাঁহার এই প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর দ্রুত বাড়িতে থাকে।

রোএরিকের শক্তি ও সাধনা এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব নানা বিরুদ্ধদলেরও শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শিল্পে যদিও তিনি নবযুগের একজন বড় বার্ত্তাবহ তথাপি গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত প্রাচীনতার পরিপন্থী অনেক এ্যাকাডেমী ও ইন্‌ষ্টিটিউটে তিনি বহুকাল ধরিয়া সভ্য মনোনীত হইয়া, এমন কি শিক্ষকতা পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন। অন্যদিকে প্রাচীনতার ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেও তাঁহাকেই সকলের আগে দেখা গিয়াছে। সেরোফ্, ভোরুবেল্, সোমোফ্, বাকৃষ্ট্ ও বেনোয়া প্রভৃতি বিখ্যাত রুশীয় চিত্রশিল্পীরা "শিল্পজগৎ" নামে শিল্পীসমাজ গঠন করিয়া যে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই নূতন-প্রাণের যজ্ঞে রোএরিকই ছিলেন বড় পুরোহিত, এবং সেই শিল্পী-সমাজের প্রথম প্রেসিডেণ্ট।

রোএরিক একজন অসাধারণ কর্ম্মী। নিজের অদ্ভুত কর্ম্মপ্রবণতায় তিনি তাঁহার জীবন-চরিত লেখক ও সমালোচকদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। হয়ত তাঁহার চিত্রকলার ব্যাখ্যা সমন্বিত তাঁহার একটি শিল্পজীবনী রচিত হইয়া ছাপা হইতে গিয়াছে। হঠাৎ এমন আরও
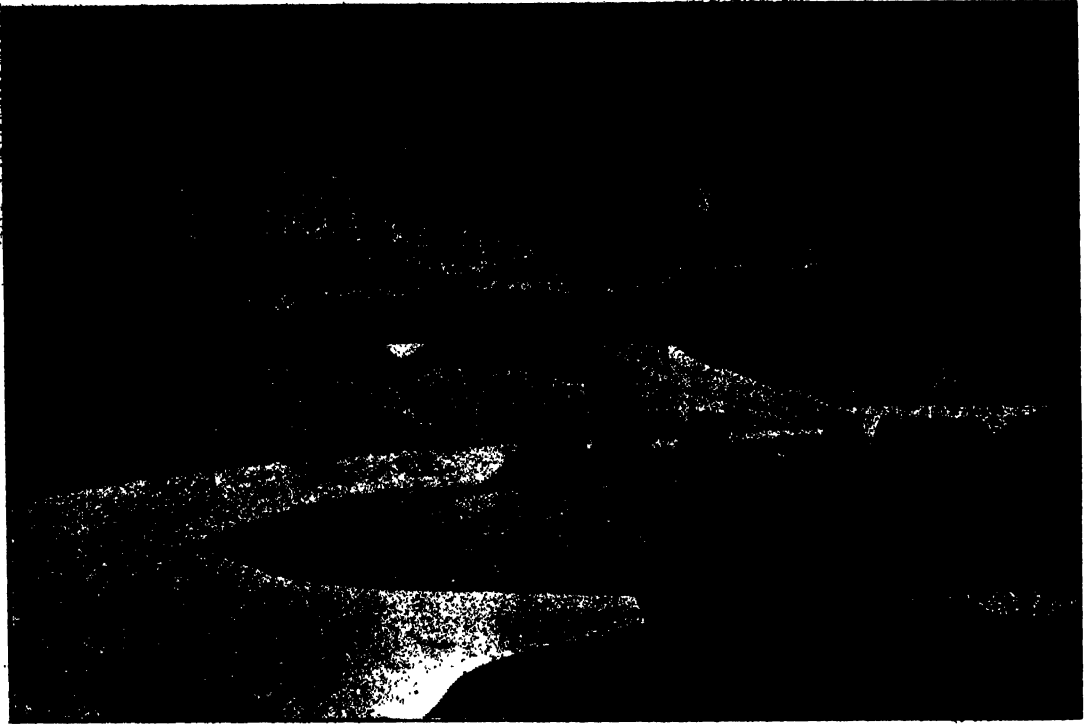
সাধু প্রোকোপিয়াস অচেনা পথযাত্রীদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

রোএরিকের আঁকা "কিম্বদন্তী" পর্য্যায়ের একখানি ছবি। সাধু প্রোকোপিয়াস অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। একবার আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তিনি কোনও ভিক্ষুকের আড্ডায় উপস্থিত হন। ভিক্ষুকেরা তাঁহাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দেয়। সেই হইতে গির্জ্জায় ঢুকিবার এক পাথর-বাঁধা পথে মুক্ত আকাশের তলে তাঁহাকে বাস করিতে হইত। সেই জায়গার বাতাস থাকিয়া থাকিয়া কেমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া প্রচণ্ড শীতের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিত। একবার প্রস্তর-বৃষ্টিতে তিনি যে শহরে বাস করিতেন সেই শহর ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। সাধু প্রোকোপিয়াস প্রস্তর-বৃষ্টির পথে ছুটিয়া গিয়া আকুল হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন।—মেঘেরা তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যায়। প্রোকোপিয়াসের অন্তরের পরিপূর্ণতার সঙ্গে রাশিরাশি মেঘে পরিপূর্ণ আকাশ, কূলে কূলে পূর্ণ নদী, বাতাসে ভরা পাল ও পূর্ণবক্ষ পর্ব্বতমালা যেন এক সুরে বাঁধা।

গুটি-দশ-বারো ছবি আঁকা হইয়া বাহির হইয়া গেল, যাহাতে পূর্ব্বতন ব্যাখ্যার আগাগোড়া পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত রোএরিক যত ছবি আঁকিয়াছেন তাহার সংখ্যা কম করিয়া ধরিলেও ৭০০র নীচে হইবে না! পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র এই ছবিগুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে। ছবি আঁকার অবসরে তিনি শিল্প-সম্বন্ধে তাঁহার নানা মতবাদ প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতিও রচনা করিয়া থাকেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবি বলিয়াও তাঁহার প্রচুর খ্যাতি আছে।

বাহির হইতে দেখিলে রোএরিকের চিত্র সম্বন্ধে সকলের আগেই যাহা চোখে পড়ে তাহা এই,—তিনি কোথাও পরিপার্শ্ব বা backgroundকে অবহেলা করেন নাই। বস্তুতঃ এইখানেই সাধারণ ভাবাত্মক চিত্রের সঙ্গে তাঁহার চিত্রের পার্থক্য। স্বর্গের দেবদূতকেও দিগন্তব্যাপী ঘননিবিড় মেঘাবেষ্টন বা কুজ্ঝটিকার অস্পষ্টতা দিয়া ঘিরিয়া আঁকিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না; এই মাটির পৃথিবীর যে রূপটি তাঁহার মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে তাহারই মধ্যে কোনো-একটি বিশেষ অর্থের দ্যোতনায় তিনি তাহাকে স্থাপন করেন। মানুষকে কেবলমাত্র মানুষ হিসাবে আঁকিয়াও তাঁহার মন ভরে না; বিশ্বের সঙ্গে তাহার সত্যকার সম্বন্ধের ক্ষেত্রটিতে তিনি তাহাকে ধরিয়া দেখিতে চান্। রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া মানুষের যে জীবন তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, বিশ্ব-

মায়াপুরী।
রোএরিকের আঁকা "রুশিয়ার মায়ামন্ত্র" পর্য্যায়ের একখানি ছবি। অশ্বারোহী রাজপুত্র মুক্ত তরবারি হস্তে প্রেত-পিশাচের আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিতেছেন। নগর ঘিরিয়া ধৈর্য্য ও অটলতার দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-প্রাচীর ও শুচিতার অগ্নি-পরিখা।
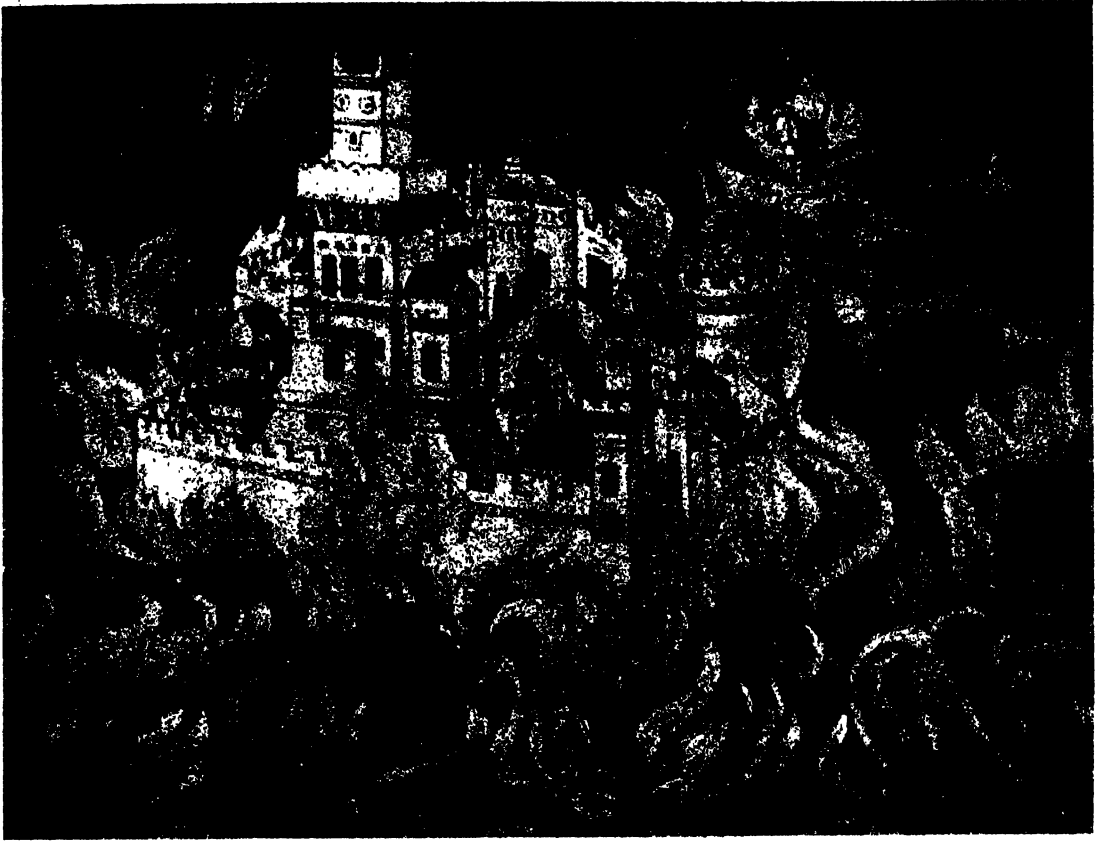
সম্পর্কে মানুষ এবং মানব-সম্পর্কে বিশ্ব—ইহাই তাঁহার শিল্পসাধনার বস্তু। তাঁহার চিত্রে এই বিশ্ব সর্ব্বত্র স্বভাবতই মানুষকে অনেকখানি ছাড়াইয়া গিয়াছে, চল্‌তি অর্থে শিল্পের যাহা বিষয়বস্তু পরিপার্শ্ব তাহা হইতে স্বাধিকারের বলেই যেন বড় হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, রোএরিকের মতে বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক; প্রকৃতির উপর মানুষ যত রকম করিয়াই জয়ী হোক, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে কোনোদিনই সে করতলগত করিতে পারিবে না, শেষ পর্য্যন্ত তাহার শক্তি ও সম্পদের অসীমতার কাছে মানুষকে হার মানিতেই হইবে, রহস্যের নাগাল মিলিবে না। রোএরিকের অনেকগুলি চিত্রে এই ভাবটিই জাজ্বল্যমান হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে।

যদিও আপাত-দৃষ্টিতে রোএরিকের অনেক চিত্রে মানবের এই স্থান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তবু তার সম্পর্কে এই বিশ্ব সর্ব্বত্রই অর্থপূর্ণ। গিরি নদী বন উপবন মেঘ বিদ্যুৎ সমস্তই যেন সেই ক্ষুদ্র মানুষটিরই সত্তার এক-একটি অংশ। একেকে ছাড়িয়া অন্য উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের পরিপূর্ণতা।

এই উদ্দেশ্য ও সম্পর্ক সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট নহে, তবু ইহাকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। হ্রদের তীরে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কি রহস্যময় কাজে ব্যাপৃত আছেন তাহা আমরা জানি না; কিন্তু দৃষ্টিমাত্রে সেই কাজটির গুরুত্ব আমাদের মনকে আসিয়া স্পর্শ করে, আমরা দেখিতে পাই সেই কাজকে ঘিরিয়াই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশ যেন স্তব্ধ হইয়া আছে, দিগন্তপ্রসারী হ্রদের জল কাঁপিতেছে না।

গুপ্তধন।
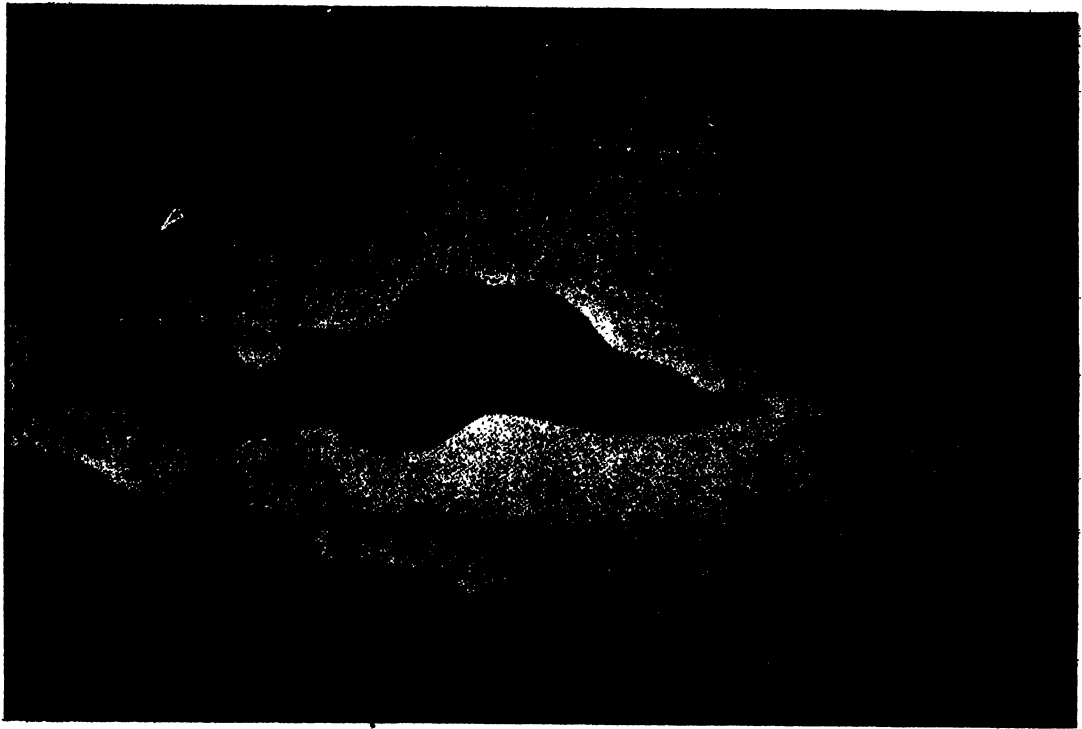
রোএরিকের আঁকা "রুশীয় মায়ামন্ত্র" পর্য্যায়ের আর-একখানি ছবি। রুশিয়ার আদিম অধিবাসী একটি লোক পাহাড়ের গুহায় তাহার ধন-সঞ্চয় লুকাইয়া রাখিয়া যাইতেছে। নিকটের মেঘখানি তাহার মনের ভয়ব্যাকুল চঞ্চলতার ছোঁয়াচ লাগিয়াই যেন কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিয়াছে। সঞ্চিত ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখা চিরবিপ্লবের-দেশ রুশিয়ার আবহমানকালের রীতি। এজন্য নানা যাদুবিদ্যা ও মন্ত্র-তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। ধন গোপন করিবার সময় ও গুপ্তধন আবার খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় সেইসব মন্ত্র আওড়াইতে হইত।

নীরস পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া কাটা আঁকা-বাঁকা পথটি মুহূর্ত্তে যেন সজীব হইয়া উঠে, প্রত্যেকটি পাথরের বুকের মধ্যের কোন্ এক ঔৎসুক্যের হৃৎস্পন্দন আমরা যেন স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি।—কিছু বুঝিলাম না, এ কথা বলিবার প্রবৃত্তি মন হইতে তখন কোথায় চলিয়া যায়।

বাস্তবিক সহজ-দৃষ্টিতে ঐ যেটুকু আমরা বুঝি, তাহার বেশী বুঝাইবার অভিপ্রায় রোএরিকের নিজেরও কোথাও থাকে কি না তাহাও অত্যন্তই সন্দেহের বিষয়। তিনি জীবনকে কোথাও ব্যাখ্যা করিতে বসেন নাই, টীকা ও অন্বয়-কারের কাজ তাঁহার নহে,—তিনি দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা; সেই হিসাবে জীবনের যে রহস্যরূপ তাহার একান্তই সত্যরূপ,—সেই সত্যকে এমন সাহসের সঙ্গে ও সুস্পষ্টরূপে তাঁহার চিত্রগুলিতে তিনি আকার দিয়াছেন, যে, এক কথায় তাঁহার পরিচয় দিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি শিল্পজগতের এক ঋষি।

জীবনের বিপুল রহস্য। রোএরিকের কাছে মৃত্যু হইতেও সে জীবন বেশী অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ। সেইজন্যই রোএরিকের চিত্রে জীবনকে যেন জীবনাতীত রূপে আমরা পাই, মৃত্যুকে প্রতি-মুহূর্ত্তে আমরা অতিক্রম করি। শুদ্ধমাত্র grotesque বা অপ্রাকৃত অদ্ভুত-কিছুর মধ্যে দিয়া এ জিনিষটি হইতেই পারিত না। রোএরিকের চিত্রও অদ্ভুত, কিন্তু তাহা জীবন্ত। সৃষ্টিপ্রেরণার এমন একটি নিবিড়তায় প্রত্যেকটি চিত্র দেদীপ্যমান, যে, রসজ্ঞের চোখে সেগুলি বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নহে। রোএরিকের চিত্রের মৃত্যুর মতন স্তব্ধ বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের উল্লেখ করিয়া সুবিখ্যাত রুশীয় সাহিত্যিক এ্যাণ্ড্রেয়েফ্ বলিয়াছিলেন,—"মৃত্যুর সান্নিধ্যই যেন রোএরিকের সৃষ্ট রহস্যজগতের জীবন।"
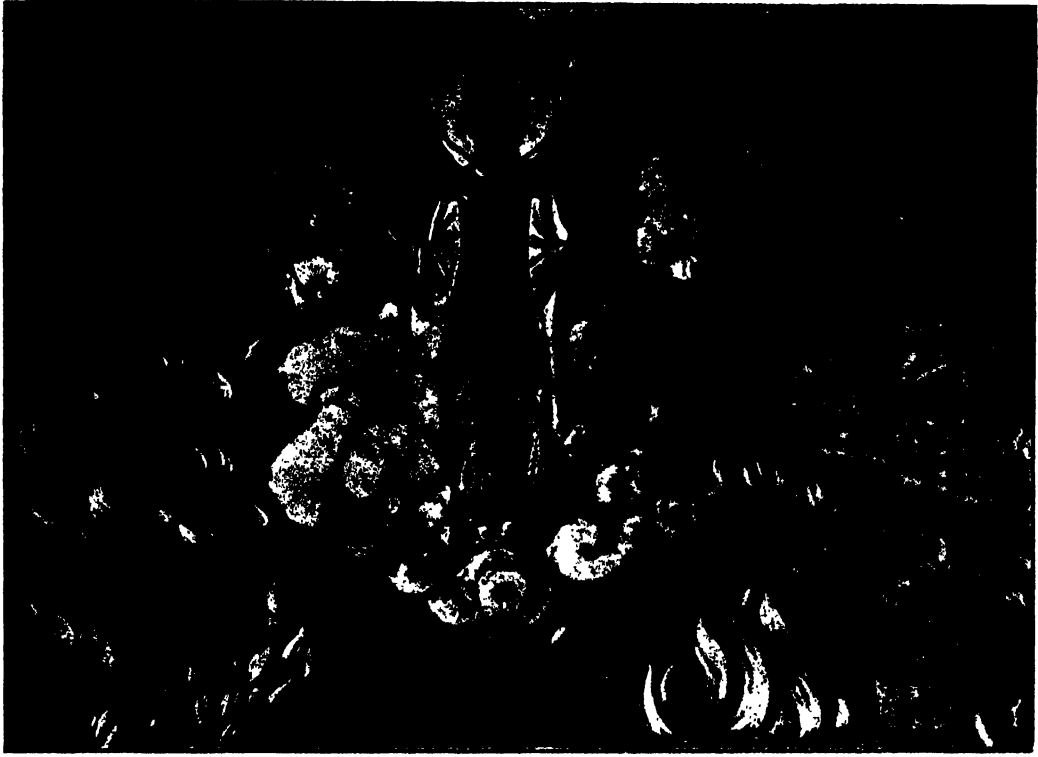
সর্ব্বশেষ দেবদূত।

রোএরিকের আঁকা "দৈববাণী" পর্য্যায়ের একখানি ছবি। ছবিটির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির অর্থ রোএরিক নিজেও জানেন না। এই দেবদূত কেনই যে সর্ব্বশেষ দেবদূত, হতভাগ্য দুঃখজর্জ্জরিত পৃথিবীর কানে কি তাঁহার বাণী, তাঁহার হাতের বর্শাফলকটিরই বা কি অর্থ, এসমস্ত কথার কোনও সদুত্তরই তিনি দিতে পারিবেন না। সমস্ত ছবিটি তার একটুখানি একটি ব্যাখ্যা সমেত অকস্মাৎ তাঁহার মনের মধ্যে ঝলসিয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যাখ্যাটি এই—

"সুন্দর চির-সুন্দর, ভয়ঙ্কর চির-ভয়ঙ্কর, সর্ব্বশেষ দেবদূত পৃথিবীর উপর দিয়া পক্ষবিস্তার করিয়া চলিয়া গেলেন।"

অনেকে এই দৈববাণীর মধ্যে বর্ত্তমান যুগের সুন্দর মানবসভ্যতার ধ্বংসোন্মুখীন ভবিষ্যৎকে নাকি প্রতিফলিত দেখিতেছেন।

মৃত্যুর সঙ্গে মেশামেশি এই জীবন, মৃত্যুর খোলা বাতায়নে ওপারের আলো যাহার উপর পরিপূর্ণ ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। "পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যের অবসান ত মৃত্যুতেই; প্রতিটি মেঘখণ্ড মৃত্যুর পথেই যাত্রা করিয়া চলে, প্রতিটি সূর্য্যোদয় মৃত্যুতেই পর্য্যবসিত হয়। কেবল সেই তৃণপুঞ্জই রোএরিকের তৃণপুঞ্জের মতো সতেজ এবং সবুজ, যাহা জানে—শীত এবং মৃত্যু তাহার জীবনের পুরোভাগে রহিয়াছে।"

জীবনের এই রহস্যকে আকার দিতে গিয়া রোএরিককে সর্ব্বত্র প্রাচীন ইতিহাস কিম্বদন্তী পুরাণ উপকথার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। আধুনিকতার এই অভাব তাঁহার চিত্রের আর-এক বিশেষত্ব।

ভাবাত্মক চিত্রে প্রাচীনতার একাধিপত্য লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন, মানুষের আধুনিক জীবন-যাত্রা তার আধুনিক সভ্যতা, হাব-ভাব, পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে বুঝি শিল্পের সেই উপাদানটি নাই, যাহা ছিল বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষে, ইলিয়াডযুগের গ্রীসে, খৃষ্টীয় যুগের ইস্রায়েলে, ক্লিওপেট্রাযুগের ইজিপ্টে। এ ধারণার মূলে ভুল আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। মানুষের প্রতিদিনকার বাস্তব জীবন হইতে তাহাকে একটুখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া না লইলে সাধারণত ভাবাত্মক বস্তুর পরিপূর্ণ রসগ্রহ করা তাহার পক্ষে কঠিন হয়। কেননা বিস্ময় এই রসের একটি প্রধান উপাদান; এবং পরিচিত নিকটের বস্তু হইতে অপরিচিত দূরের বস্তু

সহজে আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাই আজ বৌদ্ধযুগের ভারতবর্ষ যে ভাবে আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে, সুদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমানের এই ভারতবর্ষও আমাদের অনাগতবংশীয়দের কল্পনাকে ঠিক তেমনই ভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানকে মানুষের মনে ধরে না, ভবিষ্যৎকে সে সন্দেহ করে ভয় করে, একমাত্র অতীতকেই সে ভালো করিয়া ধরিতে পারে বলিয়া তাহাকে সে বিশ্বাস করে এবং অন্তরের মধ্যে সহজেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, এইজন্যও শিল্পসৃষ্টির বিষয়বস্তু অনেক শিল্পী অতীত হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এসমস্ত ছাড়াও রোএরিকের শিল্পে অতীতের প্রাধান্যের আর-একটি বড় কারণ আছে, তাহা তাঁহার অতীতের প্রতি অনুরক্তি। শৈশব হইতে রুশিয়ার, বিশেষত উত্তর রুশিয়ার অতীত ইতিহাসকে তিনি ভালবাসেন। তখন হইতেই উত্তর রুশিয়ার, নানা অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী, গুপ্ত-সম্পদের নানা রহস্যময় তথ্য, উপাখ্যান, কিম্বদন্তী তাঁহার শিশুকল্পনাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছে। তাঁহার নিজের শরীরে রাজ-রক্ত প্রবাহিত, তাঁর সেই অভিজাত-বংশীয় পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতির গৌরব তাঁহার শিশুচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে। বয়সের সঙ্গে তাঁহার এই অনুরক্তি বৃদ্ধি পাইয়াই চলে। সমগ্র রুশিয়ার অতীত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করিয়াই কেবল তিনি তৃপ্ত হন নাই, স্বয়ং বহু সময় ও উদ্যম ব্যয় করিয়া প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল রুশিয়ার পল্লীতে পল্লীতে পর্য্যটন করিয়া যেখানে যাকিছু প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন, বাড়ী, গির্জ্জা, দেবায়তন, মঠ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান সব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতে থাকেন। বৃদ্ধ, ফকির, সন্ন্যাসী ও কৃষকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে গল্পগুজবে তাহাদের অভাব-বেদনার কথার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার গৌরবময় অতীত জীবনেরও পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার শিল্প-চর্চ্চায় এইসব অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছেন। ইতিহাস হার মানিয়া গেলে কিম্বদন্তীর শরণ লইয়াছেন, তাহাতেও যখন চলে নাই তখন অবলীলায় উপকথা-রূপকথার রাজ্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন, তাহাও উত্তর রুশিয়ারই একান্ত নিজস্ব জিনিষ।

এই উত্তর রুশিয়াতে একদিকে রোএরিকের চিত্রের মতোই জীবন ও মৃত্যু যেন পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতেছে, শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে হিমানীস্তব্ধ কালো-কষ্টির বিকটতার যেন পরিণয় ঘটিয়া গিয়াছে। আর-একদিকে ইহার অতীত ভরিয়া পতন-অভ্যুদয়ের কত সহস্র বিচিত্রতা; এশিয়াবাসী যাযাবর ও তাতার দস্যুরা কতবার ইহার বুকের উপর দিয়া ঝড়ের মতো বহিয়া গিয়াছে; দেশবিদেশ হইতে কতবার নূতন নূতন ধর্ম্ম-আন্দোলনের স্রোত আসিয়া ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্লাবিত করিয়াছে; চলোর্ম্মি-মুখর সমুদ্রের বুক মথিত করিয়া বীরগর্ব্বী ভাইকিংদের বারংবার হানা, ভল্‌কফ্ নদী বহিয়া স্ফীতপাল মণিখচিত তরীবহরের কত বিজয়যাত্রা, স্বপ্নের অগোচর বহুমূল্য উপঢৌকনসহ কত বিদেশবাসী রাজঅতিথির আগমন, কত যুদ্ধ কত সন্ধি, কত বীরত্বের শৌর্য্যের অক্ষয় কীর্ত্তি ইহার অতীতের স্তরে স্তরে স্বপ্নের মতো সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। লিওনিড্ এণ্ড্রেয়েভ্ বলিতেছেন, "রোএরিক উত্তর রুশিয়ার একমাত্র কবি। উহার রহস্যময় আত্মাটিকে তাঁহার মতো করিয়া আর কেহই প্রকাশ করিতে পারে নাই, যে আত্মার পরিচয় প্রকাশ পায় উহার ধ্যানগম্ভীর কালো-কষ্টির পাহাড়ে, উহার স্নিগ্ধ স্তিমিত ফলপুষ্পহীন বসন্তে, দীর্ঘ মেরুরাত্রির জাগরণে। ইহা বস্তুতান্ত্রিক শিল্পীদের সেই নিরানন্দ উত্তর রুশিয়া নহে, যেখানে সব আলোর এবং সব জীবনের অবসান। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সকলের চেয়ে সত্য সম্বন্ধের বাণীটিই এখানে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে,—'চিরন্তন প্রেম ও চিরন্তন সঙ্ঘর্ষ'।"

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী
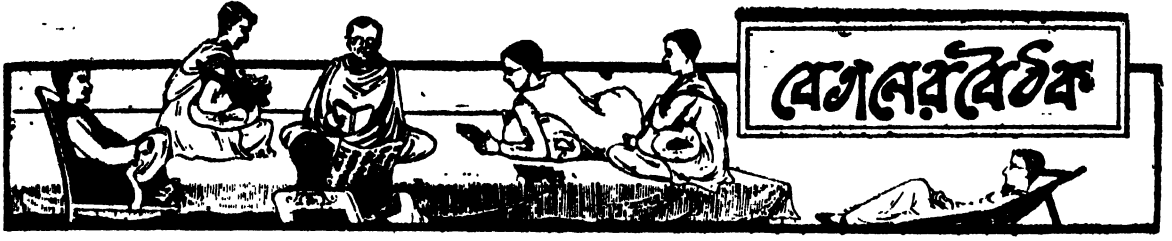
জিজ্ঞাসা

(১৯)

মহাভারতে লিখিত দ্বৈতবনের বর্ত্তমান অবস্থান কোথায় এবং উহার বর্ত্তমান নাম কি?

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(২০)

পূর্ব্ববঙ্গে নৌকা ছাড়িবার সময় মাঝিরা "গাজী বদর" বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে কেন? গাজী বদর কে?

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

(২১)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যাপনা হইত কি না? উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিশেষ খবর কোন্ পুস্তকে পাওয়া যাইবে?

শ্রী বীরেন্দ্রমোহন সেন

(২২)

ধর্ম্মদাসকৃত রত্নাকর-উদ্ধারে দৃষ্ট হয় যে রত্নাকরের স্ত্রীর নাম মঞ্জুষা, তিনি শূদ্রকন্যা; ইহার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি? যদি থাকে তবে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী মনোরমা দাস

(২৩)

২৪ পরগণার ২৪টি পরগণার নাম কি কি?

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সুর

—

মীমাংসা

গত বৎসরের প্রশ্নের মীমাংসা

(৬৭)

"কাগজ হইতে কালীর দাগ তোলা"

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত লালগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন:—

"পি, এম্, বাগ্‌চীর শিল্প-প্রস্তুত-প্রণালীতে এইরূপ লেখা আছে—সোডা, সোহাগা ও নিশাদল একত্র পেষণ করিয়া কাগজে মাখাইলে লিখিত অক্ষর উঠিয়া যায়।"

কত পরিমাণ সোডা, সোহাগা ও নিশাদল একত্র পেষণ করিতে হইবে, উত্তরদাতা তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমি সমপরিমাণে পেষণ করিয়া লিখিত অক্ষরে মাখাইয়া দেখি দাগ উঠে না। অনেকক্ষণ ঘসার পর অক্ষর উঠে বটে, কিন্তু কাগজ ছিঁড়িয়া যায়। ছুরি দিয়া চাঁচিলেও সেইরূপই হয়। এসম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিছু বলিবার থাকিলে, আগামী বৈঠকে তাহা পেশ করিলে বাধিত হইব।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

(১৪০)

বেলপাতা, তুলসী প্রভৃতি পবিত্র কেন?

বিল্বপত্র—"একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাদ্বিল্বপত্রং তথৈকতঃ
মণিমুক্তা-প্রবালশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা।
ন তথা জায়তে প্রীতির্বিল্বপত্রৈর্যথা মম"—
—ভবিষ্যপুরাণধৃত শিববচন।

তুলসী—দেবগণের সহিত যুদ্ধে অসুররাজ জলন্ধর, পত্নী বৃন্দার একাগ্র বিষ্ণু-আরাধনার বলে, শিবপ্রমুখ সমস্ত দেব এমন কি স্বয়ং বিষ্ণুরও অবধ্য হইল। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার তপোভঙ্গ করাতে জলন্ধর নিহত হইল। তখন সতী বৃন্দা বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু বলিলেন, "তুমি পতির অনুমৃতা হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে উহার পূজা করিলে আমার তুষ্টি হইবে।" বৃন্দার শরীর ভস্মীভূত হইলে তাহা হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল।

—বিষ্ণু-পুরাণ ও পদ্মপুরাণ।

মতান্তরে—

তুলসী অসুররাজ শঙ্খচূড়ের পত্নী। দেবগণের সহিত শঙ্খচূড়ের যুদ্ধ বাধিলে তুলসীর সতীত্বের প্রভাবে স্বয়ং মহাদেবও শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিতে অক্ষম হন। তখন দেবগণের একান্ত অনুরোধে বিষ্ণু শঙ্খচূড়-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তুলসীর অবমাননা করিলে শঙ্খচূড় নিহত হয় এবং পতিশোকাকুলা তুলসী বিষ্ণু-পদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শরীর হইতে গণ্ডক শিলা এবং কেশ হইতে তুলসী বৃক্ষের উদ্ভব হয়। তদবধি তুলসী বৃক্ষ বিষ্ণু-পূজায় প্রশস্ত।

—ব্রহ্মপুরাণ।

দূর্ব্বা—সমুদ্রমন্থনকালে বিষ্ণু মন্দার পর্ব্বত ধারণ করিলে পর্ব্বত-ঘর্ষণে তাঁহার অঙ্গের রোমরাজী স্খলিত হইয়া তরঙ্গবেগে তীরে সংলগ্ন হইলে দূর্ব্বারূপ ধারণ করে। তজ্জন্যই দূর্ব্বা দেবপূজায় প্রশস্ত।

(১৪১)

Human Magnetism

বাঙ্গলায় আমরা যাহাকে মনুষ্য-শরীরের ওজঃশক্তি বলি ইংরেজীতে তাহাকেই বলে Human Magnetism। ইহাকে সাধারণতঃ ব্রহ্মতেজ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ওজঃ দেহরক্ষার একমাত্র পদার্থ।

"ওজস্তু তেজো ধাতুনাং শুক্রান্তানাং পরম্ স্মৃতম্
হৃদয়স্থমপিব্যাপিদেহস্থিতিনিবন্ধনম্"—সুশ্রুতঃ॥

কোন কোন মানুষের যে অসামান্য চিত্তশক্তিতে অপরে স্বেচ্ছায় তাহার নিকট অবনত হয় তাহা এই ওজঃশক্তির ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যসাধন করিলে এই ওজঃশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার উৎকর্ষসাধনের জন্য ব্যবহারিক উপায় পাতঞ্জলোক্ত যম ও নিয়মে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তাহা সংক্ষেপে এই—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান বৎসরের মীমাংসা

(১)

পুষ্করিণীর জলে তুঁতে দেওয়া

পুষ্করিণীর জলে তুঁতে ব্যবহার করিলে মৎস্যের কোন হানি হয় না। (পরীক্ষিত।)

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(২)

ব্রহ্মক্ষত্র শব্দের অর্থ

শাস্ত্রে ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই।

১। "ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষি সৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥"

৪।১১ অ।

৪র্থ অংশে বিষ্ণুপুরাণ। এবং ভাগবত ৯ স্কন্দ ২২ অ ৪৪ শ্লোক।

এখানে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াতে জাত "মূর্দ্ধাবসিক্ত" জাতি।

২। ব্রহ্মক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোশং সমপূরয়ন্।

১৩।৭ সর্গ বালকাণ্ড, রামায়ণ।

৩। পঞ্চ পঞ্চ ন খা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ॥

৩৯।১৭ সর্গ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, রামায়ণ।

(২) অর্থাৎ "ইক্ষ্বাকুর অমাত্যগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কোন হিংসা না করিয়াই রাজকোষ পূর্ণ রাখিতেন।"

(৩) "হে রাঘব, শল্যকাদি পঞ্চ নখ-পঞ্চ-বিশিষ্ট জন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য।"

এখানে "ব্রহ্ম" ও "ক্ষত্র" দুইটিই স্বতন্ত্র শব্দ; উহার অর্থ "ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং "ক্ষত্র" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা "রাজা" এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরন্তু "মূর্দ্ধাবসিক্ত" অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই।

শ্রী ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ

প্রফেসার কিয়েলহর্ণ বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির-প্রশস্তির ব্যাখ্যা-কালে "স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" লাইনটির অর্থ করিয়াছেন head garland of the clans of the Kshatriyas and Brahmanas. (Ep. Ind., Vol. I, 35.)

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া প্রফেসার ডাক্তার ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে ঐ লাইনটির ব্যাখ্যা হইবে "head garland of the Brahma-Kshatra family"। আবার চাৎসু-লিপিতেও ভর্তৃভট্টকে ব্রহ্মক্ষত্রান্বিত বলা হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ ভাণ্ডারকার possessed of both priestly and martial energy করিয়া ফুটনোটে পুনরায় বলিয়াছেন যে ভর্তৃভট্ট ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন ইহাও বুঝায়। উক্ত দুই স্থল এবং বল্লাল-চরিতেও সেনবংশীয় রাজাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্র বলিয়া-উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিয়া ইহা অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে ইহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল এবং হিন্দু-বর্ণাশ্রম-সংস্কারযুক্ত সমাজগঠনের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় হইয়াছিল; তাহার কারণ হয়ত তাহারা ব্রাহ্মণ পদবী অপেক্ষা ক্ষত্রিয় পদই উচ্চতর বিবেচনা করিত।

প্রফেসর ভি স্মিথ্ মিবারের রাজবংশকে ব্রহ্মক্ষত্র-জাতিভুক্ত বলিয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপ ভাণ্ডারকার লিখিত 'Guhilots' শীর্ষক প্রবন্ধ (J. and Proc A. S. B. (N. S.), Vol. V, 1909) দাখিল করিয়াছেন এবং তাহাতেই উক্ত অনুমানের সারবত্তা দৃষ্ট হইবে। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে টড্ প্রভৃতি মনীষিগণ নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন এবং আধুনিক কালেও বহু মতের সৃষ্টি হইয়াছে; এই-সকল হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয়—রাজপুতনায় কতকগুলি শাখার (clan), দাক্ষিণাত্য-বাসী অনার্য্য কোল গণ্ড প্রভৃতি নীচ জাতির উচ্চস্তরে আরোহণ-জনিত শিষ্ট-সমাজের সহিত একাঙ্গী-করণ নিবন্ধন, সৃষ্টি হইয়াছে এবং আর কতকগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উচ্চ বর্ণের অধঃপতন-জনিত মধ্যপথে সংরক্ষণ নিবন্ধন সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই শেষোক্ত প্রকার শাখার মধ্যেই পড়ে মিবারের রাজবংশ।

অধ্যাপক ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে মিবারের রাণাগণ নাগর ব্রাহ্মণ-কুল হইতেই উৎপন্ন এবং প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন যে যোধপুরের বন্ধারা তন্তুবায় ও রজক জাতি পূর্ব্বে নাগর ব্রাহ্মণ ছিল এবং সেইরূপেই রাজপুতের গুহিলোট শাখার উৎপত্তি—তাহার পূর্ব্বে বৈদেশিক ব্রাহ্মণ ছিল এবং পরে অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত হিন্দু সমাজের একাঙ্গীকরণের পূর্ব্বেই তাহারা ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া ক্ষত্র-ধর্ম্মোচিত গুণাবলী বরণ করিয়া লয়।

ভি স্মিথ্ এই-সকল প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক উক্তপ্রকার অনুমান যৌক্তিক বিবেচনা করিয়াছিলেন।

শ্রী লালমোহন মুখোপাধ্যায়

(৩)

ভারতবাসীর জামা পরা

ভারতবাসীর জামা পরার কথা বেদেও পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—"সূচ্যা বাসঃ সন্দধদিয়াৎ।" ইহা হইতে সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয় স্থির করিয়াছেন ছুঁচ দ্বারা সেলাই করা জামার ব্যবহার তখনও ছিল। (Asiatic Society of Bengal কর্ত্তৃক প্রকাশিত সত্যব্রত-সামশ্রমী প্রণীত "ঐতরেয়ালোচনম্" ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) 'কঞ্চুক' 'বাণবার' প্রভৃতি শব্দও প্রাচীনকালে কোন-না-কোনরূপ জামার অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। গৌতমসংহিতার দশম অধ্যায়ে কূর্প (কোর্ত্তা বা জামা) বলিয়া একপ্রকার পরিচ্ছদের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনীসের সময় একপ্রকার দীর্ঘ পোষাকের (জামা) উল্লেখ পাওয়া যায়। (শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসুর 'প্রাচীন ভারতে বস্ত্রালঙ্কার' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', কার্ত্তিক, ১৩২৮।) কাদম্বরীতে চাণ্ডালকন্যার বর্ণন-কালে তাহার জামার উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কঞ্চুকেন সমং নারী ভর্ত্তৃ-সঙ্গং সমাচরেৎ। ত্রিভির্বর্ষৈশ্চ মধ্যে বা বিধবা ভবতি ধ্রুবম্॥' এই কঞ্চুক কি সেমিজ অথবা সেইরূপ কিছু ?

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

জামার ভারতীয় নাম 'অঙ্গরক্ষা'। এখনও পশ্চিমারা বলিয়া থাকে 'আঙ্‌রাখ্‌খা'। ঠিক কোন সময় হইতে ইহার প্রবর্ত্তন তাহা বলা যায় না, তবে যখন রামায়ণ-মহাভারতের যুগে লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থের অঙ্গাবরণ কবচ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত, তখন সে যুগে জামাও প্রস্তুত হইত এরূপ অনুমান বোধ করি অন্যায় হইবে না।

অমরকোষে পাওয়া যায় বস্ত্রাদিনির্ম্মিত সেনার জামার নাম "কঞ্চুকো বারবাণোঽস্ত্রী," বস্ত্রাবৃত সেনার নাম "আমুক্তঃ, প্রতিমুক্তশ্চ, পিনদ্ধশ্চা-পিনদ্ধবৎ"। নারীরা যে প্রাচীনকালে কাঁচুলী ব্যবহার করিতেন তাহা

প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই কাঁচুলীকে অমরে বলা হইয়াছে "চোল, কূর্পাসক।"

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচায্য

(৫)

শয়ান অবস্থায় বেশী শীত

এই প্রশ্নের উত্তর ১৩২৮ বৈশাখের প্রবাসীর "পঞ্চশস্যেই" আছে।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের শরীরের সমুদয় ক্রিয়ার বেগই কমিয়া যায়। জাগ্রতাবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আস্তে আস্তে হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে হয় এবং মাংসপেশীগুলিও কতকটা শিথিল হইয়া থাকে। এইজন্য জাগ্রতাবস্থায় আমাদের শরীরে যে পরিমাণে উত্তাপ (Heat) উৎপত্তি হইয়া থাকে নিদ্রিতাবস্থায় তদপেক্ষা কম হয় এবং আমরা শৈত্য অনুভব করি।

শ্রী হরেন্দ্রলাল বসু

আমাদের শরীরে যে উত্তাপ আছে বাহিরের বায়ুর উষ্ণতা তাহা হইতে বেশী হইলে আমরা গরম অনুভব করি, আর শরীরের উত্তাপের চেয়ে বায়ুর উষ্ণতা কম হইলেই আমরা শীত অনুভব করি। আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদাই উত্তাপ বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছে। যেমন একটি উত্তপ্ত পদার্থ উন্মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে শীঘ্রই তাহার তাপ কমিয়া যায় সেইরূপ বাহিরের বায়ু যতই বেশী শীতল হইবে আমাদের শরীর হইতে উত্তাপের অপচয়ও ততই বেশী হইতে থাকিবে। যদিও আভ্যন্তরীণ তাপ সাধারণতঃ একই ভাবে থাকে। আমরা শীত নিবারণের জন্য যে-সকল কাপড়-চোপড় ব্যবহার করি তাহার উদ্দেশ্য শরীর হইতে বহির্গত যে তাপ তাহা যেন শরীরের চর্ম্মাবরণের চারিদিকেই বদ্ধ থাকে এবং বাহিরের শীত-বায়ুও যেন আমাদের শরীর স্পর্শ না করে। শরীর হইতে উত্তাপ বাহির হইবার আর-একটা মান এই, যে, শরীরের উপরিভাগের (surface) যতটা অংশ বায়ুতে উন্মুক্ত থাকে তাহারই উপরে নির্ভর করে শরীর হইতে কতটা তাপের অপচয় হয়। উপবিষ্ট অবস্থায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতকটা গুটান অবস্থায় থাকে। শয়ান অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি উপবিষ্ট অবস্থার চেয়ে অনেকটা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে; কাজেই শীতবোধও শয়ান অবস্থায়ই বেশী হইয়া থাকে।

ইহার আনুসঙ্গিক আর-একটা কারণও আছে। আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি আমাদের শরীরের ভিতরে সর্ব্বদাই একটা কার্য্যকরী শক্তি (motor activity) কাজ করিতেছে; তাহার ফলে আমাদের ধমনীতে রক্তসঞ্চালন হইতেছে। এই কার্য্যকরী শক্তি যত বেশী, ফলে ধমনীতে রক্তসঞ্চালন যত দ্রুত হয়, শরীরের উত্তাপের সৃষ্টিও ততই বেশী পরিমাণে হইতে থাকে। দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদের শরীরের কার্য্যকরী শক্তির ব্যয় যতটা, উপবিষ্ট অবস্থায় তার চেয়ে অনেক কম, শয়ান অবস্থায় আরও কম; তাহার প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই যে শরীর-সঞ্চালনে আমরা শ্রান্ত হইলে আমরা দাঁড়াইয়া না থাকিয়া বসিয়া থাকিতে চাই, শুইয়া থাকিতে পারিলে আরও আরাম পাই। কাজেই উপবিষ্ট অবস্থার চেয়ে শয়ান অবস্থায় শরীরে উত্তাপের সৃষ্টিও কম হয়—শীত বেশী বোধ হইবার ইহা আর-একটি কারণ।

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(৬)

ভারতের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র

মুদ্রাযন্ত্র সর্ব্বপ্রথম অর্থাৎ ১৫শত খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে গোয়া নগরে তৎপরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনারী সাহেব লেফ্‌টনাণ্ট্‌ লি উইল্‌কিন্স্‌ ঐস্থানের পঞ্চানন কর্ম্মকারকে অক্ষর প্রস্তুত শিক্ষা দেন। এবং পঞ্চানন পরে এক সেট কাঠের বাংলা হরফ প্রস্তুত করিয়া মিশনারীদিগকে দ্যায়।

শ্রী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র

(৭)

রাণা উপাধির অর্থ

টডের রাজস্থান হইতে এই উত্তর সংগৃহীত হইল :—

We...shall commence with the annals of Mewar and its princes. These are styled Ranas and are the elder branch of the Suryavansi or the children of the sun.

অর্থাৎ মেবারের সূর্য্যবংশীয় রাজগণ "রাণা" এই উপাধি ধারণ করিতেন।

Rahup obtained Cheetore in S. 1257 (A. D. 1201) and shortly after sustained the attack of Shemsudin whom he met and overcame in a battle at Nagore. Two great changes were introduced by this prince, the first in the title of the tribe to Sesodia; the other in that of its prince, from Rawul to Rana. ...The cause of the latter is deserving more attention. Amongst the foes of Rahup was the Purihar prince of Mundore: his name was Mokul with the title of Rana. Rahup seized him in his capital and brought him to Sesodia, making him renounce the rich district of Godwar and his title of Rana, which he assumed himself, to denote the completion of his feud.

অর্থাৎ ১২৫৭ সংবতে (খৃঃ ১২০১ অব্দে) রাহুপ চিতোরের রাজা হন। অল্পদিন পরেই সমসুদ্দিনের সহিত তাঁহার নাগোর নামক স্থানে যুদ্ধ হয়; তাহাতে তিনি জয়লাভ করেন। তিনি দুইটি বিশেষ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন। তন্মধ্যে প্রথমটি তাঁহাদের জাতির অভিধান "শিশোদিয়া" করা, দ্বিতীয় তাঁহাদের রাজোপাধি রাউলের পরিবর্ত্তে "রাণা" লওয়া। রাহুপের শত্রুদলের মধ্যে মন্দুরাধিপতি পুরীহররাজ মকুল রাণাই প্রধান। রাহুপ তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিশোদিয়ায় লইয়া আসেন এবং গদবার প্রদেশ ও রাণা উপাধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং রাণা উপাধি ধারণ করেন।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়, শ্রী স্নেহাংশুভূষণ বক্সী

প্রাকৃত ব্যাকরণের মতে রাণা এবং রাজা একই শব্দ। রাণার স্ত্রী রাণী; রাজার স্ত্রী রাজ্ঞী। টড সাহেবের মতে চিতোরের প্রমারদের 'রাণা' এই উপাধি ছিল। রাও বাপ্পা তাহা কাড়িয়া লন।

শ্রী মন্মথ ভট্টাচার্য্য

(৯)

টক দেখিলে জিবে জল আসে কেন

Reflex secretion বা প্রতিক্রিয়া-জনিত নিঃসরণ হেতু টক

ও মিষ্টি উভয় দেখিলেই বা উভয়ের ঘ্রাণ পাইলেই জিহ্বায় সাধারণতঃ জল আসে। কিন্তু টক দেখিলেই শুধু জিহ্বায় জল আসে, মিষ্টি দেখিলে আসে না ইহার বোধ হয় কোন বিশেষ কারণ নাই। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে টক বস্তুর তীব্র স্বাদ ও ঘ্রাণ আমাদের salivary glands বা লালা-নিঃসারক গ্রন্থির উপর মিষ্ট বস্তু অপেক্ষা হয়ত অধিক পরিমাণে প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে।

শ্রী হরেন্দ্রলাল বসু

জিহ্বায় জল আসা মানে জিহ্বার তলদেশস্থিত গ্রন্থিসমূহ (Glands) হইতে লালারস (Saliva) নিঃসৃত হওয়া। এখন এই লালারস এরূপ পরিমাণে নিঃসৃত হইবে যে-পরিমাণে আমাদের জিহ্বা কোন রস সম্বন্ধে বোধশীল (Sensitive)। সুতরাং 'মিষ্টি দেখিলে জিহ্বায় জল আসে না' কথাটা ভুল। বলা উচিত ছিল যে মিষ্টিতে জিহ্বায় ততটা জল বা লালা আসে না যতটা টক রসে আসে।

এখন দেখিতে হইবে যে কেন টক রসে অধিক লালা নিঃসৃত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জিহ্বা যে রস সম্বন্ধে যত অধিক বোধশীল, লালা তত অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইবে।

জিহ্বার যতখানি অংশ টক রস সম্বন্ধে বোধশীল, অন্য কোন রস সম্বন্ধে বোধ হয় ততখানি নয়। সেইজন্য টক রসে জিহ্বার গ্রন্থি হইতে যত অধিক পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইবে, অন্য কোন রসে তাহা হইবে না। কারণ,

"The tastes are not excited equally all over the surface of the tongue. Thus the tip is most sensitive to sweet substances, and back the bitter, while the sides of the tongue most readily respond to acids."—Huxley's Physiology.

শ্রী কালিদাস ঘোষাল
শ্রী শচীনাথ ঘোষ

(১০)

প্রাচীন ভারতে সূচ

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কিরূপ সূচের প্রচলন ছিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু সূচ যে ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত সুশ্রুত নামক বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে—সীবৎ ক্রিয়া (sewing) নাম পাওয়া যায়।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

ঋক্ সংহিতায় সূচিকার্য্য-বিশিষ্ট বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। সে-প্রাচীনযুগেও আর্য্যগণ বস্ত্র কাটিয়া সূচের সাহায্যে উচ্চ অঙ্গের পরিচ্ছদ প্রস্তুতের প্রণালী অবগত ছিলেন। যাঁহারা উড়িষ্যার দেবমন্দির-গাত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, অধিকাংশ মূর্ত্তিই নানাবিধ সুন্দর সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত। উদয়গিরির রাণী-গুম্ফায় একটি মূর্ত্তির গাত্রে বর্ত্তমান সময়োপযোগী চাপকান দেখা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে কতিপয় মূর্ত্তির পাদদ্বয় চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাদুকায় আচ্ছাদিত দেখা যায়। অজন্তার গিরিগাত্রে বহু চিত্রে সুন্দর পরিচ্ছদের বিন্যাস দেখা যায়। অমরকোষ হইতে অবগত হওয়া যায় যে ভারতে সূচিকার্য্যযুক্ত-বস্ত্র-প্রস্তুতকারী সৌচিক নামে অভিহিত হইত। ৺বারাণসী ধামে অদ্যাপি এইরূপ একটি স্বতন্ত্র জাতি দৃষ্ট হয়।

সাধারণ পরিচ্ছদ হইতে পৃথক করিবার জন্য সূচী-পরিচ্ছদের কতিপয় বিশেষ নাম অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের নানাস্থানে রাজপরিচ্ছদ জ্ঞাপনার্থ সেই-সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ভারতে যে বহু পূর্ব্বে সূচী-পরিচ্ছদের প্রচলন ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

রামায়ণ-যুগের আলোচনা ত্যাগ করিয়া আমরা যদি বৌদ্ধযুগের ঘটনাবলী সম্যক রূপে আলোচনা করি, তবে আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধযুগেও ভারতে সূচী-শিল্পের প্রচলন খুব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। Samuel Beal-এর Chinese Sanscrit-এর ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিলে "The Story of the Nobleman who Became a Needle-maker গল্পে একস্থানে দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব যখন সূচ প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধ সূচ-বিক্রেতার কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন সূচ-বিক্রেতা এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে সূচ-প্রস্তুত সম্বন্ধে এই-সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

"The old man asked him and said, 'O well, sir! and is it true that you are able to make beautiful needles?" He replied, 'I am able.' The old man then added, 'Let me see some of your ware, that I may have an idea of your skill.' Then the noble youth took out of his bamboo case a needle to show him. The old man, having examined it, replied, 'Respectable youth! You are skilful in making needles; you drill the holes well.' Then the noble youth answered, 'This needle is nothing. I have others in my case far superior to these.' On which he took another out of his bamboo case and showed it to the old man. Having examined it, he again began to praise the workmanship and said, 'Very well made and drilled indeed!' Then the youth said, 'Oh! This is nothing. I have others better than that.' So he took out a third and showed to the old man who, having looked at it, cried out, 'Beautifully made, beautifully drilled indeed.' Then the youth said, 'Oh! I have better needles than that.' On which he took out another……taking that needle in his hand placed it gently in a vessel of water, and lo! it floated on the surface.

বুদ্ধদেবের এবং সূচ-বিক্রেতার কথাবার্ত্তা হইতে ইহা সম্যকরূপে প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধযুগে সূচীশিল্প খুব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

শ্রী সুধীরচন্দ্র দাশদত্ত

(১২)

শিখা রাখার প্রথা কত কালের

ঋগ্বেদের সংহিতা-গ্রন্থেও শিখার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমারা বিশিখা ইব' (ঋগ্বেদ, ৬।৭৫,১৭)। পরবর্ত্তী গৃহ্য-সূত্রাদিতে ইহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

শিখা না থাকিলে ক্রিয়া-কর্ম্ম শুদ্ধ হয় না। প্রমাণ যথা, "শিখী-তিলকী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।" পূজাদির প্রারম্ভে "শিখায়াম্ বন্ধে বা গ্রন্থিং বধ্নীয়াৎ।"

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

মস্তকে শিখার উদ্দেশ্য

শুদ্ধিতত্ত্ব-ধৃত একটি 'ব্রাহ্মণ'-বচনে দেখিতে পাওয়া যায়,—"এষ

রিক্তোবানপিহিতস্তস্যৈতদপিধানং যৎ শিখেতি" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আবরণ-শূন্য হইয়া থাকিলে রিক্ত (তুচ্ছ) হয়, একারণ শিখাই উঁহার অপিধান। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ কৌপিনধারী থাকার দরুণ আবরণ-শূন্য ছিলেন, একারণ আতপতাপাদি হইতে মস্তককে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা মস্তকের আবরণরূপে শিখা ধারণ করিতেন। অধুনা মান্দ্রাজ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ মস্তকে যেরূপ কেশ ধারণ করিয়া থাকেন, উহাই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত শিখা।—

আপস্তম্বের একটি বচন আছে—"ন সমাবৃত্তা বপেয়ুরন্যত্র বীহারাদিত্যেকে।" অর্থাৎ 'বীহার' ভিন্ন অন্য সময় সমাবৃত্তগণ বপন (শিখা বর্জ্জন) করিবে না। "বীহারাদ্দর্শপৌর্ণমাসাঙ্গযাগবিশেষঃ।" বীহার অর্থে দর্শ-পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গীভূত যাগ বুঝায়। দর্শ-পৌর্ণমাস একটি বৈদিক যজ্ঞ। উপরন্তু 'ব্রাহ্মণে' শিখা-ধারণের উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য্য 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "ব্রাহ্মণং মন্ত্রেতরবেদভাগঃ", মন্ত্র ভিন্ন বেদভাগই 'ব্রাহ্মণ'। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বৈদিক সময় হইতেই শিখা ধারণের নিয়ম প্রকাশিত আছে।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৩)

সজারু, শশক, প্রতিকূল বায়ু ইত্যাদি অযাত্রা কেন

'জ্যোতির্বিদাভরণ' গ্রন্থে পঞ্চম বর্ষে কর্ণবেধের কথা আছে। "বর্ষে ত্রিভিঃ প্রদরকাণ্ডমিতে বা সম্যঃ শিশোঃ শ্রবণবেধবিধানমাহুঃ"—প্রদরকাণ্ডমিতে (প্রদর=বাণ=পাঁচ) পঞ্চম বর্ষে। অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষে অথবা তৃতীয় বর্ষে কর্ণবেধ কর্ত্তব্য। মদন-পারিজাতে বলা হইয়াছে, কুলক্রমাগত প্রথা অনুসারে কালনির্ণয় করিতে হইবে। কোন কোন গ্রন্থে অযুগ্ম বর্ষ মাত্রে ইহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রন্দন মাত্রেই অযাত্রা। যথা—'রোদনং ন শুভং যানে বাহনস্য পলায়নম্' (জ্যোতির্নিবন্ধ)। অনুকূলবায়ু শুভসূচক এরূপ কথা পাওয়া যায়।

"বামে মধুরবাক্‌পক্ষী বৃক্ষঃ পল্লবিতোঽগ্রতঃ।
অনুকূলো বহন্ বায়ুঃ প্রয়াণে শুভশংসিনঃ॥"

অনুকূল বায়ু শুভ, সুতরাং প্রতিকূল বায়ু অশুভ।

শশক যাত্রায় অশুভ, যথা—"গোধা-সর্পঃ শাশকোজাহকশ্চ যানে দৃষ্টঃ কৃকলাসোঽপি নেষ্টঃ" জ্যোতির্নিবন্ধে শ্রীপতি।

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কর্ণবেধের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময় হইতেছে জন্মকাল—"জাতমাত্রস্য বালস্য মাতুরুৎসঙ্গবর্ত্তিনঃ শললাা ভেদয়েৎ কর্ণং সূচ্যা দ্বিগুণসূত্রয়া" —জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে।

রুদ্রাধ্যায়-মহিমা—ইহা রুদ্রের স্তব করিয়া রচিত কতগুলি শ্লোক। বর্ত্তমানে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে শ্লোক-সংখ্যা ৬৬। যজুর্ব্বেদী বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বৃষের দক্ষিণ কর্ণে সমগ্র রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে হয়। যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্মপদ্ধতির পুস্তকে বৃষোৎসর্গের হোমের পর এই রুদ্রাধ্যায় আছে।

উপর্যুক্ত মীমাংসায় কর্ণবেধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত শ্লোকটি হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষে কিরূপ সূচের প্রচলন ছিল তাহারও আভাস পাওয়া যায়। শললী অর্থাৎ শজারুর কাঁটায় সূতা পরাইয়া সূচের কার্য্য করা হইত। এবং ইহাতে যখন সদ্যোজাত শিশুর কর্ণবেধ সম্ভবপর হইত তখন অন্যান্য সীবনকর্ম্মও যে ইহার দ্বারা চলিতে পারিত তাহাতে সন্দেহ কি?

শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

রুদ্রাধ্যায় রুদ্রের উপদেশ-কৃত যজুর্ব্বেদীয় সূক্ত; শ্রাদ্ধ কার্য্যে পঠনীয় গ্রন্থাংশ-ভেদ; ইহা যজুর্ব্বেদীদিগের বৃষোৎসর্গে পঠিত হইয়া থাকে।

(বিশ্বকোষ)

শ্রী বিজয় কৃষ্ণ রায়

শশক যে অযাত্রা তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে:—

সর্পঞ্চতনরং সর্পং গোধাঞ্চ শশকং বিষম্।
শ্রাদ্ধপাকঞ্চ পিণ্ডঞ্চ মোদকঞ্চ ভিন্নাংস্তথা॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

'প্রতিকূল বায়ু অযাত্রা' এসম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন নির্দ্দেশ নাই, তবে "ঝঞ্ঝাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাদ্যঞ্চ নৃপঘাতকম্"—এইগুলি অশুভ লক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে। আরও বায়ুকে যদি দৈব বস্তু বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে প্রতিকূল বায়ু অযাত্রা। কারণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে যাত্রাকালে দৈবানুকূল্য একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া গণিত হইয়াছে।

নিজদৈবানুকূল্যে হি প্রাতিকূল্যে পরস্য চ।
যায়াদ্ ভূপো যতো দৈবং বলমেতৎ পরং মতম্॥

(যুক্তিকল্পতরুঃ)

"মুক্তকেশীং ছিন্ননাসাং রুদন্তীঞ্চ দিগম্বরীম্" এই বাক্যে নারীর ক্রন্দন অযাত্রা বিবেচিত হইয়াছে।

রুদ্রাধ্যায় রুদ্রসর্গ নামক পর্ব্বের অংশ বলিয়া বোধ হয়। রুদ্রসর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:—

কথিতস্তমসঃ সর্গো ব্রহ্মণস্তেঽয়ং মহামুনে।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

ইতি তে কথিতো রাজন্ রুদ্রসর্গঃ প্রজাপতে।
যং শ্রুত্বাপি নরঃ সদ্যোঃ জহ্যাদ্ ভূতকৃতং ভয়ম্॥

(পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে রুদ্রসর্গঃ ৮ অধ্যায়ঃ)

শাস্ত্রে কর্ণবেধ কেবল পঞ্চম বর্ষেই করিতে হইবে এরূপ কোন অনুজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে অযুগ্মবর্ষে কর্ণবেধ করিতে হইবে এইরূপ বিধান আছে।

প্রমাণ—

ন জন্মমাসে ন চ চৈত্রপৌষে ন বর্ষযুগ্মে ন হরৌ প্রসুপ্তে।

(দীপিকায়াম্)

কিন্তু বিদ্যারম্ভ পঞ্চম বর্ষে করাইতে হয়:—

"অপঠনদিনবর্জ্জ্যং পাঠয়েৎ পঞ্চমেঽব্দে।"
"সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রসুপ্তে জনার্দ্দনে॥"

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ রায়

(১৬)

হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতার ইতিহাস

এই জিজ্ঞাসার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"আর্য্যদের …… ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলিতে ধর্ম্মের যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই—উহাই ধর্ম্ম-ভাবের সনাতন আদিম মূর্ত্তি। আর্য্যেতর জাতির মধ্যেও যখনই ধর্ম্মভাব প্রথম দেখা গিয়াছে—তখনই এই মূর্ত্তি ……। এই মূর্ত্তিটি—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অগ্নিতে, বায়ুতে, যাহা-কিছুর সঙ্গে দৈনিক জীবন-যাত্রায় মানবের পরিচয় হয়, তাহাতেই একটি দেহাতিরিক্ত সূক্ষ্ম চিন্ময় সত্তার কল্পনা এবং তাহাতে মানবের শক্তির অতীত শক্তির অর্থাৎ দেবত্বের আরোপ। ঋগ্বেদে এইরূপ দেবতার অভাব নাই। অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, ইন্দ্র দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বিষ্ণু দেবতা ইত্যাদি। ধর্ম্মের এই পর্য্যন্ত প্রকাশ সমস্ত

আদিম ধর্ম্মেরই এক। কিন্তু যেদিন আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান-নেত্রে সহসা এই সত্য দেখিতে পাইলেন যে, অগ্নি বায়ু বরুণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবসত্তা নহে,—এক মহাদেবসত্তারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, জগতের ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা এক স্মরণীয় দিন।

সেই দিন হইতে আর্য্যধর্ম্মের স্রোত এক সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হইল।...... ৫০০০ খৃঃ পূঃ হইতে মিশর আইসিস-ওসাইরিসের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, আসিরিয়া কেলডিয়াও তাহার কিঞ্চিৎ পরেই সামাস ইষ্টর, মিলিট্টার মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিল। ... খৃঃ পূঃ ৪র্থ ৩য় ও ২য় শতাব্দীতে ভারতে ধর্ম্মের অবস্থা এই—বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রভাব কমে নাই, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ উপনিষদের ঈশ্বরতত্ত্বও আলোচনা করিতেছেন,—এদিকে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে নীচে বা বেদীতে পূজাও আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন ভাস্কর্য্য-নিদর্শন বরহাট স্তূপে এই ব্যাপারের মনোরম নিদর্শন রহিয়াছে।

মৌর্য্যবংশ-পতনের পর খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর প্রারম্ভে সুঙ্গদের অধিকার কালে বরহাট স্তূপ নির্ম্মিত হয়।...............এই স্তূপে দেখা যায়—বুদ্ধের মূর্ত্তি এখনও গঠিত হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধের আসন, বুদ্ধের পদচিহ্ন, বুদ্ধের দেহের ভস্মাবশেষের উপর নির্ম্মিত স্তূপ, যে বৃক্ষ-তলে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেই বটবৃক্ষ, এই-সমস্তই দেবতার মত পূজা পাইতেছে। ... পীপরাহা হইতে যে-সব প্রাচীন জিনিষ সংগৃহীত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে দুইখানা স্বর্ণপাতের উপর পৃথিবী-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। পরলোকগত ডাক্তার ব্লকের মতে—এই প্রাচীন জিনিসগুলি ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের। .... খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষণ রাজা কনিষ্ক আসিয়া ভারতের পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া বসেন। কনিষ্ক তাঁহার সঙ্গে গ্রীস, পারস্য, আসিরিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশের মূর্ত্তি-পূজা লইয়া আসেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতেই দেশ মন্দিরে এবং মন্দির দেবমূর্ত্তিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বুদ্ধদেবের শূন্য আসনে অচিরাৎ বুদ্ধমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল এবং দেখিতে দেখিতে কার্ত্তিক, গণেশ, শিব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিল।

"প্রতিভা," ১৩২১, ২৩—২৯ পৃঃ।

উপরোক্তরূপেই হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা সংক্রামিত হইয়াছে।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৭)

'চা' শব্দের উৎপত্তি

'চা' শব্দ ও 'Tea' শব্দ চীনা ভাষা হইতে উঠিয়াছে। দুই প্রদেশের বিভিন্ন উচ্চারণ। চা চীনা Chá ও Tea চীনা Tú শব্দ হইতে হইয়াছে। জাপানী উচ্চারণ দুইটি Ta, Cha।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন

(১৮)

দুগ্ধ সময় সময় টক হইয়া যায় কেন ?

শীতকালে দুধ মোটেই টক হয় না। গ্রীষ্মকালে গরমের আধিক্য বশতঃ সময় সময় দুধ টক হয়। এই সময়, দুধ সকালে এক-বার মাত্র ফুটাইয়া রাখিলে, সন্ধ্যার মধ্যে তাহা টক্ হইয়া যায়। দুধ টক না হইবার জন্য সমস্ত দিনে অন্ততঃ চার-পাঁচবার দুধ ফুটাইয়া রাখা আবশ্যক।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

বিনা জ্বালের দুগ্ধে শুক্‌না মরিচ দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল থাকে। "৫৬ সের দুগ্ধে ১৪ সের শ্বেতশর্করা এবং ছোট এক চামচ বাইকার্ব্বনেট অব সোডা দিতে হয়। ঐ মিশ্রিত দ্রব্য পরে এনামেল-মণ্ডিত লৌহ-কটাহে ঢালিয়া বাষ্প-তাপে সিদ্ধ করিতে হয় এবং ক্রমাগত উহাকে বাতাস করিতে হয় এবং নাড়িতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত জল শুকাইয়া দুগ্ধ গুঁড়ার মত হইবে। এই-সকল চূর্ণই পরে এক পাউণ্ড লইয়া চাপ দিয়া ইষ্টকাকারে বিক্রয় হয়। আবার ব্যবহার-কালে ঐ ইট গুঁড়াইয়া জল গুলিলেই দুগ্ধ হয়।"

শ্রী অমূল্যগোবিন্দ মৈত্র

ও

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

দুধ টক্ হইবার কারণ ফার্ম্মেন্‌টেস্যন্ Fermentation। দুধে দুগ্ধশর্করা Lactose নামে শর্করা-জাতীয় এক পদার্থ আছে। ফার্ম্মেন্-টেস্যনে এই Lactose, Lactic acidএ পরিণত হয়, এবং এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এক বিশেষ-প্রকার জীবাণুর সাহায্যে। এই Bacillus যে দুধের মধ্যে স্বতঃই উৎপন্ন হয় না তাহা স্বপ্রজনন মতবাদের পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বাতাসেই এই জীবাণুর বাস এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। দুধের পাত্রকে চতুর্দ্দিক বায়ু-সংস্পর্শশূন্য করিয়া বন্ধ (Hermetically seal) করিতে পারিলে জীবাণুর প্রবেশ-পথ রোধ হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে দুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে জীবাণু তাড়িত হইয়াছে কি না। জীবাণুর কার্য্য তথা বংশবৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতভাবে সম্পন্ন হয় আমাদের দেহতাপের সান্নিধ্যে; অধিক উত্তাপে জীবাণু বিনষ্ট হয়, অধিক শৈত্যে ইহাদের কর্ম্মের শক্তি ক্ষীণ হয়, কিন্তু জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকে। জলীয়ভাগের উপস্থিতিও কোন কোন Fermentationএর বিশেষ আনুকূল্য করে। সুতরাং দুধ জ্বাল দিয়া শুকাইয়া ফেলিলে Fermentation বন্ধ হইতে পারে—সাধারণভাবে জ্বাল দিয়া রাখিলে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য Fermentation বন্ধ থাকে। জীবাণুর পক্ষে বিষাক্ত এমন কোন বস্তুর সাহায্যেও Fermentationএর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এইরূপ পদার্থ মনুষ্যদেহের অনিষ্টসাধন না করে। অতি সামান্য পরিমাণে Formaldehyde বা ফর্ম্মালিন কোন কোন দুগ্ধ-ব্যবসায়ী পাশ্চাত্যদেশে দুগ্ধ-সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ ভাবে ফর্ম্মালিন ব্যবহার করা নিতান্ত অবৈধ। Fermentation-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের জন্য আমরা ফরাসী রাসায়নিক পাস্তুরের নিকট ঋণী।

শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার

ফাউন্‌টেন পেন সাফ করা

বৈশাখ মাসের "প্রবাসীতে" "ফাউন্টেন পেন্ সাফ করা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিলাম (পৃঃ ৫৮)। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে প্রণালীর কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ফাউন্টেন পেনের পক্ষে ইহা অনিষ্টকর—মারাত্মক।

"কলমের মধ্যে গরম জল" ভরিলে কলম ফুলিবেই, এবং ইহার গর্ত্ত বড় হইবেই—বেশী না হউক সামান্য হইবেই। ইহার ফল এই হইবে যে কলমের স্ক্রু-এর ঘরও বড় হইবে, এবং nib-holder আর আঁট হইয়া বসিবে না—কালী চুয়াইবে। কলমের feederটিও অল্পবিস্তর ফুলিবে এবং তাহা হইলে কালি ঠিক আসিবে না। এইরূপে কলমের প্রত্যেক অংশটি অল্প-বিস্তর বড় হইয়া কলমটিকে একেবারে পদার্থহীন, অকর্ম্মণ্য করিয়া দিবে। বাল্যকালে অনেকগুলি ফাউন্টেন পেন গরম জলে ধুইয়া একেবারে নষ্ট করিয়াছি বলিয়া শ্রীযুক্ত হেমন্তবাবুকে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলাম।—

ফাউন্টেন পেন সাফ্ করার একটি অতি সোজা ও সুন্দর উপায় আছে। কলমটির কালি ফেলিয়া দিয়া দু-একবার ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হইবে। পরে কলমটিকে methylated spiritএ কয়েক ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। Spiritএ কলমের ভিতরকার প্রত্যেক অংশের "কালির দানা" গলিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এবং কলমটি একেবারে সাফ্ হইবে। তাহার পর কলমটি মুছিয়া কালি ভরিলেই কলমটি ব্যবহার-যোগ্য হইবে।

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

একেবারে ফুটন্ত জল কলমে ভরিলে কলম নষ্ট হইবেই। গরম জল অর্থাৎ ঠাণ্ডা জলকে কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লইয়া কলমে ভরিয়া ধুইতে হইবে। তাহাতে কলম নষ্ট হইবে না। আমি নিজে এই প্রকারে কলম ধুইয়া ব্যবহার করিতেছি। কলম একটুও খারাপ হয় নাই। আমেরিকা এবং ইউরোপেও এই প্রকারে ঝরণা-কলম পরিষ্কার করা হয়।

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

—

হারামণি ?

প্রবাসী বৈশাখ (১৩২৯) সংখ্যায় প্রকাশিত 'হারামণি'র সকল গানগুলি প্রকৃত হারামণি নয়,—ইহার তৃতীয় গানটি ৺ রজনীকান্ত সেন প্রণীত "কল্যাণী" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে "অন্তর্দৃষ্টি" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উচ্চে উড্ডয়ন

"প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ভট্টশালী মহাশয় পঞ্চশস্যে লিখিয়াছেন যে ল্যারি-বর্জেস ২১,৯০৯ ফুট উঠিয়াছেন, ইহার বেশী কেহ কোনদিন উঠেন নাই। কিন্তু "ব্যোমযান" নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে James Glacier ৩৯০০০ ফুট উঠিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র গুপ্ত

আমেরিকান বিমান-বীর শ্রোয়েডের (Schroeder) গত ১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩,১৩৩ ফুট উচ্চে উঠেন। তিনি Lepere biplaneএ চড়িয়া এই আশ্চর্য্য কাজটি করেন।

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

—

দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস

বর্ত্তমান সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে "কৃষ্ণভাবিনী-স্মৃতি-সভায়" প্রবন্ধে দেখিলাম যে "দেবী কৃষ্ণভাবিনী দাস চুয়াডাঙ্গার এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।"

কিন্তু স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস মুর্শিদাবাদ জেলার চোয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা ছিলেন।

শ্রী নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিতি' সম্বন্ধে যে কয়টি লাইন লেখা হইয়াছে তাহার ভিত্তি নিতান্তই অমূলক। প্রথমতঃ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষের যে পুত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত লাইন কয়টি লেখা হইয়াছে সে পুত্র এ বৎসর 'বি-এস্‌সি' পরীক্ষা দেয় নাই। দ্বিতীয়তঃ সে পরীক্ষার প্রত্যেক দিবসই উপস্থিত ছিল কোনও দিনও অনুপস্থিত ছিল না। কেবলমাত্র একদিন পরীক্ষার সময় বিশেষ অসুস্থতা বোধ করাতে ১ ঘণ্টা প্রশ্নের উত্তর করিয়া 'হল্' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। আমি যতদূর তাহার বিষয় জানি তাহাতে মনে হয় সে কোনও বিষয়ে এক পেপার পরীক্ষা দিতে অক্ষম হইলেও পাস্ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহার পর "তাহাকে পাস্ করা যায় কি না বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহার বিষয়টি মডারেটারদের নিকট পেস্ করা হইয়াছে"—এ সংবাদের ভিত্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে মনে হয় পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিয়াও কেহ পাস্ করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীণ্ডিকেটের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইতে পারে না। আপনি এ সংবাদ যাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছেন, আমার মনে হয় তাহার সংবাদ ঠিক্ নহে। অতএব আপনার ন্যায় বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এ সামান্য বিষয় লইয়া

আলোচনা করা ঠিক্ বলিয়া বোধ হয় না। আশা করি আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আপনি সত্যের আদর করিতে ভুলিবেন না।

ভবানীপুর, শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৪, পদ্মপুকুর রোড

সম্পাদকের মন্তব্য।—আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে একটি ভুল ছিল; "বি-এস্‌সী"র পরিবর্ত্তে "আই-এস্‌সী" হইবে। আর যাহা লিখিয়াছি, অর্থাৎ আসল কথাগুলি, সমস্তই ঠিক্। প্রমাণ, সীণ্ডিকেটের গত ৫ই মে তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ হইতে নীচে উদ্ধৃত কথাগুলি:—

"85. Read an application from Satyendra Chandra Ghosh, a candidate at the recent I. Sc Examination, bearing Roll Cal. No. 767, praying that he may be re-examined in Physics, as he was slightly ill, while he sat for the first paper on the 22nd April, and as he had to be carried away due to illness before he could answer any question of the Second Paper on the 24th April,

RESOLVED—

"That the matter be referred to the Board of Moderators in Arts and Science."

বিষয়টি সামান্ত নহে। কারণ, পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্র পীড়িত হয়। একজনের সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, সকলের সম্বন্ধেই করা উচিত।

—

বেরির চর্‌খা ও তাঁত

"ভারতবর্ষের" বিশ্বকর্ম্মাকে তাঁহার ভুল সংশোধনের জন্ত আমি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে পরিষ্কার বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে" এই প্রতিবাদ তিনি বাহির করিবেন না। এজন্তই আপনার নিকট প্রতিবাদ-পত্রখানা পাঠাইতে বাধ্য হইলাম।

ভারতবর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা), ৭৩৭ পৃষ্ঠা, সম্পাদকের বৈঠক।

"ভারতবর্ষ" ৭৩৭ পৃষ্ঠার চিত্রটির নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন, "বেরীর ইম্‌প্রুভ্‌ড্ কোর্ড্‌ং স্পিনিং মেসিন" তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে ঐ যন্ত্রটি বেরীর স্পিনিং মেসিন; ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ঐ যন্ত্রটি বেরীর অটোম্যাটিক হ্যাণ্ড্‌লুম।

"ভারতবর্ষ" ৭৩৮ পৃষ্ঠায় বেরীর অটোম্যাটিক হ্যাণ্ড্‌লুম চিত্রটির যে নাম লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ হইতেছে, ঐ যন্ত্রটি বেরীর হ্যাণ্ড্‌লুম, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ঐ যন্ত্রটি মাত্র স্পিনিং মেসিন (চর্‌কা)। উন্নত প্রণালীর চর্‌কা কাহাকে বলিতে চান? যদি সাধারণ চর্‌কা হইতে উহাতে অধিক পরিমাণে সূতা কাটা যাইত তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারিতাম, উন্নত প্রণালীতে বেরীর চর্‌কা তৈয়ারী হইয়াছে। সাধারণ চর্‌কাতে (পুরাতন প্রণালীর) দৈনিক /॥০ সের তুলা কাটা যায়। ৩৲ টাকা মূল্যের চর্‌কাতে সে কাজ হয় ১৫৲ টাকা মূল্যের চর্‌কাতে সেই কাজ হইলে লোকে ১৫৲ টাকা দিয়া বেরীর চর্‌কা কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন?

বেরীর তাঁত সম্বন্ধে ১৩২৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" সম্পাদকের বৈঠকে লিখিয়াছেন, তাঁতের কোন যন্ত্র হাতে চালাইতে হয় না, সমস্ত কাজ আপনাআপনি হয়। ঐ তাঁত মানবশক্তি-চালিত একটি যন্ত্র মাত্র, যে-সকল তাঁত বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে, তাহারও অনেক কাজ হাতের সাহায্য ছাড়া চলিতে পারে না। মানবশক্তি-চালিত হ্যাণ্ড্‌লুম যন্ত্রে হাতের সাহায্য লাগে না, ইহা হইতে পারে না।

কাঠের তৈয়ারী বেরীর তাঁতের মূল্য ২৫০৲। উহা উন্নত প্রণালীর ফ্লাই-শাট্‌ল্ তাঁত (মূল্য ৭০৲) হইতে কিছুমাত্র অধিক কাজ দিতে পারে না। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, মিঃ হুজ্‌ওয়ার্ফের তৈয়ারী তাঁত, যাহা বেরী তাঁত নামে পরিচিত, ঐ তাঁতে ১০ নং অর্থাৎ ২।২০ নং সূতাতে ১৬ নং পড়েন দিয়া দৈনিক ২০ গজের অধিক খদ্দর তৈয়ারী হয় না। তাহা হইলে ৭০ টাকা মূল্যের ফ্লাই-শাট্‌ল্ লুম না কিনিয়া ২৫০৲ টাকা দিয়া মিঃ হুজ্‌ওয়ার্ফের নির্ম্মিত বেরী তাঁত লোকে কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? (গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর ২৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন।) ভারতবর্ষ-সম্পাদকের লেখা সংবাদ নিয়া আমি প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বেরীর তাঁতের দোষ এই যে ডবল সূতা পাকান টানার ব্যবহার ভিন্ন উপায় নাই। এক ছাড়া সূতা হইলে এত ছিঁড়িয়া যায় যে তাহাতে কাজ চালান খুবই কষ্টসাধ্য, একপ্রকার অসম্ভব।

শ্রী ললিতকুমার মিত্র

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, ২২ ভাগ, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠায়

"তিনি শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল বয়ন শিক্ষা করিয়াছিলেন" এই সংবাদটি ভুল ছাপা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্র শ্রীরামপুর গভর্ণমেণ্ট বয়ন-বিদ্যালয়ে দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছেন।

শ্রী নৃপেন্দ্রমোহন ঘোষ
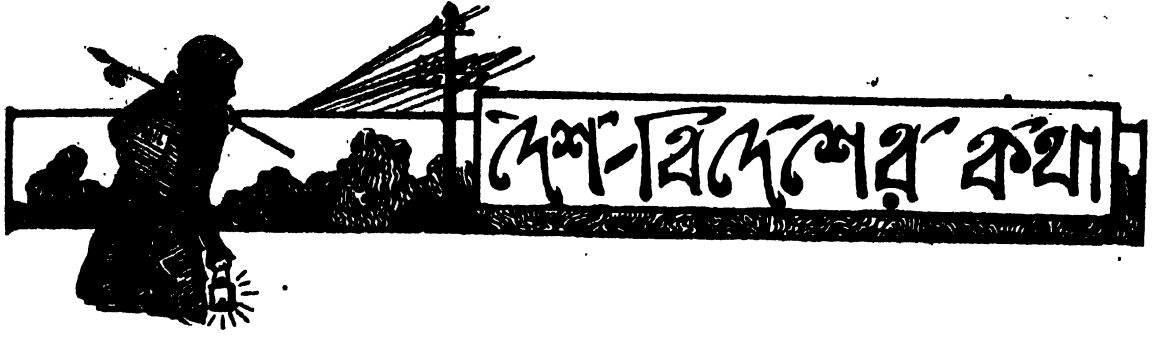
বিদেশ

ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য—

ইংলণ্ডের বাণিজ্য-বিভাগের আয়ব্যয়ের খসড়া হিসাব কমন্স-সভায় দাখিল করিবার সময় বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ ষ্ট্যানলে বল্ডুইন (Stanley Baldwin) বিশ্বের হাটে ইংরেজি পণ্যের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন উপনিবেশগুলি, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকা, হল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, এবং স্পেনের আর্থিক অবস্থা এতটা সচ্ছল আছে যে তাহারা প্রভূত পরিমাণে ইংলণ্ড-জাত দ্রব্য কিনিতে পারে। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী স্পেন ও যুক্তরাজ্য বিদেশ-জাত দ্রব্যের শুল্ক অত্যন্ত বৃদ্ধি করাতে সেই-সকল দেশে বৃটিশ বাণিজ্যের প্রসার কমিয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। উপনিবেশ-গুলিতে অবাধ-বাণিজ্য প্রচলিত থাকিলে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ কতটা আঁটিয়া উঠিতেন বলা যায় না, তবে সুবিধাজনক শুল্কহার নির্দ্ধারিত হওয়াতে উপনিবেশে ইংরেজের বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরেজ-চালিত মাল-সরবরাহের জাহাজের বিপক্ষে অনেকগুলি রাজ্য মার্কিন ও জাপানী জাহাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করাতে পণ্যবহন-ব্যবসায়ে ইংরেজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ইউরোপের নষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট দেরী আছে। ততদিন ইংরেজকে প্রাচ্যের হাটে ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য-বিস্তারের সুযোগ খুঁজিতে হইবে এবং উপনিবেশ-গুলির সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যুদ্ধের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যে হঠাৎ একটা সাড়া পড়াতে অনেক মাল প্রস্তুত হইয়া বাজারের অভাবে গুদামজাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলির কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা দেখিতে হইলে পণ্যদ্রব্যের উপর কর কমাইতে হইবে।

একমাত্র কয়লার ব্যবসায় যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াছে এবং কয়লার রপ্তানী আবার পুরাদমে চলিতেছে। কিন্তু লোহা ও ইস্পাতের কারবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং যতদূর দেখা যাইতেছে—অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা ভাল হইবারও সম্ভাবনা নাই।

পশমের সুতা ও কাপড়ের ব্যবসায় বেশ সন্তোষজনক-রূপেই চলিত যদি বিদেশী রাজ্যগুলি শুল্কের হার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি না করিতেন; তথাপি পশমের কারবারের অবস্থা মন্দ নহে। ভারতের সহিত ল্যাঙ্কেশায়ারের বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। তাহার উপর বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্কের হার ভারতে ইংলণ্ডজাত কাপড়ের ব্যবসায়ের অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। চীনের অন্তর্দ্রোহে চীনের সহিত বাণিজ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে, কেননা বর্ত্তমান অবস্থায় চীনের সহিত ব্যবসায় বিপজ্জনক। মোটামুটি ইংলণ্ডের বাণিজ্যের অবস্থা এইরূপ। এক দক্ষিণ আমেরিকা ও উপনিবেশগুলির সহিত বাণিজ্যের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ।

হেগ বৈঠকের সূচনা—

কান্ ও পারী বৈঠকের ন্যায় জেনোয়া-বৈঠকেও ইউরোপ-সমস্যার বিশেষ কোনও মীমাংসা হইল না। অথচ রাশিয়া ও জার্ম্মানীর সহিত মিত্রশক্তিদের একটা বুঝাপড়া না হইয়া গেলে ইউরোপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিবে, তাই আবার আর-একটি বৈঠকের সূচনা হইতেছে। জেনোয়া-বৈঠক ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের স্বার্থের খাতিরে ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া ইংরেজ মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ্ আবার একটি বৈঠকের প্রস্তাব করিলেন। রাশিয়ার অবস্থা পরখ করিয়া একটি বন্দোবস্তের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৫ই জুন তারিখে হলাণ্ডের হেগ সহরে অভিজ্ঞদের একটি সভা করিবার প্রস্তাব লয়েড জর্জ্জ্ জেনোয়া-বৈঠকে উপস্থিত করেন। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিসমূহ হেগ্-বৈঠকে উপস্থিত হইয়া এই অভিজ্ঞের দরবারের গঠন স্থির করিয়া দিবেন। অভিজ্ঞের মণ্ডলী তিন মাসের মধ্যে তাঁহাদের নির্দ্ধারণ জাতিসমূহের সংঘে পেশ করিবেন। আমেরিকা কিন্তু হেগ্-বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে অসম্মত হইয়াছেন। আমেরিকান সিনেট সভায় সিনেটর বোরা বলেন, যে, "ইউরোপের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ ভার্সাই সন্ধি। সেই সন্ধিতে আমেরিকার কোনও হাত নাই; কাজেকাজেই ইউরোপের দুর্ভাগ্যের জন্য আমেরিকার কোনও দায়িত্ব নাই। আমেরিকা সোভিয়েট দরবারের সহিত নিজের সুবিধা- ও ইচ্ছা-মত সন্ধি করিবার অধিকার খর্ব্ব করিবে না।" তাঁহার প্রস্তাবানুসারে আমেরিকা হেগ্-দরবারে উপস্থিত হইবেন না। রাশিয়া হেগ্-বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইয়াছেন এই সর্ত্তে, যে, ইতালী সুইডেন ও জেকোস্লোভাকিয়ার সহিত সোভিয়েট সরকারের যে সন্ধিগুলি পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। হেগ্-বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধপত্র জেনোয়া-বৈঠকের সভাপতির স্বাক্ষরিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছে এবং হলাণ্ড-সরকার সভার বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

ইজিপ্ট্ জাহাজ ও ভারতীয় লস্কর—

অনেক যাত্রী ও বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার সমেত পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডাক-জাহাজ 'ইজিপ্ট্' ব্রেষ্ট্ বন্দরের নিকটে একখানি ফরাসী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। আঘাতের ফলে একটি বৃহৎ ছিদ্র হইয়া যখন জল উঠিয়া জাহাজটি ডুবিবার উপক্রম হইল তখন প্রাণভয়ে যাত্রীর দল ও জাহাজের কর্ম্মচারীরা যেরূপ ব্যাকুল হইয়া প্রাণরক্ষার প্রয়াসে পাগলের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ফলে অনেকে অকারণে প্রাণ হারাইয়াছেন। একটু ধীরতার সহিত আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। ব্যাপারটি অত্যন্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঘটনাটিকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় লস্করদিগের প্রতি যে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছে তাহা অত্যন্ত অন্যায়। ভারতীয় নাবিকেরা যুদ্ধের সময় ডুবোজাহাজের আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া যেরূপ নির্ভয়ে সমুদ্রবক্ষে

বিচরণ করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই নির্ভীক নাবিকদিগের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের মূলে অন্য কাহারও স্বার্থ বিজড়িত আছে বলিয়া মনে হয়। লস্করদিগের নামে অপবাদ এই নূতন নহে। ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সুবিধা পাইলেই ভারতীয় লস্করদিগের সম্বন্ধে কলঙ্ক প্রচার করিয়া থাকে।

ইংরেজ নাবিকেরা ভারতীয়দিগের ন্যায় এত অল্প বেতনে কাজ করিতে পারে না এবং ইহাদের ন্যায় কর্ম্মঠও নয়। ভারতীয় লস্করেরা আবার ইংরেজ নাবিকের তুলনায় অত মদ্যপায়ীও নহে। সেইজন্য ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরেজ নাবিক আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডে অনেক নাবিক বেকার বসিয়া আছে এবং দুর্ম্মূল্যতার জন্য তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। ভারতীয় নাবিকের নামে এই মিথ্যা অপবাদ তাঁহাদের স্বার্থের খাতিরে হয় নাই তো? ভারতীয় নাবিকদিগের নামে অপবাদটি বেশ চতুরতার সহিতই প্রচার করা হইয়াছিল। একটুখানি ত্রুটির জন্য সব ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অপবাদকারীরা বলিয়াছিল যে ভারতীয় লস্করেরা নারীদিগের প্রতিও বন্দুক ছুড়িয়াছিল। কিন্তু লস্করের নিকট বন্দুক থাকে না; তাহাদের বন্দুক বহন করিবার লাইসেন্স্ নাই। কাজেকাজেই তাহারা বন্দুক ছুড়িবে কি করিয়া?

এই একটি ফাঁক হইতেই অপবাদের প্রকৃত মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তুরস্ক ও হত্যাকাণ্ড—

তুরস্ক-চরিত্রকে মসীলিপ্ত করিলে যখন ইউরোপের সুবিধা হয় তখনই খৃষ্টান প্রজাদিগের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার-কাহিনীর কথা প্রচার হইতে দেখা যায়। Turkish Atrocities অর্থাৎ তুরস্কের নৃশংস-ব্যবহারের অছিলায় শ্বেতকায় জাতির সুবিধার্থ ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রনৈতিক বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে তুরস্কের জাতীয়দলের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ব্যগ্রতা ইউরোপের সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছিল। ফ্রান্স ও ইতালী রফানিষ্পত্তি করিয়া ফেলিলেন, এবং অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর ইংলণ্ডের সহিত মিলনের কথাবার্ত্তা আপাতত ভাঙিয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ দরবারের সহিত ইউসুফ কামালের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল ততদিন পর্য্যন্ত তুরস্কের অত্যাচারের কথা বড় একটা শুনা যায় নাই। কিন্তু হঠাৎ সেদিন পার্লামেণ্ট মহাসভায় চেম্বারলেন ও কার্জ্জন প্রমুখ ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণ খ্রীষ্টান প্রজাদিগের দুঃখে আকুল হইয়া তুরস্কের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়া এসিয়া-মাইনরে মিত্রশক্তিবর্গের একটি কমিশন (মিলিত অনুসন্ধান-সভা) প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। শুনা যায় খ্রীষ্টান প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যাচার সাত-আট বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহা সত্য হইলে, এতদিন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনও বন্দোবস্ত না করিয়া তুরস্কের সহিত রফানিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা চলিতেছিল কেন?

তুরস্কের জাতীয়দলের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী বলেন যে খারপুট সহরে আর্ম্মেনিয়ানদিগের হত্যা করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজন তুরস্কবিদ্বেষী আমেরিকান ধর্ম্মযাজক মার্কিন সাহায্য-ভাণ্ডারের কর্ত্তা হইয়া আসিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে তিনি এই-সব মিথ্যা অভিযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য আমেরিকান কর্ম্মীরা এই-সকল অভিযোগ মিথ্যা বলিয়াই স্বীকার করেন।

পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানিবার উপায় নাই। তবে ১৬ই মে তারিখের রয়টারের তারে দেখা যাইতেছে যে অনুসন্ধান করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের সহিত এসিয়ামাইনরে উপস্থিত থাকিতে আমেরিকা রাজী নহেন। ফ্রান্স উপস্থিত থাকিতে প্রস্তুত আছেন বটে কিন্তু তাঁহারা স্মার্ণার গ্রীক অত্যাচারের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গ্রীক অত্যাচারের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রস্তাব আরও হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এবারকার প্রস্তাব সম্বন্ধেও ইংলণ্ডের অভিমত কি তাহা এখনও জানা যায় নাই।

যুদ্ধের সময় কলঙ্ক আরোপ নূতন নহে—বোল্‌শেভিকগণ নারীদিগকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া সোভিয়েট সরকারের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ, মৃত-নরদেহ হইতে জার্ম্মান রাসায়নিকের নানা দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতের মিথ্যা জনরব, রাশিয়াতে শিশুহত্যার মিথ্যা গল্প প্রভৃতি, অনেক মিথ্যা কলঙ্কের সৃজন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই হইয়াছিল। তুরস্কের সম্বন্ধে এই-সব অভিযোগের মূলে কোনও রাষ্ট্রীয় অভিসন্ধি আছে কি না কে বলিবে?

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

অস্পৃশ্যতার আপদ—

কামরূপের মহাদেব-মন্দিরে অস্পৃশ্যতার অজুহাতে নমঃশূদ্রদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ইহাতে কিছুদিন হইল নমঃশূদ্রদিগের ভিতর চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছিল। গত ১১ই জানুয়ারী তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদল ভলেণ্টিয়ার প্রেরণ করে। এই ভলেণ্টিয়ার-দল বলপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। পরের দিন ভলেণ্টিয়ারদের সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া মোহন্ত নমঃশূদ্র নেতাদিগকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করেন ও মন্দিরের শুদ্ধিক্রিয়া সম্পাদন করেন। ইহাতে নমঃশূদ্রেরা আপনাদিগকে অধিকতর অপমানিত মনে করিয়া পৌষ-সংক্রান্তির দিন আবার মন্দিরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মোহন্ত পূর্ব্বাহ্নেই পুলিশের সাহায্য লইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং নমঃশূদ্রদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ব্যাপারে ২৬জন নমঃশূদ্রের নামে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। বিচারে ১৪জনের প্রত্যেকে ছয় সপ্তাহ হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিরা হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিল। প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ প্যাণ্টন কামরূপের ডেপুটি কমিশনারের উপর এক রুলজারী করিয়াছেন এবং দরখাস্তকারীদের দণ্ড হ্রাস করা কেন হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে আদেশ দিয়াছেন।

দেশ হইতে অস্পৃশ্যতার আবর্জ্জনা দূর করাইবার জন্য যখন বিশেষ ভাবে চেষ্টা চলিতেছে তখন এরূপ একটা ঘটনা যথেষ্টই লজ্জার কথা। ছোট-বড়র মাপকাঠি দিয়া মানুষকে মাপা চলে না—বিশেষতঃ দেবতার দুয়ারে এ বৈষম্য একেবারেই অচল।

বিচারের শেষ ফল দ্বারা নমঃশূদ্র নেতারা অবনমিত জাতিদের অধিকার সম্বন্ধে ইংরেজ-রাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন কি?

পুলিশ কেন মোহন্তের সাহায্য করিয়াছিল?

শাস্ত্রী-মহাশয়ের স্পষ্টকথা—

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে প্রবাসী ভারতবাসীদের অধিকার শ্বেতাঙ্গদের সমান করিয়া লইবার জন্য বিদেশ-

যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে সেদিন বড়লাট শিম্‌লায় এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই যে আমলাতন্ত্রের এত বিশ্বাসী লোক—ইনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "আজকার দিনে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতিতে ভারতবাসীরা একেবারে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। শাসনযন্ত্রের প্রতি এই অবিশ্বাসের মত এমন শোচনীয় ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে আর কখনো ঘটে নাই।"

সরকারী কর্ম্মচারীদের গলদ—

ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ভিতর নৈতিক অবনতি অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই অবনতির কথা কর্ত্তৃপক্ষের যে অজানা আছে তাহাও নহে। এই সম্পর্কে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাব গবর্মেণ্ট অনেকটা সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মচারীদের দোষ জানিয়া তাহা চাপা দিতে চেষ্টা করেন নাই, সে-সম্বন্ধে ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপর তদন্তের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এই কমিটি সম্প্রতি পঞ্জাবের পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, পুলিশের ভিতর যে সাধু ব্যক্তির একান্ত অভাব, তাহা নানাবিধ সাক্ষ্য-প্রমাণ, এমন কি সরকারী কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য হইতেও বুঝিতে পারা গিয়াছে।

এরূপ অবস্থা যে পঞ্জাবেরই একচেটিয়া সম্পদ তাহা নহে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই পুলিশের অবস্থা প্রায় এইরূপ। বাংলা দেশে ত ঘুষের চোটে এবং অত্যাচারের দাপটে পুলিশের দারোগা সাধারণের চোখে এমনি ভীতির বস্তু এবং শক্তির অবতার যে বাংলার অশিক্ষিত জনসাধারণ লাট-সাহেবকেও আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলে, 'সাহেব তুমি দারোগা হও।' অথচ এই পুলিশ বিভাগটারই যে সর্ব্বাপেক্ষা সাধু হওয়া দরকার তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাঁওতাল পরগণায় জুলুম—

গত ২১শে মে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনা হইতে লিখিয়াছেন,

সাঁওতাল পরগণার নানা স্থানে, বিশেষতঃ রাজমহলে, যেরূপ জুলুম চলিয়াছে তাহা বিশেষভাবেই আক্ষেপজনক। স্থানে স্থানে লোকেরা এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেখানে অসহযোগীকে গৃহে স্থান দেওয়াও অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। আদালতে এই মর্ম্মে একটা রায়ও বাহির হইয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে সহানুভূতি দেখানোর ফলে কীর্ত্তন রক্ষিত নামে এক ব্যক্তি গৃহ ও জমী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই ধরণের আরো কয়েকটি মামলা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও আরো কয়েকটি মামলা দায়ের আছে। ফৌজদারী সংস্কার আইন অনুসারে বহু লোককে কঠোরতম দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। অথচ আইনটি এই প্রদেশের উপর জারি করা হয় নাই ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কোনো কোনো মহকুমায় বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত লোকদের প্রতি যেরূপ অকথ্য ভাষায় গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন, তাহা ভদ্রলোকের মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। বহু নিরীহ লোককে হাতে পায়ে বাঁধিয়া প্রখর রৌদ্রে বাহিরে ফেলিয়া মারা হইয়াছে। কিল, ঘুঁষি, যষ্টি-প্রহার এ-সমস্তের তো কথাই নাই। অনেকের ভাগ্যে ফুটবলের মত লাথিও প্রচুর জুটিতেছে। সাঁওতাল পরগণা জেলা সাধারণ আইনের বহির্ভূত। কিন্তু তাই বলিয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণ শাসনের মূলনীতি লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না।"

বিহার গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানের পর এই-সব অভিযোগ সম্বন্ধে রিপোর্ট বাহির করিলে কর্ত্তব্য করা হইবে।

পেন্স্যন বন্ধের কারণ—

'সার্ভেণ্ট' পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, অবসরপ্রাপ্ত 'জেলার' শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ বড়ুয়ার পেন্স্যন গবর্মেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কেহ অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিবেন না, এই মর্ম্মে একখানা অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া তাহাতে স্বীকৃত হন নাই—এই তাঁহার অপরাধ। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার একমাত্র পুত্র গৌহাটী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পুত্রটি সাড়ে চারিমাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সম্প্রতি অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা অসহযোগ-আন্দোলনে আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া জেলা কংগ্রেস-কমিটির এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর কাজ করিতেছেন। ইনিও নয় মাস কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় জামাতাও অসহযোগী উকিল এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির সহকারী প্রেসিডেণ্ট্। ইঁহার প্রতিও এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার তৃতীয় কন্যাও স্বামীর ন্যায় কংগ্রেসের একজন অতি উৎসাহী কর্ম্মী। যাঁহার পরিবারের সকলেই অসহযোগমন্ত্রে দীক্ষিত—তাঁহাকেই শায়েস্তা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট পেন্স্যনের কয়েকটা টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার ভয় দেখাইয়াছেন।—চমৎকার!

জেল-সংস্কার—

জেলের সাজা যে কয়েদীদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে না একথা আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে জেলটা যাহাতে ঠিক কয়েদখানা হইয়া না দাঁড়ায় তাহার জন্য নানারকম ব্যবস্থা চলিতেছে। কিন্তু এ-সব ব্যবস্থা ছাড়াও আমেরিকায় যে-সব কয়েদী জেলের ভিতর বেশ ভদ্রভাবে চলাফেরা করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াও হয়। এই ভদ্র-ব্যবহারের মাপকাঠিতে মাপিয়া যাহাদের গুরুদণ্ড হইয়াছে তাহাদের দণ্ড লঘু করিয়া দিবার ব্যবস্থাও সেখানে আছে। এদেশেও জেলের সংশোধন লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনার ফলে ইণ্ডিয়ান জেল কমিটির অনুরোধে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটির উপর বোম্বাইএর জেল-সমূহ পরিদর্শন ও উহাদের সংস্কারের উপায় নির্দ্ধারণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এই কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বোম্বাই গবর্মেণ্ট সাত শত কয়েদীকে মুক্তি দিয়াছেন এবং যাহারা দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদেরও দণ্ডভোগের কাল কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এদেশে এ ব্যবস্থাটা কিরূপ ফল দেয় তাহা পরীক্ষা করিবার যে প্রয়োজন আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

দেশী শিল্পের নমুনা সংগ্রহ অনাবশ্যক!—

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্মেণ্ট 'কমার্শিয়াল ইণ্টেলিজেন্স্ ডিপার্টমেণ্ট্' বা 'বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিভাগ' নামে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করেন। ভারতের আন্তর্জ্জাতিক-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য প্রকাশ করাই ঐ বিভাগের কাজ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কারমাইকেলের উদ্যোগে এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট একটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহালয় খোলা হয়। ভারতের শ্রমশিল্প-জাত দ্রব্যাদির নমুনা ঐ সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সম্প্রতি গবর্মেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। শোনা যাইতেছে, গবর্মেণ্ট এই সংগ্রহালয়টি অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছেন, এবং ইঞ্চকেপ কমিটির কাছে তাঁহারা এটি তুলিয়া

দিবার জন্যই অভিমত প্রকাশ করিবেন। যখন বিলাতে অজস্র অর্থ-ব্যয় করিয়া ভারত-শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে তখনই দেশের ব্যুরোটি ব্যয়-বাহুল্যের ভয়ে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে—এ ব্যবস্থা অদ্ভুত।

শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা—

ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভিতর কেহ কাজ করিতে করিতে অন্ধ বা অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে বর্তমান নিয়মে তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ-দান করিতে নিয়োগকারী বাধ্য নহেন—অর্থদান করা না-করা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ও অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। গবর্মেণ্ট এই ধরণের দুর্ঘটনা-গুলিতে ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক করিতে চাহেন। ভারত-গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এক পাণ্ডুলিপি পেশ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আপাততঃ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিটির কর্তা মনোনীত লইয়াছেন মিঃ সি এ ইনেস্।

যাহার কাজ করিয়া শ্রমজীবী অন্ধ বা অকর্মণ্য হইবে, তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার শ্রমজীবীদের আছে। তাহা দিতে নিয়োগকারীও ন্যায়তঃ এবং ধর্মতঃ বাধ্য।

গবর্মেণ্টের অমিতব্যয়—

এসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স্ অব কমার্স্ নামক ইউরোপীয় বণিক-সমিতির সমষ্টি ভারত-গবর্ণমেন্টের অর্থ-সঙ্কট সম্বন্ধে সম্প্রতি বড়-লাটের কাছে এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দেশের অর্থ অনুচিতভাবে ব্যয়িত হইলে শিল্প-বাণিজ্য কিছুরই উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ভারত-গবর্মেণ্টের কর্মচারী-বিভাগের খরচ অত্যন্ত বেশী, সামরিক ব্যয়ভার গুরুতর, নূতন দিল্লীর গঠন ব্যাপার একটা বিষম ভ্রম, এই-সমস্ত দিক হইতে খরচ কমানো আবশ্যক। অতিরিক্ত ট্যাক্স বসানোতে বিপদ আছে। জনসাধারণ উহা বহন করিয়া উঠিতে পারিবে না। ব্রিটিশ জাতির একটা প্রাচীন কথা আছে—শান্তি, ব্যয়-সঙ্কোচ এবং সংস্কার। এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গবর্মেণ্টের কাজ করিতে হইবে।

কবিরাজের ডাক্তারী শিক্ষা—

আসাম গবর্মেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, কবিরাজ পরিবারের একজন এবং হকিম পরিবারের একজন—এই দুইজন ছাত্রকে চারি বৎসর কাল মাসিক কুড়ি টাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়া ডিব্রুগড়ের বেরী হোয়াইট মেডিক্যাল স্কুলে রোগ-নির্ণয়-বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। মেডিক্যাল স্কুলের বিদ্যা শেষ করিয়া এই-সমস্ত ছাত্র কবিরাজী ও হকিমী পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিবেন, ইহাই গবর্মেণ্টের অভিপ্রায়। পাটনাতেও কবিরাজ-দিগকে গুলজারবাগের স্যানিটারী স্কুলে রোগ-প্রতিষেধ সম্বন্ধে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহুসংখ্যক কবিরাজ এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতেছেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাদের জন্যও রেল-ভাড়া ও কিছু কিছু ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে ভারতবর্ষ একদিন যথেষ্টই উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু উন্নতি ক্রমবিকাশের জিনিষ—কোনোখানেই তাহার সীমা-রেখা টানা যায় না। তাহাকে চরম এবং পরম মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহার অধঃপতন সুরু হইয়া যায়। আয়ুর্বেদেরও উন্নতির প্রয়োজন আছে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যাধির যে-সব নূতন রহস্য প্রকাশ করিতেছে, কবিরাজী শাস্ত্রকে উন্নত করিতে হইলে তাহার সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। এই হিসাবে গবর্মেণ্টের এ চেষ্টা প্রশংসার্হ।

মহিলার আয়ুর্বেদ-শিক্ষা—

কাশীর মহিলা-শিক্ষাসমিতি মহিলাদের জন্য আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। পরীক্ষার প্রথম বিভাগে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী শিবানী দেবী এবং দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী, শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী ও শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার যেরূপ প্রবল তাহাতে নারীদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে দখল থাকা বিশেষভাবেই প্রয়োজন। বাংলায় কি এরূপ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতে পারে না?

দেবদাস গান্ধী—

গত ১২ই মে এলাহাবাদে কারাগারের ভিতর শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধীর বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি সভায় সমবেত জনসঙ্ঘকে খেলাফৎ ও কংগ্রেসের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার প্রতি দেড় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দেবদাস তাঁহার বর্ণনা-পত্রে বলিয়াছেন,—"দেশের কাজে আমার ডাক পড়িয়াছে এবং সেইজন্য আমি কারাগারে যাইতেছি, ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত গৌরবের বিষয়। এদেশীয় যুবকবৃন্দের পক্ষে জেলে যাইয়া স্বাধীনতালাভের সহায়তা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই। আমি যাহা করিয়াছি তাহা জানিয়া-শুনিয়া এবং কর্ত্তব্য-বোধেই করিয়াছি। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদিগকেই আমি স্বেচ্ছাসেবক হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।"

মহাত্মার পুত্র মহাত্মার মতই নিরাপত্তিতে নিজের কৃত-কাজ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—কোনোরূপ আড়ম্বর বা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।

এই পুত্রের কারাদণ্ডে শ্রীমতী গান্ধী 'নবজীবন' পত্রিকাতে লিখিয়া-ছেন;—"আমার তো মাত্র দুইটি পুত্র জেলে গিয়াছে। কিন্তু ভারত-মাতার বিশ হাজার পুত্র আজ জেলে। সুতরাং আমি দুঃখ করিব কেন? ভারতমাতার যুবক সন্তানগণ, তোমরা বিশেষ উৎসাহ সহকারে খদ্দরের কাজে আত্মনিয়োগ কর। তাহাতে হয় তোমারা তোমাদের ভ্রাতৃগণকে ফিরিয়া পাইবে, অথবা তোমরাও জেলে গিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবে।"

দেবদাস গান্ধীর অভিযোগ—

যুক্তপ্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত সারাৎগঞ্জের হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী লিডার পত্রিকাতে একটি রিপোর্ট বাহির করিয়াছিলেন। রিপোর্টে চারিটি স্পষ্ট অভিযোগ ছিল—(১) পুলিশ কংগ্রেস-আফিসে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং খাতাপত্র সমস্তই অগ্নিতে নিক্ষেপ করে; (২) ভলেণ্টিয়ারদের উপর প্রহার চলে; (৩) আঘাতের ফলে একজন ভলেণ্টিয়ার পরদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়; (৪) আহতগণের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহাদিগকে তিন দিন আচ্ছাদন-শূন্য স্থানে ভীষণ রৌদ্রতাপ সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সম্প্রতি গোরক্ষপুরের কমিশনার এই রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়া এক কমিউনিক বাহির করিয়াছেন। কমিউনিকে তিনি বলিয়াছেন,

শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ গান্ধী
মহাত্মা গান্ধীর পত্নী

শ্রীযুক্ত জাহিরলাল নেহ্‌রু
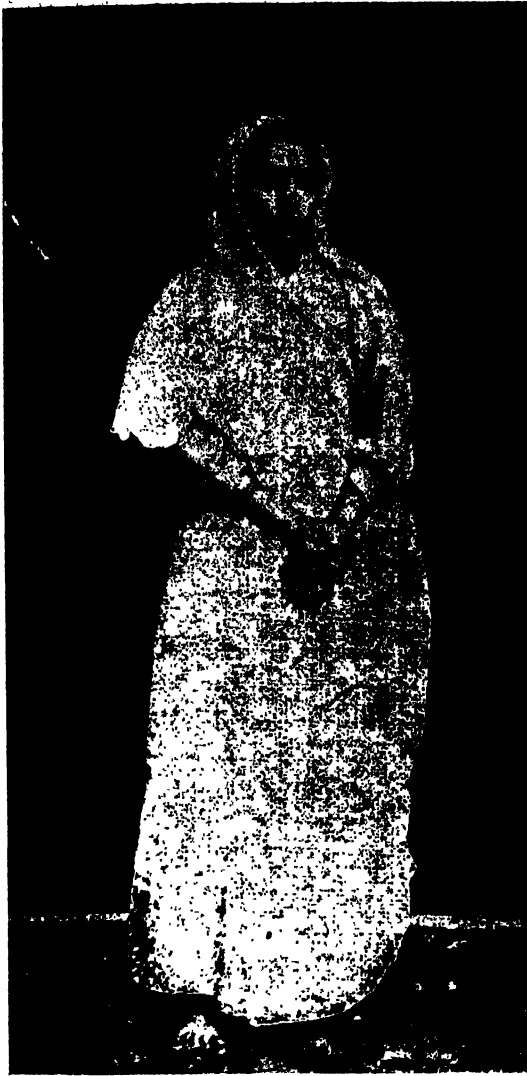
ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া জানাইয়াছেন, উক্ত লোকটির মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে। পিকেটারগণকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ যে কার্য্য করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনীয় এবং ছত্রভঙ্গ করিবার সময় কেহ কোনোরূপ গুরুতর আঘাত পায় নাই। কমিউনিকে কংগ্রেস-আফিসে অগ্নিসংযোগ এবং খাতাপত্র পোড়ানোর কোনো উল্লেখ নাই, আহতগণকে আচ্ছাদনশূন্য স্থানে ফেলিয়া রাখা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহারও তেমন কোনো প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভলেণ্টিয়ারগণ প্রহৃত হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধেও কমিউনিক নীরব। সুতরাং কমিউনিক এগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, একথা বলিলে সম্ভবতঃ কিছু অন্যায় করা হইবে না।

জাহিরলাল নেহ্‌রুর শাস্তি—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোতিলাল নেহ্‌রুর পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জাহিরলাল নেহ্‌রু গত ১১ই মে অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌ জেলে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত কেশবদেও মালবীয়, শ্রীযুক্ত অনাদি-প্রসাদ, মিঃ খুদা ইয়ার খাঁ এবং শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রাও প্রভৃতিও ধৃত হইয়াছেন। পণ্ডিত জাহিরলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতেছে, (১) বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণ আইনতঃ বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতে পারে, পণ্ডিত জাহিরলাল তাহাদের এই আইনসঙ্গত কার্য্যে পিকেটিংএর দ্বারা বাধা দিয়াছেন; (২) তিনি পিকেটিং করিবেন বলিয়া সাধারণ সভায় ভয় দেখাইয়াছেন; (৩) তিনি এলাহাবাদ কংগ্রেস-কমিটির সদস্য, কংগ্রেসের এক সভায় বক্তৃতা-কালে দেশবাসীকে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তিনি কংগ্রেসের বে-আইনি কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশবদেও মালবীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ
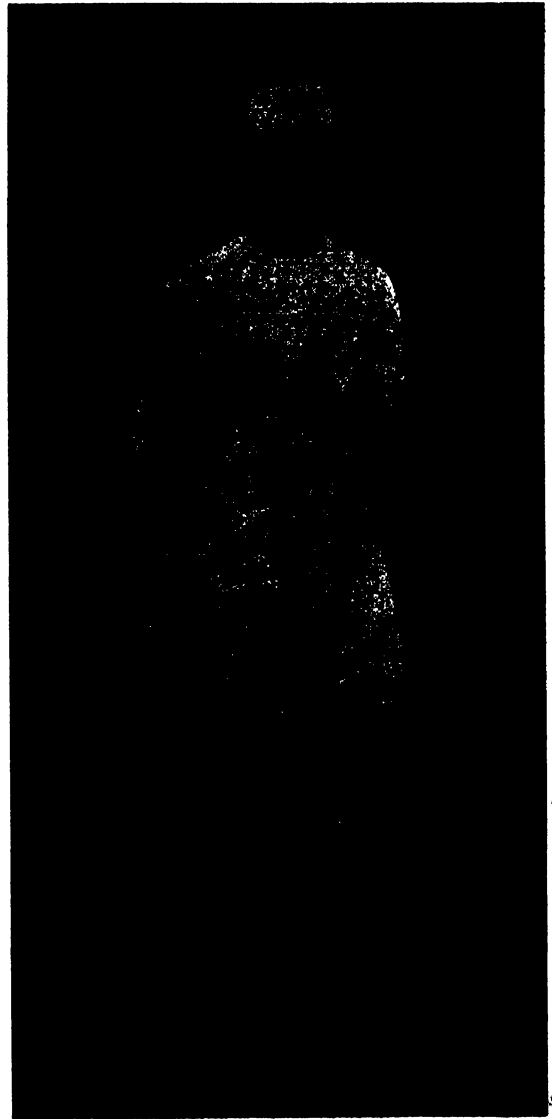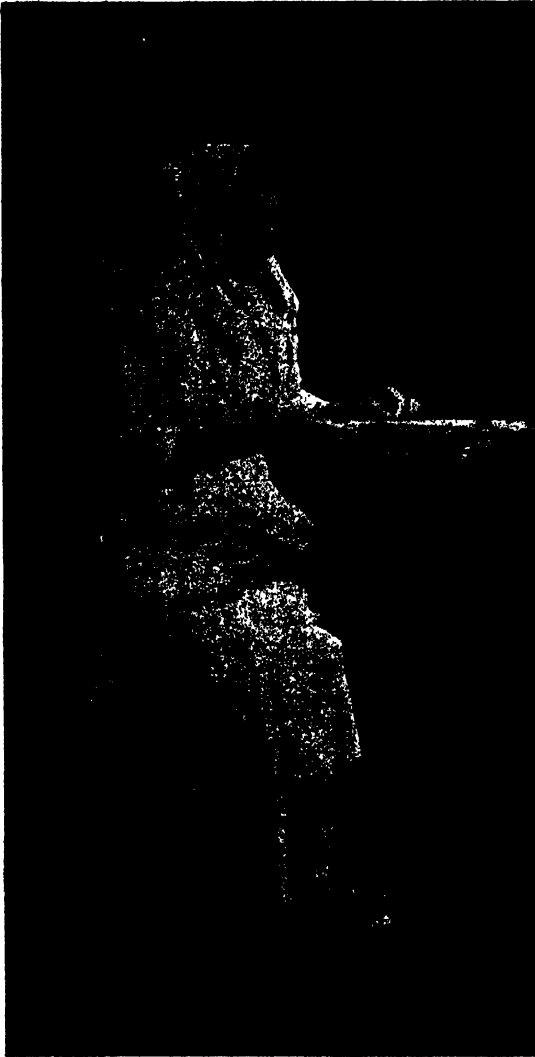
শ্রীমতী স্বরূপরাণী দেবী
পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রুর সহধর্ম্মিণী
ও
শ্রীযুক্ত জাহিরলাল নেহ্‌রুর জননী

তিনি বিদেশী-বস্ত্র-ব্যবসায়ীগণের ব্যবসার ক্ষতি এবং অবৈধ উপায়ে টাকা আদায় করিবার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য আসামীগণের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল, পিকেটিং করা ও ভয়প্রদর্শন করা। এলাহাবাদের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নক্সের এজ্‌লাসে গত ১৯শে মে ইঁহাদের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুই দফার জন্য পণ্ডিত জাহিরলালকে দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং তৃতীয় দফার জন্য ভোগ করিতে হইবে ছয় মাস। ইহা ছাড়া জরিমানা দিতে হইবে একশত টাকা। টাকা না দিলে আরো তিন মাস তাঁহাকে জেলে পচিতে হইবে। শ্রীযুক্ত কেশবদেও এবং খুদা ইয়ার খাঁর প্রতি দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী ছয়জন আসামীর প্রত্যেককে ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

পণ্ডিত জাহিরলালের জননী পুত্রের এই কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ শুনিয়া বলিয়াছেন, "আমার প্রাণাধিক পুত্রের দণ্ডের কথা শুনিয়া বেদনায় আমার বুক ভরিয়া গিয়াছে। কুসুম-শয্যায় লালিত পুত্র আমার কিরূপে জেলের কঠোরতা সহ্য করিবে তাহা ভাবিলে আমার চোখে জল আসে। আমার 'আনন্দভবন' আজ নিরানন্দ বলিয়া মনে হইতেছে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার পুত্র যেখানেই থাক্, কষ্ট পাইবে না। রামচন্দ্র বনে গমন করিলে শোক-সন্তপ্তা কৌশল্যা যেভাবে সংসারে ছিলেন আমিও সেইভাবেই থাকিব। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার পুত্রও রামচন্দ্রের মত শত্রুদলন করিয়া বিজয়ীর বেশে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে।"

সামন্তরাজ্যে রাজদ্রোহ-আইন—

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি রাজদ্রোহের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের সামন্ত-রাজ্য-সমূহও এই নোটিশের আমলে আসিবে। ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের সমর্থন ছাড়া সম্ভবতঃ এ নোটিশ বাহির হয় নাই। সুতরাং এই নোটিশের কবল হইতে অন্যান্য প্রদেশের সামন্ত-রাজ্যগুলি যে অব্যাহতি পাইবে এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। ব্রিটিশ ভারতে আজ যে জাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছে, সামন্ত-রাজ্যগুলিতেও তাহার আভাস সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ এই জাগরণকে গলা টিপিয়া নিঃশেষ করিবার জন্যই এ অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু আইন করিয়া জনশক্তির জাগ্রত প্রবাহকে বন্ধ করা যায় নাই। বাধা পাইলে তাহা বরং কূল ছাপাইয়া বিপ্লব-বন্যারই সৃষ্টি করিবে। গবর্ণমেণ্টের এই কথাটা এখন বিশেষ ভাবে বুঝিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

নিখিল-ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস-কমিটি—

হাকিম আজমল খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে এবার লক্ষ্ণৌ সহরে নিখিল-ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন বসিয়াছে। এবারকার অধিবেশনের প্রধান আলোচনার বিষয়ই হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণের আইন অমান্য করা। মহাত্মা গান্ধির কারাবাসের পর ইহাই প্রথম অধিবেশন। মহাত্মার কারাবাসে ও দেশমধ্যে পুনরায় দমন-নীতির প্রসারে লোকের মন খুব ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের বহু ব্যক্তিই গবর্ণমেণ্টের এই বর্ত্তমান দমন-নীতির বিরুদ্ধে একটা কিছু করিতে চান। তাই মহাত্মার আইন-অমান্য সম্বন্ধে আদেশ অনেকেই এখন মানিতে চাহিতেছেন না। যাহা হউক, কংগ্রেস-কমিটি অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরে ঠিক করিয়াছেন যে ৩০শে সেপ্‌টেম্বর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেশের তখনকার অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করা হইবে। লোক পাঠাইয়া দেশের অবস্থা বুঝিবার জন্য হাকিম-সাহেবের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। মতিলাল নেহ্‌রু মহাশয় কারামুক্ত হইয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অস্পৃশ্যতা নিবারণের সুব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কমিটি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ডাক-হর্‌করা

হাকিম আজমল খাঁ

নারীমঙ্গল—

রাজস্থান-রমণীর তেজ। সম্প্রতি মেবারের বেজোলিয়া নামক স্থানে পুলিশ পাঁচজন পুরুষ ও এগারজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে। ইহাতে লোকেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ঘটনা-স্থলে অনেক নরনারী আসিয়া জমা হয়। রাজস্থান সেবা-সঙ্ঘের সেক্রেটারী এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষদিগকে বুঝাইয়া সেখান হইতে সরাইয়া দেন, কিন্তু রাজপুত নারীরা তাঁহার কথা না শুনিয়া সেখানে জড় হইতে থাকে। প্রায় পাঁচশত রাজপুত নারী পুলিশকে ধরা দিতে প্রস্তুত হয়। শ্রীমতী অনা দেবী চৌধুরাণী এই দলের নেত্রী হন। অবশেষে পুলিশ যত লোক গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তাহাদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। প্রকাশ যে খদ্দর লইয়া গোলমাল বাধিয়াছিল।—মেদিনীপুরহিতৈষী

পরলোকে বীর রমণী—দক্ষিণ আফ্রিকার নেটালের "হিন্দু" পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীদয়ালের মহীয়সী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী জগরাণী দেবী সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রবাসীগণের বিশেষ ক্ষতি হইল। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সময় ভারতীয়দিগের প্রতি ঘোর নির্য্যাতন চলিতেছিল, সেই সময় নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-ব্রত-ধারিণী এই পুণ্যশীলা বীর রমণী মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণীর সহিত পুনঃ পুনঃ সানন্দে কারাগারকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। দেড় বৎসরের শিশু-সন্তানের

স্বর্গীয়া জগরাণী দেবী
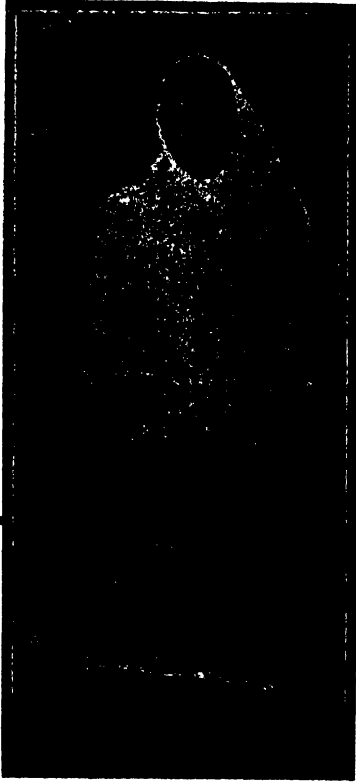
মমতাও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ইঁহার মৃত্যুতে ভারতবাসীমাত্রেই দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই।—নীহার

অদ্ভুত দৌড়দার—

মান্দ্রাজের একটি যুবক দৌড়বাজিতে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেছেন। ইঁহার নাম এন বরদারাজুলু নাইডু। ইঁহার বয়স মাত্র বাইস বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই সাঁতারে, লাফানোয়, ভার তোলায় ও দৌড়ে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালোর এবং মহীশূরে ইয়ং মেন্‌স্ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের নানা রকম ক্রীড়ায় ইনি বহুবার জিতিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার সবচেয়ে সুনাম রটিয়াছে দৌড়-প্রতিযোগিতায়। ১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালোরে একটি নিখিল-ভারত ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে ইনি এই কয়টি দৌড়ে জিতিয়াছিলেন—

প্রথম—এক মাইল দৌড়—৪ মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড লাগিয়াছিল—প্রথম পুরস্কার।

দ্বিতীয়—পাঁচ মাইল দৌড়—২৫ মিনিট—প্রথম পুরস্কার।

তৃতীয়—২২ মাইল দৌড়—১ ঘণ্টা ৫২ সেকেণ্ড—প্রথম পুরস্কার।

তৃতীয় বারের দৌড়ের সময় কয়েকজন লোক বাইসাইকেলে চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াও বরাবর তাঁহার সঙ্গে চলিতে পারে নাই। এই দৌড়ে মহীশূরের যুবরাজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুবকটিকে ইংলণ্ডের ম্যারাথন রেসে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যুবকটি বাস্তবিকই ভারতবর্ষের গৌরব। যুবকটি নিরামিষাশী।
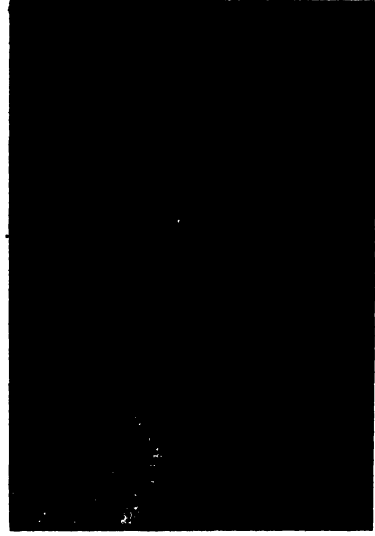
এন বরদারাজুলু নাইডু—দৌড়বিজেতা

বাংলা

পল্লীর কথা—

জলাভাবের জন্য কূপ খনন।—বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই বিষ জলাভাব উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে গত এক শতাব্দীর মধ্যে নদ-নদীগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃতি কারণে ও চতুর্দ্দিকে রেলওয়ে লাইন বিস্তৃত ও ছোট ছোট নদীগুলি উপর সেতু নির্ম্মিত হওয়াতেও এরূপ ব্যাপার অনেকটা ঘটিয়াছে দেশের সহস্র সহস্র দীঘি-পুষ্করিণীর অবস্থা শোচনীয় পূর্ব্বে বড় লোকেরা দীঘি-পুষ্করিণী কাটিয়া লোকের জলাভাব দূর কর মহা পুণ্যানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা দীঘি-পুষ্করি কাটাইয়া পুণ্য লাভ করিতেন। এক্ষণে বড়লোকেরা বিলাসিতা সমুদ্রে সাঁতার দিতেছেন। তাঁহাদের মতি-গতি আর সেরূপ নাই আবার আজকাল মজুরীর দাম অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে, দীঘি পুষ্করিণী খননও অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গের ব জমীদার, প্রজাকে পুষ্করিণী-খননের অনুমতি দেন না, ইহা ঘো অবিচার। যাহা হউক, বঙ্গের যে যে জেলায় কূপ খননের সুবিধ আছে, সে-সব অঞ্চলের সর্ব্বসাধারণ কূপ খনন করিয়া জলাভাব দূ করিতে যত্নপর হও। নিম্ন বঙ্গের যে-সকল জেলা বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়, ঐ সকল জেলায় কূপ খননের সুবিধা হইবে না। উচ্চ ভূমিতে কূপ খননের সুবিধা আছে। সাধারণ কূপ খননে বোধ হ খরচও বেশী নয়। ১৫৲—২০৲ টাকা হইতে ৩০৲—৪০৲ টাকা স্থানবিশেষে কূপ খনন করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য স্থানে স্থানে ঐরূপ কূপ-খননের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়-জঙ্গল পানা ও শৈবালাদি-পূর্ণ পুষ্করিণীগুলিও গ্রামবাসিগণ পরিষ্কার করিয়া লইলে জলাভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।—নবযুগ

পল্লীর জলকষ্ট ও স্বাস্থ্য।—চারিদিক হইতেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে এবার জলকষ্টের জন্য লোকে দূষিত পানীয় ব্যবহার

করিয়া কলেরায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের তহবিল শূন্য বলিয়া লোকের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য পুলিশ-খরচা বৃদ্ধির কোন বাধা হইতেছে না, কিন্তু লোককে বাঁচাইবার প্রতি কোন দৃষ্টি পড়ে না। জলকষ্টে প্রজাকুল মরিয়া গেলেও জনবহুল দেশে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ভারতে এরূপ হইতে দিলে কোন দোষ হয় না সত্য; কিন্তু বিলাত হইলে আর এরূপটি হইতে পারিত না। এ যে পরানুগ্রহজীবী জাতির কপালে বিধাতার কলমের খোঁচা। উল্টাইবে কে?—জাগরণ

মার্কিনে কচুরি-পানা-নাশের এক সুন্দর উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কচুরি-দ'মের উপর যদি অত্যন্ত গরম জলীয় বাষ্প ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। মার্কিনের লাইসিয়েনা এবং ফ্লোরিডা অঞ্চলের জলপথগুলি কচুরি-পানায় পূর্ণ হইয়া নৌকা-যাতায়াতের পথ আটক করিয়া ফেলিয়াছিল। এই উপায় অবলম্বন করিয়া তথায় সেই জলপথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রজাদের পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব। তবে সরকার যদি এই বিষয়ে সহায়তা করেন, তাহা হইলে এই উৎপাতের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে।—নবযুগ

আমাদের অক্ষমতা ও বিদেশীর লাভ—

চিনির কথা—ভারতে যত চিনি উৎপন্ন হয় এত আর কোথাও হয় না; আবার ভারতের লোক যত চিনি খায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোক তত চিনি খায় না। সকল রকম খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একমাত্র চিনিই কেবল বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

নিম্নলিখিত কয়েক বৎসরে ভারতে কত-পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল ও কত-পরিমাণ কাঁচা ইক্ষুজাত চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	চিনির পরিমাণ টন	জমির পরিমাণ একার
১৯১১-১২	২৪,৫০,৮০০	২৩,৮২,৫০০
১৯১৩-১৪	২২,৯৭,৫০০	২৫,৩৬,৯০০
১৯১৫-১৬	২৬,৩৩,০০০	২৩,৯১,০০০
১৯১৭-১৮	৩৪,৩৪,০০০	২৮,৫২,০০০
১৯১৯-২০	৩০,৩৬,০০০	২৬,৮৬,০০০
১৯২০-২১	২৪,৬৫,০০০	২৫,৫৩,০০০

১৯১৩-১৪, ১৯১৯-২০, এবং ১৯২০-২১ এই তিন বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে যে চিনি আমদানি হইয়াছিল তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৩ হাজার, ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত এবং ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯ শত টন। অর্থাৎ বিদেশ হইতে আমদানি চিনির পরিমাণ দেশজাত চিনির ষষ্ঠাংশ। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারতে বৎসর বৎসর যে-পরিমাণ চিনি খরচ হয় তাহার অধিকাংশ ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলেও বিদেশী চিনি কিনিবার জন্য ভারতকে বৎসর বৎসর ১৪ কোটী হইতে ১৭ কোটী টাকা খরচ করিতে হয়। এই ১৪ হইতে ১৭ কোটী টাকার সমস্তটাই বিদেশের ইক্ষুচাষী চিনি-প্রস্তুতকারক ও বিদেশী সওদাগরদের উদরসাৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থাটা আমাদের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের ইক্ষুচাষকারীদের পক্ষে একটুও আনন্দের কথা নহে। যদি এইভাবে বিদেশী চিনির আমদানী বাড়িয়া যায় তাহা হইলে কালে যে আমাদের শর্করা-শিল্প বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।—মোহাম্মদী

অলসের বিলাস-ব্যয়—

আফিংএর খরচ ও উহার পরিমাণ—গত ১৯১৯।২০ সালে ভারত-বাসীরা ১০৯৪৬ মণ আফিং উদরস্থ করিয়াছে। ১৯২০-২১ সালে ভারত হইতে ১৪২১৫ মণ আফিং বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং উহার মূল্য বাবদ আদায় হইয়াছে ৩০৪৩৭৭৫০ টাকা।—নবযুগ

হর্ষ-বিষাদের সংবাদ—

গত এপ্রিল মাসে বাঙ্গলা দেশে ৩৮টি নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মূলধন দেড় কোটী টাকা। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত এপ্রিল মাসে নাকি ২৩টি কোম্পানী ফেল হইয়াছে। তাহাদের মূলধন ৭ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকা।—যশোহর

বস্ত্র-কথা—

দেশে যাতে খদ্দর উৎপাদন ভালো ভাবে হতে পারে তার জন্য কংগ্রেস-কমিটি শেঠ যমুনালাল বাজাজের হাতে ১৭ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকা বয়ন-শিল্প শিক্ষা, খদ্দর তৈরি আর তার বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হবে

এই সতেরো লক্ষ টাকা কি ভাবে খরচ করা হবে তারও একটা আঁচ দেওয়া হয়েছে।

বয়ন-শিল্প শিক্ষার জন্য	২৫,০০০৲
বিক্রয়-বিভাগ	২,০০,০০০৲
উৎপাদন-বিভাগ	২০,০০০৲
প্রচার-বিভাগ	১,০০,০০০৲
বিভিন্ন প্রদেশে ধার	১,৩৫,৫০১৲

—জাগরণ

সুতার চাষ।—চট্টগ্রাম কাষ্টম-অফিসের উত্তর দিকে মাদারবাড়ী গ্রামে মুন্সী আবদুল লতিক কেরাণীর বাসায় এক-রকম সুতার গাছ আছে। এই গাছ ৮।১০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে ও খুব বড় হয়। চরকায় কাটিলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতা বাহির হয়। এই সুতা পাহাড়িয়া সুতা হইতে অনেক শক্ত।—সম্মিলনী

স্বাধীন জীবিকার আয়োজন—

নূতন দেশলাইর কল—কলিকাতা বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানীর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেশলাই তৈয়ারীর নূতন একরূপ কল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কলে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে এক দিনে ২০ লক্ষ কাঠি প্রস্তুত হইবে এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসাবে কল চালাইলে প্রত্যহ কাঠি-সমেত বাক্স ৫০ গ্রোস পরিমাণ প্রস্তুত হইতে পারিবে। অল্প মূলধনে এই কলে কাজ চলিবে। আবিষ্কর্তার উদ্যম প্রশংসনীয়। দেশে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইলে এই পর-প্রত্যাশী দেশের যে অনেক উপকার হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। —নীহার

দেশলাই-কল স্থাপন।—রাণাঘাটের রেল-ষ্টেশনের সন্নিকট রেলের অপর পার্শ্বে একটি ছোট-রকমের স্বদেশী কোম্পানী দেশলাই কল কিনিয়া দেশলাই প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। ইহা একটি সুসংবাদ। —বঙ্গরত্ন

সদনুষ্ঠান—

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ—বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ কলিকাতা হইতে পাঁচ মাইল দূরে, বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যাদবপুরে ১০০ বিঘা জমি ৯৯ বৎসরের জন্য লিজ লইয়াছেন। এই জমির উপর পাঁচ শ জন ছাত্র থাকিবার মত একটি ছাত্রাবাস, একটি কলেজ, এবং পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক-বিদ্যা ও বৈদ্যুতিক-বিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাগার এবং কারখানা তৈয়ারি করা হইবে। ইহা করিতে পাঁচ ছয় লক্ষ

টাকা খরচ পড়িবে। বেঙ্গল টেকনিকাল ইনষ্টিটুট এইখানে স্থানান্তরিত করা হইবে। স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষের দানের উপর নির্ভর করিয়া এই পরিষদ এত বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে সাহস করিয়াছেন। —বন্দেমাতরম্

রাজসাহীতে আজ পর্য্যন্ত সাতটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে সুপ্ত নর-নারায়ণকে জাগাইতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই ধন্য। —যশোহর

দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের গ্রেপ্তারের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, পুত্রবধূ, কন্যাগণ এবং শ্রীযুত দাশের ভগ্নী মহোদয়া প্রভৃতি দেশের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে ব্রতী হন। ফলে তাঁহারা মোট ৭৪৬০১।৶৬ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য এই ফণ্ডে শ্রীযুক্ত দাশও ৯৮১২. টাকা দান করিয়াছিলেন, এই মোট ৮৪৪৭৩।৶০ হইতে ২৩২০১৲ টাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতিতে এবং ৩০০০৲ টাকা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিতে এবং যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিয়াছে তাহাদের নিরন্ন পরিবারের সাহায্যের জন্য ৫০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর হাতে মোট ৫২২৭২।৶৬ আছে। তিনি সাধারণকে জানাইয়াছেন যে উক্ত টাকা কংগ্রেস ও খেলাফতের জন্য ব্যয় করা হইবে।—যশোহর

দান।—কলিকাতার তালতলার পাল-বংশীয় স্বর্গীয় রাইচরণ পাল মহাশয় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করিয়া গিয়াছেন। দাতার করপোরেশন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে অধ্যক্ষ বাবু গিরীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে স্কুলের উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি মহোদয় কার্য্যকরী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। —সম্মিলনী

দান।—'সার্ভেণ্টে' প্রকাশ জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রাষ্ট্র-সমিতির সম্পাদকের নিকট গত শনিবার ৫০০০ টাকা তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালী এবং নিজের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। এমন নিঃস্বার্থ দানের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা দেশে বিরল।

—এডুকেশন গেজেট

প্রবলের অত্যাচার—

শ্রীহট্টে পুলিশের অত্যাচার—"বলিতে লজ্জা হয়, পুলিস ঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের বলিতেছে কোমরে কাপড় বাঁধিয়া মাটি গোঁড়ো। বরং আমরা আরও শুনিয়াছি যে একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত এই আদেশ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।"

"অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় প্রত্যহ সংবাদ আসিতেছে যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের অন্দরবাড়ীতে, যেখানে আগে পুলিস ঢুকিতে দ্বিধা বোধ করিত, সেখানে এখন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেছে। সাধারণ লোক বড়ই ভয় পাইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলায় অত্যাচারের মাত্রা যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে পল্লীবাসী বোনদের সসম্মানে থাকাই দায় হইয়া উঠিয়াছে। একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, বঙ্গের কোথাও এরূপ অত্যাচার হইতেছে না।"

নিবেদিকা

—মোহাম্মদী শ্রী—

সমাজের অত্যাচার—

বধূ-নির্য্যাতন—আহিরীটোলার বধূ-নির্য্যাতন মামলায় বধূ-নির্য্যাতনের যে কদর্য্য চিত্র লোকগোচর হইল, তাহাতে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের এতটুকু লজ্জা হইয়াছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে যে সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজের মাথা নত হইল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহাও বলি, বাঙ্গালার অন্তঃপুরে যে বালিকা-বধূরা কিরূপ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়, সে সংবাদের আভাসও ইহার সহিত প্রকাশ হইয়া পড়িল। এরূপ অত্যাচার কেন হয়? দুর্ব্বলকে অসহায়কে পীড়ন করিবার যে সুখ, সেই সুখ-লাভই কি ইহার কারণ? আহিরীটোলার বালিকা বধূর উপর অত্যাচারের কাহিনী পড়িয়া বাঙ্গালী শিহরিয়া উঠিয়াছে—ইহা সত্য। কিন্তু আজও গৃহে গৃহে যে-সকল বধূ নির্য্যাতিত হইতেছে, তাহাদের নির্য্যাতন কমিবে কি? বালিকা বধূর নির্য্যাতনের দুইটি কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রথমতঃ তাহাদের অসহায় অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ বরপক্ষীয়ের এবং কন্যাপক্ষীয়ের মধ্যে তত্ত্ব-তাবাস লইয়া অর্থের সম্পর্ক। আহিরীটোলার বধূ-নির্য্যাতনের ব্যাপারে হয়ত অর্থ লইয়া কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু আনন্দময়ী একান্ত অসহায় বলিয়াই পাষণ্ডেরা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিয়াছে। বাঙ্গালীর সমাজ-বন্ধন আজ এতই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সমাজের আজ এতই অধঃপতন ঘটিয়াছে, যে, চক্ষের সম্মুখে অত্যাচার দেখিয়াও অত্যাচারের কোনও প্রতিকারই করিতে পারিতেছে না। —বন্দেমাতরম্

দেশহিতকর কাজ—

গো-বধ—ফরিদপুর সহরের মিউনিসিপালিটির সীমার মধ্যে গো-বধ হইতে পারিবে না, ফরিদপুর মিউনিসিপালিটি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।—কাশীপুরনিবাসী

সেবক

ভারতে মদের আমদানী

(স্পিরিট সহ)

সন	মূল্য (টাকা)	সন	মূল্য (টাকা)
১৯১৫—১৬ ইং	১৮৭৩৪০০০৲	১৯১৮—১৯ ইং	৩৩০২১০০০৲
১৯১৬—১৭ ইং	২৩৩০১০০০৲	১৯১৯—২০ ইং	৩৩৭৪১০০০৲
১৯১৭—১৮ ইং	২৪৯৯৬০০০৲	১৯২০—২১ ইং	৪৯০০২০০০৲

শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ চৌধুরী

ঘাস

(গান)

কখন্　বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে।
ঐ　ঘাসের ঘন ঘোরে
ধরণীতল হল শীতল
চিকন আভায় ভরে ;
ওরা　হঠাৎ-গাওয়া গানের মত
এল প্রাণের মেঘে ॥

ওরা যে এই প্রাণের রণে
মরু-জয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের
প্রথম যুগের চেনা।
তাই　এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি
ওদের খেলাঘরে।
ওদের　দোল্ দেখে আজ প্রাণে আমার
দোলা ওঠে জেগে ॥

বর্ষা-প্রাতে

(গান)

আজি　বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ-আলো মেশে।
বেণুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে ॥

এই　ঘাসের ঝিলিমিলি,
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
এক তালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে,
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে,
ওঠে আকুল হেসে ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাটির তলায় আগুন

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলায় পাচদোনা গ্রামে যাইয়া জানিতে পারিলাম যে সেখান হইতে কয়েক মাইল দূরে একটি মাঠে কৃষকের তামাক খাবার আগুন হইতে একটি মাঠের মাটীর নীচে আগুন লাগিয়াছে। আমরা ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমদিয়া গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সহ সেই মাঠে যাই। গিয়া দেখি বহু বহু বিঘা স্থান ব্যাপিয়া মাটীর নীচে দিবারাত্রি আগুন জলিতেছে; কত বৃষ্টি গেল, মাঠের উপর দিয়া জলের প্রবাহ বহিয়া গেল, তবুও আগুন জলিতেছে। ক্ষেত্র রক্ষার জন্য গভীর পরিখা কাটা সত্ত্বেও আগুন ৩০০।৪০০ হাত দূরে মাটী ভেদ করিয়া বহু বহু ছিদ্র দিয়া ধূম উদ্গার করিতেছে। বহু বহুদূর ব্যাপিয়া কেবলি অসংখ্য ছিদ্রপথে ধূম উদ্গিরণ করিতেছে। বাছুর, শিয়াল, সাপ, প্রায়ই আগুনে পড়িয়া মারা যায়। স্থানীয় কৃষকেরা বড় ভয় পাইয়াছে। এখানে কি কোন-প্রকারের কয়লা আছে? স্থানটি বিল, তার চারিদিকে লাল টিলা, কঙ্করে ভরা মাটী, স্থানটির নাম সাতগাঁয়ের বিল। ঢাকা হইতে জিনায়দী ষ্টেসন (A. B. Ry.), তথা হইতে ৭ মাইল বা ষ্টীমার ষ্টেসন ভাঙ্গা হইতে ৫ মাইল। এখানে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন
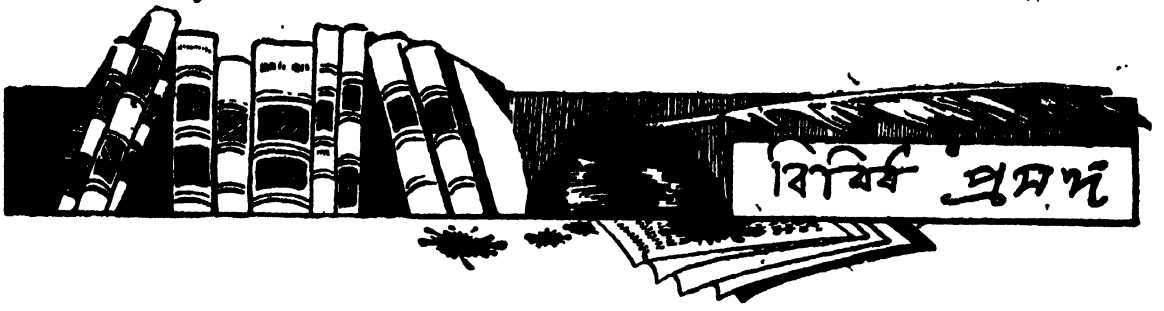
স্বাধীনতার ফল

আগে বীজ না আগে গাছ, আগে ডিম না আগে পাখী, এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, তেমনি মানুষের কোন্ সদ্গুণ স্বাধীনতার কারণ বা স্বাধীনতার ফল, কোন্ দোষ পরাধীনতার কারণ বা তাহারই ফল, তাহা বলাও কঠিন। এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা না করিয়া দুই-একটি বিষয়ে স্বাধীন ও পরাধীন জাতিদের মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করিব।

ইংরেজরা, বিশেষতঃ ইংরেজ খৃষ্টীয়ান মিশনারীরা, আমাদের কোন দোষ দেখাইয়া তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য সমাজের, বিশেষতঃ ইংরেজ সমাজের, নানা দোষের উল্লেখ করিয়া বলেন, "তোমরা নিজের দেশে এত দুর্নীতি থাকিতে আমাদের জন্য এত মাথা ঘামাও কেন? আগে নিজেদের দোষ শুধ্‌রাও, তাহার পর বিদেশে আসিয়া পরের দোষের চর্চ্চা করিও।" উত্তেজিত হইয়া এরূপ কথা বলা কতকটা স্বাভাবিক বটে; কিন্তু এখন ইহার ন্যায্যতা বা অন্যায্যতার আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এখানে ইহাই বলিতে চাই, যে, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা নিজেদের সমাজের দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া যে-পরচর্চ্চা করে, একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইংলণ্ডে বা পাশ্চাত্য দেশ-সকলে যে-সব দোষ আছে, তাহার প্রত্যেকটিই সেই-সব দেশের লোকদের কাহারো না কাহারো চোখে পড়িয়াছে, এবং যাঁহারা দোষ দেখিয়াছেন, তাহার সংশোধনের প্রবল চেষ্টাও তাঁহারা কেহ না কেহ করিতেছেন। পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা সকলেই ঘরের দোষে অন্ধ হইয়া পর-ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত, ইহা সত্য নহে।

স্বাধীন জাতি-সকলের অনেকের মধ্যে এরূপ শক্তি ও মহাপ্রাণতা আছে, যে, তাহারা পরের দুঃখ-দুর্গতির খবর রাখিতে পারে, এবং তাহা মোচনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে। পেশাদার মিশনারী ও জনহিতসাধক যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু খাঁটি ধার্ম্মিক প্রচারক ও জন-হিতসাধকও স্বাধীন জাতি-সকলের মধ্যে অনেকে জন্মিয়াছেন। পরাধীন-জাতীয় কয়জন লোক কুষ্ঠ রোগের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, কয়জন কতগুলি কুষ্ঠ হাঁস্‌পাতাল ও আশ্রম, অন্ধাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন ও পরি-চালন করেন, কয়জন নরখাদক অসভ্যজাতিদের উপকার করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন? ইহা নিশ্চিত, যে, স্বাধীনতা মানুষের শক্তি, মহাপ্রাণতা, এবং হৃদয়ের উদারতা, মানস দৃষ্টির প্রসার ও বৃদ্ধি করে।

স্বাধীন ফ্রান্সের লোকেরা আমেরিকান্‌দিগের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল, গ্রীসের স্বাধীনতা-সমরে স্বাধীন ইংলণ্ডের কবি বায়রন্ ও অন্য ইংরেজরা সহায় হইয়াছিল। এরূপ সাহায্য করিবার শক্তি ও সুযোগ পরাধীন জাতিদের নাই।

জনহিতসাধন ব্যাপারেই যে স্বাধীন জাতিদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। অন্যবিধ নানা দুঃসাধ্য কার্য্য সাধনেও তাহারা অগ্রণী। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার স্বাধীন জাতীয় লোকেই করিয়াছে। হিমালয় আমাদের দেশের পর্ব্বত; কিন্তু তাহার উচ্চতম শৃঙ্গ-সকল আরোহণ করিতেছে স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা; কিন্তু এই দেশেরই কুলিরা তাহাদের সঙ্গে ভারবাহী হইয়া যাইতেছে।

জ্ঞানরাজ্যেও স্বাধীনতার জয়। বিজ্ঞানে, দর্শনে, ইতিহাসে, শিল্পে, আজ ইউরোপ-আমেরিকার স্বাধীন জাতিরাই অগ্রণী। এশিয়ার জাপানও ভারতবর্ষের একশত বৎসরেরও অধিক কাল পরে পাশ্চাত্য সংস্পর্শে আসিয়াছে।

কিন্তু স্বাধীনতার গুণে সেই জাপান জ্ঞানরাজ্যে অন্য সব এশিয়াবাসীকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে।

পরাধীন জাতিসকলের শক্তিহীনতার অন্য সব কারণের আলোচনা না করিয়া একটার উল্লেখ এখানে সহজেই করিতে পারি। আমরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশায় এরূপ অভিভূত, তাহা দূর করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি এতটা ব্যয়িত হয়, যে, আমরা পরের ভাবনা ভাবিতে পারি না। তা ছাড়া, একথা ত আছেই, যে, যে নিজে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, সে কেমন করিয়া অপরের সিদ্ধি লাভের সহায় হইবে ?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে শ্রমজীবীদের অন্যতম প্রতিনিধি (এখন পরলোকগত) মিঃ কেয়ার হার্ডিকে "শ্বেত কুলি সর্দ্দার" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কেয়ার হার্ডি ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের অন্যতম নেতা ছিলেন বটে। কিন্তু ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ ; সেখানকার প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত শ্রমজীবীদের সঙ্গে আপোষে মিট্‌মাট করিবার জন্য তাহাদের সহিত ভদ্রভাবে নানা সর্ত্তের আলোচনা করিতে বাধ্য হন। পরাধীন দেশের রাজা মহারাজা ত দূরে থাক্, জগন্মান্য নেতা গান্ধীও সে ভদ্রতা গান্ধী-রেডিং-সংবাদ উপলক্ষ্যে বড়লাটের নিকট হইতে পান নাই।

স্বাধীন দেশ-সকলের অজ্ঞাতনামা অতি সামান্য লোকেরও যে তেজ, যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ন্যায়ের ও সত্যের পক্ষে দাঁড়াইবার যে ক্ষমতা, সকল বিষয়ে যে মনুষ্যত্ব অনেক সময়ে দেখা যায়, তাহা পরাধীন দেশের খ্যাতনামা ধর্ম্ম- ও সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, সম্পাদক, বক্তা প্রভৃতিদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। পরাধীনতা আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়াছে, না, মনুষ্যত্ব না থাকাতেই আমরা পরাধীন হইয়াছি, তাহার মীমাংসা নাই বা হইল ? আমাদের মনুষ্যত্ব নাই, মনুষ্যত্ব চাই, এই কথাই অতি সামান্য অখ্যাতনামা লোকদের যেমন প্রণিধানযোগ্য, তেমনি কৃতীতম ও প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিদেরও প্রণিধানযোগ্য।

পাশ্চাত্য দেশের লোকদের হাজার দোষ থাকিলেও, তাহারা আমাদের যে যে দোষ দেখায়, তাহা সত্য সত্যই আমাদের আছে কি না, তাহাই আমাদের বিচার্য্য ; যে যে দোষ আমাদের আছে, তাহার সংশোধনই আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য।

—

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বৈকুণ্ঠনাথকে দারিদ্র্যের যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। সেই বৎসর ১২শে মার্চ্চ তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার অসাধারণ সাফল্যের কথা অনেকেরই জানা আছে। ১৯১৪ সালে এই ব্যবসায়ে তাঁহার ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্মরণশক্তি সকলকে বিস্মিত করিত। তিনি গত ১৩ই মে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বহরমপুর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। যখন গবর্ণমেণ্ট বাংলায় জেলা বোর্ডে বেসর্‌কারী চেয়ার্‌-ম্যান নিয়োগ করেন, বৈকুণ্ঠনাথই প্রথম বে-সর্‌কারী চেয়ার্‌ম্যান হন। তাঁহার কার্য্যের সাফল্যে সমগ্র বাংলায়

সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর করেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দেন।

কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে বৈকুণ্ঠনাথ সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের যে যে স্থানে অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই বৈকুণ্ঠনাথ যোগদান করিয়াছিলেন। মিসেস্ বেসাণ্ট্ যখন কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হুগলিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিকে মফঃস্বলে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

জন্মস্থানের প্রতি বৈকুণ্ঠনাথের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। পূজার অবকাশে যখন সকলে দার্জ্জিলিং সিমলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গমন করেন, তিনি প্রতি বৎসর সেই পাড়াগাঁতে সপরিবারে যাইতেন এবং বিপুল আয়োজনে শারদীয় পূজা করিতেন। গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি ৩।৪টি পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ গ্রামবাসীদের জন্য পিতামাতার নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ছাত্রদিগের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। রুগ্ন ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন।

তিনি চিরদিনই স্বদেশী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্ব হইতে তিনি স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিবার কথা বলেন। আজ যে কলিকাতা পটারি ওয়ার্ক্‌স্ দেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তিনিই সেই পটারির মূল ভিত্তি। তিনি দেশীয় আরও অনেক ব্যবসায়ের ডিরেক্টার ছিলেন, এবং স্বদেশী আন্দোলনের পরে তাঁহার জন্মস্থানে তাঁতের ব্যবস্থা করেন।

বৈকুণ্ঠনাথ অতিশয় দয়ালু ছিলেন। দুঃখী তাঁহার দ্বার হইতে রিক্ত-হস্তে কখনও ফিরে নাই। ২০ জন ছাত্রের পড়িবার ব্যবস্থা এবং তাহাদিগের আদ্যোপান্ত খরচ ৪০ বৎসর ধরিয়া বৈকুণ্ঠনাথ দিয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার দয়ায় ৭০০।৮০০ বাঙ্গালী পরিবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাঁহার মত গৃহকর্ত্তা বর্ত্তমান যুগে বিরল। অভ্যাগত তাঁহার বাড়িতে আসিলে তিনি কৃতার্থ মনে করিতেন। ভোজন করাইয়া ও অতিথির সেবা করিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা যেন মিটিত না।

শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়

কোন মানুষের কেবল একটা হাত, একটা পা, একটা চোখ, একটা কান কার্য্যক্ষম থাকিলে তাহাকে সমর্থ মানুষ বলা যায় না; কারণ বস্তুতঃ সে সমর্থ নহে। জাতি ও
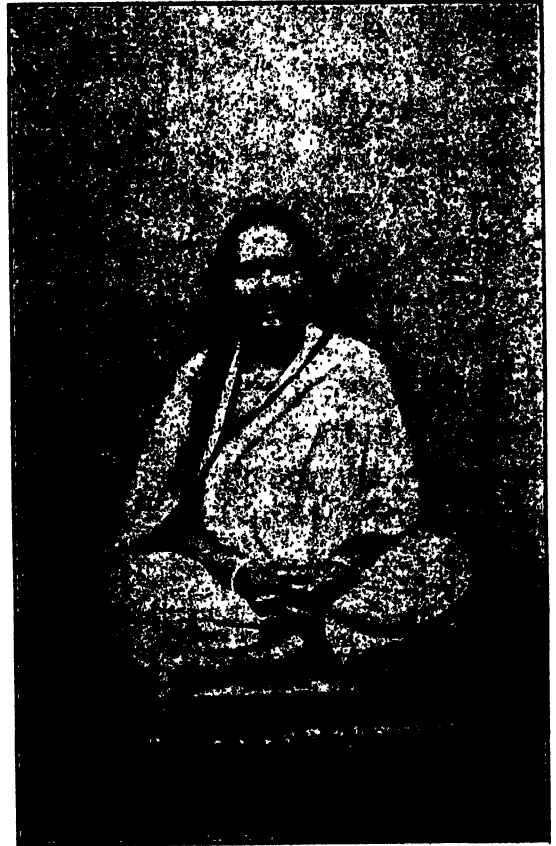
শ্রীশ্রী গৌরীপুরী দেবী
শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম
ও হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী

সমাজেও কেবল পুরুষের শিক্ষা ও শক্তি বাড়িলেই জাতি ও সমাজ উন্নত, বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। মহিলা-কুলেরও শিক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। সুখের বিষয় ইহা এখন আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তদনুসারে কাজ করিতে কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছেন। "শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দুবালিকা-বিদ্যালয়" এইরূপ একটি চেষ্টার ফল। ইহার একটি বিবরণপত্রী হইতে জানা যায়, যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্যা আবাল্যসন্ন্যাসিনী শ্রী গৌরীপুরী দেবী অন্যূন ত্রিশবৎসর কাল হিমাচলের নিভৃত প্রদেশে তপস্যার পর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পর্য্যটন কালে মাতৃজাতির অবনতি এবং দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যথিত হন। তাঁহার গুরুদেবের আদেশে তপোবনের অনাবিল শান্তি ত্যাগ করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল তিনি মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তদবধি একমনে অক্লান্তভাবে ইহার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন।

"বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি এবং হিন্দি ও ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। শিল্পচর্চ্চার মধ্যে বর্ত্তমানে সেলাইকার্য্য, সুতাকাটা এবং বস্ত্র-বয়নের উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে; ক্রমে অন্যান্য গৃহশিল্প শিক্ষার বন্দোবস্তও হইবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সুশিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীগণই বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।"

চিরকৌমার্য্যব্রতধারিণী জনসেবিকা এবং সুগৃহিণী, উভয় প্রকার আদর্শ নারীর উপযোগী শিক্ষা এখানে দিবার চেষ্টা করা হয়। ইহার কয়েকটি ছাত্রী সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আমরা এই বিদ্যালয়ে নির্ম্মিত তোয়ালে দেখিয়া প্রীত হইয়াছি।

আশ্রম ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে হইলে ৫ বি রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় শ্রীশ্রী গৌরীপুরী দেবীর নিকট পত্র দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে হইবে। উহার সাহায্যার্থ টাকাকড়িও ঐ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।

—

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয়

গিরিডি বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা "মহিলা মজলিস্" বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। গিরিডি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে বালিকারা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইতে পারে। বাংলাদেশে নারীশিক্ষার এই একটি অন্তরায় আছে, যে, বালিকাদের বয়স একটু বাড়িলেই তাহারা আর স্বচ্ছন্দে খোলা জায়গায় চলাফিরা করিতে পারে না; তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক-চালনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত অঙ্গচালনা না হওয়ায় দৈহিক ক্ষতি হয়। গিরিডিতে এই ব্যাঘাত নাই। তথায় বালিকা ও মহিলারা স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন; ইহা তথাকার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

—

নারীশিক্ষা-সমিতি

বাংলাদেশে বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষার নিমিত্ত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নারীশিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয়। বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, এই-সব বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা, মাতাদিগকে শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা শিখাইবার ব্যবস্থা করা, গৃহশিল্প শিখাইবার বন্দোবস্ত করা, এবং অসহায়া বিধবা ও অন্য নিঃস্ব স্ত্রীলোকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার মত শিক্ষা দিবার জন্য আশ্রম ও শিক্ষালয় স্থাপন, এই সমিতির উদ্দেশ্য। এপর্য্যন্ত সমিতি দশটি নূতন স্কুল স্থাপন এবং একটি পুরাতন স্কুলকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চারিটি কলিকাতায়, এবং বাকীগুলি চব্বিশ-পরগণা ও হুগলী জেলায় স্থিত। সাড়ে ছয় শতের উপর ছাত্রী এই-সব স্কুলে শিক্ষা পাইতেছে। সমিতি কলিকাতার ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে প্রসূতি ও শিশুর কল্যাণ-সাধন বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সচিত্র বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নিবারণচন্দ্র মিত্র, ও

শ্রীমতী অবলা বসু
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী
(তৈলচিত্র হইতে)

করেন। যে-যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইবে, তথাকার স্কুল তত্রত্য বালিকা ও মহিলাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ-সাধন-চেষ্টার কেন্দ্র হয়, সমিতির এইরূপ ইচ্ছা। গ্রামের লোকেরাই স্থানীয় স্কুল-কমিটির অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হন।

সমিতি দুঃস্থা নারীদের, বিশেষতঃ বিধবাদের, সাধারণ শিক্ষা ও অর্থকর শিল্প আদি শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম অনুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে—

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন।

এই বাণী-ভবনের কিছু বিবরণ গত মাসের প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে ইহাও লেখা হইয়াছে, যে, শ্রীমতী হরিমতি দত্ত ইহার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই দানশীলা মহিলা কলিকাতা ইটালী বেনিয়াপুকুর নিবাসী ৺ পরাণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী। তিনি কাশীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহার স্বামীর নামে একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং দুটি রোগীর শয্যার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তদ্ভিন্ন এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে (বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে) দশহাজার টাকা দিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়া নারীশিক্ষা-সমিতির ও বিদ্যাসাগর বাণীভবনের সম্পাদিকা। সমিতির ও বাণীভবনের কার্য্যের জন্য বিস্তর টাকার প্রয়োজন। বাণীভবনের জন্য জমী বা বাড়ী ক্রয় করিতে হইবে, এবং কেবল

তেজেন্দ্রনাথ রায় ডাক্তার মহাশয়েরা বারটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আহিরীটোলা ও ভবানীপুরে আরো দুটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে দুঃস্থা মহিলাদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত কোন কোন শিল্প শিখাইবার উপযোগী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। সেখানে আপাততঃ চরকায় সুতা কাটা, হাতের তাঁতে কাপড় বোনা, সেলাইয়ের কাজ, এবং মোরব্বা জেলী ও চাটনী তৈয়ার করিতে শিখান হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চব্বিশ-পরগণা, হুগলী, হাবড়া ও নদিয়া জেলায় সমিতি অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা

শ্রীমতী হরিমতী দত্ত

জমী কিনিলে সমুদয় ঘর বাড়ী, ও জমীসহিত বাড়ী কিনিলে বাড়ীও কিছু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। টাকাকড়ি সম্পাদিকার নামে ১০৫ নং আপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দান সাদরে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

—

শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ গান্ধীর অভিভাষণ

মহাত্মা গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের প্রতি অবিচার দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ গান্ধী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর কার্য্য গৃহে ও বাহিরে উভয়ত্রই করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে পতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী সাধুশীলা পত্নী লক্ষ লক্ষ আছেন। অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র গৃহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অন্তঃপুরিকারাও বাহিরের কাজের খবর লইতেছেন এবং কেহ কেহ কর্ম্মীও হইতেছেন। শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ গৃহে ও বাহিরে স্বামীর সহকর্ম্মী বহু-বৎসর পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যেমন জাতীয় সম্মান বজায় রাখিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় জেলে গিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীও তদ্রূপ ভারতনারীগণের সম্মান রক্ষার্থ জেলে গিয়াছিলেন; কারণ তখন দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ভারত-প্রচলিত হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গণ্য না করায় দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত বিবাহিতা ভারতনারীরা তথাকার আইনের চক্ষে বিবাহিতা পত্নী বলিয়া স্বীকৃত হইতেছিলেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ গান্ধী গৃহে ও বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি গুজরাটের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তিনি সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে গান্ধী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট তিনটি কর্ত্তব্যের উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন; যথা—খদ্দর বয়ন ও ব্যবহার, কায়মনোবাক্যে অহিংসা নীতির অনুসরণ, এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। যাহাদিগকে সমাজ অস্পৃশ্য মনে করে এবং তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করে, তাহারা যে লোকালয়ের একান্ত আবশ্যক কাজ করিয়া সমাজের কি মহৎ উপকার সাধন করে, এবং তাহার বিনিময়ে তাহারা যে কীদৃশ গর্হিত দুর্ব্যবহার পায়, শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন।

—

কক্সবাজারের বিপন্ন লোকদের সাহায্য

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ কক্সবাজারের বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন। টাকা কড়ি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে, ২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা, ঠিকানায় প্রেরিতব্য। তদ্ভিন্ন নিম্নমুদ্রিত আবেদন অনুসারেও সকলে চাঁদা পাঠাইতে পারেন।

চট্টগ্রাম জিলাস্থ কক্সবাজার সব-ডিভিজনের গত ২৪শে এপ্রিল তারিখের বাত্যাপীড়িত, দুঃস্থ, গৃহহীন নরনারীর সাহায্যকল্পে, কলিকাতায় চট্টগ্রাম-সম্মিলনীর আনুকূল্যে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে চাঁদা সংগ্রহের ভার প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ষা সমাগত, সহৃদয় দেশবাসীকে অবিলম্বে এই মহৎকার্য্যে সাহায্য দান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। যিনি যাহা কিছু দান করিবেন, নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে যে কাহারও নিকট প্রেরণ করিলে, অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। ইতি সন ১৩২৯ বাং, তারিখ ২১শে

১। ডাক্তার জে, এম, দাস, এম, বি, সি এইচ, বিঃ (এডিন) সভাপতি, ২২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ২। কবিরাজ দুর্গাদাস ভট্ট, এবি, এ, বিস্তারত্ন, ৫৪ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ৩। অধ্যাপক গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা। ৪। শ্রীযুক্ত বাবু পরেশচন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল, কার্য্যাধ্যক্ষ, ১০ নং নবীন কুণ্ডুর লেন, কলিকাতা। ৫। অধ্যাপক বিভূতিভূষণ দত্ত, ডি, এস-সি, ১৫ নং নবীন কুণ্ডুর লেন, কলিকাতা। ৬। শ্রীযুক্ত বাবু রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭। কবিরাজ মণীন্দ্রলাল কাব্যতীর্থ, যোগেন্দ্র ঔষধালয়, যোড়াসাঁকো, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ৮। ডাক্তার এস, সি, সেনগুপ্ত, এম, ডি, ৮২।২ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—

সিত্তন্নবসল গুহা-মন্দিরের চিত্রাবলী

অজন্টাগুহার চিত্রাবলী বহু বৎসর হইতে জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ছবিগুলির নকল ও তাহার সম্বন্ধে বহিও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর মধ্য-ভারতে রামগড় গুহার ছবি জানা পড়ে। তাহারও কিছু কিছু নকল করা হইয়াছে। অতঃপর গ্বালিয়র

পল্লব যুগের গুহা-মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র

রাজ্যের বাঘগুহার চিত্রাবলীর নকল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর করেন। কিছু দিন হইল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুদু-কোট্টাইর নিকটবর্ত্তী সিত্তন্নবসল নামক স্থানের মন্দিরে কতকগুলি চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দির পাহাড়ের পাথর কাটিয়া নির্ম্মিত। ইহাকে গুহা-মন্দির বলা যাইতে পারে। পণ্ডিচেরির ফরাসী অধ্যাপক দ্যুব্রেই বলেন, তথাকার চিত্রগুলি অজন্টাগুহাচিত্রাবলীর মত প্রক্রিয়া অনুসারে অঙ্কিত হইয়াছিল। মন্দিরের ছাদের ভিতরের পিঠ, স্তম্ভ, প্রাচীরের ভিতরের দিক্, প্রভৃতির উপর ছবিগুলি অঙ্কিত। অনেক ছবি নষ্ট হইয়াছে। যেগুলি এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে একটি কমল-সরোবরের দৃশ্য প্রধান। তাহাতে পদ্মফুল ছাড়া মৎস্য, হংস, মহিষ, হস্তী ও তিনটি মানুষের ছবি আছে। কমল-সরোবরের চিত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত। ফরাসী অধ্যাপক চিত্রকর নহেন বলিয়া তাহার প্রতিলিপি লইতে পারেন নাই। একটি স্তম্ভের গায়ের এক নৃত্যরতা নারীমূর্ত্তির কিয়দংশের রেখাচিত্র মাত্র তিনি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাহার নকল আমরা ছাপিলাম।

—

কংগ্রেসের অনুমোদিত কাজের সংবাদ

বঙ্গের কোন্ জেলায় কত চরকা চলিতেছে, কত হাতের তাঁত চলিতেছে, কত তাঁতে কেবল চরকার সুতা ব্যবহৃত হয়, কত জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে ও তাহার ছাত্রসংখ্যা কত, ইত্যাদি সংবাদ বঙ্গের কংগ্রেস কমিটি প্রকাশ করিয়া ভালই করিতেছেন। এই-সব খবর জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল আছে। খবর ভাল হইলে উৎসাহ বাড়ে, মন্দ হইলে নিরুৎসাহ না হইয়া আরো বেশী চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। খবরগুলি যাহাতে নির্ভুল হয় সেদিকে খুব বেশী নজর রাখা উচিত। বাংলা দেশে টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে কত টাকা উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে যেরূপ ক্লেশকর বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহা মনে রাখিয়া সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

—

বাঁকুড়ার দারিদ্র্য নিবারণের চেষ্টা

বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের নিমিত্ত সাহায্য ভিক্ষা করিবার জন্য দেশের লোকদের কাছে বার বার উপস্থিত হইতে হইয়াছে। তাহা হইতে সকলে

জানেন, ঐ জেলা কিরূপ গরীব। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত লোকদের অর্থাগমের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলায় অনেক হাজার পুকুর ও বাঁধ আছে। বহু বৎসর পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় তদ্দ্বারা জলকষ্ট নিবারিত হয় না, চাষের সুবিধা হয় না, মাছও পাওয়া যায় না। যৌথ ঋণগ্রহণ-সমিতি গঠন করিয়া জলাশয়গুলি আবার ব্যবহারের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইতেছে। উন্নত আধুনিক প্রণালীতে চামড়া কষ করিবার প্রক্রিয়া স্থানীয় মুচিদিগকে দেখান হইতেছে। খেজুর রসের মত তাল গাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা হইতেছে। বাকুড়ায় তসরের কাপড় আগে খুব হইত, এখনও হয়। বিষ্ণুপুরে গরদের কাপড় আগে হইত, এখনও হয়। গালা বাঁকুড়ার একটি প্রধান পণ্যদ্রব্য। এই-সকলের দিকে এবং তুলার চাষের দিকে দত্ত-মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঁকুড়ার কয়েক জায়গায় উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসন হয়।

সকল জেলায় এইরূপ চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—

বিপন্ন রুশীয় মনস্বীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা

খবরের কাগজ যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা সকলেই রুশিয়ার ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা জানেন। বিপন্ন লোকদের ছবিও আমরা মডার্ণ রিভিউ কাগজে ছাপিয়াছিলাম। তথাকার সাধারণ লোকদের অবস্থা ত খুব শোচনীয়ই হইয়াছে; অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ললিতকলাবিদ্ প্রভৃতি মানসিক শ্রমী মনস্বীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ, যখন বিপ্লবে রুশিয়ার সম্রাট্ সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন, তখন দৈহিক শ্রমজীবীদের অব্যাহত প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তাহারা মূলধনী এবং মস্তিষ্কজীবী শ্রেণীর লোকদের উচ্ছেদসাধনে রত হয়। তাহার পর যখন দেখা গেল, যে, দৈহিক শ্রমে সব কাজ হয় না, তখন মস্তিষ্কজীবীদিগকেও অতি সামান্য মজুরীতে শ্রমজীবী-গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিল। এখন তাঁহাদের সেরূপ কাজও গিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ অনাহারে মারা পড়িয়াছেন। কেহ কেহ সামান্য খাট বিছানা বাসনাদিও বিক্রী করিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহা নিঃশেষ হওয়ায় অস্থিচর্ম্মসার দেহে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই-সকল মস্তিষ্কজীবীদের জন্য সাহায্য চাহিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আবেদন যাইতেছে। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এই আবেদন অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশীয় অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফ্ পাঠাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্য্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া, তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

—

"মেরে লড়্‌কে কী গিরফ্‌তারী"

বিদেশী কাপড়ের দোকানের সামনে পাহারা দিয়া ক্রয়েচ্ছুদিগকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টার অভিযোগে এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত জাহিরলাল নেহ্‌রুর কারাদণ্ডের সংবাদ অন্য পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মাতা শ্রীমতী স্বরূপরাণী দেবী এই উপলক্ষে দেশবাসীদিগকে অনুরোধ ও মনোবেদনা জানাইয়া হিন্দীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হাজার হাজার খণ্ড মুদ্রিত ও বিতরিত হইতেছে। তাহার শীর্ষদেশে লেখা আছে—"মেরে লড়্‌কে কী গিরফ্‌তারী" "আমার পুত্রের গ্রেপ্তারী।" যে-সব কাপড় বিক্রেতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আবার বিদেশী কাপড় বেচিতেছিল, তাহাদের এই কুকার্য্যের জন্যই ত জাহিরলালকে জেলে যাইতে হইয়াছে। জননী স্বরূপরাণী বলিতেছেন:—

> "যে-সব ব্যাপারী ভাইদের কাজে আমার ছেলের জেল হইল, তাঁহাদের এখন কর্ত্তব্য কি? তাঁহাদেরই ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করাইবার জন্য সে জেলে গেল। আমি আশা করি, প্রত্যেক ব্যাপারী নিজের নিজের পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিবেন, এবং এলাহাবাদের বাজারে আর বিদেশী কাপড় ঢুকিতে দিবেন না। আমার এই ভরসা আছে, যে, এলাহাবাদবাসীরা এখন হইতে কেবল শুদ্ধ খদ্দর পরিবেন, এবং যে বিদেশী কাপড়ের জন্য আমাদের ছেলেরা জেলে যাইতেছে, তাহা গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। বিশেষ করিয়া আমার ভগিনীদিগের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন বিদেশী কাপড় স্পর্শ করাও পাপ মনে করেন।"

মাতা স্বরূপরাণী সর্ব্বশেষে বলিতেছেন:—

"জবাহির লাল পিকেটিং কী বজহ্ সে জেল্ গয়া। মৈঁ আশা করতী হুঁ, অগর্ কিসী বজাজ্ (কাপড়বিক্রেতা) নে অপনী প্রতিজ্ঞা তোড়ী, ঔর ব্যাপারী মণ্ডল কী রায় হুই তো উস্‌কী দুকান্ পর্ ফির্ সে পিকেটিং অবশ্য হোগী, ঔর ইলাহাবাদকে রহনেবালে অপ্‌না ফর্জ্ সমঝ্ কর্ বহ্ পিকেটিং জরুর করেঙ্গে। অগর্ জরুরৎ হুঈ, তো হমারী বহিনী কো ভী সাথ্ দেনা আবশ্যক হৈ। মৈঁ ভী চাহ্‌তী হুঁ কি মুঝে ঔর্ মেরী বহু কী ভী পিকেটিং করনে কা অবকাশ মিলে। জিস্ কাম্ কো করনে কে লিয়ে জবাহিরলাল জেল গয়া, বহ্ তো এক মিনট ভী নহী রুক্ সক্‌তা। অগর মর্‌দোঁ নে উস্‌মে হিম্মৎ হারে, তো ঔরৎ করেংগী। ক্যা হিন্দুস্তান্ কে জেল্ সির্ক্ মর্‌দোঁ হী কে লিয়ে হৈ? ক্যা হমারে দেশ্ কী ঔরতোঁ মেঁ দেশ্ কা প্রেম নহী হৈ?"

—

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া চাকরী লাভ

অনুগ্রহ, এবং মুরুব্বি ও সুপারিশের জোরে চাকরী লাভ বরাবর রীতি ছিল। মধ্যে কয়েক বৎসর প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা বাছাই করিয়া ডেপুটি ও সব-ডেপুটি নিযুক্ত হইত। তাহার পর তাহা উঠিয়া যায়। এখন আবার ডেপুটি সব্‌ডেপুটি এবং পুলিশ ও আব্‌কারী বিভাগের কতকগুলি চাকরী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু সচ্চরিত্র ও সুস্থ-দেহ নির্দ্দিষ্টবয়স্ক যে কোন গ্রাজুয়েট পরীক্ষা দিতে পারিবে না। দরখাস্তকারীদিগের মধ্যে ২৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে তাহাদের কলেজের অধ্যক্ষগণ বাছিয়া দিবেন; ১৩ জনকে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মনোনীত করিবেন। এই ২৭৬জনের নাম সর্‌কার-নিযুক্ত এক কমিটির কাছে যাইবে। কমিটি তাহার মধ্যে ২০০ জনের নাম মনোনীত করিবেন। ইহারাই পরীক্ষা দিতে পারিবে। সুতরাং পরীক্ষার আগেই দুইবার বাছাই হইবে।

কোন্ কোন্ কলেজ কতজন ছেলেকে মনোনীত করিতে পারিবে, তাহার তালিকাটি বেশ উপভোগ্য। কয়েকটি কলেজ ২৪জন করিয়া, কয়েকটি ১৩জন করিয়া, এবং বাকী কয়েকটি ৬জন করিয়া ছেলেকে মনোনীত করিতে পারিবে। কি কারণে যে কোন্ কলেজ কোন্ শ্রেণীতে পড়িল, ঠিক্ বুঝা যায় না। কোন্ কলেজে কত ছাত্র পড়ে, কোন্ কলেজে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় ও লাইব্রেরী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি শিক্ষার সরঞ্জাম কোথায় কিরূপ আছে, এবং কোথা হইতে কত ছাত্র পাশ হয়, এই-সব দেখিয়া শ্রেণী বাঁধা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধরুন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি। সিটি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ প্রথমশ্রেণীভুক্ত। বঙ্গবাসী কলেজ ও সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ কলেজ দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলি ২৪ জন করিয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তের জন করিয়া ছাত্র মনোনীত করিবে। শিক্ষার উৎকর্ষ, ছাত্রসংখ্যা, ইত্যাদিতে প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলি কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি অপেক্ষা দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট? দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি (যেমন রঙ্গ-পুরের কলেজ) তৃতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি (যেমন বাঁকু-ড়ার কলেজ) হইতে কি দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট? একেই ত শ্রেণীবিভাগ করাই কঠিন; তাহার পর, তাহা করিলেও অধিকারের ন্যূনাধিক্য একেবারে আধাআধি না করিয়া অল্পস্বল্প করিলেই ঠিক হইত। যেরূপ করা হইয়াছে, তাহাতে সুবিচার হয় নাই।

দুবার ছাঁকনীর পর প্রতিযোগিতা খাটি-প্রতি-যোগিতা নহে। যাহা হউক, খোসামোদ ও মুরুব্বির জোরে যেরকম লোক চাকরী পায়, এরূপ প্রতিযোগিতাতেও তার চেয়ে যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা ভাল। কিন্তু দেশের দিক্‌টাও দেখা দর্‌কার।

পুস্তকার্জ্জিত-বিদ্যা-সাপেক্ষ চাকরী ও বৃত্তির দিকে বাঙালীর ঝোঁক বেশী। ভাল ছেলেরা সহজে চাকরী না পাইলে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে ক্রমে ক্রমে যাইত;—ইতিমধ্যে অনেকে গিয়াছিলও। কিন্তু এই পরীক্ষা দিবার লোভ সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় অনেক ছেলে এই দিকেই ঝুঁকিবে। ইহা দেশের পক্ষে ভাল নয়। দ্বিতীয় কথা এই, যে, দুবার ছাঁক্‌নীতে সর্ব্বাগ্রে সাহসী তেজস্বী দেশভক্ত দেশহিতরত ছেলেদের বাদ পড়িবার সম্ভাবনা বেশী। এই কারণে অনেক ছেলে সার্ব্বজনিক কাজ ও তাহার আলোচনা ও তাহাতে যোগ-দান হইতে দূরে থাকিয়া গোবেচারী হওয়াটাই সুপন্থা মনে করিতে পারে। ইহাও দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে। সর্‌কারী চাক্‌রী যত উচ্চই হউক, তাহাতে

খুব বেশী প্রতিভা মনস্বিতা প্রভৃতির দর্‌কার হয় না; ডেপুটীগিরি প্রভৃতি সামান্য চাকরীতে ত হয়ই না। অথচ দারিদ্র্যবশতঃ দেশের অনেক প্রতিভাবান্ যুবক পরীক্ষা দিবে; এবং চাকরী পাইয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ডিক্রী ডিস্‌মীস্ আদি করিয়াই অপব্যয় করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের দেশে যেরূপ বুদ্ধি ও প্রতিভা লইয়া লোকে সামান্য চাকরী করে, স্বাধীন কোন দেশে সেরূপ করে কি না সন্দেহ। ইহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। বক্ষ্যমাণ পরীক্ষায় এই দুর্ভাগ্য বাড়িবে।

—

খেজুর গাছের উঠা-নামা

কাঁথির নীহার কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে যে,

বাসুদেবপুর থানার রাণীবসান গ্রামে রামকৃষ্ণ নায়কের খিড়্‌কীর পুকুরের পাড়ে প্রায় ১০ বৎসর হইল একটি খেজুর গাছ আছে। গাছটি লম্বায় ৭ হাত; কিন্তু গোড়া হইতে তিন হাত উঁচুতে একটা গাঁঠের মত আছে এবং ঐ গাঁঠের উপরের অংশটি একটু হেলান ভাবে আছে। আজ প্রায় মাসখানেক হইল, গাছের ঐ উপরের অংশটি প্রত্যহ বেলা ৯।১০ টার সময় হইতে ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে মুড়িয়া আসিয়া পুকুরের জলের সহিত গাছের কাণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। সন্ধ্যার পর হইতে উহা ক্রমেই জল হইতে উঠিয়া কয়েক ঘণ্টা পরে পুনরায় পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গাছটিতে অনেক ফুল ধরিয়াছে, সেগুলি ক্রমেই শুকাইয়া যাইতেছে। প্রত্যহই গাছটির অবস্থা পূর্ব্বোক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া লোকে এ সম্বন্ধে নানা গুজব রটাইতেছে। অবশ্য ইহার মূলে যে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফরিদপুর জেলার একটি গাছ এইরূপ উঠিত নামিত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করেন। তিনি আমাদিগকে ঐ গাছের দুই অবস্থার ফোটোগ্রাফ প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন ও আমরা তাহা ছাপিয়াছিলাম। তাঁহার কোন ছাত্র তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র লইয়া গেলে রাণীবসান গ্রামের গাছটিরও উঠা-নামার কারণ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

—

বঙ্গে ডাকাতি

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বঙ্গে ২০।৩০।৪০।৫০টা ডাকাতির সংবাদ কাগজে বাহির হয়। অনেক ডাকাত বাঙালী নয়, বাংলার বাহির হইতে আসে। তাহারা বাধাদানে অসমর্থ অসহায় সম্পন্ন লোকদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে। কোনও দেশের গবর্ণমেণ্ট, খুব বেশী ইচ্ছা থাকিলেও, আত্মরক্ষায় অসমর্থ প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী পাহারা দিতে পারে না। আত্মরক্ষা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। অহিংসা অতি উচ্চ ধর্ম্ম। কিন্তু বিপন্ন ও লাঞ্ছিতের রক্ষা এবং আত্মরক্ষাও ত করিতে হইবে? চোখের সম্মুখে বাড়ীর মেয়েদের লাঞ্ছনা দেখা ও প্রতিকার করিতে না পারা প্রশংসনীয় নহে। অবশ্য, পরাধীন দেশে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াও নিরাপদ নহে। অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া দুর্ঘট, ব্যবহার করিতে শেখারও সুযোগ বেশী নাই। যে-সব যুবক ব্যায়াম করে, লাঠি খেলা জিউজুৎসু শেখে, তাহাদের উপর কর্ত্তাদের দৃষ্টি পড়ে। তা পড়ুক; কিন্তু অসহায় হওয়া বড় লজ্জার বিষয়,—বিপদের কারণ ত বটেই।

—

ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটি

এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যত কমিশন কমিটি বসাইয়াছেন, তাহাতে প্রত্যাশিত ফল ফলে নাই। অনেকে মনে করেন, যে, তাহাতে সর্‌কারী লোকের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য থাকাতেই ব্যর্থতা ঘটিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়সংক্ষেপ কি প্রকারে হইতে পারে, সে-বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য লর্ড ইঞ্চকেপের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি ও সভ্য সকলেই বেসর্‌কারী লোক। কেবল বোম্বাইয়ের মিঃ দালাল বিলাতে কিছুকালের জন্য ভারতসচিবের কৌন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। এইজন্য কেহ কেহ মনে করিতেছেন, যে, হয়ত বা এবার এই কমিটির দ্বারা কিছু কাজ হইবে। কিন্তু বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

কমিটির ইংরেজ সভ্যেরা বণিক; তাঁহারা, ইংরেজের স্বার্থে ঘা লাগে, এমন কিছু করিবেন না। সভাপতি পী-এণ্ড্-ও কোম্পানীর সভাপতি। এই জাহাজ-কোম্পানী বিলাতী ডাক বহিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক টাকা পায়। দেশী তিনজন সভ্যের বাণিজ্য, এঞ্জিনীয়ারিং ও অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেও ভারতীয় শাসন-যন্ত্রের তেমন জ্ঞান নাই। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নাম অনেক কাগজে করা হইয়াছিল। তাঁহার

রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপারের জ্ঞান অন্য সব দেশী সভ্যদের চেয়ে বেশী। তাঁহাকে সভ্য করিলে ভাল হইত।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলেরও ব্যয়সংক্ষেপ আবশ্যক এবং তাহা করা অসাধ্য নহে।

মোট কথা, বিদেশী দ্বারা চালিত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় দেশী শাসনযন্ত্রের ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইবেই। অতএব, ব্যয়সংক্ষেপের গোড়ার কথাই এই, যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য ভারতীয়দের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হওয়া চাই। নতুবা মঙ্গল নাই।

—

বঙ্গে অ-বাঙালী

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোক বাংলাদেশে আসিয়া রোজগার করিয়া খায় ও ধনী হয়; এখন নাকি গুর্খা ও তিব্বতীরাও অনেকে আসিতেছে। যে পরিশ্রম করিতে পারে, যাহার বিষয়বুদ্ধি আছে, যাহার ব্যবসা ও শিল্পের জ্ঞান আছে, সে ত করিয়া খাইবেই এবং ধনীও হইবেই। অন্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসা করা ও তাহাদের নিন্দা করা ভাল নয়; তাহাতে কোন লাভও নাই। কিন্তু বাঙালী যে নিজের দেশে দরিদ্র, রুগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ ও অমানুষ থাকিতেছে ও হইতেছে, ইহাই দুঃখের বিষয়। সকল শ্রেণীর বাঙালীকেই অবিলাসী, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও উপার্জ্জক হইতে হইবে। বিলাসিতা ও আরামলোলুপতা ছাড়িতে হইবে। মানুষের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক যত প্রকার উৎকর্ষ সম্ভব, তাহার প্রত্যেক-টির দৃষ্টান্ত বাঙালী জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের সমুদয় জাতিটিরই যে সর্ব্ববিধ উন্নতি হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস অমূলক নহে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই অপরকে উপদেশ দিব, নিজে কিছু করিব না, এরূপ হইলে চলিবে না। যিনি যে অবস্থারই লোক হউন, তাঁহাকে নিজের শক্তির ও সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যিনি গৃহী নহেন, তাঁহাকে অন্ততঃ নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ের সমান মূল্যের কাজ দেখাইতে হইবে। যিনি গৃহী তিনি ত ধর্ম্মতঃ পরিবার প্রতিপালন করিতে, পরিবারস্থ সকলকে সুস্থ সবল রাখিতে, শিক্ষা দিতে, জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। ইহা অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। অতএব অর্থোপার্জ্জন গৃহীর কর্ত্তব্য। অর্থ উপার্জ্জন না করা গৃহীর পক্ষে অধর্ম্ম। কোন প্রকারে জন্তুর মত প্রাণ-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট আয় হইলেই তাহাকে যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়; কেননা, তাহার দ্বারা সকলের সুস্থ-সবল থাকার ও জ্ঞান-উপার্জ্জনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। নানা প্রকারে দেশের ও সমাজের হিতসাধন করিতেও আমরা বাধ্য। কিন্তু তাহাও অর্থব্যয়-সাপেক্ষ।

"আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্"।

"আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা করিবে, তাহা দুর্লভ মনে করিবে না।"

"ন্যায়পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবে এবং চিরজীবন আপনাকে ধনোপার্জ্জনের অধিকারী জানিবে। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্যদুঃখ দূর করা আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয়-কার্য্য জানিবে।"

—

"খদ্দর পরিধান ও সৎকর্ম্মশীলতা"

চরখায় সুতা কাটিয়া হাতের তাঁতে তাহা হইতে কাপড় বুনিয়া, দেশের বস্ত্রের অভাব মোচন যত করা যায়, ততই মঙ্গল, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। যাহাদের অধিকতর লাভজনক কোন কাজ নাই, এই উপায়ে তাহাদের আয় হইতে পারে। এই আয় যদি খুব কম হয়, তাহা হইলেও ইহা, দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট শ্রমীদিগকে যে মজুরী দেন, তাহা অপেক্ষা কম হইবে না। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস যাহারা চাষ আদি কাজ করে, ও বাকী সময় বেকার অবস্থায় আলস্যে কাটায়, চরখায় সুতা কাটিলে তাহাদের কিছু আয় হয় এবং আলস্য নিবারিত হয়। চরখায় সুতা কাটিয়া হাতের তাঁতে কাপড় বুনিয়া দেশের বস্ত্রাভাব যত দূর করিব, ততই, যে-টাকা বিদেশী সুতা ও কাপড় ক্রয়ে ব্যয়িত হইত, তাহা দেশে থাকিবে। অতএব খদ্দর প্রচলন দেশের ধনের অপচয় নিবারণের একটি উপায়। ভিক্ষোপজীবী হইলে, পরের গলগ্রহ হইলে, নৈতিক অধোগতি হয়, আত্ম-মর্য্যাদা লোপ পায়। আলস্য স্বয়ং একটা মহৎ দোষ; তদ্ভিন্ন উহা অন্য অনেক দোষের জনক। এইহেতু চরখা ও তাঁতের প্রচলন দ্বারা যে পরিমাণে লোকের আলস্য দূর হইবে, সেই পরিমাণে দেশের নৈতিক উন্নতিও হইবে।

বস্ত্রাভাব দূরীকরণ বিষয়ে সকল অবস্থার ও সম্প্রদায়ের লোকেরা বিলাসিতা ও আরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া খুব মোটা খদ্দর পরিলে, চরখা ও তাঁতের গরীব কর্ম্মীদের প্রতি কার্য্যতঃ যে মমতা দেখান হইবে, তাহাতে জাতীয় একতা খুব বাড়িবে। সকল শ্রেণীর লোকে খদ্দর পরিলে সকলের পরিচ্ছদ সাদাসিধা হওয়ায় গরীবে ধনীতে একটা পার্থক্য দূর হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে পারে। আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিলে, আমাদের আত্মশক্তিতে যে বিশ্বাস জন্মিবে, একজোট হইয়া কাজ করিবার যে অভ্যাস ও ক্ষমতা জন্মিবে, তদ্দ্বারা এবং পূর্ব্বোক্ত একতা দ্বারা আমাদের স্বরাজ লাভের সুবিধা হইবে।

এবম্বিধ নানা কারণে আমরা খদ্দর উৎপাদন ও পরিধানের পক্ষপাতী। অনেকে বলেন, সুতার কল ও কাপড়ের কলের সহিত চরখা ও হাতের তাঁত প্রতিযোগিতায় শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এত বড় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করিয়া আমরা বলিতে চাই, যে, যতদিন টিকিয়া থাকিতে পারে, ততদিনই টিকুক না; যে-সব তাঁতি-পরিবার আবহমান কাল হইতে এখন পর্য্যন্তও হাতের তাঁত চালাইতেছে, তাহাতে ত তাহাদের ও দেশের কোন অমঙ্গল হয় নাই। তাহারা কাপড়ের কলের মজুর হইলে কি তাহাদের ও দেশের অধিকতর কল্যাণ হইত?

খদ্দর প্রচলনের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি খদ্দর পরিধান ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে দৈনিক বসুমতীতে নিম্নোদ্ধৃত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সায় দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন:—

"দেশের সেবা করিতে যে-সকল নরনারী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিধেয় খাদি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা যায় না। মহাত্মাজীর সহিত সর্ব্বাংশে মতের মিল নাই, এমন লোক দেশের সেবায় অনেক স্থলে নিযুক্ত আছেন। দেশের সেবক সকলেই নন্‌কোঅপারেটর না হইতে পারেন, কিন্তু খাদি না পরিয়াও দেশের সেবা করা যায়, ইহা আমার কাছে আজকাল অসম্ভব মনে হয়। কোনও সেবা-অনুষ্ঠানে খাদি পরিধান না করিলে সেবা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, ইহাই আমি বুঝি।"

আচার্য্য রায়-মহাশয় যে আদর্শ মনে রাখিয়া লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বিস্তৃততররূপে প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারি, "যিনি যে-কোন প্রকারে মানবের হিতসাধন করিতে চান, তিনি আত্মায়, মনে, দেহে, আহারে ও পরিচ্ছদে নিখুঁত হইলে ভাল হয়।" আদর্শটি এরূপ ব্যাপক করিবার কারণ এই, যে, আদর্শ পরিচ্ছদ অপেক্ষা আদর্শ দেহ, এবং আদর্শ দেহ অপেক্ষা আদর্শ আত্মা অধিক আবশ্যক। তদনুসারে অহিংসাবাদী, নিরামিষ-ভোজী, খদ্দর-অনুরাগী কোন ব্যক্তি বলিতে পারেন, "কোনও প্রকার লোকহিত করিতে হইলে কর্ম্মীর শুদ্ধাত্মা, সচ্চরিত্র, সুস্থ-সবল-দেহ, নিরামিষ ভোজী, নগ্নপদ কিম্বা কাষ্ঠপাদুকা বা অন্যবিধ উদ্ভিজ্জ পাদুকা-পরিহিত, এবং খদ্দর-পরিহিত হওয়া উচিত।" কেহ এরূপ কথা বলিলে তাঁহার সহিত আমরা তর্কবিতর্ক করিব না। কিন্তু যদি কেহ বলেন, যে, ঠিক ঐরূপ না হইলে তাঁহার দ্বারা কোন লোকহিত বা সেবার কাজ হইতে পারে না, তাহা হইলে আমরা এরূপ উক্তি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। কারণ, মৃত লোকহিতসাধকদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে, ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক ব্যবস্থা, জ্ঞানবিস্তার, চিকিৎসা, জলদান, অন্নদান, শিল্পবিস্তার, প্রভৃতি নানা লোকহিতসাধনক্ষেত্রের বহু জীবিত কর্ম্মী আত্মা, মন, দেহ, আহার ও পরিচ্ছদ, প্রত্যেক বিষয়ে, উল্লিখিত আদর্শের অনুসরণ না করিলেও তাঁহাদের দ্বারা কোন-না-কোন প্রকার কল্যাণ সাধিত হইতেছে। খদ্দর পরিধান করেন না, এমন অবৈতনিক চিকিৎসকের রোগী নীরোগ হইতেছে, এমন অবৈতনিক শিক্ষকের ছাত্রেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছে, এমন জনহিতৈষীর অর্থে খনিত পুষ্করিণী ও কূপে জল সঞ্চিত হইতেছে ও তাহাতে স্নান ও তাহা পান করিয়া লোকে উপকৃত ও তৃপ্ত হইতেছে ও জমীতে তাহা সেচন করিলে ফসলও হইতেছে, এমন ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশে লোকে জীবনপথে নূতন আলোক পাইতেছে, এমন গবেষক আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন ও সেই আবিষ্কারে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট হইতেছে ও কার্য্যসৌকর্য্য বাড়িতেছে, এবং এমন কবি কবিতা লিখিতে পারিতেছেন ও তাহা

পড়িয়া লোকে আনন্দ পাইতেছে ও অনুপ্রাণিত হইতেছে।

আচার্য্য রায়-মহাশয় "সেবা সম্পূর্ণ" হওয়া কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। যদি ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার যে কাজটি করা হইতেছে,—যথা চিকিৎসা, জলদান, অন্নদান, বিদ্যাদান, জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পোষণ, ইত্যাদি,—তাহা সম্পূর্ণ হওয়া, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করি ও দেখাইয়াছি, যে, খাদি না পরিলেও তাহা হইতে পারে। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয়, যে, সেবার কার্য্যবিশেষ দ্বারা সেবিত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের ঐহিক পারত্রিক আত্মিক মানসিক দৈহিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ যুগপৎ সাধিত হইয়া সর্ব্ববিধ অভাব দূরীভূত হইবে, তাহা হইলে, আমাদের ধারণা এই, যে, খাদিপরিহিত বা অন্যবিধ-বস্ত্র-পরিহিত কোন জনসেবক জগতে এপর্য্যন্ত এরূপ "সম্পূর্ণ সেবা" কোন একটি প্রকারের হিতকার্য্য দ্বারা সাধন করিতে পারেন নাই।

খাদির ব্যবহার আমরা মন বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সমর্থন করি, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে অত্যুক্তির সমর্থন করিতে পারি না। তাহা পরিণামে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি।

—

অসহযোগে প্রবাসী বাঙালী

প্রবাসী বাঙালীদের খবর দেওয়া "প্রবাসী"র অন্যতম উদ্দেশ্য। তদনুযায়ী একটি সংবাদ দিতেছি।

গবর্ণমেণ্ট যখন কংগ্রেসের সম্পর্কে ভলণ্টীয়র বা স্বেচ্ছা-সেবক হওয়া আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন এই ঘোষণা অন্যায় বোধে হাজার হাজার লোক ভলাণ্টীয়র-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রবাসী বাঙালীর নামও পাওয়া যায়। "প্রবাসী"র জন্মস্থান এলাহাবাদে যাঁহাদের জেল হয়, তাঁহাদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন শ্রীমান্ রণেন্দ্রনাথ বসু। ইনি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জেলা-জজ স্বর্গীয় রায়বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পুত্র। রণেন্দ্রনাথ এলাহাবাদের একজন প্রধান মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

শ্রীরণেন্দ্রনাথ বসু

ছিলেন, জল-সরবরাহ বিভাগ (Water Works Department) ইঁহার অধীন ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে তিনি হাইকোর্টের ওকালতী ত্যাগ করেন। স্থানীয় কংগ্রেস্-কমিটির সম্পাদকরূপে, অন্যান্য কাজের মধ্যে, খদ্দর উৎপাদন ও তাহার ব্যবহারের বিস্তারে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র জারী হইল। তখন স্বেচ্ছাসেবক হইয়া দৃঢ় থাকায় অন্যান্য অসহযোগীর সঙ্গে রণেন্দ্রনাথের জেল হয়। এখন তিনি খালাস পাইয়াছেন। তাঁহার পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের দৃঢ়তায় সন্তুষ্ট হইতেন।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি

গত ২২শে এপ্রিল তারিখের লণ্ডন টাইম্‌সের শিক্ষা-বিষয়ক প্রপূর্ত্তিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহার শেষ তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"A pleasing feature of the Convocation was the first presentation of the gold medal endowed by the Vice-Chancellor to be bestowed biennially upon the individual deemed by the syndicate to be the most eminent for original contribution to letters or science written in the Bengali language. The medal was awarded to Dr. Rabindranath Tagore, the most brilliant Bengali writer of our day. It is an interesting coincidence that the distinguished poet has accepted within the last few weeks the chairmanship of an organization for improving the economic outlook of the educated middle classes in Bengal."—*The Times* Educational Supplement, April 22, 1922, p. 188.

সম্রাটের প্রদত্ত নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিবার পর একজন রাজভৃত্যের প্রদত্ত একটি পদক অন্য এক রাজভৃত্যের হস্ত হইতে রবীন্দ্রনাথ কেন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা অবগত নহি।* কিন্তু তাঁহাকে কন্‌ভোকেশ্যনে আনিবার জন্য কেন ঝুলাঝুলি হইয়াছিল, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিয়া মডার্ণ রিভিউতে লিখিয়াছিলাম। এখন অনুমানটা নিতান্ত ভ্রান্ত মনে হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো অধিকতর দামী পুরস্কার ও পদক বর্ষে বর্ষে প্রদত্ত হয়, কিন্তু তাহা দেশ-বিদেশে ঘোষিত হয় না; কিন্তু বক্ষ্যমাণ পদকটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করায় বিজ্ঞাপন উত্তমরূপে হইল। ইহাতে তাঁহার গৌরব বাড়িয়াছে কি না, তাহা কাহারও বিবেচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া, কিসে তাঁহার গৌরব বাড়ে কমে, তাহা বিবেচনার যোগ্য মনে করি।

টাইম্‌স্ হইতে উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে উল্লিখিত কমিটি-টি কি এবং কাহার দ্বারা নিযুক্ত, তাহা আমরা অবগত নহি; সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্‌ গ্রাজুয়েট বিভাগ

টাইম্‌সের উল্লিখিত সংখ্যার প্রবন্ধটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েট বিভাগ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

"......These truths, we are sure, are not denied by men of position and influence who severely criticize the working of the post-graduate department..... But their complaint is that under his [Sir Asutosh Mookerjee's] dominating influence the Senate has allowed an *imperium in imperio* to be built up, and to be an excessive drain upon the University resources, so that it cripples the ordinary work. They also hold that the aggrandisement of the department has become an obsession with its distinguished head (*i. e.* Sir Asutosh), and that a Geddes axe should be applied to its administration.

"The farewell speech of Lord Ronaldshay, while studiously judicious in tone, shows that these criticisms are not altogether baseless. He admitted that in a poor country there are obvious limits to the extent to which post-graduate studies can reasonably be financed by public funds......He suggested for the consideration of the Senate the question whether it is bound to provide post-graduate teaching in every subject in which it is prepared to examine and confer awards, or whether, following the precedent set by such Universities as Oxford in this country, it should not expect students of very special subjects to make their own arrangements for the greater part of their studies." (P. 188)

—

গৃহশিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম আছে,

"No person who takes pupils privately in any subject or subjects shall be eligible for appointment as a member of the Board of Examiners in that subject or those subjects, or as a paper-setter or Head Examiner in the Examination for which he has prepared pupils privately."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ কোন নিয়ম আছে কি? থাকিলে, কেহ তাহা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলে ছাপিব। পরীক্ষক-সমিতি প্রশ্নকর্ত্তা নির্ব্বাচন ও প্রশ্নপত্র আবশ্যকমত সংশোধন-পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহারা এই প্রকারে পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্বে প্রশ্নগুলি

জানিতে পারেন। প্রধান পরীক্ষক যে-কোন পরীক্ষার্থীর কাগজ পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া নম্বর কম বেশী করিতে পারেন। পাটনার নিয়মের কারণ এই সব। এরূপ নিয়ম না থাকিলে পরীক্ষার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না।

—

লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস্ কমিটির বৈঠক

অনেক তর্কবিতর্কের পর লক্ষ্ণৌয়ে নিখিলভারতীয় কংগ্রেস্ কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, নিরস্ত্র আইন অমান্য করিবার সঙ্কল্প এখন স্থগিত থাক্; আগে দেখা যাক্, দেশ ইহার জন্ম প্রস্তুত কি না, এবং অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, চরকা ও তাঁতের প্রচলন প্রভৃতি কাজ কোথায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও দেখা যাক্। খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষও এইরূপ স্থির করিয়াছেন। ইহা সমীচীন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সব প্রদেশে যেরূপ জোরে নিগ্রহনীতি চালাইতেছেন, তাহাতে সাত্ত্বিক ভাবে আইন-অমান্য প্রচেষ্টার আবশ্যকতা ও, গবর্ণমেণ্টের নীতি ও ব্যবহার আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলে, প্রচেষ্টাটির কালক্রমে অবশ্যম্ভাবিতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একটু অপেক্ষা করা দরকার। যাঁহারা বীরত্ব ও উত্তেজনা ভাল বাসেন, তাঁহারা অপেক্ষা করিতে সম্মত না হইতে পারেন; কিন্তু আইন অমান্য করিবার প্রচেষ্টা আরব্ধ হইলে যে আইন-সঙ্গত ও বেআইনী নিগ্রহ ও অত্যাচার আরম্ভ হইবে, তাহার প্রতিশোধ না দিয়া সাত্ত্বিকভাবে অক্ষুণ্ণ ও অটল দৃঢ়তার সহিত তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা জাতির জন্মিয়াছে কি না, ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। এরূপ প্রচেষ্টার জন্ম জাতীয় একতাও খুব দরকার; নতুবা এক শ্রেণী দল বা সম্প্রদায়কে অন্য শ্রেণী দল বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহজেই লাগান যাইতে পারিবে। সকল রকমের ভেদ ও ভাগ দূর করা সম্ভবপর নহে; কিন্তু প্রধান প্রধান জনসমষ্টির মধ্যে মনোমালিন্য বিদূরিত হওয়া দরকার। যেমন, হিন্দুসমাজের "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতিদের অপমানবোধ ও মনের জ্বালা বিনাশ করা দরকার। অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা বোধ কিরূপ অবিবেচনা ও নিষ্ঠুরতা হইতে জাত, তাহা স্পৃশ্য ও আচরণীয়েরা স্থির-চিত্তে ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্বেতকায়েরা যে আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহা কেমন মিষ্ট লাগে?

স্বরাজলাভের জন্যই যে অস্পৃশ্যতা দূর করা দরকার, তা নয়। দেশ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইত, তাহা হইলেও মনুষ্যত্বের, ন্যায়ের, প্রেমের, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অস্পৃশ্যতা দূর করা আবশ্যক হইত।

—

শ্বেত-অশ্বেতের পরস্পর ভালবাসা

বিলাতে "কলিকাতা ভোজে"র বক্তৃতায় লর্ড রোনাল্ড্‌শে বলিয়াছেন, "Non-co-operation mistook hatred of Britain for love of India and acted accordingly." "সহযোগিতা-বর্জ্জকেরা ব্রিটেনের প্রতি বিদ্বেষকে ভারতের প্রতি প্রেম বলিয়া ভুল করে এবং তদনুসারে কাজ করে।" এবম্বিধ গঞ্জনা বা তিরস্কার খাইয়া অমনি, "ব্রিটেন্, তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি," সত্য বা মিথ্যা এরূপ কথা বলিতে অপমান বোধ হওয়া স্বাভাবিক।

একটা কথা ইংরেজদের বুঝা উচিত। ছাগলের বাচ্চাকে যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে সম্পূর্ণ সত্যবাদিতার সহিত বলিতে পারে, "হে ছাগশিশু, তোমাকে আমি বড্ড ভালবাসি"। ছাগলের বাচ্চাও রসিক হইলে সম্পূর্ণ সত্যবাদিতার সহিত স্বীকার করিতে পারে, "ম'রে যাই, বড্ড ভালবাস"; কিন্তু সেইরূপ সত্যবাদিতার সহিত সে কখনই বলিতে পারে না, "হে ভোজনার্থী মহাশয়, তোমাকেও আমি বড্ড ভালবাসি।"

—

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব

আগামী কংগ্রেসে কে সভাপতি হইবেন, তাহার আলোচনা হইতেছে। আলীভ্রাতাদের শ্রদ্ধেয়া জননীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাকে সভানেত্রী করিলে ভালই হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের আগেও নারীরা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় অল্পাধিক পরিমাণে যোগ দিয়াছেন; কিন্তু অসহযোগ প্রচেষ্টা অধিকসংখ্যক নারীকে কার্য্যক্ষেত্রে নামাইয়াছে,

এবং তাঁহারা অনেকে উৎসাহ সাহস ও দক্ষতার সহিত অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছেন। বার্দ্ধক্যসত্ত্বেও আলীদের জননী তাঁহাদের অন্যতম।

—

বাঙালী লস্করদের প্রশংসা

ঈজিপ্ট্ জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার পর লস্কর অর্থাৎ ভারতীয় নাবিকদের খুব নিন্দাবাদ আরম্ভ হয়। তাহাদের অপরাধ বোধ হয় এই, যে, সমুদ্রতরঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া কেবল কালা আদ্‌মিদিগকেই কেন গ্রাস করিল না। যাহা হউক, নিন্দার দ্বিতীয় সর্গে বলা হইল, পূর্ব্ববঙ্গের লস্করেরা কোন দোষ করে নাই, বোম্বাই অঞ্চলের নাবিকেরা করিয়া থাকিবে। তৃতীয় সর্গে বলা হইল, যারা দোষ করিয়াছিল, তারা লস্করই নহে, গোয়ার খান্‌সামা সর্দ্দার-খান্‌সামা প্রভৃতি। শেষে বলা হইতেছে, বাঙালী লস্করেরা বরাবর খুব সাহস ধৈর্য্য দক্ষতা আত্মোৎসর্গ ও মিতাচারের পরিচয় দিয়াছে। যারা গোরা নাবিকদের সমান কাজ তাদের চেয়ে ঢের কম বেতন লইয়া এবং অপকৃষ্ট ও কম জায়গায় থাকিয়া করে, তাদের নিন্দা ক্ষণকালের জন্যও করা ঘোর অকৃতজ্ঞতা।

—

একজন জাপানীর আত্মবলিদান

রবার্ট্‌সন্ স্কট্ সাহেবের লিখিত "জাপানের ভিত্তি" (The Foundation of Japan) নামক পুস্তকে একজন জাপানী কৃষকের আত্মোৎসর্গের একটি আখ্যান আছে। একবার দুর্ভিক্ষের সময় ঐ চাষার গ্রামে কেবল তাহারই পুরা এক বস্তা ধান ছিল। বস্তাটি খোলাই হয় নাই। তাহারও অন্নকষ্ট হইয়াছিল. কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে অপরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে বলি দিতে মনস্থ করিল। সে ঐ ধান খাইবার জন্য ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে নাই, কারণ তাহা হইলে আগামী বীজ বপনের সময় গ্রামে আর বীজ থাকিবে না। ফলে একদিন দেখা গেল, যে, সে তাহার কুটীরে ধানের বস্তার উপর মাথা রাখিয়া অনশনে মরিয়া আছে।

ভারতীয়ের বিলাতী নিন্দা

দি লেডিজ্ ওয়ার্ল্ড নামক একখানা বিলাতী কাগজে ভারতের খোকাখুকীদের সম্বন্ধে একটা খুব আজগুবি রকমের প্রবন্ধ কয়েক মাস পূর্ব্বে বাহির হয়। তার সবটাই উপভোগ্য নহে; কারণ কতকগুলি মিথ্যা নিন্দাও তাহাতে আছে। গোটা দুই নমুনা দিতেছি। এক জায়গায় বলা হইতেছে—

In after life these sedate infants develop into patriots, who take pot-shots at the hated white man. "ভবিষ্যৎ জীবনে এই শান্ত শিশুরা 'দেশভক্ত' হইয়া উঠে এবং বিদ্বেষ-ভাজন শ্বেতকায় মানুষদের উপর গুলি ছোঁড়ে।"

যেন ঐটাই আমাদের সব ছেলে দের নিত্যকর্ম্ম! রামদীন ও মোতী নামক দুই কাল্পনিক ভাইবোনের বিষয় লিখিতে লিখিতে লেখক বলিতেছে:—

The twain seldom have more than two or three little brothers and sisters to help them in the daily task; for father and mother—being wise in their generation—do not burden themselves with larger families than they can afford to bring up. Indeed, to such an extent do they push their economy, that new arrivals sometimes mysteriously disappear within a few minutes of their birth, arrangements being made whereby wild animals and snakes relieve the callous parents of superfluous hostages of fortune Occasionally the perpetrators of infanticide are brought to book by the limbs of the law. But as the black policeman is ready to compound the gravest felony in return for a *rupee*, the innocents are slaughtered with impunity.—*The Ladies World*. November, 1921, p. 129.

তাৎপর্য্য। "এদের দুজনকে রোজকার কাজে সাহায্য করিবার জন্য দুতিনটির বেশী ভাইবোন থাকে না; কারণ তাদের বাপ-মা খুব চালাক, যত বড় পরিবার পালন করিতে পারে, তার চেয়ে বড় পরিবারের বোঝা তারা ঘাড়ে রাখে না। বাস্তবিক, তাদের মিতব্যয়িতাটার তারা এত বাড়াবাড়ি করে, যে, নবাগত শিশুরা কখন কখন জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়;—এরূপ বন্দোবস্ত করা থাকে, যাতে বন্য জন্তু বা সাপে নির্ম্মম বাপমাকে তাদের অতিরিক্ত সন্তানের বোঝা হইতে মুক্ত করে। কখন কখন শিশুহত্যাকারীরা আইনরক্ষকদের চেষ্টায় শাস্তি পায়। কিন্তু কালা পাহারাওয়ালা একটা টাকার বিনিময়ে খুব গুরুতর অপরাধীর সঙ্গেও রফা করিতে প্রস্তুত বলিয়া, নির্দ্দোষ শিশুরা অবাধে হত হয়।"

—

নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা

উপরে একজন ইংরেজ লেখকের ভারতীয় সমাজের মিথ্যা নিন্দার নমুনা দিলাম বটে; কিন্তু তা বলিয়া ইহা বলা চলে না, যে, আমাদের দেশে নিষ্ঠুরতা নাই। রাজপুতদের মধ্যে আগে খুব কন্যাহত্যা প্রচলিত ছিল। এখনও একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে কি না, বলা যায় না। তা ছাড়া, শিশুদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার আছে, এবং বালিকা ও নারীদের প্রতি তদপেক্ষাও নিষ্ঠুর (কখন কখন পৈশাচিক) ব্যবহার আছে। আমরা আগে আগে দুই-একবার সর্কারী রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছি, যে, আমাদের দেশে শতকরা যত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, আর কোথাও তত করে না। ইহার কারণ নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদের দুঃখ ও দুরবস্থা। কিন্তু সেই কারণ দূর করিবার দিকে দৃষ্টি কই? তাহা না করিয়া আমরা করি কি, না, পাশ্চাত্য দেশের নিন্দা রটনা করিতে থাকি, তাহাদের দেশের কুৎসিত বিবাহচ্ছেদ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কাগজে উদ্ধৃত করিতে থাকি। আচ্ছা, ধরা যাক্ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, পাশ্চাত্য সমাজ নারকীয়। তাহা হইলেই কি ইহাও প্রমাণ হইয়া যাইবে, যে, আমাদের দেশের অবস্থা স্বর্গীয়?

আমাদের দেশের মেয়েরা কেন আত্মহত্যা করে, তাহার কারণ স্থির হইল এই, যে, উপন্যাস ও নাটক পড়িলে এই প্রকার হয়। কাল্পনিক গল্প পড়িলে যদি আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি বাড়িত, তাহা হইলে আমাদের দেশের পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে শতকরা অনেক বেশী হইত; কারণ নারী অপেক্ষা লিখনপঠনক্ষম ও উপন্যাসপাঠক পুরুষের সংখ্যা আমাদের দেশে অনেকগুণ বেশী। পাশ্চাত্যদেশ-সকলে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত ও পঠিত হয়। তথায় নারীদের মধ্যে শিক্ষার ও উপন্যাস পাঠের চলন এদেশের চেয়ে ঢের বেশী। অথচ এদেশের মত এত বেশী নারী তথায় আত্মহত্যা করে না।

কেহ হয়ত বা বলিবেন, ঘরে বসিয়া বসিয়া উপন্যাস পড়িয়া মাথা খারাপ হয়, খোলা বাতাসে চলিয়া ফিরিয়া অঙ্গচালনা না করায় মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে। যদি তাই হয়, তাহা হইলে খোলা বাতাসে নড়িবার-চড়িবার বন্দোবস্ত করুন না কেন?

আর-একটি কথা শোনা গিয়াছিল, যে, আমাদের দেশে যে-সব নারী আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের কাহারো কাহারো শবব্যবচ্ছেদে দেখা গিয়াছে, যে, তাহাদের জরায়ুর পীড়া ছিল। ইহা সত্য হইলে, অনুসন্ধান হওয়া উচিত, যে, কেন এদেশেই নারীদের এত জরায়ুর ব্যাধি হয়।

আমাদের দোষে বাংলা দেশ অভিশপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নেহলতা কেরোসীন তেলে পরণের শাড়ী ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া মরিল; তাহার মড়ক বাংলা দেশেই বিস্তৃত হইল ও আবদ্ধ রহিল। অন্যত্র দুইএকজন নারী মাত্র এইভাবে আত্মহত্যা করিল। বঙ্গের এই কুপ্রাধান্যের কারণ কি?

বঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে বধূর উপর অত্যাচার কি কম হয়? দু-এক স্থলে ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় বলিয়া জানা পড়ে; কিন্তু অজানা তার চেয়ে অনেক বেশী থাকিয়া যায়। আনন্দময়ী নামে এক বালিকাকে তাহার স্বামী শাশুড়ী ও ননদ দুহাত লম্বা চৌড়া ও উঁচু ঘরে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখিয়া তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়া মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছিল, যে জঘন্য উদ্দেশ্যে, তাহা খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য অন্যত্র বিদ্যমান থাকে না, কিন্তু ছেঁকা দেওয়াটা মোটেই বিরল নহে। প্রহার, অনাহার, গঞ্জনা, গালাগালি ত আছেই। আমাদের লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায়? একেই ত সামাজিক কুপ্রথা ও দারিদ্র্যের জন্য কন্যার অনাদর অপমান বহু পিতৃগৃহে হয়, তদুপরি মেয়ে যদি পরের মেয়ে হইল, যদি সে পুত্রবধূরূপে অপরের ঘরে গেল, অমনি ধরিয়া লইতে হইবে, যে, তাহার হৃদয় হৃদয় নয়, তাহার শরীর শরীর নয়। সে সর্ব্বংসহা পাষাণে গড়া।

পাশ্চাত্য সমাজের যতই দোষ থাক্, সেখানে নারী অত্যাচরিত হইলে আদালতে স্বয়ং প্রতিকারপ্রার্থী হইবার সাহস শক্তি ও সুযোগ তাহার আছে। এদেশে কত নারী নরকযন্ত্রণা ভোগ করে; সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, আদালত পর্য্যন্ত তাহার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি

পৌঁছে না। তাহাদের উপর অত্যাচারী পুরুষ, অত্যাচারী বলিয়া জ্ঞাত হইলেও, আত্মীয়বন্ধুমণ্ডলে ও সমাজে তাহাদের পাতিত্য ঘটে না, তাহারা অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় হয় না। ধিক্ আমাদিগকে!

শিক্ষা দিয়া, সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত করিয়া, নারীদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ না করিলে তাহাদের দুর্দশার প্রতিকার হইবে না।

ইতরপ্রাণীদের মধ্যেও অনেক শ্রেষ্ঠজাতীয় জীব আছে, যাহারা দাম্পত্য সম্বন্ধে একনিষ্ঠ। আর আমাদের দেশে বহুরাণীসমন্বিত বহু তথাকথিত দাসী দ্বারা পরিবৃত মানবদেহধারী শত শত জন্তু, রাজা মহারাজা নামে অভিহিত এবং লোকসমাজে ও ব্রিটিশ রাজদরবারে সম্মানিত হয়। 'উচ্চতম' শ্রেণীর মধ্যে নারীর সম্মান এইরূপ। এমন দেশ অধঃপতিত থাকিবে না?

—

কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়

লণ্ডন টাইম্‌সের শিক্ষাবিষয়ক প্রপূর্ত্তিতে (*The Times* Educational Supplement, April 22, 1922, page 187) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় ১৯২০-২১ সালে উহার আয় ১০১৫৭১ পাউণ্ড ১০ শিলিং ৮ পেনী অর্থাৎ ১৫২৩৫৭৩ টাকা হইয়াছিল। ব্যয় ইহা অপেক্ষা বেশী হওয়ায় কম্‌তি পড়িয়াছিল ৩৯৭৫ পাউণ্ড ২শিলিং ২ পেনী অর্থাৎ মোটামুটি ৬০০০০ টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ সালের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব বা বজেট হইতে উহার আয়েরও একটি আন্দাজ দিতেছি। উহার প্রধান আয় পরীক্ষার ফী হইতে। ইহাকে বলে ফী ফণ্ড। ফী ফণ্ডের সমস্ত আয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের সমষ্টির মধ্যে ধরিলে কলিকাতার আয় কেম্ব্রিজ অপেক্ষা অনেক লক্ষ টাকা বেশী হয়। এই হেতু আমরা ফী ফণ্ডের কেবল সেই পরিমাণ টাকা আয়ের মধ্যে ধরিব, যাহা উহা হইতে পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট শিক্ষা-বিভাগকে দেওয়া হয়। ফী ফণ্ডের কেবল এই টাকাটিই আয়ের মধ্যে ধরিবার আর-একটি কারণ আছে। আমরা যদি ফী ফণ্ডের সমস্ত টাকা আয়ের মধ্যে ধরিয়া তুলনায় দেখাই, যে, কেম্ব্রিজ অপেক্ষা কলিকাতার আয় ঢের বেশী, অমনি উত্তর দেওয়া হইবে, যে, কেম্ব্রিজ অপেক্ষা কলিকাতার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঢের বেশী হওয়ায় খরচও খুব বেশী হয়। সেই জন্য আমরা ফী ফণ্ড্ হইতে পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট বিভাগে প্রাপ্ত টাকাটাই উহার আয় বলিয়া ধরিলাম। অবশ্য কেম্ব্রিজের পরীক্ষার্থীদের ফী হইতে প্রাপ্ত সব টাকাটাই আয় ধরা হইয়াছে। তাহা হইতে পরীক্ষার ব্যয় বাদ দিলে কেম্ব্রিজের আয়ও কিছু কম দেখান যায়। কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আয় ও মোট আয় দেখান যাইতেছে।

পোষ্টগ্রাজুয়েট্ বিভাগ (ফী ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত টাকা সমেত)	৫৬৪৭৪৫
বিজ্ঞান কলেজ	২৮৫১৯০
আইন কলেজ	২৪৭০৫৫
হার্ডিং হষ্টেল	৬৪৯২৮
ইন্‌স্পেক্‌শ্যান্ আদি ফণ্ড	৩৩৪২০
পাথেয় ফণ্ড	৭৬১৭
রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ ফণ্ড	১৯৭১৩
ছাত্রাবাস ফণ্ড	৭৫৪৫৭
রীডারশিপ ফণ্ড	১৫০৩৯
মিণ্টো অধ্যাপক ফণ্ড	১৮৯৪৪
হার্ডিং অধ্যাপক ফণ্ড	১৫৯৪৯
পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক ফণ্ড	৩২০৬৫
কার্মাইকেল অধ্যাপক ফণ্ড	২৮৩৭৩
পালিত বিদেশী বৃত্তি ফণ্ড	১০৬৮০১
খয়রা ফণ্ড*	২২২৫০
মোট	১৫৩৭৫৪৬
* বাদ, খয়রা ফণ্ড হইতে বিজ্ঞান কলেজে প্রদত্ত	১১৫০০
	১৫২৬০৪৬

ইহা হইতে দেখা যাইবে, যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় (১৫২৩৫৭৩৲) অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আয় (১৫২৬০৪৬৲) কিছু বেশী। পালিত বিদেশী বৃত্তি ফণ্ডের আয়ের ৯৬০৬৯ টাকা আবার সুদে খাটান হইবে। তাহা বাদ দিলেও কলিকাতার আয় কেম্ব্রিজের কাছাকাছি হয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কেম্ব্রিজের পরীক্ষার্থীদের ফীর সব টাকা উহার আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার ফী ফণ্ডের অংশ মাত্র উহার আয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। কেম্ব্রিজে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়ায় ষাট হাজার টাকা কম্‌তি পড়িয়াছিল। কলিকাতায় শুনিয়াছি পাঁচ লক্ষ টাকা কম্‌তি পড়িয়াছে। বজেট হইতে দেখা যায়, সাড়ে চারি লক্ষের উপর বটে।

কেম্ব্রিজে ১৯১৯-২০ সালে ৪৩৬০ জন ছাত্র পড়াশুনা করিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েট ও আইন শ্রেণীগুলিতে কত ছাত্র শিক্ষা পায় জানি না। পাঠকেরা মনে রাখিবেন, বিলাতে জীবনধারণের ব্যয় কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। অবশ্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের আয় ছাড়া উহার কলেজগুলির স্বতন্ত্র আয় আছে। তদ্রূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিরও স্বতন্ত্র আয় আছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই কলেজগুলির আয় আমরা ধরিলাম না। যাহা হউক উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় যখন প্রায় সমান সমান, অথচ কলিকাতায় কম্‌তি পড়িয়াছে কেম্ব্রিজ অপেক্ষা প্রায় চারি লক্ষ টাকা বেশী, তখন দেখা যাইতেছে, কেম্ব্রিজ অপেক্ষা কলিকাতা প্রায় চারি লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করিয়াছে। কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা তাহাদের প্রত্যেকের ব্যয়ের বিনিময়ে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার বৎসরে কি পরিমাণে বৃদ্ধি করে, কিরূপ দরের কত ছাত্র প্রতি বৎসর সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণ করে, এবং উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি পৃথিবীতে কিরূপ, তাহা ভাবিবার বিষয়। "আমরা বিশ্বের সব বিদ্যা শিখাইতে চাই, বা শিখাইতে প্রস্তুত," বলিলে চলিবে না, কোন্ কোন্ বিদ্যা কেমন শিখাইতেছেন, তাহাই বিবেচ্য।

—

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ

কলিকাতা বিদ্যাপীঠের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার কতকগুলি প্রশ্নপত্র আমরা দেখিয়াছি। অধিকাংশ প্রশ্ন এরূপ, যে, তাহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের চিন্তা ও বিচারশক্তি পরীক্ষিত হয়, মুখস্থ করিয়া তাহার উত্তর দেওয়া যায় না। সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নগুলির দ্বারা কাব্যরসগ্রাহিতা পরীক্ষিত হয়। প্রশ্নপত্রে যে-সব বাংলা ও ইংরেজী কবিতা ও গদ্য বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটি হইতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

বাংলা প্রশ্নপত্রগুলির আর-একটি বিশেষত্ব এই, যে, উহা কেবল সে-কালের সাহিত্য সম্বন্ধেই নহে, দুই মাস আগে প্রকাশিত "মুক্তধারা" সম্বন্ধেও উহাতে প্রশ্ন আছে।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার প্রধান বিশিষ্টত্ব এই যে, তিনি বেসরকারী লোক। পরে তিনি বা তাঁহার মত অন্য কোন যোগ্য বেসরকারী ব্যক্তি স্থায়ীভাবে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলে ভাল হয়। আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ ভাবে, কেবল সুনিয়ম প্রবর্ত্তনের খাতিরে, এই কথা লিখিতেছি। আমরা যে বাড়ীতে ভাড়া দিয়া বাস করি, তাহার পাশের খোলা কীটাকীর্ণ ও দুর্গন্ধ নর্দ্দমা ও দুটা খোলা পায়খানা সংস্কারের জন্য অনেক লেখালেখি এবং স্থায়ী চেয়ারম্যানের স্বচক্ষে দর্শন সত্ত্বেও পাঁচমাসে যাহা হয় নাই, সুরেন্দ্র-বাবুর নিকট হইতে তাহার প্রতিকারের আশায় কিছু লিখিতেছি না। এখানে মশা আগেও খুব ছিল; তাহার বিষয় মিউনিসিপালিটীকে জানাইয়াছিলাম; উহার এক কর্ম্মচারী বলিয়া গিয়াছিলেন, মাণিকতলা মিউনিসিপালিটী হইতে মশারা আসিয়া থাকে। তাহারা খুব এণ্টারপ্রাইজিং সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন সন্ধ্যার সময় হইতে মশার আধিক্যে লেখাপড়া করা কষ্টকর হইয়াছে। অস্থায়ী চেয়ারম্যান মহাশয়ের নিকট হইতে ঘরজোড়া একটা মশারি পাইবার লোভে তাঁহার প্রশংসা করিতেছি না—মশার কামড় একান্ত অসহ্য হইলে ওরূপ একটা মশারি কোন উপায়ে নিজেই সংগ্রহ করিব। সুরেন্দ্র-

বাবু বেসরকারী লোক ও যোগ্য লোক বলিয়া তাঁহার নিয়োগের অনুমোদন করিলাম, কোন প্রকার লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নহে।

—

বঙ্গীয় নমঃশূদ্র কন্‌ফারেন্স্

গত ২রা ৩রা জ্যৈষ্ঠ পিরোজপুরে বাবু রজনীকান্ত দাস বি-এলের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় নমঃশূদ্র কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। বঙ্গের নানা জেলা হইতে প্রায় ৮০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তৃতায় অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। দুই-চারিটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আবহমান কাল এক দেশে, এক জল-বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া নমঃশূদ্র সমাজ তাহাদের উচ্চ শ্রেণীর ভ্রাতাগণের নিকট হইতে প্রাণের ভালবাসা, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি, অক্লান্ত সেবা ইত্যাদির পরিবর্ত্তে যে অবজ্ঞা, নির্ম্মমতা, অস্পৃশ্যতা, হিংসা, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই ফলে ইহাদের কোন কাজেই নমঃশূদ্র সমাজের কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই। ইহারা নমঃশূদ্র সমাজকে ইহাদের প্রতি অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ও পথ প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে অসহযোগ করাকেই নমঃশূদ্র সমাজ তাহাদের মঙ্গল বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। যে কোন কাজে ইহাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহা হইতেই নমঃশূদ্র সমাজ সন্দেহের সহিত দূরে থাকাকেই নিরাপদ মনে করে। স্মরণাতীত কাল হইতে একত্রে বসবাস করিয়া ইহারা জ্ঞানে, গরিমায়, শিক্ষা-দীক্ষায় বড় হইয়াছে, কিন্তু অনুন্নত সমাজসমূহের প্রতি একবার তাকাইয়াও দেখে নাই। পরন্তু বহু শতাব্দীর পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সংস্পর্শে নমঃশূদ্র সমাজ আলোর একটু আভাস পাইয়াছে। কে জানে এদেশে বৃটিশের পদার্পণ না হইলে নমঃশূদ্র সমাজ আরও কতকাল তাহাদের এই দুর্ব্বহ বোঝা শিরে বহন করিত? দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য পারিয়া জাতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের সঙ্গে এক রাস্তায় গমনাগমন করিতেও পারে না। কে জানে অস্পৃশ্যতার ক্রমোন্নতিতে নমঃশূদ্র সমাজও এই উন্নতি লাভ না করিত? একমাত্র বৃটিশের উদারতার দৃষ্টান্ত ও সাম্যবাদী ন্যায়ই বাঙ্গলাকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

বক্তার মতের আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে চাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ ভারতেও আছে, বঙ্গেও আছে। যদি "একমাত্র ব্রিটিশের উদারতার দৃষ্টান্ত ও সাম্যবাদী ন্যায় বাঙ্গলাকে" ভীষণ অস্পৃশ্যতা ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা হইলে দক্ষিণ ভারতেও বিদ্যমান ঐ জিনিস দুটি দক্ষিণ ভারতকে ঐ ব্যাধি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই? ব্রিটিশ জাতি ও গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রশংসা হইতে আমরা বঞ্চিত করিতে চাই না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বক্তার ঐতিহাসিক ভ্রম হইয়াছে। তিনি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষের যে-যে অঞ্চলে মুসলমান প্রভাব বেশী হইয়াছিল, সেই-সেই স্থানে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার প্রকোপ অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কমিয়াছিল। বঙ্গে বৈষ্ণব প্রভাব ও তৎপূর্ব্বে বৌদ্ধ প্রভাব এ বিষয়ে কিছু প্রশংসার দাবী করিতে পারে।

খদ্দর ও চরকা সম্বন্ধে বক্তা ঠিক কথা বলিয়াছেন।

অনেকে চরকা ও খদ্দরের নামেই চমকিয়া উঠেন, কিন্তু বাস্তবিকই কি চরকা ও খদ্দরের মধ্যে ভয়ের কিছু আছে? এদেশেই এক শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতি ঘরে ঘরেই চরকার প্রচলন ছিল। এইগুলিকে সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলনের অঙ্গ মনে করা ভুল। অসহযোগিতার অর্থ—গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করা। চরকা দিয়া সুতা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত করার সঙ্গে অসহযোগিতার কোনই সংস্রব নাই। কেবল অসহযোগীগণের দ্বারা এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। অসহযোগীগণ * * * দেশের দরিদ্রতা ও লোকের কষ্ট কতক পরিমাণে দূরীকরণের মানসে চরকা দিয়া সুতা কাটা ও তাহা হইতে কাপড় তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করার আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। অসহযোগীগণ কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই কি ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে? আমার নিজের পরনোপযোগী কাপড় যদি আমি নিজে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারি, তাহাতে কি কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে? অনেক স্ত্রীলোক ও বিধবা-সমূহ এবং পুরুষরাও অনেক সময় বিনা কাজে গল্পগুজব করিয়া কাটায়। এই সময়টুকু সুতা কাটাতে ব্যয় হইলে কোন আপত্তি থাকিতে পারে কি? দরিদ্র সমাজ নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিলে একদিকে অলসতা দূরীভূত হইবে, অপরদিকে দরিদ্রতার কতক পরিমাণে লাঘব হইবে। নমঃশূদ্র সমাজে চরকার বহুল প্রচলন ও তাহা হইতে প্রস্তুত সুতা দ্বারা নিজের কাপড় তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কাপড় কিনিবার আবশ্যক হইলে, যাহা নিজেদের অর্থের বলে কুলায় তাহাই ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু বিলাসিতার জন্য এক কপর্দ্দক খরচ করাও নমঃশূদ্র সমাজের অনুচিত, কারণ আজ ভারত যে বিলাসিতা বর্জ্জনের জন্য কঠিন চেষ্টা করিতেছে, আমাদেরও সেই পাপ হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

কন্‌ফারেন্সের অনেকগুলি প্রস্তাবের, যেমন সামাজিক প্রস্তাবগুলির, সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায়। কন্‌ফারেন্স্ যে-প্রস্তাবে, গবর্ণমেণ্টকে জমীর চাষী প্রজাকে তাহার স্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তাহা দান-বিক্রয়াদি করিতে ও বিনা বাধায় তাহাতে কূপ পুষ্করিণী খনন করিতে গাছ কাটিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহার সমর্থন করি।

মুল্‌শীপেঠায় সত্যাগ্রহ।

তাতা কোম্পানী মহারাষ্ট্রে জলস্রোতের শক্তিতে তাড়িত শক্তি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এক বৃহৎ কার্‌খানা স্থাপন করিতে চান। এইজন্ত তাঁহারা মুল্‌শী-পেঠায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বহুবিস্তৃত স্থান ক্রয় করিয়াছেন। উহাতে ৫৪টি গ্রাম আছে; অধিবাসীর সংখ্যা ১২০০০। তাহারা ছত্রপতি শিবাজীর বিখ্যাত মাব্‌লা সৈনিকদের বংশধর। তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবস্মৃতিমণ্ডিত গ্রামগুলি ছাড়িয়া যাইতে নারাজ। তাহারা সত্যাগ্রহ করিয়াছে। নিখিল-মহারাষ্ট্র কন্‌ফারেন্স্‌ তাহাদের কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ধনাগম যাহার উদ্দেশ্য এরূপ কোন ব্যক্তির বা কোম্পানীর কোন কাজের জন্ত আইনের জোরে মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জমী গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া দিলে তাহা ন্তায়সঙ্গত হয় না।

—

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশী-চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাল্য-কালে গ্রাম্য বিত্তালয়ে সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর পরলোকগত শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর তিনিও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি জ্ঞান উপার্জ্জনে মনো-নিবেশ করেন। অনুবাদের সাহায্যে তিনি প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র-সমুদয় অধ্যয়ন করেন। বাংলা উৎকৃষ্ট সমুদয় পুস্তক ও মাসিক পত্র পড়িয়া তিনি এরূপ বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করেন, যে, শুধু বাংলার সাহায্যে এত জ্ঞান লাভ করা যায় লোকে তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পুস্তক পড়িয়া ও জ্ঞানী লোকদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি কঠিন দার্শনিক বিষয়-সকলও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে চলনসই ইংরেজী শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের প্রধান ও উৎকৃষ্ট অংশ বাংলাভাষার সাহায্যেই লব্ধ। তিনি কয়েকটি পুস্তক ও অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংগীতবিত্তায় তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি প্রচার কার্য্যে পরম উৎসাহী ছিলেন, এবং তদুপলক্ষ্যে বাংলা ও আসামের সমুদয় অঞ্চলে এবং উত্তর ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দেহমনআত্মার সমঞ্জসীভূত উৎকর্ষ সাধনের তিনি পক্ষ-পাতী ছিলেন, এবং দৈহিক উৎকর্ষ সাধন তাঁহার বক্তৃতার অন্যতম বিষয় ছিল। তিনি কন্যা ও পুত্রদিগকে বিশ্ববিত্তা-লয়ের উচ্চশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

চিত্রপরিচয়

কৌতূহল

অন্তঃপুরিকা বধূ বাতায়ন-বলভিতে এক-বাটি খাবার রাখিয়া গাছের পাখীকে প্রলুব্ধ করিয়া ডাকিয়া কাছে আনিতে পারে কি না তাহাই কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছে।

জলসত্র

গ্রীষ্মকালে যখন জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়, তখন পথিকদের তৃষ্ণা মোচনের জন্য পথের ধারে ছায়াশীতল গাছের তলে কোনো কোনো পুণ্যকামী জলসত্র দিয়া থাকেন; শ্রান্ত পথিককে চারখানা বাতাসা বা চারটি গুড়ছোলা খাইতে দিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করা হয়। জলের ঘটী কাহাকেও ছুঁইতে দেওয়া হয় না; জল হাতে ঢালিয়া দেওয়া হয়, পিপাসার্ত্ত অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করে। কিন্তু মুখের সঙ্গে ঘটীর সঙ্গে জলধারার সংস্পর্শে সংযোগ ঘটিলেও পাছে ঘটীতে ছুত লাগে, এই ভয়ে একটা বাঁশের চোঙা মধ্যস্থরূপে টাঙানো হয়; চোঙার এক প্রান্তে ঘটীর জল ঢালা হয় ও অন্য প্রান্তের নীচে অঞ্জলি পাতিয়া ছত্রিশ জাতের লোক জাত ও ছুত বাঁচাইয়া জল পান করে। এই ছবিখানিতে বালিকা জলদাত্রী সাক্ষাৎ করুণা-রূপিণী তৃপ্তি-মূর্ত্তি; পত্রল ঝাঁপালো গাছটি শান্ত শীতল আশ্রয়ের প্রতিরূপ।

দর্‌গা হইতে

ফার্সী দর্‌-গাহ্‌ মানে মসজিদ, ধর্ম্মমন্দির, উপাসনা-গৃহ। উপাসনা-মন্দিরের সম্মুখে স্নেহশঙ্কাতুর মাতারা অসুস্থ সন্তানদের লইয়া উপস্থিত থাকেন, সদ্য-ভগবৎপূজা-সমাপ্ত পুণ্যাত্মাদের আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া সন্তানের সকল অমঙ্গল দূর করিবেন এই আকাঙ্ক্ষায়। এই পঞ্জাবী মহিলাটি সন্তানের জন্য ধর্ম্মপরায়ণ, ঈশ্বরপ্রেমিকদের আশীর্ব্বাদ আহরণ করিয়া মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। চিত্রল
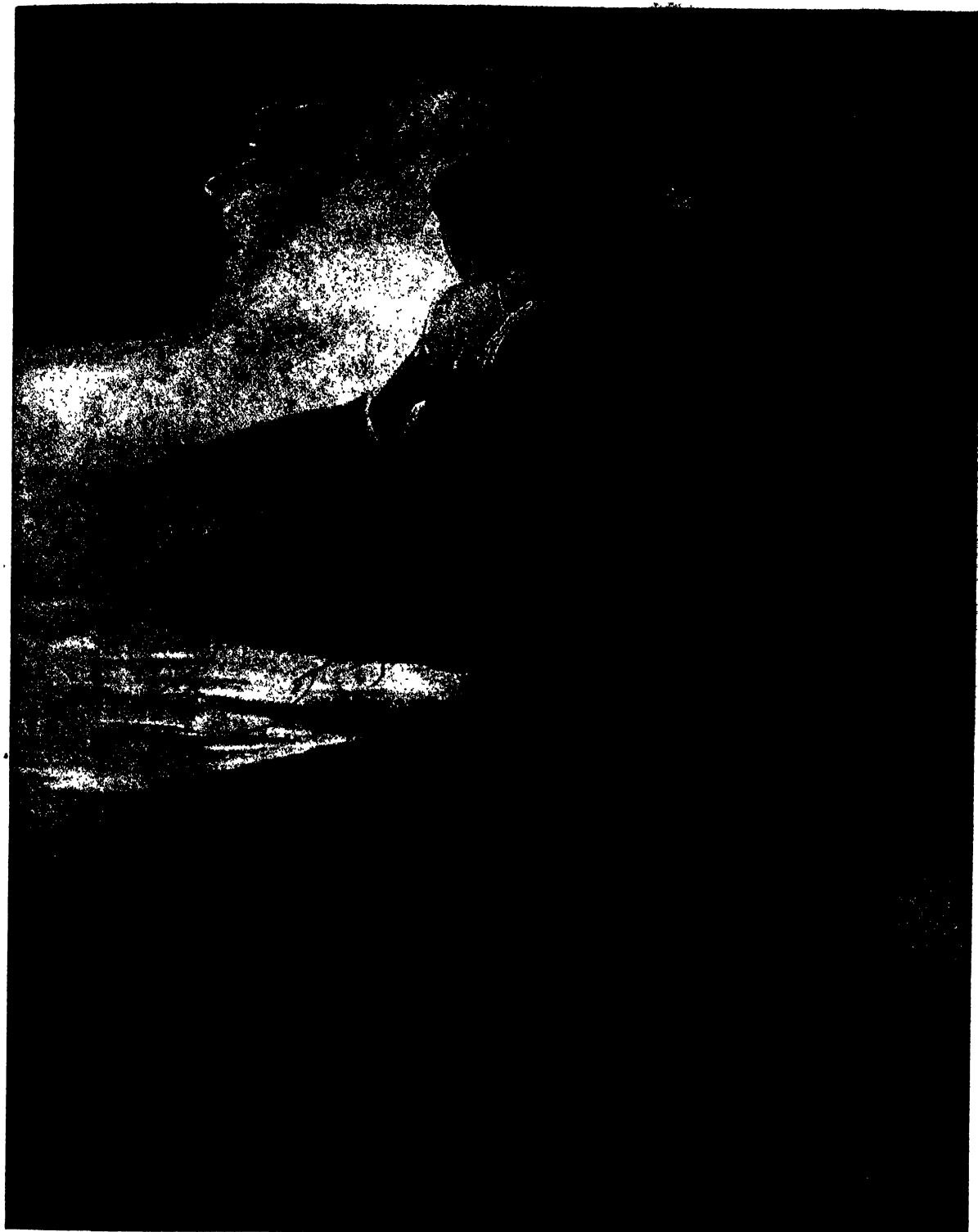
রহস্যময়ী প্রকৃতি

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের সৌজন্যে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩২৯

৪র্থ সংখ্যা

ভোগের অনাচার

এক-ফসলের দেশে লোকে কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে চাষারা সমস্ত বৎসর ধরিয়াই কাজ পায় সেখানেও তাহারা মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই এমনি। এই যে মাড়োয়াড়ী বণিক কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, যাহাদের ব্যবসা সুদূর মফঃস্বলেও চলিতেছে, রেল ষ্টেশনের ধারে যাহাদের কুশ্রী করোগেটের গুদাম ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে, তাহাদেরও দেশ রাজপুতানা মাড়্বাড়ে গেলে দেখা যাইবে যে সেখানকার জনসাধারণও দারিদ্র্য-দুঃখে পীড়িত।

ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে যাঁহারা বি এন আর রেল-পথে পূর্ব্ব উপকূল দিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন কলিকাতার রেল ষ্টেশনের সীমা পার হইলেই চারিদিক সবুজ শস্তে ভরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন দ্রুত চলিতেছে, বাংলার সমতল ছাড়িয়া উড়িষ্যার বন ও পাহাড় দেখা দিল, কিন্তু পাহাড়ের কোলে, চিল্কার লবণ-জলের ধারে, গণ্ডগ্রামের প্রান্তরে কোথাও সবুজের বিচ্ছেদ নাই। রাত্রি গেল। ইতিমধ্যে ট্রেন কত পথ অতিক্রম করিয়াছে; সকালে উঠিয়াও দেখি সবুজ শস্যের নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণতা। তারপর মাদ্রাজের দিকে শস্যের রকম বদলাইয়া কোথাও বা হলুদের ছাপ, কোথাও বা পাকা শস্যের সোনার রং, আবার কোথাও বা চষা ক্ষেতের ফিকা রং। সবুজের নেশায় যখন পাইয়া বসিয়াছে, পূর্ণতার আনন্দে যখন মন ভরা, তখন শস্যের পূর্ণতার পাশেই উৎপাদকের রিক্ততার কথা মনে পড়িল। চোখ মেলিয়াও দেখি তাহাই। মাঠে মাঠে লোক ভরা। কোথাও বা নিড়াইবার সময় বলিয়া সমস্ত গ্রাম বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ এমন কি কুব্জ-দেহ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। গায়ে কাপড় নাই, পরণে নেংটী, কালো কালো মূর্ত্তিগুলি মানুষ বলিয়া চেনা যায় কি না-যায়! কেবল মেয়েদের শাড়ীতে রৌদ্র পড়িয়া দূর হইতে মানুষের দল বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোথাও বা লাঙ্গল দেওয়া হইতেছে, গরুগুলির চেহারা মানুষের অপেক্ষা কতক ভাল। শীর্ণ লোকগুলি হয়ত নিজেরা না খাইয়াও গরুগুলিকে সবল রাখিয়াছে; না হইলে যে, যাহা-কিছু খাইতে পায় তাহাও বন্ধ হইবে। জলভরা গোদাবরী দুই পার সিক্ত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তুতিকোরিনের খাল বড় বড় প্রান্তর জল দিয়া উর্ব্বর করিয়াছে। ফসলে ভরা ক্ষেত। কিন্তু লোকের চেহারা ঐ এক—গায়ে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই। এ কি বিপুল পরিহাস! বাংলায় চাষার দুর্দ্দশা, মাদ্রাজে বুঝি আরো বেশী। এই যে ফসল

হইয়াছে ইহাতে উহাদের ভাত জুটিবে না, কাপড় জুটিবে না, ইহারা সকলে ঋণে জড়িত। ফসল সংগ্রহ করিবার সময় হইলেই সাউকার আসিয়া মাঠে দাঁড়াইবে। অসমান বিনিময়ে সে তাহার প্রাপ্য অর্থের মূল্যে শস্য লইয়া যাইবে। যে সামান্য শস্য চাষার ঘরে থাকিবে তাহাতে বীজ রাখিবে, দুই বেলা বা এক বেলা অন্নের সংস্থান করিবে ও কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করিবে, এমন দুরাশা কোনও চাষার নাই। যে ফসল চাষার ঋণ শোধ করিয়া ঘরে আইসে তাহা দুই দিনেই ফুরাইয়া যায়। তারপর আবার মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। ইহারা নেশা করে না, জমি অনাবাদী ফেলিয়া রাখে না, বিলাতী বিলাসের জিনিষ একপ্রকার কেনেই না বলিলেই হয়, তথাপি উহাদের অবস্থা এত হীন। যেখানে এতটুকু জমি আছে, নালার ধার, আনাচ্ কানাচ্, কোথাও বাদ নাই, শস্য শস্য। ভাবিতেছিলাম যদি চেষ্টা করিয়া, কার্‌খানায় যেমন করিয়া কাজ করে তেমনি করিয়া যদি হিসাব রাখিয়া সুপার্‌ভাইজার রাখিয়া এই শস্য উৎপাদন করিতে হইত! কি প্রচণ্ড আয়াসে কত কম ফল হইত! চাষার কাজ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে লোকগুলি যেন একেবারে মরিয়া হইয়া শেষ ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে। যদি কোনও একজন বা এক দল মালিকের জন্য লোকে চাষ আবাদ করিত, তবে এ জমি ভাল নয়, সে জমিতে সময়-মত বীজ পাই নাই, ওখানটাতে লাঙ্গল চলে না, এমনি করিয়া হয়ত অৰ্দ্ধেক জমি বাদ যাইত। কিন্তু তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা নিষ্ঠার ভাব সমস্ত ক্ষেতের কাজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি কেবলি ভাবি যাহারা এমন করিয়া ফসল তুলিয়াছে, যাহারা নেশা করে না, আলস্যে সময় কাটায় না, তাহাদেরও কেন দুই বেলা খাওয়া জুটিবে না; তাহারা কেন খাইতে পরিতে পাইবে না?

এই কেনর জবাব অতি নিদারুণ। সমস্ত উৰ্দ্ধতন সমাজ একযোগে ইহাদিগকে ইহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। দশজন শতজন শ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে,—একজন জমিদার, উকীল, ডাক্তার, বা ব্যবসাদার বড় লোক হইয়া তাহার উৎপন্ন এবং শ্রমলব্ধ ফলে ভোগলালসা তৃপ্ত করিবে। যখন মজুরের অভাব, চাহিবামাত্র পাওয়া দুষ্কর, তখনও দিন-মজুরকে দশ আনা মজুরী দিই। একজনার উপর চার-পাঁচজনার অন্ন জোগাইবার ভার, অসুখ আছে, বৃষ্টি বাদল আছে, অজন্মা আছে। এমনি করিয়াই না গড়পড়্তা ভারতবাসীর দৈনিক একআনা মাত্র আয় হিসাবে দাঁড়ায়।

তাহার ফল কি তাহা চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি। বয়স্ক নরনারী অৰ্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে, শিশুগুলি অধিক সংখ্যায় মারা যায়। তাহারা অন্ন-বস্ত্র-অর্থ-হীন। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই ত বাঁচিয়া থাকিবার একটা সামাজিক দাবী আছে। সমাজে যখন শ্রমজীবীর আবশ্যক, তখন তাহাকে ও তাহার উপর নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সমাজের কর্ত্তব্য। জনসাধারণ যতই অশিক্ষিত ও অকর্ম্মা হউক, মোটের উপর যে জীবিকা অর্জ্জনের যথেষ্ট চেষ্টা আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার কি? প্রতিকার ব্যবসা বাণিজ্য নহে। বড় বড় কলকারখানা করিয়া সস্তায় পণ্য উৎপন্ন করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। প্রতিকার কেবল মাত্র শিক্ষায়ও নহে। শিক্ষা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থা আরো ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু খাটিবার ও খাটাইবার পরস্পর অবস্থা-গত সম্পর্ক পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শিক্ষা সকলের পাওয়া আবশ্যক, তাহাতে পরোক্ষভাবে জীবিকা-অর্জ্জন-পটুত্ব জন্মিতে পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকিলে আত্মরক্ষার কথা ভাবিতে পারে, সেটুকু শিক্ষা আমাদের জনসাধারণের সংস্কারগত ভাবে আছে। তারপর লোকসংখ্যার আধিক্যও এই দুর্দ্দশার হেতু নহে। যত লোক ভারতবর্ষে আছে, তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, অনেকটা বিদেশেও চলিয়া যায়। Supply and demand অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার যে অমোঘ যুক্তি সচরাচর শোনা যায় তাহাও এ হীনতার হেতু নহে। কলকারখানা, চা-বাগান ও কয়লার খনিতে শ্রমিকের চাহিদা খুবই আছে। তবুও তাহাদের অবস্থার হীনতা অপরিসীম। জনসাধারণের দুর্দ্দশা যদি বাণিজ্য ব্যবসায়ের অভাবে না হইয়া থাকে, যদি অশিক্ষাও ইহার মূলে নাই, যদি

লোকাধিক্য ও চাহিদার অভাবও ইহার হেতু না হয়, তবে তা কি? কোন্ সে দানব আমাদের সাধারণকে পীড়িত করিয়া এমনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহাকে সহজে ধরিতেও জানি না?

আমার মনে হয় এই ছদ্মবেশী দানব struggle for existence—জীবন-সংগ্রাম। ভোগলিপ্সার ইহা নামান্তর মাত্র। জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় হইয়া থাকে। যোগ্যতমের জয়ই যে চরম লাভ তাহা আমরা জানিতাম না, আর এই জয়ই যে শেষ পর্য্যন্ত জয় তাহাও আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা বলে না। বিলাতী সভ্যতার শক্তির মদ যখন আমাদের মস্তিষ্ক ঘোলাইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতে এই নৃশংস মন্ত্রগুলি এদেশে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগুলিতে আমরা এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে উহার কদর্য্যতা অনুভব করার মত শক্তিও আমাদের নাই। যখন এই ধরণের চলিত কথা লোকের মনকে পরুষ করিয়া হীন করিতে থাকে, তখন তাহার প্রতিবাদও অসহনীয় হয়। শক্তিবাদী বলিবেন struggle for existence জীবনসংগ্রাম বৈজ্ঞানিক সত্যবাদ। গাছের নীচে যদি ২৫টা চারা হয়, তবে দুই চারিটি জোরাল চারা বাকীগুলিকে আবছায়ার আওতায় ফেলিয়া অপুষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে বড় হয়। তারপর মাইক্রোস্কোপে এক বিন্দু জলকণার মধ্যে দেখা যায় কত শত সহস্র প্রাণী একে অন্যকে ঠেলিয়া মারিয়া নিজে বাঁচিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহারা যোগ্যতম তাহারাই বাঁচিতেছে, বাকীগুলি মরিতেছে। এ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় একবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহার উপর আর যুক্তিপ্রয়োগ অসম্ভব। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই এই বড় বড় বিলাতী বৈজ্ঞানিকবাদের নৃশংসতা ধরা পড়ে। শক্তিবাদী বলিবেন মজুর দশ আনায় পাই বলিয়াই রোজ দশ আনা দিয়া থাকি, তাহাতে যদি তাহার পরিবারস্থ লোক খাইতে না পায় তবে সে ভাবনা নিয়োক্তার নহে। মজুরের যদি সাধ্য থাকে তবে বেশী আদায় করিয়া লউক—যদি আদায় করিতে পারে ভাল কিন্তু নিয়োক্তা যথাবিহিত বাধা দিবে, আর যদি চেষ্টা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াও আদায় করিতে না পারে তবে নিয়োক্তা এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নিয়োক্তার সমাজ পরাজিত শত্রুর সাজা দিবে। কিন্তু খাস বিলাতেও ইহার কদর্য্যতা ও অমানুষিকতা উপলব্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ ত আর গাছপালা বা জলবিন্দুস্থ সহস্র প্রাণীর একটি নয়। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, সমাজ আছে, মানুষ বলিবে বাঁচাও, দশজনকে বাঁচিতে দাও। মানুষ বলিবে অহিংসা পরমধর্ম্ম। মানুষ বলিবে সমাজ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাহাই না হয় তবে সন্তান পালনের বিড়ম্বনা লই কেন? মৎস্যের মত, বিড়ালের মত, সরীসৃপের মত আত্মজকে হত্যা করি না কেন? অসহায় শিশু ত যোগ্যতমের বিপরীত। আর যত জীব আছে তাদের তুলনায় মানুষের শিশু ত সর্ব্বাপেক্ষা অসহায়। এমন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আগুনে সেঁকিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া কাহাকেও বড় করিতে হয় না। এমন অসহায় জীবকে মারিয়া না ফেলিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা কোথায় হইতে আসিতেছে? ইহার কারণ মানুষের সমাজ বিলাতী নৃশংসবাদ অপেক্ষা অনেক পুরাতন। যে প্রেম সন্তানে প্রকাশ হয় তাহাই দশে বিতরণের জন্য মানুষের অন্তরাত্মা চিরকাল আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহাকে বিলাতী নৃশংসতায় আচ্ছন্ন করিতে পারে না।

সামাজিক জীবনে এই নৃশংসবাদ আমাদিগকে কেমন কঠিন করিয়াছে তাহা যদিও সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে এবং উহাই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, তথাপি দুই এক জায়গায় নিতান্ত নিদ্রিত সমাজের নিকটেই উহা বিসদৃশ বলিয়া ধরা পড়ে। যুদ্ধের সময় কাঁচা পাটের রপ্তানি বন্ধ হয়। চট্ বা থলে বিক্রয়ের অনুমতি সরকার দিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য পাটের বস্তার চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তা ছাড়া সাধারণ ব্যবহারের জন্যও পাটের বস্তা ভারতবর্ষ হইতে মিত্রশক্তির জন্য যোগান হয়। যুদ্ধের মাল যোগাইয়া কিছু লাভ করার কথা। কিন্তু এই ব্যাপারে বাংলাদেশের চাষাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তাহারা দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহারে কদাহারে রোগগ্রস্ত হইয়া দলে দলে মরিতে লাগিল। পাটের

দাম কমিয়া যাওয়ায় কত যে চাষা মরিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর সেই পাটের কাজে কলওয়ালারা একশত টাকা খাটাইয়া এক বছরে ছয়শত টাকা লাভ করিয়াছে। ইহা যে সম্ভবপর হইল, যদি পাটের কলগুলি বিদেশী লোকের হাতে না থাকিয়া দেশী লোকের হাতে থাকিত তবেই কি ইহার কিছু ব্যতিক্রম আশা করা যাইত? সুযোগ পাইলে টাকা রোজ্‌গার করিবার পথ, অতিরিক্ত লাভ করিবার পথ, দেশী বিদেশী কেহই ছাড়িত না। এই যে ব্যাপারটি ঘটিল, পাটের দর তিনটাকা মণ মাত্র দাঁড়াইল, একমণ পাট বিক্রয় করিয়া আধমণ ধানও পাওয়া গেল না, আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই পাট-কলে এক-শত টাকায় ছয়শত টাকা মুনাফা দেওয়া হইল,—এই অবস্থা কোন্ শিক্ষায় অসম্ভব হইত? প্রাথমিক শিক্ষা চাষারা পাইলেও এই ঘটনা ঘটিত। মাড়বাড়ী মধ্যবর্ত্তী না থাকিয়া সবটা হাত-ফেরতার কাজ হাটখোলার বাঙ্গালী মহাজনদের হাতে থাকিলেও এই দুর্ঘটনা বন্ধ হইত না। কুটীর-শিল্পের প্রচলন থাকিলেও এই দুর্দ্দশার নিবারণ হইত না, কেননা পাটে নিযুক্ত শ্রমেরই মূল্য পাওয়া যায় নাই। সাধারণের শিক্ষা, কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠা কিছুতেই এই ব্যাপারের সংঘটন বন্ধ করিতে পারিত না। ইহা যুদ্ধেরও ফল নহে, কেননা পাটের কাজেই আবার একদল লোক লক্ষ লক্ষ টাকা জমায়েৎ করিয়াছিলেন। পাটের ক্ষেতে কাজ করিয়া, কোমর অবধি পচাজলে ডুবাইয়া পাট ধুইয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া পাট শুখাইয়া যে হতভাগ্য পাট ব্যবহারোপযোগী করিল, সে অন্নাভাবে, দারিদ্র্যে, সংক্রামক ব্যাধিতে মরিল; আর সেই পাটে গুটিকতক মাত্র লোক, তাদের দেশ যেখানেই হউক, চামড়ার রং সাদা বা কালোই হউক, চাষার অনাহার ও অকাল-মৃত্যুর হেতুভূত পাটে লক্ষ লক্ষ টাকা করিল। Supply and demand, "চাহিদা ও সরবরাহের" মন্ত্রে সমস্ত জিজ্ঞাসু মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহই জেদ করিলেন না যে চাষাদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে। বাঁচিবার অধিকার Right to live এক দিন সমাজকে মানিতেই হইবে। যে সমাজ মানব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভুলিয়া আছে, সেই অনিচ্ছুক ও স্বার্থান্ধ সমাজেরও একদিন প্রেমের শান্ত মন্ত্রে নয় ত ধ্বংসের গর্জ্জনে স্বীকার করিতেই হইবে যে চাষাদেরও বাঁচিবার অধিকার আছে।

যদি চাষারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বলিত যে বারো টাকার কমে পাটের মণ বেচিব না, তবে কলওয়ালাকে হয়ত ঐ দরেই পাট কিনিতে হইত। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শিক্ষা অন্য রকম। লোকে ঠেকিয়া শিক্ষা করে। ধর্ম্মাশ্রিত সমাজ উহা মানিয়া লয়; আর স্বার্থান্ধ সমাজ, যে সমাজ ভোগ করাই পরম লাভ বলিয়া জানিয়াছে, সে সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; তখন বিরোধ সংঘর্ষ ও প্রাণহানি আরম্ভ হয়। সঙ্ঘ নানা রকমের ও নানা ছোট ও বড় স্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্ট হয়। আজকাল আমাদের দেশে নির্ব্বিসংবাদী একপ্রকার সঙ্ঘ দেখা দিয়াছে। এইগুলি সমবায়-সমিতি নামে পরিচিত। মহাজনদের হাত হইতে কৃষক ও শিল্পীকে রক্ষা করিয়া তাহার ব্যবসায়ের উপযুক্ত মূলধন যোগানই এইসকল সমিতির কাজ। কোনও কোনও স্থানে জোলা তাঁতী ও মুচিদের এই সমিতিতে বেশ কাজ হইতেছে। আবশ্যক-মত অল্প সুদে ধার পাইতেছে। সুদও শতকরা সাড়েবারো টাকার বেশী নয়। টাকা শোধের ও প্রত্যেক সভ্যের মূলধনের অধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে।

তথাপি এইসকল সমিতির দ্বারা চাষাদের দুঃখ দূর হইবার অনেক অন্তরায় আছে। যখন এই সমিতিগুলি শক্তির কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইবে, যখন কৃষকেরা সমবায়-সমিতিকে কেবলমাত্র ঋণ লইবার আফিস বলিয়া ব্যবহার করিবে না, তখন ধনিক-শীর্ষ সমাজ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবেন সে বিষয়ে আশঙ্কা আছে। গবর্ণমেণ্ট ও ধনিক-সমাজ আজ যে সমিতিগুলি অর্থ দ্বারা লোক দ্বারা গঠন করিবার চেষ্টা ও সাহায্য করিতেছেন সেই সমিতি-গুলি চাষাদের স্বার্থরক্ষার সঙ্ঘরূপে সত্যই ব্যবহৃত হইলে, বিষাক্তজ্ঞানে এখনকার পৃষ্ঠপোষকেরা ঐসকল সমিতি দমন ও ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা স্বাভাবিক মনে হয়।

এইপ্রকার সমবায়-সমিতিগুলির মূলে ক্ষুদ্র কেন্দ্রের স্বার্থ থাকায় ইহারাও অপর অর্থাধিকারীর ন্যায় পরপীড়ক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক, কোনও গ্রামের

কৃষকেরা দেখিল ধান না বিক্রয় করিয়া চাল বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হয়। তাহারা সকলে মিলিয়া সমবায় সমিতির অর্থে একটি ধান-কল বসাইল, নিজেদের ধান ভানিয়া লইল এবং উদ্বৃত্ত ধান লাভে বিক্রয় করিল; তাহাতে নিজেদের ধান ভানার ব্যয় কমিল কিম্বা আরও লাভ হইল। কিন্তু ঐ কলে যে-সমস্ত মজুর দিন-মজুরী খাটিবে তাহাদের অবস্থা অ; কলের মজুরদের অপেক্ষা একটুও ভাল না হইবার কথা। এই কেন্দ্রভূত সমিতির স্বার্থই হইতেছে যত সস্তায় পারা যায় ধান ভানা। অন্যান্য মূলধনের অধিকারীর যে দোষ,—অপরকে বঞ্চিত করিয়া কলের বা ব্যবসায়ের লাভ বাড়ান,—সে লোভ বা প্রচেষ্টার জড় ইহাতে মরিবে না। সমবায়-সমিতি দ্বারা ছোট ছোট কেন্দ্রের ইষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সমাজের গোড়ায় যে অবিচার নির্ধনকে পিষ্ট করিতেছে তাহার প্রতিকার ইহাতে হইবে না। সমবায়-সমিতি একজাতীয় শ্রমিককে ধনিক করিতে পারে এই পর্য্যন্ত। সমবায়ের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় কোনও একদল শ্রমিক ধনী হইলেও অন্য ধনীর সহিত আর তাহার প্রভেদ থাকে না।

দেখা যাইতেছে যে কোনও এক দল চাষী বা শিল্পীর যদি ধনবান হইবার পথ মুক্ত হয় তাহা হইলেও সমষ্টি হিসাবে সমাজের বিশেষ হিত হইবে না। প্রথমে যে কথা আরম্ভ করা হইয়াছিল যে ক্ষেত-ভরা শস্য থাকিতেও উৎপাদক চাষারা অনাহারে থাকে তাহার প্রতিকার হয় না। ধনী ও নির্ধন, যাহারা খাটে ও খাটায়, তাহারা সকলেই একই সমাজের অঙ্গ। যদি এই ব্যষ্টির ভিতর পরস্পর প্রেমের সম্পর্ক থাকে তবেই সমষ্টির মঙ্গল। আর যদি একে অপরকে পীড়ন করিয়া সম্পদ সংগ্রহ করিবে এই ইচ্ছাই থাকে এবং তাহা কর্ম্মে প্রকট হয় তবে সে সমাজের অহিত কিছুতেই ঠেকান যাইবে না। দেশের জনসাধারণ এখন চরকায় কিছু কিছু রোজগার করিতেছে। নিষ্কর্ম্মা কর্ম্ম পাইয়া ইহাতে কিছু অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিবে। কিন্তু বেশীদিন এই অবস্থা যে স্থায়ী হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়। পাটের বেলায় পাটের চাষীর অবস্থা যাহা হইয়াছিল, চরকার সূতা কাপড়ের বেলায় তাহাই যে আংশিকভাবে হইবে না, তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ কোনও অর্থনৈতিক নিয়মে উহা না হইবার পথ নির্দ্দেশ করে না। দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য যাঁহাদের হাতে, সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার চাবিটিও তাঁহাদের হাতে। তাঁহারা যতই আর্থিক অসমতা সৃষ্টি করিতে থাকিবেন ততই দেশের অহিত হইবে, বুভুক্ষুর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। সমাজের এক অংশের পক্ষে শত চেষ্টাতেও মানুষের মত বাস করা অসম্ভব হইবে। অবশ্য ইহা বরাবর চলিতে পারে না। ভৈরব একদিন ডমরুর তালে তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠেন, অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া শিবের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ লইয়া নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। মহাকালের এই লীলা পৃথিবীর বুকের উপর কতবার প্রলয়-নৃত্যে অভিনীত হইয়াছে।

সমাজের ভিতর যে এতবড় একটা অবিচার চলিতেছে, তাহার জন্য কেবল মাত্র ধনী ও ব্যবসাদার সম্প্রদায়ই দায়ী আর সাধারণ শিল্পী ও কৃষক মেষের মত শান্ত ও নিরপরাধ এমন কথা আমি মোটেই বলিতেছি না। অত্যাচরিত সুযোগ-মত অত্যাচারীর উপর অত্যাচার করিতেছে। একই অবিচার-অত্যাচারের শৃঙ্খল সমাজ-শীর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে। কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষ আপন সভ্যতা ও শিক্ষা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমের ন্যায় আপাতসুখের অভিলাষী হইয়া পড়িয়াছে।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥"

"শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় গ্রহণ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।"—(কঠোপনিষৎ ১।২।২)। আমাদের দেশ পশ্চিমের ক্ষমতাদৃপ্ত রূপের মোহে অভিভূত হইয়া শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পশ্চাৎ গমন করিতেছে। কেবল কেমন করিয়া ভোগ করিব ইহাই সমাজের আরা-

ধনার বিষয় হইয়াছে। ভোগলিপ্সা সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভোগ করিতে পারিতেছে অল্প লোকেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার পীড়ন প্রত্যেক স্তরেই অনুভূত হইতেছে। যাঁহারা বাণিজ্যে লিপ্ত তাঁহারা দুই হাতে দেশের মঙ্গল ঠেলিয়া বিদায় করিয়া অপ্রয়োজনীয় আয়েসের দ্রব্য আনিয়া ফেলিতেছেন। পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা ধন-সম্পদের অধিকারী হইতেছেন। অপর দশজনও তাঁহাদেরই আদর্শে অধিকতর উপার্জ্জনের পথ খুঁজিতেছে। ইহাতে কদাচ সমষ্টির মঙ্গল হইতে পারে না। মোটের উপর হিসাব করিলে দেশ দরিদ্রই হইতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বহুবিধ জড় উপকরণ আমাদিগকে অনেক দিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দিয়াছে তাহার অধিক মূল্য লইয়াছে। দ্রুতগামী যান বাহন, সংবাদবাহী টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রাদি, কলমের চারার মত দেশে বসিয়াছে। এগুলি দেশের মাটীতে গড়িয়া উঠে নাই, তৈরী হইয়া বাহির হইতে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার মূল্য স্বরূপ আমরা কি না দিয়াছি। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও সুখ দারিদ্র্যের ক্রোড়ে বিসর্জ্জন দিয়াছি। ধন সম্পদ দুই-এক জায়গায় বিশেষতঃ সহরের বণিকের নিকট স্তূপীকৃত করিয়া সর্ব্বত্র দৈন্যের দুর্দ্দশা বিতরণ করিয়াছি। আর সর্ব্বোপরি আমাদের চরিত্রের ও সভ্যতার সম্পদ অবহেলা করিয়া যে-সকল জড়বস্তু বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া এদেশে আম্‌দানী করিয়াছি তাহার প্রভাবে জড়েই পরিণত হইতেছি! চিত্তের সে সন্তোষ নাই যাহাতে ধনী ও দরিদ্র একজায়গায় দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের দেশে সামাজিক অসমতা কাঁটার মত সমাজকে বিঁধিয়া ছিল, এখনো আছে। তথাপি একটা দিকে উদারতা ছিল যাহা সমাজের প্রাণ ও স্বাস্থ্য কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ভোগ করাই পরম এবং চরম ইহা সমাজ স্বীকার করিত না। কোন কালেই সমাজস্থ সকলে ত্যাগের আদর্শে জীবন যাপন করিত না, তবুও সমাজের শীর্ষে যাঁহারা তাঁহারা ত্যাগের সম্মান করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকও ঐ আদর্শের বলে সমাজকে সুস্থ রাখিতে পারিত। অল্প দিন পূর্ব্বেও দারিদ্র্য-ব্রত, পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া এবং পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয়ী হইয়াও দরিদ্রোচিত অশন-বসনে অতি শ্লাঘ্য জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্কীর্ণতা ছিল, তথাপি সরল জীবন যাপন করিয়া রিক্ততার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারা এক প্রকারের পাপ সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইতে দেন নাই। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে এই উচ্চ আদর্শ ভারতবর্ষই পৃথিবীর সমক্ষে খাড়া করিয়াছিল। রাজা বিদ্বানের সম্মানে দৈন্যেরই সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগের সম্মান করা ভারতবাসীর পক্ষে মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। আজও ত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে সম্মান পাইতেছেন তাহার মূলে পুরাতন সংস্কার রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর প্রাণ নাই। ধর্ম্মগত ও সাম্প্রদায়িক শত মতে বিচ্ছিন্ন বর্ণাশ্রমে বিভক্ত এবং অস্পৃশ্যতা দোষে দুষ্ট সমাজের শেষ প্রাণবায়ু ভোগের মোহে বহির্গত হইয়াছে। এতটুকুও যদি সত্য পদার্থ সমাজের জীবনে না থাকে তবে কিসে আর তাহা বাঁচিতে পারে? আমরা জন্মগত জাতিগত অসমতা বর্জ্জন করি নাই, উপরন্তু ধনগত অসমতাও সমাজে স্থান দিয়াছি। আধুনিক সমাজস্থ ধনী নির্ধন সকলে নিজের ও বংশপরম্পরার ভোগের জন্য সমিধ সংগ্রহে আজীবন ব্যস্ত। শিশুকালে পাঠশালায় শিখি "লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"—কেহ গাড়ীঘোড়া চড়িতে পাই, কেহ পাই না, কিন্তু সমান অসন্তোষ লইয়া দেহত্যাগ করিয়া যাই। ইংরেজীতে ভাষা শিক্ষার পথে প্রথমেই কণ্ঠস্থ করি "Honesty is the best policy", আর সেই পলিসি বা চালই বজায় রাখিতে জীবন ও কর্ম্ম শেষ করি। "জীবনে ও মিথ্যা আচরণে শেষ আর ভেদ নাহি রয়!"

ভোগলিপ্সাই আমাদের অধোগতি ও মৃত্যুর প্রধানতম হেতু। যিনিই যে পরিমাণে ভোগ করিতেছি, সেই পরিমাণে দুইটাকা মাসিক আয়ের চাষার অন্নে ভাগ বসাইতেছি। আমার ভোগের সহিত চাষার দুর্দ্দশা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন না আমরা এই ভোগসর্ব্বস্ব মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতেছি, ততদিন চাষারা যতই ক্ষেতে খাটুক, দেশে যতই চরকা তাঁত চলুক, দুর্দ্দশার বাস্তবিক পরিবর্ত্তন হইবে না। প্রথমে যে প্রশ্ন তুলিয়া-

ছিলাম, যে, কেন চাষারা এত খাটিয়াও অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারে না এইখানেই তাহার জবাব।

বিলাতী পণ্যের আম্‌দানী ও দেশী মালের রপ্তানীর হিসাব দেখিলেও একই উত্তর পাওয়া যাইতেছে। আমরা বিদেশ হইতে তৈরী মাল আনি, আর কাঁচা মাল পাঠাই। আম্‌দানী যে-সকল দ্রব্য করি তাহার মূল্য রপ্তানী দ্বারাই দিয়া থাকি। ১৯১৮।১৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে আড়াই-শত কোটী টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছি। এবং তাহা দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট প্রাপ্য ইংলণ্ডের ঋণের সুদ ও পেন্‌সন্‌ আদি শোধ দিয়াও একশত শত্তর কোটী টাকার মাল আম্‌দানী করিয়াছি। যাহা আম্‌দানী করিয়াছি তাহার অর্দ্ধেকই হইতেছে বিলাতী সুতা, বিলাতী কাপড় ও বিলাতী চিনি। বাকী কতক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আর কতক অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, খেলনা, আয়েসের বস্তু। আমরা তুলা রপ্তানি করিয়া কাপড় আম্‌দানী করিয়াছি, খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতী সখের জিনিস কিনিয়াছি; যাহারা কৃষি-ক্ষেত্রে ও বনে জঙ্গলে শ্রম করিয়া এই রপ্তানীর মাল জন্মাইতেছে আম্‌দানীর মালের সামান্য অংশই তাহাদের নিকট পঁহুছিতেছে। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে এই রকম দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষের ধনী-সমাজ চাষার শ্রমলব্ধ ফল গ্রহণ করিতেছে এবং বিনিময়ে নিজের ভোগস্পৃহা বিলাতী পণ্যে মিটাইতেছে। যদি এই ভোগের উপকরণ দেশেই সংগৃহীত হইত, তবুও মন্দের ভাল হইত; টাকাটা দেশের মধ্যেই চলাফেরা করিত; কিন্তু বিলাতে যাইতেছে বলিয়া ইহাতে দেশের দৈন্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বৎসরের পর বৎসর দৈন্য বাড়িয়াই চলিতেছে। সুব্যবস্থা না হইলে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

যে পরিমাণে লোকের মজুরী বাড়িতেছে তাহার তুলনায় খাদ্যদ্রব্য অধিক দুর্ম্মূল্য হইতেছে। সাধারণতঃ মনে হয় খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইলে যাহারা উৎপন্ন করে তাহাদের অবস্থা ভাল হইবে। কিন্তু কাজের বেলায় তাহার বিপরীত হইতেছে। সমাজে ভোগের স্পৃহাই এই অঘটন ঘটাইয়াছে। বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্যে ভোগস্পৃহা মিটাইবার ব্যবস্থাতেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। একটি চাষার যদি কতকগুলি গরু থাকে তবে তাহাদিগকে খাটাইয়া চাষা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে গরুগুলিকে অল্লাহারে কদর্য্য অবস্থায় রাখিয়াও চালাইতে পারে, যতদিন না তাহার ফসল কমিতে কমিতে ভাতের উপর টান পড়ে। দেশের শতকরা দশজন লোক অপর নব্বই জনকে এই ভাবেই ব্যবহার করিতেছে। এই দশজন লোক যেন চাষা, আর নব্বই জন গরু। তাহারা খাটিতেছে কিন্তু অনাহারে কদাহারে কেবল কোন-মতে প্রাণ রাখিয়াছে। আর নাম মাত্র গোলমালেই মরিতেছে।

দেশের আবশ্যকীয় দ্রব্য রপ্তানী করিয়া, অনাবশ্যকীয় বিদেশী মাল আম্‌দানী করিয়া, শেয়ারের জুয়া খেলিয়া, পাট তুলা বস্ত্র শস্যাদি পণ্য একচেটিয়া (কর্ণার) করিয়া পীড়াদায়ক সর্ত্তে ও সুদে টাকা খাটাইয়া অস্বাভাবিক ও অধর্ম্মোচিত উপায়ে আমরা অর্থ একদিকে পুঞ্জীভূত করিয়া ফেলিতেছি। ইহা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের অন্যায় মনে হইতেছে না। আর সেই পুঞ্জীভূত অর্থ এমন সকল ভোগোপকরণে ব্যয় করিতেছি যে তাহা দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে। সহরের অনেক লোকের হাতে হাতে একটা রিষ্ট্‌ ওয়াচ্‌ দেখা যাইবে, এই অনাবশ্যক আভরণ দুই মণ চাউলের মূল্যে পাওয়া যায়। চাউল কত আক্রা হইয়াছে যে তাহার দুইমণের বিনিময়ে এমন সূক্ষ্মকারুকার্য্যকরা দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে! বিলাতী সৌখীন ও অনাবশ্যক পণ্য যত দিন আমাদের উর্দ্ধতন সমাজে ব্যবহার হইবে তত দিনই শতকরা নব্বই জন দেশবাসী, যাহারা কৃষি ও শ্রমজীবী, তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইবে। কোন কঠিন শ্রমেই তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার পথ করিয়া দিবে না। যদি কৃষকের গরুগুলি বলে যে আমরা না খাইতে পাইলে কাজ করিব না, গুঁতাইব, তাহা হইলে হয়ত তাহাদের বাঁচিবার পথ হয়। কিন্তু কৃষকের সঙ্গে লড়াই করা দুইটি মাত্র শিং সম্বল লইয়া গরুর পক্ষে যেমন অসম্ভব, আমাদের শতকরা নব্বই জনেরও ধনী-সম্প্রদায়ের সহিত লড়াই করা তেমনি অসম্ভব। ধনীর হাতে নিজের গড়া আইন আছে। আর ধনীরা পরস্পর লড়াই করিয়া

ও-বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া আছে। সাধ্য কি যে নির্ধন-সমাজ ভয় দেখাইয়া কিছু করে। তবে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে বিপ্লব আনিতে পারে, তাহাতে দশ ও নব্বই সমান ধ্বংস হইবে। এ অবস্থায় দশের কর্ত্তব্য নব্বইয়ের দিকে দেখা, যাহাতে তাহারা খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ বিদেশী ভোগের অনাচার ত্যাগ করা।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের ভারতবর্ষ নামক পুস্তকে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"On the whole it may be said a rise in prices tends to emphasize the economic differences throughout the rural population of India, those who are well to do becoming more well to do, those who are poor becoming poorer."—India in 1920. Page 134.

"জিনিষের মূল্য চড়িলে গ্রাম্য লোকের আর্থিক অবস্থার অসমতা বাড়াইয়া দেয়। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা আরও ধনী হয়, আর যাহারা দরিদ্র তাহারা আরও দরিদ্র হয়।"

অথচ দর চড়ার জন্য সেটেল্‌মেণ্টের বেলায় খাজনা বাড়ান হয় যাহাতে দরিদ্র আরও পীড়িত হয়। এই-সকল কারণে ভারতবাসী শতকরা নব্বই জন গ্রাম্যলোক অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শতকরা দশজনের নিকট পরোক্ষ-ভাবে গবাদি পশুর মতই হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ত পরোক্ষভাবে এই সম্পর্ক আছে, কোথাও কোথাও আবার সাক্ষাৎ ভাবেও এই সম্পর্ক দেখা যায়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সিংহের উড়িষ্যা-চিত্রে কয়েক জায়গায় এই কথাটি কৃষক মহাজনকে বলিতেছে যে "আমি গরু চরাই, আপনি মনুষ্য চরান।" কথাটা কতদূর কল্পিত তাহা গ্রন্থকার বলিতে পারেন, কিন্তু সরকারী বিবরণে এই অবস্থাটির অস্তিত্ব নির্ম্মম ভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

"সারা ভারতবর্ষেরই চাষার অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে তাহারা এত দরিদ্র, এত অসহায় যে ইউরোপে তাহার তুলনা মিলে না। তাহারা অজ্ঞ ও অসমর্থ বলিয়া তাহাদের অপেক্ষা একটু সঙ্গতি-পন্ন লোকের পীড়ন সহ্য করিয়া থাকে। গত বৎসরের ছোটনাগপুরের সেটেল্‌মেণ্টের বিবরণে জানা যায় যে ওখানকার কৃষক মজুরেরা কষ্টে পড়িয়া সময় সময় নিজের স্বাধীনতা বন্ধক রাখিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। সামান্য মাত্র সাময়িক অর্থের আবশ্যক মিটাইতে না পারিয়া তাহারা এই সর্ত্তে ধার করিতে বাধ্য হয় যে গায় খাটিয়া ঐ টাকা শোধ দিবে। নিয়ম এমন, যে ব্যক্তি চাকর খাটিবে সে বাৎসরিক দুই হইতে চারি টাকা পাইবে এবং বৎসরে দুইখানা কাপড় পাইবে। তাহার মহাজনই তাহার শ্রমফলের স্বত্বাধিকারী। এই রকম ঋণ সন্তানাদিতে বর্ত্তে এবং তাহারাও ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সর্ত্তে বাঁধা থাকে। যদিও দাসপ্রথা অনেক দিন হইতেই আইন-বিরুদ্ধ, তথাপি এই প্রকারে ছোটনাগপুর প্রদেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার-সূত্রে দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বীয় বংশপরম্পরাকে সেই দাসত্ব দিয়া যাইতেছে।"

* * * The general condition of the peasantry up and down the country can only be described by saying that the average cultivator is poor and helpless to a degree to which Europe can afford little parallel. Ignorant and without resources he is always liable to be oppressed by those richer and more influential than himself. Mention was made in last year's report of certain settlement operations in Chotanagpur which have disclosed the fact that agricultural labourers in that region are not infrequently compelled in time of stress to mortgage their personal liberty. In return for a small some of money which they happen to need at the moment, they agree to serve the individual from whom they borrowed. The rule is that a man who has so bound himself gets from two to four rupees a year as pocket money and two pieces of cloths. His labour belongs to his creditor. The debt extends to the children, who remain bound till it has been discharged. There are therefore in Chota Nagpur people who have inherited servitude and who in turn have passed it on to their children although slavery has long been illegal in India."—India in 1920. Page 159. *"The Indian Peasant.*

এই হইল সাক্ষাৎ কৃষকের দাসত্ব। ইহা ছোটনাগ-পুরেই বদ্ধ নহে। বাংলা বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের

পল্লীজীবন অনুসন্ধান করিলে কোন না কোন প্রকারে এই অবস্থা বিদ্যমান দেখা যাইবে। যাহারা সাক্ষাৎ দাসত্ব করে তাহারা ছাড়া যাহারা বাকী রহিল তাহারা সকলেই পরোক্ষভাবে উর্দ্ধতন শতকরা দশজনের সমাজের দাসত্ব করিতেছে। বাহ্যিক আবরণ ঠিক আছে বলিয়া এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষ এই দাসত্বের ফল গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া এই দশজনার নব্বইজনাকে দাস ভাবে ব্যবহার করার কদর্য্যতা ও দোষ চোখের আড়াল আছে। ক্ষেতে যতই শস্য হউক, কৃষক যতই খাটুক, তাহার শ্রমফল টানিয়া লইবার ব্যবস্থা বেশ ভাল রকম আছে। মহাজনের ঋণের সুদে, বর্দ্ধিত খাজনায় ও ট্যাক্সে, কাপড় নুন-তেলের চড়া দামে সে শ্রমের ফল তাহার হাতছাড়া হইয়া, তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব হইবেই।

কৃষকের শ্রমলব্ধ ফল ধনী সমাজের হস্তগত হইয়া তাহা যে প্রকারে ব্যয় হয় তাহাতে তাহা আর ঐ নব্বইএর মধ্যে ফিরিয়া যায় না। বড় লোকেরা বেশী ইন্‌কম ট্যাক্স দিতেছেন, তাহাতে সরকারের আয় বাড়িতেছে। কিন্তু সরকারের আয়ের সামান্য অংশই লোকহিতে ফিরিয়া আইসে। সরকার এই দরিদ্র দেশকে, চাষীর দেশকে শাসন করিতে আর সামরিক ঠাট বজায় রাখিতে এত ব্যয় করেন যে আর বিশেষ কিছু লোকহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্য থাকে না। আর ভারতের আয়ের অধিকাংশ অর্থ রকম-বেরকমে বিলাতে চলিয়া যায়। ওদিকে আবার অর্থ ধনীর ঘরে আসিয়াই বিলাতী ভোগের বস্তুতে প্রচুর পরিমাণে বিলাতে চলিয়া যায়। কাগজ-পেন্‌সিলে, রিষ্ট্-ওয়াচে, মোটরকার-সাইকেলে, কাপড়ে, সুতায়, রঙে, চিনিতে তাহা দ্রুত দেশের বাহির হইতেছে। বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া দেখুন জাহাজের খোল ভরিয়া কি যাইতেছে, আর তাহার খোল খালি করিয়া কি দ্রব্য উদ্গিরণ করিয়া যাইতেছে।

আমাদের ভোগলিপ্সার "প্রেতই" কৃষকের সোনার ক্ষেত শুষিয়া লইতেছে। বিদ্যাচর্চ্চায় জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে, কিন্তু সেই বিদ্যা যে-পরিমাণে মানুষে মানুষে অসমতা সৃষ্টি করিতেছে সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছে। যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই হয় যে এক দেশ আর-এক দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া সেদেশের লোককে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দাসবৎ ব্যবহার করিবে, যদি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা মানুষের সমাজ জ্ঞানে চরিত্রে ও ধর্ম্মে উন্নতিলাভ না করে, যদি তাহার ফলে এই হয় যে কে কাহার অন্ন কাড়িয়া লইয়া নিজের ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতে পারে সেই পথে সমাজের অধিকাংশ লোক চেষ্টা করিতেছে, তবে ধিক্ সে বিদ্যাচর্চ্চায়, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে। আলো বাতাস আর নদীর জল যেমন সাধারণ সম্পত্তি, কাহাকেও মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তেমনি মানুষের সাধারণ সম্পত্তির প্রসার হওয়াই ত আবশ্যক। মানুষ সমাজে জন্মিলেই সে খাদ্য ও পরিধেয় প্রাপ্ত হইবার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে, উন্নতির যুগে সমাজ ত ইহাই মানিয়া লইতে পারে। সহজ উপায়ে পণ্য চলাচল দ্বারা, অল্প পরিশ্রমে প্রভূত দ্রব্য গড়িবার ব্যবস্থা করিয়া, বাষ্প বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইয়া যে সুবিধা সমাজের হইয়াছে, তাহা ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় আবদ্ধ না রাখিয়া সাধারণের ব্যবহারে আনাই ত মানুষের কাজ। কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে সমস্ত সুবিধাই ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় নিয়োজিত হইতেছে। আমাদের দরিদ্রের দেশে আমরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভোগের পথে পা দিয়া কেবল দরিদ্রকে তাহার বাঁচিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিশ্চয়-মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছি।

হিন্দুগণ তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাতে, মুসলমানগণ তাঁহাদের নমাজে যে সৎকথা প্রত্যহই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া জীবনে তাহার কথঞ্চিৎও আচরিত হইলে ভোগলিপ্সা কমিয়া আসিবে। অর্থোপার্জ্জন করাই কাম্য না করিয়া সদুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া লোকহিতে অর্থব্যয় করাই কাম্য বলিয়া গৃহীত হউক।

দেশের যে অবস্থা তাহাতে সাময়িক প্রয়োজনে সকলকেই চর্‌কা কাটিয়া খাদি পরিয়া গৃহে গৃহে সুতা তৈয়ারীর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। তাহাতে

নিতান্ত দৈন্যে পীড়িত নরনারীর আপাততঃ অন্নসংস্থান হইবে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরো বড় কাজ এই হইবে, যে, চরকায় কায়িক শ্রম করিয়া দশজনের নব্বইজনকে দাস করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে। চরকা ও খাদি সেই মনোবৃত্তির অনুশীলনে সমাজকে পাপ-নির্মুক্ত ও নির্ম্মল করিবে, পবিত্র করিবে। সেই পথেই স্বরাজের শুভাগমন হইবে।

কোনও সম্প্রদায়ে উৎসবে, শোকে ও উপাসনায় এই সুন্দর মন্ত্রটি কতবার উচ্চারিত হইয়া থাকে—

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ;
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যং।

যদি জীবনে ইহার কিছুও আচরণ করা হয় ; বিদেশী জিনিস ব্যবহারের দ্বারা আমরা দেশে অভাব ও দারিদ্র্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, যদি এই কথাটি আমরা বুঝিতে পারি, তবে অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম বিদেশী বস্ত্র আপনি খসিয়া পড়ে, বৈদেশিক ভোগ-বিলাসের উপকরণ তিক্ত মনে হয় এবং যে ভোগের প্রেত দেশকে শ্মশান করিতেছে সে প্রেত আলোকের আগমনে অন্ধকারের ন্যায় তৎ তৎ সমাজ হইতে প্রস্থান করে।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

সাজসজ্জা আস্‌বাব্‌ ধনরাশির স্তূপ প্রভৃতি উপকরণে পীড়িত হওয়াই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? বিলাসের তাণ্ডবনৃত্যে মত্ত হইয়া ভুলিয়া যাই কোনদিকে বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় নিজেকে আহুতি দিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছি। উদ্‌ভ্রান্ত মনকে সুস্থির রাখিতে পারি না। হায়! যে ভারতে অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রমণীকণ্ঠ হইতে বজ্রগম্ভীর নিনাদ উঠিয়াছিল "যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌", আজ কোন্‌ পথে সেই ভারত ধাবিত হইতেছে!

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রমলা

ইহার পর তিনদিন ঘটনার স্রোত এত রুদ্র তালে বহিয়া গেল যে তিনদিনের শেষে কিরূপে এত ওলট-পালট হইয়া গেল তাহা কেহ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। চারিটি জীবনের সূতা লইয়া বুনিতে বুনিতে শিল্পী যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সূতার সহিত সূতা গেরো দিয়া অথবা ছিঁড়িয়া কোনরূপে শেষ করিতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়। যতীন জীবনের লীলায়িত ছন্দে চলিতে পারে না, সব সমস্যার সমাধান অতি শীঘ্র সারিয়া ফেলিতে চায়, তাই ঘটনাগুলির বেগ বাড়িয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে চা না খাইয়াই যতীন মোটর হাঁকাইয়া যোগেশ-বাবুর বাড়ীতে হাজির হইল। গেটের কাছে তাহার প্রিয়-স্থানে মাধবী ঘুরিতেছিল। ক্রীম-রংয়ের শাড়ীর উপর সদ্যস্নাত মুক্তকেশ প্রভাতের আলোয় ঝলমল করিতেছে, পামগাছের তলায় দীপ্ত আননে বনদেবীর মত দাঁড়াইয়া। সে মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ধীরে যতীন তাহার সম্মুখে মাথা নত করিল, কি কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

মাধবী বাগানের দিকে চলিয়া গেল, যতীন তাহার বন্ধুর ঘরের দিকে চলিল।

রজত কাজীসাহেবের ছবিখানিতে রং দিতেছিল। যতীন ঘরে ঢুকিতেও কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া রং দিতে লাগিল। যতীন তাহার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিল—কি হে, ভারি ব্যস্ত?

কাচের এক চতুষ্কোণ বৃহৎ খণ্ডের উপর লাল রং ঘসিতে ঘসিতে রজত বলিল,—হাঁ ভাই, ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ রজতের রং দেওয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া "তোমাকে আর disturb করব না" বলিয়া যতীন বাহিরে আসিয়া বারান্দায় ঘুরিতে লাগিল। পূর্ব্বদিকের বারান্দা পার হইয়া ড্রয়িংরুমের সম্মুখে গিয়া পড়িল। ঘরে

কাজী সাহেব যোগেশ-বাবুকে জেবুন্নেসার পদ্য পড়িয়া শোনাইতেছিলেন—

গর্‌চে মন্‌ লায়লি হস্তম্‌
দিল চুঁ মজ্‌নু দর হওয়াস্ত্‌।
সর্‌ ব-সহ্‌রা মী-জনম্‌
লেকিন হায়া-ই-জেঞ্জির পাস্ত্‌।

অর্থাৎ, প্রেমিক লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য পাগলিনী হইয়া মরুপ্রান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল আমার ইচ্ছা হয় আমিও তেম্নি করিয়া ছুটিয়া বেড়াই; কিন্তু আমার পা যে সরমসম্ভ্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা!

ড্রয়িংরুম পার হইয়া যতীন পশ্চিমদিকের বারান্দায় আসিল। অদূরে ইউক্যালিপ্‌টাসের গাছগুলির ফাঁক দিয়া মাধবীর শাড়ীটা একটুখানি দেখা যাইতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণদিকের বারান্দায় একেবারে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া যতীন বড় অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল। মনিয়া রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সে এক সেলাম করিল। ঘরের ভিতর রমলা রান্নার শব্দের সহিত তাহার কণ্ঠ মিশাইয়া চারিদিক গীতমুখর করিয়া তুলিয়াছিল। সেই কলগানে যতীনের বুক দুলিয়া উঠিল, সে স্তব্ধ হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রমলার জাপানী ফ্যাসানে বাঁধা খোঁপার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ডাকিল,—দিদিমণি!

"কি," বলিয়া প্যান্‌টা উনানের উপর হইতে তুলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া রমলা দেখিল, যতীন দ্বারে দাঁড়াইয়া।

কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া রমলা বলিল,—এই যে, আসুন।

যতীনের রৌদ্রদগ্ধ শক্ত মুখ তরুণীর গণ্ডের মত রাঙা হইয়া উঠিল। রমলা একটি দেশী শাড়ী পরিয়াছিল, জুঁইফুলের মত সাদা কাপড়ের উপর লালপাড় রক্তের ধারার মত, দীর্ঘ আঁচল কোমরে জড়ানো, গেরুয়া রংএর ব্লাউজে উনানের আভা আসিয়া জ্বলিতেছে, স্বপ্নভরা মুখ, রহস্যভরা কালো চোখ—সেই তরুণী মূর্ত্তির সম্মুখে যতীন্‌ সত্যই হতবাক হইয়া গেল।

সোনার চুড়ির ঝঙ্কার দিয়া রমলা বলিল,—বন্ধুর দেখা পেলেন না বুঝি? কিছু খাবেন? একখানা কাট্‌লেট গরম গরম?

যতীন ধীরে বলিল,-না, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রহস্যের সুরে রমলা বলিল,—কথা? কি কথা?

যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, প্যান্‌টা টেবিলে রাখিয়া বলিল,—আচ্ছা একটু দাঁড়ান, এই প্লেট্‌টা ধুয়ে নি, আলুগুলো কুটে নি, মাংসটা চড়িয়ে দি—

যতীন বিনীতস্বরে বলিল,—একা হলে ভাল হয়।

ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া রমলা বলিল,—বেশ, এই মনিয়া, আমার ঘরে টেবিলের উপর একখানা চিঠি আছে, এক্ষুনি ফেলে দিয়ে আয়। আর খান্‌সামা, তোমার আর ত কোন কাজ নেই, বাজার যাও ত, একসের ভাল চাল নিয়ে আস্‌বে পোলাওর জন্য, আজ রাতে হবে, যত শীগ্‌গীর পার এসো—যাও—

মনিয়া ও খান্‌সামা চলিয়া গেলে, উনানে চাপানো ভাতের হাঁড়ি হইতে একহাতা ভাত তুলিয়া এক প্লেটে ফেলিয়া ভাতগুলি হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে রমলা হাসিভরা সুরে বলিল,—তারপর কি বল্‌ছিলেন?

"বল্‌ছিলুম,—" বলিয়া যতীন থামিয়া গেল, তাহার চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

দুষ্টামিভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রমলা বলিল,—কি?

যতীনের মুখে কথা বাহির হইতে চাহিল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া টেবিল হইতে এক চামচ লইয়া প্লেটে টুং টুং শব্দ করিতে লাগিল।

রমলা যতীনের দিকে একখানা চেয়ার অগাইয়া দিয়া বলিল,—বসুন না, কষ্ট হচ্ছে, টুপিটা খুলে ফেলুন, যা গরম রান্নাঘরে—কি, এক পেয়ালা চা তৈরী করে দেব?

টুপিটা খুলিয়া টেবিলের উপর একটা চিনিভরা পিরিচের ওপর রাখিয়া যতীন কোনরূপে বলিল,—না, থ্যাঙ্ক্‌স্‌, দেখুন আপনাকে সে কথা ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন—

হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়া রমলা বলিল,—বল্‌তে না পারেন, লিখে আন্‌লেই পার্‌তেন—মনে আবার কর্‌ব কি?

চামচ ছাড়িয়া ছুরী নাড়িতে নাড়িতে রমলার পায়ের সাটিনের চটিজুতোর উপর চোখ রাখিয়া যতীন বলিল,—দেখুন আপনাকে প্রথম দিনেই দেখে মনে হয়েছে—

সে আবার থামিয়া গেল, ছুরী ছাড়িয়া প্যাণ্টের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। রমলা রহস্যকৌতুকভরা মুখে চাহিয়া টেবিলে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—গরম হচ্ছে, চলুন বাইরে।

রুমালটা হাত দিয়া পাকাইতে পাকাইতে যতীন মরিয়া হইয়া বলিল,—দেখুন, কাল রজতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সে বল্লে তুমি কি খনির সন্ধানে ফির্‌ছ, আমি যদি আমার জীবনের সত্যিকার সঙ্গিনীকে খুঁজে পাই—right girl—

হুঁ, বলিয়া রমলা অতি ক্ষীণ মধুর করুণ হাসিল। সে হাসি রমলাই হাসিতে পারে।

মরিয়া হইয়া যতীন বলিয়া যাইতে লাগিল,—কাল বিকেলে আপনাকে পেয়ে মনে হল আমার জীবনের সঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে আমি সত্যি খুবই—

রমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল। ভাতের জল ফুটিয়া হাঁড়ির গা বহিয়া উনানের আগুনে পড়িল। সেই জলের ছিটার স্পর্শে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ কাঁপাইয়া যতীনের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমলা গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—দেখুন, আপনি—

থতমত খাইয়া যতীন বলিল,—হাঁ—

রমলা গম্ভীর স্বরে বলিল,—আপনি আমায় একদিন মাত্র দেখেছেন, কয়েক ঘণ্টা জানেন মাত্র।

অতি বিনীতকণ্ঠে যতীন বলিল,—কিন্তু একদিনেই আমার বোধ হচ্ছে—at first sight—

তীক্ষ্ণস্বরে রমলা বলিল,—দুদিন বাদে সে বোধ নাও হতে পারে।

অনুনয়ের স্বরে যতীন বলিল,—আমি সত্যি বল্‌ছি, আমার মনে হচ্ছে—

তিক্তকণ্ঠে রমলা বলিল,—আমার মনে নাও হতে পারে।

প্রার্থনার স্বরে যতীন বলিল,—দেখুন, যদি কোন দোষ করে থাকি ক্ষমা করবেন।

ব্যথিতকণ্ঠে রমলা বলিল,—দোষ আর কি? তবে একদিনের আলাপেই—

যতীন ধীরে বলিল,—তাই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল!

সহজস্বরে রমলা বলিল,—তা যথেষ্ট নয়, এক জীবনের জানা-শোনাও যথেষ্ট হয় না। আমি ভেবেছিলুম আপনি বুদ্ধিমান, কাজের লোক—

সে মনে মনে হাসিয়া বলিল,—কিন্তু দেখ্‌ছি একটা ইডিয়ট্‌।

যতীন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—তাই যা মনে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, ফেলে রাখ্‌তে পারি না।

রমলা হাসিমাখা সুরে বলিল,—অতটা তাড়াতাড়ি ভাল নয়। দেখুন—আমার সঙ্গে এমন ফ্লার্ট্‌ করাটা আপনার উচিত হচ্ছে না।

ব্যথিত হইয়া যতীন রুমালে আর-একবার মুখ মুছিয়া ভীতকরুণনেত্রে চাহিয়া বলিল,—আমি আপনার বন্ধু হতে চাই।

রমলা এতক্ষণে যেন নিজের সহজ অবস্থা ফিরিয়া পাইল। সে আবার কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল,—বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই।

হ্যাট্‌টা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া বিনীতস্বরে যতীন বলিল,—ক্ষমা কর্‌বেন, কিছু মনে কর্‌বেন না।

অতি মিষ্টিগলায় রমলা বলিল,—না, না। আর দেখুন রাতে আপনার নেমন্তন্ন রইল, আপনার জন্যই খান্‌সামাকে পাঠাতে হল চাল আন্‌বার জন্যে—বিকেলে কিন্তু ঠিক আস্‌বেন, শালবনটার কাছে যাওয়া যাবে।

টুপি তুলিয়া যতীন ধীরে ধীরে দাঁড়াইল।

রমলা একটু ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—আপনাকে না জেনে ব্যথা দিলুম, ক্ষমা কর্‌বেন। আস্‌বেন ঠিক।

ধীরে নমস্কার করিয়া যতীন বাহির হইয়া গেল। তাহার চায়না-সিল্কের সুটটা যখন গাছের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল, রমলা টুলটা টানিয়া উনানের আগুনের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মাংস চড়াইল না, আলুও কুটিল না। রান্নাঘর স্তব্ধ, শুধু জলের টগবগ শব্দ আর রান্নাঘরের মাথায় শালগাছ-গুলির মৃদু মর্ম্মরধ্বনি। রমলা আগুনের দিকে চাহিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে পাশের ছাইগুলি চটি দিয়া গুঁড়াইতে লাগিল।

দুপুরে সহসা রমলার মনে হইল হয়ত এরূপভাবে নিমন্ত্রণ করা ঠিক হয় নাই, রজতকে জানান দরকার। রজতের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ, দুইবার মৃদু করাঘাত করিয়াও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাধবীকে খানিকক্ষণ জ্বালাতন করিয়া সে পিয়ানো বাজাইতে গেল।

সন্ধ্যার সময় রজত যখন দরজা খুলিয়া বাহির হইল তখনও পিয়ানোর টুং টাং শোনা যাইতেছে। ড্রয়িং-রুমের কাছে আসিয়া দেখিল পিয়ানোর সম্মুখে এক চেয়ারে যতীন বসিয়া। তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না, পিয়ানো বাজান থামিয়া গেল।

ধীরে রজত আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দরজা বন্ধ করিল। রজত কিন্তু ভুল ভাবিতেছিল। যতীন সেইমাত্রই আসিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিতেই রমলা পিয়ানো বন্ধ করিয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার দরজায় সজোরে করাঘাত হইল। রমলা ও যতীনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

যতীন বলিতেছে,—হ্যালো রজট্, এখনও দরজা বন্ধ করে কি কর্‌ছ!

রমলা বলিল,—সারাদিনই দরজা বন্ধ ছিল, চিচিং ফাঁক্!

রজত ধীরে দরজা খুলিল।

রমলা বলিল,—ছবি আঁক্‌ছিলেন এখন!

হাঁ, বলিয়া একখানি সাদা কাগজে ঢাকা ছবি বিছানার আড়ালে রাখিয়া দিল। রমলা উৎসুক হইয়া বলিল,—দেখ্‌তে পারি না?

রজত ধীরে বলিল,—শেষ হলে দেখ্‌বেন।

রমলা হাসিমাখা স্বরে বলিল,—আপনার বন্ধুকে আজ আমি নিমন্ত্রণ করেছি, জানেন?

তাহার চঞ্চল কালো চোখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রজত বলিল,—ও।

যতীন রজতের হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—সারাদিন ত ঘরে বন্ধ ছিলে, চলো না একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

রমলা কৌতুকভরা মুখে বলিল,—জ্যোৎস্না এখনও ওঠেনি, না হলে সেই পদ্মদিঘিতে যাওয়া যেত।

রজত যেন একটু উদাস স্বরে বলিল,—আপনারা বেড়িয়ে আসুন, আমার ভাল লাগ্‌ছে না।

রমলা একটু ব্যথিত হইয়া বলিল,—দেখুন—

যতীন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—আমায় বল্‌ছেন!

রমলা রজতের দিকে ফিরিয়া বলিল,—না, দেখুন—

রজত যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া রমলার কালো-চোখের দিকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নয়নে তাকাইয়া বলিল—আমাকে!

রমলা নম্রকণ্ঠে বলিল,—হাঁ।

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,—কি বল্‌ছিলেন?

রহস্যমাখানো মুখে রমলা বলিল—হাঁ, ও কি মনে হল, ভুলে গেলুম।

যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া সে চুপ করিল। তিন-জনেই চুপচাপ। একটু পরে রমলা বলিয়া উঠিল—রান্নাঘরে চল্লুম, দেখে আসি পোলাওটা কতদূর।

রমলা চলিয়া গেল। দুই বন্ধু বারান্দায় আসিয়া বসিল।

যতীন ধীরে বলিল,—আরও কিছুদিন এখানে আছ ত?

রজত বলিল,—ঠিক নেই, দু'একদিনের মধ্যেও চলে যেতে পারি।

যতীন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কেন হে?

রজত চুপ করিয়া রহিল। যতীন বলিল,—আমার ত সেই দিনই চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তোমার পাল্লায় পড়ে—কাল কিন্তু যেতেই হচ্ছে।

দুইজনে নীরবে চুরুট টানিতে লাগিল।

সহসা মাধবীকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া দুইজনেই চুরুট ফেলিয়া নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল, যতীন তাহার চেয়ারটা একটু অগসর করিয়া দিল; কিন্তু মাধবী তাহাদের নিকট না আসিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল। দুইজনে একটু বিস্মিত হইয়া আবার চেয়ারে বসিয়া চুরুট ধরাইল। একটু পরে মনিয়া আসিয়া

তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—আপনাকে সাহেব ডাক্‌ছেন উপরে।

রজত ফিরিয়া বলিল,—আমাকে ?

মনিয়া যতীনের দিকে চাহিয়া বলিল,—না, আপনাকে।

রজত বিস্মিত হইল না, ধীরে বলিল,—আচ্ছা, যতীন যাও।

যতীন চলিয়া গেল। সম্মুখে শালবনের মাথার উপর দিয়া চন্দ্র উঠিতেছে তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রজত বসিয়া রহিল।

রাত্রে খাবারের টেবিলে সবাই প্রায় চুপচাপ কাটাইল। রজত এত কম খাইল যে রমলাও আশ্চর্য্য হইল। যতীন শুধু মাঝে মাঝে রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, শিল্পীর আহারের সহিত ইঞ্জিনিয়ারের আহারের তুলনা করিয়া টেবিল সরগরম রাখিয়াছিল। রমলার প্রসন্ন মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাহার চোখ পড়িতেছিল বটে কিন্তু মাধবীর স্থির দামিনীর মত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার মুগ্ধ নয়ন বার বার আকৃষ্ট হইতেছিল। রজত শুধু একবার পোলাওএর প্লেট হইতে রমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দেখিল তাহার মুখে চোখে আজ যেন আনন্দের বান ডাকিয়া আসিয়াছে। রজত ঠিক দেখিয়াছিল, কিন্তু ভুল বুঝিল। রমলার আজিকার আনন্দ শুধু যতীনকে খাওয়ানর আনন্দ নয়, নিজের হাতে রাঁধিয়া পরিবেষণ করিয়া যে কোন পুরুষকে খাওয়াইতে প্রতি নারীর বুকের যে সেবিকা মা পরম সুখ পান—এ সেই আনন্দ।

খাওয়া শেষ হইবামাত্র যতীন প্রত্যেকটি রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, খাবার ঘরেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া অতি ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

রজত ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল; ঘরে থাকিতে ভাল লাগিল না। বারান্দা ঘুরিতে ঘুরিতে ড্রয়িংরুমের সাম্‌নে আসিয়া পড়িল, বারান্দার ধারে সাজানো ফুলগাছের টবগুলির পাশে এক কোণে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

দেখিল, যতীনের মোটরকারটা রাজপথের গাছের সারির মধ্য দিয়া আলেয়ার আলোর মত দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া যাইতেছে। সহসা পূর্ব্বদিকের গাছের সারির দিকে চোখ গেল। দেখিল, একটি ছায়া-মূর্ত্তি অতি দ্রুতবেগে পামগাছগুলির আড়ালে আড়ালে উঠিয়া আসিতেছে। মূর্ত্তিটি একটু নিকটে আসিলে, বুঝিল, নারীমূর্ত্তি। ম্লানজ্যোৎস্নায় গাছের ছায়ার অন্ধকারে তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। শুধু শাড়ীর ঝলমলানি, সাপের ফণার মত উদ্যত বেণী, আর হাতে একখানি সাদা কাগজ।

ব্যথিত ক্ষুব্ধ স্বরে আপন মনে, O the flirt, coquette! বলিয়া, হাতের সিগারেটটা টবে ছুড়িয়া ফেলিয়া সে সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। ঈর্ষান্ধময় চোখে কেহ ঠিক দেখে না, রজতও ভুল দেখিল।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। রমলা বহুক্ষণ নিজের ঘরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিল। চেয়ারে বসিয়া বিছানায় শুইয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া জানালায় মুখ বাড়াইয়া এটা ওটা নাড়িয়া দু'একটা গজলের সুর গাহিয়া কি আনন্দে উল্লসিত হইয়া সে আপন ঘর হইতে বাহির হইল। পাশের ঘরে গিয়া মাধবীর সহিত গল্প করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। ড্রয়িংরুম মহারহস্যময় অন্ধকারে ভরা, শুধু পিয়ানোর কাছটা জ্যোৎস্নার আলোয় একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। সে ধীরে গিয়া পিয়ানো খুলিয়া বাজাইতে বসিল। এ যেন নিশীথ রাতের অন্ধকারে ধীরে ধীরে আসিয়া প্রিয়ের কানে চুপে চুপে কি কথা বলিতেছে। বড় মধুর, বড় করুণ সে সুর, অনন্তকালের বিরহবেদনায় ভরা।

রজত চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, উঠিয়া যাইতে চাহিলেও পারিল না, তাহার চারিদিকে সুরের স্বপ্নজাল সৃষ্টি হইল।

যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল কাজীসাহেব তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। সঙ্গীত কখন থামিয়া গিয়াছে, পিয়ানো-বাদিনী কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা তাহার খেয়ালই হয় নাই। কাজীসাহেবের শ্মশ্রুমণ্ডিত স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিল। এ লালসার সুধা-হলাহল-ময় নদী পার হইয়া ভোগবতীর শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অতৃপ্ত অবসন্ন এই প্রৌঢ় সুরশিল্পীর পাশে বসিয়া

তরুণ চিত্রশিল্পীর নিকট এই ম্লান জ্যোৎস্না রজনী বড় করুণ লাগিল।

ব্যর্থ যৌবন, ব্যর্থ সব আশা, জীবনের মর্ম্মস্থলে যেন মায়াবিনীর বাসা, সে ভোলায়, মাতায়, হাসায়, তারপরে কাঁদায়, ধরা কিছুতেই দেয় না। প্রাণ যদি একটুকু কাহারও প্রেম হৃদয়-পেয়ালায় ভরিয়া নিজের তপ্ত তৃষিত ওষ্ঠে ধরিতে চায় অমনি পাত্র নিমেষে ভাঙ্গিয়া শত-খান হয়।

একটি পাখী জ্যোৎস্নায় মাতোয়ারা হইয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। কীট্‌সের মত রজতের প্রাণ কোন চিরব্যর্থতার বেদনায় ভরিয়া উঠিল—

O for a draught of vintage, that hath been
Cooled a long age in the deep-delved earth.

ধীরে রজত ডাকিল,—কাজীসাহেব।

স্নিগ্ধস্বরে কাজী বলিলেন,—কি ?

—আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না, আপনি সেই গানটা একবার আমায় শোনান।

—কোনটা ?

—মীরার যে গানটা সেদিন পড়ছিলেন।

দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। কাজী তাঁর ভাঙ্গা গলায় তপস্বিনীর ভক্তিপূত সঙ্গীত ধরিলেন।—

ম্‌হানে চাকর রাখো জী।
চাকর রহস্যুঁ, বাগ লগাস্যুঁ, নিত উঠি দরশন পাস্যুঁ,
বৃন্দাবন-কী কুঞ্জ-গলিন্-মেঁ তেরী লীলা গাস্যুঁ॥
ম্‌হানে চাকর রাখো জী।
হরে হরে সব বন বনাঁউ, বিচ বিচ রাখুঁ বারী,
সাবলিয়াকে দর্শন পাঁউ পহির কুসুম্মী সারী॥
ম্‌হানে চাকর রাখো জী।

গান শেষ হইলে রজত ধীরে বলিল,—কাজীসাহেব, আর আপনাকে জাগিয়ে রাখ্‌ব না, ঘুমোতে যান, কালই আমি বোধ হয় চলে যাচ্ছি।

—কালই ! কেন ?

—হাঁ, তাই ঠিক করলুম।

—না না, আমরা ছাড়্‌লে ত।

—না, কাজীসাহেব।

তাহার গলার ব্যথাভরা স্বরে চমকিয়া কাজী ধীরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন,—অত অধীর হলে চল্‌বে কেন, আর আপনার বন্ধুটিকে আন্‌লেন কেন, ওকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না—গোলযোগ বাধাতে উনি মজবুৎ—কিন্তু আমার কথা যদি শোনেন, যাবেন না।

রজত একবার কাজীসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

মধ্যরাত্রি। কাজীসাহেবের ঘুম বার বার ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, বুকের সব রক্ত যেন মাথায় গিয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে বারান্দায় বাহির হইলেন। রজতের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অবারিত দ্বার দিয়া ধীরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রজত নিবিষ্ট মনে রমলার ছবি আঁকিতেছে, সে যেন চোখ বুজিয়া তুলি বুলাইয়া চলিয়াছে। ক্ষীণদৃষ্টি কাজীসাহেবের নিকট এ মৃদু বাতির আলোয় ছবি আঁকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। কাজীসাহেব স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

রজত ফিরিয়া তাকাইল, কাজীসাহেবের ভাবে-ভরা ভাসা ভাসা চোখের উপর তাহার দীপ্ত চক্ষু চশ্‌মার কাচ ভেদ করিয়া গিয়া পড়িল। তাঁহার জটার মত কেশ, গৈরিক বেশের উপর চোখ বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া রজত আবার ছবিতে মন দিল।

কাজীসাহেব একটি গান মৃদু গুঞ্জরণ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাকী রাতটুকু আর তাঁহার ঘুম হইল না।

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে যখন রজত যোগেশ-বাবুকে জানাইল, সে আজই চলিয়া যাইতে চায়, রমলা কিম্বা মাধবী কোন কথা বলিল না, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করিল না, আশ্চর্য্যান্বিতও হইল না, যেন এ ঘটনা ঘটিবে তাহা তাহারা জানিত। যোগেশ-বাবুও বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, যদি সুবিধা বোধ না হয় তিনি জোর করিয়া রাখিতে চান না। গতরাত্রির মদের ঝোঁকটা তখনও তাঁহার যায় নাই। রজত বলিল—কলিকাতায় যাইয়া আর-একজন ভাল আর্টিষ্টকে পাঠাইয়া দিবে।

রজত তাহার জিনিষগুলি গোছাইতেছিল, চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া ছোটখাট জিনিষগুলি সাজাইতেছিল। নিঃশব্দে রমলা ঘরে প্রবেশ করিল, অর্দ্ধেক ভেজান দরজার কাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চিররহস্যভরা স্বরে বলিল,—আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন ?

ক্ষণিকের জন্য রমলার লোধ্ররেণুর মত রাঙা মুখের দিকে চাহিয়া রজত রংএর বাক্সটা শেভিংএর সরঞ্জামের পাশে রাখিল।

চুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল,—কেন ভাল লাগ্‌ল না ?

রজত রমলার অতলস্পর্শ কালো চোখের দিকে একটুখানি চাহিয়া বলিল,—অনেক সময় খুব ভাল লাগ্‌লেই চলে যেতে হয়।

হাসির স্বরে রমলা বলিল,—পালিয়ে যাচ্ছেন বুঝি!

রজত নীরবে তাহার রুমালগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

দরজাটা দোলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল,—বা! আমাদের ছবিগুলো আঁকা হল না ?

ওই আপনাদের ছবি, বলিয়া বিছানার কোণ হইতে দুখানি ছবি রমলার সম্মুখে টেবিলে রাখিল। একখানি মাধবীর, আর-একখানি রমলার ছবি। প্রথমে আসিয়াই মাধবীকে যে রূপে দেখিয়াছিল,—সেই পামগাছের তলায় পাঠনিরতা মাধবী। আর রমলার ছবিখানি ডুলাক-অঙ্কিত ওমার খৈয়ামের সাকীর মত—জ্যোৎস্নার স্বপ্নভরা আলোয় হাস্নাহানাকুঞ্জের পাশে সে দাঁড়াইয়া।

ছবিখানি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া একটু দেখিতেই রমলার মুখ শরৎ-উষার আকাশের মত রাঙা হইয়া উঠিল। রজত তখন ধীরে ব্যাগের উপর ঝুঁকিয়া কাপড় জামাগুলি কোনমতে গুঁজিয়া রাখিতেছিল। সেই নত দীর্ঘ দেহ বিপর্য্যস্ত কেশভরা সুঠাম মুখের দিকে রমলা ক্ষণিক চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, রজতের হাত হইতে ব্যাগটা টান মারিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত জিনিষ ঘরে ছড়াইয়া ফেলিয়া আবার ভাল করিয়া গুছাইয়া দেয়। রমলার রাঙা মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া রজত বলিল,—কেমন হয়েছে ?

দৃপ্তস্বরে রমলা বলিয়া উঠিল,—এ কাকাবাবুকে দেবেন না।

বাঁশীগুলি ব্যাগে রাখিতে রাখিতে রজত বলিল,—তবে দিন, বাক্সে পুরে নি, এখনও জায়গা আছে।

ভীতলজ্জিতভাবে হুকুমের ভঙ্গিতে রমলা বলিল,—না, এ কক্ষনো কাউকে দেখাতে পাবেন না।

রমলার প্রদীপ্তমুখের দিকে চাহিয়া রজত বলিল,—তবে দিন আমি নিয়ে যাই।

রজতের দিকে স্নিগ্ধ কটাক্ষ করিয়া—না আমি নিয়ে চল্লুম, বলিয়া রমলা ছবিখানি আঁচলে ঢাকিয়া ছুটিতে ছুটিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আপনার ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিল।

বাকী জিনিষগুলি যে-কোনপ্রকারে তাড়াতাড়ি পুরিয়া রজত বাক্সটা কোনমতে বন্ধ করিয়া বাঁচিল। চেয়ারটায় যেন অতি শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মাধবী আসিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইতেই সে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল।

ধীরকণ্ঠে মাধবী বলিল,—আপনি আজ যাচ্ছেন ?

নম্রকণ্ঠে রজত বলিল,—হাঁ।

মাধবী একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কেন চলে যাচ্ছেন, কয়েকদিন বাদে গেলে হত না ? মনে মনে যাহা ভাবা যায় তাহার সবই যদি বলা যাইত তবে জীবনে সুখ বাড়িত কি কমিত বলিতে পারি না, তাহাই বোধ হয় ভাল হইত। সে যাহাই হউক, মাধবী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, স্থির মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ধীরে বলিল—পুস্‌পুস্ ঠিক কর্‌তে হবে কি ?

—না; মোটরেই যাব।

আচ্ছা, আমি মনিয়াকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। সঙ্গে কি খাবার দেব ?

—কিছু দেবার দর্‌কার নেই।

—না, রমু কোথায় গেল, সে কি রোষ্ট্ আর পুডিং কর্‌বে বল্‌ছিল—আপনার থাক্‌তে অনেক অসুবিধে হল, ক্ষমা কর্‌বেন।

স্নিগ্ধ বিনীতকণ্ঠে রজত বলিল,—না, না, আমারই যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন

স্থির হইয়া মাধবী দাঁড়াইয়া রহিল। এই পদ্মরাগের মত রাঙা মুখ, নিখুঁত সৌন্দর্য্যভরা দেহ, এ যেন কত রাত্রির অশ্রু জমাট হইয়া দীপ্ত শুভ্র হইয়াছে, এ যেন মূর্ত্তিমতী বেদনা, ওই শুভ্র সুন্দর কপোলে কত ব্যথাময় দুঃখরাত্রি আঘাত করিয়াছে, কিন্তু কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, এ যেন কত ব্যথা সহিয়াছে, কত ব্যথা সহিবে। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় বেদনার দিকে চাহিয়া রজতের মাথা নত হইয়া আসিল।

বারান্দার শেষপ্রান্তে যতীনের টুপি দেখা যাইতে মাধবী ধীরে সরিয়া গেল।

—হ্যালো রজট, এ কি, এত ঝিমিয়ে পড়েছ, cheer up old boy!—life—struggle—energy,—বলিয়া রজতের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া হাতে ঝাঁকুনি দিয়া হাত পা ছুড়িয়া যতীন সমস্ত ঘর যেন কাঁপাইয়া তুলিল।

রজত ধীরে হাসিয়া বলিল,—আমি ত আর তোমার মত একটা machine of money-making নই যে দিন-রাত সমানবেগে ঘুরছি আর ঘুরছি।

—তা বটে, তোমরা আর্টিষ্ট্।

—হাঁ, আমরা ভাই, গ্রীষ্মে জ্বলি, বর্ষায় কাঁদি, শরতে হাসি, বসন্তে উদাস হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

—ভ্যাগাবণ্ড্ আর কি—তোমার চেয়ে আমার কলে যে কুলীটা খাটে সমাজে তার বেশী প্রয়োজন, জান? আরে packing? তাই বল, so sorry, কি হল?

—এই ত বল্লে, ভ্যাগাবণ্ড্, এক জায়গা বেশী দিন সইবে কেন?

—তা বটে, যেখানে যাবে একটা গোলযোগ বাধাবে, নিজে টিক্‌বে না, আর কাউকে টিক্‌তে দেবে না।

—তুমিও কি আজ যাচ্ছ?

—তা বল্‌তে পারছি না, that depends,—বলিয়া যতীন থামিয়া গেল।—আচ্ছা, তুমি গুছোও, স্মিথের কাছে ঘুরে আস্‌ছি, cheer up—বলিয়া রজতকে আর-এক ঝাঁকুনি দিয়া সে চলিয়া গেল।

যতীন কিন্তু সত্যই স্মিথসাহেবের কাছে গেল না। সে গেটের নিকট আসিয়া এক পামগাছের কাছে দাঁড়াইল। একখানি চিঠি গাছের তলায় তীরাহত পাখীর মত আসিয়া পড়িল। দৃঢ়হস্তে খামখানি তুলিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। আইভারি-ফিনিস কাগজের এককোণে এক লাইন লেখা। তাহার চোখ নাচিতে লাগিল, মুখ দৃঢ় একটু রুক্ষ হইল। কাগজখানি হাতের মুঠায় পাকাইতে পাকাইতে প্যান্টের পকেটে পুরিয়া সে একবার লালবাড়ীটার দিকে চাহিল, তারপর একটু টলিতে টলিতে মোটরের দিকে অগ্রসর হইল। মোটরে উঠিয়া আর-একবার বাড়ীটার লাল পথের দিকে চাহিল। ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের সারির পাশ দিয়া মাধবীর শাড়ীর লাল পাড় লাল কাঁকরের উপর লুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই সময় রজত যদি ড্রইংরুমের সম্মুখে বারান্দার কোণে থাকিত তবে সে হয়ত তাহার স্যুটকেসে রংএর বাক্সটা তখনও ভরিত না, কিন্তু তখন সে একটা সিল্কের রুমালের মধ্যে রমলার একটি ছোট ছবি রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিতেছিল। আর তাহার উপরের ঘরে রমলা তাহার বাক্স খুলিয়া শাড়ীগুলির তলায় নিজের ছবিখানি রাখিতেছিল।

যতীনের মোটরের পেছনে-ওড়ানো লালধূলি দেখিতে দেখিতে মাধবী ধীরে ধীরে গেটের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার প্রিয় পামগাছের তলায় আসিল। মোটরের শব্দ যখন দূরে মিলাইয়া গেল, সে কাঁকরের উপরই যেন অতি পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। শূন্যমনে রৌদ্রভরা প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশ-আলোক অতি উদাস, চারিদিক নিঝুম, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি।

কাজী সাহেব তখন যোগেশ-বাবুকে জেবুন্নেসার কবিতা শুনাইতেছেন—

গুফ্‌তম্ আজ্ ইশ্‌কে বুতাঁ
আয় দিল্ চে হাসিল কর্‌দাই।
গুফ্‌ত্ মারা হাসিলে জুজ্
নালাহয়ে হাম্ নিস্ত্॥

ভালবাসার অনেক কথাই ত বলা হইল, কিন্তু ওরে আমার মন, তুই কি লাভ করিলি? মন উত্তর করিল,—অশ্রুমালা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

১৩

নীলসমুদ্রের তীরে সোনালী বালুকার সমুদ্র—ক্রোশের

পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ। অনন্তের চিরচঞ্চল চিরকল্লোলময় স্নিগ্ধনীল রূপের পাশে চিরস্থির বিরাট শূন্যতাময় উদাস স্তব্ধ ধূসর রূপ—তাহার উপর চির-জ্যোতির্ম্ময়ের গমনাগমনের পদরেণু জ্যোতিষ্কমণ্ডলের নর্ত্তনমঞ্চ অনন্তব্যোম।

রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারের ভিতর ধূসর বালুভূমির উপর দিয়া একখানি জীর্ণ খর্জ্জুরপত্রাচ্ছাদিত গরুর গাড়ী চলিয়াছে। কয়েকখানি কালো মেঘে দশমীর চাঁদ ঢাকিয়া গিয়াছে, ছোট ছোট দৈত্যের মত ছিন্নকালো মেঘভরা আকাশের তারাগুলি পথহারা শিশুদের মত করুণ নয়নে তাকাইয়া আছে—পথহীন জনহীন ভূমি অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, চারিদিকে তিমির-রাত্রির মায়া, তাহার মধ্য দিয়া মানবের এই অতিপ্রাচীন যানটি রাত্রির পরপারে কোন অরুণ-লোকের যাত্রী।

গরুর গাড়ীটি একটু বেগে চলিতেছে, তাহার কেরো-সিনের লণ্ঠনের মৃদু আলো বালুকারাশির উপর ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, শীর্ণ গরু দুইটি মাঝে মাঝে ঝিমাইয়া পড়িতেছে, আর বিঁড়ি টানিতে টানিতে উড়িয়া গাড়োয়ান তাহাকে পুচ্ছ মলিয়া ঠেলা দিয়া জাগাইয়া দিতেছে; তারাগুলির মত করুণ চোখে চাহিয়া গরু দুইটি মেঘাচ্ছন্ন পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে, গলার ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিতেছে,—কতদূর আর কতদূর?

গাড়ীর ভিতর বহুক্ষণ নিদ্রা যাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া যে যুবকটি মাথার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া বসিল, সে রজত। পিছনের ঝাঁপি তুলিয়া দিয়া ছাউনির গায়ে এক বালিশ রাখিয়া তাহাতে হেলান দিয়া বসিয়া সে একটা চুরুট ধরাইল। চারিদিক মৃত্যুপুরীর মত নির্জ্জন, ছায়ায় ভরা, সমুদ্রের কল্লোল সুদূরদেশের স্বপ্নের মত, বুকচাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মত অতি মৃদু বাতাস বহিয়া বালুকারাশি কাঁপাইয়া সিরসির করিয়া বহিতেছে, একটি তারা মাথার অতি নিকটে জ্বলিতেছে, তাহা . নিশ্বাস যেন গায়ে লাগিতেছে। রজতের গা সিরসির করিতে লাগিল, কিন্তু পায়ের কাছের চাদরটা টানিয়া লইতেও কুঁড়েমি ধরিল। এই তৃণহীন জীবহীন পথহীন বালু-সমুদ্রের উপর দিয়া রাত্রির অন্ধকারে কোথায় তাহার যাত্রা! কোনারকের যে শিল্পসৌন্দর্য্য তাহার মনকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রাত্রিপ্রভাতে তাহার ত দেখা মিলিবে। কিন্তু? ধীরে সে চাদরটা তুলিয়া লইয়া পায়ে জড়াইল, চিররহস্যময় আজন্ম-ঈপ্সিত দুইটি কালোচোখ তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই অসীম স্তব্ধ শূন্যতা ছাড়াইয়া অন্ধকার ছাড়াইয়া সে চলিয়াছে;—পথের কোন্ সঙ্গিনীর জন্য, কোন্ কণ্ঠের কথাগীতের জন্য, কোন্ মুখের দীপ্ত আলোর জন্য প্রাণ তৃষিত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

একটি ছোট নদীর তীরে গাড়ী আসিয়া পৌছাইল। অন্ধকার রাত্রির চোখের জলের মত নিরাখিয়া নদী মরুভূমির বুক হইতে উৎসারিত হইয়া অতি ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কয়েকটি পাখীর ডানার শব্দে আকাশ শিহরিয়া উঠিল, মেঘ সরিয়া গিয়া চাঁদের আলো দেখা দিল, বাতাস জোরে বহিতে লাগিল। নদীজলের ছল-ছল শব্দে রজত যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারের বুকে কোন্ আঁখির আলোর জন্য প্রাণের কান্নার মত এই নদীটি!

ধীরে ধীরে রজত গাড়ী হইতে নামিয়া লোহা-বাঁধানো পাহাড়ে লাঠিটি লইয়া নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে কালো ছায়ার মায়া, চাঁদ হইতে ঝরিয়া-পড়া আলো সে অন্ধকারে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। নদীর পরপারে কয়েকটি মানুষের কণ্ঠ শোনা যাইতেছে, কয়েকটি উড়িয়া পাল্কীবেহারাদের গুঞ্জরণ, দুইটি আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে।

এই জল, আলো, মানুষের কণ্ঠ শুনিয়া রজতের মন যেন সচেতন হইয়া উঠিল। ধীরে নদীর তীরে বসিল। সহসা পরপারের মায়ালোক আগুনের রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। উড়িয়া বেহারাগুলি আগুন জ্বালাইয়া তামাক খাইতে বসিয়াছে। আগুনের রাঙা শিখার চারিদিকে গোল হইয়া তাহারা বসিয়াছে। তাহাদের কালো মুখ হলুদের রঙে ছোপানো। নিকটে পাল্কীর উপর হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া এক তরুণী মূর্ত্তি, ঠিক একখানি ছবির মত, মুখ ঠিক দেখা যাইতেছে না শুধু তাহার শাড়ীর ঝলমলানি আর কথার সুর আর তাহার সুতীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট ছায়া অগ্নিশিখাময় পটে ছবির মত আঁকা।

গরুরগাড়ীখানি যখন নদী পার হইয়া অপর তীরে আসিয়া পৌছিল তখন পাল্কী সম্মুখে বহুদূর পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রজত দূরে মরীচিকার মত পাল্কীর আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী মৃদু আর্ত্তনাদে চলিতে লাগিল।

দূরে অন্ধকারে গাছের ছায়ায় একটি ছোট গ্রাম সুষুপ্ত, মাঝে মাঝে এক-একটা গাছ যেন পথের ধার হইতে মুখ বাড়াইয়া আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, অন্ধকারের ভিতরে হরিণের পাল কোথায় ছুটিয়া গেল। যাত্রাপথের বিভীষিকা যেন কাটিয়া যাইতেছে, বিরাট শূন্যতা প্রাণের হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে,—লক্ষ-কোটি তারার গমনাগমনের ছন্দ, কত শত কীটপতঙ্গের রিনিঝিনি। এ পৃথিবী জুড়িয়া যাত্রার সহিত রজতও চলিয়াছে।

ধীরে বাঁশীটি লইয়া রজত একটি গানের সুর বাজাইতে লাগিল, পিছনে-ফেলা নদীর কালো জল যেন বালুতটের কানে কানে তাহারি গানের কথা কহিয়া যাইতে লাগিল,—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান
তার বদলে আমি চাইনি কোন দান।"

সম্মুখপথে পাল্কীতে বসিয়া রমলা পাল্কীবেহারাদের করুণ গুঞ্জরণধ্বনির সুরে সুরে গাহিতেছিল—

"এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান,
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।"

পাল্কী ও গরুর গাড়ী চলিয়াছে, আলো-অন্ধকারের স্রোতের ভিতর দিয়া। দুই যাত্রী পরস্পর হইতে বহুদূরে, তবু তাহারা পরস্পরের সঙ্গ অনুভব করিতেছে।

একে একে তারা নিভিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিতেছে, বাতাস থামিয়া গিয়াছে। আসমুদ্র চন্দ্রভাগা উষার আলোক-আঁধারে স্তব্ধ। জ্যোতির্ম্ময় সন্তান জন্মের প্রসববেদনার মত সমস্ত আকাশ কাঁপিতেছে।

পূর্ব্বাকাশে রক্তবিন্দুর মত এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে দিকে দিকে অগ্নিশিখা নাচিয়া উঠিতেছে।

রজত গাড়ী হইতে নামিয়া লাঠি হাতে করিয়া পূর্ব্বাকাশে অনল-ভরা মেঘস্তূপের দিকে চাহিয়া গাড়ীর আগে আগে চলিল। কাঁধ বদলাইতে সম্মুখে পাল্কী একবার থামিল, তাহার তরুণী আরোহিণী নামিল, উষার রক্তমায়ায় রজত তাহার স্বপ্নমূর্ত্তি আবার দেখিতে পাইল।

হাজারিবাগের পথের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। সেই যে অন্ধকার রাত্রির দিকে ঝুঁকিয়া-পড়া তীর-বেঁধা নীড়-হারা পাখী যাত্রা করিয়াছিল, সে যেন জ্যোতির্ম্ময় লোকের দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে, সমুদ্রের জলে স্নাত নির্ম্মল দুই পাখা মেলিয়া আবার নব আলোকের যাত্রা সুরু করিয়াছে।

আকাশবীণার স্বর্ণতন্ত্রীতে আলোকের জয়গান বাজিয়া উঠিল; পৌছিয়াছে, অন্ধকার রাত্রি পার হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে। তিমিরদুয়ার উন্মুক্ত করিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। গলিত সোনার মত আলোর ধারা পূর্ব্বাকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া সমুদ্রতরঙ্গে রক্ত-তরঙ্গের মত গড়াইয়া আসিতেছে, রাত্রির কালো পাথরের উপর রাঙা আলোর তরঙ্গ আছাড়ি-পিছাড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ধূলিসম চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া যাইতেছে, বালুভূমি স্বর্ণরেণুর মত ঝিকিমিকি করিতেছে, চন্দ্রভাগার তীর্থজল রক্তচন্দন-স্রোতের মত দেখাইতেছে।

কোনার্কের মন্দির পূজাপ্রদীপের শিখার মত জ্বলিতেছে। তাহার ভগ্নচূড়ায়, তাহার মরুশয্যানিমগ্ন পাথরগুলিতে তাহার বনশিখরে আতপ্তরক্তের প্রলেপ মাখানো, রাঙা আকাশের পটে পূজারত সাধক-মূর্ত্তির মত আঁকা। সূর্য্য-দেবতার প্রতি মানব-অন্তরের চিরন্তন বন্দনা, শিল্পীর এই মানস-কমল ধরণীর বুক হইতে উচ্ছ্বসিত জয়গানের মত এই জনশূন্য সমুদ্রকূলে বালুভূমে শতাব্দীর পর শতাব্দী জাগিয়া আছে, দিনের পর দিন নব নব যাত্রীদলের কানে কানে পাথরের বন্দনাগান বাজিয়া উঠিতেছে,—জয়, আলোর জয়, সূর্য্যদেবতার জয়!

রাঙা আলোর মায়া ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। দুধের মত সাদা আলো, চারিদিকে প্রখর প্রদীপ্ত আলো।

তরুণী পাল্কীর ভিতর উঠিয়া বসিয়াছে, ছয় বেহারার

কাঁধে পাল্কী যেন উড়িয়া চলিয়াছে। দূরে মিলাইয়া গেল।

রজত ধীরে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় মৈত্রীবনের স্নিগ্ধছায়ায় এক বটগাছের নির্জ্জন কোণে রজত ও রমলা পাশাপাশি আসিয়া বসিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহারা কোনারকের মন্দির ঘুরিয়াছে, প্রতি শিলা, প্রতি মূর্ত্তি যেন প্রদক্ষিণ করিয়াছে। রজত রমলাকে সব বুঝাইয়া দিয়াছে—এই উড়িষ্যার শিল্পধারার সঙ্গে ভারতের অন্য শিল্পধারার যোগাযোগ, ইহার শিল্পপ্রণালীর কৌশলগুলি, সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন্ পণ্ডিত কি বলিয়াছেন, রাজহস্তীর সুবিপুল গাম্ভীর্য্যময় মূর্ত্তি, অরুণ-অশ্বে গতির ভাবাত্মক মূর্ত্তি, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া সালাঙ্কুল নরসিংহের এই আশ্চর্য্য শিল্পকীর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছে।

সমস্ত দিন বাহিরের কথাই হইয়াছে, দুই জনের মনে যে কথাগুলি কানায় কানায় ভরা ছিল, সে মনের কথা কেহ কিছুই বলে নাই।

দুইজনে পাশাপাশি বসিল, চারিদিকে আলোছায়ার মায়া, সম্মুখে একাদশীর চন্দ্র উঠিতেছে।

রমলা ধীরে বলিল—আচ্ছা, তুমি অমন ক'রে চলে' গেলে কেন?

ধীরে রমলার হাত নিজের হাতে টানিয়া রজত বলিল—সে আর-একদিন বল্ব, আজ থাক্—আচ্ছা তুমি যতীনের বিয়েতে গিয়েছিলে?

রমলা বলিল - না যাইনি। তুমিও যাওনি?

আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইয়া ধরিয়া রজত বলিল—আমি ত কল্‌কাতায় ছিলুম না; চিঠিটা কল্‌কাতা ঘুরে আগ্রায় যায়, সেদিন তাজমহল দেখে ফিরছি, ঘরে এসে দেখি একখানা লাল চিঠি, সমস্ত রাত সেখানা খুল্‌তে সাহস হয়নি।

ও,—বলিয়া রমলা হাসিয়া উঠিল, গাছের পাতাগুলিও সে হাসিতে নাচিয়া উঠিল।

রজত বলিল,—হাঁ, পরের দিন যখন খুলে পড়্‌লুম মাধবীর সঙ্গে বিয়ে—

তারপর, কি কর্‌লে?—বলিয়া রমলা দুষ্টামিভরা চোখে চাহিল।

তাহার হাতের সোনার চুড়িগুলি নাড়িয়া টুং টুং মিষ্টি শব্দ করিতে করিতে রজত বলিল,—তক্ষুনি প্যাক্ করে' ষ্টেশনের দিকে ছুট্‌লুম।

—বিয়েতে যেতে?

—না।

—তবে?

রমলার মুখের দিকে বিদ্যুৎ-কটাক্ষ করিয়া রজত বলিল—তোমার সন্ধানে। ভাব্‌লুম সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী যখন বাঁধা পড়েন নি, একবার ত দেখা পেয়েছিলুম এই পাথরের রাজ্যে, কবর ঘুরে শিল্পসুন্দরীর সন্ধান করে' আর কি হবে।

—শিল্প দেখার নাম করে' বেশ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান হয়েছে! কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?

—দিল্লী, আগ্রা, অমৃতসর।

—বেশ, দিব্যি একা একা বেড়িয়ে আসা হ'ল!—জান, তোমার জন্যে এবার আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না?

হাতে হাত জড়াইয়া রজত বলিল,—আর তোমার জন্যে আমার একখানাও ছবি আঁকা হয় নি, আর কিছুদিন হলে starve করিয়ে ছাড়্‌তে।

কাঁধে কাঁধ ঠেকাইয়া দুইজনে বসিয়া রহিল।

রমলা ধীরে বলিল—আচ্ছা, জীবনটা কি মজার, নয়? পৃথিবীটা মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত লাগে, যখন ভাব্‌তে বসি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

তাহার চুলগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে রজত বলিল—বুঝ্‌তে না চেষ্টা করাই সবচেয়ে ভাল, ততক্ষণ পিয়ানো বাজালে—

রমলা ধীরকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল—আচ্ছা ধরো, সাত মাস আগে, তুমি কোথায় ছিলে, আমিই বা কোথায় ছিলুম, কেউ কাউকে জানতুম না ত, মাঝে মাঝে ভাবি কে যেন টেনে নিয়ে যায়, সে কি ঘটাবে, কি দেখাবে, কোন্ পথে নিয়ে যাবে, কত লোক তাকে কত কি বলে, কেউ বলে Fate, কেউ circumstances, কেউ God, কেউ Life force, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

ধীরে রমলার কাঁধে হাত রাখিয়া রজত বলিল,—কি দর্কার বুঝে? চেয়ে দেখ কি সুন্দর রাতটা—এই সাগর আর মরুভূমির মাঝে মন্দিরটা—এর দিকে চাইলেই যেন মনে হয় মানুষ শুধু সাগর ডিঙোয়নি, মরুভূমি পার হয়নি, বারুদ কামান তৈরী করেনি, সে মনের আনন্দে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে।

অতি মিষ্টি গলায় রমলা ডাকিল,—এই!

রজত ধীরে উত্তর দিল,—কি?

একটু যেন ভীত হইয়া রমলা বলিল,—ওদিকে কিসের শব্দ হচ্ছে।

রজত একটু হাসিয়া বলিল,—সাপটাপ হবে।

রমলা একটু গম্ভীর স্বরে বলিল,—আচ্ছা, যে এমন সুন্দর রাত, এমন চাঁদের আলো সৃষ্টি করেছে, তার সাপ সৃষ্টি কর্বার কি দর্কার ছিল, যদি সাপকে সুন্দর করেই তৈরী কর্লে, তার মুখে বিষ ভরে' দিলে কেন—

রজত বলিল,—এক হাতে প্রাণ আর এক হাতে মৃত্যু, এক হাতে ফুলের মালা আর এক হাতে বজ্র—থাক্ ওসব কথা। দেখ, ওটা সাপ নয়—একটা হরিণ, কি সুন্দর চোখ দুটো! নয়?

রমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—lovely!

রজত হাতের সহিত হাত জড়াইয়া বলিল,—তোমার সেই The moon shines bright in such a night as thisটা আরম্ভ করনা।

রমলা রজতকে একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল,—যাও।

রজত আবার সরিয়া বসিল, রমলার আঙ্গুর-আঙ্গুলগুলি ধরিল। রমলার মনে হইল রজতের দেহ যেন একটি বাঁশী, রক্তধারার ছন্দে কি সুর বাজিতেছে তাহা তাহার দেহের স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিল। আর রজতের কাছে রমলা মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত, পথহারা সমস্ত রাগরাগিণী যেন তাহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হাতে হাত জড়াইয়া দুইজনে বসিয়া রহিল।

তাহাদের ঘেরিয়া পিছনে বনের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, মন্দিরের প্রতি শিলায় মৃদঙ্গের মত জীবনকল্লোলময় কোন্ নীরব সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। সম্মুখে একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সোনালী বালুচরে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব

আশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য ও প্রাচীনত্ব।

পূর্ব্বে দ্বিজাতিগণের জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত হইত এবং তাহার প্রথম আশ্রম কেবল বিদ্যাশিক্ষার জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। গ্রন্থাক্ষর-জ্ঞানেই এ শিক্ষার পর্য্যবসান হইত না; ইহা বিদ্যার্থীর সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করিয়া তাহাকে ভবিষ্যতের দুঃখকষ্ট সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া তুলিত। এজন্যই ইহার নাম হইয়াছিল 'আশ্রম' [শ্রমু তপসি খেদে চ]। এরূপ আশ্রম-বিভাগ পরবর্ত্তী কালের প্রবর্ত্তন নহে; উপনিষদ্ গ্রন্থেই আমরা ব্রহ্মচর্য্য (১), গৃহস্থ (২), বানপ্রস্থ (৩) ও সন্ন্যাস (৪) এই চতুরাশ্রমের স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেখিতে পাই।

ঋক্‌সংহিতা (৫), তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬), অথর্ব্বসংহিতা (৭), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৮), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৯),

* মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

(১) ছান্দো ২,২৩,১। ৮, ১৫।
(২) ছান্দো ৫, ১০, ২। ৮, ১৫
(৩) ছান্দো ৫, ১০, ১।
(৪) বৃহ ৪,৪, ২২, ছান্দো ২, ২৩, ১। শ্বেতা ৬, ২১।
(৫) ঋক্ সং ১০, ১১৯, ৫।
(৬) তৈত্তি সং ৬, ৩, ১০, ৫।
(৭) অথর্ব্ব ৬, ১০৮, ২। ৬, ১৩৩,৩। ৭,১০৯,৭। ১১,৫,১।
(৮) ঐত ব্রা ৫, ১৪। ২২,৯।
(৯) তৈত্তি ব্রা ৩,৭,৬,৩।

শতপথ ব্রাহ্মণ (১), গোপথ ব্রাহ্মণ (২) প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উপনয়নের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ।

সাধারণতঃ অষ্টম হইতে ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া (৩) ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে প্রথম আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। প্রাচীন যুগে বিদ্যাশিক্ষার সহিত উপনয়নের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রচলিত আধুনিক ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। উপনিষদে দেখা যায়—সকল প্রকার উপদেশের প্রারম্ভেই উপনয়নের আবশ্যকতা ছিল (৪)।

ইহা নিশ্চয়ই আধুনিক উপনয়নের মত বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল না। ধর্মশাস্ত্রে প্রত্যেক বেদ অধ্যয়নের জন্য পৃথক উপনয়ন ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে (৫)। বেদত্রয়ীর সারভূত গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় একবার সংস্কারেই ঋক্, সাম, ও যজুঃ এই তিন বেদের অধ্যয়ন চলিতে পারিত ও অথর্ব্ববেদ পাঠের জন্য পুনরুপনয়ন আবশ্যক হইত (৬)। পূর্ব্বে কেবল বিদ্যাশিক্ষার জন্যই এই সংস্কারটির প্রয়োজন হইত; তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না (৭)।

প্রাচীন যুগেও অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের আবশ্যক ছিল।

দেখা যাইতেছে—বেদাধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন; সুতরাং এ সংস্কার যেদিন হইতে দ্বিজাতিগণের অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান রূপে প্রবর্ত্তিত হইল (৮), বেদাধ্যয়নও সেদিন হইতে তাঁহাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার প্রাচীনত্বে কোন সন্দেহই নাই। অনুপনীত ব্রাহ্মণের কল্পনাই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সংহিতা (৯) ব্রাহ্মণ (১০) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উপনয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং "ছান্দোগ্যোপনিষদের সময়েও অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই" এরূপ সিদ্ধান্ত (১) সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। "আমার বংশে কেহ লেখাপড়া না করার জন্য নিন্দাভাজন হন নাই" আরুণির এই উক্তি (২) হইতে কেবল ইহাই জানিতে পারা যায় যে তখনও কোন কোন বংশে অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন মূর্খকে দেখিয়াই তাহার দেশে অধ্যয়নের বিধান নাই, এমন কথা বলা যায় না; কারণ বিধান থাকিলেও সকলেই মেধাবী হইতে পারে না। বরং আরুণির উক্তি হইতে ইহাই মনে হয় যে পরবর্ত্তী কালের মত (৩) সে যুগেও বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ বিশেষ নিন্দাভাজন ছিলেন।

গুরুকরণ।

পিতা স্বয়ং অধ্যাপক হইলে কখন কখন পুত্র স্বগৃহেই উপনীত হইয়া পাঠারম্ভ করিতেন (৪); কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ব্রতনিয়মাদির সম্যক্ পরিপালনের জন্য বালক অন্য গুরুর নিকট প্রেরিত হইত (৫)। প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ আরুণির পুত্র শ্বেতকেতুকেও সংযম-অভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে যাইতে হইয়াছিল; যথারীতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহে ফিরিয়া তিনি পিতার নিকট গভীরতর বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন (৬)। বিদ্যার্থিগণ নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া একাধিক গুরুর নিকটও অধ্যয়ন করিতে পারিতেন (৭)। বেদ প্রভৃতি সাধারণ পাঠ্য বিষয়গুলি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসার জন্য ব্রহ্মচারিগণ আবশ্যক হইলে অন্য কোন বিশেষজ্ঞের নিকট যাইতেন।

মদ্রদেশে পতঞ্চলে যজ্ঞবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কাপ্য নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। ঐ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বহু

(১) শত ব্রা ১১,৩,৩,১। ১১,৩,৩,৭।
(২) গো ব্রা ১,২,১-৮।
(৩) আশ্ব গৃ ১,১৯।
(৪) ছান্দো ৫,১১,৭। কৌষী ৪,১৮।
(৫) আপ ধর্ম্মসূত্র ১,১,১,৮-৯।
(৬) বৈতানসূত্র ১,১, ৫।
(৭) উপনয়নং বিদ্যার্থস্য শ্রুতিতঃ সংস্কারঃ (আপস্তম্ব ১,১,১,৮)।
(৮) "যজ্ঞোপবীত্যেবাধীয়ীত" তৈত্তি আর ২,১,৩।
(৯) অথর্ব্ব ১১,৫,৩।
(১০) শত ব্রা ১১,৫,৪।

(১) *Phil. of the Upanishads*, Deussen, p. 369.
(২) "ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি" (ছান্দো ৬,১,১)।
(৩) "তপঃশ্রুতাভ্যাং যো হীনোজাতিব্রাহ্মণ এব সঃ" (২,২,৬। পাতঞ্জল মহাভাষ্যোদ্ধৃতশ্লোক।)
(৪) বৃহ ৫,১,১।
(৫) ছান্দো ৬,১,১। ৮,১৫। বৃহ ৬,৩,৬।
(৬) ছান্দো ৬,১।
(৭) যদ্বেশ তেন মোপসীদ তত্ত্বস্তু উর্দ্ধং বক্ষ্যামি (ছান্দো৭,১,১)।

বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট যাইতেন (১)। অশ্বপতি বৈশ্বানর বিদ্যায় অভিজ্ঞ থাকায় ঐ বিষয় জানিবার জন্য ছয়জন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন (২)। স্বশাখীয় গুরুর নিকট অধ্যয়ন প্রশস্ত হইলেও বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন পণ্ডিতের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত। যজুর্ব্বেদবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ ব্যতীত সামবেদেরও অধ্যাপনা করিতেন (৩)।

গৃহস্থ গুরু ও শিক্ষার কেন্দ্র।

গুরুগণ সকলেই বনবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরিবারবর্গের সহিত গ্রামে বা নগরে বাস করিতেন (৪)। বিদেহ, কাশী, পঞ্চাল, মদ্র, প্রভৃতি স্থান বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে কুরুপঞ্চালে বহুপণ্ডিত বাস করিতেন (৫) এবং বিদ্যার্থিগণ মদ্রদেশে (৬) ও উত্তর ভারতে (৭) অধ্যয়ন করিতে যাইতেন।

বিদ্যার্থীর কর্ত্তব্য

গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা গুরুর নিদেশবর্ত্তী থাকিতেন। ভিক্ষান্ন আহরণ (৮), গৃহ্য অগ্নির রক্ষণাবেক্ষণ (৯), গোপালন (১০) প্রভৃতি কর্ম্ম শিষ্যকে করিতে হইত। এ-সকল কর্ম্ম প্রথম অবস্থায়ই চলিতে পারিত। পরে শিষ্য যখন গভীরতর বিষয় অধ্যয়নের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তখন তাঁহাকে নিজের ব্রতানুষ্ঠান ও অধ্যয়ন লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত, এ সময়ে অবশ্যই আর পূর্ব্বের মত গৃহকর্ম্মাদি সম্পাদন করা শিষ্যের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

(১) বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১।
(২) ছান্দো ৫,১১।
(৩) বৃহ ৩,১,২।
(৪) ছান্দো ৪,১,২। বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১।
(৫) বৃহ ৩,১,১।
(৬) বৃহ ৩,৩,১। ৩,৭,১।
(৭) কৌষী ব্রা ৭,৬।
(৮) ছান্দো ৪,৩,৫। শত ব্রা ১১,৩,৩, ১।
(৯) ছান্দো ৪,১০,১। শত ব্রা ১১,৩,৩,১।
(১০) ছান্দো ৪,৪,৫।

ব্রহ্মচর্য্যকাল।

ব্রাহ্মণে (১) ও উপনিষদে (২) নানাবিধ পাঠ্য বিষয়ের উল্লেখ আছে; সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ এবং অপরাপর বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইলে বহুসময় আবশ্যক হইত।

উপনিষদে বার বৎসর, বত্রিশ বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল অধ্যয়নের উল্লেখও পাওয়া যায় (৩), গৃহ্যসূত্রে আটচল্লিশ বৎসর অধ্যয়নকাল নির্দ্দিষ্ট আছে (৪)।

গুরুগৃহে থাকিয়া দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়নই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল (৫)।

কোন বিদ্যার্থী ইহা অপেক্ষাও অল্প সময়ে অধ্যয়ন শেষ করিতে সমর্থ হইলে তখনই তিনি গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিতেন (৬)।

অর্থ না বুঝিয়া কেবল মুখস্থ বিদ্যা নিন্দনীয় হইলেও সে যুগেও অর্থজ্ঞানহীন অথচ কল্পকুশল একশ্রেণী যাজ্ঞিকের সত্তা লক্ষিত হইত (৭)। ইঁহারা উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন না করিয়াই সমাবর্ত্তন করিতেন। যাঁহারা গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া গৃহী হইতেন তাঁহাদিগকে স্নাতক বলা হইত। স্নাতক তিন প্রকার—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক, এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক (৮)। যাঁহারা অধ্যয়নের সহিত পালনীয় ব্রতগুলি সম্যক অনুষ্ঠান না করিয়াই সমাবর্ত্তন করিতেন তাঁহারা বিদ্যাস্নাতক, যাঁহারা যথাবিধি ব্রত পালন করিয়াও বেদ অসমাপ্ত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন তাঁহারা ব্রতস্নাতক এবং যাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান এই দুইটিই পালন করিতে সমর্থ হইতেন তাঁহারা বিদ্যাব্রতস্নাতক (৯)। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত স্নাতকগণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইতেন (১০)।

(১) গো ব্রা ১,২,৯।
(২) ছান্দো ৭,১। বৃহ ২,৪,১০।
(৩) ছান্দো ৬,১,২;৮,৭,৩।
(৪) পার গৃ ২,২।
(৫) ছান্দো ৬,১,২। আশ্ব গৃ ১,২২,৩
(৬) আশ্ব গৃ ১,২২,৪।
(৭) পার গৃ ২,৭। নিরুক্ত ১,১৮।
(৮) পার গৃ ২,৮। মহাভাষ্য ৪,২,৫৯।
(৯) গোভি গৃ ৩,৫,২২।
(১০) গোভি গৃ ৩,৫,২২।
(১১) গোভি গৃ ৩,৫,২৩।

বিদ্যার্থীর পালনীয় বেদব্রত।

গুরুগৃহে থাকিয়া বেদের বিভিন্ন অংশ পাঠকালে বিভিন্ন ব্রত পালন করিতে হইত। সামবেদের আগ্নেয়, ঐন্দ্র, ও পাবমান পর্ব্ব পাঠের জন্ম গোদানিক ব্রত, আরণ্যকের শুক্রিয় ভিন্ন অন্য অংশ পাঠের জন্ম ব্রাতিকব্রত, শুক্রিয় পাঠের জন্ম আদিত্যব্রত, উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ পাঠের জন্ম ঔপনিষদব্রত এবং আজ্যদোহ পাঠকালে জ্যৈষ্ঠ-সামিকব্রত পালন করিতে হইত (১), এবং সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী মহানাম্নী, মহাব্রত প্রভৃতি আরও কয়েকটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন।

অরণ্যে বসিয়া ব্রহ্মচারীর অধ্যয়ন।

ব্রতস্নাতক বা যাজ্ঞিকগণও অধ্যাত্মবিদ্যার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ না লইয়া সমাবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। বেদের অন্তভাগ প্রত্যেক স্নাতককে পাঠ করিতে হইত; আরণ্যক-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিয়া কেহই স্নাতক হইতে পারিতেন না (১)। অরণ্যে বসিয়া ব্রতানুষ্ঠান করিতে করিতে এই বেদান্তভাগ পড়িতে হইত। অংশ-বিশেষ পাঠের জন্ম সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সময়ে অবিচ্ছিন্নভাবে অরণ্যবাস সকলের পক্ষে সম্ভব-পর নয় বলিয়া কেবল দিবাভাগে অধ্যয়নকালে অরণ্য-বাসের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায় (২)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, স্বাধ্যায়-পাঠ যেমন অচ্ছদিদর্শ অর্থাৎ যে স্থান হইতে গৃহের ছাদ দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ স্থানে যাইয়া সম্পাদন করিতে হইত (৩), তেমনই বেদের রহস্যভাগও গ্রাম হইতে অল্পমাত্র দূরেও অধীত হইতে পারিত। এই অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষার সময়ে সতীর্থবহুল গুরুপরিবারের মধ্যে থাকিলে চিত্তবিক্ষেপের আশঙ্কা থাকায় গ্রামের বাহিরে যাইয়া অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল এবং বোধ হয় ঐ কারণেই গুরু এক সময়ে একজন মাত্র শিষ্যকে আরণ্যক বিদ্যা শিখাইতেন (৪). সাধারণ পাঠের মত এক সময়ে বহুবিদ্যার্থীকে উপদেশ দিতেন না (১)।

(১) আশ্ব গৃ নারায়ণীবৃত্তি ১,২২,৪। নেদমধীয়ন্ স্নাতকো ভবতি যদ্যপ্যন্যবহ্বধীয়ান্নেদমধীয়ং স্নাতকো ভবতি। ঐত আর ৫,৩,৩,১২।
(২) গোভি গৃ ৩,২,৩৬।
(৩) তৈত্তি আর ২,১১,১।
(৪) ঐত আর ৫,৩,৩। এক একস্মৈ প্রক্রয়াৎ।

আরণ্যক যেমন বানপ্রস্থীর আলোচ্য তেমনই ব্রহ্মচারীরও পাঠ্য।

বেদের যে অংশ অরণ্যে থাকিয়া পাঠ করিতে হইত তাহা 'আরণ্যক' নামে পরিচিত। অনেকের ধারণা যে তৃতীয়াশ্রমী বনবাস-কালে পাঠ করিতেন বলিয়াই এই গ্রন্থের ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে অরণ্যস্থ ব্রহ্মচারীও ইহা পাঠ করিতেন—আরণ্যক নামকরণের ইহাও একটি কারণ। আরণ্যক বিদ্যা বালক বা বৃদ্ধকে প্রদান করিবে না (২) এরূপ স্পষ্ট বিধান হইতে জানা যায় - যুবক ব্রহ্মচারীই ইহা পাঠ করিতেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মেধা, খ্যাতি ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ম অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে (৩); তাহাতে অনুষ্ঠাতা প্রার্থনা করেন যে তাঁহার মেধা বর্দ্ধিত হউক, তিনি যেন খ্যাতিলাভ করেন, এবং বিদ্যার্থিগণ যেন স্রোতোবারির মত তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসে। এরূপ অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা ব্রহ্মচারীর পক্ষেই সম্ভব; সংসার-বিরক্ত প্রৌঢ় বানপ্রস্থীর পক্ষে নহে। ব্রহ্মচারী আরণ্যক অধ্যয়ন করিতেন এবং বানপ্রস্থাশ্রমে উহার উপদেশগুলি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইত। বানপ্রস্থী অরণ্যে বসিয়া সমাগত বিদ্যার্থিগণকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতেন অথবা কৃতবিদ্য গৃহস্থ গুরু শিষ্যের সহিত গ্রামের বাহিরে যাইয়া আরণ্যক সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।

সমাবর্ত্তন।

এইরূপ বহু কষ্টকর অনুষ্ঠানের পর স্নাতকগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। বিদায়কালে আচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার ভাবী জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেন (৪)। ইহাতে অর্থোপার্জ্জন, বিবাহ, ধর্ম্ম-শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, অধ্যাপনা, গুরুভক্তি, অতিথিসেবা

(১) ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ১৫,৩। একঃ শ্রোতা দক্ষিণতো নিষীদেদ্দ্বৌ বা ভূয়াংসস্তু যথাবকাশম্।
(২) ন বৎসে ন চ তৃতীয়ে (ঐত আর ৫, ৩, ৩)।
(৩) তৈত্তি আর ৭, ৪।
(৪) তৈত্তি উপ ১, ১১।

প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই উল্লেখ থাকিত। এই উপদেশে আমরা প্রাচীন ভারতীয় জীবনের প্রকৃত আদর্শ দেখিতে পাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বঙ্গের পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন সমাপ্তির পর একবার মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিদ্যার কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। এইসকল স্থানে নাম না পাইলে পণ্ডিতগণের বিদ্যা সম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইত না। উপনিষদের যুগেও নবীন স্নাতকগণ এইরূপ বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যগ্র হইতেন। সে কালে রাজসভাগুলি বিদ্যার অন্যতম কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। তথায় নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইতেন। স্নাতকগণ এই রাজসভায় বিদ্বান্ রাজা বা সভাসদ্‌গণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতেন (১)। এরূপ বিদ্যাচর্চ্চার জন্যই উশীনরবাসী গার্গ্য বালাকি মৎস্য কুরুপঞ্চাল কাশী এবং বিদেহ দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন (২)।

স্নাতকের জীবিকা

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বিদ্যালোচনার জন্য রাজার সাহায্য পাইতেন (৩) এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে যাইয়া পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতেন—ঋত্বিক্ কর্ম্মে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহিত হইত (৪)। ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হইত; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ভিক্ষাহরণ নিষিদ্ধ ছিল (৫)। গুরু স্নাতককে বলিয়া দিতেন যে তখন হইতে ধনোপার্জ্জনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে (৬); আর কেবল অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করা চলিবে না।

অধ্যাপনা আরম্ভ

সমাবর্ত্তনের সময় গুরু শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া অধ্যাপনা করিতে বলিতেন (১) এবং কোন কোন বিদ্যা গ্রহণের সময়ই ব্রহ্মচারীকে প্রতিশ্রুত হইতে হইত যে তিনি পরে সে বিষয় অপরকে শিখাইবেন (২)। সুতরাং কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন। তিনি বিদ্যার্থিগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহাকে মনে রাখিতে হইত যে ছাত্রগণের সমগ্রজীবনের শুভাশুভের জন্য তিনিই দায়ী।

বেদ ও বেদাঙ্গপাঠের বিভিন্ন কাল

শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৎসরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে বেদ পাঠ ও অপরভাগে অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা হইত। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে উপাকর্ম্ম নামে একটি অনুষ্ঠান হইত (৩)। এই দিন গুরু শিষ্যদিগকে বেদারম্ভ করাইতেন। পৌষ বা মাঘ মাসে উৎসর্গ নামক আর-একটি অনুষ্ঠান করিয়া বেদ পাঠ বন্ধ করিতে হইত (৪)। বৎসরের অবশিষ্ট সময়ে বেদের রহস্যভাগ এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা চলিত (৫)। এইরূপে নিয়মিতভাবে গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা

(১) ছান্দো ৫, ৩।
(২) কৌষী উপ ৪, ১।
(৩) ছান্দো ৫, ১১, ৫। বৃহ ২, ১, ১। ৩১, ১।
(৪) ছান্দো ১, ১০। ঐত ব্রা ২২, ৯।
(৫) শত ব্রা ১১, ৩, ৩, ৭।
(৬) তৈত্তি উপ ১, ১১, ১।

(১) তৈত্তি উপ ১, ১১, ১।
(২) ঐত আর ৩, ২, ৬।
(৩) শাঙ্খা গৃ ৪, ৫। আশ্ব গৃ ৩, ৫, ২। পারস্কর গৃ ২,১০,২।
(৪) শাঙ্খা গৃ ৪, ৬। পারস্কর গৃ ২, ১২, ১। ঐত আর ৫, ৩, ৩,৭।
(৫) খাদির গৃ ৩, ২ ২২। আশ্ব গৃ নারায়ণীবৃত্তি ৩, ৫, ২৩।

একটি বাঙালী ভাস্কর

ভারতবর্ষের ভাস্করেরা পাথরের বুক চিরে একদিন যে ভাবের সুর বইয়ে দিয়েছিল, সে সুরে আজ জগৎ মোহিত ও স্তম্ভিত। কিন্তু তারা যাবার সময় যাদের হাতে বাটালি দিয়ে গিয়েছিল তারা তাদের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে নি; কাজেই এই শিল্প ভারতবর্ষ থেকে একরকম লোপ পেয়ে গিয়েছিল বল্লেই হয়। ভারতের এই সুকুমার শিল্পটিকে এখন আবার যাঁরা বাঁচিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন তাঁদের মধ্যে ম্হাত্রে, দেবল, কর্ম্মকার প্রভৃতি ভাস্করের নাম শুন্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে একজন বাঙালী ভাস্কর আছেন যাঁর কথা আমরা তেমনভাবে শুন্‌তে না পেলেও তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জান্‌তে পারা গেছে তাতেই বোঝা যায় যে, তাঁর প্রতিভা এঁদের চেয়ে কম নয়।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু।
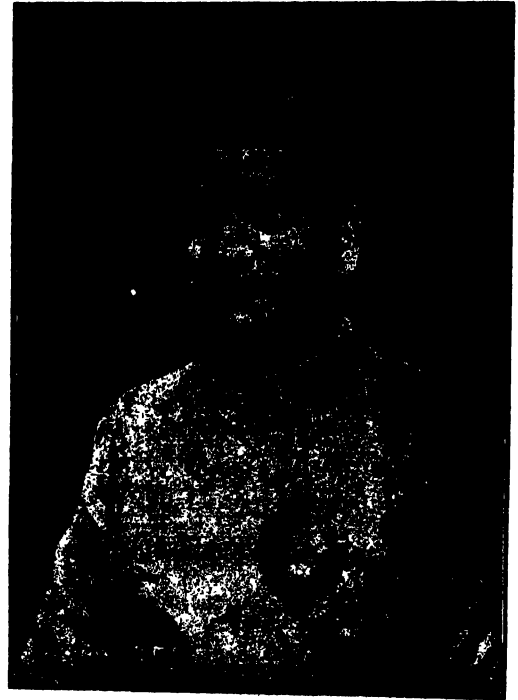
আমরা যাঁর কথা বল্‌তে যাচ্ছি তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু। ইনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের এডিন্‌বরা সহরে বাস করেন, এবং সেইখানেই তাঁর নিজের কার্‌খানা ইত্যাদি করেছেন। ফণীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীযুক্ত তারানাথ বসু। ছেলে বেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে ফণীন্দ্রের বিশেষ ঝোঁক ছিল। তারানাথ ছেলের এই ছবি আঁকার খেয়ালে কোনও বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহ দিতেন। চোদ্দ বছর বয়সে ফণীন্দ্র কল্‌কাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে এসে ভর্ত্তি

বড়োদার মহারাজা।

শিকারী
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক গঠিত।

সাপুড়ে
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক গঠিত।

হন। এইখানে কিছুকাল শিক্ষালাভের পর তিনি এডিনবরার রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে গিয়ে ছবি আঁকা ও মূর্ত্তি খোদাই করার কাজ শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। এডিনবরায় (Percy Portsmouth A. R. S. A.) পার্সি পোর্ট্‌স্‌মাউথ নামক ওস্তাদ শিল্পীর কাছে তিন বছর পাথর খোদাই করার কাজ শেখেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেকগুলি বৃত্তি ও মেডেল পেয়েছিলেন। এইখান থেকে শিক্ষা শেষ কোরে বেরোবার পর অন্য অন্য দেশের মূর্ত্তি পরিদর্শন ও শিল্পীদের কাছে শেখ্‌বার জন্য তাঁকে একটি বৃত্তি (Travelling
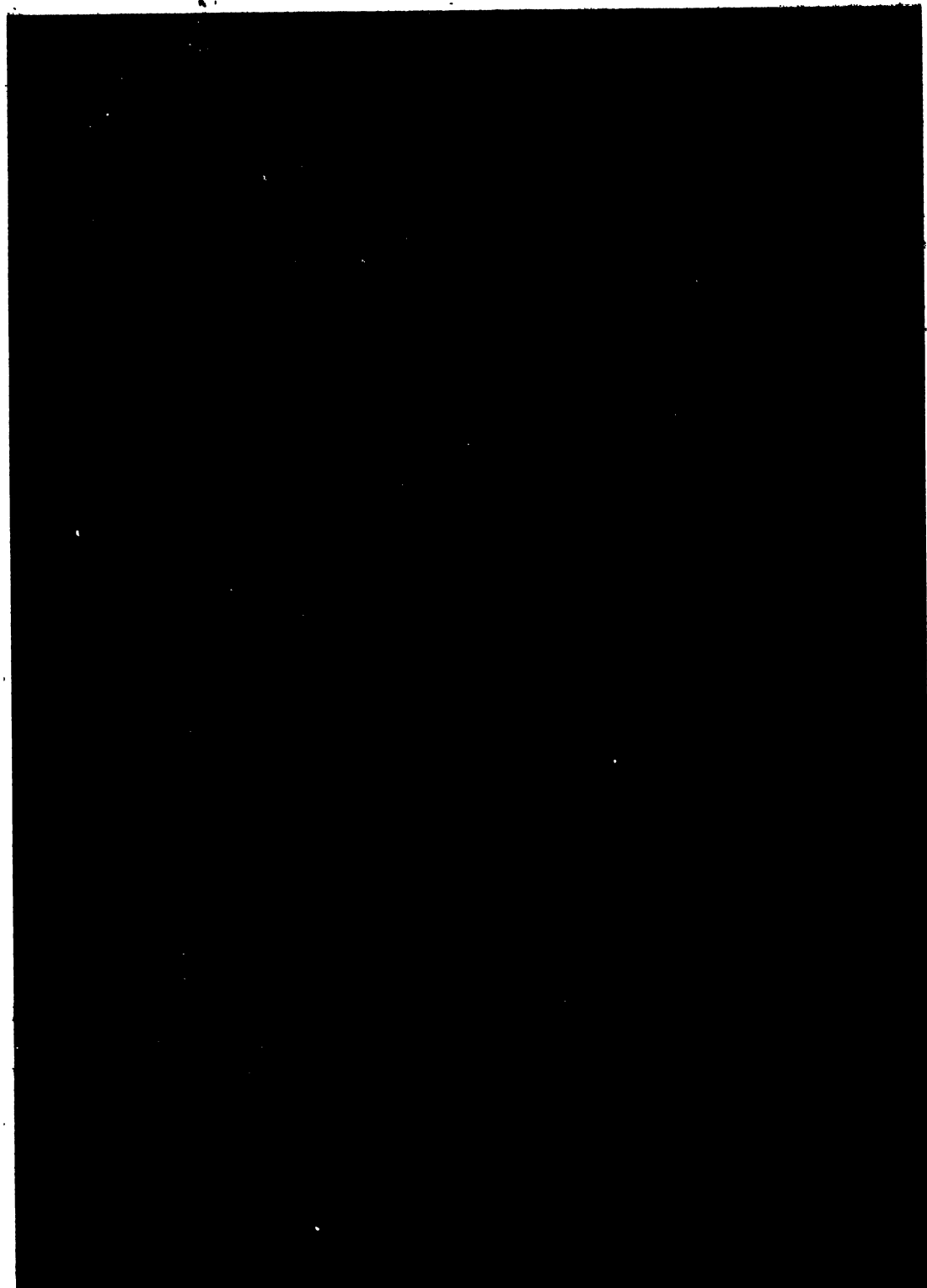
সাধু

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক গঠিত

বাজ-খেলোয়াড়
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক গঠিত।

জলকে
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক গঠিত।

Scholarship) দেওয়া হয়েছিল। ফণীন্দ্র বৃত্তি পেয়ে এক বৎসর ইটালি ও ফ্রান্সে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। পারী সহরে বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রোদ্যাঁ তাঁর কাজ দেখে খুব প্রশংসা করেন এবং তাঁকে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এখান থেকে স্কট্‌ল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে ফণীন্দ্র নিজের কারখানা খুলে ব্যবসা সুরু করেছেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল স্কটিশ একাডেমীতে তিনি প্রথমে তাঁর মূর্ত্তি পাঠিয়ে দেন। পরে রয়েল একাডেমীতে তিনি দুটি ছোট ছোট মূর্ত্তি পাঠিয়েছিলেন। এই দুটি মূর্ত্তির মধ্যে শিকারীর (Hunter) মূর্ত্তিটির ছবি এখানে দেওয়া হলো। রাজশিল্পী সার্ উইলিয়াম্ গাস্কোম্ব্ জন (Sir William Gascombe John, R. A.) এই শিকারীর মূর্ত্তিটি কিনেছিলেন। এই মূর্ত্তিটি দেখে বড়োদার মহারাজার এত ভাল লেগেছিল যে, তিনি ফণীন্দ্রনাথকে বড়োদার আর্টগ্যালারির জন্য ঐ মূর্ত্তিটির আর-একটি নকল কোরে দিতে অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়, পরে তাঁর লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের বাগানে সাজিয়ে রাখ্‌বার জন্য আরো আটটি ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি তৈরী কোরে দিতে বলেন। প্রতিমূর্ত্তিগুলি বড়োদাতে বসেই তৈরী কর্‌বার মনস্থ কোরে ফণীন্দ্র স্কট্‌ল্যাণ্ড থেকে বড়োদায় এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে ব্রোঞ্জ ঢালাই করা ইত্যাদির অসুবিধা হওয়াতে তাঁকে আবার এডিন্‌বরায় ফিরে যেতে হয়। বড়োদায় অবস্থান কালে তিনি সেখানের 'কলাভবনে' কিছুকাল পাথর খোদাই করা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তির ছবি এখানে দেওয়া হোলো। সাপুড়ে ও সাধুর মূর্ত্তি দুটো ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এডিন্‌বরার (Royal Scottish Academy) রয়াল স্কটিশ একাডেমীর প্রদর্শনীতে দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সাপুড়ে প্রতিমূর্ত্তিটা (Royal Academy) রয়াল একাডেমীতে দেখানো হয়। এই সময় অনেক সমালোচক এই মূর্ত্তিটির প্রশংসা করেন এবং ঐ মূর্ত্তির নির্ম্মাতা যে ভবিষ্যতে একজন বড় ভাস্কর হয়ে উঠ্‌বেন অনেক সমালোচক একথাও প্রকাশ করেন।

ফণীন্দ্রনাথ শিল্পকলার কোনও একটা বাঁধাধরা

মন্দির-পথে
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক গঠিত।

দিনের শেষে
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক গঠিত।

প্রথা অনুসরণ কোরে চলেন না। তবে তাঁর মূর্ত্তির মধ্যে প্রাচ্য-শিল্পের আদর্শের আভাষই বেশী কোরে পাওয়া যায়। মূর্ত্তির মধ্যে ভাব ও ভাষাকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর আসল কাজ—কোনো একটা আদর্শ বিশেষের খাতির রাখ্‌তে গিয়ে এ দুটো জিনিষকে তিনি নষ্ট করেন না।

সাপুড়ের মূর্ত্তি—ভারতবর্ষের সাপুড়েদের দেখেই তৈরী করা হয়েছে। সাপুড়ে বাঁশী বাজিয়ে সাপকে মুগ্ধ করেছে। সাপকে মুগ্ধ করার কাজে সাপুড়ে নিজেই মুগ্ধ হোয়ে গিয়েছে। তার চোখের ভাবে, তার বাঁশী বাজাবার কায়দায় এই ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

সাধুর মূর্ত্তি—সাধু একহাত বাড়িয়ে আশীর্ব্বাদ করছেন আর একহাতে তাঁর কমণ্ডলু। মুখের উপর শান্ত ও সৌম্য ও সহানুভূতির ছবি। তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন কোরে তাঁর হাত পা দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু। সাধু বল্লে সাধারণ ভারতবাসীর মনে যে ছবি ফুটে উঠে, ফণীন্দ্রনাথ এই মূর্ত্তির মধ্যে তা সমস্তই ফুটিয়ে তুলেছেন।

দিনের শেষে—মূর্ত্তির কল্পনাও ভারতবর্ষের। দিন-মজুর সারাদিন খেটে দিনান্তে কাজ থেকে ছুটি পেয়ে ক্লান্ত দেহে বাড়ীর দিকে চলেছে। তার চলন, তার কোদাল ধরার ভঙ্গী দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায় সে ক্লান্ত, কিন্তু এই ক্লান্তি সত্ত্বেও তার মুখে একটা শান্তি ও প্রসন্নতা বিরাজ করছে—এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অন্তরের প্রসন্নতা সে হারায় নি।

"জলকে"— মূর্ত্তিটিতে গতির ব্যগ্রতা বেশ ফুটেছে।

মন্দির-পথে—মূর্ত্তিটি মহাত্রে-রচিত এই নামের প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিটির অনুকরণ হলেও পূজারিণীর ভাবটি বেশ প্রকাশ পেয়েছে।

বাজ-খেলোয়াড়—মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ ভারতীয়।

শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
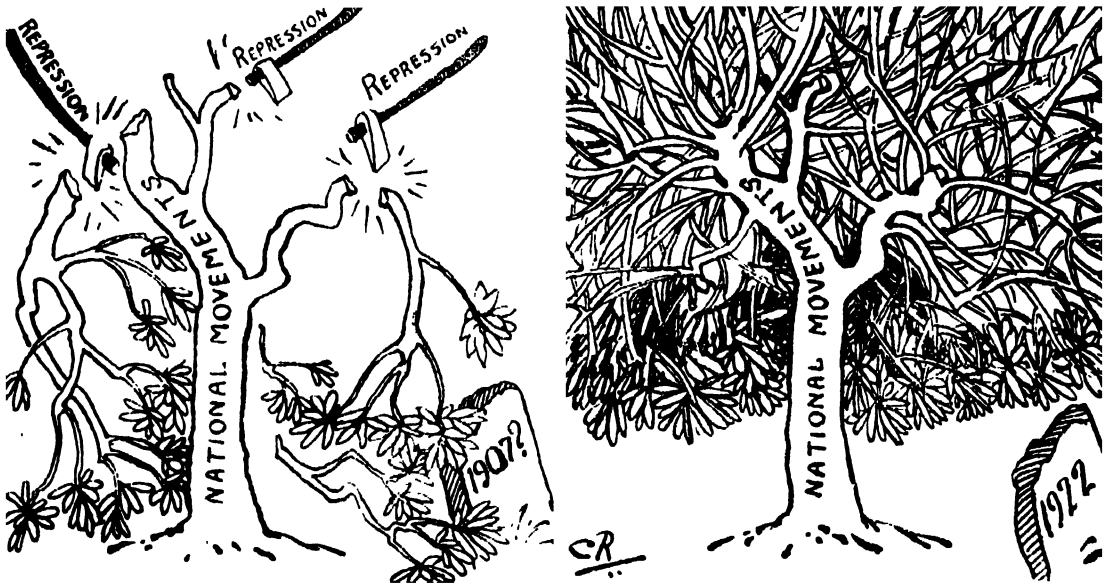
স্বাভাবিক ঘটনা
স্বদেশী-ভাব-বৃক্ষের শাখা যতই ছেদন করা হইতেছে ততই তার প্রশাখা-বৃদ্ধি ঘটিতেছে।
চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে।

রবীন্দ্র-পরিচয়

রুদ্রচণ্ড

[রবীন্দ্রনাথের শৈশব-রচনা একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে লেখা যার হাজার লাইন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে প্রায় কিছুই আজকালকার প্রচলিত সংস্করণে পাওয়া যায় না। কিছুদিন হইল রবীন্দ্র-সাহিত্য-সূচী (Bibliography) সংকলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই সূচী-সংকলন কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কালানুক্রমিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। নিদর্শন-স্বরূপ বাল্য-রচনা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিব। এই সময়ের অধিকাংশ লেখায় স্বাক্ষর নাই। এখন কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া না রাখিলে পরে আর কোন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। সংকলন যেমন অগ্রসর হইবে রবীন্দ্র-পরিচয়ও তেমনি বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়ায় সমালোচনার ধারাবাহিক ঐক্যসূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা। তাই মনে রাখা আবশ্যক যে "রবীন্দ্র-পরিচয়" সাহিত্য-সমালোচনা নহে, সমালোচনার পূর্ব্বাভাস মাত্র।]

কবিকাহিনীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা রীতিমত প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথের ষোল হইতে আঠারো বৎসর বয়সের লেখা প্রায় সাড়ে তিন হাজার লাইন গীতিকবিতা ১২৮৪—১২৮৭ সালের (ইংরেজী ১৮৭৭—১৮৮০) ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। গীতিকবিতা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। "রুদ্রচণ্ড" নামক নাটিকাখানিও এই বয়সেরই লেখা, ইহা প্রথমে কোন মাসিকপত্রে বাহির হয় নাই, ১২৮৮ সনে (ইংরেজি ১৮৮১, শকাব্দ ১৮০৩, সম্বৎ ১৯৩৫) একেবারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ-পরিচয়

"রুদ্রচণ্ডের" আকার ৭½ ইঞ্চি × ৪½ ইঞ্চি (১৮.৫ মিমি × ১১.৫ মিমি) ১পৃষ্ঠা উপহার + ৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপহার ১৩ লাইন, চতুর্দ্দশ সর্গে ৭৮৭ লাইন, মোট ৮০০ লাইনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। নাম-পত্র (title-page) এইরূপ :—

রুদ্রচণ্ড

(নাটিকা)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

কলিকাতা

বাল্মিকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

প্রথম সংস্করণে ১০০০ কপি ছাপা হয়, মূল্য ॥০ (আট আনা)। পরে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই; গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। দুইটি গান কাব্য-গ্রন্থাবলীর ১৩০৩ সনের সংগ্রহে "কৈশোরকের" মধ্যে ছাপা হইয়াছিল; প্রচলিত সংস্করণে কিছুই নাই।

বেঙ্গল লাইব্রেরী তালিকায়—No. 1268 (3rd quarter. of 1881)। ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। *

উপহার

গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উপহার স্বরূপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উপহার কবিতাটি এইরূপ :—

ভাই জ্যোতিদাদা,
যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই!
কোথাও পাইনে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে, ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিয়াছি ছুটিয়া তোমার পাশ,
দেখিতে পারিলে তাহা মিটিত সকল আশ।

---

* শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

ছেলেবেলা হ'তে ভাই ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি' যেতে হবে পরবাসে,
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

প্রবাসে যাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে ইহা বিলাত যাত্রা করিবার পূর্ব্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার পূর্ব্বে লেখা হইয়া থাকিলে, "রুদ্রচণ্ড" নাটিকাটিকে যোল সতেরো বৎসর বয়সের লেখা বলা যায়।

আখ্যানভাগ

রুদ্রচণ্ড হস্তিনাপুর-অধিপতি পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছেন। এখন অরণ্যে অরণ্যে রুদ্রচণ্ডের দিন কাটিতেছে, একমাত্র প্রতিশোধ-স্পৃহা রুদ্রচণ্ডকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। নাটিকা আরম্ভ হইয়াছে রাত্রির অন্ধকারে কালভৈরব-প্রতিমার সম্মুখে। নিজ সংকল্প-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুদ্রচণ্ড ভৈরব-পূজায় আসীন।

মহাকাল ভৈরব মূরতি,
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি!
কটাক্ষে প্রলয় তব, চরণে কাঁপিছে ভব,
প্রলয়-গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন,
তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া,
অমাবস্যা রাত্রিরূপে ছেয়েছে ভুবন।
জটার জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি,
দশন-বিদ্যুৎ-বিভা দিগন্তে খেলায়।
তোমার নিশ্বাসে খসি, নিভে রবি নিভে শশী,
শতলক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।
প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতের শ্মশানেতে
প্রেত-সহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে,
নিদারুণ অট্টহাসে প্রতিধ্বনি কাঁপে ত্রাসে,
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে করপুটে।
প্রলয়-মূরতি ধর, থরহর সুর নর,
চারিপাশে দানবেরা করুক বিহার,
মহাদেব শুন শুন, নিবেদিনু পুনঃ পুনঃ,
আমি রুদ্রচণ্ড, চণ্ড, সেবক তোমার। (১)

রুদ্রচণ্ডের মনে শুধু এক চিন্তা—প্রতিহিংসা। রুদ্রচণ্ডের কন্যা অমিয়ার মনে কিন্তু এসব কোন ভাবনা নাই, সে ফুল তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথে, আপন মনে গান করিয়া যায়, তাহার এসমস্ত ছেলেখেলা রুদ্রচণ্ড একেবারেই দেখিতে পারে না। চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ। তিনি অনেক সময়ে অরণ্যে আসিয়া অমিয়ার সহিত গল্প করিতেন, অমিয়াকে গান শিখাইতেন। পৃথ্বীরাজ-সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি অমিয়ার সহিত আলাপ করিবে এ ধৃষ্টতা রুদ্রচণ্ডের নিকট অসহ্য। রুদ্রচণ্ড অমিয়াকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিয়া বলিয়া দিল, যে, চাঁদকবিকে পুনরায় অমিয়ার নিকটে দেখিতে পাইলে চাঁদকবির আর নিস্তার নাই। রাত্রির অন্ধকারে কুঠারহস্তে অরণ্যের পাদপ কাটিতে কাটিতে রুদ্রচণ্ড ভাবিতে লাগিল পৃথ্বীরাজকে নিজ হস্তে যন্ত্রণা দিয়া অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ কিরূপভাবে গ্রহণ করিবে। এইরূপ চিন্তায় অনেক সময় রুদ্রচণ্ডের সারারাত ঘুম হইত না, সে রাত্রিতেও রুদ্রচণ্ড ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে রুদ্রচণ্ড আবার দেখিল যে চাঁদকবি অমিয়াকে গান শুনাইতেছে। তখন আর তাহার সহ্য হইল না, রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে আক্রমণ করিল। রুদ্রচণ্ডের শরীরে আর পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল। কিন্তু রুদ্রচণ্ডের সংকল্প এখনও সিদ্ধ হয় নাই, রুদ্রচণ্ডের প্রতিহিংসা-তৃষ্ণা এখনও মিটে নাই, রুদ্রচণ্ড চাঁদকবির নিকট প্রাণ-ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু এই প্রাণ-ভিক্ষা চাওয়ার অপমান রুদ্রচণ্ডের মনে দারুণ শেলের ন্যায় আঘাত করিল।

জীবন মাগিতে হল তোর কাছে আজ,
শতবার মৃত্যু এই হইল আমার!
রুদ্রচণ্ড যে মুহূর্ত্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে
রুদ্রচণ্ড সে মুহূর্ত্তে গিয়াছে মরিয়া।
আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম ল'য়ে
কেবল শরীর তা'র, কহিতেছি তোরে—
এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন! (২)

চাঁদকবি প্রাণ-ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল। রুদ্রচণ্ড কিন্তু অপমান ভুলিতে পারিল না।

অনুগ্রহ ক'রে মোরে চলে গেল চাঁদ!
গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্ন-বদনে
রুদ্রচণ্ডে বাঁচালেন অনুগ্রহ ক'রে?
অনুগ্রহ! রুদ্রচণ্ডে অনুগ্রহ করা

(১) রুদ্রচণ্ড, ১ম দৃশ্য, পৃঃ ১-২।

(২) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ২০।

*　*　*　*

ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয়!
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে
তখনি ধূলায় এরে করিব নিক্ষেপ,
চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ ক'রে দেব। (৩)

প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য রঘুপতিও একদিন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল, এবং ভিক্ষা-লব্ধ দুইদিনের কলঙ্কে রঘুপতির সমস্ত গর্ব্ব সমস্ত তেজ নিভিয়া গিয়াছিল। রুদ্রচণ্ডের মধ্যে রঘুপতি-চরিত্রের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাই।

যাহা হউক অনুগ্রহ-ক্ষুব্ধ রুদ্রচণ্ড রোষে অপমানে জ্বলিতে লাগিল। অমিয়ার জন্যই এই অপমান, রুদ্রচণ্ডের নিকট অমিয়াও দুই চক্ষের বিষ হইয়া উঠিল। অমিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাওয়াতেও কোন ফল হইল না।

রুদ্রচণ্ড। শিশুর হৃদয় একি পেয়েছিস্ তুই!
দুই ফোঁটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাহিস্।
এখনি ও অশ্রুজল মুছে ফেল্ তুই।
অশ্রুজলধারা মোর দু' চক্ষের বিষ।
আর নয়, শোন্ শেষ আদেশ আমার
দূর হ' রে—

অমিয়া। ধর' পিতা, ধর গো আমায়—

রুদ্রচণ্ড। ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে মোরে, রাক্ষসি, ছুঁস্‌নে। (৪)

অমিয়া বিষণ্ণ-হৃদয়ে চাঁদকবির সন্ধানে রাজধানীতে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে মহম্মদ-ঘোরী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছে। এক দূত রুদ্রচণ্ডের সন্ধানে অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত। রুদ্রচণ্ডের কুটীর এমন অন্ধকার যে দূত পথ দেখিতে পায় না।

দূত। একি ঘোর স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার!
চারিদিকে ঝোপঝাপ পথ নাহি কোথা।
ওই বুঝি হবে তার আঁধার কুটীর,
ওইখানে রুদ্রচণ্ড বাস করে বুঝি! (৫)

রুদ্রচণ্ড মানুষ সহ্য করিতে পারে না, দূতকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

রুদ্রচণ্ড। পথ ভুলে বুঝি তুই এসেছিস্ হেথা?
আমি রুদ্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা।
নগর-নিবাসী তোরা হেথা কেন এলি?
ঐশ্বর্য্য মাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস্,
ননীর পুঁতুল যত ললনারে ল'য়ে
আবেশে মুদিত আঁখি, গদগদ ভাষা,
ফুলের পাপ্‌ড়ি পরে পড়িলে চরণ
ব্যথায় অধীর হ'য়ে উঠিস্ যে তোরা
নগর-ফুলের কীট হেথা তোরা কেন?
আমি পৃথ্বীরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড।
মৃদু মিষ্ট কথা শুনি' আহ্লাদে গলিয়া
রাজ্য-ধন উপহার দিইনাক আমি। (৬)

দূত বুঝাইয়া বলিল যে সে কোন অপকার করিতে আসে নাই।

দূত। রুদ্রচণ্ড। মিছে কেন করিছেছ রোষ।
উপকার করিতেই এসেছি হেথায়। (৭)

উপকারের কথা শুনিয়া রুদ্রচণ্ড আরও জ্বলিয়া উঠিল।

রুদ্রচণ্ড। বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ!
তোমরা নগরবাসী স্ফীত-দেহ সবে
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত!
তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে। (৮)

দূত তখন জানাইল যে মহম্মদঘোরী পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, ঘোরী রুদ্রচণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। রুদ্রচণ্ড এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া সে পৃথ্বীরাজকে নিজহস্তে শাস্তি দিবার সংকল্প করিয়া আসিয়াছে, আজ মহম্মদঘোরী বুঝি রুদ্রচণ্ডের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়! অপরের হস্তে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলে রুদ্রচণ্ডের প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে না। রুদ্রচণ্ড দূতকে দূর করিয়া দিল এবং ঘোরীর আক্রমণ-বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য রাজধানী যাত্রা করিল।

রাজধানীতে আসিয়া রুদ্রচণ্ডের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, এত লোক এত কোলাহল তাহার সহ্য হয় না।

রুদ্রচণ্ড। একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে
সম্মুখে, দক্ষিণে বামে, সহস্র বর্ব্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!

*　*　*

(৩) রুদ্রচণ্ড, ৪র্থ দৃশ্য, পৃঃ ২১।
(৪) রুদ্রচণ্ড, ৪র্থ দৃশ্য, পৃঃ ২৩।
(৫) রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃঃ ২৯।
(৬) রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃ ২৯-৩০।
(৭) রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃ ৩১।
(৮) রুদ্রচণ্ড, ৭ম দৃশ্য, পৃঃ ৩১।

যেথা যাই শত আঁখি মোর মুখ চেয়ে
আঁখিগুলা বুঝি মোরে পাগল করিবে!
যেথা হেরি চারিদিকে সূর্য্যের আলোক
নয়ন বিঁধিছে মোরে বাণের মতন! (৯)

কিন্তু পৃথ্বীরাজের সংবাদ না পাইলে ত চলিবে না। ভিক্ষা-চাহিয়া-পাওয়া জীবন রুদ্রচণ্ডের নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, পৃথ্বীরাজকে না পাইলে রুদ্রচণ্ডের জীবনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। রুদ্রচণ্ড রাজধানীর পথে পথে খবর লইয়া বেড়াইতেছে যে পৃথ্বীরাজ বাঁচিয়া আছেন কি না, এমন সময়ে একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। রুদ্রচণ্ডের এ কথা শুনিয়া তাহার নিকট সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, দূতকেই সে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

রুদ্রচণ্ড। হত? সেকি কথা? মিথ্যা বলিসনে মূঢ়!
মরেনি সে, মরেনি, মরেনি পৃথ্বীরাজ।
এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ।
কোথা যাস্, বল্ তুই এখনো সে আছে। (১০)

দূত চলিয়া গেলে রুদ্রচণ্ড বুঝিল পৃথ্বীরাজ সত্যই মরিয়াছে। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই রুদ্রচণ্ড বাঁচিয়া ছিল, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুতে রুদ্রচণ্ডের জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাঙ্গিয়া পড়িল, রুদ্রচণ্ডের জীবন শূন্য হইয়া গেল।

রুদ্রচণ্ড। মুহূর্ত্তে জগৎ মোর ধ্বংস হয়ে গেল।
শূন্য হ'য়ে গেল মোর সমস্ত জীবন!
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্য-শিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন,
তা'রে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর-কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই। (১১)

রুদ্রচণ্ডের পক্ষে জীবন ধারণ করিবার আর কোন হেতু রহিল না, সে নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিল।

যদিও রুদ্রচণ্ড এই নাটিকাখানির প্রধান পাত্র, তথাপি অমিয়ার করুণ কাহিনী নাটিকার মধ্যে একটি সামান্য জিনিষ নহে। অমিয়ার মনে প্রতিহিংসার কোন ভাব ছিল না, সে আপন মনে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিত, তরুদেহে লতা জড়াইয়া দিত, আনমনে গান গাহিত। পিতাকে সে অত্যন্ত ভয় করিত; কিন্তু পিতা যে কেন তাহাকে তিরস্কার করিতেন তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিত না। চাঁদ-কবিকে সে এত ভালবাসে অথচ পিতা যে চাঁদ-কবিকে কেন দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না তাহা সে ভাবিয়া পায় না। রুদ্রচণ্ড যখন চাঁদকবির সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, অমিয়ার মন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জ্যোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া! (১২)

আঁধার-ভ্রূকুটীময় অরণ্যে কঠোর শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাহার আরো কতদিন কাটিবে, কে জানে! একমাত্র চাঁদকবিকে দেখিয়া নিজের সঙ্কীর্ণ অবরুদ্ধ জীবনের কথা সে ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া থাকিতে পারিত, এখন তাহাও বন্ধ হইল—

পরদিন প্রাতঃকালে চাঁদকবি অমিয়ার কাছে আসিয়া বলিলেন, "তোমার জন্য দুইটি গান রচনা করিয়া আনিয়াছি।" অমিয়ার হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপিতেছে, সে চাঁদ-কবিকে চলিয়া যাইতে বলিল। বলিয়াই মনে হইল তবে ত চাঁদ-কবির সহিত আর কখনও দেখা হইবে না। তাহার পর আবার ভাবিল অমিয়ার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটুক, চাঁদকবি যেন নিরাপদে থাকেন। অমিয়া তখন চাঁদ-কবিকে চলিয়া যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল, চাঁদকবি কিন্তু সমস্ত কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অমিয়ার একবার মনে হইল যে তাহার পিতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে কি তিনি কিছুই বুঝিবেন না! অমিয়া চাঁদকবিকে বলিল—

(৯) রুদ্রচণ্ড, ৯ম দৃশ্য পৃঃ ৩৮।
(১০) রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৪-৪৫।
(১১) রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৫—৪৬।
(১২) রুদ্রচণ্ড, ২য় দৃশ্য, পৃঃ ৯।

পিতারে বুঝায়ে তুমি বল একবার !
বোলো তুমি অমিয়ারে ভালবাস বড়,
মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে !
আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো
তুমি যদি ভাল ক'রে বলো বুঝাইয়া
নিশ্চয় তোমার কথা রাখিবেন পিতা ! (১৩)

চাঁদকবি বলিলেন, "আচ্ছা বলিব। কিন্তু ও কথা এখন থাকুক্, তোমাকে সে' দিন যে গানটি শিখাইয়া দিয়াছি সেই গানটি আমাকে শুনাও।" অমিয়া ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

রাগিণী—মিশ্র ললিত।
বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।
সৌন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল—
বসন্ত-লাবণ্যে সাজি গো ;
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো !

ঊষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা,
হরষে কপোল তার রাঙা !
আকাশ সুনীল আজি কিবা
অরুণ নয়নে হাস্য-বিভা,
বিমল শিশির-ধৌত তনু
হাসিছে কুসুম-রাজি গো ;
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো !

মধুকর গান গেয়ে বলে—
"মধু কই, মধু দাও দাও !"
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে—"এই লও, লও !"
বায়ু আসি কহে কানে কানে—
"ফুলবালা, পরিমল দাও !"
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল—
"যাহা আছে সব ল'য়ে যাও !"
হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চায় বিলাইতে—
নূতন জগৎ দেখি রে
আজিকে হরষ একি রে ! (১৪)

গান শেষ হইলে চাঁদকবি বলিলেন, "এইবার আমি একটি গান শিখাইয়া দি", বলিয়া তিনি গাহিতে লাগিলেন—

রাগিণী—মিশ্র গৌড় সারঙ্গ।
তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।
শুষ্ক তৃণরাশি মাঝে একলা পড়িয়া—
চারিদিকে কেহ নাহি আর।
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
একবিন্দু শিশিরের কণা ?
কেহ না—কেহ না।

মধুকর কাছে এসে বলে—
"মধু কই, মধু চাই চাই !"
ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে—"কিছু নাই নাই।"
"ফুলবালা পরিমল দাও"
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে,
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে—"আর কিবা আছে ?"
মধ্যাহ্ন-কিরণ চারিদিকে,
খর দৃষ্টি চেয়ে অনিমিখে,
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়। (১৫)

এমন সময়ে রুদ্রচণ্ড আসিয়া উপস্থিত। অমিয়া কি করিয়া চাঁদকবিকে রক্ষা করিবে তাই ভাবিয়া আকুল ; সে সমস্ত দোষ নিজের মাথায় পাতিয়া লইল।

অমিয়া। পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে ;
আপনি এসেছি আমি চাঁদকবি কাছে,
চাঁদের কি দোষ তাহে বল পিতা, বল !
এসেছিনু, কিছুতেই পারিনি থাকিতে,
নিজে এসেছিনু আমি, চাঁদের কি দোষ ? (১৬)

চাঁদকবির সহিত রুদ্রচণ্ডের যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়, অমিয়া তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। রুদ্রচণ্ড যখন চাঁদকবির নিকট প্রাণভিক্ষা করিলেন অমিয়ার মূর্চ্ছা তখনও ভাঙ্গে নাই। ইতিমধ্যে রাজধানী হইতে দূত আসিয়া চাঁদকবিকে জানাইল যে রাজ্যের সমূহ বিপদ, রাজসভায় চাঁদকবির উপস্থিতি এখনই আবশ্যক, নিমেষ ফেলিবার অবসর নাই। অমিয়ার সহিত

(১৩) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ১৩।
(১৪) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ১৪-১৫। কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩) কৈশোরক, পৃঃ ৪-৫।
(১৫) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ১৭-১৮। কাব্য-গ্রন্থাবলী (১৩০৩), কৈশোরক, পৃঃ ৫।
(১৬) রুদ্রচণ্ড, ৩য় দৃশ্য, পৃঃ ১৮।

কথা বলিবার আর অবসর ঘটিল না, চাঁদকবি চলিয়া গেলেন।

তাহার পর অমিয়া যখন চাঁদকবিকে খুঁজিবার জন্য রাজধানীতে আসিল, চাঁদকবি তখন মহম্মদঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন। অমিয়া সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া চাঁদকবির দেখা পাইল না। রাত্রির অন্ধকারে ঝড় উঠিয়াছে, দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ;—এই ভীষণ দুর্য্যোগে অমিয়া হতাশ-হৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে বনের এক কাঠুরিয়া তাহাকে আশ্রয় দেওয়ায় অমিয়ার প্রাণরক্ষা হইল।

এদিকে চাঁদকবি অমিয়ার জন্য ভাবিয়া আকুল, শিবিরে বসিয়া শুধু অমিয়ার কথা মনে পড়িতেছে।

সহস্র থাকুক্ কাজ, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা!
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচার।
* * * *
প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী,
কবে এ আঁধার রাত্রি ফুরাইবে তোর ?
ওই মুখখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে
গান গাবি খেলাইবি প্রশান্ত হরষে। (১৭)

আবার দূত আসিয়া খবর দিল যে শত্রুসৈন্য রাত্রিযোগে অলক্ষ্যে আসিয়া তিন ক্রোশ দূরে শিবির ফেলিয়াছে, এখনি যুদ্ধসজ্জা করিতে হইবে। চাঁদকবি সৈন্যদলকে প্রস্তুত করিবার জন্য চলিয়া গেলেন, অমিয়ার সহিত আর দেখা করা হইল না।

বেলা দ্বিপ্রহরে রাজধানীর পথে দলে দলে লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলিয়াছে, সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রা করিতেছে। নেপথ্যে অমিয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে, বিদায়ের পূর্ব্বে চাঁদকবি যে গান তাহাকে শিখাইয়াছিলেন সেই গানটি।—

তরুতলে ছিন্ন-বৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার।
চারিদিকে কেহ নাহি তার—
নিরদয় অসীম সংসার।"

চাঁদকবি একদল সৈন্যকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনে হইল যেন অমিয়ার কণ্ঠ শুনিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন যে মধ্যাহ্নে রাজপথে সে কি করিয়া আসিবে। একজন সেনাপতি আসিয়া সংবাদ দিল যে হিন্দুসৈন্য যুদ্ধশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত, সাহায্যের আশায় এখন একটা যুদ্ধ করিতেছে, বিলম্ব হইলে তাহারা হতাশ হইয়া পড়িবে। চাঁদকবি বলিলেন "তবে চল, চল ত্বরা, আর দেরী নয়।" এমন সময়ে অমিয়া আসিয়া ডাকিল—

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ—ভাই মোর—
সৈন্যগণ। কে তুই ! দূর হ'।
সেনাপতি। স'রে দাঁড়া, পথ ছাড়, চল সৈন্যগণ !
চাঁদকবি। (স্তম্ভিত হইয়া) অমিয়া রে—
সেনাপতি। চাঁদকবি, এই কি সময় !
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেখেলা পেলে একি পথের ধারেতে ?
চল' চল' বাজাও বাজাও রণ-ভেরী।
চাঁদকবি। (যাইতে যাইতে) অমিয়া রে, ফিরে এসে—
সেনাপতি। বাজাও দুন্দুভি !
[রণবাদ্য। সৈন্যগণের সহিত চাঁদকবির প্রস্থান।] (১৮)

দুন্দুভির শব্দে চাঁদ-কবির কথা ডুবিয়া গেল, অমিয়ার কানে কোন কথা পৌঁছিল না। অমিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না, অবসন্নহৃদয়ে পথপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, রাজধানীর পথ নিস্তব্ধ। অমিয়ার মনে শুধু এক কথা—

চলে গেল!—সকলেই চ'লে গেল গো!
দিনরাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্ত্তের তরে দেখা হ'ল যদি,
চ'লে গেল ? একবার কথা কহিল না ?
একবার ডাকিল না অমিয়া বলিয়া ?
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো ? (১৯)

চলিতে চলিতে অমিয়া সেই অরণ্যের পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমিয়া ভাবিল আর কোথাও যখন আশ্রয় মিলিল না পিতার নিকটেই ফিরিয়া যাই, সে অরণ্যে ফিরিয়া চলিল। তার হৃদয় কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মা গো মা, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল মোর !
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিঁড়ে গেল সব।
চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হ'ল যদি,
একবার ডাকিলে না অমিয়া বলিয়া ? (২০)

---

(১৭) রুদ্রচণ্ড, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, পৃঃ ২৭।

(১৮) রুদ্রচণ্ড, ৮ম দৃশ্য, পৃঃ ৩৫-৩৬।

(১৯) রুদ্রচণ্ড, ১০ম দৃশ্য, পৃঃ ৪০।

(২০) রুদ্রচণ্ড, ১০ম দৃশ্য, পৃঃ ৪১।

অরণ্যে ফিরিয়া আসিয়া অভাগিনী দেখিল যে পিতা নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন। অমিয়া পিতার পায়ের উপর কাঁদিয়া পড়িল।

অমিয়াকে দেখিয়া রুদ্রচণ্ড চমকিয়া উঠিল। এতদিন পরে আজ মরিবার সময় তাহার মনে পড়িল যে তাহার কন্যা আছে। প্রতিহিংসা-বৃত্তির কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া রুদ্রচণ্ডের পিতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

রুদ্রচণ্ড। আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা।
এতদিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।
অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর,
আহা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে।
আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা,
পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন।

এতদিন পরে অমিয়া এই প্রথম পিতৃস্নেহের পরিচয় পাইল, সে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

অমিয়া। ও কথা বোল না পিতা, বোল না, বোল না।
অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর।
তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত সংসার,
এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ত হয়ে।
যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে,
যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিবু,
তোমারে তিলেক তরে ছাড়িব না আর।

আসন্ন-মৃত্যু রুদ্রচণ্ড কন্যাকে বুকে টানিয়া লইল।

রুদ্রচণ্ড। আয় মা আমার তুই থাক বুকে থাক।
সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিনু।
এখন সময় মোর ফুরায়ে এসেছে,
আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা?

* * * *

অমিয়া মা, কাঁদিসনে, থাক্ বুকে থাক্। (২১)

এদিকে মহম্মদ-ঘোরী হস্তিনাপুর অধিকার করিয়াছে, পৃথ্বীরাজের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত। চাঁদকবি ধ্বংসস্তূপ ছাড়িয়া চলিয়াছেন।

চাঁদকবি। পৃথ্বীরাজ, রাজদণ্ড, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,
হাসি-কান্না-লীলাময় নগর নগরী,
অচল অটল কাল ছিল বর্ত্তমান,
আজ তার কিছু নাই। চিহ্নমাত্র নাই।
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত,
এই যে মানুষগণ করে কোলাহল,
এ কি সব শ্মশানেতে মরীচিকা আঁকা! (২২)

এ সমস্তের মধ্যেও কিন্তু চাঁদকবির মনে পড়িতেছে অমিয়ার কথা। চাঁদকবি আর থাকিতে পারিলেন না, অমিয়ার সন্ধানে অরণ্যে চলিলেন। কুটীরের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে সমস্ত নিস্তব্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। পদশব্দে প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া উঠিতেছে, হাহা করিয়া বায়ু বহিতেছে। সন্তর্পণে কুটীরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া চাঁদকবি দেখিলেন রুদ্রচণ্ডের মৃত-দেহের পাশে মুমূর্ষু অমিয়া। আকুল কণ্ঠে অমিয়াকে ডাকিলেন—

অমিয়া, অমিয়া, স্নেহের প্রতিমা,
চাঁদকবি ভাই তোর এসেছে হেথায়।

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(২১) রুদ্রচণ্ড, ১২শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৬-৪৭।
(২২) রুদ্রচণ্ড, ১৩শ দৃশ্য, পৃঃ ৪৮।

রণরঙ্গ

আজি গগনে গগনে ঘন-গরজনে রণঝঞ্ঝনা বাজে,
তড়িত চমকে অসির ফলক ঝলকে জলদ মাঝে।
ভূবিমানে আজি জীমূতমন্দ্রে বাজিল তুমুল রণ,
কাঁপিল বিশ্ব, কি ঘোর দৃশ্য, ভয়াতুর জীবগণ।
মহা ব্যো'ম ঘিরি' নিকষকৃষ্ণ নীরধর নিনাদিল,
বাত্যাতাড়িত ধূলায় অন্ধ ধরা আঁখি নিমীলিল।

বিহগ কুলায়ে আশ্রয় নিল, নরনারী নিল ঘরে,
জননীর ক্রোড়ে লুকাইল শিশু বিপুল শঙ্কা ভরে।
ধারাধর-ধারা ধরণীর গলে অযুত অস্ত্রগার,
বজ্র গরজে? নাকি অসংখ্য অনীকিনী-হুঙ্কার?
বৃক্ষ ভাঙিল, ব্রততী ছিঁড়িল, বাধিল গণ্ডগোল,
মুক্ত প্রকৃতি-বুকে আজ একি পরলয়-কলরোল?

শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার

উমারাণী

বসন্ত পড়ে গিয়েচে না? দখিন হাওয়া এসে শীতকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল, যে মনে হচ্চে, উড়ন্ত চিলগুলোর ডানায় নীল রং লেগে যাবে। এই সময় আমার তার কথা বড় মনে পড়ে। তার কথাই বল্‌বো।

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিন কতক গবর্ণমেণ্টের চাকরী নেবার বৃথা চেষ্টা কর্‌বার পর যে মাসে আমি একটা চা-বাগানের ডাক্তারী নিয়ে গৌহাটীতে চ'লে গেলুম, সেই মাসেই আমার ছোট বোন শৈল তার শ্বশুর-বাড়ীতে কলেরা হয়ে মারা গেল। এই শৈলকে আমি বড় ভালবাস্‌তুম, আমার অন্যান্য বোনেদের সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক মারামারি করেছি, কিন্তু শৈলর গায়ে আমি কোনোদিন হাত তুলিনি। শৈলর বিয়ে হয়েছিল যশোর জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। শৈল কখনো সে গ্রামে যায় নি, তার স্বামী তাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা ক'রে থাকৃতো। তার স্বামী প্রথমে পাটের দালালী কর্‌তো, তার পর একটা অফিসে ইদানীং কি চাকরী কর্‌তো। যেখানে শৈলর স্বামী বাসা করেছিল, তার পাশেই আমার মামার বাড়ী,—একটা গলির এপার ওপার। এই বাসায় ওরা শৈলর বিয়ের অনেক আগে থেকেই ছিল এবং শৈলর বিয়েও মামার বাড়ী থেকেই হয়।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের বাংলা থেকে একটা ঘা ড্রেস ক'রে ফির্‌ছি, পিওন খান-কতক চিঠি আমার হাতে দিয়ে গেল। আমার বাসায় ফিরে এসে তারি একখানাতে শৈলর মৃত্যুসংবাদ পেলুম। বাংলার চারি পাশের ঝাউ কৃষ্ণচূড়া ও সরল গাছগুলো সন্ধ্যার বাতাসে সন্ সন্ কর্‌ছিল। আমার চোখের সাম্‌নের সমস্ত চা-বাগানটা, দূরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, মারঘেরিটা ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলার সাদা রংটা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবগুলো মিলে একটা জমাট অন্ধকার পাকিয়ে তুল্‌লো।

আলো জ্বালিয়ে চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে রইলুম। বাইরের হাওয়া খোলা দুয়ার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুক্‌তে লাগ্‌লো। অনেক দিনের শৈল যে! কলিকাতা থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমায় তৃপ্তি দেবার পন্থা খুঁজে ব্যাকুল হয়ে পড়্‌তো। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কথ্‌বেল পেকেছে, আমি বাড়ী আস্‌বার আগেই শৈল এসব ঠিক ক'রে রাখ্‌তো; নানা রকম মসলা তৈরী ক'রে কাগজে কাগজে মুড়ে রেখে দিত; আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ-জড়ানো ব্যস্ততা আর ছুটাছুটির আর অন্ত থাকৃতো না। গ্রীষ্মের ছুটীতে আমি বাড়ী গেলে আমায় বেলের সরবৎ খাওয়াবার জন্যে পরের গাছে বেল চুরি কর্ত্তে গিয়ে ঘরের পরের কত অপমান সে সহ্য করেচে; আমারই জুতো বুনে দেবে ব'লে তার উলবোনা শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লুম কত ঘটনার সঙ্গে কত তুচ্ছ সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে শৈল জড়ানো রয়েচে। কত খেলা-ধূলোয় সে আজ ঐ আকাশের মাঝখানকার জলজলে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মত দূরের হয়ে গেল, ঝাউ-গাছের ডাল-পালার মধ্যেকার ঐ বাতাসের শব্দের মতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল!

তার পরদিন ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেলুম। বাড়ীর সকলকে সান্ত্বনা দিলুম। আহা, দেখ্‌লুম আমার ভগ্নীপতি বেচারা বড় আঘাত পেয়েছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারা শৈলকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লুম। শৈল প্রথম বুন্‌তে শিখেই আমার ভগ্নীপতির জন্যে একটা গলাবন্ধ বুন্‌ছিল, সেটা আধ-তৈরী অবস্থায় প'ড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন একটু হিংসে হোলো, আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উল বুন্‌তে শিখে শেষে কিনা নিজের স্বামীর গলাবন্ধ আগে বুন্‌তে যাওয়া! তবুও তো সে আজ নেই!

পরে আবার গৌহাটী ফিরে গিয়ে যথারীতি চাকরী করতে লাগলুম। দেশ থেকে এসে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, তারপর তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তার আর বিশেষ কোনো সংবাদ রাখতুম না, তবে মাঝে মাঝে মামার বাড়ীর পত্রে জানতে পারতুম, সে অনেকের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করতে রাজী নয়। বিবাহ সে আর নাকি করবে না।

এই রকম ক'রে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, দেশে যাবার বিশেষ কোনো টান না থাকাতে দেশে বড় যেতুম না। আমার মা বাবা অনেক দিন মারা গিয়েছিলেন, বোনগুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমার পক্ষে দেশ বিদেশ দুই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজের কোন বৈচিত্র্য ছিল না, সকাল-বেলা ডাক্তারখানায় ব'সে নীরস একঘেয়ে ভাবে কুলীদের হাত দেখা, কলের পুতুলের মত ঔষধ লিখে দেওয়া। রোগ তাদের যেন বড় একঘেয়ে রকমের, সাদাজ্বর, হিল্-ডায়েরিয়া, বড় জোর কালাজ্বর, কালে ভদ্রে এক-আধটা টাইফয়েড বা শক্ত রকমের নিউমোনিয়া। যখন হাতে কাজকর্ম্ম বিশেষ থাকতো না, তখন পড়তুম, না হয় আমার একটা খেয়াল আছে—অপটিক্সের বা আলোকতত্ত্বের চর্চ্চা করা—তাই করতুম। বাংলার একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আঁধার ঘর বা ডার্করুমে পরিণত করে নিয়েছিলুম। কলিকাতা থেকে প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও অপটিক্সের বই সব আনাতুম।

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময় মামার বাড়ীর পত্রে জানলুম, আমার ভগ্নীপতি আবার বিবাহ করেছে। সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির হাত সে নাকি আর এড়াতে পারলে না। এতে মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পারলুম না, শৈলর প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্রিমই, তারই বলে সে এতদিন যুঝলো তো?

সেবার বৈশাখ মাসের প্রথমে দেশে গিয়ে মামার বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কতকগুলো কথা অপটিক্স সম্বন্ধে মনে এসেছিল যা একজন বিশেষজ্ঞের নিকট বলা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বস্তুবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে সে-সব বিষয়ের কথাবার্ত্তা কইবার জন্যেই আমার একরকম কলিকাতায় আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরম্ভ করলুম, সেও খুব উৎসাহ দিল, আমি অপটিক্স নিয়ে একেবারে মেতে উঠলুম।

এই অবস্থায় একদিন সকাল-বেলা বারান্দায় ব'সে পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল সামনের বাড়ীর জানলাটায়। সেইটেই আমার ভগ্নীপতির বাসা। দেখলুম কে একটি অপরিচিতা মেয়ে ঘরের মধ্যে কি কাজ করছে। আমার দিক থেকে শুধু তার সুপুষ্ট হাত দুটি দেখা যাচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল তার পিঠের দিকটা খুব চওড়া।

একটু পরেই সেই ঘরের ভিতর ঢুকলো আমার ভগ্নীপতির বোন টুনি। টুনির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। আমি গৌহাটী থেকে এসে পর্য্যন্ত ওদের বাড়ী যাই নি। টুনিকে দেখে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—টুনি, ঐ মেয়েটি কি নতুন বউ?

—হ্যাঁ, দাদা।

—দেখি একবার।

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বল্লে, তাকে জানালার কাছে নিয়ে এসে তার ঘোমটা খুলে দিলে। ভাল দেখা গেল না। গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগুলোকে প্রায় অপটিক্স চর্চ্চার ডার্ক-রুম ক'রে তুলেছিল, দিনমানেও তার মধ্যে আলো যায় না। ভাল না দেখতে পেয়ে বল্লুম, "হাঁ রে, কিছুই তো দেখতে পেলুম না?"

টুনি হেসে উঠলো, বল্লে, "আপনি ওখান থেকে যে দেখতে পাবেন না তা আমি জানি। তার ওপর তো আবার চশমা নিয়েচেন।" তারপর কি ভেবে টুনি একটু গম্ভীর হোলো, বল্লে, "আপনি এসে পর্য্যন্ত তো এবাড়ী একবারও আসেন নি, দাদা। আজ দুপুরবেলা একবার আসবেন?"

দুপুর বেলায় ওদের বাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুকতেই মনে

হোলো, ৪।৫ বছর আগে ভাই-ফোঁটা নিতে শৈলর নিমন্ত্রণে এবাড়ী এসেছিলুম, তার পর আর এবাড়ী আসিনি। দালান পার হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা সব আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে গেলে টুনি বল্লে "দাদা, বৌ দেখ্বেন আসুন।" ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বউয়ের ঘোম্‌টা খুলে দিয়ে বল্লে, "ওঁর সাম্‌নে ঘোমটা দিতে হবে না, বৌদি। উনি তোমার দাদা।"

মেয়েটি আধ-ঘোম্‌টা দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম কর্‌লে। দিব্যি মেয়েটি তো! রং খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখখানির গড়ন। একরাশ কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া ঠাস্-বুনানি কালো চুলে মাথা ভর্ত্তি। বেশ মোটা-সোটা গড়ন। বয়স বোধহয় ১৪।১৫ হবে। টুনির মা বল্‌লেন, মেয়েটির বাপ পশ্চিমে চাকরী করেন, সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অন্য ছেলেপিলে কিছু নেই। তাঁদের সঙ্গে কি জানাশুনো ছিল, তাই এখানেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে বিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটি প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালে আমি তার হাত ধরে তাকে কাছে নিয়ে এলুম। বাঁহাতে তার ঘোম্‌টা আর-একটু খুলে দিয়ে বল্লুম, "আমার কাছে লজ্জা কোরো না, খুকী, আমি যে তোমার দাদা। তোমার নামটি কি?"

তার চোখের অসঙ্কোচ দৃষ্টি দেখে বুঝ্‌লুম, মেয়েটি সেই মুহূর্ত্তেই আমার বোন হয়ে পড়েচে। সে খুব মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "উমারাণী"।

আমি বল্লুম, "আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? এস উমারাণী, এই চৌকিটায় ব'সে তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।" আমি চৌকিতে তাকে কাছে নিয়ে বসালুম, খানিকক্ষণ তার সঙ্গে একথা সেকথা নানা কথা কইলুম।

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "বাড়ী ছেড়ে এসে বড় মন কেমন কর্‌ছে, না?"

উমারাণী একটু হেসে চুপ ক'রে রৈল।

আমি বল্লুম, "তোমার বাবা থাকেন কোথায়?"

—মাউ।

আমি মাউএর নাম কখনো শুনিনি। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, —মাউ, সে কোন্‌খানে বল দেখি?

—সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়।

—তোমার বাবা সেখানে কি কাজ করেন?

—কমিসারিয়েটে।

—তোমার আর কোন ভাই বোন নেই, না?

—না। আমার পর আমার আর এক বোন্ হয়, সে আঁতুড়েই মারা যায়। তার পর আর হয় নি।

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূর এসেছে, ভাব্‌লুম হয়তো বাপ-মায়ের কথা বল্‌তে মেয়েটির মনে কষ্ট হচ্ছে। কথার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,—তুমি লেখাপড়া জান, উমারাণী?

—আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়্‌তাম, বাংলা পড়া হতো না ব'লে বাবা ছাড়িয়ে নেন্। তার পর বাড়ীতে বাবার কাছে পড়্‌তাম।

—বাংলা বই বেশ পড়্‌তে পারো?

—পারি।

আমি উমারাণীর কথাবার্ত্তা কইবার ভাবে ভারী আনন্দিত হলুম। এমন সুন্দর শান্তভাবে সে কথাগুলি বল্‌ছিল, মাটীর দিকে চোখদুটি রেখে, যে আমার বড় ভাল লাগ্‌লো। আমি তার মাথায় একটা আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লুম,—বেশ, বেশ। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, অন্য আর এক সময়ে আস্‌বো, এখন আসি।

দাঁড়িয়ে উঠেচি, উমারাণী আবার সেইরকম গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম কর্‌লে। আমি তাকে বল্‌লুম,—খুব শান্ত হয়ে থেকো কিন্তু উমারাণী। কোনো দুষ্টুমি যেন কোরো না। তাহলে দাদার কাছে,—বুঝ্‌লে তো?

উমারাণী হেসে ঘাড় নীচু ক'রে রইল।

* * *

এর ৫।৬ মাস পরে পূজার সময় আবার মামার বাড়ী এলুম। অষ্টমী পূজার দিন দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর একটা বড় ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে একটা ঘরের ভিতর খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার মামার বাড়ী পূজা হোত। সমস্তদিন নিমন্ত্রিত-

দের অভ্যর্থনা করা, পরিবেশন করা প্রভৃতি নানা কাজে বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে গেলুম। আমার ছোট ভাই খাবার সময় বল্লে, "অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন তো দাদা? দিদি এসেছিলেন, আরতির সময় আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে আপনার ঘরে গেলেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পায়ে হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্যে। আপনি উঠ্‌লেন না। তার পর তাঁরা সব চলে গেলেন। তিনি নাকি পরশু বাপের বাড়ী চলে যাবেন। আপনি অবিশ্যি একবার ওবাড়ী যাবেন, কাল। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দিদি বড় দুঃখ ক'রে গিয়েছেন।"

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিয়ে না বুঝে বল্‌লুম, —দিদি মানে?

—ও বাড়ীর।

—উমারাণী?

—হাঁ। দিদি, টুনিদি, এঁরা সব আরতির সময় এসেছিলেন কি না।

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তার সেই ভক্তিনম্র মধুর ব্যবহারটুকু আমার বড় ভাল লেগেছিল। তাই তাকে ভুলি নি, এবার চা-বাগানে গিয়ে মেয়েটির কথা কয়েকবার ভেবেছি। তার পরদিন সকালে উঠে কাজকর্ম্মের পাশ কাটিয়ে এক ফাঁকে ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখ্‌তে পেয়ে একেবারে ওদের রান্নাঘরের মধ্যে চ'লে গেলুম। টুনির মা বল্‌লেন, "এস এস বাবা। তা এতদিন এসেছ, এ বাড়ী কি একবারও আসতে নেই?"

আমি সময়োচিত কি একটা কৈফিয়ৎ দিলুম। উমারাণী মাছ কুট্‌ছিল, আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চ'লে গেল। একটু পরেই হাত ধুয়ে এসে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। টুনির মা বল্‌লেন, "বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও গে। এখানে এই ধোঁয়ার মধ্যে—"

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে ব'লে উঠ্‌লো, "একি! দাদা যে? কি ভাগ্যি! বৌদিদি দাদা দাদা ব'লে মরে ফি দিন আমায় জিজ্ঞেস করে—দাদা পূজোর ছুটিতে বাড়ী আস্‌বেন তো? দাদার দায় প'ড়ে গিয়েছে খোঁজ করতে! ৪।৫ দিন এসেছেন, এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি?"

আমাকে একটু অপ্রতিভই হতে হোলো। উমারাণীর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লুম, "হ্যা রে রাণী, দাদার কথা তা হলে ভুলিস্ নি?"

টুনির কথায় মেয়েটির খুব লজ্জা হয়েছিল, সে মুখ নীচু ক'রে আমার কোঁচার কাপড়ের কোণ হাতে নিয়ে চুপ্ ক'রে নাড়তে লাগ্‌লো—আমি দালানে একটা খাটের উপর বসে ছিলুম, উমারাণী নীচে আমার পায়ের কাছটিতে বসে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "শচীশ বল্‌ছিল, দিদি চলে যাবে সোমবারের দিন। সে কথা কি ঠিক?"

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল, "বাবা পত্র দিয়েছিলেন একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও তো এলেন না।"

ওর গলার স্বরটা যেন একটু কেঁপে গেল।

তার বিরহী বালিকা-হৃদয়টি মা-বাপের জন্যে তৃষিত হয়ে উঠেচে বুঝে সান্ত্বনার সুরে বল্‌লুম, "আস্‌বেন; আজ তো মোটে নবমী। আচ্ছা, কল্‌কাতা কেমন লাগ্‌লো, রাণী?"

উমারাণী উত্তর দিল, "বেশ ভালো।"

আমি তার নতমুখখানির দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "তা নয় রে, রাণী। ভালো কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে ভাল বল্‌লে চল্‌বে না। কোথায় পশ্চিমের অমন জল হাওয়া, আর এই ধুলো ধোঁয়া—ভালো লাগ্‌তেই পারে না।"

উমারাণী একটুখানি হেসে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম, "পশ্চিমে পূজো হয় রে রাণী?"

সে বল্‌লে, "ঠিক এদেশের মত হয় না। হিন্দুস্থানীরা কি একটা করে, সেও অনেকটা এই রকমের। আর সেখানে এ সময় রামলীলার খুব ধুম হয়।"

আমি উঠে আস্‌বার সময় উমারাণী আবার একবার আমার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

আমি বল্লুম, "রাণী, আমি যতবার আস্‌বো যাবো ততবারই কি আমায় একটা ক'রে প্রণাম করতে হবে?"

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথমবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বল্লে, "কাল বিকেলে আসবেন, দাদা।"

এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব'লে ডাকেনি। আমি ওর মুখে দাদা ডাক শুনে বড় আনন্দ পেলুম। বল্লুম, "কাল তো বিজয়া দশমী, আস্‌বো বৈ কি।"

তার পরদিন বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম করলুম। টুনি এসে বল্লে, "আপনি দালানের পাশের ঘরে যান্। ওখানে বৌদি আছেন।"

আমি সে ঘরের দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে একটা বড় সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌লুম। তাতে ঘরের মধ্যে যাওয়া বন্ধ ক'রে আমায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হোলো।

দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের উপরে ব'সে আমার ছোট ভাই শচীশ, তার বয়স বার তের। তার পাশে উমারাণী দাঁড়িয়ে খাটের পাশের একটা টেবিলের উপরকার একখানা রেকাবী থেকে খাবার নিয়ে শচীশের মুখে তুলে দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে। ওদের দুজনকারই পেছন আমার দিকে।

এমন কোমল স্নেহের সঙ্গে উমারাণী. শচীশের কাঁধের ওপর তার বাঁ হাতটি দিয়ে স্নেহময়ী বড়দিদির মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে, যে, আমার মনে হোলো আজ শৈল বেঁচে থাক্‌লে সে এর বেশী করতে পার্‌তো না। উমারাণীর প্রতি এতদিন অনমুভূত একটা স্নেহরসে আমার মন সিক্ত হয়ে উঠ্‌লো। আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে উমারাণীকে বল্লুম, "লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু হবে না। দাদাকে কি খেতে দিবি রে, রাণী?"

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো লজ্জায়। সে এমন থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ, যে, খামকা যে এত প্রণাম ক'রে, আজ বিজয়ায় প্রণাম করতে সে ভুলে গেল। একটা কি কথা অস্পষ্টভাবে বার দুই ব'লে সে মাথা নীচু ক'রে রইল। আমিও তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধ'রে ফেলেছি, তার ভাই-বোন্-বিহীন নির্জ্জন প্রাণটি কিসের জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, তা যে আজ বার ক'রে ফেলেছি। আজ অনুভব করছিলুম, জগতের মধ্যে ভাইবোনের একটুকু স্নেহ পাবার জন্যে ব্যাকুল, এমন অনেক হৃদয়কে আজ আমি আমার বড়-ভাইয়ের উদার স্নেহছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি। একটা বুক-জুড়ানো তৃপ্তিতে আমার মন ভ'রে উঠ্‌ল।

সেই সময় টুনি সেই ঘরে ঢুকে আমার সাম্‌নের টেবিলে থালা-ভরা মিষ্টান্ন রেখে বল্লে, "দাদা, একটু মিষ্টি-মুখ করুন।"

আমি টুনিকে বল্লুম, "আয় টুনি, সকলে মিলে—"

উমারাণীকে খাটের উপর বসালুম। খাবার সকলকেই দিলুম। উমারাণী লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে' গেল তার, লজ্জার চোটে। বেচারী লজ্জায় আর ঘামে হাঁপিয়ে মারা যায় দেখে তার ঘোম্‌টা বেশ ক'রে খুলে দিলুম। বল্লুম, "আমি দাদা, আমার কাছে লজ্জা কি রে, রাণী? আমার লক্ষ্মী ছোট বোন্‌টি—,"

জলযোগ পর্ব্ব সমাধা ক'রে বাইরের দালানে এসে টুনির মায়ের সঙ্গে গল্প কর্ত্তে আরম্ভ করলুম। একটু পরে তিনি উঠে রান্নাঘরে চ'লে গেলেন। আরও খানিক পরে আমি উঠ্‌তে যাচ্ছি, উমারাণী এসে কাছে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলুম, "রাণী, আজ ঠাকুর-বিসর্জ্জন দেখ্‌লি নে?"

সে বল্লে, "ওপরের ঘরের জানালা থেকে দেখ্‌ছিলাম, বেশ ভালো।"

বল্লুম, "অনেক রকমের প্রতিমা, না?"

সে বল্লে, "হাঁ, কত সব বড় বড়।" তার পর একটু চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, "দাদা, কাল আস্‌বেন-না?"

আমি বল্লুম, "সে কি বল্‌তে পারি? সময় পাই তো

আস্‌বো। আবার শীগ্‌গির চলে যাবো কিনা, অনেক কাজ আছে।"

সে বল্লে, "আপনি কি খুব শিগ্‌গির যাবেন, দাদা?"

আমি বল্লুম, "হাঁ, বেশী দিন তো ছুটি নেই, পূর্ণিমার পরেই যেতে হবে।"

উমারাণী নতমুখে চুপ ক'রে রইল।

বল্লুম, "তা তোকেও তো আর বেশী দিন থাক্‌তে হবে না রে।"

উমারাণী বল্লে, "বাবা বোধ হয় কাল আস্‌বেন।"

ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্লুম, "তবে আর কি? এই দুটো দিন কোন রকমে কাটলেই তো—"

সে একটু চুপ ক'রে থেকে তার পর যেন ভয়ে ভয়ে বল্লে, "যাবার আগে একবারটি এবাড়ী আস্‌তে পার্‌বেন না, দাদা?"

বল্লুম, "খুব খুব। আস্‌বো বৈকি। নিশ্চয়।"

এর ৬৷৭ দিন পরে গৌহাটী রওনা হলুম। এই ৬৷৭ দিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে চারিদিক ঘুরতে হয়েছিল। শচীশের মুখে শুনেছিলুম উমারাণীর পশ্চিম যাওয়া হয় নি। কি কারণে তার বাবা তাকে নিতে আস্‌তে পারেন নি। শচীশ মাঝে মাঝে বল্‌তো, "দাদা যাবার আগে একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন।"

ইচ্ছা থাক্‌লেও গৌহাটী যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে দেখা করা আর আমার ঘটে' ওঠে নি।

গৌহাটী গিয়ে এবার অনেকদিন রইলুম। উমারাণীর কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হোত, তারপর দিন-কতক পরে তেমন বিশেষ ক'রে আর মনে হোত না, ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম। কিছু দিন পরে গৌহাটীর চাকরী ছেড়ে দিলুম। শিলচর, দার্জ্জিলিং, নানা চা-বাগান বেড়ালুম। দু-একটা হাসপাতালেও কাজ করলুম। সব সময় নির্জ্জনে কাটাতুম। একা বাংলায় থেকে থেকে কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের একসঙ্গে কথাবার্ত্তা, সহ্য কর্‌তে পার্‌তুম না। এখানে সন্ধ্যায় পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে কুঙ্কুম-ছড়ানো সূর্য্যাস্ত, চা-ঝোপের চারিপাশ-ঘেরা গোধূলির অন্ধকার, গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গভীর থম্‌থম্ ভাব, আর সরল গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের বিচিত্র সুর, ওই আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় স্বস্তিকর ব'লে মনে হোত।······বস্‌বার ঘরটিতে সাজিয়ে রেখেছিলুম জগতের যুগ-যুগের জ্ঞানবীরদের বই—Gauss, Zollner, Helm-holtz, Giekie, Logan, Dawson; যাঁদের অলোক-সামান্য প্রতিভা আমাদের সুন্দরী বসুন্ধরার অতীত শৈশবের, তাঁর রহস্যময় বালিকা-জীবনের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের পাতা আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, যাঁদের মনীষার যোগ-দৃষ্টি অসীম শূন্যের দূরতা ভেদ ক'রে বিশাল নক্ষত্রজগতের তত্ত্ব অবগত হচ্চে, তাঁদের সঙ্গে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটাতুম। জগতের রহস্যভরা অন্ধিসন্ধি তাঁদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ্চ-লাইট পাতে উজ্জ্বল হয়ে তবে তো আমাদের মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সীমার মধ্যে আস্‌ছে!

এই রকম প্রায় ৭৷৮ বছর পরে আবার কল্‌কাতায় গেলুম। ভাব্‌লুম কল্‌কাতাতেই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ কর্‌বো। মামার বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লুম। শুন্‌লুম, সাম্‌নের বাড়ীটায় আমার ভগ্নীপতিরা আর থাকে না, তারা বছর পাঁচ ছয় হোলো দেশে চলে গিয়েছে। কয়েক মাস কল্‌কাতায় কাট্‌লো। প্র্যাক্‌টিস্ যে খুব জমে' উঠেছিল, এমন নয়; বা অদূর ভবিষ্যতেও যে খুব জমে' উঠ্‌বে, এমন মনে কর্‌বার কোন কারণও দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না। এমন অবস্থায় একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে বসে' পড়ছি, এমন সময় কে ঘরে ঢুক্‌লো। চেয়ে দেখে প্রথমটা যেন চিন্‌তে পার্‌লুম না, তারপর চিন্‌লুম—টুনি। অনেক দিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদ্‌লে গিয়েছে। আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্য্যও হলুম, তেমনি খুব আনন্দিতও হলুম।

টুনি বল্‌লে, সে তার স্বামীর সঙ্গে আজ ৫৷৬ দিন হোলো কল্‌কাতায় এসেছে, শিম্‌লেতে তাদের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আছে, আজ এবাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সুরেন এখন কোথায়?"

সুরেন আমার ভগ্নীপতির নাম।

টুনি বল্লে, "ছোড়্‌দা এখন আবাদে কোথায় চাকরী করেন, সেখানেই থাকেন।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "উমারাণী কোথায়?"

টুনি একটু চুপ করে রইল। তার পর বল্লে, "দাদা, সে অনেক কথা। আপনি এখানে আছেন, তা আমি জান্‌তুম। সেসব কথা আপনাকে বল্‌বো বলেই আমার একরকম এখানে আসা।"

আমি বল্লুম, "কি ব্যাপার শুনি? সে ভাল আছে তো?"

টুনি বল্লে, "সে ভাল আছে কি, কি আছে, সে আপনিই শুনুন না। সেই যে বছর পূজোর সময় আপনি এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আস্‌বার কথা ছিল, সে তো আপনি জানেন। তখন তিনি ছুটী পান নি ব'লে আস্‌তে পারেন নি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে নিয়ে যাবেন। তার বুঝি মাসখানেক পরে খবর এল তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের কনে বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল, এমনি তার অদৃষ্ট, আর সে-মুখো হতে হোলো না। তারপর—"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "উমারানীর মা?"

টুনি বল্লে, "শুনুন্ না। মা আবার কোথায়? তিনি তো বৌদির বিয়ে হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর এদিকে দাদা তার সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ রাখেন না। তিনি সেই যেখানে চাকরী করেন, সেখানেই থাকেন, বৌদি থাকে চাঁপাপুকুরের বাড়ীতে প'ড়ে। দাদা চিঠিপত্রও দেন না। বৌদি বড় শান্ত, বড় চাপা মেয়ে, সে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। মেয়েমানুষের ও কষ্ট যে কি, সে আপনি বুঝ্‌বেন না, দাদা। যতদিন মা ছিলেন, বৌদিকে কষ্ট জান্‌তে দেন্‌নি, তা তিনিও আজ দুবছর মারা গিয়েছেন। বাড়ীতে আছেন শুধু পিসিমা।"

সেই শান্ত ছোট মেয়েটির উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গিয়েচে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হোলো। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সুরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি?"

টুনি বল্লে, "তা তিনিই জানেন। তবে তিনি নাকি বলেন, জোর ক'রে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে করার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড় দাদাও দেশের বাড়ীতে থাকেন না। বাড়ীতে থাকেন শুধু পিসিমা। কাজেই বৌদিদির মুখের দিকে চেয়ে তাকে একটু যত্ন করে, দুটো কথা বলে, এমন লোকটা পর্য্যন্ত নেই। পিসিমা আছেন, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে।"

সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর বল্লে, "আপনাকে একটা কথা বলি দাদা। আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন। আপনাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বল্‌তে পারি নে দাদা। সেবার চাঁপাপুকুর গিয়েছিলাম, বৌদি বল্লে, আমার দাদার কথা কিছু জানো, ঠাকুরঝি? আপনি এদেশ ওদেশ ক'রে বেড়াচ্চেন শুনে সে কেঁদে বাঁচে না। মাঝে মাঝে যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনার কথা এমন দিন নেই যে সে বলেনি। বলে, ভগবান আমার ভাইয়ের অভাব পূর্ণ করেছেন, দাদা আর শচীশকে দিয়ে। এখনও পর্য্যন্ত কি চিঠিতেই আপনার খোঁজ নেয়। তা বড্ড পোড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহই সে কোনোদিন পেল না। আপনার পায়ে পড়ি, দাদা, আপনি তাকে একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন, আপনি গেলে সে বোধ হয় অর্দ্ধেক দুঃখ ভোলে।"

ছাদের আলিসার উপর থেকে রোদ নেমে গেল, পাশের বাড়ীর ছাদের চৌবাচ্চার উপর বসে একটা কাক একঘেয়ে চীৎকার কর্‌ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সুরেন কি মোটেই বাড়ী যায় না?"

টুনি বল্লে, "সে এক রকম না যাওয়াই দাদা। বছরে হয় তো দুবার, তাও গিয়ে এক আধ দিন থাকেন। তাও যান সে কি জন্যে, কিস্তী না কি, —সেই সময় যার কাছে যা খাজনা পাওয়া যাবে তাই আদায় কর্‌তে।"

তারপর অন্যান্য এক আধটা কথাবার্ত্তার পর টুনি চ'লে গেল। সেদিন বিকালে সেনেট-হলে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল, তিনি কেম্ব্রিজ থেকে এসেছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার বিষয়টি ছিল যেমনই চিত্তাকর্ষক,—বক্তৃতার তথ্যাংশও

বক্তার যুক্তিপ্রণালী ছিল তেমনই দুর্ব্বোধ্য। বক্তৃতা আরম্ভ হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাক্‌লেও বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তারা প্রায় স'রে পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোড়বান্দা রকমের ছাত্র তখনও হলের বিভিন্ন অংশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসে ছিল। বক্তা খ্যাতনামা অধ্যাপক, রয়েল সোসাইটীর ফেলো। তাঁর ব্যাখ্যায় মৌলিকতার মোহে সকলেই তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পোষাক পরা সৌম্যমূর্ত্তি ঋজুদেহ অধ্যাপককে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত বোধ হচ্ছিল। বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে কিন্তু আমার মন ভেসে যাচ্ছিল বক্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলিকাতার ইট-পাথরের রাজ্য থেকে অনেক দূর, আমার অভাগিনী বোন্‌টি যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন কর্‌ছে সেইখানে। মাঝে মাঝে হলের খোলা দুয়ার দিয়ে জ্যোৎস্না-ওঠা বাইরের দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে উমারাণীর বালিকা-মুখখানি বড় বেশী ক'রে মনে পড়্‌ছিল। আর মনে পড়্‌ছিল তার সেই মিনতিভরা দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখ্‌তে পাবার জন্যে তার সে করুণ আগ্রহ। তার আগ্রহ-ভরা দাদা ডাকটি অনেক দিন পরে আবার বড় মনে পড়্‌লো। ভাবলুম সত্যিই কারুর কাছ থেকে কোনো স্নেহ সে কখনো পায় নি। আজ বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথার রস আমার স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থার সঙ্গে আমার অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোন্‌টির নির্জ্জন জীবনের অবস্থা কল্পনা ক'রে আমার মন যেন কেঁদে উঠ্‌লো। বাইরের জগতে যখন এত বিচিত্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন সে কি শুধু ঘরের কোণে ব'সে দিনরাত চোখের জলে ভাসবে? জগতের আনন্দবার্ত্তা তার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যাবার কি কেউ নেই?···

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘীর জলের উপর চাঁদ উঠেছে, কিন্তু ধোঁয়া-ভরা আকাশের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নার শুভ্রমহিমা আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছে না। আমার মস্তিষ্ক তখন বক্তৃতার নেশায় ভরপূর, পুকুরের জলের ধারে সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে মর্শুমী ফুলের ক্ষেতগুলো আমার চোখের সাম্‌নে এক নতুন মূর্ত্তি ধরেছে। কিন্তু ত্রয়োদশীর অমন বৃষ্টি-ধোয়া যুঁইফুলের মত জ্যোৎস্নাও ধোঁয়ার জাল কাটিয়ে বাইরে আস্‌তে না পেরে ব্যর্থতার দুঃখে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে লক্ষ্য ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হতে লাগ্‌লো—এই জ্যোৎস্না, এই ফুলের ক্ষেত, এই ত্রয়োদশী, এবারকারের মত সব মিথ্যা, সব ব্যর্থ।···ও জ্যোৎস্না প্রতীক্ষায় থাকুক সেই শুভ রাতটির, যে রাতে আকাশ-ভরা সার্থকতা ওকে বরণ ক'রে নেবে ফোটা-ফুলের ঘন সুগন্ধের মধ্যে দিয়ে, তরুণ-তরুণীদের অনুরাগ-নম্র দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, গভীর রাতের নীরবতার কাছে পাপিয়ার আকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে।···

বাড়ী এসে ভাব্‌তে ভাব্‌তে একদিন নানা কাজের ভিড়ে আমার যে বোন্‌টিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী ব'য়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো।

এরি কয়েকদিন পরে কল্‌কাতা ছেড়ে বার হলুম উমারাণীর কাছে যাব ব'লে। শীত সেদিন নরম পড়ে এসেছে, ফুটপাথ বেয়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে দখিন হাওয়া অতর্কিত ভাবে গায়ের উপর এসে পড়ে উৎপাত করা সুরু করে দিয়েছে।

পরদিন বেলা প্রায় ২টার সময় ওদের ষ্টীমার-ষ্টেশনে নেমে শুন্‌লুম ওদের গাঁ সেখান থেকে প্রায় ৪ ক্রোশ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া নাকি কোন উপায় নেই, কোন রকম যান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব।

কখনো এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা কর্‌তে কর্‌তে পথ চল্‌তে লাগ্‌লুম। কাঁচা রাস্তার দুধারে মাঠ, মাঝে মাঝে লতাপাতায় তৈরী বড় বড় ঝোপ। কোনো কোনো ঝোপের মাথায় আলোক-লতার জাল, কোনো কোনো ঝোপের তাজা সবুজ ঘন-বুনানি মাথা আলো ক'রে ফুটে আছে সাদা সাদা মেটে-আলুর ফুল। মাঠে মাঠে মাটীর ঢেলার আড়ালে ঝুপ্‌সি গাছে দ্রোণ-ফুলের খই ফুটে আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে মাটীর পথের উপর অভ্যর্থনা বিছিয়ে রেখেছে রাশি রাশি সজ্‌নে-ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আর বাতাবী-নেবু-ফুলের গন্ধে মাতাল। বুনো কুলে আর

বৈঁচি গাছের বনে কোনো কোনো মাঠ ভরা। পড়ন্ত রোদে গাছপালার তলায়, ঘন ঝোপের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করছে, মাঝে মাঝে কোনো কোনো জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে কোনো অজ্ঞাত বনফুলের এমনি সুগন্ধ বেরুচ্ছে, যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে। পায়ের শব্দ পেয়ে শুক্‌নো পাতার রাশের উপর খস্ খস্ শব্দ করতে করতে দু একটা খরগোস কান খাড়া ক'রে রাস্তার এ পাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে পালাচ্চে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমুল-ফুলের গাছগুলো দখিন হাওয়ার প্রথম স্পর্শেই আবেশ-বিধুরা তরুণীর মত রাগ-রক্ত হয়ে উঠ্‌ছে।

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবার পড়বে চাঁপাপুকুর। গ্রামের মধ্যে যখন ঢুকলুম, তখন গ্রামের পথ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আশপাশের নানাবাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষ্মীদের সাঁজের শাঁখের রব নিস্তব্ধ বাতাসে মিশ্‌ছিল।

কোন্ ঘরটি আলো ক'রে আছে আমার স্নেহের বোন্‌টি? কোন্ গৃহস্থের আঙ্গিনার আঁধার আজ দূর হোলো তার হাতে জ্বালা সন্ধ্যা-দীপের আলোয়? কাদের গৃহতল আজ মুখর হয়ে উঠ্‌লো তার সেবা-চঞ্চল চরণের শান্ত-মধুর-ছন্দে?

রাস্তার মধ্যে একজায়গায় কতকগুলো ছেলেকে দেখ্‌তে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তাদের মধ্যে একজন বল্লে, "আসুন, আমি সে বাড়ী আপনাকে পৌঁছে দিচ্চি।" খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের একটা সরু পথ বেয়ে চল্‌লো। তার পর একটা বড় পুরোনো বাড়ীর সাম্‌নে গিয়ে বল্লে, "এই তাঁদের বাড়ী। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি।" একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে থেকে বার হয়ে এলো। বৃদ্ধাকে বল্লে, "ইনি কল্‌কাতা থেকে আস্‌চেন, জেঠাই মা, আপনাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে আমি ওপাড়া থেকে নিয়ে আস্‌চি।"

বৃদ্ধা আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমায় তো চিন্‌তে পারছিনে, বাবা, কোন্ জায়গা থেকে তুমি আস্‌চো?"

আমি আমার নাম বল্লুম, পরিচয় দিতেও উদ্যত হলুম। বৃদ্ধা ব'লে উঠ্‌লেন যে আমায় আর পরিচয় দিতে হবে না, আমার আসা যাওয়া নেই বলে তিনি কখনো আমায় দেখেন নি, তাই চিন্‌তে পারছিলেন না। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি এতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলাম না, আমি তো ঘরের ছেলের বাড়া. আমার আবার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কি, ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। কেবল মনে হতে লাগ্‌লো, আট বছর—আজ আট বছর পরে! কি জানি উমারাণী কেমন আছে, সে কেমন দেখ্‌তে হয়েছে। আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে সে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝ্‌চি, আমার বুকের তারে তার প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজ্‌ছে। আজ এখনি তার স্নেহমধুর ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আস্‌বো, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারবো, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুন্‌বো, এ কথা ভেবে আনন্দ আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়ছিল।

দেখ্‌লুম এদের অবস্থা একসময় ভাল ছিল, খুব বড় বাড়ী, এখন সবদিকেই ভাঙ্গা ঘর-দোর, দেওয়া'ল ফেটে বড় বড় অশ্বত্থ-চারা উঠেছে। বাইরের উঠান পার হয়ে ভিতর-বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধা ব'লে উঠ্‌লেন, "ও বৌমা, বার হয়ে দেখ, কে এসেছে।"

"কে, পিসিমা?" বোলে প্রদীপ হাতে যে ওদিকের একটা ঘর থেকে বার হয়ে এল, অস্পষ্ট আলোয় দেখ্‌লুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার পাশ দিয়ে চুলগুলো অসংযত ভাবে কানের পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে, পরনে আধ-ময়লা শাড়ী, চেহারা রোগা-রোগা একহারা। এই সেই উমারাণী! তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হো'লো এ আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে, আর মাথায়ও অনেকটা খেড়ে গিয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড উমারাণী আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না, তার পরই যেন হাঁপিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"দাদা!-"

অন্য কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপটা কোনো রকমে নামিয়ে রেখে সে এসে আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়্‌লো।

আমি তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখ্‌লুম এক অপূর্ব্ব ভাব। মনে হোলো—আনন্দ বিস্ময় আশা অভিমান সব ভাবের রংগুলো একসঙ্গে গুলে তার প্রতিমার মত মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা বল্‌লেন, "বাবা, তুমিই আস না, বৌমা দাদা বল্‌তে অজ্ঞান। কত দুঃখ করে, বলে, কল্‌কাতায় থাক্‌লে দাদার মাঝে মাঝে দেখা পেতাম, এ তেপান্তরের পুর, তিনি আস্‌বেন কেমন ক'রে। বৌমা, সতীশকে আগে হাত মুখ ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠাণ্ডা হোক্‌, যে পথ!"

হাত মুখ ধোয়ার পর উমারাণী একটা ঘরের মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ অবস্থায় হঠাৎ আস্‌বো তা সম্ভাবনার সীমার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ, অন্ততঃ তার কাছে। তাই বেচারীর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে স্বাভাবিক গতিলাভের সুযোগ দেবার জন্যে আমিও কোনো কথা বল্‌ছিলুম না। একটুখানি দুজনে চুপ ক'রে থাকার পর উমারাণী বল্‌লে, "দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়্‌লো?"

আমি আগেকার মত তার মাথার দুপাশের চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লুম, "রাণী, আস্‌তে পারিনি হয়তো নানান্ কাজে। কিন্তু এ কথা মনে ভাবিস্‌নি যে ভুলে গি'ছিলুম। চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে রে, বড্ড কি অসুখ-বিসুখ হয়?"

আট বচ্ছর আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত মুখ নীচু ক'রে একটুখানি হেসে সে চুপ করে রইল।

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "আচ্ছা রাণী, আমি আস্‌বো একথা ভেবেছিলি?"

তার দুই চোখ, জলে ভ'রে এল, বল্‌লে, "কি ক'রে ভাব্‌বো দাদা? আমি আপনাদের আবার দেখ্‌তে পাবো, আদর যত্ন কর্‌তে পার্‌বো, এমন কপাল যে আমার হবে, তা কি ক'রে ভাব্‌বো?"

এলোমেলো যে-সব চুল তার ঘোম্‌টার আশে পাশে পড়েছিল, সেগুলো সব ঠিক-মত সাজিয়ে দিতে দিতে বল্‌লুম, "সেইজন্যেই ত এলুম রে। আর তোদের দেখ্‌বার ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না? ভাবিস্‌ বুঝি দাদাদের মন সব সানবাঁধানো।"

সে বল্‌লে, "তাই আজ ২।৩ দিন থেকে আমার বাঁ চোখের পাতা অনবরত নাচ্‌ছে দাদা। আজ ওবেলা যখন ঘাটে যাই তখন বড্ড নেচেছে। পিসি-মাকে বল্‌তে পিসিমা বল্‌লেন, মেয়েমানুষের বাঁ চোখ নাচ্‌লে ভাল হয়।"

আমি বল্‌লুম, "আমার কথা তোর মোটেই মনে ছিল না, না রে রাণী?" সে একথার কোনো উত্তর দিল না, তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌লো। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "হ্যাঁ রে, সুরেন বাড়ী থেকে গিয়েছে কতদিন?"

সে নতমুখে উত্তর দিল, "প্রায় ৮ মাস।"

বল্‌লুম, "চিঠি পত্র দেয়?"

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হাঁ।

তার মুখের ভাবে বুঝ্‌লুম যে তার বড় ব্যথার স্থানে আমি ঘা দিচ্ছি, দুঃখিনী বোন্‌টির এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে স্নেহে আমার মন গ'লে গেল। রুমাল বের ক'রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের জলে কেটেছে, তার খোঁজ তো কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী আছে কেবল আকাশের ঐ গহন অন্ধকার, আর চারি-পাশের গাছপালার মধ্যেকার ঐ ঝিঁঝিঁ পোকার রব।

উমারাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "দাদা, এখন আপনি কোথায় থাকেন?"

আমি বল্‌লুম, "আগে নানাজায়গায় ঘুর্‌ছিলুম, এখন ঠিক করেছি কল্‌কাতাতেই থাক্‌বো।"

সে বল্‌লে, "আপনি বিয়ে করেছেন, দাদা?"

বল্‌লুম, "না রে। বিয়ের তাড়াতাড়ি কি? সে এক দিন কোর্‌লেই হবে।"

ছোট মেয়েটির মতন তার ঠোঁট দুটি অভিমানে ফুলে উঠ্‌লো, বল্‌লে, "তাই বৈকি? আপনি বুঝি ভেবেচেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন? তা হবে না দাদা, আমি এই বছরেই আপনার বিয়ে দেবো।"

আমার হাসি পেল, বল্‌লুম, "দিবি তুই?"

সে বল্‌লে "দেবোই তো, এই আষাঢ়মাসের মধ্যেই দেবো।"

আমি বল্‌লুম, "তা যেন হোলো। কিন্তু আমার তো বাড়ী ঘর দোর নেই, বিয়ে ক'রে রাখ্‌বো কোথায়?"

সে বল্‌লে, "কেন দাদা, রাখ্‌বার জায়গার বুঝি ভাব্‌না? আমি বৌকে এখানে রাখ্‌বো। দুজনে মিলে বেশ ঘর-সংসার কর্‌বো।"

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বল্‌লুম, "তা হোলে পাঁজিখানা আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সাম্‌নের মাসে দিনটিন যদি থাকে—"

উমারাণী বল্‌লে, "পাঁজি ত ওপরের ঘরে রয়েছে দাদা। আপনি এখন খাওয়া দাওয়া করুন, কাল সকালে দেখ্‌লেই হবে।"

অবশ্য খুব আশ্বস্ত হলুম। কি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, উমারাণী বলে উঠ্‌লো, "আপনাকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করিগে, কাল থেকে ভাত পেটে যায় নি, আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, দাদা।"

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই ভোরে নাইতে যাবার উদ্যোগ কর্‌ছে। শীত সেদিন সকালে একটু বেশী পড়েছে। উমারাণীর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তার শরীরে আর কিছু নেই। রাত্রে ভালো টের পাইনি, আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না মেয়েটির সঙ্গে বর্ত্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা ক'রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠ্‌লো। তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "এত সকালে নাইতে যাবার কি দর্‌কার রে রাণী?"

সে বল্লে, "একটু সকাল-সকাল না নেয়ে এলে কখন রান্না চড়াবো, দাদা? কাল রাত্রে তো আপনার খাওয়াই হয় নি এক রকম।"

আমি বল্লুম, "তা হোক্। আমাকে যে আটটার মধ্যেই খেতে হবে তার কোনো মানে নেই। এত সকালে নাইতে যেতে হবে না তোর।"

উমারাণী ঘড়া নামিয়ে রাখ্‌ল।

পিসিমা বল্লেন, "তোমার কথা, তাই শুন্‌লে বাবা। নৈলে ও কি তেমন পাগ্‌লী মেয়ে নাকি, দ্বাদশীর দিনে মাঘ মাসের ভোরে নাইতে যাবে। শোনে না, বলি, বৌমা তোমার শরীর ভাল নয়, এত সকালে জলে নেবো না। শোনে না, বলে, পিসিমা কাল গিয়েচে আপনার একাদশী, একটু সকালে সকালে কাজ না সেরে নিলে, আপনাকে দুটো খেতে দেব কখন?"

সেদিন দুপুরে ওদের উপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি বই পড়্‌ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক'রে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বল্লুম, "কে, রাণী? আয় না ভেতরে।"

আমি উঠে বস্‌লুম। সে দেওয়াল ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে রৈল। দেখ্‌লুম তার শরীর আগেকার চেয়ে খুব রোগা হয়ে গিয়েচে, তার মুখখানি কিন্তু প্রতিমার মত টল্‌টল্ কর্‌ছে। বয়স যদিও ২২।২৩ হোলো, তার মুখ কিন্তু তের বছরের মেয়েটির মতই কচি। কথা আরম্ভ কর্‌বার ভূমিকাস্বরূপ বল্‌লুম, "আজ বড় গরম পড়েচে, না?"

উমারাণী বল্লে, "হ্যাঁ দাদা। আমি ভাব্‌লাম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনি দিনমানে ঘুমোন না বুঝি দাদা?"

বল্লুম, "মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমুই। আজ আর ঘুমোব না। আয় এখানে বোস্, গল্প করি।"

তাকে কাছে বসালুম। তার চুলের অবস্থা দেখে বুঝ্‌লুম সে চুলের যত্ন করে না। মুখের আশে পাশে কোঁকড়া চুলের রাশ অযত্নবিন্যস্ত ভাবে পড়ে ছিল, চুলগুলোর রঙ্ একটু কটা হয়ে পড়্‌ছিল। রাত্রের মত চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বল্লুম, "তোর শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে? বিয়ের পর সেই সময় কেমনটি ছিলি! খুব কি জ্বর হয়?"

একটু হাসি ছাড়া সে একথার কোনো উত্তর দিলে না।

আমি বল্লুম, "না, একথা ভালো না রাণী। আমি

গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়ম-মত খেতে হবে। না হোলে এ যে মহা কষ্ট।"

একটু পরে সে বল্লে, "তা হলে সত্যি, দাদা, আমি কিন্তু বিয়ের চেষ্টা করবো। বলুন।"

আমি তার কথায় মনে বড় কৌতুক অনুভব করলুম। এই অবোধ মেয়েটা জানে না যে সে এমনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বসেচে, যাকে কার্য্যে পরিণত করা তার ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে।

বল্লুম, "বকিস্ নে, রাণী।"

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কয় না দেখে পেছন ফিরে দেখি, ছেলেমানুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন ভরসা-হারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। মনে হোলো, একটা ভুল করেছি, উমারাণী সেই ধরণের মেয়ে যারা নিজেকে জোর ক'রে কখন প্রচার করতে পারে না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে স্রোতের জলের শেওলার মত যারা জীবন কাটিয়ে দিতেই অভ্যস্ত। স্নেহ-সুখে সে আবোল্-তাবোল্ বক্‌ছিল, এর সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হবে, বাতাস লজ্জাবতী-লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হয়ে চলে, তার চেয়েও। কথাটা যতটা পারি সাম্‌লে নেবার জন্য বল্লুম, "তোর যদি সত্যি সত্যি বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাক্‌তো, তা হলে তুই পাঁজিখানা আন্‌তিস্। দিন কোন্ মাসে আছে না-আছে সেগুলো সব দেখ্‌তে হবে তো, না শুধু-শুধু তোর কেবল বকুনি।"

উমারাণীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো, চোখের সে ভয়-ভয় দৃষ্টিটা কেটে গেল। আমার কথার মধ্যে সে আমার বকুনির একটা কারণ খুঁজে পেল। বোধ হয়, বিয়ে করবার জন্য নিতান্ত উৎসুক দাদাটির উপর তার একটু কৃপাও হোলো। সে বল্লে, "পাঁজি আপনাকে দিয়ে আজ দেখিয়ে নেব, সে তো ভেবেই রেখেচি, দাদা। আপনি বসুন, আমি ওঘর থেকে পাঁজিখানা নিয়ে আসি।"

দালানের ওপাশে একটা ঘর ছিল, উমারাণী সেই ঘরটার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময় পিসিমা নীচে থেকে ডাক্ দিলেন, "বৌমা, নেমে এস, বেলা যে গেল, চাল-গুলো আবার কুটুতে হবে তো।"

উমারাণী ঘরটার বার হয়ে এসে আমার হাতে পাঁজি-খানা দিয়ে বল্লে, "আপনি দেখে রাখুন দাদা, আমায় বল্‌বেন এখন। আমি এখুনি আস্‌চি।"

সে নীচে নেমে গেল।

তখন বেলা একটু প'ড়ে এসেছে, নীচের বাগানের সদ্য-ফোটা-বাতাবী-নেবু-ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভুরভুর কচ্ছে, বাগানের পথের পাশের সজ্‌নে-গাছগুলো ফুলে ভর্ত্তি। পড়ন্ত রোদ ঝিরঝিরে বাতাসে পেয়ারা-গাছের সাদা ডাল গুলো বুটি-কাটা রাংতার সাজে মুড়ে দিয়েচে।

উমারাণী কাজে গিয়েছে, এখন আর আসবে না ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হোলো। উঠ্‌তে গিয়ে লক্ষ্য করলুম খাটের পাশে একটা কাঠের হাত-বাক্‌স রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-ওঠা, তাতে চাবির কলটাও নেই। সেই কাঠের বাক্সটার ডালা খুললুম। দেখি তার মধ্যে কতকগুলো টাটকা-তোলা নেবু ফুল, কতক গুলো গাঁদা ফুল, আর কতকগুলো আধ-শুক্‌নো ঘেঁটু ফুল। ফুলগুলোর তলায় একটু আধ-ময়লা নেকড়ায় যত্ন ক'রে জড়ানো কি জিনিস। নেকড়ায় এমন কি জিনিষ যার সঙ্গে এতগুলো ফুলের কার্য্যকারণ সম্পর্ক, এই নির্ণয় করতে কৌতূহলবশতঃ নেকড়ার ভাঁজ খুলে ফেলে দেখ্‌লুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোর উপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতের লেখা আমার ভগ্নীপতি সুরেনের। তার পোষ্ট অফিসের মোহর দেখে বুঝ্‌লুম চিঠিগুলো ৫।৬ বছরের পুরোনো, একখানা কেবল এক বছর আগে লেখা।

কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরোনো চিঠি-গুলো এমন সযত্নে রক্ষা করছে, তার মধুর হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়াগহন যূথীবনে যার স্মৃতির নীরব আরতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল-সাঁঝে চলছে, কেমন সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা-মন্দিরের ধূপগন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই ফিরতে লাগলো!

মাঠ থেকে বেড়িয়ে যখন আসি, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, ওদের রান্নাঘরে আলো জলছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে উমারাণী বল্লে, "দাদা এলেন?" আমি উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সে হাসিমুখে রান্নাঘর থেকে বার

হয়ে এলো। বল্লে, "দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, কোন্ দিকে বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে বুঝি?" তার পর সে বল্লে, "দাদা, আপনি রান্নাঘরে বস্‌বেন? আমি আপনার জন্যে পিঁড়ি পেতে রেখেছি।"

পিসিমা বল্লেন, "বৌমার যত অনাছিষ্টি, এখানে বাছাকে ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা।"

আমি বল্লুম, "আমার কোনো কষ্ট হবে না, এখানেই বসি পিসিমা।"

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে বস্‌লুম, উমারাণী খাবার তৈরী ক'রে রেখেছিল আমায় খেতে দিল, তার পর কাজ কর্‌তে ব'সে গেল। দেখ্‌লুম সে অনেকগুলো চালের গুঁড়ি ময়দা প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে পিটে তৈরী সুরু করেচে। পিসিমা খুবই বৃদ্ধা, তিনি কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু কর্‌তে পারেন না, খাটুতে সবটাই হচ্ছিল উমারাণীর। রোগা মেয়েটির অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হোলো ভাব্‌লুম কেন অনর্থক পিটে কর্ত্তে বসে মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমারাণী যা কর্‌তে বসেচে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বল্লুম না অবশ্য।

জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "রাণী, আমায় পিটে গড়্‌তে শিখিয়ে দিবি?"

উমারাণীর বড় লজ্জা হোলো। মুখটি নীচু ক'রে সে বল্লে, "দাদা, আমরা বেঁচে থাক্‌তে পিটে খাওয়ার ইচ্ছে হলে আপনাকে কি পিটে গ'ড়ে নিতে হবে, যে আপনি পিটে গড়্‌তে শিখ্‌বেন?"

পিসিমা বল্লেন, "না, তোমার দাদার পিটে খাবার ইচ্ছে হলে এই সাত লঙ্কা পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে খেয়ে যাবেন।"

উমারাণী চুপ ক'রে রইল।

আমি বল্লুম, "তা কেন, পিসিমা। ও তার আর-এক উপায় বার করেছে, শোনেন নি বুঝি?"

পিসিমা বল্লেন, "কি বাবা?"

আমি বল্লুম, "ও এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই ওর দাদার বিয়ে দেবে।"

পিসিমা বল্লেন, "তা বৌমা তো ঠিক কথাই বলেচে বাবা। এত বড়টি হয়েছ, আর কি বিয়ে না করা ভাল দেখায়? সংসারী হতে হবে তো।"

উমারাণী ব'লে উঠ্‌লো, "ভালো কথা, দাদা। দিন তখন তো আর দেখা হোলো না পাঁজিতে, আমি আর ওপরে যেতে পার্‌লাম না। অবিশ্যি ক'রে বল্‌বেন খাওয়ার পর রাত্রে।"

আমি বল্লুম, "বল্‌বো রে বল্‌বো। এতদিন তো মনে ছিল না তোর, এখন সাম্‌নে পেয়ে বুঝি দাদার ওপর ভারি মায়া।"

পিসিমা বল্লেন, "ও তোমার তেমন পাগ্‌লী বোন নয় বাবা। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়। আজ ৩।৪ বছর হোলো, ওরা যখন প্রথম কল্‌কাতা থে.ক এখানে আসে, তখন বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছে, তোমার জন্যে। বলে, দাদা দুঃখু করেছেন যে আমার বোন আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উল্‌বোনা শিখে, প্রথম কিনা জিনিস বুন্‌লো তার স্বামীর। তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো পরাবো। তার পর ওদের আর কল্‌কাতায় যাওয়া হোলো না, সুরেনের অন্য জায়গায় চাকরী হোলো। তুমিও আর কখনো এদিকে আসনি। কাল তুমি আস্‌তেই বৌমার যে আহ্লাদ, আমায় বল্‌লে, পিসিমা, আমার সাধ এইবার পূর্‌লো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে পার্‌বো।"

উমারাণীর চোখ দুটি লজ্জায় নীচু হয়ে রইল, প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মত এমন লাবণ্যমাখা অথচ কচি মনে হচ্ছিল, যে, বোধ হল নোলক পর্‌লে তাকে এখনও বেশ মানায়।

তার পর নানা কথায় আর খেতে দেতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে যখন উপরের ঘরে শুতে গেলুম, তখন চাঁদ উঠেছে। গভীর রাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজ্‌লো আমার মনে। আজ অনেকক্ষণ উমারাণীর নিকটে ব'সে থেকে একটা জিনিস বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—উমারাণীর থাইসিস্ হয়েছে।

মৃত্যু ওর শান্ত ললাটে তার তিলক পরিয়ে ওকে

বরণ ক'রে রেখেছে, শীগ্‌গির ওকে বেরিয়ে পড়্‌তে হবে অনন্তের পথের তীর্থযাত্রায়। উমারাণী এক গ্লাস জল দিতে আমার ঘরে ঢুক্‌লো। জল নামিয়ে রেখে বল্‌লে, "কৈ, দাদা, সে পাঞ্জিখানা ?"

তার মুখখানির দিকে চেয়ে বড় মন কেমন ক'রে উঠ্‌লো। বল্‌লুম, "রাণী, এদিকে আয়।" একথা আমার মনে উঠ্‌লো না যে উমারাণী আমার আপন বোন নয় বা আমাদের তুজনেরই বয়স কম। আমিও যেমন নিঃসঙ্কোচে বল্‌লুম, সেও তেম্‌নি নিঃসঙ্কোচে এসে আমার পায়ের কাছে খাটের নীচে মাটিতে ব'সে পড়্‌ল। আট বছর আগের মত আজও ওকে আদর ক'রে তার বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বল্‌লুম, "রাণী, জুতোর কথা কে বলেছিল রে তোকে ?"

উমারাণী অসীম নির্ভরতার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটির মত খাট থেকে ঝোলানো আমার পায়ের উপর তার মুখটি লুকিয়ে রাখ্‌লে। ওরে, স্নেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ হোতো. তা হলে আমি বড় ভাইয়ের স্নেহ তোকে শিশি ভ'রে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে যেতাম।

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর তার কাছ থেকে পেলুম না। কেন পেলুম না, তাও একটু পরেই বুঝ্‌লুম। একমাত্র লোক যে ঐ জুতোর কথা জানে বা যার কাছে আমি এক-সময় এ কথা বলেছিলুম, সে হচ্চে—স্থরেন। স্থরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোনো সময় উমারাণীকে এ কথা বলে থাক্‌বে। বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনটি তো আর সে কথা বল্‌তে পারে না ?

বল্‌লুম, "রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি বল্‌ছিল—মানে—স্থরেন কি ঠিক পত্রটত্র দেয় ? বাড়ী-টাড়ী আসে ?"

উমারাণী বড্ড জড়সড় হয়ে গেল। আমার কথার কোনো উত্তর দিলে না, মুখও তুলে নিলে না, আগের মত আমার পায়ের উপর মুখটি লুকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তাব পর বুঝ্‌লুম সে কাঁদ্‌চে।

তাকে সান্ত্বনা কি ব'লে দেব ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না, শুধু তার মাথার চুলগুলোর উপর পরমস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লুম। বেশীদিন না রে, সোনার বোন্‌টি বেশীদিন না। তোর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

ব্যর্থ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে যখন সে নীচে শুতে নেমে গেল, চাঁদের আলোর তলায় ঘুমন্ত বাতাস সজনে-ফুলের মিষ্টি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

এর ২।৩ দিন পরে তাদের ওখান থেকে চলে আস্‌বার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এর আগেই চ'লে আস্‌তুম, কল্‌কাতায় অনেক কাজ ছিল আমার, কিন্তু উমারাণীর করুণ মিনতি এড়াতে না পেরে কিছু দেরী হয়ে গেল।

কাপড় প'রে তৈরী হয়েছি, উমারাণী কাঁদো-কাঁদো মুখে এসে নিকটে দাঁড়াল। আমায় বল্‌লে, "আবার কবে আস্‌বেন, দাদা ?"

বল্লুম, "আস্‌বো রে আবার পূজোর সময় আস্‌বো।"

সে বল্‌লে, "সে যে অনেকদিন!—না দাদা, আপনি আষাঢ় মাসে রথের সময় আস্‌বেন। আমাদের এখানে রথের বড় জাঁক হয়, দাদা। আর কিন্তু আমি আপনার বিয়ে দেবোই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি অমত করবেন না।"

তার পর সে সেই পশমের জুতো জোড়া বের ক'রে আমার সাম্‌নে মাটীতে রাখ্‌লে; বল্‌লে, "আমি আন্দাজে বুনেছি, আপনি পায়েদিয়ে দেখুন দেখি, দাদা, হবে এখন বোধ হয়।"

জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারাণী বড় খুসী হোলো, তার সমস্ত মুখখানা সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো।

তার পর সে আবার বল্‌লে, "দাদা, আমি আপনার গরীব বোন্‌, কখনো আসেন না এখানে, যদি বা এলেন, না পার্‌লাম ভাল ক'রে খাওয়াতে মাখাতে, না পার্‌লাম তেমন আদর যত্ন করতে। এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি করবো, আমার যেমন কপাল।"

অনেকদিন আগের মত সেইরকম গলায় আঁচল দিয়ে সে আমায় প্রণাম কর্‌লে, তার চোখের জল আমার পায়ের উপর টপ্‌ টপ্‌ ক'রে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

আমি তাকে উঠিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লুম, "রাণী, তুই আমার মায়ের পেটের বোনই।

একথা ভুলে যাস্‌নে কখনো যে তোর বড় ভাই এখনও বেঁচে আছে।”

যখন চ’লে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর দোর ধ’রে দাঁড়িয়ে রইল, আস্‌তে আস্‌তে পিছন ফিরে দেখ্‌লুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

যখন পথের বাঁক ফিরেচি, তখনও তাকে দেখা যাচ্ছিল, বেলা-শেষের হল্‌দে-রোদ সুপারি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে তার রুক্ষ কোঁক্‌ড়া চুলে ঘেরা বিষণ্ণ মুখখানির উপর গিয়ে পড়েছিল।

* * * *

বছর খানেক পরে আমি আবার চাকরী নিয়ে গেলুম ময়ূরভঞ্জ রাজষ্টেটে। সেখানে থাকৃতে সুরেনের এক পত্রে জান্‌লুম উমারাণী মারা গিয়েচে।

যাবেই, তা জান্‌তুম। সেবার যখন তার কাছ থেকে চ’লে আসি তখনই বুঝে এসেছিলুম, এই তার সঙ্গে শেষ দেখা। সুরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুম, উমারাণীর অবস্থা সব খুলে, কোনো একটা ভাল জায়গায় তাকে কিছুদিন নিয়ে যেতে। সুরেন লিখেছিল, জমিদারের কাজ, আদায়পত্র হাতে, পূজোর সময় বরং দেখ্‌বে, এখন যাবার কোনো উপায় নেই, ইত্যাদি। উমারাণী মারা গেল সেই ভাদ্র মাসে।

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার কিছুদিন ছুটী নিয়ে কল্‌কাতা এসে দেখ্‌লুম ওদের সেই বাড়ীতে ওরা আবার বাস কর্‌ছে। আমি এসেছি শুনে টুনি দেখা কর্‌তে এল। খানিক একথা সেকথার পর টুনি কাগজে মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে দেখি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলো রূপোর কাঁটা। টুনি বল্‌লে, “বৌদি যে ভাদ্র মাসে মারা যায়, আমি সেই শ্রাবণ মাসে চাঁপাপুকুর গিয়েছিলাম। বৌদি আপনার কত গল্প কর্‌লে, বল্লে, মায়ের পেটের ভাই যে কি জিনিস, ঠাকুরঝি, তা আমি দাদাকে দিয়ে বুঝেচি। আমার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী ক’রে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান্, কেউ একটু যত্ন কর্‌বার নেই, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। ওই রূপোর কাঁটাগুলো সে গড়িয়েছিল আপনার বিয়ে হলে আপনার বৌকে দেবার জন্যে। সে আষাঢ় মাসে ওগুলো গড়িয়েছিল, আমি গেলে আমায় দেখিয়ে বল্লে, ইচ্ছে ছিল সোনার চিরুনী দিয়ে দাদার বৌএর মুখ দেখ্‌বো, কিন্তু এখন অত পয়সা কোথায় পাবো, এই বছরেই দাদার বিয়ে না দিলে নয়। বিয়ে হোক্, তার পর চেষ্টা ক’রে গড়িয়ে দেব। কাঁটা ওর বাক্সে তোলা ছিল, তার পর ভাদ্র মাসে বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে কাঁটাগুলো বের ক’রে এনেছিলাম, আপনাকে দেব ব’লে। কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছর জমিয়ে যা করেছিল, তাতেই ঐগুলো গড়েছিল। দাদা তো এক পয়সাও তার হাতে দিতেন না, সংসার-খরচ ব’লে যা দিতেন, তাতে সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবার গিয়ে দেখেই এসেছিলেন।”

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, “তা হ’লে তার হাতে পয়সা জম্‌ল কোথা থেকে?”

টুনি বল্‌লে, “বৌদি বাজারের খাবার বড় ভালবাস্‌তো। ওরা পশ্চিমে থাকৃতো, সেখানে ওসব বোধ হয় তেমন মেলে না, সেইজন্যে ঐ বাজারের কচুরী নিম্‌কির ওপর তার কেমন ছেলেমানুষের মত একটা লোভ ছিল। বৌদি কর্‌তো কি, নারকোল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাটি ক’রে রাখ্‌তো, লোকে পয়সা দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেতো। এই রকম ক’রে যে পয়সা পেত, তাই দিয়ে গোপালনগরের হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাতো, নিজে খেতো, তাদের দিতো। আপনি সেবার চ’লে আস্‌বার পর থেকে সেই পয়সায় আর খাবার না খেয়ে তাই জমিয়ে জমিয়ে ঐ রূপোর কাঁটাগুলো গড়িয়েছিল।”

আমি বল্‌লুম, “সে মারা গেল কোন্ সময়ে?”

টুনি বল্‌লে, “শেষ রাত্রে, প্রায় রাত ৪টার সময়। রাত্রে বৌদির ভয়ানক জর হোলো, সেই জরে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি ওর বিছানার পাশে ব’সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের এপাশ ওপাশ হাতড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজ্‌চে। আমি বল্‌লুম, বৌদি, লক্ষ্মীটি, ও রকম কর্‌চো কেন? তখন তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বল্‌লে, আমার চিঠিগুলো কোথায় গেল, আমার সেই চিঠি

গুলো ? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগ্‌লো। দাদা বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেসব চিঠি তাকে লিখেছিলেন, সে সেগুলো যত্ন ক'রে ওর বাক্সে তুলে রেখেছিল, আমি তা জান্‌তাম। আমি সেগুলো বাক্স থেকে বের করে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে দিলাম—তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা গেল। যখন তাকে বার করে নিয়ে গেল তখনও তার আঁচলে সেই চিঠিগুলো বাঁধা।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সুরেন সে সময় ছিল না ?"

টুনি বল্‌লে, "ছোড়্‌দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তিনি যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা হয়ে গিয়েচে।"

* * * *

অনেক বছর হয়ে গিয়েছে।

এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাতাবী-লেবুর ফুল ফোটে, সজ্‌নে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে যায়, পাড়াগাঁয়ের বন ঝোপ ঘেঁটু-ফুলে আলো ক'রে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন-ফুলের রাঙা ছায়া পড়ে, ফাগুন-দুপুরের আবেশ-বিভোর রোদ আকাশে বাতাসে থরথর ক'রে কাঁপ্‌তে থাকে, তখন আপন মনে ভাব্‌তে ভাব্‌তে কার কথা যেন মনে প'ড়ে যায়, মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে-ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, তখন মন বড় কেমন ক'রে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে······

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোরিয়ায় জাপানী শাসন

আর্থার ব্রিস্‌বেন্ নামে একজন আমেরিকাবাসী বলেন,—"একজন এসিয়াবাসী অপর একজন এসিয়াবাসীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বলিয়াই ইউরোপ এসিয়াকে পেষণ করিবার সুবিধা পাইতেছে। একজন চীনা অ. লোক অপেক্ষা একজন জাপানীকে হত্যা করিতে পারিলে বেশী তৃপ্ত হয়। এবং জাপানীরা কোরিয়াবাসীকে খরগোসমারা করিতে নিযুক্ত।"

আধুনিক এসিয়ার ইতিহাসে মানুষকে খরগোস-মারা করিবার দৃষ্টান্ত এক শোচনীয় ঘটনা। জাপানীরা কোরিয়া দেশের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছে, সেখানকার লোকদের একেবারে দাস করিয়া রাখিয়াছে এবং সেখানে কঠোর শাসন-প্রণালী স্থাপিত করিয়াছে। একেবারে খোলা তলোয়ার তাদের সেখানকার শাসনের প্রতীক। কোরিয়ার বিদ্যালয়ে জাপানী পুরুষ শিক্ষকরা তলোয়ার সঙ্গে রাখে। প্রকৃতপক্ষে কোরিয়ার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এসিয়ার মানচিত্র হইতে কোরিয়ার ছবি বোধহয় বা উঠিয়া যায়! জাপানীরা কোরিয়ার নাম রাখিয়াছে—চো-শেন।

কোরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস গৌরবপূর্ণ। কোরিয়া প্রাচীন দেশ। চার হাজার বৎসর ধরিয়া কোরিয়া স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতর কোরিয়ার স্বাধীনতা কোন বিদেশী শক্তির দ্বারা কলুষিত হয় নাই। প্রাচীনকালে কোরিয়া-বাসীরা সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল। তাদের সাহিত্য ও শিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। জাপান যখন মাত্র কতকগুলি বিভক্ত দ্বীপে, কতকগুলি যুদ্ধপ্রিয় জাতির কলহে বিধ্বস্ত হইতেছিল, কোরিয়া তখন সভ্যতায় অগ্রসর। তাছাড়া এই কোরিয়াদেশই জাপানকে এসিয়া মহাদেশের সভ্যতার প্রাথমিক নীতি ও সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন প্রদান করিয়াছিল। কোরিয়ার ধর্ম্মপুরোহিতরাই অধিকাংশস্থলে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আবার কোরিয়ায় যে দেশাত্ম-বোধ জাগিতেছে তার প্রেরণায় সেখানকার বৌদ্ধ ধর্ম্মও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। কোরিয়ার রাজধানী শিউল নগরে একটি বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষালয় আছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় হইতেই জাপান কোরিয়াকে
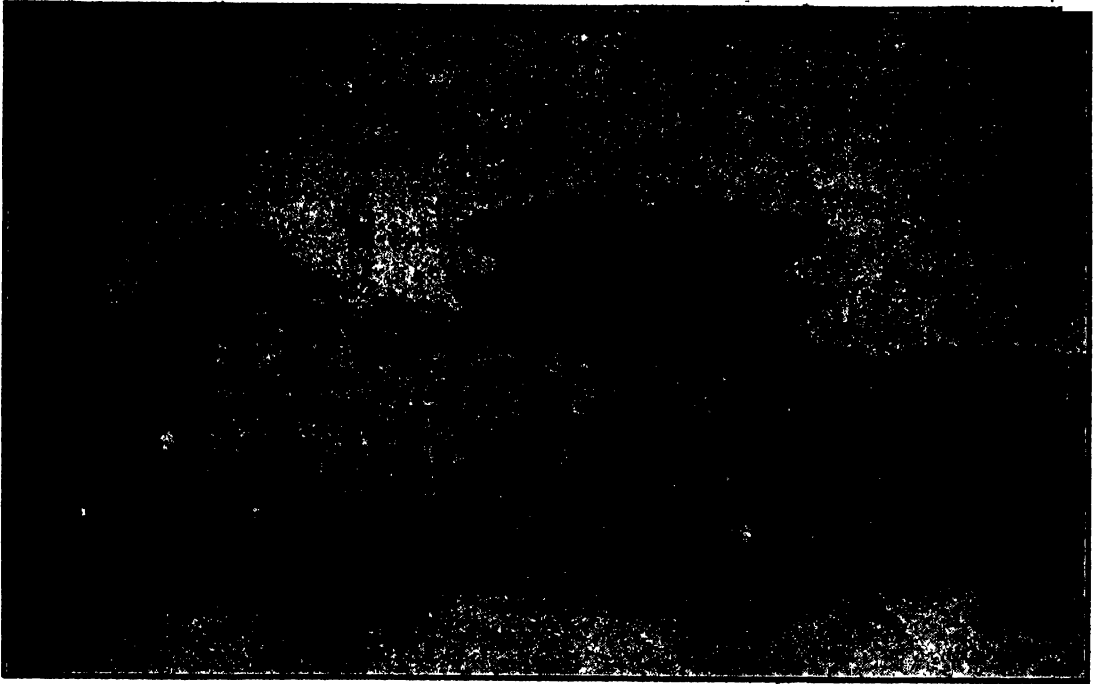
কোরিয়ার রাজধানী সিউলে কেংবক্ নামক রাজপ্রাসাদের তোরণ।

কবলিত করিতে আরম্ভ করে। জাপান কোরিয়ার নিকট এক সন্ধিপত্র উপস্থাপিত করে। তার মর্ম্ম এই, যে, জাপান গভর্ণমেণ্ট কোরিয়ার বৈদেশিক কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া তাহা পরিচালনা করিবে। কোরিয়া এই সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হয়। ১৯০৭ সালে জুলাই মাসে আবার কোরিয়ার ঘাড়ে যে সন্ধিসর্ত্ত চাপান হইল তাহা হইতেই সব কথা স্পষ্ট হইবে। তার মর্ম্ম এই—

(১) কোরিয়ার রাজ-সরকার শাসন-কার্য্যে জাপানী রেসিডেণ্ট্-জেনারেলের অনুজ্ঞা ও অনুমোদন অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(২) কোরিয়ার রাজ-সরকার যাহা কিছু আইন গঠন করিবেন বা যাহা কিছু অভিনব শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিবেন—সমস্ত কাজেই পূর্ব্ব হইতে জাপানী রেসিডেণ্ট্ জেনারেলের সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোরিয়ার রাজ-সরকারের বিচার-কার্য্য এবং সাধারণ শাসন-কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হইবে।

(৪) কোরিয়ার রাজ-সরকারে ব্যক্তি নিয়োগ-কার্য্য রেসিডেণ্ট-জেনারেলের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

(৫) রেসিডেণ্ট-জেনারেল অনুমোদন করিলে যে-কোন জাপানী কোরিয়ার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

(৬) রেসিডেণ্ট-জেনারেলের বিনা অনুমতিতে কোরিয়ার রাজ-সরকার কোন বিদেশীকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

কোরিয়াকে সমগ্রভাবে গ্রাস করা বা এই সন্ধি-সর্ত্ত তার ঘাড়ে চাপানো প্রায় একই কথা। ইহা সত্ত্বেও ১৯০৮ সালে রেসিডেণ্ট-জেনারেল প্রিন্স্ ইতো ঘোষণা করিলেন যে, কোরিয়াকে জাপানরাজ্যভুক্ত করিবার ইচ্ছা তাঁদের নাই! অবশেষে ১৯১০ সালে আগষ্ট মাসে জাপান-গভর্ণমেণ্ট কোরিয়াকে জাপানরাজ্য-ভুক্ত করিল! এইরূপেই জাপান তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিল!

কোরিয়ার বিচারালয়-সমূহে বিচারকার্য্যের দুই রকম ব্যবস্থা আছে। একজন জাপানী অপরাধ করিলে সে

শিউলে প্যাগোডা উদ্যান।

কয়েকদিন মাত্র কয়েদ ভোগ করিবে, কিন্তু সেই পরিমাণের অপরাধে একজন কোরিয়াবাসীর ফাঁসি হইতে পারে। একজন জাপানী কোন কোরিয়াবাসীকে প্রতারিত করিলে জাপানীর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করা কোরিয়াবাসীর পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। যদিও সে কোনক্রমে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে সক্ষম হয়, ন্যায়-বিচার লাভ তার ভাগ্যে অসম্ভব। আর, সব বিচারালয়ের হর্তা কর্তা বিধাতা একজন করিয়া জাপানী থাকেন। তাঁর কৃপা স্বজাতীয়ের প্রতিই বর্ষিত হয়।

অত্যাচার এবং দমননীতি কোরিয়ায় জাপানী শাসনের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমেরিকা-বাসীর কথায় কোরিয়ার অবস্থা এই :—"পুলিশের বিশেষ অনুমতি ব্যাতিরেকে এক স্থানে পাঁচজনের বেশী লোক কোন প্রকারের সভা করিতে পারিবে না—সামাজিক নয়, অন্য বিষয়েও নয়। কোরিয়ার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বই সংবাদ-পত্র প্রভৃতি প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছে। কোন কোরিয়াবাসী সাহস করিয়া স্বাধীনতা বা নেতৃত্বের ভাব পোষণ করিলে তার ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা। উচ্চ রাজপদ লাভ করা কোরিয়াবাসীর পক্ষে সুদূরপরাহত।"

কোরিয়াবাসীদের সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হইয়াছে। তারা কোন প্রকারের আগ্নেয় অস্ত্র (বন্দুক প্রভৃতি) ব্যবহার করিতে পারে না। তিনটি গৃহস্থ মিলিয়া রান্না-কার্য্যের জন্য একটি ছুরি বা বঁটি ব্যবহার করিতে পারে। এবং কাজ হইয়া গেলে সেই ছুরিটি আবার এমনিভাবে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় যে জাপানী পুলিশ বাহির হইতে যেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়।

জাপানীরা কোরিয়াবাসীদের পিছনে তীব্র গোয়েন্দা পাহারা লাগাইয়া রাখিয়াছে। এই গোয়েন্দা-শাসন সম্বন্ধে একজন আমেরিকাবাসী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা আমরা তুলিতেছি।—"কোরিয়ার প্রত্যেক লোককে রেজিষ্ট্রি করিয়া একটি নম্বর দেওয়া হয়; সেই নম্বরটি পুলিশের কাছে জানানো থাকে। যতবার লোকটি গাম বা নগর ছাড়িয়া বাহিরে যাইবে ততবার তাকে থানায় গিয়া স্পষ্টরূপে লিখাইয়া যাইতে হইবে সে কোথায় যাইতেছে এবং কি কাজে যাইতেছে। তা'পর পুলিশ তার গন্তব্য স্থানে

কোরিয়ার একজন শাসনকর্ত্তা।

টেলিফোন করিয়া জানিবে তার কথা সত্য কি না। যদি তার কথা কোন অংশে মিথ্যা বলিয়া জানা যায় তাহা হইলে তার ভাগ্যে গ্রেপ্তার এবং নির্য্যাতন। শিক্ষা, সামাজিক পদ এবং প্রতিপত্তি ও প্রভাব অনুযায়ী লোকের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যেমনি কোন লোক দক্ষতা বা নেতৃত্ব-গুণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে অমনি তাকে "A" শ্রেণীর সন্দেহ-দাগীর মধ্যে ফেলা হয়, তার পিছনে গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয় এবং তখন হইতেই সে "দাগী" লোক হইয়া থাকে। এমন কি বালকদের উপরেও তীব্র দৃষ্টি রাখা হয়, এবং খবর বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহাদের ঘুস দেওয়া হয়। যদি কোন লোক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে খুঁজিয়া দেখা হয় তার নম্বর কত, এবং তার পরিবারবর্গ বা আত্মীয়স্বজনকে গ্রেপ্তার করিয়া পীড়ন করা হয়, যতক্ষণ না তারা লোকটির সন্ধান বলে। হঠাৎ একদিন হয়ত কোন লোককে দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পরেও তার আর কোন সন্ধানই মিলে না।"

কোরিয়ার উচ্চশ্রেণীর লোক।

কোরিয়াতে শিক্ষাকার্য্য গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। কোরিয়া স্বাধীনতা হারাইবার আগে তার যে-সব উচ্চ-শিক্ষালয় ছিল সে-সমস্তই জাপানীরা লুপ্ত করিয়াছে। কোরিয়ার একটি মহৎ জাতীয় গৌরবের জিনিস আছে,—সেটি তার জাতীয় ভাষা। কোরিয়ার ভাষা ও অক্ষর চীনা ও জাপানী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কোরিয়ার জাপানী গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে কোরিয়ার বিদ্যালয়-সকলে দেশীয়

কোরিয়ার নারী—লিখনরতা
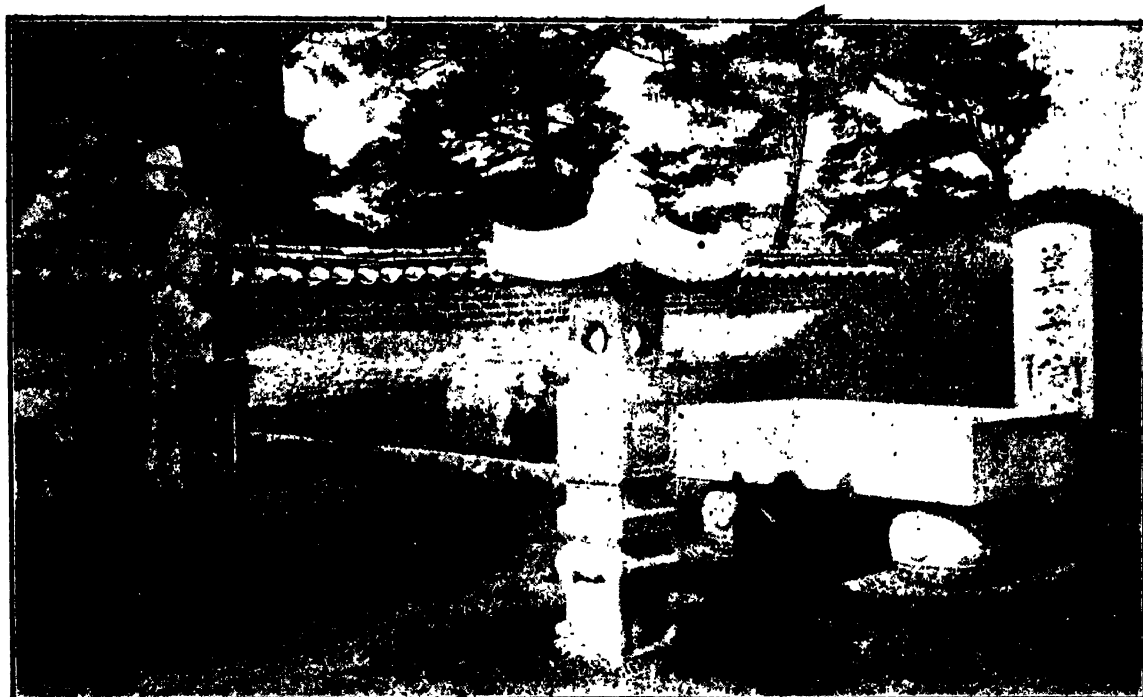
কোরিয়ার প্রথম রাজার সমাধি-মন্দির।
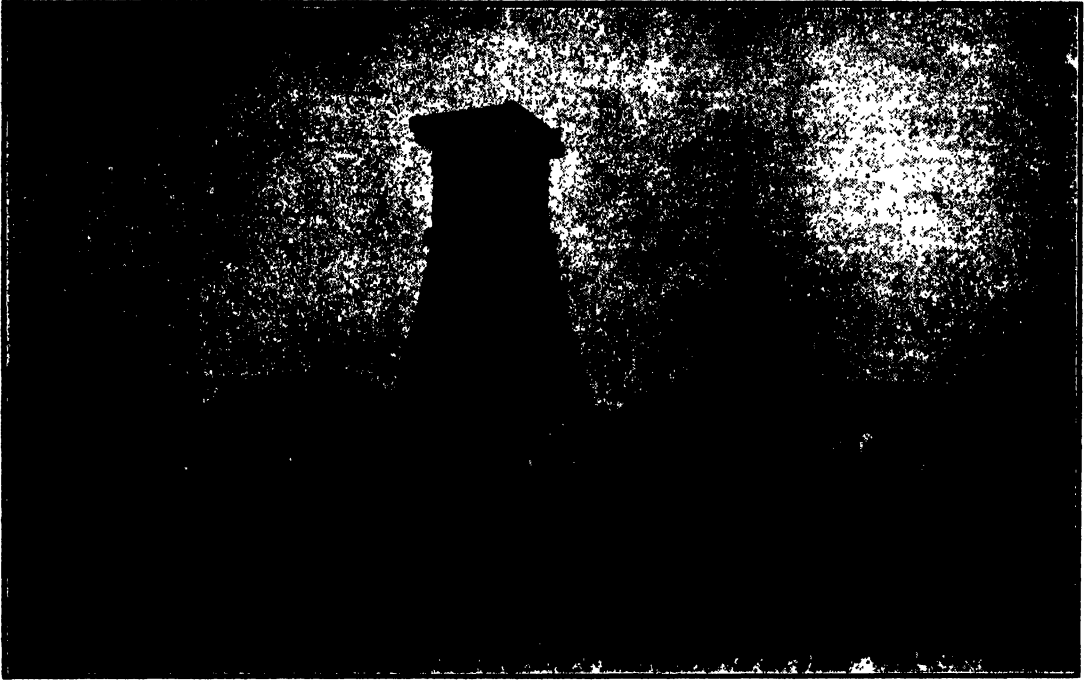
কোরিয়ার প্রাচীন মানমন্দিরের অবশেষ।

ভাষার প্রচলন বন্ধ করিয়াছে। জাপানী ভাষা সেখানে "জাতীয় ভাষা" বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে এবং ছাত্রদিগকে জাপানী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আর বিদ্যালয়ের ধার্য্য (text) বই জাপান হইতে প্রকাশিত এবং জাপানী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে অচল। সেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসের স্থান নাই। এমন কি কোরিয়ার ইতিহাসও পড়ানো হয় না। তার বদলে জাপানী ইতিহাস পড়ানো হয়। আর জাপানী ইতিহাস এমন ভাবে রচিত হয় যে তাহাতে কোরিয়াবাসীদের মনে এই ভাব অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয় যে, তারা জাপানীদের অপেক্ষা হীন এবং নীচ জাতি।

সেখানে জাপানের রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য কোরিয়াবাসীদের দেশাত্মবোধ বিলুপ্ত করা এবং তাদের সার্ব্বজনিক নৈতিক উন্নতি খর্ব্ব করা। এ সম্বন্ধে কোরিয়ার অবস্থাভিজ্ঞ লোকের কথা এই—

"কোরিয়াকে নিজরাজ্যভুক্ত করার কিছুদিন পরেই জাপানী গভর্ণমেণ্ট কোরিয়াতে লোক পাঠাইয়া আফিঙের প্রচলন করে এবং কোরিয়াবাসীদের মধ্যে ইহা খাওয়ার অভ্যাস প্রবর্ত্তিত করে। তারপরেই বারবনিতার প্রচলন আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে জাপান হইতে হাজার হাজার বারাঙ্গনা কোরিয়াতে আনা হইয়াছে। আর তারা কোরিয়ার জন-সমাজকে ঘৃণ্য মারাত্মক পাপে ও রোগে কলুষিত করিতেছে। এখানে স্থানে স্থানে সাধারণ স্নানাগার স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে মেয়ে-পুরুষে এক সঙ্গে স্নানের নিয়ম। এই প্রথায়ও কোরিয়াবাসীদের প্রভূত নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, এবং পরিণামে পরবর্ত্তী বংশীয়দের জীবনে ইহা ভীষণ কুফল ফলাইবে, সন্দেহ নাই। বারাঙ্গনা, সাধারণ স্নানাগার এবং জুয়াখেলার প্রভাবে কোরিয়ার নৈতিক আদর্শ আজ ধ্বংসোন্মুখ।"

জাপানীরা বলে তারা কোরিয়ার অনেক হিত করিয়াছে। অবশ্য কয়েক বিষয়ে তারা যে কোরিয়ার উন্নতি সাধন করিয়াছে তা অস্বীকার করা যায় না। জাপানী গভর্ণমেণ্টের সুদীর্ঘ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তারা কোরিয়াতে ডাক-বিভাগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, টেলিগ্রাম্ ও টেলিফোন্ বসাইয়াছে, বড় বড় রাস্তা তৈরী করিয়াছে

শিউলের প্যাগোডা উদ্যান।

এবং রেল-লাইনও বসাইতেছে। কিন্তু জাপান তাদের রিপোর্টে পটুতার সহিত তাদের অর্থ-গৃধ্নুতার ভাব চাপা দিয়া রাখিয়াছে। তাদের অর্থ-লোভ কিন্তু কোরিয়ার জাতীয় জীবনের বহু বিভাগে হাত বাড়াইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায় যে, কোরিয়ার বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্র জাপানীরা নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়াছে। কোন ব্যবসার কাজে যদি কোন কোরিয়াবাসী নামিতে চান তবে তাঁকে রাজ-সর্‌কারের হুকুম লইতে হইবে। রাজ-সর্‌কারে তিনি যে আবেদন করিবেন তাহা তাগাদা সত্ত্বেও দিনের পর দিন ফেলিয়া রাখা হয়, মঞ্জুর আর হয় না। ইতিমধ্যে যদি কোন জাপানী সেইরূপ কাজের জন্য আবেদন করে তবে, আশ্চর্য্য এই, তার আবেদনই মঞ্জুর হয়!

কোরিয়ার নিত্যব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই জাপান হইতে আম্‌দানি করা হয়। সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য নামে মাত্র কোরিয়াতে হয়, তার পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে জাপানী-দের হাতে। এ সম্বন্ধেও একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কথা এই—

"কোরিয়াতে কোন পরিদর্শক উপস্থিত হইলে তাঁকে জানানো হয় জাপান কেমন করিয়া কোরিয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করিয়াছে। কিন্তু তাঁকে এ-কথা বলা হয় না যে কোরিয়ায় জিনিসের আম্‌দানি ও রপ্তানি ব্যাপারের শতকরা পঁচাত্তরটি জাপানীদের হাতে, এবং জাপানীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবসা চালাইবার কোন সুবিধাই কোরিয়াবাসীদের নাই। সম্পূর্ণরূপে জাপানী এবং আধা-সর্‌কারী ওরিয়েণ্টাল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোম্পানী যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির সমস্ত ধানের ক্ষেত কিনিয়া লইয়া কোরিয়াবাসীদের অধিকৃত নীচেকার জমিসকলের জলসংযোগ কাটিয়া দিয়াছে এবং কোরিয়াবাসীদিগকে জলাভাবে সে-সমস্ত জমি যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করাইয়াছে—তাহা পরিদর্শকের গোচর করা হয় না।"

ব্যবসা ও বাণিজ্যের সমস্ত লাভ জাপানের ঘরে গিয়া উঠিতেছে। এবং এইরূপে কোরিয়ার অর্থ শোষিত হইতেছে। কোরিয়ার অবস্থা যখন এই, তখন জাপানের মুখে কোরিয়ার সমৃদ্ধি-সাধনের কথা শোভা পায় না।
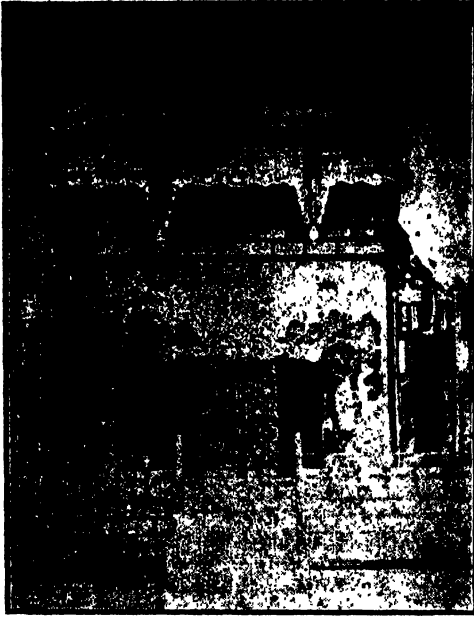
কোরিয়ার রাজসিংহাসন।

কোরিয়ার রাজপ্রাসাদের সিংহাসন-গৃহের ছাদতলের কারুকার্য্য।

জমি-জমার বন্দোবস্ত, বিদেশে যাওয়া-আসার আইন, দেশ-শাসনের আইন, যাহা কিছু কোরিয়ার উন্নতি-বিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট—সমস্তই জাপানীরা নিজেদের সুবিধামত গঠন করে, কোরিয়াবাসীদের তাতে যতই অহিত হউক না কেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জাপানীরা দস্যুর মত কোরিয়ার অর্থ লুটিয়া লইতেছে। এই লুটে এবং ব্যবসাবিষয়ে দাসত্বের পীড়নে কোরিয়া নির্য্যাতিত।

১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে কোরিয়া আপনাকে সাধারণতন্ত্র দেশ বলিয়া ঘোষিত করে। জাপান অপেক্ষা কোরিয়া দেড়গুণ বড় দেশ। এই দেশ আজ জাপানের পদতলে পড়িয়া অশান্তি ও আত্মগ্লানিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কোরিয়া অস্ত্রহীন; পদে পদে সে জাপানীদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ-নীতি প্রয়োগ করিতেছে। আর জাপানীরা সে প্রতিরোধ দমন করিবার জন্য কোরিয়ার দেশভক্ত সন্তানদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছে। সে পাশবিক অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা এই:—হাতের ও পায়ের আঙুলের নখ উপ্ড়াইয়া লওয়া, দেহের শিরা ছিঁড়িয়া বাহির করা এবং গরম লোহা দিয়া দেহের মাংস পুড়াইয়া দেওয়া। এত অত্যাচারেও কিন্তু তারা কোরিয়াবাসীদের স্বাজাত্য-বোধ-চাঞ্চল্য দমন করিতে পারে নাই। কোরিয়াবাসীরা অহিংস প্রতিরোধ-প্রথা চালাইতেছে। কোরিয়াবাসীদের নির্ভীক আচরণে জাপান বিক্ষুব্ধ, ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ তারা কোরিয়ার নেতাদের মনস্তুষ্টির জন্য স্বায়ত্তশাসন দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে জাপানের আদৌ ইচ্ছা নাই। কোরিয়ার উপর যে-সমস্ত অন্যায় আচরিত হইয়াছে তার জন্যও জাপান দুঃখিত বা লজ্জিত নয়।

কোরিয়ায় যে-সব অত্যাচার সাধিত হইয়াছে তার জন্য জাপান গভর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে দুই-একজন কর্ম্মচারীকে একটু-আধটু ভর্ৎসনা করিতেছে মাত্র। অত্যাচার ও কু-শাসন নিবারণ করিতে হইলে রাজনীতির বা শাসন-নীতির মূলতঃ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কোরিয়ায় জাপানী শাসন তরবারিশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে শাসনে প্রজাদের মতামত বা স্ব-ইচ্ছার কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। 'রিফর্ম্' বা শাসন-সংস্কার যাহা প্রদত্ত হইতেছে তাহা চতুর নীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা পিঠ চাপ্ড়াইয়া ঠাণ্ডা রাখার মত। ইহার দ্বারা তীব্র সমালোচকদের মন খানিকটা পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে।

জাপান কোরিয়ায় দমন, পীড়ন ও অত্যাচার

অবলম্বন করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। নানাদিক হইতে প্রতিবাদ ও অভিযোগ আসা সত্ত্বেও এবং স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও জাপানীরা বীভৎসতার সহিত তাদের দমন-নীতি চালাইয়া চলিয়াছে এবং চালাইবেও। কিন্তু দেশাত্মবোধ এবং স্বাধীনতার প্রেরণায় যখন সমস্ত জগৎ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তখন কতদিন জাপান কোরিয়াকে পদদলিত করিয়া রাখিতে পারিবে? এসিয়ারই এক জাতি আর-এক জাতির উপর এমন নির্দ্দয় অত্যাচার আর কতদিন করিবে?

গুপ্ত

বিশ্বদরদী

কত জন দ্বারে আসে,
চেয়েও দেখি না, ফিরে যায় তারা গভীর হতাশ্বাসে।
তাদের দীর্ঘশ্বাস
হা হা করে' ফেরে পৃথিবীর বুকে, ছেয়ে ফেলে নীলাকাশ।
আমি যদি চাই কারে
আকুল পরাণে আঁচলটি পেতে বসে' থাকি তার দ্বারে,—
পাই না ভিক্ষা-মুঠি,
ব্যর্থবাসনা চাপিয়া বক্ষে ধূলার উপর লুটি;
আমার বেদনারাশি
সাগরের মত ঢেউ তুলে উঠে আমাকেই ফেলে গ্রাসি।
এমনই করিয়া হায়
সারাটি ভুবন কেঁদে কেঁদে মরে, পায় না যা-কিছু চায়।
দুঃখ-দহনে জ্বলে'
বিধাতারে সবে দোষ দিই শুধু ক্রন্দন-কলরোলে;
ভাবি অবোধের প্রায়
আমাদের এত দুঃখে বিধির কিছু নাহি আসে যায়।
জানি না ভিখারী-সাজে
তিনিও ফেরেন হৃদয় মাগিয়া নিখিল-মানব মাঝে।
বিমুখ হইয়া যবে
ফিরাই তাঁহারে, কত ব্যথা পান, হিসাব কে রাখে কবে?

যতেক বেদনা যার
এক সাথে জমে' অচল-মুকুট গড়েছে মাথায় তাঁর।
যত আশা হল ছাই,
সেসব তাঁহার অঙ্গবিভূতি,—চিরসন্ন্যাসী তাই।
মানব-মনের বিষ
তিল তিল করে' কণ্ঠে তাঁহার জমিছে অহর্নিশ।
ব্যথিত বেদন বয়ে
সবাকার সাথে ফিরিছেন পথে সবাকার বোঝা লয়ে।
ওগো রাজ-অধিরাজ!
তোমার ব্যথার সমুখে আমার এ কান্না পায় লাজ।
আমার নয়ন-বারি
বিরাট অশ্রু-সাগরে হারায় খোঁজ নাহি পাই তারি।
মানুষেরে দিয়া হাসি
দরদী! তোমার কাছেতে শুধুই কান্নাটি নিয়ে আসি।
ক্ষম সেই অপরাধ,
মোর বুকে আজ প্রেমের লীলায় মিটাও তোমার সাধ।
পরম-প্রেমিক জন!
কাঁদিয়ে তোমায় কাঁদাব না আর, এই হল মোর পণ।
বক্ষে মিলায়ে থাক,
হে দরদী বঁধু! আমায় তোমার শান্তি-আঁচলে ঢাক।

শ্রী সুনীতি দেবী

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

ও

অন্যান্য পুস্তক

ভাগবতাচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক ও পুস্তিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি :—

১। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতম্, প্রকাশক শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১৪২।১, বাহিরমির্জাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা। পৃঃ ২১৯। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

২। শ্রীকৃষ্ণরাসলীলামৃত, প্রকাশক শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সাধু, ১৮, অদ্বৈতচরণ মল্লিক লেন, কলিকাতা। পৃঃ ৷৷/০ + ৪১৩ + ৩। মূল্য ২৲ টাকা।

৩। পঞ্চরত্নম্ শ্রীশ্রীগৌরশতকঞ্চ, প্রকাশক শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন দাস, ৪৩।১ মাণিকতলা রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১৩১ + ২৬ + ২১। মূল্য ৷৷/০ আনা।

৪। পতিব্রতা, প্রকাশক শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সাধু। পৃঃ ৩১। মূল্য ।০ আনা।

৫। পিতৃস্তোত্রম্, প্রকাশক শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সাধু। পৃঃ ১২+১৫। মূল্য ।০ আনা।

৬। সত্যমেব জয়তি, প্রকাশক শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সাধু। পৃঃ ৩১। মূল্য ।০ আনা।

উল্লিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি সংস্কৃতে রচিত, এবং কয়েকখানায় সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ ও অপর কয়েকখানায় তাহার বাংলা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের গোলোক, অবতার, জন্ম, অসুরসংহার, চৌর্য্য, মৃদ্ভক্ষণ, দামোদর, ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস এই চতুর্দ্দশ লীলার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে রাসলীলার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায় তাহাই আরো বিস্তারিত করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ীর (১০।৩১-১৫) প্রথমে প্রত্যেকটি শ্লোক লইয়া পরে যথাক্রমে তাহার সংস্কৃত অন্বয়, শ্রীধর স্বামীর টীকা, শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও বাঙ্গালায় তাহার তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক দুইখানি পড়িয়া গ্রন্থকারের উপর আমাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে। বৈষ্ণব-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণলীলাকে যেরূপ দেখা যাইতে পারে তিনি তাহা দেখিয়াছেন, এবং আমাদের বিশ্বাস যিনি ঐ দৃষ্টিতে এই পুস্তক দুইখানি পড়িবেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। আমরা দেখিয়াছি গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বত্র কেবল পূর্ব্বাচার্য্যগণকে অনুসরণই করেন নাই, নিজেও নূতন চিন্তা করিয়াছেন, নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এবং তাহা সুন্দর ও সুসঙ্গত হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে আত্মস্তব-রুদ্ধ সৌরতঃ (৫.২৬) ও তেজিয়সাং (৫.২৯) শব্দের ব্যাখ্যা উল্লেখ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বাচার্য্যের মতকে স্থান বিশেষে ত্যাগ করিতেও হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের অভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সুশ্লীল কি অশ্লীল, শুকদেব তাহাতে সাদা চুন-কাম করিয়াছেন কি না, ইহা তর্ক করিয়া লাভ নাই। দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা শ্রবণে কাহারো কাহারো হৃদয় গলিয়া গিয়াছে ও অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে; কামের গন্ধ মাত্রও তাঁহাদের নিকট অনুভূত হইতেছে না, ইন্দ্রিয়ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়া আসিয়াছে; এক কথায়, কেবল বৈষ্ণবের শাস্ত্রে নহে, বিশ্বের শাস্ত্রে ভক্ত বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে। অপর পক্ষে আবার ইহাও দেখিয়াছি কাহারো কাহারো নিকট ইহার উল্লেখ মাত্রও অসহ্য। মনের ভাবের ভেদে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। একটা প্রাচীন কথা আছে, আচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন (সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ, বৌদ্ধ দর্শন) একই স্ত্রী শরীর দেখিয়া পরিব্রাজক, কামুক, ও কুকুর এই তিনের তিন রকম কল্পনা হয়; পরিব্রাজক তাহা শবের ন্যায় ত্যাজ্য বলিয়া মনে করেন, কামুক তাহা উপভোগ্য মনে করে, আর কুকুর তাহা ভক্ষ্য বলিয়া ভাবে। সাংখ্যবিদেরা বলিবেন—বস্তুরই এমনি স্বভাব যে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, একই বস্তু কাহারো সুখ কাহারো দুঃখ কাহারো বা মোহ উৎপাদন করে। কেন? কারণ, বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি তাহার বিশেষ বিশেষ রূপটা প্রকাশ পায়। তাই যাহা নিজের নিজের অনুভবের বিষয় সেখানে তর্ক করা চলে না; অথবা তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোনো লাভ হয় না। আমাদের অনেক সময় বিরোধ হওয়ার একটা কারণ এই যে, যে ভাবে এই জাতীয় গ্রন্থসমূহ লিখিত হইয়াছে ঠিক সেই ভাবে না পড়িয়া অন্য ভাবে পড়া। কোনো মহাত্মা বলিয়াছেন, Every Holy Scripture ought to be read with the same spirit wherewith it was written. আর একটা কারণ হইতেছে অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অক্ষরের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়া। তাই বুদ্ধদেব বলিতেন, ভিক্ষুকগণ তোমরা ব্যঞ্জন গ্রহণ করিও না, উপদেশের কথার দিকে তোমরা অভিনিবিষ্ট হইও না, অর্থকে অনুসরণ কর। Truth is to be sought for in the Holy Scriptures, not eloquence, এবং We ought not to believe every saying or suggestion, but ought to warily and patiently to ponder the matter with reference to God. তাই যদি কেহ রাসলীলার প্রত্যেকটি অক্ষরের ব্যাখ্যা করিয়া তাহা বুঝিতে চান তাহা হইলে ঠিক বুঝা হইবে না। চিত্ত বিদ্বেষে মলিন হইয়া থাকিলে বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণবদৃষ্টিতে তাহা কি ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে না। কেহ সামনে মাটি রাখিয়া উপাসনা করে। সে যদি মাটিকেই উপাসনা করে তবে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মাটির মধ্যে আছেন, যিনি মাটির অন্তরতম, যিনি মাটিকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং মাটি যাঁহাকে জানে না, সে যদি সামনে মাটিকেই রাখিয়া ইঁহাকেই উপাসনা করে, তাহার উপাসনা ঠিকই হয়। কিন্তু সে যে বস্তুত মাটির অথবা মাটির অন্তরতমকে উপাসনা করে, অন্যের পক্ষে তাহা জানা সব সময় সম্ভব হয় না। অপর পক্ষে যে মাটির অন্তরতমকে উপাসনা করে, অথচ সামনে মাটি রাখে না, তাহারো উপাসনা ঠিক এই-রূপে সার্থক হয়, যদিও অন্যের পক্ষে ইহা বুঝা সব সময় সম্ভব হয় না। উভয় উপাসনার মধ্যে ভাবই প্রধান, সেই ভাবকেই উপেক্ষা করিলে

উভয়ই নিরর্থক হয়। তেমনি অন্যত্রও তাহকেই দেখিতে হইবে, ভাবকে বর্জ্জন করিলে প্রাণকে বর্জ্জন করা হয়, এবং প্রাণ না থাকিলে কেবল দেহটা তো শব। যাঁহারা এই ভাবে, বিশেষত বৈষ্ণব ভাবে, এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করিবেন, অবৈষ্ণব হইলেও, মনে হয়, তাঁহারা আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, অন্তত বৈষ্ণবদৃষ্টিতে কৃষ্ণলীলা কি তাহা বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকার কিন্তু বলিয়াছেন, এবং ইহা তিনি ঠিকই বলিয়াছেন—"আর-একটি বক্তব্য, যাঁহাদের স্বাভাবিক যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণভক্তি আছে অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই এই পুস্তক সংগ্রহ করিবেন, অন্যথা অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।" গ্রন্থকারের শেষ নিবেদনে আর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এই, ইহা ভক্তের উক্তি:—"আমার কৃষ্ণভক্তি নাই, আমি পণ্ডিত নহি, এবং আমার ভাষাজ্ঞানও নাই, একথা আমি স্বীকার করিয়াছি। কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে মৌখিক দৈন্য দেখাইবার জন্য স্বীকার করিয়াছি, তাহা নহে, প্রকৃতই আমি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলার সমাধানে সর্ব্বাংশেই অযোগ্য। তবে যে-কোন কারণে অত্যল্প কাল কৃষ্ণকথার আলোচনা করিলেও জীবন পবিত্র হয় ইহা আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে এখনকার মতে যদি কেহ অন্ধ বিশ্বাস বলিতে চাহেন, বলুন, আমি তাহা আশীর্ব্বাদ মনে করিব। কেননা, আমার বিশ্বাস, যে দিন যাঁহার ভগবানে প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস হইবে সেই দিন তিনি কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস নাই; অন্ধবিশ্বাসের গন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই বিশ্বাস-গন্ধের প্ররোচনায় আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, কৃষ্ণনাম ভালবাসি, এবং কৃষ্ণলীলা ভালবাসি। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার গুণ গাহিতেই চাহে, ইহা মানবের আজন্মসিদ্ধ স্বভাব। সে স্বভাব আপন মনেই প্রিয়জনের গুণ গাহিয়া যায়, কাহারো মুখের দিকে তাকায় না। আমি,—ভক্তিহীন আমি,—জ্ঞানহীন আমি,—শব্দসম্পত্তিহীন আমি—সেই মানবোচিত স্বভাবের বশীভূত হইয়া কেবল অভীষ্ট কৃষ্ণনাম আলোচনায় কিঞ্চিৎ আনন্দলাভের লোভে 'শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা' নামক পরম রসের লীলা আলোচনা করিলাম।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম আছে কি না ইহা লইয়া একটা বিবাদ আছে। সত্য বলিতে গেলে তাহা নাই। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাতে কষ্ট পান। তাই যে-কোন প্রকারে হউক তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহার উল্লেখ বাহির করিবার জন্য প্রয়াস করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধান গ্রন্থ, তাহাতে উহা না পাইলে তাহা তাঁহাদের পক্ষে বড় অশোভন। রাসলীলার একটি শ্লোকের (২.২৮—১০.৩০.২৮) প্রথমাংশ হইতেছে—"অনয়ারাধিতো নূনম্"। এখানে আরাধিত শব্দেরই দ্বারা রা ধা শব্দ সূচিত হইতেছে, ইহাই ইঁহাদের মত। শ্রীধরস্বামী এসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু শ্রী সনাতন গোস্বামী, শ্রী জীব গোস্বামী ও শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহাই বলেন। আমাদের ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ও ইহাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অতি কষ্টকল্পনা, ইহা সমর্থন করা যায় না। আমার মনে হয় শ্রী রাধার নাম ভাগবতে না থাকিলেও তাঁহাদের চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই; কেননা, তাঁহারা কৃষ্ণলীলাকে যাহার উপর স্থাপন করিয়াছেন তাহা পুরাণ। শ্রী জীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে পুরাণের যেরূপ প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন, বৈষ্ণবগণের তাহা অকাট্য। অতএব, যদি তাহাই হয়, তবে ভাগবতের ন্যায় অন্য পুরাণও যখন কৃষ্ণলীলার সমর্থন করে, তখন তাহা হইতেই শ্রী রাধার নাম পাওয়া গেলে তাহাতে তো কোনো ক্ষতি দেখা যায় না। এরূপ কষ্ট-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা'যায় না।

ঐতিহাসিক দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বৈষ্ণবগণের সম্মুখে এখন একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে শুনাইয়াছেন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দুইখানি অতিপ্রাচীন পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রাসপঞ্চাধ্যায়ী নাই।

আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা পুস্তকে এই কয়টি বাক্য বা অনুচ্ছেদ একবারে তুলিয়া দেওয়া ভাল, ইহা অশ্লীল:—"আমাদের পাঠকদিগের..." (পৃ-১৪৬), "কামিনীকে ..."(পৃ-২০০), "ছি, ছি, ছি......" (পৃ ২০৪)।

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহম্..." (পৃ ৬৯) এখানে 'স্নেহ' শব্দের অর্থ 'যত্ন' করা হইয়াছে। ইহা ঠিক হয় নাই, কোন টীকাকারও ইহা সমর্থন করেন না। ইহার অর্থ এখানে ক্রমসন্দর্ভের মতে 'বাৎসল্য' ("স্নেহং পিত্রোঃ") আর বৈষ্ণবতোষিণী ও বীররাঘবের মতে 'সখ্য' ("স্নেহং বৃষ্ণিপাণ্ডবানামিব")। "যে নানা বস্তু দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখে" (পৃ ৬০), ইহা নিশ্চয়ই "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" এই উপনিষদ্-বাক্যের অনুবাদ: এখানে তদনুসারে "মৃত্যুর পর" স্থানে "মৃত্যু হইতে" হওয়া উচিত। "ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে" (পৃ ৬৪), এখানে "ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে" হইবে।

ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় পুস্তক পঞ্চরত্ন ও শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ-শতকে (১) মাতৃস্তোত্র, (২) গুরুস্তোত্র, (৩) ধর্ম্মস্তোত্র, (৪) বিবেক-প্রশংসা (অথবা অজ্ঞান-নিন্দা), (৫) হরিনাম-প্রশংসা ও (৬) শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তোত্র রহিয়াছে। যথাক্রমে প্রকরণগুলির প্রতি শ্লোকের শেষচরণগুলি এই—(১) "তস্যৈ মাত্রে নমো নমঃ", (২) তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ", (৩) যতো ধর্ম্ম, স্ততো জয়ঃ, (৪) কিমজ্ঞানমতঃপরম্, (৫) হরের্ণামৈব কেবলম্, এবং (৬) স গৌরঃ শরণং মম। আশা করা যায় ইহার দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির বর্ণনা-প্রণালী অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রদ্ধার সহিত এগুলি পাঠ করিলে হৃদয়ে একটা পবিত্রভাবের সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গশতকে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনের অনেক কথা বলা হইয়াছে। এ পুস্তকখানির অন্য কোনো বিশেষত্ব নাই।

ইহার মধ্যে মাতৃস্তোত্র আছে, কিন্তু পিতৃস্তোত্র না থাকায় দুঃখিত হইয়া ভাগবতাচার্য্য মহাশয় পিতৃস্তোত্র—নামে পুস্তিকাখানি পৃথক-ভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন।

পতিব্রতা—পুস্তিকায় পতিব্রতার ধর্ম্ম ও গুণের প্রশংসা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে দেশান্তরের নারীদের অপকর্ষও দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকার অন্যান্য বহু কথা আলোচনা করিয়াছেন। সবগুলি উপস্থিত করার সময়ও নাই, সাধ্য নাই, স্থানও নাই, করিয়াও বিশেষ লাভ নাই। দুই একটা বলি। ভাগবতাচায্য মহাশয়ের একটি শ্লোক এইরূপ—

> অমূর্খঃ কো বদেন্ নারী ভারতীয়ার্য্যবংশজা।
> পরাধীনেতি হীনেতি দীনেতি দুঃস্থিতেতি চ॥

ইহার অর্থ হইতেছে যে, এমন কোন্ অমূর্খ ব্যক্তি আছেন যে, তিনি বলেন যে, ভারতের আর্য্যবংশসমুদ্ভূত নারীরা পরাধীনা হীনা দীনা ও দুঃস্থিতা। তিনি যদি আমাদিগকে অ-মূর্খের মধ্যে না ধরিয়া মূর্খেরই শ্রেণীতে গণ্য করেন, করুন, মাথা পাতিয়া তাহা সহিয়া লইব, কিন্তু আমাদিগকে বলিতেই হইবে, নারীর দুর্দ্দশা ভারতে খুবই আছে। আমরা যে স্থানে থাকিয়া এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তাহার চারিদিকে নারীদের দুর্দ্দশার চিত্রগুলি চোখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল, বিশেষত বিধবাদের কথা তো বলিবারই নহে। ইঁহাদের দৈন্য-দুর্গতির সীমা পরিসীমা নাই। প্রথমে এসব কাহিনী অন্যের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিতাম না, মনে করিতাম তাহা অতিরঞ্জিত। কিন্তু যখন চোখ ফুটিল, দেখিতে পাইলাম তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে। তাই ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের কথাগুলিকে একবারে উল্‌টাইয়াই বলিতে হয়। তাঁহার আর-

একটা কথা বড় সাঙ্ঘাতিক—"ভারত আজ নাস্তিকপ্রায়। হায়! হায়! আজ এখানে সতীপ্রথাকে নিষ্ঠুর বলা হয়। আমাদের সে-সব দিন গিয়াছে।"—

"অধুনা নাস্তিকপ্রায়ে ভারতে সা সতীপ্রথা।
জাতা নিষ্ঠুরতা হা হা, তে হি নো দিবসা গতাঃ॥"

খুব ভাল হইয়াছে যে, সেসব দিন গিয়াছে। এ শ্লোকটা অবিলম্বে ছিঁড়িয়া ফেলিলে ভাগবতাচার্য্য—মহাশয়ের উপযুক্ত কাজ করা হইবে। পতির প্রতি নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে, নূতন করিয়া আর-কিছু না বলিলেও চলিত। তিনি যদি স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির কর্ত্তব্যের কথা কিছু শুনাইতেন, তবে তাহা সব দিকে কাজে লাগিত। প্রকাশকের কথায় জানিতে পারা যায় ভাগবতাচার্য্য মহাশয় অতি সুন্দর কথক। তিনি যদি কথকতার দ্বারা নারীদের প্রতি পুরুষদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রোতাদিগকে কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করেন, তবে তাহা সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিবে।

আমাদের আলোচ্য শেষ পুস্তিকা **সত্যমেব জয়তি,**—নামেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ইহাতে সত্যের মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভাগবতাচার্য্য মহাশয়ের সংস্কৃত রচনা সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনীয় বিষয়ের অনুকূল, কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র সংস্কৃত বাক্‌পদ্ধতিকে (idiom) অনুসরণ করে নাই, স্থানে স্থানে খুবই বাঙ্গলা গন্ধ পাওয়া যায়; আর ব্যাকরণ-দোষও লক্ষিত হইল অনেক এবং ছন্দোদোষও আছে। আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তাই সংক্ষেপে কেবল একখানি মাত্র পুস্তক হইতে কয়েকটি ত্রুটি দেখাই:—

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে দিদৃক্ষন্তি (পৃঃ ১৫, শ্লোক ১২) হয় না, দিদৃক্ষন্তে লেখা উচিত ছিল। প্রে ম য়ি ত্বা (পৃঃ ৪৭, শ্লো ২৬) স্থলে প্রে য্য লিখিতে হইত। উ প চ ক্র মুঃ (পৃঃ ৪৮ শ্লো ২৬) এখানে ক্রম্ ধাতুর আত্মনেপদে প্রয়োগ করিতে হইত। স ম্ম ত্য স্তি (পৃঃ ৪৮ শ্লো ৩০) হয় না স্পষ্টই, স ম্ম তি র স্তি লিখিতে হইত। অন্য প্রকারেরও সন্ধিদোষ আছে—বা ধ স্তে ইতি (শ্লো ৬৬ পৃঃ ৫২), জায়স্তে অধর্ম্ম-নিরতাঃ—(৫২ পৃঃ শ্লো ৬৭), এরূপ স্থানে সন্ধি না করা দোষ। এরূপ দোষ (অসন্ধি) আরো অন্যত্র আছে [পৃঃ ৬৮, শ্লো ৪; পৃঃ ১১১, শ্লো ৬৯ দুইবার; পৃঃ ১২৭, শ্লো ২৭; পৃঃ ২০১ শ্লো ৪৯৮)। প্র থি তুং (পৃঃ ৮৩ শ্লো ৪০) দ র্শি তুং (পৃঃ ১০৮ শ্লো ৪১) না লিখিয়া প্র থ য়ি তুং দ র্শ য়ি তুং লিখিতে হইত। ক্র হ্য°স্তি হোক হ স্তা রং (পৃঃ ৯৯ শ্লো ২৩) এখানে ০ হ স্ত্রে লিখিয়া চতুর্থী বিভক্তি দেওয়া উচিত ছিল। বি স্ত রং তত্র দ্র ষ্ট ব্যং (পৃঃ ১২৫ শ্লো ১৪), কিন্তু বি স্ত র শব্দ পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ নহে। বি হিং স স্তী (পৃঃ ৪৯ শ্লো ৩৯) ও ক্র দ স্তী ভ্যঃ (পৃঃ ১০৮ শ্লো ৪২) যথাক্রমে বি হিং স তী ও ক্র দ তী ভ্যঃ হওয়া উচিত ছিল। বস্ত্র অর্থে বা স স্ শব্দের পরিবর্ত্তে বা স শব্দের প্রয়োগ (পৃঃ ১০৪ শ্লো ১, পৃঃ ১১৫ শ্লোক ১০২,১০৩) ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সু ত রাং (পৃঃ ১১৩ শ্লো ৮৭) শব্দের প্রয়োগটা বাঙলার মতে কাজে-কাজেই হইয়াছে। সংস্কৃতে তার এরূপ অর্থ নয়।

"যৎপাদপদ্মপরাগনিষেবতৃপ্তা ..." (পৃঃ ১৯০, শ্লো ৪০১) ইহা ভাগবতের (১০.৩৩,৩৪) শ্লোক। কিন্তু ইহা তুলিতে একটু ভুল হইয়াছে—"যৎ পাদপদ্ম" না হইয়া "০ প ঙ্ক জ—" হইবে।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বিদ্যানিধি বিজ্ঞান-ভূষণ রায় বাহাদুর। প্রকাশক—সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ৮/৯ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৬+১৪ পৃষ্ঠা। বোর্ডে বাঁধা। বারো আনা।

বিবিধ প্রবন্ধের বই। ১০ টি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ আছে—(১) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ,—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে আপেক্ষিক শব্দ তাহা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী নক্ষত্র ও অণু প্রভৃতির সংস্থান ও আকারের তারতম্য তুলনা দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে; (২) কলাগাছ—কলাগাছের সম্বন্ধে উদ্ভিদ-বিদ্যার ও কৃষিবিদ্যার অনেক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে; (৩) কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—গ্রন্থের আখ্যায়িকা ও কবিত্ব, তথ্য ও বিশেষত্ব অতি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে; (৪) তেলেগু দেশ—ভ্রমণের সরস বিবরণ; (৫) ফুলের বাগান—ফুলের বাগান কোথায় কেমন হওয়া আবশ্যক ও এখনকার বাগানে কি কি অভাব ও ত্রুটি আছে তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; (৬) কুষ্মাণ্ড—কুমড়ার উদ্ভিদতত্ত্ব সমস্ত আলোচিত হইয়াছে; (৭) ধূলা—পদার্থটা কি ও তাহা না থাকিলে সংসারের অবস্থা কিরূপ হইত ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা; (৮) খণ্ডগিরি—ওড়িষ্যার প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি দর্শনের বর্ণনা; (৯) দধিবীজ—দধ্যম্ল বা দইয়ের সাজা বস্তুটার স্বরূপ নির্ণয়, দই পাতার প্রণালী ও দধির উপকারিতা বর্ণনা; (৯) অগ্নিমন্থন—প্রাচীন কালে অগ্নি উৎপাদনের উপায় বর্ণন। পরিশিষ্টে টীকা আছে।

যোগেশ-বাবু বাস্তবিকই বিদ্যা-নিধি ও বিজ্ঞানভূষণ; তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি যে নিখুঁৎ তথ্যবহুল ও সরস সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ তা বলাই বাহুল্য; যাঁরা তাঁর নাম জানেন তাঁরাই তাঁর বিদ্যাবত্তারও পরিচয় জানেন; সুতরাং ইহা যোগেশ-বাবুর বই বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল।

মিতা—সম্পাদক শ্রী অজরচন্দ্র সরকার, ১৭২ বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা; প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় পয়সা।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে—শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা "রাজা রামমোহন"। মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহনের বিচিত্র ঘটনা- ও কর্ম্মবহুল জীবনের পরিচয় অতি দক্ষতার সহিত দেওয়া হইয়াছে। লেখা শিশুদের উপযোগী সরল ও সরস এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বাঙ্গালী শিশুদের সঙ্গে এই মহৎ জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাইবার চেষ্টার জন্য সম্পাদক ও লেখক উভয়েই ধন্যবাদ-ভাজন।

আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছে—সাহিত্যাচার্য্য ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লেখা একটি গল্প—মিলন। দুই পরিবারের মধ্যেকার পঞ্চাশ বৎসরের "বিবাদ দুইটি সরল বালকের অকৃত্রিম ভালবাসায় সহজে মিটিয়া" যাওয়ার গল্প। গল্পের পরে একটি কবিতা আছে—"রাক্ষসের হাতে ক্ষুদ্রমণি।" ছোট ছেলেদের পাখীর বাচ্চা পাড়ার বদ্ অভ্যাসের প্রতিকারক উপদেশমূলক রূপক কবিতা।

আমেরিকাভ্রমণ—শ্রী সত্যশরণ সিংহ। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

আমেরিকার অনেক খবর এই বইএ আছে। কিন্তু লেখকের লেখায় কোনো মুন্সিয়ানা নাই, ভাষার উপর দখল নাই; সাহিত্যে কোন্ কথা চলে আর কি চলে না সে বোধ নাই। এমন অনেক জুগুপ্সিত বিষয় লেখা হইয়াছে যাহা পড়িতে লজ্জা ঘৃণা বিরক্তি জন্মে।

প্রস্রবণ—শ্রী নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়। অতুলশিব ক্লাব, লাবপুর। বারো আনা।

কবিতার বই—৩৯টি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। মিল ছন্দ নিখুঁত—কিন্তু কোনো বিশেষত্ব নাই।

তুলা—শ্রী শরচ্চন্দ্র রায়। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দেড় আনা।

তুলার শ্রেণী বিভাগ, চাষ, পাইট, তুলার ব্যাধি ও প্রতিকার, তুলা চয়ন, বীজ ছাড়ানো প্রভৃতি তুলা উৎপাদনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তিকায় চিত্র সহ বিবৃত হইয়াছে। ইহা তুলা-চাষীদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি—শ্রী অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুতরাগড়, শান্তিপুর, নদিয়া। বারো আনা।

হাওড়ার নিকটবর্ত্তী ব্যাঁটরা গ্রামের শীতলাতলার শ্রী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা ব্রহ্মর্ষি অসীমানন্দের কতকগুলি উপদেশ ও তাঁর শিষ্য গ্রন্থকারের কতকগুলি তত্ত্বমূলক গান ও কবিতা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

অখণ্ড আলোক—সত্যাশ্রয়ী লিখিত। প্রকাশক শ্রী সুশীলচন্দ্র বসু, "সৎসঙ্গ", হিমাইতপুর, পাবনা। তিন আনা।

এই চটি বইএ ধর্ম্ম কর্ম্ম শিক্ষা আলোচনা চার বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্তর-বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লোকহিত ধর্ম্ম; পল্লীর উন্নতি কর্ম্ম; সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানলাভের উপায় শিক্ষা; এবং আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

নালন্দা—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। প্রকাশক—কর মজুমদার কোম্পানী, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, কলিকাতা। আট আনা।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে বহু তথ্য একটি গল্পাকারে বিবৃত হইয়াছে; আখ্যায়িকায় সেই প্রাচীন যুগের একটি ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় গ্রন্থকারের লিখিত নালন্দা প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রবাসীর এই সংখ্যারই কষ্টিপাথর বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে—কৌতূহলী পাঠক তাহা হইতে জানিতে পারিবেন পুস্তকে কি আছে। আমরা আগ্রহের সহিত এক নিশ্বাসে বইখানি পড়িয়া ফেলিয়াছি। রচনার ভাষা ও ভঙ্গী সুন্দর; পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড়—৺ কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব। প্রকাশক—লণ্ডন লাইব্রেরী, ১৩০ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গয়াতীর্থ ও গয়ার সন্নিহিত বৌদ্ধ পর্ব্বতগুহার জন্য প্রসিদ্ধ বরাবর পাহাড় দর্শনের বিশদ ও সরস বর্ণনা।

রূপরেখা—শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এক টাকা।

গল্পের বই। গোকুল-বাবু গল্প রচনায় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ফুলের গন্ধের মতন অতি সূক্ষ্ম মৃদু একটু ভাবকে তিনি ভাষায় রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন—এই তাঁর গল্পের বিশেষত্ব। বিনিসূতার ফুলের মালার মতন সেই কথার গাঁথুনি বড় পল্‌কা, বড় ভঙ্গুর—তাহা আলতো ভাবে দরদ দিয়া সম্ভোগ না করিলে তার সব বাহার সব সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যাঁরা স্থূল রকমের কোনো গল্প খুঁজিবেন তাঁরা একটু হতাশ হইবেন। একে তাই গদ্য-কবিতা নাম দেওয়াই সঙ্গত মনে করি।

সুনীলা—শ্রী সুধাকান্ত রায় চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বাসভবন আসানসোল, ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। বারো আনা।

গল্পের বই—তিনটি গল্প আছে।

কাঞ্চনতলার কাপ—শ্রী নলিনীকান্ত সরকার। চেরী প্রেস, কলিকাতা। এক আনা।

কাঞ্চনতলা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম। সেখানে ফুটবল খেলা জিতিয়া কাপ পাওয়ার ঘটনা একজন গ্রাম্য লোক বর্ণনা করিতেছে—নিজের জেলার প্রভাষায়; সেই বর্ণনা লেখক ছড়ায় গাঁথিয়াছেন।

> কেন্টালের খেলে শিথ্‌সু লয়্যা লয়্যা বোল,—
> শালিসকে র‍্যা ফারী কহে, আর চাঁদকে কহে গোল্।
> চাঁদিরুপার বামুন অ্যাকটা কাপ কহছে অ্যাকে,
> পেলু জিৎলে তিন মাসের লেগ্যা বক্‌সিস দিবে তাকে,
> কাঞ্চনতলা জিৎলে বাজী, বাহাল থাক্‌লো গোঁ,
> তিনটা গোল খেয়্যা পোকোড় কর্‌লে দেলা বোঁ।
> সৎরোটা দল হায়রান হোলো আরে বাপরে বাপ!
> কাঞ্চনতলায় রোহ্যা গ্যালো কাঞ্চনতলার কাপ।

এই রঙ্গ-রচনার তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে—ইহাতেই বুঝা যায় যে ইহা পাঠকসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে।

পল্লীচিত্র—শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক—রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, ২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২৫২ পৃষ্ঠা। উত্তম বাঁধানো। আড়াই টাকা।

দীনেন্দ্রকুমার-বাবু পল্লীর চিত্রাঙ্কন করিয়া যশস্বী হইয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে নিজের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ আসন রচনা করিয়া লইয়াছেন। পল্লীচিত্র প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন এক বৎসরে বইয়ের দুই সংস্করণ ছাপিতে হইয়াছিল; এখন এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পল্লীগ্রামের উৎসবের শব্দচিত্র নয়টি ও গ্রাম্যশব্দের অর্থ-পরিশিষ্ট এই পুস্তকে আছে। পল্লীর উৎসবের এমন সুন্দর বর্ণনা এই পুস্তকে আছে যে সেইগুলি ছবির মতন সুস্পষ্ট ও মনোহারী। যাঁরা এ বই পড়েন নাই—তাঁরা বঙ্গসাহিত্যের একটি সুন্দর রত্নের সঙ্গে অপরিচিত আছেন; যাঁরা পড়িয়াছেন, তাঁরাও ইহা আবার পাঠে বিমল আনন্দ পাইবেন।

জীবনের ভ্রম—শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নিয়োগী-পাড়া রোড, বরাহনগর। ছয় আনা।

মানুষের শৈশব যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্যে যত রকম ভ্রম ঘটিতে পারে তাহার প্রতীকার কি, তাহারই উপদেশমূলক সন্দর্ভপুস্তক। উপদেশগুলি মহাভারত প্রভৃতির আখ্যায়িকা দিয়া সমর্থন ও বিশদ করা হইয়াছে।

ধর্ম্মপুরী—শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু (ভিখারী নীরানন্দ) কল্পিত ও প্রকাশিত, ৬ গোপাল বসু লেন, কলিকাতা। আট আনা।

ব্রহ্মানন্দাশ্রম ও অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিবার অনুষ্ঠান-পুস্তক। কি প্রণালীতে ও উপায়ে আশ্রম ও ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হইবে তার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য সাধু।

তুলসী-প্রতিভা—শ্রী প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

ভক্ত কবি তুলসীদাস গোস্বামীর আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত নাটক—গৈরিশ ছন্দে লিখিত।

প্লাবন—শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাকৃচি প্রণীত, গৌরীপুর আসাম। পাঁচ আনা।

সামাজিক নাটিকা। জলপ্লাবনে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; কৃপণ ধনীর স্বভাব পরিবর্তনে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। নাটিকার উদ্দেশ্য—"ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দেব, রুগ্নের সেবক হব, অনাথকে আশ্রয় দেব, ওরে ওরে পিতৃহারার পিতা হব।" এই নাটিকায় স্ত্রীচরিত্র নাই—বিদ্যালয়ের বালকদের পরোপকার শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত।

পুণ্ডরীক—শ্রী শ্রীশচন্দ্র বসু ব্যারিষ্টার। আর ক্যাম্বে এণ্ড কোম্পানী, ৯ হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সচিত্র।

নাটক। ভিক্তর হিউগোর নত্র্ দাম দ্য পারী গল্পের ছায়া অবলম্বনে ভারতীয় ঘটনার আকারে রচিত।

পরিত্যক্ত—শ্রী নারায়ণচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গবাণী সমবায়, ৭৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

নাটক। গ্রন্থকার ভূমিকায় নাটকের উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন—"আমাদের অন্তঃপুরের সব দরজা-জানালাগুলি বন্ধ ক'রে রেখেছি ব'লেই, চিরন্তন আজ পরিত্যক্ত, শুধু যা' ক্ষণকালের, তাই দিয়েই ঘর ভ'রিয়ে রেখেছি। হৃদয়ের নিভৃতের সব তারগুলি টান ক'রে বাঁধ্‌লেই চিরন্তন তাদের ওপর তার অফুরন্ত অনাহত রাগিণী বিচিত্র ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে দিবে। প্রাণের ধূলাকে যেদিন চিন্‌তে পারব, সেই দিনই ধূলা আমাদের চোখে সোনা হ'য়ে উঠ্‌বে।"

মুদ্রারাক্ষস

হিন্দী

১। **বিশ্বনাথ কবিরাজ কৃত সাহিত্য-দর্পণ—১ম ও ২য় খণ্ড**—সাহিত্যাচার্য্য শ্রী শালগ্রাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিমলাখ্য হিন্দীব্যাখ্যাবিভূষিত। প্রকাশক—শ্রী শ্যামসুন্দর শর্ম্মা ভিষগ্‌রত্ন, শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঔষধালয়, ৩২৮ আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ। পৃঃ ৩১২+২৩২+পূর্ব্বপীঠিকা ১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য—৩্+২্। ১৯৭৮ সংবৎ।

কবিরাজ বিশ্বনাথের এই সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি অলঙ্কার। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজকে 'সান্ধিবিগ্রহিক' ও 'মহাপাত্র' বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রতি নিজের যে প্রশংসা ('আলংকারিকচক্রবর্ত্তী') তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে পঠিত ও আলোচিত হইতেছে। সংস্কৃত টোলে ও ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার আদর সমান ভাবেই হইয়াছে। কাশীর 'আচার্য্য', বাংলার 'তীর্থ', পঞ্জাবের 'বিশারদ' এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'এম্-এ' পরীক্ষায় এই গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত।

পণ্ডিত শালগ্রাম শাস্ত্রী এই উপযোগী গ্রন্থের একটি ভাল সংস্করণ বাহির করিয়া সংস্কৃতবিদ্যার্থীদিগের উপকার করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর রামচরণ তর্কবাগীশের টীকা এবং তাঁহার নিজের কৃত 'বিমলা' টীকা এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণগুলির দোষ অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন। বাংলা দেশে ইহার আদর হইলে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীও শিক্ষা করা হইবে। এই গ্রন্থের আরম্ভে যে বিস্তৃত "বিষয়ানুক্রমণী" এবং শেষে যে "উদাহৃত-শ্লোকাদ্যানুক্রমণিকা" দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই সংস্করণের একটি বিশেষত্ব। শাস্ত্রী-মহাশয়ের এই উদ্যম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। এই গ্রন্থের ছাপাও বেশ ভাল হইয়াছে।

২। **সরল হিন্দী শিক্ষা**—শ্রী গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান—শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি-এ, ৩৪নং গোবিন্দ ঘোষালের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ১৷০। ১৯২১।

৩। **হিন্দী শব্দ ও অনুবাদ-মালা** শ্রী গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ও শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত। "হিন্দীপ্রচার কার্য্যালয়"। ১৩২৯। পৃঃ ১২০। মূল্য ৷৷০ আনা।

পণ্ডিত গোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী নিজে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর হিন্দী শিক্ষার জন্য এই দুইখানি বই বাঙ্গলাভাষায় লিখিয়াছেন। তিনি নিজে হিন্দীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং হিন্দী পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছেন। বাঙ্গালীর হিন্দী শিক্ষায় যে-সকল বিষয়ে অসুবিধা হয়—যথা বানান, উচ্চারণ, লিঙ্গ, ক্রিয়া—তাহা তিনি নিপুণভাবে সরল-ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই দুইখানি বই দ্বারা প্রথম-হিন্দী-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হইবে।

শ্রী রমেশচন্দ্র বসু

বাদল দিনে

মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ
—ঝম্ ঝম্ ঝরে জল। নাহি অবকাশ
অশ্রান্ত বর্ষণে তার। বেণুবনে আজি
উঠিয়াছে মাতামাতি,—বাঁশী ওঠে বাজি
কোথা কোন্ পথ দিয়ে বেদনা-সঞ্চারে?
জমে উঠে কোন ব্যথা ঘন অন্ধকারে?
উড়ে চলে পিউ কাঁহা ঝাপটিয়া ডানা
আম্রকুঞ্জ হতে; কেউ জানে না ঠিকানা
আকাশের কোন্ তীরে হয়ে যাবে পার!
গুরু গুরু ডাকে দেয়া—কোন্ বেদনার
দিতে অস্ফুট প্রকাশ? ছিন্ন ভিন্ন মেঘে
যে বাণী জেগেছে আজ তারি স্পর্শ লেগে
মন মোর হয়েছে উদাস। কে রোধিবে তারে?
নিরুদ্দেশ হবে সে যে আঁধারের পারে!

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বসু

স্বতঃস্ফূর্ত্তি

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে। পাখী জানে না কখন দস্তুরমততার গান গাওয়া চাই। সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে, এজন্যে তাদের বুদ্ধিবিচারের দরকার হয় না। সুনয়নী দেবীও এম্‌নি করেই তাঁর ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন। কি করে' আঁক্‌তে হয় তিনি কখনো শেখেন নি, তাই তাঁর অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং রেখায় রেখায় গান করে' উঠ্‌তে থাকে।

তাঁর ছবির মধ্যে কোনো পূর্ব্বকল্পিত আদর্শ নেই, তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেচে। তাতে রেখাগুলির ধারা অভিন্ন এবং সুনিশ্চিত; যেহেতু তারা তাঁর প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজন্যে কোনো দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করে নি; তারা প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে বা আকৃতি-সমবায়কে বেষ্টন করে' ধরে; তারা একইকালে বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মঘোষণ তেমনি আত্মসম্বরণ, বায়ুহিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মত তাদের আকুঞ্চনতা, আর সেই ভরা ফসল-ক্ষেতের মতই যেন এই রেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা বিকীর্ণ হতে থাকে।

তাঁর আঁকা বালিকাদের মুখগুলির চারদিকে পূর্ণ পরিণত প্রাণশক্তির উদ্যম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ় সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের সাড়িগুলির মধ্যে এম্‌নি একটি ব্যঞ্জনা, যেন তারা কাপড়ে তৈরী নয়, যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই সাড়ি যেন ঐ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেষ্টন

গ্রাম-বধূ
শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত
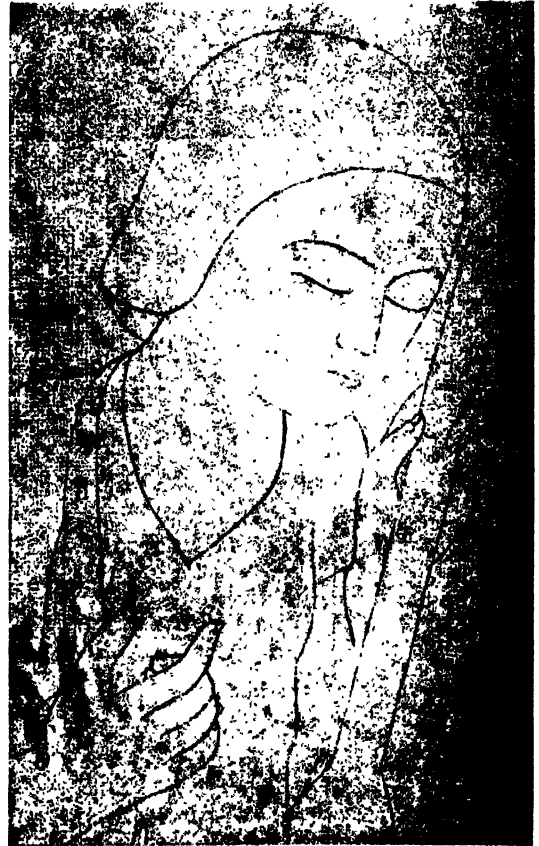
বাউল
শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত
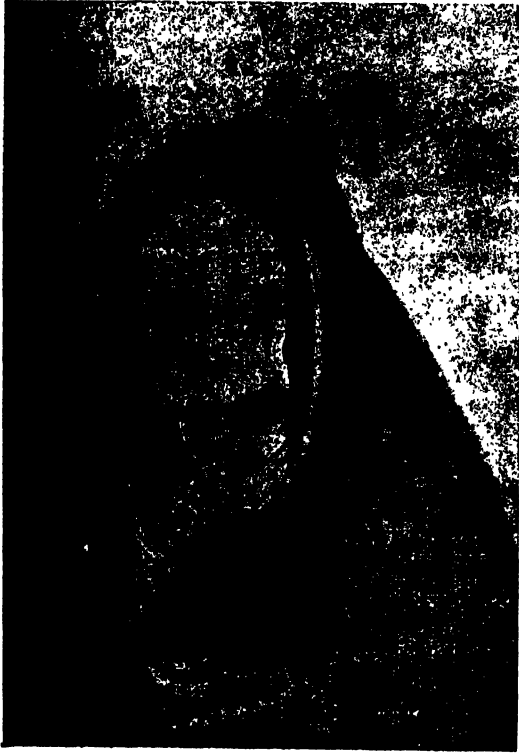
পুজারতা
শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত

করে' রক্ষা করুচে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবার্ত্তা যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই তা বুঝে নিয়েচে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে এই সাড়িগুলি যেন বড় আদরের দোলায় দোলাচ্চে। এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; তারা সেই অন্তরলোকের দূতী যে লোক লাল এবং সবুজ সাড়ির বিলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাদের ঐ দীর্ঘ এবং স্থির অথচ পাখীর মত উদ্যত চোখ-দুটির ভিতর দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই ছবিটিকে জীবনপূর্ণ করে' তুলেচে।

এমনি করে' ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখা দিয়েচে। একটি হচ্চে, শস্যক্ষেতের ভিতরকার বায়ু-মূর্চ্ছনার মত শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাম্ভীর্য্যের বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে ঐক্য এবং ধ্রুবত্ব দান করেচে। আরেকটি হচ্চে ঠিক এর বিপরীত, সেটি চঞ্চল, তীক্ষ্ন, লঘু; সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে

অর্দ্ধনারীশ্বর
শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত

দ্রুত ধেয়ে চলে। এমনি করে' চোখ, ঠোঁট, এবং হাত দুটি মিলে একখানি ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখীর ওড়ার মত ত্বরিত বেগে রচনাটির সুসংযত প্রবাহের উপর দিয়ে চলে যায়।

এম্‌নি করে' খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেচে। সুনয়নী দেবীর আর্টের মূলতত্ত্বই হচ্চে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একইকালে অনিত্য এবং ধ্রুব। এই ত সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড প্রবাহিত কলা-রীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করুতে পেরেচেন। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব্ব করে' ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই ত্রুটি বিস্মৃত এবং মার্জ্জনাপ্রাপ্ত হয়েচে। রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ ভারতীয় রেখার আকুঞ্চন-ভঙ্গী (curvature) আপনার শান্ত সকরুণ সুরটিকে প্রকাশ করেচে।

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্ব্বেকার জিনিষ, তারই সঙ্গে এত সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকাল-

কার দিনের কোনো পুরুষ চিত্রকর এমন করে' চিত্র রচনা করতে পারত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সূক্ষ্মচেতনা, এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তর্গূঢ় জাতীয় জীবনের অখণ্ড ধারাবাহিকতার সহজ-বোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েচে। সেইজন্যেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম-বধূরা তাদের আল্পনায় যে-সব মোলায়েম গোল রেখার ধারা আঁকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলা-প্রচলিত প্রাণের গতি-রেখা দেখ্‌তে পাই।

সুনয়নী দেবী আর্টিস্‌ট্‌ পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো ভাই বহুকাল পূর্ব্বে অজন্তার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, মার্গারিটোনে ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব ভাইদের মধ্যে কেউ কারো অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে' চলে তখন দেশকাল নির্ব্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্যেই ত সকল কালের সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।

যে একটি দ্বিধাহীনতার জোরে সুনয়নী দেবী তাঁর তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে নিয়েচেন। তাঁর বৈচিত্র্যহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি গাম্ভীর্য্য আছে। সোনালি আর কালো রং পরিমিতভাবে বাঁটোয়ারা করে' দিয়ে তাঁর ছবিতে তিনি ঘনতা দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের, পর্দ্দার কোমল ধূসর (grey) এবং পিঙ্গল (brown) রঙের এক সমতলে তিনি লাল আর সবুজ রঙ মেলে ধরেছেন।

এই রকম চিত্রকলার মধ্যে যে নিবিড়তা আছে সে নিজের মধ্যেই নিজে বদ্ধ থাকে, কেননা শিল্পীর অন্তর্নিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয়। কোনো শিক্ষা, বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে' দিয়ে নষ্টই করতে পারে। আরও একটি বিপদ আছে, মাঝে মাঝে সুনয়নী দেবীকে তা আক্রমণ করে' থাকে, সে হচ্চে মানুষের জীবনযাত্রা ও গল্পের সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য। তাঁর নিজের সৃষ্টি যে-সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি তাঁর দৃষ্ট বা কল্পিত পদার্থের অনুকৃতি-চেষ্টায় খাটাতে হয় তাহলে তাঁর সহজ সৃজনশক্তির উৎস এইসব জঞ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তাহলে তাঁর দৃষ্টির ও লেখনী-চালনার ক্ষিপ্রতাই প্রবল হয়ে উঠ্‌বে এবং হৃদয়াবেগ ও ঘটনা-বর্ণনার ব্যস্ততায় তাঁর রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে' যাবে।

সুনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্‌টের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে। তাঁর আর কিছু দর্‌কার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তাহলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাক্‌বে।

ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ্‌

আসা-যাওয়ার মাঝখানে

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছ চেয়ে কাহার
পথ-পানে!
আকাশে ঐ কালোয় সোনায়
শ্রাবণ-মেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার-আলোর কোন্ খেলা যে
কে জানে,
আসা-যাওয়ার মাঝখানে!

শুক্‌নো পাতা ধূলায় ঝরে,
নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপন-হারা,
পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চলে' ঐ অশ্রুভরা
কোন্ গানে,
আসা-যাওয়ার মাঝখানে!

১৮ আষাঢ়, ১৩২৯

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্যের নারী

পারস্য দেশে যখন কোন সম্পন্ন-গৃহস্থের ঘরে পুরুষ-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, গৃহে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। কত রকমেই যে তাহার আগমন-বার্ত্তা লোককে জানান হয়, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সন্তান যদি স্ত্রী হয়, তবে আনন্দের পরিবর্ত্তে নৈরাশ্য এবং গভীর দুঃখ গৃহবাসীদের ছাইয়া ফেলে। পুরুষ-সন্তানের আগমনে বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ভোজ পায়, স্ত্রী-সন্তান জন্ম লইলে তাহারা অনেককাল পর্য্যন্ত সে খবর জানিতেও পারে না।

সন্তানের জন্ম হইবার পূর্ব্বে জননীর ঘরে দুটি দোল্‌না থাকে, একটি চমৎকার গদিওয়ালা, নানা-রকমের রং-বেরঙের ঝালর দেওয়া এবং আর-একটি নেহাৎ কম-দামী—কোন-রকমে-কাজ-চলা গোছের। দুটি ভাল পোষাক থাকে। একটি রেশম সাটিন বা অন্য কোন বহুমূল্য বস্ত্রের তৈয়ারী, অন্যটি দ্বিতীয় দোল্‌নাটির মতই যা তা। ভাল দোল্‌না এবং ভাল পোষাকটি পুরুষ-সন্তানের জন্য এবং খারাপ দুটি কন্যা-সন্তানের।

সন্তান জন্ম লইলে পর, ধাত্রী তাহাকে বাঁ হাতে ধরিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে জল ছড়াইয়া দেয়। তারপর তাহাকে বেশ করিয়া ধুইয়া পুছিয়া পোষাক পরানো হয়। পোষাক পরা হইলে একটা চৌকা বালিশে শিশু বাঁধা থাকে। কেবল হাত আর মাথা খোলা অবস্থায় থাকে। শিশু যদি বড় বেশী কাঁদে তবে তার পৃথিবী-আগমনের প্রথম সপ্তাহ আফিমের নেশাতেই কাটিয়া যায়। আফিমের নেশার ঘোরে সে এক-রকম বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া থাকে।

ধাত্রী এবং সন্তানের জননী সন্তানকে "দূষিত চক্ষুর আক্রমণ" হইতে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। নীল রঙ্ নাকি শিশুকে এই-সব আক্রমণ হইতে বাঁচায়। তাইজন্য শিশুর বক্ষের উপর অনেক-সময় নীল কাপড়ের ফালি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই-সমস্ত ফালির সঙ্গে মন্ত্রপূত মাদুলি ঝুলানো থাকে। মক্কা হইতে আনীত বলির ভেড়ার চোখের মধ্যে নীলা পাথর বসাইয়া বা পশম দিয়া ছোট একটি উষ্ট্রমূর্ত্তি তৈরী করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেই শিশু "শনিদৃষ্টি"র প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়।

শিশুকে আপদ হইতে বাঁচাইবার আর-একটি উপায় তাহাকে ধোকড়-ধাকড় জামা-কাপড় পরানো। তাহা হইলে শিশুকে কেহ প্রশংসা করিবে না। ভাল-পোষাক-পরা শিশুকে লোকে প্রায়ই ভালবাসে এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, কিন্তু প্রশংসা-বাক্যের শেষে "মসাহ্লা" (ঈশ্বরই সর্ব্বশক্তিমান)—এই কথাটি বলিতে ভুলিয়া যায়। তাহাতে শিশুর অদৃষ্টদেবতা অপ্রসন্ন হন এবং শিশুর ভাগ্য-লিপিতে অকল্যাণ-বাণী লেখেন।

শিশুর যা-কিছু অসুখ হয় সবেরই কারণ নাকি মন্দ-চোখের-দৃষ্টি। একবার একটি শিশুর মস্তিষ্কে নাকি জলাধিক্য হইয়াছিল। হাকিম আসিয়া বলিলেন, শিশুকে একটা দানাতে পাইয়াছে। তাহার জন্য ব্যবস্থা হইল এইরূপ—শিশুর পিতা-মাতাকে একটা নূতন কবর খনন করিতে হইবে এবং রাত্রে শিশুকে ঐ কবরে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। প্রাতঃকালে দানা হয় শিশুকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, নয় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। সমস্তই যথাযথ করা হইল। সকালে দেখা গেল, শিশু বেশ ঘুমাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাকে দানা ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহার অসুখের কমতি হয় নাই, বাড়তিও হয় নাই।

শিশু-কন্যার পিতা প্রায় ক্ষেত্রেই কন্যাকে আদর করেন না। তবে যদি পিতার অন্য পুরুষ-সন্তান থাকে তবে তিনি "অন্দারুনে" তাহাকে দয়া করিয়া কোলে করেন, বছরে গোটা-দুয়েক চুমাও দিয়া থাকেন। শিশু-কন্যা বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেই একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠে এবং তার

আট বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সে পাঠশালে পড়িতে পারে। আট বছর পূর্ণ হইলেই শিশু-কন্যার পাঠ সাজ হয়। তবে বড়-ঘরের মেয়েদের আলাদা কথা। পারস্যের যে-সব নারী লিখিতে এবং পড়িতে জানেন—তাঁহারা অতি বিদুষী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত, এবং লোকে তাঁহাদের দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। আট বছর বয়স পূর্ণ হইলেই মেয়েকে তাহার খেলার সাথীদের সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতে হয়।

পারস্যের ঘর-বাড়ীর বিষয় কিছু না বলিলে মেয়েদের জীবনের কথা সব বুঝা যাইবে না, সেইজন্য তাহাদের ঘর-বাড়ী কেমন ধরণের হয় তাহার বিষয় কিছু বলিব।

বাড়ির চারিদিক উঁচু দেওয়ালে ঘেরা এবং বাড়ীর মাঝখানে উঠান। বাহির হইতে অন্দরের কিছুই দেখা যায় না। সদর দরজা প্রকাণ্ড, এবং এই দরজা দিয়া "বাইরুন"এর (বাহির মহলের) প্রবেশ পথ। বাহির মহল কেবল পুরুষেরাই ব্যবহার করে। বন্ধু-বান্ধব আসিলে এইখানেই বসে। বাহির মহল খুব সামান্য রকমে সাজান থাকে। এইখানে বাড়ির কর্ত্তা তাঁহার কাজকর্ম্ম করেন এবং অবসর সময়ে নানা রকমের বাজে গল্প করিয়া কাটান। বাড়ীর ছেলেরাও বাইরুনে বসিয়া মোল্লার কাছে কোরাণ পড়িতে এবং লিখিতে শিখে। কোরাণের মানে বুঝিবার কোন দরকার হয় না। চাকরেরা সব-সময় ছেলেদের কাছে কাছে থাকে। মেয়েরা বাইরুনে আসিতে পায় না। অন্দারুনে যাইবার পথটি সরু এবং অন্ধকার, শেষে একটি দুয়ার আছে। অন্দারুনের ব্যবস্থা সব দিক হইতেই বাইরুন অপেক্ষা ভাল। অন্দারুনের কোঠাগুলি হইতে উঠানের ছোট ফুলের গাছগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট গাছে নানা রকমের রঙিন এবং সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া আছে। ঘরগুলিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেতে গালিচা পাতা, নীচু চৌকি, ছবি ইত্যাদি দ্বারা সাজান ঘরগুলি দেখিতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু অন্দারুনের এই-সব যতই চমৎকার হউক—বাইরুনের কারো সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। অবশ্য বাড়ীর পুরুষ এবং নিকট আত্মীয়দের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নয়। কর্ত্তার সবচেয়ে

পারস্যের নারী—অন্তঃপুরে

অন্তরঙ্গ বন্ধুও কখনো অন্দারুনে আসিতে পায় না। তাহারা বন্ধুর স্ত্রী-পরিবার সম্বন্ধে কোন কথাও খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কোন কথা জানিতে হইলে—বাড়ীর সব কেমন—এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এইজন্য পারস্য দেশের নারী-মহলের কথা যতই ভাল করিয়া বলা হউক না কেন, সব নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ হয় না।

পারস্যের স্নানাগার—এইখানে নারীদের মজলিস বসে। আমাদের দেশের পুকুর-ঘাটে দুপুর বেলা যেমন গ্রামের ললনাকুল জমা হন—পারস্যের দেশের স্নানাগারও ঠিক তেমনি। মাঝে মাঝে এইখানে তারা সমস্ত দিন কাটায়—খাবার বন্দোবস্ত এখানে আছে। যত রকমের বাজে গল্প চলে। মেয়েরা বাড়ী হইতে আসিবার সময় ছোট ছোট বালিস আনে এবং একটি সুন্দর ছোট বাক্সে নানা রকমের সুগন্ধি তেল, তোয়ালে ইত্যাদি স্নানের জিনিষ আনে। গরম এবং ঠাণ্ডা উভয় প্রকার জলেরই আয়োজন থাকে। প্রথমে গরম জলে অবগাহন করিয়া তারপর ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়ার নিয়ম। স্নানের পর চুলে নীল এবং

পারস্যের নারী—বাহিরে

হেনা লাগান হয়। আঙুলের নোখেও হেনা দেওয়া হয়। চোখে সুর্‌মা সকলেই লাগায়।

পারস্যে জলাভাব বড় ভয়ানক, সেইজন্য স্নানাগারের জল প্রত্যহ বদ্‌লান হয় না। বড়লোকদের স্নানাগারের জল দু-এক দিন অন্তর নূতন করিয়া ভরা হয়, কিন্তু যেগুলি গরীবদের স্নানাগার, সেগুলির জল ভয়ানক দূষিত হইয়া থাকে। নানা রকমের রোগের বীজে জল পূর্ণ থাকে। সেখানে স্নান করা ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার।

শুক্রবার ছুটির দিন। সেইদিন সকলেই স্নানাগারে যায়। কারণ মস্‌জিদে যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের স্নানাদি করিয়া পবিত্র হইতে হইবে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম-মতে নারীদের কোন আত্মা নাই বলে—সেইজন্য খুব কম নারীই মস্‌জিদে যায়। মস্‌জিদে অবশ্য নারীদের জন্য বসিবার ঘন-পর্দ্দাওয়ালা স্থান আছে। এইখানে বসিয়া তাহারা সব দেখিতে পায় কিন্তু বাহিরের কেহ তাহাদের দেখিতে পায় না।

নারীদের পোষাক।—ঘরের ভিতর নারীরা ভেল্‌ভেটের জ্যাকেট্ ব্যবহার করে এবং খুব আঁট, হাটু পর্য্যন্ত পায়জামা পরে। পায়ে শাদা মোজা থাকে। শাহ নাসীরউদ্দীনের সময় হইতেই এইরূপ পোষাকের চলন। তিনি নর্ত্তকীদের এই রকমের পোষাকে দেখিতে বড় পছন্দ করিতেন। কিন্তু পারস্যের গরীব গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা গোড়ালী পর্য্যন্ত আঁট পায়জামা ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে সকল নারীই আপাদমস্তক কালো চাদর মুড়ি দিয়া বাহির হয়, কেবল মুখের কাছে রেশমের লেস দেওয়া ঘোম্‌টা থাকে। লাল বা সবুজ রঙের পায়জামা পরিয়াই অধিকাংশ নারী বাহিরে যায়। ঘরের বাহিরে যদি কোন পুরুষ তাহার মাতা বা স্ত্রীকে চিনিতেও পারে, তবুও কোন কথা বা অঙ্গভঙ্গী না করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বাহিরে কথা বলা বেয়াদবী। যদি কোন লোক কোন মেয়ের ঘোম্‌টা তুলিয়া দেখে তবে তাহার শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড।

মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইলেই (প্রায় মেয়ের খুব কম বয়সেই বিবাহ হয়) পিতা-মাতা উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করেন। বিবাহ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের বিশেষ কোন দাম নাই। অনেক মেয়ের বিবাহ ১৫।১৬ বছর বয়সেও হয়।

মেয়েদের মুখ তাহাদের আত্মীয় ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না, সেইজন্য ঘটকরাই প্রায় সব বিবাহ স্থির করে। পারস্যে মাস্‌তুত পিস্‌তুত খুড়্‌তুত বোনকে অনেকেই বিবাহ করে। ঘটকেরা বিবাহযোগ্যা পাত্রী এবং বয়স্ক পাত্রের পিতামাতার নিকট যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা লাভ করে। কারণ ঘটক খুসী থাকিলে সে সুন্দর পাত্র বা পাত্রী যোগাড় করিয়া দিতে পারে।

কোন পাত্রের জন্য পাত্রী স্থির হইলে পর পাত্রের মাতা এবং আরো দু-একজন আত্মীয়া কন্যার বাড়ী বেড়াইতে যান। কন্যা হয়ত পথে আপাদমস্তক মণ্ডিত হইয়া, পাত্রকে কোনদিন দেখিয়া থাকিবে, এবং তাহার হয়তবা ঐ পাত্রকে পছন্দ হয় নাই। তখন তাহার বিবাহ হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র উপায় আছে। পাত্রের মাতা ইত্যাদি তাহার বাড়ীতে আসিলে, কন্যা খুব অনাদর এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাহাদের চা কেক ইত্যাদি পরি-

পারস্যের নারীর আগুন পোহানো—
বালাপোষে ঢাকা টেবিলের তলায় আগুনের আংটা লুকানো আছে।

বেষণ করে। এইরূপ ব্যাপার হইলে বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথা হয় না। আর পাত্রী যদি খুব যত্ন করিয়া পরিবেষণাদি করে, তবে বিবাহের সব পাকা বন্দোবস্ত হইয়া যায়। পাত্রের মাতা, পাত্রী এবং তাহার মাতাকে চা-খাইবার নিমন্ত্রণ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ভাবী স্ত্রীর মুখ দেখিতে পায় না—কিন্তু কন্যা যেদিন তাহাদের বাড়ী আসে, সে আনাচে-কানাচে গোপন থাকিয়া ভাবী পত্নীর সুন্দর মুখখানা একবার দেখিয়া লয়। পুরোহিতের সাম্‌নে পাত্র এবং পাত্রী বাগ্‌দত্ত হয়। পাত্র ইচ্ছা করিলে এই সময় বিবাহ বাতিল করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কিছু দণ্ড দিতে হয়। দণ্ডের পরিমাণ—পাত্র যৌতুক হিসাবে শ্বশুর বাড়ী হইতে যাহা পাইত, তাহার অর্দ্ধেক। এই রকম করিয়া যে বিবাহ ভঙ্গ করে, সমাজে তাহাকে নানা প্রকার অপমান সহিতে হয়। বাগ্‌দত্ত হইবার সময় একটা জ্বালান মোমবাতি, একখানি কোরাণ এবং একটি আয়না, আর একটা ট্রে'র উপরে নানা-প্রকার গন্ধদ্রব্য, শুকান বীজ, এবং খেজুর কন্যার কাছে রাখা হয়। কন্যা একটা সবুজ চাদরে আবৃত থাকে এবং কাহারো সঙ্গে কথা বলিতে পায় না। তারপর একটা জ্বালান মোমবাতি একটা পিতলের গাম্‌লা দিয়া ঢাকা দেওয়া হয়। কন্যা এই দ্রব্য-সমষ্টির ওপর একবার বসে। ইহার অর্থ, সে স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করিল।

বিবাহের সময়েও কন্যার দেহে এই সবুজ চাদরটি থাকে। বিবাহের পর তাহার সৌভাগ্য কামনা করিয়া এক-টুক্‌রা সোনা দেওয়া হয়। তাহার ভাবী সংসারে প্রাচুর্য্য প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে একটুক্‌রা রুটি এবং একটু নুন দেওয়া হয়। তারপর কন্যা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময় উনানের পাথরটাকে চুম্বন করিয়া যায়। বিবাহ ব্যাপার খুবই ব্যয়সাধ্য। অনেকে বিবাহের সময় প্রচুর ঋণ করে। বিবাহের সময় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ভিক্ষুক ইত্যাদি সবাইকেই খুব ভোজ দেওয়া হয়। নাচ-গানেরও বন্দোবস্ত থাকে।

স্ত্রীর সুখ-দুঃখের সমস্ত ভার স্বামীর উপরেই থাকে। স্বামীর মর্জ্জি হইলে স্ত্রী রাণীর মত থাকে, আবার স্বামীর খেয়ালে স্ত্রী গোলামের মত দিন কাটায়। বিচারের জন্য স্ত্রী একমাত্র স্বামীর কাছেই নালিস করিতে পারে। তবে স্ত্রীর যদি ধনী এবং প্রতাপশালী আত্মীয় থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে দুঃখ দিতে সাহস করে না।

স্বামী ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে।

স্ত্রীর পুত্রসন্তান না হইলে স্বামী পুনরায় বিবাহ প্রায় ক্ষেত্রেই করিয়া থাকে। অনেক সময় এই নবাগতার সেবাও প্রথম পত্নীকে করিতে হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমনে প্রথম স্ত্রীর দাম অনেক কমিয়া যায়, তাহাকে সংসারের দাসী বলিলেও কিছু অন্যায় বলা হয় না।

কারমান সহরের এক পাহাড়ের গা হইতে একটা ঝরণা বাহির হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে আঘাত করিয়া আলি নাকি এই ঝরণা বাহির করিয়াছিলেন। যে-সমস্ত নারীদের সন্তান হয় না, তাহারা এই ঝরণার জলে স্নান করে, নানা রকম পূজা অর্চ্চনা এইখানে করে। পারস্য দেশে এই রকমের আরো স্থান আছে। সন্তান থাকিলেও নারীরা সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এইখানে আসে।

বাল্যকাল হইতেই পারস্যের লোকেরা স্ত্রীলোকের কথায় কান না দিবার শিক্ষা পায়। নারীর নাকি কোন আত্মা নাই। দেহের শেষ হইলেই নারীর সব শেষ হইল। মৃত্যুর পরে পুরুষ স্বর্গে যায়, সেখানে সে ক্ষীর-সাগরের তীরে থাকে। হুরীর দল তাহার সেবা করে। সেখানে গাছে গাছে নানা রকমের সুখাদ্য ভারে ভারে ফলিয়া আছে। দিবা-রাত্রি হুরীর সঙ্গীতে মন মাতোয়ারা হইয়া থাকে। নারীর মৃত্যুর পর নরক ছাড়া আর গতি নাই। তবে কোন নারী যদি খুব পুণ্যের কাজ কিছু করে তবে তাহার স্বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্তু এই স্বর্গও পুরুষদের স্বর্গ হইতে অনেক খারাপ।

পারস্যে স্ত্রৈণ পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। নারী সব সময়েই তাহার স্বামীর ভয়ে থাকে। একবার এক পারস্য-নারী একজন শ্বেতাঙ্গ নারীকে পারস্য-পুরুষ বিবাহ করিতে নিষেধ করেন।

একবার এক নারীর গালে, তাহার পুত্রের অসাবধানতায় একটা বন্দুকের গুলি লাগে। সাহেব-হাসপাতালে তাহার চিকিৎসা হয়। যখন সে আরোগ্য লাভ করিল, তাহার স্বামী আসিয়া হুকুম করিল, "নারী, তোমার ঘোম্‌টা খোল, আমি তোমায় দেখব।" তার পর সে যখন দেখিল তাহার মুখ দেখিতে বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে স্ত্রীকে তাহার পুত্র সমেত ত্যাগ করিল। তাহার পর এই নারীকে পরের ঘরে দাসীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতে হয়।

পারস্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও লোকে এখন ক্রমে এক-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র্যই বোধ হয় ইহার কারণ। অনেক লোক আজ্‌কাল পারস্যের নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য চিন্তা করিতেছেন। নারীদের অবস্থা সব দিকেই যে খারাপ তাহা নয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল অবস্থার, তাহাদের বন্ধুবান্ধব আসিলে তাহারা বেশ আনন্দে দিন কাটায়। শনিবারে কোন বন্ধু আসিলে সে সোমবারের পূর্ব্বে যাইতে পারে না, মঙ্গলবারে আসিলে বৃহস্পতিবার, এবং বৃহস্পতিবারে আসিলে শুক্রবারে তাহারা গৃহ ত্যাগ করিতে পায়। এই নিয়ম পালন না করিলে নাকি গৃহের অকল্যাণ হয়। স্ত্রীর বন্ধু যতদিন বাড়ীতে থাকে, বেচারা স্বামীকে বাহিরে বাহিরেই থাকিতে হয়।

পারস্যের নারীরা প্রায়ই ভোজ দেয়। এই সময় তাহারা খুব জমকাল পোষাক পরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের আদরে অভ্যর্থনা করে। "তোমার স্থান অনেকদিন খালি আছে, তোমার ছায়া যেন ক্ষীণ না হয়, তোমার নাক যেন মোটা হয়"—এই রকমের অনেক প্রকার অভিবাদন-বাণী প্রচলিত আছে। সকলে কার্‌পেটের উপর উপবেশন করে। কোন বড়-ঘরের নারী আসিলে, সকলেই তাহাকে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে স্থান করিয়া দেয়। আবার গরীব ঘরের কেহ আসিলে, তাহার দিকে কেহ বিশেষ নজর দেয় না।

চাকরে চা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি বিতরণ করে। গেলাসে করিয়া দুধ-বিনা চা দেওয়া হয়, তাহাতে ডেলা ডেলা চিনি ফেলিয়া দেওয়া হয়। আরো অনেক রকমের খাবার এবং ফল দেওয়া হয়।

নারীদের ভূতপ্রেত দানা ইত্যাদিতে অত্যন্ত বিশ্বাস আছে। ভূতেরা নাকি নির্জ্জনে কবরস্থানে পোড়ো বাড়ী ইত্যাদিতে বাস করে। তাহারা পথিকদের পথ ভুলাইয়া দেয়, এবং তারপর তাহাদের হত্যা করিয়া ভোজন করে। ভূতের ভয়ে, কোন নারী একলা শোয় না, বা বাসি খাবার খায় না; বাসি খাবার ভূতে দেখিতে পাইলে

নাকি বিষে পরিণত করিয়া দেয়। পারসীকরা কুকুর বিড়াল হত্যা করে না, কারণ অনেক সময় তাহাদের মধ্যে জিন এবং আফ্রিট্সরা বাস করে। তাহারা দেহ-ছাড়া হইলে হত্যাকারীর অমঙ্গল হয়। কারমান সহরে লোকের বিশ্বাস যে, সোমবার সাপ মারিলে পাশের বাড়ীর কেহ না কেহ মরিয়া যাইবে। চড়ুই পাখীরা গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে। পেঁচা বড় খারাপ। নারীরা স্বপ্নেও খুব বিশ্বাস করে। নারীদের এই রকমের অনেক কু-সংস্কার আছে।

বুধবার বড় অশুভ দিন। এই দিন নাকি পৃথিবীর শেষ বিচার হইবে। এই দিনে সবাই গৃহের বাহিরে কাটায়। বুধবারে তাহারা কাহারো সঙ্গে কলহ করে না। পারস্যের শাহের যাহাকে ইচ্ছা ঘোম্‌টা খুলিয়া দেখিবার অধিকার আছে। যে নারীকে তিনি দেখেন, তাহার ভাগ্য নাকি বড়ই ভাল।

দূরে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নারীরা দান করে, তাহাতে পথের বিপদ নাকি কাটিয়া যায়। ভৃত্য প্রভুপত্নীকে আয়না দেখায়, জলে ভাসা ফুল দেখায়, বা এক-রকমের লতা পোড়ায়। এই-সব করিলে নাকি পথে কোন বিপদ ঘটে না।

যাত্রার পূর্ব্বে হাঁচি হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই দিনের মত যাত্রা বন্ধ করা হয়। কিন্তু হাঁচির ভাল গুণও আছে। কেহ কোন কিছু মনে মনে কামনা করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ হাঁচে, তবে তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়।

পারস্য দেশে রোগকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। "গরম ব্যাধি" এবং "ঠাণ্ডা ব্যাধি"। গরম রোগের (যেমন জর) ঔষধ—রোগীকে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে চোবান। নানা প্রকার মন্ত্রাদির দ্বারাও রোগ দূর করিবার ব্যবস্থা আছে।

মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহারা স্বর্গ-লাভের উপায় চিন্তা করে। সমস্ত গয়নাদি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ জোগাড় করিয়া স্বামীর অনুমতি লইয়া, মক্কা বা কারবালা তীর্থে যাত্রা করে। যাহাদের অতদূর যাইবার সামর্থ্য নাই, তাহারা মেসেদের ইমাম রেজা মন্দিরে তীর্থ করিয়া আসে। এই তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাহার নাম হয় মাহস্তাদি। যাহারা মক্কা বা কারবালা ঘুরিয়া আসে তাহাদের লোকে হাজি এবং কারবালা বলে।

তীর্থ-যাত্রীকে পথে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। খচ্চরের পিঠে এক-রকমের ঝুড়ির মত বসিবার বন্দোবস্ত থাকে। ইহাকে কাজাভেহ্ বলে। যাত্রীকে আপাদ-মস্তক কালো চাদরে ঢাকিয়া যাইতে হয়। চোখের কাছে একটু খোলা থাকে। পথে যে-সমস্ত সরাই আছে, সেখানে থাকার কষ্ট অসীম। ঘরের বন্দোবস্ত এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। পথের নানা-রকম কষ্ট পার হইয়া যখন যাত্রী তীর্থে উপস্থিত হয়, তখন সে সেখানে বছর-খানেকের মত থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লয়। এই এক বছর সে রোজ মস্‌জিদে যায়, দান-ধ্যান করে, কোরাণ-পাঠ শোনে। দিনের অন্য সময় নিজের দেশের আগত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া কাটায়। তীর্থে মরণ হইলে তাহার স্বর্গ লাভ হইবেই। তাহাকে ঘরের ভাবনা ভাবিতে হয় না, কারণ স্বামীই সেখানের সব কাজের কর্ত্তা। ছেলে-মেয়েরাও দাসদাসীদের কাছে বেশ সুখেই থাকে। গৃহিণী মারা গেলেও পরিবার যেমন তেমনিই থাকে। তীর্থস্থানে মরণ হইলে একটা যার-তার পুরানো কবরে তাহাকে গোর দেওয়া হয়। দেশে ফিরিয়া মরণ হইলে বেশীর ভাগ লোকেরই কুমের মস্‌জিদের নিকটেই গোর-স্থানে কবর দেওয়া হয়। পারস্য দেশের অনেক স্থান হইতেই এখানে মৃতদেহ সমাধি বাস করিতে আগম করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

বনমানুষের কথা
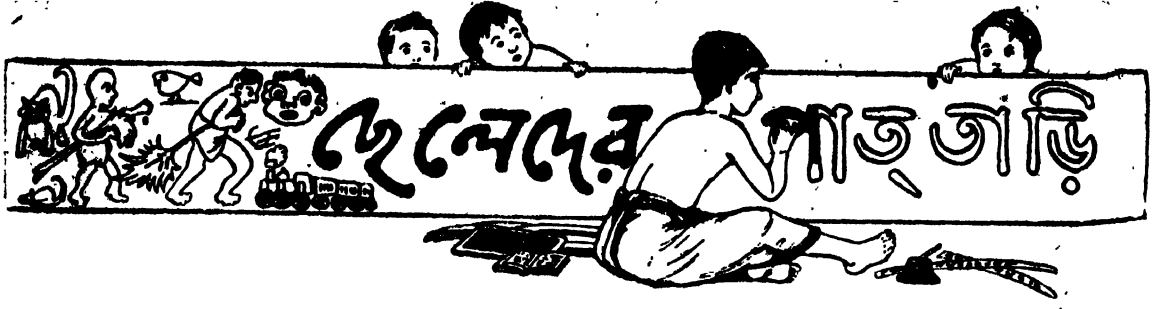
বনমানুষই নাকি মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। অনেক পণ্ডিত এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যদিও এই কথাটা বিশ্বাস করিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় না, কারণ ভাল লাগে না। বনমানুষের বুদ্ধি পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। শিম্পাঞ্জী অপেক্ষা বনমানুষ অনেক স্থির এবং ধীর। শিম্পাঞ্জীর ছটফটানিকে বনমানুষ ছেলে-মানুষী বলিয়া তত বেশী পছন্দ করে না। বনমানুষ যখন জঙ্গলে থাকে, সে বড় একটা মাটিতে নামে না। অবশ্য যখন শীকারীর বন্দুকের গুলি খায় তখন আহত হইয়া অনেক সময় তাহাকে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া মাটি আশ্রয় করিতে হয়। যখন জল-তৃষ্ণা পায়, সে জলের ধারের কোন একটা গাছের ডালের একেবারে আগায় গিয়া বসে। ভারের চোটে ডালটা নুইয়া যখন জলের খুব কাছাকাছি যায়, তখন বনমানুষ জলপান করে। বনমানুষ বন্দী হইবার পর, গভীর মনের দুঃখে খাঁচার একটা পাশে চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহাকে দেখিলে, আমাদের হয়ত কষ্ট হইবে না, কিন্তু স্বাধীনতা-পিয়াসী লোকের সত্যই কষ্ট হয়। তবে বাচ্চা অবস্থায় তাহাকে বন হইতে বন্দী করিয়া আনিলে সে বন্দীশালাতেও বেশ থাকে। তাহাকে যে যত্ন করে, খাওয়ায় পরায়, তাহার সঙ্গে বনমানুষ-বাচ্চার বেশ ভাব হয়।

কাজের সময় কাজ

মিঃ শিক্ নামে এক ভদ্রলোক এক জন্তু-দলের সঙ্গে সহরে সহরে ঘুরিয়া পশু-পক্ষী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন। এমন সময় হটাৎ কে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তার পরেই দেখিলেন, একটা বনমানুষ বাচ্চা তাহার খাঁচার দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া, তাঁহার কোলের উপর আয়েস করিয়া বসিল।

নিউ ইয়র্ক জন্তুশালায় দেখা যায়, বনমানুষ তা'র পালকের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। পালক হয়ত দৌড়াইয়া তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইতে চায়, বনমানুষও লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ডিগ্‌বাজি খাইতে খাইতে তাহার সঙ্গে দৌড়াইতেছে। অনেক বনমানুষকে টেবিলে বসিয়া ছুরি কাঁটার সাহায্যে খাইতে দেখা যায়, বোতল হইতে মদ গেলাসে ঢালিয়া খাইতেও অনেক সময় দেখা যায়।

১৯০৮ সালের নিউ ইয়র্ক পশু-প্রদর্শনীতে একটি দু-বছরের বনমানুষ বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সে তাহার সহবাসী শিম্পাঞ্জীটাকে বড় ভয় করিত। শিম্পাঞ্জীটা তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁত খিঁচাইলেই সে দৌড়াইয়া গিয়া, তাহার পালকের গলা জড়াইয়া ধরিত। এমন করিয়া তাকাইত যাহাতে মনে হইত, সে যেন বলিতেছে —"ওগো, আমাকে ঐ অসভ্য কুৎসিত জানোয়ারটার হাত হইতে রক্ষা কর।"

বনমানুষের হাসি মানুষের হাসির মতই। শিম্পাঞ্জীর মত বিকট শব্দ করিয়া তাহারা হাসে না। বনমানুষের স্বজাতি-প্রীতি বড় বেশী আছে। একসঙ্গে দুটি বনমানুষ থাকিলে তাহারা বেশ হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়, তবে শিম্পাঞ্জীর মত বীভৎস রকমের চেঁচামেচি করে না। বনমানুষ ভ্রাতা-বনমানুষের জন্য প্রাণ দিতেও কসুর করে না। দু-একটি বনমানুষ আবার অন্য ছোট জন্তুদের বড় স্নেহের চোখে দেখে। প্রিয় ছোট জন্তুটির অনেক আব্‌দার সে সহ্য করে। এক চিড়িয়া-খানায়
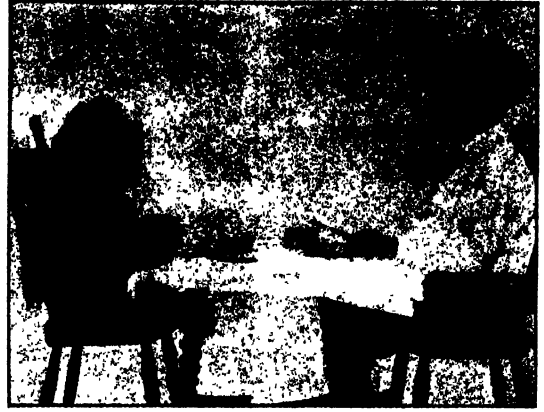
সিগারেটটাও চলে

একটা বনমানুষের একটা পোষা বানর ছিল। বানরটা বনমানুষটিকে কত রকমে যে জ্বালাতন করিত তাহার ঠিক নাই।

বনমানুষ নিজের প্রয়োজনের জন্য আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশল দেখায়। এক ভদ্রলোকের পোষা বনমানুষটি সত্তরটি কথার মানে বুঝিতে পারিত। নানা রকমের মুদ্রা চিনিতে পারিত। কোন একটি বিশেষ মুদ্রা একগাদা মুদ্রা হইতে তুলিতে বলিলে সে বাছিয়া ঠিক মুদ্রাটি তুলিত, কোন্ প্রকার ভুল হইত না। একবার একটা আলোর তেল গরম হইয়া, আলোটা ফাটিয়া যায়। তাহাতে বন-

ছুরীকাঁটা না চলে খাওয়া হয় না

মানুষ বেচারা আহত হয়। সেই হইতে সে আলোর কাছে ঘেঁসিত না। একটু জোরে আলো জ্বলিলে সে চীৎকার করিয়া অস্থির করিত। আলো কমাইলে তবে সে শান্ত হইত। এই বনমানুষটির নাম ছিল জো। একদিন তাহার খাঁচার বাইরে একটা বাদাম পড়িয়াছিল, জো অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনরকমেই হাত দিয়া ঐ বাদামটার লাগাল পাইল না। অথচ বাদাম খাইতেই হইবে। তখন সে যা কাণ্ড করিল তা অদ্ভুত। তাহার গায়ে যে জামা ছিল, তাই খুলিয়া বাদামটার উপর ছুড়িয়া বাদামটাকে খাঁচার নিকট টানিয়া লইল। তারপর বাদাম খাওয়া হইলে পর সে আবার জামা পরিল।

জো কোনরকমের ঔষধ খাইতে ভালবাসিত না। একবার তাহাকে কয়েকটা ঔষধের বড়ী কলার মধ্যে পুরিয়া খাইতে দেওয়া হয়। সে হঠাৎ পিল দেখিয়া কলাটা ফেলিয়া দেয়। এবং তারপর তাহার রক্ষকের মুখের দিকে এমন করিয়া তাকায়, ঠিক যেন বলিতেছে—"পৃথিবীতে তোমার কাছে এমন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যাশা করি নাই।" তারপর হইতে জোকে কলা দেওয়া হইলে সে ভাল করিয়া দেখিয়া খাইত, বা ফেলিয়া দিত। জো মারা যাইবার পূর্ব্বে তাহার ভয়ানক অসুখ করে। ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তিনি জোকে দেখিয়া তাহাকে ইনজেক্‌সন্ দিবেন স্থির করিলেন। দুচারবার ইনজেক্‌সন দিবার পর তৃতীয়বার যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন

জো পিচ্‌কারী দেখিবামাত্র আপনা হইতে গায়ের জামা খুলিয়া তৈয়ারী হইয়া বসিল। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছিলেন একটা বনমানুষের এত বুদ্ধি তিনি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অনেক মানুষের বুদ্ধি অনেক বনমানুষের অপেক্ষা কম।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

—

সাইকেলে বিপদ

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং! সবে সরে' যাওনা,
চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাও না?
ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত,
পথ মাঝে রবে পড়ে' ছিরকুটে দন্ত।
বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল—
"যেও না যেও না সেথা, যেথা চলে সাইকেল।"
তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট—
মিছে কেন চাপা পড়ে' পাবে খালি কষ্ট?
ভাল যদি চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়া।
কি লাভ হইবে বল অকালেতে মরিয়া?
সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে;
গালি দিবে চাষা, ডোম, মুচী, তেলি, কামারে।
এত আমি বলিতেছি—ওরে পাজী রাস্‌কেল—
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল?
রঘুনাথ একদিন না সরার ফলেতে
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে।
সত্তরই বৈশাখ—(রবিবার দিন সে)
চাপা পড়ে' মরেছিল বুড়ো এক মিন্‌সে।
তাই আমি বলিতেছি পালানা রে এখনি,
বাঙালী হয়েছ বাপু পলায়ন শেখনি?

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

—

বৌ কথা কও

তোমরা বোধ হয় বৌ-কথা-কও পাখী দেখেছ। এই পাখী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, অর্থাৎ কাঁটাল পাকার দিনে বের হয় বলে' আমাদের সিলেটের দিকে ওকে "কাঁটাল পাখী" বলে। কাঁটাল পাখী ডাকতে সুরু করার পর থেকেই কাঁটালও পাকতে আরম্ভ করে, তারপর শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত 'কাঁটাল পাখী'কে ডাকতে শুনা যায়। এ পাখীটার ডাকার মধ্যে একটা মস্ত মজা আছে। তুমি মনে মনে যাই ভাববে, শুনবে যেন পাখীও তাই বলে' ডাকছে। যেমন তুমি মনে মনে ভাব্‌লে 'বৌ কথা কও', অমনি তুমিও শুনবে যেন পাখীও বলছে বৌ কথা কও। আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে' দেখতে পার।

সিলেটের দিকে কচি কচি ছেলে-মেয়েরা "কাঁটাল পাখী" ডাক্‌লেই বলতে সুরু করে' দেয়—

"কাঁটাল পাখী, 'নাইওর' যাইতে,
ভাইকে খাইল, বনের বাঘে—।"

ছড়াটার একটা সুন্দর মানেও আছে:—

অনেকদিন আগে কাঁটাল পাখী (বৌ কথা কও) নাকি মানুষ ছিল। এক গেরস্তের ঘরে ছিল একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। মেয়েটি ছিল বয়সে বড়। সেই গেরস্তের বাড়ী থেকে অনেক দূরে মেয়েটির বিয়ে হয়। বিয়ের পর অনেকদিন আর তা'দের ভাই-বোনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তারপরে এক বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কাঁটাল পাক্‌লে সেই ছেলে একজন লোকের সঙ্গে তার বোনের বাড়ীতে তত্ত্ব নিয়ে যায়। কচি বোন এতদিন পরে ভাইকে দেখে যে কত খুসী হল, তা ত বুঝতেই পার। সেও তার বাপ-মাকে দেখ্‌বার জন্যে একবার বাপের বাড়ী আস্‌তে চাইলে। বোনের শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে ভাই বোনকে নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হল। বোন চল্‌ল পাল্কী চড়ে, আর ভাই সেই পাল্কীর ধারে ধারে হেঁটে চল্‌ল।

পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পথ; পথের দুই ধারে নিবিড় বন। সে বনে লোক-জন নেই, কেবল পশু, পাখী, আর গাছপালা। চারিদিকে কোন গাঁয়ের নাম-গন্ধও নাই, কেবল বন ধূ ধূ করছে। হঠাৎ জঙ্গল থেকে মস্ত একটা বাঘ বেরিয়ে এল। পাল্কী বেহারারা নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে পালাল, সেই ছোট ছোট ভাই-বোনদুটির দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। কিন্তু ভাই

আপন বোনকে ফেলে ত আর পালাতে পারে না; তারা ভাই-বোনে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে রইল। বাঘ এসে বোনের বুক থেকে ভাইকে কেড়ে নিয়ে মেরে ফেল্লে, কিন্তু বোন্‌কে ছুঁল না। বোন সেই মরা ভায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেইখানেই মরে গেল।

বোনের সেই হৃদয়ভেদী কান্না শুনে ভগবান তাকে পাখী বানিয়ে দিলেন আর সে আজ পর্য্যন্ত সেই মরা ভায়ের শোকে পাগল হয়ে গেয়ে বেড়ায়—

"কাঁটাল পাখী নাইওর যাইতে
ভাইকে খাইল বনের বাঘে—"

আমাদের এ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক মেয়ে আছেন, যাঁরা 'কাঁটাল পাখী''র ডাক শুন্‌লেই সেই মরা ভায়ের কথা মনে করে' চোখের জল রাখ্‌তে পারেন না।

শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—

জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় কোথা ?

আমরা বলি জিনিষ নষ্ট হয়। কিন্তু নষ্ট হওয়ার মানে কি তা আমরা অনেক সময় বুঝি না। আমরা চোখে দেখি একটা গাছের পাতা, কাগজের টুক্‌রা বা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পচে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নষ্ট হয়ে তারা কি একবারে লোপ পায় ? না, তারা অন্য আকারে পৃথিবীর মধ্যেই থাকে। কি রকম করে থাকে তা বল্‌ছি।

বর্ষাকালে নদী, খাল, পুকুর সমস্তই বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু আবার গ্রীষ্মকালে সেই-সব জল যায় কোথা ? সেই জল সূর্য্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে মেঘের সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে আবার সেই মেঘ জল হয়ে যায়। বরফ গলে জল হয়ে গেল আবার জলই বাষ্প হয়ে গেল। কিছুই নষ্ট হল না।

ধান থেকে চাল করে' আমরা খেলাম। দেখ্‌তে গেলে ধানগুলি নষ্ট হল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকারান্তরে আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধন কর্‌লে। গাছের পাতা মাটির উপর ঝরে' পড়্‌ল, দু'দিন পরে পচে গেল —আর দেখা গেল না। কোথায় গেল ? সেই পাতা প্রকারান্তরে আবার গাছেই গেল।—

পাতা যখন পচ্‌ল তখন তা থেকে তিনটে জিনিষ হল :—(১) বাষ্পীয়, (২) জলীয় এবং (৩) কঠিন।

বাষ্পীয় পদার্থটি গেল হাওয়ায় মিশে। হাওয়া থেকে গাছ তাকে পুনরায় পাতার সাহায্যে আহরণ কর্‌লে; জলীয় পদার্থটি মাটিকে ভিজিয়ে দিলে, কতকটা তার হাওয়ায় শুকিয়ে গেল আর কতকটা গাছের শিকড় শুষে নিলে; এবং শেষের ঐ কঠিন অংশটুকু মাটির উপর রইল পড়ে; তা আবার সময়-ক্রমে জলে গলে গিয়ে অবশেষে সেই গাছেই শিকড় দিয়ে চলে গেল। এরা সবাই মিলে আবার গাছের পাতা তৈরী কর্‌তে সাহায্য কর্‌লে।

এই রকম ভাবে দেখ্‌তে পাই যে প্রকৃতির ভিতর একই জিনিষ অবস্থা-বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ কর্‌ছে। একই লোক যেমন থিয়েটারে, যাত্রায়, বিভিন্ন সাজে সেজে এসে নানা রকমের অভিনয় করে, প্রকৃতির নানা জিনিষও তেম্‌নি নানা আকারে নানা কাজ করে' চলেছে। কেউই ব্যর্থ হচ্ছে না, নষ্ট হচ্ছে না।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

—

ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী

ছেলেদের খেলার রেলগাড়ী অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চাবি ঘুরাইয়া দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সে গাড়ীর ইঞ্জিন খানিকটা খুব ছুটিত। আজকাল

ছেলেদের বেড়াবার রেলগাড়ী

আমেরিকায় বড়-লোকরা অনেক বাগানে সরু রেল পাতিয়া ছেলেদের জন্য গাড়ীর প্রচলন করিয়াছেন।

সে-রকম একখানি গাড়ীর ছবি আমরা এখানে দিলাম এ গাড়ীর ইঞ্জিনের ভিতর বৈদ্যুতিক মোটরের কলকব্জা থাকে।

—

কুকুর-চালিত গাড়ী

আমরা যেমন মোটর চালাই, সাইকেল চালাই, জন্তুদের দ্বারাও কি সে-রকম কাজ পাওয়া যায় না? রয় ওয়াট্‌সন্ নামে আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেসের একটি দশ বছরের ছেলে বেল্‌জিয়ামের একটি বড় কুকুরের দ্বারা এক চার-চাকার গাড়ী চালাইতেছে। কুকুরটি গাড়ীর ভিতরে থাকিয়া পা দিয়া কল টিপিতে থাকে আর তাহাতে চাকা ঘুরিয়া গাড়ীটি চলিতে থাকে।

কুকুর-চালিত গাড়ী

প

স্তব্ধ বাদল
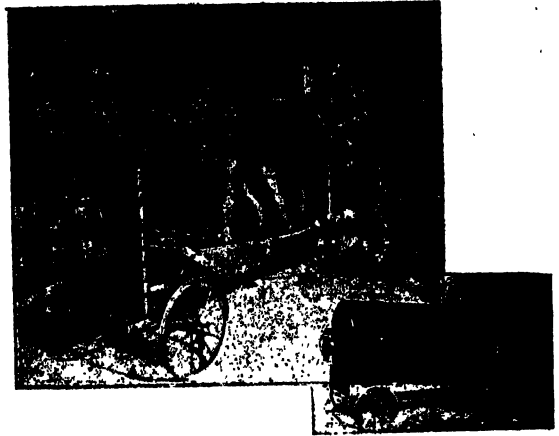
ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নাম্‌লো কাজল-কালো মায়া;
বনের ফাঁকে চম্‌কে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া॥
ঐ তমাল-তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁড়িয়ে আছে,
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আকুল ঢলঢল কায়া॥
যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
কদম-কলি শিউরে ওঠে,
যুঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে,
কেয়া-বধূর ঘোম্‌টা টুটে,

আহা, আজ কেন তার চোখের ভাষা
বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাসা?
জলে ভাসা?
দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই
নিতল আঁখির নীল আব্‌ছায়া॥
ও কার ছায়া দোলে অতল-কালো
শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায়?
আম্‌লকী-বন থাম্‌লো ব্যথায়,
থাম্‌লো ক্রন্দন গগন-সীমায়।
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,—
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
এ কোন্ পথিক?
এ কি স্তব্ধ তারি আকাশ-জোড়া
অসীম রোদন-বেদন-ছায়া॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

বীবর-ছেদিত-প্রকাণ্ড বৃক্ষ—

বীবররা গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়া বাসা তৈয়ারী করিয়া বাস করে। তাহারা একসঙ্গে অনেকে মিলিয়া বস্তি তৈয়ার করে। গাছের ডাল দাঁত দিয়া কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়া ফেলে, তাহার পর সেইগুলাকে তাহাদের বস্তির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সাধারণত তাহারা ছোট ছোট গাছই কাটে। কিন্তু মেক্সিকোতে সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড এ্যাস্‌পেন গাছ বীবরেরা দাঁত দিয়া কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়াছে। গাছটাকে যেখানে ছেদন করা হইয়াছে, সেখানের পরিমাণ ৩০´/২৬´। এত বড় গাছ তাহারা প্রায়ই কাটে না, কারণ প্রকাণ্ড গাছের কাণ্ড তাহারা টানিয়া
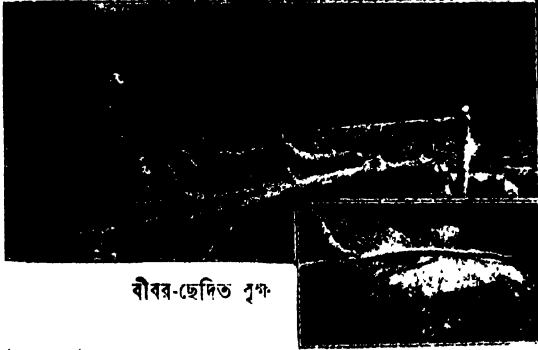
বীবর-ছেদিত বৃক্ষ

লইয়া যাইতে পারে না। এই গাছটাকে মাটিতে ফেলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য তাহার উপরের ডাল-গুলিকে সংগ্রহ করা। গাছটা পুকুরের দিকেই পড়িয়াছে, তাহাতে বীবরদের ডালপালাগুলিকে বেশীদূর বহন করিবার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

পকেট বিশ্বকোষ—

মার্কিন দেশের 'রিয়ার অ্যাড্‌মিরাল' ব্র্যাড্‌লি এম্‌ ফিস্কে সম্প্রতি একপ্রকার নূতন বই ছাপিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইলে যে কোন ব্যক্তি পকেটে করিয়া ২০ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া লইয়া পথে ঘাটে বেড়াইতে পারিবে। এই পদ্ধতির মুদ্রণে বইএর দামও নাকি তাহার বর্ত্তমান মূল্যের ১/১০ হইবে। টাইপ, বই বাঁধান ইত্যাদির কিছুই প্রয়োজন হইবে না। ছাপা বইএর অক্ষরগুলি ফটো-এনগ্রেভিংএর সাহায্যে এক-একটি অক্ষর যা আছে তাহার ১০০ গুণ ছোট হইয়া যাইবে। এই ১০০ গুণ ছোট অক্ষরগুলি দু-ইঞ্চি চওড়া এবং ৫ ইঞ্চি লম্বা কাগজের উপর ছাপা হইবে। কাগজের দুই পিঠেই ছাপা চলিবে। এই রকম পাঁচখানা কাগজে একটা মাঝারি গোছের উপন্যাস ছাপা খুবই সহজ। আড্‌মিরাল ফিস্কে বলেন যে মাত্র ৪ পয়সা খরচে ১০০,০০০ কথাওয়ালা বইএর ১০,০০০ খণ্ড ছাপা হইতে পারে।

এই মুদ্রিত কাগজগুলিকে খালি চোখে পড়া যায় না। পড়িতে হইলে ইহাদের একটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী ছোট হাল্কা ফ্রেমে বসাইতে হয়। এই ফ্রেমে খুব জোরাল লেন্স বসান আছে। এই লেন্সটিকে ইচ্ছামত এবং সুবিধাজনক করিয়া নাড়ান যায়।

পকেট-বিশ্বকোষ ও তাহা পাঠের প্রণালী

এই কলটি বাজারে আসিলে অনেকের খুব সুবিধা হইবে। দু-পয়সার টিকিটের সাহায্যে যথেষ্ট বই পাঠান চলিবে। ৫০ হইতে ১০০০ খানা বই একটা সিগার কেসের মধ্যে অনায়াসে লইতে পারা যাইবে।

বন্দী অক্টোপাস—

নিউ-ইংলণ্ডের কয়েকজন মৎস্যজীবী একটা প্রকাণ্ড আট-শুঁড়-ওয়ালা অক্টোপাস্‌ ধরিয়াছে। এক-একটা শুঁড়ের জোরও ভয়ানক। সে শীকারকে এই আট পা দিয়া জড়াইয়া ধরে, এবং তারপর তার টিয়াপাখীর মত প্রকাণ্ড ঠোঁট দিয়া তাহার দেহ ঠুকরাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

তক্তোপাস্

দুধের কল

রাস্তার মোড়ে মোড়ে দুধের কল দাঁড়াইয়া আছে। কলের মুখের কাছে ক্রেতা একটি খালি বোতল রাখিয়া, একটি মুদ্রা রাখিয়া কল টিপিলেই উপযুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা দুধ বোতলে আসিয়া পড়িবে। দুধের পাত্রের চারিদিকে বরফ থাকাতে দুধ ঠাণ্ডা থাকে এবং নষ্ট হয় না।

দুধের কল

বোতল সরাইবা মাত্র উপরের ট্যাঙ্ক্ হইতে জল পড়িয়া নল সাফ হইয়া যায়। আমাদের দেশেও এই রকম করিয়া খাটি দুধের ব্যবসা চালান যাইতে পারে।

—

জাপানী সৈন্যের দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি—

ভাতের সঙ্গে মাংসের বন্দোবস্ত হইবার পর হইতেই গড়পড়্তা প্রত্যেক জাপানী সৈন্য ২ ইঞ্চি করিয়া লম্বা হইয়াছে।

সাপের শূকর গেলা—

ফ্রেঞ্চ-কঙ্গো রাজ্যে একটা বোড়া সাপ একটা শূকর আস্ত গিলিয়া ফেলে। গিলিবার পূর্ব্বে সে শূকরটাকে জড়াইয়া ধরে এবং জোর দিয়া তাহার হাড় গুঁড়া করিয়া দেয়। তারপর গিলিবার সময় তাহার

শূকর-গেলা সাপ

বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু গেলা শেষ হইবার পর শূকর পেটে গিয়া সাপটাকে নিশ্চল করিয়া ফেলে। অবশেষে সাপটা পেট ফাটিয়া মরিয়া যায়।

আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা—

উইলিয়াম জে লা-ভারে নামক এক ২৪ বছরের যুবক আমেরিকার সব-চেয়ে বড় হীরা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মহামূল্য রত্নটি পাওয়া গিয়াছে ব্রিটিস্ গায়ানাতে এক জঙ্গলের মধ্যে। হীরাটি এক ইঞ্চি লম্বা এবং ½ ইঞ্চি মোটা, চওড়াতে ইহা এক ইঞ্চি। ইহার ওজন ৩১ ক্যারাট।

লা-ভারে যখন এই মহামূল্য হীরাটি লইয়া নিউইয়র্কে আসিলেন, তখন তাঁহার পেছনে একদল লোক লাগে, হীরাটিকে বেহাত করিবার মতলবে। পুলিস্ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া হীরাটিকে এক ব্যাঙ্কের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখে।

যে জঙ্গলে এই হীরা পাওয়া গিয়াছে, সেখানের আবহাওয়ার কথা বলিয়া কাজ নাই। ম্যালেরিয়া-পীড়িত বাংলা দেশেও এমন কোন স্থান নাই যে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সেখানে রত্নের সন্ধানে অনেকেই গিয়াছেন, কিন্তু সেই অনেকেই ফিরিবেন কি না বলা যায় না। লা-ভারে প্রথম ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৮ বছর বয়সে লা-ভারে প্রথম ঐ স্থানের ম্যাজারূনি নদীতে সোনা তুলিতে যান। প্রথম তিন মাসে তিনি প্রায় ৬০,০০০৲ টাকার

সোনা পান। জঙ্গলে মশার আক্রমণ ভয়ানক। দূর হইতে মশার পালকে কালো মেঘের মত মনে হয়, তাহাদের গুঞ্জন-ধ্বনি কর্ণে অমৃত বর্ষণ না করিয়া অন্তরে অন্য-কিছুর সঞ্চার করে! লা-ভারের সঙ্গে চারজন সঙ্গী ছিল, তাহাদের তিনজন জঙ্গলী-জ্বরে মারা গিয়াছে। চতুর্থ-জন হাসপাতালে মরিবার অপেক্ষায় আছে। লা-ভারের মতে ঐ-সব নিবিড় জঙ্গলে কোন লোক একটানা ৫ মাসের বেশী থাকিতে পারে না। লা-ভারের তিনবার জ্বর হয়—এবং একবার তিনি মরমরও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে "মরি আর বাঁচি—হীরার সন্ধান করে' তবে লোকালয়ে ফিরবো।—" তাঁহার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সার্থক হইয়াছে। লা-ভারের কার্য্যে ঐ স্থানের আদিম অধিবাসীরা অনেক সাহায্য করিয়াছে।

আকন্দের তুলা—

আকন্দের তুলাকে ইংরেজিতে ক্যাপক্ বা সিল্ক্ কটন বলে। এই তুলা ভারতবর্ষে, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজে, ষ্টেট্ সেটেল্‌মেণ্টে, ইউকেডারে, ব্রাজিলে এবং ফিজিতে পাওয়া যায়। এই তুলার আঁশ খুব মসৃণ এবং লম্বা। আঁশের মধ্যে হাওয়া ভর্ত্তি থাকে। জাভা দ্বীপেই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্ক বা আকন্দ তুলা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য দেশ হইতে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহা খুবই সামান্য এবং খারাপ ধরণের। ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা ভারী এবং মোটা। তাহা ছাড়া ইহাতে বড় বেশী বীচি থাকে। ভারতবর্ষের আকন্দ তুলা জাভার অর্ক তুলার মত শক্ত এবং চকচকে হয় না। ব্রাজিল এবং ইউকেডারে আকন্দ তুলার উন্নতি করিবার খুবই চেষ্টা চলিতেছে।

আকন্দের ফল ও তুলা

বাজারে ইহার আদরও ক্রমে বাড়িতেছে। জাভাতে পথে ঘাটে আকন্দ গাছ দেখা যায়। জাভার লোকেরাই বেশীর ভাগ এই তুলার চাষ করে, শ্বেতাঙ্গও দু-একজন আছে। একই জমিতে কফি এবং কোকো গাছের সঙ্গে অর্কের চাষ করা হয়। জাভার লোকেরা লাঠির সাহায্যে আকন্দ ফল পাড়ে। মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছেলেরা ফল ভাঙিয়া তুলা বাহির করে। তুলা বাক্সবন্দী করিবার সময় খুব সাবধানে করিতে হয়। বেশী চাপ পড়িলে তুলা নষ্ট হইবার আশঙ্কা।

আকন্দের তুলার জামা

উৎকৃষ্ট আকন্দ তুলা মার্কিনে চালান হয়, ইউরোপে যায় মাঝারি গোছের এবং সব-চেয়ে খারাপ আকন্দ তুলা যায় অষ্ট্রেলিয়াতে।

১৯২০ সালে অর্ক তুলার চালান (জাভা হইতে):—

মার্কিনে—৫৫৪৫ টন

অষ্ট্রেলিয়াতে—৩৪১৭ টন

ইংলণ্ডে এবং ইউরোপে—২৫২৮ টন।

—

রেডিওর খেলা—

প্যারিস হইতে একজন খবর দিয়াছেন—মেয়েদের রং-বেরঙের ছাতায় বেতার-বার্ত্তা গ্রহণের সব কলকব্জা লাগান হইয়াছে। এখন হইতে মেয়েরা আর ভীড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড হলে বসিয়া গান বাজনা শুনিবেন না—তাঁহারা উদ্যানে ছাতা খুলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্গীত এবং বাদ্য উপভোগ করিবেন। এমন কি বাগানে বসিয়া বসিয়া বাড়ীতে রান্নার কতদূর হইল, মাংসের ঝোলে যেন লঙ্কা বেশী না হয়—এই সব কথারও আদান-প্রদান চলিবে।

ছাতার সাহায্যে বেতার সংবাদ গ্রহণ এবং প্রদান প্রথমে এক-জন মার্কিন বালক আবিষ্কার করে। সম্প্রতি নিউ জার্সি সহরের এ্যালফ্রেড ডি রাইনহার্ট নামক এক বালক আঙ্গুলের একটি আংটির উপর বেতার-সংবাদ-গ্রহণী কল স্থাপন করিয়াছে। সে ছাতা ব্যবহার করে—সংবাদ ধরিবার জন্য। কেনেথ্ আর হিনম্যান নামে আর-একজন জার্সির বালক একটি ছোট দেশলায়ের বাক্সের মত বাক্সে বেতার-সংবাদ-গ্রহণী-প্রদানী সব কলকব্জা স্থাপন করিয়াছে। এই ছোট বাক্সের তুলনায় ছাতার বেতার-কলকে একটা প্রকাণ্ড বাজে জিনিষ বলিয়া মনে হয়। ইহাতে আশেপাশের (৩২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া) চারিদিকের বেতার আড্ডা হইতে যাহা-কিছু শব্দ পাঠান হয়, সবই ধরা যায়। গান বাজনা বক্তৃতা ইত্যাদি সবই বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাওয়া যায়। এই বালক আর শিশুকাল হইতেই

ছাতার গায়ে রেডিও

কলকব্জা নির্ম্মাণে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। শিশুকালে সে কাগজ কাটিয়া একটি এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করে। এয়ারোপ্লেনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্ত কলকব্জা ঠিক জায়গা মাফিক বসানো হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় শিশু হিন্‌ম্যান কাগজের এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে এয়ারোপ্লেনের কল-কব্জা কখনো দেখে নাই। আর-একবার সে কাগজ কাটিয়া একটি বৃহৎ মোটরকার তৈয়ার করিয়াছিল। আমেরিকার এখন প্রায় প্রত্যেক বালকই রেডিও সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু আলোচনা করিতেছে। তাহারা হয়ত ভবিষ্যতে রেডিও-জগতে কত আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিবে।

তলোয়ারের ফলার উপর নাচ

পশ্চিমী বাজিকরদের অনেক সময় দেখা যায়, তারা একেবারে খোলা তলোয়ার পর পর উপর দিকে ফলা রাখিয়া সাজাইয়া তার

তলোয়ারের ফলার উপর নাচ

উপর বাজনার তালে তালে নাচিতে থাকে, অথচ তাদের পায়ের তলা মোটেই কাটে না। এমন ধারালো তলোয়ারে পা না কাটিবার কারণ কি? অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে খুব ধারালো তলোয়ার প্রভৃতির ফলাও একেবারে মসৃণ নয়, একটু করকরে, অনেকটা করাতের মত। তার উপর পা বা হাত চাপিয়া রাখিলে তাহা কাটে না। কিন্তু হাত পা একটু এদিক ওদিক সরাইলেই কাটিবে। বাজিকররা ফলার উপর পা চাপিয়া রাখে, এবং মনে হয় তারা নাচিবার সময় পা নাড়িতেছে, কিন্তু পা যেখানে পড়ে সেখান হইতে মোটেই নাড়ে না; তাই পাও কাটে না।

একচাকার আরাম-গাড়ী—

পূর্ব্ব-আফ্রিকার পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত স্থানে ধনী লোকেরা এক রকম আরাম গাড়ী ব্যবহার করেন, তার একটি মাত্র চাকা। গাড়ীটিকে চাকা-ওয়ালা চেয়ার বলিলেও চলে। সামনে ও পিছনে দুইটি

একচাকার আরাম-

চাকরে গাড়ী লইয়া যায়। খারাপ রাস্তায় বা বন-পথে এই গাড়ী আবার চাকরেরা কাঁধে করিয়া পাল্কীর মত বহিয়া লইয়া যায়।

সাগরিকা—

সাগরে জাহাজ চালাইবার কাজ আজ অবধি পুরুষেই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি একটি নারী দক্ষতার জোরে জাহাজে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পাইয়াছেন। ইঁহার নাম মিসেস্ কারলিয়া এস্ ওয়েষ্টকট্, বাড়ী ওয়াশিংটনে সিয়াটলে। বর্ত্তমানে তিনি প্রধান এঞ্জিনিয়ারের পদে আছেন। ইনি বলেন—বাষ্প-যন্ত্র-চালনার কাজ মেয়েদের পক্ষে কষ্টকর নয়, ইহাতে কেবল সতর্কতা ও মনোযোগের প্রয়োজন।

প

কালিয়া এস্ ওয়েষ্টকট—তাহাদের মহিলা ইঞ্জিনীয়ার

তিমি-তুণ্ড পক্ষী—

বৈজ্ঞানিকের নিকটে ইহা "Whale-head" নামে পরিচিত এবং যে বিশিষ্ট বিহঙ্গ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাকে তাহারা গণ্য করেন তাহার বৈজ্ঞানিক নাম "Balænicipitidæ"। পাখীটার আর-

তিমি-তুণ্ড পক্ষী

একটা নাম আছে "Shoe-bill" বা "Shoe bird"—জুতা-ঠোঁট পাখী। ইহা ইহার আরবী নামের তরজমা বলিলেই হয়। ইহার একটি রঙ্গিন চিত্র ১৮৫১ খৃঃ Zoological Societyর proceedingsএ প্রদত্ত আছে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে দুটি জীবন্ত পক্ষী ইংলণ্ডের চিড়িয়াখানায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মিশর দেশের নীল নদের সমীপবর্ত্তী শরতৃণাকীর্ণ জলাভূমিতে ইহাকে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহাকে হাড়গিলা এবং বক জাতীয় বিহঙ্গগণের মধ্যবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সংযোগ-বিধায়ক 'শৃঙ্খল' বলিয়া গণ্য করা হয়।

দেখিতে সুন্দর নহে; বর্ণ ধূসর; দাঁড়াইলে পাঁচ ফুট হয়, ইহার বৃহৎ চঞ্চু তিমি মৎস্যের মাথার স্তায় দেখায়, চঞ্চুর অগ্রভাগ বক্র ও ভীতিপ্রদ।

মার্কিন দেশের যাদুঘরে যে ৫টি এই প্রকার পাখী সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে পঞ্চমটি সম্প্রতি নিউইয়র্কে আনীত হইয়াছে। ইহারা হাড়গিলা বা মদনটাক শ্রেণীর পাখী।

সত্যচরণ লাহা

—

পৃথিবীর বয়ঃক্রম—

ত্রিশ বৎসর আগে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন বলিয়াছিলেন,—পৃথিবী যে রকম দ্রুতগতিতে ঠাণ্ডা হইয়া চলিয়াছে তাহার অনুপাত ধরিয়া হিসাব করিলে মনে হয়, দুই কোটি বৎসর আগে উহার প্রচণ্ড তাপ কোনোপ্রকার জীববাসের অনুপযুক্ত ছিল। এই একই যুক্তির বলে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, আর দুই কোটি বৎসর পরে সূর্য্যপিণ্ডও জ্যোতিহীন তাপহীন হইয়া যাইবে, তখন আলোক ও তাপের জন্য গ্রহপুঞ্জকে হয় অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের দ্বারস্থ হইতে হইবে, নতুবা গ্রহ উপগ্রহ সমেত সমস্ত সৌরমণ্ডল মরিয়া গিয়া চির অন্ধকারে সমাধি লাভ করিবে।

কিন্তু অধুনা Radio-activity বা অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ার আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকদের অনেক ধারণাই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে পরমাণু বা atomকে এতকাল অবিভাজ্য বলিয়া মনে করা হইত, তাহারও মধ্যে এমন এক অদৃশ্য শক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং সমস্ত পদার্থেরই মূল উপাদান-বস্তু। অদৃশ্য রশ্মি-তরঙ্গের ক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম নামক পদার্থ বহু পরিবর্ত্তনাদির মধ্য দিয়া সীসাতে রূপান্তরিত হয় দেখা গিয়াছে, এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার সময় বহু হেলিয়াম 'গণ্ড' (পৃথিবীর সব চেয়ে লঘু গ্যাস) ভীষণবেগে চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িতে থাকে এবং তাহা হইতে উত্তাপের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে এত বেশী পরিমাণে ইউরেনিয়াম বিদ্যমান আছে, যে, এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবার পরে পৃথিবীর জুড়াইয়া যাইবার ভয় একেবারে ঘুচিয়া গিয়া পণ্ডিতদের ভয় হইয়াছে পাছে অত্যধিক হেলিয়াম গ্যাসের মুক্তিলাভের ফলে পৃথিবী উত্তরোত্তর উষ্ণ হইয়া উঠিয়া ক্রমে জীববাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

ইউরেনিয়ামের এই সীসায় রূপান্তরকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর বয়সও নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ ইউরেনিয়াম এই উপায়ে সীসাতে রূপান্তরিত হয় তাহার চার নিক্তির মাপে জানা আছে।—যে কোনো-একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম-খণ্ডের ১০০০ কোটির এক ভাগ মাত্র সীসাতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম-সীসা-সমন্বিত কোনো একটি খনিজ পদার্থ লইয়া তাহার মধ্যে ঐ দুটি পদার্থ কি অনুপাতে আছে তাহা স্থির করিতে পারিলেই ঐ খনিজ পদার্থটির বয়সও আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে। এই উপায়ে দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান প্রস্তরগণ্ড-

বয়স ন্যূন পক্ষে ৯২ কোটি বৎসর। কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠের মাটীর আবরণের বয়স প্রাচীনতম প্রস্তরপিণ্ডটি হইতেও অনেক বেশী। পৃথিবীর মোট ইউরেনিয়াম ও সীসার পরিমাণ ও তাহাদের অনুপাত ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই বয়স ৬০০ কোটি বৎসরও হইতে পারে!

—

ঘূর্ণী—

ঘূর্ণী-বায়ুর কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরিয়া সমুদ্রের ঢেউ সবদিকে সমান জোরালোই হওয়া উচিত, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয়। কিন্তু সম্প্রতি বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, ঘূর্ণীবায়ুর গতিমুখের সম্মুখে কেন্দ্রবিন্দুর ডানদিকের ঢেউগুলি অন্যদিককার ঢেউ হইতে অনেক বেশী বড় ও জোরালো হয়। সম্ভব হইলে এই কথা মনে রাখিয়া অতঃপর ঝড়ের সময় কাপ্তেনেরা জাহাজের গতি নিয়মিত করিবে।

—

রেডিও-বার্ত্তাবহ—

আমেরিকার ডাক-বিভাগকে রেডিও-বার্ত্তাবহে রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এই রেডিও-বার্ত্তাবহের সহায়তায় সমস্ত দেশ জুড়িয়া গৃহে গৃহে কথাবার্ত্তা চলিবে। কাজ করিতে করিতে রেডিও-ফোনের মুখে পৃথিবীর রোজকার খবর শুনিয়া লইতে পারা যাইবে। রেডিওফোনের উন্নতির সম্ভাবনা অসামান্য ও বহুবিস্তৃত। অতি মৃদু শব্দটিও ইহার সহায়তায় এক মহাদেশ জুড়িয়া শুনিতে পারা যাইবে। কলিকাতায় কোথাও একটি আলপিন পড়িয়া গেলে কলম্বো বা পেশোয়ারে বসিয়া তাহা বলিয়া দিতে পারা যাইবে। ইহা কবি-কল্পনা নহে, দ্রুতগতিতে সত্য হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকার ঘরে ঘরে রেডিওফোন বসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গায়কের গান, শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয়, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের বক্তৃতা, শ্রেষ্ঠ পুরোহিতের উপাসনা, শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের অধ্যাপনা, একসঙ্গে সমস্ত মহাদেশের লোকে মিলিয়া শুনিবার উপায় হইয়াছে। আমরা সহরবাসীরা কজন টেলিফোন ব্যবহার করি?

(গত বৎসরের চৈত্রের প্রবাসীর ৮২২ পৃষ্ঠা দেখুন।)

—

ভবিষ্যতের এয়ারপ্লেন—

আজকালকার গেসোলিন-মোটরে চলা যে কোনও এরোপ্লেন ঘণ্টায় ১৫০ মাইল চলে। ঘণ্টায় ২০০ মাইল চলিতে পারে এরূপ এরোপ্লেন নির্ম্মাণের চেষ্টা নানাস্থানে হইতেছে। সম্ভবত বিমান-বিহারে গেসোলিনের ব্যবহার উঠিয়া গিয়া চাপ-দেওয়া বাতাসের চলন হইবে। চাপ-দেওয়া বাতাস গেসোলিন্-ইঞ্জিনের মত এত স্থান জুড়িবে না, উহাতে চলার বেগও এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

* * * *

—

সচল চিত্রের অভিনয়ে প্রত্নতত্ত্ব—

ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিভিন্ন-দেশীয় শিল্পরীতি, প্রভৃতির ছাত্রদের ঐ ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এতদিন নানাদেশ পর্য্যটন করিতে হইত। জার্ম্মাণীতে সচল-চিত্রের অভিনয়-সজ্জায়, রোম, গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের নানা প্রসিদ্ধ স্থান ও নানাপ্রকার শিল্প-রীতির এমন যথাযথ ও সুন্দর অনুকরণ করা হইয়াছে, যে, বার্লিন হইতে দলে দলে ছাত্রেরা শিক্ষালাভের জন্য এইগুলি আসিয়া দেখিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপের এই ষ্টুডিওগুলি ইতিহাস-ছাত্রদের তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে। বিখ্যাত শিল্প-উদাহরণগুলির প্রতিটি রেখার টান, প্রতিটি রঙের ছোপ পর্য্যন্ত হুবহু নকল করা হইয়াছে। ছাত্রদের বিনা পয়সায় ইজিপ্ট, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশ বেড়ানোর কাজ হইয়া যাইতেছে।

স চ
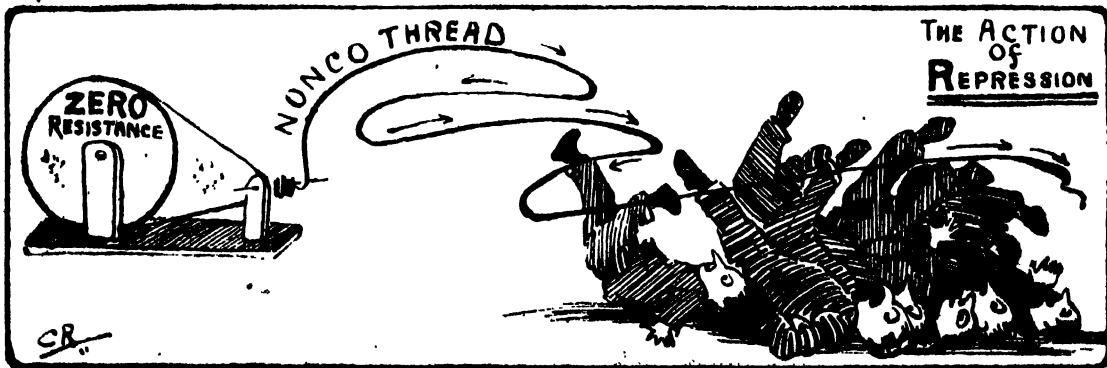
একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র—টানের উল্টা টান না থাকিলে ফল পিঠটান।

চিত্রকর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় বি-এস্‌সি মহাশয়ের সৌজন্যে
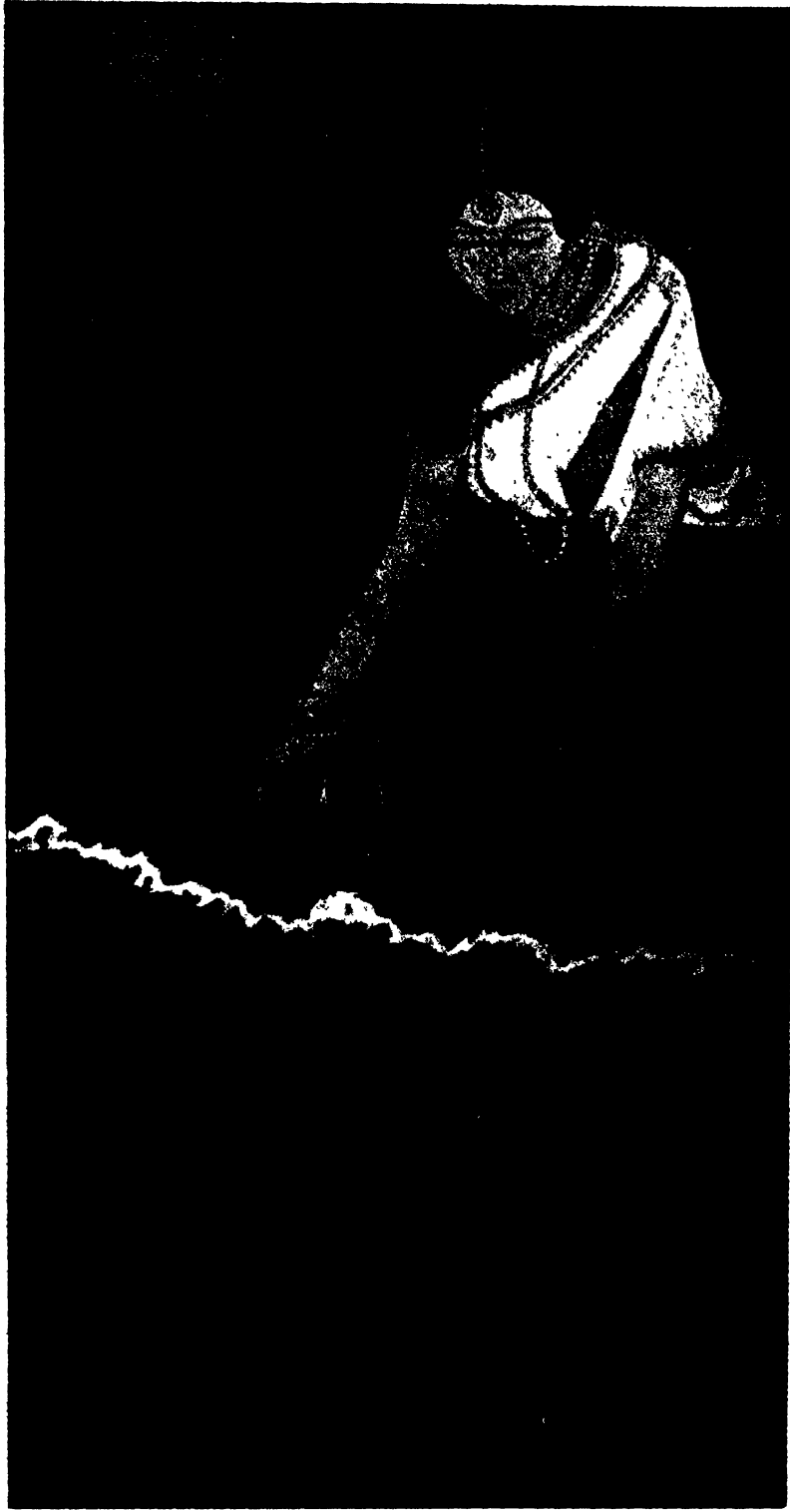
"প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে"

শ্রীমতী শান্তা দেবী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

খদ্দর—খাদি—ক্ষুদ্র

গত আষাঢ়ের "প্রবাসী"তে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত "চরকা ও খদ্দর" প্রবন্ধে দেখিলাম, পা ঢাকিয়া' কাপড় পরা মেমদের অনুকরণ ; ইহা ঠিক নয়। মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত না ঢাকিলে স্ত্রীলোকের উপাসনা শুদ্ধ হয় না ও পাপ হয়। সর্ব্বদা পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখাই মুসলমান মহিলার অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কি বিলাতি কাপড় পরিয়া উপাসনা করিতে হইবে ?

রিজিয়া বেগম

—

'দাসবিক্রয়ের প্রাচীন দলীল' প্রবন্ধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে "দাসবিক্রয়ের প্রাচীন দলীল" নামীয়, একখানা দলীল সহযোগে, একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কিন্তু ঐ দলীলের লিখিত ব্যক্তিনিচয় ও সাকীন সম্বন্ধে যে ভুল বিবরণী রহিয়াছে, উহা নির্দ্দেশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

লেখক বলেন, বিক্রমপুর সিমুলিয়াবাসী নরসিংহ দত্ত ক্রেতা এবং শ্রীরামপুরনিবাসী রামধন দত্ত বিক্রেতা,—বিষয় দাসবিক্রয়। বিক্রমপুরের মধ্যে কোন শ্রীরামপুর গ্রাম না পাইয়া লেখক গঙ্গাতীরের শ্রীরামপুর অন্বেষণ করিয়া বাহির করিলেন, এবং ক্রেতা নরসিংহ দত্তকেও একেবারে শ্রীরামপুরের লোক বলিয়া ঘোষণা করতঃ রাঢ়ী কায়স্থে সন্নিবেশ করিতে বিলম্ব করিলেন না। লেখক বাড়ীর চতুঃসীমা একবারও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না, যে, বিক্রমপুরের মধ্যে না থাকুক উহার নিকটে কোন স্থানের নাম শ্রীরামপুর আছে কি না।

ইংরেজ লেখক বা বাঙ্গালী লেখকগণ বহু অনুসন্ধানে বাঙ্গালার দেশসমূহের যে যে ইতিহাস বা ভুগোল প্রকাশিত করিয়াছেন, লেখক যদি তাহার অনুসন্ধান লইতেন, তবে তাঁহার আর এই ত্রুটি ঘটিতে পারিত না। তখন তিনি অবশ্যই অবগত হইতেন, শ্রীরামপুর বলিয়া একটি স্থান বিক্রমপুরের দক্ষিণ দিকে, ইদিলপুর পরগণার সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে,—যাহার পরিচয় আইন-ই-আকবরীর লিখিত বাক্‌লার সরকারে স্পষ্ট দেখা যায়। অতঃপর, বিভারিজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিলেও তাঁহাকে এজন্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের দ্বারস্থ হইয়া প্রত্নতত্ত্বের দোহাই দিতে হইত না।

বিক্রমপুরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে ইদিলপুর ; এই ইদিলপুর নয়াভাঙ্গনী নদী কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার ঠিক মধ্যস্থানে শ্রীরামপুর বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পরগণা দৃষ্ট হয়। বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম উহার মধ্যে না থাকায় তত্রত্য অধিবাসিগণ পরিচয়স্থলে শ্রীরাম-নিবাসী বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। উহা ঠিক 'মেঘনার উপর' সন্নিবেশিত এজন্য, বহু জমি জলসাৎ হইয়া গিয়াছে, অল্পমাত্র বর্ত্তমান আছে।

এই শ্রীরামপুরের সংলগ্নই মইজরদি বলিয়া একটি তপ্পা ছিল, তত্রত্য অধিবাসীরাও সাং মইজরদি বলিয়া পরিচয় দিত। তৎপর গুণানন্দী, উহা দক্ষিণ বিক্রমপুরের কতকস্থান ও চাঁদপুরের অন্তর্গত, আজিও বিদ্যমান আছে। যদি গুণানন্দী না হইয়া রামানন্দী হয়, তবে, উহাও সাহাবাজপুর পরগণার একটি গ্রামের নাম। মূলকথা এই স্থানগুলি একই কেন্দ্রমধ্যে অতি নিকট নিকট সন্নিবেশিত। বিক্রেতার বাড়ী শ্রীরামপুর, সাক্ষী কাশীচরণের বাড়ী মইজরদী, অপর সাক্ষী শ্রীরাম, বাড়ী গুণানন্দী। এইরূপ অবস্থায় আমরা কি বলিব যে হুগলী শ্রীরামপুরের কবেলাতে, এই গুণানন্দী ও মইজরদী হইতে সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইয়াছিল ? হুগলী শ্রীরামপুরের হইলে তথাকার বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সাক্ষী থাকাই সম্ভবপর হইত। একজন মাত্র সাক্ষীর নিবাস দেখা যায় শ্রীরামপুর, উহা আমাদের নির্দ্দেশিত তারথপুর হওয়াই সম্ভবপর, কারণ উহার নিকটবর্ত্তী মইজরদী ও গুণানন্দীর নাম অন্য দুই সাক্ষীর সহিত জড়িত রহিয়াছে। হুগলী শ্রীরামপুরের মধ্যে কি নিকটে ঐ দুই নামীয় কোন স্থানের পরিচয় আছে কি ? অতএব এই কবেলাখানা যে বরিশাল শ্রীরামপুরেই সম্পাদিত হইয়াছিল উহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগ্নশীলা মেঘনার তটবর্ত্তী এই শ্রীরামপুরেই বোধহয় ক্রেতাদের বাড়ী ছিল, বাড়ী বিক্রয় হইলে তাহারা বিক্রমপুর চলিয়া যায়।

হুগলী দাসব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র হইলেও পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের ন্যায় রাঢ়ীয় সমাজে যে দাস খরিদের বিশেষ প্রচলন ছিল, উহা আমরা অবগত নই। থাকিলেও বিরল প্রচার ছিল।

শ্রী আনন্দনাথ রায়

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী ১৮৭ পৃষ্ঠায় যে দলীলখানি ছাপা হইয়াছে, তাহার পার্সী ও বাঙ্গলা অংশে অল্প প্রভেদ আছে। অর্থাৎ

১। মোহরের কাছে "মোহর নং ৯" না হইয়া "মেহর মাসে সন ৯" হইবে। মোগল কালে সৌর ও চান্দ্র দুই প্রকার মাসই প্রচলিত ছিল। হায়দ্রবাদ রাজ্যে এখন মেহর মাস ৭ই আগষ্ট আরম্ভ হয়। দলীলখানি ১৬ই শ্রাবণ অর্থাৎ ১লা আগষ্টের লেখা। তখন বোধ হয় ১লা আগষ্টের পূর্ব্বেই মেহর মাস আরম্ভ হইত, কেননা ঐ সৌর গণনাতে পুরা ৩৬৫ দিন ধরা হইত।

২। বিক্রেতা ও তাঁহার পিতা ও পিতামহর নাম পার্সীতে দত্ত-স্থানে "দেও" লেখা হইয়াছে। সম্ভব লেখকের ভুল।

৩। পার্সী অংশে আছে যে নফরের স্ত্রী ও সন্তানাদি হইলে তাহাদেরও লওয়া জমা (নির্দ্ধারিত নিয়ম) মত খোরাক ও পোষাক দিতে হইবে ও তাহাদের কাছে নফরি কর্ম্ম লইতে পারিবে।

৪। নফরকে বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ক্রেতার রহিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী ও সন্তানদের বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে কি না স্পষ্ট লেখা নাই।

৫। ১২৲ টাকাতে বিক্রয়। প্রত্যেক টাকা ১০ আনা ওজন অর্থাৎ ১২০ মাশা খাঁটি রূপা নফরের মূল্য। এখনকার ইংরেজি টাকা ১১¾ মাশা অর্থাৎ ১০¾ ভরি রূপা।

৬। পার্শী অংশের শেষে কেবল শওয়াল মাস আছে। তারিখ পড়া যায় না। ১৬ শ্রাবণ ১১৯৫, ২৯ শওয়াল ১২০২ হিজরী ছিল।

শ্রী অমৃতলাল শীল

—

সূর্য্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন ?

গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'র ৪১৫ পৃষ্ঠায় 'সূর্য্যের মত পৃথিবী কিরণ দেয় না কেন' এই প্রশ্নের যে মীমাংসা বাহির হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। লেখকের ধারণা এই যে বিকিরণের দ্বারা সূর্য্যের তাপ (quantity of heat) ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে এবং তাহার উত্তপ্ততা (temperature) ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, কেবল সূর্য্য অনেক বড় বলিয়াই উত্তপ্ততা এখনও এত কমিয়া যায় নাই, যে, তাহার আলোকদানের ক্ষমতা লোপ পাইয়া যাইতে পারে। এই ধারণা হইতেই ছোট বড় কাচের বল ও ছোট এবং জোয়ান মানুষের উদাহরণের সাহায্য তিনি লইয়াছেন।

লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন যে সূর্য্য এখনও কঠিন বা তরল অবস্থায় আসিয়া উপনীত হয় নাই, এখনও তাহা বেশীর ভাগই বায়বীয় অবস্থায়। উত্তাপ সম্বন্ধে বায়বীয় পদার্থের একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহা কঠিন বা তরল পদার্থের নাই ; এবং সূর্য্যের উত্তপ্ততা হ্রাস না হইবার কারণ সেই বিশেষ ধর্ম্ম,—তিনি যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের বৈজ্ঞানিক লেন সাহেব প্রদর্শন করেন যে যদি কোনও সম্পূর্ণ বায়বীয় পদার্থ বিকিরণের দ্বারা তাপ হারাইতে থাকে এবং আপনার মাধ্যাকর্ষণের টানে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তবে বিভিন্ন অণুর পরস্পরের মধ্যে দুরত্বের হ্রাস হেতু যে শক্তি (energy) তাপ আকারে দেখা দিবে, বিকিরণে তাপক্ষয় হইলেও, তাহাতে ঐ পদার্থের উত্তপ্ততা (temperature) পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াই যাইবে। তরল বা কঠিন পদার্থের বেলা এই নিয়ম খাটে না। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নীহারিকা-বাদ স্বীকার করিয়া লইলে, আমাদিগকে বলিতে হয় যে আদিতে সূর্য্য সম্পূর্ণ বায়বীয় আকারে সমগ্র সৌর-জগৎ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল, এবং তখন হইতেই আপনার আকর্ষণের বশে তাহার আকারের সঙ্কোচন ঘটিতেছে ও বিকিরণের দ্বারা তাপক্ষয় হইতেছে। সুতরাং অন্ততঃ কিছুকাল লেনের নিয়ম অনুসারে সূর্য্যের উত্তপ্ততা বাড়িতেছিল। কিন্তু পৃথিবীতে জ্যোতিষচর্চ্চা আরম্ভ হইবার হয়ত বহু পূর্ব্বেই উপরোক্ত সঙ্কোচন হেতু এতটুকু অন্ততঃ বাষ্পীয় অংশ দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে যে এখন বায়বীয় অংশের দরুণ উত্তপ্ততা বৃদ্ধি ও জলীয় অংশের দরুণ উত্তপ্ততার হ্রাস, উভয়ে মিলিয়া সূর্য্যের উত্তপ্ততা আজ পর্য্যন্ত আর না বাড়িতেছে না কমিতেছে। হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে সূর্য্যের মধ্যে জলীয় অংশের অনুপাতই বাড়িয়া যাইবে এবং (সঙ্কোচন হেতু) সূর্য্য প্রথমে দ্রবীভূত এবং পরে তাপ-বিকিরণ হেতু তাপক্ষয় এবং তজ্জনিত উত্তপ্ততা হ্রাসে ঘনীভূত হইয়া যাইবে। জলীয় অংশের আধিক্যের সময় হইতেই সূর্য্যের উত্তপ্ততা-হ্রাস আরম্ভ হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়া যাওয়ার পর হইতে কাচের বলের যে ধর্ম্ম লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিবে। সুতরাং বহু বহু যুগ পরে সূর্য্যের উত্তপ্ততা এত হ্রাস পাইবে যে, তাহার আর আলোকদানের ক্ষমতা থাকিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কাচের বলের ধর্ম্ম সূর্য্যে আরোপ করা ভুল।

পূর্ব্বোক্ত সঙ্কোচনের জন্য যখন সূর্য্যের আকার-হ্রাস হইতেছিল, তখন আকার-হ্রাসের জন্য তাহার ঘূর্ণনবেগ বাড়িয়া যাইতেছিল এবং কেন্দ্রাপসারক বলও কাজেকাজেই বাড়িতেছিল। সুতরাং মাঝে মাঝে equator-এ অবস্থিত পদার্থের উপর মাধ্যাকর্ষণের বল অপেক্ষা কেন্দ্রাপসারক বল অধিক হওয়াতে, তাহা সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অঙ্গুরীয়াকারে ঘুরিতে থাকে। এই অঙ্গুরীয়গুলি মাধ্যা-কর্ষণ ও অন্যান্য বলের বশে সঙ্কোচন হেতু দ্রবীভূত এবং পরে তাপ-বিকিরণ ও তজ্জনিত উত্তপ্ততাহ্রাস হেতু ঘনীভূত হইয়া বর্ত্তমান গ্রহগুলির সৃষ্টি করিয়াছে। দ্রবীভূত হইয়া যাওয়ার পর হইতে উত্তপ্ততা হ্রাসের আর কোনও বাধা থাকে না। এবং উজ্জ্বলতার গণ্ডী পার হইতে দেরী হয় না।

কিন্তু সূর্য্যের বহুপূর্ব্বেই এই অঙ্গুরীয়গুলি কিরূপে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করা যায়। ইহার উত্তর এই যে এক-একটি অঙ্গুরীয়কে বর্ত্তমান বাষ্পরাশির পরিমাণ (mass) সূর্য্যের বাষ্পরাশির পরিমাণের তুলনায় এত সামান্য ছিল, এবং নানাকারণে তাহাদের সঙ্কোচন এত দ্রুত ঘটিতেছিল যে শীঘ্রই বাষ্পীয় অংশের অনুপাত অপেক্ষা জলীয় অংশের অনুপাত বেশী হইয়া উঠে। সূর্য্যের বর্ত্তুলাকৃতি এবং ইহাদের অঙ্গুরীয়াকৃতি এর একটি কারণ।

কোনও কোনও পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটি মত আছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে রেডিয়ামের শক্তি-রক্ষার ক্ষমতা একরকম অপরিসীম। একটুকরা রেডিয়াম বহু বহু কাল আলো ও তাপ বিকিরণ করিয়া ও অনুজ্জ্বল হইয়া যায় না, তাহার শক্তির (energy) কোনও ইতরবিশেষ লক্ষিত হয় না। সূর্য্যে নাকি এই রেডিয়ামের খুব বেশী প্রাচুর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, গ্রহগুলিতে তাহার তুলনায় রেডিয়াম নাই বলিলেও চলে। সুতরাং গ্রহগুলির আলো ও তাপের ভাণ্ডার শীঘ্রই ফুরাইয়া গিয়াছে ; সূর্য্যের ভাণ্ডার রেডিয়ামের কল্যাণে অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে এবং করিতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ লেখক কঠিন পদার্থের তাপ ও তাপক্ষয়ের নিয়মটি এত সংক্ষেপে এবং এত অসাবধানে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহাতে বালকদের তরুণ মনে একাধিক ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।

তিনি লিখিয়াছেন 'যে জিনিষ যত ছোট, তার উত্তাপ তত কম এবং তার উত্তাপ বড় জিনিষের উত্তাপের চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়।' যে জিনিষ যত ছোট, তার উত্তাপ তত কম না হইতেও পারে, কথাটা সত্য হইবে কেবল তখনি যখন জিনিসগুলি হইবে একই উপাদানে নির্ম্মিত এবং সমান উত্তপ্ত। 'ছোট জিনিষের উত্তাপ বড় জিনিসের উত্তাপের চেয়ে শীঘ্র চলিয়া যায়,' ইহাও সত্য নয়, সত্য এই যে 'ছোট জিনিষের উত্তপ্ততা বড় জিনিষের উত্তপ্ততা অপেক্ষা শীঘ্র কমিয়া যায়।' প্রকৃতপক্ষে সম-উপাদানে নির্ম্মিত, সমান উত্তপ্ত দুইটি জিনিষের ছোটটি হইতে কোনও সময়ের মধ্যে যতটুকু তাপ বিকিরণ-দ্বারা বাহির হইয়া যায়, বড়টি হইতে তদপেক্ষা অনেক বেশী তাপ বাহির হয় ; কারণ বড়টির বহির্দ্দেশ (area of the surface) ছোটটির বহির্দ্দেশ অপেক্ষা বৃহত্তর। তথাপি বড়টির উত্তপ্ততা কমে দেরীতে, কারণ এক সেকেণ্ডে তাপবিকিরণের দ্বারা ছোটটির উত্তপ্ততা যত ডিগ্রী কমিয়াছে, বড়টিরও তত ডিগ্রী কমাইতে হইলে, যতটুকু তাপ বড়টি হইতে এই সময়ে বাহির হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী তাপ বাহির হইয়া যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

শ্রী রাসবিহারী গুপ্ত

বদরপুরের দুর্গ

বিগত চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'বেতালের বৈঠকে'র ১৩৪ নং জিজ্ঞাসার উত্তরে এবং বৈশাখ সংখ্যার ১৩৪ নং মীমাংসার প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা বদরপুর দুর্গের জীর্ণ-প্রাচীর-সংলগ্ন একখানি শিলালিপির পাঠ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে ঐ দুর্গের ঐতিহাসিক তথ্য যথাসম্ভব জ্ঞাত হওয়া যাইবে। লিপিখানির পাঠ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ, বি-এ, মহাশয়ের সহায়তায় শিলচর নর্ম্যাল স্কুলে উদ্ধার করা হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ উক্ত বিরজা-বাবু লিখিত "বদরপুরের কেল্লা ও শিলালিপি" প্রবন্ধে ১৩২৮ বাঙ্গালার "রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার" ফাইলে দ্রষ্টব্য।

বিগত বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত স্নেহাংশুভূষণ বক্সী উক্ত দুর্গ ছাতকের রাজা দেবীদাস কিংবা তদ্‌বংশীয় কাহারও নির্ম্মিত বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। প্রমাণের অভাবে উহা গ্রহণীয় নহে।

ছাতকের সুপ্রসিদ্ধ "ইংলিস কোম্পানীর" সহিত বদরপুর দুর্গের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকার সম্ভব। কারণ, ঐ দুর্গ—প্রকৃতপক্ষে শেলখানা (অস্ত্রাগার)—তৎকালীন পল্টনের গবর্ণর জোন ইংলিস সাহেবের সময়ে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দে, নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখন আমল ছিল শ্রীযুক্ত মেস্তর (Mr.) জর্জ্জ রাপন্টের অর্থাৎ সম্ভবত তিনি তখন শ্রীহট্ট অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নিমাইরাম দাসের তত্ত্বাবধানে (বরক্ত তদ্বিরনে under the direct supervision of) সরবরাহকারী নিত্যানন্দ ও নীলমণি ভদ্রের সাহায্যে ধনীরাম রাজমেস্তরি ঐ শেলখানা প্রস্তুত করেন। বদরপুর দুর্গের প্রবেশ-দ্বারের উপরিভাগে, ইষ্টক-প্রাচীর-সলংগ্ন একখণ্ড প্রস্তরে, পুরাতন বাংলা অক্ষরে যে লিপি খোদিত আছে, তাহা হইতে এই তথ্য সংকলিত হইল। লিপিখানির যে পাঠ বন্ধুবর বিরজাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের সহায়তায় শিলচর নর্ম্যাল স্কুলে উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। উহার একখানা উত্তম ফোটো ঐ স্কুলে আছে।

"ইংরাজি ১৮০১ সাল সন ১২০৭ সাল বাঙ্গালা পরগনে চাপঘাট মুকাম বদরপুর আমলে শ্রীযুক্ত মেস্তর জর্জ্জ রাপন্ট সাব গবর্ণর পল্টন শ্রীযুক্ত মেস্তর জান ইংলিস সাব বরক্ত তদ্বিরনে নিমাএ রামদাস ছরবরা শ্রী নিত্যানন্দ

নীলমণি ভদ্র দএরায় সেলখানা বানাএ শ্রী ধনীরাম রাজমেস্তরি ইতি"

শ্রী জগন্নাথ দেব

—

"মাটির তলায় আগুন"

ক্ষিতিমোহন-বাবুর "মাটির তলায় আগুন"-এর বিবরণটি পড়িয়া খুবই মনে হয় যে ঐ স্থানে কয়লা আছে। এই কয়লা অবশ্য ঠিক পাথুরে কয়লা (coal) নয়। ইংরেজীতে যাহাকে 'পীট' (peat) বলে সেই শ্রেণীর কয়লা থাকার খুব সম্ভাবনা। কেননা, ক্ষিতিমোহন-বাবু লিখিয়াছেন, স্থানটি একটি বিল। বিল বা জলায় বৎসরের পর বৎসর গুল্ম জাতীয় যে-সমস্ত উদ্ভিজ্জ মাটিচাপা পড়িয়া যায়, সময়ে, চাপে পড়িয়া তাহারা অঙ্গারে পরিণত হয়। মাটি মিশান এই অঙ্গার-চাপকেই ইংরেজীতে "পীট" (peat) বলে। পাথুরে কয়লার মত ইহা শুষ্ক ও কঠিন নয়; খাঁটি অঙ্গারের ভাগও পাথুরে কয়লার অপেক্ষা কম। গরীব লোকের জ্বালানীর জন্ত এই "পীট"-এর ব্যবহার ও ব্যবসায় বিলাতে বেশ চলিত আছে। মাটির মত "পীট" সেখানে চাপ চাপ করিয়া কাটিয়া তোলা হয়।

আমাদের এই বিলটি কত গভীর ছিল, কত বৎসরে কতখানি "পীট" ইহার কোলে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবু শস্য-ক্ষেত্র নষ্ট করিয়া "পীট" কাটা সঙ্গত হইবে কি না জানি না। চেষ্টা করিলে গভীর গড়খাই কাটিয়া আগুনকে বেড়-বন্দী করিয়া মারা যাইতে পারে। গভীর গর্ত্ত কাটিলে মাটির নীচের অবস্থাটাও ঠিকমত জানিতে পারা যায়।

শ্রী সুধাবিন্দু বিশ্বাস

—

খাদ্যকথা

খাদ্যকথা নামক একখানি পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে করা হইয়াছে। উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে এরকম বৈজ্ঞানিক বিষয়ের যত বহি প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। কিন্তু, এ পুস্তকখানি পড়িয়া লোকের খাদ্যদ্রব্যের উপাদান সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান হওয়া সম্ভব, তাঁহাদের প্রাত্যহিক কার্য্যে ততটা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকে ৬১ হইতে ৬৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাঙ্গালীদের নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণ করিয়া শতকরা উপাদানের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যাগুলি ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। শতকরা সংখ্যার যোগফল ১০০ হওয়া উচিত, কিন্তু (৬১ পৃঃ) গম ৮২.১৮, ময়দা ৮০.৮৪, আটা ৯১.৫৫, সুজি ৭৫.২১, যাঁতার আটা ৮১.৫৬ যোগফল হয়। অবশ্য কোন-কোনটা ১০০ আছে।

ইহা ছাড়া, চাউলে (৬২ পৃঃ) শতকরা আমিষ ৬.৩৫ ও শালি ৭৮.৮ লেখা হইয়াছে। অর্থাৎ যদি ১০০ ভরি চাউল লওয়া যায়, তবে তাহাতে ৬.৩৫ ভরি আমিষ ও ৭৮.৮ ভরি শালি আছে বুঝিতে হইবে। এই ১০০ ভরি চাউল জল দিয়া সিদ্ধ করিলে (৬৯ পৃঃ) তিনশত ভরি ভাত হয়। অতএব তিনশত ভরি ভাতে ৬.৩৫ ভরি আমিষ ও ৭৮.৮ ভরি শালি উপাদান থাকা উচিত। ফেনে কিছু নষ্ট হইলে ইহাদের পরিমাণ কমিতে পারে কিন্তু কোনও কারণে বাড়িতে পারে না। কিন্তু ভাতে (৬৯ পৃঃ) শতকরা ২.৮ আমিষ ও ৫৭.২ শালি লেখা হইয়াছে অর্থাৎ তিনশত ভরি ভাতে ২.৮×৩=৮.৪ ভরি আমিষ ও ৫৭.২×৩=১৭১.৬ ভরি শালি আছে। সোজা কথায়, একশত ভরি চাউল খাঁটি জলে সিদ্ধ করাতে ৮.৪−৬.৩৫=২.০৫ ভরি আমিষ (বা শতকরা ৩২.৩) ও ১৭১.৬−৭৮.৮=৯২.৮ ভরি শালি (বা শতকরা ১১৭.৮) উপাদান বাড়িয়া গেল। পুস্তকে এ বৃদ্ধির কোনও কারণ দেখান হয় নাই।

আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে আমিষ, শালি, ইত্যাদির পরিমাণ নিরূপণ করিয়া দিলে কার্য্যতঃ কোনও ফল হয় কি না সন্দেহ। পেঁয়াজে (৬৪ পৃঃ) শতকরা ৩.৫৮ শালি ও ১.৫৭ আমিষ আছে। অতএব আধপোয়া (১০ ভরি) পেঁয়াজে মাত্র .৩৫৮ শালি .১৫৭ আমিষ আছে। কিন্তু আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি (ও ইচ্ছা করিলে যে কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন) যে একজন সাধারণ পরিশ্রমী লোক সমস্তদিন অন্নের পরিবর্ত্তে দশ ভরি কাঁচা পেঁয়াজ খাইলে ক্ষুধায় কষ্ট পায় না ও কোনও রূপ দুর্ব্বলতা বোধ করে না। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদেরও আধপোয়া কাঁচা পেঁয়াজ খাইয়া সমস্ত দিন অক্লেশে কাজ করিতে দেখিয়াছি।

মুগের ডালে (৬২ পৃঃ) শতকরা ২৩.৬২ আমিষ ও ৫৩.৪৫ শালি,

অড়হর দালে ২১·৬১ আমিষ ও ৫৪·২৭ শালি আছে। আমিষ অপেক্ষা শালি খাদ্য সহজপাচ্য, অতএব মুগ অপেক্ষা অড়হর সহজ-পাচ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সকলেই জানেন যে অনেকে মুগের দাল সহজে জীর্ণ করিতে পারেন কিন্তু সেই পরিমাণে বা তাহাপেক্ষা কিছু কম অড়হর দাল খাইলেই বুক জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর ইত্যাদি অম্ল রোগের নানাচিহ্ন প্রকাশিত হয়। অতএব আমাদের দেহ পোষণ করিতে প্রত্যহ আমিষ, শালি, লবণ ইত্যাদি কি পরিমাণে প্রয়োজনীয় জানিতে পারিলেও সেই অভাব কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে দূর হয় বা হওয়া সম্ভব, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কার্য্যতঃ অসম্ভব। অতএব তালিকা দেখিয়া খাদ্যদ্রব্যের ওজন স্থির করিলে কার্য্যতঃ ভ্রমে পড়িতে হয়।

শ্রী অমৃতলাল শীল

—

ভাতের ফেন গালা হয় কেন?

'খাদ্যকথা'র সমালোচক জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে বলেছেন "......... ফেন গালা চলিত হইল কেন?.........ফেন গালার মধ্যে আহার-বিদ্যা আছে।" জান্‌তে পারি কি কেন চলিত হ'ল, আর কি আহার-বিদ্যা আছে?

শ্রী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর

আমরা ফেন খাই না, খাই ভাত। ভাতের ফেন না গালিয়া গতি কি? ভাত যেমন রান্না হয়, তাতে ভাত সিদ্ধ করিতে জল যত আবশ্যক, তার চেয়ে বেশী দেওয়া হয়। না দিলে ভাত চুঁইয়া যাইতে পারে, হাঁড়ির তলায় লাগিয়া যাইতে পারে, চাল উপর নীচে হইতে না পারিয়া কিছু কাঁচা থাকিয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া, ভাত চড়াইয়া কে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে চায়? এক সের চালে প্রায় ২॥০ সের জল খায়। কিন্তু শুখ্‌না ও রসা, পুরানা ও নূতন, সরু ও মোটা, এই সব ভেদে জলের ভাগ কম বেশী করিতে হইত। এত বিচারে না গিয়া রান্নী ৩।৪ সের জল দিয়া ভাত রাঁধে। কাজেই ফেন থাকে।

এখন কথা, সে ফেন গালিয়া ফেলা হইবে, না, রাখিয়া ফেনে-ভাতে খাওয়া হইবে। দরিদ্রে ফেন ফেলিয়া দেয় না, হয়, ফেনে-ভাতে খায়, কিংবা ফেন গালিয়া রাখিয়া পরে নুন-লঙ্কা দিয়া নিজে খায়, ছেলেপিলেকে খাইতে দেয়। আমাদের মিষ্টান্ন জলপানের মতন তাহাদের ভাতের মাঁড়-পান। যাহারা আরও দরিদ্র, যাহাদের অনেক-গুলি ছেলেপিলে, তাহারা এক সের চালে ৪।৫ সের জল দেয়, ফেন গালিয়া রাখিয়া সেই জ'লো মাঁড় বাটি বাটি খাইতে দেয়। ক্ষুধার সময় জল খাইলে ক্ষুধার যেমন শান্তি হয়, এই দুঃখীদিগেরও তাই হয়। কিন্তু ক্ষণিক; কারণ, ফেনে ভাতের অন্নই থাকে। তাই আমরা ফেলিয়া দিতে পারি। কিন্তু, হায়, এই দুঃখীদিগের নিকট এই অন্নও বহু-মূল্য।

আমরাও ফেন খাইতে পারি; ফেন খাদ্য, কিন্তু ভোজ্য নয়। অভ্যাস করিলে ফেন-মাখা ভাত, অর্থাৎ ফেন না গালিয়া ভাত খাইতে পারি। কিন্তু প্রচুর নুন চাই, লঙ্কা পাইলে আরও ভাল। কিংবা গুড় বা চীনি চাই, কারণ ফেন-মাখা ভাত স্বাদু নয়, জ'লো। যে ভাতের স্বাদ নাই, সে ভাত কে কতদিন খাইতে পারে?

একথা কিন্তু অনেকে জানেন না। ভাতের সঙ্গে কাঁচা নুন খাইবার অভ্যাস অনেকের আছে। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা যে ভাত খাইয়া থাকেন, কিংবা প্রথম প্রথম খাইতেন, সে ভাতের স্বাদ নাই। সকল চালের ভাতের স্বাদ সমান নয়। নূতন চালের ভাতের স্বাদ সবাই জানেন। কিন্তু এমন চালও আছে, যাহা দুই-এক বছরের পুরানা হইলেও স্বাদহীন হয় না। এখানে একটু নিজের কথা বলি। শ্রীমতীরা হাসিবেন না, একবার তাঁহাদের রন্ধন-কলা শিখিবার আমার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কলা দুই-একদিনে শিখিতে পারা যায় না। বার বার করা চাই, অভ্যাস চাই। আমার সময় কই? ফাঁকি দিয়া কলাটা শিখিয়া লইবার ফিকির করিলাম। সে ফিকির আর কিছু নয়, রন্ধন-কলার মধ্যে যে বিদ্যা আছে, সেই বিদ্যা আমার লক্ষ্য হইল। বেড়ী ধরিতে পারা যাইবে না, দেখি রান্নার সুত্রটা ধরিতে পারি কি না। প্রথমে ভাত রাঁধিতে গিয়া ঠেকিলাম। কত জল দিব? জল গরম হইলে চাল, না গরম হইবার পূর্ব্বেই চাল? কখন্ জ্বাল মৃদু করিব, কখন্ বা প্রবল করিব? ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন ঘেরিয়া ফেলিল। সে সময়ে আমার বন্ধুবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "বলুন ত কোন্ চাল ভাল?" অর্থাৎ উত্তম চালের লক্ষণ কি? তাঁহারা "কি চাল", "কি চাল" করিতেন। কেহ বলিতেন, যে চাল সরু ও শাদা; কেহ যোগ করিতেন, যে চাল গোটা গোটা, ভাঙ্গা নয়; কেহ আর-একটু বলিতেন, যে চাল লম্বা। আর-একটু বলিতে পারিতেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, কাহারও মনে হইত না, যে চালের ভাত খই-ফাটা হয় না, যে চালের ভাত কোমল ও মিষ্ট। আর একটু উঠিলে বলিতে হয়, যে চালের ভাত পুষ্টিকর ও বলকর, যে চালের ভাত লঘুপাক। চাল শাদা না হইলেও উত্তম হইতে পারে; চাল সু-বর্ণ হইবে, সে বর্ণ শাদা হউক, আপীত হউক, আরক্ত হউক। ভাতে সুঘ্রাণ হইবে, সে ঘ্রাণ রাঁধনী-পাগল প্রভৃতির মতন পাগল-করা ঘ্রাণ নহে। আমাদের দেশে এমন উত্তম চাল আছে। বঙ্গভূমি সু-ফলাই বটে। সু-ফলা না হইলে কি দশা হইত, জানি না। প্রত্যহ যে ভাত খাইতে হয়, সে ভাত উত্তম না হইলে অরুচি জন্মিত। লোকে কিন্তু এত কথা ভাবে না; চাল ত চাল। যদি রন্ধন-কলায় রস পাইত, তাহা হইলে বুঝিত ভাত রুচিকর করিতে হইলে কত যত্ন আবশ্যক। আমি পাই নাই, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিয়াছি, ভাত রান্না সোজা নয়। কারণ উত্তম চাল ত সর্ব্বদা পাই না।

উপরে উত্তম চালের যে যে লক্ষণ দিলাম, সব চালে সে-সব একত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যেক লক্ষণ আহার-বিদ্যার বিচার্য। সে-সবের ব্যাখ্যার সময় কই? আর, এমন কোন্ বিদ্যা আছে, যার গোড়া ছাড়িয়া আগায় চড়িতে পারা যায়? কাজেই লাফাইয়া উঠিতে হইতেছে। ফেন গালার কি কি গুণ? (১) ভাত ধৌত হইয়া নি-র্মল হয়, সু-ঘ্রাণ হয়; (২) গোটা গোটা থাকে, জড়-জড়া হয় না; (৩) চালের উগ্রতা নষ্ট হয়। তিনই আহার-বিদ্যার অন্তর্গত।

কিন্তু চালের উগ্রতা কি?

চালে দেহের অহিতকর উগ্রবীর্য বস্তুবিশেষ আছে।

প্রমাণ কি?

১। আমাদের দেশে তিন জাতের ধানের চাষ হয়। ধান পাকিবার কালানুসারে এই তিনের নাম,—বার্ষিক অর্থাৎ বর্ষাকালে পাকে, শারদ শরৎকালে পাকে, হৈমন্তিক হেমন্তকালে পাকে। বার্ষিক ধান্য, আশু বা আউশ নামে খ্যাত। শারদ ধান্য, লঘুধান নামে খ্যাত। হৈমন্তিক, চলিত ভাষায় হৈঁমত, বাঁকুড়ায় বলে 'বড়ান' (অর্থাৎ বড়ধান, লঘু নহে গুরু, প্রধান বা উত্তম), আয়ুর্বেদে নাম শালি। এই তিন ছাড়া, বোরো ধান আছে, সকলে জানেন না। সে ধান গ্রৈষ্মিক, আউশের রূপান্তর। সে যাহা হউক, উক্ত তিন ধানের মধ্যে আউশ (যদিও ভাত সুমিষ্ট) অধম, লঘু মধ্যম, হৈঁমত উত্তম (এই হেতু নাম

শা-লি—শল ধাতু প্রশংসায়)। কি লক্ষণে অধম বা উত্তম? আহারে, গুরু লঘু পরিপাকে। অর্থাৎ কোন কোনও চালে এমন কিছু উগ্রবস্তু, সোজা কথায়, বিষ আছে, যেজন্য সে সে চাল গুরুপাক হয়।

২। ধান সিদ্ধাইলে সে দোষ দূর হয়। যেহেতু দেখি, সিদ্ধ চালের ভাত যত লঘু, আলো চালের ভাত তত নয়।

৩। ভাত রাঁধিলে ফেনের সঙ্গে অবশিষ্ট দোষ দূর হয়। যেহেতু দেখি, নূতন চালের ভাত গুরুপাক হইলে বেশী জল দিয়া রান্না হইয়া থাকে। ভাতে আঠা-আঠা ধরিবার শঙ্কা হইলে, ফেন গালিবার পূর্বে ভাতে জল ঢালা হয়। ইহাতে ভাত ধুইয়া সড়-সড়া হয়; আর গোটা গোটা ভাতই উত্তম। কিন্তু শুধু এই অভিপ্রায় নহে। যে চাল হউক, চতুর্গুণ, ষষ্ঠগুণ, অষ্টগুণ জল দিয়া রাঁধিলে ভাত উত্তরোত্তর লঘু হয়। আয়ুর্বেদে ষোড়শগুণ জল দিয়াও রোগীর পথ্য ভাত রাঁধিবার উপদেশ আছে।

বেগুন ও বিলাতী আলু রান্নায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। বেগুনই ধরি। বেগুনে একটা উগ্র বস্তু বা বিষ আছে। কাঁচা বেগুন অখাদ্য হইবার হেতু এই। পোড়াইয়া, ভাজিয়া, কিম্বা জলে সিদ্ধাইয়া সে বিষ নষ্ট করি। ব্যঞ্জনের বেগুন কুটিবার সময় কুচিগুলি জলে ফেলা হয়। অভিপ্রায় বিষটা ধুইয়া ফেলা। ধুইলে সব যায় না, ভাজিয়া অন্ততঃ সাঁতলাইয়া লইতে হয়। ভাজা-পোড়ায় বিষ যত সহজে নষ্ট হয়, সিদ্ধায় তত সহজে হয় না। সব বেগুন সমানও নয়। বেগুনের আদিম বিষ চাষের গুণে অনেক গিয়াছে। বুনো ওল ও চাষের ওলে কত তফাৎ, আমরা জানি। দেখি, আউশ চালের ভাত খাইয়া জীর্ণ করা যার-তার কর্ম নয়। কিন্তু আউশ চাউলের মুড়ি সুপচ না হইলেও ভাতের মতন দুষ্পচ নয়। আউশ চালে এমন কিছু আছে, যে জন্য উহার ভাত সকলের সয় না। সেটা শালিতে নাই, কিংবা ভাগে অত্যল্প আছে। এই যে উগ্র বস্তুর সত্তা অনুমান করিতেছি, মনে হইতেছে এক জাপানী কৈমিতিক সেটা পৃথক্ করিয়াছেন। (অনেক কালের কথা, সবিশেষ মনে পড়িতেছে না।) আমাদের দেশে এখন কৈমিতিকের অভাব নাই। এই বিষয়ে তাঁহারা গবেষণা করিতে পারেন। তিন জাতের ধানের চালে, নূতন ও পুরানা ধানের চালে, নূতন ও পুরানা চালে গুণান্তর দেখি, কিন্তু নিগূঢ় কারণ জানি না।

কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন লোকে ফেন ত খায়। তা ত খায়। দেশের কয়-আনা লোক খায় না, গণিয়া বরং তাহাই বাহির করা সোজা। যখন দেশের এই দুর্দশা মনে পড়ে, যখন কামী (কুলি) ও কামিন্‌দিগের অস্থিচর্ম্মসার কৃশ ও দুর্ব্বল দেহের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন বুঝি ফেনে সারাংশ কিছুই নাই। কলিকাতার শ্রীমতীরা শুনিয়াছেন কি না, জানি না; বাঙ্গালা ভাষায় 'ফেন চাটা' শব্দ আছে। দারিদ্র্যের শেষ সীমায় জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে ফেন-চাটা হইতে হয়। তখন অন্যের অখাদ্য, অন্নক্লিষ্টের ভোজ্য হয়। ফেন ত উপাদেয়। দুর্ভিক্ষে নয়, সুভিক্ষের সময়েও কাঁচা বেগুন খাইতে দেখিয়াছি, রেড়ির তেলে ব্যঞ্জন রান্না হয় শুনিয়াছি। আউশ চাল দরিদ্রের খাদ্য। তাহাদের জঠরাগ্নিতে কুপথ্যও ভস্মীভূত হয়। ধনীর ভোজ্যে কেবল রসনার তৃপ্তি নয়, সমস্ত দেহের তৃপ্তি হয়। ধনী যাহা ফেলিয়া দেয়, নির্ধনের তাহাই ভোজ্য। ফেনে লবণীয় পদার্থ চলিয়া যায়, কিন্তু শাগে-আনাজে তাহার পূরণ হয়। লবণীয়ের মধ্যে কস্‌ফরিক লবণ একটা। চালে এই লবণ অত্যল্প। ফেন গালিয়া ফেলিলে আরও অল্প হয়। ফেন গালায় এই ক্ষতি। কিন্তু সে ক্ষতি কতটুকু? অন্নের অল্প গেলে জানিতে পারা যায় না। যিনি এই অল্পকেও বাঁচাইতে চান, তিনি অবশ্য ফেন গালিতে দিবেন না। কিন্তু আরও সোজা উপায় আছে। সব চালে কস্‌ফরিক লবণ ভাগে সমান নয়। যে চালে বেশী আছে, সে চালের ভাত খাইলে ফেন বাঁচাইতে হইবে না। আমরা ফেন খাইতে পারি, অতএব ফেলা কর্তব্য নহে, এ যুক্তি ঠিক নহে। কেন নহে, তাহা আহার-বিদ্যার প্রধান কথা। কারণ সে আহারই শ্রেষ্ঠ, যে আহারে শরীরের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, আর—এইখানে বিশেষ—পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়া লঘু হইবে। আহারের উদ্দেশ্য উদর-পূরণ নয়; উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য-বিধান। স্বাস্থ্য কি, তাহা না বুঝিলে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে না। এটুকু বলা যাইতে পারে, দেহের কেবল আরোগ্য স্বাস্থ্য নহে, অরোগিতা ও স্বাস্থ্য এক নহে। গালিলে যদি অন্ন-পরিপাক লঘু হয়, ফেন অবশ্য ফেলিতে হইবে।

আরও তর্ক আছে। পোড়ের ভাতে ও বাষ্পে সিদ্ধ ভাতে ফেন থাকে না, সে ভাত খাইলে অসুখ করে না, বরং লঘুপাক বলিয়া অজীর্ণ রোগীর পথ্য বিবেচিত হয়। দুই ভাতই সুসিদ্ধ। সিদ্ধাইলে বেগুনের বিষ নষ্ট হয় বলিয়া ব্যঞ্জনে কাঁচা বেগুন ফেলিয়াও রান্না হয়। সুসিদ্ধ ভাতও তেমন। কিন্তু সুসিদ্ধ হইতে সময় লাগে। পাথর্যা কয়লার জ্বালে রান্না ভাত কাহার কাহারও সয় না, খাইলে নাকি অম্বল হয়। কিন্তু সেটা কয়লার দোষ নয়, দোষ রান্নার। রান্নীর কুটনা কোটা, বাটনা বাটা শেষ হয় না, উনানে কয়লা ধরিলেই ডাল ভাত চড়াইয়া দেয়। তখন কয়লার প্রচণ্ড আগুনে ভাত শীঘ্র ফুটিয়া উঠে, ফাটিয়া যায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁচা থাকে। কাঁচা ভাত খাওয়াতেই অম্বলের উৎপত্তি।

শ্রীমতীদিগের মধ্যে নিশ্চয়ই পাকা রাঁধুনী আছেন। তাঁহাদের নিকট এসব জানা কথা। আনাড়ীর রান্না কিরূপ, তাহা ভাতের এই ফেন গালাতেই বুঝিতে পারিবেন। ইতি

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

—

'খাদ্যকথা'র সমালোচনায় মুদ্রণ-অশুদ্ধি

এই সমালোচনায় (প্রবাসী, ২৩৪ পৃঃ) 'পেপটোনা' না হইয়া 'পেপটোন' এবং 'তবস্তা কোম্পানী' না হইয়া 'তাতা কোম্পানী' হইবে।

—

শূদ্র

গত জ্যৈষ্ঠের প্র বা সী তে শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব আমার আলোচিত শূ দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আশা করা যায়, এরূপ আলোচনায় আলোচ্য শব্দটির আসল ব্যুৎপত্তিটি একদিন বাহির হইয়া পড়িবে—যদি আমার প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিটি ঠিক হইয়া না থাকে। মৌলবী সাহেব যাহা লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নীচে লিখিলাম।

ক্ষ স্থানে যে একটা উষ্মবর্ণ হয় ইহাই আমি হিন্দ-ইরানীয় (১) ভাষা

---

(১) হিন্দী গুজরাতী ও মরাঠী খবরের কাগজে দেখিয়াছি 'India' বা 'ভারত' বুঝাইতে তাহাতে হি ন্দ (হি ন্দু নহে) শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাই তাহার সহিত ই রা ন শব্দ জুড়িয়া দিয়া বিশেষণ করিয়া লইয়াছি হি ন্দ-ই রা নী য়। মৌলবী সাহেব বলিতে চান হি ন্দু-ঈ রা ণী য়, কিন্তু হি ন্দু বলিতে 'হিন্দুস্থান' বা 'India' বুঝায় কি? উহা দ্বারা 'হি ন্দু জা তি' ই বুঝায়। আর, ঈ রা ণ শব্দে মূর্দ্ধণ্য ণ লিখিবার যুক্তিও নাই,

হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া হয় তাহা আমি তখন অনাবশ্যক ভাবিয়া দেখাই নাই। শহীদুল্লাহ সাহেব এই দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন বেশী ; ভালই করিয়াছেন।

আমার বিরুদ্ধে তাঁহার একটা কথা হইতেছে "আবেস্তার শব্দতত্ত্ব (Phonology) বৈদিক ভাষায়ও খাটিবে তাহার প্রমাণ কি ?"

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই :—যখন অবেস্তা ও বৈদিক ভাষার এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, প্রায় ৷ অংশে উভয়েরই প্রকৃতি এক প্রকার, তখন যদি একের শব্দতত্ত্ব অনুসরণে অন্যের কোনো শব্দের ব্যাখ্যা করা যায়, আর তাহাতে যদি কোনোরূপ বিরোধ না থাকে, তবে তাহার দ্বারা কোনো অন্যায় করা হয় বলিয়া আমার মনে হয় না।

আমার অবেস্তার প্রমাণ প্রসঙ্গে মৌলবী সাহেব ক্ষ-য়ের মূল সম্বন্ধে একটা অবান্তর কথা তুলিয়াছেন ; ইহা না তুলিলেও পারিতেন, কারণ ইহাতে আমার সিদ্ধান্তের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই বলা হয় নাই। আর প্রকৃত আলোচনাতেও ইহার কোনো আবশ্যকতা দেখা যায় না। ক্ষুদ্র শব্দের ক্ষ্ (ক্-ষ্) মূল ক্-স্ হইতে, না শ্-স্ হইতে, ইহা আমার মোটেই বিচার্য্য ছিল না ; আমার বিচার্য্য ছিল ক্ষ'র ক্-টার লোপ তা এই ক্-টা মূলত ক্ স্'র ক, অথবা শ্-স্'র শ্ ই হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যাহাই হউক, কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন একটু আলোচনা করা ভাল।

সংস্কৃতে যে, আমরা ক্ষ্ (ক্-ষ্) দেখিতে পাই, পণ্ডিতেরা বলেন, তাহার মূল বা প্রকৃতি একটিমাত্র নহে ; বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাহার দুইটি মূল আছে। একটি হইতেছে শ্-স্ ; যেমন, দি শ্ +সু=দি ক্ষু ; √র শ্+সি=র ক্ষি ; ইত্যাদি। আর অন্যটি হইতেছে ক্-স্ ; এই মূল আদি ক্-টা আবার অন্যান্য অক্ষর হইতে ফুটিয়া বাহির হয় ; যেমন, √র চ্ (>র ক্)+স্য+তি=র ক্ ষ্য তি : √দ হ্ (<দ স্ >ধ ক্) +স্য+তি=ধ ক্ ষ্য তি ; ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে এইরূপ ধাতু-প্রত্যয়াদি নাই যাহাতে ক্-ষ্'র মূল প্রকৃতি শ্-স্ অথবা ক্-স্ স্থির করিতে পারা যায়, সেখানে তাহা জানিবার উপায় কি ? পণ্ডিতেরা (Jackson, Pichel, Hubschmann, Macdonell) বলেন ইরানী ভাষার সাহায্যে সর্ব্বত্রই ইহা ঠিক করিতে পারা যায়। তাঁহারা দেখিয়াছেন, মূলত যেখানে শ্-স্, অবেস্তায় সেখানে ষ্ ; আর যেখানে মূলত ক্-স্, আবেস্তায় সেখানে খ্-ষ্। মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এই মতে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, মনে হইল।

বস্তুত, ইরানী ভাষার সাহায্যে সংস্কৃত ক্-ষ্'র মূল নির্দ্দেশের এই মতটি আংশিক সত্য হইলেও, আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ সত্য নহে ; ইহার বহু বহু ব্যভিচার আছে। কয়েকটি দেখাই :—

স. (=সংস্কৃত) √ ক্ ষ ন্ (ক্ষন্), অ.=অবেস্তা √খ্ ষ ন্ 'আঘাত করা,' 'পীড়ন করা,' ইহা হইতে অ. খ্ ষাঁ ষ্ম ন্ 'দুঃখ,' 'সঙ্কট' ; আবার ষ ত, স. ক্ ষ ত (ক্ষ ত) ; অ. হু ষ ত, স. সু ক্ ষ ত (সু ক্ষ ত) ; অ. ষ ষ্ম ও ষ 'ক্ষত', 'কাটা' 'অস্ত্রের আঘাত'। এখানে সংস্কৃতের ক্-ষ্ স্থানে অবেস্তায় খ্-ষ্ ও ষ্ দুই-ই দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মত অনুসরণ করিলে এখানে সংস্কৃতের ক্-ষ্'র দুইটি মূল ধরিতে হয়, ক্-স্ ও শ্-স্, কিন্তু বস্তুত তাহা বলিতে পারা যায় না, অসম্ভব। নিম্নলিখিত উদাহরণ-গুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

স. √ ক্ ষি (ক্ষি), অ. √খ্ ষি 'বাস করা'। ইহা হইতে অ. খ্ ষ এ তী(২), স. ক্ ষে তি ; অ. ষ য় ন 'রাজধানী,' 'প্রধান নগর', স. ক্ ষ'য় ণ, 'বাসস্থান' ; অ. ষি তি, স. ক্ ষি তি।

স. √ ক্ ষি, অ. √ খ্ ষি 'ক্ষয় করা' 'ক্ষয় হওয়া'। ইহা হইতে অ. খ্ ষ এ ন, স. (* ক্ ষে ণ=) ক্ ষী ণ ; আবার অ. ষ এ ত, স. * ক্ ষে ত 'গর্ভপাতের ঔষধ বিশেষ'।

স. √অ ক্ ষ্, অ. √অ খ্ ষ্ 'দেখা' (তুল : স. √ঈ ক্ ষ্)। হইা হইতে অ. অ ই র‍্যা খ্ ষ য়ে ই স্তি, স. অ ভ্যা ক্ ষ'য়ন্তি (=অ ভি+আ+অ ক্ ষ.) ; আবার অ. অ ষি, স. অ ক্ ষি।

এইরূপ আরো উদাহরণ দিতে পারা যায়। অতএব বলিতেই হইবে ইরানীর সাহায্যে সংস্কৃত ক্ষকারের মূল প্রকৃতিকে (অর্থাৎ শ্-স্, অথবা ক্-স্-কে) সর্ব্বত্র নির্ণয় করা যায় না। তাই ঐ মতটির উপর নির্ভর করিয়া কোনো সিদ্ধান্ত করিলে তাহা অভ্রান্ত হইতে পারে না।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় কথা হইতেছে "যদিও পহ্লবী ও আধুনিক পারসীতে (৩) মূল শ্-স্ ও ক্-স্ উভয় স্থানে ষ (শীন) হয়, কিন্তু প্রাচীন অবেস্তার ভাষায় কিংবা প্রাচীন পারসীতে এইরূপ দেখা যায় না।" প্রাচীন ফারসীর সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু প্রাচীন অবেস্তা বলিতে যদি তিনি অবেস্তার গাথা অংশকে (Gatha Avesta) মনে করিয়া থাকেন (গাথা-অংশই অবেস্তার সর্ব্বপ্রাচীন), তবে তাঁহার সে কথা ঠিক বলিতে পারি না। পরবর্ত্তী অবেস্তার (Younger Avesta) কাজ নাই, গাথা হইতেই কয়েকটি উদাহরণ দিই :—

রহিশ্তোইশ্তি গাথায় (যস্ন, ৪৩-৮) "মো ষু (চা অস্তু),"স. ম ক্ ষু (চ অস্তু)।

স্পেন্তামইন্যু গাথায় (যস্ন, ৪৮-১১) "ষ নি তি শ্", স. সু ক্ ষি তি স্।

অহুনবইতি গাথায় (যস্ন, ৩৮-.৩) "রো উ রু চ ষ নে", স. উ রু চ ক্ষ নে।

উশ্তাবইতি গাথায় (যস্ন, ৪৬-৪) "মো ই থ্র হ্যা", স. ক্ ষে ত্র স্য (<√খ্ ষি=√ ক্ ষি)।

এইরূপ আরো উল্লেখ করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের (অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে আমার প্রদর্শিত মরাঠী-প্রভৃতির) শব্দবিকারের দ্বারা প্রথম স্তরের (অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে বৈদিক) শব্দের ব্যাখ্যা ঠিক নহে। ইহা অনেকটা সত্য। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার এই জাতীয় শব্দগুলির উল্লেখের একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাই দেখান যে, প্রথম হইতে পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ভাষার এইরূপ একটা ধারা চলিয়া আসিয়াছে। যদি সর্ব্বনিম্নস্তর পর্য্যন্ত ভাষার একটা ধারাবাহিক গতি দেখা যায়, তবে প্রথম স্তরের-শব্দের আলোচনায় তাহার উল্লেখ দোষাবহ মনে হয় না। যদি কেবলমাত্র নিম্নস্তরেরই শব্দবিকারের দ্বারা ঐ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা খুবই আপত্তিজনক, সন্দেহ নাই। তবুও, এ স্থলে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, পৈতৃক গুণ-দোষ যেমন কখনো মধ্যবর্ত্তী কোনো পুরুষে অস্ফুট থাকিয়াও পরবর্ত্তী কোনো পুরুষে আবার ফুটিয়া উঠে, শব্দবিকার সম্বন্ধেও সেইরূপ কোনো নিয়ম মধ্যবর্ত্তী স্তরে তিরোহিত থাকিলেও কোনো পরবর্ত্তী স্তরে পুনর্ব্বার তাহার আবিভূর্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

মরাঠীতে সংস্কৃত ক্ষ স্থান-বিশেষে স বা শ হয়, ইহা আমি বলিয়াছি,

প্রয়োজনও নাই। ঈকারটাই বা কেন ? আমাদের উচ্চারণেও ইহা পাওয়া যায় না। তাই আমার মনে হয় Indo-Iranian স্থলে হি ন্দ-ই রা নী য় লিখিলে ভাল হয়।

২। এই স্থানে বলা আবশ্যক এই শব্দটির অনেক পাঠভেদ আছে, খ্ শ এ তী, ষ ঐ তী, ইত্যাদি।

৩। প্রচলিত ফা র সী লিখিতে আপত্তি কি ?

এবং এ বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই ; কিন্তু কিরূপে হয় তাহা আমি বলি নাই। মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ইহা বলিয়া ভালই করিয়াছেন। আমার এখন মনে হইতেছে, মরাঠীর উদাহরণটা না দিলেই ভাল হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী সাহিত্যের শি প্রা শব্দ যে ক্ষি প্রা হইতে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। ইহা তাঁ হা রো নিকটে "সন্দেহজনক" হইবে বলিয়া মনে হয় নাই, সংস্কৃতের ক্ষ মরাঠীতে স হয়, ইহা তিনি জানেন, স্বীকারও করিয়াছেন। তালব্য বা কণ্ঠতালব্য স্বরের যোগ হইলে এই সকারই শকার হয়। যেমন, স. ম ক্ষী, ম. মা শী ; স. ক্ষে ত্র, মরাঠী শে ত। এই নিয়মেই ক্ষি প্রো > শি প্রা। ইহাতে সন্দেহ কোথায় জানি না। তাহা ছাড়া, বৃহৎসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শি প্রা র পাঠভেদে যে ক্ষি প্রা শব্দের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কি কোনো মূল্য নাই? আমার বন্ধুকে আমি একবার ঐ মূল বই দুইখানি (উল্লিখিত সংস্করণের) দেখিতে অনুরোধ করি। তবুও তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন, তবে অসন্তোষের কারণটা জানিতে চাই, উত্তর দিবার চেষ্টা করিব—যদি কিছু উত্তর থাকে।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

গত জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবাসীতে মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের লিখিত "শূদ্র" নামক "আলোচনা" চোখে পড়িল। তিনি স্থানবাচক Sudrai হইতে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। পণ্ডিতপ্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে নাকি "ক্ষুদ্র" হইতে "শূদ্র" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে—আমি তাঁহার মূল প্রবন্ধ দেখি নাই।

আমার মনে হয়, যে দেশে যে শব্দের প্রচলন, এবং যে সময়ে ঐ শব্দ প্রচলিত ছিল, সেই দেশের এবং সেই সময়ের না হউক, অন্ততঃ তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি জানিতে পারিলে আর সেই শব্দের ব্যাখ্যার জন্য বিদেশীয় ভাষা বা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ সঙ্গত নহে—তাহাতে অনেক সময়েই ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

খ্রীষ্টের জন্মের বহুপূর্ব্বে পাণিনীয় ব্যাকরণের উণাদি প্রকরণে শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। উণাদির দ্বিতীয় পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্র—"শুচেদর্শ্চ"। সূত্রানুবাদ—শুচধাতুর অর্থাৎ শুচ ধাতুর অন্ত্যবর্ণের স্থানে 'দ'ও হইবে। "রক্" প্রত্যয় প্রসঙ্গে এই সূত্র রচিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে এই সূত্রের পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অদ ধাতুর হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ হইবে। সুতরাং "চ" বা "ও"এর অর্থ, রক্ প্রত্যয় হইলে শুচ্ এর উ স্থানে ঊ হইবে আর চ স্থানে 'দ'ও হইবে। তত্ত্ববোধিনী টীকা এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শুচ্ শোকে, তস্মাদ্রক্, দশ্চান্তাদেশঃ, ধাতোর্দীর্ঘশ্চ। শূদ্রো—বৃষলঃ।"

সারস্বত ব্যাকরণেও শুচ্ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন 'শুচ' শব্দের দ্বারা শূদ্র শব্দ সাধন করা হইয়াছে। সারস্বতের ব্যাখ্যা—"শুচং দ্রবতীতি শূদ্রঃ" (শুচ্+দ্রু+ড) -যে শোকগ্রস্ত সেই শূদ্র। সূত্র "শুচঃ শূদ্রে" —শুচঃ শূরাদেশো ভবতি দ্রেপরে (শুচঃ+ক্বিপ=শুচ্ প্রথমার এক বচনে শুক্)।

শোক বা তমোভাবের প্রাবল্যের জন্যই যে শূদ্র আখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ব্যাসদেবের উত্তরতন্ত্রস্থ পশ্চাল্লিখিত সূত্র হইতে আরও সপ্রমাণ হয়—"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ", ইহার শোক আছে, তন্নিমিত্ত (ধর্ম্মোপদেশাদি?) অনাদরের সহিত শ্রবণের জন্য এ "শূদ্র"।

শ্রুতিতেও "অহাহা রে ত্বা শূদ্র" এই প্রয়োগ আছে। এখানে শূদ্র শব্দের অর্থ রূঢ়ি অর্থাৎ প্রচলিত জাত্যর্থবাচক নহে—এখানে শূদ্র যৌগিক শব্দ (তত্ত্ববোধিনী)। সুতরাং মানসিক অবস্থা বা গুণ বিশেষের অধীনত্ব বুঝাইবার জন্যই যে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আরও সমর্থিত হইতেছে।

আমার মনে হয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের অশৌচের সময়-পরিমাণও এই মাপকাঠি দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে, যে তমোগুণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভিভূত তাহার অশৌচের কালও তদনুপাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" গীতার এই উক্তিও এই ব্যুৎপত্তির আর-একটি অনুকূল প্রমাণ।

শ্রী দীনেশচন্দ্র কবিরত্ন

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় আমাদের শূদ্র শব্দের আলোচনায় যোগ দিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমার মূল প্রবন্ধটি তিনি দেখেন নাই ; দেখিলে ভাল করিতেন, এবং দেখা খুবই উচিত ছিল ; ইহা দেখিলে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা লিখিবার প্রয়োজন হয় তো হইত না। তাঁহার লিখিত ছান্দোগ্য, ব্রহ্মসূত্র ও পাণিনির উণাদি সূত্রের কথা আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সারস্বত ব্যাকরণের কথা ব্রহ্মসূত্র দেখিয়াই লেখা হইয়া থাকিবে। ভাষাতত্ত্বকে অনুসরণ না করিলে শব্দের ঠিক ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া যত ব্যাকরণ আছে তাহার কোনো একখানিতেও সর্ব্বত্র যথাযথরূপে ভাষাতত্ত্বকে অনুসরণ করা হয় নাই। তাই এক-একটা শব্দের ব্যুৎপত্তিতে এত কষ্ট-কল্পনা করা হইয়াছে যে, তাহা বলিবার নহে ; ইহাতে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। ব্যাকরণগুলি বহুস্থলে যেমন-তেমন করিয়া যেরূপই হউক একটা ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছে। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ অর্থটা ছাত্রের কাছে ধরিয়া দিয়াছে, কিন্তু কিরূপে সেই অর্থটা হইল তাহা দেখাইতে পারে নাই, তাহা তাহাদের লক্ষ্যও ছিল না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, ইহা তাহার স্থান নহে। একটা মাত্র উদাহরণ দিই :—

পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যাকরণকারই বলিয়াছেন √দৃশ ধাতু স্থানে প শ্য আদেশ হয়। কিন্তু কিরূপে ইহা হইতে পারে? √দৃশ্ ধাতুর দ স্থানে এখানে প কিরূপ হইবে? কখনো ইহা হইতে পারে না। আসল কথাটা হইতেছে প শ্য তি প্রভৃতি পদ √দৃশ্ হইতে মোটেই হয় নাই। ইহারা হইয়াছে √স্পশ্ 'দর্শন করা' হইতে। বেদে প স্প শে, প স্প শা ন প্রভৃতি পদ প্রসিদ্ধ। লৌকিক সংস্কৃতেও ইহার তিনটি পদ পাওয়া যায় (—যদিও ক্রিয়ারূপে ব্যবহার নাই) :—প স্প শা 'ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকের নাম', স্প শ 'চর', ও স্প ষ্ট। পাণিনি লৌকিক সংস্কৃতে √স্প শের সাধারণতঃ অপ্রচলন, ও √দৃ শে র বহুল প্রচার দেখিয়া বলিয়াছেন √দৃ শে র স্থানে প শ্য আদেশ হয়। শব্দের আদিতে সংযুক্ত উষ্ম বর্ণের উচ্চারণ সুকর নহে বলিয়া ভারতীয় ভাষায় তাহার পরিত্যাগের দিকে প্রবণতা দেখা যায়, যেমন √স্প ন্দ্ হইতে প স্প ন্দে (স্প স্প ন্দে নহে)। এখানেও সেইরূপ √স্প শে র আদিস্থিত সকারটি লোপ হওয়ায় প শ (প শ্য) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'চর' অর্থে আমাদের স্প শ ও ইংরেজী Spy একই, এবং একই ধাতু হইতে (Cf. Lat. *Spieio*, Germ. *Spehon*)। একমাত্র ভাষাতত্ত্বকে অনুসরণ করিলেই এই তত্ত্বটা জানা যাইতে পারে, কেবল আমাদের প্রচলিত ব্যাকরণের দ্বারা ইহা পাওয়া যাইবার উপায় নাই, ব্যাকরণ যদি ভাষাতত্ত্বের অনুসরণে লিখিত না হয় তবে বহু স্থলে ভ্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা আছে। ব্যাকরণের যে নিয়ম ভাষাতত্ত্বের অবিরুদ্ধ তাহা নিশ্চয়ই প্রমাণ, কিন্তু বিরুদ্ধ হইলে তাহা মানিতে পারা যায় না। এইজন্যই আমি আমার মূল প্রবন্ধে কবিরত্ন-মহাশয়ের প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি দুইটিকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তিনি ইহা সেখানে দেখিতে পাইবেন।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

জিজ্ঞাসা

(২৪)
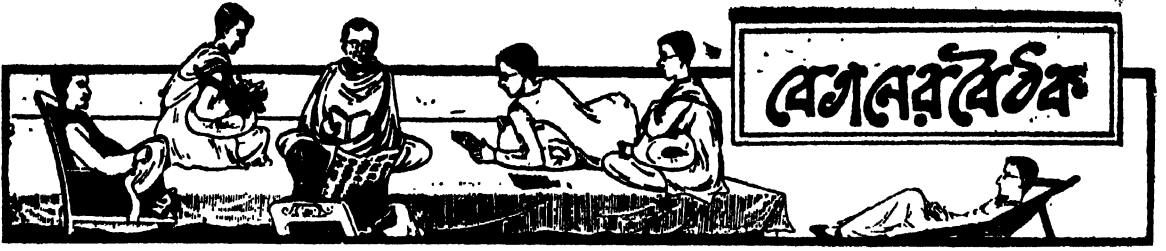
সরিষার তৈল জলে ফেলিলে নানা রকম রং দেখা যায়। ইহার কারণ কি ?

শ্রী

(২৫)

মানুষের দাঁত পড়িয়া যায় কেন ? বালকের দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার হয়, কিন্তু বৃদ্ধের হয় না কেন ?

শ্রী নরেশচন্দ্র দে

(২৬)

শীতকালে নারিকেল তৈল জমে, সরিষার তৈল জমে না কেন ?

শ্রী মেঘমালা সেন

(২৭)

বরিশালে নানা রকমের ধান্যই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু বরিশাল হইতে আমদানী চাউল মাত্রই "বালাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন একটা স্বতন্ত্র রকমের ধান্য হইতে যে চাউল হয় উহাই "বালাম", না বরিশাল হইতে আমদানী যে কোন রকমের চাউলের নামই "বালাম" ?

শ্রী গিরীন্দ্রনাথ চন্দ

(২৮)

"কতকাল পরে, বল ভারত রে" শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটির অন্তর্গত নিম্নলিখিত দুই চরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি ?

"ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন সৌধ-শিরে,
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে !"

শ্রী—

(২৯)

একটি পাত্রে জল রাখিলে তাহার তলাটা অপেক্ষাকৃত উঁচু দেখায় কেন ?

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

(৩০)

১। "Sinn Fein" ও "Bolshevik" বা "Bolshevism" কোন্ ভাষার কথা ? তাহাদের প্রকৃত (root) অর্থ কি ?

(৩১)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে নিম্নলিখিত ছত্র কয়টি পাইয়াছি। অর্থ কি ?

বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী।
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী॥
বুঝিয়া চলিয়া বার্ত্তা দেয় আসি কানে।
বীরের কিঙ্কর নহে বুঝহ সিয়ানে॥

শ্রী অমলাবালা ঘোষজায়া

(৩২)

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কোথায় ?

১। সাহেবেরা বলিয়াছেন আসাম প্রদেশের কামরূপ বা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী গৌহাটীকে পুরাকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিত। আমরাও তাহাই অনুসরণ করি। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন ভগদত্ত। ইনি নরকাসুরের পুত্র।

২। মহাভারতের সভা-পর্ব্বে দেখা যায় অর্জ্জুন দিগ্বিজয় করিতে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে উত্তরদিকে যাইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তকে জয় করিয়া আরও উত্তরে কাশ্মীরও জয় করিয়াছিলেন (২৬ অঃ ৭—৯ শ্লোক)। কর্ণও দিগ্বিজয় করিতে হস্তিনাপুর হইতে উত্তর দিকে যাইয়া ভগদত্তকে জয় করেন (বনপর্ব্ব—২৫৩ অঃ ৪।৫ শ্লোক)। এই ইন্দ্রপ্রস্থ এবং হস্তিনাপুর হইতে কামরূপ এবং গৌহাটী পূর্ব্ব দিকে।

৩। মহর্ষি বাল্মীকির রচিত রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে দেখা যায় সীতার অন্বেষণার্থ পশ্চিমদিকে প্রেরিত বানরসেনাকে সুগ্রীব বলিয়াছিলেন—

যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥ ৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥ ৩১

(৪২ সর্গ)

সুগ্রীব দক্ষিণ ভারতের ঋষ্যমূক পর্ব্বত-শিখর মাল্যবান হইতে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই পর্ব্বত হইতে আসাম প্রদেশ উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনা উত্তর দিকে। অতএব রামায়ণে নির্দ্দিষ্ট প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর হইতে পশ্চিমোত্তর কোণে অবস্থিত। এবং ভগদত্তের পিতা নরকাসুর ইহার অধিপতি।

সাহেবেরা বলেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পূর্ব্বদিকের আসামে। মহাভারত বলেন উত্তরদিকে এবং রামায়ণ বলেন পশ্চিমসমুদ্রে, অতএব কোন্‌টা প্রকৃত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ?

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

—

মীমাংসা

পুকুরে তুঁতে দেওয়া

আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যে "পুষ্করিণীর জলে তুঁতে ব্যবহারে মৎস্যের কোন হানি হয় না।" আমি কিন্তু স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে তুঁতে দিলে মাছ মরিয়া যায়। পোনের ষোল বৎসর গত হইল শ্রীহট্টের পুলীস লাইনের একটা বড় পুষ্করিণীতে

ডুবে দেওয়া হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরেই ছোট বড় মাছ মুমূর্ষু হইয়া চিৎ হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(২০)

"বদর বদর"

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বদরপুর নামক স্থানে শাহ বদর নামে খুব বড় এক পীর ছিলেন। তাঁহার নামেই স্থানের নাম বদরপুর হয়। বদরপুরের ধারে বরাক নদীতে তখন প্রায়ই নৌকা মারা পড়িত। পীর শাহ্ বদরের নাম লইয়া নৌকা ছাড়িলে নাকি কোন বিপদ্‌পাত হইত না। তাই মাঝিরা "বদর" "বদর" বলিয়া নৌকা ছাড়িত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক লোক শ্রীহট্টের এই অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যে আসে। সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারাই ইহা পূর্ব্ববঙ্গে নীত হইয়াছে।

মহিউদ্দীন আহ্মদ্ চৌধুরী
মোহম্মদ আব্দুল বারী
শ্রীহট্ট শ্রী অমৃত পালিত

(২১)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। উক্ত বিদ্যালয়ের খবর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, প্রণীত "নালন্দা" পাঠে পাওয়া যাইবে।

শ্রী স্নেহাংশুভূষণ বকসী
শ্রী মনোরঞ্জন ভৌমিক

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইত :—

১। চিকিৎসা-বিজ্ঞান।
২। যন্ত্র-বিজ্ঞান।
৩। ব্যাকরণ-শাস্ত্র।
৪। ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

"নালন্দা" সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর নীচের বইগুলিতে পাওয়া যায় :—

1. The tradition about the origin of the Vikramasila Monastery.
2. Hiouen Thsang's—
"Si-yu-Ki" (up to 625 A. D.)
3. I-Tsiang's Account of the Buddhist Religion as practised in India.

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(২৩)

২৪ পরগণা

সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করিতে ইংরেজ কোম্পানিকে সাহায্য করিবার জন্য পুরস্কার স্বরূপ মিরজাফর "মারহাট্টা খাতে"র অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড চিরদিনের জন্য নিষ্কর প্রাপ্ত হন। সেই দিনই (১৭৫৭ খৃঃ, ২০শে ডিসেম্বর) পৃথক দলিলে নিম্নলিখিত ১৪টি সম্পূর্ণ ও ১০টি আংশিক পরগণার জমিজমার স্বত্ব বার্ষিক ২,২২,-৯৫৮ টাকা করে ইংরেজ কোম্পানিকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

(১) আকবরপুর (২) আমীরপুর (৩) আজিমাবাদ (৪) বেলিয়া (৫) বদীরহাটী (৬) বসনধারি (৭) কলিকাতা (৮) দক্ষিণ সাগর (৯) গড (১০) হাতিয়াগড় (১১) এক্তিয়ারপুর (১২) খড়িজুড়ি (১৩) খাস্‌পুর (১৪) মেদ্‌নিমল (১৫) মাগুরা (১৬) মনপুর (১৭) ময়দা (১৮) মুড়াগাছা (১৯) পইকান (২০) পেঁচাকুলি (২১) সাতল (২২) সাহানগর (২৩) সাহাপুর (২৪) উত্তর পরগণা।

ইহার ৬টি এখন হাবড়া ও হুগলী জেলা ভুক্ত। নদীয়া ও যশোহর হইতে অপর ২৯টি আসিয়া এখনকার ২৪পরগণা জেলায় মোট ৪৭টি. পরগণা আছে।

গত ১৩২৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা "পল্লী-বাণী" তে 'জেলা ২৪ পরগণা—নামের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

২৪ পরগণার পরগণাসমূহের নাম :—

(১) কলিকাতা (২) আকবরপুর (৩) আমীরপুর (৪) আজিমাবাদ (৫) বালিয়া (৬) বরিদহাটী (৭) বসুন্দরী (৮) দক্ষিণ সাগর (৯) গড় (Garh) (১০) হাতিয়াগড় (১১) ইক্তিয়ারপুর (১২) খারিজুরী (১৩) খাসপুর (১৪) মোদনমল্ল (১৫) মাগুরা (১৬) মানপুর (১৭) ময়দা (১৮) মুড়াগাছা (১৯) পাইকেন (২০) পেঁচাকুলি (২১) সাতাল (২২) সানগর (২৩) সাপুর (২৪) উত্তর পরগণা।

শ্রী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রী সুধাংশুভূষণ পুরকাইত

সত্য

সত্য শুধু রুদ্ধ নহে শাস্ত্র কারাগারে
দীপ্ত হয়ে রাজে নিত্য অন্তর মাঝারে;
কর্ত্তব্য সুধায়ে যে বা চলে তার ঠাঁই
তাহার লক্ষ্যের পথে কোন বাধা নাই।

শ্রী জানকীনাথ দত্ত

ন্যায়ের সেবক

ন্যায়ের সেবক সেই, উন্মুখ যে জন
বিশ্ব হতে দাসত্বেরে দিতে নির্ব্বাসন;
ন্যায় পাশে কেহ উচ্চ কেহ নহে হীন,
সবাই সমান সেথা সবাই স্বাধীন।

শ্রী জানকীনাথ দত্ত

রাজপুতানায় বাঙ্গালীর স্মৃতি

পরিব্রাজক ৺ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় মিবার ভ্রমণ করিয়া ১৩০৯ সালে "নবপ্রভা" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, চিত্তোর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্যামলদাসকে এরাজ্যে বাঙ্গালীর বাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতজী বলেন, "এখানে বাঙ্গালী নাই এবং না থাকাই ভাল।" * * * "পঞ্চানন-বাবু নামে একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যুবা অজমীঢ় সহরে বড় চাকরি করিতেন। সাহেবদিগের অনুরোধে তাঁহাকে উদয়পুরের ফৌজদারের (পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট) পদ প্রদত্ত হইয়াছিল। কয়েকমাস পরে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া এখানকার লোকে মারিয়া ফেলে। সন্দেহযুক্ত মৃত্যুর জন্য বৃটিশ রেসিডেন্টের আদেশে মৃতদেহের শবাস্তক পরীক্ষা (Post-Mortem Examination) পর্য্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই অপরাধী বলিয়া সন্দিগ্ধ হয় নাই। মৃত বাবুর পরিবারকে মাসিক ত্রিশ টাকা পেন্সন দিবার জন্য মহারাজা আদেশ করিয়াছেন।" ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের প্রদত্ত এই সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। দুই-তিন বৎসর হইল এলাহাবাদে অবসরপ্রাপ্ত কেরৌলীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রাওসাহেব ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি পঞ্চানন-বাবু ও তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে তাঁহার দিনলিপি ও পুরাতন স্মারক বহি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রবাসীর পাঠকপাঠিকার গোচর করিলাম।

সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশ হইতে প্রথম উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আগমন করেন। পরে তিনি রাজপুতানায় নিমচের (Southern Malwa State) এজেন্ট্স্ অফিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজপুতানায় কেরৌলীর গোস্বামীগৃহে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে থাকিয়া নিমচের কর্ম্মের জোগাড় করিয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি তথা হইতে পলায়ন করিয়া কেরৌলী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেরৌলীর মহারাজা মদনপাল তাঁহাকে অন্যত্র কর্ম্মগ্রহণ করিতে না দিয়া কেরৌলী স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া এবং ৫০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী দান করিয়া আপনার কাছেই রাখেন। কেরৌলীতেই মাধব-বাবুর দেহান্ত হয়। সে সময় কেরৌলীতে গোস্বামীদের এরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল যে মাধব-বাবু গোস্বামীদের ঘরে বিবাহ করায়, মোহন্তের ভগিনীপতি—এই সম্পর্কে, মহারাজাও তাঁহাকে ভগিনীপতির ন্যায় মান্য করিতেন। অধিকতর কৌতুকের কথা এই যে শ্যালক ও ভগিনীপতির মধ্যে যেরূপ কৌতুকামোদ হওয়া স্বাভাবিক ততদূর পর্য্যন্ত ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে চলিত। মাধব-বাবুর পুত্র বাবু পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্বে রাজপুতানা রেলওয়ের মালওয়া এগ্‌জামিনার অফিসে কার্য্য করিতেন। এই অফিস পরে উঠিয়া অজমীঢ়ে গেলে তাহার নাম হয় Chief Engineer's Office। রাজপুতানা-মালওয়া রেলওয়ে অফিসে তিনি প্রায় পনর বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। যদিও তিনি অজমীঢ়ে থাকিতেন তথাপি পিতার বিবাহ-সূত্রে কেরৌলীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহার প্রতি কেরৌলীর রাজপরিবারের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। মহারাজা অর্জ্জুনপালের বিধবা পত্নী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে* শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শন মানসে যাত্রা করিলে, তাঁহার সঙ্গে একজন ইংরেজী-জানা লোকের আবশ্যক হওয়ায়, তিনি পঞ্চানন-বাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। ইতিপূর্ব্বে পঞ্চানন-বাবু মহারাজ মদনপালের পত্নীর সহিত তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ বাক্‌পটু ছিলেন। "সভাচতুর" বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি রাজপুত সর্দ্দারদিগের সহিত খুব মিশিতে পারিতেন। একসময় উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ গজসিংহ অজমীঢ়ে আগমন করেন। তিনি পঞ্চানন-বাবুর আতিথেয়তায় ও বাক্‌পটুতায়

* ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮৬ অব্দে রাও বাহাদুর ৺ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেরৌলী আগমন করেন এবং ৺মাধব-বাবুর স্থলে কেরৌলীর হেডমাষ্টারি করিতে থাকেন।

এতদূর মোহিত হন, যে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মহারাণাকে বলিয়া উদয়পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেন। তথায় প্রায় সাত বৎসর কর্ম্ম করিবার পর তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

মহারাণা পঞ্চানন-বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রমাধুর্য্যে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী ও নাবালক পুত্রের শিক্ষা এবং পালনার্থ ত্রিশ টাকা মাসহারা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্চানন-বাবুর পুত্র, বাবু প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহারাণা তাঁহাকে Residencyর উকীল—এই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ প্রদান করেন। পরে তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আবুপর্ব্বতে Agent to Governor Generalএর উকীল অর্থাৎ মহারাণার Representative করিয়া দেন।

পঞ্চানন-বাবুর জনহিতৈষণা (public spirit) যথেষ্ট ছিল। দেশহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি অজমীঢ় প্রবাসে একসময় "Rajputana Herald" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের উৎসাহের অভাবে বৎসর-কাল পরে উক্ত পত্র বন্ধ হইয়া যায়।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

"ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে!"

চিত্রকর শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সৌজন্যে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলিপরে ?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে ;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা ; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে ?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি' ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি !

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে' গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে', অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি,
ঝরে'-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়াপরে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে ;
নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ?
ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি', সর্ব্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্ত্য কবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্র-তর্পণ

আজি সূর্য্য মেঘে-ঢাকা, দিবস ঘনিমা-মাখা, অন্ধকার ঘিরেছে ভুবন,
এ স্নিগ্ধ বাদল-দিনে পুলক-পূরিত মনে কাব্য-ছবি করিতে অঙ্কন ;
যত মেঘে ভিড় করে, যত বারি ঝরঝরে, তত তোমা মনে পড়ে আজ—
মনে পড়ে সৌম্য মূর্ত্তি, আঁখি-যুগ স্নিগ্ধ-কান্তি, কল্পনার ওহে পক্ষিরাজ !
বরষারি মেঘ সম ছিলে শান্ত সৌম্য কম, তারি মত করেছ বর্ষণ—
অজস্র ভাবের ধারা—কী শীতল জ্বালাহরা, কী প্রশান্ত আনন্দ-ভাষণ !
এ বরষা আঁধিয়ার কেঁদে মরে আরবার কোথা তুমি দুলাল-সন্তান,
এস পূর্ণ সত্য কবি, গাও গান আঁক ছবি কল্পনায় করিয়া সন্ধান।
সাহিত্য-সমাজ হতে যে কেহ কালের স্রোতে ভেসে গেছে লভিয়া মরণ,
তাহারি কল্যাণ তরে ভক্তিশ্রদ্ধাভরা স্বরে তুমি নিতি করেছ তর্পণ ;
আজি তুমি স্বর্গলোকে, রুদ্ধ বুক তব শোকে, কে তোমারে করিবে অর্চ্চন,
কে তোমার স্নিগ্ধ গীতি উচ্ছল স্বদেশ-প্রীতি পিয়ে তোমা করিবে বন্দন

সমাজের অবিচার, শাসকের অত্যাচার মর্ম্মে তব তুলেছে ক্রন্দন—
তাই শত কবিতায় তীব্রতম বেদনায় সে কলুষ করেছ ছেদন।
মনে পড়ে সেই দিন স্নেহলতা স্নেহহীন হয়ে যবে বরিল মরণ—
তুমিই ব্যথিত বুকে নির্দ্দয় লেখনী-মুখে ঢেলেছিলে তীব্র হুতাশন।
আজো কত স্নেহলতা নির্য্যাতন-অবনতা কত বধূ করে আর্ত্তনাদ,
তাদের হৃদয়-ক্ষত কাহারে কাঁদাবে তত, বেদনায় কে দিবে সংবাদ?
ভণ্ডামি ও ক্ষুদ্র কথা তোমারে দিয়েছে ব্যথা, তীব্রতম দেছ প্রতিবাদ,
ন্যায়ের নির্ভীক বাণী তোমার শায়ক হানি' কত ভণ্ডে দিলে অবসাদ।
স্বদেশের অকল্যাণ যে করেছে ক্ষুদ্র-প্রাণ তুমি তারে শাসিয়া কঠোর
কর্ত্তব্য দেখায়ে দেছ, সত্য-পথ চিনায়েছ, হে তেজস্বী হে সত্য-বিভোর!
ডায়ারের অপকীর্ত্তি পঞ্জাবে সে দস্যুবৃত্তি, তুমি তার দিলে পরিচয়—
ছাড় নাই খুনীটারে পলাইতে অহঙ্কারে, শিক্ষা দিলে নির্ম্মম নির্ভয়।

* * * *

মহাদ্রুম বনস্পতি যে আজ সাহিত্য-পতি, পেলে তাঁর স্নেহছায়া দান,
সে রবি ভুবন-জ্যোতি, তুমি যেন নিশাপতি আহরিলে তাঁরি আলো প্রাণ;—
সে স্নেহে অন্তর ভরি' নিজ শির উচ্চ করি' নিজ শক্তি করিলে প্রকাশ,—
অফুরন্ত সে কবিত্ব, অফুরন্ত মনুষ্যত্ব, অফুরন্ত বিচিত্র বিকাশ!
বাজাইলে বেণুবীণা, জাগাইলে ক্ষুব্ধমনা হতাশ্বাস বাঙালী-সন্তান,
কোমলে গেয়েছ গান, বজ্রের তুলেছ তান, হে কুসুম-কুলীশ-পরাণ!
উজাড়ি আপন শক্তি ঢেলেছ সাহিত্য-ভক্তি, তবু তব মিটে নিক আশ,
দেশ-দেশান্তর ছুটে মধুপের মত লুটে আহরিলে মধু বারো মাস;
ছন্দে তব চিত্ত নাচে, রেণু বীণা কুহু বাজে, যাদুকর মোহে যেন মন—
কভু লঘু কভু গুরু কভু বাজে দুরুদুরু মাদল মৃদঙ্গ অগণন।
অক্ষয় অক্ষয়কীর্ত্তি, তাঁরি তুমি শক্তি-পূর্ত্তি, আজি তোমা করি হে বন্দন,
হে বাংলার ভক্ত ছেলে, স্বর্গ হতে হস্ত মেলে ক্ষুদ্র পূজা কর হে গ্রহণ।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

কান্না সুরে ভর্‌ল বাতাস, আকাশ ঢালে নেত্র-সলিল,
মৌন হল মুখর বীণার তান;—
কর্‌তে পূত সবার শিরে ঢাল্‌বে কে আর 'তীর্থ-সলিল'—
কে শুনাবে 'কুহু-কেকার' গান?
'ফুল-ফসলে'র পসরা নিয়ে, আন্‌বে কে আর গৌরবে,
দেশের লাগি 'তীর্থরেণু' আর;—

বাণী দেউল ভর্‌বে কে আর 'চীনের ধূপের' সৌরভে,
কে বাজাবে 'বেণু-বীণা'র তার।
কে চলাবে ভাষারে আর, নৃত্য-দোদুল ছন্দে গো—
কে গাবে আর দেশ-বিদেশের কথা,—
বীরের গাথা, প্রাচীন ঋষির জ্ঞানের কুসুম-গন্ধে গো
কে ঘুচাবে হিয়ার মলিনতা;—

বীণাপাণি অঙ্গখানি সাজাবে কে নূতন সাজে ;—
'হোম-শিখা' কোন্ জ্বাল্‌বে সাধক বীর ;
'অভ্র-আবীর' কে ছড়াবে আজকে বাণী কুঞ্জমাঝে—
দেশের গর্ব্বে কর্‌বে উচ্চ শির !
বাণী-দেউল পূর্‌বে কে আর অতুল 'মণি-মঞ্জুষা'য়—
কে গাঁথিবে 'রঙ্গমল্লী' আর ;
'তুলির লিখন' হাতে নিয়ে কে ভরাবে সুষমায়
'হসন্তিকা'য় পূজার অর্ঘ্যভার !
আজকে সে যে গেছে চলি' গেছে চলি' কোন্ সুদূরে—
সেথায় কি সে শুন্‌ছে মোদের বাণী ,
ভাসিয়ে মায়ে অশ্রু-ধারে কোথায় গেল সে কোন্ পুরে,
পত্নীপ্রাণে বজ্র কঠোর হানি'.?
মৃত্যু যদি নে যায় তাকে কেড়ে মোদের কাছ থেকে
মরণের আজ ঘট্‌বে পরাজয় ;
অমর সে যে মোদের কাছে—গেছে যে সে কীর্ত্তি রেখে--
করেছে সে হৃদয় সবার জয় ।
নিভ্‌ল আজি একটা তারা ; থামাল গান একটি পিক্—
হিয়া সবার উঠ্‌ল ব্যথায় ভরে' ;
শান্তি লভ, অমর কবি, মৃত্যু,—সে তার প্রাপ্য নিক্,
বঙ্গ আজি ভাসুক্ নয়ন-লোরে ।

শ্রী দেবীদাস মুখোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্র-স্মরণে

জীবন-নাট্য অকালে সাঙ্গ করি'
আষাঢ়ের মেঘ-মুকুট মাথায় পরি'
ললাটে আঁকিয়া জয়চন্দন-টীকা
করিলে প্রয়াণ যেন গো বহ্নিশিখা !

মেঘলোকে যেথা নন্দনবনছায়ে
স্বচ্ছ সরসী আকুল দখিনা বায়ে,
শ্বেত সরসিজ ফুটায়েছে মায়াছবি,
সবুজ সায়রে উঁকি দ্যায় শিশু-রবি,
মৃণাললুব্ধ মরালের মত তুমি
সেথা কি গো গেলে ত্যজিয়া মর্ত্ত্যভূমি ?

ধূলিধূমে ভরা মহানগরীর প্রাণ
নারিল কি দিতে তব পূজা-অবদান ?
চলে গেলে যেথা চিরবসন্ত রাজে,
নূপুরের ধ্বনি নিয়ত বাতাসে বাজে ?

'মেঘদূত'-কবি হাতে নিয়ে মালাগাছি
তোমারে বরিতে রয়েছে দাঁড়ায়ে আজি !
সুরধুনী তব ভস্ম বুকেতে ধরি'
জলধির শিরে দিল সে উজাড় করি',
ফেনপুষ্পের অঞ্জলি ধরি' তুলে'
জয়গাথা তব গাহিল কর্ণমূলে !

দাঁড়াইয়া এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমে
দীনহীন এক বন্ধু তোমারে নমে !
নাই তার হাতে নন্দনফুলহার,
অশ্রুর মালা দিতেছে সে উপহার !
সান্ত্বনা পাক অশান্ত তব হিয়া.
মেলে যেন সেথা মনের মতন প্রিয়া !
সুরপতি-সভা উজ্জ্বলি' রহ কবি,
নয়নে ফুটুক অলোক-আলোক-ছবি !

১২ আষাঢ়, ১৩২৯ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

সত্য তুমি, ইন্দ্র তুমি, রচ্‌তে সুরের ইন্দ্রজাল,
বেসুরা এই মিথ্যা ধরা আর কি ভাল লাগ্‌লো না,
ফুল ফুটিয়ে কোথায় গেলে চক্রবালের অন্তরাল,
মঞ্জরিত কল্প-পাদপ ফল ধরাতে থাক্‌লো না।

সবুজ পরী অলকপুরী বন্ধ আজি কর্‌লে দ্বার,
থাম্‌লো অঝোর মুক্তা-ঝরা পাগ্‌লা-ঝোরার মুখ থেকে ;
কোন সে দারুণ জহ্নুমুনি গণ্ডূষেতে ভর্‌লে তার
সপ্তঝরা গঙ্গাধারা রুক্ষ ধরার বুক থেকে !

নওকো বেলী, নও চামেলী, সত্য তুমি গন্ধরাজ,
পীযূষভরা প্রাণটি গড়া ভালবাসার বিশ্বাসে,
ভোম্‌রা তোমার নিত্য চারণ কাঁদ্‌ছে শোনো বন্ধু আজ,
পারিজাতের জাত যে তুমি, শুকাও ধরার নিশ্বাসে।

পাহাড় কেটে আন্‌লে নদী প্রেমিক ফর্‌হাদ ভাই তুমি,
পান না করি' স্নিগ্ধ বারি কর্‌লে পয়াণ কোন দূরে,
হেথায় তোমার শিরিন্ কাঁদে কোথায় সখা কই তুমি,
হায়রে মানস-যাত্রী মরাল চায় না ফিরে বন্ধুরে।

বিশ্ববাণীর নূপুরধ্বনি বাজ্‌তো তোমার সুরটিতে
বর্ণে আলোয় গন্ধে নূতন সুর মিশাতে জান্‌তে গো,
তোমার বুকের সাত-মহলায় পরিমলের পুরটিতে
দিল-দরদী তোমার দয়া দীনের লাগি কাঁদ্‌তো গো।

তুচ্ছ সে দীপ আলাদীনের, তোমার সখী আস্‌মানী
আস্‌মানেতে গড়্‌তো তুলে অমর-পুরী তাজমহল,
তাঞ্জামেরে ছাড়্‌তো যে পথ সূর্য্য-তুরগ রাশ মানি',
আন্‌তো হুরী নিংড়ে আঙুর দূর সিরাজের আল্‌কহল।

ফুলের কবি পালিয়ে গেলে আজকে ফলের মর্‌সুমে
এই ধরাকে তরুণ করে' করুণ কোমল সঙ্গীতে,
হায় যুবরাজ কাঁদ্‌ছে যে আজ ভাইটি তোমার কর চুমে,
সান্ত্বনা দাও শান্তিকামী মুক্ত আঁখির ইঙ্গিতে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১

যে চোখে আসে না জল, সে আঁখি পাষাণ
আজি সিক্ত অশ্রুধারে, চাহি চারি ভিতে
ভাবি যবে, আর কভু পাব না দেখিতে
সেই শান্ত সুগম্ভীর মূরতি মহান্।
বাংলার কবি তুমি, মর্ম্মবাণী তার
কি অমৃতছন্দসুরে বাঁধিয়া গাঁথিয়া
বিরচিতে ইন্দ্রজাল, সে মধু ঝঙ্কার
নিত্য নব নব তানে আর গুঞ্জরিয়া
উঠিবে না এ শ্মশানে। বিহঙ্গের দল
গাবে কুঞ্জে সেই সুরে, কুসুমের রাশি
ফুটাবে সে বর্ণগন্ধ, সেই শ্যামাঞ্চল
প্রসারিবে দিগঙ্গনা, শুধু সেই বাঁশি
যার সুরে বয়ে যেত বাংলার প্রাণ,
সে বাঁশরী চিতানলে ভস্ম-অবসান।

২

মৃত্যু আসি দেহ হতে মুক্তি দেয় যারে
জানি না সে নব দেহে নূতন জীবনে
নব জন্ম লভে কি না। এ মর ভুবনে
জানি এক মৃত্যুঞ্জয় অমর আত্মারে
প্রাণ হতে প্রাণান্তরে নিত্য যে বিলায়
আপনারে প্রতি কর্ম্ম চিন্তা আচরণে।
সেই মৃত্যু বিজয়িনী অমৃত-ধারায়
ঢেলেছিলে কলস্বনে প্রাণের প্লাবনে,
তাই আজি ঘরে ঘরে কত নরনারী
বক্ষে বক্ষে ধরে তব প্রাণরসধারা।
ভেঙেছে সে পূর্ণ ঘট যার পুণ্যবারি
অভিষিক্ত করেছিল উষর সাহারা ;
অলি উড়ে গেছে রাখি মধুচক্রে তার
কাব্যরস-পিয়াসীর অমৃত-ভাণ্ডার।

সত্যেন্দ্রনাথের কথা

সমাপ্তি নাই কিসের? দুঃখের না শোকের? অথবা দুয়েরই?

দুঃখ মানুষ সহিতে পারে—দুঃখ যে নিত্যনৈমিত্তিক। শোক অসহ—মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়।

শুধু তাহাই নয়। দুঃখের পর সুখ—বৃষ্টির পর রৌদ্র, আশায় মানুষ বুক বাঁধে। কিন্তু শোক?—সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্ববিধ্বংসী, জীবনব্যাপী—সে যে পাগল করিয়া ছাড়ে।

মানসপটে জাজ্জ্বল্যমান যাহা, মুছিবে তাহা কেমন করিয়া? মনের ভার লাঘব করিতে চাও,—কাঁদো বঙ্গের নরনারী, বাঙ্গালার তরুলতা, পদ্ম অপরাজিতা, সেই সঙ্গে সুর মিলাইয়া দাও তোমরাও হে দোয়েল শ্যামা ফিঙা। তোমরা যে তার প্রাণের প্রাণ—তোমাদের সেই সত্যেন্দ্রনাথের।

না, নাই, সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই নাই! আষাঢ়ের পহিলা বাদলে সেই মহাপ্রাণ অমরধামে যাত্রা করিয়াছে। গত ১০ই আষাঢ়, শনিবার, রাত্রি আড়াইটায় তাহার শেষ নিশ্বাস ধরিত্রীর বাতাস স্পর্শ করিয়াছে।

শৈশবে

আজ মনে পড়ে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ১২৮৮ সালের ২৯এ মাঘ, শনিবার, অমনই বাদল রজনীতে দ্বিপ্রহর রাত্রে শীর্ণ শিশু প্রথম বিস্ময়ের চাহনি চাহিল। কে জানিত নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ের সূতিকাগারে দেশমান্য ঋষি-কবির আবির্ভাব হইল।

তাহার পর উপর্য্যুপরি কয়দিন কেবল ঝড়। সকলেই তাই নাম রাখিল—"ঝড়ি"। নামে 'ঝড়ি' কিন্তু প্রকৃতি কি শান্ত সংযত! শিশু আপন মনে হাসিত খেলিত, কাঁদিতে যেন জানিত না। ভগ্নস্বাস্থ্য, নিত্য পীড়া সারা-জীবন কুগ্রহের মত তাহাকে বেড়িয়া ছিল। শারীরিক যন্ত্রণার বাহ্য পরিচয় কিন্তু কেহ কোনদিন পায় নাই—সহিষ্ণুতা এমনই অসাধারণ।

স্নেহার্দ্র পিতা পূজ্যপাদ ৺ রজনীনাথ রাশি রাশি মেওয়া ও সুপক্ক ফল নিত্য আনিতেন। পুত্র দশজনকে বিলাইয়া কি আনন্দই না অনুভব করিত। রসনার তৃপ্তিদানে মুক্তহস্ত শিশু কে জানিত যৌবনে কবিত্বের বিচিত্র রস সৃষ্টি করিয়া সমগ্র বাঙ্গালাকে মাতাল করিয়া তুলিবে।

বাল্যে

গল্প শুনিতে বালকের আনন্দের অবধি ছিল না। অশীতিবর্ষবয়স্কা ঠাকুরমাতা কাহিনী ও ছড়া বলিতে বলিতে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন, বালকও তন্ময় হইয়া যাইত। পরদিন সকল কাহিনী সকল ছড়া যথাযথ আবৃত্তি করিত। স্মৃতিশক্তি এমনই তীক্ষ্ণ।

খেলার প্রতি বিতৃষ্ণা বালকের একটা বিশেষত্ব ছিল। ধর্ম্মবীরগণের প্রতি অনুরাগ কিন্তু পূর্ণ প্রকট। ধ্রুব, প্রহ্লাদ সাজিয়া "বল্ মাধাই মধুর স্বরে" কি আন্তরিকতার সহিতই গাহিত। যে শুনিত মুগ্ধ হইয়া যাইত, পুনঃ পুনঃ শুনিতে চাহিত।

কবিতা শুনিতে, ছবি দেখিতে বালকের কি বিপুল আগ্রহ! আত্মীয় শ্রী পূর্ণচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মসজীদ্-বাড়ী ষ্ট্রীটের বাটীতে থাকিয়া তখন পড়াশুনার সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চাও করিতেন। বালকের অনুরোধে প্রকাশচন্দ্রকে নিত্যই হয় একটা নূতন ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া, নয় একখানা ছবি আঁকিয়া দিতে হইত। নিজস্ব সম্পত্তি ভাবিয়া বালক তাহা লইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখরিত করিয়া তুলিত। পূর্ণচন্দ্র বালক সত্যেন্দ্রের প্রথম শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। বালক একমাসে প্রথম ভাগ শেষ করে।

পঠদ্দশায় পাঠে অনুরাগ পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকে নয়। অমনোযোগের জন্য মন্দ ভর্ৎসনার দু-একবার প্রয়োজন হয়। হস্তাক্ষর সম্বন্ধেও তাই। মার কাছে গোপনে অনুযোগ করিতে শুনিয়াছি—"মামা বকিয়াছেন লেখা বেশী করিয়া লিখি না বলিয়া। কিন্তু আমি ত কেরানী হইব না।"

প্রবন্ধ-লেখক তখন সংবাদপত্র সম্পাদনে ব্যস্ত। ইংরেজী বাঙ্গালা সংবাদপত্রে গৃহ পরিপূর্ণ, লেখক সর্ব্বদাই

সম্পাদকীয় মন্তব্যরচনায় বা প্রুফ সংশোধনে ব্যাপৃত। তের বৎসরের বালক সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই দেখিত, অসাক্ষাতে কিছু কিছু প্রুফ সংশোধন করিত, দু'একটি শব্দও যোগ্যতার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিত। প্রত্যহ পড়া লইবার সময় কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইতাম যাহা একবার বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা কণ্ঠস্থ হইয়াছে।

এই সময় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সত্যেন্দ্রের পিতা পুত্রকে লইয়া মধুপুরে যান। যাত্রার দুই দিন পূর্ব্বে বালক ছাপাখানা হইতে নিজনামের অক্ষর কয়টা আনিয়া বাটীতেই কালী দিয়া নিজ নাম ছাপিয়াছিল সমুদায় পুস্তকে, ছবিতে, দেওয়ালে। পরদিন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাহার নামটা সংবাদপত্রে ছাপিয়া দিতে হইবে। যখন উত্তর পাইল যে মধুপুর হইতে একটা সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেই নাম ছাপা হইবে, তখন উল্লাসের আর সীমা রহিল না। মধুপুর হইতে দিন কয়েক পরেই বালক সত্যেন্দ্র একটি সংবাদ লিখিয়া পাঠায়। লিখন-ভঙ্গী অতি সুন্দর হইয়াছিল। সেই প্রথম রচনা প্রেরকের নাম সহ যথারীতি সাপ্তাহিক "হিতৈষী" পত্রে প্রকাশিত হয়।

ইহার এক বৎসর পরে কবি শেলির Skylark সম্বন্ধে আমার কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা হইতেছিল। হেমচন্দ্রের অনুবাদের কথা উঠিল। অনুবাদে যে মূলের সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র সংরক্ষিত হয় নাই ইহাই সাব্যস্ত হইল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বালক সত্যেন্দ্র বলিয়া উঠিল, আমি ঐ কবিতা অনুবাদ করিব। বালকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া কৌতূহল জন্মিল। কবিতা ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইল। পরদিন সুন্দর অনুবাদ পাঠে চমৎকৃত হইলাম। সন্তুষ্ট হইয়া O. W. Holmesএর "The Old Man Laughs" কবিতা অনুবাদ করিতে দেওয়া হইল। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য যথাযথ সংরক্ষিত হইয়াছিল, পড়িয়া মনে হইল যেন সম্পূর্ণ মৌলিক কবিতা। দুইটি কবিতাই পরে সাময়িক পত্রে প্রকাশ করা হয়। তাহার পর প্রতি মাসেই কিছু কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার অনুবাদ চলিতে লাগিল, দু'এক স্থানে সংশোধনের প্রয়োজন হইত মাত্র।

যৌবনারম্ভে

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ স্কটিশ চার্চ্চেস কলেজে ভর্ত্তি হয়। এই সময়ে আমি ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হই। পরলোকগত বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতির "সাজি" ও আমার "যূথিকা" একই মাসে প্রকাশিত হয়। তখন ছোটগল্পের বহি বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না বলিলেই চলে। একদিন দেখি, রোগ সংক্রামক হইয়াছে, সত্যেন্দ্রনাথ অঙ্কের খাতায় একটা ছোট গল্প ফাঁদিয়াছে। ইহা কলেজের পাঠের বিশেষ অন্তরায় হইবে ভাবিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করি। সেই অবধি সত্যেন্দ্র গল্পরচনার চেষ্টা বোধ হয় আর তত করে নাই। ইউরোপীয় নানা ভাষা হইতে অনূদিত বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গল্পসাহিত্য পাঠে তখন আমার নেশা ছিল। আমার অজ্ঞাতসারে সত্যেন্দ্রনাথও সেগুলি সযত্নে পড়িত। কথা-প্রসঙ্গে একদিন তাহার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইলাম। তদবধি নিত্যই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দুইজনে সাহিত্যালোচনা হইত। সতের বৎসরের বালকের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা মনে হইলে অনেক সময় হাসি পাইত, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিত, ফরাসী, রুষীয় প্রভৃতি নানা গ্রন্থ এত যোগ্যতার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিত যে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হইত।

অঙ্কশাস্ত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বীতস্পৃহ ছিল। ইংরেজী সাহিত্য প্রত্যহ নিজে পড়াইতাম। অঙ্কপুস্তকের প্রতি মনোযোগ দিতেছে কি না একদিন পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিতেছে।

বিরক্ত হইয়াছি বুঝিয়া সত্যেন্দ্র বলিল, "উহা অনর্থক পণ্ডশ্রম মাত্র, ভালও লাগে না, বুঝিতেও পারি না।" তাহার পর সুযোগ্য শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকনাথ সরকারের প্রতি অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষার ভার সমর্পিত হয়। তাঁহারই যত্নে ছাত্র এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং পদার্থবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে। ইহারই ফলে "সবিতা" কবিতা। এই কবিতা অতঃপর হোমশিখার প্রারম্ভে সংযোজিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু (উকীল) শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্রের

ব্যয়ে গোপনে "সবিতা" গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। কয়েকমাস পরে উহা সত্যেন্দ্রের পিতার ও আমার গোচরে আসে। পাঠান্তে আনন্দিত হইলেও উভয়কেই বাহ্যতঃ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হয়। আশঙ্কা, পাছে উৎসাহিত হইয়া সত্যেন্দ্র কলেজের পাঠ সম্পূর্ণ অবহেলা করে।

এফ-এ পরীক্ষার পর সত্যেন্দ্রের পিতার একান্ত ইচ্ছা হইল পুত্র ডাক্তারি পড়ে। এজন্য সকল ব্যবস্থাই হইল, মেডিকাল কলেজে আবেদনপত্রও প্রেরিত হইল। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ তাহাতে সম্মত হইয়া পরে বিরক্তি প্রকাশ করিল। তাহার মনোবৃত্তি কোন্ দিকে রজনীনাথকে তাহা বুঝাইলাম। তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, পুত্রের ডাক্তারি পড়া হইবার নয় বুঝিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। অবশেষে বি-এ পড়াই সাব্যস্ত হইল।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় সত্যেন্দ্রের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু হায়! রজনীনাথকে পুত্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল না। পিতা মনস্বী অক্ষয়কুমার দত্তের "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা" পুস্তক পরিবর্দ্ধিত আকারে লিখিয়া ৪৫ বৎসর মাত্র বয়সে রজনীনাথ লোকলীলা সম্বরণ করিলেন।

বৎসরান্তে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইল। বিবাহের মাস কয়েক পরেই বি-এ পরীক্ষায় সত্যেন্দ্র অনুত্তীর্ণ হইল। তাহার কারণ মনোবিজ্ঞানের চর্ব্বিতচর্ব্বণ তাহার আদৌ ভাল লাগিত না। পুনর্ব্বার বি-এ পরীক্ষা দিতেও সে অসম্মত হইল। পীড়াপীড়ি করায় আমাকে বলিল, "আপনার export import ব্যবসায়ে যোগদান করিব। তাহাতে দেশের এবং দশেরও কাজ হইবে।"

যৌবনে

সত্যেন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই সে কার্য্যে বিরত হইল। শিরঃপীড়াই তাহার প্রধান কারণ। তাহার পর বহুবার এ কার্য্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে আর অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। গত বৎসরেও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য জৌনপুরে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিল, "শুনিলাম, বোম্বাই সহরে সাহেবদের আধিপত্য নাই, তাহার কারণ সেখানকার অধিবাসীরা বড় ব্যবসায়ী। আমাদেরও একটা আদর্শ খাড়া করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফিরিয়া আসিয়া আফিসের কার্য্যে যোগ দিব ভাবিতেছি।" ফিরিয়া আসার পর আর এই উৎসাহ ছিল না। কথা-প্রসঙ্গে বলিল—"ব্যবসায় ত অর্থোপার্জ্জনের জন্য, অর্থে আমার এমন কি প্রয়োজন!"

আফিস ত্যাগের পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রবল উৎসাহে সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করে। নূতন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিয়া সত্যেন্দ্র পিতামহের লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করিতে থাকে এবং সর্ব্বদাই অধ্যয়নে মগ্ন থাকিত। ইহার পর স্বদেশী আন্দোলনের নূতন যুগে সে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়। "সন্ধিক্ষণ" কবিতা লিখিয়া আমাকে দেখিতে দেয়। সামান্য পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তনের পর উহা মুদ্রিত ও বহু সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়। "সন্ধিক্ষণ" কোন পরবর্ত্তী গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয় নাই। একটি স্থান উদ্ধৃত হইল—

"বৎসরান্তে ভাদ্রশেষে শুধু একবার
কূল প্লাবি' আসে যে জোয়ার,
তাহার তুলনা নাই, সমস্ত বৎসরে
সে জোয়ার আসে একবার!
সে জোয়ার এসেছে রে
আমাদের ঘরে ঘরে,
এসেছে রে নূতন জীবন!
বাঙ্গালী পেয়েছে আজ সামর্থ্য নূতন।"

ইহার পর সত্যেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন রীতিমত আরম্ভ হয়। "বেণু ও বীণা" "হোমশিখা" "তীর্থসলিল" "তীর্থরেণু" "ফুলের ফসল" "জন্মদুঃখী" "কুহু ও কেকা" "তুলির লিখন" "মণিমঞ্জুষা" "অভ্র আবীর" "হসন্তিকা" "রঙ্গমল্লী" "চীনের ধূপ" পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। জীবনের এই অংশ তাঁহার বন্ধুগণের সম্যক পরিচিত। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ্বর্গ সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিবেন আশা করি।

প্রকৃতি

সত্যেন্দ্রের প্রকৃতি কোমল মধুর ও গম্ভীর ছিল।

অর্থে আসক্তি নাই, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, আহার বিহার আমোদ আহ্লাদের প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্রিয়, পূতচরিত্র, সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা মিলা ভার। বালকসুলভ সরলতা তাহার ভূষণ; অতি বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ হইতে বিদ্যালয়ের স্বল্পবয়স্ক ছাত্র পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে সমবয়স্ক বন্ধু জ্ঞান করিত।

পুস্তকপাঠ ও কবিতা রচনা সত্যেন্দ্রের জীবনের কেন্দ্র ছিল। রচনার জন্য চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা আদৌ ছিল না। বাগ্দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া যাহা লিখাইতেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় যেন তাহাই লিখিত। অর্থাগম হয় এমন কোন গ্রন্থ—বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক বা শিশুরঞ্জন কবিতাপুস্তক—লিখিবার জন্য কতবার পরামর্শ দিয়াছি, কোন ফল হয় নাই। বৈষয়িক ব্যাপার যাহা কিছু তাহাতেই তাহার বিষম বিরক্তি ছিল। সংসারের কোলাহল ও সাংসারিকতা হইতে সর্ব্বদাই সে দূরে থাকিতে চাহিত।

সত্যেন্দ্রনাথ স্বল্পভাষী এবং অপরের অনুগ্রহ প্রার্থনার প্রতি খড়্গহস্ত ছিল। অধিক লোকের সহিত মিশিতেও সে চাহিত না। বাল্যবন্ধুর মধ্যে বোলপুর বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত আজীবন সৌহার্দ্দ্য দেখিতে পাই।

স্বদেশপ্রেম

স্বদেশপ্রেমে কবি উদ্বুদ্ধ ছিল—"সন্ধিক্ষণে" তাহার উন্মেষ, পরবর্ত্তী রচনায় পূর্ণ বিকাশ। মেকির প্রতি, নকলের প্রতি, দোকানদারি বেনিয়াগিরির প্রতি, তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সে বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে এত শ্রদ্ধা আর কাহারও উপর তাহার ছিল না।

খদ্দর প্রচলনের পর হইতে আত্মীয়-স্বজনকে সে জানাইয়াছিল যে, খদ্দর ভিন্ন অন্য কোন বস্ত্র কেহ যেন তাহাকে উপহার না দেন। নিজেও সে সকলকেই খদ্দর দিত।

সমাজ-সংস্কার

আজীবন প্রকৃতপক্ষে সংসারের বা সমাজের বাহিরে থাকিলেও সত্যেন্দ্র সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের যত্ন করিতে ক্রটী করে নাই। ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও অত্যাচার, অস্পৃশ্য জাতির প্রতি ঘৃণা প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে সর্ব্বদাই সে বদ্ধপরিকর ছিল। সে কায়স্থ জাতির মধ্যে চারি সম্প্রদায়ের মিলনের সহায়তা করিয়াছিল।

দানশীলতা

সত্যেন্দ্রনাথের দান অতি সংগোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে হইত। বহু দুঃস্থ ছাত্রকে বিদ্যালয়ের মাহিনা ও পাঠ্য পুস্তক প্রতি মাসে যোগাইত, পাছে কেহ জানিতে পারে এজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত। দরিদ্র, আতুর দেখিলে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, যাহা নিকটে থাকিত তাহাই দিয়া ফেলিত। কয় বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন সত্যেন্দ্র দুইশত টাকা মূল্যের একখানি নূতন শাল ব্যবহার করিতেছিল; সপ্তাহকাল তাহা আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া সত্যেন্দ্রের জননী তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—সেখানা কি হইল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় সত্যেন্দ্র বলিল—"সেদিন এক বুড়ী কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে শীতে খুব কাঁপিতেছে দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, কাম্বেল হাঁসপাতাল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। শীতার্ত্তকে তাহা দিয়াছি।"

মাতৃভক্তি

মাতৃভক্তি সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ ছিল। সাংসারিক কোন কিছুরই প্রতি আসক্তি ছিল না, মাতৃভক্তি কিন্তু হৃদয়ে ওতঃপ্রোত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত যাত্রার সময় সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। জননীর পরেই যাঁহার প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা তাঁহার সঙ্গলাভ এবং তাঁহার সহিত পৃথিবী ভ্রমণের আশায় সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠে। বিধবা জননী অন্ধের যষ্টিস্বরূপ পুত্রকে দূরদেশে পাঠাইতে আতঙ্কিত হইলেন। পাছে মার প্রাণে ব্যথা বাজে এই আশঙ্কায় সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রার বাসনা পরিত্যাগ করিল। হায়! সেই জননীকে বৃদ্ধবয়সে একা ফেলিয়া আজ সে কোন্ সুদূরের যাত্রী!

ব্রহ্মচর্য্য

বিবাহিত হইলেও সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন ব্রহ্মচর্য্য

অবলম্বন করিয়া গিয়াছে। এমন ত্যাগ, এমন সংযম, ধীর স্থির প্রশান্তভাব যোগিজনেও দুর্লভ। ভীষ্মের মত তাহার প্রতিজ্ঞা, ভীষ্মের মতই চরিত্র-বল,—অচল অটল।

যাও সত্যেন্দ্রনাথ যাও, অমর লোকে সোনার সিংহাসন আলো করিয়া বস। জ্ঞানানুশীলনে ও কবিতারচনায় যে পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছ সেই পুণ্যফলে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া থাক। আমরা সে লোকে যেদিন পৌঁছিব, নিকটে যাইবার অধিকারী না হই, দূর হইতে দেখিয়াও ধন্য হইব।

শ্রী কালীচরণ মিত্র

সত্যেন্দ্র-পরিচয়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে মানুষ হিসাবেও ঘনিষ্ঠভাবে জান্‌বার আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর বন্ধুত্ব-লাভের সৌভাগ্যে। এক মাঘোৎসবের বিকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে যেতে যেতে পথে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করে' দেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। সে বোধ হয় ইংরেজী ১৯০৩ সালে বা তারও কিছু আগে। তার পর বহুকাল আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি—আমি কল্‌কাতা-ছাড়া হয়ে নানা দেশে ঘুর্‌ছিলাম। ১৯০৮ সালে আমি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের তরফ থেকে কল্‌কাতায় এসে ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস নামক বইএর দোকান খুলি। কল্‌কাতায় এসে একদিন মিউজিয়াম দেখে ফির্‌ছি, সিঁড়ির বাঁক ঘুরে নাম্‌তেই দেখ্‌লাম সত্যেন্দ্র উপরে উঠ্‌ছেন। নমস্কার ও কুশল-প্রশ্নের পর সত্যেন্দ্র আমার বাসার ঠিকানা জেনে নিলেন। একদিন রাত্রি প্রায় আটটার সময় সত্যেন্দ্রনাথ একতাড়া প্রুফ হাতে করে' আমাদের পাব্‌লিশিং হাউসের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন—আমি তখন ঘুমোবার জোগাড় কর্‌ছি। ভদ্রতার খাতিরে উঠে বস্‌তে হল, কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয়ে। তার পর যখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রুফের গুটানো কাগজ মেল্‌তে মেল্‌তে কিছু কবিতা পড়ে' শোনাবার প্রস্তাব কর্‌লেন, তখন ভাব্‌লাম—সার্‌লে এবার! অসহ্য কবিতার উপদ্রব শিষ্ট হয়ে সইতে হবে! তার আগে সত্যেন্দ্রনাথের কোনো কবিতা পড়িনি। সে ১৩১৫ সালের গোড়ার দিকের কথা—তখন সত্যেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুস্তক 'তীর্থ-সলিল' ছাপা হচ্ছে। দু-একটা কবিতা শুন্‌তেই আমার ঘুম ছুটে গেল, উৎসাহে আনন্দে সোজা হয়ে বস্‌লাম—একজন খাঁটি কবির সন্ধান পেয়ে মনটা খুসী হয়ে গেল। একে নানা দেশের কবিদের ভাবসম্পদ, তায় সত্যেন্দ্রের মধুর ভাষায় নিখুঁৎ ছন্দে রূপান্তরিত; আমি কবিতার রসমাধুর্য্যে মজে' গেলাম। আমাকে উৎসাহী দেখে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্র রোজ সন্ধ্যাকালে আমার কাছে আস্‌তে লাগ্‌লেন। আমি বড় ঘুম-কাতুরে, আটটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে

ঘুমিয়ে পড়্তাম, সত্যেন্দ্র আমার বিছানায় চুপ করে' বসে' থাক্তেন ন'টা পর্য্যন্ত। আমি লজ্জিত হয়ে একদিন জিজ্ঞাসা কর্লাম—'আমি ঘুমিয়ে পড়্লেও আপনি একলাটি চুপ করে' বসে' থাকেন কেন?' তার উত্তরে সত্যেন্দ্র বল্লেন—'রোজ সাড়ে নটার সময় আমি বাড়ী ফিরি—এই আমার নিয়ম; তার আগে বাড়ী ফির্লে মা ভাব্বেন যে আমার হয়ত কিছু অসুখ করেছে, তাই রোজ ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরি।' এই নিয়মটি তিনি মৃত্যুর অসুখে শয্যাগত হবার আগে পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে' গেছেন; যদি সঙ্গী না পেয়েছেন তবু একলা চুপ করে' হেদোয় বসে' থেকে নটা বাজিয়ে তবে বাড়ী ফির্তেন।

এই-রকমে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে তা বৃদ্ধি হয় দুজনেরই টো টো করার স্বভাব থেকে; আমরা দুজনে দুপুর বেলা বেড়িয়ে পড়্তাম বেড়াতে—চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বোটানিকেল গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির, বায়স্কোপ, ফেরি-ষ্টীমারে উত্তরে শিবুতলা ও দক্ষিণে রাজগঞ্জ আমাদের ভ্রমণ-পর্য্যায়ের অন্তর্গত ছিল। বারো মাসের তেরো পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে কল্কাতার কোন্ পাড়ায় কবে কোথায় মেলা হয় সত্যেন্দ্রের সব জানা ছিল ও দেখারও সখ ছিল। আমি হতাম তাঁর সহচর।

তার পর আমি এলাহাবাদে চলে' যাই। সেখান থেকে আমি সত্যেন্দ্রকে এক চিঠিতে তুমি বলে' সম্বোধন করি। তার উত্তরে সত্যেন্দ্র যে চিঠি লেখেন তার আরম্ভ—"আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান!—তুমি আমাকে তুমি বলেছ।" সাক্ষাতের যে সঙ্কোচ বাধা হয়ে ছিল, চিঠিতে সেটা দুজনেই কাটিয়ে উঠ্তে চেষ্টা কর্তে লাগ্লাম।

আবার কল্কাতায় ফিরে এলাম 'প্রবাসী'র সেবার ভার পেয়ে। সাক্ষাতে আবার আপনি সম্বোধন চল্তে লাগল।

এই সময় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্ত্তি হব-হব হয়ে আস্ছে। সত্যেন্দ্র প্রস্তাব কর্লেন, কবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা কর্তে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন কর্লেন মণিলাল ও যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি। আমরা চারজনে মেতে উঠ্লাম এর আয়োজনে। এই সময় আমরা পরস্পরে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্বার সুযোগ পেয়েছিলাম। আপনি বলে' সম্বোধন কর্লেই সম্বর্দ্ধনা-তহবিলে এক আনা করে' জরিমানা দিতে হবে, সত্যেন্দ্র ও যতীন্দ্রের এই প্রস্তাবে আমরা সকলেই কিছু কিছু জরিমানা দিয়ে আপনি বলার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলাম।

সত্যেন্দ্র রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা ঘটিয়ে তুলে আমাদের দেশের —বিশেষ করে' সাহিত্যপরিষদের—মুখরক্ষা করেছিলেন, তা না হলে য়ুরোপ নোবেল-প্রাইজ দিয়ে ভারতের যে অপমান কর্ত তাতে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবার জো থাক্ত না।

সত্যেন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে কত বড় মনে কর্তেন তার পরিচয় আমি পাই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরেই তাঁর প্রথম বই 'বেণু ও বীণা'র উৎসর্গ পড়ে'।

"যিনি জগতের সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন,
যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন,
যিনি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক,
সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন
কবির উদ্দেশে
এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।"

আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম—"এ আপনি কাকে উৎসর্গ করেছেন?" সত্যেন্দ্র বল্লেন—"আপনিই বলুন না।" আমি বল্লাম—"হয় রবীন্দ্রনাথকে, নয় শেক্স্পীয়ারকে।" তখন সত্যেন্দ্র বল্লেন—"ঘরে থাক্তে পরকে দিতে যাব কেন?" এই কথা শুনে আমার মন উল্লাসে নৃত্য করে' উঠেছিল; য়ুরোপের জহুরীদের কষ্টিপাথরে যাচাই হবার আগে রবীন্দ্রনাথকে বড কবি বলে' স্বীকার না করাটাই ছিল ফ্যাশান। যারা রবীন্দ্রনাথকে জগতের সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখক বলে' স্বীকার কর্বার দুঃসাহস রাখে সেইরকম সুদুর্লভ লোকের মধ্যে সত্যেন্দ্র একজন, এই পরিচয় জেনে আমি সত্যেন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠি। সত্যেন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথকে অতই শ্রদ্ধা করেন, তবে কবিগুরুর নাম প্রকাশ কর্বার সাহস হয়নি কেন তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সত্যেন্দ্র বলেছিলেন—"আমার সঙ্গে ত তাঁর পরিচয় নেই; অপরিচয়ে

তাঁর অনুমতি চাইতে সাহস হয়নি।" পরে সত্যেন্দ্র তাঁর নিজের গুণের জোরে বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্রের স্নেহভাজন হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন।

সত্যেন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে কত বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্‌তেন তার পরিচয় আমি বারবার পেয়েছি। সেবার রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়ে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করে' খুব নাম করেছেন। কবি-সুলভ দূরদৃষ্টির অনুভবে সত্যেন্দ্র প্রায়ই বল্‌তেন—"এবার রবি-বাবু নোবেল প্রাইজ পান ত ঠিক হয়।" একদিন আমি প্রবাসী-আপিসে প্রুফের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছি; বেলা তখন তিনটে হবে; সত্যেন্দ্র হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকেই বলে' উঠ্‌লেন—"আমি তোমায় মারব।" প্রুফ থেকে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি। উল্লাসে সত্যেন্দ্র যেন উপ্‌চে পড়ছেন—সেই আনন্দ যে কিসে প্রকাশ কর্‌বেন তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"কি এমন সুখবর যে আমায় মার্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে?" সত্যেন্দ্র বল্‌লেন—

ত্রয়ী

৺ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী　৺ সতীশচন্দ্র রায়　৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"আন্দাজ করো!" সত্যেন্দ্রের হাতে একখানা এম্পায়ার খবরের কাগজ দেখে বল্‌লাম—"রবি-বাবু নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?" এ আন্দাজ আমি কর্‌তে পেরেছিলাম সত্যেন্দ্রের কাছে এর আগে বহুবার এই ঘটনার সম্ভাবনার উল্লেখ শুনেছিলাম বলে'। সত্যেন্দ্র কাগজখানা টেবিলের উপর মেলে ধরে', শুধু খবরটা দেখালেন, কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না। তার পর বল্‌লেন—"আজ আর কিছু কাজ নয়, আজ ছুটি! ছুট বেরিয়ে পড়!" আমি বল্‌লাম—'রবি-বাবুকে টেলিগ্রাম করেছ?' সত্যেন্দ্র বল্‌লেন—"আমি (রবিবাবুর জামাই) নগেন গাঙ্গুলীর কাছে এস্‌প্লানেডে শুনেই কাগজ কিনে নিয়ে তোমাকে খবর দিতে ছুটে এসেছি। টেলিগ্রাম ত আমি কর্‌তে জানি না,—তুমি যা হয় করো।' তখন আমরা দুজনে কান্তিক প্রেসে গিয়ে মণিলালকে খবর দিলাম, আর তিনজনের নামে রবি-বাবুকে টেলিগ্রাম কর্‌লাম আমাদের সানন্দ প্রণাম জানিয়ে—Nobel prize, our
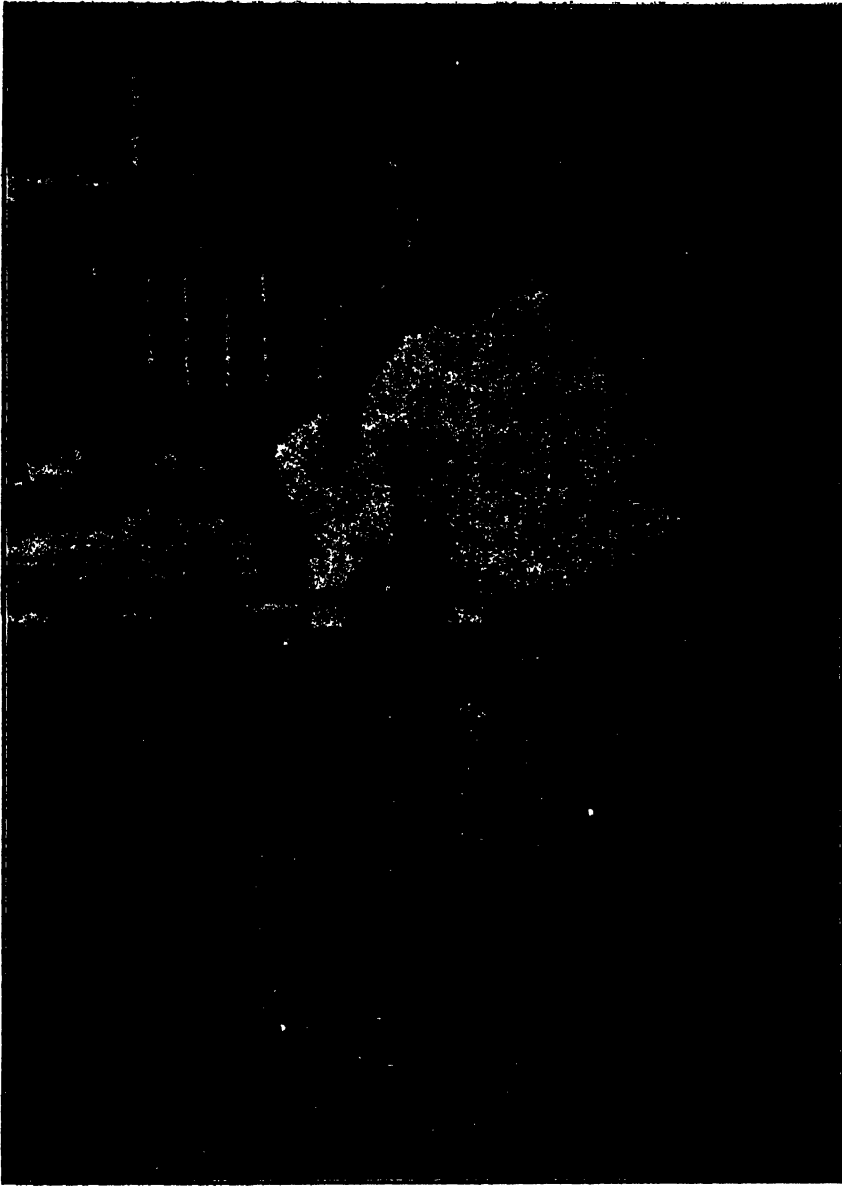
নিজের লাইব্রেরীতে রচনারত সত্যেন্দ্রনাথ

pranams। আমাদের টেলিগ্রামটা নগেন-বাবুর টেলি-গ্রামের পরে রবি-বাবুর কাছে পৌঁছেছিল, তাতে সত্যেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিলেন—"আমি টেলিগ্রাম করতে জান্‌লে আমিই আগে খবর দিতে পারতাম।"

সত্যেন্দ্র বড় অসহায় রকমের লোক ছিলেন, করিতকর্ম্মা কাজের লোক মোটেই ছিলেন না। কেমন করে' টেলিগ্রাম কর্‌তে হয়, মনিঅর্ডার কর্‌তে হয়, তা তিনি জান্‌তেন না। তাঁর গোপন দান ছিল যথেষ্ট; সেজন্য কোথাও মনিঅর্ডার কর্‌তে হলে পোষ্টাপিসের ফরম্‌-লিখিয়েকে পয়সা দিয়ে লিখিয়ে নিতেন; তারা একজন শিক্ষিত লোকের আশ্চর্য্য খেয়াল মনে করে' বিস্ময়ে চক্ষু-বিস্ফারিত কর্‌ত। আমি বিদ্রূপ কর্‌লে সত্যেন্দ্র হেসে

অন্তিম-শয্যায় সত্যেন্দ্রনাথ

বল্‌তেন—'আরে অত ছকের গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় কি লিখ্‌তে হবে তা কি করে' জানি?' কোথাও যাবার কথা হলেই সত্যেন্দ্র আমাকে বল্‌তেন—'তুমি যাও যদি ত যাই।' আমার উপর তাঁর অসীম নির্ভর ছিল; আর ছিল তাঁর মার উপর।

মার প্রতি সত্যেন্দ্রের অসাধারণ ভক্তি ছিল। সত্যেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয় সত্যেন্দ্রের কিশোর বয়সেই; সেই অল্প বয়সেই সত্যেন্দ্র মার সঙ্গে নির্জ্জলা একাদশী কর্‌বার চেষ্টা করেছিলেন। এবং সেই কষ্ট স্বয়ং অনুভব করে'ই তিনি লিখেছেন—

সুজলা এই বাংলাতে হায় কে করেছে সৃষ্টি রে,
নির্জ্জলা ওই একাদশী—কোন্ দানবের দৃষ্টি রে।
শুকিয়ে গেল, শুকিয়ে গেল, জ্বলে গেল বাংলা দেশ,
মায়ের জাতির নিশ্বাসে হয় সকল শুভ ভস্মশেষ।

মায়ের অসুখ হলেই সত্যেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হতেন; তিনি বল্‌তেন—"মা নেই, আমি আছি,—এ অবস্থা আমি কল্পনা কর্‌তে পারি না।"

কোথাও বেড়াতে যাবার জন্যে সত্যেন্দ্রকে ডাক্‌তে গেলে প্রায়ই শুন্‌তে হত—"আমার কাপড় বড় ময়লা।" আমরা বল্‌তাম—"ফর্‌সা কাপড় পরে' নাওনা।" উত্তর শুন্‌তাম—মার কাছে চাবি। মাকে দিয়ে বাক্‌স খুলিয়ে কাপড় বার করাতে হলে মাকে যে একটু কষ্ট দেওয়া হবে সেটুকুও সত্যেন্দ্র সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না। আজ মার একাদশী কিংবা—মা এখন শুয়ে আছেন, বা এমনি কিছু মার বড় অসুবিধার কারণ থাক্‌লে ত কথাই থাক্‌ত না।

সত্যেন্দ্রের পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে কোন রফা বা চলনসই ভাব ছিল না। যা তাঁর পছন্দ হত তা—'ভালো'। আর যা ভালো নয়, তা একেবারেই—'ছাই'। 'মন্দ নয়' 'মাঝারি', এসব তাঁর কাছে ছিল না। যা তাঁর মতে 'ছাই' তা তিনি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না, সেটার তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হত—Hang it! এ ব্যবস্থায় বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনই পক্ষপাত ছিল না।

সত্যেন্দ্র অসুন্দর কিছু সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না—তা সে ব্যক্তি হোক বা বস্তু হোক বা বাক্যই হোক। তাই তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন; মেকি বা অনধিকারচর্চ্চা তাঁর কাছে রেহাই পেত না। এজন্য তাঁকে অনেক লোককে রূঢ় কথা বল্‌তে হয়েছিল ও লোকের

বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। সত্যেন্দ্রের মেজাজের একটি আশ্চর্য্য সংযম ছিল; অতি রূঢ় তিরস্কারও অতি ধীরভাবে অনুত্তেজিত স্বরে সাদর সম্ভাষণের মতন বলে' যেতে পারার অসাধারণ শক্তি তাঁর ছিল।

কিন্তু যাঁর মধ্যে একটুও কিছু গুণ আছে বলে' তিনি মনে করতেন তাঁকে তিনি সম্মান করতেন। এই শ্রদ্ধালু স্বভাব থেকেই তিনি দেশ-বিদেশের ধার্ম্মিক ও সাহিত্যিক ও দেশসেবকদের ছবি সংগ্রহ করে' নিজের পাঠাগারে সাজিয়ে রাখ্তেন। এই সংগ্রহের মধ্যেও সত্যেন্দ্রের কবি-উপযোগী সৌন্দর্য্যবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যেত; ছবিগুলি সুশৃঙ্খলায় মণ্ডলাকারে সুসজ্জিত করে' তা থেকে বড় ফটো তুলিয়ে সত্যেন্দ্র লাইব্রেরী সাজিয়েছিলেন, সাহিত্যপরিষৎকে উপহার দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পনেরো দিন আগেও তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ফটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে তাঁর কিছুমাত্র ভেদবুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রমেশ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, গিরিশ, অমৃতলাল, প্রভৃতি এক মণ্ডলে স্থান পেয়েছিলেন। অথচ যখন সত্যেন্দ্রের শ্রদ্ধেয় কোনো কবি অপর এক ভক্তিভাজন কবির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ সেই শ্রদ্ধাভাজন কবিকেও রেয়াৎ করেন নি—কঠোর সমালোচনা দ্বারা সেই কবির ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেছিলেন। কোনো বিদেশিনী মহিলার ভারতপ্রেম দেখে মুগ্ধ হয়ে সত্যেন্দ্র তাঁর একটি মূর্ত্তি কিন্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমি তাঁকে বাধা দি। পরে সেই মহিলার মত পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখে সত্যেন্দ্র প্রায়ই বল্‌তেন—"তুমি আমার পাঁচটা টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছ, নইলে সেই মূর্ত্তি এখন ভাঙ্‌তে হত।" আমাদের অন্য কোনো স্বদেশ-হিতৈষীর আচরণেও তিনি এই রকম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্র সত্য কথা অপ্রিয় হলেও দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌তে পার্‌তেন। এজন্য একদিন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'সে যে সত্যেন্দ্র!' সত্যেন্দ্রের চরিত্রের দৃঢ়তাও অসাধারণ ছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ দেবার স্থান হবে তাঁর জীবনচরিতে; এইটুকু এখন বল্‌তে চাই যে তিনি বিবাহিত হলেও গৃহস্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংযম দেখে মুগ্ধ হয়ে একদিন বলেছিলাম—"সত্যেন, আমি তোমায় ভাই একদিন প্রণাম করব।"

সত্যেন্দ্রের চরিত্রে তেজস্বিতা ও নম্রতার সমন্বয় হয়েছিল। তিনি যাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতেন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করায় তিনি আনন্দ পেতেন; এইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কবি ও সাহিত্য-রসিকদের সঙ্গ কামনা করতেন, কিন্তু কোথাও শ্রদ্ধার খাতিরে নিজস্ব মত ক্ষুণ্ন হতে দেন নি।

সত্যেন্দ্রের এই গুণ ছিল বলে' সত্যেন্দ্র তাঁর বন্ধুদের ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। কোনো রচনা সত্যেন্দ্রকে দেখিয়ে তাঁর পছন্দ না হলে কেউ ছাপ্‌তেন না। সত্যেন্দ্র বন্ধুত্বের খাতিরে ও চক্ষুলজ্জায় কখনো সত্য সমালোচনা করতে বিরত হতেন না। বন্ধুদের বইএর নাম, ছেলেমেয়েদের নাম রাখ্‌বারও ভার ছিল সত্যেন্দ্রের উপর। আমার অধিকাংশ বইএর নাম সত্যেন্দ্রের দেওয়া।

সত্যেন্দ্রের তীর্থসলিল বই হয়ে বেরোনো পর্য্যন্ত তিনি কোনো কাগজে লেখেন নি এক 'সাহিত্য' ছাড়া। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সত্যেন্দ্র বলেছিলেন —"সমাজপতি আমাদের পাড়ার লোক, মামার বন্ধু, আমাকে ছেলেবেলা থেকে চেনেন, তিনি আমার কবিতা চেয়ে নিয়ে ছাপেন। যখন অপর কাগজের সম্পাদকেরা আমাকে চিনে আমার লেখা চাইবেন তখন তাঁদের দেবো, নিজে যেচে দেবো না।" ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসে আমি তখন কাজ করি; একদিন দোকানে সত্যেন্দ্র আমার কাছে এসেছিলেন, তখন রামানন্দ-বাবুও এলেন। আমি তাঁদের দুজনের পরিচয় করে' দিলাম। সেই মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের To the Sea বলে' একটি কবিতা ছাপা হয়, রামানন্দ-বাবু সেই কবিতাটি অনুবাদ করে' প্রবাসীতে দিতে অনুরোধ করেন। সত্যেন্দ্রের

সেই অনুবাদ কবিতা 'সমুদ্রের প্রতি' প্রবাসীতে প্রথম ছাপা হয়।

সত্যেন্দ্রের সমস্ত জীবনযাত্রাটাই কবিত্বময় সুন্দর সুসঙ্গত ছিল। তাঁর আচরণ ছিল সুন্দর, তাঁর রচনা সুন্দর, তাঁর আলাপ সুন্দর, তাঁর গান গাইবার শক্তি ছিল সুন্দর, তাঁর গৃহ গাছপালায় সুসজ্জিত সুন্দর, তাঁর লাইব্রেরী সুন্দর। তিনি সুন্দর আল্‌মারীতে সবচেয়ে সুন্দর সংস্করণের বই কিনে সাজিয়ে রাখ্‌তেন; বৈদিক সাহিত্য, দেশবিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও ইতিহাস তাঁর খুব ভালো পড়া ছিল। জ্যোতিষের চর্চ্চা তাঁর অবসর-বিনোদন ব্যসন ছিল। অখ্যাত অবজ্ঞাত জাতির মধ্যেও কোনো কবির সন্ধান পেলে সত্যেন্দ্র তাঁর কবিতা পড়্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তেন; সেই কবিতা অশেষ চেষ্টায় সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে আগ্রহে তা সেই কবিরই ছন্দে অনুবাদ করে' বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ কর্‌তেন। নানা দেশের কবিত্বরস বিশেষ ভাবে সম্ভোগ কর্‌বার সুবিধা হবে বলে' তিনি নানা দেশের ভাষা শেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন। তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁর রচনায় প্রকাশ পেত; এক-একটা কবিতা ইতিহাস বা পুরাণের বিশ্বকোষ হয়ে উঠ্‌ত। সত্যেন্দ্র যে বিষয়ে কবিতা লিখ্‌তেন, সে বিষয়ের হাটহদ্দ জেনে লিখ্‌তেন। কাজরী, গরবা সম্বন্ধে কবিতা লিখ্‌বেন বলে' তিনি চেষ্টা করে' ঐসব সুরের গান শুনেছিলেন; ফুলের কবিতা লিখ্‌তে বহু ফুলের নাম ও প্রকৃতি সংগ্রহ করেছিলেন; মেঘঘটাকে যুদ্ধ আয়োজনের রূপক দেবার জন্যে তিনি বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমি তাঁকে বল্‌তাম—"এসব শব্দের মানে কেউ বুঝ্‌বে না।" সত্যেন্দ্র বল্‌তেন—"না বোঝে খোঁজ করে' বুঝ্‌বে।" এমন বহুবিদ্য লেখক এখন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ আছেন বলে' আমি জানি না।

সত্যেন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের বহু ভাষা জান্‌তেন বলে' তাঁর ভাবসম্পদ ছিল প্রচুর এবং বাংলাভাষার উপাদান সংস্কৃত পালি ফার্সী হিন্দি বাংলা যথেষ্ট পড়া ছিল বলে' তাঁর শব্দ-সঞ্চয় ও তথ্য-সংগ্রহ ছিল অফুরন্ত। সত্যেন্দ্র আমার কাছে ছ মাস ফার্সী পড়েছিলেন; রোজ দুপুর বেলা তাঁর বাড়ীতে তাঁকে পড়াতে যেতাম। এই নিত্য সাহচর্য্যে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়। সত্যেন্দ্র একেবারে কল্‌কাতার মধ্যে চির-আবদ্ধ থাক্‌লেও বাংলা দেশের অন্তরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ও পরিচয় ছিল; তিনি এত অপভ্রংশ গ্রাম্য দেশজ প্রভাষার শব্দ জান্‌তেন যে তাঁর জ্ঞান ও পর্য্যবেক্ষণ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হত। বহু শব্দ জানা ছিল বলে' ও কবিতার মিল করা খুব অভ্যাস ছিল বলে' সত্যেন্দ্র কথা নিয়ে ওলট-পালট করে' বা এক কথা বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে' শব্দক্রীড়া (pun) কর্‌তে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় 'হসন্তিকা' বইয়ে 'অম্বল-সম্বরা কাব্যে'। শব্দচর্চ্চার জন্য তিনি মজ্‌লিশী রসিকতায় সিদ্ধবাক্‌ ছিলেন। আর-একটি ফল হয়েছিল তিনি ভাষাতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব ব্যাকরণতত্ত্ব আলোচনাতেও আনন্দ পেতেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণের ও শব্দতত্ত্বের বহু নূতন মৌলিক নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন; আমি তাঁকে প্রায়ই সেগুলি লিখে ফেল্‌তে অনুরোধ কর্‌তাম, বল্‌তাম—"Grimm's Lawএর মতন 'সত্যেন্দ্রনিয়ম' সকলের কাছে সমাদৃত হবে।" সত্যেন্দ্র বল্‌তেন—লিখ্‌ব। লিখ্‌ব লিখ্‌ব করে' তাঁর আর সেইসব অমূল্য নিয়মগুলি লেখা হয়নি; তাঁকে এত শীঘ্র হারাতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি বলে' আমিও সেগুলো লিখে রাখিনি—তাঁর মৃত্যুতে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও একটা মহৎ ক্ষতি হয়ে গেল আমি মনে করি। সাধারণে তাঁকে কেবল কবিরূপেই জান্‌তেন, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁর বন্ধুবা বিশেষ রূপেই জান্‌তেন। সাহিত্যের আদর্শ সত্যেন্দ্রের খুব উঁচু ছিল। তিনি বল্‌তেন—"বাংলা দেশে আড়াই জন সত্যিকার কবি জন্মেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র এক, রবীন্দ্রনাথ এক, আর মাইকেল আধ।" আমাদের দেশের কবি বলে' তিনি স্বীকার কর্‌তেন দু'জনকে—কালিদাস, তারপর রবীন্দ্রনাথ। য়ুরোপেও তিনি তিন-চার জনকে মাত্র শ্রেষ্ঠ কবি বলে' স্বীকার কর্‌তেন— গ্যেটে, হিউগো, শেক্‌শ্‌পীয়ার, শেলী। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে তিনি কবি বলে' মান্‌তেনই না; এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রকে অনেক বোঝাবার

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রের ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটে নি। আমেরিকার উপর তিনি বড় চটা ছিলেন সে দেশে একজনও খাঁটি কবি জন্মেনি বলে'। তিনি বল্‌তেন—"ওদের দেশের দুটি মাত্র ত কবি, এক লংফেলো আর হুইট্‌ম্যান্; একজনের ছন্দ মিল জুটেছিল ত ভাব জোটেনি, অপরের ভাব জুটেছিল ত ছন্দ মিল জোটে নি। দুয়ের সমন্বয় না হলে কি কবি?" এই দুয়ের সমন্বয় থাক্‌লেও তিনি ব্রাউনিংকে বড় কবি বলে' স্বীকার কর্‌তেন না, বল্‌তেন—"ওসব কবিতা নয় ত হেঁয়ালি।" আমাদের বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নাটক-রচয়িতা বলে' দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি সত্যেন্দ্রের অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

এই উচ্চ-আদর্শ ছিল বলে' সত্যেন্দ্র নিজের সম্বন্ধে একটুও অহঙ্কার পোষণ কর্‌তেন না; নিন্দায় প্রশংসায় তিনি সমান অবিচলিত থাক্‌তেন। তাঁর কবি-গুরু তাঁর কোনো কবিতার প্রশংসা কর্‌লে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন, কিন্তু সে আনন্দ তাঁর অন্তরেই গোপন থাকৃত। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রের চম্পা কবিতাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করাতে সত্যেন্দ্র আপনার সাহিত্য সাধনার চরম পুরস্কার পেয়েছেন মনে করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রের চিত্ত এমন সজাগ ছিল যে জগতের যে-কোনো স্থানে অসাধারণ মহৎ ঘটনা কিছু ঘট্‌লেই তাঁর অন্তর সাড়া দিয়ে উঠ্‌ত। টাইটানিক জাহাজ ডোবা, ম্যাক্‌সুইনীর প্রায়োপবেশন, টলষ্টয়ের গৃহত্যাগ, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা—সবই তুল্যভাবে সত্যেন্দ্রকে বিচালত কর্‌ত।

সত্যেন্দ্রের কবিত্বের বিশেষত্ব ছিল তাঁর অন্তরের দরদের ব্যাপকতায় এবং সেই কবিত্বের প্রকাশক ছন্দের বৈচিত্র্যে। ঝড়ের গাছ, গুটিপোকা, মেথর, কুলী থেকে আরম্ভ করে' রবীন্দ্রনাথ গন্ধী পর্য্যন্ত জগৎবরেণ্য মহাপুরুষ-দিগের প্রতি সত্যেন্দ্রের সমান টান দেখা যায়। সত্যেন্দ্রের বয়স যখন ১২।১৩, তখনকার অনেক কবিতা তাঁর প্রথম বই 'বেণু ও বীণা'তে সংগৃহীত আছে; সেই অল্প বয়সেই সত্যেন্দ্র ঝড়ে ভাঙা গাছের দুর্দ্দশায় ব্যথা বোধ করেছিলেন, লক্ষ গুটিপোকার মৃত্যু দিয়ে তৈরী রেশমী কাপড় পরা অধর্ম্ম বলে' প্রচার করেছিলেন। এই কবিতাটি পড়ার পর থেকে আমি রেশমী কাপড় পর্‌তে পারি না—এ কবিতাটি আমার মনে এমনই ছাপ রেখেছে। এই অল্প বয়সেই তিনি একদিকে স্বদেশকে সকল দেশের সেরা বলে' প্রচার কর্‌ছেন—

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে!

আবার সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির দীনতায় কাতর হয়ে প্রশ্ন কর্‌ছেন—

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে' আছিস বিরস মুখে?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে?
ঢলঢল নয়ন-যুগল জলভরে পড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে।
শিথিল মুঠি—ত্রিশূল কেন ধরার ধুলা আছে চুমি'?
কে মা তুই, কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি?

এই-সব কবিতা তাঁর 'বেণু ও বীণা'য় আছে—কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ১৩১৩ সালের মধ্যে লেখা। সত্যেন্দ্রের জন্ম হয় ১২৮৮ সালের ২৯ মাঘ বসন্ত-সংক্রান্তির দিন। সুতরাং কবিতাগুলি ১২ থেকে ২৫ বৎসর বয়সে লেখা।

এই যৌবনকালেই সত্যেন্দ্র জগৎব্যাপী সাম্য-সামের যজ্ঞে হোমশিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন—

এ বিপুল ভবে কে এসেছে কবে উপবীত ধরি গলে?
পশুর অধম, অসুর-দম্ভে মানুষেরে তবু দলে!

* * *

কর্ম্মে যাদের নাহি কলঙ্ক, জন্ম যেমনি হোক,
পুণ্য তাদের চরণ পরশে ধন্য এ নরলোক।
হোক সে তাহার বরণ কৃষ্ণ, অথবা তাম্ররুচি,
নির্ম্মল যার হৃদয় সেজন শুভ্র হতেও শুচি।

*　　　*　　　*

জননীর জাতি দেবতার সাথী নারীরে বোলো না হেয়,
অর্দ্ধজগতে কোরো না গো হীন, জগতের মুখ চেয়ো।

*　　　*　　　*

দেবতার ঘরে গণ্ডী রেখো না,—খোল মন্দির-দ্বার,
দেবতা কাহারো নহে তৈজস, দেবভূমি সবাকার।

*　　　*　　　*

সমীরে যাহার নিশ্বাস আছে, সে আছে আমারি বুকে;
সলিলে যাহার আছে আঁখিজল সে আমার দুখে সুখে;
কুসুম-সরস ধরণী যাদের বহিছে পরশখানি,
জীবনে মরণে কাছে কাছে তারা, মনে মনে তাহা জানি।
জাগো জাগো ওগো বিশ্বমানব! বারতা এসেছে আজ।
তোমার বিশাল বপু হতে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ।

*　　　*　　　*

ভাই সে আবার আসুক ফিরিয়া ভাইয়ের আলিঙ্গনে,
ভস্ম হউক বিবাদ বিষাদ যজ্ঞের হুতাশনে।
সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়,
মানুষের মত, মানুষের পথ, এক হোক পুনরায়,
সমান হউক আশা অভিলাষ, সাধনা সমান হোক,
সাম্যের গানে হউক শান্ত ব্যথিত মর্ত্ত্যলোক।

এই ছন্দটিতে সত্যেন্দ্রের কবিত্ব বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করত। প্রায় সমস্ত ভাবময় কবিতা তাঁর এই ছন্দে লেখা।

এই কবিতা লেখার ৯ বছর পরে সত্যেন্দ্র এই কথাই আবার বলেছিলেন—

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
　　সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত,
　　একই রবি শশী মোদের সাথী।

সত্যেন্দ্র হিন্দুমুসলমানের মিলনকামী ছিলেন—

"হিন্দু-মুসলমানের মিলনে তিনি প্রসন্ন হন।"

মুসলমান ধর্ম্মে সাম্য আছে বলে' তিনি ঐ ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন।

এই সাম্যভাব তাঁর মধ্যে ছিল বলে' সত্যেন্দ্র শূদ্রকে বলতে পেরেছিলেন—

শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্,
　　শূদ্র অতুল এ তিন লোকে,
শূদ্র রেখেছে সংসার, ওগো,
　　শূদ্রে দেখো না বক্র চোখে।

এবং তিনি শূদ্র হওয়াকে গৌরবের কারণ মনে করতেন—

"দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব!"

এবং তিনি মেথরকে বলেছিলেন—

কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।

*　　*　　*　　*

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে।

যেখানেই কেউ লাঞ্ছনা সয়ে কল্যাণের কর্ম্ম করেছেন সেখানেই সত্যেন্দ্রের চিত্ত একদিকে কল্যাণ-কর্ম্মীর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়েছে আর অন্যদিকে অন্যায়-লাঞ্ছনাকারীর বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে উঠেছে—স্নেহলতার মৃত্যুতে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর সাত্ত্বিক প্রতিরোধে তিনি যে কবিতা লেখেন তাতে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্র বিশ্বপ্রেমিক হলেও স্বদেশ তাঁর সর্ব্বাধিক প্রিয় ছিল। 'আমরা', 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' প্রভৃতি কবিতা তার সাক্ষী। সত্যেন্দ্রের কাছে "বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা" ছিল; এবং

"মধুর চেয়েও আছে মধুর—
　　সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
　　খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!"

স্বদেশ-সেবায় যিনি যিনি মহৎ ত্যাগের দুঃখ বরণ করেছেন তাঁদের প্রতি সত্যেন্দ্রের শ্রদ্ধাসম্নত চিত্তের কবিত্ব-পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হয়েছে। দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার দিনে উদাসীন থাকার জন্য বা তাঁর মতের সম্পূর্ণ অনুকূল মত পোষণ না করার জন্য বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধাভাজন

কয়েকজন মহাশয় ব্যক্তির প্রতিও সত্যেন্দ্র অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

সত্যেন্দ্র যেমন দেশ-বিদেশের প্রমাণিত মহত্ত্বকে সম্মান ও বন্দনা করে' গেছেন, তেমনি মহত্ত্ব-সম্ভাবনাকেও তিনি অভিনন্দন করেছেন—

হল্লা করে' ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,—
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল, ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে,—
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে;
ওই আমাদের ছেলেরা সব, ভাবনা যা সে ওদের পিঠে।
ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্যফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

সত্যেন্দ্রনাথ এই-সব কবিত্বমণ্ডিত উচ্চ ভাব প্রকাশ করেছেন ছন্দের বিচিত্রতায় সুন্দরতর করে'। তিনি বিদেশী বহু ছন্দ বাংলা কবিতায় আমদানী করেছিলেন; বহু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছিলেন; বহু ছন্দ নিজে সৃষ্টি করেছিলেন; এবং বাদ্যের বা যন্ত্রের সুর পর্য্যন্ত কথার ছন্দে ধরে' তিনি বন্দী করে' গেছেন। পাল্কী-বেহারার পাল্কী-বহনের কলরবের যে ছন্দ, তা সত্যেন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন 'পাল্কীর গান' কবিতায়।—পাল্কী চলেছে—

পাল্কী চলে,
পাল্কী চলে—
ভুল্‌কি চালে
নৃত্য-তালে!

পাল্কী বইতে বইতে বেহারারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, পথও ফুরিয়ে এসেছে, তখনকার সে ভাব ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে—

পাল্কী চলে রে!
অঙ্গ ঢলে রে!
আর দেরী কত?
আরো কত দূর?
আর দূর কি গো?
বুড়ো শিবপুর
ওই আমাদের;
ওই হাটতলা,
ওরি পেছুখানে
ঘোষেদের গোলা।

কাঁধ বদল করে' বেহারারা আবার ছুটল—

পাল্কী চলে রে,
অঙ্গ টলে রে;
সূর্য্য ঢলে,
পাল্কী চলে।

'পিয়ানোর গান' কাটা কাটা ছাড়া ছাড়া ছন্দে পিয়ানোর সুরকে কথায় ধরেছে—

তুল তুল টুক টুক
টুক টুক তুল তুল,
কোন্ ফুল তার তুল,
তার তুল কোন্ ফুল?
টুক টুক রঙ্গন,
কিংশুক ফুল্ল,
নয় নয় নিশ্চয়
নয় তার তুল্য। ইত্যাদি।

যখন চারিদিকে চর্‌কা চালাবার চেষ্টা চলেছে, তখন একদিন সত্যেন্দ্রকে বল্‌লাম—'একটা চর্‌কার গান লেখ।' সত্যেন্দ্র বল্‌লেন—'কেউ যদি আমাকে চর্‌কা-কাটার সুর শোনাতে পারে ত চেষ্টা কর্‌তে পারি।' আমাদের বন্ধু সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বাড়ীতে সত্যেন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে চর্‌কার সুর ও ছন্দ শোনালেন এবং সত্যেন্দ্র সেই সুর কানে বয়ে বাড়ী গিয়ে কথায় প্রকাশ কর্‌লেন—

ভোম্‌রায় গান গায় চর্‌কায়, শোন্ ভাই!
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই!
ঘর-বা'র কর্‌বার দর্‌কার নেই আর,
মন দাও চর্‌কায় আপ্‌নার আপ্‌নার।
চর্‌কার ঘর্ঘর পড়্‌শীর ঘর ঘর!
ঘর ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর!
পড়্‌শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!

নৈসর্গিক ব্যাপারকেও সত্যেন্দ্র ছন্দে রূপ দিতে পারতেন—

ইল্‌শে-গুঁড়ি! ইল্‌শে-গুঁড়ি!
ইলিশ-মাছের ডিম।
ইল্‌শে-গুঁড়ি ইল্‌শে-গুঁড়ি
দিনের বেলার হিম।
কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে—
পড়্‌তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম।
ইল্‌শে-গুঁড়ি হিমের কুঁড়ি
রোদ্দুরে রিমঝিম।

সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রবর্ত্তনে সত্যেন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে; বাংলায় আমরা সংস্কৃত হ্রস্ব স্বরকে সর্ব্বত্র হ্রস্বই উচ্চারণ করি না, এবং দীর্ঘকেও দীর্ঘ করে' উচ্চারণ করি না। সত্যেন্দ্র এই তথ্যটি ধর্‌তে পেরে বাংলার স্বাভাবিক হ্রস্ব দীর্ঘ ও হসন্ত অকারান্ত উচ্চারণ অনুসারেই সংস্কৃত ছন্দে কবিতা রচনা করেছিলেন, কোথাও কৃত্রিম উচ্চারণের সাহায্য নেন নি। সংস্কৃতের ছন্দ-শাস্ত্রে পঞ্চচামর ছন্দ একটি কঠিন ছন্দ; সত্যেন্দ্র তাকে বাংলা রূপ দিয়েছিলেন—

মহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।
বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক,
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

সংস্কৃত মালিনী ছন্দের উদাহরণ—

উড়ে চলে' গেছে বুল্‌বুল্,
শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর,
উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর
মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্বণ।

মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের উদাহরণ—

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল,
পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে' যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

রুচিরা ছন্দের নমুনা—

তখন কেবল ভরিছে গগন নূতন মেঘে,
কদম-কোরক দুলিছে বাদল-বাতাস লেগে;
বনান্তরের আসিতেছে বাস মধুর মৃদু,
ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু;—
তখন কাহার আঁচলে গোপন যূথীর মালা
মধুর মধুর ছড়াইত বাস— কে সেই বালা?

বিদেশী বা সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ একটি দুটি শ্লোকে নয়—৪।৫ পৃষ্ঠা জোড়া গোটা গোটা কবিতায় তিনি প্রকাশ কর্‌তে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় স্বল্প-পরিসরে দেওয়া কঠিন। আর একটি কথা বলে' আমার তর্পণ সমাপ্ত কর্‌ব। সত্যেন্দ্র নিজেকে লোকের কাছে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী রূপে প্রকাশ কর্‌তেন। কিন্তু তিনি যে কত বড় বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন তার পরিচয় তাঁর প্রথম পুস্তক 'বেণু ও বীণা' থেকে পরবর্ত্তী পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর থেকে সত্যেন্দ্রের দৃষ্টি অস্বচ্ছতার অন্ধকারে আবৃত হয়ে আস্‌ছিল, সেই উপলক্ষ্যে তিনি যে কবিতা লেখেন তা যখন আমি প্রথম পড়ি তখন আমি চোখের জল রাখ্‌তে পারিনি—

১

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে

সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে।
পরাণ ভরিছে ত্রাসে।

১১

সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার ?—
কে এলে দোসর
দুঃখ করিতে পার ?
ঘুচাতে অন্ধকার।

১২

কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনার ?
এতদিন যারে
করেছি অস্বীকার !—
আত্মীয় আত্মার !

১৩

এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিতে ?
পূজা যে করে'নি
বৈকালী তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভৃতে ?

১৬

বাহিরে তিমির
ঘনাক এখন তবে,
আজ হতে তুমি
রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো দোসর হবে।

২৩

জয় ! জয় ! জয় !
তব জয় প্রেমময় !
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয়।
জয় ! জয় ! তব জয় !

অন্যত্রও সত্যেন্দ্রের প্রার্থনা এমনি ব্যাকুল ও নির্ভরতায় ভরা—

জাগিয়ে রেখ একটি তারার আলো,
একটু দয়া রেখ আমার পরে,—
চোখে যখন দেখ্‌তে না পাই ভালো,
দু চোখ যখন চোখের জলে ভরে,—
গহন আঁধার, অকূল পাথার, আবিল কুজ্ঝটিকা,
জ্বালিয়ে রেখ তোমার প্রেমের শিখা।

* * *

একটি তারার একটু শুভ্র আলো
জাগিয়ে রেখ আমার যাত্রা-পথে,
ঘির্‌বে যেদিন মৃত্যু-আঁধার কালো,
ফির্‌তে যেদিন হবে নীরব রথে,
যম-নিয়মের নিমে যখন সকল তনু তিতা ;—
দয়া রেখ পিতা আমার পিতা !

সত্যেন্দ্রের এই অকালে মহাযাত্রার পথে তিনি যে বিশ্বপিতার দয়া থেকে বঞ্চিত হন নি তা দয়াময়ের দয়াই একমাত্র কারণ নয়। মৃত্যুর মাস-খানেক আগে আমি সত্যেন্দ্রকে বল্‌ছিলাম—"বিধাতা মানুষকে নিয়ে একটু রঙ্গ করেন—হাইকোর্ট যাব বলে' ট্রাম ধর্‌তে গেলে আগে আসে এস্‌প্লানেড, আর এস্‌প্লানেড যাব মনে করে' গেলে আগে আসে হাইকোর্ট ; কোনো মাসে কিছু বেশী আয় হলে সে মাসে পরিবারের কারো অসুখে দ্বিগুণ ব্যয় হয়ে যায়।" এতে সত্যেন্দ্র প্রতিবাদ করে' বল্‌লেন—"যিনি মঙ্গলময়, যিনি দয়াময়, তাঁর বিধান এ হতেই পারে না ; ওগুলো Chance, Fate বা সয়তানের কাণ্ড বল্‌তে পার—বিধাতার নয় !" বিধাতার দয়া ও মঙ্গলময়ত্বে তাঁর এমনি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

সত্যেন্দ্র আমার বাড়ীতে একবার যাবার জন্যে বছর দুই থেকে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। শহুরে ধনী বন্ধুকে পাড়াগাঁয়ের গরিবের কুঁড়েঘরে নিয়ে যেতে আমার সঙ্কোচ হত ; আমি এখন নয় তখন করে' বছর দুই বিলম্ব করি। এবার তাঁর আগ্রহ এত প্রবল হয়ে গেল যে আর মুল্‌তুবি রাখ্‌তে পার্‌লাম না। আমার বাড়ীতে জ্যোৎস্নারাত্রির উষাকালে নানা পাখীর বিচিত্র ঝঙ্কারে জাগ্রত হয়ে খানিকক্ষণ পরে সত্যেন্দ্র বলেছিলেন—"এমন প্রভাত আমি জীবনে কখনো সম্ভোগ করিনি।" আমার বাড়ী থেকে ফিরেই তিনি শয্যাগত

হয়ে পড়েন। যখন তাঁর চেতনা বিকারগ্রস্ত রোগবিষে মূর্চ্ছাহত, তখনও তিনি একটু চেতনা পেয়েই আমাকে খুঁজেছেন; মা, স্ত্রী ও ভাইয়েরা যখন তাঁকে ঔষধ পথ্য খাওয়াতে পারেন নি, আমি তাঁকে অনুরোধ করতেই হাসিমুখে যুক্ত-করে নমস্কার করে' আমার প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি নির্ভর ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার অনুরোধ পালন করেছেন। তাঁর অকাল-তিরোধানে একপুত্রা মাতার ও পতিব্রতা পত্নীর যে ক্ষতি তার ত তুলনা নেই; কিন্তু সত্যেন্দ্র কেবল পরিবারের আত্মীয় ছিলেন না—তিনি ছিলেন সমস্ত দেশের আত্মীয় বন্ধু, নিরুৎসাহীর উৎসাহদাতা, সৎকর্ম্মীর যশোগায়ক, অন্যায়ের প্রতিরোধী। সত্যেন্দ্রের অভাবে দেশের লোকের ও সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে তাও পূরণ হবার নয়।

সত্যেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯১৫ সালে কাশ্মীরে গিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন—

চারু,

হয়েছে ভূস্বর্গ-প্রাপ্তি হঠাৎ আমার,
স্বর্গীয় হয়েছি আমি, ভুল নাই তার।
ভূ:পূর্ব্ব স্বর্গীয় কবি অদ্য তাই sings
নিসর্গের জয়! আর বিজয়া Greetings।

সত্যেন্দ্র যে এত শীঘ্র ভূত-পূর্ব্ব স্বর্গীয় কবি হবেন তা স্বপ্নেও ভাবি নি। আজ ভূত-পূর্ব্ব স্বর্গীয় কবিকে তাঁর শোকসন্তপ্ত বন্ধু শ্রদ্ধাতর্পণ নিবেদন করছে।

ছন্দ-সরস্বতীর প্রিয় দুলাল, মাতৃভূমির বক্ষের ধন, বন্ধুবৎসল কবি আমাদের এই বিচ্ছেদদুঃখ অনুভব করে'ই সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন—

যেদিন আবার ফুটবে মুকুল
　সেদিন আমায় দেখতে পাবে,
ফাগুন-হাওয়া বইলে ব্যাকুল
　থাকব দূরে কোন্ হিসাবে?
আসব আমি স্বপন ভরে
　গভীর রাতে ভুবন পরে;
হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
　গাইব যখন কোকিল গাবে।
তোমরা যখন কইবে কথা
　শুনব আমি শুনব গো তা,
আমার কথা হরষ ব্যথা
　হায় গো হাওয়ায় ভেসেই যাবে!

কবির এই বিশ্বসত্তা আমরা যেন অনুক্ষণ অনুভব করতে পারি বিশ্বকর্ত্তার কাছে এই প্রার্থনা। ১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে সত্যেন্দ্র তাঁর বন্ধু সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে একছাতার তলে দাঁড়িয়ে ফটো তোলান। এই তিনজনই অল্প বয়সে নিজের নিজের প্রতিভাচ্ছটায় বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত করেন এবং তিন-জনেই অল্প বয়সেই পরলোকে যাত্রা করলেন। অজিত-কুমারের মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্র প্রায়ই বলতেন—"তিন জনের দুজন গেল, এবার আমার পালা।" কবি সত্যেন্দ্র শীঘ্রই "সুদূরের যাত্রী" হবেন জেনে সকলের কাছে বিদায় চেয়ে গেছেন—

আজ আমি তোমাদের জগৎ হইতে
　চলে' যাই ভাই।
জনেকের চেনা মুখ কাল যদি খোঁজ
　দেখিবে সে নাই।

*　　*　　*

আমি যদি কারো প্রাণে ব্যথা দিয়ে থাকি
　আজ ক্ষমা চাই;
স্বেচ্ছায় বেদনা মোরে দাও নাই কেহ,
　আমি জানি ভাই।

*　　*　　*

মনে থাকে মনে কোরো; আমি তোমাদের
　ভুলিব না হায়!
তোমাদের সঙ্গহারা সঙ্গী তোমাদেরি—
　বিদায়! বিদায়!

সত্যেন্দ্র পরলোকের আনন্দলোকে আমাদের পূর্ব্বজ হয়ে অপেক্ষা করছেন; আমরা ইহলোকের কর্ম্ম সমাপ্ত করে' বিদায় নিলে আবার তাঁর সঙ্গসুখ পেয়ে ধন্য হব, তাঁরই আশ্বাসবাণী আমাদের আশান্বিত করে' তুলেছে। সর্ব্বলোকাশ্রয় ভগবান আমাদের সেই আশা পূর্ণ করবেন—এই প্রার্থনা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্র-নামা

সবে আজ বর্ষার খুলে গেছে বোরোকা,
ওড়্‌না যে ওড়ে তার রংদার দোরোখা,
পর্দ্দার ফাঁক থেকে আঁখি তার চম্‌কায়,
সর্দ্দার বাজ দেখে বেআব্রু ধম্‌কায়!

বাউরিয়া সংসার,—সেই সুরে কবি আজ
তুলেছিল ঝঙ্কার্ বেঁধে নিয়ে এস্রাজ্;
থাম্‌কা এ কি আঘাত্—বীণ্ ভেঙে চৌচির,
ঝরে আঁখি একসাথ্ বাগ্‌দেবী লছ্‌মীর!

আল্লার জয়গান শুন্‌বে না ফেরিদূন
শমনের শয়তান কর্‌লে কি তাই খুন—
দুনিয়ার দেল্-খোস্, বাঙ্‌লার দিল্‌দার্?
হায়! হায়! আফ্‌শোস্! মিল্‌বে কি মিল্ তার?

সে যে ছিল ফুল-কবি চর্চ্চিত চন্দনে,
মন্দার্ মুখ-ছবি পারিজাত নন্দনে;
কল্পনা-কালোয়াৎ, খাসা ভাষা-কারিকর,
শব্দের শাহান্‌সা, ছন্দের ঈশ্বর!

দুষ্‌মন্ চুম্ দিয়ে লুটে নিল দোস্তি,
নয়নের ঘুম নিয়ে আরামের স্বস্তি!
দিচ্ছিল বুল্‌বুল্ মশ্‌গুল্ মিঠে শিশ্,
মরণের একি ভুল তার মুখে দিলে বিষ?

সে ছিল যে মছ্‌লন্দ্, হিস্পানী গাল্‌চে,
জড়োয়ার গুল্‌বন্দ্ মিনেদার লাল্‌চে,
সিরীয়ার কিঙ্খাপ, সমর্ণা মখ্‌মল্
চুম্‌কীর চিক্-টাপ্ জৌলসে জল্‌জল্!

কীমাম্ সে কস্তুরী, কাশ্মীরী জাফ্‌রান্,
দর্‌গার তস্তেরি, ফকীরের আলোয়ান্,
জরিদার জামেয়ার্ মল্‌মল্ মস্‌লীন,
বাঙ্‌লার জান্-এয়ার্ লুটে নিল কোন্ জিন?

গজল্ সে আলাপের, গুজ্‌রাটি গার্ব্বা,
বস্‌রাই গোলাপের গাজিপুরী কার্ব্বা,
কাম্‌রা সে আমখাস্ মর্ম্মর পাথরের,
চামেলীর নির্য্যাস, খোস্‌বাই আতরের;

জম্‌কাল মজ্‌লিশ্, জল্‌সা সে আসরের,
নমাজের কুর্ণীশ্, দিল্লাগী বাসরের;
হোলী-খেলা, নওরোজ্ বারোয়ারী দশেরা,
হাসি-খুসি নাচ্ ভোজ্ খেয়ালের পসেরা!

জেহাদের ঝাণ্ডা সে—কোরানের কল্মা,
অভেদের পাণ্ডা সে সত্যের শল্মা;
শক্র সে হারামের কাম্ তার সাচ্চা,
বিদ্রোহী আরামের, মরদের বাচ্চা!

লাগাম সে সোয়ারের, দুব্‌লার নিভর্,
চাবুক সে গোঁয়ারের, বে'কুফের মুদ্গর!
ইজ্জৎ বাঙ্‌লার, বাঙালীর ইমান্ সে,
দৌলত দুনিয়ার কৈসার ধীমান্ সে!

বেগমের তাঞ্জাম্, বাদ্‌শার হাওদা,
দর্‌বারী আঞ্জাম্, তারিফের বাহোবা,
কিতাবের সুল্‌তান্, কাব্যের নবাবটি,
সব-সেরা ফুল-দান টুটে গেল হঠাৎ কি?

হামাম্ সে হারেমের, নার্গিস্ বাগিচার,
ওস্তাদ্ সারেঙের, সেলামের ভাগিদার,
বেলকুঁড়ি, জুঁই ফুল, গুল্‌সান্ খোস্‌বাই,
মণিহার, মোতিদুল, দেওয়ালীর রোশ্‌নাই!

পান্নার পিল্‌সুজ্, মাণিকের জেল্লা,
জড়োয়ার গম্বুজ, জহরতী কেল্লা,
খাটেনি সে খেদ্‌মৎ—নোকর্ না বান্দা,
ভোগেনি সে বদ্‌খৎ দুঃখের ধান্ধা!

মৃদঙ্গ সঙ্গত্, বংশী সে বঁধুয়ার,
কলেজার মুহবত্ দিলভরা মধু তার,
মেহ্‌দীর মিহি রং, সুকুমার-রূপ-টান,
কাজলের কালো ঢং, কবরীর ধূপ-দান!

আরক সে আঙুরের, কমলার ফুল-মদ,
মিঠে বোল্ ঘুঙুরের, চাট্নী সে গুলকন্দ,
সর্ব্বৎ শরদার, মোরব্বা আমলকী,
মিঠে-খিলি-বর্দ্দার আজ থেকে থাম্ল কি ?

মোহর সে হিন্দুর, আস্‌রফী মোগলের,
দানা রেস্ সিন্ধুর, মোখেল্ সে চোগলের,
অকপট ইন্‌কার, নেক্ অনবদ্য,
ভারতীর বীণ্‌কার্, কমলার পদ্ম !

তোজ্‌দানে ভর্‌পুর মুক্তির মশ্‌লা,
আরতির কর্পূর, জ্যোৎস্নার পশ্‌লা !
ধূপ ধূনো গুগ্‌গুল্, লবানের গন্ধ,
খস্‌খস্, কেয়াফুল, থাক্‌বে কি বন্ধ ?

চেয়েছে যে দুনিয়াতে মোবারক হর্‌দম,
নেই যার শরীয়তে গোড়ামীর কদ্দম,
বন্দেগী মনসুর, সত্যেন্ সৎ-নবী !
জিন্দেগী বাহাদুর, মরে না হে সব্ কবি।

হাফেজ বা জামী, রুমী, সেখ্ সাদী, ফার্‌দোসী,
এ যুগের কেউ তুমি, আশ্‌মানে যার্ শশী—
গায়েব্ কি হয় তার জৌলস্ কবরে ?
অমর সে বরাবর বেহেস্তী সফরে !

শ্রী নরেন্দ্র দেব

তস্তেরি—প্রণামীর পাত্র। জিন্—অপদেবতা।
গুলসান্—মুকুল। মুহব্বত্—ভালবাসা।
দানা—জ্ঞানী। রেস্—সমতুল্য।
মোখেল্—প্রতিবন্ধক। চোগলের নিন্দুকের।
নেক্—সৎ। মোবারক—কল্যাণ।
শরীয়ত্—ধর্ম্মপথ। মনসুর—মহাপুরুষ।
নবী—প্রচারক। গায়েব্—লুকায়িত।

মহাপ্রস্থান

বঙ্গবাণীর বীণারব আজি থামিয়া গিয়াছে হায় !
উদার ললাট ঢেকেছে বিষাদ-আঁধার-কালিমা-ছায় !
বিমল আস্যে মধুর হাস্য আর নাহি আজ ফুটে,
শোকের সাগর উথলি' নয়নে অশ্রুর ধারা ছুটে !

নয়নের মণি গিয়াছে হারায়ে দারুণ মরণ-ঘাতে,
ধ্রুবতারা আজ খসি' পড়ি' গেল নীরবে আঁধার রাতে।
দুবাহু বাড়ায়ে কারে খোঁজ আর ? নাই আলো নাই হাসি,
"ফুলের ফসলে" ফুটাতে তাহার আর বাজিবে না বাঁশী !

সে যে চলে' গেছে কোন্ সে সুদূর জীবনের পরপারে,
গহন আঁধারে আপনাকে ঢাকি' কোন্ প্রেম্-অভিসারে ?
স্বপন-বালিকা তারার মালিকা পরিয়া আকুল কেশে
গেল লয়ে' তারে বাঁধি বাহুপাশে কোন্ স্বপনের দেশে ?

ওগো কবি, তুমি বাংলার ছবি এঁকে দিয়ে গেলে গানে,
"ফুলের ফসলে" ধরণী হাসালে, ভাসালে সুরভি-বানে।
"অভ্র-আবীরে" সাজালে মায়েরে চির-অপরূপ রূপে,
"তীর্থ-সলিলে" করায়ে সিনান্ বন্দিলে চীনা-ধূপে।
"বেণু ও বীণা"র সুরের ঝঙ্কারে নিখিলের মন হর,
শতেক "তীর্থ-রেণু-"কণা আনি দুয়ারে করিলে জড়,

"মণি-মঞ্জুষা" ভরিয়া মায়েরে রত্ন করিলে দান,
"হোমশিখানলে" যে দীপ জ্বালালে সে চির জ্যোতিষ্মান্।

হে কবি কলাপী, 'কেকা'রবে তব চির-বিরহীর প্রাণে
প্রিয়-স্মৃতি জাগে, নয়নের আগে অশ্রু ঘনায়ে আনে।
বসন্ত-রাজ, 'কুহু'রবে তব ধরা-চিত উতরোল,
তারায় তারায় কম্পন লাগে জ্যোছনার ফুল-দোল।

ছন্দের দোলে ভাষারে দোলালে ভাবেতে ভোলালে মন,
অরূপেরে তুমি রূপ দিলে ওগো ঘটাইলে অঘটন।
বালক কিশোর যুবক বৃদ্ধ সকলেরি তুমি কবি,
সকলের তরে বহু প্রেম ভরে আঁকিলে মোহন ছবি।

সত্যই তুমি সত্যের রাজা, উদার মহান্ ধীর,
মিথ্যাসূদন নির্ভয় ছিলে, চির-অনলস বীর।
অভয় মন্ত্রে নিরাশ হৃদয়ে জাগাইলে তুমি আশা,
দশের পরাণে দেশের কারণে জাগাইলে ভালবাসা।
তুমি চলে' গেলে, দু'হাতে করিয়া করে' গেলে তুমি দান
হৃদয়-সাগর-মন্থন-করা অমিয়-মাখান গান।
যাবার বেলায় রেখে গেলে তুমি দীপ্ত-অনল-জ্বালা,
"দুখ-তরণের, সুধাক্ষরণের উদাহরণের মালা।"

তুমি মর নাই, আছ আছ বেঁচে বাঙ্গলার গেহে গেহে,
বাঙ্গালীর বুকে, বাঙ্গালীর মুখে, তার সুখে-দুখে-স্নেহে।
অক্ষয়-স্মৃতি, অফুরাণ-গীতি তোমার কি আছে শেষ ?
মানস-নয়নে উদিবে গো তুমি পরি' নিতি নব বেশ।

আসিবে এখনো কত উৎসব, কত আলো, কত হাসি,
তুমি কি আড়ালে লুকায়ে তখন বাজাবে অলোক-বাঁশী ?
দুর্গমপথে গহন আঁধারে যেইজন পথহারা
তার তরে তুমি উঠিবে ফুটিয়া আকাশেতে ধ্রুবতারা ?

শ্রী সুবোধচন্দ্র রায়

কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ

হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দ ছন্দরাজ !
একি অভিনব ছন্দে মৃত্যুমন্ত্রে বরি' নিলে আজ
আপন মর্ম্মের মাঝে, সহসা পথের মধ্যখানে ?
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত সুর শুধু ঘুরে' মরে কানে !
রিক্ত-আশা বঙ্গভাষা—বিয়োগিনী কাঁদিছে করুণ
দুর্ভাগ্য দেশের বুকে ;—মধ্যপথে মুদিত অরুণ !
বিরহের মন্দাক্রান্তা আষাঢ়ের মেঘমন্দ্র মাঝে
গুমরি' গুমরি' তাই বাঙ্গলার বক্ষে আজি বাজে !
শুনেছি বরুণ-মন্ত্রে বিনামেঘে বৃষ্টিধারা ঝরে,
প্রমূর্ত্ত দীপক রাগে কলাবিৎ নিজে পুড়ে' মরে ;
জানিনাক কোন্ সুরে বন্ধু তুমি সেধেছিলে বাঁশী—
রুদ্র পরিণাম যার মূর্ত্তিমান দেখা দিল আসি'
সমস্ত দেশের বুকে অকস্মাৎ বজ্রব্যথা হানি'—
বঙ্গ সারস্বত কুঞ্জে মূর্চ্ছাতুর নিজে বীণাপাণি !
যাজ্ঞিকের হোমশিখা সমারব্ধ যজ্ঞ-সূচনায়
লাগিল কেবল গৃহে ; যজ্ঞ শেষ হ'ল না'ক হায় !
ভৃঙ্গারে শুকায়ে গেল সমাহৃত পুণ্যতীর্থবারি,
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি' তার শেষ অশ্রু-ঝারি ;
কাব্যের নিকুঞ্জ থেকে কুহু-কেকা লভিল বিদায়,
চোখ্ গেল—চোখ্ গেল ভগ্ন কুঞ্জে আজি বাহিরায় !
তুলিখানি অশ্রুজলে অঙ্কে তুলি রাখিলা ভারতী—
কে লিখিবে লেখা আর, কে করিবে একান্ত আরতি
নিত্য নব নব ছন্দে মন্দিরেতে তুলিয়া ঝঙ্কার,—
কভু সংস্কৃত ভাষা, কভু সাম, কভু বা ওঙ্কার !
আর কেন ছন্দ গাঁথি ? বন্ধু গেছে 'ছন্দ লয়ে' সাথে ;
মোরা শুধু মন্দভাগ্য, পড়ে' আছি চাহিয়া পশ্চাতে
শুধিতে দুঃখের ঋণ ! নেত্রপথ রুদ্ধ অশ্রুজলে—
কবে মিলাইবে তার দৃশ্যপট জবনিকা-তলে !

শুধু থেকে থেকে আজ এক কথা জেগে উঠে মনে,
কেন তুমি চলে গেলে অকস্মাৎ হেন অকারণে।
যাবার সময় তা যে শুধাবার দিলে না সময়,
শুধাবার দূরে থাক্—হ'লনাক দৃষ্টি বিনিময়।
দুর্ভাগিনী বঙ্গভূমি—ছিল যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়,—
যার নাম জপমালা, নামাবলি যার উত্তরীয়
ছিল তব অনুদিন, সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন,
লাঞ্ছিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে পায়ে পরের অধীন ;
তারে কি বলিয়া আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে-
সিংহাসন কৈ দিলে ?—লুটায় সে কণ্টক-আসনে।
রাণী বলে' ডেকেছিলে—এই কি রাণীর যোগ্য সাজ,
জননী বলিয়া ডাকি' ঘুচালে না জননীর লাজ !
হে দেশবৎসল, তবু সত্যসন্ধ তোমারি সন্ধান
আজি আরো হানে মর্ম্মে—তব সত্য কত বড় দান
যাহা তুমি রেখে গেছ ; মূর্ত্তি যত পশ্চাতে লুকায়,
অভাবের অন্ধকার ঝলি' উঠে দীপ্ত প্রতিভায়।
তাই চোখে পড়ে যত ধরণীর ধূলি আর বালি,
দেশজোড়া অসত্যের পুঞ্জীভূত কলঙ্কের কালী।
তবু যে তোমারে চাই—ভাব নিয়ে ভরে না জীবন,
মাটীর মানুষ মোরা—মাটী যে একান্ত প্রয়োজন !
কি ফল বিফল বাক্যে ? গেছ যদি, যাও কবি যাও—
ফুলের ফসল ফেলি' এ ধরার, যদি সুখ পাও
নবীন নন্দনে আজি—অম্লান মন্দারে ভরি' ডালা
গাঁথিতে নূতন ছন্দে বরদার বর কণ্ঠমালা।
হেথা সবি পুরাতন, ধূলিম্লান দৈন্যভারাতুর
চিত্ত নিত্য অশ্রুনেত্রে চায় হেথা বিয়োগবিধুর !
নিষ্পলক মাতৃনেত্রে ঝরে সেথা যে প্রসন্ন হাসি,
তারি স্পর্শে ধৌত হোক্ ধরণীর সর্ব্ব ধূলিরাশি।

শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সিদ্ধি

১

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না এই তার পণ। তাই কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েচে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে' তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরণার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখীতে এসে ঠুকরে খেয়ে যায়।

আরো কিছুদিন গেল। তখন ঝরণার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কি? আমার সেবা যে বৃথা হতে চল্‌ল।"

তারপর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে' ধরে' ছায়া করে' দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে' থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী স্নেহ করে' জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ?"

কাঠকুড়নি বলত, "আমার ভালই কি আর মন্দই কি! কিন্তু তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই? তোমার মা? তোমার বোন?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কি? তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?"

কাঠকুড়নি বলত, "প্রাণ থাকে না বলেই ত প্রাণের জন্য এত দরদ।"

তাপস বলত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব।"

এই বলে' সে কত কি বলে' যেত, তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে?

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশের নব মেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরো কিছু দিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আস্‌বার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে, মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তাহলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এদিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্ত্ত্যকে লঙ্ঘন করে' স্বর্গ পেতে চায়—এত বড় স্পর্দ্ধা!

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বল্‌লেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল; মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে?"

মেনকাকে মহেন্দ্র বল্‌লেন, "যাও তপস্যা ভঙ্গ করগে।"

মেনকা বল্‌লেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্ত্ত্যের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতেও স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই?"

ইন্দ্র বল্‌লেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়ার দোলা লাগ্‌তেই মর্ম্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দন-বনের হাওয়া এসে লাগ্‌ল। আর তার দেহ মন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্য্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। তার মনের ভাবনাগুলি চাকছাড়া মৌমাছির মত উড়্‌তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

ঠিক্ সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হ'ল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জ্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেল্‌ল।

সামনে দেখে, সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভ ফুলে রং-করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়্‌চে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল—চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রং লাগিয়েচে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, "কেন প্রভু?"

তপস্বী বল্‌লে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্য।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বল্‌লে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে?"

তপস্বী আবার আসনে বস্‌ল, অনেকক্ষণ ভাব্‌ল, আর কিছু বল্‌ল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের একধার থেকে আর একধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল।

সে ভাবলে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে?"

সে রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে' তার নিজেকে নিজের তুচ্ছ করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে' উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষ গাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না! কি ভাবলে কি জানি!

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে' বললে, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

মেয়েটি বললে, "আমি বহুদূর দেশে যাব।"

তপস্বী বললে, "যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বললেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।"

তপস্বী বললে, "তা হ'লে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?"

তপস্বী বললে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

(সবুজ পত্র, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৮)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখ

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস,
কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে?
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢেকে'
মন্থর মেঘখানি
এল গভীর ছায়া ফেলে।
রুদ্রতপের সিদ্ধি একি
ঐ যে তোমার বক্ষে দেখি,
ওরি লাগি আসন পাতো
হোম-হুতাশন জ্বেলে।

নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে
মৃত্যু-ক্ষুধার মত
তোমার রক্ত নয়ন মেলে।
ভীষণ তোমার প্রলয় সাধন
প্রাণের বাঁধন যত
যেন হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ যে
আশার ভাষা উঠ্ল বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামলরূপে
করুণ সুধা ঢেলে॥

(ভারতী, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখী ঝড়

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে।
মোহন এল ভীষণ বেশে,
আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে,
এল তোমার সাধন-ধন
চরম সর্ব্বনাশে।
বাতাসে তোর সুর ছিল না,
ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর
শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
এল তোমার পথের সাথী
বিপুল অট্টহাসে॥

(ভারতী, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠক্‌রিয়ে মধু-কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি;—
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি।
হের, কুল্ কুল্ 'কুল্' বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রস্ ঝরা,
ভোমরার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিলকুলই!
তারা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্ ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক্ ছেড়ে,
আওরা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে দোরে খালি চুলবুলি'!
কত বোল্‌তা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ্ দিয়ে;
ফল্‌সা বনের জল্‌সা ফুরলো
মৌমাছি এলো রোল্ তুলি'!
ওই নিঝুম্ নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ্ মাখা,
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল কলি!
আজ ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফজ্‌লি সে
মেশে কাঁচামিঠে মজ্‌লিসে;
'রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি!
ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে;
জামরুলী-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী!

মরি, ভোমরা ছুটেছে তার পাকে
হাওয়া ক'রে ছুটো পাথ্‌নাকে,
ফলের মধুর মরশুম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি' !

(ভারতী, আষাঢ়) ৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঝর্ণা

ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দনবর্ণা !
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে'
গিরিমল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা !

পাষাণের স্নেহধারা ! তুষারের বিন্দু !
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু !
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে,
চুমা চুম্‌কীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা !
ঝর্ণা !

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্তে,
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্তে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও পরশে করগো শ্রীমন্ত,
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসার ভর্ণা;
ঝর্ণা !

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে সুপর্ণা !
ঝর্ণা !

মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হল ছাওয়া যে !
মোতিয়া মোতির কুঁড়ি মুরছে ও অলকে,
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্ণা !

(ঝর্ণা) ৺ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

—

শিল্প ও ভাষা

ছবি না বোঝা ঘট্‌তে পারে—হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই আর্টিষ্টের ছবির ভাষায়, বিশেষ জ্ঞান না থাকায় ; অথবা যে ছবি দেখছে, চিত্রের ভাষায় দৃষ্টিটা তার যদি মোটেই না থাকে। ছবির ভাষা অনেকটা সার্ব্বজনীন ভাষা। ছবির ভাষার মধ্যে অপরিচয়ের প্রাচীর এত কম উঁচু যে সবাই, এমন কি ছেলেতেও, সেটা উল্লঙ্ঘন সহজেই করতে পারে। কিন্তু ঐ একটু চেষ্টা, যার নেই তার কাছে ঐ এক হাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত দুর্গপ্রাকার, ছবি-ঠেকে সমস্যা ! কবির ভাষা চলেছে শব্দ-চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে' মনের দিকে ; ছবির ভাষা, অভিনেতার ভাষা, এরা চলেছে রূপ-চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে' ইঙ্গিত করতে করতে। শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রংএর সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে—রূপ-কথা। অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা।

ছবির বেলাতে সুরসার কথাবার্ত্তা এসবের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, আঁকা রূপগুলো অমনি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে, তবে তারা একটা একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের তালিকা দ্রষ্টার চোখের সামনে ধরে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকে, বলে না, চলে না—পিদুম, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা, পণ্ডিত, সাহেব, কিম্বা অমুক অমুক অমুক, এর বেশী নয়। কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম, তার কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সল্‌তে, ঢেলে দিলাম তেলটা পটের উপর—ছবি কথা কয়ে উঠলো, "নির্ব্বাণ-দীপে কিমু তৈল-দানম্ !" ছবিকে ইঙ্গিতের ভাষা দিয়ে বলানো গেল, চলানো গেল।

কথার ব্যাকরণে যাকে বলে 'ধাতু', ছবির ব্যাকরণে তার নাম 'কাঠামো', (form), ধারণ করে' রাখে বলেই তাকে বলি ধাতু। ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হলে কথিত ভাষায় শব্দরূপ পাই না, ছবির ভাষাতেও ঠিক ঐ নিয়ম—মাথা হাত পা ইত্যাদি রেখা দিয়ে একটা কাঠামো বা ফর্ম্মা বাঁধা গেল, কিন্তু সেটা বানর বা নর এ প্রত্যয় বা বিশ্বাস কিসে হবে যদি না ছবিতে নর-বানরের বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দিই ! শুধু এই নয়। বিভক্তি, যিনি ভাগ করেন, ভক্তি দেন, তাঁর চিহ্ন লেজ ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয়া চাই, বানরের সঙ্গে গাছের কি বনের, নরের সঙ্গে ঘরের কি আর কিছুর সন্ধি সমাস সন্ধান করা চাই। সংকীর্ত্তিত ভাষা যেমন তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা, ছবি দেখা শুধু চোখ নিয়ে চলে না, ভাষাজ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার, ছবি-স্রষ্টার। শুধু অক্ষর কিংবা কথা অথবা পদ কিম্বা ছত্রের পর ছত্র লিখ্‌তে পারলে, অথবা চিনে চিনে পড়্‌তে পারলেই সুন্দর ভাষায় গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক বা পাঠক হয়ে ওঠা যায় একথা কেউ বলে না। ছবি অভিনয় নর্ত্তন গান ইত্যাদির বেলায় তবে সে কথা খাটবে কেন ? যেমন চিঠি লিখ্‌তে পারে অনেকে, তেমনি ছবিও লিখ্‌তে পারে একটু শিখ্‌লে প্রায় সবাই ; কিন্তু লেখার মতো লেখার ভাষা, আঁকার মতো আঁকার ভাষার উপর দখল কজনে পায় ? কাযেই বলি, যে ভাষাই হোক তাতে স্রষ্টাও যেমন অল্প, তেমনি দ্রষ্টাও কচিৎ মেলে ভাষা-জ্ঞানের অভাব-বশতঃ। ফুলকে দেখারূপে আঁকা এক, ফুলের ভাষা শুনে নিজের ভাষায় ফুলকে বর্ণন করায় তফাৎ আছে কে না বলবে ?

বাংলা দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা। কিন্তু সেই অপ্রচলিত ভাষা চলিত বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষা প্রচলিত যেমনি হল অমনি, বাংলার পণ্ডিত-সমাজে খুব চলন হল সেই ভাষার, সবাই লিখ্‌লে কইলে বুঝ্‌লে বুঝালে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাংলার খাঁটি বাংলায় লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়্‌লো ; ফল হ'ল—এক কালের চলিত ভাষা সহজ কথা সমস্তই দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়্‌লো, এমন কি কথার অক্ষর-মূর্ত্তিটা চোখে স্পষ্ট দেখ্‌লেও কথাটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি বোঝা শক্ত হয়ে পড়্‌ল ! বাংলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় যদি এটা খাটে, তবে ছবির ভাষার বেলায় সেটা খাট্‌বে না কেন ?

ছবির মূর্ত্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশের ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেই-গুলোর নাম হয় অন্ধযুগ। এই অন্ধতার মধ্য দিয়ে আমাদের মতো পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময় সময়।

আর্টের ভাগ যথা—শাস্ত্রীয় শিল্প Academic art, লোকশিল্প Folk art, পরশিল্প Foreign art, মিশ্রশিল্প Adapted art. লোকশিল্পের ভাষা হল—পটপাটা গহনাগাটি ঘটিবাটি কাপড়-চোপড় এমনি যে-সব art শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিললেও মন হরণ করে। 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ' হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে, শুক্রাচার্য্যের মতে তাই হল লোকশিল্পের ভাষার রূপ। আর যা 'পণ্ডিতানাম্ মতম্', যেমন দেবমূর্ত্তি-রচনা শিল্পশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রাজা বা পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প, সেই হ'ল শিল্পের সংস্কৃত ভাষা। পরশিল্প হ'ল যেমন গান্ধারের শিল্প, একালের অয়েলপেন্টিং। মিশ্রশিল্প চীনের বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, এসিয়ার ছাঁচে ঢালা এখনকার ইউরোপীয় শিল্প, গ্রীসের ছাঁচে ঢালা স্থান-বিশেষের বৌদ্ধশিল্প, এবং এখনকার বাংলার নবচিত্রকলাপদ্ধতি! সুতরাং শিল্পের ভাষা-রহস্য বড় জটিল হয়ে উঠেছে ক্রমেই, কাকে রাখি কাকে ছাড়ি এও এক সমস্যা! ছবিগুলো সমস্যা হয়ে উঠ্‌লে তো বড় বিপদ! ছবিটা যে সমস্যার মতো ঠেকে সেটা ছবির বা ছবি-লিখিয়ের দোষে অথবা ছবি-দেখিয়ের দোষে। ছবিকে মূর্ত্তিকে শুধু ছবি বা মূর্ত্তির দিক দিয়ে বুঝ্‌তে পার্‌লে আর-সব দিক সহজ হয়ে যায়, কিন্তু একাজটাও যে সবাই সহজে দখল কর্‌তে পারে,—হঠাৎ ছবিমূর্ত্তি দেখেই তাদের সত্তার দিক দিয়ে তাদের ধরা চট করে' যে হয় তা নয়, সেই ঘুরে ফিরে আসে পরিচয়ের কথা।

সুরের ভাষা যে না বোঝে সঙ্গীত তার কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিকা, দুর্ব্বোধ শব্দ মাত্র। সুতরাং এটা ঠিক যে মানুষ কথা কয়েই বলুক অথবা সুর পেরে কি ছবি রচে' কিম্বা হাতপায়ের ইসারা দিয়েই বলুক, সেটা বুঝ্‌তে হলে যে বোঝাতে যাচ্ছে তার যেমন, যে বুঝ্‌তে চলেছে তারও তেমনি, ভাষা ইত্যাদির জটিলতা ভেদ করা চাই। কথায় যেমন ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন করা হল তখন সবাই সেটা সহজে বুঝ্‌লে সার্থক হল, না বুঝ্‌লে বাচন ব্যর্থ হ'ল। বাঁধা দস্তুর বা styleএর মধ্যে এক এক সময়ে একটা একটা ভাষা ধরা পড়ে যায়। কথিত ভাষা, চিত্রিত বা ইঙ্গিত করার ভাষা সবারই এই গতিক। যেমনি style বেঁধে গেল, অমনি সেটা জনে জনে কালে কালে একই ভাবে বর্ত্তমান রয়ে গেল—নদী যেমি বাঁধা পড়্‌লো নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে। নতুন কবি নতুন আর্টিষ্ট এরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন, তখন style উল্‌টে পাল্‌টে ভাষা আবার চল্‌তি রাস্তায় চল্‌তে থাকে। এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বল্‌তেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনো লিখ্‌তেম এবং যাত্রা করেই বসে থাক্‌তেম সবাই। ভাষা সকল গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতো, অথচ দেখে মনে হতো ভাষা যেন কতই চলেছে!

(বঙ্গবাণী, আষাঢ়) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

বাংলার নবযুগের কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ

(১)

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটা খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শ বুকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ভূমিষ্ঠ হন। এই ব্রাহ্মসমাজ বাংলার নিজস্ব বস্তু।

প্রবল সংশয়বাদ বা নাস্তিক্য, স্বেচ্ছাচার ও অনাচার, স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ—এই ত্রিবিধ অমঙ্গলের হস্ত হইতেই দেশকে রক্ষা করেন ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের এই [ত্রিবিধ] আত্মবিস্মৃতি দূর করিয়া আত্মজ্ঞানের প্রথম উদ্রেক করেন ব্রাহ্মসমাজ। আর এই কর্ম্মে প্রথম এবং প্রধান নায়ক ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রাজা রামমোহন ইহার সূত্রপাত করিয়া যান, দেবেন্দ্রনাথ রাজার সিদ্ধান্ত ও সাধন দুইই বর্জ্জন করেন। তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে রাজা অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। মহর্ষি ভক্তিবাদী ছিলেন। রাজা শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি এই প্রামাণ্য বর্জ্জন করেন।

সন্দেহ—বিচার—সঙ্গতি—এবং সমন্বয়, ইহাই সত্যের সনাতন পথ। কি করিয়া নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের আক্রমণ হইতে ধর্ম্মের সত্য প্রাণবস্তুকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, মহর্ষির নিকট ইহাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যার বিষয় হইল। এ অবস্থায় মহর্ষি গুরু শাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াও শুদ্ধ যুক্তির উপরে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। বাংলার নবযুগের নবীন সাধনার ইতিহাসে ইহাই মহর্ষির শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি।

কিন্তু এখানে মহর্ষিও একটা সমন্বয়েরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তি মানিয়াও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই যে যুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠা, ইহা স্বীকার করিলেন না। আমাদের মধ্যে জ্ঞাতা যে আত্মা তাহাতে জ্ঞানের কতকগুলি নিত্যসিদ্ধ ছাঁচ আছে। যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুসকল আত্মার এই জ্ঞানের ছাঁচে যাইয়া ঢালাই হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় কোনও বস্তুজ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের এই ছাঁচগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না। ইহারা অতীন্দ্রিয় যে আত্মা তাহারই বৃত্তি। মহর্ষি জ্ঞানের এই নিত্যসিদ্ধ ছাঁচগুলিকে 'আত্মপ্রত্যয়' কহিয়াছেন। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শনে ইহাকে Intuition কহে।

স্বদেশের প্রাচীন এবং সর্ব্বজনপূজ্য শাস্ত্রের পরিভাষার সাহায্যেই মহর্ষি নিজের স্বানুভূতিলব্ধ ধর্ম্মসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। ইহার ফলে মহর্ষির নবযুগের নবীন সাধনা প্রাচীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশাভিমানেরও প্রথম শিক্ষাগুরু হইয়া উঠেন। মহর্ষির সুযোগ্য শিষ্য এবং সহকর্ম্মী ৺ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে কষিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগের যুগ-সাধনার প্রথম গুরু হইয়া আছেন।

এই শিক্ষা ও সাধনার প্রাণবস্তু যে স্বাধীনতা এবং মানবতা তাহাকে বাংলা যেমন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশ সেরূপ ধরে নাই। ইহাও ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ সত্য-প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্র গুরু বর্জ্জন করিয়া প্রত্যেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করিলেন। এই স্বাধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া বাঙ্গালী যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং অম্লানবদনে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশের লোকে সেরূপ করে নাই। এবং এই ত্যাগের সাধনায় ব্রাহ্মসমাজই আমাদের প্রথম গুরু হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষাগুরু। কিন্তু এ সাধনা অসাধারণ শক্তি লাভ করে, দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীনে।

(বঙ্গবাণী, আষাঢ়) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই বিদ্যাদান করিতেন। নালন্দার বর্ত্তমান নাম "বড়গাঁও"—ইহা পাটনা জেলার বিহার মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এখন পাটনা হইতে রেলপথে নালন্দাতে যাওয়া যায়। নালন্দা মঠটি একটি আম্রকুঞ্জে অবস্থিত ছিল। সেই কুঞ্জের পুষ্করিণীতে নাকি একটি নাগ বাস করিত। সেই নাগের নাম হইতেই আম্রকুঞ্জটির নাম হয় 'নালন্দা'। আবার কেহ কেহ বলেন, ভগবান তথাগত পূর্ব্বজন্মে এখানে তপস্যা করিতেন। জীবের দুঃখকষ্টে তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিত, তাই তিনি দুই হাতে সব জিনিস দীনদুঃখীকে বিলাইতেন। সেইজন্য তাঁর নাম হয় "না—অলম্ দা" অর্থাৎ "নালন্দা"—যার সর্ব্বস্ব বিলাইয়াও তৃপ্তি হয় না।

সম্ভবতঃ গুপ্তযুগেই ইহার প্রাদুর্ভাব হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে ফাহিয়ান মগধ ভ্রমণকালে নালন্দার উল্লেখ করেন নাই। নালন্দা একটি প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। সেই মঠে অনেক ভিক্ষু থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বিদ্যায় জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, তিনি মঠের অধ্যক্ষের পদ পাইতেন।

বাঙ্গলার পাল রাজারা যখন মগধ জয় করেন, তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাদের অধীনে আসে। অনেক সময় পাল-রাজাই স্থির করিতেন কে সর্ব্বাধ্যক্ষ হইবেন। এইসকল জ্ঞানতপস্বীদের পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া দেশ-বিদেশ হইতে ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। ৭ম শতাব্দীতে হুয়েনসাং যখন এখানে সংস্কৃত শিখিতেছিলেন, তখন ছাত্র ও ভিক্ষু লইয়া সর্ব্বসমেত দশহাজার লোক ছিল। যেসকল ছাত্র এখানে পড়িত, তাহাদের জন্য পৃথক পৃথক বাসগৃহ দেওয়া হইত। নালন্দাতে খনন করিয়া এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে যে এক-একটি ঘর ১২ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ ছিল।

এখানে ছাত্রদের নিকট হইতে কোন রকম বেতন লওয়া হইত না। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়েও লওয়া হইত না? সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য রাজাদের নানারকম দান ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য প্রত্যেক দিন ১২০টি জম্বীর, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, আড়াই তোলা কর্পূর, এক পোয়া মহাশালী ধান্যের চাউল দেওয়া হইত; আর মাসে তিন রাশি তৈল ও প্রত্যহ কিছু মাখন দেওয়া হইত। প্রতিদিন প্রাতে ঘণ্টাধ্বনি হইলে ভিক্ষুরা ও ছাত্রেরা পুষ্করিণীতে স্নানে যাইতেন। অধ্যয়নের সময় নানাস্থানে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুরা এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে সন্ধ্যাগীত গাহিয়া বেড়াইতেন।

নালন্দাতে সর্ব্বসমেত ৬টি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ ছিল। মানুষের জ্ঞান যত কিছু বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, সেইসকল বিদ্যার শিক্ষা এই আশ্রমে দেওয়া হইত। সেইজন্য হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা—সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা এখানে হইত। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধদর্শন, ত্রিপিটক, জাতক ও বাস্তুশাস্ত্রেরও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুর শাস্ত্র—সাংখ্য, বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনের আলোচনাও এখানে যথেষ্ট হইত।

প্রথমে এখানকার ছাত্রদিগকে কোন রকম উপাধি বিতরণ করা হইত না। পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি বিতরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁরা যে প্রতিষ্ঠাপত্র দিতেন, তাহাতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীল মোহর থাকিত। সেই শীল মোহরে লেখা থাকিত—"শ্রীনালন্দা-মহাবিহারী আর্য্য-ভিক্ষু-সংঘস্য।" তাহাতে একটি ধর্ম্মচক্র আঁকা থাকিত, আর ধর্ম্মচক্রের দুইপার্শ্বে দুইটি হরিণ উপরের দিকে মুখ করিয়া থাকিত।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

প্রথম সেনরাজ ও তাঁহার সময়

বৈদ্য বল্লাল সেন ও সেনরাজ বল্লাল সেন, উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাট হইতে বঙ্গে আগমন করেন। আদিশূর পালবংশীয় রাজা দেবপালের পূর্ব্ববর্ত্তী। ৮৮৫ হইতে ৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময় দেবপালের রাজত্বকাল। সামন্ত সেনের পিতা বিশ্বসেনই বঙ্গের প্রথম সেন রাজা এবং ১০৫৫ সংবৎ হইতে ১০৮০ সংবতের মধ্যে ইঁহার স্থিতিকাল।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

—

প্রাচীন জীব-বলি প্রথা

পশুবলি অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে ডিভনসায়ারে মে মাসের প্রথম ভাগে জলদেবতার উদ্দেশ্যে মেষ-বলির একটি উৎসব হইত। বলির পর পশুটির এক টুকরা মাংসের জন্য জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কারণ তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে উহার একখণ্ড মাংস খাইতে পারিলে সম্বৎসর তাহাদের কোন অমঙ্গল হইবে না। বুরিয়ট নামক মঙ্গোলীয় এক জাতি সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদের নিকট বাস করে। তাহারা এখনও কোন ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার সময় তাহার প্রিয় অশ্বটিকে বলি দেয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের বাৎসরিক অশ্ব-মেধ প্রথা আছে। দেবতা-অধ্যুষিত পবিত্র পাহাড়ে বলির অশ্বটিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহার পাদচতুষ্টয় বন্ধন করতঃ ভূতলে ফেলিলে পুরোহিত পেট চিরিয়া তাহাকে বধ করেন। ইহার মাংস রন্ধন করিয়া তাহার কতকটা যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় এবং তৎসঙ্গে সোমরসের ন্যায় একপ্রকার মাদক দ্রব্যও ঐ অগ্নিতে ঢালিয়া দেওয়া হয়। বলির কতকাংশ আকাশদেবতাদের উদ্দেশ্যে শূন্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং পুরোহিত পশুটির অস্থিসকল যজ্ঞাগ্নিতে প্রদান করেন। তখন সকলে অবশিষ্ট মাংস দেবতাদিগের প্রসাদরূপে ভক্ষণ করে এবং এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে—"আমাদের গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হউক, বহু সন্তান-সন্ততি হউক, অসংখ্য গো-অশ্ব প্রভৃতিতে দেশ পরিপূর্ণ হউক, দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হউক," ইত্যাদি। যজ্ঞাবশেষ যাহাতে কুকুর প্রভৃতি কোন অস্পৃশ্য পশু ভক্ষণ না করে, তজ্জন্য অগ্নিতে পুড়াইয়া ফেলা হয়।

বুরিয়টদের এই বাৎসরিক যজ্ঞ প্রাচীন আর্য্যদের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সন্তান-লিপ্সা, পাপ-স্খালন বা দিগ্-বিজয় প্রতিষ্ঠা আর্য্যদের অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণ বলা যাইতে পারে।

গ্রীক ও রোমকজাতিদের মধ্যেও অশ্বমেধ প্রথা বিদ্যমান ছিল। বর্ষাঋতুর অন্তে গ্রীকদের একটি উৎসব হইত। এই সময় কয়েকটি শ্বেত অশ্ব সূর্য্যদেবতার অর্ঘ্য স্বরূপ সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে এইরূপ পূজায় দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিবেন। স্পার্টানগণও, বুরিয়টদের মত, গিরি-শিখরে অশ্বমেধ করিয়া দেবতার তুষ্টি সাধন করিতেন। রোমকগণও শরৎ ঋতুতে মার্স দেবতার নিকট শ্বেত অশ্ব বলিদান করিতেন। ইহার মস্তক রাজপুরোহিতের ভবনে আনয়ন করতঃ সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইত। দেবালয়ের কুমারীগণ ইহার রক্তের সহিত গোশাবকের রক্ত মিশ্রিত করিয়া পশুপালকগণকে প্রদান করিতেন এবং তাহারা পশুর বংশ বৃদ্ধির জন্য ইহা গ্রহণ করিত। ইরাণদের ইতিহাসেও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের উল্লেখ আছে।

শকগণও কৃষিদেবতার উদ্দেশ্যে এবং মৃতব্যক্তির আত্মার সুখ- ও শান্তি-বিধানার্থে অশ্ব বলিদান করিতেন। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহু জাতি বৃক্ষদেবতার পূজায় পশুকে বৃক্ষে বন্ধন করতঃ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা উহার বধসাধন করিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় দেখিতে পাই যে সন্তান কামনা করিয়া লোকে বৃক্ষদেবতার নিকট পশুবলি দিত। বুরিয়টগণ অশ্বমেধের সময় পর্ব্বতোপরি একটি বৃক্ষশাখা বহন করিয়া লইয়া যাইত এবং তাহাতেই অশ্বকে বন্ধন করিত। আর্য্যহিন্দুদের মধ্যেও বলির পশু যূপকাষ্ঠে বন্ধন করা হইত।

ব্রাহ্মণযুগে আর্য্যদের মধ্যেও পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে নরবলি সংঘটিত হইত, ইহার প্রমাণ ব্রাহ্মণগ্রন্থে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, দেবতাগণ পূর্ব্বে যথাক্রমে মানুষ, অশ্ব, বৃষ, মেষ, ছাগ বলি দিতেন এবং উচ্চস্তরের জন্তু হইতে যজ্ঞের সার নিম্নস্তরের জন্তুর মধ্যে গমন করিল এবং অবশেষে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিল ; সেইজন্য 'বলি অর্থে তণ্ডুল ও যব' বুঝায়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে আরও দেখিতে পাই যে পূর্ব্বে অগ্নিবেদী নির্ম্মাণের সময় বেদী দৃঢ় করিবার জন্য ইহা মনুষ্য-মস্তকের উপর নির্ম্মিত হইবার রীতি ছিল। ভিত্তি দৃঢ় করিবার মানসে ইহার নিম্নে মনুষ্য-মস্তক রাখিয়া তদুপরি প্রাসাদ, দুর্গ বা সেতু নির্ম্মিত হইবার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে রোমসহরে Capitol-এর নিম্নে মনুষ্য-মস্তক পাওয়া গিয়াছিল। দ্রবিড় খণ্ডজাতির মধ্যে যে নরবলি প্রচলিত ছিল তাহা মঙ্গোলীয় বুরিয়টদের অশ্বমেধ প্রথার অনুরূপ। রোমান সেনেট খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৫ অব্দে আইন করিয়া নরবলি প্রথা উঠাইয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে জীববলির প্রতিকূল সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিল। একজন য়িহুদী ধর্ম্মসংস্কারক জীববলি প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিয়াছিলেন—"What purpose is the mulititude of your sacrifices unto me?" Saith the Lord, "I am full of burnt sacrifices of the rams and the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of goats." (Isaiah, i. 11.) ভারতবর্ষে বুদ্ধ 'অহিংস' মূলমন্ত্র করিয়া পশুবলির বিরুদ্ধে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এখনও শাক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় দুইটি ভিন্ন মতের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

(প্রভাতী, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ

ঠাকু'মার পাঠশালা

চিত্রকর—শ্রীসারদাচরণ উকীল মহাশয়ের সৌজন্যে

বিদেশ

ইউরোপের হত্যা-লীলা—

হার র‍্যাটেনো ও হিউগো ষ্টাইনিসের প্রযত্নে রণক্লান্ত জার্ম্মানী তাহার পুঞ্জীকৃত অবসাদ-ভার সরাইয়া ফেলিয়া আবার নব উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। র‍্যাটেনো ও ষ্টাইনিস উভয়েই প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে কারবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে ইঁহারা স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইঁহাদের অর্থ ও শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জার্ম্মানীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যখন হইল তখন ধনকুবের র‍্যাটেনো আপনার সম্পদের কথা ভুলিয়া গিয়া সাম্যবাদীদলের সহিত একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু জার্ম্মান গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাইজার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে সন্ধির সম্ভাবনা অতি অল্পই দেখিয়া জার্ম্মান প্রজাপুঞ্জ গণতন্ত্রের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিল। কিন্তু শান্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অনেকেই জার্ম্মানীতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বিখ্যাত যোদ্ধা হিণ্ডেনবার্গ ও লুডেনডর্ফের পরিচালনায় জার্ম্মানীর জাতীয়দল ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। হার র‍্যাটেনোর পরিচালনায় গণতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া জাতীয়দল র‍্যাটেনোর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইলেন। র‍্যাটেনোকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চক্রান্ত হইতে লাগিল। বিগত ২৪শে জুন বার্লিনের এক নির্জ্জন রাস্তায় গুপ্তঘাতকের হস্তে হার র‍্যাটেনো প্রাণ হারাইয়াছেন। গুপ্তঘাতকেরা একটি মোটরগাড়ী করিয়া আসিয়া রিভলবারের গুলি ছুঁড়িয়া ইঁহাকে হত্যা করে। ইঁহার মৃত্যুতে জার্ম্মানী এমন একজন কৃতী পুরুষকে হারাইলেন যিনি হয়তো একদিন সমস্ত ইউরোপকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইনি জার্ম্মানীর পুনরভ্যুদয়ের জন্য যে অসাধারণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে একমাত্র রাশিয়ার লেনিন ভিন্ন আর কোনও শক্তিধর পুরুষ কর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কি না সন্দেহ। মৃত্যু সময়ে র‍্যাটেনোর ৫২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইঁহার পিতা ডাক্তার এমিল র‍্যাটেনো জার্ম্মান বৈদ্যুতিক কারখানার মালিক ছিলেন। ইঁহার কারবার এত সুবৃহৎ যে জার্ম্মানীতে এক ক্রুপের কারখানা ভিন্ন এতবড় কারখানা আর নাই। র‍্যাটেনো পৈতৃক কারবারের মালিক হইয়া তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন।

তেজারতি কারবারেও ইনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে ও পুরাতত্ত্ববিদ্যায় ইঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল। বহু পুস্তক রচনা করিয়া ইনি জার্ম্মান সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের মাঝে যখন জার্ম্মানীতে কাঁচা-মাল সংরক্ষণ এবং অপচয়-বর্জ্জনের একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল তখন সংরক্ষণ ও অপচয়-বর্জ্জন বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া র‍্যাটেনো রাজনৈতিক আসরে দেখা দিলেন। বিশেষজ্ঞের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র। র‍্যাটেনোর ন্যায় বিশেষজ্ঞের উপর অপচয়-বর্জ্জনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া জার্ম্মান রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা নিশ্চিন্ত রহিলেন।

মিত্রশক্তিবর্গ যখন জার্ম্মানীতে মাল আমদানী বন্ধ করিয়া দিলেন তখন র‍্যাটেনোর চেষ্টায় জার্ম্মানী আপনার গৃহজাত দ্রব্যসমূহের সুব্যবহার করিয়া নিজের অভাবও অনেক পরিমাণে মিটাইতে পারিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ৭০।৮০টি কারবারের পরিচালক হইয়া ইনি জার্ম্মান ব্যবসায়কে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। নানা কারবারের সহিত সংসৃষ্ট থাকাতে ইনি বার্ত্তাশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি জার্ম্মানীর পররাষ্ট্র-সচিব নির্ব্বাচিত হন এবং যুদ্ধ ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিবার ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ-ঋণ শোধের সুব্যবস্থা করিয়া মিত্রশক্তিবর্গের নিকট হইতেও সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিগত জেনোয়া-বৈঠকের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার বোল্‌শেভিক প্রতিনিধিবর্গের সহিত ব্যবসায়-সংক্রান্ত সন্ধি করিয়া ইনি সমস্ত জগৎকে বিস্মিত করিয়া দেন। ইঁহার রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই রুশ-জার্ম্মান সন্ধি।

বড় বড় যন্ত্রের উপর যদিও ইঁহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত তথাপি ইনি যান্ত্রিক সভ্যতার বিপক্ষে ছিলেন। যান্ত্রিক কারবারের দোষে জনসাধারণের মধ্যে দুর্নীতি ও অশান্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ইঁহার বিশ্বাস ছিল। ইনি বলেন যে যন্ত্রসাহায্যে যাহা নির্ম্মিত হয় তাহার নির্ম্মাণে নির্ম্মাতার কোনও সৃজনের আনন্দ না থাকাতে উহা হৃদয়হীন শুষ্ক কাজ মাত্র। উহাতে হৃদয় ও মনের কোনও প্রসার হয় না এবং নির্ম্মাতার মন ক্রমেই শুকাইয়া যায়। কর্ম্মকুশল শিল্পী আনন্দের অভাবে ক্রমেই অলস এবং অসৎপ্রবৃত্তির লোক হইয়া উঠে। কাজেকাজেই কারবারে ক্রমশই কম সময় দিবার প্রবৃত্তি হইতে দৈনিক কর্ম্ম-সময় কমাইবার আন্দোলন দেখা দিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কল-কারখানা একেবারে তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য র‍্যাটেনো বলেন যে যন্ত্র-সাহায্যে নির্ম্মাণ-কার্য্য যেখানে চলে তাহার মধ্যেও সৃজনের আনন্দ যাহাতে কারিকরের মনে জাগিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। র‍্যাটেনোর মনে এইটিকেই সার্থক করিয়া তুলিবার কল্পনা সব-চেয়ে বেশী কাজ করিতেছিল। ইহাই র‍্যাটেনোর জীবনের আদর্শ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ইঁহার মৃত্যুতে রাজতন্ত্রপন্থীদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধির কিঞ্চিৎ হয়তো সুবিধা হইতে পারে কিন্তু এত বড় কর্ম্মীর অকাল-মৃত্যুতে জগৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহার সন্দেহ নাই।

জবরদস্ত ইংরেজ সেনাপতি স্যার হেন্‌রি উইল্‌সন আততায়ীর হস্তে লণ্ডনের রাজপথে নিহত হইয়াছেন। স্যার হেনরী ইংরেজ সেনাবিভাগে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি ব্রহ্ম-যুদ্ধে ও দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধে

কৃতিত্ব প্রদর্শন করাতে সৈন্য-পরিচালন বিভাগে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিগত বিশ্বযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি স্যার জন ফ্রেঞ্চের প্রধান সহকারীরূপে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ সৈন্য-সমাবেশ ও পরিচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তা (Director of Military Operations) নিয়োজিত হন। লর্ড ফ্রেঞ্চ অবসর গ্রহণ করিলে স্যার হেন্‌রী তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়া ইংরেজ সামরিক বিভাগের কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ইনি আলষ্টার দলের সহিত একযোগে আইরিশ জাতীয় দলকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। ব্ল্যাক ও ট্যান সম্প্রদায়ের অত্যাচারের জন্য আইরিশ জাতীয় দল ইঁহাকেই প্রধানতঃ দায়ী বলিয়া মনে করেন। এইজন্য স্বাধীনতা-প্রয়াসী আইরিশগণ অনেকদিন হইতেই ইঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। সেইজন্য প্রথমে অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলেন যে এই হত্যাকাণ্ড আইরিশ জাতীয় দলের দ্বারাই সংঘটিত। কিন্তু এখন যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে জাতীয় দলের সহিত ইহার কোনই সংস্রব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বরং ইংরেজ মন্ত্রী চেম্বারলেন বলিয়াছেন যে জাতীয় দলের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কোনই সম্পর্ক নাই। জাতীয় দলের নেতা ডি ভ্যালেরাও হত্যাকাণ্ডটি অত্যন্ত হীন ও জঘন্য কাণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন গুপ্ত হত্যা কাপুরুষের কাজ; এইরূপ হেয় ও জঘন্য কাজের দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। আইরিশ জাতি কখনই এইরূপ নীচ ও ভীরু-জনোচিত কার্য্য দ্বারা নিজেদের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস পাইবে না। হত্যাকারী দুইজন ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহারা যেরূপ স্থিরভাবে এই পৈশাচিক কাণ্ড সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে, বীভৎস ব্যাপার স্থিরভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা যে ইহাদের অসাধারণ, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে। হত্যা ব্যাপারের পর ইহারা বেশ ধীরভাবেই পলায়নের চেষ্টা পাইয়াছিল এবং বহু লোকে ইহাদের ধরিবার প্রয়াস পাইলেও ইহারা বুদ্ধি স্থির রাখিয়া পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুঝিয়া পরিশেষে ইহারা ধরা পড়ে। প্রথমে পুলিসে ইহাদের নাম কোনোলি ও ম্যাকব্রাউন বলিয়া স্থির করে। পরে জানা গিয়াছে যে ইহাদের প্রকৃত নাম রেজিন্যাল্ড ডান ও জোসেফ ওসালিভান। ইহাদের চেষ্টাতেই পুলিস প্রথমে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে নাই। হত্যাপরাধে ইহাদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু সে বিচারের প্রতি ইহাদের কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই। পুলিস যখন ইহাদের চাতুরীর কথা বর্ণনা করিতেছিল, কেমন করিয়া ইহারা পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া আত্মপরিচয় গোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কেনই বা পুলিসে নিজেদের অন্য নামে পরিচয় দিয়াছিল, সেই-সকল কাহিনী প্রকাশ করিতেছিল তখন ইহারা বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছিল। ইহাদের ব্যবহারে সকলেই অবাক্ হইয়াছেন। কেন যে ইহারা এই পৈশাচিক কাণ্ড করিয়া বসিল সে রহস্যজাল এখনও ভেদ হয় নাই। তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুমান করেন যে ইহার অন্তরালে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিহিত আছে।

আয়ার্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্দ্রোহ—

মাইকেল কলিন্স, আর্থার গ্রিফিথ্‌স্ প্রমুখ জননায়কগণের সহিত ইংরেজ সরকারের যে রফানিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহাকে স্বীকার করিয়া ঔপনিবেশিক স্বরাজ্যের আদর্শে আইরিশ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহারা স্বরাজপন্থীদল (Free Stater) নামে অভিহিত। আর যাঁহারা ডি ভ্যালেরা, ক্যাথাল ব্রুগা, কাউণ্টেস মার্কেভিচ ও মিস ম্যাক্‌সুইনির আহ্বানে ইংরেজ শাসন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিয়া গণতন্ত্রের উপর আইরিশ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী তাঁহারা গণতান্ত্রিকদল (Republican) নামে পরিচিত। স্বরাজপন্থীদল ও গণতান্ত্রিকদলের মধ্যে বিবাদ এরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, উভয়দলের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ডি ভ্যালেরা ও কলিন্সের চেষ্টায় তাহা কোনও ক্রমে এতদিন পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু আইরিশ শাসন-পরিষদের নির্ব্বাচন ফল প্রকাশিত হওয়াতে গণতান্ত্রিকদল নিজেদের সর্ব্বত্র পরাজিত হইতে দেখিয়া আর সংযত রহিতে পারিলেন না। তাই আয়ার্‌ল্যাণ্ডে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এতদিন যাহা ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতেছিল হঠাৎ তাহা ভীষণ দাবদাহে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আইরিশ মহাসভার নির্ব্বাচনফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল সন্ধিপক্ষীয় স্বরাজপন্থীদলের ৫১ জন, সন্ধিবিরোধী গণতান্ত্রিকদলের ৩১, শ্রমজীবিদলের ১৪, স্বাধীনমতাবলম্বী ১০, কৃষাণ-দলের ৩ জন মহাসভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। লায়াম মেলোস প্রভৃতি সুবিখ্যাত গণতান্ত্রিক নেতা নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। গণ-তান্ত্রিকদল নির্ব্বাচনে হারিয়া যাইতেছেন দেখিয়া গণতান্ত্রিকদলের সেনাপতি রডারিক ওকোনর ডাব্‌লিন সহরের আইন-বিদ্যালয়ের ফোর-কোর্ট্‌স্ নামক গৃহগুলি অধিকার করিয়া সৈন্য-সমাবেশ এবং পরিখা-খনন কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। ইহাই বিদ্রোহের প্রথম সূচনা। আইরিশ গণতান্ত্রিক সেনা (Irish Republican Army) কর্ত্তৃক ফোর-কোর্ট্‌স্ অবরোধ ইংরেজ সরকার সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া ইংরেজ মন্ত্রী চার্চ্চিল সাহেব ঘোষণা করিলেন। স্বরাজপন্থীদল গণতান্ত্রিক-দলকে আইনসঙ্গত বৈধ আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিয়া একটি ইস্তাহার জারি করিলেন এবং উহার সহিত ঘোষণা করিলেন যে গণতান্ত্রিক সেনাগণের যথেচ্ছ ব্যবহার আইরিশ স্বাধীন-রাজ্য সহ্য করিবেন না। গণতান্ত্রিকদলকে ফোর-কোর্ট্‌স্ পরিত্যাগ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিকদলের বেল্‌ফাষ্ট সহরের নেতা হেণ্ডার্‌সনকে স্বরাজপন্থীদল বেল্‌ফাষ্টে অরাজকতার কারণ বলিয়া গ্রেফ্‌তার করেন। তাহার প্রতিশোধস্বরূপ গণতান্ত্রিকদল স্বরাজপন্থীদলের প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল ওকোনেলকে বন্দী করেন। ২৮শে জুন তারিখে সরকার-পক্ষের সেনাপতি ইনিস স্বরাজপন্থী সেনাদল সহ ফোর-কোর্ট্‌স্ আক্রমণ করেন। রোরি ওকোনর অমিত বিক্রমে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ওকোনর ইস্তাহার জারি করিয়া ঘোষণা করিলেন, "আয়ার্‌ল্যাণ্ডের যুবকেরা আপনাদের জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে আত্মদান করিবে তথাপি অধীনতাশৃঙ্খল বাচিয়া পায়ে পরিবে না। আমরা যতক্ষণ জীবিত থাকিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করিব।" আয়ার্‌ল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট সম্প্রদায় গণতান্ত্রিকদলের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ডি ভ্যালেরা, ক্যাথাল ব্রুগা, লায়াম মেলোস, মিস ম্যাক্‌সুইনি, কাউণ্টেস মার্কেভিচ প্রভৃতি আইরিশ স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী নেতৃবৃন্দ আসিয়া বিদ্রোহে যোগ দিলেন। লিমারিক, কর্ক, টিপারেরি প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ডাব্‌লিনের বিদ্রোহ একটু বেবন্দোবস্তে হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া বিদ্রোহীরা বেশীদিন আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। লায়াম মেলোস ও রোরি ওকোনর ফোর-কোর্ট্‌সের পতনের সহিত বন্দী হইলেন। কিন্তু ডি ভ্যালেরা, ক্যাথাল ব্রুগা প্রভৃতি বিদ্রোহী জননায়ক স্যাক্‌ভীল ষ্ট্রীটে নূতন আস্তানা স্থাপন করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ফলে ক্যাথাল ব্রুগা নিহত হইয়াছেন; ডি ভ্যালেরা, রেনর এবং কাউণ্টেস মার্কেভিচ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। ডাব্‌লিনের বিদ্রোহীরা পরাভূত হইয়াছেন কিন্তু দক্ষিণ আয়ার্‌ল্যাণ্ডে এখনও বিদ্রোহীরা বীর-বিক্রমে লড়িতেছে। ডনিগ্যাল, স্লিগো, সিক্সেরিন, লিট্টোরেল প্রভৃতি স্থানে তাহারাই জয়ী হইয়াছে।

লর্ড টেম্প্‌ল্‌মোরের আবাসভূমি গ্লেনভিয়ে. ক্যাস্‌ল্‌ অধিকার করিয়া তাহারা দেশ দৃঢ়ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। লিঞ্চ নামক এক ব্যক্তি ইহাদের নেতৃত্ব করিতেছেন। খুব সম্ভব ডি ভ্যালেরা, ও মার্কেভিচ ইহাদের সহিত যোগ দিয়া ডাব্‌লিন অবরোধের প্রয়াস পাইবেন। সংবাদ আসিয়াছে যে দক্ষিণ আয়ার্‌ল্যাণ্ডের কর্ক প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ফ্রি ষ্টেট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি নূতন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আয়ার্‌ল্যাণ্ডে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়াছে সহজে যে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে তাহা মনে হয় না। যদিও ডাব্‌লিন সহরের বিদ্রোহীরা সহজেই হারিয়া গিয়াছে তথাপি দক্ষিণে গণতান্ত্রিকদলের প্রতাপ দেখিয়া মনে হয় যে এই বিদ্রোহ সহজে থামিবে না।

চীনের গোলযোগ—

চীনের অন্তর্বিপ্লবের প্রকৃত তথ্য এখনও প্রকাশ পায় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে পিকিঙ্‌ সরকারই ক্রমশ আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। চাঙ্‌-সো-লিন যখন রণকুশলী যোদ্ধা উ-পাই-ফুকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার জোগাড় করিয়াছিলেন তখন সুবিখ্যাত চীন-সেনাপতি ফেঙ্‌-উ-সিয়াঙের অপূর্ব্ব কৌশলে চাঙ্‌-সো-লিন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। সেনাপতি ফেঙ্‌ একজন অসাধারণ ব্যক্তি। ইনি ধর্ম্মে খৃষ্টান এবং মেথডিষ্ট্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাঁর অধীন সেনাদল কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পায় না, এমন কি ধূমপান পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইনি চীনদেশ হইতে জুয়া খেলা ও মাদকদ্রব্য-সেবন নির্ব্বাসিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। দক্ষিণে সান্‌-ইয়াট-সেনের অধীন একদল সেনা বিদ্রোহী হইয়া সানকে বন্দী করিয়া ফেলিবার চেষ্টা পায়। সান পলাইয়া একটি জাহাজে আশ্রয় লইয়াছেন। সেনাপতি ফেঙ্‌ দক্ষিণচীনকে উত্তরে আনিবার জন্য দক্ষিণাভিমুখে রওনা হইয়াছেন। আমেরিকার চৈনিক প্রতিনিধি ওয়েলিংটন কু ও অ্যাল্‌ফ্রেড স্জি চীনের এই বিপদকালে চৈনিক রাষ্ট্র-যন্ত্রের গতি মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। সানের সহিত যাহাতে উভয়ে বিরোধ মিটাইয়া ফেলিয়া একযোগে চীনের মঙ্গলসাধনের জন্য আত্মনিয়োগে সমর্থ হন তাহাই ইহাঁদের একান্ত অভিলাষ। এই উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিবার মানসে ইহাঁরা চীন অভিমুখে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ-চীনের প্রতিনিধি মা-সুর কথা শুনিয়া মনে হয় উত্তরের সহিত দক্ষিণের মিলন সহজে সম্ভবপর নহে। মা-সু বলেন যে, "পেকিঙ্‌ সরকার সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত। চীনের জনসাধারণের প্রতিনিধি ইহাঁরা নহেন। জনসাধারণ দক্ষিণ-চীন সরকারেরই অনুরাগী। চীনের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই উত্তর-চীন সরকারের বিনাশ একান্ত প্রয়োজন। দক্ষিণ-চীন সেই উদ্দেশ্যে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে।" সান-ইয়াট-সেন চীনেনৌবহরের সাহায্য লাভ করিয়া ক্যান্টন সহর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু সে উদ্যমে আমেরিকা ও ইংরেজ-সরকার বাধা দিতেছেন এই অজুহাতে যে কান্টন সহর ধ্বংস হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ইহাদিগের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ ও মার্কিন সরকার সানকে ক্যান্টন আক্রমণ করিতে দিতে পারেন না। ইংরেজ-সরকারের প্রশান্ত মহাসাগরস্থ নৌবহর ক্যান্টন সহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সানের আক্রমণ উদ্যোগ ইহাতে ব্যর্থ হইয়াছে। সান নিরুদ্যম হইয়া তাঁহার নৌবহরেই আপাতত অবস্থান করিতেছেন। সানের এই অকস্মাৎ বিপদের পর কি দক্ষিণ-চীন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে?

হেগ-বৈঠক—

কান্‌, পারী ও জেনোয়া-বৈঠকের ন্যায় হেগ-বৈঠকেও কোনও লাভ হইল না। ইউরোপের সমস্যা পূর্ব্বের ন্যায়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেই রহিল। একটা বুঝাপড়া না হইয়া গেলে এরূপ গণ্ডগোলের ভিতর দিয়া যে পুনর্গঠন অসম্ভব তাহা বুঝিয়াও ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরেরা স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নিজেদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চাওয়াতে একটা রফা-নিষ্পত্তি ঘটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ স্বার্থের সংঘাত চলিবে ততদিন পর্য্যন্ত গোলযোগের আর মীমাংসা হইয়া উঠিবে না এবং ধ্বংসোন্মুখ ইউরোপ ধ্বংসের মুখেই চলিতে থাকিবে।

রাশিয়ার সহিত ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ না হইলে ইউরোপের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সেই দায়ে ঠেকিয়া মিত্রশক্তিবর্গ বোল্‌শেভিকদিগের সহিত রফানিষ্পত্তির চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মিত্রশক্তিবর্গের এই দায়-ঠেকা অবস্থা রাশিয়ার অজানা ছিল না। তাই সুযোগ বুঝিয়া রাশিয়া মিত্রশক্তিবর্গের নিকট যুদ্ধে রাশিয়ার যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই আদায় করিয়া লইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। রাশিয়ার কৃষিবাণিজ্যের অবস্থা আবার যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা মিত্রশক্তিবর্গের নিকট বহুকোটি টাকা ঋণ চাহিলেন। বলিলেন, এই ঋণ না পাইলে তাঁহারা মিত্রশক্তিবর্গের সহিত কোনও প্রকার বন্দোবস্তে আসিতে প্রস্তুত নহেন।* রুশ-প্রতিনিধি লিট্‌ভিনফের এই দাবী শুনিয়া হেগ-বৈঠকে মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। এত কোটি মুদ্রা তাঁহারা কোথা হইতে দিবেন? বোল্‌শেভিক প্রতিনিধিরা কিন্তু বলেন যে ইহার কমে তাঁহাদের কৃষি বাণিজ্য রক্ষা করা অসম্ভব। যদি রাশিয়াকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয় তবে ওই ঋণের ব্যবস্থা মিত্রশক্তিবর্গকে করিতেই হইবে। রাশিয়ায় যদি ফসল না হয় তবে সমস্ত ইউরোপে খাদ্যাভাব হইবে। অতএব সমস্ত ইউরোপের মঙ্গলের জন্য রাশিয়াকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিবর্গ কিন্তু এত বেশী টাকা ঋণ দেওয়া অসম্ভব মনে করেন। তাই হেগ-বৈঠক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন ইউরোপের এই সমস্যার মীমাংসা কিরূপে সম্ভব হয় দেখা যাউক।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

দেবপূজায় স্বাদেশিকতা—

পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের পুরোহিতগণ সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন, জগন্নাথদেবের পূজার জিনিস-পত্র সমস্তই স্বদেশী হওয়া সঙ্গত। সুতরাং যাঁহারা দেব-দর্শনে আসিবেন তাঁহারা যেন খদ্দর পরিয়াই আসেন এবং এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যাঁহারা জগন্নাথদেবকে উপহার দিবেন তাঁহারা যেন দেশী জিনিস এবং খদ্দরই প্রদান করেন। ইহার পর ভুবনেশ্বরের পাণ্ডারাও এই মত প্রচার করিয়াছেন।

ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুরা কি করিবেন, বলা যায় না; কিন্তু জগন্নাথের পাণ্ডারা দৃঢ় থাকিলে, অন্য হিন্দুদের মধ্যে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িতে পারে, এবং তাঁহারাই সংখ্যায় বেশী।

অস্পৃশ্যদের সহিত ভোজন—

গত ২৫ জুন লাহোর আর্য্যসমাজ এবং স্বরাজ্য সভার সভাপতি এবং সভ্যগণের উদ্যোগে একটা ভোজ-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই ভোজের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত জাতির একত্র ভোজনের দ্বারা হিন্দুদের ভিতর হইতে অস্পৃশ্যতার আবর্জ্জনা ঘুচাইবার চেষ্টা করা। ভোজ-সভাতে হাজার হাজার অস্পৃশ্য এবং পতিতমণ্ড জাতিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম, সনাতনী

ও অস্পৃশ্যমন্য জাতির লোকেরা পাশাপাশি বসিয়া সেদিন আহার করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভিতর প্রায় ৩০০ ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। এই ভোজের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ভাই ব্রহ্মানন্দ। অস্পৃশ্যতাকে দূর করিবার জন্য বক্তৃতা যথেষ্টই হইয়াছে। এখন বক্তৃতা অপেক্ষা হাতে-কলমে কাজ করা দরকার। এই ধরণের ভোজের অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইলে কিছু কাজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্বদেশীর পাণ্ডাকেও যাচাই করিয়া লইবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় বাংলা দেশে এরূপ ভোজ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় নাই। দৈনন্দিন জীবনে এবং বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে-সব ভোজ হয়, তাহাতে সকল জাতির লোক প্রকাশ্যভাবে একত্র ভোজন করিলে, তবে বুঝা যাইবে, যে, অস্পৃশ্যতা দূর হইতেছে। সমুদয় কংগ্রেস অফিসে "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়" জাতির লোকদিগকে জল দিবার জন্য ও অন্য কাজের জন্য চাকর রাখা হউক।

সরকারী ইস্তাহার—

সরকারী ইস্তাহারগুলির ভিতর সত্যের মাত্রা যে কতটুকু থাকে বহু ব্যাপারে তাহার হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি রাজপুতানার শিরোহী রাজ্যের ভীল হাঙ্গামা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যে ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন তাহাও অনেকটা এই ধরণের। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, শিরোহী রাজ্যের ভীলগণ রাজা-সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে; সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে রাজস্থান সেবাসঙ্ঘের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দ্বারকা-লাল গুপ্ত লিখিয়াছেন—"আমি এই ইস্তাহারের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য আজমীরের শ্রীযুক্ত বি, এস, পথিকের নিকট তার করিয়া-ছিলাম। উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন, সরকারী বর্ণনা সম্পূর্ণ ভুল। মেবারের নইপুরে পূর্ব্ব দিনেও গুলি চলিয়াছে।"

রাজস্থান সেবাসঙ্ঘের সেক্রেটারী গত ১৭ই জুন আজমীর হইতে জানাইয়াছেন "শিরোহীর এবং অন্যান্য স্থানের নির্য্যাতিত ভীলদের সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা উঠিয়াছে। এক গাঁইট কাপড়ও সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শিরোহীর রাজা এইসব অর্থ এবং বস্ত্রাদি বিতরণের জন্য কর্ম্মীদিগকে রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। সুতরাং আপাততঃ চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ রাখা হইবে।"

গৌরীশঙ্কর অভিযান—

গত বৎসর হইতে গৌরীশঙ্করের চূড়ায় পঁওছিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। গত বৎসর কাপ্তেন হাওয়ার্ড বেরী খানিকটা উঠিয়া বর্ষা আসিয়া পড়ায় গৃহে ফিরিয়াছিলেন। এবারে কাপ্তেন বেরী আসিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিত্যক্ত অভিযানটির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন জেনারেল ব্রুস। দুনিয়ায় যাহা আর কেহ করিতে পারেন নাই, জেনারেল ব্রুসের এই দল তাহাই করিয়াছেন—তাঁহারা শৃঙ্গশীর্ষে ২৭,২০০ ফুট পর্য্যন্ত মানুষের চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া আসিয়াছেন। এর আগে পাহাড়ের সব চেয়ে বেশী উঁচুতে উঠিয়াছিলেন ইটালীর ডিউক অব আবরুজ্জি। কারাকোরাম পর্ব্বতের ২৪,৬০০ ফুট উঁচু স্থানটায় প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সাফল্যের নিশানা রাখিয়া আসিয়াছেন। এই ব্যাপারটায় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিবার মত জিনিষ হইতেছে—এই পাশ্চাত্য জাতিটির দুর্জ্জয় সাহস, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, অনর্থক বিপদকে আলিঙ্গন করিবার মত নির্ভীকতা। জাতি ফাঁকি দিয়া বড় হয় না, দুনিয়াকে হাতের মুঠার ভিতর আনিয়া জয়ের শ্রেষ্ঠ মাল্যটি গলায় পরিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মূল্যই তাহার জন্য দিতে হয়।

মহারাষ্ট্র মুল্‌সী কন্‌ফারেন্স—

বোম্বাই সহরে মহারাষ্ট্র মুল্‌সী কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের সব স্থান হইতেই প্রতিনিধিরা কনফারেন্সে যোগ দিয়াছিলেন। মাবলা প্রতিনিধিও আসিয়াছিলেন অনেক। কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হইয়াছিলেন ডাঃ মুঞ্জে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সি ভি বৈদ্য। ইঁহারা মুল্‌সী সত্যাগ্রহের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলেন—মাবলাগণ নরনারী নির্ব্বিশেষে তাহাদের পৈত্রিক বাসভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল ও আছে। কাহাকেও বাস্তুভিটা হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য আইন প্রয়োগ করা একান্ত ভাবেই অন্যায়। কারণ ইহাতে জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব্ব করা হয়। একটা কোম্পানীর লাভের পথ প্রশস্ত করিবার জন্যই এই জমী সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। আর এই ব্যাপারে ৫৪ খানা গ্রামের প্রায় বারো হাজার প্রজাকে পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইহার ভিতরে না থাকিলে এতদিন এ গোলযোগ কবে আপোসে মিটিয়া যাইত। মুল্‌সী সত্যাগ্রহী সম্প্রদায়কে জয়লাভ করিতেই হইবে এবং জয়লাভের একমাত্র উপায় সর্ব্বথা নিরুপদ্রব-নীতি অবলম্বন করিয়া চলা।

এই ব্যাপারটায় গবর্মেণ্টের জেদ যে কেন এত বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর স্বার্থ অপেক্ষা এতগুলি প্রজার স্বার্থই যে গবর্মেণ্টের চোখে বড় হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই।

শিখ রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স—

গত ২৬ জুন পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার মহাতাব সিংহের সভাপতিত্বে গুজ্‌রানওয়ালায় শিখ রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক শিখ এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি শিখ সম্প্রদায়ের হিতের জন্য যে-সব কাজ করিয়াছেন সভায় প্রথমে তাহারই আলোচনা চলে। তাহার পর আলোচনা করা হয় স্বাধীনতা লাভ এবং গুরুদ্বারের সংস্কার সম্পর্কীয় বিষয়গুলি লইয়া। ইহা ছাড়া সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি পরিগৃহীত হইয়াছে।

(১) তাঁহারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করিয়া কৃপাণ ব্যবহারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

(২) পন্থের জন্য যাঁহারা কারাকষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত ইঁহারাই তাঁহাদের সংগ্রাম দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করিবেন।

(৩) খদ্দর প্রস্তুত ও ইহার প্রচার স্বরাজলাভের অন্যতম প্রধান উপায়।

(৪) মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কার্য্যের জন্য সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

(৫) শিখ প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়ায়

কংগ্রেসের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে সত্বর সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক।

শেষোক্ত প্রস্তাবটিতে ইঁহারা পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির দৃষ্টিই বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন।

সৈনিকের কারাদণ্ড—

কানপুরের শিখ রেজিমেণ্টের কেশব সিংহ নামক একজন সিপাহী সরকারের চাকরী করিতে অস্বীকার করায় রেজিমেণ্টের কর্ত্তা বিচার করিয়া তাঁহার প্রতি ১৪ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই শিখ সৈন্যদল কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন ঝিলামে ছিল, তখন আরো তিন জন এই অপরাধে ১০ বৎসর, ৮ বৎসর এবং ৬ বৎসরের জন্য কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই অল্প দিনের ভিতর এই শিখ সৈন্যদলের চারিজন সিপাহী চাকরীর বদলে দীর্ঘ কারাবাসের ব্যবস্থা বরণ করিয়া লইল কেন তাহার অনুসন্ধান হওয়া দরকার। কয়েকজন সিপাহী ব্যারাকের বাহিরে খদ্দর পরিয়া বেড়াইত। দলের কর্ত্তা হুকুম দিয়াছেন—ব্যারাকের ভিতরে তো নহেই, বাহিরেও কোনো সিপাহী খদ্দর কিংবা অকালীদের কালো উষ্ণীষ ব্যবহার করিতে পারিবে না। চাকরীর খাতিরে যেখানে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিবার ব্যবস্থা করা হয় সেখানেই অসন্তোষ এবং অশান্তি বিশেষ করিয়া বিস্তার লাভের সুবিধা পায়।

গোপবন্ধু দাসের কারাদণ্ড—

উৎকলের জন-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস এবং শ্রীযুক্ত ভাগীরথী মহাপাত্রের বিরুদ্ধে দুই দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। বিচারে এক দফায় তাঁহাদের এক মাস এবং আর এক দফায় দুই বৎসর অশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস ও শ্রীযুক্ত ভাগীরথী মহাপাত্রকে বালেশ্বর হইতে কটক জেলে স্থানান্তরিত করিবার সময় তাঁহাদের হাতে হাত-কড়ি ও কোমরে দড়া বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। জেলে আহার সম্বন্ধেও তাহাদের কোনরূপ সুব্যবস্থা করা হয় নাই। মোটা চাউলের ভাত ও কলমী শাকের পাতার তরকারী খাইতে খাইতে ইঁহারা ক্রমেই অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন।

মদনমোহনের আইন অমান্য—

গোরক্ষপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দেউড়িয়া-কাসিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত মদনমোহনের প্রতি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি করিয়া গোরক্ষপুর জেলার ভিতর সব স্থানে তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আজমগড়ের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত মালবীয় এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া একটি দুইটি নহে, একেবারে পাঁচ পাঁচটি সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। অনবরত ঘা দিতে দিতে গবর্ণমেণ্ট যে কেমন করিয়া স্থির ধীর মানুষকেও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছেন, আইন ভঙ্গের নীতি গ্রহণে বাধ্য করিতেছেন, পণ্ডিত মালবীয়ের এই ঘটনাটিই তাহার প্রমাণ। পণ্ডিত মদনমোহন কংগ্রেসের নেতাদের ভিতর বিশেষ ভাবেই মধ্য পথের পথিক। তিনি গবর্ণমেণ্টকে অগ্রাহ্য না করার দিকেই, আইন অমান্য নীতি গ্রহণের বিরুদ্ধেই এতদিন ওকালতি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ খোঁচাইতে খোঁচাইতে তাঁহাকেও এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছেন যে, তিনিও আইনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অসীম ধৈর্য্যের বাঁধও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

নারী শিল্পাশ্রম—

কাছাড় জেলার শিলচর সহরে 'নারী শিল্পাশ্রম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইতেছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সুরবালা দেবী এই আশ্রমের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গলার মহিলাগণকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার জন্য সুতা কাটা এবং বয়নের প্রচলন করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। একখণ্ড ক্ষুদ্র জমি ইজারা লইয়া আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঁচ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা এই আশ্রমে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আশ্রম-বাসিনীগণকে আশ্রমের আইন-কানুন সব মানিয়া চলিতে হইবে। বিধবাগণকে আহার্য্য এবং বস্ত্রাদি প্রদান করা হইবে। যাঁহারা আশ্রমে থাকিবেন আশ্রম তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল মাত্র সুতা কাটা বা কাপড় বোনা শিখিবেন তাঁহাদিগকে এক বৎসর কাল আশ্রমের জন্য খাটিয়া দিতে হইবে।

গুজরাটে স্বদেশীর অবস্থা—

সম্প্রতি গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই পটেল। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—গুজরাটেই অসহযোগ নীতির জন্ম। কাজেই আইন অমান্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুজরাটে গঠনকার্য্যগুলি সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। গুজরাটে দেড় লক্ষ চরকা চলিতেছে এবং প্রচুর খদ্দর জমা আছে। সেখানে বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং না করিয়াও লোককে খদ্দর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত পটেলের কথা ঠিক হইলে গুজরাটে যে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। পিকেটিং ছাড়াও লোকে যদি খদ্দর ব্যবহার করে তবে বুঝিতে হইবে আন্দোলনের ফল সেখানে ব্যর্থ হয় নাই। প্রাণের ভিতর যখন স্বদেশের জন্য, স্বদেশের দ্রব্যের জন্য সত্যকার দরদ জাগে, তখন জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন হয় না—উপরোধ অনুরোধ পিকেটিং তখন অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

বাংলা

বাঙ্গালার বাণিজ্য—

১৯২১—২২ সনের সরকারী হিসাবে দেখা যায়—এ বৎসর বঙ্গদেশে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। বিগত বৎসর—অর্থাৎ ১৯২০—২১ সনে বাঙ্গালায় ১২২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মাল বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের আমদানীর পরিমাণ মাত্র ১০৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

গত বৎসর কাপড় বাবদ ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। বাংলা হইতে এককালে ১৫ কোটি টাকার কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইত।

এবার বিলাতী কাপড়ের আমদানী ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার স্থলে কমিয়া গিয়া ২৭ কোটি ২৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে ইহা শুনিলে

সত্যই প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। মনে হয় মহাত্মার কাতর প্রার্থনা হয়ত বিফল হয় নাই। গত বৎসর একমাত্র গেঞ্জি মোজা প্রভৃতির দরুণই আমাদিগকে ১০৯ লক্ষ টাকার ঘরের কড়ি পরকে বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। সুখের বিষয় এ বৎসর উহা কমিয়া মাত্র ২৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পৌনে সতর লক্ষ টাকার জুতার স্থানে মাত্র ৩ লক্ষ টাকার জুতা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। আবার ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ইংরেজ বা আধা-ইংরেজেরাই ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা, মূল্যের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, কখনও নিজের দেশের তৈয়ারী জিনিষ পাইলে অপরের জিনিষ ব্যবহার করেন না।

মাদক দ্রব্যের আমদানীও খুব কমিয়াছে। এ বৎসর মাত্র ৪৩০৭১ গ্যালন ব্রাণ্ডি আমদানী হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় উহা অর্দ্ধেকেরও কম। বিলাত হইতে আমদানী মদের পরিমাণ ৪২৫৫৯ গ্যালন কমিয়া ৫১৭০২৭ গ্যালনে দাঁড়াইয়াছে। ইহাও নিতান্ত শুভ চিহ্ন। এই বিষপানে আত্মঘাতীদিগকে সাবধান করিয়া দিতে যাইয়া যে-সব মহাপ্রাণ কর্ম্মী আজ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই।

১৯২০—২১ সনে ৫০০০ খানা মোটর গাড়ী আমেরিকা হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল। এবার উহার ৫ ভাগের একভাগও আসে নাই। এ সংবাদেও আমরা সুখী হইয়াছি।

আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীও কমিয়াছে। আপাতঃদৃষ্টিতে উহা আমাদের লোকসান। কারণ বাহির হইতে টাকা আনিতে না পারিলে, শুধু পরের জিনিষ কিনিতে গেলে, আমাদের ঘরের টাকাই বাহির হইয়া যাইবে। বাঙ্গলার রপ্তানীর মধ্যে পাট, চা ও চামড়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পাটের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বিদেশীর হাতে। চামড়ারও এই একই অবস্থা। কাঁচা চামড়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করি; কিন্তু সেইগুলিই আবার আমরা বিদেশ হইতে "ট্যান্" করিয়া বহুমূল্যে খরিদ করি। যে পর্য্যন্ত এদেশের কাঁচামাল আমরা পণ্যশিল্পে পরিবর্ত্তিত না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত বিদেশী বণিকের খেয়ালমত দরেই আমাদিগকে উহা বিক্রয় করিতে হইবে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিলে, শুধু ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই দিলে কেহ শুনিবে না, দুঃখ-দুর্দ্দশার করুণ কাহিনীতেও বিদেশী মহাজনের চোখ ভিজিবে না। তাহারা লুটিতে আসিয়াছে, সুবিধা পাইলেই লুটিয়া লইয়া যাইবে। আমরা যদি নিরীহ ছাগলের মত আমাদের গায়ের লোম কাটিতে দিই, তবে তাহারা ছাড়িবে না। সুতরাং যাহাতে বাঙ্গলার শিল্পবাণিজ্য বাঙ্গালীর হাতে আসে, তাহাই এখন আমাদের করিতে হইবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

তুলার উপকারিতা—

১। ঘরে ঘরে তুলার চাষ হইলে আমরা বিনামূল্যে আমাদের আবশ্যকীয় লেপ তোষক ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিব।

২। ঘরের তুলায় তৈয়ারী সূতায় উৎপন্ন কাপড় বিদেশী কাপড়ের চেয়ে সস্তা ও টেকসই। একসের তুলায় এক জোড়া কাপড়ের সূতা হয়।

৩। ঘরের তুলায় সূতায় কাপড় প্রস্তুত করিলে ঘরের পয়সা ঘরে থাকিয়া যাইবে, ঐ পয়সায় আমাদের অন্ন অভাব পূরণ হইতে পারে।

৪। তুলা ও তুলার বীজ বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়। বিদেশে উহা চালান দিতে পারিলে বিদেশ হইতে অনেক অর্থ এদেশে আসিবে; উহাতে দরিদ্র দেশবাসীর অন্নসংস্থান হইবে।

৫। তুলার বীজ হইতে উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল সরিষার পরিবর্ত্তে ডাল তরকারীতে ব্যবহার করা যায়। উহা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এক মণ বীজে ৫।৬ সের তৈল পাওয়া যায়।

৬। তুলার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া যে খইল পাওয়া যায়, উহা দ্বারা জমিতে সার দেওয়া যায়। তৈল প্রদীপে পোড়ান যায়।

৭। ঐ খইল গরুর একটি পুষ্টিকর খাদ্য। উহা খাইলে গরুর শরীর ভাল হয় এবং বেশী দুধ দেয়। এক মণ বীজে আধ মণের উপর খইল হয়।

৮। পাটের চাষের পরিবর্ত্তে তুলার চাষ করিলে দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি লাভ হয়।

৯। কার্পাস অনেক রোগের শান্তিদায়ক ঔষধ।

১০। তুলার গাছ জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহৃত হয়।

পল্লীবার্ত্তা।

—নীহার

বাঙ্গালার শিক্ষা—

বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে গত ১৯২০—২১ সালে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৮৯টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং মোট ৫৩৯৬৮টিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় ৮৭৬৪ জন কমিয়া গিয়াছে। এ বৎসরের শেষভাগে বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ১৯৪৫১৪৫ জন বিদ্যালয়-সমূহে বালিকার সংখ্যা ১৬৫৪৪ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মোট ৩৪০৫৩৬তে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মুসলমান ছাত্রী-সংখ্যাই ১৩৮০২ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।—যশোহর

বঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়—

বঙ্গে ১৫০ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইসকল বিদ্যালয় কোথায় কোথায় স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাতে ছাত্র-সংখ্যা কত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ঢাকা	৪০১৬
ফরিদপুর	১৬৮১
ময়মনসিংহ	১৪০১
কলিকাতা	১২০১
বরিশাল	৯১২
ত্রিপুরা	৮৫২
মেদিনীপুর	৫৯০
শ্রীহট্ট	৪৭৬
যশোহর	৪২৯
পাবনা	৩৯৪
নোয়াখালি	৩৫০
মুর্শীদাবাদ	৩৪৬
খুলনা	৩০৫
হুগলী	২৩৫
বর্দ্ধমান	১৪০
চট্টগ্রাম	১৩০
বাঁকুড়া	১০০
রংপুর	১২০
বীরভূম	১০০
রাজসাহী	৯৮

হাবড়া	৮০
নদীয়া	৭৫
কাছার	৬০
মালদহ	৬০

সর্ব্বসমেত ১৪১৯১ ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে।

—বাসী

সাহিত্য-সংবাদ—

শান্তিপুর বান্ধব নাট্যসমাজ (সাহিত্য-বিভাগ) বর্ত্তমান বর্ষে রচনার জন্য কয়েকটি পদক বিতরণ করিবেন। রচনাগুলি আগামী ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌছান দরকার।

স্বর্ণ পদক—বিষয় "মহাকবি গিরিশচন্দ্র"
রৌপ্য পদক—বিষয় "ধর্ম্ম ও স্বদেশ-সেবা"
রৌপ্য পদক—বিষয় "মানবজীবনের সার্থকতা"।

শেষোক্ত রচনায় কেবল স্কুলের ছাত্রগণ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

—শ্রী মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী
সম্পাদক, শান্তিপুর বান্ধব নাট্যসমাজ,
শান্তিপুর (নদীয়া)

সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠান—

দান—হেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চন্দননগর পুস্তকাগারে শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকা সুদের ৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। বাবু পুলিনবিহারী শেঠ এবং বাবু রামকৃষ্ণ পাল যথাক্রমে ৫০০ ও ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।　—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ

পয়সা ভাণ্ডার।—মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত পয়সা ভাণ্ডার হইতে গত বৎসর মদিনীপুরের ১০৯ জন, খড়্গপুরের ১৪ জন, পিঙ্গলার ১০৫ জন ও চট্টগ্রামের ৩ জন দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিকে বস্ত্র সাহায্য করা হইয়াছে।　—সম্মিলনী

কলিকাতার কথা—

হিন্দুস্থানে খবর পাওয়া গেছে কল্‌কাতার লোকসংখ্যা হচ্ছে ১৩।০ লক্ষ—তার মধ্যে প্রায় ৮॥০ লোক বাঙালী, আর বাকি ৪৸০ অ-বাঙালী।

বেহার ও উড়িষ্যা থেকে এসেছে ২॥০ লক্ষের ওপর, যুক্তপ্রদেশ থেকে ১।০ লক্ষের কিছু ওপর, রাজপুতানা থেকে ৩০ হাজার, মাড়োয়ারী ৩০ হাজার, পাঞ্জাব হতে ১০ হাজার। কল্‌কাতায় কাবুলীর সংখ্যা হচ্ছে ৬১১।

বিলেতের লোক কল্‌কাতায় এসেছে ৮ হাজার, ফরাসী আছে ১৮৮, জর্ম্মন ২৫, ৪৯ গ্রীক, ৬৯ ইতালীয়, ৫১ রুশীয় ও ৫২ জন মার্কিন।

—নবসঙ্ঘ

স্বার্থত্যাগী আদর্শ কর্ম্মী—

শরৎকুমারের প্রায়োপবেশন—বরিশালের স্বনামধন্য কর্ম্মী ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের উপর ১১৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ স্বরূপ শরৎ-বাবু গত ২৯শে জুন হইতে প্রয়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার বক্তৃতায় যে কাজ হইত, তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ কাজ হইতেছে। বরিশালের মাতৃজাতি শরৎকুমারের এই লাঞ্ছনার জন্য কংগ্রেস-কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। চর্কা ও খদ্দরের কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত চলিতেছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ভগিনী শঙ্কর মঠের সন্ন্যাসিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী মহাশয়া শরৎকুমারের স্থলবর্ত্তিনী হইয়া বিশেষ ভাবে কার্য্য করিতেছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সতীন্দ্রনাথের প্রায়োপবেশন।—পটুয়াখালীর কর্ম্মী শ্রীমান সতীন্দ্রনাথ জেলে প্রায়োপবেশন করিতেছেন শুনিতে পাইয়া বরিশালবাসী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।—বরিশাল-হিতৈষী

পণ্ডিত রামরক্ষা রাজনৈতিক অপরাধে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে পৈতা পরতে দেওয়া হয় না। পণ্ডিতজী বলেন যে ব্রাহ্মণের ছেলে যজ্ঞোপবীত ছাড়া জলগ্রহণ করতে পারে না। সে কথা কর্ত্তৃপক্ষ কানেই তোলেন না—ফলে রামরক্ষাকে অনশনে থাকতে হয়।

নব্বই দিন না খেয়ে থেকে পণ্ডিত রামরক্ষা আন্দামানে প্রাণত্যাগ করেন। সরকারের জেদ বজায় থাকে।—বিজলী

*　　*　　*

অধঃপতিত বাঙালী সমাজ—

দিনাজপুরের এক ভদ্রসন্তান স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করে। সে পূর্ব্ব হইতেই প্রথমা স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিত। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত ভদ্রসন্তান অবলা গৃহলক্ষ্মীর পৃষ্ঠদেশে উত্তপ্ত লৌহদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া দগ্ধ স্থানে লঙ্কাবাটার প্রলেপ দিয়াছে। বধূর শ্বশুর-শাশুড়ী গুণধর পুত্রের কার্য্যে বরাবর উৎসাহ দিয়াছেন। পুলিশ এই ঘটনার সন্ধান পাইয়া স্বামীকে চালান দিয়াছে।—এডুকেশন গেজেট

বাঙ্গলায় মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যা পুনরায় দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে শাশুড়ীদের দুর্ব্যবহারের জন্য।—পঞ্চায়েৎ

দিনাজপুরেও এক বধূনির্য্যাতনের মামলা দায়ের হইয়াছে। এবার এই তৃতীয় দফা।—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদালতে দৌড়াদৌড়িতে এসব আপদ দূর হইবে না—অন্য দিক হইতে সায়েস্তা করা চাই—সমাজদেহে তেমন শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে।—শঙ্খ

সেবক
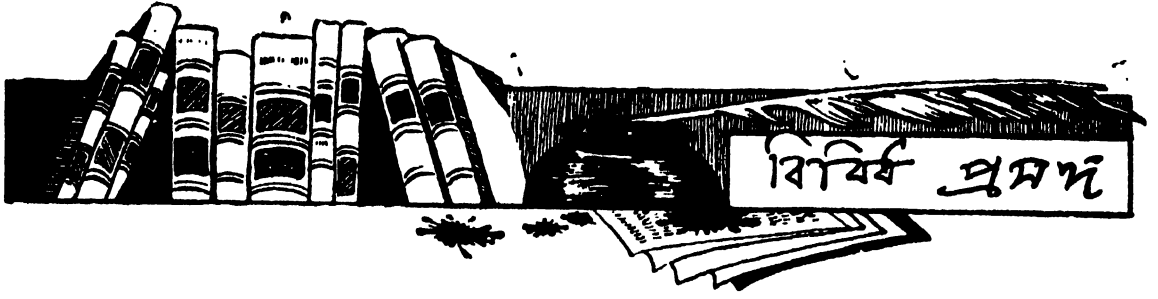
বাঙালীর আলস্য

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কোন কালেই বেশ সুস্থ সবল ছিলেন না। এখন তাহার উপর তাঁহার বয়স ষাটের উপর হইয়াছে। এই বয়সে শারীরিক অসুস্থতা ও অবসাদ, রোদ বৃষ্টি ও কাদা, সবই অগ্রাহ্য করিয়া তিনি যে দেশের কল্যাণার্থ নানা স্থানে গিয়া দেশের লোককে জাগাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রশংসা করিবার জন্য আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার একটি কথা ও তাঁহার দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। তিনি অনেকবার লিখিয়াছেন ও অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, যে, আলস্য বাঙালীর দারিদ্র্যের এবং নানাদিকে বাঙালীর অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ। বাঙালীর চেয়ে পৃথিবীর কোন জাতি বেশী বুদ্ধিমান্ নয়। বাঙালীর মধ্যে খুব বলবান্ লোকও ছিল এবং আছে। তথাপি বাঙালী গরীব কেন, বাঙালীর পেটে অন্ন নাই কেন, বাঙালী একটি একটি করিয়া রোজ্‌গারের সকল ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইতেছে কেন? তাহার একটি কারণ আলস্য। অন্য কারণও আছে—যেমন, বাঙালীর পরস্পরকে অবিশ্বাস এবং নিজেদের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা। এই অবিশ্বাসের কারণও আমরা। জাতির মধ্যে সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে, পরস্পরের উপর বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিবে? যাহা হউক, আমাদের সব দোষের কথা না ভাবিয়া কেবল আলস্যের কথাই এখন ভাবি। দোষ-ক্ষালন ও আত্মপক্ষ-সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে বলা যায়, আমাদের দেশের জলবায়ু পরিশ্রমের অনুকূল নহে, এখানে বড় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, ইত্যাদি; এইজন্য আমরা এত অলস। কিন্তু আগেও এদেশে এমনি গরম, এমনি বর্ষা, এমনি কাদা ছিল; অথচ তখন ত আমাদের দৈহিক পরিশ্রমের সব কাজ ওড়িয়া, বিহারী, হিন্দুস্থানী, সাঁওতাল প্রভৃতিরা করিয়া দিত না। আমরাই করিতাম। ম্যালেরিয়াতে শরীর অবসাদগ্রস্ত হওয়ায় আলস্য উৎপাদন করে বটে; কিন্তু আলস্য ম্যালেরিয়ার জনকও বটে। কারণ, দারিদ্র্য ম্যালেরিয়ার একটি কারণ; যাহারা পরিশ্রমী ও উপার্জ্জক এবং যাহাদের শরীর পুষ্ট তাহাদের চেয়ে অনশনক্লিষ্ট লোকদিগকেই ম্যালেরিয়া অধিক আক্রমণ করে। যাহারা নিজে পরিশ্রম করিয়া গ্রামের আগাছা জঙ্গল কাটিয়া ফেলে, অনাবশ্যক খানা ডোবা বুজাইয়া ফেলে, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে, তাহাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া অপেক্ষাকৃত কম হয়। পূর্ব্ব বঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়া বেশী; লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুতে কমিয়াছে পশ্চিম বঙ্গের জেলা-সকলে। কিন্তু ধান কাটিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা স্থানান্তর হইতে তত মজুর আম্‌দানী করে না, যত পূর্ব্ব বঙ্গের লোকেরা করে। বিহারের অনেক জেলায় অনেক বৎসর হইতে ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সেই-সব জেলা হইতেও হাজার হাজার লোক বঙ্গে আসিয়া দৈহিক শ্রম দ্বারা বিস্তর টাকা রোজ্‌গার করে। অতএব ম্যালেরিয়ার জন্যই আমরা অলস হইয়া পড়িয়াছি, ইহা সত্য নহে। আলস্যের প্রধান কারণ এই, যে, আমাদের স্বভাব খারাপ হইয়াছে। আমরা পরিশ্রম, বিশেষতঃ শারীরিক পরিশ্রম, করিতে চাহি না; আমরা কষ্টসহিষ্ণু নহি, আমরা বাবু। ষষ্টিপর বৃদ্ধ আচার্য্য রায়ও ত ক্ষীণজীবী বাঙালী; তিনি সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান; নিজেও বৎসরে রোজ্‌গার করেন অনেক হাজার টাকা। তিনি

মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন; তুমি আমি কেন করি না?

বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। আমরা সহজেই উত্তেজিত হই, ভাবের আবেগে আমরা কখন কখন দেশের জন্য মহাবিপদকে আলিঙ্গন করিয়াছি। ঝড় ভূমিকম্প বন্যা দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ দৈহিক শ্রমও কিছুদিনের জন্য আমরা করি। কিন্তু সারাজীবন পরিশ্রমের অভ্যাস আমাদের কেমন করিয়া জন্মিবে, বুঝিতে পারিতেছি না। এমন কোন অনুপ্রাণনা কি আসিবে, যাহার প্রভাবে আমরা স্থায়ীভাবে পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইয়া যাইতে পারি?

"ভদ্রলোক" শ্রেণীর লেখক বক্তা কর্ম্মী প্রভৃতিগণের একটি কর্ত্তব্য আছে, যাহা তাঁহারা পালন করিলে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা দৈহিক শ্রমে অভ্যস্ত হইতে পারে। এখন সকলেই বাবু হইতে চায়। বাবুর লক্ষণ এই, যে, তিনি দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ করিবেন না। বাবু যদি নিজের ছোট বাক্স, গাঁটুরী বা হাল্কা বিছানা-কম্বলও বহন না করেন, তাহা হইলে গরীব চাষা-ভূসারাই বা তাঁহার এই "উচ্চ" দৃষ্টান্তের অনুকরণ কেন না করিবে? রেলওয়ে ষ্টেশন ষ্টীমারঘাট বঙ্গের কত কত গ্রামের নিকটে। এই-সব গ্রামে অতি গরীব ঋণগ্রস্ত লোক বাস করে। তাহাদের অনেকে দুর্ভিক্ষের সময়ে এবং অন্য সময়েও লোকের নিকটে হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করে না; কিন্তু তাহারা ট্রেনের সময় ষ্টেশনে আসিয়া মোট বহিয়া দুএক আনা রোজ্‌গার করিতে চায় না। কেননা, মোট ঘাড়ে করাটা বাবুলোকদের কাজ নহে! অতএব বাবুরা যদি উপদেশ দেন এবং কাজেও যিনি যত বড় পারেন নিজেদের মোট নিজে বহন করেন, তাহা হইলে কিছু সুফল হইতে পারে। অন্যান্য দৈহিক শ্রমের কাজও বাবুদের করা একান্ত কর্ত্তব্য। পরিচ্ছদে এবং দৈহিকশ্রমে বাবু ও অবাবু শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য দূর বাবুরা চেষ্টা না করিলে হইবে না। কিন্তু পার্থক্য দূর হওয়া চাই-ই চাই।

বঙ্গে অবাঙালী

সেদিন দুখানা এংলোইণ্ডিয়ান কাগজে লিখিল, যে, অবাঙালীতে বাংলার সব রোজ্‌গারের ক্ষেত্র দখল করিয়া ফেলিতেছে, অমনি বাংলা কাগজওয়ালারা এ বিষয়ে খুব কলম চালাইতে আরম্ভ করিলেন,—যেন এটা একটা ভারি নূতন আবিষ্কার, আগে কেউ একথা বলে নাই! আমরা স্বাজাতিকতার যত বড়াই-ই করি না কেন, ইংরেজ একটা কথা বলিলে তবে সেটা আমরা শুনি।

আমরা অনেক বৎসর হইতে বার বার বলিয়া আসিতেছি, যে, আমরা নিজ বাসভূমে প্রবাসীর মত নানা কার্য্যক্ষেত্র হইতে বেদখল ও তাড়িত হইতেছি। কোন কাগজওয়ালা তাহাতে কান দেন নাই; কারণ কথাগুলা লিখিয়াছি আমরা এবং বাংলায় লিখিয়াছি! যাহারা আমাদের পুরাতন গ্রাহক এবং "প্রবাসী" বাঁধাইয়া রাখেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আমরা "প্রবাসী"তে নিম্নলিখিত বৎসর, মাস ও পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, হয়ত অন্যত্রও করিয়াছি:— ১৩১১ বৈশাখ ৪৯ পৃষ্ঠা, ১৩১১ আশ্বিন ৩১২ পৃষ্ঠা, ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ ১০৯ পৃষ্ঠা, ১৩১৮ চৈত্র ৬১৭ পৃষ্ঠা, ১৩২১ ভাদ্র ৫০১ পৃষ্ঠা, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৫ পৃষ্ঠা, ১৩২৫ পৌষ ২৮০ পৃষ্ঠা, প্রভৃতি। বঙ্গীয়হিতসাধনমণ্ডলী অনেকবার স্বীয় প্রদর্শনীতে একটি ছবি দেখাইয়াছেন, তাহাতে নানা-কার্য্যক্ষেত্রে অবাঙালীর প্রতিষ্ঠা চিত্রের সাহায্যে দেখাইয়া নীচে লেখা হইয়াছে, "বাঙ্গালী কোথায়?" এইছবি ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"র ৬৮ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আচার্য্য রায় মহাশয় "প্রবাসী"তে প্রকাশিত তাঁহার বহু প্রবন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে বাঙ্গালী, এবং বাংলাতেই বলিয়াছেন। আর কোন কাগজে কেহ এ কথা ইতিপূর্ব্বে লেখেন নাই, ইহা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা যাহা করিয়াছি, কেবল তাহারই উল্লেখ করিলাম এইজন্য, যে, ইহা আমরা ভাল করিয়া জানি। বাঙালী বাংলায় কিছু বলিলে লিখিলে তাহা "মান্যগণ্য" লোকেরা দেখেন না, শুনেন না, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, কথাটা যেই বলুক, ইহা সত্য, যে, বাংলা দেশে বাঙালী ছাড়া আর সবাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং অনেকে খুব ধনীও হয়। এজন্য অবাঙালীদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া উচিত নয়, এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ব্যর্থ কল্পনা, ইচ্ছা ও চেষ্টা করা উচিত নয়। অবাঙালীরা কি গুণে কি উপায়ে বাংলায় আসিয়া রোজ্‌গার করে, তাহাদিগকে দেখিয়া তাহা শিক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা অলস, আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে; আমরা বাবু, কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে।

আমরা দৈহিক শ্রমের কাজকে ছোট লোকের কাজ মনে করি, এবং আলস্যকে বাবুর লক্ষণ মনে করি। এই ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করিয়া সব রকমের সৎ কাজকে প্রয়োজন মত সব মানুষের করণীয় মনে করিতে হইবে, ও তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে। যাহাতে মিথ্যা, বঞ্চনা, চুরি, জাল বা অন্যবিধ দুর্নীতি নাই, তাহাই সৎ কাজ।

আমাদের আর-একটা দোষ এই আছে, যে, আমরা মনে করি, বাংলা দেশে যে কাজের যে রীতি, উপায় বা যন্ত্র চলিত আছে, তাহাই চালাইয়া যাইতে হইবে। বাস্তবিক কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ ও দেশের কুমার, কামার, তাঁতি, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, প্রভৃতি কারিকরদিগের রীতি উপায় ও যন্ত্র হইতে অনেক শিখিবার ও অনুকরণ করিবার আছে। তাহা আমাদের করা উচিত। তাহার প্রচলনে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদেরও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, দেশ-বিদেশের খবর তাঁহারা যত সহজে লইতে পারেন, অন্যেরা তত সহজে পারে না।

—

খদ্দরের প্রচলন

চরখায় সুতা কাটিয়া সেই সুতা হইতে হাতের তাঁতে কাপড় বুনিয়া ব্যবহার করিলে আমাদের দেশের আর্থিক ও নৈতিক প্রভৃত উন্নতি হইতে পারে, তাহা অনেক মনীষী বারবার দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ও শুধু ভাবের দ্বারা চালিত হইবার লোক নহেন। তিনি বহুপূর্ব্বে ঘরবুনা মোটা কাপড় পরিবার ঔচিত্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে যুক্তি-পূর্ণ সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতেও তিনি দেখাইয়াছেন, যে, খদ্দর চালান অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে, এবং উহার প্রচলন দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। যাঁহারা ঐ প্রবন্ধ পড়েন নাই, তাঁহারা একবার পড়িয়া দেখুন। কলের সুতা ও কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতার কথা তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে সময়টির কোন সদ্ব্যবহার দেশের অধিকাংশ লোক করেন না, যাহা আলস্যে যাপন করেন, তাহারই সদ্ব্যবহার দ্বারা দারিদ্র্য-দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে নিবারণের উপায় চিন্তা করিলে দেখা যায়, কাপাস গাছ লাগাইয়া তুলা উৎপাদন, চরখায় সেই তুলা হইতে সুতা কাটা এবং হাতের তাঁতে ঐ সুতা হইতে কাপড় বুনা সকলের চেয়ে সহজ ও সুসাধ্য উপায়। তিন রকম কাজই কেহ একা না করিতে পারেন। যিনি যাহা পারেন, করুন। খদ্দর প্রচলনের জন্য চাই আলস্য-ত্যাগ, এবং মোটা কাপড়, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, পরিতে রাজী হওয়া। কিছুদিনের জন্য বলিতেছি এইজন্য, যে, চরখায় বেশ সরু সুতাও নিপুণ হাত হইতে বাহির হয়। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে যে মস্‌লিন হইত, তাহা ত কলের সুতায় নয়—তখন কল ছিল না, চরখায় কাটা সুতাতেই তাহা বোনা হইত। এখনও স্থানে স্থানে চরখায় মিহি সুতা হইতেছে। অতএব, কিছুকাল পরে হাত পাকিলেই সরু সুতাও হইবে, মিহি কাপড়ও হইবে। যদি না হয়, তাহাতেই বা কি আসে যায়? আগে ত আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক মোটা কাপড়ই পরিত, এখনও অনেকে পরে। তা ছাড়া, এখন অনেক এই-দেশী লোকের পোষাক ইংরেজদের মত, এবং এই-সব পোষাকের কাপড় খদ্দরের চেয়ে কম পুরু বা কম ভারী নহে। এ দেশে গ্রীষ্মকালে পরিহিত বিলাতী ধরণের পোষাকের পাজামা, কোট,

ওয়েষ্ট্ কোট, কামিজ, গেঞ্জি, কলার, নেক্‌টাই এবং মোজার সম্মিলিত ওজন, খদ্দরের ধুতি, চাদর, ও পঞ্জাবীর সম্মিলিত ওজন অপেক্ষা কম নহে। শীত-কালের বিলাতী ধরণের পোষাকের ওজন ত খুবই বেশী।

রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সকল দলের লোকদের চর্‌খায় কাটা সুতা হইতে হাতের তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সমর্থন করা উচিত। খদ্দর নামে আপত্তি থাকে ত তাহা না হয় ব্যবহার নাই করিলেন।

সাধারণ লোকেরা ও গরীব লোকেরা বাবুদের অনুকরণ করে। এইজন্য বাবুদেরই সর্ব্বাগ্রে খাঁটি খদ্দর ব্যবহার করা উচিত। এবং, খদ্দরে দাম বেশী লাগিলে, তাঁহারাই বেশী দাম দিয়া উহা কিনিতে অধিক সমর্থ।

—

ভারতের ও বঙ্গের ব্যয়সংক্ষেপ

বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বহুব্যয়সাধ্য হইবেই। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের মানে, এরূপ লোকদের দ্বারা দেশশাসনের প্রধান প্রধান কাজগুলি নির্ব্বাহ, যাহারা বিদেশী এবং কার্য্যকাল অতীত হইয়া গেলে যাহারা নিজের দেশে চলিয়া যাইবে। এই-সব লোক যে নিজের দেশ ছাড়িয়া আসিবে, কেন আসিবে? স্বদেশে তাহারা যত বেতন পাইত বা পাইতে পারিত, তাহা অপেক্ষা বেশী বেতন না পাইলে তাহারা কেন দূর দেশে কাজ করিতে আসিবে? অতএব, ইহা খুবই সহজবোধ্য, যে, দেশী লোকদের দ্বারা কাজ চালান অপেক্ষা বিদেশী লোকদের দ্বারা কাজ চালান অধিক ব্যয়সাধ্য হইবে। সেইজন্য রাষ্ট্রীয় কার্য্যের ব্যয় কমাইতে হইলে, গবর্ণমেণ্টটাকে দেশী গবর্ণমেণ্ট করিতে হইবে। দেশী গবর্ণমেণ্ট দুই প্রকারে করা যায়। সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ দেশী হয়; আবার, ভারতীয়েরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও আভ্যন্তরীন আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট অনেকটা দেশী হইতে পারে। ভাল করিয়া ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে হইলে এই দুটি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তবে ইহা ঠিক্ বটে, যে, বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বেশী অপব্যয়ী ও কম অপব্যয়ী দুই প্রকারের হইতে পারে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বাংলা গবর্ণমেণ্টের ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য যে দুটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা যদি কিছু কাজ হয়, তাহা হইলে এই দুটি গবর্ণমেণ্ট এখনকার চেয়ে কিছু কম অপব্যয়ী হইবে মাত্র, যথেষ্ট মিতব্যয়ী তাহারা হইবে না, হইতে পারে না। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অপব্যয়ী হইবার আরো কতকগুলি কারণ আছে। অধীন দেশ ও জাতিকে বশে রাখিবার জন্য উহার সেনাদল ও পুলিশ বৃহৎ হওয়া চাই এবং বিদেশী কর্ম্মচারীদের অধীনে থাকা চাই, গোয়েন্দা বিভাগ বড় হওয়া চাই, জেলগুলা বড় হওয়া চাই, ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা মনে করাও ভুল, যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হইলেই তাহা মিতব্যয়ী হইবে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট মিতব্যয়ী হইতে পারে, অপব্যয়ীও হইতে পারে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ভাল হইলে তাহা মিতব্যয়ী হইবে, মন্দ হইলে অপব্যয়ী হইবে। তাহার প্রমাণ হাতের কাছেই রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ দেশী হইলে বড় বড় সব সরকারী কর্ম্মচারী দেশী হইবে, গবর্ণমেণ্ট অংশতঃ দেশী হইলে বড় অনেক কর্ম্মচারী দেশী হইবে। কিন্তু এখন যাঁহারা দেশী মন্ত্রী বা শাসনপরিষদের দেশী সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, দেশী লোক হইলেই যে তাঁহারা বিদেশীদের চেয়ে কম বেতনে দেশের সেবা করিতে সম্মত হইবেন, তাহা নহে। অন্য দিকে ইহাও শোনা গিয়াছে, যে, দেশের কাজ করিবার জন্য সংগৃহীত টাকা (অর্থাৎ কংগ্রেসের ও খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের অনুমোদিত কাজ করিবার জন্য সংগৃহীত টাকা) কোথাও কোথাও স্বাজাতিক (nationalist) দলের কোন কোন লোকের দ্বারা নিজেদের আরাম ও ব্যসনের জন্য অপব্যয়িত হইয়াছে। সেইজন্য বলিতেছিলাম, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত লোক রাজনৈতিক যে দলেরই হউন, তাঁহারা অর্থগৃধ্নু হইতে পারেন। এই হেতু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ভাল অর্থাৎ প্রকৃত গণতান্ত্রিক হওয়া চাই, নতুবা সরকারী কাজে মিতব্যয় হইতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক মতিগতি ও রীতি কি, তাহা একটু খুলিয়া বলা দরকার।

আসল গণতন্ত্র রাষ্ট্র তাহাই, যাহাতে সমুদয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও রমণীর ভোট আছে ও রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে। এইরূপ গণতন্ত্র দেশের গবর্ণমেণ্ট লোকমত অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য হয়। ঠিক্ এই আদর্শ অনুযায়ী গণতন্ত্র কোথাও না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার কাছাকাছি যায় এরূপ গণতন্ত্র আছে। গণতান্ত্রিক মতে সর্‌কারী কর্ম্মচারীরা দেশের লোকের মনিব নহে, তাহারা সেবক। গণতান্ত্রিক মতে সর্‌কারী চাকরী দেশের লোকদের উপর প্রভুত্ব করিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে, তাহাদের সেবা করিয়া তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্য অভিপ্রেত। গণতান্ত্রিক মতে সর্‌কারী চাকরী ধনী হইবার উপায় নহে ;—গণতান্ত্রিক দেশে যাহারা ধনী হইতে চায় তাহারা কার্‌খানায় পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করে, ব্যবসাবাণিজ্য করে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস করে, জাহাজ চালায়, ও এইপ্রকার অন্যান্য নানা কাজ করে। অনেকে আইনজীবী, চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি হয়। গণতান্ত্রিক দেশের ব্যবস্থা এরূপ হয় না, যে, তাহার ফলে উচ্চপদস্থ সর্‌কারী চাকরেরা বিলাসিতা করে ও টাকা জমায় এবং নিম্নপদস্থ চাকরেরা খাইতে পরিতে পায় না। আমাদের দেশে লাটসাহেব পান আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক বেতন ও তদুপরি নানাবিধ ভাতা, নিম্নতম কর্ম্মচারীরা কিন্তু বৎসরে আড়াই শত টাকাও পায় না। এত বেশী তফাৎ কোন গণতান্ত্রিক দেশে থাকিতে পারে না, নাই। খুব সামান্য মানুষ যে, তাহারও ঘরবাড়ী, খাওয়াপরা, পরিবার-প্রতিপালন, শিক্ষা, বিমল আনন্দ, জ্ঞান, ও অসময়ের জন্য সঞ্চয়ের দর্‌কার। কিন্তু যে দেশে উচ্চতম কর্ম্মচারী নিম্নতমের দুই হাজার গুণেরও বেশী বেতন এবং ভাতা পায়, সে দেশের গবর্ণমেণ্টের ও লোকদের মত যেন কতকটা এইরূপ, যে, উচ্চতম কর্ম্মচারী দেবতা এবং নিম্নতম কর্ম্মচারী ও তাহার সমশ্রেণীস্থ লোকেরা পশুরও অধম। ইহা বাজে কথা নয়। গ্রাম্য চৌকিদার ও গুরুমহাশয়-দিগকে যে বেতন দেওয়া হয়, গরুঘোড়া রাখিবার খরচও তাহা অপেক্ষা অধিক।

নিম্নতম কর্ম্মচারীরাও যাহাতে মানুষের মত জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহার মত বেতন তাহাদিগকে দিতে হইলে উচ্চপদগুলির বেতন আমাদের দেশের মত নবাবী রকমের করিলে চলে না। জাপানের দৃষ্টান্ত লউন। উহা স্বাধীন দেশ, আমাদের চেয়ে ধনী দেশ, এবং সেখানকার জীবনধারণ-ব্যয় ভারতের চেয়ে বেশী। এ হেন শক্তিশালী স্বাধীন ও ধনী দেশে প্রধান মন্ত্রীর বেতন মোটামুটি মাসিক দেড় হাজার বা বার্ষিক ১৮০০০ টাকা মাত্র। জাপানের সিবিল সার্বিসের পদগুলির সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর নাম হান্-নিন্। এই হান্-নিন্ শ্রেণীর নিম্নতম কর্ম্মচারীরা মাসিক ষাট টাকা বেতন পান। ১৯২০-২১ সালের জাপানী বর্ষপুস্তক অনুসারে জাপানী প্রাথমিক বিদ্যালয়-সকলে সাধারণ শিক্ষকদের গড় বেতন মাসিক চল্লিশ টাকা। পরাধীন দুর্ব্বল দরিদ্র বাংলাদেশের গুরু মহাশয়দের বেতন যদি দশ টাকাও ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা বছরে ১২০ টাকা পান, এবং এক-একজন মন্ত্রী পান ৬৪০০০ টাকা, অর্থাৎ পাঁচশত গুণেরও অধিক। স্বাধীন শক্তিশালী ধনী জাপানের প্রধান মন্ত্রী জাপানী গুরুমহাশয়দের গড় বেতনের পঞ্চাশ গুণ বেশী বেতনও পান না।

আমাদের দেশেও বেতনের ফর্দ্দ জাপানী ধরণের করিতে হইবে। তাহাতেও নিশ্চয়ই যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে।

ভারতশাসনে অপব্যয়ের অন্ত নাই। সৈনিক বিভাগ, যত শীঘ্র সম্ভব, নেতা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সিপাহী পর্য্যন্ত, দেশী লোকে পূর্ণ হওয়া দর্‌কার। তাহা হইলে ব্যয় অন্যূন টাকায় দশ আনা কমিয়া যাইবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সার্ গড্‌ফ্রি ফেল্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ফর্দ্দ হইতে জানা যায়, যে, একজন অবিবাহিত সার্জেণ্টের মাসিক প্রাপ্য ২০৪্, বিবাহিতের ২৬০ টাকা। অন্যদিকে একজন দেশী হাবিলদারের মাসিক প্রাপ্য ৫২, অশ্বারোহী হইলে ৫৮। সাধারণ গোরা সৈনিকের প্রাপ্য অবিবাহিত পক্ষে ১৫০, বিবাহিত হইলে ২০৬। সাধারণ সিপাহীর প্রাপ্য ৪২, অশ্বারোহী হইলে ৪৫ টাকা। বিদেশীর সব কাজ দেশী দ্বারা চলিতে পারে। তাহা চালাইলে কত ব্যয়সংক্ষেপ হইবে, এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে।

সিবিল অর্থাৎ অসৈনিক সমুদয় বিভাগে উচ্চ সমুদয় পদগুলির বেতন-কমাইয়া, জাপানের তুলনায় আমাদের দেশের আয় যেরূপ সেইরূপ করিতে হইবে; এবং নীচের পদগুলির বেতন বাড়াইতে হইবে। বাড়াইলেও, উচ্চ বেতনগুলির হ্রাস দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারিবে। তা ছাড়া, অনেক অনাবশ্যক পদ আছে, যাহা উঠাইয়া দেওয়া চলে ও দেওয়া উচিত। যেমন ডিবিজনের কমিশনার। সব প্রদেশে এই পদ নাই। যেখানে যেখানে নাই, তথাকার কাজ বাংলা দেশ অপেক্ষা খারাপ হয় না। পুলিশ-বিভাগে পরিদর্শক কর্ম্মচারীর এত বাহুল্য অনাবশ্যক। তাহা ছাঁটিয়া ফেলা উচিত। শিক্ষা-বিভাগেও এত পরিদর্শক কর্ম্মচারীর আবশ্যক নাই। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অপব্যয় বাড়িয়াছে, অকারণ প্রদেশবৃদ্ধির জন্য। বহুপূর্ব্বে আসাম, বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর, ওড়িষ্যা, এক-প্রদেশ-ভুক্ত ছিল। এক লাটসাহেব, এক সেক্রেটারিয়েট, এক-একটি শিক্ষা, পুলিস্, আব্‌গারী, প্রভৃতি বিভাগে কাজ চলিত। এখন হইয়াছে তিনটি প্রদেশ, তিন লাট, তিন সেক্রেটারিয়েট, তিনতিনটি শিক্ষা, পুলিস্, প্রভৃতি বিভাগ। রাজধানীও শীত-গ্রীষ্ম-ভেদে দুটা দুটা করিয়া ছয়টা এবং তদনুযায়ী প্রাসাদ আফিসাদি হইয়াছে। তাহাতে অনেক কোটি টাকা গিয়াছে। তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান, শান্তি, শক্তি বাড়িয়াছে কি?

দিল্লীতে রাজধানী লইয়া গিয়া উহার বহুযোজনব্যাপী সাম্রাজ্যসমাধিক্ষেত্রে যে কোটি কোটি টাকা ঢালা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার মত স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি জ্ঞান শান্তি শক্তি আমাদের বাড়িয়াছে কি?

ভারত-গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেন না। দেশের উপর ট্যাক্সের বোঝাও খুব বাড়ান হইয়াছে। তথাপি তিন বৎসরে ভারত-সর্‌কারের আয় অপেক্ষা ব্যয় নব্বই কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। এই টাকা উচ্চহারে সুদ দিয়া ধার করিতে হইতেছে। অপব্যয় এই অকুলান ও ঋণের কারণ। ঋণ পাওয়াও ক্রমশঃ কঠিন হইয়া আসিতেছে। ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি বসাইবার ইহা একটি প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি।

আমাদের প্রধান বক্তব্য সংক্ষেপে আবার বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। গবর্ণমেণ্ট বিদেশী থাকিতে যথাসম্ভব মিতব্যয় হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট দেশী বা জাতীয় হইলেও, আমাদের মতিগতি গণতান্ত্রিক না হইলে জাতীয় গবর্ণমেণ্টও যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হইবে না। অতএব, প্রথমতঃ চাই স্বরাজ স্থাপন; দ্বিতীয়তঃ চাই, আমাদের তদ্রূপ মতিপরিবর্ত্তন যাহার ফলে সরকারী চাকরীকে আমরা সাধারণ লোকদের উপর মনিবগিরির ও ধনী হইবার উপায় মনে না করিয়া উহাকে বৈতনিক দেশসেবা বলিয়া মনে করিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট বিদেশী থাকিলেও কতকটা ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। তাহা হইলেও মন্দের ভাল।

—

আশঙ্কার কথা

যখনই ব্যয়সংক্ষেপের কথা উঠে তখনই চাপ্‌রাসী পিয়াদা প্রভৃতিদের সংখ্যা ও বেতনের উপর দৃষ্টি পড়ে, কিম্বা শিক্ষার জন্য মঞ্জুর সামান্য টাকাও কমাইয়া দেওয়া হয়, অথবা এইরূপ শোচনীয় ও হাস্যকর আর-কিছু ঘটে। এ বারেও তাহা হইতে পারে। সিন্ধুদেশে ও বিহারে ইতিমধ্যেই শিক্ষার উপর হাত পড়িয়াছে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-বিভাগ

নানাদিকে নানাপ্রকারে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় হইয়া আসিতেছে। তাহার নিন্দা আমরা বরাবরই করিয়া আসিতেছি। কিন্তু মানবদেহের কঠিন পীড়ার যেমন চিকিৎসার দর্‌কার, সামান্য ব্যাধিরও তেমনি চিকিৎসা হওয়া ভাল, কারণ অবহেলিত হইলে তাহাও কঠিন হইতে পারে। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে বলিয়া পল্লীগ্রামের একটা খুন অবহেলার যোগ্য নহে। মিউনিশন্ বোর্ডের কয়েক কোটি টাকা চুরি গিয়াছে বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট, মফঃস্বলের সামান্য কোন আফিসের কেরাণী অল্পটাকা চুরি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেন না,

তাহাকেও ফৌজদারী সোপর্দ করেন। অতএব সামান্য অমিতব্যয় বা অপব্যয়ও মার্জ্জনীয় নহে।

অপব্যয়ের প্রশ্রয় কোথাও দেওয়া উচিত নহে বলিয়া আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টকে এবং শিক্ষিত সাধারণকে দৃষ্টি দিতে বলিয়া আসিতেছি। অপব্যয় কিম্বা চিন্তাহীনভাবে ব্যয় না হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক লাখ টাকা অকুলান পড়িত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট বড় নানা কথার এত আলোচনা আমাদের বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে করিবার আরো কারণ এই, যে, ইহা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অবৈতনিক ও বৈতনিক কর্ম্মীদিগের শিক্ষার কেন্দ্র; ইহার নৈতিক হাওয়া বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর না থাকিলে দেশের কল্যাণ কখনও হইতে পারে না। অনিয়মিত ব্যয়, অপব্যয়, চিন্তাহীনভাবে ব্যয় করিবার ক্ষমতা যেখানে থাকে, সেখানকার নৈতিক হাওয়া ভাল থাকিতে পারে না। এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নাই। এখানে স্থলবিশেষে অনুগ্রহে এবং তদ্বিরের জোরে পাস্ হওয়া যায়, উচ্চশ্রেণীতে পাস্ হওয়া যায়, প্রথমস্থানীয় হওয়া যায়, বৃত্তি পাওয়া যায়, চাকরী পাওয়া যায়, চুরি করা বিদ্যার জোরে প্রশংসিত হওয়া যায়, এইরূপ ধারণা লোকের জন্মিয়াছে। কোন বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল লোকই এরূপ মনে করেন না, যে, যাহারা পাস্ করে, ভাল পাস্ করে, বৃত্তি পায়, ইত্যাদি, তাহাদের সকলেরই কৃতিত্ব অনুগ্রহ- ও তদ্বির জাত; অধিকাংশেরই কৃতিত্ব স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী। কিন্তু অল্প কয়েকজনের দোষে অনেককে সন্দেহভাজন হইতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থঘটিত কার্য্য পরিচালন অতীতে যে শোচনীয় হইয়াছে, তাহা শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র তাঁহার গত ১লা মার্চ্চের বক্তৃতায় বলিয়াছেন ("the financial management of the Calcutta University in the past was deplorable")। এই অর্থঘটিত কার্য্য পরিচালনা কিরূপ হইয়াছে ও হইতেছে, শ্রীযুক্ত ঋষীন্দ্রনাথ সরকারের প্রস্তাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, অধিকাংশ সভ্যের মতে, তাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে এক কমিটি নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। প্রজাদিগের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট (Reponsible Government!) তাহা করেন নাই। যদি ঐরূপ কমিটি নিযুক্ত হইত, এবং তাহাতে কৃষ্ণলাল দত্ত, চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির মত লোক নিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ কতটা সমূলক বা অমূলক বুঝা যাইত।

আমরা আপাততঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্ট হইতে উহার শিক্ষাদান-বিভাগের (Post-graduate Departmentএর) প্রধান ব্যয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই পুস্তিকার নাম Post-graduate Teaching in the University of Calcutta, 1920-21। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় এই বৎসর ৮ই জুন ছাপা হইয়াছে।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, যে, পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগে ১৯২০-২১ সালে মোট ছাত্র ছিল ১১৯৬জন। বৎসরের শেষে যাহা ছিল তাহাই ধরিয়াছি। বৎসরের গোড়ায় আরো ৫০জন ছাত্র বেশী ছিল। এই ১১৯৬জনের শিক্ষার জন্য মোট ২৩৮টি শিক্ষকের পদ ছিল। কলিকাতায় কয়েকটি কলেজ আছে, যাহাদের প্রত্যেকের ছাত্রসংখ্যা ১১৯৬ অপেক্ষা বেশী কিম্বা তাহার কাছাকাছি। তাহারা পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের সমানসংখ্যক বিষয় শিক্ষা দেয় না; কিন্তু খুব কমও দেয় না। তাহাদের প্রত্যেকটিতে কতজন করিয়া শিক্ষাদাতা আছেন তাহা চিন্তনীয়। গড়ে ৫০ জন করিয়াও আছেন কি? প্রেসিডেন্সী কলেজেও ৫০।৬০ জনের বেশী অধ্যাপক নাই। পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের কয়েকজন শিক্ষককে বাদ দিলে অবশিষ্টেরা প্রথম শ্রেণীর কলেজের অধ্যাপকদিগের চেয়ে বেশী যোগ্য লোকও নহেন।

১১৯৬জন ছাত্রের শিক্ষার জন্য শিক্ষাদাতাদিগকে মোট বেতন মাসিক ৫৩১৩০ (তিপান্ন হাজার এক শত ত্রিশ) টাকা অর্থাৎ বার্ষিক ৬৩৭৫৬০ (ছয়লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাচ শত ষাট) টাকা দিতে হইয়াছে। ইহার উপর ক্যাপ্টেন পেটাভেল্‌কে বার্ষিক ১০০০ টাকা, অর্থাৎ মোট খরচ, ৬৩৮৫৬০৲ টাকা বার্ষিক শিক্ষাদাতাগণকে দিতে

হইয়াছে। তাহার উপর লাইব্রেরীর খরচ, কেরাণীদিগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির খরচ, ইত্যাদি আছে। অর্থাৎ শিক্ষাদাতাদিগের বেতনের জন্যই ছাত্রপ্রতি বার্ষিক প্রায় ৫৩৭৲টাকা খরচ হইয়াছে। যদি কেহ এই খরচের সহিত অন্য কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যয়ের তুলনা করিতে চান, তাহা হইলে, তাঁহাকে ইহাও দেখাইতে হইবে, যে, সে দেশের লোকদের জনপ্রতি গড়পড়তা আয় কত, এবং আমাদের দেশের লোকদেরই বা গড়পড়তা জন-প্রতি আয় কত।

উপরে যে মোট মাসিক বেতন ব্যয় ৫৩১৩০৲টাকা দেখাইয়াছি, তাহার মধ্যে ১৩৩৭৫৲টাকা মাত্র অর্থাৎ প্রায় সিকি বিজ্ঞান-বিভাগের জন্য!

ভারতবর্ষ যে এখন সমুদয় সভ্য-দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহার একটি কারণ বিজ্ঞানের চর্চ্চার অল্পতা। ভারতবর্ষের সাবেক শিল্প-কল প্রায় লোপ পাইয়া তাহার জায়গায় যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কারখানায় নানা পণ্যদ্রব্য যথেষ্ট রকম ও পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না, তাহার কারণও বিজ্ঞানের চর্চ্চার অল্পতা। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে যে-প্রকারের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আরম্ভ হইতে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন, তাহা প্রধানতঃ কেতাবী ও অবৈজ্ঞানিক। তাহার কারণ, গবর্ণমেণ্ট আদালতের ও আফিসের কর্ম্মচারীর এবং আইন-জীবীর আবশ্যকতা যত অনুভব করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে বিজ্ঞানে শিল্পে কল-কারখানায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্য সব সভ্য-দেশের সমকক্ষ করিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা তেমন করিয়া অনুভব করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ঠিক্ ইংরেজ আম্‌লাতন্ত্রের অনুসৃত নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, বলা যায় না। কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না। গত ১লা মার্চ্চের বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রীও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রতি আংশিক বিরূপতা প্রমাণ করিয়া বলেন, "I am pointing out these facts with the hope that they will induce the Calcutta University to revise their way of dealing with the science side."

এখন এক-একটা বিষয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা এবং অধ্যাপকদের মাসিক বেতনের পরিমাণ দেখাই।

বিষয়।	অধ্যাপকসংখ্যা।	ছাত্রসংখ্যা।	মাসিকবেতন।
ইংরেজী	২১	৪৪৯	৪৪০০ টাকা
সংস্কৃত	২১	৪৪	২৮৫০
পালি	৯	৬	১৪৭৫
আরবী ও ফারসী	৬	১৬	১১৫০
তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	৩	৫	৯৭৫
ভারতীয় আধুনিক ভাষা	২৫	৩৮	২১৭৫
দর্শন	১৫	১১৬	৪৭৭৫
পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান	৭	৯	১৫৫০
ইতিহাস	৩৮	১২৮	৯১৭৫
নৃতত্ত্ব	৮	৯	১৩৪০
অর্থবিজ্ঞান	১৬	১৩৮	৪৪০০
বিশুদ্ধ গণিত	১২	৮৮	৪৪০০
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা	১	অজ্ঞাত	১৫০
ফ্রেঞ্চ	১	,,	২০০
তিব্বতী	৩	,,	৭৩০
ফলিত গণিত	৯	৩১	১৮২৫
পদার্থবিজ্ঞান	১৫	৪৩	৪১২৫
রসায়নীবিদ্যা	১২	৩৭	৩৫০০
ফলিত ঐ	উল্লেখ নাই	১০	উল্লেখ নাই
উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান	৫	৫	১৯২৫ টাকা
শারীরবিজ্ঞান	২	১২	২০০
প্রাণিবিজ্ঞান	৫	৩	১২৭৫
ভূবিজ্ঞান	৩	৯	৫২৫

পাঠকেরা দেখিবেন, যে, কতকগুলি বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা খুব কম, এবং তাহার তুলনায় অধ্যাপকসংখ্যা ও তাঁহাদের মোট বেতনব্যয় খুব বেশী; যেমন, পালি, তুলনা-মূলক ভাষাবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, তিব্বতী, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, ও প্রাণিবিজ্ঞান। কোন বিদ্যাই অনাবশ্যক নহে। কিন্তু মানুষের আয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ও পরিমিত। সেই আয় কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত, তাহা স্থির করিতে হইলে খুব চিন্তা করা দরকার।

প্রথম চিন্তনীয় বিষয় দেশের অবস্থা। মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে, তবে ত তাহার কল্চ্যর্ (culture) হইবে! এইজন্য পরিমিত আয়ের কথা মনে রাখিয়া, আমরা পালি, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও তিব্বতীভাষাকে প্রয়োজনীয় মনে করিলেও, ভূবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানকে কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় মনে করি। এ বিষয়ে মতভেদ হইবে। আমাদের মত আমরা বলিলাম। অন্ততঃপক্ষে, অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সকলের অধ্যাপনার নিমিত্ত এত বেশী টাকা খরচ করিয়া এত অধ্যাপক রাখা কর্ত্তব্য মনে করি না। যদি ঐ বিষয়গুলি পড়াইতেই হয়, তাহা হইলে অধ্যাপকসংখ্যা খুব কমাইয়া দেওয়া উচিত। ধনীলোক একটি ছেলেকেও বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা শিখাইবার জন্য দশজন গৃহশিক্ষক রাখিতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশ সেই ধনীলোক নহে। নৃতত্ত্ব এত বিস্তারিত করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু ভূবিজ্ঞানের মত এরূপ দরকারী ও বহুশাখাসমন্বিত বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা পিত্তরক্ষার উপযোগী কেন? তাহাতে এত কম অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া এত কম খরচ কেন করা হয়? উহা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান অপেক্ষা কিসে কম? পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ শারীর-বিজ্ঞানের (Physiologyর) জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অথচ শারীর-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা যেন তাচ্ছিল্যের সহিতই করা হইয়াছে। উহার অধ্যাপক দুইজন খুব যোগ্য লোক। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি বিদ্যার ৬টি, ৫টি, ৯টি, ৯টি, ০ (?) টি, ৫টি ও ৩টি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যদি বহু বেতনে যথাক্রমে ৯জন, ৩জন, ৭জন, ৮জন, ৩জন, ৫জন ও ৫জন অধ্যাপক রাখা দরকার হয়, তাহা হইলে শারীর-বিজ্ঞানের ১২জন ছাত্রের জন্য এক-এক শত টাকায় দুইজন মাত্র অধ্যাপক কেন যথেষ্ট বিবেচিত হইল? তিব্বত দেশের মত তিব্বতী ভাষাটির অধ্যাপনা, ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি রহস্যাবৃত। উহা ছাড়িয়া দিলে, সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যবস্থা প্রাণিবিজ্ঞানের; ছাত্র তিনটি, অধ্যাপক পাঁচটি এবং তাঁহাদের বেতন মাসিক ১২৭৫৲। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের ব্যবস্থাও খাসা; ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা সমান সমান—পাচ; বেতন মাসিক ১৯২৫৲। পালিরও ছাত্রসংখ্যা ৬জন, কিন্তু অধ্যাপক ৯জন এবং তাঁহাদের বেতন ১৪৭৫৲। উত্তরে, পালিতে লিখিত নানা শাস্ত্র ও বিদ্যার উল্লেখ করা যায়; কিন্তু ঘরে যে টাকা কম এবং শিখিবার মানুষও কম। নৃতত্ত্বও বড় কম যান না। ছাত্রসংখ্যা অধ্যাপকদের চেয়ে এক বেশী। ৪৪টি ছাত্রের জন্য ২১জন সংস্কৃত অধ্যাপক বড় বেশী মনে হয়। জানি, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নানা বিদ্যা আছে; কিন্তু বিভাগ এবং শাখারও ত একটা আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী সীমা থাকা উচিত। নতুবা শুধু ব্যাকরণ শিখাইবার জন্যই ত পাণিনির একজন, মুগ্ধবোধের একজন, সংক্ষিপ্তসারের একজন, কলাপের একজন,.........এইরূপ অধ্যাপক নিযুক্ত করুন না?

আরবী-ফারসী সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থায় দেখিলাম, অধ্যাপক আছেন ছয়-জন। (আর-এক জায়গায় আছে সাত-জন।) তার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বেতন পান লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল্ জর্জ র‍্যাঙ্কিং—৫০০ টাকা। কিন্তু তিনি যে কি কাজ করিয়াছেন, কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। অধ্যাপনা করিয়াছেন, অপর পাঁচ জনা। র‍্যাঙ্কিং কোন গবেষণা করিয়াছেন বা সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে কোন বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাও কোথাও লেখা নাই। এমন কি, কলমবাজ গুণ্ডার কাজও তাঁহার দ্বারা হয় নাই। অথচ তিনি বৎসরে ৬০০০ টাকা পাইয়াছেন। এই টাকায় প্রায়-নিরক্ষর বাংলা দেশে ১২০০ ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে পারিত। এই ছয় হাজার টাকা কি সম্পূর্ণ অপব্যয় হইতেছে না? শিক্ষামন্ত্রী ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কি বলেন?

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অনেক অধ্যাপক কলেজের অধ্যাপকদের চেয়ে সপ্তাহে অনেক কম ঘণ্টা অধ্যাপনা করেন। তাহার কারণ এই দেখান হয়, যে, যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদিগকে পড়াইবার কাজ বেশী দেওয়া উচিত নয়। তথাস্তু। আমরা সমস্ত রিপোর্টটি ঘাঁটিয়া

দেখিলাম, আলোচ্য বৎসরে ইংরেজীর কোন অধ্যাপক কোন গবেষণা করেন নাই বা বহি প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের অধ্যাপনার কালের পরিমাণের সহিত তাঁহাদের সমান দরের কলেজ-অধ্যাপকদের অধ্যাপনা-কালের পরিমাণের তুলনা করা অন্যায় হইবে না। তাঁহাদের কেহ কেহ নিজেই কলেজ-অধ্যাপক। তাঁহারা কত কাজ করিয়া কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কত বেতন পান, শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তাহার অনুসন্ধান করুন। যদি কেহ কাজের তুলনায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত কম বেতন পান, তাহা হইলে কলেজে কেন বেশী লয়েন, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। এইরূপ অনুসন্ধান সকল বিষয়ের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে হওয়া উচিত। অতিবিস্তৃতির ভয়ে আমরা অধ্যাপক-দের কাজের ও বেতনের তালিকা দিলাম না।

ইংরেজীর ছাত্র ৪৪৯ জন। তাহার তুলনায় অধ্যাপক-সংখ্যা খুব বেশী নয়, যদিও আমাদের বিবেচনায় আরো কম অধ্যাপক দ্বারা কাজ চলিতে পারে, কারণ, এই অধ্যাপকেরা দেখিতেছি গবেষক নহেন। যাহা হউক, ইংরেজীর কোন্ অধ্যাপক কত কাজ করেন, তাহা বুঝিবার উপায় আছে; এবং তাঁহাদের কেহ র‍্যাঙ্কিঙের মত বসিয়া বসিয়া ৫০০ টাকা করিয়া বেতন পান না। কিন্তু সংস্কৃত, পালি, নানা ভারতীয় ভাষা, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, আরবী ও ফারসী, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থবিজ্ঞান, এবং আরো কোন কোন বিষয়ে ইংরেজীর মত কার্য্য-তালিকা দেওয়া হয় নাই বলিয়া কে কত কাজ করিতেছেন, বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং, র‍্যাঙ্কিঙের আরবী-ফারসীর অধ্যাপকতার মত পূরা ফাঁকি না হইলেও, কিছু কিছু আংশিক ফাঁকি আরো আছে কি না, সহজে বুঝিবার জো নাই। তা ছাড়া, রিপোর্টে কাজ যাহা লেখা আছে, কোনও কোনও অধ্যাপক তাহাতেও ফাঁকি দিয়া থাকেন, এরূপ খবর ত অনেকের মুখেই শুনা গিয়াছে। তাহা না-হয় নাই ধরিলাম।

* পালির চারিটা গ্রূপ (group) এবং ছয়টি ছাত্র, অর্থাৎ গড়ে দেড় জন ছাত্র এক এক শাখায় বিদ্যার্থী আছেন। ইহাদের জন্য ৯ (নয়) জন অধ্যাপক মাসে ১৪৭৫ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কোন কলেজে বা কলেজের বাহিরে বাংলা দেশে বা বাঙালীর দ্বারা কোন গবেষণা হয় নাই বা হইত না, এমন নহে। এখনও কোন কোন কলেজের কোন কোন অধ্যাপক এবং কলেজের সহিত অসংসৃষ্ট অনেক লোক গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপিত হওয়ায় গবেষণায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং গবেষণা-কার্য্যে ও নানা-বিদ্যার উচ্চতম শাখার অধ্যাপনায় দেশী অধ্যাপকদের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কোন বিষয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের কোন কোন অধ্যাপক ও ছাত্র খাঁটি গবেষণা করিয়াছেন। খাঁটি জিনিষকে মেকি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই উচিত। যখন কয়েকটা মেকি নমুনা দেখিয়া লোকের এরূপ সন্দেহ হইবার কারণ হয়, যে, বুঝি বা সবই মেকি, তখন মেকিটাকে আরও ভাল করিয়া দাগিয়া পৃথক্ করিয়া দেওয়া বেশী আবশ্যক হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাহা করেন নাই, বরং, কেবল একজনের বেলায় ছাড়া, যাহাদের গবেষণার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাদিগকেই তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ডক্টর গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "Hellenism in Ancient India" এবং "India as Known to the Ancient World" বহি দুখানিতে যে পূর্ব্বতন বহু গ্রন্থ হইতে অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ ঋণ-স্বীকার না করিয়া হুবহু নকল করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় ও ব্রিটিশ কাগজে প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও একটিকে "valuable and erudite work" এবং অন্য-টিকে "illuminating and interesting book" বলা হইয়াছে। উভয় গ্রন্থই যে "plagiarism"পূর্ণ, তাহা এই প্রকারে চাপা দেওয়া হইয়াছে, এবং গ্রন্থকারের পদোন্নতি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে কোটি কোটি টাকা

অপব্যয় হয়, তাহা অমার্জ্জনীয়। কিন্তু টাকার অপব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর জিনিষ নহে। যাহা বিদ্যা-মন্দির এবং যেখানে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হইবে, তাহার বিশুদ্ধতা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষিত হওয়া উচিত। তাহা রক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য অনেকে যাহাকে চিন্তাহীনভাবে সামান্য ব্যাপার মনে করিতে পারেন, তাহাও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগোচর হওয়া আবশ্যক। ঝুড়ি ঝুড়ি পাস্ এবং রাশি রাশি গবেষণা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়, তাহা হইলেও তাহা দ্বারা চারিত্রিক অধোগতির, দূষিত নৈতিক হাওয়ার, চরিত্রহীনতার প্রশ্রয়-প্রাপ্তির প্রতিকার হইতে পারে না। টাকার অপব্যয়ে, আশ্রিত কুটুম্ব, বা তোষামোদকারীদিগকে দুই-চারিটা চাকরী প্রদানে এবং সহজ পরীক্ষা দ্বারা অনেক ছাত্র পাস্ করায় অনিষ্ট হইলেও তত অনিষ্ট হয় না, যত অনিষ্ট হয় অনুগ্রহ বা তদ্বির দ্বারা পরীক্ষার বিশুদ্ধতা নাশে, কোন কোন অধ্যাপকের কাজে অবহেলা করায় বা সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়াতে, সাহিত্যিক চুরি ও তোষামোদ-কারিতায়।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘরাও বন্দোবস্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্বের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আগে আগে সেরূপ দৃষ্টান্ত কিছু দিয়াছি। এখন আর একটি দিতেছি। বিদেশে ছাত্র পাঠাইবার জন্য গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি আছে। কিরূপ ছাত্রেরা এই বৃত্তি পাইতে পারে, তাহা ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত নিয়ম হইতে বুঝা যাইবে।

If an applicant has not already passed the Intermediate Examination in Science of this University or the final examination of a recognised School of Arts or Technical or Agricultural College, he must produce with his application proof that he has attained a knowledge of English and Mathematics up to the standard of the Matriculation Examination and of Physics and Chemistry up to the standard of the Intermediate Examination in Science."

অর্থাৎ, প্রার্থীরা যদি আর্ট স্কুল বা কৃষি কলেজ বা টেক্নিক্যাল কলেজের পাস্ করা ছাত্র না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া দরকার, এবং তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, তাঁহারা বিজ্ঞানে ইণ্টার্মীডিয়েট্ পাস করিয়াছেন বা তত্তুল্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা মুদ্রিত বর্ণনা-পত্র হইতে দুজন প্রার্থীর যোগ্যতার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কাহার নাম দিব না। প্রথমে বৃত্তিপ্রাপ্ত একজনের যোগ্যতার বিষয় উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Passed the Matriculation Examination in 1912 in the First Division from Hare School; obtained a Second Grade Scholarship and stood first in that grade.

2. Passed the I.Sc. Examination in 1914 from the Presidency College with Mathematics, Physics and Chemistry as his optional subjects. Stood *ninth* in order of merit and first in Physics and obtained the *Duff Scholarship* and *Saradaprasad prize* in the subject.

3. Passed the I.A. Examination in History in 1915 as a non-collegiate student and obtained 140 marks out of 200.

4. Passed the B.A. Examination in 1916 from the Presidency College with *First Class Honours* in Economics.

5. Passed the M.A. Examination in 1918 in Economics, Group B, stood *First* in the *First Class* and obtained the University Gold Medal and Prize in the subject.

6. Has been serving as a Professor of Economics in the Scottish Churches College since November, 1918.

ইনি বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে বৃত্তিটির দাবী করেন,

কারণ, ইনি আর্টস্কুলের বা কৃষি বা টেক্নিক্যাল কলেজের ছাত্র নহেন। কিন্তু ইনি বিজ্ঞানে ইণ্টারমীডিয়েট্ পাস্ করার পর বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ছাত্র হিসাবে ইঁহার দাবী ও যোগ্যতা সমুদয় বি-এস্‌সী ও এম্-এস্‌সী পাস্ করা প্রার্থীদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। অথচ ইনি বৃত্তি পাইলেন, কিন্তু প্রার্থী অনেক বি-এস্‌সী, এম্-এস্‌সী পাইলেন না। তন্মধ্যে, না বাছিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনাপত্রের গোড়াতেই যে প্রার্থীর নাম আছে, তাঁহার যোগ্যতার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> Passed Matriculation in the 1st Division (1910).
> Passed I.Sc. (1912) standing 5th and obtained a Govt. Scholarship, a Duff Scholarship and an S. C. College Scholarship.
> Passed B.Sc (1914) with Honours in Physics.
> Passed M.Sc. in Physics (1916) standing 2nd in Class I and was awarded the University Silver Medal in Physics and a prize of books worth Rs. 100.
>
> Was awarded a Sir R. B. Ghose Research Scholarship and worked for 2 years in the University College of Science. At present employed as a Lecturer and Demonstrator in Physics in the S. C. College.

এখন, বৈজ্ঞানিক প্রার্থী হিসাবে যোগ্যতর কে ছিলেন, তাহা সহজেই স্থির করা যাইবে। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস্ হইতে যোগ্যতা ঠিক বুঝা যায় না, প্রতিষ্ঠিত লোকদের সাক্ষাৎ পরিচয়-লব্ধ জ্ঞান হইতে বুঝা যায়। অতএব, এরূপ লোকদের সার্টিফিকেটও বিবেচিত হউক। যিনি বৈজ্ঞানিক প্রার্থী হিসাবে বৃত্তি পাইলেন, তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, রেভারেণ্ড্ ওয়াট্, রেভারেণ্ড কিড্, অধ্যাপক ব্যারো, অধ্যাপক কয়াজী, অধ্যাপক জাকারিয়া, অধ্যাপক গিল্‌ক্রিষ্ট এবং অধ্যাপক ষ্টার্লিং। রেভারেণ্ড্ ওয়াট্ ছাড়া ইঁহারা কেহই বৈজ্ঞানিক নহেন ও কাহারও বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে অধিকারী নহেন। যিনি বৃত্তি পান নাই, তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, অধ্যাপক ও রেজিষ্ট্রার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক পীক্, রেভারেণ্ড ওয়াট, অধ্যাপক এস্ সি মহলানবীস, অধ্যাপক এস্ এন্ মৈত্র, অধ্যাপক পী মহলানবীস্, এবং অধ্যাপক এন্ সী রায়। ইঁহারা সকলেই বৈজ্ঞানিক।

পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, যে, যিনি বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহার যোগ্যতার প্রত্যেক দফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনাপত্রে আলাদা আলাদা নম্বর দিয়া ছাপা হইয়াছে, এবং যাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহা বাঁকা ইটালিক অক্ষরে ছাপা হইয়াছে;—উদ্দেশ্য; যাহাতে এইগুলি সহজেই নির্ব্বাচকদের চোখে পড়ে। এই প্রার্থীটির যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ কর্ম্মচারীর আদেশে এবং কেন এরূপ করিয়া ছাপা হইল? আর কাহারও যোগ্যতার বর্ণনা ত বর্ণনাপত্রে এমন করিয়া ছাপা হয় নাই?

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থপ্রাপ্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২২ সালের জুন পর্য্যন্ত ৫॥০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী ২॥০ লক্ষ মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রকারে অঋণী হইবে বুঝা গেল না। তবে, এরূপ শুনা গিয়াছিল বটে, যে, আসল ঘাটতি ৫॥০ লাখ নহে, বেশী টাকা পাইবার আশায় তাহাকে ফাঁপাইয়া ৫॥০ করা হইয়াছিল; কারণ, ষোল আনা চাহিলে আট আনা পাইবার আশা থাকে।

যাহা হউক, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা যদি এমন কোন প্রমাণ পাইয়া থাকেন, যে, এই ২॥০ লাখের দ্বারা সকল ঋণ শোধ হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অপব্যয় নিবন্ধন আবার ঋণ না হয় তদনুরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইলে আড়াই লাখ টাকা মঞ্জুরে তাঁহারা সম্মত হইয়া ভালই করিয়াছেন। ঐরূপ কোন প্রমাণ আমরা এখনও দেখি নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলাম না।

ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যেরাও ঐরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া স্পষ্ট ধারণা জন্মিতেছে না। বরং এইরূপই মনে হয়, যে, তাঁহারা কেহ কেহ যেন মনে করিয়াছিলেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয় গর্ব্বোদ্ধত, অতএব তাহার দর্প চূর্ণ করা উচিত; এবং এক্ষণে তাহার মাথাটা নীচু হওয়ায় তাঁহারা খুসি হইয়া দয়া করিয়া কিছু টাকা দিতেছেন। এরূপ মনোভাবের প্রেরণায় টাকা মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর কিছুই করা উচিত নয়। টাকার অমিতব্যয় বা অসদ্ব্যয় না হইয়া মিতব্যয় ও সদ্ব্যয় হইবে, এইরূপ প্রমাণ লইয়া ও পাইয়া টাকা মঞ্জুর করা উচিত, এবং তাহা না পাইলে মঞ্জুর করা উচিত নয়, সকল বিষয়ে এই নিয়ম অনুসরণীয়।

পূর্ব্বে যে 'মনোভাবের কথা বলিয়াছি, সকল সভ্যের তাহা ছিল বলিয়া মনে হয় না। দুখানা দৈনিক কাগজ হইতে কাহারও কাহারও কথা উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয় অনেক বক্তৃতা একেবারে বাহির হয় নাই; কয়েকটি অত্যন্ত সংক্ষেপে রিপোর্ট করা হইয়াছে।

Babu Rishindra Nath Sarkar submitted a motion proposing to refuse the grant to the University. In view of the charges of bad administration which had been brought against the University, he declared, the Council were not justified in approving a grant of Rs. 2,50,000 without inquiring into the reasonableness of the demand.

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, বাবু ঋষীন্দ্রনাথ সরকারের মনের ভাব এরূপ ছিল না। রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর বলেন :—

It would have been gracious for Government to form a committee to make an enquiry as to the financial condition of the University. But that was not done and the House felt this as an insult to it. Further, the question arose what guarantee was there that future liabilities would not be again incurred.

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের কথায় মনে হয়, যে, কাহারো কাহারো মনের ভাব পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ ছিল। যথা—

Dr. Jatindra Nath Moitra said it seemed to be the desire of some of the members of the Council to see the Vice-Chancellor of the University, who had been referred to as the "autocrat of autocrats", humbled down at their feet.

ইহার আভাস কাহারো কাহারো কথায় পাওয়া যায়। যথা,—

Babu Kishori Mohan Chaudhuri said that since the University authorities had come down and were willing to submit accounts they should also reconsider the situation.

Mr. S. N. Mullick said there was much in the present activities of the Calcutta University, which he deplored. He was sorry Mr. Haq raised a question which he ought not to have raised. The University had come down and it was time that they should show that they were relenting. He was sorry to see his dear *alma mater* in the hands of people who did not know how to conduct the University. He would support the grant on the condition that the University behaved better in future and that the Minister would take steps towards its democratisation.

অভিধানে দেখিলাম, to come downএর মানে to be humbled or abased। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এই অবস্থা হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যেরা পাইয়া থাকিবেন।

শিক্ষামন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে কাজ হইলে ভবিষ্যতে সুফল ফলিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন :—

The University has also informed the Government that it is willing to place financial information before the Government. This decision was first arrived at by the Syndicate and was then confirmed by the Senate. Further, the auditing of the accounts of the University up to June, 1921, is, I understand, almost ready for submission to the Government, and I am informed by the Accountant-General that the audit officers propose to make certain suggestions about the current year's accounts as well. This information will, I hope, satisfy the Council that the Government very shortly will be in possession of valuable materials—the audit report and other suggestions of the Accountant-General, and also the views of the Senate—to deal with the matter.

Mr. Mitter concluded by once again assuring the Council that when the views of the University and the audit reports and notes were before him, he would stand by every word that he had uttered in the Council in this connection.

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সংস্থিতি

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলিয়াছেন, যে, দুটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আছে; তাহার একটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থিতি (constitution) পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। শীতকালে এই আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে। আইন যাহাতে ভাল হয়, খসড়া প্রকাশের পর সে চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। কিন্তু ভাল আইন হইলেই আপনা হইতেই সুফল ফলিবে ও অকল্যাণ নিবারিত হইবে, এরূপ আশা কেহ করিবেন না। শিক্ষাদান কার্য্য যাঁহারা বুঝেন কিম্বা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন, বুদ্ধিমান্, কর্ম্মিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ, নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির এরূপ লোক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য খাটিতে রাজী হইলে সুফল ফলিবে। বর্ত্তমান সময়েও, কেবল চালাকী ও প্রসাদ-বিতরণ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ ক্ষমতাশালী হয় নাই। চিন্তা করিতে, খাটিতে, সময় দিতে হইয়াছে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ

শিক্ষামন্ত্রীর ১লা মার্চ্চের বক্তৃতায় দেখিতে পাই, যে, ১৯২০র জুনে যে বৎসর শেষ হয়, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের হাতে ৬৮৬২৩ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল এবং অন্যান্য বৎসরেও থোক্ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। অথচ এই কলেজ বৎসর বৎসর অনেক হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞান কলেজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন সুদৃষ্টি নাই। সেই জন্য শিক্ষামন্ত্রী বলিতেছেন, যে, তিনি আইন কলেজের জন্য বরাদ্দ বার্ষিক ৩০০০০ টাকা তাহাকে না দিয়া বিজ্ঞান কলেজকে দেওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিবেন।

আইন কলেজে অধ্যাপকের অভাব নাই। কিন্তু ইহাতে আইনজীবীদের কার্য্য-নির্ব্বাহের পক্ষে আবশ্যক সব রকম শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাহা দেওয়া উচিত। সলিসিটার এটর্নীদের কাজ ইহাতে না শিখাইবার কোন কারণ নাই। এলাহাবাদের আইন কলেজের মত ইহাতে অনন্যকর্ম্মা অধ্যাপক নিযুক্ত করা উচিত এবং ইহার অধ্যাপনার সময়ও অন্যান্য কলেজের মত করা কর্ত্তব্য।

—

বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

বাংলা দেশে পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রন্থকার বলিয়া, শিক্ষাদাতা বলিয়া, দয়ার সাগর বলিয়া, মানুষের মত মানুষ বলিয়া এবং বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত। ১৩ই শ্রাবণ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ দিন প্রতি বৎসর নানাস্থানে নানা সভায় তাঁহার গুণকীর্ত্তন করা হয়। কিন্তু অনেক বক্তা বিধবাবিবাহের কথা একেবারে বাদ দেন, কোথাও বা সামান্যভাবে উহার উল্লেখ হয়। বিধবাবিবাহের প্রচলন বাংলাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে। অথচ মনুষ্যোচিত দয়াধর্ম্মের ও স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমান ন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থার অনুরোধে উহার প্রচলন আবশ্যক, সহস্র সহস্র নারীর ঐহিক পারত্রিক শারীরিক আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য উহার প্রচলন আবশ্যক, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত উহার প্রচলন আবশ্যক, এবং বঙ্গে হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস নিবারণের জন্য উহার প্রচলন আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন দ্বারা, বহু-বিবাহ নিবারণ দ্বারা, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার দ্বারা এবং আরো কোন কোন উপায়ে নারীজাতির হিতসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় যে বাঙালীরা বিধবা বিবাহের ন্যায্যতা ও একান্ত আবশ্যকতা বুঝিলেন না। কিন্তু যদি বাঙালী জাতি অন্য নানা উপায়ে নারী জাতির হিতসাধনে যত্নবান্ হন, তাহা হইলেও কিছু মঙ্গল হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন বিধবা ও অন্য দুরবস্থাপন্ন মহিলাদের শিক্ষা দ্বারা হিতসাধনের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভা যত জায়গায় যতগুলি হইবে, তথায় বিদ্যাসাগর বাণীভবনের জন্য অর্থসাহায্য সংগৃহীত এবং ১০৫ নং আপার সার্কুলার রোড ঠিকানায় সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়ার নামে

প্রেরিত হইলে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সার্থক হইবে। বাণীভবনের জন্ম বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। ছাত্রীও পাওয়া গিয়াছে। অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বঙ্গে শিক্ষার জন্য নূতন সরকারী সাহায্য

শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্ম নূতন করিয়া টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, বালিকাদের শিক্ষা; মুসলমানদের শিক্ষা; অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার; ব্যায়াম ও ক্রীড়াদি শিক্ষার দ্বারা দৈহিক উন্নতি; মফঃস্বলে বেসরকারী কলেজসমূহের কার্য্যক্ষেত্রের, বিশেষতঃ বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে, বিস্তার; বেআইনী দুষ্কার্য্য করিবার দিকে যাহাদের প্রবৃত্তি, এরূপ বালকবালিকাদের শিক্ষা; এই-সকলের জন্যও টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁহাদিগকে নবীন বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চিন্তা ভাব ও ভাষার সম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদেশী কবিতার অনুবাদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার অনুবাদগুলি মূল কবিতা বলিয়া মনে হয়। সকল প্রকার রস ও সকল প্রকার ভাবের চিন্তার ও ঘটনার অনুরূপ ছন্দের সৃষ্টি ও ব্যবহারে, এবং শব্দচয়ন ও শব্দবিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কবিতায় তাঁহার অনাড়ম্বর নির্ভীক মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্য রচনাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তিনি যত বড় কবি ছিলেন, মানুষ ছিলেন তাহা অপেক্ষাও বড়। শান্ত সংযত পৌরুষ তাঁহার প্রকৃতিতে নিহিত ছিল। যশের জন্ম ভীড় ঠেলিয়া জনতার সামনে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না; আত্মগোপন তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু যশ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি যে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা অল্প লোকেই জানিত। তাঁহার জাতি স্বাধীন হয়, মানুষের সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়, সোজা হইয়া মাথা উঁচু করিয়া

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মানব-সমাজে দাঁড়াইতে পারে, ইহা তাঁহার হৃদ্গত বাসনা ছিল। তাঁহার জীবিতকালে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। কিন্তু তাঁহার কবিতায় যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির সাহায্য হইবে।

তাঁহার প্রবল স্বাজাতিকতা তাঁহাকে সংকীর্ণমনা করে নাই; তাঁহার নানা দেশের কবিতার অনুবাদেই বুঝা যায়, যে, তিনি সকল দেশের লোকের সহিত কিরূপ আত্মীয়তা অনুভব করিতেন!

তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ মর্ম্মাহত হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্বদেশবাসীগণ ব্যথিত হইয়াছেন।

মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে তাঁর বাড়ীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের তোলা সত্যেন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থার শেষ ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত একটি ছবি আমরা এখানে মুদ্রিত করিলাম।

—

প্রবেশিকা পরীক্ষার ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয়

স্থির হইয়াছে, যে, অতঃপর প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষণীয় ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয় দেশভাষার সাহায্যে শিখিতে হইবে, এবং সেই-সকল বিষয়ে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর দেশভাষায় দিতে হইবে। ইংরেজীও একটি অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় থাকিবে।

এইরূপ পরিবর্ত্তন ভাল হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী খুব ভাল করিয়া শিখাইতে হইবে, তাহা শিখাইবার উৎকৃষ্টতম প্রণালী শিক্ষকদিগের শিখিতে হইবে। যে-সব জায়গায় ইংরেজী উচ্চারণ ও ইংরেজী কথোপকথন ভাল করিয়া শিখিবার অন্য উৎকৃষ্ট উপায় নাই, তথায় ফোনোগ্রাফ বা গ্রামোফোনের সাহায্যে তাহা শিখাইতে হইবে। ইহার উপযোগী রেকর্ড চেষ্টা করিলেই পাওয়া যাইবে। যে-সকল শ্রেণীতে ইংরেজী শিখান হইবে, তাহার প্রত্যেকটিতে ইংরেজী পড়া ও ইংরেজী বলার পরীক্ষা লইতে হইবে। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, যে, বাঙালী ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকদের চেয়ে অন্য অনেক প্রদেশের ছাত্র শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা অবাধে তাড়াতাড়ি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারে।

মাতৃভাষায় নানা বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টায় আপাততঃ অনেক অসুবিধা ও অনিষ্টও হইতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীই যখন স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত, তখন ইহার প্রবর্ত্তন করিয়া অসুবিধা ও অনিষ্ট পরিহার করিবার চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য। বাংলা পাঠ্যপুস্তক-সকলের বিষয়-বিন্যাস, লিখন-প্রণালী, ছাপা ও কাগজ, চিত্র, ম্যাপ্ প্রভৃতি ইংরেজী উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক সকলের মত করিতে হইবে। তা ছাড়া, যাহা লেখা হইবে, তাহা যেন সেকেলে না হইয়া, হালনাগাদ লব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী হয়, তাহা দেখিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ কেবল ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক-সমূহ দেখি। আমেরিকান্, ফ্রেঞ্চ ও জার্মেন্ পাঠ্যপুস্তক-সকলও আনাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। ফরাসী হইতে অনুবাদিত গ্যানোর পদার্থবিজ্ঞান ও ডেশানেলের পদার্থবিজ্ঞান আমরা অনেকে পড়িয়াছি। ঠিক্ ওরূপ বহি ইংরেজীতে ছিল না। নানা বিষয়ে বাংলা পাঠ্য-পুস্তক এখন চলিবে। স্বজনপোষণ, আশ্রিতপোষণ, উৎকোচের বিনিময়ে নিকৃষ্ট পুস্তক নির্ব্বাচন, প্রভৃতি কি প্রকারে নিবারণ করা যায়, এখন হইতে তাহার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

দৈনিক কাগজ-সকলে প্রবেশিকার অবশ্য-শিক্ষণীয় ও বৈকল্পিক বিষয়-সকলের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইতিহাস নাই। ইহা কি কাগজগুলির ভুল, না ইতিহাস সত্যসত্যই বাদ পড়িয়াছে? ভূগোল বাদ দিলে মানুষকে স্থান সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা কূপমণ্ডূক করা হয়, ইতিহাস বাদ দিলে মানুষকে কাল সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা ও কূপমণ্ডূক করা হয়। জাতীয় নৈরাশ্যের প্রধান প্রতিষেধক ও ঔষধ ইতিহাস। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আচরণ সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। অতীতের ভ্রম, কুপ্রথা, কুসংস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে সুপথে চলিতে হইলে ইতিহাস আমাদের প্রধান সহায়। মিথ্যা ইতিহাসের অনিষ্টকারিতা জানি, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত অনেক ইতিহাসের ভ্রম যে সংশোধন করা যাইবেই না, ইহা কেন মানিয়া লইব?

একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল, যে, প্রবেশিকাপরীক্ষার্থী-

ছিলকে এই সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে, যে, তাহারা নিয়মিতরূপ দৈহিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহা গৃহীত হয় নাই। কলিকাতার জন্য ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া মফঃস্বলের সকল স্কুলের জন্য এই নিয়ম এখন করিলে ভাল হইত। জানি, দেশের দারিদ্র্য নিবারণ দ্বারা পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া বিনাশ না করিলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের সম্যক্ উন্নতি হইবে না; কিন্তু নিয়মিত অঙ্গচালনের ব্যবস্থা থাকিলে কিছু উন্নতি হইত। এবং শরীর পটু হইলে মনের জোর ও সাহসও কিছু বাড়িত।

—

দমন নীতি

আইনভঙ্গ নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের একটি কাজ। এইজন্য দমননীতি অবলম্বন করা কখন কখন আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যে জাতির যে মানুষগুলির সমষ্টি, তাহাদের চরিত্র ও প্রয়োজন অনুসারে আইন ভাল হয়, মন্দও হয়। সুতরাং কোন কাজ আইনসঙ্গত হইলেই তাহা নির্দ্দোষ, এবং আইনবিরুদ্ধ হইলেই তাহা মন্দ হয় না। তথাপি খুব খারাপ আইন অনুসারেও যদি দমন ও দলন কার্য্য চলে, তাহা তত অনিষ্টকর ও ভীষণ হয় না, শাসকদের স্বেচ্ছাচারিত ও বেআইনী দলন ও দমন কার্য্য যত অনিষ্টকর ও ভীষণ হয়। কারণ আইন খুব খারাপ হইলেও তাহাতে শাস্তির প্রকার ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের প্রকার, মাত্রা, প্রণালী, পরিমাণ, কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই, থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে আইনসঙ্গত ও বেআইনী উভয় প্রকার দলন ও দমন কার্য্য চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক প্রকার দলন কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি। কংগ্রেসকে গবর্ণমেণ্ট কোন আইন দ্বারা বা অনুজ্ঞা দ্বারা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন নাই; এই হেতু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার সভ্যজগতের নিকট লেফাফাদুরুস্ত্ আছে। চরখা ও হাতের তাঁতের দ্বারা খদ্দর উৎপাদন, এবং তাহা বিক্রয় ও পরিধান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের আচরণের বহিরাবরণের শোভনতা রক্ষিত আছে। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা নানাস্থানে কংগ্রেস-কমিটির আফিস অন্বেষণ ও লণ্ডভণ্ড করিয়া, খদ্দর উৎপাদন প্রচলন আদি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত কাজের ব্যবস্থাপকদিগকে কোন-না-কোন অছিলায় দণ্ডিত করিয়া, কংগ্রেস-পক্ষের খবরের-কাগজওয়ালাদিগকে কোন-না-কোন প্রকারে দণ্ডিত করিয়া, এবং আরও কোন কোন উপায়ে কংগ্রেসকে ও উহার জাতিগঠনমূলক আইনসঙ্গত কার্য্যাবলীকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী শাসকদের রীতি অবস্থা-বিশেষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইরূপ হইয়া আসিতেছে বটে। দুঃখের বিষয়, রাজকর্ম্মচারীরা ইহার অনিষ্টকারিতা এবং পরিণামে ব্যর্থতা বুঝিতে পারেন নাই। তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, যে, আমাদের স্বদেশবাসী বহু রাজনৈতিকও ইহার প্রতিবাদ করেন না, এবং বহু দৈনিক কাগজও এ-সকলের সংবাদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করেন না।

দলন ও দমনের এই পথ বিপ্লব উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা সম্ভবতঃ কর্ত্তৃপক্ষের অগোচর নহে। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় ইহা জানিয়াও এই পথ এই কারণে পরিত্যাগ করেন নাই, যে, সশস্ত্র বিপ্লবের সামর্থ্য ও যথেষ্ট প্রবল প্রবৃত্তি ভারতবর্ষের নাই, এবং শাক্ত বিপ্লব-চেষ্টা তাঁহারা সহজেই দমন ও নিষ্ফল করিতে পারিবেন। আমাদেরও ধারণা সেইরূপ বটে। অধিকন্তু আমরা বিশ্বাস করি, যে, শাসকদের জাতির, শাসন-যন্ত্রের ও শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের নিরস্ত্র ও সাত্ত্বিক চেষ্টা ব্যর্থ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তত সহজ নয়। এইজন্য মনে করি, দেশের লোক এই পথে অটল থাকিলে সিদ্ধকাম হইবেন।

কিন্তু তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে কোন কোন জাতি শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা চিন্তায় কল্পনায় কথায় ও কাজে ত্যাগ করিতে হইবে। পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ ছাড়িতে হইবে, ইহাও সত্য। কিন্তু তাহারও আগে অবজ্ঞাকে ছাড়িতে হইবে। শত্রুতা মারামারি কাটাকাটি অপেক্ষাও অবজ্ঞা মর্ম্মে-মর্ম্মে বেশী বিঁধে। শত্রুতা মারামারি কাটাকাটি সমানে সমানে হয়, কিন্তু

যাহাকে অবজ্ঞা কর, তাহাকে যে মানুষ বলিয়াই মনে কর না। এই ভাব অসহ্য।

আর এক প্রকারের জাতিভেদ রাজনৈতিক জাতিভেদ; তাহাও বর্জ্জন করিতে হইবে। সরল আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ অসহযোগী হইতে পারে, সহযোগী মডারেট্ও হইতে পারে, কিম্বা ঠিক্ কোন দলেরই না হইতে পারে। এই তিন প্রকার মানুষের দ্বারাই কোন-না-কোন রকমের লোকহিত হইতে পারে। দলের ছাপ্ দেখিয়া মানুষের বিচার করা উচিত নয়; আচরণ দেখিয়া বিচার করা উচিত। স্বার্থপর নীচাশয় তোষামোদকারী লোকেরা নিন্দার যোগ্য। অন্য সকলেরও কথার ও কাজের সমালোচনা অবশ্যই হইতে পারে ও হওয়া উচিত; কিন্তু দল বা দলবহির্ভূততা লক্ষ্য করিয়া কাহারও অবিচারিত নিন্দা অনুচিত।

মনে রাখিতে হইবে, অহিংসার মানে শুধু এ নয়, যে, আমরা অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা ইংরেজকে তাড়াইতে বা তাহার অনিষ্ট করিতে চাহিব না; অহিংসার অর্থ ইহাও বটে, যে, স্বদেশবাসী ও বিদেশী কাহারও প্রতি মনেও হিংসার ভাব পোষণ করিব না। এই আদর্শের অনুসরণ অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রকৃতিই এইরূপ, যে, মানুষ ক্রমে ক্রমে সাধনা দ্বারা অধিকতর পরিমাণে তাহাদের অনুগামী হয়।

—

"মুক্তধারা"র জার্ম্মেন সমালোচনা

ভারতবর্ষের বাহিরে কোন কোন দেশে "প্রবাসী"র গ্রাহক ও পাঠক আছে। বৈশাখ মাসের "প্রবাসী" এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে বিদেশে প্রেরিত হয়। উহা মে মাসে জার্ম্মেনী পৌঁছে। ২৬শে মে তারিখের বার্লিনের প্রধান সংবাদপত্র "Vossische Zeitung" নামক কাগজে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার হেল্মুথ ফন্ গ্লাসেনাপ্ "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "মুক্তধারা"র দীর্ঘ সমালোচনা করেন। তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক, বাংলা জানেন ও পড়েন। সুদূর বাংলাদেশের একখানা মাসিক কাগজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নাটক বাহির হইয়া তাহা জার্ম্মেনীতে পৌঁছিবার কয়েকদিন পরেই জার্ম্মেনীর একখানি প্রধান কাগজে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হওয়া একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি জার্ম্মেন জাতির জাতিবর্ণভাষানির্ব্বিশেষে বিশ্বসাহিত্যানুরাগেরও পরিচায়ক। অধ্যাপক গ্লাসেনাপের জার্ম্মেন সমালোচনার ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিউয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এখানে মূল জার্ম্মেন সমালোচনার প্রথম কয়েক পংক্তির ছোট ফোটোগ্রাফিক প্রতিলিপি মুদ্রিত করিতেছি।

Mukta-dhârâ.

Das neue Drama Rabindranath Tagores.

Von

Dr. Helmuth v. Glasenapp,

Privatdozent an der Universität Berlin

Ueber ein neues Werk des indischen Dichters, das bisher noch in keiner europäischen Sprache vorliegt unterrichtet unser als Tagore-Uebersetzer bekannter Mitarbeiter:

Die in Kalkutta erscheinende Monatsschrift „Prabâsi" (Der Wanderer) veröffentlicht in ihrer April-Mai-Nummer den bengalischen Originaltext eines neuen Dramas von Rabindranath Tagore. Das Stück führt den Namen „Muktadhârâ", d. h. der „Frei-Strom", nach der symbolischen Bezeichnung eines großen Wasserfalls, der im Mittelpunkt der Handlung steht und vor dem sich alle Szenen abspielen.

Die zugrundeliegende Fabel des Dramas ist kurz folgende: Vibhûti, der Baumeister des Königs Ranadschit von Uttarakût, hat nach fünfundzwanzigjähriger Arbeit eine große Stauanlage fertiggestellt, welche es ermöglicht, die Wasser der Mukta-Dhârâ aufzuhalten, so daß diese nicht nach dem Uttarakût tributpflichtigen aber oft aufsässigen Gebiete von Schiwatarai gelangen können. Der König hofft durch Vorenthaltung des Wassers die Bewohner von Schiwatarai in Zukunft zum Gehorsam zu zwingen. Die Inbetriebsetzung der Maschinerie soll durch eine Einweihungsfeier in dem in unmittelbarer Nähe des Wasserfalls gelegenen Schiwa-Tempel festlich begangen werden. Während die Mönche des Tempels einen Lobgesang zu Ehren ihres Gottes ertönen lassen, tauschen die ver-

"মুক্তধারা" পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

—

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে বাংলাদেশ একজন অনাড়ম্বর উদারপ্রকৃতি জ্ঞানী সেবকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি এডুকেশন গেজেট সম্পাদন করিতেন। এবং তাহাতে দলের বিচার না

করিয়া, উদারভাবে নানা পত্রিকা হইতে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেন। তিনি সাতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন এবং পিতার আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু আদর্শ যে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহে, তাহার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে দিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁহার কন্যা। তাঁহার যত্নে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

—

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর সংস্থিতিপত্র (constitution) ছাপা হইয়া রেজিষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহার কাজ আগে হইতেই চলিতেছিল। এখন সংস্থিতি অনুসারে চলিতে থাকিবে।

"জাতীয় শিক্ষা" কথা দুটি নানা জনে নানা অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু যিনি যে-অর্থেই করুন, সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে অন্ততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ না থাকিবে।

আমাদের দেশের বাবু লোকেরা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত ত নহেই। যাহারা চাস করিয়া কুলি-মজুরের কাজ করিয়া বা কোন প্রকার কারিগরী মিস্ত্রীগিরি করিয়া খায়, তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ও বিশ্বভারতীতে চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম্য জীবনের ও জীবিকার সহিত সম্পর্ক আছে। এখানে চাষ ও কয়েক প্রকার কারিগরীর কার্য্যগত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আষাঢ়ের "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা হইতে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুরুলে বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগে চর্ম্মশিল্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

"ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান্ কুলদাপ্রসাদ সেন এই বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী মৌদপুর গ্রামের তিনজন মুচীও বিশেষ আগ্রহের সহিত এক মাস শিক্ষালাভ করিয়া এই কাজে পাকা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষিবিভাগে বারোটি ছাত্র আছে। তাহাদের প্রত্যেককে নিজেদের স্বতন্ত্র জমি দেওয়া হইয়াছে। সেই জমি তাহারা নিজেদের হাতে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিনে বাদাম, বিলাতি বেগুন, বরবটি, ও মুলার বাঁচ লাগাইয়াছে।......ছুতারের কাজেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি ছাত্রেরা নুতন বৃষ্টি পাইয়া কয়েক দিন চাষের কাজে ব্যস্ত আছে। তাহাদের জমির কাজ একটু কমিলেই তাহারা অন্যান্য কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে।"

ছাত্রেরা পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল ও অন্যান্য সাধারণ লোকদিগকে লেখাপড়া ও অন্যান্য শিক্ষা দিয়া থাকে, এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষের লোকদের সাধনায় শ্রমে ও প্রতিভায় যে যে বিদ্যা ও যেরূপ সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোন শিক্ষা-প্রণালী জাতীয় হইতে পারে না। বিশ্বভারতীতে এরূপ যোগ আছে।

আমাদিগকে সমুদয় মানবজাতির সহিত যোগ রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে ও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। বিশ্বভারতীতে এই আদান-প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। ইহা এই প্রতিষ্ঠানের যেমন জাতীয় দিক্, তেমনি আন্তর্জাতিক দিক্ও বটে। ভারতবর্ষকে বাহির হইতে এখন বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান এবং তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়েও যে দৃষ্টি আছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

গ্রীষ্মকালে এখানে বড় জলাভাব হয় বলিয়া আশ্রমে দেড় শ' ফুট এবং সুরুলে প্রায় দু শ' ফুট মাটী মৃত্তিকাভেদন যন্ত্রের সাহায্যে খনন করা হইয়াছে। কিন্তু নীচে পাথরের মত শক্ত মাটী বলিয়া কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। খনন করিবার যন্ত্রটি দিবারাত্রি চালাইবার জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই অক্লান্তভাবে দিনরাত্রি কাজ করিয়াছিলেন।

নানা দেশের ও নানা ভাষার পুস্তক সংগ্রহ বিশ্ব-ভারতীতে যেমন হইতেছে, এমন ভারতের আর কোথাও হইতেছে কি না সন্দেহ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনাসাকী কয়েকখানি বহুমূল্য দুর্লভ চীনা ও জাপানী পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। সাংহাই হইতে আমরা সমগ্র চীন ত্রিপিটক (প্রায় চারশত গ্রন্থ) উপহার পাইয়াছি। ফরাসী দেশ হইতে বিশ্বভারতীর বন্ধুগণ বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক পাঠাইয়াছেন। জার্ম্মানীতে গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে যে-সব পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলিও হাম্বুর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতীতে জৈন সাহিত্য ও ধর্ম্ম আলোচনার জন্ম জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ বোথরা, কলিকাতার শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার ও তদীয় পুত্র শ্রীমান পৃথ্বী সিং এবং ভাওনগর, কাঠিবারের 'যশোবিজয় গ্রন্থমালার' প্রকাশক অনেকগুলি জৈন গ্রন্থ দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

তদুপরি অধ্যাপক সিল্‌ভাঁ লেভি, ডক্টর কুমারী ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ, অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্ প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাবেশ।

এখানে অন্যান্য স্কুল-কলেজের মত সাধারণ শিক্ষিতব্য বিষয়ও শিখান হয়। অধিকন্তু সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিখান হয়।

সংবাদ প্রকাশে বিপদ্

"অসমিয়া" কাগজে যে অত্যাচারের সংবাদ বাহির হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট্ তদন্ত না করিয়াই তৎসম্বন্ধে তদন্তের এই রিপোর্ট দেন যে উহা মিথ্যা। সুতরাং ঐ সংবাদ প্রকাশ অপরাধে যে ঐ কাগজের সম্পাদক অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

রুশিয়ার কে একজন লোক বলিল, যে, সে বহু লক্ষ টাকা ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য পাঠাইয়াছে, অমনি, মূল টেলিগ্রামে গান্ধীর নাম না থাকা সত্ত্বেও, অনেক এংলোইণ্ডিয়ান কাগজ লিখিল, যে, ঐ টাকা গান্ধী কিম্বা তাঁহার দলের লোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে কোন দোষ হইল না। কিন্তু ডেপুটী কমিশনার কিড্ মীটিং ভাঙ্গিতে গিয়া শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষকে প্রহার করিয়াছেন, অনুসন্ধানের পর সার্ভেণ্ট্ এইরূপ সংবাদ প্রকাশ করায় উহার সম্পাদক ও প্রিণ্টারের দণ্ড হইল। বিচারকের মতে সার্ভেণ্ট্ যথেষ্ট অনুসন্ধান করেন নাই ও সাবধান হন নাই। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও কোন কাগজ নিজের নিজের আদালত বসাইয়া উভয়পক্ষে উকীল লাগাইয়া অনেক দিন সপ্তাহ বা মাসের পর সংবাদ ছাপেন না। সকলে যাহা করে, সার্ভেণ্ট্ তাহা অপেক্ষা তাড়াতাড়ি করেন নাই বা অসাবধান হন নাই। কিডের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন বিদ্বেষও ছিল না। কিডের কথা যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে, বিচারকও স্বয়ং তাহা বলিয়াছেন। সার্ভেণ্টের শাস্তি ন্যায়সঙ্গত হয় নাই, এবং কিড্ যে-মানের হানি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রতিষ্ঠিত বা বৰ্দ্ধিত হয় নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

ব্যবস্থাপক সভার অনেকে বেতন চান। অনেক দেশে এরূপ রীতি আছে বটে। কিন্তু সে-সব স্বাধীন দেশ, তথায় প্রতিনিধিদের বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, এবং অনেক শ্রমজীবীও তথায় প্রতিনিধি হয়। বাংলা দেশ আগে ঐরূপ হউক, তখন বেতনের কথা উঠিবে। এখন জেদ করিলে আমরা মেকি পার্লেমেণ্টের মেকি প্রতিনিধিদিগকে আমাদের দেশের লোকদের গড়পড়তা আয়ের অনুপাতে অল্প কিছু বেতন মেকি টাকায় দিবার ব্যবস্থা করিতে বলিব। যেখানে মুখে ছিপি আঁটিয়া দিয়া হাত তুলাইয়া এতগুলা প্রস্তাবের ডিক্রী ডিস্‌মিস্ হয়, সেখানে এই গুরুতর কর্ত্তব্য করিবার জন্য বেতনের দাবী কেন করা হয়? উত্তর বোধ হয় এই, যে, কর্ত্তারাও ত বেশী কিছু না করিয়া বহুৎ টাকা পান, আমরা কিছু না পাইব কেন?

"সঞ্জীবনী"র ভ্রম

গত সপ্তাহের "সঞ্জীবনী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, "তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবাদ প্রবাসী-সম্পাদককে জানাইয়াছিলেন। প্রবাসীতে তৎসম্বন্ধে খুব প্রদাহকারী প্রবন্ধ প্রকাশিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের নিন্দা ঘোষিত হইয়াছিল।" ইহা মিথ্যা কথা। ইহাও সত্য নহে, যে, প্রবাসীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সম্বন্ধে "খুব প্রদাহকারী" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, বা হইয়াছিল। "খুব প্রদাহকারী" প্রবন্ধ প্রকাশ করা প্রবাসীর রীতি নহে। "প্রবাসী"তে প্রকাশিত কোন্ প্রবন্ধটিকে "সঞ্জীবনী" "খুব প্রদাহকারী" বলিয়াছেন, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করুন। "প্রদাহকারী" বলিতে আমরা "ইনফ্ল্যামেটরী" (inflammatory) বুঝিয়া থাকি। "সঞ্জীবনী" কি অর্থে ঐ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি। উক্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের "পদচ্যুতি" হইয়াছে, কিংবা তিনি আমাদিগকে কোন সংবাদ দিয়াছিলেন, ইহাও সত্য নহে।

জেলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার

রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত অনেক ব্যক্তির প্রতি

নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর ব্যবহারের যে-সব বৃত্তান্ত কাগজে বাহির হয়, তাহার তুলনায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ব্যবহার ভাল হইতেছে বলিতে হয়। কিন্তু উননের আগুনের চেয়ে তপ্ত খোলা ঠাণ্ডা বলিয়া বাস্তবিক উহা ঠাণ্ডা নয়। খবরের কাগজে সম্প্রতি এই খবর বাহির হইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধীকে খবরের কাগজ পড়িতে দেওয়া হয় না, এবং তাঁহাকে রাত্রে প্রদীপ দেওয়া হয় না। তাঁহার বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে। তাহার মানে এই যে, তাঁহাকে কেবল আটক করিয়া রাখা হইবে, যাহাতে তিনি বক্তৃতা, কথোপকথন বা লেখা দ্বারা দেশের লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন। তাঁহাকে কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক দণ্ড দিবার কথা নাই। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার শরীরের খোরাক দিতে যেমন বাধ্য, মনের খোরাক দিতেও তেমনি বাধ্য। জগতের সংবাদ না পাইলে সভ্য লোকদের মন ঠিক্ থাকিতে পারে না; বিশেষতঃ গান্ধীর মত লোকের। সুতরাং তাঁহাকে খবরের কাগজ দেওয়া উচিত। সেকালে অনেক দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের চোখ তুলিয়া ফেলা হইত। গান্ধীকে রাত্রে প্রদীপ না দেওয়ায় ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল্ রিফর্মারের সেই কথা মনে পড়িয়াছে। অন্ধ করিয়া দেওয়া ও প্রদীপ না দেওয়া এক জিনিষ নহে, কিন্তু প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্ম উভয়ের ফল কতকটা এক রকম হয় বটে।

শহরের চাকর-চাকরানী

কলিকাতার মত বড় শহরের হাজার হাজার চাকর বামুন চাকরানী বাম্‌নীর নৈতিক অবস্থা কাহারো অবিদিত নাই। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে যে ইহাদের প্রভূত মঙ্গল হয়, সমাজের হাওয়া পবিত্রতর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ ঘটিতেছে, কিন্তু বৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে যে উদ্যম সাহস ও লোক-হিতৈষণার প্রয়োজন, বঙ্গে তাহা নাই।

হস্‌রৎ মোহানী

'বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে স্থির হইয়াছে যে মৌলানা হস্‌রৎ মোহানী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কাহাকেও উত্তেজিত বা উৎসাহিত করেন নাই। সত্য ও ন্যায়ের জয় হইয়াছে, সুখের বিষয়।

কলিকাতায় খানাতল্লাসী

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কয়েকটি খবরের কাগজের আফিস্ ও বহির দোকানে পুলিস খানাতল্লাসী করিয়া কিছু পায় নাই। সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসী ভারতীয়দের কোন কোন পুস্তিকা ও কাগজ বিদেশ হইতে এদেশে ডাকে আসিয়া থাকে। পুলিস্ তাহার খোঁজ করিতেছিল। মজা মন্দ নয়। খবরের কাগজ-ওয়ালারা ও পুস্তকবিক্রেতারা এসব জিনিষ অর্ডার দিয়া আম্‌দানী করে না, তাহাদের নিজের জাহাজে ও রেলে ও নিজের ডাক বিভাগ দ্বারা এগুলি আসে না। গবর্ণমেণ্ট না জানিয়া এগুলি বহন করিয়া আনাইয়া বিতরণ করেন, এবং তাহার পর আবার খানাতল্লাসীও করিতেছেন। গোয়েন্দারা লোকের ঘরে গোপনে আফিং রাখিয়া দিয়া তাহার খানাতল্লাসী করায়। ইহা তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া করে। পুলিস্ অবশ্য ঐ বিদেশী কাগজ-সকল ইচ্ছা করিয়া কাহারো ঘরে ফেলিয়া দেয় না; কিন্তু সেগুলি আসে ত সর্‌কারী ডাক বিভাগের মার্‌ফতেই? আসাটাই বন্ধ কর না কেন?

বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

মিস্ জেনো ও মিস্ রাইট্ বেথুন কলেজের কাজ ভাল করিয়া চালাইতে পারেন নাই। মিস্ রাইট্ চলিয়া যাইবেন, শোনা যাইতেছে। তিনি গেলে যোগ্যতম বাঙালী মহিলাকে এই কাজ দিয়া শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঠিক্ কাজ হয়।

মুক্তধারা

(জার্ম্মান সমালোচনা)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নবতম নাটক মুক্তধারার একটি সমালোচনা জার্ম্মানীর সদর শহর বার্লিন হইতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'ফোসিশ্ ট্সাইটুং'এর ১৯২২ সালের ২৬ মে তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমালোচনাটি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বাভাষ রূপে সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন—

"বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর জার্ম্মান অনুবাদক বলিয়া বিখ্যাত ডক্টর হেলমুট ফন্ গ্লাসেনাপ্ আমাদের পত্রিকার লেখক। তিনি আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে ভারত-কবির একটি নূতন নাটক প্রকাশিত হইয়াছে যাহা এ পর্য্যন্ত কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। তিনি সেই নাটক সম্বন্ধে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নাটক

"কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্র প্রবাসী (অর্থাৎ বিদেশবাসী) তার এপ্রেল (বৈশাখ) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত মূল বাংলা একখানি নূতন নাটক প্রকাশ করিয়াছে।

"নাটকখানির নাম মুক্তধারা—অর্থাৎ বাধাহীন স্রোত, —ইহা একটি বড় ঝরণার রূপক নাম; সেই ঝরণাটিই নাটকের ঘটনার কেন্দ্র এবং উহারই চারিদিকেই নাটকের সকল দৃশ্য সন্নিবেশিত।

"কবির নাটকের ভিত্তীভূত গল্পটি এই—

"উত্তরকূটের রাজা রণজিতের ইঞ্জিনিয়ার (যন্ত্ররাজ) বিভূতি ২৫ বৎসর চেষ্টার পর মুক্তধারার জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া একটি বাঁধ বাঁধিয়াছে, তাতে নাবাল দেশ শিবতরাইএর জলের যোগান্ বন্ধ হইয়াছে। শিবতরাইএর লোকেরা উত্তরকূটের অধীন, কিন্তু প্রায়ই তাহারা বিদ্রোহী ও অবশীভূত হইয়া উঠে।

"রাজা রণজিত আশা করিতেছেন যে মুক্তধারার জলস্রোত রুদ্ধ করিয়া তিনি শিবতরাইএর লোকদের বশে রাখিতে পারিবেন। মুক্তধারার বাঁধ সম্পূর্ণ হওয়ার উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মুক্তধারার সন্নিহিত ভৈরব-মন্দিরে সেইদিন এক মহৎ উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

"ভৈরব-মন্দিরের পূজারী ভৈরবপন্থী সন্ন্যাসীরা যখন তাদের ইষ্টদেবতা শিবের স্তোত্র গান করিয়া বেড়াইতেছে, তখন বিভিন্ন পাত্র পাত্রী রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া যন্ত্ররাজ বিভূতির ও তার যন্ত্র সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

"কেউ কেউ তাকে মহৎ প্রতিভাশালী স্থির করিয়া প্রশংসা করিতেছে এবং তার যন্ত্রের মহিমা গান করিতেছে। অন্যেরা আবার তাকে তুচ্ছ করিতে চেষ্টিত, এবং বাঁধ বাঁধিতে যে কত লোক প্রাণ দিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া ক্ষুব্ধ। রাজবাড়ীর কেউ কেউ বিভূতিকে শিবতরাইএর লোকদের সর্ব্বনাশ করিয়া মুক্তধারা একেবারে রুদ্ধ করা হইতে বিরত করিতে চেষ্টিত। কিন্তু এদের চেষ্টা তেমনি বিফল হইল, যেমন নিষ্ফল হইয়াছিল রাজার কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে আগত শিবতরাইএর লোকদের আবেদন।

"কিন্তু রাজা সবচেয়ে বড় বাধা পাইলেন যুবরাজ অভিজিৎ হইতে। এই কুমার বিশ্বমানবের বিচক্ষণ বন্ধু। তিনি এই কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না যে উত্তরকূট রাজ্যের রাষ্ট্রনীতির কাছে শিবতরাইএর সকল প্রজাকে বলি দেওয়া যাইতে পারে।

"যুবরাজ অভিজিৎকে তাঁর পিতা রাজা রণজিত এই অধীন দেশ শিবতরাইএর শাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অভিজিৎ যখন বিজেতা রাজার প্রতিনিধি রূপে সে দেশে ছিলেন, তখন তিনি স্বদেশবাসীর স্বার্থ অপেক্ষা সেই দেশবাসীর হিতসাধনেই অধিক চেষ্টিত ছিলেন। এজন্য নন্দীসঙ্কটের অবরুদ্ধ পথ খুলিয়া দিয়া তিনি বাণিজ্য চলাচলের সুবিধা করিয়া দেন। এই পরাধীন দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্যের তাহাতে সুবিধা হইয়াছিল যথেষ্ট, কিন্তু বিজেতা উত্তরকূটের তাতে পরধন অপহরণে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল।

"অভিজিৎ যন্ত্ররাজের যন্ত্র ভগ্ন করিবার জন্য যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন তার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র মানবহিত নয়, তার মধ্যে আধ্যাত্মিক কিছুও ছিল। যুবরাজ অকস্মাৎ জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি বাস্তবিক রাজা রণজিতের পুত্র নন; রাজা তাঁকে মুক্তধারার নিকট সদ্যোজাত শিশু অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া পালন করিয়াছেন, কারণ রাজা এই শিশুর অঙ্গে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ ও চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

"যুবরাজ এই সংবাদ জানার পর অনুভব করিতে লাগিলেন তিনি যেন অবাধ ব্যগ্রগতি মুক্তধারার সন্তান। সেই জলধারা তাঁকে মুগ্ধ আকৃষ্ট করিল। সেই জলধারা ও নিজের মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্কের টান তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। সুতরাং মুক্ত-ধারার প্রাণ ও স্রোতগতি যেন তাঁর নিজেরই জীবনধারা বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। এবং সেই মুক্তধারার অবাধ জলস্রোতের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বমানবের উপভোগ্য করিয়া রাখাই তাঁর পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

"রাজা রণজিতের আদেশে যুবরাজ বন্দী হইলেন; রাজা মনে করিয়াছেন যে শাস্তির ভয়ে অভিজিতের স্বভাব সংশোধিত হইবে। এদিকে উত্তরকূটের জনসঙ্ঘ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; যুবরাজ অভিজিৎ শিবতরাইএর লোকদের পক্ষ হইয়া স্বদেশের বিপক্ষতা আচরণ করিতেছেন বলিয়া কেউ কেউ তাঁকে শাস্তি দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে; কেউ কেউ তাঁকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক।

অবশেষে বন্দীশিবিরে আগুন লাগাইয়া কুমার অভিজিতের মুক্তির সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। মুক্তি পাইয়া কুমার নিজের সঙ্কল্পিত কর্ত্তব্য পালনের জন্য যাত্রা করিলেন।

"তিনি গোপনে বাঁধের উপর যন্ত্রকে আঘাত করিয়া রুদ্ধ জলধারা মুক্ত করিয়া দিলেন; মুক্তিপ্রাপ্ত জলধারা বেগে প্রবাহিত হইয়া যন্ত্রকে ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল। যুবরাজও তাঁর এই বীরব্রতের উদ্‌যাপনে মৃত্যু লাভ করিলেন—তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। রুদ্ধ জলধারা মুক্ত করিয়া তিনি নিজের মুক্তি লাভ-করিলেন, তিনি আপনার জননী মুক্তধারার কোলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

"যুবরাজ অভিজিতের শোচনীয় পরিণাম সমস্ত নাটকটির রূপক বুঝিবার চাবি। মানবের প্রগতি ও উন্নতি তখনই সম্ভব যখন মানুষ সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে পারে, যখন মানবসমাজের নেতৃস্থানীয় অসামান্য লোকেরা বৈষয়িকতা বর্জ্জন করিয়া নিজেদের আদর্শের জন্য প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করেন না। এই নাটকটির মধ্যে কয়েকটি ঘটনাতেই একটি সঙ্কীর্ণ পরপীড়ক ক্ষণিকসুখকর স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ও মানবভ্রাতৃত্বের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

"যথা, সুলভ স্বাদেশিকতার প্রতিভূ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে এক গুরুমশায় ও তার ছাত্রদল। গুরুমশায় তার পোড়োদের এক বিকট বাগাড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রশস্তি মুখস্থ করাইয়াছে, উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া লওয়া। সে ছাত্রদের মনে শিবতরাইএর লোকদের সম্বন্ধে একটা ঘৃণার ও বিরাগের ভাব সঞ্চার করাইয়াছে, কারণ,—'ওদের ধর্ম্ম খুব খারাপ' এবং মানবসমাজের উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত উত্তরকূটের লোকদের মতন তাদের নাক উঁচু নয়। অতএব তারা নিশ্চয়ই 'খুব খারাপ।' অতি আগ্রহের বশে গুরুমশায় ছাত্রদিগকে শিখাইয়াছে যে জগতের সকল ইতিহাসের উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত জগতে উত্তরকূটরাজবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সে ইহাও বুঝাইয়াছে যে রাজা রণজিতের রাজবংশের নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অন্যের উপর অত্যাচার করার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে এবং উহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

"এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। তাঁর শিক্ষা তেমন সফলও হয় নাই, লোকে ভালো করিয়া বুঝেও নাই; কিন্তু তিনি ইহাই বুঝাইতে চেষ্টিত যে অশুভ অকল্যাণ সহ্য করিয়াই প্রতিকার করিতে হইবে যাহাতে তাহা আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়; অশুভের প্রতিরোধে অশুভ অনুষ্ঠানে, অত্যাচারের প্রতিরোধে অত্যাচারে নূতন নূতন অকল্যাণেরই সৃষ্টি হইতে থাকে।

"ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় নেতা সম্প্রতি-বন্দী মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু কবি নিজে একটি টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র ও তাঁর উক্তি কবির ১৫ বৎসরের পুরাতন নাটক প্রায়শ্চিত্ত হইতে পুনর্গৃহীত।

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন নাটকখানি এইরূপ গভীর-ভাব-দ্যোতক ঘটনায় ও আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতে পূর্ণ ঐশ্বর্য্য-শালী। নাটকের পাত্রপাত্রীদের গদ্য কথার মধ্যে কবিত্বময় পদ্যচ্ছন্দের গানও ছড়ানো আছে।

"ভারতীয় জীবনের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় মুক্তধারা নাটক ভারতে সুস্পষ্ট আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হইবে নিশ্চয়। রঙ্গমঞ্চে এর সফলতা কতদূর হইবে তাহা কেবল অনাগত ভবিষ্যৎই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে।"

চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপটে দশমহাবিদ্যার কমলা-মূর্ত্তি।

মুখপাতের "রহস্যময়ী প্রকৃতি" ছবিটিতে চিত্রকর এই বোঝাতে চেয়েছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির অর্দ্ধেক গুপ্ত অর্দ্ধেক সুপ্রকাশ। এই চিত্রটি অবলম্বন করে', কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথ একটি কবিতা রচনা করেছেন চিত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করবার জন্যে; সেই কবিতাটি এই মাসের প্রবাসীতে ৫৩৫ পৃষ্ঠায় "আসা-যাওয়ার মাঝখানে" নামে ছাপা হয়েছে।

"প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে" ছবিটিতে ভারতের একটি প্রথা অঙ্কিত হয়েছে। মেয়েরা সম্বৎসরের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্যে নদীতে সমুদ্রে পুকুরে জলন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে দ্যায়—সেই প্রদীপ যদি ডুবে' বা নিবে না গিয়ে ভেসে চলে তবে শুভ সূচিত হয়।

চারু

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নন্দোৎসব

চিত্রকর—আচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি-লিট. সি-আই-ই

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২৯

৫ম সংখ্যা

ভাসে

(গান)

জলে-ডোবা চিকণ শ্যামল
কচি ধানের পাশে পাশে,
ভরা নদীর ধারে ধারে
হাঁসগুলি আজ সারে সারে
দুলে দুলে ঐ যে ভাসে।

অম্‌নি করেই বনের শিরে
মৃদু হাওয়ায় ধীরে ধীরে
দিক্-রেখাটির তীরে তীরে
মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে॥

অম্‌নি করেই অলস মনে
একলা আমার তরীর কোণে
মনের কথা সারা সকাল
যায় ভেসে আজ অকারণে।

অম্‌নি করেই কেন জানি
দূর মাধুরীর আভাস আনি'
ভাসে কাহার ছায়াখানি
আমার বুকের দীর্ঘশ্বাসে॥

৩১ আষাঢ়, আত্রাই নদী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোপন-বাসী

(গান)

কান পেতে রই আমার আপন
আঁধার হৃদয়-গহন-দ্বারে,
গোপন-বাসীর কান্না-হাসির
গোপন কথা শুনিবারে॥

ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী
কোন্ নিভৃত পদ্ম লাগি',
রাতের পাখী গায় একাকী
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে॥

কে যে সে মোর কেই বা জানে,
কভু তাহার দেখি আভা,
কিছু বা পাই অনুমানে,
কিছু তাহার বুঝি না বা।

মাঝে মাঝে তার বারতা
আমার ভাষায় পায় কি কথা?
ও সে যে জানি পাঠায় বাণী
গানের তানে লুকিয়ে তারে॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন

১। বাঙ্গলার বিশেষত্ব

মুসলমান যুগে বঙ্গদেশ কয়েকটি কারণে নিজের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল,—তাহার মধ্যে ভাষা ধর্ম্ম ও জমিদার এই তিনটি প্রধান। বাঙ্গলার বাতাস ভেজা ও গরম, জমি অসংখ্য নদী-খাল-নালায় কাটা, গম ও বুট জন্মে না, লোকে উর্দ্দু, এমনকি হিন্দী পর্য্যন্ত বলে না। সুতরাং উত্তর-ভারতের ভদ্রশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সকলেই বাঙ্গলায় কাজ করিতে নারাজ ছিলেন। তাঁহারা এই প্রদেশকে "রুটীপূর্ণ নরক" বলিতেন; রাজকর্ম্মচারীদের অনেক সময় শাস্তির জন্য এখানে পাঠান হইত এবং তাঁহারাও শীঘ্র বদলি হইবার জন্য বাদশাহের দরবারে সুপারিশ খুঁজিতেন। ভারত-বাহিরের ভদ্র মুসলমান এখানে পুরুষানুক্রমে বসতি করিতে চাহিতেন না। কয়েকজন মাত্র জমিদারী পাইয়া এখানে আবদ্ধ হইয়া যান।

সুতরাং উর্দ্দুভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতীয় মুসলমান-সভ্যতার কেন্দ্র বাঙ্গলায় স্থাপিত হইতে পারে নাই। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, তাহাই ভাবের আদান-প্রদানের, মানসিক আমোদ ও শিক্ষার, সামাজিক মিলনের, উপাদান ছিল। তাহার পাশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উর্দ্দু সাহিত্য, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যেও, গড়িয়া উঠে নাই।

আর, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানের পর চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতিক্রান্ত সমস্ত প্রদেশকে, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে এক করিল। শাক্তও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই দুই ধর্ম্ম পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিত, ইচ্ছামত এক ভাই শাক্ত আর-এক ভাই বৈষ্ণব হইতেন। কোটি কোটি বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ তিনশতাব্দীতে (১২০০-১৫০০) মুসলমান হইয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত পুরোহিতের অভাবে এবং বাহিরের মুসলমান জগতের সহিত কম সংস্রব থাকায় তাহারা ইসলামের প্রাথমিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, তাহারা আরবী ও ফারসী জানিত না বলিলেই হয়; তাহাদের পুরোহিতগণের দশাও প্রায় সেইমত,—কুরান ও হদিস্ পড়িবার ও ব্যাখ্যা করিবার মত জ্ঞান ছিল মাত্র। সুতরাং ঐ দুই গ্রন্থ ভিন্ন পশ্চিম-ভারতের ও আরব পারস্যের বিরাট মুসলমান ধর্ম্ম-সাহিত্য তাঁহাদের অপঠিত অজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, নানা কারণে ইংরেজ যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গলা হইতে অতি কম যাত্রী মক্কায় যাইত এবং মক্কা হইতে কম শিক্ষক ও সাধু বঙ্গদেশে আসিতেন—পশ্চিম-ভারত হইতে আরবে ইহার অনেক বেশী যাতায়াত ছিল। সুতরাং বাহিরের বৃহৎ মুসলমান জগৎ হইতে নূতন ভাবের স্রোত আসিয়া বঙ্গের মুসলমান সমাজের পুরাতন আবদ্ধ জলকে বিশুদ্ধ সতেজ করিতে পারিত না। যুগে যুগে ইস্‌লামের অনেক সংস্কারক উঠিয়াছেন; কালক্রমে যে-সব কুসংস্কার পাপ কদাচার, প্রেরিত-পুরুষের ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তিত ব্যাধিগ্রস্ত করে, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া সেই প্রাথমিক যুগের পবিত্রতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যুদ্ধ করেন। কিন্তু বৃটিশযুগে ওয়াহাবী ও ফরাজী সম্প্রদায় ভিন্ন, মুসলমানযুগে বঙ্গের ইস্‌লামে যে কোন সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে পাই না। সুতরাং বঙ্গীয় গ্রামবাসী ও সাধারণ মুসলমানগণ হিন্দুদের আমোদ আহ্লাদ গান কথকতা ব্রত প্রভৃতিতে যোগ দিত, পূজা-পর্ব্ব দেখিত; গ্রাম্য-দেবী, ব্যাধি-দেবীকে মানত করিত, মেলায়, প্রতিমা-ভাসানে যাইত। এসব কাজ যে ইস্‌লামের কঠোর পবিত্রতার বিরোধী এ কথা তাহারা জানিত না; কখন কখন একজন তেজীয়ান মুল্লা বা গোঁড়া নবাব তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া ধমকাইতেন, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ কোটি কোটি লোকের জীবন পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না, তাহারা তাহা দুদিনে ভুলিয়া যাইত। [অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী মুসলমানগণ, এবং শহরবাসী কর্ম্মচারীদের দোভাষী হইতে হইত; তাঁহারা অন্তঃপুরে হাট-বাজারে বাঙ্গলা বলিতেন, আর কাচারীতে বৈঠকখানায় এবং সরকারী চিঠিতে

ফারসী (বা উর্দ্দু) ব্যবহার করিতেন,—যেমন. উড়িষ্যায় দীর্ঘকালবাসী মুসলমানেরা ঘরে ওড়িয়া বলে।] এইরূপে বাঙ্গলাদেশে সামাজিক জীবন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রায় একমত ছিল, এবং ইহা পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিভিন্ন। সেই যুগে বাঙ্গলায় ধর্ম্ম হিন্দু হইতে মুসলমানকে পৃথক্ করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাষা ও সামাজিক রীতি বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে পশ্চিম-ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান হইতে পৃথক রাখে। (আমি এখানে আম্‌লা-বর্গের কথা বলিতেছি না; মুঘলযুগে আম্‌লারা প্রায় সব প্রদেশেই 'জাতভাই' ছিল।)

২। বাঙ্গলার জমিদারদের গৌরব

তাহার পর, বাঙ্গালার জমিদারগণ অন্য প্রদেশের জমিদার হইতে অনেক অধিক ধন জন-ক্ষমতাশালী,—প্রায় সামন্ত রাজাদের মত স্বাধীন ছিলেন। পাঠান-যুগে সুল্‌তানদের এবং মুঘলযুগে বাদ্‌শাহী সুবাদারদের এত লোক-বল ছিল না যে জমিদারদের সম্পূর্ণ বশ ও শক্তিহীন করেন। এই অসংখ্য নদীর ভাঙ্গন-গড়নের দেশে জমির জরীপ ও সীমাচিহ্ন রক্ষা করা অসম্ভব ছিল। উত্তর-ভারতীয় মুসলমান বিজেতাদের প্রধান বল ছিল শিক্ষিত সবল অশ্বারোহী; তাহা এই বন্যা বিল খালের দেশে কাজ করিতে পারিত না, ঘোড়া শীঘ্র মরিয়া যাইত। এইজন্য বাঙ্গলার পদাতিক-গণের (পাইক) যুদ্ধে এত মূল্য ছিল। এই উর্ব্বর দেশে ভূস্বামীর টাকার অভাব হয় না; জমিদারগণ সহজেই পাইক সংগ্রহ করিয়া নৌকা লইয়া, স্থলগামী মুঘল অশ্বারোহীকে বাধা দিতে পারিতেন। আর, পশ্চিম ভারতে যেমন সম্রাটের বন্ধু ও স্বজাতী মুসলমান জমিদার অনেক ছিলেন, স্থানীয় বিদ্রোহী-জমিদারের দমনে সাহায্য করিতেন, বঙ্গদেশে সেরূপ লোক অত্যন্ত কম। দিল্লীশ্বরের পূর্ব্বেকার বঙ্গীয় মুসলমান শাসকগণ অন্যদেশ হইতে বলিষ্ঠ সৈন্য খুব কম আনিতে পারিতেন, বাঙ্গালীর বা বাঙ্গালীত্বপ্রাপ্ত আফ্‌গানের সাহায্যে লড়িতে হইত। সুতরাং বিদ্রোহী-জমিদারের সৈন্য অপেক্ষা সুলতানের সৈন্যগণ জাতি বল ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিল না, বঙ্গবিদ্রোহ-দমন কঠিন সমস্যা ছিল। আর, বাঙ্গলা দেশ দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধীন হইবার পরেও যখনই কোন বাদ্‌শাহ মরিতেন এবং তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিত, অমনি বাঙ্গালার জমিদারগণ খাজনা বন্ধ করিতেন ও আশপাশে লুঠ আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন; কারণ বঙ্গদেশ দিল্লী-সাম্রাজ্যের এক সুদূর কোণে। এরূপ দূরবর্ত্তী সীমান্ত-প্রদেশে কেন্দ্রস্থ রাজশক্তির প্রভাব স্বভাবতই ক্ষীণ থাকে।

বাঙ্গলার জমিদারগণের প্রতিপত্তি ও স্বাধীনতার ইহাই. স্থায়ী কারণ; তাহার উপর, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী পাঠান রাজশক্তির অবনতি ও পতন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের নানা বাধা-বিদ্রোহ ঠেলিয়া প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে বঙ্গে জমিদারগণ একেবারে প্রভুহীন স্বস্ব কর্ত্তা হইয়া উঠিয়া যথাসাধ্য রাজ্য-বিস্তার করিবার মহা সুযোগ পান। এই সুযোগে প্রতাপাদিত্য ও বারভুঁইয়াদের উত্থান।

আকবর বাঙ্গলা জয় করিলেন বটে, কিন্তু ইহা বশ করিতে তাঁহাকে বিশ বৎসর ধরিয়া শ্রম করিতে হয়। তাঁহার বঙ্গীয় সুবাদার ও সেনাপতি রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার জলবায়ুকে ভয় করিতেন, রাজমহলে বাস করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বাঙ্গলায় প্রথম বিদ্রোহ দমন করিয়া জমিদারের নিকট হইতে নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকার ও খাজনা লইয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলেন, একেবারে নষ্ট করিলেন না। তাঁহাদের শক্তিহীন দাসের মত করিতে হইলে অনেক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করা আবশ্যক হইত। সুতরাং বাঙ্গলার জমিদারগণ বাদ্‌শাহের বিপদের কারণ থাকিয়া গেল।

তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত পদানত ও ঢোঁড়া সাপের মত নিস্তেজ করেন পরবর্ত্তী সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ (১৬০৮—১৬১৩ খৃ)। ইঁহার বয়স অল্প, কিন্তু একদিকে যেমন অহঙ্কার অপর দিকে তেমনি তেজ, সাহস, দূরদর্শিতা এবং কর্ম্মে আগ্রহ ও শ্রমশীলতা। তাঁহার বঙ্গশাসন এবং জমিদার-ধ্বংসের সুদীর্ঘ ও সমসাময়িক বিবরণ তদীয় কর্ম্মচারী শিতাব খাঁর (মির্জ্জা নহন) রচিত ফারসী

স্তলিপি বহারিস্তানে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য ও উস্মানের পতনের কাহিনী অগ্রে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছি। আজ পাবনার জমিদার-গণ ও বিক্রমপুরের মুসাখাঁর যুদ্ধ ও পরাভব বর্ণনা করিব।

৩। প্রতাপাদিত্য

প্রথমে একটি কথা বলিয়া শেষ করি। ইতিহাস পড়িয়া আমার মনে হয় যে প্রতাপাদিত্যের বীর-কীর্ত্তি-গুলি আকবরের রাজত্বে মানসিংহের সময়ে ঘটে। তখন তাঁহার যৌবন-কাল, শরীর ও মনের শক্তি অটুট, নৌবল অদম্য। কিন্তু প্রায় ২০ বৎসর পরে যখন ইস্লাম খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন তখন প্রতাপ বৃদ্ধ, জীর্ণদেহ, হয়ত পারিবারিক শোকে ম্রিয়মাণ। তাঁহার আর পূর্ব্বতেজ নাই, পুত্রগণের দ্বারা যুদ্ধ চালাইলেন, আর যখন তাহারা পরাজিত হইল, তখন প্রতাপ নিজে হতাশায় অবসন্ন মনে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। (১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) রামরাম বসুর রচিত 'প্রতাপাদিত্য-চরিতে' লেখা আছে যে এই আত্মসমর্পণের সময় ইস্লাম খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি তোমার কর্ত্তব্য, লড়াই কি কয়েদ?" রাজা কহিলেন, "না, আমরা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল এই। অতএব আমি কয়েদ হইব।"

আমার বিশ্বাস যে এই নিরাশ উক্তি ৫ অবসাদ ঐতিহাসিক সত্য।

৪। ইস্লাম খাঁর বঙ্গশাসন

২৬ এপ্রিল ১৬০৮ জাহাঙ্গীর ইস্লাম খাঁকে বিহার হইতে বাঙ্গলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

৫ জুন" বঙ্গের নূতন দেওয়ান আবুল হসন্ আগ্রা হইতে রাজমহল পৌছিলেন। এখানে ইস্লাম খাঁ অগ্রেই আসিয়াছিলেন।

১৩ জুন „ ইহতমাম্ খাঁ তোপ ও নওয়ারা লইয়া আগ্রা হইতে বঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।

৭ ডিসেম্বর „ ইস্লাম খাঁ সসৈন্যে নৌকাযোগে গঙ্গা বহিয়া রাজমহল হইতে নিম্নবঙ্গের দিকে রওনা হইলেন।

২ জানুয়ারি ১৬০৯, ইস্লাম খাঁ মুর্শিদাবাদের গোয়াশ পরগণার ধারে গঙ্গা পার হইলেন, এবং নৌরঙ্গাবাদ সরকারে আলাইপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়া প্রায় দুই মাস বাস করিলেন।

২ মার্চ্চ „ ইস্লাম খাঁ আলাইপুর হইতে নাজিরপুরের দিকে [উত্তরে] কুচ আরম্ভ করিলেন।

৫ বা ৬ মার্চ্চ „ ইস্লাম খাঁ ফতেপুরে থামিলেন।

৩০ মার্চ্চ „ ইস্লাম খাঁ ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া রাণা টাণ্ডাপুরে পৌছিলেন।

২৬ এপ্রিল „ বজ্রপুরে প্রতাপাদিত্য ইস্লাম খাঁর সহিত দেখা করিলেন।

৩০ এপ্রিল „ ইস্লাম খাঁ আত্রেয়ী নদীর ধারে শাহপুরে পৌছিলেন, এবং এখানে শিবির রাখিয়া নাজিরপুরে নয় দিনের জন্য গিয়া খেদা করিয়া ৩২টি হাতী ধরিলেন।

২ জুন „ ইস্লাম খাঁ শাহপুর হইতে নদীতে পুল বাঁধিয়া ঘোড়াঘাট পৌছিলেন।

১৫ অক্টোবর „ ইস্লাম খাঁ ঘোড়াঘাট হইতে করতোয়া বহিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দিকে রওনা হইলেন। জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ।

১৮ ডিসেম্বর „ ইস্লাম খাঁ পাবনা জেলার শাহজাদপুরে। পরে মুসাখাঁর সহিত যুদ্ধ।

জুন ১৬১০, ইস্লাম খাঁ বারভুঁইয়াকে পরাজয় করিয়া ঢাকায় প্রবেশ করিলেন।

মার্চ্চ ১৬১১, মুসাখাঁর সহিত দ্বিতীয় বার যুদ্ধ।

নবেম্বর „ উস্মান বোকাইনগর হইতে শ্রীহট্টে তাড়িত হইলেন।

? জানুয়ারি ১৬১২, প্রতাপাদিত্যের পতন।

২ মার্চ্চ ১৬১২, উস্মানের যুদ্ধে মৃত্যু।

১১ আগষ্ট ১৬১৩ ভাওয়ালের জঙ্গলে ইস্লাম খাঁর মৃত্যু।

৫। পাবনা জেলার জমিদারদের দমন

ইসলাম খাঁ রাজমহল পৌছিবার পূর্ব্বে উস্মান ময়মনসিংহ হইতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পশ্চিম দিকে আসিয়া মুঘলদের আলপসিংহ থানা দখল করিয়া, থানা-

দার সুজাওল খাঁ-নিয়াজাইকে হত্যা করেন। ইস্লাম খাঁ তৎক্ষণাৎ অনেক সৈন্য সহ ইনাএৎ খাঁকে ঐ থানা উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন [৩ খ]।

মুঘল তোপ ও নৌবিভাগের সেনাপতি ইহতমাম্ খাঁকে সোনাবাজু ভাটুরিয়া-বাজু কেলাবাড়ী প্রভৃতি পরগণা জাগীর দেওয়া হইল। ভাটুরিয়া-বাজুর অন্তর্গত চিলা-জোয়ার নামক পরগণা হইতে তাঁহার শিকদার (অর্থাৎ তহসিলদার ও শাসন-কর্ত্তা) সৈয়দ হবিব্ তাঁহাকে তেঁতুলিয়াতে * লিখিয়া জানাইল যে তাহার সঙ্গী দিলির বাহাদুর ও লুৎফ আলিবেগ সোনাবাজুতে গিয়া চাটমহরে বাস করিয়া পরগণা শাসন করিতে লাগিয়াছিল এমন সময় মাসুম খাঁর পুত্র মির্জা মুমীন্ খাঁ, আলমের পুত্র দরিয়া খাঁ, ও খলশীর জমিদার মধু রায়—যাহারা এতদিন সোণাবাজু পরগণা ভোগ করিতেছিল—একত্র হইয়া, ৪ হাজার অশ্বারোহী ৪ হাজার পদাতিক ও ২০০ কোসা নৌকা লইয়া আসিয়া ঐ দুইজনকে এক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া সব সৈন্য সহ হত্যা করিল। শুধু দুজন অনুচর আহত হইয়া চিলা-জোয়ারে পলাইয়া আসিল। এইরূপে সোণাবাজু শত্রুর হস্তে পড়িল।

সুবাদারের অনুমতি লইয়া ইহতমাম খাঁ নিজ পুত্র মির্জা সহনকে এই যুদ্ধের নেতা করিয়া পাঠাইলেন। সহন আলাইপুর হইতে দুই দিনের কুচে চিলা এবং তথা হইতে দুই দিনে চাটমহর পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে শত্রুরা আগেই চাটমহর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সহন তথায় থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া দুই দিনের কুচে আত্রেয়ী নদীর তীরে শাহপুর † গ্রামে গেলেন, এবং সেখানে মাটির তিনটি দুর্গ গড়াইয়া তোপ দিয়া রক্ষা করিলেন। কিছু পরে ইস্লাম খাঁর আজ্ঞায় তাঁহার নিকট হইতে একদল সৈন্য নাজিরপুর হইয়া একদন্তে * পৌঁছিল, এবং সহনও শাহপুর হইতে তথায় আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু সুবাদার তাহাদের যুদ্ধ-যাত্রা নিষেধ করিয়া নাজিরপুর গিয়া খেদা করিয়া হাতী ধরিতে বলিলেন। ৩২টি হাতী ধরা হইল।...তাহার পর সুবাদার ঘোড়াঘাটে গিয়া সৈন্যসহ খড়ের ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু করতোয়ার জল কম বলিয়া ইহতমাম খাঁ নৌকা লইয়া তথায় যাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে নিজ জাগীর কেলাবাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি আম্রুল পরগণা অতিক্রম করিয়া ইব্রাহিমপুর এবং তথা হইতে উদিবুঢ়ায় (?) পৌঁছিলেন, সঙ্গে তিন শত বাদ্শাহী নৌকা। তাহার পর কেলাবাড়ী পরগণা দিয়া ঘোড়াঘাট আসিলেন (১০ ক)।

এদিকে বর্ষার আগমনে ইস্লাম খাঁর আজ্ঞায় তুক্মাক্ খাঁ আলপসিংহ হইতে উঠিয়া নিজ জাগীর শাহজাদপুরে † আসিলেন। এই শাহজাদপুরের জমিদার রাজা-রায় তুক্মাকের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজ পুত্র রাঘু (রঘু বা রাঘব) রায়কে খাঁর দরবারে রাখিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু বর্ষার মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া অনেক নৌকা লইয়া আসিয়া শাহজাদপুরের দুর্গ তিন দিনরাত্রি অবরোধ করিলেন, অবশেষে কিছু করিতে না পারিয়া রণভঙ্গ দিলেন। তখন তুক্মাক্ খাঁ রাগিয়া রঘুরায়কে জোর করিয়া মুসলমান করিলেন, এবং নিজ খিদ্মৎগারের (ভৃত্যের) কাজ করিতে বাধ্য করিলেন। এ সংবাদে ইস্লাম খাঁ অসন্তুষ্ট হইলেন।

চাঁদপ্রতাপ ‡ থানায় মুঘলপক্ষে মিরক বাহাদুর ছিলেন। কিন্তু ঐ চাঁদপ্রতাপের জমিদার নবুদ (?— বিনোদ) রায়, সঙ্গে মির্জা মুমীন, দরিয়া খাঁ ও মধু রায়কে লইয়া, ঐ থানা ঘেরাও করিলেন এবং তাহা ব্যতিবস্ত

---

* তেঁতুলিয়া—মালদহ শহরের ২৩ মাইল পূর্ব্বে।

খলশী—জাফরগঞ্জের ৪ মাইল উত্তর পূর্ব্বে।

চাটমহর—পাবনা শহরের ১৫ মাইল উত্তরে, বরু নদীর ধারে।

† শাহপুর—রাজশাহীর নওগাঁ শহরের ৬ মাইল উত্তরে।

* একদন্ত—পাবনা শহরের ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, ইচ্ছামতীর উত্তর পারে।

নাজিরপুর—মালদহের ৩৮ মাইল পূর্ব্বে, আত্রেয়ী নদীর তীরে, E. B. R.-এর ১৭ মাইল পশ্চিমে।

† শাহজাদপুর—পাবনা শহরের ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে।

‡ চাঁদপ্রতাপ, পূর্ব্বে চাঁদগাজী, এই পরগণা ভাওয়ালের জমিদার ফজল গাজীর বংশের অধীন ছিল।

করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তুকমাক্ খাঁ শাহজাদপুর হইতে সাহায্যে আসায় শত্রুরা পলাইয়া গেল।

এইরূপে ১৬০৯ সালের বর্ষাকাল নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। বর্ষার শেষে ১৫ই অক্টোবর সুবাদার ও সৈন্যগণ ঘোড়াঘাট হইতে "ভাটী" অর্থাৎ ঢাকার দিকে করতোয়া বহিয়া রওনা হইলেন। তিন দিনের কুচে তিনি শিয়ালগড় পৌছিলেন এবং ইহতমাম খাঁ আত্রেয়ী নদী হইতে নৌকা লইয়া যোগ দিবেন এই আশায় এক সপ্তাহ এখানে রহিলেন। কুদিয়া-খালের জল কম বলিয়া নৌকা আসিল না, তখন তিনি শাহজাদপুরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে মির্জ্জা সহন অসীম পরিশ্রমে নৌকাগুলি ঠেলিয়া শিয়ালগড়ে আসিলেন, এবং তথা হইতে ইহতমাম খাঁ সাত কুচে (নৌকায়) শাহজাদপুরে পৌছিলেন। এখানে সকলে ঈদ পর্ব্ব যাপন করিলেন (১৮ ডিসেম্বর ১৬০৯)। এখানে বাদশাহী নওয়ারার মহলা (review) হইল।

৬। কাটাসগড়ার মোহানায় যুদ্ধ

এখান হইতে ইস্‌লাম খাঁ স্থলপথে 'বলিয়া'য় * রওনা হইলেন, এবং তিন দিনে তথায় পৌছিয়া বেপারীদের নৌকায় পুল বাঁধিয়া নদী পার হইলেন। নদীর পেঁচের জন্য নওয়ারা আসিতে অনেক দিন লাগিল। সুবাদারের আজ্ঞাক্রমে ইহতমাম ও সহন খাল-যোগিনীর ত্রিমোহানীতে গিয়া তিনটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। ইস্‌লাম খাঁ দুই কুচে কাটাসগড়ার মুখে পৌছিলেন, এবং তথায় ইহতমাম নৌকা সহ আসিয়া যোগ দিলেন। 'বলিয়া' হইতে একদল অগ্রগামী সৈন্য, শেখ কমাল, তুকমাক্ খাঁ ও মিরক্ বাহাদুরের অধীনে ছয়দিনে ঢাকা পৌছিল, ইহাতে মুসা খাঁ ও অন্যান্য জমিদারগণ দুই দিকে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

কাটাসগড়ার মুখে ইহতমাম খাঁর নিকট পীর মুহম্মদ লোদী আফ্‌গান এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ শত্রুপক্ষের এই সংবাদ আনিল: মুসা খাঁর আদেশমত তাঁহার তিন জন সহযোগী, মির্জা মুমীন, দরিয়া খাঁ এবং মধু রায়, যাত্রাপুরে ইচ্ছামতীর মোহানায় গড় করিয়া পাহারা দিতেছিল, এমন সময় দরিয়া খাঁর কোন পাপের জন্য মির্জা মুমীন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুন করিল। ইহার ফলে মধু রায় সন্দেহ করিল যে মুমীন গোপনে মুঘলদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে, সুতরাং যাত্রাপুরের জমীদারদের নওয়ারায় একতা ও সাহস রহিল না। ইহতমাম এই সুযোগে নৌকাসহ যাত্রাপুর আক্রমণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু ইস্‌লাম খাঁ তাহাতে সম্মত না হইয়া সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথের পরামর্শে এই রণনীতি অবলম্বন করিলেন:—

মুঘলেরা প্রথমে কাটাসগড়া হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত সমস্ত নদীর তীর দেওয়াল ও তোপে সুরক্ষিত করিবে; পরে তাহার আড়ালে আড়ালে বাদশাহী নওয়ারা নদী ভাটাইয়া গিয়া যাত্রাপুরের মোহানা দখল করিবার চেষ্টা করিবে।

এদিকে দরিয়া খাঁর হত্যা-সংবাদ পাইয়া মুসা খাঁ শশব্যস্তে অনেক জমিদার * এবং সাত শত নৌকা সহিত যাত্রাপুরে গেলেন এবং মুমীন ও মধু রায়কে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছামতী হইতে বাহির হইয়া বাদশাহী শিবিরে তোপ চালাইতে লাগিলেন। নৌকাগুলি এই কয় শ্রেণীর—কোসা, জল্‌বা, ধুরা, সুন্দরা, বজ্‌রা এবং খেল্‌না।

রাত্রি হইলে মুসা খাঁর দলবল সরিয়া গিয়া পদ্মার বাম তীরে—অর্থাৎ যেদিকে বাদশাহী সৈন্যরা ছিল—ডাকছাড়া নামক গ্রামে মাল্লাদের দ্বারা অতিক্রত একটি মাটীর দুর্গ প্রস্তুত করাইল, তাহার দেওয়াল উঁচু, পরিখা গভীর, এবং মধ্যে অনেক তোপ।

* 'বলিয়া'—Bowleeah, রেনেলের ম্যাপে, শাহজাদপুরের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

খাল-যোগিনী—মুন্সীগঞ্জের নিকট বর্ত্তমান ইচ্ছামতীর মোহানায় 'যোগিনী ঘাট' এই স্থান হইতে পারে না।

যাত্রাপুর—ঢাকার ২৫ মাইল পশ্চিমে।

* আলাওল্ খাঁ (মুসা খাঁর পিতৃব্যপুত্র), আবদুল্লা খাঁ ও মহমুদ খাঁ (মুসা খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়), বাহাদুর গাজী, সোনা গাজী, আনওর গাজী, শেখ বাবর (হাজী ভাকলের পুত্র), বিনোদ রায় (চাঁদপ্রতাপের জমিদার), পালোয়ন (মটংএর জমিদার), এবং হাজী শমসুদ্দীন বোঘদাদী। [১৯ খ]

পরদিন প্রাতে বাদ্‌শাহী সৈন্ত নিজ নিজ স্থানে মাটী কাটিয়া গড়খাই ও দেওয়াল গড়িতে লাগিল। ইস্‌লাম খাঁ থানায় বসিয়াছেন এমন সময়ে মুসা খাঁর তোপের গোলা আসিয়া সেখানে পড়িতে লাগিল; প্রথম গোলায় তাঁহার সমস্ত ভোজন-পাত্রগুলি পড়িয়া গেল এবং বিশ ত্রিশ জন চাকর মরিল, দ্বিতীয় গোলায় তাঁহার হাতীর উপরের পতাকার বাহক হত হইল। মহা গোলমাল উঠিল, কিন্তু দুপুর পর্য্যন্ত এইরূপ তোপের যুদ্ধ চলিল। উঁচু পাড় হইতে দাগা বাদ্‌শাহী গোলায় শত্রু নওয়ারায় অনেক লোক (মধু রায়ের পুত্র এবং বিনোদ রায়ের ভ্রাতা) মারা গেল এবং কয়েকখানি কোসা ডুবিয়া গেল। তখন জমিদারগণ অপর পারে ফিরিয়া গেল। ইস্‌লাম খাঁ মাটীর দুর্গ হইতে তাম্বুতে আসিলেন।

পরদিন প্রাতেও সেইমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুত্র ও ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্ত মধু রায় ও বিনোদ রায় নৌকায় এ পারে আসিয়া মাটীতে নামিয়া বাদ্‌শাহী সৈন্যদের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিলেন। একবার এ-পক্ষ অগ্রসর হয়, আবার ও-পক্ষ। অবশেষে জমিদারদের সৈন্য পরাস্ত হইয়া পলাইল, অনেকে নৌকায় পৌছিবার আগে জলে ডুবিল, হাতীগুলি অনেক সৈন্ত ও নৌকা পিষিয়া ধ্বংস করিল। বাদ্‌শাহী সৈন্য জয়-ডঙ্কা বাজাইল।

ইতিমধ্যে ইস্‌লাম খাঁ শেখ হবিবুল্লার অধীনে অপর একদল সৈন্য মজলিস্ কুতবের জমিদারী ফতেহাবাদ (অর্থাৎ ফরিদপুর) আক্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা মাটীভাঙ্গার মোহানা দখল করিয়া ঐ জেলা লুটপাট করিয়া মজলিস্ কুতবকে ফতেহাবাদ দুর্গে ঘেরাও করিল। মুসা খাঁ ২০০-নৌকা-পূর্ণ সৈন্য পাঠাইয়া কুতবকে সাহায্য করিলেন, কিন্তু এই সাহায্যকারী সৈন্তদল পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

৭। যাত্রাপুর ও ডাকছাড়া অধিকার

এখন প্রশ্ন হইল মুসা খাঁর দুর্গ কিরূপে আক্রমণ করা যায়। স্থলপথে সেখানে পৌছান অসম্ভব। সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ পরামর্শ দিলেন যে নদীর পাড়ে মুঘলদের সুদীর্ঘ গড়খাই এর (trench) মধ্যে একটি পুরান শুষ্ক নালা আছে, তাহার মোহানা উঁচু বালিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এই নালা কাটিলে বাদ্‌শাহী নৌকা ইহার ভিতরে গিয়া অতি সহজে ইচ্ছামতীতে ঢুকিতে পারে; তখন বিনা যুদ্ধে মুসা খাঁর দুর্গ ও যাত্রাপুর দখল হইবে।

বাদ্‌শাহী নওয়ারায় বার হাজার মাল্লা ছিল। সহন তাহাদের দশ হাজারকে লইয়া, স্বয়ং চার প্রহর দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছয় প্রহরে নালার মুখের পর্ব্বত-প্রমাণ চর কাটিয়া ফেলিলেন। মাল্লাদের উৎসাহ দিবার জন্ত অনবরত পয়সা চাউল ভাঙ্ ও আফিম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় মুসা খাঁ ভয়ে আসিয়া ইস্‌লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন একটা ঝগড়া বাধিয়া গেল। ইস্‌লাম খাঁর এক নর্ত্তকীর স্বামী মুসা খাঁর চাকরী করিত, এবং তাঁহার কাছে মার খায়। নর্ত্তকীর নালিশে ইস্‌লাম খাঁ মুসা খাঁকে ধম্‌কাইলেন, এবং তিনি অপমানে চলিয়া গিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

মুসা খাঁর দুর্গ আক্রমণের উপায় স্থির হইল। সুবাদারের আজ্ঞায় ঢাকা হইতে তুকমাক্ খাঁ কোদালিয়ার * মোহানায় আসিয়া বসিল এবং মিরক্ বাহাদুর বিশখানা নৌকা লইয়া কুঠারুইয়ার মোহানায় পৌছিল। এদিকে ইস্‌লাম খাঁ নিজে কাটাসগড়ার মোহানার অপর পার হইতে আব্দুল ওয়াহিদকে সঙ্গে লইয়া কুচ করিয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতে কুঠারুইয়ার মোহানায় পৌছিলেন, এবং মিরক বাহাদুরের নৌকা লইয়া সৈন্তদের ইচ্ছামতী নদী পার করাইতে লাগিলেন। অনেকে হাতীর পিঠে নদী পার হইল। তাহার পর যাত্রাপুরের দুর্গের দিকে কুচ হইল। শত্রুরা নৌকাযোগে পদ্মার অপর তীরে পলাইয়া গেল।

তাহার পর সুবাদারের আজ্ঞায় আব্দুল ওয়াহিদ

---

* নারায়ণগঞ্জের ২॥০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যে কোদালিয়া গ্রাম আছে তাহা এস্থান হইতে পারে না। "পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থল, বাইশকোদালিয়ার মোহানা" [যতীন্দ্র রায়, ঢাকার ইতিহাস, ১—৩৯, ৪৬] কুঠারুইয়া = কাথারিয়া, কীর্ত্তিনাশার পূর্ব্ব গ্রাম [যতীন্দ্র, ১—৪২]

ইচ্ছামতী পার হইয়া ডাকছাড়ার মোহানায় মুসা খাঁর দুর্গ এক দিক হইতে অবরোধ করিল।

সাত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া মির্জা সহন সেই শুষ্ক নালা কাটিয়া তাহাতে ইচ্ছামতীর জল আনিলেন। জ্যোতিষীরা বলিল যে ৯ জুন ১৬১০ রাত্রি দুই ঘড়ির সময় নৌকা লইয়া নালায় প্রবেশ করিবার শুভ মুহূর্ত্ত। তাহাই করা হইল। শত্রুগণ নদীর মধ্যের নৌকা হইতে গোলা চালাইয়া বাধা দিতে চেষ্টা করিল; বাদ্‌শাহী নৌকা ঠেলিতে মাল্লাদের খুব ভিড় হইয়াছিল, কাজেই তাহাদের অনেকে মারা পড়িল। কিন্তু রাত্রে সব নওয়ারা মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন মির্জা সহন শত্রুদুর্গ আক্রমণ করিবার ভার চাহিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে দুর্গের কাছে ছুটিয়া গেলেন। শত্রুগণ দুর্গ-প্রাচীর এবং পদ্মার বক্ষ হইতে গোলাগুলি চালাইতে লাগিল। অনেক বাদ্‌শাহী সৈন্য মরিল; কিন্তু মির্জা সহন মাটির উপর তিন হাজার টাকার স্তূপ করিয়া তাহা হইতে মুঠে মুঠে টাকা নিজের আহত সৈন্য ও মৃত সৈন্যের আত্মীয়দের দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ "আল্লাহু আকবর!" এবং "ইয়া মুইন!" ধ্বনি করিয়া মুখের সাম্‌নে ঢাল ও তরবাল ধরিয়া ছুটিল। তাহার পর আত্মরক্ষার জন্য দুর্গের বাহিরে অধিকৃত জমীতে গড়খাই (trench) খুঁড়িতে লাগিল। এখান হইতে আবার ছুটিয়া গিয়া বাকী জমীর অর্দ্ধেক অধিকার করিয়া, দম লইবার জন্য ঢালের আড়ালে বসিয়া পড়িল। দুর্গ ও নদীবক্ষ হইতে তীর, বল্লম, গোলা-গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল।

তখন সহন হুকুম দিলেন যে রণনৌকার সাম্‌নে পুলের মত* যে-সব গাড়ী [গর্দ্দুন—চাকা, রথ] রাখা ছিল তাহা আনিয়া নিজ সৈন্যদের পাশে খাড়া করা হউক এবং মাল্লারা ঘাসের আঁটি ও মাটীর ঝুড়ি মাথায় করিয়া আনিয়া ঐ কাঠের গাড়ীর পশ্চাতে দ্রুত দেওয়াল গড়িয়া তুলুক। তাহাই করা হইল। সৈন্যগণ পরে এই আশ্রয় হইতে ছুটিয়া বাহির হইল, কিন্তু অশেষ পরিশ্রমেও দুর্গ নিতে পারিল না, কারণ আর কোন সেনাপতিই সহনের সাহায্য করিলেন না, শত্রুর সমস্ত বল তাঁহার উপর পড়িল।

এদিকে পাঁচ হাজার মাল্লা প্রত্যেকের মাথায় ঘাসের আঁটি এবং আর পাঁচ হাজার মাটির ঝুড়ি লইয়া প্রস্তুত রাখা হইল। মুসা খাঁ নিজ দুর্গের চারি-দিকে পরিখা খুঁড়িয়া তাহাতে চোখালো বাঁশ* পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র সহনের মাল্লাগণ ছুটিয়া গিয়া ঘাস ও মাটী ফেলিয়া পরিখা পুরাইতে লাগিল। তৃতীয় ঘড়িতে এ কাজ শেষ হইল। তখন হাতী পাঠাইয়া দুর্গ আক্রমণ করা হইল। দুই ঘড়ি ধরিয়া মহা যুদ্ধ হইল, অনেক হাতী ও মাহুত তোপে আহত হইল; কিন্তু অবশেষে পঞ্চম ঘড়ির শেষে মির্জা সহন দুর্গে প্রবেশ করিলেন। "'আল্লাহু আকবর' ও 'ইয়া মুইন' ধ্বনি উঠিল, ভেরী হু হু শব্দ করিল, ডঙ্কা গুড়ুম গুড়ুম করিয়া বাজিয়া উঠিল।" শত্রুগণ অনেকে মরিল, বাকীরা পদ্মাপারে আশ্রয় লইল। তখন আর-সব বাদ্‌শাহী সেনাপতি দুর্গে ঢুকিলেন। এই জয়লাভের পর ইস্‌লাম খাঁ ঢাকার দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমে কুঠাকুইয়ার মোহানায় থামিলেন; এখানে মুসা খাঁর ভ্রাতা ইলিয়াস খাঁ আসিয়া মুঘল পক্ষে যোগ দিলেন। পরদিন "বল্‌রা"য় কুচ হইল। ইস্‌লাম খাঁ সৈন্য পাঠাইয়া কেলাকুপাতে [নবাবগঞ্জের এক মাইল উত্তরে] শত্রু দুর্গ দখল করিলেন এবং নিজে তথায় পৌছিলেন। নওয়ারার এক অংশ শ্রীপুরে পাঠান হইল। এদিকে ময়মনসিংহ হইতে উস্‌মান আসিয়া ঘোড়াঘাট অঞ্চল আক্রমণ করিতে না পারেন এজন্য ইফ্‌তিখার খাঁ শেরপুর মুর্চায়† নিযুক্ত রহিলেন।

কেলাকুপা হইতে ইস্‌লাম খাঁ ঢাকায় পৌছিলেন। নওয়ারা পাথরঘাটার মোহানায় পৌছিয়া থামিল;

* Gangway ? লম্বা পাটাতন, নীচে চাকা।

* কাঞ্জ বা ভাঞ্জ। আসামে গড় রক্ষার প্রধান উপায়।

† বগুড়া জেলায়, ২৪·৪০ ডিগ্রীর উত্তর, ৮৯·২৯ পূর্ব্ব। পাথর-ঘাটা—ঢাকার ৬ মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে।

পরে গোয়াধরী * নালা দিয়া ঢাকা পৌছিল। সৈ গণ স্থলপথে আসিল।

ঢাকার কাছে দোলাই নদী দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়াছিল, একটি খিজরপুরে যায়, অপরটি ডুম্‌রা খালে পড়ে। ডুম্‌রা খালের মোহানায় দুধারে বেগ মুরাদ খাঁর দুটি দুর্গ ছিল। তাহা ইহ্‌তমাম ও সহনের হাতে রাখা হইল।

৮। মুসা খাঁর সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

পরাজিত মুসা খাঁ কাত্রাবু পৌছিয়া, আবার যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবার লক্ষিয়া নদী তাঁহার আশ্রয়স্থান হইল। শ্রীপুর ও বিক্রমপুরে সামান্য দুট চৌকি (ছোট থানা) রাখিয়া তিনি পন্দার নালার এই দিকে রহিলেন, তাঁহার পশ্চাতে মির্জা মুমীন্, নালার অপর পারে আলাওল্ খাঁ; কদম রসুলে [নবাবগঞ্জের সাম্‌নে লক্ষিয়ার অপর পারে] আব্দুল্লা খাঁ, কাত্রাবুতে দায়ুদ খাঁ, ডুম্‌রা খালে মহ্‌মুদ খাঁ, এবং চূড়াতে † বাহাদুর ঘাজী মোতায়েন হইল।

ইহাদের বিরুদ্ধে ইস্‌লাম খাঁ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সহন ও শেখ কমাল খিজরপুর ও কুমারসর দখল করিবার আজ্ঞা পাইলেন। রওনা হইয়া প্রথম দিন সহন ও শেখ কমাল কুপার [ধাপার?] মোহানায় থামিলেন। রাত্রি চারি ঘড়ি থাকিতে সৈন্যগণ লক্ষিয়ার পাড় দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রভাত হইলে সহন খিজির-পুরে ‡ এবং শেখ কমাল কুমারসরে পৌছিয়া গড় বানাইতে লাগিলেন। শত্রুরা নৌকায় আসিয়া তোপ চালাইয়া বাধা দিতে লাগিল। অনেক লোক মরিল, নৌকা ডুবিল, কিন্তু দিন-শেষে সহনের দুর্গ সম্পূর্ণ হইল। এক দিন পরে ইহ্‌তমাম খাঁকে খিজিরপুরে এবং সহনকে কাত্রাবুর সম্মুখে (অর্থাৎ দায়ুদ খাঁর বিরুদ্ধে) পাঠান হইল। এইরূপে ১২ মার্চ্চ ১৬১১, নও-রোজ উপস্থিত হইল।

মির্জা সহন স্থির করিলেন যে হাতীর পিঠে লক্ষিয়া পার হইয়া কাত্রাবু দুর্গ আক্রমণ করিবেন। সেই রাত্রে দুই ঘড়ির সময় একজন বেপারির খেলনা নৌকা (=আধ কোসা) ধরা পড়িল; সে বলিল যে শত্রুপক্ষে জনরব উঠিয়াছে যে চূড়ায় বাহাদুর ঘাজী মুঘল সেনাপতি আব্দুল ওয়াহিদের সহিত সন্ধি করিয়াছে, এবং সে যেন বাদ্‌শাহী সৈন্যকে নদী (দোলাই) পার করিয়া না দিতে পারে এজন্য মুসা খাঁ সেই দিকটা সাবধানে পাহারা দিতেছেন। সহনের মহা সুবিধা হইল; তাঁহাকে বাধা দিবার শত্রু নাই।

সেই রাত্রেই এক প্রহর থাকিতে তিনি কয়েকখানি ছোট ডিঙ্গিতে ১৪০ অশ্বারোহী ও ৩০০ বর্কআন্দাজ পার করিয়া দিলেন, তাহাদের নেতা শাহবাজ খাঁ। তখনও দুই ঘড়ি রাত্রি ছিল। সহন, ঢালী পাইকদের (তরবালধারী পদাতিক) ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা দাঁড়াইয়া আমার মুখ দেখিতেছ! তোমাদের হাজার জনকে পার করিবার জন্য কোথায় নৌকা পাইব? যাও প্রত্যেকে একটি কলাগাছ লইয়া ভাসিয়া পার হও।" তাহাই করা হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি শাহবাজ খাঁকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে যখন তিনি হাতী লইয়া নদীতে সাঁতার দিবেন, খাঁ যেন তুরী বাজাইয়া দায়ুদ খাঁর দুর্গের দিকে ধাইয়া যায়, তাহা হইলে শত্রুগণ নদীবক্ষে সহনকে আক্রমণ করিতে অবসর পাইবে না। এখন এ পারে নিজ গড়খাইয়ে সেনাদের বলিলেন যে, শত্রু-নৌকা নদীতে দেখা দিলে তাহারা যেন তোপ দাগিয়া তাড়াইয়া দেয়।

তাহার পর "বিস্‌মিল্লা" বলিয়া নিজ বাছা বাছা বীর সৈন্য সহ কয়েকটি হাতীতে চড়িয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া

---

* গোয়াধরী বা কাউবাধরী?

দোলাই—"এই খালের একটি শাখা ঢাকা সহরের মধ্য দিয়া বাবুর বাজারের নিকট বুড়ীগঙ্গা নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কামারনগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ইহার একটি শাখা বংশালের মধ্য দিয়া টঙ্গী নদীতে মিলিত হইয়াছিল।" [যতীন্দ্র, ১—৭৬]

পন্দার—"বন্দর" পড়া যায়।

† চূড়া—নবাবগঞ্জের ৬ মাইল পূর্ব্বে চূড়ন ঝিলের উত্তরে চূড়ন নামে এক গ্রাম আছে।

কুমারসর—নারায়ণগঞ্জ হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে এবং ফিরিঙ্গী বাজারের উত্তরে রেনেলের ম্যাপে *Coblenesser* নামে একটি স্থান আছে।

‡ "খিজরপুরের মোহানায় দোলাই নদী লক্ষিয়াতে পড়িয়া নিজ নাম ত্যাগ করে।" এখানে নদীর মুখে সহন কটারী ও মানকী নৌকা দিয়া এক পুল বাঁধিলেন এবং দুই পাড়ে সৈন্য সাজাইলেন। নিজে খিজরপুরের মস্‌জিদে কেন্দ্র লইয়া রহিলেন।

পড়িলেন, এবং সাঁতরাইয়া পরপারের দিকে গেলেন। তখন শাহবাজ খাঁর দল দায়ুদ খাঁর দুর্গ আক্রমণ করিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিবার পর মধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রু পলাইল।

ইতিমধ্যে ইহতমাম খাঁ সমস্ত নওয়ারা লইয়া দোলাই নদী হইতে বাহির হইয়া লক্ষিয়া ছাড়িয়া কদমরসুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদে রণশ্রান্ত সহন পুনর্ব্বার নদী পার হইয়া দুতিন শত অশ্বারোহী এবং অনেক পদাতিক বর্কান্দাজ ও তীরান্দাজ লইয়া শীঘ্র কদমরসুলে পিতার সঙ্গে যোগ দিলেন।

এখানে নদীতে ভীষণ জলযুদ্ধ বাধিল, কারণ বাদশাহী নওয়ারা বিনা আজ্ঞায় এবং সেনাপতিকে না লইয়া শত্রু-নৌকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, এবং এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় শত্রু নওয়ারা দ্বারা খুব আক্রান্ত হইল। শত্রুদের দৃষ্টি অন্যদিকে লইয়া গিয়া বাদশাহী নৌকাকে বিশ্রাম দিবার জন্য মির্জা সহন হাতীর পিঠে ছুটিয়া মুসা খাঁর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মুসা ও মুমীন নৌকাযোগে পলাইয়া গেল। তখন সহন কয়েকজন সৈন্য লইয়া পদব্রজে পন্দরের [বন্দর?] নালা পার হইয়া অপর পাড়ের শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। আলাওল খাঁও নিজ দুর্গ খালি করিয়া পলাইল।—পরে জোয়ার আসায় এই নালা জলে পূর্ণ হইল, সহনের ফিরিয়া আসায় বাধা পড়িল, তাঁহাকে শত্রু নওয়ারার সহিত কঠিন যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। অবশেষে শত্রু পরাজিত এবং শত্রু নওয়ারা ধৃত হইল।

মুসা খাঁ নিজ ভ্রাতৃগণ ও জমিদারগণ সহিত বেকুলীয়াচর হইয়া নিজ রাজধানী সাজকামে আশ্রয় লইলেন।

৯। মুসা খাঁর শেষ চেষ্টা.

মুসা খাঁ ইব্রাহিমপুরের চরে পলাইয়া গিয়া মির্জা মুমীনকে সাজকাম হইতে তাঁহার ধন-দৌলত লইয়া এখানে আসিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। মুসা খাঁর প্রধান কর্ম্মচারী হাজী শমসুদ্দীন বোঘ্দাদী ইস্লাম খাঁর সহিত দেখা করিয়া পরিত্যক্ত সাজকাম নগর মুঘলদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

কিন্তু মুসা খাঁর ভ্রাতা দায়ুদ খাঁ তখনও ফিরিঙ্গীদের* পথ বন্ধ করিয়া বেশ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণ রাত্রে দায়ুদ খাঁর বাড়ী আক্রমণ করিল এবং যেই দায়ুদ খাঁ বীরের মত মাচানের উপর হইতে নামিলেন, তাহারা তাঁহাকে না চিনিতে পারিয়া এক গুলিতে মারিয়া ফেলিল, এবং মুসা খাঁর লোক-জন আসিবার আগেই পলাইয়া গেল।

তখন মুসা খাঁ ভাবিলেন যে নদীতীরে দুর্গের পর দুর্গ গড়িয়া সহনের গড়ে পৌছিয়া তাহা আক্রমণ করিবেন। মানসিংহের শাসনকালে মগ-রাজা বঙ্গ আক্রমণ করিয়া নদীতীরে যে গড় করিয়াছিলেন তাহা পুরাতন ভগ্নদশায় ছিল। মুসা খাঁ নৌকা-যোগে সেখানে পৌছিয়া দেওয়াল তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু সহনের আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ইব্রাহিমপুরে পালাইয়া আসিলেন।

কোদালিয়া মোহানার দুর্গে তুক্মাক্ খাঁর স্থলে শেখ রুকন নিযুক্ত হইল। সে সর্ব্বদা মদ খাইয়া বিভোর থাকিত। এক সপ্তাহ পরে এই সংবাদ পাইয়া মুসা খাঁ ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সহন বন্দরের (পন্দর?) নালা হইতে তাঁহার উপর তোপ চালাইলেন; বাদ্শাহী নওয়ারাও নদীবক্ষে আসিয়া মুসা খাঁর নৌকা আক্রমণ করিল। অনেকক্ষণ এবং বারবার যুদ্ধ করিয়া শত্রুরা অবশেষে পরাস্ত হইয়া পলাইল,—অনেকে হত হইল, অনেকে জলে ডুবিয়া মরিল।

এইসব সংবাদে বাহাদুর ঘাজী আসিয়া ইস্লাম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করিল। মজ্লিস্ কুতবও অধীন হইল। বর্ষা-আগমনে ইস্লাম খাঁ বন্দরের নালা হইতে থানা তুলিয়া কুমারসরে আনিলেন।......অবশেষে মুসা খাঁ নিজ জাতভাই লইয়া ইস্লাম খাঁর নিকট আসিয়া ধরা দিলেন, এবং ঢাকায় নজরবন্দী হইয়া

* মুঘলেরা কি ফিরিঙ্গীদের মুসা খাঁর বিরুদ্ধে উৎসুকাইয়া দিয়াছিল? কণ্টকেনৈব কণ্টকং?

রহিলেন, কারণ সুবাদার শীঘ্রই উস্‌মানকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এমন সময় অপর শত্রুকে ছাড়িয়া দিলে বিপদ বাড়িবে।*

যদুনাথ সরকার

* প্রবাসীর পাঠকেরা যদি এই প্রবন্ধে উল্লিখিত নদী খাল ও গ্রামের স্থান-নির্দ্দেশ ও বর্ণনা করিয়া পাঠান তাহা সাদরে বিচার করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আত্রেয়ী, ইচ্ছামতী, করতোয়া ও তিস্তা নদীর গতি ও তেজ এখন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। রেনেলের ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত বেঙ্গল এট্‌লাসেও ভিন্ন। —যদুনাথ সরকার।

আলাইপুর—পদ্মার পূর্ব্বতীরে, রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

ফতেপুর—পদ্মার পূর্ব্বতীরে, রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

ঘোড়াঘাট—রংপুর জেলায় চাকলে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত, করতোয়ার তীরবর্ত্তী। নিলফামারি হইতে প্রায় ১৬ মাইল পূর্ব্বে।

শাহজাদপুর—পাবনা হইতে প্রায় ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে।

বোকাইনগর—ময়মনসিংহ জেলায়। কিশোরগঞ্জের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

আলাপসিংহ—ময়মনসিংহ জেলার একটি পরগণা, ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

সোনাবাজু—সরকার বাজুহার অন্তর্গত একটি পরগণা। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫ মাইল পশ্চিমে সোনাবাজু নামে একটি স্থান আছে।

ভাতুরিয়াবাজু—তাহেরপুর সহ সমুদয় উত্তর রাজসাহী ভাতুরিয়া-বাজুর অন্তর্গত ছিল। ভাতুরিয়া পরগণার উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদীদ্বয়, পূর্ব্বে করতোয়া নদী, দক্ষিণে রাজসাহীর কিয়দংশ। আত্রেয়া নদী ভাতুরিয়া পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

কেলাবাড়ী—কড়ইবাড়ী? কড়ইবাড়ী ময়মনসিংহ জেলার একটি পরগণা।

চিল্লাজোয়ার—ভাতুরিয়াবাজুর অন্তর্গত একটি পরগণা।

আমরুল—রাজসাহী জেলার একটি পরগণা। সরকার বরবকাবাদের অন্তর্গত।

চন্দ্রপ্রতাপ—ঢাকা জেলার একটি পরগণা।

ভাটি—মেঘনাদ ও হুগলী নদী এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ পূর্ব্বকালে ভাটি নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ এই ভূভাগের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানই ভাটি নামে প্রসিদ্ধ। মোসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মার এবং লক্ষ্যার সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম পর্য্যন্ত স্থানকে ভাটি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহা ১৮ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এক্ষণে বাখরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত দক্ষিণবর্ত্তী স্থানগুলিই ভাটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৯২ পৃঃ।)

শিয়ালগড়—রেনেলের ম্যাপে জাফরগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে শিয়ালো নামক একটি স্থান দেখা যায়। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুরের অনতিদূরে শিয়ালজঙ্গলা নামক একটি গ্রাম আছে।

কুদিয়াখাল—শাহজাদপুরের প্রায় ৫ মাইল পূর্ব্বে হুরাসাগরে মিলিত হইয়াছে। রেনেলের ম্যাপে কদি নামক স্থানের নিকটে একটি শাখা-নদী অঙ্কিত আছে, উহা করতোয়া হইতে বাহির হইয়া ইছামতীতে পতিত হইয়াছে।

কাটাসগড়—কাত্রাসিন? ইছামতী নদীর তীরে, সাভার হইতে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

যাত্রাপুর—ইছামতী নদীর তীরে, সাভার হইতে প্রায় ১৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৯৭ পৃঃ।)

ইছামতী নদী—সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্ব্বদিকে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরাসাগরের মোহানার বিপরীত দিকে নাগপুরের ফ্যাক্টরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী যোগিনীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৮ পৃঃ।)

ডাকছাড়া—যাত্রাপুর হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঢাকজোরা নামক একটি স্থান আছে।

ফতেহাবাদ—ফরিদপুর।

মাটিভাঙ্গা—মাথাভাঙ্গা? পদ্মার যে স্থান হইতে জলঙ্গী বাহির হইয়াছে, তাহার প্রায় ৫ ক্রোশ নিম্ন দিয়া মাথাভাঙ্গা নদী বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণপূর্ব্ব মুখে পরে কিয়দ্দূর আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-বাহিনী হইয়া কৃষ্ণগঞ্জের তলদেশে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। এই দুই স্রোতের একের নাম চূর্ণী, অপরের নাম ইছামতী।

বলুরা—ইছামতীর তীরে, ঢাকা হইতে প্রায় ২৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

কেলাকুপা—কলাকোপা?—ইছামতীর তীরে, ঢাকা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

দোলাই নদী—বালু নদী হইতে বহির্গত হইয়া ঢাকা ফরিদাবাদের নিকট বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৭৬।)

শ্রীপুর—সোনারগাঁ হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে কালীগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অধুনা পদ্মা-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৫১০ পৃঃ।)

খিজিরপুর—নারায়ণগঞ্জের ১ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে, ঢাকা হইতে প্রায় ৯ মাইল অন্তরে, লক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৫৩ পৃঃ।)

ডুমরা—ডেমরা? ঢাকার উত্তর-পূর্ব্বে বালু ও লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলের প্রায় ৬ মাইল অন্তরে অবস্থিত। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৬৯ পৃঃ।)

লক্ষ্যা নদী—এই নদীর উত্তরাংশ বানার বলিয়া পরিচিত। ইহা এগারসিন্ধু নামক স্থানের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে উৎপন্ন হইয়া নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৪ পৃঃ।)

কদমরসুল—নারায়ণগঞ্জের অপর তীরে লক্ষ্যা নদীর পূর্ব্বতটে নবীগঞ্জস্থিত কদমরসুল দুর্গ মোসলমানগণের একটি তীর্থস্থান। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪২২ পৃঃ।)

কত্রাবু—কর্ত্তাভু বা কত্রাপুর—লক্ষ্যানদীর তীরে খিজিরপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত, অধুনা কাটারব নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার ছিল। (ঢাকার ইতিহাস ১ম—৪৪৮ পৃঃ।)

কমারসর—কুমারসুন্দর? সহর সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে অবস্থিত, রেনেলের ম্যাপে ইহা Coblenesser নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভেকুলিয়া চর—কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত কালীগঞ্জের অনতিদূরে ভেকালিয়া নামক একটি স্থান আছে।

সাঙ্গকাম—সাজনগাঁও? একডালার প্রায় ৭ মাইল উত্তরে বানার নদীর অনতিদূরে সাজনগাঁও নামক একটি স্থান আছে।

শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায়

উপনিষদে শিক্ষা-প্রণালী ও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের প্রভাব

ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মচারী নানারূপ ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যায় উপস্থিত হইতেন। অগ্নি-চর্য্যা, গো-রক্ষা, ভিক্ষাহরণ প্রভৃতি কায়িক শ্রমের সহিত শিক্ষার আরম্ভ হইত, এবং আরণ্যক ও উপ-নিষদ্ অধ্যয়ন দ্বারা মানসিক বিকাশে এ শিক্ষার শেষ হইত।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সম্বন্ধ।

বেদের ব্রাহ্মণভাগের ন্যায় আরণ্যকেও নানারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ আছে; কিন্তু এ সকল অনুষ্ঠানে প্রয়োগ অপেক্ষা চিন্তনের অংশই অধিক। উপনিষদ ও ব্রাহ্মণের উপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবধান লোপ করিয়া আরণ্যক পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের সূচনা করিয়া দিত।

ব্রহ্মবিদ্যায় ক্ষত্রিয়প্রভাব সম্বন্ধে অমূলক ধারণা।

আপাতদৃষ্টিতে যজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখিতে পাইয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন—একই ব্রাহ্মণ জাতি এই দুই মার্গের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না; তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন। বোধ হয়, দুই কারণে ইঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের ধারণা যে যাহারা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান-বহুল যাগ-যজ্ঞে মগ্ন থাকিতেন, তাঁহাদের চিন্তার ধারায় কখনই ব্রহ্মবিদ্যা স্থান পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উপনিষদের মধ্যেই দুই-একটি আখ্যায়িকা পাওয়া যায়, যাহাতে ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের উপদেশ-লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের পরিপুষ্টি।

কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপরোক্ত মত নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। 'কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড যথাক্রমে 'আরুরুক্ষু' ও 'আরূঢ়ের' অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছু ও লব্ধজ্ঞানের আশ্রয়ণীয় একই পথের আদি ও অন্ত। চতুরাশ্রমের ক্রম হইতেই আমরা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ এবং পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করিতে পারি; প্রথম দুই আশ্রমে কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং শেষ দুই আশ্রমে কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে হইত। যাগ প্রয়োগেই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি যজ্ঞের প্রধান দেবতা, সমস্ত কর্ম্মের অধীশ্বর; কালক্রমে এই প্রজাপতি, বিশ্বকর্ম্মা বা যজ্ঞপুরুষের ব্রহ্মরূপে পরিণতি অতি স্বাভাবিক। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বহু দেবতা এক সঙ্গে বিশ্বদেব নামে অভিহিত হইয়াছেন, উপনিষদে তাঁহারাই আবার সম্পূর্ণরূপে বহুত্ববিহীন হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন।

যজ্ঞেই ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ (১), শতপথ ব্রাহ্মণ (২), প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা উদ্ভূত হইয়াছিল এরূপ কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানকাণ্ড বা কর্ম্ম-সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন এরূপ উক্তি ভিত্তিহীন। কোন কোন যজ্ঞানুষ্ঠানেই সন্ন্যাসের আরম্ভ হইত, কর্ম্মের মধ্যে ত্যাগ, আসক্তির মধ্যে বিরাগের সূচনা হইত। সর্ব্বমেধযজ্ঞের যজমান, পার্থিব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যজ্ঞান্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন (৩)। ক্ষত্রিয়গণও যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন না। ব্রহ্মিষ্ঠ জনক যজ্ঞসভায় বসিয়াই ব্রহ্মের আলোচনা করিয়াছিলেন (৪)। ব্রাহ্মণগণ যখন বৈশ্বানর-বিদ্যায় উপদেশ লাভের জন্য রাজা অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন, তিনিও তখন যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছিলেন (৫)।

ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা-গ্রহণ।

উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের বিদ্যাগ্রহণের আখ্যায়িকা দেখা যায় বটে, কিন্তু আবার উপনিষদেই ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক ব্রাহ্মণ উপদেষ্টার নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাই।

জনক ও তাঁহার আচার্য্যগণ।

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে রাজা জনকেরই ব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক খ্যাতি। কিন্তু এই জনকও ব্রাহ্মণ যাজ্ঞ-বল্ক্যের নিকট ব্রহ্মোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন (৬)। ইহার পূর্ব্বেও তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য জিত্বা, উদঙ্ক, বর্কু,

গর্দ্দভীবিপীত, সত্য-কাম এবং বিদগ্ধ এই পাঁচজন আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (৭)।

রাজা জানশ্রুতি ও ব্রাহ্মণ রৈক।

রাজা জানশ্রুতি বহুকষ্টে ব্রাহ্মণ রৈকের সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন (৮)।

রাজা বৃহদ্রথ ও শাকায়ন।

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা বৃহদ্রথ ব্রাহ্মণ শাকায়নের চরণে নত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (৯)। এইরূপে বহু ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়ের উপদেশ লাভের আখ্যায়িকা পাওয়া যায়।

ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের শিক্ষা।

ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের উপদেশ লাভের আখ্যায়িকা-গুলি একে একে পর্য্যালোচনা করিলে উহা দ্বারা কিছুতেই বলা যায় না যে, ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যার জনক ও শিক্ষক ছিলেন।

কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ে ক্ষত্রিয় উপদেষ্টা। তিনজন ব্রাহ্মণ ও রাজা জনক। তিনজন ব্রাহ্মণ ও রাজা প্রবাহণ।

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় জনক অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু, সোমশুষ্ম, এবং যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষা অধিক কথা বলিয়াছিলেন (১০)। ইহাতে ব্রহ্মবিদ্যার সংস্পর্শও নাই। কারণ অগ্নিহোত্র একটি যজ্ঞ বিশেষ। উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি নামক একজন ক্ষত্রিয় দুই স্থলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম আখ্যায়িকা হইতে এইমাত্র জানা যায় যে, শিলক, দাল্ভ্য, ও প্রবাহণ এই তিনজন সতীর্থ বিদ্যার্থীর স্বরসম্বন্ধে আলোচনাকালে ক্ষত্রিয় প্রবাহণই অধিক মেধাবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন (১১)। এই স্বরবিদ্যাও কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত।

ব্রাহ্মণ উদ্দালক ও রাজা প্রবাহণ।

এই ক্ষত্রিয়ই পরে পঞ্চালের রাজা হইলে রাজসভায় সমাগত শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিয়া অনুত্তর করেন এবং শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে বলিয়াছিলেন যে, এ বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণ জানেন না (১২)। ইহার নাম পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। মৃত্যুর পর জীব যে-সকল পথ দিয়া পরলোকে গমন করে এবং পুনরায় যেরূপে বৃষ্টির জলের সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার বর্ণনাই এই বিদ্যার বিষয়। এই আখ্যায়িকাই ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষাত্রত্ববাদীদিগের প্রধান অবলম্বন; কারণ এই স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বিষয়টি ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ইহাও প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা নহে। সুতরাং ইহা না জানিলেও ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যায় অজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ এই আখ্যানটিতে প্রবাহণের নিজের কথাতেই পরস্পর-বিরোধ দেখা যায়। শ্বেতকেতুর নিকট উত্তর পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে রাজা প্রবাহণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কারণ শ্বেতকেতু উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানে না তাঁহার শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় নাই (১৩)। অথচ যে বিদ্যা তৎপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণই জানিতেন না, তাহা শ্বেতকেতুর জানিবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই-সকল দেখিয়া মনে হয়, উপাখ্যানে অক্ষরার্থ মাত্র প্রমাণ নহে, কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। ভারতীয় প্রাচীনমতেও বেদের উপাখ্যান-ভাগ অর্থবাদ মাত্র।

ছয়জন ব্রাহ্মণ ও রাজা অশ্বপতি।

আর-একটি আখ্যায়িকা এইরূপ (১৪):—ব্রাহ্মণ আরুণি বৈশ্বানর-বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন শুনিয়া প্রাচীন-শাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন এবং বুড়িল এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে আসিলেন; আরুণি আবার তাঁহাদিগকে লইয়া কৈকেয় অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইলেন; কারণ সে সময়ে অশ্বপতিও এই বিদ্যার আলোচনা করিতেছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণ আরুণি এবং ক্ষত্রিয় অশ্বপতি উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে একই বিষয়ের অনুশীলন করিতেছিলেন, কিন্তু আরুণি তখনও কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহা হইতে বলা যায় না যে ক্ষত্রিয়গণই এ বিদ্যার উদ্ভাবক ও শিক্ষক ছিলেন।

ব্রাহ্মণ বালাকি ও রাজা অজাত-শত্রু।

অপর একটি আখ্যায়িকায় (১৫) কাশী-রাজ অজাত-শত্রু ব্রাহ্মণ বালাকিকে ব্রহ্মের স্বরূপ শিক্ষা

দিয়াছেন। রাজা প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের নিকট শিক্ষা বিপরীত ব্যবহার (১৬)। যদি তখন ক্ষত্রিয়গণই ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষক হইতেন, তবে, ঐ কথার কোন অর্থই হয় না। বিশেষতঃ বালাকি উপদেশ লইবার জন্য অজাতশত্রুর নিকট যান নাই। বরং সভায় উপস্থিত হইয়াই বালাকি বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজাকে ব্রহ্মের স্বরূপ শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। পরে যখন দেখিলেন—অজাতশত্রু তাঁহার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, তখন লজ্জিত হইয়া রাজার নিকটই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং এই-সকল উপাখ্যান হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্ভাবক এবং ব্রাহ্মণেরা যখন এই বিদ্যালাভের জন্য ব্যগ্র হন, তখন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়েরা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

রাজগণের বিদ্যাবত্তার কারণ।

আমরা উপাখ্যান-ভাগ হইতে জানিতে পারি যে, সে যুগের রাজগণ জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের সভায় থাকিয়া বিদ্যানুশীলন করিতেন। মধ্যে মধ্যে রাজসভায় বিরাট বিদ্বৎসম্মিলন হইত (১৭)। প্রত্যেক রাজাই ইচ্ছা করিতেন যে, তাঁহার সভায় অধিক-সংখ্যক পণ্ডিতের সমাগম হউক, এবং আগন্তুক পণ্ডিতগণের সংখ্যার হ্রাস হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন (১৮)। রাজারা পণ্ডিতগণের বিচার শুনিতে শুনিতে বহু কঠিন সিদ্ধান্তে জ্ঞান লাভ করিতেন। যে ব্রাহ্মণ যাহা জানিতেন, তাহাই রাজসভায় প্রচারিত হইত; সুতরাং বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত রাজা সভায় বসিয়া জানিতে পারিতেন। এইরূপে রাজার পক্ষে জ্ঞানলাভের অনেক সুযোগ ছিল। এইজন্যই বোধ হয় উপনিষদে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেবল কয়েকজন রাজাই ব্রহ্মবিদ্ রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন; কোন সাধারণ ক্ষত্রিয়ের নামে ঐরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজা একজন ব্রাহ্মণের নিকট কোন সিদ্ধান্ত শুনিয়া সে বিষয়ে প্রশ্ন দ্বারা অপর একজন ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিতে পারিতেন, সুতরাং কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলেই প্রমাণিত হয় না যে সে বিষয়টি সকল ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত ছিল। কোন কোন রাজা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন, ইহা দেখিয়া কেবল ক্ষত্রিয়গণই ঐ বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে কোন কোন রাজা কর্ম্মকাণ্ডে পারদর্শী (১৯) ছিলেন বলিয়া আমরা ইহাও মনে করিতে পারি যে কর্ম্মকাণ্ডেও ক্ষত্রিয়গণই ব্রাহ্মণদিগকে শিক্ষা দিতেন।

উপনিষদের আখ্যায়িকায় কর্ম্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে বিরোধ নাই।

উত্তরকালে ক্ষত্রিয় শাক্যসিংহ ও মহাবীর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম এবং কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মত প্রচার করায় এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে উপনিষদের যুগেও ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁহারাই অনুষ্ঠান-প্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানমার্গ দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। স্বজাতির মধ্যে দুইজন মহাপুরুষ পাইয়া বহু ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্বজাতীয় রাজাগণ তাঁহাদিগের পোষকতা করেন।

ক্ষত্রিয়গণ জ্ঞানমার্গের উদ্ভাবক বা পোষক ছিলেন বলিয়াই বুদ্ধ বা মহাবীর যে উত্তরাধিকারসূত্রে উহা তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়া উহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করেন এরূপ মত ভ্রান্ত। যদি তাঁহারা তাঁহাদের মতের কোন উপকরণ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের চিন্তা-স্রোত হইতে লইয়াই থাকেন তাহা হইলে সেই চিন্তা-স্রোত যে ব্রাহ্মণ হইতে প্রবাহিত হয় নাই এমন কথা বলা যায় না। উপনিষদের আখ্যায়িকায় কর্ম্মী ও জ্ঞানীর মধ্যে বিরোধ নাই।

আমরা উপনিষদের আখ্যায়িকার মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের কোন বিরোধ দেখিতে পাই না। যদি ব্রহ্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াই স্বতন্ত্র মত প্রচার করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে এত সম্মান করিতেন না। যেখানেই কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়াছেন, সেখানেই উপদেষ্টা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন।

বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। উপনিষদের আখ্যান হইতে জানা যায় ব্রাহ্মণগণ বিদ্যালোচনা করিতেন, রাজারা তাঁহাদিগকে পোষণ করিতেন এবং আলোচনায় যোগ দিতেন; পক্ষান্তরে রাজারা যজ্ঞ করিতেন, ব্রাহ্মণেরা তাহাতে ঋত্বিক্ হইতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা পরস্পরের সহায় হইতেন (২০)। তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিগত মতবিরোধের কল্পনা নিতান্তই অযৌক্তিক।

আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

উপনিষদের আখ্যানগুলি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, অক্ষরার্থ ছাড়া এগুলির অন্তর্নিহিত অন্য উদ্দেশ্যও আছে। আখ্যায়িকা হইতে আমরা নানারূপ উপদেশ পাইয়া থাকি।

অহংকারে 'স্তব্ধ' 'অনূচানমানী' শ্বেতকেতু পিতার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই (২১)। জনকের সভায় বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণ সকলে যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন (২২)। 'দৃপ্ত' বালাকি অজাতশত্রুকে উপদেশ দিতে যাইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন (২৩)। পরমব্রহ্মজ্ঞ জনকও যখন ভাবিয়াছিলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বোধ হয় তাঁহার নিকট উপদেশ লইতেই আসিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঋষির নিকট নত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (২৪)। এই-সকল আখ্যানের তাৎপর্য্য এই যে বিদ্যাভিমানী প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ঋগ্বেদাদি বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও নারদ আত্মবিদ্ হইতে পারেন নাই (২৪)। ইহা হইতে জানা যায় যে অধ্যয়ন করিলেই পরাবিদ্যা লাভ করা যায় না।

মহাধনশালী রাজা জানশ্রুতি অতি দীন রৈক্বের নিকট ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে বিদ্যা গ্রহণ করিতে যাইয়া প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন (২৫)। এই আখ্যায়িকা দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে যে বিদ্যা-সম্পদের নিকট পার্থিব ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ।

ব্রাহ্মণ্য-গর্ব্বিত শ্বেতকেতু পঞ্চালরাজ প্রবাহণের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া পিতাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তিনি একটা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়াছেন (২৬)। এই আখ্যায়িকার স্পষ্ট উপদেশ এই যে, সামাজিক বিধানে নিম্নস্তরের ব্যক্তিও উচ্চজাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জ্ঞানশালী হইতে পারেন। এইরূপে উপনিষদের প্রত্যেক আখ্যায়িকার মধ্যে কোন না কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত দেখা যায়।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির কথা এতই সত্য যে ব্রাহ্মণ-রচিত উপনিষদেও সে কথা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদেই বহুস্থলে বিদ্যাসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে; বৃহদারণ্যকের চারিটি প্রকরণের শেষে (২৭) চারিটি বংশ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। ঐ তালিকায় জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি, প্রবাহণ প্রভৃতি কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নাই। মুণ্ডকোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির কথাতেও কেবল ব্রাহ্মণগণের নামই পাওয়া যায়। "প্রথমে ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। অথর্ব্বা আবার তাহা অঙ্গিরকে দিলেন, অঙ্গির্ ভারদ্বাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে প্রদান করিলেন (২৮)।"

জাতিবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই যদি ব্রাহ্মণগণ এ-সকল তালিকা হইতে ক্ষত্রিয়ের নাম বাদ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা উপাখ্যান-ভাগেই বা ক্ষত্রিয়ের নিকট স্বজাতির অপমানের কথা লিপিবদ্ধ করিবেন কেন, তাহা বুঝা যায় না।

শঙ্করাচার্য্য "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্" এই গীতাবাক্যের (২৯) অর্থ করিয়াছেন "এই উত্তম পবিত্র জ্ঞান বিদ্যার রাজা, এবং রহস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" স্বাভিপ্রায় সাধনের জন্য 'রাজবিদ্যা' শব্দের রাজার বিদ্যা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-প্রচারিত বিদ্যা এরূপ অর্থ করিলে 'রাজগুহ্যের' কিরূপ অর্থ হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

উপসংহার।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে,—

(১ম) অতি প্রাচীন কাল হইতেই অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত; উপনিষদের যুগ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল না

এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক। (২য়) কেবল যে বানপ্রস্থী বনবাস-কালে আবশ্যক আলোচনা করিতেন বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে, তাহা নহে; ব্রহ্মচারী অরণ্যে বসিয়া উহা পাঠ করিতেন বলিয়াও এই বেদাংশের নাম আরণ্যক। এবং (৩য়) যজ্ঞবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা একই আকর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ভাবক বা প্রচারক, জ্ঞানকাণ্ডও তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা

(১) ঋক্ সং ২, ২, ১০। ২, ৩৪, ৭। ৬, ৭৫, ১৯। ৮, ৩, ৯।
(২) শত ব্রাঃ ১২, ৮, ৩, ২৯। ১০, ২, ৪, ৬। ১১, ২, ৩।
(৩) শত ব্রাঃ ১৩, ৭, ১। শাঙ্খা শ্রৌ ১৬, ১৫, ৫-৬। ১৬, ১৫,২৩। ১৬, ১৬, ৩-৪।
(৪) বৃহ ৩, ১, ১।
(৫) ছান্দো ৫, ১১, ৫।
(৬) বৃহ ৪, ২।
(৭) বৃহ ৪, ১।
(৮) ছান্দো ৪, ১।
(৯) মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ ২।
(১০) অতি বৈ নোঽয়ং রাজন্যবন্ধুরবাদীৎ—শত ব্রাঃ ১১, ৬, ২, ৫। বৃহ ৪, ৩, ১।
(১১) ছান্দো ১, ৮, ৮।
(১২) ছান্দো ৫, ৩, ৭।
(১৩) যোহীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীত, ছান্দো ৫,৩,৪।
(১৪) ছান্দো ৫, ১১।
(১৫) বৃহ ২, ১।
(১৬) প্রতিলোমঞ্চৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াৎ—বৃহ ২, ১, ১৫।
(১৭) বৃহ ৩, ১, ১।
(১৮) বৃহ ২, ১, ১।
(১৯) শত ব্রা ১১, ৬, ২, ৫। ছান্দো ১, ৮, ৮।
(২০) শত ব্রা ৪, ১, ৪, ৬।
(২১) ছান্দো ৬, ১।
(২২) বৃহ ৩, ১।
(২৩) বৃহ ২, ১।
(২৪) বৃহ ৪, ২, ১।
(২৫) ছান্দো ৪, ১।
(২৬) ছান্দো ৫, ৩।
(২৭) বৃহ ২, ৬। ৪, ৬। ৬, ৫। ৬, ৬।
(২৮) মুণ্ড ১, ১।
(২৯) গীতা ১১, ২।

কৃপণের শাস্তি

(Monsieur de la Motteএর গল্প অবলম্বনে)

সে ছিল বড় কৃপণ। আজীবন গতর-ভাঙা খাটুনি খেটে শুধু টাকা রোজ্‌গার করেছে, পয়সাটি তার খরচ করেনি। সবাই বলে সকাল বেলা তার নাম কর্‌লে গৃহস্থের হাঁড়ি ফেটে যায়—এম্‌নি তার সুযশ।

একদিন যমরাজের কাছ থেকে বুড়োর তলব এল—তাকে তখনই বুকের রক্ত দিয়ে সঞ্চিত সিন্দুক-ভরা টাকাকড়ি ছেড়ে উঠ্‌তে হল—কড়া তলব অমান্য করার জোটি নাই।

আঁধার, জমাট আঁধার—তারই ভিতর দিয়ে বুড়ো চল্‌ছে চল্‌ছে। যেতে যেতে ঝড় উঠ্‌ল, কড়্ কড়্ মেঘ ডাক্‌তে লাগ্‌ল, আর তারই মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগ্‌ল। সেই বিদ্যুতের আলোকে বুড়ো দেখ্‌তে পেলে সাম্‌নে বৈতরণী নদী—পাহাড়ের মত তার ঢেউ-গুলি, দৃষ্টিতে তার কূল-কিনারা মেলে না। বুড়ো দেখ্‌লে নদীর উপর পারের সেতু নাই, শুধু খেয়াঘাটের মাঝি সেই ঝড়েও নৌকায় করে' যাত্রীদের পারাপার কর্‌ছে।

বুড়ো বল্‌লে, 'ওগো খেয়া ঘাটের মাঝি, আমায় পার কর্‌তে পার্‌বে?'

'ঐ ত হ'ল আমার ব্যবসা। তা পারের কড়ি কিন্তু এক কড়া কাণা কড়ি। দেখ্‌ছ না কি ঝড়ো হাওয়া।'

ও বাপ! এ ক ক ড়া কা ণা ক ড়ি! বুড়ো আর কথাটি না বলে' সেই ঢেউয়ের মাঝে লাফিয়ে পড়্‌ল।

যমপুরীতে মহা হুলুস্থূল, বুড়ো কিনা খেয়া ঘাটের মাঝিকে ঠকিয়েছে। অম্‌নি সভা বসে' গেল বুড়োর অপরাধের বিচারের জন্য। কেউ বল্‌লে—'ওকে গরম তেলের কড়াইএর ওপর চাপিয়ে দাও।' কেউ বল্‌লে—'কষাই দিয়ে ওর গায়ের চাম্‌ড়া তুলে ফেল, শকুনি দিয়ে চোখ উপ্‌ড়ে দাও, আর শেয়াল কুকুর দিয়ে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেল।' এম্‌নি সব মন্ত্রণা হতে লাগ্‌ল।

বুড়ো এক বিচক্ষণ বিচারক এক কোণে চুপটি করে' বসে' ছিল, সবার শেষে সে বল্‌লে,—'না হে, না, ও-সবে হবে না। ওকে আবার পৃথিবীতেই পাঠিয়ে দাও। সেখানে যেয়ে একবার দেখুক পুত্রপৌত্রেরা ওর সঞ্চিত অর্থ কিরূপে ব্যয় কর্‌ছে। সেই ওর যোগ্য শাস্তি।'

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

স্বদেশীর দ্বিতীয় যুগ

পুরাতন সমস্যা

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয় জীবনকে সবল স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা দেশে প্রথম দেখা গিয়াছিল। তাহার পর আর-এক যুগ ও আন্দোলন আসিয়াছে। মধ্যে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ব্যবধান। এই যুদ্ধ আমাদের বৈষয়িক জীবনের দোষ ও দুর্গতি আরও প্রকট করিয়াছে। তাই আবার আমরা পূর্ব্বেকার মত পল্লীসেবা শিল্পপ্রতিষ্ঠা বাণিজ্যপ্রসারের দিকে মন দিয়াছি।

কিন্তু এই যুগে আমাদের পরনির্ভরতা আরও অধিক হইয়াছে। অনেক স্বদেশী কারবার ফেল হওয়াতে একটা ভয় ও সন্দেহ আসিয়াছে। কুটিরশিল্প আরও অবনতির দিকে গিয়াছে। যুদ্ধের পর বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতা আরও কষ্টকর ও অনিষ্টজনক হইয়াছে। পাট ও তুলার রপ্তানি বন্ধ হওয়াতে কিছুকাল কৃষকের দুর্গতির অবধি ছিল না। বণিকের আধিপত্য কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইয়া দেশবাসীকে অকারণ কষ্ট দিয়াছে। যুদ্ধের সময় মালিক ও ব্যবসায়ীদিগের অন্যায্য লাভের আয়োজন আমাদের বৈষয়িক জীবনের অসহায় ও বিমূঢ় অবস্থার সাক্ষী।

পল্লী-স্বরাজ

উপায় কি? উপায় এক। উপায় সহজও,—কারণ তাহা দেশের যুগপরম্পরার্জ্জিত সমাজ-শাসন-শক্তিকে আশ্রয় ও আধাররূপে পাইবে। তাহাই নূতন শিল্পের রাষ্ট্রের ও সমাজ-ব্যবস্থার একমাত্র সুদৃঢ় পুরাতন কায়েমী ভিত্তি। জীবনোপায়ের পরনির্ভরতা ও বণিকের কূটনীতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—সমবায়। গ্রামের জীবনোপায়ের ব্যবস্থা—কৃষি শিল্প ব্যবসা—সমবেত প্রণালীতে কর, জলসেচন, নদনদী সংস্কার, বনজঙ্গল পরিষ্কার সংঘবদ্ধ হইয়া কর। দুর্ভিক্ষের অনাহার নিবারণের জন্য যৌথ শস্যগোলা স্থাপন কর; গোজাতির উৎকর্ষ ও বীমার ব্যবস্থা কর; শিক্ষা, ধর্ম্ম, আমোদ-প্রমোদ, বিবাদ নিষ্পত্তি সবই পূর্ব্বেকার মত গ্রাম্য পঞ্চায়েতের শাসনে ব্যবস্থা কর; বিলাসের দ্রব্য বর্জ্জন কর; আর যদি কলকারখানা দরকার হয়, সুইজারল্যণ্ড ডেনমার্ক জার্ম্মানীর মত ছোট ছোট তেল ও বাষ্পের কল অথবা তাড়িত শক্তির সাহায্যে কুটিরে তাঁত চালাও, লোহা পিটো, কাঠ চেরো। এই উপায়ে এমন এক কর্ম্মঠ ফলপ্রদ সমবায়-সমাজ গড়িয়া উঠিবে যেখানে আমরা একটা নীরব নির্ব্বিবাদ আত্মনির্ভর জীবনের নূতন সম্পদে ধনী হইব, সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতার ভিতরে থাকিয়াও আমরা তাহার শোষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব, এবং নবীন ও প্রাচীন সভ্যতার সম্মিলনে জড়বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের একটা চূড়ান্ত মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইব। ইহাতে যাহা আমাদের পল্লীসমাজের বিশেষত্ব,—সমূহের উন্নতিসাধনের জন্য একতা ও সমবেত কার্য্যানুষ্ঠান—তাহা সঙ্কীর্ণ গ্রাম ও জাতি পঞ্চায়েতে ও ব্যবসায়ে আবদ্ধ না থাকিয়া জাতীয়তার বলবৃদ্ধি করিবে, এবং পল্লীর কৃষক একটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সামাজিক ও কার্য্যকরী প্রণালীর সঙ্গে সহজ ও সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় লাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিবে।

নূতন সমস্যা

কিন্তু এই যুগের নূতন সমস্যা আসিয়াছে মজুরের জীবনযাত্রা লইয়া। কলের কারখানায়, নীল ও চা-বাগানে, কয়লার খনিতে মালিকরা অপ্রত্যাশিত লাভ করিয়াছে, কিন্তু মজুরের দুঃখের সীমা নাই। এদিকে যুদ্ধের ফলে আহার্য্যাদির মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু মজুরী সে অনুপাতে কিছুই বাড়ে নাই। একদিকে লোভের হঠকারিতা, অপরদিকে প্রতিঘাতের বিমূঢ়তা। আরম্ভ হইয়াছে এমন এক তুমুল সংঘর্ষ যাহার ফলে আমাদের যুগপরম্পরালব্ধ সামাজিক শান্তি একবারে সুদূরপরাহত।

তাই নূতন কথা উঠিয়াছে কাজ নাই কারখানায় ব্যবসা বাণিজ্যে, যে কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য মানুষকে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও কৃত্রিমতার দিকে লইয়া যায়,—সভ্যতার সে-সব ত বিকার। এই বিকারের কথাই আজ যেন সব অপেক্ষা বড় কথা বলিয়া প্রতীয়মান।

কিন্তু কল কারখানা ব্যবসা বাণিজ্য মানুষের অস্ত্র, মানুষের সৃষ্ট সব জিনিষের মত জীবনযাত্রায় টিকিয়া থাকিবার সমাজের হাতিয়ার। অস্ত্রের যে যেমন ব্যবহার করে। মানুষ যদি কলের নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সে দোষ কলের নহে, মানুষেরই। কিন্তু কথা উঠিয়াছে—বুঝি এই কলের সহিত ভারতের মানুষের কোন সামঞ্জস্য হইবার নহে। তাঁত, পুলী, হাতল, সেও ত কল এবং এই কলেরই সাহায্যে ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত জগতের শিল্পব্যবসায়-ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পুরাতন কালের কলে ভারতবর্ষ একদিকে তাহার শিল্পীর সৃজনশক্তি ও সৌন্দর্য্যবোধের অবাধ বিকাশসাধন করিয়াছে, অপরদিকে বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে একটা সদ্ভাব ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, অনৈক্য ও অত্যাচারের বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে দেয় নাই।

নূতন কলের সহিত তাহার যোগাযোগ কি অসম্ভব? নূতন কলের নিকট সে কি আত্মবিক্রয়ের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে না? এ কল হাতে না হইয়া বাষ্পে বা তাড়িতে চলে বলিয়া ইহার কি এমন 'অ-মানুষিক' প্রভাব!

মজুরের কাহিনী

এটা ঠিক, বর্ত্তমান কালে যে-সকল স্থানে কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে সেখানে আমাদের নূতন ও পুরাতনের কোন সামঞ্জস্যের চিহ্ন দেখা যায় না। কল এখানে সমাজের গোড়াপত্তন ভাঙ্গিতেছে। মানুষেরও হাড় মাস পিষিতেছে। স্বাস্থ্য, চরিত্র, মনুষ্যত্ব—সবই বলি প্রদত্ত। সে দৈন্য, সে ক্লেশের ইতিহাস অতি নিদারুণ এবং সে ইতিহাস এখনও গোপন। খনির মালকাটা ও তাহার স্ত্রী খাদে নামিল—সেখানে এক-হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া সে অহোরাত্র কাজ করিতেছে। অনেক সময় উপযুক্ত পরিমাণে কাজ জুটিল না, তখন তাহার মজুরীতে পেট ভরে না। মেট ও সর্দ্দার-মেট বক্‌শীস না পাইয়া টবগাড়ির বোঝাইয়ের হিসাব লইয়া গোলমাল করিল। সেখানেও নিস্তার নাই,—আফিসে গিয়া হয়ত হিসাবের দেরী হওয়াতে সে সেদিন মজুরীই পাইল না। তখন হিসাব-কাগজ জামিন রাখিয়া অতি বেশী দামে সে মুদির কাছে আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইল। কারখানার সর্দ্দাররাও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না। কাজের হিসাব দিবার সময় কিছু ঘুস চাই, না দিলে কাজের পরিমাণ অল্প দেখানো হইবে। 'ওভার্-টাইম্' কাজ চলিতেছে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত হিসাব নাই। কেহ কলে কাজ করিতে করিতে দুর্ঘটনায় মারা পড়িল, তাহার পরিবারের কোন দাবী গ্রাহ্য নহে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে করিতে মজুরণীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল, চিকিৎসকের ব্যবস্থা নাই। কারখানার ভিতর ১২০ ডিগ্রী গরম, কিন্তু হাওয়া যাওয়া-আসার দরজা জানালা নাই। মজুররা কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে বসিতে পাইলে অধিক পরিমাণ কাজ দিনের শেষে দেখাইতে পারে, কিন্তু বসিবার টুল বা পীঁড়ি নাই। সর্দ্দারের সহিত ঝগড়া হইল, মজুরের কাজ গেল—সালিসীর ব্যবস্থা নাই। কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের বাজার মন্দা, অনেক মজুরের কাজ হঠাৎ গেল, বাকী মজুরের পুরা-পুরি কাজ জুটিল না। দলে দলে মজুর গ্রামের দিকে ফিরিল, কিন্তু সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে জমি বন্দোবস্তের উপায় নাই। রোগে, শোকে, আপদ বিপদে মালিক মজুরের স্বার্থ দেখেন না, অথচ তিনি খুব টাকা উপার্জ্জন করেন এবং দেশের অংশীদারেরা লাভের অংশ পাইয়া খুব খুসী থাকে। আইনের অতিরিক্ত সময় কাজ কর, বেগার কাজ কর, বক্‌শীস দাও, আধ ঘণ্টার মধ্যে পরিবার সুদ্ধ খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বাঁশী বাজার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসিয়া পুনরায় কাজে লাগ, ছেলে-মেয়েদের বয়স বেশী করিয়া লিখিয়া দাও, এমন কি সতীত্ব বিসর্জ্জন কর—খনিতে কারখানায় বাগানে সর্দ্দার আড়কাটী মালিকের অবিচারের কাহিনী এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাহা ছাড়া কল পুরুষ-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে, কারণ কল হয়ত স্ত্রী শ্রমজীবীর কাজ দিতে পারে না, শুধু পুরুষেরই সমাগম চাহে। তাই কলের সহর অনেক সময় স্ত্রীবর্জ্জিত সহর। মজুরের পরিবার মজুরের সঙ্গে আসিতে পায় না,—সে থাকে একা এবং তাহার অসংযত আমোদ বা আসক্তি বাধা দিবার জন্য না আছে তাহার পরিবারের

নীরব ভর্ৎসনা, না আছে পঞ্চায়েতের অলঙ্ঘ্য বিধান। আবার এই মত্ত আমোদ বা আসক্তি না থাকিলে সে বাঁচে না, কারণ কল যে তাহার চোখ কান হাত পা অবশ করিয়া দেয়। একটা উৎকট স্নায়বিক উত্তেজনা ভিন্ন সে পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বা আনন্দ পায় না। তাহার পর ক্ষুদ্র সেঁতসেঁতে বস্তিতে বাস,—খড়, খোলা, কখনও বা শুধু হোগলাপাতার ঘর, অথচ ঘরের ভাড়া অত্যন্ত অধিক, সেখানে দিনের বেলায় আলো না জ্বালিলে কিছুই দেখা যায় না। সঙ্কীর্ণ জায়গায় কোন রকমে পুরুষ স্ত্রী নির্ব্বিশেষে মাথা গুঁজিয়া থাকা, না আছে লজ্জা, না শ্রী—সম্মুখেই অপরিষ্কার গলি, আবর্জ্জনারাশির মত সেখানে সব সময়েই কুৎসিত আলাপ ও অকথ্য গালাগালির বিনিময়। নিকটে মদের দোকানে মজুর তাহার মজুরীর অর্দ্ধেকের উপর ব্যয় করিয়া সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিতে চেষ্টা করে। দলবদ্ধ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া আপনাকে দলের মধ্যে ঠিক রাখে। মদের দোকানে তাহার শিশুর অনাহার নাই, তাহার ঘরের অন্ধকার পূতিগন্ধ নাই, সেখানে আছে একটু আরাম আমোদ ও আলো।

কারখানার মালিকরা উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ বা শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে কোন দায়িত্ব স্বীকার করেন না। মালিক লাভ করিতেছে শতকরা ৫০০, কিন্তু মজুরের পারিশ্রমিক অতি অল্প হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, শতকরা ১০। কুলিদের মানুষ করিবার কোন চেষ্টাই নাই। শ্রমজীবী-সংঘ ও সম্মিলন গঠিত হইতেছে, কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষা ধর্ম্মঘট প্রভৃতির জন্য চাঁদার ব্যবস্থা নাই, নিয়মকানুন নাই, শিক্ষিত ধুরন্ধর নাই, সংহতি-কার্য্যসাধন-ব্যবস্থা নাই। শ্রমিক ও মালিকের বিরোধে ধর্ম্মঘট ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে অনাহার ও ক্লেশ। বিরোধ মিটে খুব কষ্টে এবং শেষ মীমাংসার কোন আয়োজন নাই।

কল তুলিয়া দেওয়া

মজুরদিগের বর্ত্তমান কার্য্যরীতি আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে, নূতনভাবে, শিল্পপ্রণালী না গড়িয়া তুলিতে পারিলে আমরা ইউরোপের গত শতাব্দীর ধনী ও শ্রমজীবীর সংঘর্ষ ও সমূহ-তন্ত্রের নিদারুণ ইতিহাস এদেশে পুনরাবৃত্তি করিব। কলের সহিত মানুষের নূতন সম্বন্ধ-স্থাপন একান্ত প্রয়োজন—কল মানুষের ভৃত্য, কলকে যদি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, ধনী ও শ্রমজীবী মিলিয়া কলকে সমাজ-সেবায় নিয়োজিত করিতে পারি, তবেই কলের জীবন সার্থক হয়। তাহা করা যায়। অধিকন্তু ইহা অসম্ভব মনে করিয়া যদি আমরা রুশিয়ার সমূহবাদীদিগের মত কল তুলিয়া দিই, তাহা হইলে আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। শুধু চরকা, তাঁত, কামারশালা, ঢেঁকিশালা, জাঁতা, উদূখল লইয়া থাকিলে আমরা আর বাঁচিব না, কারণ জাহাজে রেলগাড়িতে চড়িয়া বণিক যে তুলাদণ্ড হাতে লইয়া আসিয়াছে একবারে গ্রামের হাটের মাঝখানে। সে তুলাদণ্ড প্রাচীন ও নবীনের বিভিন্নতা বিচার করে না, সে ওজনে কম বেশী ছাড়া আর কিছু জানে না, তা জিনিষ-বিজ্ঞানের দ্বারাই হউক বা অজ্ঞানের দ্বারাই হউক! তাহাতে দেশের অশান্তি উপসর্গ আসুক বা না আসুক, তার জিনিষ বিক্রয় হইলেই হইল।

কল আয়ত্ত করা

কলকে আয়ত্ত করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে মালিক ও বণিকের লোভ হইতে রক্ষা করা। কল-কারখানা ও ব্যবসায়ে মালিক মজুরের সমবেত স্বামিত্ব, অন্তত সমবেত দায়িত্ব, চাই। তাহা নির্ব্বিবাদে ও স্বাভাবিক ভাবে আসিবে যদি আমরা দিন দিন অধিকতর তাড়িতশক্তি কলকব্জা-চালনে লাগাই। বাষ্প ও তাড়িত শক্তির শিল্পে নিয়োগে তফাৎ এই—তাড়িত শক্তির ব্যবহারে ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত ও এক কেন্দ্রে ক্রমশঃ বিরাট হইতে বিরাটতর হয় না। বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়িত শক্তি লইয়া যাওয়া সহজ, তাহাতে গড় খরচ কমিবে, বাষ্প-চালিত কলের মত বাড়িবে না। এইরূপে তাঁতীদের গ্রামে, কামারশালায়, লোহার কারখানায়, তেলের কলে, দূরে চিনির বা চাউলের কলে তাড়িত শক্তি পৌঁছাইয়া দিয়া পল্লীগ্রামকে ক্রমশঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের ধর্ম্মে দীক্ষিত করা যায়। নগরে বা কলকারখানায় বহু লোক একত্রে বাস ও কাজ করিবার জন্য যেসব অমঙ্গলের সৃষ্টি করে তাহার প্রতিরোধ হইবে। তাড়িতের সাহায্যে

কুটিরশিল্প অধিকতর ফলপ্রদ হইলে তাহার অনেক স্বাভাবিক সুবিধাহেতু কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় সে সক্ষম হইবে। অপরদিকে জার্ম্মানী বেল্‌জিয়াম সুইজারল্যণ্ডের মত ছোট ছোট কলকব্জি চালাইলে এখানে সমাজব্যবস্থার সমূহ-আদর্শের প্রাবল্যহেতু কারখানার কার্য্যপ্রণালীতে শ্রমজীবীগণের দায়িত্ব ও শাসন এবং কারখানার মূলধনে ও লাভে অবশেষে তাহাদের স্বামিত্ব স্থাপনও খুব অসম্ভব নহে। তখন ব্যবসায়ের লাভ লোক্‌সান বণিক ও মালিক শ্রেণীতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া প্রসার লাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে মজুর ও মালিক, মালিক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে স্বার্থবিনিময়ের ও সদ্ভাব স্থাপনের নূতন প্রকার ভাবুকতা চাই।

কলচালনে সমূহের দায়িত্ব

সে ভাবুকতা আসিলে দেশের গ্রামে গ্রামে তাড়িত অথবা তেল ও বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেখানে মালিকের অপেক্ষা সমূহেরই কর্ম্মকুশলতার মহিমা প্রকটিত হইবে। দেশের নানাস্থানে—নদীর ধারে, চাউলের হাটের কাছে, আকের ক্ষেতে—এখন এইরূপ শিল্পব্যবস্থার পরীক্ষার অভিনব প্রণালী চাই। এইরূপ আয়োজন হইলে ক্রমে পল্লীগ্রাম হইতে সুবাতাস বহিয়া নগরের কারখানার আবহাওয়া বদলাইবে। এখন যেমন সেখানে মালিকের দুর্দ্দমনীয় লোভ ও মজুরের দায়িত্ববোধহীন বিদ্রোহ দেখা গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে উভয়ের দায়িত্বজ্ঞান, আদান প্রদান রীতি ও ভবিষ্যৎ বিচার, দেখা যাইবে। ক্রমে আসিবে মালিক ও মজুর শ্রেণীর ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ স্বার্থ-পরতাকে দমন করিবার জন্য লাভ-লোক্‌সানের দায়িত্বে ও কারখানা পরিচালনে সকলের পাকা অধিকার,—কারখানায় স্বায়ত্ত শাসন। সকল শ্রেণী যাহাতে পরস্পরের ব্যথার ব্যথী হয় তাহার জন্য বর্ত্তমান শ্রমিক ও মালিকের সম্বন্ধ এইরূপে নূতন করিয়া গড়া চাই। শুধু শিল্পপ্রণালীতে নহে, উপযুক্ত বাসস্থান, উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত আমোদ প্রমোদ ও শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে কল মজুর ও মালিকের মধ্যে ব্যবধান দূর করিবে।

শিল্প-স্বরাজ

ইহাই ধনবিজ্ঞানের সহজ পথ এবং ইহাই সিদ্ধির পথ। মানুষ আজ কলের সাহায্যে মানুষকে অত্যাচার করিতেছে বলিয়া, মানুষ ও শিল্পব্যবস্থার দোষ না দিয়া এবং কলের দোষ মনে করিয়া আমরা যদি শুধু হাতুড়ী রেতি নেহাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকি তাহা হইলে ইহা নিতান্ত হাস্যকর, দেশকালকে অগ্রাহ্য করার কাজ হইবে। তাহা আধ্যাত্মিকেরও বিপরীত হইবে। কারণ যে অধিকতর বিশ্রামের অবসর কলের ব্যবহার সাপেক্ষ তাহা না পাইলে জীবনটা শুধু জীবনযাত্রার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, উচ্চতর জীবনের কোন সুযোগই ঘটিবে না।

ভারতবর্ষের একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত ভূমি-ব্যবস্থায়, তাহার জাতি পঞ্চায়েতে ও ব্যবসায়ে, তাহার গ্রাম্য-শাসনে, তাহার সমাজ দল ও শ্রেণীর সমবায়ে, তাহার ধর্ম্ম ও সমাজবন্ধনে একটা স্বাবলম্বী সমূহভাব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এদেশে আমরা কলকারখানা এমন ভাবে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি যাহা আমাদের সমাজ-গ্রন্থি ছিঁড়া দূরে থাক তাহাকে নূতন করিয়া বুনিয়া ধনবিজ্ঞানের অব্যর্থ নিয়মা-নুসারে একটা সরল আত্মনির্ভর সমবায়-জীবনের সূত্রপাত করিবে। আমাদের গ্রাম্য সমাজে ভূমির ব্যক্তিগত স্বত্বভোগ সমূহের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত। আমাদের পুষ্করিণী বাঁধ সাধারণের, আমাদের জলসেচন-নালী ও গোচারণ-ভূমির উপর সাধারণের অধিকার। বিদ্যালয় ও মন্দিরের কার্য্যকলাপে, গ্রাম্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থায়, বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দান প্রতিষ্ঠায়, আমরা সেই একই সমূহভাবের কার্য্যকারিতা দেখি। তাহাকে কি আমরা বর্ত্তমান শিল্পপ্রণালীর ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিতে পারিব না, যাহাতে শিল্প অত্যাচারী না হইয়া সমাজের সেবক হয়?

শিল্পপ্রণালীতে মজুর ও মালিকের সম্বন্ধ সমগ্র সমাজের কল্যাণকল্পে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলাই

স্বদেশীর এই দ্বিতীয়যুগের আমাদের প্রধান দায়িত্ব। ব্যবসায় চালন ও শাসনের দায়িত্ব ও অধিকার সকলের মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়ার একটা সুদৃঢ় ফলপ্রদ ব্যবস্থা যদি আমাদের শিল্পপ্রণালী হইতে আমরা আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে শুধু আমাদের নহে, পাশ্চাত্যেরও মঙ্গল। কারণ পাশ্চাত্য জগৎ শ্রেণী-সংঘর্ষের ভীষণ ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া এখন চারিদিকে আলোক-রেখা খুঁজিতেছে। সংঘবাদী রুশিয়ার শিল্প ও সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্য স্থাপনের বিভীষিকা বুঝি সব আলোকই নিবাইয়া দিয়া সমগ্র ইউরোপের উপর এখন একটা দুর্ভিক্ষ ও ধ্বংসের করাল ছায়া ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছে। প্রাচ্য গ্রাম্য সমাজ যে যুগপরম্পরানুষ্ঠিত জীবনোপায়ের ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা দমন ও সঙ্গে সঙ্গে সমূহেরও অত্যাচার প্রতিরোধ করিয়াছে তাহা বহু শতাব্দীর মধ্য দিয়া প্রথম অরুণপাতের মত দেশ-দেশান্তরে প্রতিভাত হইয়া নবজীবনের পথ দেখাইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্মপূজা

(পণ্ডিত-তত্ত্ব)

ধর্ম্ম-পূজার পুরোহিতকে পণ্ডিত বলে। সংস্কৃতে পণ্ডিত শব্দে যা বুঝায় এদের সে আখ্যা দেওয়া যায় না। ধর্ম্ম-পূজার আর-এক নাম হচ্ছে পণ্ডিত-পদ্ধতি; তার কারণ হচ্ছে রমাই পণ্ডিত নামে কোনো ব্যক্তি এই ধর্ম্মমত প্রচার করেছিলেন বলে' কিম্বদন্তী চলে' আসছে। এ ছাড়া ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস চার যুগে চার পণ্ডিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রচার করেছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে শেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত, রমাই বা রামাই পণ্ডিত। শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজাবিধানেই এঁদের নাম পাওয়া যায়; ধর্ম্ম-মঙ্গলগুলিতে এক রামাই পণ্ডিত ছাড়া আর কারো নাম আছে বলে' মনে হয় না। শূন্যপুরাণের মতে এই চার পণ্ডিতকে পূজার স্থানের চার দিকে স্থাপন করা হতো। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে চার পণ্ডিত দেখা যায় তা নয়; কয়েক জায়গায় পাঁচ জন-পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তখন দিকের বদলে দ্বারের উল্লেখ দেখা যায়। পাঁচ পণ্ডিত পাঁচ দ্বারে অধিষ্ঠিত। এই পঞ্চম পণ্ডিতের নাম গোঁসাই পণ্ডিত।

নগেন্দ্রবাবু শূন্যপুরাণের ভূমিকায় লিখেছেন যে ময়নাপুর ও জামালপুরের বিখ্যাত ধর্ম্মের গাজনে পণ্ডিতদের স্থাপন করার বিধি এখনো প্রচলিত আছে। তবে তিনি সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেননি বলে' বেশী কিছু জানা যায় না। আবার এই পণ্ডিত সাজানোর অনুরূপ পদ্ধতি মধ্যযুগের বৌদ্ধদের বিদ্যা-আয়তনে দেখা যায়। বিক্রমশিলার বিদ্যা-আয়তনে ছয়টি দ্বারে পণ্ডিত-দ্বারপাল থাকতেন; প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁদের নিজ নিজ শিষ্য থাকতো। যে-সব ভিক্ষু জ্ঞানে বিদ্যায় নাম করতেন তাঁরাই সেই-সব দ্বারে থাকতে পেতেন।* সেটা ছিল সম্মানের পদ; আমাদের চোবে দোবে তেওয়ারীর পদের সঙ্গে তাদের পদ মিলিয়ে দেখলে চলবে না। আমার মনে হয় ধর্ম্মপূজায় পণ্ডিতদের দ্বারে রাখার প্রথাটা বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামের দ্বার-পণ্ডিতের অনুকরণেই করা হয়েছিল। তবে এ ছাড়া আরও কিছু যে ছিল তা আমরা এখনি দেখবো।

বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রই শূন্যপুরাণ পড়তে গিয়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে' থাকবেন যে উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত পণ্ডিতদের নামকরণের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। একটা কোনো অভিপ্রায় বা অর্থ বোঝাবার জন্য যে একটা রূপক নাম সৃষ্ট হয়েছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। শেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই এই চার

* পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখিত "Indian Medieval Logic," p. 151. বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে উদ্ধৃত।

নামের সঙ্গে চারটি রঙের যোগ আছে। যথা— শ্বেত, নীল, কাংস ও রাঙা। রামাই শব্দ রাঙাই শব্দ থেকে হয়েছে, এ কথা প্রসঙ্গচ্ছলে শহিদুল্লা সাহেব আমাকে বলেন। সুতরাং এই চার পণ্ডিতের সঙ্গে চারটি রঙের যোগ অবশ্যম্ভাবী। এখন দেখা যাক্ এই চার রঙের উৎপত্তি কোথায়।

নেপালে যে বৌদ্ধধর্ম্ম আছে সেটিকে বেশ একটি সুস্পষ্ট প্রণালীতে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা হয়েছিল। আদি-বুদ্ধ তাঁদের পরব্রহ্ম। তিনি সৃষ্টিকার্য্য চালাবার জন্য পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধ সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চ ধ্যানী-বুদ্ধের নাম হচ্ছে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি। এঁদের তিনজন গত হয়েছেন; চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ হচ্ছেন বর্ত্তমান জগতের নিয়ন্তা। অমোঘসিদ্ধি হচ্ছেন পঞ্চম ধ্যানীবুদ্ধ যিনি আস্‌বেন। বৌদ্ধদের ত্রিকায়-তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক বুদ্ধের তিনটি করে' কায়া আছে। সেগুলি তিনটি স্তরের জিনিষ। পৃথিবীতে সেই বুদ্ধ আছেন মানুষী বুদ্ধরূপে—তাঁদের মধ্যে যে তিনজন গত হয়েছেন, তাঁদের নাম হচ্ছে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ। বর্ত্তমান মানুষী বুদ্ধের নাম হচ্ছে শাক্যসিংহ; আর ভবিষ্যতের বুদ্ধের নাম হচ্ছে মৈত্রেয়ী। ত্রিকায়ের এই স্তরকে দার্শনিকগণ নাম দিয়েছেন নির্ম্মাণ-কায়। এর পর হচ্ছে ধ্যানীবুদ্ধ, যাঁরা নির্ব্বাণ লাভ করেছেন;—তাঁদের অবস্থাকে বলা হয়েছে ধর্ম্মকায়। আর তৃতীয় অবস্থায় যাঁরা আছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে বোধিসত্ত্ব। তাঁরা আছেন সম্ভোগ-কায়ে। (A. Getty—Northern Buddhism, p. 10)। মোটামুটি সংক্ষেপে এই হচ্ছে বৌদ্ধদের বুদ্ধতত্ত্ব (Buddhalogy)।

এই-সব ধ্যানীবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মূর্ত্তি উপাসকেরা কল্পনা করেছেন, চিত্রীরা পটে এঁকেছেন, ভাস্করেরা পাথরে কুঁদেছেন, ছাঁচে ঢেলেছেন। নেপালে, তিব্বতে, চীনে, জাপানে এঁদের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি বা চিত্রকে বুঝ্‌বার জন্য পৃথক পৃথক চিহ্ন আছে। প্রথম চেনা যায় মুদ্রা দিয়ে; তারপর জানা যায় সহচর দিয়ে; আর চেনা যায় রঙ দিয়ে। নেপালে তিব্বতে ধ্যানীবুদ্ধদের যে-সব চিত্র পাওয়া যায়, সেগুলির বর্ণের মধ্যে বিশেষ চিহ্ন আছে। যেমন বৈরোচনকে তাঁরা শ্বেত বর্ণ দিয়ে ও অক্ষোভ্যকে নীলবর্ণ দিয়ে, রত্নসম্ভবকে পীত বা স্বর্ণ বর্ণ দিয়ে, অমিতাভকে রক্ত বর্ণ দিয়ে ও অমোঘসিদ্ধিকে হরিৎ (সবুজ) বর্ণ দিয়ে আঁকতেন। এখন যদি আমরা বলি যে ধর্ম্ম-পূজার পণ্ডিতগণ সাবেকী আমলের ধ্যানীবুদ্ধের নূতন সংস্করণ, তবে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই—

প্রথমে দেখুন, ধ্যানীবুদ্ধ ও পণ্ডিতদের পর্য্যায় ঠিক রয়েছে। ১ বৈরোচন (শ্বেত বর্ণ) এদিকে শ্বেতাই; ২ অক্ষোভ্য (নীলবর্ণ) এদিকে নীলাই পণ্ডিত; ৩ রত্ন-সম্ভব (স্বর্ণবর্ণ বা পীত) এদিকে কংসাই পণ্ডিত। কাংস বর্ণ ও স্বর্ণ বা পীতবর্ণের মধ্যে বেশী তফাৎ নেই। ৪ অমিতাভ (রক্তবর্ণ) এদিকে রামাই পণ্ডিত। রামাই শব্দ রাঙাই থেকে হয়েছে নিশ্চিত। বর্ণের মিল কর্‌বার জন্য এ নামের সৃষ্টি। আরও অধিক বল্‌বার আগে নীচে দুটা ছক্ দিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বো।

বুদ্ধ-তত্ত্ব

ধ্যানীবুদ্ধ	মানুষীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব	তারা	স্থান	ইন্দ্রিয়	ভূত	বর্ণ
১। বৈরোচন	ক্রকুচ্ছন্দ	সমন্তভদ্র	বজ্রধাত্বশ্বরী	মধ্য	শব্দ	ব্যোম	শ্বেত
২। অক্ষোভ্য	কনকমুনি	বজ্রপাণি	লোচনা	পূর্ব্ব	স্পর্শ	মরুৎ	নীল
৩। রত্নসম্ভব	কাশ্যপ	রত্নপাণি	মামকী	দক্ষিণ	দৃষ্টি	তেজ	স্বর্ণ বা পীত
৪। অমিতাভ	শাক্যমুনি	পদ্মপাণি	পণ্ডরা	পশ্চিম	স্বাদ	অপ	রক্ত
৫। অমোঘসিদ্ধি	মৈত্রেয়ী	বিশ্বপাণি	তারা	উত্তর	গন্ধ	ক্ষিতি	হরিৎ

পণ্ডিত-তত্ত্ব

পণ্ডিত	কোটাল	আমিনী	স্থান	যুগ	গতি (অনুচর)
১। শেতাই	চন্দ্র	বসুয়া	পশ্চিম	সত্য	৪০০ গতি
২। নীলাই	হনুমান	চরিত্রা	দক্ষিণ	দ্বাপর	৮০০ ,,
৩। কংসাই	সূর্য্য	গঙ্গা	পূর্ব্ব	ত্রেতা	১২০০ ,,
৪। রামাই	গরুড়	দুর্গা	উত্তর	কলি	১৬০০ ,,
৫। গোঁসাই	উলুক	অভয়া	—	শূন্য	অনেক গতি

এখন এ বিষয়ে দুই-একটা ঐতিহাসিক অনুমান করাটা খুব দুঃসাহসিক কার্য্য বলে' নাও প্রতিপন্ন হতে পারে। ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক যিনিই হউন না কেন, তিনি একটা মতলব বা প্ল্যান্ থেকে এটা করেছিলেন বলে' মনে হয়।

প্রথমে ধর্ম্মপূজা হুবহু বৌদ্ধধর্ম্ম যে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য; এবং এটাও ঠিক যে যেরূপ আকারে ধর্ম্মপূজাকে দেখ্‌তে পাই, সেটা স্বাভাবিক অধোগতির ধ্বংসাবশেষ নয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের একদল লোকের একটা কিছু গড়ে' তোল্‌বার চেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রামাই বলে' কোনো লোক এইটাকে সৃষ্টি করেছিলেন কি? বৈরোচন, অক্ষোভ্য প্রভৃতি বুদ্ধের বর্গের সঙ্গে মিল করে' একটা প্রণালী বা পদ্ধতি খাড়া করে' তোলার ইচ্ছা তাঁর ছিল। অমিতাভ বুদ্ধ যেমন চতুর্থ বুদ্ধ, তেমনি রামাইও চতুর্থ পণ্ডিত। তিনজন বুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব যুগে গত হয়েছেন—তিনজন পণ্ডিত সত্য দ্বাপর ত্রেতা যুগে ছিলেন। বর্ত্তমান জগৎ অমিতাভ-শাক্যমুনির পূজক, কলিযুগে রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক। পঞ্চম বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি মৈত্রেয়ী; এদিকে গোঁসাই পণ্ডিত; তাঁর সম্বন্ধে সবই অস্পষ্ট—তাঁর যুগ শূন্য, ও গতি 'অনেক'। এ-সবের মধ্যে বেশ একটা উদ্দেশ্যগর্ভ প্রণালী রয়েছে সেটা সহজে বুঝা যায়।

তার পর হচ্ছে বোধিসত্ত্বদের কথা। সেখানেও মিল রয়েছে।

"The five Dhyani Bodhisattvas correspond with the five Dhyani-Buddhas and differ in many respects from the other celestial Bodhisattvas. * * * Each Bodhisattva in the group of five is evolved by his Dhyani Buddha. He is a reflex, an emanation from him; in other words, his spiritual son. Certain northern Buddhist sects that interlink the dogmas of the *Trikaya* and the *Triratna* look upon the Dhyani-Boddhisattva as the active creator. * * * According to the system of Adi-Buddha, the Dhyani-Boddhisattva receives the active power of creation from the Adi-Buddha through the medium of his spiritual father, the Dhyani-Buddha." (A. Getty—Gods of Nothern Buddhism, p 44).

শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজাবিধানে আমরা 'কোটাল' * নামে এক শ্রেণীর উপ-দেবতার উল্লেখ পাই। এঁদের কাজ অনেকটা বোধিসত্ত্বদের মত। 'দুআরে কোটাল সভ জাগে নিরন্তর'; সৃষ্টি কাজে তাঁদেরই হাত বেশী। উলুক হচ্ছেন একজন কোটাল, সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁর হাত যে কতখানি তা আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি। আবার হনুমানকে না হলেও ধর্ম্মঠাকুরের এক দণ্ড চলে না। তার নিদর্শন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বিস্তর পাওয়া যায়। ধর্ম্মঠাকুর ত নির্বিকার হয়ে বসে' আছেন, মাঝে মাঝে তাঁর আসন টল্‌ছে, আর তিনি চোখ খুলে হনুমানকে জিজ্ঞাসা করছেন—'বাছা ব্যাপার কি?' হনুমানই বুদ্ধি পরামর্শ সব দিচ্ছেন। 'বীর হনু বলে তবে ব্যাজ অকারণ। চল প্রভু বলি সঙ্গে চলে দেবগণ॥' (ঘনরাম, পৃঃ ৩৬)। 'বীর হনুমানে প্রভু সুধান বচন। মন উচাটন্ করে কিসের কারণ॥' (ঘনরাম পৃঃ ১৯২) ইত্যাদি। সুতরাং কোটালদের কল্পনা করা হয়েছিল বোধিসত্ত্বদের দেখে এ কথা বলা খুব অযৌক্তিক নাও

* কোটাল শব্দটি কোটপাল হইতে হইয়াছে—অর্থ 'guarding the fort', the titular deity of a fort.—Vastuvidya, XI, 23, 53 (Monier Williams' Dict.).

হতে পারে। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর যত পূজা পেয়ে থাকেন, তত পূজা অমিতাভ পান কি না সন্দেহ। বোধি-সত্ত্বদের পূজা না করে' যেমন উপায় নেই, তেমনি ধর্ম্মের মন্দিরে প্রবেশ লাভ করতে হলে কোটালদের রীতিমত তুষ্ট করার আয়োজন করতে হতো। চন্দ্র কোটালের কাছে সোনার কড়ি, হনুমান কোটাল যিনি নীলাই পণ্ডিতের দ্বার রক্ষা করছেন তাঁকে দিতে হতো রূপার কড়ি, ইত্যাদি করে' সকলকে কিছু দিতে হতো। তবে 'কপাট ঘু।এ দিল চন্দ্র মহাসএ।' 'কপাট ঘুচাএ দিল হনুমন্ত মহাসএ।' 'কপাট ঘুচাএ দিল সুরজ মহাসএ।' ইত্যাদি।

বুদ্ধ-তত্ত্ব ও পণ্ডিত-তত্ত্বের তৃতীয় মিল হচ্ছে শক্তি। পূর্ব্বের ছকে দেখানো গিয়েছে যে মহাযান-বুদ্ধতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চতারা বা শক্তির কল্পনা হয়েছিল—যেমন, আদিবুদ্ধের সঙ্গে আদ্যা-শক্তির কল্পনা। পণ্ডিত-তত্ত্বের মধ্যেও দেখা যায় যে পাঁচজন 'আমিনী' পঞ্চ পণ্ডিতের সঙ্গে আছেন—বসুয়া, চরিত্রা, গঙ্গা, দুর্গা, অভয়া; আর ওদিকে হচ্ছেন বজ্রধাত্বশ্বরী, লোচনা, মামকী, পণ্ডরা, তারা। পঞ্চ আমিনীর নাম দেখে মনে হয় তাঁরা বাস্তব কামিনী ছিলেন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পূজার শক্তির কাজ করতেন। তাই তাঁদের নাম ধর্ম্মপূজার সঙ্গে রয়ে গেছে। ধর্ম্মপূজার মধ্যে তান্ত্রিকতার স্থান সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলবার ও ভাববার আছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে।

তিনটা বড় বড় মিল ছাড়া ছোটখাটো আরও দুই-একটা মিল খুঁজলে পাওয়া যায়। বুদ্ধদের স্থান নির্দ্দেশ, পণ্ডিতদেরও স্থান নির্দ্দেশ করা হতো। রীতিটা ঠিক আছে, বিস্তৃতিতে গোল ঢুকেছে। ঐতিহাসিকত্বের দিক থেকে ক্রকুচ্ছন্দ প্রভৃতি মানুষী বুদ্ধেরা হয় তো অতীত কালের লোক ছিলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে শ্বেতাই, নীলাই, কংসাই সত্য দ্বাপর ত্রেতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এই মিল কেন হলো এ সম্বন্ধে অনেক রকমের কল্পনা চলতে পারে। কিছু পূর্ব্বেই একটা কল্পনা করা হয়েছে। রমাই বা রামাই নামে কোনো ব্যক্তি নিজেকে 'কেন্দ্র' করে' এই পদ্ধতিটাকে গড়ে' তুলেছেন। আবার কেউ বলতে পারেন যে সবটাই কাল্পনিক অথবা রূপক, রামাই বলে' কেউ ছিল না, 'রাওাই' কথাটাই ঠিক। এসব কথার পরিষ্কার জবাব দিতে হলে 'রামাই' সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলতে হয়। সেটা আর-একবার করা যাবে, এ প্রবন্ধের সঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়া যাবে না।*

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

* প্রবন্ধগুলির অনেক জায়গায় বাহুল্য-ভয়ে সিদ্ধান্তের মূল তথ্যের উল্লেখ করি নাই। ইংরেজীতে লিখিত Social History of Bengal during the middle ages নামক গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ হইতে চুম্বক করিয়া প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে। সেই পরিচ্ছেদ কয়টি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

সন্ধ্যা
চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে।

চরকার সূতা

গত মাসের 'প্রবাসী'তে "চরকা ও খদ্দর" পড়িয়া কেহ কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কেহ কেহ কিছু ভুল দেখাইয়াছেন। আমি সূত্রকর্তন কিম্বা বস্ত্রবয়ন কলা জানি না। সামান্য বুদ্ধিতে যাহা মনে হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি। এবার চরকার সূতা দেখি। আগামী বারে খদ্দর দেখিব।

(১) কেমন চরকা চাই।

(১) চরকা এত ভারী হইবে যে সূতা কাটিবার সময় নড়িবে না। সূতা কাটা, তুলী দিয়া কাগজে রং লেপা নয়। চরকা ঘুরাইতে থামাইতে, উল্‌টা ঘুরাইতে হয়। তখন চরকার মাথা (টেকোর দিক) নড়িতে থাকিলে কাজ হইবে না। এই হেতু চরকার বৈঠনা (base) বড় হওয়া চাই। (২) চরকা এমন মজবুৎ হইবে যে ছেলেপিলের ঘরে কিছুকাল টিকিবে। সেকালের চরকা তিন পুরুষ দেখিত, এমন চরকা দেখিয়াছি যাহার হাতার গোল ছিদ্র আঙ্গুল লাগিয়া লাগিয়া লম্বা হইয়া গিয়াছে। সে কালে চরকা সখের জিনিস ছিল না, কাচের আলমারীতে সাজাইয়া রাখা হইত না। ছেলেপিলে হাত দিবেই, ঘুরাইবেই। (৩) ভারী চরকা ঘুরাইতে একটু জোর অবশ্য লাগে। একটু জোর লাগা দরকার, নচেৎ যথা-সময়ে থামাইতে পারা যায় না। হাল্‌কা চরকার বিশেষ দোষ, ইহার বেগ সমান থাকে না। বেগ সমান না হইলে সূতার পাক সমান হয় না, সমান মোটা হইয়া সূতা টানা হয় না। চক্রের মাঝে পাথরের পিণ্ড আঁটিবার হেতু এই। চক্র কেবল বেগবর্ধক (multiplying wheel) নয়, বেগ-সমীকারকও (flywheel) বটে, পাক সমান রাখে। (৪) চক্রের 'দাঁড়া' (অক্ষদণ্ড) কাঠেরই ভাল, একটু জোর ধরে। একটু জোর চাই। বেশী হইলে তেল দিতে হয়। "নিজের চরকায় তেল দেওয়া"—কেবল টেকোয় নয়, চক্রের আধারেও (bearing) বটে। যে সব নব্য চরকা হাল্‌কা করা হইতেছে, লোহার বা পিতলের 'দাঁড়া' ও আধার করা হইতেছে, সে-সব আনাড়ীর গড়া। তা ছাড়া, একটা ইস্ক্রুপ খসিয়া গেলে যে-দেশের লোক অন্ধকার দেখে, সে দেশে লোহা পিত্তলের চরকা গড়িবার আগে কামার গড়া আবশ্যক। (৫) টেকো সিকি ইঞ্চি মোটা লোহার (ইস্পাতের উত্তম) শিক দুই দিকে সূচলা। মাঝে মোটা, মাল-সূতার টানে বাঁকে না, মাল-সূতাও বেড়িয়া ধরিবার একটু জায়গা পায়। কিন্তু আধারের অংশে সরু হওয়াতে ঘর্ষণ কম হয়। টেকোর মুখ সরু হওয়াতে কাটা সূতা আটকাইয়া যায়, খুলিয়া লইতেও পারা যায়। (৬) টেকোর আধার এক টুকরা দোড়ীর ফাঁশ। কিন্তু যে-সে দোড়ী ভাল নয়। মুঞ্জ (পূর্ববঙ্গে বলে মু-জ) নামে এক তৃণ আছে। ইহা শর গাছের তুল্য; এমন কি শর ও মুঞ্জ পৃথক কি না, তাহাই বলিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, এই মুঞ্জ হইতে দোড়ী হয়। শর-গাছের মঞ্জরীর ত্বক হইতেও হয়। ইহার নাম শর-মাঁজা। এই দোড়ী মসৃণ ও স্থিতি-স্থাপক, অথচ ঘর্ষণে শীঘ্র ক্ষয় পায় না। বেতের পাতলা ত্বক দিয়াও টেকোর আধার হইতে পারে। (৭) মাল-সূতা টেকো ও চক্রকে মাল্যাকারে বেড়িয়া থাকে। ইহা বরাবর সমান টানে থাকা চাই। ঢিলা হইলে টেকো সমান ঘোরে না; কখনও বা আদৌ ঘোরে না, পিছলাইয়া পড়ে। তখন সূতা সমান মোটা বাহির হয় না, সমান পাকও পায় না। টেকো থামাইবার কিংবা উল্‌টা ঘুরাইবার সময় চক্রের সঙ্গে সঙ্গে থামে না, ঘোরে না। টেকোটি ডান হাতের বশে থাকা চাই; চক্রী চক্র দ্বারা টেকোকে ঘুরায়, থামায়। প্রথমে চক্র ছিল না, ছিল তর্কু, অপভ্রংশে টা-কু, টা-কু-য়া বা টেকো। যখন চক্রের সহিত যুক্ত হইল, তখন ইহার নাম তর্কু রহিয়া গেল, সূত্রকর্তন-কলার নাম হইয়া গেল ত-কু-টী, অপভ্রংশে তা-কু-ড়ী, তা-কু-ড়। তাকুড়ের পিণ্ড (তর্কু-পিণ্ড) চক্রে চলিয়া গেল, এবং চক্রটি এমন কার্যোপযোগী হইল যে সামান্য তর্কু উঠিয়া গেল! কার্য-সমর্থ (efficient) হইবার কারণ দুইটি, টেকো লঘুভাবে ঘুরিতে পারে, চক্র স্থিতিস্থাপক হওয়াতে টেকোকে বশে রাখে। বস্তুতঃ চক্রটি দোড়ীর; স্থিতিস্থাপক পাখীর (পক্ষ, spokes) যোগে চক্রের বেড় বা নেমি স্থিতিস্থাপক। এইরূপ রজ্জু-চক্র উদ্ভাবনার নিমিত্ত শিল্পীকে শতবার ধন্য বলি। কি সোজা উপায়ে মাল-সূতার সমান টান রাখা হইয়াছে, টেকোর সমবেগ সম্পাদিত হইয়াছে! এখানে নিজের একটা কথা বলি। একবার আমার বাড়ীতে এক ছোট কামারশাল বসাইতে হইয়াছিল, চামড়ার যাঁতা (ভস্ত্রা) পাওয়া গেল না। অগত্যা কাঠের পাতলা পাটার ছোট ছোট পাখা দিয়া এক 'বাত-প্রেরক' যন্ত্র (fan-blower) করাইতে হইল। ইহাকে বেগে ঘুরাইতে হইবে, কাঠের পাটার একটা বড় চাকা করাইতে হইল। ইহার ঘেরের পিঠে নালী কাটিয়া এবং তাহাতে দোড়ী দিয়া বাত-প্রেরকের ছোট চাকার সহিত যুক্ত করা গেল। দেখিতে বেশ, কিন্তু বিশপঁচিশ বার ঘুরাইলে মালদোড়ী ঢিলা পড়িতে লাগিল। টান রাখিবার সোজা উপায় করিতে পারিলাম না। শেষে পাটার চাকা ফেলিয়া দিয়া, চরকার শিল্পীকে নমস্কার করিয়া দোড়ীর চাকা করি। তাহাতেই কাজ হইতে লাগিল। চরকার মালসূতা ঢিলা হয় বটে, কিন্তু শীঘ্র হয় না। কারণ চরকার দোড়ীর গায়ে টান করিয়া ফাঁশ (গাঁইট নয়) দিতে পারা যায়। তারপর মালসূতা যত লম্বা হয়, পাখীগুলিও বাহির দিকে সোজা হইয়া চাকার বেড (পরিধি) বড় করে। পাটার চাকার স্বয়ং-সমাধান (self-adjustment) অসম্ভব। (৮) চরকার দোড়ী অবশ্য শণের হইবে। তিনভাং (ভঙ্গ) করিয়া পাকাইয়া রঁজিয়া (পাক বসাইয়া মসৃণ করিয়া) লইলে বহুকাল দেখিতে হয় না। মালসূতা অবশ্য কাপাস সূতার; কিন্তু ইহা পাকাইয়া তেল ধুনার চিট দিয়া রঁজিতে হইবে। (ধুনা-গুঁড়া অল্প তেল দিয়া আগুনে ফুটাইয়া এই চিট হয়)। ইহাতে দুইটি ফল হয়, সূতার পাক খুলিয়া যায় না, চিট হেতু মসৃণ টেকোকে ঈষৎ জড়াইয়া ধরে। মালসূতার ফাঁশও এমন যে চরকা ঘুরিতে ঘুরিতে সূতা বরং টান হইতে থাকে, অথচ যখন ইচ্ছা তখন খুলিতে পারা যায়। (৯) শেষে দেখিতে হইবে, কি রকম বসিয়া কিসে বসিয়া চরকা চালাইতে হইবে। সূতা কাটিবার সময় ডান হাত চরকার হাতায় মাঝে মাঝে আশ্রয় পায়, কিন্তু বাঁ হাত কখনও পায় না, অল্পেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সোজা বসিয়া হাত আড়ষ্ট না করিয়া সূতা কাটিতে পারা চাই। মাটুরে বসিলে টেকোর খুঁটা নীচু করিতে হইবে, উঁচু আসনে বসিলে উঁচু করিতে হইবে। কাটুনীর বয়স অনুসারে টেকো ও চরকার ব্যবধান কমবেশী হইবে। বড় মেয়ের নিমিত্ত যে ব্যবধান, ছোট মেয়ের নিমিত্ত সে ব্যবধান চলিবে না, কম করিতে হইবে। সূতা কাটা এক রকম যোগসাধনা; এমন আসন চাই, এমন যন্ত্র চাই, যাহাতে দেহ সচ্ছন্দ থাকিতে পারে। একথা সত্য, দুরন্ত চঞ্চল ছেলে-মেয়েকে চরকা ধরাইতে পারিলে তাহাদের চাঞ্চল্য দূর হয়।

(২) চরকার কাঠ।

উল্লিখিত চরকা গড়িতে ২০ খানি কাঠ চাই। যথা,

২টা বৈঠনা—একটা টেকোর ১৪″×৩″×২॥″, অপরটা চক্রের ২০″×৩″×২॥০″।

২টা পা-মেলা ২৪″×২″×১″। ইহার সমুখে পা থাকে। এই হেতু এই নাম।

৫টা খুঁটী ২″×১″ কাঠ। ২টা চকের ২১″; ২টা টেকোর ও ১টা মাল-সুতার ৯″ লম্বা। টেকোর খুঁটীর মাথা চিরিয়া চেরার মধ্যে টেকোর দোড়ীর ফাঁশ পরাইয়া দিলে আর কিছুই করিতে হয় না। বাঁকুড়ায় দেখিয়াছি, খুঁটীর বাঁ পাশে টুকরা কাঠ দিয়া 'কান' করা হয়। এই কানে ছিদ্র করিয়া দোড়ী পরানা হয়। এই কান অনাবশ্যক, দোড়ী আঁটিবার ধরণ অবৈজ্ঞানিক।

১টা দাঁড়া (অক্ষদণ্ড) ১৮″×১″×১″। ইহার দুই মুখ কুঁদিয়া গোল করিতে হইবে।

৮টা পাখী ১৮″×২″×৷৷৹″। পাখীগুলি মাঝে ২″, পরে ক্রমশঃ ১″। বাঁকুড়ার চরকার পাখী খাঁজ কাটা কাটা। সুন্দর করিবার চেষ্টা। কিন্তু ভাল নহে, কারণ দোড়ী টান করিতে পারা যায় না।

১টা হাতা ৮″×১॥০″×৷৷৹″। এই হাতার নীচের দিকে গোল ছিদ্র করিয়া কেহ তাহাতে আঙ্গুল পরাইয়া চরকা ঘুরায়, কেহবা পেন্‌সিলের মতন কাঠি পরাইয়া তাহাকে বাঁট করিয়া ঘুরায়। এই কাঠীর পেছু দিকে মাথা থাকে, সে জন্য কাঠী খসিয়া পড়ে না। এই বুদ্ধি মন্দ নয়। আঁটা বাঁটের প্রয়োজন দেখি না, লাভের মধ্যে ভাঙ্গিয়া খসিয়া যায়।

মোট কাঠ লাগে প্রায় ½ ঘন ফুট। মোটা কাঠ চিরিয়া চরকার কাঠ বাহির করিতে গেলে দাম বেশী পড়ে। যেখানে জানালা দরজা গড়া হয়, সেখানে রেজা কাঠ অনেক জমে। সেই সব কাঠ হইতে চরকা গড়িলে কাঠের দাম কম পড়ে। এই রূপ, একটা চরকা গড়িতে দুই দিন লাগে, কিন্তু অনেক গড়িতে হইলে হারাহারি-দেড় দিন যায়। চাকার মাঝের পাথুরের পিণ্ড সকল জায়গায় পাওয়া যায় না। তখন চরকা ভারী কাঠের করাইতে হইবে, মাঝে কাঠের পিণ্ড দিলে দুই পাশের পাখী কাছে চলিয়া আসিবে না। সাল কাঠে প্রশস্ত। সালের অভাবে পিয়াসালের ও আসনের। সেগুনের কর্ম্ম নয়। গ্রামের কাঠের মধ্যে তাল কাঁড়ীর দাঁড়া ও পাখী, বাবলার বৈঠনা, খুঁটী। অর্জুন, শিরীষ ও নিম, কুল ও বেল, শাওড়া ও করঞ্জা, চালতা ও তেঁতুল প্রভৃতি হইতে এক এক রকমের কাঠ বাছিয়া লইতে পারা যায়। মউল কাঠ ভারী। ইহার পিণ্ড হইতে পারে। চাটিগাঁ, নোয়াখালী ও আসামে চরকার যোগ্য অনেক রকম কাঠ পাওয়া যায়।

(৩) তুলার পাইট।

তুলার পাইট ভাল না হইলে সূতা কাটিতে সময় লাগে, সূতা সরু মোটা হয়, জায়গায় জায়গায় গোদড়া হয়। সরু জায়গায় পাক বেশী লাগে, সেখানটা ছিঁড়িয়া যায়। তুলার পাইট তিনটি। তুলা বস্তা-বাঁধা হইয়া পড়িয়া থাকিলে চাপ বাঁধিয়া যায়। তখন দুই হাতের আঙুল দিয়া চাপ ভাঙ্গিতে, তুলা পৃথক করিতে হয়। এই কর্ম্মের নাম পেঁ-জা (সং পিঞ্জন)। রোদে দিয়া মসৃণ ছড়ী দিয়া আছড়াইবার পর তুলা পিঁজিতে হইবে। পিঁজিতে সময় ও ধৈর্য লাগে। তার পর, কো-ড়া (স্ফুটিত করা), তুলার রোঁআ পরস্পর আলগা করা। ইদানী শহরে ধুনারী পাওয়া যায়. ইহারা তুলা ধুনিয়া দেয়। গ্রামে মেয়েরাই ছোট ধনু দিয়া তুলা ফোড়ে। এই ধনুর নাম আ-ছা-ড়। অবশ্য ইহাতেও তাঁতের (জান্তব তন্তু) গুণ দিতে হয়। রোঁআ পৃথক পৃথক হইবার পর পাঁজ পাকানা। পাঁজ (সং পঞ্জি), তুলার নল বা শূন্যগর্ভ বর্তিকা। একটা কাঠের মসৃণ পীড়ীর উপরে ফোড়া তুলা অল্প লইয়া সমান করিয়া বিছাইতে হইবে। এই স্তরের এক ধারে এক টুকরা মসৃণ শর (অভাবে পেন্‌সিল) রাখিয়া তুলা গুটাইয়া লইতে হইবে। তখন পাঁজ পাকানা শেষ। এই রূপ পাঁজ করিয়া কাগজের মোড়কে বিক্রি করিতে বলিয়াছি। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এক দিনের আবশ্যক পাঁজ করিতে ২ ঘণ্টা সময় লাগে। বোধ হয়, তিনি বাজারের চাপ-বাঁধা তুলা না ধুনিয়া কেবল পিঁজিয়া পাঁজ করেন। বস্তুতঃ ইহা অবিধি। ধোনা তুলার পাঁজ পাকাইতে বেশী সময় লাগে না। এক দিন পাঁজ পাকাইলে এক মাস চলিয়া যায়। সে কালে সূতাকাটায় বিশ্রাম ছিল; একাদশী, এবং পর্ব্বদিনে (যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা) দিনে চরকা ঘুরানা হইত না, পাঁজ পাকানা হইত। দেব-কাপাসের তুলার রোঁআ লম্বা ও নরম। এই তুলা ধুনিতে পারা যায় না, ধনুর তাঁতে জড়াইয়া যায়, আছাড়েও সুবিধা হয় না। তখন হাতে করিয়া একটু পিঁজিয়া লম্বা লম্বা বাতির মতন-করিয়া লইতে হয়। সদ্য বীজ ছাড়ানা তুলা, এমন কি বীজ শুদ্ধ কাপাস ধরিয়া সূতা কাটিতে পারা যায়। কারণ বীজ হইতে তুলা সহজে খসিয়া আসে। দশ পনরটা দেব-কাপাসের গাছ রাখিতে পারিলে কাপড়ের জন্য সূতার চিন্তা থাকে না। অপর বিশেষ সুবিধা, খা-অ-ই (সং খাদক) দিয়া খাওয়ানা পরে পেঁজা, ফোড়া পাঁইজ পাকানা কিছুই দরকার হয় না। সদ্য খাওয়ানা তুলার অনেক গুণ, পিঁজিতে হয় না। অতএব নূতন কাপাস জন্মিলে খাঅই দিয়া তুলা পৃথক করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধুনিয়া পাঁজ পাকাইয়া রাখা কর্তব্য। রোঁআগুলি পরস্পর আলগা করা ধোনার, এবং সেই অবস্থায় রাখা পাঁজ পাকাইবার উদ্দেশ্য।

(৪) সূতা কাটার পরিমাণ।

আমি লিখিয়াছিলাম, ৪ ঘণ্টায় ১০ নম্বরের আধপোয়া সূতা কাটিতে পারা যায়। বাঁকুড়া জেলার কোনো কোনো গ্রামে পূর্ব্বাবধি চরকা কিছু কিছু চলিয়া আসিতেছে। এক কাটনী এই সংবাদ দিয়াছিল। ওড়িষ্যাতেও শুনিয়াছিলাম, এক এক নারী আধ পোয়া সূতা কাটিতে পারে। এখন বোধ হইতেছে, সে সূতা দশের নয়, আরও মোটা; চারি ঘণ্টায় নয়, ছয় ঘণ্টায় কাটা। সাধারণতঃ দিনে এক ছটাক ধরা যাইতে পারে। অবশ্য গৃহস্থালীর কাজ সারিয়া দিনে ও সন্ধ্যার পর। আজিকালির বাজারে সূতার দর চড়া। এই চড়া দরের সহিত মিলাইয়া বাণি পাইলে এক ছটাক কাটিয়া মাসে ২৲ টাকা উপার্জন হইতে পারে।

(৫) সূত্র-পরীক্ষা।

লোকে জিজ্ঞাসা করে, সূতা সরু না মোটা। কোন্ সূতা ভাল, কোন্ সূতা মন্দ, তাহাও সকলে জানে না। কতকগুলি রোঁআ পাকাইয়া সূতা। সুতরাং রোঁআ যত কম হইবে, সূতা তত সরু হইবে, এবং পাক যত বেশী হইবে সূতা তত সরু হইবে। অর্থাৎ অল্প রোঁআ, বেশী পাক। কিন্তু খর পাকের দোষ আছে। সূতা সরু মোটা না হইয়া সমান হইলে তত দোষ হয় না। কিন্তু সরু মোটা হইলে সরুতে পাক বেশী খায়, পরে সহজে ছিঁড়িয়া যায়। প্রথম চরকা ধরিবার সময় তাড়াতাড়ি অনেক সূতা কাটিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই সময়ে সংযম আবশ্যক, নইলে হাত আর শোধরাইবে না। বরং অল্প কাটা হউক, কিন্তু সূতা অসমান হইবে না।

উনিশ বিশ, আঠার বিশ, পনর বিশও চলে ; কিন্তু দশ বিশ, পাঁচ বিশ অচল। মোটা বরং ভাল, কিন্তু মোটা-সরু ভাল নয়। মনে রাখিতে হইবে সূতা-কাটা একটা কলা, দুই চারি দিনেই হাত হয় না।

যদি পাক যথা-উচিত পাইয়া থাকে তাহা হইলে নম্বর দ্বারা সে সূতা সরু কি মোটা বুঝিতে পারা যায়। নম্বর নিরূপণের নিমিত্ত একটা নিক্তি, একটা দুয়ানি, একটা গজ চাই। নিক্তির এক পাল্লায় দুয়ানিটি রাখিয়া অপর পাল্লায় সূতা দিয়া সমান কর। সে সূতা গজে মাপিয়া দেখ। ১০ নম্বরের সূতা, দুয়ানি-ওজনে ২৭ গজ হয়। ইহা হইতে অন্য সূতার নম্বর কষিতে পারা যায়। দুয়ানির ওজনে সে সূতা যত গজ হইবে, তাহাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২৭ দিয়া ভাগ করিলে ফল হইবে নম্বর। যথা, সূতা ৩২ গজ হইল। ৩২×১০÷২৭=১২। অতএব সে সূতার নম্বর ১২। এই সূতা কলের ছিল।

কিন্তু সহজেই বুঝা যায়, একই নম্বরের সূতা সরু হইতে পারে, মোটাও হইতে পারে। ওজনে লম্বায় সমান, কিন্তু যেটার পাক বেশী সেটা সরু দেখাইবে। সব কলের সূতা সমান সরু নয়। চরকার সূতার ত কথাই নাই। যদি সূতা সরু মোটা না হয়, তাহা হইলে পাক গণিয়া দেখা কর্তব্য। এক ইঞ্চির মধ্যে কত পাক আছে জানিতে হইবে। এক টুকরা খড়িকার এক প্রান্ত একটু চিরিয়া তাহাতে সূতা পরাইয়া আঁটিয়া দেও। দেখিবে পাক খুলিয়া না যায়। তার পর খড়িকাটি ডাইন হাতে ধরিয়া, সূতা মোটা হইলে দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি, সরু হইলে এক ইঞ্চি মাপিয়া সে স্থানে বাঁ হাতের দুই আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধর। এখন খড়িকাটি পাকের উল্টা দিকে ঘুরাইতে থাক। ক্রমে তুলার রোঁআর পাক খুলিতে থাকিবে। এক ইঞ্চিতে কত পাক আছে, এখন জানিতে পারা যাইবে। দেখিতে পাইবে, সরু স্থানে অনেক, মোটার স্থানে অল্প পাক আছে। এমন সূতার পাক জানিয়া ফল নাই. যদি সূতা সমান হয়, তাহা হইলে জানিয়া ফল আছে। তাঁতের টানার সূতায় কিছু বেশী পাক থাকে। যদি ১০ নম্বরের সূতায় ১২।১৩ পাক থাকে, তাহা হইলে তাহাতে টানা হইতে পারিবে। যদি ৯।১০ পাক থাকে তাহা হইলে পড়্যান হইতে পারিবে। যদি আরও কম থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কাপড় বোনা চলিবে না, মোজা বোনা চলিতে পারে। ৬ নম্বর সূতায় ১০ পাক, ১২ নম্বরের সূতায় ১৪ পাক, টানার নিমিত্ত কলের সূতায় এইরূপ ধরা হইয়া থাকে।

চরকার সূতা কাটিবার সময় পাক ঠিক হইতেছে কি না জানা মন্দ নয়। বাঁ হাতকে ক্লান্ত না করিয়া একবারে ২ ফুট সূতা কাটিতে পারা যায়। চরকার চক্র ১৭॥০ এবং টেকো সিকি ইঞ্চি হইলে, চক্রের প্রতি ঘূর্ণনে টেকো ৭০ বার ঘুরিবে। যদি কাটা সূতা ৬ নম্বরের হয়, তাহা হইলে ২ ফুট বা ২৪ ইঞ্চি সূতায় ২৪০ পাক চাই। অতএব চরকা ৩।০ বার ঘুরাইতে হইবে। ১০ নম্বরের সূতা হইলে ঠিক ৪ বার ঘুরাইতে হইবে। খর পাক বরং ভাল, উন-পাক ভাল নয়।

যে সূতা টান সহিতে পারে না, তাহাতে কাপড় বোনা চলে না। চলিলেও কাপড় টেক-সই হয় না। অতএব টান পরীক্ষাই কাজের পরীক্ষা। টানিয়া দেখিলেই কোন্ সূতা কেমন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রথম অন্য উপায়ে পরীক্ষা কর্তব্য। এ নিমিত্ত দাঁড়ী পাল্লা ও বাটখারা চাই। হাত খানেক সূতার এক খুঁট এক পাল্লায়, অপর খুঁট নীচে গোল কিছুতে বাঁধিয়া সূতার উপর দাঁড়ী ধর। অপর পাল্লায় এক ছটাক এক ছটাক করিয়া বাটখারা চাপাও। দেখিবে সূতায় একটু টান পড়িয়া দাঁড়ী সমান রহিয়াছে। কয়েক ছটাক পরে সূতা ছিঁড়িয়া যাইবে। এইরূপ আরও চারি পাঁচ স্থানের সূতার টান মাপিবে। পরে হারাহারি কত দাঁড়ায় বুঝিতে পারিবে। কলের ১০ নম্বরের সূতা প্রায় আধসের ভার সহিতে পারে।

এখন চরকার সূতা লইয়া দেখি। ক সূতা ১০ নম্বরের বলিয়া ২৲ টাকা সেরে বিক্রির নিমিত্ত আসিয়াছিল। খ সূতা এক বাড়ীতে কাটা, উত্তম বলিয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছিল। দেখিলাম ক সূতা তেমন সরু মোটা নয়, দেব-কাপাসের মতন লম্বা রোঁআর কাটা। নম্বর কিন্তু ৬॥০। প্রধান দোষ পাক কম হইয়াছে, পোয়াটাক ভারে ছিঁড়িয়া যায়। খ সূতা দেখিতে সরু, মনে হয় ২০।২২ নম্বরের হইবে, কিন্তু বাস্তবিক ১২॥০ নম্বরের। পাক বেশী হইয়াছে, ইঞ্চিতে ২০। কিন্তু মাঝে মাঝে যে সরু আছে, তাহাতে সূতার টান এক পোয়ার অধিক উঠিল না।

(৬) চরকার সূতা বিক্রায় না কেন ?

শুনিতেছি এক এক স্থানে সূতা জমিয়া যাইতেছে, বিক্রি হইতেছে না। সূতা যে রকম দেখিতেছি, যে দাম শুনিতেছি, তাহাতে না বিকাইবার কথা। গোদড়া সূতার কাপড় পরিবার লোক থাকিলে, দাম সস্তা হইলে বিকাইত। এখন মোটা-বোনা তাঁতীও চরকার সূতার নামে পিছাইয়া যায়। কারণ, একে কিনিবার লোক নাই, তার উপর তাঁত না বদলাইলে বুনিতে পারা যায় না। সূতা ভাল কর, মোটা হউক সমান কর, পড়িয়া থাকিবে না।

অর্থনীতির কথা স্বতন্ত্র। বোধ হয় এমন নির্বোধ কেহ নাই যে মনে করে চরকা দ্বারা কলকে হারাইতে পারা যায়। কলের সূতা সস্তা হইবেই ; চরকার সূতা তত সস্তা কখনও পাওয়া যাইতে পারে না। চরকার সূতার কেনা বেচা চলিবে না। পূর্বে চলিত, তখন কল ছিল না। এখন সামনে সস্তা ফেলিয়া কে আক্রায় যাইবে ? কাট্‌নার বাণি না লাগিলে অবশ্য সস্তা। এই কথা মনে রাখিয়া চরকা ধরিতে হয়, ধর ; সূতা বিক্রির আশায় ধরিও না। অর্থাৎ নিজের কাপড়ের তরে চরকা ধর, ইহাতে তোমার পয়সা বাঁচিবে, দেশের পয়সাও বাঁচিবে।

সূতা বেচা কাট্‌নীও চাই। কারণ সকল বাড়ীতে চরকা ঘুরিবে না, ঘুরিতে পারিবে না। সেখানে হয় কলের সূতা নয় চরকার সূতা লইতে হইবে। কলের সূতার, স্বদেশী কলের সূতার দর সম্প্রতি অত্যন্ত চড়া। অনেক দিন হইতে চড়া চলিতেছে · কেন চড়া বলিতে হইবে কি ? কারণ কল-আলাদিগের দেশের লোকগুলা অ-জ্ঞান, তাহারা দেশী চায়। সে যাহা হউক, কলের সূতার চড়া দরে চরকা চালাইবার সুবিধা হইয়াছে। এখন সেরে ১৲ টাকা বাণিও দিতে পারা যায়। কিন্তু এটা প্রকৃত অবস্থা নহে। কলের সূতার দর কিছু কমিলেই চরকা কাটার বাণিও কমাইতে হইবে। তখন কাটনী পাওয়া যাইবে না। তবে যদি চরকা একবার চলিয়া যায়, সূতা কাটার নিন্দা ঘুচিয়া যায়, তাহা হইলে কম বাণিতে কাট্‌নী কাটিতে থাকিবে। এখন মাসে ২৲ টাকা, তখন ১৲ টাকা হইলেও কাটা বন্ধ হইবে না। কারণ একটা টাকা অল্প নয়, অন্ততঃ ভিটার ত্রিসীমানার মধ্যে পাওয়া যায় না।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

আরোগ্য-দিগ্দর্শন

(সমালোচনা)

গুজরাটী ভাষায় লিখিত মহাত্মা গান্ধী প্রণীত "আরোগ্য-দিগ্দর্শন" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রী কিরণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বারাণসী হইতে শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

পুস্তকখানি ৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী এবং দ্বিতীয় ভাগে "জল চিকিৎসা" প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালী, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি কতিপয় সাধারণ রোগ এবং জলে ডুবা, অগ্নি-দাহ প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার চিকিৎসা-প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থমধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা, হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার এবং দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে অনেক হিতকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ যাহাতে দেহমধ্যে আদৌ সঞ্চারিত হইতে না পারে, মহাত্মা গান্ধী তদ্বিষয়ে বহুল সাধারণ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালনেই শরীর ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হইয়া থাকে, এই ধ্রুব সত্য তিনি গ্রন্থমধ্যে প্রতিপন্ন করিবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং শৈশবকাল হইতে আজীবন প্রত্যেক নরনারীকে ইহার অনুশীলন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা আশা করি যে তাঁহার এই সদুপদেশ বর্ত্তমান কালের ভোগসর্ব্বস্ব নরনারীর হৃদয়ে চেতনা সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে সংযমের পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে।

মহাত্মা গান্ধী "জল" ও "বায়ু" কিরূপে দূষিত হয় এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে পরিশোধিত করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং বিজ্ঞানানুমোদিত অনেক হিতোপদেশ গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি স্বকীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। মনুষ্যের পক্ষে ফলাহারই প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, দাল, এমন কি, দুগ্ধ পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এবিষয়ে আমরা তাঁহার মতের পোষকতা করিতে পারি না। ফলাহার তাঁহার মত ঋষিকল্প লোকের পক্ষে প্রশস্ত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উহা উপযোগী নহে। বারমাস শুদ্ধ ফল ভোজন করিয়া সাধারণ লোক কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না এবং তাহা দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যও রক্ষা হইবে না। কারণ যে প্রকার এবং যে পরিমাণ ফল ভোজন করিলে তাহা হইতে শরীর-গঠনের সমস্ত উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার সংগ্রহ অসম্ভব। অতএব মহাত্মা গান্ধীর এই উপদেশ কার্য্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া আমরা মনে করি না।

মহাত্মা গান্ধী দাল একটি "স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ" বলিয়া দালের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। আমরা এই উপদেশের সারবত্তা স্বীকার করি না। ভারতবাসীদিগের মধ্যে অনেকেরই আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক ব্যবস্থা হেতু আমিষ ভোজন সম্ভবপর নহে, তাঁহাদের খাদ্য দালই মাছ-মাংসের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। "দাল ভাত" বা "দাল রুটি" ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য; গরীব ভারতবাসীর পক্ষে দালই একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য। এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গরীব লোকের খাদ্যের মধ্যে "দাল" যাহাতে অধিক পরিমাণে আদর লাভ করে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক বা অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মহাত্মা গান্ধীর এই উপদেশের সমর্থন করিবেন না।

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাত্মা গান্ধী দুগ্ধ ব্যবহার করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। দুগ্ধ চিরদিনই আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট সারবান ও সাত্ত্বিক খাদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দুগ্ধ ও তদুৎপন্ন নানাবিধ সামগ্রী ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। আজ দেশে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিয়াই ভারতবাসী দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও বীর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে। দুগ্ধের সহিত নানাবিধ মলিন দ্রব্য মিশ্রিত হয় এবং দুগ্ধবতী গাভীগণ সকল সময়ে রোগশূন্য নহে বলিয়া তিনি দুগ্ধের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই নিষেধ কেহই পালন করিয়া চলিবে না। বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত দেশে যাহাতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বসাধারণে উহা সহজে পাইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা উচিত; দুগ্ধ ব্যবহারের নিষেধ সমীচীন নহে। ঘৃতের পরিবর্ত্তে তিনি তিলতৈল ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন উদ্ভিজ্জ তৈলই ঘৃতের ন্যায় সুপাচ্য ও পুষ্টিকর নহে। মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয়। মাখনে ভাইটামিন্ (Vitamines) যথেষ্ট আছে। কোন উদ্ভিজ্জ তৈলে স্বাস্থ্যরক্ষার সহায় এই উপাদান নাই। মহাত্মা নিজে ফলাহারী, কাজেই তিনি সকল লোককে তদবলম্বিত পথ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ একদেশদর্শী উপদেশ সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে।

মহাত্মা গান্ধী খাদ্যের সহিত লবণ-ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। তিনি রন্ধন দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করারও বিরোধী। বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই উদ্ভট উপদেশ কোনকালেই জগতের কোন সমাজেই গৃহীত হইবে না। রন্ধন একটি কলাবিদ্যা; উহা সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসভ্য মনুষ্য শিকারলব্ধ আমমাংস ও যথেচ্ছাহরিত বনজ ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। কৃষিকার্য্য ও রন্ধন হইতেই মানব-সভ্যতার সূত্রপাত। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় সকলে ফলাহারী হইলে খাদ্যের সহিত লবণের পৃথক ব্যবহারের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু যতদিন মনুষ্য সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করিবে, ততদিন তাহার রন্ধনের এবং খাদ্যের সহিত যথাপরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে "মসলার ন্যায় লবণ পরিত্যাজ্য। লবণ একটি বিষাক্ত জিনিষ। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।" অবশ্য অধিক মসলা বা অধিক লবণ ব্যবহার করিলে অনিষ্ট হইয়া থাকে এবং রোগ-বিশেষে লবণের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু সুস্থ শরীরে কি লবণ, কি মশলা, উভয়েরই পরিমিত ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল। মহাত্মা গান্ধী জ্ঞানী ও পণ্ডিত হইলেও অনেক সময়ে অনেক অপ্রযোজ্য (Unpractical) মত প্রচার করিয়া থাকেন।

মিতাহার ও ব্যায়াম সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পালন করিলে স্বাস্থ্য, দেহোন্নতি এবং দীর্ঘজীবনলাভ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার হইবে।

পরিচ্ছদ-বাহুল্য এবং অলঙ্কার-ব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইহা দ্বারা অর্থের অপব্যয়, অনেক অসুবিধা ও বিপদের হস্ত হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। তবে জুতার ব্যবহার নিষেধ করিয়া যে মত

প্রচার করিয়াছেন,* তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

সংযম সম্বন্ধে তিনি অতি যুক্তিপূর্ণ সারগভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি আমাদের প্রাত্যহিক প্রত্যেক কার্য্যেই সংযম পালনের বিশেষ আবশ্যকতা ও সুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। স্ত্রীর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী নিজ অভিজ্ঞতা হইতে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রচারিত এবং তাহার পালন প্রাচীন হিন্দু সমাজে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অদ্য সংযমের অভাবে আমাদের সমাজ বিবিধ ব্যাধি, শোক ও দরিদ্রতার প্রবল চাপে নিষ্পীড়িত। মহাত্মা গান্ধী যথার্থই বলিয়াছেন যে স্বাস্থ্যরক্ষার বহু উপায় থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্যই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীই হউন, আর পুরুষই হউন, ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত কাহারো সুস্থ থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি বলিয়াছেন—"বালক পিতা ও বালিকা মাতার সন্তান জন্মিলে আমরা কত মঙ্গলগীত গান করি, কত উৎসবের অনুষ্ঠান ও ভগবানের জয়গান করিয়া থাকি। কি ভীষণ মূর্খতা! চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এ পাপ দূর করিবার উপায় কি?"………

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মহাত্মার এই মহাবাক্যের সমর্থন করিতেছি। সর্ব্ব প্রকারে ইন্দ্রিয়-সংযম প্রত্যেক নরনারীর অবশ্যপালনীয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূলে এই সনাতন সত্য অবস্থিত। ইহাই যে কোন জাতির শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

সকলেই জানেন যে মহাত্মা গান্ধী যে-কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি মাদক-সেবনের বিরুদ্ধে পুস্তকে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সমাজহিতৈষী নীতিপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিবেন।

"বায়ু চিকিৎসা," "জল চিকিৎসা," "মৃত্তিকা চিকিৎসা" প্রভৃতি বিবিধ প্রণালীর চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি অল্প বিস্তর লিখিয়াছেন। "মৃত্তিকা চিকিৎসা" একটি অভিনব ব্যাপার; এবিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া ইহার সম্বন্ধে কোন প্রকার মত প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। জল ও বায়ু চিকিৎসার প্রকরণ সম্বন্ধে সকল স্থলে তাঁহার সহিত একমত না হইলেও এবং মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং চিকিৎসক না হইলেও, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বিশেষ মূল্য আছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

বসন্ত রোগে টীকা লইবার বিরুদ্ধে তিনি যে-সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ইংলণ্ডের সম্প্রদায়-বিশেষের অনুমোদিত হইলেও আমরা তাহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিবাদ করিতে বাধ্য এবং প্রয়োজন হইলে ঐ ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ। মহাত্মা গান্ধী টীকা লওয়া সম্বন্ধে যে-সকল অনুদার মত প্রচার করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের মত দেশে উহা প্রচারিত হইলে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে "টীকা লওয়া নেহাত জংলী প্রথা। ইহা এমনই একটি কুসংস্কার যে যাহাদিগকে আমরা বন্য অসভ্য বলি, তাহাদের মধ্যেও এরূপ প্রথা নাই। টীকা লইয়া ত আমরা অন্য জীবের রক্ত পান করিয়া থাকি, তাহাও আবার পচা রক্ত। যাহারা বাস্তবিক ঈশ্বর-ভক্ত, তাহারা যদি সহস্র বার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং যদি মৃত্যু-মুখেও পতিত হয়, তথাপি এই পচা রক্ত পান করিতে স্বীকৃত হইবে না। টীকা লওয়ায় ধর্ম্মভ্রষ্টও হইতে হয়।"

বসন্ত রোগ নিবারণের একমাত্র উপায় ইংরেজী টীকা লওয়া। এ দেশের সাধারণ লোকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার হেতু টীকা লইতে চাহে না বলিয়া ভারতবর্ষে বসন্তের এত প্রাদুর্ভাব এবং এত অধিক সংখ্যক লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে অথবা তাহাদের চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর মুখ হইতে টীকার বিরুদ্ধে এই ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইলে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইবার কথা।

"প্রসব" সম্বন্ধে তিনি যে-সকল হিতোপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তির প্রণিধানযোগ্য। সহরের স্ত্রীলোকগণ অস্বাভাবিক ও অলস জীবন বহন করে বলিয়া তাহারা প্রসব-কালে অনেক সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে তাহাদের জীবন-সংশয় হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন যে অস্বাভাবিক ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ব্যতীত প্রসব-কষ্টের আরও একটি প্রবল কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

"অল্প বয়সেই গর্ভধারণ এবং প্রসবান্তে পুনরায় গর্ভধারণ ব্যাপার যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে বিদূরিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সুখ-প্রসবের আশা সুদূরপরাহত।"

আমরা বলি যে কেবল সুখ-প্রসব নহে, যতদিন পর্য্যন্ত এই অনাচারের নিবারণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই পতিত জাতির মধ্যে বলবীর্য্যশালী দীর্ঘজীবী সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ এবং দারিদ্র্য দূর করিবার আশা দুরাশায় পর্য্যবসিত হইবে।

সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে "শিক্ষা বালকের জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে, একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। মাতা-পিতাই বালকের উত্তম শিক্ষক। মাতা-পিতার স্বভাবের অনুযায়ীই বালকের স্বভাব হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই যে সন্তান সচ্চরিত্র হইবে, এ আশা করা বৃথা। সদাসর্ব্বদা সৎসঙ্গ করাই সচ্চরিত্রতালাভের একমাত্র উপায়। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি বিভিন্ন প্রকারের হয়, তাহা হইলে কখনই বালকের চরিত্র সংশোধিত হইবে না।"

এই গ্রন্থে এমত কতিপয় মত প্রচারিত হইয়াছে, যাহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে, সুতরাং তাহাদের অনুমোদন করিতে পারা যায় না। আরও এমন কতকগুলি মত আছে যাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে, সুতরাং তাহাদিগেরও সমর্থন করিতে পারা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ উপদেশই স্বাস্থ্যরক্ষা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-লাভের পক্ষে অনুকূল, সুতরাং তাহাদের আলোচনায় দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে। পাঠক পাঠিকা গ্রন্থ পাঠে উপকার লাভ করিবেন।

অনুবাদের ভাষা সরল ও সুবোধ্য। গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা সুবিধার নহে। গ্রন্থে অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে, আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এসকল ত্রুটীর সংশোধন হইবে।

শ্রী চুণীলাল বসু

মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী

খাণ্ডোয়া

খৃষ্টীয় ১৯১১ অব্দের সেন্সাস্ গণনানুসারে মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে ২৫৪০ জন বঙ্গীয় নরনারী সংখ্যাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নাগপুর বিভাগে ছিলেন ৭৭২ জন, জব্বলপুর বিভাগে ৫৭৬, ছত্রিশগড় বিভাগে ৪৫৮, নর্ম্মদা বিভাগে ৩৮৩, বেরার বিভাগে ১৯৭ এবং ফরা মহলে ১৫৪ জন। অর্দ্ধাধিক শতাব্দী পূর্ব্বে নর্ম্মদা বিভাগে খাণ্ডোয়া নামে একটি জেলা গঠিত হয়, এক্ষণে উহা নিমার জেলার অন্তর্ভুক্ত। জেলা গঠনের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮০ অব্দে এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। ইতিপূর্ব্বে নাগপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে প্রথমাগত বাঙ্গালীদের প্রধান ও প্রসিদ্ধগণের মধ্যে যাঁহারা পরবর্ত্তীগণের পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁহাদের এদেশে আগমনের কালানুসারে তিনটি দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমাগত বা প্রথম দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন্নগরনিবাসী স্বর্গীয় বাবু বিহারীলাল বসু, কলিকাতার বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু, সার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু, বাবু কুঞ্জবিহারী গুপ্ত, স্বর্গীয় রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর, স্বর্গীয় রায় তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, নৈহাটী-নিবাসী স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ, কলিকাতা হেদুয়ানিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ দে এবং স্বর্গীয় বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী। ইঁহারা নাগপুর, নরসিংপুর, জব্বলপুর, সাগর ও হোসাঙ্গাবাদ প্রবাসী হন। ইঁহাদের পর আসেন বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, এবং তাঁহার সহযোগী স্বর্গীয় বাবু প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এই দুইজনেই খাণ্ডোয়ার সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী এবং সর্ব্বপ্রথম উকীল। ইঁহাদের পরবর্ত্তী অর্থাৎ তৃতীয় দলের মধ্যে ছিলেন বেলঘরিয়া-নিবাসী স্বর্গীয় বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার ডি, ঘোষ। ইঁহারা সাগর ও জব্বলপুর প্রবাসী হন। ইঁহাদের পর মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালীর বাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

খৃঃ ১৮৮০ অব্দের পূর্ব্বে খাণ্ডোয়ার আদালতে বাদী-প্রতিবাদীর স্ব স্ব পক্ষ-সমর্থন ও সাক্ষ্যসাবুদ দ্বারা মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত। লোকের ধারণা ছিল এখানে ওকালতি ব্যবসায় চলিবে না, খাণ্ডোয়ায় উকীলের অন্ন নাই। ১৮৮০ অব্দের ৭ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়া সে ধারণা ঘুচাইয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নিকট আমরা শুনিয়াছি, তিনি এখানে প্রথম বৎসরেই মাসিক চারিশত টাকা এবং পরবৎসরে মাসিক ছয়শত করিয়া উপার্জ্জন আরম্ভ করেন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হুগলির গোঁসাই-মালপাড়া গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যে-বংশে তাঁহার জন্ম, তাহা "অবসথী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশ" বলিয়া খ্যাত। অবসথী গঙ্গানারায়ণের সন্তানগণ দেশময় এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রব্রজন করায় এই নামে

পরিচিত হন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়া "অবসথী" নাম লোপ করিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা ভবানীপুর ল্যান্সডাউন রোডে ভদ্রাসন, খাণ্ডোয়া (মধ্যপ্রদেশ) ও ইন্দোরে (মধ্যভারত) প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ, এবং এই দুই প্রদেশেই ভূসম্পত্তি করিয়া, তাঁহাদের অন্যতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বনামধন্য মনীষী বঙ্কিম-বাবুর প্রপিতামহ এবং হরিদাস-বাবুর প্রপিতামহ সহোদর ভাই ছিলেন। এই বংশে যাঁহারা পাশ্চাত্য-উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়াছেন, বঙ্কিম-বাবু তাঁহাদের অগ্রদূত এবং স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আই-সি-এস মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম।

হরিদাস-বাবুর পিতৃদেব স্বর্গীয় তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় শিপ্-সরকারি করিয়া যে দশ পনর টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া কলিকাতার বাসায় সামান্যভাবে জীবনযাপন করিতেন, কারণ এই সামান্য আয়ে মালপাড়া হইতে পরিবারবর্গকে আনিয়া কলিকাতায় রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু হরিদাস-বাবু পিতার এরূপ দৈন্য সত্ত্বেও আশৈশব সুশিক্ষায় বঞ্চিত হন নাই। তিনি হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হন। তাঁহার সময় সাট্‌ক্লিফ্ এবং পেড্‌লার সাহেব কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং শিক্ষক ছিলেন স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার। তাঁহারা তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অসমর্থ মেধাবী ছাত্রকে অল্প বেতনে ভর্ত্তি করিয়া লইবার নিয়ম ছিল। এই অধিকারে হরিদাস-বাবু অর্দ্ধবেতনে উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাই সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হন, এবং এম-এ পর্য্যন্ত বৃত্তি পান। তাঁহার গুরুভ্রাতৃদ্বয় নগেন্দ্র এবং যোগেন্দ্রনাথ সরকার, নাগপুরবাসী বাবু বিপিনকৃষ্ণ বসুর সহোদর স্বর্গীয় নন্দকৃষ্ণ বসু, ভূতপূর্ব্ব 'সময়'-সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এবং বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

এম-এ পাশ করিবার পর বার্দ্ধক্যবশতঃ পিতা অসমর্থ হইয়া পড়িলে, হরিদাস-বাবুকে বাধ্য হইয়া কলেজ ত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি প্রাইভেট টিউশনী ও গবর্মেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে অল্পবেতনে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার পরিচালন এবং আইন অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ১৮৭৮ অব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সেই বৎসরই আলিপুর ও পরে পাবনায় ওকালতি আরম্ভ করেন। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের আদালতে শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় ওকালতি করিতেছিলেন। তখন নাগপুরে তাঁহার প্রসার খুব জমিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে শুনিয়া হরিদাস-বাবু তাঁহাকে দেখিতে যান এবং তাঁহারই সাহায্যে মধ্য-প্রদেশে ওকালতি করিবার লাইসেন্স্ পান। বিপিন-বাবুই তাঁহাকে, যেখানে উকীল বেশী নাই এবং বাঙ্গালী নাই, সেইখানে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার পরামর্শ-মতে বাঙ্গালী- ও উকীল-হীন খাণ্ডোয়ায় গিয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে যান নদীয়া কুড়ুলগাছির বিখ্যাত গাঙ্গুলী পরিবারের ৺ প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি হরিদাস-বাবুর প্রবর্ত্তিত জনহিতকর প্রত্যেক কার্য্যেই সহযোগিতা করিতেন এবং সম্পূর্ণ তাঁহার পথানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হরিদাস-বাবু খাণ্ডোয়ায় আসিয়া অবধি ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি দেশের ৪০৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি ত্যাগ করিয়া ৪০০৲ এবং শীঘ্রই ৬০০৲ টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিতে থাকিলে, তাঁহার সংসার-প্রতিপালনের চিন্তা দূর হয় এবং তাঁহার স্বাভাবিক সদ্বৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। তিনি দেখিলেন খাণ্ডোয়া অতিশয় অনুন্নত স্থান। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহও তদ্রূপ। দেশীয় লোকের মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক কুসংস্কার অতিশয় প্রবল। নাগপুর জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর সংস্রবে যদিবা শিক্ষার অবস্থা ও সংস্কারের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে,

খাণ্ডোয়ার স্থায় স্থানসমূহের অধিবাসীবৃন্দ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, আত্মোন্নতিতে উদাসীন, রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারে অনভিজ্ঞ এবং সমাজ- ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহুবিধ কুসংস্কারের নিতান্ত বশীভূত। খাণ্ডোয়ায় গবর্মেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত একটি অতি ক্ষুদ্র মাধ্যমিক স্কুল ছাড়া ছেলেদের ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের আর কোনই অনুষ্ঠান নাই। দেশের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি প্রথমেই একটি সাধারণের পাঠাগারের প্রয়োজন বোধ করেন এবং অচিরেই একটি লাইব্রেরী স্থাপনে যত্নপর হন। এই কার্য্যে প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার অদ্বিতীয় সহায় হন। তাঁহারা প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং দেশীয় ও সাহেব-দিগের নিকট হইতে প্রায় চারি সহস্র টাকা প্রাপ্ত হন। মধ্য-প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব চীফ্ কমিশনার সার্ জন মরিস্ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য হরিদাস-বাবু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নাম দিলেন মরিস্ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী। ইহাতে ইংরেজী হিন্দী ও অল্প উর্দ্দু পুস্তক এবং সংবাদপত্র রক্ষিত হইল। এই সময় হইতে এখানে সাধারণের শিক্ষার সূত্রপাত হইল। অতঃপর এখানে স্কুলের শোচনীয় অভাব দূর করিবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৫ অব্দে স্বকীয় ভবনে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলে প্রথমে তিনি এবং প্যারীলাল-বাবু ছাত্রগণকে দেড় বৎসর কাল পড়াইতে থাকেন। ১৮৯২ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ৺ উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র ব্যারিষ্টার হেমেন্দ্রনাথ মিত্র খাণ্ডোয়ায় যান। তিনিও ইহাঁদের সহিত যোগ দিয়া স্কুলে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য এই স্কুলের যাবতীয় ব্যয় হরিদাস-বাবুই নির্ব্বাহ করিতেন। ছাত্রগণ এই স্কুলে এরূপ সুন্দরভাবে শিক্ষা পাইতে থাকে যে প্রথম বৎসরেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং পর বৎসর হইতে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাহারা বেশ সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হয়। এই বিদ্যালয়ের নামও বিস্তার লাভ করে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হরিদাস-বাবুর মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত কুসুমকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৮ অব্দে এখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ এবং মধ্য-প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার ফলে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট মাসিক ৩৮৲ টাকা সাহায্য দেন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে শাখা স্বরূপ পরিগ্রহণ করেন। মধ্য-প্রদেশের জেলায় জেলায় হাই স্কুল স্থাপনার ইহাই সূত্রপাত। এই সময় প্যারীলাল গাঙ্গুলী মহাশয় এ প্রদেশের খেজুর-গাছ-পূর্ণ জঙ্গলগুলির প্রতি হরিদাস-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হরিদাস-বাবু দেখিলেন সত্যই এতদঞ্চলে এত অধিক গাছ আছে যে তাহা হইতে রস লইয়া গুড় এবং চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে একটি বিস্তৃত ও প্রভূত লাভজনক ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত হয়। এদেশের লোককে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিতে শিখাইতে পারিলে তাহারা উপার্জ্জনের একটি নূতন পথ পায় এবং এই শিল্পের বিস্তারে অল্প দিনের মধ্যেই আপনাদের দৈন্য ঘুচাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি পরীক্ষা-কার্য্য আরম্ভ করেন এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া এই বিষয়ে বিশেষভাবে আন্দোলন করিতে থাকেন। খেজুর-গাছ হইতে রস লইয়া এদেশে মদ তৈয়ারী করে বলিয়া এ ব্যবসায়ে দেশের লোকের শ্রদ্ধার অভাব এবং গবর্ণ-মেণ্টের উদাসীনতা দর্শন করিয়া হরিদাস-বাবু বাঙ্গালীদের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আহ্বান করেন এবং অমৃতবাজার-পত্রিকা, বেঙ্গলী, বাঙ্গালী, সঞ্জীবনী, বসুমতী, হিতবাদী, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংবাদ- ও সাময়িক-পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। তিনি নিজেই এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৮৯৩ হইতে ১৯১৮—১৯ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ১৯০২ অব্দে ইন্দোর গবর্ণমেণ্ট ইন্দোরের তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ্ এবং বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনের হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া এই শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অনু-সন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট পেশ করিতে বলেন। কীর্ত্তনে মহাশয় যদিও এ সম্বন্ধে খুব

অনুকূল রিপোর্ট দাখিল করেন এবং বলেন যে, এই ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের যেমন লাভজনক হইবে দেশের লোকের তদ্রূপ আশু হিতকর হইবে, তথাপি মধ্য-ভারতীয় রেসিডেণ্টের গবর্ণমেণ্ট এবং দরবার তাহাতে উৎসাহ না দেওয়ায় হরিদাস-বাবু এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী পড়িয়া যান। তিনি দেবাস (Dewas, C. I.), উজ্জৈন (Gwalior State) ও নাগপুরে (C.P.) এবং ১৯০৮-৯ অব্দের নাগপুরের মহাপ্রদর্শনীতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা দেখান কিরূপ রস হইতে গুড় এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই উপলক্ষে হরিদাস-বাবু মধ্য-প্রদেশের জনসাধারণ ও গ্রামবাসীদের হিতার্থ একটি নূতন শ্রমশিল্পের প্রথম পথপ্রদর্শক (Pioneer of a new industry for the benefit of the people and villagers of C.P.) বলিয়া ১৯০৯ অব্দে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট হইতে একটি রৌপ্যপদক এবং প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন। এই শিল্প-প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব এখনও পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি মধ্য ভারতের সকল দরবারেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয় নাই। ১৯২০ অব্দের ১৩ই জুলাই তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া "ভারতবর্ষীয় চিনি কমিশনে" সাক্ষ্য দান করেন। কিন্তু কমিশন খেজুর চিনিকে লাভজনক ব্যবসায় মনে করেন নাই। হরিদাস-বাবু অবশেষে পাঁচ লক্ষ টাকার লিমিটেড কোম্পানী করিয়া ইন্দোর রাজ্যে এক কৃষিক্ষেত্র ও যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষেত্রে এক হাজার বিঘা চাষের জমি ও পনর হাজার খেজুর গাছ আছে। তিনি এই কারবারের নাম দেন "Date and Cane-Sugar Company"। কিন্তু Date অর্থাৎ খেজুর এই নাম সংযুক্ত থাকায় এদেশবাসী ইহাতে যোগদানে বিরত হয়। এজন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইহাতে ফেলিয়া ইহার ম্যানেজিং এজেন্সী নিজের হাতে রাখিয়া এবং পুত্রগণের অনুরাগ ও কল্যাণ ইহার সহিত চিরজড়িত থাকিবে বলিয়া "হরিদাস চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী" এই নাম দিয়া কারবার, পরিচালন করিতেছেন। এক্ষণে উদ্যোগী ও কৃতকর্ম্মা বাঙ্গালীরা যদি এই যৌথ কোম্পানীতে যোগদান করেন তাহা হইলে সকলেই বেশ লাভবান হইতে পারেন এবং ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। যখন এই শ্রমশিল্প-প্রবর্ত্তনের কল্পনা মাত্র হইতেছিল সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস-বাবুর গৃহে এক মাস অবস্থিতি করেন। স্বামিজী তাঁহাকে এই কার্য্যে নামিতে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। স্বামিজীর ইংরেজী জীবন-চরিতের চতুর্থ ভাগে তাঁহারই জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধে একথার উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন যেমন এই কার্য্যে তাঁহার সময় শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিতেছেন, তিনি আশা করেন, বংশধরগণ এবং তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহার এই চিরপোষিত আশা ফলবতী করিবেন।

খৃষ্টীয় ১৮৮৫ অব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৮৬অব্দে হরিদাস-বাবু প্রথম ডেলিগেট হইয়া যান এবং তদবধি তিনি একজন পাকা কংগ্রেসওয়ালা থাকিয়া প্রতি বৎসর তাহাতে যোগ দিয়া আসিতেছেন। বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি এক্ষণে পরিশ্রমের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও জনহিতকর কার্য্য মাত্রেই তাঁহার উৎসাহ এবং সহানুভূতি কাহারও অপেক্ষা কম নহে। সাধারণ অনুষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা দেওয়া তাঁর খুবই অভ্যাস। তিনি খাণ্ডোয়া ও তাহার বাহিরে নানাস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু বক্তৃতা করিয়াছেন। ১৯১৭ অব্দে মধ্য-প্রদেশের ৬ষ্ঠ প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এবং তাহাতে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন,—স্বায়ত্ত-শাসন, সরকারের দমননীতি ও শিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল সার উক্তি করেন তাহা শাসকবর্গ ও দেশবাসী উভয়েরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন, ও উচ্চ নিম্ন সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহাদের দেশ-ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। দেশে শিক্ষা-প্রচারের এবং যুবকগণকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য যাঁহারা দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রদূত। প্রাদেশিক

সভায় তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান কথা আছে। তিনি, শিক্ষার প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন—"Brother Delegates, the question of education is extremely important, and no time or space could be said to have been wasted over it." তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য নিজের প্রথম তিন পুত্রকে বিলাত পাঠান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। মধ্যম পুত্র কুসুমকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, এ-এম, আই-সি-ই, এ-সি-এফ, কুপার্স হিল কলেজ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া বিহার প্রদেশের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এস-সি (লণ্ডন), এ-এম, আই-ই-ই, ইলেক্‌ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়া বম্বে পাওয়ার হাউসের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরিদাস-বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিশির-বাবুকে কৃষিবিদ্ agriculturist করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে খাণ্ডোয়ার স্থায়ী বসবাসী করিয়া কৃষিক্ষেত্রের সকল ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। হরিদাসবাবু রাজনৈতিক বিষয়ে চরমপন্থী হইলেও একজন প্রকৃত রাজভক্ত প্রজা। খাণ্ডোয়ার এবং শুদ্ধ খাণ্ডোয়া কেন, জব্বলপুর মৌ এবং ইন্দোরে তাঁহার অপ্রতিহত প্রসার ও প্রতিপত্তি। তিনি উকীল-সম্প্রদায়ের সম্মানিত নেতা এবং এতদঞ্চলে এই ব্যবসার পথপ্রদর্শক। মধ্য-প্রদেশের সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রখ্যাতি আছে। তিনি চরিত্রবলে এবং পরার্থপরতাদি-সদ্গুণ-প্রভাবে রাজপুরুষ এবং দেশবাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তিনি যে এদেশে জনপ্রিয় এবং প্রজামিত্র বলিয়া স্বীকৃত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা তাঁহাকে হোলকার রাজ্যের প্রজাপরিষদের সভাপতির আসনে দেখিতে পাই।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। এ পর্য্যন্ত তিনি যে-সকল বক্তৃতা দান করিয়াছেন তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যায়। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার Law of Legal Necessities and Obligation নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়াছেন। উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ঐ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। পুস্তকখানি সমস্ত আদালতে আদৃত হইয়াছে। তিনি হিন্দু আইন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি তাহারই সুফল। বহু বৎসরের প্রবাসবাসে থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষা ভুলেন নাই। তিনি বঙ্গের বিবিধ সাময়িক ও সংবাদ পত্রে ভূরি ভূরি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছেন। গত দশ বৎসর হইতে তিনি পরিচিত বা অপরিচিত উচ্চশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই পত্র লিখিতে মাতৃভাষাই ব্যবহার করিতেছেন।

খাণ্ডোয়ায় তাঁহার ভবন দেশ- বা বিদেশ-আগত বাঙ্গালী-মাত্রেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। এক্ষণে খাণ্ডোয়ার পাঁচ ঘরে প্রায় জন-কুড়ি বাঙ্গালীর বাস হইয়াছে। হরিদাস-বাবুর গৃহে প্রধান প্রধান আইনব্যবসায়ীগণ মধ্যে মধ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই ইহাঁর আলয়ে আগমন করিয়া আনন্দিত হইতেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগী ও খাণ্ডোয়া-যাত্রায় প্রথম সঙ্গী প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ অব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র খাণ্ডোয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক খাণ্ডোয়াবাসী আর-একজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র গাঙ্গুলি। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মিরাট হইতে বদলি হইয়া খাণ্ডোয়ায় জেলা জজ হইয়া আসেন। তাঁহার আগমন হইতে খাণ্ডোয়ায় ৺ কালীর পূজা আরম্ভ হয়। মাধব-বাবু কালীর মৃণ্ময়-মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্যারীলাল-বাবুর গৃহে পূজা করেন। সেই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দ হরিদাস-বাবুর গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

গান

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কি সুর বাঁধা রে।
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর করে' তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁধা রে।
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ
হের দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।
মন যে আমার পথ-হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

এস এস হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করি কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কল কল ছল ছল।
এস এস উৎস স্রোতে
গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এস হে নির্ম্মল,
কল কল ছল ছল।
রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়
তুমি যে খেলার সাথী সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এস হে উজ্জ্বল,
কল কল ছল ছল।
হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়", সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গ রবে
করতালি দিতে হবে,
এস হে চঞ্চল,
কল কল ছল ছল।
মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এস বন্ধহীন ধারা,
এস হে প্রবল,
কল কল ছল ছল॥

৪ বৈশাখ, ১৩২৯

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাঁতের কথা

"দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না"। দাঁত এক রকম হাড় বিশেষ। হাড়ে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস আছে—লবণ ও জিলেটিন। জিলেটিনের সঙ্গে যদি চূণ-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট না থাকে, তবে হাড় তেমন শক্ত হয় না। যে শিশুর হাড় শক্ত হয় না, অল্প বয়স হইতেই তাহাদিগের পা বাঁকিয়া যায়। আবার, যে কারণে শিশুদিগের হাড় শক্ত হয় না (অর্থাৎ রক্তে চূণ জাতীয় পদার্থ কম হইলে), সেই কারণেই সেই-সেই শিশুর দাঁত তেমন মজবুত হইতে পায় না। কাজেই, গর্ভকালীন মাতার স্বাস্থ্য ও খাদ্যাখাদ্যের উপরে ভ্রূণের বা ভবিষ্যৎ বালকের দাঁতের হিতাহিত নির্ভর করে।

দাঁত ভাল রাখিবার উপায়

প্রথম কথা।—যদি ভাল (সুস্থ, সবল, সুদৃশ্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী) দাঁত পাইতে চাও, তবে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মাতার আহারের দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

দ্বিতীয় কথা।—যদি দাঁত ভাল করিয়া রাখিতে চাও, তবে কখনো মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিও না।

তৃতীয় কথা।—দাঁতকে সুস্থ রাখিতে হইলে, প্রত্যহ এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে দাঁতকে পরিষ্কার রাখা চাই। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর একবার এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার ঠিক পূর্ব্বেই আর একবার সকলেরই রীতিমত দাঁত মাজা উচিত। ইহা ছাড়া অতি সামান্য কিছু খাইলেও, তৎক্ষণাৎ এবং পানসুপারি খাইবার পরেও খুব ভাল করিয়া 'কুলকুচি' করিয়া মুখ ধোওয়া উচিত। দাঁত পরিষ্কার রাখিবার আর একটি উৎকৃষ্ট উপায়—প্রত্যেক গ্রাস খুব ভাল করিয়া চর্ব্বণ করা।

চতুর্থ কথা।—মুখ যেন কখনো টকিয়া না যায়। আহারের এতটুকুও কণা মুখে থাকিলে, তাহা হইতেই সেখানে অম্লরস উৎপন্ন হয়। দাঁতের পাথরের মত এনামেলে এই অম্লরস লাগিলেই এনামেল ক্ষয় হইতে থাকে। পান বা মুখশুদ্ধি ব্যবহার করিলে, মুখে প্রচুর ক্ষার-ধর্ম্মী লালা ক্ষরিত হয়—তাহার ফলে মুখ কুলকুচি করার কাজ হয় বলিয়া, মুখশুদ্ধির এত আদর। কিন্তু যে মুখশুদ্ধিই ব্যবহার কর না কেন, উহা ব্যবহারের পরেই মুখ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলা চাই।

পঞ্চম কথা।—মুখে জীবাণুর চাষ আবাদ করিও না। দাঁত ও মাড়ি—এই দুইয়ের ফাঁক দিয়া অথবা দাঁতের পাথরের মত এনামেলের গা ভেদ করিয়া যদি কোনও জীবাণু প্রবেশ করে, তবে সে কি-কি করিতে পারে?

(১) দাঁত ও দাঁতের মাড়ির মাঝে পুঁয নির্গত হওয়া। (২) দাঁতের শাঁসের ভিতরে কন্‌কনানি সৃষ্টি করা। (৩) দাঁতের শাঁস ভেদ করিয়া, চোয়ালের যে গর্ত্তে দাঁতটি বসান আছে, সেখানে পুঁয সৃষ্টি করিয়া, দাঁতের গোড়ায় স্ফোটক উৎপাদন করা। (৪) অল্প অল্প করিয়া জীবাণুজাত বিষ দাঁতের শাঁসের লসিকা শিরা দ্বারা সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়া।

আমাদিগের কর্ত্তব্য

প্রথম কর্ত্তব্য।—দাঁত পরিষ্কার রাখিবে। দাঁতের সর্ব্বল পিঠই ঘসিয়া মাজিবে—যতবার কিছু খাইবে ততবার সযত্নে মুখ ধুইবে। পান, দোক্তা, "সুখা", "খৈনি", জরদা, সুর্ত্তি প্রভৃতি ত্যাগ করিবে।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।—খুব নরম কোন জিনিষ প্রত্যহ খাইবে না। সুপারি, চাল-কড়াই প্রভৃতি চিবানর অভ্যাস রাখিবে।

তৃতীয় কর্ত্তব্য।—মিষ্টান্ন কম খাইবে। খাইয়াই খুব ভাল করিয়া মুখ ধুইবে।

চতুর্থ কর্ত্তব্য।—সময়ে, সহজপাচ্য, সুখাদ্য খাইবে; পরিশ্রম রীতিমত করিবে; মুক্ত বায়ু নিত্য সেবন করিবে—অর্থাৎ সর্ব্বদা শরীর-পালনে যত্নবান্ হইবে।

পঞ্চম কর্ত্তব্য।—কখনো মুখ হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবে না।

ষষ্ঠ কর্ত্তব্য।—দাঁতের কোথাও ব্যথা হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করাইবে। টিংচার আইয়োডিন কয়েক ফোঁটা জলে গুলিয়া কুল্লি করিলে, এবং যে দাঁতে ব্যথা, সেই দাঁতের যেখানে কাল দাগ হইয়াছে সেইখানে, দাঁত ও মাড়ির সংযোগ স্থলে, এই দুই জায়গায় টিংচার আইয়োডিন লাগাইলে, অনেক সময়ে অতি সহজেই দাঁতের রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। এই ঔষধ দু-দশ ফোঁটা পেটে গেলেও কোন অনিষ্ট হয় না।

কচি ছেলেরা অতি অল্প বয়স হইতেই দাঁত মাজিতে আরম্ভ করিবে। যাহাদের অত্যন্ত মিষ্ট খাওয়া অভ্যাস, তাহাদিগকে মাঝে মাঝে বা প্রত্যহ সোডা বাই-কার্ব্বনেটের কুল্লি করাইলে, বেশ সুফল পাওয়া যায়। পান, দোক্তা, চুরুট ও তামাকে—দাঁতের শূলব্যথায় সামান্য উপকার হইলেও আখেরে তাহাদের দ্বারা দাঁতের অপকারই বেশী হইয়া থাকে।

(স্বাস্থ্যসমাচার, আষাঢ়) শ্রী রমেশচন্দ্র রায়

—

গান

বহুযুগের ওপার থেকে
আষাঢ় এল আমার মনে।
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে
ঝর-ঝর বরিষণে।
যে মিলনের মালাগুলি
ধূলায় মিশে হল ধূলি,
গন্ধ তারি ভেসে আসে
আজি সজল সমীরণে॥
সেদিন এম্‌নি মেঘের ঘটা
রেবানদীর তীরে,
এম্‌নি বারি ঝরেছিল
শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে
কাল মেঘের ছায়ার সনে॥
বহুযুগের ওপার থেকে
আষাঢ় এল আমার মনে॥

(অলকা, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শিল্পের সচলতা ও অচলতা

ছবি কবিতা অভিনয় যাই বল সেটা চল্লো কি না এই নিয়ে কথা। মন দিয়ে লেখা তীরের মত সোজাসুজি চলে; ভাষাকেও গতি দেয় পরিস্ফুটতার দিকে মানুষের অন্তর বা মনের গুণ! মনে যেখানে ছবি কি ছাপ পরিষ্কার নেই সেখানে ছবির রেখাপাত বর্ণবিন্যাস সমস্তের মধ্যে একটা আবলা আলস্য অস্ফুটতা আমরা দেখ্‌তে পাই; কবিতার বেলায়ও এটা দেখি কথার মধ্যে যেন ঝোঁক নেই, ঝিমিয়ে আছে, আবোল তাবোল বকে' চলেছে ভাষা!

যদি আর্টিষ্টের মনের হাতে পড়ে' চলিত ভাষাও বিনা সাধুভাষার সাহায্যেই সুন্দরভাবে চল্‌তে পারে, তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে চল্‌তি বলে তুচ্ছ করা তো যায় না—আর্টিষ্টের হাতে এই পটের ভাষা যে সুন্দর হয়ে উঠ্‌তে পারে না তা কেমন করে' বলা যায়? জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হকুসাই এই পটের ভাষাতে যে চমৎকার চিত্রসব লিখে গেছেন তা আজকের ইউরোপ দেখে অবাক হচ্ছে! তাই বলি, যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন, মনের হাতে তার লাগাম না তুলে দিয়ে তাকে চালিয়ে যাওয়া শক্ত। শব্দ সুর ছন্দ, বাক্য রূপ ইঙ্গিত-ভঙ্গী—এরা ভাষাকে চালাবার, মনকে বেঁধ্‌বার, মহাস্ত্র বটে, কিন্তু মনের হাতে এগুলো তুলে দেওয়া তো চাই!

খালি ক্রিয়াপদ দিয়ে কখন পদ্য লেখা যায় না, কিন্তু এই ক্রিয়াপদ ছবিতে মূর্ত্তিতে অভিনয়ে ঢের বেশি কাজ করে, কিন্তু এর সদ্ব্যবহার খুব পাকা আর্টিষ্টের দ্বারাই সম্ভব। রাফেলপ্রমুখ পুরোনো ইতালীর আর্টিষ্টরা ছবিতে বায়ু বইছে দেখাতে হলে আগে আগে—ছবির আকাশ-পটে গোটাকতক গালফুলো ছেলে ফুঁ দিয়ে ঝাঁটার মতো খানিক ঝড়, কি দক্ষিণ হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে এইটে আঁক্‌তো, কিন্তু বায়ুর যথার্থ রূপ এমন চালাকি দিয়ে ধরা না-ধরা সমান, ওটা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। ভারত-শিল্পের বায়ু-দেবতার মূর্ত্তি তাও আমাদের ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণের মতোই ছেলেমানুষি পুতুল মাত্র। একই মূর্ত্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই! দেবমূর্ত্তিগুলো তেত্রিশ কোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গীতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই মূর্ত্তি যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য্য! একই দেবীমূর্ত্তি মকরে চড়া হলেই হলেন তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে বসিয়ে হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপ-কল্পনার মধ্যে যে রকম রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য; গ্রীক মূর্ত্তি আপোলো, ভিনাস্, জুপিটার, জুনো ইত্যাদি মূর্ত্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য;—তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্ত্তিকে একটু আস্‌বাব রংচং আসন বাহন বদলে রকম রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস,—দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্য্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে' পাথরের রেখায় ধরেছে বলে' আমার জানা নেই।

সারথির মানস রাশের মধ্যে দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌঁছয়, তেমনি মনের ভাবনার সামান্য ইঙ্গিত ভাষার মধ্যে গিয়ে চলাচল করে, তা সে ছবির ভাষা কবির ভাষা বা অভিনেতার কি গায়ক বা নর্ত্তকের ভাষা যে ভাষাই হোক। "The art of Painting (নিরূপণ ও বর্ণন শিল্প সমস্তই) is perhaps the most indiscreet of all arts"—যাচন করা চলে ঢেকে ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণন করা চলে না সে ভাবে। কথার যেটুকু বা যাচন কর্‌বার ফাঁক আছে, ছবির তাও নেই—হুবহু বর্ণন, নয় মিথ্যা বর্ণন, দুই

রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নেই। তেমনি মন যেখানে নেই, কথা সেখানে থেকেও নেই। মনে বেদন এল, নিবেদন হ'ল তবে ছবিতে কবিতায় নাট্যে! মন কার নেই? কিন্তু মনের কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা যার-তার নেই এটা ঠিক। ছাত্র পরীক্ষার দিনে খুব মনের আবেগ ও মনঃসংযোগ দিয়ে লিখ্‌ছে—সে মন এক, আর সেই ছাত্রই দেশে গিয়ে যাত্রা জুড়েছে, কি মাঠে বসে' মন দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে—সে মন অন্য প্রকার। তেমনি সাধারণ মন, আর রসায়িত মন, কবির মন আর্টিষ্টের মন আর তাদের হুঁকোবরদারের মন ও মনের আবেগে তফাৎ আছে। খুব খানিক মনের আবেগ নিয়ে লিখে কিম্বা বলে' কয়ে' চল্লেই কবি চিত্রকার অভিনেতা হয় না। অভিনেতা যদি অত্যন্ত মনের আবেগে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো রুদ্রমূর্ত্তিতে বেরিয়ে সত্যিই দ্বিতীয় অভিনেত্রীর গলা কেটে বসে, তবে তাকে নট বল্‌বে, না পাগল মূর্খ এ-সব সম্বোধন করবে দর্শকরা? কিম্বা দর্শকদের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের নাচে মুগ্ধ হয়ে কেউ যদি হঠাৎ কোমর বেঁধে নানা অঙ্গভঙ্গী মনের আবেগে সুরু করে' দেয় তবে তাকে নটরাজ বলে' ডাকে কেউ? অভিনেত্রী বেশ তাল লয় সুর দিয়ে কেঁদে চলেছে, হঠাৎ উপরের বক্স থেকে আবেগভরে ছেলে কাঁদা ও ঘুমপাড়ানো সুরু হ'ল, তার বেলায় শ্রোতারা ধমকে ওঠে কেন ছেলেকে ও ছেলের মাকে?—মনের আবেগ তো যথেষ্ট সেখানে ভাষায় প্রকাশ হচ্ছিল, কিন্তু আর্ট ব'লে তো চল্লো না সেটা? তবেই দেখ, শিল্পের অনুকূল মনের পরশ আর তার প্রতিকূল—এই দুরকম মনের পরশ রয়েছে। মালী যেমন বেছে বেছে ফুল নেয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফুলের তোড়া ফুলের হার গাঁথে, শিল্পীর মনের পরশ ঠিক সেই ভাবে কাজ করে' যায় বাক্য রং রেখা ভঙ্গী ইত্যাদিকে ভাবে সূত্রে ধরে' ধরে'। নিছক আবেগের উচ্ছৃঙ্খলা আছে, সংযম নির্ব্বাচন এসব নেই। ছেলে-কাঁদার ঠিক উল্টো যে পাকা নটীর কান্নার সুর, কৃত্রিম সুরে হলেও সেটা মনোরম হয় শিল্পীর বর্ণনভঙ্গী নির্ব্বাচন ইত্যাদি নিয়ে। বাষ্পের মতো শুধু খানিক আবেগের সঞ্চয় নিয়ে ছবি বল আর লেখাই বল শিল্প বলে' চলে না!

কাঁচা অভিনেতা Realismএর পথে গিয়ে নাটকের বিষয়টাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করে' যেন দর্শকের নাকের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চলে, আর পাকা অভিনেতা শিল্পীর সংযম নিয়ে সেই বিষয়টাই দিয়ে যায় অথচ ফল হয় তাতে বেশি দর্শকের উপরে! এইজন্যই ঋষিরা বলেছেন বাক্যকে মনের সঙ্গে যুক্ত কর বা 'কায়েন মনসা বাচা' ছবি লেখ, কথা বল, অভিনয় কর, সাফল্য লাভ করতে বিলম্ব হবে না। কথা তো বল্‌তে পারে সবাই, চলেও সবাই রঙ্গে ভঙ্গে, ছবিও লেখে অনেকে; কিন্তু ভাষাকে পায় না সবাই।

ছবিকে কেবলি দেখা ও ভোগ করার রাজত্ব থেকে কথা ও ভাষার কোঠায় টেনে আনার সম্বন্ধে সবার মত হবে না। তাঁরা বলেন—কথা বল, কবিতা বল, উপকথা বল, তার তো স্বতন্ত্র রাস্তা, art বর্ণমালার পুস্তক, নীতিশাস্ত্র কিম্বা কথামালা হতে বাধ্য নয়, একে সৌন্দর্য্য ও তার অনুভূতির রাস্তাতে চালানোই ঠিক। এ কথা মান্‌তেম যদি রূপের জগতে এমন বিশেষ পদার্থ একটা থাক্‌তো যে নির্ব্বাক নিশ্চল। বিন্দু সে বলে আমি চোখের জল, শিশির-ফোঁটা, কত কি! মৃত্যু সেও বলে আমি এই দেখ চলেছি আর ফিরবো না, গভীর সান্ত্বনা আমি, নিদারুণ আমি, সকরুণ আমি! ফুলের সঙ্গে ফুলদানিটাও যদি কথা না কইতো তবে কি তারা মানুষের মনে ধরতো? নির্ব্বাক যে সেও ইঙ্গিতে বলে—আমি বল্‌তে পারছিনে মন কি করছে! অবোধ যারা তারাই কেবল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত আর্টের কল্পনাজাল বুনে বুনে নিজেকে ও নিজের শিল্পকে গুটির মধ্যে গুটিপোকার মতো বদ্ধ করে' রাখ্‌তে চায়। শিল্প যে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাষা—আনন্দ-কাকলী, আনন্দের দোলা—

"কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ"

মহাশূন্য—তার নিজের বাক্য দিয়ে সেও পরিপূর্ণ রয়েছে।

চটক্ এবং চাকচিক্যময় ক্ষণিক পদার্থটার উপভোগের অনিত্যতার উপরে, কিম্বা ক্ষণিক শ্রুতিসুখ দৃষ্টিসুখ ইত্যাদির উপরে শিল্প-রচনার ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করলে বাণীকে নামিয়ে দেওয়া হয় আকাশ থেকে রসাতলে।

চতুরশীতি লক্ষ জন্মের তপস্যালব্ধ জীবনটা নিয়েই মানুষ যখন ছিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে তখন যুগ-যুগান্তরের তপস্যা দিয়ে কত মহৎ জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ থেকে সার্থকতার আনন্দ দিয়ে লাভ করা ভাষাসমূহকে নিয়ে মানুষ যে নয় ছয় করে' খেলা করবে তার বাধা কি? শিল্পরূপিণী সুন্দরী ভাষাকে পেতে তপস্যার দুঃখ আছে—"Art interprets the mightier speech of nature. It is a poetical language, for it is an utterance of the imagination addressed to the imagination and to rouse emotion."—(Gilbert.)

অনাহতের ধ্বনি ব্যক্ত করে যে ভাষা, অরূপের ইঙ্গিত ও রূপ দর্শন করার যে ভাষা, নিশ্চল নির্ব্বাক পাষাণকে চলায় বলায় যে ভাষা, তাকে বিনা সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেয়ে থাকে? ভাষার তপস্যায় বলীয়ান মানুষ পাথরের কারাগার থেকে বার করে' নিয়ে এল যে ভাষাকে চিরসুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী—তারি চতুঃষষ্টি ধারা হল—কথা, ছবি, মূর্ত্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলা বিদ্যা।

(বঙ্গবাণী, শ্রাবণ)　　　　শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হ'ল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি
হাতে করে' আনি,
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল তাল শিরীষের মিলিত মর্ম্মরে
বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।
রক্ত পথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে আসে ধরণীর পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে

কাল-বৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত-উত্তরীয়-তলে লয়ে মোর প্রাণ-দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে।
জন্ম-মরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলালো।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরী হ'তে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে'।
আলোকের অসীম সঙ্গীতে
চিত্ত মোর ঝঙ্কারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।
উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নব মল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল ছন্দে,
শ্যামলের বুকে
নির্নিমেষ নীলিমার নয়ন-সম্মুখে।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি'
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।
হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক্ তব জাগরণ
ভস্ম হ'তে দীপ্ত হুতাশন!
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক্ কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন!
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি',
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্ত্তে অরণ্য দেয় ভরি'—
সেই মত, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন!
ব্যক্ত হোক্ জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক্, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়!"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত-মাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

(সবুজপত্র, চৈত্র-বৈশাখ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

বাংলার নবযুগের কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দ

বাংলার নবযুগের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতা। ব্রাহ্ম-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্বতোভাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যান নাই। এ কাজটা করেন কেশবচন্দ্র। এইজন্যই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র একটা অতি উচ্চ-স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইংরেজী শিক্ষা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ জাগাইয়া তুলে, কেশবচন্দ্র তাহারই মধ্যে একটা প্রবল ধর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চারিত করেন। আমাদের নব্যসমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শে যে স্বাধীনতার আদর্শ ফুটিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের প্রেরণা সঞ্চার করিয়া কেশবচন্দ্রই বিশেষভাবে একটা অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন। এই ত্যাগের দ্বারাই বাংলার নবযুগের সাধনা মহীয়সী হইয়া আছে। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী শাসনের ফলে আমাদের প্রথম যুগের ইংরেজীনবীশদিগের মতি-গতি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে; এবং ইঁহারা স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদের মতি-গতিকে সংযত করিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্বদেশাভিমুখীন করেন। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ইহাই মহর্ষির প্রধান কীর্ত্তি। মহর্ষির প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন একটা বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ একটা দুর্জ্জয় রক্ষণশীলতাও ছিল।

কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে মহর্ষি নানাদিক দিয়া তাঁহার প্রকৃতিনিহিত রক্ষণশীলতার বাঁধনকে পর্য্যন্ত আল্‌গা করিয়া দেন। তখন পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও বসিবার অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও গুণে মোহিত হইয়া মহর্ষি তাঁহাকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করেন। কিন্তু মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই প্রগাঢ় স্নেহের সম্বন্ধ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে ক্রমে গুরুতর মতভেদ দাঁড়াইয়া গেল। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটা ধর্ম্মসাধনের কেন্দ্র করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিপ্লব আনয়ন করিতে চাহেন

নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচরেরা জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অগ্রসর হয়েন। ইঁহারা সকলের আগে প্রচলিত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চা'ন। জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীতধারণ এই সংস্কৃত ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মেরা উপবীত পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন।

এইসকল আলোচনার ফলে দলে দলে ব্রাহ্ম যুবকেরা প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্বন্ধ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে পরিবার পরিজন এবং বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা অশেষ প্রকারের শারীরিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই ব্রহ্মোপাসনা করিতেছিলেন। এখন অদম্য উৎসাহ সহকারে সমাজ-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। নবীন ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে ব্রাহ্মসাধারণের মতানুযায়ী পরিচালনা করিবার জন্য এক ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ছোট বড়, যুবক ও বৃদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজে কার্য্যপরিচালনায় প্রত্যেক ব্রাহ্মের সমান অধিকার, এই গণতন্ত্র আদর্শের উপরে ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য থাকিতে পারিবেন না, নবীন ব্রাহ্মেরা এই প্রস্তাব আনিলেন। মহর্ষি সম্পূর্ণভাবে ইহাতে সায় দিতে পারিলেন না। উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্রপ্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

মহর্ষির চরিত্র, সাধনা এবং বৈষয়িক পদমর্য্যাদার প্রভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাল করিয়া মাথা তুলিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আতিশয্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সে সময়ের খৃষ্টীয়ান পাদরী ডাইসন (Dyson) সাহেব কহিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আর কিছুই নহে, কেবল Conjugation of the verb to think মাত্র, অর্থাৎ I think; We think; Thou thinkest; You think; He thinks; They think—ইহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। এক কথায় প্রত্যেক ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত এই ধর্ম্মের আর কোনও প্রামাণ্য নাই।

কথাটা সম্পূর্ণরূপেই সত্য ছিল বটে। কিন্তু যে কালে জগতের সকল ধর্ম্মেই মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে শাস্ত্রের বন্ধনে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সে সময়ে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রচার করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহাও মানিতেই হইবে। এদেশে এই শাস্ত্রানুগত্যের ফলে ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সাধকের আন্তরিক অনুভবের একটা বিরাট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবধানে নিবন্ধন লৌকিক ধর্ম্মের শক্তি ও সজীবতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্ম মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চতম শিখরে তোলা দূরে থাকুক, নানা দিক দিয়া মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিতই করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিতে উদ্যত হন, তাহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নবীন ব্রাহ্মদিগের জীবনে ধর্ম্মকে কেবল একটা খেয়ালরূপেই গড়িয়া তুলে নাই, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইঁহারা নিজে যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কত দারিদ্র্য, কত নির্য্যাতন, আত্মীয়-স্বজনবর্গের সঙ্গে কি দুর্ব্বিষহ বিচ্ছেদ-যাতনা, ইঁহাদিগকে নিজের মতবাদের জন্য সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে এই-সকল স্বাধীনতার সাধকের প্রতি অন্তর শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়ে। এ খেলা ছিল না। ইঁহারাই বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন।

(বঙ্গবাণী, শ্রাবণ) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

—

গান

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেচে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে।
কেমন করে' যায় যে ডেকে
বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে
ক্ষণে ক্ষণে।
বাঁধনহারা জলধারার
কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী
যায় যে বলে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানস লোকে গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর
কুঞ্জবনে।

২রা আষাঢ়, ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
"বুধবার"

প্রেম

প্রেম সে ফুটে কাঁটার কেয়া দুর্দ্দিনেরি দারুণ দেয়া
নিবিড় যখন বুকে;
তার সুরভি হরবি যদি,
সইবি কাঁটায় কাঁটার ক্ষতি
চক্ষে আকুল অশ্রু-নদী—
ফুটবে হাসি মুখে!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মান্দ্রাজের আডিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি দামোদর উদ্যানের ভিতর অবস্থিত। ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই বিদ্যালয়ের কৃষিক্ষেত্র দেখিলাম। এখানে যে প্রকার ধান দেখিলাম তাহা মান্দ্রাজের সহরতলীতে যে শস্য হয় তাহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। বোধ হয় কোনপ্রকার বিশেষ সার ব্যবহার করাই এই উৎকর্ষের কারণ। তাহার পর একটি ছোট হল্‌দে রঙের বাড়ীর পাশ দিয়া গেলাম। ইহা ছাত্রাবাসেরই একটি অংশ; এখানে অনেকগুলি ছাত্রকে দেখিতে পাইলাম। সবাই ব্যস্ত; কেহ ঘরের ভিতরে রহিয়াছে, কেহ কুয়ার ধারে। সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া তাহারা দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান অংশগুলি এখন দেখিতে পাইলাম। শাদা ধুতি ও জামা পরা ছেলে দলে দলে বাড়ীগুলির ভিতর ঢুকিতেছে এবং বাহির হইতেছে। প্রত্যেক গাছের গায়েই তাহার নামধাম বড় বড় অক্ষরে লেখা, পড়িতে পড়িতে চলিলাম। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে হইলে এইপ্রকার বাগানের ভিতর থাকাই সুবিধাজনক, মধ্যে মধ্যে দূরের কোন একটা বাগানে গিয়া দুচারটা গাছ দেখিয়া আসা অপেক্ষা ঢের ভাল। এতক্ষণে আমি একেবারে কলেজের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভিতরে ঢুকিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার পরিচিত একজন অধ্যাপক তখন আসিয়াছেন কি না। দরোয়ান আমাকে উপরে লইয়া গেল। আমার বন্ধুকে সেখানে দেখিলাম, তিনিও কলেজের জাতীয় পোষাক পরিয়া আছেন। তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার ল্যাবোরেটারিতে লইয়া গেলেন। তিন-চারটি ছাত্র মাইক্রোস্কোপ, ক্ষুর, ছুঁচ, প্রভৃতি লইয়া কাজ করিতেছে দেখিলাম। মাইক্রোস্কোপ, ছাত্রদের বসিবার বেঞ্চ প্রভৃতি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত। ঘরে আলোর ব্যবস্থা সুন্দর। ছাত্রদের মুখ বেশ প্রফুল্ল, অধ্যাপকগণও এমন আনন্দের সহিত তাহাদের কঠিন বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন যে দেখিয়া আমার ভারি ভাল লাগিল। এখানকার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে যেন বুঝিতে পারিলাম। আমার অধ্যাপক বন্ধু আমাকে যেখানে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সব দেখা হইবার আগেই আমরা উপাসনার ঘণ্টা শুনিতে পাইলাম। আমরা তাড়াতাড়ি একটি খড়ে ছাওয়া বড় ঘরের দিকে চলিলাম। ঘরখানি একটি আমগাছের তলায়। ঢুকিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যেই সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সমবেত হইয়া সশ্রদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের সকলের সম্মুখে তাঁহাদের অধ্যক্ষ। ইনিও সকলের সহিত উপাসনায় যোগদান করেন। আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া পিছন দিকে দাঁড়াইলাম। শঙ্করাচার্য্যের একটি বিখ্যাত স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া তাঁহারা উপাসনা আরম্ভ করিলেন এবং উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া শেষ করিলেন। তাহার পর পরে পরে একটি পার্সী প্রার্থনা, একটি মুসলমান ও একটি বৌদ্ধ প্রার্থনা উচ্চারিত হইল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি সর্ব্বশেষে গাওয়া হইল। এই ব্যাপারটি জাতীয় বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ।

একজন ভদ্রলোকের উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চিন্তার ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শুনিলাম অনেকেই এইরূপ বক্তৃতা দিবার ভার লইয়াছেন। এই উপায়ে অনেক জনহিতৈষী মানুষ শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্য করিতেছেন। বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র ছাত্ররা নিজের নিজের ক্লাশের ঘরে চলিয়া গেল। যে-সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে যন্ত্রাদির সাহায্যে কোনরূপ পরীক্ষা করিতে হয় না, সেই-সকল বিষয় ছাত্রগণ গাছের তলায় বসিয়াই শিক্ষা করে। উপরে একটুখানি খড়ের ছাউনি থাকে, কিন্তু চারিপাশ খোলা! মাটি হইতে একহাত উঁচু করিয়া বাঁধানো বসিবার স্থান। দেয়াল-ঘেরা বদ্ধ গৃহের কোনও অসুবিধা ইহার মধ্যে নাই, উপরন্তু সুবিধা এই যে ছাত্রগণ প্রকৃতির

আডিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকার্য্যে-রত ছাত্র

মাত্রই একটি প্রার্থনা হইল। ভগবদ্গীতা হইতে একটি স্তোত্র পঠিত হইল, এবং একটি বৈদিক সঙ্গীত সকলে সমস্বরে গান করিল। এই সময়ে ছাত্ররা সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ পায় এবং পুস্তকাগার বা ক্রীড়াবিভাগের সম্পাদকগণের কোন কথা সকলকে জানাইবার থাকিলে তাঁহারা এই সময় তাহা বলেন।

খাওয়া শেষ হইবামাত্র আমার বন্ধু আমাকে ছাত্রদের থাকিবার ঘরে লইয়া গেলেন। ছোট ছোট ঘর, মেঝেগুলি বাঁধানো। একটি প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘিরিয়া এই ঘরগুলি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রাঙ্গণটি খেলার জন্য ব্যবহার করা হয়। ঘরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণ ইচ্ছামত ঘরগুলিকে সজ্জিত করিয়াছে। প্রত্যেক ঘরেই কোন-না-কোন বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় নেতা বা ধর্ম্মবীরের চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। টেবল্ বা চেয়ার নাই, একটি করিয়া নীচু ডেস্ক আছে, তাহারই সামনে বসিয়া ছেলেরা পড়াশুনা করে। এক

আডিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকার্য্যে-রত ছাত্র

সাহচর্য্য অনেকখানি লাভ করে। আমার বন্ধুর এই সময় একটি ক্লাশ ছিল, অগত্যা তিনি আমাকে একলা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি লাইব্রেরীতে গিয়া ঢুকিলাম। শুনিলাম লাইব্রেরীটি সাধারণ রকমের নয়। কয়েকটি আল্‌মারি দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, শিক্ষাপ্রণালী, মনস্তত্ত্ব ও কৃষি বিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট বই রহিয়াছে। টেব্‌লের উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পত্রিকা অনেকগুলি দেখিলাম, হাতে লেখা একখানি পত্রিকাও রহিয়াছে, মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার উৎসাহ দিবার জন্যই ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে। আর একটা টেব্‌লে দৈনিক ও রাজনৈতিক সংবাদপত্র রক্ষিত আছে। এইগুলি উল্টাইয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় ঘণ্টা পড়িল এবং আমার অধ্যাপক বন্ধু আসিয়া জুটিলেন।

তখন প্রায় ১১টা। খাইবার স্থান হইয়াছে শোনা গেল। ছাত্ররা সার দিয়া বসিয়া গেল। সব শ্রেণীর ছাত্রই একসঙ্গে বসিল। খাদ্য পরিবেশন করা হইবা-

আড়িয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিকার্য্যে রত-ছাত্র

ছাত্রদের আলোচনা-সভা হয় শুনিলাম। নানা বিষয় আলোচনা হয় ও সকলেই তাহাতে যোগদান করে। সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ছাত্রদিগকে ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

চারটার মধ্যে আমার সব দেখা শেষ হইয়া গেল, আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সকলের কাছে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। যাহা দেখিয়া গেলাম তাহার চিন্তাতেই মন ব্যাপৃত হইয়া রহিল। এই বিদ্যালয়টি কেমনভাবে আপনার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে ও অন্যান্য বিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নতিলাভ করিতেছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এই বিদ্যালয়টির প্রধান উদ্দেশ্য সকলকে জাতীয়তার এক ক্ষেত্রে ডাকিয়া আনিয়া দাঁড় করানো, কিন্তু প্রত্যেকের ধর্মসংক্রান্ত যে বিশেষত্ব আছে তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইহারা চান না। কার্য্যক্ষেত্রে এক হইয়া থাকা এবং অন্যের ধর্ম্মকে সহ্য ও শ্রদ্ধা করা—এই দুই শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানাদিকে ভালবাসিতে ইহারা নানা উপায়ে শিক্ষা দেন। প্রত্যহ জাতীয় সঙ্গীত গান, নানা ধর্ম্মের প্রার্থনা উচ্চারণ করা, সাদাসিধা ভারতীয় পরিচ্ছদ পরা, এই-সকলের ভিতর দিয়া তাহারা নিরাড়ম্বর জীবন যাপন ও উচ্চচিন্তা করার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষের সকল রকম অবস্থা সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান আছে। সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা লাভ করে তাহারা অধ্যাপকদের মহৎ আদর্শে। তাঁহারা সকলেই বিশেষজ্ঞ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের জ্ঞান একত্রে তাঁহাদের আশ্রয় করিয়াছে। ইহারা শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহারাই যথার্থ গুরু হইবার ও মানুষ গড়িবার উপযুক্ত।

ঘরে কতকগুলি পেন্সিল কলম দাঁতমাজন সাবান প্রভৃতি দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা ছাত্র-সমবায়-ভাণ্ডার। এক-একজন ছাত্র এক-এক বৎসর উহা পরিচালনের ভার গ্রহণ করে। আর-একটি ছাত্রের উপর ডাকঘরের ভার। সে পোষ্টকার্ড খাম টিকিট প্রভৃতি জোগাড় করিয়া রাখে ও ছাত্রদিগকে দরকার-মত বিক্রয় করে। চিঠি বিলি করা ও ডাকে পাঠানোর কাজও সেই করে।

দুইটার সময় আবার ঘণ্টা শোনা গেল। ছেলেরা ঘর হইতে বাহির হইয়া বিজ্ঞানাগারগুলির দিকে চলিল। সন্ধ্যা বেলায় যন্ত্রাদি সহযোগে কাজ করা হয়, তখন আর বই পড়া নয়। ছয়-সাতজন ছাত্র জৈব রসায়ন বিভাগে আছে, তাহারা আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। অন্যান্য ছাত্রেরাও যে যাহার কাজে নিযুক্ত হইল। দুইটা আড়াইটার সময় সমস্ত বিদ্যালয় জুড়িয়া কাজের সাড়া পড়িয়া যায়। বন্ধুর সঙ্গে আমি ঘরে ঘরে ঘুরিতে লাগিলাম। ফিজিক্সের একটি নূতন বিজ্ঞানাগার হইতেছে দেখিলাম। নির্ম্মাণ শেষ হইলে উহা খুব উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে হইল। রাত্রে

শ্রী—

গ্যাস-পিস্তল—

এই পিস্তল দিয়ে চোর তাড়ান যায়, এবং ছোটখাট আগুন নেবানো যায়। একটা চোঙার মধ্যে গ্যাস ভরা থাকে। হাতলটা ঠিক পিস্তলের হাতলের মত। পিস্তলের ঘোড়া টিপ্‌বামাত্র চোঙা ফেটে গ্যাস বেরিয়ে আসে। চোরের নাকে সেই গ্যাস ঢুকলে অনেকটা "কাঁদন গ্যাসের" কাজ করে। চোরকে খানিকক্ষণের জন্তে অজ্ঞান করে' রাখ্‌বে—কোন চিরস্থায়ী ক্ষতি করে না। গ্যাস পেছন দিকে যায় না, কাজেই যে পিস্তল চালাবে তার বিশেষ কোন ভয় নেই। আগুন-লাগা স্থানে পিস্তল ছুড়্‌লে—আমাদের "বেঙ্গল কেমিক্যাল" থেকে তৈরী ফায়ারকিং যা কাজ করে—এতেও ঠিক সেই কাজ হবে।

কাগজের তাগৎ

কাগজের জোর—

কাগজের শক্তি-পরীক্ষার এক নূতন উপায় করা হইয়াছে। একখানা পাত্‌লা কাগজের ওজন একখানা সাধারণ চিঠির কাগজের সমান। এই রকম একখানা কাগজকে একটা ফ্রেমে আঁটা হয়। এই ফ্রেমের গায়ে কয়েকটা পিঁড়ি লাগান ছিল। তাহাতে কয়েকজন লোক বসিতে পারে। তিনজন নারী এই সকল পিঁড়িতে বসেন। এবং দুইজন দাঁড়াইয়া থাকেন। কাগজখানি মোট ৭৬৯ পাউণ্ড (সাড়ে নয় মণের উপর) ওজন বহন করিয়াছে, তবুও ইহা ছিঁড়িয়া যায় নাই বা কোন রকমে নষ্ট হয় নাই।

ইলেকট্রিক ট্রেন—

রাশিয়াতে এখন বৈদ্যুতিক রেলগাড়ির চলন হইয়াছে। এই গাড়ি একেবারে না থামিয়া ৫০০ মাইল ছুটিয়া যাইতে পারে। মোটরের শক্তি ৩৬০০ ঘোড়ার জোর। সোভিয়েট সরকার ইহার গঠনে সাহায্য করিয়াছেন এবং এখনো কল-কব্জা ইত্যাদির গঠন-প্রণালী গোপন রাখিয়াছেন।
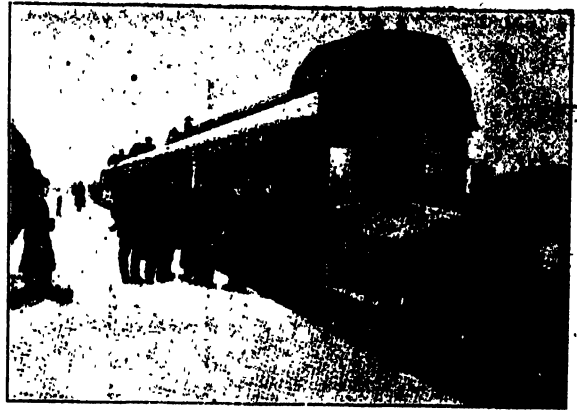
ইলেকট্রিক ট্রেন

আগুনের হাত হইতে তুলা বাঁচানো—

তুলাতে বড় তাড়াতাড়ি আগুন ধরে। পোড়া বিড়ি বা সিগারেট যদি কোন রকমে তুলার গাঁইটে লাগে তবে সমস্ত গুদামের লক্ষ লক্ষ টাকার তুলার বস্তা ছাই হইয়া যায়। জাহাজে বা রেলগাড়িতে করিয়াও যখন তুলা চালান হয়, তখনও অনেক সময় ইঞ্জিনের ধোঁয়াতে আগুনের ফুল্‌কি আসিয়া তুলার গাদায় পড়িয়া আগুন ধরিয়া যায়। বছরে এক তুলা পুড়িয়াই যে কত কোটী টাকা নষ্ট হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সম্প্রতি আমেরিকাতে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রবণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে তুলাকে আগুনের হাত হইতে বাঁচানো চলিবে। একটা চৌবাচ্চাতে এই দ্রবণ পদার্থ দু ইঞ্চি ভরা থাকে। একটা নল দিয়া ঐ রাসায়নিক পদার্থ চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়ে। তুলার গাঁইটকে ঐ চৌবাচ্চায় চোবান হয়। প্রত্যেক পাশ দু মিনিট করিয়া ভিজিতে পায়, তাহাতে তুলার গাঁইটের ভিতর দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। চারি পাশ উপর-নীচু ভিজান হইলে পর রৌদ্রে তুলার গাঁইট ২।৩ দিন শুকান হয়। গাঁইট শুকাইয়া গেলে পর চালান দিতে পারা

যায়। এইরূপ এক গাঁইট তুলার গায়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও আগুন লাগানো যায় নাই। এই প্রকারে তুলা ভিজাইয়া লইলে তুলা অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ ভাল অবস্থায় থাকে। তিন বছরে এইরূপ এক গাঁইট (৫০০ পাউণ্ড) তুলার মাত্র ২ পাউণ্ড নষ্ট হইয়াছিল। আর এমনি এক গাঁইটে (৫০০ পাউণ্ড) কয়েক মাসের মধ্যে ৮০ হইতে ৪০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত তুলা নষ্ট হয়।

ছোট্ট রেলগাড়ী—

লণ্ডনের এক রাস্তায় একদিন, কথা নেই বার্ত্তা নেই, বেজায় লোকের ভিড় জমে' গেল। সবাই ভিড় ঠেলে সাম্‌নে আস্‌তে চায়—একটা ছোট্ট ইঞ্জিন—তার সঙ্গে তেমনি ছোট্ট একটা ঠেলা গাড়ী জোতা। ইঞ্জিনটা বাষ্পের জোরেই চল্‌ছে। একটি ক্ষুদে ড্রাইভার সেটাকে

হাতীর সাহায্যে মেঝের শক্তি পরীক্ষা

হাতীর সাহায্যে মেঝের দৃঢ়তা পরীক্ষা—

কথায় বলে হাতী নাকি কাঁচা ইমারত বা পল্‌কা স্থানের ওপর কখনো যায় না। আমেরিকার ওহিওতে এক ভদ্রলোক একটা মোটা গ্যারেজ নির্ম্মাণ করেন—গ্যারেজের মেঝে কতখানি শক্ত হ'ল জান্‌বার জন্যে তিনি একটা সার্‌কাসের দল থেকে পাঁচটা হাতী এনে তার ওপর চাপান। তাতে মেঝের মাঝখানে ৪০৫ মণেরও বেশী চাপ পড়ে।

মিষ্টি বাড়ী—

নীচে যে একটি বাড়ীর ছবি দেওয়া হয়েছে—ঐ বাড়ীটি পৃথিবীর সব-চেয়ে মিষ্টি। ঐ ছোট বাড়ীটি একটি বড় বাড়ীর জান্‌লায় দেখানো
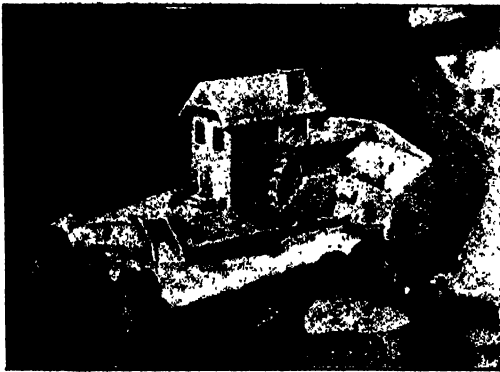
মিষ্টি বাড়ী

হয়। বাড়ীটি মিশ্রীর তৈরী। ওহিওর সিন্‌সিনাটি সহরের এক মিঠাইওয়ালা এর কর্‌নে-ওয়ালা।

ছোট্ট রেলগাড়ী

পোঁ পোঁ করে' সিটি মারতে মারতে চালাচ্ছে। ঠেলা গাড়ীতে অনেকগুলি কচি কচি হাসিমুখ বসে' আসে। এক সাহেব এই বাচ্চা রেলগাড়ি তৈরী করেছেন।

বৃষ্টি-বিন্দু মোটরকার—

কত রকমের যে মোটর গাড়ী হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সম্প্রতি জার্ম্মেনিতে একটা অদ্ভুত-রকমের মোটরকার তৈয়ারী হইয়াছে। বার্লিন সহরের এক মোটর প্রদর্শনীতে এই অদ্ভুত গাড়ীখানাকে দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছেন। এই গাড়ীখানি যখন চলে

বৃষ্টি-বিন্দু মোটরকার
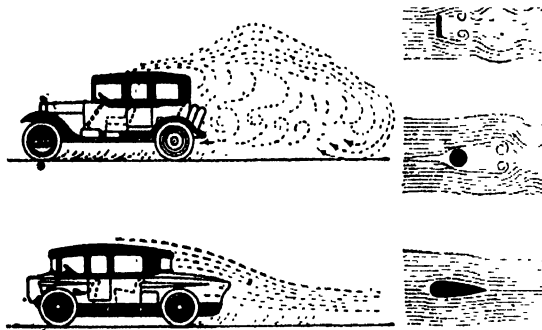
বৃষ্টি-বিন্দু মোটর-গাড়ীর অবাধ গতি
সাধারণ মোটর-গাড়ী যখন চলে তখন বাতাসের মধ্যে একটা মোটা দণ্ড বা চেপ্টা থাল্লা ঘুরাইলে বাতাসে যেমন ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হয় তেমনি ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়া মোটর-গাড়ী চলায় বাধা জন্মায় ; কিন্তু বৃষ্টি-বিন্দু মোটর-গাড়ী বৃষ্টি-বিন্দুরই মতন বিনা বাধায় বাতাস ভেদ করিয়া চলে বলিয়া গতি দ্রুততর হয়।

তখন হাওয়াতে ইহাকে কোন রকম বাধা দেয় না বলিলেই হয়। কারণ ইহাকে একবিন্দু বৃষ্টির জলের ছাঁচে তৈয়ার করা হইয়াছে। চালক সামনে বসে। অন্যান্য আরোহীরা চালকের পিছনে গাড়ীর মাঝখানে বসে। কলকব্জা গাড়ীর তলায় পিছন দিকে থাকে। গাড়ীর শক্তি মাত্র ১০ ঘোড়ার জোর। কিন্তু হাওয়ায় বাধা না পাওয়ায় এই সামান্য শক্তির বলে গাড়ীখানি ঘণ্টায় ৭৫ মাইল দৌড়াইতে পারে।

দেশলাইএর কাঠির বেহালা—

বেহালা সাধারণতঃ খুব ভাল কাঠেরই হয়। যে বেহালাখানির ছবি দেওয়া হইল, উহা দেশলাইএর কাঠি এবং দাঁত-খুঁটা খড়্কে-কাঠি

দেশলাইএর কাঠির বেহালা

শিরিষ আঠার সাহায্যে জোড়া লাগাইয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। ইহার আওয়াজ খুব মিষ্ট এবং উঁচু। কয়েকবার বাজানো সত্ত্বেও ইহা ফাটিয়া যায় নাই।

পাহাড় থেকে কাঠ নামানো—

আমেরিকার পাহাড়ে-জঙ্গল থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কেটে নীচে নামানো হয়। তারপর তার থেকে তক্তা ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়। কাঠ, পাহাড়ের গা বেয়ে নামানো খুবই সহজ বলে' মনে হয়, কিন্তু কাজটা শুন্‌তে যত সহজ, কাজে তার চেয়ে অনেক পরিমাণে শক্ত। পাহাড়ের গা স্থানে স্থানে এত বেশী ঢালু যে কাঠের গুঁড়িগুলাকে নীচের দিকে না ঠেলে উপরের দিকেই ঠেলে রাখ্‌তে হয়। মাঝে মাঝে মোটর-ট্রাকে করে' কাঠ নামান হয়। মোটরের জন্যে তক্তা বিছিয়ে রাস্তা তৈরী করা আছে। এই তক্তার রাস্তার মাঝখান্‌টা ফাঁক—যেখানে চাকা চলে সেখানে এঁকা-বেঁকা করে' তার বিছান আছে। মোটর চালায়, ঘোরায় এবং থামায় একজন লোক। কেবল ব্রেক নিয়ে বসে' থাকে আর-একজন। এই ট্রাক ছ'চাকা-ওয়ালা। চাকার দু-পাশে ভিতরের দিকে উঁচু করে' কাঠের চক্কর বসান আছে। তাতে মোটরখানা বাঁধা রাস্তা ছেড়ে নীচে পড়ে না।

মিটার-যুক্ত টেলিফোন—

আমাদের দেশে টেলিফোনের একটা বাঁধা দর আছে। কেহ ব্যবহার করুক বা না করুক, তাহাতে টেলিফোনের জন্য বছর শেষে সেই বাঁধা হারে টাকা দিতে হয়। আমেরিকাতে এখন হইতে গ্যাস এবং ইলেক্‌ট্রিক লাইটের মত মিটার টেলিফোনেও বসাইতে হইবে। ইহাতে নাকি গ্রাহকদের খরচ শতকরা ৮৫ টাকা কমিয়া যাইবে—অথচ কোম্পানীর লাভও কম হইবে না। এই মিটারের কাজ টেলিক্রোনোমিটারের (telcchronometer) সাহায্যে হইবে। কে কতক্ষণ টেলিফোন ব্যবহার করিল ইহাতে সব ধরা পড়িবে। আমাদের দেশেও কর্ত্তারা ঐ রকম একটা কিছু করিলে পারেন। তাহাতে লাভ অনেক আছে, কারণ তাহা হইলে টেলিফোনে বাজে এবং যা-তা কথা বলা অনেক কমিয়া যায়।
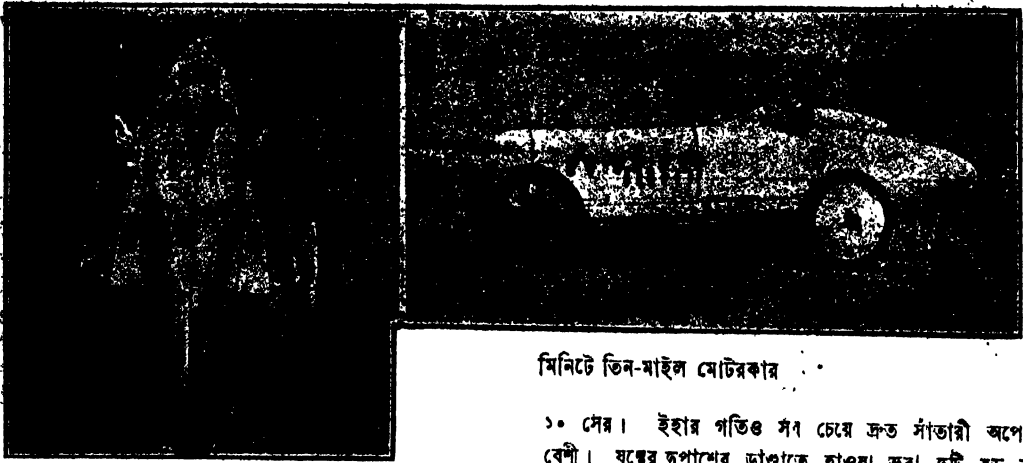
মিনিটে তিন-মাইল মোটরকার

মিনিটে-তিন-মাইল মোটরকার—

গত ৬ই এপ্রিল আমেরিকাতে ফ্লোরিডা সহরে সিগ্‌হগ্‌ডাহ্‌ল নামক এক ব্যক্তি একখানি রেসিং কারে করিয়া ১৯.৯৭ সেকেণ্ডে এক মাইল করিয়া দৌড়াইয়াছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে যে ব্যক্তি মোটর-দৌড়ে বাজি জিতিয়াছিলেন তিনি ঘণ্টায় সিগ্‌হগ্‌ডাহ্‌ল অপেক্ষা ২৪ মাইল কম দৌড়িয়াছিলেন। হগ্‌ডাহ্‌লের গতি ঘণ্টায় ১৮২.৭ মাইল। হগ্‌ডাহ্‌লের মোটরখানি ২৫০ ঘোড়ার জোর, কিন্তু মাত্র ২০ ইঞ্চি চওড়া। গাড়ীখানির ওজন ৬১০ পাউণ্ড এবং এলুমিনিয়ামের তৈয়ারী।

জলো-সাইকেল—

আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিনের এক ভদ্রলোক জলে চালাইবার জন্য এক প্রকার সাইকেল আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে করিয়া এমনি জলে ভ্রমণ করাও যায়, আবার দরকার হইলে ডুবন্ত ব্যক্তিকে জল হইতে উদ্ধার করাও যায়। এই যন্ত্রের ফ্রেম এলুমিনিয়ামের তৈরী।
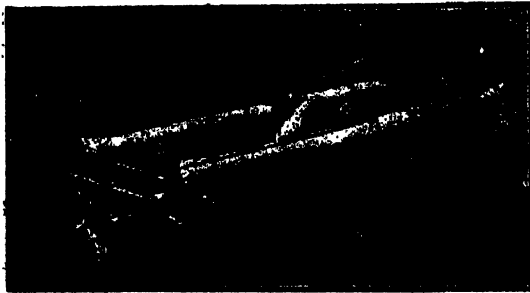
জলো-সাইকেল

বাইসাইকেলের মত পেডাল বা পা দান আছে, তাহা পা দিয়া চালাইলেই প্রপেলার বা ঠেলা-দাঁড় ঘোরে; তাহার সাহায্যে যন্ত্রটি জল কাটিয়া অগ্রসর হয়। যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে প্রয়োজন মত ছোট বড় করিয়া লাগান যায়, তাহাতে লম্বা এবং বেঁটে যে-কোন লোকেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে। এই জলো-সাইকেলকে খুলিয়া পাট করিয়া একটা পোর্টম্যাণ্টের ভিতর অনায়াসেই রাখা যায়, ওজন মাত্র ১০ সের। ইহার গতিও সব চেয়ে দ্রুত সাঁতারী অপেক্ষা অনেক বেশী। যন্ত্রের দুপাশের ডাণ্ডাতে হাওয়া ভরা দুটি বড় বড় বেলুন-ক্লথের তৈরী নল থাকে। তাহাতে ইহাকে ভাসাইয়া রাখে।

কাঠের ঘড়ি—

আমেরিকার পেওরিয়া (Peoria) শহরে এক পাকা ওস্তাদ একটি নূতন ধরণের ঘড়ি তৈয়ার করিয়াছেন—তার কলকব্জা ঢাকনা
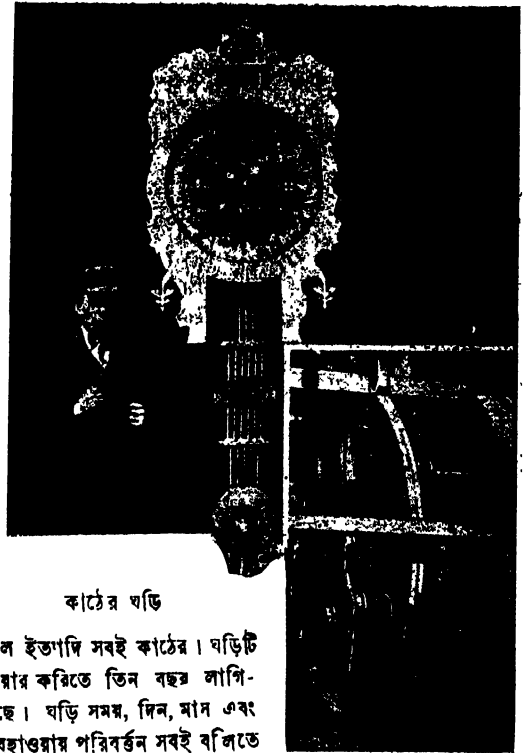
কাঠের ঘড়ি

খোল ইত্যাদি সবই কাঠের। ঘড়িটি তৈয়ার করিতে তিন বছর লাগিয়াছে। ঘড়ি সময়, দিন, মাস এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সবই বলিতে পারে। ঘড়িটি কতদূর কাজের হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। কিছু কাল পরে তাহা বলা সম্ভবপর হইবে।

লাইব্রেরী ফেরি

লাইব্রেরী ফেরি—

ক্যালিফোর্ণিয়ার ষ্টকটন পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ জনসাধারণের কাছে লাইব্রেরীর ব্যবহার বাড়াইবার জন্য এক মজার উপায় ঠাওরাইয়াছেন। একটা কাঠের বাক্স ৪ ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া এবং ১৫ ফুট গভীর, দেখিতে একটা বইএর মতন। তার গায়ে লাইব্রেরীর সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা থাকে। ভাল ভাল বইএর নাম ইত্যাদি অনেক কিছু লোকে জানিতে পারে। এই কাঠের বই'টাকে ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায়, লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

রাস্তা-ধোয়া মোটর গাড়ী—

আমাদের দেশে রাস্তায় জল দেয় লোকে হাতে করিয়া ক্যাম্বিশের পাইপ ধরিয়া, বা খচ্চরে টানা জল-দেওয়া গাড়ীতে করিয়া। লণ্ডনে আজকাল রাস্তায় জল দিবার জন্য এক রকমের মোটর কার তৈয়ার

রাস্তা-ধোয়া মোটর গাড়ী
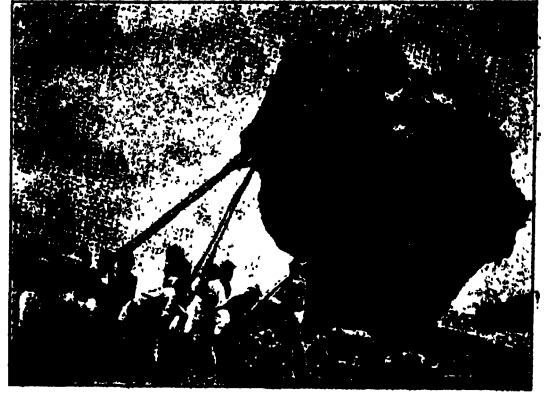
হইয়াছে। রাত্রি বারোটার পর এই মোটর পথে পথে জল ছড়ায়। গাড়ী যত জোরে চলে জলের বেগও তত বাড়ে। রাত্রি বারটার পর জল দেওয়া হয়, এই জন্য যে তাতে পথিকদের অসুবিধা হইবে না। কোথাও আগুন লাগিলে এই গাড়ী অনেক কাজে লাগে। জল ৫২ ফুট পর্যন্ত বেশ জোরে যায়।

উইঢিপি

পাহাড়ের সমান উইএর ঢিপি—

দক্ষিণ আফ্রিকাতে এক-একটা উইএর ঢিপি কি ভয়ানক প্রকাণ্ড এবং উঁচু হয় তাহা শুনিলে অবাক হইয়া যাইবার কথা। উইএরা কাদার সাহায্যে এই ঢিপি তৈয়ার করে, কিন্তু রৌদ্রের তেজে কাদা পাথরের মত শক্ত হইয়া যায়। লোক-বাসের সুবিধার জন্য মাঝে মাঝে এই-সব ঢিপি ভাঙ্গিতে হয়। একটা পুরা সহর ধ্বংস করিতে যে শক্তির অপব্যয় হয়, এই ঢিপি ধ্বংস করিতেও ঠিক তাই লাগে।

গাছ-কাটা কল—

বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিতে হইলে আমাদের দেশে কুড়াল দিয়া ১৫ দিন ধরিয়া লোকে কাটে। এক প্রকার কল হইয়াছে,—তাহার সাহায্যে খুব কম সময়ে গাছের গুঁড়িকে টুকরা টুকরা করিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলা যায়। একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে

গাছ কাটা কল

গুটি কলা যুক্ত একটি চাকা ঘোরে। এই কলাগুলি খুব ধারাল। গুঁড়িব যে অংশে এই কলা লাগে সেখানের খানিকটা অংশ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। ইঞ্জিনও সঙ্গে সঙ্গে একটু করিয়া আগাইয়া যায়। এই রকমে খুব কম-সময়ে গাছের গুঁড়ির স্থানে কতকগুলি কাঠের টুকরা মাত্র পড়িয়া থাকে।

পাকা গল্‌ফ্ খেলোয়াড়—

আমেরিকাতে একজন এমন পাকা গল্‌ফ্ খেলোয়াড় হইয়াছেন যিনি আর-একজন লোকের নাকের ডগাতে বল রাখিয়া প্রাণপণ
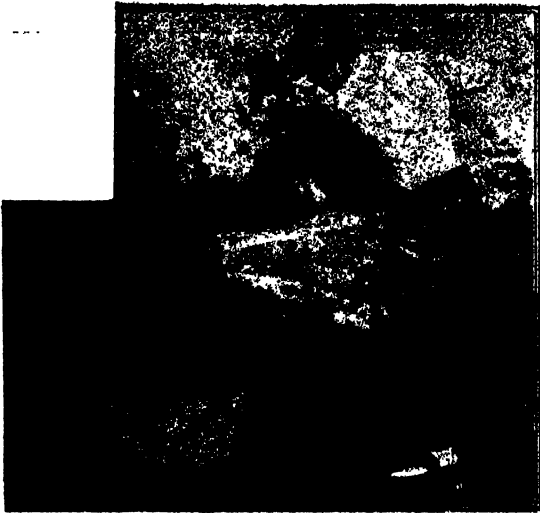
পাকা গল্‌ফ খেলোয়াড়

জোরে মারিতে পারেন—অথচ গল্‌ফ খেলিবার লোহার ডাণ্ডা নাকে স্পর্শমাত্র করে না। এমনি অদ্ভুত তাঁহার হাতের টিপ।

হেমন্ত

আলুর গুণ—

আমাদের যাবতীয় দৈনিক তরিতরকারীর মধ্যে আলু একটি প্রধান আহার্য্য। ইহাতে অধিক পরিমাণে 'শ্বেতসার' বা 'Starch' থাকায় ইহা আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। তাহা ছাড়া ইহা আমাদের আরও অনেক কাজে আসে। ইহা হইতে নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে যে 'শঠী' প্রস্তুত করা যায়, তাহা অনেকেই হয়ত 'ভারতবর্ষের' "বিশ্বকর্ম্মার ইঙ্গিতে" পড়িয়া থাকিবেন। আজকাল সচরাচর যে "কৃত্রিম হস্তি-দন্তের" জিনিষ দেখা যায়, তাহাও এই আলুর তৈয়ারী। অতি সহজ উপায়ে ইহা আলু হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে—কতকগুলি উৎকৃষ্ট গোল আলু লইয়া উত্তমরূপে খোসা ছাড়াইতে হয়। তৎপরে উহার ময়লাযুক্ত অংশগুলি সযত্নে বাদ দিয়া কয়েকদিন নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একটি পাত্রে পরিষ্কার জল ও 'Sulphuric Acid' মিশাইয়া রাখিতে হয়। পরে জল হইতে আলুগুলি তুলিয়া উক্ত পাত্রের 'Sulphuric Acid' মিশ্রিত জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিতে হয়, শেষে অগ্নিতাপে কঠিন মণ্ডের ন্যায় হইলে আগুন হইতে নামাইয়া উহা পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপে ধুইতে হয়। তখন নরম থাকিতে থাকিতে যে-কোন বস্তু প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল। প্রস্তুত জিনিষ দেখিতে হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা ও দৃঢ় হইবে। আলু শেষে 'Ivory' হইবে বিজ্ঞানের বলে।

"রঞ্জন"

মোটর সেন্‌সাস্—

সম্প্রতি পৃথিবীতে কতগুলি মোটর গাড়ী আছে তাহা গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছে। পৃথিবীতে ১১০০০০০০ খানা মোটর আছে, তন্মধ্যে শতকরা ৮৩ খানা আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সেই আছে। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে প্রত্যেক ১১ জন, গ্রেট্ বৃটেনে ১১০ জন, ফ্রান্সে ২০৫ জন ও রুশিয়ার সাইবেরিয়ায় ২৫০০০০ জন লোক পিছু একখানি মোটর গাড়ী আছে।

য়্যাক্সুসে পিপীলিকার দ্বারা গৃহ পরিষ্কার—

দক্ষিণ আমেরিকার কতক অংশের অধিবাসীরা তাহাদের গৃহ পরিষ্কার করে না। বিনা খরচে ও খাটুনীতে তাহারা নিজেদের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লয়। প্রতিবৎসর বসন্তকালে সাউবা নামক (Sauba)

একজাতীয় বৃহদাকার রাক্ষুসে পিপীলিকা তাহাদের গৃহ পরিষ্কার করিয়া বিনা সাহায্য করে। সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে পোকামাকড়ের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা এই সাউবা পিপীলিকার সাহায্যে নিজেদের গৃহ পরিষ্কার করার শ্রম ও পোকামাকড়ের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। সাউবা পিপীলিকা দেখিতে ঠিক কেন্নোর মত, ও উহাদের ক্ষুধাও বড় ভীষণ। বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার উহারা দলে দলে খাদ্য অন্বেষণে বহির্গত হয়, লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা সারি বাঁধিয়া যায় ও সম্মুখে ছোট গাছপালা ঘাস যাহা দেখিতে পায় খাইয়া নিঃশেষ করে। গ্রামের অধিবাসীরা এই পিপীলিকার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি নিজেদের জিনিষপত্র সরাইয়া ফেলে ও নিজেরা গ্রাম হইতে পলায়ন করে। সাউবা পিপীলিকা-বাহিনী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে ও দলে দলে বিভক্ত হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যায় ও সম্মুখে পোকা মাকড় যাহা পায় এমন কি ইঁদুর পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। শেষে গৃহের ভিতরে ও বাহিরে দেওয়ালে যে ময়লা লাগিয়া থাকে তাহাও খাইতে ছাড়ে না। যখন খাইবার আর কিছুই থাকে না তখন অন্যত্র খাদ্যের চেষ্টায় গমন করে। গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পায় তাহাদের গৃহ নূতনের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পোকামাকড়শূন্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে বিনা খরচে তাহারা গৃহ পরিষ্কার করিয়া লয় ও পোকামাকড়ের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

অলক

প্রাচীন কালের ঐশ্বর্য্য—

(ক) মিশর-রাণী ক্লিওপেট্রা তাঁহার প্রণয়ীকে ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি মুক্তা চূর্ণ করিয়া, মদে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেন।

(খ) নাটককার ইসোপাসের পুত্র ক্লোদিয়স্ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একটি মুক্তা চূর্ণ করিয়া গিলিয়া ফেলেন!

(গ) ক্লোদিয়সের এক "ডিস্" খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাকা।

(ঘ) সম্রাট কালিগুলাও একটিবারের ভোজনে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।

(ঙ) ফিলিওগবুলস্ একটিবারের ভোজনে ব্যয় করেন ২ লক্ষ টাকা।

(চ) লকুলস্ একটিবারের জলখাবারে খরচ করেন ২ লক্ষ টাকা।

(ছ) লকুলসের মৎস্য-পুষ্করিণীর মৎস্যগুলির মূল্য ছিল ৩॥০ লক্ষ টাকা।

(জ) সিজারের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ঋণ ছিল—২ কোটি, ৯৯ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা।

(ঝ) সিজার ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া কিউরোর বন্ধুতা ক্রয় করেন।

(ঞ) সিজার, লুসিয়াস্ পল্‌সের বন্ধুতা ক্রয় করেন—৩০ লক্ষ টাকা মূল্যে।

(ট) সিজার, অপব্যয় করেন—১৪৭,০০,০০,০০০ (একশত সাতচল্লিশ কোটি) টাকা।

(ঠ) এপায়াস্ অপব্যয় করেন—৭০ লক্ষ টাকা। যখন তিনি দেখিলেন ৮ লক্ষ টাকার অধিক সম্বল নাই, তখন আত্মহত্যা করেন।

(ড) সিজার, ব্রুটাসের মাতা সার্ভিলিয়াকে একটি মুক্তা প্রদান করেন—যাহার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা।

(ঢ) ক্রিসসের ভূসম্পত্তির মূল্য ছিল ১ কোটি, ৭০ লক্ষ টাকা। তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী এবং দাস-দাসীগণের মূল্যও ঐরূপই ছিল।

(ণ) বিজ্ঞানবিদ্ "সেনেকার" ঐশ্বর্য্য ছিল—৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও ইঁনি বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন।

(ত) রোমসম্রাট টাইবেরিয়স্ তাঁহার মৃত্যুকালে রাখিয়া যান—২৩ কোটি, ৬২ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা। নির্ব্বোধ সম্রাট কালিগুলাও ঐ টাকা এক বৎসরের মধ্যেই ব্যয় করিয়া ফেলেন।

(থ) সম্রাট ভেসপাসিয়ান্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন—৩৫ কোটি টাকা!

(দ) মিশরের পিরামিড্ নির্ম্মাণ করিতে ব্যয় হইয়াছে—৪৫ কোটি টাকা।

(ধ) পত্নী "মুম্‌তাজের" সমাধির উপর 'তাজমহল' তৈয়ার করিতে সম্রাট সাজাহান ব্যয় করেন—৩,১৭,৪৮,০২৪ (তিন কোটি, ১৭ লক্ষ, ৪৮ হাজার, চব্বিশ টাকা)। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ট্যাভার্নিয়ের তাজমহল নির্ম্মাণের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন।

(ন) সাজাহান 'ময়ূর সিংহাসন' নির্ম্মাণে ব্যয় করেন—৯ কোটি, ৭৫ লক্ষ টাকা।

(প) কোহিনূরের মূল্য আজ পর্য্যন্তও স্থির হয় নাই। মোগলবীর বাবর বলেন—"সমগ্র জগতের দৈনিক ব্যয়ের অর্দ্ধেক ইহার মূল্য।" সমগ্র জগতের দৈনিক ব্যয় কত?

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

সন্ধ্যাছায়া

নদীতীরে দেখি আজ সন্ধ্যার ম্লানিমা
অস্পষ্ট করিয়া দেয় দিগন্তের সীমা
কোন্ মৌন ছায়ালোকে ? ধীরে ধীরে ধীরে
দূর হতে দূরান্তরে, গ্রামান্তের তীরে
মিলে গেল শেষ স্বর্ণরেখা। পল্লীঘরে,
শস্যক্ষেতে,—উৎকণ্ঠিতা বধূর অন্তরে
ঘনায় সন্ধ্যার ছায়া বেদনার গানে।
দিনের বিদায়-বাঁশী সকরুণ তানে
পাটল মেঘের পুঞ্জে চলে ঘুরি ফিরি
পথহারা পথিকের মত। বিশ্ব ভরি'
শুনি যেন বাজে এক নিস্তব্ধ রোদন
অসীম ছায়ার তলে। যেন কোন্ ধন
হারায়ে গিয়েছে তার,—চঞ্চলতা তারি
তীরে তীরে সন্ধ্যালোকে গিয়েছে সঞ্চারি'।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বসু

রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়্‌কে

ভারতে বর্ত্তমান যুগের ভাস্করদের মধ্যে বোম্বাইয়ের রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়্‌কে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দশ বারো বছর আগে এই শিল্পীটির নাম সাধারণের কাছে অপরিচিত তো ছিলই, যাঁরা ভাস্কর-কলার আলোচনা করেন তাঁরাও এঁর কথা জানতেন না। এই অল্প সময়ের মধ্যে ফড়্‌কে তাঁর গুণের যে রকম পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন উঁচুদরের ভাস্কর হয়ে উঠ্‌বেন।

শ্রী রঘুনাথ কৃষ্ণ ফড়্‌কে

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহর থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে এক গ্রামে রঘুনাথ দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিদ্যা শেখ্‌বার জন্য তিনি কখনো কোনো স্কুলে যান নি, কিম্বা কোনো লোকের কাছেও এ সম্বন্ধে শিক্ষা পান নি। ছেলে বেলা থেকে নিজে চেষ্টা করে' তিনি এই কাজ শিখেছেন। কোনো জায়গায় শিক্ষা পান নি বলেই বোধ হয় তাঁর হাতের কাজে পাশ্চাত্য আদর্শের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; এটিই ফড়্‌কের বিশেষত্ব। ফড়্‌কে বেসিন ইংলিশ স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিলেন; স্কুলের পড়া শেষ করেই তাঁকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ছুটতে হয়েছিল, কাজেই কলেজে পড়ার সৌভাগ্য তাঁর কখনো হয় নি। বালক অবস্থায় ফড়্‌কে মাটি দিয়ে গণপতি পার্ব্বতী শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি তৈরি কর্‌তেন। স্কুলের পড়া শেষ করে'

প্রবচন

তিনি মাটি আর মোমের দেব-দেবীর মূর্ত্তি তৈরি করে' বিক্রি কর্‌তে আরম্ভ করেন। তাঁর মূর্ত্তি অন্যান্য কারিকরদের হাতে তৈরি মূর্ত্তির চেয়ে অনেক ভাল হোতো বলে' দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর খরিদ্দারও অনেক জুটে গেল। শেষে তিনি কয়েকটা ভাল ভাল মূর্ত্তি তৈরি করে' বেসিন ও বোম্বাই সহরে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী
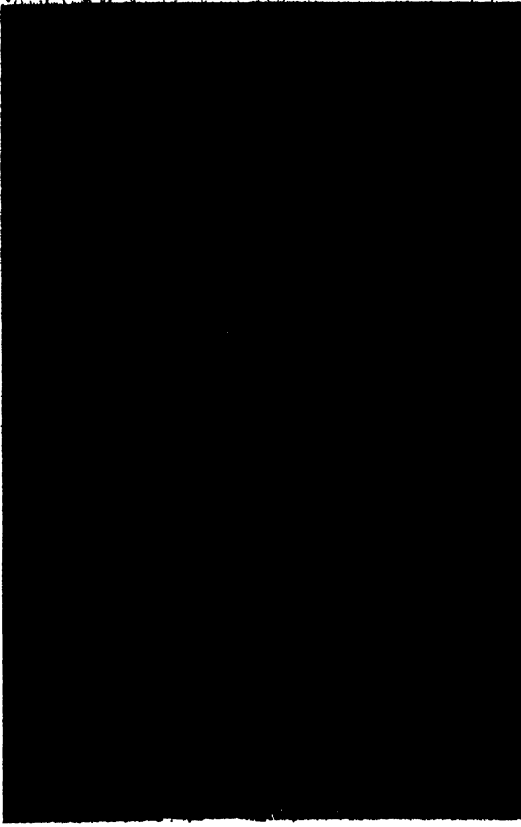
আনন্দের সপ্তম স্বর্গে

খুলতে আরম্ভ করেন। ১৯১১ অব্দে প্রথমে তিনি এই রকম প্রদর্শনী খোলেন। এই প্রদর্শনী খোলার পর থেকেই লোকে একটু একটু করে' তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেতে আরম্ভ করে। ১৯১৪ অব্দে বম্বে আর্ট্ সোসাইটির প্রদর্শনীতে তিনি "প্রবচন" নামে একটি প্রতিমূর্ত্তি পাঠিয়ে দেন। সাধারণ প্রদর্শনীতে ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনো কোনো মূর্ত্তি পাঠান নি। এই প্রদর্শনীতে অনেক নামজাদা লোকের আঁকা ছবি ও প্রতিমূর্ত্তি এসেছিল, কিন্তু বিচারকেরা ফড়্কের "প্রবচন" মূর্ত্তিটিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন এবং তাঁকেই সে বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার স্বর্ণ পদক উপহার দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ের এই সোসাইটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোনো ভারতবাসীকে তাঁরা স্বর্ণ পদক পাবার উপযুক্ত মনে করেন নি। এই পুরস্কার পাবার পরই ফড়্কের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্লো, এবং সেই থেকে তাঁর গুণের আদর হোতে সুরু হোলো। "প্রবচন" মূর্ত্তিটির কল্পনা—একটি ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌তে কর্‌তে তন্ময় হোয়ে গিয়েছেন। এই তন্ময়তা ফড়্কের বাটালির আঘাতে এমন ফুটে উঠেছে যে, মূর্ত্তিটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাস্তবিকই দর্শককেও তন্ময় হোয়ে যেতে হয়। বোম্বাই সহরের এই প্রদর্শনীর পর "প্রবচন" মূর্ত্তি আসল ও নকল মহীশূর বড়োদা প্রভৃতি অনেক জায়গার প্রদর্শনীতেই দেখান হয়েছে। বড়োদার মহারাজা তাঁর রাজ্যের আর্ট্ গ্যালারীর জন্ত এই মূর্ত্তিটি কিনেছেন। ফড়্কে পরে কৃষকের বিলাসিতা, শ্রীকৃষ্ণ, বংশীবাদক, আনন্দের সপ্তম স্বর্গে, অন্ধজনে দয়া কর, ইহকাল ও পরকাল (His Heart and Soul), শিবাজী, ঘড়িওয়ালা প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল মূর্ত্তি তৈরি করেছেন। ১৯১৪ অব্দের প্রদর্শনীর পর বম্বে আর্ট্ সোসাইটির অনেকগুলি প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর তৈরি মূর্ত্তি পাঠিয়েছেন এবং কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছেন, কিন্তু স্বর্ণ পদক তাঁকে আর দেওয়া হয় নি। সোসাইটির নিয়ম অনুসারে কোনো শিল্পীকে দু-বার স্বর্ণ পদক দেওয়া হয় না। কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে ফড়্কে যতগুলি মূর্ত্তি তৈরি করেছেন তার মধ্যে কৃষকের বিলাসিতা (Farmer's Luxury) নামক মূর্ত্তিটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; দুই-একজন বিদেশী সমালোচকও এই মতের পোষকতা করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ফড়্কে যতগুলি মূর্ত্তি তৈরি করেছেন তার মধ্যে ঘড়িওয়ালার মূর্ত্তিটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মূর্ত্তিটি তিনি অতি অল্পদিন হোলো শেষ করেছেন।

ফড়্কে কারুর কাছে শিক্ষানবিশী করেন নি বলে' একদিকে তাঁর যেমন সুবিধা হয়েছে, অন্তদিকে তেমনি বিপদেরও সম্ভাবনা আছে। তাঁর মূর্ত্তির মধ্যে ভাব-ভঙ্গীর অদ্ভুত ওস্তাদী দেখ্‌তে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে শরীরবিদ্যা (Anatomy) জানা না থাকার জন্য তাঁর মূর্ত্তিতে এই দিক দিয়ে গোল থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু

অন্ধজনে দয়া কর

শিবাজী মহারাজ

ঘড়ী-সারা মিস্ত্রী
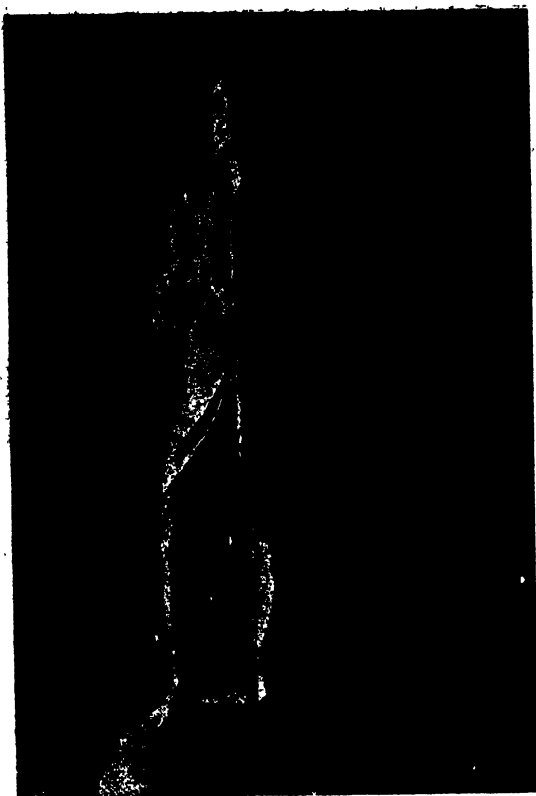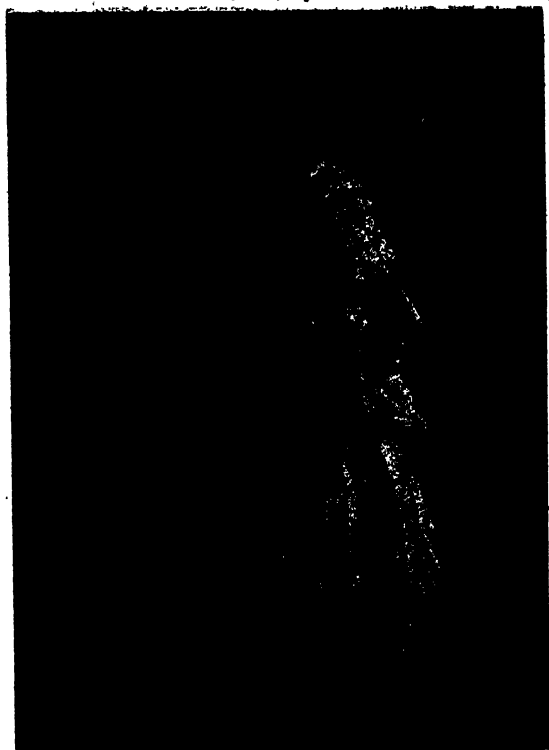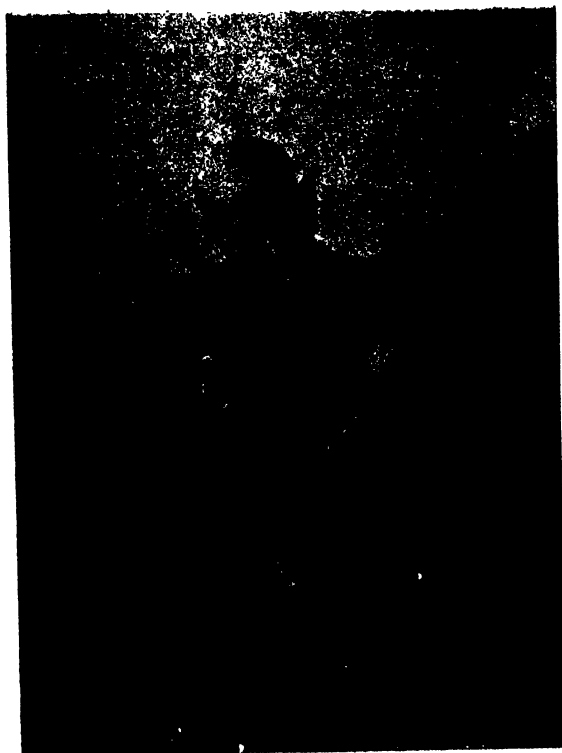
কর্তৃক এপর্য্যন্ত সে রকম কোনো ভুল যখন করেননি, তখন শরীরবিদ্যা তাঁর জানা নাই কিংবা ভবিষ্যতে কোনো ভুল করবেন এ-সব কথা বলা ঠিক সমালোচকের কাজ নয়।

শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

তরুণী

ও তরুণী, তোর ঐ দুটি সুর্ম্মা-পিছল চোখ,
তিমির-ভরা মন-বাসরে মোতির প্রদীপ হোক!
ও তরুণী, তোর ঐ লালিম আল্‌তা-ঝরার হাসি,
কোন্ স্বপনের তুবড়ি-জ্বালা' ফুল্‌কি প্রেমের রাশি!
ও তরুণী, তোর ঐ বুকের হাওয়া-উছল শ্বাসে,
কোন্ পূরবীর কান্না-করুণ সুরটি ভেসে আসে!
ও তরুণী, ডালিম-লালিম তোর ঐ তুরল ঠোঁটে,
কোন্ প্রভাতের সোনার লিখন ফাগ মেখে' সে জোটে!

ও তরুণী, তোর ঐ কোমল আঙুর-সরস গাল,
কুঙ্কুমেরই কোন্ লেপনে নিতুই নিটোল লাল!
ও তরুণী, রঙের শিখা সুচল আঙুলগুলি,
দম্‌কা-কাঁপন চম্‌কা-লহর স্পর্শে যে দ্যায় বুলি'!
ও তরুণী, তোর ঐ ভালের আবছা-নীলের টীপ,
মেঘ্‌লা নভের সাঁজ-সায়রে কোন্ তারকার দীপ!
ও তরুণী, সব শেষে তোর এই যে হৃদয়-খানি,
কোন্ পীযূষে উছলে-ওঠা, কোন্ প্রণয়ের বাণী!

শ্রী নীহারিকা দেবী

শুকতারা

অবিনাশদের বাড়ীতে প্রতি রবিবার আমাদের যে আড্ডা বসত—তাকে সভা বললে অত্যুক্তি করা হয়—তাকে ক্লাব বললেও তার প্রতি অবিচার করা হয়, আসলে সেটা ছিল একটা পুরোপুরি আড্ডা। অবিনাশ জমীদারের ছেলে। ছেলেবেলায় তার বাপ মারা যাওয়াতে সেই ছিল বাড়ীর কর্তা এবং বাড়ীর লোকের মধ্যে আর ছিলেন তার মা। অতএব তার বসবার ঘরে অথবা কখনো তাদের দোতলার খোলা ছাদে আমাদের যে সভা বসত তার তর্কে বা গানে বাধা দেবার কোন্ লোক ছিল না। আমরা সকলেই তখন কেউ প'ড়ছি, কেউ বা সদ্য পাশ ক'রে' বেরিয়েছি। সংসারের সঙ্গে তখনও আমাদের ভাল করে পরিচয় হয়নি। সভায় আমরা যে-সকল বিষয় সাধারণতঃ আলোচনা করতাম সে-সকল বিষয় ছিল নিতান্ত অসার, যথা প্রফেসারের পড়াবার রীতি, কলেজ স্কোয়ারের বক্তাদের মধ্যে কার বক্তৃতা ভাল, ফুটবলের শিল্ড্ পাবার সম্ভাবনাই বা কার, ইত্যাদি। তাই বলে' গভীর বিষয় আলোচনা যে হ'তই না এমন নয়,—কিছুদিন পূর্ব্বে সুরেশের সঙ্গে মদন-দার পাটের উপর ট্যাক্স্ বসান উচিত কি না এই নিয়ে যে তর্ক হয়েছিল তার ফলে মদন-দা দিন কয়েকের জন্তে আমাদের সভায় আসাই বন্ধ করেছিলেন। মদন-দা আমাদের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড় ছিলেন। মানুষের মুখকে যে-অরসিকেরা 'বদন' আখ্যা দিয়েছিল তাদের প্রতি মনে মনে আমার একটা রাগ ছিল, কিন্তু মদন-দাকে দেখলে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হতাম যে তাঁর মুখটা ছিল শুধু বদন নয়, একেবারে বদনমণ্ডল। সাদাসিদে, মোটা, গম্ভীর, প্রশান্ত লোকটি, জুলপির উপর চশমার নিকেলের ডাঁট দুটো একেবারে বসে' যেত। এলোমেলো খামখেয়ালি-ভাবে খানিকটা গালে, বেশীর ভাগ চিবুকের নীচে দাড়ি উঠেছিল, মদন-দা কেটে ছেঁটে সেগুলোকে সমানও করতেন না, বা কামাতেনও না। লোকে সচরাচর যাকে ধার্ম্মিক বলে, তিনি ছিলেন তাই—অর্থাৎ ভক্তির বিহ্বলতা বা অনন্তের প্রতি একটা ব্যথায় ভরা সূক্ষ্ম আকর্ষণ এ-সব কখনও তিনি অনুভব করেন নি, কিন্তু গীতা, রাজযোগ কর্ম্মযোগ প্রভৃতি বই তিনি পড়েছিলেন এবং চুরুট খাওয়া, থিয়েটার দেখা, নাটক-নভেল পড়া, কি স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ বিরুদ্ধে ছিলেন। পাঁচ বছর হ'ল তাঁর বিয়ে হয়েছিল, শুনেছি এরি মধ্যে তাঁর চারটি ছেলেপিলে হয়েছে! বলা বাহুল্য সচ্চরিত্র বলে' মদন-দার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অর্থনীতিতে তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে এম-এ পাশ করেছিলেন এবং দেখেছি এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত একটা গোলযোগ না হয়ে যেত না। আমরাও তাঁকে ও বিষয়ে ঘাঁটাতাম না। কিন্তু সুরেশের তো কোন কাণ্ড-জ্ঞান ছিল না,—তার পাঠ্যবিষয় ছিল Physics, সে-বিষয়ে তাকে কোন দিন একটা কথা বলতে শুনিনি, কিন্তু রুষ-সাহিত্য বল, ইণ্ডিয়ান আর্ট, বল, গ্রীকদর্শন বল, চীনদেশের ভাষাতত্ত্ব বল, যে-কোন বিষয়ে কথা উঠলেই সুরেশকে তর্কে পরাস্ত করা সোজা ছিল না। পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের সভার হালচাল ছিল অত্যন্ত ঢিলেঢালা রকমের। কিন্তু যেদিন থেকে মদন-দা আমাদের আসরে অবতীর্ণ হলেন সেদিন থেকেই সভার প্রকৃতি বদলাতে লাগল। সভার আইন-কানুন ঠিক হল, রিপোর্ট লেখা হ'ল। মদন-দার উপদেশ অনুসারে ঠিক হ'ল যে এক-এক দিন এক-এক জন সভ্য একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখবেন এবং তার পর আলোচনা হবে। সভার একটা নাম দেওয়া হল—আত্মোন্নতিবিধায়িনী সভা বা ঐ রকম একটা কিছু। কোথায় গেল আমাদের হাসি, উড়ো তর্ক, গান, বাজে গল্প, এবার একেবারে রীতিমত সভা। আমাদের দলে যারা কবি বৈজ্ঞানিক বা সমালোচক ছিল তাদের কথা জানি না, কারণ তারাই ছিল পাঠক; কিন্তু আমরা ছিলাম শ্রোতা—তাই আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠ্‌ছিল। কিছু পরিমাণ আড্ডার লোভে, কিছু পরিমাণ কাটলেট চা'র লোভে এসে আমরা একেবার উন্নতির জাঁতাকলে পড়ে' গিয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান যাকে রক্ষা করেন তাকে মারা

মদন-দারও কর্ম নয় সেই কথাই প্রমাণ হল। হঠাৎ এক বর্ষাসন্ধ্যায় আমাদের সমস্ত ভাল সঙ্কল্প উড়ে গিয়ে আবার আমরা নিতান্ত অসার আলোচনা নিয়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লাম এবং মদন-দাও আমাদের ত্যাগ কর্‌লেন। কি করে' আমাদের এই অধঃপতন হল তাই নিয়েই এই গল্প।

তিনটে প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ পড়্‌ল অবিনাশ—বিষয় "আধুনিক ইওরোপীয় সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা"। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পড়্‌ল আমাদের ঐতিহাসিক শ্রীপতি—বিষয় ছিল "চন্দ্রগুপ্তের নাম চন্দ্রগুপ্ত ছিল কি না?" তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ, এমন কি সন্ধির নিয়মগুলি মন্থন করে' শ্রীপতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে চন্দ্রগুপ্তের নাম চন্দ্রগুপ্তই ছিল। তৃতীয় প্রবন্ধ পড়্‌ল সুরেশ—বিষয় ছিল—"Economo-Biological Background of Euro-American Civilisation"। তারপর পালা ছিল মদন-দার, কথা ছিল তিনি Bimetallism সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়্‌বেন—কিন্তু তা আর হয়ে উঠ্‌ল না। সে দিনটা ছিল আষাঢ়ের একটা বর্ষণমুখর দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টির পর যদিও সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি ধরেছিল, তবু আসন্ন বৃষ্টির ভাবটা আকাশ থেকে যায় নি। মদন-দার আস্‌তে দেরি হচ্ছিল—কিন্তু সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ছিলাম না।

একবার সেই বর্ষাসন্ধ্যা-টার কথা ভেবে দেখো—মেঘভরা আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে দিগন্তের গাছ এবং ছাদগুলোর ঠিক মাথার উপরে মেঘের ফাটল দিয়ে ঝরে'-পড়া সূর্য্যাস্তের রঙীন আভা তখনও একেবারে মিলিয়ে যায় নি। আমরা ছাদে কেউবা চেয়ারে কেউবা চাতালের উপর খবরের কাগজ পেতে বসে' ছিলাম। ছাদের পাশে কৃষ্ণচূড়া-গাছের বৃষ্টি-ধোয়া পাতাগুলো ঝলমল কর্‌ছিল। পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় চলন্ত ট্রামের আলো দেখা যাচ্ছিল। ছাদের টবে অনেকগুলো বেল-ফুল ফুটেছিল, দক্ষিণের মাতাল বাতাস হঠাৎ এসে এসে তার মাঝখানে লুটিয়ে পড়্‌ছিল। সত্যি বল্‌ছি—সেদিন অর্থনীতি শোন্‌বার মত মনের অবস্থা আমাদের ছিল না। কি সব কথা যে এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে আনাগোনা কর্‌ছিল—বোঝাতে পার্‌ব না। সেদিনকার হাওয়ার মত আমাদের কথাবার্ত্তাও হঠাৎ এসে অমনি এলিয়ে পড়্‌ছিল। সত্যেন গুনগুন করে' গান [illegible] "এমন দিনে তারে বলা যায়।" সত্যেন গা[illegible] কথাগুলো জান্‌ত না, কিন্তু আমরা তাকে থাম্‌তে দিলাম না। সে ফিরে ফিরে দুগার কলি গাইতে লাগ্‌ল। কথার অসম্পূর্ণতা অথবা সুরের যেটুকু মিষ্টতার অভাব ছিল, আমাদের মনের উত্তেজনা সেটুকু পূরণ করে' নিচ্ছিল। তখনও জীবনে কোন বিশেষ নারীর আবির্ভাব হয় নি বটে, তবু যে যেটুকু জেনেছিলাম—চলন্ত স্কুলের গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে নিমিষের দেখা এক জোড়া চোখ—অথবা এমনি কিছু—তারই অস্পষ্ট স্মৃতির চারিদিকে আমাদের মন ঘুরে ঘুরে গুনগুন করে' সেই কথাই বল্‌তে চাচ্ছিল—যার ইঙ্গিত ছিল গানে, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে ঝরে'-পড়া সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ আভায়, দখিন-হাওয়ার গন্ধ-বিভোর মত্ততায়। যাদের সঙ্গে মিলন হয় নি—সাক্ষাৎও হয় নি—তাদের বিরহে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলাম।

অমল আমাদের দলের মেম্বর ছিল বটে, কিন্তু অনেক দিন তার সাথে আমাদের দেখাশুনা ছিল না, কারণ প্রায় এক বছর হল সে তাদের গ্রামে গিয়ে বাস কর্‌ছিল। সে সম্প্রতি সেখান থেকে ফিরেছে। একটা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধেক শোওয়া অবস্থায় সে বসে' ছিল। সে বল্‌ছিল—"আমাদের এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের যে কি প্রেমলীলা চলে সে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। গ্রীষ্মের দুপুরে দেখেছি আকাশের নিবিড় আলিঙ্গনে মূর্চ্ছিতা ধরণী। ঝড়ের দিনে দেখেছি উন্মাদ কালো আকাশ অন্ধরোষে পৃথিবীর উপর কি অত্যাচারটাই না করে—যেন সে ঈর্ষায় পাগল, সবুজ অঞ্চলের নীচে পৃথিবীর বুকটা দুলে দুলে ফুলে ফুলে ওঠে—তারপর চোখের জলে পৃথিবীর বুক ভাসিয়ে তবে তার সে রাগ শান্ত হয়। আবার দেখেছি শরতের ভোরের বেলায় আকাশ কি মধুর করুণ ব্যাকুল সুরে যে আহ্বান করে—সমস্ত গৃহ-কর্ম্মের মাঝখানে থেকে থেকে পৃথিবীর মনটা যেন উদাস হয়ে যায়, তার বুকটা অকারণে দীর্ঘশ্বাসে ভরে' ওঠে—

কখনও মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, কখনও বা চোখ জলে ভরে' আসে। 'বর্ষার গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখেছি মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ আকাশ পৃথিবীর মুখের উপর অবনত, ম্লান পৃথিবী মৌন—একটা "বৌ কথা কও" পাখী উড়ে উড়ে কেবলি বলছে—"কথা কও" "কথা কও"—তারপর অকস্মাৎ আকাশ থেকে ঝর ঝর চোখের জল—সে চোখের জলের যেন আর শেষ ছিল না। এই রকম কত রূপে কত বর্ণে কত ভাবে মায়াবী আকাশ যে পৃথিবীকে তার প্রেম জানাত সে তোমাদের কি বলব। ভোরের বেলায় দেখেছি তার চাঁপারঙের উত্তরীয়, সূর্য্যাস্তে দেখেছি তার স্বর্ণভূষা, সন্ধ্যায় দেখেছি তার চাঁদের কিরীট, তারার মালা। পৃথিবীকেও দেখেছি—বৈশাখে সে ধূলিশয্যায় নিরাভরণা মানিনী, বর্ষায় সে পত্রপুষ্পসজ্জিতা অভিসারিকা। আমাদের এই পৃথিবী—কখন্ কোন্ আদিম কালে কে তাকে ঘরছাড়া করেছে—সেই থেকে রাত্রিদিন সে কার উদ্দেশ্যে চলেছে সে নিজেই জানে না। আর আকাশ তার চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা নিয়ে আলো-অন্ধকার নিয়ে পৃথিবীকে বলছে—প্রিয়া, প্রিয়া, সে যে আমি, সে যে আমি।" এমনি করে' অমল কখন থেমে, কখন চুরুটটা মুখ থেকে হাতে বা হাত থেকে মুখে নিয়ে আপন মনে বলে' যাচ্ছিল। আমরা কখনও শুনছিলাম, কখনও বা তার কথায় আমাদের মনে বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া দু'একটা ঘটনার স্মৃতি ভেসে আসছিল। তার পর কোন্ প্রসঙ্গে আকাশ পৃথিবী বর্ষা শরৎ ছেড়ে অমল কি সূত্রে যে নিজের কথা তুলল তা আমাদের মনে নেই, তবে যেই সে নিজের কথা আরম্ভ করল অমনি আমরা সজাগ হয়ে বসলাম।

অমল বলল—দেখ, আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি তখন আমার বয়স তের কি চোদ্দ—না—তারও আগে স্ত্রীবেশধারী একটি যাত্রাদলের ছোক্‌রাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়েছিল, তবে সেটা বিশেষ গুরুতর হয় নি। তের বছর বয়সে প্রেমের কথা শুনে বুঝতে পারবে একটু অল্প বয়সেই পেকেছিলাম—

সুরেশ বলল—ওহে গল্পটা সত্যি ত?

অমল বলল—আগে শোনো, তার পর প্রশ্ন কোরো—

মদন-দা এসে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ শোনবার কারও কোনরূপ আগ্রহ না দেখে গম্ভীর হয়ে বসে' ছিলেন। তিনি বললেন—"দেখুন অমলবাবু, আমি যতদূর বুঝি, বিয়ের পূর্ব্বে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি যে অনুরাগ হয়—"

সুরেশ বলল—"মদন-দা, Freud ও-সম্বন্ধে কি বলেছে সে ত—"

মদন-দা বললেন—"সুরেশ, আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও, আমি বলি ও-সব বিলেতে হয়ে থাকে, আমাদের দেশে—"

সুরেশ আবার একটা কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমরা বাধা দিলাম, বললাম—"আঃ সুরেশ, আজ আর তর্ক কোরো না—মদন-দা, আজ আমাদের ক্ষমা করুন।"

আবার আমরা চুপ করে' বসলাম—আমাদের চারিদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। মদন-দাও গম্ভীর হয়ে বসে' রইলেন। অমল আবার বলতে লাগল—এবার আর গল্পে বাধা পড়ল না। আস্তে আস্তে, থেমে থেমে সে বলছিল—মনে হল যেন সেই মেঘান্ধকার সজল সন্ধ্যার ম্লান আলোতে বহুদিন আগেকার ঝরে'-পড়া গোলাপের পাপড়িগুলো কুড়োবার জন্যে সে তার অতীত জীবনটা হাতড়ে খুঁজছিল।

অমল বলল—আশা করি মদন-দা ও ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন—কিন্তু সত্যি বলছি ভালবাসায় আমি অনেকবার পড়েছি। সে ভালবাসা দুদিনব্যাপীও হয়েছে, দুবছরব্যাপীও হয়েছে। সেগুলো প্রেম কি না, আজ তা নিয়ে তর্ক করে' কোন লাভ নেই। কোথায় যেন পড়েছি যে মানুষ ফিরে ফিরে প্রথম প্রেমের কথাই মনে আনে। আজ অনেকদিন পরে আমারও সেই প্রথমবারের কথা মনে পড়ল। সেই কথা আজ তোমাদের বলব—তবে কতটা সত্যি ঘটেছিল কতটা বা আমার কল্পনা তা এতদিন পরে আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। তখন পড়তাম গ্রামের ইস্কুলের থার্ডক্লাসে কি সেকেণ্ডক্লাসে, কিন্তু ক্লাসের পাঠ্যের চেয়ে অপাঠ্যের দিকে আমার মন ছিল বেশী। ঐ বয়সেই বঙ্কিম, রবিবাবু, এমনকি উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমও পড়েছিলাম। সব যে বুঝতে

পার্‌তাম তা নয়, তবু এটা বুঝ্‌তে পার্‌তাম যে চাণক্য-শ্লোকে গভীর তত্ত্ব যতই থাক্‌ না কেন রস কণামাত্র ছিল না। তবে সাহিত্যের অন্ত রসের চেয়ে বীররসের প্রতিই আমার ঝোঁক ছিল বেশী। জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র, মোহনলালের আদর্শে জীবনটাকে গড়ে' তুলব এই ছিল তখন ইচ্ছা—অবশ্য যুদ্ধশেষে বিজয়লক্ষীর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের ঝাড় এবং ইংরেজীবাদ্যের সহকারে আরও কোন লক্ষীর সাথে মিলনের লোভও আমার না ছিল তা নয়।

সে সময়টা ছিল শীতকাল। তোমরা কখনও কল্‌কাতা ছেড়ে বড় একটা বেরও নি বলে' বাংলাদেশের কোনও ঋতুর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই; সেইজন্তে বসন্তকাল সম্বন্ধে তোমরা কবিয়ানা করে' থাক। সত্যি যদি বাংলা-দেশ দেখ্‌তে' চাও তবে শীতকালে পাড়াগাঁয়ে যেও। সে সময় বাংলার পল্লী যে কি আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করে তা না দেখ্‌লে বোঝান যায় না। আকাশ থাকে নীল—গ্রীষ্মের আকাশ যেমন কঠিন পাথরের মত নীল তেমন নয়—কোমল নীল, তারি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ শাদা মেঘের সূক্ষ্ম রেখা টানা। কল্‌কাতায় আকাশকে দূরে রেখেছে কলের চিম্‌নী আর গির্জ্জার চূড়ার খোঁচা দিয়ে; কিন্তু গ্রামে আকাশের সঙ্গে বাঁশ-ঝাড়ের নারিকেল-গাছের মাথামাখি চলেছে অবিশ্রাম। আকাশ নেমে এসে ক্ষেতের উপর দূরগ্রামের গাছ-গুলোর উপর একেবারে লুটিয়ে পড়েছে। শীতের ভোরের বেলা কুয়াসা কাটিয়ে যে রোদ্দুটুকু ওঠে চাঁপার মত তার রং।

এমনি একটা শীতের সকালবেলায় পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে আমাদের অন্দরের বাগানের কুলগাছের উপর উঠেছিলাম। তখন আমাদের ক্লাসের পরীক্ষা হয়ে গিছ্‌ল। ফল তখনও বের হয় নি। কিন্তু দাদার শাসনে পড়া কামাই কর্‌বার জো ছিল না। নতুন পড়া না থাক পুরোনো পড়া তো ছিল, আর পুরোনো পড়ার এক মজা দেখেছি যে তার আর শেষ নেই—যতবার খুসী ফিরে ফিরে পড়া যায়। সেই পুরোনো পড়ায় ভঙ্গ দিয়ে কুল-গাছে উঠেছিলাম, তাই বিশেষ সাবধান হবার প্রয়োজন ছিল পাছে দাদা টের পায় যে পড়ার ঘরে আমি নেই। কিন্তু ছোড়্‌দিদি ছিল। সে আমার জাঠ্‌তুত বোন—আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়। আমরা যে মাষ্টারের কাছে পড়্‌তাম সেও তাঁর কাছে পড়্‌ত—কিন্তু সে পড়া নিতান্ত তার খেয়াল-মত চল্‌ত। রবিবার সকালেও সাড়ে নটার আগে আমাদের ছুটি ছিল না, কিন্তু ছোড়্‌দির পক্ষে সোমবার রবিবারে কখনও কোন প্রভেদ দেখি নি। সে যখন খুসী আস্‌ত, যখন খুসী বেণী দুলিয়ে ভিতরে চলে' যেত। তার পর মাস ছয়েক হ'ল বোধোদয় সাহিত্যপাঠ এবং সেকেণ্ড্‌ বুক প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ করে' তার শিক্ষা সমাপ্ত হল। তার পর সে অন্দরে ঢুকল, আর বড় একটা বাইরে আস্‌ত না। তখন থেকে আমাদের উপর সে ভারি মুরুব্বিয়ানা কর্‌ত। তার জ্বালায় পড়া কামাই করে' বাগানে ঘোরা কি বাড়ীর ভিতর থাকা একেবারে অসম্ভব ছিল। স্কুল থেকে ফিরে বাড়ীর ভিতর ঢোকা মাত্র ছোড়্‌দি প্রশ্ন কর্‌ত—"কি? আজ ক্লাসে কত ছিলে? লাষ্ট্‌ নাকি?" আমরা কোনদিন এমন কোন কাজ কর্‌তে পারিনি যা ছোড়্‌দির চোখ এড়িয়েছে বা যে সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র বাক্‌সংযম দেখিয়েছে। সে-দিনও কুলগাছে পাঁচমিনিট থাক্‌তে না থাক্‌তেই তার গলা শুনতে পেলাম—"সকালবেলা কুলগাছে কে রে?" প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' উত্তর না পেয়েও শান্ত সন্তুষ্ট থাক্‌বে, ছোড়্‌দির প্রকৃতি সে রকম ছিল না। কোন প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া মাত্র তার মীমাংসা না কর্‌তে পার্‌লে তার মানসিক যন্ত্রণা হত। অতএব গাছতলায় তার আগমন আশঙ্কা করে' গাছের উপর আত্মগোপন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম—কিন্তু ধরা পড়্‌লাম। ছোড়্‌দি বল্‌লে—"কে—অম্‌লা বুঝি?" অত্যন্ত ছেলেবেলায় সবাই যখন আমার নামটাকে বিকৃত কর্‌তেন তখন তাতে আপত্তি কর্‌বার বয়স আমার ছিল না—কিন্তু তেরো চোদ্দ বছর বয়সে ও-নাম শুন্‌লে আমার ভারি রাগ হত। বাড়ীতে সকলে যখন আমাকে অমল বলে' ডাক্‌তেন, ছোড়্‌দি তখনও 'অম্‌লা' বলা ছাড়্‌ল না। কিন্তু আমার নামমাধুর্য্য অথবা আমার বয়সের মর্য্যাদা এর কোনটাই ছোড়্‌দি রক্ষা কর্‌বে—এ আশা করা বৃথা। যা হোক আমি তার অনাবশ্যক প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বেছে বেছে কুল খাচ্ছিলাম। ছোড়্‌দি

বল্‌ল—"দাদাকে বলে' দেব যে সকালবেলা পড়াশুনা ছেড়ে কুলগাছে ওঠা হয়েছে।" মুখে বল্‌লাম "দাও গে না" কিন্তু মনটা দমে গেল। দেখ্‌লাম ছোড়্‌দির অভিপ্রায় ঠিক তত খারাপ নয়—সে কুল চায়। তার পর আমি কুল দিচ্চি—সে কুড়োচ্ছে।

এমন সময় বাগানের বেড়ার ওধার থেকে মেয়েলি গলায় ডাক শোনা গেল—"টুলি"। টুলি আমার ছোড়্‌দির নাম। ছোড়্‌দি বাগানের দরজার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে ডাক্‌ল—"আয় না।" আমি তাদের দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু বুঝ্‌লাম যে আমি থাকাতে মেয়েটি আস্‌তে দ্বিধা কর্‌ছে। ছোড়্‌দি বল্‌ল—"আরে ও আমাদের অম্‌লা।" সে এল। অপরিচিতা মেয়েদের সাম্‌নে আমার ভারি লজ্জা কর্‌ত—তাই তার মুখের দিকে তাকান আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ছোড়্‌দি আমায় বল্‌লে—"ভাল দেখে পাড়।" প্রথমটা সে লজ্জায় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটু একটু করে' তার লজ্জা কেটে গেল। আমি কুল পাড়্‌তে লাগ্‌লাম, তারা পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে' হাসাহাসি করে' কুড়োতে লাগ্‌ল। নিজের জন্যে বেছে বেছে যে-সব ভাল কুল পকেটে জমা করেছিলাম তাও পকেট শূন্য করে' তাদের দিয়ে দিলাম। তার পর সে চলে' গেল—বাগানটা হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। দিদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"ও কে?" দিদি একটা কুলের অর্দ্ধেকটাকে কামড়ে নিয়ে বাকিটার উপর চোখ রেখে অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিল—"তোর বৌ।"

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার ভিতর-বাহির বদ্‌লে গেল। মনে হল সে যেন একান্ত আমার আপনার। আমি দেখ্‌তে পেলাম—সে বসে' আছে বাসর-ঘরের পাটির উপর লজ্জাবনতা হয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায়। সারাদিনের উপবাসে তার মুখটি শুকিয়ে গেছে। আমি যাচ্চি আলো জালিয়ে, বাজনা বাজিয়ে—আমার মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা। যুগে যুগে আমি তাকে পেয়েছি কখনও কাল ঘোড়ার উপর চড়ে', মন্ত্রপূত বাঁকা তলোয়ার হাতে করে' দৈত্যপুরী থেকে তাকে উদ্ধার করে'—আসন্ন সন্ধ্যায় তেপান্তরের মাঠ ধু ধু কর্‌ছে—সে যেন আর ফুরোয় না—সমস্ত দীর্ঘ পথটা তার দুই ক্ষীণ বাহু দিয়ে আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছে। কখনও বা তাকে পেয়েছি স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্য ভেদ করে' সমস্ত রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে। কখনও বা ঝোড়ো রাতে ভগ্ন-মন্দিরে স্তিমিত আলোকে তার সঙ্গে আমার দেখা। যে-সকল কাব্য উপন্যাস পড়েছিলাম সে-সব যেন তারি সঙ্গে আমার মিলন হবার অপূর্ব্ব কাহিনী। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম নিজের দিকে তাকিয়ে —যে আনন্দ-লোকে চিরবসন্তের দেশে প্রতাপ, জগৎসিংহ বাস করে, আমি যেন সেই দেশের অধিবাসী—প্রতাপ হেমচন্দ্রের সহচর—এই আমি! কত তুচ্ছ মনে হল দাদার শাসন আর পুরোনো পড়ার অত্যাচার। কিন্তু আনন্দের মধ্যে কোথায় যেন ব্যথা লুকিয়ে ছিল। সেই ব্যথার স্পর্শে যে আকাশ যে গাছ যে ফুলের দিকে কখনও তাকাই নি—তা এত মধুর হয়ে উঠ্‌ল। চেয়ে দেখ্‌লাম—অন্দরের পুকুরের পাড়ে গাঁদাগুলো ফুটে ফুটে আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে' দিচ্ছে। উত্তরে বাতাসে পুকুরের জলের গায় কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে এবং ভোর বেলাকার রোদ তার উপর ঝিক্‌মিক্‌ কর্‌ছে। বাগানে আল বেঁধে বেঁধে কপির চারা লাগান ছিল—বুড়ো মালী ঝাঁঝরায় করে' তাতে জল দিচ্ছিল। সেই জলের ধারা, ভোরবেলাকার রোদের সেই ঝিকিমিকি, শিশির-ভেজা সেই ঘাস, সেই গাঁদাফুল, এমন কি সেই বুড়ো মালীর জল আনা, জল ঢালা—সব সুদ্ধ পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা ইতিপূর্ব্বে কখনও চোখে পড়েনি। যা দেখি অমনি মনে হয়—কি আশ্চর্য্য—কি আশ্চর্য্য!

ছোড়্‌দি অনেকক্ষণ চলে' গেছে। ঘরে ফিরে এসে হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়্‌ল। জগৎসিংহের কথা মনে হল—একবার নিজের চেহারা ও বেশভূষার দিকে তাকিয়ে নিলাম—দেখ্‌লাম জগৎসিংহের সঙ্গে মিল্‌ল না। কাপড়টা কোমরে বাঁধা—এজন্যে মার কাছে অনেকদিন বকুনি খেয়েছি—গায়ে ফ্ল্যানেলের একটা সার্ট, সেও বেশী পরিষ্কার নয়—বোতামও অধিকাংশই নেই—তা হোক, কিন্তু গর্ব্বে মনটা একেবারে ভরে' গিয়েছিল। মনে হল

এমন বিস্ময়কর ঘটনা পৃথিবীতে কখনও ঘটে নি। মনে মনে স্থির করলাম যে তাকে আমি বিয়ে করবই। বোধ হল সে আমার চেয়ে বছর খানেকের বড় হবে, কিন্তু তাতে আমার কিছু আপত্তি ছিল না।

কামিনী-দাদা গ্রাম-সম্পর্কে আমার কি-রকম যেন দাদা হতেন। খবর পেলাম মেয়েটি তাঁর শ্যালী। কামিনী-দাদার নবম না দশম সন্তানের অন্নপ্রাশনে কামিনী-দাদার শ্যালী ও শাশুড়ী এখানে এসেছিলেন। সেইদিন থেকে কামিনী-দাদার ছেলে রাখালের প্রতি আমার মনোভাব বদ্‌লে গেল। রাখালের মস্ত মাথা, পেটভরা পিলে, বড় বড় গোল গোল দুই চোখ, কিন্তু তার গলা জড়িয়ে ধরে' সত্যি একটা তৃপ্তি পেলাম। এর পূর্ব্বে রাখালের প্রতি আমার এত স্নেহ কেউ কখনও দেখে নি। এমন কি সকলেই জানত যে তার উপর আমাদের বিশেষ রাগ ছিল। তার কারণ যদিচ রাখুর বয়স মাত্র দশ বছর ছিল, দুষ্টবুদ্ধিতে তার জুড়ি সে গ্রামে ছিল কি না সন্দেহ। মিথ্যে কথা এবং চুরি-বিদ্যায় সে ওস্তাদ ছিল। আমাদের মার্ব্বেল, নাটাই, ঘুড়ির, সুতো তার জন্যে রাখাই মুস্কিল হ'ত। তা ছাড়া গুরুজনের কাছে নালিশ করতে তার মত কেউ পারত না। রোজ অন্ততঃ বারদশেক করে' সে আমাদের নামে নালিশ করত। তার উপর সে এমনি কাঁদুনে ছিল যে তাকে কোনো দিন একটা চড় মেরেছি কি সে এমনি জোরে এবং এমনি করুণভাবে আর্ত্তনাদ করত যে লোকে মনে করত তাকে কেউ খুনই করছে বা সেইরকম একটা-কিছু। সেই রাখালকে অযাচিত হয়ে একটা নাটাই দিয়ে ফেলেছিলাম। তার প্রতি এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক স্নেহে কেবল যে দলের লোক বিস্মিত হত তা নয়—রাখালের গোল চোখ আরো গোল হয়ে উঠ্‌ত। বোধ করি তার মনে আমার মত্‌লব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হত, তাই বলে' দেওয়া জিনিষ নিতে সে গররাজী হবে—রাখালের মন এত অনুদার ছিল না। কিন্তু রাখালের কাছে যে খবর পেলাম সে অতি সামান্য। সে শুধু এই যে—তারা দিন দশেক থাকবে—আর জেনেছিলাম তার নাম। তার নাম—তোমাদের তা শুনে লাভ নেই, কারণ তার মধ্যে তোমরা কোন মাধুর্য্যই দেখতে পাবে না—আর আমিও আজ তাতে হয়ত কোন বিশেষত্বই দেখব না। সে অতি গ্রাম্যধরণের নাম—সরলা কি অবলা কি এই রকমের একটা-কিছু। কিন্তু তবু এও সত্য যে একদিন ঐ নামটা আমার সমস্ত ভুবন সুরে সুরে রাঙিয়ে দিয়েছিল।

বিকেল বেলা খেলায় মন লাগ্‌ত না। যে পরমাশ্চর্য্য অনুভূতি পেয়েছিলাম তার কাছে খেলা-টেলা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। মন আপন মনে কেবলি বল্‌ত—"ভালবাসি—আমি ভালবাসি।" এক-একবার ইচ্ছা করত কথাটা প্রকাশ করি। কিন্তু প্রকাশ করলে তার ফল শুভ হবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তাই করা হ'ল না। তবে একদিন খেলার শেষে নবীনদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মেয়েদের কোন্ নামটা তাদের ভাল লাগে। দেখ্‌লাম এ সম্বন্ধে তাদের কিছু-মাত্র ঔৎসুক্য নেই; অবলা, সরলা কি তরলা কারো প্রতি তাদের বিশেষ পক্ষপাত দেখ্‌লাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—কাকেও বিয়ে করতে ইচ্ছা করে কি না? কোন প্রকার চিন্তা বা দ্বিধা না করে' নবীন বল্‌ল—তার দিদির ননদকে। সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষ করে' কেন নবীন তার দিদির ননদকে নির্ব্বাচন করল তার কোন সন্তোষজনক কারণ সে দেখাতে পারল না, এমন কি প্রকাশ পেল তাকে সে দেখেও নি। তার দিদির ননদকে বিয়ে করতে না পারলে নবীনের হৃদয়ভঙ্গ বা ঐরূপ কোন দুর্ঘটনা যে ঘটবে এরকম মনেই হ'ল না। যতুকে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখ্‌লাম পাত্রীসম্বন্ধে তার মন অতি উদার—তবে তার দাদা বিয়ে করে' একটা সাইকেল পেয়েছিলেন—সেই রকম একটা সাইকেলের প্রতি তার বিশেষ লোভ ছিল এবং গড়ের বাদ্যের জন্য তার যতটা উৎসাহ দেখা গেল কোন বিশেষ পাত্রীর সম্বন্ধে ততটা উৎসাহ দেখা গেল না। বেশ বুঝ্‌লাম, আমি যে স্বপ্নলোকে ছিলাম নবীন সতীশ প্রভৃতি তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে

মা। শীতের একটা সকালবেলায় তাদের ও আমার মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান হয়ে গেছে—তাদের নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে' মনে হল।

সমস্ত খেলা ও গল্পের মধ্যে তাকে দেখ্‌বার ক্ষুধা ভিতরে ভিতরে আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে, দাসদের কঞ্চির-বেড়া-ঘেরা বেগুন-ক্ষেতের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকে বেঁকে গেছে সেই রাস্তায় খানদুয়েক বাড়ীর পরেই কামিনী-দাদাদের বাড়ী। ইতিপূর্ব্বে কতদিন সে বাড়ীতে যে গেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু সে বাড়ীতে যেতে আজ যেন বাধ্‌ছিল। তবু রাখালের খোঁজে দুএকবার গেছি। যাওয়ামাত্র রাখালের দেখা পেয়েছি, কিন্তু তার মাসীর সাক্ষাৎ যেমন দুর্লভ ছিল তেমনি দুর্লভ রয়ে গেল। আর এক আশা ছিল সে যদি আমাদের বাড়ীতে আসে। বাড়ীর ভিতরের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না এক খাবার সময়ে ছাড়া। আজকাল সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ কর্‌লাম, কিন্তু সেখানে গেলেই ছোড়দি একেবারে তেড়ে আস্‌ত, বল্‌ত "যাও, যাও, বাইরে যাও—রাতদিন বাড়ীর ভিতরে কেন?" পাছে প্রেমিকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এই ভয়ে তার সঙ্গে তর্ক কর্‌তাম না—চলে আস্‌তে হত। এমনি করে' তাকে দেখ্‌বার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। এমন সময়ে একদিন বিকেলে জলখাবার খেতে অন্দরে গেছি,—সচরাচর লোকে যেমন করে' চলে তেমন করে' চলা আমার অভ্যাস ছিল না,—প্রথমতঃ বারবাড়ী থেকে বাড়ীর ভিতরের পথটা এবং বাড়ীর ভিতরকার উঠানটা কতকটা লাফিয়ে কতকটা ছুটে চল্‌তাম, তার পর সেই ঝোঁকে উঠান থেকে বারান্দায় একবারে লাফিয়ে উঠ্‌তাম—সিঁড়ি ব্যবহার কর্‌তাম না। সেদিনও তেমনি করে' সশব্দে ঝুপ করে' মার কাছে উপস্থিত হয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়েছি। দেখি মার কাছে বসে' একটি গিন্নীগোছের মোটা-সোটা স্ত্রীলোক—তাঁর একগাল পান এবং গোল মোটা হাতে লাল টক্‌টকে অনন্ত, কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ্‌। তাঁর পাশে সেই মেয়েটি আর ছোড়দি। নিজেকে কোন রকমে সাম্‌লে নিয়ে বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়ালাম। মা বল্‌লেন, "অমু, প্রণাম কর্‌।" প্রণামটা আমার ভাল আস্‌ত না। কোন রকমে সেই গিন্নীকে প্রণাম কর্‌লাম। মোটা গলায় প্রশ্ন হল, "তোমার নাম কি?" আমি বল্‌লাম, "অমল।" মা বল্‌লেন, "ভাল করে' বল্‌।" আমি বল্‌লাম, "শ্রীঅমলচন্দ্র বসু।" পুনরায় প্রশ্ন হল, "কোন্ ক্লাসে পড়?" ছোড়্‌দিদি ফস্ করে' বল্‌ল, "ও থার্ড্ ক্লাসে পড়ে—এবার যদি পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে সেকেণ্ড্ ক্লাসে উঠ্‌বে।" গিন্নী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "আমাদের নেপাও থার্ডক্লাসে পড়ে—না?" মেয়েটি বল্‌লে, "তুমি কি বল মা! সে আজ দুবছর ফিফ্‌থ্ ক্লাস থেকে প্রমোশন পাচ্ছে না।" গিন্নী বল্‌লেন, "তা, তার শরীর অসুখ, কি কর্‌বে? তবে তার পড়াশুনায় মনোযোগ আছে।" পড়াশুনা থেকে আমার এবং নেপার বয়সের কথা উঠ্‌ল। নেপার জন্ম বৈশাখের প্রথমে না শেষে তা নিয়ে গোল বাধ্‌ল, তার পর গিন্নীর মনে পড়্‌ল যে বৈশাখের সেই যে বড় ঝড়টা হয়েছিল যাতে তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপের চালটা উড়ে গেছ্‌ল তারি দশ দিন না না—আট দিন পরে নেপার জন্ম হয় ঢেঁকিশালার পাশের ঘরটাতে ইত্যাদি। নেপালের জন্ম-তারিখের গোলমালে সেখান থেকে চলে' এলাম। যতক্ষণ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম মেয়েটি তার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে-ছিল বলে' ভাল করে' জবাব দিতে পার্‌ছিলাম না; তা ছাড়া ওসকল প্রশ্নে ভিতরে ভিতরে অপমানিত বোধ কর্‌ছিলাম। কিন্তু গ্লানি রইল না। সে আমার পক্ষ নিয়েছে বুঝ্‌লুম, সেও আমায় ভালবাসে। মনটা আনন্দে ভরে' গেল, আমি নিজেকে আর সম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছিলাম না।

কি করে' কোন্ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে সমস্ত গ্রামের দৃষ্টি এবং বিশেষ করে' তার দৃষ্টি যে আমার দিকে আকৃষ্ট কর্‌ব তাই নিয়ে কল্পনা কর্‌তাম। যদি সেকাল হত তবে নবীন সন্তু প্রভৃতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়ে তার মন জয় কর্‌তে পার্‌তাম, একালেও যদি পরীক্ষায় প্রথম হতে পার্‌তাম অথবা ম্যাচ্‌খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পার্‌তাম তা হলে হয়ত সে টের পেত যে আমি নিতান্ত সামান্য লোক নই। লোকের মুখে আমার খ্যাতি শুনে নিশ্চয়ই সে আমার জন্যে গর্ব্ব অনুভব করত। কিন্তু আমি চিরকাল মাঝারি, পরীক্ষায় জীবনে কখনও

প্রথম হই নি, খেলাতেও এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারি নি যাতে করে' আমার নাম লোকের মুখে মুখে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মনে পড়্ল কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে একটা ম্যাজিকওয়ালা এসেছিল। ম্যাজিক দেখাবার দিন সন্ধ্যেবেলা গ্রামের সমস্ত লোক কি প্রশংসমান চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল! তার পর সে যখন অসম্ভব জায়গা থেকে ডিম ঘড়ি প্রভৃতি বের করতে লাগ্ল তখন আমরা ভেবেছিলাম তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। তার পর যে দুয়েকদিন সে লোকটা ছিল আমরা তিনচার জন পড়াশুনা ছেড়ে তার পেছনে পেছনে ঘুরেছিলাম ম্যাজিক শেখ্বার আশায়, কিন্তু ম্যাজিক শেখা ত্ হলই না, মাঝখান থেকে পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে দাদার কাছে অপমানিত হতে হয়েছিল। অবশ্য সে লোকটা চলে' গেলে আমরাও একটা টিনের বাক্স, একটা ভাঙ্গা ঘড়ি, নবীনের সংগৃহীত একখণ্ড অস্থি—পিসিমা বলেছিলেন সেটা নিশ্চয়ই গরুর হাড়—এই-সব দিয়ে একটা ম্যাজিক দেখাবার দল তৈরি করেছিলাম, কিন্তু দর্শকদের ইচ্ছা এবং সহযোগ না থাক্‌লে সে ম্যাজিক দেখিয়ে তাদের আশ্চর্য্য করে' দেবার কোন উপায় ছিল না। বস্তুত তিনু টেঁপি প্রভৃতি দর্শকেরা যা দেখে সব চেয়ে আনন্দ পেত সে হচ্ছে—নবীনের ডিগ্‌বাজী। যা হোক পিসিমা সেই গরুর হাড়ের কথাটা অভিভাবকদের কানে তুলে দেওয়াতে আমাদের ম্যাজিকের দল ভেঙ্গে দিতে হল। আজ মনে হল যদি সেই ম্যাজিকওয়ালার মত ম্যাজিক দেখাতে পার্‌তাম তবে সে আমাকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পার্‌ত না।

এমনি করে' কয়েকদিন গেল। তার পর রাখালের কাছে খবর পেলাম যে তাঁরা চলে যাচ্ছেন—পরের দিন সকাল বেলা। স্থির কর্‌লাম যাবার আগে কোনরকমে আর-একবার দেখা করে' বিদায় নিতে হবে। বিজয়া দশমীর ভোরের বেলায় সানাইয়ের করুণ সুর শরৎ-আকাশকে যেমন করে' কানায় কানায় বিদায়-ব্যথায় ভরে' দেয়, মনটা তেমনি করে' ব্যথায় ভরে' গেল।

পরদিন খুব ভোরে উঠ্‌লাম। নবীনকে সঙ্গে নিলাম, বল্‌লাম "চল্ মর্ণিংওয়াকে।" ইচ্ছা ছিল সেদিন বেশভূষায় যথাসাধ্য পারিপাট্য করব। কিন্তু বাক্সের চাবি ছিল মায়ের হাতে—সাজসজ্জার কোন সরঞ্জামই আমার আয়ত্তে ছিল না। তবে শিশিতে সুগন্ধি তেল ছিল, তার অনেকটা মাথায় ঢেলে চক্‌চকে করে' তুল্‌লাম। মাথা আঁচ্‌ড়ান আমাদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু সিঁথি করা নিষেধ ছিল; কিন্তু সেদিন কে কার শাসন বারণ মানে। অনেকক্ষণ ধরে' বেশ করে' সিঁথি কর্‌লাম। পরণের কাপড়টা ময়লা হলেও কোঁচা দিয়ে পর্‌লাম। গায় সেই ফ্ল্যানেলের সার্টটা। সার্ট ধুতির অপ্রতুল থাক, মোজা ছিল দুজোড়া। এক জোড়া নিজের লম্বা মোজা, সেটা পায় দিয়ে তার উপর আল্‌নায় পরিত্যক্ত দাদার এক জোড়া ছেঁড়া সিল্কের মোজা ছিল, সেটাও পায়ে দিয়ে নিলাম। খিড়্‌কী দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বেরোলাম। যাবার সময় কোন কিছু বিঘ্ন হল না বটে, কিন্তু নব্‌নেকে নিয়ে পড়্‌লাম মুস্কিলে। একে ত তার কাপড়-চোপড় অতি অভদ্র রকমের, তার উপর তার ইচ্ছা ছিল যে যদি মর্ণিংওয়াকে যেতেই হয় তবে নদীর ধারে না গিয়ে দাসদের পুকুরের ধারে যাওয়া যাক, কারণ সেদিকে ভোরের বেলায় খেজুরের রস পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বেচারা নবীন আমার কাছ থেকে অনেক ঘুড়ি, সিগারেটের ছবি পেয়েছে, আজ সে কি করে' নিমকহারামী করে—অতএব চল্‌ল সঙ্গে। কিন্তু পথের ধারে যতগুলো বুনো কুলগাছ ছিল, প্রত্যেকটাতে দুচারটে ঢিল ছুড়্‌ল এবং দুচারটে কুল কুড়োল। এমনি করে' নদীর ধারে যেতে দেরি হয়ে গেল।

উঁচু সর্‌কারি বাঁধা রাস্তা দিয়ে নদীর ঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তার পাশে বাঁশ-ঝাড়ের মাথার উপর তখন সবেমাত্র একটুখানি রোদ এসে পড়েছিল, অন্যধারে দূরবিস্তৃত মাঠের শেষে ভিন্ন গ্রামের গাছের সবুজ রেখা কুয়াসায় ঝাপ্‌সা। মাঠে কলাই-ক্ষেতের উপর বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা শিশির তখনও শুকোয় নি। মাঠের মাঝখানে ইঁটের পাঁজার উপর গোটা কয়েক বাব্‌লা গাছ। একটা মরা খেজুর-গাছের উপর একটা ঘুঘু ক্রমাগত বুক আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে ডাক্‌ছিল। হঠাৎ নবীন তার দিকে

একটা ঢিল ছুড়ে দিল, ঘুঘুটা পাখার শব্দ করে' খাড়া আকাশে উঠ্‌ল, তার পর খানিকটা নেমে দূরে উড়ে গেল। ক্রমে বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে নদীর ইস্পাতধূসর জল এবং দূরে শাদা বালির চরটা দেখা যেতে লাগ্‌ল। এমন সময়ে একখানা পাল্কী এল। আমরা পথ ছেড়ে দিলাম, পাল্কীখানা নদীর দিকে চলে গেল। পাল্কীর দরজার ফাঁক দিয়ে খানিকটা সাড়ী ও খানিকটা চওড়া লাল পাড় দেখ্‌তে পেলাম। আর নদীর দিকে গেলাম না। ভাব্‌লাম সে নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পারবে যে আমি তারি জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম—নবীন কি-একটা কথা বল্‌ছিল তা আমার কানেও পৌঁছল না। খানিকক্ষণ পরে দেখি রাখাল আস্‌ছে। এক হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন, আর-এক হাতে একটা মুখে-সরা-বাঁধা হাঁড়ি, পিঠে একটা ছোট পুঁটুলি। কোন রকমে মাঝে মাঝে থেমে, জিনিস্ নামিয়ে হাত বদ্‌লে এবং নিজের বারংবার খসে পড়া কাপড়ের বাঁধ বারবার এঁটে সে আস্‌ছিল। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"রাখু—পাল্কীতে কে গেল রে?" সে বল্‌লে—"দিদিমা।" "আর তোর মাসীমা?" "তিনি অনেকক্ষণ আগেই গেছেন।"

অমল চুপ কর্‌ল।

আমি বল্‌লাম—তার পর?

সে বল্‌ল—তার পর আর কিছু নেই।

—সে কি হে?

সে বল্‌ল—তার দিন সাতেক পরে একটা ক্রিকেট ম্যাচ্ নিয়ে এমন মেতে গিয়েছিলাম যে ও ঘটনা ভুলেই গেলাম। এমন কি রাখালকে যে নাটাইটা দিয়েছিলাম সেটাও ফিরিয়ে নিলাম।

সুরেশ জিজ্ঞাসা কর্‌ল—আর কখনও তাঁকে দেখেছ?

অমল অনেকক্ষণ ধরে' একটা চুরুট ধরাল। দেশলাই-য়ের আলোতে তার চশমার কাঁচ দুটো চক্ চক্ করে' উঠ্‌ল। তার পর থেমে বল্‌ল—"পরশু দিন দেখে এসেছি—ওজনে দুমণের উপরে এবং চার পাঁচ ছেলের মা। আর সুরেশ এবং মদনদা তর্ক আরম্ভ কর্‌বার পূর্ব্বে আমি শুধু এই কথা বলে' রাখ্‌তে চাই যে যে-মনোভাবের ইতিহাস তোমাদের বল্‌লাম—সেটা মোহ হতে পারে, কিন্তু আমি শপথ করে' বল্‌তে পারি সেটা রূপজ মোহ নয়, দ্বিতীয়ত আমি প্রথম থেকেই বিয়ে কর্‌তে প্রস্তুত ছিলাম অতএব ওটাকে অবৈধ বা অন্যায় বলাও ঠিক হবে না।"

কিন্তু তর্ক কর্‌বার কারও প্রবৃত্তি ছিল না। যেমন চুপ করে' বসে' ছিলাম আমরা তেমনি বসে' রইলাম। অমল গল্প শেষ কর্‌তেই খেয়াল হল যে সমস্ত পাড়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। দেখ্‌লাম সমস্ত আকাশ একেবারে নির্মেঘ—কৃষ্ণচূড়া গাছটার ঠিক উপরে কৃষ্ণ-পক্ষের বাঁকা চাঁদ স্বপ্নের মত ক্ষীণ সুদূর আর আকাশময় ছড়ানো তারা। তার পর হঠাৎ সুনীল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বল্‌ল—"সাড়ে দশটা বেজে গেছে আর ট্র্যাম পাবার আশা নেই—সমস্ত পথটাই হাঁটুতে হবে।"

অমলের গল্পে আমরা সবাই বিরক্তি বোধ কর্‌ছিলাম বটে, কিন্তু মদন-দা সত্যি সত্যি রাগ কর্‌লেন, তিনি সেই থেকে আমাদের ত্যাগ কর্‌লেন।

শ্রী কিরণশঙ্কর রায়

গোয়ালিয়র দুর্গ

"গোয়ালিয়র দুর্গ" কাত্তোয়ারের সূর্য্যসেন নামে এক রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল জানা যায়; কিন্তু এই সূর্য্যসেন যে কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন। বিল্‌ফোর্ডের মতে গোয়ালিয়র দুর্গ ৭৭৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বের।[1] খড়্গা রায় বলেন দুর্গটি প্রায় কলিযুগের প্রারম্ভের (৩১০১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ)। ফজল আলির মতে ইহা বিক্রম ৩৩২ অব্দে (২৭৫ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। হীরামনও ঐ সময়টি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।[2]

আমরা দুর্গমধ্যস্থিত "চতুর্ভুজ" মন্দিরের শিলা-লিপিতে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) হুনবংশীয় মিহিরকুলের নাম দেখিতে পাই। "শাশ-বহু"র মন্দিরে একটি একাদশ শতাব্দীর শিলালিপি আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় গোয়ালিয়র দুর্গ ২৭৫ খৃঃ হইতে কচ্ছ-বাহাদিগের অধীনে ছিল। মাঝে মাঝে কিন্তু তাহাদেরও স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত যাইত, কারণ, শিলা-লিপি হইতে জানা যায় তোমরবংশীয় রাজা ভোজ-দেব (বিক্রম ৯৯৩ অব্দ) ৮৭৬ হইতে ৯০০ খৃঃ অবধি ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। "গোয়ালিয়র-নামা" এই তোমর-বংশের ছত্রিশটি রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।[3] ১০২৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গজনী 'গোয়া-লিয়র দুর্গ' আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফলযত্ন হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।[4] তাহার পর ধোলারায়ের নাম পাওয়া যায় (বিক্রম ১১৯৩, খৃঃ ১০৩৬)। ইনিই এই বংশের সর্ব্বশেষ রাজা ছিলেন। তিনি নিজের ভাগিনেয় পরমলদেব পরিহারকে দুর্গের ভার দিয়া বিবাহ করিতে যান। ভাগিনেয় মামাকে আর দুর্গটি প্রত্যর্পণ করে নাই। সেই অবধি ১০৩ বৎসর পর্য্যন্ত 'গোয়ালিয়র দুর্গ' পরিহার-বংশীয় রাজার অধীনে ছিল। কচ্ছবাহা বংশীয়গণ আর হৃত দুর্গ পুনরায় পাইলেন না। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে কুতুবউদ্দীন আয়বগ "গোয়ালিয়র দুর্গ" অধিকার করিলেন।[5]

১২১০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইল, তাঁহারা দুর্গটিকে পুনরায় অধিকার করিলেন এবং ১২৩২ খৃঃ অবধি আবার পরিহারগণই দুর্গের অধীশ্বর হইয়া রহিলেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে আল্‌তামষ গোয়ালিয়র দুর্গের প্রতি অভিযান করিলেন ও অতি কষ্টে দুর্গ আক্রমণ করিতে সক্ষম হন।[6]

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বী আর ভালেঁরাও (Historical Researcher Gwalior State) একটি অতি পুরাতন

গোয়ালিয়র দুর্গের পথের ঘাটী

হস্তলিপি পাইয়াছেন।[7] লিপিটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কীটদষ্ট হইয়া লিপিটি অনেক স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুস্তকটির নাম "গোপাচলাখ্যান"। এক স্থানে পড়িয়া দেখিলাম আল্‌তামষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন, দুর্গাধিপতি রাণা সারঙ্গদেব বাধাদানের চেষ্টা করিতেছেন,

1 Asiatic Society's Researches, IX., p. 213.
2 Cunningham's A. S. I., Vol. II., p 371.
3 "গোয়ালিয়র-নামা" এইটি উর্দ্দ ভাষায় লিখিত হস্তলিপি।
4 Hunter's Imperial Gazetteer of India
5 Brigg's Ferishta, I., p. 202.
6 Cunningham's A. S. I. Vol. II, p, 381.
7 এই অবধি সর্ব্বসমেত তিনটি হস্তলিপি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি উর্দ্দ ভাষায় "গোয়ালিয়র-নামা", দ্বিতীয়টি পার্শী ভাষায় "কুল্লিয়াদ-গোয়ালিয়ারী" এবং তৃতীয়টি হিন্দি ভাষায় "গোপাচলাখ্যান"।
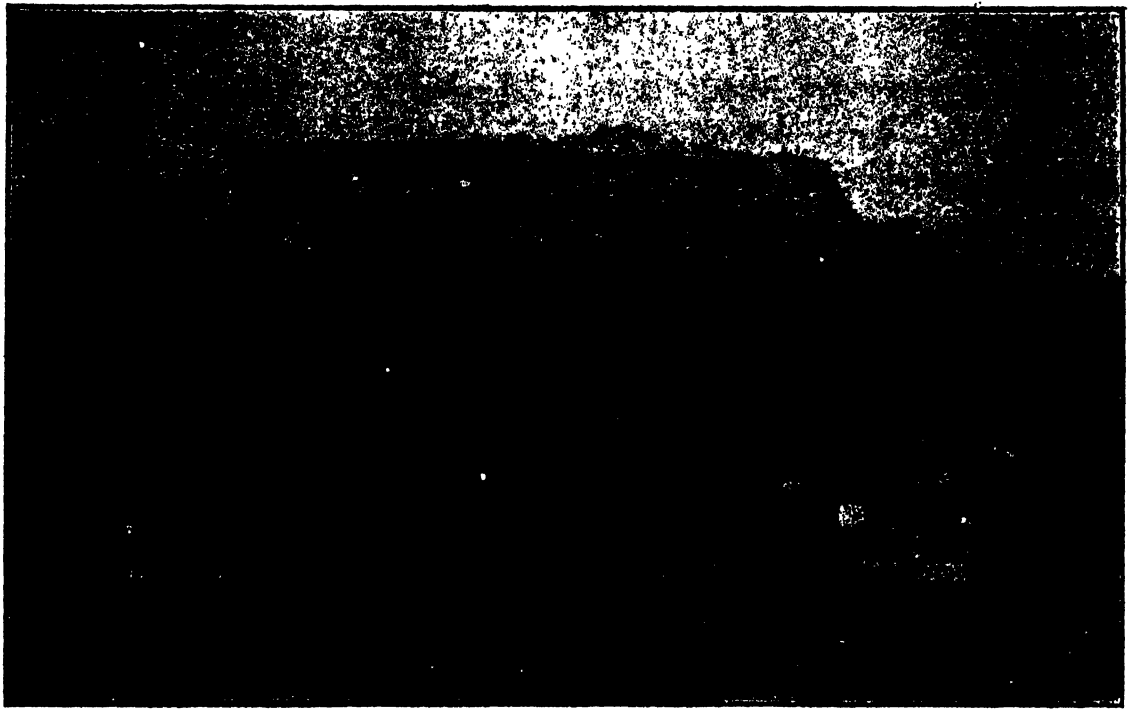
গোয়ালিয়র দুর্গ

কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। তিনি যখন রাজ্ঞীদিগকে পরাজয়বার্ত্তা জানাইতে গেলেন তখন ভারতের বীর নারীগণ বলিতেছেন :—

"পহিলে হামকো জোহর পারী,
তব তুম জুঝহু কন্ত সম্ভারী।"

রাণা ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহার রাজ্ঞীরা বিজেতার হস্তে পতিত হইয়া সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রেরিত হওয়া অপেক্ষা তাঁহাদের মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিয়া রাজপুতের চিরগৌরব জৌহর ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন ; বিশালকায় মহাচিতা প্রজ্বলিত হইল, কুলাঙ্গনাগণ প্রফুল্ল আননে সেই ধর্ম্মচিতায় প্রাণাহুতি দিলেন।

ইহার পর প্রায় দীর্ঘ একশত বৎসর কাল "গোয়ালিয়র দুর্গ" মুসলমানদিগের অধীনে ছিল। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ ভারত লুণ্ঠন করিতে আসিলে হিন্দুরা নষ্ট দুর্গ পুনরুদ্ধারের উহাই পরম এবং চরম সুযোগ বুঝিয়া নির্ব্বিবাদে দুর্গ অধিকার করিলেন। তোমরবংশীয় বীরসিংহদেব স্বাধীনভাবে "গোয়ালিয়র দুর্গের" অধীশ্বর হইয়া রহিলেন।[৪]

১৪০২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেব দুর্গেশ্বর ছিলেন। ১৪২৪ খৃঃ দুর্গটি ডুঙ্গরসিংহের অধীনে ছিল। তিনি নরবরের দুর্গ জয় করিবার মানসে অভিযান করিলেন। নরবরের দুর্গ তখন মালবাধিপতি সুল্‌তান মহম্মদের অধীনে ছিল। তিনি ফৌজ সহ ডুঙ্গরসিংহের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িলেন, নিজের দুর্গটিও হাতছাড়া হয় দেখিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন।[৫]

ডুঙ্গরসিংহ ভাস্কর্য্য (Rock-Sculptures) অতিশয় ভালবাসিতেন। "গোয়ালিয়র দুর্গে" পর্ব্বতগাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলি তাঁহারই সময় নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার পর কিরণ সিংহ এবং তাঁহারও মৃত্যুর পর রাজা

8 Brigg's Ferishta., I., p. 502.

9. Ibid., IV., 205.

কল্যাণমল্ল "গোয়ালিয়র দুর্গ' সাত বৎসর অবধি নিজ দখলে রাখেন।[১০]

রাজা মানসিংহ কল্যাণমল্লের পুত্র। তিনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গাধিপতি হইলেন। তিনিই "মান-মন্দির" ও "গুর্জ্জরী মহল" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। সেকেন্দর লোদী তাঁহার সেনাপতি আজীম হুমায়ুনকে "গোয়ালিয়র দুর্গ" জয় করিতে পাঠান। তিনি বহু কষ্টে ১৫ ৯ খৃষ্টাব্দে দুর্গটি জয় করিলেন।[১১] এতদিন পরে "গোয়ালিয়র দুর্গের' স্বাধীনতাসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

খৃঃ ১৫২৬ অবধি "গোয়ালিয়র দুর্গ" লোদীবংশের অধিকারে ছিল। ১৫২৬ খৃঃ ২১এ এপ্রিল দিল্লীর উত্তরে পাণিপথ-ক্ষেত্রে, বিজয়-লক্ষ্মী মোগলদিগের উপর প্রসন্ন-হাস্য বর্ষণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লোদীবংশ দিল্লীর সিংহাসন হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল,—মোগল সম্রাট বাবর সমগ্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইলেন। বিজয়গর্ব্বিত মোগল "গোয়ালিয়র দুর্গ" অধিকার করিল।

গোয়ালিয়র ফটক ও হাওয়া পাহাড়
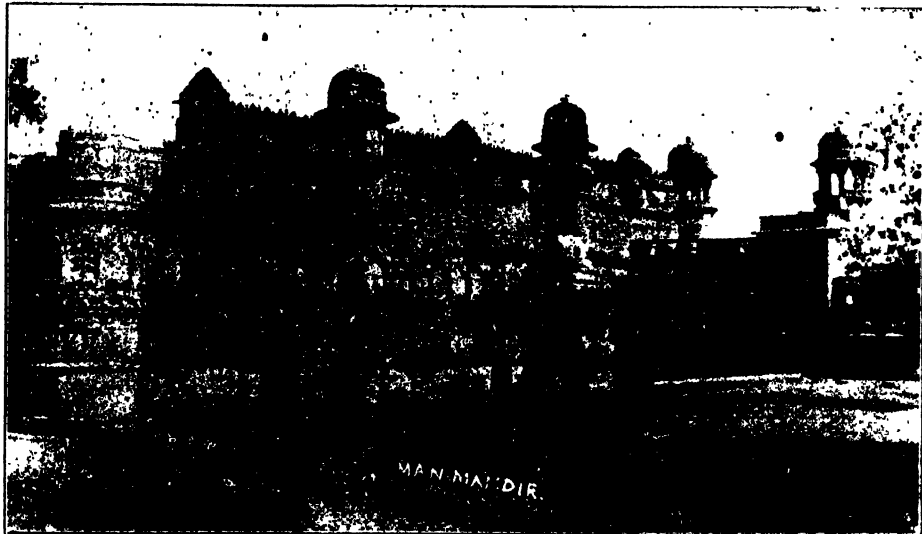
গোয়ালিয়রের মান মন্দির

সেই অবধি দিল্লী হইতে যাহাদের নির্ব্বাচন করা হইত তাঁহারাই প্রতিনিধি স্বরূপ দুর্গাধিপতি হইতেন।[১২]

মাঝে শেরসাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া ১৫৪২

10. Niamatulla's History of the Afghans, by Doru, pp. 51-53 and Brigg's Ferishta, I., p. 557-559.

11. Fazl Ali's MSS. Niamatullah's Afghans, p 74, and Brigg's Ferishta, I., p. 591

12. Baber's Memoirs, by Erskine, p. 308.

গোয়ালিয়র দুর্গে শাশ-বহু'র মন্দির

সিন্ধিয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিলেন। দুঃখের বিষয় মহাদজী সিন্ধিয়া কিংবা লোকেন্দ্র সিংহ দুজনের মধ্যে সে সময় একজনও ছিলেন না। প্রিন্স্ বলবন্ত-রাও[17] "গোয়ালিয়রনামা" অনুবাদ[18] করিয়াছেন, তাহা হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাও বোধ হয় ঠিক নয়। 'গোয়ালিয়ারনামা'র কবি বলিতেছেন, পেশবার সেনাপতি বিনচুরকর গোয়ালিয়র হইয়া দিল্লী যাইতেছিলেন, পথে সহসা জাট-ফৌজ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কতিপয় মহারাট্টা
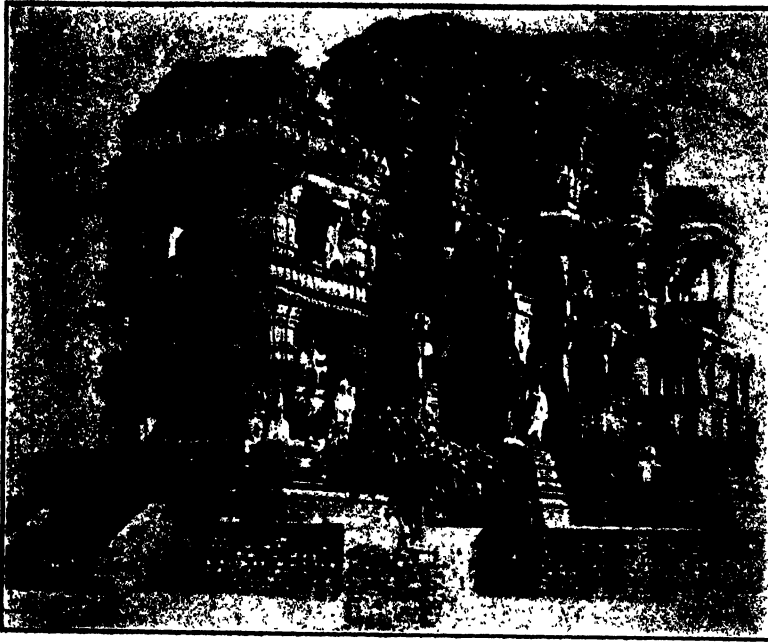
খৃষ্টাব্দে দুর্গটি নিজের অধিকারে রাখিলেন। শেরসাহের সুর-বংশীয় বাদ্শাহদিগেরও আধিপত্য অধিকদিনস্থায়ী হয় নাই,—১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহ দুর্গটি আবার জয় করিলেন।[14] মোগলদিগের জ্যোতি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে গোহাদের জাট রাজা পুনরায় দুর্গ অধিকার করিলেন।[15] তাহার পর "গোয়ালিয়র দুর্গ" মহারাট্টাদিগের অধীনে আসিল।

এখনও অনেকে জানেন না কবে এবং কেমন করিয়া "গোয়ালিয়র দুর্গ" প্রথমে মহারাট্টাদিগের করায়ত্ত হইল। "গোয়ালিয়র গেজেটিয়রে"[16] যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা একেবারে ভিত্তিহীন। গেজেটিয়রের লেখক মহাশয় বলিতেছেন—'১৭৬১ খৃঃ গোহাদের রাণা লোকেন্দ্র সিংহ "গোয়ালিয়র দুর্গ" জয় করেন, কিন্তু তাঁহার প্রাধান্য অধিকদিন স্থায়িত্ব লাভ করিল না,—মহাদজী

সৈন্যকে দুর্গে রুদ্ধ করিয়া রাখে। বিনচুরকর দিল্লী না গিয়া "গোয়ালিয়র দুর্গ" আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধে রাণার মৃত্যু হইল ও দুর্গে মহারাট্টাদিগের গেরুয়া রঞ্জিত পতাকা উড়িল।'

"গোপাচলাখ্যান" পড়িয়া আমরা যাহা অবগত হইয়াছি তাহা বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য। 'পেশবার সেনাপতি বিঠ্ঠলরাও বিনচুরকর যখন গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করেন তখন দিল্লী-সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ কসোরআলি খাঁ দুর্গের সুবাদার ছিলেন। সুবাদার মহাশয় গোহাদের রাণা ভীমসেনের সাহায্য প্রার্থী হইলেও কিছুই কাজ হয় নাই। রাণা যুদ্ধে হত হইলেন এবং মহারাট্টাগণ বিক্রম ১৭৮৪ শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে দুর্গ জয় করিলেন।

বিনচুরকর প্রায় সতের বৎসর অবধি দুর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কে একজন রঘুনাথ রাও বলিয়া দুর্গের মালীক হন। তাঁহারই সময় 'গোয়ালিয়র দুর্গ' গোহাদের রাণা ছত্র

13. Cunningham's A. S. I., Vol II., p 394.
14 Ency. Frit, Vol. XII., p. 794.
15 Hunter's Imperial Gazetteer of India
16 Gwalior Gazetteer, By Captain, C. E. Luard, M. A.

17. ইনি বর্ত্তমান মহারাজের অগ্রজ।
18 Translated in English.

মহাদজী সিন্ধিয়া

দৌলতরাও সিন্ধিয়া

সিংহ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া পলায়ন করিতে হয়। অবশেষে কর্ণেল পোফামের সাহায্য লইয়া রাণা দুর্গ চড়াই করিলেন [১৯] এবং কয়েকমাসব্যাপী যুদ্ধের পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট দুর্গ অধিকার করিলেন। ১১ মাস পর্য্যন্ত ইংরেজ দুর্গটিকে নিজের হাতে রাখিয়া গোহাদের রাণাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন।

২২ মার্চ্চ ১৭৭৭ খৃঃ মহাদজী সিন্ধিয়া পেশবার নিকট হইতে গোয়ালিয়র দুর্গ এবং ১০॥০ লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা পাইলেন। দুর্গটি কিন্তু তখনও গোহাদের রাণার অধিকারে। মহাদজী সিন্ধিয়া নিজের সেনাপতিদ্বয় খাণ্ডেরাও হরি এবং আম্বোজী ঈঙ্গলেকে গোহাদে পাঠাইলেন।[২০] অতি কষ্টে অবশেষে মহাদজী ৩১এ

19. Cunningham's A. S. I., Vol. II., p. 305.
20. Gwalior Gazetteer, By Luard.

মহারাজ জিয়াজিরাও সিন্ধিয়া—(বর্ত্তমান মহারাজার পিতা)

জুলাই ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গোহাদের রাণাকে পরাজিত করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। যে দিবস তিনি দুর্গটি নিজের অধীনে পাইলেন সেই দিবসই কোটেশ্বরে শিব-মন্দির স্থাপন করিলেন।[21]

১৭৮৩ খৃঃ হইতে ১৮০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত দুর্গটি সিন্ধিয়ার অধীনে রহিল। খাণ্ডেরাও হরির মৃত্যুর পর আম্বোজী ইঙ্গলে সুবাদার নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেনাপতি হোয়াইটকে ১৮০৫ খৃঃ[22] নির্ব্বিবাদে দুর্গটি অধিকার করিতে দেন। সেই বৎসরই দৌলতরাও সিন্ধিয়া ইংরেজদের নিকট হইতে দুর্গ পাইলেন।[23]

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র দুর্গ মহারাষ্ট্রাদিগের অধিকারে ছিল। মহারাজপুর এবং পানিহারের যুদ্ধের পর ইংরেজ অফিসারের অধীনে দেশীয় ফৌজ এই দুর্গে অবস্থান করিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদিগের হাতে দুর্গ পড়িল। সার্ হিউ রোজ ১৮৫৭ খৃঃ ১৭ই জুন দুর্গ অধিকার করিলেন।[24] পরে ১০ই মার্চ্চ ১৮৮৬ খৃঃ ঝাঁসি ইংরেজদিগকে দিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে মহারাজা জিয়াজিরাও "গোয়ালিয়র দুগ লইলেন। পরিশেষে সিন্ধিয়াবংশ "গোয়ালিয়র দুর্গে পুনরধিষ্ঠিত হইলেন।[25]

ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

21. Life of Deo Maharaj—A famous and respected sanyasi of the "Koteshwar" temple
22. Baber's Memoirs, by Erskine, p 384. Cunningham, A. S. I. Vol.. II, p. 395
24. H. N. S. I., Vol. I., p. 361.
25. H. N. S. I., Vol. I., p 363.

চিরন্তনী

এই যে আমি,—এই যে জীবন, প্রতি নিমিষের,
পলে-পলে চল্‌ছে টেনে এই চলারি জের,
নিত্য-দিনের খণ্ডতারে বাঁধ্‌ছে যে এ গেঁথে
সঞ্চয়েরি একটি পুরে,—একটি সুরে বেঁধে ;
জীবনের এই ছন্দেতে হায় পড়্‌বে কোথা যতি!
গ্রন্থি কোথা এই মালিকার? কোথায় পরিণতি!
লক্ষবছর আগের জীবন এই জীবনের বুকে
এর চেতনায় কাঁপ্‌ছে আজো, এরি সুখে-দুখে!
মৃত্যু-মাঝে হয়নি'ক তার একটুখানি লয়,
মরণ, সে তার জীবনেরেই করেছে অক্ষয় ;
ফুলের ব্যথাই মরণপারে ফলের বুকে জাগে,
ফল, সে মরা ফুলের জীবন দেয় ফিরায়ে তা'কে,—
এম্‌নিতর বিনিময়ের প্রেমের মেলা-মাঝে
নিত্যকালের জীবন যে গো অমর হয়ে' আছে ;
তাইত আজি মনের বনে যে-ফুল ফুটে মোর
গন্ধে সে তার, চির-যুগের সাধের স্বপন-ঘোর,
তাইত গো আজ্ আমার গানের সুরের মঞ্জুষাতে
পড়্‌ল ধরা বিশ্ব আপন অনন্ত-প্রাণ সাথে!
আমার এ প্রাণ নয় একেলা,—ক্ষুদ্রতারি মাঝে,
বক্ষে এ মোর নিখিল-মেলা, অনন্ত প্রাণ রাজে!
চির-কালের এই আমি যে আদিম পুরাতন;
চিরন্তনী-লীলার মাঝে নিতুই গো নূতন!

শ্রী হৃষীকেশ চৌধুরী

কাগজের নৌকা

চিত্রশিল্পী—শ্রীমতী শান্তা দেবী
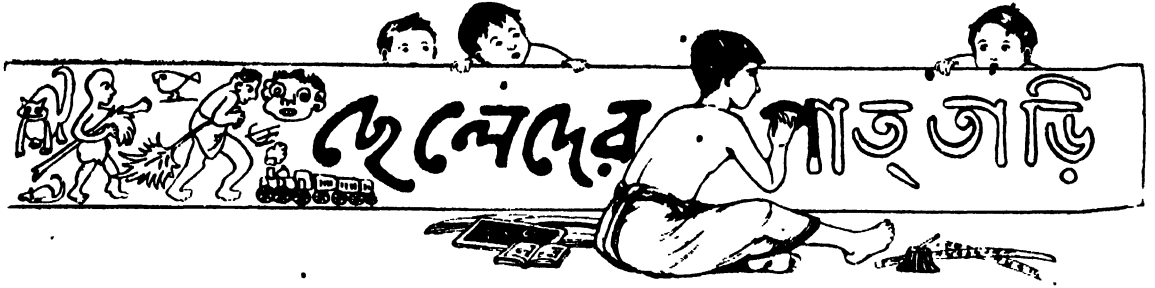
রাজাড়ে ভোর

রাজা-মশাইকে সমস্ত দিন বেজায় খাটতে হয়, রাত দুপুর পর্যন্তও তাঁর খাটুনির কমি নেই। এত খেটে খুটে অনেক রাত্তিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, সে ঘুম ভাঙতে তাঁর অনেক বেলা হয়ে যায়। রোজ তিনি যে সময়ে ওঠেন, ছেলেরা স্কুল থেকে সে সময়ে ফিরে আসে।

রাজা-মশাই দেখেন, দিনটা যেই ফুরিয়ে আসে, সূয্যিদেব অমনি আকাশের পশ্চিম দোর দিয়ে কোথায় চলে' যান; তার পরেতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। পরের দিন উঠে দেখেন সূয্যি প্রায় মাথার কাছাকাছি! এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড় আশ্চয্য ঠেক্‌লো। আচ্ছা, সূয্যি ত ডুবে যায়, কিন্তু আবার আসে কোথা থেকে? কখনই বা আসে? রাজা-মশাই ত কোন দিন সকালে ওঠেন নি, তিনি সূর্য্য উঠ্‌তেও দেখেন নি।

একদিন তিনি রাজসভায় মন্ত্রীদের ডেকে তাঁর মনের এই খট্‌কার কথা বলে' ফেল্লেন। মন্ত্রীরা শুনে বল্লেন, "মহারাজ, সূয্যি-ঠাকুর রোজ ভোর বেলা পূব দিক দিয়ে ওঠেন; তখন তাঁকে দুপুর বেলার মত অত উজ্জ্বল দেখায় না, তখন তাঁর রংটি চমৎকার লাল, ঠিক সন্ধ্যে-বেলার মত।"

শুনে রাজা-মশাই আরও আশ্চর্য্য হলেন। কই, তিনি ত কোন-দিন সূয্য উঠ্‌তে দেখেন নি! মন্ত্রীরা বল্লেন, "মহারাজ, আপনি যদি আর একটু সকালে ওঠেন, তবে সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে পান।"

বেশ। রাজা-মশাই ঠিক করলেন যে, তার পরদিন খুব সকালে উঠ্‌বেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠ্‌লো না। তাঁর বেলায় ওঠা অভ্যেস্ হয়ে গিয়েছিল, তিনি কি আর ইচ্ছে করলেই ভোরে উঠ্‌তে পারেন? উপায়? মন্ত্রীরা বল্লেন, "মহারাজ, শোবার সময়ে বাড়ীর কাউকে বলে' দেবেন, যেন খুব সকালে আপনাকে জাগিয়ে দেয়।"

তাতেও হল না। তিনি সকাল বেলাটা এমনি বেহুস হয়ে ঘুমুলেন যে রাজবাড়ীর ঝি, চাকর, মেয়ে, ছেলে, কেউই তাঁকে জাগাতে পারলে না। সে-দিনও তাঁর ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

রাজা-মশাই জেগে যখন দেখ্‌লেন যে সূয্য একেবারে মাথার উপর, তখন তাঁর ভারী রাগ হ'ল। তাঁর মনে হ'ল মন্ত্রীরা তাঁকে মিথ্যে কথা বলেছে, সূয্য কখনও পূব দিক দিয়ে ওঠে না, আকাশের ওই মাঝখানটাতেই হঠাৎ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে!

বাড়ীর লোকেরা বল্লে, সকলেই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রাজামশায়ের ঘুম ভাঙাতে পারা যায় নি।

রাজা কারুর কথা বিশ্বাস করলেন না। সকলে মিলে কেন তাঁকে ঠকাচ্ছে, তিনি সকলের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন।

রাজ্যে হুলুস্থূল পড়ে' গেল! মন্ত্রীদের বুঝি গর্দ্দান্ যায়! রাজবাড়ীর কারুর কাঁধে বুঝি আর মাথা থাকে না! অনেক ভেবে চিন্তে বুড়ো-মন্ত্রী রাজার কাছে গেলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে রাজা মশাইকে বল্লেন, "রাজা-মশাই, এমন করে' হবে না। রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে দিতে হুকুম দিন, যে আপনাকে সূর্য্যোদয় দেখাতে পারবে, তাকে হাজার আস্‌রফি পুরস্কার, কিন্তু না পারলে তার গর্দ্দান নেওয়া হবে।"

তথাস্তু। রাজ্যে ঢোল পিটানো হ'ল। কিন্তু কথা শুনে কাজটা করতে আস্‌তে কারুর সাহসে কুলোল না। দু'দিন গেল। রাজা-মশায়ের সূর্য্যোদয় দেখা বুঝি আর এ জীবনে হ'য়ে উঠ্‌লো না।

তৃতীয় দিনে একজন লোক এল। সে লোকটা নাকি বেজায় চালাক। সে রাজাকে জানালে, "মহারাজ, আমি আপনাকে সূর্য্যোদয় দেখাবই দেখাব।"

রাজার আহ্লাদ আজ আর দেখে কে ? তিনি ঢোল পিটিয়ে রাজ্যে প্রচার করে' দিলেন যে তার পরদিন সূর্য্য উদয় হতে দেখে সমস্ত দুঃখীপ্রজাকে রাজবাড়ীর সাম্‌নে বস্ত্র দান করবেন। সমস্ত লোকে যেন ভোর বেলাই রাজবাড়ীতে এসে হাজির হয়।

লোকটা এক নতুন উপায় ঠাউরেছিল। সমস্ত রাত সে মহারাজার বিছানার কাছে বসে' তাঁকে জাগিয়ে রেখেছিল। প্রথমতঃ নানান্ রকম গল্প করে', পরে হাসির কথা বলে' সে রাজাকে ঘুমোতে দেয় নি। ভোর প্রায় হয়ে এসেছে। লোকটা ভাব্‌লে, আর ভয় নেই, এইবার নিশ্চিন্তি হওয়া গেল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য্য উঠে পড়বে! সে খালি খালি পূব দিকে তাকাতে লাগ্‌লো—আর একটু হলেই হয়!

তার পরেতেই চতুর্দ্দিক লাল রঙেতে ছুপিয়ে দিয়ে সূয্যিদেব একটুখানি উঁকি মারলেন। ব্যস্, শেষকালে সে সফল হ'ল!

কিন্তু ও কি ? রাজা মশাই যে ঘুমে অচেতন! হায়! হায়! সমস্ত রাত্তির খাটুনি বুঝি পণ্ড হ'ল! শেষের দিকে সূর্য্যোদয় দেখবার জন্যে একটু অন্যমনস্ক হতেই রাজামশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে অনেক ডাকাডাকি করলে, "রাজা-মশাই, ও রাজা-মশাই, উঠুন, ওই যে সূর্য্য উঠ্‌ছে।"

আর রাজা-মশাই! তিনি সমস্ত রাত জেগে ছিলেন, সে দিন আরও উঠ্‌তে বেলা হ'ল। লোকটাও ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে ঘরের মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লো।

এদিকে রাজ্যসুদ্ধ লোক রাজার দান নেবার জন্যে সকাল থেকে দেউড়ীতে এসে জড়ো হয়েছে। ক্রমে বেলা বেড়ে চল্‌ল দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লো। তারা আর অপেক্ষা করতে পারে না।

রাজার যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন তিনি উঠে দেখেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। তিনি ভয়ানক বিরক্ত হয়ে গেলেন। তার উপরে যখন দেখ্‌লেন যে, লোকটা মেঝেয় পড়ে' খুব ঘুমুচ্ছে তখন তিনি রেগে হুকুম দিলেন, "এক্ষুনি লোকটার গর্দ্দান্ নেওয়া হোক্, এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

সেই রাজ্যসুদ্ধ লোকের সাম্‌নে বেঁধে নিয়ে গিয়ে, জল্লাদ লোকটার মুণ্ডু কেটে ফেল্লে। সমস্ত লোক ভয়ে ভয়ে কাণ্ডটা দেখে যে যার ঘরে চলে' গেল।

এর পরে কে আর সাহস করে' রাজাকে সূর্য্যোদয় দেখাবার জন্যে জাগাতে আস্‌বে ? কিন্তু হাজার আস্‌রফির লোভ বড় কম নয়। তিন-চারদিন যেতেই কোথা থেকে আবার একজন লোক এল।

রাজা-মশাই দুপুর বেলা রাজ-সভায় বসে' আছেন, ভোরে উঠ্‌তে না পেয়ে রাগে তাঁর মুখখানা হাঁড়ি-পানা। চারদিকে পাত্রমিত্ররা চুপচাপ বসে' আছে, ভয়ে কারো মুখে কথাটি নেই। সকলেই ভাব্‌ছে রাজা না জানি এইবার কার মুণ্ডুটা কেটে ফেলে দিতে হুকুম দেন। এমন সময়ে সেই দুঃসাহসী লোকটি এসে রাজ-সভায় দাঁড়াল। সে মহারাজকে প্রণাম করে' বল্ল, "মহারাজ, আমি আপনাকে সূর্য্যোদয় দেখাব। কিন্তু আমার দু-একটা কথা রাখ্‌তে হবে।"

সভার সকল লোক এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো। এ লোকটা কোথা থেকে এল ? এ পাগল নাকি ? না, এর মাথাটার আর কোন দরকার নেই ?

শুধু রাজা-মশাই বল্লেন, "কি, কি কথা ?"

সে বল্লে, "আমি রাত্তির বেলা, আপনি ঘুমুলে, আপনার ঘরে যাবো, সে সময়ে আমায় যেন কেউ বাধা না দেয়।"

"বেশ।"

"আর আপনাকে পূবদিকের ঘরখানাতে ঘুমুতে হবে, সে ঘরে আর কেউ থাক্‌তে পারবে না, শুধু আপনি আর আমি থাক্‌বো।"

"বেশ।"

"আপনার বিছানার পূব শিওরের জানালাটা খোলা থাকা চাই—যাতে আপনি উঠেই সূর্য্যোদয় দেখ্‌তে পান।"

"বেশ। আর কোন কথা আছে?"

লোকটা বল্লে, "হাঁ, মহারাজ, আর এক কথা। আমার পুরস্কারটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে, আস্‌রফিগুলো কাছে রেখে ঘুমুবেন।"

রাজা-মশাই রাজি হলেন। তার পরেতে সেই অদ্ভুত লোকটা যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে রাজাকে প্রণাম করে' চলে' গেল।

রাজ্যে গুজব রটে' গেল, আবার একজন লোক এসেছে রাজাকে সূর্য্যোদয় দেখাতে। লোকটার বোকামি মনে করে' অনেকে হায় হায় কর্‌তে লাগ্‌লো। আবার অনেকে বল্‌তে লাগ্‌লো, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভীকে দয়া কর্‌তে নেই, সে পাপী।"

ভোর হতেই রাজবাড়ীর সিং-দরজার সাম্‌নে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এবারে আর তাদের কেউ ডাকে নি। এবারে তারা নিজেরাই এসেছে—দান নিতে নয়, মজা দেখ্‌তে। তারা ভেবেছে লোকটা রাজাকে সূর্য্য উঠ্‌তে দেখাতে ত নিশ্চয়ই পার্‌বে না, আবার একটা লোকের গর্দ্দান নেওয়া নিশ্চয়ই হবে। তাই দেখ্‌তে রাজ্যসুদ্ধ লোক ভোর না হতেই আপনা থেকে এসে জড়ো হলো।

ক্রমে বেলা বাড়্‌তে লাগ্‌লো। রাজা মশায়ের ঘুম থেকে ওঠার কোন লক্ষণই নেই। লোকেদের মনেও আর সন্দেহ রইল না যে, হতভাগা মাথাটা পোয়ালো।

প্রখর রোদ ঝাঁ ঝাঁ কর্‌তে লাগ্‌লো। রাজা-মশাই রোজ যে সময়ে ওঠেন, সেই সময় এসে গেল। বাইরের লোকেরা গর্দ্দান নেওয়া দেখ্‌বার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌লো।

এদিকে ঘরের ভিতর সেই লোকটা রাজার দিকে তাকিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেলা অনেকখানি হয়ে গেল, সে কিন্তু রাজাকে একবারও জাগাতে চেষ্টা কর্‌ল না।

তারপরে যথাসময়ে রাজা-মশাই উস্‌খুস্‌ করে' নড়ে' উঠ্‌লেন। তাই দেখে লোকটা আস্তে আস্তে রাজা-মশায়ের মাথার কাছে গিয়ে তাঁকে ডাক দিল, "মহারাজ, উঠুন, ওই দেখুন সূর্য্যোদয়—সূর্য্য কেমন আকাশ রাঙা করে' উঠ্‌ছে দেখুন।"

রাজা-মশাই ধড়্‌মড়িয়ে উঠে জান্‌লা দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন। সত্যিই তো! ওই সন্ধ্যেবেলার মত—রাঙা সূয্যিদেব উঠ্‌ছেন!

মহারাজ ভারী খুশী।

লোকটা বল্লে, "মহারাজ, এইবার আমার পুরস্কার?"

বিছানাতেই মোহরগুলো ছিল। রাজা-মশাই তক্ষুনি হাজার আস্‌রফি গুনে লোকটাকে দিলেন। সে প্রণাম করে' চলে' গেল।

বাইরে, এদিকে, লোকেদের মনে ভাব্‌নার উদয় হ'ল। এত বেলা হ'য়ে গেল, আজ এখনও কি রাজা-মশাই উঠ্‌লেন না? মন্ত্রীদের মনে খট্‌কা লাগ্‌ল। একজন বল্লেন, "তাই তো, সেই অদ্ভুত লোকটা রাত্রে রাজার ঘরে একলা ছিল, রাজা-মশায়ের কিছু অনিষ্ট করেনি তো?"

মন্ত্রীরা চম্‌কে উঠ্‌লেন, "ঠিক তো!" তখনই তাঁরা দৌড়ে রাজা-মশায়ের ঘরে ঢুকে পড়্‌লেন। গিয়ে দেখেন, রাজা একদৃষ্টে পূব দিকের জান্‌লা দিয়ে কি দেখ্‌চেন। সে ঘরে আর কেউ নেই।

তাঁদের ঢুক্‌তে দেখে রাজা ফিরে তাকালেন, হেসে বল্লেন, "আজ আমার ঘুম ভেঙেছে, ওই দেখ এখনও সূর্য্য লাল রয়েছে।"

তাঁরা জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লেন, লাল সূর্য্যই বটে! কিন্তু—

কিন্তু কি? তাঁরা জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, "মহারাজ, সে লোকটা কোথা গেল?"

রাজা বল্লেন, "কেন, পুরস্কার নিয়ে চলে' গেছে,—তার কাজ করে'।"

মন্ত্রীরা বল্লেন, "না, মহারাজ, তার কাজ সে করেনি। এখন অনেক বেলা। তবে, সে আপনাকে ঠকিয়েছে। ওই দেখুন, জান্‌লাটার আগা-গোড়া একখানা পাত্‌লা লাল রংএর কাচ আঁটা!"

অ্যাঁ, সত্যিই তো!

ঠগ! ঠগ! ভয়ানক ঠগ! চারদিকে লোকটার খোঁজ

পড়ে' গেল। সে লোকটা অনেক আগেই দেউড়ীর লোকারণ্যে মিশে গিয়েছিল। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

রাজ্যের লোককে নিরাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ল, এত-খানি বেলা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেও তারা গর্দ্দান্ নেওয়া দেখ্‌তে পেল না! তাদের বড়ই দুঃখ হ'ল!

কিন্তু রাজা-মশাই একটুও রাগ্‌লেন না। তিনি মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, "তাকে খুঁজ্‌তে হবে না, সে ঠিকই করেছে, সে আমাকে 'রাজাদে ভোরে' জাগিয়ে দিয়েছে।"

শ্রী কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

—

পুনর্মূষিক

(জাপানী গল্প)

জাপানের তোকিও সহরে এক খুব গরীব দিন-মজুর ছিল। তার কাজ রাস্তা-মেরামত করা। কি কষ্টেই না দিন তার কাট্‌ত! দুই এক টুক্‌রো পোড়া রুটী তাও মিল্‌ত বহু কষ্টে।

রাতে সে একখানা ভাঙা ঘরে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ত, 'আমি যদি একটা মস্ত বড়লোক হতাম, তাহলে কি মজাটাই না হত। রাস্তার দুইধারে যে-সমস্ত সুন্দর সুন্দর পিটের দোকান আছে, সেগুলো সব আমি কিনে নিতাম। আর, সারা দিনরাত একটা খুব মোটা নরম গদীর উপর শুয়ে থাক্‌তাম। কোনো কাজ নেই, কেবল শুয়ে থাকা আর চাকর-চাক্‌রাণীদের আদেশ করা।"

একদিন এক দেবদূত সেই ভাঙা কুঁড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শুন্‌তে পেলেন তার কথা। এই মানুষ জাতটাকে দেবদূত ভাল রকমই চেনেন কিনা, তাই ভাব্‌লেন একে নিয়ে একটু রগড় করা যাক্।

এই মনে করে' তিনি মজুরের উদ্দেশে বল্লেন যে "তোমার ইচ্ছা সফল হোক্।"

দেবদূতের কৃপায় নিমেষের মধ্যে মজুর এক মস্ত ধনী। প্রকাণ্ড বাড়ী, যথেষ্ট দাস দাসী, তার আর কিছুরই অভাব নেই।

একদিন সে দেখ্‌লে তার বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে এক সম্রাট চলেছেন। খুব সুন্দর চারটি দুধের মতো সাদা ঘোড়া তাঁর প্রকাণ্ড গাড়ীখানা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কি জম্‌কালো তাঁর জরির পোষাকটা। তাঁর হীরার মুকুটটা এমনি ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছিল যে সে মনে কর্‌লে যেন সেটা তাকেই উপহাস কর্‌ছে। সম্রাটকে দেখে সবাই হাঁটুগেড়ে বসে' সম্মান দেখাচ্ছিল। এই সব দেখে সে ভাব্‌লে ধনজন থাক্‌লে কি হয়? আমাকে দেখে কি অম্‌নি করে' কেউ জয়ধ্বনি করে, না সম্মান দেখায়?"

এইবার সে দেবদূতের বরে একটা সাম্রাজ্যও লাভ কর্‌লে। একদিন মহা সমারোহে বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একটা পাথর-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে সে চলেছে। সে চার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে যে আজ সবাই তাকে দর্শন করে' আনন্দধ্বনি কর্‌ছে। সে ভারী খুসী হল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়্‌ল সেই পাথরের রাস্তাটার উপর। সূর্য্যের আলোতে রাস্তাটা এমন জল্‌ছিল যে সেদিকে চাইতে গিয়ে তার চোখদুটো ঝল্‌সে গেল।

এবার সে বুঝ্‌লে রাজ-ঐশ্বর্য্যও সূর্য্যের কাছে কিছুই নয়। রাস্তাটার দিকে সে কিনা চাইতেই পার্‌ছিল না।

দেবদূত তার দিকে একটু হেসে চাইতেই সে একেবারে সূর্য্যদেব হয়ে গেল। সে তার প্রখর কিরণ পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে দিল। তার অসহ্য প্রতাপে নদ নদী সাগর শুকিয়ে উঠ্‌ল; গাছ-পালা সব মরে' যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু একদিন ছোট্ট একখানা কালো মেঘ তাকে ঘিরে এলো। এইবার সে জব্দ হলো। পৃথিবী হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

সে দেখ্‌লে যে একখানা সামান্য মেঘ তার প্রচণ্ড তেজকে একেবারে ঢেকে ফেল্‌ল। এর চেয়ে যে মেঘ হওয়া ছিল ঢের ভালো।

দেবদূত এ সাধও তার অপূর্ণ রাখ্‌লেন না। সে তার প্রকাণ্ড শরীরটা দিয়ে সূর্য্যকে আবৃত করে' রাখ্‌ত। হঠাৎ একদিন সে বৃষ্টির জল হয়ে গলে' মাটিতে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সেই জলরাশি একটা প্রবল স্রোতের আকার ধরে' তার সম্মুখে যা পেল তাই ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

সে ভাবল্ল এইবার সে আসল ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু এ কি!—এই ছোট্ট পাহাড়টাকেই যে সে সরাতে পার্‌ছে না। তা হলে ভারী ত তার ক্ষমতা?

এখন হয়েছে কি—দেবদূত তাকে একটা পাহাড় করে' দিয়েছেন। এবার বৃষ্টিকেও তার ভয় নেই, রোদকেও সে একদম কেয়ার করে না। হঠাৎ তার মনে হল কি একটা যেন তার পায়ের দিকে ঘা মার্‌ছে। সে তার পাথরের চোখ দুটো দিয়ে অনেকক্ষণ দেখে দেখে ঠিক কর্‌লে যে একটা ছোট্ট মানুষ একখানা ভাঙ্গা কোদাল দিয়ে তাকে আঘাত কর্‌ছে, আর তার পায়ের পাথরের আঙ্গুলগুলো একটি একটি করে' খসে' যাচ্ছে।

তার ভারী রাগ হল। মানুষের এত আস্পর্দ্ধা—সে একটা পাহাড়কে ধ্বংস কর্‌তে চায়!

সে জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "আমি মানুষ হতে চাই।"

আবার সেই দিন-মজুর। কোদালখানা কোলের উপর ফেলে রেখে রাস্তার ধারে বসে'! ক্ষিদের জ্বালায় পেটটা তার চিঁ চিঁ কর্‌ছিল।

শ্রী হেমেন্দ্রনাথ সান্যাল

—

চাতকের সৃষ্টি

এক সহরে বাস কর্‌ত এক গয়লা। তার দুধ খেয়ে সে সহরের লোক তাকে চমৎকার চিনে নিয়েছিল। দুধে কেবল সাদা রঙটি রেখে সে ছেড়ে দিত। সহরের লোকে তার দুধের নাম দিয়েছিল—সাদা জল। তার একসের "সাদা জলে" ছটাক কি আধপোয়াটাক দুধ থাকৃত কি না সন্দেহ। কিন্তু দুধ খাঁটী দুধের দরে বিক্রী! কাজেই সহরের লোক তার কাছে ঘেঁস্‌ত না। তবে তার চল্‌ত কেমন করে'? বিদেশী লোকের কল্যাণে। ঠিক সহরে ঢুক্‌বার মুখেই সে তার দোকান খুলে বসেছিল। বিদেশী লোক ও মুসাফেরদের দৃষ্টি চট্ করে' ওরই ওপর পড়্‌ত। ব্যস্, আর কি! তার দুধ বেশ চড়া দরেই বিক্রী হত। কিন্তু খানেওয়ালাদের তা খেয়ে মোটেই যে তৃপ্তি হত না, এটা ঠিক। কেউ তাকে মনে মনে গাল দিত,—কেউ দুকথা শুনিয়ে দিত;—কেউ বা ধর্ম্মের ভয় দেখাত—অত অধর্ম্ম সইবে না গয়লার পো, ওপরে ধর্ম্ম আছেন। কিন্তু গয়লার পো এসব মোটেই গ্রাহ্য কর্‌ত না। জল বেচে লোকের বহুকষ্টে-রোজ্‌গার-করা পয়সা (গায়ের রক্ত বল্‌লেও হয়) গয়লা দিব্যি শোষণ করে' নিতে লাগ্‌ল। অনেক টাকা রোজ্‌গার কর্‌লে—অনেক বিষয়-সম্পত্তি কর্‌লে—মনে কর্‌লে এ ধন-সম্পদ্ চিরদিন ভোগ করব। যখন সুখেই থাক্‌ব, তখন হলই বা পাপ! কিন্তু হঠাৎ একদিন কাল এসে গয়লাকে তার অধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন-সম্পদ থেকে টেনে নিয়ে গেল। একটুও তার জোর খাট্‌ল না। কেউ—কোন জিনিষ তার সঙ্গে গেল না।

মৃত্যুর পর গয়লাকে হাজির করান হল ধর্ম্মরাজের দর্‌বারে। তার বিচার হবে। পাপীর মন কেঁপে উঠ্‌ল। এখানে ফাঁকি দেবার জো ত নেই। বিচারক অন্তর্য্যামী; তিনি পাপ-পুণ্য সবই জান্‌ছেন।

গয়লা শুকনো মুখ কাল করে' বিচারকের সাম্‌নে হাত জোড় করে' দাঁড়াল। ধর্ম্মরাজ তার উপর ক্রোধ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে' বল্‌লেন—তোর কিছু বল্‌বার আছে?

গয়লার মনে আশা হল। মনে কর্‌লে—স্বর্গেও বুঝি মিথ্যার জয় হয়। সে অম্‌নি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বলে' উঠ্‌ল—হুজুর, ধর্ম্মাবতার, দোহাই আপনার—

চুপ্!—বজ্রগম্ভীরস্বরে ধমক দিয়ে ধর্ম্মরাজ বল্‌লেন—তোর পাপের সীমা নেই—মিথ্যে কথা বলে পাপ আর বাড়াতে চাস্‌নে। এই শোন্—এরা কি বলছে।

গয়লা চেয়ে দেখ্‌লে কতকগুলি মুসাফের যারা তার কাছে দুধ কিনেছিল। তার কালো মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিলে। তারা বল্‌লে—হুজুর! এ আমাদের জল খাইয়ে দুধের পয়সা নিয়েছে। এর পাপের শেষ নেই। আমাদের বহুকষ্টের পয়সা গায়ের এক বিন্দু রক্ত এ চুষে নিয়েছে।

ধর্ম্মরাজ গয়লার প্রতি ভ্রূকুটী করে' বল্‌লেন—শুন্‌ছিস্—পাপিষ্ঠ! দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়েছিলি। খুব তার সদ্ব্যবহার কর্‌লি। এখন তোর কি শাস্তি

বধান করি। এবার কোন্ জন্ম চাস?—কুকুর, শিয়াল, গাধা, শূয়র—

গয়লা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে' কাঁদতে কাঁদতে বল্‌তে লাগ্‌ল—হুজুর রক্ষা করুন—হুজুর রক্ষা করুন—

ধর্ম্মরাজ কিছুক্ষণ চিন্তা কর্‌লেন। তার পর কঠোর কণ্ঠে বল্‌লেন—তুই এবার এক রকম পাখী হয়ে জন্মাবি। মানুষের রক্ত শোষণ কর্‌তে দুধের ব্যবসায়ে যত জল ব্যবহার করেছিলি—ভগবান তোর জন্যে যে জল মেপে রেখেছেন, তত জল তার থেকে বাদ গেল। তুই সামান্য জলই তোর ব্যবহারের জন্য পাবি। কেবল বর্ষায় মেঘের জল পান করে' তুই জীবনধারণ কর্‌বি। অন্য সময় বা কোন জলাশয়ে তোর জলপানের শক্তি থাক্‌বে না। তোর তেষ্টা কিছুতেই মিট্‌বে না। যখন দারুণ তেষ্টায় তোর প্রাণ ছট্‌ফট্‌ কর্‌বে, তুই যন্ত্রণায় আকাশে ছুটে বেরোবি এবং একবিন্দু জলের জন্যে করুণ স্বরে "ফটিক জল!" "ফটিক জল!" বলে কেঁদে বেড়াবি।—এই হল তোর শাস্তি!

সেই অবধি সে গয়লা চাতকপাখী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। সে কেবল মেঘের জল পান করে। অসংখ্য জলাশয়ের দিকে চেয়ে থাকে—তেষ্টা পেলেও তাদের জলপান কর্‌বার তার শক্তি নেই। গ্রীষ্মকালে দারুণ তেষ্টায় যখন তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, ছাতি ফেটে যায়, তখন তাকে আকাশ ফাটিয়ে করুণ স্বরে কাঁদতে শোনা যায়—ফটিক জল, ফটিক জল!

শ্রী দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার।

সেয়ানা বোকা

বৃষ্টি হলেও পাঠশালে যায়
মাথায় দিয়ে টোকা,
তাই বোকাকে চালাক হলেও
বল্‌ত সবাই বোকা!
সেদিনও সে হন্‌হনিয়ে
যাচ্ছে হেঁটে জোরে
বর্ষা-সজল-কাজল-ঘেরা
শ্রাবণ-ঘন ভোরে,
বাগিয়ে নিয়ে বগলদাবায়
পাত্‌তাড়ি আর জুতো,
ঝুলিয়ে হাতে মাটির দোয়াত
জড়িয়ে বাঁধা সুতো।
বাইরে বড় বেরোয়নি কেউ,
পথ ঘাট সব ফাঁকা,
জল-সপ্‌-সপ্‌ জোব্‌ড়া মেঘে
আকাশ যেন ঢাকা!
বাজে গুড়্‌গুড়্‌ মেঘের মাদল,
চম্‌কে চিকুর হানে!
থাক্‌ছে না আর কানের পোকা
ব্যাঙের গলার গানে!
টইটুম্বুর পুকুরে জল,
শেওলা-পিছল ঘাট,
উঠ্‌ছে বেড়ে আগাছা বন,
ঘাসে বোঝাই মাঠ!
গাছ-পালারা আদুড় গায়ে
দাঁড়িয়ে ভেজে ঠায়,
বোকা তবু টোকা মাথায়
পাঠশালেতে যায়!
পথের মাঝে একটা গলি
পার হ'তে হয় তাকে,
গলিটা প্রায় জলে কাদায়
নোংরা হয়েই থাকে;
মাঝখানে তার যাওয়া-আসায়
লোকের পায়ে পায়ে
একটু সরু পথ হয়েছে
জমাট কাদার গায়ে;
তারই উপর সাবধানে খুব
যাচ্ছে বোকা ছেলে,
হাঁটুর চেয়েও গুড়িয়ে কাপড়
সাম্‌নে পা'টি ফেলে!
না এগোতেই অল্প দূরে
দেখ্‌লে—জ্বালাতন,—
আজও গলির ওমুখ থেকে

আস্‌ছে আর-একজন !
পথটা কিন্তু এতই সরু
বাঁচিয়ে জুতোর তলা,
পাশ কাটিয়ে দু'জন লোকের
হয় না মোটেই চলা !
চল্‌তে গেলে একজনকে
নাম্‌তে হবেই জলে,
কি করা যায় ভাব্‌ছে বোকা
এগিয়ে যত চলে !
যেই দু'জনে মাঝ-পথে ঠিক্
পড়্‌ল এসে কাছে,
দাঁড়িয়ে গেল সাম্‌নে যে যার,
কাদায় পড়ে পাছে !
বোকা মোদের টোকা মাথায়
বল্‌লে তখন হেঁকে,—
"কে তুমি হে সাম্‌নে এলে ?
"সর' এ পথ থেকে।
"নইলে আমি এখনই আজ
"করব জেনো তাই,
"করেছিলাম কাল্‌কে যেমন,
"পথ যদি না পাই !"

হঠাৎ শুনে এ-সব কথা
ভড়্‌কে গেল বড়
যে ছেলেটি ওধার থেকে
হয়েছিল জড়।
শুকিয়ে গেল মুখখানি তার
উঠ্‌লো ভয়ে ঘেমে,
পথ ছেড়ে সে নিঃশব্দে
কাদায় এল নেমে !
বোকা তখন বুক ফুলিয়ে
এগিয়ে চলে দেখে
জান্‌তে চাইলে সেই ছেলেটি
পিছন থেকে ডেকে—
"পথ না পেয়ে কাল আপনি
"করেছিলেন যেটা,
"বলুন তো সে উপায়টা কি,
"শিখে রাখ্‌বো সেটা !"
হেসে ফেল্‌লে বোকা শুনেই,
বল্‌লে ফিরে থেমে—
"তোমার মতই কাদায় দাদা
"দাঁড়িয়েছিলাম নেমে !"

শ্রী নরেন্দ্র দেব

রমলা

(১৪)

বিবাহের পর রজত ও রমলা পুরী হইতে কিছু দূরে নির্জ্জন সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মের বাকি মাসটা কাটাইল। নবদম্পতী প্রথমপ্রেমলীলায় জগতের সব মানুষ ও সব বস্তু যেন ভুলিয়া গেল। প্রতিজন প্রতিজনের নিকট অপরূপ মহাবিস্ময়কর পরমানন্দময় সৃষ্টি, নবজগৎ রূপে প্রকাশিত হইল। আর কোন মানুষের সঙ্গের দরকার রহিল না, এমন কি বহিঃপ্রকৃতির শোভাও থিয়েটারের দৃশ্যপটের মত তাহাদের নবজাগ্রত প্রেমের দীপ্তির নিকট ম্লান হইয়া গেল।

তরুণ ও তরুণীর প্রথম মিলনের দিনগুলি। সে কি বিস্ময়ঘন আনন্দময়, সে কি অন্ধ-আবেগময় মহারহস্যভরা, সে কি অনাস্বাদিত অমৃতের স্বাদে দেহে মনে চিরউন্মাদনা। নটরাজ যে মত্ত আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে নীহারিকা-পুঞ্জ হইতে তারার মালা, অগ্নিপিণ্ড হইতে শ্যামলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টির আনন্দ প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তে

ত্য করে। ধরণীর কিশোরী বয়সে যখন জলস্থলের বিভাগ হয় নাই, তখন অগ্নি জল হাওয়া যে অজানা বেদনার গোপন পুলকে মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, সেইরূপ অসহনীয় ব্যথাময় সুখে দম্পতীর দেহমন কাঁপিতে থাকে। সে কি স্বপ্নভরা দিন, সে কি গল্পভরা রাত!—শিশুর হাসির চেয়েও সুন্দর, প্রসববেদনার চেয়েও ব্যথাময়, বন্ধুমিলনের চেয়েও সুখময়, ভাইবোনের ভালবাসার চেয়েও মধুর, মাতৃস্নেহের চেয়েও পবিত্র।

রজত ও রমলার প্রথমমিলনের দিনগুলি! দুইজনে দুইজনের মধ্যে যেন হারাইয়া গিয়াছে, প্রেমের নীহারিকা-পথে আপনাদের খুঁজিয়া পাইতেছে না, প্রতিজন যেন কোন্ অপূর্ব্ব দেশে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, পথের বাঁকে বাঁকে নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে। দেহের প্রতি অঙ্গ মনের প্রতি গোপন কক্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কৌতুক কত ঔৎসুক্য, প্রতিক্ষণে নব নব অমৃত-ভাণ্ডারের রহস্য উদ্‌ঘাটন। কথা কওয়ায়, চুপ করায়, হাসায়, চোখের জলে, চাওয়ায়, না চাওয়ায়, ছোঁয়ায়, না ছোঁয়ায়, বসায়, চলায়, হাতের সঙ্গে হাতের বাঁধনে, কেশের সঙ্গে কেশের স্পর্শে, অধরের সঙ্গে অধরের মিলনে জগতের কোন্ অন্তর্নিহিত আনন্দময় চৈতন্যের সহিত দুইজনের চেতনা একাকার হইয়া যাইত।

এখন বাহিরের বিশ্ব যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় কিছুই আসে যায় না; যে সোনালী বালুচর সন্ধ্যায় মিলন-শয্যা পাতে, যে সিন্ধু মিলনগীত গায়, যে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ-চ্ছটা মিলনক্ষণ রঙ্গীন করে, যে জ্যোৎস্না মিলন-মুহূর্ত্ত স্নিগ্ধ করে, সব যদি শূন্যে মিলাইয়া যায়, কিছুই আসে যায় না—দুইজন দুইজনের মধ্যে অনন্ত জগৎ খুঁজিয়া পাইয়াছে। রমলার অমল তনু সমস্ত বিশ্বের চেয়েও আনন্দসৃষ্টি, অকলঙ্ক নীলাকাশের দিনগুলি তাহারই চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি, তারাভরা রাত্রি তাহারই লজ্জাজড়িত আঁখির কৃষ্ণ পল্লবের রহস্যময় ছায়া। তাহাদের দুইজনের মধ্যেই ত পুষ্প ফুটিতেছে, কুহু ডাকিতেছে, সূর্য্য উঠিতেছে, সাগর গাহিতেছে, জ্যোৎস্না ঝরিতেছে—একটু মিলন যেন অনন্ত ক্ষণ, একটু বিরহ যেন অনন্ত যুগ—তাহাদের ঘেরিয়া মাধুর্য্যপ্রস্রবণ দিকে দিকে বহিয়া যাইতেছে।

মধু মধু, বাতাসে মধু বহিতেছে, আলোকে মধু ক্ষরিতেছে, আকাশে মধু ঝরিতেছে, সাগরে মধু টলমল করিতেছে, প্রিয়ার দৃষ্টি মধু ও তাহার বাক্য মধু, এই দেহ মধু, এই আত্মা মধু।

কোন্ স্তব্ধরাত্রে সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া রজত দেখিত রমলার এলায়িত নিদ্রিত দেহ—গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দতিমিরবেষ্টিত আকাশের তলে এই নিদ্রাটুকু কি সুন্দর! কোন্ প্রভাতে রমলার আগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে রজতের সুপ্ত দেহের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই বিশ্রব্ধ বিশ্রামের ছবি প্রভাতের আলোয় কি মধুর! কোনদিন দুইজনেই এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিত, সে কি সুন্দর মধুর জাগরণ—দুইজনের চুম্বনে যেন পদ্মের মত প্রভাত ফুটিয়া উঠিত, দুইজনের মিলিত চোখের আলো দিয়া মধুর হাসি দিয়া দিনের আলোর সৃষ্টি হইত।

রৌদ্র-উদাস কর্ম্মহীন অলস দুপুরে ঘরের সব জানলা বন্ধ করিয়া শুধু সমুদ্রের দিকের দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া সেই দরজার সামনে দুইজনে পাশাপাশি চেয়ারে বসিত। সমস্ত দুপুর হেলাফেলা করিয়া কাটিত। সম্মুখে উদাস জনহীন বালুচরে আলোর প্রখর দীপ্তি আর সাগরের একসুরে করুণ সঙ্গীত—কখনও দুইজনেরই অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, মন উদাসী হইয়া উঠিত, কখনও রজত চুপচাপ বসিয়া রমলার চুলগুলি লইয়া খেলা করিত আর রমলা স্তব্ধ পুলকের বিদ্যুতে চকিত হইয়া উঠিত, কখনও রমলার অপর্য্যাপ্ত কৌতুকে তীব্র হাস্যদগ্ধ কথায় অলস মধ্যাহ্ন চকিত হইয়া উঠিত।

সন্ধ্যার সময় সাগরতীরে দুইজনে বেড়াইত, ঢেউয়ের সহিত খেলা করিতে করিতে রমলা জুতা ভিজাইয়া ফেলিত আর রজত সেই ভিজা জুতা বহিত।

জ্যোৎস্নারাত্রে উদ্বেলিত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিত, রজতের কোলে রমলা মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িত, তারাগুলির দিকে চাহিয়া সহসা অলক্ষ্যে মৃদু নিশ্বাস পড়িত—জীবন যদি চিরকাল এইরূপ সুখ-স্বপ্নের মত কাটিতে পারিত! রজতের স্নিগ্ধ চোখের উপর তাহার কালো চোখ গিয়া পড়িত—এইরূপ শান্ত স্নিগ্ধ মধুময় যদি সমস্ত দিনরাত্রি হইত! পরস্পর

বেশীক্ষণ চোখে চোখ রাখিয়া থাকিতে পারিত না, রজত সাগরের দিকে চাহিত, রমলা আকাশের দিকে; সাগরের করুণ সুরের সঙ্গে দুইজনে চুপচাপ ভাবিত।

রজত ভাবিত—কেন একে এত ভালবাসি? এই কি সত্য ভালবাসা?

রমলা ভাবিত—এই কি প্রেম, একেই লোকে বলে ভালবাসা? না, সে আরও কিছু অপূর্ব্ব বিস্ময়কর মধুময়?

দুইজনেরই সন্দেহ জাগিত, মনে হইত হয়ত এ ফাঁকি, এ প্রেম নয়, সে অমৃতের দ্বারে এখনও তাহারা আসিয়া পৌঁছায় নাই।

আবার ক্ষণিকের মধ্যে সন্দেহ দূর হইত—এই ত প্রেম। আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইয়া মুখে মুখে চাহিত। আর পৃথিবীতে এই দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমলীলা দেখিয়া সিন্ধু উচ্ছলহাস্যে কি বলিত?

রমলা রজতের কোলে মাথা দিয়া সাগরতীরে শুইয়াছিল, কুড়ানো ঝিনুকগুলি নাড়িতে নাড়িতে মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে দেখিতে অতি মিষ্টস্বরে রমলা ডাকিল—এই।

চুলগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে রজত বলিল—কি?

দুইজনে আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে রমলা আবার ডাকিল—এই—কি বল্‌ছো?

—আচ্ছা কবে যেতে হবে?

—পরশু।

—এ জায়গাটা ছাড়্‌তে মোটেই ইচ্ছে কর্‌ছে না—যেন মায়া পড়ে গেছে।

—কিন্তু ছাড়্‌তে ত হবে।

—সেখানে এম্নি সুখে থাক্‌তে পার্‌ব, এম্নি তোমায় পাব, আমার কেমন ভয় কর্‌ছে।

—ভয় কি রমু, কলকাতায় এর চেয়েও সুখে থাক্‌বে।

—এই দিনগুলোর মতই সেখানেও দিন কাট্‌বে?

—যে দিন যায় সে ত আর ফিরে আসে না, একটা দিনের মত কি আর-একটা দিন হতে পারে?

—তবে?

—তবে, জগৎ যে চলেছে, জীবন যে চলেছে, পিছনে আঁক্‌ড়ে থাক্‌তে চাইলে টেনে নিয়ে যাবে।

—আচ্ছা পৃথিবীটা যদি মুহূর্ত্তে এসে থেমে যেতো, আমাদের বয়স না বাড়্‌ত, জীবনের প্রতিদিন আজকের মত কাট্‌ত!

—তা ত হয় না রমু, এগিয়ে যেতেই হবে, কৈশোর হতে যৌবনে, যৌবন হতে—

—না, বুড়ো বয়সের কথা ভাব্‌তে আমার এত খারাপ লাগে, আমি যেন চুলপাকার আগে মরি, যখন হাস্‌তে গাইতে পার্‌ব না, দেখ্‌তে ভালো থাক্‌ব না, দুষ্টুমি কর্‌লে লোকে নিন্দে কর্‌বে—

—কিন্তু আমার কাছে তুমি চিরকাল—

—না, আমি বুড়ী হতে পার্‌ব না।

তাহার গালে মৃদু আঘাত করিয়া রজত বলিল—তুমি কোন কালে বুড়ী হবে না, ভয় নেই, যতই বুড়ী হও তোমার বুড়ো তোমায় ছাড়্‌বে না।

—যাঃও! আচ্ছা সেখানে গিয়ে—

—হাঁ, আমি বল্‌ছি।

—আচ্ছা।

রজতের চোখের দিকে রমলা চাহিয়া রহিল।

গভীর রাত্রে রমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা হইতে ধীরে ধীরে উঠিল, রজতের কোঁক্‌ড়ানো চুল নিদ্রিত মুখের দিকে স্নিগ্ধ করুণনয়নে চাহিল। দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নার মায়ায় ধূসর বালুচর স্তব্ধ, সাগরের একটানা সুর বড় করুণ। আবার ঘরে ফিরিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইল, রজতের মাথাটা বিছানা হইতে বালিশে তুলিয়া দিল। এই সমুদ্রগীত-মুখর নির্জ্জন বালুচরে প্রেমলীলাময় দিনগুলি ছাড়িয়া যাইতে তাহার গোপন বেদনা বোধ হইতেছিল। চোখে জল ভরিয়া আসিল, বারান্দায় বাহির হইয়া গেল,—বহুবৎসর পূর্ব্বে এক বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে সে কাঁদিয়াছিল, তারপর এই তার যৌবনজীবনের প্রথম ক্রন্দন। সুখমিলনরাত্রি অশ্রুসিক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া উঠিল।

(১৫)

আষাঢ়ের প্রথম মেঘের সঙ্গে সঙ্গে নবদম্পতী কলিকাতায় আসিয়া পড়িল। রজত রমলাকে তাহার মামার বাড়ীতে আনিয়া তুলিল। বর্দ্ধমানে তাহার কাকা মক্কেল চরাইয়া ও প্রতিবৎসর সংসার বৃদ্ধি করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। দেশের গ্রামে তাহার জেঠামশাই ভাঙ্গা ভিটে আঁকড়াইয়া সপরিবারে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া গ্রামে প্রতিদিন দলাদলি বাধাইয়া জীবনের শেষদিনগুলি পরম শান্তিতে কাটাইতেছিলেন—ইহাদের চিরন্তন বাঁধা-পথের সংসারযাত্রার মধ্যে রমলাকে এক মূর্ত্তিমতী ফাল্গুন-হাওয়ার মত লইয়া যাইতে রজতের সাহস হইল না। সুতরাং সে রমলাকে মামার বাড়ীতেই উঠাইল।

অবশ্য মামার বাড়ী বলিতে যাহা বুঝায়, এবাড়ী তাহা নহে—প্রৌঢ় ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় শীর্ণ অবিবাহিত এক প্রফেসার মামা আর তাঁর ছোট ভাড়াটে বাড়ী। রজতের মামা তার মার প্রায় সমবয়সী ছিলেন, দুইজনে ছেলেবেলা হইতেই খুব ভাব, আর এই সংসারে বৈরাগী ভাইটির ভার রজতের মাকে আজীবন বহিতে হইয়াছিল। তুলসী-বাবু কলিকাতায় বরাবর রজতের মা-বাবার কাছেই ছিলেন। তার পর তাঁরা যখন মারা গেলেন, মাতৃপিতৃহীন রজতকে তিনি বুকে তুলিয়া লইয়া স্বর্গগত বোনের এই মধুর স্মৃতিটিকে আজীবন পরমস্নেহে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন। নববধূ লইয়া রজত তাঁহার কাছেই উঠিল।

তুলসী-বাবু কেন বিবাহ করেন নাই, তাহা লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিত। এখন তাঁর কাঁচাপাকা চুল, ছোট দাড়ি, তেলচুকচুকে টাক আর তালপাতার মত পাৎলা দেহ দেখিয়া, এ লোকটা বিবাহ করিল না কেন সে বিষয় কেহ ভাবে না। কিন্তু প্রথম যৌবনেই যখন তিনি কলেজের ডিমন্‌ষ্ট্রেটার হইতে প্রফেসার হইলেন অথচ সংসার পাতিলেন না, তখন তাঁর সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইত। তুলসী-বাবু সম্বন্ধে যে-সব গল্প প্রচলিত ছিল, এখন সেগুলি প্রাচীন কথাসাহিত্যের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু একটি গল্প মাঝে মাঝে লোকের মনে জাগিয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজের নাম করিলেই তুলসী-বাবুর মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, আনন্দমোহন ইত্যাদি মহাপুরুষদের সহিত বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন, দেশে ধর্ম্ম ও সমাজের পুনরুত্থানের জন্য অদম্য উৎসাহে লাগিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার মধ্যে আশ্চর্য্যকর পরিবর্ত্তন ঘটিল। ব্রাহ্মসমাজের সব সংশ্রব ছিঁড়িয়া তিনি ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। লোকে বলে তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহ নাকি এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ। সে যাহাই হউক, তুলসী-বাবু এতদিন হেকেল, কোম্‌তের গ্রন্থাবলী, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, রিসার্চ-ওয়ার্ক, নূতন নূতন ছেলের দল, রজতের খেয়াল, জীবাণুতত্ত্ব আর অম্ল অজীর্ণতা লইয়া পরম আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া ছিল তাঁহার প্রাণ, আর মদের নেশার মত জীবাণুতত্ত্ব তাঁহার নেশা ছিল।

কলিকাতায় ভদ্রবাঙ্গালীপাড়ায় একটি ছোট গলিতে ছোট বাড়ী। গলিটি উত্তর হইতে দক্ষিণে গিয়া এক বড় রাস্তায় পড়িয়াছে। বাড়ীটি পূর্ব্বমুখী। উপরে তিনখানি, নীচে তিনখানি ঘর। একতলায় সাম্‌নে বসিবার ঘরখানি বেশ বড়, সমস্ত পূর্ব্বদিক জুড়িয়া, ঘরের পাশ দিয়া সিঁড়ি দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে, সিঁড়ির পাশে উত্তরমুখো দুইখানি ছোট ঘর, একটিতে রান্না হয় আর-একটিতে চাকর থাকে। ঘরগুলির সম্মুখে বারান্দা, তার পর সিমেন্ট-বাঁধানো ছোট উঠান। উত্তরদিকটা পাশের বাড়ীর দেওয়াল দিয়া একেবারে চাপা, পশ্চিমদিকটা আর-একখানি পাশের বাড়ীর অন্দরমহলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ঢুকিবার দরজা সম্মুখের বড় ঘরের উত্তরদিকে এক কোণে। দোতলায় তিনখানি ঘর, পূর্ব্বদিকের বড় ঘরখানিতে মামাবাবু থাকেন, ঘরের তিন দিক বৈজ্ঞানিক বইয়ে ঠাসা আলমারিগুলি দিয়া ভরা, আর-একদিকে তিনখানি লম্বা টেবিলে ভূতত্ত্ববিদ্যার নানা রংএর ছোট বড় পাথর, স্পিরিট বা ফর্ম্মলে রক্ষিত নানা প্রকার মৃত জন্তুর দেহ ভরা ছোট বড় শিশি, আর স্লাইড্‌ভরা কাঠের বাক্স সাজানো রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে শোবার ছোট তক্তা যেন অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরমুখো ঘর দুখানির মধ্যে, একখানিতে রজত থাকে আর-একখানিতে

তাহার আঁকার সরঞ্জাম আর মামার ফ্লাস্ক, টেষ্ট টিউবে ভরিয়া শিল্পীর শিল্পাগার আর রাসায়নিকের বীক্ষণাগার এইরূপ একটি উভচর বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতে এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ কাটিয়া কলিকাতার আকাশ কচি শিশুর হাসির মত নির্ম্মল রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে। বালিখসা হল্‌দে বাড়ীর দেওয়াল জলে ভিজিয়া রৌদ্রে ঝিকিমিকি করিতেছে। বাড়ীখানিকে বাহির হইতে দেখিলে মোটেই মনে হয় না ইহার ভিতর এক বৈজ্ঞানিক তপস্বী তাঁহার জীবনের সাধনা করিতেছেন, এইখানে এক শিল্পী তাহার প্রিয়াকে লইয়া জীবনের নীড় বাঁধিতেছে।

ভাড়াটে গাড়ীটি যখন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রমলা যদি সুতীক্ষ্ণ চোখে বাড়ীর সম্মুখভাগটা দেখিত তবে সে দুঃখিতই হইত, কিন্তু তাহার সব জিনিষই অনির্ব্বচনীয় মধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল, কে সুন্দর আজ তাহার চক্ষে মোহনমন্ত্র বুলাইয়া দিয়াছে,—ষ্টেসনের কুলি, পথের জনতা, দোকানের সারি, গাড়ীর শব্দ, এই প্রভাতের মেঘ ও রৌদ্র, রজতের মুখ, সবই কি অপূর্ব্ব সুন্দর। সমস্ত পথ রজত তাহাকে তাহার মামার গল্প, এই বাড়ীর গল্প বলিতে বলিতে আসিয়াছে, কখানি ঘর আছে, বাজার করার রান্না করার চাকরটির কি কি গুণ প্রকাশ পায়, কিরূপে এতদিন কাটিয়াছে, ইত্যাদি সব বলিতে বলিতে আসিয়াছে। বাড়ীটি রমলার কাছে রজতের কৈশোর জীবনের কত স্বপ্নময় দিনের স্মৃতিবিজড়িত হইয়া তাহার মামার কথার সহিত জড়াইয়া মহারহস্যরূপে দেখা দিল। গাড়ী দরজার সম্মুখে থামিতেই চাকর গোপাল তাড়াতাড়ি হাতের বিড়িটা ফেলিয়া সম্মুখের দোকান হইতে ছুটিয়া আসিল এবং রমলা গাড়ী হইতে নামিতেই পথের ফুটপাথেই তাহার পদধূলি লইয়া নূতন গৃহকর্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে সুরু করিয়া দিল।

রজত তাহার মামাকে কোন খবর দিয়া আসে নাই। চিঠি লিখিয়া আসিলে তিনি প্রতিঘরের ধূলা ঝাড়িয়া ঘর সাজাইয়া খাবার আনিয়া যে কাণ্ড করিয়া তুলিতেন তাহা ভাবিয়া সে কোন খবর দেয় নাই। মামাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য করিয়া দিবার লোভও কম ছিল না।

তুলসী-বাবু দোতলায় তাঁহার ঘরে মাইক্রস্‌কোপে একটা স্লাইড দিয়া অতি নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিলেন, বহুক্ষণ দেখিলেন, কিন্তু তিনি যে জীবাণুর সন্ধান করিতেছিলেন তাহা পাইলেন না, একটু হতাশভাবে কাচ হইতে চোখ তুলিয়া ঘরের চারিদিকে আর পাশের টেষ্ট টিউবের দিকে চাহিলেন, তারপর টেবিলের উপর এক বড় খাতায় লিখিলেন, ৪৯৯ বার, not found, তার পর এক-একটা স্লাইড দিয়া মাইক্রস্‌কোপে মনোযোগ দিলেন। তিনি এই পরীক্ষাটি তিন বছর ধরিয়া করিতেছেন, এখনও সিদ্ধিলাভ করেন নাই।

রজত ধীরে আসিয়া স্লাইড সরাইয়া লইল, তুলসী-বাবুর চোখ মাইক্রস্‌কোপে ছিল—তিনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিলেন, তার পর মাথা তুলিয়া রজত ও রমলাকে দেখিয়া, ইউরেকা, ইউরেকা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। রজত ও রমলা একসঙ্গে তাঁর পায়ের ধূলো লইবার জন্য নত হইতেই তিনি তাঁর শীর্ণ হাতে রজতের সিল্কের পাঞ্জাবীর গলাটা আর রমলার ক্রীমরংএর শাড়ীর আঁচল টানিয়া দুজনকে তুলিলেন। তার পর রজতের দুইগালে দুই মৃদু চড় পড়িল, আর রমলার গণ্ড ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—বা! এ যে খাসা বৌ হয়েছে রে—আমি ভেবেই মরছিলুম, যে রজতকে বাঁদর বানিয়েছে, না জানি সে কেমন ধিঙ্গি! তারপর রমলার গালে দুই আঙ্গুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন—মা-লক্ষ্মী, বেশ হয়েছে, আমি ভারি খুসি হয়েছি।

তার পর রজতের এক হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—আচ্ছা, হতভাগা গাধা; একটা খবর দিয়ে আস্‌তে নেই, আমি কোথায় বসাই, কি বা খেতে দি বল্ ত।

তাঁর পাৎলা দেহ তালপাতার মত কাঁপাইয়া তুলসী-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—তোর ঘরে যাস্ না, এখন এখানে বোস্, গোপাল ছোঁড়াটা হয়েছে যেমন বাঁদর—বাবু নেই ত ঘর ঝেড়ে কাজ নেই,—না, ও গাধা, ওঘরে গেলেই অসুখ করবে, আমার ঘরটা তবু কিছু পরিষ্কার আছে। না, মা, তুমি এইখানে বোস,—বলিয়া রমলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের বিছানার উপর

বসাইয়া দিলেন। রঞ্জত পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

রমলাকে বসাইয়া তুলসী-বাবু বারান্দায় বাহির হইয়া বাড়ী কাঁপাইয়া ডাকিতে লাগিলেন,—বাঁদর, অ বাঁদর। এ ডাক চাকর গোপালকে। গোপাল বস্তুতঃ তাঁহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল কয়েকবার ডাকিবার পর সাড়া দিতে মামা-বাবু বলিলেন,—যা, বাঁদর, শীগ্‌গীর গিয়ে সাম্‌নের দোকান থেকে—যা গরম খাবার পাবি, গরম যেন হয়, একেবারে টাট্‌কা, এখন ত জিলিপি ভাজ্‌ছে, আবার খাবার এনেই বাজার যাবি—ভাল মাছ, বুঝ্‌লি দেখে নিবি, যেন একটু গন্ধ না হয়, পচা হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—আর বাঁদর বলেছিলুম না দাদাবাবুর ঘর ঝেড়ে রাখ্‌তে? শীগ্‌গীর যা হতভাগা—চাকরের দিকে এক দশটাকার নোট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি নববধূকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমলা তাঁহার লাল নীল সব পাথরের টুক্‌রোগুলি ঘাঁটিতেছে আর শিশিতে ভরা জীবজন্তুগুলির প্রতি বিস্মিত নয়নে চাহিয়া আছে। রঞ্জতকে ঘরে দেখিতে না পাইয়া মামা-বাবু বলিয়া উঠিলেন—কোথায় গেল উল্লুকটা, বল্লুম ঘরে যাস্‌ না, ধূলোয় কিচিমিচি, একটা অসুখ না বাধিয়ে ছাড়্‌বে না। ধূলো, সে কি সামান্য জিনিষ মা, সব বীজাণুভরা, কত রোগের বীজাণু—ওই যদি দেহ একবার দখল করতে পারল, তার পর ডাক্তারই ডাকো আর যতই কাঁদ, ঈশ্বর ঈশ্বর বলে' চেঁচাও, ও রাজাও মানে না, উজীরও মানে না, বুদ্ধও মানে না, নেপোলিয়নও মানে না, একবার কল একটু ভেঙ্গে দিল ত, ব্যস—একবারে বন্ধ!—কোথায় গেল সে?—বলিয়া তিনি ঘরে অতি ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। রমলাকে কিরূপে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবেন তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

রমলা মৃদুহাস্যে বলিল—আপনি যদি এত ব্যস্ত হন—

রমলার পিঠে এক থাপ্পড় দিয়া মামা-বাবু বলিলেন—আপনি? বল, তুই।

এই সরল শিশুর মত মানুষটিকে রমলা দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া মামাবাবুর টুইল-সার্টের পিঠের উপর ছেঁড়া অংশটার দিকে একবার চাহিয়া বলিল—আচ্ছা এই পাথরগুলো দিয়ে কি হয়?

শিশুর মত হাসিয়া মামাবাবু বলিলেন—বুড়ো ছেলে মা, এ হচ্ছে আমার খেলাঘর দেখ্‌ছিস না, খেলা করি—কিন্তু বাঁদরটা কোথায় গেল?

আবার রমলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন—ও বাঁদরটার গলায় মুক্তোর হার হলে, মা-লক্ষ্মী।

তাঁহার বিছানার পাশে মাথার কাছে একটি ফটোর দিকে রমলা ভক্তিদীপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে দেখিয়া মামা-বাবু থামিয়া গেলেন, ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন—হাঁ, ওই হচ্ছে রঞ্জতের মা, ও বোনটা যদি আজ থাক্‌ত, তবে কি আজ—তাহার কথা আবার থামিয়া গেল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কত সুখদিনের স্মৃতি-বিজড়িত করুণস্নিগ্ধ নয়নে ফটোটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমলা ধীরে ব্রোমাইড-এন্‌লার্জ্জ্‌মেণ্ট্‌ ফটোটির দিকে অগ্রসর হইল। ফটোটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে স্নেহোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি, চোখ দুইটির উপর প্রশস্ত ললাট প্রসন্নতা শান্তিতে ভরা, মুখখানি হইতে কি কল্যাণময় আনন্দ-দীপ্তি বাহির হইতেছে,—সুখদুঃখময় সংসারের শান্তি-মঙ্গলময়ী ভগবতী মহাশক্তির এ স্নেহসৌন্দর্য্যময় প্রতিরূপ। সিঁথির সিঁদুর তেজোময় কল্যাণটীকার মত জ্বলজ্বল করিতেছে, হাতের সোনা দিয়া বাঁধানো শাঁখা তাঁহার নিষ্ঠা ও সেবার চিহ্ন।

রমলার মাথা আপনিই নত হইয়া আসিল, ধীরে সে করজোড়ে কাঠের ফ্রেমে কপাল ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। যখন সে মাথা তুলিল, দেখিল, রঞ্জত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ছবির চোখ ও ঠোঁট যেন নড়িয়া উঠিল। সেই স্নিগ্ধ চিরস্নেহময় মুখ হইতে স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল।

আবার দুইজনে যুক্তকরে ছবির কাছে মাথা ঠেকাইয়া বার বার স্বর্গগত জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মামা-বাবুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তিনি এই চিরপ্রিয় মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বজননীর আশীর্ব্বাদের মত প্রভাতের আলো ঘরখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাহার মীমাংসায় বহুলোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৩৩)

(১) রাঢ় বা কলিকাতা অঞ্চলের যে কথ্য ভাষা এখন ক্রমশ লেখ্য ভাষা হয়ে উঠ্‌ছে, তার ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপে শেষদিকে কোথাও ল এবং কোথাও লে থাকে—সে বল্‌লে, সে বল্‌ল; সে হাস্‌লে, সে হাসল; ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন এই—কোথায় লে হবে, আর কোথায় ল হবে?

সাবধানী লেখকদের রচনারীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়—

(ক) সকর্ম্মক ধাতুর অতীত কালে লে, এবং অকর্ম্মক ধাতুর অতীত কালে ল হয়; কেন?

(খ) সকর্ম্মক ধাতু মাত্রই অব্যভিচারীরূপে যে অতীতকালে লে দিয়ে শেষ হয় তাও নয়। এই ব্যতিক্রমের কারণ কি কি?

(গ) অকর্ম্মক ধাতুরও অতীতকালের রূপে অন্তে লে দেখা যায়—হাসিলে, দাঁড়ালে, কাঁদলে, ফিরলে, ইত্যাদি,—কেন?

(২) এই লে হওয়ার কারণ কি? সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতকালের রূপে প্রথম অক্ষর (syllable) ঝোঁক দিয়ে (stress, accent) উচ্চারণ করার ফলে কি ল রূপান্তরিত হয়ে লে হয়ে যায়?

যদি তাই হয় তবে—এল, উঠ্‌ল, গেল, শুল প্রভৃতির পদান্ত ল কেন লে হয়ে যায় না?

(৩) অতীতকালের ক্রিয়ারূপে পদান্ত ল যে লে হয়, তা কি অসমাপিকা ক্রিয়ার লে রূপের দেখাদেখি সাদৃশ্য বজায় রাখ্‌বার চেষ্টায়?

অসমাপিকা ক্রিয়ার সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক সকল ধাতুর শেষেই লে হয়—করলে, পেলে, হাস্‌লে, বল্‌লে, শুলে, মলে, ইত্যাদি; কিন্তু অতীত কালের ক্রিয়ার বেলা বেশীর ভাগ সকর্ম্মক ধাতুর শেষে লে হওয়ার কারণ কি?

বৈয়াকরণিক পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের মীমাংসা জানালে উপকৃত হব।

ল, ব, রামস্বামী,
চীফ কোর্টের উকিল,
ত্রিচূড়, কোচিন ষ্টেট, দক্ষিণভারত।

(৩৪)

খেঁকশেয়ালীর বিয়ে

Tales of Old Japan (by Lord Redesdale, G. C. V. O., K. C. B.) নামক পুস্তক পড়িতে পড়িতে The Foxes' Wedding শীর্ষক গল্পে নিম্নলিখিত বাক্যটি পাইলাম—

"When the ceremonies had been concluded, an auspicious day was chosen for the bride to go to her husband's house, and she was carried off in a solemn procession *during a shower of rain, the sun shining all the while.*" (আমি শেষের কথাগুলি ইটালিক করিয়াছি) অর্থাৎ—বিবাহসম্বন্ধীয় আচার শেষ হইয়া গেলে একটি ভাল দিন দেখিয়া কনেকে স্বামীর ঘর করিতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইল; এবং খুব সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল—তখন বৃষ্টি হইতেছিল, রৌদ্রও ছিল।

বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশেও এইরূপ কিম্বদন্তীর চলন আছে। একসঙ্গে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইলে প্রায়ই দেখি যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মহা উৎসাহে তারস্বরে বলিতে থাকে—

"রোদ হচ্ছে জল হচ্ছে।
খেঁকশেয়ালীর বিয়ে হচ্ছে॥
(হুগলী, বর্দ্ধমান, হাওড়া জেলা)

"রোদে রোদে জল হয়।
শিয়াল-শিয়ালীর বিয়ে হয়॥
(বীরভূম জেলা)

অথবা—

"রোদ হচ্ছে জল হচ্ছে।
শিয়াল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে॥

অথবা—

"শিয়ালে বিয়া করে ছাতি মুরায় দিয়া।
আইরোরা পান খায়.........দিয়া॥"
(টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ)

এখানে (মুঙ্গেরে) আমার পরিচিত কয়েকজন হিন্দু ও মুসল-মানকে (এবং অন্যান্য জায়গায়, যথা—পাটনা, ও পাটনা হইতে ট্রেনে আসিতে ট্রেনে) জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে এদেশের ছেলে-মেয়েরাও ঐরূপ বলে—

(১) "গিধর গিধরণী বিয়া হোয়"
(২) "গিধরা গিধরীসে বিয়া হোয়।"
(৩) রৌদা উভে বাভানা।
মুরগী দেব চাক্‌না॥
বিলাই দেব ঝোল।
এক পাইনা লোংটা
গোসাই নাই নেংটা।
বাজনা কহে উখেল উখেল।
গিধ্‌ড়া গিধ্‌ড়ি বিয়া ভেল॥

[আমার মনে হয় যে শেষ শ্লোকটির সহিত আমাদের—
আয় রোদ্দুর হেনে
ছাগল দেব মেনে" ইত্যাদির মিল আছে।]

জানি না ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে এইরূপ প্রবাদ কিংবা ছড়ার চলন আছে কি না। যাহা হউক বাঙ্গলা, বিহার ও জাপানে একই প্রকার প্রবাদের চলন যখন আছে তখন তাহা যে একেবারে আকস্মিক তাহা মনে হয় না। এরূপ সাদৃশ্যের কারণই বা কি? যুগপৎ রৌদ্রবৃষ্টি-সন্নিপাতের সহিত শিয়ালশিয়ালীর আজগুবি বিবাহেরই বা সম্পর্ক আসিল কোথা হইতে? আশা করি এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া ছেলেমানুষী করিতেছি না।

Lord Redesdale পাদটীকায় লিখিতেছেন—"A shower during sunshine, which we call the 'devil beating his wife' is called in Japan the fox's bride going to her husband's house."

একই ব্যাপার সম্পর্কে বিলাতে ও জাপানে (তথা ভারতে) দুই কম প্রবাদও বড় আশ্চর্য্যের। কোথায় শিয়াল-শিয়ালীর বিবাহ আর কোথায় বা সয়তানের তার স্ত্রীকে ধরিয়া প্রহার? তবে মনে হয় the devil beating his wife"এর একটা মীমাংসা এইরূপে হইতে পারে।—

Devil = German—Donner = Old Norse—Donar
= Thunder

অতএব Thunder strikes = *Devil Strikes* ; কিন্তু কাহাকে? Devilএর বিপরীত কাজ! স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেই বা হইবে?

যাহা হউক, ইহার ঠিক মীমাংসা কি জানিতে উৎসুক।

শ্রী কালীপদ মিত্র।
ডি. জে. কলেজের, প্রিন্সিপ্যাল, মুঙ্গের।

(৩৫)

মৌচাক হইতে যে মোম পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ কাল হয়। উহা বিশুদ্ধ এবং সাদা করিবার সহজ উপায় কি—এবং ঐ কার্য্য ভারতবর্ষের কোথায় হইয়া থাকে?

নীলাম্বর বিষয়ী ও কেশবলাল বিষয়ী

(৩৬)

'দাদা', 'দিদি' শব্দগুলি বাঙ্গালা শব্দ না অন্য কিছু? "মাসী" "পিসী"ই বা কেমন করিয়া অত ছোট হইল?

শ্রী দামিনীকান্ত চৌধুরী

(৩৭)

কোন ধাতুর দ্রব্যে কোন কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিলে ঝনাৎ করিয়া শব্দ হয়; পরে হাত বা পা দিয়া স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ শব্দটি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ কি?

শ্রী শিবপ্রসাদ কুতি

(৩৮)

হিন্দুদিগের বিবাহ রাত্রেই হইয়া থাকে। দিনে না হওয়ার কি কোনও নিষেধ-বিধি আছে? আর যদি এখন কোনও দেশে হিন্দুদের বিবাহ দিনে হইবার প্রথা থাকে, তাহা হইলে সেই দেশ বা দেশগুলির নাম কি? পূর্ব্বে কোনও সময়ে দিনে বিবাহ রীতি ছিল কি না? যদি থাকে তাহা হইলে কোন্ সময় হইতে এবং কেন উহা বন্ধ হইয়া যায়? রাত্রে বিবাহ প্রথা কোন্ সময় হইতে এবং কাহার দ্বারা প্রথম প্রচলিত হয়?

শ্রী সুধাংশুকুমার ঘোষ

(৩৯)

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে গুজরাটে জনবসতির বিবরণে ব্রাহ্মণদের মধ্যে পদবী পাই—

বিল, বাগাঙ্কি, কুলিলাল, পারীপাতি, মালখণ্ডী, বলাল, কুলিয়াল, কুলখাল, পিশাচখণ্ড, কর্ণাট, শীতলশাঞ্চী, মতিলাল।

এবং ভাঁড়ুদত্ত আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিয়াছিল—আমি আমলহাঁড়ার দত্ত।

এইসব পদবীর কুলপরিচয় কি?

হিন্দুদের যে জাতি-বিভাগ আছে তাতে ছত্রিশ জাতির উল্লেখ অনেক স্থানে দেখা যায়। সেই ৩৬ জাতি কি কি?

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪০)

বাণভট্ট "হর্ষচরিত" গ্রন্থারম্ভের প্রথম শ্লোকগুলিতে কয়েকজন বড় বড় গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েক জনের নাম দিলাম :—

'মহাভারত'-রচয়িতা "ব্যাস"; 'বাসবদত্তা'-প্রণেতা "সুবন্ধু"; 'গাথা-সপ্তশতী'-রচয়িতা "সাতবাহন"। "সাতবাহনের" নামোল্লেখ করিবার পূর্ব্বে বাণভট্ট "ভট্টার হরিচন্দ্র" কবির গদ্য রচনা প্রশংসা করিয়াছেন। 'ভট্টার' শব্দ পূজার্থে প্রযুক্ত। এই "হরিচন্দ্র" কে ছিলেন? কবি হরিচন্দ্র 'ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়-কাব্যম্' গ্রন্থে "ধর্ম্মনাথ" নামক কোন রাজার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যকর্ত্তা "হরিচন্দ্র" ও গদ্য-রচয়িতা "হরিচন্দ্র" কি একই ব্যক্তি?

নগেন্দ্র ভট্টশালী

(৪১)

আজকাল কেহ কেহ automatic বা স্বয়ংক্রিয় চরকা অর্থাৎ যাহাতে সুতা পাকান এবং জড়ান এক সময়েই আপনা আপনি হয় এইরূপ চরকা প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু বিলাতে যখন Arkwright, Hargreaves প্রভৃতি প্রথমে সুতা-কাটা কলের উদ্ভাবন করেন, তাঁহারা বোধ হয় কল automatic করা অপেক্ষা একসঙ্গে অনেক খে সুতা যাহাতে হয় সেই বিষয়ে অধিকতর চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে এইরূপ পাঁচ সাত খে সুতা একজন লোক একত্রে কাটিতে পারে এমন চরকা কেহ করিয়াছেন কি? [Arkwright প্রভৃতির কলের বিবরণ Ency. Britt., 9th Edn.এ পাওয়া যায়]।

শ্রী সতীশ

(৪২)

শৈব, শাক্ত কি বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই মালা জপের ব্যবস্থা আছে। জপের জন্য যে মালা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ১০৮টি দানা ও একটি সাক্ষী থাকে। দানা ১০৮টি হইবার কারণ কি এবং কখন হইতে উহার প্রথম উদ্ভব হইয়াছে ? সাক্ষী উল্লঙ্ঘন করিয়া মালা জপা নিষেধ ; ইহার কি কোন যুক্তি আছে ?

শ্রী আশুতোষ সরকার

(৪৩)

হরিনামের মালার ঝুলিতে একটি ছিদ্র করিয়া তর্জ্জনী আঙ্গুলটি সেই ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া রাখিবার কারণ কি ? ইহার সহিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানাইলে সুখী হইব।

শ্রীমতী কল্পনাময়ী রায়

(৪৪)

মূল্যবান কাগজে কিংবা নোটে সরিষার কিংবা অন্য কোনও তৈলের দাগ লাগিলে, তাহা উঠাইবার উপায় কি ?

শ্রী মূলচাঁদ মারয়ারি

(৪৫)

প্রদীপ নিবিবার পুর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া নিবে কেন ?

শ্রী

(৪৬)

প্রাচীনকালে রাজারাণী ঋষিদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। পাচক দ্বারা পক্ব অন্ন রাজারাণী আনিয়া ঋষিদিগকে ভক্ষণ করিতে দিতেন। এই পাচকগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন ? প্রমাণ সহ কেহ দেখাইলে বাধিত হইব।

শ্রী বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ববিশারদ

(৪৭)

কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী নামক পুস্তকে অনেক স্থানে এইরূপ লেখা আছে, যে—অমুক রাজা এতগুলি অগ্রহার নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। "অগ্রহার" শব্দের অর্থ কি ?

শ্রী শুকলাল চক্রবর্ত্তী

মীমাংসা

(২৪)

শুধু সরিষার তৈল নয়, যে-কোন তৈল জলে ভাসিলেই নানারূপ রং দেখা যাইতে পারে, উহার স্তরটি খুব পাত্‌লা হওয়া দরকার মাত্র। ইংরেজিতে ইহাকে interference colour বলে।

প্রচলিত মত অনুসারে ঈথরের স্পন্দনের জন্য আলোর উৎপত্তি হয়। নির্দ্দিষ্ট রংএর আলোর জন্য এই স্পন্দনের বেগ নির্দ্দিষ্ট। এই স্পন্দনের জন্য ঈথরে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (wave length), আন্দোলনের পরিমাণ (amplitude), বিভিন্ন রংএর আলোর জন্য ভিন্ন। সাদা আলোতে সাত রকম রংএর আলো আছে। অর্থাৎ উহাতে সমস্ত বেগের স্পন্দন, সমস্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ, সমস্ত রকমের আন্দোলন-পরিমাণ একসঙ্গে আছে।

ঈথরের তরঙ্গের প্রকৃতি আমাদের পরিচিত জলের ঢেউএরই মত। জলে একটা ঢিল ফেলিলে উহার চারিপাশে ঢেউএর উৎপত্তি হয়। সেই ঢিলটার পাশে আর-একটা ঢিল ফেলিলে উহার চারিপাশেও সেই রকম ঢেউএর সৃষ্টি হয়। উভয় ঢেউএর "গতিমুখ" (direction) যদি এক হয় তাহা হইলে উভয়ের "আন্দোলন-পরিমাণ" মিলিয়া বড় ঢেউএর সৃষ্টি হইতে পারে। ভিন্ন হইলে "আন্দোলন-পরিমাণের" হ্রাস এবং অবস্থা-বিশেষে সম্পূর্ণ লোপও হইতে পারে। ইহা হইল মোটামুটি কথা। এই "আন্দোলন-পরিমাণের" হ্রাসবৃদ্ধি ঢেউগুলির "অবস্থা"র (phase) উপর নির্ভর করে। এই হইলে interference of waves ঘটে।

তৈলের উপর সাদা আলো পড়িলে এক অংশ "উপরিতল" (upper surface) হইতে প্রতিফলিত হয় ; আর এক অংশ তৈলের স্তরে প্রবেশ করে। ইহার এক ভাগ তৈলের নিম্নতল (lower surface) হইতে প্রতিফলিত হয়। প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত আলোর ঢেউগুলি "পরস্পর বিরোধ" (interfere) করে। উহাতে ঐ ঢেউগুলির "স্পন্দনের বেগ" "তরঙ্গের দৈর্ঘ্য" ও "আন্দোলনের পরিমাণের" নানা রকম পরিবর্ত্তন হয়। ইহাতেই নানা রকম রং দেখা যায়।

বিজয় বসু

জলের উপর যখন কোন তৈল বা অমিশ্রণযোগ্য তরল পদার্থ দেওয়া যায়, তখন তাহার দুইরূপ অবস্থা হইতে পারে। পদার্থটি যদি জল অপেক্ষা ভারি হয় তবে জলের তলায় ডুবিয়া যায়, অথবা যদি হাল্কা হয় তবে জলের উপর ভাসিয়া থাকে। তৈল প্রভৃতি পদার্থ জলে পড়িলে যে কেবল ভাসিয়া থাকে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয় (droplets)। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈলবিন্দুর উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে তাহার যৌগিকবর্ণ মৌলিক বর্ণে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সেইজন্যই পীত রশ্মি সপ্তরশ্মিতে (spectrum colours) বিভক্ত হইয়া নানাবর্ণ সৃজন করিয়া থাকে। আকাশস্থিত মেঘমালার উপরে সূর্য্যালোক পতিত হইয়া এইরূপভাবেই রামধনুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। মেঘ ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় বাষ্পবিন্দু মাত্র।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(২৫)

প্রতি জীবজন্তুর দাঁতের চারিপাশে মাড়ির বেষ্টন আছে। চুয়ালের মধ্যে গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তে দাঁতের শিকড় থাকে এবং ঠিক চুয়ালের হাড়ের উপর হইতে দাঁতের প্রায় পৌণে একভাগ মাড়ির দ্বারা বেষ্টিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির কারণেই হউক বা কোন পীড়ার কারণেই হউক উক্ত মাড়ি যদি দুর্ব্বল বা শিথিল হইয়া পড়ে তাহা হইলে উহার টিপিয়া রাখিবার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। তদুপরি চর্ব্বণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য দাঁতের শিকড় ও চুয়াল হইতে দাঁত ক্রমে ক্রমে চ্যুত হইয়া পড়ে ও অবশেষে পড়িয়া যায়।

চুয়ালের হাড়ের মধ্যে যখন প্রথম দাঁত জন্মায় তখন তাহার দুইটি ভাগ থাকে। একটির বৃদ্ধি প্রায়ই শিশুর ৪ মাস বয়ঃক্রম হইতে ১ বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং ইহাকেই "দুধে দাঁত" বলে। দুধে দাঁতের পাশেই আর-এক ভাগ থাকে, তাহার বৃদ্ধি জন্মের প্রায় ৬।৭ বৎসর পর হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহার বৃদ্ধি পূর্ব্বজাত দুধে দাঁতের ভিতরে হইতে থাকে ও সেই সময়ে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়, কারণ দুধে দাঁতের বাহিরের হাড় বা এনামেলটি বয়োদাঁতের হাড় অপেক্ষা দুর্ব্বল ও অধিকতর অপবিপুষ্ট। এই কারণেই মানুষের দাঁত দুইবার করিয়া জন্মায়। অস্থায়ী বা দুধে দাঁত এবং বয়োদাঁত বা স্থায়ী দাঁত—ইহাদের শিকড় একই। দুধে দাঁত ছাড়াও বয়োদাঁত জন্মে। শিশুদিগের দাঁতের সংখ্যা কুড়িটি, কিন্তু বৃদ্ধের বত্রিশটি। কখন কখন আবার বৃদ্ধের আটাশটিও হয়—যখন জ্ঞান-দন্ত বা আক্কেল দাঁত না উঠে। ইহা সকলেরই থাকে না।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(২৬)

নারকল তেল সরষের তেল প্রভৃতি সমস্ত (রাসায়নিক) বস্তুই, র উপরে চাপ (pressure) ও তাপ (temperature) যেরূপ া হবে সেই অনুসারে, অবস্থা-বিশেষে, বাষ্পীয়, জলীয় ও কঠিন aseous, liquid, and solid' এ তিন অবস্থাতেই থাকতে ।।

বায়বীয় চাপ (atmospheric pressure) নারকল তেল, সরষের সমস্ত বস্তুর উপরেই সমান ভাবে পড়ছে ; এই চাপে জলীয় নারকল কে বাষ্পীয় হতে এত বেশী (একটা নির্দ্দিষ্ট) তাপ দরকার, তেমনি ন হতে এত কম (একটা নির্দ্দিষ্ট) তাপ দরকার। একই চাপের হাতে সরষের তেলের বাষ্পীয় বা কঠিন অবস্থা পেতে যে বেশী তাপ দরকার তা নারকল তেল বা অন্য সব বস্তুর থেকে তফাৎ।

প্রত্যেক বস্তুর একটা বিশিষ্ট গুণ (property)।

নারকল তেলের কঠিন হতে হলে যতটা কম তাপ দরকার াদের দেশের শীতকালে ততটা কম-তাপ বা শীতলতা হয়। ় সেই একই বায়বীয় চাপের অবস্থাতে, সরষের তেলের কঠিন আরও ঢের কম তাপ বা আরও অধিক শীতলতা দরকার, া শীতলতা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। হয় ত অন্য ানো অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে পাওয়া যেতে পারে। সেখানে সরষের ল অবশ্যই জমবে।

সরষের তেলকে আমরাও জমাতে পারি। তার উপরের চাপ না লে তাকে আমরা ঠাণ্ডা করে' যেতে পারি ; তার কঠিন হবার দ্দিষ্ট শীতলতায় যেই আসবে সেই সে জমবে। অথবা তাপ না লে, তার উপরের চাপ যদি ক্রমশ বাড়িয়ে যাই, তখন একটা দিষ্ট অধিক-চাপে সরষের তেল জমবে। এরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন লে নারকল ও সরষের তেল প্রভৃতিকে গ্রীষ্মকালেও জমানো যেতে ারে।

অবশ্য কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন একই অবস্থাতে নারকল তেল বার ক্ষমতা কোথা থেকে পেলে যা সরষের তেল পেলে না, তার ানো সম্ভবত আজও বিজ্ঞান দিতে পারে নি।

শ্রী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

যেমন অনেক জিনিস সহজে গলিয়া যায়, অনেক জিনিস সহজে লে না (যথা সীসা ও সোনা) সেইরূপ আবার অনেক পদার্থ হজেই জমিয়া যায়—আবার কতকগুলি সহজে জমে না; যথা— ারিকেল তৈল ও সরিষার তৈল। জল সহজে জমিয়া যায়, কিন্তু দুধ হজে জমে না।

পদার্থবিশেষের তারল্য এবং কাঠিন্য তাহাদিগের আণবিক াকর্ষণ-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে-সকল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে াকর্ষণ-শক্তি খুব বেশী তাহা কঠিন পদার্থ এবং যাঁহাদিগের খুব কম তাহারা বাষ্পীয়, আর যাহাদিগের মধ্যে খুব বেশীও নয় এবং খুব কমও নয় তাহারা তরল পদার্থ।

এই আকর্ষণ-শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি উত্তাপ-প্রয়োগে বা উত্তাপ-বিয়োগে হইয়া থাকে। কোন জিনিষ গলাইতে হইলে উহাতে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় এবং এই উত্তাপ সেই জিনিষের অণুগুলির মধ্যে যে আকর্ষণ-শক্তি আছে তাহা কমাইয়া দেয় এবং সেইজন্যই তরল হইয়া পড়ে। সেইরূপ উত্তাপ-বিয়োগে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হয়। সেইজন্যই ঠাণ্ডা করিলে জিনিস জমিয়া যায় বা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক পদার্থের এই অণুগুলির পরস্পর আকর্ষণ-শক্তি একরূপ নহে—কাহারও বা অধিক, কাহারও কম। যাহার অধিক তাহাকে জমাইতে বেশী দেরি হয় না, কিন্তু যাহাদিগের ঐ শক্তি কম তাহারা সহজে এবং অল্প ঠাণ্ডাতে জমে না; সেইজন্য সরিষার তৈল সহজে বা সাধারণ শীতকালের ঠাণ্ডায় জমে না, কিন্তু নারিকেল তৈল শীতকালের ঠাণ্ডায় জমিয়া যায়।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(২৭)

বরিশালের চাউলের মধ্যে কোন একটা স্বতন্ত্র রকম ধান্যের চাউলকে "বালাম" বলে না। পূর্ব্বে যখন রেল-ষ্টীমারের এত প্রচলন হয় নাই সেই সময় চট্টগ্রামের এক প্রকার নৌকাতে বরিশাল হইতে কলিকাতায় চাউল চালান হইত। ঐ নৌকাগুলিতে পেরেকের সম্বন্ধ ছিল না। নৌকার তক্তাগুলি বেতের বাঁধন দ্বারা জোড়া হইত। এই নৌকাগুলিকে "বালাম" নৌকা বলিত বলিয়া কলিকাতা অঞ্চলে বরিশাল হইতে আমদানী চাউলের নাম "বালাম" বলিয়া পরিচিত।

আসাম প্রদেশের তেজপুর, ডিব্রুগড়, উত্তরলক্ষীপুর, প্রভৃতি স্থানে বরিশালের চাউলকে "নলছিটি" চাউল বলে। কারণ, আসামের এই-সকল স্থানে যে ষ্টীমারে এই চাউল আমদানী হয় তাহা নলছিটি ষ্টীমার ষ্টেসন হইতে ষ্টীমারে চালান দেওয়া হয়।

শ্রী হেমন্তকুমার সেন
শ্রী বিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

(২৯)

আলোক ও আলোকিত বস্তু হইতে নির্গত রশ্মিসকলের গতি সরল এবং পরস্পর ক্রমশঃ দূরাপসরণশীল। একই পদার্থের মধ্যে রশ্মির গতি পরিবর্ত্তিত হয় না। এক পদার্থের (যথা বায়ু) মধ্য দিয়া সরলভাবে গমন করিবার পর অন্য পদার্থের (যথা জল) মধ্য দিয়া যাইবার কালীন রশ্মি নিজ গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য সরল পথে ধাবিত হয়। কম ঘন হইতে ঘনতর পদার্থে যাইবার কালীন রশ্মিসকলের পরস্পর ক্রমশঃ দূরাপসরণশীলতার হার কমিয়া যায় ; ঘনতর হইতে কম ঘন পদার্থে যাইবার কালীন উক্ত হার বাড়িয়া যায়। একই পদার্থের মধ্য দিয়া যাইবার পর রশ্মি চক্ষুর উপর পতিত হইলে, চক্ষু রশ্মিসকলের সন্ধিস্থলে বস্তুকে দেখিতে পায় ; অর্থাৎ যেখানে বস্তু আছে ঠিক সেইখানেই তাহাকে দেখিতে পায়। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পথ দিয়া যাইবার পর রশ্মি চক্ষুর উপর পতিত হইলে, চক্ষুর নিকট প্রতীয়মান হইবে যে তাহার নিকটবর্ত্তী রশ্মিগুলির সন্ধিস্থলে বস্তুটি অবস্থিত আছে ; এবং সেইজন্য চক্ষু বস্তুটিকে নিজস্থানে না দেখিয়া অন্য স্থানে দেখিবে। বিষয়টি উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট হইবে :—

পাত্রে জল আছে, এবং চক্ষু বায়ুমণ্ডলে আছে। পাত্রের তলদেশ দেখিতে হইলে বায়ু ও জলের মধ্য দিয়া দেখিতে হইবে। পাত্রের তলদেশের একটি বিন্দু হইতে ২টি রশ্মি লও। রশ্মি ২টি নিশ্চয় পরস্পর ক্রমশঃ দূরাপসরণশীল। মনে কর তাহাদের মধ্যের কোণ ১৪ ডিগ্রি। জল বায়ু হইতে ঘনতর। জল হইতে বায়ুতে আসিয়া রশ্মি ২টির পরস্পর ক্রমশঃ দূরাপসরণশীলতার হার বাড়িয়া যাওয়াতে তাহাদের মধ্যের কোণও বাড়িয়া গিয়া মনে কর ১৮ ডিগ্রি হইল এবং পরে রশ্মি ২টি চক্ষুর উপর পড়িল। চক্ষুর নিকটবর্ত্তী রশ্মি ২টির সন্ধিস্থল স্পষ্টতঃ পাত্রের তলদেশের কিছু উপরে অবস্থিত। সুতরাং পাত্রের তলদেশের যে বিন্দুটি হইতে রশ্মি দুটি লওয়া হইয়াছিল সেই বিন্দুটিকে চক্ষু কিছু উপরে দেখিল। এইরূপে সমগ্র তলদেশটি একটু উপরে দেখা যায়। (পাত্রের তলদেশ জলের গভীরতার প্রায় এক-চতুর্থাংশ উপরে দেখা যাইবে।)

শ্রী আশুতোষ স্থানপতি

[শ্রী ললিতমোহন দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নয়নরঞ্জন মিত্র—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।]

(৩০)

Sinn Feinএর অর্থ Our own ইহা আয়ারলণ্ডের নিজ ভাষা Erseএর কথা।

Bolshevik, Bolshevism—ইহা রুশীয় ভাষার কথা। Bolshevik অর্থে যাহারা খুব বেশী চায়, অল্পে রাজি নয়। Bolshevism অর্থে উপরোক্ত তন্ত্র বা মত। ইহার বিপরীত Menshevik, Menshevism—যাহারা কম পাইলেও সন্তুষ্ট এবং উক্ত পন্থা বা মত। যখন রুশীয় বিপ্লববাদীরা প্রবল হইয়া উঠে, তখন প্রথম প্রথম ঐ দুইটি কথার ল্যাটিন হইতে ব্যুৎপন্ন প্রতিশব্দ, Maximalist Minimalist, ব্যবহার হইত। পরে বিশুদ্ধ রুশীয় কথা দুইটির প্রচলন হয়। উহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Extremist ও Moderate বলা যাইতে পারে।

শ্রী বিমলাচরণ দেব

Sinn Fein, গেইলিক (Gaelic, আয়ার্লণ্ডের নিজস্ব ভাষা) ভাষার কথা। মূল অর্থ Ourselves=আমরা; যে পন্থার লোক নিজেদের উপর নির্ভর করতে চায়, পরের অযাচিত মাষ্টারি চায় না।

Bolshevism, রুশ ভাষার কথা, অর্থ "For all"-ism, যে বিধান সবার জন্তে অর্থাৎ যে বিধান অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক ধন-সম্পদে, শাসন ব্যাপারে, ভোগের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে সকলের সমান অধিকার।

প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত

ধরণীর মর্ম্মে মর্ম্মে রসের যে গোপন সঞ্চয়
সঞ্চারে পল্লবে পত্রে, নাহি অন্ত নাহি তার ক্ষয়!
কুসুমে কুসুমে তাই কেঁদে মরে সুরভির শ্বাস,
অন্তরের রসরূপ গন্ধে তাই করিছে প্রকাশ।
হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মরে
বাসনা কামনা কত—তাই বেদনায় আঁখি ঝরে,
মহানন্দে হৃদয়ের মরা গাঙে দুই কূল ছাপি'
নানা বাণী নানা বর্ণে তরঙ্গিয়া উঠিতেছে কাঁপি।
কত কাব্যে, কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মূরতি,
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধ্বনিছে আরতি।
কথা কত হল বলা সৃজনের সেই আদি হতে
তবু যেন মনে হয় বলা নাহি হল কোন মতে।
ক্ষণে ক্ষণে তাই সুরে অর্থহীন বেদনায় ভরি'
সেই কথা বলি—যাহা বলা নাহি হ'ল যুগ ধরি'।

শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার খোকার হাসি

আমার খোকার হাসি,—
ডালিম-ভাঙা-রাঙা ফুলের
প্রথম বিকাশ-বাঁশী।
ফাগুন-হাওয়ার পরশ পেয়ে
পাপ্‌ড়ি মেলে পলাশ যে এ,
কৃষ্ণচূড়ার আঁচল যেন
আনন্দে উদাসী!

আমার খোকার হাসি,—
আবীর-বাগের গুলাব যেন
স্বপন দেখায় আসি!
প্রভাত-রবির কিরণ লেগে
রক্ত-কমল উঠ্‌চে জেগে,
সংসারেরি কাঁটায় কে নয়
'কোমল'-অভিলাষী?

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বৈষ্ণব যুগে নারীর শক্তি

বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থখানির মধ্যে যে সত্য ও কল্পনা উভয়ই মিশ্রিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ বইখানির ভিতর বৈষ্ণবযুগের সামাজিক ইতিহাসও একটু অবগত হওয়া যায়। তাহা ছাড়া আর-একটি কারণে উক্ত গ্রন্থখানি সকলের আলোচনার যোগ্য। তন্মধ্যে কয়েকটি মনস্বিনী ও ধর্ম্মশীলা নারীর সাধনের, শাস্ত্রজ্ঞানের ও ভক্তির কাহিনী বর্ণিত আছে। উহা পড়িয়া যথার্থই হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়।

আমরা এ দেশের প্রসিদ্ধ কয়েকখানি পুরাণে বিস্তর পতিব্রতা নারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। তাঁহারা স্বামীকেই জীবনসর্ব্বস্ব দেবতা মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগের ইতিহাস একটুকু পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু রমণী পুরুষের মতই স্থান লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য সুখ স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়াছেন, ভিক্ষুণী হইয়া কঠোর সাধন করিয়াছেন; তাহার পরে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কেহ কেহ দূর বিদেশে সাগর-পারেও চলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের পরে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে—অর্থাৎ মীরাবাইর সময় হইতে বৈষ্ণব লেখকদিগের পুস্তকে কয়েকটি ভক্তিমতী ও তেজস্বিনী নারীর জীবনের কিছু নূতন রকমের কথা পাঠ করিয়া থাকি। তাঁহারা স্বামীকেও ভালবাসিয়াছেন, স্বামীর সেবাও করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, অন্তরস্থিত বিশ্বাসে অটল থাকিবার জন্য তাঁহারা স্বামীর কুসংস্কারপূর্ণ মতের বিরুদ্ধে চলিতে এবং অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে মোটেই ভয় পান নাই। এজন্য প্রথমে শ্বশুরকুলের লোকেরা তাঁহাদের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার পরে ঐ-সকল সাধ্বী নারীদিগের মনের বল, অন্তরের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভগবানের প্রতি ভক্তি দেখিয়া, স্বামীরাও তাঁহাদের পদতলে মস্তক নত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমি আজ ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উক্তরূপ দুইটি মনস্বিনী ও ভক্তিমতী নারীর জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

(১)

দেবকীনন্দন রায় কাটোয়ার নবাবের ফৌজদার। তাঁহার বিস্তর টাকা। তিনি মস্ত বড় ধনী। ধর্ম্ম বলিলে ঠিক যাহা বুঝা যায়, এই ধনাঢ্য লোকটির ভিতরে তাহার কিছুই ছিল কি না তাহা বলা বড়ই মুস্কিল। কিন্তু তাঁহার ভণ্ডামি যে পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, সে কথা সকলেই জানিত। আপনাকে ধনী এবং ধার্ম্মিক বলিয়া জাহির করিবার জন্য বাহিরে তাঁহার পূজার আড়ম্বরই বা কত! ভক্তমাল-রচয়িতা বলিতেছেন—

> "যমুনার তীরে ঘর নিকটে যমুনা।
> স্নানাদি করয়ে সদা সন্ধ্যাদি বন্দনা॥
> হস্তী যে বৃহৎ এক বৃহৎ দশন।
> দশন উপরে করি চৌকির আসন॥
> জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া।
> দেবীপূজা করে বড় বড়াই করিয়া॥
> রক্তচন্দনের ফোঁটা সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
> সদা ভৈরবের প্রায় আকার হইয়া॥
> রক্তচন্দন জবা পুষ্প তাম্র শঙ্খে।
> পূজয়ে বসিয়া———"

এই জাঁকজমকওয়ালা ধনীর প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ হইল। এই বিবাহের স্ত্রী গৃহস্থ বৈষ্ণবের কন্যা। বিবাহের সময়ে তাঁহার কত বয়স হইয়াছিল, ভক্তমাল গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন কথারই উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু তিনি যে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও ধর্ম্মশীলা তরুণী নারী ছিলেন, তাঁহার বয়স যে নিতান্ত অল্প ছিল না, সে কথা ঐ গ্রন্থের বর্ণনা পাঠ করিয়া অতি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। ভক্তমাল-রচয়িতা বলিতেছেন, এই বৈষ্ণবের কন্যা 'পিতৃগৃহে থাকিতেই

ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরম ভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার গুরু ছিলেন। পিতৃগৃহে এই শক্তিশালিনী নারী শুধু যে লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন, তাহা নহে; শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া আপনার ধর্ম্মমতে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি পুরুষদিগের সঙ্গে রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। কিন্তু বিচার করিলে কি হইবে? এই শিক্ষিতা ও স্বাধীনভাবাপন্না নারী স্বামীর গৃহে আসিয়া আপনার জীবনই ব্যর্থ বলিয়া মনে করিলেন; স্বামীর ব্যবহারে দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন কি, স্বামীর অন্যায় কার্য্য দেখিয়া তাঁহার গৃহের অন্নজল গ্রহণ করিতেই ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। এ বিষয়ে ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণনার কিয়দংশ এই—

"বিবাহের পরে যবে নবধা গমনে।
ব্যবহার মতে আইল স্বামীর ভবনে॥
আসিয়া দেখয় সব বিপর্য্যয় ভাব।
তমোগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব॥
রক্তচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্পমাল।
ঢুম্ ঢুম করি চলে দেখিতে করাল॥
কাটা ছেঁড়া মদ্য মাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার॥
এতেক দেখিয়া কন্যা চমকিয়া চায়।
এই হয় বুঝি মোর শ্বশুর-আলয়॥
হা হা বিধি হেন বিড়ম্বন কেন কৈলে।
কি দোষে আমারে হেন পঙ্কেতে ডারিলে॥
পিতা মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া॥
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমে গড়ি যায়।
এখন আমার দশা কি হবে উপায়॥
* * *
তবে কি আমার গতি হইবে এখন।
পালাবার পথ নাহি অবলা-জনম॥"

এই "অবলাজনম" শব্দটি যেন অসহায়া নারীর সমস্ত প্রাণের বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কথাটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে এ দেশের অনেক দুঃখিনী নারীর মর্ম্মান্তিক ক্লেশ মনের মধ্যে যেন কেমন এক ব্যথা জাগাইয়া তোলে। আমরা দেখিতেছি, চারিশত বৎসর পূর্ব্বের এই বৈষ্ণবদুহিতা অন্তরের যাতনায় এ কালের স্নেহলতার মতই একবার ভাবিয়াছিলেন,—

"উপায় আছয়ে এই মাত্র দেখি এবে।
অনাহারে থাকিয়া শরীর ত্যজি তবে॥

কিন্তু এই তরুণী ধর্ম্মশীলা; শ্রীহরিকে লাভ করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই তিনি আত্মহত্যার সংকল্প করিয়াই ভাবিতে লাগিলেন—

"সত্য বটে এ কথা নিশ্চয়।
আত্মঘাতীরে হরি না হন সদয়॥

হরি সদয় হন না বলিয়াই তিনি মৃত্যুর চিন্তা আর মনে স্থান দিতে পারিলেন না। তবুও তিনি স্পষ্ট কথায়ই বাড়ীর মেয়েদের জানাইয়া দিলেন, এ গৃহের অন্ন আমি গ্রহণ করিব না। ভক্তমাল-রচয়িতা লিখিয়াছেন—

"এত শুনি নারীগণ হাসিয়া কহয়।
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি ডোম নয়॥
অন্ন নাহি খাবে, ঘর করিবে কেমনে।
এত বড় অসঙ্গত ভাব তব কেনে॥
কেহ কহে আগো উনি বৈষ্ণবের ঝি।
না খান শাক্তের অন্ন হেনই বা বুঝি॥
ইহা শুনি হাসি নিন্দা করে মেয়েগুলা।
খাশুড়ী ননদবর্গ তিরস্কার কৈলা॥

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মেয়েদের হাসি-ঠাট্টার এবং শাশুড়ী-ননদের ভর্ৎসনার যে কোনই কারণ ছিল না, তাহাও নহে। বউটির শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব থাকিলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের গোঁড়ামি যথেষ্টই ছিল। তিনি শুধুই বামাচারী, মদ্যপায়ী, মাংসখোর স্বামীর ভণ্ডামি ও ভ্রষ্টাচার দেখিয়াই ত আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন নাই; শ্বশুরকুল যে শাক্ত, এজন্যও তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

কিছুদিন পরে এই ধর্ম্মশীলা নারী স্বামীর হৃদয়ের উপরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে এবং তাঁহার মন অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের দিকে ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বামী তান্ত্রিক বামাচার ধর্ম্মের সুরা-পান ও তাহার সঙ্গের আর সকল ব্যাপার ত্যাগ করিয়া যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হন, সেজন্য তিনি তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু—

"স্বামী তাহা শুনি বহু ভর্ৎসনা করয়।
তুই মোর গুরু হইলি কহিয়া কহয়॥"

তা, গুরু না হইয়া স্ত্রী হইলেও এই দৃঢ়চিত্ত তেজস্বিনী মেয়েটিকে তিনি আর বেশিদিন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রীর চরিত্রের

প্রভাবে দেবকীনন্দনের মন বদ্‌লাইয়া যাইতে লাগিল। ভক্তমাল বলিতেছেন—

"কিন্তু হরিভক্তের দেখহ কি বা গুণ।
ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু তমঃ হৈল ন্যূন ;
স্ত্রীর ভজনরীতি চরিত্র দেখিয়া।
মনেতে প্রশংসা করে দ্রবীভূত হৈয়া॥"

এই সময়ে দেবকীনন্দনের সাম্‌নে আবার এক নিদারুণ শোক আসিয়া উপস্থিত হইল। অকালে তাঁহার ছেলেটি মরিয়া গেল। গর্ব্বিত মানুষের মাথা নত করিয়া দিতে এবং হৃদয়ের উপরে ঘা মারিয়া লোকের মনকে ঈশ্বরের পানে লইয়া যাইতে, মৃত্যু যেমন পারে, এমন ত আর কিছুই নহে। তাই এইবার মৃত্যুর আঘাতেই দেবকীনন্দন শোকাচ্ছন্ন হইয়া স্ত্রীর কাছে এবং ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করিলেন। ভক্তমাল লিখিয়াছেন—

"কতেক দিবস পরে পুত্রেটি মরিল।
শোকেতে আকুল হয়ে কাতর হইল॥
দুঃখের সময় বিনা যথার্থ না বুঝে।
কৃষ্ণে নাহি লয় মন শুনিলে না বুঝে॥
তখন আছিল কিছু চিত্ত নিরমল।
স্ত্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল॥
তবে কহে অনুযোগ তুমি সে করহ।
তোমার মনস্থ কিবা কি করিব কহ॥
তেঁহ কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ।
নতুবা সকল ব্যর্থ অনর্থক দেহ॥"

শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্না পত্নী ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইয়া স্বামীকে আরো অনেক তত্ত্বকথা শুনাইলেন ; বৈষ্ণব পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। তাহা ছাড়া তিনি নিজেও স্বামীকে বলিতে লাগিলেন—"একমাত্র হরি ভিন্ন আর কে মানুষের অন্তরে শান্তিদান করিতে পারে? সংসারে এমন শক্তি আর কাহার আছে? আমি তাই একমাত্র হরিকেই আশ্রয় করিয়াছি। তুমিও সেই হরির পাদপদ্মেই হৃদয় অর্পণ কর। তাঁহাকে পাইলেই সব পাইবে। তাঁহাতেই মনের শান্তি এবং সন্তোষ।"

ইহার পরেই দেবকীনন্দন রায়ের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রীর ন্যায় শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। অধর্ম্ম ও পাপ আর তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেও পারিল না। দিনের পরে দিন ধর্ম্মভাবে তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। তিনি আর সংসারে বাস করিতে পারিলেন না। আপনার ধনৈশ্বর্য্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগকে দান করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার বৈরাগ্য ও কঠোর সাধন দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভক্তবৎসল ভগবানও তাঁহাকে দেখা দিয়া এবং ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত করিয়া, তাঁহার মানবজন্ম সার্থক করিলেন। ভক্তমাল বলিতেছেন—

"দৌলত লুটায়ে দিল ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে।
বৃন্দাবন গেলা হরি-অনুরাগ ভাবে॥
যমুনার তীরে বসি হরি নাম করে।
অযাচক বৃত্তি মাত্র রহে অনাহারে॥
কতেক দিবসে হরি-চরণ পাইলা।
কহা নাহি যায় হরি-ভক্তির কি লীলা॥
যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহা মোহ উপজয়।
সেই স্ত্রী হইতে হৈল ভক্তির উদয়॥
অন্ত আশয় জীবহিংসা তেয়াগিয়া।
ভাগবত হৈল হরিময় হৈল হিয়া॥"

দেবকীনন্দনের পত্নী গৃহেই ছিলেন। গৃহই তাঁহার ভক্তি-সাধনের ক্ষেত্র ছিল। তিনি যখন বর্ষীয়সী রমণী, তখন ভগবানের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহার গভীর ভক্তি এবং উন্নত ধর্ম্মজীবন দর্শন করিয়া শত শত লোক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

(২)

দ্বিতীয় জীবনচরিতটি এই :—

জয়পুরের রাজার নাম মাধবসিংহ। তিনি খুব সাহসী এবং মস্ত একজন বীর। তাঁহার সুশাসনে সকলেই খুব খুসী। জয়পুরের যিনি রাণী, তিনি পরমা রূপসী। রূপের মতই তাঁহার গুণ। রাজার উপরে তাঁহার ভালবাসাও অত্যন্ত অধিক। একদিন তিনি শুভ্র সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ; দাসী তাঁহার সুন্দর পা দুখানি টিপিয়া দিতেছে। এমন সময়ে সেই পরিচারিকার মুখখানি কেমন এক আশ্চর্য্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাণী বিস্মিত নয়নে সেই মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পরে পরিচারিকা প্রেমোচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল।

এই দাসী অভাবে পড়িয়া চাকরাণীর অতি ক্ষুদ্র কার্য্যই করিয়া থাকে বটে ; কিন্তু সে ধর্ম্মশীলা নারী। তাহার অন্তরে ভক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। সে তাহার

প্রাণের দেবতা শ্রীহরিকেই স্বামিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখন সেই হরিই তাহার সর্ব্বস্ব। সে ত হরির দর্শন ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। তাই সে রাণীর পা টিপিতে টিপিতে শ্রীহরিরই সুমিষ্ট নামটি মনে মনে জপ করিতেছিল। নাম করিতে করিতেই তাহার হৃদয়ের প্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই বাহিরে এই ভাবোচ্ছ্বাস।

রাণীর বড় কোমল চিত্ত। তাই দাসীর ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া সেই চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। দাসীও আবার তাঁহাকে ভগবানের প্রেমের রসপূর্ণ কাহিনীই শুনাইতে লাগিল। রাণী আর তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তিনি শ্রদ্ধায় ও ভাবে পূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বল, ঐ সুমধুর ভক্তির কথাই আমাকে বল। তোমার মুখ হইতে যে সুধার ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। তুমি আমার প্রাণে যে অমৃত বর্ষণ করিতেছ।" ভক্তমাল বলিতেছেন—

"কহ পুনঃ পুনঃ কহ আহা বল বল ॥
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল।
দাসীর প্রশংসা করি কহিতে লাগিল ॥
তুমি ত আমার পদসেবা-যোগ্য নহ।
দাসী যে তোমারে বলি অপরাধ সেহ ॥
অতএব তুমি মোর পদ ছাড়ি দেহ।
শিয়রে আসিয়া শিরে চরণ ধরহ ॥
এতেক বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কৈল।
দুই জনে প্রেমানন্দে বিহ্বল হইল ॥
দাসী কহে ঠাকুরাণী দেখহ ভাবিয়া।
ভুঞ্জিলে বিষয়-সুখ মোহিত হইয়া ॥
এ অনিত্য সুখ তাতে কত বা আস্বাদ।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভকতির কি সুন্দর স্বাদ ॥
অনিত্য বিষয়-সুখ হৈল আর গেল।
কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আলো ॥
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে তা বুঝিনু।
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিনু ॥
আজি হৈতে বিষয়ের গুণ তেয়াগিনু।
কৃষ্ণ-প্রেম-ধন লাগি বিষয় সঁপিনু ॥"

জয়পুরের রাণী ভক্তির জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি আর জাতির বিচার করিতেও পারিলেন না। নিম্নবর্ণের এই দাসীকেই গুরুরূপে বরণ করিলেন; তাহার কাছে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেও কোনরূপ সঙ্কোচ-বোধ করিলেন না।

রাণীর ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি যে আসক্তি, তাহা একেবারেই চলিয়া গেল। তাঁহার স্বর্ণখচিত বসন ও রত্নাদি ভূষণ কোথায় পড়িয়া রহিল। রাণী সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া নিরন্তর প্রাণের দেবতাকেই ডাকিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। প্রেমে ও পুলকে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি ভক্তির উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া, তাঁহার প্রেমের দেবতাকে লইয়াই অধিক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এতদিন রাণীকে অন্তঃপুরে পর্দ্দার আড়ালেই বাস করিতে হইত। এখন আর সে পর্দ্দাও রহিল না, অন্তঃপুর এবং তাহার বাহিরের সঙ্গেও তেমন একটা প্রভেদ রহিল না। রাণী ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সঙ্গেই মিলিত হইয়া শ্রীহরির চরণ সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা মাধব সিংহ রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যুদ্ধের জন্য অন্য জায়গায় গমন করিয়াছিলেন। দেওয়ানের হস্তেই রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং রাজ্যে উপস্থিত থাকিলে, বুঝি বা অন্তঃপুরে এমন একটা ব্যাপার হঠাৎ ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। দেওয়ান মহাশয় রাণীর সব কাজকর্ম্ম দেখিয়া ত অবাক্! তিনি রাণীর কাছে লোক প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি রাজরাজেশ্বরী হইয়া এ-সব কি করিতেছেন? অন্তঃপুরের পর্দ্দা তুলিয়া দিলেন কেন? কতকগুলি বৈষ্ণবের সঙ্গেই বা মিশিতেছেন কেন?"

রাণী দেওয়ানকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দেওয়ান, তুমি আমাকে আর রাণী বলিয়া সম্বোধন করিও না। আমি যে এখন শ্রীহরির দাসী বলিয়াই আমার নাম লিখাইয়াছি। আমার পর্দ্দাই বা কোথায়? জাতিই বা কোথায়? আমার আর লজ্জা-সরমই বা কোথায়? কোথায় বা আমার ধনৈশ্বর্য্য? আমি শ্রীহরির প্রেমে পাগলিনী হইয়া সর্ব্বস্বই যে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছি।"—

"রাণী কহে রাণী বলি না কহিও মোরে।
দাসী নাম লিখে দিনু যুগল-কিশোরে ॥
জাতি-পাতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব সমাজে।
*　　*　　*
এ-সব রিপুর হাত যদি ছাড়াইনু।
তবে আর কারে ভয়, নির্ব্বিঘ্ন হইনু ॥
অতএব বিবরণ দেওয়ানেরে কহ।
শ্রীচরণে সঁপিয়াছি দেহ পর্দ্দা সহ ॥".

দেওয়ান চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রাণীর অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়, এইবার রাজাকে সব ঘটনা লিখিয়া পাঠানো প্রয়োজন। দেওয়ান তাই রাজার নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্র পাঠ করিয়া রাজার মন ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি রাণীকে হত্যা করিবার জন্য স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাজা রাণীর প্রেমোজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অনুপম ভক্তির ও অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। শুধু তাহাই নহে। পত্নীর অনেক বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, রাণী ত এখন আর মানবী নহেন—তিনি যে দেবী। এই দেবীর প্রতি রাজা কি ভক্তি প্রকাশ না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? তাই—

"পাত্র মিত্র সভাসদ সমভিব্যাহারে।
রাণীর নিকটে গেলা বিনীত অন্তরে॥
নিকটে যাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল।
নিজ স্ত্রী বলি অভিমান নাহি কৈল॥
যোড়হস্তে স্তবস্তুতি অনেক করিল।
অপরাধ ক্ষম বলি কাতরে কহিল॥"

পতিব্রতা রাণী রাজার অপরাধের কথা মনেও করিলেন না। তিনি নম্রবচনে রাজাকে কহিলেন, "আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধীন। তুমি কখনই তোমার দয়া হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। এখন আমার একান্ত অনুরোধ, তুমিও ভগবানের শরণাপন্ন হও এবং ভক্তির সহিত তাঁহারই নাম কীর্ত্তন কর। তাহা হইলেই তোমার যথার্থ মঙ্গল হইবে।"

রাজা কহিলেন, "এখন আর তুমি কোন মানুষেরই অধীন নও। যাঁহার অধীন এই জগৎসংসার, তুমি শুধু তাঁহারই অধীন। তুমি আমার সহায় হও। আমি তোমার সাহায্যেই রাজ্য শাসন করিব"—

"তোমারে সহায় করি রাজ্য মুই করি।"

এই-সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, যথার্থই বৈষ্ণব যুগে এক শ্রেণীর নারীর অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছিল। হয় ত তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু সংখ্যা কম হইলেও তাঁহাদের একটুকু শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল, স্বাধীনতাও ছিল; তাঁহারা পুরুষের মতই সাধন করিয়া ভক্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই পুরুষেরা তাঁহাদিগকে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

—

টরেস ষ্ট্রেট এবং নিউগায়েনার নারী

নিউগায়েনা এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে টরেস ষ্ট্রেট (প্রণালী) এবং কতকগুলি দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জকে কুইন্স্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু এইখানের প্রাচীন অধিবাসীদের চেহারার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম কালের লোকদের চেহারার কোনো প্রকার সাদৃশ্য নাই। টরেস ষ্ট্রেটের লোকেরা পাপুয়ান জাতির হইলেও নিউ-গায়েনার লোকদের সহিত চেহারায় এবং আচার-বিচারে বিশেষ কোনো অমিল নাই। নিউগায়েনার লোকদের সহিত ইহাদের বিবাহাদিও চলিয়া থাকে। গত ৩০ বৎসর হইতে, মুক্তার ব্যবসার জন্য পৃথিবীর নানাদেশ হইতে নানা জাতির লোক এই টরেস ষ্ট্রেটের দ্বীপগুলিতে শুভাগমন করিতেছে।

এই শুভাগমনের ফলও ফলিতেছে, তবে তাহা শুভ কি অশুভ তাহা বলা শক্ত। বিদেশীর আগমনে এবং আধিপত্যে দেশবাসী তাহাদের প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি ক্রমে ত্যাগ করিতেছে বা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। বিদেশীর নানা প্রকার কুশ্রী ব্যাধির আমদানী হইয়াছে। প্রাচীন দ্বীপবাসীরা খুব তাড়াতাড়ি লোপ পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দ্বীপের যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই। সেই সময় কুকুরের দাঁতের হারের যে দাম ছিল, একটা লোহার ছুরি বা কাচের বোতলেরও ছিল সেই দাম। ঐ রকম যে-কোনো একটা জিনিষের বদলে একটা স্ত্রী ক্রয় করা যাইত। সেই-সব দিন গত হইয়াছে। কতকগুলি দ্বীপ লোকশূন্য হইয়াছে। বাকী দ্বীপে প্রাচীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা জন ছয় করিয়া আছে। প্রাচীন দ্বীপবাসীরা মনে করিত তাহাদের এক এক বংশ এক এক জন্তু হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ বংশের আদি জন্মদাতা জন্তুর মূর্ত্তি পিঠে

বর্ত্তমান কালে পিঠে ছবি

নিউগায়েনার পিঠে-উল্কি-কাটা বৃদ্ধা বিধবা নারী।
এই উল্কি তাহার জাতির বংশচিহ্ন।

নিউগায়েনার জাতীয় পরিচ্ছদে ও ভূষণে সজ্জিতা বালিকা।

হয়। বুকেও নানা রকমের উল্কি পরা হইত। প্রত্যেকটি দাগের এক এক রকম অর্থ করা হইত। কিন্তু এই-সমস্ত দাগের যথার্থ অর্থ যে কি তাহা এই দ্বীপের আদিকালের লোকেরাও বলিতে পারে না।

প্রাচীন কালের নারীরা সাগু গাছের পাতার তৈয়ারী এক রকম ঘাঘ্‌রা পরিধান করিত। তাহারা এই বস্ত্রকে ধূসর বা কালো রঙে রঙ করিয়া লইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ঐ দ্বীপের নারীরা এই পরিষ্কার এবং সহজপ্রাপ্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা এখন বিলাতী কাপড়ের তৈয়ারী কিম্ভুতকিমাকার দেখিতে একটা সেমিজের মত গাউন পরে। নূতন যখন এই সেমিজ তৈয়ারী হয়, তখনই ইহা পরিষ্কার থাকে, তার পর ইহার রূপ যে কি রকম হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। লোকদের অবস্থা খারাপ বলিয়া বড় জোর দুইটা সেমিজ তাহারা এক সঙ্গে রাখিতে পারে। প্রত্যেক দিন এই সেমিজ পরা চাই, কারণ এই সেমিজ এখন তাহাদের ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ সময় তাহারা সাগু-পাতার ঘাঘ্‌রা পরিয়া থাকে, দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত থাকে।

পূর্ব্বে বালিকা যখন নারীত্ব প্রাপ্ত হইত, তখন টরেস দ্বীপপুঞ্জে এবং নিউগায়েনাতে একটি উৎসব করা হইত। এই সময় ঐ বালিকাকে একেবারে আলাদা স্থানে কয়েক দিনের জন্য বাস করিতে হইত। ঘরের এক অন্ধকার কোণে লতাপাতা ঘেরিয়া দেওয়া হইত, এই স্থানে বালিকা নানাপ্রকার দেশীয় অলঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া দিনের বেলায় বসিয়া থাকিত। রাত্রিকালে লতা পাতা নূতন করিয়া বদলাইয়া দেওয়া হইত। রাত্রে বালিকা কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের হাওয়াতে আসিতে পাইত। এই ভাবে বালিকাকে তিন মাস কাল কাটাইতে হইত। দুইজন বৃদ্ধা নারী (তাঁহারা সম্পর্কে খুড়ী বা মাসী) তাহার সমস্ত সেবা করিত। অবরুদ্ধা বালিকা-নারী এই সময় নিজের হাতে কিছুই করিতে পাইত না, এই দুইজন বৃদ্ধাই তাহাকে হাতে করিয়া মুখে খাবার তুলিয়া দিত।

এই তিন মাস কাল সূর্য্যের আলো বালিকার লতা-ঘেরা স্থানে কোনো রকমেই প্রবেশ করিতে পাইত না। লোকের ধারণা ছিল, যদি কোনো রকমে সূর্য্যের আলোর এক টুক্‌রা বালিকার দেহে লাগে, তবে তাহার নাক পচিয়া যাইবে। তিন মাস কাল পূর্ণ হইলে বালিকাকে নিকটের কোনো একটা ঝরণাতে লইয়া যাওয়া হইত। তাহাকে ঘাড়ে করিয়া বা অন্য কোনো রকমে বহন করিবার প্রথা ছিল, কারণ বালিকার পা মাটি ছুঁইতে পাইত না। এইখানে বালিকার অঙ্গ হইতে সমস্ত বস্ত্র এবং গহনা খুলিয়া লইবার পর, ঐ দুই বৃদ্ধা এবং বালিকা ঝরণার জলে অবগাহন করিত। গ্রামের অন্যান্য নারীরা বালিকা এবং তাহার সেবিকাদ্বয়ের গায়ে অঞ্জলি করিয়া জল ছিটাইত। স্নান শেষ করিয়া বালিকা নানা রকম লতা-পাতার বস্ত্রে এবং দেশীয় অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া গ্রামের ভোজে আসিয়া যোগদান করিত। ভোজ শেষ হইলে পর বালিকা অন্য দশ জন নারীর মত গ্রামের সব কাজে সমান অধিকার লাভ করিত। বালিকা যে নারীত্বে উপনীত হইয়াছে তাহার পরিচয়-স্বরূপ তাহার বুকে ইংরেজী V অক্ষরের ন্যায় উল্কি কাটা হইত।

বিবাহ করিবার পূর্ব্বে যুবতী নারী প্রথমে তাহার মনোমত কোন যুবকের সহিত প্রণয় করিত। অবশ্য কোনো যুবক যদি কোনো যুবতীর প্রেমে পড়িত তবে সে গ্রামের নাচে গানে ও অন্যান্য নানা কাজে সব সময় বাহাদুরী লাভের প্রয়াসে থাকিত। শান্তির সময় এই পদ্ধতিতে যুবক কোনো বিশেষ যুবতীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত। কিন্তু অশান্তির সময় যুবক যদি কোনো রকমে একটা মড়ার মাথার খুলি জোগাড় করিতে পারিত তবে তাহার ভালবাসার পাত্রী তাহার প্রেমে না পড়িয়া আর থাকিতে পারিত না। কারণ মাথার খুলি জোগাড় করা যার-তার কর্ম্ম নয়—প্রকাণ্ড বীর না হইলে কেহই তাহা পারে না। যুবতীর মন হরণ করিবার আরো একটা উপায় ছিল—যুবক নারিকেল তেলের সঙ্গে নানা রকম গাছ-পালার রস মিশাইয়া এক রকম গন্ধ-তৈল প্রস্তুত করিত। এই গন্ধ-তৈল মাখিয়া সে যুবতীর সাম্‌নে ঘুরিত। তেলের চমৎকার গন্ধে যুবতীর মন একেবারে পাগল হইয়া যুবকের দিকে ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে সেই যুবতী একগাছা ফুলের মালা যুবকের কাছে পাঠাইত—এই মালা দেওয়ার অর্থ যুবককে পাণিগ্রহণে আহ্বান করা। মালা বহন করিত যুবতীর বোন বা অন্য কোনো নিকট সম্বন্ধীয়া আত্মীয়া। রাত্রে বন্ধু-বান্ধব সকলে নিদ্রিত হইলে পর-যুবক ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রেমিকা যুবতীর কুটীরে হাজির হইত। কিছুকাল এই রকম ভাবেই চলিত। দিনের বেলায় যুবক নানা কার্য্যে যুবতীর পিতার সাহায্য করিত। কন্যার পিতা সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কিছু না-জানিবার মত ভাব দেখাইত। তারপর যখন কথাটা পাকা রকমে কন্যার পিতার কানে আসিত, সে রাগ করিত না। কিন্তু কন্যার মাতার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল একটা বিকট রকমের গোলমাল করা। ক্রমশ বরপক্ষে এবং কন্যাপক্ষে বেশ একচোট ঝগড়ার মত হইত, তাহার পর সামান্য রক্তপাত হইলেই কন্যার সম্মান বজায় থাকিত। এই-সমস্ত প্রাথমিক কাণ্ড শেষ হইলে পর বিবাহ পাকা রকমে হইত। বর এবং কন্যা নানা রকম সাজে সাজিয়া একটা মাদুরে সামনা-সামনি বসিত। নানা প্রকার উপহারাদির আদানপ্রদান শেষ হইলেই বর-কন্যা আহার করিত—বাস্‌, তাহার পর হইতেই তাহারা স্বামী-স্ত্রী।

টরেস ষ্ট্রেটে সেবাই (Saibai) দ্বীপে কোনো নারীর প্রথম সন্তান হইবার পূর্ব্বে একটি মজার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। নারীর গলায় সাগু-পাতার তৈরী একটা পুতুল বা গুটিকা ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। বাঁশের কাঠামোর উপর এই পুতুল বা গুটিকা তৈরী হইত। যে দুটা সূতা দিয়া গুটিকা বা পুতুল গলায় বাঁধা থাকিত, তাহা পুতুলের হাত। আর যে দুটা দড়ি দিয়া কোমরে বাঁধা থাকিত তাহা পুতুলের পা। পুতুলটা ২০ ইঞ্চি লম্বা। এই পুতুল গলায় ঝুলাইয়া ভাবী মাতা গ্রামের আর-সকল নারীদের সঙ্গে উৎসব করিতে করিতে গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাতে গ্রামের সকলেই জানিতে পারিত যে তাহাদের গ্রামে অচিরে একজন নূতন লোক আসিতেছে। গ্রামবাসীরা ইহাতে আনন্দিত হইয়া উঠিত।

টরেস ষ্ট্রেট ত্যাগ করিয়া নিউগায়েনার যে অংশে পৌঁছানো যায়, সে স্থান অতি অস্বাস্থ্যকর এবং জলা-ভূমিতে পরিপূর্ণ। এই স্থানে লোকের বসতি নাই বলিলেই হয়, এবং যাহারা আছে তাহাদের সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। এই অংশের তুগেরি জাতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার মত জানা যায়। নিউগায়েনার নাবাল দেশের কয়েকটি জাতির একটা সাধারণ নাম "তুগেরি"। ইহারা অনেক-কাল হইতেই ইংরেজ-অধিকৃত পশ্চিম গায়েনাতে মাঝে মাঝে আসিয়া লুটপাট করিয়া যায়। উপকূলের আদিম জাতিরা তুগেরিদের অত্যাচারে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইংরেজ সরকার ইহাদের শাস্তি দিবার জন্য মাঝে মাঝে দলে দলে সৈন্য পাঠান। এই-সমস্ত হইতে তুগেরিদের অস্ত্র শস্ত্র, নৌকাদির গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান লাভ হয় না। তবে এই জাতির নারীদের ছবি দেখিয়া মনে হয়, তাহারা বেশ শক্ত এবং কষ্টসহিষ্ণু, তাহারা চুল কাটে না, পাকাইয়া পাকাইয়া ঝুলাইয়া রাখে। এই জাতির নারীদের গহনার বহরও বেশ দেখিবার মত। নিউগায়েনার অন্য অংশের নারীরা কোনো প্রকার গহনা পরে না বলিলেই হয়, পুরুষেরাই বেশী গহনা পরে।

ফ্লাই নদীর কাছাকাছি যে-সব জাতি বাস করে তাহাদের গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অদ্ভুত রকমের। গ্রামে মাত্র চার-পাচটি ঘর থাকে। এক-একখানি ঘর প্রায় ১০০ গজ করিয়া লম্বা এবং ৩ গজ করিয়া উঁচু। কটক জেলার তেলেঙ্গীদের ঘর কতকটা এমনি ধারার। অনেক গ্রামেই পুরুষ এবং নারীদের শুইবার এবং থাকিবার আলাদা বন্দোবস্ত। নারীরা যেখানে বাস করে সেখানে পুরুষেরা যাইতে পারে না। এই-সব লম্বা ঘরের মধ্যে কতকগুলি অংশ ভাগ করা থাকে। সেখানে বিশেষ বিশেষ পরিবার রান্না করে এবং ভাণ্ডার রাখে। কোনো পুরুষের মরণকালে বা বেশী অসুখ হইলে সে তাহার স্ত্রীর কাছে আসিয়া থাকিতে পায়।

ফ্লাই নদীর মুখ হইতে পূর্ব্বদিকে আসিলে ঘোর কালো এবং ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া-চুল-ওয়ালা এক রকম লোক দেখা যায়। কেপ্ পজেসনের পরে আর ইহাদের বড় একটা দেখা যায় না। ইহার পূর্ব্বদিকে ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত এক প্রকার মানুষ দেখা যায়, তাহাদের নিউ গায়েনার পশ্চিমের লোকদের সহিত বিশেষ কোনো মিল নাই। ইহাদের দেহের রঙ্ খুব কালো নয়। মাথার চুল কোঁকড়া বা ঝাঁকড়া নয়, অনেকটা সোজা সোজা। এই অংশের অনেক বালিকার রঙ বেশ ফর্‌সা বলা চলে।

পশ্চিমের কয়েকটা জাতি মানুষ খায়। আর তাহাদের অধিকাংশ জাতিই মানুষ মারিয়া তাহার মাথার খুলি সংগ্রহ করিতে খুবই ভালবাসে। এটা তাহাদের একটা নেশার মত। নিউগায়েনার পূর্ব্ব অঞ্চলের লোকেরা মানুষ খায় না—এখানের মাত্র দু-একটি জাতি ছাড়া আর কোনো জাতি মাথার খুলি সংগ্রহও করে না।

নিউগায়েনার সমুদ্র-উপকূলের নারীরা সমস্ত অঙ্গেই উল্কি পরে। উল্কিতে নানা রকমের রঙ থাকে। খুব কম বয়সেই উল্কি পরা সুরু হয়। মেয়ের ছয় সাত বছর বয়সেই উল্কি দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বুকের মাঝখানে ইংরেজি ভি V অক্ষরের আকারে একটি দাগ কাটা হয়। ইহাকে উপকূলের মতু জাতি 'গাড়ো' বলে। বয়স্কা মেয়ের তলপেটের নীচেও উল্কি পরিতে হয়। কারণ এই স্থানে উল্কি না পরিলে কোনো মেয়ের ভাগ্যেই বর জুটে না।

মধ্য নিউগায়েনার অবিবাহিত নারী এবং বিবাহিত নারী চিনিবার একমাত্র উপায় তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, উল্কি এবং অলঙ্কারাদির বহর। অবিবাহিতা যে, তাহার চুল খোলা এবং লম্বা এবং সে অলঙ্কারে ভূষিতা। সে যে "রামি" বা ঘাঘ্‌রা পরে, তাহাতে কারুকার্য্য থাকে। নারী এই একমাত্র অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে। ইচ্ছা হইলে কেহ বা ততোধিক "রামি" পরিতে পারে। একটার বেশী "রামি" পরিলে নাকি নারীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। উৎসব উপলক্ষে তাহারা বিশেষভাবে তৈয়ারী 'রামি' পরে। তালপাতাকে নানা রকম রঙে ছোপাইয়া এই ঘাঘ্‌রা তৈয়ার হয়। মধ্যে মধ্যে শাদা রঙ্ থাকে বলিয়া তাহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য হয়।

ঘাঘ্‌রা কোমর হইতে হাঁটু অবধি। তাহার ডান দিক খোলা থাকে। নাচিবার সময় যখন ঘাঘ্‌রার ডানদিক হাওয়াতে মাঝে মাঝে উড়িয়া যায় তখন ডান উরু জঙ্ঘা ও জানুর নানা রকম উল্কি চোখে পড়ে।

মধ্য গায়েনার বিবাহ এবং বিবাহের পূর্ব্বের আচার ব্যবহার এইরূপ—কোনো যুবক কোনো যুবতীর প্রেমে পড়িলে সে-দিন শেষের অন্ধকারে তাহার পিতার বাড়ী যায়। সত্যিকারের কোনোরূপ লুকোচুরি নাই বটে, তবুও একটা লোকদেখানো লুকোচুরির ভাব থাকে। কারণ বাড়ীর অন্যান্য সকলে ঘুমাইবার ভান না করা পর্য্যন্ত প্রেমিকবর প্রেমিকার গৃহে প্রবেশ করে না। তার পর তাহারা দুইজনে রাত্রি একসঙ্গে যাপন করে—বর মহাশয় বিবাহের পূর্ব্বে নানাপ্রকার কুকুরের দাঁতের হার, শামুকের খোলার ও মুক্তা-খোলার নানা রকমের গহনা সংগ্রহ করে। এই সমস্ত দ্রব্যাদি ইহাদের কাছে খুবই মূল্যবান এবং কন্যার বদলে এই-সমস্ত তাহাকে দিতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে এই-সমস্ত দামী দামী যৌতুক বর তাহার শ্বশুরমহাশয়কে দেয়, তিনি নিজের জন্য বিশেষ কিছুই রাখেন না, জ্ঞাতি-কুটুম্বের মধ্যেই প্রায় সব বিলাইয়া দেন। এই প্রথার দ্বারা বুঝায় যে কোনো কন্যা একমাত্র তাহার পিতার সম্পত্তি নয়, সে তাহার জাতির কতকটা সাধারণ ধনের মত। বিবাহের কয়েকদিন পরে কন্যার অঙ্গ হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া লওয়া হয়। বাপের বাড়ীর কোনো জিনিষই সে সঙ্গে লইতে পারে না। গহনাদি লওয়ার এক সপ্তাহ পর পর্য্যন্ত কন্যা তাহার উৎসবের "রামি" বা ঘাঘ্‌রা পরিয়া থাকে, তাহার পর ইহাও তাহাকে তাহার পিতার বাড়ীতে ফেরৎ দিতে হয়! এইবার তাহার মাথা মুড়াইবার পালা। ভাঙ্গা কাঁচ দিয়া এই কাজ চলে। তখন হইতে সাধারণ ঘাঘ্‌রা পরিতে হয় এবং বিবাহিত কন্যা আর কোনোদিনই নাচে যোগ দিতে পারে না। বিবাহিতা নারী নাচে যোগ দিলে বড় লজ্জার কথা হইয়া পড়ে।

স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত আত্মাকে খুসী রাখিবার জন্য নারীকে অনেক কিছুই করিতে হয়। আচার-বিচারের কোনো প্রকার অন্যথা হইলে মৃত আত্মা এত ক্ষেপিয়া উঠেন যে বলা যায় না। মৃত্যুর পর প্রথমেই একটা ভোজ হয়। ভোজের পূর্ব্বে বিধবা নারীকে মাথা মুড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গে কালী লেপিতে হয়। পা পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে, এমন একটা ঘাঘ্‌রা পরে, আর-একটাতে কাঁধ হইতে কোমর অবধি আবৃত করে। তাহার উপর একটা জালের বোনা ওয়েষ্ট-কোট সদৃশ আঙ্গিয়া পরে। কাঁধ হইতে কোমর পর্য্যন্ত জামা না পরিয়া এই রকম একটা ওয়েষ্ট-কোট পরিলেও হয়। মাথায় জালের বোনা একটা শোকসূচক টুপী পরা চাই। তাহাকে নানা রকমের শামুকের গহনাও পরানো হয় এবং স্বামীর গলার কোনো একটা অলঙ্কার কালো সূতা দিয়া বাঁধিয়া বিধবা গলায় ঝুলায়। এই রকমের আরো খুচ্‌রা অনেক কিছু অঙ্গে ঝুলাইতে হয়। তাহার পর শেষ শোক-ভোজ সমাধা হইলে পর মৃত স্বামীর কোনো আত্মীয়া (ভগিনী হইলেই ভাল) বিধবার ঘাঘ্‌রা কাটিয়া ছোট করিয়া দেয়। তাহার পর বিধবা দেহ হইতে কালী ধুইয়া ফেলিতে পারে এবং ইচ্ছা হইলে আবার বিবাহ করিতে পারে।

ঘর-সংসারের কাজের জন্য এই দেশের মেয়েদের বড় বেশী খাটিতে হয়। সকালেই জলের কলসী বাঁশের তৈরী) ভরে, তারপর মেয়েরা খাবারের জোগাড় করে। এই-সমস্ত কাজ শেষ হইলে পর ছেলেপিলেদের সেবা আছে। ছেলেকে কোলে বা কাঁধে করিয়া মেয়েরা বাগান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে যায়। শস্য-বীজ বপনের সময় মাটিকাটা এবং বেড়া দেওয়া ছাড়া আর সব কাজই নারীদের করিতে হয়। সংসারের জ্বালানী কাঠও তাহাদের জোগাড় করিতে হয়। নারীরা সকালের দিকে বাগানে যায়, ফিরিতে তাহাদের দুপুর পার হইয়া যায়, আবার একটু পরেই চাষের কাজে গিয়া বিকালে নারীরা বাড়ী প্রত্যাগমন করে। বাড়ীতে আসিয়াই তাহাদের আবার রাত্রের ভোজ্য দ্রব্যের আয়োজনে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

মেয়েদের জন্যই গ্রামের একদল লোকের সঙ্গে আর-এক দলের প্রায়ই তুমুল মারামারি হয়। সমুদ্র-তীরের হাটে কোনো নারী হয়ত মাছ কিনিতে বা বিক্রয় করিতে গিয়াছে, সেখানে যদি কেহ কোনো রকমে তাহার অপমান করে—তবে সেই নারী গৃহে আসিয়া

তাহার স্ব-দলের লোকেদের এই কথা বলে। তখন দুই দলে বেশ একটা ঝগড়া বাধিয়া যায়। তাহাতে দুই পক্ষেরই অনেকে আহত হয়। এই স্থানে আহত ব্যক্তির উপর কোনো নারী যদি তাহার ঘাঘ্‌রা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তবে আর কেহ তাহাকে কোনো রকমে আঘাত করে না। যদি কোনো লোকের তাহাকে খুন করিবার বাসনা থাকে তবে সে বাসনা ত্যাজ্য।

নিউগায়েনায় যত রকমের ভোজ হয়, তাহার মধ্যে "গাপা" ভোজই সব চেয়ে বড়। প্রায় দুইমাস কাল ধরিয়া এই ভোজ চলে। সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের মজ্‌লিস হয়। এই সময়ে অনেক বিবাহ-ব্যাপারও হইয়া যায়। ভোজের পূর্ব্বে গ্রামের সব বাগানে প্রচুর ফল এবং ক্ষেত্রে শস্য আছে কি না তাহার সন্ধান লইতে সকলেই ব্যস্ত থাকে। যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকদের কাছে গিয়া শূকর ইত্যাদি চাহিয়া আনে। নারিকেল কলা ইত্যাদি বহুবিধ ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন হয়। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে পর গ্রাম-গ্রামান্তরের নারীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহাদের সঙ্গে একটা করিয়া খালি ঝুড়ি থাকে। এই ঝুড়ি তাহারা বাড়ী ফিরিবার সময় খাদ্যসামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া ছাঁদা লইয়া যায়। যে গ্রামে ভোজ হয় সেই গ্রামের চারিদিকে শক্ত বেড়া দেওয়ার প্রথা চলিত আছে। প্রত্যেক বাড়ীর বারাণ্ডাতেও বেড়া দেওয়া হয়। নানা রকম লতা-পাতা দিয়া বেড়া সাজানো হয়। মাঝে মাঝে নারিকেল এবং কলা ঝুলিতে থাকে। গ্রামের চারিদিকের বেড়াতেও কলার কাঁদি এবং থোকা থোকা নারিকেল টাঙ্গানো থাকে। যে জাতির নামে এই ভোজ হয়, সেই জাতির প্রধান মোড়লের বাড়ীতে শক্ত করিয়া একটা মাচা বাঁধা হয়। এই মাচা ফুলে ফলে সাজানো হইলে, তাহার উপর রাখা হয় ভারে ভারে নারিকেল কদলী ইত্যাদি নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য।

এই-সমস্ত কাজ শেষ হইলে পর নানা গ্রাম হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উৎসবে যোগদান করে। পূর্ব্বে ভিন্ন গ্রামের লোকেরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া এই ভোজে যোগদান করিত। যাহাদের সহিত শত্রুতা ছিল, তাহারা মাথায় আড়াআড়ি ভাবে একটা আক বহন করিয়া আনিলে মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। নারীদের উৎসবের পোষাক দেখিতে বড় চমৎকার। কত রকমের পালক, শামুকের খোলা গহনা করিয়া যে তাহারা পরে তাহার ঠিক নাই। মাদী তোতাপাখীর রঙীন লেজ বেতে গাঁথিয়া ইহারা এক প্রকার মুকুট পরিধান করে। তাহাতে নারীদের বড় চমৎকার মানায়। অনেকে এই পালকের সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের মালা জড়াইয়া লয়। মেয়েরা গলাতে শাঁখের গহনা পরে। অনেকে কুকুরের দাঁতের বা শূকরের দাঁতের হারও পরে।

নিউগায়েনার হুড নামক অংশে এই ভোজ দুই দিন খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে হয়। উৎসবের প্রথম দিন বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বরণ করা হয়। যে মেয়েরা এই দিন বিবাহযোগ্যা বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহারা নূতন করিয়া উল্কি পরে—নূতন ঘাঘ্‌রা পরে। এই ঘাঘ্‌রার ডান দিক একেবারে খোলা থাকে। তাহারা ডুবু বা মঞ্চ আরোহণ করিবার পূর্ব্বে "ইরোপি" নৃত্য করিয়া থাকে। ঢোলের তালে তালে কুমারীরা আগুপাছু পা ফেলিয়া যখন নৃত্য করে দেখিতে বেশ লাগে। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরিয়া এই নাচ হয়। তার পর অন্য অনেক রকমের নাচ হয়, তাতে গ্রামের অন্যান্য অনেকেই যোগদান করে। এই সময় লোকেরা খুব সুপারি চিবায়। দ্বিতীয় দিনই ভোজের আসল দিন। এই দিন কুমারীদের বিবাহযোগ্যা বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করা হয়। আগামী বৎসর যে গ্রাম বা জাতি এই ভোজের ভার গ্রহণ করিবে তাহাদের নামও এই দিন সকলকে বলিয়া দেওয়া হয়।

মেয়েরা বিবাহযোগ্যা বলিয়া গণ্য হইবার পূর্ব্বে "ডুবু" মঞ্চে উঠিয়া দাঁড়ায়। তাহার পর ঢাকের শব্দ হইবা মাত্র তাহারা তাদের ঘাঘ্‌রা খুলিয়া সাম্‌নে ফেলিয়া দেয়। মেয়েদের পিতারা সাম্‌নেই দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা ঘাঘ্‌রা লুফিয়া লয়। তার পর কয়েকজন বৃদ্ধা নারী প্রত্যেক মেয়ের সাম্‌নে একটা ঝুড়িতে করিয়া কিছু কলা, বাদাম এবং একটা ছুরি রাখিয়া দেয়। এই বিশেষ সময়ে যে-মেয়ের পিতা কোনো দিন মানুষ বধ করিয়াছে, কেবল

নিউগায়েনার "ইরোপি" নৃত্য—বালিকার নারীত্ব লাভের উৎসব।

মাত্র সেই মাথায় স্বর্গ-পক্ষীর পালক-নির্ম্মিত টুপী পরিতে পারে। তাহার পর একজন বৃদ্ধা মেয়েদের বুকে শূকরের চর্ব্বি বা নারিকেল তেল ঘসিয়া দেয়। দুই তিন জন বিবাহিতা বা বিধবা নারী পিছনে বসিয়া থাকে, তাহারা ঢাক বাজাইতে আরম্ভ করিলে মেয়েরা ডান হাতে ছুরি এবং বাঁ হাতে কলা লইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিতে থাকে। গোটা ছয় করিয়া কলা কাটা হইলে পর, ঢাক বাজান বন্ধ হয়, এবং মেয়েরাও সেই মুহূর্ত্তেই সাম্‌নের জনতার উপর বাদাম বৃষ্টি করে।

বিবাহিতা এবং বিধবা স্ত্রীলোকেরা এই বিশেষ ভোজের অন্যান্য সমস্ত কাজই করে। ইহাদের রান্না ক'রবার প্রথা অনেকটা নিউজিল্যাণ্ডের মত। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে পাথর বিছাইয়া আগুন জ্বালাইয়া গরম করা হয়। পাথর গরম হইয়া লাল হইলে পর, তাহার উপর কলাপাতায় মোড়া মাংস্ ইত্যাদি রাখা হয়, এবং উপর হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলা হয়। এম্‌নি ভাবে খাবার বেশ সিদ্ধ হয়। মেয়েরাই এই খাবার পরিবেষণ করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

নারী-প্রগতি

ব্রহ্মদেশের নারীরা লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

* * * *

ব্রহ্মদেশের সংশোধিত শাসন-ব্যবস্থায় ইহাও ধার্য্য হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কোনও নারীকে কাউন্সিলের 'নির্ব্বাচিত' সভ্যরূপে গ্রহণ করিবার অনুকূলে বিধি-প্রণয়ন করিবার অধিকারও কাউন্সিলের রহিল। বর্ত্তমানে কোনও নারীর সভ্য 'মনোনীত' হইতে বাধা নাই।

* * * *

মান্দ্রাজ সহরে কর্পোরেশনের ব্যবস্থায় বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

* * *

মাদ্রাজ প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত সালেমে নারীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। ইহাই ভারতবর্ষে নারীপরিচালিত প্রথম ব্যাঙ্ক। দুই বৎসর হইল এগারো-জন মহিলা মিলিত হইয়া এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন, ইতিমধ্যেই ইহার সভ্যসংখ্যা হইয়াছে ৪১; ১০ টাকা করিয়া ১১০টি শেয়ারে মোট মূলধনের পরিমাণ ১১০০ টাকা; ৪০০০ টাকা পর্য্যন্ত এই মূলধন বাড়ানো যাইতে পারিবে।

* * *

জাপানে নারীদের রাজনীতিক সভায় যোগদান এতদিন নিষিদ্ধ ছিল। অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে নারীরা সম্প্রতি সেই অধিকার লাভ করিয়াছেন, এ সংবাদ প্রবাসীতে ইতিপূর্ব্বেই আমরা দিয়াছি। গত ১০ই মে কোবে শহরে জাপানী নারীদের প্রথম রাজনীতিক সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।

* * *

মিস্ তোমি ওয়াদা নাম্নী একজন জাপানী মহিলা আমেরিকার ডক্‌টর অব্ ফিলজফি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহার আগে আর কোনও নারী মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্ব্বোচ্চ সম্মানটি লাভ করেন নাই।

* * *

বিগত তিন বৎসরের সমাজহিতচেষ্টার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলি হইতে ৮৩টি সাধারণী-পল্লী উঠিয়া গিয়াছে, প্রায় ৮০০ শহরের নৈতিক আবহাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে, সৈনিকদের মধ্যে দুর্নীতি-জাত ব্যাধি হাজারকরা ৯০ হইতে ৬২তে নামিয়াছে। এই হিতচেষ্টার মূলে আমেরিকার নারীদের সাহায্য বিশেষভাবে আছে।

* * *

ডানৎসিকের 'ডায়েট' বা প্রতিনিধি-সভা নারীদিগকে বিচারাসনে বসিতে পুরুষদিগের সমান অধিকার দিয়া এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

* * *

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের Hall of Fame বা যশোমন্দিরে ইতিপূর্ব্বে যশস্বী পুরুষ ও যশস্বিনী নারীদের মূর্ত্তি প্রতিকৃতি প্রভৃতি আলাদা প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইত। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক অধিবেশনে সম্প্রতি এই প্রভেদ ঘুচাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

* * *

'সেনোরা' দোলোর আরিয়াগা নাম্নী একজন মহিলা মেক্সিকোর একটি ষ্টেটের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

* * *

নূতন গ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীদিগকে নির্ব্বাচন প্রভৃতি প্রজাস্বত্ব দিয়া একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

স. চ.

ওষধি পর্য্যায়ে তাল-জাতীয় এক শ্রেণীর গাছ

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে কলা, ধান, বাঁশ ও ঘাস প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়। এজন্য তাহাদিগকে 'ওষধি' বলে। তাল জাতীয় গাছ— যথা নারিকেল, খেজুর, গুপারি, সাগু, গোলপাতা প্রভৃতি— সাধারণতঃ বহুবর্ষজীবী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাল-জাতীয় গাছের মধ্যেও 'করিফা' (Corypha) নামক এক শ্রেণীর গাছ আছে যাহাদের জীবনে একবার মাত্র ফুল ফল হওয়ার পর তাহারা মরিয়া যায়। আব্রহ্ম-ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর ৪ প্রকার গাছ দেখা যায়। যথা—Corypha Elata, C. Umbraculifera, C. Talliera এবং C. Macropoda। এতন্মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের গাছ বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে প্রথমটি সাধারণতঃ 'বাজুর' ও দ্বিতীয়টি 'তালী' ও তৃতীয়টি 'তারীট' নামে পরিচিত। যদিও ইহাদের পাতা (ছবি দেখুন) দেখিতে তালের মত, কিন্তু উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্‌গণ ইহাদের ফুল ও ফল পরীক্ষা করিয়া খেজুর শ্রেণীর নিকটে ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'তালী' বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রোপিত হয়।

বর্ষায় তালগাছ।

এতদ্‌সঙ্গে 'তালী' বা করিফা 'আম্ব্রেকিউলিফেরা' (Corypha umbraculifera) গাছের যে ছবি প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ফুল ফল হওয়ার পর গাছগুলির কি দুরবস্থা হয়। বাঁ-দিকের গাছটিতে সবে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, আর ডান্‌দিকের গাছটিতে ছোট ছোট ফুল দেখা দিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ডানদিগের গাছের পাতা শুকাইয়া যাওয়ায় গাছটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই ইহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ফল পাকিয়া মাটিতে পড়ার পর অঙ্কুরোদ্গমের কিছুকাল মধ্যেই বাকী অংশও ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রকৃতির এমনই ব্যবস্থা! প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে এ গাছের ফুল ফল হয়। কখন কখন এ গাছ প্রায় ১০০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

সিংহলে উপরোক্ত করিফা আম্ব্রেকিউলিফেরা (Corypha umbraculifera) গাছের পাতা ছত্ররূপে ও পুঁথি লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; গাছের মধ্যভাগের কোমল অংশের গুঁড়া আটার ন্যায় রুটী প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। সেই রুটী খাইতেও প্রায় সাধারণ আটার রুটীরই মত। বীজের কঠিনাংশ মালা গাঁথিয়া ও (রঙাইয়া) নকল প্রবালরূপে ব্যবহৃত হয়, উহা হইতে সুন্দর ছোট ছোট বাটীও প্রস্তুত হয়। ইউরোপে এই বীজ হইতে সুন্দর সুন্দর বোতাম প্রস্তুত হয়। ব্যবসায়ীদিগের নিকট ইহা 'বাজার-বাটু' (Bazar batu), 'বাজুর-বাট' (Bajurbat) অথবা 'বাজুর-বাটম্' (Bajurbatum) বীজ নামে পরিচিত। বোম্বাই হইতে আরবদেশীয় লোকগণ কর্ত্তৃক এই বীজ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। উপরোক্ত জিনিষগুলি তৈয়ার করা তেমন খুব কষ্টসাধ্য নয়। বাঙ্গালাদেশেও কেহ এগুলি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বেশ হয়।

পি যেন ডি

শিবানী

শিবের বুকে শিবানীরে দেখেছি আজ প্রভাতকালে,
চন্দ্র যখন অস্ত গেল বনরাজির অন্তরালে।
ধবল দেহের অমল আলো মাঠের বুকে ছড়িয়ে আছে,
শ্যামা আমার শ্যামল বনের ছায়া হয়ে দাঁড়ায়েছে॥

আলো-ছায়ার মেশামিশি সাদা-কালোর লুকোচুরি,
বিশ্বে আমার ছড়িয়ে দিলে রাত্রি-দিনের কি মাধুরী।
শ্যামল বনের শতেক ফাঁকে শ্যামময়ীর হাসি জাগে,
তরুণ ভানু অরুণ আঁখির ভুবন-ভরা কিরণ ঢালে॥

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

মনসা পূজা

আমাদের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের "বাংলায় মনসা পূজা" পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের সামান্য কিছু বক্তব্য আছে, নিবেদন করিতেছি।

১। বাঙ্গালায় মনসা পূজা প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন-বাবু মহাভারত হইতে নাগজাতির বিষয়ে যাহা যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তার মধ্যে একটি বড় বিষয়কে উপেক্ষা করিয়াছেন। মহাভারতে বলদেবকে অনন্ত নাগের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদু বংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন রাম নির্জ্জনে যোগযুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে সহস্রশীর্ষ মহানাগ নিঃসৃত হইয়া সাগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে। ক্ষিতি-বাবু যে দিক দিয়া এই নাগ জাতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, সেইদিক হইতে ইহার কিরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে? রামায়ণে লক্ষ্মণ অনন্তাবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন কি না মনে পড়িতেছে না। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ অনন্তের অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অবতার-বাদের মধ্যে অনন্তের স্থান প্রাপ্তির কারণ কি? নাগগণ ইন্দ্রের ভক্ত, গরুড় বিষ্ণুর ভক্ত, তাই এই দুই জাতি পরস্পর শত্রু, ইহাই ক্ষিতি-বাবুর সিদ্ধান্ত; শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের শত্রু, সুতরাং নাগগণও শ্রীকৃষ্ণের শত্রু, ইত্যাদিও ঐ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। এখন জিজ্ঞাস্য—ঘোর শত্রু নাগ জাতির একজন কি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের স্থান অধিকার করিতে পারে? যদি বলা যায় পরে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তবে সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে বাসুকী নাগের ফণা-ছত্রের তলে ঢাকিয়া বৃষ্টি বজ্র হইতে রক্ষার কি ব্যাখ্যা হইবে?

২। মহাভারতে উতঙ্কের উপাখ্যান হইতে ক্ষিতি বাবুর সিদ্ধান্তের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় কি না?

৩। "আমাদের দেশের মারীভয়" "দেবীদের প্রকোপ"কে বুঝায় না। কেবল মনসা দেবীর "প্রকোপকে" বুঝায়। পাড়া-গাঁয়ে ওলাউঠা হইলে এখনো মহা সমারোহে মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

৪। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন "মনসা খোলা" আছে, এদেশে তেমন কোনো কিছু নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গে মনসা (সিজু) গাছের ডাল পুঁতিয়া কয়েক মাস সেই ডালের পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দশহরার দিনে এই ডাল বাড়ীতে পুঁতিতে হয়। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ, শূদ্রের বাড়ীতে প্রতি পঞ্চমীতে সেই ডালের পূজা হয়। শারদ বিজয়া দশমীতে তাহার বিসর্জ্জন। সেই দিন নবপত্রিকার সঙ্গে ঐ ডাল জলসই করিয়া দিতে হয়।

"চেংমুড়ী"র অর্থ মনসামঙ্গল-গায়কগণ বলিতে পারে না। তবে "কাণী"র একটা অর্থ তাহারা বলে। সে সম্বন্ধে মঙ্গল গ্রন্থে একটা উপাখ্যানও আছে। দুর্গার সঙ্গে মনসার বিবাদ ছিল, একটা কুশের খোঁচা দিয়া দুর্গা মনসার একটা চোখ কাণা করিয়া দিয়াছিলেন। মনসাও ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন—সমুদ্র মন্থনের সময় বিষপান করিয়া শিব অচেতন হইয়া পড়িলে অনন্যোপায় হইয়া দুর্গা মনসাকে আনিতে কার্ত্তিক গণেশকে পাঠাইয়া দেন। মনসা বলেন, দুর্গা না আসিলে যাইব না। পরে দুর্গা যান। মনসা বলেন, কোলে কর। দুর্গা তাঁহাকে কোলে লইলে মনসা চাপ দিয়া দুর্গার কটীদেশ বাঁকাইয়া দেন। দুর্গা দুঃখ করিলে, মনসা বর দেন, মহিষাসুরের কাঁধে পদ-অঙ্গুষ্ঠ দিয়া সিংহপৃষ্ঠে যখন দাঁড়াইবে, তখন তোমাকে এইজন্যই মানাইবে ভাল, সেই দিন তোমার এজন্য অনুশোচনা আর থাকিবে না। (বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল)

৫। চাঁদ সওদাগর যে এ দেশের লোক নয় ইহা এখনো উপযুক্ত ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। চাঁদের বাণিজ্য ব্যপদেশে দক্ষিণে যাতায়াত ছিল বটে। হেঁতালের নড়ি (হিন্তাল, হেমতাল) চাঁদের বড় প্রিয় ছিল। হিন্তাল সম্ভবতঃ সমুদ্রকূলের গাছ। বাঙ্গালায় হিন্তাল জন্মায় কি না জানি না।

বেহুলাকে দক্ষিণী মনে করিবার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। ডোম সাজিয়া শ্বশুরবাড়ীতে সংবাদ জানিতে যাওয়া বাঙ্গালিনীর পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। বালিকা-ব্রতের সাঁজ-পূজানীর ছড়ায় "ডোমনা ডুমিনী"র উল্লেখ আছে। পল্লীবালার পক্ষে এরূপ সাহসিনী হওয়া অসম্ভব নয়। কৃষকবধূ ক্ষেত আগলায়, গান করে, সংস্কৃত সাহিত্যেও তাহার উল্লেখ আছে। খুল্লনাও মাঠে মাঠে ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছিল। খুঁজিলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন সাহসিনী নারী অনেক মিলিতে পারে।

মনসার বিবাদ শিবের সঙ্গে ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিবাদ প্রধানতঃ ছিল চণ্ডীর সঙ্গে। সুতরাং ক্ষিতি-বাবু যে বলিতেছেন "শিব চণ্ডীকে স্বীকার করিলেও মনসার দাবিত্ব গ্রহণ করিতে নারাজ", ইহার মানে বোঝা যায় না। চাঁদ ছিলেন গন্ধেশ্বরীর ভক্ত। বিষ্ণু-পালের মনসামঙ্গলে আছে—"গন্ধেশ্বরী হাতে করি বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার"। গন্ধেশ্বরী দেবী দুর্গার অংশ। সুতরাং চাঁদকে শাক্ত বলাই ঠিক।

৬। আর একটা কথা, "মনে মাঙ্গী" "মাঞ্চাম্মা" "মনসা অম্মা" হইতে "মনসা মা" হওয়া স্বাভাবিক বটে। তেমনি "মনসা" হইতেও কি "মাঞ্চাম্মা" হইতে পারে না? বাঙ্গালার কোনো জিনিস দক্ষিণে যায় নাই, এ অনুমানই বা কিরূপে করা যাইতে পারে? সবই যে বিদেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে তাহারই বা মানে কি? আদান প্রদান তো পরস্পর হইতে পারে।

৭। ক্ষিতি-বাবুর নাগ ও পক্ষী জাতি বাঙ্গালার উপনিবাসী নহে। ছোটনাগপুর অঞ্চলকেও পণ্ডিতগণ নাগজাতির আদি বাসভূমি বলিয়া বর্ণনা করেন। পুরাণে বাঙ্গালীকে স্পষ্টই পক্ষী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা গিধোর (গিধর, গৃধ্র) অঞ্চলকে এই পক্ষী নামে কথিত জাতির আদি বাসস্থানের একাংশ বলিয়া মনে করি। সুতরাং এই দুই জাতির বিবাদ ও সন্ধির সূত্র এবং মনসা পূজার মূল বোধ হয় বাঙ্গালাতেই অনুসন্ধান করিলেই ভাল হয়।

শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মুসলমান মেয়েদের আত্মা আছে কি নাই

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে "পারস্যে নারী" শীর্ষক প্রবন্ধে মোস্লেম নারীর আত্মা সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক লিখিয়াছেন :—

"কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম-মতে (?) নারীদের কোন আত্মা নাই বলে—সেইজন্য খুব কম নারীই মস্‌জিদে যায়।" (৫৪৮ পৃঃ)

দেখা যাক "মুসলমান ধর্ম্ম-মতে" (অর্থাৎ কোরাণে) নারীর আত্মা সম্বন্ধে কি বলে :—

"এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে কেহই সৎকর্ম্ম করুক, এবং যদি সে বিশ্বাসী হয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি তিলার্দ্ধও অবিচার হইবে না।"

— (সুরা নেসা ১২৪ আয়েত)

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করিয়াছে, সে পুরুষই হউক বা নারীই হউক, এবং সে যদি বিশ্বাসী হয়, তবে অবশ্য আমি তাহাকে বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত রাখিব এবং অবশ্য তাহাদের সৎকর্ম্মের বিনিময়ে পুরস্কার দিব।" (সুরা নাহল, ৯৭ আয়েত)

"অনন্তর তাহাদের আল্লাই তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন (এবং বলিলেন) নিশ্চয়ই আমি অনুষ্ঠানকারীর অনুষ্ঠান বিফল করি না, স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, তোমাদের মধ্যে এক অন্য হইতে জাত।"—(সুরা আল্‌-এমরাণ, ১৯৪ আয়েত)

"তাহারা অনন্তকালের জন্য স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে—তাঁহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদিগের সহিত—যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে—(সুরা আন্‌ রাদ, ২৩ আয়েত)

"এবং আমি তাহাদিগকে (পরকালে) পবিত্রা সুন্দরীগণের সহিত মিলিত করিব।"

—(সুরা কা'হার, ৫৪ আয়েত)

নারী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্বন্ধেও কোরাণ বলিয়াছেন,—"তাহারা তোমাদের ভূষণ; এবং তোমরা তাহাদের ভূষণ। (সুরা বকর ১৮৭ আয়েত)

হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন—"স্বর্গ জননীর চরণতলে অবস্থিত।"

ইহাই গেল "মুসলমান ধর্ম্ম-মতের" কথা। লেখক মহোদয় এস্থলে বলিতে পারেন—তিনি পারস্যের প্রচলিত ধারণার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। নানা কারণে ওরূপ ধারণা বিদ্যমান থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যদি থাকে, তবে বলিতে হইবে পারস্যে কোরাণ নাই,—অথচ তাহারা মুসলমান, আর মুসলমান হইলেই কোরাণকে মানিয়া লইতে বাধ্য। অতএব উক্ত মত প্রচলিত থাকা একরূপ অসম্ভব।

লেখক মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গোলমেলেও বটে। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—"তবে কোন নারী যদি পুণ্যের কাজ কিছু করে, তবে তাহার স্বর্গে স্থান হইতে পারে। কিন্তু এই স্বর্গও পুরুষদের স্বর্গ হইতে অনেক খারাপ।" ইহা দ্বারাও অন্ততঃ এটুকু বুঝা যাইতেছে যে কোন কোন নারীর বেশ ভাল রকমই আত্মা আছে, কেন না তাহারা স্বর্গে যাইবে।

অন্যত্র লেখক বলিয়াছেন, "মেয়েদের একটু বয়স হইলেই তাহারা স্বর্গলাভের উপায় চিন্তা করে।" যাহাদের আত্মাই নাই, তাহারা আবার স্বর্গচিন্তা করে?

শেষভাগে লেখক বলিতেছেন—"তীর্থে মরণ হইলে তাহার স্বর্গলাভ হইবেই।"

উপরের কথাগুলি খুবই সামঞ্জস্যহীন বলিয়া বোধ হয়, এবং প্রকৃত তথ্যের উপর সত্যের আলোক-পাত করে। এই-সমস্ত কারণে মনে হয়, লেখক মহোদয় যেন উপযুক্ত পাত্র হইতে তাঁহার বিবরণ সংগ্রহ করিবার সুযোগ পান নাই।

গোলাম মোস্তফা

বর্ত্তমান শ্রাবণসংখ্যা প্রবাসীর "মহিলা মজ্‌লিসে" হেমন্ত-বাবুর লিখিত 'পারস্যের নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে সাধারণ মুসলমানসমাজকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। "কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মমতে নারীদের কোন আত্মা নাই বলে—সেইজন্য খুব কম নারীই মস্‌জিদে যায়।" এই মতটি হেমন্ত-বাবু কোথায় পাইয়াছেন?

মোহাম্মদ খলিলর্‌ রহমান

"পারস্যের নারী" নামক প্রবন্ধের প্রায় সমস্তই ইংরেজি বইএর সাহায্যে লেখা, তাহার জন্য উক্ত প্রবন্ধে অনিচ্ছাকৃত প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। "মুসলমান নারীদের আত্মা নাই"—এই কথা ভুল, তাহা স্বীকার করিতেছি, তবে তাহা ইচ্ছাকৃত নহে এবং কাহাকেও আঘাত করিবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লিখিত হয় নাই। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

পাখী

আকাশেতে বেড়িয়ে বেড়াও পাখী,
আমরা তোমায় খাঁচায় পুরে রাখি!
সকল ছেড়ে তোমার মত উড়্‌তে জানি না,
আকাশ-পথে তোমার ওড়া তাই ত মানি না।
আমরা মানুষ তবু তোমায় চাই,
তাই ত তোমায় বদ্ধ করি ভাই!

গহন বনে অনেক দূরে—দূরে
গান গেয়ে যাও আপন সুরে সুরে!
বাঁধন-হারা তোমার মত গাইতে জানি না,
গহন বনে তোমার গাওয়া তাই ত মানি না!
আমরা মানুষ তবু তোমায় চাই,
বাঁধা বুলি তাই ত শেখাই ভাই!

"বনফুল"

কান্তকবি রজনীকান্ত*

১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন প্রায় একবৎসর কাল উৎকট রোগে ভুগিয়া দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তিনি কুড়ি বৎসর ওকালতী করিয়াছিলেন এবং ওকালতীতে তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যশ ও সুখ্যাতি উকীল বলিয়া নহে, তাঁহার নাম ও পসার কবিতায়, গানে, সদালাপে, রসিকতায়, সৌজন্যে, ভালবাসায় ও দেশের প্রতি প্রাণের টানে। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন, সকলের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তাঁহার লোক চিনিবার শক্তি খুব ছিল, তাই তিনি মৃত্যুশয্যায় শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে আপনার জীবনচরিত লিখিবার ভার দিয়া যান। বার বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে নলিনী বাবুকে কেমন করিয়া চিনিলেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা এখন নলিনী বাবুকে বেশ জানি; তিনি যাহা ধরেন, প্রাণপাত করিয়াও তিনি তাহা করিয়া তুলেন। সে জন্য শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করেন না, কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করেন না, খরচকে খরচ জ্ঞান করেন না, দূর দূরান্তর যাইতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েন না। কোন কাজ হাতে লইলে তিনি তাহাতেই তন্ময় হইয়া যান। তাঁহার এই তন্ময়ভাব রজনীকান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার হাজার হাজার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, প্রেমিক ও ভক্ত থাকিলেও নলিনী বাবুকেই তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করেন। নলিনী বাবুও বার বৎসর কাল অকাতরে পরিশ্রম করিয়া, নানা স্থান হইতে অনেক মসলা সংগ্রহ করিয়া, পিজিয়া পিজিয়া সেই সকল মসলা হইতে এই সুপাঠ্য জীবনচরিতখানি বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন।

রজনীকান্ত তাঁহার জীবন সুখেই কাটাইয়া গিয়াছেন। এমন একখানি জীবনচরিত যে ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে মরণেও তাঁহার সুখ। নলিনীরঞ্জন একাধারে রজনীকান্তের জীবনচরিত-লেখক ও তাঁহার কাব্যের টীকাকার—একাধারে বস্‌ওয়েল ও মল্লিনাথ। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জন্‌সনের নাম এত দিনে সকলেই ভুলিয়া যাইত, মল্লিনাথ না হইলেও কালিদাসের কবিতা দুর্ব্যাখ্যা-বিষমূর্চ্ছিতা হইয়া এত দিনে কোথায় তলাইয়া যাইত, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। নলিনী বাবু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া রজনীকান্তের জীবনের সকল ঘটনা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহার ছোট ছোট পদ্যগুলি ও গানগুলি কোথায় কি ভাবে লেখা হইয়াছিল, তাহার পূরা ইতিহাস দিয়াছেন। খুঁজিয়া

কান্তকবি রজনীকান্ত
মৃত্যুর পনের দিন পূর্ব্বে

* শ্রী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-প্রণীত। হৃষীকেশ সিরিজ গ্রন্থাবলীর চতুর্থ গ্রন্থ। মূল্য চারি টাকা। বহু-চিত্র-শোভিত, আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪০৫ পৃষ্ঠা। কলিকাতা ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে বেঙ্গল বুক কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জিনিস বাহির করা এক কাজ, আর সেইগুলিকে সাজান আর-এক কাজ। নলিনী বাবু দুই কাজেই যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন।

গানগুলির ব্যাখ্যাও বেশ জমিয়াছে। কোথায় পুরাণ গানের দুই চারিটি কথা বদ্‌লাইয়া রজনীকান্ত গানের ভাব গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়াছেন, তাহাও দেখান হইয়াছে। আবার কোথায় একটি কথার একটি অক্ষর বদ্‌লাইয়া ব্যঙ্গরসের চূড়ান্ত করা হইয়াছে, তাহাও দেখান হইয়াছে। সুতরাং নলিনী বাবু একাধারে বস্‌ওয়েল ও মল্লিনাথ, এ কথাটা আমি যে বড় বাড়াইয়া বলিয়াছি, তাহা কেহ যেন মনে না করেন।

একজন লোকের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার সব ইতিহাস সংগ্রহ করা ত কঠিনই। সেই ইতিহাস হইতে তাঁহার জীবনের, প্রতিভার, চরিত্রের বিকাশ দেখান আরও কঠিন। এই বইখানিতে নলিনী বাবু দুইই খুব ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহাকে যে কি পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। রজনী বাবু আট মাস হাঁসপাতালে ছিলেন, এই সময় তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া যায়। তিনি কথা একেবারে কহিতে পারিতেন না। কাগজের উপর পেন্‌সিল দিয়া লিখিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। জলতৃষ্ণা লাগিলে লিখিয়া জল চাহিতেন। ক্ষুধা লাগিলে লিখিয়া খাবার চাহিতেন। কেহ আসিলে তাঁহার সঙ্গে লিখিয়া আলাপ করিতেন, তাহাতে বার তারিখ বড় লেখা থাকিত না। কাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, তাহারও সূচনা থাকিত না। তাহার উপর আবার কাগজ বাঁচাইবার জন্য একবার লেখা কাগজের উপর মক্‌স করিতে হইত। একবার আড়াআড়ি লিখিয়াছেন, আবার লম্বালম্বি লিখিতে হইত। এইরূপে আট মাসে রাশি রাশি কাগজ জমিয়াছিল; কেহ সে সব কাগজ সাজাইয়াও রাখেন নাই। নলিনী-বাবু সেই কাগজগুলি পড়িয়া, কবে কাহার সহিত কি আলাপ হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে বাহির করিয়াছেন এবং "হাসপাতালের রোজ-নামচা" নাম দিয়া কয়েকটি সুন্দর অধ্যায় আমাদের উপহার দিয়াছেন। আমি ত পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। রজনী বাবুর ধৈর্য্য, প্রশান্ত ভাব, ঈশ্বর-প্রেম, ভগবানের উপর নির্ভর, এ সব ত বিস্ময়ের কথা; তাহার উপর এই দারুণ যন্ত্রণার সময়েও তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা ত আরও বিস্ময়কর। তাহার উপর নলিনী বাবুর খাটুনি আর-এক বিস্ময়ের কথা।

এই নিদারুণ অবস্থায় রজনী বাবুর চরিত্রের অনেক সদ্‌গুণ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর নলিনী বাবু দেখাইয়াছেন যে, এই সদ্‌গুণগুলি রজনীকান্ত তাঁহার পিতৃপিতামহ হইতে পাইয়াছিলেন। বাল্যে সেই সব সদ্‌গুণের কেমন অঙ্কুর হইয়াছিল; কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহা কেমন করিয়া বাড়িয়াছিল এবং হাসপাতালে তাহা কেমন করিয়া পুষ্প-ফল-সুশোভিত হইয়াছিল। এইটুকুই ত জীবন-চরিতের বাহাদুরি। এই নাস্তিকতার দিনে, এই ঘোর স্বার্থপরতার দিনে, যে সময়ে যশ ও অর্থের জন্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে শুদ্ধ লালায়িত, তাহা নহে—অনেক অকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না—বরং সেই অকুণ্ঠার জন্য গর্ব্ব ও অহঙ্কার করেন, সেই সময়ে ভগবানের উপর এত নির্ভর, এত আস্তিকতা, এত বিনয়, এত আত্মত্যাগ রজনী বাবু কোথা হইতে পাইলেন?—এ কথা সহজেই লোকের মনে উদয় হয়। নলিনী বাবু দেখাইয়াছেন, এই আস্তিকতা রজনী বাবু তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা যদিও গবর্ণমেন্টের বড় চাকরি করিতেন, তিনি একজন পরম ভক্ত, সুকবি ও পরম সাধক ছিলেন এবং ছেলেটিকেও উপদেশ দিয়া, আপনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি ভক্ত ও সাধক করিয়া তুলিয়াছিলেন। কবিত্বশক্তিও রজনী বাবুর পিতার যথেষ্ট ছিল; সে শক্তিও রজনীকান্ত পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। সে শক্তি কলেজে কেরাণীকে ব্যঙ্গ করিয়া, দু চারটি ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া ক্রমে বিকাশ হইতেছে, শেষ রোগশয্যায় তাঁহার সেই শক্তিই রহিল, আর সকল শক্তিই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যে শক্তির বিকাশে শুদ্ধ রাজসাহী নহে, সমস্ত বাঙ্গালা মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াছি, তুলসীদাস বিবনিক রোগে পীড়িত হইয়া অসীম যন্ত্রণার মধ্যে "হনুমানবাহক" নামক একটি

দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া, ইষ্টদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইয়াছিলেন আর সমস্ত হিন্দুস্থান মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীদাসের সে যন্ত্রণা চারি দিন মাত্র ছিল, পাঁচ দিনের দিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রজনী বাবুর ভীষণ যন্ত্রণা আট মাস। এরূপ যন্ত্রণায় লোকে অধীর হয়, আর রজনী বাবু তাহাতেই আমাদের অনেক "অমৃত" দিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা এই সময়েই অধিক জমিয়াছে। অল্প কথায় প্রগাঢ় ভাব এই সময়েই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার "অমৃত", "আনন্দময়ী", "অভয়া" এই সময়েরই লেখা। বঙ্গবাসী তাঁহার এই সময়ের কবিতার বেশ আদর করিয়াছিল।

নলিনী বাবু একটি ভাল কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখ-দৈন্য ও দুর্দ্দশার সময় কিছুমাত্র সাহায্য না করিয়া বাঙ্গালী যে কলঙ্ক মাখিয়াছিল, তাহার কতকটা রজনীকান্তের ঘোর বিপদে অকাতরে সাহায্য করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। সকলেই রজনী বাবুর দুঃখে দুঃখিত ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। বাক্যে, কার্য্যে, অর্থে, সেবায়, নানাবিধ প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ইঁহার ত দানের পার নাই। কিন্তু দান অপেক্ষা ইঁহার আর-এক বড় গুণ আছে, সেটা এই যে, ইনি সকলের ব্যথায় ব্যথী; এরূপ কোমল অন্তঃকরণের লোক জগতে দুর্লভ। তিনি যে রজনীকান্তের বিপদে তাঁহার ব্যথায় ব্যথী হইবেন, তাহা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। আর-একজন রজনীকান্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন, তিনি দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়। ইনি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, অশেষ গুণে গুণান্বিত, তিনি স্বতঃ পরতঃ, পরমেশ্বরতঃ, অনবরত রজনী-বাবুর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একটি কথায় একটু ব্যথিত হইয়াছি, তিনি রজনী-বাবুকে "রাজসাহীর কবি" বলিয়াই সাহায্য করিয়াছেন। রাজসাহীতে জন্মিলে কি হয়, রজনী-বাবু যেমন সমস্ত বাঙ্গালার কবি, কুমার শরৎকুমারও সেইরূপ সমস্ত বাঙ্গালার সম্পত্তি; তাঁহার এরূপ সঙ্কীর্ণতাটা ভাল দেখায় না।

কিন্তু যে বাঙ্গালী মাইকেলকে ও হেম-বাবুকে কষ্ট পাইতে দেখিয়াও কিছু করে নাই, সে বাঙ্গালী রজনী-বাবুর জন্য এত করিল কেন? ইহার কারণ নলিনী-বাবু খুলিয়া দেখান নাই। মাইকেল ও হেম-বাবুর সময় বাঙ্গালী যে একটি জাতি, বাঙ্গালীর এ উদ্বোধনটা হয় নাই; তাঁহারাও তাঁহাদের বাক্যে, কার্য্যে এবং কবিতায় সে উদ্বোধনটা জন্মাইয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু রজনী-বাবুর সময় বাঙ্গালার হাওয়া বদলাইয়া গিয়াছিল এবং সে বদলাইবার তোড়ের মুখে তিনি পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" যখন লেখা হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালীরা উহা হইতে আমরা যে একটা জাতি, সেটা বোধ করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রথম প্রথম উহার বড় আদর হয় নাই। ত্রিশ বৎসর পরে যখন জাতির উদ্বোধ হইল, তখন উহারা "বন্দে মাতরমে"র গভীর অর্থ বুঝিতে পারিল ও তাহার আদর করিল। রজনী-বাবু এই উদ্বোধের সময়ের কবি এবং উদ্বোধে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গানটি এই উদ্বোধের প্রাণ বলিলেও হয়। রজনী-বাবু যখন এই গান গাহিতে গাহিতে কলিকাতার পথে দলবল লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল—সে যে কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা রামেন্দ্র-বাবুর ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বর্ণনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা ত একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

নলিনী-বাবুও রজনীকান্তের বাল্য ও যৌবনের ইতিহাস দিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই গানেই রজনী-বাবুর কবিত্ব-শক্তির পূর্ণ বিকাশ, এই গানেই তাঁহার খ্যাতি, এই গানেই তাঁহার প্রতিপত্তি, এই গানের জন্য লোকে তাঁহার উপাসনা করিয়াছে, এই গানের জন্য তিনি সকল বাঙ্গালীর আত্মীয় ও স্বজন হইয়াছিলেন, এই গানের জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভক্তি করিত ও ভালবাসিত।

তাই বলিয়াই কি তিনি এক গানের কবি? একে-

বারেই নহে। ওটা তাঁহার কবিত্বশক্তির একদিকের বিকাশ মাত্র, তাঁহার দেশভক্তির উদাহরণ মাত্র। কিন্তু আমরা বলি, তাঁহার কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ ভগবানের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তিতে। যখন তাঁহার সব গেল, ব্যবসা গেল, তালুক মুলুক গেল, স্বাস্থ্য গেল, বাক্‌শক্তি গেল, তখনও তিনি লিখিতেছেন,—ভগবান্, তুমি আমার সর্ব্বস্ব লইয়া, আমি যে কত ছোট আর তুমি যে কত বড়, সেইটি বুঝাইয়া দিতেছ। আমার সব গর্ব্ব, সব অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছ, এখন আমি কি বস্তু, তাহা বুঝিয়াছি।

হাসপাতালের অধ্যায়টি পড়িলে এই সমস্ত বিষয়গুলিই আমরা দেখিতে ও বুঝিতে পাই। বাঙ্গালা ভাষায় ত এ জিনিস পড়ি নাই, অন্য কোন ভাষায়ও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার কোন জীবন-চরিতে এ অপূর্ব্ব সম্পদের সমাবেশ দেখি নাই। এই অপূর্ব্ব ও সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশে সাহায্যের জন্য কুমার নরেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীর সেবা করুন।

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

লক্ষ্মী

ক্ষীর সাগরের বক্ষ হতে সোনার দুকূল পরে'
কে আজিকে উদয় হল আঁধার ধরা 'পরে!
শঙ্খ-পরা হাত দুখানি, সীমন্তে সিঁদূর,
আল্‌তা দিয়ে বরণ-করা চরণে নূপুর।
অরুণ চরণ যেথায় পড়ে
কমল ফোটে থরে থরে;
সবাই নমে ভক্তি-ভরে;
সবাই ঘরে পাবার তরে গাহে একই সুর॥
ঝাঁপি-ভরা রত্নমণি, চক্ষে ঝরে স্নেহ,
ধান্য হাতে নিয়ে আসেন পূর্ণ করি' গেহ,
কোমল করের পরশ পেয়ে জুড়ায় সবার দেহ।
আপন তারে করে যে তায় করে না সে দূর,
সদয় হলে সে জননী সদাই ভরপুর॥

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

কালো মেঘ

মেঘখানি সে বড়ই কাল দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়,
দেখ্‌তে পেলাম প্রত্যুষেরি পূর্ব্ব-সীমা-তটে;
প্রভাত-আলোয় প্রাণের কালী মুছ্‌ল না তার হায়,
মেঘখানি সে—হায় কালো মেঘ! অম্‌নি কালো বটে!
আকাশ তারে হাওয়ার ছলে বল্‌লে ঠেলে—সরো,
তুমি ত নও সূর্য্যদেবের সোনার দেশের কেহ।
মেঘ বলে,—হায়! কোথায় যাব, কোথায় পাব স্নেহ?
আঁধার সারা রাতটি হেঁটে শ্রান্ত আমি বড়।
মাটির ধরা মর্ম্মরিয়া ডাক্‌লে তারে কাঁদি,—
ও কালো মেঘ, হেথায় এস, আমিও আর-এক কালো,
আমার কালো মাটির হিয়া তোমায় দিলাম পাতি।
মেঘ কহে,—মোর মাটির দেবি, তোমায় বাসি ভালো।
বইল মলিন মেঘের বুকে বিমল প্রীতির ধারা,
আপ্‌নাকে সে বিলিয়ে দিয়ে শুভ্র হল খাঁটি;
দাঁড়াল দিক্‌-দুয়ার খুলে দ্যুলোক-অঙ্গনারা,
উঠ্‌লো শত মল্লিকাতে ভরে' ধরার মাটি!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বিদেশ

ইতালীতে বিপ্লবের সূচনা—

যুদ্ধের পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর ইউরোপে যে অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত বাধিয়া উঠাতে উভয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে। এই বিরোধটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা দিয়াছে ইতালীতে; সেখানকার ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব এই দ্বন্দের ফলে।

পূর্ব্বে শ্রমজীবীদের যখন দুর্দ্দশার সীমা ছিল না তখন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের দুঃখ মোচনের প্রয়াস পাইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও ধনীর দ্বন্দ্বে তাহাদের স্বার্থ বড় জড়িত ছিল না। শিক্ষক, লেখক, চিত্রকর, প্রভৃতি চিন্তাজীবী অথবা শিল্প-স্রষ্টা লোকেরা যেমন ধনমদে মত্ত হইবার সুবিধা পাইত না তেমনই অভাব-অনটনের তীব্র তাড়নাও তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে নাই। তাই কর্ম্মের অবকাশে তাহাদের তরুণ প্রাণ দীন-দুঃখীর কষ্টে ব্যথিত হইয়া উঠিবার অবসর পাইত। তাই শ্রমজীবী আন্দোলন, সমত্ব আন্দোলন, গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি যাবতীয় সাম্যযজ্ঞের পুরোহিত হইতেন তাঁহারাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণ-সম্প্রদায়ের মন ছিল সাম্যের আগুনে রঞ্জিত, তাই তাহারা সামাজিক ন্যায়ের সন্ধানী ছিলেন, আর ছিলেন অন্যায়ের প্রতিরোধী।

কিন্তু যুদ্ধের পর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথম পরিবর্ত্তন এই যে পূর্ব্বে যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের যেখানে কোনও স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল না সেখানে এখন পরস্পরের স্বার্থে আঘাত বাজিয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া নির্ম্মাতারা (manufacturers) অসম্ভব রকম লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধের পর শ্রমজীবী-সম্প্রদায় সেই লাভের অংশ দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন। বোল্‌শেভিক আন্দোলন যাহাতে না জাগিয়া উঠে সেই উদ্দেশ্যে ধনীরাও সহজেই শ্রমীর দাবী মানিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শ্রমীর দাবী মানিয়া লাভের গণ্ডা হইতে শ্রমীর কড়াটি বুঝাইয়া না দিয়া ধনী, ক্রেতার নিকট হইতে সেইটি আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা পাইলেন। ইহাতে লোক্‌সান হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সব-চেয়ে বেশী। তাহাদের আয় বাড়িল না, অথচ নিত্য-ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গেল, তাহাতে তাহাদের কষ্টের আর সীমা রহিল না। শ্রমী ও মধ্যবিত্তের আয়ের মাপকাটি উল্টাইয়া গেল। শ্রমীর আয় দ্রুত-গতিতে বাড়িয়া চলিল, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়া গেল বটে কিন্তু ব্যয়ের অঙ্ক ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াতে অবস্থা-বিপর্য্যয় যেরূপ হইল তাহাতে শ্রমিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার উপর আবার শ্রমজীবী-সম্প্রদায় বুদ্ধিজীবীদিগের প্রতি অবিচার করিতে লাগিলেন। বোল্‌শেভিকদিগের মূলমন্ত্র "অলসের অন্নপানের অধিকার নাই, কর্ম্ম না করিলে অন্ন মিলা অনুচিত" তাঁহাদিগের জীবনের বীজমন্ত্র করিয়া তুলিতে গিয়া তাঁহারা বুদ্ধি-জীবীদিগের প্রতি মহা অবিচার আরম্ভ করিলেন। কর্ম্ম অর্থে তাঁহারা একমাত্র দৈহিক শক্তির ব্যবহার বুঝিলেন, চিন্তাশক্তির ব্যবহার যে অলসতা নহে, বুদ্ধিজীবীরাও যে কর্ম্মপটু, একথা তাঁহারা স্বীকার না করিয়া বুদ্ধিজীবীদিগকে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতালীর হাটে ঘাটে মাঠে, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার শিক্ষক কেরানীর দল অপমানিত হইতে লাগিলেন। মস্তিষ্ক-পরিচালনার মূল্য এইরূপে অপমানের মালা হইয়া উঠিল।

এদিকে আবার দেশের আর্থিক দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের বিষময় ফল লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিল। জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধে যেমন সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিল, ধ্বংসলীলার তাণ্ডব তেমনই আবার যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিল। শ্রমিকের দল চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন তুলিলেন।

দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই সৈনিক হইয়াছিলেন সব চেয়ে বেশী। শ্রমিকেরা সেই সকল যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিকদিগকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই তাহারা আদর-সম্মানের পরিবর্ত্তে এইরূপে অভিনন্দিত হইয়া যে শ্রমিক-দিগের প্রতি তিক্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এইরূপে নানা কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা শ্রমিকদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।

সেই বিরক্তিকে আশ্রয় করিয়া সাম্যবাদীদিগের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সৃজন করিলেন ইতালী-দেশীয় রাষ্ট্রবিদ্ পণ্ডিত সেনর মুসোলিনী। এই আন্দোলনের নাম ফ্যাসিষ্টি (Facisti) আন্দোলন। সাম্যবাদকে ইতালী হইতে উৎখাত করিয়া ফেলা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—তাহা ছলেই হউক আর বলেই হউক।

কাজেকাজেই ফ্যাসিষ্টি ও শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠিল, স্থানে স্থানে সেই দ্বন্দ্ব রক্তপাতেও পর্য্যবসিত হইল। ব্যাপার এমনই গুরুতর আকার ধারণ করিল যে দেশে নিরাপদে বাস করা দায় হইয়া উঠিল।

এরূপ উৎপাত তো কোনও রাজশক্তি সহ্য করিতে পারে না। ইতালী সরকার তাই উভয় দলকে শাসন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল যে ইতালী সরকার উভয়দলের কাহারও সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইতালীর গণ্যমান্য বহু লোক, এমন কি মহাসভার অনেক সভ্য, গোপনে গোপনে ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন থাকাতে তাঁহাদের

চেষ্টাতে ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। মন্ত্রী-সভার এই ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হইয়া ইতালীর জাতীয় মহাসভাতে বিগত ১৯শে জুলাই, দেশে শান্তি-স্থাপনে মন্ত্রীসভার অক্ষমতার জন্য, মন্ত্রীসভাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া একটি মন্তব্য গৃহীত হয়। ফলে প্রধান মন্ত্রী সেনর ফ্যাক্টা পদত্যাগ করেন। সেনর মুসোলিনী মহাসভাতে বক্তৃতা করিতে করিতে বলিলেন যে যদি ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভা গণতন্ত্রের সহিত কোনও প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করে তাহা হইলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন এবং সুদক্ষ সাহসী ও সুপরিচালিত সেনানী পরিচালনা করিয়া তিনি ইতালীর ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়-ভুক্ত লোক বোলোনা, মিলান, পিকাঞ্জা প্রভৃতি স্থানে শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী-সভার পতনের পর নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। সেনর অর্ল্যাণ্ডো মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক একযোগে কাজ করিতে পারে তিনি তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন সাধারণ ক্যাথলিক সম্প্রদায় (Catholic Popular Party)। মহাসভাতে এই দলের আধিপত্য বেশী। ইঁহারা ফাসিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কাজ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। ফ্যাক্টার পূর্ব্বে বনোমি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার দেওয়া হইল। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইলেন না। ব্যাপার দেখিয়া ইতালীর সুবিখ্যাত রাষ্ট্রীয় নেতা জিওলেট্টি বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ভাগ্যে আমি মহাসভার সভ্য হইবার সুবিধা এইবার পাই নাই; তাহা না হইলে আমার প্রতি এই অসম্ভব কার্য্যের ভার অর্পিত হইত। অকৃত কর্ম্মের হস্ত হইতে আমি ভগবানের কৃপায় নিস্তার পাইয়াছি।" কেহই মন্ত্রীসভা গঠনে কৃতকার্য্য না হওয়াতে সেনর ফাক্টাকেই পুনরায় সেই ভার দেওয়া হয়। তাঁহার পুরাতন মন্ত্রী-সভাই পুনর্নির্ব্বাচিত হইল। ফাক্টা কার্য্য গ্রহণের পূর্ব্বে মহাসভার বিশ্বাস তাঁহার প্রতি আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার প্রতি নির্ভর-জ্ঞাপক প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের ইচ্ছায় গৃহীত হওয়াতে তিনি পদগ্রহণ করিয়াছেন। ফাক্টা বলিতেছেন, দেশের শাসন-ব্যয়-সংক্ষেপ ও দৃঢ়তার সহিত অরাজকতা নিবারণ তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। প্রয়োজন হইলে তিনি ফ্যাসিষ্টি-হাঙ্গামা নিবারণ কল্পে বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেশের প্রকৃত হিতসাধন বর্ত্তমান অবস্থায় এক প্রকার অসম্ভব। যেরূপ দেখা যাইতেছে, রক্তের স্রোতেই ইহার একটা মীমাংসা হইবে—বাহুবলের সেই মীমাংসা প্রকৃত কল্যাণকর কি না তাহা কে বলিবে?

যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ-সমস্যা—

যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গকে যুদ্ধোপকরণ ও আহার্য্য-সামগ্রী পরস্পরের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইয়াছিল এবং এক মণ্টিনিগ্রো ও সার্ব্বিয়া ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্য দ্রব্যসম্ভার জোগান দিয়া নগদ মূল্য পায় নাই। এই জোগানের সূত্রেই ফরাসী ও ইতালী ইংরেজ ও মার্কিনের নিকটে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ইংরেজের মার্কিনের নিকট ঋণ অনেক জমিয়া উঠে। ফ্রান্স ইংলণ্ডের নিকট ইস্পাত ও আমেরিকা হইতে রাসায়নিক দ্রব্যসম্ভার ও গম বহুল-পরিমাণে ক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং ইহার মূল্য স্বরূপ ফরাসী মুদ্রা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রেরণ না করিয়া ইংরেজ ও মার্কিন রাজকোষ হইতে পাউণ্ড ও ডলার ধার করিয়া বিক্রেতাদিগের মূল্য চুকাইয়া দেওয়া হয়। ফরাসীকে ফ্রাঙ্কে দাম দিতে না হওয়াতে সন্ধির পূর্ব্বে ফ্রাঙ্কের দাম কমে নাই। কিন্তু যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গের রাজকোষ হইতে যে ঋণ দান করা হইয়াছিল তাহা তো আর বহুকালের জন্য চলিতে পারে না? যুদ্ধ-শেষে যুদ্ধঋণের একটা বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কিন্তু ঋণভার এত বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহা শীঘ্র শোধ করিবার বন্দোবস্ত করা অনেকগুলি রাজ্যের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

সমর-ব্যয় যে যুযুৎসুরাজ্য-সমূহের অধিকাংশকেই একেবারে দেউলিয়া করিয়া দিবে, বার্ত্তাশাস্ত্র-বিশারদ কিন্‌স্ বহু পূর্ব্বেই 'যুদ্ধের আর্থিক কুফল' (Economic Consequences Of War) নামক পুস্তকে দেখাইয়াছিলেন।

ধ্বংসোন্মুখ রাজ্যগুলি আর্থিক দুর্গতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াসে যে-সকল উপায় খুঁজিতে লাগিলেন তাহা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা কলুষিত থাকায় তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ইউরোপের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ১৯০৮ সালে নভেম্বর মাসে ফরাসী অর্থসচিব ক্লজ (Klotz) বৃটিশ মার্কিন ও ফরাসী অর্থসচিব-গণকে লণ্ডন-নগরীতে এক আলোচনা-সভায় যোগ দিয়া যুদ্ধঋণের একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সেই সময়ে ইংরেজ মন্ত্রীসভা-নির্ব্বাচন লইয়া ব্যস্ত থাকায় কোনও আলোচনা-সভা বসিবার সুযোগ হয় নাই।

নির্ব্বাচনের পর অষ্টেন চেম্বারলেন অর্থসচিব নির্ব্বাচিত হন। তিনি যুক্তরাজ্যের সহিত একটা বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর কি না জানিবার জন্য মার্কিন অর্থসচিবের সহিত পত্র-ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। মার্কিন অর্থসচিব কর্ণেল হাউসের ব্যবহারে বুঝা গেল যে যুক্তরাজ্য সহজে কোনও বন্দোবস্তে আসিতে সম্মত হইবেন না। ফ্রান্সের ঋণ তাঁহারা কিছুকাল পর্য্যন্ত আদায়ের চেষ্টা না করিতে পারেন কিন্তু ইংরেজের ঋণ তাঁহারা বেশীদিন ফেলিয়া রাখিবেন না। কারণ তাঁহারা বলেন, ইংরেজের রাজস্বের অবস্থা কোনওক্রমে শোচনীয় বলা যাইতে পারে না, বরং বেশ অবস্থাপন্নই বলিতে হয়। ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যও ফ্রান্স বা মিত্রশক্তিবর্গের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কাজেকাজেই ইংলণ্ডকে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি দিবার কোনও সঙ্গত কারণ মার্কিন দেখিতে পাইলেন না।

মার্কিনের মনোভাব বুঝিয়া ইংরেজও আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফরাসীকে চাপ দিবার চেষ্টা পাইলেন। ফরাসী জাতি বিপদ গণিয়া আত্মরক্ষার্থে তাঁহাদের ঋণভারের সমস্তটাই জার্ম্মানীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাই জার্ম্মানীর নিকট হইতে যতশীঘ্র সম্ভব ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইবার আগ্রহাতিশয্য দেখা যাইতে লাগিল।

ফ্রান্সের এই অত্যধিক দাবীর চাপে জার্ম্মানীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল। জার্ম্মান সরকার নানাপ্রকারের নূতন কর স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে জার্ম্মান মার্কের দাম অসম্ভবরূপে কমিয়া যাওয়াতে জার্ম্মানীর প্রজাসাধারণের আপেক্ষিক আয় কমিয়া গেল। কিন্তু আয়কর পূর্ব্বের ন্যায় থাকাতে অল্প আয়ের লোকদিগের কষ্ট অনেক বাড়িয়া গেল। দেশের দুর্দ্দশা বাড়িয়া উঠাতে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি হইতে লাগিল। পথের ভিখারীকে মাল বিক্রয় করা সম্ভবপর নহে। তাই জার্ম্মানীর এই দুর্দ্দশায় ইংরেজ বিপদ গণিলেন। জার্ম্মানী ইংরেজের একজন বড় খরিদ্দার। তাঁহার অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা ইংরেজের বাণিজ্য-সংহতি ও অর্থসাম্যকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

তাই দায়ে ঠেকিয়া ইংরেজ ফরাসীজাতির নিকট প্রস্তাব করিলেন যে মিত্রশক্তিবর্গ পরস্পরের ঋণ কিছুদিনের জন্য ভুলিয়া থাকিবেন। ফরাসী যদি ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার সময় বেশ ধীর ভাবে

জার্ম্মানীর ক্ষতিপূরণের সামর্থ্য বিচার করিয়া চলেন তবে ইংরেজ ফরাসীর ঋণের জন্য কোনও গোলযোগ করিবেন না।

ইংরেজের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া ফ্রান্স জার্ম্মানীর প্রতি চাপ কিছুদিনের জন্য কমাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মানীর প্রকৃত অবস্থা যে প্রকাশ পায় নাই, তাহার দুর্দ্দশার অধিকাংশটাই যে লোক-দেখান, ভিতরে ভিতরে তাহার অবস্থা যে বেশ স্বচ্ছল এ বিশ্বাস ফ্রান্সের থাকাতে ফ্রান্স মধ্যে মধ্যে জার্ম্মানীর প্রতি জোর করিতেও ছাড়িতেছিল না।

মার্কিনে ও ইংরেজে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আবার অন্যদিকে বাড়িয়া উঠাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে। তাই মার্কিন আবার ইংরেজকে ঋণ শোধ করিবার তাগিদ আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজও আবার বাধ্য হইয়া ফ্রান্সকে তাগিদ দিতেছেন। ফ্রান্স আবার জার্ম্মানীকে চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু ইউরোপের রাজ্য-সমূহের রাজস্বের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা দুইটি উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী আয়ব্যয়ের খসড়াতে (budget) জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী সম্পূর্ণরূপে আদায় হইলেও ১৬২৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ফাজিল (deficit) থাকে।* কিন্তু জার্ম্মানীর নিকট হইতে দাবীর সমস্ত টাকা আদায় হওয়া অসম্ভব। কাজেকাজেই অভাবের অঙ্ক আরও বাড়িয়া যাইবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জার্ম্মান রাজস্বের আয়ব্যয়ের যে খসড়া প্রস্তুত হয় তাহাতে দেখা যায় যে ৬৩০০০০ লক্ষ মার্ক কম পড়িতেছে, এবং সাত মাস শাসনকার্য্যপরিচালনেই দেখা গেল যে খসড়াতে যে আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে আয় অনেক কম হইয়াছে এবং ব্যয়ও বেশী হইয়াছে; কাজেকাজেই তহবিলে এই সাত মাসেই ৫২৫০০০ লক্ষ মার্ক কম পড়িয়াছিল। অতএব জার্ম্মান জাতীয় ঋণ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক দুর্গতি এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে কোনও পাওনা বর্ত্তমান সময়ে কাহাকেও দেওয়া তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার না হইলে জার্ম্মানী আর কাহাকেও কোনও টাকা শোধ দিতে পারিবে না। তাই জার্ম্মান সরকার মিত্রশক্তিবর্গকে অনুরোধ করিয়াছেন যে জার্ম্মানীর কোষ শূন্য থাকায় জার্ম্মানীর দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা যেন আপাততঃ আদায় করা স্থগিত থাকে।

১৩ই জুলাই কমন্স সভাতে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ বলিলেন, "জার্ম্মান সরকারের এই অনুরোধ মিত্রশক্তিবর্গের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তবে এ সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের কর্ত্তব্য কি তাহা না বলিয়া তিনি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে জার্ম্মান সরকারকে অর্থ-নৈতিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য করা উচিত। এবং তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী আপাততঃ স্থগিত রাখা বিধেয় হইলে তাহাই করিতে হইবে।"

ফরাসী মন্ত্রী পঁয়কারে বলিলেন যে, "জার্ম্মানী যে পর্য্যন্ত না প্রমাণ করিতে পারিবে যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া যাহা দেওয়া সম্ভব তাহা দেওয়া হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত পাওনা স্থগিত রাখিবার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে না। ফরাসী সরকার মনে করেন যে জার্ম্মান সরকার দেনা ফাঁকি দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কাজেকাজেই আপনার প্রাপ্য বুঝিয়া পাইতে ফরাসী সরকার চেষ্টা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগেও ফ্রান্স কুণ্ঠিত হইবে না।"

১লা আগষ্ট তারিখে ইংরেজ সরকারের তরফ হইতে লর্ড ব্যালফুর, ফরাসী, ইতালী, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, রুমেনিয়া ও পর্ত্তুগাল সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, "ইংরেজ সরকারকে মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পরের পাওনার দাবী কিছু না লইয়া চুকাইয়া ফেলিতে যে মিত্রশক্তিবর্গ অনুরোধ করিয়াছেন তাহা ইংরেজ সরকার গ্রহণ করিতে পারেন না; কেননা মার্কিন ইংরেজ সরকারের ঋণ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। মার্কিনের পাওনার সমস্ত টাকা ইংরেজ বুঝাইয়া দিবেন আর ইংরেজ তাঁহার পাওনা অনাদায় রাখিবেন, এরূপ সর্ত্তে ইংরেজ সরকার সম্মত হইবেন কি প্রকারে? ইংরেজের নিকট মার্কিনের পাওনা মোট ৮৫০০ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের নিকট ইংরেজ সরকারের পাওনা ৩৪০০০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ মার্কিনের পাওনার চারগুণ।" ব্যালফুর ফরাসী সরকারকে জানাইলেন যে, "ইংরেজ সরকার এতদিন পর্য্যন্ত দেনার টাকা কিংবা সুদের টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ দেন নাই, কিন্তু এখন মার্কিনের চাপে বাধ্য হইয়া ফরাসী সরকারকে জানাইতেছেন যে তাঁহারা ইংরেজের নিকট ফ্রান্সের ধারের টাকা শোধ দিবার জন্য ফরাসী সরকারকে তাগিদ দিতে বাধ্য হইতেছেন। ফরাসী সরকার শীঘ্র শীঘ্র এই টাকাটি শোধ দিবার বন্দোবস্ত করুন।"

ফরাসী সরকার জার্ম্মান সরকারকে জানাইলেন যে ফরাসীর ক্ষতিপূরণের টাকা এবং ফরাসী অধিবাসীর নিকট জার্ম্মান অধিবাসীর দেনার টাকা যদি জার্ম্মানী পূর্ব্বের সর্ত্ত অনুসারে শোধ না করে তবে ফরাসী আল্‌সেস ও লোরেনের জার্ম্মান অধিবাসীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া জার্ম্মানদের তাড়াইয়া দিবেন এবং রাইন-প্রদেশের সম্পত্তি-সকলও বাজেয়াপ্ত করিবেন। ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের নিকট অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া জার্ম্মানী এক মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জার্ম্মানীর সহিত কোনও প্রকার বন্দোবস্ত সম্ভব কি না, ইংরেজ সরকারের সহিত কিরূপ বন্দোবস্ত সম্ভবপর, এই-সব স্থির করিবার জন্য পঁয়কারে লয়েড জর্জ্জের সহিত দেখা করিতে লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে ৭ই আগষ্ট তারিখ হইতে মিত্রশক্তিবর্গের বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্ রাষ্ট্রীয় নেতাদের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে পঁয়কারের প্রস্তাবের আলোচনা চলিতেছে। জাপান, ইতালী, বেল্‌জিয়াম, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিরা এই মিলিত বৈঠকে উপস্থিত আছেন। বেলজিয়ামের প্রতিনিধি থিউনিস, পঁয়কারের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু ইংরেজ ও ইতালীর প্রতিনিধিবর্গের এ প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি দেখা যাইতেছে। জার্ম্মানীর শুল্ক-কর বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব এবং রুর-উপত্যকার কয়লার খনি এবং বনবিভাগের রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব ইংরেজ সমর্থন করেন না। ফ্রান্সের প্রস্তাবে ইঁহাদের যেরূপ আপত্তি দেখা যাইতেছে এবং এই সূত্রে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে যেরূপ কলহের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাব বেশীদিন থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, এবং ইউরোপের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এখন যেরূপ তাহাতে কোনও একটা সুমীমাংসা সহজে হইবে আশা করা যায় না।

"ইজিপ্ট" জাহাজের সম্বন্ধে তদন্ত—

সরকারী বাণিজ্যবিভাগের (Board of Trade) তত্ত্বাবধানে 'ইজিপ্ট'-জাহাজ-ডুবি সম্বন্ধে যে তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে তাহা হইতে সেই জাহাজ-ডুবির অনেক কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। অনুসন্ধানের প্রধান বিষয় ছিল যে লোকের অনুপাতে এত বেশী সংখ্যক প্রাণরক্ষার উপযোগী নৌকা এবং কোমরবন্ধ থাকা সত্ত্বেও এত বেশী লোকের প্রাণ নষ্ট হইল কেন? "সিন" নামক ফরাসী জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর "ইজিপ্ট" জাহাজ হইতে ছয়খানি নৌকা নামানো হইয়াছিল . এই ছয়খানি নৌকায় যতগুলি আরোহী ধরে তাহার

চেয়ে বেশী-সংখ্যক আরোহী জাহাজে ছিল না। 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর সামুদ্রিক বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা স্যার ফ্রাঙ্ক নোট্‌লি সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন যে গোয়ানিজ এবং ভারতীয় লস্করেরা ইংরেজ নাবিকদিগের মতই কর্ম্মক্ষম ও উপযুক্ত—"Quite as good as British sailors'। তিনি আরও বলেন যে লস্করদিগের চেয়েও বেশী উপযুক্ত লোক কি হইতে পারে তাহা তিনি জানেন না। যুদ্ধের সময়ে বিপদকালে এই লস্করেরা যেরূপ সৎসাহস ও কর্ম্মক্ষমতা দেখাইয়াছিল তাহা জগতে অতুলনীয়।

ডক বিভাগের কর্ত্তা কাপ্তেন র‍্যাম বলেন যে তিনি একথা স্বীকার করেন না যে ইংরেজ নাবিকগণই দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি পাইবার উপযুক্ত। দেশীয় লস্করেরা প্রাচ্যসাগরে ইংরেজ নাবিকদিগের চাইতে অনেক ভাল কাজ করিতে পারে।

জাহাজের কাপ্তেন, কলিয়ার সাহেব, বলেন যে লণ্ডন হইতে বোম্বাই যাত্রার পথে লস্করেরা শ্বেতকায় নাবিকদিগের চেয়ে বেশী কর্ম্মতৎপর ও কৌশলী। বিপদকালে লস্কর ও শ্বেতকায়দিগের মধ্যে ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। যদি জাহাজের সমস্ত নাবিকই শ্বেতকায় হইত তথাপি লোকক্ষয় বড় কম হইত কি না সন্দেহ। কেবল যে ভারতীয় নাবিকেরাই ভয়ে আকুল হইয়াছিল তাহা নহে; শ্বেতকায় নাবিকেরাও বিশেষ ভয় পাইয়াছিল। প্রত্যেকেই ভয়ে কাঁপিতেছিল।

ভারতীয় লস্করদিগের সম্বন্ধে এরূপ উক্তি আরও কেহ কেহ করিয়াছেন বটে কিন্তু অপর একদল লোক ভারতীয় লস্করদিগের চরিত্রে মসীলেপন করিবার প্রয়াস পান। তদন্তের শেষে জবানবন্দী-গুলির উপর এক এক পক্ষের লোকের বক্তৃতা হয়। ইংরেজ নাবিক-দিগের পক্ষ হইতে নাবিকসভার সভাপতি কটার সাহেব বক্তৃতা করেন। তিনি সমস্ত দোষ ভারতীয় লস্করদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলেন যে 'পি এণ্ড ও' কোম্পানী সস্তায় নাবিক পাইবার প্রলোভনে না ভুলিয়া যদি ভারতীয় লস্করদিগের পরিবর্ত্তে ইংরেজ নাবিক লইতেন তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিত না। তদুত্তরে ভারতীয়-দিগের পক্ষে মিঃ বাক্‌নেল বলেন যে "ভারতীয় লস্করেরা ইংরেজি কাগজ না পড়াতে সম্ভবত মিঃ কটারের বক্তৃতা প'ড়িবে না। কিন্তু যদি তাহারা এই বক্তৃতার কথা জানিতে পারে তবে নিশ্চয়ই ইংরেজ-জাতিকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবে। যুদ্ধের সময় তাহারা যেরূপ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল মিঃ কটার তাহার উপযুক্ত পুরস্কারই আজ দিলেন বটে! লস্করদিগের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে তদন্ত-কমিটি নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ বিচার করিয়া ইহাদিগের দোষ স্খালন করিবেন।"

'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর তরফ হইতে বলা হয় যে জাহাজটি হঠাৎ ভয়ানক রকম কাত্‌রাইয়া যাওয়াতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। লস্করদিগকে কার্য্যে গ্রহণ করিয়া কোম্পানী কোনও অন্যায় করে নাই। হঠাৎ বিপন্ন হইলে অনেক ধীর স্থির ও বীরেরও মস্তিষ্ক-বিভ্রম ঘটে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এবং শুধু লস্করদিগের দোষ দিলে অন্যায় হয়; শ্বেতকায় ব্যক্তিরাও বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় কম দেন নাই।

সরকার পক্ষে সলিসিটার জেনারেল বক্তৃতা দিবার সময় সমস্ত দোষ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কুয়াশার মধ্যে জাহাজ যেরূপ দ্রুতগতিতে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা অন্যায় এবং অতিরিক্ত বেগে পরিচালিত সন্দেহ নাই। জাহাজে অধীনস্থ নাবিকদিগকে সংযত রাখিবার ভাল বন্দোবস্ত না থাকায় গণ্ডগোল বেশী হইয়াছে। ডকবিভাগের কর্ত্তা, জাহাজের কাপ্তেন ও অন্য দুই-একটি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বেবন্দোবস্তে জাহাজের নাবিকদিগকে সুসংবদ্ধ রাখা যায় নাই। এজন্য প্রধানতঃ তাঁহারাই দায়ী। নাবিকদিগকে কর্ম্মশৃঙ্খলা শিখাইবার বন্দোবস্তও ভাল নহে। ভারতীয় লস্করেরা কর্ম্মঠ ও সাহসী। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিলে তাহারা খুব উপযুক্ততার সহিত এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারে। ইঁহাদের বক্তৃতা শেষ হইলে তদন্তকমিটির সভাপতি জ্ঞাপন করেন যে অনুসন্ধানফল প্রকাশ করিতে তাঁহাদের কিছুদিন সময় লাগিবে। ফল এখনও বাহির হয় নাই।

গ্রীসের আস্ফালন ও তুরস্ক-সমস্যা—

তুরস্ক ও গ্রীসের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিবার প্রয়াস মিত্রশক্তিবর্গ অনেকদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন। এই মিটাইবার চেষ্টায় অবশ্য মিত্রশক্তিবর্গ গ্রীসের স্বার্থের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন। তথাপি গ্রীস সেই-সকল চেষ্টায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে জানাইয়াছেন যে স্তাম্বুলকে গ্রীসের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ যে তাহাকে সার্ব্বজাতিক বন্দরে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাহাতে তুরস্ক-শক্তির প্রতাপ অব্যাহত থাকিবার সুযোগ রহিয়া যাওয়াতে তুরস্ক এসিয়ামাইনরের খৃষ্টান প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার করিবার অবকাশ পাইবে। কাজেকাজেই গ্রীসকে বাধ্য হইয়া স্তাম্বুল দখল করিতে হইবে। মিত্রশক্তিবর্গ যেন তাঁহাদের সৈন্য সরাইয়া লইয়া গ্রীসের স্তাম্বুল দখলের সুবিধা করিয়া দেন।

তদুত্তরে ইংরেজ সেনাপতি হ্যারিংটন জানাইয়াছেন যে গ্রীসের স্তাম্বুল দখলের প্রচেষ্টায় মিত্রশক্তিবর্গ বাধা দিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। এদিকে জাতি-সমূহের সংঘের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্রীস আইওনিয়া ও স্মার্ণার স্বরাজ্য ঘোষণা করিয়া তাহা গ্রীসের শাসনচ্ছায়ায় আনিবার সংকল্প জানাইলেন।

ফ্রান্স ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে জানাইলেন, গ্রীসের এই সিদ্ধান্ত বিগত মার্চ্চ মাসের সন্ধির বিপরীত হওয়াতে ফ্রান্স কখনই গ্রীসের এই আব্দার সহ্য করিবেন না। ইংলণ্ডে অ্যাঙ্গোরা সরকারের প্রতিনিধি ফেথী বে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে যদি মিত্রশক্তিবর্গ আড্রিয়ানোপল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেন তবে জাতীয়দলের সহিত মিত্রশক্তিবর্গের মনোমালিন্য অতি সহজেই মিটিয়া যায়। লয়েড জর্জ্জ এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছেন।

গ্রীস কিন্তু এদিকে খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সমরসজ্জা করিতেছে। রোডোষ্টোর সন্নিকটে প্রায় ৫০০০০ হাজার গ্রীক সৈন্য সমবেত হইয়া-ছেন। যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব খুব জাঁকজমকে হইতেছে। তবে গ্রীস যত গর্জ্জায় কার্য্যকালে তত বর্ষায় না, এই যা ভরসা। নতুবা ইউরোপ শীঘ্রই অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় কাঁপিয়া উঠিত।

আয়ার্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্দ্রোহ—

স্বাধীনতা-প্রয়াসী দল ডাব্‌লিনের যুদ্ধে হারিয়া দক্ষিণ আয়ার্‌ল্যাণ্ডে আস্তানা পাতিয়াছিলেন। স্বরাজপন্থীর দল ক্রমে ক্রমে সেখানেও স্বাধীনতা-প্রয়াসীদলকে হটাইয়া দিতেছেন। লিমারিকের অধিকাংশই ইঁহাদের হস্তগত হইয়াছে। ডি ভ্যালেরার বিশ্বস্ত অনুচর এবং আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব আইরিশ প্রতিনিধি হ্যারি বোলাণ্ড যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছেন। কিন্তু কর্ক প্রদেশে এখন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-প্রয়াসী দলই প্রবল আছেন। ইঁহারা ক্লিফ্‌ডেনের তারহীন বার্ত্তাযন্ত্র

দখল করিয়া ধ্বংস করিয়াছেন এবং ওয়েষ্ট পোর্ট ও ক্লনমেন সহর স্বরাজপন্থী দলের নিকট হইতে দখল করিয়াছেন। ক্লনমেনেই এখন ডি ভ্যালেরার আড্ডা। কেরি প্রদেশেও স্বাধীনতাপন্থী দল দুই-এক জায়গায় জয়লাভ করিয়াছেন। ওয়াটারভিল সহর ইঁহাদের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। এই সহর দখল হওয়াতে ভেলান্টিয়া তড়িৎবার্ত্তা কোম্পানীর, ওয়েষ্টার্ণ কেবল্ কোম্পানীরও সরকারী তার প্রেরণে বাধা হইতেছে। আমেরিকার সহিত আর সংবাদ আদানপ্রদান চলিতেছে না। তবে সংবাদ আসিয়াছে যে স্বরাজপন্থীরা কর্ক আক্রমণ করিয়াছেন। সেখানে তুমুল যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা

রোগ-নিবারণের অভাব—

বঙ্গদেশে প্রতি ৪২০০০ হাজার লোকের মধ্যে একজন করিয়া শিক্ষিত ডাক্তার পাওয়া যায়, আর বিলাতে প্রতি ১২০০ হাজারে একজন ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। কতকগুলি ব্যাধি অনিবার্য্য, সুতরাং শিক্ষিত চিকিৎসক অন্ন-বস্ত্রের ন্যায় জীবনধারণের জন্যই প্রয়োজন। শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক অভাবে যে দেশে কত দুঃখ ও বিপদ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পল্লীগ্রামসমূহে চিকিৎসকের, বিশেষতঃ ডাক্তারের, একান্ত অভাব। তাই জল-পড়া ও তেল-পড়ার বহুল প্রচলন দেখা যায়। কৃষক-পল্লীসমূহে ডাক্তারখানা স্থাপন দ্বারা প্রভূত উপকারসাধন হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য চেষ্টা ও আন্দোলন কই?

—খুলনা

সরকারের সর্ব্বনেশে আয়—

আবগারী আয়—এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট বা মাদক-দ্রব্য বিভাগে ভারত-সরকারের বৎসরে বৎসরে প্রচুর আয় হইয়া থাকে। এই আয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমরা নিম্নে গত দশ বৎসরের আয়ের একটি তালিকা দিলাম।

সন	আয়	
১৯১০—১১	৭০৩০৩১৪	পাউণ্ড
১৯১১—১২	৭৬০৯৯৫৩	"
১৯১২—১৩	৮২৭৭৯১৯	"
১৯১৩—১৪	৮৮৯৪৩০০	"
১৯১৪—১৫	৮৮৫৬৮৮১	"
১৯১৫—১৬	৮৬৩২২০৯	"
১৯১৬—১৭	৯২১৫৫৯৯	"
১৯১৭—১৮	১০১৬১৭০৬	"
১৯১৮—১৯	১১৫৫৭৫১৮	"
১৯১৯—২০	১২৭৫২১৫০	"
১৯২০—২১	১৩৬৭৪০০০	"

দেবমন্দিরের মত ভারতের সর্ব্বস্থানে এখন মাদক-দ্রব্যের দোকানগুলি বিরাজ করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর আদেশ—এ পাপ ভারত হইতে বিদূরিত করিতে হইবে। কিন্তু এ কথায় জাতি এখনও কান দেয় নাই। চীন গবর্ণমেণ্ট নিজের দেশের পক্ষে অহিতকর জানিয়া অতকালের পুরানো আফিংখোর জাতির আফিং এক মুহূর্ত্তে বন্ধ করিয়া দিলেন—চীন সরকারের অত বড় একটা বিরাট আবগারী আয় বন্ধ হইয়া গেল, আর আমাদের দেশে উত্তরোত্তর এই পাপের বৃদ্ধিই চলিয়াছে।

—ধানসন্ধী

কেবল চীন কেন, আমেরিকাও মদ্য জগতের অগ্রাহ্য স্থির করিয়া তাহা বিক্রয় বন্ধ করিয়াছে।

দেশের অর্থের যথেচ্ছ অপব্যয়—

ঘোড়সওয়ারের দর—কলকাতার মোড়ে মোড়ে যে-সমস্ত ঘোড়ায় চড়া পুলীস দেখতে পাও, তাদের জন্যে বছরে সরকারী তহবীল থেকে খরচ হয় ৪১৬১৫ টাকা।

—আত্মশক্তি

পুলিশ-ব্যয়—পুলিশ-ব্যয় আবার বাড়িল। ভারত-সরকারের সামরিক ব্যয় বাড়িতেছে, প্রাদেশিক সরকারের পুলিশ-ব্যয় বাড়িতেছে। সামরিক ব্যয় এবং পুলিশ-ব্যয়ের যেন দৌড়বাজি চলিয়াছে—কে হারে, কে জেতে। না খাইতে পাইয়া দেশবাসী প্রাণত্যাগ করুক, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বিনা চিকিৎসায় লাখে লাখে দেশবাসী দক্ষিণ দুয়ারের পথ প্রশস্ত করুক, অশিক্ষার তিমিরান্ধকারে ডুবিয়া থাকুক, তাহাতে কি আসিয়া যায়? পুলিশের ব্যয় বাড়াও।

—বন্দেমাতরম্

কাপড়ের কথা—

বিলাতী কাপড়ের আমদানী বন্ধ হইল কি না?—বিলাতী কাপড় ও সূতা কেহ কিনিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তবু ১৯২১-২২ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বিলাত হইতে বাঙ্গালা দেশে আমদানী হইয়াছে। সহযোগী সঞ্জীবনী হিসাব দেখাইয়াছেন। গত-পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বেশী হইয়াছে। কিন্তু দাম ৩॥ কোটি হইতে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ হইয়াছে।

বিদেশ হইতে ১৯২০-২১ সালে ৩৭,১১,৩৬,৭৬১ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২১-২২ সালে ২৭,১৯,২০,৪২৩ টাকার বস্ত্র আসিয়াছে। এক বৎসরে প্রায় ১০ কোটি কমিয়াছে। কিন্তু কোরা কাপড়ের আমদানী কম না হইয়া বেশী হইয়াছে। গতপূর্ব্ব বৎসর ৩৮ কোটি ২০ লক্ষ গজ কোরা কাপড় আসিয়াছিল, গত বৎসর ৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছে। রঙ্গিন কাপড়ের আমদানী ১১ কোটি ২০ লক্ষ গজ হইতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হইয়াছে। ধোলাই কাপড়ের আমদানীর হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। গতপূর্ব্ব বৎসর ৩ কোটি ৭০ লক্ষ গজ আমদানী হইয়াছিল, গত বৎসরও তাহাই হইয়াছে।

বিলাতী কাপড়ের দাম সস্তা হইয়াছে এবং রঙ্গিন কাপড়ের আমদানী কমিয়াছে, তাই আমদানী কাপড়ের মূল্য প্রায় ১০ কোটি কম হইয়াছে। কিন্তু কোরা কাপড়ের আমদানী বাড়িয়াছে ও ধোলাই কাপড়ের আমদানী সমান আছে, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিলাতী-বর্জ্জনের চেষ্টা বঙ্গদেশে সফল হয় নাই।

বিলাতী সূতার আমদানী বেশী হইতেছে, তদ্দ্বারা খদ্দর প্রস্তুত হইতেছে। বিলাতী কোরা ও ধোয়া কাপড়ের আমদানী কিছুমাত্র হ্রাস করা যায় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

ব্যর্থ হওয়ার প্রকৃত কারণ এই যে বঙ্গদেশে যত বস্ত্রের প্রয়োজন তত নির্ম্মিত-হইতে পারে নাই।

—কাশীপুরনিবাসী

বরিশালের কলসকাঠি কংগ্রেস কমিটীর অধীনে একটি সূত্র-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যাহারা সূতা কাটায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মেডেল ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীমতী শিশুবালা দেবী এক ঘণ্টায় ২২ নম্বরের ১০৮০ হাত সূতা কাটিয়া একটি স্বর্ণ মেডেল পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীও এক ঘণ্টায় ২২ নম্বরের ৭৭০ হাত সূতা কাটিয়া একটি স্বর্ণ মেডেল পাইয়াছেন। শ্রীমতী মনোরমা দেবী এক ঘণ্টায় ৭০০ হাত সূতা কাটিয়া একটি চরকা পুরস্কার পাইয়াছেন। কলসকাঠির এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

—প্রতিকার

পাটের হিসাব—

এ বৎসর বাঙলা দেশের কোন্ জেলায় কি পরিমাণ পাটের আবাদ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এক হিসাব বাহির হইয়াছে। গত বৎসরাপেক্ষা এ বৎসর বাংলা দেশে মোট ৩০৮০০০ বিঘা কম ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। ফরিদপুর জেলায় ১৬৩০০০ বিঘা, ময়মনসিংহ জেলায় ১০৩০০০ বিঘা, যশোহর জেলায় ৪২০০০ বিঘা, বাকরগঞ্জ জেলায় ৩৩০০০ বিঘা এবং ঢাকা জেলায় ৩২০০০ বিঘা কম ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় পাটের আবাদ আবার কিছু কিছু বাড়িয়াছে। সরকারী হিসাবে জানা যাইতেছে এবার ৪০ লক্ষ বেল্ পাট জন্মিতে পারে। কিন্তু কল-কারখানার জন্য প্রয়োজন হইবে প্রায় ৯০ লক্ষ বেলের। কাজেই এবার পাটের মূল্য খুব চড়িবার কথা। তবে আমাদের দেশের কৃষকগণ এই বৃদ্ধির ফল কি-পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে তাহা বলা যায় না। সকলে এককেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের (organisationএর) অন্তর্গত থাকিয়া চেষ্টা করিলে এবার অল্প জমির দ্বারাই কৃষককুলের হাতে কিছু বেশী টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে।

—চারুমিহির

বঙ্গদেশে রেসমের চাষ—

বঙ্গদেশে একসময় রেসমের চাষ খুব উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় রেসম চাষের বেশ প্রসার হইয়াছিল। কতিপয় ইংরেজ কোম্পানী কুঠি স্থাপন করিয়া প্রভূত রেসম খরিদ এবং নানা দেশে চালান দিতেন। রেসমের চাষ বিশেষ লাভজনক। তুঁত গাছের চাষ করিয়া গুটি-পোকা পালন করিলেই রেসম উৎপন্ন করা যায়। বাড়ীর মেয়েরাই রেসম-পোকা পালন ও উহার হেফাজৎ করিতে পারে। অবশ্য ইহাতে অনেক ঝঞ্ঝাট, সতর্কতা ও পরিশ্রম আছে। ওসব ত থাকিবারই কথা। বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ঝঞ্ঝাটে অর্থ লাভ হইতে পারে না। বগুড়া জেলা হইতে রেসমের চাষ উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি আবার নূতন উদ্যমে উহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি, বাঙ্গালা দেশের সকল জেলায়ই রেসম চাষের বন্দোবস্ত করা হইবে। কার্পাস চাষের ন্যায় রেসম চাষও অতি দরকারী। বিশেষতঃ ইহা অর্থাগমের একটি প্রধান উপায়।

—নবযুগ

শিক্ষা—

বালিকা-শিক্ষার সাহায্য।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বালিকা-শিক্ষার জন্ম মোট ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬ শত ৭০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানদিগের কোনও বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম দেখা গেল না। কলিকাতার সাখাওয়াত গার্লস্ স্কুল ও সোহরাওয়ার্দ্দী বালিকা-স্কুলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আছে, কিন্তু এই তালিকায় তাহাদের নাম নাই। অনেক নারী-বিদ্যালয় (কলেজ) বা বালিকা-স্কুলে বার্ষিক সাহায্য ব্যতীত এককালীন সাহায্য ২৫০০৲ হইতে ৭০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

—নবযুগ।

ফেনীতে কলেজ।—নোয়াখালী-ফেনীতে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব অনেকদিন হইতে চলিতেছিল। এতদিনে সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আগামী ২০শে জুলাই হইতে কলেজ খোলা হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র ভর্ত্তি করা হইবে। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগের জন্ম ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

—ঢাকা গেজেট

জাতীয় কলেজ।—যে-সকল ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ের আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্ম সম্প্রতি বরিশাল ব্রজমোহন জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তথায় একটি উচ্চাঙ্গের জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট

বাধ্যতামূলক শিক্ষা।—আসাম-প্রদেশের বালকদিগকে শিক্ষা-লাভে বাধ্য করার চেষ্টা হইতেছে। শুনিতেছি, আসাম ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্ম একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। এই বিল অনুসারে কার্য্য করার নিমিত্ত শিক্ষা-বিভাগের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রদানের এবং ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজন হইলে করস্থাপনেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

—ঢাকা-প্রকাশ

দান ও সদনুষ্ঠান—

বাণীভবনে দান—গত ৭ই জুলাই তারিখে রেনবো ক্লাব অভিনয় করিয়া যে টিকিট বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা হইতে ঐ ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগর বাণীভবনের জন্ম তিন শত টাকা দান করিয়াছেন।

—বন্দেমাতরম্

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সত্যেন্দ্রনাথের দান—স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত মহাশয়া সত্যেন্দ্রনাথের সংগৃহীত লাইব্রেরী, নানা প্রকারের পুরাতন মুদ্রা, প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি নানা প্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন।

—বন্দেমাতরম্

অদ্ভুত দান—বরিশালের বাবু শরৎকুমার ঘোষ, গত বৎসর তাঁহার সর্ব্বসঞ্চিত ৭০০৲ টাকা স্বদেশী কার্য্যে দান করিয়া চাকরি ত্যাগ করতঃ স্বদেশী কার্য্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন। গত ১৮ই জুলাই গান্ধী পুণ্যাহ দিনে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্বামীর অনুকরণে তাঁহার সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার—প্রায় ১২০০৲ টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট জিনিষ এবং তদীয় ভ্রাতৃবধূ, দুগাছা অনন্ত, তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

—কাশীপুরনিবাসী

বন্যায় সাহায্য।—হুগলী কংগ্রেস কমিটির চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত দ্বারকেশ্বর বন্যায় দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ মোট ২৪১৸৵৯ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে।

—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ

সম্প্রতি কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটের ইট-ব্যবসায়ীগণ এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে কেবল পূজার খরচ ব্যতীত বারোয়ারী উপলক্ষে যাত্রা প্রভৃতি তামাসায় কোনরূপ অর্থ অপব্যয় না করিয়া বারোয়ারী ফণ্ডের উদ্বৃত্ত অর্থ তথাকার কংগ্রেসের গঠন-কার্য্যের জন্য কংগ্রেস-কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবেন। ইঁহাদের দান আনুমানিক হাজার টাকা হইবে। গত বৎসরও ইঁহারা তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারে দেড়-সহস্রাধিক টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

—নীহার

শ্রমিক আশ্রম—বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে কুমিল্লাতে শ্রমিক আশ্রম (House of Labourers) নামে একটি নানাবিধ কল তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখান হইতে সম্প্রতি উন্নত প্রণালীর দিয়াশলাইর কল ও তৎসম্পর্কীয় বিবিধ প্রণালীর সরঞ্জাম তৈয়ারী হইতেছে। কয়েকজন ত্যাগী যুবকের অক্লান্ত চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহের ফলেই এই প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এতৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে উল্লেখযোগ্য।

তিনি সময় সময় বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদি ক্রয় তাহাদিগকে বিনা সুদে অর্থসাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত সহায়তা করিতেছেন।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী

নিপীড়িতা বালিকা বধূ আনন্দময়ীর জন্য সাহায্য সংগ্রহ করা হইতেছে। "দৈনিক বসুমতী"তে সাহায্যের তালিকা ছাপা হইতেছে।

—নবযুগ

পরীক্ষণীয় ব্যবসার পথ—

ইক্ষুর মোম।—"অয়েল, পেণ্ট এণ্ড ড্রগ রিপোর্টার" পত্রিকায় প্রকাশ যে ইক্ষুর রস পরিষ্কার করিবার সময় যে গাদ পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা দশ ভাগ মোম পাওয়া যায়। ঐ মোম বেনজিনের সাহায্যে বাহির করিতে হয়। প্রথমাবস্থায় ঐ মোম কঠিন এবং দেখিতে হরিদ্রা বর্ণের। —এডুকেশন গেজেট

আমাদের সমাজ !—

কেরোসিনে আত্মহত্যা।—শ্রীরামপুরের নিকটে বৈদ্যবাটি গ্রামে একটি ১৭ বৎসরের বালিকা বধূ কেরোসিনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, কোন পারিবারিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া বধূটি কেরোসিনে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহার চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোকেরা দৌড়িয়া যায়, কিন্তু অচিরেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

বালিকার আত্মহত্যা।—কাঁসারীপাড়ার একটি হিন্দু বালিকা বধূ বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিত না। এই মনঃকষ্টেই নাকি বালিকা আত্মহত্যা করিয়া ভবযন্ত্রণা শেষ করিয়াছে। হিন্দু-সমাজে বালিকা ও যুবতীদিগের মধ্যে এই আত্মহত্যার সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। —নবযুগ

আবার বালিকাবধূ-নির্য্যাতন।—গত মঙ্গলবার সকালে মুচিপাড়া থানার ইন্সপেক্টার হামিদ ২৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে সারদা নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সারদা তাহার ১৪ বৎসর বয়স্কা পুত্রবধূ কুসুমকুমারীকে প্রহার করার অভিযোগে অভিযুক্তা। বধূটি শাশুড়ীর অনুমতি না লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাওয়ার পর ফিরিয়া আসিলে তাহার শাশুড়ী লোহা পুড়াইয়া বধূর শরীরের কয়েকটি স্থানে ছেঁকা দিয়াছে। বধূটির হাঁসপাতালে চিকিৎসা চলিতেছে।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

ত্যাগী দেশসেবী—

বরিশালে সতীন্দ্রনাথ।—বসুমতীর নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, আজ ৩৫ দিন যাবৎ বরিশাল জেলে সতীন্দ্রনাথের প্রায়োপবেশন চলিতেছে। ১৩ দিন উপবাসের পর তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়ানের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার শরীর নাকি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

বরিশাল জেলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় ও ধীরেন্দ্র সেন নামক দুইজন বন্দী স্বেচ্ছাসেবকও নাকি ১০।১২ দিন যাবৎ প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

সতীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বরিশাল আসিয়াছেন। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তাঁহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতেছে না।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ আষাঢ়, ১৩২৯

কৃতী ও সাহসী বাঙালী—

দীর্ঘ সন্তরণে প্রতিযোগিতা—খড়দহ হইতে আহিরীটোলা পর্য্যন্ত হুগলী নদীর ১৩ মাইল জলপথে সেদিন সাঁতারের এক প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সন্তরণ ক্লাবের প্রায় ১৮জন সন্তরণকারী বেলা ৩টা৷ ৫ মিনিটের সময় খড়দহ হইতে সন্তরণ আরম্ভ করে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ৮জন সাঁতার দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমান্ আশুতোষ দত্ত নামক এক ১৬ বৎসরের যুবক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আশুতোষ এক ঘণ্টা সাত মিনিটে ১৩ মাইল সাঁতার দিয়াছেন। ইঁহার ৮ মিনিট পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি পৌঁছিয়াছিলেন।

—নীহার

বালকের বীরত্ব—বারাসতে একটা কূপ হইতে জল তুলিবার সময় তথাকার অম্বিকা কর্ম্মকারের পত্নী সেই কূপের মধ্যে পড়িয়া যান। সেই সময় তথাকার উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র দেব সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। বালকটি তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে এবং নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও অতি কষ্টে স্ত্রীলোকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় জল হইতে তুলিয়া আনিয়াছে।

—নীহার

সেবক

ভারতবর্ষ

হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তির ব্যবস্থা—

বোম্বাইএর রায় যুগলকিশোর বিরলা বারাণসীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৭৫টি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে এই বৃত্তিগুলি প্রদত্ত হইবে।

(১) মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে এক বৎসরের জন্য প্রার্থী-দিগকে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে।

(২) বৃত্তিধারী যতদিন বৃত্তি ভোগ করিবেন, ততদিন তাঁহাকে কৌমার্য্য ব্রত পালন ও নিরামিষ ভোজন করিতে হইবে। তাঁহার পক্ষে সুরাপানও নিষিদ্ধ।

(৩) প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি যথাশক্তি স্বদেশ-সেবা করিবেন ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিবেন।

(৪) প্রত্যেক বৃত্তিধারীকে সানুবাদ ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক বৃত্তিধারী প্রতিশ্রুতি দিবেন যে, তিনি একদিকে যেমন নিজের ধর্ম্মমত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিবেন, তেমনি অপর দিকে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্য-সমাজ প্রভৃতি হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিবেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমাজের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনে সচেষ্ট হইবেন, এবং সমগ্র মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন।

(৬) ব্রাহ্মণ বৃত্তিধারীদিগকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সংস্কৃত অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে।

(৭) প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার অনুরূপ আদেশ না করিলে বৃত্তি-প্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে বাস করিতে হইবে।

(৮) যাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম, যিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুস্থদেহ, সবলকায়, সচ্চরিত্র এবং ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন এরূপ আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

(৯) সিণ্ডিকেটের মতানুসারে যদি কাহারো পাঠোন্নতি সন্তোষজনক না হয়, অথবা কাহারো ব্যবহার বা চরিত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

যুদ্ধ-বিভাগের গোশালা—

যুদ্ধ-বিভাগের জন্য রাউলপিণ্ডি, কসৌলী ও পুনাতে গোশালা আছে। এতকাল এই-সব গোশালার ভার ইউরোপীয়ান সৈন্যদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ইহাতে খরচ পড়িত বহু টাকা, কুলাইতে না পারিয়া গবর্মেণ্ট এখন ব্যয় কমাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং গোশালা-বিভাগে ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত না করিয়া ভারতবাসী নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে। যাঁহাদের কৃষি, গোপালন ও গোচিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, ঐ পদলাভের জন্য তাঁহারাই কেবল আবেদন করিতে পারিবেন। শিক্ষানবীশেরা মাসে বেতন পাইবেন ৬০ টাকা হিসাবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কৃতী ছাত্রদিগকে ওভারশিয়ারের পদ দেওয়া হইবে তখন তাঁহাদের বেতন হইবে একশত টাকা। প্রতিবৎসর ১০ টাকা হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই বেতন ক্রমে ২৫০ টাকা হইতে পারিবে। যাঁহারা ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাঁহাদের মাহিনা গোড়াতে হইবে ২০০ টাকা, এবং উঠিবে ৫০০ টাকা।

রাজনৈতিক কয়েদীর প্রতি ব্যবহার—

রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি জেলে যে প্রকার অত্যাচার চলিতেছে, প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অনেক প্রদেশেরই ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক কয়েদীদের সম্বন্ধে একটু ভালো ব্যবস্থা করার প্রস্তাবও অনেক ব্যবস্থাপক সভাতেই পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের অবস্থার যে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই, কয়েদীদের মুখের কথায় এবং কোনো কোনো স্থলে পরিদর্শকদের রিপোর্টেই তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই অত্যাচারের বহরও বড় সহজ নহে। নীচে কতকগুলির নমুনা দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত ভোজরাজ এবং শ্রীযুক্ত ভেরোমল নামক দুইজন রাজনৈতিক কয়েদী সম্প্রতি ছয় মাস জেল খাটিয়া বোম্বাইএর বিজাপুর জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। 'নিউ টাইম্‌স্' পত্রিকায় তাঁহারা তাঁহাদের কারাগারের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "ছয় মাস বরাবর চাকী দেওয়া হইত। আমাদের একজনের ওজন ছয়মাসে ৩৬ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে পায়ে শিকল দেওয়া থাকিত। তাহাতে দুই পায়ের অধিক সরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। প্রথম দুইমাস একরকম নিয়মিত ভাবেই আমাদিগকে একটা মোটা বেত দিয়া প্রহার করা হইত। একবার ভোজরাজ বিনা দোষে ১৮ ঘা বেত খাইয়াছিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইবার পরেও প্রহার চলিতে থাকে। দিনের ভিতর পাঁচবার আমাদিগকে উলঙ্গ করিয়া দেওয়া হইত। একই সময়ে একই পাত্রে একসঙ্গে বহু লোককে মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। নিয়ম ছিল— বেলা দুইটার পর হইতে পরদিন বেলা নয়টার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই উনিশ ঘণ্টার ভিতর কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারিবে না। ফলে মূত্রবেগ রোধের জন্য অনেকে দড়ি বাঁধিয়া রাখিতে বাধ্য হইত।"

পরলোকগত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা হজারিবাগ জেলে আছেন। পুরুলিয়া কংগ্রেস অফিসের শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাসগুপ্ত সম্প্রতি উক্ত জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া 'বেহার হেরাল্ডে' এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন অসুস্থতার জন্য ওজনে দশ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছেন। এজন্য ইঁহার সম্বন্ধে কোনোরূপ বিবেচনা করা দূরের কথা, ইঁহাকে চারিদিন 'দাঁড়া' হাতকড়া লাগানো হইয়াছিল। সকাল হইতে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত হাতকড়া লাগানো থাকিত। কেবল দুপুর বেলায় খাইবার জন্য এই হাতকড়া অল্পক্ষণের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইত মাত্র। তাঁহার শিরোঘূর্ণন রোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে এইরূপ ভাবে হাতকড়া লাগানো হইয়াছিল।

কানপুরের 'বর্ত্তমান' নামক হিন্দী দৈনিক লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কানপুরের বীর স্বদেশসেবক। এখন তিনি নাইনী জেলে বন্দী আছেন। জেলের ভিতর তাঁহার পৃষ্ঠে হামেশা বেত্রাঘাত চলিতেছিল, তাঁহাকে জোর করিয়া ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হইত। লাঙ্গল চালানোর কাজেও তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।"

আমাদের তেজপুর জেল হইতে মুক্ত কয়েদীদের মুখ হইতে সেখানকার জেলের অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা জানাইয়াছেন, একদল রাজনৈতিক কয়েদীকে ঢেঁকিতে ধান ভানিতে দেওয়া হইয়াছে। জেলে মাত্র তিনটি ঢেঁকি আছে, অথচ প্রত্যেক কয়েদীকে প্রত্যহ একমন করিয়া ধান ভানিতেই হইবে। শেখ আব্বাস নামক জনৈক রাজনৈতিক কয়েদী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান ভানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে তিন সপ্তাহ চট পরিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি হাতকড়িরও ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীযুক্ত খানেশ্বর নামক আর-এক ব্যক্তির ঐ অপরাধের জন্য তিনদিনের 'রেহাই' কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় বাণী থিয়েটারের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বড়ুয়া ঢেঁকিতে কাজ করিতে গিয়া আঙুলে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন।

আসাম ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত ডালিমচন্দ্র বোরা গত ১১ই মে তারিখে তেজপুর জেল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি জেল-পরিদর্শন-বহিতে লিখিয়া আসিয়াছেন—"আবাসউদ্দিন নামক সতের বৎসর বয়স্ক একজন মুসলমান বালক কয়েদীকে প্রত্যহ তিন বাক্স করিয়া পাথর ভাঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে। এত অল্পবয়স্ক সাধারণ কয়েদীকেও এরূপ কষ্টকর কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদের জন্য আইনে অল্পশ্রমসাধ্য কার্য্যেরই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জেল-কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কয়েদীদের বয়স ও বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধেও কোনো পার্থক্য রাখেন না। প্রফুল্লচন্দ্র বড়ুয়া একজন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। ইহারও বয়স অল্প। ইহাকেও পাথর ভাঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রনাথ নামক আর-একজন রাজনৈতিক কয়েদীর পা খোঁড়া। এইরূপ বিকলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে পাথর ভাঙ্গার ন্যায় শ্রমসাধ্য কাজ যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্ততঃ দয়া-পরবশ হইয়াও ইঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা জেল-কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরীর বিষয়ে গবর্মেণ্টের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক। তিনি আমার কাছে অভিযোগ করেন, তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে কাঁপে এবং তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করেন। ইহাতে শ্রমসাধ্য কাজ করা সব সময় তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। গৌহাটী জেলে অবস্থান কালে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ডেরাংএর সিভিল সার্জ্জন বলেন যে, ইহা তাহার বদমায়েসী—ফলে চিকিৎসা বন্ধ হইয়াছে। আমি দেখিলাম তাঁহার দেহের ওজন ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।"

"টাইম্‌স্ অব আসাম" পত্রিকা বলিতেছেন—শ্রীযুক্ত ডালিমচন্দ্র বোরা তেজপুরের বেসরকারী জেল-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার এই পরিদর্শনের ক্ষমতা গবর্মেণ্ট নাকচ করিয়া দিয়াছেন। বোরা মহাশয়

জেলাপুর জেলখানা পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শনের খাতায় যে মন্তব্য করিয়াছিলেন ইহা সম্ভবতঃ তাহারই দণ্ড। একথা সত্য হইলে ইহা যে আরো অপূর্ব্ব তাহাতে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় সম্প্রতি জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—"তাঁহাকে একদিন কুয়োর ভিতর মাথা নীচে ও পা উপরে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল।"

'মাদারল্যাণ্ড' পত্রিকা শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ, এম-এ, এল-এল-বির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ছয়মাস জেল খাটিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জেলে তাঁহার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করা হইয়াছে।"

বাংলার বরিশালের জেলেও রাজনৈতিক কয়েদীদের উপর ভীষণ অত্যাচার চলিতেছে বলিয়া নানা সংবাদপত্রে প্রকাশ। এজন্য অন্তঃপুরিকাদের ভিতরেও বিষম উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা পথে বাহির হইয়া, কলেজের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

যে কোনো অবস্থাতেই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই তাহা সমর্থনের যোগ্য নহে।

রামরক্ষার মৃত্যু—

কলিকাতার হিন্দি দৈনিক 'ভারতমিত্র' লিখিয়াছিলেন—পণ্ডিত রামরক্ষা নামক জনৈক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞোপবীতও জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া হয়। ফলে প্রতিবাদস্বরূপ ৯১ দিন অনশনে থাকিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্প্রতি ভারত গবর্মেণ্ট এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়া এক কমিউনিকে প্রচার করিয়াছেন। সরকার জানাইয়াছেন, রামপ্রকাশ—রামরক্ষা নহে—অসুখে মারা গিয়াছেন। রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে কমিউনিকেতে কোন কথাই উল্লেখ করা হয় নাই। কমিউনিকের উত্তর স্বরূপ 'ভারতমিত্র' গবর্মেণ্টকে নিম্নলিখিত চারিটি প্রশ্ন করিয়াছেন।

(১) রামরক্ষা নামে কোনো ব্রাহ্মণ ষড়যন্ত্র মামলায় আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন কি না?

(২) কালাপানিতে পৌঁছিবামাত্র তাহার যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল কি না?

(৩) যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দেওয়ার পর রামরক্ষা অনশন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না?

(৪) দীর্ঘকালব্যাপী স্বেচ্ছাকৃত অনশনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন কি না?

ধামা চাপা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া এই প্রশ্নগুলির সত্য এবং নির্ভীক উত্তর দেওয়া গবর্মেণ্টের দরকার। চুনকামের বাহুল্যের জন্য গবর্মেণ্টের কমিউনিকেগুলি হইতে সত্যের সহজ মূর্ত্তিটি সহজে ধরা পড়ে না। এইজন্য গবর্মেণ্টের কমিউনিকেগুলির উপরে বাহিরের লোকের আস্থা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

স্যাণ্ডহার্ষ্টে ভারতবাসী—

চারিজন ভারতীয় যুবক স্যাণ্ডহার্ষ্টের রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম হইতেছে—(১) গুরুদীপ সিংহ, ইনি পরলোকগত রিশালদার-মেজর সর্দ্দার বাহাদুর রায় সিংহের পুত্র, (২) আশগর আলি, ইনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার এম্ আজিজুদ্দিনের পুত্র; (৩) বলবন্ত সিংহ, ইনি গুজরানের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট তারা সিংহের পুত্র; (৪) শেখ মকবুল হোসেন, ইনি মুলতানের অনারারি এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার খাঁ বাহাদুর সেখ বিরাজ হোসেনের পুত্র। এ ব্যাপারে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যভারত, উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা, আসাম, এবং আগ্রা-অযোধ্যার একজন যুবকও স্যাণ্ডহার্ষ্টের ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হন নাই। অথচ এ সম্বন্ধে যে আইন-কানুন আছে তাহাতে এই-সব প্রদেশের লোকদের প্রবেশের কোনরূপ বাধা আছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই।

সাদা ও কালা—

মাদ্রাজের মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী দুবরাম সাবাম্মা এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রকাশ, মাদ্রাজের 'ল এণ্ড অর্ডার' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত কে, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এই মহিলা কয়েদীটিকে মুক্তি দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু গোদাবরীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্র্যাকেন তাহা হইলে পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখানোতে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। দেশী লোক যত বড়ই হোক না কেন তাহার দৌড় ঐ মসজিদ্ পর্য্যন্ত। তাহার মত ততক্ষণই বড় যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাদার সহিত সে মতের সংঘর্ষ না বাধে। সাদা ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সে যে যে-কোনো কালোর অপেক্ষা বড়, এ বুদ্ধি ভারতে থাকিয়া আজও যাহার জন্মায় নাই তাহার দৃষ্টির দোষ আছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

দেশীরাজ্যে মদ বর্জ্জন—

কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গতঃ লিম্বড়ি রাজ্যে দেশী মদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি এক আইন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে এই রাজ্যে কেহ দেশী মদ আমদানি করিতে বা রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করে তাহা হইলে তাহার কঠোর দণ্ড হইবে। নিয়মভঙ্গকারীকে যে ধরাইয়া দিবে সে তাহার অর্থদণ্ডের এক-চতুর্থাংশ পুরস্কার পাইবে। কেবল মাত্র দেশী মদের বিরুদ্ধেই লিম্বড়ি রাজ্য এই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দেশী মদেই কেবল যে লোককে মাতাল, মতিচ্ছন্ন করিয়া তোলে তাহা নহে, ও গুণটি বিলাতি মদের ভিতরেও পুরা মাত্রাতেই আছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি মদের নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাটাও করা উচিত ছিল।

মৌলবী মজহরল হকের কারাদণ্ড—

পাটনার 'মাদারল্যাণ্ড' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মজহরল হক সাহেবের বিরুদ্ধে পাটনার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিহার-উড়িষ্যার ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মানহানির এক মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। গত ২৬শে জুলাই সে মামলা শেষ হইয়া গিয়াছে। জেলে মুসলমান ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা সম্বন্ধে মাদারল্যাণ্ড পত্রিকায় ইনি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মাদারল্যাণ্ড পত্রিকা উঠিয়া গেলেও তাহা সেই প্রবন্ধের জের চালাইয়াছিল। অবশেষে মৌলবী হকের দণ্ডাজ্ঞায় তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী হককে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া এক হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। টাকা না দিলে তিন মাস শ্রমহীন কারাবাসের হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। মৌলবী সাহেব অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়া ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বলা বাহুল্য তিনি জরিমানা দেন নাই—জেলকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রেস আইন উঠাইয়া দেওয়ার স্বরূপটা যে কি এই ব্যাপারগুলিই তাহার নমুনা।

বাবা গুরুদিৎ সিংহের নির্ব্বাসন—

'কোমাগাতা মারু' জাহাজের হাঙ্গামা সম্পর্কে শিখ বাবা গুরুদিৎ সিংহ রাজদ্রোহ অভিযোগে আসামী হইয়াছিলেন। অমৃতসরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমর রায়ের এজলাসে ইঁহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। এক লিখিত এজাহারে ইনি সহযোগীদিগকে এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে 'কোমাগাতা মারু' এবং বজবজ কাণ্ডের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বিচারক বাবা গুরুদিৎ সিংহের প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিয়াছেন। 'কোমাগাতা মারু' এবং বজ্‌-বজ্‌ কাণ্ড সম্বন্ধে জনশ্রুতি অনেক রকম। সুতরাং এই দুইটি ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়ার প্রয়োজন আছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

গণ্টুরে সভা বন্ধ—

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিরুপদ্রবভাবে আইন ভঙ্গ করা সঙ্গত কি না তাহাই নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস ও খেলাফৎ সমিতি অনুসন্ধান-কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সেই কমিটি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। গত ৩১শে জুলাই এরোড় হইতে কমিটি মাদ্রাজ যাত্রা করেন। সেখান হইতে সেই দিনই তাঁহারা গণ্টুরে গমন করিয়াছিলেন। কমিটির পরিদর্শন উপলক্ষে সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন—কমিটির আগমন উপলক্ষে এখানে অন্য স্থান হইতে কংগ্রেস ও খেলাফৎ-কর্ম্মীরা আসিতেছেন, শান্তি-সেনার আমদানি হইতেছে, কিন্তু ইহাতে এখানকার শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। সুতরাং ৩১শে জুলাই হইতে ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এখানে কোন রকম মিছিল বা সভা-সমিতি হইতে পারিবে না।

ভারতবর্ষে শান্তিটা বড় ঠুনকো জিনিস।

জেলের ভাষা—

মৌলানা মহম্মদ আলি বর্ত্তমানে বিজাপুর জেলে আবদ্ধ আছেন। তাঁহার মাতা এবং পত্নী উভয়েই তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য যাইতেছিলেন। কিন্তু বিজাপুর জেলের কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন—ইংরেজী ভাষা ছাড়া মৌলানা মহম্মদ আলির সহিত আর কোনো ভাষায় কথা বলিতে দেওয়া হইবে না। ফলে মাতা এবং পত্নী উভয়েই মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। টীকা অনাবশ্যক।

গরহাজিরার শাস্তি—

বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর স্যর জর্জ্জ লয়েড কিছুদিন পূর্ব্বে কাঠিয়া-বাড় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহাকে সেলাম করিবার জন্য সে অঞ্চলের সকল জমিদার এবং তালুকদারই লাট-দরবারে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন, কেবল হাজিরা দেন নাই করাচীর তালুকদার ঠাকুর গোপালদাস অম্বাইদাস দেশাই। এই অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও বলা হইয়াছিল। কিন্তু এই তেজস্বী তালুকদার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও রাজি হন নাই, অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ করিতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। ফলে বোম্বাই গবমেণ্ট দেশাই মহাশয়ের দুই-খানি তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন। বিদেশীর কাছে আজ এইরূপ ভাবে অকারণে লাঞ্ছিত হইয়া স্বদেশবাসীর হৃদয় দেশাই মহাশয় জয় করিয়া লইয়াছেন। দেশবাসীগণ এজন্য বিরাট সভা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

রাজনৈতিক আসামী—

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবীর কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের এবং কাশীবিদ্যাপীঠের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি সম্প্রতি ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৭(২) ধারা অনুসারে ধৃত হইয়া-ছিলেন। অপরাধ—কংগ্রেসের জন্য ভলান্টিয়ার ভর্ত্তি করা। অস্থায়ী জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জ্বালাপ্রসাদের বিচারে ইঁহার ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এলাহাবাদের লীডার সংবাদ দিয়াছেন—বিচারের সময় ইঁহাকে প্রতিদিন হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়া বাঁধিয়া হাজত হইতে আদালতে হাজির করা হইত। থানাদার নাকি নিজ ব্যয়ে এক্কার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত ধর্ম্মবীর থানাদারের ব্যয়ে এক্কা ব্যবহার করিতে সম্মত হন নাই।

আমাদের বিশ্বাস, রাজদ্রোহসূচক হাজার বক্তৃতাতেও গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়, সাধারণের শ্রদ্ধা-ভাজন ব্যক্তির উপর এইসব জুলুম ও অত্যাচারের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

কয়েদীর মুক্তি—

কারাগারের ব্যয়ভার অত্যধিক রকমে বাড়িয়া উঠায় যুক্ত-প্রদেশের গবর্মেণ্ট সম্প্রতি ৫০০০ বন্দীকে মুক্তিদান করিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশে নাকি এই নূতন নহে—আরো দুই-এক বার এইরূপ ভাবে বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন ধারা ব্যয়-সঙ্কোচের কথা বিশেষ শোনা যায় না। সুতরাং এই নূতন পথ গ্রহণের জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট ধন্যবাদের পাত্র। এই ব্যবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গবর্মেণ্ট বলিয়াছেন—অনেক স্থলে আদালতসমূহ অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে অল্পদিনের জন্য কারা-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এরূপ স্থলে কতকগুলি লোককে কারা-গারে রাখায় বিশেষ কোন লাভ দেখা যায় না—কেবল মাত্র ব্যয়-বাহুল্য ঘটে। সেইজন্য কারাক্লেশ ভোগের যাহাদের অল্পদিন মাত্র বাকী আছে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

এদেশে কারাগারের আবহাওয়া যেরূপ তাহাতে সেখানে প্রতি-মুহূর্ত্তে নৈতিক অধঃপতনই ঘটে। সুতরাং সে আবহাওয়া হইতে যাহাদিগকে দূরে রাখা সম্ভব তাহাদিগকে দূরে রাখাই সঙ্গত। এইজন্য আমরা তরুণ অপরাধীদের কারামুক্তির পক্ষপাতী।

জাতীয় শিক্ষায় দান—

মজঃফরনগরের শেঠ বিহারী লাল জাতীয় শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার উন্নতির জন্য একলক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আন্‌সারী ও আরো কয়েকজনকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া এই সম্পত্তির ভার তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কি ভাবে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে তাঁহারাই তাহার ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিবেন।

বালক মজুরের আইন—

ভারত গবর্মেণ্ট আইন পাশ করিয়াছেন, ১২ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগকে বন্দরের মাল বহন বা নাড়াচাড়া কাজে নিযুক্ত করা হইবে না। ভারতের দারিদ্র্য যেরূপ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে বালকদিগকে নানারূপ শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইতেছে। যাহা তাহারা পারে না, যাহা তাহাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা উভয় দিক হইতেই অপকারী, তাহাও তাহাদিগকে অনেক সময় করিতে হয়। এজন্য জাতির ক্ষতি নিতান্ত কম হইতেছে না। সুতরাং এইসব ক্ষতি যাহাতে না হয়, আইন করিয়াই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থাও করা দরকার যাহাতে উপযোগী

কাজের অভাবে বালকদিগকে বসিয়া থাকিতে না হয়। এই দরিদ্র দেশে কি বালক কি বৃদ্ধ, বসিয়া থাকিবার অবসর কাহারো নাই—অধিকারও কাহারো নাই। সুতরাং কতকগুলি কাজ আইন করিয়াই বালকদের জন্ম আলাদা করিয়া রাখা দরকার।

পার্শির বদান্যতা—

অনেক দরিদ্র পার্শি-পরিবার অর্থের অভাবে অস্বাস্থ্যকর নোংরা স্থানে বাস করিতে বাধ্য হন এবং সেজন্য নানা রকমের ব্যাধি পীড়াতে কষ্ট পান। তাঁহারা যাহাতে অল্প ভাড়ায় ভাল ঘরে বাস করিতে পারেন সেজন্য করাচীর পার্শি অঞ্জুমান নামক পঞ্চায়েৎ ১২খানি বাড়ী নির্ম্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ আর্দাশের এইচ্ মামা করাচীর একজন ধনশালী পার্শি। তিনি ৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একখানি বড় ও সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া অঞ্জুমানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। মিঃ মামা দানশীলতার জন্ম বিখ্যাত, এপর্য্যন্ত তিনি নানা সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্ম তিন লক্ষ টাকার উপরে দান করিয়াছেন। গৃহসমস্যা বাঙালী দরিদ্র ভদ্রলোকদের পক্ষেও বড় সহজ সমস্যা নহে। প্রায় সব সম্প্রদায়ের ভিতরেই এদিকে নজর দিবার মত মহানুভব ব্যক্তি দুই-চারিজন মিলেই। কিন্তু বাঙ্গালীদের ভিতর এরূপ একজন লোকেরও সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।

ট্রেন-দুর্ঘটনা

বিহার চম্পারণের অন্তর্গত রাক্সউল ষ্টেশনের কাছে গত ২৩শে জুন একটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। অথচ এই ঘটনাটি সম্বন্ধে জনসাধারণ এতদিন বিশেষ কিছুই জানিতে পারে নাই। ঘটনাটির বিবরণ এখানে প্রকাশিত হইল। ইহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা এই বিবরণ হইতেই বোঝা যাইবে। ঘটনার দিন রাত্রি ১০টা হইতে ১১টার ভিতর ২৬ নং ডাউন ট্রেন ভেবরা ষ্টেশন পরিত্যাগ করে। তখন বৃষ্টি হইতেছিল। ট্রেনখানি একখানি 'মিক্সড্' ট্রেন; ইহাতে যাত্রীগাড়ী ছিল, ডাকগাড়ী ছিল, আবার মালগাড়ীও ছিল। ট্রেনখানি একটি সেতুর উপর দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একস্থানের জোড়া ফাটিয়া যায়। ফলে কয়েকখানি গাড়ী পিছনে পড়িয়া থাকে। ট্রেনের যে অংশটি পিছে পড়িয়া ছিল তাহার আবার কতক অংশ ছিল সেতুর উপরে, আর কতকটা ছিল সেতুর বাহিরে। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সেতুটি ভাঙ্গিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে সাতখানা যাত্রীপূর্ণ গাড়ী সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানি পত্র সংবাদপত্রের দরবারে পেশ করিয়াছেন। তাহা হইতেই অবস্থার এই পরিচয়টা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্রে প্রকাশ, এই দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একজন ভুক্তভোগী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হিসাব দিয়াছেন, লোক মারা গিয়াছে অন্যূন দুই শত। যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল তাহারাও ১৭ ঘণ্টাকাল কোনো রকম সাহায্য পায় নাই। পরের দিন সন্ধ্যা ছয়টায় একখানা ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্ম নহে, ডাক লইবার জন্ম। যাত্রীরাই বিশেষ চেষ্টা করিয়া তিনজন স্ত্রীলোক এবং একজন পুরুষকে জল হইতে তুলিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে—রেল-কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, একজন লোকও মরে নাই, সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। আমরা বিহার গবর্মেণ্টকে এ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ের জন্ম অনুরোধ করিতেছি। ক্ষতি-পূরণের ভয়ে যদি আত্মীয়-স্বজন পুত্রকন্যা-পরিবারের নিকট মৃত্যুর খবরটাও গোপন করা হয় তবে তাহার মত অমানুষিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।

শ্রী ক্ষেমেন্দ্রলাল রায়

বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন

কার্য্যের প্রারম্ভ

যাহার নামের সহিত এই আশ্রমের নাম জড়িত সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিনে সিদ্ধিদাতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমরা কার্য্যারম্ভ করিতেছি।

আজকার দিনে বাংলা দেশের এমন অবস্থা যে যে-কোন সংউদ্দেশ্য লইয়াই শিক্ষাকার্য্যে নামা চলে। কোন এক রকম শিক্ষার আমাদের আর দরকার নাই, আর-এক নূতন রকম শিক্ষা না হইলে এখন আর চলিবে না, এসমস্ত কথা বলা আমাদের শোভা পায় না। আমরা দরিদ্র ভিক্ষুকের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এক মুঠা ভিক্ষা পাইলেই পরম ভাগ্য বলিয়া গণিব; চাল আতপ কি সিদ্ধ, ছাটা কি আছাটা কাঙ্গাল গরীব তাহা দেখিতে যায় না। শিক্ষার আমাদের দরকার—এইটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় কথা। মেয়েদের ত আরোই দরকার, কারণ শিক্ষার সহিত সম্পর্ক তাঁহাদের নাই বলিলেই চলে।

আজকাল চারিদিকে যে দুই চারিটি বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সকল বালিকার শিক্ষা দীক্ষা হওয়া যে সম্ভব নয় তাহা ত সকলেই জানেন। সুতরাং বয়স্থাদের স্থান যে এখানে নাই তাহা ত বলাই বাহুল্য। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অল্প বয়সে তাঁহাদের অধিকাংশেরই শিক্ষালাভের কোন

সুযোগ হয় নাই ; কিন্তু সংসারচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া তাঁহারা পদে পদে এই অভাব অনুভব করিতেছেন। যাঁহাদের অর্থ-সামর্থ্যের অভাব নাই, স্বামী পিতা সকলেই বর্ত্তমান, তাঁহারাও শিক্ষার মূল্য বুঝিয়া অনেক স্থলে পরিণত বয়সে পাঠচর্চ্চা সুরু করিতে চান। আর যাঁহাদের সংসারে অন্নের সংস্থান নাই কিন্তু ক্ষুধিতের কান্না আছে, আশ্রয় নাই কিন্তু অসহায় শিশু-সন্তান আছে, তাঁহারা যে এ অভাব অনুভব করিবেন তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? অল্পবয়সে বিবাহিত হইয়া হিন্দুবালিকা স্বামীর সংসারে যান। যখন বিবাহ হয় তখন অনেক স্বামীও বালক মাত্র। ভবিষ্যতে অন্নের কোন সংস্থান তিনি করিতে পারিবেন কি না জানিবার আগেই তাঁহার সংসার পাতান হইয়া যায়। শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই তাঁহার মাথায় স্ত্রী পুত্র কন্যা বিধবা মাতা ভগ্নী প্রভৃতি ৬।৭ এমন কি দশ বারো জনের ভারও চাপিয়া বসে। এমন অবস্থায় শিক্ষাতেও মন বসে না, ভাল কাজ কি অর্থকরী ব্যবসায়ের আশায় বসিয়া থাকা চলে না। হাতের কাছে যাহা জোটে তাহাই অবলম্বন করিয়া দুটি মোটা ভাত কাপড় জোটানই হইয়া উঠে তখন জীবনের একমাত্র সমস্যা। এই হাতের কাছে পাওয়া তৃণমুষ্টিতে অন্নসমস্যা মিটে না, অথচ তাহা ছাড়িয়া অধিকতর লাভবান কিছু ব্যবসায় বাণিজ্য ফাঁদিবার ভরসা এত বড় সংসার ফেলিয়া করা চলে না। কাজেই জীবন-মরণের এই সন্ধিস্থলে "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়াই তাহাদের চিরদিন কাটে। এমন দৃশ্য ত বাংলার ঘরে ঘরে। যাহাদের দুই বেলা পেট ভরিয়া অন্ন জোটে না শীতে শতছিন্ন পুরাতন বালাপোশের উপরে নূতন একখানা কিনিবার সামর্থ্য নাই, ব্যাধির কবলে পড়িতেও তাহাদের দেরী হয় না; কারণ দেহ পোষণের জন্য গ্রহণ করে যতটুক, অর্থচিন্তায় আর দুর্ভাবনায় ক্ষয় করে তার চেয়ে অনেক বেশী। তার উপর জীবনব্যাপী নিরানন্দ দেহ মন এমনই অবসন্ন করিয়া রাখে যে ক্ষীণ প্রাণ লইয়া দুরন্ত কেন সামান্য ব্যাধির সঙ্গেও যুদ্ধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কাজেই সংসারের মাথা ভাঙিয়া পড়িতে বিলম্ব হয় না; তৃণমুষ্টি যাহাদের সম্বল ছিল ধূলিমুষ্টি তাহাদের সম্বল হয়। তখন সেইসব অশিক্ষিতা বালিকা বধূর চক্ষে সংসার যে কি মূর্ত্তিতে দাঁড়ায় তাহা তাঁহারাই জানেন। মনে হয় এ অনন্ত দুঃখের সাগরে ডুবিয়া মরা ছাড়া পার হইবার বুঝি আর কোনো উপায় নাই।

এই-সব সংসারের মেয়েরা বিশেষতঃ আশ্রিতা বিধবারা যদি নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, সংসারে দুই পয়সা সাহায্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সংসার তাঁহাদের চক্ষে এমন অন্ধকার ঠেকিত না, সংসারে তাঁহারা একটা প্রতিষ্ঠা পাইতেন, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করিয়া বহু দুঃখেও একটু আনন্দের সন্ধান পাইতেন। সংসারে মেয়েরা যদি দুপয়সা আনিয়া কিছুদিনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাহা হইলে পুরুষকেও এমন নিরুপায়ভাবে যখন যাহা জোটে তাহাই আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত না। যে মেয়েদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা আছে তাহাদের সুখে রাখিবার ভাবনা মানুষে নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতে পারে, এবং দেখিয়া শুনিয়া একটা সুব্যবস্থা করিতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী মাত্রই যদি কিছু অর্থকরী বিদ্যা জানিতেন, তাহা হইলে সংসারের দুঃখ অন্তত অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। বিধবাদের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষার আর-একটা দরকার এই যে পরের সংসারে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া আত্মসম্মান রক্ষা করা তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজন।

এই ত গেল অন্নসমস্যার কথা। এ প্রত্যেকের ঘরের কথা। ইহা ছাড়া আরও অনেক ভাবিবার কথা আছে। এই যে শিক্ষা-বিস্তারের কথা আমরা বলিতেছি ইহা ত আপনি বিস্তৃত হইতে পারে না; এই কাজের ভার লইবার জন্যও ত মানুষের দরকার। আমাদের ঘরে ঘরে বিধবা, স্বামীপরিত্যক্তা প্রভৃতি কত দুঃখিনী মেয়ের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা ত কেবল অকাজে কি বিনা কাজে অপচয়ই হয়;

একটু শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে এই-সমস্ত মিলিত শক্তিতে ত দেশে যুগান্তর আনিতে পারিত। শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা শিশুপালন দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষনিবারণ প্রভৃতি কত কাজের জন্য দেশে কর্ম্মীর প্রয়োজন, কিন্তু করে কে? এই-সব মেয়েদের যদি আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি তবে কি অন্তত অর্দ্ধেক অভাবও দূর হয় না? মনে করিবেন না, এই-সব বাহিরের কাজে মেয়েরা কিছু করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ শিক্ষা-বিস্তার, রোগীর সেবা, শিশুর পালন, ধাত্রীবিদ্যা—এ-সব ত মেয়েদেরই কাজ; তা ছাড়া যা-কিছু পুরুষের কাজ বলিয়া মনে করা যায় তাহাও মেয়েদের পক্ষে করা অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা ত সকল কাজই করিতেছেন। সমাজ-রক্ষার জন্য যে-সব সৎকার্য্যের প্রয়োজন তাহা ত অনেক জায়গায় মেয়েদের একচেটিয়া। বাহিরের নিতান্ত পুরুষোচিত কাজও যে তাঁহারা কেমন করিয়াছেন তাহা বিগত মহাযুদ্ধের কথা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। দেশে কাজ করিবার জন্য বৃদ্ধ ও শিশু ভিন্ন একটি পুরুষ ছিল না বলিলেই চলে। এত বড় বড় দেশের এত কাজ কে করিল? গৃহ সংসার সমাজ আপিস আদালত কল কারখানা হাঁসপাতাল বিদ্যালয় যান বাহন বজায় রাখিল কে? মেয়েরাই ত সব করিয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে রোগীর সেবা করিয়াছেন, আবার ঘর হইতে যোদ্ধাদের মাল মসলা খাদ্য পানীয় পোষাক-পরিচ্ছদ জোগাইয়াছেন। তাহার উপর ট্রাম মোটর চালাইয়াছেন, পুলিশের কাজ করিয়া শান্তিরক্ষা করিয়াছেন, টেলিগ্রাফ টেলিফোন প্রভৃতির কাজ করিয়াছেন, আপিস আদালত করিয়াছেন, ঘরসংসার করিয়াছেন, এক কথায় সংসারটা তাঁহারাই আগাগোড়া চালাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সংসার সমাজ যে কতখানি জটিল তাহা যিনি জানেন তিনি মেয়েদের কোনো ক্ষমতায় কখনও অবিশ্বাস করিবেন না। সমগ্র দেশকে শুধু মেয়েরা যদি বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন তবে আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে দেশ কিছু আশা করিবেন না কেন? দেশের নানা জনহিতকর কার্য্যে আমাদের মেয়েদেরও গড়িয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এই-সব কাজ কুমারী মেয়েরাই করেন, কারণ তাঁহারা বিবাহিত জীবন আরম্ভ করিবার আগেই কার্য্যক্ষম হইয়া উঠেন, অনেকে বিবাহ করেনই না। আমাদের মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া লোকের অভাব হইবে না, ব্যাধি ও জরা ঘরে ঘরে এত বিধবার সৃষ্টি করিয়াছে যে তাঁহাদের দ্বারাই সমস্ত দেশের সেবা করাইয়া লওয়া যায়।

যাঁহাদের আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই তাঁহাদের শুধু শিক্ষা দিলে ত হইবে না, আশ্রয়ও দিতে হইবে। আমরা যাঁহাদের উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিতে চাই, তাঁহাদের অর্থ দিয়া শিক্ষা লইবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই, এক্ষেত্রে শিক্ষা-ব্যয় গ্রহণ না করিয়া দেওয়াই উচিত। আমরা সেই রকম ব্যবস্থা করিতেছি। মেয়েদের এই অনুষ্ঠানে মেয়েদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীদের অর্থ সামর্থ্য ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের প্রধান সম্বল। মানুষ আত্মীয়ের দুঃখ যেমন বুঝে পরের দুঃখ কি তেমন বুঝে? তাই মেয়েদের কাছেই আমরা মেয়েদের মঙ্গলকামনা চাহিতেছি। তাঁহারা আমাদের সহায় না হইলে বাহিরে হাত পাতিব কোন্ ভরসায়? আমাদের কার্য্যের সূচনাই ত হইত না যদি আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী হরিমতি দত্ত মহাশয়া ১০,০০০৲ টাকা দিয়া এই শুভ-কার্য্যের উদ্বোধন না করিতেন। বিধবা ও অন্যান্য অসহায় রমণীদের দুঃখ যে কত বহুল এবং জীবনব্যাপী, এ কথা অনেকেই একটু আধটু জানেন, কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনীর মত অন্তরের সহিত সে দুঃখ কয়জন অনুভব করিয়াছেন? করিলে কি আজ তাঁহাদের মানসিক ও দৈহিক দুঃখ মোচনের জন্য অর্থ ও সামর্থ্যের অভাব হইত?

এ বিষয়ে বেশী আর কি বলিবার আছে। আবার আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া শেষ করিতেছি। দুঃখিনী ভগিনীদের দুঃখ মোচনে সহৃদয়া ভগিনীরা সহায় হউন এই আমাদের প্রার্থনা।

[এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্তা অবলা বসু কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল]

জয়ন্তী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃগয়া

মহকুমা নূরপুরের মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন শীকারে যাইতেছিলেন। কেল্লার ভিতর তাঁহার প্রাসাদ। কেল্লার সম্মুখে প্রকাণ্ড মাঠে শীকারের দলবল প্রত্যূষে সমবেত হইয়াছিল। শীতকাল। শীকারীরা ও অপর লোকেরা তুলাভরা মিরজাই পরিয়া ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শীকারীদের পিঠে বন্দুক, হাতে বর্শা, কোমরে তরওয়াল। চারিদিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি। শিকলে বাঁধা তাজী কুকুর মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, ধমক খাইয়া আবার স্তব্ধ হইতেছে। কয়েক জনের হাতে চক্ষু-বাঁধা বাজ পাখী। শীকার-যাত্রার বিলম্ব নাই।

আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু সূর্য্যোদয় হয় নাই। উত্তর হইতে শীতল বায়ু বহিতেছে। সহসা কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। মন্‌সব্‌দার কেল্লার ফটক পার হইয়া বাহিরে আসিতেছেন, সঙ্গে পাঁচ-সাতজন বন্ধু ও কর্ম্মচারী। সকলেরই শীকারের বেশ। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই আছেন। পাগ্‌ড়ীতে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। মন্‌সব্‌দার নিকটে আসিলে সকলে তাঁহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। মন্‌সব্‌দার হাস্যমুখে মস্তকে হাত তুলিয়া কহিলেন; "তস্‌লীম!"

জলালুদ্দীনের বয়স চল্লিশ হইবে। দুই-চারি-গাছা গোঁফ দাড়ি পাকিয়াছে। শরীর দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দিব্য সুপুরুষ, চক্ষে ওষ্ঠে দৃঢ়তার লক্ষণ, দৃঢ়তার সহিত নিষ্ঠুরতা। হাসিলেও চক্ষের কটাক্ষে ও অধরপ্রান্তে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন বিলীন হয় না।

পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্যক্তির স্কন্ধে জলালুদ্দীন বাম হস্ত রক্ষা করিয়া ছিলেন। সে হিন্দু ও বয়সে মন্‌সব্‌দারের অপেক্ষা অনেক ছোট। তাহাকে একবার দেখিলে আবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে হয়। আকৃতি জলালুদ্দীনের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, বক্ষ প্রশস্ত, কটি ক্ষীণ। দেখিয়া বলবান কি না বুঝিতে পারা যায় না, তবে চলিবার ভঙ্গীতে ক্ষিপ্র ও লঘুগামী মনে হয়। এরূপ রূপবান পুরুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আকারে ইঙ্গিতে বড় মোলায়েম, চক্ষের দৃষ্টি বড় কোমল ও মধুর। কণ্ঠের স্বরও সেইরূপ, কিছু আলস্যজড়িত, মৃদু, পুরুষকণ্ঠের পরুষতাশূন্য। মন্‌সব্‌দার যুবককে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "কেমন বিহারীলাল, কিছু শীকার পাওয়া যাইবে? দিন ত ভাল বোধ হইতেছে।"

বিহারীলাল চৌধুরী মহকুমার বড় জমিদার, মন্‌সব্‌দারের প্রিয় পাত্র। তিনি মধুর অলস স্বরে কহিলেন, "শীকার ত পাশা খেলা, পড়ে ত পোয়া বারো, না পড়ে ত তিন কাণা।"

পাশে একজন মোসাহেব বলিল, "ঠিক বাত বাবু সাহেব, ঠিক বাত!"

শীকারের সরঞ্জাম মন্‌সব্‌দার ভাল করিয়া দেখিলেন। ঘোড়া, কুকুর, বাজ সব দেখিলেন। তাহার পর অশ্বে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। বিহারীলাল ও আর কয়েক জন তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

কিছু দূর গিয়া অরণ্য। সকলে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে অরণ্য নিবিড়, অন্যত্র বিরল, কোথাও পল্বল, কোথাও বৃহৎ জলাশয়। একটা জলাশয় হইতে কতকগুলা বক উড়িয়া গেল। দেখিয়া, যাহাদের হাতে বাজ ছিল তাহারা বাজের চক্ষু উন্মোচন করিয়া, বাজকে বলাকা দেখাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার পর অশ্বারোহণে বাজের পিছনে ছুটিল।

জলালুদ্দীন, তাঁহার সঙ্গীবর্গ ও কয়েকজন অনুচর সেদিকে না গিয়া সম্মুখে অশ্বচালনা করিলেন। বনের মধ্যে একটা মাঠ, সেইখানে একদল হরিণ চরিতেছিল। মৃগযূথ দেখিয়া শিকারীরা কুকুরের শিকল মুক্ত করিয়া দিল, সেই সঙ্গে একদল অশ্বারোহী ধাবিত হইল।

জলালুদ্দীন, বিহারীলাল ও আর সকলে সেই পথ অনুসরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা বৃহৎ বন্য বরাহ তাঁহাদের পাশ দিয়া বেগে পলায়ন করিয়া বনে প্রবেশ করিল। জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল তৎক্ষণাৎ

সেইদিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। আর সকলে অতটা লক্ষ্য না করিয়া পূর্ব্ববৎ হরিণের দিকে ধাবমান হইল। মন্‌সবদারকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেবল এক জন তাঁহার অনুগামী হইল।

নিবিড় শাখা প্রশাখা, লতা গুল্ম ভেদ করিয়া বরাহ ছুটিল; পশ্চাতে জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল। পাশাপাশি যাইবার পথ ছিল না, মন্‌সব্‌দার আগে বিহারীলাল পশ্চাতে। দুই জনে বিশ ত্রিশ হাত ব্যবধান হইবে। কিছু দূর গিয়া বরাহ বিটপীশূন্য তৃণাবৃত পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইল। পরিসর অল্প, কিন্তু আক্রমণকারীর সুবিধা। মন্‌সব্‌দার বর্শা লক্ষ্য করিয়া বরাহকে আক্রমণ করিলেন।

তাঁহার নিমেষ মাত্র বিলম্ব হইয়া থাকিবে। বরাহ চকিতের মত ফিরিয়া অশ্বকে আক্রমণ করিল। জলালুদ্দীনের বর্শা বরাহের বক্ষে অথবা পার্শ্বস্থলে বিদ্ধ না হইয়া, তাহার পৃষ্ঠে অল্প লাগিয়া, ভূমিতে প্রোথিত হইল। বর্শাফলক মুক্ত করিবার পূর্ব্বেই বরাহ বজ্রদন্ত দিয়া অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল। বিকট চীৎকার করিয়া অশ্ব পড়িয়া গেল।

মন্‌সব্‌দার লম্ফ দিয়া অন্যদিকে দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু বর্শা হস্তচ্যুত হইল। অশ্বকে ছাড়িয়া বরাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

পশ্চাৎ হইতে বিহারীলাল দেখিলেন। বর্শার মুষ্টি দিয়া অশ্বকে দারুণ প্রহার করিলেন। অশ্ব লম্ফ দিয়া বরাহের সম্মুখে আসিল। বিহারীলাল মন্‌সব্‌দার ও বরাহকে দেখিতেছিলেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না। বর্শা-ফলক সজোরে বৃক্ষশাখায় লাগিয়া, বর্শা তাঁহার হস্ত হইতে ঠিক্‌রিয়া দূরে গিয়া পড়িল। যখন তাঁহার অশ্ব বরাহের সম্মুখে তখন তিনি নিরস্ত্র, কেবল কটিতে তরবারি। তাহাও বাহির করিবার অবসর হইল না। বরাহ আবার ফিরিয়া বিহারীলালের অশ্বের উরু চিরিয়া ফেলিল। মন্‌সব্‌দারের ন্যায় বিহারীলালও লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। তখন বরাহ পাল্টাইয়া আবার মন্‌সব্‌দারকে আক্রমণ করিল। তাঁহার হস্তে তরবারি, কিন্তু তরবারি দ্বারা তিনি কখনই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না, কারণ তিনি বরাহকে আঘাত করিলেও সে তাঁহাকে দীর্ণ করিয়া হত্যা করিত।

পলকের মধ্যে এই-সকল ঘটিতেছিল। বিহারীলাল কোন কথা না কহিয়া, বেগে গিয়া বরাহের পিছনের দুই পা ধরিয়া, অমানুষী শক্তিতে তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন। বরাহের সম্মুখের দুই পা মাটীতে রহিল, পিছনের দুই পা শূন্যে উঠিল। দন্ত দিয়া আঘাত করিবার ক্ষমতা একেবারেই রহিত। ঘুরিতে যায়, ঘুরিতে পারে না, কিংবা সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলালও ঘোরেন। সঙ্কটে পড়িয়া বরাহ গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মন্‌সব্‌দার কয়েক পদ হটিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় তৃতীয় অশ্বারোহী উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া বিহারীলাল কহিলেন, "মক্‌দুম শাহ, বিলম্ব করিও না। ইহাকে আর রাখিতে পারিতেছি না।"

মক্‌দুম শাহ হস্তস্থিত বর্শা বরাহের পঞ্জরে আমূল বিদ্ধ করিলেন। তখন মন্‌সব্‌দারেরও বিস্ময় ও মোহ অপনীত হইল। লক্ষ্য করিয়া বরাহের হৃদয়ে তরবারি বিদ্ধ করিলেন। বরাহ গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

কিয়ৎকাল কেহ কোন কথা কহিল না। পরে জলালুদ্দীন বিহারীলালের নিকট গিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ।"

বিহারীলাল কহিলেন, "সাহেব, ও কথা আর বলিবেন না, আমি ওরূপ অবস্থায় পড়িলে আপনিও আমাকে রক্ষা করিতেন।"

মন্‌সব্‌দার ঘাড় নাড়িলেন, "আমার বাহুতে এমন বল নাই যে বন্য বরাহকে তুলিয়া ধরিতে পারি। নিজের চক্ষে না দেখিলে আমি প্রত্যয় করিতাম না।"

"আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম শীকার ও পাশা খেলা সমান। সৌভাগ্যক্রমে তিন কাণা না পড়িয়া তিন ছয় আঠারো পড়িয়াছে।"

জলালুদ্দীন গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমার এ ঋণ আমি কখন শোধ করিতে পারিব না, কখন ভুলিব না। যদি ভুলি তাহা হইলে যেন দোজখেও আমার স্থান না হয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বনদেবী

মধ্যাহ্নের সময় আহারাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকল শীকারী একত্র হইল। বিহারীলালের অদ্ভুত বাহুবলের কথা শুনিয়া সকলে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। সকলে বুঝিল বিহারীলাল না থাকিলে মন্‌সব্‌দার বরাহ হইতে রক্ষা পাইতেন না।

আহারাদির পর অর্দ্ধ দণ্ড বিশ্রাম করিয়া সকলে গৃহের অভিমুখে ফিরিল। ফিরিবার সময় অন্য পথ দিয়া, দুই তিন দলে বিভক্ত হইয়া চলিল। জলালুদ্দীন ও বিহারীলাল এবার বর্শা ছাড়িয়া বন্দুক লইলেন। জলে নানা জাতীয় পক্ষী, তাহারই শীকার হইবে। দুই জনের লক্ষ্য অব্যর্থ, পাখী উড়াইয়া মারিতে লাগিলেন। অনুচরেরা সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার পর অনেক দূর পর্য্যন্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় বন্দুকের আওয়াজে পাখী উড়িয়া গিয়া থাকিবে। মন্‌সব্‌দার ও বিহারীলাল দুই জনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতেছিলেন।

অকস্মাৎ উভয়ে দেখিলেন বনের মধ্যে একপার্শ্বে প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে একটি রমণী একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ও অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জলালুদ্দীন রমণীর সম্মুখে উপনীত হইয়া অশ্বের গতি রোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অনুচরেরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে রমণীর প্রতি চাহিয়া ছিল।

সাক্ষাৎ বনদেবীর ন্যায় এই নারী কে? এমন স্থানে একাকিনী কি করিতেছে? ধনীর ঘরের পুরস্ত্রী না হউক, নীচ জাতীয় দরিদ্র রমণী নহে। বস্ত্র ও বেশ বহুমূল্য না হউক, পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার। পরিধানের ধরণে বিদেশিনী বিবেচনা হয়। আলুলায়িতদীর্ঘকেশী, রূপে বন আলোকিত করিয়াছে। বিশাল নয়নের দৃষ্টি স্থির, ভয়শূন্য। অশ্বারোহী অস্ত্রধারী পুরুষদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল বা ত্রস্ত হইল না। যেমন দাঁড়াইয়াছিল সেই-রূপ দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্‌সব্‌দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

রমণীর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, কহিল, "আপাততঃ এই বনবাসিনী।"

"কি জাতি?"

"আমার পরিচয় জানিয়া আপনার কি হইবে?"

"আমি রাজকর্ম্মচারী। অজ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় লইবার আমার ক্ষমতা আছে।"

"আমি ক্ষত্রিয়কন্যা।"

"কোথায় নিবাস?"

"এইমাত্র ত বলিলাম—সম্প্রতি আমি এই বন-বাসিনী।"

"এখানে কেমন করিয়া আসিয়াছ?"

"কিছু দূর আপনার ন্যায় অশ্বারোহণে, অবশিষ্ট পথ পদব্রজে।"

"এমন জনশূন্য বনে তোমার কি প্রয়োজন?"

"বনবাসের বাসনা।"

"তুমি কি বনবাসের যোগ্যা?"

"তাহার বিচারকর্ত্তা আপনি নহেন।"

মন্‌সব্‌দারের কৌতূহল—সেই সঙ্গে আরও কোন মনোভাব—বাড়িতেছিল। কিছু রাগও হইতেছিল। রুক্ষ স্বরে সংক্ষেপে কহিলেন, "তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।" অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন, "এই স্ত্রীলোককে অশ্বে আরোহণ করাইয়া দুর্গে লইয়া চল।"

বিহারীলাল এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিষ্পন্দ ছিলেন। এখন একটি মাত্র কথা কহিলেন, "কেন?"

স্বরে আলস্য নাই, কোমলতা নাই, তীক্ষ্ণ, তীব্র, স্পষ্ট কণ্ঠ। আকাশপ্রান্তে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় একবার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

মন্‌সব্‌দার বিহারীলালের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এই রমণী একাকিনী, অসহায়, দুর্গের অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইবে।"

বিহারীলাল প্রথম কথা কহিতেই রমণী তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিল। এখন অবনত নয়নে তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারকে কহিলেন, "ইনি একাকিনী

ন, অসহায় হউন, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন নাই, স্বেচ্ছায় বাক্যালাপও করেন নাই। ইনি ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি আপনার মহলে যাইতে চাহেন সে কথা স্বতন্ত্র।"

মন্‌সব্‌দার আবার বিহারীলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টি ক্রূর, কুটিল, ওষ্ঠাধরের প্রান্তে নিষ্ঠুরতার রেখা প্রস্তরে লৌহরেখার ন্যায় স্পষ্ট। তিনি কথা না কহিতেই রমণী বলিল, "বনচারিনী বলিয়া আমি অসহায় বা একাকিনী এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমি কাহারও আশ্রয়প্রার্থী নহি, এবং আপনার বা আর কাহারও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চাহি না। আপনারা উদ্দিষ্ট পথে গমন করুন। আমি একাকিনী হইলেও নিরপরাধিনী, আমাকে পীড়ন করিবেন না।"

মন্‌সব্‌দাব কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বিহারীলাল কহিলেন, "আমার অনুরোধ—আপনি ইঁহাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বে দুর্গে বা আর কোথাও পাঠাইবেন না, ইঁহার যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে দিন।"

জলালুদ্দীনকে কথা কহিতে অবসর না দিয় রমণী বিহারীলালকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনাবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কিন্তু এই অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারী হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই।"

একবার রমণীর ও বিহারীলালের চক্ষু মিলিল অপর মুহূর্ত্তে রমণী বনে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল।

মন্‌সব্‌দারের আদেশে অনুচরেরা অনেক অন্বেষং করিল, রমণীকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

শীকার বন্ধ হইয়া গেল। বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন, পথে আর বড় একটা কথা-বার্ত্তাও হইল না।

সেই দিন প্রভাতে, তৃণ হইতে শিশিরবিন্দু লীন হইবার পূর্ব্বে বিহারীলাল মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীনের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কেন? ভবিতব্য সর্ব্বযামী ব্যতীত কে জানে?

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যাসাগর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে' থাকতে পারেননি বটে কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের সেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করচেন।

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে' গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেচে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন।—এমন দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্ত্তমান, বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতের

অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করেনি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে' তার পথে সহস্র বাঁধ বেঁধে সমাজকে নিরাপদ কর্‌বার চেষ্টা করেচে। কিন্তু তৎসত্ত্বে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাক্‌তে পারেননি। এতেই তাঁর চারিত্রের অসামান্যতা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিন্তু চারিত্র-বল আমাদের দেশে সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্র-বল কেবলমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধি-গত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধি-গত সেই প্রবলেরা অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চারিত্র-বল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মান্‌তে পারে না। মানসিক চারিত্র-বলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে' দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে' নিয়ে যাবার সারথী স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সব-চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।

বর্ত্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ। যাঁরা বর্ত্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্ত্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ত দেখে বলে' তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে সত্য সুদূর অতীতের মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে' ফেলেছে; তারা বলে যে তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিষয়-ব্যাপারের যা-কিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে, তারা প্রাণের নিয়ম অনুসারে ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেনি, সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে' জিনিষটাই তাদের নয়।

এইরূপে সুসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে' তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্ব্বত্র লক্ষ্য-গোচর হয়, এমন কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে' যাচাই করে' নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে' নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা কর্‌তে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে' নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে' আত্মপরীক্ষা দেবার জন্তে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই-সকল নব-যুগের বীরদের কাছে সত্যের ছদ্মবেশধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকল প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে' কল্পনা করে' কোনো রকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে' রাখ্‌তে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এই-টেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইজন্তেই আশ্চর্য্যের কথা এই যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্ত্তব্যের সাহস অনুভব করে' ধর্ম্মবুদ্ধিকে জয়ী কর্‌বার জন্তে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণ-তনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল, তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জয়ী হয়ে-ছিলেন বলে গৌরব কর্‌তে পারিনে। কারণ সত্যের জয়ে দুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দর্‌কার। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে যাঁরা বাহিরে পরাভব পান তাঁরাও অন্তরে

জয়ী হন, এই কথাটি জেনে আজ আমরা তাঁর জয়কীর্ত্তন করব।

বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতু-স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে' অপমান করেননি। তিনি জান্‌তেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর কর্‌বার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু যাঁর অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে' তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ কর্‌তে পেরেছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশী বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত-বিদ্যারই চর্চ্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার কর্‌তে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চির-যৌবনের অভিষেক লাভ করে' বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব-চেয়ে পূজনীয় কারণ তিনি আমাদের দেশে চল্‌বার পথ প্রস্তুত করে' গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্চে এইভাবে বাধা অপসারিত করে' ভাবী যুগে যাত্রা কর্‌বার পথকে মুক্ত করে' দেওয়া। তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে' দেন। কিন্তু বাধাই যে-দেশের দেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান কর্‌তে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সব-চেয়ে বড় পরিচয় হয়ে থাক্‌বে। এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন কর্‌তেন, তাহলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বস্‌তেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য কর্‌তে হ'ত না। কিন্তু যাঁরা বড়, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি কর্‌বার জন্যে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না।

একথা মান্‌তেই হবে যে বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই বেদনা বহন করেছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্চে যে যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পাননি। তিনি যদিও তাতে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হননি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড় তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পাননি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন কর্‌তে সংসারে পাঠান, তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে' তোলে,—অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষ্যে আরেক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে—যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মত জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেননি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে পার্‌লেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্ম্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মানুষ নতন নতন দেশে নিষ্ক্রমণ করে'

অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনই মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে' নব নব পথে ধাবিত কর্‌তে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্র-মহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য্য করে' নিয়ে থাকেন। আমরা অনুভব কর্‌তে পারি না যে এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত ঊর্দ্ধে বিরাজ করেন। যারা ছোট, বড়র বড়ত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড় অপরাধ বলে' গণ্য করে। এই কারণেই ছোটর আঘাতই বড়র পক্ষে পূজার অর্ঘ্য।

যে জাতি মনে করে' বসে' আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্যকে অর্জ্জন কর্‌বার জন্যে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্ব্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মত সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে' কখনই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্ম্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে' যা অজ্ঞাত যা অলব্ধ তার অভিমুখে নিয়ত চল্‌তে চায়; বহুমূল্য পাথরে দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্ম্মে শক্তিহীন ও নিস্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্ব্ব-গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে স্পেনের চিত্ত ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয়নি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্ত্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্ত্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে' মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই বলে' অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জান্‌তে হবে যে অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর কর্‌বার জন্যে। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সাম্‌নের পাকে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সাম্‌নের পা-কে পিছনে টেনে রাখ্‌ত তাহলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্ম্মাণ করে' দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে' দিয়েছেন। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয় যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। এইরূপে আমরা উভয় কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে' মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। একদিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হতে পার্‌ছি না, অন্যদিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁকড়ে থাক্‌তেও পার্‌ছি না। তাই আমরা একদিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্য-সহচর করেছি, আবার অন্যদিকে বল্‌ছি যে বিজ্ঞান্ আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌ল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা না আগে না পিছে কোনো দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পার্‌ছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্চে যে আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে' রাখ্‌তে চাচ্ছি, তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই।

আজ আমরা বল্‌ব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পদকে কৃপণের ধনের মত মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন কর্‌তে উদ্যমশীল হয়েছেন তাঁরাই চিরস্মরণীয়, কারণ

তাঁরাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক। তাঁদের সকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেন তা নয়, কারণ আমি বলেছি যে তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র অনুসারে সার্থকতার তারতম্য হয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে আমাদের দেশেও এঁদের মত লোকের জন্ম হয়।

আজকাল আমরা দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান কর্‌ছি তা কতকটা দেশাভিমান বশত। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বশত প্রাচীন বিদ্যাকে সর্ব্বমানবের সম্পদ কর্‌বার জন্য ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ কর্‌চি কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা কর্‌তে কুণ্ঠিত হইনি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে' মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বল্‌বেন যে তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে ত শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্য্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব কর্‌তে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেননি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে' গেছেন।

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে এমন একদিন আস্‌বে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চল্‌তে গৌরব বোধ কর্‌ব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে' থাক্‌ব না, যেদিন "যুদ্ধং দেহি" বলে' প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে' নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে' আন্‌বার জন্যে যাঁরা প্রত্যূষেই জাগ্রত হয়েছিলেন, তাঁদের বল্‌ব, "ধন্য তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয়নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্ত্তি অক্ষয়রূপ ধারণ কর্‌ছিল।"

সত্যপথের পথিকরূপে সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে একতালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বল্‌তে পার্‌ব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর-স্মরণসভায় বক্তৃতার মর্ম্ম (১৭ই শ্রাবণ, ১৩২৯। ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।) শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিপিত।
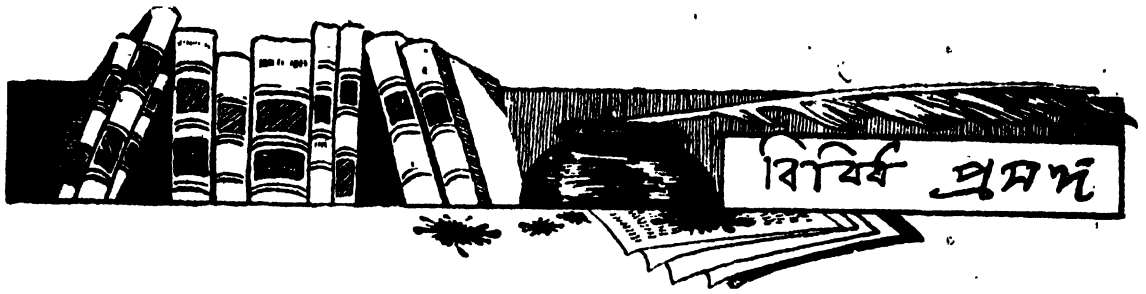
কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্ন

বর্ত্তমান সময়ে তিনটি রাজনৈতিক প্রশ্ন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। নিরুপদ্রব আইনভঙ্গ তদন্ত কমিটি কিছুদিন হইতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া প্রধান প্রধান অসহযোগীর সাক্ষ্য লইয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, দেশ ব্যাপকভাবে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি বিষয় আলোচিত হইতেছে। কংগ্রেস্‌ওয়ালাদের অধিকাংশ কয়েক বৎসর হইতে অসহযোগনীতির পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু এখনও কংগ্রেসের এমন সভ্য আছেন যাঁহারা, অসহযোগ প্রচেষ্টার মূলীভূত নীতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে মানেন না, বা মানিতে প্রস্তুত নহেন। মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ কংগ্রেসওয়ালা, কিছুকাল হইতে, ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করিয়া, তথায় দেশহিতসাধনের চেষ্টার পক্ষপাতী হইয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশেও এই মতাবলম্বী লোক আছেন। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের সভানেত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অভিভাষণে এই মত সমর্থিত হইয়াছিল। অবশ্য তাহার প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। কংগ্রেস্ ও অসহযোগ দলের আলোচ্য আর-একটি বিষয় এই, যে, যে-সব কংগ্রেস্- ও অসহযোগদল-ভুক্ত আইনজীবী সরকারী আদালতে নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি না।

উল্লিখিত তিনটি প্রশ্ন প্রধানতঃ অসহযোগীদের চিন্তার বিষয় হইলেও মডারেট্‌রাও তাহার আলোচনা করিতেছেন। তদ্রূপ, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর একটি বক্তৃতা প্রধানতঃ মডারেট্‌দের ভাবনার কারণ হইয়া থাকিলেও, উহা অসহযোগী ও মডারেট উভয়দলের লোকদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

—

কয়েকজন নেতার কারামোচন

এই প্রকার গুরুতর প্রশ্ন-সকলের আলোচনার সময় অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও নেতা মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন থাকিলে বড় ভাল হইত। তিনি দেশের অবস্থা বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারিতেন।

কিন্তু যদিও এসময়ে তাঁহার কারাবাসে দেশ তাঁহার পরামর্শ ও নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তথাপি তাঁহার কারাবাস দ্বারা অসহযোগীদের পরীক্ষাও হইতেছে। কেবলমাত্র একজন নেতার বুদ্ধিবিবেচনা রাজনীতিজ্ঞান দৃঢ়তা ও সাহসের বলে কোনও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা চলিতে বা সফল হইতে পারে না। দলের অন্যান্য লোক ও নেতাদেরও চিন্তা ও কাজ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই, এবং দৃঢ়তা ও সাহস আদি গুণ থাকা চাই। ইহা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু সাধারণ কথা হইলেও ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

সুখের বিষয়, সমুদয় নেতা কারারুদ্ধ হন নাই; এবং যাঁহারা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে কেহ কেহ কারামুক্ত হইতেছেন। তাঁহারা ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ ভোগ করিয়া নেতৃত্বের যোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সকলকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় কয়েকদিনের মধ্যেই দেশের অবস্থা বিশেষভাবে জানিয়া লইতে পারিবেন। অসহযোগীগণ তাঁহার পরামর্শ শুনিবার জন্য ব্যগ্র

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ (কারামুক্তির পর)

যাছেন। শীঘ্রই তিনি পরামর্শ দিতে পারিবেন। তিনি জলে থাকিবার সময় জেলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল লিয়াছিলেন, যে, তিনি কারামুক্ত হইয়া আবার ্যারিষ্টারিতে প্রবৃত্ত হইবেন। বেসরকারী লোকেরাও বিষয়ে কানাঘুসা করিতেছিলেন। তিনি এই-সব গুজবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সমালোচকেরা এই কথা রটাইয়াছিলেন, যে তিনি ডুমরাওঁ-রাজের মোকদ্দমায় এক পক্ষে ব্যারিষ্টারি করিবেন। যদি তিনি তাহা করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। কারণ, তিনি যখন ব্যারিষ্টারি ত্যাগ করিবার সংকল্প

প্রকাশ্য সভায় জ্ঞাপন করেন, তাহার পর একথাও বলেন, যে, ডুমরাওঁএর মক্কেলের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, এবং তজ্জন্য তিনি সেই মোকদ্দমাটি করিবেন।

শ্রীযুক্ত সুবাসচন্দ্র বসুও কারামুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। সাধারণতঃ আমরা, অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্রদের চলিত রাজনীতির সহিত কোনই সম্পর্ক থাকা উচিত নহে, এ মতের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব ও আচরণ যেরূপ, তাহাতে অসহযোগী কোন অধ্যাপক বা শিক্ষকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিয়া উহার কর্ম্মী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি না। তাহাতে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। যে শিক্ষক সর্ব্বদা আপনাকে বিপদ্ হইতে দূরে রাখিতে ব্যগ্র, ছাত্রেরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে না সত্য, কিন্তু যাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এরূপ শিক্ষকগণ দেশমধ্যে কিরূপে সাধারণ শিক্ষা, নানাবিধ বৃত্তিশিক্ষা এবং স্বাদেশিক কর্ত্তব্যের শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে, তাহার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিলে ভাল হয়।

—

রাজনৈতিক সাপুড়িয়া

আমেরিকার একটি কাগজ হইতে এখানে একটি ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। ছবিটির ব্যাখ্যাকর্ত্তা ভারতবর্ষের জাতীয় প্রচেষ্টাকে সাপ এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাপুড়িয়া করিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতশাসন আইনের সংস্কার ও তদনুযায়ী ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি এই সাপুড়িয়ার তুবড়ীর বাদ্য। যদি এই বাদ্যে সাপ মুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সাপুড়িয়ার হাতে যে অস্ত্র আছে, তাহা প্রয়োগ করা হইবে।

ভারতবর্ষের লোকেরা যে প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দ্বারা স্বরাজ লাভ করিতে চাহিতেছে, তাহা জগতের অতীত ইতিহাসে লিখিত বিপ্লব ও বিদ্রোহসমূহের মত নহে। আমরা আমাদের বিরোধীদিগকে আঘাত করিতে চাহিতেছি না। সহযোগী অসহযোগী
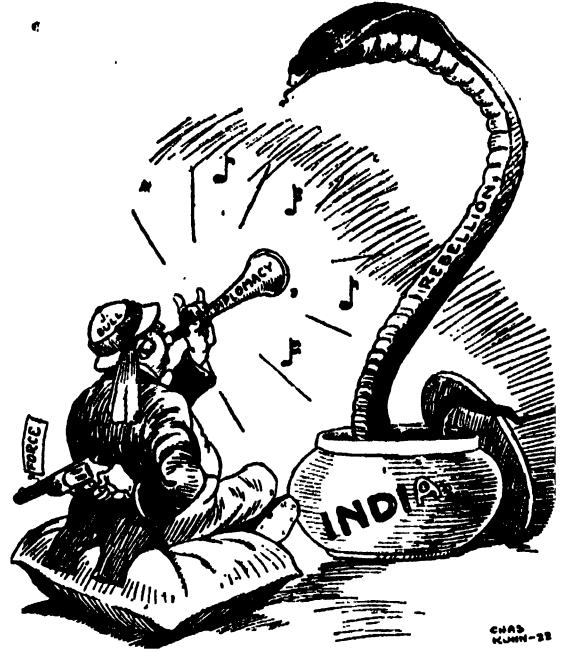
সাপ-খেলানো।—মিঠে বুলির বাঁশী ও নিপীড়নের অসি।
(ইণ্ডিয়ানাপোলিস হইতে)

উভয়দলের ভারতীয়েরাই অহিংসাপন্থী। সুতরাং ভারতবর্ষের সমুদয় বা কোন রাজনৈতিক দলকে দংশনোদ্যত সর্প বলিয়া আঁকিলে তাহা ঠিক্ হয় না। অন্যদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও বলিতে পারেন, "আমরা শাসনসংস্কার-আইন ও ব্যবস্থাপক সভা আদি দ্বারা ভারতবাসীদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চাই না, আমরা ভণ্ড নহি, আমরা সত্যসত্যই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে আত্মকর্ত্তৃত্ব দিতে চাই।" ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ কথা যে সত্য হইতেই পারে না, এমন বলা যায় না; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জের ভারতীয় সিবিল-সার্বিস্ সম্বন্ধীয় সেদিনকার বক্তৃতা পড়িয়া মডারেটরাও গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন। অবশ্য, ব্যঙ্গচিত্রটি লয়েড জর্জের উল্লিখিত বক্তৃতার কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, সাপুড়িয়ার হাতের অস্ত্রটা কোনপ্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কারণ, গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, কয়েক বৎসর হইতে "শান্তি ও শৃঙ্খলা", "আইন ও
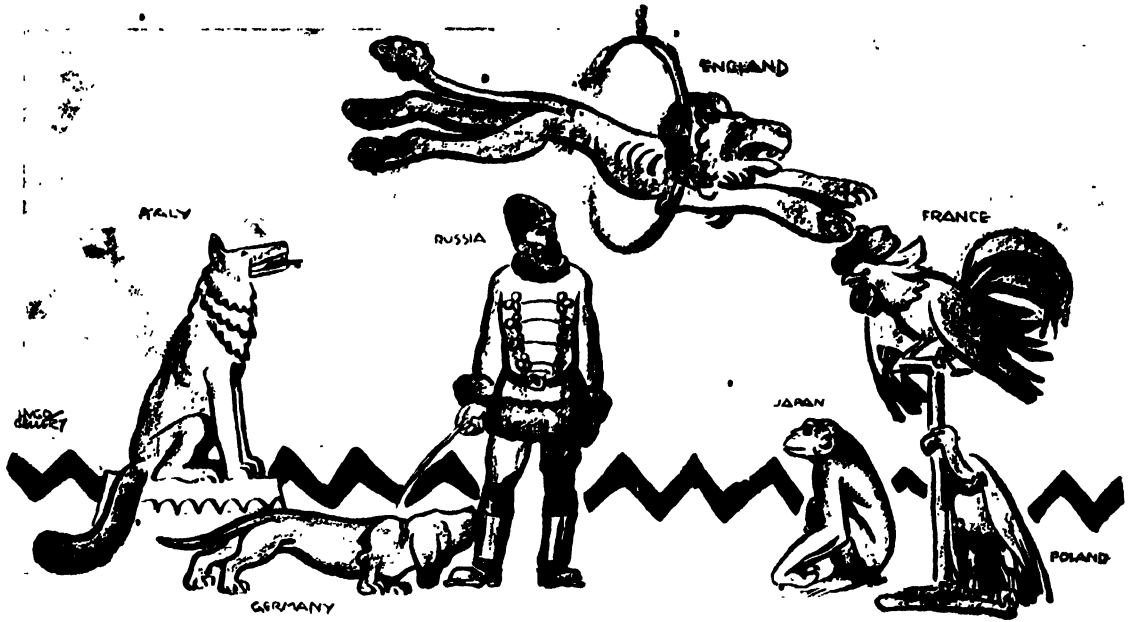
The Circus at Genoa

জেনোয়ার সার্কাস (লিবারেটার পত্র হইতে)

শৃঙ্খলা", প্রভৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত গুলি চালাইবার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

—

জেনোয়ার সার্কাস

মহাযুদ্ধে ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। মানুষ হত, আহত, অঙ্গহীন, অক্ষম হইয়াছে লক্ষ লক্ষ; অর্থনাশেরও পরিমাণ করা অতি কঠিন। যুদ্ধের অবসানের পর হইতে ইউরোপের বিজয়ী জাতিরা চেষ্টা করিতেছেন, যে, তাঁহারা, বিশেষতঃ ফ্রান্স, কি প্রকারে জার্মেনীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবেন, কি প্রকারে নিজেদের ভাঙা ঘর গড়িয়া তুলিবেন, কি প্রকারে জার্মেনীকে চিরকালের মত হীনবল করিয়া রাখিবেন, কি প্রকারে এশিয়া ও আফ্রিকার ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি এবং বাণিজ্যের সুবিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবেন, এবং কি প্রকারে রুশিয়ার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবেন, বল্‌শেবিকদের প্রভাব নষ্ট করিবেন ও রুশিয়ার কাঁচা মাল নিজেদের দেশে আমদানী ও নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য রুশিয়ায় রপ্তানী করিয়া ধনবান্ হইবেন। কেরোসীন্ ও অন্যবিধ ভূগর্ভস্থ তৈল যে-যে দুর্ব্বল দেশে আছে, তাহার মালিক হওয়াও বিজেতাদের অন্যতম লক্ষ্য।

এই-সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যুদ্ধ শেষ হইবার পর, অনেক কন্‌ফারেন্স্ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। জেনোয়ার কন্‌ফারেন্স্ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। উহাতে বিজয়ীরা কাজ হাসিল করিতে পারে নাই, কিন্তু রুশিয়ার প্রতিনিধিরা যে খুব খেলোয়াড় তাহা দেখা গিয়াছে। রুশিয়া ও জার্মেনী অন্য সব জাতিদের মুখাপেক্ষা না করিয়া জেনোয়ায় বাণিজ্য ও আত্মরক্ষা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছে।

রুশিয়ার চতুরতা উপলক্ষ করিয়া আমেরিকার লিবারেটর সংবাদপত্র জেনোয়ার কন্‌ফারেন্স্‌কে একটা সার্কাসের মত করিয়া আঁকিয়াছে। তাহাতে রুশিয়ার নির্দ্দেশ মত অন্যান্য জাতির প্রতিনিধিরূপী জন্তুরা নানাবিধ খেলা দেখাইতেছে।
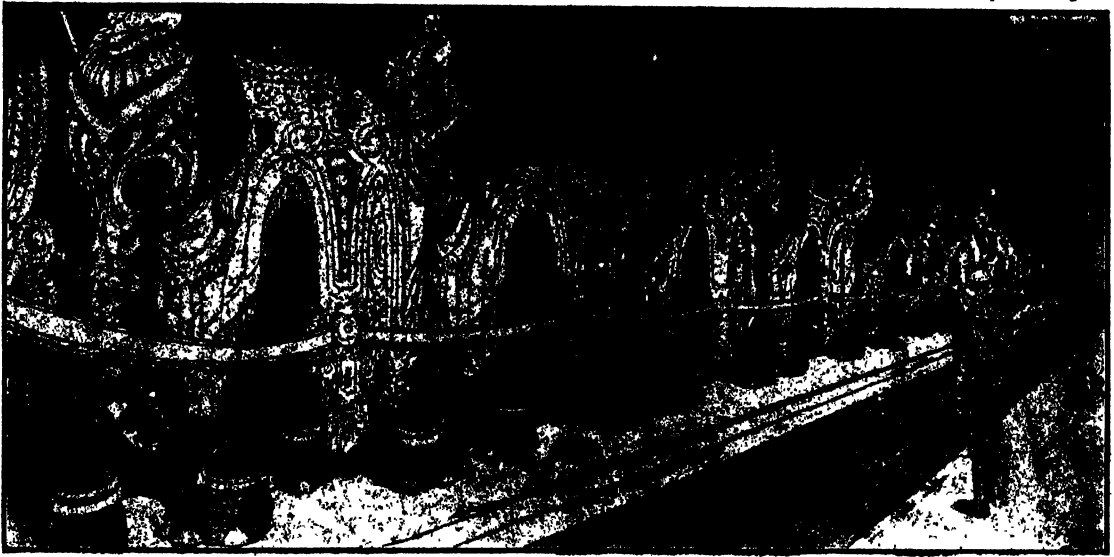
আট হাতীর রথে ভারতীয় মহারাজা, ও ইংলণ্ডের যুবরাজ। (শিকাগো হেরাল্ড এণ্ড এগজামিনার হইতে)

আট হাতীর রথ

ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতবর্ষ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি দেশী রাজাদের রাজ্যসকলেই অধিক সময় যাপন করিয়াছিলেন, এবং তথায় যেরূপ জাঁকজমকের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনার ও মনোরঞ্জনের চেষ্টা হইয়াছিল, ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে তেমন হয় নাই। একজন মহারাজার রাজ্যে তিনি যখন যান, তখন তাঁহাকে যে-সব আড়ম্বর দেখান হয়, তাহার মধ্যে মহারাজার রৌপ্যনির্ম্মিত আট হাতীর রথ একটি। তাহার ছবি একখানা আমেরিকান্ কাগজে বাহির হইয়াছে। আটটা হাতীর পশ্চাতে হস্তীযানে মহারাজা আসীন, অদূরে দাঁড়াইয়া ইংলণ্ডের যুবরাজ তাহা দেখিতেছেন। এই চিত্র অবলম্বন করিয়া আমেরিকান্ কাগজখানার সম্পাদক যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা আগষ্টমাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে তাহার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। আমেরিকান্ সম্পাদকের বক্তব্যের সার কথা এই, যে, মানুষের বাহিরের আড়ম্বর কোন কাজের নয়, ভিতরের আস্‌বাব অর্থাৎ নানাবিধ মানসিক শক্তিই মানুষকে বড় করে। তিনি নিজের দেশের ধনী লোকদেরও রেহাই দেন নাই। তাঁহারা মনে করেন, যে, তাঁহারা অনেক হাজার টাকা দামের মোটর গাড়ীতে চড়েন বলিয়া তাঁহারা, যে-সব লোকের পা-দুখানা মাত্র অবলম্বন, তাদের চেয়ে বড় মানুষ; কিন্তু বাস্তবিক বড় তাঁহারা যাহারা মানসিক শক্তিতে বড়।

একটা হাতীতেই দশবিশ গণ্ডা মানুষকে টানিতে পারে; অথচ একজন মহারাজাকে টানিবার জন্য আট-আটটা হাতীর দরকার হইল। এইরূপ মহারাজাগুলা বড়, না স্কটল্যাণ্ডের সেই ছেলেটা বড়, যে ষ্টীম্-এঞ্জিন্-রূপ লোহার এমন একটা বাষ্পীয় হাতী প্রথম নির্ম্মাণ করিয়াছিল যাহার এক-একটাতে এক-একটা রেলওয়ে ট্রেন টানিয়া লইয়া যায়?

এক-একটা হাতী যাহা খায়, তাহাতে বহুসংখ্যক মানুষের অন্নসংস্থান হইতে পারে। সকল দেশী রাজ্যের সকল মানুষই সুপুষ্ট নহে। অনশনক্লিষ্ট মানুষদের ক্ষুধা নিবারণ যাহার দ্বারা হইতে পারিত, তাহার দ্বারা কতকগুলি হাতী পুষিবার কি সার্থকতা আছে?

—

বিদেশী বস্ত্র ক্রয় নিষেধ

কলিকাতার বিদেশী কাপড়ের সওদাগরেরা মহাত্মা

গান্ধীর নিকট অনেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাদের হাতে যত বিদেশী মাল আছে, তাহা বিক্রী হইয়া গেলে তাঁহারা আর বিদেশী কাপড় আমদানী করিবেন না। কিন্তু সে মাল কি অফুরন্ত? এখনও ত সওদাগরেরা বিদেশী কাপড় বিক্রী করিতেছেন!

তাঁহারা স্বয়ং যখন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, তখন বিদেশী কাপড়ের কাটতি বন্ধ বা হ্রাস করিয়া দেশী কাপড়ের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা অন্যপ্রকারে করা আবশ্যক। কিন্তু কোন প্রকার বল-প্রয়োগ যেমন গর্হিত তেমনি ব্যর্থ হইবে। যাহা দেশের পক্ষে উপকারী, মানুষকে বুঝাইয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত করা, কিম্বা যাহা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর মানুষকে বুঝাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করা, ধর্ম্মনীতি-অনুসারে বৈধ, আইন-অনুসারেও বৈধ। অথচ দেখা যাইতেছে, যাঁহারা বড়বাজারে কাপড়ের দোকান-সকলের সম্মুখে বা নিকটে দাঁড়াইয়া বিদেশী কাপড়ের ক্রেতাদিগকে উহা না-কিনিতে অনুরোধ করিতেছেন, কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিতেছেন না, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন।

শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার ও পুত্রদ্বয়

এবারকার বিদেশী বস্ত্র ক্রয় নিষেধ চেষ্টার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বালকমাত্র। সেও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাকে জেলে যাইতে হইয়াছে। শ্রীমতী হেমপ্রভার সহিত আরো অনেক মহিলা ও ভদ্রলোক যোগ দিয়াছেন। শুধু বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার না-করিতে অনুরোধ করিয়া দেশী বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না, জানি। কিন্তু তাহা হইলেও, যাঁহারা দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়া এই নিষেধবার্ত্তা জানাইতেছেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতার পাত্র।

যদি হাতের তাঁতে বোনা চরখায় কাটা সূতার কাপড় না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেশী কাপড়ের কলে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করা উচিত; বিদেশী কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। খদ্দর ব্যবহার করা কেন উচিত, তাহা অনেকবার বলিয়াছি। যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি খদ্দর যাহাতে উৎপন্ন হয় এবং সে-

সকল সহরে ও গ্রামে এখন বিদেশী কাপড়ের দোকান আছে, তথায় যাহাতে খদ্দরের দোকান স্থাপিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা কংগ্রেসকর্ম্মীদের একান্ত কর্ত্তব্য। চরখার সূতা যাহাতে ক্রমশঃ আরো শক্ত ও মিহি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা দুঃসাধ্য নহে; কারণ কলের সূতার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে চরখায় কাটা সূতা হইতেই ঢাকাই মস্‌লিন তৈরি হইত। আমরা বিলাসিতার জন্য মিহি শক্ত সূতা কাটিতে বলিতেছি না। মিহি শক্ত সূতা কাটিলে অল্প তুলায় বেশী সূতা ও কাপড় হইবে, এবং যাহারা মোটা ভারী কাপড় পরিতে অনিচ্ছুক, তাহাদের আপত্তি খণ্ডিত হইবে। আর একটি দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আটপৌরে খদ্দর সৌখীন লোকদের পোষাকী কাপড় নহে; ইহা দেশের সকল শ্রেণীর লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হউক, দেশহিতৈষীদিগের ইহাই উদ্দেশ্য। দেশের অধিকাংশ লোক গরীব। সুতরাং খদ্দরের দাম যাহাতে ক্রমশঃ কমিতে থাকে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

কোন কোন কাগজে খদ্দর সম্বন্ধে উপহাস-বিদ্রূপ দেখিতে পাই। ইহার রসগ্রহণ করিতে আমরা অসমর্থ। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর যে স্বদেশী আন্দোলন হয়, তাহাতে স্বজাতির উন্নতিপ্রয়াসী সকল রাজনৈতিক দল যোগ দিয়াছিলেন। এখন কেন সে ভাব দেখিতে পাই না? খদ্দরের গোঁড়ামি না করুন, কিন্তু উহা লইয়া বিদ্রূপ করিবার কারণ কি? উহাও ত এক প্রকার দেশী কাপড়? বিদেশী কাপড় কিনিলে কোন প্রকার পুণ্য হয়, এবং খদ্দর কিনিয়া পরিলে কোনরূপ পাপ হয়, ইহা কেহ বলিতে পারেন কি? অন্য দিকে, বিদেশী কাপড় পরিলে পাপ হয়, ইহাও আমরা মনে করি না; কিন্তু দেশী কাপড় প্রাপ্তব্য হইলেও বিদেশী বস্ত্র ক্রয় ও ব্যবহার করা যে গর্হিত সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। খদ্দর কিনিয়া ব্যবহার করিলে তাহাতে স্বদেশবাসী বিস্তর লোকের এবং স্বজাতির মঙ্গল হয়, ইহাও আমাদের বিশ্বাস।

অনেকে এই বলিয়া তর্ক করেন, যে, তোমরা অমুক অমুক বিদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, যেমন মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি নানা বিদেশী কল, বিদেশী কাগজ, বিদেশী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ইত্যাদি, অথচ বিদেশী কাপড়ের বেলাতেই তোমাদের যত আপত্তি! এইরূপ তর্ক যাঁহারা করেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই, যে, সকল রকম বিদেশী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করা অসাধ্য ও অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া, যাহা আমাদের দেশে আগে প্রস্তুত হইত, এবং এখনও হইতে পারে, সেরূপ স্বদেশী জিনিষ উৎপাদন ও ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না, এমন কেন মনে করা হয়?

আমরা খাঁটি খদ্দরের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে ছাপিতে প্রস্তুত আছি। এরূপ বিজ্ঞাপন কংগ্রেস্ কমিটির মারফতে কিম্বা বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত লোকের অনুমোদন সহ আমাদের নিকট প্রেরিত হইলে, আমরা আহ্লাদের সহিত উহা ছাপিব। উহাতে কেবল বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা, এবং ভিন্ন ভিন্ন রকম কাপড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ রং ও মূল্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিবরণ থাকা আবশ্যক।

—

ডাকাত ও গুণ্ডার অত্যাচার

কলিকাতায় গুণ্ডার এবং মফঃস্বলে ডাকাতের অত্যাচার খুব হইতেছে। গুণ্ডারা প্রায় সকলেই বঙ্গের বাহিরের লোক। ডাকাতদের মধ্যেও এরূপ লোক অনেক আছে। এ অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, কোন গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যতটা আছে, দেশের লোকদের কর্ত্তব্য তদপেক্ষা অধিক আছে।

গবর্ণমেণ্ট পুলিশের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু তাহাতে পুলিশ বিভাগের ব্যয় বাড়িবে ও তাহাতে আপত্তি হইবে। কিন্তু যাঁহারা আপত্তি করিবেন, তাঁহাদিগকে অন্য সদুপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

বাঙালীদের পেটে অন্ন নাই; তাহার উপর ম্যালেরিয়া, হুক্ কৃমি, উদরাময়, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় তাহারা জর্জ্জরিত। ইহাতে শরীর ও মন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে।

এরূপ লোকদিগের হাতে অস্ত্র দিলেও তাহারা অনেক সময় অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। কখন কখন হয়ত ডাকাতরা অস্ত্র কাড়িয়া লইতেও পারে। তথাপি যাহারা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র চায়, তাহাদের অস্ত্রপ্রাপ্তির উপায় এখনকার চেয়ে সহজ করিয়া দেওয়া উচিত। দেশের অন্নবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত একাগ্র চেষ্টা হওয়া একান্ত আবশ্যক। যাহাতে গায়ের জোর বাড়ে তাহার জন্য বাল্যকাল হইতে শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি আরো বেশী মন দেওয়া দরকার। বালকদের নানাবিধ কুঅভ্যাস যাহাতে না জন্মে, ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হয়, সেইরূপ শিক্ষা ও সংসর্গের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। লাঠি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য নানারূপ অস্ত্রের ব্যবহার করিতে সকলের অভ্যস্ত হওয়া, এবং মুষ্টিযুদ্ধ ও জাপানী জিউজুৎসু সকলের শিক্ষা করা উচিত।

কিন্তু গায়ের জোর যতই বাড়ুক, অস্ত্রশস্ত্র যতই থাকুক, এবং অস্ত্রচালনার অভ্যাস যতই থাকুক না কেন, মনের জোর ও সাহস না থাকিলে সবই বৃথা। মনের জোর ও সাহস কেমন করিয়া বাড়িতে পারে, তাহা হঠাৎ এক কথায় বলিয়া দেওয়া কঠিন। কিন্তু বাঙালীর ভীরুতা কেন হয়ত দ্রুত কমিতেছে না, হয়ত বা বাড়িতেছে, তাহার কোন কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইস্কুলে দেখা যায়, এক-একটা ক্লাসের ২।৩টা দুষ্ট বালকের ভয়ে সমস্ত ক্লাস তটস্থ হইয়া থাকে; অথচ ঐ ২।৩টা ছাত্র আর-সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ না হইতে পারে। দুষ্ট ছেলেরা যেমন 'মরিয়া' ও একজোট, ভাল-ছেলেরা যদি তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একতাসূত্রে বদ্ধ হয়; তাহা হইলে দুষ্ট ছেলেদের প্রতাপ সহজেই নষ্ট করা যায়। সেইরূপ যে গ্রামে ডাকাতী হয়, তাহার অধিবাসীরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একমন হন, তাহা হইলে তাঁহারা ডাকাত তাড়াইতে ও কোন কোন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। ইহাতে অবশ্য বিপদ্ আছে। কিন্তু ডাকাতদের সহিত যুদ্ধ না করিলেও ত বিপদ ঘটে, ডাকাতরা ত নিরীহ অবিরোধী লোকদেরও খুন জখম করে। ডাকাতদের হাতে হত; হৃতসর্ব্বস্ব বা জখম হইবার পালা কখন কাহার হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই। কলিকাতায় গুণ্ডার হাতে কখন কাহার অর্থনাশ বা প্রাণসংশয় ঘটিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। গুণ্ডা কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে দেখিলে, দর্শকেরা যদি বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থ অগ্রসর হন, তাহা হইলে গুণ্ডার অত্যাচার কমে। কিন্তু যদি সবাই "চাচা, আপ্‌না বাঁচা" নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কাহারও আত্মরক্ষার উপায় হয় না।

আমাদের ভীরুতার কারণ আর-একটি এই, যে, আমরা কেবলই বলি ও শুনি, যে, বাঙালী ভীরু ও কাপুরুষ, বাঙালী অমুক জায়গায় আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টাও না করিয়া মার খাইল এবং দর্শকেরা কেবল দাঁড়াইয়া দেখিল বা পলায়ন করিল; কিম্বা অমুক গ্রামে ডাকাতী হইয়া গেল, ডাকাতদের সংখ্যা ১০।২০।২৫ ছিল, তাহারা মার্ ধর্ করিয়া অত্যাচার করিয়া এত হাজার টাকার জিনিষ লইয়া গেল, গ্রামবাসীরা কিছু করিল না, বা করিতে পারিল না। ইহাতে আমাদের ভীরুতা বাড়ে, আমরা যে অসহায়, এই ভাব বদ্ধমূল হয়। কিন্তু ১০।২০ জন ডাকাতদের সাহায্য কে করে? তাহারা অনেক শত বা হাজার লোকের বাসভূমি গ্রাম খানা লুট করে কি সাহসে? নিজের বুকের পাটা বড় করা চাই। আর যদি ভগবানের উপর নির্ভরের কথা বল, তাহা হইলেও ত ইহা নিশ্চিত, যে, ভগবান্ ডাকাতদের পক্ষে নহেন, সৎলোকদেরই পক্ষে। কিন্তু তিনি ভীরু কাপুরুষেরও পক্ষে নহেন, ইহাও নিশ্চিত।

তবে কি, "আমরা ভীরু, আমরা ভীরু," না বলিয়া ও না শুনিয়া, আমরা ক্রমাগত কল্পনা করিয়া বলিতে ও শুনিতে থাকিব, "আমরা সাহসী, আমরা বীর"? তাহা নয়;—মিথ্যা বলিলে ও কল্পনা করিলে কখনও উন্নতি হয় না। সত্যের পথই অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহা সত্য নহে, যে, বাঙালী সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্যক্তিগত ভাবে কেবলই মার খাইয়াছে, কখন আত্মরক্ষা করিতে ও দুর্ব্বৃত্ত আততায়ীকে পরাস্ত করিতে পারে নাই; ইহাও সত্য নহে, যে, বঙ্গের কোনও গ্রামের লোকেরা

ডাকাত তাড়াইতে বা ধরিতে পারে নাই, ডাকাতদের হাতে কেবলই হৃতসর্ব্বস্ব, হত ও আহত হইয়াছে। কোন কোন বাঙালী আততায়ীকে পরাস্ত করিয়াছে, ইহা সত্য কথা। কোন কোন গ্রামের লোক ডাকাত তাড়াইয়াছে ও ধরিয়াছে, ইহাও সত্য কথা। সাহসের সহিত ডাকাত তাড়ান ও গ্রেপ্তার করার জন্য অনেকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন, ইহাও সত্য কথা। এইসব সত্য ঘটনা সঙ্কলন করিয়া যদি খবরের কাগজে ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে অনেক সুফল হইতে পারে। কিন্তু সাবধান হইতে হইবে, ঘটনার বৃত্তান্তে যেন একটুও অত্যুক্তি, মিথ্যার ভেজাল বা আস্ফালন না থাকে। বিবরণগুলি হইতে আমরা কেবল এই উপদেশ ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে চেষ্টা করিব, যে, অন্য বাঙালীরা যেরূপ মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছেন, আমরাও যেন সেইরূপ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

—

বাঙালী কি "ঘরকুনো" ?

[শ্রাবণের প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত]

নানা দেশের ও প্রদেশের লোকেরা বঙ্গে আসিয়া অর্থ-উপার্জ্জন করে, ও অনেকে ধনী হয়। তাহার মধ্যে দৈহিক-শ্রমজীবীর সংখ্যাই অধিক। দৈহিক শ্রম দ্বারা রোজ্‌গার করিয়া খাইবার নিমিত্ত, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বিহারীদের মত হাজার হাজার বাঙালী ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না। তাহার কারণ কি? আগে হয়ত এ কথা বলা যাইত, যে, জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও উর্ব্বরতা বশতঃ বঙ্গের সাধারণ লোকদের অবস্থা ভাল বলিয়া তাহারা ঘরেই থাকে। কিন্তু এখন ত সেকথাও জোর করিয়া বলা যায় না। এখন কোন কারণে বঙ্গে অন্নকষ্ট হইলে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের চাঁদার উপর বিপন্ন লোকদের প্রাণধারণ নির্ভর করে। তবে সাধারণ বাঙালী খাইতে না পাইলেও কেন বাংলা ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। একটা কারণ এই মনে হইতে পারে, যে, বাঙালী ঘরকুনো, কিন্তু লেখাপড়াজানা বা বিদ্যার্থী বাঙালী ত পৃথিবীর নানা দূরদেশে যায়। সম্ভবতঃ সাধারণ বাঙালী অনিশ্চিতের উপর ততটা নির্ভর করিতে চায় না। কোন একটা আশ্রয়, যেমন কেরাণীগিরি বা অন্য চাকরী, মিলিলে বাঙালী দূরতম স্থানে যাইতে রাজী হয়। কিন্তু বড় বা ছোট ব্যবসা, কিম্বা কারিগরী বা দৈহিক শ্রমরূপ অনিশ্চিত রোজ্‌গারের আশায় বাঙালী হয়ত গৃহ ছাড়িয়া দূরে যাইতে চায় না। ইহা হয়ত বাঙালী-প্রকৃতির একটা দুর্ব্বলতা। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা যে সকলেরই আছে, তাহা নয়। কারণ, চাকরী না লইয়াও অনেক লিখন-পঠনক্ষম বাঙালী ওকালতী প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত দূরদেশে যায়। বহু প্রবাসী বাঙালীর জীবন-চরিত হইতে ইহা জানা যায়। সম্ভবতঃ বঙ্গের বাহিরের জগতের জ্ঞান যে-বাঙালীর যত কম, উক্ত দুর্ব্বলতা তাহার তত বেশী, যাহার ঐ জ্ঞান যত বেশী, তাহার এই দুর্ব্বলতা তত কম। বাংলা দেশের উর্ব্বরতা বশতঃ বহু শতাব্দী ধরিয়া সাধারণ বাঙালীর জীবিকা-অন্বেষণে কোথাও না-যাওয়ায় যে অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে ও যে অজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, অনশনক্লিষ্ট আধুনিক বাঙালীর সেই অভ্যাস ও অজ্ঞতা রহিয়া গিয়াছে। ইহা দূর করিতে হইবে। সম্ভবতঃ অন্যান্য প্রদেশ-সকল অপেক্ষা বাংলা দেশ অধিকতর গ্রামবহুল বলিয়া অধিকাংশ বাঙালী পাড়াগেঁয়ে, এবং পাড়াগেঁয়ের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতা তাহাদের অধিক। কলিকাতা, হাবড়া ও ঢাকা বাদ দিলে বঙ্গে শহরের মত শহর, লক্ষাধিক মানুষের শহর, নাই; অন্য অনেক প্রদেশে বিস্তর আছে। সাধারণ বাঙালীর ঘরকুনো ভাব ঘুচাইতে হইবে। পৈত্রিক ভিটার মায়ায় না-খাইয়াও সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের এ মায়া কম; তাই তাহারা নূতন চরের আবাদ করে, জাহাজে চাকর হয়, নানা সাহসের কাজ করে। এই জন্য তাহাদের অনেকের অবস্থা ভাল। গ্রাম্য বাঙালীকে মধ্যে মধ্যে ঠাঁই-নাড়া করিলে হয়ত তাহার কিছু উন্নতি হইতে পারে।

—

বাঙালীর অবাঙালীর একটি প্রভেদ

আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া "প্রবাসী"তে প্রবাসী

বাঙালীদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এই সকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত জীবনচরিতগুলি "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামে বিরাট পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। তিনি এখনও নূতন নূতন জীবনচরিত "প্রবাসী"তে দিতেছেন। এই সকল বিবরণ হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, যে, লিখনপঠনক্ষম ভদ্র শ্রেণীর বাঙালীরা বহুদূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, এবং অনেকে নানাপ্রকার লোকহিতকর কাজও করিয়াছেন। নূতন জায়গায় ভিন্নভাষাভাষী লোকদের মধ্যে গিয়া নিজ বুদ্ধি ও কর্ম্মিষ্ঠতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। অতএব সব বাঙালীই যে ঘরকুনো এবং পল্লী-জননীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকিতেই অভ্যস্ত, বা কেবল তদ্রূপ পৌরুষবিহীন জীবনেরই যোগ্য, ইহা সত্য নহে। কিন্তু বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে একটি প্রভেদ লক্ষ্য ও উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ছোটনাগপুর, বিহার, ওড়িষা, আগ্রা-অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে হাজার হাজার অশিক্ষিত লোক রোজ্‌গারের জন্য জন্মস্থান হইতে দূরে গিয়াছে; কিন্তু বাংলা দেশ হইতে অশিক্ষিত লোকেরা এত বেশী সংখ্যায় রোজ্‌গারের জন্য পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া দূরে যায় নাই। বাংলা দেশের উর্ব্বরতা এবং, কিয়ৎপরিমাণে, ভূমির খাজানার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইহার কারণ। ভীরুতা বা প্রকৃতিগত ঘরকুনো ভাব যে ইহার কারণ নহে, তাহা শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর বাঙালীদের বিদেশযাত্রা হইতেই প্রমাণ হয়। ইহার আরও এক প্রমাণ এই, যে, পূর্ব্ববঙ্গের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত বাঙালী মাঝি-মাল্লারা লস্কররূপে জাহাজে কাজ লইয়া পৃথিবীর নানা দেশে যায়, এবং ঝড়তুফানের মধ্যেও শ্বেতনাবিকদের সমান সাহস ও দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সাধন করে।

কারণ যাহাই হউক, কথাটা সত্য, যে, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের যত লোক বিদেশে যায়, বঙ্গের তত লোক বিদেশে যায় না। নিজের লোকদের মধ্যে থাকিলে বোকা জড়প্রকৃতির লোকেরাও কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিতে পারে; কিন্তু বিদেশে গিয়া রোজ্‌গার করিয়া খাইতে হইলে কতকটা চালাক-চতুর কর্ম্মিষ্ঠ ও সপ্রতিভ না হইলে চলে না। এই জন্য বাঙালী ভারতবর্ষের অন্য অধিবাসীদের চেয়ে বুদ্ধিতে হীন না হইলেও, অধিকাংশ বাঙালী, অর্থাৎ পল্লীগ্রামের নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত বাঙালী, অন্যান্য প্রদেশের ঐ শ্রেণীর লোকদের মত বিদেশগামী না হওয়ায় চালাক-চতুর কর্ম্মিষ্ঠ ও সপ্রতিভ হয় না। "আমরা বাঙালীরা সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্," এই অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙালীর গায়ের জোর অন্যান্য প্রদেশের লোকদের চেয়ে কম, ইহা বলিলেই নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ক্ষুধিত ও বেকার অবস্থার সম্যক্ কারণ ব্যাখ্যাত হইবে না। কেন-না, যে-সব ওড়িয়া বিহারী হিন্দুস্থানী কারিগর কলিকাতায় নানাবিধ কাজ করিয়া খায়, তাহাদের দৈহিক বল বা বুদ্ধি তাহাদের শ্রেণীর বাঙালীদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী বলা যায় না। আমরা যে কারণের উল্লেখ করিতেছি,—তাহাও একমাত্র কারণ নহে। তাহাতে কিছু সত্য আছে, ইহাই আমাদের অনুমান।

অধিকাংশ বাঙালীর পাড়াগেঁয়ে ভাবের আর-একটা কারণ ভাষা। যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী তাহাদের অনেক সুবিধা আছে। কল-কারখানার মালিকেরা বহুস্থলে ইউরোপীয়। তাহাদের মধ্যে যত লোক চলনসই হিন্দুস্থানী বলিতে পারে, তত লোক অন্য কোন ভারতীয় ভাষা বলিতে পারে না। রেলে, ষ্টীমারে, জাহাজের বন্দরে হিন্দুস্থানীর যত প্রচলন, অন্য ভাষার তত প্রচলন নাই। এই কারণে হিন্দীভাষীরা যত কাজ বা কাজের সুবিধা পায়, বাংলাভাষীরা তাহা পাইতে পারে না। আরও একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে, অন্যান্য যে-সব প্রদেশের মাতৃভাষা হিন্দী নহে, তাহারা হিন্দী বলিতে যতটুকু অভ্যস্ত, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীরা ততটুকু অভ্যস্ত নহে। "বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের সব সাহিত্যের সেরা" এইরূপ ধারণা হয়ত শিক্ষিত

বাঙালীদের হিন্দী না বলিবার ও শিখিবার আংশিক কারণ হইতে পারে। কিন্তু নিরক্ষর বাঙালীরা ত কোন সাহিত্যেরই ধার ধারে না; তাহাদের হিন্দী বলিতে অনভ্যস্ত হওয়ার কারণ কি? বোধ হয়, তাহাদের অধিকাংশ বঙ্গের বাহিরে অর্থ উপার্জ্জন করিতে যায় না বলিয়া, তাহাদের হিন্দী বলার অভ্যাস হয় না।

নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম বাঙালীরা হিন্দুস্থানী বলিতে অভ্যাস করিলে তাহাদের কার্য্যক্ষমতা ও উপার্জ্জন-ক্ষমতা নিশ্চয় বাড়িবে।

—

আইনভঙ্গ তদন্ত-কমিটি

কাহাকেও আঘাত না করিয়া, কাহারো উপর জোর জবরদস্তি বলপ্রয়োগ না করিয়া, সাত্ত্বিক ভাবে আইন বা সরকারী আদেশ অমান্য ব্যাপক ভাবে করিবার জন্য দেশ প্রস্তুত কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ভারতের সকল প্রদেশে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। এই প্রকারের অবাধ্যতা (disobedience) দুই রকমের হইতে পারে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের বরিশালে যে অধিবেশন হয়, তাহা চরমপন্থীদের অধিবেশন নহে। তাহাতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নাথ বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতি বিখ্যাত মডারেটগণ নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা সরকারী আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন। আবার গত বৎসর যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আসিবার পর কোন কোন প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক (Volunteer) হওয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়, তখন শ্রীযুক্ত মোতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, এবং আরও অনেক নেতা ও কয়েক হাজার অসহযোগী সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া জেলে যান। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে গোরখ-পুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ এক হুকুম জারি করেন, যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ঐ জেলায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। ঐ হুকুম অমান্য করিয়া পণ্ডিতজী ঐ জেলার পাঁচ জায়গায় পাঁচটি বক্তৃতা করেন। এই দৃষ্টান্ত-গুলিতে গবর্ণমেণ্ট্ প্রথমে সাধারণ রাষ্ট্রীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং তাহা রক্ষার নিমিত্ত সরকারী আদেশ অমান্য করা হইয়াছিল। সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ গবর্ণমেণ্ট যখন যেখানে করিবেন, তখন সেই-খানেই গবর্ণমেণ্টের আদেশ লঙ্ঘন করা প্রত্যেক ভারতীয়ের একান্ত কর্ত্তব্য। এই রকমের অবাধ্যতার জন্য দেশ প্রস্তুত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তদন্ত কমিটি সাক্ষ্য লইতেছেন না। তাঁহারা অন্যবিধ অবাধ্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কোন প্রদেশ, জেলা বা মহকুমার লোক বরাবর যে ভূমিকর বা অন্যবিধ ট্যাক্স্ দিয়া আসিতেছেন, তাহা হয়ত বেশী নহে, বা অন্যায় নহে। কিন্তু "যে-গবর্ণমেণ্ট লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে-গবর্ণমেণ্ট লোকমতকে অগ্রাহ্য ও অপমানিত করে, যে-গবর্ণমেণ্টের আমলে জালিয়ানওয়ালা বাগের মত কাণ্ড ঘটে ও তাহার সমুচিত প্রতিকার হয় না, তাহার আইন মানা বা তাহাকে ট্যাক্স্ দেওয়া উচিত নহে," এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রদেশের, জেলার, মহকুমার, বা গ্রামের লোক যদি ট্যাক্স্ দেওয়া বন্ধ করিতে চায়, তাহা হইলে সেইরূপ অবাধ্যতার জন্য দেশ প্রস্তুত কি না, কমিটি তাহারই বিচার করিবেন—আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি। কোন প্রদেশ, জেলা, প্রভৃতির যোগ্যতার বিচার তাঁহারা কি প্রকারে করিবেন, জানি না। তবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে, হাজার হাজার লোক উক্ত প্রকারে আইন লঙ্ঘন করিলে তাঁহাদের উপর খুব নির্য্যাতন আসিবে, তাঁহাদিগকে দারিদ্র্য ও অন্য নানা দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, অথচ শান্ত সংযত থাকিতে হইবে। তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রহার ও অপমান করিয়া, তাঁহাদের স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিয়া, শান্তিভঙ্গ করাইবার চেষ্টা হইবে। এরূপ ঘটিলেও শান্ত থাকিতে হইবে। ইহার জন্য কাহারা প্রস্তুত, কমিটির ইহাই নির্দ্ধারণীয়।

শাসকেরা সব দেশেই চিরকাল একদল লোককে আর-এক দলের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে। অতএব, যেখানে সাম্প্রদায়িক

বিরোধ ঈর্ষা আদি প্রবল ভাবে বিদ্যমান, তাহা আইন-লঙ্ঘনের যোগ্য স্থান নহে। যেখানে "অস্পৃশ্যতা" আছে, তথায় একদল লোক অবজ্ঞাপীড়িত থাকায় অবজ্ঞাকারীদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন নহে, ইহা সহজবোধ্য। সুতরাং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও মনোমালিন্যের এবং "অস্পৃশ্যতা"র অস্তিত্ব আইনলঙ্ঘনের যোগ্যতার অভাব প্রমাণ করে।

স্বদেশের কল্যাণের জন্য যাঁহারা আইনলঙ্ঘন করিয়া জেলে যাইতে ও অন্যবিধ নানা দুঃখ সহ্য করিতে বাস্তবিক প্রস্তুত, বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চয়ই তাঁহাদের পক্ষে সহজ কাজ। যাঁহারা এই অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ করিতে পারেন না, যাঁহাদের ইহা করিবার মত ধৈর্য্য ও আত্মসংযম নাই, তাঁহারা ধীর শান্তভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া আইনলঙ্ঘনের আনুষঙ্গিক সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহার আইনলঙ্ঘনের যোগ্যতার অন্যতম প্রমাণ, এরূপ মনে করিবার ইহা একটি কারণ।

তদ্ভিন্ন, বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বাধীনতা স্বরাজের একটি প্রধান অঙ্গ। আমরা খদ্দর দ্বারা এই স্বাধীনতা কতকটা লাভ করিতে পারি। এবং ইহা যতটা কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, রাজনৈতিক স্বরাজ লাভ ততটা কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টাসাপেক্ষ নহে; উহাতে অন্যের সম্মতিও চাই। যাহা প্রধানতঃ আমাদের চেষ্টাসাপেক্ষ, তাহা যদি আমরা করিতে না পারি, তাহা হইলে যাহা অন্যেরও সম্মতিসাপেক্ষ, তাহা কেমন করিয়া লাভ করিব?

সুরা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য ত্যাগ ও তাহার বিক্রী বন্ধ করা রাজনৈতিক স্বরাজ লাভ করা অপেক্ষা সহজ কাজ। ইহা যদি দেশের লোকে করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি-প্রকারে স্বরাজ লাভ করিবেন? দেশবাসী সকলের "স্ব"-রাজ পাওয়ার মানে এই, যে, সকলে নিজের নিজের প্রভু হইয়াছেন। কিন্তু দেশের বিস্তর লোক যদি নেশার বশ থাকে, তাহা হইলে "স্ব"-রাজের পরিবর্ত্তে নেশা-রাজই অনেক স্থলে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অধিকন্তু শান্ত ও নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার জন্য দেশব্যাপী যে শান্ত সংযত সাত্ত্বিক অবস্থার প্রয়োজন, সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের প্রচলন থাকিতে তাহা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে।

—

লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতা

সম্প্রতি বিলাতের পার্লেমেণ্টে ভারতীয় সিবিল সার্বিসের চাকুরিয়াদের দুঃখ ও আশঙ্কার কথা আলোচিত হয়। তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, যে, ভারতবর্ষে আর যত পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, সিবিল সার্বিস্ ও তাহাতে ইংরেজের চাকরী এবং ইংরেজ সিবিলিয়ানদের প্রভুত্ব ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তিনি ভারতশাসন-সংস্কার আইন এবং তদনুগামী সমুদয় ব্যবস্থাকে একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ বা পরীক্ষা বলেন। অর্থাৎ যদি ভারতীয়েরা ইংরেজদের মনের মত ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই আইন অনুসারে কাজ চলিতে থাকিবে, যদি তাহা না করে, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয়দিগকে "পুনর্মূষিকো ভব" বলিবেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা হইতে ইহা বুঝা যায়, যে, আমরা যেরূপ ব্যবহারই করি না কেন, ইংরেজরা কোনকালেই আমাদের হিত করিবার দায়িত্ব ত্যাগ করিবেন না। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত কখনও হইব না, চিরকাল নাবালক থাকিব, নিজেদের দেশের কাজ চালাইবার দায়িত্ব পাইবার ও লইবার যোগ্য কখন হইব না, ইংরেজ চিরকালই আমাদের হিত করিতে থাকিবেন! অথচ মডারেট্‌রা বুঝিয়াছিলেন, যে, শাসনসংস্কার আইন কালক্রমে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষকে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত আত্মকর্ত্তৃত্ব আনিয়া দিবে, এবং তখন ইংরেজ সিবিলিয়ানদের প্রভুত্ব থাকিবে না। এ বিষয়ে সম্ভবতঃ মডারেট্‌দের ভ্রমই হইয়াছিল। কারণ, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য ভারতশাসন আইন সংস্কার করা হইয়াছিল, এবং অনেক স্তোকবাক্য বলা হইয়াছিল। হইতে পারে, যে, মণ্টেগুর এরূপ প্রবঞ্চনার অভিসন্ধি ছিল না; কিন্তু মন্ত্রীসভার অন্য সভ্যেরা রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যে অঙ্গীকার-

ভঙ্গ বহুবার করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের বর্ত্তমান লাটের পিতা ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট হাত গুটাইবার বা উল্টা দিকে চলিবার উপায় আইনের মধ্যেই যে রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হয়ত মডারেটরা সন্দিগ্ধভাবে তলাইয়া দেখেন নাই। কিন্তু শাসন-সংস্কার আইনের একচল্লিশ ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে, যে, দশ বৎসর পরে একটা তদন্ত-কমিশন নিযুক্ত হইবে,—

"for the purpose of inquiring into the system of government, the growth of education, and the development of representative institutions, in British India, and matters connected therewith, and the Commission shall report as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government, or to extend, modify, or restrict the degree of responsible government then existing therein."

মডারেটরা সম্ভবতঃ ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের "ন্যায়পরায়ণতা" ও "সদাশয়তা"র উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

যাহা হউক, লয়েড জর্জ কি বলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কোন পরাধীন জাতি এ পর্য্যন্ত কেবল ভাল-মানুষী দ্বারা বিজেতাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সদাশয়তার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা পায় নাই। আমেরিকা দ্বারা বিজিত ফিলিপিনোরা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পাইয়াও এখনও স্বাধীনতা পাইতেছে না। তাহাদিগকে খুব আন্দোলন করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ হউক, ইহা আমরা চাই না; তাহা হইলেও তাহা একটা বড় রকমের মোপ্‌লাবিদ্রোহের মত হইবে, ও ব্যর্থ হইবে। তথাপি জন্ ব্রাইট্ লালমোহন ঘোষকে পরিহাস করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে, তাহা হইতে আমরা উপদেশ লাভ করিতে পারি। শুনা যায়, জন্ ব্রাইট্ বলিয়াছিলেন, "তোমরা যদি আর-একটা বিদ্রোহ ঘটাইতে পার, তাহা হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের মত আর-একটা রাজকীয় ঘোষণা-পত্র পাইবে।" জন্ ব্রাইট্ কোয়েকার ছিলেন ও শান্তিপ্রিয় রাজনীতিবিদ্ ছিলেন; তিনি যে সত্যসত্যই ভারতীয়দিগকে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার কথার গূঢ় মর্ম্ম এই, যে, গবর্ণমেণ্টকে অতিষ্ঠ ও অস্থির করিয়া না তুলিতে পারিলে ভারতীয়েরা কখন রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবে না।

লয়েড জর্জের বক্তৃতায় অনেক পুরাতন "বাঁধি গৎ" আছে। যথা,—"India has never been governed on these principles before"; অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রজাদের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী গবর্ণমেণ্ট কোনকালে ছিল না। একথা যে সত্য নহে, তাহা আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি। বিস্তারিত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ Towards Home Rule নামক পুস্তকে আছে।

নিতান্ত বাজে মিথ্যা কথাও প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় আছে। তিনি ইংলণ্ডের লোকদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"They have made a great sacrifice for India"! ইহা অপেক্ষা ভিত্তিহীন কথা কি হইতে পারে? ইংরেজ জাতি আমাদের জন্য কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ করে নাই। স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহারা এদেশে আসিয়াছিল, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তাহারা এখানে আছে। অবশ্য অল্পসংখ্যক ইংরেজ, যেমন অন্য কোন কোন দেশে তেমনি এদেশেও, স্বার্থত্যাগ করিয়া কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা আমরা স্বীকার করি।

লয়েড্ জর্জের আর-একটা হাস্যকর কথা শুনুন। ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌দের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"There is not one of this 1200 that could not easily find a much better job in this country and a much better-paying one."

বটে! তবে তাঁহারা স্বদেশ ছাড়িয়া এদেশে আসিয়াছেন কেন? আমাদের হিত করিতে? তাহা হইলে বেতন, পেন্‌শ্যন, ইত্যাদি বাড়াইবার জন্য এত চীৎকার কেন হইয়াছে ও হইতেছে? তাঁহারা আগে যে বেতন পাইতেন, তাহাতে এদেশে শিক্ষিত ভদ্র ইংরেজদের যে বেশ চলে, তাহা ত লোকে বেশ জানে। কারণ, সিবিলিয়ান্‌দের সমান বা তাঁদের চেয়ে বেশী

বিদ্বান ও যোগ্য অধ্যাপক ও মিশনরীরা এখনও তাঁদের চেয়ে কম বেতনে সুস্থ সবল থাকিয়া কাজ করিতেছেন।

লয়েড্ জর্জের মতে আমরা যে কখনও আত্মকর্তৃত্ব ও আত্মনির্ভরের উপযুক্ত হইব না, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় অতি বিশদ ভাষায় বলা হইয়াছে। আমরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রূপে বা শাসনকর্তা রূপে যতই যোগ্যতা দেখাই না কেন, ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌দের নেতৃত্ব ও সাহায্যের অপেক্ষা আমাদিগকে চিরকাল করিতেই হইবে! একদা লর্ড মর্লী বলিয়াছিলেন, যে, তিনি এমন কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ কালের কল্পনাও করিতে পারেন না যখন ভারতীয়েরা স্ব-শাসনক্ষম হইবে। লয়েড জর্জও তদ্রূপ তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"What I want specially to say is this, that, whatever their success, whether as parliamentarians or as administrators, I can see no period when they can dispense with the guidance and assistance of a small nucleus of British Civil Servants—of British officials in India."

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, None are so blind as those that will not see, যাহারা দেখিবে না বলিয়া পণ করিয়াছে তাহাদের মত অন্ধ আর কেহ নাই। লয়েড্ জর্জ সেই-জাতীয় লোক।

—

"সঞ্জীবনী" ও প্রবাসী-সম্পাদক

আমরা শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"তে "সঞ্জীবনী"র যে ভ্রম দেখাইয়াছিলাম, তাহা "সঞ্জীবনী" "প্রবাসী"র সম্বন্ধে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, যে, তিনি যাহা "প্রবাসী" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহা "মডার্ণ রিভিউ" সম্বন্ধে সত্য; এবং ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তদ্বিষয়ে আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, ঐ প্রবন্ধেরও প্রধান কথাতে এবং অবান্তর কোন কোন কথাতে ভুল আছে।

—

বন্যায় বিপদ্

আমাদের দেশের চেয়ে দুঃখী দেশ পৃথিবীতে আর আছে কি? এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, প্রভৃতি নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ত লাগিয়াই আছে; তাহার উপর এমন বৎসর যায় না, যখন দুর্ভিক্ষ, জল-প্লাবন বা ঝড়ে দেশের কোন-না-কোন অংশ সাতিশয় বিপন্ন না হয়। গত বৎসর খুলনার দুর্ভিক্ষ লইয়া দেশ বিব্রত ছিল। তাহার জের মিটিতে না মিটিতে বন্যায় মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তর গ্রাম জলমগ্ন হওয়ায় লোকেরা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। অনেকের গৃহাদির চিহ্ন.মাত্র নাই। অনেকে নিজে মারা পড়িয়াছে, গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে, শস্যক্ষেত্রের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায় এ বৎসর কোন শস্য হইবে না। মেদিনীপুরে কংগ্রেস আফিসে শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের নামে টাকাকড়ি পাঠাইলে বিপন্ন লোকেরা সাহায্য পাইবে। বাঁকুড়ার শিমলাপাল অঞ্চল হইতে যে চিঠি পাইয়াছি, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

আজ ধনী দরিদ্র সকলেরই এক দশা। এখন তাহাদের পক্ষে স্বজাতিবৎসল, আর্ত্তরক্ষক, মহাপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের অনুগ্রহই একমাত্র ভরসা। আপনারা এখানে আসিয়া স্বচক্ষে অবস্থা দেখিয়া যদি ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এতগুলি লোকের পরিণাম অতি ভয়াবহ হইবে। ইহার মধ্যেই নানারূপ অসুখের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিতে যে সামান্য চাউল সংগৃহীত ছিল, তাহাতেই এই কয়দিন একরূপ কষ্টে চলিল। অতি সত্বর সাহায্য প্রেরণ আবশ্যক। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে তাহা উপযুক্ত পাত্রে বিতরিত হইবে। ইতি—

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাণ্ডা,
ভেলাইডিহা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী,
সিমলাপাল পোঃ, বাঁকুড়া।

—

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের খাইখরচ ও রাহাখরচ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা খাইখরচ ও রাহাখরচ বাবদে দেড় বৎসরে কে কত টাকা লইয়াছেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে তাহা বাহির হইয়াছে। সকলে টাকা লন নাই। যাঁহারা লইয়াছেন, তাঁহারা মোট ১৫২৯২৩৵৩ লইয়াছেন। গরীব দেশের পক্ষে ইহা খুব বেশী বলিতে হইবে। শুনা যায়, কোন কোন

"সভ্য" সচরাচর কলিকাতাতেই বাস করেন, অথচ বরাদ্দ অনুযায়ী দৈনিক খাইখরচ ও বাসাখরচ দশটাকা করিয়া লইয়াছেন, এবং মফঃস্বলের পৈত্রিক বাসস্থান হইতে যাতায়াত বাবদে বরাদ্দ রেলভাড়াও লইয়াছেন, যদিও সেখান হইতে আসেন নাই ও তথায় যান নাই! এরূপ প্রবঞ্চকদিগের অন্ততঃ নামটা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আইন অনুসারে অন্য শাস্তি হইলে আরও ভাল হয়। কোন কোন "সভ্য", ঘন ঘন-বাড়ী যাতায়াত করিয়া রাহাখরচ আদায় করিলে কলিকাতায় থাকিয়া খাইখরচ আদায় করা অপেক্ষা বেশী লাভবান্ হইবেন দেখিয়া, দশ হইতে একুশবার পর্য্যন্ত বাড়ী যাতায়াত করিয়াছেন। এই প্রকারে ফাঁকি দিয়া টাকা আদায় করার পথ বন্ধ করা উচিত। অনেক "সভ্য" রেলের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত না করিয়াও বরাদ্দ-মত দুটা প্রথম শ্রেণীর ভাড়া আদায় করিয়াছেন। ইহাও সুনীতিসম্মত নহে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা বেতন ও পদমর্য্যাদা অনুসারে ভ্রমণব্যয় পাইয়া থাকেন। ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা, প্রভৃতির ভাড়া, কুলিখরচা, প্রভৃতির আলাদা আলাদা হিসাব যাহাতে রাখিতে না হয়, এইজন্য গবর্ণমেণ্ট দুটা ১ম, ২য়, মধ্য, বা ৩য় শ্রেণীর রেলওয়ে টিকিটের ভাড়া দিয়া থাকেন। সুতরাং এক এক জনে দুটা টিকিটের মূল্য লওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনেক কর্ম্মচারী নীচের শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াও নিয়ম মত উচ্চশ্রেণীর ভাড়া আদায় করেন; ব্যবস্থাপক সভার অনেক সভ্যও তাহাই করিয়াছেন। রাহাখরচ হইতে এইরূপ লাভ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। অতএব ইহা গর্হিত। ইহা বন্ধ করা উচিত।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কমিটির রিপোর্ট

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় এবং অন্যান্য নানা বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য সেনেট দুটি কমিটি নিযুক্ত করেন। একটির রিপোর্ট দিবার নির্দ্দিষ্ট শেষ দিন ছিল ১৩ই এপ্রিল, অন্যটির ২৫শে এপ্রিল। কিন্তু প্রথমটির রিপোর্ট সভ্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় ২৯শে এপ্রিল, এবং দ্বিতীয়টির স্বাক্ষরিত হয় ৮ই জুলাই। যাহা হউক, রিপোর্ট দুটি এত বিলম্বে প্রস্তুত হইলেও, জুলাই মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইবার পূর্ব্বে ঐ দুটি প্রকাশিত হইতে পারিত। এবং তাহা হইলে শিক্ষাসচিব ও সভ্যেরা রিপোর্ট দুটি পড়িয়া তন্মধ্যস্থ সত্যাসত্য এবং বিদ্রূপের বিচার করিয়া টাকা দেওয়া না-দেওয়া স্থির করিতে পারিতেন। কিন্তু রিপোর্ট দুটি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জুলাইয়ের অধিবেশন শেষ হইবার এবং তাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইবার পর ২৯শে জুলাই সেনেট কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া তদনন্তর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। ইহার মধ্যে চাতুরী আছে, এইরূপ ধারণাই জন্মে। কারণ, রিপোর্ট দুটি এরূপ, যে, তাহা পড়িয়া শিক্ষাসচিব ও সভ্যেরা সন্তুষ্ট ও খুসি হইবেন না।

রিপোর্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক মুখপত্র কলিকাতা রিভিউতে ছাপা হইয়াছে। দুটি ঠাসা ১১৪ পৃষ্ঠা পরিমিত। তা ছাড়া, আলাদা কয়েকটি লম্বা হিসাবের ফর্দ্দ আছে। এত বড় জিনিষের সম্যক্ সমালোচনা "বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্ভবে না। আমরা তাই রিপোর্ট দুটির একটি মাত্র প্রধান বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কমিটির রিপোর্টের কোন কোন অংশ অক্ষরে অক্ষরে এক। আমরা যাহার আলোচনা করিতে যাইতেছি, উহা তদ্রূপ একটি অংশ।

কমিটিদ্বয়ের সভ্যগণ * গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্পর্শ কোন্ কোন্ বিষয়ে আছে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ঐ ঐ বিষয়ে কতটুকু, তাহা দেখাইতে গিয়া, আয়ব্যয়পরীক্ষা ও ব্যয় কি প্রকারে

* Sir Asutosh Mookerjee, Sir Nil Ratan Sircar, Principal H. Maitra, Sir A. Chaudhuri, Sir P. C. Ray, Rev Dr G. Howells, Dr. Bidhan Chandra Ray, Principal G. C. Bose, Dr. Hiralal Haldar, Rev. Dr. G. Watt, and Dr. Jatindranath Maitra.

হইবে তাহার জন্ম উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কি অধিকার আছে, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন :—

The point which has been reserved above for consideration, arises on Section 15 of the Act of Incorporation. The section, as enacted in 1857, was in the following terms :

"The said Chancellor, Vice-Chancellor and Fellows shall have power to charge such reasonable fees for the degrees to be conferred by them and upon admission into the said University and for continuance therein, as they, with the approbation of the Governor General of India in Council, shall, from time to time, see fit to impose. Such fees shall be carried to one General Fee Fund for the payment of expenses of the said University, under the direction and regulations of the Governor General of India in Council, to whom the accounts of income and expenditure of the said University shall, once in every year, be submitted for such examination and audit as the said Governor General of India in Council may direct."

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৫ ধারাটি এইরূপে উদ্ধৃত করিয়া কমিটিদ্বয় বলিতেছেন :—

Let us now turn to the language of Section 15, which, as we have stated, has been in operation since 1857. The fees mentioned in the first sentence of the section have to be carried into one General Fee Fund for the payment of expenses of the University under the direction and regulations of the Government. Apart from the question of the meaning of the expression "direction and regulations," it is obvious that such direction and regulations can apply only to the classes of fees specified in the first sentence, namely, (1) fees for degrees conferred by the Senate, (2) fees for admission into the University, (3) fees for continuance in the University. Under (1) comes the fee of Rs. 5 charged by the University when a degree is conferred *in absentia* ; under (2) comes what is known as the Registration fee of Rs. 2 ; under (3) comes the fee payable by Registered Graduates. The Government, is not authorised to issue "direction and regulations" in respect of other classes of fees which the University may charge or other kinds of income which the University may possess.

বিশ্ববিদ্যালয় কি কি ফী আদায় করিতে পারিবেন, তাহার উল্লেখ ১৮৫৭ সালের আইনের উপরে উদ্ধৃত ১৫ ধারা ভিন্ন আর কোথাও নাই। তাহাতে তিন রকমের ফীর উল্লেখ আছে। কমিটির সভ্যগণ বলিতেছেন, যে, উঁহার মানে এইরূপ :—

(1) Fees for degrees conferred by the Senate, (2) fees for admission into the University, (3) fees for continuance in the University. Under (1) comes the fee of Rs. 5 charged by the University when a degree is conferred *in absentia* ; under (2) comes, what is known as the Registration fee of Rs. 2 ; under (3) comes the fee payable by Registered Graduates.

তাহা যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ আইনের জোরে প্রবেশিকা হইতে পিএইচ্-ডি, ডি-এল্, এম্-ডি, ডি-এস্‌সি পর্য্যন্ত সব পরীক্ষার ফী আদায় করেন? কমিটিদ্বয়ের উল্লিখিত ফী তিনটি অল্প অল্প টাকার, পরীক্ষার ফী-গুলি বেশী বেশী টাকার। ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, যে, গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে ছোট ছোট ফী তিনটি বসাইবার ও আদায় করিবার অধিকার দিলেন, কিন্তু বড় বড় ফী বসাইবার ও আদায় করিবার অধিকার দেন নাই। ইহা কিরূপ অসঙ্গত কথা, তাহা একটা কোন বৎসরের মোট আদায়ী উভয়বিধ ফীর টাকার পরিমাণ তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২১-২২ সালের বজেটে দৃষ্ট হয়, যে, ১৯২০-২১ সালে প্রবেশিকা আদি পরীক্ষার ফী আদায় হয় মোট ৯২৭৫৯৫ (নয় লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচ শত পঁচানব্বই) টাকা, কিন্তু কমিটিদ্বয়ের উল্লিখিত তিনটি ফী মোট আদায় হয় ২৭২৬৫ (সাতাশ হাজার দুশ পঁয়ষট্টি) টাকা। তাহা হইলে কমিটি দুটির সভ্যেরা বলিতে চান, যে, গবর্ণমেণ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা পরিমিত ফী সম্বন্ধে কোন আইন করেন নাই, কিন্তু যাহা হইতে সামান্ত কয়েক হাজার টাকা আদায় হয়, তাহা বসাইবার আইন করিয়া গিয়াছেন। আরও মজার কথা এই, যে, ১৯০৪ সালে যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন হয়, সর্ব্বপ্রথমে তাহার ২৫ ধারায় প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে রেজিষ্টরীভুক্ত করিবার কথা পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বপ্রথমে ঐ আইনের ৫, ৭, ও ২৫ ধারায় গ্রাজুয়েটদিগকে রেজিষ্টরীভুক্ত করিবার কথা পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে ঐ ফীগুলির উল্লেখ কোথাও নাই। তাহা হইলে, কমিটিদ্বয়ের মতে আস্থা স্থাপন করিতে হইলে, বিশ্বাস করিতে হইবে, যে, গবর্ণমেণ্ট, যে-সব ফী হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয়, তাহার উল্লেখ বা ব্যবস্থা ১৮৫৭ সালের আইনেও করেন নাই, ১৯০৪ সালের আইনেও করেন নাই, কিন্তু সামান্ত কয়েক হাজার টাকা আদায় যাহা হইতে হয়, তাহার উল্লেখ ও ব্যবস্থা দুটা আইনেই করিয়াছেন!

আরও শুনুন। কমিটিদ্বয় যে তিনটি ফীর কথা বলিয়াছেন, তাহা ১৯০৪ সালের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন

পাস্ হইবার পর বসান হয় ও আদায় হইতে আরম্ভ হয়; অর্থাৎ সেগুলি ১৮৫৭ সালের আইনের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বসান হয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালের আইন হইবার পর হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষা গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং সেগুলির জন্য ফী আদায়ও তখন হইতেই আবশ্যক ও আরম্ভ হয়। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ, যে, ১৮৫৭ সালের আইন পাস্ হইবার পর হইতেই যে-সব রকমের ফী আদায় করা আবশ্যক ও আরম্ভ হয়, গবর্ণমেণ্ট ঐ সালের আইনে তাহার কোন উল্লেখ বা ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যে-যে ফী বসান হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন! ইহা যে গবর্ণমেণ্টের ভয়ঙ্কর নিকট-অদর্শিতা ও ভয়ঙ্কর দূর-দর্শিতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই!

সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা বলিতে এখনও বাকী আছে। যদি ব্যয় সম্বন্ধে কোন কর্তৃপক্ষ (যেমন গবর্ণমেণ্ট) অপব্যয় চুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য কোন উপদেশ দিতে বা নিয়ম প্রণয়ন করিতে চান, তাহা হইলে ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক, যে, ছোট বড় সব রকম আয় সম্বন্ধেই ঐ কর্তৃপক্ষ তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ পক্ষে মোটা মোটা টাকার ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন, অল্প টাকা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন। কিন্তু কমিটিদ্বয় বলিতেছেন, যে, যে ছোট ছোট ফীগুলি অর্দ্ধশতাব্দী পরে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, যেগুলি ১৮৫৭ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত ছিল না, এবং পরে যাহার মোট বার্ষিক পরিমাণ সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র হইয়াছে, তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও নিয়ম করিবার ক্ষমতা ১৮৫৭ সালেই গবর্ণমেণ্ট লইয়াছেন, কিন্তু যে-সব মোটা মোটা ফী ১৮৫৭ সালের পর হইতেই আদায় আরম্ভ হয় এবং যাহার মোট পরিমাণ এক্ষণে বৎসরে বহু লক্ষ টাকা, তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও নিয়ম করিবার কোন ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট কোন আইন দ্বারাই এপর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই! গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিবার বিষয়ে বিশ্বাসভাজন মনে করিয়াছেন, কিন্তু কয়েক হাজার টাকা খরচ করিবার বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই!

কমিটিতে দুজন নামজাদা আইনজ্ঞ লোক ছিলেন, এবং আমরা আইন জানি না। সেই জন্য সহজ বুদ্ধির সাহায্যে ভয়ে ভয়ে কিছু লিখিলাম। ভুল হইয়া থাকিলে আইনজ্ঞগণ কৃপাপুরঃসর দেখাইয়া দিবেন। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১৫ ধারায় প্রবেশিকা আদি পরীক্ষার সাধারণ ফীর সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ব্যবস্থাপকগণ নিকটকেও উপস্থিতকে ছাড়িয়া দিয়া ভবিষ্যৎজ্ঞান-বলে দূর ও অনাগত সম্বন্ধে কল্পনার সাহায্যে ব্যবস্থা করেন নাই।

—

ভারত-সভা

কয়েকদিন হইল, ভারত-সভার বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চলিত ভাষায় যাহাকে "জুলুম" বা যথেচ্ছাচার বলে, শুনা যায়, এই অধিবেশনের কার্য্যপরিচালনা ব্যাপারে আগাগোড়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট কতকগুলি বিশেষ অভিযোগ আসিয়াছে। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কিরূপে প্রচলিত বিধি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সমেত দুইখানি পত্র আমরা পাইয়াছি। স্থানাভাবে আমরা তাহা এবার ছাপিতে পারিলাম না, সুবিধা হইলে ভবিষ্যতে ছাপিব। কিন্তু শুধু সভাপতি নয়, অন্য কর্ম্মকর্ত্তারাও সভাপরিচালনায় নির্দ্দিষ্ট বিধান মানিয়া চলেন নাই। তাঁহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যে কেবল ভারত-সভার নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ তাহা নহে, বস্তুতঃ যে কতকগুলি নিতান্ত মৌলিক বিধি না মানিয়া সাধারণ কোনও সমিতিই চলিতে পারে না, তাহাদেরও সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাধারণ সভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্দেশ্যই এই, যে, জনসাধারণ স্বাধীন মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিতে পারে। এইজন্য এই-সমস্ত সভাসমিতি প্রভৃতিতে যাহাতে রাজকর্ম্মচারীদিগের তেমন প্রভুত্ব বা প্রভাব না থাকে,

তদ্রূপ নীতি সর্ব্বত্রই অনুসৃত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যেই, যাহাতে আমাদের দেশে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে রাজকর্ম্মচারীদের কর্তৃত্ব বা কোন-প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা না থাকে, সে বিষয়ে বরাবরই প্রবল আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। ভারত-সভার বর্ত্তমান অধিনায়কগণই এক-সময় এই আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। বর্ত্তমান সচিবগণ (Ministers) সরকারের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং পক্ষান্তরে যে প্রণালীতে ভারতসভার কর্তৃপক্ষরা কিছুকাল ধরিয়া ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিবেচনা করিলে আমাদিগের নিশ্চিত ধারণা হয়, যে, সচিবগণ এই সভার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিলে সভার উদ্দেশ্যসিদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাধারণের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা প্রকাশ করা সভার যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারিবে না। একজন সচিবের পক্ষে ভারতসভার সভাপতির কার্য্য করা, তাঁহার পক্ষে যেরূপ অশোভন, সভার পক্ষেও সেইরূপ অহিতকর ও অস্বাস্থ্যকর।

—

অদাহ্য কাপড়

ফ্রেড্ হাওয়ার্ড্ নামক আমেরিকার একজন রসায়নবিৎ এরূপ একটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে কাপড় অদাহ্য করা যায়। ছবিতে দেখা যাইতেছে, তিনি অগ্নিশিখার উপর একটুকরা কাপড় ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহা পুড়িতেছে না। যে-সব কারখানায় শ্রমীদিগকে আগুনের কাছে কাজ করিতে হয়, এইরূপ কাপড়ে তাহাদের পোষাক তৈরি করিবার কথা উঠিয়াছে।

অদাহ্য কাপড়

বঙ্গীয় সমাজে ও বাঙালী অনেক পরিবারে নারীর প্রতি ব্যবহার যেরূপ, তাহাতে নারীদের পরিধেয় বস্ত্র অদাহ্য করিতে পারিলে কিছু সুবিধা হইত কি? বোধ হয় হইত না। কারণ, স্নেহলতার দ্বারা যখন পরিহিত শাড়ী কেরোসীন তেলে ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়, তাহার পূর্ব্বে আত্মহত্যার আরও বিবিধ উপায় বিদ্যমান ছিল। সেগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। যাহাদের জীবন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় পূর্ণ, তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করা সুকঠিন। তাহাদিগকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিলে তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। যদি তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা যায়, এবং তাহাদের দুঃখ দূরীভূত হয় ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হয়, কেবল তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বাঙালী জাতির ধর্ম্মবুদ্ধি না জাগিলে এবং শিক্ষা দ্বারা ও বিবাহের বয়স পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা নারীগণ আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইলে তাঁহাদের দুঃখ দূর ও তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হইবে না।

—

যুদ্ধের ঋণ ও ক্ষতিপূরণের দাবী

গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে রত উভয় পক্ষের জাতিরা কোনপ্রকারে জিতিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য অমিতব্যয়, অপব্যয়, শত্রুর সম্পত্তি নাশ, উৎকোচ প্রদান, চুরি, এত হইয়াছিল, যে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। এখন জাতি-সকল পরস্পরের নিকট যত টাকা চাহিতেছেন, তাহা কাগজে পড়া যায় বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে ঠিক্ ধারণা জন্মে না। একসঙ্গে কয়েক শত টাকার বেশী কখন চোখে দেখি নাই, এতগুলা

শূন্য হইতে কি ধারণা করিব? ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট বিস্তর টাকা ধার করিয়াছিল, আমেরিকা ইংলণ্ডের নিকট ১২৭৫০০০০০০০০ টাকার দাবী করিতেছে। ইহার মানে বারশত পঁচাত্তর কোটি টাকা। তদ্রূপ ইংলণ্ড তাহার অন্য মিত্র জাতিদিগকে যে টাকা ধার দিয়াছিল, তাহার পরিশোধ স্বরূপ ১৬৪৭০০০০০০০০ অর্থাৎ ষোল শত সাতচল্লিশ কোটি টাকা চাহিতেছে। ফ্রান্স জার্মেনীর কাছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩৭৫০০০০০০০০০ (তিন হাজার সাতশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা চাহিতেছে। কিন্তু সবাই জানে, ইংলণ্ডের, তাহার ইউরোপীয় মিত্র দেশসকলের ও জার্মেনীর এত টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। টাকা আছে কেবল আমেরিকার। এখন যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের দেশ দখল করা কিম্বা ঋণগুলা অনাদায়ী বলিয়া খাতায় লিখিয়া ফেলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু লোভ কেহ ছাড়িতে চায় না। আমাদের দেশে যাহাদের ছেলেমেয়ে দুই-ই আছে, তাহারা মেয়ের বিবাহের সময় বরপণের বিরুদ্ধে চীৎকার করে, কিন্তু ছেলের বিবাহের সময় বৈবাহিকের যথাসর্ব্বস্ব লইতে চেষ্টা করে। তেমনি পাশ্চাত্য জাতিরা চাহিতেছে, তাহাদের দেনদারেরা শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত প্রদান করুক, কিন্তু পাওনাদারেরা ঋণ মাফ্ করুক।

—

কচুরি পানা কমিটি

আর এক সপ্তাহ পরে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কচুরি পানা বিনাশের উপায় সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে। ইহা পড়িয়া সর্ব্বসাধারণের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে, যে, কচুরি-পানা বিনাশ করিবার উপায় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে কি না, এবং কমিটির সভ্যগণ কি রিপোর্ট দিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, কমিটির কাজ শেষ হইয়াছে। তাহা হইলে এখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কমিটির পুরা রিপোর্ট দেখিবার দাবী করিতে পারেন।

এইরূপ শোনা গিয়াছিল, যে, যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা শেয়াল-কুকুরের মত ব্যবহার পায়, তথাকার একজন শ্বেতকায় লোক বাংলা গবর্ণমেণ্টকে কি একটা গুপ্ত বিষের পাঁতি বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল, যাহার সাহায্যে কচুরি পানা বিনষ্ট হইতে পারে। এই গুপ্ত কথার দাম নাকি মোটা মবলগ ছয় অঙ্কের কিছু টাকা, এবং বিষ প্রয়োগ করিবার বার্ষিক ব্যয়ও তাহা হইলে কোন্ দু-চার লাখ টাকা না হইবে? সর্ব্বসাধারণের ইহা জানিবার অধিকার আছে, যে, এই জনরব সত্য কিনা, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এই লোকটা বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগকে ও কচুরি-পানা-কমিটিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া গরিব দেশের অর্থ শোষণ করিতে পারিয়াছে কি না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, দেশবাসীদের এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন কি? তাঁহারা এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন না?

—

অসহযোগ ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যে, যদিও আমাদের মনের ঝোঁক সম্পূর্ণ অসহযোগের দিকে, তথাপি যখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এবং ব্যবস্থাপক সভার স্বাধীনচেতা সভ্যদের দ্বারা কিছু ইষ্ট সাধন ও কিছু অনিষ্ট নিবারণরূপ হিত হইতে পারে, তখন কেহ উক্ত সভা-সকলের সভ্য হইতে চাহিলে তাঁহাকে আক্রমণ করা উচিত নয়। ইহা যদি মানিয়াও লওয়া যায়, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি দেশকে চিরপদানত রাখিবার অস্ত্রস্বরূপ, তাহা হইলেও ঐ অস্ত্রগুলিকে নিজেদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করায় দোষ কি? বিপক্ষ যদি লাঠি বা অন্য অস্ত্র লইয়া আমাকে বশীভূত করিতে আসে, তাহা হইলে উহা বিপক্ষের অস্ত্র বলিয়াই আমি কেন উহা কাড়িয়া লইয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে চেষ্টিত হইব না? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে।

—

অসহযোগ ও সরকারী আদালত

অসহযোগীদিগকেও সরকারী আফিস আদালতের সাহায্য কখন কখন লইতে হয় ও হইয়াছে; উকীল ব্যারিষ্টারদের সাহায্যও লইতে হয় ও হইয়াছে। অতএব, আইনজীবীরা নিজ নিজ ব্যবসা করিলে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা উচিত নয়। তবে তাঁহারা আপনাদিগকে অসহযোগী বলিতে পারেন কি না, তাহা বিচার্য্য। কংগ্রেসের সভ্য তাঁহারা থাকিতে পারেন, আমাদের ধারণা এইরূপ।

ভুল-সংশোধন

এই মাসের প্রবাসীর ৭৫৪ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাসংখ্যা ভুল ছাপা হইয়াছে, বরাবর ৪ সংখ্যা কম ধরিয়া পড়িতে হইবে। ৭৬৬ পৃষ্ঠার ব্যঙ্গ-চিত্রের নামের নীচে 'ইণ্ডিয়ানাপোলিস'এর পরে 'নিউজ' পড়িতে হইবে।

অনুলেখক

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

২২শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শারদীয় উৎসব

বর্ষার অবসানে,—ভাদ্রের শেষে, যখন জল-ঝরা সাদা সাদা মেঘগুলি অনির্দ্দিষ্ট শূন্যপথে ভাসিয়া যায়, প্রভাতে যখন শিউলি-গন্ধি বাতাস বহিয়া যায়, স্বচ্ছ জলে যখন গাঢ় নীল আকাশের ছায়া পড়ে, তখন উৎসবের রূপ দেখি, উৎসবের গন্ধ পাই, উৎসবের স্পর্শ অনুভব করি। মনে হইতে পারে, যে, আমরা আশ্বিনের উৎসবে অভ্যস্ত বলিয়াই প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে অজ্ঞাতে উৎসবের স্মৃতি-রসে উৎফুল্ল হই; আমাদের আনন্দে স্মৃতি-জনিত ভাবের উচ্ছ্বাস অস্বীকৃত হইতে পারে না, কিন্তু শারদীয় উৎসব ও বসন্ত-উৎসব যে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ডাকে উদ্বুদ্ধ, তাহা ভুলিতে পারি না।

বেশি পুরাতত্ত্ব না ঘাঁটিয়া সেকালের কয়েকখানি পরিচিত নাটক পড়িলেই দেখিতে পাইব যে, রাজা ও রাণীরা বসন্ত-উৎসব করিতেছেন উপবনে; উপবনের গাছে গাছে দোলনা ঝুলিতেছে আর সেই দোলনায় বসিয়াছেন যুবতী রাণী ঠাকুরাণীরা,—"পূজার ঠাকুরেরা" নহেন; এবং এই দোলনাগুলিতে দোল দিতেছেন নিজে রাজারা। রাজ-প্রাসাদের উপরে দাঁড়াইয়া মৌর্য্য সম্রাট নন্দেন্দু চন্দ্র-গুপ্ত, পাটলিপুত্র নগরে লোকসাধারণের যে শারদ-উৎসব দেখিয়াছিলেন, সে উৎসব পূজা-পাঠের নহে,—সুভূষিত নাগরিকদের আনন্দলীলার। উৎসবের সম্ভোগ প্রবৃত্তির উৎশৃঙ্খলতার ভয় আছে; উৎসবের আনন্দের দিনে আপনার আপনার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলে ও পূজা করিলে বিলাস-লীলার বাড়াবাড়ি হয় না বলিয়াই হয়ত বসন্ত-উৎসবে দেব-পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; বাসন্তী পূর্ণিমার যজ্ঞের বিধান বৈদিক যুগেই শেষ হইয়াছিল, আর তাহা ছাড়া জনসাধারণের প্রাকৃতিক উৎসব কখনও সেই যজ্ঞে শাসিত হয় নাই। উত্তর ভারতে আমরা পূরামাত্রায় কৃষ্ণলীলা লইয়াই দোল-যাত্রা দেখি; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে শৈবেরা শিব-পার্ব্বতী লইয়া দোলযাত্রা করেন। এ উৎসবটি মূলে কোন একটি দেবলীলার স্মৃতিতে নয়; আমাদের প্রাকৃতিক উৎসব প্রাচীন কোন ঐতিহাসিক কীর্ত্তির—অর্থাৎ নরলীলার স্মৃতিতেও নয়।

বসন্তের প্রাকৃতিক আহ্বানে চঞ্চলতার স্ফূর্ত্তি আছে,—কামনার জাগরণ আছে; কিন্তু শারদ-প্রতিমা মানুষকে শান্তরসে আপ্লুত করে, এবং সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্যে মনকে অনন্তের দিকে উন্মুখ করে; শিলায় বিভক্ত "ফেনিলাম্বু-রাশি"র সৌন্দর্য্যের গম্ভীরতা বুঝাইবার জন্য কবিকে শরতের আশ্রয় লইয়া লিখিতে হইয়াছে—

ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্।

শারদীয় উৎসবের অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশে অল্প একটুখানি বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু এ উৎসব বাঙ্গালীর মধ্যেও বদ্ধ নয়, আর্য্যজাতির মধ্যেও বদ্ধ নয়; সারা ভারতবর্ষে আর্য্যেতর সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এ উৎসব চিরকাল প্রচলিত আছে। এ জীবনে যাহা দুর্ব্বোধ্য, জীবন-মরণের সমস্যায় যাহা হেঁয়ালী, তাহার কথা এই শরৎকালে মনে পড়ে বলিয়া অনার্য্যদের শারদীয় উৎসবে নৃত্য-গীত ছাড়াও দেব-সাধনার অনেক অনুষ্ঠান আছে। যাহারা জ্ঞানে উন্নত নয়, তাহাদের চিন্তা যখন অলক্ষ্যে অনন্তের দিকে যায়, তখন তাহারা কাল্পনিক অপদেবতা ও ভূত-প্রেতের কথা ভাবে; তাই এই সময়ে মানুষের ঘাড়ে ভূত নামাইয়া হিতাহিতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে এবং ভূত প্রভৃতিকে শান্ত করিয়া রাখিবার অনুষ্ঠানও আছে।

শারদীয় উৎসবে বঙ্গের বিশেষত্বের দাবী করিবার আগে, অনার্য্যদের উৎসব-পদ্ধতির সংবাদ লইলে ভাল হয়। ছত্রিশগড়ের সীমান্তে ওড়িশার পশ্চিমভাগে যে-সকল অনার্য্যজাতি এখন আর্য্যসমাজভুক্ত, তাহাদের "কুমারী ওষা" নামে পরিচিত শারদীয় উৎসবের একটু বিবরণ দিতেছি। আশ্বিনের কৃষ্ণ-অষ্টমী হইতে শুক্লনবমী পর্য্যন্ত এই উৎসব হইয়া থাকে। এই পর্ব্বে কুমারীরা একবেলা উপবাস করিয়া কুমারী দেবীর পূজা করে বলিয়া ইহার নাম কুমারী ওষা। এ অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে পনের দিন ধরিয়া বাজনা বাজে, ও নিম্নস্তরের শূদ্র জাতির কুমারীরা নাচিয়া ও গান গাইয়া উৎসব করে। প্রথমে কৃষ্ণ-অষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কুমারীরা স্নান করিয়া নূতন রঙ্গীন কাপড় পরিয়া এক একখানি ডালা মাথায় করিয়া দল বাঁধিয়া গান গাইতে গাইতে কুমারী দেবী গড়িবার মাটী আনিবার জন্য বাহির হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী বাজনদারেরা ঢাক শানাই ও কাড়া বাজাইতে বাজাইতে যায়। মেয়েরা বেলা প্রায় দশটার সময় মাটী লইয়া ঘরে ফেরে এবং গান গাহিতে গাহিতে সকলেই এক একটি করিয়া কুমারী দেবীর মূর্ত্তি গড়িতে থাকে। ঘরে ঘরে কুমারী দেবীর পুতুল বসে, ও দেয়ালের আল্পনায় উহার ছবি চিত্রিত হয়।

যে কুমারী দেবীর নামে এই উৎসব, তিনি কে? একজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিয়াছিলেন, "উনি বন-দুর্গা।" বলিয়া রাখি যে ব্রাহ্মণ করণ (কায়স্থ) প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকেরা এ উৎসব করেন না। এই দেবী দুর্গা হইতে পারেন, কিন্তু শিবের উমা বা পার্ব্বতী নহেন। ব্রাহ্মণ যাজকেরা উৎসবের শেষ দিনে ফুল ফেলিয়া দক্ষিণা লইতে আসেন বলিয়াই হউক, অথবা উৎসবকারীরা আর্য্য-সমাজভুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই হউক, দেয়ালের আল্পনায় কুমারী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ও হর-পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবতাদের ছবিও চিত্রিত হয়। ইতিহাসের হিসাবে ইহা ভালই হইয়াছে; কারণ কুমারী যে হর-পার্ব্বতীর কেহ নহেন, তাহা সহজে বুঝিবার পথ রহিয়াছে।

মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত দুর্গাস্তোত্রে দুর্গা অবিবাহিতা ও বিন্ধ্যবাসিনী। পূর্ব্বে স্থানান্তরে এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছি; এখানে কেবল কথাটির উল্লেখ করিলাম। এই বিন্ধ্য-সংলগ্ন আরণ্য প্রদেশে সেই কুমারী দুর্গাই পূজা পাইয়া আসিতেছেন মনে হয়। বলিয়াছি, যে, পূজার শেষ দিনেই কেবল ব্রাহ্মণ যাজক আসেন, নহিলে সারা উৎসবটি নাচিয়া গাহিয়াই শেষ হয়। অষ্টমীর রাত্রে কুমারীর পূজা শেষ হয় এবং নবমীর দিন প্রাতে কুমারীমূর্ত্তিগুলি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। বিসর্জ্জনের পরে গ্রামের কুমারীরা ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকেরাও নাচিয়া গান গায়, এবং বিশেষ ভাবে হাসিতামাসার আনন্দ বাড়াইবার জন্য কয়েকজন বেহায়া বর্ষীয়সী অনেক অশ্লীল গান গাহিয়া থাকে।

বর্ণিত প্রদেশে আর্য্যসভ্যতা এখনও ভাল করিয়া বিস্তৃত হয় নাই; জাতিনিষ্ঠ অনেক প্রথাই অক্ষুণ্ণ আছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পূজা ও উৎসব করেন না, তাহার উৎপত্তি নিশ্চয়ই অনার্য্য সমাজে। উৎসবটি যাহাদের মধ্যে প্রচলিত, তাহাদের অনুরূপ শ্রেণীর লোকেরাই কি আর্য্য-প্রভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আপনাদের এইরূপ উৎসব করিত না? সন্দেহ হয়, বঙ্গের দুর্গা পূজা

যেন এই প্রাচীন উৎসবেরই সংস্কৃত সংস্করণ। এখনও আমাদের অষ্টমীতে কুমারী পূজা আছে, দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও বন-দুর্গা নামে একটি কলাগাছের প্রতিষ্ঠা আছে, এবং ঠিক নবমীর দিনে এক সময়ে বঙ্গের সকল পূজার বাড়ীতেই কুমারী-ওষার নবমীর দিনের অশ্লীল গানের অনুরূপ নবমীর খেঁউড় প্রচলিত ছিল।

যাহাদের উৎসবের কথা বলিলাম তাহাদের এই কুমারী-ওষার আর-এক নাম "ভাইজিঁউতিয়া"; ভাইদের কল্যাণের কামনায় কুমারীরা এই উৎসব করেন। ভাই-দ্বিতীয়া পর্ব্বটির নাম ও বিধি বিধান আমাদের প্রাচীন পুরাণ ও স্মৃতিতে পাই না; ভাই-দ্বিতীয়ার পর্ব্ব শরতের উৎসবের মধ্যে, তবে দুর্গা-পূজার পরের শুক্ল দ্বিতীয়াতে হয়। অনার্য্য-প্রায় জাতিরা যদি কুমারী-ওষা আর্য্যদের নিকটে ধার করিয়া লইত, তবে আমার বর্ণিত প্রদেশের আর্য্য সমাজে এই ওষা ও জিঁউতিয়া পর্ব্ব উপেক্ষিত হইত না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে চাই; বঙ্গে কেবল ধনীদের গৃহে দুর্গাপূজা হয়, কিন্তু পশ্চিম ওড়িশার প্রতি পল্লীতে সকলে মিলিয়া নাচিয়া গাইয়া উৎসব উপভোগ করে।

বঙ্গের বাহিরে যে যে গ্রামে বা নগরে আমাদের দেবীমন্দির আছে, সেইখানে মহালয়ার পর হইতে দেবীর নবরাত্র পূজা হয়, এবং বহু গ্রামের লোকেরা মন্দিরে আসিয়াই পূজা দিয়া যায়, অথবা পূজা দেখিয়া যায়; বাড়ীতে বাড়ীতে উৎসব হয় না। বঙ্গে মন্দিরের আধিক্য নাই। তবে যখন দেশে রাজা ছিল, তখন হয়ত কেবল রাজবাড়ীতেই উৎসব হইত; এখন সকল ধনীই রাজা; তাই বহু চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর পূজা হয়। অন্য প্রদেশে দেখি, যে, একটা উৎসবের সময়ে একটি মন্দির হইতেই দেবতার "যাত্রা" অর্থাৎ প্রোশেসন চলে, আর সেই যাত্রা বা মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে নাচ গান ও তামাসা-ওয়ালারা চলিতে চলিতে অভিনয়াদি করে। বঙ্গে এক সময়ে ঠিক তাহাই হইত বলিয়াই মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গানের দলের আগেকার নাম ঘোচে নাই; এক স্থানের এক আসরে যে গানের পালার অভিনয় হয়, তাহার নাম রহিয়া গিয়াছে "যাত্রা-গান"। যাত্রা বা মিশিলের সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল কৌতুক অভিনয় হইত, তাহা ছিল যাত্রার "শোভাঙ্গ"; এই শোভাঙ্গের প্রাকৃত নাম ওড়িয়ায় দাঁড়াইয়াছে "শোয়াঙ্গ" এবং বাঙ্গলায় হইয়াছে—"শং"। সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রা-গানে "শং" সাজিবার রীতি ছিল। ঘরে ঘরে দুর্গা-পূজার প্রথা যে গোড়াগুড়ি বঙ্গে প্রচলিত ছিল না,—একটি অবস্থা-বিশেষেই শেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, এ কথা বুঝিয়া লইলে আমাদের বিশেষত্বের দাবী কিঞ্চিৎ কমিবে; আর জাতি সাধারণের অথবা নিম্নস্তরের লোকের উৎসবে মাতিয়া আমরা যে শারদীয় উৎসবের প্রসার বাড়াইয়াছি, ইহা জানিলে আমাদের অপমান নাই, বরং মান বাড়িবে।

পূজার শেষে বিজয়া দশমীর সামরিক উৎসব, খাঁটি আর্য্য সমাজের। দেবী বা শক্তির নয় দিনের পূজায় শক্তি সাধনার পর অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যে খেলা হইত, এখনও তাহা স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। এই উৎসবে, স্বীয় দলের লোকের মধ্যে মনোমালিন্য ঘুচাইয়া, সৈন্য সামন্ত জুটাইয়া ক্ষত্রিয় রাজারা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন; দিগ্বিজয়ের এই সময়ের কথা অনেকেই জানেন, কারণ প্রাচীনের সকল কাব্যেই ঐ বিজয়-যাত্রা শরতে বর্ণিত। এখন একটি জাতীয় লক্ষ্যে সকলের একসঙ্গে জৈত্রযাত্রা নাই; কিন্তু সকলের সঙ্গে কোলাকুলি রহিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক শরতের উৎসবে, উদ্বোধন যে প্রকৃতির আহ্বানে,—প্রশান্ত শারদ-প্রতিমার অনুধ্যানে, তাহাই বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে। যে উৎসবের জন্য প্রকৃতির স্বভাব-নিষ্ঠ আনন্দের আকর্ষণে, সে উৎসবকে অপৌরুষেয় বলিতে পারি। সংক্ষেপে কথা কয়েকটি এই:—(১) এ উৎসবের খাঁটি মূল নৈসর্গিক আকর্ষণে; (২) উৎসবে উদ্বুদ্ধেরা উৎসবের পবিত্রতা বাড়াইতে চাহিয়াছে আপনাদের ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়া; (৩) উচ্চেরা আপনাদের উচ্চতা ভুলিয়া নিম্নস্তরের প্রতিবেশীদের আনন্দকে আপনাদের আনন্দে মিলাইয়া সুখী হইয়াছে।

শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার

খদ্দর চাই কেন ?

যাহারা দেশের দুর্দশা চোখে দেখিয়াছেন, অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, খদ্দর কেন চাই, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। অনেকে দেখেন, কিন্তু ভুলিয়া যান। অনেকে দেখিতে পান, কিন্তু দেখেন না। এই যে অতিবৃষ্টিতে ও নদীর বানে পশ্চিম বঙ্গে তিনটা জেলায় হাহাকার পড়িয়াছে, তাঁহারা শুনিয়াছেন, কিন্তু দুই-দশ টাকা দিয়া ভুলিয়াও গিয়াছেন। যখন দুর্ভিক্ষের দারুণ সংবাদ পাইবেন, তখনও দুই-দশ টাকা দিয়া দেশের দুঃখের মাত্রা ভুলিয়া যাইবেন। ভারত ভূমিতেই এত দুর্দশা কেন ?

কলিকাতা টাকার শহর। এত ধন এত ঐশ্বর্যের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা দেশের দশা কেমন করিয়া অনুভব করিবেন ? সে দশা বলিতে গেলে তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে কি না, সন্দেহ। কত লোকের যে একখানি বই দুইখানি কাপড় নাই, এই বর্ষায় মাথায় দিবার একখন্দা গামছাও নাই, একথা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। এমন পরিবারও আছে, যে পরিবারের সকলের তরে একখানিমাত্র আছে, কাহাকেও কোথাও যাইতে হইলে সেইখানি পরিয়া যায়। পুরুষে লেংটি পরে, মেয়েরা বাড়ীর বাহির হয় না। সাঁওতাল নয়, কোল ধাঙ্গড় নয়, বাউরী নয়, বাগদী নয়। যাহাদের কাপড় নাই, তাহারা খায় কি ?

অথচ দেখি, পরণে প্রায় সবারই সরু ধুতি বা পাছা-পাড় শাড়ী ! অল্প লোকে মোটা পরে, কারণ সরু তাহাদের কুরুচি। বহুর মধ্যে দুই-একজনকে দেখিয়াছি, ঘরের কাটা সুতায় খাদি পরিয়াছে। বঙ্গদেশ মিহির দিকে ছুটিয়া ধনে প্রাণে মজিতেছে।

কে মজাইয়াছে ?

কে বাঁচাইতে পারে ?

কাটনী সুতা কাটিয়া বেচিয়া যে পয়সা পাইতেছে, সে পয়সায় মিহি কিনিতেছে। নিজের কাটা সুতায় কাপড় বোনাইয়া পরিবার সাহস হইতেছে না।

কে সাহস সঞ্চার করিবে ?

ইংরেজী শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সে শৌখ জন্মিয়াছে, তাও ত নয়। আশ্চর্য বোধ হয়, লোকে দেহের একটা বাহিরের খোলসকে এত মূল্যবান্ জ্ঞান করে। কত রকমে এই খোলসের মান বাঁচাইয়া চলিয়াছে, সব লিখিতে গেলে পুথী বাড়িয়া যায়। টাকার টানাটানি, দশহাতী ধুতি মহার্ঘ, কিন্তু লম্বা কোঁচা চাই-ই চাই। এই কারণে আট হাত লম্বা কিন্তু ৪৫ ইঞ্চি বহরের ধুতি বোনাইয়া শি-ক্ষি-ত জন পরিতেছেন। ৮×২=১৬ বর্গহাত কাপড়ে যাঁহার চলিতে পারিত, তিনি ৮×২॥০=২০ বর্গহাত কাপড় পরিয়া ৪ বর্গহাত কাপড় অপব্যয় করিতেছেন। অপব্যয় কেন বলিতেছি তাহা পরে লিখিব। কলিকাতায় দেখিয়াছি, বাড়ীতে লুঙ্গী পরিয়া আছেন। মুসলমানের লুঙ্গী বুঝি ; সে লুঙ্গী মোটা সুতার ও রঙ্গিন। ব্রহ্মদেশের বসন লুঙ্গী ; কিন্তু সে লুঙ্গী পাটের ও রঙ্গিন। কিন্তু বাঙ্গালী বাবুর লুঙ্গী না মোটা না রঙ্গিন। কোন কোন জাঙ্গিয়া-ধারী 'মিলিটারী' বাবু বলিয়াছেন, ধুতির পয়সা জোটে না বলিয়া জাঙ্গিয়া পরেন। যদি তাই, খাদি পরিলে ইঁহাদের মানের কি লাঘব হইত, ইঁহারাই জানেন। কেহ কেহ বাড়ীতে খদ্দরের জামা গায়ে দেন, কিন্তু অপরূপ বেশ নইলে কর্মস্থানে যাইতে পারেন না। কেহ বা স্থান-বিশেষে, সভা বিশেষে খদ্দরে সাজিয়া যান ; বাড়ীতে আসিয়া সরু পরিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই যদি লুকা-চুরি খেলিতে থাকেন, অ-শিক্ষিতের দোষ কি ?

আমাদের গেঞ্জি ও জামার খরচ বছরে কম কি ? কেহ কেহ খদ্দরের কোট পরিতেছেন, কারণ খদ্দর মোটা। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিবেন, গেঞ্জির বদলে অধম খাদির ছোট জামা বহু গুণে উত্তম। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, তিন কালেই ভাল। কারণ খাদির আল্‌গা সুতায় বায়ু আবদ্ধ হয়, এবং এই হেতু শীত নিবারণ করে, গ্রীষ্মে ঘর্ম শোষণ করে, বর্ষার আর্দ্র বায়ু রোধ করে। খাদির দুই ফর্দ চাদর গায়ে দিলে শীতে কাঁপিতে হইবে না। যাহারা পাকানা সুতার

'চেক' চাদর গায়ে দেয়, তাহারা নির্বোধ। চরকার সূতায় গামছা ও তোয়ালে উত্তম বলিতে হইবে। বিছানার চাদর, লেপ বালিশের খোল চিরকাল গীড়ায় হইয়া আসিতেছিল। অতএব ধুতি শাড়ী ছাড়িয়া দিলেও খদ্দরের অনেক প্রয়োজন আছে। বঙ্গদেশ এই সবেরই সূতা যোগাইতে পারিবে কি না, সন্দেহ।

যাঁহারা শিল্প-লোপের আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, চরকার মোটা সুতায় ঢাকাই তাঁতী ঢাকাই শিল্প স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতেছে। কারণ সেটা শিল্প নয়, কলা। তা ছাড়া, যে শিল্পে বিলাতী সূতা বই গতি নাই, সে শিল্প আছে কি? 'মেলিন্‌স্ ফুড' খাইয়া যাহাকে বাঁচিতে হয়, সে আর বাঁচিয়া কই? বিলাতী সরু সূতা না পাইলে যে তাঁতীকে অন্ধকার দেখিতে হয়, সে যে অন্ধকারেই আছে। মনে রাখিতে হইবে, তাহার সখের ব্যাপার নয়, তাহার জীবিকা।

যে-সব সূতা-কাটা বিলাতী কল চলিতেছে, সে-সবের ভরসায় দেশ থাকিতে পারে কি? সে কল কি কল, যার টেকো তৈয়ারি করিবার যোগ্যতাও আমাদের হয় নাই? পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকার কমে যে কল পাওয়া যায় না, সে-রকম বড় কলের দাম কে পায়? কার পরিশ্রমে ও বুদ্ধিতে সে কলের উৎপত্তি? বিলাতী-বর্জন নয়, নিজের জীবন রক্ষার কথা। যাহাকে ভাত-কাপড়-ওষুধের তরে পরের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়, সে বাঁচিয়া আছে কি?

খদ্দরে এক আপত্তি, ইহার সূতা অসমান। কিন্তু অসমান বলিয়াই যে সুন্দর! 'মার্কিন' ও 'লংক্লথের' মসৃণতায় সৌন্দর্য্য কই? দেখিবেন, কেবল মোটা বলিয়া খদ্দরের কোট পরেন না, বৈষম্যে সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই কোট করাইতেছেন।

খদ্দর পরিলে না কি খোট্টার মতন দেখায়? বাঙ্গালীর যে কি অধোগতি হইয়াছে, তাহার কার্তিকের মূর্তিতেই প্রকাশ। যে কার্তিক দেব-সেনাপতি হইয়াছিলেন, তিনি কি ফুল-বাবু ছিলেন? খদ্দর মোটা। কিন্তু মোটার ভিতরে মোটা চিক্কণ বরং থাকিতে পারে, সরুর ভিতরে নয়। লোকে কি বলিবে, সে আশঙ্কা নয়; আশঙ্কা নিজের মনের কাছে।

মোটার আর-এক গুণ এই, অল্প কাপড়ে চলে। এই দুর্দিনে অনাবশ্যক অর্থ ব্যয় উচিত কি? যদি আট হাতে চলে, দশ হাত কেন পরিবে? যদি ৩৮ ইঞ্চিতে চলে, কেন ৪৫ ইঞ্চি পরিবে?

আরও কথা আছে। আমরা যত কাপড় চাই, তত কাপড় দেশে জন্মিতেছে না। যখন এই অবস্থা, তখন কাপড় অপব্যয় কর্তব্য কি? যখন বস্ত্রাভাবে কত নর নারী জ্বরে ও শ্লেষ্মায় ভুগিতেছে, শীতে কাঁপিতেছে, লজ্জায় ঘরের ভিতর লুকাইয়া আছে, আত্মহত্যাও করিয়াছে, তখন লম্বা কোঁচা সাজে কি? আমরা আট হাতে তুষ্ট হইলে আমাদের চারি জনের ফেলা কাপড়ে একজন দুঃখীর চলিয়া যাইবে। বস্ত্র দান করিতে বলি না, নিজের কাপড়-খরচ কমাইতে বলি। যত কম করিবে, কাপড়ের দামও তত কমিবে। ইয়ুরোপের যুদ্ধের সময় যে যে দেশ যুদ্ধ করিতেছিল, সে সে দেশে লোকের দৈনিক আহার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কারণ আহারীয় প্রচুর ছিল না। ভাতের টানাটানি ও দুর্ভিক্ষের সময়, ভাতের ফেলা-ছোঁড়া চলে না। সেইরূপ, দেশটি যদি এক পরিবার মনে করি, কোনও বিষয়ে কাহারও অপব্যয় কর্তব্য হইবে না।

আমাদের তাঁতীদের প্রতিও দৃষ্টি কর্তব্য। কলের চাপে তাহারা পেষা হইয়া যাইতেছে। মাঝারী সূতার কাপড় বুনিয়া কোনও তাঁতী বাঁচিতে পারে না। কলে সেখানে নিশ্চয়ই সস্তা। সরু বুনিয়া পারে; মোটা বুনিয়াও পারে। ভাল পারে তা নয়; কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। একথা পরে লিখিতেছি। মোটা বুনিয়া যে পারে, তার সাক্ষী জোলা। যাহারা কাচা ও গামছা বোনে, তাহারাও এক রকম বাঁচিয়া আছে। যাঁহারা খাদি বোনে, গড়া বোনে, তাহারাও দশ-বার নম্বরের সূতায় বোনে। কারণ মোটা বোনা সোজা, বেশী বুনিতেও পারা যায়। কলের পক্ষেও সে কথা বটে। কলে বাণি কম, হাতেও বাণি কম। যে কর্ম মোটা, সে কর্মে কল ও হাতে প্রায় সমান

দাঁড়ায়। সুতা কাটায় কলের কাছে হাত পারিবে না, কিন্তু মোটা কাপড় বোনায় প্রায় পারিবে।

শেষ কথা এই যে যদি মোটা পরিলে আত্মপ্রসাদ আসে, দেশের কাপড় পরিতেছি বলিয়া অভিমান জন্মে, সেটার মূল্য অল্প কি? চরকার খদ্দরই পরিতে হইবে, এমন নয়; মোটা ধরিতে বলিতেছি। মোটা ধরিলে বহু অমঙ্গল দূর হইবে। এইটুকু কষ্ট স্বীকার অসম্ভব কি? চরকায় হাত পাকিলে সরু সুতা জন্মিতে থাকিবে, অন্ততঃ ২০।২২ নম্বরের সুতা পাওয়া যাইবে। তখন এত কষ্টও করিতে হইবে না।

খদ্দর যে আক্রা

ধান-চালের দরের তুলনায় আক্রা নয়, কলের কাপড়ের তুলনায় আক্রা। কিন্তু কাপড় খরচ কম করিলে বেশী দামেও আটকায় না। তা ছাড়া, হাত-বোনা কাপড় বেশী দাম দিয়াও ত লোকে কিনিতেছে। যদি দশ-হাত আড়াই-হাত ধুতি বা শাড়ী সস্তায় পরিতে হয়, মিহি পরিতে হয়, বিলাতী পরাই এক উপায়। কারণ হাত-কাটা হাত-বোনা কাপড় বিলাতীর তুলনায় নিশ্চয়ই আক্রা পড়িবে। এখন দেখিতেছি, যে হাত-বোনা কাপড়ের দাম ৫ টাকা, দেশী কলের সে কাপড় ৪৷৷০ টাকায়, বিলাতী কলের ৪ টাকায় পাওয়া যায়। খদ্দরের দাম আরও বেশী।

তুলা কিনিয়া কাটনার ও বোনার বাণি দিয়া খদ্দর জন্মাইতে গেলে দাম বেশী পড়িবেই পড়িবে। চরকা-মন্ত্রের বিশেষ এই, নিজে জপ করিলে ফল পাইবে, ভাড়া করিয়া অন্যকে দিয়া জপিলে ফল পাইবে না। স্বাবলম্বন ইহার বীজ, সাহজিক সমাজ ইহার প্রয়োগ।

দ্বিতীয়তঃ, খাদির ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া আরও অনর্থ হইতেছে। খাদিকে খাদি রাখিতে হইবে। যদি কেহ ক্ষুদ্র ধুতি বা শাড়ী পরিতে না পারেন, খদ্দর-প্রচার হাজার হইলেও তাঁহাকে পরাইতে পারিবেন না। কারণ অর্থনীতি বলবান্ হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রাখিতে দিবে না। পুরুষের ধুতি ও উড়নী নইলে নয়। উড়নী উত্তরীয়, অনেকের এখন জামা বা কোট, উত্তরীয় হইয়াছে। অতএব খাদির ধুতি ও খাদির জামা বা কোট পরিলে বাহিরে যাইতে পারা যায়। এই দুই-এ খরচ তত বেশী পড়ে না। দেশের লোকের পক্ষে এইরূপ বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

অবশ্য প্রেমের নিকট অর্থনীতি দাঁড়াইতে পারে না। আর, প্রেমই অসাধ্য সাধন করিতে পারে, আর কিছুতে পারে না। স্বদেশ-প্রেম জন্মিলে, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গানের 'মোটা' উঠিয়া গিয়া 'ভাল' হইবে। মায়ের দেওয়া কাপড় 'মোটা' হইতে পারে না। সে কাপড় সস্তা কি আক্রা, এ তর্কও উঠিতে পারে না। তখন ঘরে ঘরে চরকা চালাইবারও দরকার হইবে না। ব্রহ্মদেশের পাটের লুঙ্গী ৩৫৲ টাকার কমে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলিয়া কেহ কাপাস সুতার সস্তা লুঙ্গী পরে না।

খাদি সস্তা হইবে কি ?

কলের কাপড়ের তুলনায় কখনও হইবে না। মাত্রিকা (raw materials) কাপাস তুলা ঘরে যেমন দাম, কলেও তেমন দাম। বরং লক্ষ লক্ষ টাকার তুলা কিনিতে গিয়া কলে সস্তায় পড়্‌তা করিবে। তার পর কাট্‌নার বাণি ও বোনার বাণি কলেই সস্তা।

কলের কাপড়ের সহিত তুলনা না করিয়া দেখি। আমি লিখিয়াছিলাম, এক সের সুতায় (দশ নম্বরের) এক জোড়া ধুতি বা শাড়ী হইতে পারে। এক সমালোচক লিখিয়াছেন, এক সেরে হইতে পারে না, সাত-পোয়া সুতা লাগে। দশহাত × আড়াই হাত শাড়ীর জন্য প্রায় তাই লাগে। আমার বিবেচনায় কাপড়ের টানা-টানির দিনে এত লম্বা-চওড়া খুঁজিলে চলিবে না। মনে রাখিবেন, ধনবানের কথা হইতেছে না, দেশের কথা হইতেছে এবং দেশের রক্ষার নিমিত্তে সকলকে ছোট পরিতে বলিতেছি। পুরুষের জন্য আট হাত × আট পোয়া, এবং নারীর জন্য দশ হাত × নয় পোয়া যথেষ্ট। দেখি, এই দুই পরিমাণের কাপড় বুনিতে কত সুতা লাগিবে।

এক সঙ্গে পাঁচ-সাত জোড়া তাতে জুড়িতে না পারিলে

বাণি বেশী পড়ে, সূতাও বেশী লাগে। কারণ, এক জোড়ার সূতার পাইট, পূরণি, ব-তোলা প্রভৃতি কর্ম করিতে যত সময় লাগে দশ জোড়ায় দশ গুণ সময় লাগে না, অনেক কম লাগে। এই হেতু বাণি কম। নরাজে চড়াইতে এক জোড়ায় যত দশী লাগে, দশ জোড়াতেও প্রায় তত লাগে। টানা ও পড়্যানের সূতা পরিমাণে সমান হইলে কাপড় ভাল জমে। আনাড়ী তাঁতী সমানে বুনিতে পারে না। শুনি, এখানকার তাঁতী পড়্যানে বেশী, ঢাকার তাঁতী কম খাওয়ায়। বয়ন-বিদ্যায় দুইই অবিধি। মনে করি ৫ জোড়া ৪ গজী ধুতি চাই। অর্থাৎ ৪০ গজ কাপড়। ৪০ গজে মরতি ২ গজ, দশী ১ গজ। মোট টানা হইবে ৪৩ গজ। বহর ৩৬ ইঞ্চি থাকিবে। কাজেই মরতি ২ ইঞ্চি দিয়া ৩৮ ইঞ্চি জুড়িতে হইবে। ১০ নম্বরের সূতা ইঞ্চি-প্রতি ৩২ খাই লাগে। (টানা ও পড়্যান সমান রাখিলে ৩২ খাই যথেষ্ট, বরং ৩০ খাইতে চলে।) অতএব ৩৮ × ৩২ = ১২১৬ খাই। পাড়ে দ্বিগুণ, আধ ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পাড়ে অধিক ৩২ খাই। ১২১৬ + ৩২ = ১২৪৮ খাই। সুতরাং টানায় ১২৪৮ × ৪৩ = ৫৩,৬৬৪ গজ সূতা চাই। পড়্যানেও এত। মোট ২ × ৫৩,৬৬৪ = ১,০৭,০২৫ গজ। ১০ নম্বরের সূতার ২১৬ গজে ১ তোলা। এই সূতা ৫০০ তোলা হইবে এবং জোড়া-প্রতি ১০০ তোলা বা ১।০ পোয়া সূতা লাগিবে। এখন কাটুনীকে বাণি ১।০ সিকা, তুলার দামও প্রায় ১।০ সিকা, মোট ২॥০ টাকা। বুনিতে বাণি হাতে ৵১০ হিসাবে ১॥০ টাকা। মোট খরচ ৪৲ টাকা। রঙ্গিন পাড় দিলে রং খরচ ৵০ আনা, ব্যাপারীর লাভ অন্ততঃ ।০ আনা। অর্থাৎ কিনিতে গেলে ৪॥০ টাকা জোড়া পড়িবে। ঘরে কাটুনা চলিলে ৩॥৵০।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি পাড় দিয়া নয় পোয়া বহরের দশ হাতী শাড়ী বুনিতে কত খরচ পড়িবে? ৪০ ইঞ্চি বহর রাখিতে ৪২ ইঞ্চি জুড়িতে হইবে। দুই ধারে দুই ইঞ্চি পাড় হেতু অধিক দুই ইঞ্চি। মোট ৪৪ ইঞ্চি × ৩২ = ১৪০৮ খাই। ৫ জোড়ায় ৫০ গজ, মরতি ২॥০ গজ, দশী ১ গজ, মোট টানা ৫৩॥ গজ। সূতা ৫৩॥০ × ১৪০৮ = ৭৫,৩২৮ গজ। পড়্যানেও এত। মোট সূতা ১৫০,৬৫৬ গজ, দশ নম্বরের ৭০০ তোলা। জোড়া-প্রতি ।৵০ পোয়া। অতএব সূতারই দাম ৩।০ টাকা। বুনিবার বাণি ২০ হাতে ১৵০, রং খরচ ।৵০ ৮ জোড়া-প্রতি খরচ ৫॥৵০। ব্যাপারীর লাভ দিয়া ৬৲ টাকা বটে।

কোন্ বাবদে খরচ কমাইতে পারা যায়? তাঁতীর বাণি কমাইবার জো নাই। কেন নাই পরে বলিতেছি। কাটুনার বাণি দিতে না হইলে ১৵০ সিকা কম হইবে। মাঝে ব্যাপারী না থাকিলে কিছু কম হইবে। তথাপি ৪৲ টাকা পড়িবে। বিধবার পক্ষে রঙ্গিন পাড় লাগিবে না। তাহার পক্ষে ৩॥৵০।

ঘরে না-ই কাটুনা চলিল, তাঁতীকে বাণি দিতেই হইবে ঘরে ঘরে তাঁত বসানাও সোজা নয়। কাপাসও কিনিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে কাপাস চাষ নাই বলিলেও চলে। যা-কিছু আছে চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে। তার পর, কিন্তু অনেক কম, বাঁকুড়ায়; তার পর মেদিনীপুরে। সুতরাং কাপাস চাষ হঠাৎ এত বাড়িবে না যে তুলা সস্তা হইবে। গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে দেব-কাপাস রাখা এক সোজা উপায়; এত সোজা যে অনেকের পক্ষে তুলার দাম লাগিবে না।

সব জায়গায় তাঁতীর রোজগার সমান নয়। তাঁতী যেমনই খাটুক, মাসে ২০ দিন তাঁত চলে, ১০ দিন জোড়ন করিতে লাগে। তার উপর পালি-পার্বন আছে, অসুখ-বিসুখ আছে। মাসে ২০ টাকা হয় কি না সন্দেহ। বাঁকুড়ায় তাঁতীর সহযোগী-সমিতি আছে। প্রায় ৫০০ তাঁতী লইয়া এই সমিতি। এই সমিতির সম্পাদকের মুখে শুনিলাম তাঁতীরা কোনও রকমে বাঁচিয়া আছে। মাসে ১৭।১৮৲ মাত্র বাণি পায়। অথচ সূতা পাইতে কাপড় বেচিতে কষ্ট নাই। এই উপার্জন তাঁতীর একার নয়, সমস্ত পরিবারের ভাগ আছে। গড়া বুনিবার বাণি হাতে ৵১৫, কদাচিৎ ৵০। ২॥ হাত বহরের প্রমাণ শাড়ী বুনিবার বাণি ১৵০—১।০। ঢাকার দিকে জোলারা বিলাতী রঙ্গিন সূতার লুঙ্গী ও শাড়ী বুনিয়া নাকি বেশী পায়। শুনিতে প্রত্যহ এক টাকা পাঁচসিকা বটে, কিন্তু বছরের হিসাব খতাইতে গেলে মাসে ২০৲ টাকার অধিক হইবে না। সগোষ্ঠীর ২০৲ টাকা বেতন যে কিছুই নয়! যাহারা মাটি কাটে, তাহারাও যে ২০৲ টাকা রোজগার

করে। তাঁতী কারু। কামার কুমার ছুতার প্রভৃতি সব কারুর 'বেতন' বাড়িয়াছে, পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়াছে, তাঁতীর বাড়ে নাই। কারণ শিয়রে করাল কল দাঁড়াইয়া আছে। এত কষ্ট করিয়া বুনিলেও হাত তাঁতের কাপড় কলের দরে দিতে পারে না। এই যে বিক্রি হইতেছে, সে দেশের অনুগ্রহে। কারণ বেশী দাম দিয়া লোকে কিনিতেছে। বয়ন-শিক্ষাশালা বসাই আর গ্রামে গ্রামে শিক্ষকই পাঠাই, তাঁতী নিজের জোরে বাঁচিতে পারিবে না। যাহারা সরু বোনে, পাড়ে ফুল তোলে, জমীতে নক্সা বাহির করে, তাহারা নিজের জোরে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সখের কাপড় দিয়া দেশ চলিতে পারে না।

কলের সুতায় কাপড় বোনার বাণি উপরে দিয়াছি। চরকার সুতায় সে বাণিতে পোষায় না। অতএব সুতা টান-সহ ও কিছু সমান কর, তাঁতীর বাণিও কম হইবে। তাঁতী চরকার সুতার নামে ভয় পায়। ভয়ের হেতু আছে। আমার মনে হয়, ইহাদিগকে ইহাদের কর্মে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। ইহারা যেমন বুনিতেছে বুনুক। নূতন তাঁতী তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। কয়েক বৎসর হইতে নূতন তাঁতী কিছু কিছু জন্মিতেছে। ইহারা তাঁতী নয়, তাঁত বোনা এক জীবিকা নয়। এই চাষের সময়ে তাঁত বন্ধ আছে, চাষ ফুরাইলে চলিবে। তাঁতী বুঝিয়াছে, নূতন এক প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মিতেছে। মনে করিতেছে, ইহাদিগকে তাঁতের কর্ম না শিখাইলে রক্ষা পাইবে। কিন্তু জানে না, দেশময় কি বিপুল সংগ্রাম চলিতেছে; অর্থলোভে লোকের কি উদ্‌ভ্রান্তি জন্মিয়াছে; 'কে মরিল কে বাঁচিল, কে কার বার্তা রাখিতেছে। এই নূতন তাঁতীকে আটকাইয়া রাখিলেও কাপড়ের কল আটকাইতে পারিবে না; এক-একটি কল বসিবে, তাঁতীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। যে-সব তাঁতীর তাঁত আছে, চাষও আছে, তাহারাই বাঁচিয়া আছে; যাহাদের তাঁত আছে চাষ নাই, তাহারা মৃতবৎ পড়িয়া আছে।' শুধু তাঁতী নয়, এমন কোনও কারু নাই, যে গ্রামে চাষ না করিয়াও বাঁচিয়া আছে। পূর্বের মতন সংখ্যায় অধিক থাকিলে একজনেরও দিন চলিত না। দেশ যে দরিদ্র, কারু পুষিতে পারিতেছে না।

নূতন তাঁতীর তাঁত মোটা, শানা মোটা, মাকু মোটা হইবে। চরকার সুতা কাটিতে ঠক্‌-ঠকি মাকুর কর্ম নয়, হাত-মাকু চাই। নূতন তাঁতীর অন্য জীবিকা থাকিবে; চাষের সময় চাষ করিবে, চাষ ফুরাইলে তাঁত ধরিবে। এই তাঁতী হাতে আনা বাণিতে বুনিতে পারিবে। অতএব কেবল চরকা শিখাইলে খদ্দর চলিবে না, তাঁতও শিখাইতে হইবে।

লুপ্তপ্রায় কলার উদ্ধার যেমন-তেমন যত্নে হয় না, দৃঢ়-সংকল্প হইয়া লাগিয়া থাকিলে, নূতন পথ দেখাইতে পারিলে উদ্ধার সম্ভব। কাপড়েই দেখিতেছি, প্রাচীন রঙ্গাজীব নাই; যদি বা মানুষ আছে রঙের মাত্রিকা নাই। অন্য রং না পাই, লাল ও কাল চাই। কিন্তু লাল রঙের চাষ উঠিয়া গিয়াছে, নীল চাষও প্রায় তাই। এখন বিলাতী রং ভিন্ন গতি নাই। যখন জাহাজের পথ খোলা, তখন কোন্ ভরসায় কে নূতন পত্তন করিতে বসিবে? কত জন রঙ্গিন পাড় বিসর্জ্জন করিতে চাহিবে? দেশ-প্রেম প্রবল হইলে বিলাতী রং পরিত্যাগ অবশ্য সম্ভব। কিন্তু এই ত্যাগ দ্বারা স্বদেশী রঙের উৎপত্তি হইবে কি না সন্দেহ। বোধ হয়, প্রধান অঙ্গে স্বদেশী হইতে পারিলেই যথেষ্ট। বিদেশী রং না পাইলেও কাপড় পরা চলিবে, কোনও রং না পাইলেও চলিবে।

এইরূপ, টানা ও পড়্যানের সুতা, দুই-ই চরকার না হইলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, এমন নয়। কেবল পড়্যানের সুতা যোগাইতে পারিলেও যথেষ্ট মনে করি। তা ছাড়া, অনেকে খদ্দরের দাম দিতে পারিবে না, চরকাও ঘুরাইতে পারিবে না। ইহারা কলের ১০।১২ নম্বরের সুতার কাপড় পরিলে সে উদ্দেশ্যের বিশেষ বিঘ্ন হইবে না। উদ্দেশ্যটি আবার বলি, বস্ত্র-বিষয়ে স্বাধীন হইতে হইবে, মোটা না ধরিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কলের মোটা ও চরকার মোটা প্রায় একই। এই হেতু, মোটা সভ্য বিবেচিত হইলে গ্রামের দরিদ্র নর-নারী চরকার সুতার কাপড় পরিয়া আত্মগ্লানি বোধ করিবে না। তখন তাহাদের ঘরে চরকাও চলিতে পারিবে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

রসসৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

আরব্যোপন্যাসের কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে যেত—সে-সব শেষটা স্তূপাকার করে' গাধা বোঝাই করে' ঘরে নিয়ে আসা ছিল তার নিত্য কাজ—তার যানবাহন সামান্যই ছিল—এমনি করে' তার প্রয়োজনের খাতিরের মান রক্ষা করতে হ'ত। হঠাৎ একদিন তার ভাগ্যে সোনার ফসল জুটে গেল—মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্রা, হীরক-মরকত পেয়ে গেল। তা বয়ে' নেওয়ার তার আর অন্য উপায় ছিল না—সে-সব গাধার পিঠেই আনন্দে চাপিয়ে বাড়ী চল্‌ল। আর সে-সবের দামও সে তার সোজা চোখে দেখে বুঝ্‌ল না—গণিতশাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করে' এক-গাছি দাঁড়িপাল্লা এনেই রত্নসম্ভারের পরিমাপ ঠিক করতে হ'ল।

রসসৃষ্টির পরিমাপও দুর্ভাগ্যক্রমে এমনি ভাবে অনেক কাল থেকে হয়েছে। এ যুগে একটা বড় রকমের সংস্পর্শ পাওয়া গেছে—একটা যাদুমন্ত্র হঠাৎ মানুষ পেয়েছে যাতে করে' নানা দেশের শিল্প-সৌন্দর্য্য ও কাব্যগীতি একটা পরম রূপলোককে উদ্ভাসিত করে' তুলছে যার হীরক-কনকের প্রাচুর্য্যে মানুষ বিস্মিত হচ্ছে! আজও কি আমাদের সে-সবকে পুরাণ ও রুগ্ন উপায়ে পরিমাপ করতে হবে? আজও কি আমরা সে-সমস্ত স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যকে গাধার পিঠে বোঝাই করে' দুনিয়ার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে' বেড়াব এবং শেষটা অমনি নির্দ্দয় ভাবে গুদাম ভর্ত্তি করব?

ইতিহাসে দুবার পূর্ব্ব-পশ্চিমের সৌন্দর্য্যগত মিলনের সূচনা হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রোফেসর ষ্ট্রিঝিগাওস্‌কির (Strzygowski) মতে বাইজেন্‌টাইনের মধ্যবর্ত্তিতায়, প্রাচ্যভাবানুসিক্ত পূর্ব্বাঞ্চলের হেলেনিষ্টিক (গ্রীক) আর্ট উরোপের প্রাথমিক মিডিভেল (মধ্যযুগের) আর্টের উপর একটা বড় রকমের গভীর প্রভাব সঞ্চার করেছিল। কলার এই সংস্পর্শের ফলে আর্টের ভিতর একটা নূতন রস-সঞ্চার হয়েছিল—যা, ভাল হোক মন্দ হোক, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভিতর একটা ভাবের বিনিময় ঘটিয়েছিল। এবার এই মিলনের সূচনা হয়েছে বর্ত্তমান কালে। পাহাড়ের মত দেশকালের বাধা চূর্ণ হয়ে গিয়ে এ ভাব-সঙ্গম একটা অপূর্ব্ব রসলোককে সার্থক করে' তুলছে। উরোপীয় কলার সহিত জাপানী আর্টের সঙ্গম ক্রমশঃ চীন ও ভারতকেও নিকটতর করেছে। ওদিকে প্রত্নতাত্ত্বিকদের বেবিলন পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রত্ন-দ্রব্যাদির সঞ্চয়ও উরোপকে বাঁধা নোঙর ছিঁড়তে বাধ্য করেছে। শিল্পীরা এসিয়ার কন্‌ভেন্‌শন বা প্রথা ও পদ্ধতি বিনাসঙ্কোচে গ্রহণ করেছে। ইম্প্রেশনিষ্ট্ মোনের ছবি ত স্পষ্টভাবে জাপানী—হিরোসিগে ও হোকুশাইর ছবির সঙ্গে তা আশ্চর্য্যভাবে মেলে।

এই রকমে একবার যেমন পথ ভাঙ্‌ল অমনি প্রাচ্য-ভাবের স্রোত হুড়মুড় করে' উরোপে ঢুক্‌ল। চৈনিক আর্টের প্রভাব উরোপের আর্টের উপর ব্যাপ্ত হয়েছে। এসব আমাদের কীর্ত্তি-কথা মনে না করে' উরোপেরই ব্যাপকতর জীবনলীলা মনে করা মন্দ নয়। যাকে decorative arts মণ্ডন-শিল্প বলা হয়, সে-সকলের মূলই হচ্ছে প্রাচ্য। কোন লেখক বল্‌ছেন:

The whole history of these arts in Europe is the record of the struggle between orientalism with its frank rejection of imitation, its love of artistic convention, its dislike to the actual representation of any object in Nature and our own imitative spirit. Whenever the former has been paramount as in Byzantine, Sicily and Spain by actual contact or in the rest of Europe by the influence of Crusades, we have had beautiful and imaginative work in which the visible things of life are transmuted to artistic conventions and the things that Life has not are invented and fashioned for her delight.

আধুনিক যুগেও পূর্ব্বদেশের সম্পর্কে এই স্বভাব-বাদের সম্পর্ককে—ঐন্দ্রিয়িক সত্যকে—পশ্চিম প্রত্যাখ্যান করে' নূতন নূতন রসলীলায় আত্মহারা হয়ে গেছে। তার

ভিতর আমাদেরও স্থান আছে একথা ভাব্‌লে অনেকটা আরাম পাওয়া যায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে অধিকার কি সকলের জন্মেছে? আমরা জ্ঞানী বলে' ভাব্‌ছি যে মানুষ বুঝি শুধু দুটো চোখ এবং একটা nervous system বা স্নায়ুমণ্ডল দিয়ে রচিত হয়েছে—এত বড় অলীকতাকে আজকাল মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাও প্রত্যাখ্যান কর্‌ছেন। শরীর ও মনের parallelism বা পরস্পর-সাপেক্ষতা একটা উদ্ভট কল্পনা। মনের লীলা শরীরকে পদে পদে ছাড়িয়ে যায়—প্রফেসর বার্গসোঁ বার বার একথা দেখিয়েছেন। কাজেই চাক্ষুষ সত্যের পরিমাপের উপর মনের আনন্দ ও বেদনা মোটেই নির্ভর করে না। আমরা জ্ঞানী বলেই রসজ্ঞ বা রসবিদ্ বেশী, একথা বলা কম শক্ত নয়; এবং সৃষ্টির রূপরসগন্ধের সন্ধিস্থল হতে সৌন্দর্য্যের যে অফুরন্ত উৎস উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ছে প্রতি যুগেই তার বহন ও অনুভবের ক্ষমতাকে বার বার পরাজয় মান্‌তে হচ্ছে। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অগ্রদূতের মত সুন্দরের পতাকা বহন করে' এগিয়ে চলেছে, মানুষও সে মায়ামৃগের পিছনে ছোটে। আশ্চর্য্যের বিষয় শত শত বৎসর পরেও তার এই রম্য প্রয়াণ তাকে ক্লান্ত করে নি, তাকে আশ্বাস ও আনন্দ দিয়েছে, তাকে সুস্থ ও সজীব করে' নিত্যনূতন রূপলোকের বিভ্রম এনে তা ক্রমশঃ সত্যোপেত করে' তুলেছে।

প্রতিমুহূর্ত্তেই সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শ এই পরম রমণীয় অভিযানের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকে বিকশিত কর্‌ছে—সৃষ্টির কণ্ঠে রূপমাল্য দান কর্‌ছে। প্রতি পলকে মানুষ ধাতার কুহেলি-কৌতুকে এই রসাভিনয়ে চরিতার্থ হচ্ছে। কিন্তু যা লীলা, তার ভিতরকার রসসমাবেশ ও রসাস্বাদ এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণেই হয়ে থাকে—তা' মূলে যে পরমলোকের সহিত যুক্ত তার সঙ্গে সব সময় বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া হয় না। এজন্য রসাস্বাদেও নানা অন্তরায় ঘটে' উঠে।

আজকাল পশ্চিমে ললিতকলার যে কয়েকটা রম্য সৃষ্টি হয়েছে—সে সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। কবিতায় আর্ট বস্তুনিরপেক্ষ হয়েছে—ছন্দের রূপ-মাধুর্য্যে নানা ভাবের বায়বীয় রামধনু চিত্তফলকে বিম্বিত করা হচ্ছে—সঙ্গীতে প্যাটার্‌ণ্ মিউজিক ভেঙে ওয়াগ্‌নার যার সূত্রপাত করে' গেছেন, ষ্ট্রাওস ও Lisz প্রভৃতি তাকে অবিভাজ্য লোকোত্তর অনির্দ্দিষ্টতার ভিতর নিয়ে গেছেন। চিত্রে কাণ্ডিন্‌স্কী (Kandinsky) অরূপলোককে রূপলোকের রম্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করার স্পর্দ্ধা করেছেন। আর্চিপেঙ্কো (Archipenko) ভাস্কর্য্যে সে চাক্ষুষ অরূপতার ললিত রূপকে খোদিত কর্‌তে সঙ্কোচ করেননি। এ-সব হয়েছে বলে' যারা বিচার ও তর্কের ভিতর দিয়ে দুনিয়াকে দেখ্‌তে চায় শিল্পীরা আজ তাদের অপ্রিয় হয়েছে। কাণ্ডিন্‌স্কীর spiritual impressions বা আধ্যাত্মিক প্রত্যয়, internal harmonies বা আন্তর্লৌকিক সুর, psychical effects বা অধ্যাত্মব্যঞ্জনা, soul vibration বা অধ্যাত্ম-পুলক আজ না জ্ঞানীর না রসার্থীর প্রিয় হ্‌তে পেরেছে। জনতার অশ্রদ্ধায় আর্চিপেঙ্কোর রূপলোকও আজ ক্লান্ত হয়ে ললাট কুঞ্চিত করে' আছে। এ যুগের ভূতত্ত্ব জীব-তত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্বতত্ত্বাদি যদি আর্টের উপর ভ্রূকুটি করে তবে অধ্যাত্মতত্ত্বও বাদ যায় কেন? রাসেল (Russel) ও (Wright) রাইটের বর্ণস্তরবিধি ত মুকুলেই অকূল পাথারে ডুবেছে। আজ এ-সব বহন করার দুর্যোগ কি অসামান্যই হয়ে পড়েছে!

উরোপ যেমন এশিয়ার সংস্পর্শে জেগেছে, তেমনি এশিয়ার শিল্প-লোকও উরোপের সঙ্ঘাতে একটা সদ্য বিকাশের মহিমা পেয়েছে। কিন্তু সে রচনাও কি পরিপূর্ণ সার্থকতার ভিতর দিয়ে যেতে পার্‌ছে? অজন্তার অপূর্ব্ব ও অকুণ্ঠিত কলা আজ বিচার করে' বিজ্ঞতার চশ্‌মা দিয়ে দেখ্‌তে হচ্ছে। অধ্যাপক ফুসে সে-সবের মানে বার কর্‌তে যতটা পরিশ্রম করেছেন, রসাস্বাদ তার সামান্য কণাও করেছেন কি না সন্দেহ। দেশের হৃদয়ের সহিত মমি বা মিউজিয়মের যতটা যোগ, অর্দ্ধ অন্ধকারে স্তিমিত দিবালোকে দুর্লক্ষ্য সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যস্বপ্ন তার চেয়েও দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে।

চিরকালই হয়ত এমনিভাবে চলে' এসেছে। এ শুধু একূল ওকূলের বোঝাপড়ার কথা নয়, এদেশের ওদেশের বলে' এটা ওটা যে দুর্ব্বোধ্য তাও নয়। এদেশ ওদেশ যখন কোথাও বা এক-জায়গায় মিলেছে তখনও যে সৌন্দর্য্যের টানকে নিঃসঙ্গভাবে কেউ ওজন করেছে তা

নয়, তখনও লোক বিস্ময়ে এমন কি শঙ্কায় সে রম্যাবর্ত্তের চারিদিকে চড়ক-পূজার পুতুলের মত ঘুরেছে—আকর্ষণকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছে অথচ মাথাও ঘুরে গেছে।

এ বিরোধের একটা ভিত্তি হচ্ছে খাঁটি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি—পরিপূর্ণ ও বহুমুখী; তা ময়ূরকণ্ঠের রঙের মত রসব্যঞ্জনায় নিত্য নূতন রঙে হয়ত ফলিত হয়—তার কূল পাওয়া যায় না,—যেমন করে' আদি কাল হতে সূর্য্যাস্তের কুঙ্কুমরক্ত হোলিলীলা, মধ্যাহ্নের শুভ্র দুকূলবাসের নিঃশব্দ স্বচ্ছতা, এবং প্রভাতের সদামিলিত সুকুমার হরিৎ হিল্লোলের কোন কূল নেই। পূর্ণসৃষ্টির ভিতর অনাদ্যন্ত সুগুপ্ত মহিমা নিহিত আছে বলে' তার রসের নিবেদন বা æsthetic appeal অসীম, তা নিঃশেষ হতে পারে না। এ জন্যই গুপ্ত হওয়া, অমুদিত থাকা, মুকুল-রূপী হওয়াটা কোন কোন শিল্পীর একটা লক্ষ্য হয়ে পড়েছে একালে। পশ্চিমের আধুনিক কবি ও শিল্পী এজন্য স্পষ্ট করেই বলে, যে ফরাসীতে যাকে বলে—"abscon" অমুদিত, অপরিস্ফুট, তা হওয়াই তাদের লক্ষ্য। ম্যালারমের সেই পরিচিত উক্তি, 'To name is to destroy, to suggest is to create' তাদের জপমন্ত্র হয়ে পড়েছে।

এটা হচ্ছে গোড়াকার কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকে সিন্ধবাদের মত বহুকাল হতে নানা আবর্জ্জনা কাঁধে করে' অগ্রসর হ'তে হয়েছে। সেটা সৌন্দর্য্যের সৌভাগ্য হোক্ না-হোক্, অন্ততঃ আবর্জ্জনার ভাগ্য বলতে হয়। কিন্তু তাতে একটা ভ্রান্তি জন্মে' গেছে। শ্যাম-দেশের যুক্ত-যমজের মত এ সূক্ষ্ম সম্পর্কে কোন্‌টা রসের রূপ কোন্‌টা তর্ক বা তথ্যের রূপ—এটা বোঝা শক্ত হয়েছে। যেটা যা নয় তা নিয়ে এমন কঠিন সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে এ যুগে যা সত্যোপেত তা নির্দ্ধারণ করতে একটা নির্ম্মম antithesis বা বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। আধুনিক পশ্চিমের আর্ট তারই প্রতিরূপ।

ইন্দ্রিয়ের আখ্যানগত সম্পর্ক ও সাযুজ্য (association) এজন্য আজ আঘাত পাচ্ছে—কিন্তু তা বলে' রসরূপসৃষ্টির পথে ইন্দ্রিয়ের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি অব্যাহত আছে। এটা একটু ভাল করে' বোঝা দরকার।

এসিয়ার সহিত প্রাথমিক সম্পর্কেও উরোপকে একবার ইন্দ্রিয়ের অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে হয়েছিল—এবারও বাহির থেকে দেখলে তাই মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। এবার আনন্দে রূপরসগন্ধকে জগৎ বরণ করছে—কিন্তু বিচিত্রতা হচ্ছে তার বিশুদ্ধ ও খাঁটি স্বরূপকে আঁকড়ে ধরবার জন্য এবার বিশ্বের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, যে অধিকার সব-চেয়ে বড় ও স্বতঃসিদ্ধ বলে' আজ মানুষ বড়াই করে, তাকে যে সে বার বার কত পঙ্গু ও বিকল করে' রেখেছিল তা ইতিহাস দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সৌন্দর্য্যের আকুল আকর্ষণ মানুষকে জীবনের নানা সন্ধিস্থলে মুক্তি ও স্বাধীনতা, আলোক ও আনন্দের দিকে টেনে নিতে চেয়েছে; আর অমনি ভীত ও চকিত গতানুগতিক বিধিব্যবস্থা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে—এবং ছায়াময়ী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অর্গলবদ্ধ করতে না' পেরে মানুষের ইন্দ্রিয়কে বার বার শিকল দিয়ে বেঁধে পঙ্গু ও বিকল করেছে;—কখনও বা দোহাই দেওয়া হয়েছে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পিচ্ছল-প্রান্তে বিহার করার উপর, কখনও বা নৈতিক রাজ্যের ভাল-মন্দের মধ্যবর্ত্তী যে অনিশ্চিত ও ক্ষুরধার সেতু দুলচে তাতে বিচরণ করার খাতিরের উপর।

এজন্য চোখের দেখাকে পঙ্কিল, কানের শোনা মধুর আওয়াজকে গরল বলে' মানুষ অনেককাল ডমরু বাজিয়েছে—কখনও বা ধর্ম্মোপজীবীর আদেশে, কখনও বা রুক্ষ রাজন্যের দণ্ড-ভয়ে।

কাজেই দুনিয়ার রূপরসগন্ধের জগৎ হঠাৎ এম্‌নি ঝরে' পড়ে' মানুষকে পেয়ে বসেনি। পথে কাঁটাবন অনেক পাওয়া গেছে—আবার বাইরের শাসন যেখানে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে নেই—সেখানেও ভিতর হতে মনের উপর অনেক পর্দ্দা এসে পড়েছে।

মানুষের সামাজিক জীবনের জটিলতা নানা নৈতিক ধর্ম্মগত ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আলোড়িত হয়ে এসেছে, যা তাকে ঝড়ের মত এদিক ওদিক নিয়ে গেছে—বিচারকে মূঢ় করেছে, আনন্দকে শিথিল করেছে, গতিকে সঙ্কুচিত করেছে। এজন্য সে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের জালে

ধরা পড়্‌লেও সে কথা অস্বীকার কর্‌তে ইতস্ততঃ করেনি। শিল্পীরা যে রকমের আব্‌হাওয়ার ভিতর রসসৃষ্টি করেছে—সব সময় তা মুক্ত বা সহজ ছিল না, নানা বজ্রঘোষ ও আগ্নেয় সংঘর্ষের ভিতর শিল্পী আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও নিপুণতার সহিত নির্ভয়ে সোনার স্বপ্ন বুনে' গেছে। সমাজবিধির অনুশাসনে মানুষ নিজের চোখ বেঁধে ইন্দ্রিয়কে যেমন হিতোপদেশে দুর্ব্বল কর্‌তে উৎসাহ পেয়েছে—তেমন নিজের ভিতরকার অন্তরতম প্রেরণাকেও সে ইচ্ছা করে' এমন অস্বচ্ছ ও স্থূল করে' তুলেছে যে তার পক্ষে সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম ভাবাবেশ অনুভব করা সকল সময় সম্ভবও হয় নি। হয়ত এ জন্যই—এরকম কঠিন বলেই—রসাস্বাদকে এ দেশ অপরূপ মর্য্যাদা দিয়েছে—

ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ রসাস্বাদ-লোকোত্তরঃ।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এদেশে—এদেশে কেন, বোধ হয় সব দেশেই—রূপরসজগতের পথে অরূপ জগৎ বাধা দিয়েছে। অরূপ জগতের ধ্যানেও অপ্সরারূপী রূপরসগন্ধের প্রলোভন ত একটা না-হলে-নয় ব্যাপারই হয়ে পড়েছিল, এদেশের কাব্যে ও পুরাণে।

এজন্য রসচর্চ্চার গোড়াতে এই রকমের একটা বিচার ও আলোচনা দর্‌কার হয়ে পড়্‌ছে। রসাস্বাদ ও রসসৃষ্টিকে কষ্টিপাথরে কষে' দেখা অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে।

চোখে দেখা ও চোখে পাওয়া—এ দুটিতে অনেক তফাৎ। চোখের উপর দুনিয়ার অনেক জিনিষ পড়্‌ছে ও ভাস্‌ছে—কানেও অহরহ অনেক আওয়াজই আস্‌ছে—সে-সব কোন্‌ ধূসরিত পথে চলে' যায় তার ঠিক নেই। কোকিলের আওয়াজ, আম্রমুকুলের গন্ধ সৃষ্টির আদি হতেই ত মানুষ পেয়ে আস্‌ছিল—কিন্তু কলার ইন্দ্রজালেই তা লোকের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে প্রথম আবিষ্ট করে—সে-সব কালিদাস ও জয়দেবের মত কবির অপেক্ষায় ছিল—তাঁরা শোনেন নি মাত্র—তাঁরা পেয়েছেন এবং সে-সবকে সৌন্দর্য্য-লোকের চিরন্তন অধিকারী করেছেন। তেমনই বর্ষাগমে ময়ূরময়ূরীর মত্ত কেকাধ্বনি, রক্তচঞ্চু খঞ্জনের রম্যনৃত্য—এ-সব মানুষের রসহৃদয় অধিকার করে' বসেছে শিল্পের ভিতর দিয়ে—এক অপরূপ-রূপ পেয়ে গেছে সার্থক রসসৃষ্টির ভিতর। এজন্যই পশ্চিমে ঊনবিংশ শতাব্দীকে ব্যাল্‌জাকের (Balzac) সৃষ্টি বলে। ব্যাল্‌জাকের রসসৃষ্টির ভিতর নরনারী ও সমাজব্যবস্থা এমন এক রূপ পেয়ে গেছে যে, তিনি যে রসের রসিক ছিলেন সে ভাবের ভাবুক না হয়ে ফরাসী জাতি পারে নি—এখানেই হচ্ছে সৌন্দর্য্যের জয়! দেশকালের প্রাকৃত বন্ধনকে ছিন্ন করে' কলা এই রকমেই জগৎকে উন্নীত ও রূপান্তরিত করে। কোন পশ্চিমের লেখক পশ্চিমের রসসাহিত্য ও কলায় জাপানের যে মূর্ত্তিটি পাওয়া গেছে, তা যে একেবারে ললিতকলার সৃষ্টি, তা দেখাতে গিয়ে বলেছেন :—

The Japanese people are the deliberate self-conscious creation of certain individual artists. If you set a picture, by Hokusai or Hokkai or any of the great native painters, beside a real Japanese gentleman or lady, you will see that there is not the slightest resemblance between the two. The actual people are not unlike the general run of English people······One of our most charming painters went recently to the land of Chrysanthemum in the foolish hope of seeing the Japanese. All he saw—all he had the chance of painting were a few lanterns and some fans. He did not know that the Japanese people are simply a mode of style—an exquisite fancy of art.

কাজেই চোখে যা পাওয়া যাচ্ছে—তা চোখে যা মাত্র দেখা যায় তার চেয়ে স্বতন্ত্র। সৌন্দর্য্যের মায়াঞ্জন চোখে দিতে হয়—চিত্তের সঞ্চিত আবেগ রসসিক্ত কর্‌তে হয়—তবেই রূপজগতের অলৌকিক ধারা চোখে পড়ে। উচ্চতর সৃষ্টির উপলব্ধির পথে সাধনা চাই। সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী সাতমহল হর্ম্ম্যের অগণ্য সম্ভারে বেষ্টিত হয়ে রূপরসরাগের অজস্র উৎসের মধ্যে রূপকথার রাজকন্যার মত সোনার খাটে ঘুমিয়ে আছে—কোন্‌ দিন রাজপুত্র সমস্ত বাধা চূর্ণ করে' তারুণ্যের উদ্বেগে বাইরের বাধাকে রম্যমন্ত্রে বিপর্য্যস্ত করে' সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে

সঞ্জীবিত করবে! সে চেষ্টা আজ কত দিকে চলেছে। নীট্‌সের জরথুস্ত্র বলেছেন :—

"A thousand paths are there, which never have been trodden—a thousand salubrities and hidden islands of life. Still unexhausted and undiscovered is mankind and man's world."

যা-কিছু আমরা সুন্দর দেখ্‌ছি তার পিছনে ললিত-কলার এ রকম আকর্ষণ আছে—তার শিহরিত মূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত রম্যতর লোকের অধিকারী হয়ে উঠেছে। কলা-জগতে কোন বস্তুবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-জগতের ভিতরও যে কি-রকম বিপর্য্যয় ঘটে—তা কোন লেখক কৌতুক করে' উল্লেখ করেছেন :

"The quivering sun-light that one sees now in France with its strange blotches of mauve and its restless violet shadow is her (Art's) latest fancy……and nature reproduces it quite admirably. When she used to give us Corots and Daubignys, she gives now exquisite Monets and enhancing Pissaros.

এর মানে হচ্ছে মোনে ও পিসারো যে ছায়াজগৎকে উদ্ঘাটন করে' সকলের চোখে ফেলেছেন তার মূলে ললিত-কলার প্রবল প্রেরণা কাজ করেছে। এ দেশের আচার্য্যেরা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে চক্ষুষ্মান করে' সকলকে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারে সক্ষম কর্‌তেন বলা হয়—তেমনি ভাবে কলা ও কবিতাও মানুষের পক্ষে সৌন্দর্য্যের সপ্তলোক-বিচরণের জন্ম রম্য দেবযানের সৃষ্টি করেছে।

কাজেই মানুষের ইন্দ্রিয়-জগৎ একটিমাত্র চওড়া ও বাঁধান রাস্তায় চলে না—তা পলকে সৃষ্টির ভিতর এক রম্য ইন্দ্রজাল উপস্থিত করে' রূপরস-জগতের অপূর্ব্ব ও বহুমূল্য স্বরূপকে উদ্ঘাটন করে।

একবার তাত্ত্বিকদের মতামত দেখা যাক্। কাব্য ও কলা প্রসঙ্গে নীট্‌সেকে ভোলা অসম্ভব। ব্লেভির মতে উরোপের নব্য Renascence বা নব-অভ্যুদয়ের ভিতর তিনটি ভাবুক মাথা তুলে দাঁড়ান; একজন হচ্ছেন, স্তাঁদাল—যিনি বর্ত্তমানকে অতি তুচ্ছ করে' অগ্রসর হয়েছিলেন; দ্বিতীয় হচ্ছেন গোটে, যিনি বাইবেলকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বই বলেছেন, এবং অধিক বা majorityর মতামতকে বরাবরই ব্যঙ্গ করেছেন; তৃতীয় হচ্ছেন, নীট্‌সে—the greatest hero of the Renascence রেনেসাঁসের বা নব-অভ্যুদয়ের মাথার মণি। নীট্‌সের আবির্ভাবের আগেকার উরোপীয় কাব্য ও কলার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন নীট্‌সের দীক্ষামন্ত্র উরোপে কি অসাধ্য সাধন করেছে।

ইন্দ্রিয়-পরিধি অতিক্রম করার আবেগ ও কল্পনা মানুষের সব জায়গায় আছে। এ দেশ সে পথে মানুষকে অতিমানুষ না করে', দেবতাকে মানুষ করেছে—তা'তে সকলের আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটেছে। উরোপ দেবতা মানে না। কাজেই সেখানে মানুষকে মনুষ্যত্ব অতিক্রম করার কল্পনা করলে কল্পনার দিক্ থেকে ভাল লাগে, কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে দুঃসহ হয়। মানুষকে ও-রকম দেবতা-স্থানীয় করলে ওখানে তাকে স্বর্গচ্যুত কর্‌তেই হয়। এজন্য অতিমানবত্বের অনেক ব্যঙ্গ পশ্চিমে হয়েছে।

আজকাল নীট্‌সের will to power ও কল্পনাকেও রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে লঘু ব্যঙ্গের বিষয় করা হচ্ছে, যদিও উরোপ তা এখন মাথা পেতে নিচ্ছে। অথচ জিগীষার এই প্রেরণা উরোপের বুক হতে রুগ্ন ও গলিত কত আবর্জ্জনা যে দূর করেছে তার সীমা নেই। অন্ততঃ সঙ্কীর্ণ বস্তুবাদের ধারা থেকে চিত্তকে মুক্ত করার কাজটিও যৎসামান্য নয়। এদেশের লোক ভাল করে' জানে না যে নীট্‌সে শোপেনহাউয়ারের শিষ্য। শোপেনহাউয়ারের Will-বাদই নীট্‌সের ভিতর প্রলয়ঙ্কর শক্তি পেয়েছে এবং তারই মূলে বেদান্তের 'আত্মানং বিদ্ধি' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' প্রভৃতি রয়েছে। কারণ শোপেনহাউয়ারের সহিত উপনিষদের সম্পর্কের কথা সকলেই জানে। নীট্‌সে স্পষ্টই বলেছেন, সৃষ্টির কাজ ত মানুষই করে' আস্‌ছে। দুনিয়া যখন এক অজ্ঞাত ও অবিশিষ্ট বস্তু-ভাণ্ড ছিল তখন ইন্দ্রিয়জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া করে' মানুষই ত তার নাম ও দাম কষে' নিয়েছে, সেটাই ত সৃষ্টি।

"Naming, adjusting, classifying, qualifying, valuing, putting a meaning into things and above all, simplifying—all these functions acquired a sacred character and he who performed them to the glory of his fellows became sacrosanct."

তাতে করে' মানুষ দুনিয়াকে বোঝ্‌বার সূত্র পেলে, এলো-মেলো ইন্দ্রিয়ের বিচ্ছিন্ন ফাঁদ হতে বেরিয়ে দুনিয়ার বস্তুপর্য্যায় নাম পেয়েই যেন সৃষ্ট হ'ল। এজন্য কোন কোন জায়গায় নামকরণ ও সৃষ্টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মিসর-ধর্ম্মে ঈশ্বর নাম-করণ করে' দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন বলা হয়েছে। জিহোবা শুধু নাম উচ্চারণ করে' বস্তুধারা সৃষ্টি করেছেন এ রকম একটা বর্ণনাও আছে।

নীট্‌সে এজন্য Dionysian বা মোদ-মত্ত আর্টিষ্টের কল্পনা করেছেন—যে নূতন নূতন ভুবন সৃষ্টি কর্‌বে—যার হাতে becoming বা ভাব্য রম্যতর being বা সত্তাতে পরিণত হবে। তাঁর মতে অলস হয়ে বহিরিন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে পুরাণ কথায় না মজে' বিশ্বামিত্রের মত নূতন সৃষ্টি ঘটিয়ে তুল্‌তে হবে। Art is the will to overcome becoming, it is a process of eternalising, আর্ট অনন্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। সৃষ্টির শিহরিত কম্পন ও মরীচিকার ভিতর দিয়ে, শিল্পীর রূপসৃষ্টির ভিতর দিয়ে, সুন্দর অসীমতার স্পর্শ পায়, অমর হয়ে যায়! এই অপরূপ ইন্দ্রজালের অধিকার সুকুমার-কলার আদিম ও নিজস্ব। কথাটিতে দার্শনিক শেলিঙের একটি কথা মনে পড়ে—

"Art, in that it presents the object in this movement, withdraws it from time and causes it to display its pure being in the form of eternal beauty"—আর্ট কাল অতিক্রম করে' বস্তুকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের শুদ্ধ রূপে প্রকাশিত করে।

দুনিয়ায় এই যে অশ্রান্ত প্রবাহ, এই যে flux —গতি, এই বিসৃষ্টি ও বিসর্জ্জন চলেছে, তার কোন মুহূর্ত্তকে চয়ন করাকে বার্গ্‌সোঁ অলীক ব্যাপার বলে' মনে করেন। তিনি বলেন এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি শুধু আর্টেরই আছে। Becoming বা প্রবাহকে মন্ত্রবলে নিরস্ত করে' ঘোম্‌টা খুলে তাকে চিরন্তন শ্রী দান করার এ মন্ত্র কবি ও শিল্পীরাই জানে, এ ইন্দ্রজাল শুধু তাদের হাতেই সম্ভব হয়।

বিচার বিবেচনা বা কার্য্যকারণের ধারা অনুসরণ করে' এই গুণ্ঠন উন্মোচন হয় না—উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে হয়। এরকমের অদ্ভুত উদ্দীপনা শিল্পীর হাতের রঙের তাস—ভেল্কীর মন্ত্রদণ্ড। তা ইন্দ্রিয়কে সুপ্ত করে' আবার অপরূপ সৃষ্টির ভিতর জাগ্রত করে। বার্গ্‌সোঁর কথাটি বলি :—

"It is like a refined and spiritualised version of hypnosis. Music in its ordered rhythm invades us with such power that it suspends the usual course of our sensations and ideas and renders us susceptible to the smallest artistic hints of this feeling or that."

তিনি কবিতা সম্বন্ধে বলেন :—"Its rhythm masters us, our mind is enchanted, led captive by the thoughts of the poet, his words conjure up images before our eyes—there we attain in sympathy that which without his magic we should have missed. The artist tears away a veil which the exigencies of practical life have placed between his consciousness and ours, and the richer in thought the more inspired by feeling is the world into which he brings us, the loftier and the more intense is the beauty he enshrines in his colour, his marble, his notes of music and his words."

প্রাগ্‌মেটিষ্টদের অন্যতম প্রতিনিধি নীট্‌সের কথা এবং আত্মপ্রত্যয়বাদী নব্যদর্শনকার বার্গ্‌সোঁর উক্তি, এই একটি জায়গায় মিলে যাচ্ছে।

বার্গ্‌সোঁ সৃষ্টিকে অহরহ পরিবর্ত্তনশীল মনে করেন। Science বা বিজ্ঞান যা নিয়ে ক্রিয়া কর্‌ছে সেটা হচ্ছে যন্ত্র-জগৎ—dead matter, তার ভিতর নিয়মতন্ত্রের অপূর্ব্ব

বাধ্য-বাধকতা ও শৃঙ্খলা আছে, তাকে বাঁধা যায় এবং এ-রকমে বেঁধে মানুষ তাকে নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু যেখানে জীবনের সম্পর্ক সেখানে গেলে মনে হয় যেন এক অসীম ও অকূল সাগরে পৌছন গেল। অ নিত্য চঞ্চল, তার ক্রম-হিল্লোল এক মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করছে না,—তা ওতপ্রোত ও অখণ্ড, এজন্য তাকে পাওয়া মুস্কিল, দেখা মুস্কিল। দুনিয়াকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' দেখা যায়, কিন্তু তা হলে সে ত দুনিয়া আর থাকে না! এজন্য এমন লোক চাই যার চোখ আছে, যে দেখিয়ে দিতে পারে। সে চোখ অন্তর-নিরপেক্ষ নয়। সে চোখ যার আছে সে দেখ্‌তে জানে। বার্গ্‌সোঁ বলেন, এ-রকমে দেখ্‌তে জানে যারা তারাই হচ্ছে আর্টিষ্ট্।

"From the beginning of humanity there have been men whose peculiar office has been to see and to make other men see that which without their aid would never have been discovered. They are artists."

এই সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটন বা সৌন্দর্য্যারোপকে বার্গ্‌সোঁ অনেকটা জন্মগত সংস্কার বলেছেন। এ যেন অসীমের রূপ-সংস্পর্শের সহিত মনের একটা আদিম বন্ধন, যাতে শিল্পী বাঁধাও পড়েছে—মুক্তও হয়েছে।

এ অবস্থাটিকে আমাদের গীতাকারের মতে অনেকটা বিভূতি-যোগের ফল বল্‌তে হয়। শুধু সংস্কার নয়—চর্চ্চারও দর্‌কার হয় সংস্কারেরই খাতিরে। 'নাম-রূপ' যেমন অগ্রসর হওয়ার সোপান, তেম্‌নি বাধাও। গীতাকার আর-একটা উচ্চতর অবস্থার কথা বলেছেন, যে অবস্থায় বিশ্বরূপদর্শন হয়। সেটা বিভূতি-যোগের পরের অবস্থা। এ প্রসঙ্গে কথাটি মনে করা ভাল।

এদেশের শব্দ- ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্পর্কে একটা স্ফোটবাদ অনেক কাল হতে চলে' আস্‌ছে। তাত্ত্বিকদের মতে প্রত্যেক জিনিষের পিছনে একটা অনাদি শব্দঝঙ্কার ঝড়ের মত ভাবের হিল্লোল উপস্থিত করে—যা-কিছু দেখ্‌ছি তা অর্থযুক্ত করে' তোলে। না হলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌ত। শারীরিক-সূত্রের বিচারে শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষের দিক হতে এ বিচার করেছেন। একটা কথাকে অক্ষরে বিভক্ত করা হলে কোনও অক্ষরে সমস্ত বাক্যের মানে নিহিত থাকে না, কিন্তু একে একে শেষ অক্ষর উচ্চারণ হতেই সমস্ত কথাটি হঠাৎ জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে উঠে। এ স্ফোটকে বার বার বাক্যটি উচ্চারণ করলে পাওয়া যায়। এজন্য তাকে অনাদি বলা হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে, দুনিয়া সার্থক ও পরিস্ফুট হচ্ছে এরকমের একটা অসীমতা তাকে অর্থযুক্ত করছে বলে'। তর্ক ছেড়ে সহজে শিল্পীর এ অবস্থাটিকে আমরা একটা রসের স্ফোটবাদ বলে' কল্পনা করলে অনেকটা বার্গ্‌সোঁর কল্পনার সাম্‌নে এসে পড়ি। শিল্পীর ভিতর একটা অনাদ্যন্ত রসরূপ এমনি সংস্কারকে সার্থক করে' তোলে।

সে যাক্। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল-প্রসঙ্গে ঐন্দ্রজালিকের প্রসঙ্গ এমনিভাবে উঠ্‌ছে। চোখে দেখার পিছনে যে দেখ্‌ছে তার প্রশ্নই বার বার উঠ্‌ছে। স্রষ্টা বা শিল্পী ইন্দ্রিয়স্থানীয় মনেরও অতীত। শুধু মনকে এদেশের তত্ত্ববিদ্‌রা ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—একাদশ ইন্দ্রিয়ের ভিতর মনকে অন্যতম ইন্দ্রিয়স্থানীয় করা হয়েছে, স্থূল থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর অবস্থার দিকে বিচার করে'। এজন্য মানুষের পঞ্চকোষাত্মক জীবাত্মার কথা বলা হয়েছে—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

ইন্দ্রিয়াত্মক মনোময় কোষের অধিকার সামান্য। বুদ্ধি ও বিচারাত্মক (conceptual sheath) কোষের একটা প্রয়োজনীয় স্তরের ভিতর দিয়ে গেলে—তবেই আনন্দময় কোষে ব্রহ্মাস্বাদ লাভের আনন্দ ঘটে। কাজেই মনকে ছাড়িয়ে আরও গভীরতর জায়গায় গেলে দেখা যায় তা অতলস্পর্শী—সে গভীর আনন্দ-হ্রদে যারা পড়েছে তারা বেরোবার পথ পায়নি। তারা যা চায় তা পেয়েছে, জীবনের বহুমুখ রসসংস্পর্শের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরম কৈবল্য লাভ করেছে। কাব্যচর্চ্চায় ও কাব্যের রসভোগেও এ-সমস্ত স্তর সম্বন্ধে অঙ্গুলি না হোক অন্ততঃ কয়েকটা প্রশ্ন এ যুগে ভাল রকমেই উঠেছে। চিত্রেও সে জটিলতা সম্মুখীন হয়েছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রী যামিনীকান্ত সেন

নিরাশার বুকে আশার অঙ্কুর
চিত্রকর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

মালবিকা

জ্যোৎস্নালোকে সম্রাট অশোক উদ্যানে পাদচারণ করিতেছিলেন, সঙ্গে দুই-চারিজন বয়স্য। ঝাউ বৃক্ষে নৈশ বায়ু মর্ম্মর করিতেছিল, গন্ধরাজ কিংশুক মল্লিকা রজনীগন্ধার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল। সম্রাট অল্পভাষী, মাঝে মাঝে দুই-চারিটি কথা কহিতেছিলেন, বয়স্যেরা চপল, তাহাদের মুখে কথার বিরাম নাই।

অশোক ধীরে ধীরে, কখন তরুচ্ছায়াতলে, কখন জ্যোৎস্নাশোভিত দূর্ব্বাদলের উপরে পাদচারণ করিতেছিলেন। সরোবরের জলে পাদপছায়া কম্পিত হইতেছিল, বায়ুভবে সম্রাটের কুঞ্চিত কেশ ও উত্তরীয় চঞ্চল হইতেছিল। নীল নির্ম্মল আকাশ, আকাশে ও পৃথিবীতে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত নিশীথিনীর মায়া।

পদ্মনাভ কহিলেন, "প্রয়াগে মহারাজের নূতন কীর্ত্তি-শিলা-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে।"

ধর্ম্মপাল কহিলেন, "তক্ষশিলার স্তম্ভের সমান হইবে।"

চন্দ্রচূড় কহিলেন, "ইন্দ্রপ্রস্থের স্তম্ভই শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবের কীর্ত্তি মহাভারতে; মহারাজের কীর্ত্তি সর্ব্বলোকের দৃষ্টির গোচর, আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যুগে যুগে এই কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ দেখিয়া লোকে বিস্মিত চমৎকৃত হইবে; পাটলীপুত্র হইতে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী হইতে দ্বারকা, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে মহারাজের অক্ষয় কীর্ত্তি, সসাগরা ধরণীর চক্রবর্ত্তী অধীশ্বর; ইতিহাসে পুরাণে সম্রাট অশোকের সমকক্ষ কে?"

সম্রাট আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। প্রশান্ত প্রশস্ত ললাট, বিশাল চক্ষে গভীর অন্তর্দৃষ্টি। স্নিগ্ধ গম্ভীর ধীর স্বরে কহিলেন, "পাষাণে উৎকীর্ণ যশের কাহিনী কি অক্ষয় কীর্ত্তি?"

চাটুবাদী বয়স্যগণ স্তব্ধ হইলেন।

সম্রাট কহিতে লাগিলেন, "যে কীর্ত্তি মানব-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে, পুরুষপরম্পরায় যে কীর্ত্তি কণ্ঠে কণ্ঠে কথিত হয়, সেই কীর্ত্তিই অক্ষয় কীর্ত্তি। আমি এ পর্য্যন্ত আপনার নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে পারি নাই।"

অল্পবুদ্ধি বয়স্যেরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ধর্ম্মপাল সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "নামের সার্থকতা? মহারাজের নাম জগতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে, মহারাজের জয়ধ্বজা দেশ-দেশান্তরে উড্ডীয়মান, কত রাজা মহারাজা মহারাজের পদানত, মহারাজের নামে শত্রুর হৃৎকম্প হয়। নামের সার্থকতা নাই?"

চিন্তাযুক্ত স্বরে, যেন আপনার মনে সম্রাট কহিলেন, "আমার নাম অশোক। পিতামাতা এ নাম কেন রাখিয়াছিলেন? শুধু কি আমি রাজ্যবিস্তার করিব, দিগ্‌বিজয়ী হইব, এই মনে করিয়া? পিতা-মাতার শোক হরণ করিব, এইজন্য? অশোক তরুর নাম সার্থক, কেন না শোকার্ত্তা সীতা অশোক-বনে গিয়া পরিণামে শোকশূন্য হইয়াছিলেন। আমি কি অ-শোক, শোকশূন্য? কাহারও শোক মোচন করিয়াছি? শোকসাগরে কত লোককে নিমগ্ন করিয়াছি, স্বাধীন রাজাদিগকে করদ করিয়াছি, অপরের সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছি। কেমন করিয়া আমার নামের সার্থকতা হইল? আমি কি অশোক?"

আর কেহ কোন কথা কহিল না। এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিল। অশোক ধীরে ধীরে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

২

সম্রাট আপনার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বয়স্যেরা প্রমোদ-আগারে গমন করিল।

সুসজ্জিত প্রমোদ-প্রকোষ্ঠ আলোকে উজ্জ্বলিত। স্বর্ণ-প্রদীপে সুগন্ধি তৈলে আগার আলোকিত, আমোদিত। কোথাও সুরভি পুষ্পরাশি, কোথাও বিচিত্র মাল্যদাম। এক দিকে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের মধুর আরাব, তাহার পার্শ্বে নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ, অলঙ্কারশিঞ্জন, বিচিত্র অলস লাস্য। মধ্যে মধ্যে রমণীকণ্ঠের মধুময় গীত।

প্রমোদগৃহে সম্রাট ইচ্ছামত আগমন করেন, অথবা করেন না। আজ আসিলেন না।

প্রাসাদের অপর পার্শ্বে, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে, করতললগ্ন-কপোল সম্রাট চিন্তা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া উঠিয়া রাজবেশ ত্যাগ করিয়া সাধারণ নাগরিকের বেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে স্বহস্তে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া প্রাসাদ হইতে গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল, সেখানে প্রহরী থাকিত না।

চন্দ্র অস্ত গিয়াছে। অশোক রাজপথ ত্যাগ করিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় নগর-প্রহরী ডাকিল, "কে যায় ?"

সম্রাট কহিলেন, "নাগরিক।"

"বল, মহারাজ অশোকের জয়!"

সেইরূপ বলিয়া সম্রাট গলিতে প্রবেশ করিলেন। সে পথে আলোক অল্প, অন্ধকারে অশোক সাবধানে চলিলেন।

কিছু দূর গিয়া দেখিলেন একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটীর, দ্বার অর্দ্ধমুক্ত, ভিতরে প্রদীপের সামান্য আলোক। সম্রাট ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে কে কহিল, "দ্বার মুক্ত আছে, প্রবেশ কর।"

অশোক প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জীর্ণ কন্থার উপর একটি বৃদ্ধা বসিয়া আছে। বৃদ্ধা কহিল, "তুমি তস্কর? এ কুটীর হইতে অপহরণ করিবার যোগ্য কিছুই নাই।"

সম্রাট কহিলেন, "আমি তস্কর নহি। আমি ধনবান নাগরিক, কাহারও কোনরূপ অভাব হইলে পূরণ করিবার প্রয়াস করি।"

বৃদ্ধার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, কহিল, "আমার অভাব কে পূর্ণ করিবে?"

অশোক কহিলেন, "আমার সাধ্যের অতীত হয়, সম্রাট অশোককে জানাইব।"

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে উদ্বেলিত অশ্রুধারা বহিল, কহিল, "সম্রাট অশোককে আপনি জানেন?"

"জানি।"

"তিনি আমার অভাব মোচন করিবেন?"

"তাঁহার ক্ষমতা অসীম, ঐশ্বর্য্য অতুল, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন?"

"তিনি কি বড় দয়ালু?"

"শুনিতে ত পাই।"

"তিনি ত অশোক, তাঁহার কোন শোক নাই। তিনি কি অপরেরও দুঃখ মোচন করেন?"

"তিনি নিজে শোকশূন্য নহেন, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা সাধ্যমত অপরের শোক দূর করেন। অনেক সময় অনুতাপে তিনি আকুল হন।"

"কিসের জন্য অনুতাপ?"

"এই নিরবচ্ছিন্ন রাজ্য ও প্রতাপের বিস্তৃতির জন্য। এই সাম্রাজ্য কোন্ ছার, সমস্ত জগতের অধিপতি হইলেই বা কি ফল? সম্রাটের চারি পাশে চাটুবাদী, সত্যবাদী কেহ নাই। লোভ সকলের, মমতা কাহারও নাই। বহু পার্শ্বচর, মিত্র কেহ নাই। কেবল তৃষ্ণা, নিবৃত্তি কিছুতে নাই।"

বৃদ্ধা প্রদীপ তুলিয়া সম্রাটের মুখের সম্মুখে ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সম্রাট মস্তক অবনত করিলেন, কহিলেন, "আমি অশোক।"

বিস্ময়ে বা সম্ভ্রমে বৃদ্ধা অভিভূত হইল না। প্রদীপ রাখিয়া দিল। চক্ষের অশ্রু শুকাইয়া গিয়া চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত সম্রাটের মুখের সম্মুখে ধরিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বৃদ্ধা বলিল, "তুমি অশোক, তুমি সম্রাট, রাত্রে দস্যু-তস্করের ন্যায় এই ভগ্নপ্রায় জীর্ণ কুটীরে, এই বৃদ্ধা অনাথিনী ভিখারিণীর আলয়ে প্রবেশ করিয়াছ? আর কেহ এ কথা শুনিলে হাসিবে। আমি জানি তোমার কথা সত্য, তুমি জগৎবিশ্রুত রাজাধিরাজ অশোকই বটে। কোথায় তুমি প্রমোদগৃহে নির্লাজ নৃত্য দেখিবে, না তুমি এই শূন্য প্রাচীন কুটীরে গভীর রাত্রে তস্করের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছ! কেন মহারাজ? তুমি কি জান না, যে হত্যা করে সে হত্যাস্থানে পুনঃ পুনঃ আগমন করে, তাহার অন্তরের পাপ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসে? তুমি অশোক, তোমার নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে এই রাত্রে এমন স্থানে আসিয়াছ? দয়ার সাগর তুমি, অর্থ দিয়া আমার দুঃখদারিদ্র্য মোচন করিবে? মহারাজ, তস্করে ত তুচ্ছ তৈজস অপহরণ করে, তুমি যে আমার প্রাণসর্ব্বস্ব

অপহরণ করিয়াছ! আমি বিধবা, দরিদ্র, দুইটিমাত্র আমার পুত্র; কত যত্নে, কত কষ্টে তাহাদিগকে লালন পালন করিয়াছিলাম। আমার চক্ষের মণি যে তাহারা, আমার আশার সম্বল, বৃদ্ধ বয়সে ভরসার স্থল! রূপে গুণে, বলে বিনয়ে রাজপুত্রও তাহাদের সমকক্ষ নহে। কোথায় তাহারা, মহারাজ? তোমার যমদূতেরা দুই ভাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, তোমার সৈনিক হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিবে। তোমার জয় হইল, আর এক রাজ্যে তোমার জয়ধ্বজা উড়িল। কিন্তু আমার দুই পুত্র কোথায়, মহারাজ? যুদ্ধক্ষেত্রে শৃগাল শকুনী তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। তুমি আমার অভাব মোচন করিবে, আমার দুই পুত্রকে ফিরাইয়া দিবে? তুমি অশোক? তুমি কৃতান্ত স্বয়ং!"

মহারাজ অশোক অবনত মস্তকে, হেঁট মুখে, বিনা বাক্যে কুটীর হইতে প্রস্থান করিলেন।

৩

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, কোথাও কোনরূপ সজ্জা নাই। ধরণীতলে সামান্য আসনে বসিয়া সম্রাট অশোক। চিন্তামগ্ন।

দৌবারিক আসিয়া যুক্ত করে নিবেদন করিল, "মহারাজ, সেনাপতি দ্বারে দণ্ডায়মান।"

সম্রাট কহিলেন, "দ্বার মুক্ত। তাঁহাকে আহ্বান কর।"

সেনাপতি আসিয়া, দুই হস্ত তুলিয়া অভিবাদন করিলেন,-"জয়, জয় মহারাজ!"

সম্রাট কহিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক! কোন সংবাদ আছে?"

"মহারাজ, কলিঙ্গের রাজকন্যা আসিতেছেন। দূতমুখে সংবাদ পাঠাইয়াছেন আজ সন্ধ্যার সময় নগরে আসিয়া উপনীত হইবেন।"

"কলিঙ্গের রাজকন্যা? এখানে কেন?"

"রাজদর্শনে। কলিঙ্গ বিজিত হইবার পরে রাজার মৃত্যু হয়। রাজকন্যা পিতৃমাতৃহীন, যুবতী, এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। মহারাজের দর্শন কামনায় রাজধানীতে আগমন করিতেছেন।"

"এখানে তাঁহাকে কোথায় বাসস্থান দেওয়া হইবে?"

"মহারাজের আদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি।"

অশোক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া কহিলেন, "অমরাবতী উদ্যান-প্রাসাদে তাঁহার বাসের আয়োজন কর। অনুচরবর্গের সংখ্যা কত?"

"পঞ্চাশ জন।"

"তাহাদের জন্যও উপযুক্ত আয়োজন কর। আমি স্বয়ং যাইতেছি।"

অমরাবতী প্রাসাদে গিয়া সম্রাট স্বয়ং সকল আয়োজন পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। রাজকন্যার শয়নাগার, স্নানাগার, বিশ্রামাগার দেখিলেন। স্থানে স্থানে সজ্জার সামগ্রী পরিবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী আনীত হইল। সঙ্গীতাগারের বীণা সেতার বংশী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। শিল্পাগারের শিল্পের সকল সামগ্রী দেখিলেন। প্রসাধনকক্ষে অঙ্গবিন্যাসের সকল উপকরণ আছে কি না লক্ষ্য করিলেন। দাসদাসীদের বাসস্থানও স্বয়ং পরিদর্শন করিলেন।

সম্রাট কলিঙ্গ-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজকন্যা আসিতেছেন। কি উদ্দেশ্য? অনুযোগ, অভিযোগ? সম্রাট শঙ্কিত হইলেন।

অপরাহ্ণে উদ্যান-প্রাসাদ পুষ্পে সজ্জিত হইল। রাত্রে দীপাবলী। চারিদিকে দীপমালা সাজাইয়া রক্ষকেরা ইন্দ্রপুরী করিয়া তুলিল।

সম্রাটের আদেশে সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া রাজকন্যাকে আনয়ন করিলেন। প্রত্যুদগমনের জন্য নগরদ্বারে দাঁড়াইয়া সম্রাট স্বয়ং।

সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে রাজকন্যা মালবিকা নগরদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সম্রাট কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। রাজকন্যা শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে উদ্যত হইলেন। ব্যস্তভাবে সম্রাট তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

কিয়ৎকাল সম্রাট রাজকন্যার হস্ত মুক্ত করিতে বিস্মৃত হইলেন। তিনি অনেক সুন্দরী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এমন সুন্দরী অদ্যাবধি কখনও তাঁহার নয়ন-

গোচর হয় নাই। অতুলনীয় রাজরাজেশ্বরীর রূপ রাজপথ আলোকিত করিয়া সম্রাটের সম্মুখে বিরাজিত হইল। চাঞ্চল্যরহিত, স্থির রূপরাশি, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে সজ্জিত উর্ম্মিমালার লাবণ্যলহরী।

বেশ এবং অলঙ্কার রূপের অনুরূপ। ললাটে কুঞ্চিত কেশে এক খণ্ড বৃহৎ হীরক অস্তমান সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে, চূর্ণকুন্তলে মুক্তামালা। স্কন্ধে মণি-মুক্তাখচিত কঞ্চুক, হীরকে মাণিক্যে স্বর্ণাঞ্চল ঝল্-মলায়মান।

মুগ্ধ বিস্ফারিত লোচনে সকলে সেই অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রমণী অপূর্ব্ব রূপসী, পুরুষ তেজস্বী ধীর সৌম্য মূর্ত্তি।

সম্রাট রাজকন্যার হস্ত মুক্ত করিলেন, কহিলেন, "তোমার শুভাগমনে পাটলীপুত্র ধন্য হইল!"

রাজকন্যা কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

৪

দিন যায়। রাজকন্যা মালবিকা পাটলীপুত্র নগরে কেন আগমন করিয়াছেন কেহ জানে না, কেহ তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করে না। সম্রাট প্রতিদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদের নানা বিষয়ে অনেক কথোপকথন হয়, কিন্তু রাজকন্যার আগমনের উদ্দেশ্য সম্রাট কখন জিজ্ঞাসা করেন না, সে কথা উত্থাপন করেন না।

মালবিকার সহিত কথা কহিতে কহিতে সম্রাট বিস্মিত, চমৎকৃত হইতেন। রাজকন্যার বিদ্যানুরাগ, বহুমুখী বিদ্যার অনুশীলন, তাঁহার যুক্তিপূর্ণ সরস বাক্যালাপ, তাঁহার নম্রতা ও ধীরতা দেখিয়া সম্রাট আশ্চর্য্য হইতেন।

যাহাতে রাজকন্যার সময় সুখে অতিবাহিত হয় অশোক তাহার নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজধানীতে যে-সকল দেখিবার উপযুক্ত স্থান, সেখানে রাজকন্যাকে পাঠাইয়া দিতেন। পণ্ডিতেরা তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে আসিতেন। দুই-এক দিনেই সম্রাট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যুবতীসুলভ আমোদ-প্রমোদে রাজকন্যার অভিরুচি নাই, এজন্য তাহার আয়োজন করিতেন না। মালবিকা যে কলাবিদ্যা জানিতেন না তাহা নহে। বীণা উত্তম বাজাইতেন, অতি মধুর কণ্ঠে কখন কখন গান করিতেন, কিন্তু অনেক সময় একা থাকিতেন।

রাজকর্ম্ম দেখা হইলে স্নানাহারের পূর্ব্বে সম্রাট একবার রাজকন্যাকে দেখিতে যাইতেন; বৈকালে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া দ্বিতীয় বার যাইতেন। প্রথম প্রথম অল্পক্ষণ থাকিতেন, তাহার পর সাক্ষাতের সময় দীর্ঘ হইতে লাগিল। সম্রাট কখন নিজের উদ্যান হইতে ফুল লইয়া আসিতেন, কখন ভূর্জ্জপত্রে লিখিত গ্রন্থ লইয়া আসিতেন। রাজকন্যার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন।

কিন্তু রূপের আকর্ষণী শক্তি কোথায় যাইবে? ক্রমে ক্রমে সম্রাট রাজকন্যাকে কয়েক দণ্ড না দেখিলে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। কিন্তু হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবেন কিরূপে? রাজকন্যা অতিথি, তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেন না, আপনার সম্বন্ধে কোন কথা কহিতেন না, তাঁহার কথা হইলে কৌশলে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন।

অশোক লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে রাজকন্যা নগরে প্রবেশ করিয়াই সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, আর কখন কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। কেন? সম্রাট ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেন না।

সন্ধ্যার সময় মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে বসিয়া সম্রাট ও রাজকন্যার কথোপকথন হইতেছিল।

অশোক কহিলেন, "রাজকন্যা, তুমি নিজের সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতে চাহ না। এমন কি কথা থাকিতে পারে যাহা বলিতে তোমার বাধা আছে?"

"কিছুই না, মহারাজ। আপনি ত সকলই অবগত আছেন। আমার পিতা-মাতা নাই, রাজগৃহ ত্যাগ করিয়াছি, একজন আত্মীয়ার গৃহে বাস করি। আমার নিজের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। আত্মকথা বলা সঙ্গতও নয়।"

কলিঙ্গ রাজ্য যে অশোক জয় করিয়াছিলেন এবং

মালবিকার পিতা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন রাজকন্যা সে কথার কোন উল্লেখ করিলেন না।

সম্রাট কহিলেন, "অনেকের আত্মকথা আত্মগরিমার নামান্তর। তোমাকে দিয়া তাহা হইবে না, জানি। কিন্তু তুমি মনেরও কোন কথা প্রকাশ কর না। তোমার এই নবীন জীবনে কত আশার সঞ্চার, কত কল্পনা, কত বাঞ্ছা উদয় হইবার কথা। আমি তাহাই শুনিতে চাই। তুমি কিসের কামনা কর, কি তোমার বাঞ্ছনীয়?"

"মহারাজ, আমি কিছু প্রার্থনা করি না।"

"কঠোর শব্দ! তোমার নিকটে আমি সম্রাট নহি। প্রার্থনা কিসের? তুমি আদেশ কর, আমি তোমার আদেশ প্রতিপালনের সুখ মাত্র চাই।"

"মহারাজ, আপনার সৌজন্য ও আতিথ্যে আমি আপ্যায়িত হইয়াছি এবং আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার ত কিছুরই অভাব নাই।"

"ইহা ত শুধু শিষ্টাচারের কথা। ইহার অপেক্ষা অধিক কি আর কিছু আশা করিতে পারি না?"

"মহারাজ, আশা ও লালসা উভয়েরই নিবৃত্তি নাই।"

"এ কথা সত্য। আশা পূর্ণ হইলেই কি সুখ হয়? কে বলিতে পারে? সম্রাটের মুকুট ধারণে শিরঃপীড়া হয় মাত্র, আর কি ফল? পিতৃপিতামহের এই বিশাল রাজ্য আমার পক্ষে গুরুভার-মাত্র। সাধ্য-মত প্রজার হিত সাধন করি, তাহাদের কার্য্যে সময় কাটিয়া যায়, কিন্তু ইহাতে সুখ শান্তি কোথায়? যদি কাহাকেও সুখী করিতে পারি, কাহারও শোকে সান্ত্বনা দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার নাম ও জীবন সার্থক।"

"আমরা যাহাকে দুঃখ সুখ মনে করি তাহা ত তুচ্ছ বস্তু, ও সেই কারণেই জীবন সঙ্কীর্ণ ও দুঃখদায়ক হইয়া উঠে। সুখ-মরীচিকার অনুসরণেই জীবন বহিয়া যায়, সত্যকে মানুষ দৃঢ় করিয়া ধারণ করিতে পারে না। সুখ ছদ্মরূপী স্বর্ণমৃগ, নিত্য মানবকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে। সংযম ও চিত্তদমন ব্যতীত কি আর কোন সুখ আছে?"

"মালবিকা, তোমার কথা শুনিয়া আমার অনেক সময় বিস্ময় হয়। তুমি রাজকন্যা, যুবতী, সম্পদে ভোগে লালিত, সংসারের সুখে, সংসারের আনন্দ-কোলাহলে তোমার নিবিষ্ট থাকিবার কথা, কিন্তু তুমি সর্ব্বদাই গভীর চিন্তায় মগ্ন থাক, তোমার মুখে আমি যে কত জ্ঞানগূঢ় কথা শুনিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যাহা কিছু স্পৃহণীয় সকলই তোমার আছে, অথচ সংসারের কিছুতেই তোমার বিশেষ স্পৃহা নাই। কিন্তু সংসারের দ্বারে দাঁড়াইয়া বীতরাগ হইও না। সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখ।"

৫

আবার জ্যোৎস্না রাত্রি আসিল। আকাশে আবার পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল, চন্দ্রালোকের তরল মায়ায় জগৎ আচ্ছন্ন হইল।

মালঞ্চে সম্রাট অশোক ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, পাশে মালবিকা। বিকশিত পুষ্পের সুগন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ। অলস, গন্ধবহ বায়ু বহিতেছিল।

ধীর পদক্ষেপে, মালবিকার সমগতি, বীথিকা হইতে বীথিকান্তরে, কখন মুক্ত দূর্ব্বাদলে সম্রাট ভ্রমণ করিতেছিলেন। গতি ধীর, কিন্তু হৃদয়ে তুমুল অধৈর্য্য। তিনি স্থির করিয়াছিলেন আজ মালবিকাকে বলিবেন যে তিনি তাহার প্রেমপ্রার্থী, পাণিগ্রহণের অভিলাষী। তাঁহাকে প্রধান মহিষী করিয়া প্রকাশ্য সভায় স্বতন্ত্র সিংহাসনে স্থান দিবেন।

মালবিকাও কি মনে করিয়া আজ নূতন বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। যেমন অলঙ্কৃত হইয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে বাহির হইয়াছেন। প্রতি পদক্ষেপে চরণে অলঙ্কার শিঞ্জিত হইতেছে, অঙ্গের অলঙ্কার, ললাটে হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে। আবার সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি!

অশোকের মুখে কথা নাই, মালবিকাও নীরব। কিয়ৎকাল পরে অশোক কহিলেন, "আজ তোমাকে কেন এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে কি কথা বলিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যগ্র হইতেছে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

মালবিকা অশোকের মুখে চক্ষু তুলিয়া আবার নত

করিলেন, কহিলেন, "মহারাজ, যদি বলি বুঝিতে পারিয়েছি তাহা হইলে স্পর্দ্ধার কথা হয়।"

অশোক অধীর হইয়া মালবিকার হস্ত ধারণ করিলেন। রুদ্ধ বাক্যস্রোত মুক্ত হইল। "তুমি যেমন এই নগর আলোকিত করিয়া আসিয়াছিলে, সেইরূপ আমার হৃদয়ে আইস। আমাকে অশোক বলিয়া সম্ভাষণ কর, তোমার মুখে আমার নাম শুনিয়া শ্রবণ শীতল হউক! এ সাম্রাজ্য তোমার, তুমিই ইহার উপযুক্ত। কিন্তু তোমার সিংহাসন আমার হৃদয়ে, আমার হৃদয়-আসনে তোমার স্থান।"

মালবিকা কহিলেন, "অশোক, যদি সংসারে আমার স্থান থাকিত, সম্পদের কামনা থাকিত, তাহা হইলে আজ আমি আপনাকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতাম। জগতে যাহা-কিছু বাঞ্ছনীয় আছে তুমি সকলই দিতে পার। তোমার যশ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, কিন্তু তোমার দেবতুল্য প্রকৃতি সকলে জানে না। আমি জানি। কিন্তু আমি সংসার-সুখে বঞ্চিত, তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারিব না।"

"এমন কথা কেন বলিতেছ? কি দুঃখে তুমি সংসার ত্যাগ করিবে? মালবিকা, আমাকে ছলনা করিও না, বল আমাকে বিবাহ করিবে।"

অতি কোমল স্বরে—সে স্বরে নিরতিশয় করুণা, অসীম বেদনা—মালবিকা কহিলেন, "আমি ত সামান্য মানবী, দেবী নহি যে ছলনা করিব। ঘটনাচক্র যদি অন্য দিকে ফিরিত, যদি আমার মনের গতি অন্যরূপ হইত, তাহা হইলে আজ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতাম, কিন্তু সংসারে আমার স্পৃহা নাই। দেখিতেছি নশ্বর জীবনে কেবল অনিত্যের বাসনা। রূপ যৌবন, ঐশ্বর্য্য সম্পদ কয় দিন থাকে? কে কাহাকে সুখী করিতে পারে? পিতার রাজ্য গিয়াছে, আমি তাহাতে মঙ্গল মনে করি। কোন দেবতা অলক্ষ্যে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সংসারের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। তুমি কেমন করিয়া আমাকে সংসারে ফিরাইবে? অশোক, মহারাজ, আমি আর রাজকন্যা নই, আমি ভিক্ষুণী।"

মাথা তুলিয়া মালবিকা চন্দ্রের দিকে চাহিলেন। মুখে অপূর্ব্ব অলৌকিক দীপ্তি, চক্ষে প্রশান্ত কোমল দৃষ্টি। ধীরে ধীরে অঙ্গের প্রচ্ছাদন মুক্ত করিলেন। ভুজঙ্গিনী যেরূপ নির্ম্মোক ত্যাগ করে, অঞ্চল ও অঙ্গের আবরণ স্রস্ত হইয়া সেইরূপ দূর্ব্বাদল আস্তরণে পতিত হইল। মালবিকার পদতলে অঙ্গবস্ত্র সংসর্পিণী সর্পিণীর ন্যায় লক্ষিত হইল। অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন। ললাটের হীরক অঞ্চলে পড়িয়া ভুজঙ্গের মস্তকের মণির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

এক মাত্র গৈরিকবসনধারিণী ভিক্ষুণী সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মুখর আঁধার

অন্ধকারে সম্মুখে মোর বইচে কল-জলস্রোত—
ও যেন ওই অন্ধকারের অন্তরেরি ব্যথা
কান্নাতে আজ ফেটে পড়ে' অশ্রুতে হয় ওতপ্রোত
চমকে দিয়ে নিশীথ-নিশার নিদ্রিত স্তব্ধতা।
থেকে থেকে সজল বাতাস শিউরে বয়ে' যায়,
ও যেন তার অশ্রুমাখা দীর্ঘনিশাস হায়!

কোন্ অনাদি কালের থেকে এই আঁধারের মনক্ষোভ
না জানি যে অনাগত কোন্ আলোকের লাগি,
নিত্য নীরব জমে' জমে' গভীর ব্যথার গোপন ভোগ
শ্রাবণে সে কেঁদে কেবল বারেক উঠে জাগি'।
ঘরের দুয়ার দিছি খুলে, নয়নে নাই নিদ্রা-বোধ,—
অন্ধকারে সম্মুখে মোর বইচে কল-জলস্রোত!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সমস্যা

সে খুব বেশীদিনের কথা নয়, হারাদা নৈস্থখ যখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জাপানের সিনাগাওয়া নামক স্থানে বাস করতেন। তিনি সামান্য জোতদারী করতেন, আর অবশ্য খুবই গরীব ছিলেন। সেবার যখন বৎসর প্রায় শেষ হয়ে এল তখন তাঁদের মন ভয়ে ও চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল। কেননা হাতে যে তাঁদের একটিও পয়সা নেই, অথচ দেনা যে মেটাতে হবে অনেক।

যা হোক, অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা এক উপায় ঠিক করলেন। নৈস্থখের স্ত্রীর এক দাদা কান্দা সহরে বাস করতেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার আর তাঁর পয়সাও ছিল যথেষ্ট। নৈস্থখের স্ত্রী তাঁর কাছে তাঁদের বর্ত্তমান অবস্থা জানিয়ে কিছু ধার চেয়ে চিঠি লিখলেন।

দাদাটির মনটি ছিল সাদা এবং অন্তঃকরণটিও ছিল উঁচু। তিনি বোনের চিঠিখানা পড়ে' খুবই দুঃখিত হলেন। ভাবলেন, 'না, বোনটা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে; এদের জন্য দেখছি কিছু না করলেই নয়।' সেদিনই একটা ছোট ঔষুধের বাক্সের ভিতর ১০টি মোহর ভরে' কাগজে ভাল করে' মুড়ে বোনের নামে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাক্তারের লোক নৈস্থখের বাড়ীতে এসে মোড়কটি দিয়ে গেল। নৈস্থখ ও তাঁর স্ত্রী তাকে কতই-না ধন্যবাদ ও কতই-না আপ্যায়িত করলেন। মোড়কটি খুলেই হর্ষে ও বিস্ময়ে তাঁদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। একটি ছোট ডাক্তারী বাক্স, তার উপর ডাক্তারের হাতে বেশ স্পষ্ট করে' লেখা :—

রোগ—দারিদ্র্য।

ঔষধ—স্বর্ণমুদ্রা-বড়ি।

মাত্রা—উপযুক্তরূপ ব্যবহারে রোগের উপশম হইবে।

ঠিক যেন সত্যিকার রোগের ব্যবস্থা!

তাঁরা ডাক্তারের এই অদ্ভুত রোগনির্ণয় ও তার ব্যবস্থা দেখে খুবই এক চোট হাসলেন এবং বাক্স খুলে মোহর দশটি দেখে প্রথম ত তাঁদের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। দশ দশটা মোহর, এ ত কম কথা নয়! এ যে ঐশ্বর্য্য! যা-হোক তাঁরা খুবই আনন্দিত হয়ে উঠলেন; এবং খাঁটি সামুরাইদের (কুলীন) মতনই তখনই ঠিক করলেন যে প্রতিবেশীদেরও এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। নৈস্থখ তখনই তাঁর বন্ধুদের রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করে' পাঠালেন।

সেদিন রাত্রিতে বিষম শীত পড়েছিল, তুষারপাতও অবিশ্রাম হচ্ছিল। তাই বন্ধুদের মধ্যে সাত জন মাত্র উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর বন্ধুরা ত বেশ একটু আশ্চর্য্যই হয়ে গিয়েছিলেন যে নৈস্থখ আবার হঠাৎ এত টাকা পেলেন কোথায় যে তাঁর সমস্ত বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতে পারলেন। যাহোক শীঘ্রই তাঁদের ঔৎসুক্য নিবারিত হল। খাবার প্রস্তুত হলে নৈস্থখ তাঁর বন্ধুদের সকল কথা জানিয়ে তাঁর শালার মজার ব্যবস্থাপত্র ও মোহরগুলি দেখালেন।

সবাই একচোট খুব হেসে নিলেন এবং যে দারিদ্র্য-ব্যাধিতে তাঁরা সকলেই প্রপীড়িত তার এই অমোঘ ঔষধ স্বর্ণমুদ্রা-বড়িগুলিরও যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। সকলের দেখা শেষ হলে নৈস্থখ বল্লেন, "আচ্ছা, তা হলে এখন ঔষধগুলিকে ভরে' রাখা যাক।" মোহরগুলি সংগ্রহ করে' নৈস্থখ চমকে উঠলেন। একি! দশটির জায়গায় মাত্র নয়টি পাওয়া যাচ্ছে যে!

নৈস্থখের কথা শুনে সবাই দাঁড়িয়ে উঠে কাপড় ঝাড়তে লাগলেন যদি তাঁদের কাপড়ে কোথায়ও আটকে থাকে। কিন্তু হারানো মোহরটি কোথায়ও পাওয়া গেল না। সবাই তখন বলাবলি করতে লাগলেন, "এ ত বড় আশ্চর্য্য, মোহরটি যাবে কোথায়?"

নৈস্থখ তখন এমন একটা ভান করলেন যেন হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে' গেছে। কপাল চাপড়ে তিনি বলে' উঠলেন, "পোড়া কপাল! আমার মন যে কি হয়েছে! আরে আমি যে একটা মোহর খরচ করে' ফেলেছি, বাক্সে যে মাত্র ন'টি মোহর ছিল।" এই বলে' তাড়াতাড়ি বাকি নয়টি মোহরকে মুড়ে রেখে দিলেন।

বন্ধুরা কিন্তু নৈস্থখের এই ভদ্রতায় ভুল্‌লেন না; বেশ বুঝ্‌লেন যে তিনি ব্যাপারটা চাপা দিচ্ছেন। তাই তাঁরা সবাই বল্‌লেন, "না নিশ্চয়ই দশটা ছিল।" কিন্তু তা হলে আর-একটা গেল কোথায়! নৈস্থখের ঠিক পাশেই যিনি ছিলেন তিনি তাঁর কাপড় খুলে ফেলে বেশ করে' ঝেড়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। পাশের দ্বিতীয় লোকটি নিঃশব্দে উঠে তাই কর্‌লেন।

কিন্তু এ কি! তৃতীয় লোকটি গম্ভীর হয়ে চুপ করে' বসে' রইলেন; লজ্জায় তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ সে অবস্থায় থেকে তিনি সেখান হতে উঠে এলেন। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে' হাত-দুখানি ঊর্দ্ধে তুলে তিনি ভাঙা গলায় সকলকে সম্বোধন করে' বল্‌তে লাগ্‌লেন; "বন্ধুগণ, জীবনটা বিড়ম্বনাময়। আমার কাপড় তল্লাস করেই বা কি হবে? আমার কাছে একটি মোহর আছে; বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় সেটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। অদৃষ্টের ফেরে আজ তাই আমাকে চোর বন্‌তে হলো। আমার পূর্ব্বজন্মের পাপেরই বোধ হয় এ শাস্তি। যা হোক আমি আর এ জীবন রাখ্‌বো না।" এ কথা বলেই প্রকৃত সামুরাইদের মত তিনি আত্মহত্যা কর্‌তে উদ্যত হলেন।

সবাই তাঁকে বাধা দিয়ে বলে' উঠ্‌লেন—"আহা, আহা, করেন কি! আপনি ত সত্যি কথাই বল্‌ছেন। আপনি কেন মোহর নেবেন? আমরা গরীব সন্দেহ নেই, তা বলে' সঙ্গে নিয়ে না ঘুর্‌লেও অমন এক-আধটা মোহর আমাদের ঘরে সবারই আছে।"

কথাটা যত জোরে তাঁরা বল্‌তে পার্‌লেন, বিশ্বাস কর্‌তে তত জোরে পার্‌লেন না। কেননা মনে মনে তাঁরা বেশ জান্‌তেন যে আধখানা মোহরও তাঁদের সমস্ত ঘর খুঁজে বের করা যাবে না।

তখন সেই লোকটি বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তেকুজো আমাকে যে ছোরাটি তৈয়ারী করে' দিয়েছিল কাল আমি সেটিকে জুজেমনের কাছে এক মোহরে বিক্রী করেছি। যা হোক, সে কথা আর বলে' কি হবে। আমার ইজ্জৎ গেছে। মৃত্যুই এখন আমার শ্রেয়। আমি এখনই আত্মহত্যা কর্‌বো। কিন্তু 'আপনারা আমার একটা কথা রাখ্‌বেন কি? কাল যেন একবার জুজেমনের কাছে আপনারা যান, তবেই আমার কথার সত্যাসত্য টের পাবেন।

কথা শেষ করে' তিনি যখন পেটের ভিতর ছোরা বসাতে যাচ্ছেন তখন চীৎকার করে' হঠাৎ একজন অভ্যাগত বলে' উঠ্‌লেন, "এই যে, এই যে, মোহরটি পাওয়া গেছে। বাতিটার আড়ালে পড়ে' ছিল; এইমাত্র কুড়িয়ে পেলাম।"

সকলেই হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। লোকটিরও আর আত্মহত্যা কর্‌তে হল না। সবাই বল্‌লেন—"ভাল করে' না খোঁজার ফলে কি ফ্যাসাদই ঘট্‌ছিল!" বিপদ কেটে যাবার আনন্দে সবাই সবাইকে একচোট ধন্যবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌লেন। কিন্তু তখনই নৈস্থখের স্ত্রী দৌড়ে এসে চীৎকার করে' বল্‌লেন, "এই যে মোহরটি, বাক্সটির ডালায় আট্‌কে ছিল।"

তাই ত, এ ত বড় অদ্ভুত। অবশ্য নৈস্থখের স্ত্রী যা বল্‌লেন সেটা সত্য ঘটনা। কিন্তু তা হলে যে দশটির জায়গায় এগারটি মোহর হয়ে বস্‌লো! তবে বাতির আড়ালে যেটি পাওয়া গেল সেটি এল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই সেটি অভ্যাগতদের মধ্য হতে কেউ রেখেছিলেন। কিন্তু রাখ্‌লেন কে? সকলেই পরস্পরের মুখ চাইলেন। 'দশটি মোহর এগারটি হল—এ ত বেশ ভাগ্যেরই কথা' এই বলে' সকলে নৈস্থখকে তাঁদের খুব আনন্দ জানিয়ে দিলেন।

নৈস্থখের বাড়ীওয়ালাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি বল্‌লেন, "দশটি মোহরের একটি হারিয়ে নয়টি হয়েছিল, ফের পাওয়া যাওয়াতে দশটি হয়েছে, এটা ত স্বাভাবিক; কিন্তু এগারটি হল কি করে'? আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় সেই বিপদের সময় কেউ একটি দিয়েছেন। যিনি দিয়েছেন তিনি বলুন এবং অনুগ্রহ করে' তাঁরটা ফিরিয়ে নিন।"

বারবার অনুরুদ্ধ হয়েও কেউই মোহরটিকে নিজের বলে' স্বীকার কর্‌তে রাজী হলেন না। অনেকক্ষণ কেটে গেল। সকলেই অস্বস্তি বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু তবুও মোহরের মালিক ঠিক হল না। এই ব্যাপারে

সমস্ত আনন্দোৎসবটা মাটি হয়ে গেল। অবশেষে বাড়ী-ওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখুন, আমি যাকে মালিক সাব্যস্ত করে' দেবো তাকে আপনারা মান্‌বেন?" সকলেই রাজী হলেন।

তখন তিনি বললেন, "বেশ, তা হলে শুনুন। মোহরটি বাক্সে ভরে' বাইরে বাগানের বেড়ার কাছে যে কুয়োটি আছে সেখানে রেখে আস্‌ব। আপনারা সকলে একে একে সেই পথ দিয়ে বাড়ী চলে' যাবেন। প্রত্যেকেই যাবার সময় ঘরের দরজাটি বন্ধ করে' যাবেন এবং বাগানটি পেরিয়ে বেড়ার দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। বেড়ার দরজাটি বন্ধ হওয়ার শব্দ না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্য কেউ আর বের হবেন না। যাবার সময় যার মোহর তিনি নিয়ে যাবেন।"

বাক্সে ভরে' মোহরটি কুয়োর কাছে রেখে আসা হল। একে একে সবাই চলে' গেলেন। সবাই চলে' গেলে নৈয়থ ও তাঁর পত্নী বাক্সটি গিয়ে দেখ্‌লেন, মোহরটি তার ভিতরে আর নেই।

আচ্ছা, নিল কে? কেউই তা জানেন না; কিন্তু এটা নিশ্চয়ই—যে দিয়েছিল সেই নিয়েছে; কারণ তাঁরা যে সবাই সামুরাই। গরীব হলেও আত্মসম্মান-জ্ঞান তাঁদের যথেষ্টই ছিল এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাঁরা ভাল করেই বুঝ্‌তেন।*

শ্রী সতীশচন্দ্র সেন

* জাপানের সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক ইয়ারা সইকাকুর একটি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা

মানুষের মনে যে সৃজনী শক্তির বেগ আছে তার প্রকাশচেষ্টাতেই শিল্পকলার জন্ম। সৃষ্টি বল্‌তে আমরা দুটো কথা বুঝি, স্রষ্টা, যে সৃষ্টি করবে, এবং সেই জিনিষ, যা সৃষ্ট হবে। শিল্পীর উপাদান হচ্ছে জীবন,—প্রাণের প্রাচুর্য্যকে, তার অন্তহীন বৈচিত্র্যকে রূপের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করে' তোলা, শিল্প-রচনার মধ্যে আকার দান করাই হচ্ছে তাঁর সমস্ত সাধনার লক্ষ্য। শিল্পরচনামাত্রই সৃষ্টি, এবং সেইজন্যে তার মধ্যে একটা প্রাণধর্ম্ম আছে যাকে অবলম্বন করে' সে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং নিজের অস্তিত্বের অধিকার ও সত্যতা প্রমাণিত করে;—তার সার্থকতার মূল কারণ তার নিজেরই মধ্যে নিহিত, বাহিরে বা অন্য কোথাও নয়। প্রত্যেক শিল্পরচনাতেই রেখা, সমতল ক্ষেত্র, আয়তন ও বর্ণ পরস্পরের সঙ্গে একটা গভীর সামঞ্জস্য, একটা নিবিড় সম্বন্ধের গূঢ় যোগসূত্রে বিধৃত হয়ে বিরাজ করে, একটা বিশিষ্ট অভিপ্রায়সূচক আকৃতির মধ্যে তারা একটা ভাবের ঐক্যে মিলিত হয়ে তাৎপর্য্য পায় এবং অনন্তের চিরন্তন সঙ্গীতকে ধ্বনিত করে' তোলে।

দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনের এক-একটা অংশ সমাদৃত হয়ে থাকে, জীবনের এক-একটা রূপ নূতন করে' যেন চোখে পড়ে' যায়, এবং সেইজন্যে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বংশানুক্রমেই শিল্পীর মনেরও দিক্‌-পরিবর্ত্তন না হয়ে পারে না, শিল্পসৃষ্টির প্রবাহ ক্রমাগত নব নব ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে তবেই যেন আপনার প্রকৃত সত্তাকে অনুভব করে। এই কারণে পৃথিবীতে অধ্যাত্ম জগতের আর অন্ত নেই, চার দিক থেকেই আমরা এই-সব অদৃশ্য ভুবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত; কোন্ শুভমুহূর্ত্তে অকস্মাৎ কোন্ শিল্পীর বলে তাদের রহস্যের ঘন-আবরণ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তাদের অন্তরের গোপন কথাটি আবার এক নূতন প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সজীব সত্য হয়ে উঠ্‌বে—সেই আশা-পথ চেয়ে যেন তারা নীরব ধৈর্য্যে চির-অপেক্ষায়মান হয়ে থাকে।

আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে হলে প্রথমেই রূপক এবং সাঙ্কেতিকতা জাতীয় সব কথা ভোলা চাই, কারণ শিল্পরচনা মাত্রই স্বপ্রকাশ, মূল সত্যের সঙ্গে তাদের একেবারে সোজাসুজি কারবার, এবং সত্যকে অখণ্ডভাবে

ত্রিমূর্ত্তি—হস্তীগুম্ফা
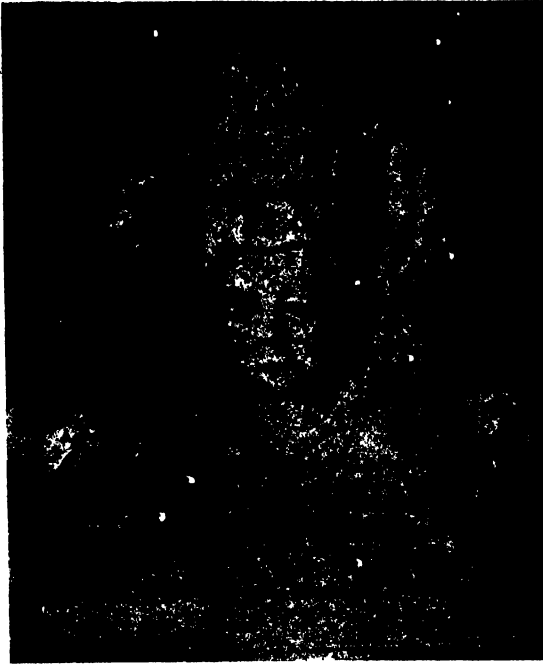
ফুটয়ে তুল্‌ছে বলে' তার সমগ্ররূপের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, বাহিরের যুক্তি বা চিন্তা, ব্যাখ্যা বা বিবৃতির কিছুমাত্র দর্‌কার করে না। এলিফাণ্টার গুহা-মন্দিরের দেয়ালের মধ্য থেকে "ত্রিমূর্ত্তির" বিরাট প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি তার সমস্ত বিশালতা এবং অপূর্ব্ব রেখাবিন্যাস নিয়ে যেন চতুষ্কোণ অন্ধকারের পুঞ্জে স্তম্ভিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। নিখুঁৎ সৌসামঞ্জস্য এবং ক্ষোদিত আকৃতির ক্রমবিকাশমান রূপপর্য্যায়ের একটা তরঙ্গ এক মাথার পার্শ্বদেশ থেকে ধীরে ধীরে উত্থিত হয়ে, মধ্যস্থিত মাথার সম্মুখ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, তৃতীয় মাথাটির ধারে ধারে অল্পে অল্পে নিম্নদিকে হ্রাস হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে যেন সমস্ত ত্রিমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করে' রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহগুলি পাথরের ভিতর তলিয়ে গিয়ে আপন আপন স্বতন্ত্র সত্তা এবং বিশেষত্ব হারিয়ে ফেল্‌ল, যা থেকে গেল তা হচ্ছে একটা বিরাট প্রস্তরের স্তম্ভ, এবং সমস্তটাকে ব্যাপ্ত করে' একটা অদৃশ্য অপূর্ব্ব দেবত্বের ভাব। অতি কোমল কুঞ্চিত রেখা যেন কপোল ও ভ্রূযুগলের উপর দিয়ে লীলা কর্‌তে কর্‌তে চলে' গেছে। এই ছন্দোময় সমান্তরালগামী গতি মাথার উপরকার ত্রিকোণাকৃতি কিরীট-সদৃশ আচ্ছাদনাদির উঁচু নীচু নির্ম্মাণ-প্রণালীর আরেকটা বিরুদ্ধগতির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে একটা স্থিরতা, একটা সমতা, একটা অতি মনোরম এবং নয়নাভিরাম সুষমা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন এই যে শারীরিক আকৃতির নানা অংশের অতি সূক্ষ্ম সুনিপুণ সমাবেশ ও রচনা-প্রণালী, উঁচু নীচু ও পাশাপাশি রেখার বিরুদ্ধগতিকে সংযত এবং সংহত করে' এই যে একটা অটল অপরিবর্ত্তনীয় ভারসাম্যে নিবদ্ধীকরণ—এ-সমস্তের ভিতর দিয়ে শিল্পীর সেই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে—সেই কল্পনাই
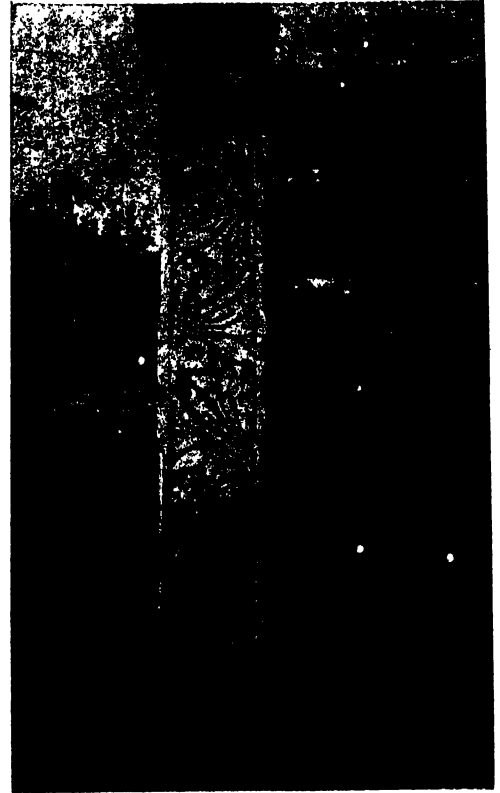
সাঁচি স্তূপের রেলিঙের গায়ে পদ্মলতা

মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যেখানে তিনি ভগবানের পরম অদ্বৈত ধ্রুব স্বরূপকে ত্রয়ীরূপে দেখেছেন। এবং শিল্পীর এই মনোভাবটি বুঝ্‌তে হলে সরল মন ও যথার্থ অনুভাবিকতার সঙ্গে ঐ বিশেষ শিল্পরচনাটির দিকে তাকালেই যথেষ্ট, কেননা তার অন্তরের বাণী আপনা হতেই ধ্বনিত

হয়ে উঠ্‌ছে, বাহিরের কোনো টীকা বা অন্বয়ের জন্যে কোথাও লেশমাত্র অপেক্ষা রাখেনি।

এ হল ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির একটি ধারা; এ ছাড়াও আর-একটি প্রণালী আছে যেখানে মানসমূর্ত্তিকে রূপ দেওয়া নয়, বাহ্য প্রকৃতিকে ভাবে অনুপ্রাণিত করে' দেখানোই হচ্ছে শিল্পীর উদ্দেশ্য। আর, ভেবে দেখ্‌তে গেলে আধ্যাত্মিক জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে একটা সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে তাও ত নয়। "অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ", যা অরূপ এবং নিরাকার তারও পরিচয় ত আমরা বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে রূপের মধ্য দিয়েই পাই; এই প্রকৃতি এই বাস্তবজগৎ সেও ত এক অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় প্রাণশক্তিরই অভিব্যঞ্জনায় স্পন্দমান। সুতরাং শিল্পীর পক্ষে দু-ই সমান সত্য, এবং তাঁর রচনার জন্যে দুয়েরই সমান দরকার। তিনি আমাদের এই মাটির কাছ থেকেই ফুল ধার করে' তবে ত তাকে পাথরের গায়ে গায়ে কোমল কম্পিত মৃণাল-বৃন্তটির উপর অপূর্ব্ব লাবণ্য-লহরে লীলায়িত করে' তুল্‌তে পার্‌লেন। ফুল, পাতা, জল, পাখী সেখানে এক বিশুদ্ধ সুরের অমরাবতীতে স্থান পেল,—সেই দ্বন্দ্ববিরোধ-বৈষম্যবর্জ্জিত ছন্দোময় জগতে যেখানে প্রতি পুষ্প-কোরক, প্রতি কোমল পত্রপল্লব এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের রূপরশ্মিপাতে সমুদ্ভাসিত, যেখানে কোনো কিছুই ব্যর্থ বা অপ্রাসঙ্গিক নয়, কল্পনা এবং বাস্তবিকতা যেখানে অপরূপ মিলনের মাধুর্য্যে বিলীন হল। এই যে রূপসৃষ্টি এ ত কেবল আলঙ্কারিক নয়, এ ত কেবল সাজসজ্জা শিল্পচাতুর্য্য-সংক্রান্ত নয়, এ যে "সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে" বিকশিত একটি করুণ কমলের মুগ্ধ জয়গান। প্রকৃতির শুধু অবিকল নকল করে' যাওয়া, বা কেবল তার ভাবকে রূপ দেওয়া, এর কোনটাই ভারতীয় শিল্পীর ঠিক আদর্শ নয়; প্রকৃতির নিবিড়-নিহিত গতিবেগ, তার গোপন প্রাণ-স্পন্দনকে তিনি উপলব্ধি করে' নেন এবং তারই তালে তালে নিজের মনোধর্ম্ম এবং স্বভাবগত সৃষ্টিপ্রণালী অনুসারে তিনি একটা স্বতন্ত্র ভাবোজ্জ্বল রূপরচনা কর্‌তে বসেন। আমরা যে বিশেষ শিল্পরচনাটির কথা বল্‌ছিলাম সেখানে প্রস্তর-ক্ষোদিত ঐ কম্পিত পদ্মবৃন্তগুলি তাদের উপরকার পূর্ণকুসুমিত সুডৌল পদ্মফুল এবং সূক্ষ্মাগ্র কমল-কলিকার মাধুর্য্যসম্ভার নিয়ে অতি মধুর সুষমার সহিত প্রকৃতির একটা ভারী অপূর্ব্ব ছন্দকে দুলিয়ে তুলেছে।

ভারতীয় শিল্পকলায় প্রত্যেক জিনিষকেই এমনি একটা অনুভূতির প্রাবল্য, একটা নিবিড়তা এবং একাগ্রতার সঙ্গে ধরে' দেখানো হয়, কারণ যদিও চেতনাশক্তির সূক্ষ্মতাহেতু অল্পেতেই শিল্পীর মন সাড়া দেয়, তৎসত্ত্বেও কল্পনাবিকাশের জন্যে তাঁকে কোনো বিশিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ থাকৃতে হয় না, কোনো বাহ্যিক বস্তুসামগ্রীর উপর একান্তভাবে তাঁর অবলম্বন না কর্‌লে চলে। তাই তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন রচনার বিষয় এবং তার জন্যে নূতন নূতন নিয়ম এবং প্রয়োগপ্রণালী উদ্ভব করে' যান। বস্তুত ভারতের মত এমন স্বাধীনতাপ্রিয় এবং স্বাতন্ত্র্যচারী শিল্পপ্রতিভা জগতে আর দ্বিতীয় নেই। নিজের বিশেষত্ব এবং স্বগঠিত নিয়মপ্রণালীকে এখানে এতদূর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যে শেষে আপনার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকেও সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করে' তোলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্যে শেষে এমন সব প্রকাশপদ্ধতি এমন সব নিরীক্ষণ-প্রণালীগত নিয়মের সৃষ্টি কর্‌তে হয় যা সমগ্র শিল্পরচনার প্রতি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, অথচ ছবির প্রত্যেক অংশের উপর খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে আপন অধিকার বিস্তার করে। এর একটা ভাল দৃষ্টান্ত এলোরায় যে একটা পাথরে-কাটা মন্দির আছে সেইটে। এই শিল্পরচনায় অতি সূক্ষ্ম সুনিপুণ কারুকার্য্য এবং অপর্য্যাপ্ত জটিল রেখার বৈচিত্র্য যেন সৃষ্টির অজস্রস্রোতে উৎসারিত হয়ে সকল বাধাবিঘ্ন একেবারে আচ্ছন্ন করে' সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে' দিয়েছে। এখানে দেখ্‌তে পাই শিল্পজনিত সংযমের বদলে অফুরন্ত শক্তির আতিশয্য, সীমা ও পরিমাণের স্থানে পূর্ণতা ও সমগ্রতা, এবং রচনাবিন্যাসের পরিবর্ত্তে সৃষ্টির একটা বিপুল উদ্যম ও দ্বিধাবিহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

এই প্রকার শিল্পসৃষ্টি রূপপ্রকাশের যা সবচেয়ে সহজ বাহুল্যবর্জ্জিত উপায়—রেখা—তার মধ্যেই নিজেকে

কৈলাশ-মন্দির—এলোরা

সংযত এবং ঘনীভূত করে' তোলে, অন্ততঃ এইদিকেই তার বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে, বলে' ত মনে হয়। অজন্তা-গুহার গায়ে গায়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা ঘরবাড়ীর নক্সা, মানুষ দেবদেবী অথবা প্রাণীজগতের যে-সব নানা বর্ণ ও রূপের ঘনসমাবেশপূর্ণ বিচিত্র চিত্র-রচনা আছে তাতেও এই রেখা জিনিষটাই হয়েছে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন,—ছবির গূঢ় অভিব্যঞ্জনা ও যথার্থ তাৎপর্য্য তারি মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেও ভারতীয় শিল্প-কলার মূলনীতি এবং আদর্শ সম্বন্ধে হয়ত কিছু কিছু বোঝা যাবে। এইসব মূলনীতি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োগপ্রণালী ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ঠিক্ তেম্‌নিই অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধকে চিত্র বা ভাস্কর্য্যের সমতল ক্ষেত্রে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পরিণত করা মিশরদেশীয় শিল্পের পক্ষে যেমন প্রয়োজন হয়েছিল; এবং ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সময়-কার ত্রিকোণ-পদ্ধতি, কিম্বা বারোক্ (Baroque) চিত্রগুলির কোণাকুণি বা তির্য্যক্‌গামী রচনাবিন্যাস-প্রণালীকে যেমন ভাবে মেনে নেওয়া হয় এদেরও ঠিক্ তেম্‌নি ভাবেই মেনে নিতে হবে। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখ্‌তে হবে যে ভারতীয় শিল্পের একটা অত্যন্ত বিস্ময়োদ্দীপক বিশেষত্ব এই যে একে কিছুতেই কোনো একটা বিশেষ শিল্পপ্রণালী বা কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিণত করা যায় না, এর অসীম প্রাণশক্তি নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী গতিকে বা ধারাকে শোষণ করে' নিয়েছে এবং সব ছাড়িয়েও আপন প্রকৃতিকে পূর্ণ প্রকাশিত কর্‌তে পেরেছে।

অবিচ্ছিন্ন ভাবকে, কল্পমূর্ত্তিকে রূপের মধ্য দিয়ে আকারের মধ্য দিয়ে পাবার জন্যই ভারতীয় শিল্পে পরিমাণ, আয়তন ও রেখা ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, কিম্বা তার বহু পরে হিন্দুশিল্পী

সাচি স্তূপের কারুকার্য্য—লতানো নারীমূর্ত্তি

যে "ত্রিমূর্ত্তি" রচনা করেন এ দুয়েতেই এই কথা প্রমাণ কর্‌ছে। এ ছাড়া এই প্রকার নির্ম্মাণপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির আর একটা গতি প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পরচনায় দেখা যায়,—সেটা হচ্ছে একটা কম্পমান অসমরেখার তরঙ্গলীলা—প্রায় কোনো মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি বা অঙ্গসমাবেশে এই জিনিষটা আসেনি এমন দেখা যায় না। শিল্পী যেখানেই কোনোপ্রকার প্রাণরূপ, কোনোপ্রকার সজীবতা দেখাতে চেয়েছেন—সে মানুষ, তরুলতা বা কর্ম্মজীবন সম্বন্ধীয় কোনো ঘটনা—যারই বিষয় হোক,—এই লীলায়িত রেখাই এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছে। এইজন্যে পদ্মের কম্পিত মৃণাল ভারতীয় শিল্পকলায় একটা বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে, এবং তার একটা প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে।—এই উপায়ে জ্যামিতিগত রচনাবিন্যাস অবিচ্ছিন্ন ভাবরূপকে এবং অসম রেখা প্রাণের গতিকে প্রকাশ করেছে। আর এই দুয়ে মিলে শিল্পীর কাছে কত যে অজস্র রচনার বিষয় এবং রূপের উপলব্ধি এনে দিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ ছাড়াও আরো একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে, এবং সেই তৃতীয় কথাটি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক দেশের শিল্পকলারই একটা সমগ্ররূপ আছে, সব মিলে তার একটা এমন রচনা-প্রণালীর ভঙ্গী, এমন একটা প্রয়োগবিদ্যাগত স্বাতন্ত্র্য আছে যা বিশেষ করে' তার নিজেরই সম্পদ্‌,—এবং এই স্বতন্ত্র রূপ হচ্ছে স্বপ্রকাশ,—অর্থাৎ আপনা হতেই সে নিজের এমন একটা জাতীয়তা ও বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করে' নিজেকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া যার অন্য
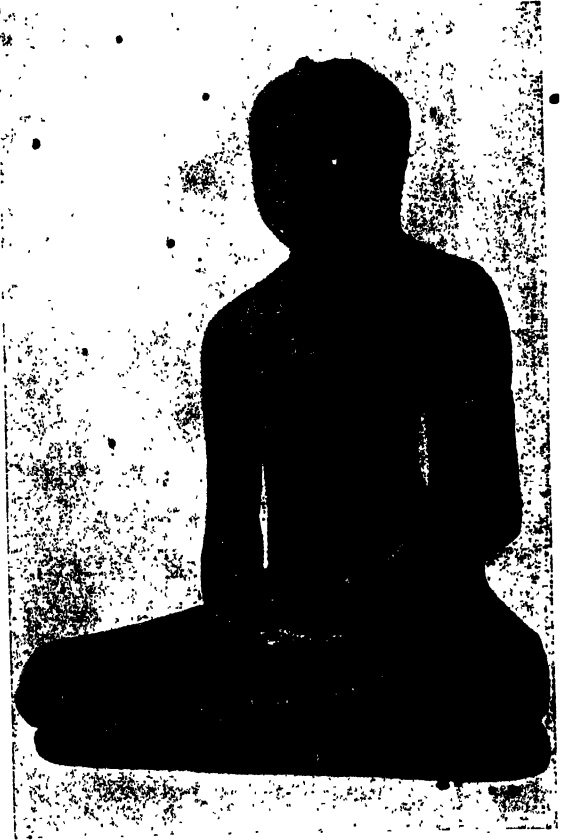
ধ্যানী বুদ্ধ, সিংহল

কোনো উদ্দেশ্য নেই। ভারতীয় শিল্পকলায় দেখি আকার-সৃষ্টির অজস্রত্ব শিল্পীর শক্তি-বেগকে এবং রেখা জিনিষটা তাঁর হৃদয়-বেগকে ফুটিয়ে তুলেছে,—মন দিয়ে দেখ্‌লে বোধ হয় ভারতীয় শিল্পের এই বিশেষত্বটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

কিন্তু এ-সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে—সাধারণ সিদ্ধান্ত, এবং সেইজন্যে এইসব বাহিরের কথার তেমন যে

নটরাজ শিব

মূল্য আছে তা নয়, যদিও আর্ট সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে এ ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ আর্ট জিনিষটা হচ্ছে একটা জীবন্ত জিনিষ, এবং সজীব পদার্থমাত্রেই এমন একটা জটিলতা এবং রহস্যময়তা আছে যে কথায় তাকে ধরে' দেখানো একেবারেই সম্ভবপর নয়। আর এ-কথাও ভুললে চল্‌বে না যে ভারতীয় শিল্পে

সাঁচি স্তূপ

তুলে শেষে ঐ পদ্মাসনযুক্ত পদদ্বয়ে যেন এক পরমাশ্রয় পেল। বুদ্ধদেবের ঐ উদ্গত-ভাবপূর্ণ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটির অন্তরের ঐক্য, জীবন্ত দেহের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য, কিম্বা অংশ-সমাবেশে সমসঙ্গতির উপর নির্ভর করে নি, সমস্ত মূর্ত্তিকে ব্যাপ্ত করে' এবং প্রতি অঙ্গকে গূঢ় যোগ-সূত্রে মিলিত করে' যে অন্তঃ-শীলা ছন্দগতি নিবিড়-প্রবাহিত
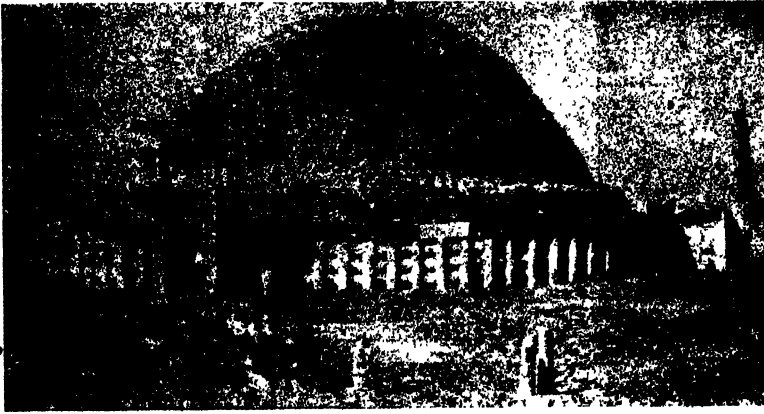
যেমন আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে তেম্‌নি সে একটা প্রাণপূর্ণ পদার্থও বটে, বিশ্বপ্রকৃতির ধমনীস্পন্দনে তার প্রতিমূর্ত্তি এবং রেখা কম্পমান।

ভারতীয় শিল্পী জীবনের এই গভীর হৃদ্‌স্পন্দনকে অনুভব করেছেন, তার গতিবেগ তাঁর সমস্ত মনকে আন্দোলিত করে' তুলেছে। ভারতীয় চিত্রকলায় বহু কাল থেকেই নারীদেহ ও তরুলতার মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো এবং উভয়কে একজায়গায় উপস্থিত করার যে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে তাতেও এই কথা বলে, কারণ ঐসব ছবিতে শুধু যে রমণীদেহের রমণীয়তা ও সৌকুমার্য্য ফুটে উঠেছে তা নয়, একটা সকৌতুক স্নেহময় লাবণ্যলীলা এবং গতিতরঙ্গ যেন রমণীর দেহ এবং তার বক্র বাহুদুটি, গাছের শাখা-প্রশাখা এবং তার কোমল পত্রপল্লবগুলি সমস্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দৃশ্যকেই যেন একটা অনির্ব্বচনীয় সুষমায় স্বর্গীয় করে' তুলেছে।

বুদ্ধদেবের যে সৌম্য শান্ত ধ্যান-মৌন মূর্ত্তি, তার চারদিকে একটা বিপুল নীরবতা এবং একটা অচল অটল তপশ্চর্য্যার ভাব আছে সত্য, কিন্তু দেহের ঐ অনুবিচ্ছিন্ন স্থিরতার ভিতর দিয়েও একটা প্রাণের ছন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। আনত নয়নপল্লব এবং মসৃণ বাহু দুটি থেকে একটা জীবনের কম্প নিম্নপ্রবাহিত হয়ে ভাবমগ্ন করযুগলে এসে শান্তি লাভ করেছে, সমস্ত দেহের উপর দিয়ে একটা প্রাণের তরঙ্গ তুলে হয়ে গিয়েছে তারই ফলে সেটা ফুটে উঠতে পেরেছে।

শিবের তাণ্ডবনৃত্যের নানা নিদর্শন এবং তাকে অবলম্বন করে' যে-সব বিচিত্র শিল্পসৃষ্টি দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাতে সমুখ বা পিছন, বাম বা দক্ষিণ, সবই যে কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই, এমন কি, নৃত্যের কোনো অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়নি, কারণ একটা গতির উন্মত্ততা, নৃত্যের নেশাতেই যেন সমস্তটা মেতেছে, প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এবং সময় ও সীমার বেধকে অতিক্রম করে' চলার উদ্দাম গতি-বেগের অব্যক্ত আন্দোলনে যেন দণ্ড-পল-মুহূর্ত্ত-বিবর্জ্জিত দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য একটা ভাবলোকের স্বতন্ত্র দেশ ও কাল সৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এই নৃত্যোন্মত্ত প্রচণ্ড গতিস্রোতকে গোচর করে' দেখাবার জন্যে বাধ্য হয়ে এমন একটি দেহের সৃষ্টি করতে হল যাতে বাহুর বহুত্বই অলৌকিক শক্তিবেগকে রূপতরঙ্গে ব্যক্ত করে' তুল্‌তে পারে। এই চলচঞ্চল আবেগবিকম্পিত রূপচ্ছবির মধ্যে জ্ঞেয় অজ্ঞেয় সকল প্রকার বেগের বিকাশ আছে বলে' এর মধ্যে এক অপূর্ব্ব গতিসাম্য ঘটেছে, এবং বুদ্ধদেবের ধ্যানস্তব্ধ মূর্ত্তিতেও যেমন একটা নিবিড় জীবনের প্রবাহ দেখ্‌তে পাই এখানে আবার তেম্‌নি সমস্ত বিরুদ্ধ গতিকে পরম সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করে' সমস্তটার একটা বিরাট শান্ত রূপ চোখে পড়ে।

ভারতের শিল্পী জীবনের অন্তরতম গোপনগামী গতিকে উপলব্ধি করেছেন। স্মৃতিস্তম্ভ বা মনুমেণ্ট মাত্রেরই

সাঁচি স্তূপের তোরণ

চতুর্ভুজ মন্দির—খাজুরাহো

একটা বিশালতা, একটা বিস্তৃত স্থিরতার ভাব থাকা চাই; কিন্তু তিনি যখন "স্তূপ" রচনা কর্‌লেন তখন তাকে এমন একটা রূপ এমন একটা আকার দিলেন যাতে স্থিরতা আছে বটে কিন্তু সে স্থিরতাকে জড়ত্বের নির্জ্জীবতা বল্‌লে ভুল হবে, গতির তরঙ্গ যেন সেখানে স্তম্ভিত হয়ে জমাট্ বেঁধে গিয়েছে। ভারতবর্ষীয় মনুমেন্ট্—স্তূপ—আকৃতিতে অর্দ্ধবৃত্তাকার, যেন ভূমণ্ডলের আধখানা টুক্‌রো নিশ্চল হয়ে পড়ে' আছে। মিশরের পিরামিড্ মিশরের পক্ষে যেমন মূল্যবান, এই স্তূপ জিনিষটা ভারতবর্ষের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম নয়, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! পিরামিডের চারটে ধারই সমান, তার প্রতি রেখা দৃঢ় এবং সুনির্দ্দিষ্ট, এবং সমস্তটা মিলে সে যেন খাড়া উপরের দিকে উঠে গিয়েছে, কিন্তু স্তূপের মধ্যে আগাগোড়া একটা গতির লীলা উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সে গতি যেন আপনার বেগে আপনহারা হয়ে কেবল প্রবাহের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করেছে এবং নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে নিজেরই উপর এসে পড়েছে,—এখানে না আছে সরল রেখা, না আছে সুনির্দ্দিষ্ট দিক্‌নির্ণয়ের কোনো চেষ্টা।

তাহলেই দেখ্‌তে পাই একটা গতি, একটা চলন্ত জীবন্ত ভাবই হচ্ছে ভারতীয় শিল্পরচনার প্রধান বিশেষত্ব; একেই অবলম্বন করে' তার সৌধশিল্প বা চিত্রকলা, তার জড়প্রকৃতি বা জীবজগতের নানা রূপচ্ছবি সব ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখের ভাবে, তার অঙ্গের আকৃতিতে সকলখানেই এই প্রাণের নিবিড় সঞ্চার অনুভব করা যায়, যেন গোপন অন্তরের "বেগের আবেগ" "আকারের অসহ্য পিয়াসে" রূপের ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আত্মার শুভ্র রশ্মিরাগে দেহ এবং মুখাবয়বকে যেন উজ্জ্বল করে' তুলেছে। নাক মুখ বা চোখে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ না করে' ভারতীয় শিল্পী তাঁরও

ভিতর দিয়ে জীবনের বিরাট ছন্দকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

এই বিরাট ছন্দের তালে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই ত নিয়ত স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌ছে, তাই আর্টিষ্টের কাছে কোনো জিনিষই সামান্য বা তুচ্ছ নয়, কিন্তু শিল্পরচনার সময় তিনি কোনো একটা বিশেষ জিনিষকেই বড় করে' দেখেন, জগৎ যেন তখনকার মত ঐ একটা রূপের মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই তাঁর কাছে মূল্যবান এবং অর্থসূচক বলে' তাঁর শিল্পরচনাতেও তিনি কোনো জিনিষকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না, পটভূমির কোনো জায়গাতেই শূন্যতা রেখে বা কোনো সামান্য রেখাতেও প্রাণসঞ্চার না করে' তিনি সন্তুষ্ট হন না। এইজন্যে এই শিল্পে এমন একটা ছবি বা প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি নেই যা আগাগোড়া বিবিধ আকারসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ নয়, সাঁচির যে অত বড় বিশাল তোরণদ্বার তারও সমস্তটা কাঠামো খোদাই-করা বড় বড় প্রস্তর-ফলকের দ্বারা আবৃত, আর এই-সব ফলকও আবার প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্তখানি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্যে খচিত এবং চিহ্নচিত্রিত। শিল্পী যেন শূন্যতার বিভীষিকায় ভীত হয়ে কোনো একটা জায়গায় এসে থেমে যেতে সাহস পান নি, আর এই-জন্যে তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন আকারসৃষ্টি করে' বিশাল পাথরটার প্রতি কোণ প্রতি রন্ধ্র ভরে' তুলেছেন, এবং অত বড় যে তোরণ তারও উপরিভাগ যথাসম্ভব মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি দিয়ে সজ্জিত করে' ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরের বেলাতেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় ঠিক্ এই ঘটেছে, তাদের দেয়াল বা বহির্দেশকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি এবং রেখাচিত্রে আচ্ছন্ন না করে' ছাড়া হয়নি। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যের মধ্যে যা ব্যবধান ছিল সে যেন অপসারিত হয়ে গেল, কোন্‌খানে এসে যে কার আরম্ভ এবং কার শেষ তাও বোঝা শক্ত। শিল্পী যেন বড় বড় বাড়ীর কঠিন আড়ষ্ট জড়ত্বের ভাবে কিছুতেই তৃপ্ত হতে না পেরে সৌধশিল্প এবং শিলাশিল্পের (ভাস্কর্য্য) একটা সম্মিলন কর্‌বার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষণ তাঁর হাতে একটুকুও নির্ম্মাণসামগ্রী অবশিষ্ট থেকেছে তিনি ক্রমাগত কেবল এক রূপের মধ্য থেকে অন্য রূপের উৎপত্তি করেছেন, এবং এইভাবে জড়জিনিষের মধ্যেও একটা জীবন্ত ভাব, একটা ছন্দোময় প্রাণের চাঞ্চল্য এসে গিয়েছে, কোঠাবাড়ীর কাঠিন্য শিল্পের সৌন্দর্য্যে কমনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। শিবের তাণ্ডব নৃত্যের প্রস্তরমূর্ত্তিতে যেমন, এখানেও তেম্‌নি—শিল্পের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সমুখ বা পিছন বলে' যেন কোনো জিনিষের অস্তিত্বই নেই, আছে কেবল একটা বাধাহীন গতির বিকাশ, একটা ঘূর্ণমান বেগের প্রবাহ।

ভারতীয় শিল্পের সম্ভবপরতা অসীম। মানুষ এবং প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক জগৎ বা স্থূল জগৎ, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য —সকলের মধ্যে যে গূঢ় সম্বন্ধসূত্র, গভীর অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে এই দেশের শিল্পী ছন্দোময় শিল্পরচনার মধ্য দিয়ে প্রাণপূর্ণ রেখাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সেইটিকেই ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন, এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাভাবিক প্রাচুর্য্যের ভাব অথবা গণিতগত জটিলতার অভাব আছে কি না-আছে সেটা ভাব্‌বার বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে এই যে সহজেই তার মধ্যে একটা সত্য উপলব্ধির আন্তরিকতা, একটা ভাবের স্বচ্ছতা, এবং একটা যথার্থ গভীরতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।*

ষ্টেলা ক্রাম্‌রিশ

* শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা ইংরেজী হইতে অনুদিত।

রমলা

(১৬)

কলেজে লেক্‌চার দিবার সময় তুলসী-বাবুর অমনোযোগিতা দেখিয়া ছাত্রেরা সেদিন সত্যই অবাক হইয়া গেল। সেদিন শেষের দুই ঘণ্টা ছুটি দিয়া তিনি সকাল সকাল বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিলেন, হাসি, জলঝরা ও ঝাঁটার শব্দে সমস্ত বাড়ী মুখরিত, সিমেণ্টের মেজে যেন এস্রাজের মত বাজিতেছে, গোপাল চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিয়া দিতেছে, রজত ঢালিতেছে আর রমলা ঝাঁটা ঘসিতেছে। সিঁড়ি ধোয়া শেষ করিয়া তাহারা উঠান লইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় সম্মুখের বারান্দায় তুলসী-বাবুকে আসিতে দেখিয়া রজত ও গোপাল প্রমাদ গণিল। বীজাণু ঘাঁটিয়া তুলসীবাবুর যেমন বীজাণু-বিভীষিকা ছিল, সব ধূলাতেই তিনি যক্ষ্মা বা কলেরা বা কোন ভয়ানক রোগের বীজাণু দেখিতে পাইতেন, তেমনি বীজাণুদের সঙ্গে বহুদিন বাস করিয়া তাহার শত্রুদের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। বেশী রোদে থাকা, বেশী হাওয়া খাওয়া, বেশী জল ঘাঁটা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না, তাঁর ঘরের দরজা-জান্‌লাগুলি যেমন প্রায়ই বন্ধ থাকিত তেমনি নিজের দেহকেও সর্ব্বদা গলাবন্ধ র‍্যাপার মোজা ইত্যাদি দিয়া মুড়িয়া তিনি আপনাকে হাওয়া বা ঠাণ্ডা হইতে সর্ব্বদা বাঁচাইয়া চলিতেন।

হাতের মোটা একখানি বই নাড়িয়া রজতের দিকে চাহিয়া মামাবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—হতভাগারা, কি হচ্ছে?

রমলা নর্দ্দমার মুখের আবর্জ্জনা ঝাঁটা দিয়া সরাইতে সরাইতে তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিল,—মামাবাবু, সিঁড়িটা এখনও শুকোয়নি, জুতো পায়ে দিয়ে যাবেন না।

রমলার দিকে চাহিয়া মামাবাবুর আর কিছু বলা হইল না। তাহার খোলাচুল মাথার ওপর ঝুঁটির মত বাঁধা, আঁচলটা কোমরে জড়ানো, সাদা শাড়ী ধূলায়, জলের ছিটায় গেরুয়া রংএর ব্লাউসের সঙ্গে এক রংএর হইয়া গিয়াছে, লাল পাড়টা জলের উপর লুটাইতেছে, হাসিভরা চোখে প্রবলবেগে ঝাঁটা নাড়িতে নাড়িতে সে চারিদিকে এরূপভাবে জল ছিটাইতেছিল যে তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আজ সমস্ত দিন কি অপরিমিত ধূলা ও সুপ্রচুর জল মহানন্দের সহিত ঘাঁটা হইয়াছে তাহার দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। তাহার কাজের কোন প্রতিবাদ করিবার বা বাধা দিবার মত শক্তি তাঁহার রহিল না।

—সবই ত পরিষ্কার হয়ে গেছে মা, তুমি এবার উঠে এস, ওই জঞ্জাল ওই বাঁদরটাকে সরাতে দাও,—বলিয়া সত্যিসত্যিই জুতা খুলিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে উপরের ঘর হইতে মামাবাবুর ফ্লানেল জড়ানো গলার শব্দ পাওয়া গেল,—ওরে গোপাল, খানিকটা গরম জল করে' নিয়ে আস্‌বি। এ জল তাঁহার খাবার জন্য নয়, তাঁর পা গরম করিবার জন্য।

পরদিন সকালে তুলসী-বাবু কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন, দেখিলেন একখানি গরুর-গাড়ী বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল,-খাট, বিছানা, আল্‌মারী, ড্রেসিং টেবিল, রকিং চেয়ার ইত্যাদি বোঝাই করা। এগুলি রমলার দাদা তার বিবাহের যৌতুকরূপে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মামাবাবুর আর কলেজ যাওয়া হইল না। তিনি বুঝিলেন, এইগুলি লইয়া তাঁহার ভাগ্নে ও ভাগ্নেবৌ কালকের মতনই ধূলা ঘাঁটিবে, আর রজত তাহার ছোট ঘরেই এইগুলি কোনমতে ঢুকাইয়া লইবে। তিনি তাঁহার দোতলার বড় ঘরটা রজতকে দিয়া নীচে নামিয়া আসিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গলির মোড় হইতে বারোজন কুলী ডাকিয়া আবার বাড়ী ফিরিলেন। বিনা অসুখে এই তাঁহার প্রথম কলেজ কামাই হইল।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বাড়ীটির অনেকগুলি সুবিধা ছিল। তাহার সম্মুখেই খাবারের দোকান, মুদির দোকান, ডাক্তারের বাড়ী, চায়ের দোকান, পানের দোকান প্রায় পাশাপাশি ছিল। গলিটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকেই বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে; উত্তরদিকে বড় রাস্তায়

পড়িলেই ট্রাম, বাজার, পোষ্টাফিস, পুলিসের থানা, উকীলের বাড়ী, আর দক্ষিণদিকে বড়রাস্তার মোড়ে গাড়ীর আড্ডা, কাপড়ের দোকান, সেকরার দোকান, মুটের আড্ডা।

বারোজন কালো ষণ্ডা গুণ্ডার মত কুলী সমভিব্যহারে মামাবাবু ঢুকিতেই রজত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—এ কি মামা! কি লুট হবে?

যা, তোর শ্বশুরবাড়ীর দরওয়ানটাকে ভাল করে' খাওয়াগে, আর গাড়োয়ানটাকে খাওয়াতে ভুলিস্ না,—বলিয়া একখানি পাঁচটাকার নোট তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া তিনি কুলি লইয়া নিজের ঘরে গেলেন। রমলা ঘরের জিনিষপত্র সাজাইতেছিল, অর্থাৎ ঘাঁটিয়া দেখিতে-ছিল, সহসা এরূপ কুলীসমেত মামাবাবুকে ঢুকিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার হাতের টেষ্ট্ টিউবটা মেজেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

এর শাস্তি,—বলিয়া মামাবাবু হাসিয়া তাহাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন।

—বা, আমি ত জিনিষ গোছাচ্ছিলুম, এ কি, এরা!

—এর শাস্তি হচ্ছে, লক্ষ্মীমেয়ের মত ওই বারান্দার কোণে চুপ করে' বসে' থাকবে, কিছু গোছাতে পারবে না।

—বা!

—বা, টা, নয়, ওসব ধূলো ঘাঁটা চলবে না।

—আচ্ছা, আপনি ত রোজ বাড়ী থাকবেন না।

ধীরে সে চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিল। রজত আসিয়া মামাবাবুর ঘর ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দেখাইয়া তর্ক করিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিল বটে, রমলা কিন্তু চুপ করিল না। বহুক্ষণ ঝগড়া করিয়া ঠিক হইল, মামাবাবু একতলায় যাইবেন না, রজতের ছোট ঘরে শুইবেন, তাঁর জিনিষপত্র নীচের বড় ঘরে যাইবে।

নাকে রুমাল গুঁজিয়া, একবার এঘর ওঘর করিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া ছুটাছুটি করিয়া কুলীদের ধমক দিয়া ধাক্কা মারিয়া কয়েকটি জিনিষ নাড়িয়া তুলসীবাবু যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, রজত ও রমলা তাঁহার দুই হাত ধরিয়া চেয়ারে আনিয়া বসাইল, বলিল,—মামা, তুমি এবার একটু চুপচাপ বস, আমরা একটু লাফাই, চেঁচাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, শুধু দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিবি কোথায় কি রাখতে হবে, নিজের হাতে ধূলো ঘাঁটবি না।

রমলা বলিল,—কোথায় ধূলো? আর আপনার ওই ফ্লাস্ক, শিশি, ওরা যে ওসব ভেঙ্গে ফেলবে।

সত্যই কোন ঘরে কিছু ধূলা ছিল না, পূর্ব্বদিন রমলার ঝাঁটার স্পর্শে সমস্ত বাড়ী নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছিল।

আচ্ছা, শুধু আমার ফ্লাস্ক, শিশিগুলো তোরা সরা,—বলিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার উঠিয়া কুলীদের সঙ্গে চেঁচাইতে সুরু করিলেন।

রমলা বলিল,—মামাবাবু, আপনার এই বইগুলো না-হয় আমাদের ঘরেই রইল।

তুলসীবাবু তাঁহার বৃহৎ মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন,—না, মা, তা কি হয়, ও আমার চাই, ওসব বইয়ের আলমারি আমার শোবার ঘরে যাবে।

প্রেমিক যেমন তাহার প্রিয়ার মুখ বা ছবি না দেখিয়া সমস্ত দিনের কাজের শেষে শান্তিতে শুইতে পারে না, তেমনি এই বইয়ের আলমারীগুলি চোখের সম্মুখে না দেখিলে, তুলসী-বাবুর রাত্রে নিদ্রা হইবে না। প্রত্যেক বই যেন তাঁহার পরিচিত বন্ধু, চোখ বুজিয়া তিনি আলমারীর কোথায় কোন্ বই আছে বলিয়া দিতে পারেন; বন্ধু যেমন বন্ধুর দেহ স্পর্শ করে তিনি তেমনি রোজ একবার বইগুলির ওপর হাত বুলাইতেন, এ স্পর্শের আনন্দ গ্রন্থকীটেরাই জানে।

পাঁচটি বইয়ের আলমারী ও শোবার খাটে টেবিলে রজতের ছোট ঘর ভরিয়া গেল, বাকী আলমারীগুলি নীচে পাঠাইতে হইল। ঘরের পাশের বারান্দা চাটাই-চট দিয়া ঘিরিয়া একটা ঘর তৈরী করা হইল, সেখানে টেবিলে ভূতত্ত্ববিদ্যার পাথরগুলি রহিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে কিছু ক্ষতি হইবে না। পাশের ছোট ঘরে তুলসী-বাবুর বাকী জিনিষগুলি কোনমতে গুছান হইল।

রজতের নতুন বড় ঘরটিতে কিরূপ-ভাবে জিনিষপত্র গোছান হইবে তাহা লইয়া এবার তর্ক বাধিল। রজত

বলিল,—আজ যেমন করে' হোক রাখা যাক, পরে সাজিয়ে নেওয়া যাবে। রমলা কিন্তু থাকিবার ঘরকে গুদাম-ঘর বা আসবাবের দোকান করিয়া রাখিতে সম্মত হইল না। আর-একদিন যে তাহারা ধূলা ঘাঁটিবে তাহাতে তুলসী-বাবু আপত্তি জানাইলেন। রমলা ঘর সাজাইবার ভার লইল। রাস্তার দিকে পূর্ব্ব-মুখে ঘরটির চারিটি জান্‌লা, সিঁড়ির সাম্‌নে একটি দরজা আর বারান্দার দিকে দুইটি জান্‌লার মধ্যে একটি দরজা। নতুন খাটটা উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া রহিল। খাটের পাশে রাস্তার দিকের জান্‌লার কাছে ড্রেসিং টেবিল আর তাহার উল্টাদিকে কাচওয়ালা কাপড়ের আল্‌মারী রহিল। সে আল্‌মারীর পরেই বারান্দার দিকের দরজা, সেই দরজা ও জান্‌লার ফাঁকে রজতের ছবির বই ও নভেলে ভরা ছোট আল্‌মারী রহিল। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া আল্‌না, পূর্ব্ব কোণে লিখিবার টেবিল চেয়ার ও তাহার পাশে সোফা রাখা হইল। মাঝে খানিকটা জায়গা ফাঁক রাখা হইল, মাদুর পাতিয়া বেশ বসা যাইবে। বাকী জায়গাটুকু একটা গোল সাদা মার্ব্বেল টেবিল ঘিরিয়া রকিং চেয়ার, ইজিচেয়ার ও কোচে ভরিয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া দুলিতে রমলা খুব ভালবাসে বলিয়া তাহার দাদা রকিং চেয়ারখানি বিশেষ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইজি-চেয়ারটি রজতের অতি পুরাতন বন্ধুর মত, এখন ছারপোকাসমাকুল হইয়া কতদূর আরামের তাহা বলা শক্ত।

আস্‌বাবপত্র গুছাইয়া রমলা ঘরের দেওয়াল হইতে নানা-ভঙ্গির মেমদের চিত্র সম্বলিত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন ও ক্যালেণ্ডারগুলি টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

রমলা বলিল,—আচ্ছা, আর্টিষ্টের ঘরে এসব ছবি রাখ্‌তে লজ্জা হয় না!

উচ্চ হাসিয়া রজত বলিল,—আহা, jealous হও কেন, এখন আর কোন ছবির দর্‌কার হবে না।

যাও,—বলিয়া মুখ রাঙা করিয়া রমলা ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

জিনিষপত্র সাজাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঘর গোছান শেষ হইলে মামা-বাবু রমলার সাজাইবার শক্তির উচ্চপ্রশংসা করিয়া কুলীদের জন্য খাবার আনিতে দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন। বিবাহের ভোজটা কুলীরাই খাইয়া লইল। সম্মুখের খাবারের দোকানদার তাহার এরূপ খাবার বিক্রিতে নববধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

মেঘছায়াঘন ক্লান্তবর্ষণ স্তব্ধদিন সন্ধ্যার তীর পার হইয়া রাত্রির অন্ধকার পাত্রে অঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বারিধারা-মুখর তারাহীন রাত্রি, পথে পথে ঝোড়ো হাওয়া দুরন্ত শিশুর মত হাঁকিয়া বেড়াইতেছে, ছাদের উপর নর্দ্দমা দিয়া ঝিলিমিলি বহিয়া গলি উচ্ছ্বসিয়া জল খলখল হাস্যে বহিয়া যাইতেছে, বন্ধ দরজা জান্‌লা মাঝে মাঝে সজল বাতাসে কোন প্রমত্ত পথিকের করাঘাতের মত কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঘরের কোণে একটি বাতির ম্লান শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। রমলা দোলানো-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার পাশেই ইজিচেয়ারে একটি পাৎলা লেপ পাতিয়া রজত হেলান দিয়া শুইয়া পা নাড়িতেছিল। দুইটি চেয়ার ঘেঁসাঘেঁসি বসান, দুইজনের পা এক নীল শালে জড়ান। রমলার একখানি হাত রজতের মাথার উপর চেয়ারে আর-একখানি হাত ইজিচেয়ারের হাতে। দুইজনেই স্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে রজত রমলার আঙুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছিল আর তার চেয়ারটিতে মৃদু দোলা দিতেছিল। বাহিরের ঝোড়ো হাওয়ায় সমস্ত ঘরটিকে যেন মৃদু দোলা দিতেছিল।

সমস্ত দিন ধরিয়া সাজানো এই আলোছায়াময় ঘর-খানি যেন কি অপূর্ব্ব রহস্য, কি মাধুর্য্যময় স্বপ্নে ভরা। দুইজনে হাতে হাত জড়াইয়া ধীরে দুলিতে দুলিতে কোন্‌ অজানা স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল।

রজত মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—এই—

রমলা অতি মিষ্টি করিয়া বলিল—কি!

আবার দুইজনে চুপচাপ, রজত রমলার মুক্তকবরীর অলকগুলি চেয়ারের মাথা হইতে সরাইয়া ধীরে সাজাইতে লাগিল।

ঝড়ের রাতে বৃক্ষের নীড়ে দুই কপোত-কপোতীর

মত তাহারা মাথায় মাথা ঠেকাইয়া চোখ অর্দ্ধেক বুজিয়া বসিয়া রহিল। মামাবাবু যে একবার নিঃশব্দে তাহাদের দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না।

রমলা অতি মৃদুকণ্ঠে কানে কানে বলিল,—ওগো!

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল,—কি গো!

আবার দুইজনে স্তব্ধ। এ যে বিনাপ্রয়োজনে অকারণে নামের ডাকার নেশার সুখে ডাকা।

বাহিরে বজ্রপাতের শব্দ হইল, বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়া বিদ্যুতের ঝিলকি দেখা গেল।

রমলা ধীরে বলিল,—মামাবাবুর ওঘরে গিয়ে হয়ত কষ্ট হবে।

—তা হবে, কিন্তু উনি ত কিছুতেই শুনলেন না।

—অমন মামা, তাই তুমি এমন হতে পেরেছ।

—আচ্ছা গো, আমার নিজের কোন গুণ নেই, সব ধার-করা।—জলের ছাট আসছে কি পড়পড়ি দিয়ে?

—একটু আসুক। দেখ, ঘরখানায় কয়েকখানা ছবি দিতে হবে, কি বল?

—আমি ত জীবন্ত ছবি দিয়েই ঘর সাজিয়ে রেখেছি। তোমার যদি দরকার হয় দিও।

—যাও!

—আচ্ছা, তোমার যে ছবিখানা এঁকেছিলুম, আছে ত?

—আছে, তা বলে সেখানা টাঙাতে দিচ্ছি না, না। দেখ, তোমার আঁকা কয়েকখানা ছবি আর কতকগুলো খুব famous ছবি কপি করে'—

—যেমন?

—যেমন, র‍্যাফেলের ম্যাডোনা লেয়োনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা, ওয়াট্‌সের হোপ, আর টার্ণারের দু'একখানা, আর দেখ, অজন্তার সেই 'মা ও মেয়ে'—

—বলে' যাও, বলে' যাও—

—আর তোমার একখানা Portrait by Artist Himself.

—বেশ, বেশ।

রজত রমলার গণ্ডে একটু আঘাত করিয়া বলিল,—এই, একটু ওঠো না, আমি একটু দুলি।

—থাক্‌না, আব্‌দার, নিজে এমনি একটা চেয়ার আনলেই পার।

—আচ্ছা, আমার যখন ভেল্‌ভেটে মোড়া চেয়ার আসবে, তুমি বসতে পাবে না।

—দেখা যাবে।

অতিস্নিগ্ধস্বরে রজত ডাকিল, রমু। এ নাম যেন সে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত দিনের পর দিন আজীবন ডাকিয়া যাইতে পারে, তবু এ নামের অপূর্ব্ব অসীম মাধুর্য্য নিঃশেষিত হইবে না। রমলা কোন উত্তর দিল না, চেয়ারটা একটু কাৎ করিয়া ধীরে তাহার মাথাটা রজতের বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। এ মুখ যেন সে বৎসরের পর বৎসর জন্মের পর জন্ম অনন্ত যুগ ধরিয়া দেখিতে পারে, তবু নয়ন তৃপ্ত হইবে না, হৃদয় জুড়াইবে না।

বাহিরের আষাঢ়ের আকাশ আরও মেঘঘন বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ হইয়া বন্ধনহীন বারিধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়ায় পথের গাছগুলির মর্ম্মরে কে যেন উদাস সুরে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, 'ভরা বাদর মাহ ভাদর।' প্রথম যৌবনের কত বর্ষামুখর-রাতে বিদ্যাপতির এই গানটি রজত গাহিয়াছে। তাহারই সুর বারি-ঝরঝরে কানে বাজিতে লাগিল। পরিপূর্ণ অনন্তমিলনের মধ্যে কোথায় অসীম বিরহ রহিয়াছে। মন্দির ত পূর্ণ হইল, তবু শূন্য যেন কোথায় কাঁদিয়া ফিরিতেছে। বুকে যাহাকে পাই, মনে হয়, তাহাকে ত সম্পূর্ণ পাই নাই, এ মিলন ক্ষণিক, এ ফাঁকি, এ বিরহের ব্যঙ্গরূপ! শিশুর জন্য মায়ের চিরচঞ্চল প্রাণের ভয়ের মত তাহার বুক দুলিয়া উঠিল, আবেগের সহিত রমলাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইল।

আষাঢ়-নিশীথ-গগন হইতে অবিশ্রাম জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, মত্ত শিশুর মত বাতাস দিকে দিকে আনন্দধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বাতিটি পুড়িয়া শেষ হইয়া নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিল।

(১৭)

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে।

কলিকাতায় সাহেব-পাড়ায় যতীনের সুসজ্জিত বাড়ীর সুরম্য শুইবার ঘরে এক সোফায় মাধবী চুপ করিয়া

বসিয়া ছিল। ঘরটি অতি সুন্দরভাবে সাহেবী ফ্যাসানে সাজান। কার্পেট-পাতা মেজেতে কিছুক্ষণ ঘুরিল, ইলেক্‌ট্রিক আলোয় নীল সিল্কের আবরণ টানা ছিল, সেটা টানিয়া খুলিয়া দিল, বড় আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘড়ি দেখিল, রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

যতীন অতি উগ্র রকমের সাহেব, চেয়ার-টেবিলে না বসিলে, কোট-প্যান্ট্‌ না পরিলে বাঙ্গালী কখনও কর্ম্মে ক্ষিপ্রতা লাভ করিবে না, শাক চচ্চড়ি ভাত ছাড়িয়া মাংস না খাইলে তাহার দেহ সুঠাম মাংসবহুল হইবে না, আর পাশ্চাত্য সভ্যতা বরণ না করিলে জাতির পুনরুত্থান হইবে না, এই ছিল তাহার মত। বর্ত্তমান জগতে যে যন্ত্ররাজ বণিকসভ্যতারাণীকে লইয়া রাজত্ব করিতেছেন, সে ছিল তাহারই এক মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি।

ধীরে দরজা খুলিয়া মাধবী পাশের ঘরে ঢুকিল। এক বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সম্মুখে গদিওয়ালা ঘোরান চেয়ারে বসিয়া স্লিপিং-সুট পরিয়া যতীন এক বড় খাতা লইয়া হিসাব দেখিতেছিল। ধীরে মাধবী টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চেয়ারটা একটু ঘোরাইল। খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া যতীন বলিল,—আচ্ছা? তুমি এখনও শোওনি? যাও, যাও, শীগ্‌গীর শুতে যাও, অনেক রাত হয়েছে।

মাধবী দাঁড়াইয়া রহিল। —আ! দেখ-দেখি হিসেবটা গুলিয়ে দিলে।—বলিয়া যতীন পাতার উপর হইতে আবার অঙ্কগুলি গুণিতে লাগিল। সে-পাতার হিসাব শেষ করিয়া যতীন মাধবীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—দেখ, আজ আমায় এ খাতাখানা চেক করে' রাখ্‌তেই হবে, পর্‌শুর মধ্যে কোম্পানীর dividend declare করতে হবে। অনেক রাত—লক্ষ্মী মেয়ে, আর রাত জেগো না, শুতে যাও।

তাহার মুখের দিকে আর খাতার দিকে একবার স্থির নয়নে তাকাইয়া বক্রমধুর হাসিয়া কোন কথা না বলিয়া মাধবী ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন নিমেষের জন্য তাহার এই যাওয়ার সৌন্দর্য্যগতির দিকে চাহিল, তাহার মধ্যে প্রেমতৃষিত বিরহী মানুষটি ক্ষণিকের জন্য জাগিয়া বলিল,—বন্ধ কর খাতা, ও হিসাব চিরজীবন থাক্‌বে, কিন্তু এ বর্ষার রাত—

অমনি কর্ম্মগর্ব্বিত ইঞ্জিনিয়ার মানুষটি দাবাইয়া উঠিল,—সাবধান, don't be sentimental, কাজ আগে, লভ্‌ পরে। বিরহী মানুষের কান্না অঙ্কের কালো দাগের মধ্যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। পাইপ টানিতে টানিতে যতীন লিমিটেড কোম্পানীর dividendএর p. c. করিতে বসিল।

মাধবী ধীরে শুইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। পূর্ব্বদিকের জান্‌লার সবুজ নীল ফুলভরা cretonneএর পর্দ্দাটা টানিয়া জান্‌লা খুলিয়া পাশের কিংখাবে মোড়া সোফায় হেলান দিয়া বসিল। বাহিরে তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ নিকষমণির মত কালো, চাপা আর্ত্তনাদের মত বাতাস কয়েকটি নারিকেল গাছ মর্ম্মরিত করিতেছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাইতেছে না, শুধু দীর্ঘশ্বাসের মত করুণ একটানা শব্দ। মাধবীর চক্ষে অশ্রু আসিল না, বক্ষে হতাশ্বাস উঠিল না, প্রদীপ্তনেত্রে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় ছয় মাস হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। এই ছয় মাসেই তাহার জীবনের সব স্বপ্ন ছুটিয়া গিয়াছে। কেন সে যতীনকে বিবাহ করিয়াছিল, আর্দ্র স্তব্ধ অন্ধকারে সে-কথা ভাবিতে চেষ্টা করিল। আপনার মনকে সে বিবাহের পূর্ব্বেও বুঝিতে পারে নাই, এখনও বুঝিতে পারিল না। কোন অজানা শক্তির হাতে সে যেন ক্রীড়নক, এ তিমিররাত্রি পার করিয়া কাণ্ডারী কোথায় লইয়া যাইবে!

মাধবীর কাছে যতীন যখন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, সে অসম্মতি জানাইয়াছিল। কিন্তু যতীন হার মানিল না, হার মানা তার স্বভাব নয়, সে মাধবীর পিতার শরণাপন্ন হইল। রমলা চলিয়া যাইবার পর যোগেশ-বাবুর মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। কোন কোন বিনিদ্র রাত্রে তিনি ভূতের মত বাড়ীর চারিদিক ঘুরিতেন। এক সকালে দেখা গেল, যে-ঘরে মাধবীর মা মরিয়াছিলেন, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। কত অর্দ্ধরাত্রে মাধবী জাগিয়া শুনিত, পাশের ঘরে তাহার পিতা গোঁ গোঁ শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছেন।

যোগেশ-বাবু বেশ বুঝিতেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাই এ বিবাহের প্রস্তাবে মাধবীর অসম্মতি থাকিলেও তিনি তাহাকে সম্মতি দিবার জন্য নানাপ্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন। মাধবীকে পিতার মতে মত দিতে হইল। কিন্তু একমাত্র পিতার অনুরোধ বিবাহের কারণ বলা যায় না,—ইহার মধ্যে রজতের প্রতি একটু অভিমান ছিল, পিতার সঙ্গে দুঃস্বপ্নময় জীবনভারের শ্রান্তি ছিল, নারীজনোচিত নবজীবনস্বাদের ঔৎসুক্য ছিল, আর নবজাগ্রত তরুণী-চিত্তের ক্ষুধাও ছিল। মাধবী বিবাহের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করে নাই, চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিত না। যেদিন সে বিবাহে মত দিল তারপর দিন হইতে দেখিল, যতীনকে সে সত্যই ভালবাসিয়াছে। তাহার দেহ সুন্দর, তাহার সঙ্গ মধুর, তাহার বাণী সুখকর, তাহাকে ঘিরিয়া কি স্বপ্নরহস্যজাল বিজড়িত।

বিবাহের পর যতীন মাধবীকে কয়লার খনিতে লইয়া গেল। সেখানে প্রথম মাস সত্যই যেন স্বপ্নের ঘোরে কাটিয়া গেল। সে যে কেমন করিয়া তাহার পূর্ব্বজীবন, তাহার পিতার অবস্থা ভুলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে দিন কাটাইল তাহা ভাবিয়া সে নিজে বিস্মিত লজ্জিত হইয়া উঠিত। সকালে যতীনকে চা করিয়া দিতে, দুইজনে বসিয়া এক টেবিলে খাইতে সে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইত। তাহার গাম্ভীর্য্য মাঝে মাঝে ভাঙিয়া যাইত, রমলার মত সে চঞ্চলা কৌতুকময়ী হইয়া উঠিত। যতীন কাজে চলিয়া গেলে প্রভাতের আলোর দিকে চাহিয়া বিরহিণী স্বপ্নের জাল বুনিত। দুপুরে আবার দুইজনে একসঙ্গে থাকার সুখ, কত মৃদুগল্প, শীত মধ্যাহ্নের রৌদ্রের দিকে চাহিয়া সে দিবাস্বপ্ন দেখিত। সন্ধ্যাবেলায় তাহারা প্রায় মোটর করিয়া বেড়াইতে বাহির হইত, উচুনীচু আঁকা-বাঁকা লালপথ ধরিয়া কতদূর চলিয়া যাইত, যতীনের পাশে বসিয়া তাহার মোটর চালানর কায়দা দেখিয়া তাহার বুক অসীম সুখে ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু এ স্বপ্নের ঘোর বেশীদিন রহিল না, মদের নেশার মত কাটিয়া গেল। নারীর সম্বন্ধে যতীনের ধারণা ছিল যে নারী পুরুষের কাছে নেশার পাত্রের মত, সে যেন জীবনের কাজের মধ্যে জুড়িয়া না বসে। সন্তান জন্মদান ও পালনের জন্য প্রকৃতি নারীকে সৃষ্টি করিয়াছে; এ গণ্ডী হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া প্রকৃতির এ অভিপ্রায় পুরুষ যেন ব্যর্থ না করে। বস্তুতঃ, শিকার বা কয়া মোটর হাঁকানর মত, বিবাহ করাটাও যতীনের কাছে জীবনের একটা সখ মেটান মাত্র। শিকার-শেষের পর বন্দুকটা যেমন বাক্সে পুরিয়া রাখে, কোথায় থাকে তাহার ঠিকানা থাকে না, তেমনি বিবাহের প্রথম মাসের পর যতীন মাধবীকে তাহার কলিকাতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল এবং নানা ব্যবসায়-সংক্রান্ত চিঠির সঙ্গে প্রতিসপ্তাহে একখানি করিয়া চিঠি লিখিয়া খোঁজ লইত সে বাঁচিয়া আছে কি না।

কালো আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নিরেখা টানিয়া একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। মাধবীর মনটাও অমনি চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, হয়ত সব বিবাহে এইরকমই ঘটে, এইরূপ ক্ষণিক আনন্দ স্বপ্নমায়ার পর দীর্ঘ অবসাদ, শ্রান্ত জীবনভার। সত্যই ত, উষার আকাশে আলোর হোলিখেলা কতক্ষণ থাকে, সে রঙের স্বপ্ন নিমেষে টুটিয়া যায়, সমস্তদিন ধরিয়া বর্ণহীন তপ্ত জ্বালাময় আলোর দীপ্তি, তারপর স্নিগ্ধ অন্ধকারভরা রাত্রি আসে। সে মৃত্যুরাত্রির অতল কালো স্নেহের জন্য এখনও তাহার প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু এ সজল অন্ধকার তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না, ইচ্ছা হইতেছিল জনহীন পথে মত্ত-বাতাসের সঙ্গে তামসী রাত্রে বাহির হইয়া পড়ে।

আর সত্যসত্যই তাহাদের বিবাহ যদি ভুল হইয়া থাকে! এ ভুল সংশোধন করিবার কি কোন উপায় নাই? তাহা হইলে কি সমস্ত জীবন দুইজন দুইজনকে ফাঁকি দিবে, প্রেমের ভণ্ড অভিনয় চলিবে আর—,আর তাহার ভাবিতে ভাল লাগিতেছিল না। ব্লাউসের ভিতর হইতে কাজী-সাহেবের চিঠিখানি বাহির করিল। কাজীসাহেব তাহার নববিবাহিত জীবনের নানা সুখচিত্র নানা রংএ বর্ণনা করিয়া বহুফার্সীকবিতামণ্ডিত করিয়া এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার এই কল্পিত আনন্দগুলির কথা পড়িয়া তাহার ঠোঁটে এক ব্যঙ্গ হাসি খেলিয়া গেল। তারপর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। চিঠির সবশেষে কাজীসাহেব

লিখিয়াছেন, তাহার পিতার মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে, তিনি কিছুতেই তাঁহাকে দমন করিতে পারিতেছেন না। চিঠিটি বুকের ভিতর ফেলিয়া মাধবী আবার অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কি একখানি ইংরেজী নভেলে মাধবী পড়িয়াছিল, We marry only to develop ourselves, why should we otherwise marry at all? আত্মার বিকাশের জন্যই বিবাহ, তাহা ছাড়া বিবাহের অন্য সার্থকতা কোথায়? আত্মার সে বিকাশের পথ এ বিবাহজীবনের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া সে খুঁজিয়া পাইবে? যে প্রেমের আলোয় জীবন পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়া কল্যাণের বর্ণে সেবার সৌরভে চারিদিক আনন্দিত করে, সে প্রেম,—ভাবিতে ভাবিতে সে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পর্দা দিয়া জানলা বন্ধ করিয়া আলোর পর্দাটা টানিয়া বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

যতীন যখন ঘুমাইতে আসিল, তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। যতীন বিছানার কাছে আসিতে মাধবী গম্ভীরকণ্ঠে বলিল,—দেখ—

হুঁ,—বলিয়া যতীন এক পাশে শুইয়া পড়িল।

মাধবী গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল,—বাবার বড় অসুখ, ভাব্ছিলুম একবার যাব।

বেশ, যাওনা,—বলিয়া যতীন চোখ বুজিল।

—দেখনা, এই চিঠিটা।

আচ্ছা, যেদিন খুসি, কালই যেতে পার, বড় ঘুম পেয়েছে,—বলিয়া যতীন ভাল করিয়া শুইল, কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রায় অসাড় হইল।

যতীনের দিকে চাহিয়া মাধবীর যেন কেমন ভয় হইল, এ যেন কে অপরিচিত! ধীরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া জান্লার কাছে আসিয়া বসিল। নয়নের কালো-তারার মত কালো আকাশ করুণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, শুধু ছেঁড়া মেঘের মাঝখানে একটি তারা জলজল করিতেছে। সেই তারার দিকে চাহিয়া সহসা মাধবীর মাকে মনে পড়িল। ছেলেবেলায় এক বর্ষারাত্রের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—অন্ধকার সিঁড়িতে ভয় পাইয়া সে কিরূপে ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ঢুকিয়া মার কোলে আশ্রয় লইয়া শান্তি পাইয়াছিল। সেই রকম কোন স্নিগ্ধ শীতল স্নেহময় ক্রোড়ের আশ্রয়ের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

বাহিরের অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ জলিয়া উঠিতে লাগিল আর শূন্যঘরে ইলেক্‌ট্রিকের আলো আর মাধবীর দুই চক্ষু জলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

দিবেহি রাজ্জে

মালদ্বীপপুঞ্জের নাম আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি, কিন্তু আমরা অনেকেই এই দ্বীপ ও সেখানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এস্থানের অধিবাসীরা তাদের জন্মভূমিকে "দিবেহি রাজ্জে" (দ্বীপ-রাজ্য) বলে। আপনারা সকলেই জানেন যে, মালদ্বীপপুঞ্জ ভারত-মহাসাগরের কোলে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের নাম। এই দ্বীপগুলি পাশাপাশি লম্বালম্বি ভাবে সাজান। সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে এগুলি প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দূরে অবস্থিত। সর্ব্বসমেত তেরো চৌদ্দটি দ্বীপ আছে। প্রত্যেক দ্বীপটির মাঝে খানিকটা অগভীর জলাভূমি সেগুলিকে বিযুক্ত করে' রেখেছে। দ্বীপগুলি মাপে ও আকারে এক নয়, কোনোটি গোল, কোনোটি বাদামী, এই রকম নানা আকারের আছে।

মালদ্বীপের অধিবাসীরা কোনো একটা বিশেষ জাতির (race) বংশধর। তাদের নিজেদের গভর্ণমেণ্ট, ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি আছে। এই ইতিহাস থেকে জান্তে পারা যায় যে তারা একটি পুরাতন সভ্য জাতি। গত বৎসরের আদম-সুমারিতে জান্তে পারা গেছে যে দিবেহি রাজ্যের লোকসংখ্যা সত্তর হাজারেরও বেশী

মহম্মদ সাম্‌স্‌-উদ্‌-দীন—মালদ্বীপের সুল্‌তান

এখানকার অধিবাসীরা পরিশ্রমী, সমজাতিক এবং সমধর্ম্মসম্পন্ন। মাছধরা আর নারিকেল চাষই তাদের প্রধান ব্যবসা, এ ছাড়া তারা ঘাসের মাদুর বোনে, তুলার সুতা কেটে কাপড় তৈরী করে, ছোটখাট প্রয়োজনীয় কাঠের কাজও করে' থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সমুদ্রযাত্রার উপযোগী বেশ ভাল নৌকাও তৈরী কর্‌তে পারে। এই-সব নৌকাতে চড়ে' তারা এডেন, সিংহল, কলিকাতা এবং এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পাড়ি দেয়। দিবেহি রাজ্যের লোকেরা মাছ (শুট্‌কী ও লোণা), নারিকেলের দড়ি, নারিকেল, নারিকেলের শাঁস (শুষ্ক অবস্থায়), কড়ি শামুক, কচ্ছপের খোলা ইত্যাদি রপ্তানি করে; আর চাল, সুপারি, তুলাজাত বস্ত্র, তেল, মসলা ও আরো কিছু কিছু জিনিষ আম্‌দানী করে।

গত বৎসর সিংহলের অবসরপ্রাপ্ত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানী (Archaeological Commissioner) মিঃ এইচ সি পি বেল মালদ্বীপে গিয়েছিলেন—সেখানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে তদন্ত কর্‌তে। তাঁর রিপোর্টে প্রকাশ যে দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে এখানকার শাসনপ্রণালী দ্বীপবাসীদের সম্পূর্ণ উপযোগী। লোকেরা এই শাসনপ্রণালীর অধীনে বেশ সুখেই আছে। অন্য কোন দেশের সঙ্গে তাদের কোনো রকম যোগ না থাকায় এখানে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক হাঙ্গামা নেই।

এই দ্বীপগুলির মধ্যে "মালে" নামক দ্বীপে সুল্‌তান বাস করেন। মালদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে "মালে"ই সর্ব্বপ্রধান দ্বীপ, খাস সর্‌কারী দপ্তরখানা ইত্যাদি যা কিছু তা মালেতেই বসে; কিন্তু আকারে মালের চেয়েও বড় দ্বীপ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অনেকগুলি আছে।

মিঃ বেল বলেন, বহুশতাব্দী থেকেই এখানকার প্রজারা বেশ উন্নত শাসনবিধির অধীনে বাস কর্‌ছে। শাসন-ব্যাপারে সেখানকার প্রজাদের অনেক বিষয়েই পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল—অনেকটা constitutional monarchy বা বিধি-সংযত রাজ-তন্ত্র; সুল্‌তান এবং তাঁরও আগেকার অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নৃপতিগণ প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধি সর্দ্দারদের ইচ্ছামতই চল্‌তে বাধ্য হতেন। সর্দ্দারেরা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হোয়ে মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি হাঙ্গামাও কর্‌তো। বর্ত্তমানে সুল্‌তানকে পরামর্শ দেবার জন্য তিনটি কাউন্সিল আছে। এই কাউন্সিলগুলিকে সিংহল গবর্ণমেণ্টের শাসন, ব্যবস্থাপক ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের (Executive, Legislative, and Municipal Councils) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

শাসন এবং খাজনা ও শুল্ক আদায়ের সুবিধার জন্য সমস্ত দ্বীপপুঞ্জকে তেরটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে প্রধান গবর্ণমেণ্টের (Central Government) একজন প্রতিনিধি থাকেন এবং তিনিই সেই প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। আগেই বলা হয়েছে

মালদ্বীপের প্রধান মস্‌জিদ হুকুরু মিস্‌কিট (মস্‌জিদ) অভিমুখে সুল্‌তানের সমারোহ-যাত্রা

যে, দ্বীপগুলি পাশাপাশি থাক্‌লেও তাদের মধ্যে মধ্যে একটু কোরে জলভাগ তাদের পৃথক কোরে রেখেছে; এদের মধ্যে একটি দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জ থেকে একটু বেশী দূরে অবস্থিত; এই দ্বীপটি আলাদাভাবে শাসিত হয় অর্থাৎ মূল দ্বীপপুঞ্জের গবর্নমেণ্টের সঙ্গে এই দ্বীপের গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎভাবে কোনো সম্পর্ক থাকে না। এই দ্বীপটিকে নিয়ে মালদ্বীপপুঞ্জে সর্ব্বসমেত চৌদ্দটি দ্বীপ আছে।

এখানে নৌ ও ডাঙার সৈন্য ও সেনানী নিয়ে সর্ব্বসমেত আট শো থেকে এক হাজার মাত্র লোক মোতায়েন থাকে। একজন স্বাধীন সুল্‌তান এই দ্বীপে রাজত্ব করেন, কেবলমাত্র বৎসরে একবার এখান থেকে একজন প্রতিনিধি সিংহল গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়ে আসে। এই কর দেওয়া ছাড়া শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে সুল্‌তান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

মালদ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। শোনা যায় যে, টলেমি একস্থানে এই দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। সিংহলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোনো দ্বীপের অধিবাসীদের প্রতিনিধি রোমক সম্রাট জুলিয়ানের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলেন এমন কথাও শুন্‌তে পাওয়া যায়। মালদ্বীপের সুল্‌তানের নিকট আরবী ভাষায় লিখিত যে ইতিহাস (তওারিখ) আছে, তার মধ্যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্ত্তমান সময়ের পর্য্যন্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

মিঃ বেল এই ইতিহাস থেকে বিরাশীজন সুল্‌তানের নাম, উপাধি এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই বিরাশীজন সুল্‌তান ১১৪১ অব্দ থেকে ১৯১৩ অব্দ পর্য্যন্ত সেখানে রাজত্ব করেছিলেন। ইতিহাসখানি আরম্ভ করা হয়েছে সেখানকার প্রথম সুল্‌তান মহম্মদ-উল্‌-আদিলের রাজত্বকাল থেকে। এঁর আমলেই দ্বীপবাসীরা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় (১১৫৩—৫৪ খৃষ্টাব্দে)। তাব্রিজবাসী শেখ ইয়ুসুফ্‌ শামসুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি এদের মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই ইতিহাসখানিতে মালদ্বীপপুঞ্জ এবং সেখানের অধিবাসীদের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা

মালদ্বীপের স্থলতান-পুত্র হাসান ইজ্জদ্-দীনের নূতন প্রাসাদ

জানা যায় যা সাধারণের কাছে এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মিঃ বেল বলেন যে, ঐতিহাসিকদের কাছে এখানি একটি অমূল্য গ্রন্থ। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলমান পরিব্রাজক ইব্‌ন্ বাতুতা এই দ্বীপে এসেছিলেন এবং তিনি তাদের বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস রেখে গিয়েছেন। দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার অনেক দিন পরে ইব্‌ন্ বাতুতা সেখানে গিয়েছিলেন।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা কিছুদিনের জন্য একবার মালদ্বীপ অধিকার করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দ্বীপবাসীরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। পর্ত্তুগীজেরা কিন্তু তাতে হতাশ না হোয়ে এই দ্বীপ অধিকার করবার বার বার চেষ্টা করতে থাকে। অবশেষে একবার দ্বীপবাসীদের হারিয়ে দিয়ে দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে' বসে। এইবার পর্ত্তুগীজেরা একাদিক্রমে প্রায় পনেরো বছর এখানে রাজত্ব করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা রঙ্গমঞ্চে এসে আবির্ভূত হলো। তারা এসেই সিংহলদ্বীপে পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত জায়গাগুলি দখল করে' বসলো। সিংহলের স্থানগুলি অধিকার করেই তারা বুঝতে পারলে যে, মালদ্বীপের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ না কোরে তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করলে তারা অধিক লাভবান হোতে পারবে। এই-সব বিবেচনা কোরে তারা এই দ্বীপবাসীদের সঙ্গে বোধ হয় একটা রফানিষ্পত্তি কোরে ফেলেছিল। এই সম্পর্কে মিঃ বেল এক জায়গায় লিখেছেন যে, ১৬৪৫ অব্দে মালদ্বীপ থেকে সিংহলে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিনিধি পাঠান হয়। তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রতিবৎসরে মালদ্বীপ থেকে সিংহলে রাজ-প্রতিনিধি পাঠান হোয়ে থাকে।

এখানকার ভাষার সঙ্গে দেশের ইতিহাস এমন ভাবে জড়িত যে, ভাষা না জানা থাকলে তাদের ইতিহাস জানা এক রকম অসম্ভব। এখানকার ভাষা ও সিংহলী ভাষায় অনেক মিল আছে। এই দুটি ভাষা ভাল কোরে পরীক্ষা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এক সময়ে এই দুই ভাষা প্রায় এক ছিল। বর্ত্তমানে সিংহলের যে ভাষা চলে তার সঙ্গে বর্ত্তমানের মালদ্বীপের ভাষার মিল নেই বটে, কিন্তু সিংহলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে
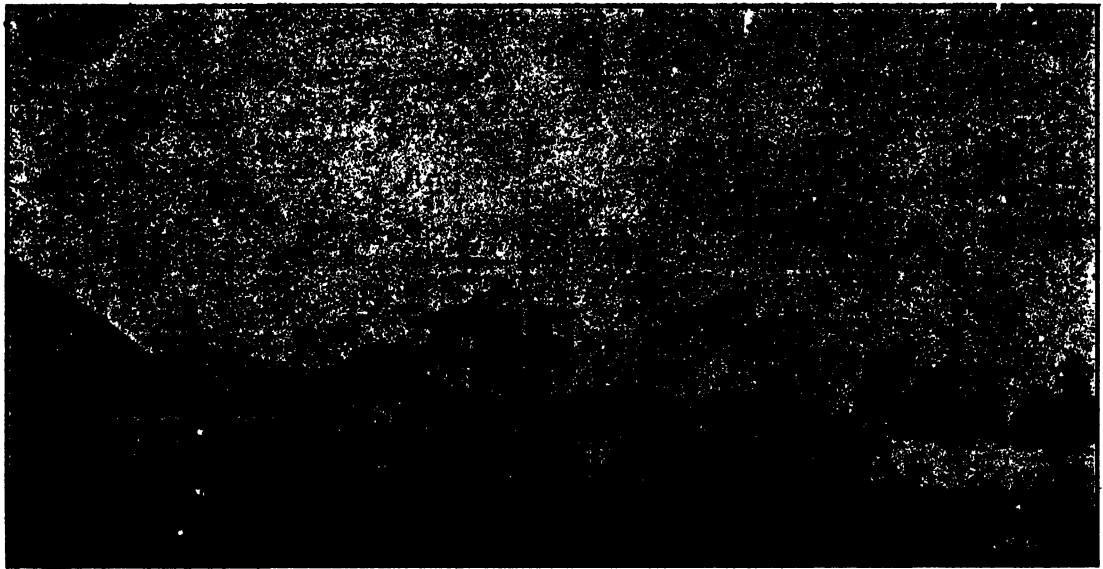
মালদ্বীপের রাজপ্রাসাদের আবেষ্টন-গৃহ
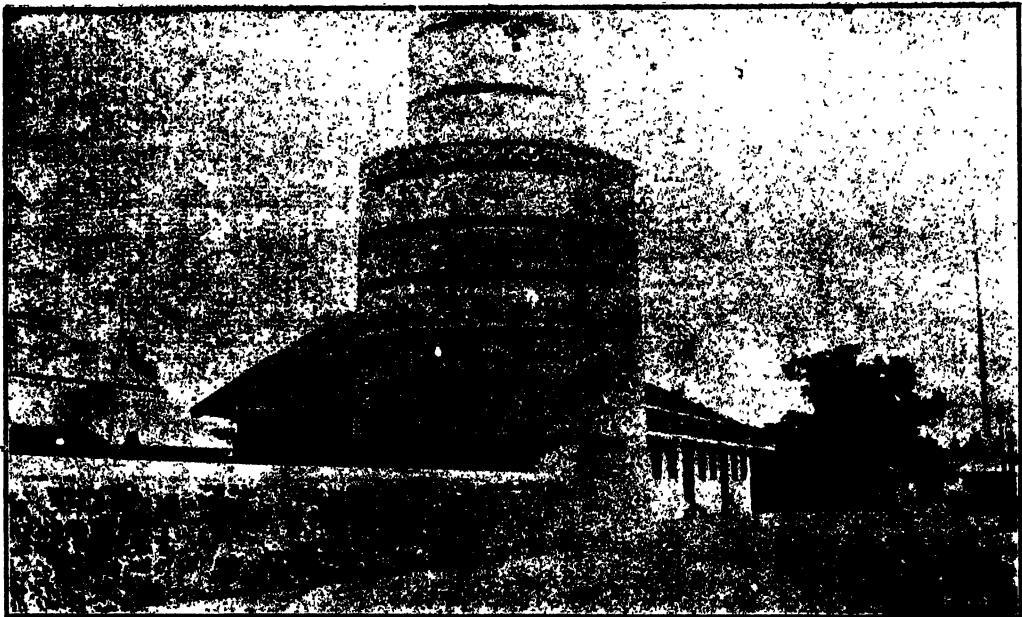
মস্‌জিদ হকুরু মিস্‌কিট ও মুন্নারু মিনার, মালদ্বীপ

ভাষার প্রচলন ছিল। সেই ভাষার সঙ্গে এখনকার মালদ্বীপের ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য দ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর থেকে এই আটশো বছর ধরে' তাদের মূল ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হোয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ কোরান আরবী ভাষায় লিখিত। সেইজন্য তাদের ভাষায় একটা একটা কোরে আরবী কথা প্রবেশ কর্‌তে আরম্ভ করে; ক্রমে কোরানের ভাষার ওপর
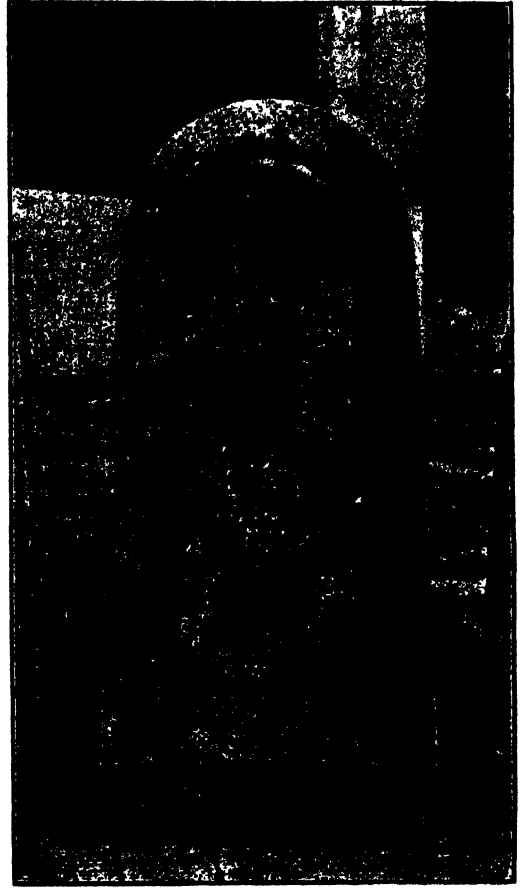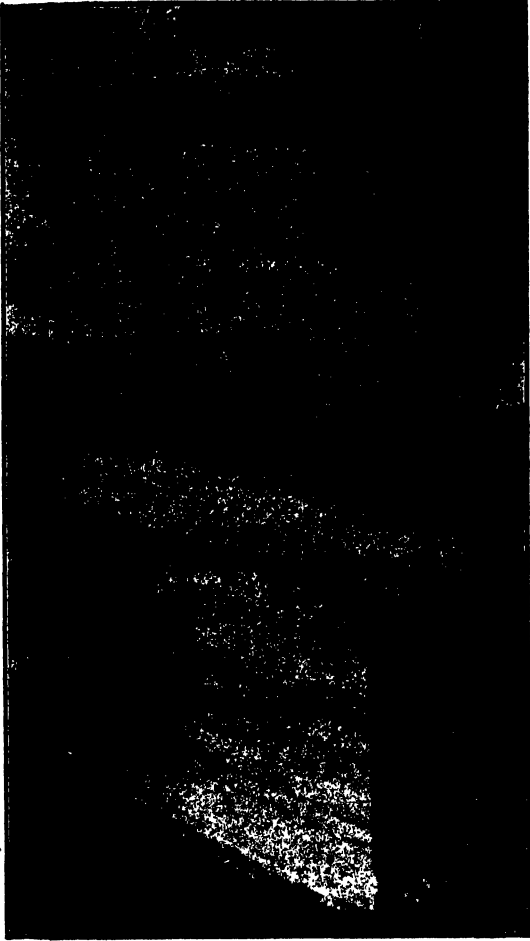
মস্‌জিদ হুকুরু মিস্‌কিটের খোদিত প্রাচীর-গাত্র

প্রাচীন মালদ্বীপের ভাষায় (দিবেস অকুরু) লিপিত সমাধি-স্ত

অত্যধিক আকর্ষণ থাকায় তাদের ভাষার অক্ষরের আকৃতি পর্য্যন্ত আরবীয় অক্ষরের অনুরূপ হোয়ে পড়েছে। এখন সর্‌কারী যা-কিছু নথি-পত্র তা আরবী অক্ষরেই লেখা হয়। তাদের পুরাতন দেশজ ভাষা, অর্থাৎ যে ভাষা প্রায় সব বিষয়েই সিংহলী ভাষার অনুরূপ ছিল সে ভাষা, তারা বর্জ্জন করেছে এবং আরবী ভাষার অনুকরণে তারা এখন ডান দিক থেকে লেখা আরম্ভ করেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর আরবী ভাষার কথাও তাদের ভাষার মধ্যে এসে পড়েছে। ওদিকে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সিংহলী ভাষার মধ্যেও পরিবর্ত্তন শুরু হয়; এবং এই কয়েক বছরে তাদের ভাষাও বিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এই দুই দেশ দুই বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হওয়ায় এখন তাদের ভাষার মধ্যে ব্যবধানটা খুবই বেশী হোয়ে পড়েছে। তার ওপর মালদ্বীপবাসীরা মুসলমান হওয়ায় সিংহলীদের সঙ্গে তাদের প্রায় সমস্ত আদান-প্রদান বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল, এবং এমনি কোরে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা ক্রমে বেড়েই গিয়েছে। সিংহলীদের পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত মালদ্বীপের কোনো কথা পাওয়া যায় নি; কিন্তু যতদুর জান্‌তে পারা গেছে তাতে মনে হয় যে, সিংহলের ভাষাই মালদ্বীপের ভাষার মাতৃভাষা। এই দুটি দ্বীপের সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হোলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হোতে পারা যাবে। হয়তো এও প্রমাণ হোয়ে যেতে পারে যে, মালদ্বীপবাসীরা সিংহলদ্বীপবাসীদেরই বংশধর, কোনো সময়ে সিংহলদ্বীপের একদল লোক সেখানে গিয়ে বসবাস

সুরু করেছিল। বিখ্যাত শব্দতত্ত্ববিদ অধ্যাপক উইল্‌হেল্‌ম গেইগের (Wilhelm Geiger) তাঁর Maldivian Linguistic Studies নামক পুস্তকে বলেছেন—"কোনো এক সময়ে (যদিও সময়টা এখনও স্থির করতে পারা যায় নি) সিংহলদ্বীপ থেকেই লোক গিয়ে মালদ্বীপে বাস করতে আরম্ভ করে কিংবা ভারতবর্ষ থেকে আর্য্যেরা যে সময়ে সিংহলে এসেছিল একদল আর্য্য সেই সময় মালদ্বীপেও গিয়ে বাস করতে থাকে।" কিন্তু এদের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করলে মনে হয়

মালদ্বীপের পুরুষ

মালদ্বীপের নারী ও শিশু
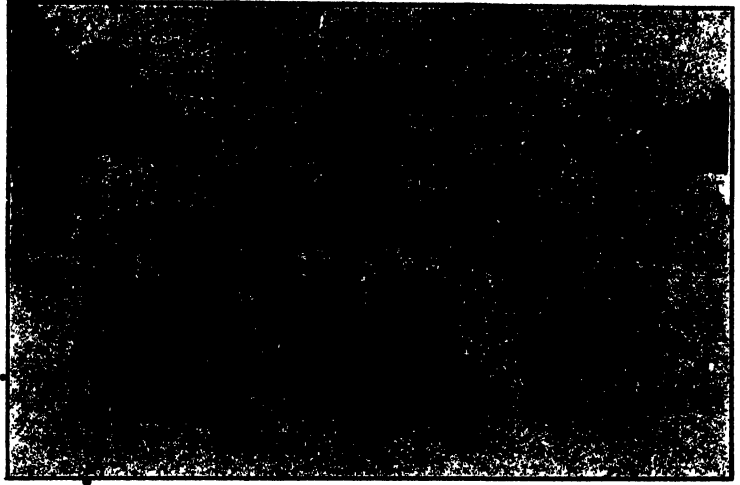
যে সিংহলদ্বীপ থেকেই একদল লোক মালদ্বীপে গিয়েছিল; কারণ সিংহলের অনেক দেশজ শব্দ মালদ্বীপের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়।

মিঃ বেল সেখানকার সুল্‌তানের নাম ও উপাধির যে তালিকা সংগ্রহ করেছেন, সেই-সকল উপাধির মধ্যেও সিংহলী ভাষার আঁচ পাওয়া যায়। এই-সকল সম্মান-সূচক উপাধিকে বিরুদ বলা হয়; অথচ মালদ্বীপের ভাষায় বিরুদ শব্দের কোনো অর্থই নেই, কিন্তু সিংহলী ও সংস্কৃত ভাষায় বিরুদ শব্দের অর্থ রাজস্তুতি। মালদ্বীপের সুল্‌তানদের এই-সকল উপাধির সঙ্গে সিংহলী রাজাদের উপাধির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা নীচে মালদ্বীপী, সিংহলী সংস্কৃত বা পালি ও বাংলা এই চার ভাষার একটি তালিকা দিলাম। মালদ্বীপী ও সিংহলী ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য কতটা নিকট, এ থেকে পাঠক তা অনুমান করতে পারবেন।

মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা
দিব্	দিব্ বা দিবইন	দ্বীপ (সং, বাং)
		দীপ (পালি)
	রাজ্জে	রাজ্য (সং, বাং)
		রাজ্জ (পালি)
	অকুরু	অক্ষর (সং, বাং)
		অকখর (পালি)
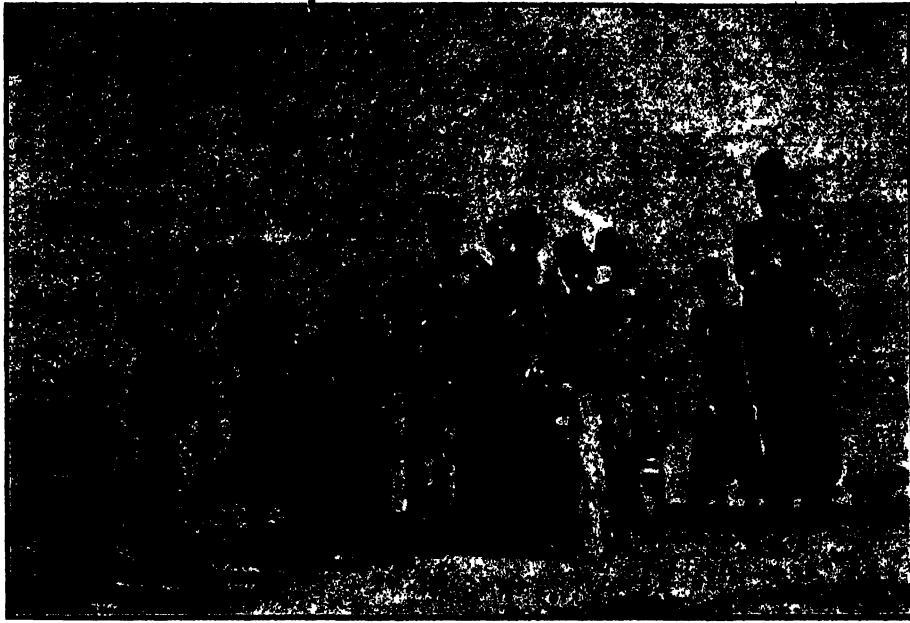
মালদ্বীপের নারী ও বালকবালিকা

মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা
দরুমবস্থ	ধর্ম্মবস্ত	ধর্ম্মবৎ বা ধর্ম্মবস্ত (সং, বাং) ধম্মবস্ত (পালি)
লক্ষনফুরি	লঙ্কাপুর	লঙ্কাপুর
এদুরু	এদুরু	আচার্য্য
উস্তব	স্তুপ	স্তুপ
হীরিগা	হীরিগল	প্রবাল
বেলিগা	বেলিগল	বেলে পাথর
বুন্দা—গে	বুদ্ধ – গে	বুদ্ধ-গৃহ
মা	মা কিংবা মহা	মহা
কুদা	কুদা	ক্ষুদ্র, কোদা (খোকা)
বন্দর	বন্দর	মহৎ, বড়
দহর	দহর	দহর (ক্ষুদ্র), হ্রদ, ডহরা (গর্ত্ত)
ইস্	ইস্ কিংবা উস	উচ্চ, উঁচু
রিয়	রিয়ন	এক হাত পরিমাণ
এটিরি	এটিলি	বাটি বা পাত্রী

মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা
নলি	নেলি	নলী
মাগু	মাগ	মার্গ (সং, বাং) মগ্‌গ (পালি)
মারাফা	মারাওয়া	মারা (মৃত)
একেকু	একেকু	একক
অনেনেকু	অনিকেকু	অন্য এক
তিরি	তিরি	তির্য্যক্ তেরছা
দেবী	দেব	দেব (রাক্ষস)
ফরুওয়ান	পোরাওয়ানাওয়া	প্রাবরণ
হফন	হপন	চর্ব্বণ, হাপড়ানো
হতুরু	হতুরু	শত্রু
মা	মামা	অহং, আমি
তিবি নামা	তিবে নামা	যদি হয়
ইরু	ইরু	ইতু (সূর্য্য) (ঋতু >ইতু)
মা-গে	মা-গে	মম, আমার, মোগোর, আমাগোর

মালদ্বীপী	সিংহলী	সংস্কৃত, পালি বা বাংলা
উম্বা আমা	উম্বা আম্মা	তব অম্বা (তোমার মা)
বিরুদ	বিরুদ	বিরুদ (রাজস্তুতি)
রাহুন	রাহুন বা রাজুন	রাজন্, রাজা
হাত-তৈলি	হাত-তেলিয়া	সাত তৌলো (সাত হাঁড়ি)
বেহিমান ফুরি	বিহারমান পুরী	ব্রাহ্মণপুরী, বিহারমানপুরী
মুন্নফুরি	মুনিপুরী	মুনিপুর (বৃদ্ধ মুনির পুর)
কদু	কদু	খড়্গ (তলোয়ার)
রা	রা	তাড়ি
বেরে	*	বিহার
বোই গাস	*	বটগাছ
হবিত্ত	*	চৈত্য

কথার তালিকা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। সেখানকার ভাষার আর্‌বী ও পার্‌সী শব্দ বাদ দিলে দেখা যায় যে, শতকরা পঁচানব্বইটা শব্দ সিংহলী ভাষা থেকে এসেছে; কাজেই এ ক্ষেত্রে যদি ধরে' নেওয়া যায় যে, সিংহল থেকেই লোক এসে মালদ্বীপে বাস কর্‌তে আরম্ভ করেছিল তা হোলে সেটা নেহাৎ অন্যায় হবে না।

ভাষা ছাড়া সেখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে যা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হতে পারে যে মালদ্বীপবাসীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বার আগে বৌদ্ধ ছিল। মিঃ বেল এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মিঃ বেল মালদ্বীপপুঞ্জের সমস্ত স্থানে যান নি, কিন্তু সেখানকার দ্বীপবাসী অনেকের কাছে শুনেছেন যে, এই দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো দ্বীপে প্রাসাদতুল্য পাথরের বাড়ী চৈত্য ইত্যাদি ভগ্নাবস্থায় পড়ে' আছে। এই-সকল অট্টালিকা এবং সেখানকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং মালদ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার কত অমূল্য ইতিহাস লুকিয়ে আছে তা কে বল্‌তে পারে।

শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

চোখ গেল

সাধারণের চোখে হয়ত সে সুশ্রী ছিল না। আমিও তাহাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে—কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুটিতে যে কি ছিল তাহা জানি না। তেমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও দেখি নাই! দুষ্টু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

সেই কুরূপা এবং চঞ্চলা 'মিনি' আমার চিত্ত-হরণ করিয়াছিল! তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়া বলিয়াছিলাম—"ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটো কেড়ে রাখি।"

"কেন?"

"ওই দুটোই ত আমাকে পাগল করেছে। আমি সবচেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি।"

এত ভালবাসিতাম—কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই।

অজ্ঞাত অপরিচিত আর-একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

কিন্তু সে বেদনা হয়ত মুছিয়া যাইত যদি সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

'মিনি' যখন বাপের বাড়ী আসিল, দেখি, তাহার দু'টি চক্ষুই অন্ধ! কারণ শোনা গেল যে চোখে গোলাপজল দিতে গিয়া সে ভুলক্রমে আর-একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আর-একদিন আড়ালে দেখা হইয়াছিল। বলিলাম—"অসাবধানতার জন্যে অমন দু'টি চোখ গেল!"

সে উত্তর দিল—"এর মধ্যে যে কত কথা লুকানো আছে তা' যদি না বুঝ্‌তে পেরে থাক তাহলে না জানাই ভাল!"

"বনফুল"

জয়ন্তী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহারীলাল ও পুণ্ডরীক

বিহারীলালের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুস্থানী। বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের একজন বঙ্গ প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা ধনাঢ্য জমিদার। বিহারীলাল তাঁহাদের বংশধর ও সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকারী।

অল্প বয়সে বিহারীলালের পিতামাতার মৃত্যু হয়। পিতৃব্য বনওয়ারিলাল ও তাঁহার পত্নী শিশু বিহারীলালকে লালন পালন করেন। বনওয়ারিলাল সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান, বিহারীলালকে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছিলেন। ব্যায়ামাদি শিখাইবার জন্য উত্তম লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জমিদারী ও অপর সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া বিষয় অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বিহারীলাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সকল সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিহারীলাল সচ্চরিত্র, ধীর, বুদ্ধিমান। শিক্ষাগুণে বিলাসলালসাবর্জ্জিত, আমোদ-প্রমোদে অধিক অনুরাগ নাই, তোষামোদপ্রিয়ত্ব নাই, অথচ কোনরূপ বিরক্তিও নাই। সকল বিষয় নিজে দেখিতেন, সকল দিকে নজর রাখিতেন। খাজনা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন বা অন্য কোন রূপ অত্যাচার করিতেন না বলিয়া প্রজারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল, ও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সুখ্যাতি করিত।

বিহারীলালের কিশোর বয়সে পিতৃব্য তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের অল্প দিন পরেই পিত্রালয়ে বধূর মৃত্যু হয়। বিহারীলাল এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। এখন তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর। বিধবা পিতৃব্যা বাড়ীর গৃহিণী, বিহারীলালকে আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার সম্মুখে বিহারীলাল চুপ করিয়া থাকিতেন, পরোক্ষে বলিতেন, বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

চৌধুরীদিগের বসতবাটী অট্টালিকা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুরুষানুক্রমে বাড়ীর আয়তন বাড়িতেছিল। তিন চার মহল বাড়ী, বিস্তর লোকজন, সিংহদরজায় হাতী বাঁধা, তাহার বাহিরে গোপালজীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ পুষ্করিণী। একদিকে অশ্বশালা, তাহার পাশে হস্তীশালা। আর এক দিকে প্রকাণ্ড বাগান, তাহাতে সকল জাতীয় ফল। অন্দর মহলে খিড়কীর দিকেও পুষ্করিণী ও প্রাচীর দিয়া ঘেরা বাগান। সিংহদ্বারের উপর সকাল সন্ধ্যায় রোশনচৌকী বাজিত। বৈঠকখানায় তিন চারিটা বড় বড় কামরা, চারিদিকে ঝাড় লণ্ঠন, দেয়ালে ছবি, যে দিকে দেখ ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন। একটা ঘরে সকল রকমের বাদ্যযন্ত্র, যেখানে সর্ব্বদা মহফিল, মোজরা নাচ হইত। বিহারীলালের আমলে সে-সকল অনেক কমিয়া গিয়াছিল, তবে দেওয়ালি ও হোলিতে বংশপ্রথা অনুসারে উৎসব হইত। অন্যান্য বিষয়ে, আহার ব্যবহারে, আচার বিচারে, কথাবার্ত্তায় চৌধুরী বংশ বাঙ্গালীর মত হইয়া গিয়াছিলেন, কেবল স্ত্রীলোকেরা হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড় পরিতেন ও পুরুষেরা মাথায় টুপি কিম্বা পাগড়ী ব্যবহার করিতেন।

যে সময় বিহারীলালের মাতার মৃত্যু হয় তখন বিহারীলাল নিতান্ত শিশু। বালককে স্তন্যদুগ্ধ পান করাইবার জন্য গ্রাম হইতে একজন ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। তাহার কোলে একটি পুত্র, বিহারীলালের অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড়। নাম পুণ্ডরীক। বাল্যাবস্থায় ও কৈশোরের প্রথম অবস্থায় পুণ্ডরীক বিহারীলালের খেলার সাথী ও তাঁহার নিত্যসঙ্গী। বিহারীলালের বয়স যখন ষোল ও পুণ্ডরীকের সাড়ে সতেরো, সেই সময় পুণ্ডরীকের মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে সে বিহারীলালের কাছে থাকিত।

পুণ্ডরীক ঠিক ভৃত্যের মত নয়। অপরের সাক্ষাতে বিহারীলালের সহিত সম্মানপূর্ব্বক কথা কহিত, আর কেহ না থাকিলে সমবয়স্ক বন্ধুর মত। বিহারীলাল তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ও কেহ তাহাকে রূঢ় কথা

বলিলে অসন্তুষ্ট হইতেন। পুণ্ডরীক অল্প স্বল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি বড় ছিল না। তাহা না থাকুক, অন্য পক্ষে পুণ্ডরীকের সমকক্ষ কেহ ছিল না। একা বিহারীলাল ব্যতীত তাহার তুল্য বলবান সে অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যাইত না। লাঠি তরবারি খেলায়, বর্শা বন্দুকে শীকার করিতে, অশ্বে আরোহণ করিতে সে অদ্বিতীয়। দৌড়িতে, সাঁতার দিতে তাহার সঙ্গে কেহই পারিত না।

দেখিতেও পুণ্ডরীক অদ্ভুত রকম। আকৃতি খর্ব্ব, মাথাটা প্রকাণ্ড, চক্ষু ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ, বাহু আজানুলম্বিত। তাহাকে অনেকে বিদ্রূপ করিয়া জাম্বুবান বলিত— কিন্তু আড়ালে, তাহার সাক্ষাতে নয়। একবার একটা নূতন ঘোড়সোয়ার অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীককে জাম্বুবান বলিয়াছিল, পুণ্ডরীক কিছু না বলিয়া এক মুষ্ট্যাঘাতে তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বিহারীলালের কাছে নালিশ হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন, "উত্তম করিয়াছে। আবার যদি বলে তাহা হইলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে।" বিহারীলাল যেখানেই থাকুন পুণ্ডরীকের পথ অবারিত। যে গোপনীয় কথা বিহারীলাল আর কাহাকেও বলিতেন না তাহা পুণ্ডরীককে বলিতেন। পুণ্ডরীকও প্রাণান্তে তাঁহার কোন কথা প্রকাশ করিত না।

শীকারে বিহারীলালেরও দুই চারি জন লোক ছিল, কিন্তু পুণ্ডরীক যাইতে পারে নাই। শীকারের ঘটনা কাছারিতে, বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। পুণ্ডরীক বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বিহারীলালকে গিয়া বলিল, "লালজী"—বিহারীলালের ডাক-নাম—"তুমি না কি আজ একটা শূয়োরের ঠ্যাং ধরিয়া তাহাকে নাচাইয়াছিলে? শূয়োরের গায় কি হাত দিতে আছে? মহাভারত!"

বিহারীলালও হাসিয়া ফেলিলেন, "অত বিচার করিলে মনসবদারের কি হইত?"

"বেড়ে হইত, বরাহরাজ মনসবদারের ভুঁড়ি ফুটিফাটা করিয়া দিত!" নরসিংহ যেমন নখর দিয়া হিরণ্যকশিপুর উদর চিরিয়া ফেলিয়াছিলেন, পুণ্ডরীক দুই হাতের নখ দিয়া সেইরূপ নিজের পেট চিরিবার ভঙ্গী করিল।

বিহারীলাল হাস্য সম্বরণ করিলে পুণ্ডরীক তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি কহিল, "আর সেই যে যক্ষ- না মুনিকন্যা, সে কে?"

"জানি না", বলিয়া বিহারীলাল অন্যমনা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনসবদার জলালুদ্দীন

বাদশাহী আমলে দেশবিদেশ হইতে নানাজাতীয় বালিকা ও যুবতী আনিয়া ভারতবর্ষে বিক্রয় করা একটা ব্যবসা ছিল। সে ব্যবসা আরবদিগের হাতে। ধাউ নামে সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকায় অপহৃত বা ক্রীত কিশোরী ও তরুণীর চালান পাঠাইত, এদেশে পঁহুছিতেই দালালেরা খরিদ করিয়া লইত, পরে সুবিধা-মত গ্রাহক দেখিয়া বিস্তর লাভে বিক্রয় করিত। শুধু যে সুন্দরীর আমদানী এমন নহে, সব রকম রমণীর খরিদ্দার হইত। জঞ্জীবারের সীদী ও কাফ্রী স্ত্রীলোক সিন্ধুদেশে অনেক মূল্যে বিক্রয় হইত, পঞ্জাবে বেলুচি-স্তানের ও মেক্রান দেশের স্ত্রীলোক পসন্দ। কেবল বাদশাহী সহর দিল্লীতে কিছু পড়িতে পাইত না। সৌখীন বিলাসী ধনী ওমাশবীন অসংখ্য, রমণী বাজারে আসিলেই চিলের মত ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইত। পাঠানী, ইরাণী, তুর্কী, আরবী, সরকেশিয়ানী, ইহুদিনী, মিসরবাসিনী, ইটালী দেশীয়া রমণী, রুষিয়ার স্লাভ, ফ্রান্সের অঙ্গভঙ্গীহাবভাবচতুরা চপলা রমণী, স্পেনের কৃষ্ণকেশী কৃষ্ণতারচক্ষু দীর্ঘায়তনী সুন্দরী, ইংলণ্ডের নীলচক্ষু পিঙ্গলকেশী তরুণী, এমন দেশের স্ত্রীলোক ছিল না যে বাদশাহের হরমে ও আমীর-ওম্‌রাহের মহলে মিলিত না। চিড়িয়াখানায় যেমন সকল দেশের পশু পক্ষী থাকে, দিল্লীর প্রাচীরাবৃত জেনানায় সেইরকম সকল দেশের স্ত্রীলোক থাকিত।

জলালুদ্দীন দিল্লীর একজন ধনীর বেলুচী দাসীর পুত্র। জলালুদ্দীনের পিতা সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে মাতারও মৃত্যু হয়। জলালুদ্দীনের পিতার এক বন্ধু বালককে আশ্রয় দেন। যখন তাঁহার বয়স কুড়ি

বৎসর, তখন সুবেদার ফইয়াজ আলি সুবা বাঙ্গালায় যাইতেছিলেন। জলালুদ্দীনের পিতার বন্ধুর সুপারিষে সেই সঙ্গে জলালুদ্দীন সিপাহী হইয়া গেলেন। জলালুদ্দীন চতুর, পরশ্রমী, উপরওয়ালা কর্ম্মচারীদের তোষামোদ করিতে পটু। তাঁহার উন্নতি দ্রুত হইল। দশ বার বৎসরের মধ্যে মনসবদার হইলেন। নূরপুরে নিযুক্ত হইবার সময় রাজকর্ম্মচারী জলালুদ্দীনের যথেষ্ট প্রশংসা। যেমন কর্ম্মে দক্ষ, তেমনি রাজশাসনে মজবুত। তাঁহার প্রতাপে মহকুমার লোক ও জমিদারেরা থরহরি কাঁপিত।

সামান্য চাকরী হইতে বড় কর্ম্ম হইলে যে-সকল দোষ হয় জলালুদ্দীনের সে-সকল দোষ ছিল। তাহার উপর হিন্দুবিদ্বেষী ও দুষ্টচরিত্র। বিহারীলাল ও কয়েক জন হিন্দু তাঁহার প্রিয় পাত্র, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করিতেন। তবে তাঁহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার সময় সুবেদার ফইয়াজ আলি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "জলালুদ্দীন, তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমি কোন সংশয় করি না, কিন্তু তোমার ন্যায়-পরায়ণতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাদশাহ প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বা জাতি বিচার করেন না, হিন্দু মুসলমান তুল্য জ্ঞান করেন। এ বিষয়ে কোন অনুযোগ তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে তিনি নারাজ হইবেন।"

এ কথা মনসবদারের স্মরণ ছিল।

জলালুদ্দীনের তিন বিবি—মলেকা, ফতেমা, খদিজা। তিন বেগমের স্বতন্ত্র মহল, কিন্তু ফতেমা স্বামীর হৃদয়ের অনেকটা স্থান দখল করিয়া ছিলেন এবং জেনানায় আসিলে জলালুদ্দীন অধিকাংশ সময় তাঁহার মহলেই থাকিতেন। ফতেমা যে সপত্নীদিগের অপেক্ষা সুন্দরী তাহা নহে, কিন্তু তিনি সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও নানাপ্রকার কৌশলে স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতেন। তাঁহার বাবর্চিখানায় যেমন পাক হইত এমন আর কোন মহলে হইত না, তাহার কারণ ফতেমা নিজে উত্তম রন্ধন করিতে জানিতেন এবং বাঁদীদিগকে নিজে শিখাইতেন। তেমন জরদা পোলাও ও মুরগীর দোপেয়াজা জলালুদ্দীন কোথাও খান নাই। তেমনি তোফা সরাব ও শরবত। ফতেমা যখন স্বহস্তে শরবত প্রস্তুত করিতেন তখন জলালুদ্দীন মুগ্ধ নয়নে তাঁহার হস্তচালনা নিরীক্ষণ করিতেন; কোন সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, "বিবি, তোমাকে এমন হুনর কে শিখাইল?"

ফতেমা বলিতেন, "যার কাছে শিখিয়াছি। তিনি বাদশাহের হাবেলিতে পাচিকার কর্ম্ম করিতেন।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কিন্তু একটু কৌতুকের জন্য ফতেমা ঐরূপ করিতেন। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। মনসবদার পদস্থ হইয়া নিজের জন্মবৃত্তান্ত না ভুলিয়া যান ও পত্নী পাচিকা-কন্যা বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা না করেন, ফতেমা এইরূপ কৌশলে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন।

শিকারের পর সন্ধ্যার সময় জলালুদ্দীন অন্তঃপুরে আসিলে ফতেমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ শীকার কেমন হইল?" বেগম সমস্তই অবগত ছিলেন, কিন্তু প্রশ্নের ভাবে বিবেচনা হয় যেন তিনি কিছুই জানেন না।

মনসবদার সব কথা বলিলেন, কেবল বনে যে-রমণীকে দেখিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না। তিনি ফতেমাকে একটু ভয় করিতেন।

ফতেমা মনের অঞ্চলে একটা গাঁইট বাঁধিলেন।

অল্পক্ষণ বসিয়া জলালুদ্দীন উঠিয়া গেলেন। উঠিবার সময় কহিলেন, "সদরে কাজ আছে। এলাকা হইতে কিস্তি আসিবার কথা আছে।"

তিনি চলিয়া গেলে বেগম পুরাতন বিশস্ত বাঁদী নসরৎকে ডাকিলেন। সে আসিলে দরজা বন্ধ করিয়া বিবিতে বাঁদীতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

বাহিরে আসিয়া মনসবদার এলাকার কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সঙ্গে শীকারে রমজান নামক পুরাতন ভৃত্য গিয়াছিল। তাহাকে ডাকাইয়া গোপনে তাহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিলেন।

এ রাত্রে অন্দরে বাহিরে গোপনীয় পরামর্শের পালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গিরিগুহায়

রেবতী নদীর তীরে ত্রিকূট পর্ব্বত। নদীর স্রোতে অত্যন্ত বেগ, কিন্তু নদী তেমন প্রশস্ত নহে। পর্ব্বতের

এক পার্শ্ব ধৌত করিয়া নদী প্রবাহিত। কিছু দূরে পর্ব্বতের উপর মন্দির। গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লোক দেবতা দর্শন করিতে আসিত। পর্ব্বতের আর-এক দিকে বনজঙ্গল, সেদিকে বড় একটা লোকের যাতায়াত ছিল না, সময়ে সময়ে ব্যাঘ্র ভল্লুক আসিত। নিকটে লোকালয় ছিল না।

এক দিন মধ্যাহ্নের সময় এক ব্যক্তি নদী পার হইয়া পাহাড়ের পথে মন্দিরে না গিয়া সেই দিকে গমন করিল। সাধারণ পথিকের বেশ, হস্তে কোন অস্ত্র ছিল না। কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলে সাধারণ লোক মনে হয় না। দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্ত ললাট, ভ্রূ নিবিড়, চক্ষু তীব্রোজ্জ্বল, মুখের ভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ক্ষমতাশালী পুরুষের সকল লক্ষণ বিদ্যমান। এ পথে এমন পথিক বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেরূপ দ্রুত পদক্ষেপে কোন দিকে না চাহিয়া পথিক গমন করিতেছিলেন তাহাতে বিবেচনা হয় পথ তাঁহার পরিচিত। পর্ব্বতের নিকটে গিয়া পথিক দেখিলেন পথের আর কোন চিহ্ন নাই। তাহাতে নিরুৎসাহ বা নিরস্ত না হইয়া তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে আরও কিছু দূর গমন করিয়া পথিক একটা গিরিগুহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাধারণত যেরূপ গিরিগুহা হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ। একটু অপেক্ষা করিয়া, এদিক ওদিক দেখিয়া, পথিক সাবধানে সেই গুহায় প্রবেশ করিলেন।

পথিক পদ গণনা করিতেছিলেন। সপ্তদশ পদ গণনা করিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে কিছু অন্ধকার। পথিক বস্ত্রের মধ্য হইতে বাতি বাহির করিয়া জ্বালিলেন। আলোক দিয়া উত্তমরূপে দেখিয়া একখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া লইয়া পাহাড়ে বার কয়েক আঘাত করিলেন। আঘাতে সঙ্কেতের ভাব। আঘাত করিয়া বাতি নিবাইয়া দিলেন।

অল্পক্ষণ পরে পাহাড়ের ভিতর দিক হইতে কয়েক বার শব্দ হইল। পথিক আবার প্রস্তরখণ্ড দিয়া আঘাত করিলেন, কিন্তু এবার শব্দের সঙ্কেত অন্যরূপ।

নিঃশব্দে, অল্পে অল্পে অলক্ষিত দ্বার মুক্ত হইল। দ্বারে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া, বামহস্তে আলোক, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। পথিককে দেখিয়া সে তরবারি ও মস্তক নত করিল, নিঃশব্দে আলোক ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিল, পথিক তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

মুক্ত দ্বার আবার নিঃশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

কিছু দূর গিয়া পর্ব্বতের ভিতর একটি প্রকোষ্ঠ। কয়েকটি দীপে আলোকিত। প্রকোষ্ঠে চার জন লোক মৃগচর্ম্মের উপর উপবিষ্ট। পথিককে দেখিয়া তাহারা উঠিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। পথিক দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

এই চার ব্যক্তি পথিকের তুল্য তেজস্বী না হউক, কেহই সামান্য লোকের মত নহে। বেশভূষা আড়ম্বরশূন্য, কিন্তু সকলেরই মুখে কিছু বিশেষত্ব আছে। সকলেই মনস্বী, গম্ভীরপ্রকৃতি, স্বল্পভাষী। যে পথিক সর্ব্বশেষে আগমন করিলেন তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন। তাঁহাকে যে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল সে দ্বারের নিকট ফিরিয়া গেল।

পথিক কহিলেন, "আমাদের লোকেদের নিকট সকল দেশের সংবাদ পাইয়াছি। আপাততঃ কোথাও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, কোথাও বিশেষ অত্যাচার নাই। তবে এ সুবার সংবাদ তেমন সন্তোষজনক নহে। নূতন সুবেদার আসিয়াছে, সে লোভী ও অত্যাচারী। নূরপুরের মনসবদার দূরের কয়েক এলাকায় গোপনে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। অন্য দোষও আছে। বিশেষ সে হিন্দুবিদ্বেষী। পুরাতন সুবেদার ও বাদশাহের ভয়ে এতদিন প্রকাশ্যে কিছু করে নাই। এখন সে ভয় কতক দূর হইয়াছে। সুবেদার স্থানান্তরিত হইয়াছেন, বাদশাহ অনেক দূরে।"

চার জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কহিল, "বাদশাহের চক্ষু ও কর্ণ সর্ব্বত্র। তিনি শুনিতে বা জানিতে কতক্ষণ?"

পথিক কহিলেন, "সত্য। কিন্তু বাদশাহ সত্যও শুনিতে পারেন, মিথ্যাও শুনিতে পারেন। যে অত্যাচার করে সে অর্থব্যয় করিয়া কর্ম্মচারীর মুখ বন্ধ করিতে পারে, অথবা তাহাকে দিয়া মিথ্যা কথাও বলাইতে পারে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "বাদশাহ আমাদের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। সে বিষয়ে কোন সংবাদ আছে?"
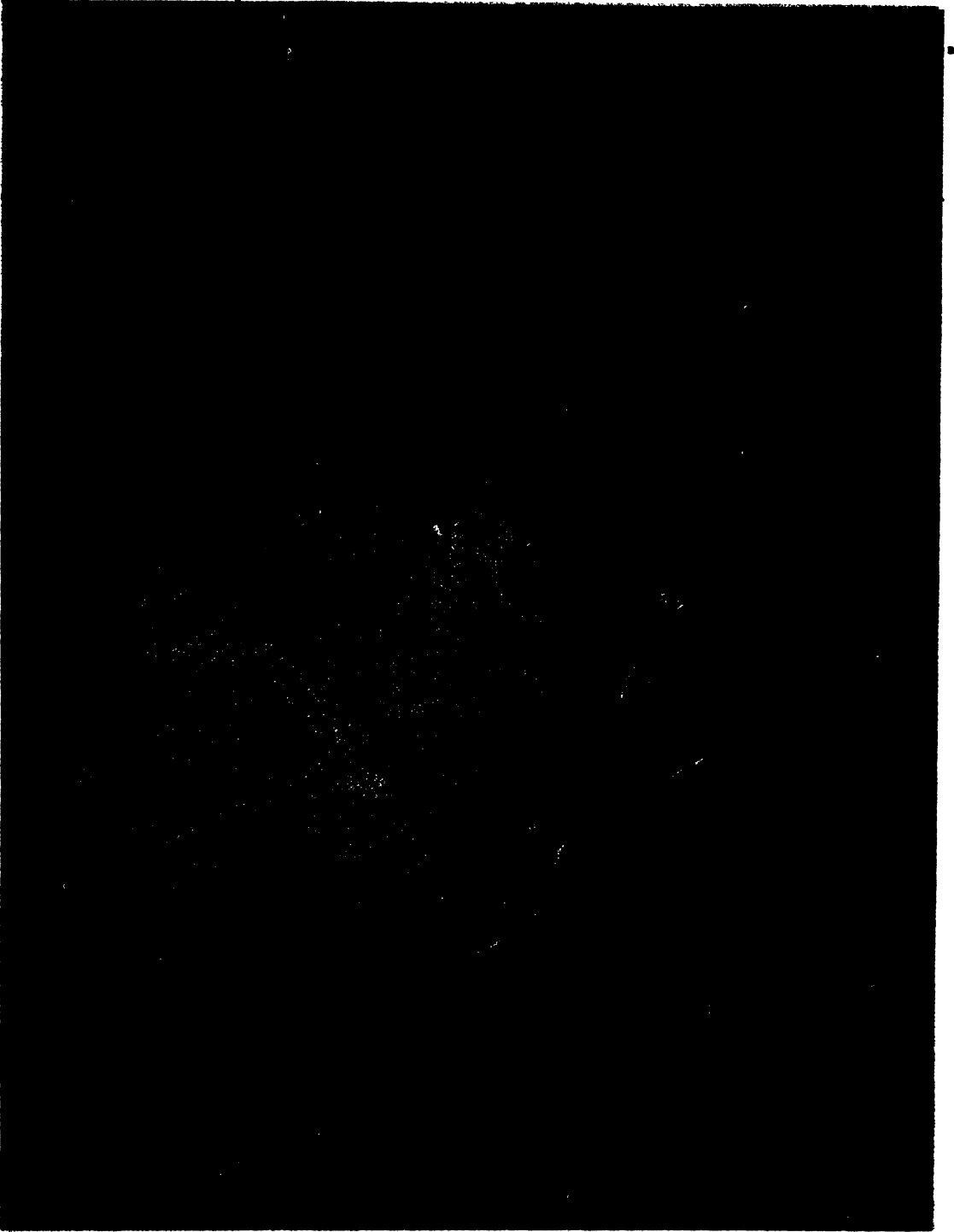
অন্ধ বালক

চিত্রকর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

"আছে। গুপ্তচর-বিভাগের নায়েব মন্ত্রীর নিকট খবর তলব করিয়াছেন। চরেরা সর্ব্বত্র মুখে মুখে আদেশ পাইয়াছে, কিন্তু কোনরূপ পরোয়ানা জারি হয় নাই। বাদশাহও কোনরূপ ফর্মান কিম্বা ইরশাদ প্রচার করেন নাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাতে আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ আছে?"

প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি পথিক একবার বিদ্যুতের ন্যায় কটাক্ষ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিজের কোন আশঙ্কা হইতেছে?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "কিছু মাত্র না। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, কোনরূপ আশঙ্কা থাকিলে, অথবা কোনও কালে আশঙ্কার সম্ভাবনা হইলে, তাহা করিতে পারিতাম না। আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য, যে কার্য্যে আমরা নিযুক্ত আছি, তাহার কোন ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা আছে কি না।"

"তোমার কথাতেই ইহার উত্তর দেওয়া যায়, কিছু মাত্র না। যে কয়জন আমরা এখানে উপস্থিত আছি যদি এই দণ্ডে নিহত হই তাহা হইলেও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের কোনও ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের সম্প্রদায়ের সকল কথাই তোমরা অবগত আছ, তবে এ সংশয় কেন? বাদশাহের বাদশাহী নিমেষের মধ্যে যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের কর্ম্ম কখন নিবারিত হইতে পারে না, কারণ আমাদের কাহারও কোনরূপ স্বার্থ নাই, অথচ আমাদের সঙ্কল্পও বিচলিত হয় না। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম একজন না পারে আর-একজন করিবে।"

অপর দুই ব্যক্তি নীরবে সকল কথা শুনিতেছিল, একটিও কথা কহে নাই।

পথিককে যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল সে আসিয়া দূরে দাঁড়াইল। সঙ্কেত-মত নিকটে আসিয়া পথিককে একটি অঙ্গুরী দেখাইল। দেখিয়া পথিক কহিলেন, "এখানে লইয়া আইস।"

দ্বাররক্ষক ফিরিয়া গিয়া একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিল।

বনে মন্মথনাথ ও বিহারীলাল যাহাকে দেখিয়াছিলেন এই সেই রমণী!

পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে?"

রমণী স্পষ্ট মধুর স্বরে কহিল, "আদেশ পালন করিয়াছি।"

"উত্তম। তোমার আবাসস্থান কেহ অবগত আছে?"

"আপনি আছেন।"

এইবার প্রথম পথিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। পথিক কহিলেন, "আমি না জানিলে তুমি কেমন করিয়া যাইতে? আর কেহ জানে?"

"বলিতে পারি না, কিন্তু আর কেহ জানে বলিয়া মনে হয় না।"

"যাহাদের কথা বলিয়াছিলাম তাহাদিগকে দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি।"

"তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছ?"

"বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চেষ্টা করিতে পারি নাই।"

পথিক কহিলেন, "আবশ্যক হইলে তোমায় সংবাদ দিব অথবা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

রমণী চলিয়া গেল। পথিক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপর চারি জনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। সংক্ষেপে সম্ভাষণ করিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। কেহ কাহারও নাম করিলেন না, ব্যক্তিগত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকলেই অজ্ঞাত রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী

জব্বলপুর ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের মধ্যে নাগপুরের পরই উল্লেখযোগ্য বড় সহর। জব্বলপুরের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থান। সহরের চারি পাঁচ মাইল দূরে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত, এখান হইতে তের মাইল দূরে নর্ম্মদা নদীর জলপ্রপাত ও মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় (marble rocks)। এই পাহাড় ভেদ করিয়া নর্ম্মদা নদী নিজের পথ কাটিয়া লইয়াছে। ইহা জগৎবাসীর একটি প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান। ইহা ছাড়া আরও অনেক দেখিবার জিনিষ আছে, যেমন হ্রদ (reservoir) যেখান হইতে এখানকার জল সরবরাহ হয়, 'মদনমহল' যাহা স্বনামপ্রসিদ্ধা রাণী দুর্গাবতীর শেষ যুদ্ধের স্থান, ইত্যাদি। জব্বলপুর সম্বন্ধে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠকগণের জ্ঞাতব্য এই যে এখান হইতে ১৩ মাইল দূরে, যেখানে জলপ্রপাত ও মর্ম্মর পাহাড় আছে, সেইখানেই ভৃগুমুনির আশ্রম ছিল এবং সেইজন্য ইহার নাম "ভৃগুক্ষত্র"। জব্বলপুর চিত্রকূট পাহাড়ের প্রায় ১৮০ মাইল দক্ষিণে এবং খাণ্ডব-অরণ্যের ('বর্ত্তমান খাণ্ডোয়ার) প্রায় ২৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা নর্ম্মদাক্ষেত্রের অন্তর্বর্ত্তী বলিয়া তীর্থ হিসাবে একটি প্রধান স্থান।

জব্বলপুরে বাঙ্গালীদের থাকিবার জায়গা দুইটি—প্রথম, সহর, এবং দ্বিতীয়, সহর হইতে প্রায় তিনমাইল ব্যবধানে ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট অথবা সদর বাজার। জব্বলপুরের কমিশারিয়াট আফিস বেশ একটি বড় আফিস ছিল এবং সেই আফিসটি বঙ্গের অধিকার হইতে বাংলার অধিকারে আসায় এবং তাহার অধিকাংশ কর্ম্মচারী বাঙ্গালী হওয়ায় সদর বাজারও বাঙ্গালীদের বেশ একটি ছোটখাট কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দূরতা হেতু সহরের বাঙ্গালীদের এবং সদরের বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কমই সংস্রব ছিল; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে আপনাদের জীবন কাটাইতেন। সহরের বাঙ্গালীরা পৃথক দুর্গাপূজা করিতেন এবং সদরের বাঙ্গালীরাও পৃথক দুর্গাপূজা করিতেন; তবে লর্ড কিচ্‌নারের সময়ে জব্বলপুরের কমিশারিয়াট আফিস ভাঙ্গিয়া তাহার অধিকাংশ কর্ম্মচারীকে মৌএ বদলি করা হয়। সেই অবধি সদর বাজারে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের পৃথক দুর্গাপূজাও বন্ধ হইয়াছে। সদরের বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা সেখানকার বাঙ্গালীদের নেতা ৺ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই সম্পন্ন হইত। বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা ছাড়াও সেখানকার মাদ্রাজীদের আর-একটি দুর্গাপূজা হইত এবং তাহা এখন পর্য্যন্তও তাঁহারা ধারাবাহিকভাবে চালাইতেছেন। মাদ্রাজীদের এবং আমাদের দুর্গাপূজার মধ্যে প্রভেদ এই যে আমাদের দুর্গাপূজা সাধারণতঃ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, মাদ্রাজীদের পূজা বৈদিক পদ্ধতিতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়, যিনি প্রায় একশত বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন, তিনিই বোধহয় এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি প্রথমে কমিশারিয়াটে কার্য্য করিতেন এবং সেই কার্য্যসূত্রে মিউটিনীর পূর্ব্বে জব্বলপুরে আসেন। যদিও সিংহ মহাশয় কমিশারিয়াটের কর্ম্মসূত্রে এখানে প্রথমে আসেন, কিন্তু পরে তিনি এখানকার ডিপুটি কমিশনারের আফিসে কর্ম্ম লইয়াছিলেন এবং কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াও পেন্‌সন প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল এখানে কাটাইয়াছেন। তিনি অতি সৎ ও পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি অতি প্রাচীন বয়সেও বেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং এখানে যে-কেহ নূতন বাঙ্গালী আসিতেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নবাগত বাঙ্গালী মহাশয়ের বাসস্থান ও থাকিবার সমুদায় বন্দবস্ত ঠিক করিয়া দিতে না পারিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি থাকিত না। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম রেখা-লিপির (shorthand writing) প্রবর্ত্তক। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাড়ী জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে সকলের বসিবার স্থান ছিল। এবং শুনিয়াছি রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান অনেকেই বিলাতের যাতায়াতের রাস্তা হিসাবে সেই বাটীতে পদার্পণ ও দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া

গিয়াছেন। জব্বলপুরের স্বনামখ্যাত উকীল ৺ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (যাঁহার বিবরণ পরে লেখা হইয়াছে) সিংহ মহাশয়ের শ্যালিকা-পুত্র ছিলেন এবং সিংহ মহাশয়ের বাসের কারণেই শ্রীশ-বাবুর আন্দাজ ১৮৭৬ সালে জব্বলপুরে প্রথম আগমন হয়।

কেহ বলেন—৺ মথুরামোহন বসু, এবং কেহ কেহ বলেন—হালদার মহাশয় নামে একজন বাঙ্গালী এখানকার প্রথম প্রবাসী বাঙ্গালী। হালদার মহাশয় জব্বলপুরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন।

জব্বলপুরস্থ পুরাতন বাঙ্গালীদের মধ্যে ৺ শ্রীনাথ বসু, ৺ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং ৺ বীরেশ্বর দত্ত মহাশয়দিগের নাম শুনা যায়। ইঁহারা সকলেই রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী (এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার) ছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জব্বলপুরের আর-একজন পোষ্টমাষ্টারও বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার নাম হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব কম লোকেই জানেন যে রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান জব্বলপুর। যে বাড়ীতে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন সেই বাড়ীতে অথবা তাহার খুব নিকটেই আজকাল বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

জব্বলপুর আজকাল মধ্য প্রদেশে নাগপুরের নীচেই প্রসিদ্ধ স্থান হইলেও ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এতটা প্রসিদ্ধ ছিল না। মহারাষ্ট্র রাজাদিগের সময়ে এ প্রদেশের রাজধানী ছিল সাগরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের জংসন হওয়ার কারণে জব্বলপুর ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পূর্ব্বে সাগরই এ প্রদেশে বড় স্থান ছিল। যেটি এখন জব্বলপুর কলেজ নামে পরিচিত, তাহা পূর্ব্বে ১৮৩৬ সালে সাগরে স্কুলরূপে স্থাপিত হয় এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সাগর হাইস্কুল নামে পরিচিত ছিল। সেই স্কুলের প্রথম হেড্ মাষ্টার বাঙ্গালী। Col. Sleeman's Rambles and Recollections পুস্তকে তাঁহার নাম আছে মনে হয়। সাগর হইতে ৺ দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় এ প্রদেশে সর্ব্ব প্রথমে এল-এ পাশ করেন। সেইজন্য কিংবদন্তী আছে যে এখানকার চিফ কমিশনারের সম্মুখে নগরবাসীরা তাঁহাকে হাতীতে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করান। ইনি পরে সাগর হাইস্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য লয়েন এবং স্কুল ও কলেজ পরে জব্বলপুরে স্থানান্তরিত হইলে তিনি জব্বলপুরে আসেন এবং ক্রমে স্কুলের হেড্ মাষ্টার হয়েন। শুনিয়াছি সাগরে বাঙ্গালীরা ১০৭ বৎসর হইতে দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন। জব্বলপুরের বাঙ্গালীরাও দুর্গাপূজা প্রায় ৭০।৮০ বৎসর হইতে ধারাবাহিক রূপে করিয়া আসিতেছেন।

জব্বলপুরের বাঙ্গালীরা এখানে সাধারণের উপকারের কার্য্য অনেক করিয়াছেন। এখানকার সর্ব্বপ্রধান স্থানীয় সভা, যাহা হিতকারিণী সভা নামে পরিচিত, তাহা প্রথমে বাঙ্গালীদেরই দ্বারা স্থাপিত এবং তাহার সেক্রেটারী এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বাহাদুরী এই যে তিনি নিতান্ত হীনাবস্থা হইতে শুধু নিজ ক্ষমতাবলে জব্বলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন এবং তাঁহারই বাটীতে আজকাল এখানকার বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। ৺ কৈলাসচন্দ্র দত্ত শাস্ত্রী, এম-এ এখানকার কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক শুধুই যে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে; তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী চৌকষ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বনামখ্যাত ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বিলাত-যাত্রা-বৃত্তান্ত যাহা "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহার সর্ব্বপ্রথমে কৈলাসবাবুর নাম দেখিতে পাইবেন। কৈলাস-বাবু কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। কাউয়েল কর্ত্তৃক সম্পাদিত দশকুমারচরিতের সংস্করণের ভূমিকায় তিনি যে কৈলাস-বাবুর সম্পাদিত সংস্করণ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন এরূপ উল্লেখ আছে। তিনি আরো দুই-একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশিত হয় নাই এবং এখন যে তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রকাশিত হইবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। হিতকারিণী সভার তিনি একজন প্রধান সভ্য

ছিলেন এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা অম্বিকা-বাবু ও কৈলাস-বাবুর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। জব্বলপুরের হিতকারিণী সভার প্রধান কার্য্য—এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাধারণের স্কুল—হিতকারিণী স্কুল—স্থাপন ও পরিচালনা। নাগপুরের স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী রায় বাহাদুর সার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় জব্বলপুরের হিতকারিণী হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই দেশে আসেন, পরে জব্বলপুর হইতে ওকালতি পাশ করিয়া নাগপুরে যান। তাঁহার নাগপুর যাওয়ার পর ৺ কালীচরণ বসু মহাশয় অনেকদিন পর্য্যন্ত হিতকারিণী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। জব্বলপুরের সাধারণের উপকার করা তাঁহার জীবনের একটি ব্রত-স্বরূপ ছিল। প্রাতে গরীব-দুঃখীকে বিনামূল্যে ঔষধদান, সমুদায় দিন স্কুলে পরিশ্রম, তাহার পরে আবার নাইট স্কুল করিয়া গরীব-দুঃখীকে বিদ্যাদান—ইহাই তাঁহার দৈনন্দিন জীবন ছিল। ১৮৯৬-৯৭ সালে যখন এ প্রদেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন কালী-বাবু কৈলাস-বাবু ইত্যাদির চেষ্টায় অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হয়। তাঁহারা ২।৩ শত লোককে রোজ খিচুড়ী বিতরণ করিয়া খাওয়াইতেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানে সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রম করেন এখানকার ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরাট এম-বি মহাশয়। তাঁহারই চেষ্টায় জব্বলপুরের সাধারণ কর্ত্তৃক একটি Poor House বা দরিদ্রাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল; সুরেন্দ্র-বাবু সেক্রেটারীরূপে তাহার কার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং পরে গভর্ণমেণ্ট হাতে লইলেও শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনের ভার সুরেন্দ্র-বাবুর হাতেই ছিল। তাঁহার এই চেষ্টার ফলে দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানে যে কত লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে তাহা বলা দুরূহ। কালী-বাবু এখানকার ভৃগুক্ষেত্র থিওসোফিকাল সোসাইটির একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন; তিনি এবং এখানকার উকীল শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ বি, মহাশয় অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই সভা চালাইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বালিকা লইয়া হিতকারিণী সভার পক্ষ হইতে অম্বিকা-বাবু একটি অনাথাশ্রম খুলিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের সাহায্যের অভাবে তাহা ক্রমে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

মধ্যপ্রদেশের ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডারের কার্য্য অতীব প্রশংসার সহিত চালিত হইয়াছিল। তাহার অন্যতম সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু এবং সেই কার্য্যের জন্য তিনি ১৮৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী সি আই ই উপাধি পান। জব্বলপুরের দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডারের কার্য্য অতীব সুখ্যাতির সহিত সিভিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ম্যাকে এবং এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরাট চালাইয়াছিলেন এবং সেইজন্য সেইসময়ে ম্যাকে সাহেব সি-আই-ই এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরাট মহাশয় রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েন।

একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে জব্বলপুরের সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালী ছিলেন উকীল ৺ শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। তাঁহার বাড়ী কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুরে; এবং পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে এখানকার ৺ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সম্পর্কসূত্রে আন্দাজ ১৮৭৬ সালে তাঁহার জব্বলপুরে প্রথম আগমন হয়। তিনি এন্‌ট্রান্‌স্ ও প্লিডারশিপ পাস করিয়া এদেশে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় অনেক বড় বড় এম-এ বি-এল উকীল ও ব্যারিষ্টারকেও পরাজয় মানিতে হইল। এরূপ শুনা যায় যে জব্বলপুরের মতন গরীবস্থানেও তিনি এক সময়ে মাসে দুই আড়াই হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন। জব্বলপুরের প্রসিদ্ধ ধনী রাজা গোকুলদাসের অবস্থা এমন কিছু সমৃদ্ধিশালী ছিল না এবং তাঁহার নামও বড় বেশী কেহ জানিত না। শ্রীশ-বাবুর পরামর্শক্রমে চলিয়া তিনি এ প্রদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও জমীদার-রূপে প্রসিদ্ধ হয়েন এবং ক্রমে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা উপাধি পান। জব্বলপুরের যাহা-কিছু লোকহিতকর সাধারণ কার্য্য,—টাউনহল, ওয়াটার ওয়ার্ক্‌স্ ইত্যাদি—তাহার সমুদায় রাজা গোকুলদাসের বদান্যতায় ও দূরদৃষ্টিতে স্থাপিত এবং সেই বদান্যতার ও দূরদৃষ্টির মূলে শ্রীশ-বাবুর পরামর্শ। শ্রীশ-বাবুর প্রতিভা যে শুধু আদালতে বদ্ধ ছিল তাহা নহে।

তিনি রসায়ন (Chemistry), খনিবিদ্যা (Mining), ভূতত্ত্ব (Geology) ইত্যাদি বিষয়েরও খবর রাখিতেন এবং তাহার কতকগুলিতে বেশ উন্নতিলাভও করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শক্রমে রাজা গোকুলদাস তাঁহার নিজের ও ভ্রাতুষ্পুত্র বল্লভদাসের নামে, গোকুলদাস বল্লভদাস মিল (Gokuldas Ballabhdas Mills) নামে সুতা ও কাপড়ের কল স্থাপন করেন এবং মধ্যে সেই কলটির অবস্থা যখন মন্দ হইয়া ক্রমে তাহার কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, শ্রীশ-বাবুর চেষ্টায় তাহা পুনর্জীবন লাভ করে। মধ্যপ্রদেশও বেরার তুলার জন্য বিখ্যাত এবং এখানে রাজা গোকুলদাস যে অনেকগুলি তুলা-ধোনা কল (Ginning Factory) স্থাপন করেন তাহাও শ্রীশ-বাবুর পরামর্শক্রমে। এখানে পারফেক্ট পটারি ওয়ার্ক্‌স্ (Perfect Pottery Works) এবং রাজা গোকুলদাস বল্লভদাসের খনি সম্বন্ধে যে চেষ্টা তাহারও মূলে তিনিই ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জব্বলপুরের বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

আন্দাজ ১৮৮৮ সালে শ্রীশ-বাবুর একটু দূরসম্পর্কীয় জামাতা কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশীয় ৺ ধীরাজকৃষ্ণ ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয় জব্বলপুরে আসেন। সুন্দর, সুপুরুষ, সুবক্তা ও ধীর বিবেচনাগুণে তিনি শ্রীশ-বাবুর বর্ত্তমানেই জব্বলপুর বারে (bar) প্রধান পদ লইয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলীর জন্য একদিকে লোকসাধারণ তাঁহাকে যেরূপ মান্য করিত, তাঁহার ধীর বুদ্ধিমত্তার জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। এই কারণে বর্ত্তমান কালে জব্বলপুরে রাজা-প্রজা-সম্পর্কীয় যে কয়েকটি আধা-সরকারী সাধারণ (Semi-offical public) কাজ হইয়াছে তাহার সবগুলিতে তিনি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি জব্বলপুর ডিভিসনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কমিটির সেক্রেটারী হইয়াছিলেন এবং পরে ১৯০৮ সালে নাগপুরের একজিবিসন (প্রদর্শনী) কমিটির ও জব্বলপুর শাখার সম্পাদক হয়েন। এখানকার স্থানীয় ভার্গব্‌ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের তিনি আইন সম্বন্ধে

৺ ধীরাজকৃষ্ণ ঘোষ, বার-এট্‌-ল,
জব্বলপুর বার লাইব্রেরীর জনপ্রিয় নেতা

পরামর্শদাতা ছিলেন ও আমার যতদূর জানা আছে তাহার প্রতিষ্ঠাতেও তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য ছিল। দুইবৎসর হইল তিনি অকালে ৫৩ বৎসর বয়সে হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গিয়াছেন। ঘোষ সাহেব অতি মিষ্টভাষী ও মিশুক লোক ছিলেন। তাঁহার, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বরাটের এবং এখানকার ভূতপূর্ব্ব সিভিল্ জজ্ ৺ মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এখানে ওরিয়েণ্টাল ক্লাব নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে ক্লাবটি বেশ উন্নতিশীল অবস্থায় পদার্পণ করে। এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের একমাত্র মিলনের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে খুব কম স্থানে যাহা হইয়াছে ঘোষ সাহেব, ডাক্তার বরাট্ প্রভৃতির চেষ্টায় তাহা অর্থাৎ ক্লাবের নিজের বাড়ী পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের অনেক কার্য্যের শেষ কালে যাহা ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল অর্থাৎ এত চেষ্টা করিয়াও ক্লাবটিকে তাঁহারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা যে রাস্তা

দেখাইয়া গিয়াছেন সেই রাস্তা ধরিয়া অন্য ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এবিষয়েও জব্বলপুরের বাঙ্গালীরা অগ্রণী বলিতে হইবে।

শ্রীশ-বাবুর আর-এক একটুদূরসম্পর্কীয় জামাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এখানে গোকুলদাস বল্লভদাসের মিলে উইভিং মাষ্টার ছিলেন ও পরে জেলের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েন। বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ দীর্ঘাকার সুপুষ্ট সবল পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তিনি যেরূপ চেহারায়, কার্য্যেও সেইরূপ সাহসী ও বীর ছিলেন—যেমন ঘোড়ায় চড়িতে সেইরূপ বন্দুক ছুড়িতে পারিতেন। তখন (১৯০২-১৯০৩ সালে) বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বয়নকার্য্য এক তিনিই শিখিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পূর্ব্বেই আমাদের দেশী তাঁতের উন্নতির জন্য তিনি বাড়ীতে যন্ত্রাদি আনিয়া সে সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই একজন অনিপুণ ডাক্তারের হাতে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান অবস্থায় অস্ত্রোপচারে তাঁহার আর জ্ঞান হইল না, সেই অবস্থাতেই প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের অনেক উপকার করিতে পারিতেন—স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার মাতুলের সাহায্যে তিনি চন্দননগরে একটি ছোট কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন।

উপস্থিত সময়ে আর-একজন বাঙ্গালীর নাম বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য। ব্যারিষ্টার প্যারীচাঁদ দত্ত ব্যারিষ্টারী লাইনে থাকিয়া, খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার এবং তাহা কার্য্যোপযোগী করা বিষয়ে যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেছেন, (Geological Department) ভূতত্ত্ব-বিভাগের লোক ভিন্ন যে অন্যের দ্বারা তাহা সম্ভব তাহা লোকে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারিত না। ব্যারিষ্টারী লাইনে থাকিয়াও ইঁহার মনের গতি বরাবর খনিজ আবিষ্কারের দিকে। যে সময়ে তিনি খনিজ আবিষ্কারের দিকে প্রথম মন দেন, মধ্যপ্রদেশ যে নানা প্রকার খনিজ পদার্থে এরূপ সম্পত্তিশালী তখন লোকে তাহা জানিত না। ইহাই তাঁহার প্রধান বাহাদুরী এবং আজকাল এবিষয়ে মধ্য-প্রদেশ যে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ দত্ত মহাশয়ের চেষ্টা ও অধ্যবসায়। তিনি নিজে সময় ও অর্থব্যয় করিয়া এখানে কতকগুলি ম্যাঙ্গানিজ, বক্‌সাইট, সীসা, সাবান-পাথর, গন্ধক-লৌহ-তামা-মিশ্রিত ধাতুজ (Manganese, Bauxite, Galena, Soapstone, Pyrites) ইত্যাদির খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি ম্যাঙ্গানিজের খনি আমেরিকার প্রসিদ্ধ কার্ণেগী ও এখানকার টাটা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়াছেন। জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী কাটনীতে তাঁহার আবিষ্কৃত বক্‌সাইট্ হইতে বিলাতী-মাটী প্রস্তুত করিবার কারখানা ভারতবর্ষে প্রথম। এবং তাঁহার আবিষ্কৃত খনিজ পদার্থগুলি যাহাতে আরো কাজে লাগাইতে পারেন সেইজন্য বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তিনি এক বৎসর হইতে বিলাতে আছেন।

জব্বলপুরের অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে খুইমাটি (white ball clay) প্রসিদ্ধ। কলিকাতার বার্ণ কোম্পানি সর্ব্বপ্রথমে এই খুইমাটি কাজে লাগাইবার জন্য রাণীগঞ্জে যেরূপ তাঁহাদের একটি পটারির কারখানা আছে, ১৮৮৮ সালে জব্বলপুরে ঐরূপ একটি কারখানার সূত্রপাত করেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা রাণীগঞ্জ হইতে তাঁহাদের একজন শিক্ষিত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পঠান এবং নগেন্দ্র-বাবুর প্রস্তুত দ্রব্যাদিতে কলিকাতার হেড আফিস সন্তুষ্ট হইলে রীতিমত কারখানা তৈয়ারীর হুকুম দেন এবং ম্যানেজার প্রভৃতি পাঠাইয়া কার্য্য বিস্তারের বন্দোবস্ত করেন। ক্রমে নগেন-বাবু এখানে অন্যান্য খুইমাটির খনি আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত ঐরূপ একটি খনি লইয়া শ্রীশ-বাবুর পরামর্শক্রমে রাজা গোকুলদাসের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র (রায় বাহাদুর জীবনদাস ও দেওয়ান বাহাদুর বল্লভদাস) তখনকার বার্ণ কোম্পানীর পটারির ম্যানেজার রোজ সাহেব ও কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নগেন-বাবুদিগকে লইয়া পারফেক্ট পটারি ওয়ার্কস্ নামে নূতন একটি পটারির কারখানা খুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

জব্বলপুরের বর্ত্তমান বাঙ্গালী অধিবাসীর মধ্যে বর্ষীয়ান ও সকলের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ না হইলে আমার বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। মোহনচন্দ্র-বাবুর পিতা ৺ রামচন্দ্র চট্টো-

প্রাধ্যায় মহাশয় খড়দহ হইতে প্রথমে এলাহাবাদ ও আগ্রা যুক্তপ্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী হামিরপুরে কার্য্যোপলক্ষে আসেন; পরে তথা হইতে প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে প্রথমে সিহোরে ও পরে হোসাঙ্গাবাদে পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। মোহনচন্দ্র-বাবুর জন্ম ১৮৯৯ বিক্রম সম্বৎ (১৮৪২ খৃষ্টাব্দ) মার্চ্চ মাসে, সুতরাং তাঁর বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর হইল। বাড়ীতেই বাংলা, ফারসী ও ইংরেজী শিক্ষা করিয়া সরকারী কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ যোগ্যতা গুণে ক্রমে একষ্ট্রা অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদ লাভ করেন। ও পরে যোগ্যতার সহিত কর্ম্ম করিয়া ঐ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের প্রায় সকল জেলাই ইনি ঘুরিয়াছেন এবং এইরূপে ইঁহার নিকট হইতে অনেক কৌতূহলজনক পুরাতন গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যখন শুধু মোগলসরাই পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল তখন মোগলসরাই হইতে এদেশে আসা কিরূপ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর ছিল মোহনচন্দ্র-বাবুর গল্পে তাহা অতি সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয়। এ দেশের বাঙ্গালী প্রবাসীর পক্ষে তখন পুত্রকন্যার জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ খুঁজিয়া লওয়া ও বিবাহ কার্য্য সমাধা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল। মোহনচন্দ্র-বাবুর নিকট শুনা যায় তখন এদেশে একজন বাঙালী ঘটক ছিলেন যাহার কাজই ছিল এই ব্যাপারে মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাংলা ঘুরিয়া সম্বন্ধ ঠিক করা। মোহনচন্দ্র-বাবু ভাণ্ডারায় থাকেন। তখন এই ঘটকের চেষ্টায় ভাণ্ডারার একটি পাত্রীর অম্বালায় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং ঘটক মহাশয় অম্বালা হইতে গরুর গাড়ী করিয়া পাত্র সহিত একমাসে ভাণ্ডারা আসিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা করেন। মোহনচন্দ্র-বাবু সেন্সস্ উপলক্ষে বারুই (তাম্বুলী) ও নাপিত জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অনেক পরিশ্রমের সহিত সংগ্রহ করেন এবং সেইজন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন। ইনি এখন অবসর লইয়া এখানকার সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন।

জব্বলপুরের সৌভাগ্যক্রমে দুই জন সাহিত্যসেবী এখানে কিছুদিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাহা অল্পদিনের জন্য। বঙ্গের সুকবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন স্বাস্থ্যলাভের চেষ্টায় দুই তিন বৎসর এখানে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ সময়ের কবিতাগুলি (গণেশ-মঙ্গল ইত্যাদি) এই স্থান হইতে লেখা; তাঁহার গ্রন্থগুলির নূতন সংস্করণ ছাপারও এখান হইতেই বন্দোবস্ত হয়। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও প্রায় সেই সময়েই জব্বলপুরের ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার হইয়া আসেন। হরিদাস বাবুর লেখার অভ্যাস অনেকদিন হইতেই ছিল। কিন্তু তাঁহার জব্বলপুর আগমনের সময় হইতেই বলিতে গেলে তিনি সাহিত্যসেবায় জীবন মন সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপত্র আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা নিয়ম-মত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে হরিদাস-বাবুর লেখনী কিরূপ অক্লান্ত ও লেখা কিরূপ সরস। পূজনীয় শিশির-বাবুর তিরোধানের পর আনন্দবাজার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও হরিদাস-বাবু বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তার চেষ্টায় যাহা করিয়াছেন আর কেহই তাহা করিতে পারেন নাই। হরিদাস-বাবুও দুই তিন বৎসর জব্বলপুরে থাকিয়া ভূপালে পোষ্টমাষ্টাররূপে বদলি হইয়াছেন। সুতরাং জব্বলপুরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে।

আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য, তবে তাহা একটু স্বতন্ত্র ধরণে। তিনি প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে প্লেগে মারা যান। তাঁহার নাম ছিল উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। তবে জব্বলপুরের বাঙ্গালী সাধারণের নিকট তিনি মামা নামেই পরিচিত ছিলেন। গঞ্জিকা সেবনের জন্য তিনি নিজের ভাবেতে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার প্রথম হইতে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং কালক্রমে সেই ঝোঁক নর্ম্মদা নদীর বালুকারাশি হইতে স্বর্ণ নিষ্কাসনের চেষ্টায় পরিণত হয় এবং তাহাই শেষে তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জীবনের শেষ ভাগে তিনি তাহা অপেক্ষা আরো একধাপ উচ্চে উঠিয়াছিলেন। তাহা অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্তুত করা। তিনি মধ্য বয়সে ডেপুটি কমিশনারের আফিসে কার্য্য করিতেন। একদিন

আফিসের সাহেব তাঁহার উপর কোন কারণ বশতঃ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মারিতে দৌড়ান। তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং ডেপুটি কমিশনারের আফিসের সম্মুখেই টেলিগ্রাফ আফিসে যাইয়া তৎক্ষণাৎ গভর্ণর জেনারেলকে এক তার প্রেরণ করেন "Umacharan in danger, send troops at once". মধ্যপ্রদেশে অনেক ছোট ছোট করদ রাজা আছেন। সুতরাং গভর্ণর জেনারেল মনে করেন যে তার-প্রেরণকারী উমাচরণ সেইরূপ করদরাজার মধ্যে কেহ একজন হইবেন। যাহা হউক তার তখনই ফরেন আফিসে (Foreign Office) প্রেরণ করা হইল, ফরেন আফিস হইতে জব্বলপুর কমিশনারের নিকট তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য তার আসিল, কমিশনার তাহা আবার ডেপুটি কমিশনারকে পাঠাইলেন, এইরূপে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে জব্বলপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পরে তার আফিসে তদন্তে প্রকৃত ঘটনা বাহির হওয়ায় জব্বলপুর হইতে সিমলা পর্য্যন্ত সকলে সুস্থির হইতে পারিলেন এবং উমাচরণ বাবু ভবিষ্যতে পুনরায় এরূপ কার্য্য না করেন এরূপ ধমক দিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। জব্বলপুরের বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে এই গল্পটি এত প্রচলিত যে ইহার মূলে ভিত্তি না থাকিলে এরূপ প্রচলিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একসময়ে জব্বলপুর অঞ্চলে অনেক বড় বড় রাজকর্ম্মচারী বাঙ্গালী ছিলেন এবং বারেও (Bar) তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল। এখানে বড় হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত ডাক্তারও উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন—ডাক্তার রাধানাথ, উপেন্দ্রমোহন, রায়বাহাদুর ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বরাট ইত্যাদি। ১৮৯৬ সালের পূর্ব্বে জব্বলপুরে চারজন বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন—সংস্কৃতাধ্যাপক ৺ কৈলাসচন্দ্র দত্ত, ইংরেজী অধ্যাপক ৺ হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, আইন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ৺ হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ৩৯ বৎসর বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব দত্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অপ্টিম (Senior Optime) এবং তাঁহার নাম বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ-বিদ্যা সম্বন্ধে সুপরিচিত। তিনি মধ্যপ্রদেশ ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিভাগে নিজ কার্য্য বদলি করিয়া লয়েন এবং এক্ষণে শ্রীহট্টে মুরারীচাঁদ কলেজের প্রিন্সিপাল। এ প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে প্রায় সমুদয় সরকারী কার্য্যবিভাগেই বাঙ্গালীর সংখ্যা স্বাভাবিক কারণে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

স্থানীয় উকিল ব্যারিষ্টার মহলে এখনও বাঙ্গালীর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ৺ শ্রীশচন্দ্র ও ধীরাজকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র, কুঞ্জবিহারী গুপ্ত, জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পি সি দত্ত এখন পর্য্যন্তও উকিল-ব্যারেষ্টারের মধ্যে নেতা। ইঁহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী উকিল ব্যারিষ্টার ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছেন এবং ক্রমে বয়স্কদের পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন আশা করা যায়। তবে domicile বা প্রবাসী হইবার নিয়ম চিফ কমিশনারের দ্বারা পাশ করাইয়া লইয়া এখানকার বাঙ্গালী ব্যবহারজীবীরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠার মারিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের এ পদ আর কত দিন রাখিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র, বি-এ, এ-এম্-আই, সি-ই, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এবং রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্যাল, এম্-এ, বি-এল্, ডিভিসন্যাল ও সেসন্স্ জজ ছিলেন। এক্ষণে ইঁহারা উভয়েই পরলোকে। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের পিতা মিউটিনীর পূর্ব্বে ৺ কাশীধামে কমিশরিয়াটের পেন্‌সন্ ডিপার্টমেণ্টের হেড আসিষ্টাণ্ট ছিলেন, এবং সেই অবধি ইঁহাদের কাশীধামে বাস। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ বীরেশ্বর মিত্র মহাশয় কাশীর একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন এবং কাশীর (waterworks ও drainage scheme) কলের জল ও ড্রেন ব্যবস্থা বলিতে গেলে বীরেশ্বর-বাবুর চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে যখন এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি স্থাপিত করিবার প্রথম প্রস্তাব উঠে তখন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে সেই সম্বন্ধে

রায় সাহেব রাজেশ্বর মিত্র
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এঞ্জিনিয়ার, নাগপুর

মন্তব্য চাহিয়া পাঠান। ৺বীরেশ্বর মিত্র মহাশয়ের মন্তব্যের দক্ষতায় লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর সার অক্‌ল্যাণ্ড্‌ কল্‌ভিন এবং গভর্ণার-জেনারেল লর্ড ডাফ্‌রিন এমনই প্রীত হয়েন যে তাঁহারই মন্তব্যকে মূলভিত্তিরূপে লইয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। এবং বীরেশ্বর-বাবুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য রূপে মনোনীত করিয়া গভর্ণার-জেনারেল নিজে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের (Legislative Council) ব্যবস্থাপক সভায় বীরেশ্বর-বাবু সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সদস্য। তাঁহার পরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র প্রমুখ অন্যান্য বাঙ্গালী সদস্য হইয়াছিলেন বটে। রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের শিক্ষা কিয়দংশ বেনারস কলেজে এবং কিয়দংশ বাঁকিপুরে পাটনা কলেজে হয়। সেখানে তিনি প্রসন্নকুমার সিংহ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। স্বনামখ্যাত বলদেব পালিত মহাশয় বিবাহ-সম্বন্ধে ইঁহার নিকট-সম্পর্কীয়। রাজেশ্বর-বাবু বি-এ পাশ করিয়া রুড়কী কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করিতে যান এবং সেখানে বিশেষ যোগ্যতার সহিত পাশ করিয়া মধ্যপ্রদেশে পূর্ত্ত বিভাগে কর্ম্ম লয়েন। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র মহাশয়ের রাজকীয় কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতীব সুখ্যাতিপূর্ণ এবং ইনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে আণ্ডার-সেক্রেটারি-রূপে অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে নিজের কার্য্য সম্বন্ধে ইঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, সুলেখক বলিয়াও সেইরূপ সুখ্যাতি ছিল। ১৮৯৮-৯ সালে যখন মধ্যপ্রদেশ পুনরায় দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয় তখন যে ৯৬—৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের ন্যায় এই প্রদেশকে বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ মিত্র সাহেব কর্ত্তৃক দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের সুচারু বন্দোবস্ত। ইঁহার কার্য্য-কুশলতার জন্য বিলাতের ইন্‌ষ্টিটিউট অব্‌ সিবিল ইঞ্জিনিয়ার্‌স্ ইঁহাকে সহযোগী সদস্য নির্ব্বাচিত করেন এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৈসর-ই-হিন্দ্‌ মেডাল প্রাপ্ত হয়েন। ভারতবাসীর মধ্যে বলিতে গেলে ইনিই সর্ব্ব-প্রথমে সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার পূর্ব্বে বোম্বে প্রদেশে তারাপুরওয়ালা নামক একজন পার্শী ইঞ্জিনিয়ার অল্পদিনের জন্য এই কার্য্য অস্থায়ী ভাবে করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্র সাহেব ১৯০৬ সাল হইতে এই কার্য্য বরাবর করিয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়েন। রুড়কিতে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার যে নিজের বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানে অথবা পরিচালন-ক্ষমতার হিসাবে বিলাতের পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন তাহা শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র, রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ সরকার, রায় বাহাদুর গঙ্গারাম (যাঁহার হস্তে দিল্লীর দরবারের ইঞ্জিনিয়ারিংএর বন্দোবস্তের ভার ছিল) ইত্যাদির দৃষ্টান্তই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল, এম-এ, বি-এল, মহাশয় বাঁকীপুরের সদরালা ৺গোবিন্দচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের পুত্র এবং কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব Judicial Member of the Council শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জামাতা। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

শ্রীশরৎচন্দ্র সান্ন্যাল, জিলা জজ্

সান্ন্যাল মহাশয় দিল্লীর একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। পাঠ্যাবস্থায় রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল ও রাজেশ্বর মিত্র মহাশয় কাশীতে বেনারস কলেজে এবং বাঁকীপুরে পাটনা কলেজে প্রায় একই সময়ে ছাত্র ছিলেন। পরলোকগত কুচবিহার-পতি ও রেজেষ্টরী বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টর-জেনারেল রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সান্ন্যাল মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয়ের কর্ম্মজীবন সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে মুন্‌সেফরূপে আরম্ভ হয়। সার এণ্টনী ম্যাক্‌ডনেল বঙ্গদেশে থাকিতেই ইঁহার কার্য্যে এরূপ প্রীত হয়েন যে যখন তিনি মধ্যপ্রদেশে চিফ-কমিশনার হইয়া আসেন তখন এখানকার বিচার-বিভাগে সুযোগ্য কর্ম্মচারীর অভাব দেখিয়া ইঁহাকে ও ইঁহার সহকর্ম্মচারী আর-একজন মুন্‌সেফকে (শেষোক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) এ প্রদেশে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ শেষোক্ত মুন্‌সেফ মহাশয়ের এ প্রদেশে আসা ঘটে নাই। যেরূপ দক্ষতার সহিত সান্ন্যাল মহাশয় কার্য্য করিয়াছেন এবং তিনি ক্রমে বিচার-বিভাগে যেরূপ উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন তাহাই ম্যাক্‌ডনেল সাহেবের বিশ্বাসের বিশিষ্ট প্রমাণ। সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট একখানি পুস্তক আছে যাহা সার্ ওয়াল্‌টার স্কট স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া এডিনবার্গের পুস্তক-বিক্রেতা বন্ধু ব্যালাণ্টাইন্ (Ballantine) সাহেবকে উপহার দিয়াছিলেন। ব্যালাণ্টাইন্ সাহেবের দোকান হইতে সার ওয়াল্‌টারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইত এবং ইঁহার দেউলিয়া হওয়ার ঘটনাচক্রে সার ওয়াল্‌টার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে ঋণগ্রস্ত হন এবং এই ঋণ শোধ করিবার জন্যই সার ওয়াল্‌টার স্কট তাঁহার সুবিখ্যাত ওয়েভার্লি পর্য্যায়ের উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যালাণ্টাইন সাহেবের নিকট-কুটুম্ব ডক্‌টর জেম্‌স্ ব্যালাণ্টাইন্ বেনারস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া আসেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সান্ন্যাল মহাশয়ের পিতা এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হয়েন।

যদিও স্থানীয় বাঙ্গালীরা জব্বলপুরের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তবু ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে এখানকার বাঙ্গালীদের স্থায়ী নিজস্ব জিনিস হিসাবে বাৎসরিক দুর্গাপূজা ছাড়া বিশেষ কিছুই নাই ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশাও খুব কম। পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালীদের স্থাপিত একটি কালীবাড়ী ছিল। কিন্তু বহু বৎসর হইতে তাহা বাঙ্গালীদের হাতছাড়া ও লুপ্তপ্রায়। এখানে একটি মিশনারিদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালী মেয়েদের ইস্কুল আছে, কিন্তু স্থানীয় বাঙ্গালীদের সাহায্যের অভাবে তাহা মৃতপ্রায়। ১৯০৩ সালে ৺ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কিরণকৃষ্ণ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের চেষ্টায় এখানে একটি বাঙ্গালা লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা যেরূপ স্বল্প ও তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে মিলামিশাও যেরূপ কম, তাহাতে যে লাইব্রেরীটি এতকাল বাঁচিয়া আছে ইহাই ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

তবে স্থানীয় বাঙ্গালীরা নিজেদের মিলিত হইবার এবং নিজেদের ভাষার চর্চ্চার জন্য একটি সাধারণ স্থানের প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমে অধিক বুঝিতে পারিতেছেন ইহাই আশাপ্রদ।

এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আর-একটি অঙ্গ—অত্রস্থ বার্ন্ কোম্পানীর কারখানার বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক বাৎসরিক কালীপূজা ও দোলযাত্রা উপলক্ষে অভিনয়। তাঁহারা গত ১৬।১৭ বৎসর হইতে যেরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত বাঙ্গালা ভাষার উৎকৃষ্ট নাটক প্রতি বৎসরে ২।৩ বার করিয়া এখানকার বাঙ্গালী সাধারণকে দেখাইয়া থাকেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। জব্বলপুর বঙ্গদেশ হইতে এতদূরে ও এখানকার স্থানীয় বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের দেশের সহিত সম্পর্ক এরূপ কম হইয়াছে যে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সেইরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেরই জীবনে বাঙ্গালা অভিনয় দেখিবার এই একমাত্র সুযোগ।

এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প, বড়জোর ৭০।৮০ ঘর হইবে; তাহার মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়ী বড়ই কম, অধিকাংশ সরকারী অর্দ্ধ-সরকারী অথবা বেসরকারী আফিস অথবা কারখানায় নিযুক্ত এবং কিছু অংশ স্বাধীন ওকালতি ব্যবসাতে নিযুক্ত। নিজের কার্য্যের ভাবনায় প্রত্যেকেই ব্যস্ত, নিজের কার্য্য ব্যতিরেকে অপরের সহিত সম্বন্ধ বড়ই কম। তবে এক জায়গায় অধিক দিন বাস করিলে অথবা সেখানকার চিরস্থায়ী অধিবাসী হইলে লোকে নিজের ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক নিজের কার্য্যের সহিত যে স্থলে বাস করিয়াছেন সেখানকার জন্য কিছু করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম এবং সেই হিসাবে জব্বলপুরের বাঙ্গালী প্রবাসী তাঁহাদের নিজেদের কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই, বরং তাঁহাদের নিজেদের সংখ্যা যেরূপ স্বল্প সেই অনুপাতে অনেক অধিকই করিয়াছেন।

জব্বলপুর-প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই বিবরণ সাত বৎসর পূর্ব্বে জব্বলপুরপ্রবাসী এক বন্ধু আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; প্রায় অবিকল তাঁহার ভাষাতেই ইহা প্রকাশিত হইল; এজন্য আমি বন্ধুবরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

হাসি-কান্না

অবন্তীপুরের রাজপুত্র মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, বৈদ্যরা সব জবাব দিয়ে গেছে। সারাটা রাজ্য একেবারে থম্‌থমে, কারুর মুখে আজ হাসি নেই,—বুকের খবর অবশ্য জানিনে। তবে বাইরে শুধু একটা অব্যক্ত হাহাকার বিরাজ করছে।

মন্ত্রীর ছেলে-হল-না ছেলে-হল-না করে' বুড়ো বয়সে আজ একটি ছেলে হয়েছে। বুকে তাই তার হাসির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে তা একটুও ফুটে উঠ্‌ছে না—রাজা যদি দেখ্‌তে পান!

মন্দিরের পুরোহিত দেবতার সমুখে নিঃশব্দে বসে' আছে—চোখ মুদে, গম্ভীর হয়ে। বুকে তার উৎসাহের অবধি নেই—লক্ষীধর বণিক কিছুদিন আগে তার কাছে মানত করে' গিছলো, এবারকার বাণিজ্য-অভিযান তার যদি সফল হয়, তা হলে দেবতাকে সে বেশ মোটারকম ঘুস দিয়ে যাবে। আজ সে দেশে ফিরেছে এবং বাণিজ্য-অভিযানও তার সফল হয়েছে। একটু পরেই সে মোহরের তোড়া নিয়ে মন্দিরে আস্‌বে, এমনি ধারা একটা সংবাদও পাওয়া গেছে। পুরোহিতের বুকে আনন্দের জোয়ার খেলে যাচ্ছে, কিন্তু মুখ তার গম্ভীর, চোখ তার সজল, কেননা রাজার ছেলে মৃত্যুশয্যায়,—তার মুখে হাসি দেখ্‌তে পেয়ে কেউ যদি রাজার কানে সে কথা তোলে, তবেই তো সর্ব্বনাশ। সে গম্ভীর শুষ্কমুখেই দেবতার সমুখে বসে' রইল।

মন্দিরের দেবদাসী মদনমঞ্জরী। তার প্রাণে আজ হাসির লহর নেচে নেচে উঠ্‌ছিল। গোপনে গোপনে

এতদিন ধরে' সে যাকে মনে মনে পূজো করে' আস্‌ছিল এবং আজ বুকে সাহস করে' প্রেমপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিল সখীর হাত দিয়ে, তারই জবাব এসেছে এই কিছুক্ষণ হল, রাত্রিরে কুঞ্জবাটিকার একপাশের বকুলবীথিকার ঘন ঝোপের আড়ালে মিলনের প্রস্তাব নিয়ে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সমস্ত বাছাই-করা অলঙ্কারগুলা আজ সর্ব্বাঙ্গে চড়িয়ে সে এখন থেকেই রাত্তিরের অভিসারের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে' থাকে, কিন্তু উপায় নেই—রাজপুত্র যে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে! কাজেই তাকে মন্দিরের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়ে চুপটি করে' বসে' থাক্‌তে হল—মুহ্যমানের মত।

বুকে যাদের হাসির লাল রঙ্‌ টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, তাদেরও আজ মুখখানাকে কালীবর্ণ করে' বসে' থাক্‌তে হয়েছে—রাজার ছেলে মৃত্যুশয্যায় যে!

সবাই কাঁদ্‌ছে, হাসি পেলেও কাঁদ্‌ছে, কান্না পেলে তো বটেই। মোট কথা রাজ্যে এমন একটিও লোক নেই যার মুখ না শুষ্ক আর চোখ না সজল।

আজ হাসিমুখ কেবল একজনার, তিনি হচ্ছেন রাজকুমারের মা।

কিছুক্ষণ হল রাজবৈদ্য রোগীকে দেখে গেছে। রাণী তাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন দেখ্‌লেন?"

রাজ-বৈদ্য গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে, "হয়ে এসেছে, আর দেরী নেই বড়।"

রাণী বল্লেন, "এখনো তো বেশ জ্ঞান রয়েছে।"

বৈদ্য বল্লে, "যক্ষ্মারোগের বিশেষত্বই ওই, মরবার শেষ মুহূর্ত্ত অবধি জ্ঞান টন্‌টনে থাকে।"

—"ওঃ, কি কষ্টই না তাহলে ওর! ও টের পাচ্ছে যে, ওকে আর-একটু পরেই—"

—"না, তা জানে না। এ রোগে, রোগী শেষ পর্য্যন্তও মনে করে যে সে সেরে উঠ্‌বে।"

রাজ-বৈদ্য চলে' গেলে রাণী চুপ করে' খানিকটা দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর রোগী যখন জিজ্ঞেস কর্‌লে, "মা, কবিরাজ কি বলে' গেলেন?"

রাণী বল্লেন, "বলে গেলেন, শীগ্‌গিরই তুমি ভালো হয়ে উঠ্‌বে বাবা!"

রোগী আবার বল্লে, "তবে তোমার মুখ অমন শুক্‌নো কেন?"

"কই, না"—বলে' রাণী একবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তার পর যখন রোগীর দিকে চাইলেন, তখন তাঁর মুখে হাসির অভাব নেই।

মন্ত্রী কাঁদ্‌ছে, পুরোহিত কাঁদ্‌ছে, দেবদাসী কাঁদ্‌ছে—হাসিকে বুকের মধ্যে জোর করে' চেপে রেখে; রাণী কিন্তু হাস্‌ছেন—বুকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের কান্নাকে জোর করে' আট্‌কে রেখে!

শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শেফালি

ভাল আমি বাসি বড় শরতের শেফালির দল,
ঝরিয়া-পড়ারই এ যে ফুটে-ওঠা স্বপনে কেবল!
এ যেন রে একান্তে একেলা—
মৃত্যুর উরসে জমা তুহিন তুষার—তারি
প্রাণ হয়ে ফুটিবারই খেলা,
স্তব্ধ রাত্রিবেলা!
তরুণ আলোক-বুকে যত কিছু কামনার আগে
সচকিতে চুম্বনের যে নিবিড় আকুলতা জাগে,
আলোকের উদ্যত সে চুম—
অর্দ্ধপথে থেমে যায়, তারো আগে ঝরে ওরা—
ধূলিতলে নিঃশব্দ নিঝুম
সদ্য-জমা ঘুম!
স্তব্ধতার তলে ডোবা ব্যর্থ স্বপনের ব্যথারাশি
অতল হইতে এসে আঁধারের জোয়ারেতে ভাসি
ঠেকিয়াছে প্রভাতেরি তীরে;
সুরহারা গান মোর রূপ ধরে' ঝরে যেন
যতবার দেখি ফিরে ফিরে
ঝরা শেফালিরে!

শ্রী সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

আইরিশ বিপ্লবে আইরিশ রমণী

আয়ার্লাণ্ডের দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথা আজ আর কারও অজানা নেই। এই সুদীর্ঘ যুদ্ধে বহু আইরিশ রমণী যে আশ্চর্য্য সাহসিক ও বহু দুঃসাহসিক কাজ করেছেন, আয়ার্লাণ্ডের ইতিহাসে তা চিরকাল জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে।

এই অসাধারণ স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রধান (সর্ব্ব-প্রধান বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না) কাউণ্টেস্ মার্কিয়েভিক্স্ (Countess Markievicz)। একটি আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে এঁর মা আইরিশ রমণী হলেও অত্যন্ত আইরিশ-বিদ্বেষী ও ইংরেজ-ভক্ত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে তিনি জিদ্ করে' নিজের বাড়ীর সমস্ত ঘড়ীর আইরিশ সময় বদ্‌লে, ইংলিশ সময় রাখ্‌তেন। যা-কিছু ইংলিশ সবই ভাল, আর যা-কিছু আইরিশ সবই মন্দ। বালিকা কন্‌ষ্ট্যান্‌স্ (Constance, শেষে Countess Markievicz), এইরূপ ইংরেজ-ভক্ত মায়ের সন্তান হয়েও নিজের সমস্ত জীবন আয়ার্লাণ্ডের কাজে উৎসর্গ করেন। মাতৃভূমি আয়ার্লাণ্ডকে স্বাধীন করতে তাঁর সমস্ত দিয়েছেন। ইনি প্যারিসে চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে যান ও সেখান থেকে কাউণ্ট মার্কিয়েভিক্‌স্‌কে (Count Markievicz) বিয়ে করে' আয়ার্লাণ্ডে ফিরে আসেন।

টাকাকড়ি দিয়ে দেশের কাজে সাহায্য করা মহত্ত্ব বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ও স্ত্রী হয়ে চিরসুখে লালিতা পালিতা হয়ে, নিজের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিয়ে দেশের কাজে যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা কত বেশী মহত্তর। শুধু উৎসর্গ নয়, অতি ধীর রাজনৈতিকের মত কাজ করা।

১৯০৯ সালে সর্ব্বপ্রথম আইরিশ বয় স্কাউট্ (Boy Scout) গঠন আরম্ভ করেন কাউণ্টেস্ মার্কিয়েভিক্স্। আয়ার্লাণ্ডের ভবিষ্যৎ আশা তরুণ বালকেরা কাউণ্টেসকে দেবীর মত ভক্তি শ্রদ্ধা করত। কত দীর্ঘ দিন, কত দীর্ঘ রাত্রি তিনি দেশের বালকদলকে নিয়ে স্বাধীনতার গল্প বলেছেন, কত পুরাণ আইরিশ বীরত্বের ইতিহাস বলে' তাদের প্রাণে উদ্দীপনা দিয়েছেন। নিজেই তাদের ড্রিল শিখিয়েছেন, কেমন করে' সবুজ সাদা ও কমলা রংএর জাতীয় পতাকাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে হয় তা শিখিয়েছেন। তাঁর আদর্শ ছিল—"কোনও প্রকৃত বীরপুরুষ শত্রুকে পশ্চাৎ দেখায় না বা মিথ্যা বলে না।" তাই শেষে স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় বীর আইরিশ যুবক এত শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়েছে ও এখনো প্রত্যহ দেখাচ্ছে। কাউণ্টেসের কাজ এই একরকমের নয়। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে উৎসাহ দিতে এই সুন্দরী মাতৃমূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা গিয়েছে। যেখানে কাউণ্টেস্ সেখানে যেন নূতন প্রাণ, নূতন উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তাঁর কথায় যেন বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে হাসিমুখে কর্ত্তব্য পালন করতে পারে।

১৯১৩ সালে ডব্‌লিনের বড় ধর্ম্মঘটের (Strike) সময় এই অদ্ভুত রমণী অতি প্রত্যূষে বাইসিকেল চড়ে' গিয়ে নিজের হাতে খাবার তৈরী করে' ধর্ম্মঘটকারীদের মায়ের মত স্নেহে খাইয়েছেন। যাতে তারা মানুষের মত ব্যবহার পায়—ও বিলাতি ছেড়ে আইরিশ ফ্যাক্টরীতে কাজ করে তার জন্য ধর্ম্মঘট বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

কাউণ্টেসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অনেক সময় অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বিপ্লবের স্রোত যখন খুব প্রবল, ইংরেজের অত্যাচার যখন বড় প্রখর, এমন এক আগষ্ট মাসের শুক্রবারে তিনি প্রচার করলেন যে জীম্ লার্কিন (Jim Larkin, Labour Leader) বীর শ্রমিক নেতা, পরের রবিবারে বিকালে সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিবেন। লার্কিন অতি স্পষ্টবাদী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও তেজস্বী বক্তা, তাঁর বক্তৃতায় লোকে মুগ্ধ ও উত্তেজিত হয়, বহু দূর থেকে হাজার হাজার লোক লার্কিনের বক্তৃতা শুনতে আসে।

পাছে তাঁর বক্তৃতা শুনে লোকে উন্মত্ত হয়, তাই শনিবার, গভর্ণমেণ্ট ঐ সভা বেআইনি বলে' প্রচার করে ও লার্কিনকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। কিন্তু লার্কিনকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। অনেকে ভাবল তবে বোধ হয় লার্কিন ধরা দেওয়ার ভয়ে পলাতক। কিন্তু যারা তাঁকে জানত তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি। বিশেষতঃ যখন কাউণ্টেস্ সভা প্রচার করেছেন, অনেকের ধারণা যে যখন কাউণ্টেস্ আছেন, তখন সভা নিশ্চয়ই হবে। কি জানি কেন বক্তৃতার দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব থেকে সভাস্থলে লোক জমা হতে লাগ্‌লো। গভর্ণমেণ্ট তখনও কিছু প্রকাশ্য গোলমাল করে নি। সময় চলে' যায় তবুও বক্তার খোঁজ নেই। হাজার হাজার লোক উৎসুক ভাবে লার্কিন বা কাউণ্টেসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো, এমন সময় হঠাৎ একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল। কাউণ্টেস একটি দীর্ঘশ্মশ্রুধারী পুরুষের সঙ্গে নাম্‌লেন। পুরুষটি তাঁর টুপী ও কৃত্রিম দাড়ী খুলে বক্তৃতা আরম্ভ করতেই সেই সহস্রাধিক লোক আনন্দে বিভোর হয়ে "লার্কিন কথা রেখেছে" বলে' চীৎকার আরম্ভ করল। এদিকে গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র পুলিশ প্রস্তুত ছিল; পুলিশ প্রথম সভা বন্ধ করতে বলে, কিন্তু শ্রোতারা এ অত্যাচার বিনাবাক্যব্যয়ে মাথা পেতে নিতে রাজি নয়। উভয় পক্ষের মারামারির পর সভা ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু উভয় পক্ষেই কয়েকটি খুন ও বহু জখম হয়। সমস্ত ডব্‌লিন সহর (Dublin) ঐ মৃতদের সৎকারের দিনে নিস্তব্ধ ভাবে শোক প্রকাশ করে।

হেলেনা মলোনি (Helena Moloney) নামে একটি মেয়ে কাউণ্টেসের ডান হাতের মত সাহায্য করেছে। ১৯১১ সালে যখন ৫ম জর্জ্জ আয়ার্লাণ্ডে যান তখন এই স্ত্রীলোক-দুটি অক্লান্ত ভাবে দিনরাত বক্তৃতা দিয়ে লোককে বলেছেন যে রাজা জর্জ্জকে বয়কট্ করে' দেখাও যে আইরিশরা তাঁর লোকের অত্যাচারকে কত ঘৃণা করে। ইংরেজের অধীনে থেকে ইংরেজের রাজপতাকা ইউনিয়ন জ্যাক্ (Union Jack) পোড়ান কম সাহসের কথা নয়। মৃত্যুদণ্ড বা দীর্ঘ কারাবাস এর শাস্তি জেনেও কাউণ্টেস্ বহুবার সাধারণ সভায় ইউনিয়ন জ্যাক্ পুড়িয়েছেন। অনেক সময় পুলিশ তাঁর কাছে যেতে সাহস করে নি। এইরূপ সাহস ছিল বলেই আজ আয়ার্লাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থার এত পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে। গত স্বাধীনতা-সংগ্রামে আয়ার্লাণ্ডের ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ এবং সাধারণ শ্রমজীবী রমণীরাও যোগ দিয়েছিল, তাদের উৎসাহে তাদের উত্তেজনায় পুরুষেরা অকাতরে দেশের জন্য জীবন দিতে পেরেছে।

কুটিল রাজনীতিতেও আইরিশ রমণী কম দক্ষতা দেখায়নি। মোটকথা জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেয়েদের শক্তি পুরুষকে যথেষ্ট সাহস দিয়েছে। আইরিশ স্ত্রী-সভা (Irish Women's Council) সামাজিক আর্থিক রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে সাহায্য করেছে। এঁদের সেবা সংঘ (Red Cross), বালিকা সংঘ (Girl Guide) যে কাজ করেছে তা যে-কোন দেশের গর্ব্বের কারণ। তাছাড়া এঁরা নিজেরা ইচ্ছা করে' কিছু কিছু যুদ্ধ-বিদ্যাও শিখেছিলেন। কেউই জানত না যে ইংরেজ এত সহজে নরম হবে, এবং ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ এত শীঘ্র থাম্‌বে। তাই আবশ্যক হোলে স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করতে পারবে আশায় কাউণ্টেস্ মার্কিয়েভিক্‌স্ এ বন্দোবস্ত করেন।

এই বীর রমণীদের আর একটি কাজ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—"স্বেচ্ছা-সেবিকা" দল গঠন ও জাতীয় ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ। টাকা না হোলে কোন কাজই আজকাল একরকম চলে না। বিশেষতঃ বিপ্লবের সময়ে, যদি আবশ্যক মত টাকা না থাকে তবে অনেক কাজ নষ্ট হবার সম্ভব। আইরিশ রমণীরা এ বিষয়ে আশাতীত সাহায্য করেছেন।

বহুবার জেল খেটে যদিও কাউণ্টেসের শরীর খুব দুর্ব্বল হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মন উত্তরোত্তর সবল, ও স্বাধীনতা লাভের আশা ততোধিক প্রবল হয়েছিল। ব্রীটিশ পুলিশের বহু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তাই তিনি প্রত্যেক বালিকা ও স্ত্রীলোককে আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে শিখিয়েছিলেন। যেন তারা আবশ্যক-মত যুদ্ধেও সাহায্য করতে পারে।

১৯১৬ সালের বিপ্লবের সময়ে কাউণ্টেস্ ও বহু আইরিশ

রমণী যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা যে-কোনও জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে', গোলা বর্ষণকে গ্রাহ্য না করে' এই বীর রমণী জাতীয় কর্ত্তব্যে অগ্রসর হয়েছেন। এইরূপ কার্য্যতৎপরতা ও বীরত্বের জন্য—বিপ্লব সময়ে অন্য বীর পুরুষ নেতাদের মত এঁকেও সহরের এক অংশ রক্ষার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছিল। একে একে যখন সমস্ত নেতারা বন্দী হন, কাউন্টেস্ তখনও যুদ্ধ চালাতে থাকেন। একদিন পরে প্রায় ১০০ রমণী সহযোগীর সঙ্গে ইনি বন্দী হন। এই বিপ্লবের বিচারে এঁর (অন্য অনেকের সঙ্গে) জীবন-দণ্ড হয়। কিন্তু কৌশলে অনেকেই জেল থেকে পলায়ন করেন। এই সময়ে এঁদের প্রধান নেতা ডি ভ্যালেরা (De Valera) পালিয়ে আমেরিকায় আসেন। আমেরিকায় তাঁর স্বদেশবাসী প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের বাস। তাদের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য নিয়ে ডি ভেলেরা পুনরায় দেশে ফিরলে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। যদিও ইতিমধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তবু বাহুল্য-বোধে আর বেশী লিখ্‌লাম না। আইরিশদের স্বদেশপ্রীতিতে দুঃসাধ্য ব্যাপারও সম্ভব হয়েছে, তাই আজ আয়ার্লাণ্ড স্বাধীন হতে যাচ্ছে। জগতের অন্যান্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে সমান গর্ব্বে মাথা উঁচু করে' দাঁড়াতে যাচ্ছে।

কোথায় ভারত?

নিউ ইয়র্ক শ্রী কমলা মুখার্জ্জি

কুমারী লেনা

ভারতের বাহিরে দিন দিন নারীশক্তি যেমন করিয়া সর্ব্বতোমুখী হইয়া বিকাশ লাভ করিতেছে তাহা ভাবিতে গেলে স্বদেশের দুর্দ্দশায় লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে।

কুমারী লেনা অষ্ট্রেলিয়ার একটি পল্লীগ্রামে সামান্য একজন সূত্রধরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অবস্থা এমন নহে যে যথোপযুক্তরূপে একমাত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কন্যার সাহায্য লইয়া কোনও ক্রমে কায়ক্লেশে দিনপাত হইতেছিল। তথাপি সারাদিন পরিশ্রমের পরও তিনি অবসরমত কন্যাকে সংবাদপত্রাদির সারাংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্প বিজ্ঞান ও সামাজিক রীতিনীতির কথা, উত্থান পতন ও ক্রমবিস্তৃতির কথা বলিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেন। বালিকার তরুণ চিত্তপটে তাহা এমনই গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে কেবলমাত্র পিতার মুখে শুনিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। লেনা নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া ফেলিলেন। বয়স যখন সবেমাত্র নয় কি দশ তখন হইতেই আশ্চর্য্য শিক্ষা-গুণে অবসর-বিনোদনের জন্য পিতাকে বহু দেশ-দেশান্তরের বিচিত্র ঘটনাবলী পড়িয়া শুনাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। এই সময় হইতেই ইতিহাস পাঠে তাঁহার অদ্ভুত উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইল এবং জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল। কুমারী লেনা এখন মাত্র সাতাইশ বৎসরের একটি তরুণী। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভার কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন না। অর্জ্জিতজ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি প্রথমেই সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ইতিমধ্যেই ন্যূনাধিক তেরটি ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটিতেই মাতৃভাষার ন্যায় অনায়াসে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন। সঙ্গীত ও নৃত্যকলায়ও আজকাল তাঁহার যশ নগণ্য নহে।

সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়া একনিষ্ঠ ভাবে দেশ-সেবা করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া লেনা এখন পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হন নাই। পিতা জীবিত আছেন বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্রও কন্যার মুখাপেক্ষী নহেন। অল্পদিনের মধ্যে এই দেশহিতপ্রাণা কুমারী ১৮টি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। এবং স্বয়ং তাহার একটিতে প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্তা আছেন। বলা বাহুল্য, সকল কয়টি বিদ্যালয়ই স্ত্রীশিক্ষা-কল্পে প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে সারাজীবন অপরের মুখের দিকে তাকাইয়া, অপরের অর্জ্জিত অন্নে দিনপাত করিতে না হয়, আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভদ্রভাবে অভাব-অভিযোগের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় লেনা-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন-

গুলির মূল সূত্রই এই। একদিকে যেমন পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উদ্দেশ্যে সুগৃহিণী মাতার ও স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয়, অন্যদিকেও তেমনই সমাজের প্রতি দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ প্রত্যেক বালিকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নিজে নিতান্ত আড়ম্বর-বিহীন জীবন যাপন করিয়া তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে উচ্চতম আদর্শের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

এই বিদুষী কুমারী বলেন যে, দেশের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে উপযুক্ত মাতা গঠন করা। এবং দেশহিতৈষণার সর্ব্বনিম্ন সোপান হইবে বালিকা-শিক্ষা। বালিকার কেবল মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে পারিলেই তাহার শিক্ষা পর্য্যাপ্ত হইল না। স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিতে না পারিলে ইনি শিক্ষাকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন। এইরূপ আংশিক শিক্ষা দ্বারা ইনি নিজেও পরিতৃপ্ত হন নাই এবং অপরকেও সেরূপ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন না। শরীর ও মন যাহাতে পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে, সমভাবে উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন হয়, তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে তদনুযায়ী বন্দোবস্ত রহিয়াছে। কিছুদিন হইল ইনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং আপনাকে অধিকতররূপে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার ইচ্ছায় কয়েক বৎসর বিদেশ ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রী অনন্তকুমার সান্যাল

—

কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়

বাংলা মায়ের যে-সমস্ত শক্তিমতী মেয়েরা দেশের বাইরে গিয়ে আপনাদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন এবং দেশকে গৌরবান্বিতা কর্‌ছেন, কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় তাঁদের একজন। সুপ্রসিদ্ধ ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এঁর পিতা এবং ভারতনারী-গৌরব শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এঁর বড় দিদি।

মৃণালিনীর শিক্ষা পিতার নিকটেই প্রথমে হয়। তাঁর কাছ থেকেই ইনি গণিত রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞান এবং উর্দ্দু ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি আই-এসসি শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানলাভের উপযুক্ত দুখানা চটী বই ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত করেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা মহিলা-সমিতির প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে ইনি শিক্ষাদানের কাজে বিচক্ষণতা লাভের জন্য ইংলণ্ডে যান। এঁর ইচ্ছা ছিল যে নিজের জীবনের কিয়দংশ নিজের দেশের নারীদিগের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করেন। ইংলণ্ডে ট্রেনিং পাশ করার পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের ট্রাইপস পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন এবং সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সেখানে থাক্‌তে ইনি একখানা চটী বই লেখেন যাতে করে' নিজেকে অরাজক-পন্থীদলের অন্তর্ভুক্ত করে' ফেলেন। ভারত-সর্‌কার এঁর মনের এই ভাবটিকে মোটেই পছন্দ করেন নি এবং সেই কারণে সর্‌কারী বা সর্‌কারী-সাহায্য-প্রাপ্ত কোনও বিদ্যালয়ে এঁর কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

বিলাত থেকে ফিরে এসে ইনি মান্দ্রাজে যান এবং সেখানে মিসেস বেশান্ত এবং শ্রদ্ধাস্পদ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা সৎকার্য্যে যোগ দেন।

গত এক বৎসর থেকে ইনি "শামা-আ" নামে এক সুদর্শন ও সুখপাঠ্য ত্রৈমাসিক পত্র অতি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করে' আস্‌ছেন। প্রতীচ্যের বলদর্পের বিরুদ্ধে প্রাচ্য জাতির মানব-সেবাধর্ম্মকে খাড়া করে' দেবার জন্য সুব্রহ্মণ্য আয়ার যে সমিতি গঠন করে' তুল্‌বার জন্য চেষ্টিত, মৃণালিনী তার সম্পাদিকা নিযুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও কলের কুলী-মজুরদিগের সুখ সুবিধা দেখ্‌বার জন্য যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে মৃণালিনী তাতেও ঘনিষ্ঠ রকমে সংশ্লিষ্ট।

আমাদের দেশের এই বুদ্ধিমতী শক্তিশালিনী মেয়েটি অতি নীরবে এবং শান্তভাবে দেশের কল্যাণের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে' যাচ্ছেন। খুব সবল দেহ এঁর নয়, জীবনের উপর ঝঞ্ঝাবাতও অনেক গিয়েছে, গুরুভার দায়িত্বও ইনি মাথায় তুলে নিয়েছেন, কিন্তু সবই প্রসন্ন হাসির সঙ্গে, এবং অত্যন্ত তৃপ্ত মনে।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

—

ম্যাডাগাস্‌কারের নারী

সমগ্র ম্যাডাগাস্‌কারের সভ্যতার কোন একটা সীমা নাই—এই দেশের বিভিন্ন জাতির সভ্যতা বিভিন্ন প্রকারের। হোভা বা এন্টিমেরিনা জাতির সভ্যতা এক রকম, বেসিলেও জাতির সভ্যতা আর-এক প্রকার। এই দ্বীপটিতে অনেকগুলি জাতি বাস করে। পশ্চিম উপকূলে বাস করে স্যাকালাভা জাতি, পূর্ব্ব উপকূল এবং মধ্য-প্রদেশের উচ্চভূমির মাঝখানে থাকে বেজানোজানো জাতি। পূর্ব্ব উপকূলে বাস করে এণ্টেমোরো এবং বেট্‌সিমিসারাকা জাতি। মাহাফালি এবং বারা জাতি দক্ষিণে বাস করে। উত্তর দিকে আন্‌টান্‌ কারানাদের প্রাধান্য। মাঝখানে উচ্চভূমিতে যে-সব জাতি বাস করে, তাহারাই ম্যাডাগাস্‌কারের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সভ্য এবং শান্ত। এই স্থানের বাসীন্দাদের দৈনিক জীবনযাত্রার কথা খুব বেশী পরিমাণে জানিতে পারা যায়। এইখানের নারীরা প্রধানত মালাগাসি-নারী নামে অভিহিত হয়।

বেট্‌সিলেও বালিকা
এদের চেহারা অনেকটা মালয়-জাতীয়দের মতন, একটুখানি নিগ্রো-রক্তের মিশল আছে

দ্বীপের নারীদের মধ্যে পুরুষদের মতই নানা রকমের পার্থক্য দেখা যায়। এন্টিমেরিনা জাতির লোকেরা অনেকটা দেখিতে পলিনেসিয়ানদের মতন, অঙ্গের গড়নের বেশ সাম্য আছে—দেহের রং হরিদ্রা বর্ণের, দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি। অন্যান্য জাতির নারীরা দেখিতে নানা রকমের হয়—দেহের বর্ণ কৃষ্ণ, অনেকের রূপ হুবহু নিগ্রোদের

—সাকালাভা নারী, লাম্বা-পরিহিতা
ইহাদের চুল কোঁকড়ানো, চেহারা নিগ্রো—

মতই। তাহাদের দৈর্ঘ্য আরো বেশী, নাক মুখ একটু বেশী চেপ্‌টা। ইহাদের ভাষার সহিত অষ্ট্রো-এসিয়ান্‌ ভাষার কিছু ঐক্য আছে, কিন্তু আকারে প্রকারে উক্তদেশসমূহের লোকদের সহিত ম্যাডাগাস্‌কার-বাসীদের বিশেষ কোন মিল পাওয়া দুষ্কর।

সমস্ত দ্বীপটিতে স্ত্রী এবং পুরুষের কাজ ভাগ করা আছে। পুরুষ বেশীর ভাগ সময়েই শীকার করে, মাছ ধরে, জাল বুনে, শস্যের ক্ষেত চষে বা ঘর দুয়ার তৈরী করে। পশু পালনের কাজও তাহারা করিয়া থাকে। গরুবাছুর ইত্যাদি পশুকে ইহারা জেবুস্‌ বলে। স্ত্রী-লোকেরা রান্নার কাজ করে, ছোট ছোট মাছ ধরে, ঘরের ছাউনি দেয়, ক্ষেতে শস্য লাগায় এবং ছেলে-মেয়েদের সমস্ত ভার গ্রহণ করে। কাজের নমুনা দেখিয়া মনে হয়, পুরুষই সকল শক্ত কাজ করে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। নারীদের কাজের খাটুনি অনেক বেশী। কোন্‌ কাজের ক্লান্তি কতখানি তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া কাজ ভাগ করা হয় নাই।

বেজানোজানো জাতি ছাড়া অন্য সব জাতির মধ্যে নারীর স্থান পুরুষের সমান। ম্যাডাগাসকারে পুরুষের

প্রাধান্য দেখা যায় না। মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ানদের মধ্যেও পুরুষ এবং নারীর এতখানি সাম্য নাই। ইহাদের বিবাহ—ক্রয়-বিক্রয়-প্রথা নয়। কন্যা তাহার সমস্ত জিনিষ-পত্রের মালিক, মাঝে মাঝে তাহার স্বত্ব রক্ষার জন্য তাহাকে তুমুল কলহ করিতে হয়। পূর্ব্বে যখন বহু-

—বেট্‌সিমিসারাকা নারী, আংশিক ইউরোপীয় পোষাকে
ইহাদের চেহারা কতকটা মালয় এবং কতকটা নিগ্রো জাতির মতন—

বিবাহ-প্রথা খুব বেশীরকম চলিত ছিল, তখন এক জনের এক এক স্ত্রী, ভিন্ন ভিন্ন বেড়া-দেওয়া স্থানে বাস করিত। এই বেড়া-দেওয়া স্থানটিতে সেই স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার ছিল। বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত। তাহার কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পুরুষের ছিল না। বিবাহ মনোমত না হইলে সহজেই বিবাহ বাতিল করিবার অধিকার প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই ছিল।

মালাগাসি-নারীর স্থান সমাজে পুরুষের সঙ্গে এক ছিল। বর্ত্তমান শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার আগমনে নারীর স্থান ভাল হওয়া অপেক্ষা অনেক পরিমাণে খারাপই হইয়াছে বলা যায়। ফরাসী-বিজয়ের পূর্ব্বে দ্বীপের শাসন ব্যাপারে নারীদের খুব বেশী হাত ছিল। অনেক জাতির মধ্যে নারী-প্রাধান্যই ছিল, এই-সমস্ত জাতির পুরুষেরা নারীদের অধীনে বাস করিত। কিন্তু মালাগাসি-নারীর বর্ত্তমান জীবন দেখিয়া পূর্ব্বঅবস্থা স্থির করা শক্ত। তবে এটা বেশ স্থির হইয়া গিয়াছে যে নারীও দেশের "রাজা" হইতে পারিত—তবে তাহা সময়-বিশেষে। কমাণ্ডান্ট্ গুইলঁ্যার লিখিত সাকালাভা জাতির ইতিহাস পাঠে এমন অনেক রাণীর কথা জানিতে পারা যায়, যাহারাই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিত; রাজারা মন্ত্রীর স্থান অধিকার করিত।

মাজুঙ্গা ইত্যাদি প্রদেশে মুসলমান-প্রাধান্য বেশী। এখানে নারীর স্থান পুরুষদের সমান নয়। শ্বেতাঙ্গরাও যে যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই-সব স্থানেও পুরুষ-প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মালাগাসি-নারীদেরও প্রাধান্য দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। শ্বেতাঙ্গ-সভ্যতার শুভ্র আলোক কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের কৃষ্ণবর্ণের প্রতি লজ্জা আনিয়া দিতেছে, সেইজন্যই বোধ হয় তাহারা আস্তে আস্তে ঘরের কোণে প্রবেশ করিতেছে।

মালাগাসি-নারীরা তাহাদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে বেশ সচেতন। তাহারা বেশ ভাবপ্রবণ, বন্ধুত্বের এবং প্রণয়ের সম্মান তাহারা রক্ষা করে। বেট্‌সিলেও এবং এন্টিমেরিনা জাতির নারীদের মন বড় কোমল। মনের কোমলতা আফ্রিকার নিগ্রো মেয়েদের একেবারে নাই বলিলেই হয়।

অনেক জাতির স্ত্রী-সঙ্ঘ আছে। পূর্ব্ব-দক্ষিণের অ্যাফিসোরো জাতির মধ্যে এই রকম সঙ্ঘ খুবই শক্তি-শালী। কোন পুরুষ যদি কোন নারীর প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করে, তবে নারী-সঙ্ঘ বসে—তাহারা রাজার কাছে সেই পুরুষের শাস্তি প্রার্থনা করে। নারী-সঙ্ঘের কথা রাজা-মহাশয় সব সময় রাখিয়া থাকেন।

এণ্টেমোরো জাতির পুরুষেরা যখন শীকারে যায়,

তখন নারীরা এক প্রকার বিশেষ নাচ নাচিয়া থাকে। এই নাচের উদ্দেশ্য স্বামীদের কার্য্যে সফলতা এবং শরীরের বলবৃদ্ধি কামনা। নারীরা নানা রকম কবচ ইত্যাদি ধারণ করে। তাহাতে নাকি অসুখ-বিসুখ দূর হয়, সন্তান-প্রসবের কষ্টও কম হয়।

নারীরা "সিম্বো" নামে এক প্রকার দুমুখ খোলা ছালা পরিধান করে। দেহের উপরার্দ্ধে তাহারা তাকোম্বো নামে জামা ব্যবহার করে। জামা বুকে আঁটা থাকে। এই-সমস্ত বস্ত্র এক এক জাতি এক এক প্রকার কাপড়ে তৈয়ার করে। কেহ কেহ খুব রঙিন করে। কেহ আবার দুই রঙের করে। সিম্বো কোমরে চাম্‌ড়ার পেটির দ্বারা আট্‌কানো থাকে।

দ্বীপের মধ্য-প্রদেশের অধিবাসী নারীদের বেশ একটু সৌন্দর্য্যের জ্ঞান আছে। তাহা তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরিচ্ছদের কিনারে কিনারে তাহারা খুব চমৎকার নানা রকমের লেস লাগায়। এই লেস তাহাদের হাতের তৈরী। এই-সমস্ত বস্ত্রের উপর যে সূচীকার্য্য থাকে, তাহাও খুব সূক্ষ্ম এবং চমৎকার। ইহাদের এক রংএর সহিত আর-এক রং মিলাইবার দক্ষতা প্রচুর। পুরুষেরা এক প্রকার চাদর ব্যবহার করে, তাহার রং শাদা, এবং শাদা সূতার নানা রকম কাজ তাহার উপর থাকে। নারীরাও অনেকে এই চাদর ব্যবহার করে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে শ্বেতাঙ্গদের অনুকরণে বিদ্‌ঘুটে পোষাক ব্যবহার সুরু করিয়াছে। বিশেষত টানানারিভো ইত্যাদি বড় বড় সহরে ইহা বেশী করিয়া লক্ষিত হইতেছে।

মালাগাসি নারীর চুল বাঁধা এক বৃহৎ কার্য্য। এক-জনের চুল বাঁধিতে জন-কয়েকের সাহায্য প্রয়োজন। চুলগুলিকে অনেকগুলি বিনুনিতে ভাগ করা হয়। তার পর জাতীয় প্রথা অনুসারে বিনুনি-গাঁথা হয়। এই-সমস্ত হইলে তাহার উপর কাদা বা গরুর চর্ব্বি লেপা হয়। তাহাতে বিনুনি ঠিক থাকে, এবং মাসে এক বারের বেশী চুল বাঁধিবার দরকার হয় না। চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম—একখানা কাঠের চিরুণী এবং মাথা পরিষ্কার করিবার জন্য একটুকরা সুচাল হাড়ের বা তামার কাঁটা।

মালাগাসি-নারী নাচ গান খুব ভালবাসে। তাহাদের বাঁশের তৈরী একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাঁশের ফালি এক সঙ্গে আর-একটা বাঁশের গায়ে বসান থাকে, তাহাতে ঘা মারিলে খুব তীক্ষ্ণ স্বর বাহির হয়। নাচের বিশেষ কোন বালাই নাই, সাম্‌নে এবং পিছনে নড়া-চড়া ছাড়া আর কিছুই করিতে হয় না। নাচ একলাও হইতে পারে, আবার দলবদ্ধ হইয়াও চলে।

হোভা (এন্টিমেরিনা) নারী, লাম্বা-পরিহিতা।
চেহারা বিশুদ্ধ মালয়-জাতীয়ের মত

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই ঘরের মাঝে মাদুর আড়াল দিয়া আর-একটি ছোট কামরা করা হয়। কামরার মাঝখানে আগুন জলে সব সময়, কারণ, ইহাদের মতে ঘর গরম থাকিলে, প্রসূতির কষ্ট কম হয় এবং শরীর তাড়াতাড়ি সবল হইয়া উঠে। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবী-জননীকে দেখিতে আসে এবং কিছু টাকা ভেট দিয়া যায়। এই ভেট দেওয়ার উদ্দেশ্য জ্বালানি কাঠের খরচ জোগানোতে সাহায্য করা। ছেলে বা মেয়ে যাই

হোক, তাহাতে গৃহস্থের আনন্দের কোন কম্‌তি হয় না। ঐই দেশে ছেলে-মেয়ের সমান আদর এবং কদর। আমাদের প্রাচীন-সভ্যতাভিমানী বর্ত্তমান-মৃত দেশের মত সেদেশে কন্যার আগমনে গৃহস্থের ঘরে চাপা কান্না শোনা যায় না।

বেট্‌সিলেও নারীর লাম্বা-পরিধান-রীতি
বিশুদ্ধ মালয়-জাতীয়ের মতো চেহারা

সন্তানকে সাধারণত দুই বছর মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চারি বৎসর পর্য্যন্তও দুধ ছাড়ানো হয় না। মায়েরা সন্তানকে পিঠে বহন করে। ইমারিনা জাতির মধ্যে একটা বেশ মজার প্রথা চলিত আছে। সন্তান বড় হইলে পর, সে তাহার মাকে একটা মুদ্রা দেয়। এই মুদ্রা দেওয়ার অর্থ—ছেলেবেলায় মা যে তাহাকে পিঠে করিয়া বহন করিয়াছেন তাহার ভাড়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

মেয়েদের নাম দেখিয়া তাহাদের কে বড় কে ছোট বোঝা যায়। যেমন কাহারও নাম "রাফারাভাভি" শুনিলে বুঝিতে হইবে যে সে জননীর কনিষ্ঠা কন্যা। অনেক সময় কোন একটা জন্তুর নামে সন্তানের নাম রাখা হয়।

সন্তানবতী নারীদের সম্বোধন করা হয় "অমুকের-জননী" বলিয়া। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স হইলে নারীদের বলা হয় "রামাটোয়া"—ইহা খুব সম্মানসূচক অভিভাষণ। বৃদ্ধা নারীকে "ইনেনি" বলা হয়। ইহার অর্থ—মাতা।

কোন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকিলে প্রথমা স্ত্রী কয়েকটা বিষয়ে অন্য স্ত্রীদের উপর প্রভুত্ব করিতে পায়। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের তৈজসপত্রাদির উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। গরীব লোক বহুবিবাহ করে না, তাহাতে খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। কারণ এই দ্বীপে স্বামীকে তাহার স্ত্রীর সকল ভার গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই যে ধনী সেই কেবল বহুবিবাহ করিবার খেয়াল বা সখ করিতে পারে। আমাদের দেশের কুলীন ব্রাহ্মণদের মতন বিবাহ করিয়া ফাঁকি দেওয়া সেই অসভ্য দেশে চলে না।

সমগ্র ম্যাডাগাস্‌কারে বিবাহের নানা রকম পদ্ধতি চলিত আছে। তবে সকল স্থানেই ছেলের কোন বন্ধু ঘটকের কাজ করে। কেবলমাত্র এন্টিমোরো জাতির মেয়েরা নিজেদের স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এই নির্ব্বাচন-প্রথা অনেকটা আমাদের দেশের স্বয়ম্বর-প্রথার মত।

বিবাহ পাকাপাকি রকমেই হয়, তবে অনেক সময় আইনের সাহায্যে বিবাহ ভঙ্গ করা যায়। বিবাহ বাতিল হইলে পুরুষেরই সুবিধা বেশী হয়। অনেক জাতির মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ কিছুকালের জন্য সাময়িক বিবাহ করিয়া দেখে—যদি তাহাদের মনের মিল হয় এবং উভয়ের উভয়কে পছন্দ হয় তবে বিবাহ পাকা করিয়া লয়।

উভয়পক্ষের কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেলে পর বর কন্যাকে দাবী করিতে আসে। এই সময় কন্যার পক্ষের সমস্ত মেয়েদের বেশ সাজান হয়—এবং যে আসল কন্যা তাহাকে তাহার রূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হয়।

বিবাহের পর উভয় পক্ষের লোকেরা ভোজে বসে। এন্টিমেরিনা জাতির বর এবং কন্যা একটা বড় "লাম্বা"

উভয়েই একসঙ্গে পরিধান করে, এবং একই থালাতে ভোজন করে। সাকালাভা জাতির বিবাহ-ভোজে বরের কোন বন্ধু একটা মুরগী মারে, এবং তাহার দুইটা পা বরকে দেয়। বর একটা পা কন্যাকে দেয় এবং একটা নিজে আহার করে। বাকি পক্ষীটাকে অন্যান্য অভ্যাগতবৃন্দ আহার করে। অনেক জাতির বিবাহ-উৎসবে মহিষ বা ষাঁড় হত্যা করা হয়। এই ভোজের দ্বারা কেবল বর-কন্যার নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি পরিবারের মিলন ঘটে।

মেয়েদের ১২।১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে খুব ছোট থাকিতেই তাহার পিতামাতা তাহাদের বিবাহ স্থির করিয়া রাখে। কিন্তু প্রণয়-বিবাহ এদেশে একেবারেই বিরল নয়। এই গল্পটিতে তাহার আভাস বেশ ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে।

পাহাড়ের ধারে এক গ্রামে এক যুবক বাস করিত। দেবতার মত তাহার রূপ, অসুরের মত তাহার দেহের বল। পাশের গ্রামে এক যুবতী থাকিত—তাহার রূপে গ্রামের যুবকেরা পাগল হইয়াছিল। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিল—এবং একে অন্যকে ছাড়িয়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিল। বিধাতা বাদ সাধিল—দুই পরিবারে বহুকালের প্রাচীন কলহ ছিল। পিতায় পিতায় এবং মাতায় মাতায় মুখ দেখাদেখিও ছিল না। মরণের এপারে মিলন নাই দেখিয়া তাহারা দুইজনে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পাহাড়ের উপর হইতে নীচের অতল নীল জলে ঝাঁপ দিল। সেইদিন হইতে সেই কন্যার গ্রামে যদি কোন মেয়ে মারা যাইত, তবে অর্দ্ধেক খালের জল লাল হইয়া যাইত—এবং সেই যুবকের গ্রামের কোন যুবক মারা গেলে সমস্ত জল লাল হইয়া উঠিত—জল রক্তের মত দেখাইত। আন্দ্রিয়ানামজয়নীমেরিনা তখন টানানারিভোর রাজা। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহার রাজ্যে প্রচার করিলেন—"এখন হইতে আমার রাজ্যে কেহ প্রেমিক-প্রেমিকাকে মিলনে বাধা দিতে পারিবে না। যদি বাধা দেওয়া হয় তবে অকল্যাণ হইবে। যুবক যুবতী যাহার যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে।"

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মূক

কেন প্রাণ পরশিলে ওগো বীণাপাণি
বাণী যদি নাহি দিলে? যে সুরব কানে
আনে অমৃতের বন্যা কেন তারে গানে
আনিতে পারে না কণ্ঠ, পরাভব মানি
মৌন বেদনার ভরে গুমরিয়া মরে!
এ যেন বোবার স্বপ্ন মূক রসনায়,
এ ব্যথা যে প্রজাপতি গুটির ভিতরে
লুকান রেখেছ তার গুটান পাখায়!
কত কথা জাগে মনে তোমার পরশে
ভাষা তার কোথা পাই? না ফুটিলে ফুল
কেমনে জানাবে শাখী কি অমৃত-রসে
বসন্তের স্পর্শ তারে ভরেছে আমূল?
অবচনা এ রসনা পারে না বলিতে
কি বাণী তুলেছ মোর প্রাণের নিভৃতে।

শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা

সনেটের প্রতি

তুমি মোর বসন্তের শেষ পুষ্পকলি,
ফুটিতে পারনি তব শাখা বিদরিয়া,
বিকাশের ব্যথাভরে শুধু মুঞ্জরিয়া
উঠিয়াছ শেষ পলে! গেল যবে চলি
ফুল ফুটিবার কাল, আসিলে তখন
ঝরিতে মরিতে শুধু! ক্ষুদ্র বুকটিতে
ঢাকা ছিল কি সুরভি কিবা সে বরণ
কে পাবে উদ্দেশ তার? কে পারে জানিতে
মূকের মরমবাণী? মৌন ব্যাকুলতা
ভাষা পায় কানে যার হেন সমদুখী
কেবা তোর আছে হেথা? চির অপূর্ণতা
বক্ষে ধরি রয়েছিস্ তুই মৃত্যুমুখী
অস্ফুট কিশোরী মোর! চতুর্দ্দশদলে
কি বারতা রেখেছিস্ ঝাঁপিয়া সবলে?

শ্রী সুরেশ্বর শর্ম্মা

সমুদ্রে কুড়ানো জিনিসে বাড়ী তৈরী—

দৈনিক রোজনামচার পথ ছাড়িয়ে একটা-কিছু করলেই লোকের চোখে চমক লাগে—ছুটে আসে সবাই দেখতে—ব্যাপারটা কি হল। তা সামান্য একটা খেলনাই হোক আর খুব দরকারী বা অদরকারী কিছু একটা হোক। আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় রেডোণ্ডোর কাছে সমুদ্রের উপকূলে একটা প্রকাণ্ড খাড়া পাথরের পাশে এক ভদ্রলোক একটি বাসগৃহ তৈরী করেছেন মাত্র এক ডলার বা সাড়ে তিন টাকা ব্যয় করে'। বিষম অসুখে ভুগে সমুদ্রের ধারে বাস করতে ইচ্ছে হল, কিন্তু বাড়ী ভাড়া বা তৈরী করবার পয়সার অভাব। কাজেই তাঁকে বিনা-পয়সায় যেমন করে' হোক একটা থাকবার মত বাড়ী তৈরী করবার উপায় চিন্তা করতে হল।

সমুদ্রের সাহায্যে তৈরী বাড়ী

সমুদ্রে নানা রকম জিনিষপত্র ভেসে আসে—সেই-সমস্ত জিনিষ যোগাড় করে' করে' বাড়ী তৈরী সুরু হল। প্রথম যে বাড়ীটি হয়, সেটিতে কোন-রকমে থাকা চলত। কিন্তু বর্ত্তমানে তার নানা রকম উন্নতি করা হয়েছে। এবং একতলার পরিবর্ত্তে দুতলা করা হয়েছে। শোবার ঘর, বসবার ঘর, রান্নার ঘর ইত্যাদি সবই আছে। যে সিঁড়ি দিয়ে অভ্যাগতরা ওপরে ওঠেন তা কোন একটা জাহাজের ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই একটা ছোট হাতল আছে, সেটা টানলেই ভিতরে একটা লোহার ডাণ্ডা আগত অতিথিদের নাম সই করবার বন্দোবস্ত আছে খাতাতে নয়, খুব মসৃণ করে চাঁছা কাঠের তক্তাতে। লোহার তারে সার-বন্দি করে' এই তক্তা টাঙ্গানো থাকে—একখানা নামে ভরে' গেলেই সেটাকে তারের এক প্রান্তে সরিয়ে রাখা হয়। বসবার চৌকি তৈরী করা হয়েছে মদের পিপার ওপর গদি লাগিয়ে। জানলার সার্সি কেবল পয়সা দিয়ে কিনতে হয়েছে; সমুদ্রে যে-সব কাচ পাওয়া যায়, তার বড় বেশী টুকরা টুকরা অবস্থা। বাড়ীর পাশে পাথরের গায়ে একটা ঝরণা আছে—তার মুখে নল লাগিয়ে বাড়ীর ভিতর খাবার-জল আনা হয়। বাড়ীর পাশে একটা পিপাতে সব সময় জল ভরা থাকে। বাড়ীটির নামকরণ হয়েছে "ক্রোটনাম্ কাসল্" এবং ক্যাসল্এর অধিকারী হচ্ছেন—লুই ডার্ট্।

—

সুইট্জারল্যাণ্ডের নির্ব্বাচন-ভূমি—

সুইট্জারল্যাণ্ড ২২টি স্বাধীন প্রদেশের সমষ্টি। এক একটি প্রদেশকে ক্যাণ্টন বলে। বহু পুরাতন চারিটি ক্যাণ্টনে বৎসরে বৎসরে এপ্রিল মাসের শেষ বা মে মাসের প্রথম রবিবারে জনসাধারণ আগামী বৎসরের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। নির্ব্বাচন-স্থান খোলা মাঠের উপর। এই দেশে
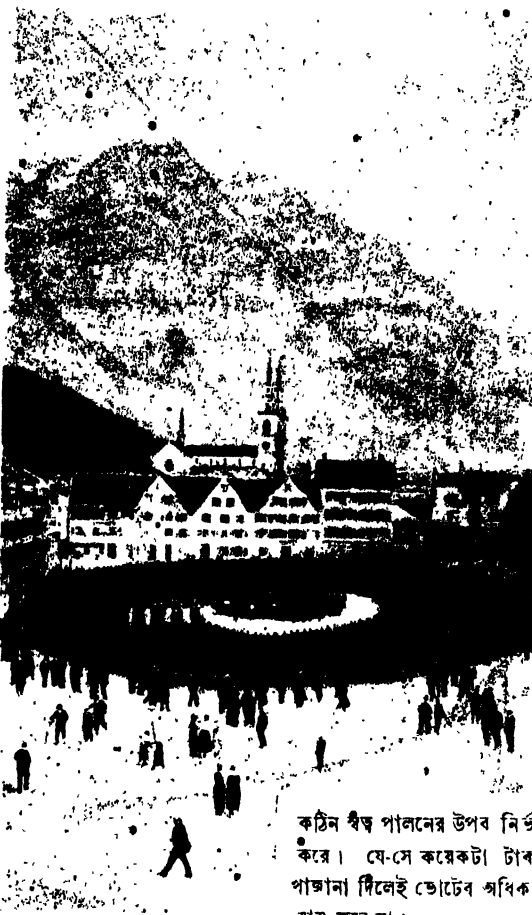
কঠিন স্বত্ব পালনের উপর নির্ভর করে। যে-সে কয়েকটা টাকা খাজনা দিলেই ভোটের অধিকার লাভ করে না।

সুইট্জারল্যাণ্ডের নির্ব্বাচন-ভূমি

ছড়ি-বেহালা—

আমেরিকাতে এক কন্সার্টে একদিন এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটা ছড়িকে কাঁধে বেশ করে' বাগিয়ে ধরে' বেহালার মত বাজাতে শুরু

ছড়ি বেহালা
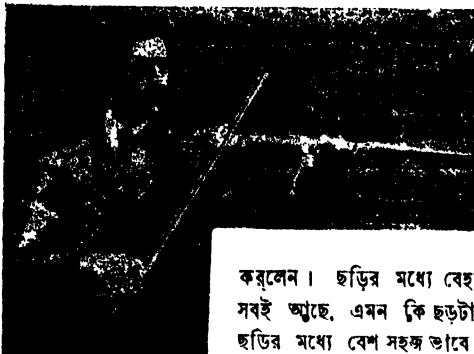
করলেন। ছড়ির মধ্যে বেহালার সবই আছে, এমন কি ছড়টাকেও ছড়ির মধ্যে বেশ সহজ ভাবে রাখা যায়। ছড়িটাকে মোটা লাঠি না বলে' ছাতা বলাও চলে—অদ্ভুত সেই রকমই কতকটা দেখতে। এর আওয়াজ বেশ ভাল বেহালার মত।

উচ্চে উড্ডয়ন

গত আষাঢ় মাসে প্রবাসীতে "আলোচনায়" লেখা হইয়াছিল "আমেরিকান বিমান-বীর শ্রোয়েডের (Shroede.) গত ১৯২০ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৩১৩৩ ফুট উচ্চে উঠেন।" এতদিন অবধি ইঁহা আসনই আকাশের সব-চেয়ে উঁচুতে ছিল। কিন্তু গত ২৯এ সেপ্টেম্বর (১৯২১ সনে) লেফ্টেন্যান্ট জে, এ, ম্যাক্রেডি নিজেকে সব চেয়ে উঁচুতে তুলিয়াছেন। ইনি ৪০,৮০০ ফুট উপরে উঠিয়াছিলেন। ইঁহার মতে কিছুকাল পরে আকাশ-পথই সব চেয়ে সুবিধার হইবে, ইহাতে খরচ এবং সময় কম লাগিবে, আরাম এবং আনন্দ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

পাখা-টুপী—

মিস্ এথেল বিচ্ একজন আমেরিকান নারী। ইনি একদিন এক পার্টিতে মাথার টুপিতে ছোট ইলেকট্রিক ফ্যান লাগাইয়া হাজির হন।

টুপী পাখা

এই ফ্যান দুটি ড্রাই-সেলের সাহায্যে ঘোরে। এই রকম পাখা লাগাইয়া দুজন মুখোমুখি বসিলে দুজনেই বেশ হাওয়া পাইতে পারেন।

—হেমন্ত

চলন্ত ঘরকন্না—

একটা-না-একটা অদ্ভুত জিনিস আমেরিকায় অনবরতই তৈরী হচ্ছে। মোটরগাড়ীর মত কলকব্জার উপরে এক প্রকাণ্ড কাঠের ঘর, তাতে মানুষের খাওয়ার ও শোবার সমস্ত সরঞ্জামই আছে। এ গাড়ী-ঘর যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন রাস্তার উপর দিয়ে চালানো যায়। ভাল স্প্রিং থাকার জন্যে আরোহীর কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না। এই ঘরের ভিতরটা অনেকটা জাহাজের কেবিনের মত দেখতে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শোবার বিছানা বেশ আরামের। গাড়ীর মাথায় আবার একখানা ছোট নৌকা থাকে, পথে জলা পাড়ি দেবার জন্যে।

হস্তহীন লোকের লেখা—

ইংলণ্ডের অনেক হাস্পাতালে হস্তহীন লোকদের লেখাবার জন্তে অনেক রকম পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে। হস্তহীন লোকদের বুকের উপর একটা কাঠের যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয়—তাতে বুকের ঠিক মাঝখান থেকে একটা এক ফুট লম্বা ডাণ্ডা থাকে, তার মুখে

হস্তহীন লোকের বুক দিয়ে লেখা

পেন্‌সিল ধর্‌বার একটা কল, তাতে পেন্সিল লাগিয়ে হস্তহীন লোক বুকের চাপে বেশ গড়গড় করে' লিখে যেতে পারে। এ প্রণালীর উদ্ভব হওয়াতে হস্তহীন লোকের মনের ক্ষোভ কত পরিমাণে যে দূর হয়েছে তা বলা যায় না। এই সমস্তই সদা সজাগ সভ্যতার সুফল।

[illegible]

বাইসাইকেল বহনের সুবিধা—

ঘোড়ার গাড়ীতে বা ট্রেনে বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়া এক অসুবিধাজনক ব্যাপার। তার জন্তে জায়গা চাই বিস্তর আর আরোহীদের খুব অসুবিধা। সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহর থেকে খবর পাওয়া গেছে যে সেখানে এমন এক রকম বাই-সাইকেল তৈরী হচ্ছে যার চাকা মুড়ে পুঁটুলি 'করে' হাতে ঝুলিয়ে অনায়াসে বহন করে' নিয়ে যাওয়া যাবে। এই সাইকেলের চাকা সাধারণ প্রচলিত সাইকেলের চাকার চেয়ে একটু ছোট। একে মুড়েসুড়ে একটি পোর্টম্যাণ্টের মধ্যে অনায়াসে নিয়ে যাওয়া যায়। এই সাইকেলের উদ্ভাবনে ভ্রমণকারীদের প্রচুর সুবিধা হবে।

—

নদীর উপর পাহাড়—

আমেরিকার ওয়াশিংটন ও অরিগনের মাঝামাঝি কলম্বিয়া নদীর মোহানার ২০ মাইল উপরে একটা ২০ ফুট উঁচু প্রকাণ্ড পাথর আছে। সেটি দেখ্‌তে অদ্ভুত, যেন নদীর উপর থেকে একটা থাম উঠে গেছে।

জলের উপর পাহাড়

আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এটি অনেকের দর্শনীয় জিনিস ছিল। সম্প্রতি এটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এর মাথার উপরে একটি লাল আলো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে সেই নদীর নাবিকেরা আপনাদের গন্তব্য পথ অন্ধকারেও ঠিক দেখে' যেতে পারে।

—

জলের উপর স্মৃতিস্তম্ভ—

টর্‌পেডো দিয়ে লুসিটানিয়া জাহাজ গত যুদ্ধের সময় ডোবানো হয়েছিল। 'ঠিক যেখানে জাহাজটি ডুবেছিল সেই জায়গায় একটি স্মৃতিচিহ্ন ভাসিয়ে রাখ্‌বার জন্তে করাসী ভাস্কর জর্জ্জ হু থোয়া একটি মাতৃমূর্ত্তি তৈরী করছেন—মজ্জমানা জননী প্রিয় সন্তানকে আঁকড়ে [illegible] তাকিয়ে আছেন। মূর্ত্তিটি

লুসিট্যানিয়া স্মৃতিচিহ্ন সাগরে ভাসমান

সমুদ্রের উপর ভাসিয়ে রাখা হবে তীর থেকে তারের সাহায্যে। তাতে রাত্রে বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বলবে—এতে জাহাজদের পথ দেখানোর কাজও অনেকটা হবে। একটা ভেলার উপর এই স্মরণ-চিহ্ন থাকবে। ভেলার নাম হবে লুসিটানিয়া।

আমেরিকার প্রকাণ্ড বেহালা—

সম্প্রতি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে একটি প্রকাণ্ড বেহালা প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটি এগার ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু, চার ফুট সাত ইঞ্চি চওড়া, তের ইঞ্চি মোটা এবং তার ওজন ১৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫

পৃথিবীর সব-চেয়ে প্রকাণ্ড বেহালা

সের বা ১ মন ৩৫ সের। এই বেহালাটি নাকি জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বেহালা। বেহালার তারগুলি মানুষের আঙুলের মত মোটা মোটা।

ব্যথার গৌরব

(বাউলের সুর)

আমায় তুমি ব্যথা দিলে অন্তরে,
নাইক আমার এই গরবের অন্ত রে!
দানের দিনে সবাই আসি
নিয়ে গেল হাসি-রাশি,
সুখ-সায়রে চিত্ত সবার সন্তরে—
নাইক আমার এই গরবের অন্ত রে!

বিতরণের ভার দিলে মোর মস্তকে,
দিলে নাকো চাইতে আমার হস্তকে।
সবার শেষে আপন জেনে
ত্যক্ত ব্যথা দিলে এনে,—
স্নেহের পরশ কর্‌লে হৃদি-যন্তরে,
নাইক আমার এই গরবের অন্ত রে!

গোলাম মোস্তফা

গান

১

ভোর হল যে শ্রাবণ-শর্ব্বরী
তোমার বেড়ায় উঠ্‌ল ফুটে
হেনার মঞ্জরী।
গন্ধ তারি রহি রহি
বাদল বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে
বেড়ায় সঞ্চরি'।
বেড়া দিলে কবে তুমি
তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল ক'রে রেখেছিলে
আমার বনের পানে।
কখন গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে
ডাকে মর্ম্মরি'।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ আষাঢ়, ১৩২৯।

২

একলা ব'সে একে একে অন্যমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায়রে বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে
ও যে আমি এনেছিলাম আপ্‌নি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণ-মূলে
অকারণে,
কখন্ তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে
অন্যমনে।
দিনের পর দিনগুলি মোর এম্‌নি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়,
এমনি তোমার আলসভরা অবহেলায়,
হয়ত তখন বাজ্‌বে ব্যথা সন্ধ্যেবেলায়,
অকারণে,
চোখের জলের লাগ্‌বে আভাষ নয়ন-কোণে
অন্যমনে॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ আষাঢ়, ১৩২৯।

৩

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ঐ যে পুরব গগন জুড়ে
উত্তরী তার ধায় রে উড়ে,
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউতোলা॥

শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা

বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র, বাঙ্গালীর যে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে,—(১) বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে, (২) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে, (৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত বর্ষকাল কোন সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর স্মৃতি ও দায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে, (৪) বাঙ্গালীর জাতি এবং কুল-পরিচয় পূর্ণরূপে লইতে হইবে। এমন কি বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডে, যজ্ঞাদিতে বাঙ্গালী ভবদেবের পদ্ধতি মান্য করিয়া চলে, অন্য কোন আর্য্য পদ্ধতিকারকে গ্রাহ্যই করে না। দায়তত্ত্বে জীমূতবাহন বাঙ্গালীকে অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছেন; দায়ভাগ বাঙ্গালার হিন্দুয়ানীকে অনেকটা Territorial বা দেশগত ও জাতিগত করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেব, উমাপতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ, লুইপাদ কাহ্নু-প্রমুখ সিদ্ধাচার্য্যগণ, শঙ্কর-কৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বাঙ্গালীকে এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ধর্ম্ম কর্ম্ম, শীল ও আচার লইয়া বাঙ্গালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালাই বজ্রযানের আদিস্থান, আবার সে বজ্রযান সহজিয়া মত এবং তন্ত্র মতের দ্বারা এমনই ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িত হইয়াছিল যে, পরে হীনযানী সদ্ধর্ম্ম হইতে উহা পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। যত জীব তত শিব, এই মহাবাক্য বাঙ্গালাদেশেই প্রথম উত্থিত হয়; এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষ্য-সমাজে যতটা কাজ হওয়া সম্ভবপর তাহা বাঙ্গালাদেশেই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে হইয়াছিল। বাঙ্গালার সহজ মত, তন্ত্র ধর্ম্ম, এবং পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই মহাবাক্যের বেদীর উপরে বিন্যস্ত। এমন কি বাঙ্গালীর ভক্তিশাস্ত্রটা এই মহাবাক্যের দ্বারা এতটা সঞ্জীবিত যে উহা রামানুজ-বল্লভাচার্য্য-প্রমুখ মধ্যযুগের আচার্য্য-পাদগণের ব্যাখ্যাত ভক্তিধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে; তাই আছে দেহভাণ্ডে।" ইহাও বাঙ্গালার একটা মহাবাক্য। ব্রহ্মাণ্ড Macrocosm, নরদেহভাণ্ড Microcosm; একটা ব্যাপ্ত, অপরটা সঙ্কুচিত; একটা বিরাট, অপরটা স্বরাট্। দেহভাণ্ডকে বুঝিতে পারিলে, আয়ত্ত করিতে পারিলে, ব্রহ্মাণ্ডকে

বুঝা যায়, ব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করা যায়। এই সিদ্ধান্ত, এই অপূর্ব্ব generalisation বাঙ্গালীর একটা বড় বিশিষ্টতা। এই সিদ্ধান্তের উপরে সহজিয়া মত এবং বৈষ্ণবদিগের "দেহতত্ত্ব" প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালীর "দেহতত্ত্ব" বাঙ্গালীর নিজস্ব; এই দেহ-তত্ত্বই বাঙ্গালীর Anthropomorphism বা নরপূজার—নরদেবতাপূজার বেদী। বাঙ্গালীর আগমনী বাঙ্গালীর নিজস্ব; বাঙ্গালীই একা নরদেবতা এবং নারীদেবীকে পূজা করিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশেই প্রেমের ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ হয়।

বেদের বহির্দেববাদের প্রতিবাদ বাঙ্গালার তান্ত্রিকগণ সার্থকভাবে করিতে পারিয়াছিল।

"আত্মস্থং দেবতাং ত্যক্ত্বা
বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা
ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥"

অর্থাৎ হাতের মুঠার মধ্যে কৌস্তুভমণিকে ফেলিয়া দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি কাচখণ্ড অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তেমনি যে ব্যক্তি চৌদ্দপোয়া মাপের নরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী দেবতাকে অবহেলা করিয়া বাহিরের অন্য দেবতার পূজায় ব্যস্ত হয়, সে ততোঽধিক মূর্খ। সোজা কথা এই—বাহিরের দেবতার পূজা বন্ধ করিয়া, যাগযজ্ঞাদি পরিহার করিয়া, পরমাত্মার পূজায় ব্যাপৃত হও। এই সিদ্ধান্তের উপরে বাঙ্গালীর উপাসনা-তত্ত্ব বিন্যস্ত। বাঙ্গালীর দেহতত্ত্ব বেদের Deismএর প্রতিবাদ। বাঙ্গালীর দেহতত্ত্বের প্রভাবে বাঙ্গালায় বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি লোপ পাইয়াছিল; আমাদের মনে হয় বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এবং Deism কোন কালেই বঙ্গদেশে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। এই দেহতত্ত্বের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র নিহিত আছে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, নাম, রূপ, ভাব, রস এই চারি পদার্থকে বুঝিতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ষট্‌চক্রভেদ ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে। নহিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অর্দ্ধেকটা বুঝিতে পারিবে না, বাঙ্গালীর বিশিষ্টভাবের অর্দ্ধেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব তাহার আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙ্গালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। বাঙ্গালার কাণা ভট্টশিরোমণি রঘুনাথ মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনাথ তাবত ন্যায়গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব-মনীষা-প্রভাবে নব্য-ন্যায়ের উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে মিথিলার একচেটিয়া চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্বরূপ হইল। ইহাই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বাঙ্গালী ন্যায়ের এই অভ্যুদয়-ধারা চারিশত বর্ষ-কাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবদ্বীপকে নব্য-ন্যায়ের অদ্বিতীয় কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

দায়ভাগ ও স্ত্রীধনবিন্যাসে বাঙ্গালী স্মার্ত্ত যে গণবাদের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডেও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কল্পনামাত্র ছিল। জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত-সকল পুরামাত্রায় এখনও ব্রীটিশজাতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" মিতাক্ষরার প্রকাণ্ড প্রতিবাদ, Feudalismএর বিরুদ্ধে বিষম protest! সহস্রবৎসর পূর্ব্বে, সকল সভ্যজাতির আগেভাগে বাঙ্গালী এই প্রতিবাদটি করিয়া গিয়াছেন।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন একজন বিষম Protestant ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি-সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব এবং অতুল্য। তাঁহারই প্রভাবে বাঙ্গালায় আচারী-দিগের "ছুৎমার্গ" দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার আর-একটা উপাদান।

আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী-প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ গিরি বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা উন্মেষের আর দুইজন সাধক। ইঁহারাই "বাশিষ্ঠ্য পদ্ধতি" অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় "শৈব বিবাহের" প্রচলন করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নারীর জাতি-বিচার করিতে হয় না, যৌবনের পূর্ণ উন্মেষ না ঘটিলে শৈব বিবাহ হইতে পারে না। এই শৈব-বিবাহের প্রভাবে বাঙ্গালায় নানা জাতির সম্মেলন ঘটিয়াছিল, শাক্তের যেমন শৈব বিবাহ, বৈষ্ণবের তেমনি "কণ্ঠী বদল" ছিল।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অথবা বিক্রমপুরের নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান সহায়ক। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাই লোকে ইঁহাকে নাস্তিক ভট্টাচার্য্য বলিত। দীপঙ্কর ভুটানে তিব্বতে চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; টেঙ্গুরে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; নেপালে বাঙ্গালী কীর্ত্তির অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল দিন যখন বাঙ্গালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বৎ চীন নেপাল ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল দিন যখন বাঙ্গালায় অসংখ্য বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত এবং বাঙ্গালী রমণীকে শৈব বিবাহের সাহায্যে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত। "ভরার মেয়ে বিবাহ" বাঙ্গালা দেশে বংশজ ও কষ্টশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল; শাক্ত কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এবং কুলাচারী অন্য জাতির মধ্যে পাকস্পর্শের দিনে নব-বধূর জাতি-কুলের পরিচয় লইয়া ঘোঁট হইত না। ইহা একটা বড় কথা।

দেবীবরের মেলবন্ধন এবং কৌলীন্যের নবপ্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্বের একটা বড় পরিচয়। দেবীবর মেলবন্ধন করিয়া যে কত সাঙ্কর্য্যকে ঢাকিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর এখন হিসাব করিয়া বলা যায় না।

বাঙ্গালার প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্ব্বত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, ঘনরাম প্রভৃতি সকল বড় কবিই ব্রাহ্মণ, পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের Hero and Heroine নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক, সদ্গোপ, কৈবর্ত্ত, গোড়ো, গোয়ালা প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ-সকলই এই-সকল কাব্যের নায়ক। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের লেশমাত্র নাই। চণ্ডীর ঘট স্থাপন ফুল্লরা নিজেই করিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু, পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতি প্রমুখ নায়কগণ কোন জাতীয় ছিলেন? ইঁহারা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন্ হিসাবে? কাজেই বলিতে হয় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের, জল আচরণীয় এবং জল অনাচরণীয়ের মধ্যে এমন অজ্ঞাত কোন তত্ত্ব আছে, যাহা এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই।

বাংলা ভাষা বাঙ্গালীকে অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্ব্বাবয়বে, শিল্প-কলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্ম্মাণে, লাঠি খেলায়, ক্ষুরপা-রণপা নির্ম্মাণে ও ব্যবহারে, নৌশিল্পে, নৌকা প্রস্তুতিতে, কথকতায়-ব্যাখ্যায়, বয়ন-শিল্পে, তসর-গরদের বসন প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্য্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে,—সভ্যজাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীভূত হইয়া আছে। মনীষী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার

মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে বাঙ্গালার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের Technique ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালীর ভাস্কর্য্য অপূর্ব্ব ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে; বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের ঢোল বাজনা অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। এমন ভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোন জাতি পারে না। বাঙ্গালীর গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর আর কোন জাতিতে পারে না। বাঙ্গালার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপসকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাইও। বাঙ্গালার "পঙ্খের কাজ" বাঙ্গালীর নিজস্ব; উহা বাঙ্গালার বাহিরে ছিল না,—নাইও। এমন কি বাঙ্গালার জনার্দ্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্ম্মকারগণ যেমন তোপ কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিকরে তেমনটি পারিত না, জাহান-কোষা, দল-মাদল, কালে খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালীর নৌশিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোন জাতি পারিত না। বাঙ্গালার "ষাট বৈঠার ছিপে" চড়িয়া মীরকাসেম একরাত্রে গোঁদাগিরি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার আর-একটা শিল্প ছিল—কুসুম-শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বাঙ্গালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেবপুত্র যুবরাজ মহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কি আর মণিমুক্তা, চুণি পান্নার লোভ দেখাও পিত, বাঙ্গালার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার-সকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্য-সমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগেযুগে, বারেবারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আমদানী করিয়াও বাঙ্গালায় যাগ-যজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুকগণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়া মনে হয় আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিলে, "পুনঃসংস্কারমর্হতি!" কেননা বাঙ্গালায় দীর্ঘকাল বাস করিলে সোমরসপায়ী গোষ্ঠ আর্য্যগণের জাতিনাশ ঘটিত, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট হইত। বাঙ্গালায় জৈন ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোন গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবনের অর্দ্ধেকটা কাল বর্দ্ধমান বিভাগে বা রাঢ়দেশে কাটাইয়াছিলেন; বাসুপূজ্য উত্তর রাঢ়ে ও ভাগলপুর জেলার পূর্ব্বাংশে জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই জৈন ধর্ম্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথের "নাথী ধর্ম্ম" বাঙ্গালার উত্তর রাঢ়ে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। একপক্ষে জৈন তীর্থঙ্করগণ, অন্য পক্ষে গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যগণ বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পুষ্টি পক্ষে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালারই কপিল-কণাদ, বাঙ্গালাই অহিংসা পরম ধর্ম্মের বেদী, বাঙ্গালাই জৈনাচার্য্যগণের লীলাক্ষেত্র, বাঙ্গালায় সিদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাব এখনও ধর্ম্ম-কর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট।

বঙ্গবাণী, ভাদ্র শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার নবযুগের কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলার নব্যশিক্ষিত সমাজে যে স্বাধীনতার আদর্শ জাগিয়া উঠে, ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথমে সেই আদর্শকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এই কারণেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়েই এই স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

এই স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিপূর্ণমাত্রায় বাধিয়া উঠে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে। সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের মূলসূত্র হইল সত্য ও স্বাধীনতা। নিজের বিচারবুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, প্রাণ পাত করিয়াও তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোনও গ্রন্থের, কোনও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের, সমাজের অধীনতা স্বীকার করিলে চলিবে না, তাহাতে ধর্ম্মহানি হইবে। এই মূলমন্ত্র স্বাধীনতার মন্ত্র। এইভাবে সেকালের শিক্ষিত লোকমাত্রেই ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। কেশবচন্দ্র দেশাত্মবোধকে সে সময়ে বিশেষভাবে জাগাইয়া তুলেন।

বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী যে স্বাধীনতামন্ত্র সাধন করিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের একরূপ প্রথম দীক্ষাগুরু। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই তাহার গোড়ায় একটা ধর্ম্মের প্রেরণা জাগিয়াছে। এবং এই ধর্ম্মের প্রেরণায় মানুষ আগে ভিতরের বাঁধন কাটিয়াছে, নিজের চিন্তা ও চিত্তকে বাহিরের বন্ধনমুক্ত করিয়াছে, পরিবারে ও সমাজে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছে, এবং পরিণামে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ভিতরে যে দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। পরিবারে এবং সমাজে যে আপনার বিচারবুদ্ধি এবং বিশ্বাস অনুসারে চলিতে ভয় পায়, সে কখনও নির্ভীক হইয়া একতন্ত্র রাজশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে না। কেবল সাংসারিক সুখ সুবিধা যেখানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল প্রেরণা হইয়া রহে, সেখানে এই স্বাধীনতার সংগ্রাম কদাপি জয়যুক্ত হইতে পারে না। যেখানে জয়যুক্ত হয়, সেখানে দেশের জনসাধারণে এক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অপর অধীনতাতে যাইয়া পড়ে, 'স্ব'য়ের উপরে দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা বিশুদ্ধ উদার এবং অপরাজেয় হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়া ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার, বর্ত্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা- ও দীক্ষা-গুরুরূপে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতে পাই।

কেশবচন্দ্র বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করেন নাই, একথা সত্য। কিন্তু সে সময় রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনাও লোকে অনুভব করিতে আরম্ভ করে নাই। বন্ধনের বেদনা যেখানে নাই, মুক্তির বাসনাও সেখানে জাগে না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজের শৃঙ্খল আমাদের গলায় বাধে নাই। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডে এবং জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও ছুৎমার্গচারী সমাজের কঠোর রজ্জুটাই আমাদিগের গলায় এবং হাতে ও পায়ে বড়ই বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই বন্ধনের বেদনা জাগিয়াছিল। পৌরাণিক দেবদেবীতে বিশ্বাস নাই, অথচ তাহাদিগের নিকটে

মাথা নোয়াইতে হইত ; ব্রাহ্মণের অতিপ্রাকৃত অধিকারে আস্থা ছিল না, অথচ পরিণীরের শাসন-ভয়ে পুরাপার্ব্বণে শ্রাদ্ধশান্তিতে বামুন ডাকিয়া মন্ত্র পড়িতে হইত। সংস্কৃতজ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান তখনও জন্মে নাই ; সুতরাং না পুরোহিতের, না যজমানের, কাহারও মন্ত্রের অর্থবোধ ছিল না, অথচ টিয়াপাখীর মতন এ সকল অর্থশূন্য শব্দ আবৃত্তি করিতে হইত। এই-সকল ব্যাপারে বিচারবুদ্ধিতে আঘাত লাগিত। এই আঘাতের তাড়নাতেই মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যাঁহারা সমাজ-ভয়ে এ-সকল অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহারাও মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সত্যধর্ম্মের প্রেরণা—বিশ্বাস ও ভক্তি। বিশ্বাস বিচারবুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হইলেই সত্য ও শক্তিশালী হয়। এখানে তাহা হইত না। সমাজে জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হইত। অথচ নব্যশিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিচারযুক্তি কিম্বা নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা এই কৃত্রিম সামাজিক ভেদবাদকে সত্য বা কল্যাণকর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেন না। এই জাতিভেদ মানিতে যাইয়াও তাঁহাদের অন্তরে গুরুতর আঘাত লাগিত। যাঁহারা মানিতেন তাঁহারাও নিজের কাছে নিজে অত্যন্ত খাটো হইয়া থাকিতেন। আর নিজের কাছে নিজে খাটো হইয়া থাকার মতন দুরবস্থা মানুষের আর কিছুতে হয় না। ইহাতে তাহার আত্মসম্মানে যেমন আঘাত লাগে, পরের অপমানে বা নির্য্যাতনে তাহার শতাংশের একাংশও আঘাত লাগিতে পারে না। এই বন্ধন-বেদনাটাই তখন আমাদের শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রাম সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেই বাধিয়া উঠিল। সেই সাধনার উত্তরাধিকারীরূপেই বাংলা আজি পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার সাধনে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া আছে। স্বাজাত্যের গৌরববোধ জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বনিয়াদ। এই স্বাজাত্যাভিমান সর্ব্বত্রই জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় আত্মচৈতন্যের—National life এবং National consciousnessএর সূচনা করে।

দুনিয়াতে আজিও যে আমাদের কিছু দিবার আছে, সভ্য জগতের যে আমাদের নিকটে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, কেশবচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে এই ভাবটা জাগাইয়া দেন।

প্রথম যুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগত নবীন ব্রাহ্ম যুবকেরাই সেনানী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই উপরে আমাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইহাই প্রধান কীর্ত্তি।

বঙ্গবাণী, ভাদ্র শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

—

বৃষ্টি-রৌদ্র

ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
আজকে সারাবেলা।
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভরে'
সূর্য্যকে নেয় চুরি করে'
ভয়-দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদের ধরতে মিছে
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে-পিছে,
যায় না তাদের ধরা।
আজ যেন ঐ জড়সড়
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়
মন-কেমন-করা।
বটের ডালে ডানা ভিজে
কাক বসে' ঐ ভাবচে কি যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে,
সজ্‌নে-পাতার ঝরে' ঝরে'
জল পড়ে টুপটুপ্‌।
ল্যাজের মধ্যে মাথা থুয়ে
খ্যাঁদন-কুকুর আছে শুয়ে
কেমন একরকম।
দালানটাতে ঘুরে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন-সুরে
ডাক্‌চে বকবকম্‌।
কার্ত্তিকে ঐ ধানের ক্ষেতে
ভিজে হাওয়া উঠ্‌ল মেতে
সবুজ ঢেউয়ের পুরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হি হি করে' ধানের শিষে
শীতের কাঁপন ধরে।
ঘোষাল-পাড়ার লক্ষ্মী বুড়ি
ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িসুড়ি
গেছে পুকুর-পাড়ে,
দেখ্‌তে ভাল পায় না চোখে
বিড়বিড়িয়ে বকে' বকে'
শাক তোলে ঘাড় নাড়ে।
ঐ ঝমাঝম্‌ বৃষ্টি নামে
মাঠের পারে দূরের গ্রামে
ঝাপ্‌সা বাঁশের বন।
গরুটা কার থেকে থেকে
গোটায় বাঁধা উঠ্‌চে ডেকে,
ভিজ্‌চে সারাক্ষণ।
গদাই কুমোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু করে'
হাঁড়ির উপর হাঁড়ি।
চল্‌ছে রবিবারের হাটে
গামছা মাথায় জলের ছাঁটে
হাঁকিয়ে গরুর গাড়ি।
বন্ধ আমার রইল খেলা,
ছুটির দিনে সারাবেলা
কাটবে কেমন করে'?
মনে হচ্ছে এমনিতর
ঝরবে বৃষ্টি ঝরঝর
দিন রাত্তির ধরে'!
এমন সময় পুবের কোণে
কখন্‌ যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে' যায় মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।

ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,
লাগায় ঝিলিমিলি ;
বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুল-গাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
বাদল-বেলার কথা,
হারিয়ে পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
বেড়ায় ঝুমকো-লতা।
উপর নীচে আকাশ ভরে'
এমন বাদল কেমন করে'
হয়, সে কথাই ভাবি।
উলটপালট খেলাটি এই,
সাজের ত তার সীমানা নেই,
কার কাছে তার চাবি ?
এমন যে ঘোর মন-খারাপি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি
সমস্ত খন আজি,—
হঠাৎ দেখি সবই মিছে,
নাই কিছু তার আগে পিছে,
এ যেন কার বাজি।

সন্দেশ, ভাদ্র — শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের ঐশ্বর্য্য

ভারতের ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সম্রাট শাহ্‌জহানের রাজ্যকালেই পাওয়া যায়। প্রাচ্যরাজসিক ঐশ্বর্য্য-গরিমায় ভারতবর্ষ বোধ হয় সেই সময় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আব্দুল হমিদ্ লাহোরীর সমসাময়িক ইতিহাস থেকে ১৬৪৮ খৃঃ সম্রাট শাহ্‌জহানের অর্থসম্ভারের একটি ঠিক ধারণা করিতে পারা যায়। তখনকার টাকার মূল্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ২½ শিলিং অর্থাৎ আঠার আনার সমান। এই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এখন এক টাকায় যে জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায় তখন ইহার সাতগুণ জিনিষ পাওয়া যাইত।

সমস্ত মুঘল সাম্রাজ্যে ২০ কোটী টাকা খাজনা আদায় হইত। সম্রাটের খাস মহলের আয় ছিল দেড় কোটী টাকা; তাহা হইতে সম্রাটের নিজের খরচ চলিত।

রাজত্বের প্রথম ২০ বৎসরে শাহ্‌জহান দান ও পুরস্কার কার্য্যে ৯½ কোটী টাকা ব্যয় করেন, তাহার মধ্যে ৪½ কোটী টাকা নগদ আর ৫ কোটী টাকার জিনিষপত্র।

প্রাসাদসৌধ প্রভৃতি নির্ম্মাণে তিনি কি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

আগ্রার সৌধমালা :—	
দুর্গাভ্যন্তরস্থ মোতী মস্‌জীদ, প্রাসাদ ও প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান	৬০ লক্ষ টাকা
তাজমহল	৫০ „ „
দিল্লীর সৌধমালা :—	
প্রাসাদসমূহ	৫০ লক্ষ টাকা
জুম্মা মস্‌জীদ	১০ „ „
দিল্লী নগরীর চারিদিকে প্রাচীর	৪ „ „
দিল্লীর সহরতালীর ইদ্‌গাহ	½ „ „
লাহোরের সৌধমালা :—	
প্রাসাদ, উদ্যান ও খাল	৫০ লক্ষ টাকা
কাবুলের সৌধমালা :—	
মস্‌জীদ, দুর্গ, প্রাসাদ ও নগরপ্রাচীর	১২ „ „
কাশ্মীরের সৌধমালা :—	
প্রাসাদ ও উদ্যান	৮ লক্ষ টাকা
কান্দাহারের সৌধমালা :—	
কান্দাহার বিস্ত ও জমিন্দাবারের দুর্গ	৮ „ „
আজমীরের সৌধমালা :—	
আজমীর ও অহ্‌মদাবাদ	১২ „ „
মুখলিশ্‌পুরের সৌধমালা :—	
রাজপ্রাসাদ	৬ „ „
যুবরাজ দারাশুকোর প্রাসাদ	২ „ „
	মোটা ২৭২½ লক্ষ টাকা

সম্রাটের ৫ কোটী টাকার হীরা জহরত ছিল। তা বাদে ২ কোটী টাকার হীরা জহরত শাহজাদা ও শাহজাদী ও অন্যান্য সকলকে দান করিয়াছিলেন।

সম্রাট নিজে মাথায় গলায় বাহুতে ও কোমরে যে সকল গহনা পরিতেন তারই হীরা-জহরতের মূল্য ছিল ২ কোটী টাকা। এই সম্রাটের নিজব্যবহার্য্য ২ কোটী টাকা মূল্যের রত্নালঙ্কার হারেমে দাসীদের জিম্মায় থাকিত। বাকী ৩ কোটী টাকার রত্নালঙ্কার বাহিরে ক্রীতদাসের জিম্মায় থাকিত।

সম্রাটের জপমালায় ৫ খানা রুবি [চুনি] ও ৩০টি মুক্তা ছিল। জপমালাটির মূল্য ছিল ৮ লক্ষ টাকা। এই জপমালাটি ছাড়া আরও দুইটি জপমালা ছিল। তাহারও প্রত্যেকটিতে ১২৫টি করিয়া বড় বড় রুবি [চুনি] ছিল। প্রত্যেক দুটি জপের দানার মাঝখানে একটি করিয়া ইয়াকুতও ছিল। জপমালার সুমেরুটির (মাঝখানের বড় রুবিটার) ওজন ছিল ৩২ রতি, আর তার মূল্য ছিল ৪০,০০০ হাজার টাকা। আর দু'টো মিলিয়া দাম ছিল ২০ লক্ষ টাকা। এই জপমালার রুবি প্রভৃতির অধিকাংশই সম্রাট আকবরের সংগৃহীত।

প্রথম জপমালাটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রত্নাদি ছিল। পাগ্‌ড়ী-ঘেরা সরপেচ্-এই সবচেয়ে দামী ও বড় রুবিগুলি ছিল। সিংহাসনাধিরোহণের (জলন) বাৎসরিক উৎসবের দিন শুধু এই বহুমূল্য সরপেচ্ সম্রাট পাগ্‌ড়ীতে ব্যবহার করিতেন। ইহাতে ৫টি বড় রুবি, ২৪টি মুক্তা ছিল। মাঝখানের বড় রুবিটির ওজন ২২৮ রতি ও মূল্য ২ লক্ষ টাকা, এবং সরপেচ্‌টির সর্ব্বসমেত মূল্য ১২ লক্ষ টাকা। ১৬৪৪ খৃঃ ১১ ই নবেম্বর এই সরপেচের সহিত ৪০,০০০ হাজার টাকা মূল্যের একটি মুক্তা গাঁথিয়া দিয়া ইহার মূল্য আরও বৃদ্ধি করা হয়। সম্রাটের নিজের হীরা-জহরতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরার ওজন ৪৩০ রতি এবং মূল্য ২ লক্ষ টাকা। এই রুবিটি অবশ্য সরপেচের বড় রুবিটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। আর একটি ৪৭ রতি ওজনের রুবি ছিল, সেটির মূল্য ৫৩ লক্ষ টাকা।

১৬৫৩ খৃঃ ১২ই মার্চ তারিখে সম্রাট শাহ্‌জহান সর্ব্বপ্রথম তাঁর বড় সাধের ময়ূর-সিংহাসনে উপবেশন করেন। হমিদ লাহোরী বলেন, "সম্রাট আকবর, জহাঙ্গীর, শাহ্‌জহান ইঁহারা তিন পুরুষ ধরিয়া বহু হীরা মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন। লোকে যদি তাহা না দেখিল তবে তাহার মূল্য কি ? সম্রাটও এরূপ ভাবিয়া বাহির-

স্থুড়ীতে ক্রীতদাসদের কাছে যে ২ কোটী টাকা মূল্যের হীরা জহরত থাকিত তাহা হইতে ভাল ভাল কএকটি বাছিয়া লইলেন। এই কএকটির মূল্য ছিল ১৬ লক্ষ টাকা। সরকারী স্বর্ণকারদের ডাকিয়া এই-সকল হীরা মুক্তা প্রভৃতির সঙ্গে এক লক্ষ তোলা সোনাও দেওয়া হইল। তখন এই এক লক্ষ তোলা সোনার মূল্য ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। বেবাদল খাঁ ছিলেন স্বর্ণকারদের প্রধান। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে এই সোনা ও হীরা প্রভৃতি দিয়া ময়ূর-সিংহাসন নির্ম্মিত হইল। ময়ূর-সিংহাসনখানি ৩১/৪ গজ লম্বা, ২১/২ গজ চওড়া ও ৫ গজ উঁচু ছিল। সিংহাসনের ছাদের তলা এনামেল (মিনা) করা হইল ; ছাদের ভিতরের দিকে খুব অল্পসংখ্যক হীরা মুক্তা বসান ছিল, কিন্তু বাহিরের দিকে অসংখ্য পাথর বসান ছিল। বারটি পান্নার থামের উপর ছাদ। তার উপর মণিমুক্তা-খচিত দুইটি ময়ূর, আর এই দুই ময়ূরের মাঝে ঐরূপ মণিমুক্তাখচিত একটি গাছ। গদিতে উঠিবার তিনটি সিঁড়ি। সিঁড়িগুলি আবার রেলিং দিয়া ঘেরা। শুধু সম্রাটের বসিবার জায়গার সামনে কোনও রেলিং ছিল না ; অন্য এগার দিকেই রেলিং ছিল। এই এগারটি বেষ্টনীর মধ্যটিই ছিল সবচেয়ে ভাল। এই মধ্যটিতেই সম্রাট হেলান দিয়া বসিতেন। এইটিই তৈয়ারী করিতে খরচ পড়িয়াছিল ১০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্য-মণিটির দাম ১ লক্ষ টাকা। এই মধ্য-মণিটি পারস্য-সম্রাট প্রথম শাহ আব্বাস সম্রাট জহাঙ্গীরকে উপহার দেন। এই রুবিটিতে তৈমুর মীর শাহরুক মীর্জ্জা উলুক বেগ, শাহ আব্বাস, আকবর-পুত্র জহাঙ্গীর ও শাহজহানের নাম খোদিত ছিল। সিংহাসনের ভিতরের দিকে হাজী মহম্মদ জান কুদ্‌সীর রচিত একটি কবিতা (২০ লাইনে) মিনা-করা অক্ষরে লিখিত হয়। কবিতাটির শেষ তিনটি শব্দ ছিল এই—আওরঙ্গ-ই-শাহানাশা-ই-আদিল অর্থাৎ "ন্যায়পরায়ণ রাজাধিরাজের সিংহাসন।" তারপর সিংহাসনটির নির্ম্মাণের তারিখ দেওয়া।

স্বর্ণকার প্রভৃতির মাহিনা বাদে শুধু সিংহাসন তৈরীর মালমশলা দাম করিতেই এক কোটী টাকা খরচ হইয়াছিল।

ভারতের এই বিপুল রাজকীয় অর্থসম্ভার পুঞ্জিত হইবার সম্ভাবনা তখনকার দিনে যথেষ্টই ছিল। অতএব ইহা লুণ্ঠনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সেইরূপ বিপুল সৈন্যসামন্ত রাখিতে হইত। তাই দেখিতে পাই ১৬৪৮ খৃঃ সম্রাটবাহিনী ছিল—

২০০,০০০ অশ্বারোহী
৮,০০০ মনসুবদার
৭,০০০, আহদী এবং অশ্বারোহী তীরন্দাজ
৪০,০০০ তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ

ইহার মধ্যে ১০,০০০ হাজার সম্রাটের সঙ্গে থাকিত। বাকী ৩০,০০০ হাজার বিভিন্ন সুবায় থাকিত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন রাজপুত্র ও আমীর-ওম্‌রাহের অধীনে ১৮৫,০০০ অশ্বারোহী ছিল। সর্ব্বসমেত ৪৪৫,০০০ পল্টন ছিল। এই সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন পরগণার ফৌজদার ও ক্রোরী আম্‌লাদের অধীনেও যে-সকল স্থানীয় পল্টন ছিল তাহাদের হিসাব ধরা হয় নাই।

শাহজহানের বন্দী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে নিজেকে ৯ লক্ষ সোয়ারের প্রভু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার দিল্লীশ্বরের পল্টনের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ ছিল, যদিও সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার অধীনে ছিল না।

প্রভাতী, ভাদ্র শ্রী যদুনাথ সরকার

কলার কথা

চারুশিল্প হচ্ছে মানবাত্মার সেই উদার ক্রীড়াক্ষেত্র, যেখানে সে একদিকে ঐকান্তিক প্রাণচেষ্টা অপর দিকে শুদ্ধমাত্র পুণ্যতৃষ্ণার দোটানা থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছাড়্‌চে ; এবং যুগে যুগে তার সভ্যতা বর্ব্বরতায় প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কট থেকে বেঁচে যাচ্ছে। যথাসম্ভব ব্যাপক করে' যদি দেখি,—মানুষ যেখানেই প্রকৃতির উপর আপনার ইচ্ছার প্রয়োগ করেছে, সেইখানে তার শিল্পের সূত্রপাত। 'ইহা এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ আছে'—এই হ'ল বিজ্ঞান ; 'একে এই রকম করো'—এই হচ্ছে শিল্প। আমার পাঁঠা আমি লেজেই কাট্‌ব,—আমার কুঁড়েের গায়ে আমি কচুপাতা আঁক্‌ব,—আমারই খুসির নিমিত্তে। কিন্তু কথা আছে। সেটা অন্যেরও ভাল লেগে যায়—অন্ততঃ যখন লাগে, তখন সেটা আর্ট।

আর্ট হচ্ছে—একটা অ-দরকারের লীলা।

ভারতবর্ষ, ভাদ্র শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঘামের ফোঁটা

খেল্‌তে খেল্‌তে ফোঁটায় ফোঁটায়
ঘাম্‌লো খোকার রাঙা গাল !
শুকোয়নি জল—না মুছে কে
রাখ্‌লে মেজে' সোনার থাল !
খোলা সিঁদুর-কৌটাতে কে
মোতির-ছড়া গেছে রেখে,
কে তুলে' এ আন্‌লে মরি
নীহার-নাওয়া ফুলটি লাল ;
রক্ত-মর্ম্মরে এল কি
নির্ঝরেরি জন্ম-কাল !

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত যাহার মীমাংসায় বহুলোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৪৮)

"মহালয়া" শব্দের অর্থ কি? শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বের অমাবস্যার দিন "মহালয়া" হয় কেন? ঐ দিনে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি করিবার উদ্দেশ্য কি?

শ্রী অপর্ণাচরণ সোম

(৪৯)

কোনও দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে একই জিনিষ ২।৩টি করিয়া দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ কি?

শ্রী শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(৫০)

ডাক-বাঙ্গালা কথাটি ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নামকরণের সহিত বাঙ্গালা দেশের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ

(৫১)

অনেকেই খামের পশ্চাতে ৭৪॥ লিখে কেন?

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

(৫২)

সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় হিন্দুরা পাকপাত্র পরিত্যাগ করেন। গ্রহণ-স্পর্শের পূর্ব্বে যদি কোন বস্তু রন্ধন করা থাকে তাহাও ভক্ষণ করেন না। ইহার বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক কারণ কি? হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতিও ইহা পরিত্যাগ করে কি না? যদি অন্য কোন জাতি পরিত্যাগ করে তাহারা কাহারা?

শ্রী জ্যোতিশ্চন্দ্র সুর

(৫৩)

'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা' এই প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? 'ঘোগ' নামক কোনও প্রাণী বাস্তবিক আছে কি না, এবং থাকিলে উহার আকৃতি ও স্বভাব ইত্যাদি কিরূপ?

শ্রী বীরেন্দ্রভূষণ বসু

(৫৪)

"ভারতবর্ষের প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রী সিলভ্যাঁলেভি লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি যে খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন তা মনে করার মত প্রমাণ নেই।" কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব চৌদ্দশত বৎসরে হইয়াছিল বলিয়া কোলব্রুক্ প্রভৃতি মনীষীবর্গ বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষীয় কতিপয় পণ্ডিত মহাভারতোক্ত জ্যোতিসংস্থান দেখিয়া বলিয়াছেন যে সেই যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ বৎসরে হইয়াছিল। তাহা হইলে কি সেই যুদ্ধের যুযুধানেরা অর্থাৎ কৌরবেরা আর্য্য ছিলেন না? অথবা, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেমন বলেন, যুদ্ধটা কি ভারতবর্ষের বহির্ভাগে হইয়াছিল?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(৫৫)

পুরাণোক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ যে বর্ত্তমান কামরূপ ইহা সকলেরই মত হইলেও তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? এই প্রশ্ন করিবার কারণ এই যে পাণ্ডবেরা অথবা কৃষ্ণ যে আসাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস হয় না, যে হেতু ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। কৃষ্ণ যে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার জন্য আসামের পূর্ব্বপ্রান্ত সদীয়ায় যান নাই, কৃষ্ণ বলরাম যে বাণরাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসামের অন্তর্গত তেজপুরে যান নাই, হিড়িম্ব হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের বাড়ী যে কাছাড়ে ছিল না এবং অর্জ্জুন যে বর্ত্তমান মণিপুরাখ্য দেশে যান নাই, ইহা মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ভগদত্তকে বধ করিবার জন্য কৃষ্ণ যে প্রাগ্‌জ্যোতিষে গিয়াছিলেন সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপ ভিন্ন অন্য কোন দেশ বলিয়া বোধ হয়।

আমরা বাল্যকালে শুনিতাম যে প্রয়াগের সান্নিধ্যে কোন স্থানকেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলে।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(৫৬)

শীতকালে ভোর বেলা পুকুরের ও কূপের জল একটু গরম থাকে। ইহার কারণ কি?

শ্রী যোগেন্দ্রকুমার পাল

(৫৭)

ভোজনকালে যে পঞ্চদেবতার নামে অন্ন নিবেদন করা হয়, সেই পঞ্চদেবতা কে কে ?

শ্রী দিগেন্দ্রনাথ পালিত

(৫৮)

দুর্গা প্রতিমার নানা ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কোথাও হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি; কোথাও বৃষারূঢ়া চতুর্ভুজা মূর্ত্তি; কোথাও (পূর্ব্ববঙ্গে) প্রতিমার দক্ষিণে কার্ত্তিক, বামে গণেশ; কোথাও বা (পশ্চিমবঙ্গে) কার্ত্তিক বামে, গণেশ দক্ষিণে। এ সকল ভেদ সম্বন্ধে কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি না ?

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(৫৯)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মেঘ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, cirrus, stratus, cumulus এবং nimbus. সংস্কৃত ভাষাতেও পুষ্কর আবর্ত্তক দ্রোণ ও মেঘের চার শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই উভয় প্রকার শ্রেণী-বিভাগের কোন সাদৃশ্য আছে কি ? পুষ্করাদি মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতির বিবরণ কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তাহা কি ?

শ্রী সতীশ

(৬০)

বারের নাম গ্রহগণের নামানুসারে হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল এইরূপ পরম্পরার কারণ কি ? Encyclopaedia Britannicaতে মিশরীয় জ্যোতিষানুযায়ী এক কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় জ্যোতিষে এইরূপ পরম্পরার কোন কারণ পাওয়া যায় কি ? এই পরম্পরা-মত নামকরণ ভারতবর্ষে কত দিন আছে ? বেদে কি এই-সকল নাম এইরূপ ক্রম অনুসারে পাওয়া যায় ?

শ্রী সতীশ

মীমাংসা

(৩১)

উক্ত হেঁয়ালির অর্থ "মশক"।

শ্রী হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

(৩৪)

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রিন্সিপ্যাল কালিপদ মিত্র জিজ্ঞাসা করেছেন "যখন যুগপৎ রৌদ্র ও বৃষ্টি হয় তখন শৃগাল-শৃগালীর বিয়ে হয়" এরূপ প্রবাদ বাঙ্গালা ও বিহার ভিন্ন ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে আছে কি না। দক্ষিণ ভারতের মালবার ও তামিল প্রদেশেও এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার ঠিক মীমাংসা বা উদ্ভবের হেতু জানিতে পারা যায় না।

এল্—বি— রামস্বামী আইয়ার

(৩৬)

দাদা ও দিদি শব্দ দুইটি সংস্কৃত দায়াদ বা তাত শব্দের অপভ্রংশ। মাসী পিসী শব্দ সংস্কৃত মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা শব্দের অপভ্রংশ, প্রাকৃত মাউসী পিউসী হইতে সংক্ষিপ্ত রূপ।

শ্রী নীহাররঞ্জন ঘোষ

(৩৭)

ধাতব পদার্থে কোন কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিলে উহাতে আণবিক স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এই স্পন্দন স্বরতরঙ্গ রূপে c স্থিতিস্থাপক (elastic) বস্তুর (যথা বায়ু) ভিতর দিয়া সঞ্চা হইয়া আমাদের কর্ণপটহের (tympanum) সংস্পর্শে আ ইহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের চেতনায় ক্রিয়া করে। বস্তুতঃ এই স্প শব্দশ্রুতির হেতু। কম্পের ক্ষিপ্রতার উপর সুরের গ্রাম (pit নির্ভর করে; আর কম্পতরঙ্গের পার্শ্বিক বিস্তারের (amplitude vibration) উপর স্বরের প্রাবল্য (intensity or loudness) f করে।

এই শব্দায়মান ধাতব পদার্থের গায়ে অপর কোন-একটা ক্ষুদ্র অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করাইলে উহাতে দ্রুত স্পন্দনের অস্তিত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। কোন কোনও স্থলে এই কম্প চে স্পষ্ট দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় আপন স্থিতিস্থাপকতার (e ticity) স্বাভাবিক চেষ্টায় কম্পতরঙ্গের বিস্তার (amplitude) কমিয়া আসে—শব্দও সেইসঙ্গে লয় পাইতে থাকে। তাহা ঐ শব্দায়মান বস্তু কোন অ-স্থিতিস্থাপক (inelastic) বস্তুর সং আসিলে কম্প বিশেষ বাধা পায়। এই কারণে, সরু তারে বা দ ঝুলান ঘণ্টায় আঘাত করিলে তাহা বেশ জোরে বাজিয়া উঠে; হাতে রাখিয়া আঘাত করিলে মন্দ চাপা আওয়াজ বাহির শব্দায়মান পাদার্থকে হাত দিয়া ধরিলে, উহার স্পন্দন অব্য পরেই শেষ হইবে, ফলে শব্দও থামিয়া যাইবে। অবশ্য সংস্পর্শ হইলে বাধাও কম হইবে।

শ্রী ধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

বায়ু বা অন্য কোনো জড় পদার্থের স্পন্দনে শব্দের সৃষ্টি কাঁসার থালাকে ফেলে দিলে সেটা কাঁপতে থাকে, হাত দিয়ে তা বোঝা যায়। এই কাঁপনেই শব্দের উৎপত্তি। থালার বায়ুকে ছোট ছোট বায়ুস্তরের সমষ্টি বলা যায়। থালার কাঁ জন্য যেই থালা ডান দিকে চোলে আসে, থালার ডান দিকের বায়ু-স্তরটি ঠেলা পায়, এই প্রথম-স্তরের (ডান দিকের) পাশে একটি দ্বিতীয় স্তর থাকায় প্রথম স্তরটি সঙ্কুচিত হয়, যদিও স্তরকে সে ঠেলা দিতে থাকে। কিন্তু আবার ইতিমধ্যে বাঁদিকে চোলে আসে, সুতরাং (থালার ডান দিকের) প্রথম এবার প্রসারিত হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচন তরঙ্গ দ্বিতীয় গিয়ে পৌঁছায়; কারণ প্রথম স্তরটি প্রসারিত হলে সে তা দিকে (দ্বিতীয় স্তরের দিকে), বাঁদিকে (থালার দিকে) দু দিকেই থাকে, আর দ্বিতীয় স্তরের ডান পাশে আবার তৃতীয় স্তর আছে। এর পর থালা আবার ডান দিকে ফিরে আসে, আ দিকে ফিরে যায়, ইত্যাদি। এইরূপে, পর পর স্তর দিয়ে সঙ্কু ও প্রসারণ শেষে আমাদের কানের পর্দায় এসে পড়ে, আ আমরা শব্দ শুনি।

বাতাসে (বা অন্য শব্দ-বাহনে) একবার এইরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি তা বরাবর থাকে না, কারণ শব্দ-শক্তি (sound energy) শক্তিতে (heat energy) পরিণত হয়, নানা রকম থালা কাঁপার দরুন যে শব্দটা হোলো সে একই ভাবে ততক্ষণ যতক্ষণ বাতাস একই রকম সঙ্কুচন- ও প্রসারণ-তরঙ্গ পুনঃ পুন থাকবে, অর্থাৎ যতক্ষণ থালাটা সমানভাবে কাঁপতে থা থালার কাঁপন যেই আপনি কমে আসতে থাকে, শব্দও আসতে থাকে, কারণ শব্দের বাহন (এখানে বাতাস) ততই প্রসারণের ধাক্কা কম পেতে থাকে; থালার কাঁপন হাত দিয়ে

দিলে এই একই কারণে শব্দ থেমে যায়। তবে থালায় হাত দেওয়া মাত্রই যে শব্দ থেমে যায় তা নয়, থালার কাঁপন থামিয়ে দেবার পরও পূর্ব্ব শব্দের সামান্ত রেশ অন্তত অতি অল্প ক্ষণের জন্তেও শোনা যায় (ভালো করে কান রাখলেই বোঝা যায়)। কারণ থালা থামবার আগে বাতাস যে স্পন্দনটা পেয়েছিল তা 'ত একেবারে তখনি থেমে যায় না; স্পন্দন একেবারে থামতে অন্তত একটু সময়ও লাগে। যে কারণে থালাকে একবার আঘাত করলে, যে কাঁপন সে পায় সে কাঁপন যদিও চিরস্থায়ী নয়, তবু একেবারে লোপ পেতে একটু সময় লাগে, ঠিক সেই কারণেই বাতাস যে কাঁপন (সঙ্কুচন ও প্রসারণের) একবার পেয়েছে তার লোপ হতে অন্তত অতি অল্পক্ষণও লাগে। সুতরাং থালা থামাবার পর অতি অল্পসময়ের জন্যেও শব্দের রেশটা থাকে।

শ্রী ভরথী প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৮)

গোভিল ও পারস্কর বলেন দিবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, "বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা। বিরহানলসন্দগ্ধা নিয়তং স্বামীঘাতিনী।" (উদ্বাহতত্ত্ব) অর্থাৎ দিবাবিবাহে কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা, বিরহানল-সন্দগ্ধা ও স্বামীঘাতিনী হয়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মত বঙ্গদেশে বিধিবদ্ধ বলিতে হইবে। নচেৎ মিথিলা দ্রাবিড়, গুজরাট প্রভৃতি দেশের বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিতে হইবে। সেইসব দেশে দিবাবিবাহ এখনও প্রচলিত।

শ্রী স্নেহাংশুভূষণ বক্সী

(৪৪)

১। কাগজের যে স্থানে তেলের দাগ লাগিয়াছে সেই স্থানে খানিকটা গোলাচুণ (slaked lime) লাগাইয়া কাগজখানি কয়েক মিনিট রৌদ্রে রাখিতে হইবে; তৎপরে কাগজ শুকাইলে গুঁড়া চুণ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে কাগজ পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার হইবে।

২। কাগজের যে জায়গাটায় দাগ লাগিয়াছে সেই জায়গায় দুই পিঠেই কিছু গুড়া খড়ি ঘষিয়া কাগজখানি একদিন ঐ অবস্থাতেই রাখিয়া দিতে হইবে। এই রকম তিনবার করিলে তেলের দাগ একেবারে উঠিয়া যাইবে।

শ্রী রাধারমণ সুর

(৪৫)

যখনই কোন জিনিস জ্বলিয়া শিখার সৃষ্টি করে তখনই বুঝিতে হইবে দুইটি ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। জ্বাল্যবস্তুটি প্রথমতঃ বাষ্পীভূত হয় ও তৎপরে ঐ বাষ্প বায়বীয় অম্লজানের (oxygen) সাহায্যে জ্বলিয়া উঠে।

প্রদীপ জ্বলিবার সময় প্রদীপের তৈলটি প্রথমতঃ বাষ্পীভূত হয় ও তৎপরে তাহা অক্সিজেন বা অম্লজান সাহায্যে (যাহা সাধারণ বায়ুতে আছে) জ্বলিয়া শিখার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ প্রদীপের শিখার উত্তাপ এত হয় না যাহাতে তাহার গর্ভস্থ সমস্ত তৈলটি উত্তপ্ত হইয়া উঠে, পরন্তু মুখের কাছে যে অল্পটুকু তৈল থাকে তাহাই বাষ্প হইয়া জ্বলিতে থাকে। এবং উহা ফুরাইয়া গেলে পলিতার ভিতর যে ফাঁক থাকে সেই ফাঁকের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে কৈশিক আকর্ষণে মুখের কাছে তৈল সংযোগ হয় ও অবিরত শিখাটি প্রজ্বলিত থাকে এবং বাষ্পটি পশ্চাৎদিকে বা অন্য কোন দিকে বিস্তৃত হইতে পায় না, কারণ শিখার উত্তাপ তৈল থাকার দরুণ ছড়াইয়া পড়ে না।

কিন্তু যখন প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আইসে তখন পলিতাটি অবশেষে জ্বলিয়া উঠে অর্থাৎ পলিতাও বাষ্পীভূত হইয়া তৈলবাষ্পের সহিত মিলিয়া শিখার সৃষ্টি করিয়া থাকে। যখন সমস্ত তৈল শেষ হইয়া আইসে অথবা তৈল জ্বলন্ত শিখার এত দূরে পড়িয়া যায় যে আর পলিতা তৈল টানিতে পারে না, তখন ঐ বাষ্প (তৈল ও পলিতা উভয়ের) জ্বলন্ত শিখার উত্তাপে পশ্চাৎদিকে সরিয়া যায়, সুতরাং শিখাটি ক্ষণিকের জন্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে ও পরক্ষণেই ঐ বাষ্প উত্তপ্ত হইয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠে ও শিখাটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে এবং পরক্ষণে পলিতা ও তৈল উভয়ই শেষ হওয়াতে আর শিখা থাকে না ও একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে প্রদীপের উজ্জ্বল হওয়া ও নিষ্প্রভ হওয়াকে চলিত কথায় প্রদীপের "হাসি ও কান্না" বলে।

শ্রী হীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়

(৪৫)

কারবন ডাই-অক্সাইড (CO_2) আলো জ্বলিবার সাহায্য করে না। যতক্ষণ তৈলের বা মোমের শেষ বিন্দু থাকে, ততক্ষণ উত্তাপের সাহায্যে CO_2 সংগঠিত হয়। কিন্তু যখন তৈলের বা মোমের কোন অবশিষ্ট থাকে না তখন CO_2 সংগঠিত হইতে পাবে না, কাজেই আলোটি আরো জোরে জ্বলিয়া উঠে। আমরা আরো দেখিতে পাই যদি তৈল কিম্বা মোম থাকে কিন্তু পলিতা ফুরাইয়া যায় তখন আলোটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে না। যদি কেহ আরও কিছু Engineering সম্বন্ধে জানিতে চাহেন এই ঠিকানায় পত্র দিলে আমি বাধিত হইব।

শ্রী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
Mechanical and Electrical Engineer
58 M Road,
Jamshedpur.

(৪৭)

অগ্রহার - পুং (অগ্র+হার)
অর্থ---ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব, শস্যপূর্ণা ভূমি।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

পদার্থ ও তাহার-পরিণতি

আমরা সচরাচর যে-সমস্ত জিনিষ দেখ্তে পাই সে-সকলকে যদি আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমান্বয়ে ভাগ কর্তে কর্তে চলে যাই, তবে কি হয়? যেমন লেখ্বার খড়ি—এই খড়ি যদি ভেঙ্গে টুক্রা টুক্রা করি, সেই টুক্রার কোন্-একটিকে যদি আরো ভাঙ্গি, তাকে যদি আবার ভাঙ্গি, তা হ'লে ক্রমে ক্রমে এমন এক অবস্থাতে এসে পৌছব যে আর ভাগ করা যাবে না। যদিই বা অন্য-কোন এমন সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাকে সূক্ষ্মতর ভাবে ভাঙ্গ্তে চেষ্টা করি তাহলে সে পদার্থটা আর খড়ি থাক্বে না—সেটা ভেঙ্গে গিয়ে তখন হ'য়ে যাবে তিনটে জিনিষ, যে তিনটে জিনিষ খড়ির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পরস্পর পরস্পর থেকেও ভিন্ন। এই রকম অবস্থার নাম হচ্ছে অণু (molecule)। সুতরাং অণু অবস্থা পর্য্যন্ত জিনিষটা রইল খড়ি। কিন্তু ঐ অণুকে যখন সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভেঙ্গে অন্য তিন প্রকার জিনিষে পরিণত করা যায় তখন তার নাম হয় পরমাণু (atom)। এতদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের পরিণতি পরমাণু পর্য্যন্তই জান্তেন। পরমাণুকে আর ভাঙ্গ্তে পারা যেত না। কিন্তু সম্প্রতি পরমাণুকেও ভাঙ্গা হয়েছে—এবং তা হতে কেবলমাত্র তেজের উৎপত্তি হয়েছে। এরূপ তেজের নাম ইলেকট্রন্।

একটি বিন্দু-পরিমিত কেন্দ্রের চারিধারে কতকটা তড়িৎশক্তি আবদ্ধ, এই তড়িৎশক্তিই ইলেকট্রন্। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে কতকটা শক্তি যখন বৃত্তাকারে কেন্দ্রীভূত হয় তখন তা ইলেকট্রন্। এইরূপ কতকগুলি ইলেকট্রন্ একত্র মিশে একটি পরমাণু গড়ে উঠে। কতকগুলি পরমাণু মিশ্লে একটি অণুর সৃষ্টি হয়, এবং কতকগুলি অণুর সমষ্টিতে একটি পদার্থের প্রকাশ। সুতরাং জগতের যত কিছু পদার্থ আছে তার চরম অবস্থা শক্তি; এই শক্তিরই বিভিন্ন রূপ হচ্ছে পদার্থ। অতএব শক্তি ছাড়া এ জগতে আর কিছুই নেই—সেই এক শক্তি থেকেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি, সমস্ত জীব-জন্তুর সৃষ্টি, তবে কম আর বেশী। যখন কম শক্তি একত্রীভূত হয় তখন এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, আবার বেশী শক্তি মিলিত হলে আর-এক পদার্থের বিকাশ হয়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের এই দৃঢ় ধারণা। তুমিও শক্তি, আমিও শক্তি, তবে তোমাতে আমাতে তফাৎ এই যে তুমি হয়ত আমার অপেক্ষা একটু বেশী শক্তি, আমি হয় ত একটু কম শক্তি; এই বেশী-কমের তারতম্যই পদার্থগুলির মধ্যে বিভিন্নতার কারণ।

শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

—

"খোকা হোক্" পাখী

তরুণ রাজপুত্র আজ গভীরবনে গাছতলায় একাকী বসে'। গালে হাত দিয়ে কি ভাব্ছেন। সুন্দর মুখখানি মেঘলা পূর্ণিমা রাতের চাঁদটিরই মত ম্লান।

কি দোষে তাঁর এ দশা?

রাজ্যে মহামারী; রোজ হাজার লোক মর্ছে। রাজ্য উজাড় হতে ক'দিন লাগে? এক একটি লোক মরে প্রজাবৎসল রাজার দেহ থেকে এক এক বিন্দু রক্ত যে ঝরে' পড়ে। দিন দিন লোকক্ষয় বেড়ে চল্তে লাগল রাজ্যের ওপর শনির যে কোপদৃষ্টি পড়েছে তা কাটাবার জন্য রাজা কত যাগযজ্ঞ কর্লেন, কিছুতেই কিছু হল না শেষে রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে রাজ্যে মঙ্গলের জন্য রাজা হত্যা দিলেন। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিন দিনের দিন ভোর রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখ্লে দেবী বল্ছেন, "মহারাজ, কুমারই তোমার রাজ্যের শ

স্বরূপ। তার খরদৃষ্টিতে রাজ্য পুড়ে যাচ্ছে। রাজ্যের যদি মঙ্গল চাও ত রাজ্যের বাইরে কোথাও তাকে পাঠিয়ে দাও, কক্ষণও তাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আন্‌তে পাবে না। আন্‌লেই আবার অমঙ্গলের সৃষ্টি হবে। তবে যদি এখন তাকে বনে পাঠিয়ে দাও তা'হলে তোমার ও তার এটুকু সুবিধে হবে যে, সে যদি সেখান থেকে খোকাহোক্ পাখী ধরে' নিয়ে এসে রাজ্যে ছেড়ে দিতে পারে ত তার কুদৃষ্টিটুকু কেটে যাবে। রাজ্যের আর অমঙ্গল হবে না। তোমার মৃত্যুর পর সে সুখে ও শান্তিতে রাজত্ব করতে পারবে।" রাজা স্বপ্নে বল্‌লেন, "সে কি রকম পাখী, মা? কুমার আমার সে পাখী খুঁজে পাবে ত?" দেবী উত্তর করলেন, "সে পাখী গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী খোকাহোক খোকাহোক বলে' ডেকে বেড়িয়ে তাদের কল্যাণ কামনা করে। সে পাখী কুমার পাবে কি না বল্‌তে পারি না। তবে আমার উপর বিশ্বাস রেখো। আর একটা কথা, বনে পাঠাবার সময় রাজপুত্রকে বলো, 'স্বপ্নে দেবীর কাছে জানলুম তুমি এ রাজ্যের অমঙ্গলের কারণ। তাই তোমাকে বনে চিরতরে নির্ব্বাসিত করলুম।' ব্যস্ এই পর্য্যন্ত! আর কোন কথা না। আর জেনে রাখবে আমি যা করি সবই মঙ্গলের জন্যে।" রাজা পরদিনই দেবীর উপদেশ-মত কাজ করলেন। "যা করেন সর্ব্বমঙ্গলা সবই মঙ্গলের জন্যে"—এই হল রাজার জপমালা।

রাজপুত্র ভাবছিলেন, "যার জীবনটা কেবল অমঙ্গলের বোঝা তার বেঁচে থাকায় লাভ কি? এ জীবন না রাখাই শ্রেয়! তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তখন পশ্চিম দিকের আকাশের কোলে রাঙা রবি আস্তে আস্তে ডুব্‌ছে। রাজপুত্র সেদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, আকাশের গায়ে কে রাশি রাশি ফাগ ছড়িয়ে দিয়েছে। বসনপ্রান্তে তাঁর চোখ পড়্‌ল, তাই ত তাঁর কাপড়েও যে ফাগের ছিটে লেগেছে! তাঁর মনে পড়্‌ল আজ হোলি-খেলা। বনের গাছের মাথায় মাথায়, লতার পাতায় পাতায় ফাগের ছড়াছড়ি। বনের গাছপালা সবই যেন তাঁকে হোলি খেল্‌তে ডাক্‌ছে। জীবনের খেলা তাঁর ত তো ফুরোয় নি। বনের সাথে একটু খেল্‌তে হবে যে!

বনের একটা গাছে কেমন সুন্দর সুন্দর ফল পেকে রয়েছে। রাজকুমার একটি করে' পাড়েন, একটি করে' খান।

কাছেই ঝরণা। তার তক্‌তকে জল। তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট চক্‌চকে ঢেউ। অঞ্জলি ভরে' জলপান করে' রাজপুত্রের প্রাণ সুশীতল হল।

বনের পাখীর ডাক কেমন মিষ্টি! শুনে রাজপুত্র মোহিত হলেন।

"কে রে অমন চাঁদের মত ছেলে?—কেমন করে' এখানে এলি রে বাপ্!" এই কথাগুলো উচ্চারিত হতে শুনে রাজপুত্র অবাক হয়ে পেছন ফিরে দেখ্‌লেন, নিবিড় গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক বুড়ী,—কেমন সুন্দরী! গা দিয়ে দুধে-আল্‌তা-গোলা রঙ ফেটে পড়ছে।—মাথায় নিয়েছে একটা ঝুড়ি,—তাতে কাঠ।

রাজপুত্রের ছেলেবেলায় ধাইমার-কাছে-সোনা কাঠ-কুড়োনী গল্পের একটা ছড়া মনে পড়ে গেল—

কে গো মা বুড়ী,
মাথাতে ঝুড়ি,
কাঠ-কুড়ী!

এই বিজনবনে বুড়ীকে দেখে রাজপুত্র আশ্বস্ত হলেন, যাহোক এমন বনেও মানুষের মুখ দেখ্‌তে পাওয়া গেল! তিনি বুড়ীর কাছে তাঁর এই দুর্দ্দশার কারণ সব খুলে বল্‌লেন। বুড়ীর চোখে জল এল। রাজপুত্রের সুন্দর মুখ দেখে বুড়ীর হৃদয়ে যেন পুত্র-স্নেহ উথ্‌লে উঠ্‌ল। "আয় বাপ্ আমারি কাছে থাক্‌বি! তোর ভয় কি?"—এই না বলে' বুড়ী তার কুঁড়েঘরে রাজপুত্রকে নিয়ে গেল।

* * *

রাজপুত্রের সঙ্গে বুড়ীর প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণ থেকে তিন তিনটি বছর চলে' গেছে। রাজপুত্র এখন বুড়ীকে মা বলে' জানেন, বুড়ীও রাজপুত্রকে পুত্র বলে' জানে। দুজনের মধ্যে মায়ার বন্ধনটা বেশ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। বুড়ী এখন হাঁট্‌তে পারে না, বড্ডই দুর্ব্বল। রাজপুত্র সেবা করছেন। তিনি রোজ ঝুড়ি নিয়ে কাঠ কুড়োতে যান, ফল পেড়ে আনেন, শ্যামা-ঘাসের বোঝা বয়ে এনে ঘাসের ফলগুলি পিষে পিঠে তৈরী করেন। বুড়ী বসে'

বনে' বেশ রাজভোগ খাচ্ছে। তার যে উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান! এত খাটাখাটুনিতেও রাজপুত্রের কোনো কষ্ট নেই। বন তাঁকে খাবার জিনিষ সবই জুগিয়ে দিচ্ছে, ভোর বেলায় বনের পাখী ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙাচ্ছে। উঠেই বেণুবনের মাথায় মাথায়, সবুজ পাতায় পাতায় আলোর মাতন তিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন—বন যেন এই নিয়ে তাঁর সম্বর্দ্ধনা কর্‌ছে। সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে পবিত্র যা—মায়ের ভালবাসা,—তাও বনের মধ্যে তিনি পেয়েছেন। তাঁর মা তাঁকে ছেলেবেলায় ছেড়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন; তাঁকে আবার নূতন করে' ফিরে পেয়েছেন। এমনটি কি আর রাজধানীতে মিল্‌ত?

বুড়ী বসে' বসে' ভাবে, তার সৌভাগ্যের কথা। রাজপুত্র তার ছেলে, সে ত আজ রাজরাণী! ভাব্‌তে ভাব্‌তে বুড়ীর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু দু'-এক ফোঁটা ঝরে' পড়ে। যখন-তখন রাজপুত্রের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গভীর স্নেহে চুমা খায়। মনে মনে কত কি আশীর্ব্বাদ করে সেই জানে! রাজপুত্র এক-এক দিন হেসে বলেন, "এত কি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছ বুড়ীমা? এত আশীর্ব্বাদ যদি ফলে' যায়; আশীর্ব্বাদের বোঝার চাপে মারা যাব বলে' রাখ্‌ছি।" বুড়ী কিছু বলে না; রাজপুত্রকে সজোরে বুকে চেপে ধরে। কখন কখন বলে, "বাপ, তোর একটা বিয়ে দিতে পার্‌লে কি সুখই না হত! কেমন একটি সুন্দর খোকার মুখ দেখে আনন্দে মর্‌তে পার্‌তুম।" শুনে রাজপুত্র কেবল হাসেন।

রাজপুত্র সাম্‌নে না থাক্‌লে বুড়ী তার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানি আশীর্ব্বাদে আশীর্ব্বাদে ভরিয়ে তোলে—"বাবা, তোর খোকা হোক্ খোকা হোক্…" কতবার যে এই আশিস্ বুলিটি বুড়ী আওড়ায়, তার সংখ্যা নেই। একটা গল্প আছে;—এক বুড়ী জজের কাছে সুবিচার পেয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে—"বাবা তুমি দারোগা হও।" সে তার অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজের গ্রামের দারোগার প্রবল প্রতাপ দেখে' ধারণা করেছিল, দারোগা হওয়াটাই যেন পৃথিবীর সবচেয়ে গৌরবের জিনিষ। এ বুড়ীরও হয়েছে তাই। নিজে নিঃসন্তান বলে' পুত্রের অভাবটা তার কাছে বড্ডই বাজ্‌ত। খোকা পাওয়াটাই যেন তার কাছে সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাই তার কাছে খোকা হোক্ এই আশীর্ব্বাদ নাকি সবচেয়ে সেরা আশীর্ব্বাদ।

বুড়ীর দিন দিন শরীর ভেঙে পড়্‌ছিল। নানান্ রকম অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। কিন্তু আশীর্ব্বাদের সংখ্যাটা বেশী ছেড়ে কম হয়নি। আজকে অসুখটা তার বড্ডই বেড়েছে। রাজপুত্র রোজ যেমন তার জন্যে গাছ-গাছড়া খুঁজ্‌তে নদীর তীরে যেতেন—আজও গেলেন। সেখানে পৌঁছে বিস্মিত হয়ে দেখ্‌লেন, একটি পরম সুন্দরী মেয়ের দেহ—তার কতকটা ভাস্‌ছে নদীর নীরে, কতকটা পড়ে' নদীর তীরে। মেয়েটির দেহলতা জড়িয়ে বেগুনে রঙের শাড়ী, তাতে কারুকার্য্য করা, চুনির চুম্‌কি বসান। মেয়েটির গা-ভরা গয়না—সোনা হীরে জহরতে মোড়া, সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক্ করে' জল্‌ছে—এ ত রাজকন্যা না হয়ে যায় না। অজানা আনন্দে তরুণ রাজপুত্রের বুক কেঁপে উঠ্‌ল। রাজপুত্র ধীরে ধীরে মেয়েটির অচেতন দেহ তুলে শুক্‌নো ডাঙায় এনে রাখ্‌লেন।

ক্রমে রাজপুত্রের সেবা ও যত্নে মেয়েটির চেতনা হল।

পরিচয়ে রাজপুত্র জান্‌তে পার্‌লেন, সে রাজকন্যাই বটে। সখীদের সঙ্গে নৌকায় করে' নদীতে বেড়াতে বার হয়েছিল, হঠাৎ ঝড় আসায় নৌকো ডুবে যাওয়ায় এই দুর্দ্দশা হয়েছে। সখীরা কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। রাজপুত্রও নিজের পরিচয় দিলেন। রাজপুত্রের বাকী সমস্ত জীবনসূত্রটা এই বনের সঙ্গে গাঁথা আছে শুনে রাজকুমারীর চোখে জল এল। টল্‌টলে জলভরা চোখের দৃষ্টি রাজপুত্রের ওপর নিবদ্ধ করে' রাজকুমারী বল্‌লেন, "কেন আমার সঙ্গে আমাদের রাজ্যে আপনি চলুন না—আপনাকে সুখে রাখ্‌বার প্রাণপণ যত্ন কর্‌ব।" রাজকুমার বল্‌লেন, "না, রাজকুমারী তা হয় না। এই বনটিতেই আমি বেশ সুখে আছি—আমার মা যে এখানে আছেন। চল আমাদের কুঁড়েঘরে—বুড়ীমাকে দেখ্‌লে ভাল করে' চিন্‌তে পার্‌বে। মা তোমাকে দেখ্‌লে কতই না খুসী হবেন। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে তোমার পিতার নিকট রেখে আস্‌ব। তবে যদি কখনও এই বনের কথা মনে পড়ে, তবে এই হতভাগা রাজপুত্রের কথা মনে কোরো। আর কিছু চাই না।" বলে' প্রশান্ত

চোখদুটি রাজকন্যার সাম্‌নে থেকে রাজপুত্র সরিয়ে দিলেন।'

রাজপুত্র রাজকন্যাকে সঙ্গে করে' কুঁড়েয় ফিরে দেখেন সর্ব্বনাশ হয়েছে। বুড়ীমা মারা গেছেন। হায়, তিনি কত সাধ করেছিলেন, কিছুই ত পূর্ণ দেখ্‌তে পেলেন না—

রাজপুত্র বুড়ীমার সৎকার করে' কুঁড়েঘরে ফিরে এলেন বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের চোখের জল নিয়ে। রাজপুত্রের কাছে তাঁর বুড়ীমার গুণের কথা শুনে রাজকুমারীর চোখ-দুটি জলে ভরে' গেল। মা-হারা কুঁড়েখানা রাজপুত্রের চোখের সাম্‌নে খাঁ খাঁ কর্‌তে লাগ্‌ল। রাজপুত্র আঙিনায় আছ্‌ড়ে পড়ে' কেঁদে উঠ্‌লেন—"মা—মাগো! তুমি নেই—আর আমার কেউ নেই গো! তোমায় ছেড়ে কেমন করে' এ গহনবনে বাস কর্‌ব মা—"

রাজকুমারী রাজপুত্রের মাথা কোলে তুলে নিলেন। চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। কি বল্‌বার জন্যে তাঁর ঠোঁট-দুখানি কেঁপে উঠ্‌ল, কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফুট্‌ল না। রাজপুত্র খানিকক্ষণ পরে উঠে বস্‌লেন; তারপর হাতজোড় করে' কুঁড়েঘরের পানে চেয়ে বল্‌লেন, "ওগো আমার মায়ের ঘর, ওগো আমার মায়ের মাটি, তোমাদের ছেড়ে এখন চল্লুম, আর ফির্‌ব কি না জানি না। ফির্‌বারও বড় ইচ্ছে নেই। মা-হারা ঘর দেখ্‌তে পার্‌ব না।" তার পর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর্‌লেন। রাজকুমারীও দেখাদেখি প্রণাম কর্‌লেন।

তাঁরা ছিলেন আঙিনার অশোক-গাছের তলায়। গাছের ওপর থেকে কে বলে' উঠ্‌ল—"খোকা হোক্‌, খোকা হোক্‌!" রাজপুত্র মাথা তুলে অবাক হয়ে গাছের দিকে তাকালেন। দেখ্‌লেন গাছের একটা উঁচু ডালে কেমন ছোট একটি সুন্দর পাখী! সবুজ পাতার সঙ্গে যেন মিশে আছে। পাখী আবার ডেকে উঠ্‌ল, "খোকা হোক্‌, খোকা হোক্‌!"

পাখীর এমন ডাক ত রাজপুত্র কখনো শোনেন নি। কতদিন বনে আছেন, কত রকম পাখী দেখ্‌লেন, পাখীর কত রকম ডাক শুন্‌লেন। তাঁর কাছে এ পাখী যে একেবারেই অচেনা!

রাজপুত্র তুড়ি দিয়ে আদর করে' ডাক্‌লেন, "আয় পাখী আয়, আদরে রাখিব তোরে সোনার খাঁচায়।" পাখী সত্যসত্যই উড়ে এসে তাঁর কাঁধের উপর বস্‌ল। রাজপুত্র তাকে ধরে' খাঁচায় পুর্‌লেন। রাজকুমারী বল্‌লেন, "চলুন রাজপুত্র, এ পাখী আমাদের রাজ্যে নিয়ে যাব। রাজবাড়ীর তোরণে এর সোনার খাঁচা টাঙানো থাক্‌বে। দেশ-বিদেশের লোক একে দেখ্‌তে আস্‌বে।" রাজপুত্র বল্‌লেন, "না রাজকুমারী, একে কাছছাড়া কর্‌তে পার্‌ব না। বুড়ীমা আমার খোকা দেখ্‌বার জন্য বড্ডই সাধ কর্‌তেন। এর ডাক শুনে তাঁর কথা সবই মনে পড়্‌বে।"

রাজকন্যা কি জানি কি মনে করে' লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লেন।

* * * *

এ দিকে রাজা রাজপুত্রকে বনে পাঠানোর পর সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর পূজোয় মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন। এক বছর যায়, দু বছর যায়, তিন বছর যায়,—কুমার কই "খোকাহোক্‌" পাখী নিয়ে রাজ্যে ফিরে এল না! দুর্ব্বল মনকে শক্ত করে' রাজা আবার নিজেকে পূজোর মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। চার বছর গেল, পাঁচ বছর যায় যায়—রাজার মনের বাঁধন বুঝি আর থাকে না! সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর মন্দিরে পুত্রের মঙ্গলের জন্যে রাজা এবার হত্যা দিলেন। প্রথম দিনই দুপুর রাত্রে স্বপ্নে সর্ব্বমঙ্গলা-দেবী রাজার শিয়রের পাশে আবির্ভূত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে রাজাকে বল্‌লেন, "মহারাজ, আপনার কুমারের সঙ্গে মালব-রাজকন্যার বিবাহ হয়েছে। কুমার এখন মালব-দেশে। সে বন থেকে 'খোকাহোক' পাখী ধরে' এনেছে। শীঘ্রই মালবরাজ্যে যাও। মহাসমারোহ করে' নবদম্পতীকে এ রাজ্যে নিয়ে এস!" স্বপ্নভঙ্গে রাজার দেহমন আনন্দে শিউরে উঠ্‌ল। পরদিনই তিনি হাতীঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে মালবরাজ্যে যাত্রা কর্‌লেন।

রাজকন্যাকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে এসে, রাজপুত্র আর বনে ফির্‌তে পাননি। রাজকুমারীর রাঙা অঞ্চলেই বাঁধা পড়েছেন। এমন সুন্দর রাজপুত্র হাতে পেয়ে পিতা মালবরাজ কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ না করে' থাক্‌তে পারেন কি? বিশেষ সে যখন কন্যার রক্ষা-

কর্ত্তা, আর কন্যাও তাকে কম শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি। সোনার পিঞ্জরাবদ্ধ "খোকাহোক্" পাখীর ডাকে বুড়ীমার কথা রাজপুত্রের মনে পড়ে' যায়। তিনি আকাশের দিকে চেয়ে কপালে দুহাত ঠেকিয়ে কাকে প্রণাম করেন।

একদিন রাজপুত্র দেখ্লেন, রাজধানী হাতীঘোড়া লোক-লস্করে ছেয়ে গেছে। ব্যাপার কি জান্‌বার জন্যে সভায় যাবার উদ্যোগ কর্‌ছেন এমন সময় মালবরাজ এসে তাঁকে বল্লেন "তোমার পিতা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবে চল!" মালবরাজের মুখ হাসি-হাসি। রাজপুত্র অবাক হয়ে তাঁর সঙ্গে চল্লেন।

পিতা-পুত্রের দুজনেরি চোখে জল এল। পুত্রের অভিমানে; পিতার মিলন-আনন্দে। পরে পিতা যখন পুত্রকে সব কথা খুলে বল্লেন—পুত্র পিতার বুকে মাথা রেখে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। পুত্রের নিকট তার বনবাসের সব কথা শুনে পিতা শিউরে উঠ্‌লেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। পিঞ্জরাবদ্ধ "খোকাহোক্" পাখীর পানে চেয়ে কপালে বদ্ধহাত ঠেকিয়ে সজল নয়নে রাজা বল্লেন, "মা সর্ব্বমঙ্গলা, অপার তোর করুণা! আমার কুমারের মঙ্গলের জন্যে বনে তুই 'বুড়ীমা' সেজেছিলি—এখন আবার খোকাহোক্ পাখী সেজে এসেছিস্। ধন্য কুমার ধন্য! তোর ভালবাসা সে পেয়েছে—" তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। রাজা পুত্রকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন দিলেন।

রাজ্যে এসে মহাসমারোহে "খোকাহোক্" পাখীর পূজো করে' রাজকুমার তাকে ছেড়ে দিলেন।

এই গল্পটি অনেকেই জানেন। তাঁরা বলেন যে রাজপুত্রের "খোকাহোক্" পাখীরই বংশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে, রাজপুত্রের "খোকাহোক্" পাখী তাঁর বুড়ীমাই। রাজপুত্রের মায়া কাটাতে না পেরে "খোকাহোক্"—এই বুলি নিয়ে মরার পর পাখীর মূর্ত্তি নিয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে রাজপুত্রের "খোকাহোক্" পাখী একটা পাখীই। রাজপুত্রের বুড়ীমার কুঁড়েঘরের আঙ্গিনায় অশোক-গাছে সে বাস করত। সেখানে বসে' বুড়ীমার "খোকা হোক" আশীর্ব্বাদটি অনবরত শুনে শুনে সে বুলি সে ভুল্‌তে পারে নি। "খোকাহোক্" বলে' ডাকা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বুড়ীমার মরার পরই সে রাজপুত্রের নজরে পড়ে।

কোন্‌টা ঠিক কে জানে?

শ্রী দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার

কাজরী গান

"ছটামাখা গগনের ঘন ঘটা সাজনা,
দুম্‌দুম্ দুমদুম্ খুন-করা বাজনা;
খোকারে পাড়ানো ঘুম—সে আমার কাজ না।"
"—সেহলী লো সেহলী!
গুরুগুরু দেয়া ডাকে, তাই শুনে' এ হ'লি?"

"সমীরণ-শিহরণে ফুলে ফুলে নাচনা,
আকুল নয়ন তুলি অকূলের যাচনা;
এ কুলে বসতি করে' প্রাণ আর বাঁচে না।"
"—সেহলী লো সেহলী!
বায়ু বহে ফুল দোলে, তাই দেখে' এ হ'লি?"

"ঝর্‌ঝর্ ঝরে ওই শাওনের ঝরণা,
অধর ধরায় নামি করে পদচারণা;
এই পড়ে' রইলো এ ছার ঘর-করনা।
"—সেহলী লো সেহলী!
ঝরঝার বরিষণে অকারণে এ হ'লি!"

"ঝম্‌ঝম্ নূপুরের রুণুরুণু লাহনা,
পিতমের বুকভরা প্রাণকাড়া বাহনা;
সোহাগ-মিনতি-স্বরে ঘরে মন রহে না।"
"—সেহলী লো সেহলী!
জলদ প্রপাত হেরি তুই যেন কি হ'লি!"

"চিতচোর এলো মোর দূরে গেল ভাবনা,
পরশনে ধুয়ে গেল বিরহের দাবনা;
বাহিরে পরাণসাধা ঘরে আর যাব না।"
"—সেহলী লো সেহলী!
কুলের বহুরী হয়ে বাউরী কি হইলি?"

"এসো এসো পিয়া মোর হিয়া আছে বিছানা,
অঙ্গে অঙ্গে কর তরঙ্গ রচনা;
ঝুম্‌ঝুম্ দাও চুম—আর নাই যাচনা।"
"—সেহলী লো সেহলী!
বসন তিতিল জলে,—লাজ খেয়ে কি হ'লি?"

দরবেশ
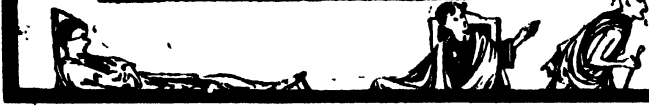
চাতকের সৃষ্টি

ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় ছেলেদের পাততাড়ি বিভাগে "চাতকের সৃষ্টি" শীর্ষক একটি গল্প লিখিয়াছেন। চাতকের সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের দেশে (ব্রাহ্মণ গাঁ, ঢাকা) আর-একপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। পাঠকপাঠিকাগণের কৌতূহল-নিবারণার্থ আমাদের জানা গল্পটি প্রকাশ করিলাম।

এক নগরে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার একটিমাত্র পুত্র ছিল, আর দ্বিতীয় কোন আত্মীয়স্বজন তাহার ছিল না। রমণী দরিদ্রা, সামান্য ব্যবসাদি করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; পুত্রটিরও ভরণপোষণ করিত।

একদা বৃদ্ধা জ্বররোগে আক্রান্ত হইল। ক্রমে তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া যাইত, পুত্রটিও নিকটে থাকিত। ক্রমে বৃদ্ধার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল, তাহার এমন শক্তি ছিল না যে ডাক্তার বা কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। কাজেই বৃদ্ধার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদিন বৃদ্ধা মুমূর্ষু অবস্থায় জলপান করিতে চাহিল; কিন্তু ঘরে কেহই ছিল না যে একটু জল তাহাকে দেয়। সে কাতরস্বরে পুত্রকে ডাকিতে লাগিল। পুত্র ঘরের বাহিরে বসিয়া কি যেন খেলা খেলিতেছিল, সে জননীর ডাক শুনিয়া বাহির হইতে উত্তর করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"মা! আমাকে ডাক কেন?" জননী তাহার নিকট জল চাহিল। কিন্তু বালক 'দেই' বলিয়া খেলা করিতে লাগিল এবং জল দেওয়ার কথা ভুলিয়া গেল।

এদিকে বৃদ্ধা শেষ অবস্থায় উপনীত। একেই ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তাহাতে আবার প্রবল জলপিপাসা; কিন্তু সময়মত জল না পাইয়া বৃদ্ধা বড়ই কাতর হইয়া পড়িল, আর জল চাহিতে পারিল না; অত্যল্পকাল মধ্যে বৃদ্ধা রমণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

পুত্রটি অনেকক্ষণ পরে ঘরে আসিয়া দেখিল জননীর দেহে প্রাণ নাই; তখন হঠাৎ তাহার জলের কথা স্মরণ হইল কিন্তু এখন আর স্মরণ হইলে কি হইবে! বালকটি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। জননী জল-পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এই কথা ভাবিয়া বালক বড়ই অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিল। পাড়ার লোক সংবাদ পাইয়া আসিয়া বৃদ্ধার মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করিল এবং জনৈক গ্রামবাসী বৃদ্ধার পুত্রটিকে নিজ বাড়ীতে রাখিয়া ভরণপোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মাতৃশোকে বালক বড়ই কাতর হইয়া পড়িল; অবশেষে একদিন প্রবল জ্বররোগে বৃদ্ধার স্মৃতিচিহ্ন পুত্রটিও জননীর নিকট চলিয়া গেল।

বালকের মৃত্যু হইলে ধর্ম্মরাজের রাজসভায় পাপপুণ্যের বিচার আরম্ভ হইল। ধর্ম্মরাজ বালকের পাপপুণ্য বিচার করিয়া বলিলেন, "তুই তোর জননীকে মৃত্যু-সময়ে জল দিস্ নাই, একারণে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইয়াছিস্, জননীর আত্মাও তোকে অভিশাপ দিয়াছে; অতএব এই পাপের ফল তোকে ভোগ করিতেই হইবে। এ পাপ হইতে তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। তোর স্নেহময়ী জননী জলপিপাসায় কাতরকণ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

বালক ধর্ম্মরাজের নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি করিল। ধর্ম্মরাজ অনেকক্ষণ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন—"তুই পরজন্মে পাখী হইয়া জীবনধারণ করিবি, এবং তোর জননীর মত শুষ্ককণ্ঠে 'জল, জল, ফটিক জল' বলিয়া চীৎকার করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইবি—বৃষ্টিপাত না হইলে কখনও জলপান করিতে পারিবি না, এবং তোর তৃষ্ণাও মিটিবে না।"

সেই অবধি অভিশাপগ্রস্ত বালক চাতকপাখী হইয়া আকাশপথে উড়িয়া বেড়ায় আর তৃষ্ণায় কাতরকণ্ঠে ফটিকজল ফটিকজল বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, বৃষ্টি না হইলে আর জলপান করিতে পারে না।

শ্রী নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—

তেলে-জলে

এ বছরের ২৪ নং জিজ্ঞাসার মীমাংসায় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, "তৈল প্রভৃতি পদার্থ জলে পড়িলে যে কেবল ভাসিয়া থাকে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয় (droplets)। . . ."। (ভাদ্র, ৭১৭ পৃষ্ঠা।)

কিন্তু ব্যাপারটি একেবারেই তা নয়। তেল জলের উপর ভাসে বটে কিন্তু বিন্দুতে পরিণত মোটেই হয় না। Surface Tensionএর জন্যে জলের উপর তেল, যত কমই দিন্ না কেন, জলের সমস্ত surfaceএর উপরে স্তর হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌বে বা পড়্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। জলের surface যত বড় হবে তেলের স্তর তত পাত্‌লা হবে। সুতরাং ইন্দ্র-বাবুর মীমাংসা বিজ্ঞান-সম্মত হয় নি।

শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু জিনিসটাকে ঠিক বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তবে বাঙ্‌লায় খুব ভালো করে' এই interference colourকে বোঝানো শক্ত। জলের উপর তেল পড়ার দরুন রং, সাবানের ফেনার রং, বা ইস্পাতের surfaceএর রং সবই এক কারণে হয়; একে Colour of thin plates বলে। এ সব ক্ষেত্রেই আলোক-তরঙ্গ একই কারণে বিপর্য্যস্ত হয়।

বিজয়-বাবুর মীমাংসায় একটা ভুল রয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন "তৈলের উপর শাদা আলো পড়িলে এক অংশ 'উপরিতল' (upper surface) হইতে প্রতিফলিত হয়, আর-এক অংশ তৈলের স্তরে প্রবেশ করে। ইহার একভাগ তৈলের 'নিম্নতল' (lower surface) হইতে প্রতিফলিত হয়।. . . ." (ভাদ্র, ৭১৭ পৃষ্ঠা।)

তেলের নিম্নতল থেকে তো প্রতিফলিত হয় না, হয় তেলের নিম্নতলের নীচে অবস্থিত জলের "উপরিতল" থেকে।

প্রভাতনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

—

বাঙ্গালী কি ঘরকুণো

বাঙ্গালীরা কি ঘরকুণো, এ সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় আলোচনা করিয়াছেন। আমি চিরকাল বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে নানা প্রকার অবস্থায় বাঙ্গালী দেখিয়া যাহা স্থির করিয়াছি তাহাই বলিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের ঠিক ঘরকুণো বলা যায় না, কিন্তু তাঁহারাও একান্ত অভাবে না পড়িলে বিদেশে যাইতে চাহেন না।

কিন্তু অশিক্ষিত বাঙ্গালী শ্রমিকেরা ও শিল্পীরাও ঘরের আধপেটা, সিকিপেটা, এমন কি প্রায় অনশন ছাড়িয়া বিদেশের সুখসচ্ছলতা পছন্দ করে না। আজকাল পূর্ব্ব-আফ্রিকা, মেসোপোটেমিয়া ইত্যাদি স্থানে বাঙ্গালী আছে বটে, তবে বেশী নহে, ও ইহারা প্রায় সকলেই কেরানি; ব্যবসায়ীর মধ্যে ডাক্তার ও উকিল ছাড়া অন্য ব্যবসায়ী নাই বলিলেই হয়। বঙ্গের বাহিরে—ভারতের সীমার মধ্যেও—বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এত কম যে নাই বলিলেও চলে। অন্যদেশবাসী অপেক্ষা সাধারণ বাঙ্গালীদের পৈত্রিক ভিটার মায়া অত্যন্ত বেশী। সচ্ছল অবস্থা হইলেও সাধারণ বাঙ্গালী পৈত্রিক ভিটার এক কাঠা জমিতে কষ্টে বাস করে, কিন্তু ভিন্ন স্থানের বড় বাড়ীতে যাইতে চাহে না। আমার ধারণা যে বাঙ্গালীরা শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে পারে না, বা চাহে না, অথবা তাহাকে ছোটলোকের কাজ বলিয়া ঘৃণা করে। কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে বহু ভারতবাসী শ্রমিকেরা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী নাই বলিলেও চলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি বাঙ্গালী যুবক বি-এসসি পাস করিয়া কলিকাতা হইতে বম্বের একটি ফার্মে ৫০৲ বেতনের কেরানিগিরি চাকরি লইয়া আসে। বোধ হয় বম্বের ব্যয় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ছিল না। বম্বেতে পোষ্ট আফিসের পত্রবাহক পিওনেরা ৫০৲ বেতন পায়। গবর্মেণ্ট তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার কমে তাহাদের পেট চলিতে পারে না। এই যুবকটি আসিবার অল্পদিন পরেই কোনও কারণে ফার্মটি উঠিয়া গেল। যুবক কর্ম্মহীন অবস্থায় অনাহারে কষ্ট পাইতে লাগিল। সেই সময়ে টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের একটি বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের অনুগ্রহে প্রাত্যহিক ৩৲ বেতনে টেলিগ্রাফের থামে উঠিয়া তার বাঁধা কুলির কাজ পাইল। অতি কষ্টে বাড়ী ফিরিবার রেলভাড়া সংগ্রহ করিয়া যুবকটি দেশে চলিয়া গেল। কিন্তু সেই ইঞ্জিনিয়ার-বাবু বলিয়াছিলেন, আমাদের একটু বুদ্ধিমান কুলিই রাখিতে হয়, আমার কাছে প্রত্যাহিক ৩৲র কমের কুলি নাই। ২।১ মাসের মধ্যে ভাল কাজ শিখিতে পারিলে বেতন বাড়াইয়া দিতে পারিব। আমার কাছে ১০৲ প্রাত্যহিক পর্য্যন্ত নিরক্ষর কুলি বা মেকানিকেরা কাজ করে। বাঙ্গালীরা বি-এসসি পাস করিয়া ৩০০৲ মাসিক আয়ের এইরূপ কুলিগিরি বা মেকানিকের কাজ অপেক্ষা ৫০৲ বেতনের কেরানিগিরি করিতে চাহে। তাহার কারণ (আমার বিশ্বাস) দ্বিবিধ।—(১) বাঙ্গালীরা শ্রমসাধ্য কাজ করিতে চাহে না ও (২) আমাদের সমাজে কুলিরা ৩০০৲ মাসিক অর্জ্জন করিলেও ছোটলোক ও কুলি, কিন্তু কেরানিরা দশটাকা উপায় করিয়া উপবাস করিলেও বাবু। লোকে এ সহজলব্ধ সম্মান (cheap respect) সহজে ছাড়িতে চাহে না।

বাঙ্গালী শ্রমিকেরা শ্রমস্বীকার করিলে যুক্তপ্রদেশ, বেহার, পঞ্জাব ও উড়িষ্যার শ্রমিক বাঙ্গলাদেশের গলি-ঘুঁচিতে পাওয়া যাইত না। বাঙ্গালী শ্রমিকেরা অল্পস্বল্প কষ্টে পড়িলেও বিদেশে যাইতে চাহে না। কেরানিরা কষ্টে পড়িলেই বিদেশে যায়। এখানে (দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে) একজন বাঙ্গালী কর্ম্মকার ছিলেন। তাঁহার দোকানে ১০।১২টি বাঙ্গালী স্বর্ণকার শিল্পী কাজ করিতেন। তাঁহাদের খাওয়া, বাড়ী, ধোপা, নাপিত ছাড়া বেতন ১০০০৲ হইতে ২০০০৲ বাৎসরিক ও বৎসরে দুই মাস ছুটি দিতেন। অর্থাৎ ঐ বেতন ১০ মাসের। তথাপি কর্ম্মকার মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কারিগরেরা দেশে চলিয়া গেলেন, ২০।২৫ বৎসরের দোকান উঠিয়া গেল।

বাঙ্গালীরা যতদিন শারীরিক শ্রমে পটু ও ঐ শ্রমের উপযুক্ত সম্মান না করিতে পারিবে ততদিন তাহাদের উন্নতি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালীদের আর-একটি দোষ আছে, সেটিও না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাঙ্গালীরা—বিশেষতঃ বিদেশে আগন্তুকেরা—স্বয়ং যতই নির্ব্বোধ হউন না কেন—বিদেশে আসিয়াই প্রায় আপনাকে অতি বুদ্ধিমান ও এই দেশের লোকদের নির্ব্বোধ ভাবিয়া থাকেন ও ঘৃণা ও করুণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা বাল্যাবধি এইরূপ বিদেশীদের জন্য ছাতুখোর, খোট্টা, মেড়ো ইত্যাদি কতকগুলি অসম্মানসূচক কথা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত; তাঁহাদের আবাল্য ধারণা সহজে যাইতে চাহে না। সেইজন্য অনেক সময়ে তাঁহারা বাস্তবিক যোগ্যতর হইয়াও স্থানীয় অধিবাসীর সম্মান আকর্ষণ করিতে পারেন না। পূর্ব্বে (মিউটিনির পরই) যখন বাঙ্গালীরা বিদেশে (বা পশ্চিমে) আসিয়াছিলেন, তখন স্থানীয় লোকেরা ইংরেজি শিক্ষা করে নাই, অতএব ইংরেজি অফিসের কেরানিগিরি ওকালতি ও ডাক্তারি বাঙ্গালীদের একচেটিয়া হইয়া গিয়াছিল। এখন সকল স্থানেই ইংরেজি-জানা স্থানীয় উপযুক্ত লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়। অতএব ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা স্থানীয় লোকদের মূর্খ ভাবিলে—অনুচিত হইলেও—কতক কতক ভাবিতে পারিতেন, কিন্তু এখন আর সেরূপ ভাবা চলে না অথচ বাঙ্গালীরা পুরাতন বুলি ছাড়েন নাই।

বিদেশে বাঙ্গালীদের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। জীবনধারণের একমাত্র উপায়—চাকরি এখন বাঙ্গালীর ছেলেরা প্রায় পায় না। ইহা ছাড়া শিক্ষা সম্বন্ধেও অবনতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার ফলে প্রথম শ্রেণীতে যত বাঙ্গালীর ছেলের নাম দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন বিদ্যার্থীর সংখ্যা বাড়িয়াও তত দেখা যায় না।

দেশে কার্য্যাভাব হইলে তবে লোকে বিদেশে যায়, নতুবা যায় না। বাঙ্গালী শ্রমিকদের এখনও বিদেশে যাইবার মত অভাব বা প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করিতে স্বীকার করিলে বঙ্গদেশেই যথেষ্ট কাজ পাওয়া যায়। বিদেশী শ্রমিকদের আমদানি কমে মাত্র। বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা বাড়িতেছে, তাঁহাদের শ্রমসাধ্য কাজ করিবার ক্ষমতা ও ঐ কাজ সম্মান করিবার সৎসাহস হইলেই তাঁহাদের ১৫ আনা কষ্ট দূর হয়। আমরা সমাজে শ্রমিকদের হীন বিবেচনা না করিলেই আমাদের যুবকেরা গ্রাজুয়েট হইয়া কেরানিগিরিতে যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জ্জন করিয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন।

শ্রী অমৃতলাল শীল

—

“মনসা পূজা” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার “মনসা পূজা” প্রবন্ধের (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯) কোনো কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি এজন্য যে মনোযোগসহ আমার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন ও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন সেজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

তাঁর প্রতিবাদের একটি কথা এই যে আমার প্রবন্ধে নাগদের বিষয়ে নানা কথা থাকিলেও বলদেব যে অনন্ত নাগের অবতার তাহা নাই। আর কৃষ্ণ নাগবিরোধী। অনন্তাবতার বলরাম কৃষ্ণের ভাই হন কেমন করিয়া?

নাগদের ইতিহাস আমার এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। মনসা পূজার অবতারণায় একটু একটু বলিতে হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধটি একটি সান্ধ্য সভায় পঠিত। তাই সময়াভাবে নাগদের দীর্ঘ বিবরণ দিতে পারি নাই। ভাদ্র-প্রবাসীর ৬৮৫ (১ম

প্যারা), ৩৮৫ (৪র্থ প্যারা), ৩৯০ (১ম প্যারা), ৩৯৫ (২য় প্যারা) পৃষ্ঠা দেখিলে বুঝা যাইবে যে আমি সব কথা বলি নাই।

একদল নাগ যে সুপর্ণদের ভয়ে নারায়ণকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহা আমি প্রবাসী ৩৮৮ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারাতে বলিয়াছি।

তাই অর্জ্জুন কৃষ্ণসখা হইয়াও নাগকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিলেন (৩৮৯ পৃঃ, ৫ম প্যারা)। নাগেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং কোনো কোনো দলের সঙ্গে অর্জ্জুনের বিরোধ ছিল না (৩৮৭ পৃঃ, ৬ প্যারা)।

ভবিষ্যতেও যে এই বিষয়ে অনেক কথা বলিব তাহাও ৩৯৫ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাতে জানাইয়াছি। যে বক্তব্য হাতে রাখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে অনন্ত ও শেষ নাগের কথাই প্রধান।

অনন্তনাগ নারায়ণকে গ্রহণ করাতেই শক্তিশালী হইল। তাই অনন্তের দল ও নারায়ণের দল এক হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। তাই অবতারবাদে অনন্তের স্থান হইল।

গীতায় ১০ অধ্যায়ে আছে "সর্পাণাম্ অস্মি বাসুকি," (২৮ শ্লোক), "অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্", (২৯ শ্লোক)। "বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্" (৩০ শ্লোক)। সেখানে কৃষ্ণ আপনাকে শ্রেষ্ঠ বুঝাইতেই অনন্ত ও বাসুকির সঙ্গে এক কহিয়াছেন (দ্রঃ—বনপর্ব্ব, ১৮৯,১১ এবং অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৭, ৫৭)।

অনুশাসন পর্ব্বের ১৪শ অধ্যায়ে শিবকেও এইরূপ "অনন্তনাগ" বলা হইয়াছে (২২ শ্লোক)।

মহাভারতে আছে শেষনাগ অন্য নাগদের অধর্ম্মাচরণে বিরক্ত হইয়া নানা তীর্থে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ কথা, তুমি জগতের ভার বহন কর"। তোমার ধর্ম্মকার্য্যে সুপর্ণ তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন (আদি পর্ব্ব, ৩৬, ২৫)।

আদি পর্ব্বে বলদেবকে শেষনাগের অংশাবতার বলা হইয়াছে (৬৭ অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)। শেষ ও অনন্ত বিষ্ণুভক্ত, তাই এই কথাতে বিরুদ্ধতা হয় নাই। বলদেবের মুখ হইতে অনন্তনাগ বাহির হইয়া গেলে বলদেব দেহত্যাগ করেন (মৌষল পর্ব্ব, ১৬, ১২-১৭ শ্লোক)।

অনুশাসন পর্ব্বে (১৪৭ অধ্যায়, ৫৭-৬০ শ্লোক) আছে "যেই রাম, সেই বিষ্ণু হৃষীকেশ, সেই অনন্ত।"

অনন্ত ও শেষ সম্বন্ধে এইরূপ বহু কথা বলিবার আমার আছে। তাহা পরে এক প্রবন্ধে লিখিব। "শেষ নাগের অবতার" কথাটার অর্থ যাহা বুঝিয়াছি তাহাও তখন লিখিব।

আবার আদি পর্ব্বের ১৯৭ অধ্যায়ে (৩২,৩৩ শ্লোক) আছে যে নারায়ণের শুক্ল ও কৃষ্ণ কেশের অবতার বলদেব ও কৃষ্ণ।

ইহা দেখাই যাইতেছে যে অন্য অধার্ম্মিক নাগদের সঙ্গে ধার্ম্মিক অনন্তনাগের বিরোধ হইল। তাই অনন্ত বিষ্ণুর ভক্ত ও সুপর্ণের সখা। তাই বলদেব অনন্তের অবতার হইলে দোষ নাই।

ইহা ছাড়া ঐ প্রবন্ধে আমার অনেক সিদ্ধান্ত ও তাহার হেতু আমি লিখিয়াছি। তাহার সবগুলি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সবাই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এমন আশা করাই অসঙ্গত। তবে এইসব বিষয়ের আলোচনা চলিলে নানা জনের সিদ্ধান্ত ও নানাবিধ ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইতে থাকিবে। তাহাতে আমাদের জ্ঞান প্রতিদিন বাড়িতে থাকিবে।

এই বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলোচনা করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। তাই পুনরায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন

শূদ্র ও ক্ষুদ্র

কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় "শূদ্র" শব্দ ও "ক্ষুদ্র" শব্দ একই বলাতে কিছু বাদানুবাদ হইতেছিল। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃতাদি ভাষা হইতে তাঁহার বাক্য প্রমাণিত করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে হিন্দী ও বাংলার প্রাকৃত গ্রন্থাদি হইতেও প্রমাণ মিলিতে পারে।

যথা, ঢাকা মোগলটুলী হইতে শ্রী পূর্ণচন্দ্র সিংহ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত দ্বিজ বংশীদাস রচিত পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠাতে দেখি, চাঁদ সদাগর লঙ্কারাজকে আপন পরিচয় দিতেছেন—

"চন্দ্রধর নাম মোর, হই ক্ষুদ্র জাতি।
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবণিক্য পদ্ধতি।"

আবার ১৯৮ পৃষ্ঠাতে দক্ষিণ পাটনের চন্দ্রকেতু রাজাকে পরিচয় দিতেছেন—

"চন্দ্রধর বলে আমি হই শূদ্র জাতি।
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবাণিক্য পদ্ধতি।"

আবার ২১১ পৃষ্ঠাতে রাজাকে পরিচয় দিবার সময় চাঁদ বলিতেছেন—

"চন্দ্রধরে বলে আমি হই ক্ষুদ্র জাতি।
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবাণিক্য পদ্ধতি।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারি—দ্বিজ বংশীদাস "ক্ষুদ্র" ও "শূদ্র" একই কথা বলিয়া জানিতেন। এইরূপ পুরাতন বাংলা ও হিন্দী খুঁজিলে এই বিষয়ে আরও প্রমাণ মিলিতে পারে।

শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন

—

শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ

গত ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী" শীর্ষক প্রবন্ধে নৈহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাশয়কে 'স্বর্গীয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হরিদাস-বাবু এখনও সশরীরে বর্ত্তমান। তিনি ৫১ নং সিমলা ষ্ট্রীটে অবস্থান করেন।

শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্ত
শ্রী উমাপ্রসাদ ঘোষ

—

মাঠে আগুন

গত আষাঢ় মাসের "প্রবাসীতে" শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের লিখিত ঢাকা জেলার "সাতগাঁয়ের বিল" নামক স্থানে মাটীর তলায় আগুনের বর্ণনা দেখিলাম। এই বর্ণনা পাঠেই আমার মনে হয় স্থানটিতে Peat (উদ্ভিজ্জীবনের কয়লায় রূপান্তরিত হইবার প্রথম অবস্থা) আছে। আমি সেজন্য এখানকার জিওলজি বা ভূবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক Dr. Fettke-র সহিত এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিয়াছিলাম—তাঁহারও এই মত।

কয়লার উৎপত্তি উদ্ভিদ হইতে, একথা সকলেই জানেন। অগভীর হ্রদগুলি অনেক সময়ই নানারূপ আগাছায় পূর্ণ থাকে দেখা যায়। এইসকল গাছ জলে পচিয়া হ্রদের তলায় জমা হইতে থাকে। উদ্ভিদশরীরে অঙ্গারের পরিমাণ শতকরা খুব বেশী—এই অঙ্গার হ্রদের তলায় বহুবৎসর ধরিয়া জমিয়া পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপে অবশেষে কয়লায় পরিবর্ত্তিত হয়। এই রূপান্তরের কয়েকটি ভিন্ন

ভিন্ন অবস্থা আছে—যেমন peat, lignite, bituminous coal, semi-bituminous, semi-anthracite ও graphite। পীট এই রূপান্তরের প্রথম অবস্থা। দেশের জলবায়ুর অবস্থা শুষ্ক (arid) হইলে—হ্রদ অগভীর হওয়ায় শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, সুতরাং বেশী কয়লা জমিতে পারে না ; কিন্তু জলবায়ু ভিজা বা humid হইলে হ্রদ বহুবৎসর ধরিয়া একই অবস্থায় থাকে—সুতরাং কয়লা হইবার খুবই সুবিধা হয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন-বাবুর বর্ণনায় দেখা যায়—স্থানটি বিল। সুতরাং ঐ স্থানে যে বহুবর্ষ পূর্ব্বে একটা ছোট হ্রদ ছিল এরূপ সহজেই মনে করা যাইতে পারে। এবং সম্ভবতঃ ঐ হ্রদের তলায় বহুবৎসর ধরিয়া উদ্ভিদ পচিয়া জমিয়া আছে এবং তাহার রূপান্তর বোধ হয় প্রথম অবস্থাতেই আছে—কারণ কয়লার ঘনতা (density) পীট্ অপেক্ষা অনেক বেশী—সেজন্য সহজে তাহাতে আগুন ধরিতে পারে না এবং আগুন ধরিলেও উহা বেশীদূর পর্য্যন্ত যায় না—যদি না বাহির হইতে কয়লার মধ্যে বায়ুপ্রবেশের জন্য যথেষ্ট পথ বা ফাটল থাকে। বর্ণনায় দেখা যায় আগুনধরা জায়গাটি চাষের মাঠ। চাষের মাঠে সাধারণতঃই বেশী জল দাঁড়াইতে পারে না (well drained)। সেজন্য মাটীর তলায় পীট বেশ শুকাইয়া খুব সছিদ্র (porous) হইতে পারে। এইরূপ পীটে একবার আগুন ধরিলে তাহা সহজে নিবে না। ২।১টা বর্ষা বা বন্যার জল তাহার কিছুই করিতে পারে না। প্রায় সমস্ত পীট পুড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত এই আগুন থাকে। আমেরিকার ওয়াসিংটনের নিকট একবার এইরূপ একটা পীটের স্তরে আগুন লাগে—বহু শত একর স্থান ব্যাপিয়া এই আগুন জ্বলিতে থাকে এবং সহস্র সহস্র ছিদ্রপথ দিয়া অনর্গল ধূম উদ্গিরণ হয়। ২।৩ টা বর্ষাতেও ঐ আগুন নিবে নাই।

পীট আমাদের অনেক কাজে আসে—আমেরিকার অনেক বড় বড় কারখানায় পীটের আগুনে ষ্টীম তৈয়ারি হয়—এদেশে পীটের দাম বিটুমিনাস্ কয়লার দামের প্রায় সমান। পীটের উত্তাপকারী ক্ষমতাও (heat of combustion) খুব বেশী—পীট্ অনেক সময় সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হইতে অনেক সময় কাঠকয়লা প্রস্তুত করা হয়। এইসকল নানা কারণে ক্রমেই পীটের ব্যবহার বেশ বাড়িতেছে। সেজন্য ঐ মাঠের আগুন যতশীঘ্র সম্ভব নিবাইতে পারিলে এই পীটের উদ্ধার হইতে পারে। তা ছাড়া চাষের জন্যও আগুন নিবান দরকার। এই আগুন নিবাইতে হইলে ঐ মাঠের চতুর্দ্দিকে জল নির্গমনের পথ (drainage) সমস্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত—তাহা হইলে এই-সমস্ত বাঁধে জল আট্‌কাইয়া ঐ জায়গায় কিছুদিন দাঁড়াইতে পারিলে আগুন নিবিতে পারে। আমাদের দেশে আমরা খনিজ পদার্থের তত মূল্য বুঝি না। অনেক জায়গায় অনেক রকম মাটী পাথর চূণ ইত্যাদি চিরকাল দেখিয়া আসি—তাহা ব্যবহারের চেষ্টা করি না। কিছুদিন পরে দেখি কোনও সাহেব কোম্পানী আসিয়া ঐ জায়গায় মস্ত বড় কারখানা খুলিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতে থাকে। আমাদের নিজেদের অবহেলাতেই অনেক সময় আমরা এই-সব জিনিস হারাই। যে মাঠে আগুন লাগিয়াছে—সেখানে পীট আছে বলিয়া সন্দেহ হওয়া খুবই সহজ—সুতরাং উহার ভাল করিয়া অন্ততঃ একটা পরীক্ষাও হওয়া ঐকান্ত দরকার। এই পীট পাওয়া গেলে ইহার আয় বড় অল্প হইবে না।

অবশ্য এতদূর হইতে ঐ স্থানের সকল তথ্য ঠিক করিয়া না জানিয়া কিছু একটা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাহা ছাড়া—ঐ স্থানে পীট থাকার বিরুদ্ধেও একটা জিনিষ দেখিতে পাই ঐ জায়গার মাটীর রঙ। সাধারণতঃ যেখানে পীট থাকে—সেখানে মাটীর রঙ কাল বা brown অর্থাৎ পাটল হয়—কিন্তু এই জায়গার মাটীর রঙ ক্ষিতিমোহন-বাবুর বর্ণনায় দেখি লাল। Dr. Fettke মনে করেন বোধ হয় ঐ স্থানে পূর্ব্বে আরও একবার আগুন লাগিয়াছিল—তাহাতে মাটীর রঙ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন মনে করি। পীটের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলে আগুন যতশীঘ্র সম্ভব নিবাইয়া ফেলা উচিত। স্থানীয় দরিদ্র চাষারা এই-সকল বিষয়ে অত মাথা ঘামানো দরকার মনে না করিতে পারে—কিন্তু যাঁহাদের পয়সা আছে—তাঁহারা আরও কিছু পয়সা করিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের আমাদের একটি বাঙালী বন্ধু এদেশে একটা পীটের জায়গা ইজারা লইয়া খনি করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রী সন্তোষকুমার বসু
Mining Engineering Student,
Carnegie Institute of Technology,
Pittsburgh., Pa.
U.S A.

—

খদ্দর

খদ্দর প্রচলনের বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তি সচরাচর প্রদর্শন করা হয় তন্মধ্যে একটি এই যে দেশীয় তাঁত বিদেশীয় মিলের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিবে না। এই যুক্তি যে অন্ততঃ কিয়দংশে অসার তাহা জাপানের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়।

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি New Yorkএর National Bank of Commerce কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Commerce Monthly" নামক মাসিক পত্রিকায় বিগত July সংখ্যার Japan's Trade in Cotton and Wool Textiles শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য উক্ত ব্যাঙ্কের মুখপত্রের খবরাখবর অতীব বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হইতে সংগৃহীত হয়।

"For many years after the beginning of cotton manufacturing in Japan, yarns were practically the only product of the industry. These were woven into cloth *in the homes on narrow hand-looms*, and were exported to China."

"The number of Japan's power looms in 1920 was estimated at 110,000 as compared with 798,000 looms in the United Kingdom, and 728,000 in the United States. Japan's ability to export cotton cloth, however, is greater than would at first appear, for as *domestic demand is largely met by the product of hand-looms*, a considerable number of Japan's power looms produce for export only."

স্বদেশে হাতের তৈয়ারী কাপড় ব্যবহার করিয়া বিদেশে কলের জিনিষ রপ্তানী করে!

পুনরায়, জাপানে যে এখনও মোটা সুতা ও মোটা সুতার কাপড় প্রস্তুত হয় তাহার প্রমাণ—

"Coarse, low count yarns have always formed the greater part of Japan's output."

"Up to the present time, the large trade in textiles has consisted mainly of inferior and coarsely woven materials."

কথায় কথায় আমরা জাপানের সহিত ভারতের তুলনা করি। এই বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে জাপানীদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি অনুসরণ করিলে আমরাও তাহাদের ন্যায় উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব।

শ্রী—

চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ [ব্রজলীলা]—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত। প্রকাশক ভারত-চিত্র-মন্দির, ১৪২ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শিবপুর, হাওড়া। ৪১ পৃষ্ঠা, ৪১ খানি রঙিন ছবি, রেশমী কাপড়ে উত্তম বাঁধা। দাম চার টাকা।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রধান প্রধান ঘটনা এক এক পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে ও তার সম্মুখে এক এক পৃষ্ঠাব্যাপী রঙিন ছবিতে সেই ঘটনা প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তদের কাছে এই পুস্তক সমাদৃত হইবে। ছবিগুলি রঙিন, কিন্তু তার মধ্যে কোনো আর্ট নাই—নিতান্ত মামুলি।

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা—শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, কলিকাতা, ঢাকা, ও ময়মনসিংহ। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি, ১২৭ পৃষ্ঠা। কাপড়ে উত্তম বাঁধা। দাম আট আনা।

প্রথমে কাব্য ও আর্টের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া লেখক এই স্থির করিয়াছেন যে—লোকশিক্ষা ও সমাজের উন্নতিসাধন আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর বর্ত্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যে এই উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সাধিত হইতেছে তাহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, নষ্টনীড়, ঘরে-বাইরে; শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন, বড়দিদি, পল্লীসমাজ, দেবদাস, স্বামী; হরিদাস হালদারের কর্ম্মের পথে প্রভৃতি পুস্তক সমালোচনা করিয়াছেন; এবং বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম ও বারবনিতার প্রেম অঙ্কনের জন্য লেখকদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সমালোচক নিন্দা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথকে এক জায়গায় 'পাগল' বলিতেও সমালোচক দ্বিধাবোধ করেন নাই। সমালোচকের মতে—সমাজে অনেক খারাপ লোক আছে, তাহাদের প্রলোভনময় পাপচিত্র অধিকতর প্রলোভনীয় করিয়া ধরাতে তাহারা অনেকের অনুকরণীয় হইতেছে। কবি কেবল পুণ্যের আলোক ফুটাইবার জন্য তাহার পাশে পাপচিত্র অঙ্কিত করিবেন, পাপের দণ্ডবিধান করিয়া পুণ্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিবেন, কারণ ইহাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। সমাজে ঐসব দুর্নীতিপূর্ণ পুস্তকের প্রচারে যে প্রেমরোগ ছড়াইতেছে তার প্রতিষেধক হইতেছে বাল্যবিবাহ।

সমালোচক গোড়ায় গলদ করিয়াছেন—যাঁরা পাপচিত্র অঙ্কিত করেন তাঁরাও তাহা গর্হিত করিয়াই প্রকাশ করেন, কেবল গুরু-ঠাকুরের মতন উপদেশ দিয়া পাঠককে বলিতে যান না যে—দেখিলে ত পরিণাম, খবরদার ও পথে পা দিও না। সেরূপ করিলে এক শ্রেণীর লোক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন বটে, কিন্তু কলাসরস্বতীর তাতে হাঁপ ধরে। লেখক পাঠকের কাছে এতটুকু বুদ্ধির আশা করেন যে সে আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি তলাইয়া বুঝিবে। চোখের বালির বিনোদিনী, ঘরে-বাইরের বিমলা, চরিত্রহীনের কিরণময়ী প্রভৃতির আচরণ যে অন্যায় ও ভুল এইটাই লেখকেরা দেখাইয়াছেন, কোথাও লেখকেরা সেইসব চরিত্রের আচরণ সমর্থনও করেন নাই, অনুকরণীয়ও বলেন নাই। যতীন্দ্রমোহন-বাবু পাড়াকুঁদুলীর মতন কুলগাছের কাঁটায় কাপড় আটকাইয়া কোঁদল খুঁজিয়াছেন—রসজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই—অথচ তিনি রসিক, রসরচনাতেও তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষী ধ্রুবতারা ও উড়িষ্যার চিত্র। মানুষের মন বিরূপ (biased) হইলে তার আর সুবিচারের শক্তি থাকে না—এই বইখানি তাহার দৃষ্টান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা দুঃখিত।

মুদ্রারাক্ষস

পর্ণপুট [দ্বিতীয় খণ্ড]—শ্রী কালিদাস রায়, বি-এ প্রণীত। গুপ্ত এণ্ড কোং হইতে শ্রী চন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ৪৯ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

কবি বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার পর্ণপুট সুপরিচিত কাব্য-গ্রন্থ। পর্ণপুটের আলোচ্য খণ্ডে কতকগুলি পৌরাণিক ও পল্লী সম্বন্ধীয় কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই বেশ সহজ সুন্দর। পৌরাণিক কবিতাগুলি স্বদেশ-প্রেমে ও স্বজাতি-গৌরবে অনুপ্রাণিত। পল্লী সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি স্নিগ্ধ। গ্রামের 'পুরুৎ ঠাকুর' হইতে 'কৃষক-বালা' পর্য্যন্ত সকলকার ব্যথাই কবি সমান ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'চীন পরিব্রাজকের প্রতি' শীর্ষক কবিতাটিতে কবির স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-গৌরব সহজ ধারায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতাটি শব্দসম্পদেও সম্পদশালী—

> "কহ—মোরা নহি হেয় আফ্রিকার কাফ্রির মতন,
> মোদের অতীত নহে অরণ্যের জঘন্য জীবন।
> সমগ্র নিখিল যবে বনে বনে,—গিরির গুহায়
> দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল অজ্ঞতার ঘোর তমিস্রায়,
> ভারত তখনি ছিল বিশ্ববন্দ্যা আলোকের বাণী,
> জ্ঞানের সুমেরু-শৃঙ্গে ছিল তার তুঙ্গ-রাজধানী।
> নালন্দা বৈশালী কাঞ্চী তক্ষশিলা উজ্জয়িনী কাশী
> প্রণবমন্ত্রে সত্যমার্গে জ্ঞানস্বর্গে উঠিল উদ্ভাসি';
> জ্যোতিষ্কমণ্ডল যেন সৌরলোকে সমুজ্জ্বলতম,
> বিরিঞ্চির চতুর্ম্মুখে মূর্ত্তিমান বেদগান সম।
>
> * * * *
>
> অহিংসা-মন্ত্রের ধ্বজা, মৈত্রীচ্ছন্দ তুলিয়া আকাশে
> মগধের রাজশক্তি আর্য্যাবর্ত্তে বাঁধে বাহুপাশে,
> সর্ব্বস্ব বিলায়ে নিঃস্ব বল্কপট পরিত সম্রাট,
> জ্ঞানি-গুণি-পদপ্রান্তে ক্ষাত্রশক্তি লুটাত ললাট।"

একটা কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবির পর্ণপুট প্রথম খণ্ডের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রথম খণ্ড যেমন স্বতঃ-উৎসারিত সহজ-কবিত্ব-মণ্ডিত, দ্বিতীয় খণ্ড তেমন বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিতীয় খণ্ডে ভাষা ও ছন্দের দিকে কবির ঝোঁক দেখা যায়। তবে প্রথম খণ্ডের প্রেম-অভিব্যক্তির চঞ্চলতা দ্বিতীয় খণ্ডে শান্ত হইয়া ফুটিয়াছে।

উনপঞ্চাশী—শ্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ রামরতন বোস লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪৭। দাম পাঁচসিকা।

মানুষের তীব্রতম বেদনাও অনেক সময়ে হাসির আকারে ফুটিয়া উঠে। উপেন-বাবুকে আমরা একজন প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া

জানি। দেশের নানা গলদ তাঁহার মনে যে বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই তিনি বিদ্রূপের আকারে হাসিতে প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের "হাসির গান" এই ভাব হইতেই উদ্ভূত। "হাসির গানের" পর আলোচ্য গ্রন্থে ছাড়া, দেশের অন্যায়-অসত্যের উপর এমন বিদ্রূপ-কশাঘাত আর দেখা যায় না। বহু বৎসর ধরিয়া দ্বীপান্তর-নির্য্যাতিত মানুষের চিত্তে যে এমন অনাবিল হাসির ধারা সঞ্চিত থাকিতে পারে তাহা ভাবিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। শেষে একটা কথা আমরা না বলিয়া পারিতেছি না। মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিকে লইয়া মাঝে মাঝে যে ব্যঙ্গ-তামাসার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনেকের পক্ষেই পীড়াদায়ক। বইটির দাম কিছু কম হইলে ভাল হইত।

—গুপ্ত

পথের সন্ধান—স্বামী স্বরূপানন্দ। কল্পতরু-গুরুকুল-সমিতি, ১৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অবৈতনিক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সাহায্যার্থ মূল্য—ছয় পয়সা।

কতকগুলি ছোট ছোট উক্তির সমাবেশে জীবনের পথের সন্ধান প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবনের পথ হইতেছে—আশা, ত্যাগ, সাধুতা, প্রেম, অভীঃ। উক্তিগুলি বেশ জোরালো ও সত্যভিত্তিতে সুদৃঢ়।

স্বামীজীর পত্র—স্বামী স্বরূপানন্দের লিখিত কতকগুলি পত্র। অবৈতনিক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সাহায্যস্বরূপ মূল্য দশ আনা।

বহু সত্য উপদেশ এই পত্রগুলিতে আছে। বলার ভাষা তেজস্বী, উক্তি স্বানুভব-সঞ্জাত, সেইজন্য মর্ম্ম স্পর্শ করে। যিনি পড়িবেন তিনিই উপকৃত হইবেন।

শশিনাথ—শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৯০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে-বাঁধা। আড়াই টাকা।

এখানি উপন্যাস—পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস শ্রেণীর। গল্পের প্লট নিতান্ত ঘরোয়া, কিন্তু সেই ঘরোয়া প্লটকে ঘোরালো করিয়া লেখক বিশেষ শক্তির ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

সোমনাথ ও শশিনাথ দুই ভাই; অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইলে তাঁদের পিসিমা তাঁদের পালন করেন। বাড়ীর পাশে এক রুগ্ন ভদ্রলোকের ভাগ্নীকে দেখিয়া পিসিমা উপযাচক হইয়া সেই মেয়ে উর্ম্মিলার সঙ্গে সোমনাথের বিবাহ দেন; বিবাহের পরেই উর্ম্মিলার মামা মারা যান, উর্ম্মিলার বোন লীলারও ভার পিসিমা গ্রহণ করেন উর্ম্মিলা ঘরকন্না বুঝিয়া লইলে পিসিমা কাশীবাসিনী হন।

সোমনাথ বিবাহ করিয়া আর লেখাপড়া করিতে পারেন নাই; তিনি নিতান্ত সংসারী সামাজিক জীব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে একটু মাঠো। শশিনাথ দাদার উল্টা—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সংসার-বিরক্ত, রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইতে উৎসুক। উর্ম্মিলা এই দুই ভাইয়ের guardian angel—রক্ষণ-দেবতা। স্বামী-স্ত্রী, ভাই ভাই, ভ্রাতৃজায়া-দেবর এই ত্রি-সম্পর্কের চিত্র লেখক বড় মধুময় প্রাণস্পর্শী করিয়া আঁকিয়াছেন—একখানি আদর্শ গৃহস্থালির ছবি।

উর্ম্মিলার ইচ্ছা যে ভগিনী লীলার সঙ্গে শশিনাথের বিবাহ দিয়া বোনকে নিজের কাছে ও দেবরকে সংসারে ধরিয়া রাখেন। এই প্রস্তাব যেদিন শশিনাথের কাছে করা হইল তখন শশিনাথ অস্বীকার করিয়া দাদাকে বলিল—"লীলা যেন স্বপ্নেও একথা মনে না করতে পায় যে সে তোমার আশ্রয়ে আছে বলে তুমি সৎপাত্রের চেষ্টায় একবার রাস্তা পর্য্যন্ত মাড়ালে না সস্তা মাল বাড়ী থেকেই ধরে' দিচ্ছ।—দেশে ত সৎপাত্রের অভাব নেই...আমি যদি দেখি যে লীলার এমন কোনো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে যে আমার চেয়ে কোনো অংশে হীন, তখন আমি সে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে লীলাকে বিয়ে করব। কিন্তু তার আগে কেন?" শশিনাথ তার সহপাঠী সুধীরের সঙ্গে লীলার বিবাহ স্থির করিল—সুধীর রূপে গুণে বিদ্যায় প্রতিষ্ঠায় ধনে মানে অসাধারণ।

বিবাহের পরদিন লীলার বাক্স সাজাইতে গিয়া উর্ম্মিলা বাক্সর ভিতর হইতে বাহির করিলেন শশিনাথের একজোড়া জুতা! সেই দিন জানাজানি হইল যে লীলা শশিনাথকেই ভালোবাসে, শশিনাথের হুকুমেই সে বিবাহ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে ব্যাপার আর-একটু জটিল হইয়াছে এক সরযূর আবির্ভাবে। সরযূ শশিনাথের পিতৃবন্ধুর কন্যা; এক কায়স্থ প্রফেসার সরযূর পাণিপ্রার্থী হওয়ায় সরযূর গ্রামিকেরা ব্রাহ্মণকন্যার ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া সরযূর পিতাকে উৎপীড়ন করিতেছিল। শশিনাথ এই সংবাদ পাইয়া বন্ধু বরেন্দ্রকে লইয়া সরযূ ও তার শয্যাগত পিতাকে গ্রামিকদের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় আনে। প্রফেসর-পুঙ্গব শেষে সরযূকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, এবং সরযূর রুগ্ন পিতা সরযূকে শশিনাথের হাতে সমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

বরেন্দ্র সরযূকে ভালোবাসিয়াছিল। কিন্তু শশিনাথের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতাকে ও শশিনাথের হাতে তাকে তার পিতা সমর্পণ করিয়াছেন অতএব শশিনাথই তার স্বামী এই ধারণাকে সরযূ শশিনাথের প্রতি ভালোবাসা বলিয়া ভুল করিয়া বরেন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করে।

লীলার বিবাহের পরে লীলার স্বামী সুধীর জানিতে পারে যে লীলা উর্ম্মিলার সহোদরা নয়, এবং লীলার মা লীলার পিতার সহধর্ম্মিণী ছিলেন না। সুধীর কুশণ্ডিকা সিন্দূরদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান না করিয়া লীলাকে ত্যাগ করে।

লীলার বিবাহ হইয়া গেলে শশিনাথ বুঝিতে পারে যে সে লীলাকে কত ভালোবাসিত। সুধীর লীলাকে ত্যাগ করিয়াছে জানিয়া শশিনাথ লীলাকে নিজের বাড়ীতে ফিরাইয়া আনে এবং লীলাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই বিবাহের বাধা হইল সোমনাথ ও লীলা—সোমনাথ সমাজের ভয়ে এবং লীলা শশিনাথকে লোকচক্ষে হেয় করিবার ভয়ে ও সরযূকে দুঃখী করিবার আশঙ্কায়।

লীলা রেঙ্গুনে চাকরী লইয়া যাইবে, গোপনে সে শশিনাথের কাছে গভীর রাত্রে বিদায় লইতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। শশিনাথ লীলাকে নিজের শয্যায় শোয়াইয়া শুশ্রূষা করিতেছে, এমন সময় উর্ম্মিলা ও সোমনাথ সেই ঘরে আসিয়া তাহাদের সেই অবস্থায় দেখিয়া সন্দিহান হয়।

লীলা ও শশিনাথ মিথ্যা কলঙ্কের প্রতিবাদ না করিয়া উভয়ে রেঙ্গুন চলিয়া গেল। সোমনাথ ও উর্ম্মিলা যখন নিজেদের ভুল জানিতে পারিয়া শশিনাথ ও লীলাকে ফিরাইতে গেল তখন ষ্টীমার জেটি ছাড়িয়া মাঝ গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে।

বরেন্দ্রের অনুরাগ সরযূর হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হইলেও বন্ধু ও আত্মীয়-বিচ্ছেদে তাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইতে পারিল না।

এই মোটামুটি প্লট। কিন্তু সংক্ষেপে প্লটের জটিলতা ও বর্ণনার চাতুর্য্য কিছুই বুঝাইতে পারিলাম না। সরযূ শশিনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করে, তাই তার মুখে শশিনাথের প্রতি কোনো মমতার কথা প্রকাশ পায় না; কিন্তু শশিনাথের বন্ধু বরেন্দ্রের উপর তার টানের পরিচয় কথায় কথায় পাওয়া যায়; শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির বন্ধু বলিয়া যে দরদ তাকে শশিনাথ ও বরেন্দ্র দুজনেই ভালোবাসা বলিয়া ভুল করিতেছে—এইটি লেখক অতি কৌশলে পাঠককেও না জানাইয়া

বরাবর প্রকাশ করিয়াছেন। লীলা, শশিনাথ, বরেন্দ্র ও সরযূর মনস্তত্ত্বের জটিলতা ও সংঘাত অতি নিপুণতার সহিত দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্র জীবন্ত হইয়াছে; এমন কি পিসিমা মাত্র দুবার ঘটনাক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেও একটি নিজস্ব মূর্ত্তিতে পাঠকের মানসলোকে প্রতিভাত হন।

এই বইখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—লেখক অসাধারণ শক্তির ও শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

ভুলের ফসল—শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এল-এজি। প্রকাশক—শ্রী রবীন্দ্রনাথ মিত্র, ১ নিকাশীপাড়া লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। দশ আনা।

লেখক চাষা। লিখিয়াছেন গল্প, চাষের মহিমা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। চাষ, সমবায়, পল্লীসংস্কার, প্রভৃতি বিষয়ের চারটি গল্প। গল্পগুলি সম্পূর্ণ নুতন ধরণের। গেঁয়ো ছবি মাঝে মাঝে বেশ ফুটিয়াছে। লেখায় মুন্সিয়ানার অভাব আছে; তবে লেখকের এই প্রথম উদ্যম ও রচনা উদ্দেশ্যমূলক, সুতরাং শিল্পরচনা আশা করা যায় না।

প্রবোধকৌমুদী ও শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী—শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-প্রণীত। কাশী গোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে বিতরিত। ছোট আকারের ক্ষুদ্র বই।

এতে দেহ চিত্ত আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা, কতকগুলি হিন্দী তত্ত্বমূলক কবিতার অনুবাদ, সৎসঙ্গের স্বরূপ, ও সাধনাভ্যাসের ক্রম নিয়ম দেওয়া হইয়াছে।

ভক্ত নন্দ—শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, মেদিনীপুর। খুব ছোট আড়ার ছোট বই। দাম দশ পয়সা।

মাদ্রাজী ভক্ত অস্পৃশ্যমন্ত্য পড়িয়া জাতির নন্দের মহত্ত্বকথার বই।

প্রার্থনাতত্ত্ব—শ্রী যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (মৈত্র)। পাবনা। বিনামূল্যে বিতরিত।

ভগবান ও মাতৃভূমির ধ্যান ও আরাধনা সম্বন্ধীয় বই।

অরবিন্দ-মন্দিরে—প্রবর্ত্তক হইতে পুনর্মুদ্রিত, দাম বারো আনা।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মন্দিরে যে-সব কথা আলোচনা হইয়াছে তারই সংগ্রহপুস্তক। বিবিধ গভীর তত্ত্ব ও জটিল সমস্যার মীমাংসা আছে।

সনাতন ধর্ম্ম ও মানব-জীবন—স্বামী যোগানন্দ প্রণীত। গারো হিল যোগাশ্রম। এক টাকা।

মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব কি, ও তাহা লাভের সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

মালুটী রাজবংশ—শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মালুটী, সাঁওতাল পরগণা। এক টাকা।

মালুটী রাজবংশের ইতিহাস। অনেক অলৌকিক আজগুবি কথাও ইতিহাস নামে এই বইএ স্থান পাইয়াছে।

ভাঙ্গাগড়া—শ্রী সুকুমাররঞ্জন দাশ, রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, ২৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দোতলা, কলিকাতা। ছয় আনা।

প্রবন্ধ পুস্তক। স্বাদেশিকতার সীমা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, গ্রহণ ও বর্জ্জন, ভাঙ্গন ও গড়ন, যুগ-সাধনা শক্তি-সাধনা সম্বন্ধে ছয়টি প্রবন্ধের সমষ্টি। বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া, সকলের সঙ্গে চলার তাল ঠিক রাখিয়া স্বদেশের কল্যাণের জন্য শক্তিসাধনা করিতে হইবে—ইহাই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য।

দেখা-শোনা—শ্রী পাঁচকড়ি ঘোষ। প্রকাশক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ১৭২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা। ছবি আছে।

নানা দেশ ভ্রমণের বর্ণনার বই। শিমলা থেকে রামেশ্বর ও শিলং থেকে বোম্বাই চৌহদ্দীর মধ্যের অনেক দুর্গম স্থানের বর্ণনা ইহাতে আছে।

পঞ্চশস্য—সংগ্রাহক শ্রী পাঁচকড়ি ঘোষ। প্রকাশক শ্রী অজেশচন্দ্র সান্যাল, ১ বিবি রোজিও লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

১০টি বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধের বই। পুণ্যচরিত, প্রাচীন কবি, ভক্তিপ্রসঙ্গ, রঙ্গসাহিত্য, কাব্যসুন্দরী—এই পাঁচ বিষয়ের ১০টি প্রবন্ধ এতে আছে।

যুধিষ্ঠির—শ্রী শশিভূষণ বসু। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। সচিত্র। এক টাকা।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্র বিশ্লেষণের শিশুপাঠ্য পুস্তক। ইহার মধ্যে মহাভারতের মূল উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব ক্রমশ উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে।

প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা—শ্রী সন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্য-রত্ন প্রণীত। চন্দননগর। ২৮৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। আড়াই টাকা।

ব্যবসা-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারী বই। এতে ব্যবসায়ের অনেক তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

আত্মিক জগৎ—শ্রী মন্মথনাথ নাগ প্রণীত। মেদিনীপুর-হিতৈষী কার্য্যালয়।

ভূত নামানো, সম্মোহন, অশরীরী আত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সম্বন্ধীয় বই। লেখক নিজের অভিজ্ঞতা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গুরুভক্তি—সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট। সচিত্র। চার আনা।

একলব্য, আরুণি, উপমন্যু—মহাভারতের তিনটি বিখ্যাত চরিত্রের গুরুভক্তির কাহিনী। শিশুপাঠ্য বই।

মিতা—ভাদ্র সংখ্যায় মহরমের উপাখ্যান আছে। শ্রী অমিয়া মিত্রজায়ার লেখা, শেষ পাতায় একটি কবিতা আছে—শিশুর প্রাণ।

সুবল সখার কাণ্ড—শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট দোতলা, কলিকাতা, রেশমী কাপড়ে বাঁধা, অনেকগুলি রঙিন ছবি আছে। দাম আঠারো আনা।

কৃষ্ণলীলার কথা।—সুবল নানা রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেন তারই বর্ণনা। ভূমিকায় বৈষ্ণবতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে।

পাপের ছাপ—শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা। নয় সিকা।

উপন্যাস—এতে Criminology বা অপরাধতত্ত্ব ও Sexology বা মিথুনতত্ত্ব উপন্যাসের প্লটের সঙ্গে জড়াইয়া অতি দক্ষতা, ও শক্তির সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। সকলের রুচিতে এই বই ভালো লাগিবে না; কিন্তু রুচি ও সাহিত্যে এইসব তত্ত্ব আলোচনার উপযোগিতার বিচার ছাড়িয়া দিয়া যে উদ্দেশ্যে এ বই লেখা কেবল

তাহারই বিচার করিলে বলিতেই হইবে যে লেখক বিশেষ শক্তিমান ও বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

প্রলাপ—শ্রী যশোদালাল তালুকদার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা। উপন্যাস।

ঝড়ের দোলা—প্রকাশক Four Arts Club, ৮৮বি হাজরা রোড, কলিকাতা।

চারটি গল্প চারজনের লেখা। পাগল—শ্রী সুনীতি দেবী। মাধুরী—শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ। শ্রীপতি—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু। জয়মালা—শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ। চারিটি গল্পই সুলিখিত।

ঘ.র পরে—শ্রী বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ। ডি, এম্ লাইব্রেরী, ৯৩।১এ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। উপন্যাস।

আমার ফটে—শ্রী অবতারচন্দ্র লাহা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা। দেড় টাকা। উপন্যাস।

ব্যথার দান—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। মোসলেম পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দেড় টাকা। ছোটগল্পের বই। ৬টি গল্প আছে।

বসন্ত-প্রসূন—শ্রী প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাবত্ন। প্রকাশক শ্রী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ককরেন রোড, শ্রীরামপুর। চার আনা। পদ্যের বই।

গান্ধী-মাহাত্ম্য—শ্রী কালীহর দাস বসু। প্রকাশক শ্রী মনসাচরণ বসু, হাঁসাড়া, ঢাকা। তিন আনা।

মহাযজ্ঞ—শ্রী কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর। প্রকাশক শ্রী মধুসূদন দাস অধিকারী, শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয়, এলাটি পোষ্টাপিস, জেলা হুগলি। সওয়া চার আনা।

চৈতন্যদেবের কথা, বর্ণনা নেকামীভরা।

হোমিওপ্যাথিক কলেরা এবং রক্তামাশয় চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রী আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, সুধাংশুশেখর দাতব্য ঔষধালয়, রত্নকর পোষ্টাপিস, জেলা ফরিদপুর। দশ আনা।

বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মত ও ঔষধনির্দ্দেশ এই পুস্তিকায় সংগৃহীত আছে। গৃহস্থের ও চিকিৎসকের উপকারে লাগিবে।

বাজীকর—শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। আট আনা।

ছোটগল্পের বই। গল্পগুলি সুখপাঠ্য।

মহাশ্বেতা—শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। আট আনা। ছোট উপন্যাস।

দুঃখের পাহাড়—শ্রী বঙ্কিম সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রী শম্ভুচরণ সেনগুপ্ত, রিসার্চ হোম, পাটনা। এক টাকা। উপন্যাস।

পরীর কাহিনী—শেখ হবিবর রহমান। মখদুমী লাইব্রেরী, ৫এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। বারো আনা।

পরীর আবির্ভাবের গল্প।

মিলন—শ্রী সরসীবালা বসু। প্রকাশক—শ্রী অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮০। উপন্যাস।

শ্রেয়সী—শ্রী সরসীবালা বসু. শিশির পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৷৹। ছোট গল্পের বই।

এস্‌লামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। এক টাকা।

কোরান ও হাদিসের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জীবনযাত্রার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সদাচরণ করিবার উপদেশের বই।

স্বরাজ কোন পথে—শ্রী হেমন্তকুমার সরকার। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। আট আনা।

এ বইএ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :-(১) আমাদের সাধনা, (২) সত্যপ্রকাশ, (৩) কো-অপারেটিভ নন-কোঅপারেশন, (৪) সমবেতভাবে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গ, (৫) কৃষিজীবী-সমস্যা, (৬) শ্রমজীবী-সমস্যা, (৭) জেলের ভয়, (৮) নারীজাতির কর্ত্তব্য, (৯) স্বরাজের সময়, (১০) নন-কোঅপারেশন ও সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলন, (১১) কংগ্রেসের পুনর্গঠন, (১২) কাউন্‌সিলে যাওয়া, (১৩) কাউন্‌সিলে নন-কো-অপারেশন।

হেমন্ত-বাবু ত্যাগ করিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়া দুঃখ বরণ করিয়া নিজে যে ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন সেই ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা-লব্ধ মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ; সুতরাং সকলের এইসব মত ধীর ভাবে বিচার করিয়া স্বরাজ-সাধনায় চেষ্টা ও সমবেত সাহায্য করা উচিত।

বন্দীর ডায়েরী—শ্রী হেমন্তকুমার সরকার, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব। এক টাকা।

ছয় মাস সশ্রম কারাবাসের ডায়েরী ও যে-সব মহাত্মাদের সংস্পর্শে বন্দীর কারাবাস তাঁদের কাহিনী এই পুস্তকে আছে। প্রত্যেক নরনারীর স্বদেশসেবা ব্রত হওয়া উচিত ; সেই ব্রত পালনের ফল স্বরূপ কারাবাস ভাগ্যে ঘটা খুবই সম্ভব। সুতরাং সকল নরনারীর এইসব কারাকাহিনী পড়িয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত।

বিশ্বভারত—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

মানুষের সভ্যতা বিকাশের উপকরণের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকিলে যে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে না, রাষ্ট্র ও শিল্পের নিগড় হইতে বিশ্বসভ্যতাকে মুক্ত করিয়া সমূহের সমবায়-শক্তির মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, ভারত এই বিশ্বযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হইয়া সকলের হাতে মিলনের রাখীবন্ধন করিবে—ইহাই এই পুস্তকের প্রধান প্রতিপাদ্য। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—(১) বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী, (২) যুদ্ধ ও শান্তি, (৩) যুযুৎসু-বিজ্ঞান, (৪) পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাত, (৫) হিন্দু ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি ও সাধনা, (৬) জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা, (৭) পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশিষ্টতা, (৮) পাশ্চাত্য চিন্তায় অবসাদ। সকল প্রবন্ধেই চিন্তাশীলতা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে।

সহজিয়া—শ্রী বিভূতিভূষণ ভট্ট। ওরিয়েণ্টাল সিণ্ডিকেট, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। কাপড়ে সুন্দর বাঁধা। দেড় টাকা। উপন্যাস।

সোনার কাঠি—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির। এক টাকা। উপন্যাস।

আঁধি—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী, ২৪ নং কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। সুন্দর বাঁধা। আড়াই টাকা। উপন্যাস।

পিয়াসী—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। রায় এণ্ড রায়চৌধুরী। সুন্দর বাঁধা। পাঁচ সিক্কা। ছোটগল্পের বই। চারটি গল্প আছে।

নীরব ভাষা বা ধাত্রীবাণী—পথিক। প্রকাশক শ্রী মাণিক লাল দে, হরিনাভি, সোনারপুর পোঃ, ২৪ পরগণা।

প্রকৃতির সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া মানব কিরূপে আর্য্যবিজ্ঞান ও আর্য্যসভ্যতার চরম পরিণতি, এবং সাম্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠাস্থল ঋষিত্বলাভ করিতে পারেন এবং জীবমাত্রেরই হৃদয়নিহিত ধাত্রীরূপিণী জগন্মাতার অভয়বাণী ও উৎসাহবাণী কিরূপে তাঁহাকে এই আনন্দময় অবস্থার দিকে অগ্রসর করে তাহা এই কবিতা-পুস্তকে বিবৃত করিতে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। কবিত্ব, ছন্দ, শব্দচয়নে রসজ্ঞতার পরিচয় নাই। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

টুনটুন—শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। ফ্রেণ্ড্‌ য়্যাণ্ড কোম্পানী, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ছয় আনা।

শিশুদের গল্পের বই। ৭টি গল্প আছে। শেষ গল্পটি পদ্যে মশারি আবিষ্কারের কৌতুককর কাহিনী। সব গল্পগুলিই দেশের বা বিদেশের প্রচলিত উপকথা বা পুরাণকথার পুনরুল্লেখ, ছেলেদের চিত্তবিনোদনের জন্য নূতন করিয়া লেখা। সহজ সরস চলিত কথায় গল্পগুলি লেখা, শিশুদের সহজবোধ্য। অনেকগুলি বহুবর্ণের ও এক-রঙা ছবি আছে; দুখানি ছবি বিদেশী চিত্রকরের আঁকা, প্রতিধ্বনির ছবিখানি প্রসিদ্ধ শিল্পীর বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি। মলাটের উপরের ছবিখানি খুব সুন্দর হইয়াছে। একরঙা ছবির মধ্যেও টুনটুনির গলা থেকে কুলের আঁঠি বাহির করার ও মশারি তৈয়ারীর ছবি দুখানি ভালো হইয়াছে। মোটের উপর লেখা ছবি ছাপা শিশুদের মনোরঞ্জন করিবে; সমস্ত লেখার মধ্যে হাল্কা টুলটুলে ভাবটি আছে; তাই মলাটের উপর কচু-পাতায় জলের ফোঁটার ছবিতে দেখানো হইয়াছে।

পঞ্চকন্যা—শ্রী শরৎকুমার রায়। প্রকাশক শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়, ১৬, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাপড়ে বাঁধা বারো আনা।

পুণ্যশ্লোক পাঁচটি মহিলার চরিতকথা, একটি চরিত্র কবিকল্পনার সৃষ্টি—সীতা; অপর চারিটি ঐতিহাসিক মহানারীদের—ভগবতী দেবী, রাবেয়া, ফ্লোরেন্‌স্ নাইটিঙ্গেল, ডোরা। এইসব পূতচরিত্রা পুণ্যশীলা নারীদের চরিতকথা আমাদের মেয়েদের পাঠ করা খুব উচিত; তাতে চিত্ত উদার, চরিত্র উন্নত, মন পবিত্র ও স্বভাব সুন্দর সেবাপটু হয়। গ্রন্থকার এই সুযোগ দিয়া সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন। রচনা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

দন্তবিকাশ শ্রী উদ্‌ভ্রান্ত-চৈতন্য গোস্বামী। ধূমকেতু কেন্দ্র, ৭ প্রতাপ চাটুর্জ্জের গলি, কলিকাতা। চার আনা।

হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ-কবিতার বই। অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা-রীতি ও কবিতার অনুকৃতি-কৌতুক। বঙ্গে হাস্য সুদুর্লভ; লেখক হাসিয়াছেন, হাসাইয়াছেন, এই যথেষ্ট। কবিতাগুলি চলনসই হইয়াছে; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের হসন্তিকা কাব্যের কথা পদে পদে স্মরণ করায়।

বিবেকানন্দ স্মৃতি—শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস ও শ্রী মাধবচন্দ্র দাস। রায় সাহেব এণ্ড সন্স, ৬২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পদ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত।

—মুদ্রারাক্ষস

সন্ধ্যাকিশোরী

শরৎসাঁজে কে এল আজ
মনোহর বরণে,
আমার প্রিয়ার কিশোর কালের
বেশের অনুকরণে!
ভালে শশীর টীপ্‌টি আলা,
গলায় তারার পলার মালা,
আলোকলতার হাতের চুড়ি
পল্লীবালার ধরণে।

শালিক্ষেতের আলিপথে
চল্‌তে কত রঙ্গেতে
জর্‌দা শাড়ীর আঁচল লাগে
ধানের ক্ষেতের অঙ্গেতে।
ছাতিমতলায় প্রাচীন ঘাটে
আধ-আঁধার পল্লীবাটে
ঝিঁঝিঁর ঝিঁ ঝিঁ রবে শুনি
নূপুর বাজে চরণে।

শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার

ভারতবর্ষ

মিঃ এণ্ড্রুজের দান—
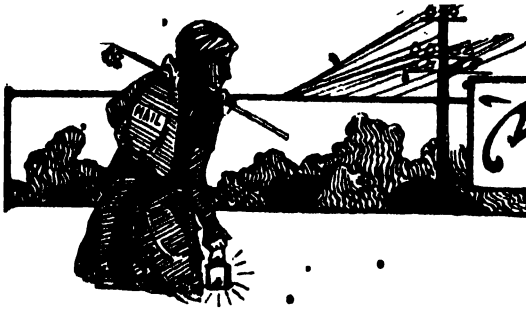
মিঃ সি এফ এণ্ড্রুজ যখন আফ্রিকার উপনিবেশসমূহে ভারত-বাসীদের অবস্থা জানিবার জন্য সফরে বাহির হইয়াছিলেন তখন উপনিবেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ভারতবাসীরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দনপত্রগুলি যে-সব রৌপ্যাধারে তাঁহাকে প্রদান করা হয় সেই-সমস্ত রৌপ্যাধার তিনি তিলক-স্বরাজ-ফণ্ডে দান করিয়াছেন। ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ সেগুলি আবার গুজরাট রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে এই পাত্রগুলি রক্ষিত হইবে।

মুলসী পেট্টার সত্যাগ্রহ—

মুলসী পেট্টায় টাটা কোম্পানী জলের তোড় হইতে শক্তি লইয়া বিদ্যুতের কারখানা করিবেন। সে কারখানায় এত বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে যে গোটা বোম্বাই সহরের কলকারখানা চালনা ও আলো বাতাস সরবরাহের জন্য বিদ্যুতের আর অভাব ঘটিবে না। এই সুবিধা-টুকুর জন্য মুলসী পেট্টার দরিদ্র গৃহস্থদিগকে উদ্বাস্তু করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধনী কারবারী বণিক ফন্দী আঁটিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন তাহাতে সায়। কিন্তু মুলসী পেট্টার দরিদ্ররা তাহাদের বাপ-পিতামহের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিতে রাজি নহে। ইহা লইয়া তাহারা অনেকবার অনেক রকমের প্রতিবাদ করিয়াছে। কিন্তু সে-সব প্রতিবাদে বিশেষ ফল হয় নাই। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের 'এসোসিয়েটেড প্রেস' সংবাদ দিয়াছেন, মুলসী পেট্টার টাটা কোম্পানীর হাইড্রো-ইলেকট্রিক ট্যাঙ্কের নিকট আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পুনা হইতে আগত কয়েকজন নেতা এবং স্থানীয় কৃষকেরা এই আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছেন। সত্যাগ্রহীরা প্রস্তাবিত ট্যাঙ্কের নবনির্ম্মিত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এই কার্য্যে বাধা দিয়াছেন। ফলে উঁহাদের নেতা মিঃ বাপাৎ এবং আরো ২৩ জন লোককে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৩, ৪২৬ এবং ৪৪৭ ধারা অনুসারে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। পরের খবরে জানা গিয়াছে, এই দলের বিচারও শেষ হইয়া গিয়াছে। মিঃ বাপাৎ প্রভৃতি তিন জন ছয়মাস এবং আরো আঠার জন তিন মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই দলের ভিতর দুইজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ২৫ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দণ্ডের অর্থ না দিলে একমাস করিয়া তাঁহাদিগকে কারাগৃহে বাস করিতে হইবে। মুলসীতে এখনও সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম পুরামাত্রায় চলিতেছে।

গুরু-কা-বাগের অবস্থা—

পাঞ্জাবে অকালীদের ব্যাপার লইয়া দেশের ভিতর একটা বড় রকমের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে পুলিশ জোরসে লাঠি চালাইতেছে, আর একদিকে অকালীরা পড়িয়া মার খাইতেছে ও সঙ্কল্পে আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে।

গুরু-কা-বাগ অমৃতসর হইতে ছয় মাইল দূরের একটা স্থান। এখানে একটি শিখ দেবালয় আছে। এই দেবালয়ের মোহন্তের সহিত অকালী শিখদের ঝগড়া। তাহাই গড়াইয়া এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। অকালীরা গত ৯ই আগষ্ট দেবালয়ের ক্ষেতে গিয়া কয়েকটা গাছ কাটে। মোহন্ত এই ব্যাপার লইয়া আদালতে হাজির হন। ফলে চৌর্য্য-অপরাধে পাঁচ জন অকালীর দণ্ড হইয়া যায়। ইহার পর অকালীরা দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদ স্বরূপেই গাছ কাটিতে মরিয়া হইয়া উঠে। তাহারা বলে, মন্দির এবং মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি তাহাদেরই ন্যায্য অধিকারের জিনিষ। মোহন্তের ইহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সুতরাং এই অধিকার বজায় রাখিবার জন্য তাহারা প্রাণ পণ করিয়া চেষ্টা করিবে। বস্তুতঃ তাহারা করিতেছেও তাহাই। তাহারা দলে দলে ধৃত হইতেছে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, পুলিশের লাঠিতে জখম হইতেছে, অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে। অথচ তাহারা সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইতেছে না। এ ব্যাপারে আরো একটা বিশেষত্ব হইতেছে এই—এত মার খাইয়াও অকালীরা একেবারে নিরুপদ্রব, জোয়ারের জলের মত দিনের পর দিন তাহারা অধিকারের দাবী করিয়া লোক পাঠাইতেছে। একদল মারের চোটে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, আর-একদল আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে।

কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য বলিতেছেন, অকালীদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ করা দরকার তাহার বেশী তাঁহারা কিছু করিতেছেন না। কিন্তু এই যতটুকু করিতেছেন তাহারই বহর যে কতখানি নানা প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে বিস্তৃত বিবরণ বাহির করিতেছেন। তাহা হইতে পুলিশের জুলুমের একটি নমুনা আমরা এখানে তুলিয়া দিতেছি।

"লাহোর জেলার একশত অকালী দলবদ্ধ হইয়া বেলা দুইটার সময় স্বর্ণমন্দির হইতে যাত্রা করে। যাইবার পূর্ব্বে অকাল তখতের নিকট গিয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, যত অত্যাচারই হোক, কেহ অহিংসা বৃত্তি ত্যাগ করিবে না। রেল ষ্টেশন হইতে রাজাশংসী পর্য্যন্ত মোটরে যাইবার সময় দেখিলাম, বহুলোক টোঙ্গাতে, টমটমে এবং পদব্রজে ঘটনা-স্থলের দিকে যাইতেছে। ঐ স্থানটি মেলার মত দেখাইতেছিল। শিখের দল পৌনে পাঁচটার সময় রাজাশংসীতে পৌঁছিল। সেখানে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ম্যাকফার্সন ও তাঁহার সহকারী মিঃ বেটী অপেক্ষা করিতেছিলেন। দলটিকে চলিয়া যাইতে বলা হইল। উত্তর আসিল—সকলে গুরু কা-বাগে যাইবে, কোনো নিষেধ শুনিবে না। তহশীলদার ঐ স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতেছিলেন। তিনি

পাঞ্জাবী ভাষায় দলকে সম্বোধন করিলেন। দল চলিয়া যাইতে অসম্মত হইল। ম্যাক্‌ফার্সন পুলিশকে হুকুম দিলেন সকলকে তাড়াইয়া দিবার জন্য। পুলিশ রেগুলেশন লাঠি লইয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অকালীদের উপর এলোপাথাড়ি লাঠি পড়িতে লাগিল। একজন পুলিশ ঢোল পিটিতেছিল, বাকি সকলে তালে তালে লাঠি চালাইতেছিল। ১৫ মিনিট লাঠি চালানোর পর অকালীরা সোজা হইয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িল। অনেকে অজ্ঞান হইয়া গেল। যাহাদের জ্ঞান ছিল তাহারা সরিয়া পড়িল। পুলিশ আবার লাঠি চালাইতে লাগিল। ইট-পাথরের মত সকলকে রাস্তা হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। অজ্ঞান ও আহতদিগকে দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন। আহতদিগের ভিতর অনেক ৬০ বৎসরের বৃদ্ধকে দেখিয়াছি। অনেকের মাথার চুলে রক্ত লাগায় জট৷ পড়িয়া গিয়াছিল। লাঠিগুলির একদিকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমিত স্থান লোহা বাঁধা ছিল। সকলে 'ওয়া গুরু' 'ওয়া গুরু' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে মার খাইতেছিল। মিঃ বেটি মারের সময় খুব কাজ করিতেছিলেন—ম্যাক্‌ফারসন দূরে দাঁড়াইয়া আদেশ দিতেছিলেন।" * * *

এমনি আরো অনেক নমুনা দেওয়া যায়। অকালীদের প্রতি অবিশ্রান্ত অত্যাচার চলিতেছে। এই অত্যাচারে তাহাদের সাহস এবং দৃঢ়তা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। কর্ত্তৃপক্ষের এই জুলুম যে 'কেবলমাত্র অকালীদের ভিতরেই নিবদ্ধ আছে' তাহা নহে। অনেক গণ্যমান্য লোক যাঁহারা এই ব্যাপারটা আপোষে নিষ্পত্তি করিবার শুভেচ্ছা লইয়া সেখানে গমন করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃ যাঁহাদের মধ্যস্থতায় একটা নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব বলিয়াও মনে হয়, তাঁহারাও পুলিশের হাতে রীতিমত লাঞ্ছিত হইতেছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে গুরু-কা-বাগে যাইতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার প্রতি পুলিশের ব্যবহারও বিশেষ সম্মানকর নহে।

এই-সব জুলুম চিরসহিষ্ণু নারীসম্প্রদায়কেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। গুরু-কা-বাগে যাইয়া এই-সব অত্যাচারের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অনেক শিখ মহিলা জাঠাদলভুক্ত হইতে চাহিতেছেন। কিন্তু গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি তাঁহাদিগকে গুরু-কা-বাগে যাইতে দিতেছেন না।

মহরমে দাঙ্গা—

মুলতানে মহরম উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গায় বহু ব্যক্তি নিহত ও আহত হইয়াছে। লুট-তরাজ ও গৃহদাহে বিস্তর সম্পত্তিও নষ্ট হইয়াছে। সৈন্যদলের সাহায্যে এই দাঙ্গা বন্ধ করা হয়। তবে বাঁচোয়া এই, গুলি চালাইতে হয় নাই। রাত্রি ৯টার পর রাস্তায় কাহারো বাহির হইবার হুকুম ছিল না। মুসলমানগণ বাজার লুট করিয়াছে. অনেকগুলি দোকান ও ঘরবাড়ী আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছে, কয়েকটি দেবমন্দির ও ধর্ম্মশালা অপবিত্র করিয়াছে। এই আত্মকলহ যাহাতে না ঘটে, হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যাহাতে প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস এতদিন ধরিয়া সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সে চেষ্টা যে তাঁহাদের সর্ব্বত্র সফল হয় নাই এইগুলিই তাহার প্রমাণ। এরূপ বিরোধের দ্বারা জাতির শক্তি খর্ব্ব হয়, তাহার দুর্ব্বলতা বাড়ে। পরের কাছে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও আমরা এই সহজ সত্যটা বুঝিয়া গলদ শোধরাইতে পারিতেছি না। ইহা যেমন দুর্ভাগ্যের বিষয় তেমনি লজ্জার কথা।

মোপ্‌লা অন্ধকূপ হত্যার বিচার—

একশত মোপ্‌লাকে বায়ুচলাচলহীন মালগাড়ীতে বস্তাবন্দী করিয়া তিরুর হইতে পদানুরে পাঠানো হইয়াছিল। পথে ৭০জন মোপ্‌লা দমবন্ধ হইয়া মারা যায়, এ খবর এদেশে আজ আর কাহারো অজ্ঞাত নাই। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধেই মন্তব্য করিতে গিয়া বিলাতের 'ডেলি মেল' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ শাসনের ছদ্মবেশে এই ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে কলিকাতার অন্ধকূপ-হত্যার মত ইংরেজের ললাটেও একটা দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছে। এই ব্যাপারটির জন্য যে দায়ী তাহাকে এই মুহূর্ত্তেই খুঁজিয়া বাহির করা উচিত এবং বিচার করিয়া তাহাকে ফাঁসী দিতে কিছুতেই দেরী করা সঙ্গত নহে। যে ন্যায়-বিচারের গর্ব্ব আমরা করি, ভারতে সে গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।"

এতদিন পরে এই হত্যা সম্পর্কে গবমেণ্টের রায় প্রকাশিত হইয়াছে। এণ্ড্রু নামক যে সার্জেণ্টটি এই-সব বন্দী লইয়া আসিতেছিল, অনেক বিবেচনা করিয়া গবমেণ্ট তাহাকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার নামে মাদ্রাজ গবমেণ্টকে মামলা রুজু করিতে আদেশ দিয়াছেন। আর একজন শ্বেতাঙ্গ ট্রাফিক ইন্‌স্পেক্টারকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছেন। এ ব্যাপারে গবমেণ্ট সামরিক কর্ম্মচারীদের কোন দোষ দেখিতে পান নাই। মালগাড়ীতে এরূপ অবস্থায় বন্দী পাঠানোও অন্যায় হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও এরূপ অবস্থায় যাত্রীর জন্য মালগাড়ীর ব্যবহার চলিতে পারিবে এই রায়ই তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতগবমেণ্টের রায় এবং ডেলি মেলের মন্তব্য প্রায় জায়গাতেই কাছাকাছি ঘেঁষিয়া গিয়াছে! চমৎকার!

কাগজ তৈরীর উপাদান—

বাঁশের মণ্ড হইতে কাগজ তৈরী হয় এবং ভারতের বাঁশে কাগজের মাল-মশলা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে বিশেষজ্ঞরা এই রায় প্রদান করিয়াছিলেন। বন বিভাগের ডেপুটি কন্‌জারভেটর মিঃ জে ডব্লিউ নিকলসন, ইহার পর উড়িষ্যার জঙ্গল-সমূহ পরীক্ষা করা সুরু করিয়া দেন। সাত সপ্তাহ পরীক্ষা করিয়া তিনি রিপোর্ট দিয়াছেন, কটকে বাঁশের মণ্ড তৈরীর জন্য একটা কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলে বেশ ভাল কাজ চলিতে পারে।

বন্যায় প্লাবন—

উত্তর-পশ্চিম- ও যুক্ত-প্রদেশের ও বিহারের কয়েকটি স্থান বন্যার প্লাবনে একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। উনাও অঞ্চলের বহু লোক আশ্রয়ের অভাবে গাছে চড়িয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। রাস্তাঘাট সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং শস্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এবার গঙ্গায় যেরূপ বাণ ডাকিয়াছে গত ত্রিশ বৎসরের ভিতর এমন আর দেখা যায় নাই। এসব অঞ্চলে সাহায্য প্রেরণ আবশ্যক।

ট্রেনে পানাহারের ব্যবস্থা—

কলিকাতার মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন শিম্‌লায় রেলওয়ে বোর্ডের কাছে এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। এই দরখাস্তে তাঁহারা বলিয়াছেন, এ দেশের 'থু' ট্রেনগুলিতে দেশী যাত্রীদের জন্য দেশী রকমের পানাহারের ব্যবস্থা নাই। ফলে যাহাদের পয়সা হইতে কোম্পানীর এত আয় তাহারাই যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে। সুতরাং যাহাতে প্রত্যেক 'থু' ট্রেনেই দেশী রকমের অন্ন-ব্যঞ্জন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে তাহার বন্দোবস্ত রাখা দরকার।' সেজন্য প্রত্যেক ট্রেনের সঙ্গে সাহেবী 'ডাইনিং কারের' মত একখানি করিয়া তিন-কাম্‌রা-ওয়ালা গাড়ী রাখিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়। এ ব্যবস্থা মঞ্জুর হইলে কোনো কোনো লাইনে মাড়োয়ারী

এসোসিয়েসনই ঐরূপ গাড়ীর বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিতে রাজি আছেন।

দূরপথের যাত্রীদের পক্ষে পান-ভোজন-সমস্যা যে খুব একটা বড় সমস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে সে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। তাহা ছাড়া ছুঁৎমার্গের শুচিবায়ু হইতেও ইহাতে দেশকে মুক্তি দেওয়ার সাহায্য করিবে। রেল-ষ্টিমারের কল্যাণে অস্পৃশ্যতার বালাই অনেকটা কমিয়াছে। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে তাহা আরো কমিবে।

সদস্যের মৌলিকতা—

পীর মহম্মদ আজান খাঁ নামক ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের একজন সদস্য ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। প্রস্তাবে এই কথাই বলা হইবে, প্রধান মন্ত্রী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। শাসন-সংস্কার ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ এপর্য্যন্ত কোনো ভারতবাসীই সমুচিত দায়িত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। যাহাদের সুবিধার জন্য নূতন দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে তাহারা গবর্মেণ্টের সহযোগিতা করিতে নারাজ। এই-সকল বিবেচনা করিয়া শাসন-সংস্কার প্রত্যাহার করা এবং শাসন-শৃঙ্খলা ও আইনের সম্মান বজায় রাখার জন্য এ দেশকে জবরদস্ত সামরিক শাসনের অধীনে আনা উচিত।

পীর সাহেবের মগজে যে মৌলিকতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বোম্বাইয়ের হিতসাধন-মণ্ডলী—

দেশের জাগরণের অর্থ নিজেদের উন্নতির পথগুলি নিজেদের চেষ্টায় পরিষ্কার করিয়া লওয়া। জাতির প্রয়োজনের প্রতি জাতির মনে তাগিদ না থাকিলে এই উন্নতি সম্ভবপর হয় না। অথচ এই-খানেই আমাদের প্রকাণ্ড গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমরা উন্নতি চাই কিন্তু উন্নতির পথের ঝড়ের ঝাপটাগুলি সহ্য করিতে আমরা একান্তই নারাজ। সেগুলি সহিবার ভার পরের উপরে ছাড়িয়া দিয়া উন্নতিটারই প্রতি আমরা লোভ করি। ফলে সমস্ত আন্দোলন আমাদের খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া যায়—জাতি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকে। বোম্বাইয়ের হিতসাধনমণ্ডলী আমাদের এই সনাতন জড়তার পথ পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব কাজের আসরে নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা যে ধরণে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন, আর-সমস্ত প্রদেশের কর্ম্মীদেরও তাহার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ৩০টি স্কুল পরিচালিত হইতেছে। এই-সব স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৩৩৯ জন। ছাত্রদের ভিতর ১২১৬ জন বয়স্ক পুরুষ ও বালক এবং ১২৩ জন বালিকা ও নারী। ৩০টি স্কুলের ১৮টিই হইতেছে নৈশ বিদ্যালয়। নৈশবিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ৭৫৪ জন।

সমিতির তত্ত্বাবধানে ৯টি পুস্তকালয় আছে। তাহা ছাড়া ৫০টি বাক্সে চলন্ত লাইব্রেরীর কাজ চলিতেছে। সারা বৎসরে ৬৮৪৩৫ জন লোক এই-সব পুস্তকালয়ে পাঠ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েদিদের জন্য কোন কোন কারাগারে এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য কোনো কোনো হাসপাতালেও পুস্তক সরবরাহ করা হইয়াছে।

সারা বৎসরে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ১৯টি বক্তৃতা দিয়া শ্রমজীবীদের সমবায় অবলম্বন ও মদ্যপান নিবারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রমজীবীদিগকে লইয়া ১৯ বার খোলা জায়গায় বেড়ানো এবং ৩৭ বার ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভ্রমণে ১৮১২ জন এবং ক্রীড়া কৌতুকে ১৬৭৫ শ্রমজীবী যোগদান করে। শ্রমজীবীদের সন্তানদের লইয়া তিন দল 'বয় স্কাউট' গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেক দলে ৪০ জন করিয়া বালক ভর্ত্তি হইয়াছে।

সমিতির তত্ত্বাবধানে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে, একটি কেবলমাত্র স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য। এখানে সারাবৎসরে ৯৮৫২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা হয়। ইহাতে চিকিৎসিত হইয়াছে ২৪২৬ জন। প্রথম চিকিৎসালয়টির ব্যয় নির্ব্বাহের একটি স্থায়ী ফণ্ডের জন্য কানজি কর্ষণদাস ৫৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের উপকারের জন্য সমিতির দ্বারা ৮৪টি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ৮৪টি সমবায়-সমিতির মূলধন ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা এবং সভ্যসংখ্যা ৫৬৭৫ জন। এই সমিতিগুলিতে সারা বৎসরে ৩লক্ষ ২০ হাজার টাকার কারবার চলিয়াছে।

তাতা সান্স্ শ্রমজীবী ইন্‌ষ্টিটিউট এবং করিমভাই ইব্রাহিম শ্রমজীবী ইন্‌ষ্টিটিউট এই সমিতিকে নানা রকমে সাহায্য করিতেছেন। এই দুইটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দৈনিক এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; কেরানী ও স্ত্রীলোকদের জন্য বিশেষ শ্রেণী খোলা হইয়াছে। নারী শ্রমজীবীদের শিশু সন্তানদের আশ্রয়ের জন্যও আশ্রম খোলা হইয়াছে। শ্রমজীবী মাতারা এই আশ্রমে উপযুক্ত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে আপনাদের শিশুদিগকে রাখিয়া কলে কাজ করিতে যায়। পারেল ও মদনপুরে শ্রমজীবীদের দুইটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মদনপুরে ৪টি উর্দ্দু নৈশ বিদ্যালয় এবং পারেলে ২২টি সমবায়-সমিতি চলিতেছে।

সমিতির তত্ত্বাবধানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি ফণ্ড নামক ফণ্ড খোলা হইয়াছে। এই ফণ্ড হইতে ১১টি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সাহায্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে সমিতির সভ্যসংখ্যা ৭২৩ জন। সমিতির মোট আয় ছিল ৩,০০,৯৭৮ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ২৮৩৪৫৫ টাকা।

কোনো প্রতিষ্ঠানের বাস্তবিক 'ধার এবং ভার' থাকিলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলা কাহারো পক্ষে সহজ হয় না। ভারতের আমলা-তন্ত্র গবর্মেণ্টের মত খামখেয়ালী গবর্মেণ্টও যে এই প্রতিষ্ঠানটিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাই ইহার সাফল্যের প্রমাণ। এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট (১) ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন, (২) সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগের কলের কার্য্যে নিয়োগ, (৩) ট্রেড ইউনিয়নের (শ্রমী-সঙ্ঘের) পরিচালনা ও (৪) শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইন সম্বন্ধে সমিতির মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

বিদেশ যাত্রায় বাধা—

বারদোলী হইতে দেড়শত অসহযোগী পানামায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, যাওয়ার জাহাজও তাঁহাদের স্থির হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সুরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের যাত্রা স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এসম্বন্ধে সম্যক তদন্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পানামায় যাইতে দেওয়া হইবে কি হইবে না তাহা স্থির হইবে। বিদেশ-যাত্রার সঙ্কল্প সম্ভবত অপরাধ নহে। ভারতবাসীর মত ঘরমুখো জাতির পক্ষে বিদেশের আবহাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিয়া আসিবার প্রয়োজন আছে। তাহাতে জাতির জ্ঞান বাড়ে, নূতন পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা জন্মে। এই ভারতবর্ষে হাজার জাতি আসিয়া পকেট ভারি করিয়া ঘরে ফিরিতেছে, অথচ ভারতবাসী অনশনের হাত হইতে আত্মরক্ষার পথ খুঁজিয়া

পাইতেছে না। বিদেশটা ঘুরিয়া আসিলে বিদেশীদের অর্থোপার্জ্জনের ফিকির-ফন্দীগুলিও যে অন্তত তাহারা আয়ত্ত করিয়া ঘরে ফিরিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উড়িয়া যুবকের দেহের শক্তি—

কাশীরাম পাত্র নামে একজন উড়িয়া যুবক ছাত্র ময়ূরভঞ্জের রাজার কাছে সম্প্রতি কতকগুলি দৈহিক বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। একখানি মোটর গাড়ীর এবং একটি হাতীর গতিরোধ করা, আঙ্গুলের টিপে একটি টেনিস বল ফাটাইয়া দেওয়া, দুইটি তিন মণ ওজনের গদায় পাঁচশত টাকার একটি তোড়া ঝুলাইয়া তাহা তোলা—এই-সব শক্তির কাজ ইনি অবলীলাক্রমে সাধন করিয়াছেন। ভারতবাসীর ভিতর এরূপ শক্তির নমুনা এই নূতন নহে। তথাপি শক্তিমান লোক ভারতবাসীর ভিতর এত কম যে ইহাদের সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল।

হাস্‌পাতালে গান্ধী টুপী—

মিরাটের 'ওপিনিয়ন' পত্রিকা সংবাদ দিয়াছেন, মিরাটের কোনো হাইস্কুলের দুইটি ছাত্র গান্ধীটুপী মাথায় পরিয়া লুডোভিক পোর্টার হাস্‌পাতালে চিকিৎসার জন্য গমন করিয়াছিল। হাস্‌পাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার গান্ধীটুপী দেখিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। ছাত্র দুইজন বিদেশী, মিরাটে তাহাদের অভিভাবক বা আত্মীয় কেহ নাই। টুপী পরিত্যাগ করিয়া ইহারাও হাস্‌পাতালে ভর্ত্তি হইতে রাজি হয় নাই। গবর্মেণ্টের অফিসে ও কোন কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীর অফিসে গান্ধীটুপী অচল এই খবরই ইতিপূর্ব্বে শোনা গিয়াছিল, কিন্তু হাস-পাতালেও যে ইহা অচল হইতে পারে তাহা আমাদের জানা ছিল না। মানুষের মনের বিকার যত রকমের তাহার কতকগুলির নমুনা এবারকার অসহযোগ আন্দোলনে পাওয়া গিয়াছে।

জেলে বেত্রাঘাত—

'নবীন রাজস্থান' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ,—শ্রীযুক্ত ছোটুলালজী যোশীর পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম সাত বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মেবার জেলে আছেন। জেলে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার গীতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া তিনি সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। ৯ দিন অন্নজল পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার প্রতি ১২ ঘা বেত মারার আদেশ হয়। উপবাস-ক্লান্ত শরীরে এই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর নম্বরদার গোপনে তাঁহাকে একখানা গীতা প্রদান করিলে সমস্ত গোলযোগের অবসান হয়। কিন্তু জেল-দারোগা আবার তাঁহার গীতা কাড়িয়া লইয়াছেন। এবার গঙ্গারাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রাণ যায় সেও ভালো তথাপি নিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাপন না করিয়া কখনো ভোজন করিবেন না। ২৩শে জুলাই হইতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা বন্ধ হওয়ার কোনো সূচনা দেখা যাইতেছে না।

গীতা বিপ্লববাদের মহাস্ত্র এরূপ আশঙ্কা করা এক ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষেই সম্ভব, এই ছিল আমাদের ধারণা। এখন দেখিতেছি ভারতবর্ষে হিন্দু মহারাণা এই গীতাভীতির হাত হইতে মুক্ত নহেন। বেত্রদণ্ড সমস্ত অবস্থাতেই বর্ব্বরতা। উদয়পুরের মহারাণার জেলেও যদি গীতাপাঠ বন্ধ করিবার জন্য এইসব বর্ব্বর অত্যাচার চলে তবে তাহা জাতির পক্ষে যেমন লজ্জা তেমনি অগৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

হাইকোর্টের ব্যবস্থা—

শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ সিভিল ডিস্‌ওবিডিএন্স কমিটির সভ্যগণকে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকিলেরা বার-লাইব্রেরী গৃহে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। অপরাধ তো এই। ইহারই জন্য হাই-কোর্টের জজেরা উকিলদের কাছে একটি কৈফিয়ৎ এবং বার-লাইব্রেরী-গৃহে ভবিষ্যতে আর কখনো রাজনৈতিক আলোচনা করা হইবে না এরূপ একটা প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছিলেন। উকিলেরা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, হাইকোর্ট প্রকৃত ঘটনা না জানিয়াই তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নেহেরু প্রভৃতির অভ্যর্থনাতে রাজনীতির কোনো সংস্রব ছিল না, ইহা সম্পূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রতিশ্রুতির প্রস্তাবে তাঁহাদের বক্তব্য এই, উকিল-সভা যদিও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে, তথাপি অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং তাঁহারা এরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইতে পারেন না। উকিলদের এই কৈফিয়ৎ জজদের মনঃপূত হয় নাই। এই সম্বর্দ্ধনা যে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নহে, কেবলমাত্র সামাজিক অনুষ্ঠান, জজেরা ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা উকিল-সভাকে জানাইয়াছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই গৃহ ব্যবহার করিতে দেওয়া সম্ভব নহে। ভবিষ্যতে আবার যদি কখনো ঐ গৃহে কোনো রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় তবে হাইকোর্ট-গৃহ তাঁহাদিগকে আর সভাগৃহরূপে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।

গবর্মেণ্টের লোকমত সংগ্রহ—

সমগ্র দেশ সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি গোটা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া এ সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের রিপোর্ট বাহির হইলে এ সম্বন্ধে দেশের যোগ্যতা কতখানি তাহা বোঝা যাইবে। কিন্তু বিহার-উড়িষ্যা গবর্মেণ্টও এদিক দিয়া বেশ একটা চাল চালিয়াছেন। সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স সম্বন্ধে তাঁহারাও লোকের মতামত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে কংগ্রেস সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স ঘোষণা করেন এবং কমিটির সাক্ষ্য যদি জনসাধারণের মত বলিয়া গৃহীত হয় সেই ভয়েই সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা। সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স ঘোষণা করিবার আগে ইহার ফলাফল, দেশের যোগ্যতা ইত্যাদি বিশেষ রকমেই ভাবিয়া দেখা দরকার। এবং আমাদের বিশ্বাস কংগ্রেস সে দিক্ দিয়া কিছুমাত্র ত্রুটি থাকিতে দিবেন না। কিন্তু বিহার-উড়িষ্যা গবর্মেণ্টের এই মতামত সংগ্রহের কোনো সার্থকতা আছে কি না সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কারণ গবর্মেণ্টের সংগৃহীত মতামতের উপর এদেশের লোকের শ্রদ্ধা যে দিন-দিনই কমিয়া যাইতেছে তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই।

মহিলা বৃত্তি—

বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এদেশের শিক্ষা-কার্য্যে শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতে রাজি আছেন এমন একজন ভারতীয় মহিলাকে ৩০০ পাউণ্ড হিসাবে বৃত্তি দানের জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত বজেটে ২২৫০৲ টাকা এবং পাথেয়ের জন্য ৭৫০৲ টাকা চাহিয়াছেন। বৃত্তি প্রার্থিনী কেম্‌ব্রিজ বা অক্সফর্ডে পড়িলেই তাঁহাকে এই ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি দেওয়া হইবে, অন্যথা, তাঁহার বৃত্তির পরিমাণ হইবে ২৫০ পাউণ্ড। ভারতীয় মহিলার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু ইউরোপীয় মহিলার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। একজন ইউরোপীয় মহিলাকেও বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত হইতেছে। কিন্তু

তাহার বৃত্তির পরিমাণ হইবে ৩৪৫ পাউণ্ড। বিলাতেও কি একজন ইউরোপীয় মহিলার পড়ার ব্যয় একজন ভারতীয় মহিলা অপেক্ষা বেশী পড়ে? আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া বিদেশ বিভূঁয়ে আসিতে হয় বলিয়া ইউরোপীয়দের মাহিনা, ভাতা, পেন্‌সন প্রভৃতি বাড়াইবার জন্ত মিঃ লয়েড জর্জ্জ হইতে চুনো পুঁটি পর্য্যন্ত যুদ্ধে নামিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে বিদেশ বিভূঁয়ে কেবল ইংরেজদেরই কষ্ট হয়, ভারতবাসীদের হয় না। এমন কি স্বদেশেও ইউরোপীয় মহিলার যত বেশী কষ্ট হয়, ভারতীয় মহিলার বিদেশেও তত হয় না। নতুবা ইউরোপীয় মহিলার বৃত্তি ভারতীয় মহিলা অপেক্ষা কিছুতেই বেশী বলিয়া ধার্য্য হইতে পারিত না। সাধারণ বুদ্ধিতে তো এই কথাই মনে হয় যে, বিলাতে ভারতীয়দের খরচই বেশী লাগে। কারণ একে সে দেশটা তাহাদের পক্ষে নূতন, খরচপত্রের ধারণা নাই, তাহার উপর একজন ইউরোপীয় রমণীর যেমন সহজে কোনো ইউরোপীয় পরিবারের ভিতর মিশিয়া পড়িবার সুযোগ আছে, ভারতীয় রমণীর তেমন নাই। পরিবারের ভিতর থাকিতে পারিলে খরচ যে হোটেল বা বোর্ডিং অপেক্ষা কম পড়ে ইহাই আমাদের সাধারণ বিশ্বাস।

নারীদের অধিকার—

বেহার ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপ্যাল আইনে শিক্ষিত রমণীদিগকে মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যনির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বেহার বিশেষভাবেই পর্দ্দানসীন, সুতরাং বেহারের পক্ষে এইটাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও কেবলমাত্র শিক্ষিতা রমণীদিগকে বিশেষভাবে খাতির করায় সমগ্র রমণীসমাজের দাবী অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। পুরুষদের বেলায় যখন শিক্ষিত পুরুষরাই কেবল ভোট দিতে পারিবে এমন কোন নজির নাই, তখন রমণীদের বেলাতেও সেরূপ আইন থাকা উচিত নহে। আজ এমন দিন আসিয়াছে যখন এই-সব অধিকারের দাবীতে নারী-পুরুষে কোনো ভেদ থাকা সঙ্গত নহে।

বালক কয়েদী—

বোম্বাইয়ের জেল-বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে জেলের ইন্‌স্পেক্টর্-জেনারেল বালক অপরাধীদের জন্য একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটরা প্রথম বালক অপরাধীদের উপরেও সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ইন্‌স্পেক্টর্-জেনারেল এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহাতে উপকার হোক্ আর নাই হোক, অপকার হয় পুরা মাত্রায়। ইহাতে তাহাদের জেলের প্রতি ভয়ও কমিয়া যায়, অশ্রদ্ধাও বাড়ে না।

এ দেশের জেলে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই, বরং তরুণবয়স্করা সেখানে পুরাতন পাপীদের সঙ্গেই মিশিবার সুযোগ পায়। সুতরাং যে-সব বালককে জেলের ঘানি টানিতে হয়, জীবনের পথও যে তাহাদের পঙ্কিল হইয়া ওঠে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

প্রাথমিক শিক্ষা—

গত বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নানা দিক হইতে আলোচনা করিবার জন্ত বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যর নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর। কিছুদিন পূর্ব্বে কমিটি এ সম্বন্ধে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সেই রিপোর্ট অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিবার জন্ত একটি বিলের জেলা এবং লোকাল বোর্ডসমূহের টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনোই দায়িত্ব থাকিবে না। এই ভার অর্পিত হইবে নূতন একটি বোর্ডের উপর। প্রত্যেক স্থানে ১০ হইতে ১৫ জন সদস্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত হইবে। সদস্য হইবেন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। অনুন্নত সম্প্রদায় এবং নারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকেও সদস্যদের ভিতর গ্রহণ করিতে হইবে। কোনো বোর্ডের ভিতর গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্য তিনজনের বেশী থাকিতে পারিবে না। এই বোর্ড তাঁহাদের এলাকায় যে-কোনো অংশে শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করিবার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। যে-সব পিতামাতা ছেলেকে স্কুলে পাঠাইবেন না, তাঁহাদের জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে দুই টাকা। ইহা ছাড়া সাবধান করিয়া দেওয়ার পরেও যদি কেহ ছেলেকে স্কুলে না পাঠান, তবে এই জরিমানার হার প্রতিদিন আট আনা হিসাবে বাড়িতে চলিবে। স্কুলগামী ছাত্রদিগকে কোনো ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলে তাহার দণ্ডের মাত্রা হইতেছে ২৫ মুদ্রা। বাংলায় কি শিক্ষা ব্যাপারে এই ধরণের কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না?

আসামের কালাজ্বর—

কালাজ্বরের জন্ম আসামে হইলেও বাংলায় খুব কম লোকের কাছেই এই ব্যাধিটির নাম অজানা আছে। কারণ আসামের সীমা ডিঙ্গাইয়া এই জ্বরের বীজাণু বাংলার অনেক ঘরেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এতদিন এ রোগ প্রায় অসাধ্য ব্যাধি বলিয়াই ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ইহার বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আসাম গবর্ণমেণ্ট ইহার চিকিৎসার জন্ত কয়েকটি নূতন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের বা লোকাল বোর্ডের সকল ডাক্তারখানাতেই এখন কালাজ্বরের চিকিৎসার উপযোগী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আসাম গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে এক ইস্তাহার বাহির করিয়া জানাইয়াছেন, যাহারা কালাজ্বরে ভুগিতেছে, এই ব্যাধির জন্ত প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারখানায় তিন মাস সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাজির হইয়া চিকিৎসা করাইলেই তাহারা রোগমুক্ত হইবে। কোনো রোগী ইচ্ছা করিলে নিকটবর্ত্তী কোনো চিকিৎসালয়ে থাকিয়াও চিকিৎসা করাইতে পারে। চিকিৎসার জন্ত বা আহার ও অবস্থানের জন্ত হাসপাতালে পয়সা লাগে না। কাপড় ও বিছানাও সরবরাহ করা হয়। এ ব্যবস্থায় দরিদ্র প্রজাদের উপর যে গবর্ণমেণ্টের দরদ আছে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়ায় বাংলা নিঃশেষ হইতে বসিয়াছে। বাংলার বিশেষ বিশেষ ম্যালেরিয়ার কেন্দ্রেও এই ধরণের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

হেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

দেশের অবস্থা—

বাংলাদেশ	জন্ম ২৭	মৃত্যু ৩৬;
বিলাত	„ ১৯	„ ১৪;

উপরে যে জন্ম-মৃত্যুর হার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা হাজারকরা বুঝিতে হইবে।

	কলেরা	ম্যালেরিয়া
১৯১৭ মৃত্যু	৪৫০২১	৮৮২৭৬৮
১৯১৮ „	৮২৩৮৯	১৩৫৭৯০৬
১৯১৯ „	১২৪১৪৯	১২২৯২৫৭

কলিকাতায় অসম্ভব মৃত্যু।—কলিকাতার করপোরেশনের এক সাধারণ সভায় কলিকাতার অতিরিক্ত মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারিত করিবার প্রসঙ্গে মিঃ এ, সি ব্যানার্জ্জি বলেন যে জন্মের সংখ্যা হইতে মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ জন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ দেখাইতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে মফস্বল হইতে যে-সকল রোগী বিনা চিকিৎসায় অথবা স্বল্প চিকিৎসায় প্রাণ ত্যাগ করিয়া এখানে আসে, তাহারাই কলিকাতার মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কারণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই।

২৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতাতে ৪৭৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে ৪৩৭ এবং ৪৪৯ জন কালগ্রাসে পতিত হয়। সকল রকমের রোগের মৃত্যুর হার কষিয়া দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহ হইতে বর্ত্তমানে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে প্রত্যেক মাইলে প্রতি সপ্তাহে ২৩·০ হারে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল। কিন্তু এই বৎসর তাহার স্থানে ২৭·২ দাঁড়াইয়াছে।

—বন্দেমাতরম্

আমাদের দুর্দ্দশা—

বাংলায় তুলা ও পাটের কল।

বাংলায় তুলার কল তেরটা—তা'র মধ্যে আটটার মালিক ইংরেজ, তিনটার মালিক মাড়োয়ারী, আর মাত্র দুইটি কলের মালিক বাঙ্গালী। ইংরেজের আটটা কলের মধ্যে দুইটা কলের মূলধন জানা যায় নাই, বাকী ছয়টা কলের মূলধন ১,৪৫,০০,০০০ টাকা; মাড়োয়ারীর তিনটে কলের মধ্যে একটার মূলধন ৮০,০০,০০০ টাকা ও বাকী দুইটি কলের মূলধন জানা যায় নাই; আর বাঙ্গালীর দুইটা কলের মূলধন মাত্র ৩৩,০০,০০০ টাকা।

বাংলার পাটের কল একান্নটা, তাহার একটিও বাঙ্গালী বা মাড়োয়ারীর নহে, সমস্ত ইংরেজের। এই ৫১টা পাটকলে মূলধন খাটে প্রায় তের কোটী উননব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা। দেশটা কাহার?

—বীরভূমবাসী

আশার আলো—

বাংলার জয়,—রেশমী মোজা ইত্যাদির আমদানী ১ বৎসরে ৬২ লাখ টাকা থেকে ৭০ হাজারে নেমেছে। জুতোর আমদানি ১৬ লাখ থেকে ৩ লাখে নেমেছে। এইবার কাপড়ে মন দিলে ভাল হয়।

—সনাতন

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, গত ১৯২২ সালের জুন মাসে সমগ্র ভারতবর্ষে ১১৯ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩৩টি যৌথ কারবার খোলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব মাসে ৪৭৬ লক্ষ টাকা মূলধনে ৩৯টি কোম্পানী এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর এই মাসে ২৩৭৫ লক্ষ টাকা মূলধনে ৬৬টি কোম্পানী খোলা হইয়াছিল। এক বঙ্গদেশেই ৩১ লক্ষ টাকা মূলধনে ১৪টি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেশের লোকের মন ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে যে মঙ্গলপ্রসু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—যশোহর

কিন্তু এইসব যৌথ কারবারের মধ্যে দেশী লোকের কারবার কয়টা, তাহা না জানিলে কিছু বলা কঠিন। আমাদের দেশের কারবার প্রায়ই দেশী নয়।

চরকায় অর্থার্জ্জন—

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি চরকার অর্থনীতি করিত, তাহার একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

১৮০৭ সালে ডাক্তার বুকাননের বিবরণী হইতে প্রকাশ "বিহার ও পাটনায় ৩,৩০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক চরকা কাটিত। তাহাদের অধিকাংশই অপরাহ্নে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া চরকা কাটিত, তাহাতেই তাহারা বৎসরে দশ লক্ষ একাশি হাজার পাঁচ টাকা লাভ করিত।

সাহাবাদে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত জন স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া বৎসরে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ২ শত ৫০ টাকা উপার্জ্জন করিত।

ভাগলপুরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া বৎসরে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা রোজগার করিত।

গোরক্ষপুরে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬ শত স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া বৎসরে ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা আয় করিত।

দিনাজপুরে ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণই চরকা কাটিতেন; বৎসরে তাঁহারা ৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বে পাঁচটি জেলার স্ত্রীলোকগণ বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। আজকালকার হিসাবে এই টাকার মূল্য দুই কোটি টাকার উপর।

দেশবাসী, দেখ, বোঝ, আর নির্ব্বোধের মত হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিও না।

ভারতের বস্ত্রশিল্প:—"লেবার গেজেটে" প্রকাশ ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১৩ হাজার তাঁত ও ১ লক্ষ চরকা চলিত এবং ৪৮ হাজার শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত ছিল। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে সে জায়গায় কিঞ্চিদধিক ১০ লক্ষ তাঁত ও ৬০ লক্ষ চরকা চলিতেছে, এবং প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক উহাতে নিযুক্ত আছে। একমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেই ২ লক্ষের উপর শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

—জনশক্তি

স্বদেশী মেলা—

আগামী মাসের মধ্যভাগে মির্জ্জাপুর পার্কে আর-একটি বড় রকমের স্বদেশী দ্রব্যের মেলা বসাইবার আয়োজন হইতেছে। খদ্দর প্রচারকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে মাঝে মাঝে এইরূপ মেলা বসানোর যে প্রয়োজন আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তারপর পূজা আসিতেছে। পূজার এই বিকিকিনির মরসুমে বিদেশী বস্ত্র এবং বিদেশী দ্রব্যের মধ্য দিয়া যে কত টাকা বিদেশে চলিয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। এই মরসুমে মেলা বসাইয়া মেলার কর্ত্তৃপক্ষ যে দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা জাতীয় অনুষ্ঠান এই মেলার প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

—বন্দেমাতরম্

দুর্দ্দশার কারণ ঔদাসীন্য—

যে-সমস্ত বস্তু আমাদের দেশে জন্মে, তাহাদের সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হয়, তাহা আমরা ভাবি না, কিন্তু বিদেশী তাহা দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হয়। এই দেখুন না কেন জাপানে নারিকেল জন্মে না, কিন্তু বিদেশ হইতে জাপানে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল রপ্তানি হইয়া থাকে। জাপানীরা ঐ-সকল নারিকেল খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না, উহা হইতে তৈল প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা কোটি কোটি টাকা লাভ করে। অধিকন্তু নারিকেল-খৈল [illegible] ব্যবহার করিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। এই দ্বিবিধ

১১৬৮০০০ পাউণ্ড মূল্যের নারিকেল-তৈল বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছিল। এই তৈল প্রস্তুত করিতে ১৩০৫০০ পাউণ্ড মূল্যের নারিকেল ব্যবহার করা হয়। সুতরাং একমাত্র নারিকেল-তৈল প্রস্তুত করিয়াই জাপানীরা ১০৩৭৫০০ পাউণ্ড লাভ করিতে পারিয়াছে।

আমাদের দেশের বাখরগঞ্জ নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে, অথচ আমরা নারিকেল তৈলের জন্য আজও পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? আমরা মরি কর্ম্মদোষে, বিদেশী বাঁচে বুদ্ধি-বশে।

—জ্যোতিঃ

ব্যবসায়ে সততার অভাব—

কয়লা হইতে উৎপন্ন স্যাকারিন, চিনি অপেক্ষা বহুগুণে মিষ্ট ও অত্যন্ত সুলভ বলিয়া ব্যবসায়ীরা চিনির পরিবর্ত্তে উহা সাধারণ লোকের অজ্ঞাতসারে বিক্রয় করিতেছে। মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ীরা চিনি অপেক্ষা প্রচুর সস্তা অথচ মুখপ্রিয় মধুবৎ সুমিষ্ট বলিয়া উহা মিষ্টান্নে মিশ্রিত করিতেছে। উহা লেমনেড প্রভৃতি পানীয়ের সহিত যথেষ্টপরিমাণে মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে স্যাকারিন একটি তীব্র বিষ। ইহা দ্বারা পাকস্থলীতে ক্যান্সার বা কর্কটী রোগ উৎপন্ন হয়। কোন ডাক্তার ইহার ঔষধ আজ অবধি বাহির করিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যবসায়িগণের অর্থের লোভে অপরের শরীরাভ্যন্তরে দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন করিয়া দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সে অর্থ কখনও ব্যবসায়িগণের ভোগে আসে না, জানা উচিত। সাধারণ লোকেরও এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

—এডুকেশন গেজেট

দান—

মিঃ এণ্ড্রুজের দান :—মিঃ এণ্ড্রুজ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অভিনন্দিত হইয়া যে-সমস্ত উপহার-পেটিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তিনি তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। সেগুলি সযত্নে রক্ষিত হইবে। —সত্যবাদী

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয় ফেণী মহকুমার জনৈক জমিদার। তিনি সম্প্রতি নবপ্রতিষ্ঠিত ফেণী কলেজে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। পাইকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও উক্ত কলেজে উপযুক্ত ভাবে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু তিনি কত দান করিবেন তাহা এখনও অপ্রকাশিত।

—যশোহর

বন্যাপীড়িতের সাহায্য—

ঘাটালের বন্যা।—আমরা বন্যায় সর্ব্বস্বান্ত ঘাটালের নরনারীদের সাহায্যের জন্য দেশের ভাই-বোনদের কৃপা প্রার্থনা করেচি। খবরের কাগজে ঘাটালের যে দুর্দ্দশার কথা প্রকাশ পেয়েচে, তা এতদিনে সবাই দেখেচেন বলে' আমাদের বিশ্বাস। আমরা আশা করি এবং অনুরোধ করি যিনি যেমন পারেন তাই দিয়েই হতভাগ্য নর-নারীর সাহায্য করুন। অর্থ বস্ত্র সব ৪৩ নম্বর চক্রবেড়ে রোড, নর্থ ভবানীপুর কলিকাতা, সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের কাছে পাঠাতে হবে।

—বিজলী

ঘাটাল এলেকার বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য নাড়াজোল-রাজ শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ এক হাজার টাকা ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের সভাপতি মহাশয় [illegible]

প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য বহু সহৃদয় ব্যক্তিও সাহায্য-ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কলিকাতায় শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায় মহাশয়ের চেষ্টায় প্রায় ১২০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাস মহাশয়গণ উক্ত অর্থসহ ঘাটালে গমন করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম্মিগণ ভিক্ষা করিয়া গত মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রায় ৮০৲ টাকা ও ৫ মণ চাল সংগ্রহ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মেদিনীপুর বাঁকুড়া হুগলী ও হাওড়ার বন্যা-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০০৲ শত টাকা মেদিনীপুরে, ২০০ টাকা বাঁকুড়ায়, ২০০ শত টাকা হুগলীতে ও ২০০ শত টাকা হাওড়ায় ব্যয়িত হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণও বন্যাপ্লাবিত স্থানে দুঃস্থ ও আর্ত্তব্যক্তিগণের সেবা করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। দেশবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য দেশবাসীর এই চেষ্টা বড়ই সুলক্ষণ। —সত্যবাদী

বন্যাপীড়িতদের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার।—কলিকাতা ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ঘাটালের বন্যাবিপন্ন নরনারীর সাহায্যের জন্য এক সাহায্যভাণ্ডার খুলিয়াছেন। ভাণ্ডারে গত ২৩শে আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মোট ১২৯২।৵১৫ সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার উক্ত মিশনের সদস্যগণ ঘাটালে উপস্থিত হইয়া সাহায্য-বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ৭৬ মণ চাউল, ১৬ মণ দাইল, ১ মণ লবণ, ১০০ জোড়া কাপড়, ২ মণ আলু, আধ মণ পিঁয়াজ, ১।০ মণ চিড়া এবং ১৫ সের মুড়কী লইয়া গিয়াছেন। দেশের অন্যান্য স্থানের সেবক-মণ্ডলী ইঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করুন। —২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

বন্যা ও রামকৃষ্ণ মিশন।—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ আরামবাগ-বন্যায় ২২১টি কুটীর নির্ম্মাণের জন্য ৬৩৯৲ সাহায্য প্রদান ও ১১ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছেন। হুগলী জেলার কংগ্রেস কমিটি ঐ স্থানের সাহায্য-কার্য্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করায় রামকৃষ্ণ মিশন আপাততঃ সমস্ত তাঁহাদেরই হাতে প্রদান করিয়াছেন। —চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ

সৎ অনুষ্ঠান—

অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—মাননীয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বহুলপ্রচার ও প্রচারোদ্দেশ্যে ২০ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে কাশিমবাজার মহারাজার অবৈতনিক গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় নামে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৭ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক কাব্যব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ ভিষক্শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু সুবিজ্ঞ কবিরাজ ও ডাক্তার অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন। এই দরিদ্র দেশে এই প্রকার অবৈতনিক বিদ্যালয়ের যত প্রতিষ্ঠা হয় ততই মঙ্গল। ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। নির্দ্দিষ্ট ছাত্রসংখ্যা পূর্ণ হইলে আর ছাত্র গ্রহণ করা হইবে না। —২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

মহামিলনমন্দির।—উত্তরপাড়া মহামিলনমন্দিরের একটি অনুষ্ঠান-পত্র পেয়েছি। এই মন্দিরের কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে খদ্দর প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন। ছয়মাসে প্রায় দুই হাজার টাকার খদ্দর জনসাধারণকে দিতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'উত্তরপাড়া শিল্পপীঠ' নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয়ও খুলেছেন। আমরা এই অনুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি। —[illegible]

বয়ন বিদ্যালয়।—মেদিনীপুর সহরের ছোটবাজার পল্লীতে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নামে উৎসর্গিত একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও আয়োজন হইয়াছে। এই সাধু চেষ্টা সিদ্ধিলাভ করে ইহাই বাঞ্ছনীয় এবং দেশে এরূপ বিদ্যালয়ের যতই আধিক্য হয় ততই মঙ্গল।

—সত্যবাদী

লাভপুর সমাজ-সেবক সমিতি।—প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে "সমাজ-সেবক সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থানীয় সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছে ও আর্থিক অবস্থানুযায়ী যথাসাধ্য 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবা করিয়া আসিয়াছে।

যে কোনও রূপ সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে ও সংবাদপত্রাদিতে প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি-এ,
সম্পাদক।

—বীরভূমবার্ত্তা

অনাথ-সেবা ভাণ্ডার।—২৪ পরগণার অন্তর্গত গারুলিয়া গ্রামে একটি অনাথ-সেবা ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেবকগণ সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

স্বেচ্ছাসেবক সমিতি।—কয়েকজন পরার্থপর খ্রীষ্টীয় যুবক উদ্যোগী হইয়া এই সেবা-সমিতি গঠিত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—বর্দ্ধমান জেলার বিশেষতঃ কাল্না মহকুমার পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ ও আর্ত্তের সেবা করা। বিসূচিকা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় যত্নের অভাবে যাঁহারা নিরাশ্রয়, সমিতির সেবকগণ তাঁহাদের শুশ্রূষার জন্য সতত প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যে কাল্নার মিশন হাসপাতালের দুইটি রোগীশয্যা আমরা আয়ত্ত করিয়াছি।

সেবকেরা সকলেই সামান্যবেতনজীবী, সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। সর্ব্বসাধারণের কাছে বিনীত প্রার্থনা,—প্রিয়বন্ধুগণ আমাদের এই সাধু উদ্দেশ্যের সহায় হউন। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আসুন, সকলে দুঃস্থ ও পীড়িতের এই সেবাব্রতে সাহায্য করুন। যিনি আমাদের সমিতির সদস্য হইতে চান দয়া করিয়া পত্র দিবেন।

আপনি দয়া করিয়া যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রদ্ধাস্পদ "পল্লীবাসী" সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইলে আমরা অনুগৃহীত হইব। পত্রাদি এই ঠিকানায় দিবেন।

শ্রী সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ।
সুপারভাইজার, স্বেচ্ছাসেবক সমিতি,
মিশন হাউস, কাল্না।

—পল্লীবাসী

পাঠাগার স্থাপন।—পাণ্ডুয়া থানার অধীন দ্বারবাসিনী গ্রামে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় সম্প্রতি একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ

বাঙালীর গৌরব—

ঢাকা বজ্রযোগিনী গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু অঙ্কবিদ্যায় অসাধারণ কৃতী পুরুষ। সম্প্রতি তিনি বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি খুব বড় বড় অঙ্ক—ভাগ, পূরণ, ভগ্নাংশ, বর্গমূল প্রভৃতির ফল অতি অল্পকাল মধ্যেই মুখে মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার আলাপ হয়। প্রতিনিধি ইঁহার অঙ্কশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া উপরে নীচে ছাট বাট সংখ্যা অঙ্ক রাখিয়া তাহার ফল প্রকাশ করিতে বলেন। সোমেশ-বাবু অতি অল্পকাল মধ্যেই মনে মনে সেই বৃহৎ অঙ্ক কষিয়া ফল প্রকাশ করেন। তাঁহার এরূপ অসাধারণ অঙ্কবিদ্যার পরিচয় পাইয়া বিলাতী সংবাদপত্রগুলি তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেছেন। আমরা সোমেশচন্দ্রের প্রশংসার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা।

—ঢাকা গেজেট

বাঙ্গালী ভূ-পর্য্যটক।—উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক মাদ্রাজ এবং সিংহল হইয়া আফ্রিকায় যাইতেছেন। গত ১৬ই আগষ্ট তারিখের সকাল বেলা তিনি উড়িষ্যার রূপসা নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানকার লোকেরা তাঁহাকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৭ই তারিখে তিনি বারিপদায় যান এবং ১৮ই বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি নাকি পঁচিশ হাজার মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন।

—সময়

সৎ সাহস—

সম্প্রতি দামোদর ও কানা নদীর বন্যায় অনেক গ্রাম ভাসিয়া যায়; হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পন্নার গত শনিবার বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যার্থ গমন করিয়া কুলগেছিয়ার নিকট নদীস্রোতে একটি স্ত্রীলোককে নিঃসহায় অবস্থায় ভাসিয়া যাইতে দেখিতে পান এবং তৎক্ষণাৎ নিজের বিপদের কথা না ভাবিয়া স্ত্রীলোকটির উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন ও অতি কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

—নীহার

নারী-প্রসঙ্গ—

কর্পোরেশনে স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকার।—গত শুক্রবার দিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কর্পোরেশনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন রহিত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। উহার পক্ষে ১৬ ও বিপক্ষে ১৭টি ভোট হওয়াতে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। একজনের বহু ভোট প্রদানের অধিকারও লোপ করা হইয়াছে।

—বঙ্গরত্ন

মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব।—এবৎসর সাকিনা ফরুখ্ সুলতান মোয়াজ্জিদজাদা, বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে ১ম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন। অন্যান্য মুসলমান পরীক্ষার্থী তাঁহার চেয়ে অনেক কম নম্বর পাইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বেগম সুলতান মাজ্জিদজাদা বি-এ পরীক্ষায় গুণানুসারে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি গত প্রিলিমিনারী বি-এল পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রোমান্ আইনে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন। তাঁহারা পারস্যের উচ্চ ও নানাগুণসম্পন্ন মুসলমান-বংশ-সম্ভূত। তাঁহারা "হাবুল মাতিন" পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা মুয়াজ্জিদউল ইসলাম জালাল-উদ্দিন আলিহাসানের কন্যা। আরবী, পার্শী, উর্দ্দু তাঁহারা বেশ ভাল জানেন এবং উত্তমরূপে বাংলা লিখিতে ও পড়িতে পারেন। তাঁহারা ফরাসী পত্রিকায় কয়েকটি উত্তম প্রবন্ধও লিখিয়াছেন।

বঙ্গমহিলার কৃতিত্ব।—কুমারী সত্যপ্রিয়া বোস কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিকতর পারদর্শিণী হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন হইল ইংলণ্ডের এফ-আর-সি-এস উপাধি পাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এফ-আর-সি-এস উপাধি-বিশিষ্ট মহিলা ডাক্তার ভারতবর্ষে অতি কমই আছেন। কুমারী সত্যপ্রিয়া এই উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গমহিলার গৌরব বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তা হ

বাঁকুড়ায় স্ত্রীশিক্ষা।—গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে বাঁকুড়ায় পর্দা মহিলাগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভাতে পর্দানশীন মহিলাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সভাপতি চরকা, কুটীর-শিল্প, ব্যায়াম, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। প্রায় ৭০জন মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এইসব কার্য্য সুচারুরূপে সমাধার জন্য একটি সভা গঠন করা হইয়াছে। সভ্যগণের বৎসরে কমপক্ষে এক টাকা করিয়া চাঁদা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

—বন্দেমাতরম্

সমাজের গলদ—

উপরি উপরি কয়েকটা বধূ-নির্য্যাতনের মামলা হয়ে গেল। স্ত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করার জন্য কয়েকজনের সাজাও হয়ে গেছে। অবশ্য এদের সাজা হওয়ায় সামাজিক উপকার হয়। কিন্তু যারা স্ত্রীর শরীরের উপর অত্যাচার না কোরে তাদের মনের ওপর অত্যাচার করে তারাও কম অপরাধী নয়। অনেক স্বামী স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত; অনেক স্বামী এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আর-একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়া পত্নীর সঙ্গে সংসার-ধর্ম্ম পালন করছেন। এরা অপরাধী হলেও আমাদের দেশের আইনে এদের সাজা দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। আইনত যে-সকল অপরাধীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থা নেই, তাদের সামাজিক দণ্ড দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ একমাত্র নারীকে দণ্ড দেবার ব্যবস্থাই কোরে রেখেছে—তার প্রধান কারণ নারীরা সেই দণ্ড মাথা পেতে স্বীকার করে বলে'। আমরা শুনলুম যে, বধূ-নির্য্যাতনের মামলার বিচার করেছেন এমন কোনো ধর্ম্মাধিকারী যিনি এক পত্নী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আর-একটি বিবাহ কোরে দ্বিতীয়াকে নিয়ে সংসার করছেন!

—বিজলী

মুসলমানের ঔদার্য্য—

গো-হত্যা নিবারণ।—ফরিদপুর সহরস্থিত মুসলমান ভ্রাতাগণ পবিত্র বক্‌রিদ্ দিনে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া গো-হত্যা নিবারণ করিয়া হিন্দুদিগের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

—কল্যাণী

হিন্দুর ঔদার্য্য—

হিন্দুধর্ম্মে পুনঃদীক্ষিত।—যে-সকল ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়াছেন এবং পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চান, তাঁহারা যেন ১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আর্য্য সমাজে অথবা শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে আর্য্যসুখী সভার প্রেসিডেণ্টের নিকট আবেদন করেন।

—বন্দেমাতরম্

সেবক

বিদেশ

তুরস্কের বিজয়-অভিযান—

মিত্রশক্তিবর্গের ঝোঁক গ্রীসের দিকে থাকাতে গ্রীসের দম্ভ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই রফানিষ্পত্তির উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বাহুবলে এসিয়া মাইনরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াসে গ্রীস যে উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন কামালের বাহুবলে তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। গ্রীসসৈন্য এস্কিসহরের নিকট সমবেত হইয়া আফিউন-কারাহিসারের দিক হইতে তুরস্ক সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার মানসে সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিলেন। গ্রীক আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য অ্যাঙ্গোরা সরকারও খুব ক্ষিপ্রতার সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কামালের পরিচালনায় সে বন্দোবস্ত এত সুচারুরূপে চলিতে লাগিল যে ইংরেজ সেনাপতি স্যার চার্লস্ টাউন্‌শেণ্ডের চমক লাগিয়া গেল। তিনি তুর্কী সৈন্যের সমরসজ্জা সম্বন্ধে ডেলী এক্স্‌প্রেস্ নামক পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করিলেন যে "কামালের সৈন্যদল অত্যন্ত সাহসী এবং তাহারা একপ্রাণ হইয়া দৃঢ়তার সহিত স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। এমন সংঘবদ্ধ ও সুপরিচালিত সৈন্যদল প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাঁদের রসদ সরবরাহের বন্দোবস্তও উত্তম এবং খাদ্যাদি ও যুদ্ধোপকরণগুলি বেশ ভালই। গোলাগুলি ও বারুদও প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। সেভার্স্ সন্ধি অনুসারে বন্দুকের ব্রিচব্লকগুলি (breech blocks) তাহারা মিত্রশক্তিবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কোনিয়ার অস্ত্রাগারে আবার সেগুলি তাহারা করিয়া লইয়াছে। তুরস্কের সামরিক কর্ম্মচারীবর্গ সুদক্ষ এবং চতুর।" টাউন্‌শেণ্ডের অভিমত প্রকাশিত হওয়াতে অনেকেই ইহা অতিরঞ্জিত মনে করিয়া নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ইউরোপের রুগ্ন রাজ্য যে এত সহজেই আবার সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারে ইহা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। কিন্তু আজ রণকুশলী কামালের অপূর্ব্ব কৃতিত্বে জগৎ-সমক্ষে তুরস্ক-গৌরবের পুনরুত্থান সাধন করিয়া একটি শক্তিশালী মুসলমান-সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। পাঁচ দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর আফিউন-কারা-হিসার অঞ্চলে গ্রীক সৈন্যকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলিতে কামালের সৈন্যদল সমর্থ হয়। তাহার পর উত্তরাঞ্চলের গ্রীকদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দক্ষিণ দিকের গ্রীক বাহিনীর উপর তুলুবুনার অঞ্চলে তুরস্ক সৈন্য প্রবল বেগে আক্রমণ করে। গ্রীক সৈন্য পরাজিত হইয়া উসাক অঞ্চলে প্রস্থান করে। পরে তুরস্ক সৈন্য এস্কিসহর দখল করিয়া স্মার্ণা আক্রমণের উদ্যোগ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে তুরস্ক সৈন্য দশ হাজার গ্রীক সৈন্য ও চারিশত গ্রীক সেনাপতিকে বন্দী করে ও অনেক গোলাগুলি ও রসদ দখল করে। যুদ্ধে হারিয়া গ্রীক সৈন্য এমনই ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে যে গ্রীক সরকার প্রকৃত অবস্থা জানিবার অবকাশও পান নাই। গ্রীক সরকার প্রধান সেনাপতিকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে জেনারেল ত্রিকোপিস্‌কে (Tricoupis) প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু পরে সংবাদ আসিয়াছে যে এই নির্ব্বাচনের তিন দিন পূর্ব্বেই সেনাপতি ত্রিকোপিস্ তুরস্ক সৈন্যের হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

গ্রীসের সমর-সজ্জা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যাওয়াতে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য গ্রীস মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য ভিক্ষা করে এবং গ্রীসের তরফ হইতে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্ক সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। অ্যাঙ্গোরা সরকার সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা বলেন যে গ্রীস যদি আড্রিয়ানোপোল ও থ্রেস ছাড়িয়া দিতে

প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে অ্যাঙ্গোরা সরকার যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

যুদ্ধজয়ের সংবাদ পাইয়া কামাল তাঁহার সৈন্যবর্গের নিকট এক ইস্তাহার জারি করিয়া বলিলেন—"শত্রুপক্ষের শক্তির কেন্দ্রে আঘাত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হওয়াতে তোমরা দেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছ। তোমাদের শক্তির পরিচয় পাইয়া ভবিষ্যতের প্রতি তুরস্ক জাতির ভরসা জন্মিয়াছে।" অ্যানাটোলিয়াতে যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। সৈন্যগণ! তোমাদের প্রথম কর্ত্তব্য সমুদ্রতীরে স্মার্ণা দখল করা। অগ্রসর হও! জয়লাভ কর!" কামালের ইস্তাহারে উৎসাহিত হইয়া তুরস্ক সৈন্য স্মার্ণা অভিমুখে রওনা হইল। ১১ই সেপ্টেম্বর খবর আসিয়াছে তুরস্ক সৈন্য স্মার্ণা দখল করিয়াছে। উত্তরে দার্দ্দেনেলিস্ প্রণালীর তীরে ক্রসা সহরও তুরস্ক সৈন্য দখল করিয়াছে। গ্রীসের এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থান পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন শ্বেতকায় জাতির পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইবে না বলিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা চিন্তাকুলিত হইয়া উঠিয়াছেন।

তুরস্ক তাহার অজানা শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। থ্রেস ও আড্রিয়ানোপোল পুনর্দখল করিয়া ইউরোপে আবার আপনার শক্তির প্রতিষ্ঠা করিবার ভরসা তাহার হইয়াছে। তাই তেজদৃপ্তকণ্ঠে তুরস্ক-প্রতিনিধি ফেতে বে বলিতেছেন, "আমরা ইউরোপে আবার তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া, থ্রেস ও আড্রিয়া-নোপোল দখল করিয়া তবে ক্ষান্ত হইব। ইহাতে যে কোন শক্তি আমাদিগকে বাধা দিবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা পরাঙ্মুখ হইব না।" তুরস্কের এই জাগরণে ইংরেজ বড় প্রীত নহেন। ফ্রান্স বলিতেছেন যে তুরস্ককে তাহার হৃত সাম্রাজ্য ফেরত দেওয়া হউক; আর গণ্ডগোলে প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলিতেছেন, "এসিয়া মাইনরে তুরস্ক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেখানে তাহাকে স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইউরোপে তাহার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর হইবে কি না সন্দেহ। বল্কান রাজ্যসমূহ, জেকো-স্লোভাকিয়া, যুগো-স্লাভিয়া প্রমুখ পশ্চিমের প্রাচ্যপ্রান্তিক রাজ্যসমূহ যে ইহার বিরোধী। আমরা এই নূতন রাজ্যগুলির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতে যে প্রতিশ্রুত আছি। কাজেকাজেই আমরা তুরস্কের দাবী এত সহজে স্বীকার করিলে প্রতি-শ্রুতি ভঙ্গ হইবে। আর তুরস্কের খৃষ্টান প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার গুরু দায়িত্ব যে আমাদের। সেজন্যও আমাদের অবস্থা অত্যন্ত দায়িত্ব-পূর্ণ। আমরা সহজে কোনও মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারি না।"

তুরস্ক বলিতেছেন, "কেহ আমাদের স্বীকার কর আর নাই কর, আমরা আমাদিগের হৃত সাম্রাজ্য নিজ বাহুবলে উদ্ধার করিব। আমরা কাহারো সাহায্যের প্রত্যাশী নহি। যদি কেহ আমাদিগকে বাধা দিতে আসে, সে বাধা আমরা মানিব না। তুরস্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আমাদের সাধনা। আমরা সে সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিব।"

ফরাসী কাগজপত্রের সুরে আবার ইংরেজ-বিদ্বেষ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। পেতি পারিসিয়াঁ নামক সুবিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা বলেন যে মর্ম্মোরা সাগরের তীরে ফরাসী সৈন্য এখনই প্রেরণ করা উচিত। কেননা সেখানে ইংরেজ সৈন্য গ্রীক সৈন্যের স্থানে আসিয়া উক্ত স্থান রক্ষা করিয়া গ্রীসের সাহায্য করিতেছে বলিয়া উক্ত পত্রিকার বিশ্বাস। এবং কামালের সৈন্যের সঙ্গে বৃটিশ বাহিনীর সংঘর্ষ এক ফরাসী সৈন্যই থামাইতে পারিবে। মাতাঁ পত্রিকা বলেন যে, আমরা ইংরেজদিগকে এই উপদেশই দিতেছি যে অজেয় শত্রুর সহিত সন্ধি করাই সমীচীন। ইংলণ্ডেও লয়েড জর্জ্জের শাসনের বিরুদ্ধে মহা অসন্তোষ দেখা দিতেছে এবং ইংরেজ সরকারের তুরস্ক-নীতি অত্যন্ত অবিবেচনার পরিচায়ক হইয়াছে বলিয়া লয়েড জর্জ্জকে দোষ দিতেছে। লয়েড জর্জ্জ পদত্যাগ করিবেন এমন কথাও শুনা যাইতেছে। কাজেকাজেই বলিতে হয় যে প্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিল।

সমস্ত মুসলমান জগৎ এখন মুগ্ধনেত্রে এই অদ্ভুত মুসলমান বীর গাজী মুস্তফা কামাল পাশার প্রতি চাহিয়া আছে। ইহাঁর অলৌকিক শৌর্য্যে ভরসা হয়, বুঝি বা মুসলমান শক্তির ভাগ্য আবার প্রসন্ন হইল।

গ্রিফিথ্‌সের মহাপ্রস্থান—

মহাত্মা গান্ধি যেমন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাকে এক অভিনব পথে পরিচালিত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে উন্নততর নৈতিক ভূমিতে লইয়া গিয়াছেন, আয়ার্‌ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ধারাকে তেমনই নূতন পথে পরিচালিত করিয়া আর্থার গ্রিফিথ্‌স্ আয়ার্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্য, রীতিনীতি, সুকুমার কলা, দর্শন ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া নিজের চেষ্টায় স্বদেশের মঙ্গলসাধন করাই গ্রিফিথ্‌স্-প্রবর্ত্তিত সিনফিন্ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ভাষায়, আর্টে, আদর্শে ও এমন কি খেলা-ধূলায় সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী ছাঁচে আইরিশ জাতিকে গড়িয়া তুলিতে এই আন্দোলন প্রয়াস পাইয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় বিধানে ইংলণ্ড ও আয়ার্‌ল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র এক বলিয়া ঘোষিত হয়: সেইদিন হইতে আয়ার্‌ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার লোপ হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আইরিশ বীর রবার্ট এমেট্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাহার পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আয়ার্‌ল্যাণ্ডের তরুণ সম্প্রদায় টমাস্ ডেভিস্, গ্যাভান ডাফি ও জন্ মিচেলের অধিনায়কত্বে আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের সৃজন করেন এবং তাঁহাদের মুখপত্ররূপে "নেশন" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে আন্দোলন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মিচেল একাকী ইউনাইটেড্ আইরিশম্যান কাগজ স্থাপন করিয়া জাতীয় আন্দোলন চালাইতে থাকেন। তাহার নির্ব্বাসনের পর আইরিশ আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে। আমেরিকার প্রবাসী আইরিশগণ নানা প্রকার রাজদ্রোহকর সমিতি স্থাপন করিয়া ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ১৮৯৩ সালে পিয়ার্সের নেতৃত্বে গেলিক লিগ্ স্থাপিত হয়। তাহার উদ্দেশ্য ছিল আইরিশ ভাষা সাহিত্য সঙ্গীত ও বাণিজ্যের মুক্তি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গ্রিফিথ্‌স্ 'ইউ-নাইটেড্ আইরিশম্যান' কাগজ স্থাপিত করিয়া এই আন্দোলনকে খুব প্রসারিত করিয়াছেন। গ্রিফিথ্‌সের লেখায় এমন একটা তেজ ছিল যে চারিদিকে মহাচাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। আইরিশ জাতি নব উৎসাহে মাতিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া গেলেন। ইংরেজ সরকার বিপদ দেখিয়া গ্রিফিথ্‌সের পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। গ্রিফিথ্‌স্ বারবার বাধা পাইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। উল্‌ফ্‌টোন, জন মিচেল, পুইক্ স্মিথ্ ও জন্ ডিক্ প্রভৃতি স্বদেশহিতকামী ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত ও কর্ম্মপ্রণালীর সহিত আইরিশ জাতির পরিচয়-সাধন করাইয়া গ্রিফিথ্‌স্ আইরিশ জাতিকে যেরূপ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলেন তাহার ফলে আয়ার্‌ল্যাণ্ডে, ডিকের নেতৃত্বে হাঙ্গেরীতে যেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, তদনুরূপ একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনই সিনফিন্ আন্দোলন নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। গ্রিফিথ্‌সকেই ইহার স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। গ্রিফিথ্‌স্ এই আন্দোলনের ব্যাখ্যাতারূপে আইরিশ সাহিত্য দর্শন সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি জীবনের সমস্ত দিকেই যে নূতন ভাবের সৃজন করেন

নষ্ট নবীন আয়ারল্যাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজ সরকারের সহিত দ্বন্দ্বে এবং পরবর্ত্তীকালে স্বাধীনতাপ্রয়াসীদলের সহিত দ্বন্দ্বে গ্রিফিথ্‌স্‌ যে অলৌকিক রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহার কথা প্রবাসীতে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আয়ারল্যাণ্ডের এই সঙ্কট-সঙ্কুল সময়ে আইরিশ জাতিকে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবার জন্য গ্রিফিথ্‌স্‌ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন তাহাতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ডি ভ্যালেরার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গ্রিফিথ্‌স্‌ যে মনোকষ্ট পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার জীবন এমনই অকালে শেষ হইয়া গেল। গ্রিফিথ্‌স্‌ হৃদরোগে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আয়ারল্যাণ্ডের আশা ভরসা, আয়ারল্যাণ্ডের গৌরব সহসা নিবিয়া গেল। এখন তাঁহার স্থানে কে আয়ারল্যাণ্ডের গৌরবদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে?

কলিন্সের আত্মাহুতি—

আয়ারল্যাণ্ডের অন্তর্দ্রোহের দাবদাহে একে একে অনেকগুলি আইরিশ জননায়ক আত্মাহুতি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুইজনের মৃত্যু আইরিশজাতির প্রাণে বাজিয়াছে সবচেয়ে বেশী। স্বরাজপন্থী নেতা মাইকেল কলিন্‌স্‌ ও স্বাধীনতাপ্রয়াসী নেতা চার্লস্‌ বার্জ্জেসের মৃত্যুতে আইরিশজাতির হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে। বার্জ্জেস্‌ বিদ্রোহীদলের দলপতিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন আর কলিন্‌সের ভাগ্যে ছিল গুপ্তঘাতকের হস্তে শোচনীয় মৃত্যু। বার্জ্জেস্‌ আইরিশ জাতির নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন বহুদিন। কলিন্‌স্‌ কিন্তু সহসা লোকনায়করূপে আবির্ভূত হন। কলিন্‌সের আবির্ভাব অত্যন্ত অদ্ভুত।

কলিন্‌সের পিতার সামান্য একটি ক্ষেত ছিল। সেই খামারে চাষ করিয়া বৃদ্ধ কলিন্‌স্‌ কোনও রকমে দিনাতিপাত করিতেন। মাইকেল কলিন্‌স্‌ গ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে অল্পস্বল্প পড়াশুনা করেন। এবং অল্প বয়সেই আইরিশ জাতীয়দলের সংস্পর্শে আসিয়া কলিন্‌সের মনে দেশানুরাগ জাগিয়া উঠে। কিন্তু অবস্থা ভাল না থাকাতে অল্পবয়সে বাধ্য হইয়া কাজ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। ষোলো বৎসর বয়সে কলিন্‌স্‌ লণ্ডনের পোষ্ট অফিসে চিঠি বাছাই কাজে নিযুক্ত হন। লণ্ডন সহরে অনেক আইরিশ যুবক কাজ কর্ম্ম করিবার জন্য বাস করেন। তাহাদের লইয়া কলিন্‌স্‌ একটি দল গঠন করেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অধীনতাপাশ হইতে আয়ারল্যাণ্ডকে উদ্ধার করা। কলিন্‌সের যখন কেবলমাত্র চব্বিশ বৎসর বয়স, তখন বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠে। তখন কলিন্‌স্‌ তাঁহার দলের লোকদের সঙ্গে ওয়ার্মউড নামক স্থানে গোপনে সমরকৌশল ও সৈন্যপরিচালনাপদ্ধতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অর্থনীতির মূলতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী নামক কারবারে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং লণ্ডনের কিংস কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এতই তীক্ষ্ণধী ছিলেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বার্ত্তাশাস্ত্রে এমন সুপণ্ডিত হইয়া পড়েন যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি আইরিশ সরকারের রাজস্ব-সচিব নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বৎসর বয়সে তিনি আয়ারল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিন্‌ফিন্‌ নেতা কাউণ্ট প্লাংকেটের সহকারী হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেলের সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং আইরিশ জাতীয় সৈন্যের গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ইংরেজ সরকার যখন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জাতীয় সৈন্যদলের উচ্ছেদের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পান তখন কলিন্‌স্‌ পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন এবং গোপনে গোপনে আইরিশ সৈন্যদল গঠন করিতে থাকেন। কলিন্সের পরিচালনায় এই গুপ্ত আইরিশ সৈন্যদল গুপ্ত যুদ্ধে অত্যন্ত সুদক্ষ হইয়া উঠে। কলিন্স্‌ অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়কে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। অসমসাহসী মাইকেল বহুবার ইংরেজ-হস্তে ধরা পড়িয়াও অদ্ভুত কৌশলে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার চাতুর্য্যে ইংরেজ সরকার এতই বিব্রত হইয়া উঠেন যে শেষে তাঁহারা সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া আইরিশ নেতাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন। আইরিশ সেনাপতি কলিন্স্‌ সুদক্ষ সৈন্য-পরিচালক রূপেই এতদিন পরিচিত ছিলেন। এইবার তাঁহার গভীর রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া গেল। তিনি গ্রিফিথ্‌সের সহিত একযোগে ইংরেজ সরকারের সহিত রফানিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; চার্লস্‌ বার্জ্জেস্‌ ও ডি ভ্যালেরা কিন্তু সে রফানিষ্পত্তি মানিলেন না। কাজেকাজেই আয়ারল্যাণ্ডে অন্তর্দ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কলিন্স্‌ স্বরাজপন্থী দলের সৈন্য পরিচালনা তো করিতেই লাগিলেন, আবার আইরিশ সরকারের অর্থসচিব রূপে শাসনকার্য্যেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। কলিন্সের অধিনায়কত্বে স্বরাজপন্থীদল স্বাধীনতাপ্রয়াসী-দলকে হারাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই সময় হৃদরোগে গ্রিফিথ্‌সের মৃত্যু হওয়াতে স্বাধীনতাপ্রয়াসীদল ভাবিলেন যে কলিন্স্‌কে যদি হত্যা করা যায় তবে উপযুক্ত নেতার অভাবে স্বরাজপন্থীদল ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই ২২শে আগষ্ট সন্ধ্যাবেলা ব্যাণ্ডন সহরে গুপ্তঘাতকের হস্তে কলিন্স্‌ প্রাণ হারাইয়াছেন। মৃত্যুর সময় কলিন্স হত্যাকারীদিগকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কলিন্স্‌ সদা-প্রফুল্ল এবং উৎসাহী লোক ছিলেন। মৃত্যুর সময়ও তাঁহার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মোটে বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। আরও দুঃখের কথা এই যে তাঁহার বিবাহ সম্প্রতি স্থির হইয়াছিল।

ক্ষতিপূরণ সমস্যা—

আগষ্ট মাসের লণ্ডন বৈঠকেও ক্ষতিপূরণ সমস্যার কোনই মীমাংসা সম্ভবপর হইল না। কেননা ক্ষতিপূরণের দাবীর চাপে জার্ম্মান মার্কের দাম এত কমিয়া গিয়াছে যে তাহাতে জার্ম্মানীর বিদেশের সহিত ব্যবসা করার সম্ভাবনা অতি অল্প হইয়া যাওয়াতে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গণিলেন। তাই ক্ষতিপূরণ-দাবী স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব যাহাতে সকলে গ্রহণ করে ইংরেজ সরকার তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ফ্রান্স সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারেন না। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী পঁয়াকারে এক বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে "আমাদের অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা অত্যন্ত অন্যায়। আমরা নিরো কিম্বা বিস্‌মার্কের মত নিষ্ঠুর নহি। আমরা আমাদিগের মিত্রবর্গের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ থাকিতেই চাহি এবং আমাদের পরাজিত শত্রুর সহিতও ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমরা সর্ব্বাগ্রে এই কথাই জোর করিয়া বলিব যে আমাদের ক্ষতিপূরণের যে সঙ্গত দাবী আমরা জানাইয়াছি তাহা পূরণ করিতেই হইবে। আমরা তাহা না পাইলে কিছুতেই নিরস্ত হইব না। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ সরকারের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনাও পঁয়াকারে করেন। তাহাতে ইংরেজ রাষ্ট্র-নৈতিক গগনে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইতে দেখা যায়। এদিকে ফরাসী কাগজপত্রে পঁয়াকারের বক্তৃতাকে সমর্থন করিয়া খুব লেখালেখি চলিতে লাগিল। অবস্থা এমনই গুরুতর হইল যে ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার জন ব্রাড্‌বেরি বিপদ গণিলেন। এদিকে অবস্থা সঙ্কটজনক দেখিয়া মার্কের দাম আরও কমিয়া যাইতে লাগিল। এক পাউণ্ডে প্রায় ৯০০০ মার্ক পাওয়া যাইতে লাগিল। এ সমস্যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া যখন প্রায় সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন তখন বেল্‌জিয়ান প্রতিনিধি দেলাক্রোআর (Delacroix) চেষ্টায় একটা ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া বর্ত্তমান বিবাদ কিছুদিনের জন্যও স্থগিত থাকা সম্ভব হইয়াছে। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে জার্ম্মানীর নিকট হইতে দাবীর টাকা আদায় স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে মীমাংসা হওয়া, যে পর্য্যন্ত জার্ম্মান রাজস্বের সুবন্দোবস্ত মিত্রশক্তিবর্গের প্রেরিত প্রতিনিধিরা না করিয়া উঠিতে পারিবেন সে পর্য্যন্ত, স্থগিত থাকুক। কিন্তু যতদিন রাজস্বের সুবন্দোবস্ত ঘটিয়া না উঠিতেছে ততদিন স্থিরভাবে না বসিয়া থাকিয়া জার্ম্মানীর নিকট ১৯২২ সালের দাবীর টাকাটি ছয়মাসের ট্রেজারি বিলে আদায় করা হউক। ট্রেজারি বিলে টাকা আদায় করিলে নগদ সোনা বা রূপায় দাবীর টাকাটি না দিয়া কাগজপত্রে দাবীর টাকার স্বীকারোক্তি দেওয়াতে, চলিত মুদ্রার দাম আরও কম হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু ট্রেজারি বিলের টাকা অবশ্য ভালো হইলে যাহাতে জার্ম্মানী দিতে বাধ্য থাকেন, তাহার জন্য পাকাপাকি বন্দোবস্ত এখন হইতে রাখা সঙ্গত মনে করিয়া দেলাক্রোআ প্রস্তাব করেন যে জার্ম্মানী এই স্বীকারোক্তির টাকাটা বেল্‌জিয়াম ও ফ্রান্সের ইচ্ছামত কোনও বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবেন। দেলাক্রোআর প্রস্তাবে মিত্রশক্তিবর্গের সকলেই রাজী থাকাতে গণ্ডগোল আপতত মিটিয়াছে। জার্ম্মান অর্থসচিব সরডার কিন্তু বলিতেছেন যে এই বন্দোবস্ত মানিয়া লইতে হইলে জার্ম্মান ব্যবসাদারেরা যে ফ্রান্সকে কয়লা ও কাঠ সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল সে বন্দোবস্ত বজায় থাকিবে না। দেননাষ্টাইনিস, সিল্‌ভারবার্গ প্রভৃতি বড় বড় জার্ম্মান ব্যবসাদার মার্কের দাম যাহাতে আরও না পড়িয়া যায় সেইজন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অল্পমূল্যে কাঠ ও কয়লা বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, শুধু এই অঙ্গীকারে যে ফ্রান্স দাবীর টাকা আদায়ের চেষ্টা ৩১শে ডিসেম্বর অবধি স্থগিত রাখিবেন। ফ্রান্স যখন সে অঙ্গীকার না মানিয়া ট্রেজারি বিলে টাকা আদায়ের চেষ্টায় আছেন তখন ষ্টাইনিস্‌ও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রাখিতে বাধ্য নহেন। ষ্টাইনিস্ এরূপভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইতে ফ্রান্সের মহামুস্কিল হইল। ফ্রান্সের যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলিকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা ফ্রান্সের শক্তিতে একা কুলায় না। তাই ১,৯০,০০০ গৃহ নির্ম্মাণের সমস্ত সাজসরঞ্জাম মাত্র শতকরা ছয় টাকা লাভে করিয়া দিতে ষ্টাইনিস্ পূর্ব্বে স্বীকৃত হওয়াতে ফ্রান্স খুব সুবিধা পাইয়াছিলেন। ষ্টাইনিস্ এই ব্যাপারে (১৫০০,০০০,০০০) প্রায় দেড়শত কোটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রমাদ গণিয়া ফরাসী ধনী দেলব্রাক্ ষ্টাইনিসের সহিত দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে শীঘ্র একদল জার্ম্মান ব্যবসায়ী ফ্রান্সের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভূখণ্ডসমূহ পরিদর্শনের জন্য আসিবেন। ফরাসী লোহের খনিও ভাল চলিতেছে না। জার্ম্মান লোহার কারবারীরা যাহাতে তাহা চালাইয়া লইবার ভার লন তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। এইসব ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে ক্ষতিপূরণের দাবীর চাপ আর সহজে বড় ফরাসী দিতে পারিবেন না। কিন্তু এইসব ব্যাপারে ইংরেজ বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে জার্ম্মান ব্যবসা ও জার্ম্মান ধনপ্রাধান্য এমন সুসংস্থিত ও সুপরিচালিত যে ইহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স্ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। একবার যদি জার্ম্মান ধনীরা ফ্রান্সে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা পায় তবে ফ্রান্সের বাজার তাহাদের একচেটিয়া হইয়া যাইবে। জার্ম্মানীর ব্যবসায়ের গতিরোধ করা তখন অসম্ভব হইবে।

"ইজিপ্ট" তদন্তের ফল—

ইজিপ্ট জাহাজ ডুবির সম্বন্ধে দোষাদোষ বিচার করিবার জন্য যে বিচার-সভা বসিয়াছিল তাহার বিচার-ফল প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারের ফলে লস্করদিগের কলঙ্ক স্খালন হইয়াছে। মৃতের সংখ্যা যে অত্যধিক হইয়াছে তাহার জন্য বিচারকগণ জাহাজের মাষ্টার এবং চিফ্ অফিসারকেই দায়ী করিয়াছেন। জাহাজের কর্ম্ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা ও সুসংবদ্ধ থাকিবার ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। ভারতীয়দিগের ভাষা কর্ম্মচারীদিগের না জানা থাকাতে অধীনস্থ নাবিকদিগকে সংযত রাখিতে পারা যায় নাই। তদন্ত-সমিতি মনে করেন যে কর্ম্মচারীদিগকে ভারতীয়দিগের ভাষা শিখিতে বাধ্য করা উচিত। ভারতীয় লস্করেরা যে খুব কর্ম্মঠ ও সাহসী তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। তদন্ত-ফল বাহির হইবার পর নাবিক সমবায়ের সম্পাদক কাথ্‌বার্ট ল সাহেব ইভ্‌নিং ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় ভারতীয় লস্করদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া একটি বিষয়ে তাহাদের দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তিনি বলেন যে ভারতীয় শ্রমিকগণ বিশেষতঃ লস্করেরা শ্রমিক সভা বা সমবায়ের নিয়ম মানিয়া চলেন না এবং যে একতা এবং দৃঢ়তা থাকিলে শ্রমিক সভা ধনীর অত্যাচারের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় তাহা ভারতীয়দিগের মধ্যে এখনও দেখা যায় নাই। এগুলি শিখিয়া না লইলে ভারতীয়গণ ইংরেজ ধনীর সহিত জীবন-সংগ্রামে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। এবং ইহাদিগের সাহায্যে ইংরেজ ধনী ইংরেজ শ্রমিককেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে। শ্রমজীবীদিগের জন্য যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কচুরী পানা

কচুরী পানার (Water Hyacinth) উৎপাতে আমাদের বাংলা দেশের কৃষিকার্য্যের যে কি-প্রকার অনিষ্ট হইতেছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এই পানা জন্মিয়া ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহা দ্বারা যে কৃষিকার্য্যের বিঘ্ন হইবে, তখন লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে এই পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেরও স্থানে স্থানে ইহার উৎপাত অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের ভূমি উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ, সেখানকার ভূমিতে সার দিতে হয় না ; চাষের হাঙ্গামাও সেখানে খুব কম। তাই সেখানকার জমিতে সোনা ফলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কচুরী পানার উৎপাত

পূর্ব্ববঙ্গের উর্ব্বরতা যে আর অধিক দিন থাকিবে, তাহা আশা করা যায় না।

কচুরী পানার উৎপাত যে কেবল বঙ্গদেশেই আছে তাহা নহে, আমেরিকাতেও ইহার উৎপাত কম নয়। সেখানে আজও এই উৎপাত নিবারণ করা যায় নাই। ইহা শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ বলিবেন—তবে আর কি, যাহাদের এত টাকা, এত আয়োজন, তাহারা যখন পানা নষ্ট করিতে পারিল না, তখন আমাদের চেষ্টা বৃথা। আমরা এই প্রকার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি, আমেরিকা পারিল না বা অপর কোন দেশ পারিল না বলিয়া আমাদিগের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষকেই এই উৎপাত নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা ফলবতী হইবেই। এখানে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে,—অতি প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীতে কেবল উদ্ভিদেরই আধিপত্য ছিল, তখন আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা উদ্ভিদের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া আরণ্যভূমিকে কৃষিক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন অরণ্য মানুষের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া এইক্ষণে উদ্ভিদেরই এক বংশধর মাথা-চাড়া দিয়া আজ আবার আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানুষের হাতে অস্ত্রের ত অভাব নাই। উদ্ভিদের সহিত মানুষের এই প্রকার সংগ্রাম চিরকালই চলিবে। কোন প্রাণী বা কোন উদ্ভিদ নিজের বংশ বিস্তার করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে দখল করিয়া বসুক ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাই কোন জীব যাহাতে পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিতে না পারে তাহার জন্য প্রকৃতিতে অনেক ব্যবস্থা আছে। প্রথমত: পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতায় অনেক জীব মারা যায়। তাহার পরে এক জাতীয় জীব আর-এক জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এই প্রকারে দেখা যায়, মানুষের সহিত পশুর এবং প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের নিয়তই সংগ্রাম চলে। ইহার ফলে যে জীব যতটা অধিকার পাইবার যোগ্য তাহা আপনা হইতেই পায়। যদি কোন কারণে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দ্রুত বংশবিস্তারের কোন বাধা না থাকে, তবে তাহাই হইয়া দাঁড়ায় উৎপাত। অষ্ট্রেলিয়াতে খরগোস

আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

(১) কচুরী পানার দাম, সিজবেরিয়ার কাছে গঙ্গার ধারে

ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেখানে এক জোড়া খরগোস ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র জন্তুর বংশবিস্তারে অষ্ট্রেলিয়াতে এখন এত খরগোস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে তাহাদের উৎপাতে কৃষিকার্য্যের ক্ষতির আশঙ্কা হইতেছে। কোনো এক খেয়ালী লোক ইংলণ্ড হইতে এক জোড়া পোকা সংগ্রহ করিয়া আমেরিকায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পোকাগুলি নাকি দেখিতে সুন্দর ছিল। অনুকূল অবস্থা পাইয়া সেই পোকাদের বংশধরগুলি এখন আমেরিকার বিবিধ প্রদেশে ভয়ানক বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহাদের উপদ্রবে মূল্যবান পাইন গাছ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহাকেই বলে উৎপাত। আমাদের দেশে কচুরি পানাও কতকটা এই রকমেরই উৎপাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের শৈশব-উপাখ্যানের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্র সেই প্রকাণ্ড রাক্ষসটাকে বহু চেষ্টাতেও বিনষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ রাক্ষসটার প্রাণপুরুষ ছিল চৌদ্দ হাত জলের তলায় স্ফটিক-স্তম্ভের ভিতরে লুকানো। আমাদের ও অন্য দেশের রাজপুরুষেরা কচুরি পানা বিনাশের জন্য যে-সকল চেষ্টা করিতেছেন, তাহা রাজপুত্রের রাক্ষস বিনাশের চেষ্টার মতোই বৃথা হইয়া যাইতেছে। পুরুষটা কোথায় লুকানো আছে। এইজন্য লক্ষ্য স্থির না করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টার ন্যায় ইহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে। কচুরি পানার জীবনের ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া, কি প্রকারে তাহারা বংশ বিস্তার করে এবং কোন অবস্থা তাহাদের বৃদ্ধির অনুকূল, এই-সকল তথ্য প্রথমে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এই-সকল তথ্য আজও সংগৃহীত হয় নাই। তাই পানা বিনাশের জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, সেগুলি অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ প্রায়ই বিজ্ঞানকে যাদুবিদ্যার কোঠায় ফেলিয়া থাকেন। তাঁহারা যখন কোন প্রাকৃতিক উৎপাতে ভীত হইয়া পড়েন, তখন মনে করেন বুঝি বিজ্ঞানই মন্ত্রবলে উৎপাতের শান্তি করিবে। স্বার্থান্বেষী চতুর লোকেরা সুযোগ ছাড়ে না। তাহারা বৈজ্ঞানিক সাজিয়া নানা আড়ম্বরে জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। লোকে ভাবে ইহাই বুঝি বৈজ্ঞানিক প্রণালী। কোন অজ্ঞাত ব্যাপারের মূল কথা জানিয়া কার্য্য করিতে গেলে এই ভড়ং পরিত্যাগ না করিলে চলে না। ভড়ং করা বা ভড়ং দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া বৈজ্ঞানিক রীতি নয়। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি অনুসন্ধানের বাহ্য শাখাপ্রশাখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার মূল কোথায় তাহাই দেখিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করেন। কত অবান্তর ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে তাহার ইয়ত্তাই হয় না। যে বৈজ্ঞানিক এই-সকল অবান্তর ব্যাপারের কুহক কাটাইয়া সোজা পথটি ধরিয়া চলিতে পারেন, তিনিই মূলতত্ত্ব আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হন। আবিষ্কার মাত্রেরই ইহাই মূলমন্ত্র। গাছের রস কি প্রকারে তাহাদের দেহের ভিতর দিয়া উপরের দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা এ পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্‌বিদ্যার একটি প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া ছিল। পূর্ব্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াই আমি দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অবিরাম চেষ্টার পরে এখন রসপ্রবাহের মূল কারণ জানিতে পারিয়াছি। অবান্তর ব্যাপারগুলিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া লক্ষ্য নির্ণয় করা এবং পরে সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়া আবিষ্কারের মূলসূত্র।

করা যাউক। গঙ্গার তীরে সিজ্‌বেড়িয়া নামক স্থানের একট খালে যে পানা আছে ১ম চিত্রে তাহার একটি ছবি দেওয়া হইল। গাছগুলি কখন কখন দুই হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং স্থানে স্থানে সেগুলি এমন নিবিড়ভাবে জলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, পানার উপর দিয়া মানুষও হাঁটিয়া চলিতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রে একটি বিচ্ছিন্ন পানার ছবি দেওয়া হইল। ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে পাতা-সমেত গাছটি যত উচ্চ তাহার শিকড় প্রায় সেইরূপ দীর্ঘ। এক-একট গাছে কখন কখন দেড় শতেরও অধিক শিকড় থাকে। কেবল ইহাই নয়, এই পানাগুলি আবার জলের তলায় লতাইয়া চলে, এবং ইহাতে তাহাদের বংশ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কচুরীর বংশ বিস্তারের ইহাই একমাত্র উপায় নয়। এসম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। কচুরী পানার পাতার ডাঁটাগুলিও অদ্ভুত,—সেগুলি ফাঁপা ধরণের,— তাই জলে ভাসে।

যাহা প্রত্যক্ষ এবং যাহা হঠাৎ চক্ষুগোচর হয়, মানুষের মন সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এই রকমে মনকে বিক্ষিপ্ত করার বিপদ্ অনেক। ইহাতে আসল চাপা পড়িয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বাঁধা নিয়মে কচুরী পানা সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে আসলকে ঠেলিয়া ঝুঁটাকে লইয়াই মারামারি করিয়াছেন। পানার চক্‌চকে পাতা ও ফুলগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই তাঁহারা সেইগুলি নষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে পাতা ও ফুল নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু গাছ মরে নাই। গাছগুলি যে লম্বা শিকড় চালাইয়া জলের তলা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহা ইঁহাদের নজরে পড়ে নাই। এই শিকড়গুলিই গাছগুলিকে জীবিত রাখিয়াছিল।

পুষ্করিণী হইতে পানা উঠাইয়া ফেলিলে দেখা যায়, কয়েক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহা আবার পানায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যে দুই চারিটা শিকড় জলের তলায় থাকিয়া যায়, সেইগুলিই নূতন পানার উৎপত্তি করে। জলের ভিতরকার শিকড় নষ্ট করিতে না পারিলে এই শত্রুর বিনাশ নাই। যাঁহারা পানা নষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে এই

(২) কচুরী পানার জলে-ডোবা ঝুলিয়া-পড়া লম্বা শিকড় (R) এবং আড়ে বিস্তৃত শিকড় (S)

কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। কচুরী পানার একটি ক্ষুদ্র শিকড় হাজার হাজার নূতন গাছের সৃষ্টি করিয়া ১০ বিঘা স্থানকে কয়েক মাসের মধ্যে আচ্ছন্ন করিতে পারে।

এখন কচুরী পানা বিনাশের উপায় কি, তাহার আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে চারিটি উপায়ের কথা মনে হয়,—

(১) পানাদের গায়ে ছত্রক জাতীয় (Fungal parasites) পরাসক্ত উদ্ভিদ্ জন্মাইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করা।

(২) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করা।

(৩) পানার গায়ে বিষময় দ্রব্য সেচন করা।

(৪) পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া নষ্ট করা।

প্রথম উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা কঠিন। বিষস্য বিষমৌষধম্ কথাটা সব জায়গায় খাটে না। পানা মারিবার জন্য যে ছত্রকের আমদানি করা হইবে, তাহা
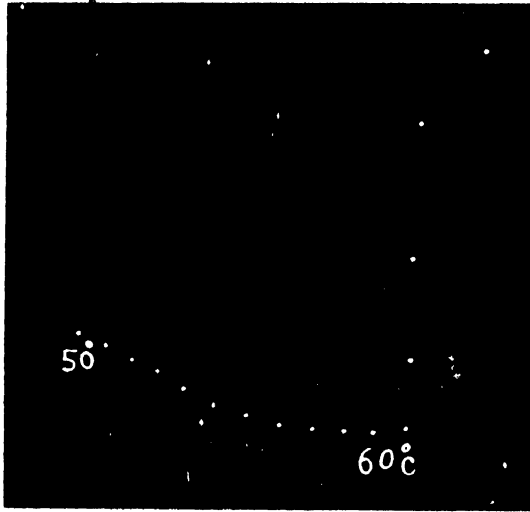
(৩) কচুরী পানার মরণ-আক্ষেপ শতাংশিক ৬০ অংশ তাপে উর্দ্ধগামী বিচ্ছিন্ন বিন্দুশ্রেণীতে পরিলক্ষিত

ধান পাট বা অপর গাছের যে ক্ষতি করিবে না, ইহা বলা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। সাপ মারিবার জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ অঞ্চলে ভারতবর্ষ হইতে বেজির আমদানি করা হইয়াছিল। ইহাতে সাপের উপদ্রব কমে নাই, কিন্তু বেজিদের উৎপাতে লোকের হাঁস বা অপর পাখী পোষা দায় হইয়াছে। কাজেই সেখানে এক উপদ্রবের শান্তি করিতে গিয়া আর-এক নূতন উপদ্রবকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। পানা মারিবার জন্য ছত্রকের আমদানি করিলে এই প্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকা বিজ্ঞানে খুবই উন্নতি দেখাইয়াছে। আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন্ বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তা ছাড়া ল্যাঙ্‌লে আকাশযান উদ্ভাবন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় আমেরিকাতে ঝুঁটা বিজ্ঞানের আড়ম্বরে আসল বিজ্ঞান চাপা পড়িতে বসিয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে কচুরী পানা নষ্ট করিবার জন্য জলীয় বাষ্প প্রস্তুত করিয়া তাহা নলের সাহায্যে গরম গরম পানার গায়ে লাগানো হইয়াছে। পানা নষ্ট করার এই পদ্ধতির প্রশংসা খবরের কাগজে অনেক পড়া গিয়াছে। বহু ব্যয়ে বর্ম্মাতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন স্থানেই সুফল বাহির হইয়া কেবল পাতাগুলাকে ছিঁড়িয়া এবং বিবর্ণ করিয়া নষ্ট করিয়াছিল মাত্র, গাছকে মারিতে পারে নাই। আশা ছিল, এই বিফলতা কর্তৃপক্ষকে ভগ্নোৎসাহ করিবে, তাঁহারা আর জলীয় বাষ্প দিয়া পানা নষ্ট করিবার পক্ষপাতী হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ অদম্য; সাধারণ উপায়ে গরম জলীয় বাষ্প দ্বারা পানা মরিল না দেখিয়া তাঁহারা কলকারখানা বসাইয়া যতদূর সম্ভব চাপ প্রয়োগে অত্যুষ্ণ জলীয় বাষ্প পানা গাছের উপরে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইহারও ফল পূর্ব্ববৎ হইল, পানা মরিল না। আমাদের দেশেও পানা মারার এই অভিনয় অনুকৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রকার একটা বৃহৎ আয়োজনে হাত দিবার পূর্ব্বে কত উষ্ণতায় পানা পুড়িয়া মরে তাহার কেহই অনুসন্ধান করিলেন না।

জখম হইলে গাছের পাতা ও ডাল প্রভৃতির অবস্থান্তর ঘটে। দেখিলেই মনে হয় বুঝি গাছটি মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এগুলি সত্যই মৃত্যুর লক্ষণ নয়। গাছের প্রকৃত মৃত্যুর লক্ষণ লইয়া বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কোন্ গাছ জীবিত অবস্থা ছাড়িয়া ঠিক কোন্ সময়ে মৃত্যুর কোঠায় পা দিল, তাহাও বৈদ্যুতিক উপায়ে সেখানে নিরূপিত হইয়াছে। কচুরী পানা মৃত্যুলেখ যন্ত্রের (Death Recorder) আধারস্থ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া জলের উষ্ণতা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। যখন জলের উষ্ণতা সেন্টিগ্রেডের ৬০ অংশ (অর্থাৎ ফাহ্‌রন্‌হিটের ১৪০ অংশ) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন যন্ত্রে পানার মৃত্যুরেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কচুরী পানা ১৪০ অংশ উত্তাপ দ্বারাই মরিয়া থাকে, তাহা পানা নাশকারী সরকারী কর্ম্মচারীরা জানিতেন না। তাঁহারা যে জলীয় বাষ্প দিয়া পানা নাশ করিতে গিয়া অজস্র অর্থ নাশ করিয়াছেন তাহা উষ্ণতার অভাবে হয় নাই। তাহার কারণ বাষ্প দ্বারা জলের নীচের শিকড় বিনষ্ট হয় নাই। কাজেই উপরকার পাতাগুলি ঝল্‌সাইয়া গেলেও পানা মরে নাই। মৃত্যুকালে যেমন প্রাণীদের সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ দেখা যায়, উদ্ভিদের মৃত্যু-সময়েও ঠিক সেই প্রকার আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মৃত্যুকালে কচুরী পানা কি প্রকারে আক্ষেপ

গাছের বৃদ্ধি নষ্ট করে এমন অনেক বিষপদার্থ আমাদের জানা আছে। বিষমিশ্র জল পিচ্‌কারীর মত কোন যন্ত্র দ্বারা পানার গায়ে ছিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা আমেরিকায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সুফল পাওয়া যায় নাই। নিবিড় পাতার আবরণ ভেদ করিয়া বিষ-জল গাছের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতে পারে নাই। সিক্ত করিলেও বিষ শিকড়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

(৪) কচুরী পানার শিকড়ে বিষপ্রয়োগের ফল।—বাম দিকের ছবিতে বিষপ্রয়োগের পূর্ব্ব অবস্থা, ডান দিকে পরের অবস্থা।

বিষপ্রয়োগের বৈজ্ঞানিক দিক্‌টা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, গরম জলীয় বাষ্প পানার পাতাই ঝল্‌সাইয়াছিল, ইহাতে পানা মরিয়াছিল, কিন্তু জলের তলার শিকড় মরে নাই,—কাজেই গাছও মরে নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গাছের পাতায় বিষ-জল ছিটাইয়া দিলে তাহাতে উহার শিকড় মরিবে কি? সর্ব্বপ্রথম এই প্রশ্নটার মীমাংসা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া ডগায় বিষ লাগাইলে তাহা গোড়ায় গিয়া পৌছিবে, ইহা অনুমান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা বিষজল ছিটাইয়া পানা মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "বসু বিজ্ঞান মন্দিরে" এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। কিপ্রকারে উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া রসপ্রবাহ চলাচল করে, তাহা ঐ-সকল গবেষণার ফলে স্পষ্ট জানা গিয়াছে। এখন সকলেই জানিয়াছেন, উদ্ভিদের দেহে বিষপ্রয়োগ করিলে, তাহা উহার ভিতরকার রসপ্রবাহের সহিত নীচু হইতে উপর দিকে চলে,—বিষ উপর হইতে নীচু দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহা কখনই ঘটে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, বিষ দিয়া পানা মারিতে হইলে বিষ-জল পানার শিকড়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই মোটা কথাটি না-জানার জন্য যে সময় ও অর্থের অপব্যয় হইয়াছে তাহা একান্ত শোচনীয়।

পূর্ব্বে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা আমরা অনুমানের পরীক্ষাতে উক্তিগুলির সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। ৪র্থ চিত্রের বাম দিকে একটি সতেজ কচুরী পানার ছবি দেওয়া হইয়াছে। শিকড়ে বিষ-জল প্রয়োগ করায় তাহার অবস্থা যে প্রকার হয়, তাহা চিত্রের দক্ষিণ অংশে অঙ্কিত আছে। শিকড়ই গোড়ার বিষ শোষণ করিয়া তাহা রসপ্রবাহের সহিত উপরকার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়াছে। তাই গাছটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীচের দিক্ হইতে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিষপ্রয়োগে কেবল যে কচুরী পানাই এই প্রকারে মৃত্যু ঘটে তাহা নয়। ৫ম চিত্রের বাম অংশে একটি সতেজ চন্দ্রমল্লিকার গাছ দণ্ডায়মান আছে। মূলে বিষ-প্রয়োগে তাহার যে দশা হইয়াছে দক্ষিণের অংশটিতে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে। রসের সহিত গোড়ার বিষ উপরের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া গাছটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

গাছের গোড়ায় বিষপ্রয়োগ না করিয়া তাহা আগায় লাগাইলে কি হয়, এখন দেখা যাউক। আগায় বিষ-জল ছিটাইয়াই কচুরীপানা মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল। লোহা বা অপর ধাতব বস্তুর আগা গরম করিলে ক্রমে তাহার গোড়া গরম হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া বিষ এই প্রকারে প্রবাহিত হয় কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হয় না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। কচুরী পানার একটি

(৫) চন্দ্রমল্লিকা গাছের নীচে বিষপ্রয়োগের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থার ছবি

করিয়া নষ্ট করাই আমাদের এখনকার কর্ত্তব্য। ইহাতে খরচপত্র আছে জানি, কিন্তু এই খরচ অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্পই হইবার কথা। তা' ছাড়া এই শ্রম ও অর্থ ব্যয় কখনই বৃথা হইবে না। দেশের টাকা প্রজাদের সাহায্যেই ব্যয়িত হইবে। কচুরী পানা নষ্ট হইলে কৃষিকার্য্যে যে লাভ হইবে তাহার তুলনায় এই ব্যয় অতি সামান্য। একই সময়ে সকলের সমবেত চেষ্টায় এক-একটি স্থান একবারে পানা-বর্জ্জিত করিতে হইবে। নচেৎ কাছাকাছি জায়গা হইতে পানা আসিয়া পরিষ্কৃত স্থান আবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কচুরী পানা যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে কৃষিজীবীরা তাহা বুঝিয়াছেন এবং ইহা বুঝিয়া যাহাতে সকলে বাধ্য হইয়া একত্র পানা-নাশের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জন্য আইন জারির প্রার্থনা করিতেছেন। আইন মাত্রেই কঠিন ও নির্ম্মম। কিন্তু যাহাতে আইনের অপব্যবহার না হয় তাহার জন্য যে সতর্কতা অবলম্বন একেবারে অসম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা আমাদের শিক্ষাদানের কাজ করিবে। সকলে একত্র খাটিয়া পরস্পরের উপকার করিবার পথ মুক্ত করিতেছি, এই ভাবটি মনে বদ্ধমূল করাকে শিক্ষাই বলিতে হয়। এই শিক্ষাতেই রাষ্ট্রীয় কার্য্যভার গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করা যায়। যাহা হউক, রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টাতেই ভবিষ্যতে উৎপাতের শান্তি হইবে।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনেক গুরুতর গবেষণা চলিতেছিল। সেই কার্য্য বন্ধ রাখিয়া আমরা কচুরী পানা সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এখন আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে যোগ দিব। কচুরী পানা সম্বন্ধে গবেষণা আজও শেষ হয় নাই, শেষ করিতে হইলে কয়েক-

ডাঁটা সমেত পাতাকে বিষ-জলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ চিত্রের বামদিকের ছবিতে তাহা অঙ্কিত আছে। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, বিষ নীচের দিকে নামে নাই,—যে পাতাটি বিষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, কেবল তাহাই মরিয়া বিবর্ণ হইয়াছিল। কেবল কচুরী পানাতেই যে ইহা দেখা যায়, তাহা নহে। চন্দ্রমল্লিকার একটা ডাঁটাকে ঠিক্ ঐ প্রকারে বিষের সংস্পর্শে রাখিয়া অবিকল ঐ ফলই পাওয়া গিয়াছিল। ৬ষ্ঠ চিত্রের দক্ষিণে তাহারই ছবি লিপিবদ্ধ আছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, কচুরী পানার বিনাশকে লোকে যে একটা মহা সমস্যা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহা মনে করার হেতু নাই। পাতা ফুল বা ফল নষ্ট করিলে ইহা মরিবে না। শিকড় দিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে,—সেই শিকড়গুলিকে নষ্ট করার চেষ্টাই এখনকার কর্ত্তব্য। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের গবর্ণমেণ্ট সাবধান হইতে পারিবেন। আশা করি, সাধারণের অর্থ আর মিথ্যা আড়ম্বরে ব্যয়িত হইবে না।

কি করিয়া পানা বিনাশের কাজ আরম্ভ করা উচিত, ইহা বোধ হয় অনেকে জানিতে চাহেন। আমার এ

তাঁহাদিগকে এই উদ্ভিদের জীবনের খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহারা কি প্রকারে বংশবিস্তার করে তাহা আরও ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার পরে দেখিতে হইবে, কচুরী পানাগুলিকে জল হইতে উঠাইয়া আমাদের কোন লাভজনক কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারা যায় কি না। এই প্রকারে
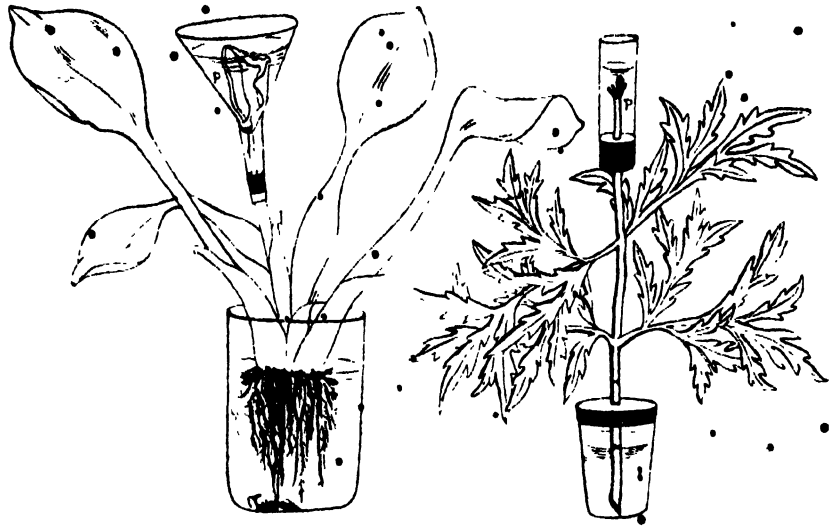
(৬) কচুরী পানা ও চন্দ্রমল্লিকা গাছের উপর হইতে বিষপ্রয়োগের ফল।—নীচের অংশে বিষের ক্রিয়া হয় না।

ব্যবহার করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা হইলে পানা তুলিবার খরচা উহাতে আদায় হইয়া যাইবে। যাঁহারা এই-সকল অনুসন্ধানের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের সত্যই সে সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে কি না, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখার প্রয়োজন হইবে। এই ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিলে চলিবে না, সুবিবেচনা করিয়া হাতে-কলমে কাজ করিবার দক্ষতা ইঁহাদের থাকা চাই। তাহা ছাড়া যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে তাঁহাদের গবেষণার কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। জনসাধারণ ও বিশেষজ্ঞেরা ইহাতে তাঁহাদের কার্য্য কোন্ পথে চলিতেছে জানিতে পারিবেন এবং কার্য্যের সমালোচনা করিবারও সুযোগ পাইবেন। সম্প্রতি একজন সহকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছেন, কচুরী পানাকে কাগজ প্রস্তুতের মুখ্য উপাদান স্বরূপে নাকি ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে-কোন উদ্ভিজ্জ বস্তুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কাগজ প্রস্তুতের উপাদান করিয়া তোলা কঠিন নয়। এই প্রক্রিয়ার খরচা উঠাইয়া সেই উপাদানে এখনকার মত সস্তায় কাগজ বিক্রয় করা সম্ভব হইবে কি না, ইহা সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আর-একটি জনরব শুনিয়াছিলাম, কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নাকি আর কতগুলি উদ্ভিজ্জ সামগ্রীকে লাভজনক কার্য্যে ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আজকাল আর তাহার কথা শুনিতে পাই না।

যাহা হউক, কচুরী পানা আমাদিগকে যে বিপদের সম্মুখীন করিয়াছে তাহা সামান্য নয়। ঘোর বিপদের সময়েই লোকে একত্র হয় এবং একত্র হইয়া বিপদ্-নিবারণের চেষ্টা করে এবং বিপদই যে মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া কাজে লাগায় তাহার আভাস তখন তাহারা প্রত্যক্ষ করে। এই মনুষ্যত্বই বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে খর্ব্ব করে এবং শেষে জয়ী হয়। অতীত যুগে এই মানুষই বহু বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া এই পৃথিবীকে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহাতে সোনার ফসল ফলাইয়াছিল। আজ আবার সেই মানুষকেই আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মপটু ও মিতব্যয়ী হইয়া এবং পরস্পরের সহিত মিলিয়া যাহা সমস্ত মানবের অকল্যাণ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। তাহাতে অকল্যাণ দূর হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবার বল সঞ্চিত হইবে।

[আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে'র বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।]

শ্রী জগদানন্দ রায়
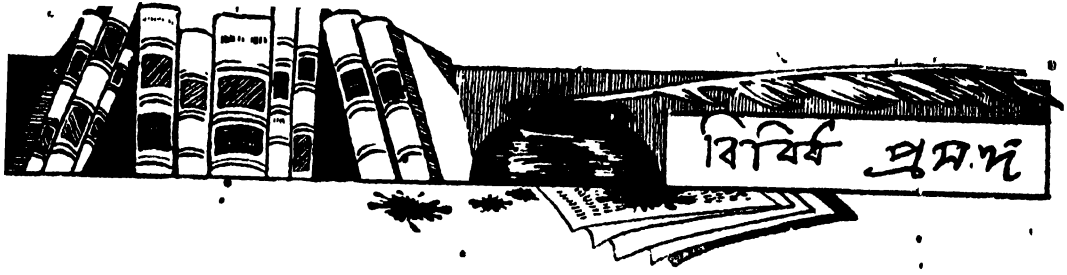
শক্তির সাধনায় ত্যাগ ও গ্রহণ

আমরা সকলেই শক্তি চাই; দৈহিক, মানসিক, হার্দিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিধ শক্তিই মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু; যদিও ইহাও সত্য যে, সকল মানুষ সকল রকম শক্তি চায় না।

দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। ইহা ব্যতিরেকে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। ভীমের মত শারীরিক বল না থাকিলেও পার্থিব নানা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ রকমের কিছু দৈহিক শক্তি না থাকিলে কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না। যাহার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই, দুর্ব্বলতা বশত যাহাকে শুইয়া থাকিতে হয়, তাহার দ্বারা মৌখিক উপদেশ দেওয়ার কাজও কতক্ষণ বা কতটুকু হইতে পারে?

কিন্তু গায়ে খুব জোর থাকিলেও, মনের হৃদয়ের আত্মার বল না থাকিলে, দেহের সে বলও পুরা কাজে লাগে না। একটা কৃশকায় ইংরেজ বালক তাহার দ্বিগুণ লম্বাচৌড়া, সুস্থসবল, পরাধীন জাতির একটা মানুষকে আঘাত করিলেও সব স্থলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত দণ্ড পায় না কেন? কারণ ঐ পরাধীন লোকটার মনের বল নাই, সাহস নাই। গায়ের জোর থাকিলেই সাহস জন্মে না। সার্কাসে যে-সব লোক ইঙ্গিত মাত্রে সিংহ বাঘ হাতীকে নানা রকমের খেলা দেখাইতে বাধ্য করে, সেই-সব মানুষের দৈহিক বল ঐ পশুগুলির চেয়ে বেশী নহে। তাহারা উহাদের উপর মানসিক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া, তাহাদের দ্বারা ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লয়। অতএব মানসিক আত্মকর্তৃত্ব, আত্মিক বল, কিসে জন্মে, তাহা স্থির করিয়া তাহার জন্যও সাধনা করিতে হইবে।

ছাড়িয়া দিয়া, এক-একটি জাতির বিষয় বিবেচনা করাই ভাল। অল্পসংখ্যক ক্ষীণদেহ দুর্ব্বল মানুষের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা খুব সাহসী বা খুব কর্ম্মিষ্ঠ। কিন্তু ক্ষীণকায়, অসুস্থ, দুর্ব্বল একটি জাতিরও নাম কেহ করিতে পারিবেন না, যাহারা সাহসী ও কর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন, কোন জাতির দৈহিক স্বাস্থ্য এবং বল না থাকিলেও তাহার মানসিক, হার্দিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের এই বাঙালী জাতিকেই ধরুন না। কোন বাঙালীর গায়ের জোর, মনের জোর, সাহস, কর্ম্মিষ্ঠতা, হৃদয়ের বল, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য নাই, ইহা সত্য নহে; কিন্তু ইহাও আমরা জানি, যে, আমরা জাতি হিসাবে, বলবান্, সাহসী, হৃদয়বান্ ও কর্ম্মিষ্ঠ জাতিদের মধ্যে পরিগণিত হই না। আমাদের হৃদয়বত্তার অভাব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা একটু অনুসন্ধান ও চিন্তা করিলেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্গে অজ্ঞতা, দুঃখদারিদ্র্য, পশু শিশু দুর্ব্বল মানুষ ও নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার, পানদোষ ও নানাবিধ পাপাচার—এ-সকলের অভাব নাই; এ-সব খুব আছে। কিন্তু এই-সকলের প্রতিকার, নিবারণ বা উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আমাদের অর্থাৎ বাঙালীর দ্বারা বাঙালীর টাকায় ও চেষ্টায় বাঙালীর দ্বারা আরব্ধ কত কাজ হইয়াছে বা হইতেছে? বঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের সমান। কিন্তু বিলাতে লোকহিতকর যত প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের দারিদ্র্য ইহার কারণ। কিন্তু, আমরা উর্ব্বর ও

থাকিয়াও গরীব কেন, এবং সেই দেশেই ইউরোপীয়, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা প্রভৃতিরা ধনী কেন, তাহার বিচার না করিয়া, জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ধনের পরিমাণ যাহা তাহারই মত লোকহিতকর সৎকাজ আমরা করি কি? স্যার্ রবার্ট গিফেনের এক বৎসরের (১৯০৩ সালের) একটা অনুমান অনুসারে বিলাতের বার্ষিক আয় ছিল একশত পঁচাত্তর কোটি পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষের ছিল ষাট কোটি পাউণ্ড। বঙ্গের লোকসংখ্যা ভারতের লোকসংখ্যার এক-সপ্তমাংশ। বঙ্গের আয় কম করিয়া ধরিয়া ভারতবর্ষের দশমাংশ মনে করিলে ছয় কোটি পাউণ্ড হয়। উহা বিলাতের আয়ের উনত্রিশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং আমরা যদি বিলাতের লোকদের সমান লোকহিতব্রত হই, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেক ২৯টি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টার জায়গায় আমাদের একটি থাকা উচিত। কিন্তু তাহা নাই। তাহাদের প্রতি একশতটিতে একটিও আমাদের নাই। লংম্যান্ কোম্পানীর প্রকাশিত শুধু লণ্ডনেরই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের তালিকার একটি পুস্তক আছে। ইহা আমরা ভুলিয়া যাই নাই, যে, মানুষ লোকহিতকর কার্য্যে টাকা দেয় আয়ের উদ্বৃত্ত হইতে, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ ধনী জাতির যেরূপ থাকে, গরীব জাতির সেরূপ থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের ধনীরাও ত তাঁহাদের সমান ধনী পাশ্চাত্য লোকদের সমান দান লোকহিতকর কার্য্যে করেন না। বিলাতের সঙ্গে তুলনা না করিয়া দেখিতে পাই, আমাদের দেশেই বিদেশীদের চালিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের অর্থে পুষ্ট যত লোকহিতকর কাজ আছে, আমাদের তাহা নাই। সাত্ত্বিকতা, আধ্যাত্মিকতা, হৃদয়বত্তা, সাত্ত্বিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, দয়া, মুখের কথায় হয় না; কাজে তাহার পরিচয় ও প্রমাণ থাকা চাই।

অনেকের ধারণা আছে, যে, বাঙালীর মত বুদ্ধিমান্ জাতি, অন্ততঃ পক্ষে বাঙালী অপেক্ষা বুদ্ধিমান জাতি, জগতে আর একটিও নাই। ইহা সত্য, যে, আমরা বুদ্ধিহীন নহি। ইহাও সত্য, যে, আমাদের মধ্যে প্রতিভাশালী কয়েকজন লোক জন্মিয়াছেন। কিন্তু সমুদয় বাঙালী জাতিকে, কিম্বা সমুদয় ভারতীয় জাতিকে বর্ত্তমান সময়ে অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী বা অপর সব সভ্য জাতিদের সমান বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী মনে করিবার কোন প্রমাণ পাইতেছি না। আমেরিকার একজন ভারতবন্ধু সাণ্ডার্ল্যাণ্ড্ সাহেব এমন একখানি বহি লিখিতে বা লিখাইতে চান যাহাতে ভারতবর্ষের মৃত ও জীবিত ঐতিহাসিক (অর্থাৎ শুধু পুরাণে ও কাব্যে বর্ণিত নহে) এমন কুড়িজন মানুষের জীবনচরিত থাকিবে যাঁহারা জগৎসভার মধ্যে বরেণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, অর্থাৎ যাঁহাদিগকে, শুধু ভারতবর্ষের নহে, জগতের মহৎ লোকদের মধ্যেও পরিগণিত করা যাইতে পারে। তিনি আমার নিকট এরূপ কুড়িজনের একটি তালিকা চাহিয়াছেন। এরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করা সহজ নহে। মনে রাখিতে হইবে, যে দেশে বনস্পতি নাই, সে দেশে ভেরেণ্ডা গাছও বৃক্ষ।

এখন ঠিক্ প্রাসঙ্গিক কথার মধ্যে আসা যাক্। জাতির বুদ্ধিমত্তার ও প্রতিভার পরিচয় দুই দিকে পাওয়া যায়। এক সাংসারিক ধনদৌলত কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে, আর-এক জ্ঞানের ও রসসৃষ্টির রাজ্যে। বাংলাদেশে পুরুষানুক্রমে যাহাদের বাস, সেই বাঙালী আমরা গরীব, এবং ক্রমশঃ আরও গরীব হইয়া যাইতেছি; কিন্তু বাংলায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে ও বিদেশ হইতে যে কোন জাতির লোক আসিতেছে, সেই খাইতে পাইতেছে, ধনী হইতেছে, অনেকে লক্ষপতি ক্রোরপতি হইতেছে, ইহা দ্বারা কি বাঙালীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? বঙ্গে সকলের চেয়ে বড় বড় কলকারখানা পাটের, কিন্তু সে কলকারখানা বাঙালীর একটিও নাই। ইহাতে কি বাঙালীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? বড় বড় কয়লার খনি ও কারবার, বড় বড় লোহা ইস্পাতের কলকারখানা, এসব কাহাদের? বাঙালীর নহে। বঙ্গের বৃহত্তম ছাপাখানা বাঙালীর নহে, সকলের চেয়ে ধনী সওদাগরেরা বাঙালী নহে। অতএব সাংসারিক হিসাবে বাঙালীকে বুদ্ধিমান্ বলা যায় না।

বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস সাহিত্য এবং সুকুমারশিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিভাশালী বাঙালী আছেন, স্বীকার করি।

কিন্তু "সবে ধন নীলমণি"র মত জন-কয়েকের নাম থোড়বড়িখাড়া ও খাড়াবড়িথোড়ের মত বার বার আস্ফালনপূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া আমরা যেন মনে না করি, যে, আমরা জগতের কোনো শ্রেষ্ঠ জাতির সমান হইয়াছি। আগে বলিয়াছি, বঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি বিলাতের সমান। আচ্ছা, বিলাতের জীবিত ও মৃত বৈজ্ঞানিক গবেষক, আবিষ্কর্ত্তা ও যন্ত্র-উদ্ভাবকদের নামের একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করুন। জীবিত ও মৃত বাঙালী বৈজ্ঞানিক গবেষক আবিষ্কর্ত্তা ও যন্ত্র-উদ্ভাবকদেরও একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। দেখিতে পাইবেন, আমাদের মানসিক দারিদ্র্য কত বেশী। আমরা কেবল নামের গুন্তিই করিতে বলিতেছি। খুব বড় বৈজ্ঞানিক কোথায় কয়জন জন্মিয়াছেন, তাহার বিচার করিতে বলিতেছি না। কোন কোন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের ভাষার অনুকরণ করিয়া আমাদের জনকয়েক মনস্বীর অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা করা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

দর্শনের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সুকুমারশিল্পের ক্ষেত্রে, এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখিতে পাইবেন, আমাদের মানসিক দারিদ্র্য কত বেশী। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের মনীষীরা বিদেশের দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া তাহাতে নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সেরূপ করিবার মত মানসিক সাহস প্রতিভা পাণ্ডিত্য আমাদের জাতির ত নাই-ই, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানরাজ্যের নানা বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষক ও লেখক অল্পস্থলেই ভারতবর্ষবংশীয়। ইউরোপের যে-সকল দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গের চেয়ে কম, তাহাদের সহিতও আমাদের তুলনা এইপ্রকারে করা যাইতে পারে। আধুনিক জাপানের বয়স আধুনিক বঙ্গের বয়স অপেক্ষা কম। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ও জ্ঞানরাজ্যে জাপানীরা ইতিমধ্যেই বাঙালী অপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে।

এইরূপ নানা কারণে, আমাদের ধারণা এই, যে, লজ্জিত হইবার কারণ যথেষ্ট আছে। 'লজ্জিত হইবার' কারণগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট করিতে পারিলে তবে আমরা একটু সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিব। গৌরব বোধ করিবার সময় পরে আসিতে পারে। কোন অবস্থাতেই কাহারও অহঙ্কৃত হওয়া উচিত নয়; আমাদেরও কখনও উচিত হইবে না।

অবস্থা ত এইরূপ। প্রতিকার কি? সে বিষয়ে ব্যবস্থা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। একেবারে অশ্রুতপূর্ব্ব রকমের নূতন কিছু এবিষয়ে আমরা বলিতে অসমর্থ। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী, প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া জীবনযাপন করিবার নিয়মাবলী, গায়ে জোর যাহাতে হয় এরূপ খাদ্য ক্রীড়া ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা—এসব আমরা বাল্যকাল হইতেই পড়িয়া ও শুনিয়া আসিতেছি। তাহার অনুসরণ না-করাতেই ত যত কুফল হয়। উপদেশ ও ব্যবস্থা পুরাতন হইলেই অকেজো হয় না। সত্য কথা বলিতে উপদেশ কত হাজার বা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কে কোথায় প্রথম দিয়াছিলেন, কেহ জানে না; কিন্তু সে উপদেশের প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে। সুস্থ থাকিবার ও গায়ে জোর করিবার প্রয়োজন এখনও আছে, চিরকাল থাকিবে। তাহার জন্য যাহা করা ও যাহা না-করা উচিত, তাহারজ্ঞান অনেকের আছে, অনেকেরই নাই। যাহা জানা আছে, তদনুসারে কাজ করিলে সুফল অনিবার্য্য।

মানসিক শক্তি লাভ ও বৃদ্ধিও অনুশীলনসাপেক্ষ। সভ্যদেশসমূহে শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইতেছে। তাহার সাহায্যে অল্পবুদ্ধি বালকবালিকাদেরও উন্নতি হইতেছে। সে-সকলের খবর আমরা রাখি না। রাখা উচিত।

অনেকের ধারণা এই, যে, সব সাহসী মানুষ জন্মাবধি সাহসী, এবং যে শৈশবে বা বাল্যে ভীরু ছিল, পরে সে সাহসী হইতে পারে না। ইহা ভুল। মহাবীর গর্ডন্ বলিয়াছেন, "যদি কেহ বলে যে সে জীবনে কখনও ভয় পায় নাই, তাহা হইলে সে সত্য কথা বলে না। আমি প্রথম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক ছুঁড়ি, তখন চোখ বুজিয়া ছুঁড়িয়া-

প্রকার দুঃখকষ্টই মানুষের সহিবার শক্তি অপেক্ষা বেশী নহে; বেশী হইলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া যায়, ও তখন কোন কষ্ট থাকে না। মৃত্যুকেই লোকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে, কিন্তু কোন-না-কোন সময়ে মৃত্যু ত হইবেই, এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং মৃত্যুভয়ে মনুষ্যোচিত আচরণ ও কাজ হইতে বিরত থাকা শুধু কাপুরুষতা নয়, বুদ্ধিহীনতাও বটে। অদৃষ্টবাদী তুর্কদের একটি প্রবাদ-বাক্য আছে, যে, "দুটি দিনে তোমার মৃত্যু হইতে পলায়ন অনাবশ্যক—যে-দিন তোমার মৃত্যু হইবে বলিয়া বিধাতাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই দিন, এবং যে-দিন নির্দ্দিষ্ট নাই, সেই দিন" (এমার্সনের ভাষায় "The appointed and the unappointed day")। আমরা অদৃষ্টবাদী হই বা না-হই, তুর্কদের এই কথাটা বুঝা খুব সহজ। যে-দিন তোমার মৃত্যু বিধিনির্দ্দিষ্ট, সেদিন তুমি পলাইলেও মরিবে; যে-দিন তোমার মরিবার কথা নয়, সেদিন তোমার উপর চারিদিক্ হইতে গুলিগোলাবৃষ্টি হইলেও তুমি বাঁচিয়া যাইবে; অতএব কোন অবস্থাতেই কোন দিনও মানুষের ভীরু হওয়া উচিত নয়। ইতিহাসে ও বহু জীবনচরিতে ইহা দেখাও যায়, যে, খুব বিপদ্ হইতেও মানুষ বাঁচিয়া যায়, আবার যখন কোন বিপদের আশঙ্কা কেহ করে নাই, তখনও অনেকে হঠাৎ মারা যায়।

প্রকৃতির নিয়ম-লঙ্ঘনে, পাপাচরণে, ব্যসনে, বিলাসিতায়, প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগে অর্থাৎ ভোগের অনাচারে, দৈহিক শক্তি যেমন কমে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিও তেমনি কমে। অনেক দুর্বৃত্ত দৈহিকবলশালী এবং অনেক কুচরিত্র বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী বা বিদ্বান্ লোকদের নাম করিয়া কেহ কেহ এ বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন। কিন্তু সে তর্কের কোন মূল্য নাই। মানুষ উত্তরাধিকার-সূত্রে এবং সামাজিক ও নৈসর্গিক পরিবেষ্টন অনুসারে যে-সব দৈহিক ও মানসিক গুণ ও শক্তির উত্তরাধিকারী হয়, সকল মানুষের তাহা সমান নহে। অনেকে জন্ম হইতে যাহা পায়, অনাচার অত্যাচার সত্ত্বেও তাহার যতটা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সদাচারী অনেকের চেয়ে, তাহাদের উত্তরাধিকারলব্ধ জন্মগত পুঁজি কম বলিয়া, বেশী। তদ্ভিন্ন দুর্বৃত্ততারও প্রকার-ভেদ আছে। যদি কোন দস্যু, বা মিথ্যাবাদী, বা প্রবঞ্চক, দৈহিক স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ না করে, তাহা হইলে তাহার গায়ের জোর কমিবার কারণ নাই। যে স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ সে প্রবঞ্চক হইলেও তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কমিবে না।

শরীরের কল্যাণের জন্য পাপাচরণ, ব্যসন, বিলাসিতা, ভোগের আতিশয্য, ত্যাগ করা প্রয়োজন? "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" "কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা আরও বাড়িতেই থাকে।" কিন্তু ভোগ মাত্রেই অনিষ্টকর ও পরিত্যাজ্য নহে। গীতার উপদেশ অনুসারে মানুষকে "যুক্তাহারবিহার" হইতে হইবে। কোন মানুষকে কোন অবস্থাতেই কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইবে না, বা কোন অবস্থাতেই তাহার উপবাসাদির প্রয়োজন নাই, এমন নহে। বুদ্ধ, ঈশা, প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও দীর্ঘকালব্যাপী উপবাসের বৃত্তান্ত দেখা যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায়, যে, তাঁহারা সারাজীবন এই ভাবে যাপন করেন নাই। এক দিকে যেমন বিলাসব্যসন তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমনি শরীর-ধারণের জন্য ও সুস্থ সবল থাকিয়া কাজ করিবার জন্য অন্য মানুষদের মত পানাহারও করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য উপযোগী ব্যবস্থা. যাহাই হউক, এক-একটি জাতির জন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটি যেমন সদুপদেশ, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিও তেমনি সদুপদেশ :—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে যেমন রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্।

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবে।

যুদ্ধের সময় মানুষকে খুব দৃঢ় খুব কঠোর হওয়া চাই; কিন্তু যাঁহারা সেকালের ও একালের যুদ্ধ-সম্ভারের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন, অভিযানের সময়েও যোদ্ধাদের আরামের ও আমোদ-আহ্লাদের এবং পড়াশুনা করিবার কিরূপ বিস্তৃত আয়োজন করা হয়। মানব-দেহ ও মানব-প্রকৃতি জটিল। উহাদের প্রত্যেক অংশের পুষ্টি ও কার্য্যক্ষম অবস্থা অন্য সব অংশের পুষ্টি ও কার্য্যক্ষম অবস্থার উপর কি ভাবে ও কি পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা না জানিয়া ও না ভাবিয়া কোন প্রকার ত্যাগমাত্রমূলক ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে। মন্দ যাহা তাহা অবশ্যই ত্যাজ্য, কিন্তু গ্রহণীয় ও ভোগ্য যাহা তাহা যথাকালে ও যথানিয়মে ভোগ্য ও গ্রহণীয়। ঐকান্তিক ত্যাগ, সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শের আকর্ষণ আছে, উহা যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা অনুসৃত হইলে কাযকরও হয়; কিন্তু উহা কোন জাতির বা মানবসমষ্টির আদর্শ হইতে পারে না। যুক্তাহারবিহার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ অনুসরণ করা সন্ন্যাসীর আদর্শ অনুসরণ করা অপেক্ষা কঠিন। এই কঠিনতর আদর্শই মানবসমষ্টির আদর্শ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে ভারতবর্ষ কোন দেশের কোন বিদ্যা জ্ঞান শিল্প সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান কখন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষের প্রভাব অন্য অনেক জাতির উপর পড়িয়াছিল, অন্য অনেক জাতির প্রভাব ভারতবর্ষের উপর পড়িয়াছিল; এইরূপে ভারতবর্ষ বড় হইয়াছিল। অতএব স্বদেশ ও বিদেশের মন্দ যাহা তাহা ত্যাগ করিব বা লইব না, ভাল যাহা তাহা সংরক্ষণ করিব ও লইব,—এই সোজা কথাই প্রকৃত আদর্শের সূচনা করে বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষের জ্ঞান সভ্যতা ও আদর্শ ছাড়া আর কিছু গ্রহণীয় নহে, কিম্বা তাহার মধ্যে পরিবর্ত্তনীয় ও বর্জ্জনীয় কিছু নাই, ইহা ঠিক কথা নহে। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সংজ্ঞানির্দ্দেশও বড় সোজা নয়। ভারতবর্ষের ইস্‌লামিক সভ্যতা শিল্প সাহিত্য জীবনযাপনরীতি বিদেশ হইতে আগত, যদিও এদেশে তাহার পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। ইহাকে কেহ বাদ দিতে চান কিম্বা পারেন কি? তেমনি, অধুনা বিদেশ হইতে ভাল কিছু আসিলে ও পাইলে তাহাকে কেন বাদ দিব, কেন বর্জ্জন করিব? মনের ও আত্মার কপাট বন্ধ রাখিব কেন? মন্দের ভয়ে বন্ধ রাখিলে ভালও ত আসিবে না!

—

বিলাতে বাঙালী এঞ্জিনীয়ার

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে বিলাতে স্বাধীনভাবে পরামর্শদাতা (consulting) এঞ্জিনীয়ারের কাজ করেন। তিনি বৈদ্যুতিক (electrical), যান্ত্রিক (mechanical) এবং সিবিল্, তিন প্রকার এঞ্জিনীয়ারিং কার্য্যেই বিশেষ পারদর্শী। মিঃ জে আর্ সার্জ্যাণ্ট্‌সন্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ইণ্ডিয়া নামক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের আগষ্ট সংখ্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, ছবি, এবং তাঁহার কৃতিত্বের একটি নিদর্শনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। আমরা যে ছবি দিলাম, তাহা ঐ ছবির প্রতিলিপি। বীরেন্দ্রনাথের বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। তিনি কলিকাতা ও গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি বিলাতে যে-যে কাজ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। গ্লাস্‌গো ও সাউথ্ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের এসিষ্টাণ্ট্ এঞ্জিনীয়ার, ওয়েষ্ট্ হার্ট্‌লপুল টেক্‌নিক্যাল কলেজের শিক্ষাদাতা, পীটার লিণ্ড্ এণ্ড্ কোম্পানীর ও ওয়ের শিপ্ বিল্ডিং কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিনীয়ার, ওয়েষ্ট্-মিন্‌ষ্টারের অনেকগুলি কোম্পানীর নির্ম্মাণকার্য্যে পরামর্শ-দাতা বিশেষজ্ঞ। তিনি এক্ষণে ইণ্টার্‌ন্যাশন্যাল্ এঞ্জিনী-য়ার্স সীণ্ডিকেট এবং ইকনমিক্ ষ্ট্রাক্‌চর্স কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। বিলাতে তিনি নানা এঞ্জিনীয়ারিং কারখানার নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং তদ্ভিন্ন গ্যাস্, জল, ও বাষ্প সরবরাহের কারখানা এবং ড্রেন্ নির্ম্মাণে বহুস্থানে পরামর্শদাতার কাজ করিয়াছেন। তিনি এঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে অনেক

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে

তালিকা চান, বীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার নক্‌সা প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং তদনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই গ্যাসের কারখানার মোট ব্যয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইবে। ইহার মধ্যে নানাপ্রকারের কংক্রীট্‌ ও ইস্পাতের ইমারৎ, রেলওয়ে লাইন, ইত্যাদি আছে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্‌ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক বলেন :—

"It may be said that Mr. Dey is the first Indian Consulting Engineer who has achieved a success of this sort in Great Britain, and his record confirms our contention that the purely Indian Engineer has a chance of achieving the highest position in his profession if he will only give his utmost courage, ability and industry to winning the laurels which await him ...we would like to take this opportunity of congratulating him upon his most important achievement, and, what is even more dear to our hearts, we would like to record his success as an encouragement and an incentive to others of his nationality to follow in his footsteps. It is always relatively easy for others to follow where a pioneer has led, and Mr. Dey's success in securing and carrying through such an important undertaking as the extension of the Glasgow Gas Works is truly an encouraging and inspiring achievement."

প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এক্ষণে "Modern Municipal Engineering Practice" নামক একখানি বৃহৎ চারি ভল্যুমে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য অনেকগুলি ফেরো-কংক্রীটের জাহাজ, বজ্‌রা ও পণ্টুনের নক্‌সা প্রস্তুত করেন ও তদনুসারে তাহা নির্ম্মিত হয়, তদ্ভিন্ন তিনি রণতরী বিভাগের ও অন্যান্য অনেক সরকারী কন্‌ট্র্যাক্টের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্‌ ইণ্ডিয়াতে তাঁহার যে বৃহৎ কাজটির বিস্তারিত সচিত্র বৃত্তান্ত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা গ্লাস্‌গো শহরের মিউনিসিপ্যালিটির সুবৃহৎ গ্যাস সরবরাহের কারখানা। এই শহরের লোকসংখ্যা এগার লক্ষের উপর। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে উহার মিউনিসিপালিটী গ্যাসের বন্দোবস্ত করাইবার নিমিত্ত যে-সব এঞ্জিনীয়ারের নিকট হইতে নক্‌সা ও আনুমানিক ব্যয়ের

পরলোকগত মতিলাল ঘোষ

ভারতবর্ষের প্রবীণতম সংবাদপত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সুস্থসবল মানুষ ছিলেন না, অথচ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুশয্যাতে যখন তিনি শয়ান, তখনও তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস লক্ষিত হয় নাই। ইহা হইতে মনে হয়, যে, দীর্ঘ কর্ম্মিষ্ঠ জীবনের নিগূঢ় রহস্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ঘোষ মহাশয়ের জীবন হইতে অন্য অসুস্থ ও কৃশকায় ব্যক্তিরা উৎসাহিত হইতে পারেন। স্বদেশের কল্যাণার্থ পরিশ্রম করিলে ও তন্নিমিত্ত দীর্ঘজীবী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তাঁহাদেরও আয়ু দীর্ঘ হইতে পারে। ঘোষ মহাশয়ের দীর্ঘজীবনের

পরলোকগত মতিলাল ঘোষ

মূলে সম্ভবতঃ এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল ; কেননা, তিনি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থায় কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইতে হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন যে, আরো কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত দেশের কিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিতেন।

মতিলাল ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতারা যশোর জেলার একটি ছোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মাতা অমৃতময়ীর নাম অনুসারে উহার অমৃতবাজার নামকরণ হয়। প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকা ঐ গ্রাম হইতেই বাংলা সাপ্তাহিক রূপে কিছুকাল প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঘোষ ভ্রাতাদিগের মাতৃদেবীর উল্লেখ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদেরও উল্লেখ এই পুস্তকে আছে। তাহার দুই-একটি স্থান হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"একবার রাত্রি দুইটার সময় উপেন সপরিবারে পলাইয়া কলিকাতা হইতে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ীতে যান। তখন শিশিরবাবুরা অগ্রসর সংস্কারক, ও ব্রাহ্ম ছিলেন।"

"তখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের মধ্যে 'আনন্দবাদী দল' নামে একটি দল হইয়াছিল, অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই দলের নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার একটু ইতিবৃত্ত আছে।... কেশববাবুর দলের লোকদিগের যীশু-খ্রীষ্টের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক হইয়া পড়ে।...ইহার ফলস্বরূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মভাব যে অনুতাপ ও প্রার্থনা, তাহা উন্নতিশীলদলকে প্রবলরূপে অধিকার করে ; পাপবোধ নব্য ব্রাহ্মদের সকলের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে ; অনুতাপব্যঞ্জক সংগীতাদি রচিত হইতে থাকে।......

"যখন একদিকে অনুতাপ, ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তখন অপরদিকে ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল লোক বলিতে লাগিলেন, 'এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন? আনন্দময়ের প্রেমমুখ দেখিয়া আনন্দিত হও।' এই দলকে ব্রাহ্মেরা তখন 'আনন্দবাদী দল' বলিতেন। শিশিরবাবু ইহাঁদের অগ্রণী ছিলেন। নরপূজার হাঙ্গামা দেখিয়া ইহাঁরা আমাদের ভিতর হইতে সরিয়া পড়িলেন। ৮৬৯ সালের মাঘোৎসবে একজন মুঙ্গের হইতে সমাগত ব্রাহ্ম, উপাসনান্তে —র চরণে ধরিয়া কি প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিশিরবাবুর দাদা হেমন্তবাবু রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।...

"ইহার পরে অমৃতবাজারের দলকে আর আমাদের উপাসনাতে বড় আসিতে দেখিতাম না। কলিকাতা পুটলডাঙ্গা, পটুয়াটোলা লেনে যশোরের লোকদের এক বাসা ছিল। শিশিরবাবু সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতেন। তিনি আসিলেই আনন্দবাদী দলের সমাগম হইত। তাঁহারা আমাকে ডাকিতেন, সে সময়ে প্রধানতঃ সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইত। শিশিরবাবু চমৎকার কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাঁহার কীর্ত্তনে আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত।

"একদিকে যেমন অনুতাপ ও ক্রন্দন শুনিতাম, অপরদিকে ইহাঁদের কাছে গিয়া আনন্দ ও নৃত্য দেখিতাম, তখন ইহা বেশ লাগিত। শিশিরবাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। ইহার পরেই তাঁহারা কলিকাতা হিদেরাম বাঁড়ুয্যের গলিতে আসিয়া বাসা করিয়া থাকেন। সে সময়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতাম। শিশিরবাবুর অমায়িকতা দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। এক দিনের কথা স্মরণ আছে, তিনি সেদিন আমাকে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'কি পরের মত বাহিরে বসে খাবে! চল, রান্নাঘরে গিয়ে মাকে বলি, হাঁড়ি হতে গরম গরম ভাত তরকারি মার হাতে না খেলে সুখ হয় না।' এই বলিয়া দুজনে গিয়া রান্নাঘরে আহারে বসিলাম। যতদুর স্মরণ হয়, তাঁর জননী গরম গরম ভাত তরকারি দিতে লাগিলেন, ও আমরা আহার করিতে লাগিলাম। ইহার পর হইতে শিশিরবাবুরা অল্পে অল্পে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে সরিয়া পড়িলেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "শিশিরবাবুদের ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত"। বস্তুতঃ মতিলাল ঘোষ মহাশয় যেরূপ ভ্রাতৃগতপ্রাণ ছিলেন, তেমন প্রায় দেখা যায় না। আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রজ শিশিরকুমারের গুণকীর্ত্তন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস এবং মতিলাল ঘোষের জীবনচরিত অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ, উভয়কে প্রায় এক বলিলেও চলে। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে

কখানি গ্রাম্য বাংলা সাপ্তাহিক ছিল। কাঠের প্রেসে পা হইত। ঘোষ ভাইয়েরা নিজেরাই কম্পোজিটর মুদ্রাকর ছিলেন, নিজেরাই কালী প্রস্তুত করিতেন। াহারা সাহসী, তেজীয়ান্ ও গরীবের উপর অত্যাচার মনে বদ্ধপরিকর ছিলেন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের ক্রোধভাজন ন। সেকালে জেলে যাওয়ার ভয় বেশী ছিল; এখনার মত দলে দলে ভদ্রসন্তানদের জেলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তখন দেখা যাইত না। সেই যুগেও ঘোষ ভ্রাতারা কারাদণ্ড-ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া সাহসের সহিত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লিখিতেন। ফলে তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা হয়। তাহাতে তাঁহারা বেকসুর খালাস পাইলেও সর্ব্বস্বান্ত হন। অতঃপর তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া এখান হইতে তাঁহাদের কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। দেশভাষায় লিখিত অমৃতবাজার পত্রিকা প্রমুখ খবরের কাগজগুলিকে জব্দ করিবার জন্য যখন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেস্ আইন হয়, তখন শিশির-বাবুরা কোন প্রকারে কিছু ইংরেজী হরফ সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাদের কাগজখানিকে আইন পাস্ হইবার পরের সংখ্যা হইতেই ইংরেজীতে বাহির করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ব্যর্থকাম ও হতভম্ব করেন। ইহাতে তাঁহারা খুব তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষে স্বাজাতিকতার উদ্বোধক ও প্রচারক অনেক খবরের কাগজ দেখা দিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে অমৃতবাজার সকলের অগ্রণী। স্বাজাতিকতা প্রচারের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার মত ভারতব্যাপী খ্যাতি সেকালে কোন কাগজের ছিল না। এইজন্য শিশিরকুমার ঘোষ এবং পরে মতিলাল ঘোষকে দেখিবার ব্যগ্রতা বঙ্গের মফস্বলের ও বঙ্গের বাহিরেসব প্রদেশের লোকদের খুবই ছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকার এই একটি বিশেষত্ব বরাবরই ছিল, এবং এখনও আছে, যে, কোথাও কোন রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা অত্যাচার হইলে, কোন বিচারবিভ্রাট ঘটিলে, এই কাগজে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও দোষ উদ্ঘাটন হইয়া থাকে। এই কারণে কয়েকবার অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কোন আইন বা অন্যবিধ কাজের দ্বারা দেশের অনিষ্ট-সম্ভাবনা হইলে, অমৃতবাজার তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন, বলিয়া ইংরেজেরা মনে করেন, যে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদিতা করাই অমৃতবাজারের ধর্ম্ম। সে কথা ঠিক সত্য না হইলেও ইহা ঠিক যে গবর্ণমেণ্টকে খুসি করা অমৃতবাজারের উদ্দেশ্য নহে, কখনও ছিল না।

দেশী রাজাদের উপর রেসিডেণ্ট প্রভৃতির অত্যাচার জুলুম জবরদস্তি নিবারণের জন্য অমৃতবাজার যাহা করিয়াছেন, তাহাও ঘোষ ভ্রাতাদের একটি কীর্ত্তি।

বস্তুতঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও রোগজীর্ণ অবস্থার প্রতিকার বিষয়ে অমৃতবাজারের চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য ও চিরস্মরণীয়।

আমরা পুনঃ পুনঃ অমৃতবাজারেরই উল্লেখ করিতেছি যে জন্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মতি-বাবুর ও কাগজখানির জীবন প্রায় অভিন্ন। প্রবীণ ও বিচক্ষণ সম্পাদকেরা কেবলমাত্র কাগজ চালাইলেও নেতৃস্থানীয় হইতে পারেন। কিন্তু অনেক সম্পাদক কাগজ চালান ছাড়া অন্য প্রকারেও নেতৃত্বাভিলাষী হইয়া থাকেন। মতি-বাবুর প্রায় সমুদয় শক্তি অমৃতবাজারের উন্নতিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল। তিনি সুরসিক ছিলেন। তোফা ইংরেজী লিখিবার উচ্চাভিলাষ তাঁহার ছিল না। বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া সহজ ভাষায় তিনি লিখিতেন, এবং তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইত।

তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ঘোষ ভ্রাতাদের বিশেষতঃ শিশিরকুমারের চেষ্টায় বৈষ্ণব পুস্তক-সকলের প্রচার ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি দেশহিত-চেষ্টায় নিযুক্ত সকল কর্ম্মীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি অতি অল্প কাজ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে-সব মহিলা ও পুরুষ কর্ম্মী দেশহিতে রত আছেন, তিনি দেশহিতার্থে যাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা তাহা করিবেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুশয্যার একটি শেষ আশা ও অভিলাষ। ইঁহাদের মধ্যে মহিলাদের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বা সদস্যদের মধ্যে শতকরা আশী জন নির্ব্বাচিত হইবেন, যাঁহারা কোন নির্ব্বাচনের তারিখের অন্যূন সাত বৎসর আগে এম্-এ, এম্-এস্‌সী, এম্-এল্, ডি-এস্‌সী, পীএইচ্-ডি, ডি-এল্, এম্-ডি, ইত্যাদি উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারা এই শতকরা আশীজনকে নির্ব্বাচন করিবেন, এবং নির্ব্বাচকদিগকে কোন ফী দিতে হইবে না।

শতকরা অন্যূন আশীজন ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, ইহা আমাদেরও মত। এই নির্ব্বাচ্য ফেলোরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হউন, ইহাও আমরা চাই। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর বা কতবৎসরের পুরাতন গ্রাজুয়েটরা নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবেন, সে-বিষয়ে আমরা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সহিত একমত নহি। উক্ত সভার প্রস্তাব নির্ব্বাচকসমষ্টিকে বড় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিতে চায়। বর্ত্তমানে নাম-রেজিষ্টারী-করা গ্রাজুয়েটরা যত ফেলো নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম বটে। কিন্তু অন্য দিকে, মাষ্টার বা ডক্টর্ উপাধিধারী যে-কোন গ্রাজুয়েট্ নির্দ্দিষ্ট ফী দিয়া রেজিষ্টারীভুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের সাত বৎসরের কিম্বা এমন কি এক বৎসরেরও পুরাতন হওয়ার প্রয়োজন নাই। তদ্ভিন্ন দশ বৎসরের পুরাতন যে-কোন ব্যাচিলারও (অর্থাৎ বি-এ, বি-এল্, এম্-বি, বি-ই, বি-এস্‌সীও) রেজিষ্টারীভুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, বর্ত্তমানে যে-সব গ্রাজুয়েট্ নির্ব্বাচক হইতে পারেন, তাঁহাদের অনেককে নির্ব্বাচন-অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন, বুঝি না। বরং এখন যাঁহাদের সে অধিকার নাই, তাঁহাদেরও সেই অধিকার পাওয়া উচিত মনে করি।

আমাদের মতে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচিলার মাষ্টার বা ডক্টর উপাধিবিশিষ্ট যে-কোন গ্রাজুয়েট্ ফেলো-নির্ব্বাচনের সময় ছাত্রত্ব অতিক্রম বা ত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিবার জন্য কোন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিক্ষালাভ করিতেছেন না, তাঁহারই নির্ব্বাচক হইবার অধিকার থাকা উচিত। যদি ইহা প্রমাণ হয়, যে, এরূপ ব্যবস্থা করিলে নির্ব্বাচক-সংখ্যা এত বেশী হইবে, যে, নির্ব্বাচন-ব্যাপার সুপরিচালিত হওয়ার পক্ষে বাধা জন্মিবে (যদিও আমাদের এরূপ কোন আশঙ্কা নাই, কারণ রাজনৈতিক নির্ব্বাচনে লক্ষ লক্ষ লোক নির্ব্বাচক হইয়া থাকেন), তাহা হইলে কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যাইতে পারে। তাহা এই:—"মাষ্টার্ ও ডক্টর উপাধিযুক্ত সকল গ্রাজুয়েট্, এবং নির্ব্বাচনের তারিখের অন্যূন পাঁচ বৎসর আগে ব্যাচিলার উপাধিপ্রাপ্ত সকল গ্রাজুয়েট্ নির্ব্বাচক হইতে পারিবেন, কিন্তু কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত শিক্ষাধীন থাকিলে তৎকালে তাঁহার নির্ব্বাচনাধিকার জন্মিবে না ও থাকিবে না।"

ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যাহারা সভ্য নির্ব্বাচন করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইতেও পারেন, এবং তাঁহাদের নির্ব্বাচিত সভ্যেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের আলোচনা করেন ও করিবার অধিকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নূতন আইন প্রণয়ন পর্য্যন্তও তাঁহারা করিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্থাৎ উহার সদস্যসমষ্টির উপর কোন কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপকত্ব করিতে অধিকারী, তাহাদের নির্ব্বাচকেরা নিরক্ষর হইলেও চলে, এমন কি ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত এই মুরুব্বি সভ্যেরাও শিক্ষিত না হইতে পারেন। অথচ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা বলিতেছেন, যে, যাহাদের উপর তাঁহারা মুরুব্বিআনা করেন, তাহাদের নির্ব্বাচকদের সাত বৎসরের পুরানো মাষ্টার্ বা ডক্টর্ উপাধিধারী না হইলে চলিবে না। ইহা সঙ্গত নহে।

সত্য বটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ যাহারা করিবেন, তাহাদের অর্থাৎ ফেলোদের কোন-না-কোন বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া উচিত; ব্যবস্থাপক সভায় যেরূপ অশিক্ষিত লোকদেরও সভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট তেমন লোক ফেলো রূপে ঢুকিলে তাহা হাস্যকর ও অনিষ্টকর হইবে। কিন্তু

ফেলোদের যোগ্যতা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা ত হইতেছে না; আলোচনা হইতেছে ফেলোদের নির্ব্বাচকদের কিরূপ যোগ্যতা থাকা উচিত সেই বিষয়ের। আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এস্‌সী, বি-এল, এম্-বি, বি-ইদেরও এই যোগ্যতা যথেষ্ট আছে।

আগে আগে বাংলাদেশে কখন কখন গ্রাজুয়েট্ সভা গঠিত হইয়াছিল। এরূপ একটি সভা আবার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে-সব গ্রাজুয়েট্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্ছেদ চান না, ইহার সংরক্ষণ সংস্কার ও উন্নতি চান, তাঁহাদের সকলেরই এইরূপ সভার সভ্য হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণ সংস্কার ও উন্নতির জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে প্রস্তুত না থাকিলে শুধু ইহার উহার তাহার দোষ দেখান ব্যর্থ ও অনিষ্টকর। তাই আমরা বলি, একটি গ্রাজুয়েট্ সভা প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হউক।

নির্ব্বাচকদের নিকট হইতে কোন ফী আদায় করা হইবে না, এই ব্যবস্থাও ভাল। নিখিলভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্ব্বাচনে এবং মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ ও লোকাল বোর্ড্-সমূহের নির্ব্বাচনে, নির্ব্বাচকদের তালিকা প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে হয়, তাহাতে কিছু ব্যয়ও হয়, কিন্তু সেই ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্ব্বাচকদিগের নিকট হইতে কোন ফী আদায় করা হয় না। কথা উঠিতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত গবর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক কোন গবর্ণমেণ্টের মত ধনী নহেন। ইহা সত্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বৎসরে কুড়ি একুশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। অনেক মিউনিসিপালিটির ব্যয় এত নহে; কিন্তু তাহারাও নির্ব্বাচকদিগের নিকট হইতে ফী লয় না। যাহা হউক, যদি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব্বাচক-গ্রাজুয়েটদের নামের তালিকা প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের এই ব্যয় দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট টাকা না দিলে, বিশ্ববিদ্যালয় চারি আনা, আট আনা বা একটাকা প্রত্যেক নির্ব্বাচকের নিকট হইতে প্রতিবৎসর আদায় করিতে পারেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়

একাউণ্ট্যাণ্ট্-জেনেরালের তত্ত্বাবধানে, কলিকাতার আউট্‌সাইড একাউণ্ট্‌সের পরীক্ষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন। তদনুসারে একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনেরাল বাংলাগবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। তদ্বিষয়ে বাংলাগবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন:—

"A report has been received from the Accountant-General, Bengal, and it reveals the fact that the finansial administration of the University has hitherto been anything but satisfactory."

একাউণ্ট্যাণ্ট্-জেনেরালের এই রিপোর্ট ৯ই সেপ্টেম্বরের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ মুদ্রিত করিয়াছেন। হিসাব-বিভাগের এই রিপোর্টের কোন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, অনুবাদ ইচ্ছা করিয়াই করিব না; কিন্তু সমুদয় রিপোর্টটি না পড়িলে ব্যাপারটি সম্বন্ধে ঠিক ধারণা জন্মিবে না।

"The average annual increase of receipts of all the fund heads together was Rs. 1,00,000 against average annual growth of expenditure of Rs. 153,000. Thus on an average the University overspent by Rs. 33,000 a year ["during the ten years 1911-12 to 1920-21"]. The overspending is chiefly noticeable since 1917-18, when the post-graduate classes were opened. In the year 1917-18 in which the post-graduate studies were taken up, the surplus came down from Rs. 2,10,000 of the previous year to Rs. 94,000 only. The years 1918-19, 1919-20, and 1920-21 recorded a progressive deficit of Rs. 38,000, Rs. 1,77,000 and Rs. 2,08,000. The deficit for 1921-22 is about Rs. 3,47,000, as bills for about Rs. 2,97,000 could not be paid for want of funds."

এত বৎসর হইতে ঘাট্‌তি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত কর্ত্তৃপক্ষ সাবধান হন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে যাহা বলিবার আছে, একাউণ্ট্যাণ্ট্-জেনেরাল তাহাও বলিয়াছেন। যথা—

"One of the chief causes for the financial trouble is the drop in the receipts of the fee fund during 1921-22 by about two lakhs as compared with the receipts of 1920-21, due to circumstances on which the

University had no control. The shortage comes to about three lakhs, if the progressive increase of previous years is taken into account."

ইহা স্বীকার করিলেও আড়াই লক্ষ টাকা ঘাটতি যথেচ্ছ খরচের জন্ম হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিরূপ বেবন্দোবস্ত হেতু কিরূপ যথেচ্ছ খরচ হয়, তাহার কিছু নমুনা হিসাব-বিভাগের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"There is a Board of Accounts appointed by the Senate whose functions are to prepare the Budget estimate, examine and audit the University accounts, consider ways and means and the financial effect of any important measures in contemplation and make recommendations relating to the finance of the University. Had sufficient control been exercised from the very beginning the expenditure on post-graduate studies would have been kept within the income of the University. In 1916 they prepared detailed rules for the preparation of Budget estimates and scrutiny of accounts, but the rules were not fully approved of by the syndicate, nor any effect given to such of the rules as were accepted......Their [the Board's] scrutiny of accounts was not sufficient, as they hardly met more than twice a year from 1917 to 1921.

হিসাব-বিভাগের রিপোর্টে দেখিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচের দায়িত্ব কোন্ কর্ম্মচারীর তৎসম্বন্ধে কোন নিয়মের বহি নাই।

"There is no manual for the guidance of the office or for fixing the financial responsibility of the officer dealing with University funds. The different spending departments of the University pass the bills as they come, under an impression that any scrutiny or budget check would be made by the Registrar. The secretary, post-graduate studies in science, did not know whether the grants passed by the Council were ultimately sanctioned by the Senate, although he continued to pass the bills of the department.

এইরূপ বেবন্দোবস্তের দরুন কিরূপে বজেটের নিয়মাবলী লঙ্ঘিত হয়, এবং যথেচ্ছ খরচ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত রিপোর্টে আছে।

"Professors of Science in the Science College place orders in England for the apparatus or other articles required for lecture and research work, disregarding the sanctioned grants. When the bills come, they are forwarded to the secretary of the post-graduate studies in science, who passes them also without any reference to the budget grants and forwards them on to the Registrar for payment. The Board of Accounts recorded a resolution at their meeting of November 8, 1918, to the effect that all orders for the purchase within the Budget grants should be sent to the Registrar or the Secretary of the Council of Postgraduate Teaching in Science. In spite of that expenditure on equipment and working expenses largely exceeded the Budget grant of 1920-21 as shown below :—

	Grant	Expenditure
Physics	Rs. 8,000	Rs. 17,207
Chemistry	„ 8,000	„ 26,171
Botany	„ 8,000	„ 14,678

No attempt is made to watch the progress of receipts, on the regular flow of which the expenditure depends. The result is that on several occasions the accumulated balances of the different solvent funds are drawn upon to meet the current expenditure.

তাহার পর রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির আয়-ব্যয়ের আনুমানিক তালিকা বা বজেট বর্ষারম্ভের আগেই প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের দ্বারা মঞ্জুর করান হয়। তাহাতে মঞ্জুরী অনুসারে ব্যয় নিয়মিত হয়। তদ্ভিন্ন কর্ম্মচারীরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে থাকে, যে, যে-যে প্রকারে যত আয় হইবার অনুমান আছে, তাহা হইতেছে কি না। না হইলে যথাসময়ে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা হয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বজেট মঞ্জুর অনেক বিলম্বে হয়, এবং বিনা মঞ্জুরীতে খরচ চলিতে থাকে।

"The Calcutta University, on the other hand, allows the expenditure to go on for months against no grant sanctioned by the Senate, and does not prepare an estimate till the year sufficiently advances. Estimate for 1919-20 was passed by the Senate on November 29, 1919, 1920-21 on December 4, 1920, and 1921-22, on March 4, 1922. Thus the expenditure up to those dates was incurred without any sanctioned grant.

১৯১৭ সালে পরীক্ষার প্রশ্ন পরীক্ষার আগেই বাহির হইয়া যাওয়ায় পুনর্ব্বার পরীক্ষা গ্রহণে বিস্তর

আমরা দুই, ওরা দুধ খায় !

ইংরেজ-জাপানে বন্ধুত্ব এশিয়ায় পরস্পরের স্বার্থ-সংরক্ষার খাতিরে—কিন্তু ফল হইতেছে জাপানের সাইবেরিয়া আর চীন সাম্রাজ্যের খানিক খানিক বেদখল করিবার সুযোগ লাভ ও ইংরেজের মর্ম্মজ্বালা !

খরচ হয়। তজ্জন্য ১৯১৭-১৮ সালে বার্ষিক মোটা-মুটি ছত্রিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলার ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত হন। অথচ রেজিষ্ট্রারের আফিসের কোনি প্রকার কর্ম্মচারী হ্রাস করা হয় নাই, যদিও সে-পর্য্যন্ত ঐ আফিসই সব কাজ করিয়া আসিতেছিল !

বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অনাবশ্যক অধ্যাপক-বাহুল্য আছে, তেমনি অনাবশ্যক কেরানী-বাহুল্য আছে। অনেক লোককে হাতে রাখিতে হইলে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে চাকরী দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু টাকা দিবার গৌরীসেনটি কোথায় ?

একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনেরাল্ বিশৃঙ্খলা ও অমিতব্যয়ের প্রতিকারের জন্য নানা প্রকার উপায় সূচনা করিয়াছেন।
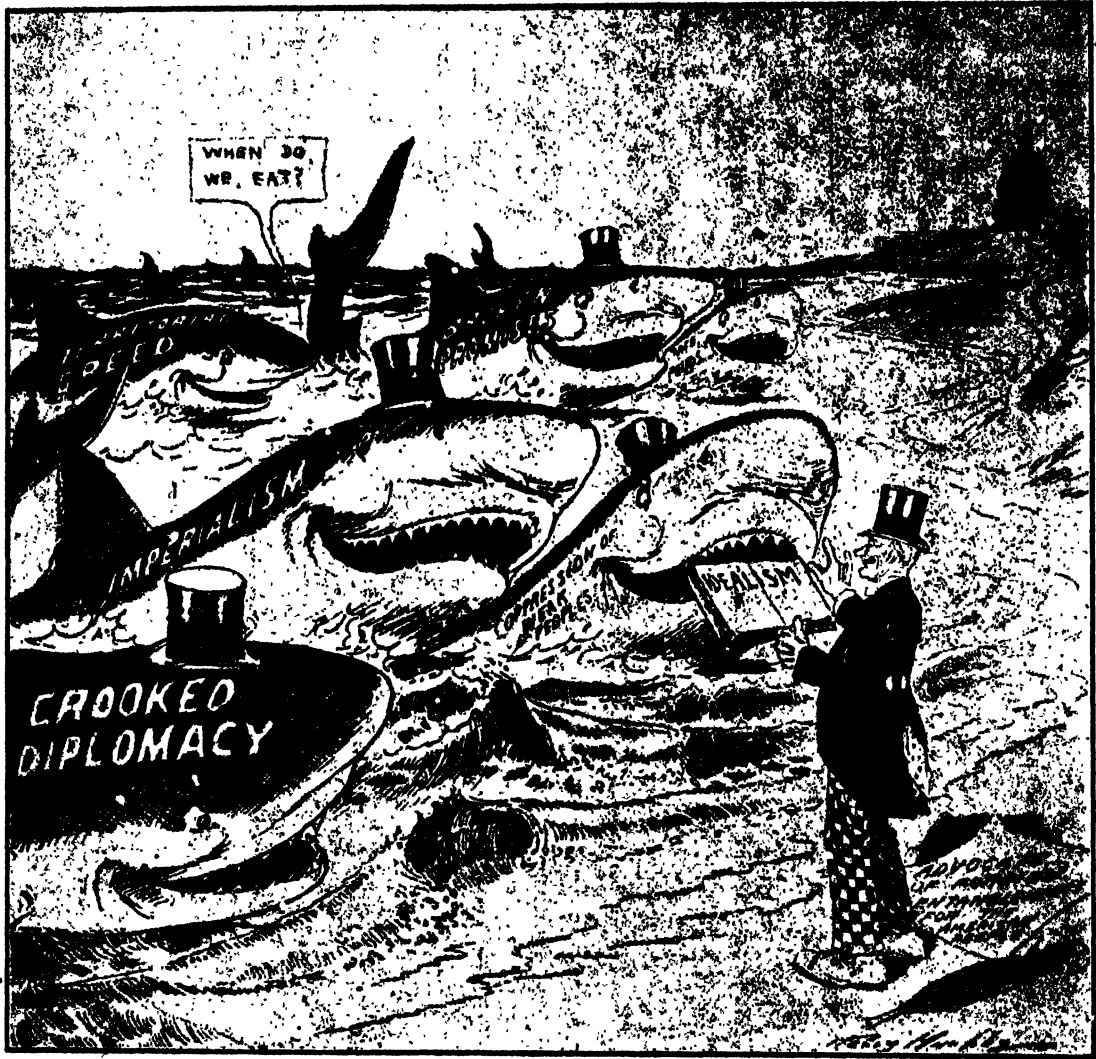
হাঙ্গরের স্বভাব সংশোধন।

শামু-খুড়ো (আমেরিকা) হিতোপদেশ খুলিয়া বাণিজ্যলোভ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সাম্রাজ্য লোলুপতা, দুর্ব্বলদলন, বক্রকূটনীতি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হাঙ্গরপ্রকৃতির পাশ্চাত্য রাজ্যশক্তিদের সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সেক্রেটারীর পত্রের অনেকটা তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়কে লেখা হইয়াছে, যে, যে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তগুলি অনুসারে চলিতে রাজী হইলেই তাহা দেওয়া হইবে। তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পরে লিখিতেছি।

গোপনীয় কাগজ প্রকাশ

৭ই ও ৯ই সেপ্টেম্বরের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে লিখিত সরকারী চিঠি এবং একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনের‍্যালের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় সেনেটের এক সভায় বিস্ময় ক্ষোভ ক্রোধ আদি প্রকাশিত হয়, এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত করিয়া এরূপ গোপনীয় জিনিষ প্রকাশ বন্ধ করিবার উপায় করিতে বলা হয়। এরূপ আশা করা যাইতে পারে কি,

যে, কোন "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি" "সঞ্জীবনী"তে এই-সব জল্পনা-কল্পনার শেষ ফলটা ছাপাইয়া দিবেন?

কিন্তু এসব অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। আসল কথা এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপন করিবার দিকে এত ঝোঁক কেন? পরীক্ষা হইয়া যাইবার আগে পরীক্ষার প্রশ্ন, এবং পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্ব্বে ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বর, অবশ্য গোপনীয়; পরে সেগুলিও প্রকাশিতব্য। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জিনিষই অবাধে প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যে যে-সব ও যেরূপ জিনিষ খবরের কাগজে পাঠান বা বিক্রয়ার্থ রাখেন, বিশ্ববিদ্যালয় সেরূপ জিনিষও লুকাইয়া রাখিতে চান, এবং কেহ বাহির করিলে রাগ করেন। গোপন করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল হইবার কারণ কি? পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলের সঙ্গে উত্তীর্ণ প্রত্যেক ছাত্রের প্রাপ্ত মোট নম্বর ছাপিয়া দেওয়া হয়।

ব্যথিতা

আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্যের সর্ত্ত

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সেক্রেটারী বিশ্ববিদ্যালয়কে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা সদ্ভাবপূর্ণ, এবং তাহাতে বিরক্তি ক্রোধ প্রতিহিংসা বিদ্রূপ বা উপহাসের লেশ মাত্র নাই। চিঠিতে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য প্রাপ্তির এবং পরে আরও ঐরূপ সাহায্য পাইবার আটটি সর্ত্ত লিখিত আছে। যে-কেহ বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা দেয়, তাহার উহার ব্যয় সম্বন্ধে সর্ত্ত করিবার অধিকার আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তগুলির মধ্যে অষ্টমটি ছাড়া অন্যগুলি সাহায্যার্থ প্রদত্ত টাকার ব্যয় সম্বন্ধে নহে। এইজন্য ঐ-সকল সর্ত্ত করিবার অধিকার আইন-অনুসারে গবর্ণমেণ্টের আছে কি না, বিচার্য্য। এইরূপ অধিকার আছে, ইহা কোন আইনে লেখা নাই বোধ হয়। অন্যদিকে এমন কোন আইনের বিষয়ও আমরা অবগত নহি যাহাতে গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ সর্ত্ত করিতে বাধা দিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যখন কমিশন বসাইয়া একবার কার্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাহার আমূল পরিবর্ত্তনার্থ স্যাড্‌লার সাহেবের সভাপতিত্বে আর-একবার যে কমিশন বসাইয়াছিলেন তদনুসারেও পরিবর্ত্তন হইবে, তখন লোকহিতার্থ কোন সর্ত্ত বা অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের নাই, ইহা বলা কঠিন। আমেরিকার ব্যবস্থাতত্ত্বজ্ঞ (jurist) বুভিয়্যার (Bouvier) তাঁহার আইন অভিধানের প্রথম ভল্যুমের ৬৮৪-৫ পৃষ্ঠায় (pp. 684-5 of Bouvier's Law Dictionary, vol. i) লিখিয়াছেন :—

"A corporation is a creature of the State. It is presumed to be incorporated for the benefit of the public. It receives certain special privileges and franchises and holds them subject to the laws of the State and the limitations of its charter. Its powers are limited by law. It can make no contract not authorized by its charter. Its rights to act as

a corporation are only preserved to it so long as it obeys the laws of its creation. There is a reserved right in the legislature to investigate its contracts and ascertain if it has exceeded its powers."

তাহা হইলে আইনের দ্বারা সৃষ্ট কোন সমিতি বা সংঘ (corporation) যাহাতে তাহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না করে, বা কেবল লোকহিতার্থ ("for the benefit of the public") কাজ করে, তদ্বিধ সর্ত্তে তাহাকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতাও গবর্ণমেণ্টের আছে মনে হয়। ইংলণ্ডের মত স্বাধীন দেশে আইনসৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান বা সমিতির ক্ষমতা আইন দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও তাহা যথেচ্ছ কাজ না করিতে পারে; কারণ তথায় জনমত প্রবল। এদেশে জনমত প্রবল নহে। সুতরাং এখানে কিরূপ কাজ ক্ষমতাবহির্ভূত, (*ultra vires*), তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া ভাল।

"গবর্ণমেণ্টের কি সর্ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে বা নাই, তদ্বিষয়ে ঠিক্ মীমাংসা যাহাই হউক, আলোচ্য বিষয়ে যে আটটি সর্ত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সবগুলিই এরূপ, যে, বিশ্ববিদ্যালয় আগে হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তদনুসারে চলিলে খুব ভাল হইত, এবং চলা কঠিনও ছিল না। এখনও যদি সেনেট বলেন, যে, "গবর্ণমেণ্টের সর্ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে ইহা মানিয়া না লইয়া, ক্ষমতা আছে কি না তাহা আলোচনা করিবার অধিকার অব্যাহত রাখিয়া, আমরা ঐ সর্ত্তগুলি অনুসারে কাজ করিতে রাজী আছি," তাহা হইলে ভাল হয়। যদি সেনেট মনে করেন, যে, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই।

অষ্টম সর্ত্তটি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। উহা নিম্নলিখিত রূপ :—

"All arrears of salaries and at least half the amount of the examiners' remunerations amounting to Rs. 1,75,000 up to June 30, 1922, should be forthwith paid."

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, পরীক্ষকেরা এবৎসর একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ফী পান নাই। পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে পরীক্ষার ফী লওয়া হয়, প্রধানতঃ পরীক্ষা-কার্য্য সম্পাদন জন্য। অতএব পরীক্ষকদিগকে তাঁহাদের ফী দেওয়া প্রথমেই উচিত ছিল।* তাহা না দিয়া পরীক্ষার্থীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বহুলক্ষ টাকা অন্য কাজে ব্যয় করা, আইনের চক্ষে যাহাই হউক, ধর্ম্মনীতির চক্ষে সাময়িক পরস্বাপহরণ হইয়াছে। অধ্যাপকদের বেতনও, পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা এবং পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট ছাত্রদিগের প্রদত্ত বেতনের টাকা হইতে, ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া উচিত ছিল। এতদিন তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখা নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ, পরীক্ষার্থীদের ফীর একতৃতীয়াংশ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ছাত্রেরাও বেতন দেয় প্রধানতঃ অধ্যাপকদিগের বেতন দিবার নিমিত্ত।

—

হাওয়েল সাহেব ও ভাইস্-চ্যান্সেলার

সেনেটে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সেক্রেটারীর চিঠি সম্বন্ধে আলোচনার সময় কথা উঠে, যে, উহার বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য নিযুক্ত কমিটি যেন এক সপ্তাহ মধ্যে নিজ কর্ত্তব্য সমাপ্ত করেন। তাহাতে ভাইস্-চ্যান্সেলার বলেন, যে, তাহা অসম্ভব। তখন হাওয়েল সাহেব মুসাহেবী ধরণে কিছু বলিতে গিয়া একটা সত্য কথার আভাস দিয়া ফেলেন। যেমন একদা বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ ভাইস্-চ্যান্সেলারের পক্ষসমর্থন করিতে গিয়া বলিয়া ফেলেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কমিটি প্রভৃতির অধিকাংশ সভ্যের ভোট তাঁহার মুঠার ভিতর, হাওয়েল সাহেবের কথা হইতেও সম্ভবতঃ তেমনি একটা ভিতরের রহস্য বাহির হইয়া পড়ায় ভাইস্-চ্যান্সেলার উষ্মার সহিত উহার প্রতিবাদ করেন। ডাঃ হাওয়েলের কথার ষ্টেট্‌সম্যানের প্রতিলেখন (report) এই :—

"Dr. Howells said he did not accept the Vice-Chancellor's judgment that it was humanly impossible to get a report in a week. He knew what was possible to the Vice-Chancellor and he believed that if the Vice-Chancellor took the matter in hand a reply would be possible even in a week."

সম্ভবতঃ ইহা হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত কিছু হইয়াছিল বলিয়া ভাইস্-চ্যান্সেলার বক্তাকে তিরস্কার করিতে

বাধ্য হন। তিনি যাহা বলেন, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের তাহার প্রতিলেখন এই :—

"The Vice-Chancellor, referring to Dr. Howell's mention of his capacity for work, said, he repudiated the suggestion that this was his job. This concerned every one of the hundred members of the Senate and he assured them that he was the last man in the world to force his views upon them. He declined to have their support unless he knew that it was a representative and reasoned judgment on their part."

কোন কোন কাগজে ইহা অপেক্ষাও বেশী এবং জোরাল কথা আছে। সমস্ত পড়িয়া শেক্স্‌পিয়ারের ভাষা একটু বদ্‌লাইয়া বলা যায় কি,

"The *knight* doth protest too much, methinks." ?

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বৃহৎ ও মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, ইহার দোষগুলি দূরীভূত হইয়া তাহা যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, এবং যাহাতে ইহার উন্নতি হইয়া ইহা সকল দিক্ দিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইজন্য আমরা অনেকদিন হইতে ইহার সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। ইহা দ্বারা শিক্ষা-বিস্তার, জ্ঞান-বিস্তার, এবং জগতের জ্ঞানভাণ্ডার-পুষ্টির যে সাহায্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখও আমরা মধ্যে মধ্যে করিয়াছি। কিন্তু সমালোচনা তদপেক্ষা অধিক করিতে হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের ও বিদেশের অনেকের এই ধারণা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এবং আমাদেরও বিশ্বাস যেন তদ্রূপ। তাহা সত্য নহে। বঙ্গে শতকরা যত পরীক্ষার্থী পাস হয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাহা অপেক্ষা কম পাস্ হয়। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় পাস্ যত কম হয়, সে বিশ্ববিদ্যালয় তত ভাল কিম্বা তাহার ছাত্রেরা সেই তত অধিক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী, ১৫।—১৮ । অবশ্য, যেখানে শতকরা খুব বেশী ছাত্র পাস্ হয়, তাহাও যে সেই কারণেই খুব ভাল শিক্ষাকেন্দ্র (বা খুব মন্দ শিক্ষাকেন্দ্র) তাহাও সত্য নহে। আমাদের ধারণা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের প্রদর্শিত দোষ-সকল সত্ত্বেও ইহা হইতে পূর্ব্বে যত জ্ঞানবান্ ও প্রতিভাশালী ছাত্র পাস্ করিয়া বাহির হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন, ভারতবর্ষের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তত বা তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক ও অধিক পরিমাণে জ্ঞানবান্ ও প্রতিভাশালী ছাত্র পাস্ করিয়া বাহির হন নাই ও হইতেছেন না। তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি। মেকি গবেষণা হিসাবে না ধরিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খাঁটি গবেষণা যত হইয়াছে, ভারতের অন্যত্র তত হয় নাই; ইহার ছাত্র ও উপাধিধারীরা প্রকৃত গবেষণা যত করিয়াছেন, অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও উপাধিধারীরা তত করেন নাই। ইহার উপাধিধারীরা বঙ্গের বাহিরে গিয়া যত জন শিক্ষক ও অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের মধ্যে তত জন স্বপ্রদেশের বাহিরে শিক্ষকতা ও অধ্যাপকতা করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা কিম্বা ইহার বিদ্যালয় ও কলেজ-সকলে কতকদূর শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বঙ্গের সাহিত্যকে যে পরিমাণে পুষ্ট ও উন্নত করিয়াছেন, অন্য কোন প্রদেশের ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাঁহাদের প্রাদেশিক সাহিত্যকে তদ্রূপ পুষ্ট ও উন্নত করিতে পারেন নাই।

সমালোচনার কাজ আমরা অনেক করিয়াছি, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইলে করিব—যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের সম্ভাবনা দেখিয়া মনে হয়, যে, আগেকার মত বেশী সমালোচনা অতঃপর করিতে হইবে না। কিন্তু আমরা সমালোচক হইলেও এই ধারণা জন্মিতে বা বদ্ধমূল হইতে দিতে পারি না, যে, ইহার নানা দোষ থাকিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মোটের উপর, অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট, বা ইহা কম কাজ করিয়াছে বা করিতেছে।

চলন্ত অন্ধকূপ

সেই কবে বিদ্রোহী মোপ্‌লা বন্দীরা দরজাজানালা-বন্ধ মালগাড়ীতে দম আটকাইয়া মারা গিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্তব্য এতদিনে বাহির হইল। রীভ্‌ ও এণ্ড্রুজ্‌ নামক যে-দুজন রেল-কর্ম্মচারীকে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে দোষী স্থির করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রীভের মৃত্যু হইয়াছে, এবং এণ্ড্রুজ্‌কে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যে তিনজন উচ্চপদস্থ সর্‌কারী কর্ম্মচারী এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার দায়িত্ব কতটুকু, গবর্ণমেণ্ট তাহার আলোচনা করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের কাহাকেও দণ্ড দিবার প্রয়োজন স্বীকার বা চেষ্টা করেন নাই। বন্ধ মালগাড়ীতে বন্দী চালান সর্‌কারের মতে দোষাবহ হয় নাই! যদিও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে আলোচ্য দুর্ঘটনার সময়েই মালাবারের অন্যান্য বিদ্রোহসঙ্কুল অংশে খোলা গাড়ীতে বিদ্রোহী বন্দী লইয়া যাওয়া হইত এবং তাহার জন্য যথেষ্ট পুলিশও জুটিয়াছিল। যথা—

"We observe that rebel prisoners despatched after conviction from other parts of the district (*e.g.*, from Calicut and Cannanore) passed through the rebellion area in open carriages and that police were evidently available to furnish for them an escort of the necessary strength; and we cannot but think that if consideration had been given to the matter it would have been possible to find police to furnish similar escorts from Tirur."

চলন্ত অন্ধকূপ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট কারণ গবর্ণমেণ্ট দেখাইতে পারেন নাই; মন্তব্য এবং তদনুযায়ী আদেশও যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক হয় নাই। দুর্ঘটনার সময়ে মিঃ ন্যাপ (Knapp) মালাবারের স্পেশ্যাল কমিশনার ছিলেন; তাঁহাকে অনুসন্ধান-কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা উচিত হয় নাই। বন্ধ মালগাড়ীতে গোরু ভেড়া ঘোড়া প্রভৃতি পশুও কখন লইয়া যাওয়া হয় না; সুতরাং কোন অবস্থাতেই, বিদ্রোহী বা অন্য কোন গুরুতর দোষে অভিযুক্ত মানুষকেও ঐরূপ গাড়ীতে [illegible] যাওয়া উচিত নয়।

সি[illegible]জোলার আমলের অন্ধকূপহত্যা যদি বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, তাহা হইলেও ঐতিহাসিকেরা যেরূপ গালাগালি দিয়া [illegible] যোগ্য নহেন। সুতরাং ইংরেজদের লে[illegible] ইতিহাস হইতে সেই-সকল কটুকথা [illegible] উচিত। কিন্তু যদি ইংরেজেরা সিরা[illegible] সাব্যস্ত করিয়াই রাখেন, তাহা হইলে [illegible] এবং মালাবার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, স্পে[illegible] অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা কে[illegible] হইবেন না? মাকড় মারিলে ধোকড় হয়[illegible] দুর্ঘটনার পরেই অনেক কথা লিখিয়াছি[illegible] অনাবশ্যক ও নিষ্ফল। যাহার কোন [illegible] ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে লিখিতে লজ্জা[illegible]

অকালীদের প্রতি নিষ্ঠ[illegible]

শিখদিগের ধর্ম্মমন্দিরকে গুরুদ্বারা [illegible] হইতে পাঁচক্রোশ দূরে গুরু-কা-বাঘ (অর্থ[illegible] নামক স্থানে এইরূপ একটি মন্দির এবং [illegible] বাসগৃহ বাগান ও জমী আছে। এ[illegible] শিখ মহন্তের অধিকারে ছিল। যে[illegible] তেমনি পঞ্জাবেও, ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত অনে[illegible] হাতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহ[illegible] তাহার সদ্ব্যবহার করে না। এইজন্য [illegible] শিখরা গুরুদ্বারাগুলি ও তাহার সম্প[illegible] হাত হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের [illegible] হাতে দিতে চেষ্টা করিতেছেন। গুরুদ্বা[illegible] এইরূপ একটি কমিটি।

গুরু-কা-বাঘ মন্দির অকালীরা কিছু[illegible] করে। এখনও উহা তাহাদেরই দখলে [illegible] মেণ্ট তাহাতে বাধা দেন নাই। কি[illegible] বাসগৃহ বাগান ও জমী মহন্তের [illegible] গবর্ণমেণ্ট এই কথা বলেন। কিছুদিন [illegible] অকালী বাগান হইতে কিছু জ্বালানী [illegible] তাহারা উহা নিজের লাভের জন্য ক[illegible] লঙ্গর অর্থাৎ গুরুর অন্নসত্রে[illegible]

পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া চুরির অভিযোগে বিচারার্থ প্রেরণ করে, এবং তাহাদের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাহার পর হইতে অকালীরা দলে দলে নানাস্থান হইতে গুরু-কা-বাগে গিয়া বাগান হইতে অন্নসত্রের জন্য কাঠ কাটিবার অধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাইতে থাকে। তাহাদের যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য ও তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য এবং গুরু-কা-বাগে যাহারা কোন প্রকারে পৌঁছিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত পুলিশ অকালীদিগের প্রতি প্রহারাদি যত প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, তাহা অনেক দিন ধরিয়া খবরের কাগজে বাহির হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন বটে, যে, অকালীরা পুলিশকে আক্রমণ করিয়াছে; কিন্তু যদি নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া তাহারা দুই এক বার তাহা করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও মোটের উপর ইহাই সত্য, যে, যোদ্ধা ও বীর অকালী সম্প্রদায়ের লোকেরা মার খাইয়াছে কিন্তু মারে নাই। এখন, পুলিশের নানাপ্রকার অত্যাচারেও অকালীরা নিবৃত্ত না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের গুরু-কা-বাগ যাওয়াতে বাধা দেওয়ার সংকল্প ছাড়িয়া দিয়া মহন্তর অধিকারভুক্ত বাগান বাসগৃহ প্রভৃতির চারি ধারে কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া দিয়াছেন এবং কেহ অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে, ঘোষণা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে, শেষোক্ত ব্যবস্থাটি প্রথম হইতেই করা হয় নাই কেন? তাহা হইলে নিদ্রিত অকালীদিগকে প্রহার, তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য কেশ আকর্ষণ ও উৎপাটন, প্রহারের চোটে অনেকের গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি ও কাহারো কাহারো সংজ্ঞালোপ এবং অনেকের হাঁসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন, দেশব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি, ইত্যাদি হইত না। সরকারী কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন বটে, যে, অকালীদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ আবশ্যক তাহার বেশী কিছু করা হয় নাই। কিন্তু যাহারা অত্যাচার করিয়াছে ও করাইয়াছে বলিয়া অভিযোগ, ইহা তাহাদেরই কথা; গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র অনুসন্ধান দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সম্ভ্রান্ত লোক এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ সাক্ষ্য দিতেছেন।

যে মন্দির অকালীদের দখলে আছে, তাহারই সংলগ্ন সম্পত্তিও অকালীদের কি না, সে বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা হইতে পারে। মন্দিরের জিনিষ মনে করিয়া গুরুর অন্নসত্রের জন্য যদি অকালীরা জ্বালানী কাঠ কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সাধারণ চোরদের মত শাস্তি হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয়। হইতে পারে, যে, তাহাদের ভ্রম বা বিবেচনার ত্রুটি হইয়াছে। তাহার জন্য ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড অতি উৎকট শাস্তি। অপরের বা বন হইতে এমনিও অনেক সময় লোকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে। এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে, শিখ মন্দির, তাহার সংলগ্ন বাসগৃহ, বাগান, জমী, এই কয়টি জিনিষ পূর্ব্বে একই গুরুদ্বারার সম্পত্তি ছিল; মহন্ত ছিল তাহার সেবাইতরূপী স্বত্বাধিকারী। পরে মন্দিরটি অকালীরা দখল করে। গবর্ণমেণ্ট তাহা উহাদের দখলেই থাকিতে দেন, মহন্তকে তাহার দখল দেওয়াইয়া দেন নাই। সুতরাং যদি অকালীরা মনে করিয়া থাকে, যে, বাসগৃহ বাগান এবং জমীও মন্দিরটির মত ন্যায়তঃ শিখদের সাধারণ সম্পত্তি, প্রভেদ এইমাত্র, যে, তাহারা এখনও উহা দখল করিতে পারে নাই, এবং যদি সেই ধারণা বশতঃ উহারা কাঠ কাটিয়া থাকে, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে বেশী দোষ দেওয়া যায়, না তাহাদের কাহারও দাগী চোরের মত শাস্তি হওয়া উচিত হইয়াছে?

—

কমাল পাশার জয়

গাজী মুস্তাফা কমাল পাশার জয়ে ও গ্রীসের পরাজয়ে তুর্কদের প্রতি ইউরোপীয় "মিত্রশক্তি"-পুঞ্জের ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণের প্রতিকার হইবে। এখন ইংরেজ ও অন্যান্য "মিত্রজাতি"-গণ মহানুভব সাজিবার সুযোগ পাইবেন। পরদেশাধিকারী পাশ্চাত্য জাতিদের ইহা একটা মহৎ গুণ, যে, যখন তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ন্যায়পরায়ণ হইতে বাধ্য হন, তখন তাঁহারা নানাপ্রকার দলিল বাহির

করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন, যে, অস্ত্র ব্যবহার করিবার মৎলব তাঁহাদের অনেক আগে হইতেই ছিল, এবং তাঁহারা তাহার বন্দোবস্তও করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া তাহা করিতেছেন।

হিংসুটে, পরশ্রীকাতর ও পরধনলোলুপ নহেন, এরূপ মানুষ অনেক আছেন; কিন্তু এরূপ জাতি আছে কি না বলা কঠিন, যাহারা তাহাদের ইতিহাসে কখনও ঐ-সকল দোষের দৃষ্টান্তস্থল হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের পরস্বাপহারী জাতিদের ঐ দোষ খুব দেখা যায়। তাঁহারা পৃথিবীর সব মহাদেশে ডাকাতি ও প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইবে, অথচ লোককে স্বীকার করিতে বলিবে, যে, তাহারা অসভ্য জাতিদিগকে সভ্য করিবার জন্য তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে! কিন্তু বহুশতাব্দী পূর্ব্বে তুর্করা এশিয়া হইতে গিয়া যে ইউরোপের অনেক দেশ জয় করিয়াছিল ও তাহার কোন কোন স্থানকে তাহারা স্বদেশে পরিণত করিয়াছে, ইহা ইউরোপের জাতিদের কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তাহারা চায়, যে, ইউরোপে প্রাচ্যদেশোদ্ভব অখৃষ্টিয়ান কোন জাতি যেন না থাকে, অন্ততঃ সেরূপ কোন জাতি তথায় স্বাধীন ও প্রবল না থাকে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। পৃথিবীতে কোন দেশের অধিবাসী এমন কোন জাতি নাই, যাহারা আদিমকাল হইতে ঐ দেশের অধিবাসী ও মালিক। প্রাগৈতিহাসিক স্মরণাতীত কাল হইতে একজাতি অন্য জাতিকে জয় করিয়াছে, একজাতি স্বদেশ ছাড়িয়া গিয়া অন্য দেশে আড্ডা গাড়িয়াছে। সুতরাং এখন "তোমরা নিজের দেশে ফিরিয়া যাও," বা "তোমরা আগন্তুক, অতএব আমাদের অধীন হও," সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র এই নিয়ম খাটাইবার উপায় নাই। যাহাদের স্থায়ী বাসস্থান কোনও প্রকারে পুরুষানুক্রমে কোন দেশে হইয়াছে, তাহাদিগকে তথাকার অধিবাসী বলিয়া মানিতেই হইবে।

খৃষ্টিয়ান ইউরোপীয়েরা বলেন, যে, তাঁহারা অখৃষ্টিয়ান এশিয়া ও আফ্রিকার অসভ্য লোকদের মধ্যে সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন। যখন মধ্যযুগের পূর্ব্বে ইউরোপে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের খুব প্রাদুর্ভাব, তখন এশিয়া হইতে মুসলমানেরা গিয়া ইউরো[পে] জ্ঞান বিস্তার করিয়াছিল। এখন [...] প্রায়ই এই অভিযোগ শুনা যায় [...] খৃষ্টিয়ান আর্মেনিয়ান ও গ্রীকদিগকে সংহার করে। কিন্তু গ্রীকদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ অনেকবার শোনা গিয়াছে। খৃষ্টিয়ান জাতিরা এ পর্য্যন্ত কত কোটি [...] এবং মুসলমান জাতিরাই বা কত মা[...] হিসাব প্রস্তুত করিলে এ বিষয়ে [...] জাতিরাই বেশী দক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হই[বে]।

যাহা হউক, এখন ইউরোপের [...] যে, তুর্ক ও অন্যান্য মুসলমানদের [...] আছে, সম্ভবতঃ তাহারা খৃষ্টিয়ানদের আ[...]

—

স্যার্ বিঠলদাস দামোদর ঠা[কর্সী]

স্যার্ বিঠলদাস দামোদর ঠাকর্সী বো[ম্বাইয়ের] প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি [...] ছিল। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা[...] বাণিজ্যনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহা[...] ছিল। কিন্তু তিনি সামাজিক হিতসাধন [...] নারীজাতির কল্যাণের জন্য, যে লক্ষ [...] করিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রধান [...] মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পনের লক্ষ টা[কা] এই দান এবং এইরূপ আরও লক্ষাধিক [...] তিনি জীবিতকালেই করিয়া যান। তাঁহা[র] জননী শ্রীমতী নাথীবাঈর স্মৃতি তাঁহাকে কল্যাণার্থ দানে অনুপ্রাণিত করিত। অ[...] বৎসর বয়সে এরূপ মানুষের মৃত্যুতে ভার[তের] ক্ষতি হইয়াছে।

—

গ্রামবাসী ও ডাকাইতদের

কিছুদিন আগে মেদিনীপুর ও ঢাকা [...] গ্রামে ডাকাইত পড়ায় গ্রামবাসীরা [...]

দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। যেখানে, ডাকাইতী হইবে, সর্ব্বত্রই এইরূপ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

—

অসবর্ণ ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর বিবাহ আইন

হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ যাহাতে আইন অনুসারে বৈধ বলিয়া গণিত হয়, তজ্জন্য আইন পাস্ করাইবার চেষ্টা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও তৎপরে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল করিয়াছিলেন। গোঁড়া এবং গোঁড়ামির ভানকারী লোকদের বিরোধিতায় তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই। তৃতীয় বার চেষ্টা করিতেছেন, শ্রীযুক্ত হরি সিং গৌড়। তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিবাহ সিদ্ধ হইবার ধারাও আছে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে, যদি তাহাতে মুসলমানদের অনতিক্রম্য প্রবল আপত্তি দেখেন, তাহা হইলে আইনটি কেবল হিন্দুদের অনুলোম প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহেই আবদ্ধ রাখিবেন। তাঁহার খসড়ারও বিরোধিতা হইতেছে। যাহা হউক, উহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় নাই। উহার কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা স্থির করিবার জন্য, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত সিলেক্ট কমিটির নিকট উহা পেশ হইয়াছে। ৩৩ জন সভ্য ইহার বিপক্ষে এবং ৩৪ জন পক্ষে ছিলেন।

আমরা এইরূপ আইনের সমর্থক। ইহা কাহাকেও অসবর্ণ বিবাহ করিতে বা ভিন্নধর্ম্মীকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে চায় না। ইহা কেবল তদ্রূপ বিবাহকে বৈধ করিতে চায়। গোঁড়া লোকদের মানুষের এই স্বাধীনতা লাভের বিরোধী হওয়া উচিত নহে। এরূপ স্বাধীনতা সকল সভ্য দেশেই আছে।

—

কমিশনার-পদপ্রার্থী রজক

চুঁচুড়ায় একজন রজক মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পদপ্রার্থী হইয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ। যে-কোন ব্যক্তির সময় ও শক্তি আছে, এবং যিনি তাহা লোকহিতার্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, শ্রেণী ও জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহারই তাহা করিবার সুযোগ থাকা উচিত। বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় নমঃশূদ্র, চর্ম্মকার ও শকটবান্ সভ্য আছেন। মিউনিসিপালিটি-সকলেও সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকা উচিত।

—

রেলওয়ে ট্রেনে খাইবার গাড়ী

রেলওয়ে ট্রেনে যেমন ইউরোপীয়দের খাইবার গাড়ী আছে, দেশী লোকদের জন্যও সেইরূপ একটি গাড়ী রাখিবার নিমিত্ত মাড়োয়ারী সভা প্রস্তাব ও আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা চান। দুধ ঘিকে নিরামিষ মনে করা হয়। প্রস্তাবটি ভাল।

—

ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা

ঘোড়দৌড়ে বিশেষ বিশেষ ঘোড়ার উপর বাজী রাখিয়া জুয়া খেলার খুব চলন আছে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর প্রথা, যদিও লাটসাহেবরা পর্য্যন্ত ইহার প্রশ্রয় দেন ও এই খেলা খেলেন। সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী যুবক এই খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় সস্ত্রীক আত্মহত্যা করিয়াছে। ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। যে-সব খবরের কাগজে এই খেলাসম্বন্ধে সঙ্কেতাদি বাহির হয়, তাহারা দেশের শত্রু। রেঙ্গুনের বিশপ তথাকার ঘোড়দৌড়ের ক্লাবের দান অন্ধ ও কালা-বোবাদের সাহায্যার্থ প্রথমে লইয়াছিলেন। পরে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হওয়ায় উহা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। ঠিক করিয়াছেন। পাপের টাকা লইলে পরোক্ষভাবে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যাহারা গর্হিত কাজ করিয়া টাকা রোজগার করে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পাপ-পথ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তখন সৎকর্ম্মে ব্যয়ের জন্য তাহাদের দান লওয়া যাইতে পারে।

—

মজার জন্য মানুষ খুন

কয়েক মাস আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নরহত্যার বিচার হয়। দুইজন গোরা মদ খাইতেছিল।

তখন তাহারা বলে, "এস, আমরা কাহারো দফা শেষ করি।" এই বলিয়া তাহারা নিকটস্থ এক দর্জির দোকানের বারাণ্ডায় যায়, এবং ঈটন নামক গোরা নেহ্‌তা চৌকিদারকে ঘুষি লাথি মারিতে থাকে। তাহার পর ঈটন বলে, "উহাকে একদম শেষ করিয়া ফেলা যাক্।" এই বলিয়া, সঙ্গী সৈনিকের নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও সে একটা বড় ছোরা লইয়া নেহ্‌তাকে আঘাত করিতে থাকে। তাহার পর, "মরা মানুষ কোন অভিযোগ করিতে বা খবর দিতে পারে না," এই বলিয়া দুজনে মিলিয়া তাহাকে একটা কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। বিচারে জুরী ঈটনকে নরহত্যা-অপরাধী বলিয়া রায় দেয়, কিন্তু দয়া দেখাইতে অনুরোধ করে। তাহার ফাঁসীর হুকুম হয় কিন্তু আগ্রা-অযোধ্যার লাট তাহাকে ফাঁসীর পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়াছেন। দয়াতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু শাদা চাম্‌ড়া হইলেই কেন ফাঁসী হয় না?

কোন ঝগড়া বিবাদ উত্তেজনার কারণ ব্যতিরেকে, কেবল মজা করিবার জন্য, মানুষ খুন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের দেশের অতি অধম লোকদের মধ্যেও দেখা যায় না। ঈটনের মত জন্তু যে সমাজে ও দেশে আছে, তাহাদের সভ্য হইবার প্রয়োজন আছে। আমরাও এমন পতিত হইয়াছি, যে, কখন কখন কেহ খুন করিতে আসিলেও কেহ কেহ তাহাতে পর্য্যন্ত বাধা দিতে চেষ্টা করিতেও পারে না।

"অস্পৃশ্যে"র সহিত প্রকৃ

আহমদাবাদের শবরমতী নামক সত্যাগ্রহ-আশ্রমে অনেক যুবক চরখ তাঁতে কাপড় বোনা শিক্ষা করে। কতকগুলি ছাত্র রাস্তা দিয়া যাইতে একটা বিষ্ঠাপূর্ণ ময়লা-ফেলা চলন্ত প্রায় খুলিয়া পড়িয়াছে, এবং উহা খু গাড়ীটা হইতে ময়লা রাস্তাময় ছড়াইয় মেথর দুজন ভারী গাড়ীটার একা চাকাটা পরাইয়া খিল লাগাইয়া দিতে তখন ছাত্রগুলি আস্তীন গুটাইয়া বে বিষ্ঠাপূর্ণ গাড়ী তুলিয়া ধরিল এবং হইল। এই ছেলেগুলির মনুষ্যত্ব ও প্রশংসনীয়। ইহারা নমস্য, এবং মহ শিষ্য।

—

আমাদের শারদীয়

শারদীয় ছুটি উপলক্ষ্যে প্রবাসী-ব হইতে ২১শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকি দিন কোন কাজ হইবে না।

পল্লীসংস্কার সমস্যা

সেদিন এক বৈঠকে শোনা গেল, ভারতবর্ষের উপেক্ষিত জাতিদের ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে তার ফল ভাল হবে না। যিনি বল্‌লেন, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর বাড়ী—সে অঞ্চলের নানা স্থানে নমঃশূদ্রেরা দল গঠন করে' তাদের দুর্গতি ও দৈন্য ঘোচাবার চেষ্টা কর্‌চে; আর তারা ব্রাহ্মণকে মান্‌তে চায় না, এমন কি বর্গা স্বত্বে ব্রাহ্মণের জমি পর্য্যন্ত চাষ কর্‌তে রাজি নয়!

তারপর সামাজিক পীড়ন অসহ্য বোধ করে' অনেকে খৃষ্টান পাদ্রীদের হাতে গিয়ে পড়্‌চে দিত হয়ে এরা হিন্দুসমাজ থেকে খেদ ছিল না, কেননা সেখানে মানু চিত্তবৃত্তি যে বিশ্বাসের আশ্রয়ে বি সেই হচ্চে তার অধ্যাত্মজীবনের ভি

কিন্তু উপেক্ষিত ঘৃণিত হয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌চে বলেই ত আমাদের সমাজের অঙ্গহানি হচ্চে।

পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষতঃ ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের বিল অঞ্চলে বহুসংখ্যক নমঃশূদ্রের বাস। ইহারা "চণ্ডাল" বা "চাঁড়াল" নামে অভিহিত। অধিকাংশই কৃষিজীবী, জমিদারের জমি খাজনা নিয়ে তাতে চাষবাস করে' খায়। এরা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। ভূস্বামীর বিপদ-আপদে এরা প্রাণপণ সাহায্য করে। সব দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যায় এদের সহযোগিতা না পেলে পল্লীর আর্থিক স্বার্থও বজায় থাকে না। অথচ এদেরই অস্পৃশ্য বলে দূরে রাখা হয়েছে! এদের শিক্ষিত করবার দায়িত্ব সমস্ত পল্লীসমাজের, কিন্তু সমাজ তা করেনি। শিক্ষিত জাত্যাভিমানী হিন্দু এদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে পুষ্ট হয়েও এদের দিকে তাকায় না। আজ যখন সমগ্র দেশে জাতীয়তার কথা উঠেছে, তখনও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের উন্নতিসাধনের প্রস্তাবটা চাপা রাখ্‌বার চেষ্টার উদয় হয়েছে এই বাংলা দেশে।

এদিকে রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য আন্দোলনের বিরাম নেই। কেউ কেউ বলেন, স্বরাষ্ট্রের অধিকার পেলে ভারত-বর্ষের বিচিত্র জাতিরা এক হয়ে উঠ্‌তে পারবে—তাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকবে না। যিনি দেশনায়ক, মহাত্মা গান্ধিজী, তিনি কিন্তু বলেন,—ছোঁয়াবসা নিয়ে যে পাপ আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে, তার স্খালন না হলে "স্বরাজ" মিল্‌বে না। তিনি কি অর্থে 'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করছেন, এই নিয়ে তর্ক উঠেছে। জাতি-গত বৈষম্য দূরে হলেই ইংরেজশক্তি আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে এমন আশা করা যায় না,—তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হলে আমাদের কর্ম্মচেষ্টা দানা বেঁধে উঠবে, আমরা ভারতবর্ষকে গড়বার সুযোগ পাব। কিন্তু কেবল রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে কি এই প্রভেদ, বৈষম্য ঘুচান যাবে? বাইরের দিক্ থেকে মিল্‌তে পারা বরং সহজ। চাই মন অনুভূতি যার কেন্দ্র হচ্চে অন্তরের মাঝখানে; সেখান থেকে মিলনের বীজ সংগৃহীত হলে তবেই সুফল ফল্‌বে। আর বাইরের আয়োজনের উপর ভর করে' এই জাতিগত বৈষম্য দূর করতে যাই, তবে কিছুতেই সামঞ্জস্য ঘটবে না।

কি করলে এ সমস্যার সমাধান হবে এই প্রশ্ন আজ আমাদের মনে এসেছে। পল্লীসংস্কারের কাজে যাঁরা ব্রতী হতে ইচ্ছুক, তাঁরা এই-সব না ভেবে চিন্তে কাজে নামলে পদে পদে ঠেক্‌তে হবে; কেননা জাতিগত বৈষম্য সহরে নানা কারণে তেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু পল্লী-সমাজে এর প্রকাশ এতই সুস্পষ্ট যে চল্‌তে ফির্‌তে উঠ্‌তে বস্‌তে জাতের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয়।

বেহালার নিকট প্রায় তিন শ' ঘর মুসলমান নিয়ে একটি পল্লী আছে। এরা সাউথ সুবার্বন্ মিউনি-সিপ্যালিটির মধ্যেই বাস করে; কিন্তু এদের পল্লীর অবস্থা সব-চেয়ে শোচনীয়, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্রামের কয়েকজন মিলে বছরখানেক হ'ল একটি পাঠশালা খুলেছে—তারই একজন মৌলভী প্রায়ই আমার কাছে যাতায়াত করেন। একদিন তাঁর সম্মুখে জলপান করে' পিপাসা মিটিয়েছিলাম এই অপরাধে তিন দিনের মধ্যে ঝি চাকর বিদায় নিলে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, গাঁয়ের সাত্ত্বিক হিন্দুরা চোখ রাঙিয়ে ঝি-চাকরদের জাত রক্ষা করেছেন!

তারপর পল্লীসংস্কারের পত্তন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়ে যে উপদেশ লাভ করলাম, তাতে বোঝা গেল পল্লীসমাজের ঐক্য-সূত্রগুলি ছিন্ন হয়ে গেছে। কি-ভাবে কাজে হাত দিলে পল্লীসমাজটাকে পুনরায় গড়ে' তোলা যাবে এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চল্‌ছে। একদিন হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার প্রধান ভক্ত আমাকে ডেকে বললেন, "যা-ই করুন, মশায়, ব্রাহ্মণধর্ম্ম বজায় রেখে করবেন। এ গ্রাম হচ্চে ব্রাহ্মণ-প্রধান; এখানে অনাচার চলবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "ব্রাহ্মণধর্ম্ম মানে কি?" তারপর এই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক চলল। কিছুদিন পরে ছেলেদের মুখে শুনলাম, আমরা যে এখানে দুঃস্থ দরিদ্র আতুরকে ঔষধপথ্য দিচ্ছি, গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করছি, পাঠশালা ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করছি, চরকা তাঁত চালিয়ে কুটীরজাত শিল্পের প্রচলন করছি, এ-সব কাজের মতলব হচ্চে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, এর মধ্যে স্বদেশপ্রীতি বা হিতৈষণা লেশমাত্র নেই।

খোঁজ নিয়ে দেখলাম, এ-যাবৎ এই পল্লীতে যে ছুই-একটা সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে, মুসলমান ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের তার মধ্যে আহ্বান করা হয়নি। এদের হিসাবের বাইরে রেখে কেমন করে' স্বরাজ-সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে এ আমি ভেবেই পাইনে। বারম্বার এই পল্লীর কর্ম্ম-চেষ্টার মধ্যে দেখা গেছে যে এদের দূরে রেখে কাজ করবার চেষ্টা সফল হয়নি, হতেও পারে না।

বাংলাদেশে হিন্দুসংখ্যা ১৯১১ সালের গণনায় পাওয়া যায়, দুই কোটি নয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত উনআশী। তার মধ্যে বাগ্দী দশ লক্ষ, বাউরী ছয় লক্ষ, গোয়ালা উনচল্লিশ লক্ষ, নমঃশূদ্র উনিশ লক্ষ, রাজবংশী উনিশ লক্ষ, কোচ সওয়া লক্ষ, জেলে কৈবর্ত্ত তিন লক্ষ, মালো আড়াই লক্ষ, তিয়র দুই লক্ষ, মুচি সাড়ে চার লক্ষ, ধোপা ছয় লক্ষ, কাপালী দেড় লক্ষ, সূত্রধর দেড় লক্ষ, কুমার আট লক্ষ। অর্থাৎ এক কোটি তেইশ লক্ষের উপর জনসংখ্যাকে আমরা হিসাবের বাইরে রাখতে চাই! কিন্তু কিছুতেই এদের বাদ দিয়ে পল্লীসমাজের পুনর্গঠন সম্ভব হবে না।

যে কারণে আমাদের কাজ এত জটিল ও দুঃসাধ্য বলে' ঠেকছে তার গোড়াটাও হচ্চে এই। শিক্ষায় দীক্ষায় ও জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এত বেশী, যে, কোনো-একটা ক্ষেত্র পাওয়া যাচ্চে না যেখানে এদের নিয়ে বর্ত্তমানকালের উপযোগী একটি কেন্দ্র গড়ে' তোলা যায়। গ্রামে ঘরে ঘরে নবান্নের আয়োজন হয়; আমি প্রস্তাব করেছিলাম, কোনো স্থানে সবাই মিলে নবান্নোৎসব করা হোক। অতি কষ্টে কয়েকজনকে একত্র করা গেল, কিন্তু যাদের চিরকাল দূরে ঠেকিয়ে রাখা গেছে, তারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সাহস পেলে না। সমবায় প্রণালী অনুযায়ী টাকা কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের উপর এদের ভরসা নেই। অর্থাৎ পল্লীর মধ্যে যে ঐক্যসূত্র (Homogeneity) খুঁজছিলাম, দেখা গেল, "ভদ্রলোকের" সৌরাজ্যে তা মেলা ভার। অতএব এখন দেখা দরকার, একটা একটা শ্রেণী, যারা একই ধরণের কাজ করে, যাদের আচার-অনুষ্ঠান একরকম, তাদের নিয়ে স্থাপন করা যায় কি না। এই ভাবে এক-একটা দল) নিয়ে কাজ সুরু না পাওয়া যাবে না। এই গ্রামের মুচি... একসঙ্গে থাকে—কোনো সুব্যবস্থা দ্বারা ব্যবসাটার উন্নতি করতে পারলে এদে কাজ করবার ভিত্তি অনায়াসেই পাওয় বাঁধন দিয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এমনি interests পাওয়া গেলে তারপর স ক্ষেত্র মিলতে পারে।

অতএব যাঁরা পল্লীসংস্কারের কাজে হ তাঁরা সব-প্রথমে যেন প্রত্যেক বিভিন্ন অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেন। আর্থি এ যেন মনে না করি, যে, দু-একটা সমবা করা বা চাষীদের কিছু ভাল বীজ বি তাঁতির কাপড়গুলা সহরের পাইকারের ব্যবস্থা করা। আধুনিক ব্যবসাবাণিজ্যে সুবিধাই এরা পাবে এমন চেষ্টা করতে ব্যবসাটা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের রপ্তানী সওদাগরদে অংশে খাটো নয়,—অতএব বর্ত্তমানকা সুযোগ সুবিধা সওদাগরের আছে, কৃষি কেন বঞ্চিত হবে? তারপর, হয়ত দেখা উপর এরা যতজন জীবিকানির্ব্বাহ কর সে-জমিতে সেই পরিমাণ ফসল ফলে না এদের জন্য অন্য পথ খুলে দেবার আয়োজ হবে।

যাই হোক্, কোন্ প্রণালী অবলম্বন ক জাতির মধ্যে পল্লীসংস্কারের কাজে হাত বলে' মনে হয়, তাই বলা হল। এই প্র বলতে চাই যে অনাচরণীয় সম্প্রদায়কে কি (by instalments) জাতে তুলে আনবা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভায় গৃহীত হয়েছে অস্পৃশ্যতার পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে নিম্নশ্রেণীর ছোঁয়া জল গ্রহণ করা থেকে নাকি হবে—কিন্তু কিস্তি খেলাপ হলে কি করা যা